৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিকপত্র

নবম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ ১৩২৮—জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

সম্পাদক—শ্রীজলধর সেন

প্রকাশক—

গুরুদাস [illegible] এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বহুবর্ণ চিত্র

কৈলাস। নারী প্রকৃতি।

জ্যৈষ্ঠ—১৩২৯

বহুবর্ণ চিত্র

দুর্ব্বাসার অভিশাপ। নিদ্রিতা।

কেন এত ফুল তুলিলি সজনি !

শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু

Emerald Ptg. Works, Calcutta

Blocks by - BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.

পৌষ, ১৩২৮

দ্বিতীয় খণ্ড] নবম বর্ষ [প্রথম সংখ্যা

মনের ঘাত-প্রতিঘাত

[শ্রীসরসীলাল সরকার এম-এ, এল-এম-এস]

সূক্ষ্ম ঘটনাবলী আমাদের জীবনের অনেক কার্য্যকে এরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে, তাহাদের প্রভাব জীবনের প্রধান ও বিশেষ ঘটনার তুলনায় অনেক স্থলেই অধিক বলিয়া বোধ হয়। বড়-বড় কবি, নাটক ও উপন্যাস-লেখক তাঁহাদের গল্পের নায়ক-নায়িকা প্রভৃতির চরিত্র-বিশ্লেষণের মধ্যে মনের এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাত সুনিপুণ ভাবে অঙ্কিত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দৈনন্দিন ঘটনার দিকে লক্ষ্য করিলে, এই শ্রেণীর বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম ঘটনার প্রভাব, জীবনের প্রধান ও বিশেষ ঘটনার প্রভাব অপেক্ষা অনেক স্থলে এত অধিক হয় কেন, তাহা চিন্তার ও বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিবার বিষয়।

অধুনা ডাক্তার ফ্রয়েড্ (Dr. Freud), ডাক্তার ইয়ুং (Dr. Yung) প্রভৃতি মনীষিগণ মনস্তত্ত্বের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য আবিষ্কার করিয়া আমাদের মনের ব্যাপারের রহস্য উদ্‌ঘাটনের একটি নূতন পন্থা দেখাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে আমরা মানসিক ক্রিয়া সম্বন্ধে যতটা বুঝিতে পারিতাম, এক্ষণে এই আবিষ্কারের সাহায্যে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বুঝিতে পারি। যাহা হউক, ডাক্তার

ফ্রয়েড (Dr. Freud) ও ডাক্তার ইয়ুংএর (Dr. Yung) মনস্তত্বের আলোচনা সম্বন্ধে বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। দৈনন্দিন জীবনে মনের উপর সূক্ষ্ম ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের প্রভাব কতকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবারই চেষ্টাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

(১) খুলনার দুর্ভিক্ষের কথা কাহারও অবিদিত নাই। ডাক্তার পি. সি. রায়ের চেষ্টায় এই দুর্ভিক্ষের অবস্থা জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হইয়াছে। অনেককাল পূর্ব্ব হইতেই এই দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। এই দুর্ভিক্ষের জন্য একটি দুস্থ লোক উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছিল। সকলে বুঝিল—এই লোকটি খাদ্যের অভাবে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছে। অবশ্য এ কথাটি অনেক পরিমাণে সত্য বটে; কিন্তু আত্মহত্যা প্রভৃতি কার্য্যের কারণ সম্বন্ধে কিছু সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করিলে, অধিকাংশ স্থলেই একটি স্থূল কারণের অন্তরালে একটি সূক্ষ্ম কার্য্যের প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। এ স্থলেও বোধ হয় সেইরূপ একটা সূক্ষ্ম কারণ ছিল। ঘটনাটি এইরূপ।

যে লোকটি আত্মহত্যা করে, সে কোনও হিন্দু-পরিবারের উপার্জনক্ষম লোক। ঘরে কিছু সংস্থান নাই দেখিয়া, সে একটি মাদুর বুনিয়া ফেলে। সেই মাদুর এক মহাজনের নিকট বিক্রয়ের জন্য লইয়া যায়। মহাজন অতি অল্প মূল্য ধার্য্য করিয়া উহা ক্রয় করিল বটে, কিন্তু তাহার অনেক কাঁদাকাটি সত্ত্বেও, নগদ কিছু পয়সা না দিয়া, পূর্ব্বের ধারের বাবদ সমস্ত মূল্যই কাটিয়া রাখে। তখন সে নিরুপায় হইয়া, অন্যত্র ভিক্ষা করিয়া, চাল সংগ্রহ করিয়া বাড়ীতে ফিরিল এবং অন্ন প্রস্তুত করিবার জন্য সেই চাল উনুনে চড়াইয়া দিল। ভাত সিদ্ধ হইতেছে, এমন সময়ে সে শুনিতে পাইল যে, তাহার দুই ভাই আনন্দিত ভাবে গল্প করিতেছে। সর্ব্বকনিষ্ঠ ভাইটি বলিল যে, আজ সে পেট পুরিয়া ভাত খাইবে। অপর ভাই বলিল যে, পেট পুরিয়া ভাত খাওয়া হইবে কি করিয়া? এই ভাত তো সকলের ভাগ করিয়া খাইতে হইবে। এই কথা শুনিয়াই তাহাদের বড় ভ্রাতা (যে চাল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল) বাহিরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, সে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে।

এখন তাহার উদ্বন্ধনের কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করা যাউক। আমাদের বোধ হয় লোকটি যে ঠিক অন্নাভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহা নহে। কারণ, ভবিষ্যতে তাহাদের ভাগ্যে যাহাই থাকুক, উপস্থিত কিছু অন্ন তো তাহাদের জন্য প্রস্তুতই হইতেছিল। মহাজনের নিকট মাদুর বেচিতে গিয়া যে ব্যবহার সে তাহার নিকট পাইয়াছিল, সে কথা কাঁটার মত তাহার হৃদয়ে বিঁধিয়া ছিল। সে যখন অতি ক্ষুধার্ত্ত, তখনই সে মাদুর লইয়া মহাজনের শরণাপন্ন হয়। মহাজন মাদুরের মূল্য না দিয়া, তাহাকে একপ্রকার মুখের অন্নের গ্রাস হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। কারণ, এই মাদুরের মূল্য ভিন্ন তখন লোকটির অন্য সংস্থান ছিল না। যখন তাহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভাই পেট পুরিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিতেছিল, এবং আর এক ভাই তাহার এই সুখের চিন্তায় বাধা দিয়া বুঝাইয়া দিল যে, সকলের খাইতে হইলে পেট পুরিয়া খাইবার সম্ভাবনা নাই,—তখনই সেই মহাজনের অতি নৃশংস ব্যবহার তাহার স্মৃতিপথে পুনরাবির্ভূত হইয়াছিল, এবং তাহার মনে হইয়াছিল—"আমিও কি ছোট ভাইটির প্রতি ঠিক মহাজনের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি না? তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছি না? আমি যদি এই অন্নের ভাগ না লই, তাহা হইলে তো ইহার মনের ইচ্ছা পূরণ হইতে পারে।" ফলতঃ, সেই মহাজনের ব্যবহার তাহার নিকট এরূপ ঘৃণ্য ও বীভৎস বোধ হইয়াছিল যে, সে মনে করিল, এইরূপ ব্যবহার করা অপেক্ষা প্রাণ পরিত্যাগ করাও শ্রেয়ঃ; এবং কার্য্যতঃ সে তাহাই করিয়াছিল।

যদিও আইনমতে ঐ মহাজন এই মৃত্যুর জন্য কোনও রূপে দায়ী নহে—তবুও বোধ হয় বিধাতা-পুরুষ—যিনি সকলের কর্ম্মের বিচার করিয়া ফল ভাগ করিয়া দেন—তিনি এই নরহত্যার জন্য মহাজনকে দোষী না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

(২) অনেক দিন পূর্ব্বের ঘটনা বলিতেছি। তখন ঢাকার নবাব সাহেবের একজন সাহেব ম্যানেজার ছিল। যে কোনও কারণেই হউক, কোন এক দুর্ব্বৃত্ত, দুঃস্বভাব মুসলমান এই সাহেব ম্যানেজারের প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। এই মুসলমানটি এক নির্জ্জন স্থানে একটি লোককে দা দিয়া কাটিয়া খুন করে। ঘটনা-চক্রে হঠাৎ সেই স্থলে আর একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়া, ব্যাপার দেখিয়াই চমকিত হয়। এই দুর্ব্বৃত্তটি তাহার মাথায় দায়ের একটি আঘাত করিয়াই

পলাইয়া যায়। আহত লোকটি অদ্ভুত অবস্থায় তথায় পড়িয়া থাকে। এই ঘটনা লইয়া ঢাকা সহরে বিশেষ একটা হুলস্থূল (sensation) পড়িয়া যায়।

এই আহত ব্যক্তিটিকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আনা হইলে, ঢাকার কয়েকজন প্রধান লোক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে বলেন যে, এই লোকটিকে হাসপাতালে সাধারণ ওয়ার্ডে রাখা নিরাপদ নহে। কারণ, এই আহত ব্যক্তিটি সুস্থ হইয়া উঠিলে, খুনী মোকর্দ্দমার একজন প্রধান সাক্ষী হইবে। সুতরাং, যখন একপক্ষের স্বার্থ এই লোকটি না বাঁচে, তখন, এরূপ স্থলে ইহাকে হাসপাতালে সাধারণ রোগীদের মধ্যে রাখা নিরাপদ নহে। ইহা শুনিয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আহত ব্যক্তিটির জন্য পৃথক্ ঘরের ব্যবস্থা করেন; এবং একজন প্রবীণ ডাক্তার ও জনকয়েক ছাত্র নির্ব্বাচন করিয়া নিয়ম করিয়া দেন যে, এই ডাক্তার ও নির্ব্বাচিত ছাত্রগণ ভিন্ন আর কেহই তাহার ঘরে যাইতে পারিবে না। ছাত্রদের মধ্যে দুইজন কিংবা একজন করিয়া duty মত তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, সেবা-শুশ্রূষাদি সকল কার্য্য যত্ন সহকারে করিবে।

এইরূপ নিয়মে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। আহত ব্যক্তিটির প্রথমতঃ জীবনের আশা খুব অল্প থাকিলেও, সেবা-শুশ্রূষার গুণে সে ক্রমে-ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময়ে একদিন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অনুপস্থিতিকালে ঢাকার নবাব-সাহেবের সাহেব ম্যানেজার, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশের (Superintendent of Police) এর সঙ্গে হাসপাতালে আসেন। তখন একজন মিলিটারি এসিস্ট্যান্ট সার্জ্জন এবং দেশীয় সব্-এসিস্ট্যান্ট সার্জ্জন হাসপাতালের dutyতে ছিলেন। Superintendent of Police ও নবাব সাহেবের ম্যানেজার Military Asst. Surgeonকে বলেন যে, তাঁহারা মোকর্দ্দমার তত্ত্বাবধানের জন্য আহত ব্যক্তিটির সহিত দেখা করিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। গোরা ডাক্তারটি দেশীয় ডাক্তারের সহিত এই সাহেব-দুটিকে আহত ব্যক্তিটির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। রোগীর কক্ষে সাহেবদ্বয় ঢুকিবার চেষ্টা করিলে, যে ছাত্র সেই ঘরে dutyতে ছিল, সে এই বলিয়া আপত্তি করে যে, এই ঘরে অন্য কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়ার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আদেশ নাই এবং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুকুম না পাইলে সে কাহাকেও ঘরে ঢুকিতে দিতে পারে না। এই কথা শুনিয়াও সেই সাহেবদ্বয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ পূর্ব্বক জোর করিয়া ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করাতে, সেই ছাত্রটি (যাহার বাড়ী ঢাকা অঞ্চলে ও যে নিজেও বেশ বলশালী) একরূপ জোর করিয়া প্রায় গলাধাক্কা দিয়া সাহেব-দ্বয়কে বাহির করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। সাহেবরা ক্রুদ্ধ হইয়া ছাত্রটিকে শাসাইয়া চলিয়া যান। দেশীয় ডাক্তারটিও এই ছাত্রের ব্যবহারে স্তম্ভিত ও বিরক্ত হইয়া, গোরা ডাক্তারটিকে খবর দেন। তিনিও এক পত্তন আসিয়া শাসাইয়া গেলেন। কিন্তু, ইহা সত্বেও সেই ছাত্রটি রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত দরজা বন্ধ করিয়া রাখে। আটটার সময় তাহার duty শেষ হইলে সে মেসে ফিরিয়া যায়। মেসের ছাত্রগণ সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিতে লাগিল, তাহার এই কার্য্যের জন্য পর দিন তাহাকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ইত্যাদি। ছাত্রদের দ্বারা এইরূপ নানা কথায় উত্যক্ত হইয়া, সে মেস ছাড়িয়া বাহির হইল।

ঢাকায় তখন একদল নূতন থিয়েটার (theatre) আসিয়াছিল। থিয়েটারে আসিয়া ছাত্রেরা গোলমাল করে বলিয়া, ঢাকার কমিশনার এক কড়া হুকুম জারি করেন যে, যে ছাত্র থিয়েটারে যাইবে, তাহাকে তাহার স্কুল কিংবা কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে। ছাত্রদের থিয়েটারে যাইয়া গোলমাল করিবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকদের দ্বারা অভিনীত থিয়েটার যাহাতে ঢাকায় প্রচলিত না হয়, তাহারই চেষ্টা করা। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রটি মেস হইতে বাহির হইয়া, বাজারে গিয়া একটি মুসলমানের টুপি ও লুঙ্গি কিনিল। তার পর, এই লুঙ্গি ও টুপি পরিয়া, মুসলমান সাজিয়া, সে থিয়েটার দেখিতে গেল।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, হঠাৎ এই ছাত্রটির থিয়েটার দেখিবার ইচ্ছা হইল কেন? থিয়েটারে যাইবার সময়ে সে মুসলমান সাজিয়াই বা গেল কেন? এসব কার্য্য তাহার মনের অন্তস্তল হইতে ঘটিয়াছিল; এবং সম্ভবতঃ এই কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ সে নিজেও বিশেষ ভাবে বুঝে নাই। কিন্তু, এ সম্বন্ধে মনস্তত্বের দিক দিয়া কিছু-কিছু বিশ্লেষণ করা যাইতে

ছাত্রটি প্রথমতঃ হাসপাতালে বড়-রকম কর্ত্তব্যানুরোধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল।

আসিয়াও তাহার এই তেজই (spirit) দেখিতে পাওয়া যায়। ছাত্রটি সেই জন্য থিয়েটার দেখিবার বিষয়েও কর্ত্তৃপক্ষগণের আদেশ অমান্য করিল; এবং অন্যান্য ছাত্রদের থিয়েটার না দেখার সম্বন্ধে মতেরও বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থিয়েটার দেখিতে গেল। তাহার সঙ্গী ছাত্রদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সে বুঝাইল যে, তাহাদের মতের সঙ্গে তাহার নিজের মতের মিল নাই। এই থিয়েটার দেখাকে অন্য সকল ছাত্র যেরূপ খারাপ কাজ বলিয়া মনে করে, সে তাহা করে না। এ সম্বন্ধে অন্যান্য ছাত্রের মত হইতে তাহার মত স্বতন্ত্র।—তাহারা ভয় করিয়া যাহা করিতে চায় না, সে তাহা করিতে প্রস্তুত।

অবশ্য, এই ছাত্রটি মুসলমান সাজিয়া থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল। এই কার্য্যে যে আত্মগোপন রূপ হীনতার ভাব ছিল, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। আবার এই মুসলমান সাজার মধ্যে একটা আত্মম্ভরিতার ভাবও ছিল। ঢাকার ম্যানেজার সাহেবের মনিব মুসলমান। ছাত্রটি মুসলমান সাজিয়া এই প্রতিপন্ন করিতে চাহিল যে, আমিও মুসলমান সাজিয়া তোমার মনিবের সমশ্রেণীর লোক হইতে পারি। সুতরাং আমি তোমাকে গ্রাহ্য না করিয়া, তোমার উপর হুকুম চালাইতেও পারি। বাঙ্গালীদের সাহেব সাজার মধ্যে এই উভয় প্রকার ভাবই থাকে; এবং এই ভাবগুলি বাঙ্গালীদের বোধ হয় মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে।

(৩) মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইবে। তজ্জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণের সভা হইয়াছে। এই মিউনিসিপ্যালিটির একটু পূর্ব্বের ইতিহাস বলা যাইতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় আসিয়াছিলেন, তখন মিউনিসিপ্যালিটি হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইয়াছিল। নূতন নির্ব্বাচনে আর যাহাতে এরূপ ঘটনা না হইতে পারে, সেইজন্য officials এবং co-operatorদের ইচ্ছা যে, তাঁহাদের মধ্য হইতেই মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। অবশ্য non-co-operatorদের ইচ্ছা অন্যরূপ। প্রতিদ্বন্দী রূপে একজন non-co-operator দাঁড়াইয়াছিলেন ও অপর একজন ভাইস্-চেয়ারম্যান পদের জন্য গেল, সে উভয়ের মধ্যে প্রথমে চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন হইয়া গেল। এখন তাহার উভয়ের মধ্যে যিনি চেয়ারম্যানের পদপ্রার্থী ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে স্থানীয় পত্রিকার "অনুগ্রহে" প্রভৃতি নানা সুখ্যাতি বাহির হইলেও, তিনি ভোটে হারিয়া গেলেন। একজন co-operatorই চেয়ারম্যান হইলেন, এবং ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের সভায় তিনি চেয়ারম্যান হইয়া বসিলেন। তাহার পর, ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের পালা। Non co-operatorদের মধ্যে যিনি ভাইস্-চেয়ারম্যানের পদপ্রার্থী ছিলেন, তাঁহার বিশেষ ভরসা ছিল যে, তিনি নিশ্চয়ই ভাইস্-চেয়ারম্যান হইবেন।

ভোটের কাগজগুলি উপস্থিত সভ্যগণের নিকট হইতে লওয়া হইলে দেখা গেল যে, Non-co operatorদের মধ্যে যিনি ভাইস্-চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী, তিনিও আটটি ভোট পাইয়াছেন, আবার co-operatorদের মধ্যে যিনি ভাইস্-চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী, তিনিও আটটি ভোট পাইয়াছেন। যিনি চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার casting ভোট দিয়া co operatorকেই ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত করিলেন। আঠার জন মিউনিসিপ্যাল সভ্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অষ্টুজন করিয়া যোলজনের ভোটের হিসাব হইল। আর দুইজন কিরূপ ভাবে ভোট দিলেন, তাহা দেখিবার জন্য অনেকেই উৎসুক হইলেন। দেখা গেল যে, একজন কেবল মাত্র সাদা ভোটের কাগজ দিয়াছেন, আর একজন হিজি-বিজি লিখিয়া, কোনও-নাম না লিখিয়া—ভোটের কাগজ দিয়াছেন। এই দুইটি ভোটের কাগজ বাহির হইবার পরই, যিনি Non-co-operatorদের মধ্যে পদপ্রার্থী ছিলেন, তিনি সভার মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে সভার মধ্যে শোওয়াইয়া, মাথায় জল দিয়া, ও ঔষধাদি খাওয়াইয়া সচেতন করা হইলে, পাল্কী করিয়া বাড়ী পাঠানো হইল।

ইহার পর, একদিন এই ভদ্রলোকটির সহিত লেখকের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার মূর্চ্ছিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, এই ভদ্রলোকটি কিছু ব্যঙ্গ করিয়া উত্তর দেন যে, আপনারা আমাকে unfit স্থির করিয়াছেন; কিন্তু আমি যে fit, তাহা ফিট্ হইয়াই দেখাইয়া দিলাম। ধনতত্ত্বের হিসাবে এরূপ ব্যাখ্যাও অগ্রাহ্য নহে। দুই-একজন ভদ্রলোকের নিকট শুনিয়াছি, যে দুইজন ভোট দেন নাই (যদিও তাঁহাদের নাম স্থির ভাবে জানা যায় নাই; কারণ, ভোটের কাগজগুলি তখনই নষ্ট করা হইয়াছিল), তাঁহাদের মধ্যে একজন এক

Non-co-operator আমার হয় ত বিশেষ বন্ধু ছিলেন ; এবং তাঁহাকে নির্বাচন ব্যাপারে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।—

জুলিয়াস সিজারকে সেনেটের মধ্যে খুন করিবার জন্য, যখন সেনেটের কতকগুলি মেম্বার তাঁহাকে আক্রমণ করে, তখন তিনি প্রথমতঃ আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু, যখন তাঁহার অতি প্রিয় বন্ধু Brutusও তাঁহাকে ছুরির আঘাত করিল, তখন সেই আঘাতটি তাঁহার বড়ই মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল। তিনি তখন—'Et tu Brute' (কি ব্রুটাস, তুমিও মার) এই কথা বলিয়া তাঁহার গাউনের এক অংশ দিয়া নিজের মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন ; এবং আর আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া, আততায়ীদের আঘাতে নিহত হইলেন।

এস্থলেও বোধ হয়, যখন লেখকের নাম-শূন্য দুইটি ভোটের কাগজ এই বিফল-মনোরথ ভদ্রলোকের চক্ষের সম্মুখে পড়িল,—তখনই তাঁহার মনের মধ্যে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে,—ভোটের কাগজে হিজি-বিজি লেখা দেখিয়া,—এরূপ ধারণা হইল যে, এই ভোট না দেওয়া,—ভোট দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ এমন কোনও বন্ধুর দ্বারা ঘটিয়াছে। এরূপ ধারণাকে ডাক্তার ফ্রয়েড (Dr. Freud) unconscious mind-এর ক্রিয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এইরূপ ধারণার আঘাত অসহ্য হইলে, সাধারণতঃ কিছুক্ষণের জন্য স্বাভাবিক জ্ঞান লুপ্ত হইয়া, ধারণার কষ্ট হইতে অব্যাহতি দেয়। এই ভদ্রলোকটিরও তাহাই হইল। তিনিও মূর্চ্ছিত হইয়া, কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার মানসিক কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

এইরূপ, আরও অনেকগুলি ঘটনার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে ; কিন্তু প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইয়া পড়িবে আশঙ্কায় নিরস্ত হইলাম। পাঠকগণ যদি তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনের পর্য্যবেক্ষণ হইতে এইরূপ ঘটনা সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে আলোচনা করেন, তাহা হইলে মনস্তত্ত্বের আলোচনার কতকটা সুবিধা হইতে পারে।

লাজ ও বিস্ময়

[শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন বার-এট-ল]

নিজেরে লুকাতে পারিনি বলে লজ্জায় হনু সারা।
মোর, প্রাণের রুদ্ধ গুপ্ত প্রেমের কেমনে পাইলে সাড়া ?
যখন কথাটি কহিতে—শুনেও শুনিনি কানে,
যখন গানটি গাহিতে-চাহিনি তোমার পানে,
নয়নে আসিলে জল হাসিতাম নানা ভানে ;
শত যত্নের আবরণে পড়িনু কি শেষে ধরা ?

দেখিতাম যবে স্বপনে, সত্য কি তুমি আসিতে ?
আমার নীরব নিশীথে সত্য কি তুমি ভাসিতে ?
আমার প্রভাত কুসুমে সত্য কি তুমি হাসিতে ?
ছিলে কি সতত লুকায়ে নয়নে হইয়ে নয়ন-তারা ?
চাহি নাই তব দান, দিলেও দিয়েছি ফিরায়ে,
তুমি ফেলিয়া যাইতে যাহা গোপনে লয়েছি কুড়ায়ে ;

তব মূর্ত্তি করিনি পূজা স্মৃতিই রয়েছে জড়ায়ে ;
কেমনে জানিলে তুমি যে আমার সকল জগত-জোড়া ?

[শ্রীদিলীপকুমার রায়]

বার্লিন, আগষ্ট, ১৯২১

দ্বিতীয় স্তবক

এ বৎসরও মার্চ্চ মাসে সেই পরিচিত ডার্ব্বিশায়ারে ভারতীয় সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন সুচারুরূপেই হয়েছিল।* রথিবৃন্দ এ বৎসরও নিতান্ত কম ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে দুচার জনের চরিত্রচিত্রনচ্ছলে য়ুরোপ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বোধ হয় প্রারম্ভেই বলে রাখা ভাল যে, স্বচ্ছন্দে অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উথাপন করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমি নিতে চাই; যেহেতু, আমার বিশ্বাস যে, তাতেই আমার উদ্দেশ্য সমধিক সফল হবে।

গণ্য অতিথিবর্গের মধ্যে একজন ছিলেন "ইণ্ডিয়া-আফিসের" জনৈক মহাত্মা; অন্ততঃ, তিনি যে নিজে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন, তা তাঁর কথাবার্ত্তায়, চাল-চলনে, ও ভাবে-ভঙ্গীতে অহরহই বিচ্ছুরিত হ'ত। ইনি লোক নিতান্ত মন্দ ছিলেন না; তবে তাঁর আত্ম-প্রত্যয়ের পরিস্ফুট মূর্ত্তিটি এতই উজ্জ্বল ছিল যে, আমার প্রায়ই মনে হ'ত সেই কবির কথাটি—"mortality is too weak to bear it long"। অজস্র উপদেশ দিয়ে দেশের ও দশের উপকার করাই ছিল তাঁর একান্ত ব্রত। আজকাল রাজনীতিক হাওয়ার একটু গতি-পরিবর্ত্তন হওয়াতে, ইনি এক সুন্দর প্রভাতে আবিষ্কার করেন যে, ইণ্ডিয়া-আফিসের সনাতন সম্ভ্রমাত্মক গদী ছেড়ে, আমাদের মত অসহায় ছাত্রবৃন্দকে, তাঁর অমূল্য অভিজ্ঞতার এক কণা উপদেশের ছদ্মবেশে দেওয়া মন্দ নয়। যে সঙ্কল্প, সেই কাজ। সমিতির অধিবেশনের কিছুদিন আগে, একজন ছাত্রের ঘরে একদিন এঁর আবির্ভাব। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার তাতে যাওয়া ঘটে ওঠে নি। তবে জীবনে অনেক দ্রষ্টব্য জিনিষই দেখা হয় নি, বহু শ্রোতব্য জিনিষই শোনা হয় নি ও বিস্তর গন্তব্য-স্থানেই যাওয়া হয় নি বলে, তথনকার মত এ আক্ষেপটিকে বহুদিন-সঞ্চিত ক্ষোভরাশির ঝুলিতে সন্নিবেশিত করেই ক্ষান্ত হ'লাম। আমার জনৈক বন্ধু সে সময় তাঁর বাণী শুনে স্পষ্ট বুঝতে পার্লেন যে, তাঁর নিজের জ্ঞানের বোঝা বেশ একটু "ভারিতর" হয়েছে। একথা তিনি তখন এত বিজ্ঞম্মন্য ভাবে জ্ঞাপন করেছিলেন যে, আমি নিজে তাতে বঞ্চিত হওয়ার দরুণ সত্য-সত্যই একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। তবে হয় ত আমার লোকসানের গুরুত্ব বন্ধুবরের প্রতীতির অনুযায়ী নাও হ'তে পারে; এ ভরসার একটি ক্ষীণ রশ্মি তখন দেখা দিয়েছিল, যখন তিনি বল্লেন যে, ইণ্ডিয়া-আফিসের যে কোনও সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীর পক্ষে ছাত্রদের সঙ্গে গল্পালাপ কর্ত্তে আসাটাই তাঁর কাছে মস্ত করুণার কাজ (condescension)। ইণ্ডিয়া-আফিসের কর্ম্মচারিগণের মনুষ্যত্বের সম্বন্ধে বন্ধুবরের ঈদৃশ দৃঢ় ধারণা শুনে, তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সংশয় জেগেছিল; ও মনকে তখন আশ্বাস দিয়েছিলাম যে, আমার ক্ষতির গুরুত্ব হয় ত বন্ধুবরের ধারণার অনুরূপ না হ'তেও পারে। তার পর সমিতিতে এ মহাজনের শুভাগমনে আমার সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের নিরাকরণ হয়েছিল।

একদিন সমস্ত সকাল ধরে ইনি বক্তৃতা দিলেন।—"দেশোদ্ধার কর্ত্তে আমরা সকলেই চাই বটে; কিন্তু সে পক্ষে কাজ কিছুই করি না। এই দেখুন না, লণ্ডনে কত অগুন্তি উপায়ে লাভবান্ হওয়া যেতে পারে; কিন্তু এ সুযোগ কি আমরা হেলায়ই হারাচ্ছি না?" অপিচ, "অতএব আমাদের যাওয়া উচিত সর্ব্ববিধ গন্তব্য স্থানে—অর্থাৎ সভাসমিতিতে; পড়া উচিত হরেক রকম পাঠ্য পুস্তক—অর্থাৎ অপাঠ্য নয়; শোনা উচিত এ জগতে যা কিছু শ্রোতব্য আছে; এবং ভাবা উচিত রাজ্যের সব একত্রিত করে।"

তাঁর এবম্বিধ সারগর্ভ বাণী শুনে আমরা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার কর্লাম এই সত্য যে, ভাল হবার বিবিধ উপায়

* এই সুন্দর অনুষ্ঠানটির বিবরণ গত বৎসর শ্রাবণের 'ভারতবর্ষে' আমি প্রকাশ করেছিলাম।

চারিদিকেই ধোঁকা! আত্মসম্মান হারালাম এই ধিক্কারে যে, তা সত্ত্বেও এবং আমাদের দেশের এই দুর্দ্দিনে আমরা কেমন করে এত মন্দ হয়ে জীবন কাটাচ্ছি!! এবং সব-শেষে হতাশার গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হ'লাম, যখন তিনি বল্লেন যে, লণ্ডনে যে শিক্ষালাভের কত বিবিধ উপায় আছে শুদ্ধ মাত্র তার খবর পেতেই তাঁর চার-চারটি বৎসর লেগেছিল!!! তবে— "অন্যে পরে কা কথা"! তাঁর মতন বুদ্ধি, ও মনীষা-শালীরও যখন শুধু পথ খুঁজে বাহির কর্ত্তেই চার-চারটি বৎসর লেগেছিল, তখন মাদৃশ ক্ষুদ্রমতির আশা কি? আমাদের ক্ষেত্রে ত তাহ'লে এ উপায় খুঁজে বাহির কর্ত্তে-কর্ত্তেই দেখ্‌ব "হাতি যো লেগা উও ত চলা গয়া", অর্থাৎ চিত্র-গুপ্তের দরবারে ডাক পড়েছে আর কি, শিক্ষালাভ তখন করে কে! অপিচ, তাঁর উপদেশ:—"বিলাতে এসে তিনি আবিষ্কার করেছেন যে, এমন অনেক সামরিক মাসিকী এখানে বাহির হয়, যা পড়ে রাতারাতি সমর-কুশল হওয়া একান্ত সুসাধ্য।" অতএব মা ভৈঃ। আমাদের মধ্যে এক রসিক ডাক্তার ছিলেন। তিনি এই মহাজনের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর উঠে, বিনীত ভাবে তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্লেন যে, তিনি ইণ্ডিয়া-আফিসের কর্ত্তৃপক্ষদের অনুমতি নিয়ে, অশ্বারোহণ-শিক্ষার্থীদের জন্য অশ্বাভাবে গর্দ্দভ সরবরাহ কর্ত্তে পারেন কি না; এবং তাও যদি না জুটে, তবে উক্ত আফিসের একটি ঘরে স্প্রিঙের (spring) দারুভূত অশ্ব স্থাপন করার বন্দোবস্ত করা সম্ভব কি না, যাতে চড়ে অসহায় ভারতবাসী দুধের সাধ ঘোলে মিটাতে পারগ হয়। সেদিন আমি এই ভেবে আশ্চর্য্য হয়েছিলাম যে, আমাদের দেশের লোকের কাছে এখনও এমন লোক কেমন করে আদর পায়, যার মূল নীতি হচ্ছে "বক্তৃতা করিয়া বাবা লড়াই করিব ফতে।" এই ভদ্রমহোদয় যদি পাঁচজনের একজন হয়ে আমাদের মধ্যে আসতেন, তাহ'লে ত কোনও কথাই ছিল না। বিস্ময়ের প্রধান কারণ এই যে, কি স্বার্থত্যাগ বা মনীষার জোরে তিনি নিজেকে আমাদের উপদেশ দেবার যোগ্য মনে করে, উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করেছিলেন! তবে এতে এই সব বিজ্ঞম্মন্য লোকের দোষও তত নয়, যত আমাদের নিজেদের। কোন্ নীতির বশবর্ত্তী হয়ে, আমরা শুধুমাত্র সরকারী খেতাব দেখে, এই সব খেতাব-ধারীদের উচ্চ পীঠে বসিয়ে, তাঁদের জানাই যে, আমরা তাঁদের উপদেশ শুনতে উৎসুক! অক্‌স্‌ফোর্ড, কেম্ব্রিজের স্বাধীন হাওয়ায়ও যে সব ছাত্রের মন থেকে এই খেতাব-সম্ভ্রম অপনীত না হয়, তাঁদের জন্য বাস্তবিকই দুঃখ হয়। অক্‌স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজে একটি করে ছাত্রদের ক্লাব (union) আছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন কেবল ছাত্রদের দ্বারাই পরি-চালিত হয়ে থাকে, ও তাতে মাঝে-মাঝে পার্লিমেন্টের মহামহোপাধ্যায়গণও এসে তরুণ যুবকদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে যোগদান করাটা তাঁদের অভ্রংলিহ মর্য্যাদার হানিকর বলে মনে করেন না। অপিচ তাঁরা যা বলেন, তা ছাত্ররা কেউই শিরোধার্য্য করে নেয় না। সমানে বাক্‌বিতণ্ডা ও সমালোচনা দুই পক্ষই যথাযথ মনে করে। সাম্য-নীতির "comme il faut"টা যে নিতান্ত স্বাভাবিক, এটা অন্ততঃ এ দেশের ছাত্রদের মনে চারিয়ে গেছে। গুরুজনের গুরুতর গুরুত্ব এদের মাথা-আবরণী নুইয়ে দেয় না। সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের দেশের গুরুজনের প্রতি ভক্তির প্রসঙ্গ মনে হয়। বয়সের প্রতি সম্মান ততক্ষণ পর্য্যন্তই শোভন, যতক্ষণ তাতে নিজেকে অযথা ছোট প্রতিপন্ন করে তোলা না হয়। আমাদের মধ্যে গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রদর্শন-রূপশীলতা প্রায়ই আমাদের আত্মসম্মান ও ও আত্মপ্রত্যয়ের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়, যা ছোট বা বড় কারুরই মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। বয়স্কদের সামনে ছোটদের যে সচরাচর কিরূপ আড়ষ্ট ভাবে কালযাপন কর্ত্তে হয়, সে সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করাই বেশী। এটা যে কতটা অস্বাভাবিক ও হাস্যকর, তা এদেশের স্বাধীন হাওয়ায় যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমন বোধ হয় দেশে হ'তে পারে না। প্রসঙ্গতঃ মনে হচ্ছিল যে, এই খেতাব-সম্ভ্রম, গুরুভক্তি প্রভৃতির দ্বারা নিজেকে সর্ব্বদা হীন করে তোলাটা যুগ-সঞ্চিত দাস-মনোভাবেরই একটি অভিব্যক্তি মাত্র। মানুষকে মানুষ বলে সম্মান করার সময় কি আমাদের দেশে আজও আসেনি? আমি একসময়ে সমুদ্রতীরে একটি ইংরাজ ভদ্রপরিবারে কিছুদিন ছিলাম। আমার বন্ধু গৃহ-কর্ত্তা ছিলেন নানাভাষাবিৎ, সাহিত্যানুরাগী, বিদ্বান্ ও চিন্তাশীল লোক। তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন যে আজকাল এক school of thought (এক চিন্তাশীল সম্প্রদায়) এর মত এই যে, জগৎ হচ্ছে ছোটদেরই জন্য, ও বড়রা যত শীঘ্র তাদের মানুষ বলে সম্মান কর্ত্তে

শেখে ততই উভয়ের পক্ষে শুভ। কথাটা সম্পূর্ণ না হলেও একদিক্ দিয়ে সত্য। বড়রা ধর্ত্তে গেলে সংসারটা একরকম দেখে নিয়েছে ও ঠেকে শিখেছে। এখন আমাদের পালা। অবশ্য গুরুজনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন বা শীলতা পরিহার কর্ত্তে কেউই বলে না। শুধু এই কথাটি বোধ হয় বলা যেতে পারে যে, বড় ও ছোট প্রত্যেকেরই অধিকার ও সম্ভ্রমের একটা গণ্ডী আছে, যাকে অতিক্রম করা এ দুয়ের কারুর পক্ষেই শুভফলপ্রদ হ'তে পারে না।

আগন্তুকদের মধ্যে আর একটি আহূত ভদ্রলোক এসেছিলেন, যাঁর বুদ্ধিটি ছিল প্রথম মহাত্মার চেয়ে অনেক বেশী তীক্ষ্ণ। তবে এঁর বক্তৃতা থেকে এঁকে যেন অত্যন্ত পলিসি-বাজ বলে মনে হ'ল। বক্তৃতার পিছনে বক্তার জীবনের জাল (setting) শ্রোতাদের জানা না থাকলে তার ফল সম্যক্ ফলে না। এঁর ভূত জীবনের বিশেষ কিছু আমার জানা নেই বলে, বোধ হয় এঁর সম্বন্ধে বেশী না বলাই ভাল; বিশেষতঃ যখন ইনি সর্ব্বদা অত্যন্ত সাবধানে বার্ত্তা কইতেন। শুনলাম, ইনি বিলাতী কাগজপত্রে মাঝে লেখেন, ও আজকাল দেশোদ্ধার নিয়ে বড়ই [illegible]। ইনি না কি নানা ভাষাও জানেন। কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যা এঁর যতই থাকুক না কেন, expediency রূপ [illegible] (সুবিধার জন্য নীতিকে জলাঞ্জলি দেওয়া) ইনি [illegible] উপাসক। কাজে-কাজেই এঁর দ্বারা দেশের কোন প্রকার বড় কাজের আশা করা বৃথা। তবে এরকম লোকের যে দরকার নেই তা নয়। অন্ততঃ এঁদের দ্বারা [illegible] পর্য্যন্ত দেশের কাজ হ'তে পারে, যতক্ষণ এঁরা [illegible]র আদর্শের বিপক্ষে না যান। এঁর রাজনীতিক মত শুনে মনে হ'ল, ইনি শ্যাম ও কুল দুই-ই বজায় রাখতে চান। এঁর মুখ এত মিষ্ট ও ব্যবহার এত শিষ্ট যে, যে লোক এঁকে চেনে না, সে হয় ত এঁর শীলতার বাড়াবাড়িতে রীতিমত আড়ষ্ট বোধ কর্ত্তে পারে। সমিতিতে একটি ইংরাজ মহিলা এসেছিলেন। তাঁর বাড়ীতে যখন আমি পরে অতিথি হয়ে যাই, তখন তিনি একদিন কথায়-কথায় বলেছিলেন, "He is too polite"; অর্থাৎ এঁর শীলতাটা একটু বাড়াবাড়ি গোছের। আমারও মনে হয়েছিল যে, ইংরাজের মৌখিক ভদ্রতার অতিচারের ইনি একটু বেশী পক্ষপাতী। তবে আশ্চর্য্য এই যে, ইনি এই সোজা কথাটা বোঝেন না যে, আসলে আর নকলে অনেক তফাৎ ঢের। সুলভ শীলতার বাড়াবাড়ি ইংরাজ জাতির প্রায় মজ্জাগত বল্লেই চলে। কাজে-কাজেই, এর মধ্যে আন্তরিকতার একান্ত অভাব থাকা সত্ত্বেও, এটা তাদের ক্ষেত্রে তত বিসদৃশ দেখায় না। কিন্তু আমরা যখন এর হুবহু নকল কর্ব্বার আকণ্ঠ পিপাসায় দিশাহারা হয়ে পড়ি, তখন সেটা যে কতটা স্বচ্ছ রকমের বাড়াবাড়ি হয়ে ওঠে তা আমরা হয় ত অনেক সময় ধর্ত্তে পারি না; কিন্তু তা বলে তা এদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। এ প্রসঙ্গে দুচারটি কথা লেখা বোধ হয় মন্দ নয়।

আমি ইংরাজ-পরিবারে অতিথি হয়ে দেখেছি যে, সেখানে ছেলেমেয়েদের শৈশব হ'তেই কথায়-কথায় ধন্যবাদের পুষ্পবৃষ্টি কর্ত্তে শেখান হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে এ অত্যুক্তি মিষ্টই শোনায় বটে, কিন্তু পরিণত বয়সে সামাজিকতায় এই শীলতার এত বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ে যে, সেটা অন্ততঃ আমাদের চক্ষে ত অত্যন্ত অসরল ঠেকে। যথা :—প্রশ্ন, "Will you have some tea?" উত্তর, "Thanks awfully, if you don't mind." প্রশ্ন, "Will you have a few more biscuits?" উত্তর, "O I'd love to. They are heavenly." "This is Mr. So-and-so." "O, how do you do? I'm delighted to make your acquaintance." (স্মরণ রাখা দরকার যে, পরিচয়ের দরুণ এই আনন্দাতিশয্য ব্যক্তিনির্ব্বিচারে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ তার পক্ষপাত নেই।) যা লিখলাম তা মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। অবশ্য আমি স্বীকার করি যে, এই সব শীলতার কারুকার্য্যের সদর্থ বুঝতে কারুরই কষ্ট হয় না; কিন্তু যা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, নিরর্থক, তা বলার উপযোগিতা সম্বন্ধে আমি কোনও মতেই নিঃসংশয় হ'তে পারি না। তাই আমার মনে হয় না—যেমন আমাদের মধ্যে অনেকের হয়—যে আমাদের ছেলেমেয়েদেরও আত্মীয়বন্ধু স্থলেও এ শীলতা শেখানর বিশেষ দরকার আছে; বিশেষতঃ যখন সেটা আমাদের ঠিক খাপ খাবে না। এ বিষয়ে ইংরাজ পিতামাতার মত হচ্ছে এই যে, নিতান্ত আপনার লোকের কাছেও ভদ্র কেন না হই? এ ব্যাপারটা জাতীয় গুণগত perspective হিসাবে তত গুরুতর নয় বলে আমি স্বীকার কর্ত্তে রাজি আছি যে,

চলে; কিন্তু তা বলে আমি এ কথা বলবার পক্ষপাতী নই যে, এতে জীবন-যাত্রার সৌন্দর্য্য বা সৌষ্ঠব বাস্তবিকই বাড়ে। মৌখিক ভদ্রতা সম্বন্ধে Charles Lamb তাঁর Essays on Eliaতে এক স্থলে খুব ঠিক্ কথাই লিখেছেন। তিনি যা লিখেছেন, তার ভাবার্থ এই যে, আমাদের প্রকৃতির দারিদ্র্যবশতঃ সকলের প্রতি সমান্ প্রীতিমান্ হওয়া আমাদের কাছে সম্ভব নয়। ভদ্রতা দ্বারা আমরা এরই আংশিক ক্ষতিপূরণ কর্ত্তে চাই; অর্থাৎ বাইরের লোককে আমরা রূঢ় ভাবে দেখাতে চাই না যে, তাদের প্রতি আমরা উদাসীন। তাই যেখানে আসল প্রীতি বিদ্যমান, সেখানে ভদ্রতা প্রদর্শনরূপ বাহুল্যের বিশেষ দরকার নেই। এরা thank you, so good of you প্রভৃতি কথার ব্যবহার এত সময়ে-অসময়ে করে থাকে যে, যখন সত্য-সত্য কোনও ধন্যবাদজ্ঞাপক কথা বল্‌তে ইচ্ছে হয়, তখন দেখা যায় যে, সে সব মামুলী কথার পিছনে কোনও মানের বালাই নেই। তা ছাড়া, আর একটা আশঙ্কাও এ প্রসঙ্গে আমার মনে উদয় হয়। আমাদের মধ্যে এ সব বিদেশী আদব-কায়দা (etiquette) প্রচলন করার সঙ্গে-সঙ্গে এটা মনে হওয়া খুবই সম্ভব যে, এগুলি হচ্ছে মস্ত জিনিষ। আমার এক দেশীয় বন্ধুর মধ্যে এই অত্যধিক etiquette মেনে চলার ফলে একটা বিসদৃশ আড়ষ্ট ভাব দেখে মনে-মনে অনেক হেসেছি বলেই, এ আশঙ্কা আমার মনে উদয় হয়েছে; বিশেষতঃ, যখন আমার এ বন্ধুটি অসার প্রকৃতির লোক ছিলেন না। লোকাচারের এই সব সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম নিয়মের দাবী-দাওয়া সর্ব্বদা মেনে চল্‌তে গিয়ে, মনের যে কতটা বাজে-খরচ হয়ে পড়ে, তা আমরা অনেক সময়ে লোক-সমাজে ঠিক্ উপলব্ধি করি না; উপলব্ধি করি, যদি সৌভাগ্যক্রমে কিছুদিন প্রকৃতির সংস্পর্শে ছাড়া পাই। তাই আমার মনে হয় যে, এ দেশে মোটামুটি এমন মোটাকতক আদব-কায়দা মেনে চলাই যথেষ্ট, যেগুলির পালন এরা অত্যন্ত গুরুতর মনে করে। এ বিষয়ে খুব বেশী সাবধান বা tip-top হ'তে চেষ্টা করার লাভ নেই; বিশেষতঃ, শতকরা হাজার কায়দা-দুরস্ত হলেও (যেমন হাজার ... হয় না) কোনও চক্ষু-ধাঁধাঁকারিণী, ... ইংরাজ-তরুণী আমাদের ভুলেও ... করে ... না। কেহ-কেহ বলেন যে, এরূপ আদব-কায়দা-দুরস্ত হওয়ার মস্ত লাভ এই যে, তাতে এদেশের সুধীবৃন্দ ভারি সন্তুষ্ট হন। কিন্তু নির্ভীক ভাবে ভেবে দেখতে গেলে, ইংরাজকে সন্তুষ্ট করবার জন্য এই তরল শীলতার বাড়াবাড়িকেও শিরোধার্য্য করে নেওয়াটা আমাদের সেই দাস-মনোভাবেরই আর একটি বিকাশ মাত্র। কারণ এদেশীয়দের যে শ্রদ্ধা আমাদের মূল গুণ-সমষ্টির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তার মূল্যই বা কি; আর তাতে লাভই বা কতটুকু? তা ছাড়া, আমার এও মনে হয় না যে, যে সব ইংরাজদের মধ্যে সার আছে, তারা এ সব ছোটখাট আদব-কায়দার ভুলচুকের জন্য আমাদের হেয় বা বর্ব্বর ভাবতে পারে; এবং পক্ষান্তরে, আমি একথাও জোর করে বল্‌তে চাই যে, এই সব তুচ্ছ etiquetteএর ব্যত্যয়কে যারা খুব বড় করে দেখে, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেও বিশেষ শেখার কিছু নেই।

* * * * *

আমাদের মধ্যে একজন প্রবীণা ইংরাজ-মহিলা এসে-ছিলেন। ইনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে কাগজে লিখতেন ও ইংরাজ জাতিকে যুদ্ধের দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিতে সম্মত ছিলেন না বলে ৪।৫ বৎসর অন্তরীণ ছিলেন। বুদ্ধি, হৃদয়ের গভীরতা ও কুসংস্কারহীনতার একত্র যোগাযোগ সচারচর দেখা যায় না। এঁর মধ্যে আমি এই তিনটি গুণের একত্র সমাবেশ দেখে, ভারি একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। শুন্‌লাম, এই সেদিনও ইনি আইন পরীক্ষায় তিনটি বিষয়ে একসঙ্গে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেয়েছিলেন। নিজে একটি মাসিকী সম্পাদন করে থাকেন। অত্যন্ত চিন্তাশীল প্রকৃতির রমণী। আমার মনে হ'ত, তাঁর চোখ-দুটির পিছনে একটা স্বপ্নরাজ্যের অস্তিত্ব রয়েছে। এঁর সম্বন্ধে নানা লোকের কাছে প্রশংসাই শুন্‌লাম; এবং যখন শুন্‌লাম যে, স্বাধীন মতামত প্রচার কর্ত্তে বিরত হওয়ার চেয়ে ৪।৫ বৎসর অন্তরীণ থাকাও ইনি শ্রেয়ঃ মনে করেছিলেন, তখন এঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। ভারতের আধ্যাত্মিকতার উপর এঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। নিরুপদ্রব প্রতিরোধকে ইনি আমাদের একমাত্র মুক্তির উপায় বলে মনে করেন। আমার এক বন্ধু পরে আমাকে লিখেছিলেন যে, এঁর মধ্যে তিনি ৺নিবেদিতার হৃদয়ের গভীরত্বের ও অন্তর্দৃষ্টির আভাষ পেয়েছিলেন। এঁর অন্তর্দৃষ্টি সম্বন্ধে

এইটুকু বলা যেতে পারে যে, সমিতিতে ভারতীয় সঙ্গীত শুনে, ইনি একটি কবিতায় দুই লাইনে সে সম্বন্ধে এইরূপ মত ব্যক্ত করেন যে, আমাদের সঙ্গীত শুনে তাঁর মনে হ'ত, যেন তা তাঁকে অন্য কোনও এক মোহময় রাজ্যে নিয়ে যেতে চায়। এঁর আন্তরিকতা, আমাদের দেশের প্রতি অনুরাগ, গভীর সহানুভূতি ও ইংরাজ-সুলভ jingoismএর একান্ত অভাব আমার ভারি ভাল লেগেছিল। মহাত্মা গান্ধিকে ইনি টলষ্টয়ের চেয়েও বড় মনে করেন। এঁকে দেখে আমার মনে হ'ল যে, ইংরাজ জাতির জনসাধারণের মধ্যে আদর্শবাদীদের সংখ্যা অন্যান্য জাতির তুলনায় বিরল হ'লেও, তাদের অস্তিত্ব এখনও একেবারে লোপ পায় নি।

আমাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোক আছেন, যাঁরা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতাকে ভয়ের চোখে দেখে থাকেন। কিন্তু আমি মনুষ্যত্বের যে বিকাশ এই ইংরাজ-মহিলার মধ্যে দেখেছিলাম, শিক্ষার অভাবে তা নিশ্চয়ই সম্ভবপর হ'ত না। স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে নানা যুক্তি-তর্ক পড়ে ও শুনেও যে সংশয় ঘুচতে চায় না, তা বোধ হয় সহজেই ঘোচে, যদি এই শিক্ষার crystallized ফল কোনও নারীর মধ্যে সাম্‌না-সাম্‌নি দেখা যায়। আমাদের দেশে রক্ষণশীলদের দল বলেন যে, আমাদের দেশে যেমন মাতৃত্ব ও সতীত্বের বিকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তেমনটি আর কোথাও যায় না। তাঁদের এ কথা যদি তর্কের খাতিরে আপাততঃ স্বীকার করেও নেওয়া যায়, তাহ'লেও প্রমাণ হয় না যে, নারীজাতির চরম বিকাশ কেবল মাতৃত্বে বা সতীত্বেই পর্য্যবসিত হ'তে হবে। আমার মনে হয়, মানুষ সব আগে মানুষ, তার পরে স্ত্রী, মা ও ভগিনী। সুতরাং মাত্র একটি পূর্ণাঙ্গ মা বা সাধ্বী স্ত্রী-রূপে পরিণতি লাভ করা কোনও জাতির স্ত্রীলোকেরই আদর্শ হ'তে পারে না! সতীত্বের বাগাড়ম্বর ছেড়েই দেওয়া যাক্; কেন না, পুরুষের শত নৈতিক স্খলনও যখন আমরা দেখেও দেখি না, তখন স্ত্রী-জাতির কাছে থেকে সতীত্বের দাবী করবার বা তা যে একটা মহৎ জিনিষ এ কথা বল্‌বার আমাদের অধিকারই নেই। *সতীত্ব একটা মস্ত জিনিব, এ কথা আমরা কেবল তখনই* বল্‌তে পার্ব্ব, যখন নারীজাতিকে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেও পশ্চাৎপদ হব না। তা নৈলে, এ সতীত্বের আড়ম্বরের মধ্যে থেকে যায় কেবল কাপুরুষতা ও আত্ম-প্রবঞ্চনা। তবে হঠাৎ এক দিনেই তাদের স্বাধীনতা দেওয়া যায় না, এ কথা আমি স্বীকার করি। যুগ-যুগ ধ'রে দাসত্বের চাপে তাদের খর্ব্ব ক'রে রেখে, হঠাৎ নিরস্ত্র অসহায় অবস্থায় আজই তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া চলে না; কারণ, বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের বহুদিনের অত্যাচারের ফলে তারা "হঠাৎ আলো দেখ্‌বে যখন ভাব্‌বে এ কি বিষম কাণ্ডখানা।" এমন কি, হয় ত তারাই সর্ব্বাগ্রে এ আলোর বিরুদ্ধে রেজলুশন পাশ করে দেওয়া সুরু করে দেবে, যেমন পাটেল বিলের বিপক্ষে আমাদের জমিদার ও পণ্ডিত-সমাজ করেছিলেন। স্বাধীনতার মর্ম্ম বুঝতে হ'লে শিক্ষালাভ দরকার, এ কথা বলাই বোধ হয় বেশী। শিক্ষা না পেলে তারা কোনও কালেই বুঝ্‌বে না—কি দাসত্বের অন্ধতমসার মধ্যে তারা এতদিন বাস করে এসেছে; কারণ সংসারে এমন অবস্থা খুব কমই আছে, অভ্যাস-বশে যা গা-সওয়া—ও এমন কি প্রীতিপ্রদ—হয়ে না দাঁড়ায়। বিশবৎসর জেল ভোগ করার পর যে কয়েদী মুক্তি পেয়েও আবার ঘুরে-ফিরে জেলখানার মধ্যেই বাস করার অনুমতি চেয়েছিল, তার কথা বোধ হয় অনেকেই শুনে থাক্‌বেন। আমার এখানকার অনেক শিক্ষিত বন্ধুদের কাছেও স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে সব বাল-সুলভ যুক্তি মাঝে-মাঝে শুনি, তাতে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। "দেখুন দেখি, এজলাসে রোজ কতগুলি করে বিবাহচ্ছেদের দরখাস্ত হচ্ছে!" সংবাদ-পত্রে আমরা কেবল বিষময় বিবাহের খবরই পেয়ে থাকি। যে শত-শত ক্ষেত্রে বিবাহ সুখের হয়, সে সব খবর ত আর তাতে লেখা থাকে না। যে গৃহখানি হঠাৎ একদিন হুড়-মুড় করে পড়ে যায়, কাগজে কেবল তারই খবর ছাপা হয়; যে হাজার হাজার গৃহ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের খবর ত আর চারিধারে বিজ্ঞাপনে জানান দরকার হয় না! যেসব বিবাহ-চ্ছেদের কথা আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্রে পড়ি, ধরা যাক্ তারও তিনগুণ সংখ্যক বিবাহ স্ত্রী-স্বাধীনতার ফলে অসুখী; কিন্তু কোর্টে আস্‌তে নারাজ। এ সব ধরেও যদি অঙ্ক কষা যায়, তবে ৪,২০,০০০০০ ইংরাজের মধ্যে শতকরা কয়টি বিবাহ স্ত্রী-স্বাধীনতার ফলে অসুখী হয়ে উঠে? আর তা ছাড়া স্বাধীনতার ফলে সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও যে অনুরাগ সুখী দম্পতীর মধ্যে স্থায়ী হয়, তার qualityর কি কোনও দাম নেই? সংসারে quantityই ত সব নয়! বহির্জগৎকে দেখ্‌তে না দিয়ে, জোর করে ঘরের মধ্যে পুরে যে ভালবাসা

বজায় রাখ্‌তে হয়, তার দামই বা কি, আর তাতে তৃপ্তিই বা কতটুকু? আমাদের বিবাহিত জীবনের মধ্যে যে এ সমস্যা আজও তেমন মূর্ত্ত হয়ে ওঠে নি, তা ভেবে অস্মদ্দেশীয় অনেক সুধীজন মহা আত্মপ্রসাদ ভোগ করে থাকেন। কিন্তু এরূপ স্রোতোহীন অবস্থা জাতীয় জীবনের গৌরবের সূচনা করে না—তা সূচনা করে কেবল গতির অভাবের। এ সংসারে কেবল প্রাণহীন প্রস্তরেরই কোনও সমস্যা নেই; জঙ্গম উদ্ভিদেরও যে কত সমস্যার সমাধান করে বিকশিত হতে হয়, তা মেটারলিঙ্ক তাঁর "L'intelligence des Fleurs" নামে প্রবন্ধটিতে (ফুলের বুদ্ধি) বড় চমৎকার দেখিয়েছেন। নিম্ন স্তরের আনন্দ নিয়ে মানুষ কেবল ততদিনই সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারে, যতদিন উচ্চ স্তরের আনন্দের আস্বাদ সে না পায়। তা ছাড়া, যদিই বা এরূপ শিক্ষা ও স্বাধীনতার ফলে অধিকাংশ বিবাহ অসুখী হয়, তাতেও এমন কথা প্রমাণ হয় না যে, আমাদের জোর করে স্ত্রীলোকদের সতী করে রাখিবার অধিকার আছে। এ অধিকারের দাবী কেবল তারাই কর্ত্তে পারে, যারা "বলং বলং বাহুবলং" এই নীতির পূজা করে। এই বিংশ শতাব্দীতেও যে আমাদের দেশে আমরা স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে নিভৃত অন্তরে উক্ত মতই পোষণ করি, সেটা নির্ভীক ভাবে ভেবে দেখ্‌তে গেলেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সর্ব্বত্রই পুরুষ প্রধানতঃ পাশববলের সাহায্যেই স্ত্রীজাতিকে এতদিন শাসন করে এসেছে। তবে আশা এই যে, প্রকৃতির নিয়মে অসত্য চিরকাল স্থায়ী হয় না। তাই সর্ব্বত্রই স্ত্রীজাতি তার অধিকার কমবেশী পেতে আরম্ভ করেছে। কেবল দুঃখ এই যে, এ বিষয়ে "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।" আমাদের এই স্থূল কথাটি বোঝ্‌বার সময় এসেছে যে, আমরা যখন নারী-জাতির নৈতিক তত্ত্বাবধায়ক বলে বিধাতার কাছ থেকে কোনও সনন্দ পাই নি, তখন শিক্ষা ও স্বাধীনতা পেলেই যদি তারা দলে-দলে স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে বেড়িয়ে পড়ে, তাহ'লেও আমাদের তাতে বাধা দেওয়ার কোনও অধিকার নেই। তারা কি ভাবে জীবনযাপন কর্ব্বে, তা এক তারাই বেছে নিতে পারে। মুক্ত আকাশ, বাতাস ও আলোতে নারীরও পুরুষের মতনই অধিকার। স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দেওয়ার সপক্ষে এইটেই উচ্চতম ও বৃহত্তম যুক্তি। আমরাও যেন practicalityর খাতিরে উচ্চ আদর্শকে অনুসরণ কর্ত্তে বিরত না হই।

মেটারলিঙ্ক তাঁর "Notre devoir social" (আমাদের সামাজিক কর্ত্তব্য) বলে একটি চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধে এই কথাটি এমন সুন্দর ভাবে বলেছেন যে; আমি সেটি উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ কর্ত্তে পার্‌লাম না। তিনি লিখ্‌ছেন :— L' humanite n'a-t-elle pas encore assez vecu pour qu'elle se rendre compte que c'est toujours l'idee extreme, c'est a dire la plus haut, celle du sommet de la pensee qui a raison?" অর্থাৎ, "মানুষের এ সত্যটি উপলব্ধি করার সময় কি আজও আসেনি যে, এ সংসারে চরম আদর্শই চিরকাল সত্য, অর্থাৎ কি না সেই আদর্শ, যার স্থান ভাবরাজ্যের উচ্চতম শিখরদেশে?"

উচ্চতম ভাবের প্রণোদনায় কাজ করা আধিভৌতিক মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়—এই রকম একটা আবছায়া ধারণা অনেকের মধ্যেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মানুষ স্বতঃই দুর্ব্বল, এ সত্যটি বস্তুজগতে সদাসর্ব্বদা উপলব্ধি করে অনেক সময়ে এ রকমটা মনে হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত বলে বোধ হয় না। কিন্তু এরূপ কথা ভাব্‌বার সময় আমরা সচরাচর এই সাদা কথাটা ভুলে গিয়ে ভুল করে বসি যে, দুর্ব্বলতার মতন বল বা তেজস্বিতার বাসও আমাদের মনের মধ্যেই। কোথায় পড়েছিলাম যে, মানুষ যাই করুক না কেন, নিজের স্বভাবের বাইরে যেতে পারে না। একে ইংরাজীতে বলে truism. কিন্তু আমরা স্বভাবই বল্‌তে প্রায়ই আমাদের প্রকৃতির কেবল সেই অংশটুকু বুঝি, যেটুকু আমাদের আত্ম-উপলব্ধির পরিপন্থী—অর্থাৎ দুর্ব্বলতা। কিন্তু যে দেশে ৺দয়ানন্দ বা ৺বিবেকানন্দের মতন লোকও দেখা গিয়াছে, এবং যে দেশে আজও মহাত্মা গান্ধীর মতন লোকের জন্ম হয়, অন্ততঃ, সে দেশে এ রকম ধারণা পোষণ করা নিতান্ত অসঙ্গত যে, দুর্ব্বলতাই স্বাভাবিক। এ দেশে একদল লোক আছেন, যাঁরা ডিমকে নিরামিষ বলে মনে করেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, ডিমের মধ্যে প্রাণ নেই বলে ডিম্ব-ভোজনে প্রাণিহত্যা হতে পারে না; কাজে-কাজেই ডিম নিরামিষ। ডিম্ব-ভোজনের প্রবল আকর্ষণে এই সহজ কথাটি তাঁরা ভাবেন না যে, ডিমের মধ্যে যদি প্রাণ না থাকে, তবে সে প্রাণ আসে কোথা হ'তে? আমাদের মনোজগতেও তেজস্বিতা তেমনি নিহিতই থাকে, বাইরের আঘাতে তা পরিণতি লাভ করে, এই মাত্র। তাই

আমি বল্‌তে চাই যে, উচ্চতম আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যদি আমরা কাজ কর্ত্তে না পারি, তাহ'লেও এটা অসম্ভব, এরূপ ধারণা মনে পোষণ করাটা ভুল। উচ্চতম আদর্শ অনুসারে নিজের-নিজের জীবন নিয়ন্ত্রিত করা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব হলেও, আদর্শটা যে কি, এ বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়াটাই যে একটা মহৎ লাভ।

* * * *

সমিতিতে এক পাঞ্জাবী ডাক্তার, তাঁর ইংরাজ-পত্নী ও দুই ছোট মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন। ইনি আজ বিশ-বাইশ বছর বিলাতে বাস কচ্ছেন,—পসার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। পরে এঁর বাড়ীতে দু'তিনবার অতিথি রূপে যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে, এঁদের সম্বন্ধে কিছু লিখ্‌তে পারি। এতদিন বিলাতে বাস ও ইংরাজ-মহিলা বিবাহ করা সত্ত্বেও, ডাক্তার মহাশয়ের দেশের প্রতি টান যে রকম প্রবল দেখ্‌লাম, তাতে সত্য-সত্যই আশ্চর্য্য হ'তে হয়। বিশেষতঃ, যখন ডাক্তার মহাশয় এদেশে বসবাস আরম্ভ করেন, তখন য়ুরোপীয় বিলাস ও চাক্‌চিক্যকে আমাদের দেশের অনেক সারবান্‌ লোকও পরম পুরুষার্থ বলে মনে কর্ত্তেন। এঁর দেশে ফেরার ইচ্ছা বরাবরই এত প্রবল থাকা সত্ত্বেও, কেমন করে যে ঘটনা-চক্রে ইনি এদেশে আট্‌কে পড়লেন, সে গল্প শুন্‌তে-শুন্‌তে বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ ইংরাজ উপন্যাসিক Hardyর দুঃখবাদমূলক থিওরি মনে হ'ল যে, মানুষ নিজের জীবন নিজে নিয়ন্ত্রিত করে না,—নিয়ন্তা হচ্ছে ঘটনা-চক্র। বহির্জগতের দিক্‌ দিয়ে বিচার কর্ত্তে হ'লে যেমন স্বীকার কর্ত্তে হয় যে, ডাক্তার মহাশয়ের ক্ষেত্রে এ থিওরি খেটেছিল, তেমনি অন্তর্জগতের দিক্‌ দিয়ে বিচার কর্ত্তে গেলে এ কথা মনে না হ'য়েই পারে না যে, মানুষের মন বস্তুটি অনেক সময়ে পারিপার্শ্বিককে ছাপিয়ে উঠ্‌তে পারে। ডাক্তার মহাশয় যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাইশ বছর থেকে, আজও মনে-প্রাণে স্বদেশী আছেন, সে রকম বোধ হয় তাঁর অবস্থায় খুব কম লোকই থাক্‌তে পার্ত্ত। এঁর স্বদেশী ভাবটা এতই মজ্জাগত যে, ইনি তাঁর ইংরাজ পত্নীকেও ভারতীয় করে তুলেছেন বল্লেই হয়। সমিতিতে সকলেরই এই ইংরাজ মহিলাকে ভাল লেগেছিল। জর্ম্মাণ, ফরাসী, রুশ ও ইংরাজ মহিলাদের সঙ্গে যেটুকু সংস্পর্শে এসেছি, তাতে দেখেছি যে, বাইরের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ থাকলেও, নারীজাতির [illegible] একটা বিশ্বজনীনতা থাকে। পুরুষদের প্রকৃতির [illegible] এরূপ সাদৃশ্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম। কথা অবশ্য [illegible] প্রকৃতির স্ত্রীলোকদের লক্ষ্য করে বল্‌ছি না। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যেও যারা ভাল ও খাঁটি লোক, তাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে একটা স্থূল সাদৃশ্য থাকে, যা পুরুষদের মধ্যে থাকে না। এর কারণ বোধ হয় এই যে, নারীপ্রকৃতির মধ্যে রক্ষণশীলতা (conservatism) বস্তুটি একটু বেশী মজ্জাগত। য়ুরোপীয় রমণীর সহিত ভারত-রমণীর বিশেষ কিছুই গুণগত সাদৃশ্য নেই, এ কথা প্রথমে বোধ হয় মনে না হয়েই পারে না। কারণ, এরা স্বভাবতঃই একটু বেশী স্বাধীনতার হাওয়ায় পরিণতি লাভ করায় দরুণ, হাসিঠাট্টা, মেলামেশা প্রভৃতিতে বেদ অশুদ্ধ হয়ে যায়, এমন কথা মনে করে না। সেজন্য বাইরের চটকের এই যে মোটা পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে, তাতে প্রথমটা হয় ত এমন মনে হওয়া অসঙ্গত নয় যে, আমাদের নারীজাতির কোমলতা, নম্রতা ও স্নিগ্ধতা এদের মধ্যে একেবারেই নেই। কিন্তু এরূপ উপর-উপর দেখে এদের সম্বন্ধে এবম্বিধ রায় দেওয়াতে এদের প্রতি অবিচার করা হয়। একটু নিকট সংস্পর্শে এলেই দেখা যায় যে, আমাদের নারীজাতির মধ্যে যে অনুপম স্নিগ্ধতা ও নম্রতা আছে, তা এদের মধ্যেও লোপ পেয়ে যায় নি। ইংরাজ-নারীর মধ্যে আমি স্বামী-পুত্র-কন্যার জন্য যে আত্ম বিসর্জ্জনের ভাব লক্ষ্য করেছিলাম, সেটা ভারত-সুলভ বল্লে ইংরাজ ভ্রাতির মতন jingoism প্রকাশ করা হবে,—সেটা নারীসুলভ বলাই শোভন।

আমাদের দেশে অনেকের ধারণা আছে যে মাতৃত্বের বিকাশ আমাদের দেশে যেমন ভাবে হয়েছে, তেমনটি প্রতীচ্যে হয় নি। প্রথমতঃ, এক্ষেত্রে আমার একটা কথা মনে না হয়েই পারে না যে, এরূপ অভিমান যাঁরা প্রকাশ করে থাকেন, তাঁরা প্রতীচ্য নারীর সঙ্গে সংস্পর্শে না এসেই—নিতান্ত পক্ষে ইংলণ্ডের landlady শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের [illegible] অভিজ্ঞতার জোরে—এমন সাহসিক কথা প্রচার করে থাকেন। যাঁদের এদেশের সারবান্‌ শ্রেণীর—অর্থাৎ [illegible] শ্রেণীর সম্বন্ধে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা কখনো এরূপ তুলনামূলক সমালোচনা প্রচার কর্ত্তে [illegible] পারেন না বলেই আমার বিশ্বাস, বিশেষতঃ [illegible]

([illegible]) [illegible] বড়ই কঠিন। তাই, আমাদের দেশে মাতৃত্বের মধ্যে যে সুন্দর সন্তান-বাৎসল্যের বিকাশ সচরাচর দেখা যায়, তার উপর আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকলেও, এক নিঃশ্বাসে তাকে অন্যান্য সব দেশের মাতৃত্ব-গরিমার চেয়ে উঁচুতে স্থান দিতে নারাজ। আমাদের মন বস্তুটি চিন্তার বিকাশের প্রথম স্তরে সদাসর্ব্বদা তুলনামূলক সমালোচনা কর্তেই ছোটে; কারণ এ সময়ে জগতের নানান্ তথ্য তার অজ্ঞাত থাকে। কাজেই সত্যের একটা ব্যাপক রূপ তখন তার কাছে মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌তে পারে না। চিন্তার বিকাশ যখন একটু উন্নততর স্তরে ওঠে, তখন আমাদের এই cock-sure বা নিজমস্ত মন পদার্থটি দেখ্‌তে পায় যে, যে সব জিনিষ সে ধ্রুব সত্য বলে এতদিন মনে করে এসেছে, তা ধ্রুবও নয়, সত্যও নয়। এ অবস্থায়—যখন দেখা যায় যে, যাকে দৃঢ় ভিত্তি বলে মনে করা গিয়েছিল, তা দৃঢ় ত নয়ই, বরং স্রোতস্বিনীর নীচে পায়ের তলাকার বালুরাশির মত সর্ব্বদা সরে যেতেই উন্মুখ, তখন— মনটা স্বভাবতঃই একটু দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু বোধ হয়, এ বিশাল ও বৈচিত্র্য-ময় জগতে যেখানে প্রত্যেক সামান্য ঘটনার রহস্যও আমাদের প্রতিদিন বিস্ময়ে আপ্লুত করে দিয়ে চলে যায়, অথচ "কেন" প্রশ্ন চিরন্তনই থেকে যায়; যেখানে নূতন তত্ত্বের সাম্‌নে সত্যের মূর্ত্তি প্রতিক্ষণেই ভিন্ন রূপ ধারণ করে; যেখানে ঘাত ও প্রতিঘাতের ফলে স্বতঃই মনে হয় যে, অনিশ্চিতত্বই হচ্ছে এখানে একমাত্র নিশ্চিত; এমন কি. যেখানে নিজের সম্বন্ধে "ধ্রুব" ধারণাও অনেক সময়ে ভুল বলে প্রতিপন্ন হতে থাকে, সেখানে এ দিশেহারা ভাবটা কখনও স্থিরোজ্জ্বল ভাস্বর প্রত্যয়ে পরিণতি লাভ কর্বে কি না কে জানে? হয় ত সেটা চিন্তা ও সাধনার বিকাশের আরও উচ্চতর স্তরের কথা। কিন্তু এ অবান্তর কথা থাকুক। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে স্থলে স্থির প্রত্যয়ও প্রতিদিন প্রত্যক্ষ সত্যের আঘাতে ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যেতে থাকে দেখা যায়, সে স্থলে অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে ভাল রকম অভিজ্ঞতা লাভ না করেই কোনও বিশেষ [illegible] [illegible] সম্বন্ধে বড় বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টাকে [illegible] [illegible] মনে করি না। আমি এমন কথা বল্‌ছি না [illegible] [illegible] সময়ে-অসময়ে আকাশে তুলে ধরার চেষ্টাটা [illegible] [illegible]ই একচেটে। অন্ততঃ ইংরাজ জাতির যে [illegible] [illegible]ই, এ কথা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে; এবং অপরাপর জাতি সম্বন্ধে এদের অজ্ঞতা যে কত অতলস্পর্শী, তা না দেখ্‌লে ধারণা হয় না। কিন্তু আমরা ইংরাজ জাতকে অনুকরণ কর্ত্তে বসি নি।

এ প্রসঙ্গে আমার এক পরিচিত বাঙালী ভদ্রলোকের কথা মনে হল। ইনি যা বল্‌ছিলেন, তার ভাবার্থ এই যে, ইংরাজ জাতির মতন এমন একটা গরীয়ান্ দৃষ্টান্ত যখন আমাদের চোখের সাম্‌নে রয়েছে, তখন কেন তাকে চুটিয়ে অনুকরণ না করি। এ অনুকরণ না কর্লে উন্নতির ধারাটা নীহারিকার মতই আবছায়া গোছের থেকে যাবে; এবং ইংরাজ জাতির মতন হতে পার্লেই আমাদের পরম পুরুষার্থ লাভ হবে। এইরূপ একটা ধারণা আমি অনেকের মধ্যেই লক্ষ্য করেছি। এ কথা বলাই বোধ হয় বেশী যে, এ রকম মনোভাব আমাদের সেই চিরপরিচিত বন্ধু "দাস-মনোভাবের"ই আর একটি অভিব্যক্তি মাত্র। যুগযুগব্যাপী দাসত্বের প্রভাব কাটিয়ে ওঠাটা দেখ্‌ছি বড়ই কঠিন। এতে মনটা এত ছোট হয়ে যায় যে, অনুকরণ-বিতৃষ্ণাকে সে যেন ঠিক্ বুঝে উঠ্‌তে পারে না। যে কোনও abstractionকে সে উদ্ভটগোছের কিছু একটা বলে মনে করে। এমার্সন তাঁর "আত্মপ্রত্যয়" প্রবন্ধে (Essay on self-reliance) এই শ্রেণীর লোকদের লক্ষ্য করেই বক্ষ্যমান কথাগুলি লিখে গিয়েছিলেন, "Your own gift you can present every moment with the cumulative force of a whole life's cultivation; but of the adopted talent of another you have only an extemporaneous, half possession." এর ভাবার্থ এই যে, আমাদের যা কিছু নিজস্ব, তা আমরা সারা জীবন ধরে বিলোতে পারি; কিন্তু অপরের মনীষা ধার করে এনে কারবার চলে না। আমার এই বন্ধুপ্রমুখ মহামহোপাধ্যায়গণের এই সাদা কথাটা বুঝতে ভারি কষ্ট হয়ে থাকে যে, অনুকরণ ব্যতিরেকেও, নিজের পায়ে ভর দিয়ে কোনও মহৎ জাতীয় আদর্শ গড়ে তোলা যেতে পারে। এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, সচরাচর আমরা অনুকরণ কথাটির একটু ভুল মানে করে বসে থাকি। অপর কোনও জাতির কোনও মহৎ গুণকে যদি নিজস্ব করে নিতে পারা যায়, তবে তা যে অনুকরণ হবেই হবে, এমন কথা জোর করে বলা চলে না। বরং ইতিহাস যদি আমি কিছু পড়ে থাকি, তবে তা থেকে এই বুঝেছি যে,

চিরকালই এক দেশের উপর অপর দেশের ও এক সভ্যতার উপর অপর সভ্যতার অল্প-বিস্তর প্রভাব হয়েই এসেছে। বস্তুতঃ, জগৎ যখন সৃষ্ট হয়েছে, তখন পরস্পরের সংস্পর্শে এসে আমরা যে কিছু না কিছু লাভ কর্ব্ব, এতে দোষের বা অনুকরণের কথা উঠ্‌তেই পারে না। আমরা যখন দৈনিক জীবনে ব্যক্তিগত ভাবে একে অপরের কাছে ঋণী, তখন এক জাতির উপর আর এক জাতির কোনও প্রভাব না হওয়াটাই ত আশ্চর্য্যের বিষয়! কিন্তু আমাদের এ দৈন্য-দুর্দ্দশার দিনে যদি আমরা কায়মনোবাক্যে সেই দৈন্যটিকেই বড় করে দেখি, ও য়ুরোপের কোনও মহৎ গুণবিশেষ থেকে শিক্ষালাভ করার পরিবর্ত্তে যদি কোনও জাতিবিশেষের সমগ্র আচার-ব্যবহার নির্ব্বিচারে নিজেই দেশে প্রবর্ত্তনে কৃতসঙ্কল্প হই, তবেই তা হেয় অনুকরণ বলে গণ্য হবে। নৈলে জগতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বিশ্বজনীন সত্যের খোঁজে এক জাতি যদি একটু নির্ম্মল আলো-হাওয়া অপর জাতির কিছু আগে পেয়ে থাকে, তবে সে আলো-হাওয়া যে তারই একচেটে, এমন কথা প্রমাণ হয় না। এ কথা সপ্রমাণ কর্ব্বার জন্য উদাহরণের অভাব নেই। "স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীর" (liberté, eqalité, fraternité) যে মহান্ নীতির আলো ফরাসী-বিপ্লবের সময় ফরাসীজাতি প্রথম পায়, সে নীতি কি আজ প্রায় অর্দ্ধেক জগতে ছড়িয়ে পড়ে নি? জার্ম্মাণ দার্শনিক কার্ল মার্ক্সের communismএর নীতি কি আজ রাশিয়াতে হুলস্থূল বাধিয়ে দেয় নি? এবং রুষ মহাত্মা টলষ্টয়ের নিরুপদ্রব প্রতিরোধের ভাব কি আজ আমাদের ভারতে ছড়িয়ে পড়ে নি?

আমার মনে হয় যে, আমার বন্ধুটির ইংরাজ-সম্ভ্রম আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছি। ইংরাজজাতির গুণ সম্বন্ধে আমি মোটেই অন্ধ নই; সে সবের পরে উল্লেখ কর্ব্ব; কিন্তু আমি বল্‌তে চাই এই যে, আমরা ইংরাজ জাতিকে এমন অনেক গুণের জন্য গর্ব্ব করে. পূজা করে থাকি, যা মোটেই ইংরাজ জাতির নিজস্ব নয়,—প্রতীচ্যের সাধারণ সম্পৎ মাত্র; যথা স্ত্রীশিক্ষা, [illegible]তা, যৌথকারবার ইত্যাদি। এই একদেশদর্শিতার নিদর্শন নির্দ্দেশ করা মোটেই কঠিন নয়। আমরা যূথবদ্ধ হয়ে বিলাত কেবল বিলাতেই আসি,—অন্য দেশ দেখার কিছুই চেষ্টা করি না, অন্য সাহিত্য জানার জন্য কোনও ভাষা শিক্ষা করার কথা স্বপ্নেও ভাবি না;—ছুটিতে কেবল ইংরাজী সমুদ্রতীরেই বেড়াতে যাই—ও অবজ্ঞা সত্ত্বেও কেবল ইংরাজের সঙ্গে মেশ্‌বার জন্যই ছুটি। (সুখের বিষয় যে, ইংরাজের সঙ্গে মেশ্‌বার জন্য লালায়িত হওয়ার স্রোতে আজকাল বাধ্য হয়ে একটু ভাঁটা পড়ে এসেছে। তাই আশা হয় যে, আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ এখন হয় ত অন্যান্য দেশবাসীদের সঙ্গে মিশ্‌তে ইচ্ছুক হ'তে পারেন)। কাজে-কাজেই ইংরাজেতর যে অন্য বড় জাতিও জগতে বিদ্যমান থাকৃতে পারে, এ সত্যটি আমরা অতি সহজে বিস্মৃতি-গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়ে, দেশে ফিরে গিয়ে বিজ্ঞ ভাবে গুম্ফদেশে চাড়া দিয়ে বলি, "জাতি যদি বল্‌তে হয় ত ইংরাজ", যেমন প্রভুভক্ত ভৃত্য মনে করে "বাবু যদি বল্‌তে হয় ত আমাদের বড়বাবু"; যেহেতু সে বেচারী অন্য কোনও বড়বাবুর সঙ্গে সংস্পর্শে আসে নি।

ইংরাজের সম্বন্ধে ভেবে দেখ্‌তে গেলে দেখা যায় (এখানে হয় ত আমি অত্যন্ত controversial topicএর অবতারণা কর্চ্ছি; কিন্তু যেহেতু আমার এ প্রতীতি এক দিনের নয়, সেহেতু তা আমি নির্ভয়ে বল্‌তে বাধ্য) যে, ইংরাজ জাতির মধ্যে প্রতীচ্যের অনেক সাধারণ গুণ স্বতঃই থাকা সত্ত্বেও, তারা জাতিগত ভাবে এতই matter-of-fact অর্থাৎ টাকা-আনা-পাই বুঝদার যে, তারা কোনও বড় আইডিয়া বা ভাবের জন্য প্রাণপাত করাটা আজও ভাল করে বুঝতে পারে না। ফরাসী-বিপ্লবের স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রী-নীতির মতন কোনও বড় নীতি ইংরাজ-জাত প্রচার করে নি। ভালর জন্যই হোক বা মন্দর জন্যই হোক. নীট্‌জের "অতি-মানুষের" বিরাট আকাঙ্ক্ষা ইংরাজের মনে জাগে নি; টল্‌ষ্টয়ের নিরুপদ্রব প্রতিরোধ ও ক্ষমার অভ্রভেদী ভাব ইংরাজের মনে গজায় নি। প্রতি দেশেই জাতীয় জীবনের ও গুণাবলীর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েই মহাপ্রাণ সত্যদ্রষ্টার জন্ম হয়; অর্থাৎ জাতিবিশেষের নিজস্ব জাতীয় গুণই crystallized হয়ে তার মহাত্মাদের জীবনে ফুটে ওঠে। কাজে-কাজেই একটা জাতিকে তার মহাত্মাদের জীবন থেকে বিচার করা নিতান্ত superficial নয়। নেপোলিয়ন যখন ইংরাজ জাতিকে দোকানদারের জাতি বলে গালি দিয়েছিলেন, তখন তিনি তাদের প্রতি একটু অবিচার করেছিলেন বলেই আমি বিশ্বাস করি; কিন্তু ভেবে দেখলে যখন দেখা যায় যে

ইংরাজ জাতির মধ্যে আদর্শবাদী বহুদিন যাবৎ জন্মগ্রহণ করে নি, তখন সত্য-সত্যই নেপোলিয়নের উক্তিকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। মানুষের মনোজগতে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির একটা প্রধান ধারা শিল্পকলায় বিকাশ পেয়েছে। সাহিত্য-শিল্পে অবশ্য ইংরাজের সৃষ্টি খুব উচ্চ শ্রেণীর; কিন্তু অন্য কোনও শিল্পেই—না চিত্রবিদ্যায়, না সঙ্গীতে, না ভাস্কর্য্যে—কিছুতেই জগতের ইতিহাসে তার নাম নেই। ফরাসী ও জর্ম্মাণ-জাতি ইংরাজের সঙ্গীত-নৈপুণ্যের কথার উল্লেখ করে নিজেদের মধ্যে খুব হাসা-হাসি করে। সেদিন এখানে একটা মজার গল্প শোনা গেল—ইংরাজের সঙ্গীত পারদর্শিতা সম্বন্ধে। একটু অবান্তর হলেও এ মজার গল্পটির উল্লেখ না করে থাক্‌তে পার্‌লাম না। ইংলণ্ডের এক মহাভোজে এক ইংরাজ গায়িকা গান করে আকাশ পাতাল চৌচির কর্চ্ছেন; চারিদিকেই করতালির রোল। এ টি ফরাসী না জার্ম্মাণ বিড়াল ঢুলু ঢুলু নয়নে সেই গায়িকার দিকে চেয়ে আপন মনে বলছেন "If I had "mewed" like that at home, would n't they kick me out of the room ?"

আমি এ তুচ্ছ প্রসঙ্গ নিয়ে এত কথা লিখতে বাধ্য হলাম এই জন্য যে, ইংরাজকে জাতি হিসেবে আমরা এতই ভক্তি কর্ত্তে শিখেছি যে, আমরা জাতীয় গুণগত perspective হারিয়ে দিব্য শ্রদ্ধা-ঢ়ুলু ঢ়ুলু নয়নে বসে আছি। এমন কি, নব্য ভারতীয়দের মধ্যেও এমন অনেক মহাত্মা আছেন, যাঁদের অন্তরে ইংরাজ-ভক্তি এতই মূল-শিকড় জাঁকিয়ে বসেছে যে, তাঁরা আমার এই নিতান্ত সাদা সত্য কথাটিকেও ন্যায়সঙ্গত বলে মনে কর্ব্বেন না। কিন্তু আমি এ বিষয়ে যা লিখছি, তা আমার অনেক চিন্তাশীল ও সত্যপ্রিয় বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে ও নিজে যথেষ্ট ভেবে-চিন্তেই লিখছি; এবং সে অভিজ্ঞতা একদিনের নয়,—দু'বৎসর ইংলণ্ডে বাস করার ফল। আমার ইংরাজদের হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নয়; আমার উদ্দেশ্য শুধু এই সত্যটি সাধারণে জ্ঞাপন করা যে, শুধু ইংরাজই জগতে একমাত্র বড় জাতি নয়; এবং সত্য কথা বল্‌তে গেলে, অন্ততঃ বর্ত্তমান জগতে thought-movement বা চিন্তার প্রসার-বৃদ্ধিতে ইংরাজের আসন মোটেই উচুতে নয়।

সকলেই জানেন, ইংরাজের নিজের সম্বন্ধে নিজের উচ্চ ধারণা কিরূপ অভ্রভেদী। এর পরিণামে স্বতঃই এঁরা মনে করে যে, অপরের কাছ থেকে এদের শিক্ষণীয় কিছুই নেই; এবং বিজাতীয় আচার-ব্যবহারের সারবত্তা সম্বন্ধে এদের অন্তর্দৃষ্টি ও সত্যনিষ্ঠা ও সহানুভূতি যে কত কম, তা Kipling প্রমুখ প্রখ্যাত লেখকদের দ্বারা ভারতীয়দের চরিত্রচিত্রনে দৃষ্ট হয়। আমি বিলাতে এই দু'-বৎসর বাস করে, ইংরাজ-চরিত্রের সাধারণ গুণাগুণ সম্বন্ধে যদি কিছু বুঝে থাকি, তবে তা এই যে, সাধারণতঃ এদের মধ্যে একটা ধারণা দৃঢ়-মূল যে, ইংরাজ জাতি অন্য সব জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইংরাজ ও ফরাসী জাতির জাতীয় মনোভাব সম্বন্ধে একটি খুব জানা গল্প ফরাসী দেশে প্রচলিত। দুই বন্ধুতে—একজন ফরাসী ও অপর জন ইংরাজ—গল্প কর্চ্ছেন। ফরাসী ভদ্রলোক বল্লেন, "If I had not been a Frenchman, I should have liked to be an Englishman." উত্তরে ইংরাজ ভদ্রলোক বল্লেন, "If I had not been an Englishman, I should have liked to be an Englishman." এটা অবশ্য বুঝতে পারা যায়, এবং এরূপ গর্ব্বের একটা redeeming feature আছে মানি; বিশেষতঃ যখন ইংরাজ জাতি সত্য-সত্যই তুচ্ছ জাতি নয়। কিন্তু বিদেশীয় যা কিছু, তাকেই উপহাসাস্পদ দাঁড় করাবার যে লালসা এদের মধ্যে খুব বেশী, তাকে ক্ষমা করা একটু শক্ত। আমি এ বিষয়ে দু'চারজন সত্যপ্রিয় ইংরাজ লেখককে উদ্ধৃত করা দরকার মনে কর্চ্ছি; নৈলে আমার সিদ্ধান্ত হয় ত অনেকের কাছে একটু অন্যায় ঠেক্‌তে পারে। Dean Inge বলে বর্ত্তমান যুগের একজন খ্যাতনামা ও নির্ভীক প্রবন্ধকার লিখছেন "Admiration for ourselves and our institutions is too often measured by our contempt and dislike for foreigners. Our own nation has a peculiarly bad record in this respect. In the reign of James I the Spanish ambassador was frequently insulted by the London crowd, as was the Russian ambassador in 1662; not apparently because we had a burning grudge against either of those nations but because Spaniards and Russians are very unlike Englishmen." Samuel Pepys তার বিখ্যাত ডায়ারীতে

এক স্থলে লিখে গেছেন "hard to see the absurd nature of Englishmen that can not forbear laughing at anything that looks strange." Goldsmith ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সাধারণ ইংরাজ সম্বন্ধে এইরূপ মতামত প্রকাশ কচ্ছেন :—

Pride in their port, defiance in their eye,
I see the lords of humankind pass by.

Dean Inge আবার লিখছেন :—

"Michlet found in England 'human pride personified in a people' at a time when the characteristic of Germany was a profound inpersonality."

অপিচ "Our grandfathers and great-grandfathers were quite of Milton's opinion that when the Almighty wishes anything great and difficult to be done, He entrusts it to His Englishmen."

ইংরাজ জাতির গুণ সম্বন্ধে আমি অন্ধ নই ; এবং যখন এদের দোষ উদ্ঘাটন করে দেখালাম, তখন তাদের জাতীয় গুণ সম্বন্ধেও একবারে নীরব থাকা উচিত হয় না। এদের বিশেষ জাতীয় গুণের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ যে, তাদের দেশে ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা অন্য দেশের চেয়ে বেশী। দ্বিতীয়তঃ, ডিমক্রাসীর কলকাজ বোধ হয় এখানে অন্য সব দেশের চেয়ে ভাল চলে। তৃতীয়তঃ, শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের ক্ষমতা এখানে অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক বেশী ; ও চতুর্থতঃ, খেলায় এ দেশের জনসাধারণের উৎসাহের সীমা নেই বল্লেই চলে, (যদিও এদের sportsmanliness সম্বন্ধে আমার যে উচ্চ ধারণা দেশে ছিল, কেম্ব্রিজে এসে তা ভেঙে-চুরে একাকার হয়ে গেছে) অর্থাৎ এরা sportsmen কেবল নিজেদের মধ্যেই—আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে নয়। এ কথা এখন থাকুক)। ব্যবসায়ে দক্ষতা, দলবদ্ধ হয়ে কাজ কর্বার শক্তি, জ্ঞানস্পৃহা, স্বদেশভক্তি প্রভৃতি গুণের জন্য আমি ইংরাজ জাতিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি ; যেহেতু শ্রদ্ধাই সদ্‌গুণের নৈবেদ্য। তবে এ বিষয়ে আমি আমার অনেক বন্ধুবর্গের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার প্রতিবাদ করি, যখন তাঁরা এ সব গুণ ইংরাজেরই বিশেষ জাতীয় গুণ বলে ভুল করে বসেন। এ প্রতীচ্যের [illegible] তার জন্য শুধু ইংরাজকে প্রশংসা করাটা ঠিক নয় ; কারণ তাতে অপরাপর জাতির প্রতি অবিচার করা হয়।

* * * *

এইবার আমি আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করে এ প্রবন্ধ শেষ কর্ব। যে বিষয় লিখ্‌তে যাচ্ছি, সে বিষয়ে এতদিন ধরে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ইতস্ততঃ করেছি ; তা কেবল এই ভেবে যে, মাত্র আমার একার অভিজ্ঞতায় সমস্ত ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে এরূপ একটা অভিযোগ আনা হয় ত সমীচীন নয়। কিন্তু আমার সৌভাগ্য বশতঃ আমি লণ্ডন, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের অনেক ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে ভাল করে মেশ্‌বারই সুযোগ লাভ করেছিলাম ; তাছাড়া এমন দু'চারজন ভারতীয় ভদ্রলোকের বাড়ীতে অতিথি হয়ে থেকে তাঁদের বহুদিন-সঞ্চিত অভিজ্ঞতা জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম, যাঁরা এদেশে অনেকদিন ধরে সপরিবারে বসবাস কচ্ছেন। তাছাড়া আমি ফরাসী ও সুইস জাতির সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত মিশেছি ; এবং সম্প্রতি কিছুদিন ধরে সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র জার্ম্মাণ পরিবারে মেশার সুযোগ পেয়েছি, যেখানে সৌভাগ্যক্রমে রুষ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সংস্পর্শেও আসতে পেরেছি। এ সব থেকে আমি বক্ষ্যমান সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি (এ বিষয়ে ব্যক্তিগত উদাহরণ দিয়ে এ প্রবন্ধের কলেবর স্ফীত করার কোনও দরকার আছে মনে করি না,—যে কোনও আত্মসম্মানশালী, বিলাত-প্রত্যাগত ভারতবাসীই বোধ হয় আমার এ সিদ্ধান্তগুলিতে সায় দেবেন) :—

প্রথমতঃ, ইংরাজ জাতি আমাদের বিশেষ করে হীন মনে করে ও আমাদের সংস্পর্শে আসাটা তাদের সম্ভ্রমের পক্ষে হানিকর বলে বিশ্বাস করে। দ্বিতীয়তঃ, যে সব ক্ষেত্রে এরা ভারতীয়দের সঙ্গে মিশ্‌তে চায়, সে সব ক্ষেত্রেও এরা মেশে on their own terms ; অর্থাৎ এরা উপর-উপর মেশে কেবল সেই সব ছেলেদের সঙ্গে, যারা তাদের আচারে, ভঙ্গীতে ও কথাবার্তায় ইংরাজদের মানুষ হিসাবে উচ্চতর স্থান দিতে অসম্মত নয়। তৃতীয়তঃ, যে সব ভারতীয়দের আত্মসম্মান বোধ আছে—দুই একটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে—তাদের এরা অকৃতজ্ঞ মনে করে। এর হেতু খুবই স্পষ্ট। এদের জনসাধারণের (উদার অথচ অভিজ্ঞ লোকের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, যেহেতু তাদের সংখ্যা খুবই কম) কোনও ধারণাই নেই যে,

...নালয়ে কোনও উচ্চ সভ্যতা কোন কালে ছিল, এবং তাঁরা ...রে করে যে, তাঁদের সোণার কাঠির পরশেই আমরা মানুষ ...ছি। সুতরাং কৃতজ্ঞতার গুরুভারে যখন আমরা আজও ...ভিভূত হয়ে পড়ি নি, তখন আমাদের চেয়ে নিমকহারাম ...প্রাপ্য; চতুর্থতঃ ও শেষতঃ, অধিকাংশ ইঙ্গ-ভারতীয়ই—Anglo-Indian রূপ অপরূপ চীজ—আমাদের সম্বন্ধে ...নানা মিথ্যা, অৰ্দ্ধসত্য ও বিকৃত সত্য প্রচার করে নিষ্ঠুর ...নন্দ উপভোগ করে থাকেন। এই সব ভারত-প্রত্যাগত ...রাজ মহাত্মাগণ নিয়মিত ভাবে কেম্ব্রিজে—অক্স্‌ফোর্ডেও ...রেন কি না জানি না—দুই একটা কাগজে আমাদের আচার-ব্যবহারকে বিদ্রূপ করে ও অভদ্র গালি দিয়ে লেখা বাহির করেন; অন্যান্য খ্যাতনামা সংবাদপত্রের ত কথাই নেই।

আমাকে কর্ত্তব্য-বোধে সদুঃখে এ সব অভিযোগ আন্‌তে হ'ল। তবে আশা করা যাক্ যে, এ ভাবটা সাময়িক, যদিও আমার নিজের এ বিষয়ে ভরসা খুব বেশী নয়। এ ক্ষেত্রে আমি আরও বল্‌তে চাই এই কথা যে, অন্ততঃ ফরাসী, সুইস্, জর্ম্মাণ ও রুষ জাতির মধ্যে আমি ভারতবাসীদের প্রতি এই অবজ্ঞা দেখ্‌তে পাই নি; এবং আমার অনেক বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে। অক্স্‌ফোর্ডে সেদিন জনৈক সুবক্তা ও স্বাধীনচেতা রুষ ছাত্র কোনও সঙ্ঘে একটি প্রবন্ধ পড়েন। তাতে আমার দু'তিনজন বন্ধু গিয়েছিলেন। তিনি না কি বলেছিলেন যে, ভারতের মত মহান্ সভ্যতা যে দেশে সর্ব্বাগ্রে বিকাশ পেয়েছিল, সে দেশের ছাত্রদের প্রতি ইংরাজ ছাত্রদের ব্যবহার দেখে তিনি দুঃখিত ও স্তম্ভিত না হয়েই পারেন নি। ইংরাজ জাতির উপর বিশেষ করে এ সঙ্কীর্ণতার অপবাদ আমি আমার দুই-একজন ইংরাজ বন্ধু ও বান্ধবীর কাছে প্রকাশ কর্ত্তে বাধ্য হয়েছি; তাঁরা তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ে দু'এক সময়ে প্রকারান্তরে এই ভাব প্রকাশ করেছেন "Look, how signally kind we are to you; still you single us out among the nations to impute all this narrowness at our door! O fie!!" আমি তাঁদের আজ অবধি এই সাদা কথাটি বোঝাতে পারি নি যে, দুই-একটা ব্যতিক্রমের দরুণ সাধারণ সিদ্ধান্ত অপ্রমাণ হয় না; এবং আমরা যা চাই তা এই ব্যক্তিগত হিসেবে মৌখিক ভদ্রতা নয়; তাঁদের মনে আমাদের মধ্যে decent soul-এর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী এ ধারণা জাগানও নয়; এমন কি, সত্যকার ব্যক্তিগত প্রীতিও নয়, যদি আমাদের জাতি সম্বন্ধে তাঁদের অন্তরের নিভৃত প্রদেশে অবজ্ঞার মূল উৎপাটন করা না হয়। আমি যদি আর একটু দৃশ্যতঃ নিষ্ঠুর স্পষ্টবক্তা হ'তে পার্ত্তাম, তবে তাঁদের স্বচ্ছন্দে আমার এই মতটি জানাতাম যে, দু'চারটে ক্ষেত্রে আমাদের প্রতি যে ব্যক্তিগত ভাবে ভাল ব্যবহারকে তাঁরা এত বড় করে দেখ্‌ছেন, সেইটেই তাঁদের বিপক্ষে একটা মস্ত যুক্তি; কারণ এটা কোনও বস্তুগত সত্য প্রকাশ কর্চ্ছে না, এটা আমাদের সম্বন্ধে তাঁদের গূঢ় মনোভাবের দ্বারাই উদ্ঘাটিত করে দিচ্ছে। যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সরল ও সত্য, সেখানে ভাল ব্যবহার করাটা এতই স্বাভাবিক হতে বাধ্য যে, সেখানে কেউই একে বড় করে দেখ্‌তে পারে না। যে অসত্য ও অসুন্দর মনোভাবের বশবর্ত্তী হয়ে আমরা স্বদেশে নিজেরা শ্রমজীবি-সম্প্রদায়কে "ছোটজাত" বা "ছোটলোক" নাম দিয়ে মানুষ নামের অপমান করে থাকি, ঠিক্ সেই মনোভাবই ইংরাজ জাতির মধ্যে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা জাগিয়ে দিয়েছে।

আমার মনে হয় যে, আমরা সকলেই দলে-দলে কেবল ইংলণ্ডে এসে একটা মস্ত ভুল কর্চ্ছি। সেদিন আমাকে একজন সুইস্ ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা কর্চ্ছিলেন যে, তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটিও ভারতীয় নেই কেন; বিশেষতঃ যখন তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় খুবই ভাল? পারিস বা জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা অত্যন্ত কম। ইতালীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বোধ হয় এ সংখ্যা একেবারে শূন্যের কোঠায়। পক্ষান্তরে, জাপানী ছাত্র নিরপেক্ষ ভাবে প্রায় সমস্ত সভ্য-দেশের বিশ্ববিদ্যালয়েই নিজেদের কার্য্যোদ্ধারে ব্যস্ত রয়েছে দেখা যায়। আমি জানি যে, আমরা অধিকাংশই কেবল একটা ডিগ্রীর ছাপ নিতেই বিলেতে আসি, নিজের মনের সম্পৎ বাড়াতে নয়। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়,—যদিও, যাঁরা মাত্র চাকুরীর আশায় ইংলণ্ডে আসেন, তাঁদের এজন্য নির্ম্মম ভাবে সমালোচনা করাও আমার উদ্দেশ্য নয়; কারণ, কথায় আছে, অত্যুক্তি চমৎকার। তবে আমি বিনীত ভাবে এই কথা বল্‌তে চাই যে, অন্নসমস্যা

গুরুতর ইত্যাদি কথা সব মেনে নিলেও, এটা ত নিশ্চিত যে কেবল সরকারের চাকরী ও খেতাব পাওয়ার উচ্চাশাটাও আমাদের নিজেদের লোকমত গঠন করে দূর কর্ত্তে হবে! এ বিষয়ে জনসাধারণের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করার স্পর্দ্ধা আমার নেই। আমি শুধু যূথবদ্ধ হয়ে ইংলণ্ডে আসাটার কোনও মতেই অনুমোদন কর্ত্তে পাচ্ছি না বলেই এত কথা লিখ্‌লাম। তবে আমি অনেক চিন্তাশীল ও হৃদয়বান্ ছাত্রের সঙ্গে আলোচনা করে যা দেখেছি, তাতে এইটুকু আশার আলো আমার চোখে পড়েছে যে, এ সমস্যা তাঁদের প্রায় সকলের মনেই জেগেছে।

আকাশ-রহস্য

[শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত]

হে মৌন, হে শান্তিময়, সুষুপ্ত আকাশ,
ছাড়ি' অট্টহাস
আপনারে সবলে বিস্ফারি'
দেখাও গোপন গর্ভ আজিকে বিথারি'!
আমাদের মত্ত ধরা হতে
অবিরাম স্রোতে
ছুটে যায় ও বক্ষে তোমার
কত ক্ষিপ্ত কলকথা, আরাব দুর্ব্বার।
হে দানব, মেলিয়ে বয়ান
তুমি অফুরাণ
গ্রাসি' লহ বুভুক্ষু যতনে
মোদের উচ্ছল হাস্য, কলতান, উদ্বেল ক্রন্দনে।
আজি টুটি' বক্ষ-দ্বার
নয়নে আমার
দেখাও সুগুপ্ত গর্ভ, সঙ্কল্প বিরাট,
হে মৌনী সম্রাট!
যুগে যুগে, লক্ষ বর্ষে প্রচণ্ড ক্ষুধায়
গ্রাসিয়াছ কত কথা, কত না ব্যথায়
কত না উজ্জ্বল হাস্য, প্রমত্ত উল্লাস,
ব্যথিতের ব্যাকুল নিঃশ্বাস,
অনাথের, দুঃখিনীর অনন্ত ক্রন্দন,
বিজয়-বারতা কত, প্রমত্ত রনন।
আজো তব গুপ্ত বক্ষে সুপ্ত রহে পড়ে'
আনন্দ বিভোরে
ধরার বসন্ত শত—সাথে পাখীতান,
বরষার ভেক-মুখে ধরণীর হরষের গান।
সর্ব্বভুক্, বুভুক্ষু-পরাণ
সবারে গ্রাসিয়া তুমি নিজবক্ষে রাখ অফুরাণ
আজি সুধু অনন্ত বিকাশে
দেখাও বিচিত্র রত্ন বিচিত্র প্রকাশে।
আপনারে ছিঁড়ে' টুটে' হে সুপ্ত গভীর,
জেগে ওঠ প্রচণ্ড অস্থির,
দেখাও চঞ্চল কাল, লুপ্ত যুগ, সুপ্ত বেদনায়
জীবন্তলীলায়।
কথা কও, বলে দাও হে মূক মহান্,
কত রাত্রি, কত দিন, উষা কত, সন্ধ্যা গরীয়ান্
কি বিচিত্র জীবন দোলায়
তোমার বিরাট দৃষ্টি-পরে মরেছিল কালের বেলায়।
স্থির-আঁখি-পাতে
তুমি দেখিয়াছ কত ধূলিকণা সাথে
লুটায়েছে মোহন কুসুম, শিশুর জীবন্ত হাসি
চলে' গেছে ভাসি'
দুঃখিনীর বুকের রতন; কত দীপ্ত প্রাণ
ধূলায় লভেছে অবসান।
যত গান, যত ছবি, যত হাসি-খেলা
হে সিন্ধু উতলি' তব বেলা
আজো তারা জাগিছে দুর্দ্দম তোমার অনন্ত বুকে
নিজ সুখে-দুখে।
আজি তুমি জেগে ওঠ আপনারে করিয়ে চঞ্চল,
দুরন্ত প্রবল,
বিদারি' স্তবধ বর্ম্ম দেখাও আমায়
জগতের সুপ্ত হাসি, লুপ্ত প্রাণ, আনন্দ, ব্যথায়।

মেঘনাদ

[শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এ]

(৩১)

সরিৎ যখন সংবাদ পাইল যে, মেঘনাদের কারাদণ্ড হইয়াছে, তখন সে কাঁদিয়া ভাসাইল। তার কাজ-কর্ম্ম সব চুলোয় গেল,—সে দিন-রাত কাঁদিতে লাগিল।

সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে সে মেঘনাদের শাস্তির জন্য নিজকে দায়ী করিয়া বসিল। তাহার সম্পূর্ণ অসঙ্গত ভাবে মনে হইতে লাগিল যে, সে যদি মেঘনাদকে ছাড়িয়া না আসিত, তবে মেঘনাদের এ বিপদ কিছুতেই ঘটিতে পারিত না। বিপদ আসিলেও, সে কোনও একটা অসম্ভব উপায়ে নিজের প্রাণ দিয়াও, মেঘনাদকে রক্ষা করিত, তাহা নিশ্চিত। এই কথা মনে হইয়া তাহার চিত্ত ধিক্কারে ভরিয়া উঠিল।

মেঘনাদের অপরাধের কথা সে ভুলিয়া গেল। তার মন ছাইয়া রহিল মেঘনাদের মহান্ চরিত্র,—সে মহত্বের কত নিদর্শন সে রোজ-রোজ দেখিয়াছে। যখন মেঘনাদ সর্ব্বদা কাছে থাকিত, তখন মানুষটা তার সমস্ত কাজগুলি আচ্ছন্ন করিয়া থাকিত;—তার প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড গুণগুলির প্রত্যেক পরিচয় নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এখন সরিৎ তাহার সংক্ষিপ্ত বিবাহিত জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা, মেঘনাদের প্রত্যেকটি কাজ খুঁটিয়া-খুঁটিয়া দেখিতে লাগিল। প্রত্যেকটিই তাহার কাছে মহীয়ান্, গরীয়ান্ হইয়া উঠিল। সে তাহার ভিতরকার মহান্ আত্মার কাছে নত হইয়া পড়িল।

অন্ধ, অন্ধ,—মহা অন্ধ সে,—তাই এতবড় মানুষটার এতবড় হৃদয় সে দেখিতে পাইল না! তার অতীত জীবনের একটা ক্ষুদ্র ত্রুটী ধরিয়া, তাহার প্রাণে এতবড় একটা দাগা অনায়াসে দিয়া আসিল। আর কি সে ত্রুটি! একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের মোহিনী শক্তির সম্মুখে মেঘনাদ আত্ম-সম্বরণ করিতে পারে নাই। যে অপরাধ তার প্রকাশ করিবার দরকার ছিল না,—সে কথা যে সরিতের কাছে সে অকপটে প্রকাশ করিয়া ফেলিল, সেই সৎ-সাহসই যে তার সমস্ত অপরাধকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে,—তাহা সরিৎ আজ বুঝিতে পারিল।

তার জীবনের এই একমাত্র নৈতিক পরীক্ষার সময়, মেঘনাদ সরিতের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিল। এতবড় স্পর্দ্ধা তার, যে, সে এই বিপদের সময়ে তাহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত না হইয়া, স্পর্দ্ধাভরে তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া আসিল। আবার সেই মুখে সে তার সতী-ধর্ম্মের স্পর্দ্ধা করিয়া এই দেবতুল্য স্বামীকে অপমান করিল! সরিতের হৃদয় অনুশোচনায় ভরিয়া গেল।

কত ভালবাসিত মেঘনাদ তাহাকে! তার আদরের সোহাগের প্রত্যেকটি নিদর্শন বাছিয়া-বাছিয়া সরিৎ চক্ষের জলে ভাসিয়া স্মরণ করিল। মেঘনাদের প্রত্যেকটি কথা আজ বহুমূল্য রত্নের মত সে প্রাণের ভিতর চাপিয়া ধরিল;—তার চুম্বন ও আলিঙ্গনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

মেঘনাদ যে নির্দোষ, সে বিষয়ে সরিতের সন্দেহ ছিল না। গোয়েন্দা ও গুপ্ত-পুলিশ যে চক্রান্ত করিয়া মিথ্যা অভিযোগ করিয়া তাহাকে জেলে পুরিয়াছে, সে কথা সে নিশ্চয় জানিল। জানিয়া সে পুলিশের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল; তাহারা ভীষণ অত্যাচারী বলিয়া তা'র স্থির বিশ্বাস হইল; এবং যাহারা ইহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহাদের প্রতি তাহার সহানুভূতির অন্ত রহিল না। না জানি তাদের মধ্যে মেঘনাদের মত কত নিরপরাধ ব্যক্তি আছে!

যে দিন সে খবর শুনিতে পাইল, তার পরদিন সে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদিগকে সঙ্গী করিয়া ঢাকার জেলখানা দেখিতে গেল। কয়েদীদের খাওয়া-পরা, শোয়া, কাজ-কর্ম্ম বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিল। যাহা দেখিল ও শুনিল, তাহাতেই তাহার চক্ষু ভরিয়া উঠিতে লাগিল। বাড়ীতে ফিরিয়া সে বিছানা হইতে তোষক-চাদর ফেলিয়া দিল। কাপড়-চোপড় তোরঙ্গে বন্ধ করিয়া, বাজার হইতে মোটা কাপড় আনাইয়া, তাহাই পরিতে আরম্ভ করিল। সে জেলের কয়েদীদের খাদ্য খাইতে লাগিল; শুধু তক্তা-পোষের উপর মাথায় দুইখানা বই রাখিয়া শুইতে লাগিল; আর রোজ স্কুল হইতে আসিয়া ইটভাঙ্গা, মাটি কোপান, এই রকম কোনও শক্ত কাজ যতক্ষণ পারিল করিতে লাগিল। এমনি কৃচ্ছ্র-সাধনা করিয়া, সে তার কল্পিত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিল।

দুই দিন পরে মাস-কাবার। সরিৎ তাহার মাহিনা আনিতে গেল। খাতায় নাম সই করিতে তার হাত কাঁপিতে লাগিল,—বুক কাঁপিতে লাগিল। সরকারের টাকা! যাহারা তাহার স্বামীকে অন্যায় করিয়া শাস্তি দিয়াছে, তাহাদের টাকা লইয়া সে পেট ভরাইবে। কাঁদিতে-কাঁদিতে, কাঁপিতে-কাঁপিতে সে নাম সই করিয়া টাকা কয়টা হাতে লইল। টাকাগুলি যেন তার হাতে আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল। সে নোট ও টাকা-গুলি বিস্ময় ছিটাইয়া ফেলিয়া, আঁচলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে পলাইল। সকলে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

পরের দিন অজিত তাহাকে কলিকাতায় ফিরাইয়া লইবার জন্য আসিল। তাহার সাধিতে হইল না। সরিৎ ভাইকে দেখিয়া বাঁচিল। লেডী প্রিন্সিপ্যালের কাছে বলিয়া-কহিয়া, পরের দিনই সে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। কাজে ইস্তফা দিয়া গেল।

ঢাকায় থাকিতে সে ছট্-ফট্ করিতেছিল; ভাবিতেছিল, কলিকাতায় গেলেই বুঝি সে শান্তি পাইবে। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া সে আরও বেশী ছট্-ফট্ করিতে লাগিল। এইখানেই মেঘনাদ জেলে পচিতেছে, এ কথা যখন তার মনে হইত, তখন তার প্রাণ ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিত। সে মেঘনাদকে দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও দেখা করিবার অনুমতি সে পাইল না। অনেক দিন ঘুরাইয়া একদিন জেলার বলিলেন যে, পরের সপ্তাহে দেখা করিবার অনুমতি দিবেন। সে দিন অনেক আশা করিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া, সরিৎ জেলে গেল। গিয়া শুনিল, মেঘনাদের অসুখ করিয়াছে,—সে দিন দেখা হইবে না। একে তীব্র নিরাশায় সে কাতর হইল; তাহাতে শুনিতে পাইল, মেঘনাদ অসুস্থ। তাহার ব্যগ্রতা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল; কিন্তু দেখা সে পাইল না। কিছুদিন পরে আবার অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল যে, জেলে অপরাধ করায় মেঘনাদের শাস্তি হইয়াছে,—সে কাহারও সহিত দেখা করিতে পাইবে না। তার পর আর একদিন অনুসন্ধান করিয়া জানিল, মেঘনাদকে অন্য জেলে বদলী করা হইয়াছে; কোথায়, সে খবর জানা গেল না। সরিৎ একেবারে বসিয়া পড়িল।

কলিকাতায় তার আর এক উপদ্রব হইল। এখানে তার কৃচ্ছ্র সাধন কঠিন হইয়া উঠিল। তার কঠোর সাধনে মা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। জেলের কয়েদীদের মোটা চালের ভাত, কচু-শাক, কাঁজী প্রভৃতি খাদ্য যে সরিৎ মেজের উপর বসিয়া খাইবে, আর শুধু মেজের ইট মাথায় দিয়া শুইয়া থাকিবে, ইহা মা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। আবার তার উপর যে নবনীত-কোমল হাতে সরিৎ কয়েদীর পরিশ্রমের কাজ করিবে, তাহা তিনি কিছুতেই হইতে দিলেন না। ইহা লইয়া মায়ে-মেয়েতে দিন-রাত কুস্তা চলিতে

লাগিল। সরিৎ অনেক কষ্টে তার জেদ বজায় রাখিত; কিন্তু মায়ের দুঃখে তার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত।

সরিতের কীর্ত্তি-কলাপ ক্রমে কাগজে ছাপা হইল। সংবাদপত্রে হুলু-স্থূল পড়িয়া গেল। মেঘনাদের মোকদ্দমায় খুব একটা গোলমাল পড়িয়া গিয়াছিল; পুলিশের সাক্ষীরা যে মিথ্যা করিয়া মেঘনাদকে হত্যাপরাধে জড়িত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা প্রমাণ হইয়া যাওয়ায়, তাহা লইয়া খবরের কাগজে অনেক দিন পর্য্যন্ত খুব লেখা-লেখি হয়। পুলিশের মিথ্যা সাক্ষ্যের এত আড়ম্বর সত্ত্বেও যে তাহাদেরই সাক্ষ্যের উপর বিশ্বাস করিয়া জজেরা মেঘনাদকে জেলে দিলেন, ইহাতে সকলেই অবাক্ ও অসন্তুষ্ট হইল। সংবাদপত্রে মেঘনাদের নির্দ্দোষিতা খুব জোরের সঙ্গে প্রকাশ করা হইল; এবং এই মোকদ্দমা লইয়া পুলিশ ও জজদিগকে অনেক গালাগালি করা হইল।

ইহার উপর যখন সরিতের কীর্ত্তি-কলাপ প্রকাশিত হইল, তখন কাজেই লোকে আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সরিতের সমস্ত বিবরণ যখন তন্ন-তন্ন করিয়া কাগজে ছাপা হইতে লাগিল, তখন সমস্ত দেশ সরিতের প্রশংসায় ভরিয়া উঠিল; এবং লোক সেই সঙ্গে-সঙ্গে বিচারের উপর চটিয়া গেল।

অনেকে সরিৎকে প্রশংসাপূর্ণ, সান্ত্বনাপূর্ণ চিঠি লিখিল; তার মধ্যে অনেকেই দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। পত্র-ব্যবহার-সূত্রে ক্রমে ইঁহাদের সঙ্গে সরিতের বেশ সদ্ভাব জন্মিল; এবং অনেকে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে লাগিলেন।

বিশেষ করিয়া বিপ্লববাদী দলের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন নেতৃগণ সরিতের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। সরিতের বাড়ী এই দলের লোকের কাছে একটা তীর্থ গোছের হইয়া উঠিল। সরিৎ ও অজিতের সঙ্গে ইহাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল।

এ সব বিষয়ে তাহাদের প্রধান উপদেষ্টা ছিল অজিতের অন্তরঙ্গ বন্ধু শিশিরকুমার। সে একটা জীবন্ত উৎসাহ— একটা জ্বলন্ত অগ্নি-শলাকা। তার বক্তৃতা করিবার, লোককে বুঝাইবার, মাতাইবার অসাধারণ শক্তি ছিল। সে তার সুদৃঢ় উদ্দীপনা ঢালিয়া দিয়াছিল সরিৎকে বিপ্লব-পন্থায় ব্রতী করিতে। সে শীঘ্রই আশাতীত সফলতা লাভ করিল। অজিত ও সরিৎ গুপ্ত সমিতির দীক্ষিত সভ্য হইল।

সরিৎ এখন বলিল যে, সে মেঘনাদের বাসায় গিয়া থাকিবে;—সেইখানেই তাহার থাকা উচিত। তাহার বাপ-মা অনেক আপত্তি করিলেন; কিন্তু কাঁদিয়া-কাটিয়া সরিৎ অনর্থ করিল। শেষে স্থির হইল, অজিত গিয়া সরিতের সঙ্গে থাকিবে। সেখানে গিয়া তাহারা গুপ্ত সমিতির একটা রীতিমত আড্ডা গাড়িল। শিশির নানা স্থান হইতে নানা রকম বাক্স-পেটারা আনিয়া, এই বাড়ীতে বোঝাই করিতে লাগিল। তার কতক অস্ত্র-শস্ত্র, কতক ডাকাতির অপহৃত সামগ্রী। সরিৎ এই সব জিনিষের খবরদারীর ভার লইল। সে সত্য-সত্য একটা মস্ত গৌরবময় কাজে লিপ্ত হইয়াছে অনুভব করিয়া, অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। অজিত তার চেয়েও বড় সাহসের কাজে লাগিয়া গেল;—সে ডাকাতি করিতে লাগিল।

(৩২)

একদিন হঠাৎ সরিৎ মেঘনাদের একখানা পত্র পাইল; তাহাতে সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মেঘনাদ যেন তার সব কাজের খবর পাইয়াই লিখিয়াছে—

"সরিৎ, একখানা খবরের কাগজে তোমার কৃচ্ছ্র-সাধনের সংবাদ দেখিলাম। জেলার সাহেব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা পড়িতে দিয়াছিলেন। পড়িয়া মনে হইল, তুমি আমার শাস্তিতে ব্যথিত হইয়া, আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিয়াছ। সেই সাহসে তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি;—তুমি দয়া করিয়া চিঠিখানা পড়িলে কৃতার্থ হইব।

"আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি তোমার তপশ্চর্য্যা পরিত্যাগ করিও। তুমি হয় তো মনে-মনে ভাবিতেছ, আমি বড় কষ্টে আছি। তাহা ঠিক নয়। আমি পরম শান্তিতে আছি। আমি নিজের ভিতর এমন একটা শক্তি অনুভব করিতেছি, যাহাতে জেলের কঠোরতা আমার কাছে বেদনা-দায়ক না হইয়া স্ফূর্ত্তি জন্মাইতেছে। তা' ছাড়া, এখানকার জেলার সাহেব আমার পরম বন্ধু; তিনি আমার প্রতি যেমন সদয় ও স্নিগ্ধ ব্যবহার করিতেছেন, তেমন যত্ন আমি এ জীবনে কাহারও কাছে পাইয়াছি কি না সন্দেহ। সুতরাং আমি খুব কষ্ট পাইতেছি; এ রকম কল্পনা করিয়া, তুমি অযথা নিজেকে কষ্ট দিও না। আমার জন্য তুমি

রিভলভার দেখাইয়া মেঘনাদকে কাবু করিয়াছিল, সে কথা বেশ একটু স্পর্দ্ধার সঙ্গে বলিল।

সরিতের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। শিশিরের উপর এবং তার সমস্ত দলটার উপর তার মনটা এ কথায় তিক্ত হইয়া উঠিল। পুলিশের উপর সে যে চটিয়াছিল, তার মৌলিক কারণ এই যে তাহার বিবেচনায় পুলিশ মেঘনাদের শত্রু। এখন ঠিক সেই কারণে সে শিশির ও তাহার দলের উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া উঠিল। সে এত ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, কথা কহিতে পারিল না। শিশির তার পর বলিল সেই দিনের কথা, যে দিন মেঘনাদ অসিতকে দেখিতে গিয়াছিল। সে বর্ণনা শেষ করিয়া শিশির বলিল, "বাছাধন একেবারে সিংহের মত লাফিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের হাত থেকে অসিতকে তুলে আনতে। আর যেই দু' জোড়া রিভলভার তার মাথার উপর বাগিয়ে ধরা গেল, অমনি তিনি একেবারে একটা বেড়ালের মত নেতিয়ে পড়লেন।" বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

সরিতের মনে সেই দৃশ্যের একটা স্পষ্ট ছবি একবার জাগিয়া উঠিল।—সরল, সাহসী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, বন্ধুপ্রিয় মেঘনাদ বন্ধুর রক্ষার জন্য লাফাইয়া উঠিয়াছে; আর তাহাকে আপনাদের কবলের মধ্যে পাইয়া, কয়েকটি কাপুরুষ তাহার দিকে পিস্তল উঁচাইয়া ধরিয়া, তাহাকে নিরস্ত করিতেছে, ইহা সে চক্ষের উপর দেখিতে পাইল। মেঘনাদের সে দৃপ্ত মূর্ত্তিকে সে মনে-মনে শত নমস্কার করিল; আর তার রক্ত উন্মত্ত হইয়া নাচিয়া উঠিল। তাহার কাণ দুটী লাল টক্‌টক্ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ দম চাপিয়া, দন্তে অধর টিপিয়া সে নীরবে রহিল। তার পর সে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ওঃ, আমি জানতাম্ না যে, আপনারা এত বড় কাপুরুষ!"

"কাপুরুষ!" বলিয়া শিশির ভ্রূকুটি করিয়া চাহিল।

সরিৎ তাহার সরল, সুন্দর, দৃঢ় দৃষ্টি শিশিরের মুখের উপর নামিয়া বলিল, "হ্যঁশোবার কাপুরুষ! একজন সাহসী, নিরস্ত্র বীরকে আপনারা নিরস্ত্র অবস্থায় পেয়ে, দুই-চারজনে মিলে, রিভলভার নিয়ে ভয় দেখাতে অগ্রসর হ'তে পারলেন, আর আপনারা কাপুরুষ ন'ন?"

শিশির রাগে কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণ সে কথা কহিল না। তার পর কষ্টে একটু অবজ্ঞাপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, সে কথা থাক! এখন বুঝতে পারলে তো, যে, তোমার কোনও কিছু ক'রবারই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নেই!"

"আমার স্বাধীনতা নেই! এ পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, আমার স্বামী ছাড়া, যে আমার স্বাধীনতা খর্ব্ব ক'রতে পারে। আমি আপনাকে এক ফোঁটাও ভয় করি না।"

শিশির হাসিয়া, পকেট হইতে একটা রিভলভার বাহির করিয়া বলিল, "এটাকেও ভয় কর না?" সে রিভলভারটা সরিতের দিকে ঘুরাইয়া ধরিল।

"না" বলিয়া সরিৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তাহার রক্ত তখন টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল। সে তাহার দৃষ্টির ভিতর অপরিমেয় ঘৃণা ভরিয়া দিয়া, শিশিরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

অজিত এতক্ষণ বিমূঢ় হইয়া বসিয়া ছিল। সে চট্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া, শিশিরের রিভলভার শুদ্ধ হাত চাপিয়া ধরিল। শিশির কোন বাধা দিল না; সরিতের দৃষ্টি তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল। তাহার সেই দৃপ্ত, বীর মূর্ত্তি দেখিয়া, সে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে হাত ছাড়িয়া দিল,—অজিত অনায়াসে রিভলভারটা কাড়িয়া লইল।

তখন শিশির বলিল, "ধন্য! ধন্য, তুমি সরিৎ! তোমার স্বামীর চেয়ে তুমি ঢের বড় বীর! তুমিই দেশের যোগ্য সেবিকা!"

সরিৎ হাসিয়া বলিল, "আপনার শাসনকে আমি যতটা তুচ্ছ করি, আপনার স্তুতিকেও ঠিক তেমনি ঘৃণা করি। আমি জান্‌তাম না এসব কথা! জান্‌তাম না যে আমার স্বামীকে আপনি ও আপনার বন্ধুরা এমনি করে এ বিপদে ফেলেছেন! ভাগ্যে আপনি আজ বল্লেন! এখন থেকে আর আপনার সঙ্গে, আপনাদের দলের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নাই। আপনি এই মুহূর্ত্তে আপনার সমস্ত জিনিষ-পত্র নিয়ে আমার বাড়ী থেকে বিদায় হ'ন। না হ'লে আপনার জিনিষ-পত্র আমি রাস্তায় বের করে ফেলে দেব।"

শিশির বলিল, "তুমি আমাকে ভয় কর না সরিৎ, কিন্তু তুমি কি মনে কর যে, তোমার শাসনেই আমি ভয় পাব? শিশির মিত্র সে ছেলে নয়। তোমার হুকুম আমি মানছি নে। আমাদের জিনিষ এখানেই থাকবে। দেখি, তুমিই বা কি ক'রে তোমার শাসন আমাকে মানাতে পার।" বলিয়া সে একটা চেয়ারের উপর চাপিয়া বসিল। তার পর বলিল,

...মি জানি সরিৎ, যে, তুমি বেশ জান যে, আমাকে কোনও ...দে ফেলতে গেলে, তোমার ভাইকে আর তোমাকে ...-সঙ্গে জড়িয়ে প'ড়তে হ'বে।"

সরিৎ রাগে গর্‌গর্‌ করিতে লাগিল। সে যে কিছুই ...রিতে পারে না, তাই ভাবিয়া সে মনে-মনে গজরাইতে ...াগিল।

অজিত এ অবস্থায় তাহাদের দু'জনকে রাখিয়া যাইতে ...কার করিল না। সে বলিল, "দেখ শিশির, এখন ...মি ওঠ। তোমার এখানে থাকাটা ভাল হ'বে না। ...ন্ধ্যা বেলায় এসো, ঠাণ্ডা ভাবে সব বিবেচনা করা ...বে।"

সরিৎ বা শিশির কেহই এ প্রস্তাব সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ ...খাইল না। সরিৎ এই মুহূর্ত্তেই সমস্ত পাপ বিদায় করিতে ...,—শিশিরও ঐ অবস্থায় সরিতের উপর ভরসা করিয়া জিনিষগুলি ছাড়িয়া যাইতে সম্পূর্ণ নারাজ। কাজেই কেহ নড়িল না।

অজিত শিশিরের হাত হইতে রিভলভার কাড়িয়া লইয়া, টেবিলের উপরই রাখিয়া দিয়াছিল। সরিৎ চট্‌ করিয়া সেটা সংগ্রহ করিয়া, শিশিরের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এইবার আপনি বেরোন!" শিশির সত্য-সত্যই ভয় পাইয়াছিল। সে হাত তুলিয়া বলিল, "থাম, আর রিভলভার দেখাতে হ'বে না। তুমি সব পার! আমি তোমার কথাই মান্‌ছি। এখনই গাড়ী এনে জিনিষগুলো নিয়ে যাচ্ছি।"

শিশির গাড়ী ডাকিয়া জিনিষগুলি লইয়া গেল, সরিৎ বাড়ীতে তালা বন্ধ করিয়া, অজিতের সঙ্গে বাপের বাড়ী গেল। তার বাপ-মা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন যে, সে তাহার কৃচ্ছ্রসাধন পরিত্যাগ করিয়া, শান্ত ভাবে কলেজে যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

চিত্রকর

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

(১)

নিতুই তোমার চিত্র এঁকে
দেখেই মরে যাই লাজে,
তোমার মোহন রূপটী ফুটাই
বর্ণ এমন পাই না যে।
লাবণ্য তায় কি অথাই,
পরাণ ডুবে পায় না থাই,
আমার তুলি ধরতে নারে,
জাগে যে রূপ হৃদ্‌মাঝে।

(২)

ও চাঁদ-মুখের ছাঁদ উঠে না
সদাই করি শঙ্কা যা,
চিত্রকরের নয়ন জলে
ঝরে যায় তার রং কাঁচা।
বুক ভরে না কই দেখে,
যতই ছবি যাই এঁকে,
বিফলতায় বাড়ায় তৃষা
বিরাম কভু নাই কাজে

(৩)

আঁকতে আমি চাই গো যাহা
বলতে নারি মুখ ফুটে,
আঁকার নিবিড় আনন্দতেই
সকল বেদন দুখ টুটে।
প্রকাশ করার গৌরবে
বুক যে ভরে সৌরভে,
পূর্ণতারি পৌর্ণমাসীর
জ্যোৎস্নাতেই যাই মজে

হাসির কোয়ারার কোন সন্ধানই না পাইয়া, অবাক্ মুখে শুধু তাহারই পানে চাহিয়া আছে। ইহা দেখিয়া খানিক পরে অসমঞ্জর নিজেরই হুঁষ হইল। সে তখন নিজের সেই ঝরণা-ধারাবৎ কৌতুক-হাস্য রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়া, সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "আপনার অমৃত মামাটির ঘটে কিছু বুদ্ধি আছে! ওটিকে পেলে আমাদের পক্ষে বড় মন্দ হয় না।"

বিমল ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সভয়ে বাধা দিল "অমন কাজটিও করবেন না, অসমঞ্জ বাবু! আমার অমৃত মামাকে যদি ঘুণাক্ষরেও এসবের খবর জান্‌তে দেন, তার পর দিনই আপনি সদল-বলে আন্দামানে যাত্রা করেচেন বলে স্থির জান্‌বেন। অবশ্য এক হিসাবে আমারও কিছু উপকার করেছে সে, বল্‌তে হবে। দেশে দিদিমার আদরের মধ্যে থেকে এটুকুও আমার শেখবার সুবিধা হতো না। কিন্তু সে যেমন করেছে, তেমন আমার অনেক টাকাও ফাঁকি দিয়েছে।"

অসমঞ্জ তেম্‌নি হাসিয়াই বলিল, "ফাঁকি তো অনেকেই দেয় বিমলবাবু! কিন্তু আপনার ওই মামাটির ফাঁকি দেওয়ায় বেশ একটুখানি মৌলিকতা আছে যে! আর তারই জন্যেই আমি ওর তারিফ করচি। আপনার নাবালকত্ব-দশা দেড়টি বৎসর পূর্ব্বেই ঘুচে গেছে। একুশ বৎসরের বিধান সাধারণের জন্য নয়; সেটা অসাধারণদের। আমাদের বয়ঃপ্রাপ্তি স্বীকৃত হয়ে থাকে অষ্টাদশে। এই প্রায় ছুটি বৎসর আপনার 'এক্‌সেস্' লেগেছে।" এই বলিয়াই সে পুনশ্চ সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল। কিন্তু বিমলের মুখে সে হাসি এতটুকু একটুখানিও প্রতিচ্ছায়া বিম্বিত করিল না। তাহার বুকের মধ্যে তখন এই দেড়টি বৎসরের সঞ্চিত অনেকগুলি ব্যর্থ-বেদনার স্মৃতি, কিছুক্ষণ পূর্ব্বকার উৎপলা-দত্ত পরাভবের লজ্জা, জ্বালা, আর এই দীর্ঘ দিনের প্রতারিত থাকার যে পরাজয়ের অবমাননা—সে সমস্তই এক সঙ্গে ধূমায়িত হইয়া-হইয়া, দপ্ করিয়া সহসা উর্দ্ধ শিখায় ভীষণ ভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তাহার মধ্যে যে একটা অদম্য আত্মাভিমান বা অহঙ্কার একটা হিংস্র দৈত্যের মতই তাহার জন্মশোণিতের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে, সেইটে আজ আবার সেই ছোট-বেলার মতই পূর্ণ পরাক্রমে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

সেদিন সে সকাল-সকাল উৎপলাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পিছনে দরজা বন্ধ করিয়াই উৎপলা অসমঞ্জের কাছে আসিয়া বলিল, "... দেখ্‌ছো ছোড়্‌দা,—অমৃত মামার দফা আজ নিকেশ হলো।"

অসমঞ্জ ইতঃমধ্যেই কি যেন ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিল সে এই সম্বোধনে মুখ তুলিয়া বলিল, "আমিও ঠিক ওই কথাটাই ভাবছিলেম। শেষে একটা বেশি কিছু না করে বসে। বিমল ছোক্‌রাটার মধ্যে যথেষ্ট শক্তি আছে; কিন্তু ধৈর্য্য নেই।"

উৎপলা তাহার স্বভাব-সিদ্ধ থপ্ করিয়া বলিয়া দিল, "ঠিক ওরই জন্যেই আমি ওকে যা একটুখানি শ্রদ্ধা করি।"

অসমঞ্জ তখনও কি একটা ভাবিতেছিল। চিন্তা-গম্ভীর মুখে সে পুনরপি কহিল "কিন্তু পল, ওই রকম গোঁয়ারতমি করেই অনেকে অকালে নষ্ট হয়ে গেছে। তাই ভয় হয়, আমাদেরও না শেষটায়—"

দীপ্ত চোখে বিদ্যুতের দুইটা ঝিলিক্ হানিয়া, কুলিশ-কঠোর কণ্ঠে উৎপলা সবেগে কহিয়া উঠিল, "ধিক্ ছোড়্‌দা! ভয়ই যদি করবে,—এ পথে এসেছিলে কেন? যখন সঙ্কটের মধ্যে পা দিয়েছ, তখন সমুদায় ভয়-ভাবনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে চোখ বুজে সোজা চল্‌তে হবে,—তাতে যতদূর পৌঁছান যায়। তোমার মত একবার এগিয়ে দুবার পেছুতে গেলে, কোন দিনই আমাদের গন্তব্য স্থানে গমন ঘট্‌বে না, তা জেনে রেখ। যা করতে হবে, দ্বিধাশূন্য হয়ে করাই ভাল।"

অসমঞ্জ মনের মধ্যে বেশ তৃপ্ত হইতে না পারিলেও, বাহিরে নিজের পরাজয়সূচক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। নামে সেই তাহাদের সভার সভাপতি হইলেও, কার্য্যতঃ উৎপলাই তাহাদের সবার চেয়ে কর্ম্মোৎসাহে অগ্রণী। তাহার মতটাও সকলেরই অপেক্ষা অধিকতর কঠোর। অন্যে যদি ধরিবার পক্ষপাতী হয়, তো, সে বাঁধিবার। এই অত্যন্ত উত্তেজিত-স্বভাবা নারীর নিকটে নিজেদের কোন দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাওয়া কাপুরুষতা বোধে, নিজ-নিজ মতের বিরুদ্ধেও সেইজন্য অনেক সময় অনেককেই উহার সহিত এক-মতাবলম্বী বলিয়া প্রমাণ করিতে হইয়াছে; নতুবা যে নারী-হস্তে পরাভব পর্য্যন্ত ঘটিয়া যায়। সে দুর্ব্বলতা তাহার দাদা অসমঞ্জর যে না ছিল তা নয়। আজও সেই জন্য সে ছোট বোনের ভ্রম প্রদর্শন করিতে ভরসা করিল না।

ঊষা

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

Blocks by --BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.

রাজধানীর অফুরন্ত শব্দ-লহরীর মধ্যে, অসংখ্য বৈদ্যুতিক দ্যুতির ভিতর, অগণ্য নরনারীর মাঝখানে চলিয়া আসিলেও, সেদিন অপ্রকৃতিস্থ-মতি বিমলের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার আচ্ছন্ন করিয়া, কেবলমাত্র একটী সুর বাজিয়া চলিয়াছিল যে, সে প্রতারিত হইয়াছে। জগতের মধ্যে সবচেয়ে সে যে জিনিষটার সংস্রবে আসিতে ঘৃণা বোধ করে, ঠিক সেইটেই আসিয়া কি না তাহার ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসিল! সমস্ত মনটা ঘৃণায় সঙ্কোচে গুটাইয়া গিয়া, একখানা বড় কয়লার মত জমাট ও কালো হইয়া, এবং দেখিতে-দেখিতে কয়লায় আগুন ধরিয়া যেমন লাল হইয়া উঠিতে থাকে, তেম্‌নি করিয়াই তাঁহার সারা চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। তার পরই তাহার মনে পড়িল যে, শুধু আজই নয়,—ঐ একমাত্র লোকের হাতেই নয়,—জন্মিয়া অবধিই সে এই ঠকানোর ফাঁকির মধ্য দিয়াই মানুষ হইয়াছে। প্রথমতঃ, তার নিজের মায়ের কাছেই ইহার আরম্ভ! মায়ের মুখ, মায়ের বুক এজন্মের মতই তাহার কাছে অপরিচিত। জগতে আনিয়াই পাঁচজনের দয়ার হস্তে সঁপিয়া দিয়া, নিজে তিনি নিজের কোন পাওনা তাহাকে না দিয়াই বিদায় লইলেন। এর চেয়ে ফাঁকি আর কে কাহাকে দিতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ, পিতা। পিতার কাছেই বা সে কবে কি পাইয়াছে? স্মরণাতীত কালে যদি কিছু থাকে,—স্মৃতির মধ্যে তো কোন কিছুই সঞ্চিত নাই। বরং এইটুকু সে দেখিতে পায়, যে, তিনি তাহার মায়ের স্মৃতিকে বিস্মৃতির মধ্যে লুকাইয়া ফেলিয়া, তাহার জন্য এক বিমাতা আনিয়া দিয়াছিলেন। নিজের সকল কর্ত্তব্য তাহাকে দিয়া সারিয়া লইতে চাহিয়া, নিজে তাহার দিকে একদিনও ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখেন নাই। সময়-সময় শুধু শাসন করিতেই চাহিয়াছেন। এই তো তাঁহার স্মৃতির মূল্য।

তার পর দিদিমা। সেখানেও বিমলের পাওনার চাইতে ফাঁকির জমাটাই প্রকাণ্ড বড়। দিদিমা তাঁর নিজের ধরণে কিছু কম করিয়াছেন, তা বলা চলে না; কিন্তু ফলে সে পাইয়াছে কি?—সুধা নয়, মধু নয়, শুধু বড় একটা গামলা ভর্ত্তি করিয়া কটুতিক্ত-স্বাদ হলাহল! সে হিসাবে ধরিতে গেলে অমৃত মামা তাহার পিসিমার চেয়ে অপকারী নন;—বরং উপকারীই বলিলে বলা যায়। সেই তো তাহার সেই স্নেহের কারা ভাঙিয়া দিয়া, তাহাকে আলোর মধ্যে—তা সে যে উদ্দেশ্যেই হোক—আনিয়া ফেলিয়াছিল। তাই আজ সে বিমলেন্দু! তাই আজ সে সেই পাড়াগেঁয়ে দুর্দ্দান্ত বালক ছুখে নয়! জীবনের এই পাওনা-দেনার বিশ্লেষণের মধ্যে আরও কি কাহারও মুখ, কাহারও কথা চকিতে মনে পড়াইয়া দেয় না? এই হিসাব-খতিয়ানের মধ্যে আর কি কাহারও সঙ্গে কারবারের হিসাব-নিকাশ করিবার প্রয়োজন একেবারেই নাই?—বিমলেন্দুর ছোটবেলার অনেকগুলা ছোট কথা এক সঙ্গেই যেন ঝাঁক বাঁধিয়া মনের চারিপাশে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সে সব কথা তাহার বিমাতা ইন্দ্রাণীর। যাঁহার সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত একটী দিনের কোন একটী মুহূর্ত্তেও সে নিজের কোন ঋণ স্বীকার পর্য্যন্ত করিতে চাহে নাই। আজও তাহার কাছে একটা দেনার দায় মনের মধ্যে উঠি-উঠি করিতে যাইতেই, সে হাত দিয়া সেটাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল; এবং গভীর অবজ্ঞার তীক্ষ্ণ হাস্যে এই ভাবটা তাহার মনের উপর ফুটাইয়া তুলিল যে, সৎমায়ের আবার মায়া! শুধু একটী জায়গাই এখনও বাকি রহিল। আর ঐটুকুকেই শুধু বিমল তাহার শূন্যময় চিত্তের সমস্ত দরজা-জানালা আঁটিয়া রাখিয়া বাকি রাখিতেই চায়। সে তাহার সেই ছোট্ট বোনটির কথা! তাহার স্নেহশীলা আনন্দময়ী তারাটীর কথা! বহুদিনের অদর্শন, তথাপি এখনও বিমলেন্দু একটি দিনের জন্যও তারাকে তো ভুলিতে পারে নাই! আর সেই কি তাহাকে ভুলিয়াছে? কখনও না! প্রকৃত প্রেম, অবিচ্ছিন্ন, অবিস্মৃত স্মৃতিতে অবিনশ্বর হইয়া জাগিয়া থাকে। সে কি কখন অদর্শনে মুছিয়া যায়? যা মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন দিনই হরণ করিতে না! তারার কথা মনে পড়িতেই, তাহার জ্বালাভরা গুরুভারগ্রস্ত হৃদয় যেন কথঞ্চিৎ শীতল হইয়া আসিল। সংসারে সে একেবারেই রিক্ত নয়, নিঃস্ব নয়। একটা সত্য বস্তু সে এ জগতের ধূধূ মরু-বালুর মাঝখান হইতে কুড়াইয়া পাইয়াছে। একটি গোলাপ তাহার অন্তরের কাঁটাবনের মধ্য দিয়া উঁকি দিতেছে।

তার পর—হাঁা, তার পর অমৃত,—সে তাহার ভালমন্দ কি করিয়াছে, তাহারও একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক্! কোথা হইতে একদিন সহসা-উদিত নৈদাঘ ঝটিকার মত সবেগে তাহার জীবনের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া, সে

হাকে তাহার সমস্ত পরিচিত সমস্ত পুরাতন হইতে কাড়িয়া ড়িয়া, এক সম্পূর্ণ অপরিচিত অজানা রাজ্যের নব-জীবনে তিষ্ঠিত করিল! ইহাতে তাহার পক্ষে মন্দ না হইয়া লই হয় ত হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু প্রথম দিকের দুঃসহ বিরহ-বেদনা, সে দুর্ব্বহ অধীনতার নাগপাশ,— ! সেও যে এক চির-অবিস্মৃত দুঃস্বপ্নেরই মত তাহার মর্ম্মের খানটাতেই গাঁথা হইয়া আছে। আর কিসের উদ্দেশ্যে ই সর্ব্ব-বিচ্ছিন্ন একমাত্র এই অর্দ্ধ-পরিচিত আত্মীয়ের গ্রহজীবী হইয়া তাহার জীবনের এই সুদীর্ঘতম বৎসরগুলা টাইতে হইল? অমৃত মামার উদ্দেশ্য, তাহাকে যেমন রিয়া হোক নিজের অধীনস্থ রাখিয়া, তাহার অর্থ লুণ্ঠন া। সে লুণ্ঠিত ধনের পরিমাণ কতটা? সে সম্বন্ধে লের কোনই আন্দাজ নাই। তবে একদিন অমৃতের সাবধানতায় বাহিরে রাখা তাহার নামীয় ব্যাঙ্কের খাতা-না হঠাৎ কেমন বিমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; এবং কিছুই ভাবিয়া এমনি-এমনি সেটা সে উল্টাইয়া দেখে যে, হাতে বৎসর-পাঁচের মধ্যে হাজার পনের-ষোল টাকা া দেওয়া হইয়াছে। তা ছাড়া একখানা হাজার কত টাকা মের বাড়ী কেনার গুজবও কোথা হইতে তাহার কাণে কিয়াছিল, সেও আজ মনে পড়িল।—যাক টাকা। কার জন্য তাহার এতটুকুও দুশ্চিন্তা নাই। কিন্তু চুরি! ওই ঘৃণিত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য, তাহার সমুদায় ধীন সত্ত্বাকে শুদ্ধ অস্বীকার করিয়া, সে যে আইনের প্যাঁচের ছল করিয়া, তাহাকে দুই-দুইটা বৎসর নিজের মুষ্ঠাধীনে দাবিয়া রাখিল,—ইহারই লজ্জা-ঘৃণা সে যেন র সহ্য করিতেই পারিতেছিল না! এই সঙ্গে আরও জনের কথা মনের কোণে কোণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে গিল। তাহাদের মুখই আজ তাহার মনোদর্পণে স্বচ্ছ ভাস্বর হইয়া ফুটিয়া আছে। সে দুজনের একজন হার বন্ধু, তাহার প্রিয়, তাহার গুরু, তাহার বান্ধবহীন, বিহীন জীবন-তরণীর সুযোগ্য কর্ণধার অসমঞ্জ! র একজন,—সে উৎপলা। বিমলেন্দু বিস্মিত হইয়া অনুভব রিল, এই অদ্ভুত-স্বভাবা নারীটী তাহার দৃপ্ত তেজস্বিতা, বিশ্লেষণ-শক্তি, নির্ম্মম পরিহাসপ্রিয়তা—এ সমস্ত ক্রটি ও তাহার জীবন-খাতার শূন্য পাতার অনেক খানিই ভরাইয়া ফেলিতেছিল। ইহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যেন ডাক্তারের ছুরীর মত হাড় কাটিয়া ভিতরে ঢোকে; ইহার মর্ম্মভেদী বাক্যবাণে ক্ষতের মুখে শোণিতক্ষরণ করে। কিন্তু এ কি রহস্য? সেই রহস্যময়ীর রহস্যাঘাতে আহত, জর্জ্জরিত চিত্ত,—তথাপি সেই তাহার হাতেরই মৃত্যু-শেলের অভিমুখে বুক পাতিয়া দিয়া মরণ-খেলাই খেলিতে চায়! পতঙ্গ যেমন আগুন ঘিরিয়া নিজের মরণ-কান্না কাঁদে,—ব্যাকুল হইয়া বারেক সেই মৃত্যুরূপিণী রূপরাণীর আলিঙ্গনের কামনায় সুদূর বনান্ত হইতে ছুটিয়া আসে,—এও ঠিক তেমনি কি? কিন্তু সে যদি হয়, তবে সংসারে এত মেয়ে থাকিতে এই যোদ্ধবেশিনী ভৈরবী কেন? না, বিমল সেদিক দিয়া কিছুই ভাবিয়া দেখে নাই। সে শুধু এইটুকু দেখিয়াছিল যে, ওই চণ্ডীরূপিণী মেয়েটীকে সে তাহার সমস্ত অপরাজেয় অন্তর দিয়া ভয় করে; আবার তাহার প্রভাবও উহার উপর এত অধিক যে, সেও এক মস্ত বড় বিস্ময়কর সমস্যা।

বিমল সন্ধ্যাকালে বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল, অমৃত বাসায় নাই। খবর লইয়া জানিতে পারিল, সে গিয়াছে বায়স্কোপে। শুনিয়া সে বাহির হইয়া বায়স্কোপে গেল। যখন অসমঞ্জর সহিত আলাপ হয় নাই, বায়স্কোপ দেখার কি ঝোঁকই না তাহার ছিল!

পথ অনেকখানি নির্জ্জন; আলোকমালা গাঁথা পড়িয়া আছে। ট্রাম চলিতেছিল না। পথিক একটু ইচ্ছাসুখে পথ চলিতেছিল। বায়স্কোপ হইতে বাহির হইয়া, পাশাপাশি চলিতে-চলিতে বিমল ডাকিল "অমৃত মামা!"

"কি রে?"

বিমল একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কহিল, "তুমি আমার সঙ্গে এতবড় জোচ্চুরি কর?"

অমৃত যেন ঘাড়ে লাঠি খাইয়াছে, এমনি করিয়াই আঁতকাইয়া উঠিয়া, সহসা অচল হইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, "জোচ্চুরি! তোর সঙ্গে? আমি?"

বিমলও দাঁড়াইয়া পড়িল; সে দৃঢ়কণ্ঠে কহিল "হাঁ, জোচ্চুরি ছাড়া কি তুমি বলতে পারবে,—এই দুটো বৎসর ধরে যা তুমি করে আসচো?" তাহার কণ্ঠস্বরে অকথ্য ঘৃণা ব্যক্ত হইল।

অমৃত তৎক্ষণাৎ আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছিল। সে ক্ষীণ ভাবে খানিকটা হাসিয়া, অত্যন্ত ব্যস্ত ভাব দেখাইয়া বলিতে লাগিল, "ওঃ, সেই কথাটা তুমি জানতে পেরেছ!"

তাও সে যে তুমি এতদিন জানতে পার নি বাবা, সেই তোমার নেহাৎ খোকামি! আর আমি যে তোমায় বলি নি, তার কারণ এই যে, হয় ত হঠাৎ স্বাধীন হয়ে পড়লে, অতটা বিষয়-সম্পত্তি হাতে পড়লে পড়াশোনা ছেড়ে দেবে—এই সব ছাড়া আর আমার স্বার্থটা কি ছিল বলো এতে? আমি তো দুবৎসর হ'তেই তোমার নামে সব চালিয়ে আসছি। চেকের উপর তোমার সই বরাবর নিয়েছি, তাও তো তুমি জানো!"

বিমল একটুক্ষণ গুম হইয়া থাকিল। তার পর জোর করিয়া মুখ তুলিয়া, মাতুলের মুখের দিকে সোজা চাহিয়া, দ্বিধাহীন স্বরে কহিয়া গেল, "আজ রাত্রের মতন। তার পর কাল সকাল থেকেই আমরা যেন বরাবরের জন্য স্বতন্ত্র হয়ে যাই। বুঝলে?"

এই বলিয়া জোরে-জোরে পা ফেলিয়া, সে নিজেদের বাসার দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। অমৃত বজ্রস্তম্ভিত থাকিয়া, তার পর যখন অকস্মাৎ সমুদিত প্রবল ক্রোধোচ্ছ্বাসে সর্ব্বশরীরে কম্পিত হইয়া কিছু বলিবার জন্য মুখ তুলিল, তখন আর পথের উপর বিমলকে দেখা গেল না।

সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র থাকিয়া, ভোরের বেলায় বিমলের ঘরের মধ্যে আসিয়া অমৃত ডাকিল "বিমল!"

বিমল হয় ত তখন জাগিয়াই ছিল; কিন্তু সদ্য ঘুম-ভাঙ্গার ভঙ্গি করিয়া মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, "উঁ!"

"সত্যি-সত্যিই কি তা'হলে আমার এই ছটা বৎসরের প্রাণান্ত শ্রম ও যত্নের এই গুরু-দক্ষিণা নিয়ে আজকেই আমাদের দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে? সত্যিই কি এই তোমার মনের ইচ্ছা? এই কথাই কি যথার্থ তোমার মুখ থেকে গত রাত্রে আমায় শুন্‌তে হয়েছিল? না, যেমন তুমি রাগের মুখে অনেক কথাই বলে থাকো, এও তাই?"

বিমলেন্দু পাশ ফিরিয়া সামনের দিকে মুখ ফিরাইল "এ কথা যে রাগের মাথায়ও বলতে পারে, তার অন্ন তোমার গলা দিয়ে আর নামবে? যার চোখে তুমি নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য অত্যাচারী জুয়াচোর, এবং পরাস্বপহরণকারী [illegible], গচ্ছিত ধনের অপহর্ত্তা, তার সঙ্গে এক ছাতের নীচে থাকা রাখতে—"

"বিমল! বিমল! আমি কি তোমার জন্যে কোন [illegible] এই তুমি বলতে চাও?"

"আমার জন্যে, না স্বার্থের জন্যে?"

"তবে তাই। তোমার সব তুমি বুঝে নাও। এই দেখ, তোমার বাপের উইল! তাঁর সমস্ত সম্পত্তি অর্দ্ধেক অংশ তোমার সৎমার। তাঁকে তাঁর ভাগ আমি বুঝিয়ে দেব, —তোমার ভাগ তুমি নাও।"

বিমল উঠিয়া বসিল। উইল লইবার জন্য হাত বাড়াইতেই, খপ্‌ করিয়া অমৃত হাতটা সরাইয়া ফেলিল। নিদারুণ কোপে ও অপমানে তখন তাহার মাথার রক্তে বাড়বাগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। যতটুকু পারে এ অপমানের জ্বালা প্রত্যর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে, উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "বাঃ, এ আমি তোমার হাতে দি, আর তুমি নিয়ে ছিঁড়ে ফেল আর কি! সে হচ্চে না, তোমার বাপের উইলের কথা তুমি পূর্ব্বেও শুনেচ। এই দেখ তাঁর সই; সেও তোমায় চিনিয়ে রেখেছি। দরকার হয়, আদালতে একে বার করা হবে। এখন এই নাও তোমার দলিলের বাক্সর চাবি; তোমার চেক-বই, বাড়ীর পাট্টা, সব বাক্সেই আছে। তোমার সৎমার অংশের যা কিছু, সে সব আমি নিয়ে যাচ্চি, —তাঁকেই দোব। তা'হলে চল্লুম। তবে যাবার সময় একটা উপদেশ দিয়ে যাই,—যে এনার্কিষ্টের দলে ঢুকেছ,—পারো তো তাদের সঙ্গ ছেড়ো;—পারো তো হুঁসিয়ার থেকো। সেখানে থাকলে একদিন না একদিন পুলিশের হাতে না পড়ে তোমার গতি হবে না—এটা খুব সত্য কথা, মনে রেখো।"—বিমল তড়িৎ বেগে উঠিয়া আসিয়া, দুই হাত দিয়া ঘরের দরজা আট্‌কাইয়া ধরিল। কম্পিত ওষ্ঠাধর তাহার কোন-মতে উচ্চারণ করিল, "আমার সমস্ত হিসেব!—"

বিমলের হাত জোর করিয়া ঠেলিয়া দিয়া, বাহিরে আসিয়া সঘৃণ হাস্যে অমৃত জবাব দিল, "হিসাব করবার জন্য তোমার তরফ থেকে কোন কেরাণী বাহাল করা হয় নি। যদি সাহস করে আদালতে দাঁড়াতে পারো, তো, হয় ত সেখানে গিয়ে হিসেব চুক্তি হতে পারবে। কিন্তু তোমার বন্ধুর ইতিহাসটা যদি সেখানে বার হয়ে যায়, তা'হলে হিসাব-নিকাশে হার-জিতটা যারই হোক, হিসাবের কড়ি যে পোর্ট-ব্লেয়ারে বসে গুণ্‌তে হবে, সেই হিসেবটা শুধু আপাততঃ বসে-বসে করে রেখো।"—এই বলিয়াই হেঁট হইয়া দরজার পাশ হইতে একটা বড় হাতব্যাগ তুলিয়া লইয়া, আর কিছু না

...নাই অমৃত দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল। ...-পত্র বোধ করি পূর্ব্বেই চালান দিয়াছিল। বিমল ...বুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নবম পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন হইতেই যে এ পরিবারের কয়টি প্রাণীই ...ক আগ্রহে কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ...া তাঁহাদের থাকিয়া-থাকিয়া সচকিত ভাবে পথ চাওয়া, ... করিয়া একটুখানি শব্দ শোনা গেলেই উৎকর্ণ হইয়া ...এই সর্বেতেই ব্যক্ত হইতেছিল; অথচ মুখে এ লইয়া ...ল আলোচনাই হয় নাই।

মধ্যাহ্নে ইন্দ্রাণী তারাকে ডাকিয়া বলিল, "আজ আমি ...বার ইস্কুলে যাচ্চি; তুই বাবার ওষুধ, বেদানার রস, ... ঠিক-ঠিক দিয়ে যাস। আর যদি যদি কেউ আসে, ...নই খবর পাঠাস্।"

কে আসিবে, কার আসার আশা করা হইতেছে, সে ...া বলা এবং শোনা ব্যতীতই উভয়ের বুঝিবার কোন ভুল ...ে না; যেহেতু, দুজনেই যে আজ একই ব্যক্তির আগমন ...াশা করিতেছে।

নীচে জুতাপায়ের চলন জানা যাইতেই, তারা যেমন ছিল, ...নি আলুথালু কেশবেশে, ছুটিতে-ছুটিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ...নাই, যাকে সাম্‌নে দেখিতে পাইল, তাহারই উদ্দেশে ...কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "দাদা! দাদা এলে?" কিন্তু অর্দ্ধ-...র্ত্তের মধ্যেই তাহার সমস্ত উৎসাহের স্রোত যেন শৈবাল-...ত হইয়া অচল হইয়া রহিল। ঠোঁটের কোণে যে মধুর ...হাসটুকু নিজেদের আসন্ন বিপদের ভীতিচ্ছায়ায় সদাই ম্লান মূর্চ্ছিত ছিল, সে অকস্মাৎ নিজের বৈদ্যুতিক শক্তি ফিরিয়া ...াছিল,—চকিতেই উহা তাহার রাঙা ঠোঁটের অন্তরালে ...গোপন করিয়া ফেলিল। সন্ধ্যাতারার মত উৎসাহ-...া দৃষ্টিতে ত্রস্ত-বিস্ময় ঘন হইয়া ফুটিয়া উঠিল। দু'পা ...ইয়া গিয়া সে গায়ে কাপড় টানিয়া দিল।

আগন্তুকের অবস্থাও নেহাৎ প্রকৃতিস্থ নয়। বিস্ময়ের ...ে নির্ব্বাক্ তরঙ্গ তাহারও উপর দিয়া বহিয়া গিয়া, ...কেও যেন বিমূঢ় করিয়া দিয়াছিল। অলোকিক ...াতিতে ভরা, পরিপূর্ণ যৌবনতেজে সমুজ্জ্বল বিধাতার ...ার মধ্যে আশ্চর্য্যতর, নবীনতর সৃষ্টি এই মোহিনী মূর্ত্তি যেন তাহার কল্পনাকেও পরাস্ত করিয়া দিয়াছে—এমনি একটা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হতবুদ্ধি ভাব তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল; এবং সে সুধু অবাক্ মুখে তাহার পানেই চাহিয়া রহিল।

ইন্দ্রাণীকে দেখিয়াও অমৃতের মনে হইল, সে যেন আর এক নূতন সৌন্দর্য্যের সমাবেশ দেখিল! শুভ্র-বসনা, নিরাভরণা পরিণত-বয়স্কা বিধবা মূর্ত্তি যে এত শোভাময়ী—এ যেন মনে করিতে পারা যায় না। কাশাংশুকা শরৎশোভা তাহার স্মরণে আসিল। শ্বেত পদ্মাসনাকেও মনে পড়িল। ইন্দ্রাণী আসিয়াই ব্যগ্রস্বরে কহিয়া উঠিল "অমৃতদা, বিমল?"

ততক্ষণ অমৃত নিজের বিস্ময়াবেগ সাম্‌লাইয়া লইয়াছিল। সে তারার দেওয়া চৌকিখানায় বসিয়া হাতপাখার হাওয়া খাইতেছিল। চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া, হাত তুলিয়া ইন্দ্রাণীকে নমস্কার করিল। পরে তাহার কথার উত্তর দিল, "তার কি আস্‌বার কোন কথা ছিল? তা তো জানিনে। পিসে-মশাইএর অসুখ শুনে তাঁকে একবার দেখতে এলুম। কেমন আছেন তিনি এখন?"

অসহিষ্ণু ভাবে ইন্দ্রাণী জবাব দিল "একই রকম। কিন্তু বিমলকে দেখবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়েছেন। কেন তাকে সঙ্গে করে আন্‌লেন না? আবার ফিরিয়ে নিয়েই যেতেন।"

এ খোঁচাটা অমৃতকে লাগিল। কিন্তু সে তাহা আমলে আনিল না; বলিল "দিদি, তুমি ভুল করচো। বিমল দুবৎসর পূর্ব্বে সাবালক হয়ে গেছে, আমার তার উপর কিসের অধিকার? সে কি আমায় তোমার চাইতে এতটুকুও বেশি করে মানে, তোমরা মনে করো? না, তার সে প্রকৃতিই নয়। তবে এই কথাটা জেনে রেখো,—সে আর কারু নয়, তোমাদের নয়,—আমার পিসিমার নয়,—আমার নয়, সে স্বাধীন স্বতন্ত্র। মিথ্যে তার পথ চেয়ে আছ—সে আসবে না।"

সত্য কথা বলিতে কি, অমৃতের এই হঠাৎ আসা ইন্দ্রাণীর আদৌ ভাল লাগে নাই। যার জন্য সে জীবনের মধ্যে, সেই একবারমাত্র নিজেকে যথার্থ অবমানিত বোধ করিয়াছে; যে তাহার সংসারের সর্ব্ব-প্রধান কর্ত্তব্যপাশ হইতে তাহাকে জোর করিয়া অপসৃত করিয়াছে; তাহার স্বামীর সন্তানকে, যে তাহাদের নিকট হইতে নিষ্ঠুরতার সহিত ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়া, তাহাকে এমন কি তাহার শোকাতুরা অসহায়া বিধবার

সহিতও কোন সম্বন্ধ রাখিতে দেয় নাই,—আজ আবার তাহাদের এই আসন্নপ্রায় বিপদের মাঝখানে সে ব্যক্তি তাহার কোন্ কূটনীতি পরিচালিত হইয়া দেখা দিল। না জানি কি উপদ্রবই বা ঘটায়, এই সন্দেহে তাহার মনের মধ্যে বিরক্তির একটা ঘন মেঘ জমিয়া উঠিতেছিল। এখন এ সব হেঁয়ালির কথায় তাই তাহার সে সংশয় বাড়া ভিন্ন কম পড়িল না। আলোচনা বন্ধ করিয়া দিয়া কহিয়া উঠিল, "আপনার খাওয়া হয় ত হয় নি। যাই, ভাত দুটি চড়িয়ে দিই গে। আপনি ততক্ষণ মুখ-হাত ধুয়ে নিন।"

ইন্দ্রাণীর মনের ভাব অমৃতের অবিদিত ছিল না। সে ঈষৎ হাস্য করিয়া, তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "থাক্, ভাত চড়াতে হবে না। দুটি ভাত মুখে দিতে আমি কিছু এতটা দূরে ছুটে আসি নি। তোমার সঙ্গে আমার গোটাকয়েক কথা আছে। তুমি যদি একটু মন দিয়ে শোন, তা' হলেই সেগুলো চুকিয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হই।"

ইন্দ্রাণী মনে-মনে ঘোর অসন্তুষ্ট হইতে থাকিলেও, বাহিরে যথেষ্ট সংযত ভাব বজায় রাখিয়া, তাহার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত স্বরে কহিল, "বলুন।"

অমৃত নিজের হাত-ব্যাগ খুলিয়া, একখানা কাগজ বাহির করিয়া বিস্তৃত করিয়া ধরিল, "এ কার লেখা,—আর কি জিনিষ, চিনিতে পারচো ?"

ইন্দ্রাণীর বক্ষভেদ করিয়া ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস বহিয়া গেল,—এ লেখা আর তাহার চেনা নয়! কথায় উত্তর না দিয়া, সে শুধু মাথা হেলাইয়া জানাইল,—চেনে।

অমৃত বলিতে লাগিল, "এই তোমার স্বামীর উইল। এটা আদালতে বার করলেই তোমার অংশের অর্দ্ধেক সম্পত্তি তুমি পাবে। তোমার পক্ষ থেকে একটা দরখাস্ত দেওয়া দরকার। তার পর যা করতে হবে, আমিই সে সব করবো।"

ইন্দ্রাণীর মুখটা একবার একটুখানি চক্‌চকে দেখাইল। ইহার এই অকস্মাতোদিত ধর্ম্মবুদ্ধির হেতু কি, তাহা না বুঝিলেও, প্রস্তাবটা তাহার কর্ণে এই অর্থকৃচ্ছ্র অভাবগ্রস্ত দুর্দ্দিনের পক্ষে দৈববাণীর মত মধুর ঠেকিল। সাগ্রহে ও সানন্দে সে বলিয়া উঠিল, "তা' যদি হয়, এখনি আমি দরখাস্ত লিখে দিচ্চি। বাবার এই অসুখে আমি তাঁর ভাল করে চিকিৎসা-পথ্য করতে পারচি না।—" আর কিছু বলিতে গিয়াই, সে নিজের এই আকস্মিক হৃদয়োচ্ছ্বাস সংবরণ ও সংহত করিয়া রহিল।

অমৃত তাহার এই সুস্পষ্ট বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া, কিঞ্চিৎ প্রসন্ন ভাব ধারণ পূর্ব্বক কহিল, "টাকার যদি কিছু দরকার থাকে, এখনি তুমি নাও না ;—নিজের টাকা পেলে তা' থেকেই শোধ দিও।"

ইন্দ্রাণীর জিব ঠেলিয়া বাহির হইতে গেল, "আমার বড় দরকার, আমি নোব!" কিন্তু ঠোঁট সে কিছুতেই খুলিতে পারিল না। ঋণ গ্রহণ করিতে যে তাহার মাথা কাটা যায়! বিশেষ করিয়া আবার ইহারই নিকটে,—যাহার জন্য আজ অবস্থাপন্নের স্ত্রী হইয়াও, তাহাকে সৎকর্ম্ম-বিক্রয়-লব্ধ অর্থে উদর পোষণ করিতে হইতেছে। তা' ভিন্ন, সূতা কাটা, সূচি-শিল্প প্রস্তুত, মাসিকপত্রে প্রবন্ধ গল্প লেখা—এমনি কত উপায়েই নিজেকে ও বালিকা কন্যাকে অর্দ্ধরাত্রি, সারাদিন কাটাইতে হয়। সব সময় পেটের চেষ্টা করিতে ব্যাপৃত থাকায়, মুমূর্ষু পিতার সমুচিত সেবাই হয় ত বা ঘটিয়া উঠে না। সবার চেয়ে সেই দুঃখের ব্যথাই ইন্দ্রাণীর বুকে বজ্রবলে বাজিতে থাকে। তথাপি, এই দুর্দ্দশার দিনে সাহায্য সম্ভাবনায়, সেই ইহাকেই সে সেই মুহূর্ত্তে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত হইল।

অমৃত ব্যাগের মধ্য হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া, সেগুলা ইন্দ্রাণীকে দেখাইয়া বলিল, "এতে পাঁচশো টাকা আছে। অত কি হবে? তা লাগবে বৈ কি, তোমার বিষয়টা মীমাংসা হতেও তো সময় লাগবে কিছু। বিমল যে এটা সহজে ছাড়বে, তা মনেও করো না। রীতিমত মোকদ্দমা চালিয়ে, আমাদের এই উইলকে প্রমাণ করে, বিষয় দখল করতে হবে কি না। সে তো আর দু'দিনের কর্ম্ম নয়।"

ইন্দ্রাণী নোটগুলা হাতে করিয়া, অবাক্ হইয়া অমৃতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; কি শুনিল, যেন বুঝিতেই পারিল না।

অমৃত তাহার এরূপ হতবুদ্ধি ভাবের প্রকৃত অর্থ বুঝিল; বুঝিয়া মনে-মনে অসন্তুষ্ট হইয়া, প্রকাশ্যে একটুখানি জোরের সঙ্গেই বলিল, "তুমি বোধ করি এখনও সবটা বেশ তলিয়ে বোঝ নি? কথাটা হচ্ছে এই যে, বিমল এখন সাবালক হয়েছে, আর সেটা সে খুব ভাল করেই বুঝেছে। আমায় কুকুর-শেয়ালের মত দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে, আজ থেকে সে

স্বরপ্রভু! এইবেলা নিজের অংশ যদি না বার করে নাও, আর কখনও জন্মেও পাবে না। এখনি পাওয়া কঠিন। তবে এখনও সে আমার কতকটা হাতে আছে। দলিলপত্র আমার কাছে; উইল আমার কাছে; কমিশনে তোমার ও তোমার বাপের সাক্ষ্য নেওয়া হবে। তা'ছাড়া, আরও একটা কথা আছে;—তাদের দলের ক্ষতি হবার ভয়ে হয় ত সে মোকর্দ্দমা নাও চালাতে পারে। সে যে এখন এনার্কীষ্ট!" অমৃতের চক্ষু দুইটা জ্বলিয়া উঠিল;—যেন দুইটা গাড়ীর বাতি জ্বলিতেছে।

ইন্দ্রাণীর হাঁটু দুইটা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল;—হাত হইতে নোটের গোছাটা তাহার অজ্ঞাতসারেই মাটিতে পড়িয়া গেল। মুখ দিয়া আহার বাহির হইল, "বিমল এনার্কীষ্ট! না—না, তা নয়! তা নয়! এ আপনি রাগ করে বলচেন।"

অমৃতের সাদা মুখ টকটকে লাল হইয়া উঠিল। সে ঈষৎ ব্যঙ্গ-মিশ্রিত সহানুভূতি প্রকাশের ভাবে ঠাট্টা করিয়া বলিল, "কেন, ছেলেটী কি আপনার বড্ডই নিরীহ প্রকৃতির যে, একেবারেই এটা বিশ্বাস করতে পারা যায় না? তা বেশ, আমিই না হয় রাগ করে বল্‌চি। অবশ্য রাগ কর্ব্বার আমার তার ওপোর কারণ যে আছে, তা আমিও অস্বীকার করচিনে। তবে এটা শুধুই আমার ক্রোধ-কল্পনা নয়। আজ না হয় অবিশ্বাস করলে; একদিন হয় ত তার আন্দামানে যাবার সময়কার বেড়ির বাজনা তোমারও কাণকে বাঁচাতে পারবে না,—এ আমি এই জোর গলায় তোমার মুখের উপরই বলে রাখলুম। আমি যতই যা হই, মিথ্যাবাদীটা নই—এটা বিশ্বাস করো।"

ইন্দ্রাণীর মুখের সমস্ত রক্ত তাহার মুখখানাকে মরা মুখের মত ধব্‌ধবে সাদা করিয়া দিয়া, কোথায় যেন উবিয়া গেল। ক্ষণকাল সে একটিও কথা কহিতে পারিল না। তার পর অনেক কষ্টে আপনাকে একটুখানি সাম্‌লাইয়া লইয়া, সমুদয় আত্মগৌরব বিসর্জ্জন দিয়া, যোড়হাতে বলিল, "অমৃতদা, আপনিই তাকে এই সঙ্কটের মধ্যে ঠেলে নিয়ে গেছেন। আমাদের কাছে থাকলে, সে আর যাই হোক, এনার্কীষ্টের সঙ্গে মিশতো না। কিন্তু যা হয়ে গেছে, উপায় নেই। এখনও তাকে ফেরান। আপনি ইচ্ছা করলে পারবেন। চেষ্টা করুন; আমার স্বামীর জলগণ্ডূষ বন্ধ করবেন না।"

অমৃতের মন আশায় পুলকে নর্ত্তিত হইতে লাগিল। কিন্তু দর বাড়ানর হিসাবে সে একটু চিন্তিত ভাবেই জবাব দিল, "আমি তাকে কি করে ফেরাবো? বল্লাম না, সে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে! তার উপর দেখ,—তোমার এই উইলের মোকর্দ্দমা উঠ্‌লেই তো ওসব কথাও বার হয়ে পড়বার সম্ভাবনা। একটা—"

অধীর ও বিরক্ত হইয়া ইন্দ্রাণী কহিয়া উঠিল, "আপনি কি মনে করেচেন, আমি দুটো টাকার জন্যে আমার বিমুর সঙ্গে মোকর্দ্দমা করবো? এ কথা আপনি ভাবচেন কি করে?"

অমৃত কহিল, "তা'ভিন্ন এক পয়সাও তো সে তোমাকে দেবে না। তবে, কি এমন তার কাছ থেকে তুমি পেয়েছ, যার জন্য নিজের পেটের সন্তানকে বঞ্চিত করবে?"

ইন্দ্রাণীর ঠোঁটে এতটুকু একটুখানি কৃপাপূর্ণ হাস্য ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে কহিল, "অমৃতদা, বেটাছেলে বলেই এ কথা আপনি মনে করতে পারলেন। সন্তানকে পেটে না ধরলেই যে স্নেহ কম হয় তা নয়। পেটে জন্মেছিল বলেই কি তারা আমার বিমুর চেয়ে বেশী? তা'ছাড়া, বিমল বেঁচে থাকলে, ভাল থাকলে, মানুষ হলে, আমার স্বামীর নাম থাকবে। তারার দ্বারা তো তা হবে না। সে হিসেবে যে বিমল তারার থেকে ঢের বেশী আপন। সংসারে সব জিনিষেরই দর উপকারিতা হিসেবে।"

অমৃত চুপ করিয়া রহিল। যেটা সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে কিছু যেন গলদ বাহির হইয়াছিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া ইন্দ্রাণী আবার ভয় পাইল। ব্যগ্র হইয়া কি বলিতে যাইতেছে, এমন সময় "মা"—বলিয়া ডাকিয়া, তারা দ্বারের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। "দাদুর খাবার সময় হয়েছে মা; তাঁকে কি আমিই খাইয়ে আসবো, না তুমি যাবে?"—এই বলিয়াই, অমৃতকে তাহার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, সে তখনি অন্তরালে সরিয়া গেল। মার কাছেও উত্তর পাইল, "তুমিই যাও মা।"

একখানা আধছেঁড়া, ঢাকাই নীলাম্বরী পরা; আর সর্ব্বাঙ্গ ভেদিয়া যেন অফুরন্ত রূপের নির্ঝর ঝরিয়া পড়িতেছে। অমৃতের বুকের বাঁধনে বাঁধন পড়িল। প্রথম কিছুক্ষণ গভীর অন্যমনস্কতায় চিত্ত তাহার ডুব খাইয়া তলাইয়া গিয়াছিল। তার পর হঠাৎ চট্‌কা-ভাঙ্গা হইয়া শুনিতে

পাইল; ইন্দ্রাণী বলিতেছে, "ও তুচ্ছ টাকাকড়ির কথা থাকৃগে। বিমল যাতে সত্যকার কোন বিপদে না পড়ে, সে আপনাকে ক'রতেই হবে। সেও তো আপনারই হাতে গড়া ছেলে,—সে আপনারও। তার অপরাধ ক্ষমা করে, তারসঙ্গে শত্রুতা ত্যাগ করুন। দেখুন, জগতে প্রতিশোধই কি সব?"

অমৃত একটা নিঃশ্বাস মোচন করিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিল। তার পর বলিল, "তা'হলে স্পষ্ট করে সব কথা কওয়াই ভাল। বিমলের ব্যবহারে নিজেকে আমি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছি। আমি তার জন্যে কি কিছু কম করেছি বলতে পারবে? সে যে আজ দশের মধ্যে দাঁড়াতে পারচে, সে কার জন্যে? তোমার এত বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়েও তো তুমি আমার পিসির দাপটে জুজু হয়েই বসেছিলে;—কিছুই পেরে ওঠোনি। তার পর তার সাবালকত্ব গোপন করে কি ক্ষতি হয়েছিল? আমার অধীন জেনে নিজেকে অনেক সংযতই তো রাখতে হয়েছিল তাকে? তা'র জন্য সে আমার যা করেচে, আমিও তার শোধ না নিয়ে তাকে ছেড়ে দোব না। প্রথমতঃ, তোমার অৰ্দ্ধেক বিষয় তোমায় দেওয়াব। দ্বিতীয়তঃ, পুলিশে চাকরী নেওয়া স্থির করেছি। তা' আমাকেও তো একটা কিছু করে খেতে হবে।"

"অমৃতদা, এ কি আপনি বল্‌চেন? ও যে আপনার ভাগ্‌নে, আপনার ছাত্র! আজ ছ'সাত বৎসর সবাইকে ছেড়ে শুধু আপনার উপরই যে ও সমস্ত নির্ভর করেছে!"

"হ্যাঁ, সেই সাত বৎসর আমার তো ও ভিন্ন আর কেউ ছিল না। স্ত্রী-পুত্র-সংসার—সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, ঐ দুর্দ্দান্ত ছেলে বশে রেখে, তাকে পাঠশালা থেকে কলেজে তুলে দিয়েছি, সেটাও ভেবো।"

ইন্দ্রাণীর গভীর ভারাক্রান্ত বক্ষ গুরু নিঃশ্বাসের ভারে দুলিয়া উঠিল। অমৃতের বাক্যে তাহার প্রতি দীর্ঘকালের অবিচার যেন তাহার কাছে অপরাধী করিয়া তুলিল। সে অত্যন্ত অনুতপ্ত করুণ কণ্ঠে কহিল, "তা' সত্যি অমৃতদাদা, বিমল আপনার হাতে না পড়লে কখনই মানুষ হতে পারতো না। আপনি তার ঢের করেছেন বই কি! নির্ব্বোধ ছেলে সে,—আমার মুখ চেয়ে তাকে ক্ষমা করুন এবারের

"তুমিই বা আমায় কি দিয়েছ? তোমায় ভক্তি করেছিলুম বলে তুমি আমার নামে অতি হেয় কথা পিসিমার কাছে বলে, আমার মনকে কি তেতো করে দিয়েছিলে! আমার পাওনা তোমাদের কাছ থেকে ভাল করেই শোধ হচ্চে কি না।"

"আমি বলেছিলুম! তাঁর কাছে!"—বলিয়াই ইন্দ্রাণী অকস্মাৎ চুপ করিয়া গেল। এ আলোচনার ইচ্ছা তাহার ছিল না। কিন্তু অমৃতের কিছু বুঝিতেও বাকি থাকিল না; এবং এইটুকু জানিতে পারিয়াই, কৃত কর্ম্মের অনুশোচনা একদিকে, এবং আরব্ধ কর্ম্মের সফলতার আশা একদিকে, জাগিয়া উঠিয়া, তাহাকে অত্যন্ত প্রফুল্ল করিয়া তুলিল। সে বলিল, "সে সব যে আমার পিসিমার কীর্ত্তি, এ সন্দেহ হলে, এত বড় ভুল আমায় করতে হতো না। মনে বড় দুঃখ হয়েই আমি তোমার সঙ্গে কুব্যবহার করেছিলেম; ভেবেছিলাম, ভক্তি যদি নিলে না, তবে অভক্তিই নাও, সেই যদি তোমার ভাল লাগে। কিন্তু তার জন্য আমার মনে যে কষ্ট পেয়েছি, বাউলের মত রয়েছি দেখেও কি তুমি বুঝতে পারচো না? সুবিধে পেয়েও সংসারী হতে পারি নি, সুখী হই নি।"

ইন্দ্রাণীর চোখ দুটায় জল আসিয়া পড়িয়াছিল; সে আঁচল তুলিয়া মুছিয়া ফেলিল।

অমৃত কহিল, "একটা যদি কাজ করো, সব গোল চুকে যায়; বিনা মামলায় তোমার বিষয়ও উদ্ধার হয়, আর বিমলকেও আমি ক্ষমা করতে পারি। তার যতটুকু ভাল করা সম্ভব, তাও করবো,—এ কথাও দিব্বি করছি।"

সাগ্রহে ইন্দ্রাণী, তাহার জলভরা, বিষণ্ণ চক্ষু উঠাইয়া, অমৃতের মুখে স্থাপিত করিল, "কি?"

অমৃত একটু ইতস্ততঃ করিল,—"তারাকে যদি আমায় দাও। তুমি বিমলের কাছেই খবর নাও, অসচ্চরিত্র বা অন্য কিছু সেও আমায় বলবে না।" অমৃতের কণ্ঠস্বরে সন্দেহ, মিনতি ও সুগভীর আবেগ যুগপৎ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ব্লটিং কাগজ দিয়া যেমন করিয়া কালি শুষিয়া লয়, তেমনি করিয়াই ইন্দ্রাণীর মুখের প্রত্যেকটি বিন্দু শোণিত কে যেন শোষণ করিয়া লইয়াছে—এতই তাহা বিবর্ণ দেখাইল। সে মাথা নত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। বোধ করি, বুকের মধ্যে আকস্মিক একটা ভয়াবহ দুশ্চিন্তার

আঘাতে ভাল করিয়া তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসও তখন চলিতেছিল না।

সংশয়-সঙ্কুল বাগ্র ব্যাকুল স্বরে অমৃত জিজ্ঞাসা করিল, "ওকে পেলে তোমাদের কাছে আমি কেনা হয়ে থাকবো। আমার যথাশক্তি বিমলের রক্ষা-চেষ্টায় নিশ্চেষ্ট থাকবো না। যা তুমি আমায় করতে বলবে,—কেমন, দেবে না কি?"

জজের মুখ দিয়া যেমন করিয়া ফাঁসির আসামীর বিচারের রায় বাহির হয়, তেম্‌নি করিয়াই ইন্দ্রাণীর মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "না,—সেও যে আমার সন্তান।"

অমৃত চমকিয়া উঠিল। এতখানি বিশ্লেষণের পরেও আর এ উত্তর সে আশা করে নাই। বিস্ময়-উত্তেজিত উচ্চ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "দেবে না? বিয়ে দেবে না?"

ইন্দ্রাণী কহিল, "তাকে বিক্রি করতে পারবো না।"

"আমার শত্রু করলে যা' হয়, কতকটা জানা আছে; বাকিটাও কি এবার দেখতে চাও?"

ইন্দ্রাণী চুপ করিয়া রহিল।

"তা'হলে, ভেবে দেখে জবাব দিও। বরং কিছু সময় নাও। কি বলো?"

পুনশ্চ ইন্দ্রাণী কহিল, "পারবো না,"—এবং সঙ্গে-সঙ্গেই সে বাহির হইয়া গেল। নোটের তাড়াটা সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ

বিমলের জীবনের চক্র আবার এক-পাক ঘুরিয়া গেল। তাহার আগাগোড়া সমস্ত জীবনটার মধ্যেই কোথাও বেশ সুশৃঙ্খল বা শান্ত সংযত ভাব কোন দিনই ছিলই না। বরাবরই যেন কেমন একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা, অকল্যাণের মধ্য দিয়াই ইহার গতি। আজও আবার আরও একটা জটিলতা-পূর্ণ, কণ্টকময়, বাঁকা রাস্তাতেই তাহার পা পড়িল। অথবা তার চেয়েও অনেক বেশী,—প্রবল একটা ঘূর্ণীর মধ্যেই সে আসিয়া পড়িয়াছে। এখান হইতে সহজ, সরল, জীবন-যাত্রার সোজা পথে আর বুঝি তাহার এ জীবনের মধ্যে ফিরিবারও সাধ্য নাই! অথচ এমন একটা ভাবোন্মাদনার তরঙ্গের মধ্য দিয়া তাহারা এই সংহারাবর্ত্তের মধ্যে ঘুরিতেছিল যে, সেজন্য মনে তাহাদের উৎসাহের জোয়ারের গৌরব-লহরীই নর্ত্তিত হইতেছিল;—আশঙ্কার ক্ষোভ এতটুকুও জাগায় নাই। নেশার ঘোরে মানুষ যেমন অনেক কাজ করে, যা সে সহজ অবস্থায় কিছুতেই করিতে পারিত না, তেমনি কতকগুলো দুরাশার মত্ততাও জগতে আছে,—ভাবপ্রবণ ব্যক্তি, বিশেষত তাদের যখন জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অত্যন্ত বেশি অভাব থাকে, এবং বিদ্যা থাকে শুধুই পুঁথিগত,—তখন কল্পনার চশমা পরিয়া সংসারের রং তারা এম্‌নি উল্টা দেখে, ও সেই মত্ততার ঝোঁকে দুরাকাঙ্ক্ষার পায়ে এমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া বসে, যে, তখন আর জগতের সোজা নিয়মগুলার খবর কারও সাধ্য নাই যে তাদের সেই উল্টা-বুঝা মাথার মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে পারে।

বিমল একেই চিরদিনের পথভ্রষ্ট। কোনদিনই তো সে ন্যায়ের পথে, প্রেমের পথে আশ্রয় পায় নাই। তাহার বাল্য-কৈশোরে, প্রথম যৌবনেও তাহাকে মানুষ বলিয়া দেখা হয় নাই। সে যেন পাশার দান! এই ভাবেই তাহাকে ধরিয়া টানাটানি চলিয়াছিল। তাহার মধ্যের কোন উচ্চ বৃত্তির, বিশেষতঃ অন্যের প্রতি ভালবাসার, বিকাশ পাছে কোনমতে হইয়া পড়ে, এই ভয়েই চিরদিন ধরিয়া তাহার দুজন অভিভাবকে তাহার উপরে চৌকীদারী করিয়া চালাইয়াছেন। জগতে আসিয়া এমন কি নিজের বাপকে পর্য্যন্ত সে ভালবাসিবার সুযোগ পায় নাই। একমাত্র যাহাকে কোন বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তি গ্রাহ্য না করিয়াই ভালবাসিয়াছিল, তাহার সঙ্গই বা কত দিনের! সেও তো আজ সাত বৎসর কাল চক্ষের অন্তরাল হইয়া গিয়াছে। চোখের আড়ালেই যে প্রাণের আড়াল হইয়া যায়, তা নয়; তথাপি সে সমুজ্জ্বল স্মৃতির আলো কি আর ঠিক তেমনি থাকিতেই পারে? তারাকে বিমল একবারেই ভুলিতে পারে নাই বটে, কিন্তু সে যে স্মৃতি। সে আর নিশীথ রাত্রির অবিচল ধ্রুবতারার স্থির জ্যোতিঃ নয়;—ভোরের বেলা নীল গগন-সাগরে যে ডুবুডুবু ম্লান তারকাবিন্দু চোখে পড়ে, এও যেন তেমনি।

বিমলের জীবনে আবার এই একটা নূতন অধ্যায় লিখিত হইতে চলিয়াছিল। বরাবরের মতই পুরাতনের সঙ্গে এবারও এর যেন কোন খান দিয়াই কোনরূপ সংস্পর্শ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নূতন সম্পূর্ণই নূতন; এবং তাহার পক্ষে কি আশ্চর্য্য অভিনব ইহার প্রকাশ। বিমলের এবারকার নূতন অবস্থায় তাহার মনে হইতেছিল যে, জননী ধরিত্রীর অঙ্কে এ যেন তাহার

আবার নূতন করিয়া জন্মলাভ ঘটিয়াছে! এ নব জীবনে আশা অপরিসীম; উদ্যম অপর্য্যাপ্ত, আনন্দ অফুরন্ত! ইহার স্মরণে, মননে, শরণে পদে-পদেই স্বাধীনতার ভয়-বন্ধনহীন প্রফুল্লতার সংস্পর্শ। শরীরের, মনের সর্ব্ববিধ জড়ত্ব নাশ করিয়া এ যেন তাহাকে মৃত্যু হইতে অমৃতে উত্তোলন করিতেছে,—এমনি অপরিমেয় আবেগের মত্ততায় সে যেন মাতাল হইয়া গেল।

প্রথম-প্রথম এই সঞ্জীবনী-সভার কার্য্য-প্রণালী তাহার অপরিণত চিত্তে সন্দেহ, ভীতি জাগ্রত না করিয়া থাকিতে পারিত না। নিজেদের উদ্দেশ্যকে স্বদেশ-হিতৈষণার খুব বড় এবং ঝক্‌মকে খোলস দিয়া ঢাকা দিলেও, উহার ভিতর-কার একটা জিনিষ যেন বিষধর সর্পের মূর্ত্তি ধরিয়াই তাহার কাণের কাছে মধ্যে-মধ্যে ফুলিয়া উঠিত। বিবেক যেন মনের মধ্যে একটা ঝড় তুলিয়া বলিতে চাহিত যে, আচ্ছা, এই যে দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য দেশের লোকের ধন আমরা লুঠ করিয়া লইতে চাহি, এটা কি সঙ্গত? একদিন এই দ্বিধার দ্বন্দ্ব অন্ধ অভিমানের অহঙ্কার ভাসাইয়া লইল। মানুষ এম্‌নি করিয়াই অকূলে ভাসে।

অসমঞ্জরা নামে যতটা জমিদার, কাজে তেমন নয়। উহাদের জমিদারীর অংশ উহার বড় ভাই শতঞ্জীব তাঁর সরিক-জমিদারদের কাছে বিক্রি করিয়া নগদ টাকা লইয়া-ছিলেন; এবং ঐ টাকারও বেশীর ভাগটা তিনি নিজেই লইয়াছিলেন। এখন শতঞ্জীব বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার; বিবাহও তাঁহার বিলাতি ফ্যাসানের পরিবারের মধ্যে হইয়াছে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা লইয়া তিনি সাহেবী কেতায় বাস করেন;—সেও বঙ্গ দেশের বাহিরে, সুদূর পশ্চিমে। মা, ভাই, বোনের খোঁজ-খবর তিনি বড়-একটা রাখা প্রয়োজন বোধ করেন না, ইঁহারাও দেওয়ার জন্য ব্যস্ত নহেন। বিশেষতঃ, ভাই দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির দুইটি বিভিন্ন জীব। ইহাদের শৈশবাবধিই পরস্পরের সহিত মতের অনৈক্য;—শুধু আজ বলিয়া নয়। এখন অসমঞ্জদের হাতে যে সম্পত্তি আছে, ইহার মধ্যে তিন অংশ। অসমঞ্জর নামের জমিদারীর টাকা প্রায় আদায় হয় না; সেই সরিকরাই তাহা ভোগ করে, এবং উহার অংশের টাকাগুলি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে এই প্রকাণ্ড প্রাসাদসদৃশ বাড়ীখানা। অসমঞ্জর মা বুদ্ধি করিয়া পূর্ব্ব হইতেই এখানা মস্ত মোটা টাকা ঢালিয়া কিনিয়া ফেলিয়াছিলেন। সংসার চলে মায়ের টাকার সুদে, এবং না কুলাইলে, নগদ ভাঙ্গিয়া। মায়ের নামেও বিস্তর টাকা আছে। অসমঞ্জর ইচ্ছা, মা অন্ততঃ উহার অর্দ্ধেক টাকাও তাহাদের সমিতিকে দান করেন। এজন্য অনেক ভজন-সজনও চলিতেছে। কিন্তু মা মানুষটী না কি বেশ শক্ত প্রকৃতির এবং মোটেই বোকা নহেন; সেইখানেই গোল বাধিয়াছে। আরও একটা মুস্কিল হইয়াছিল, উৎপলার সম্বন্ধে। অসমঞ্জদের পিতা প্রিয়কুমার রায় উৎপলাকে দানপত্র করিয়া একটা সম্পত্তি দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু উৎপলার একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও সেটাকে স্পর্শ করিবারও উহার কোনই অধিকার ছিল না; কারণ ব্যবস্থা এইরূপ যে, বিবাহের যৌতুক স্বরূপে উৎপলা ওই জমিদারীটুকু লাভ করিবে,—অনূঢ়াবস্থায় নয়। এটাকে আদায় করিবার জন্য অসমঞ্জ, এমন কি উৎপলা নিজেও, তাহার কোন-কোন পরিচিত উকিল-ব্যারিষ্টারের কাছে আসা-যাওয়া করিতে-ছিল; কিন্তু উঁহারাও তাহাকে কোনই ভরসা দিতে পারেন নাই।

বিমলেন্দুর টাকাটা খুব কাজে লাগিল। কিন্তু সে টাকার নগদের অংশটা মোটা-মোটা আঁক গায়ে লিখিয়া অমৃতেরই ব্যাঙ্কের খাতায় জমা পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই খুব বেশী বাকি ছিল না। বাড়ী-ভাড়ার টাকা কখন সিকি পয়সার জমা হয় নাই। থাকার মধ্যে লাখ-দুই দামের খান-দুই বাড়ীই পড়িয়া আছে। বিমল ঝোঁকের মাথায় রোখ করিয়া বলিল, "ওবাড়ী বেচে সব টাকাই আমি সমিতিকে দান করবো; তুমি খদ্দের দেখ।"

অসমঞ্জ বলিল "খদ্দের এক্ষনি দেখবার দরকার নেই। ওসব স্থাবর সম্পত্তি যতটা হাতে থাকে, ততই ভাল। এখন আমাদের আরও অন্যরকমে কতকটা টাকার জোগাড় করে নিতে হবে।"

বিমল জিজ্ঞাসা করিল "আর কি রকমে?"

অসমঞ্জ অসঙ্কোচেই বলিয়া ফেলিল, "এই ডাকাতি।"

শুনিয়াই বিমলেন্দুর বুকটা ধক্ করিয়া উঠিয়াই, তাহার সমস্ত অন্তঃকরণটা যেন গুটাইয়া এতটুকু-ছোট হইয়া আসিল। কারণ মুখে বলায় আর কাজে করায় আসমান-জমিনের ফারাক আছে। অনেক বড়-বড় কল্পনা, অনেক নিকৃষ্ট চিন্তা সময় বিশেষে মানুষের অন্তঃ-কেন্দ্রে চক্রাকারে আবর্ত্তিত হয়;

পালন করিয়া আসিয়াছি,—কখনও কণামাত্র অবহেলা করি নাই। আজি প্রথম অদৃষ্ট-চক্রের আবর্ত্তনের বিরুদ্ধে চলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।” আবার বিদ্যুৎ চমকিল। হরিনারায়ণ দেখিলেন, নগ্ন মূর্ত্তি চক্ষু মেলিয়াছে। অন্ধকারে তাহার কথা শুনিয়া মাঝিমাল্লারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছে।

নগ্ন মূর্ত্তি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হরিনারায়ণের হস্তাকর্ষণ করিয়া কহিল, “আমার সহিত আইস।” হরিনারায়ণ মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় তাহার সহিত চলিলেন। বিদ্যুতের আলোকে তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, ছিপের মাঝি বলিয়া উঠিল, “ঠাকুর মহাশয়, কোথায় যান? আমার উপরে হুকুম আছে, আপনাকে পাটনায় ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।” হরিনারায়ণ কহিলেন, “তবে তোমরাও আইস।” মাঝি যখন তাহাদের অনুসরণ করিতে উদ্যত হইল, তখন সহসা একটা প্রকাণ্ড বিষধর সর্প গর্জ্জন করিয়া উঠিল। বিদ্যুতের আলোকে হরিনারায়ণ দেখিতে পাইলেন, মাঝিমাল্লারা দ্রুত-বেগে পলায়ন করিতেছে।

নগ্ন মূর্ত্তি হরিনারায়ণের হস্ত ধারণ করিয়া দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। চারিদিকে ঘন অন্ধকার, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। হরিনারায়ণের পরিধেয় সিক্ত হইয়া গিয়াছে; এবং তিনি কোন্ পথে চলিতেছিলেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। নগ্ন মূর্ত্তি চির-পরিচিতের ন্যায় দৃঢ় পাদবিক্ষেপে অজ্ঞাত পথ অতিক্রম করিতেছিল। ক্রমে হরিনারায়ণের অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল,—তাঁহার পদস্খলন আরম্ভ হইল। নগ্নমূর্ত্তি তাহা দেখিয়া থামিল। হরিনারায়ণের অবসন্ন পদদ্বয় দেহের ভার বহন করিতে পারিল না। তিনি পথের কর্দ্দমের উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। হরিনারায়ণ কতক্ষণ সেই-ভাবে বসিয়া ছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ ছিল না। পরে যখন তাঁহার চেতনা ফিরিল, তখন তিনি দেখিলেন যে, দুই-তিনজন লোক মশাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে; এবং আরও চারিজন লোক তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া একটা ডুলিতে স্থাপন করিতেছে। ডুলি চলিল; এবং তিন চারি দণ্ড পরে এক গ্রামের মধ্যে একটি অট্টালিকার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

ধৌত পরিষ্কৃত হইয়া বৃদ্ধ হরিনারায়ণ যখন দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তখন গৃহস্বামী আসিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার সঙ্গী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। সঙ্গী আসিলে হরিনারায়ণ কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি গঙ্গাবক্ষে ও নদীতীরে যে নগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, এ মূর্ত্তি তাহা হইতে বিভিন্ন। শুভ্র বসন পরিহিত সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া হরিনারায়ণ তাহাকেই ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ গঙ্গাবক্ষে মজ্জনোন্মুখ তরণীর আরোহী বলিয়া কোন-মতেই স্থির করিতে পারিলেন না; কিন্তু তথাপি তাহাকে পূর্ব্ব-পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। আগন্তুক তাঁহাকে এক-দৃষ্টিতে চাহিতে দেখিয়া কহিল, “আমাকে কি চিনিতে পারিতেছেন না?” হরিনারায়ণ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, “চিনিতে পারিব না কেন। তবে মনে হইতেছে যেন আপনাকে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি।” “আমাকে আর কোথায় দেখিবেন,—আমি বাঙ্গালী, নিবাস পূর্ব্বদেশে, এদেশে সম্প্রতি আসিয়াছি।”

সহসা হরিনারায়ণ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন; এবং সে ব্যক্তির হস্ত ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “এমন করিয়া ‘সম্প্রতি’ কথাটা আর একজন ব্যবহার করিত, তুমি কি সে-ই?” হরিনারায়ণের ভাব দেখিয়া আগন্তুক সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, “আপনি কাহার কথা বলিতেছেন? একটা কথা উচ্চারণের ভাব কতলোকের এক রকম হইয়া থাকে।” হরিনারায়ণ উভয় হস্তে আগন্তুকের হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “তুমি মিথ্যা বলিতেছ। আজ বিশ বৎসরের মধ্যে তোমার মত ‘সম্প্রতি’ উচ্চারণ শুনি নাই। এই যাট বৎসরের মধ্যে আর কেহ ত এই একটা কথা তেমন করিয়া উচ্চারণ করে নাই? বল, গোপন করিও না।—চেষ্টা করিলেও আমার নিকট গোপন করিতে পারিবে না। আমি হরিনারায়ণ, নরনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের পুত্র। অশৈশব একগ্রামে বাস করিয়াছি, যৌবনে একত্র বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি, তুমি কি আমার নিকট আত্মগোপন করিতে পার?—তুমি ত্রিবিক্রম, তুমি আর কেহ নহ, তুমি নিশ্চয় ত্রিবিক্রম।” আগন্তুক বৃদ্ধকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া কহিল, “হাঁ, আমি ত্রিবিক্রম।”

ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

সুদর্শন শয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তখনও নিদ্রিত হন নাই, এমন সময়ে বহির্দ্বারে কে সবলবেগে করাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। সুদর্শন গৃহের দুয়ার খুলিয়া দেখিলেন

আগন্তুক একজন আহদী। আহদী তাঁহাকে কহিল, "আপনাকে বিশেষ প্রয়োজনে একবার ছাউনিতে যাইতে হইবে। বাদশাহ প্রভাতেই দিল্লী যাত্রা করিবেন; সুতরাং এখন না গেলে আপনার সহিত তাঁহার হয় ত সাক্ষাৎ হইবে না। আমীরও বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি আপনার দিল্লী-যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন; সাক্ষাতে সমস্ত কথা জানাইবেন।" নূতন বাদশাহ ফর্‌রুকশিয়রের ফৌজে অসীম আমীর আখ্যায় পরিচিত ছিলেন।

সুদর্শন কোন আপত্তি না করিয়া, আহদীর সহিত গৃহত্যাগ করিলেন। তখন ত্রিযামা রজনীর দ্বিতীয় যাম শেষ হইয়া আসিয়াছে। তিনি চলিয়া গেলে, ননন্দা ও ভ্রাতৃজায়া শয়নকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, প্রদীপ লইয়া পূজার ঘরের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। বাদশাহী ছাউনীতে তখন তৃতীয় প্রহরের নৌবৎ বাজিয়া উঠিল; এবং তাহা শেষ হইতে না হইতে, গৃহের দুয়ারে পুনরায় করাঘাত হইল। তাহা শুনিয়া বধূ বলিয়া উঠিলেন, "ঐ তোর ভাই আসিয়াছে। ভাই, দুয়ার খুলিয়া দিয়া আয়।" ব্যঙ্গ করিয়া দুর্গাঠাকুরাণী কহিলেন, "পোড়ারমুখী, দুনিয়ায় সকলেই কি আমার ভাই না কি?" "তবে তোর জন্যে নূতন নাগর আসিয়াছে।" "দাড়া ভাই, কাহার নাগর আসিল, দেখিয়া আসি। পরিচিত গলার আওয়াজ না পাইলে, দুয়ার খুলিতেছি না।" দুর্গা প্রদীপ লইয়া দুয়ারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" উত্তর হইল "আমি।" "তুমি কে?" "এই কি সুদর্শন ভট্টাচার্য্যের বাড়ী?" "হাঁ, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" "আমি ফৌজদারের লোক,—জরুরী খবর লইয়া আসিয়াছি; শীঘ্র দুয়ার খুলিয়া দাও।" "বাড়ীর মালিক বাড়ীতে নাই; এখন ফিরিয়া যাও;—সকাল-বেলায় আসিও।" "আমার সংবাদ অত্যন্ত জরুরী,—বিলম্ব করিলে চলিবে না; শীঘ্র দুয়ার খুলিয়া দাও।" "বাড়ীতে পুরুষ নাই; সুতরাং তুমি যেই হও, এখন দুয়ারের বাহিরে বসিয়া থাক;—বাড়ীর মালিক আসিলে দুয়ার খুলিয়া দিব।"

দুর্গাঠাকুরাণী ফিরিয়া আসিয়া, ঠাকুর-ঘরের সম্মুখে বসিলেন; এবং বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌ, দাদা বাড়ী না ফিরিলে, কোনমতেই দুয়ার খুলিয়া দেওয়া উচিত নহে; কি বলিস্?" বধূ কহিলেন, "সে কথা আর বলিয়া! বাড়ীতে পুরুষ নাই; লোকের মধ্যে আমরা দুইটি স্ত্রীলোক। দেশ নয়, ঘর নয়, যে পাড়াপড়শী ডাকিয়া আনিব। এই তৃতীয় প্রহর রাত্রি, এখন কি দুয়ার খুলিতে আছে?" ফৌজদারের লোক আরও দুই-তিনবার দ্বারে করাঘাত করিল এবং উত্তর না পাইয়া বোধ হয় চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বড়বধূ দুর্গাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরঝি!" দুর্গা কহিলেন, "কি ভাই?" "তাঁহাকে যদি দুয়ার হইতে ধরিয়া লইয়া যায়?" "আমরা আর কি করিব ভাই! সকাল হইলে ছোট দাদাকে খবর দিব। একবার আড়াল হইতে দেখিলে হয় না,—লোকটা গেল কি না?" "কোথা হইতে দেখিবি?" "কেন, উপর হইতে!" "প্রাচীরের উপরে উঠিয়া?" "কেন, দোষ কি?" "তুই উঠিতে পারিবি?" "আমি ভাই মোটা মানুষ, উঠিব কেমন করিয়া? তুই ওঠ।"

দুর্গা প্রদীপ রাখিয়া বহির্দ্বারের নিকটে গেলেন। সেই সময়ে অঙ্গনে গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দ হইল। তাহা শুনিয়া বধূ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে দ্বিতীয়বার শব্দ হইল; এবং এক-এক করিয়া সাত-আটজন পুরুষ প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের গৃহে প্রবেশ করিল। তাহারা ক্ষিপ্রহস্তে দুর্গা ও বড়বধূর হস্তপদ বন্ধন করিল; এবং বাহিরের দুয়ার খুলিয়া দিল। বাহিরে আম্রবৃক্ষ-তলে অন্ধকারে আরও আট-দশজন দুইখানা ডুলি লইয়া লুকাইয়া ছিল। সকলে মিলিয়া স্ত্রীলোক দুইজনকে ডুলিতে তুলিয়া প্রস্থান করিল। হরিনারায়ণের প্রতিবেশীরাও জানিতে পারিল না যে, তাঁহার বধূ ও কন্যা দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছেন।

হরিনারায়ণের গৃহের অদূরে একজন পুরুষ ও একজন রমণী অপেক্ষা করিতেছিল; তাহারাও দস্যুদলের সঙ্গে চলিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া, রমণী পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলি, ও নবীন দাদা, তুমি বল কি গো! আমি একা যেতে পারব না। বিদেশ বিভূঁই, এ কি আমার রাঢ়দেশ? আমি মেয়ে-মানুষ,—এত তাল সামলান কি আমার কর্ম্ম? কাজ হাসিল হইয়াছে,—দেশে ফিরিয়া চল। বড়কর্ত্তার কাছে টাকাটা আদায় করিয়া, আমরা সরিয়া দাঁড়াই। বড় ঘরের কথা,—কখন কি হয় বলা যায় না!—আর তুমি এখন পাটনায় বসিয়া কি করিবে?" পুরুষ কহিল, "দোহাই সরস্বতী দিদি, এত চেঁচাইয়া কথা কহিও না। তোমার কল্যাণে নবীনচন্দ্রের পাটনা সহরে খাতির আছে। নবীনচন্দ্র যেঁহ-তেঁহ লোক

হন। এই সাতটা দিন দিদি—সাতটা দিন। কোনমতে যদি ই সাতটা দিন কাটাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে নবীনচন্দ্র আমার একেবারে কেনা গোলাম। তোমার বাজার করিয়া ব; পালং শাকের ক্ষেত বানাইয়া দিব; লাউ কুমড়ার চা বাঁধিয়া দিব।" "বলি, তা ত দিবে। সাতদিন পাটনায় কিয়া তোমার হইবে কি?" "একটু পরকালের চর্চ্চা রিব। অনেক কাল পরে মনের মত গুরু পাইয়াছি; তছাড়া হইলে এ জন্মে হয় ত আর পাইব না। গুরু লয়াছেন, এই সাতটা দিন।" সরস্বতী কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইয়া, আপন মনে গরগর্ করিতে-করিতে চলিল।

আফ্‌জল খাঁর বাগানে যখন নৌবতে ভৈরবী বাজিয়া ঠিল, তখন ডুলি দুইখানি পাটনা সহর পরিত্যাগ করিয়া গরোপকণ্ঠ দিয়া চলিতেছিল। পূর্ব্ব দিক পরিষ্কার হইয়া সিয়াছে। যাহারা উপকণ্ঠ হইতে নগরে উপার্জ্জন করিতে সে, তাহারা তখন পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পথে াক দেখিয়া নবীন বাহকগণকে দ্রুতপদে চলিতে আদেশ ল; এবং সরস্বতীকে বড়বধূর ডুলির কাছে রাখিয়া, স্বয়ং াঠাকুরাণীর ডুলির সহিত চলিতে আরম্ভ করিল। এত ভাতে নগরোপকণ্ঠে একসঙ্গে দুইখানি ডুলি দেখিয়া, হারা তখন পথ চলিতেছিল, তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেল; ন্তু সঙ্গে অস্ত্রধারী লোক ছিল দেখিয়া, কেহ কিছু বলিল । পথের ধারে একখানা ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে বসিয়া এক মণী মুখ প্রক্ষালন করিতেছিল। নির্জ্জন পথে সহসা এত ধিক জনসমাগম দেখিয়া, সে ত্রস্তপদে ঘরের ভিতরে লাইল; নবীন বা সরস্বতী তাহাকে দেখিতে পাইল না। লির পার্শ্বে নবীন ও সরস্বতী যখন সেই গৃহের সম্মুখ দিয়া লিয়া গেল, তখন সে তাহাদিগকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। ডুলি দুইখানি অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বে, সে গৃহস্বামিনীকে সঙ্গে লইয়া অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল। সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর হইতেছে দেখিয়া, বাহকগণ পথের ধারে এক বৃক্ষতলে ডুলি নামাইল। তাহা দেখিয়া অনুসরণকারিণীদ্বয় একটা ঝোপের অন্তরালে লুকাইল। বেলা যখন দুই দণ্ড, তখন বাহকেরা ডুলি উঠাইল; এবং দ্রুতপদে পশ্চিম দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। তিন ক্রোশ পথ চলিয়া, দ্বিতীয় প্রহর বেলায় ডুলি একখানা বৃহৎ গ্রামের সীমান্তে অবস্থিত এক ধনীর উদ্যানে প্রবেশ করিল। উদ্যানের মধ্যে দ্বিতলের একটি ক্ষুদ্র গৃহে বন্দিনীদ্বয়কে আবদ্ধ করিয়া, দস্যুগণ নবীন ও সরস্বতীকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। নবীন তাহাদিগকে দুইটি করিয়া সুবর্ণ মুদ্রা দিল; তাহারা একে-একে সহরের দিকে ফিরিল। তখন নবীন কোথা হইতে একটা ভাঙ্গা কলিকা এবং কিঞ্চিৎ তামাক্ সংগ্রহ করিয়া, গৃহের সম্মুখে বসিল; এবং সরস্বতী বাজার করিতে গ্রামে প্রবেশ করিল। অর্দ্ধদণ্ড পরে অনুসরণকারিণীদ্বয় সেই উদ্যানের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। তাহাদিগের একজনের চলন দেখিয়া নবীন অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু উঠিল না।

তৃতীয় প্রহর বেলায় সরস্বতী যখন চাউল, দাল, হাঁড়ি, কাঠ সংগ্রহ করিয়া ফিরিল, তখন নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "বলি, ও সরস্বতী দিদি, তিন প্রহর বেলা হইল, ঠাকুরাণীরা খাইবে কি?" সরস্বতী বিস্মিতা হইয়া কহিল, "কেন, রাঁধিবে!" "আজি কি আর উহারা উঠিবে?" "তাহা ত বটে!" "দিদি, তুমি একবার যাও।" "ঐটি পারিব না, নবীন দাদা। এক গাঁয়ের লোক,—মুখ দেখাইব কেমন করিয়া?" "কোন রকমে একবার নৌকায় চড়াইতে পারিলে হয়।" "তবে আমিই যাই। তুমি কিছু দুধের চেষ্টা দেখ।" (ক্রমশঃ)

ভুবনেশ্বর

[অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সরকার এম-এ]

ৎসরের পর বৎসর লক্ষ-লক্ষ ভারত-সন্তান সাগ্রহে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বরের মন্দির, মুক্তেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, কেদারেশ্বর, বিন্দুসরোবর প্রভৃতি দর্শন করিতে যান; কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতার এই প্রাচীন লীলাস্থলীর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা, ও তাহার প্রতিকারের উপায় কয়জন চিন্তা করেন? দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্ব হইতে এই ভুবনেশ্বর উৎকলদেশের রাজধানী হইয়াছিল; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সুপ্রসিদ্ধ কেশরীবংশীয় নৃপতিগণ এইখানে বাস করিয়া,
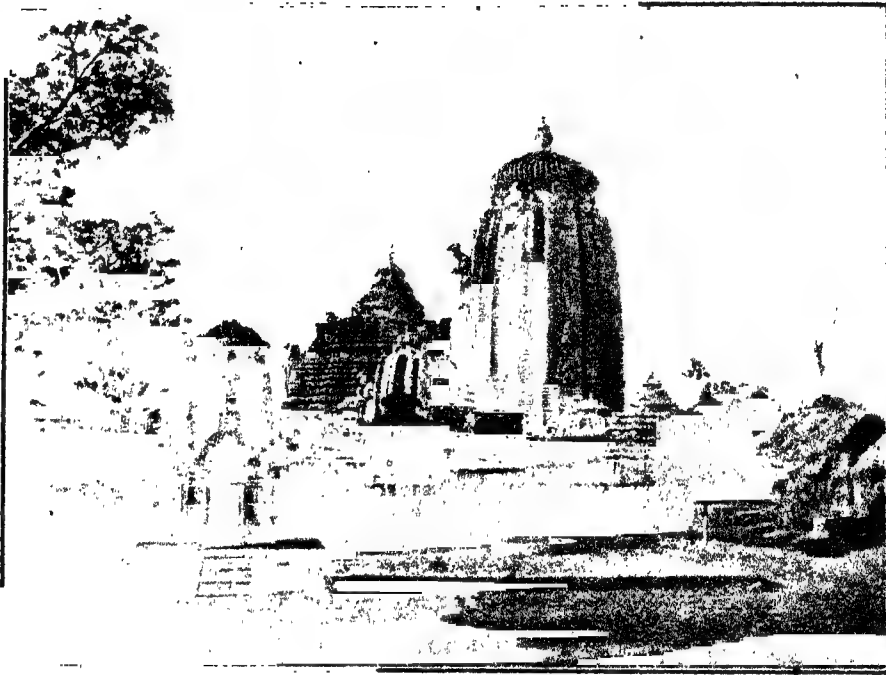
ভুবনেশ্বর মন্দিরের উত্তরদিকের দৃশ্য

মুক্তেশ্বর মন্দির

রাজা-রাণী মন্দির

বিন্দু-সরোবর

সিদ্ধেশ্বর মন্দির
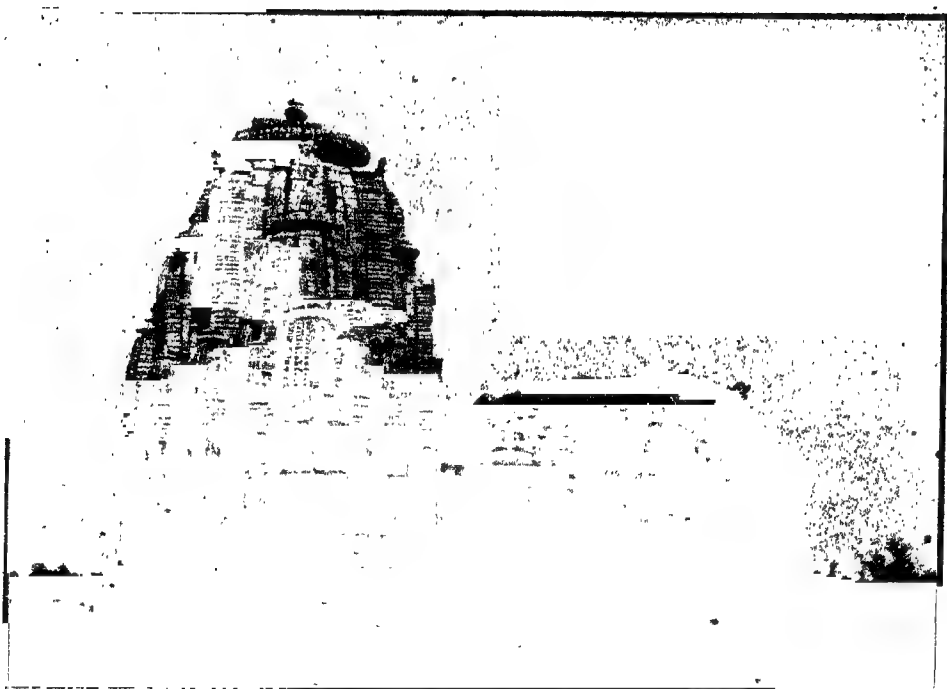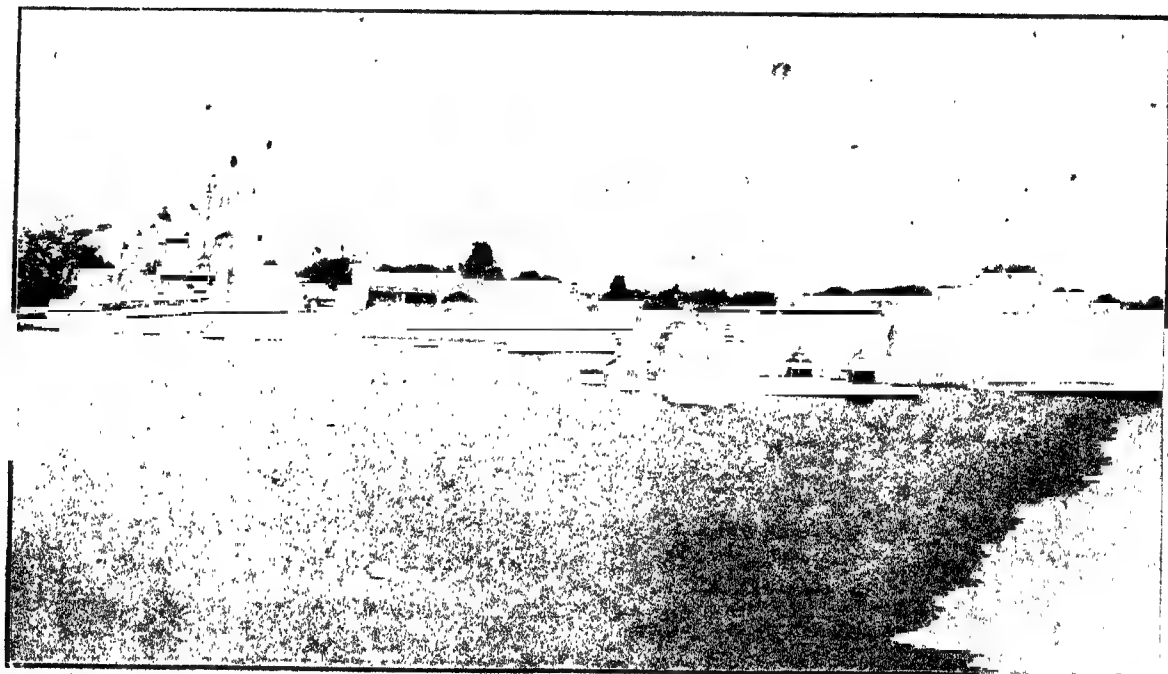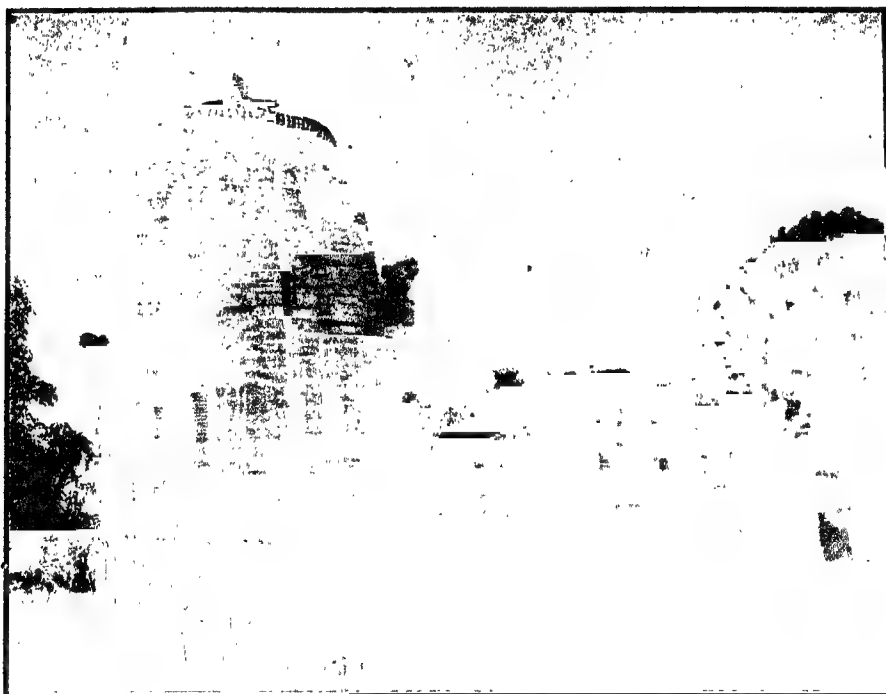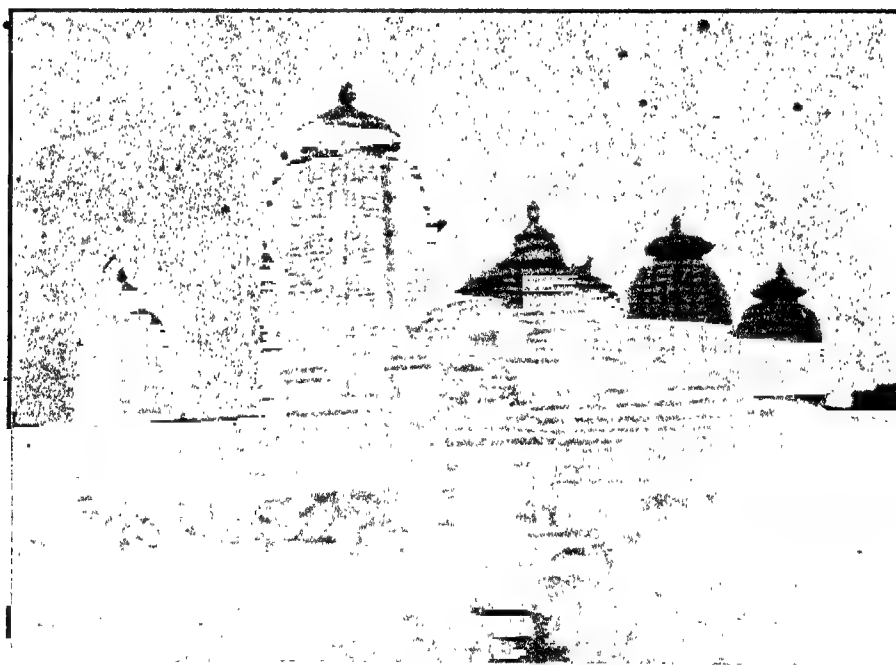
ব্রহ্মেশ্বর মন্দির
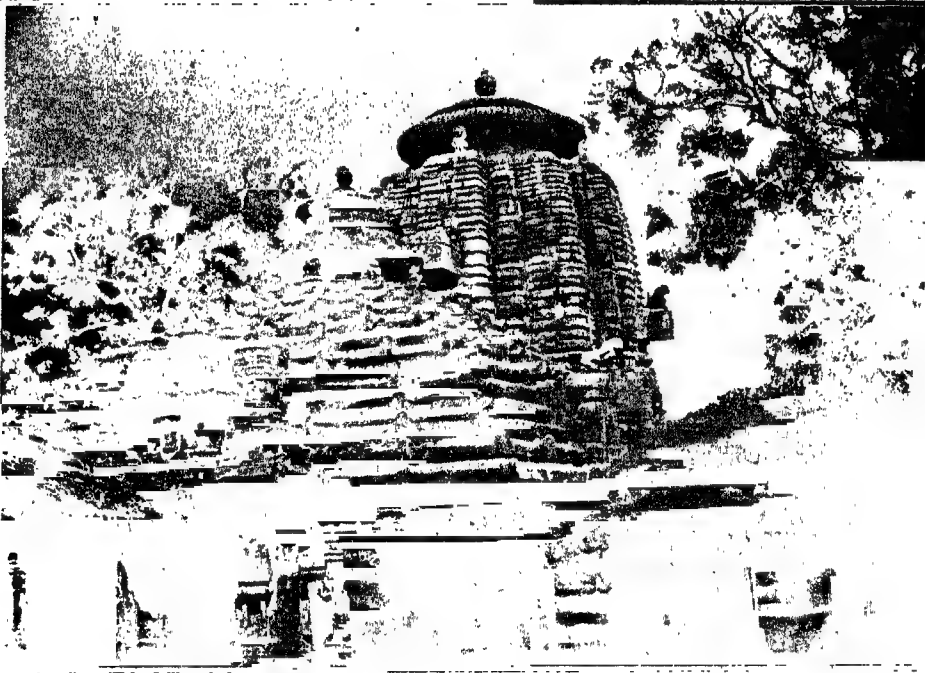
কেদারেশ্বর মন্দির
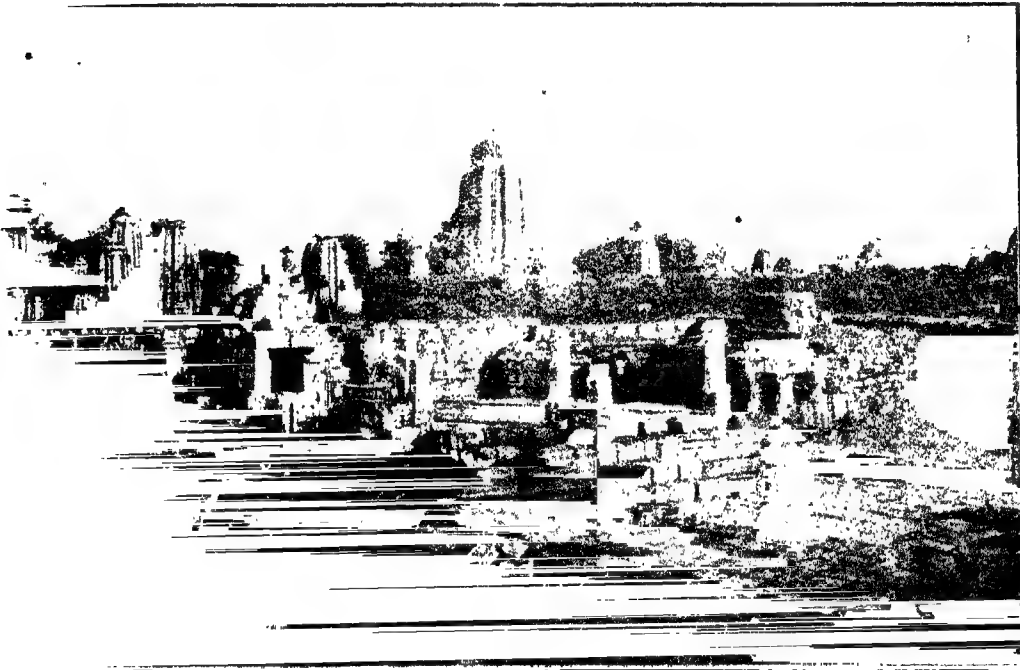
ভুবনেশ্বর মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমের দৃশ্য
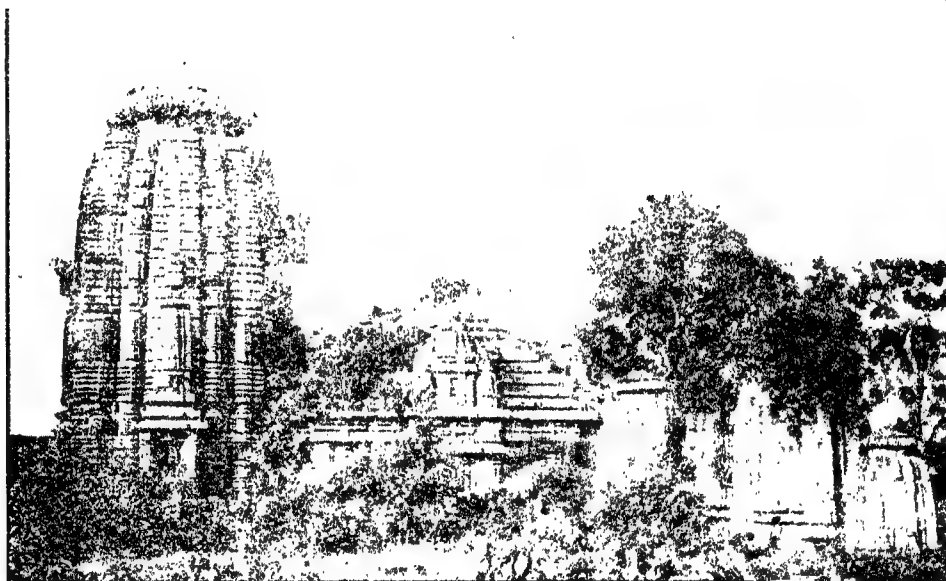
আলাবুকেশ্বর মন্দির

ভুবনেশ্বর মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্বের দৃশ্য
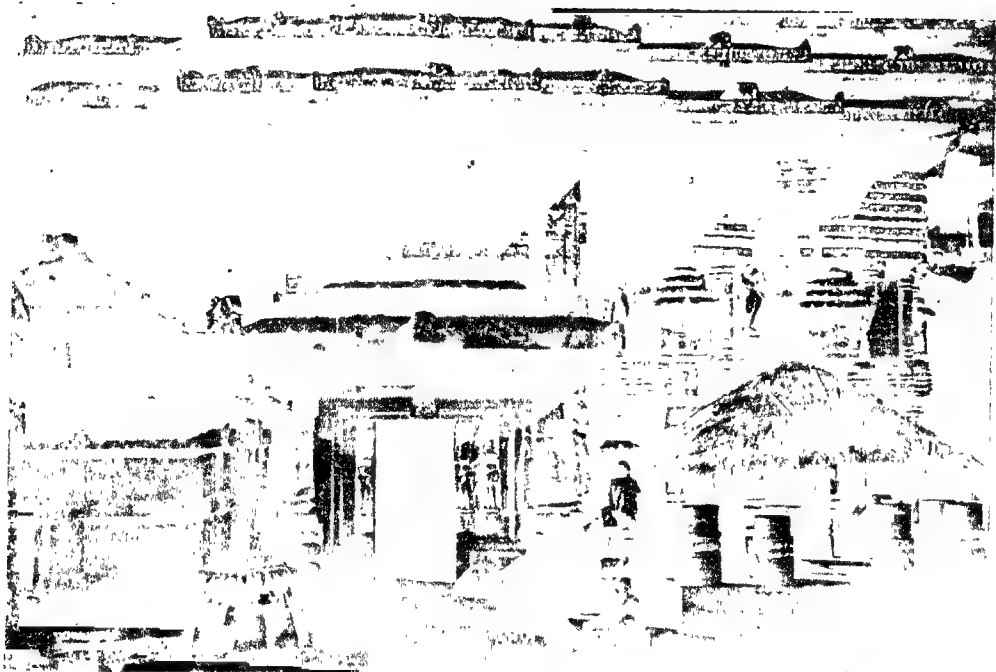
মোহনের দক্ষিণ-পার্শ্ব
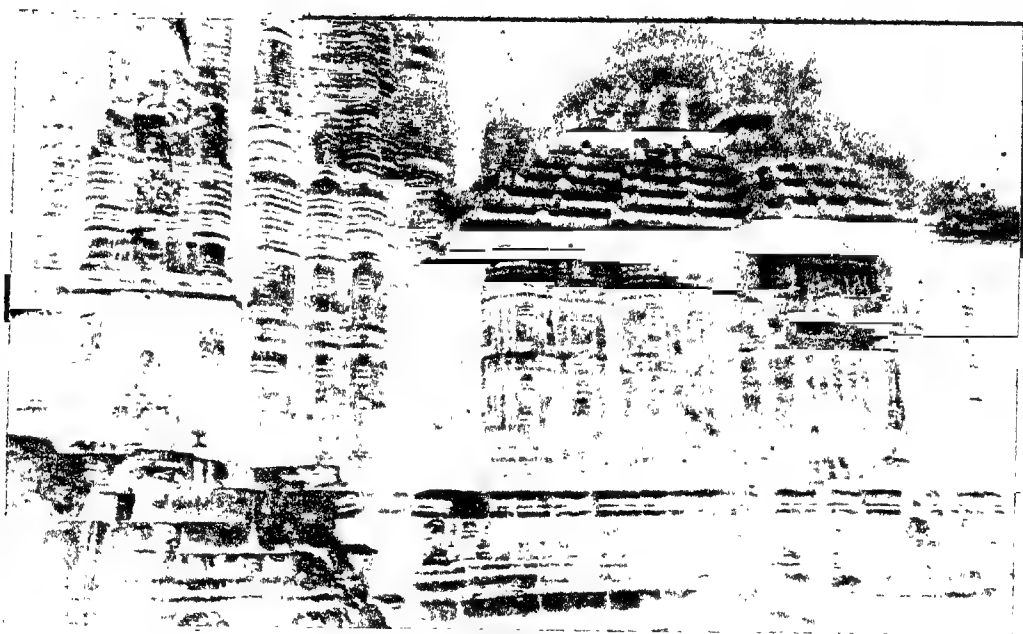
অন্ত একটী মন্দির

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পপ্রতিভার অপূর্ব্ব নিদর্শন-স্বরূপ সপ্ত সহস্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার সেই গৌরবের যুগে, সমগ্র প্রাচ্য ভারতের বিদ্যা, ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য, শক্তি ও সমৃদ্ধির স্রোত, সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া এই ভুবনেশ্বরেরই জনতাকীর্ণ কাংস্যঘণ্টামুখরিত রাজপথে প্রবাহিত হইত। তৎপরে প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পুরী রাজধানী হইলে, ও তথায় জগন্নাথ-মন্দির রচিত হইলে, ক্রমে ভুবনেশ্বরের সমৃদ্ধি হ্রাস পাইতে থাকে। কাল-প্রভাবে ভুবনেশ্বর এখন, ইতিহাসের ও প্রকৃতির প্রিয় নিকেতন হইয়াও, রামচন্দ্রের তিরোভাবে অযোধ্যাপুরীর ন্যায়, শ্রীহীন ও মলিন ;—জনবিরল, শ্বাপদসঙ্কুল ধ্বংসাবশেষে পরিণত।

সপ্ত সহস্র মন্দিরের মধ্যে কয়েক শত মাত্র এখনও অবশিষ্ট আছে। সংস্কারাভাবে সেগুলিও জীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ ধ্বংসাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সহস্রাধিক বৎসর কালের করাল প্রভাব অতিক্রম করিয়া যে মন্দিরনিচয় পূর্ব্বপুরুষগণের অপূর্ব্ব প্রতিভা ও ধর্ম্মপ্রাণতার সাক্ষ্য দিতেছে, এখন আলস্যে, ঔদাস্যে ও অযত্নে সেগুলি বিলুপ্ত হইলে, কলঙ্কের ও ক্ষোভের সীমা থাকিবে না। এই সকল মন্দিরের অতুলনীয় নিৰ্ম্মাণ-কৌশল ও শিল্প-শোভা অনেকেই স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত চিত্রাবলী দর্শনে সকলেই তাহা কল্পনায় অনুভব করিতে পারিবেন। ইতিহাসবিদ্ হাণ্টার সাহেব তাঁহার দুই খণ্ড ইংরাজি গ্রন্থে এই সকল তীর্থস্থলের বর্ণনা ও ইতিবৃত্ত প্রথম সঙ্কলন করেন। সে গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য। তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এ বিষয়ে বহু গবেষণা ও আলোচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থও এখন দুর্ল্লভ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মনোমোহন গাঙ্গুলী 'Orissa and her Remains' গ্রন্থে এ বিষয়ে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশ করেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মহাশয় 'মন্দিরের কথা' গ্রন্থে ভুবনেশ্বর, পুরী ও কোণারকের শিল্প ও ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া, বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক এই এক গ্রন্থেই প্রায় সকল বিষয় বিশদ ভাবে জানিতে পারিবেন।

ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দিরের চূড়ার উচ্চতা ১৬০ ফিট ; অর্থাৎ প্রায় দ্বাদশ বা চতুর্দ্দশ তল বিরাট অট্টালিকার সমান। 'রাজা-রাণী' মন্দিরের এখন নিতান্ত জীর্ণ দশা ; কিন্তু ইহার কারুকার্য্য অতি বিচিত্র। মুক্তেশ্বরের মন্দিরের উচ্চতা অধিক নহে ; কিন্তু ইহার সূক্ষ্ম শিল্প-চাতুর্য্য বিস্ময়কর। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরটি অনেক প্রাচীন ;—কিছুকাল পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে ইহার কথঞ্চিৎ সংস্কার করা হয়। ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের 'বিমান' ও 'জগমোহন' অতি চমৎকার। এই মন্দিরটির ভিতর ও বাহির সমভাবে কারুকার্য্যখচিত। কেদারেশ্বর মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ; বোধ হয়, প্রধান মন্দিরও এত প্রাচীন নয়। অলাবুকেশ্বর মন্দির নৃপতি 'অলাবুকেশরী' বা ললাটেন্দু কেশরীর নামে নির্ম্মিত।

বিখ্যাত বিন্দুসরোবরের দৈর্ঘ্য ১,৩০০ ফিট ও প্রস্থ ৭০০ ফিট। পূর্ব্বে ইহার চতুর্দ্দিকেই সুন্দর সোপানশ্রেণী ছিল ; এখন তাহা ভগ্ন-প্রায়। সরোবরের মধ্যস্থলে এক 'দ্বীপ' আছে। তাহার এক কোণে একটি ক্ষুদ্র মন্দির অবস্থিত। এই সরোবর-জলে স্নানের মাহাত্ম্য পুরাণাদিতে বিশেষ ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তলস্থ উৎসের জলে এই সরোবরের সৃষ্টি হয় ; কিন্তু পঙ্কোদ্ধারের অভাবে জল এখন আর বিশুদ্ধ নয়। অতএব বিন্দু সরোবরের সংস্কার-সাধন বহুব্যয়সাপেক্ষ হইলেও সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

চারি বৎসর পূর্ব্বে কাসিমবাজারাধিপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারাজ বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায়, বিন্দুসরোবর ও ভুবনেশ্বর মন্দিরাদির জীর্ণ-সংস্কারের জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। তখন হইতেই সমিতি এই পুণ্য কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দেশবাসীর দ্বারস্থ হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা কোনও মতেই পর্য্যাপ্ত নহে। দেশের ধনশালী মহোদয়গণ এ বিষয়ে উদ্যোগী না হইলে, এই মহৎ প্রচেষ্টা বিফল হইবার সম্ভাবনা।

আশা আছে, জাতীয় জাগরণের দিনে দেশবাসী প্রাচীন তীর্থকীর্ত্তি রক্ষার ব্যবস্থায়,—ধর্ম্ম ও জাতীয় স্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষায়—উদাসীন থাকিবেন না।

ভুল বোঝা

[অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, এম-এ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৫)

কয়দিন পরের কথা বলিতেছি। কি একটা উৎসব উপলক্ষে জেঠাইমা একদিন সকালে উঠিয়াই, তাঁহার এক আত্মীয়ের বাড়ী, গিয়াছিলেন। বাড়ীতে স্ত্রীলোকের মধ্যে ছিলেন পিসীমা ও রেণু। রেণুর আবার স্কুল আছে। অতএব সকাল বেলায় পিসীমাকেই বাধ্য হইয়া রাঁধিতে হইল, রেণু স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিতেই, পিসীমা বলিতে লাগিলেন,—"যেদিন বেশী কাজের ভিড় থাকে, সেই দিনই কুটুম-বাড়ী যাওয়া হয়। আমার যাওয়ার মধ্যে আছে এক যমের বাড়ী। সেখানে গেলেই হাড় জুড়ায়।" রেণু বলিল,—"পিসীমা, যমের বাড়ী যাওয়ার ত আপাততঃ দেরী আছে; ততক্ষণ তুমি এইখানে বসে পাখাখানা দিয়ে শরীরটা জুড়াও। এবেলা আমিই রাঁধছি।" রেণু কোমরে আঁচল জড়াইয়া ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকিল।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার শেষ হইবার পূর্ব্বেই জেঠাইমা ফিরিয়া আসিলেন। মাষ্টার খাইতে বসিয়াছিলেন, জেঠাইমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টার মশায়, রান্না কেমন হল?" "আজ্ঞে বেশ হয়েছে; ওবেলার চেয়ে এবেলায় ঢের ভাল হয়েছে।" রেণু এক বাটী দুধ লইয়া আসিতেছিল, লজ্জায় তার গণ্ডদেশ আরক্তিম হইয়া উঠিল। জেঠাইমা বলিলেন, "এ বেলা রেণু রেঁধেছে।" মাষ্টার আর কিছু না বলিয়া নত-মুখে খাইতে লাগিলেন। সেদিন তাঁহার পাতে একটী ভাতও পড়িয়া থাকিল না।

পিসীমা নিকটে বারান্দায় বসিয়া মালা জপিতেছিলেন; মাষ্টারের কথাগুলি খচ্ করিয়া তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া একেবারে মরমে গিয়া প্রবেশ করিল। মাষ্টার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেই, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "যাদের হাতের রান্না ভাল লাগে না,—তাদের বাড়ীতে থাকতেই বা কে বলে? কেউ ত যেচে ডেকে নিয়ে আসে নি! দাঁড়ানর যার যায়গা নাই, তার মুখে আবার রান্নার বিচার! কথায় বলে, 'ভিক্ষার চাল, তার আবার কাঁড়া আর আকাঁড়া—"

কোন্ সূত্র দিয়া, কি লক্ষ্য করিয়া যে এত কথা বলা হইতেছে, মাষ্টার তাহা সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া, ধীরে-ধীরে তাঁহার ঘরে চলিয়া আসিলেন। পিসীমার উচ্চ কণ্ঠের আওয়াজ পাইয়া, রেণু রান্নাঘরের মধ্য হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি পিসীমা?" "হয়েছে ছাই! আমার মাথা আর মুণ্ডু?" দুই-চারিবার মালা ঘুরাইয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "আমাদের হাতের রান্না ভাল লাগবে কেন? আমাদের ত আর সেই বয়সের কালও নাই, সুন্দর মুখও নাই। আমরা না জানি হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইতে, না জানি বেহায়ার মত হেসে-হেসে, কাছে গিয়ে কথা বলতে। আমাদের রান্না মুখে ধরবে কেন? বলে, যাকে দেখতে নারি তার চলনও বাঁকা।" অনর্থক ভিমরুলের চাকে খোঁচা দিয়া লাভ নাই দেখিয়া, রেণু চুপ করিয়া খাইতে লাগিল।

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গেলে ঝি আসিয়া বাসন ধরিল। পিসীমা নিকটে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "বুঝলে কেষ্টার মা, এতখানি বয়স হ'তে চল্ল,—আজ নূতন শুনলাম, আমার হাতের রান্না না কি খাওয়া যায় না।" "ওমা, সে কি কথা গো! কোথা থেকে কোন্ রাজপুত্তুর এলেন যে, তোমার রান্না তার মুখে রুচল না!" "তাই বোঝ আর কি! কত যায়গায় কত যজ্ঞির রান্না রেঁধেছি; বলি, কেউ কোন দিন একটা খুঁৎ ধরতে পেরেছে? আর এ সংসারটাকে এত দিন চালিয়ে এনেছে কে? বড় বৌ ত সে-দিন এসে হাঁড়ি ধরেছে।" "তা আর আমি জানি না। কেষ্ট যখন এতটুকু কোলে, তখন থেকেই ত আমি তোমাদের এখানে পড়ে রয়েছি। সেদিনও ও-পাড়ার মেজবাবু বলছিলেন, 'কেষ্টার মা, তুমি আমাদের বাড়ীতে এস,—বেশী মাইনে পাবে।' আমি

বল্লুম, বাবু, এতদিন যাদের নুন খেনু, আজ কি তাদের ছেড়ে আসতে পারি। 'আমি ত এ সংসারের সবই দেখে আসছি।' "তাই বল দেখি, তোমরা কে কবে আবার আমার রান্না খেতে পার নাই?" "বলি, সে নবাব-পুত্তুরটী কে, শুনি?" "কে আবার! সেই পোড়ার-মুখো রেণুর মাষ্টার। সে বলে কি না, ও-বেলাকার আমার রান্না মুখে দেবার যোগ্য হয় নাই! বলি, ভিখিরীর আবার ঠাণ্ডা আর গরম! বাড়ীতে যার একবেলা ভাত জোটে না, তার আবার এত ফষ্টি! এত যদি বাবুগিরি, তবে পরের বাড়ী থাকা কেন? কে তোকে থাকতে বলে এখানে? যেখানে ভাল জোটে, সেখানে চলে গেলেই ত পারে।" "ছি, ছি! ঘেন্নায় মরে যাই গা! আমি হ'লে কোন্ দিন অমন মাষ্টারকে ঝেঁটিয়ে বের করে দিতাম। তুমি নেহাৎ ভালমানুষ বলে সহ্য করে আছ।" পিসীমার চক্ষু দিয়া এবার কয়েক বিন্দু অশ্রু বাহির হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"কি বলব কেষ্টার মা,—এখানে যে মরে আছি। পোড়া অদৃষ্ট, নইলে কি এখানে বসে আজ মাষ্টারের খোঁটা শুনতে হয়। আমার আজ অভাব কি! রাজার মতন সোয়ামী, অমন বাছের বাছ পাঁচটা দেবর। এদের কাল নজরে পড়েই ত তারা শেষ হয়ে গেল। আজ মাষ্টারের কাছে ভালমানুষ সাজা হচ্ছে! জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, রান্না কেমন হল! বলি, কোথায় ছিল এসব যত্ন-আত্তি যখন ছোট ঠাকুরপো এখানে এসেছিল। তিনমাস ভুগে-ভুগে বেচারী মারা গেল। দিয়েছিলি তখন এক গ্লাস জল এগিয়ে?" পিসীমা আঁচলের দ্বারা চোখ মুছিলেন, "তা আর কেঁদো না বাছা। বলি, কপালে লেখা কি কারো এড়ানোর যো আছে? চোখের সামনেই ত দেখলে,—আমার অমন জলজ্যান্ত ভাইটে দুইদিনের জ্বরেই—।" "আমি আজ এর একটা হেস্তনেস্ত না করে কিছুতেই ছাড়ছিনে। আসুন দাদা বাড়ীতে ফিরে। হয় মাষ্টারকেই বিদেয় করুন; আর নয় আমাকেই বিদেয় করে, থাকুন তিনি তাঁর মাষ্টার আর বড় বৌকে নিয়ে।"

কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে দাদা সে রাত্রিতে বাটীতে ফিরিলেন না। পরদিন প্রায় সন্ধ্যার সময় সন্তোষবাবু আফিস হইতে ফিরিয়া আসিলেন। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিতেই, পিসীমা কাঁদিতে-কাঁদিতে সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—"দাদা, হয় মাষ্টারকে তাড়াও,—আর না হয় আমাকেই বিদেয় কর।" সে-দিন আফিসের কি একটা ঘটনার জন্য সন্তোষবাবুর মেজাজ অত্যন্ত খারাপ ছিল।

"কি! কি বল্লে! মাষ্টার কি করেছে?" "কাল তুমি বাড়ী ছিলে না; সে আমায় যা-তা বলে অপমান করেছে। সে বলে আমার হাতের জল অশুদ্ধ,—রান্না খেতে ঘেন্না করে—" রেণু ঘরের মধ্যে ছিল; সে তাড়াতাড়ি বলিল—"কই? মাষ্টার মশায় সে কথা কখন বল্লেন?" "বলেছেন বৈ কি! আলবোৎ বলেছেন! তুই বেরো পোড়ামুখী আমার সামনে থেকে! ননী! শীগ্‌গির মাষ্টারকে উপরে ডেকে নিয়ে আয় ত!"

"মাষ্টার মশায়! শীগ্‌গির উপরে চলুন,—বাবা ডাকছেন। দেখবেন এখন মজাটা! পিসীমাকে কাল কি বলেছিলেন?" "মাষ্টার এদিকে এস ত! বলি, বাড়ীর মেয়েদের উপর তুমি কথা বলবে কেন, শুনি? যাও তুমি বেরিয়ে আমার এখান থেকে! যাও, এক্ষুনি যাও। এক মিনিট যেন দেরী না হয়!"

মাষ্টার নীরবে বিমর্ষমুখে নামিয়া আসিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার অপরাধটা কোন্‌খানে। কি যে কর্ত্তব্য, তাহাও তাহার বুদ্ধিতে আসিল না। নিজের বিছানায় আসিয়া শুইয়া তিনি আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

খানিক রাত্রে রেণু আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ধীরে-ধীরে ডাকিল—"মাষ্টার মশায়!" "কি রেণু?" "খাবেন চলুন!" "না, আজ আর কিছুই খাব না,—শরীরটা ভাল নেই!" "মিথ্যে কথা, আপনি তাহ'লে আগে বলতেন!" মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন। রেণু দরজার শিকল ধরিয়া আস্তে-আস্তে নাড়িতে-নাড়িতে বলিল, "আপনি রাগ করেছেন?" "না,—না, কে বল্লে—কথ্‌খনো না—" "তবে আসুন আমার সঙ্গে। ওখানে আর কেউ নেই,—জেঠাইমা ভাত নিয়ে বসে আছেন।" মাষ্টার আর বাক্যব্যয় না করিয়া রেণুর অনুসরণ করিলেন।

পরদিন সকালে উঠিয়াই কর্ত্তা মাষ্টারের ঘরে গিয়া বলিলেন—"মাষ্টার, মাষ্টার, শোন ত। এক্ষুনি একবার পোষ্ট অফিসে গিয়ে এই টেলিগ্রামটা ক'রে দিয়ে এস ত! বড় জরুরি কাজ,—খুব শীগ্‌গির কিন্তু!" "আচ্ছা।"

কর্ত্তা খাইতেছিলেন! পিসীমা পাশে বসিয়া বলিতেছিলেন "বলি, তাড়িয়ে দিলেও যে মাষ্টার যেতে চায় না!" সন্তোষবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"মাষ্টার কোথায় যাবে?" এরি মধ্যে ভুলে গেলে? কাল রাত্রে তাকে জবাব দেওয়া হ'ল; আবার এখন—" "ওহো! কাল রাত্রে ননী বুঝি পড়ে নাই! বুঝলে আচ্ছ, 'ওর কিচ্ছু হবে না,—একেবারে কিছু না। আমার অবর্ত্তমানে ওর দুঃখ্‌খু দেখে শেয়াল-কুকুরে কাঁদবে। তাকে বলে দিও, সন্ধ্যা-কালে ফিরে এসে মাষ্টারের কাছে যদি তাকে না পড়তে দেখি, তাহ'লে আজ জুতিয়ে তার হাড় গুঁড়ো করে ফেলে দেব।" বলিয়াই সন্তোষবাবু একগ্লাস জল এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন।

(৬)

বিকালে পিসীমা গম্ভীর মুখে বসিয়া ছিলেন। ননী পাশ দিয়া যাইতে-যাইতে বলিল,—"পিসীমা, এমন করে একলাটী বসে আছ?" পিসীমা কথা কহিলেন না। ননী কিছুদূর গিয়া, একটী ছোট কৌটার মধ্য হইতে একছড়া মালা বাহির করিয়া বলিল,—"পিসীমা, এই দেখ, তোমার জপের মালা এনেছি।" "লক্ষীছাড়া ছেলে! স্কুল থেকে বার জাত ছুঁয়ে এসে আমার মালা ধরেছিস্?" "হ্যাঁ, ভারী ত মালা! জপের নাম করে, কেবল সারাদিন মালা হাতে করে পরের নিন্দে করে বেড়াও!" "কি! কি বল্লি! ছোট মুখে বড় কথা! দাঁড়া আজ তোকে ভাল করে মজাটা দেখাচ্ছি!" পিসীমা উঠিয়া দাঁড়াইতেই, ননী মালাটা তাঁহার গায়ের উপর ছুড়িয়া দিয়া, ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

পিসীমা মালাটীকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন—"এ বাড়ীর যেমন কচিটী, তেমন বুড়োটী! সবই এক ছাঁচে ঢালা! কারো সঙ্গে কথা কবার যো নাই। আর একজন স্কুলে গিয়ে বসে আছেন;— সন্ধ্যা হ'য়ে এল,—ফিরবার নামটী নেই। আজ বাদে কাল বিয়ে হবে, অথচ এ বুদ্ধিটুকু হল না যে, বাড়ীতে একজন মরে একবার গিয়ে তাঁর খোঁজ করি।" "কে মরে পিসীমা?" বলিয়া রেণু স্কুল হইতে আসিয়া, বইগুলিকে একধারে সাজাইয়া রাখিল। তার পর বাক্স হইতে একটী ছোট ঔষধের শিশি বাহির করিয়া, পিসীমার সন্নিহিত হইয়া বলিল, "পিসীমা, এস দেখি, তোমার কপালে ওষুধটা মালিশ করে দিই। আজ মাথা-ধরাটা কেমন আছে?" "আর কিছু কাল স্কুলে বসে থেকে, সে খবরটা নিলেই ভাল হত।" "হ্যাঁ, সত্যিই আজ বড় দেরী হয়ে গেছে!" পিসীমা কিছুকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন,—"আমি কি সাধে বলি! মাষ্টার কি আমার শত্রু যে আমি তাকে তাড়াতে যাব! এ বাড়ীতে আমি কিছু না দেখলে, আর কে দেখবে। মা নেই, এখন আমাকেই ত সব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে! আজ যদি গিরিডির এই সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়, তাহ'লে—" রেণু হঠাৎ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিল,—"আমি আসছি।"

রেণু ধীরে-ধীরে তাহার বাবার ঘরে প্রবেশ করিল। মার মৃত্যুর পর হইতে রেণু প্রতিদিন স্বহস্তে এই ঘর পরিষ্কার করিত। ঘরের এক কোণে কতকগুলি আলমারি ও বাক্স ছিল। সেগুলি বহুদিন ব্যবহার অভাবে কতকটা অপরিষ্কার হইয়া পড়িয়াছিল। রেণু ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, এক ছুটীর দিনে সে সকলগুলি সাজাইয়া রাখিবে। কিন্তু হঠাৎ কি-ভাবিয়া আজ সে ব্যস্ত-ভাবে সেগুলি ঝাড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। একটা বাক্সের মধ্যে কতকগুলি পুরাতন কাপড়-চোপড় ছিল। এগুলি রেণুর মায়ের। রেণু যত্ন সহকারে প্রত্যেক জিনিষটী ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া পরিষ্কার করিয়া, আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিল। এক কোণে একটী আলমারির উপর কতকগুলি পুস্তক যত্নাভাবে বিপর্য্যস্ত ভাবে পড়িয়া ছিল। রেণু দেখিয়াই চিনিতে পারিল, এ বইগুলি সে দু'বৎসর আগেই ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই বইগুলির পার্শ্বে একটী ছোট কাগজের বাক্সের উপর অপরিচিত হস্তাক্ষরে তাহার নিজের নাম লেখা দেখিয়া রেণু সেটী তুলিয়া লইল। এই বাক্সের গায়ে, আশে-পাশে নানা জায়গায় রেণু স্বহস্তে নিজের নাম লিখিয়া রাখিয়াছিল। দুই বৎসর আগের লেখা; অনেক অক্ষর অত্যন্ত বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। রেণু অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বাক্সের মুখটী খুলিয়া ফেলিল। উহার মধ্যে একখানি রুমাল এবং তাহাতে জড়ান একটী সুন্দর সিল্কের ফুল। অনেকদিন বোধ হয় কেহ এদের খোঁজ করে নাই।

রেণু ফুলটী হাতে করিয়া জানালার ধারে টেবিলের উপর আসিয়া বসিল। তার পর ফুলটীকে টেবিলের এক পার্শ্বে রাখিয়া, সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে জানালা দিয়া চাহিয়া রহিল। খোলা জানালা দিয়া বহুদূর হইতে বাতাস আসিয়া

রেণুর গায়ে লাগিয়া, তাহার অঞ্চল ও আলুলায়িত চুলগুলিকে ধীরে-ধীরে কাঁপাইয়া দিতেছিল।

"দিদি, এই দেখ্ তোর সেই ফুল।" ননী পিছন হইতে আসিয়া, দিদির অজ্ঞাতসারে ফুলটী তুলিয়া লইয়াছিল। "রাখ শীগ্‌গির, লক্ষীছাড়া ছেলে!" "তুই এ দিয়ে কি করবি; এখন ত আর চুলে পরিস না!" "পরি আর নাই পরি, তোর সে কথায় কাজ কি শুনি?" ননী দরজার কাছে সরিয়া গিয়া বলিল, "কাজ আর কি,—মাষ্টার মহাশয়কে গিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসি।" রেণুর মুখ অত্যন্ত মলিন হইয়া গেল। সে ব্যস্ত ভাবে বলিল, "লক্ষীটী, ছি! কাল অনেক মারবেল কিনে দেব।" ননী উৎসাহ পাইয়া ছুটিতে-ছুটিতে বলিল, "হাঁ, ছাই মারবেল! আমি এই এক্ষুনি গিয়ে দেখাচ্ছি।" রেণু ননীর পশ্চাৎ-পশ্চাৎ মাষ্টার মহাশয়ের ঘরের কাছ পর্য্যন্ত আসিল। তার পর গৃহ-মধ্যে মাষ্টারকে উপবিষ্ট দেখিয়া, আড়ষ্ট ভাবে নতমুখে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

"দেখুন ত মাষ্টার মশায়, ফুলটী কেমন?" মাষ্টার কিছুকাল ফুলটী লইয়া পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—"বাঃ, বেশ ফুল ত!" "ওটা কার জানেন? সুশীলবাবু রেঙ্গুন থেকে কিনে নিয়ে এসেছিলেন। আমরা যখন গিরিডিতে ছিলাম, তখন তিনি ওটা দিদিকে দিয়েছিলেন।" "কে দিয়েছিলেন?" "সুশীল বাবু! আপনি তাকে চেনেন না? গেল-বার এম-এ পরীক্ষায় তিনি ফাষ্ট হয়েছিলেন; এ বৎসর ল পাশ দিয়েছেন। গিরিডিতে থাকবার সময় আমাদের বাসায় তিনি প্রায়ই আসতেন। দিদি একদিন জোর করে তাঁর কাছ থেকে এই ফুলটী চেয়ে নিয়েছিল।"

রেণু ঝড়ের মতন ছুটিয়া আসিয়া ফুলটী কাড়িয়া লইল; তারপর সেটীকে ছিঁড়িয়া, সহস্র-খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, মেজের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

"কি, কি কল্লি! একেবারে ছিঁড়ে ফেলে দিলি!" "বেশ করেছি।" "হ্যাঁ, ভারী ত লজ্জা! গিরিডিতে সুশীলবাবুর সঙ্গে যখন রাস্তায় এক সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়াতিস্, তখন বুঝি আর লজ্জা ক'রত না।" রেণু চলিয়া যাইতেছিল; হঠাৎ ফিরিয়া, ননীর কপাল লক্ষ্য করিয়া, হস্তস্থিত চাবির গুচ্ছটী সজোরে ছুড়িয়া মারিল। ননীর কপাল ঈষৎ কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে, ননী একেবারে পিসিমার কাছে আসিয়া হাজির হইল। পিসীমা তখন সবেমাত্র জপে বসিয়াছিলেন; এই আকস্মিক কলরবে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। সুরটা পঞ্চমে চড়াইয়া, তিনি প্রথমতঃ রেণুর উদ্দেশে খানিক বকিয়া লইলেন; তার পর এই দুর্দ্দান্ত মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া, মাষ্টার মহাশয়ের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"বলি মাষ্টার, তাড়িয়ে দিলেও ত যাবে না; অথচ এদিকে যে এরা দুটো খুনোখুনী করে মরে, তাও ত দেখবে না! তোমাকে কি শুধু বসিয়ে রাখবার জন্যই এখানে আনা হয়েছে?"

মাষ্টার নীরবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন চারিদিকে নামিয়া পড়িয়াছে। রাস্তা দিয়া কত অচেনা মুখ কত অচেনা বাড়ীর উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে। বহু দূরে কত বাড়ীতে সন্ধ্যার আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই আলো ও আঁধারের মধ্য দিয়া, রামলালের মনের উপর কিসের যেন একটা তীব্র বেদনা আসিয়া বিঁধিতে লাগিল। কই, এমন করিয়া ত আর কোন দিনই তাহার মন অবসন্ন হয় নাই!

(৭)

সেদিন কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষে পিসীমার শ্বশুর-বাড়ী হইতে কতকগুলি মিষ্টান্ন আসিয়াছিল। রাত্রে কর্ত্তা, ননী ও মাষ্টার মহাশয় আহারে বসিয়াছেন। পিসীমা একটা থালায় করিয়া কতকগুলি মিষ্টান্ন আনিয়া, কর্ত্তা ও ননীর পাতে দিলেন; তার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া মাষ্টারের পাতে একটীমাত্র সন্দেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। রেণ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। পিসীমা বাহির হইতেই, সে কাছে আসিয়া বলিল,—"পিসীমা, তোমার মেঠাই কি সব ফুরিয়ে গেল?" "আমার শ্রাদ্ধে ত আর এ লাগাব না; যা থাকে, সবাই পাবে এখন।" রেণু মুখ ভার করিয়া উপরে চলিয়া গেল। পিসীমা একটী ডিশে করিয়া কিছু মিষ্টান্ন লইয়া রেণুর সম্মুখে রাখিলেন। রেণু পা ঝুলাইয়া টেবিলের উপর বসিয়া ছিল। পিসীমা বলিতে লাগিলেন,—"এখন আর সেখানে কে আছে যে, ভারে-ভারে তত্ত্ব পাঠাবে। সে দিনও নাই, সে লোকও নাই। আর, যা দেবে, তোমরাই দশজনে খাবে। আমার কি ছেলেপুলে আছে যে, তাদের জন্য রেখে দেব?"

রেণু চুপ করিয়া ডিশখানি হাতে করিয়া লইল। তার পর ধীরে-ধীরে উহা হইতে এক-একটী জিনিস তুলিয়া লইয়া, পিসিমার সম্মুখেই জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে লাগিল।

"দেখলে কাণ্ডটা! বলি, বড় ত বড়মানুষের মেয়ে! সন্দেশ মুখে রুচল না!" "বড়মানুষের মেয়েই হই, আর যাই হই,—তোমার মতন এক-চোখো বাপের মেয়ে ত নই।" পিসীমা কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বলিতে সুরু করিলেন, "মেয়ে ত নয়,—ঠিক যেন কেউটে সাপ! এক কথা বল্লেই দশকথা শুনিয়ে দেবে। লেখাপড়া শিখে এখন আর মাটীতে পা পড়ে না—" ইত্যাদি।

"ননী! ননী!" "কি বাবা?" "বলি, কাপড়-চোপড় পরে এত সকালে কোথায় যাওয়া হচ্ছিল?" "আজ সপ্তমী পূজো—তাই দেখতে যাচ্ছি।" "সপ্তমী পূজো! কে বলেছে সপ্তমী পূজো?" "বলবে আবার কে! সবাই দেখতে যাচ্ছে—" "সবাই দেখতে গেলেই বুঝি আজ সপ্তমী হবে! তুই আমার চেয়েও বেশী জানিস্?" "ঐ ত বাজনা শোনা যাচ্ছে!" "ফের আমার কথার উপর কথা বলিস্!" ননী অবাক্ হইয়া চুপ করিয়া রহিল। কর্ত্তা বলিলেন,—"যা, নীচে থেকে দেখে আয়, লেটার বাক্‌সের মধ্যে কোন চিঠি আছে কি না।"

ননী নীচে নামিয়া গেল; কিয়ৎকাল পরে একখানি চিঠি আনিয়া বাবার সম্মুখে ধরিল।

কর্ত্তা চিঠিখানি খুলিয়া বারকয়েক পড়িয়া ডাকিলেন,—"আহ্ন! আহ্ন!" আদরিণী তখন সবেমাত্র নিদ্রা হইতে উঠিয়াছিলেন। গৃহের মধ্যে আসিয়া কহিলেন,—"আমায় ডাকচো?"

"হাঁ, বুঝলে আহ্ন, সুশীল কটক থেকে চিঠি লিখেছে—সে ডেপুটী হয়েছে!" "বেশ উপযুক্ত চাকরীই পেয়েছে। আহা ছেলে ত নয়—ঠিক যেন কার্ত্তিক! এখন আমাদের কপালে—" "না—না, রেণুর আমাদের কপালের জোর আছে। সে বেঁচে থাকতে ঐ কথাই বলত।"

রেণু কক্ষান্তরে যাইতেছিল; সুশীলবাবুর চিঠির প্রসঙ্গটা কাণে যাওয়ায়, চুপ করিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া, কথাগুলি শুনিল; তারপর ধীরে-ধীরে নামিয়া আসিয়া, সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া রহিল।

"দিদি! কি ভাবছিস্! আজ সন্দেশ খাওয়াতে হবে যে!" "পড়াশুনো না করে, ফাজলিমি করে বেড়ান হচ্ছে বুঝি?" "হাঁ! আজ কেউ পড়ে কি না! ওসব বাজে কথায় ভুলছি না কিন্তু!" "তবে দাঁড়া! ভাল করে সন্দেশ খাওয়াচ্ছি!" ননী একটু দূরে সরিয়া গিয়া বলিল,—"ওরে বাপরে! এখন থেকেই বুঝি হাকিমি মেজাজ দেখান হচ্ছে!"

রেণু কিছু না বলিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যাকালে কর্ত্তা ডাকিয়া কহিলেন—সকলকে আরতি দেখতে যেতে হবে। ননী সাজিয়া-গুজিয়া, জুনুর হাত ধরিয়া, মাষ্টার মহাশয়ের কাছে আসিয়া বলিল,—"কই মাষ্টার মশায়! আপনি যাবেন না?" "হাঁ যাব বৈ কি, চল!" মাষ্টার বাহির হইয়া আসিলেন। ননী মাষ্টারের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—"হাঁ মাষ্টার মশায়, আপনি এবার পূজোয় কাপড়-চোপড় কিছুই কেনেন নি বুঝি?" "না!" "এই পরেই যাবেন?" "হাঁ।"

রেণু উপরে পোষাক পরিতেছিল,—ননীর কথাটা কাণে যাওয়ায়, সে চাহিয়া দেখিল, মাষ্টার মহাশয় একখানি মলিন কাপড় পরিয়া ও একটি ছেঁড়া পিরান গায়ে দিয়া, নত-মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। রেণু কিছুকাল স্থির হইয়া কি ভাবিল। তার পর সহসা পোষাকগুলিকে একপাশে ছুড়িয়া ফেলিয়া, বাহিরে আসিয়া বলিল—"পিসীমা, আমি যাব না।" "যাবিনে! সে কি! সবাই যাচ্ছে, আর তুই যাবিনে কি রকম?" "না আমি বাড়ীতে থেকে মাষ্টার মশায়ের কাছে পড়ব!" "আজকের দিনেও পড়বি।" কর্ত্তা বলিলেন—"না যেতে চায়, থাক ও। বুঝলে আহ্ন, যেমন মা ছিল, মেয়েটীও ঠিক তেমনি একগুঁয়ে হয়েছে।"

রেণু একদিকে দেওয়ালে হেলান দিয়া, নত-মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সকলে চলিয়া গেল; রেণু কিন্তু নড়িল না। পিসীমা আসিয়া বলিলেন—"এই বুঝি পড়া হচ্ছে! মাষ্টারকেও যেতে দিলে না, অথচ নিজেও কিছু পড়লে না!" "পড়ি না পড়ি, সে আমার ইচ্ছে।" বলিয়া রেণু একেবারে রান্নাঘরে জেঠাইমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

"জেঠাইমার রান্না বুঝি এখনও হয় নি?" জেঠাইমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কই, এত সকালে ত কোন দিনই

রান্না হয় না।" "রাঁধতে পারলেই হয়!" বলিয়া রেণু সেখান হইতে মাষ্টার মহাশয়ের ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

"কই রেণু, তুমি পড়লে না?" "না!" রেণু অন্যদিক চাহিয়া, টেবিলের উপরিস্থিত বইগুলি নাড়িতে লাগিল। তার পর ঈষৎ মুখ তুলিয়া বলিল—"মাষ্টার মশায়, আপনার কয় মাসের মাহিনা বাকি আছে?" "বোধ হয় দুই মাসের।" "আপনি বাবার কাছ থেকে তা চেয়ে নেন না কেন?" "দরকার হয় না,—যখন চলে যাচ্ছে।" "ছাই চলে যাচ্ছে!" বলিয়াই রেণু সহসা অদৃশ্য হইল।

(৮)

কয়েক মাস পরে একদিন বিকালে পিসীমা মাষ্টারকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বুঝলে, কাল দুইজন ভদ্রলোক আসবেন। কলকেতা থেকে এই জিনিসগুলো নিয়ে এস দেখি।"

সন্ধ্যার সময় মাষ্টার ফিরিয়া আসিয়া, পিসীমার নিকট উপস্থিত হইলে, পিসীমা একে-একে জিনিষগুলি পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—"বলি, এ ফলগুলি কি চোখ দিয়ে দেখে কিনে এনেছিলে? এর অর্দ্ধেকের উপর যে খারাপ।" মাষ্টার নীরবে মাথা নীচু করিয়া রহিলেন। "হাঁ করে চেয়ে রইলে যে! যাও, এগুলি বদলিয়ে নিয়ে এস!"

মাষ্টার দ্বিরুক্তি না করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলেন। দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়াছেন, এই সময় রেণু পশ্চাৎ হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মাষ্টার মশায়, কোথায় যাচ্ছেন?" "বড়বাজারে।" "কিসের জন্য?" "পিসিমা বল্লেন, এই ফলগুলি ফেরৎ দিতে হবে।" "কোথাও যেতে হবে না আপনার। দিন ওগুলি আমার কাছে।" মাষ্টার একটু ইতস্ততঃ করিয়া ফলগুলি রেণুর হাতে দিলেন। রেণু সেগুলি লইয়া পিসীমার কাছে উপস্থিত হইয়া, ঢিপ করিয়া তাঁহার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল। পিসীমা মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন,—"এ আবার কি ঢং! বলি, এ পচা ফলগুলো দিয়ে কি আমার পিণ্ডি হবে?" "পিণ্ডির সময় এ রকম ফল জুটলে ত উদ্ধার হয়ে যেতে! বুড়ো হয়ে যেতে চল্লে, পরের বিষয় একটু ভাবতে শিখলে না!" "বলি, পরের বিষয় ভাবতে গিয়ে কি টাকা দিয়ে খারাপ জিনিস ঘরে আনতে হবে? আনবার সময় দেখে আনলেই ত চলত! আমি ত আর সখ করে তাকে পাঠাচ্ছি নে।" "তোমার যদি ছেলে থাকত, তা হ'লে কি তুমি তাকে আজ এমনি করে পাঠাতে পারতে পিসীমা?" "আমার ছেলেই হন, জামাই হন, আমার সঙ্গে কারো খাতির নেই বাপু! টাকাগুলি জলে ফেলে দেবে, আর আমি তাকে বসিয়ে পূজো কোরব বুঝি?" "ভারী ত টাকা!" "ভারীই হ'ক আর যাই হ'ক, একটা পয়সা দেবার শক্তি নেই,—এতগুলি টাকা তিনি নষ্ট করবার কে, শুনি?" রেণু বিদ্যুতের মতন ঘরের মধ্য হইতে কয়েকটি টাকা আনিয়া, ঝন্-ঝন্ করিয়া পিসীমার নিকট ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—"এই নেও তোমার টাকা।" পিসীমা চক্ষু অগ্নিবর্ণ করিয়া বলিলেন,—"বলি, বিয়ে না হতেই এই বড়মানুষী,—বিয়ে হলে ত আর দেমাকের চোটে মাটীতে পা পড়বে না!" রেণু কিছু না বলিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল।

পরদিন ননী আসিয়া মাষ্টারকে বলিল,—"মাষ্টার মহাশয় আজ কিন্তু ছুটী।" "কেন?" "ঐ দিদিকে আজকে সুশীল-বাবুর মামা, আর সঙ্গে একজন ভদ্রলোক দেখতে আসবেন, বুঝলেন? আজ কি আর পড়া যায়! আচ্ছা মাষ্টার মশায়, আপনি কি সুশীলবাবুকে দেখেছেন?" "না।" "আর বছর একবার এখানে এসেছিলেন। জানলেন, খুব সুন্দর দেখতে। আর একদিন আসেন ত আপনাকে দেখাবো।" মাষ্টার গম্ভীর ভাবে উঠিয়া নিজের একখানি বই লইয়া পড়িতে বসিলেন।

বিকালে রেণু রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। "দিদি, তাঁরা এসেছেন। পিসীমা বল্লেন, কাপড়-চোপড় পরে এবার ঠিক হয়ে থাকতে।" রেণু ননীর দিকে একবার ভৎসনা-সূচক দৃষ্টিপাত করিয়া, তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া, নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে পিসীমা আসিয়া কহিলেন,—"কই রেণু, চল আমার সঙ্গে,—তাঁরা বসে আছেন।" রেণু বিছানায় মুখ লুকাইয়া বলিল—"না! আমি কোথাও যাব না।" "যাবিনে! এ কি ছেলেখেলা না কি? শীগ্‌গির ওঠ!" "না।" রেণু পাশের টেবিল হইতে একখানি কাগজ লইয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড-খণ্ড করিয়া মাটীতে ফেলিতে লাগিল।

জেঠাইমা আসিয়া সাধিলেন,—"রেণু! ছি মা! এখন ত আর ছেলেমানুষটী নও,—এখন কি অমন করতে

আছে ?” রেণু কথা বলিল না। “ওঠ্, লক্ষ্মীটী আমার !” রেণু তথাপি নড়িল না। ননী বারান্দা হইতে বলিয়া উঠিল, —“সুশীলবাবু আসেন নি কি না ! তাই মানিনীর মান হয়েছে !”

কর্ত্তা ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন—“এখনও শুয়ে আছিস্ ! ওঠ !” রেণু অন্য দিকে চাহিয়া ধীরে-ধীরে পা নাড়িতে লাগিল। সন্তোষবাবু কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কথা বল্‌ছিস না যে ? অসুখ করেছে ?” রেণু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিল,—“হ্যাঁ বাবা ; আমার মাথা ধরেছে। আমি কোথাও যেতে পারবো না।” “তবে থাক ! বুঝলে আদু,—ওর আর গিয়ে কাজ নেই, যখন মাথা ধরেছে।”

মামার সঙ্গের ভদ্রলোকটী সব শুনিয়া বলিলেন,—“আচ্ছা, আপনার মেয়ের কোন ফটো আছে কি ?” “হ্যাঁ, আছে বৈ কি,—অবশ্যই আছে !” “তা'হ'লে অগত্যা আপনি সেই ফটোটা একবার এনে দয়া করে দেখান ত !” “বিলক্ষণ ! বিলক্ষণ ! এতে আর দয়া কি ! মাষ্টার, তুমি যাও ত,—উপর থেকে রেণুর সেই বড় ফটোটা নিয়ে এস ত !” “চলুন মাষ্টার মশায় ! আমি আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখিয়ে দিয়ে আস্‌ছি।” বলিয়া ননী মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে-সঙ্গে গমন করিল।

ফটোখানি একটু উপরে টাঙ্গান ছিল। ননী বলিল, “মাষ্টার মশায় ! এই চেয়ারটা নিন্, এর উপর উঠে পাড়বেন।” মাষ্টার চেয়ারের উপর উঠিয়া ফটোখানি খুলিতে লাগিলেন। ননী বলিতে লাগিল,—“জানলেন মাষ্টার মশায় ! গিরিডিতে থাকবার সময় এখানি তোলা হয়। দিদি প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না। তার পর সুশীলবাবু একদিন তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে এই ফটো তুলেছিলেন।”

মাষ্টারের হস্ত সহসা অত্যন্ত কম্পিত হওয়াতে, ফটোখানি হস্তচ্যুত হইয়া, একেবারে মেজেতে পড়িয়া গিয়া, ভাঙ্গিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

“দাঁড়ান, কি করে ফেল্লেন। পিসীমাকে বলে দিয়ে আসছি।” ননী এই অত্যন্ত প্রীতিকর খবরটা দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া পিসীমার কাছে চলিয়া গেল।

“দেখেচ কাণ্ডটা ! বলি, এ পথের আপদ ডেকে নিয়ে এসে, শেষকালে আমাদের কি সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বেরুতে হবে না কি ? একখানা ছবি পাড়বার ক্ষমতা নেই,—তার আবার মাষ্টারী করতে আসা। ছি ছি ! ঘেন্নায় মরে যাই মা ! বলি, এখন ভদ্রলোকদের কাছে কি বলে মুখ দেখাব শুনি ?”

মাষ্টার নতমুখে গৃহমধ্যের কাচগুলি কুড়াইয়া একস্থানে করিতে লাগিলেন।

“তাই ত পিসীমা, এখন কি হবে ?” “হবে আর কি ; আমার মাথা আর মুণ্ডু !” এই সময় জেঠাইমা উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—“থাক, দৈবাৎ ভেঙ্গে গেছে, তার আর কি হবে। ছবিটা ত আর নষ্ট হয় নাই। ওদের ঐ খালি ছবিখানাই দেখিয়ে দেওয়া হোক।” ননী ফটো লইয়া প্রস্থান করিল। পিসীমা মাষ্টারকে বলিয়া গেলেন, —“যেখান থেকে পার, আজই ছবি সেরে নিয়ে আস্‌তে হবে ; নইলে ওবেলা থেকে এবাড়ীতে ভাত জুটবে না কিন্তু বলে রাখছি।”

রাত্রিতে কর্ত্তা ডাকিয়া বলিলেন,—“মাষ্টার, শোন ত ! আদু বল্‌ছিল, তুমি না কি ননীর ফটোটা ভেঙ্গে ফেলেচ ?” “আমার না, দিদির ” “আলবোৎ তোর ! তুই বেরো লক্ষ্মীছাড়া, এখান থেকে। , তা বুঝলে মাষ্টার, কাল সকালে গিয়ে সেটা সেরে নিয়ে আসবে। আদু, আদু ! মাষ্টার মহাশয়কে দুটো টাকা দিয়ে দাও ত।” “আজ্ঞে না, আমার এক পরিচিত বন্ধুর দোকান আছে, সেখান থেকে অমনি সেরে আনব।”

“ওহো, তুমি বুঝি সেখানে আগে পড়াতে মাষ্টার ?” “আজ্ঞে না, অমনি আলাপ আছে।” পিসিমা পাশের ঘর হইতে শুনাইয়া দিলেন,—“অমন লোকের আবার আর কোথাও মাষ্টারী জুটবে ! তুমি নেহাৎ ভালমানুষ বলে, এখন পর্য্যন্ত এখানে টিকে আছে। নইলে অপর জায়গা হ'লে কোন্ দিন বাড়ী থেকে বের করে দিত।”

মাষ্টার ঘরে আসিয়া, নিজের তহবিল পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, মাত্র একটী টাকা ও কয়েক আনার পয়সা অবশিষ্ট আছে। ছবিখানিকে একধারে রাখিয়া দিয়া, ধীরে-ধীরে বাক্সটী বন্ধ করিয়া ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলেন, দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া রেণু। “কি রেণু ?” “আপনি এই কয়টী টাকা রেখে দিন,—কাল সকালে তাই দিয়ে ছবিটা সেরে আনবেন।” “না,—না, টাকার ত কোন দরকার নাই। কে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন ?” রেণু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর করিল, “জেঠাইমা।” “তুমি

তাঁকে গিয়ে বল যে টাকার কোন আবশ্যক নাই,—আমি অমনি সেরে আনিতে পারব।" রেণু খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অবশেষে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

দুইদিন পরে কলেজ হইতে আসিবার সময় মাষ্টার দোকান হইতে ফটোখানি লইয়া আসিলেন। কি সুন্দর ফটো! দুইবৎসর আগে গিরিডিতে এখানি তোলা হইয়াছিল। রেণু একখানি বই হাতে করিয়া সহাস্য-মুখে একটী কুঞ্জের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। মাষ্টার অনেকক্ষণ নীরবে ছবিখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে রাত্রিতে ফটোখানিকে আর ফিরাইয়া দেওয়া হইল না।

পরদিন সকালে উঠিয়া মাষ্টার আবার ছবিখানি দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া ভাবিলেন,—"থাক, ব্যস্ত কি! সন্ধ্যার সময় দিয়ে এলেই চলবে।"

সন্ধ্যার সময় ছবিখানি হাতে করিয়া মাষ্টার বাড়ীর মধ্যে যাইতেছিলেন, এমন সময় ননী দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল,—"মাষ্টার মশায়, পিসীমা বল্লেন, এই কয়টা জিনিস বাজার থেকে আনতে হবে। এই নিন্ টাকা, খুব শীগ্‌গির করে কিন্তু—"

মাষ্টার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সেই সামান্য কয়টা টাকা অন্ততঃ দশবার গুণিলেন, তার পর বাক্স খুলিয়া, ছবিখানি তার মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া বাজার করিতে চলিয়া গেলেন।

কয়েকদিন পরে রেণু জিজ্ঞাসা করিল,—"মাষ্টার মশায়, সেই ছবিটা?" মাষ্টার একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিলেন,—"হ্যাঁ, সেটা এখনও ভাল করে সারা হয় নাই।"

(৯)

কর্ত্তা গিরিডিতে গিয়েছিলেন। তিন-চারি দিন পরে তাঁহার নিকট হইতে আদরিণীর নামে একখানি পত্র আসিল। রেণু নীচের লেটার-বাক্সের মধ্য হইতে সেখানি লইয়া, একেবারে বাবার ঘরের জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কম্পিত হস্তে খামখানি দুই-একবার উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া, রেণু নিমেষের মধ্যে সেখানা খুলিয়া ফেলিল। কর্ত্তা ভগিনীর নিকট লিখিতেছেন, এই মাসেরই ২১শে তারিখে রেণুর বিবাহের দিন পাকা স্থির হইয়া গিয়াছে।

রেণু বাম হস্তে চিঠিখানি ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তের উপর কপোল ন্যস্ত করিয়া, উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া দূরে চাহিয়া রহিল। দূরে—বহু দূরে, কত বাড়ী সারি-সারি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আর তার উপর দিয়া ধূমাচ্ছন্ন নীলাকাশ আরও অনেক দূরে গিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রেণু অপলক নেত্রে সেই সীমাহীন দিগন্তের ছবি দেখিতে লাগিল।

ননী বারান্দা দিয়া যাইতে-যাইতে দিদির হাতে চিঠি দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। "দিদি! কোথা থেকে চিঠি এল রে? বাবা লিখেছেন বুঝি?" রেণু কথা কহিল না। ননী আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিল—"দেখেছ, পিসীমার চিঠি খুলেছিস্!" "খুলেছি, বেশ করেছি, তোর কি?" ননী সুযোগ মত রেণুর হাত হইতে ঝাঁ করিয়া চিঠিখানি কাড়িয়া লইয়া, ছুটিতে-ছুটিতে বলিল,—"পিসীমাকে বলে এইবার মজা দেখাচ্ছি।" রেণু ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্থির ভাবে সেইখানে বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। পিসীমা জুনুকে কোলে করিয়া ঘুরিতে-ঘুরিতে রেণুর সম্মুখে আসিয়া কহিলেন,—"এই যে, আমি সারা-বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। বলি, জুনুকে একবার কোলে নিলে ক্ষতি ছিল কি? কেঁদে-কেঁদে আমায় অস্থির করে তুলেছে।"

"আমার ঢের কাজ আছে। ছেলে না রাখতে পার, ঝির কাছে দিয়ে দাওগে।" "শুনলে কথাগুলো! বলি, কাজের মধ্যে ত দেখতে পাচ্ছি, এই অন্ধকারে হাঁ করে বসে রয়েছেন।" "তা বেশ! আমি কাউকে রাখতে পারব না।" পিসীমা বলিতে-বলিতে গেলেন,—"অহঙ্কার আর গায়ে ধরে না! বিয়ে ত আর কোনদিন কারো হয় না! তোরই আজ নূতন হ'তে চলেছে—" ইত্যাদি।

রেণু উঠিয়া ঘরের মধ্যে দ্রুত পায়চারি করিতে লাগিল। ঘরের একপাশে ননীর একখানা শ্লেট ছিল,—পায়ে লাগিয়া তাহা খণ্ড-খণ্ড হইয়া গেল। খানিক ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া রেণু আবার বসিয়া পড়িল। তারপর হঠাৎ আলো জ্বালিয়া চাবি লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী একটী ট্রাঙ্ক খুলিতে আরম্ভ করিল। এ বাক্সটী রেণুর নিজের। বাক্সের একধারে কতকগুলি পুরান চিঠি-পত্র ছিল। রেণু নাড়িয়া-চাড়িয়া কতকগুলি পড়িল, আর কতকগুলি দেখিয়া রাখিয়া দিল।

একখানি খামের উপর রেণুর মায়ের নাম লেখা ছিল।

রেণু সেখানি হাতে তুলিয়া পড়িতে সুরু করিল। গিরিডি হইতে চলিয়া আসার পর, এ চিঠি-খানি সুশীলবাবু রেণুর মায়ের নিকট লিখিয়াছিলেন। রেণু দুই-এক লাইন পড়িয়াই পত্রখানা টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসিল।

বাক্সের আর একদিকে একখানি সবুজরঙের সুন্দর বাঁধান খাতা ছিল। এখানিতে রেণু, বাড়ীতে বসিয়া, বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী অনুবাদ লিখিয়া রাখিত। মাষ্টার মহাশয় সুবিধা-মত সংশোধন করিয়া দিতেন। খাতার বহু পৃষ্ঠার বহুস্থানে রামলালের হাতের লেখা বিদ্যমান রহিয়াছে। রেণু বহুক্ষণ ধরিয়া সেই খাতাখানি পরীক্ষা করিল। তারপর সেখানি সযত্নে একপাশে রাখিয়া দিয়া, অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

সকলের নীচের থাকে কয়েকখানি কাপড়ের মধ্যে একখানি ফটো ছিল। এখানি রেণুর মায়ের। রেণু আবেগ-ভরে সেখানি তুলিয়া লইয়া খাটের উপর গিয়া বসিল। মাঝে-মাঝে অবকাশ পাইলে, সে প্রায়ই এখানি খুলিয়া দেখিত। অথচ আজ যেন কেন তাহার মনে হইতে লাগিল, বহুদিন সে তাহার মায়ের ফটোখানি দেখে নাই! রেণুর দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এ তাহারি মা। ইহারই কোলে-পিঠে উঠিয়া রেণু বড় হইয়াছে। শোকে-দুঃখে ইহারই বুকে মুখ লুকাইয়া, সে কতদিন কত জ্বালা ভুলিয়া গিয়াছে। সেই মা আজ রেণুর এত কাছে,—অথচ এত দূরে। রেণু অশ্রুপূর্ণ লোচনে ফটোখানি বুকে করিয়া সেইখানে শুইয়া রহিল।

খানিক রাত্রে জেঠাইমা আসিয়া ডাকিলেন,—"রেণু খাবি চল।" রেণু উদাস ভাবে উত্তর করিল,—"না—আজ আর কিছু খাব না, মাথা ধরেছে।" "কিছু খাবিনে?" "না!" জেঠাইমা চলিয়া গেলেন। মিনিট-কয়েক পরে রেণু রান্না-ঘরে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"কই, কি খাবার আছে দেখি।"

জেঠাইমা ভাত আনিয়া রেণুর সম্মুখে রাখিলেন। রেণু নামমাত্র মুখে দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। তার পর কাজ-কর্ম্ম সমাপনান্তে জেঠাইমা অনেক রাত্রে গিয়া দেখিলেন, রেণু খোলা ছাদে, খালি গায়ে, একরাশ চুল চারিদিকে বিপর্য্যস্ত করে ছড়াইয়া দিয়া ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

(১০)

পরদিন সকালে রেণু পড়িতে আসিল না। মাষ্টার অনেক ক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ননী, তোমার দিদি আজ পড়তে এল না যে!" "হাঁ, সে বুঝি আবার পড়বে! এই ২১শে তারিখে তার বিয়ে;—সে এখন সেই ভাবনাই ভাবছে।" "২১শে তারিখে?" "হ্যাঁ, এই আসছে বুধবারের পরের বুধবার। বাবা গিরিডি থেকে তাই লিখে পাঠিয়েছেন। আচ্ছা মাষ্টার মশায়! এখন কি পড়ব?" "সংস্কৃত!" "বেশ ত! সংস্কৃত বুঝি আমি পড়ি! ও ত দিদি পড়ে থাকে।" "তা হ'লে যা হোক একটা নিজে-নিজে পড়। আমার আজ কলেজে একটু বেশী কাজ আছে।" মাষ্টার একখানি খাতা খুলিয়া একদৃষ্টে দরজার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার সময়ও রেণু আসিল না। ননী এক কাপ্ চা লইয়া আসিয়া বলিল, "এই নিন্।" মাষ্টার মহাশয় বিমর্ষ মুখে বলিলেন,—"থাক! আজ আর চা খাব না।" "খাবেন না?" "না!"

রেণু প্রতিদিন খাইবার সময় মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া লইয়া যাইত; আজ দুই দিন হইতে সে আর আসে নাই। মাষ্টার সে রাত্রে যৎসামান্য আহার করিয়া, নীরবে চলিয়া আসিলেন। পরদিন রাত্রিতেও রেণু আসিল না। মাষ্টার খাইতে বসিয়া কেবলই ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রেণু প্রত্যহ দরজার কাছে বসিয়া থাকিত; আজ যেন সে দিকটা অত্যন্ত শূন্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। খাইতে-খাইতে একবার হঠাৎ চাবির শব্দে চমকিত হইয়া, মাষ্টার মুখ তুলিয়া দেখিলেন, ননী একগোছা চাবি হাতে করিয়া পাশ দিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। মাষ্টার দীর্ঘনিঃশ্বাস-ত্যাগ করিয়া আবার ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। জেঠাইমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, এ কয়দিন যে তোমার পাতে সবই পড়ে থাকছে!" মাষ্টার উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ কয় দিন থেকে শরীরটা ভাল নেই।"

মাষ্টার অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে খাইয়া, ফিরিয়া আসিতে-ছিলেন, হঠাৎ দেখিলেন, সম্মুখে রেণু। ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রেণু, তুমি কি আর পড়বে না?" "জানিনে!" বলিয়া রেণু সহসা বিদ্যুতের মত সেই অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

কর্ত্তা ফিরিয়া আসিয়া কন্যার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন,—"মা, এই বার আমার কাজ ফুরিয়ে এল। এত দিন তোকে স্নেহ-যত্নে মানুষ করেছি; আর ক'দিন পরে তুই যে চিরদিনের জন্য পর হয়ে যাবি।"

রেণু পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। "সব বুঝি মা, সব বুঝি! আজ এ আনন্দের দিনেও যে শুধু একটা অভাব সমস্ত আয়োজনকে মলিন করে দিচ্ছে! কিন্তু সে থাকত ত দেখত, তার মেয়ে আজ কার হাতে যেতে চলেছে। আহ্, আহ্!"

আর বিবাহের মাত্র দশটা দিন মধ্যে আছে। মাষ্টার কয়দিন হইতে নিজের বইগুলি পরীক্ষা করিতেছিলেন। সামান্য কয়েকখানি বই,—কিন্তু মাষ্টার তাহাই তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া, তাহার মধ্য হইতে যেন কি বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। দুইখানি অঙ্কের বই খুব দামী ছিল। এই দুইখানি মাষ্টার অনেক কষ্টে চাহিয়া-চিন্তিয়া জোগাড় করিয়াছিলেন। মাষ্টার খানিক ভাবিয়া এই দুইখানি লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। সে স্থানে সমস্ত পুরান বইয়ের দোকানে যাচাই করিয়াও, বই দুইখানির দাম উঠিল মাত্র পাঁচ টাকা। রামলাল অগত্যা তাহাতেই বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইল।

টাকা পাঁচটা হাতে পাইয়া মাষ্টার কিন্তু এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিলেন। কাছেই একখানা কাপড়ের দোকান ছিল। মাষ্টার সেখান হইতে অনেক বাছিয়া একখানি সাড়ী কিনিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

নিস্তব্ধ রাত্রে সকলে ঘুমাইলে, রামলাল কাপড়খানি বাহির করিয়া তাহার উপর একখানি কাগজ দিয়া মুড়িয়া ধীরে-ধীরে লিখিলেন,—"রেণুর বিবাহে প্রীতি-উপহার।" লেখা শেষ হইলে মাষ্টার অনেক ক্ষণ ধরিয়া তাহা পরীক্ষা করিলেন। তার পর কি মনে করিয়া সেই লিখিত কাগজখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে আর একখানি কাগজ লাগাইয়া, পুনরায় লিখিলেন,—"রেণুর জন্য।" অবশেষে সেখানিও ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া, কাপড়খানিকে বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া, মাষ্টার নিজের বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িলেন।

সকালে উঠিয়া মাষ্টার আবার কাপড়খানি বাহির করিয়া ভাবিতে বসিলেন। ননী চা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল,—মাষ্টার ডাকিলেন, "ননী!" ননী পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"কি মাষ্টার মশায়!" "না, কিছু না। বলছিলাম, আজ পড়বে না?" "না, আজ যে রবিবার, আজ আবার পড়ব বুঝি!"

দ্বিপ্রহরে মাষ্টার কাপড়খানি বগলে করিয়া, চুপি-চুপি চোরের মতন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জেঠাইমা তখন সবেমাত্র খাইতে বসিয়াছিলেন। মাষ্টার মহাশয় আসিয়া নীরবে তাঁহার নিকটে দাঁড়াইলেন। জেঠাইমা মুখ তুলিয়া চাহিতেই, মাষ্টার যেন কি একটা কথা বলিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। তাহার মুখ দিয়া কিন্তু কোন কথাই ফুটিল না। অত্যন্ত লজ্জিত ও অপ্রতিভ মুখে মাষ্টার ফিরিয়া আসিলেন।

মিনিট কয়েক পরে ঝি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মাষ্টার মশাই, জেঠাইমা বলে পাঠিয়েছেন, আপনার কি তাঁকে কিছু বলবার আছে?" "হাঁ—না, বিশেষ কিছুই না।" ঝি বিস্মিত হইয়া প্রস্থান করিল।

(১১)

পশ্চিম আকাশে সোণালী রং ছড়াইয়া সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছিলেন। রেণু ছাদের উপর উঠিয়া একদৃষ্টে প্রকৃতির এই মহান্ সৌন্দর্য্যময় ছবি দেখিতেছিল। সে কি সুন্দর! ছোট-ছোট মেঘগুলি সূর্য্যের কিরণে রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। আর তার নিম্ন দিয়া কত রকমের পাখীর দল সারি দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। আরও নিম্নে দিগন্ত-বিস্তৃত শ্রেণীবদ্ধ অসংখ্য ছাদ কত অজ্ঞাত হাসি-কান্না বুকে করিয়া আসন্ন সন্ধ্যার এই রঙীন আলো ও ধূসর ছায়ার উপর দিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে। এই অসীম ব্যাকুলতা, এই নীরব সৌন্দর্য্য, এই হাসি ও অশ্রু, কে জানে কবে কোথায় গিয়া শেষ হইবে।

"এই যে, তুই যে শেষকালে কবি হয়ে গেলি, দেখতে পাচ্ছি!" দুইখানি কোমল হস্ত-স্পর্শে রেণু চমকিত হইয়া, ফিরিয়া চাহিয়া বলিল,—"কে, রাণী?" "যাই হোক, ভাগ্যি চিন্‌তে পারলি। আর ক'দিন পরে বোধ হয় তাও পারবি নে।" "তা ভাই, আজ স্কুলে গিয়েছিলে?" "রবিবার দিন যে স্কুল হয় না, তা বুঝি এই কয়দিন স্কুলে না গিয়েই ভুলে যাওয়া হয়েছে?" "সত্যিই ত, আজ যে রবিবার!"

"এ খবরটা আমার চাইতেও তোর ভাল জানা উচিত ছিল ; কারণ, তুই ত আজকাল দিন গুণছিস্!" রেণু পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিল,—"চল, ঐ জায়গাটায় গিয়ে বসি।" "চল, যে জায়গায় হুজুরের হুকুম।"

উপবেশনান্তে রেণু বলিল,—"তার পর, নূতন খবর কি শুনি ?"

"নূতন খবর হচ্ছে এই যে, আগামী ২১শে বৈশাখ বুধবার আমাদের ক্লাসের কুমারী রেণুপ্রভা চট্টোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার—" রেণু একরাশ চুলের দ্বারা রাণীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—"যাও! এই বুঝি নূতন খবর!"

"তা হ'লে খবরটা যখন পুরানোই হ'ল, তখন কিছু মিষ্টিমুখ করিয়ে দেওয়াই ত যুক্তিসঙ্গত। শাস্ত্রেই বলেছে—মিষ্টান্নং ইতরে জনাঃ। তার উপর, তুই যখন আবার হাকিমের উপর হাকিমগিরি করতে চ'লেছিস!" রেণু বাধা দিয়া বলিল,—"আচ্ছা, তুমি বস, আমি আস্‌ছি।"

একখানা থালাতে করিয়া কিছু মিষ্টান্ন ও এক গ্লাস জল লইয়া রেণু ফিরিয়া আসিল।

"এই যে, বলতে না বলতেই তুই সব নিয়ে হাজির হয়েছিস্। তা বেশ! ওতে আমার কিছু-মাত্র অরুচি নেই। কিন্তু বলে রাখছি, এর পর থেকে শুধু সন্দেশে কুলোবে না,—কালিয়া-পোলাওয়ের দরকার হবে।"

রাণী খাইতে খাইতে বলিল,—"আর একদিনের কথা মনে পড়ে? সেদিনও ঠিক এমনি করে তুই আমার পাশে খোলা ছাদে বসেছিলি। কোথায় বল দেখি?" "কই, ঠিক মনে পড়ছে না ত!"

"গেলবার পুরীতে। পুরীর সেই মুখর সমুদ্র, আর নীরব বালুসৈকতের দিক চেয়ে-চেয়ে তুই সুশীলবাবুর সম্বন্ধে কত কথাই আমার কাণে-কাণে বলেছিলি! আমি কিন্তু তোর হাত দেখে ঠিক ধরে ফেলেছিলাম, তোর কপালে 'লাভ ম্যাচ' আছে। দেখ দেখি, শেষ পর্য্যন্ত আমার কথাই সত্যি হল কি না!"

রেণু মুখ ফিরাইয়া দূর সান্ধ্য আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। "কি দেখছিস?" "নক্ষত্র।" "নক্ষত্র! তোর দৃষ্টিও যে আজকাল বেড়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছি! এর পর শুধু নক্ষত্র কেন, নক্ষত্র, জ্যোৎস্না, মলয় সমীরণ, কোকিলের কুহুরব, সব একসঙ্গে দেখতে আরম্ভ করবি।"

"আচ্ছা, এই নক্ষত্রগুলো কতদূরে আছে বলতে পারিস?" "না ভাই, তোর তাঁকে বলিস্, মেপে ঠিক করে দেবেন!" "ক্লাশে মাষ্টার মহাশয়েরা কিন্তু বলতেন, ও অনেক দূরে। আচ্ছা, এই নক্ষত্রগুলো কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে?" "তুই বই লেখ, বই লেখ! এখন ত আর ছাপানর জন্য চিন্তা করতে হবে না!" "যাও!" "বাঃ, ঠিক কথাই মনে করিয়ে দিয়েছিস ত। সত্যি ভাই, রাত্রি হয়ে যাচ্ছে। তা শোন, কাল বৈকালে গাড়ী পাঠিয়ে দেব। তাতে উঠে একবার দয়া করে এ অধীনের কুটীরে পদার্পণ করলে—" "লক্ষ্মীটী! এ যাত্রায় মাপ কর ভাই—" "উঁহু! তোমার তিনি যদি গলায় বস্ত্র দিয়ে স্বয়ং এসে মাপ চাইতে পারেন, তবে অন্য যাত্রায় বরং দেখা যাবে।"

রেণু নত-মুখে বসিয়া রহিল। "উঠি তা হ'লে? ঠিক মনে থাকে যেন!" "আচ্ছা!" "গুড্‌নাইট্!" "গুড্‌নাইট্!"

পূর্ব্বদিক দিয়া চাঁদ উঠিতেছিল। কত যুগযুগান্ত ধরিয়া কতদিন ত সে এমনি করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবু যেন কেন রেণু চেষ্টা করিয়াও সেদিক হইতে আজ আর চোখ ফিরাইতে পারিতেছিল না। সে যেন আজ মায়ের মত আপনার, স্নেহের মতন করুণ, অশ্রুর মত পবিত্র! রেণু উদাস নয়নে চাহিয়া রহিল!

(১২)

সোমবার কলেজে না গিয়া মাষ্টার সারাদিন আনমনে বিছানায় শুইয়া রহিলেন। সম্মুখের দরজা দিয়া কত লোক যাইয়া-আসিয়া আবার চলিয়া গেল। দিন-শেষে মাষ্টার মহাশয় উঠিয়া দেখিলেন টেবিলের পুস্তকগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। কতদিন হইতে কেহ আর উহাদিগকে গোছাইতে আসে নাই। অন্যমনস্ক ভাবে মাষ্টার একখানি খাতা টানিয়া লইলেন। উল্টাইতে-উল্টাইতে উহার মধ্য হইতে একখানা রসিদ বাহির হইয়া পড়িল। এখানি সেই রসিদ! ইহার জন্য পিসীমা একদিন তাহাকে কত বকিয়াছিলেন। সেই অতীত দিনের কথা আজ কত ভাবে আসিয়া তাহার মনের মধ্যে জাগিতে লাগিল।

খাতাখানি রাখিয়া দিয়া, হঠাৎ মাষ্টার তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাক্সটী খুলিয়া ফেলিলেন। তার পর কাপড়খানি আবার বাহির করিয়া কি মনে করিয়া ডাকিতে লাগিলেন,—"রুণী,

ননী!" খানিক বাদে ননী ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"কি, বলছেন?"

"না, কিছু না; হাঁ, বল্‌ছিলাম, তোমার দিদিকে একবার ডেকে দিতে পার?" "আচ্ছা দিচ্ছি।"

রাণীদের বাড়ী হইতে গাড়ী আসিয়াছিল। রেণু সাজিয়া গুজিয়া কেবল বাহির হইতেছে, এমন সময় ননী আসিয়া বলিল—"দিদি, মাষ্টার মশায় একবার তোকে ডাকছেন!" রেণুর মুখ সহসা ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। তাহার পা আর উঠিল না। ফিরিয়া আসিয়া জেঠাইমার কাছে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"না জেঠাইমা, আমি যাব না!" "যাবিনে, সে কি! তারা কাল এত করে বলে গেল!" "না!" "তুই দিন-দিন কি হয়ে যাচ্ছিস বল দেখি?" রেণু মুখ নত করিয়া রহিল। তার পর, খানিক পরে নিজে-নিজেই কি মনে করিয়া উঠিয়া, আবার ধীরে-ধীরে বাহিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মাষ্টার কাপড়খানি হাতে করিয়া বসিয়া ছিলেন। রেণুকে সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়াই, কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন,—"রেণু!" রেণু উত্তর না দিয়া ক্ষিপ্র গতিতে দৌড়াইয়া গিয়া একেবারে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ দেখা গেল, মাষ্টার জানালা দিয়া চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে গাড়ীখানা অদৃশ্য হইলে, মাষ্টার উঠিয়া গম্ভীর মুখে কাপড়খানি বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া, বিছানায় গিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরে ননী আসিয়া ডাকিল—"মাষ্টার মশায়, বেড়াতে যাবেন না?" "না!" "একদম বেরোবেন না?" "না।"

খাইবার সময় ননী আসিয়া যথারীতি ডাকিয়া গেল। মাষ্টার বলিলেন—"থাক! আজ আর কিছু খাব না,—শরীরটা ভাল নেই।" ননী আর কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গেল। বহুকাল পূর্ব্বের একদিনের কথা রামলালের মনে পড়িল। সেদিনও তিনি অসুখের ভাণ করিয়া পড়িয়া ছিলেন; রেণু কিন্তু তাঁহাকে না খাওয়াইয়া ছাড়ে নাই। ঠন্ ঠন্ ঠন্! রামলাল শুনিতে লাগিলেন, পাশের বাড়ীর ঘড়ীতে বারটা বাজিয়া গেল।

শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রার মতন আসিয়াছিল। হঠাৎ কি একটা শব্দে রামলাল জাগিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কে, রেণু?" একটা বিড়াল ঘরে ঢুকিয়াছিল,—রামলালের শব্দ পাইয়া সে চলিয়া গেল। খোলা জানালা দিয়া হুহু শব্দে বাতাস আসিয়া গায়ে লাগিতেছিল। রামলালের অত্যন্ত শীত করিতে লাগিল। আলো জ্বালিয়া একখানি গাত্রবস্ত্রের জন্য অনেক খুঁজিলেন; না পাইয়া, অবশেষে নিজের কাপড়ের এক অংশ খুলিয়া গায়ে দিয়া, রামলাল পুনরায় শয্যাগ্রহণ করিলেন।

সকালবেলায় রামলালের রীতিমত জ্বর হইল। ননী একবার খোঁজ করিয়া গেল, মাষ্টার মহাশয় কি খাবেন। রামলাল বলিয়া দিলেন, কিছুই খাবেন না। বেলা দশটার সময় জেঠাইমা আসিয়া দরজার কাছ হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, এবেলা তুমি কিছুই খাবে না?" "আজ্ঞে না, জ্বরের মধ্যে আমার খাওয়া অভ্যেস নেই।" মা নয়, বোন নয় যে, পুনঃ পুনঃ আসিয়া অনুরোধ করিবে। সে দিন আর কেহই মাষ্টার মহাশয়কে পথ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিল না।

(১৩)

দুইদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া রেণু রাত্রিতে খাইতে বসিয়াছিল। ননী কাছে দাঁড়াইয়া বলিল,—"দিদির এত বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়েও বুঝি সখ মিটল না,—আবার খেতে বসেছিস্!" "যা এখান থেকে! পড়াশুনো বুঝি চুলোয় গিয়েছে!" "হাঁ, পড়ব আবার কি,—মাষ্টার মশায় রয়েছেন জ্বরে পড়ে!" "জ্বর, জ্বর! কে বল্লে জ্বর!" "বল্‌বে আর কে? জ্বর হয়েছে, পড়ে আছেন।" রেণু খানিক স্থির নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কথা আমাকে বলিস্ নি কেন?"

"তোর সইয়ের বাড়ী গিয়ে ত আর বলে আসতে পারিনে!" "আজ কি খেয়েছেন?" "আজ, কাল, পরশু কিছুই খান নি।" "আজ, কাল, পরশু!" "হাঁ, আমরা কত সাধলাম।" রেণুর হাত হইতে ভাতের গ্রাস পড়িয়া গেল। খানিক অধোমুখে বসিয়া থাকিয়া তারপর উঠিয়া গিয়া যতদূর সম্ভব সত্বর একবাটি দুধ গরম করিয়া রেণু মাষ্টারের ঘরের কাছে আসিল। বহু দিন পরে সে আবার সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

মাষ্টার মহাশয় পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিলেন,—রেণু ডাকিল—"মাষ্টার মশায়!" চমকিত হইয়া মাষ্টার চাহিয়া দেখিলেন। তাহার যেন কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছিল না। কিছুক্ষণ এক-

কষ্ঠে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন,—"রেণু! তুমি!" "হ্যাঁ, আপনি এই দুধটুকু খান!" "না, থাক।" "খান! খাবেন না কেন? কি হয়েছে আপনার? এ কয় দিন আপনি কিছু খান নি কেন?" "কই, তা ত তুমি এর আগে জিজ্ঞাসা কর নি।" রেণু অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দুধের বাটিতে ফুঁ দিতে লাগিল।

"নিন্! এইবার খেয়ে ফেলুন।" "আচ্ছা দাও! আর হয় ত কোন দিন, দরকার হবে না—" "যান! আপনি ও-সব কি বলছেন!"

পরদিন সকালে রেণু কর্ত্তার কাছে গিয়া বলিল,—"বাবা, মাষ্টার মহাশয়ের জ্বর হয়েছে, একজন ডাক্তার এনে দেখাও!" পিসীমা কট্‌মট্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ডাক্তার না লাট্ এনে দেখাবে! মাষ্টারের জন্য আবার ডাক্তার! টাকাগুলো শুধু-শুধু জলে ফেলে দেওয়া!"

"ঠিক বলেছ আদু! একেবারে জলে ফেলে দেওয়া! কারো কিছু লেখাপড়া হবে না,—কিছু না! কেবল দেষ্টের ভোগ। নিরর্থক টাকাগুলো নষ্ট করা,—বুঝলে দিদি, কেবল ভস্মে ঘি ঢালা!"

কর্ত্তা হাতের খবরের কাগজটা একপাশে নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া গেলেন; এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে স্থানীয় কেদার ডাক্তারকে আনিয়া হাজির করিলেন।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—জ্বরের মধ্যে খালি-গায়ে থাকিয়া ঠাণ্ডা লাগানর দরুণ মাষ্টার মহাশয়ের নিমোনিয়া হইয়াছে। এরূপ খালি-গায়ে আরও কিছুকাল থাকলে, জীবনের কোন আশাই থাকিবে না। অতএব একটা গরম পোষাকের আগে ব্যবস্থা করা দরকার।

রেণু উপর হইতে একসুট্ গরম পোষাক আনিয়া, মাষ্টারের সম্মুখে ধরিয়া বলিল,—"এই নিন্, এই গরম জামাটা পরুন।" মাষ্টার মহাশয় আঙ্গুল গণিয়া বলিলেন,—"রেণু! প্রায় একবৎসর হ'তে চল্‌ল, তোমাদের এখানে আছি। এতদিন যখন চলে গেছে, তখন আর যে কয়টা দিন বাঁচি, কোন গতিকে চলে যাবে!" রেণুর মুখে একটা বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল! তাড়াতাড়ি চোখে আঁচল দিয়া বলিল,—"আপনি আজ কেবলি এরূপ বলছেন কেন? অসুখ করেছে, সেরে যাবে। অসুখ কি আর কারো করে না।"

মাষ্টার একটী গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

"জেঠাইমা!" "কি মা!" রেণু চুপ করিয়া রহিল। "কি বল্‌ছিলি রেণু?" "জেঠাইমা, তুমি মাষ্টার মশায়ের জন্য কলকেতা থেকে একজন ভাল ডাক্তার আনিয়ে দাও।" "আমি! আমি কি করে ডাক্তার আনব!" "না, তোমার পায়ে পড়ি জেঠাইমা, এনে দাও!" "আমার হাতে কি কিছু আছে মা, যে, আজ তাই দিয়ে—" রেণু নিজের গলা হইতে হার খুলিয়া জেঠাইমার পায়ের কাছে রাখিয়া বলিল,—"জেঠাইমা! তুমি এইটা কোথাও বাঁধা রেখে, ডাক্তার এনে দাও—" "ছি মা! এ কথা বলতে নেই! তোমার বাবার কাছে বল, তিনিই নিয়ে আসবেন।" "না! তুমি তাঁর কাছে বল!" "আচ্ছা, আমিই বলব এখন।"

কলিকাতা হইতে বড় ডাক্তার আসিয়া নূতন প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখিয়া দিলেন; আর বলিয়া গেলেন, রোগীর হার্ট খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, সামান্য উত্তেজনাতেই হয় ত প্রাণ-বিয়োগ ঘটিতে পারে।

শনিবার দ্বিপ্রহরে রেণু রোগীর নিকট বসিয়া ছিল; এমন সময় ননী সংবাদ দিয়া গেল—ডাক্তারবাবু আসিতেছেন। রেণু উঠিয়া গিয়া একপাশে দাঁড়াইল। ডাক্তার সাহেব কিছুকাল পরীক্ষা করিয়া, অপ্রসন্ন মুখে বাহির হইয়া আসিলেন। রেণু শঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কিরূপ দেখলেন, ডাক্তারবাবু?" "ভাল না, একেবারে হোপলেস্!" রেণু রাস্তা পর্য্যন্ত গিয়া বলিল—"ডাক্তারবাবু, আপনাকে আরও অনেক ক'রে টাকা দেব,—আপনি ভাল ওষুধ দিয়ে একে বাঁচিয়ে দিন।" "আমি কি কিছু চেষ্টার ত্রুটি করেছি মা! নিয়তির উপর ত কারো হাত নাই!" ডাক্তার আর বিলম্ব না করিয়া মোটরে উঠিয়া বসিলেন।

"দিদি, ডাক্তারবাবু কি বল্লেন?" "কিছু না,—যা এখান থেকে!" রেণু ধীরে-ধীরে আবার মাষ্টার মহাশয়ের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুকাল পরে মাষ্টার চক্ষু মেলিয়া ডাকিলেন—"রেণু!" "বলুন।" "ঐখানে আমার বাক্সের চাবিটা আছে, দাও ত!" রেণু চাবি লইয়া আসিল। মাষ্টার মহাশয় হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলেন; কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বল হস্ত হইতে চাবিটী মাটীতে পড়িয়া গেল!

"আচ্ছা, তুমিই খোল!"

বাক্‌স খোলা হইলে, মাষ্টার বলিলেন,—"ঐ যে,—

উপরেই রয়েছে। ঐ দুটো জিনিস দাও ত!" রেণু কথিত জিনিস দুটী বাহির করিয়া মাষ্টার মহাশয়ের কাছে রাখিল। মাষ্টার উহার মধ্যে একটী লইয়া বলিলেন,—"রেণু! এখানি তোমার সেই ফটো। তুমি একদিন জিজ্ঞাসা কোর্‌লে আমি মিথ্যা কথা বলেছিলাম। এ অনেকদিন আগেই সারা হয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে ছিল—থাক, আজ এখানি তোমায় ফেরৎ দিলাম।" "ছাই ফটো! আপনি এখন চুপ ক'রে বিশ্রাম করুন!" "খুবই ছাই হয়েছে, না! থাক, এর পর সুশীলবাবু ভাল ক'রে বাঁধিয়ে এনে দেবেন!"

রেণুর মুখ সহসা এতটুকু হইয়া গেল। সে প্রস্তরবৎ স্থির হইয়া সেইখানে বসিয়া রহিল। মাষ্টার মহাশয় খানিক থামিয়া আবার বলিলেন,—

"রেণু সেদিন আমি কত ডাকলাম, তুমি চলে গেলে! তোমার জন্য এই কাপড়খানা কিনেছিলাম। এ জীবনে আর হয় ত এখানি দেওয়ার অবকাশ হবে না—" রেণু কাপড়খানি লইয়া দূরে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, "যান! আপনি ফের ঐ সব ব'লছেন। আমি কি করেছি আপনার।"

মাষ্টার মহাশয় একদৃষ্টে মেজের উপর নিক্ষিপ্ত কাপড়খানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তার পর অকস্মাৎ তাঁহার মুখ গভীর অন্ধকারে ছাইয়া গেল। একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

রেণু তাড়াতাড়ি একটী ঝিনুকে করিয়া কিছু বেদানার রস লইয়া, মাষ্টার মহাশয়ের মুখের কাছে ধরিল। মাষ্টার হাত উঠাইয়া জড়িত স্বরে কহিলেন,—"থাক! সুশীলবাবু ভাল কাপড় কিনে দেবেন,—আমার যে পয়সা নেই রেণু!"

রেণুর হাত হইতে ঝিনুক পড়িয়া গেল। সে আর সামলাইতে পারিল না। মাষ্টার মহাশয়ের পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল,—"শেষ কালে আপনিও আমার প্রতি এই অবিচার ক'র্‌লেন,—শেষে আমায় ভুল বুঝে গেলেন। ওগো ফের! শোন! জেনে যাও,—আজ তোমার চাইতে বড় এ জগতে আমার আর কেহই নেই!—"

মাষ্টার মহাশয় আর ফিরিয়া চাহিলেন না। তাঁহার মুখের সে নিষ্প্রভ ভাব আর কাটিল না। এ জীবনের ভুল লইয়াই তিনি রেণুর সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া গেলেন।

অশ্রু

[মহারাজকুমার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়]

(১)

দূরে তুমি চ'লে যেও না—
ওগো তুমি এস মোর কাছে।
মুক্তার মত দুটি ফোঁটা—
নয়নে লুকান মোর আছে॥

(২)

বুকের মাঝারে মোর জ্বলে
দহনের দ্যুতিমান শিখা।
দেখিবে তাহারি মাঝে আছে
নিখিলের আবেদন লিখা॥

(৩)

জননীর মত স্নেহ দানে
পালন করি গো নিশিদিন।
ব্যথাতুর কত দীন হিয়া:
শোকের আঘাতে সদা ক্ষীণ

(৪)

শোণিতের মত রাঙ্গা-বাসে
লুকায়ে রেখেছি কত বাণী।
রজনীর অঞ্চল-ছায়ে
যুগলের কত কাণাকাণি॥

(৫)

নীরবে নিরালা শুনি হায়
বিবাহের নহবৎ মাঝে।
গুঞ্জরি উঠি ক্ষীণ তানে
বিরহের কি বারতা বাজে॥

(৬)

মধু-মাসে ধরণীর হিয়া
মুঞ্জরে যবে নব গানে।
নির্জ্জনে ব্যথা জাগে সুধু
বঁধুহীন বিরহীর প্রাণে॥

(৭)

সেই ক্ষণে আমি নামি হায়
বারিহীন হিয়া-মরু মাঝে।
কল্যাণ নির্ঝরে মোর
দেবতার দয়া সবে যাচে॥

(৮)

আমি সুধু ক্ষণিকের লাগি
আসি নাই ধরণীর পরে।
আকাশের রামধনু যথা
নিমেষের শত শোভা ধরে॥

(৯)

আমি নহি দিবসের হায়
অপরূপ কাঞ্চন-ছটা।
শরতের রাকা নিশীথিনী
বরষার শ্যাম-ঘন-ঘটা॥

(১০)

শিশিরের জলকণা নহি
শীত-সাঁঝে তৃণ-দল-কোলে।
জন্মি না মধু-মাসে সুধু
পাপিয়ার গীত-কলরোলে॥

(১১)

আদি যুগ হ'তে আমি আছি
নিখিলের সব সুখে দুখে।
বিকশিয়া উঠি শত রূপে
সব দেশে, সব কবি মুখে॥

(১২)

আমি আছি বাসরের রাতে
নতমুখী নববধূ-চোখে।
শ্মশানের ঘাটে আমি জাগি
যেথা চলে নিখিলের লোকে॥

(১৩)

জনমের উৎসবে আমি
জেগে থাকি জননীর বুকে॥
আলোহীন মরণের গেহে
মূক থাকি ভাষাহীন দুখে॥

(১৪)

ওগো তুমি চ'লে যেও না—
মালাখানি দাও মোর গলে।
নিশিদিন জেগে আছি আমি
তোমার ওই হৃদয়ের তলে॥

বিবিধ-প্রসঙ্গ

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা।

[রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি-এ]

আমরা অনেক সময়ে সভা-সমিতি করিয়া কোন একটা জিনিসের প্রতি আমাদের মৌখিক ভক্তি দেখাইয়া থাকি। বঙ্গদেশে বাগ্মীর সংখ্যা যত বেশী, কর্ম্মীর সংখ্যা যদি তাহার সিকিও থাকিত – তবে দেশের প্রকৃত উন্নতির পথ দূরবর্ত্তী হইত না।

আমাদের দেশের একটা ইতিহাস আছে:—তাহা শুধু পাঠান আক্রমণের কথা নহে। রাজনৈতিক নানা ঘটনার বাহিরে বাঙ্গলার পল্লী-গ্রামে, এ দেশের লোকের সভ্যতার একটা প্রকৃত ইতিহাস, পুঁথি-পত্র খুঁজিলে পাওয়া যাইবে। সেই অবজ্ঞাত, নষ্টপ্রায় ইতিহাসটি যে দিন আমরা জগতের সমক্ষে দাঁড় করাইতে পারিব, সেই দিন আমরা নিজের জাতির গৌরব করিতে পারিব।

ধরুন, চৈতন্যদেবের কথা। এ দেশে প্রায়ই বৈষ্ণব সম্মিলনীর অধিবেশন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বৎসর বৎসর বহু ব্যয় হইয়া থাকে। সেখানে চৈতন্য-দেবের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা ও ভক্তি-মূলক পূজার অভাব হয় না। এ দেশের ভিখারীরা পর্য্যন্ত রোজ-রোজ প্রাতঃকালে গৃহস্থদিগকে এই বলিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া যায়,—যে ব্যক্তি চৈতন্যের নাম করিবে, সেই বাঙ্গালীর প্রাণ-প্রিয়। এতাদৃশ প্রাণ-প্রিয় বন্ধু পূজনীয় দেবতা, এমন কি ভগবানের অবতার বলিয়া আমরা যাঁহাকে মান্য করিয়া লইয়াছি, তাঁহার সম্বন্ধে আমরা যে আমাদের অতি সাধারণ কর্ত্তব্যগুলি সাধন করিতে পরাঙ্মুখ রহিয়াছি, তাহা কি লজ্জার কথা নয়? সভ্য দেশগুলিতে, তুলনায় অতি নগণ্য ব্যক্তির জন্য যে সকল অনুষ্ঠান করা হয়, আমরা তাহার শতাংশের একাংশও ভগবৎ-প্রতিম পরম আরাধ্য ব্যক্তির জন্য করিতে পারি নাই।

চৈতন্য ১৮ বৎসর পুরীতে ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য-মঙ্গল, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিলে জানা যায় যে, তাঁহার প্রধান ভক্ত রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্র তাঁহার জীবনের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ঘটনা-গুলিও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু পুরী হইতে কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেই, প্রতাপরুদ্র সঙ্গে-সঙ্গে মঙ্গরাজ, হরিচন্দন প্রভৃতি তাঁহার মন্ত্রিগণকে প্রভুর জীবন-সংক্রান্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য নিযুক্ত করিতেন। পুরীরাজের পুস্তকশালার প্রাচীন পুঁথি ও কাগজপত্র খুঁজিলে এখনও সেই সকল তথ্য উদ্ধার করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পুরীতে চৈতন্যদেব তাঁহার উড়িষ্যাবাসী অনুরক্ত ভক্ত প্রধান-প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। সেই সময়ের বহু উড়িষ্যাবাসী কবি তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন;—তাহার কিছু কিছু নমুনা আমরা পাইয়াছি। উড়িয়া কবি সদানন্দ মহাপ্রভুকে "হরিনামমূর্ত্তি" নামে আখ্যাত করিয়াছেন। বাঙ্গালা চরিতাখ্যানসমূহে তাঁহার পুরীতে অবস্থান-কালের বিবরণ অতি অল্পই পাওয়া যায়। চরিতামৃতে রামরায়, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ ও শিখিমাহিতী ও মাধবীর কিছু কিছু উল্লেখ আছে। রাধারায় তাঁহার জগন্নাথ বল্লভ নাটকে লিখিয়াছেন, যে প্রতাপরুদ্র মল্লদিগের যমস্বরূপ, যাহার বিক্রমে পাঠান সম্রাট ভীত,—কি আশ্চর্য্য চৈতন্যদেবের স্পর্শে সেই প্রতাপরুদ্র ভাবে বিগলিত হইয়া কুসুম-কোমল হইয়া পড়েন।" আপনারা সকলেই জানেন, কবি কর্ণপুর তাঁহার চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক প্রতাপরুদ্রের আদেশেই রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এগুলি সংস্কৃত পুস্তক। উড়িয়া শত শত পুঁথিতে যে মহাপ্রভুর জীবন-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উড়িষ্যার গ্রামে-গ্রামে চৈতন্য-দেবের বিগ্রহ পূজিত হইয়া থাকে। সে দেশের কবি ও ঐতিহাসিকগণ যে তাঁহার জীবন-কাহিনীর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অনুমান করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

শুধু অনুমানের হাওয়ার উপর আমরা একটা গল্পের প্রতিষ্ঠা করিতেছি না। কয়েক বৎসর হইল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সত্যপ্রকাশ গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ গাঙ্গুলী মহাশয় প্রায় ৩৫০ বৎসরের প্রাচীন গৌরাঙ্গ বিজয় নামক একখানি প্রাচীন উড়িয়া পুঁথি এক পাণ্ডার নিকট হইতে ১২০ টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। এই পুঁথিখানি ছয় খণ্ডে বিভক্ত ছিল। সুপ্রকাশবাবু এই অমূল্য চরিত-কথাখানি একজন আমেরিকান পর্য্যটকের নিকট ১২০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইয়াছেন। পুঁথিখানি প্রশান্ত মহাসাগর ডিঙ্গাইয়া চলিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি আমার ছেলে স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র ভুবনেশ্বরে গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম, আমেরিকান ও জার্ম্মান পর্য্যটকগণ উড়িয়া পাণ্ডাদের নিকট হইতে বহুসংখ্যক প্রাচীন উড়িয়া পুঁথি অল্পমূল্যে কিনিয়া লইয়া যাইতেছেন।

আমাদের দেশের ইতিহাসের উপকরণ, এমন কি যাঁহার পদধূলির জন্য কোটি কোটি লোক লালায়িত, সেই ভগবান চৈতন্যদেবের জীবনের লুপ্ত কাহিনী আমাদের অবহেলায় হাত-ছাড়া হইয়া যাইতেছে। আমাদের জাতির ঘুম ভাঙ্গে নাই। আমরা শুধু করতাল বাজাইয়া, মৃদঙ্গ ঠুকিয়া ভক্তির তাল রক্ষা করিতেছি মাত্র। যে যাহাকে ভাল-বাসে, সে তাহার অতি সামান্য জিনিষ,—একখানি গামছা কিংবা এক জোড়া পাদুকা পাইলেও, তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। আমরা কি

মানবের আদি জন্মভূমি!! সায়ণ কোথা হইতে যে অন্তরীক্ষের আমদানি করেন, তাহা তিনিই জানেন। 'আদিত্য শব্দের অর্থ যে কেন দিবাকর হইবে, তাহাও সায়ণ বলিতে পারেন।

৩। দয়ানন্দভাষ্যং......দ্যৌঃ প্রকাশমানঃ সূর্য্যঃ বিদ্যুদিব। মে মম পিতা জনিতা নাভিঃ বন্ধনং. অত্র অস্মিন্ জন্মনি বন্ধুঃ ভ্রাতৃবৎ প্রাণঃ। মে মম মাতা মান্যপ্রদা জননী, পৃথিবী ভূমেরিব। মহী মহতী ইয়ং উত্তানয়োঃ উপরিস্থয়োঃ উর্দ্ধংস্থাপিতয়োঃ পৃথিবীসূর্যয়োঃ চম্বোঃ সেনয়োরিব, যোনিঃ গৃহং অন্তঃ মধ্যে অত্র অস্মিন্, পিতা সূর্য্যঃ, দুহিতুঃ উষসঃ গর্ভং কিরণাখ্যং বীর্য্যং আধাৎ সমন্তাৎ দধাতি।

অতি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা। দ্যৌঃ--সূর্য্য, পিতা—সূর্য্য, ইহা দয়ানন্দ কোথায় পাইলেন? নিঘণ্টু কি "চম্বোঃ" পদ দ্যাবপৃথিবীপর্য্যায়ে গ্রহণ করেন নাই? অতএব দ্যাবাপৃথিবী কি প্রকারে পৃথিবী ও সূর্য্য হইয়া গেল? দুহিতা উষা, ছি ছি ছি। গর্ভ--কিরণাখ্য বীর্য্যং, ধন্য ব্যাখ্যা, নাভি বন্ধন, ইহাই বা কে বলিল?

অবশ্য নহো বন্ধনে এই অর্থে কেহ কেহ নহ্ ধাতু হইতে নাভি শব্দ ব্যুৎপাদিত করেন। কিন্তু তাহা সত্য নহে। যে নাভি অর্থ উৎপত্তি বা উৎপত্তি-স্থান বা নাই (navel), উহা রূঢ় শব্দ। আর যাহার অর্থ হাড়িকাঠ, উহা নভধাতুনিষ্পন্ন। ক্ষীরস্বামী অমর টীকায় তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

নভতুভ হিংসায়াং

নভ্ + ইঞ্ = নাভি।

এই নাভি অর্থই হাড়িকাঠ, বধস্থল। যমাহ যজুর্বেদঃ –

অজঃ পুরোনীয়তে নাভিরস্য। ২৩।২৯অ

অজ অর্থাৎ ছাগ অগ্রভাগে তাহার নাভি বা বধস্থান হাড়ি-কাঠের নিকট নীত হইতেছে। ইহার অর্থ টানাটানী করিয়া নহে, বক্কিকা প্রভৃতি করিতে পার, অন্যত্র নহে।

৪। গ্রীফিতানুবাদ......Dyaus is my father my begetter, kin is here. This great Ear is my kin and Mother.

Between the wide-spread world-halves is the birth-place; the father laid the daughter's germ within it.

N. B. World-halves; literally bonds or vessels nto which soma is poured a figurative expression or heaven and earth. The firmament or space etween these two is, as the region of the rain, e womb of all beings. The father is dyaus, the aughter is earth, whose fertility depends upon the erm of rain laid in the firmament.

৫। দত্তজানুবাদ......স্বর্গ আমার পালক ও জনক (পৃথিবীর) নাভি আমার বন্ধু, এবং এই বিস্তীর্ণা পৃথিবী আমার মাতা। উত্তান পাত্র দ্বয়ের মধ্যে যোনি আছে। তথায় পিতা দুহিতার গর্ভ উৎপাদন করেন।

তস্য টিপ্পনী—অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে অন্তরীক্ষ আছে। তথায় পিতা অর্থাৎ দ্যু বা ইন্দ্র দুহিতা পৃথিবীর জন্য বৃষ্টি উৎপাদন করেন।

ধন্য বাঙ্গলা অনুবাদক। কেহ যদি এই বাঙ্গলার বাঙ্গলা বা ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ইহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারেন তাহা হইলে আমি

"তেষাং বহের মুদ্রকং খটকর্পরেণ"।

ফলতঃ এই মন্ত্রের প্রকৃতার্থ ইহাই।—

৬। প্রকৃতার্থবাহিনী......কশ্চিৎ ভারতীয় ঋষি বদতি, দ্যৌঃ আদিস্বর্গঃ ইলাবৃতবর্ষং (ইলা যুগস্য মাতা), মঙ্গ জনপদঃ নঃ অস্মাকং পিতা পিতৃলোকঃ (Father-land) জনিতা জনয়িতা আদিজন্মভূমিঃ অত্র অস্মামেব ভুবি নঃ অস্মাকং পূর্ব্বপিতামহানাং বৈবস্বত মনু দ্যুতানাগ্নি প্রভৃতীনাং নাভিরুৎপত্তি বভূব। ইয়ং অস্মদধ্যুষিতা মহী মহতী পৃথিবী ভারত ভূমিঃ নঃ অস্মাকং ভারতপ্রসূতানাং ঋষীণাং মাতা মাতৃভূমিঃ। অদ্যাপি তত্র ভুবি নঃ অস্মাকং বন্ধুঃ জ্ঞাতিঃদেবগণো বর্ত্ততে। উত্তানয়োঃ অত্যুন্নতয়োঃ চম্বোঃ দ্যাবা পৃথিব্যোঃ আদিস্বর্গ ভারতবর্ষয়োঃ অন্তঃ মধ্যে পিতা দ্যৌরেব যোনি রুৎপত্তিস্থানং; সর্ব্বে মনুষ্যাঃ পশুপক্ষিণশ্চ সর্ব্বাদৌ তত্রৈব প্রসূতাঃ সএব যঃ পিতা দ্যৌঃ দুহিতুঃ কন্যাস্থানীয়ায়াঃ ভুবলোকস্য সমুদ্রস্য দিবঃ ত্রিদিবস্য চ (of Siberia) গর্ভং উপনিবেশং আধাৎ ধারয়তি সম্পাদয়তি স্ম। পূর্ব্বোক্তে তে (দ্যাবাপৃথিব্যৌ দ্যোভারতবর্ষৌ) নবাং নব্যং তন্তুং (মানব বংশং) আ তন্বতে (বিস্তারতঃ) দিবি (in Siberia) সমুদ্রে ভুবর্লোকে (in Terki Parsia and Afganistan ৪।১৫৯ ১ম); একজন ভারতীয় ঋষি বলিতেছেন যে—আদি স্বর্গ দ্যো বা মঙ্গলিয়া আমাদিগের পিতা বা পিতৃভূমি (Father-land). উহাই আমাদিগের আদি জন্মভূমি। আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহ বৈবস্বত, মনু, দ্যুতান (Teuton) ও অগ্নিপ্রভৃতির উৎপত্তি উক্ত স্থোতেই হইয়াছিল। এই বিস্তীর্ণ ভারতভূমি আমাদিগের জন্মভূমি, আমাদিগের বন্ধু বা জ্ঞাতি দেবগণ এখনও স্বর্গে বাস করিতেছেন। ঐ জ্ঞানোন্নত স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে পিতা দ্যো সকলের যোনি বা উৎপত্তি স্থান, ইহাই মানবের আদি-জন্ম-ভূমি। এই পিতা দ্যো দুহিতৃস্থানীয় তুরুষ্ক, পারস্য, আফগানিস্থান এবং দিব বা সাইবিরিয়াতে বহু মানববংশের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। মাতা ভারতবর্ষহইতেও বরুণ ও বায়ু-প্রভৃতি তুরুষ্ক, পারস্য, আফগানিস্থান এবং সাইবেরিয়াতে বহু লোক যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

অহো তথাপি বালকবৃন্দ উত্তর কেন্দ্র, উত্তর কুরু, ভারতবর্ষ, ইয়াণ পণ্টাস ও বালটিক যেলাপ্রভৃতির আদি গেহত্ব সংস্থাপনে লোলজিহ্ব !!! যদি কেহ আমাদিগের এই ব্যাখ্যায় দোষ দিয়া যাস্ক, সায়ণ, দয়ানন্দ ও গ্রীফিত্তাদিকে রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে সম্মত আছি।

সাত ও শূন্য।

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ জ্যোতিরত্ন]

সাত ও শূন্য (০) র মধ্যে একটা বিশেষ রহস্য আছে। কেন তাহা জানি না। ০ শূন্যর নিজের কোন মূল্য নাই ; কিন্তু যখনই কোন অঙ্কের ডান দিকে বসে, তখনই তাহার দশগুণ মূল্য বা বল বৃদ্ধি করে ; যেমন, ১ ও ১০ দশ ; এবং নিজে যে একটা কিছু, এবং কিছু ক্ষমতাও যে রাখে, তাহাও প্রকাশ পায়। পুরুষ একটা শূন্য (০) ; যখন কনের ডান দিকে বসে, তখনই পুরুষের বিকাশ হয় শক্তির স্ফূর্ত্তি হয়—অনন্ত কর্ম্মের সূত্রপাত হয়।

সাত বা শূন্য যে বৎসরের শেষে আছে, সেই সেই বৎসরে একটা না একটা বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে দেশের একটা বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ঐ সাত বা শূন্যর বৎসরে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন, যুদ্ধ, ধর্ম্মবিপ্লব বা অন্য কোন কিছু বিশেষ ঘটনার হয় সূত্রপাত হইয়াছে, না হয় শেষ হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরে যে হয় নাই তাহা নহে, তবে সংখ্যায় অতি অল্প ; এবং যখন কোন যুদ্ধ অনেকগুলি দেশ লইয়া ঘটিয়াছে, সেখানে ঐ ৭ ও ০ র মধ্যে পড়ে না ; যেমন ফরাসি বিপ্লব, ও গত ইয়োরোপীয় মহাসমর ইত্যাদি। বোধ হয় ৭টী গ্রহই ঐ ৭ ও ০ র কারণ। চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বিশেষ উপকৃত হইব। সাত ও শূন্যর সামঞ্জস্য শুধু ইংরাজী সালেই দেখা যায়।

প্রথমে আমাদের শাস্ত্রের ভিতর দেখা যাক। সপ্তর্ষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ। সপ্তপাতাল—"অতলং বিতলঞ্চা মিতলঞ্চ গৎস্তিমৎ। মহাখ্যং সুতলঞ্চাগ্রং পাতালং সপ্তমং বিদুঃ॥ সপ্ত নাড়ী—চণ্ড, বায়ু, দহন, সৌম্য, নীর, জল, অমৃত। সপ্ত ধাতু—রসাস্রমাংসমেদোঽস্থিমজ্জানঃ শুক্রসংযুক্তাঃ। অগ্নির সপ্ত জিহ্বা—কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা চৈব সুধূম্রবর্ণা। উগ্রা প্রদীপ্তা চ কপীটযোনেঃ সপ্তৈব কীলাঃ কথিতাশ্চ জিহ্বাঃ॥ সপ্তদ্বীপ—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর। সপ্ত পর্ব্বত—মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমনৃক্ষমানপি। বিন্ধ্যশ্চ, পরিগাত্রশ্চ ইত্যেত কুলপর্ব্বতাঃ। আমাদের গীতা ও চণ্ডীর শ্লোকসংখ্যা সাতশত। সূর্য্যের সপ্ত অশ্ব যাহাদের ইংরাজীতে ভিবজিঅর বলে। রাজাঙ্গ সপ্ত। ব্রীহি সপ্ত। বিবাহে সপ্তপদী। সঙ্গীতে সপ্ত স্বর—সা, রে, গা, ইত্যাদি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সপ্তরথী। ছাঁদনাতলায় সাতপাক ঘুর।

জ্যোতিষশাস্ত্র দেখা যাক। প্রথমে গ্রহ সাতটী—রাহু ও কেতু গ্রহ নহে—ভূচ্ছায়া মাত্র। সাতটী বার। সাত শলাকা বেধ—ইহাতে পিতৃ মৃত্যু বিচার হয়। সপ্তশূন্য—মৃত্যু বিচার হয়। ২৭ নক্ষত্রে রাশিচক্র। চলতি কথায় বলে "আমি সাত সতেরো জানি না"। এই সাত ও সতেরোয় পুত্র কি কন্যা ও লগ্ন জন্মপত্রিকা হইতে জানা যায়। এমন কি কবি বঙ্কিমচন্দ্রও সাতের মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া, নবকুমারের বাড়ী সপ্তগ্রামে লিখিয়াছেন।

এইবার ইতিহাসের ঘটনার দিকে দেখা যাক। প্রথমে ইংলণ্ডের ইতিহাস দেখুন। ৬০ পূঃ খৃঃ ইংলণ্ড-বিজয়ী সিজারের প্রভুত্ব বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়। ৫০ পূঃ খৃঃ যখন বৃটন বীর ক্যারেকটেকস্ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া, শেষ বন্দিরূপে রোমে প্রেরিত হন, তখন বৃটনদিগের স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির আশা শূন্যে বিলীন হইয়াছিল। ৪১০ খৃঃ আবার স্বাধীনতার সুখসূর্য্যের উদয় আরম্ভ হয়। এই সময় হইতেই প্রকৃত-পক্ষে ইংলণ্ডের ইতিহাস আরম্ভ হয়। Ella ৪৯০ খৃষ্টাব্দে South Saxons (ইহার বর্ত্তমান Sussex) রাজ্য স্থাপন করেন। ৫৪৭ খৃঃ Ida বৃটেনিয়া অধিকার করেন। ৫৯৭ খৃঃ Kent রাজ এথেলবার্ট প্রথম খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ১০৬৬ খৃঃ ২৫ শে ডিসেম্বর সুতরাং ১০৬৭ খৃঃ William the Conqueror ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন ; অর্থাৎ ইংলণ্ড Norman-বিজেতার পদানত হয়। ১২০০ খৃঃ Count of Angonlimeএর রূপে মুগ্ধ হইয়া, জন তাঁহাকে চুরি করিয়া বিবাহ করেন ; এবং ইহাই Magna Chartaএর প্রথম ও প্রধান কারণ। এই আইন-বলে প্রজাশক্তি ও রাজশক্তির মধ্যে বিষম দ্বন্দ উপস্থিত হয় ; এবং ইহার চরম ফল ১২১৭ খৃঃ প্রজাশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া প্রথম Parliament স্থাপিত হয়। ১৩৩৭ খৃঃ শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হয় (Hundred Years War)। ১৪৬০ খৃঃ Wakefieldএর যুদ্ধ হয়। ১৫১০ খৃঃ Empson প্রভৃতির দণ্ডাজ্ঞা হয়। ১৫৩৭ খৃঃ Luther ও Zwingliর বক্তৃতায় ইংলণ্ডের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হয়। ইহাই Protestantদিগের উদ্ভব। ১৫৮৭ খৃঃ স্কটলণ্ডে রাণী Maryর শিরশ্ছেদ হয় ; কারণ তিনি Catholic ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। ১৬৪৭ খৃঃ Chartis I ধৃত হইয়াছিলেন ; এবং এই সময় হইতেই Commonদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। ইহারই চরম ফলে Oliver Cromwell দ্বারা সাধারণ-তন্ত্র প্রচারিত হয়। ইহার পর ১৬৬৭ খৃঃ Cabal Ministry স্থাপিত হয়। ১৬৭৭ খৃঃ William ও Maryর বিবাহ হইয়া Orange ও York বংশ সংবদ্ধ হয়। ১৭০৭ খৃঃ ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড এক জাতীয় পতাকার নিম্নে সম্মিলিত হয়। ১৭৩৭ খৃঃ Patriot দলের অভ্যুত্থান হয়। ১৭৫৭ খৃঃ Canada রাজ্যে ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ হয় ; এবং বঙ্গলক্ষ্মী ইংলণ্ডের পতাকায় মিশাইয়া

গিয়াছেন—সেই পলাসীর আম্র কাননের পার্শ্বে !! ১৭৭০ খৃঃ ইংলণ্ডে প্রথম সংবাদপত্র Morning Post প্রচারিত হয় ; এবং ১৭৯০ খৃঃ বাঙ্গালার প্রথম সংবাদ-পত্র Hizli Gazette প্রচারিত হয়। ১৭৭৭ খৃঃ ১৬ অক্টোবর American Wars of Independence আরম্ভ হয়। ১৮০৭ খৃঃ ইংরাজ দাস-ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ১৮৩৭ খ্রীঃ ইংলণ্ড হইতে Hanover বিচ্ছিন্ন হয় ; Canada রাজ্যে বিদ্রোহ হয় ; এবং প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে আরূঢ়া হয়েন। ১৮৫৭ খ্রীঃ ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ—নানা-সাহেব ও হ্যাবলকের নাম চিরদিন থাকিবে—মধ্য ভারতের শেষ বীর পরাধীনতার চক্ষে ধুলি দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন !! ১৮৪০ খ্রীঃ এক পেনিপত্র ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ডে প্রচারিত হয়। ১৮৬০ খৃঃ ইংলণ্ড ও চীনে যুদ্ধ হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ Mr. Footer দ্বারা English Education Act প্রবর্ত্তিত হয় ; এবং এই সময় হইতেই ইংলণ্ডে স্ত্রীশিক্ষা বিশেষরূপ আরম্ভ হয়। ১৮৮৭ খৃঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণ জুবিলি। ১৯০০ খৃঃ এডওয়ার্ড রাজা হন। ১৯১০ খৃঃ বর্ত্তমান সম্রাট জর্জ্জ সিংহাসনে আরূঢ় হন।

এইবার রোমের ইতিহাস দেখা যাউক। ৪১৮ পূঃ খৃঃ Lucius Tarquinius Superbus এর সময় রাজতন্ত্র-প্রথা শেষ হয়। ৪৭৭ খৃঃ পূঃ Bremera তীরে Fabii বা Patricianদিগের দ্বারা একটী বালক ব্যতীত সকলেই সবংশে নিহত হয়। ৩৯০ খৃঃ পূঃ Gaulরা রোমনগর ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। রোমের বৃদ্ধ Senatorগণ বীরের ন্যায় নির্ভীক হৃদয়ে, বিজেতার পদানত না হইয়া, তাহাদের অসি-ফলকে নিজ-নিজ জীবন দান করিয়াছিলেন। ৩৬৭ খৃঃ পূঃ Gaulদিগের সহিত রোমানদিগের সন্ধি হয়। ৩৪০ খৃঃ পূঃ Latine যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে Tarquatus যুদ্ধের আজ্ঞা লঙ্ঘন এবং কাপুরুষতার বশবর্ত্তী হইয়া জনৈক মুমূর্ষু Latin সৈনিকের হত্যাপরাধে শিরশ্ছেদ করিয়াছিল—একমাত্র রাজপুত ইতিহাস ব্যতীত এ দৃষ্টান্ত বিরল। ২৯০ খৃঃ পূঃ Samnite যুদ্ধের অবসান হয়। ২৮০ খৃঃ পূঃ রোমানগণ Pyrrhus কর্ত্তৃক পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধের উল্লেখ করিয়া পিরহাস বলিয়াছিলেন "If these were my soldiers or if I were their general we should conquer the world. Another such victory and I must return to Epirus alone." ২৫০ খৃঃ পূঃ Lilybacum এর Hamilear Brace দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। ২২৭ খৃঃ পূঃ Carthaginian ও Romanদিগের মধ্যে সন্ধি হয়। তাহাতে Ebroর উত্তর দিক পর্য্যন্ত Spain এ Carthaginianদিগের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। ২১৭ খৃঃ পূঃ হানিবেল কোনির যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন—রোমানগণ সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়াছিল। ২০৭ খৃঃ পূঃ Metaurus-যুদ্ধ হয়—এই যুদ্ধে ইতালির ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হয়। ২১০ খৃঃ পূঃ Scipio স্পেনে উপস্থিত হন এবং ২০৭ খৃঃপূঃ রোমান রাজ্য স্পেন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ২০০ খৃঃ পূঃ ২য় মাসিডোনিয়ান যুদ্ধ শেষ হয় ; এবং রাজা Philip পরাজিত হন। এই যুদ্ধে ৮০০০ মাসিডোনিয়ান হত হয় এবং ৫০০০ বন্দী হয়। ১৯০ খৃঃ পূঃ Scipio ম্যাগনিসিয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে Antiochusএর সহিত যুদ্ধে, অদ্ভুত যুদ্ধ-নৈপুণ্য দেখাইয়া, উহাকে পরাস্ত করেন। ইহাতে ৪০০ শত রোমান হত হয় ; এবং Antiochus পক্ষে ৫৩০০০ সৈন্য হত হয়। একমাত্র গ্রীক ব্যতীত অদ্যাবধি কোন সভ্যজাতি এরূপ যুদ্ধ-কৌশল দেখাইয়া জয়ী হন নাই। ১৪৭ খৃঃ পূঃ Scipio আফ্রিকা যাত্রা করেন। সেই যুদ্ধে Carthagianগণ প্রচুর বিত্ত, অস্ত্রশস্ত্র এবং ৩০০ উচ্চবংশীয় যুবককে রোমান করে সমর্পণ করিলেও, বিশ্বাসঘাতক রোমানগণ কার্থেজ ধ্বংস করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ; অপরদিকে কার্থেজবাসিগণ বিশ্বাসঘাতকতায় মর্ম্মাহত হইয়া, এবং জন্মভূমির রক্ষার জন্য, মৃত্যুমুখে ধাবিত হইবার জন্য প্রস্তুত হন। এই যুদ্ধে ধনুকের জ্যার অভাবে স্ত্রীলোকগণ নিজ নিজ কেশ ছিন্ন করিয়া সে অভাব মোচন করিতে কুণ্ঠিতা হন নাই। ইতিহাসে এটী চিরস্মরণীয় ঘটনা। ১১৭ খৃঃ পূঃ Juratha এবং Romanদিগের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ৯০ খৃঃ পূঃ Social War আরম্ভ হয়। ৮৭ খৃঃ পূঃ Sulla (সুলা) এথেন্স বিজয়ের জন্য Epirusএ গমন করেন। ইতিপূর্ব্বে আর কেহই এথেন্স জয় করেন নাই। ৮০ খৃঃ পূঃ সুলা পুরাতন রাজনীতি ও রীতিনীতির পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করেন। এই অব্দেই পম্পির দ্বারা Numidia ধ্বংস হয়। ৭০ খৃঃ পূঃ পম্পির দ্বারা Aristocracy দল শাসিত হয়। ৬৭ খৃঃ পূঃ Triarius নামক একজন রোমান সেনাপতি Rucullus দ্বারা পরাজিত হন: বহু বৎসর রোমানগণকে এরূপ ভাবে পরাজিত হইতে হয় নাই। ৫৭ খৃঃ পূঃ Nervusগণ Caeser দ্বারা পরাজিত হয়। ৪৭ খৃঃ পূঃ সিজর Syria জয় করেন। এই বিজয়ের সময় তিনি বলিয়াছিলেন Veni, Vedi, Vici অর্থাৎ আসিলাম, দেখিলাম, জিনিলাম। ৪০ খৃঃ পূঃ রোমান জগত নূতন ভাবে গঠিত হয়। Antony পূর্ব্ব-দিকের রাজ্য ও ওক্টেভিয়াস পশ্চিম রাজ্য প্রাপ্ত হন। ৩০ খৃঃ পূঃ Cleopatraর জন্য Antonio ও Octavianএর মনোবিবাদ ও যুদ্ধ হয় ; এবং ক্লিয়োপেট্রা আত্মহত্যা করেন এবং Egypt জয় হয়। এই যুদ্ধই রোমানদিগের শেষ-যুদ্ধ যাত্রা বলা অসঙ্গত নয়। এই সময় হইতেই রোমানদিগের সাধারণ তন্ত্র আরম্ভ হয়।

এইবার ভারতের ইতিহাস দেখা যাউক। ঐ এক নিয়মে ভারতের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ৩৭০ খৃঃ পূঃ শিশুনাগ বংশ বিলুপ্ত হয়। ২৬০ খৃঃ পূঃ অশোক (ধর্ম্মাশোক, যিনি প্রথমে চণ্ডাশোক বলিয়া খ্যাত ছিলেন) সিংহাসনে আরূঢ় হয়েন। ইঁহারই সময়ে অজন্তা গুহা, সাঁচী, ও ভিলসা গুহা (tope) নির্ম্মিত হয়। ৫৫৭ খৃঃপূঃ ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৭৭ খৃঃ পূঃ দেহত্যাগ করেন। রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য ৫৫০ খৃঃ রাজা হন। ৯৫০ খৃঃ কটক নৃপকেশরী দ্বারা স্থাপিত হয়। ১১৫০ খৃঃ ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থ রচনা করেন। ৯৯৭ খৃঃ মামুদ সিংহাসন আরোহণ করেন—হিন্দু ইঁহার নাম কখন ভুলিবে না। মামুদের নবমবার ভারত আক্রমণ ১০১৭ খৃষ্টাব্দে হয়। এবং ১০৩০ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৩১০ খৃঃ আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর দাক্ষিণাত্য বিজয় করেন। ১৩৪৭ খৃঃ বমনি বংস ধ্বংস হয়। ১৫২৭ খৃঃ

বাবর ও সংগ্রামসিংহের মধ্যে ফতেপুর শিকরীতে যুদ্ধ হয়; এবং এই যুদ্ধেই মোগলরাজ্য স্থাপিত হয়। ১৫৭০ খৃঃ কালাপাহাড় দ্বারা গঙ্গাবংশ ধ্বংস হয়। ১৫৬৭ সালে আকবর চিতোর আক্রমণ করেন। ১৫৬৭ খৃঃ, জগৎ যাহা আজ পর্য্যন্ত দেখাইতে পারে নাই, কবির কল্পনায় যাহা দুর্লভ, বীরেন্দ্রসমাজে যাহার দ্যুতি কোহিনুর অপেক্ষাও উজ্জ্বল, তাহা এই খৃষ্টাব্দে কর্ম্মদেবী, কমলাদেবী ও বালক পুত্ত দেখাইয়াছিলেন। ১৫৮৭ খৃঃ আকবর তাঁহার রাজ্য কাশ্মীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন। ১৬২৭ খৃঃ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয় এবং মহারাষ্ট্র-রবি শিবাজীর জন্ম হয়। ১৬৫৭ খৃঃ আরঙ্গজিবের পৈশাচিক ব্যবহারে ভারত কম্পিত হইয়াছিল। ১৬৮০ খৃঃ শিবাজীর মৃত্যু হয়। ১৬৮৭ খৃঃ আরঙ্গজিব কর্ত্তৃক গোলকুণ্ডা ধ্বংস হয়। ১৭০৭ খৃঃ আরঙ্গজিবের মৃত্যু হয়। ১৭২০ খৃঃ পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হয়—তিনিই ব্রাহ্মণ পেশওয়া বংশের প্রথম। ১৭৪০ খৃঃ বাজীরাও মৃত হন—ইনিই মারহাট্টার শেষ বীর। ৩য় পানিপথ যুদ্ধ ১৭৬০ সালে হয় (১৭৬১ খৃঃ ৬ই জানুয়ারি; সুতরাং ১৭৬০ খৃঃ বলিলে ভুল হয় না)। এই যুদ্ধই হিন্দুদিগের শেষ যুদ্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ইয়োরোপ ও ভারতের সম্বন্ধ একটু পিছাইয়া গিয়া দেখা যাউক। ১৪৯৭ খৃঃ Vasco de Gama কালিকটে প্রথম অবতরণ করেন। ইহার পূর্ব্বে ইয়োরোপীয়ানগণ ভারতের সন্ধান জানিতেন না। প্রায় ১৬০০ সালে দিনেমারগণ ভারতে আইসেন এবং এই ১৬০০ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয়। তাহাদের মূলধন ৭০০০০ পাউণ্ড। ১৭০০ খৃঃ সুতানুটী গোবিন্দপুর (যেখানে এখন Fort William) ও কলিকাতা আরঙ্গজিবের পুত্রের নিকট হইতে ইংরাজ খরিদ করেন। ১৭৬০ খৃঃ কর্ণেল কুট দ্বারা ফরাসী সেনাপতি লালে বন্দিবাসার যুদ্ধে পরাজিত হন। ১৭৫৭ খৃঃ ক্লাইব ৩১০০ সৈন্য লইয়া চন্দননগর হইতে পলাসীর দিকে অগ্রসর হন; এবং ঐ যুদ্ধেই বাঙ্গালার মুসলমান রাজ্য শেষ হয়। ১৭৬৭ খৃঃ ক্লাইব ভারত ত্যাগ করেন। ১৭৭০ খৃঃ বাঙ্গালায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। ১৭৮০ খৃঃ ২য় মহীশূর যুদ্ধ হয়। ১৮০০ খৃঃ ইংরাজ ও নিজামের মধ্যে সন্ধি হয়। শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নানা ফড়্নাভিসের ১৮০০ মৃত্যু হয়। ১৭৮০ খৃঃ রণজিৎসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১০ সালে কৃষ্ণকুমার আত্মহত্যা করেন। ১৮১৬ সালে পিণ্ডারী যুদ্ধ হয়; এবং ঐ বৎসরেই ফিরিঙ্গি যুদ্ধ। ১৮৩০ খৃঃ ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত প্রথম "প্রভাকর" পত্রিকার প্রচার করেন। ১৮৭৫ সালে কানপুরের মিউটিনি হয়। ১৮৭৭ খৃঃ ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের সম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষিত হন। ১৮৮০ সালে লর্ড রিপণের আগমন ও আফগান যুদ্ধ হয়। ১৮৯৭ সালে মহারাণীর হীরক জুবিলী এবং ১৯০০ সালে সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজত্ব আরম্ভ হয়। ১৯১০ সালে ৫ম জর্জ্জেরও রাজত্ব আরম্ভ হয়। ১৯২০ সালের কংগ্রেসে ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কে জানে ১৯২৭ সালে কি ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

সেকালের মজুরী

[শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম-এ]

সেকালের বাজার-দর খুব সস্তা ছিল, এ কথা অনেকেই জানেন; কিন্তু সেকালের মজুরীও যে কত সস্তা ছিল, তাহা অনেকেই জানেন না। যাহারা কিনিয়া খায়, বাজার-দরের তারতম্যের ফল তাহারাই ভোগ করে; সুতরাং যাহারা খাটিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিয়া অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে বাধ্য, তাহাদের রোজগারের সঙ্গে বাজার-দরের তুলনা না করিলে, শুধু বাজার-দরের পরিমাণ দেখিয়া লোকের সুখ দুঃখের অনুমান করা যায় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেকালের মজুরী সম্বন্ধে সামান্য একটু আলোচনা করা যাইতেছে। "মজুরী" শব্দে উচ্চ-নীচ সর্ব্বপ্রকার রোজগারীর পারিশ্রমিকই ধরা হইয়াছে।

মুসলমান রাজত্বের বাজার-দর যতটা জানা গিয়াছে, মজুরী সম্বন্ধে ততটা জানা যায় নাই। কেবল আকবর বাদশাহের সময়কার মজুরীর সঠিক খবর কতকটা জানিতে পারা যায়। সহরে বাড়ী-ঘর তৈয়ারী সম্বন্ধে, আকবর যে কতকগুলি নিয়ম করিয়াছিলেন, এবং কর্ম্মচারী-গণের কাজের সুবিধার জন্য মজুরীর যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে নিম্নলিখিত হার ধরা আছে :—

রাজমিস্ত্রি, যাহারা ইটের কাজ করিবে,—

প্রথম শ্রেণী	৭ দাম রোজ (=৵১২৷)
দ্বিতীয় "	৬ " " (=৶৫)
তৃতীয় "	৫ " " (=/১৭৷৹)
চতুর্থ "	৪ " " (=/১০)

পাথরের খোদাইকরের মজুরী—

ফুল প্রভৃতি খোদাই করিলে ১ গজের মজুরী ৬ দাম অর্থাৎ ৶৫ পয়সা। সাদাসিদে খোদাই কাজ প্রতি-গজ ৫ দাম অর্থাৎ /১৭৷৹ পয়সা।

যাহারা পাথর ভাঙ্গিবে, তাহাদের মজুরী প্রতি মণ ২২ চিতল (১) (=প্রায় ১দাম, অর্থাৎ ৭৷৹ পয়সা। ১ মণ =প্রায় ২৮ সের)

ছুতোর মিস্ত্রীর পাঁচ রকম মজুরী ছিল :—

১ম শ্রেণী	৭ দাম রোজ (=৵১২৷)
২য় ,,	৬ ,, রোজ (=৶৫)
৩য় ,,	৪ ,, ,, (=/১০)
৪র্থ ,,	৩ ,, ,, (=/২৷)
৫ম ,,	২ ,, ,, (=৲১৫)

করাতিরা অর্থাৎ করাত দিয়া যাহারা কাঠ কাটিয়া তক্তা করে, তাহাদের মজুরী ছিল রোজ ২ দাম বা তিন পয়সা।

(১) চিতল বা জিতল নামে একপ্রকার তাম্রমুদ্রা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল; কিন্তু, সম্ভবতঃ ইহা সে মুদ্রা নহে। উহার মূল্য ছিল প্রায় ৫ পয়সা।

কূপখননকারীদিগের মজুরী :—

১ম শ্রেণী—প্রতি গজ (ইলাহী গজ অর্থাৎ আকবরী গজ ৪১ ইঞ্চি) ২ দাম অর্থাৎ তিন পয়সা।

২য় শ্রেণী—প্রতি গজ ১॥ দাম (পৌনে তিন পয়সা)।

৩য় " —ঐ

যাহারা কুয়া হইতে কাদা তুলিয়া কূপ পরিষ্কার করে, তাহাদের মজুরী শীতকালে রোজ ৪ দাম বা /১০ ছয় পয়সা, আর গ্রীষ্মকালে ৩ দাম বা /২॥ সাড়ে চারি পয়সা।

যাহারা কাঁচা ইট তৈয়ারী করিয়া দেয়, তাহাদের মজুরী প্রতি শত ইটে ৮ দাম বা ✓০ তিন আনা।

সুরকি তৈয়ারীর মজুরী ৮ মণ (১ মণ=প্রায় আঠাইশ সের) ১॥ দাম বা পৌনে তিন পয়সা।

যাহারা বাঁশ কাটিয়া দেয় তাদের রোজ ২ দাম বা তিন পয়সা।

ঘরামির (যে ঘর ছায়) রোজ ৩ দাম বা সাড়ে চার পয়সা।

ভিস্তির মজুরী ৩ ও ২ দাম।

বাড়ী-ঘর তৈয়ারীর সময় যাহারা মাটি ও জল প্রভৃতি বহন করে, তাহাদের মজুরী রোজ ২ দাম বা তিন পয়সা। (২)

আকবরের পর মুসলমান-যুগের মজুরীর খবর আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। উপরে যাহা উদ্ধৃত করা গেল, তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যে, সেকালে যেমন বাজার-দরও সস্তা ছিল, তেমনি, যাহারা পয়সা দিয়া জিনিষ কিনিবে, তাহাদের রোজগারের পরিমাণও খুব কম ছিল। বলা বাহুল্য, উপরিলিখিত মজুরীর হার সহরেই প্রচলিত ছিল। পল্লীগ্রামের দর উহা অপেক্ষা আরও কম ছিল। আজকালকার তুলনায়, বলিতে গেলে, সেকালে যে মজুর তিন পয়সা রোজে পাওয়া যাইত, এখন তাহাকে পল্লীগ্রামেও ॥০ আট আনা রোজে পাওয়া গেলে, খুব সস্তা হইল মনে হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাগজপত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর পারিশ্রমিকের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। ১৭১১ খৃঃ অব্দের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ফোর্ট উইলিয়ামের জমিদারী হিসাবপত্রে নিম্নলিখিত বেতনের হার পাওয়া যায়। (৩)—

কোতোয়াল	মার্চ্চ মাসের বেতন		৫
৪জন কেরাণী	"	"	১১
" তহশীলদার	"	"	৬৸০
২০ জন পিয়ন	"	"	৪৩
৮ পাইক	"	"	১২
১ বংশীবাদক (trumpeter)	"	"	১
১ ঢাকী (Drummer)	"	"	৸০
১ হালালকর			৸০

এই হিসাবমত ঐ সময় একজন কেরাণীর মাসিক বেতন ছিল দুই টাকা বার আনা; তহশীলদার পাইত মাসে ১।৶০, পিয়নের বেতন প্রায় ২৶১০, এবং পাইক মাসে ১।০ পাইত।

ঐ সালের নভেম্বরের হিসাবে দেখিতে পাই যে, ৩জন কেরাণীর বেতন ৮ অর্থাৎ প্রত্যেকের মাসিক দুই টাকা দশ আনা আট পাই; এক আনা চার পাই মাহিনা কমিয়া গিয়াছে! অপর এক স্থানে আর একটী তালিকায় ২ জন কেরাণীর বেতন ৪ ধরা হইয়াছে; অর্থাৎ এক এক কেরাণী বাবু ২ টাকা পাইলেন! আজকালকার সওদাগরী আফিসের কেরাণী-বাবুরা তাঁহাদের পূর্ব্বগামীগণের সহিত বরাত মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারেন যে, কত পার্থক্য হইয়াছে; অথচ সময়ের এমনি দোষ যে, এখনও বেশীর ভাগ কেরাণীর অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হয় কি না সন্দেহ। বোধ হয়, তাঁহাদের পূর্ব্ব-গামিগণও ঠিক এই কথা বলিয়া বিলাপ করিতেন।

এইবার ঐ একই সময়ের সাহেবদের বেতনের কথা কিছু বলিব। সে সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহেব কর্ম্মচারীগণ ছয় মাস অন্তর বেতন পাইতেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দের ২৭ মার্চ্চ যে ছয় মাসের বেতন একসঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল,—গভর্ণর হইতে কেরাণী সাহেব পর্য্যন্ত সকলের ছয় মাসের বেতন একত্র করিয়া তাহা ৪০৩০॥৶০ মোট হইয়াছিল! (৪) এই সকল কর্ম্মচারীদিগের সংখ্যা জানিবার জন্য কৌতূহল হইতে পারে। ১৭১২ খৃষ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বরের হিসাবে প্রত্যেকের নাম-যুক্ত তালিকা আছে। তাহাতে গভর্ণর হইতে ক্ষুদ্রতম সাহেব-কর্ম্মচারীকে ধরিয়া মোট সংখ্যা ৫২ জন। এ মাসে খরচ কিছু বেশী হইয়াছিল; অর্থাৎ ৪০৫২৸৶৩ পাই। (৫) ইঁহাদের মধ্যে লাট সাহেবের বক্সিস ছিল ৪০০ টাকা, ২৩ তেইশ জন সাহেব কেরাণীর ৬ মাসের মাহিনা (বছরে ৪০ টাকা হিসাবে) ছিল ২০ কুড়ি টাকা করিয়া, এবং ৬ মাসের রোজগার ১৬০, ১৪০, বা ১৩০ এমন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী অনেক ছিলেন। স্বয়ং গভর্ণর সাহেবের ৬ মাসের মোট বেতন হইয়াছিল ৮০০ (বছরে ১৬০০, হিসাবে)! তিনি অবশ্য বছরে ৮০০ আটশত টাকা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পাইতেন। দুই রকমে জড়াইয়া গভর্ণরের মাহিনা মাসিক ২০০ ছিল। এখন একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কাজে ঢুকিয়া ৩০০ বেতন পান এবং বর্ত্তমান গভর্ণর পান মাসে ১০০০০ দশ হাজার টাকা।

১৭১২ খৃঃ অব্দে কোন কোন সামরিক কর্ম্মচারীর বেতন কমাইয়া নিম্নলিখিত হারে ধার্য্য হয়; এবং কর্ম্মচারীরা আপত্তি জানাইলে, কড়া হুকুম দেওয়া হয় যে, যাহার আপত্তি থাকে, সে কর্ম্মত্যাগ করুক :—

লেফ্‌টেনাণ্ট	মাসিক	৩৫
এন সাইন্ (পতাকাবাহক)	"	২৬

(২) Gladwin's Ain-i-Akbari.

(৩) Early Annals of the English in Bengal, vol. I. p. 46.

(৪) Early Annals of the English in Bengal vol. II. p. 82.

(৫) ঐ ঐ p. 72.

১৭১৩ সালের হিসাবে ফোর্ট উইলিয়মের সামরিক কর্ম্মচারীদের বেতন নিম্নলিখিত হারে (৬) দেখা যায় :—

সেনাপতি	মাসিক	৬৫৲
লেফ্‌টনাণ্ট বা সহকারী সেনাপতি	„	৩৫৲
এন্‌সাইন	„	২৪৲
সার্জ্জেণ্ট	„	২০৲
করপোরাল্	„	১৩৲
ঢাক-বাদক	„	১৩৲
পর্ত্তুগীজ সৈনিক	„	৫৲

সেনাপতিকে ধরিয়া এই সেনার সংখ্যা ছিল মোট ১৯৯ জন।

১৬৯৩ খৃঃ অব্দে শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের বেতন ছিল মাসিক ৪৲ (Early Annals by Wilson vol. 1, p. 143)।

এই সময় মাদ্রাজের সামরিক ও শান্তি-বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের বেতন এইরূপ ছিল। ১৭১১ খৃঃ অব্দের একখানি ভ্রমণ পুস্তকে দেখা যায় যে, মাদ্রাজের শ্বেতাঙ্গ সেনার সংখ্যা ২৫০। উহাদের প্রত্যেকের মাসিক বেতন ৯১ "ফানাম"—মুদ্রা, অর্থাৎ ১ পাউণ্ড ১ সিলিং ৯ পেন্স = ৮৲ টাকার কিছু বেশী (তখন পাউণ্ডের দর ছিল ৮৲ টাকা)। সঙ্কর জাতীয় পোর্ত্তুগীজ সৈন্যের বেতন ছিল মাসিক প্রায় ৪৲। কাপ্তেনদিগের বেতন ১৪ প্যাগোডা মুদ্রা; অর্থাৎ প্রায় ৪২৲ টাকা (প্যাগোডার দাম ছিল ৬৷৹ হইতে ৭৷৹ সিলিং, Annals of Rural Bengal, p. 295 by Hunter)। সার্জ্জেনদিগের বেতন ৫ প্যাগোডা=১৫৲ এবং এনসাইনরা ১০ প্যাগোডা=৩০৲ টাকা পাইত। (৭)

১৭১৩ খৃঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়মের প্রধান সেনাপতির বেতন আজকালকার একজন দারোগার বেতন অপেক্ষাও অনেক কম ছিল। বাঙ্গালার বাহিরেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহেব কর্ম্মচারিগণের বেতন একই রকম ছিল। কলিকাতার ও মাদ্রাজের গভর্ণর, সদস্য, সাহেব কেরাণী প্রভৃতি সকলের বেতন একই ছিল। (৮)

সেকালের তুলনায় বর্ত্তমানের টাকা কত সস্তা হইয়াছে, তাহা আর একটী ঘটনা দ্বারা বেশ বুঝা যায়। মাতলামী, অভদ্রতা, অশ্লীলতা প্রভৃতি নিবারণ করিবার জন্য ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে মাদ্রাজের গভর্ণর খুব কড়া হুকুম দিয়াছিলেন; এবং সাহেব অপরাধীর শাস্তির জন্য যে কঠিন ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, মিথ্যা কথা বলা, উপাসনার সময় অনুপস্থিত থাকা, অথবা, শপথ বা ঈশ্বর-নিন্দা করা—এই সকল অপরাধের শাস্তি প্রত্যেক বারে ৪ ফানাম (fanam) অর্থাৎ প্রায় পাঁচ আনা। (৯) আজকাল কোন লঘু অপরাধের জন্য কোন সাহেব কর্ম্মচারীর পাঁচ আনা জরিমানা করিলে, তিনি উহাকে উপহাস মনে করিবেন।

বর্ত্তমানে কলিকাতার যে রাস্তার নাম ওল্ড কোর্ট-হাউস্ ষ্ট্রীট (Old Court-House Street), সেই স্থানে ১৭২৭ খৃঃ অব্দে একটী আদালত স্থাপিত হইয়াছিল। উহার নাম ছিল কোর্ট-হাউস। এই নামেই এখন রাস্তার নাম হইয়াছে। এখানে ইংরাজের প্রজার ইংরাজের দেশের আইন অনুসারে বিচার হইত। দেশীয় লোকদের দেওয়ানী, ফৌজদারী রকম বিচার একজন সাহেব কর্ম্মচারীর হাতে ছিল; তাঁহার নাম ছিল "জমিদার।" যে সমস্ত দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল, তিনিই তাহা দেশীয় লোকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। তিনি খাজনা আদায় করিতেন, এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী সমস্ত মামলার বিচার করিতেন; এবং প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত দিতে পারিতেন। তৎকালীন কলিকাতার তিনিই সর্ব্বোচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন (গভর্ণর বাদে। তাঁহার বেতন ছিল বার্ষিক দুই হাজার টাকা (১০) এবং সামান্য আর কিছু উপরি আয়। তিনি একাধারে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ছিলেন। আজকালকার কলিকাতার যে কোন জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট বা কালেক্টারের বেতনের সঙ্গে তুলনা করিলে, পার্থক্যটা বেশ ভাল বুঝা যাইবে। এই কর্ম্মচারীর ব্যবসায়ও ছিল; এবং চাকরী অপেক্ষা তাহাতেই বেশী আয় হইত। (১১)

১৭৫৭ খৃঃ অব্দেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহেব কর্ম্মচারীদিগের বেতন যে পূর্ব্বের মতই ছিল, তাহা কলিকাতার নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণের উল্লেখ হইতে দেখা যায়।

মাননীয় রোজার ড্রেক (গভর্ণর) ২০০ পাউণ্ড বার্ষিক। প্রথম শ্রেণীর মার্চ্চেণ্ট (অর্থাৎ যাহারা কোম্পানীর ব্যবসায় সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কোন কাজ করিত)—৪০ পাউণ্ড।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মার্চ্চেণ্ট—৩০ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড ৮৲)।
ডাক্তার—৩৬ পাউণ্ড।
সাহেব কেরাণী—৫ পাউণ্ড।

(৬) Early Annals of the English in Bengal, Vol. II, p. 107.

(৭) Good Old Days of Hon'ble John Company, Vol. I, p. 258.

(৮) ঐ ঐ ঐ

(৯) Good Old Days of Hon'ble John Company. Vol. II, p. 288.

(১০) ঐ ঐ Vol. I, p. 272.

(১১) ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে গভর্ণর জেনারেলের পদ সৃষ্ট হয়; এবং ঐ পদের বেতন ধার্য্য হয় আড়াই লক্ষ টাকা। (এখনও ঐ বেতনই আছে)।

Calcutta Old and New, by Cotton p. 1031। ১৭০৮ সালে গভর্ণরের বেতন ১০০ পাউণ্ড এবং খোরাকি ৩০, ছিল। অন্যান্য সদস্যের খোরাকি ৩০৲। Early Annals, Vol. I, p. 205.

সমস্ত বেতনই বার্ষিক এবং ছয় মাস অন্তর দেওয়া হইত। তবে প্রত্যেক কর্ম্মচারীই বেতন বাদে কিছু উপরি পারিশ্রমিক পাইত। (১২)

সেকালে ভারতে যে সকল সাহেব কোম্পানীর চাকুরী করিতে আসিতেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে জনৈক গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"কোন-কোন সাহেব প্রভূত অর্থ দেশে লইয়া গিয়াছেন, এবং প্রাচ্য দেশের মত বিলাসিতা স্বদেশেও ভোগ করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, এগুলি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। সত্য কথা এই যে, খুব কম ইংরাজই দেশে ফিরিত, এবং যে অল্প সংখ্যক লোক ফিরিয়া যাইতে পারিত, তাহারা বহু অর্থ লইয়া যাইত দেখিয়া, সকলে মনে করিত যে, ভারতে সোণা রূপা রাস্তায় কুড়াইয়া পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা একটী গুরুতর ভ্রম। সাধারণ ভাবে ইহা বলা যায় যে, ইয়োরোপীয়-গণের উন্নতির আশা ও সম্ভাবনা এখনকার চেয়ে তখন খুব কম ছিল। এই বিষয়ের মন্দ দিকটা মোটেই লোককে দেখান হয় নাই। কিন্তু যদি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা যায়, তবে বন্ধুবান্ধবহীন নির্ব্বাসিত জীবনের কত দুর্গতি ও কষ্টের কথা লেখা যাইতে পারে। ঘরছাড়া হওয়ার অভাব ও সান্ত্বনাহীন শোকের কত কাহিনী, এবং রোগ-শয্যায় শুইয়া একবিন্দু দয়া, মমতা বা আরামের প্রতীক্ষায় থাকিয়া-থাকিয়া কত লোক জীবন হারাইয়াছে, তাহার বিবরণ লোকে জানিতে পারে। সে সময় এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হইত যে, তাহাতে অনেক বলিষ্ঠ হৃদয়ও ভগ্ন হইয়া যাইত। যাহারা জীবন সংগ্রামে জয়ী হইত, তাহারা বিনা ক্লেশে জয়ী হইত না, এবং জয়ের পুরস্কারও ছিল। কিন্তু কত লোকে যে চিরকালের জন্য পরাজিত হইত! যখন মিঃ শোর (পরে সার জন শোর) কেরাণী হইয়া এ দেশে আসেন (১৭৬৯ খৃঃ), তখন তাঁহার বেতন ছিল মাসিক আট টাকা, এবং ইহাও রাজনৈতিক গুপ্ত বিভাগে (Secret and Political Department)! যখন সার টমাস্ মনরো (Sir Thomas Munro) ১৭৮০ খৃঃ অব্দে শিক্ষানবিশ সৈনিক কর্ম্মচারী রূপে এ দেশে আসেন, তখন তাঁহার বেতন ছিল মাসিক পাঁচ প্যাগোদা (১ প্যাগোদা = ৩৲ টাকা) ও সরকারী বাসা। বাসা নিজে করিলে বেতন ১০ প্যাগোদা (pagoda)। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—পাঁচ প্যাগোদার মধ্যে, দুই প্যাগোদা একজন দুবাশকে দিতে হয়। মেসের চাকরদিগকে এক প্যাগোদা দিই। চুল আঁচড়ান, ছাঁটা, এবং স্নান ও কাপড় ধোয়ার জন্য এক প্যাগোদা লাগে, বাকী এক প্যাগোদা রইল আমার আহার ও কাপড়-চোপড় কেনার জন্য। (১৩)

১৭৯৫ খৃঃ অব্দের সামরিক বিভাগের এক আদেশ পাঠে জানা যায় যে, ইয়োরোপীয় সৈনিকের সন্তানেরা ৩৲ তিন টাকা করিয়া খোরাকী পাইত। (১৪) আজকাল একজন সাহেব সন্তানের খোরাকীর মূল্য কত?

কোম্পানীর কর্ম্মচারী নিজে ব্যবসা করিবার অনুমতি পাইত। কিন্তু অনেকেরই মূলধন না থাকায়, দেশীয় বানিয়ানরা টাকা যোগাইত; এবং সাহেবের নামে নিজেরাও ব্যবসায় করিত। সেই জন্য অনেক সময় দেখা যাইত যে, যে কেরাণী মাসে ৩॥০ টাকা মাহিনা পাইত, তার কারবারের মূল্য লক্ষ টাকা। লভ্যাংশ অনেক সময় দেশীয় বানিয়ানই বেশী পাইত; কখনও সমান ভাগও হইত। ১৭০২ হইতে ১৭৫৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কোর্ট অব্ ডিরেক্টর কড়া-কড়া হুকুম দিয়াও এ ব্যবস্থা রহিত করিতে পারেন নাই। এই বেনামী ব্যবসায়েই নবাব ও কোম্পানীর মধ্যে কলহের সৃষ্টি করে এবং অনেক সময় কোম্পানির প্রেসিডেণ্ট নবাবের ক্রোধ শান্তির জন্য লক্ষ-লক্ষ টাকা উপহার দিতে বাধ্য হইতেন। (১৫)

অনেক সময় কোম্পানির অল্প বেতনভোগী সাহেব কর্ম্মচারীরা দেশীয় লোকেদের কাছে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িত; ১৮১১ খৃঃ অব্দে কোর্ট অব ডিরেক্টর এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। (১৬) মধ্যে-মধ্যে বহু শ্বেতাঙ্গ অকালে রোগশয্যায় প্রাণ হারাইত। একবার ৬ মাসের মধ্যে, ১২০০ ইংরাজের মধ্যে ৪৬০ জন মারা গিয়াছিল (Early Annals, vol. I, p 204)। উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর বেতনের আরও একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন রেনেল (Captain Rennel, বোধ হয় ইনিই প্রথম বাঙ্গালার মানচিত্র তৈয়ারী করেন) নামক একজন সুদক্ষ এবং মেধাবী কর্ম্মচারী, প্রভূত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত, স্বীয় স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া, এবং জীবন বিপন্ন করিয়া, অপরিচিত দুর্গম স্থানে গিয়া কাজ করিয়াছেন বলিয়া বেতন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। (১৭) ইনি সে সময়ের Surveyor General বা জরিপ বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন; এবং এই সালে ইহার বেতন বাড়িয়া ৩০০ টাকা হইল। আজকাল এই পদের মূল্য বোধ হয় মাসিক তিন হাজার টাকা। এখন শ্বেতাঙ্গের কথা ছাড়িয়া কৃষ্ণাঙ্গের দিকে ফিরিব।

১৭৫৯ খৃঃ অব্দ হইতে সাহেব-মহলে দেশীয় চাকরদের খুব মাহিনা

---

(১২) Good Old Day of Hon'ble John Company.
Vol. I, p. 33.

যাহারা ফোর্টের বাহিরে বাস করিয়া থাকিত, তাহারা বাড়ী ভাড়া ও খোরাকী বাবদ মাসিক ৩০৲ টাকা পাইত। বাকি সকল সাহেব ফোর্টের মধ্যে এক মেস করিয়া থাকিত। ১৭১৯ খৃঃ অব্দে স্থির হয় যে কাউন্সিলের সভ্যেরা খোরাকি ও বাসা ভাড়ার জন্য মাসিক ৪০৲ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীরা ২০৲ পাইবেন।—Calcutta Old and New; by Cotton, p. 28.

(১৩) Good Old Day of Hon'ble John Company.
Vol. I, p. 105—106.

(১৪) ঐ ঐ p. 266.

(১৫) ঐ ঐ Vol. II, 289—290.

(১৬) ঐ ঐ vol. II, p. 293.

(১৭) ঐ ঐ vol. I, p. 146.

বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং ফলে অনেকে অর্থের অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও ব্যয়-বাহুল্য করিতে বাধ্য হইতেন। নিম্নের তালিকা হইতে এই চড়া দরের পরিচয় পাইয়া, পাঠক ঐ শ্রেণীর লোকের আজকালকার বেতনের সঙ্গে তুলনা করিবেন :— (১৮)

	খৃঃ অঃ ১৭৫৯	খৃঃ অঃ ১৭৮৫	
খানসামা	৫৲	১০ হইতে ২৫৲	
চোবদার	৫৲	৬৲	৮৲
কোচমান্	৫৲	১০৲	২০৲
জমাদার	৪৲	৮৲	১৫৲
খিতমদ্গার	৩৲	৬৲	৮৲
প্রধান বেয়ারার	৩৲	৬৲	১০৲
ছোট ঐ	২॥০৲	৪৲	
পিয়ন	২॥০৲	৪৲	৬৲
ধোপা	৩৲	১০৲ হইতে ২০৲	
সইস্	২৲	৫৲ ,,	৬৲
নাপিত	১৲	২৲ ,,	৪৲
মালী	২৲		
প্রধান দাসী	৫৲		
ছোট ,,	৩৲		

১৭৫৯ খৃঃ অব্দ হইতে চাকরের মাহিনা খুব বাড়িতে থাকে ; কিন্তু এখনকার সঙ্গে তুলনায় ঐ দরই খুব সস্তা। কোন সাহেবের খানসামা বা সইস্ আজকাল ২৫৲ টাকার কম আছে কি না সন্দেহ ; এবং ৪০৲ ৫০৲ টাকা মাসিক বেতন পায়, এমন অনেক খানসামা বা বাবুর্চ্চি আছে।

১৭৬০ খৃঃ অব্দে কোম্পানি চাকরদের বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন ; যথা :—চোবদার মাসিক ৪৲ ; দাসী ৩৲, কামান এবং পরচুল পরাইবার নাপিত ১৲ ; জমাদার ৫৲ ; কোচমান্ ৪৲ ; ইত্যাদি।

চাকরদের নিকট দরজী, ধোপা ও নাপিতেরা অতিরিক্ত দাম লইত বলিয়া, এই মূল্য ঠিক করিয়া দেওয়া হয় :—দরজীর দর, ১টী জামা তৈয়ারীর মজুরী ৵০, ঐ পাড় লাগাইলে ।৵০, ১টী অঙ্গরাখা ৵০, ১ জোড়া পায়জামা ৭ পণ কড়ি ; ধোপা, ১ কুড়ি কাপড় কাচার দাম ৭ পণ কড়ি ; নাপিত একবার কামান, ৭ গণ্ডা কড়ি। (১৯) আজকাল ঐ শ্রেণীর মজুরীর দাম সকলেই জানেন।

পূর্ব্বে যে সাহেবদের চাকরের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আর একটু জানিবার কথা এই যে, মাহিনা দিয়াও অনেক অসুবিধা হইত। সার ফিলিপ ফ্রান্সিসের (Sir Philip Francis) অন্তরঙ্গ কর্ম্মচারী (Private Secretary) লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ১৫টী চাকর ছিল, অথচ তাঁহাকে অনেক সময় নিজের জুতা নিজেকেই পরিষ্কার করিতে হইত। (২০)

পূর্ব্বে কলিকাতায় নানা শ্রেণীর চাকর ছিল ; তাহাদের এখন অস্তিত্ব নাই ; যথা,—১ম শ্রেণী,—ইহারা পাল্কীর আগে-আগে মনিবের ছাতা অথবা খবর লইয়া দৌড়াইত। ২য় শ্রেণী ছাতাওয়ালা,—ইহারা পাদচারী ভদ্রলোকের মাথায় ছাতা ধরিয়া যাইত। ৩য় শ্রেণী আব্দার,—ইহারা পানীয় জল ঠাণ্ডা করিয়া রাখিত। ৪র্থ শ্রেণী মসাল্চী,—ইহারা পাল্কী বা গাড়ীর আগে-আগে জ্বলন্ত মশাল লইয়া ছুটিত। ৫ম শ্রেণী হুঁকাবরদার, (১) ইনি হুঁকার তত্ত্বাবধান করিতেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণী চোবদার,—ইহারা মনিবের ঐশ্বর্য্য ও মর্য্যাদাসূচক দণ্ড বহন করিত। ৭ম শ্রেণী সন্তাবরদার,—ইহারা চোপদারের নিম্নশ্রেণী,—শুধু একগাছি রুল বা যষ্টি লইয়া চলিত। (২১)

১৭৬০ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাসে গভর্ণর সাহেবের কলিকাতা হইতে মুর্সিদাবাদে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ার যে খরচের হিসাব পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, লাটসাহেবের নানাপ্রকার চাকরদের গড়ে ১ মাস ৬ দিনের বেতন পড়িয়াছিল ৪৲ টাকার কিছু উপর। (২২)

১৭৭৬ খৃঃ অব্দে ঠিকা পাল্কীবাহী উড়িয়াদের মজুরী নিম্নলিখিত হারে ধরিয়া দেওয়া হয় :—

(১) পাঁচ জন বেয়ারার একদিনের মজুরী ১৲ টাকা।

(২) ঐ সংখ্যক লোকের অর্দ্ধদিনের মজুরী ॥০ আনা।

(৩) সূর্য্যোদয় হইতে বেলা বারটা, অথবা, যে কোন সময় ৮ ঘণ্টার কাজকে অর্দ্ধদিনের কাজ বলিয়া ধরা হইবে।

(৪) কলিকাতার বাহিরে ৫ মাইল, অথবা, আরও বেশী দূরে গেলে, প্রত্যেক বেয়ারা দৈনিক ।০ চারি আনা পাইবে।

---

(১৮) Good Old Days of Hon'ble John Company, vol. II, p. 60-61.

(১৯) Good Old Days of Hon'ble John Company, vol. II, p. 61-62.

(২০) ইনি বলেন যে এক পরিবারের ৪ জন লোক ছিল এবং চাকরের সংখ্যা ছিল ১১০। Calcutta, Old and New by Cotton, p. 98.

(২১) Good Old Days of Hon'ble John Company, vol. II, p. 62.

(২২) Good Old Days of Hon'ble John Company, vol. II, p. 14.

(২৩) সেকালের সাহেবরা হুঁকা-কলিকায় তামাক খাইতে খুব অভ্যস্ত ছিলেন। প্রত্যেক খানার সময় সাজা তামাক লইয়া হুঁকাবরদারেরা উপস্থিত থাকিত। মেমসাহেবরাও তামাক খাইতেন। ১৮৪০ খৃঃ অব্দের পর এই প্রথা উঠিয়া যায়। Calcutta, Old and New by, Cotton, p. 96.

(৫) চারি ক্রোশ অর্থাৎ আট মাইল পথ গমন করিলে, উহাই একদিনের কাজ বলিয়া ধরা হইবে। (২৪) আজকাল কলিকাতায় পাল্কী আরোহণ রাজতুল্য ব্যক্তির কাজ।

১৭৮৫-১৮২০ খৃঃ অব্দে বীরভূম অঞ্চলে সাধারণ মজুরীর দর ছিল এক আনা হইতে সাত পয়সা রোজ। (২৫)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সেকালে বাজার-দরও যেমন সস্তা ছিল, যাহারা কিনিয়া খাইবে তাহাদের রোজগারও আজকালকার তুলনায় খুব কম ছিল।

পক্ষান্তরে, আজকাল কোন কোন বিষয় এত সস্তা যে, সেকালের লোকে তাহার কল্পনাও করিতে পারিত না। যে ডাকের অসুবিধা হইলে ভদ্র, অভদ্র অনেক লোকের ঘোর অসুবিধা হয়, পূর্ব্বে তাহার খরচ ছিল এইরূপ— (২৬)

১৭৯৫ খৃঃ অঃ

কলিকাতা হইতে	আড়াই তোলা ওজনের চিঠি
বেণারস	।✓০
পাটনা	।/০
বারাকপুর	/০
রাজমহল	✓০
মুঙ্গের	।০
চট্টগ্রাম	।৶০
মাদ্রাজ	১৶/১০
হায়দ্রাবাদ	৷৶০
পূণা	১।০
বম্বে	১৷/০
ঢাকা	✓০

যে যুগে সাধারণ লোকে মোটেই চিঠিপত্র পাঠাইতে পারিত না, পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা তাহার তুলনায় অসাধারণ উপকার করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। আর উহার সহিত এখন আকাশ-পাতাল তফাৎ।

কলিকাতা হইতে ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের ডাক লইয়া যে নৌকা যাইতেছিল, ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে ৮ই নবেম্বর উহা নদীবক্ষে উল্টাইয়া যায় এবং চিঠিপত্র সব নষ্ট হয়। ঐ চিঠিপত্রের যে তালিকা বাহির হইয়াছিল, তাহাতে তৎকালীন ডাকের পরিমাণ বুঝা যায়। তালিকা এই :— ভাগলপুরের ডাক, চারখানি সরকারী এবং চারখানি বেসরকারী চিঠি, মর্ণিং-পোষ্ট (Morning Post) কাগজ একখণ্ড, এবং বার খানি সাময়িক পত্রিকা ; মুঙ্গেরের ডাক, দুইখানি সরকারী এবং ৩ তিনখানি বে-সরকারী চিঠি, এবং ৮ আটখানি সাময়িক পত্রিকা। (২৭)

সেকালের যাতায়াতের খরচ কিরূপ ছিল, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যায়।

কলিকাতা হইতে পাল্কী ডাকে যাতায়াতের খরচ :— (২৮)

চন্দননগর	২৪৷০
হুগলি	৪৬।০
মির্জ্জাপুর	৭৬
কাশিমবাজার } মুর্সিদাবাদ }	১৫৯৷০
রাজমহল	২৫৭৷৶০
ভাগলপুর	৩৫৪৷৶০
মুঙ্গের	৪০৬।০
পাটনা } বাঁকিপুর }	৫৪০
দিনাপুর	৫৫৩৷০
বক্সার	৬৬৪৷৶০
বেণারস	৭৬৪

জলপথেও ব্যয় বড় কম ছিল না।

১৭৮১ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত তালিকার নিম্নলিখিত ভাড়া লেখা আছে :— (২৯)

৮ দাঁড়ের বজরা	২ টাকা রোজ।
১৬ " "	৬ " "
২৪ " "	৮ " "

এখানে দেখা যাইতেছে দাঁড়ীরা রোজ ।০ ও ।৶০ ছ-আনার কম পারিশ্রমিক পাইত। কারণ বজরার ভাড়া কাটিয়া রাখিয়া তবে দাঁড়ীদিগকে মজুরী দেওয়া হইত।

যাতায়াতে সময়ও বেশী লাগিত। জলপথে নিম্নলিখিত সময় লাগিত :— (৩০)

কলিকাতা হইতে—

বহরমপুর	২০ দিন।
মুর্সিদাবাদ	২৫ "
রাজমহল	৩৭৷০ "
মুঙ্গের	৪৫ দিন
পাটনা	৬০
বেণারস	৭৫
কানপুর	৯০
ফৈজাবাদ	১০৫
মালদহ	৩৭৷০
রংপুর	৫২৷০
ঢাকা	৩৭৷০
চট্টগ্রাম	৬০
গোয়ালপাড়া	৭৫

(২৪) Good Old Days of Hon'ble John Company, vol. II, p. 70.

(২৫) Annals of Rural Bengal, Hunter, p. 424.

(২৬) Good Old Days of Hon'ble John Company vol. I, p. 483.

(২৭) Good Old Days of Hon'ble John Company, vol. I, p. 484.

(২৮) ঐ ঐ ঐ p. 488.

(২৯) Good Old Days of Hon'ble John Company, vol. II, p. 15.

(৩০) ঐ ঐ ঐ

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে দু-চারিটী কথা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

প্রথম ইংরেজী শিক্ষার আমলে দলে-দলে ইংরেজী-শিক্ষিত ছেলেরা খৃশ্চান হওয়ার দিকে ঝুঁকিয়াছিল। অনেকে আন্দাজ করেন, ইহার কারণ, সেই সময়টাতে এদেশে উচ্চাঙ্গের শাস্ত্রতত্ত্ব সাধারণের নাগাল পাওয়ার অবস্থায় সুলভ ছিল না (খুব সম্ভব, জিনিষটা ঠিক সাধারণের জন্য সৃষ্ট নয় বলিয়াই)। অথচ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আগত খৃশ্চান পাদরীরা তাঁদের ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চাটা খুব জোরের সঙ্গেই করিতে লাগিয়া গিয়াছিলেন। ঘরে শালগ্রাম-শিলায় ভগবানের অর্চ্চনা হয়। পূজার মন্ত্র এই—"সহস্রশীর্ষা পুরুষং সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ সভূমিং সর্ব্বতঃস্পৃষ্টা অত্যাতিষ্টদ্দশাঙ্গুলম্।" ছেলে বিশদার্থ চাহে না। পাদরী বলিলেন, "নোড়ানুড়ি ফেল সাগরের জলে।" ছেলে দেখিল, নিজের ঘরের পূজা-মন্দিরে সেই নোড়ানুড়ি। ফেলিয়া দিল। আত্মীয়েরা কপালে করাঘাত করিলেন। প্রতিবেশী বলিলেন, "জাতিভ্রষ্ট!" তেমন করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা সর্ব্বত্র হইল না যে, বাস্তবিকই পূজা ঐ শিলামূর্ত্তির নহে। পূজা যিনি মহতের চেয়ে মহৎ, আবার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, (অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্) সেই সর্ব্বভূতাধিবাসের। শিলা বা প্রতিমা তাঁহার প্রতীক্ বা 'সিম্বল্'। ইহা ব্যতীত অধিকারী-ভেদে উপাসনা-ভেদের ব্যবস্থা এই সনাতন হিন্দুধর্ম্মে যথেষ্টই আছে,—যাহাতে স্বধর্ম্ম ত্যাগ ও পরধর্ম্ম-পীড়ন ব্যতিরেকেও, অনায়াসে এই ধর্ম্মবৃক্ষের ছায়ায় বিচরণ পূর্ব্বকই ধর্ম্ম লাভ করা যাইতে পারে।

রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির অভ্যুদয় হইল। মুদ্রা-যন্ত্রের কল্যাণে শাস্ত্র-সকল সাধারণের দুষ্প্রাপ্য রহিল না। এখন দুপাতা বাংলা ও আধপাতা সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াই যে খুসী গীতা উপনিষদের বাণী আবৃত্তি করিতেছে। এক্ষণে আর স্বদেশে বা বিদেশে (নিতান্ত মূর্খ ব্যতীত) হিন্দুধর্ম্মকে পৌত্তলিক ধর্ম্ম বলিয়া অবজ্ঞা করিবার পথ নাই; এবং নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে খৃশ্চান হওয়ার ফ্যাসনও বদল হইয়াছে। তাই বলিয়াই কি দেশে ধর্ম্মের আবহাওয়া জোর করিয়াছে বলিতে হইবে? 'ফলেন পরিচীয়তে' এই যে কথাটা আছে, যে, ফলেই কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু পরিচয় কিছু পাওয়া গেল কি? অজ্ঞতার এবং বিজ্ঞতার সম পরিণাম দাঁড়াইল না কি? শাস্ত্রের অপ্রচার বা শাস্ত্রে অনধিকারী করায় যদি দেশে অজ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে আজ যখন শাস্ত্র স্ত্রী-শূদ্র সকলেরই আয়ত্তাধীনে আসিল, তখন জ্ঞানের উজ্জ্বলতর জ্যোতিঃতে দেশবাসীর অন্তরগুহা আলোকিত হইল না কেন? জ্ঞানীর যে লক্ষণ, 'সমদুঃখ-

সুখসন্তসম লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন' তাহা আজকালকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কয়জন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে খুঁজিয়া মিলে? জ্ঞানীর এ পরিচয় পুঁথিগত হইবার উপক্রম করে নাই কি?

লোক বলিবে, তুমি যে কুরুক্ষেত্রময় অর্জ্জুন খুঁজিতে আরম্ভ করিলে! অথচ সেই কুরুক্ষেত্রেও একটী ভিন্ন দুইটী অর্জ্জুন ছিল না। আমি বলিব, তবে আর ভগবানের অতবড় গীতাখানা প্রচার করিয়া ফললাভ কি হইল? বস্তুতঃ, শিক্ষা-প্রচার জিনিষটা শুধুই দু'একজন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়; সাধারণেরই জন্য। যিনি স্বতঃসিদ্ধ পণ্ডিত, স্বয়ংসিদ্ধ জ্ঞানী, তিনি ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিভূতি, পুরুষসিংহ! তাঁরা লোকশিক্ষা দিতে আসেন, নিতে আসেন না। শিক্ষাপ্রচার অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা সর্ব্বসাধারণের জন্য। ইহার ফল যদি উহাদের মধ্যে প্রকটিত না দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, উহা সুপ্রচারিত হয় নাই।

বীজ বপন করিলে বৃক্ষ হয়। এই কথাটা সাধারণ ভাবে মিথ্যা না হইলেও, অখণ্ডনীয় সত্যও নহে। 'বীজ বপন না করিলে কখনই বৃক্ষ জন্মিতে পারে না',—এই হেতুই ইহা আংশিক সত্য; কিন্তু বীজ বপন করিলেই যে বৃক্ষ জন্মিবে, এমনও তো কোন প্রমাণ নাই। প্রথমতঃ, বীজ বপনের পূর্ব্বে জমিটী তৈয়ারি হওয়া চাই। জমি উর্ব্বরা হওয়া প্রয়োজন। জমি নিড়াইয়া জলসেকে আর্দ্র হইলে, মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক বীজটি পুঁতিতে হইবে (বীজের মধ্যেও ফলোৎপাদিকা শক্তি নানাকারণে নষ্ট হইতে পারে)। তারপর অঙ্কুরোদ্গম হওয়ার পর হইতে বিবিধ উপায় ও যত্নে সন্তান-স্নেহে উহাকে জিয়াইয়া রাখিয়া, লালন ও পালন করিতে হয়। তবেই হয় ত কালে উহার ফললাভ সম্ভব হয়। আমাদের দেশে এই যে অজস্র শাস্ত্রপ্রচার, ৺রামকৃষ্ণ, ৺বিবেকানন্দ, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৺ভাস্করানন্দ, জ্ঞানানন্দ, আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপকার প্রভৃতির এবং আরও অনেকানেক মহাত্মা মহাপুরুষের জীবনাদর্শ ও উপদেশবাণী সকলি যেন ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে, ইহার কারণ ধর্ম্মবীজ বপনের জমির অবস্থা মোটেই ভাল নয়। কারণ? কারণ তাহাতে যে সব আগাছার জঙ্গল জন্মিয়াছে, তদ্দারা উহার সমস্ত উর্ব্বরতা শক্তিকেই উহা গ্রাস করিয়া লইয়াছে। সোজা কথা এই যে, আমাদের দেশে এই যে ধর্ম্মভাবের হ্রাস দেখা যায়, ইহার প্রধান এবং প্রবলতম কারণ, আমাদের রাজার দেশের ধর্ম্মহীনতা। ইয়োরোপ আজ আমাদের জীবনের আদর্শ! সেই ইয়োরোপ আজ অধ্যাত্ম বেদের জটিলতা-পাশ ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়া, জড়তত্ত্বাবর্ত্তের গুণগানে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, ইয়োরোপে এক্ষণে ধর্ম্মচর্চ্চার স্থান জড়বিজ্ঞানেরই অধিকৃত হইয়াছে। ধর্ম্মচর্চ্চা যৎকিঞ্চিৎ এতটুকু। সেই অবশেষটুকু পাদরী সম্প্রদায়ের মধ্যেই নির্ব্বাসিত। আমাদের দেশকে ইয়োরোপের মন্ত্রশিষ্য বলিতে পারা যায় না। শিষ্যের ধর্ম্ম গুরুর পদাঙ্কানুসরণ। আবার কখন-কখনও শিষ্যের কাছে উপদেষ্টা গুরুরও পরাভব প্রাপ্তির কথা শুনা যায় (যেমন কোন-কোন বিষয়ে জাপানীরা ইয়োরোপকেও পরাস্ত করিতে পারিয়াছে)। এ দেশে ইহাকে বলে গুরুমারা বিদ্যা। কিন্তু এ দেশ কি তাহার গুরুদেবের অনুসরণে স্বদেশের সর্ব্বপ্রকার হিতের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতে, জড় প্রকৃতিকে ক্রীতদাসীত্বে আনয়নপূর্ব্বক অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত-অদ্ভুত আবিষ্কার সকল করিতে, ঐহিক সমুদয় পূর্ণ সুখ-সৌভাগ্যের চরমশিখরে নিজ দেশের উত্তর পুরুষকে আরোহণ করাইতে, অপরিসীম অধ্যবসায়, আত্মত্যাগ ও অসাধারণ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে? তবে, ইহাকে শিষ্য কেমন করিয়া বলিব? অগত্যা দাস বলাই সঙ্গত। দাসের ধর্ম্মই এই যে, সে প্রভু-জাতির অনুকরণ করাতেই জীবনের চরম সার্থকতা অনুভব করিয়া থাকে;—স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য কখনই বেশী দিন রক্ষা করিতে পারে না। একদিন সমস্ত মানবজাতির পরিচালক জাগতিক সর্ব্বপ্রধানতম সভ্যতার প্রচারকগণ যে দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে জাতি যে আজ বাহিরের মতই তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়াই দাসত্বকে বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহা তাহার সর্ব্ব শরীর ও মনেই আজ ফুটিয়া উঠিতেছে। তাই আজ ইয়োরোপীয় ভীষণ ধর্ম্মহীনতা আমাদের মধ্যেও সংক্রামিত। আর অর্দ্ধমৃত অক্ষমদের মধ্যে যেমন সংক্রামক রোগেরও প্রতিষেধ সম্ভব হয় নাই, তেমনই ইহাও অপ্রতিবিধেয় হইয়া উঠিয়াছে। মহাপুরুষগণ দর্শন দিলেন; আশা দেখা দিল; তাঁদের জলদমন্দ্রস্বরে আহ্বান আসিল 'উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ'। উত্থানশক্তি বারেক স্পন্দিত হইল;—কিন্তু হায়, মোহাচ্ছন্ন রোগীর ক্ষণিক মোহাপনোদনেরই ন্যায় কি অচিরস্থায়ী সে আশা!

তবে সত্যই কি আর আমাদের এ দেশে উন্নতির কোনই আশা নাই? দিনে-দিনে পরানুকরণে রত, পরপদসেবী, এ

জাতি কি জগতের যে কোন স্বল্পজীবী দাসজাতির মতই ধীরে-ধীরে কালের তরঙ্গ মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে? হিন্দু বলিতে কিছুই কি আর তাহার বাকী থাকিবে না? অসম্ভব! এই মহাজাতির উপর দিয়া অনেক প্রলয় ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে শাখা, মহাশাখা পর্য্যন্ত ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। তথাপি এ মহাবৃক্ষ আজও কেহ সমূলে উৎপাটিত করিতে পারে নাই। আমাদের দেশেরই কোন শাস্ত্রকার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বং নযায়তে।' কয়লাকে শতবার ধৌত করিলেও তাহার মলিনতার নাশ হয় না। ভক্তবীর তুলসীদাস ইহার জবাব গাহিলেন, 'সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ বতাওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ, তব্ কয়লা কি ময়লা ছুটে, যব্ আগ্ করে পরবেশ।' কথা এই যে, 'জ্ঞানের' অগ্নি যদি অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তবে সেখানে যতবড় কয়লাই থাক্ না কেন, সে তাহাকে দগ্ধ করিয়া, নিজের ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা উহাকেও উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিবেই।' অঙ্গার শত ধৌতি দ্বারাও নিজের স্বভাব যে ত্যাগ করে না, তার কারণ এই যে, ঐ উপায় উহার পক্ষে ঠিক পথ নহে। অগ্নি-সংযুক্ত হইলে, অর্থাৎ তাহার নিজস্ব পথ, উন্নতির যথার্থ পথ প্রাপ্ত হইলে, সেই অঙ্গারই আবার উজ্জ্বলতম আভা ধারণ করিতে সমর্থ। এই যে অজ্ঞানান্ধকার নাশের উপায়,—ইহাই জ্ঞানাগ্নি! গীতাকার বলিয়াছেন, 'জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেৰ্জ্জুন!' এই জ্ঞানের পথকে অনুসরণ করিলে, জীবনের জটিলতার গ্রন্থি স্বতঃই খুলিয়া যাইবে। কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য খুঁজিবার জন্য উচ্ছৃঙ্খলতার আদর্শ নবযুগের রাঙ্গাবাতি (ডেন্‌জার সিগ্‌নাল)-ধারী ভ্রান্ত পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন হইবে না; নিজের হৃদিস্থিত হৃষীকেশই সকল বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন। অতএব হউন নর, হউন নারী,—প্রকৃত জ্ঞানের পথ, ধর্ম্মের পথ (ধর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়) অন্বেষণ করিয়া লউন। জগতে খুঁজিলে মিলে না, এমন কিছু আছে কি? আবার দেখুন, জ্ঞানের পথ কোন দিনই কাহারও জন্য রুদ্ধ নাই। কোন পথই প্রকৃতপক্ষে কাহারও জন্য কোন দিনুই রুদ্ধ থাকে না। শুদ্ধমাত্র অধিকারীভেদে পথভেদ আর্য্যশাস্ত্রকারগণ নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন। তবে মানুষ নিজেকে সহজে নিম্নাধিকারী বলিয়া নিজের মনের কাছেও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে; তাই বিঘ্নসঙ্কুল উচ্চ পথে আরোহণ করিতে যায়; ও অপারগতায় শেষে পথ-প্রদর্শকের প্রতি গালি পাড়িতে বসে। বেদ যখন শ্রুতি ছিল, তখন খুব সম্ভব মন্ত্রশুদ্ধি ও বিকৃতি ভয়েই স্ত্রী-শূদ্রের তাহাতে অধিকার ছিল না। কিন্তু উহার প্রধানতম অংশ জ্ঞানকাণ্ডে, গীতায়, পুরাণে, ষড়্‌দর্শনে, সমুদয় বেদাঙ্গে, পূর্ণ জ্ঞানমার্গে, কাহাকেও তো অনধিকারী করা হয় নাই; এবং এক্ষণে তো চারিদিক হইতেই এই জ্ঞানভাণ্ডার লুটিবার সুবন্দোবস্ত করাই হইতেছে। তবে এই মহামণিময় রত্নমুকুট শিরে ধারণ করিবার আগ্রহ ও আবেগ কই? হোন নর, হোন নারী, এই শুভের পথে, সত্যের পথে আজ আপনারা একান্ত উত্তমে, একান্ত আগ্রহে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হোন। তবে এক কথা, এই জ্ঞানমার্গাবলম্বনের প্রথমেই পরীক্ষা করিয়া লইবেন যে, যে পথটী অবলম্বন করিলেন, উহা সুপথ। ভিত্তিমূল শিথিল হইলে অট্টালিকা যতই সুচারু নির্ম্মিত হউক তাহার পতন ভয় ততই সমধিক। ধর্ম্ম-হীন শিক্ষাও তেমনি লোক সাধারণের পক্ষে কোন লাভের প্রকৃত পথ না হইয়া বিপথেই পরিণত হইয়া থাকে। শাস্ত্র ধর্ম্মের তত্ত্বকে গুহা-নিহিত (ধর্ম্মস্ব তত্ত্ব নিহিতং গুহায়া) এবং সেই গুহা-প্রবেশের পথকে দুর্গম পথ, এবং ক্ষুরস্য ধারার সহিত উপমিত করিয়াছেন। অতএব সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ ও আত্ম-সুখপরায়ণতা যে শিক্ষার বীজ মন্ত্র, সে শিক্ষা সেই গুহা নিহিত দুর্গম পথের শিক্ষা যে নহে, ইহা অত্যন্তই সুস্পষ্ট। আর সেই সব যে শিক্ষা, উপনিষদ তাদের অবিদ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন ও বলিয়াছেন, 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তিঃ যেহবিদ্যামুপাসতে?' অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঐ শিক্ষা ভগবৎ সান্নিধ্য হইতে দূরে লইয়া যায়। এক্ষণে একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইদানীং যে শিক্ষা আমাদের কন্যাপুত্রের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে আর যা থাকুক, তত্ত্বলাভের কোনই পথ নাই। অনেকের মুখে শুনা যায় যে, বয়স হইলেই আপনি ধর্ম্মে মতি হইবে। কথাটা কি বেশ সঙ্গত? অবশ্য দৃষ্টান্ত সব বিষয়েরই দু'দশটী না পাওয়া যায়, সংসারে এমন কোন কিছুই নাই। মহাপাপীদের একটি কোন আকস্মিক ঘটনার আঘাতে সহসা মহাপুণ্যাত্মায় পরিণত হইতে দেখা যায় সত্য বটে, কিন্তু সেও সেই ব্যতিক্রম। তদ্ভিন্ন আরও এক কথা, পতন-শক্তি যাহাদের অতিশয় বেগবান্, উঠিবার

ক্ষমতাও তাদেরই মধ্যে প্রচুরতর। মোট কথা তাহারা শক্তিমান্; বাঁকা পথে অগ্রসর হইতেও তাদের বাধে নাই —সোজা পথেও না। সাধারণ ভাবে দেখা যায়, চিরদিন অর্থের ও কামের সেবা করিয়া, সহসা জীবনের শেষক্ষণে অকস্মাৎ একদিন ধার্ম্মিক হইয়া উঠা স্বাভাবিক নহে। তাঁদের যতটা ধার্ম্মিক দেখায়, তার মধ্যে সাড়ে চৌদ্দ আনাই প্রায় শারীরিক ক্ষমতা-হ্রাস-প্রাপ্তির পরিণাম মাত্র। এই জন্যই মানব-শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মের স্থানই নির্দিষ্ট। ধর্ম্ম-শিক্ষায় চরিত্র গঠিত হইলে, অর্থোপার্জ্জন ও কাম্যোপভোগ, এবং পরিশেষে আজীবন ধর্ম্মাচরণের ফল-লাভ মোক্ষপ্রাপ্তি—ইহাই সনাতন বিধি। হিন্দুর আশ্রম-ধর্ম্ম এই নিয়মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাল্যাবধি মধ্য যৌবনে দৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা ছেলেরা দীর্ঘায়ু ও নীরোগ-শরীর হইত। ধর্ম্ম-সংযুক্ত বিদ্যালাভান্তর গঠিত-চরিত্র যুবকগণ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। মেয়েদের যদিও গুরুগৃহ-প্রবাসের ব্যবস্থা ছিল না (বৌদ্ধযুগে দু'এক স্থলের কথা শুনা যায় মাত্র); তথাপি স্বগৃহে বাস করিয়াই তাহারা ত্যাগ-সংযত-স্বভাবা, পরসুখে আত্মসুখাসুখ নিমজ্জনকারিণী জননীগণের সহায়তায় সেইরূপেই ত্যাগ-ধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন। ব্রত-উপবাস, অতিথিসেবা, পিতার ছাত্রবর্গের প্রতি সমুচিত ব্যবহার, রোগীর শুশ্রূষা, প্রতিপাল্যের প্রতি আত্মীয়-ভাব পোষণ—এ সকলের অপেক্ষা কোন্ শিক্ষা মহত্তর, কেহ বলিতে পারেন? ব্রত-উপবাস প্রভৃতি কৃচ্ছ্র সাধন,—আজ যাহা আমাদের কন্যাগণকে আমরা নিতান্তই নোংরা জিনিষের মত পরিত্যাগ করাইতেছি, ত্যাগ-ধর্ম্মের দীক্ষার পক্ষে তাহার স্থান নিতান্তই তুচ্ছ করিবার মত ছিল না। মানুষ হঠাৎ একদিনে যীশুখৃষ্ট হইয়া দাঁড়ায় না। যিনি যত বড় পণ্ডিতই হোন, এক শুকদেব ব্যতীত আবহমান কাল হইতে সকলকেই সেই ক খ করিয়াই পড়াশোনা করিতে আরম্ভ করিতে হইয়াছে। উর্দ্ধে উঠিবার জন্য একটির পর একটি করিয়া সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিতে হয়। তা যিনি যতটা উপরে উঠিবেন, তাঁহার উঠিবার সোপানের সংখ্যা ততই অধিক। মানুষ বড় অভ্যাসের দাস। ভালমন্দ সে যেটুকুই শেখে, শৈশব হইতেই শেখে। বার-তের বছরের বৌমা-গুলি তাঁদের বাপের বাড়ী হইতে যে শিক্ষা লইয়া শ্বশুর-ঘরে পদার্পণ করেন, সেগুলি তাঁহারা চিরজন্মেও কি আর ভুলিতে পারেন? তা যদি হইত, তাহা হইলে ছেলের বিয়ের সময় ভাল ঘরের মেয়ে লোকে খুঁজিয়া বেড়াইত না। মানুষ স্বভাবতঃই বড় আলস্যপ্রবণ,—জীবনের গতিও নদী-স্রোতের মতই নিম্নগামী। জীবের সাধারণ ধর্ম্ম আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতিই। এ বিষয়ে সামান্য কীট ইত্যাদির সহিত তাহার প্রভেদ নাই। তবে যে মানুষ আজ জীবশ্রেষ্ঠ, সে শুধু নিজের সেই নিম্নাভিমুখী প্রবৃত্তিকে, কঠোর নিয়ম-সংযমের সুকঠিন আল বাঁধিয়া, সম্পূর্ণ বিপরীত পথে ফিরাইতে পারিয়াছে বলিয়াই। এই বাঁধ যত শক্ত হইবে, নদীর স্রোত ততই হইবে উর্দ্ধমুখী। নতুবা আসল মানুষের নগ্ন মূর্ত্তি—সে তো অসভ্য জাতির মধ্যে কতকটা, প্রমত্ত ব্যক্তির মধ্যে কিছু, এবং উন্মাদের ভিতরে অনেকখানিই প্রকটিত। কি বীভৎস সে রূপ!

তবে কথা এই যে, এখন আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার যে সহজ অঙ্গটা, অর্থাৎ উহাদের মধ্যের অধ্যবসায়-শক্তি, গবেষণা-শক্তি, সম্মিলন-শক্তি, স্বদেশ ও স্বদেশীর জন্য আত্ম-ত্যাগ-শক্তি ব্যতীত আর যে চাকচিক্যময় বাহ্য রূপটা, সেটার প্রলোভন এতই যে, তার মধ্যে যত বড় সর্ব্বনাশই আমাদের জন্য প্রচ্ছন্ন থাক, উহাকে ত্যাগ করিবার শক্তিও আজ আমাদের মধ্যে নাই।

এখন যদি ইহাকে সম্পূর্ণ রূপে বর্জ্জন করিয়া, আবার সেই পূর্ব্বতন কালের গোময়লিপ্ত গৃহাঙ্গনে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করা হয়, তো সে কথা বাতুলের প্রলাপের সহিত উপমিত হইয়া, একটা অহেতুক হাস্য-রসের সৃষ্টি করিবে মাত্র। অতএব সেকালের নিয়ম ভাল ছিল, কি ছিল না, সে তর্ক তুলিয়া বৃথা কালক্ষেপের প্রয়োজন নাই। এখনকার পক্ষে যেটুকু প্রয়োজনীয়, সেই সম্বন্ধে কথা বলাই যুক্তিসঙ্গত। আমার বিশ্বাস (পূর্ব্বেও বলিয়াছি) আমাদের ছেলেমেয়েদের ধর্ম্ম-শিক্ষার দিকটাকে এতখানি শিথিল করিয়া রাখিলে, তাহাদের সঙ্গে যতবড় শত্রুতা করা হইবে, জার্ম্মানীও ইংরেজের সহিত তেমন শত্রুতা করিতে চেষ্টা করে নাই। কুসংস্কার বলিতে যে কতটা বুঝায়, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। প্রতিমায় চিত্ত স্থির রাখিয়া ভগবৎ-আরাধনা, অভ্যাস স্থির রাখার জন্য দীক্ষা-গ্রহণ, শাস্ত্র-শাসনে সম্মাননা, সন্ধ্যা উপাসনা প্রভৃতির সময় উপস্থিত হইলে আহার-সংযম, হিন্দু আচার-বিবর্জ্জিত গৃহে পান-আহার না করা, দৈব ঔষধ নামে ব্যবহৃত (বহু স্থলে) অসাধারণ রূপে ফল প্রাপ্ত নানাবিধ মাদুলি

কবচ প্রভৃতিতে সরল ভাবে বিশ্বাস স্থাপন—এ সকল তো নিন্দিত ছিলই; অধিকন্তু গুরুজনের প্রতি আনুগত্যটাও আজকাল এই দলের মধ্যেই আসিয়া পড়িল দেখিতেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদটা সমাজ গড়িবার না ভাঙ্গিবার মন্ত্র? ব্যষ্টি দ্বারা কখনই কোন জিনিস গঠিত হয় না। ঈশ্বর যখন বহুধা, তখনই সৃষ্টি; এবং যখন এক, তখন লয়, বা আনীদবাতম্ যে অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, তদবস্থা। এই 'ইন্‌ডিভিজুয়্যালিজম্' বা ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতার অল্প-বিস্তর ফল সারা ইয়োরোপই ভোগ করিতেছে। তবে সেটা সম্পূর্ণ সফল হইয়া উঠিয়াছে রুষ সাম্রাজ্যে। ইহারা দু'একটা স্ফুলিঙ্গ প্রাপ্তে এদেশের চিরন্তন বিচার-পদ্ধতি উল্টাইয়া দিয়াছিল। তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে রাজভক্ত হিন্দুর নামে রাজদ্রোহের কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসন্তান ইহার সংস্রবে আসিয়াই গুপ্তহত্যা, নারীহত্যা পাপেও পঙ্কিল হইয়া, দেশের উদ্বোধিত শক্তির অকালে অপব্যয় করিয়া ফেলিল! ইয়োরোপের পক্ষে এ কিছুই নয়; কিন্তু হিন্দুর পক্ষে এ মহাপাপ। ধর্ম্ম-শিক্ষার শিথিলতা দ্বারা দেশের ছেলেদের পক্ষে এ-সবও সম্ভব হইতেছে। নব্য-শিক্ষায় এই ব্যক্তিত্ববাদটা এতই ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে যে, বাংলার একখানা প্রধানতম সংবাদপত্রে কোন নব্য শিক্ষিত এমন কথা লিখিতেও প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন—"এতে বিস্ময় বা ক্ষোভের কোন কারণ দেখি না। এ যে যুগ-লক্ষণ। এ যে বড় আশারই কথা! এখন আর তরুণের দল সবাই বাবা খুড়ো মামা মেশো পিশে মাষ্টার মশাই বা ঘুণধরা শাস্ত্রের কথায় ওঠ-বোস করতে সম্মত নয়।......বিনয় মানে দাসত্ব নয়।"

'বিনয় মানে দাসত্ব' না হইতে পারে; ঔদ্ধত্য, অসংযমে, ধৃষ্টতায় কোন্ উচ্চবল নিহিত আছে, তাহা আমাদের মত সেকেলে লোকেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আচ্ছা, বাবা, খুড়ো, মেশো, পিশেকে না হয় অসম্মানই করিলাম, সেটা সহজ বটে। কিন্তু মনীষের বেলা কেমন ব্যবহারটী করিব, সেটি তো কই জানা রহিল না? কুসংস্কার দূর করিয়া সেকেলে পচা, পুরান, ঘুণধরা আচারের গণ্ডী হইতে নিজেদের তো বটেই,—মেয়েদেরও উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের দেশের একদল চরমপন্থী বদ্ধপরিকর হইয়া আছেন। সংবাদপত্র ও মাসিক-পত্রিকার উপন্যাস প্রবন্ধে ঠিক ঐ খৃশ্চান মিশনারীদের সুরেই ইঁহারাও আওড়াইতেছেন—নোড়ামুড়ি ফেল সাগরের জলে। অধিকন্তু খৃশ্চান মিশনারীদের চেয়ে এঁদের পরিচিত ভাষার আহ্বান মানুষের কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিতেছে বেশী; এবং এই পথটাই না কি সংসারের সকল যাত্রা-পথের চাইতে সবচেয়ে সোজা পথ। তাই তাঁদের কথার চেয়েও কাজের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে লোকাভাব ঘটিতেছে না। এই যে হিন্দুয়ানীর অচলায়তন চূর্ণের কন্‌ক্রীট দিয়া তৈরী রাস্তা, এর শেষে কোন দেবায়তন তো নাই-ই,—চার্চ্চ, মস্‌জিদ, প্যাগোডা, এমন কি একটা ব্রহ্ম-মন্দিরও দেখা যায় না। এ পথ একেবারে উদ্দাম ভাবেই খোলা পথ। এ পথের যাত্রী ছেলেমেয়েদের ব্রত, উপবাস, পূজার্চ্চনা, প্রার্থনা, উপাসনা—কোন কিছুই করিতে হয় না। মহম্মদ বা যীশু খৃষ্টকে সম্মান প্রদর্শন করিতে কোন মুসলমান বা খৃষ্টান ছেলে-মেয়ের মনে লজ্জা হইবে না; কিন্তু নব্যতন্ত্রের হিন্দু-সন্তানদের রামকৃষ্ণের প্রতি মনে-মনেও কোন শ্রদ্ধা সঞ্চিত থাকিলে, তাহা সযত্নে গোপনের চেষ্টা করিতে হয়। নিজের ধর্ম্ম, নিজ সমাজের আচার-ব্যবহার, নিজের দেশের রীতিনীতি,—এ সকলই শুধু বিদেশীয়ের কাছেই নয়, দেশী-ভাবাপন্ন আত্মীয়, কুটুম্ব, প্রতিবেশীর সাক্ষাতেও গোপন-চেষ্টায় পলে-পলে আরক্ত-গণ্ড হইতে হয়।

এর উপর অবস্থার চতুর্গুণ ব্যয়ে ঋণগ্রস্ত ও অসুখী জীবন যাপন নব্যশিক্ষার একটা অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইতেছে,—এ কথা পরস্পরেরই কিছু-কিছু জানা এবং শুনা আছে। জিজ্ঞাসা করি, সেও কি এই ধর্ম্মশিক্ষার শৈথিল্যজাত নহে? ধর্ম্ম মানুষকে কি শিক্ষা দেয়? বিশেষ-বিশেষ মহাজনদের কথা ছাড়িয়া দাও, ধর্ম্ম মানুষকে মানুষ হইতেই শিখায়। মানুষের পক্ষে মানুষের ধর্ম্মই তাহার স্বধর্ম্ম। এখন মানুষ বলিতে দ্বিপদ বিশিষ্ট জীববিশেষকে বুঝাইলেও, মানুষের মধ্যে যে বস্তুটা মনুষ্যত্ব, সেটা শুধুই ওই আহার, নিদ্রা, ভয় ইত্যাদি জৈব ধর্ম্মই নহে। প্রাতে উঠিয়া সাহেবী অনুকরণে চা-বিস্কুট সেবন, মধ্যাহ্নে সাহেবী কায়দায় টেবিলে বসিয়া ডিনার খাওয়া, অপরাহ্নে খোলা গাড়ি বা মোটরে হাওয়া খাওয়া, সমাজের আপামর সাধারণ সকলকার সহিত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা, এবং মধ্যে-মধ্যে ঠিক নিজের সমপদস্থ নরনারী লইয়া বিলাতী ধরণের আহার-বিহার ও আমোদ-প্রমোদ করা (সমকক্ষ হইলেও সেকেলে সঙ্কীর্ণ রুচিগ্রস্তা

অসত্যাগণ ইহার বাহিরে নিজ দোষেই বাদ পড়িতে বাধ্য হন)---এ ভিন্ন যদি কখন উচ্চ ইংরাজ-সমাজে নিমন্ত্রণ ঘটিল তো কুইন মেরীর সঙ্গে ঠিক সমান পোষাকে সম্মিলিত হওয়ার জন্য সর্ব্বস্বপণে সচেষ্ট থাকাই মানুষের জীবনের আদর্শ নয়। সত্য-সত্য এ ভিন্ন আর কি করা হয়? আর যাঁহারা ঠিক এই নক্সামত চলেন না, অর্থাৎ আহারের বিষয়ে কিঞ্চিৎ সংযত, তাঁহারাও অন্ততঃ মহারাণী কুচবেহারকেও সজ্জায় লজ্জা দিতে যে বিশেষ ব্যগ্র নন, তাও ঠিক বলিতে পারি না।

মেয়েদের এই বিবিয়ানীর নেশা কাটাইতে হইবে। এই সর্ব্বনেশে মৌতাত ছাড়াইবার প্রধান উপায় ধর্ম্ম চর্চ্চা! স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা ব্যতীত কি স্ত্রী-পুরুষ কাহারও চিত্তে প্রকৃত জ্ঞানের স্ফুরণ হইতেই পারে না। জ্ঞান ব্যতীত সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয় না। আধুনিক মতে যে ইংরাজের সর্ব্বপ্রকার অনুকরণেই চিত্তবৃত্তির প্রসারতালাভের উপায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই ইংরাজের ধর্ম্মনীতি অথবা রাজনীতি এবং সমাজনীতিও যে কতখানি সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর সঙ্কীর্ণ রূপেই সংস্থিত, তাহা ইংরাজ চরিত্রাভিজ্ঞ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষিগণের সহিত আলাপে এবং তাঁহাদের লিখিত পুস্তক পাঠ করিলে অনেকেই জানিতে পারেন। আমি এখানে একটা শ্রুত কথার উল্লেখ করিলাম। এক সময়ে মেহেরপুরে চাকরী করার সময়ে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কুক্ এবং আমার পূজনীয় পিতৃদেব একটা গরমের দিনে কি একটা মোকর্দ্দমার তদারকে গিয়াছিলেন। অনেক ক্রোশ পথ ঘোড়া ছুটাইয়া ফিরিয়া আসিলে একটু বিশ্রামের পর পিতৃদেব ঠাণ্ডা হইবার জন্য মুখে চোখে ও কাণে বারবার ঠাণ্ডাজল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। ঐ সাহেবটী আমার পিতার সহিত বিশেষ সুহৃদ্‌বৎ ব্যবহার করিতেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ওরূপ করিতেছ কেন? ওরূপ করিলে কি শরীরের ক্লান্তি দূর হয়?" পিতৃদেব উত্তর করিলেন "মুখে ও কাণে জল দিলে বড়ই আরাম বোধ হয়। আপনি করিয়াই দেখুন না।" ইহা শুনিয়া সাহেব অঞ্জলি পাতিয়া জল লইলেন; এবং মুখের কাছে সেই অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়াও গেলেন; কিন্তু তার পরই কি ভাবিয়া সেই জলাঞ্জলি ফেলিয়া দিয়া, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "না, আমি এরূপ করিতে পারি না; যেহেতু কোন ইয়োরোপিয়ান করেন না।" স্বদেশীয়ের অসাক্ষাতে এবং একজন বিদেশীর সাক্ষাতে অতি সামান্য বিষয়েও নিজ সমাজে অপ্রচলিত এই সামান্য পরানুকরণের দ্বারা নিজের শ্রান্ত শরীরকে একটুখানি স্বাচ্ছন্দ্য হইতে এই যে তিনি স্বচ্ছন্দে বঞ্চিত করিলেন, এবং এতবড় সঙ্কীর্ণ মতটাকে প্রকাশ করিতে এতটুকুও দ্বিধাগ্রস্ত হইলেন না, এর কারণ উঁহারা জেতার জাতি। পরের ঠাকুরের চাইতে এঁদের নিজের কুকুরটার উপরেও শ্রদ্ধা বেশী। আর সে শ্রদ্ধা প্রকাশকে এঁরা গৌরবের চক্ষেই দেখেন; যেহেতু এঁদের মনে আত্মসম্মান-বোধ জিনিষটা খুব স্পষ্ট ভাবে জাগ্রত আছে। আর ঐ-টুকুর অভাব আছে বলিয়াই আমাদের দেশের মেয়ে-পুরুষে নিজের ধর্ম্মকে, নিজের সমাজকে পদে-পদে বিদেশীর কাছেও লাঞ্ছনা-কষাহত করিতে বিন্দুমাত্র কাতর নহেন। তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেছেন, আমাদের প্রাচীন ঋষিরা হইতে অর্দ্ধ প্রবীণ পিতা পর্য্যন্ত সকলেই অর্ব্বাচীন, অজ্ঞ, কুসংস্কারান্ধ। এবং নব্য শিক্ষার মূল-মন্ত্রই এই যে পরানুকরণ করিতেই হইবে। যদি কোন ছেলে একটা ভাল পদ পাইলেন, দুই-চারি শত টাকা বাধা মাহিনা হইল (আর বিলাত ফেরৎ হইলে তো আর কথাই নাই!) তৎক্ষণাৎ (অধিকাংশ স্থলে) একটা বাবুর্চ্চি, সাহেব-বাড়ীর-ফেরৎ তক্‌মা লাগান দু'চারিটা খানসামা, একখানা সাহেবি-কায়দায় সাজান বাংলা গোছের বাড়ী (কলিকাতা হইলে সাহেবদের সহিত ভাগ করিয়া চৌরঙ্গী অঞ্চলের সাহেবী হোটেল বা ভাড়া-বাড়ীর একটা ফ্ল্যাট) এবং নিজের সাহেবী, ও স্ত্রীর শুধু সাড়ীখানা বাদ আর সমস্তই হাল ফ্যাসানের মেমসাহেবের সঙ্গে সমান হিসাবে জুতা, মোজা, ব্লাউস্, পেটিকোটের, চায়না বাসনের গাদা দিয়া নবজীবনের মঙ্গলাচরণ আরম্ভ হইয়া গেল। মেয়েরা যাঁরা তিন পাতা ইংরাজী পড়িয়াছেন, তাঁদের স্বধর্ম্ম, স্বসমাজ —কোন কিছুরই ঋণ স্বীকার করিতে হয় না। তাঁহারা এবিষয়ে স্থানে স্থানে পুরুষদেরও পরাজিত করিতেছেন। তা মেয়েরা শিক্ষিতা এবং স্বাধীনা হইয়া কি দেশের ও দশের কোন কাজে লাগেন? উঁহুঃ। সযত্নে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, সে শিক্ষার সাধারণ্যে প্রচার চেষ্টায় দরিদ্রের পর্ণগৃহে এঁদের অভ্যুদয় ইঁহারা কি কখনও কল্পনা করিয়াও দেখিয়াছেন? স্বাস্থ্যতত্ত্ব সাগ্রহে শিখিয়া প্রতিবেশী দরিদ্র-গণকে সে অমূল্য জ্ঞান দানে এঁদের কোনই আগ্রহ আছে? চিকিৎসা-বিদ্যা যথাশক্তি আয়ত্ত করিয়া (বিশেষতঃ হোমিও-

প্যাথি ও বাইওকেমিক্ চিকিৎসা) রোগাতুর, দীন-হীন স্বদেশীকে অসীম মৃত্যু ও রোগ-যন্ত্রণার হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষার চেষ্টা ইঁহারা কি জীবনের পুণ্যতম ব্রত রূপে পালন করিতে চাহিতেছেন? লক্ষ-লক্ষ অজ্ঞ স্বদেশীর মুখের অন্নগ্রাস স্বরূপ বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিতে কি ইঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারিয়াছেন;—স্বদেশীর প্রতি অন্যায় ব্যবহারের প্রতিকার-কল্পে স্বদেশীয় মহাপ্রাণ নেতার দ্বারা আহুত অনুরুদ্ধ হইয়াও এদেশের সহস্র-সহস্র শিক্ষিত তরুণ-তরুণী নিজেদের দেহ-বিলাসের এতটুকু ব্যত্যয় ঘটিতে দিয়া, দেশ-মাতৃকার সেবাব্রত গ্রহণ করিতে কি কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছেন? না,—কিছু না! কেন? যেহেতু, তাঁদের মধ্যের মনুষ্যত্ব আজ ধর্ম্মশিক্ষার অমৃত-নিষেক অভাবে অচেতন মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের মধ্যে যে শক্তি মনুষ্যত্ব, তাহা সর্ব্ব-ভূতাধিষ্ঠিত চৈতন্য-শক্তির প্রকাশ। আধার যদি মলিন হয়, অভ্যন্তরের অতি উজ্জ্বল আলোক-রশ্মিও বাহির হইবার পথ পায় না। আমাদের অন্তরের আলোকও আজ তাই আমাদের লোভাতুর চিত্তের ঘন বেষ্টনী মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া, আমাদের অমানুষে পরিণত করিতেছে। আমরা শিক্ষা ও স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া শুদ্ধমাত্র বৈদেশিক বিলাসিতার সঙ্গে স্বদেশীয় আলস্যময় ভাবে জীবন যাপনকে সংযোগ করিয়া, এক অপূর্ব্ব-সৃষ্ট জীবে পরিণত হইতেছি। ধর্ম্ম আমরা মানি না; কর্ম্ম আমাদের লোকহিতকর, বা আত্মহিতসাধক নয়, মাত্র আত্ম-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান-জ্ঞান। আমাদের না ব্রহ্মাতত্ত্ব, না বস্তুতত্ত্ব,—শুধু বিলাসতত্ত্বটাই শিক্ষা হইতেছে ভাল করিয়া। যে দেশে অজীন-শয্যায় বল্কল-বসনে বনবাসিনী ঋষি-পত্নী ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতেন, সে দেশের মেয়েদের আটপৌরে নিত্য সজ্জায় একটা ইজের, গেঞ্জি, একটা সেমিজ, দুইটা পেটিকোট, একটা বডিস্, একটা ব্লাউস্, একখানা (অধিকাংশ স্থলেই) শান্তিপুরেস্, বড়জোর ফরাসডাঙ্গার ১২ হাতি সাড়ী, একখানা রুমাল, একজোড়া চটিজুতা,—এতো চাইই। আর পোষাকীর হিসাব রাখিতে স্বয়ং একাউন্টেণ্ট্ জেনারেলও পারেন কি না সন্দেহ। নব্য শিক্ষিত পিতামাতার ছেলে-মেয়ের (বেবি ও মিসিবাবার দল) অসনে-বসনে, শয়নে-ভ্রমণে ইংরাজ-বাচ্ছার সহিত বর্ণ ব্যতীত আর কিছুতে খুব বেশী প্রভেদ নাই। ঘরের মধ্যে খৃশ্চান বা অর্দ্ধ-খৃশ্চান আয়ার সাহায্যে তাঁরা বাংলা বুলি শিখিবার পূর্ব্বাবধিই ইংরাজি বুলি শিখিতে অভ্যস্ত। বাবা, মা, দাদা, দিদি—সকলকারই আটপৌরে পোষাকের মত অষ্ট প্রহরের ভাষাও ইংরাজী। নেহাৎ যারা অতটা দূরে উঠিতে অক্ষম, তাঁদের একটা কথার মধ্যে অন্ততঃ আধখানার চাইতে একটুখানি বেশিবেশি ইংরাজীর বুক্‌নী দিয়া শোধন করা। যাঁদের আয় সহস্রার্দ্ধ বা তাও নয়, তাঁদের চাল দেখিয়া কে না সন্দেহ করিবে যে, পিছনে অন্ততঃ মহারাজা বর্দ্ধমানের সিকি আয়েরও সম্পত্তি একটা আছেই। গাড়ি-ঘোড়া এ যুগে যার নাই, সে তো ছোটলোকের সামিল। মোটর, এরোপ্লেন, সব্‌মেরিণ—এ তো ইচ্ছা করিলে তুমি-আমিও চড়িয়া বেড়াইতে পারি। আবার দুর্ভাগ্যক্রমে যাদের বাড়ীতে পশ্চিমে ঝড়ো হাওয়া এখনও ততদূর জোর করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাদের মধ্যেও অশান্তির জের নেহাৎ কম নয়। বুড়াবুড়ির দলকে (সম্ভবতঃ উত্তরাধিকারিত্বে অর্থ লাভের আশাতেই) স্পষ্ট লঙ্ঘন করিয়া নবোরা নিজেদের বিজয়-নিশান উড়াইতেও সঙ্কুচিত; অথচ মনের মধ্যে এই অধীনাবস্থাটা মরার বাড়া খোঁচা দিতে-দিতে জন্মটাকেই ব্যর্থ বোধ করাইতেছে। এই অবস্থার একটি মেয়ে, ভাসুর সম্পর্কীয়ের নিমন্ত্রণে কতকটা আধুনিক সুখ-সম্পদে পূর্ণ গৃহে আগমন করিয়া, মনের দুঃখে বলিয়াছিলেন—

"এমন একখানা বাড়ী যার নেই, এমন করে যে স্ত্রীকে রাখতে পারে না, তার গলায় মালা দেওয়ার চাইতে দড়ি দেওয়াই ভাল!"

অতঃপর হিন্দু নারীর কি এই আদর্শ দাঁড়াইবে? বিলাসিতা যদি দেশের এতবড় দুর্দ্দিনেও দেশের মেয়েদের জীবনের এতখানি সারাৎসার হইয়া দাঁড়ায়, যাহাতে দেশের মিলের মোটা সুতার মোটা সাড়ী পরিয়া মিলওয়ালাদের প্রাণে উৎসাহ জাগাইতে না পারেন, নেতৃবৃন্দের প্রস্তাবমত বিলাসিতা যথাসাধ্য বর্জ্জন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধপরিকর হইতে না পারেন, তবে কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায় যে, বিলাস-অলসিত জীবন-যাপনই ভারত-নারীর পুণ্যময় ত্যাগ-মহত্বে মহৎ চরিত্রের স্থানাধিকার করিতেছে না?

এ দেশে একশ্রেণীর অপরিণামদর্শী নব্য নারী নারী-মহিমাকে অত্যন্ত ছোট করিয়া দেখিতেছেন। পতি-পুত্রের অন্যায়কেও যে এ দেশের নারী কতবড় প্রেমের বলে, ক্ষমার বলে সহনীয় করিয়া চলিতেছেন, আজও চলেন, ইহার মহিমা

তাঁহারা বুঝিতেই পারেন না। ইহার মধ্যে শুধুই দুর্ব্বলের অনুপায়তাই দেখিয়া থাকেন। তাঁদের জন্যও কি বলিব ইংরাজী বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ প্রথা চালাইতে চান না, কি? আমার মনে হয় ঐ সকল স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন নব্য লেখকেরা বিপত্নীক বা নিতান্ত গোবেচারা স্ত্রীর স্বামী। নতুবা ইবসেনের নোরা সাহিত্য জগতে বা রঙ্গমঞ্চে মস্তবড় হিরোইন, বা বীর-চরিত্রা হইতে পারেন;—নিজের ঘরকন্নার মধ্যে ইঁহার আবির্ভাব, যতবড় সংস্কারকই হোন, কেহই পছন্দ করিবেন না।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই—যাঁরা চণ্ডীপাঠ শুনিয়াছেন, হয় ত মনে পড়িবে,—উহাতে যাঁহাকে 'বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপাত্বং স্থিতিরূপাচ পালনে, তথা সংহৃতিরূপান্তে— ইত্যাদি শ্লোকে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্ত্রী বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে, সেই তিনিই আবার অন্যত্র স্ত্রিয় সমস্তা সকলা জগৎষু—এই বাক্যে জগতের সমুদয় নারী-শক্তির কেন্দ্ররূপে স্তুত হইয়াছেন। অতএব নারীকে যে এ দেশে চিরদিনই অবলা ভাবে দেখা হইত না, এ কথা বলা চলে; এবং নারীও যে বাস্তবিকই অবলা নহেন, তাহা দরিদ্রের জীবনে নিয়তই সুপ্রত্যক্ষ। জাঁতাপেশা, মোট বহা, কুলী মজুরের কাজ করা—শারীর শ্রমের কোন্ কাজটা না আজও সর্ব্বত্র গরীবের মেয়েতে করিতেছে? ইয়োরোপে, যেখান হইতে মেয়েদের সুখালস জীবনের ছাঁচ তৈরী হইতেছে, সেখানে কি? সেখানে দুই-শত, চারিশত টাকায় নবাবের বেগম হওয়া চলে না, এবং ইয়োরোপীয়ের জীবন সেইখানেই অত্যন্ত উজ্জ্বল জ্যোতিঃতে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। ছোটবেলা হইতে কর্ম্মে অভ্যাস থাকিলে, ক্লান্তি ও অবসাদ না বুঝিয়া, উহা হইতে স্বাস্থ্য ও আনন্দ লাভ হয়। ময়দা-মাখা অভ্যাস রাখিলে, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া দূর করিবার জন্য ডাক্তারকে ডাম্বেল-ভাঁজার ব্যবস্থা করিতে হয় না। অবশ্য তেমন-তেমন গোঁয়ার ডাক্তারও আছেন, যাঁরা বাটনা-বাটা বা কড়াই ভাঙ্গার প্রেস্‌ক্রিপসনও করিয়া বসিলেন। অভিজাতবর্গ সর্ব্বত্র সমান হইলেও, কি দৃষ্টান্ত দেখাইল এই জর্ম্মাণী-ফ্রান্সের ধনী-সম্প্রদায়? ফরাসী মেয়েদের মত স্নেহহীন না কি পৃথিবীতেই ছিল না। সেই মহা-বিলাসিনী ফরাসী-মহিলারা মেথর-ডোমের কাজ হইতে মোটর-এঞ্জিন এবং আফিস আদালত পর্য্যন্ত অত বড় রাজ্যটাই প্রায় চালাইল। রাসিয়ার ও জর্ম্মাণীর রাজকুমারীগণ কাপ্তানের পোষাক পরিয়া সৈন্যদল গঠিত করিলেন। আমাদের দেশের অবস্থায় আমরা কি পতিত দরিদ্রদের বিদ্যা ও নীতিজ্ঞান দিয়া, ঔষধ-পথ্য বিলাইয়া মানুষ করিয়া তুলিতে নিজের মধ্যের পথভ্রষ্ট মনুষ্যত্বকে খুঁজিয়া বাহির করিতেও পারি না কি? মুসলমান বাবুর্চ্চির হাতের চপ, কাটলেট্ খাইলেই তাহাকে জাতে তোলা হয় না। তার রোগ-শয্যায় সেবা করিতে সাহস হইবে কি? তার ঘরের পাশে শত-শত অন্নহীন, বস্ত্রহীন,—আর সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়, অন্ন-বস্ত্রের চেয়েও যাহা সমধিক দুষ্প্রাপ্য বস্তু, সেই অমূল্য রত্ন-স্বরূপ মূর্খের দল, কি জল আচরণীয়, কি অনাচরণীয় জাতির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে পশুবৎ বিচরণ করিতেছে, তোমার ঘরে দাসত্ব করিতেছে, তাদের তুমি মানুষ করিতে কতখানি চেষ্টা করিতেছ? এ কি তোমার পক্ষে একান্তই অসাধ্য? তাদের বিদ্যাদান, সুনীতিদান, মানুষ হইতে সহায়তা দান, যদি করিতে পারো, তবেই তাদের জাতিদান করা হইল। নতুবা নিজের পাকশালায় পঞ্চাশ মণ ভাতসিদ্ধ করিবার ভার দিলেও সে যে নীচ সেই নীচই থাকিবে, তোমার মহিমা কিছুই বৃদ্ধি পাইবে না। এ কি তুমি পারো না, এ কি তোমার পক্ষে একান্তই অসাধ্য! তুমি না বিশ্ব-শক্তির অংশ? বিশ্বেশ্বর না তোমার অন্তর-মন্দিরের চিরাধিষ্ঠাতা, তোমার শরীর মনের প্রত্যেক অণুপরমাণুটি পর্য্যন্তই না সেই সর্ব্বভূতাধিবাসের অধিষ্ঠান-গৌরবে গৌরব-ময়! তবে কি না তোমার সাধ্য? তাঁর মহান্ শক্তিতে শক্তি-সম্পন্ন ধর্ম্মকে সহায় করিলে কি তুমি পারো না? 'স্ত্রিয় সমস্তা সকলা জগৎসু।' সমস্ত জগতের নারীশক্তিই যে মহাশক্তির অংশ। অতএব নব্য বঙ্গের মেয়েদের ফুলের বিছানা বা (স্প্রিংয়ের গদি) পাতিয়া সন্তর্পণে শোয়াইয়া রাখিবার কিছু মাত্র আবশ্যক করে না। তাঁদেরও জোর গলায় বলা চলে, 'উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত' এবং উঠিলে ও জাগিলে বর প্রাপ্তিও যে তাঁদের পক্ষে খুবই সুদূর-পরাহত দুরাশা-স্বপ্ন, তাও আমার মনে হয় না। আমি দেখিতেছি, পতিত জাতির শিক্ষা, অর্দ্ধ-পতিত জাতি অর্থাৎ আমাদের নিজের ঘরের চাকরবাকরের উন্নতি সাধন, বিলাসিতার হ্রাসে অযথা ধনক্ষয় নিবারণ, অনাবশ্যক বিষয়ে বৈদেশিক অনুকরণ প্রভৃতি ছোট-বড় অনেক কার্য্যের সমাধানই পুরুষের চেয়ে মেয়েদের হাতে। নিজের নিজের ঘরের ও সমাজের সেই সব জাল জঞ্জালগুলি যদি অল্পবিস্তর ঝাড়া-ঝুড়ি করিয়া লইতে পারা যায়, তাহা হইলেও আলো হাওয়া বড় কম পাওয়া যায় না। আর এই ভগ্ন-স্বাস্থ্যের দিনে সেই কি কম লাভ?

নারীর কথা

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী]

ভাদ্রমাসের—"ভারতবর্ষে" শ্রীমান্ অনন্তকুমার সান্যাল, আর আশ্বিন মাসে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ জ্যোতিরত্ন যা' লিখেছেন দেখ্‌লাম। আগে শ্রীমানের কথার উত্তর দিই।

পুরাণ মহাভারত সংহিতাগুলির সঙ্গে আমাদের কিছু পরিচয় আছে বটে,—কিন্তু 'হনুমান-চরিত' আমাদের পড়া নেই।

লেখক বল্‌তে চান, যাঁদের লোক-হিতৈষণা আর সমাজ-কল্যাণই উদ্দেশ্য ছিল, সেই ত্রিকালজ্ঞ পুরুষের সঙ্গে মুনি ঋষিরা মহিলাদের সম্মান ও স্বার্থ পুরাপুরি বজায় রেখেছেন;—নারীত্বকে কোনখানে খর্ব্ব করেন নি। যদি কোন স্থলে সে রকম শ্লোক দেখা যায়, তা' 'সুষ্ঠু আকারে ছাপার সাজ পরে' শাস্ত্রের মধ্যে গিয়ে পড়েছে; সেটা তাঁহাদের রচিত নয়,—প্রক্ষিপ্ত ধরে নিতে হবে।

বেশ কথা। তা'হলে আমাদের আর ক্ষোভের কারণ কি? শাস্ত্রোক্ত অধিকাংশ শ্লোককে যদি প্রক্ষিপ্ত ধরে নেওয়া যায়, সে ত খুব আনন্দের বিষয়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? যাকে ইনি বলছেন প্রক্ষিপ্ত, সেই সব শ্লোক (অবশ্য ইনি কিছু নির্দ্দেশ করে দেন নি কোন্ কোন্‌টা) আমাদের 'সমাজের পৃষ্ঠেই' আরোহণ করে আমাদের অর্থাৎ নারীদের তর্জ্জন আর শাসন করছে। লেখক কি এই সত্যটাকে অস্বীকার করেন? এক-একটা শ্লোকের কত রকম ব্যাখ্যা হয়;—তার সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি পালন করে কারা, লেখক কি জানেন? ত্যাগের প্রবাহ সমাজের কোন্ দিকে বইছে, আর কোন্ দিকে উচ্ছৃঙ্খলতার আবিল স্রোত বইছে,—শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে, সেটা কি আজও সমাজপতি পুরুষের অগোচর আছে? ইনি বলছেন যে, স্বাতন্ত্র্যের অভাবে আমরা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছি, সেই স্বাতন্ত্র্য-হীনাদের স্থান দেবতার আসনে ছিল। এই দেবীত্ব বা দেবত্ব—এ সম্বন্ধে আশ্বিন মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীরমলা বসু যথেষ্ট লিখেছেন;—আমি আর মিছে কথা বাড়ালাম না।

লেখক বলছেন যে, 'পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদত্ত নকল অভিমান আমাদের যে স্বাতন্ত্র্য-হীনতাকে আঘাত করছে, সেই আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, সেই নিয়মানুবর্ত্তিতাই তখন 'নারীত্বে'র শ্লাঘ্য ভূষণ ছিল, বরণীয় ছিল।' 'তার মূল লক্ষ্য ছিল অধ্যাত্ম-সম্পদ্।' এটা কোন্ যুগ, আমরা জানি না। যখন স্বামী-স্ত্রী দু'জনে অধ্যাত্ম-পথে চলতেন, বিভিন্ন পন্থানুসরণের অবকাশ তখন তাঁদের ছিল না। আমার ত মনে হয়, সমাজ-জীবনে এমন কোনও যুগ আসতে পারে না। ওটা ব্যক্তি-জীবনে সম্ভব। যাক্, ঐ নিয়মানুবর্ত্তিতা আর আজ্ঞা-পালন কি শুধু নারীদেরই করণীয় ও বরণীয়? পুরুষের ও-সব অনাবশ্যক? পুরুষের ধর্ম্ম 'ডায়ারিজম্' স্বেচ্ছাচার; আর নারীর ধর্ম্ম আইন মেনে চলা,—শাস্ত্রানুবর্ত্তিনী হয়ে প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দিয়ে মৃত্যু? এ মৃত্যু, এ ত্যাগও বাস্তবিক বরেণ্য হ'ত, যদি নারীরা তা জেনে করতেন,—গড্ডালিকা-প্রবাহের মত না চলতেন। কিন্তু তা কি? এ যে ভয়ে সঙ্কোচে মৃতের দ্বারা ধর্ম্মপালন! একে কি ধর্ম্ম বলাতে সেই উদারচেতা মনীষীরা পারতেন? আমার বাস্তবিক দুঃখ হচ্ছে, স্বাতন্ত্র্য মানে যে স্বেচ্ছাচার নয় তা' বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে বলে। ঐ যে শ্লোকটী—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' তার কত রকমের ব্যাখ্যা শোনা গেছে। ওর মূল বক্তব্যটা কি কেউ বলতে পারেন? অধিকাংশ স্থলে ওর ব্যাখ্যা হয় এই যে, নারীরা স্বাতন্ত্র্য লাভ করলে পত্নী বা মাতৃ-স্থান-ভ্রষ্ট হ'ন। স্বাতন্ত্র্য অর্থে আপনার দ্বারা আপনাকে শাসন করা; স্ব-শাসন, স্ব-চালনা। তার অর্থ যথেচ্ছাচার বা স্বেচ্ছাচার নয়। স্বাতন্ত্র্য আপনার ব্যক্তিত্ব-বোধ। সে আপনাকে সম্মানের বেষ্টনে রেখেও, নিঃসঙ্কোচে প্রেমের কাছেও আত্ম-সমর্পণ করতে পারে। সে অপরের ব্যক্তিত্বকে সম্মান করে; কিন্তু স্বেচ্ছাচারকে গ্রাহ্য করে না। আমরা এই স্বাতন্ত্র্য চাই, যা স্বেচ্ছাচারী, হৃদয়হীন পুরুষের অত্যাচার থেকে আমাদের মুক্তি দেবে;—স্বাতন্ত্র্যের যে প্রেমের বলে মীরাবাই সর্ব্বত্যাগিনী হ'তে পেরেছিলেন। আমাদেরও ক্ষোভের বিষয় এই যে, লেখক আমাদের কথার অর্থ ভুল করে ধরেছেন। আমরা আত্ম-প্রতিষ্ঠ হ'তে চাই; স্বাধীনতার অর্থও তাই। যে কল্যাণকর

বিধি-নিষেধের কথা লেখক লিখেছেন, সেই বিধিনিষেধ কি রকম আকারে আছে, পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটী কবিতাতে তার স্পষ্ট রূপটা দেখেছিলাম,—

"যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে ;
যে জাতি জীবন-হারা অচল অসাড়,
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
যে জাতি চলে না কভু তারি পথপরে,
তন্ত্র-মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে!"

বিধি-নিষেধের অবস্থা এই। পালন করতে হয় এক-তরফা। পালন না করলে অপরাধের শাস্তিও এক-তরফা। একে ধর্ম্ম বা কল্যাণ বলা কতখানি ন্যায়ানুমোদিত, আমি জানি না।

আমরা সেই শিক্ষা চাই, যা'তে মানুষ নিজেকে আর পরকে মানুষ বলে মানে ;—শূদ্রত্ব সৃষ্টি করে কারুকে ছোট না করে—ছোট না হয়। তা আর্য্য শিক্ষা হোক, আর অনার্য্য শিক্ষা হোক, তাই আমাদের ধর্ম্ম, শিক্ষা, উদ্দেশ্য।

সাগরপারের বিপ্লব-পন্থীরা 'পুতুলের ঘর' তৈরী করুন আর যাই করুন ;—পুরুষের অবহেলা, না, অত্যাচার অপমান নারীত্বকে আহত করেছে। সে জাগবেই। এতদিন পুরুষের খেলার পুতুল হয়ে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হয়েছে ;—এবার জানাতে চায়, তারা মানুষ, পুরুষের দাসী নয়। তারা নত হবে ভালবাসার কাছে, ধর্ম্মের কাছে, প্রেমের কাছে ;—অত্যাচারের অবিচারের কাছে নয়। এর ভিতর স্বৈরিণী বা স্বেচ্ছাবিহারিণীর কোন কথাই নাই ;—লেখক ভুল বুঝেছেন। শিক্ষা ও স্বাধীনতা যদি মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল করে, তাহা হ'লে আমার মনে হয়,—স্বায়ত্ত-শাসন চেয়ে দেশ-হিতকামীগণ ভুল করছেন। আজ্ঞানুবর্ত্তিতা আর নিয়মানুবর্ত্তিতা কি সকলেরই ধর্ম্ম নয়?

আমাদের সমাজে আমাদের স্থান বা আসন কোথায়, আমি বা আমরা জানি। লেখক জানেন? জান্‌লেও, এই চির-উৎপীড়িত জাতির প্রতি প্রভু-জাতির সহানুভূতি কতটা, সমবেদনা কতটা, তা' আমাদের ত অগোচর নাই।

আত্ম-বিনাশ কেউই চাহে না। স্বেচ্ছাচার বা যথেচ্ছাচার আপনাকে নষ্ট করে। আমরা আত্মবোধ—আত্ম-প্রতিষ্ঠা চাই। সেই জন্যই পুরুষের দেওয়া মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলাম।

যাক্, এইবার শ্রদ্ধেয় জ্যোতিরত্ন মহাশয়ের দুটী-একটী কথার উত্তর দিই। প্রথম, আমি এটা মানতে প্রস্তুত নই যে, "মানবগণের মোহ উৎপাদনের জন্য সর্ব্বজনমোহিনী স্ত্রী-জাতির সৃষ্টি।" ভগবান এ কথা বলতে পারেন না ; অতএব তাঁর দোষ নেই। এ কথা কোন মানুষ বলেছেন,—তাঁর দোষ। আমি বলতে চাই,—সৃষ্টি-রক্ষার জন্য নর-নারীর সমান প্রয়োজন,—কারুর মোহ উৎপাদনের জন্য কি কেউ সৃষ্ট হয়?

দ্বিতীয়, আমি লিখেছি, "স্ত্রী-শিক্ষার কথা উঠলে পুরুষেরা ভয় পেয়ে যান,—পাছে ঐ উৎপীড়িতারা উৎপীড়ন বুঝতে পারেন, পেরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেন, (পুরুষের) যথেচ্ছাচার সহ্য না করেন।" লেখক ভুল বুঝে লিখেছেন, নারীদের যথেচ্ছাচারের কথা,—আমি তা' বলিনি। লেখক বলেন, 'পুরুষ ভয় পাচ্ছেন, পাছে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে নারীদের নারীত্বের আদর্শ ক্ষুন্ন হয়।' তাতে কি নারীদের ক্ষোভের—ভয়ের কারণ নেই? আর পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শ কি এতই হীন? যাক্, আমার বিশ্বাস নারীর মর্য্যাদা নারীর কাছে বেশী,—পুরুষের চেয়ে।

পুরুষ ত সে জন্য ভয় পাচ্ছেন না। তিনি ভয় পাচ্ছেন, পাছে নারী নিজের প্রেমের, ত্যাগের অবমাননা বুঝতে পেরে, বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। এইটাই কি সত্য নয়? কেউ ব্যক্তিগত ভাবে সমাজকে দেখবেন না। সমাজের দেহে সমষ্টি-গত ভাবে চেয়ে দেখুন, কতখানি বা নারীর মর্য্যাদা,—কতটা তার দেবীত্ব, কতটা তার সম্মান, স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, অধিকার। দেখ্‌লে বুঝতে পারবেন, আমাদের একটী মাত্র বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য আছে,—একটী মাত্র অধিকার আছে,—একটী মাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আছে ; তা' হচ্ছে মৃত্যু। তাও যদি দুরগম্য হয়, তবে আত্মহত্যা ছাড়া গতি নেই। আমরা ত স্নেহলতাকে কলম্বসের চেয়েও যশস্বিনী মনে করি,—বাস্তবিক করি। এটা কি নারীহৃদয়ের কাম ক্লান্তির কথা? দেহটা যখন বোঝা, তখনই আত্মহত্যা বরেণ্য হয়ে ওঠে। বাহাদুরীর জন্য যে মানুষ মরে, তা' এই দুর্ভাগ্য দেশেই শুনতে নাই। বিশেষ এই হতভাগিনীদের বেলা! আমার বড় দুঃখেই

পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'স্ত্রীর পত্রে'র বিন্দুর কথা মনে পড়ছে।

মানুষের মনের ক্লান্তি যখন সহের সীমা অতিক্রম করে, তখনই সে মরতে চায়। ইণ্টার্নড্ শচীন্দ্রকুমারের কথা কি মনে আছে দেশের? বেচারী জন্ম থেকে মুক্তি পেতে চাইলে আত্মহত্যা করে!

আমি বলেছি—যার নিজেকে বা নিজের ধর্ম্মকে রক্ষা করবার প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা নেই ব'লে পুরুষের বিশ্বাস, তার এমন ঠুন্‌কো ধর্ম্ম নাই থাকল? তার মানে এ নয়, যে আমরা ধর্ম্মহীন হই। তার অর্থ এই যে, আমরা স্বরক্ষিত হ'তে শিখি। এই রকম অনাবশ্যক লজ্জাকর কথার উত্তর দিতে আমার বাস্তবিকই সঙ্কোচ হচ্ছে।

প্রেমের বা ভালবাসার স্বাতন্ত্র্য নাই,—তা' নরনারী-নির্ব্বিশেষে। তাই নারীর জন্য তাকে ও রকম কোন সন্দিগ্ধ অনুশাসন দিয়ে বাঁধবার দরকার নেই বোধ করি। প্রেমের আত্মপ্রতিষ্ঠ হ'বার ক্ষমতা আছে। তাই দময়ন্তী, সীতা, অরক্ষিত অবস্থাতেও আপনার প্রেম ও তেজস্বিতার দ্বারা রক্ষিত হয়েছিলেন,—এটা আমাদের কাছে নতুন কথা নয়।

প্রেম বা ভক্তি ঠুন্‌কো নয়। তার প্রতি পুরুষের বিশ্বাস এত—ঘৃণার্হ, ঠুন্‌কো, যে, ক্ষোভে, অভিমানে, ঘৃণায় তাকে ঠুন্‌কো বলেছিলাম। সতী-মাহাত্ম্য বা পাতিব্রত্য খুব উৎকৃষ্ট জিনিষ। কিন্তু প্রতিদানে কি আমরা রামের হিরণ্ময়ী সীতাকে নিয়ে যজ্ঞ করার মত কিছু দেখতে পাই? কি দেখি জানেন কি কেউ? আমরা শিক্ষিত, উচ্চবর্ণ, অভিজাত সম্প্রদায় থেকে নীচ শ্রেণী অশিক্ষিত ঘরে একই রকম ব্যবহার দেখি। সে কি? সদয় লাঞ্ছনা অর্থাৎ দয়াযুক্ত লাঞ্ছনা। শতকরা হয় ত ৮০ জন নারী এই রকম ব্যবহার পান। এই জন্যই নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া দরকার।

লক্ষহীরার উপাখ্যান খুব শিক্ষাপ্রদ, সন্দেহ কি? অপর পক্ষেও চমৎকার। সেদিনকার ঘটনা—কোন উচ্চবর্ণের ঘরে একটী বধূর কুষ্ঠ রোগ দেখা দিয়াছে,—তার স্বামী তাকে ত্যাগ করেছেন,—আবার বিবাহের পাত্রী অনুসন্ধান হচ্ছে। এর পরও কি লেখক বলেন আত্মহত্যা পাপ? আমার ত মনে হয়, যে দেশে পতিব্রতার বা প্রেমের এই রকম অবমাননা সম্ভব, সেখানে আত্মহত্যাই ত নারীর শ্রেয় ও প্রেয়।

লেখক বুঝতে পারেন নি,—আমাদের দেশে পুরুষ সর্ব্বত্রই—'আমি স্বামী', আমার পূজাই স্ত্রীর কাম, মোক্ষ, ধর্ম্ম, অর্থ লাভের উপায় বলেছেন। পুরুষ, নারীর প্রেমের পূজাকে নিজের পূজা মনে করে, অতটা স্পর্দ্ধার পরিচয় দিয়েছেন। আর যাঁরা মাতৃত্বকে পূজা করেন, পত্নীত্বকে তাঁরা কি ব'লে ঘৃণ্য বলেন! নারী-জীবনের বিকাশ পত্নীত্বে, পরিণতি মাতৃত্বে। দুটোকে আলাদা করা যায় কি? মানুষের মনের ধর্ম্মই হচ্ছে ভালবাসার পূজা, শ্রদ্ধার পূজা—সে ত নর-নারী উভয়তঃ। একদেশদর্শিতা জন্মায় পক্ষপাত-দুষ্ট ব্যবহারে; অতএব আমার একদেশদর্শিতা বিচিত্র নয়, স্বাভাবিক। আর ৺শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আর স্বামী ৺বিবেকানন্দকে আমি কম ভক্তি করি না—কারুর চেয়ে। সেই জন্যই তাঁদের ঐ কথাটীতে আঘাত পেয়েছিলাম; আর সেটা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হই নি।

আমি বলতে চাই, পুরুষ বলুন 'আমি দুর্ব্বল-চিত্ত'। মিথ্যা নিজেদের চাঞ্চল্য নারীজাতির প্রতি আরোপ না করেন। আর আমার নিবেদন, আমাদের এই বেদনা-নিবেদনকে যেন কেহ স্পর্দ্ধা মনে না করেন।

পরিশেষে—'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।'

কবির এই মহৎ বাণীটী বলে বিদায় নিলাম।

আধফোটা ফুল

[৺বিভা দেবী]

(লেস্ বোনার সঙ্কেত)

১৪ ঘর লইয়া এক লাইন সোজা-বোন।

প্রঃ লাইন। ১ ঘর যেন বুনিতে যাইতেছ এইরূপে খুলিয়া লও। দুই ঘরে এক জোড়া, সামনে সুতা লইয়া ১টা সোজা, সামনে সুতা লইয়া ১ জোড়া, ১ সোজা, সামনে সুতা লইয়া ১ সোজা, সামনে সুতা লইয়া ১ঘরে তিনবার বোন, ১ সোজা, ১ উল্টা, ১ সোজা, সামনে সুতা লইয়া ১ সোজা, আবার সামনে সুতা লইয়া ১ সোজা, কাঁটায় দুইবার সুতা লইয়া ১ জোড়া, ১ সোজা।

দ্বিতীয় লাইন। ৩ সোজা, ১ উল্টা, ১ সোজা, ৯ উল্টা, ১ সোজা, ৫ উল্টা, ১ সোজা।

তৃতীয় লাইন। না বুনিয়া ১ ঘর খোল, ১ জোড়া, সামনে সুতা লইয়া ১ সোজা, সামনে সুতা লইয়া ১ জোড়া, ১ সোজা * সামনে সুতা লইয়া ২ সোজা * চিহ্নিত স্থান হইতে আর দুইবার সামনে সুতা লইয়া ১ সোজা, দুইবার সুতা ঘুরাইয়া ১ সোজা, দুইবার সুতা ঘুরাইয়া ১ জোড়া ১ সোজা।

৪র্থ। ৩ সোজা, ১ উল্টা, ২ সোজা, ১ উল্টা, ১ সোজা, ৫ উল্টা, ৩ ঘর এক করিয়া উল্টা, বোন, ৫ উল্টা, ১ সোজা, ৫ উল্টা, ১ সোজা।

৫ম। না বুনে ১ ঘর খোল, ১ জোড়া, সামনে সুতা লইয়া ১ সোজা, * সামনে সুতা লইয়া ১ জোড়া * চিহ্নিত স্থান হইতে আর একবার ১ জোড়া, সামনে সুতা লইয়া ১ সোজা, সামনে সুতা লইয়া ১ জোড়া, ১ সোজা ১ জোড়া, সামনে সুতা লইয়া ১ সোজা * দুইবার সুতা লইয়া ১ জোড়া * চিহ্নিত স্থান হইতে আর দুইবার ১ সোজা।

ষষ্ঠ লাইন। ৩ সোজা, ১ উল্টা, * দুই সোজা ১ উল্টা, * চিহ্নিত স্থান হইতে আর দুই বার, ১ সোজা ১ উল্টা জোড়া, ১ উল্টা, * স্থান হইতে আর দুই বার, ১ উল্টা জোড়া, ১ সোজা, ৫ উল্টা, ১ সোজা।

সপ্তম লাইন। না বুনে ১ ঘর খুলে নাও, ১ জোড়া, সামনে সুতা লইয়া ১ সোজা, সামনে সুতা লইয়া ১ জোড়া, ১ সোজা, সুতা ঘুরাইয়া ১ ঘর খোল ১ জোড়া, খোলা ঘরটা জোড়া ঘরের উপর দিয়া ফেলিয়া দাও, ১ সোজা না বুনিয়া ১ ঘর খুলে নাও, ১ জোড়া, ঐ খোলা ঘরটা জোড়া ঘরের উপর দিয়া ফেলিয়া দাও, সামনে সুতা লইয়া ১ সোজা, ১০ সোজা।

অষ্টম লাইন। ৭ ঘর মুড়ে ফেল ৮ ঘর বুনিয়া, ৪ সোজা, এক সঙ্গে ৩ ঘর উল্টা বোন ২ সোজা, ৫ উল্টা, ১ সোজা।

জুড়াও

[শ্রীদেবকুমার রায়-চৌধুরী]

সংসার-সমরাঙ্গনে কাঁদে ক্লিষ্ট হিয়া!
কোথা তুমি প্রাণময়ি, কোথা তুমি প্রিয়া?
এস,—লহ আলিঙ্গনে! ক্ষুব্ধ হাহাকার
উদ্‌ভ্রান্ত করেছে ক্ষুদ্র অন্তর আমার;
শান্ত কর সে ক্রন্দন! হে মঙ্গলময়ি,
বড় দুঃখী আমি বিশ্বে।—আর তোমা' বই
আমার যে কেহ নাই! দুরন্ত হিংসায়,
উপেক্ষার খড়্গাঘাতে রুধির-ধারায়
প্লাবিত করেছে সবে এ অন্তর মম
প্রচণ্ড প্রহারে। শুধু ধরিত্রীর সম
সকল যাতনা-জ্বালা মৌনমুখে সহে'
সঞ্জীবিছ তুমি মোরে স্নেহ-স্বপ্ন-মোহে
অসীম আগ্রহে। তাই, তোমারেই ডাকি;
জুড়াও বিক্ষত হিয়া নিত্য বক্ষে রাখি'!

দুটো ভাত

[শ্রীজলধর সেন]

আজ এই ছ'মাস ধ'রে বাবাকে বলেছি, বাবা, পেন্সন নেও; আর কার জন্য চাকরী,—কার জন্য এত খাটুনী। বাবা সে কথা শোনেন না; বলেন, মা, চাকরী না করলে আমি বাঁচব না। দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত আফিসের খাটুনীতে আমি সব ভুলে থাকি। এর উপর ত আর কথা চলে না। বাবার মলিন মুখ দেখ্‌লে, আমার যে বুক ফেটে যায়! কি করব, উপায় নেই! মেয়ে হয়ে কেমন করে বলি যে, বাবা, তুমি বিবাহ কর;—তোমার মত এই ছ-চল্লিশ সাত-চল্লিশ বৎসর বয়সে অনেকেই বিবাহ করে থাকে। কথাটা যে আমার মুখ দিয়ে বার হতে চায় না। এমন নিদারুণ কথা কেমন করে বল্‌ব।

এক বছর হোলো মা মারা গিয়েছেন; আর আট মাস হোলো আমি আমার সব বিসর্জ্জন দিয়ে, সিঁথির সিন্দূর মুছে ফেলে, বাবার কোলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। এক বছরের মধ্যে বাবার মাথায়, আমার মাথায় যে বজ্রাঘাত হোলো, তাতে বাবা যে পাগল হয়ে যান নি, এই যথেষ্ট। আর আমার কথা—আমার আবার কথা কি? আমি একেবারে পাষাণ হয়ে গিয়েছি; আছি,—তাই আছি; খেতে হয়—তাই খাই। এক বাঁধন আমার বাবা;—ঐটে ছিঁড়ে গেলেই, সব যায়। এত কষ্টেও সে কামনা করতে পারিনে; জীবন শেষ হলে যে বাবার যন্ত্রণার শেষ হয়, তা বুঝি; কিন্তু বাবাও চলে যাবেন?—সব গেল,—মা গেলেন, দুটী ভাই গেল,—আমাকে যাঁর পায়ে বেঁধে দিয়েছিলেন, তিনিও গেলেন;—বাবাও যাবেন? না, না, বল তোমরা আমাকে স্বার্থপর,—বাবার যাওয়া হবে না; বাবা যদি দশটা-সাতটা আফিস করলেই বেঁচে থাকেন, তবে তাই করুন।

বাবা সন্ধ্যার পর আফিস থেকে আসেন; তার পর থেকে যতক্ষণ না ঘুমান, ততক্ষণ আমাদের ভাল যায়; বাবা কত গল্প করেন, খবরের কাগজ পড়ে শোনান, ভাল-ভাল বই পড়েন। কিন্তু বেলা দশটা থেকে সেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার আর সময় কাটে না। পড়াশুনা ভালই লাগে না। আগে নূতন কোন বই পেলে, আহার, নিদ্রা ভুলে পড়ে ফেলতাম। এখন বাবা আমার জন্য কত নূতন ভাল বই নিয়ে আসেন; আমার তা হাতে করতেও ইচ্ছা করে না; বাবা নিজে পড়ে না শোনালে আমি শুনিনে। বাড়ীতে এক বুড়া চাকর;—চাকর বলাটা বোধ হয় ঠিক হোলো না,—রামদাদা আমাদের চাকরী করে বটে, কিন্তু সে চাকর নয়,—আমাদের অভিভাবক বল্‌লেই হয়। অনেক দিন,—আমার জন্মের আগে থেকে সে আমাদের বাড়ী আছে; আমাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। তাকে পেলে সে-কালে আর কাউকে আমি চাইতাম না। কিন্তু সেই রামদাদা এখন যেন কেমন হয়ে গিয়েছে;—সে আর এখন আগেকার মত হো-হো করে হাসে না; সময় নেই অসময় নেই, গান করে না; হাসি-তামাসা করে না। আমার সম্মুখে এলেই যেন কেমন হয়ে যায়,—কে যেন তার মুখে কালী ঢেলে দেয়। কিছু বল্‌লেই, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, ছলছল চোখে বাইরে চলে যায়;—আমার কাছে সে আসতেই চায় না। অথচ আমি বেশ বুঝতে পারি, আমার সুবিধা-অসুবিধার দিকে তার প্রখর দৃষ্টি; দিদি বল্‌তে সে অজ্ঞান। সুতরাং রামদাদা থেকেও নেই; আমার সঙ্গ সে সহ্য করতে পারে না। আর আছে এক মেদিনীপুরে বামুন-ঠাকুর। তার সঙ্গে আর কি কথা বলা যায়,—আর সে জানেই বা কি? তার পুঁজি-পাটা এক জগন্নাথ দেব; সে সেই দেবতার কথাই বল্‌তে পারে—তাই সে বলে। সে কথা কি আর প্রতিদিন ভাল লাগে।

তাই সে-দিন বাবাকে বলেছিলাম, একটা ভাল দেখে ঝি রাখলে হয়। রামদাদা বুড়া হয়েছে। তার পর আমরা যে শোকে কাতর, সে শোক রামদাদারও বড় কম লাগে নাই;—মুখে না বল্‌লেও তা আমরা বেশ বুঝতে পারি। একটা ঝি রাখ্‌লে, রামদাদাকে আর খাটতে হয় না; বুড়া মানুষ যে কয় দিন বাঁচিয়া আছে, একটু আরাম করুক। আমাদের বাড়ীতে কোন দিনই ঝি ছিল না; মা সব কাজ নিজে করতে ভালবাস্‌তেন। তিনি বল্‌তেন, দশটা ছেলেপিলেও নেই, একমাত্র মেয়ে; সংসারের এত কি কাজ যে, তার জন্য

ঝি রাখতে হবে। চাকর আছে, বামুন আছে, আবার ঝি কেন? সেই জন্য কোন দিনই আমাদের বাড়ীতে ঝি ছিল না। এখন আমার দিন কাটাবার জন্য একজন সঙ্গিনীর দরকার হওয়াতেই, বাবার কাছে ঝিয়ের কথা বলেছিলাম। বাবা রামদাদাকে ডেকে একটা ঝিয়ের সন্ধান করতে বলে দিলেন; তিনি বললেন, খুব দেখে-শুনে যেন ঝি ঠিক করা হয়; আর সে ঝিকে আমাদের বাড়ীতেই থাকৃতে হবে,—কাজ শেষ করে বাসায় চলে যেতে পারবে না।

দিন দুই-তিন পরে একদিন সন্ধ্যার পর আমি বাবার কাছে বসে আছি, এমন সময় রামদাদা এসে বল্‌ল যে, সে একটা ঝিয়ের সন্ধান পেয়েছে। ঝিটি খুব নরম-সরম; দিন-রাতই থাকৃতে রাজী। ছেলে-মেয়ে নেই; তবে বয়স খুব বেশী নয়,—এই তেইশ-চব্বিশ বছর; এই যা আপত্তি। আরও একটা কথা রামদাদা বল্‌ল; তাই শুনে আমার মনটা সেই ঝিয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ল। রামদাদা বল্‌ল যে, সে ঝিকে মাইনে দিতে হবে না; কারণ তার আহারের ব্যবস্থা একটু নূতন রকমের; সে ভাত খায় না; অন্ন আহার একেবারেই কি জন্য যেন ছেড়ে দিয়েছে সে সুধু দিনান্তে সামান্য ফলমূল খায়। তাতে ত মনিবের খরচ হবে; সেই জন্য সে মাইনে চায় না।

কথাটা আমার কাছে, সুধু আমার কাছে কেন, বাবার কাছেও, নূতন বোধ হোলো। অন্নত্যাগিনী ঝি,—মাইনে নেবে না—দিনরাত থাকবে: কথাটা শুনেই যেন আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। বাবাও বল্‌লেন, রাম, তুমি যা বল্‌ছ, তা শুনে মেয়েটার উপর আমার শ্রদ্ধাই হচ্ছে। বেশ, তুমি কালই তা'কে নিয়ে এস। তার আহারের যা ব্যবস্থা, তা আমরা করে দেব। আর তারই জন্য যে সে মাইনে নেবে না, তা হবে না; মাইনেও তাকে আমি দেব। দু'বেলা ভাত খেতেও ত খরচ লাগে—তা না হয় সেই খরচটা ফল-মূলের উপর দিয়েই যাবে। বুঝেছ, তাকে এ সব কথা বলে-ক'য়েই নিয়ে এসো। কি বল মা প্রীতি, ঐ ঝিকেই আনা যাক।

আমি বলিলাম, রামদাদার কাছে শুনেই আমার কেমন ইচ্ছা হচ্চে যে, এই ঝিকেই আনা হোক। ভাত খায় না—ফল-মূল খায়;—আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। আমার মনে হোলো, এই যে ঝি, এ বড় দুঃখে, বড় কষ্টে ভাত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। আহা! হতভাগীর প্রাণে না জানি কি বিষম আঘাতই লেগেছিল, যার জন্য সে ভাত ছেড়েছে। বাবার সম্মুখে ত অত কথা বলা যায় না; তাই আমি চুপ করে গেলাম। তখনও তাকে দেখি নি; কিন্তু তার কথা শুনেই আমি তার জীবনের কথা যেন সব বুঝে নিলাম।

পরের দিনই;—সে আর কবে? এই আজ শনিবার—সে এসেছে বুধবারে। আজ সবে চার দিন সে আমাদের বাড়ীতে এসেছে; কিন্তু এই চার দিনের মধ্যেই আমি তার জীবনের সব কথা বার করে নিয়েছি! আহা! সে যে একটু মায়া-মমতার কাঙ্গাল! তাই, যে দিন সে এল, সেই দিন দুটা ভাল কথা, দুটা সমবেদনার কথা বল্‌তেই, সে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল;—সেই দিনই তাকে আমি চিনে ফেলেছি। আর, তার পরদিনই সে আমার কাছে তার অভিশপ্ত জীবনের কথা খুলে বলেছে! কি যে হৃদয়-ভেদী সে কাহিনী! আমি তার মত করে ত সে কথা বল্‌তে পারব না; সে যে তার হৃদয়ের প্রত্যেক রক্তবিন্দু মাখিয়ে এক-একটা কথা বলেছিল। আর সব কি সে বল্‌তে পেরেছে? যা বলেছে, তাই আমি বল্‌তে পারব না। তবু একবার চেষ্টা করে দেখি,—যদি সে নৃশংস কাহিনী আমার হাত দিয়ে কালীর অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করে। আমিও ত লিখ্‌তে তেমন জানিনে!

ঝির নাম মেনকা। তার বাপ-মা বোধ হয় আদর করেই ঐ নামটা রেখেছিল। মেনকা মোটেই সুন্দরী নয়; গৃহস্থ-ঘরের সাধারণ মেয়ের মতই তার চেহারা। তার বাপের কুলে এখন কেহই নাই,—সবাই মারা গিয়েছে। শ্বশুর-কুলে এখনও বোধ হয় বেঁচে আছে, তার এক ভাসুর,—তার স্বামীর বৈমাত্র ভাই; আর তার স্ত্রী। দেশে সামান্য যা জমি-জমা আছে, তাতে বার মাস সংসার চলে না। তাই তার স্বামী তিন বছর পুর্ব্বে, বাড়ী ছেড়ে কল্‌কাতায় চাকরী করতে আসেন। বড় ভাই আর ভাই-বৌ এদের স্বামী-স্ত্রীকে দুই চক্ষে দেখতে পারত না; সর্ব্বদা যন্ত্রণা দিত। অথচ তার স্বামী কোন দিন একটা কথাও বলত না; সমস্ত কষ্ট নীরবে সহ্য করত। শেষে যখন বড়ই অসহ্য হয়ে উঠল, তখন তার স্বামী চাকরীর সন্ধানে কল্‌কাতায় এল; তাকে বাড়ীতেই রেখে এল। কল্‌কাতায় এসে অল্প কয়েক দিনের

মধ্যেই তার স্বামীর কাশীপুরে একটা পাটের কলে চাকরী হোলো। মাইনে হোলো কুড়ি টাকা; আর মধ্যে-মধ্যে অতিরিক্ত খাটুনীর জন্য মাসে আরও পাঁচ-সাত টাকা পাওয়া যেত। চাকরী হবার তিনমাস পরেই সে মেনকাকে নিয়ে আসে। কাশীপুরেই একটা ছোট খোলার বাড়ী ছয় টাকায় ভাড়া নিয়ে, সেইখানেই দুইজনে বাস করতে থাকে। মাসে পঁচিশ ছাব্বিশ টাকা আয়; তাতে দু'জনের বেশ চলে যেত, কোন কষ্টই হোতো না।

কিন্তু ভগবান তাদের অদৃষ্টে এ সুখ বেশী দিন ভোগ করতে দিলেন না। বছরখানেক যেতে না যেতেই, সঙ্গ-দোষে তার স্বামীর একটু-একটু করে পান-দোষ আরম্ভ হোলো। মেনকা ভয়ে কিছু বল্‌তে পারত না। প্রায় বছরখানেক তার স্বামী মদ খেলেও, একেবারে জ্ঞানশূন্য হোতো না। তার হিসাব ঠিক ছিল। মাস গেলে কুড়িটি টাকা সে মেনকার হাতে এনে দিত; আর যা উপরি-পাওনা হোতো, তাই তার মদের খরচ ছিল। সে মদই খেত বটে, কিন্তু তার সঙ্গে-সঙ্গে অন্য কোন দোষ তার হয় নাই। সে বাড়ী ছেড়ে কোন কুস্থানে কখনও যেত না; সন্ধ্যার পরই একটু নেশা করে বাড়ী ফিরে আসত। মেনকার উপরও কোন অত্যাচার সে কখনও করে নাই; বরঞ্চ এক-এক সময় দুঃখ করেই বল্‌ত যে, এই নেশাটা না ছাড়লে তার আর চল্‌ছে না। কিন্তু ঐ বলা পর্য্যন্তই; নেশা সে কিছুতেই ছাড়তে পারল না।

শেষে তার মাতলামী ক্রমেই বাড়তে লাগল। উপরি পাওনা পাঁচ-ছয় টাকায় আর কুলিয়ে উঠত না। মাসে যে কুড়ি টাকা সে মেনকার হাতে এনে দিত, তাও কমে গিয়ে পনর টাকায় দাঁড়াল। মেনকা তাই দিয়েই কোন রকমে সংসার চালাত;—কোন রকমে অর্থাৎ নিজে এক বেলা আধপেটা খেয়ে থাকত। এত কষ্টেও কিন্তু সে কোন দিন স্বামীকে কিছু বল্‌তে সাহস পেত না। তার সুধু ভয় হোতো, কিছু বল্‌লে তার স্বামী যদি তাকে ফেলে কোথাও চলে যায়! তা হলে তার কি উপায় হবে।

এই ভাবেই কিছুদিন গেল। একদিন শনিবারে তার স্বামীর মাইনে পাবার দিন। সেই দিন টাকা এনে দিলে তবে পরের দিন হাটবাজার হবে,—বাড়ী ভাড়ার টাকা দেওয়া হবে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, স্বামীর দেখা নেই। এমন ত কখন হয় না। যেখানেই থাকুক, যাই করুক,—সন্ধ্যার পর সে বাড়ীতে আস্‌বেই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, রাত দশটা বেজে গেল; তবুও তার স্বামীর সাক্ষাৎ নাই। মেনকা উদ্বিগ্ন হ'ল। পাশের বাড়ীর একটা লোক কাশীপুরের কলেই চাকরী করত। মেনকা আর স্থির থাকতে না পেরে সেই বাড়ীতে গেল। সে লোকটা কলে মিস্ত্রীর কাজ করত। সে কোন সন্ধান দিতে পারল না; এই মাত্র বলল, সেদিন সবাই মাইনে পেয়েছে,—বাবু বোধ হয় কোথাও স্ফূর্ত্তি করতে গিয়েছেন। ভয় নেই,—বাড়ীতে ফিরে আসবেনই। মেনকা আর কি করবে, বাড়ীতে ফিরে এল। রাস্তায় কোন লোকের বা কোন গাড়ীর শব্দ পেলেই, সে দ্বারের কাছে ছুটে যেতে লাগল। কিন্তু রাত্রি বারটা বেজে গেল, তবুও তাহার স্বামী ঘরে এল না। সারা রাত্রি তাহার কাঁদিয়া কাটল। সে অনাহারে অনিদ্রায় স্বামীর পথ চেয়ে ব'সে রইল। প্রাতঃকালে একখানি গাড়ী এসে তাহাদের বাসার সম্মুখে লাগল। গাড়ীর মধ্য হইতে একটা লোক নেমে, মেনকাকে ডেকে বলল, "ওগো, এদিকে এস,—আমি একেলা কি করে নামাবো, ওর কি চলবার শক্তি আছে। পা দুটো অবশ হয়ে গিয়েছে।"

এই কথা শুনেই লজ্জা-সরম ত্যাগ করে মেনকা ছুটে বাইরে গেল। সেই লোকটার সাহায্যে তার স্বামীকে গাড়ী থেকে নামিয়ে, ঘরের মধ্যে এনে শুইয়ে দিল। তার স্বামীর তখন জ্ঞান ছিল; সে অতি কাতর স্বরে বলল, মেনকা, আমি আর বাঁচব না। আমার পা দুটো একেবারে অবশ হয়ে গিয়েছে।

গাড়োয়ান বাহির হইতে ভাড়ার জন্য চীৎকার করতে লাগল; সঙ্গের লোকটাও ভাড়া দিতে বলল। মেনকার হাতে তখন নয় আনা পয়সা ছিল। সে তাড়াতাড়ি আট আনা পয়সা ভাড়া দিল। গাড়োয়ান ও সঙ্গের লোক চলে গেল। তাহার পর কি হইল, সে কথা মেনকার ভাষাতেই বলি;—আমি গোছাইয়া বলিতে পারিব না।

মেনকা বলিল, দিদিঠাকরুণ, ওঁর ঐ অবস্থা দেখে আমার মাথায় যেন বজ্র ভেঙ্গে পড়ল। কি উপায় হবে? তাড়াতাড়ি গায়ের কোটটা খুলে ফেললাম; বাতাস করতে লাগ্‌লাম। তিনি সুধু কাঁদেন, আর বলেন, মেনকা, আমি

আর বাঁচব না ; আমার চল্‌বার শক্তি নেই।' সত্যই তাঁর পা দুখানি একেবারে অবশ হয়ে গিয়েছিল।

বলেছি ত দিদিঠাকরুণ, হাতে নয় আনা পয়সা ছিল। তার আট আনা গাড়ীভাড়া দিলাম ; রইল সবে চারটী পয়সা। ঘরে সব জিনিস বাড়ন্ত। মাইনের টাকা শনিবারে পাওয়া যাবে,—রবিবারে সব কেনা হবে। সেই রবিবারেই এই বিপদ! আমি একেবারে অকূল সাগরে পড়লাম। কি করি। আস্তে-আস্তে তাঁর জামার পকেটে হাত দিয়ে দেখি, একটা পয়সাও নেই।

তিনি কথাটা বুঝতে পেরে বল্‌লেন, মেনকা কিছুই নেই। বাইশ টাকা কাল পেয়েছিলাম। আফিসের জমাদারের কাছে উনিশ টাকা ধার হয়েছিল। সে আজ দেশে যাবে ;—তাকে সব টাকা দিতে হোলো, সে কিছুতেই ছাড়ল না। তখন আমার যে কি মনে হোলো, তা আর বলে কাজ নেই। তিনটি টাকা হাতে করে কোন মুখে বাড়ী আস্‌ব, কেমন করে চল্‌বে। এই কথা ভাবতে-ভাবতেই কল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তখন আমার ঘাড়ে শয়তান এসে বস্‌ল। সুমুখেই মদের দোকান। সব ভাবনা ভুলবার জন্য দোকানে গিয়ে বস্‌লাম। তার পর আর কি—যা ছিল সব সেখানেই খুইয়ে, অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। আজ সকালে যখন জ্ঞান হোলো, তখন দেখি আমাদের আফিসেরই একটা লোক আমাকে টেনে গাড়ীতে তুলছে। রাত্রিটা যে কেমন করে কোথায় কেটেছে, তা আমি বল্‌তে পারিনে। গাড়ীতে বসেই বুঝতে পারলাম, আমার পা-দু'খানি অবশ হয়ে গিয়েছে। মেনকা, কি হবে? আমার শাস্তি ঠিকই হয়েছে। তোমার কি হবে মেনকা? এই বলেই তিনি বালকের মত হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেল্‌লেন।

আমি তাঁকে কি বলে সান্ত্বনা দেব? আমি তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দিতে-দিতে, সুধু বল্‌তে লাগলাম, ভয় কি, তুমি আজই সেরে উঠ্‌বে। আমার স্বামী বল্‌লেন, না, পা দু'খানি গিয়েছে,—আর সারবে না।

দিদিঠাকরুণ, আর কত বল্‌ব! কি কষ্ট যে পেয়েছি, তা আর তুমি শুনো না। সে সুধু ভগবান জানেন। শেষের কথাই একটু বলি। দু'খানা থালা বিক্রী করে তিনটা টাকা পেলাম। তাই সম্বল করে, ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। সেখানে ডাক্তারেরা বল্‌ল, ও-রোগ সারবে না ; রোগীকে হাসপাতালে রাখা হবে না। কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরে এলাম।

চিকিৎসা হবে না,—কিন্তু দুটো খেতে দিতে হবে ত? আর কোন উপায় না দেখে, এক ভদ্রলোকের বাড়ী ঝির কাজ নিলাম। দু'বেলা যা ভাত পেতাম, তাই নিয়ে এসে ওঁকে খাওয়াতাম ; পাতে যা থাকৃত, তাই আমি খেতাম। একজনের মত ভাত পেতাম ; তাই প্রায়ই মিথ্যা কথা বল্‌তাম,—আমি খেয়ে এসেছি। যে বাড়ীতে ছিলাম,—ছয় টাকা ভাড়া দিতে না পেরে, সেখান থেকে উঠে, আড়াই টাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া করেছিলাম। তিন টাকা মাইনে পেতাম ; তার থেকে আড়াই টাকা ভাড়া দিতাম ; বাকী আট আনা দিয়ে কি যে করতাম, তা আর বলে কি হবে।

দেশে আমার ভাসুরের কাছে একখানি-আধখানি নয়, চার-পাঁচখানা চিঠি লেখা হোলো ; তাঁরা ত কেউ এলেনই না ;—চিঠির জবাব পর্য্যন্তও দিলেন না। এ দিকে আমি অকূল সাগরে ভাসতে লাগলাম।

দিদিঠাকরুণ, মনে করেছিলাম, যা কষ্ট পাচ্ছি, তার থেকে বেশী কষ্ট আর কি হতে পারে। গৃহস্থের বৌ, ভদ্র কায়স্থের মেয়ে, দুটী ভাতের জন্য,—স্বামীর মুখে দুটা ক্ষুধার অন্ন তুলে দেবার জন্য, পরের বাড়ী দাসীগিরি করছি ; এর বাড়া দুর্গতি আর কি হতে পারে? ভগবান বললেন, র' বেটি, আর কি হতে পারে, তা দেখিয়ে দিচ্ছি। দিদিঠাকরুণ, তার পর কি বিপদে যে আমি পড়েছিলাম, তা মনে করতেও আমার গা শিউরে উঠে। কি করে যে সব হারালাম, সে দুঃখের কথা বল্‌তে গেলে, আমার মুখে কথা যোগায় না।

আমি বল্‌লাম, কাজ নেই আর তোমার কিছু বলে ; যা বলেছ, সেই যথেষ্ট। বড় কষ্টই তুমি পেয়েছ মেনকা! যা তুমি সহ্য করেছ, স্বামীর জন্য যা তুমি করেছ, তার চাইতে বেশী কোন্ মেয়ে কি করতে পারে, আমি জানিনে। তোমাকে—

আমার কথায় বাধা দিয়ে মেনকা বল্‌ল, দিদি, আমি কিছুই করি নেই। আমি যদি তেমন করে কিছু করতে পারতাম, তা হলে কি তিনি 'দুটো ভাত, দুটো ভাত' বলে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে পারতেন? তা হলে কি তাঁকে আমার কাছ থেকে কেউ নিয়ে যেতে পারত? তা পারি নেই দিদি, পারি নেই ; তাঁর সেবা বুঝি তেমন করে করতে পারি

নেই ; তাই তিনি আমাকে ফেলে চলে গেলেন। কি কষ্টেই যে তাঁর প্রাণ বেরিয়েছে দিদি, শুন্‌লে তুমি স্থির থাক্‌তে পারবে না।

আমি বল্‌লাম, না, আমি আর শুন্‌তে চাইনে,—শুন্‌তে চাইনে। হায়, ভগবান, এমন সতী-সাধ্বীর অদৃষ্টেও কি এত যন্ত্রণা লিখ্‌তে আছে ?

মেনকা বলিল, না দিদি, দেবতার দোষ দিও না,—আমার অদৃষ্ট। আমি আর-জন্মে কোন্ সতীর বুক থেকে তার স্বামীকে কেড়ে নিয়েছিলাম,—সেই পাপের এই শাস্তি দিদি ! আমার কথাটা শেষ করতে দাও।

যাঁদের বাড়ী কাজ করতাম, একদিন তাঁদের বাড়ীতে একটা ছেলের অন্নপ্রাশন ;—অনেক লোক খাবে। গিন্নী বল্‌লেন, সেদিন আমি আর দুপুরে বাসায় যেতে পারব না। আমিও সে কথা বুঝলাম। কিন্তু বাসায় না গেলে যে আমার স্বামী অনাহারে থাক্‌বেন ; তিনি যে আমার পথ চেয়ে বসে থাক্‌বেন। প্রাণ যে কেমন করে উঠল, তা আর কি বল্‌ব ; কিন্তু আমিও গৃহস্থের বৌ,—ভিক্ষে করতে কোন দিন শিখি নাই। নিজের দুঃখের কথা ত কোন দিন কারও কাছে বল্‌তে শিখি নি ; নিজেই সব সহ্য করেছি। কেমন করে গিন্নীকে বল্‌ব যে, আমার স্বামী আমার এই দাসীগিরির দুটো ভাত খাবার জন্য পথের দিকে চেয়ে বসে থাক্‌বেন ! তা আমি বল্‌তে পারলাম না ; মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। সারাদিন খাট্‌তে হোলো ; কিন্তু দিদি আমার শুধুই মনে পড়তে লাগল, তাঁর মলিন মুখ,—দুটো ভাতের জন্য তাঁর পথ চেয়ে থাকা। নড়বার শক্তি ত নেই। সকালে বেরিয়ে আস্‌বার সময় যা-যা দরকার হতে পারে, বিছানার পাশে রেখে আসুতাম। তার পর দুপুরে গিয়ে, নাইয়ে-খাইয়ে আস্‌তাম। সে দিন তা হোলো না ! কি করি, একদিকে চোখের জল মুছি, আর একদিকে কাজ করি।

সন্ধ্যার পর কাজকর্ম্ম শেষ হলে, ভাত নিয়ে আমি বাসায় যাবার জন্য বের হলাম। তাড়াতাড়ি যাব বলে, একটা গলি রাস্তায় গেলাম, সেইটেই সোজা রাস্তা। রাত্রিতে কোন দিন আমি সে রাস্তায় যেতাম না, একেলা ভয় করত। সে দিন আর আমার ভয় ছিল না, দু মিনিট আগে যেতে পারলেও আমার পরম লাভ।

একটু গিয়েছি,—আর দেখি, দুই-তিনটা মাতাল সেই পথ দিয়ে আস্‌ছে। আমাকে দেখেই তারা দৌড়ে এসে, যে কথা বল্‌তে লাগল, তা মানুষের মুখে কোন দিন শুনি নি। আমি কোন কথা না বলে, পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই, একজন আমার হাত থেকে ভাতের থালাখানি কেড়ে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল ; ভাত তরকারী সব রাস্তাময় ছড়িয়ে পড়ল। তার পর একজন বলে উঠল "ওরে, এটা একটা ঝি ! দূর যা !" এই কথা বলেই আমাকে একটা ধাক্কা দিল। আমি পথের পাশে পড়ে গেলাম। আমার কাণের পাশটা কেটে গেল। মাথায় খুব লেগেছিল, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

বেশীক্ষণ বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে ছিলাম না। হঠাৎ একটা গাড়ীর শব্দে আমার জ্ঞান হোলো। আমি অতি কষ্টে উঠে, পথের পাশে বস্‌লাম। আমার কাপড় রক্তে ভিজে গিয়েছিল। গাড়ীখানা চলে গেলে, দাঁড়াতে গেলাম, পারলাম না ; মাথা ঘুরতে লাগল। আবার বসে পড়লাম। কিন্তু, বসে যে থাক্‌তে পারি নে ; তিনি সারাদিন না খেয়ে আমার পথ চেয়ে বসে আছেন। কি হাতে করে তাঁর সুমুখে যাব ? কি তাঁর মুখে তুলে দেব ? কোথায় ভাত পাব ? ওগো, তোমরা বলে দেও, কোথায় একমুঠো ভাত পাব !

আর ত বসে থাকা চলে না। বাড়ী যেতেই হবে,—তাঁর মুখে দুটো ভাত দিতেই হবে। ঘটিটা বাঁধা দিয়ে হোটেল থেকে ভাত এনেই তাঁকে এই রাত্রে খাওয়াব। একটা পথ যেন পেলাম দিদিঠাকরুণ, বুকে যেন বল এল ; মাথা যেন স্থির হোলো।

আস্তে আস্তে উঠে রাস্তার উপর থেকে ভাতের থালাখানা কুড়িয়ে নিয়ে, বাসার দিকে গেলাম। যখন ঘরের বারান্দায় গিয়েছি, তিনি অন্ধকার ঘরের মধ্য থেকেই বলে উঠলেন, "মেনকা, এলে। ওবেলা আমি কিছুই খেতে পাই নি, তুমি —ত এস নি। আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে,—দুটো ভাত।"

আমি কথা বল্‌তে পারলাম না। দিদিঠাকরুণ,—বলে দেও, তখন আমি তাঁকে কি বল্‌তে পারতাম। ভাত ! ভাত ! ওরে ভাত ! কাঙ্গালের মুখে তুলে দেবার একমুঠো ভাত ! তাও তখন আমার নেই ;—আমি কি জবাব দেব ;—আমার বুক ফেটে যেতে লাগল। ঘরের এক কোণে একটা কেরো-সিনের ডিবে ছিল, তারই পাশেই দিয়াশলাই ছিল। আমি আলো জ্বালতেই, তাঁর দৃষ্টি আমার উপর পড়ল। দিদি

ঠাকরুণ, কি আর বল্‌ব। আমার দিকে চেয়েই তিনি চীৎকার করে উঠ্‌লেন, "ও কি? রক্ত!"

এই কথাই শেষ কথা! সেই 'দুটো ভাত'—সেই 'ও কি? রক্ত!' আর কোন কথা তাঁর মুখ থেকে বের হোলো না। সব শেষ হয়ে গেল—সব যন্ত্রণার অবসান হোয়ে গেল দিদি গো,—সব গেল! দুটো ভাত তাঁর মুখে দিতে পারলাম না! দিদিঠাকরুণ, এখনও যেন যখন-তখন শুন্‌তে পাই, তিনি যেন কাতর হয়ে বল্‌চেন 'দুটো ভাত!'

সেই রাত্রে ভগবানকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছি, এ জীবনে আর ভাত মুখে দেব না। যদি আবার নারীজন্ম পাই—যদি আবার তাঁকে স্বামী পাই—যদি তাঁর মুখে দুটো ভাত তুলে দিতে পারি, তবেই ভাত খাব—নইলে আর না—আর না—

মেনকাকে আর কথা বলিতে দিলাম না; তাকে আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। আমার বুক যেন শীতল হয়ে গেল; সতী-সাধ্বীর স্পর্শে আমার যন্ত্রণা যেন দূর হয়ে গেল!

বঙ্গে সুলতানী আমল

(অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ)

ফিরোজ শাহের লক্ষণাবতী-অভিযান

৭৫২ হিজরির ২১শে মহরম তারিখে খেয়ালী সম্রাট্‌ মুহম্মদ তুঘ্‌লক্‌ পরলোকে গমন করেন। ২৪শে মহরম, ৭৫২ হিঃ (২৩শে মার্চ্চ, ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে) ৪৩ বৎসর বয়সে সুলতান ফিরোজ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসরেই (১) তাঁহার নিকট খবর পৌঁছিল যে, বাঙ্গালার বিদ্রোহী রাজা ইলিয়াস্‌ শাহ বারাণসী পর্য্যন্ত জয় করিয়া, দিল্লী-সাম্রাজ্যের সীমায় লুটতরাজ করিতেছে। ফিরোজশাহ ইলিয়াস্‌ শাহকে দমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস্‌ শাহ

রিয়াজ-উস্‌-সালাতিনকার শামসুদ্দিন ইলিয়াস্‌ শাহের সহিত ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়ায় পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা আলাউদ্দিন আলি শাহের কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা বিবৃত করিয়াছেন। গোলাম হোসেনের মতে, আলি শাহ মালিক ফিরোজের (যিনি পরে ফিরোজ শাহ নামে মুহম্মদ তুঘ্‌লকের পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন) একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। ইলিয়াস্‌ আলি শাহের ধাত্রীপুত্র। কোন কুকার্য্য করিয়া (কি কুকার্য্য তাহার উল্লেখ নাই) ইলিয়াস্‌ দিল্লী হইতে পলায়ন করেন; এবং আলি শাহ তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারায়, মালিক ফিরোজ ক্রুদ্ধ হইয়া আলি শাহকে দিল্লী হইতে নির্ব্বাসিত করেন। ভাগ্য-বিড়ম্বিত আলি শাহ বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন; এবং লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা কদর খাঁর অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। ক্রমশঃ তিনি কদর খাঁর প্রধান সেনাপতির পদে উন্নীত হন। সোণারগাঁর সুলতান ফখরুদ্দিনের প্ররোচনায় কিরূপে তিনি কদর খাঁকে হত্যা করিয়া ৭৪২ হিজরায় লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহা আমরা প্রথম প্রস্তাবেই দেখিয়াছি।

আলি শাহ অর্দ্ধ-বঙ্গের সুলতান হইয়া বসিলে পর, ইলিয়াস্‌ কোথা হইতে আসিয়া বাঙ্গালা দেশে উপস্থিত হইলেন। হাতে পাইবা মাত্র আলি শাহ তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু ইলিয়াসের মাতার কাতর প্রার্থনায় অবশেষে আলি শাহ ইলিয়াসকে কারামুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। চতুর ইলিয়াস্‌ কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সমগ্র সৈন্যদলকে হস্তগত করিয়া, খোজাদের সহায়তায় আলি শাহকে হত্যা করিলেন; এবং নিজে ফিরোজাবাদে সুলতান হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

রিয়াজ-উস্‌-সালাতিনকার গোলাম হোসেনের মতে,

(১) জিয়াউদ্দিন বারনি রচিত তারিখ ই ফিরোজশাহীতে "বসর" শব্দটি বহুবচনে আছে।

আলি শাহ ২ বৎসর পাঁচ মাস, এবং ইলিয়াস্ শাহ ১৬ বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব করিয়াছেন। পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখাইয়াছি যে, আলি শাহের যতগুলি মুদ্রা আমরা দেখিবার সুযোগ পাইতেছি, তাহাদের সবগুলিই ৭৪৩ হিজরির। কাজেই ৭৪৩ হিজরায় প্রায় পূরা এক বছর এবং ৭৪২ হিজরায় —বাকী কয়মাস আলি শাহের রাজত্ব ধরিতে হইবে। কিন্তু ইলিয়াস্ শাহের মুদ্রায়—কেহ-কেহ তারিখ ৭৪০ হিজরা পড়িয়াছেন। ৭৪৩ হিঃ-ও একটি মুদ্রায় পড়া হইয়াছে। এই তারিখগুলির বিচার আবশ্যক। ইলিয়াস্ শাহের নিম্নলিখিত মুদ্রাগুলি এইজন্য আলোচনা করিতে হইবে।

১। টমাস সাহেবের 'ইলিশিয়ান কয়নেজ অব বেঙ্গল' নামক পুস্তকের ৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ইলিয়াস্ সাহেবের ৭৪০-৭৪৪-৭৪৬-৭৪৭ হিজরার মুদ্রা।

২। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মুদ্রা-পেটিকার তালিকার দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ইলিয়াস্ শাহের মুদ্রা। নং ৩৩, হিজরি ৭৪৭।

৩। শিলং পেটিকার তালিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১২০ পৃঃ। মুদ্রা নং ৳ -- ৭৪০ হিজরি। ৳ -- ৭৪৩ হিজরি। ৳ ৭৪৬ হিঃ। ৳ = ৭৪৫ হিঃ।

ঢাকা জেলায় আবিষ্কৃত পূর্ব্বোল্লিখিত ৩৪৬টি মুদ্রার মধ্যে ৩৩টি মুদ্রা ইলিয়াস্ শাহের,—ইহা প্রথম প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম পেটিকার বিভাগ অনুসারে এই ৩৩টির মধ্যে ৯টি 'A' শ্রেণীর, ১৬টি 'B' শ্রেণীর এবং ৮টি 'E' শ্রেণীর। এই মুদ্রাগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই পোদ্দার পরখে ক্ষত-বিক্ষত; কিন্তু অনেকগুলির উপর টাঁকশালের নাম ফিরোজাবাদ এবং তারিখের অঙ্কে শতকে ৭ ও দশকে ৫ পড়া যায়। কিন্তু এককের অঙ্কটি একটি মুদ্রায়ও সঠিক পড়া যায় না। ঢাকা মিউজিয়ম পেটিকায় ইলিয়াস্ শাহের ফিরোজাবাদে ৭৫৪ হিঃ তে মুদ্রিত একটি মুদ্রা আছে।

শ্রীযুক্ত নেভিল্ সাহেব ১৯১৫ খৃঃ অব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ৪৮৫ পৃষ্ঠায় খুলনায় আবিষ্কৃত বঙ্গীয় সুলতানগণের মুদ্রাসমূহের মধ্যে ১২টি ইলিয়াস্ শাহী মুদ্রার বিবরণ দিয়াছেন। উহাদেরও বোধ হয় টাঁকশাল বা তারিখ পড়া যায় নাই; কারণ, নেভিল সাহেব কোনটিরই টাঁকশাল বা তারিখ দেন নাই।

টমাস ও ব্লখ্‌ম্যান সাহেব ইলিয়াসের মুদ্রায় ফিরোজাবাদ টাঁকশাল এবং ৭৪০, ৭৪৩, ৭৪৪ হিঃ—৭৪৬ ইত্যাদি তারিখ পড়িয়া, এবং আলি শাহের মুদ্রায় ও ৭৪২-৭৪৪-৭৪৬ হিঃ ইত্যাদি তারিখ পড়িয়া, সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, আলি শাহ ও ইলিয়াস্ শাহ ফিরোজাবাদের সিংহাসনের জন্য কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত লড়িয়াছিলেন। কখনও আলি শাহ জিতিতেন এবং মুদ্রা প্রচার করিতেন; ভাগ্য-চক্রের আবর্ত্তনে কখনও আবার ইলিয়াস্ শাহ সিংহাসন দখল করিয়া টাঁকশালের মালিক হইতেন। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, আলি শাহের পরীক্ষা-যোগ্য সমস্ত মুদ্রাই ৭৪৩ হিজরীর। ইলিয়াস্ শাহের বেলায় ও এই মনস্বীদ্বয় অমনি কোন একটা ভুল করিয়াছেন বলিয়া আমার প্রথমেই সন্দেহ হয়। কারণ টাঁকশাল লইয়া মারামারি এবং পর্য্যায়ক্রমে দখলের মতবাদ বিশেষ সন্তোষ-জনক নহে। নিজ নামে মুদ্রা মুদ্রিত করান, এবং মসজিদে প্রার্থনার সময় নিজের মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করান (শিক্কা ও খুত্‌বা) মুসলমান আমলের সর্ব্বজনবিদিত এবং সর্ব্বজনমান্য রাজচিহ্ন। শক্ত হইয়া সিংহাসনে না বসিয়া ঐ উভয় কার্য্য করান কঠিন। মুদ্রার বেলা এই কথা বিশেষ করিয়া খাটে। কারণ, রাজধানী ও টাঁকশাল দখল করিয়া মুদ্রা মুদ্রিত করিলেই হইল না, প্রজা-সাধারণে যদি তাহা গ্রহণ না করে, তবে মুদ্রার কোন মূল্যই রহিল না। জোর করিয়া মুদ্রা চালাইতে গিয়া, খেয়ালী সম্রাট্ মুহম্মদ তুঘ্‌লক্-সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। ইলিয়াস্ শাহের মুদ্রায় যে ৭৪০ হিঃ তারিখ পড়া হইয়াছে, তাহা নির্ব্বিচারে অগ্রাহ্য করা চলিত; কারণ তখন পর্য্যন্ত আলি শাহও সিংহাসন লাভ করেন নাই;—লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে তখন কদর খাঁ। কিন্তু ব্লখ্‌ম্যান ও টমাসের মত পণ্ডিতদ্বয়ের সিদ্ধান্ত নির্ব্বিচারে অগ্রাহ্য করিলে কেহ শুনিবে না। সৌভাগ্য ক্রমে, বিচার করিয়া অগ্রাহ্য করিবার উপকরণ অনেক পরিশ্রমে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি।

শিলং পেটিকার ৳ নং মুদ্রাটি ইলিয়াস্ শাহের ফিরোজাবাদের মুদ্রা। তারিখটি ৭৪০ হিঃ পড়া হইয়াছে। এই মুদ্রাটি পরীক্ষা করিবার জন্য শিলং হইতে ঢাকা মিউজিয়মে আনান হইয়াছিল।

মুদ্রাটি পরীক্ষা করিয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। তারিখটি পরীক্ষায়, প্রথম দৃষ্টিতে, ৭৪০ ছাড়া অন্য কিছুই পড়া যায় না। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব মনস্বিগণ ইহার তারিখ ৭৪০ পড়িয়া গিয়াছেন,

এই জ্ঞান মনের মধ্যে গুপ্ত গতানুগতিকতার সৃষ্টি করে। কাজেই মন পূর্ব্ব-পঠিত পাঠেই ঘুরপাক খাইতে থাকে। কিন্তু বার-বার, ফিরিয়া-ফিরিয়া পরীক্ষা করিবার পর সহসা একদিন চোখে পড়িল যে, ৭৪০ "আরবায়িন্ ও সবামাইয়াত" এর আরবায়িন লিখিতে যতটা খাড়া টান আবশ্যক তাহা হইতে দুই টানে গঠিত একটা কোন বেশী আছে; এবং উহার মাথা হইতে বামে উপরের দিকে একটা টেরচা টান উঠিয়া গিয়াছে। এই কোণাকৃতি রেখাদ্বয়ের বাম দিকের রেখার নীচে একটি পুটলিও চোখে পড়িল। এইরূপে যে দুইটি অক্ষরের আভাস পাইলাম তাহা 'খে' ও 'মিম্' ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলাম যে, তারিখের কথাগুলি আরবায়িন ও সবামাইয়াত্ = ৭৪০ না পড়িয়া, অরবা খম্সিন্ ও সবামাইয়াত্ = ৭৫৪ পড়িতে হইবে। যতই ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম, ততই, ইহাই যে বিশুদ্ধ পাঠ সেই বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। স্থানের সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত এমনি ঠাসা-ঠাসি করিয়া ৭৫৪ লেখা হইয়াছে যে, প্রথম দৃষ্টিতে উহা ৭৪০ ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না। ব্লথ্ম্যান ও টমাস সাহেব এই রকম মুদ্রা দেখিয়াই প্রতারিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে।

শিলং পেটিকার ৬/১ নং মুদ্রাটির তারিখ ৭৪৩ পড়া হইয়াছে। আমি এই মুদ্রাটি দেখি নাই; কিন্তু মুদ্রাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন সাহেব শিলং গিয়া এই মুদ্রাটি দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন ইহার তারিখ নিঃসন্দিগ্ধ ৭৪৮ হিঃ। এককের অঙ্কটি ছলাছ্ = ৩ নহে, ছমান্ = ৮।

৭৪৩ হিজরার আলি শাহের রাজত্বের অবসান ধরিলে, ঐ বৎসরেরই একেবারে শেষের দিকে বা ৭৪৪ হিঃ একেবারে প্রথম দিকে ইলিয়াস্ শাহ ফিরোজাবাদের সিংহাসনে উপবেশন করেন। দিল্লীতে কি 'কুকার্য্য' করিয়া ইলিয়াস্ পলাইয়াছিলেন, গোলাম হোসেন তাহার উল্লেখ করেন নাই। ফিরোজাবাদের সিংহাসনে আরোহণের জন্য মনিব-হত্যাটাও সুকার্য্যের মধ্যে গণ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাহার উপর ইতিহাসে লেখে, ইলিয়াস্ ভাঙ্গ খাইতেন। ফিরোজ তুঘ্লকের ইতিহাস-লেখক জিয়া বার্ণিও ইলিয়াসের সিদ্ধি সেবন লইয়া বেশ উপহাস করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই ভাঙ্গড় ইলিয়াস্ই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার সুলতানীর স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা। শুধু তাহাই নহে। ফিরোজ শাহের আসন্ন আক্রমণ প্রতিরোধার্থ ইলিয়াস্ শাহ হিন্দু-মুসলমান মিলাইয়া বিরাট্ সৈন্যদল গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই জাতীয় উদ্বোধনের দিনে তাঁহার এই অন্ততঃ একটি "সুকার্য্য" স্মরণ করিয়া, আমরা তাঁহার নামে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিব।

জিয়াউদ্দিন বারণী ফিরোজ শাহের ১ম লক্ষণাবতী অভিযানের আদি ও সমসাময়িক ঐতিহাসিক। তাঁহার বর্ণনা এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে :—

(মর্ম্মানুবাদ)

"সুলতান ফিরোজ শাহের রাজত্বের প্রথম বৎসরেই (মূলে বৎসর শব্দটি বহুবচনে আছে) তাঁহার কাণে খবর পৌঁছিল যে, বঙ্গের সুলতান ইলিয়াস্ বঙ্গে জাত ও বর্দ্ধিত বহু ধানুক ও পাইক সংগ্রহ করিয়া, ত্রিহুত অধিকার করিয়াছে; এবং মুসলমান ও জিম্মিগণের (মুসলমানের আশ্রয়ে রক্ষিত বিধর্ম্মীকে জিম্মি বলে), উপর অত্যাচার করিয়া লুট তরাজ করিতেছে।"

এই বঙ্গে জাত ও বর্দ্ধিত পাইক ও ধানুকগণের দলে যে হিন্দু ও মুসলমান দুই-ই ছিল, তাহা অনুমান করা যায়। ইলিয়াসের সহিত ফিরোজ শাহের যুদ্ধ বর্ণনায় জিয়া-বারণির নিম্নে অনূদিত রসিকতার নমুনা আছে।

"বঙ্গের বিখ্যাত পাইকগণ, যাহারা বহুকাল ধরিয়া বঙ্গের 'বাপ-মা' বলিয়া পরিচিত, তাহারা ভাঙ্গড় ইলিয়াসের নিকট হইতে ভাঙ্গের দোক্কা পুরস্কার পাইয়া দেখাইতে চাহিল যে, তাহারা মনিবের জন্য প্রাণটা অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে পারে এবং 'ছাতা-পড়া' চেহারার (অথবা ঢোস্কা) বাঙ্গালী রাজাদের সহিত সৈন্যদলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহারা খুব সাহসের সহিত হাত পা ছুড়িতে লাগিল। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া মাত্র, তাহারা ভয়ে মুখে আঙ্গুল পুরিয়া দিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে লাগিল; তীর-তরোয়াল দূরে ফেলিয়া, মাটিতে পড়িয়া কপাল ঘসিতে লাগিল; এবং শত্রুর তরবারীতে ভস্ম হইয়া গেল।"

বার্ণির ইতিহাসের কিছুকাল পরে রচিত তারিখ-ই মুবারক শাহীতে (Elliott. vol. IV, P. 7—8.) ফিরোজ শাহের প্রথম লক্ষণাবতী অভিযানের নিম্নে অনূদিত বর্ণনা আছে।

"খান্-ই জাহানকে রাজ্যের ভার দিয়া রাজধানীতে

থিয়া, ফিরোজ শাহ সৈন্য-সামন্ত সহকারে লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিতে চলিলেন। ২৮শে রবি-অল-আওয়াল তারিখে তিনি একডালা পৌঁছিলেন এবং খুব খানিক যুদ্ধ হইল। বাঙ্গালীরা পরাজিত হইল, এবং অনেকে হত হইল। সহদেও নামে তাহাদের সেনাপতিও মারা পড়িলেন।"

বিশেষ লক্ষ্যের যোগ্য এই যে, সম-সাময়িক ঐতিহাসিক জিয়া-বার্ণির মতে ইলিয়াস্ শাহের সেনাপতিগণের মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দু রাজগণ অর্থাৎ জমীদার বা ভূমাধিকারিগণ ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে, বার্ণির পরবর্ত্তী তারিখ-ই-মুবারক শাহীতে এই রাজাদের একজনের নাম সহদেও বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে। সহদেও সমরে হত হইয়াছিলেন। পাইক ও ধানুকগণের অধিকাংশই যে হিন্দু ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কারণ, ১২০০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় মুসলমান রাজশক্তির উত্থান ধরিলে, ৭৫৪ হিঃ=১৩৬৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ দেড়শত বৎসর মধ্যে, বাঙ্গালায় এত মুসলমান হয় নাই যে, শুধু তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া ইলিয়াস্ শাহ দিল্লীর সুলতানের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, ফিরোজ শাহের লক্ষ্মণাবতী অভিযানের বিবরণ আমরা যতগুলি পাইয়াছি, তাহাদের প্রাচীনতর সবগুলিই ফিরোজ শাহের পক্ষ হইতে লিখিত। বাঙ্গালীর পক্ষ হইতে লিখিত প্রামাণ্য কোন ইতিহাস এ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই। দিল্লীওয়ালাদের লেখা হইতেই যে আভাস পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যে, ফিরোজ শাহ জয় করিতে আসিয়া বাঙ্গালার মিলিত হিন্দু-মুসলমান শক্তির নিকট, তাহাদের বীর্য্য ও কৌশলের নিকট কার্য্যতঃ পরাজিত হইয়া ব্যর্থ-মনোরথে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। গোলাম হোসেনের রিয়াজের বিবরণ অধিকাংশই দিল্লীওয়ালাদের বিবরণের সঙ্কলন। শুধু দুই জন আধুনিক বাঙ্গালী ঐতিহাসিক দেশ মধ্যে মুখে-মুখে প্রচলিত, এবং ঘটকদের কুলগ্রন্থে নিবদ্ধ তথ্য কিছু-কিছু সংগ্রহ করিয়া, লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই দুইজন মহাত্মার নাম দুর্গাচরণ সান্যাল ও রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের নাম যথাক্রমে বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস ও গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় খণ্ডে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গ্রন্থের প্রচুর প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু অধিকতর প্রশংসা পাইবার যোগ্য সান্যাল মহাশয় পরিশিষ্ট 'ছ'তে স-সমালোচনায় স-সন্দেহে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন! এই বিভিন্ন ব্যবহার যে কিরূপ একদেশদর্শী ও অসঙ্গত হইয়াছে, তাহা দুইখানি পুস্তক যাঁহারা মিলাইয়া পড়িবেন, তাঁহারা অনায়াসেই ধরিতে পারিবেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাঙ্গালার প্রাক্ মোগল যুগের আদি বাঙ্গালী ঐতিহাসিক; এই হিসাবে তিনি অশেষ প্রশংসার পাত্র। আর সান্যাল মহাশয় নিরপেক্ষ ভাবে উত্তর-বঙ্গের জমীদার-পরিবারসমূহের—যথা, একটাকিয়া, ভাদুড়িয়া, সাঁতোড়, তাহিরপুর, দিনাজপুর, নাটোর—ইত্যাদির বিশেষ বিস্তৃত ঐতিহ্য বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন। মুসলমান রাজাদের উল্লেখ করিয়াছেন তিনি শুধু প্রসঙ্গক্রমে। তাঁহার পুস্তক পড়িতে বসিয়া মনে হয় যে, তিনি যে অমূল্য ধন আমাদিগকে দিলেন, তাহা পূর্ব্বে আর কেহ দেন নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও অনেক স্থানে সান্যাল মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ অবিকল অনুসরণ করিয়াছেন। এই পুস্তক অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলে, কালে বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলন সম্ভব হইবে; কারণ, আজকাল ইতিহাসের নামে শুধু ইতিহাসের কঙ্কাল বাজারে চলিতেছে; এবং কঠোর অস্থি বাদ্যে কাণ ঝালা-পালা হইয়া উঠিয়াছে।(২)

সান্যাল মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ এই ঃ-

"বাঙ্গালা দেশ মুসলমান অধিকারভুক্ত হইলে, দেড় শত বৎসরকাল দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল। তাহার পর বিকৃত বুদ্ধি মহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে সাম্রাজ্য ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়। শুবায় শুবায় নবাবেরা স্বাধীন হইয়াছিল। বাঙ্গালার নবাব সামসুদ্দিন তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পথ-প্রদর্শক। * * * সামসুদ্দিন বেশ বুঝিয়াছিলেন, যে সেই স্বল্প-সংখ্যক মুসলমানগণের সাহায্যে তিনি কদাচ সম্রাটের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। * * এজন্য তিনি একদল হিন্দু-সেনা সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি নিজ হিন্দু কর্ম্মচারিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের হিন্দুর মধ্যে

(২) দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় এখনও বাঁচিয়া আছেন, কি না জানিনা। (লেখক)

শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় এখনও বাঁচিয়া আছেন। (ভাঃ—সম্পাদক)

শ্রেষ্ঠ কে?" তাহারা কহিল, "হিন্দুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন, আর কুলীনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমরা যতদূর জানি, দামমাশের সান্যাল এবং ভাজনীর ভাদুড়ী।" সেই কথা শুনিয়া নবাব দামমাশ হইতে শিথাই (শিখিবাহন) সান্যালকে এবং ভাজনী হইতে সুবুদ্ধিরাম ভাদুড়ী, কেশব রাম ভাদুড়ী এবং জগদানন্দ ভাদুড়ীকে আহ্বান করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত করিলেন। * * *

"জগদানন্দ পারসী ভাষা জানিতেন; নবাব তাঁহাকে দেওয়ান উপাধি দিয়া দেওয়ান করিলেন। আর শিখাই, সুবুদ্ধি ও কেশবকে খাঁ উপাধি দিয়া সেনাপতি পদে বরণ করিলেন। * * এক বৎসরের মধ্যেই নবাবের ভাণ্ডারে মহাযুদ্ধের উপযুক্ত অর্থ ও রসদ সঞ্চিত হইল। আর পঞ্চাশ হাজার হিন্দু সেনা সংগৃহীত ও সুশিক্ষিত হইল। * * ফেরোজ তোগলক কোন মতে সামসুদ্দিনকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন।

"সান্যাল এবং ভাদুড়ীত্রয়ই সামসুদ্দিনের উন্নতির প্রধান সহায় ছিলেন। এই জন্য তিনি তাঁহাদিগকে দুইটি প্রকাণ্ড জাগীর দিয়াছিলেন। শিখাই সান্যালের জাগীর পদ্মার উত্তরে চলন বিলের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। সান্যালগড় বা সাঁতোড়ে তাঁহার রাজধানী ছিল। * * শিখাই সান্যালের তিন পুত্র; প্রথম বলাই সাঁতোড়ে রাজা হন, দ্বিতীয় কানাই কুলের রাজা বা কুলপতি, এবং তৃতীয় সত্যবান বা প্রিয়দেব ফৌজদার (ইনিই তারিখ-ই-মুবারকশাহীর সহদেব হইতে পারেন)। *** ভাদুড়ীত্রয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুবুদ্ধি খাঁ জাগীর পাইয়া রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার জাগীর চলন-বিলের উত্তরে ছিল। নিজ চলন-বিলও এই দুই জাগীরদারের অধিকৃত ছিল। ভাদুড়ীর জাগীর চাকলে ভাদুড়িয়া (ভাতুরিয়া) নামে খ্যাত হইয়াছিল। সুবুদ্ধি খাঁ তাহাতে প্রায় স্বাধীন রাজার ন্যায় ছিলেন। তিনি * * * বার্ষিক একটাকা গৌড় বাদশাকে নজর দিতেন। এজন্য তদ্বংশীয় রাজাদিগকে একটাকিয়া রাজা বলিত। * * * চলনবিলের উত্তরাংশে একটি দ্বীপে ভাদুড়িয়ার রাজধানী ছিল। নগরের উত্তর প্রান্তে একটি, পূর্ব্বে একটি, দক্ষিণে দুইটি এবং পশ্চিমে তিনটি দুর্গ ছিল। এই জন্য সেই নগরের নাম সাতগড়া হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা সেই নাম সংস্কৃত করিয়া "সপ্তদুর্গা" বলিতেন। (৩)

দুর্গাচন্দ্র সান্যালের "বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস।" পৃঃ ৫২—৫৭।

৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুস্তক হইতে জানা যায় যে, ইলিয়াস্ শাহ চট্টবংশীয় দুর্য্যোধনকে "বঙ্গ-ভূষণ" এবং পূতিতুণ্ড বংশীয় চক্রপাণিকে "রাজ-জয়ী" উপাধি প্রদান করেন। গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা।

এখন দিল্লীওয়ালাদের প্রদত্ত ফিরোজ শাহের লক্ষ্মণাবতী অভিযানের বিবরণগুলি সঙ্কলন করিয়া, এই অভিযানের প্রকৃত বিবরণ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করা যাউক। তুলনামূলক সুবিধার জন্য সময় হিসাবে পর-পর বিবরণগুলি সাজান হইল।

১। জিয়াউদ্দিন বার্ণি প্রণীত তারিখ-ই ফিরোজশাহী। ইনি ফিরোজ শাহের সম-সাময়িক গ্রন্থকার,—ফিরোজ শাহের রাজত্বের প্রথম ছয় বৎসরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তক শেষ করিয়াছেন। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে মূল তারিখ-ই-ফিরোজশাহী প্রকাশিত হইয়াছে। মদীয় শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মৌলবী মুহম্মদ শাহিদুল্লাহ এম-এ মহাশয় লক্ষ্মণাবতী অভিযানের অধ্যায়টি বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন; নিম্নে বাঙ্গালায় তাহার মর্ম্মানুবাদ সঙ্কলিত হইল।

"সুলতান ফিরোজ শাহের রাজত্বের প্রথম বৎসরেই তাঁহার কাণে খবর পৌঁছিল যে, বঙ্গের সুলতান ইলিয়াস বঙ্গে জাত ও বর্দ্ধিত বহু পাইক ও ধানুক সংগ্রহ করিয়া ত্রিহুত অধিকার করিয়াছে; এবং মুসলমান ও জিম্মিগণের উপর অত্যাচার করিয়া লুট-তরাজ করিতেছে। ৭৫

---

(৩) ১৭৩০ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে-পাছে সাঁতোড় ও ভাদুড়িয়া রাজ্য নাটোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রামজীবন রায় কর্তৃক ধ্বস্ত হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে যখন রেনেল সাহেব তাঁহার বিখ্যাত বাঙ্গালার মানচিত্র তৈয়ারী করেন, তখনও ভাদুড়িয়া প্রকাণ্ড ভৌগোলিক বিভাগ ছিল। রেনেলের নবম সংখ্যক মানচিত্রে ভাদুড়িয়া BETTOORIAH রূপে ঢাকা জেলার প্রান্ত হইতে মালদহ জেলা পর্য্যন্ত প্রদর্শিত আছে। ইহাতে দেখা যায় যে, গঙ্গার উত্তরে পাবনা ও রাজসাহী জেলার সম্পূর্ণটা ও দিনাজপুর বগুড়ার কতকাংশ লইয়া রেনেলের সময়ও ভাদুড়িয়া গঠিত ছিল।

"বড়োল নদীর ধারে সাঁতোড়ের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের আত্রাই ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বদিকে তিন ক্রোশ গেলে সপ্তদুর্গাপুরীর কয়েকটী বুরুজ এখনও দৃষ্ট হয়।' সান্যালের "সামাজিক ইতিহাস"—৩৯৮-৯৯ পৃঃ।

হিজরির ১০ই শাওয়াল তারিখে সম্রাট্ ইলিয়াস্ শাহকে দমন করিবার জন্য সৈন্য লইয়া বহির্গত হইলেন; এবং কিছু দিনের মধ্যে অযোধ্যায় পৌঁছিয়া সরযূ নদী পার হইলেন। ইলিয়াস ত্রিহুতে হঠিয়া গেল। সম্রাট্ খোরাসা ও গোরক্ষপুরে উপস্থিত হইলেন। ইলিয়াস্ পাণ্ডুয়ায় হঠিয়া গেল এবং দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। গোরক্ষপুরের ও খোরাসার রাজাগণ সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া কর প্রদান করিলেন; এবং সম্রাটের বাহিনীর সহিত লক্ষ্মণাবতী অভিযানে অগ্রসর হইলেন। সম্রাট্ লুণ্ঠন নিষেধ করিয়া ফারমান প্রচার করিলেন। ইলিয়াস্ পাণ্ডুয়ায় অবস্থান নিরাপদ নহে জানিয়া পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী একডালা নামক স্থানে যাইয়া আশ্রয় লইল। একডালার একধারে জল ও একধারে জঙ্গল। সম্রাট্ গোরখপুর হইতে জাকত্ নামক স্থানে এবং জাকত্ হইতে ত্রিহুতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রিহুতের রাজা ও জমীদারগণ সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। সম্রাট্ ত্রিহুত হইতে পাণ্ডুয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইলিয়াস্ পাণ্ডুয়া পরিত্যাগ করিয়া একডালায় আশ্রয় লইয়াছে। মন্ত্রীদের সহিত সে এই পরামর্শ ঠিক করিয়াছে যে, শীঘ্রই বর্ষা আসিয়া উপস্থিত হইবে, এবং দেশ জলপ্লাবিত হইয়া যাইবে; এবং বড়-বড় মশা জন্মিয়া কামড়ের চোটে সম্রাট্ সৈন্যকে অস্থির করিয়া তুলিবে। তখন সম্রাট্ সৈন্য লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন। এই পরামর্শ করিয়া ইলিয়াস পাণ্ডুয়ার সমস্ত লোকজন লইয়া একডালায় গিয়া আশ্রয় লইল। সম্রাট্ পরিত্যক্ত পাণ্ডুয়া দখল করিয়া, ফারমান প্রচার করিলেন যে, পাণ্ডুয়ার অবশিষ্ট অধিবাসীদের উপর যেন কোন অত্যাচার না হয়। তিনি সৈন্য লইয়া একডালার সম্মুখে নদী-তীরে যাইয়া থানা গাড়িয়া বসিলেন এবং নদী পার হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, নদী পার হইয়া একডালা দখল করিলে অনেক নির্দ্দোষ লোক মারা যাইবে, অনেক স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হইবে, অনেক সাধু ফকীর অপমানিত হইবে। তিনি আরও ভাবিলেন যে, ইলিয়াস্ জল ও জঙ্গল দ্বারা যেরূপ আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছে, তাহাতে হাতী ছাড়া তাহাকে জয় করার সুবিধা হইবে না। এই আশঙ্কা করিয়া সম্রাট্ কাতর ভাবে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, ইলিয়াস্ যেন বুদ্ধি-ভ্রমে একডালা হইতে বাহিরে আসে। একদিন প্রাতে ফারমান বাহির হইল যে, ছাউনী অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠায়, অন্যান্য দিনের মত সৈন্য সমাবেশ হইবে না; অপর এক স্থানে যাইয়া সৈন্য সমাবেশ হইবে। এই ফারমান জারি হইবামাত্র, মহা আনন্দ ও কোলাহলে সম্রাটের সৈন্যদল নূতন ছাউনীর দিকে অগ্রসর হইল। ইলিয়াস্ ভাবিল যে, সম্রাটের সৈন্য বুঝি রাজধানীর দিকে হটিয়া যাইতেছে; এবং ভাঙ্গের নেশায় কোন খোঁজ-খবর না লইয়াই, তাহার হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সহ একডালা হইতে বাহির হইয়া আসিল। সম্রাটের সৈন্য ইলিয়াস্ প্রতারিত হইয়াছে ভাবিয়া খুব খুসী হইল। ইলিয়াসের কয়েক জন সেনানায়ক যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল। সম্রাট্ তাঁহার কয়েক ফৌজের উপর এই সকল সেনানায়কের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য হুকুম জারি করিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। ঐ সকল সেনানায়ক বন্দী হইল, এবং প্রথম আক্রমণেই ইলিয়াসের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ইলিয়াসের রাজছত্র, রাজদণ্ড, রাজচন্দ্রাতপ এবং পতাকা ও ৪৪টি হাতী সম্রাটের হস্তগত হইল। ইলিয়াস পলাইয়া গেল। ইলিয়াসের মৃত সৈন্যদের দিয়া স্তূপ নির্ম্মাণ করা হইল। বঙ্গের বিখ্যাত পাইকগণ এবং হোসেন রাজগণ সম্রাট্ সৈন্যের তরবারির খাদ্য হইল। অপরাহ্ন পড়িবার পূর্ব্বেই সম্রাট্-সৈন্যগণ সম্পূর্ণ জয়লাভ করিল;—কাহারও মস্তকের একগাছি কেশও কর্ত্তিত হইল না। সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনার সময় সকলে সমবেত হইলে ইলিয়াসের পক্ষের বন্দিগণ ও হস্তিসমূহ একত্র করা হইল। হস্তিগুলি রাজ সিংহাসনের সম্মুখ দিয়া মিছিল করিয়া চালাইয়া নেওয়া হইল। সম্রাটের মাহুতগণ বলিতে লাগিল যে, এত বড় হাতী দিল্লীতে কখনও কোথা হইতে সংগৃহীত হয় নাই। সম্রাট্ বলিলেন---এই হাতীর জোরেই ইলিয়াসের সাহস এত বাড়িয়াছিল; এখন সে নরম হইবে এবং উপঢৌকন দিয়া দিল্লীশ্বরকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। অসম-সাহসী বিদ্রোহীর হস্তে হাতী পড়িলে অনেক বিপদের বীজ তাহার মস্তিষ্কে উপ্ত হয়। সম্রাটের আদেশে হাতীগুলি দিল্লীতে চালান দেওয়া হইল।

এই যুদ্ধের পর দিন সম্রাটের সৈন্য একডালা দখল করিবার জন্য সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করিল; কিন্তু সম্রাটের তাহাতে মত হইল না। তিনি বলিলেন, বিদ্রোহিদলের অনেকে হত হইয়াছে; এবং তাহাদের প্রধান অবলম্বন

হাতীগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে; তাই আমাদের চেষ্টা এই হওয়া উচিত যে, আমাদের সৈন্যদল, যাহা এ পর্য্যন্ত নিরাপদে আছে, তাহারা যেন নিরাপদেই বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারে। এই রকম জয়-লাভের পরে অতিরিক্ত কিছু করিতে যাওয়া সুপরামর্শ নহে।

ইহার পরে সম্রাটের সৈন্য দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। ত্রিহুত ও জাকতে পৌছিয়া তিনি বাঙ্গালী বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে আদেশ করিলেন। তাহার পরে সম্রাটের সৈন্য সরযূ তীরে যাইয়া পৌছিল। ৭৫৫ হিজরির ১২ই শাবন তারিখে সম্রাটের সৈন্য দিল্লীতে প্রবেশ করিল। এই জয়ের পরে ইলিয়াস্ বশ্যতা স্বীকার করিল এবং নানা উপঢৌকন সহকারে সম্রাটের আমীর পদবীভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিল।

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আরও তথ্য প্রদত্ত হইবে।

সম্পাদকের বৈঠক

[১৩২৮ সালের পৌষ হইতে ভারতবর্ষের নবম বর্ষের দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভ। সম্পাদকের বৈঠকে এই মাস হইতে যত প্রশ্ন প্রকাশিত হইবে, তাহাদের একটা ধারাবাহিক সংখ্যা দিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। ১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত এই সংখ্যার পর্য্যায় চলিবে। ১৩২৯ সালের আষাঢ় হইতে আবার নূতন সংখ্যা আরম্ভ করা যাইবে। যাঁহারা প্রশ্নের উত্তর দিবেন, তাঁহারাও সংখ্যার উল্লেখ করিলে ভাল হয়। তাহা হইলে উত্তর-প্রত্যুত্তর বুঝিবার পক্ষে পাঠক সাধারণের কিছু সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। লেখক মহোদয়গণ প্রশ্নোত্তরের ধারা বজায় রাখিয়া চলিলে, অর্থাৎ জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলি প্রশ্নের আকারে, এবং উত্তরগুলি উত্তরের আকারে পাঠাইলে অনুগৃহীত হইব।—ভারতবর্ষ সম্পাদক।]

প্রশ্ন।

[১]

লাক্ষার চাষ

নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়টার উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন। ১। কোন্ কোন্ গাছের ডালে গালার গুটী জন্মায় এবং ঐ সকল গাছের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গালা কোন্ গাছের ডাল হইতে পাওয়া যাইতে পারে? ২। গালার চাষ কিরূপ ভাবে করা প্রশস্ত এবং ঐ সম্বন্ধে কোন পুস্তকাদি আছে কি না? ৩। ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতির কোন্ কোন্ স্থানে ভালরূপ গালার চাষ হয়? ৪। গালার গুটীর চাষ কোন্ সময় আরম্ভ করিতে হয় ও উহার চাষ কিরূপ প্রণালীতে হয় তাহার আলোচনা থাকিলে বিশেষ বাধিত হইব। —শ্রীসৌরভেন্দ্রনাথ দত্ত।

[২]

শ্লেট ও পেনশিল।

বর্ত্তমান সময়ে শ্লেট ও পেন্সিলের দর অত্যধিক; অথচ উহা যেন পূর্ব্বের মত বিশুদ্ধ প্রস্তর-নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয় না; কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে প্রস্তুত বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটু আলোচনা করিলে দেশের উপকার হইবে বলিয়া মনে করি। বলা বাহুল্য শ্লেট ও পেন্সিল সমস্তই এখন বিদেশ হইতে আসে। শ্রীমধুসূদন ঘোষাল।

শাস্ত্রীয় প্রশ্ন।

১। কার্ত্তিক মাসে আকাশ-প্রদীপ দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? কত দিন হইতে এই প্রথার প্রচলন হইয়াছে? ২। সব মাসের চেয়ে কার্ত্তিক মাসে এত দীপাবলীর ঘটা কেন? ৩। গঙ্গা দশহরা পূজার দিনে, কেন আদা, কলা, উচ্ছে (বীজ) না চিবাইয়া গলাধঃকৃত করিতে হয়? ৪। চুল্লীমুখে উনানের উপর মনসা পূজা হয় কেন শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী।

[৪]

আহ্নতি গাছের পাতা।

"আহতি গাছের পাতা কিরূপে বহুদিন পর্য্যন্ত fresh ও natural colour ঠিক বজায় রাখা যায়। শ্রীমনোরঞ্জন লাহিড়ী।

[৫]

রংয়ের কথা।

গ্রাম পল্লীতে দেখিতে পাই যুগী ও জোলারা যে সব কাপড় নীল, লাল ও বেগুনী রং দ্বারা রঞ্জিত করে, সেই সব কাপড়ের রং বেশী দিন স্থায়ী হয় না; ২।৩ ধোপের পর উঠিয়া যায়। মহাশয়ের নীল, লাল ও বেগুনী প্রভৃতি রং পাকা করিবার (সিদ্ধ করিলেও যেন রং উঠিয়া না যায়) প্রণালী জানা থাকিলে তাহা লিখিয়া বাধিত করিবেন। শ্রীকালীকমল চৌধুরী।

[৬]

কাতার (Coir) কল

ভারতবর্ষে কাতার (Coir) কল কোথায় আছে জানেন? যদি ভারতবর্ষে নাই থাকে, তবে কোথায় আছে ও সেই কল কোন কোম্পানি

বা ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা পরিচালিত, সবিশেষ জানাইলে বাধিত হইব। শ্রীহরিপ্রসন্ন বসু।

[৭]

কার্ড-বোর্ড বক্স।

Card-board Box making machinery কোথায় পাওয়া যায়? উহার সম্পূর্ণ setএর দাম কত? কলিকাতায় এই ব্যবসায় কতটা আছে; কত মূলধনে আরম্ভ হইয়াছিল এবং কিরূপ চলিতেছে? এই ব্যবসায় কত কম মূলধনে আরম্ভ করা যায়? এবং কিরূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা? এই সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আপনার অভিজ্ঞতা সহ বিবরণ আগামী সংখ্যায় ভারতবর্ষে আলোচনা করিলে বাধিত হইব। শ্রীসুবোধচন্দ্র গুহ।

[৮]

পশুলোম

১। বাঙ্গালার কোন্ কোন্ স্থানে পশু লোমের বিকিকিনি আছে? উহা দেশের কাজে লাগাইতে পারা যায় কি না? উহার দাম কত বা কাজের উপযোগী কি না? যাঁহারা চরকা ও তাঁত বসাইয়া তুলার সুতার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহারা পশু লোমেরও সুতা ও বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারেন কি না, বা তাহা কত সময়-সাপেক্ষ? ২। রাত্রিতে গরু মরিলে তাহা ফেলিতে নাই কেন? ইহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে কি না? ৩। কোজাগর লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন নারিকেল চিঁড়া খাইতে হয় কেন? স্বাস্থ্যের উপর ইহার কোন ক্রিয়া হয় কি না? শ্রীমতী দুর্গাপ্রিয়া বিশ্বাস।

[৯]

পোকার উৎপাত

আমার একখানি Encyclopedia পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিতেছে। পোকায় কাটার কোন প্রতিষেধক এবং পোকা নষ্ট নিবারণ করিবার কোন প্রকৃষ্ট উপায় আছে কিনা? শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল।

[১০]

পৌরাণিক।

লক্ষ্মণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি পর-স্ত্রীর মুখ দর্শন করিবেন না (এমন কি এজন্য ভ্রাতৃ-জায়া সীতার মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করেন নাই)। তবে তিনি সূর্পণখার নাক কাণ কাটিলেন কিরূপে?—

শ্রীঅমূল্যগোবিন্দ মৈত্র।

[১১]

অকেজো জিনিসের কাজ।

যে সব টিনের কৌটার কোনো দরকার নাই—সেগুলির কোনো ব্যবসায়িক ব্যবহার হইতে পারে কি? "শিশি বোতল" ক্রেতাগণ এই জিনিষ লইতে চাহে না। যদি কোন কারখানা বা Work House এর মালিক এ বিষয়ে জানান তো ভাল হয়।—শ্রীঅমিয় মুখোপাধ্যায়।

[১২]

শিশুর স্বভাব।

১। অতি অল্পবয়স্ক শিশু যে কোন জিনিস, খাদ্যই হউক আর অখাদ্যই হউক, সম্মুখে পাইলে, তাহা ধরিয়া, তাহার দ্বারা অন্য কোন প্রকার ব্যবহার না করিয়া, খাবার অভিলাষেই হউক বা যে কোন অভিলাষেই হউক, উহা মুখের ভিতর দেয় কেন এবং দিবার চেষ্টাই বা করে কেন?

২। মনে করুন, আমি একটী নিভৃত স্থানে বসিয়া খুব মনোযোগের সহিত একটী কাজ করিতেছি। এমন সময় আমার পিছন দিক হইতে দূরে যে কোন দিক হইতে একটা মানুষ কিম্বা যে কোন প্রাণী আসিতে থাকিলে, ঐ ব্যক্তি অথবা ঐ প্রাণী আমার দৃষ্টি-পথের মধ্যে না আসা পর্য্যন্ত, সেই দিকে আমার দৃষ্টি যায় কেন? অনেকে হয় ত এরূপ মনে করিতে পারেন যে, আসার দরুণ যে শব্দ হয় সেই শব্দ আমার কাণে পৌঁছিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু এমন প্রাণী আছে, যাহার হাঁটিবার সময় কোন প্রকার শব্দ হয় না, অথবা অতি মৃদু শব্দ হয়—যাহা অতি মনোযোগের সময়ে কর্ণেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতে পারে না; যথা, বিড়াল। বিড়ালের হাঁটিবার কালিন কোন প্রকার শব্দ হয় না। হইলেও তাহা মনুষ্যের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতি দুরধিগম্য। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন ও শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ।

[১৩]

নিব তৈয়ারীর কল।

১। নিব তৈয়ার করিবার কল কোথায় এবং কোন্ কোম্পানির নিকট পাওয়া যায়। ২। ইহার দর কত পড়িবে? ৩। কত মূলধন হইলে এই কল চলিতে পারে। ৪। কি কি ধাতু নিব তৈয়ার করিবার উপযুক্ত?—শ্রীশৈলজাপ্রসন্ন দাস।

[১৪]

সুন্দরবনে লোকাবাস।

"সুন্দরবন" নামক স্থানটী যে কিরূপ জঙ্গলময় ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এখন তাহার অধিকাংশ স্থলই উত্তম রূপে পরিষ্কৃত হইয়া চাষবাসের উপযোগী হইয়াছে। বহুসংখ্যক লোকও তথায় বাস করিতেছে। যখন সুন্দরবন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, তখন আমার পিতামহ মহাশয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কিয়দংশ জমি লিজ লইয়া চাষবাসের উপযোগী করিবার জন্য জঙ্গলচ্ছেদন করিতে থাকেন। সে সময় ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রাদি জন্তু তথায় বিচরণ করিত; এবং আমরাও ৩।৪টী ভীষণাকার ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছিলাম।

সেই ভীষণ জঙ্গল পরিষ্কারের সময় জঙ্গল মধ্য হইতে একটী ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত বাটী বাহির হয়; কে বা কাহারা যে ওই জঙ্গলে বাটী

প্রস্তুত করিল তাহা জানা যায় না। কেহ বলে উহা দস্যুদের আড্ডা; কেহ বলে এখানে পূর্ব্বে লোকের বসতি ছিল—তাহারই চিহ্ন। কিন্তু শেষোক্ত কথাটী বিশ্বাস করিতে হইলে, মনে হয় যে, এখানে অন্য বাটীর চিহ্ন নাই কেন? আমরা সে সময় ঐ বাটীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে আকবরের আমলের টাকাও পাইয়াছিলাম এবং এখনও সে টাকা আমাদের কাছে আছে। এখন এই স্থানটী "শ্রীনারায়ণপুর ১৬ নং" বলিয়া খ্যাত।—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

[১৫]

লেবু গাছে পোকা।

১। সাধারণতঃ লেবু গাছে এক প্রকারের পোকা লাগিয়া গাছকে অকালে বিনষ্ট করে। কি উপায় অবলম্বন করিলে উক্ত জাতীয় পোকার আক্রমণ হইতে লেবু গাছকে রক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে?

২। আম, কাঁঠাল, কলা, কুল ও ভিন্ন ভিন্ন শাক-সব্জি জাতীয় গাছ অনেক সময় পোকা লাগিয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই বিষয়ে একটু আলোচনা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

পোকা নিবারণ জন্য ভিন্ন ভিন্ন গাছে কি কি ঔষধ ব্যবহার করা উচিত?—শ্রীকালিকাপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

[১৬]

বিষম সমস্যা।

এক ভদ্রলোক লিখিয়াছেন তিনি শাকআলু হইতে ময়দা গুড় ও শটী প্রস্তুত করিয়াছেন। কি করিয়া করিয়াছেন জানাইবেন কি? আলুর ময়দা ও উহা হইতে গুড় হইতে পারে; কিন্তু শটী কি প্রকারে হইবে বুঝিতে পারিলাম না। শটী এক প্রকার গাছের মূল হইতে প্রস্তুত হয়। সেই শটী ও আলুর শটীর গুণাগুণ কি পৃথক্ নহে?—শ্রীমোহিতকুমার মুখোপাধ্যায়।

[১৭]

ক্রোম চামড়া।

১। ক্রোম চামড়া ভারতবর্ষে পাওয়া যায় কি? যদি পাওয়া যায় তাহ'লে কোন্ স্থানে? ২। ক্রোম চামড়ার (Crome Leather) জুতা আমরা পায় দিতে পারি কি? কোন National জুতার দোকানে পাওয়া যাইতে পারে? ৩। ক্রোমের (crome) কালি কি এখন বাহির হয় নাই? যদি হইয়া থাকে, তা'হলে কোথায় পাওয়া যায়? যদি বাহির হইয়া থাকে তা'হলে ইহার প্রস্তুত করিবার সহজ প্রণালী কি? ৪। কালির ব্যবসা করিলে কিরূপ হয়? সহজে এবং কম খরচে জুতার কালি প্রস্তুত করিবার প্রণালী কি?—শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[১৮]

রেশম।

আমাদের দেশে বড়ই (কুল) কিম্বা আমগাছে রেশম পোকার বাসা পাওয়া যায়। তাহা হইতে কিরূপে সূতা বাহির করা যায়? গরম জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে সূতা বাহির হয় না।—ম্যানেজার, শান্তি লাইব্রেরী।

[১৯]

আলুর পোকা।

১। গত বৎসর আমাদের অর্দ্ধেক আলু পোকায় খাইয়া নষ্ট করিয়াছিল। এই অত্যাচার নিবারণের উপায় কি? ২। আশ্বিনের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত মহাশয় যে কয়েক প্রকার আলুর সারের কথা বলিয়াছেন, তাহা আমরা কোথায় পাইব এবং মূল্য কত? ৩। আলুর চাষে গোবরের সার কেমন উপকারী?—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্ত।

[২০]

শাস্ত্রীয় প্রশ্ন।

বিজয়ার দিন বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়া কেন কলাপাতে "দুর্গানাম" লিখিতে হয়? সেই দিন কেনই বা অন্ততঃ একটুখানি সিদ্ধি খাইতে হয়।

ভট্টিকাব্য প্রকৃতপক্ষে কাহার কৃত? ইহার রচনা সম্বন্ধে নানাবিধ মত আছে; কোন্‌টা সত্য?

আজকাল দেশী কলম ও পেন্সিল কোথায় কোন্ কারখানায় তৈয়ারি হইতেছে? তাহার ঠিকানা জানাইবেন।—শ্রীবামাচরণ কুণ্ডু বি-এ, বি-এল।

[২১]

কয়েকটি প্রশ্ন।

১। বৈজ্ঞানিক। দুইটা বিভিন্ন গরুর দুধ দোহাইয়া একটী পাত্রে রাখা হইল। দুই গরুর দুধের বর্ণ, ওজন, স্বাদ, সারবত্তা প্রভৃতি যাবতীয় গুণ একই প্রকারের। বৈজ্ঞানিক কোনও প্রণালী দ্বারা সেই দুই গরুর দুধ পৃথক করিবার উপায় আছে? যোগবলে পারা যায়, তেমন কোনও প্রমাণ আছে কি?

২। শাস্ত্রীয়। শয়নের সময় উত্তর ও পশ্চিম দিকে শিয়র দিবে না এমন একটা সংস্কার কোন কোনও স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার মূলে কোন রূপ তথ্য আছে কি না?

৩। ব্যাকরণ-ঘটিত। পৈত্রিক ও পৈতৃক এই দুইটী শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটীর সাধন-প্রণালী পিতৃসম্বন্ধীয় এই অর্থে পিতৃ×ষ্ণিক=পৈত্রিক। দ্বিতীয় পদটী নিষ্পন্ন করিতে প্রণালী কি এবং সূত্র কি? অথচ উহা পৈত্রিক শব্দের সমান অর্থ গ্রহণ করে কি না বা বস্তুতঃ শুদ্ধ কি না?—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

[২২]

নিম তৈল।

১। নিমের তেলে সাবান বা কোনও ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য উহার গুণ নষ্ট না করিয়া কিরূপে উহাকে দুর্গন্ধহীন করা যায়?

২। পেঁপের আঠা ও নিমের আঠা এবং দুধ (যাহা কোনও কোনও নিমগাছ হইতে আপনিই মাঝে-মাঝে ঝরিয়া পড়ে) কিরূপে অবিকৃত

ভাবে অর্থাৎ preserve করিয়া রাখা যায়। পেঁপে ও নিমের আঠার গুণ কি এবং কোন্-কোন্ ব্যাধিতে ব্যবহার করিতে পারা যায়?—শ্রীফণীভূষণ ভাদুড়ী।

[২৩]

বাহারগড় কাহার গড়?

পাঁশকুড়ার (Panchkura) নিকটবর্ত্তী চাঁপডালী গ্রামে গড়বাহার বা বাহারগড় বলিয়া একটী প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, ঐ স্থানে একজন রাজার রাজবাড়ী ছিল। যদি রাজবাড়ী ছিল, তবে তাহা কোন্ রাজার? কত সাল হইতে কত সাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ স্থানে ছিলেন?—শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য।

উত্তর।

চরকায় কাটা সুতা ১২ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া গরম জলে ৫।৬ ঘণ্টা সিদ্ধ করিলে অপেক্ষাকৃত শক্ত হয়। শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত।

আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, এই বৎসরের আশ্বিন সংখ্যার "ভারতবর্ষে" পোঃ বহিরগাছি, সাধনপাড়া গ্রাম (নদীয়া) হইতে শ্রীপাঁচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন যে, "প্রসবকালে গর্ভিণীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়াও যদি সন্তান প্রসব হইতে বিলম্ব বা কষ্ট হয়, তবে গর্ভিণীর কেশের অগ্রভাগে কাঁটানটের শিকড় (root) বাঁধিয়া উহা নাভিদেশে ঝুলাইলে শীঘ্রই সন্তান প্রসব হয়। কাঁটানটের কি এ ক্ষমতা আছে বলিয়া মনে করেন।" আমি ইহার উত্তরে বলি যে, হাঁ ঐরূপ বন্ত

Corner cutter বা কোণা কাটা

কাটার বা কাটিবার কল

শিকড়ের এইরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতাই আছে, কারণ আমি উক্ত বিষয়টীর প্রত্যক্ষদর্শী। আমি বাঁকুড়া জেলায় ময়নাপুর গ্রামে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী কোনও সময়ে যাই। যাইয়া দেখি যে সেই বাড়ীতে একটি মেয়ে এক দিনরাত ধরিয়া প্রসববেদনা খাইয়াছে। তাহার পর দিন গৃহকর্ত্তা একটি ছোট লোকের মেয়েকে (পাড়াগাঁয়ে উহারাই ধাত্রীর কাজ করে থাকে) ডাকে। সে আসিয়াই গৃহকর্ত্তাকে এক নিঃশ্বাসে একটি কাঁটানটের গাছ উপড়িয়া আনিতে বলে। আনিবার পর সেই ছোটলোকের মেয়েটি উহা গর্ভিণীর কেশে বাঁধিয়া নাভিদেশ পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দেয়।

কিছুক্ষণ পরে যন্ত্রণা নিবারণ হইতে থাকে; এবং ভালরূপে প্রসব হয়। আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। শ্রীপুলিনবিহারী সরকার।

১। শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সত্যজ্যোতিঃ গুপ্ত মহাশয়ের প্রশ্নোত্তর—১। শাক আলুর খোসা দুগ্ধবতী গাভীকে খাওয়াইলে, দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৬। কচুরী ও পানা প্রভৃতিতে পটাসিয়াম থাকে, এজন্য ইহার সার গাছের বিশেষ পুষ্টি সাধন করে, পানা পোড়াইলে তাহার ভস্মে শতকরা ১২ ভাগ পটাসিয়াম পাওয়া যায়।

১৬। তামাকুর গুল গুঁড়াইয়া দাঁতের মাজন প্রস্তুত করা যাইতে পারে, ইহা ব্যবহারে দাঁতের গোড়া বেশ শক্ত হয়।

কল-কব্জা।

আজকাল সকল প্রকার শিল্প জাত দ্রব্যই প্রায়শঃ কার্ডবোর্ডের বাক্সে প্যাক করিয়া বিক্রয়ার্থে বাজারে দেওয়া হয়। এই সমস্ত বাক্স অতি সহজে প্রস্তুত হইতে পারে। সাধারণতঃ তিন প্রকার কলের সাহায্যে এই সমস্ত বাক্স প্রস্তুত হয়। প্রথমতঃ কাগজ অর্থাৎ কার্ডবোর্ডগুলি একখানি ছুরি দ্বারা কাটিয়া, উহা দাগিয়া ভাঁজ দিবার জন্য scoring machineএ দেওয়া হয়। ইহার পর কোণা ভাটা কলে বাক্সের কোণা কাটিয়া উহা পাতলা কাগজে মুড়িয়া দিতে হয়। এই কাজগুলি ১২।১৪ বৎসরের বালক বালিকারাও করিতে পারে। বড় এবং বেশী মজবুত বাক্স প্রস্তুত করিতে হইলে আর এক প্রকার কল লাগে। তাহাতে বাক্সের কোণাগুলিতে তার দিয়া বাঁধিয়া দেয়।
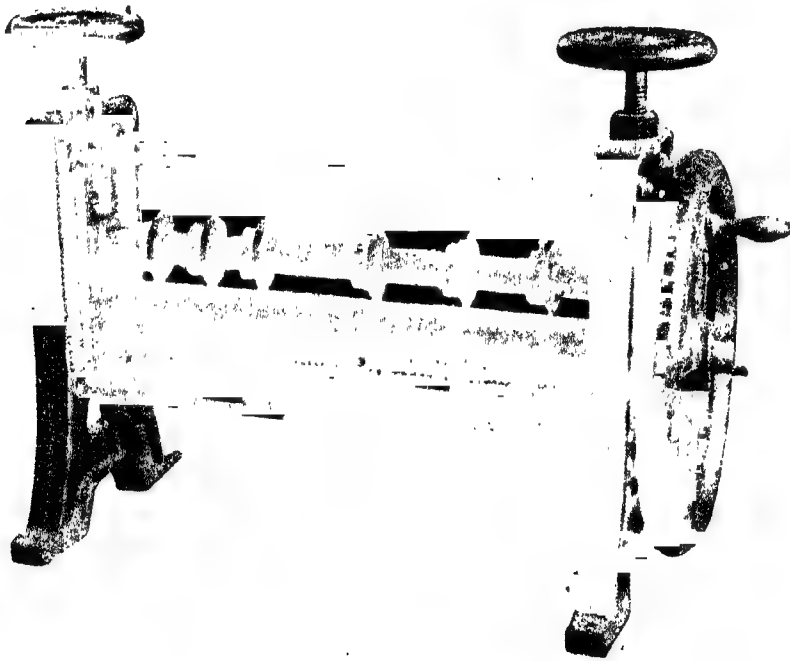
স্কোয়ার বা ভাজ দাগিবার কল

১৯। আলুর চাষে সাধারণতঃ গোময় প্রথমে মাটির সহিত মিশাইয়া পরে আলু বপন কালীন সরিষার খইল দেওয়া হয়। পুনরায় মাটি দিবার সময়ও খইল দেওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে। সাধারণতঃ শুকনা জমিতেই আলু ভাল জন্মে।

২০। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, প্রত্যেক ৵৹ অর্দ্ধপোয়া লইয়া একটি লৌহপাত্রে ⁄১ সের জল দিয়া ভিজাইয়া রৌদ্রে ২।৩ দিন রাখিলেই উৎকৃষ্ট কালি প্রস্তুত হয়। লৌহপাত্র অভাবে মাটির পাত্রে রাখিয়া তাহাতে কয়েক খণ্ড লৌহ ফেলিয়া রাখিলেও চলে। শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ।

এই কার্য্যটী পাতলা কাপড়ের টুক্‌রা দ্বারাও সম্পন্ন হইতে পারে। তাহা হইলে আর কোনও কলের প্রয়োজন হয় না। কাপড়ের টুক্‌রায় আটা মাখাইয়া বাক্সে কোণায় লাগাইয়া দিতে হয়। চিরুণী, বোতাম, পেন্সিল, চুড়ি, সাবান, এসেন্স প্রভৃতির জন্য যে সকল ছোট ছোট বাক্স প্রয়োজন হয়, তাহা হস্ত-চালিত কলে প্রস্তুত হইতে পারে। এই কলগুলির মূল্য সর্ব্বসাকুল্যে ৪৮৫ মাত্র। উহা ২০-১ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতায় অরিএন্ট্যাল মেসিনারি সাপ্লাইং এজেন্সী লিমিটেডে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-সি-ই, এম্-আর এ-এস।

নিখিল-প্রবাহ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

আগুনে তাতাইয়া পরীক্ষা

কাচ খণ্ডের সাহায্যে পরীক্ষা

জহরত ক্রয়

এসিডের সাহায্যে পরীক্ষা

টকা ঘসিয়া পরীক্ষা

জলবিন্দুর দ্বারা পরীক্ষা

জলের গেলাসের মধ্যে ফেলিয়া পরীক্ষা

১। রত্ন-পরীক্ষা।

জহুরী জহর চেনে, এ কথা সত্য ; কিন্তু ক্রেতারা অনেকেই চেনে না। সুতরাং জহুরী যদি বলিয়া দেয় যে, এখানি আসল হীরে, তবে তাহার কথার উপর বিশ্বাস করিয়াই ক্রেতাদের সন্তুষ্ট হইতে হয়। কিন্তু সে পাথরখানি আসল হীরে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার কতকগুলি সহজ উপায় আছে, যাহা জানা থাকিলে জুয়াচোরের হাতে ঠকিতে হইবে না। হীরক চিনিবার খুব সহজ উপায় হইতেছে, একখানি সাদা কাগজে একটী কালির ফুট্‌কী দিয়া, উহার সহিত সমরেখায় হীরাখানি ধরিয়া, একটুক্‌রা কাঁচের ভিতর দিয়া হীরকখণ্ড ভেদ করিয়া ঐ কালির ফুট্‌কীটি দেখিবার চেষ্টা করা। যদি উহা দেখা না যায়, কিম্বা একাধিক ফুট্‌কী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহা ঝুটা মাল,—আসল পাথর নয়। আর একটা সহজ উপায় হইতেছে, ঐ হীরকখণ্ডের উপর একফোঁটা জল ফেলিয়া দেখা। যদি আসল জিনিষ হয়, তাহা হইলে ঐ জলের ফোঁটাটি হীরকখণ্ডের উপর অবিকৃত অবস্থায় টলটল করিবে; কিন্তু নকল মাল হইলে, ঐ জলবিন্দু নাড়াচাড়া পাইলেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। জলপূর্ণ একটি কাঁচের গেলাসের মধ্যে হীরকখণ্ড ফেলিয়া দিয়াও, উহা খাটি কি না ধরিতে পারা যায়। আসল হীরে গেলাসের বাহির দিক হইতে জলের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু নকল জিনিস ঝাপ্‌সা দেখায়। আসল হীরের গায়ে উকো ঘসিলেও কোনও দাগ পড়ে না; কিন্তু নকল পাথরে দাগ ধরে। দু'চার ফোঁটা হাইড্রোফ্লুরীক এসিড হীরকখণ্ডের উপর ফেলিয়া দিলে, নকল হীরে তৎক্ষণাৎ গলিয়া যায়; কিন্তু আসল পাথর ঠিক থাকে। হীরকখণ্ডটি আগুনে তাতাইয়া, বোরাক্সের মধ্যে পূরিয়া, ঠাণ্ডাজলের মধ্যে ফেলিয়া দিলে, নকল পাথর গুঁড়া হইয়া যায়; কিন্তু আসল জিনিস একটুও নষ্ট হয় না।
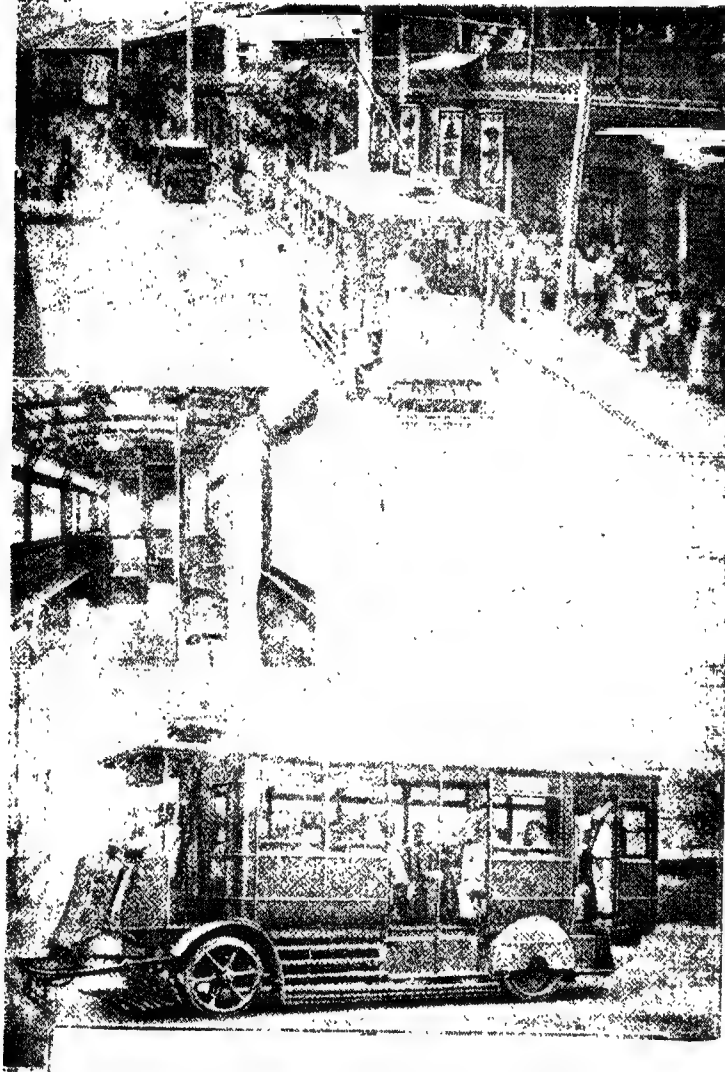
(Popular Science)

বে-লাইন বৈদ্যুতিক ট্রাম গাড়ী (সম্মুখ, ভিতর ও পার্শ্বদিক)

২। বে-লাইন ট্রামগাড়ী।

লাইনের উপর দিয়া বাঁধা রাস্তায় ট্রাম চলার অনেকগুলি অসুবিধা আছে; যেমন একখানি গাড়ী 'আউট-লাইন' হইলে, সে লাইনের অনেকগুলি গাড়ীকে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া
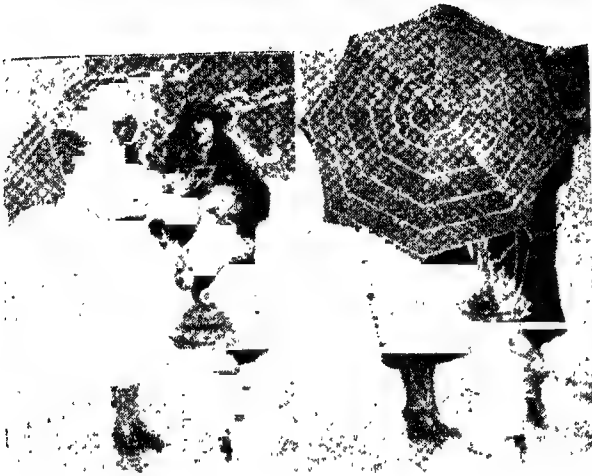
বে-তার বার্ত্তা-গ্রাহক যন্ত্র (মেয়েদের জন্য)

বে-তার বার্ত্তা-গ্রাহক যন্ত্র (পুরুষদের জন্য)

থাকিতে হয়। সামনে লাইনের উপর অন্য কোনও গাড়ী পড়িলে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার উপায় নাই। যে-যে পথে লাইন পাতা হয় নাই, সে রাস্তায় চালাইবার উপায় নাই। তা' ছাড়া, এই লাইন পাতা, মেরামত প্রভৃতি লইয়া অনেক বাজেখরচ করিতে হয় বলিয়া, জাপান সর্ব্বপ্রথমে বে-লাইন

ছেলেদের মোটর ঠেলা-গাড়ী

ট্রাম চালাইতে সুরু করে। এখন আমেরিকা, চায়না ও ইংল্যাণ্ডেও বে-লাইন ট্রামের প্রচলন হইয়াছে। তবে মাথার উপর ইলেক্‌ট্রিক তার ও তাহার সহিত ট্রামের টিকির সংযোগ এখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

Popular Science)

৩। বে-তার বার্ত্তা-গ্রাহক যন্ত্র।

পথে চলিতে-চলিতেও যাহাতে বে-তার বার্ত্তা গ্রহণের পক্ষে কোনও অসুবিধা না হয়, য়ুরোপে তাহারই একটা সহজ উপায় উদ্ভাবনের জন্য নানা চেষ্টা চলিতেছে। সম্প্রতি একটি যন্ত্র বাহির হইয়াছে, যাহা য়ুরোপীয় মেয়েদের ব্যবহার করিবার পক্ষে কোনও অসুবিধা হইবে না। পথে বাহির হইবার সময় তাহাদের অনেকেরই একহাতে দীর্ঘ-দণ্ড একটি সৌখীন ছাতি, এবং আর এক হাতে একটি সুদৃশ্য ব্যাগ বা 'রূপ-দান'
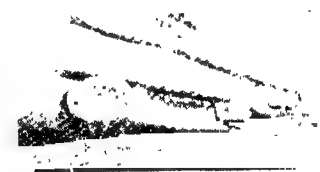
আংটি-ঘড়ী

(ইংরাজিতে ইহাকে 'Vanity case' বলে; ইহার মধ্যে ছোট আর্শি, চিরুণী, পাউডার, রুজ, এসেন্স্‌, সাবান, রুমাল ইত্যাদি এ তো থাকেই,—এ ছাড়া আবার কাহার-কাহারও টাকা পয়সা, চাবির রিং, নাম লেখা কার্ড, সিগারেট ও দেশলাই, এবং ছুরি কাঁচি ইত্যাদিও থাকে!) দেখিতে পাওয়া যায়। এই ছাতি ও রূপ-দানের সাহায্যেই উক্ত বেতার বার্ত্তা-গ্রাহক যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। ছাতির রেশমী কাপড়ের

কোন্ জিনিসটি কি—একবার দেখিয়াই বলা যায় না। সবই বেঁটে এবং চ্যাপ্টা বলিয়া মনে হয়! পাঁচ শত মাইল তফাতে অবস্থিত এমন দুইটি সহরকেও যেন পাশাপাশি রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়! অনেকবার চড়িয়া দেখা অভ্যাস না থাকিলে, কোন্‌টি কোন সহর বা গ্রাম তাহা বলা দুঃসাধ্য।

(Popular Science)

১১। দ্বিচক্র-যানে হাওয়ার হাল।

ক্যারোলীনার জনৈক অধিবাসী তাঁহার মোটর-সাইকেলের পশ্চাতে আবার একটা হাওয়ার হাল সংযুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, বেগে চলিতে-চলিতে হঠাৎ মোড় ফিরিবার সময়, প্রায়ই গাড়ীখানি একপাশে কাত হইয়া পড়ে বলিয়া, আমি অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া গাড়ীর পশ্চাতে এই হাল সংযুক্ত করিয়াছি। ডাইনে মোড় ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে হালখানি বাঁয়ে ঘুরাইয়া ধরিলে, গাড়ী আর কাত হইয়া পড়ে না। এতদতিরিক্ত আর একটা বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এই যে, অল্প জোরে গাড়ী চালাইলেও, এই হাওয়ার হাল সংযুক্ত থাকায়, আমার গাড়ী অধিক বেগে যাইতে পারে।

(Popular Mechanics)

১২। জলে দ্বিচক্রযান।

ইংলিশ চ্যানালে তরঙ্গ-স্রোতের উৎপাত এত অধিক যে, জাহাজে পারাপার হইতেও যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। আজকাল সেই জন্য উড়ো জাহাজেই লোকে এপার-ওপার যাতায়াত করে। কুমারী হিল নাম্নী জনৈকা বালিকা কিন্তু তাহার দ্বিচক্র-যানে চড়িয়া সম্প্রতি ইংলিশ চ্যানাল পার হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। প্রায় যখন ওপারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আর মাত্র ২।৩ মাইল বাকি, সেই সময় তাহার গাড়ীখানি ঢেউয়ের বেগ সামলাইতে না পারিয়া, জলের ভিতর উল্টাইয়া যায়। কাজে-কাজেই হিলকে নৌকা চড়িয়া কূলে আসিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, সে যে কেবল একখানি দ্বিচক্র-যানে চড়িয়া ইংলিশ চ্যানালের অতটা পার হইয়া আসিতে পারিয়াছিল, এজন্য সকলে তাহাকে বাহাদুরী দিতেছে। এই দ্বিচক্র-যান বিশেষ ভাবে জলে চালাইবার জন্যই নির্ম্মিত। চাকায় রবারের টায়ার টিউব থাকে না। পশ্চাতের চাকাখানিতে জল কাটিবার জন্য আল করা আছে। গাড়ীখানির দু'ধারে দুইটি মজবুত 'ভেলা' আঁটা থাকে। এই দুইটি 'ভেলার' জোরে আরোহী সমেত গাড়ীখানি জলের উপর ভাসে। চালাইবার কৌশল যেমন স্থলের উপর, তেম্‌নি জলেও পায়ে প্যাডেল করা ভিন্ন আর কিছু নয়।

(Popular Science)
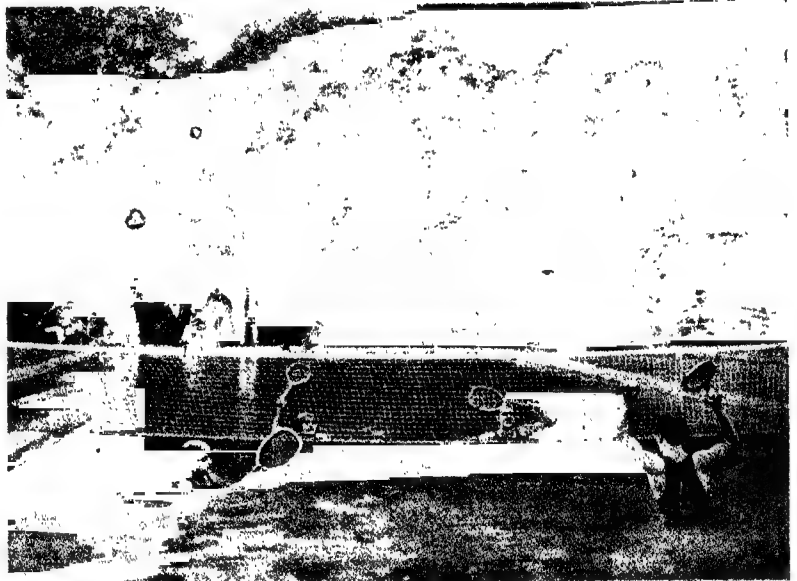
জলে টেনিস্ খেলা

১৩। জল-টেনিস্।

জলে বল খেলা অর্থাৎ 'ওয়াটার পোলো' এখানে অনেকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু জলে 'টেনিস্' খেলা এখানে এখনও সুরু হয় নাই। কেবল এখানে কেন, বিলাতেও হয় নাই। আমেরিকাই সর্ব্ব-প্রথম জলে টেনিস্ খেলা আরম্ভ করিয়াছে; তাও বেশি দিন নয়,—খুব সম্প্রতি। এ খেলার মরশুম গ্রীষ্ম-কালে। গভীর জলে এ খেলার সুবিধা হয় না। অল্প জলে অর্থাৎ কোমর বা বুকজলে দাঁড়াইয়া খেলিতে হয়। মাঝে-মাঝে সাঁতারও কাটিতে হয়; জলে নাকানি-চোবানীও খাইতে হয়। ডাঙায় টেনিস্ খেলা অপেক্ষা এই জল-টেনিস্ ঢের বেশি আমোদজনক; এবং ব্যায়ামের দিক দিয়াও শ্রেষ্ঠতর।

(Popular Mechanics)

"সাজাহানে"র গান।

প্রথম গীত।

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

পিয়ার্‌।

এ জীবনে পূরিল না সাধ ভাল বাসি'—
ক্ষুদ্র এ হৃদয় হায়! ধরে না ধরে না তায়—
আকুল অসীম প্রেমরাশি।
তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি,'
রাখিনা কেনই যত কাছে;
যুগল হৃদয়-মাঝে, কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে?

এ ক্ষুদ্র জীবন মোর, এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর,
হেথা কি দিব এ ভালবাসা।
যত ভালবাসি তাই, আরও বাসিতে চাই,
দিয়া প্রেম মিটেনাক আশা।
হউক অসীম স্থান, হউক অমর প্রাণ,
ঘুচে যাক্ সব অবরোধ,
তখন মিটাব আশা, দিব ঢালি' ভালবাসা,
জন্ম-ঋণ করি পরিশোধ।

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

	২´			৩			০			১				
II {	সা	দা	|	পা	-া	মা	|	মা	মা	|	মা	মা	-া	I
	এ	জী		ব	০	নে		পূ	রি		ল	না	০	

	২´			৩			০			১				
I	জ্ঞমা	-পদা	|	-পমা	-জ্ঞঋজ্ঞা	জ্ঞমা	|	জ্ঞা	-ঋা	|	সা	-া	-া }	I
	সা ০	০ ০		০ ০	০ ০ ধ্	ভাল		বা	০		সি	০	০	

* "সাজাহানে"র গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে, যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে। —লেখিকা।

২´ ৩ ০ ১
I { মা -া | মা -া মা | পপা দদা | মা -পা -া I
ক্ষু ০ দ্র ০ এ হৃ দয় হা ০ য়

২´ ৩ ০ ১
I দা দা | দা -া -ণা | পা দা | মা -পা -া } I
ধ রে না ০ ধ রে না তা ০ য়

২ ৩ ০ ১
I সা দা | দা -া দা | পা দপা | জ্ঞা জ্ঞা া I
আ কু ল ০ অ সী ম০ প্রে ম ০

২´ ৩ ০ ১
I মা -পা | -দা -ণা -দপা | -মা -জ্ঞা | -ঋা সা -া II
রা ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ শি ০

২ ৩ ০ ১
II { মা মা | ণঃ -দাঃ দদা | দা দণা | দা ণা -া I
তো মা র ০ হৃ দ য়০ খা নি ০

২´ ৩ ০ ১
I র্সর্ঋা র্ঋা | র্ঋা -া র্ঋর্ঋা | র্সা র্ঋা | ণা র্সা -া I
আ০ মা র ০ হৃ দ য়ে আ নি ০

২´ ৩ ০ ১
I র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা | র্সর্ঋা -র্সর্ঋা | র্সা ণঃ -দাঃ I
রা খি না ০ কে ন০ ০ই য ত ০

২´ ৩ ০ ১
I দণা -র্সর্ঋা | ণঃ -র্সাঃ -া | -া -া | -া -া -া I
কা০ ০০ ছে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা | র্সা -া র্সর্সা | র্সা র্সা | ণর্সা -ণর্সর্ঋা র্সা I
যু গ ল ০ হৃ দ য় মা০ ০০০ ঝে

২´ ৩ ০ ১
I ণা ণা | ণা -া ণা | পা ণা | দা পা -া I
কি যে ন ০ বি র হ বা জে ০

২´ ৩ ০ ১
I সা দা | দা -া দা | পা -া | মা জ্ঞা -া I
কি যে ন ০ অ ভা ০ ব ই ০

২ ৩ ০ ১
I মা পা | -দা -ণা -দপা | মা -জ্ঞা | -ঋা সা -া } I
র হি ০ ০ ০০ য়া ০ ০ ছে ০

২´ ৩ ০ ১
I { মা মা | মা -া মা | পা দা | মা -পা -া I
এ ক্ষু দ্র ০ জী ব ন মো ০ র্

২´ ৩ ০ ১
I দা দা | দা -া ণা | পা দা | মা -পা -া } I
এ ক্ষু দ্র ০ ভু ব ন মো ০ র্

২´ ৩ ০ ১
I দা দা | দা -া দা | পা দপা | মজ্ঞা জ্ঞা -া I
হে থা কি ০ দি ব এ০ ভা০ ণ ০

২´ ৩ ০ ১
I মপা -দা | পা - -া | -া -া | -া -া -া I
বা০ ০ সা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I { মা মা | মজ্ঞা -মা মা | পা পা | পা -া পা I
য ত ভা০ ০ ল বা সি তা ০ ই

২´ ৩ ০ ১
I পা -দা | দা ণা দা | পা দপা | মা -পা পা } I
আ০ ০ র ও বা সি তে০ চা ০ ই

২ ৩ ০ ১
I [জ্ঞা মা | জ্ঞমা ঋা -মা | জ্ঞা জ্ঞা | ঋা সা -া I
I { সা দা | দা -া -া | পা দা | পা মা -া
দি য়া প্রে ০ ম্ মি টে না ক ০

২ ৩ ০ ১
I [ণ্সা ঋা | সা -া -া | -া -া | -া -া -া]
I পা র্সা | ণা -া -া | -দা -পা | -মা -া -া } I
আ০ ০ শা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

I { মা মা | ণঃ -দাঃ দা | দা দণা | দদা ণা -া I

ত উ ক ০ অ সী ম০ স্থা ০ ন্

২ ৩ ০ ১

I র্সঋা ঋা | ঋা -া ঋা | র্সা ঋর্সা | ণা -সা -া } I

হ০ উ ক ০ অ ম র০ প্রা ০ ণ্

২´ ৩ ০ ১

I জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা -া -া | ঋা ঋা | র্সা ণঃ -দাঃ I

ঘু চে যা ০ ক্ স ব অ ব ০

২´ ৩ ০ ১

I দণা র্সঋা | র্সা -া -া | -া -া | -া -া -া I

রো০ ০০ ধ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

I { র্সা র্সা | র্সা -া র্সা | র্সা র্সা | ণর্সা .ণর্সঋা র্সা I

ত থ ন ০ মি টা ব আ০ ০০০ শা

২ ৩ ০ ১

I ণা ণা | ণা ণা -া | পা ণা | দা পা -া } I

দি ব ঢা লি ০ ভা ল বা সা ০

২´ ৩ ০ ১

I পা -দদা | দা -া -দা | পা দা | পা মঃ -জ্ঞাঃ I

জ ন্ম ঋ ০ ণ্ ক রি প রি ০

২´ ৩ ০ ১

I মা -পা | -দা -ণা -দপা | -মা -জ্ঞা | -ঋা সা -া II II

শো ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ধ ০

বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যা

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ]

আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'শিক্ষার মিলন' নামক প্রবন্ধে জাতীয় উন্নতির প্রকৃত পথ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ এই যে, ভারত শুধু অধ্যাত্ম-বিদ্যারই চর্চ্চা করিয়াছে; 'বিজ্ঞান'কে * অবহেলা করিয়াছে। বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া পাশ্চাত্য দেশের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের বিজ্ঞানের সহিত অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চ্চা নাই বলিয়া, সে উন্নতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে নাই। বিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মবিদ্যা উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক যথোচিত অনুশীলন করিলে, মানব জাতির আদর্শ উন্নীত হইবে। এই মত আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, এবং রবীন্দ্রনাথ যেরূপ জোরের সহিত ইহার প্রচার করিয়াছেন, সেরূপ বোধ হয় আর কেহ করেন নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে; তাহা নিবেদন করিতেছি।

ভারতবর্ষ যে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিজ্ঞানকে অবহেলা করিয়াছে, ইহা যথার্থ নহে। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য রাজার অর্থসাহায্য ও উৎসাহ যে পরিমাণে প্রয়োজন, পরাধীন জাতি বলিয়া ভারতবাসী বহুদিন তাহা হইতে বঞ্চিত ছিল। ভারত যখন স্বাধীন ছিল, ভারতের বৈজ্ঞানিক যখন রাজার উৎসাহ পাইত, তখন ভারতে বিজ্ঞানের অবহেলা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধেই বলিয়াছেন, প্রাচীনকালে "বস্তুবিদ্যা ও নিয়মতত্ত্ব ওরা (পাশ্চাত্য জাতি) যতটা শিখেছিল, আমরা তার চেয়ে

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বিজ্ঞান শব্দের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিয়াছি,—Scientific knowledge. রবীন্দ্রনাথ ইহার নাম দিয়াছেন, 'বস্তুবিদ্যা'। বস্তুবিদ্যা শব্দটি ঠিক হয় নাই; কারণ, হিন্দু দর্শনে কেবল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্য পদার্থকেই বস্তু বলা হয় নাই,—ইন্দ্রিয়ের অগোচর অধ্যাত্মবিদ্যা বিষয়গুলিকেও বস্তু বলা হইয়াছে; যেমন মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার। সুতরাং অধ্যাত্ম বস্তুবিদ্যার অন্তর্গত। বোধ হয় Science শব্দের প্রচলিত অর্থ বুঝাইতে 'ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থবিদ্যা' এইরূপ কিছু বলিতে হইবে।

বেশী শিখেছিলাম।" বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য যতটা অর্থব্যয় ও সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয়, অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চ্চার জন্য ততটা প্রয়োজন হয় না। এইজন্য ভারত পরাধীন হইবার পর হইতে, তাহার বিজ্ঞান-চর্চ্চার যতদূর অনিষ্ট হইয়াছে, অধ্যাত্ম-বিদ্যা-চর্চ্চার ততদূর অনিষ্ট হয় নাই। অপর কথায়, ভারতে বিজ্ঞান-চর্চ্চার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ ভারতের পরাধীনতা। বিজ্ঞানকে অবহেলা করিবার ফলে যে ভারত পরাধীন হইয়াছিল, এ কথা সত্য বলিয়া মনে হয় না। পাঠান যখন হিন্দুদিগকে পরাজিত করে, তখন পাঠানেরা যে বিজ্ঞান-চর্চ্চায় হিন্দু অপেক্ষা উন্নত ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। মোগলেরা ভারত-বিজয়ের সময় যে পাঠান অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক বেশী ছিল, তাহা ত মনে হয় না। ফলতঃ বিজ্ঞান-চর্চ্চার অভাব হেতু ভারত পরাধীন হয় নাই; কিন্তু ভারত পরাধীন বলিয়া বিজ্ঞান-চর্চ্চার অবনতি হইয়াছে।

বিজ্ঞানের চর্চ্চা জাতির উন্নতির সহায়ক, রবীন্দ্রনাথ ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, আমরা যদি বিজ্ঞান-চর্চ্চায় অন্য সকল জাতির সমকক্ষ না হই, তাহা হইলে আমরা টিঁকিতে পারিব না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান বাদ দিয়া শুধু অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা অনিষ্ট-কর। আমরা এতদুভয়ের কোনটিই গ্রহণ করিতে পারি না। অপর জাতি বিজ্ঞানে আমাদের অপেক্ষা উন্নত হইলে, আমাদের কিরূপ ক্ষতি হইতে পারে, দেখা যাক। সে ক্ষতি দুই প্রকারে হইতে পারে। প্রথমতঃ, বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহারা অভিনব সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া যুদ্ধে আমাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে, আমাদিগকেও বৈজ্ঞানিক কৌশলে, যত সহজে যত বেশী মানুষ মারা যায়, তাহারই চেষ্টায় নিরত থাকিতে হইবে। কিন্তু ইহা বিজ্ঞানের অপব্যবহার। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, পাশ্চাত্যদেশে "শুধু বিদ্যা নহে, বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানীও আছে"; ইহাই সেই শয়তানি। ইহা বর্জন করাই রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত বোধ হয়। অপর জাতির যুদ্ধ-সজ্জা যদি ভয়ের কারণ হয়, এবং সেজন্য যদি প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিকেও তুল্য পরিমাণে যুদ্ধ-সজ্জা করিতে হয়, তাহা হইলে জগতের বিভিন্ন জাতি অনবরত যুদ্ধ-সজ্জা বাড়াইয়া যাইবে,—ইহার আর সীমা থাকিবে না। পাশ্চাত্য জগতে এইরূপ Militarism দেখা দিয়াছে; এবং ইহার পরিণাম কিরূপ ভয়ঙ্কর হইবে, ইহা ভাবিয়া দূরদর্শী সুধীগণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে, মনের ভাব না বদলাইলে এই বিপদের প্রতিকার নাই। আমি কাহারও অনিষ্ট করিব না, সকলের সহিত সদ্ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিব,—অপরে বেশী যুদ্ধ-সজ্জা করে করুক, আমি তাহাতে ভয় পাইব না;—মনের এইরূপ ভাব হইলে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিব,—এই তত্ত্ব যতদিন পুস্তকে আবদ্ধ থাকিবে, সভ্যজাতির মধ্যে ব্যবহারে প্রয়োগ হইবে না, ততদিন এই Militarism অভিশাপ জগৎকে পীড়া দিবে।

অপর জাতি বিজ্ঞানে প্রবল হইলে আমাদের আর এক ভাবে ক্ষতি হইতে পারে,—তাহা এই। বিজ্ঞানের সাহায্যে অপর জাতি নানাবিধ কল-কৌশল উদ্ভাবন করিয়া আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল সুলভে উৎপাদন করিবে; এবং সেই সকল দ্রব্য আমাদের দেশে বিক্রয় করিতে পারে। ফলে আমাদের শ্রমজীবিদের জীবিকার উপায় বিনষ্ট হইবে,—দেশ দরিদ্র হইয়া পড়িবে। ইহার প্রতিকার করিবার জন্য যদি আমাদিগকেও বড় বড় কল-কারখানা স্থাপন করিতে হয়, তাহা হইলে আমরাও সুলভে দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইব সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে দেশে অনেকগুলি অনিষ্ট প্রচলিত হইবে। কারখানার শ্রমজীবিগণ যে অস্বাভাবিক জীবন যাপন করে, তাহাতে তাহাদের চরিত্র ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কলকারখানার মালিকগণ বিপুল অর্থ-সঞ্চয়ের চেষ্টায় বিব্রত হইয়া পড়েন। এই সকল কারণে জীবনের শান্তি বিনষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুলভে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিব, অথচ এ সকল অনিষ্ট আসিতে দিব না—ইহা হইতেই পারে না। কলকারখানার মালিকেরা যত বেশী অর্থ সঞ্চয় করিবে, তত উন্নত প্রণালীর বড়-বড় কলকারখানা স্থাপন করিতে পারিবে; তত সুলভে দ্রব্য প্রস্তুত হইবে। সুতরাং আমরা যদি এ বিষয়ে ঢিলা দিই, তাহা হইলে অন্য সকল জাতি,—যাহারা প্রাণপণ করিয়া এ বিষয়ে লাগিয়া গিয়াছে,—তাহারা জিতিয়া যাইবে,—আমরা হারিয়া যাইব। বস্তুতঃ, পাশ্চাত্যদেশে যে Titanic wealth বা কুবেরের ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখিয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথ পীড়িত হইয়াছেন, এবং "ধিক্কারের সঙ্গে" বলেছেন, "ততঃ কিম্", সে ঐশ্বর্য্যাড়ম্বর ঠেকাইয়া রাখা যাইবে

না। তাহা হইলে ইহার প্রতিকার কি? আমরা যদি বিপুলকায় কলকারখানা স্থাপন করিবার উদ্যোগ না করি, তাহা হইলে পাশ্চাত্য দেশ ঐরূপ কলকারখানা স্থাপন করিয়া, আমাদের অপেক্ষা সুলভে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, আমাদের জীবিকার উপায় কাড়িয়া লইবে,—আমরা ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারিব না। ইহারও প্রতিকার মনের ভাব বদলান। যে মনের ভাব হইতে কলকারখানার সৃষ্টি, তাহা হইতেছে ঐশ্বর্যালোভ,—বড়লোক হইবার ইচ্ছা,—সৌখীন দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা,—বিলাস-বাসনা। এ সকল ত্যাগ করিতে হইবে। বলিতে হইবে, আমার ইন্দ্রপুরীর ন্যায় সুসজ্জিত বাস-ভবন চাই না,—আমার মোটরকার এবং বায়স্কোপ চাই না;—আমি মোটাবস্ত্র পরিয়া পল্লীর পর্ণকুটীরে সরল জীবন যাপন করিতে চাই। সে বস্ত্রের প্রয়োজনীয় সূতা আমি নিজে চরকায় কাটিয়া লইব;—আমার প্রতিবেশী দরিদ্রা বিধবা তাহা কাটিয়া দিবে; গ্রামের তাঁতী সে বস্ত্র বয়ন করিয়া দিবে। মনের ভাব এইরূপ হইলে, আমাদের দরিদ্র শ্রমজীবিগণকে আমরা অন্নাভাবে মরিতে দিব না।

আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, একটা জাতি যদি নিজে খাঁটি থাকে, তাহা হইলে অন্য জাতি বিজ্ঞানে অধিকতর উন্নতি লাভ করিলেও, তাহার কোন ভয়ের কারণ নাই। অন্য জাতির সমান যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা বা সেইরূপ বৈজ্ঞানিক কলকারখানা স্থাপন করা আবশ্যক নহে। প্রয়োজন, আমাদের সততা এবং ধর্ম্মবিশ্বাস বাড়ান; প্রয়োজন, আমাদের বিলাস-বাসনা হইতে মুক্ত হওয়া। এই ভাবে চলিলে আমাদের ভিন্ন জাতির দ্বারা পরাজিত হইবার কোন ভয় থাকিবে না, এবং আমাদের শ্রমজীবিদের জীবিকার উপায়ও নষ্ট হইবে না। অপর জাতি বিজ্ঞানে বেশী উন্নতি লাভ করিলে, আমাদের অপর কোন প্রকার ভয়ের কারণ নাই। যেমন ধরুন, অন্য জাতি যদি বিজ্ঞানের সাহায্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধিকতর উন্নতি করে, তাহাতে আমাদের আশঙ্কার কারণ নাই। অবশ্য এ বিষয়ে আমরাও তাহাদের ন্যায় উন্নত হইলে, আমাদের অধিকতর মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা যদি তত্দূর উন্নত না হই, তাহা হইলে যে আমরা টিঁকিয়া থাকিতে পারিব না, ইহা সত্য নহে।

রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন, বিজ্ঞান বাদ দিয়া শুদ্ধ আধ্যাত্মিক চর্চ্চাতে দেশের অনিষ্ট হয়;—"একঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যে, দুর্ব্বলতায় কাৎ হইয়া পড়িয়াছি।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিও আমরা যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। এমন হইতে পারে যে, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া কোন-কোন ক্ষেত্রে অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে; কিন্তু সে স্থলে অনিষ্টোৎপত্তির কারণ আধ্যাত্মিকতা নহে;—কারণ, মানবের দুষ্ট প্রবৃত্তি শঠতা। এজন্য আধ্যাত্মিকতার দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় অধ্যাত্ম-চর্চ্চা ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন শুভ-ফলপ্রদ—অধ্যাত্ম-চর্চ্চার সহিত যথেষ্ট পরিমাণে বিজ্ঞানচর্চ্চা না মিশাইলে ইহা দেশের পক্ষে অনিষ্টজনক হইবে,—ইহা যথার্থ নহে। প্রথমতঃ, জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, আধ্যাত্মিক বিদ্যার সহিত কতখানি বৈজ্ঞানিক বিদ্যা মিলাইলে, আধ্যাত্মিক বিদ্যার দোষটুকু কাটিয়া যাইবে। আধ্যাত্মিক বিদ্যার দোষ কাটাইতে যদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিদ্যা সমস্তটুকু প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অতীত কালে আধ্যাত্মিক বিদ্যার চর্চ্চা করা সকল জাতির পক্ষেই অনিষ্টকর হইত; কারণ সে সময় আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিদ্যা কোন জাতির আয়ত্ত ছিল না। বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, যাজ্ঞবল্ক্য, বুদ্ধ, খৃষ্ট, শঙ্কর—ইঁহাদের বৈজ্ঞানিক বিদ্যা আজকালকার তুলনায় অল্পই ছিল।—ইঁহাদের অনেকেরই "একঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধি" ছিল বলিয়া বোধ হয়; এবং রবীন্দ্রনাথের উক্তি অনুসারে ইহাতে তাঁহাদের অনিষ্ট হইবারই কথা। জগতে এ পর্য্যন্ত যে সকল বড়-বড় ধর্ম্ম-প্রচারক হইয়াছেন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতেই উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা কেহ এ কথা বলেন নাই যে, শুধু আধ্যাত্মিক চর্চ্চাতে অনিষ্ট হইতে পারে, আধ্যাত্মিক চর্চ্চার সহিত বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার সামঞ্জস্য রাখিও। পাশ্চাত্য ধর্ম্ম-প্রচারকগণও বিজ্ঞান-চর্চ্চার উপর বেশী ঝোঁক দেন নাই; এবং বলিয়াছেন যে, বেশী বিজ্ঞান-চর্চ্চা কল্যাণকরী নহে। Thomas a Kempis-প্রণীত Imitation of Christ একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ; বাইবেল ব্যতীত অপর কোন খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থ ইহার সহিত তুলনীয় নহে। ঐ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "The vilest peasant, and he whom we in scorn think least removed from a brute, if he serve God according to the best of his mean capacity, is yet a better and a more

valuable man, than the proudest philosopher who busies himself in considering the motions of the heavens but bestows no reflection at all upon his own mind." পুনশ্চ ঐ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "Restrain that extreme desire of increasing learning."

বিজ্ঞান-চর্চ্চা না হইলে শুদ্ধ আধ্যাত্মিক-চর্চ্চা অনিষ্টকর, এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। মনে করুন, কোন ব্যক্তির বিজ্ঞান-চর্চ্চার সুবিধা নাই;—দরিদ্র কৃষক, সারাদিন পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করে;—কলেজে গিয়া বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিবার সামর্থ্য বা সুযোগ নাই। তাহা হইলে কি তাহার পক্ষে শুদ্ধ আধ্যাত্মিক চর্চ্চা অনিষ্টকর হইবে? সে যদি চাষ করিতে-করিতে প্রতি মুহূর্ত্তে ভগবানকে ডাকে, ভগবানের কথা চিন্তা করে, তাহা হইলে কি তাহার বিজ্ঞান-চর্চ্চা নাই বলিয়া এই আধ্যাত্মিক চর্চ্চা অনিষ্টকর হইবে? সে যদি সতত আন্তরিক ভাবে ডাকে, তাহা হইলে যিনি দীনবন্ধু, তিনি নিশ্চয় তাহার আহ্বান শুনিবেন; এবং দেহান্তে ঐ অজ্ঞ কৃষক নিশ্চয় ভগবানকে লাভ করিবে। কারণ, ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন,

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

ভগবানকে লাভ করার চেয়ে আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?

এ কথা বলা যাইতে পারে যে, আধ্যাত্মিক চর্চ্চার অভাবে বিজ্ঞানের চর্চ্চা অনিষ্টকর হইবে (রবীন্দ্রনাথও এ কথা বলিয়াছেন); কিন্তু ইহার বিপরীত কথা কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না যে, বিজ্ঞানের চর্চ্চার অভাবে আধ্যাত্মিক চর্চ্চা অনিষ্টকর। আজ ভারত দীন-হীন সত্য; কিন্তু এই দুর্দ্দিনে যদি ভারত সকল বিনাশ, সকল দুর্ব্বলতা ছাড়িয়া শ্রীভগবানকে আন্তরিক ভাবে ডাকিতে পারে, তাহা হইলে তাহার সুদিন আবার ফিরিয়া আসিবে,—বিজ্ঞান-চর্চ্চার অভাবে তাহার কোন প্রতিবন্ধক হইবে না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মতের সমর্থন করিবার জন্য ঈশোপনিষদ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,

বিদ্যাং চ অবিদ্যাং যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া মৃতমশ্নুতে॥

রবীন্দ্রনাথ "বিদ্যা"র অর্থ করিয়াছেন অধ্যাত্ম-বিদ্যা এবং "অবিদ্যা"র অর্থ করিয়াছেন বিজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যা ও অবিদ্যা শব্দের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, উপনিষদ শুদ্ধ অধ্যাত্ম-চর্চ্চা ও শুদ্ধ বিজ্ঞান-চর্চ্চা উভয়েরই নিন্দা করিয়াছেন; কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে আছে

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইবতে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যা শব্দ এখানে অধ্যাত্ম-বিদ্যা ও বিজ্ঞান এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। শঙ্করাচার্য্য অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অবিদ্যা শব্দের অর্থ বেদোক্ত কর্ম্ম; এবং বিদ্যা শব্দের অর্থ বৈদিক দেবতার উপাসনা। তাহা হইলে শ্লোক দুইটির তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ,—যাহারা দেবতার উপাসনা ত্যাগ করিয়া বৈদিক কর্ম্ম করে, তাহাদের মঙ্গল হয় না; এবং যাহারা কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দেবতার উপাসনা করে, তাহাদেরও মঙ্গল হয় না। যাহারা দেবতার উপাসনা পূর্ব্বক বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া দেবত্ব লাভ করে। এখানে অমৃতত্ব মানে দেবত্ব;—মোক্ষ নহে। * রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা যথার্থ নহে বলিয়া মনে হয় এজন্য যে, উপনিষদে সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রশংসা করা হইয়াছে; কোথাও এমন কথা বলা হয় নাই যে, ব্রহ্ম-বিদ্যার সহিত পদার্থ-বিদ্যারও আলোচনা করা আবশ্যক; নচেৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম-বিদ্যা-চর্চ্চার ফল অনিষ্টকর হইতে পারে। বরং এমন কথা বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম লাভ করিতে হইলে, অপর সকল চেষ্টা, অপর সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্ম-চিন্তায় তন্ময় হইয়া যাইতে হইবে। যথা;—

মুণ্ডকোপনিষদে

প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥

ব্যাখ্যা—"প্রণব হইতেছে ধনু, শর হইতেছে আত্মা, ব্রহ্ম হইতেছেন লক্ষ্য। অপ্রমত্ত হইয়া লক্ষ্য ভেদ করিতে

* "দেবগণ সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন হন এবং প্রলয়কাল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকেন, মরেন না; এই কারণে তাঁহাদিগকেও অমৃত বলে। পুরাণশাস্ত্রে আছে, আভূতসংপ্লবং স্থানং অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে অর্থাৎ প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থিতিকে অমৃতত্ব বলে। এই কারণেই আচার্য্য এ স্থলে অমৃত শব্দে দেবভাবপ্রাপ্তি অর্থ করিয়াছেন।"—শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ মহাশয় সম্পাদিত ঈশোপনিষদ্।

হইবে। শরের ন্যায় তন্ময় হইবে।”—যে ব্রহ্মে তন্ময় হইয়া যায়, তাহার বিজ্ঞান-চর্চ্চার অবসর বা প্রবৃত্তি থাকে না।

পরবর্ত্তী শ্লোকে উপনিষদ বলিতেছেন

তমেবৈকং জানথাত্মানং অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ
অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।

“একমাত্র তাঁহাকেই জান। অন্য কথা ছাড়িয়া দাও। ইহাই অমৃতের সেতু।” ব্রহ্মলাভ করা অতি দুরূহ। প্রাণপণ করিয়া একাগ্রচিত্তে সাধন না করিলে, ইহাতে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। মনকে দুইভাগে ভাগ করিয়া, একভাগ ব্রহ্ম অভিমুখে, এবং অপর ভাগ বিজ্ঞান অভিমুখে চালিত করিলে, সিদ্ধিলাভ সুকঠিন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে।” পৃথিবীতে পশ্চিমের প্রভুত্ব ২।৩ শত বৎসর মাত্র স্থাপিত হইয়াছে। মানব জাতির ইতিহাসে ২।৩ শত বৎসর খুব দীর্ঘকাল নহে। ইহারই মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার অবনতির নানা লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে, পশ্চিম জয়লাভ করেছে। মোটর-আরোহী দস্যু (Motor bandit) যদি একদিন সহসা গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে সংগ্রামজয়ী বলা যেরূপ যুক্তিসঙ্গত, ইহাও সেইরূপ। ভোগ করিবার ক্ষমতা ও সুযোগ তাহারা বেশী পাইয়াছে; এজন্য তাহাদের প্রাধান্য স্বীকার করা যায় না। কারণ, জগতে ভোগটাই সব চেয়ে বড় জিনিষ নহে।

রবীন্দ্রনাথ মোটরের মালিক পিতার সহিত ঈশ্বরের তুলনা করিয়াছেন; তাহার ভালমানুষ ছেলের সহিত পূর্ব্বদেশ, এবং চালাক ছেলের সহিত পশ্চিম দেশের তুলনা করিয়াছেন। চালাক ছেলেটি “একদিন গাড়ীখানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে, উর্দ্ধস্বরে বাঁশী বাজিয়ে দৌড় মারলে। * * বাপ আছেন কি নাই সে হুঁসই তার রইল না। * * ভায়ার পাকা ফসলের ক্ষেত লণ্ডভণ্ড করে তার মধ্যে দিয়ে হাওয়া-গাড়ী চালিয়ে বেড়াতে লাগল।” আমরা পড়িয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, ঈদৃশ গুণধর পুত্রের উপর তাহার পিতা (ঈশ্বর) খুসী হইলেন। ঈশ্বর কি চালাকি এতই ভালবাসেন, এবং নিরীহ ভালমানুষ কি তাঁহার কোন সহানুভূতি পায় না? তাহা হইলে তাঁহার দীনবন্ধু নাম যথার্থ নহে। Blessed are the meek, এ কথাও তাহা হইলে মিথ্যা।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন “পরীক্ষকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সবচেয়ে প্রশস্ত রাস্তা হচ্চে পরীক্ষায় পাশ করা।” আর একটি রাস্তা, যেটি কম প্রশস্ত নহে, সেটি হচ্চে পরীক্ষাগারে না যাওয়া। অনেক সময় এই রাস্তা গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই রাস্তাই গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং তাহাতে যে তাঁহার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “পূর্ব্বদেশে আমরা যে সময়ে রোগ হ'লে ভূতের ওঝাকে ডাকৃছি, দৈন্য হলে গ্রহ-শান্তির জন্য দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়াচ্চি” ইত্যাদি। পূর্ব্বদেশে রোগ হইলে সাধারণতঃ ভূতের ওঝাকেই ডাকা হয় না। চরক, সুশ্রুত, চ্যবন প্রভৃতি কেবল ভূত নামাইবারই ব্যবস্থা দিয়া যান নাই। যদি দেশে যথেষ্ট পরিমাণে চিকিৎসক ও ঔষধ থাকিত, এবং পীড়িত লোকদের চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার সঙ্গতি থাকিত, এরূপ অবস্থায় লোকে যদি চিকিৎসা না করাইয়া ভূতের ওঝাকেই ডাকে, তাহা হইলে অত্যন্ত দোষের বিষয়। কিন্তু দেশের কি বাস্তবিক এই অবস্থা? অধিকাংশ স্থলে লোককে যে “ইচ্ছা না করিলেও মরতে” হয়, তার কারণ কি দেশের দারিদ্র্য এবং ঔষধ ও চিকিৎসকের অভাব নহে?

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বিশ্বের নিয়মকে “নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি, তার থেকে কেবল মাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর কেউ না, আর কিছুতে না।” বিশ্বনিয়ম আয়ত্ত করিয়া তাহাকে কাজে লাগাইতে সকলে ইচ্ছা করিলেই পারে না। একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, একজনকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করিয়া চাবি লাগাইয়া দেওয়া গেল। তাহাকে কোন বহি দেওয়া হইল না,—কোন যন্ত্রপাতি দেওয়া হইল না,—পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা করিবার কোন সুযোগ দেওয়া হইল না। এক্ষেত্রে সে কিরূপে বিশ্বনিয়মকে আয়ত্ত করিয়া কাজে লাগাইবে,—কি করিয়া বিজ্ঞান-চর্চ্চায় অগ্রসর হইবে? বাস্তব জগতে দেখিতে পাই যে, পরাধীনতা, দারিদ্র্য প্রভৃতি অনেকস্থলে বিজ্ঞান-চর্চ্চায় বাধা দেয়। অবশ্য এই বাধার সহিত সংগ্রাম করা যাইতে পারে; এবং অনেকে করিয়াও থাকেন। তবে সকল অবস্থায় প্রাণপণ করিয়া বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিতেই হইবে, কিংবা কোন বিশেষ অবস্থায় অপর কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বেশী এ বিষয়ে মতভেদ

হইতে পারে। অবস্থা-বিশেষে বিজ্ঞান-চর্চ্চা ছাড়িয়া অন্য বিষয়ে মনোযোগ করা বেশী প্রয়োজনীয় হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—যে ভগবান "তাঁর সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েচেনঃ—বস্তু রাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার (মানুষের) চলবে। ওখানে থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম। একদিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম, আর এক দিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম; এই দুয়ের যোগে তুমি বড় হও, জয় হোক তোমার,—এ রাজ্য তোমারই হোক্—এ ধন তোমার, এর অস্ত্র তোমার।" রবীন্দ্রনাথ ইহাও বলিয়াছেন, "বিশ্বের একটা বাইরের দিক আছে, সেই দিকে সে একটা মস্ত কল। সেদিকে তার বাঁধা নিয়মে একচুল এদিক ওদিক হওয়ার জো নেই।" এখানে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর ও বিশ্ব এতদুভয়ের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে যে সকল মতবাদ আছে, তাহার মধ্যে দুইটি মতবাদের আমরা উল্লেখ করিব। একটি মত এই যে, ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন এবং কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন; সেই নিয়ম অনুসারে বিশ্ব চলিতে লাগিল,—ঈশ্বর বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই মত অনুসারে ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধ কতকটা ঘটিকা-যন্ত্রের নির্ম্মাতা (watch-maker) এবং ঘটিকা-যন্ত্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ তদনুরূপ। রবীন্দ্রনাথ এই মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। অপর মত এই যে, ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া, তাহার প্রতি অণু-পরমাণুর মধ্যে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন;—বিশ্বে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহা তিনিই ঘটাইতেছেন। তিনি না কাঁপাইলে একটি পরমাণু কাঁপিতে পারে না। যে নিয়ম অনুসারে এই বিশ্ব চলিতেছে, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং শক্তি ব্যতীত আর কিছু নহে। উপনিষদ্ এবং গীতার মত এইরূপ বলিয়া বোধ হয়। যথা, উপনিষদ্

> তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ।
> সৈষ সেতুর্বিধারণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।
> ভয়াদস্য অগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
> ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তথা গীতা,

> ময়া ততমিদং সর্বংজগদব্যক্ত-মূর্ত্তিনা।
> অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে।

এতদুভয় মতবাদের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর সন্তোষজনক, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।*

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমি বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করিনে"। বুদ্ধ, খৃষ্ট, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস—ইঁহারা সকলেই ঝুলি শূন্য করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের আচরণের সমর্থন করেন না। কিন্তু দেশের আপামর জন-সাধারণ এই সকল পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষগণের আচরণের সমর্থন করে বোধ হয়। আমরা নিজে মহৎ হইতে না পারিলেও, যেন মহত্ত্বকে উপলব্ধি করিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আত্মিক সাধনার একটা অঙ্গ হচ্ছে জড়বিশ্বের অত্যাচার থেকে আত্মাকে মুক্ত করা। পশ্চিম মহাদেশের লোকেরা সাধনার সেই দিকটার ভার নিয়েচে।" জড়বিশ্ব আত্মার উপর অত্যাচার কি ভাবে করে, এবং তাহা হইতে কিরূপে মুক্তি পাওয়া যায়, তাহা ভাবিবার বিষয়। জড়বিশ্বের অত্যাচার যে দেহের উপর;—শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইহারা দেহকে অভিভূত করে। আমরা ভ্রম করিয়া এই দেহকে আত্মা বলিয়া বিবেচনা করি। এজন্য আমরা জড়বিশ্বের অত্যাচারে কাতর হইয়া পড়ি। এ অত্যাচার থেকে মুক্ত হইবার উপায়—একদিকে দেহকে অন্নপান দিয়া তৃপ্ত করা; বস্ত্রাদি দিয়া আচ্ছাদন করা; অপর দিকে দেহাত্মবোধ নিবারণ করা। এক কথায়, plain living and high thinking। পশ্চিমদেশে এইরূপ সাধনা হইতেছে, ইহা বোধ হয় রবিবাবুর বলিবার অভিপ্রায় নহে। সেখানে বিলাস বাড়িয়া চলিয়াছে এবং আধ্যাত্মিক চর্চ্চার প্রসার সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। এই উভয় প্রকারে জড়বিশ্বের অত্যাচার বাড়ান হইয়াছে। লোকে যত বিলাসপ্রবণ হইয়া পড়ে, বাহ্য বস্তুর অভাব সে তত বেশী অনুভব করে।

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

---

* গীতা ও বেদান্তের মত এইরূপ বোধ হয়—God is both Immanent and transcendent; ঈশ্বর জগতের সকল পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট আছেন এবং জগৎ ছাড়াইয়াও অবস্থান করিতেছেন। এই মত Panentheism (as distinguished from Pantheism) নামে পরিচিত।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বিষয়ের দায় আধিভৌতিক বিশ্বের দায়। সে দায়কে ফাঁকি দিয়ে আধ্যাত্মিকের কোঠায় ওঠা যায় না। তাকে বিশুদ্ধরূপে পূর্ণ করে তবে উঠতে হয়।" ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, আহার, আশ্রয় প্রভৃতি অপরিহার্য্য বাহ্য অভাবগুলি পূরণ করিবার বন্দোবস্ত আগে করিয়া, তবে অধ্যাত্ম-বিদ্যা-লাভে মনোনিবেশ করিতে হইবে; নচেৎ নিষ্ফল হইবে। কিন্তু বুদ্ধদেব, যিশু খৃষ্ট, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ, যাঁহারা জগতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া বিবেচিত হন, তাঁহারা কেহই অন্নবস্ত্র প্রভৃতি বাহ্য অভাবগুলি মিটাইয়া তদনন্তর ধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী হন নাই। ইঁহারা কি কেহই আধ্যাত্মিক কোঠাতে উঠিতে পারেন নাই?

জাতি-বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ]

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রাথমিক শ্রেণীগুলি নব প্রস্তর-যুগের প্রাক্কালেই সুবিভক্ত হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই মানব জাতির প্রব্রজনের বিরাম নাই। একদিকে মানব যেমন অবিরাম গতিতে চলিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই মানব তাহার গতিবিধির অনুকূল কতকগুলি ভাবপরম্পরা সংগ্রহ করিয়া আত্মগত করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। শত্রুতা ও শান্তিসূচক সম্বন্ধ প্রভৃতি কতকগুলি উপচয় পরবর্ত্তী কালের হইলেও তাহাদের সূচনা যে সেই সময় হইতেই হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায়। এই সমস্ত উপচিত সম্বন্ধের ধারা অন্ত্যাধুনিক মানব পৃথিবীতে প্রথম আকীর্ণ হইবার পর হইতে এক প্রকার অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিয়াছিল, তাহাও বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে কত স্থানচ্যুতি ও সন্ধিচ্যুতি সংঘটিত হইয়াছে, আবার তাহাদের অব্যবহিত পরেই কত নব নব জাতি-সঙ্ঘের (ethnical groupings) অভ্যুত্থান হইয়াছে। এই সমস্ত অভ্যুত্থানের দ্বারা বীজমূলের (parent stock) স্থূল ও অন্যান্য বিশেষত্ব অনেক সময় বিশেষভাবে রূপান্তরিত অথবা ক্ষেত্র-বিশেষে একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। কাজেই অতীত ও বর্ত্তমান বংশের মধ্যে যে সমস্ত সংযোজক সূত্র ছিল, তৎসমুদয় চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে এবং ভূতত্ত্বের প্রমাণের ন্যায় জাতি-বিজ্ঞানের প্রমাণ কিয়দংশে মানবেতিহাসের এক 'খণ্ডিত-বিগ্রহ' হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তবে বর্ত্তমান নৃতত্ত্ববিদ্, বহুভাষাবিদ্ এবং প্রত্নবস্তুতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের একযোগে সযত্ন পরিশ্রমের ফলে সম্প্রতি এইরূপ কতকগুলি প্রনষ্ট বিষয়ের উদ্ধার সাধিত হইয়াছে এবং ঐতিহাসিক যুগের জাতিদিগের প্রাগৈতিহাসিক যুগে কিরূপ গতিবিধি ছিল, এক্ষণে তদ্বিষয়ের দিগ্‌দর্শন লাভেরও সম্ভাবনা হইয়াছে। এইরূপ ইউরোপে পেলাসজিয়ান, লিগুরিয়ান, ইবেরিয়ান প্রভৃতি জাতির, এসিয়ায় জাট্, রাজপুত, গালচা প্রভৃতি জাতির এবং আমেরিকায় আজটেক, মায়া, অয়মরা প্রভৃতি জাতির প্রাগৈতিহাসিক যুগের গতিবিধি নিরাকৃত হইয়াছে।

জাতিতত্ত্বালোচনায় অতিশয় সতর্কতার প্রয়োজন। ভাষাতত্ত্ব জাতি-বিজ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে জাতি-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত কখনও কখনও অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, ভাষা সকল সময় জাতির পরিচায়ক নয়। এমন অনেক জাতি আছে, যাহাদের ভাষা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং সেই সমস্ত জাতি অন্য জাতির ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। কেল্টিক জাতির অনেকে এখন ইংরেজি বা ফরাসী ভাষায় কথা কহিয়া থাকে। রোমানগণ এট্রস্কান, ইবেরিয়ান, গল, লুসিটানিয়ান প্রভৃতি জাতির মধ্যে লাটিন ভাষার প্রচলন করিয়াছিল। কখনও কখনও জাতি-সঙ্করতায় ভাষার লোপ বা অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। আর্য্যজাতির মতবাদ একমাত্র ভাষাতত্ত্ব দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়। আর্য্য জাতির আবিষ্কার সম্বন্ধে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয় যুক্তি ও গবেষণাপূর্ণ বিশিষ্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার নিষ্কর্ষ করিয়া আমরা আর্য্য-জাতি সম্বন্ধে কিছু বলিয়া, আলোচ্য বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইব।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ম্যাক্স্‌মূলর 'আর্য্য' বলিয়া

এক জাতির ধুয়া তোলেন। এই জাতিকে তিনি গৌরবর্ণ ও বিশিষ্ট সুসভ্য বলিয়া পরিচয় দেন। আর তাঁহার এই অভিমত সাধারণের বিশেষ আদৃত হইয়া পড়ে। ম্যাকৃস্‌মূলর বলেন যে, এই আর্য্যজাতি নানা দলে দক্ষিণে, দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পশ্চিমে সভ্যতা বিস্তার করিতে করিতে ভারতবর্ষে, পারস্যে, আরমেনিয়ায় এবং ইউরোপের নানা দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মতবাদের খুব প্রতিবাদ চলে। ফলে ভাষা এক হইলে জাতিও এক হইবে, এ সিদ্ধান্ত টিকিল না। শেষে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ম্যাকৃস্‌মূলর নিজে যে ভ্রান্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লেখেন—"To me an ethnologist who speaks of an Aryan race, Aryan blood, Aryan eyes and hair, is as great a sinner as a linguist who speaks of a dolicho-cephalic dictionary or a brachycephalic grammar. It is worse than a Babylonian confusion of tongues, it is downright theft." কিন্তু তথাপি আজও জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ আর্য্যজাতিরূপ মতবাদের মোহ ছাড়িতে পারেন নাই। এই মোহে পড়িয়া তাঁহারা ছয় প্রকারের মতবাদকে ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে তাহার কোনটীর মধ্যে সত্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের ছয়টী মতবাদ এই—

১। ১২০০ পূঃ খৃঃ গৌরবর্ণ এক যোদ্ধৃজাতি উত্তর-ভারত জয় ও অধিকার করে—ইহারা আপনাদিগকে আর্য্যনামে পরিচিত করিত।

২। এই আর্য্যগণ দুইবার ভারত জয় করে। প্রথম বার তাহারা আপন আপন স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া উত্তর পশ্চিম হইতে পঞ্জাবে প্রবেশ করে এবং ভারতের আদিম অধিবাসী-দিগকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়া তথায় বসবাস করে। আর ইহাদেরই বংশে জাট ও রাজপুতগণ উৎপন্ন হয়। ইহাদের শারীরিক আকার ও গঠনে একটা বিশেষত্ব আছে। তারপর দ্বিতীয় বারে আর একদল আর্য্য গিলগিট্ ও চিত্রলের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করে ও মধ্যদেশ জয় করে। এই আর্য্যেরা কিন্তু বর্ব্বর জাতিদের মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ করিয়া মিশ্রজাতি উৎপাদন করে।

৩। যে সমস্ত বর্ব্বর জাতিকে আর্য্যেরা একেবারে নষ্ট করিয়া দেয় অথবা বশীভূত করে, তাহাদের নিতান্ত অসভ্যতার জন্য আর্য্যেরা তাহাদিগকে 'দস্যু' এই ঘৃণিত নামে পরিচিত করিত।

৪। ভারতীয় আর্য্যগণ অসভ্য দস্যুদিগের সংসর্গ হেতু বর্ণের আবিষ্কার করে।

৫। বিজেতা আর্য্যগণ যে ধর্ম্মবিশ্বাস নিজের সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহাই হিন্দু পুরাণ (mythology) বলিয়া অভিহিত হয়।

৬। এই আর্য্যেরা বৈদিক ভাষায় বাক্যালাপ করিত। এই ভাষাই বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর হইতে এবং মহারাষ্ট্র প্রদেশে এই সমস্ত জাতিকে আর্য্য করিয়া লইয়া অসভ্য জাতির ভাষাকে বিতাড়িত করে। এই জন্য এখানকার বর্ত্তমান ভাষা বৈদিক ভাষা-সঞ্জাত। কিন্তু দক্ষিণভারতে ইহারা যথেষ্ট বাধা পায়। কাজেই এইখানকার ভাষা প্রধানতঃ নিজস্ব ভাষা বজায় রাখিলেও বৈদিক ভাষা হইতে ব্যুৎপন্ন কোন সংস্কৃত রীতির শব্দ ভাষায় প্রবেশ করে।

ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব বুঝাইবার জন্যই আর্য্যদের ভারত-বিজয়ের মতবাদ আবিষ্কৃত হয়। ১৭৮৬ সালে Sir William Jones সপ্রমাণ করেন যে, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, জর্ম্মাণ ও কেল্‌টিক একটী বিশিষ্ট ভাষা হইতে ব্যুৎপন্ন। ১৮৩৫ সালে বপ্ (Bopp) এই মতটী যুক্তি দ্বারা দৃঢ়ীকৃত করেন। ইহা হইতে এবং বৈদিক মন্ত্রের ভাষা ও অবেস্তার ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়া স্থির হয় যে, বৈদিক ভাষা নিশ্চয়ই ভারতের বহির্ভূত অঞ্চল হইতেই ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। এই পর্য্যন্ত ভিত্তিটা কিছু দৃঢ়।

তার পর প্রশ্ন হইতেছে যে, বৈদিক ভাষা কেমন করিয়া ভারতে প্রবেশ করিল? বিজেতারা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। এইটীই প্রচলিত মত। এই মতের পক্ষপাতীরা এই বিজয়ের প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। যদি আমরা ধরিয়া লই যে, বৈদিক ভাষা ভারতে প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পরেই বৈদিক মন্ত্রগুলি রচিত হইয়াছিল, তাহা হইলে এই বৈদিক মন্ত্রগুলি হইতে কিছু কাজ হইতে পারে। এই মতটী আমরা বেশ মানিয়া লইতে পারি; কেন না, যদিও আবেস্তা ও বেদের শব্দ ও পদের উচ্চারণে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তথাপি

দুইটী ভাষা পরস্পরের এত সন্নিকট যে, অবেস্তার একটা সম্পূর্ণ ছত্র সুধু অক্ষর-পরিবর্তনের সূত্রের সাহায্যে বৈদিক ছত্রে পরিবর্তিত করিতে পারা যায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, অবেস্তা ভাষার সহিত বৈদিক ভাষার যে পার্থক্য, তাহা অধিক দিনের নয়। সুতরাং তাহাদের ভাষা ভারতে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই বৈদিক মন্ত্রগুলি রচিত হইয়াছিল।

আচ্ছা—যদি ভাষাটী বিজেতাদের ভাষারূপেই আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের এই কল্পিত বিজয়ের অনতিকাল পরেই যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র বিরচিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ে বিজয়-কাহিনীর কোন না কোন ঘটনার উল্লেখ থাকিবেই। এ কথা সত্য যে, দস্যুদের সঙ্গে আর্য্যদের পরস্পর যুদ্ধের কথার প্রায়ই উল্লেখ আছে, কিন্তু সেগুলি সুধু গোরু, বাছুর, রমণী প্রভৃতি সম্পদ্ লাভের জন্য যুদ্ধ। মনুষ্য সৃষ্টির পর হইতেই সমগ্র পৃথিবীতে অসভ্য জাতিরা এই দ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিত। একটা জাতিকে সরাইয়া বা হঠাইয়া দিবার অথবা বিদেশী শত্রুদের নিকট হইতে দেশ কাড়িয়া লইবার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য সম্প্রতি Hoernle-Grierson-Risley মতবাদের আবিষ্কার হইয়াছে।

আর্য্যদের প্রথম দল দলবদ্ধ হইয়া অথবা এক এক দল ক্রমান্বয়ে সপরিবারে উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্তভূমির বহির্দেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করে। তাহারা সঙ্গে করিয়া স্ত্রীলোক লইয়া আসিয়াছিল। এরূপ অনুমান না করিয়া আমরা কোন প্রকারে পঞ্জাব ও রাজপুতানার লোকেদের আর্য্য-লক্ষণের সমধিক বিশুদ্ধি বিষয়ে কল্পনাই করিতে পারি না। Typeএর বিশুদ্ধি বলিলে তাঁহারা বোঝেন যে, জাট ও রাজপুতগণ কয়েকটী বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন। Risley লিখিয়াছেন —"They have a dolicho-cephalic head, leptorine nose, a long, symmetrical narrow face, a well-developed forehead, regular features, a high facial angle, tall stature, a very light brown skin." যখন আদিম আর্য্যগণ "dolicho-cephalic leptorhine type" বলিয়া জাতিতত্ত্ব-জগতে Penkar মতবাদের জয় জয়কার চলিতেছিল, তখনই Risley এই রায় দিয়াছিলেন। Risley তখন জানিতেন না যে, তারপর বহু dolicho-cephalic (দীর্ঘকপালী) জাতির আবিষ্কার হইবে। Dr. Haddon Proto-Nordicsএর আবিষ্কার করিয়াছেন। তারপর তুর্কীস্তানের উসুন (Wusun) জাতি, সাকা জাতি, Australiaর দীর্ঘকপালী (dolicho-cephal) জাতি প্রভৃতি অনেক জাতির সংবাদ বাহির হইয়াছে। ইহার উপর অধ্যাপক বোয়াস (Prof Boas) দেখাইয়াছেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় শারীরিক লক্ষণের যথেষ্ট ব্যত্যয় হইয়া থাকে। আমরা যে সমস্ত শারীরিক লক্ষণের উপর জোর দিয়া থাকি, সেগুলি একেবারে ভুল হইয়া যায়। ম্যারেট এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বোয়াসের পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন। তিনিও পঞ্জাব ও রাজপুতানার লোকেদের আকৃতি সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব-লিখিত মতের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার উপর এই অংশে এত বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষ ঘটিয়াছে যে, ইহাদের বিশুদ্ধি অক্ষুন্ন রহিয়াছে, এ কথা কোন ঐতিহাসিকই বলিতে পারেন না। পারস্য, ইয়ুরোপীয়, গ্রীক, পার্থিয়ান, বাক্ট্রিয়, সিথীয়, হূণ, আরব, তুর্কী ও মঙ্গলেরা ক্রমান্বয়ে এই স্থানটি যে শুধু জয় করিয়াছিল, তাহা নয়—এইখানে বসবাস করিয়া লোকেদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

বৈদিক মন্ত্রগুলি আর্য্যদের দ্বারা তাহাদের নিজের উপকারের জন্যই রচিত হইয়াছিল। বহু মন্ত্রে দস্যুদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে। যে সমস্ত জায়গায় দস্যুদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশ স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, দস্যুরা অলৌকিক শত্রু; অল্পসংখ্যক স্থলেই তাহারা মানুষ। বেদ হইতে বেশ বোঝা যায় যে, আর্য্য ও দস্যু বা দাসের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা সভ্যতা বা জাতিগত পার্থক্য নয়—cult বা ধর্ম্মগত পার্থক্য। আর্য্য ও দস্যু বা দাস শব্দ প্রধানতঃ ঋগ্বেদ-সংহিতায় আছে। ঋক্‌সংহিতায় আর্য্য শব্দ ৩৩ বার মাত্র মন্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে জাতি বিজেতা, সে জাতি আপনার গৌরব-কাহিনীর উল্লেখ বার বারই করিবে। আর্য্য শব্দের বিরল প্রয়োগে মনে হয়, ইহারা বিজেতৃজাতি নয়—ইহারা দেশ জয় করিয়া অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করে নাই।

দাস শব্দের উল্লেখ ৫০ বার এবং দস্যু শব্দের উল্লেখ ৭০ বার আছে। কয়েকটী স্থানে এই দুইটী শব্দের উল্লেখ দুই অর্থে দেখিতে পাওয়া যায়। দাস শব্দের অর্থ চাকর এবং দস্যু শব্দের অর্থ ডাকাত। যেথানে এই দুই অর্থে ইহাদের প্রয়োগ হয় নাই, সেখানে আর্যাদের বিরোধী দানব বা মানুষ।

ইন্দ্রারাধনায় আর্যাশব্দ ২২ বার এবং অগ্নি আরাধনায় ৬ বার আছে। ইন্দ্র ব্যাপারে দাস শব্দ ৪৫ বার, দুইবার অগ্নি ব্যাপারে। দস্যু শব্দ ইন্দ্র ব্যাপারে ৫০ বার এবং অগ্নি ব্যাপারে ৯ বার। ইন্দ্র ও অগ্নির সহিত আর্য্য ও দাস বা দস্যু শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দেখিয়া বলিতে পারা যায় যে, আর্য্যগণ ইন্দ্র ও অগ্নির উপাসক ছিল এবং দাস বা দস্যুরা বিরোধী ছিল। আর্য্যগণ যে ইন্দ্রকে পূজা করিত এবং ইন্দ্রও যে তাহাদিগকে গোরু প্রভৃতি লইয়া দ্বন্দ্বের সময় সাহায্য করিত, তাহা ঋগ্বেদ হইতে প্রমাণিত হয়। অগ্নিকে মাঝে রাখিয়া আর্য্যগণ ইন্দ্রকে আহুতি দিত। আর ইন্দ্রের পরেই অগ্নি তাহাদের সহায় ছিল।

দাস বা দস্যুরা কাহারা? ইহারা ইন্দ্র অগ্নি-পূজার বিরোধী। যে যে স্থানে দস্যু বলিলে মানুষ বুঝায়, সেই সেই স্থানে এই অর্থটী স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ১।৫১।৮,১৯; ১,৩২,৪; ৪।৪১২; ৬।১৪।৩ সূক্তে ইহাদিগকে অব্রত অর্থাৎ আর্য্যদিগের ব্রত-বিরহিত বলা হইয়াছে। ৫।৪২।৯ সূক্তে অপব্রত, ৮।৫৯।১১, ১০।২২।৮ সূক্তে অন্যব্রত বলা হইয়াছে। ১।১৩১।৪, ১।৩৩।৪, ৮।৬৯।১১ সূক্তে দস্যুদিগকে অযজ্ঞবান বলা হইয়াছে অর্থাৎ ইহারা যজ্ঞ করে না। ৪।১৬।৯, ১০।১০৫।৮ সূক্তে অব্রহ্ম—ইহারা আরাধনা করে না এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাখে না বলা হইয়াছে। অন্যান্য ঋকে ইহাদিগকে অনৃচঃ, ব্রহ্মদ্বিষঃ, অনিন্দ্র বলা হইয়াছে। এইরূপে ঋগ্বেদের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, দস্যুরা যাদু বা মন্ত্র-ব্যাপারে দেবতার ধার ধারিত না।

ঋগ্বেদের যে কোন স্থান হইতে প্রমাণিত হইবে যে, ধর্ম্ম ও পূজা-পদ্ধতি লইয়া আর্য্য ও দস্যুর বিবাদ (Cult with cult and not one of race with race) ইহাদের বিবাদ জাতিগত বিবাদ নয়।

এতদিন ধরিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ আর্য্য ও দস্যু বলিলে দুইটী বিভিন্ন জাতি বুঝিতেন বলিয়া বেদে তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, ফলে কিন্তু পর্ব্বতের মূষিক-প্রসব হইয়াছে। ঋগ্বেদে ৬।২৯।১০ সূক্তে দস্যুদের 'অনাস' বলা হইয়াছে। ইহা হইতে Maxmuller ও Haddon বলেন যে, দস্যুদের নাক চ্যাপ্‌টা ছিল। সুতরাং তুলনায় আর্য্যেরা নিশ্চয়ই টিকল-নাক হইবে। সায়ন প্রভৃতি ভাষ্যকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—মুখহীন, অর্থাৎ শোভনভাষাশূন্য। দস্যু ও রাক্ষসদের যে সকল নাক মন্দির প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি বেশ টিকল। উল্লিখিত সূক্তে অনাস মনুষ্যদের লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। দানবদের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এরূপ স্থলে এই একটী মাত্র শব্দ হইতে দস্যুদের আকৃতি ঠিক করা আদৌ সমীচীন হয় নাই।

হোলকার কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয়ও দাস বা দস্যুদিগের প্রাধান্য ও উন্নত অবস্থা সম্বন্ধেও বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহারা আর্য্য-দিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না (Indo-Aryan Polity during the period of the Rig Veda—Journal. dept. of letters vol. V). তিনি ঋগ্বেদের বহুস্থান হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। সেই সমস্ত উক্তি আলোচনা করিলে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, দাসগণ পাঁচ শত পুরীর অধিপতি ছিল। দস্যুগণ আর্য্যদের সমকক্ষ শত্রু ছিল। ইন্দ্র যেমন দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন, আর্য্যদের বিরুদ্ধেও তেমনই যুদ্ধ করিতেন। একটী ঋকে আছে যে, ইন্দ্র আর্য্য ও দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন।

প্রাণিতত্ত্বের কয়েকটি সমস্যা

[অধ্যাপক শ্রীজগদানন্দ রায়]

আমাদের দেশে সারস, বুনো হাঁস এবং খঞ্জন জাতির অনেক পাখী ঋতুবিশেষে সমতল বাংলা-দেশে আসে,—প্রচুর খাবার খাইয়া মোটা হয়; কেহ-কেহ আবার এই সুযোগে ডিম প্রসব করিয়া, বহু সন্তানের মাতা হয়। তা'র পরে ঋতু প্রতিকূল হইলে, কেহ হিমালয় অঞ্চলে, কেহ মধ্য-এসিয়ায়, কেহ বিন্ধ্য প্রদেশে, কেহ আবার সমুদ্র পার হইয়া আফ্রিকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আমাদের দেশের তুলনায়, শীতপ্রধান দেশের পাখীদের এই রকম যাওয়া-আসা যেন বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। স্কটল্যাণ্ডে গ্রীষ্ম যাপন করিয়া, অনেক পাখী শীত যাপনের জন্য নদী-সমুদ্র পার হইয়া আফ্রিকায় পৌঁছিয়াছে, ইহা অনেক দেখা গিয়াছে। একবার নয়,—প্রতি বৎসরেই পাখীর দল এই রকমে যাওয়া-আসা করে। সমুদ্রে দিঙনির্ণয়ের জন্য জাহাজে কত রকম যন্ত্র থাকে, তবুও দিক্‌ভ্রম হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ছোটো পাখীর দল কখনই পথ ভুলে না। কুয়াসার অন্ধকার, ঝড়, বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া ঠিক্ সোজা পথে তাহারা বৎসরের পর বৎসর গন্তব্য জায়গায় উপস্থিত হয়।

যাহা হউক, কি প্রকারে ইহারা পথ চিনিয়া লয়, ইহা প্রাণিতত্ত্বের একটি বড় সমস্যা। কেহ কেহ বলেন, দেখা, শুনা এবং ছোঁয়ার জন্য সাধারণ প্রাণীদের দেহে যেমন বিশেষ-বিশেষ ইন্দ্রিয় আছে, পথ-চেনার জন্য পাখীদের দেহে সেই রকম কোনো বিশেষ ইন্দ্রিয় আছে। কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র। পাখীদের দেহের কোনো জায়গায় সত্যই ঐ রকম কোনো ইন্দ্রিয় আছে কি না, এবং থাকিলে, তাহা কি প্রকারে পাখীদের চালনা করে, এই সকল ব্যাপার আজও আবিষ্কৃত হয় নাই।

পিঁপড়েদের পথ-চেনার শক্তি নিতান্ত অল্প নয়। আহারের চেষ্টায় ইহাদিগকে গর্ত্ত হইতে পাঁচ-ছয় শত হাত দূরে বেড়াইতে দেখা যায়; কিন্তু এত দূরে গিয়াও গর্ত্তে ফিরিবার সময়ে তাহারা পথ ভুলে না। এক কণা খাবার মুখে করিয়া পিঁপড়েরা বহু দূর হইতে গর্ত্তের দিকে সোজা চলিয়া আসিতেছে, ইহা আমরা অনেক দেখিয়াছি। সামনের বাধাবিঘ্নের দিকে তাহারা দৃক্‌পাত করে না। যাহা হউক, এই বিষয়টি লইয়া প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌রা পরীক্ষা করিয়া বলেন,—পিঁপড়েদের পথের স্মৃতি না কি খুব প্রবল। তা' ছাড়া, আমরা যেমন দূরের জিনিষকে অস্পষ্ট দেখি, পিঁপড়ে না কি সে রকম দেখে না। তাহারা কাছের জিনিষের চেয়ে দূরের জিনিষকেই ভালো দেখে। ইহাতেই তাহারা, ভ্রমণ-পথের কোথায় কোন্ গাছটি, এবং কোথায় কোন্ ঢিপিটি আছে, তাহা মনে করিয়া রাখিতে পারে। তার পরে স্বাভাবিক দূর-দৃষ্টির বলে, সেই সকল চিহ্ন দেখিয়া গর্ত্তে পৌঁছায়।

প্রাণীর নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দেহযন্ত্রগুলির পরস্পরের মধ্যে যে যোগ আছে, প্রাণি-বিজ্ঞানের তাহা নূতন কথা নয়। দেহের এক ইন্দ্রিয়ের সহিত অপর ইন্দ্রিয়ের, এবং এক যন্ত্রের সহিত অন্য এক যন্ত্রের অনেক যোগ ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে এ সম্বন্ধে যে কতকগুলি তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বড় আশ্চর্য্যজনক।

উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদের মূত্রাশয়ের নিকটে দুইটি গ্রন্থি (Glands) আছে। এই দুইটিকে বিজ্ঞানের ভাষায় আড্রিনাল (Adrenal) গ্রন্থি বলা হয়। দেহের অন্যান্য গ্রন্থিতে যেমন নানা প্রকার রস জমা হয়, এগুলিতেও তাহাই হয়। কিন্তু অপর গ্রন্থিতে যেমন রস বাহির হইবার পথ থাকে, এগুলিতে তাহা থাকে না। যাহা হউক, আড্রেনাল্ গ্রন্থির রসে দেহের যে কার্য্য হয়, তাহা বড় অদ্ভুত। মুখে খাদ্য পড়িলে যেমন সেখানকার গ্রন্থিতে লালা সঞ্চিত হইতে থাকে, তেমনি ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হইলেই, আড্রেনাল্ গ্রন্থিতে এক প্রকার বিশেষ রস জমিতে থাকে। এই রসকে বৈজ্ঞানিকেরা আড্রেনালিন্ (Adrenalin) নাম দিয়াছেন। উৎপন্ন হইয়াই ইহা রক্তের সহিত মিশিয়া যায়; এবং তাহাতে রক্তে চিনির পরিমাণ বাড়িয়া চলে। রক্তে মিশানো চিনি প্রাণি-দেহের একটা প্রধান খাদ্য। কাজেই প্রচুর চিনি পাইয়া দেহের পেশী সবল হইয়া পড়ে; এবং

সঙ্গে-সঙ্গে শরীরের নানা অংশ হইতে রক্ত আসিয়া পেশীতে জমা হয়। তখন হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ দ্রুত চলিতে থাকে। রাগ বা কোনো উত্তেজনায় দেহে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, এগুলিতে তাহাই ফুটিয়া উঠে। এ-অবস্থায় প্রাণী আর স্থির থাকিতে পারে না; তখন হাত-পা ছুড়িয়া, চীৎকার করিয়া, হয় ত মারামারি সুরু করিয়া ভয়ানক অনর্থের সৃষ্টি করে।

মারামারি করিলে প্রাণীরা আহত হয়;—অধিক রক্তপাতে তাহাদের মৃত্যুও ঘটিতে পারে। এই সব অনর্থ প্রশমনের ব্যবস্থাও আড্রেনালিন্ রস দ্বারাই হয়। প্রাণিদেহ হইতে টাট্‌কা রক্ত বাহিরে আসিলেই, তাহা জমাট বাঁধিয়া যায়। ক্ষতের মুখে যখন এই রকমে রক্ত জমাট হয়, তখন রক্তস্রাব বাধা পায়। রক্তপাত বন্ধ করিবার ইহা একটা স্বাভাবিক উপায়। উত্তেজনার দ্বারা আড্রেনালিন্ উৎপন্ন হইয়া যখন রক্তের সহিত মিশিয়া যায়, তখন তাহাতে রক্তের জমাট বাঁধিবার এই স্বাভাবিক শক্তি বহুগুণ বাড়িয়া চলে। কাজেই উত্তেজনার মাথায় মারামারি, কামড়া-কামড়ি করিলে, রক্তস্রাব অধিক হইতে পারে না।

আধুনিক চিকিৎসকেরা আড্রেনাল্ রসের পূর্ব্বোক্ত গুণ-গুলিকে অবলম্বন করিয়া, আজকাল নানা রকম চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। ইতর প্রাণীর দেহ হইতে এখন প্রচুর আড্রেনালিন্ সংগ্রহ করা হইতেছে। তার পরে, নাক দিয়া রক্ত পড়া, বা অস্ত্র-চিকিৎসার রক্তস্রাব বন্ধ করা ইত্যাদি কাজে তাহার প্রয়োগ চলিতেছে।

আড্রেনাল্ গ্রন্থির মত অনেক গ্রন্থিই প্রাণি-দেহে আছে। এগুলির কোন্‌টির দ্বারা দেহের কি কাজ হয়, তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে। ইহাতেও অনেক নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। সন্তান-প্রসবের পূর্ব্বে স্তন্যপায়ী প্রাণী-দের শরীরে মাতৃত্বের যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেগুলি কোথা হইতে আসে, স্পষ্ট জানা ছিল না। ইহাতেও আড্রেনাল্ গ্রন্থির মত কতকগুলি গ্রন্থির কার্য্য ধরা পড়িয়াছে। সাধারণ হাঁস লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, হাঁসের ডিম্বাশয় হইতে যে এক প্রকার রস নির্গত হয়, তাহাই ইহাদের স্ত্রীত্বের সূচনা করে। হংসীর দেহ হইতে ডিম্বাশয় কাটিয়া ফেলিলে, তখন সেই রস আর জন্মিতে পারে না। এই অবস্থায় হংসী সর্ব্বপ্রকারে হংস হইয়া দাঁড়ায়;—এমন কি, তখন পালকের রং এবং চলা-ফেরা সকলি হংসের মত হইয়া পড়ে।

থাইরয়েড গ্রন্থির কথা বোধ করি পাঠক জানেন। ইহা প্রাণীদের কণ্ঠনালীর কাছে থাকে। এই গ্রন্থি যখন ব্যাধি-গ্রস্ত হয়, তখন গলগণ্ড প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হয়। যাহা হউক, থাইরয়েড গ্রন্থি প্রাণিদেহে যে কি কাজ করে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কেহই তাহা জানিত না। এখন জানা গিয়াছে, ইহার রস শরীরে পরিব্যাপ্ত হইলে, দেহের উচ্চতা বৃদ্ধি হয়। চিকিৎসকেরা আজকাল ভেড়া প্রভৃতির থাইরয়েড গ্রন্থির রস সংগ্রহ করিয়া, মানুষের চিকিৎসা করিতেছেন। যে সব লোক খর্ব্বাকার, তাহারা এই চিকিৎসায় লম্বা হইয়া দাঁড়াইতেছে।

গর্ভস্থ সন্তান কি প্রকারে পরিপুষ্ট হয়, এবং কি প্রকারেই বা তাহাদের কতকগুলি পুরুষ এবং কতকগুলি স্ত্রী হইয়া দাঁড়ায়, তাহা প্রাণি-বিজ্ঞানের একটা সমস্যা। অনুসন্ধানে এই ব্যাপারের অনেক নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিব না। পক্ষী প্রভৃতির ডিম লইয়া পরীক্ষা করায়, এই ব্যাপারের যে অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে, এখানে কেবল তাহারি উল্লেখ করিব। যে সব ডিমের আধান (Fertilisation) হয় নাই, সেগুলি হইতে শাবক বাহির হয় না। এই রকম ডিমকে চলিত কথায় "বাওয়া" ডিম বলা হয়। সুতরাং বুঝা যায়, ডিম হইতে শাবকের উৎপত্তিতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন আছে। আমেরিকায় রকফেলের ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যাপক লয়েব আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অগ্রণী। তিনি সম্প্রতি পুরুষের সাহায্য ব্যতীত ডিম হইতে শাবক উৎপন্ন করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছেন। সি-আর্‌চিন (Sea Urchin) নামক সামুদ্রিক প্রাণীরা ডিম্ব প্রসব করিলে পুং-প্রাণী দ্বারা যখন সেগুলির আধান হয়, তখন তাহা হইতে শাবক জন্মে। যে সব ডিমের আধান হয় নাই, এই রকম কতকগুলি ডিম সংগ্রহ করিয়া, লয়েব সাহেব সেগুলিকে অল্প ক্ষণের জন্য বটিরিক্ এসিডের (Butyric acid) সংস্পর্শে রাখিয়া, পরমুহূর্ত্তে সমুদ্র-জলে ছাড়িয়া দিয়া-ছিলেন। এই প্রকারে ডিমগুলি পুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল; এবং সেগুলি হইতে শাবকও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই প্রকারে পুং-সাহায্য ব্যতীত ডিম্ব হইতে শাবকের উৎপত্তি জীব-

তত্ত্বের গবেষণার এক নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছে। সম্প্রতি ফ্রান্সের জীব-তত্ত্ববিদ্ (Prof Delage) অন্য প্রক্রিয়ায় এই কার্য্যটিই দেখাইয়াছেন। ইনি প্রথমে ট্যানিন্ এবং এমোনিয়া প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থের সংস্পর্শে রাখিয়া, ডিমগুলি জলে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে সেই সব ডিম হইতে অনেক শাবক উৎপন্ন হইয়াছিল।

যাহা হউক, এই সকল পরীক্ষা দ্বারা জানা যাইতেছে, ডিম হইতে যখন শাবক উৎপন্ন হইতে যায়, তখন একটু উত্তেজনার স্পর্শের প্রয়োজন থাকে। আধানের কাজটি সেই উত্তেজনাই প্রয়োগ করে।

জীবন "ক্ষণভঙ্গুর" হইতে পারে; কিন্তু যে অস্থি, মাংস, মজ্জা প্রভৃতি দ্বারা প্রাণিদেহ গঠিত, সেগুলি যে খুব ক্ষণভঙ্গুর নয়, তাহা নানা পরীক্ষায় সম্প্রতি জানা গিয়াছে। ক্যারেল্ (Carrel) সাহেব প্রাণিদেহ হইতে মাংস প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন করিয়া নানা প্রক্রিয়ায় সেগুলিকে দীর্ঘকাল জীবিত রাখিয়াছেন। যেমন চলিতেছিল, ঠিক সেইরকম ভাবে চলিবার জন্য প্রাণিদেহের প্রত্যেক অংশের একটা স্বাভাবিক চেষ্টা থাকে। কঠিন পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আমরা ভাবি, ডাক্তার বা কবিরাজ মহাশয়ই বুঝি পুনর্জন্ম দিলেন;— কিন্তু পনেরো আনা রোগীকে বাঁচায় তাহাদের দেহের ঐ স্বাভাবিক চেষ্টা। শামুকের মাথার উপরকার যে দুইটা লম্বা শিঙের উপরে তাহাদের চোখ বসানো থাকে, সেগুলি অনেক সময়ে কামড়া-কামড়িতে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ইহাতে শামুকেরা আজীবন অন্ধ হইয়া থাকে না। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহাদের মাথার যথাস্থানে শিঙ্ বাহির হয়; এবং তাহাতে এক জোড়া করিয়া চোখও গজাইয়া উঠে। পরস্পর লড়াই করিতে গিয়া কাঁকড়াদের দাড়া ভাঙিয়া যায়। কিন্তু ইহাতে তাহারা দীর্ঘকাল খোঁড়া থাকে না;— কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নূতন দাড়া বাহির হয়। এই সব হইতে অনুমান করা যায়, ইতর প্রাণীরা সহজে অপমৃত্যুতে মরিতে চায় না,—আঘাত-অপঘাতের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা তাহাদের দেহেই প্রচুর আছে।

প্রাণীদের যে সব সন্তান জন্ম-গ্রহণ করে, তাহাদের স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ কি প্রকারে হয়, ইহাও জীবতত্ত্বের একটি প্রকাণ্ড সমস্যা। এ সম্বন্ধে যে কত লোকে কত কথা বলিয়াছেন, তাহার হিসাবই হয় না। অধ্যাপক রিডেল্ (Oscar Riddel) পায়রার ডিম লইয়া দীর্ঘকাল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষায় পাখীদের স্ত্রী-পুরুষ-ভেদের কারণ সম্বন্ধে একটু সূত্র পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলিতেছেন, পায়রা-জাতীয় পাখীরা সাধারণতঃ দুইপ্রকার ডিম্ব প্রসব করে। একপ্রকার ডিম্বের ভিতরকার বস্তুতে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন খুব তাড়াতাড়ি চলে; এবং তাহা সহজেই বাতাসের অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া যায়। এই ডিমগুলি হইতেই পুংশাবক বাহির হয়। যে সব ডিম হইতে স্ত্রীশাবক জন্মে, তাহাতে রাসায়নিক ক্রিয়া ঐ রকম দ্রুত চলে না। অধ্যাপক রিডেল্ কেবল ডিম্ব পরীক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; স্ত্রী ও পুরুষ পায়রার রক্ত পরীক্ষা করিয়াও তিনি তাহাতে ঐ রকম রাসায়নিক ক্রিয়ার বৈষম্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

অধ্যাপকের এই আবিষ্কার কেবল পায়রা-জাতীয় প্রাণী সম্বন্ধে। অপর পাখীদের ডিমে ঐ রকম পার্থক্য ধরা পড়ে নাই। ব্যাঙের ডিম পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, গোড়ায় সেগুলির পরস্পরের মধ্যে কোনো রকম পার্থক্য ধরা যায় না। পুং-ভেকের শুক্রই দুই রকম থাকে। এক রকম শুক্রে লিঙ্গনির্ণায়ক বস্তু (Sex-Chromosome) দেখা যায়; অপর রকমে এই বস্তুর একটুও সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রথমোক্ত শুক্র দ্বারা আধানের কাজ হইলে, ডিম হইতে কেবল স্ত্রী-শাবক বাহির হয়; এবং দ্বিতীয় দ্বারা পুংশাবক জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং পায়রা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, ভেকের সম্বন্ধে তাহা খাটে না।

দুইটা মাথা-ওয়ালা ছাগল-ছানা এবং আটখানা পা-ওয়ালা বাছুরের জন্মের কথা প্রায়ই শুনা যায়। মানুষের মধ্যেও এইপ্রকার বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম দেখা গিয়াছে। এইপ্রকার জন্মের কারণ সম্বন্ধে জীবতত্ত্ববিদ্গণ অনেক আলোচনা এবং অনেক গবেষণা করিয়াছেন। সম্প্রতি মার্কিণ পণ্ডিত ডাক্তার ওয়েরবার (Werber) মাছের ডিম লইয়া যে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে এ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যের সংগ্রহ করা গিয়াছে। তিনি বর্টিরিক্ এসিড্ প্রভৃতি নানা উত্তেজক পদার্থের স্পর্শে আনিয়া ডিমগুলিকে জলে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই সকল ডিম হইতে যে মাছ জন্মিয়াছিল, সেগুলির অধিকাংশই বিকৃতাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। ওয়েরবার সাহেব বলিতেছেন, বাহির হইতে রাসায়নিক উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে, ডিমের ভিতরকার জৈব-বস্তু বিকৃত

হয়; কাজেই এই সব ডিম হইতে যে শাবক বাহির হয়, তাহা বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা সাধারণতঃ যে সকল বিকলাঙ্গ শিশুকে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখি, তাহারা মাতৃগর্ভে কি প্রকারে অস্বাভাবিক উত্তেজনা পায়? ইহার উত্তরে ওয়েবার সাহেব বলেন, বটারিক্ এসিডের মত উত্তেজক বস্তুর উৎপত্তি মাতৃগর্ভে অসম্ভব নয়। অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলনে যে কার্বোহাইড্রেট্ নামক পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহাই মানুষ ও অপরাপর উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর প্রধান খাদ্য। চিনি, চাল, গম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের প্রধান উপাদান কার্বোহাইড্রেট্। সুস্থ প্রাণী ইহা আহার করিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করে। কিন্তু অসুস্থ প্রাণীরা তাহা পারে না; এবং না পারিলেই, দেহের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট্ হইতে কখন-কখন বটারিক্ এসিড্ উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই উত্তেজক বিষপদার্থের স্পর্শে যে গর্ভস্থ শিশু বিকলাঙ্গ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, গর্ভাবস্থায় যে সকল মাতা পীড়িত থাকেন, তাঁহাদের সন্তান প্রায়ই বিকলাঙ্গ হয়। সুস্থ মাতার সন্তানদিগকে প্রায়ই বিকলাঙ্গ হইতে দেখা যায় না।

শ্রীকান্তর ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(৯)

তাহাদের সম্বন্ধে সবাই ভাবিল যাক, বাঁচা গেল। রাজলক্ষ্মীর তুচ্ছ কথায় মন দিবার সময় ছিলনা; সে উহাদের দুই চারি দিনেই বিস্মৃত হইল; মনে পড়িলেও হয়ত ইহাই মনে করিত, দু'শ টাকা যাক্, কিন্তু ঘরের পাশ হইতে পাপ বিদায় হইল। বুদ্ধিমান্ রতন সহজে মনের কথা ব্যক্ত করিতনা, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইত জিনিসটা সে আদৌ পছন্দ করে নাই। তাহার মধ্যস্থ হইবার, কর্ত্তৃত্ব করিবার সুযোগ গেল, ঘরের টাকা গেল,—এতবড় একটা সমারোহ কাণ্ড রাতারাতি কোথা দিয়া কেমন করিয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল,—সবশুদ্ধ জড়াইয়া সে যেন নিজেকেই অপমানিত, এমন কি আহত জ্ঞান করিল। তথাপি সে চুপ করিয়াই রহিল। আর বাটীর যিনি কর্ত্তা, তাঁহার ত কোন দিকে খেয়াল মাত্র নাই। যত দিন কাটিতে লাগিল সুনন্দা ও তাহার কাছে হইতে মন্ত্রতন্ত্রের উচ্চারণ-শুদ্ধির লোভ তাহাকে যেন পাইয়া বসিতে লাগিল। সেখানে সে কি পরিমাণে ধর্ম্মতত্ত্ব ও জ্ঞান লাভ করিতেছিল আমি জানি না; কিন্তু কোনদিন তথায় যাওয়ায় তাহার বিরাম ছিলনা। দিনের বেলায় আহারটা আমার চিরকাল একটু বেলাতেই সাঙ্গ হইত। রাজলক্ষ্মী বরাবর আপত্তি করিয়াই আসিয়াছে, অনুমোদন কখনও করে নাই,—সে ঠিক; কিন্তু সে ত্রুটি সংশোধনের জন্য কখনও আমাকে লেশমাত্র চেষ্টা করিতেও হয় নাই। কিন্তু আজকাল দৈবাৎ কোনদিন অধিক বেলা হইয়া গেলে মনে মনে লজ্জা বোধ করি। রাজলক্ষ্মী বলিত, তুমি রোগা মানুষ, তোমার এত দেরি করা কেন? নিজের শরীরের পানে না চাও, দাসী-চাকরদের মুখের দিকেও ত চাইতে হয়? তোমার কুড়েমিতে তারা যে মারা যায়! কথাগুলো ঠিক সেই আগেকার, তবুও ঠিক তা নয়। সেই সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুর যেন আর বাজে না,—বাজে বিরক্তির এমন একটা কুশাগ্র সূক্ষ্ম কটুতা, যাহা চাকর-দাসী কেন, হয়ত, আমি ছাড়া ভগবানের কানেও তাহার নিগূঢ় রেশটুকু ধরা পড়েনা। তাই, ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও দাসী-চাকরদের মুখ চাহিয়া তাড়াতাড়ি কোনমতে স্নানাহারটা সারিয়া লইয়া তাহাদের ছুটি করিয়া দিতাম। কিন্তু, চাকর-দাসীর আমার এই দয়া প্রকাশের প্রতি আগ্রহ ছিল কি উপেক্ষা ছিল, সে তাহারাই জানে; কিন্তু, রাজলক্ষ্মী দেখিতাম ইহার মিনিট দশ পনেরোর মধ্যেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। কোন দিন রতন, কোন দিন বা দরওয়ান সঙ্গে যাইত,—কোনদিন বা দেখিতাম সে একাই চলিয়াছে, ইহাদের

কাহারও জন্ত অপেক্ষা করিবার সময় তাহার হয় নাই। প্রথমে দুই চারি দিন আমাকে সঙ্গে যাইতে সাধিয়াছিল, কিন্তু ওই দুই চারি দিনেই বুঝা গেল কোন পক্ষ হইতেই তাহাতে সুবিধা হইবেনা। হইলও না। অতএব আমি আমার নিরালা ঘরে পুরাতন আলস্তের মধ্যে এবং সে তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও মন্ত্র-তন্ত্রের নবীন উদ্দীপনার মধ্যে ক্রমশঃই যেন পৃথক্ হইয়া পড়িতে লাগিলাম। আমার খোলা জানালা দিয়া দেখিতে পাইতাম সে রৌদ্রতপ্ত শুষ্ক মাঠের পথ দিয়া দ্রুত পদক্ষেপে মাঠ পার হইয়া যাইতেছে। একাকী সমস্ত দুপুর বেলাটা যে আমার কি করিয়া কাটে, এ দিকে খেয়াল করিবার সময় তাহার ছিলনা,—সে আমি বুঝিতাম; তবুও যতদূর পর্য্যন্ত তাহাতে চোখ দিয়া অনুসরণ করা যায়, না করিয়া পারিতাম না। পায়ে হাঁটা আঁকা-বাঁকা পথের উপর তাহার বিলীয়মান দেহলতা ধীরে ধীরে দূরান্তরালে কোন্ এক সময়ে তিরোহিত হইয়া যাইত,—অনেকদিন সেই সময়-টুকুও যেন চোখে আমার ধরা পড়িতনা,—মনে হইত ওই একান্ত সুপরিচিত চলনখানির যেন তখনও শেষ হয় নাই—সে যেন চলিয়াই চলিয়াছে। হঠাৎ চেতনা হইত। হয়ত চোখ মুছিয়া আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া তারপরে বিছানায় শুইয়া পড়িতাম। কর্ম্মহীনতার দুঃসহ ক্লান্তি বশতঃ হয়ত বা কোনদিন ঘুমাইয়া পড়িতাম,—নয়ত বা নিমীলিত চক্ষে নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিতাম। অদূরবর্ত্তী কয়েকটা খর্ব্বাকৃতি বাব্‌লাগাছে বসিয়া ঘুঘু ডাকিত, এবং তাহারি সঙ্গে মিলিয়া মাঠের তপ্ত বাতাসে কাছাকাছি ডোমেদের কোন্ একটা বাঁশঝাড় এমনি একটা একটানা ব্যথাভরা দীর্ঘ-শ্বাসের মত শব্দ করিতে থাকিত যে মাঝে মাঝে ভুল হইত, সে বুঝি বা আমার নিজের বুকের ভিতর হইতেই উঠিতেছে। ভয় হইত, এমন বুঝি বা আর বেশি দিন সহিতে পারিবনা। রতন বাড়ী থাকিলে মাঝে মাঝে পা টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া আস্তে আস্তে বলিত, বাবু, একবার তামাক দেব কি? এমন কতদিন হইয়াছে, জাগিয়াও সাড়া দিই নাই, ঘুমানোর ভাণ করিয়াছি; ভয় হইয়াছে পাছে সে আমার মুখের উপর বেদনার সূচ্যগ্র আভাসও দেখিতে পায়। প্রতিদিনের মত সেদিনও দুপুরে বেলায় রাজলক্ষ্মী সুনন্দার বাটীতে চলিয়া গেলে সহসা আমার বর্ম্মার কথা মনে পড়িয়া বহুকালের পরে অভয়াকে একখানা চিঠি লিখিতে বসিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল, যে ফার্ম্মে কাজ করিতাম, তাহার বড় সাহেবকেও একখানা পত্র লিখিয়া খবর লইব। কি খবর লইব, কেন লইব, লইয়া কি হইবে, এতকথা তখনও ভাবি নাই;—সহসা মনে হইল জানালার সুমুখ দিয়া যে রমণী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া ত্বরিত-পদে সরিয়া গেল, সে যেন চেনা,—সে যেন মালতীর মত। উঠিয়া গিয়া ডাক মারিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু, দেখা গেলনা। সেই মুহূর্ত্তেই তাহার আঁচলের রাঙা পাড়টুকু আমাদের প্রাচীরের কোন্‌টায় অন্তর্হিত হইল।

মাসখানেকের ব্যবধানে ডোমেদের সেই শয়তান মেয়েটাকে সবাই এক প্রকার ভুলিয়াছে, আমিই কেবল তাহাকে ভুলিতে পারি নাই। জানিনা কেন, আমার মনের একটা কোণে ওই উচ্ছৃঙ্খল মেয়েটার সেই সন্ধ্যাবেলাকার চোখের জলের এক ফোঁটা ভিজা দাগ এখন পর্য্যন্তও মিলায় নাই। প্রায়ই মনে হইত কি জানি কোথায় তাহারা আছে। জানিতে সাধ হইত এই গঙ্গামাটির অসৎ প্রলোভন ও কুৎসিত ষড়যন্ত্রের বেষ্টনের বাহিরে মেয়েটার স্বামীর কাছে থাকিয়া কি ভাবে দিন কাটিতেছে! ইচ্ছা করিতাম এখানে তাহারা আর যেন শীঘ্র না আসে। ফিরিয়া গিয়া চিঠিটা শেষ করিতে বসিলাম; ছত্র কয়েক লেখার পরেই পদ-শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিলাম, রতন। তাহার হাতে সাজা কলিকা; গুড়গুড়ির মাথায় বসাইয়া দিয়া নলটি আমার হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, বাবু, তামাক খান্।

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, আচ্ছা।

রতন কিন্তু তৎক্ষণাৎ গেলনা। নিঃশব্দে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, বাবু, এই রতন পরামানিক যে কবে মরবে তাই কেবল সে জানেনা!

তাহার ভূমিকার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল; রাজলক্ষ্মী হইলে বলিত, জান্‌লে লাভ ছিল, কিন্তু কি বল্‌তে এসেচিস্ বল্। আমি কিন্তু শুধু মুখ তুলিয়া হাসিলাম। রতনের গাম্ভীর্য্যের পরিমাণ তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলনা; কহিল, মাকে সেদিন বলেছিলাম কি না ছোটলোকের কথায় মজবেননা! তাদের চোখের জলে ভুলে দু' দু'শ টাকা জল দেবেন না! বলুন, বলেছিলাম কিনা! আমি জানি, সে বলে নাই। এ সদভিপ্রায় তাহার অন্তরে ছিল বিচিত্র নয়,—কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলা সে কেন, বোধ হয় আমারও সাহস হইত না। কহিলাম, ব্যাপার কি রতন?

রতন কহিল, ব্যাপার যা' বরাবর জানি,—তাই।

কহিলাম, কিন্তু আমি যখন এখনও জানিনে, তখন একটু খুলেই বল।

রতন খুলিয়াই বলিল। সমস্ত শুনিয়া মনের মধ্যে যে কি হইল বলা কঠিন। কেবল মনে আছে ইহার নিষ্ঠুর কদর্য্যতা ও অপরিসীম বীভৎসতার ভারে সমস্ত চিত্ত একেবারে তিক্ত বিবশ হইয়া গেল। কি করিয়া যে কি হইল, রতন সবিস্তারে ইহার ইতিবৃত্ত এখনও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে নাই; কিন্তু যেটুকু সত্য সে ছাঁকিয়া বাহির করিয়াছে, তাহা এই যে নবীন মোড়ল সম্প্রতি জেল খাটিতেছে এবং মালতী তাহার ভগিনীপতির সেই বড়-লোক ছোট-ভাইকে স্যাঙা করিয়া উভয়ে তাহার পিতৃগৃহে বাস করিতে গঙ্গামাটিতে কাল ফিরিয়া আসিয়াছে। মালতীকে এক-প্রকার স্বচক্ষে না দেখিলে বোধ করি বিশ্বাস করাই কঠিন হইত যে রাজলক্ষ্মীর টাকাগুলার যথার্থই এই ভাবে সদ্গতি হইয়াছে।

সেই রাত্রে আমাকে খাওয়াইতে বসিয়া রাজলক্ষ্মী এ সম্বাদ শুনিল। শুনিয়া কেবল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, বলিস্ কি রতন, সত্যি না কি? ছুঁড়িটা সে দিন আচ্ছা তামাসা করলে ত! টাকাগুলো গেল,—অবেলায় আমাকে নাইয়ে পর্য্যন্ত মারলে! ও কি, তোমার খাওয়া হয়ে গেল নাকি? তার চেয়ে খেতে না বসলেই ত হয়?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার কোনদিনই আমি বৃথা চেষ্টা করিনা—আজও চুপ করিয়া রহিলাম। তবে, একটা বস্তু উপলব্ধি করিলাম। আজ নানা কারণে আমার একেবারে ক্ষুধা ছিলনা, প্রায় কিছুই খাই নাই,—তাই আজ সেটা তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে; কিন্তু কিছুকাল হইতে যে খাওয়া আমার ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছিল, সে তাহার চোখে পড়ে নাই। ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে তাহার নজর এত তীক্ষ্ণ ছিল যে ইহার লেশমাত্র কমবেশি লইয়া তাহার আশঙ্কা, আগ্রহ ও অভিযোগের অবধি ছিলনা,—কিন্তু, আজ যে কারণেই হোক সেই শ্যেন দৃষ্টি যদি ঝাপসা হইয়াই থাকে, ত ব্যক্তি-বিশেষের মনের মধ্যে যাই ঘটুক না কেন, বাহিরের অশান্তি ও উপদ্রব কম হইবে ভাবিয়া একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া লইয়া নিরুত্তরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

আমার দিনগুলা একভাবেই আরম্ভ হয়, একভাবেই শেষ হয়। আনন্দ নাই, বৈচিত্র্য নাই, অথচ, বিশেষ কোন দুঃখ কষ্টের নালিশও নাই। শরীর মোটের উপর ভালই আছে। পরদিন প্রভাত হইল, বেলা বাড়িয়া উঠিল, যথারীতি স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিলাম। সুমুখের সেই খোলা জানালা এবং তেমনি বাধাহীন, উন্মুক্ত শুষ্ক মাঠ। পাঁজিতে আজ বোধ হয় বিশেষ কোন উপবাসের বিধি ছিল; রাজলক্ষ্মীর তাই আজ সেটুকু সময়ও অপব্যয় করিতে হইলনা,—যথা সময়ের কিছু পূর্ব্বেই সুনন্দার উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল। অভ্যাসমত বোধ করি বহুক্ষণ তেম্‌নিই চাহিয়াছিলাম, হঠাৎ স্মরণ হইল কালকার অসমাপ্ত চিঠি দুটা আজ শেষ করিয়া বেলা-তিনটার পূর্ব্বেই ডাক-বাক্সে ফেলা চাই। অতএব আর মিথ্যা কাল-হরণ না করিয়া অবিলম্বে তাহাতেই নিযুক্ত হইলাম। চিঠি দু'খানা সম্পূর্ণ করিয়া যখন পড়িতে লাগিলাম, তখন কোথায় যেন ব্যথা বাজিতে লাগিল, কি যেন একটা না লিখিলেই ভাল হইত; অথচ নিতান্তই সাধারণ লেখা, তাহার কোথায় যে ত্রুটি, বারবার পড়িয়াও ধরিতে পারিলামনা। একটা কথা আমার মনে আছে। অভয়ার পত্রে রোহিণী দাদাকে নমস্কার জানাইয়া শেষের দিকে লিখিয়াছি,—তোমাদের অনেকদিন খবর পাই নাই। তোমরা কেমন আছ, কেমন করিয়া তোমাদের দিন কাটিতেছে, কেবলমাত্র কল্পনা করা ছাড়া জানিবার চেষ্টা করি নাই। হয়ত সুখেই আছ, হয়ত নাই, কিন্তু, তোমাদের জীবনযাত্রার এই দিকটাতে সেই যে একদিন ভগবানের হাতে ফেলিয়া দিয়া স্বেচ্ছায় পর্দ্দা টানিয়া দিয়াছিলাম, আজও সে তেম্‌নি ঝুলানো আছে; তাহাকে কোনদিন তুলিবার ইচ্ছা পর্য্যন্তও করি নাই। তোমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা—আমার দীর্ঘকালের নয়, কিন্তু যে অত্যন্ত দুঃখের ভিতর দিয়া একদিন আমাদের পরিচয় আরম্ভ এবং আর একদিন সমাপ্ত হয়, তাহাকে সময়ের মাপ দিয়া মাপিবার চেষ্টা আমরা কেহই করি নাই। যেদিন নিদারুণ রোগাক্রান্ত হই, সেদিন সেই আশ্রয়হীন সুদূর বিদেশে তুমি ছাড়া আমার যাইবার স্থান ছিলনা। তখন একটি মুহূর্ত্তের জন্যও তুমি দ্বিধা কর নাই,—সমস্ত হৃদয় দিয়া পীড়িতকে গ্রহণ করিয়াছিলে। অথচ, তেম্‌নি রোগে, তেমনি সেবা করিয়া আর কখনো যে কেহ আমাকে বাঁচায় নাই, এ কথা বলিনা, কিন্তু আজ অনেক দূরে বসিয়া উভয়ের প্রভেদটাও অনুভব

করিতেছি। উভয়ের সেবার মধ্যে, নির্ভরের মধ্যে, অন্তরের অকপট শুভ কামনার মধ্যে, তোমাদের নিবিড় স্নেহের মধ্যে গভীর ঐক্য রহিয়াছে ; কিন্তু তোমার মধ্যে এমন একটি স্বার্থ-লেশহীন সুকোমল নির্লিপ্ততা, এমন অনির্ব্বচনীয় বৈরাগ্য ছিল যাহা কেবলমাত্র আপনাকে আপনি সেবা করিয়াই নিঃশেষ করিয়াছে, আমার আরোগ্যের এতটুকু চিহ্ন রাখিতে একটি পাও কখনো বাড়ায় নাই। তোমার এই কথাটাই আজ বারম্বার মনে পড়িতেছে। হয়ত, অত্যন্ত স্নেহ আমার সহেনা বলিয়াই,—হয়ত বা, স্নেহের যে রূপ একদিন তোমার চোখে-মুখে দেখিতে পাইয়াছি, তাহারই জন্য সমস্ত চিত্ত উন্মুক্ত হইয়া উঠিয়াছে।. অথচ, তোমাকে আর একবার মুখো-মুখি না দেখা পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। সাহেবের চিঠিখানাও শেষ করিয়া ফেলিলাম। একসময়ে তিনি আমার সত্য-সত্যই বড় উপকার করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়াছি। প্রার্থনা কিছুই করি-নাই, কিন্তু এই দীর্ঘকাল পরে সহসা গায়ে পড়িয়া এমন ধন্য-বাদ দিবার ঘটা দেখিয়াও নিজের কাছেই নিজের লজ্জা করিতে লাগিল। ঠিকানা লিখিয়া খামে বন্ধ করিতে গিয়া দেখি সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। এত তাড়াতাড়ি করিয়াও ডাকে দেওয়া গেলনা, কিন্তু মন তাহাতে ক্ষুণ্ণ না হইয়া যেন স্বস্তি অনুভব করিল। মনে হইল এ ভালই হইল যে কাল আর একবার পড়িয়া দেখিবার সময় মিলিবে।

রতন আসিয়া জানাইল কুশারী-গৃহিণী আসিয়াছেন, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম, কহিলাম, তিনি ত বাড়ী নেই, ফিরে আস্‌তে বোধ করি সন্ধ্যা হবে।

তা' জানি, এই বলিয়া তিনি জানালার উপর হইতে একটা আসন টানিয়া লইয়া নিজেই মেজের উপর পাতিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন, কহিলেন, কেবল সন্ধ্যা কেন, ফিরে আস্‌তে ত প্রায় রাত হয়েই যায়।

মুখে মুখে শুনিয়াছিলাম ধনী-গৃহিণী বলিয়া ইনি [illegible]না। কাহারও বাড়ী বড়-একটা যাননা। এ [illegible] তাঁহার ব্যবহারটা অনেকটা এইরূপ ; অন্ততঃ, [illegible]তা করিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন নাই। [illegible] বার দুই আসিয়াছিলেন। মনিব-বাড়ী বলিয়া [illegible]ই আসিয়াছিলেন এবং আর একবার নিমন্ত্রণ রাখিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেন যে আজ অকস্মাৎ স্বেচ্ছায় আগমন করিলেন এবং বাটীতে কেহ নাই জানিয়াও,—আমি ভাবিয়া পাইলামনা।

আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আজকাল ছোট গিন্নীর সঙ্গে ত একেবারে এক-আত্মা।

না জানিয়া তিনি একটা ব্যথার স্থানেই আঘাত করিলেন, তথাপি ধীরে ধীরে বলিলাম, হাঁ, প্রায়ই ওখানে যান বটে। কুশারী-গৃহিণী কহিলেন, প্রায় ? রোজ, রোজ! প্রত্যহ! কিন্তু ছোট গিন্নী কি কখনও আসে ? একটি দিনও না। মানীর মান রাখ্‌বে সুনন্দা সে মেয়েই নয়! এই বলিয়া তিনি আমার মুখের প্রতি চাহিলেন। আমি একজনের নিত্য যাওয়ার কথাই কেবল ভাবিয়াছি, কিন্তু আর একজনের আসার কথা মনেও করি নাই ; সুতরাং, তাঁহার কথায় হঠাৎ একটু যেন ধাক্কা লাগিল। কিন্তু ইহার উত্তর আর কি দিব ? শুধু মনে হইল ইঁহার আসার উদ্দেশ্যটা কিছু পরিষ্কার হইয়াছে। এবং একবার এমনও মনে হইল যে মিথ্যা সঙ্কোচ ও অসত্য লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বলি, আমি নিতান্তই নিরুপায়, অতএব, এই অক্ষম ব্যক্তিটিকে শত্রু-পক্ষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া কোন লাভ নাই। বলিলে কি হইত জানিনা, কিন্তু না বলার ফলে দেখিলাম সমস্ত উত্তাপ ও উত্তেজনা তাঁহার একার মধ্যে চক্ষের পলকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এবং কবে, কাহার কি ঘটিয়াছিল, এবং কি করিয়া তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল, ইহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যায় তাঁহার শ্বশুরকুলের বছর দশেকের ইতিহাস প্রায় রোজ-নাম্‌চার আকারে অনর্গল বকিয়া চলিতে লাগিলেন।

তাঁহার গোটাকয়েক কথার পরেই কেমন যেন বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার কারণও ছিল। মনে করিয়া-ছিলাম, একদিকে আত্মপক্ষের স্তুতিবাদ,—দয়া দাক্ষিণ্য, তিতিক্ষা প্রভৃতি যাহা কিছু শাস্ত্রোক্ত সদ্‌গুণাবলী মনুষ্য-জন্মে সম্ভবপর, সমস্ত গুলিরই বিস্তৃত আলোচনা—এবং, অন্যদিকে যত কিছু ইহারই বিপরীত, তাহারই বিশদ বিবরণ অন্যপক্ষের বিরুদ্ধে আরোপ করিয়া সন, তারিখ, মাস, মায় প্রতিবেশী সাক্ষীদের নাম-ধাম সমেত আবৃত্তি করা ভিন্ন তাঁহার এই বলার মধ্যে আর কিছুই থাকিবেনা। প্রথমটা ছিলওনা,—কিন্তু হঠাৎ একসময়ে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল কুশারী-গৃহিণীর কণ্ঠস্বরের আকস্মিক পরিবর্ত্তনে। একটু বিস্মিত হইয়াই

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয়েছে? তিনি ক্ষণকাল একদৃষ্টে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তারপরে ধরা-গলায় বলিয়া উঠিলেন, হবার আর কি বাকি রইল বাবু? শুন্‌লাম, কাল নাকি ঠাকুরপো হাটের মধ্যে নিজের হাতে বেগুন বেচ্‌তেছিলেন?

কথাটা ঠিক বিশ্বাস হইলনা, এবং মন ভাল থাকিলে হয়ত হাসিয়াই ফেলিতাম। কহিলাম, অধ্যাপক মানুষ তিনি হঠাৎ বেগুনই বা পেলেন কোথায়, আর বেচ্‌তেই বা গেলেন কেন?

কুশারী-গৃহিণী বলিলেন, ওই হতভাগীর জ্বালায়। বাড়ীর মধ্যেই নাকি গোটাকয়েক গাছে বেগুন ফলেছিল, তাই পাঠিয়ে দিয়েছিল হাটে বেচ্‌তে,—এমন করে শত্রুতা করলে আমরা গাঁয়ে বাস করি কি করে?

বলিলাম, কিন্তু একে শত্রুতা করা বল্‌চেন কেন? তাঁরা ত আপনাদের কিছুর মধ্যেই নেই। অভাব হয়েছে, নিজের জিনিস বিক্রী করতে গেছেন, তাতে আপনার নালিশ কি?

আমার জবাব শুনিয়া কুশারী-গৃহিণী বিহ্বলের মত চাহিয়া থাকিয়া শেষে কহিলেন, এই বিচারই যদি করেন, তাহলে আমার বলবারও আর কিছু নেই, মনিবের কাছে নালিশ জানাবারও কিছু নেই,—আমি উঠ্‌লাম।

শেষের দিকে তাঁহার গলা একেবারে ধরিয়া গেল দেখিয়া, ধীরে ধীরে কহিলাম, দেখুন, এর চেয়ে বরঞ্চ আপনার মনিব ঠাকরুণকে জানাবেন, তিনি হয়ত সকল কথা বুঝ্‌তেও পার্‌বেন, আপনার উপকার করতেও পার্‌বেন।

তিনি মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, আর আমি কাউকে বল্‌তেও চাইনে, আমার উপকার করেও কারও কাজ নেই। এই বলিয়া তিনি সহসা অঞ্চলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, আগে আগে কর্ত্তা বল্‌তেন, দু'মাস যাগ, আপনিই ফিরে আস্‌বে। তার পরে সাহস দিতেন, থাকোনা আরও মাস দুই চেপে, সব শুধ্‌রে যাবে,—কিন্তু এম্‌নি করে মিথ্যে আশায় আশায় প্রায় বছর ঘুরে এলো। কিন্তু কাল যখন শুন্‌লাম সে উঠনের দুটো বেগুন পর্য্যন্ত বেচ্‌তে পেরেচে, তখন কারও কথায় আর আমার কোন ভরসা নেই। হতভাগী সমস্ত সংসার ছার-খার করে দেবে, কিন্তু ও-বাড়ীতে আর পা দেবে না। বাবু, মেয়ে-মানুষে যে এমন শক্ত পাষাণ হতে পারে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

তিনি কহিতে লাগিলেন; কর্ত্তা ওকে কোনদিন চিন্‌তে পারেননি, কিন্তু আমি চিনেছিলাম। প্রথম প্রথম এর-ওর-তার নাম করে লুকিয়ে লুকিয়ে জিনিস-পত্র পাঠাতাম, উনি বলতেন সুনন্দা জেনে-শুনেই নেয়—কিন্তু অমন করলে তাদের চৈতন্য হবেনা। আমিও ভাবতাম হবেও বা। কিন্তু এক-দিন সব ভুল ভেঙে গেল। কি করে সে জান্‌তে পেরে যতদিন যা-কিছু দিয়েছি, একটা লোকের মাথায় সমস্ত টান্ মেরে আমাদের উঠনের মাঝখানে ফেলে দিয়ে গেল। তাতে কর্ত্তার তবুও চৈতন্য হলনা—হল আমার।

এতক্ষণে আমি তাঁর মনের কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম। সদয় কণ্ঠে কহিলাম, এখন আপনি কি করতে চান? আচ্ছা, তাঁরা কি আপনাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বা কোন প্রকার শত্রুতা করবার চেষ্টা করেন?

কুশারী-গৃহিণী আর একদফা কাঁদিয়া ফেলিয়া কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, পোড়া কপাল! তা হলে ত একটা উপায় হোতো। সে আমাদের এমনি ত্যাগ করেছে যে কোনদিন যেন আমাদের চোখেও দেখেনি, নামও শোনেনি, এম্‌নি কঠিন, এম্‌নি পাষাণ মেয়ে! আমাদের দুজনকে সুনন্দা তার বাপ-মায়ের বেশি ভালবাস্‌ত; কিন্তু যেদিন থেকে শুনেচে তার ভাশুরের বিষয় পাপের বিষয়, সেই দিন থেকে তার সমস্ত মন যেন একেবারে পাথর হয়ে গেছে! স্বামি-পুত্র নিয়ে সে দিনের পর দিন শুকিয়ে মরবে, তবু এর কড়া-ক্রান্তি ছোঁবেনা! কিন্তু এতবড় সম্পত্তি কি আমরা ফেলে দিতে পারি বাবু? সে যেন দয়া-মায়া হীন,—ছেলেপুলে নিয়ে না খেয়ে মরতেও পারে, কিন্তু আমরা ত তা পারিনে।

কি জবাব দিব ভাবিয়া পাইলামনা, শুধু আস্তে আস্তে কহিলাম, আশ্চর্য্য মেয়ে-মানুষ!

বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, কুশারী-গৃহিণী নীরবে কেবল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু হঠাৎ দুই হাত জোড় করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, সত্যি বল্‌চি বাবু, এদের মাঝে পড়ে আমার বুকখানা যেন ফেটে যেতে চায়। কিন্তু শুন্‌তে পাই আজকাল সে মার নাকি বড় বাধ্য,—কোন একটা উপায় হয়না? আমি যে আর সইতে পারিনে!

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তিনিও আর কিছু বলিতে পারিলেননা,—তেম্‌নি অশ্রু মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

বিশ্ব-ভারতী

[শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল্]
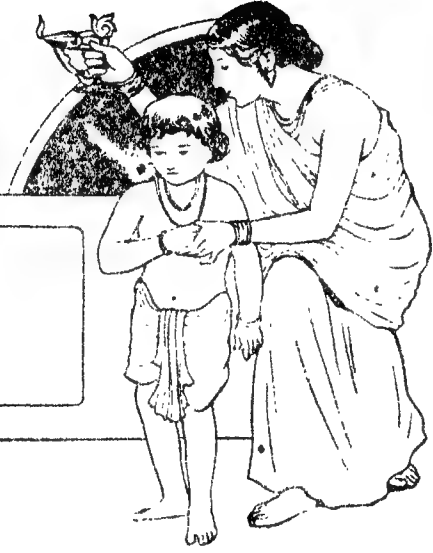
নুট হ্যামসন্

গত বৎসর সাহিত্য-বিভাগে নোবল-পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া নরওয়েবাসী হ্যামসন্ যশস্বী হইয়াছেন। নিউ ইয়র্কের The Literary Digest পত্রিকায়, তত্রত্য প্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা Alfred. A. Knopf তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, দারিদ্র্যের ভীষণ তাড়নে একসময় হ্যামসনকে চিকাগো সহরের গাড়ীর কণ্ডাক্টরের কার্য্য করিয়া দিন যাপন করিতে হইয়াছিল। যিনি উত্তর কালে স্থায়ী বিশ্বসাহিত্যে অমূল্য রত্ন উপহার দিবেন, কিছুদিন পূর্ব্বে ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাঁহাকে অস্থির হইতে হইয়াছিল। তিনি দৈনন্দিন আহার সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেন না;—উপবাসী থাকিয়া কত বিনিদ্র-রজনী সাহিত্য-সাধনায় অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তিনি নরওয়ের গ্রীমষ্ট্যাড্ নামক নির্জ্জন স্থানে লোকালয় হইতে কিছু দূরে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব এই যে, তিনি লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন না। জগতের সংবাদপত্র, পত্রিকাধ্যক্ষ, সম্পাদক, পুস্তক-প্রকাশক প্রভৃতি কতলোকেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ (Interview) দিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। বলিয়াছেন, 'আমার একটা কেমন দুর্ব্বলতা আছে মানুষের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতে পারি না। হিত কথা-বার্ত্তা কহিতে হইলে আমি একটু অস্থির হইয়া পড়ি—আমার চিত্ত-চাঞ্চল্য আসে; (nervous) আর এই জন্যই আমি মানুষের নিকট হইতে একটু দূরে বাস করি।' তিনি কোনও দিনও তাঁহার পুস্তক-প্রকাশকের সহিত কথা-বার্ত্তা বলেন নাই। যাহা কিছু কথা-বার্ত্তা হইয়াছে, তাহা পত্র-সাহায্যেই হইয়াছে। একদিন প্রকাশক মহাশয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিলে, তিনি স্পষ্টই লিখিয়া দিয়াছিলেন, 'আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথা-বার্ত্তা কহিব এমন শক্তি আমার নাই। আমি বড়ই দুর্ব্বল। আমাকে ক্ষমা করিবেন।'

কথা-সাহিত্য ধুরন্দর হ্যামসন নির্জ্জনে বসিয়া পুস্তক লেখেন আর পশু-পালন করিয়া থাকেন। মূক জীবের প্রতি তাঁহার দয়া অসীম। সময় সময় পালিত পশু-শাবকদিগের সংখ্যা অত্যধিক হইলে, অগত্যা তাঁহাকে বিক্রয় করিতে হইত, কিন্তু ক্রেতাদের সহিত তিনি এইরূপ চুক্তি করিতেন, যে তাহারা কোন কারণে জন্তুদিগকে হত্যা বা আঘাত করিতে পারিবেন না। তাঁহার পশু-শালার একটী পশুও স্বাভাবিক মৃত্যু ব্যতীত অন্যরূপে অকালে প্রাণত্যাগ করে নাই। পশুদিগের লালন-পালন ও সেবার জন্য তাঁহার অনেক সময় ব্যয়িত হয়।

তাঁহার রচিত চারিখানি পুস্তক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। সে চারিখানির নাম Growth of the Soil,

Hunger, Pan, Mothwise. আমরা প্রথম দুইখানি পুস্তক পাঠ করিবার সুবিধা পাইয়াছি। Growth of the Soil পুস্তক লিখিয়াই তিনি নোবল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার শক্তি যে অসাধারণ তাহা, তাঁহার যে কোন পুস্তক পাঠ করিলেই বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। গত ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের Englishman পত্রিকায় তাঁহার গ্রন্থানুবাদ করিয়া যে কয়টি কথা লিখিত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম ভাষান্তরিত করিয়া দিলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের বক্তব্যও লিখিলাম।

লেখক মহাশয় দুঃখ করিয়াছেন এক বৎসর হইল নোবল পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেও নুট হ্যামসনের পাঠক বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কয়েক বৎসর হইল ইংরাজী ভাষায় তাঁহার উপন্যাসের অনুবাদ হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক উপন্যাস-পাঠকই এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার নামও জানেন না, কিন্তু আশা করা যায় শীঘ্রই তিনি যথোপযুক্ত আদর লাভ করিবেন।

কয়খানি উপন্যাসের ভিতর Growth of the Soil সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এইরূপ পুস্তক শত বৎসরের ভিতর একখানি প্রকাশিত হইয়া থাকে। পুস্তকের ভাব সহজ ও সরল হইলেও, ঘটনা-সমাবেশ এমন প্রীতিপ্রদ যে পুস্তকখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এখানি গ্রাম্য গীতি-কবিতার মত সুন্দর। বন কাটিয়া বসতি করিতে হইলে মানুষকে চেষ্টা করিয়া যাহা যাহা উৎপন্ন করিতে হয়, তাহার সমুদয় বিবরণ ইহাতে আছে।

গল্পের নায়ক আইজ্যাক্ বনমধ্যে বাস করিতে গিয়া একটী সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, পরিশ্রম সহকারে পতিত ভূমিতে আবাদ করিয়া নানারূপ ফসল উৎপাদন করিয়াছিল। চারিদিকে পর্ব্বত। পর্ব্বতের সানুদেশে অতি অল্প আয়াসে প্রচুরতর দ্রব্য লাভ করিয়া যখন তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন সে আবশ্যক মত গৃহটীকে বড় করিল। জঙ্গলের মধ্যে সাহায্যকারী কাহাকেও না পাইয়া যখন সে একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন হঠাৎ কোথা হইতে আয়েঙ্গার নামে এক রমণী আসিয়া তাহার কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিল। সহকর্ম্মী হইতে ক্রমশঃ সে সঙ্গিনী হইল। গরু ছাগল প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশু আসিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের থাকিবার স্থানও নির্ম্মিত হইল। পুত্রকন্যা জন্মিল। ক্রমশঃ ঐ স্থানে অপর অপর লোক আসিয়া বাস করিতে লাগিল। ক্রমশঃ স্থানটী একটী উপনিবেশে পরিণত হইল। চিম্নীর ধূমপুঞ্জ আকাশে উঠিতে লাগিল, কলকব্জা প্রচলিত হইল। পর্ব্বতের পাদদেশে খনি আবিষ্কৃত হইয়া বহু লোকজন খাটিতে লাগিল।

আইজ্যাকের চরিত্র অপূর্ব্ব। কোনদিনের জন্য সে সহরে পদার্পণ করে নাই। খোলা মাঠ, খোলা হাওয়া ও বন জঙ্গল তাহাকে যে আনন্দ দিত, তাহাতে সে সর্ব্বদাই ভাবিত, সহরে মানুষ কি করিয়া বাস করে।

অন্যান্য চরিত্রও সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা সরল শ্রমজীবী ও সমাজের নিম্নতর স্তরের লোকদিগের প্রাণের ভাষা; সভ্যতাভিমানী সহরের লোকদিগের ভাষার ন্যায় আড়ষ্ট নহে। পুস্তকখানিতে প্রকৃতির যথাযথ বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে আনন্দে বিভোর হইতে হয়। মুক্ত আকাশ, উদার বাতাস, বিভিন্ন ঋতু ও মৃত্তিকার কথায় বইখানি ভরপূর। পুস্তকখানি শেষ হইয়া গেলে, চরিত্রগুলি অভিনীত নাটকের দৃশ্যাবলীর ন্যায় মানস চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা ফলশ্রুতি স্বরূপ যাহা লাভ করিয়াছি, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—দেশ টাকা চায় না; টাকা দেশে যথেষ্ট আছে। দেশ চায় খাঁটি মানুষ। চায় না সেরূপ লোক, যারা অর্থোপার্জ্জনের জঘন্য উপায়গুলিকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লয়। তাহারা পাগল, তাহারা বাতিকগ্রস্ত, তাহারা কাজ করিতে চায় না। কাজ করিতে ভয় পায়। লাঙ্গল ধরিতে তাহারা জানে না—তাহারা জানে পাশা ফেলিতে। পাশার দান পড়িলে জিতিতে পারে। তাহারা জুয়াড়ী। জুয়াড়ীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে চায় না—চায় বিনা পরিশ্রমে বহুৎ অর্থ-সংগ্রহ করিতে;—তাহারা জীবনের সহিত সমান ভাবে চলিতে জানে না—তাহারা অগ্রগামী হইতে চায়। ফলে দৌড়াইতে দৌড়াইতে তাহারা আর চলিতে পারে না—অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। যিনি এরূপ খাঁটি সত্য কথা বলেন, তাঁহার আদর চিরকালই থাকিবে।

পুস্তকখানিতে দুইটী ভ্রূণ-হত্যা, ও তদানুষঙ্গিক বিচারের প্রহসন আমাদের আদৌ ভাল লাগে নাই।

Hunger পুস্তকখানিতে ক্রিশ্চিয়ানের কপর্দ্দকশূন্য

সংবাদ-পত্র-লেখকের দুঃখের জ্বলন্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ এরূপ ভাবে ইহাতে আছে, যাহা রুসিয়ার বড় বড় লেখকদিগের লেখার অনুরূপ; কিন্তু কোন কোন সমালোচকের মতে এগুলিতে রং একটু বেশী ফলিয়াছে। আবার কাহারও কাহারও মতে এটী তাঁহার আত্ম-কাহিনী। পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, দুইখানি পুস্তকেই একটু নীচতার (coarseness) নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সমাজের নিম্নতর জীবের চরিত্র লইয়া যখন প্রথম পুস্তকখানি রচিত, তখন তাহাদের চরিত্রে যে একটু নীচতা থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি, এবং উহা ততটা দোষেরও নয়; তবে ইংরাজ লেখকের হাতে পড়িলে সমগ্রের সৌন্দর্য্যে উহা একটু কোমল হইত। (There is strange coarseness in both these novels excusable possibly in the first on the ground that in dealing with coarse country-folk their coarse manner could not well be left out; but we know from the writings of the English masters that coarseness may be softened with resultant beauty to the whole work) হ্যামসনের লেখায় যে অভদ্রজনোচিত চিত্র ও কথোপকথন দুই একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সত্য; এবং আমরাও একটি দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি, কিন্তু ইংরাজ লেখকের হাতে পড়িয়া কিরূপে তাহা কোমল হইত, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এ পুস্তকেও Vaterland পান্থশালা যে ন্যক্কারজনক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার কথা আর বিশেষ করিয়া বলিতে চাই না। এরূপ অসম্ভব চিত্র পাশ্চাত্য জগতে যে সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারি না। বাস্তবতার দোহাই দিয়া যাঁহারা অশ্লীল চিত্র অঙ্কিত করেন, তাঁহারাও বোধ হয় ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। এরূপ সুন্দর পুস্তকের এই স্থলটী দুষ্ট ক্ষতের মত।

Pan পুস্তকে ভালবাসার উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক চিত্রের ভিতর যে দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহাতে পৃথিবীকে নূতন চক্ষে দেখিতে হয়।

Mothwise উপন্যাসখানি পূর্ব্বোক্ত তিনখানির ন্যায় সুন্দর নহে। এমন কি Growth of the soil ও Mothwise যে একই লোকের হাতের লেখা, তাহা বুঝা যায় না।

পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায় না যে আমরা অনূদিত পুস্তক পাঠ করিতেছি। মনে হয় ইংরাজী উপন্যাসই পাঠ করিতেছি; তবে যখন বৈদেশিক শব্দের সাক্ষাৎ পাই, তখনই মনে পড়িয়া যায় যে অনুবাদ পড়িতেছি। অনুবাদকের পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

ডস্টয়ভেস্‌কি (Dostoievski)

রুসিয়ার প্রাণ-প্রতিম ডষ্টয়ভেস্‌কির শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে আনন্দের লহর ছুটিয়াছিল। জাতির ভিতর নূতন ভাবে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি আজ জগতের নিকট বরেণ্য হইয়াছেন। Margot Robert Adamson সাহেব Review of Reviews পত্রিকায় ডষ্টয়ভেস্‌কির জীবনের বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়া যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সারাংশের মর্ম্ম আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

১৮২১ সালের অক্টোবর মাসে Feodor Michaelovitch Dostoievski জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শ্রমজীবীদের হাসপাতালের সামান্য ডাক্তার ছিলেন। ৬০ বৎসর পরে ডষ্টয়ভেস্‌কির মৃত্যু সময়ে ৪০ হাজার রুশিয়া ব্যক্তি তাঁহার মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতি রুসিয়াবাসীর মনে চিরজাগরূক রাখিবার জন্য বল্‌সেভিক গবর্ণমেণ্ট একটা মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও সমালোচক Dmitre Merejkovskiর মতে তিনি একজন ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা ছিলেন। Brandesএর মতে তিনি একজন প্রতীকার-প্রিয় ভাঙ্গন-নীতির সমর্থক ও নীচ প্রকৃতির লোক। গোর্‌কির প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে ঋষি টলষ্টয় একদিন তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, তিনি একজন বিদ্রোহী; অনুভূতি শক্তি তাঁহার যথেষ্ট আছে; কিন্তু চিন্তাশক্তি তত প্রখর নয়। এই সকল বিরুদ্ধ মতের সমন্বয় করা বড় সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়। তবে একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে না যে, সমগ্র য়ুরোপে তাঁহার গুণগ্রাহীর সংখ্যা বড় কম নয়, এবং জগতের কথা-সাহিত্যে তিনি চিরস্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। কতক লোক তাঁহাকে যেমন প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া থাকে, তেমনি আবার কতক লোক তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া থাকে।

ামতি Strakhow তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট । তিনি লিখিয়াছেন, ডষ্টয়ভেস্‌কি যাহা কল্পনা রলেন, তাহার মাত্র দশমাংশ লিখিয়া গিয়াছেন; বনে ঔপন্যাসিক স্বয়ং বলিয়াছিলেন, 'যাহা আমি প্রাণে করিয়াছি, তাহার সকল কথা আমি খুলিয়া বলিতে াই—এমন কি আমার যাহা প্রধান বক্তব্য তাহাই : নাই।' অবস্থাবশে তাঁহার জীবন প্রহেলিকাময় ঠিয়াছিল। দারিদ্র্যের পীড়ন, রাজপুরুষদিগের রোষ-লোচন, সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসন, তাঁহার শক্তির সম্পূর্ণ র যে পরিপন্থী হইয়াছিল, তাহা আর বিশেষ করিয়া হইবে না। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ডষ্টয়ভেস্‌কি যখন নীত হইয়াছেন,—জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে যখন -তখন অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া ়খে আনন্দের রেখা প্রতিভাত হইবামাত্র শুনিলেন, রেরা তাঁহাকে ধৃত করিয়া জেলে দিবার চেষ্টা ়ন। সে সময় পলায়ন ভিন্ন তাঁহার অন্য গতি ছিল র্ব্বাসিত, নির্য্যাতিত, গৃহ হইতে বিতাড়িত ডষ্টয়-এই সময় অতীব দুঃখে লিখিয়াছিলেন,—"ভগবান্‌, জীবন বড়ই যাতনাদায়ক!" এই সকল অবস্থার াকিয়া তিনি তাঁহার অমূল্য গ্রন্থরাজী লিখিয়াছেন। াল হইতে ১৮৭৩ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ Crime and ment পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর হইতে The ed পুস্তক প্রকাশিত হইবার সময় পর্য্যন্ত, বন্ধক-দেনা পরিশোধ করিবার জন্য বিনিদ্র-রজনীযোগে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার পত্রাবলীতে রাজনীতির অপূর্ব্ব সমাবেশ আছে,—আর আছে র জন্য অরুন্তুদ মানসিক যাতনার চিত্র। ঋণমুক্ত ন্য তাঁহার উৎকৃষ্ট উপন্যাসগুলি ভাড়াটিয়া লেখকের হাকে লিখিতে হইয়াছে। কথা-সাহিত্যে তাঁহার ক্ত আছে কি না, তাহার বিচার করিবার তিনি : অবসর পান নাই। আবার একথাও ঠিক, সংবাদ-ত্র তাঁহার লেখা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া ারণের এত প্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন, ও দেনাও পরিশোধ করিতে পারিয়াছিলেন।

কুশলী হইবার জন্য যে মহতী চেষ্টা ও সাধনার তাহার অবসর তিনি কোন দিনই পান নাই। কলাবিদের জীবনের স্থিরতা ও ধীরতা তাঁহার জীবনে কোনও দিন ছিল না। এইরূপ জীবন লাভ করিবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবস্থা তাঁহার ঘোর প্রতিকূল ছিল। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন, 'আমি বিড়ালের ন্যায় অস্থির প্রকৃতির লোক (I had the fluctuating vitality of a cat)। অবস্থা-বশে আমি সর্ব্বদাই চঞ্চল। হায়! এরূপ অবস্থায় লোকে আমার নিকট হইতে আর্টের আশা করিয়া থাকে।' ক্রমঃপ্রকাশিত The Idiot সময়-মত বাহির করিতে না পারিয়া তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়া-ছিলেন, 'টুরগেনিভের জীবনের মত যদি জীবন যাপন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমিও তাঁহার মত লিখিতে পারিতাম।' ১৮৭০ সালে যখন তিনি কপর্দ্দক-শূন্য, তখন তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস The Possessed লিখিতেছিলেন। এই পুস্তকখানি লিখিবার পর তিনি নাস্তিকবাদের (The Atheism) ভিত্তির উপর একখানি উপন্যাস লিখিবার কল্পনা করেন। এই সময় তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আমি এবার যে পুস্তক লিখিতে চাই, তাহা নির্জ্জনে বসিয়া ধীরভাবে একান্তসাধনা করিয়া লিখিতে চাই। টলষ্টয় যেমন কোনরূপে উত্ত্যক্ত না হইয়া তাঁহার রচনাবলী লিখিয়াছেন, আমিও সেইরূপে লিখিতে চাই। আর চাই কিছু সময়—এ কার্য্য সাধন সময়-সাপেক্ষ।' ১৮৭১ সালে পুনরায় রুসিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি কিছু সময় পাইয়া তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য নাস্তিকতা প্রচারের পরিপন্থী The Brothers Karamazov পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহা তাঁহার কল্পিত সমগ্র পুস্তকের খণ্ড-বিশেষ। এই পুস্তকে তাঁহার চিন্তাশক্তির প্রখরতা ও কুশাগ্র বুদ্ধির পরিচয় যেরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্য দিকে যে তাঁহার দৈহিক শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, তাহাও বেশ বুঝা যায়। তাঁহার মত আত্ম-সমালোচক বড় কম দেখিতে পাওয়া যায়। সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের তাড়নায় দ্রুতগতিতে লিখিলে চিন্তা-শীলতার যে অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা তিনি স্পষ্টই অনুভব করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় কলা-জ্ঞান (Art consciousness) তাঁহার যথেষ্ট ছিল, এবং এই কারণেই কোন স্থানেই তিনি অশ্লীল হইয়া পড়েন নাই। স্বদেশপ্রেমিক ডষ্টয়ভেস্‌কিকে সমালোচকেরা এই জন্যই সাহিত্যের প্রাণ স্বরূপ (Hero of Literature) বলিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট কলা বা আর্ট কেবল মাত্র দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে না; স্থির ভাবে কার্য্য করিবার উপর ইহা নির্ভর করে। চরিত্র সৃষ্টি করিয়া ইহার শক্তি সম্পূর্ণ ব্যয়িত হয় না; জীবনের প্রতিদিনের দ্বন্দ্ব-কোলাহলের মধ্যে ইহা প্রবেশ করিয়া থাকে। জীবনের উচ্চ গ্রামে ও অনুভূতির শীর্ষদেশে ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

পুস্তক-পরিচয়

অব্যক্ত।—আচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু এফ-আর-এস প্রণীত; মূল্য ২॥০। আচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সাময়িক পত্রে এ যাবৎ যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহারই কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া এই "অব্যক্ত" প্রকাশিত হইয়াছে। আচার্য্য বসু মহাশয় বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের অন্যতম বলিয়া যে তিনি মাতৃভাষার সেবা ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি বাঙ্গালা ভাষায় অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিবরণ ইংরাজী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হয় বাধ্য হইয়া;—বিদেশী আদালতে না হইলে বিজ্ঞানের মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। তাই আচার্য্য বসু মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, 'জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমান আর কি হইতে পারে?' এই 'অব্যক্ত' গ্রন্থে ধারাবাহিক ভাবে কিছুই প্রকাশিত হয় নাই; সকল রকমের প্রবন্ধই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'রাণী সন্দর্শন'ও আছে, 'আকাশ-স্পন্দন'ও আছে, 'আহত উদ্ভিদ'ও আছে, আবার 'হাজির'ও আছে। অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবার, অজ্ঞাতকে জ্ঞাত করিবার সাধনায় নিযুক্ত মনীষী আচার্য্য মহাশয় এই সংগ্রহ-পুস্তকে যে কয়েকটী সন্দর্ভ দিয়াছেন, তাহার সকলগুলিই সেই অব্যক্তের সাধনার ফল; বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন। ইহার পরিচয় দিবার চেষ্টা না করিয়া বাঙ্গালী পাঠকগণকেই মূল গ্রন্থের সহিত পরিচিত হইবার জন্য আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

সের শাহ।—শ্রীকালিকারঞ্জন কাননগো এম-এ প্রণীত; মূল্য তিন টাকা। এখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত ইতিহাস-গ্রন্থ। প্রচলিত ছোট বড় ইংরাজী বাঙ্গালা ইতিহাস-পুস্তকে সের শাহ সম্বন্ধে এতদিন যাহা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা অতি সামান্য। এই অসামান্য মহাবীরের জীবন-কথা এতই বৈচিত্র্যময় এমনই ঘটনা-বহুল যে, সে সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল। এতদিন কেহই তাহা করেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে ইতিহাসাচার্য্য শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের উপযুক্ত শিষ্য শ্রীমান্ কালিকারঞ্জন গুরুর নির্দ্দেশ অনুসারে মহাবীর, অতুলকর্ম্মা সের শাহের জীবন-চরিতের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক, এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। যেখানে যেটুকু পাইয়াছেন, তাহা বিচারের কষ্টিপাথরে ফেলিয়া যাচাই করিয়া, শ্রীমান্ কালিকারঞ্জন গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং এই পুস্তকে যে সমস্ত বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ গ্রহণীয়। এখানিকে আমরা নিঃসঙ্কোচে সের শাহের সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারি। আচার্য্য যদুনাথের [illegible] সার্থক হইয়াছে; তাঁহার শিষ্য তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া [illegible] কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই ইতিহাসখানির একটা বাঙ্গালা [illegible] বাহির করিবার জন্য আচার্য্য যদুনাথের আর কোন শিষ্য কি [illegible] দিবেন না?

ঐশ্বর্য্য।—শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস প্রণীত; মূল্য দুই টাকা। শ্রীমান্ জানকীবল্লভ নূতন লেখক নহেন। তিনি অনেক দিন হইতে সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেছেন। তাঁহার রচনা-পারিপাট্য যে কেমন, তাহা এই 'ঐশ্বর্য্য' নামক সামাজিক উপন্যাসখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। শ্রীমান্ জানকীবল্লভ পল্লীমাতার বক্ষেই জীবন-যাপন করিতেছেন, তাই পল্লী-জীবনের সামান্য খুঁটিনাটিও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। পল্লী-চরিত্র বর্ণনায় তিনি এক-এক স্থলে এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার বিশ্লেষণ যে সুদীর্ঘ হইয়া যাইতেছে, সে দিকেও দৃষ্টি করিবার অবসর তাঁহার হয় নাই। এক-একটা দৃশ্য পড়িতে-পড়িতে সেই-সেই স্থান যেন চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে থাকে। ইহাই এই উপন্যাস-খানির বিশেষত্ব।

মায়া।—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত; মূল্য দুই টাকা। 'নকল-পাঞ্জাবী'র লেখক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রবাবু বহুদিন পরে এই 'মায়া' উপন্যাস-খানি বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে দাখিল করিলেন। 'নকল-পাঞ্জাবী'তে তাঁহার পাকা হাতের ওস্তাদী ও সরস ভঙ্গী দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই 'মায়া'তেও তাহার বিশেষ নিদর্শন রহিয়াছে। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের যে চিত্র উপেন্দ্রবাবু পাঠক-সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা শুধু উপভোগ্য নহে, বিশেষ শিক্ষাপ্রদ; তেজেশের ন্যায় ভ্রান্ত যুবক, অনুসন্ধান করিলে, এখনও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সুসংস্কৃত জুয়াচুরী, ভণ্ডামীর এখানি আলেখ্য। আমরা সকলকেই এই উপন্যাসখানি পাঠ করিতে বলি।

শিবনাথ।—শ্রীসুনীতি দেবী প্রণীত, মূল্য আট আনা। এখানি পরলোকগত মনীষী, আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন-কথা। শাস্ত্রী মহাশয়ের বিস্তৃত জীবন-চরিত তাঁহার জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রকাশিত করিয়াছেন; শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্ম-জীবন-চরিতও বাহির হইয়াছে। তবু আমরা শ্রীমতী সুনীতি দেবীর লিখিত এই ক্ষুদ্র জীবন-চরিতখানির সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। শাস্ত্রী মহাশয়ের পবিত্র জীবন-কথা যত অধিক লিখিত হয়, ততই ভাল। শ্রীমতী সুনীতি দেবী অতি সরল ভাষায় অল্প পরিসরের মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনের স্থূল কথাগুলি সমস্তই বিবৃত করিয়াছেন; আমাদের ছেলেমেয়েরা এই ছোট বইখানি পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন।

পঞ্চবাণ।—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রণীত; মূল্য পাঁচ সিকা। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীমান্ যোগীন্দ্রনাথ সহস্র কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও অবসরটুকু গল্প-সাহিত্য রচনায় নিয়োগ করিতেছেন, ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। বোধ হয়, গভীর গবেষণায় যখন তাঁহার একটু ক্লান্তি বোধ হয়, তখনই তিনি ক্লান্তি দূর করিবার জন্য দুই-একটা ছোট গল্প লেখেন। তাহারই ফলে এই পাঁচটী ছোট গল্প—এই 'পঞ্চবাণ'। গল্প কয়টী বেশ হইয়াছে, অতি সুন্দর হইয়াছে।

প্রথম গল্প 'মাতৃদেবী' আমরা যে কতবার পড়িলাম, তাহা বলিতে পারি না। ঐ যে মৃত্যুদণ্ড-প্রাপ্ত সৈনিক যুবক বারবার বলিতেছে, 'না, আমি প্রাণ ভিক্ষা করিতেছি না' 'আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি না' উহার মধ্যে যে কি স্বর্গীয় ভাব, অতুলনীয় মাতৃভক্তি সহস্র ধারায় ফুটিয়া বাহির হইতেছে, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

মাতৃহীন।—শ্রীইন্দিরা দেবী প্রণীত; মূল্য আট আনা। এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার অষ্টষষ্টিতম গ্রন্থ। বিনা আড়ম্বরে, অতি সরল ভাষায়, একেবারে মায়ের প্রাণের পবিত্র স্নেহধারা ঢালিয়া দিয়া শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী এই 'মাতৃহীন' গল্পটি লিখিয়াছেন। তাই তাঁহার এই গল্প-সংগ্রহের প্রথমে ঐ গল্পটী দিয়া পুস্তকের 'মাতৃহীন' নামকরণ করিয়াছেন। এই একটা গল্পেই বইখানি উজ্জ্বল হইয়াছে। তাহার সঙ্গে 'রেবা' 'ভাবের অভিব্যক্তি' 'লেখকের বিপত্তি' ও 'ভর্ত্তৃ' এই চারিটী ছোট গল্পও জুড়িয়া দিয়াছেন। এগুলি উপরি লাভ। কিন্তু উপরি লাভ হইলেও, এ কয়টা গল্পেও লেখিকার ভাষার চাতুর্য্য, তাঁহার অকৃত্রিম সহানুভূতি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখিকার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে।

মহাশ্বেতা।—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত; মূল্য আট আনা। মহাশ্বেতা উপরিউক্ত গ্রন্থমালার উনসপ্ততিতম গ্রন্থ। লেখক শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ ইতঃপূর্ব্বে এই গ্রন্থমালায় 'মায়ের প্রসাদ' দিয়া যশোভাজন হইয়াছেন; এই 'মহাশ্বেতা'ও তাঁহার সে যশঃ অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। একটা বাস্তব ঘটনার কঙ্কাল লইয়া লেখক এই গল্পটী লিখিয়াছেন। তিনি যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। বিনোদের মত অবস্থায় বিলাত-ফেরত দুই-চারিজন যে না পড়িয়াছেন, তাহা নহে; তবে বিনোদ শেষকালে যা হৌক, কোন রকমে কাটাইয়া উঠিয়াছেন; অনেকে তাহাও পারেন না। শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ বেশ খোলাখুলি ভাবে, কোন প্রকার রচনার কসরত না দেখাইয়া, সোজাসুজি গল্পটী বলিয়া গিয়াছেন; সেই জন্ম গল্পটী বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

উত্তরায়ণে গঙ্গাস্নান—শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী প্রণীত; মূল্য আট আনা। এখানি আট-আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার সপ্ততিতম গ্রন্থ। লেখিকা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী পল্লীবাসিনী; সহরের সংস্রবে তিনি অতি কমই আসিয়াছেন। পল্লীবাসিনীদিগের একদিনের গঙ্গাস্নান যাত্রার একটী মনোরম বর্ণনা তিনি দিয়াছেন। বর্দ্ধমান জেলার পল্লীরমণীদিগের আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, হাস্য-পরিহাস তিনি অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। পল্লীর কাহিনী অনেকেই লিখিয়া থাকেন; কিন্তু এই গ্রন্থের লেখিকা যে ভাবে সে চিত্র পাঠক-পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা অভিনব। বইখানি আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে। যাঁহারা পল্লী-জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না, তাঁহারা এই বইখানি পড়িয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিবেন। বইখানিতে অনেকগুলি গ্রাম্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু একটু চেষ্টা করিলেই তাহার অর্থ-বোধ হয়।

বিন্ কাশিম।—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রণীত; মূল্য ১।০। এখানি ঐতিহাসিক নাটক। মুহম্মদ বিন্ কাশিম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া নাটক লিখিত হইয়াছে দেখিয়া প্রথমে আমরা ভীত হইয়াছিলাম; কারণ অনেক স্থলেই দেখিতে পাই যে নাট্যকারের কৃপায় ঐতিহাসিক ব্যক্তির ঐতিহাসিকত্ব থাকে না, এমন কি অনেক সময়ে তাঁহাদের জাতি পর্য্যন্তও উল্‌টাইয়া যায়। শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রবাবু তাহা করেন নাই, তাঁহার বিন্ কাশিমকে আমরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া বেশ চিনিতে পারি। ঘটনার সুসংস্থানে ও ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকখানি উজ্জ্বল হইয়াছে। গ্রন্থকার মহাশয়কে আমরা বাঙ্গালার নাট্য সাহিত্যে অভ্যর্থনা করিতেছি।

রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা ভক্ত অন্নদা ঠাকুর দ্বারা প্রাপ্ত; মূল্য এক টাকা।

পরলোকগত মনীষী রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বইখানির পাণ্ডুলিপি আমাদিগকে দেখিতে দিয়াছিলেন। আমরা তখনই বলিয়াছিলাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পবিত্র বাণী যিনি যে ভাবে যেমন করিয়াই বলুন না কেন, তাহাই উপাদেয় হইবে। এখনও সেই কথাই বলিতেছি। ভক্ত অন্নদা ঠাকুর নিজে কিছুই বলেন নাই; তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন কথাগুলি পরমহংসদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত; সুতরাং ইহা সমালোচনার অতীত; মহাপুরুষের মহতী বাণী মাথায় করিয়া লইতে হয়, সকলে তাহাই করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা। প্রভুপাদ শ্রীনীলকান্ত গোস্বামি ভাগবতাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মূল্য দুই টাকা।

প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মপিপাসুগণের পিপাসা দূর করিয়াছিলেন; লীলামৃতেরই এক অংশ রাসলীলা; লীলামৃতের প্রভুপাদ রাসলীলার ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার স্থায় সুপণ্ডিত ধর্ম্মপরায়ণ, আচার্য্যের নিকট হইতে আমরা যাহা প্রত্যাশা করিতে পারি, তাহাই পাইয়াছি। বইখানি ভক্ত সাধকের নিকট রত্ন বলিয়া গৃহীত হইবে।

মনুসংহিতা।—৺কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন সম্পাদিত; মূল্য ৬॥০। বঙ্গের স্মার্ত্তচূড়ামণি স্বর্গীয় কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় অনন্য-সাধারণ পরিশ্রম ও প্রতিভা সাহায্যে মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের এক বিরাট্ অভিনব সংস্করণ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিতে সামান্য বাকী রাখিয়া অকস্মাৎ বিশ্বনিয়ন্তার আহ্বানে ইহ-সংসার ত্যাগ করিয়া যান। তদীয় উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত হেরম্বনাথ পিতৃদেবের সেই অসম্পূর্ণ প্রকাশিত মনুসংহিতার পূর্ণপ্রকাশ করিয়া বঙ্গীয়, শুধু বঙ্গীয় কেন, ভারতীয় হিন্দু সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় অন্যান্য টীকার সহিত নিজের টীকা সংলগ্ন করিয়া গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছেন। এমন অমূল্য গ্রন্থের আদর হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। আমরা অবগত হইলাম যে, শ্রীযুক্ত হেরম্বনাথ তাঁহার পিতৃদেবের এই অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; এই ঋণ পরিশোধকল্পে হিন্দু মাত্রেরই এই গ্রন্থখানি ক্রয় করা কর্ত্তব্য।

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

কয়েক মাস হইল আমি একযোড়া বোম্বাই মিলের ধুতি কিনিয়াছিলাম। দিব্যি পাড়, দিব্যি জমি। কিন্তু দুই-চারি ধোপ যাইতে না যাইতে পেড়ে-ধুতি সাদা-ধুতি হইয়া গিয়াছে। সূতায় পাকা রঙ করা একটা মস্তবড় সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের জন্য বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা মাথা ঘামাইতেছেন; সমস্যার কতক পূরণও হইতেছে; তবু এখনও অনেক বাকী রহিয়াছে।

পুরাকালে, শুনিতে পাই, ভারতে এই রঞ্জন-বিদ্যার প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু এখন তাহা লুপ্ত-বিদ্যা। তূলা বা পশমের দ্রব্যাদিতে পাকা রঙ করার বিদ্যা এ দেশে এখনও যাহাদের হাতে একটু-আধটু আছে, মন্ত্রগুপ্তির হিসাবে তাহারা সে কৌশলটুকু, ওস্তাদের বা গুরুজীর দোহাই দিয়া, সযত্নে গুপ্ত ভাবে রক্ষা করিতেছে—পুত্র বা পুত্রতুল্য সাকরেদ ভিন্ন কাহাকেও তাহা শিখাইতে চায় না;—সর্ব্বসাধারণকে ত নহেই। ফলে, এই সকল বিদ্যার ক্রমোন্নতি ত হইতেই পারে না,—সে সুযোগই নাই;—এমন কি, যেটুকু আছে, তাহাও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু আমি মনে করি, এই বৈজ্ঞানিক যুগে মন্ত্র-গুপ্তির দিন আর নাই। আগে যখন পেটেন্ট আইনের মত কোন কিছু ছিল না, সেরূপ কোন রক্ষাকবচের কল্পনাও কেহ করিতে পারিত না, তখনকার কথা স্বতন্ত্র। তখন ব্যবসায়গত স্বার্থের খাতিরে মন্ত্রগুপ্তি আবশ্যকও ছিল, সঙ্গতও ছিল। বিংশ শতাব্দীতে সে অবস্থা আর নেই। এখন কেহ কোন নূতন বিদ্যার অধিকারী হইলে, আইনের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত সুবিধা নিজে একা ভোগ করিতে পারে। পরন্তু, সাধারণে সেই বিদ্যার অধিকারী হইলে, তাহার সুবিধা উপভোগ করিতে না পারুক, বুদ্ধি খাটাইয়া, মস্তিষ্ক পরিচালন করিয়া, তাহার উন্নতি সাধন করিতে পারে। এইরূপে ঐ বিদ্যাটির ক্রমোন্নতি ঘটিতে পারে। তবে অবশ্য যদি বিদ্যাটি এমন সহজ হয় যে, তাহা সর্ব্বজনসুলভ হইলে, প্রথম আবিষ্কারক আইনের সাহায্যেও আত্মরক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে মন্ত্রগুপ্তি আবশ্যক হইতে পারে বটে।

রঞ্জন-শিল্প একটী উচ্চ অঙ্গের রসায়ন-বিজ্ঞান ঘটিত প্রশ্ন। ইহা এত সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিষয় যে, সকলের পক্ষে তাহা আয়ত্ত করা কঠিন; এবং "ইঙ্গিতে"রও রীতিমত আলোচ্য বিষয় নহে। আমি মোটামুটি একটু-আধটু ইঙ্গিত করিতে চাই মাত্র।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, পান খাইবার সময় খয়ের ও চূণ দন্ত-সাহায্যে ও লালার মধ্যস্থতায় পরস্পর মিলিত হইয়া অতি উত্তম লাল রংয়ে পরিণত হয়। আপনি খানিকটা খয়ের-গোলা জল এবং খানিকটা চূণের জল একসঙ্গে মিশাইলেও ঐ রকম লাল রং উৎপন্ন হইবে। ঐ লাল রংয়ে আপনি যদি একখানি পরিষ্কার সাদা ধোপদস্ত রুমাল ভিজাইয়া ল'ন, তাহা হইলে রুমালখানিও লাল রংয়ে রঞ্জিত হইয়া যাইবে। কিন্তু ঐ রং স্থায়ী হইবে না;—ধুইলেই উঠিয়া যাইবে। কিন্তু আপনি যদি চূণের জলে রুমালখানি আগে ভিজাইয়া লইয়া, তার পর উহা খয়েরের জলে ভিজাইয়া ল'ন, অর্থাৎ দুইটী জিনিসের রাসায়নিক মিলন কার্য্য যদি রুমালের উপর হইতে দেন, তাহা হইলে দ্বিতীয়বারে রঞ্জিত রুমালখানির রং প্রথমবারের অপেক্ষা একটু বেশী পাকা হইবে। রং পাকা করিবার ইহা একটা উপায়। তবে সকল বস্তুতে ইহার ফল সমান হয় না;—বিভিন্ন বস্তুতে ইহা বিভিন্ন রূপে কার্য্য করিয়া থাকে।

বায়ু, বিশেষতঃ বায়ুর উপাদানভূত মূল পদার্থ অক্সিজেন বা অম্লজানের ক্রিয়ার ফলেও অনেক জিনিসের রং পাকা হয়। অর্থাৎ যে সকল জিনিসের রং এক সময়ে এক প্রকার, কিন্তু অম্লজানের ক্রিয়ার ফলে তাহার রং বদলাইয়া যায়, সে সকল জিনিসে প্রথম অবস্থায় কাপড় ভিজাইয়া, পরে উহাতে অম্লজান বাষ্প লাগাইতে থাকিলে, কাপড়ের উপর যে রংয়ের পরিবর্ত্তন হয়, এবং শেষ কালে যে রং দাঁড়ায়, তাহা অনেকটা পাকা হয়। যেমন, প্রক্রিয়াবিশেষে নীলবড়ির নীল রং বদলাইয়া উহাকে সাদা করা যায়। সেই সাদা অবস্থায় উহাতে কাপড় ভিজাইয়া, সেই কাপড়ের উপর অম্লজান লাগাইলে, সাদা রং বদলাইয়া গিয়া, ক্রমশঃ ঘোর নীল রং

উত্তম বিলিয়ার্ড বল আলু হইতে প্রস্তুত হইতে পারে। ঐ রকম আরও অনেক কাজে উহাকে লাগানো যাইতে পারে। সুতরাং আলুর চুড়ির উপাদানের সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়া লউন।

একটা চীনা মাটীর পাত্রে কিছু জল লইয়া, তাহার সঙ্গে অল্প-অল্প করিয়া কিছু গন্ধক-দ্রাবক বা সলফিউরিক এ্যাসিড মিশাইয়া লউন। জলের সঙ্গে এ্যাসিডের অনুপাত ঠিক থাকা চাই। যদি ৪ ভাগ এ্যাসিড লন, তাহা হইলে জলের পরিমাণ ৫০ ভাগ হওয়া আবশ্যক। (বলা বাহুল্য, এই যে ভাগ দেওয়া হইল, ইহা কেবল বিশুদ্ধ এ্যাসিড ও পরিস্কৃত (distilled) জল সম্বন্ধে খাটিবে।) আর জলের সঙ্গে এ্যাসিড একেবারে মিশাইবেন না,—একটু-একটু করিয়া সওয়াইয়া-সওয়াইয়া মিশাইবেন।

এ্যাসিডের জল বা এ্যাসিড সলিউসন প্রস্তুত হইলে, জলের পরিমাণ বুঝিয়া গোটা কতক আলু লউন। আলুর খোসা ছাড়াইয়া শিলে উত্তমরূপে বাঁটিয়া লউন। গায়ের কোথাও পুড়িয়া গেলে, যেমন করিয়া তাহাতে আলু-বাঁটা লাগাইয়া দিতে হয়, সেই ভাবে আলু বাটিয়া লইবেন। এখন সেই আলু-বাঁটা ঐ গন্ধক-দ্রাবকের জলে ঢালিয়া দিয়া, ৩৬ ঘণ্টা স্থির ভাবে রাখিয়া দিন। দেড় দিনে—৩৬ ঘণ্টায় আলু-বাঁটার রূপান্তর ও গুণান্তর ঘটিবে। অতঃপর সমস্ত জিনিসটি একখানা ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া লউন। তার পর সেই মসলাটি দুইখানি ব্লটিং কাগজের মাঝখানে রাখিয়া, চাপ দিয়া শুকাইয়া লউন। পরে তাহা যে কোন ছাঁচে ঢালিয়া, নানা আকারের অনেক রকম জিনিস প্রস্তুত করিতে পারিবেন। জিনিসটি দেখিতে কতকটা হাতীর দাঁতের মত। ইহা হইতে ছেলেদের খেলনা অনেক রকমের তৈয়ার হইতে পারে। ইহাতে যত চাপ দেওয়া যায়, ইহা তত শক্ত ও দৃঢ় হয়। সেই জন্য খুব প্রবল চাপে ইহা হইতে বিলিয়ার্ড বল প্রস্তুত করা যায়। ইহা খুব মসৃণ হয় বলিয়াই, ইহা হইতে বিলিয়ার্ড বল প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে।

এই জিনিসটি যদি ময়লা হইয়া যায়, তাহা হইলে সাবান দিয়া ধুইয়া লইলেই, আবার অনেকটা ধবধবে সাদা হইতে পারে।

কিন্তু আলুর কথা তুলিয়া আমি বোধ হয় ভাল করিলাম না। আলু এখন ছয়আনা সের দরে বিকাইতেছে। তাহার উপর সাধারণতঃ দেশে খাদ্য-দ্রব্যের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় আলুর ন্যায় নিত্য প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান্ খাদ্যের শিল্পে প্রয়োগ আপাততঃ বাঞ্ছনীয় নহে। যাহা হউক, সংবাদটা পাঠকেরা জানিয়া রাখুন, যদি কখনও কোন কাজে লাগিয়া যায়।

সাহিত্য-সংবাদ

'মধুস্মৃতি'র স্বনামপ্রসিদ্ধ লেখক, পরম কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোমকে কলিকাতা সিমুলিয়ার সংস্কৃত চতুষ্পাঠী হইতে 'কবিভূষণ' উপাধি প্রদান করা হইয়াছে, এ সংবাদ অবগত হইয়া আমরা অতীব আনন্দিত হইয়াছি। যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মানিত হইতে দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়? ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু বঙ্গবাণীর সেবায় আরও সাফল্য লাভ করিয়া, আরও উচ্চতর সম্মানের অধিকারী হন।

শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত "অযোধ্যার বেগম" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৷৹

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত ম্যাডাম থিয়াটারে অভিনীত নূতন নাটক "আলমগীর" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৷৹

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত "মীরকাশিম" প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৲

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত নূতন ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস অপূর্ব্ব সহযোগে প্রকাশিত হইল; মূল্য ৸৹

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত নূতন উপন্যাস "বন্ধু" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৷৹

শ্রীযুক্ত পরমেশপ্রসন্ন রায় প্রণীত "পঞ্চামৃত" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৷৹

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

প্রতীক্ষা

শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু

Emerald Ptg. Works, Calcutta. Block by Bharatvarsha Halftone Works

মাঘ, ১৩২৮

দ্বিতীয় খণ্ড] নবম বর্ষ [দ্বিতীয় সংখ্যা

সেনরাজগণের কুল-পরিচয়

[অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-আর-এস, পিএইচ-ডি]

দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি শিলালিপিতে 'সেন' উপাধিধারী এক জৈন আচার্য্য-সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বংশ সেন-বংশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ৯০২-৩ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ মুলসুন্দ লিপিতে (১) উক্ত হইয়াছে যে ধবল বিষয়ান্তর্গত মুলসুন্দ নামক নগরীতে একটি জৈন-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং উক্ত মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভূসম্পত্তি প্রভৃতি সেনান্বয়-প্রসূত জৈনাচার্য্য কনকসেনের হস্তে ন্যস্ত হয়। কনকসেনের আচার্য্য বীরসেন এবং বীরসেনের আচার্য্য কুমারসেনের নামও উক্ত লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত মুলসুন্দ নগরী ও বর্ত্তমান বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত ধারওয়াড় জিলায় অবস্থিত মুলসুন্দ অভিন্ন। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান ধারওয়াড় জেলা ও তৎসন্নিহিত ভূভাগে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে 'সেনবংশ' প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

১০৫৪ খৃঃ অঃ উৎকীর্ণ হন্‌বার শিলালিপিতে (২) জৈন আচার্য্য ব্রহ্মসেন, তাঁহার শিষ্য আর্য্যসেন ও তাঁহার শিষ্য মহাসেনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বহু রাজন্যবর্গ ব্রহ্মসেনের শিষ্য ছিলেন। যে রাজার সময়ে এই শিলালিপি

(১) Ep Ind Vol. XIII, p. 193.

(২) Ind. Ant, Vol XIX, p 272.

লিখিত হয়, মহাসেন তাঁহার গুরু ছিলেন। ইন্‌বার উত্তর কর্ণাটের অন্তর্গত ও ধারওয়াড় জেলা হইতে ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী।

শ্রবণ বেলগোল (৩) লিপি হইতে জানা যায় যে, পশ্চিম গঙ্গরাজ দ্বিতীয় মারসিংহ বৃদ্ধকালে রাজ্য ত্যাগ করিয়া ধারওয়াড় জেলার অন্তর্গত বঙ্কাপুর নামক স্থানে জৈনাচার্য্য অজিত সেনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। চামুণ্ড রায়-পুরাণ নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত দ্বিতীয় মারসিংহের মন্ত্রী চামুণ্ড রায় ব্রহ্ম ক্ষত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং উল্লিখিত অজিত সেনের শিষ্য ছিলেন। দ্বিতীয় মারসিংহের রাজত্বকাল ৯৬৩—৪ খৃঃ অঃ হইতে আনুমানিক ৯৭৫ খৃঃ অঃ; সুতরাং অজিতসেন দশম শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। স্থান, কাল ও সেন উপাধির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, এই অজিতসেনও যে পূর্ব্বোল্লিখিত সেন-বংশের অন্যতম ছিলেন, এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে সেন আচার্য্যগণের নিম্নলিখিত বংশলতা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অবশ্য এই বংশ-লতায় পরস্পরের সম্বন্ধ পিতা-পুত্রের নহে, পরন্তু আচার্য্য-শিষ্যের।

১। কুমারসেন
|
২। বীরসেন } আঃ ৮৫০—৯১০ খৃঃ অঃ
|
৩। কনকসেন
|
৪। অজিতসেন...আঃ ৯৫০—৯৭৫ খৃঃ অঃ
|
৫। ব্রহ্মসেন
|
৬। আর্য্যসেন } আঃ ১০০০—১০৬০ খৃঃ অঃ
|
৭। মহাসেন

কতকগুলি কারণে এই সেনবংশের সহিত বাংলার সেনরাজ-বংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে।

১। প্রথমতঃ, সেন রাজগণের শিলালিপিতে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, কর্ণাটে তাঁহাদের আদি বাস ছিল। বর্ত্তমান ধারওয়াড় জেলা এই কর্ণাট প্রদেশের কেন্দ্রভূমি।

২। দেওপাড়া লিপির পঞ্চম (৪) শ্লোকে সামন্তসেন 'সেনান্ববায়' ও ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় কুল হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত জৈনাচার্য্য কনকসেন 'সেনান্বয়'-সম্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ধারওয়াড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে যে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়ের বাস ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মারসিংহের মন্ত্রী ও অজিতসেনের শিষ্য চামুণ্ড রায় যে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

৩। সেনরাজগণের শিলালিপিতে স্পষ্টই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন। দেওপাড়া-লিপির পঞ্চম শ্লোকে সামন্তসেনকে 'ব্রহ্মবাদী' বলা হইয়াছে। ইদিলপুর ও মদনপাড়ের তাম্রশাসনে সেনরাজ-গণের পূর্ব্বপুরুষগণ 'দর্ব্বীকর গ্রামনী' এই আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সামন্তসেন শেষ বয়সে "গঙ্গাপুলিন পরিসরারণ্য পুণ্যাশ্রমে' জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

৪। দেওপাড়া ও মাধাইনগর-লিপিতে সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষ বীরসেনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। জৈনাচার্য্য-গণের যে বংশলতা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয় জনের নামও বীরসেন। সেনরাজগণের শিলালিপিতে অবশ্য এই বীরসেনকে পৌরাণিক যুগের লোক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা কবির অতিশয়োক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সেনরাজগণ শৈব ছিলেন; সুতরাং দাক্ষিণাত্যের জৈনাচার্য্যগণের সহিত কিরূপে তাঁহাদের সম্বন্ধ স্বীকার করা যায়। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী দাক্ষিণাত্যে ধর্ম্ম-বিপ্লবের যুগ। এই বিপ্লবের ফলে যে কর্ণাটের অনেক জৈন-সম্প্রদায় বীর-শৈব অথবা লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিলেন, ইহা সুবিদিত ঐতিহাসিক সত্য। পশ্চিম চালুক্য-রাজ, জগদেকমল্ল উপাধিধারী, দ্বিতীয় জয়সিংহ (রাজ্য-কাল ১০১৮—১০৪২ খৃঃ অঃ) জৈনধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অসম্ভব নহে যে, রাজার দৃষ্টান্তে কর্ণাট অঞ্চলস্থ অনেক জৈন-সম্প্রদায় ও সেনবংশও জৈনধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৩) Ep. Ind. Vol. V, p. 171.

(৪) p. Ind. Vol. I, p. 307.

সুতরাং স্থান, কাল ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী আলোচনা করিলে, দাক্ষিণাত্যের শিলালিপিসমূহে উল্লিখিত 'সেনান্বয়' বা সেনবংশকে বাংলার সেনরাজগণের আদিপুরুষ বলিয়া গণ্য করা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য সঠিক প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কিন্তু এই অনুমান গ্রহণ করিলে সেনরাজগণের ইতিহাসের কয়েকটী তত্ত্বের সুমীমাংসা করা যায়।

(ক) দেওপাড়া-লিপির অষ্টম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সামন্তসেন কর্ণাট-লুণ্ঠনকারী শত্রুগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন। পশ্চিম চালুক্য-রাজগণের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ১০৬০ খৃষ্টাব্দের অনতিকাল-পূর্ব্বে চোলরাজ রাজেন্দ্রদেব ধারওয়াড় জেলায় প্রবেশ করিয়া, জৈন মন্দিরগুলি ধ্বংস করেন; কিন্তু অবশেষে পরাস্ত ও নিহত হন। অসম্ভব নহে যে, এই উপলক্ষেই সামন্তসেন নিজের শৌর্য্য ও পরাক্রম প্রদর্শন করেন; এবং ইহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির সূত্রপাত।

(খ) বল্লাল নামটি আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত নাই। কিন্তু বল্লাল সেনের জন্মের অনতিকাল পূর্ব্বেই ধারওয়াড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে হৈমলরাজ বল্লাল রাজত্ব করিতেন।

(গ) সুদূর কর্ণাটের সেনবংশ কি প্রকারে বাংলার রাজ-সিংহাসন লাভ করিল, তাহা এখন আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব। বিক্রমাঙ্ক-চরিতে উক্ত হইয়াছে যে, পশ্চিম চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য যুবরাজ অবস্থায় গৌড় ও কামরূপ আক্রমণ করেন। কতকগুলি ঘটনা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, উক্ত রাজা ও তাঁহার পরবর্ত্তীর রাজত্বকালে আর্য্যাবর্ত্তে আরও এইরূপ অভিযান হয়। ১০৮৮—৮৯ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ লিপিতে নর্ম্মদার অপর পারে বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক বহু রাজার পরাজয়ের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ১০৯৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ আর একখানি লিপিতেও ঐরূপ অভিযানের বিষয় লিখিত হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের শেষ ভাগে তাঁহার সামন্ত অচ কর্ত্তৃক বঙ্গ ও কলিঙ্গের পরাজয়ের বিষয় শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা নেপালের শিলালিপি ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী হইতে জানিতে পারি যে, কর্ণাটবাসী নান্যদেব একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিহুত ও নেপালে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, সামন্তসেন বিক্রমাদিত্যের সহিত উত্তরাপথ অভিযানে বহির্গত হইয়া, মিথিলায় নান্যদেবের ন্যায় বাঙ্গালাদেশে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কর্ণাট-রাজগণ যে এই সময়ে উত্তরাপথে প্রাধান্য লাভের গর্ব্ব করিতেন, তদ্বিষয়ে বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তৃতীয় সোমেশ্বর (১১২৭—১১৩৮ খৃঃ অঃ) সম্বন্ধে শিলালিপিসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি অন্ধ্র, দ্রবিড়, মগধ ও নেপালরাজের মস্তকে চরণ স্থাপন করিতেন। বিজ্জল সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে যে, তিনি নেপাল, বঙ্গ, মগধ ও কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। নান্যদেবের ন্যায় সামন্তসেনকে কর্ণাট-সামন্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে, এই সমুদয় উক্তির যাথার্থ্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সেনরাজগণের সম্বন্ধে যে মতবাদ উপরে লিখিত হইয়াছে, তাহা এখনও অনুমান মাত্র,—প্রতিষ্ঠিত সত্য নহে। যে কয়েকটি নূতন প্রমাণ আমি উপস্থিত করিয়াছি, তাহার বলে এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে; এবং সেনরাজগণের আদিম ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে, আমাদের হাতে এখন যে কিছু প্রমাণ আছে, তাহার সহিত ইহার সামঞ্জস্য ও সুসঙ্গতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—কেবলমাত্র ইহাই আমার প্রতিপাদ্য। সেনরাজগণের রাজ্যকাল সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। এই প্রবন্ধে আমি তাঁহাদের রাজ্যকাল নিম্নলিখিতরূপ ধরিয়া লইয়াছি; এবং এতৎ সম্বন্ধে যুক্তি-তর্ক সম্প্রতি-প্রকাশিত এশিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় (৫) আলোচনা করিয়াছি।

	রাজ্যলাভকাল (আনুমানিক)
হেমন্তসেন	১১০৬ খৃঃ অঃ
বিজয়সেন	১১১৮-৯ „
বল্লালসেন	১১৫৯ „
লক্ষ্মণসেন	১১৭৫ „

(৫) J. A. S. B., Vol. XVII, p. 7.
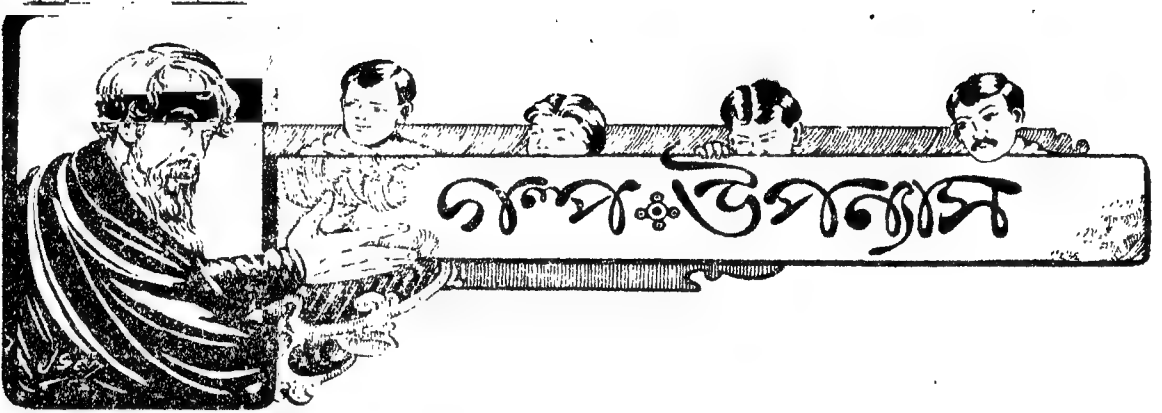
মেঘনাদ

[শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল]

৩৩

মেঘনাদের কারাদণ্ড হওয়ায় সবচেয়ে বেশী ক্ষুব্ধ হইলেন যোগেন্দ্র বাবু। মেঘনাদ যে আগাগোড়া খাঁটি সত্য কথা বলিয়াছে, এবং সে যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, সে বিষয়ে তাঁর কোনও সন্দেহ ছিল না। তাই তিনি এই মোকদ্দমায় সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্ম্মচারীর উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেলেন।

যেদিন মেঘনাদের শাস্তির আদেশ হইল, সেইদিন তিনি ডেপুটী ইনস্পেক্টার জেনারেলের নিকট চাহিয়া, পেয়ারাতলার বোমার কারখানার কেসটা নিজে তদারক করিবার ভার লইলেন। সাহেব একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সে কি যোগেন্দ্র বাবু,আপনি না এ কেসটা নিজেই ছেড়ে দিয়েছিলেন!"

যোগেন্দ্র বাবু খুব চটিয়া ছিলেন; বেশ একটু উষ্ণ ভাবে বলিলেন, "দিয়েছিলাম; কিন্তু এখন দেখছি, কয়টা অকর্ম্মণ্য লোকে মিলে কেসটা একেবারে নষ্ট ক'রবার রকম ক'রেছে। আসল আসামীর একটিও গ্রেপ্তার হ'ল না; পুলিসের কয়েকটা লোক মারা গেল; আর একটা লোকের শাস্তি হ'ল, যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ব'লে আমার সন্দেহ হয়!"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "আপনার শেষ কথাটায় এক-মত হ'তে পারলাম না।"

"না হ'তে পারেন; কিন্তু আমি মেঘনাদকে ভাল ক'রেই জানি। সে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে কখনই মিথ্যা কথা ব'লতে পারে না।"

"শুনে সুখী হ'লাম যোগেন্দ্র বাবু, যে, এতদিন পুলিসে চাকরী ক'রেও লোক-চরিত্রের উপর এত প্রবল আস্থা আপনার আছে! আমার কিন্তু তা' নেই।"

যোগেন্দ্র বাবু উঠিয়া-পড়িয়া, এই কেসের কিনারা করিবার জন্য লাগিয়া গেলেন। তিনি গুপ্ত পুলিসের কয়েকটি বাছাবাছা কর্ম্মচারীকে লইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। প্রাণ হাতে করিয়া, তাঁহারা নানা স্থানে বিপদের মুখের মধ্যে গিয়া, অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। এমনি করিয়া তাঁহারা অনুসন্ধানের অনেকগুলি সূত্র বাহির করিয়া ফেলিলেন। যে দিন সরিৎ তার বাড়ীতে উঠিয়া গেল, সেই দিন তিনি সন্দিগ্ধ হইয়া, সেই বাড়ীর উপর কড়া নজর রাখিতে লাগিলেন। সেইখানেই তিনি আবিষ্কারের প্রধান সূত্র ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এই চক্রের সঙ্গে অজিত ও সরিৎকে জড়িত দেখিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, যোগেন্দ্র বাবু বীরভূম জেলে গিয়া-

মেঘনাদের সঙ্গে দেখা করিলেন; এবং তাহাকে সরিতের কথা জানাইলেন।

ইহার কয়েকদিন পরেই যোগেন্দ্র বাবু দেখিলেন, শিশির সমস্ত জিনিষ-পত্র লইয়া বাহির হইয়া গেল। তিনি একটা আরামের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, শিশিরের পিছনে লোক পাঠাইয়া দিলেন। তার পর সরিৎ রীতিমত পড়াশুনা আরম্ভ করিল দেখিয়া, তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

শিশির সমস্ত জিনিষ লইয়া একটা হোটেলে রাখিল। তার দুই দিন পরে তাহারা তিন-চারজন আসিয়া, সেই সমস্ত জিনিষ গাড়ীতে বোঝাই করিল। ঠিক সেই সময়ে যোগেন্দ্র বাবু স্বয়ং আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিলেন। এত অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত তাহাদিগকে পিছমোড়া করিয়া ধরিয়া ফেলা হইল যে, তাহারা কোনও উৎপাত করিতে পারিল না। সেই দিনই কলিকাতা ও হাওড়ার দশ স্থানে খানাতল্লাসী হইয়া আরও অনেকগুলি লোক ধরা পড়িল। যোগেন্দ্র বাবুর আদেশ অনুসারে সমস্ত আসামীকে গুপ্ত পুলিসের হেড আফিসে লইয়া যাওয়া হইল।

সেখানে যোগেন্দ্র বাবু ডেপুটি ইনস্পেক্টার জেনারেলের সম্মুখে বসিয়া, একটি-একটি করিয়া আসামীকে ডাকিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। প্রায় সবাই বলিল, "আমরা কিছুই বলিব না,—তোমাদের যা' খুসী কর।"

যোগেন্দ্র বাবু তাহাদিগকে নানা রকমে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া প্রশ্ন করিয়া, আস্তে-আস্তে তাহাদের অজ্ঞাতসারে কতকগুলি কথা বাহির করিয়া লইলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, "মেঘনাদ ডাক্তার তোমাদের দলের লোক,—সে অমুক কথা বলিয়াছে।" এ কথায় সকলেই বলিল, "মেঘনাদ যদি এ কথা বলিয়া থাকে, তবে মিথ্যা বলিয়াছে। সে আমাদের কথা কিছুই জানে না।"

শিশির মিত্রকে যোগেন্দ্র বাবু বিশেষ করিয়া এই বিষয়ে জেরা করিলেন। সে নিজেদের বিষয়ে কোনও কথা বলিতে স্বীকার করিল না; কিন্তু মেঘনাদের সম্বন্ধে সে বলিল, "মেঘনাদ আমাদের দলের লোক নয়; তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। কেবল একদিন অসিত বোস যখন আহত হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে আমাদের আড্ডায় লইয়া যাওয়া হয়।" বলিয়া, সে ক্রমে যোগেন্দ্র বাবুর প্রশ্নের উত্তরে, সেদিনকার সমস্ত বিবরণ অকপটে বলিয়া গেল।

যোগেন্দ্র বাবু সাহেবকে একখানা কাগজ দিলেন। মেঘনাদ সাহেবের কাছে যে সব কথা বলিয়াছিল, সাহেব নিজ হাতে তাহা নোট করিয়াছিলেন। এ সেই নোটের কাগজ। শিশির মিত্রের বর্ণনা মেঘনাদের কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়া গেল দেখিয়া, সাহেব অবাক্ হইলেন।

যোগেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেঘনাদ যদি তোমাদের দলের না হ'বে, তবে তার গ্রেপ্তারের দিন সে অমন কাণ্ডকারখানা করে' ব'সলো কেন, ব'লতে পার কি?"

শিশির বলিল, "ব'লতে পারি। আমি সেখানেই ছিলাম; সব ঘটনা জানি।" বলিয়া, যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। সে বর্ণনা সাহেব মেঘনাদের বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেন।

তার পর সে ক্রমে প্রকাশ করিল যে, বটব্যাল কোম্পানীর আফিস হইতে অ্যাসিড চুরি করিয়াছিল অসিত। হাতের ভিতর মোমবাতি গলাইয়া, তাহাতে অসিত মেঘনাদের চাবীগুলির ছাপ তুলিয়া আনে। পরে সেই রকম চাবী তৈয়ার করিয়া, অসিত দুইবারে গিয়া অ্যাসিড চুরি করিয়া আনে। মেঘনাদ তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিত না। ক্রমে আরও অন্যান্য আসামী আসিয়া এই সব কথার সমর্থন করিয়া গেল।

আসামীরা বিদায় হইয়া গেলে, যোগেন্দ্র বাবু সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আপনি মেঘনাদ সম্বন্ধে কি মনে করেন?"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "একবার অন্ততঃ আপনার মানুষের উপর বিশ্বাসটা সত্য হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, যোগেন্দ্র বাবু, আপনি যে কেসটা এত সহজে হাসিল ক'রেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ। আমি আপনার কথা খুব বেশী ক'রে লাটসাহেবকে জানাব।"

যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এর জন্য আমি একটা পুরস্কার চাই।"

"নিশ্চয়! পুরস্কার তো পাবেনই। তা'ছাড়া, যাতে আপনি 'রায়বাহাদুর' খেতাব পান, সেজন্য আমি খুব চেষ্টা ক'রবো।"

"সে পুরস্কার নয় ম'শায়! আমি একটু ভিন্ন রকম পুরস্কার চাই।"

"কি?"

"সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা! মেঘনাদ যখন নির্দ্দোষ, তখন তাহাকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করুন, এই আমার প্রার্থনা।"

সাহেব বলিলেন, "আমিও তাই ভাবছিলাম যোগেন্দ্র বাবু! আচ্ছা, আমি এ বিষয়ে ভেবে দেখবো।" যোগেন্দ্র বাবু এ কথায় সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি সাহেবকে একটু চাপিয়া ধরিলেন। ক্রমে সাহেব স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "দেখুন, এ সম্বন্ধে আপনার-আমার এক মত,—মেঘনাদকে এখন মুক্তি দেওয়া উচিত। কিন্তু জানেন তো, মেঘনাদের মামলা নিয়ে কি রকম আন্দোলন হ'য়েছে। এ মোকদ্দমা মিথ্যা,—এ কথা সবাই সাব্যস্ত করে' নিয়েছে। তবু তো হাইকোর্টের বিচারে মেঘনাদ দোষী সাব্যস্ত হ'য়েছে। এখন যদি তা'কে মুক্তি দেওয়া হয়, তা' হ'লে তা'দের সেই কথাটা প্রমাণ হ'য়ে যাবে। তা'তে এদের মধ্যে জয়জয় কার লেগে যাবে; আর পুলিশের প্রতিপত্তি একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে। এই যা' মুস্কিল।"

যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন, "মেঘনাদ ডাক্তার এমন জায়গায় কি ক'রতো জানেন? সে ব'লতো, যেটা সত্য, সেটা সব জায়গায় অবাধে স্বীকার ক'রতে হ'বে। তা'তে সর্ব্বস্ব যায়, তাও স্বীকার। একটা অসত্য স্বীকার ক'রতে পারলে না ব'লে, মেঘনাদ তার চাকরী ছেড়ে দিয়েছিল।"

এই তুলনা-মূলক সমালোচনায় সাহেব প্রীত হইলেন না। তিনি কথাটাকে চাপা দিবার জন্য বলিলেন, "যাই হো'ক আমি এ সম্বন্ধে মেম্বার মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করে দেখবো। যদি কিছু করা সম্ভব হয়, তবে আমি তা' ক'রবো।"

সাহেব তাঁহার কথা রাখিয়াছিলেন। কৌন্সিলের যে মেম্বর এই ব্যাপারের ভার-প্রাপ্ত ছিলেন, তাঁহার নিকট তিনি সকল কথা বলিয়াছিলেন। মেম্বার মহাশয় শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। অনেক আলোচনা-গবেষণা চলিল। শেষে সাব্যস্ত হইল যে, পেয়ারাতলার আসামীদের বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, এ সম্বন্ধে কিছুই করা যায় না।

পেয়ারাতলার মামলার এক বৎসর ধরিয়া বিচার হইল। অধিকাংশ আসামীর গুরুতর শাস্তি হইয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে ভারত-সম্রাট্ এ দেশে আসিলেন। তাঁহার মুকুটোৎসব উপলক্ষে কতকগুলি আসামীকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই সুযোগে গভর্ণমেণ্ট মেঘনাদকে মুক্তি দিলেন।—যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে; নির্দ্দোষ ব্যক্তি মুক্তি পায়, অথচ পুলিশেরও মান বজায় থাকে!

মেঘনাদ জেল হইতে ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিন পরে, একদিন ডেপুটী ইনস্পেক্টার জেনারেল সাহেব যোগেন্দ্র বাবুকে বলিলেন, "কেমন যোগেন্দ্র বাবু, এখন আপনি খুসী হ'য়েছেন তো? আপনার বন্ধু তো মুক্ত!"

যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন, 'দুঃখিত হ'লাম ম'শায়। আমি খুসী হ'তে পারলাম না। অসত্যটাই জয়ী হ'য়ে রইল।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "O, you are too great an idealist for a policeman."

"Idealism-এর কথা নয় সাহেব,—এ একটা অত্যন্ত কঠোর materialism-এর কথা। মেঘনাদকে নির্দ্দোষ জেনেও আপনারা তাকে ছেড়ে দিলেন এমন একটা ছাপ মেরে, যাতে তার ভবিষ্যৎটা একেবারে মাটী হয়ে গেল। এখন সে খাবে কি? সে যে চাকরী বেশ যোগ্যতা ও প্রশংসার সহিত ক'রছিল, সে চাকরী তো সে পাবে না,—কেউ তাকে চাকরী দিতে ভরসা পাবে না। তার প্র্যাকটিসও নষ্ট হ'য়ে গেছে; তার পক্ষে এখন প্র্যাকটিস জমানও কঠিন হ'বে। এই ছাপটা যদি আপনারা তার নাম থেকে উঠিয়ে দিতেন, তবে তার কোনও কষ্টই হ'ত না।"

সাহেব গম্ভীর হইয়া গেলেন।

(৩৪)

মেঘনাদ যেদিন জেল হইতে মুক্তি পাইল, সেদিন সরিৎ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তাহার খুব ইচ্ছা হইয়াছিল, বীরভূমে গিয়া মেঘনাদকে প্রথম সম্ভাষণ করিতে; কিন্তু লজ্জায় সে কথা সে বলিতে পারিল না। যতক্ষণ না মেঘনাদ আসিয়া পৌঁছিল, ততক্ষণ সে অসহ্য যাতনায় চঞ্চল হইয়া ফিরিতে লাগিল। মেঘনাদ এই এক বৎসর কারাবাসে দেখিতে কেমন হইয়াছে, দেখা হইলে সে কি বলিবে, মেঘনাদ কি বলিবে,—এই সব কথা লইয়া সে কত সব কল্পনা করিতে লাগিল।

যখন মেঘনাদ আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন সে স্তব্ধ হইয়া গেল। সে মেঘনাদ আর নাই! সেই সরল, চঞ্চল প্রেমিকের সমাধি হইয়া গিয়াছে। যাকে দেখিলে

তার চোখে-মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিত, যাহার বুকে মাথা রাখিলে রক্ত তাতিয়া উঠিত, সে মেঘনাদ আর নাই। তার স্থানে সে দেখিল, এক অপরূপ তেজঃপুঞ্জ দেবশরীর। তাহার মুখ শান্ত, স্নিগ্ধ হাস্যমণ্ডিত; তাহার মূর্ত্তি স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত। সরিতের যেন মনে হইল তাহার সমস্ত শরীর দিয়া অপরূপ এক জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে।

সরিৎ মনে-মনে ভাবিতেছিল যে, মেঘনাদ আসিলেই সে তার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে; নিজের তৃষিত বক্ষে তাহার হৃদয় চাপিয়া ধরিয়া, তাহাকে চুম্বনধারায় স্নান করাইয়া দিবে। কিন্তু সে তার কিছুই করিল না। সে গলায় আঁচল জড়াইয়া, ভক্তিভরে মেঘনাদের পায়ে মাথা ঠেকাইয়া তাহাকে প্রণাম করিল।

মেঘনাদ হাসিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিল। তাহাকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া, হাসিমুখে তাহার ওষ্ঠাধরে একটি চুম্বন দিল। সরিতের সমস্ত অন্তর তাহাতে স্নিগ্ধ হইয়া গেল। সে তার এই শান্ত, শীতল আশ্রয়ে মাথা রাখিয়া, অনেকক্ষণ নীরবে রহিল; তাহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। সে অশ্রু বেদনার নহে,—তৃপ্তির, শান্তির!

মেঘনাদ সরিতের চক্ষু মুছাইয়া, আদর করিয়া তাহাকে পাশে বসাইল! তার পর ধীরে-ধীরে এই দেড় বছরের জমান সব কথার কপাট খুলিয়া গেল। দুইজনে কত কথা বলিল,—কত হাসিল, কাঁদিল!

মেঘনাদকে লইয়া সবাই ভারি টানাটানি আরম্ভ করিল। তাহার মুক্তি উপলক্ষে চারিদিকে একটা বড় রকমের হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। খবরের কাগজে কেহ বলিল, ভারত-সম্রাট্ যোগ্য পাত্রে ক্ষমা স্থাপন করিয়াছেন। কেহ বলিল, এতদিনে গভর্ণমেণ্ট ন্যায় ও সত্যকে স্বীকার করিলেন। কেহ বা যোগেন্দ্র বাবুর মত ধন্যবাদ দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিল; কেন না, গভর্ণমেণ্ট তাহাকে ছাড়িলেন; কিন্তু সে যে নির্দ্দোষ, এই সত্যটা স্বীকার করিলেন না। কিন্তু সকলেই একবাক্যে মেঘনাদের অভিনন্দিত করিল। সকলেই তাহার সুযশ গান করিতে লাগিল; তাহাকে মহাপ্রাণ স্বদেশসেবক বলিয়া সবাই ব্যাখ্যান করিল। কেহ-কেহ বলিল, বিচারক তাহার উপর যে অবিচার ও অত্যাচার করিয়াছেন, দেশবাসীর উচিত ঠিক সেই অনুপাতে তাহাকে সমাদর ও সম্বর্দ্ধনা করা। ক্রমে এই কথাটা আকার ধারণ করিল একটা প্রস্তাবে যে, মেঘনাদের কষ্টের প্রতিকার স্বরূপ তাহাকে চাঁদা করিয়া কিছু মোটা টাকা হাতে দেওয়া উচিত।

হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া যখন মেঘনাদ উপস্থিত হইল, তখন একদল লোক তাহার সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। মেঘনাদ তাহার এই অভ্যর্থনায় লজ্জিত, কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ইহাদিগের সম্বর্দ্ধনা অস্বীকার করিয়া ইহাদিগকে অপমান করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না; কিন্তু সে এই সমাদরে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

তার পর সমস্ত লোক তার বাড়ী বহিয়া দেখা করিতে আসিতে লাগিল; নানা স্থানে তাহার নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। অভিনন্দনের বন্যা বহিয়া চলিল। মেঘনাদ এ বন্যায় পীড়িত হইল; সরিৎ ক্ষেপিয়া উঠিল। সে এতদিন পরে স্বামীকে পাইয়াছে; কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যে খুব অল্প সময়ই সে তাহার কাছে থাকিতে পায়। তার মন চাহিতেছিল, দিন-রাত সে স্বামীর কাছে পড়িয়া থাকে। অথচ এই অভিনন্দনের উৎপীড়নে সে তাহাকে কাছে পাইতই না।

মেঘনাদ একদিন বলিল, "সরিৎ, আমি তো মারা গেলাম! এখন উপায় কি? এঁদের কটু কথা বলতে আমি পারি না; কিন্তু এ সব অন্যায় অভিনন্দন তো আর সহ্য ক'রতে পারি না।"

সরিৎ শেষ কথাটা মানিতে পারিল না; সে বলিল, "অন্যায় কিসে?"

"যেটা যার পাওনা নয়, সেটা দেওয়াও অন্যায়, নেওয়াও অন্যায়। এতে করে আমি যেটা নই, আমাকে তাই ক'রে দাঁড় করান হ'চ্ছে। এ সব অভিনন্দনের তাৎপর্য্য এই যে, আমি একজন মহাপুরুষ,—একটি ত্যাগী স্বদেশ-সেবক। আমি তো জানি যে, আমি এর কিছুই নই।"

সরিৎ উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি যে কি, তা, তুমি কিছুই জান না। তুমি যে কতবড় মহাপুরুষ, তা' তুমি ভাব না,—সে কেবল তুমি মহাপুরুষ ব'লেই। কিন্তু আমি যে তোমার বিরাট মূর্ত্তির কাছে দাঁড়িয়ে, নিজের খর্ব্বতার মাপ দিয়ে, তোমার মহত্ব সম্পূর্ণ আয়ত্ত ক'রতে পেরেছি। আমি জানি, তুমি দেবতা।"

মেঘনাদ হাসিয়া বলিল, "প্রেমমুগ্ধা পত্নীর এষ্টিমেট

লইয়া মহাপুরুষের ওজন করিতে গেলে, পৃথিবীটা মহাপুরুষে ঠাসাঠাসি হ'য়ে যায়।"

সরিৎ কপট ক্রোধ করিয়া বলিল, "তুমি যতবড় মহাপুরুষই হও, আমার বিচার-শক্তিকে এমন অপমান করবার তোমার কোনও অধিকার নেই। আর তা ছাড়া, স্ত্রীলোকের এমন অপমান সম্পূর্ণ chivalry-বিরুদ্ধ।"

মেঘনাদ হাসিয়া বলিল, "ভয়ানক অপরাধ হ'য়েছে! তুমি মস্ত বুদ্ধিমতী! তোমার কখনও ভুল হ'তে পারে না। কিন্তু কথাটা হ'চ্ছে যে তোমার কথা সত্য নয়।"

তার পর মেঘনাদ বলিল, "একটা কথা মনে হ'চ্ছে সরিৎ, এ অসত্যটাকে আমি জগতে টি'কে যেতে দিতে পারি না। যখন এ অভিনন্দন আমাকে মাথা পেতে নিতে হ'চ্ছে, তখন এটাকে সত্য ক'রবার জন্য আমার চেষ্টা ক'রতে হ'বে।"

সরিৎ বুঝিতে পারিল না।

মেঘনাদ বলিল, "ত্যাগী স্বদেশ-সেবক বলে এঁরা আমাকে বর্ণনা ক'রছেন। আমি তা' নই; কিন্তু তা' আমি হ'তে পারি। আমি স্থির ক'রেছি, তাই ক'রবো,—এঁদের কথাটা সত্য ক'রতে হবে। এতদিন আমি কেবল টাকাই রোজগার ক'রেছি, আর যশের কামনা করেছি। এই আত্মসেবা আর ক'রতে আমার প্রবৃত্তি নেই। এখন আমি নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে স্বদেশ-সেবায় নিযুক্ত ক'রবো।"

"কি করিবে?"

"ক'রবার ঢের কাজ আছে। দেশময় ব্যাধির একচ্ছত্র আধিপত্য! আমার যে শক্তি আছে—সে ব্যাধির প্রতিকার ক'রতে যারা ডাক্তার নয়, তা'দের সে ক্ষমতা নেই। আমি আমার শিক্ষা ও শক্তি এতদিন কেবল নিজের পেট ভরবার জন্য নিযুক্ত ক'রেছি, এখন থেকে তাকে সম্পূর্ণ রূপে আর্ত্ত ও পীড়িতের সেবায় নিযুক্ত ক'রবো।"

সরিতের মনটা খুব উল্লসিত হইয়া উঠিল না। মেঘনাদের সুখ এখন তার সবচেয়ে বড় সাধনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাহার এ ত্যাগের সংকল্প শুনিয়া, সে ব্যথিত হইল। সে কোনও কথা বলিল না।

মেঘনাদ আশা করিয়াছিল, সরিৎ এ কথায় উৎসাহিত হইয়া তাহার সহধর্ম্মিণী হইয়া, পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে চাহিবে। সরিতের মনেও সে কথা উঠিয়াছিল;—মেঘনাদের সঙ্গে-সঙ্গে সে যে সব কষ্ট মাথা পাতিয়া লইতে পারিবে, সে বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্রও সংশয় ছিল না। কিন্তু মেঘনাদের কোনও কষ্ট কল্পনা করিতে সে ব্যথিত হইয়া উঠিল; তাই সে কথা বলিল না।

মেঘনাদ একটু নিরাশ হইল; সেও আর কোন কথা বলিল না। কিন্তু কথাটা তার মনের ভিতর বসিয়া গিয়াছিল। সে স্থির করিল, দেশের লোকে তাহার সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত সংস্কার পোষণ করিতেছে, তাহা সে সত্য করিবে,—নিজেকে নিঃশেষ রূপে দেশের সেবায় বিলাইয়া দিবে। সরিৎকে এই কাজে সঙ্গে পাইলে সে সুখী হইত। কিন্তু সে অনুমান করিল যে, সে ত্যাগের জন্য সরিৎ প্রস্তুত নয়। এজন্য সে দুঃখিত হইল; কিন্তু তাহার ন্যায়নিষ্ঠ অন্তর যুবতী, বিলাস-পালিতা, কঠোরতার সহিত চিরদিন অপরিচিতা সরিৎকে এই কল্পিত সুখলিপ্সার জন্য দোষী করিতে পারিল না। কেবল সে আশা করিল যে, কালে সরিতের ত্যাগ-শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে,—একদিন সে সম্পূর্ণ রূপে সর্ব্বান্তঃকরণে তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে।

এখন ঠিক কোন্‌খানে কি প্রকারে কার্য্যারম্ভ করিবে, তাহা সে কল্পনা করিতে লাগিল। সরিৎ যখন তার আমন্ত্রণে সাড়া দিল না, তখন আর সে তার কাছে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল না। সে একলা তার ভবিষ্যৎ সাধনার সঙ্কল্প গড়িয়া তুলিতে লাগিল,—কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

সে স্থির করিল, বড়-বড় চটকদার কাজ করিবার জন্য অনেক লোক জুটিবে; কিন্তু সবচেয়ে ভারী কাজ হইল, ছোট কাজ, সেটা বেশীর ভাগ লোকচক্ষুর অন্তরালে করিতে হয়। সে কাজে লোকে আকৃষ্ট হয় কম। মেঘনাদ সেই কাজই বাছিয়া লইল। সে স্থির করিল, তার নিজ গ্রামে গিয়া সে সেবার কার্য্য আরম্ভ করিবে।

তাহার জন্য প্রায় পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল। সে সেই টাকা লইয়া, তার কতক দিয়া ঔষধপত্র ও যন্ত্রপাতি কিনিয়া লইয়া, দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিল।

স্বামী যে তার কাছে একটা কিছু কথা গোপন করিতেছে, সে কথা সরিৎ বুঝিতে পারিল। সে ইহাতে ব্যথিত হইল। সে মনে-মনে সাব্যস্ত করিল, মেঘনাদ তার অপরাধ ভুলিতে পারে নাই। হায়, তার এ কঠোর প্রায়শ্চিত্তেও কি মেঘনাদের মন টলিল না! ভাবিয়া সে কাঁদিল; কিন্তু সাহস করিয়া কিছু বলিল না।

এক দিন মেঘনাদ শেষে তাহাকে জানাইল যে, পরের সপ্তাহে সে দেশে যাইবে। সেখানে কি করিবে, তাহারও একটু আভাস সে দিল।

সরিৎ কেবল বলিল, "আর আমি?" মেঘনাদ একটু হাসিয়া বলিল, "তুমি এখন পড়াশুনা কর। তোমার পড়াশুনা শেষ হ'লে তুমি যা ইচ্ছে ক'রবে, তাই হবে।"

সরিৎ বিষণ্ণ হইল; মেঘনাদ তাহা দেখিতে পাইয়া ব্যথিত হইল। তাই সে বলিল, "আমি দু-তিন মাস অন্তর এসে তোমাকে দেখে যাব। সর্ব্বদা চিঠি লিখবো।"

সরিতের বুকের তলায় এ কথায় যে বিষম ব্যথা বাজিল, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। মেঘনাদ যে সত্য-সত্যই জীবনের সকল সুখ ও সৌভাগ্য হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতে যাইতেছে, সে কথা ভাবিতে তার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িল। এত দিন পর স্বামীকে পাইয়া আবার তাহাকে ছাড়িতে তার চিত্ত চূরমার হইয়া গেল। তা ছাড়া স্বামী যে তাহাকে তাঁর সঙ্গে লইয়া তাহাকে সেবা করিবার অধিকার দিলেন না, তাঁর কঠোর তপস্যার জীবনে একটু সুখ একটু আনন্দ যোগাইবার সুযোগ দিল না, তাহাতে তার দুঃখ হইল। কিন্তু সব চেয়ে বেশী হইল তার বুকভরা অভিমান। তার স্বামী তাহাকে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, সহচারিণী হইবার যোগ্য মনে করিলেন না বলিয়া, সে নীরবে রহিল। স্বামীর সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া সে অশ্রুর প্রস্রবণ ছুটাইয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরে সে ঘরে ফিরিয়া আসিল। সমস্ত দিন ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া, মেঘনাদ তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গভীর রাত্রে কলিকাতার মুখরিত জীবন শান্ত হইয়া কেবল দূরশ্রুত একটা মৃদু কল্লোলে পরিণত হইয়াছে; কেবল মাঝে-মাঝে পাথর-বাঁধা রাস্তার উপর দিয়া ভাড়া-গাড়ীর চাকার শব্দ মৃদু-মন্দ মেঘ-গর্জ্জনের মধ্যে একটা বজ্রপাতের মত রূঢ় ভাবে সেই মৃদু শান্তি ভাঙ্গিয়া দিতেছে।

সে দিন পূর্ণিমা। গ্যাসের উগ্র আলোকে উদ্ভাসিত নগরীর ভিতর সে খবর বড় কেহ পায় নাই; কিন্তু সরিতের এই ঘরখানার খোলা জানালার ভিতর দিয়া জোছনা আসিয়া বিছানা ভরিয়া দিয়াছিল। চাঁদের আলোয় মেঘনাদের সুন্দর, শান্ত, নিদ্রাস্তব্ধ মুখখানা দেখিয়া সরিতের সমস্ত সত্তা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে চাহিয়া রহিল; চাহিয়া-চাহিয়া তাহার আশ মিটিল না। যতই সে দেখিল, ততই তাহার হৃদয় মথিত করিয়া বেদনারাশি অবারিত অশ্রুধারায় ফাটিয়া বাহির হইল। এই মুখ যে তার ভাঙ্গাঘরের মণি-দীপ! এ যে তার কাঙ্গাল হৃদয়ের রাজৈশ্বর্য্য।

অনেকক্ষণ নীরবে সরিৎ চাহিয়া রহিল। সুপ্ত মেঘনাদের কোলের কাছে বসিয়া সে চাহিল। অনেকক্ষণ পরে সে স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহাকে একবার চুম্বন করিল। ঘুমের ঘোরে মেঘনাদ নড়িয়া চড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ। কিন্তু সরিতের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় ইহাতেই তাহার দুঃখের ভরা ছাপাইয়া উঠিল। যে স্থান বেদনায় টন্‌টন্ করিতেছে, সেখানে অতি মৃদু স্পর্শেও অসহ্য যাতনা হয়। মেঘনাদ যে স্বপ্নাবেশেও তার চুম্বনের সমাদর করিল না, ইহাতে তার দুঃখ উছলিয়া উঠিল,—অভিমান বুক ঠেলিয়া উঠিল। সে মুখ লাল করিয়া উঠিয়া গেল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া সে জানালার ধারে বসিয়া, নীরবে লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টিতে চাঁদের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর সে তার সেতারটা কোলে টানিয়া লইয়া, অলস ভাবে তাহার উপর অঙ্গুলি-চালনা করিতে লাগিল। তখন তার হৃদয়ের ব্যথা সঙ্গীতে ব্যক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে ক্রমে আত্মবিস্মৃত হইয়া, ক্রমে তন্ময় হইয়া সেতার বাজাইতে লাগিল।

সেই নৈশ নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়া তাহার পটু অঙ্গুলি-নিঃসৃত বেহাগ রাগিণীর সুগভীর করুণ আর্ত্তনাদ সমস্ত আবেষ্টনের সঙ্গে, এবং তাহার ব্যথিত হৃদয়ের সুরের সঙ্গে এমন সঙ্গত সৃষ্টি করিল যে, তাহাতে সে মুগ্ধ, তন্ময় হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইল।

মেঘনাদের ঘুমটা একটা মধুর স্বপ্নাবেশের ভিতর দিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সে এ কথা-শূন্য সঙ্গীতের মাধুরীতে স্তব্ধ হইয়া, নীরবে ইহা কিছুক্ষণ উপভোগ করিল। যখন সরিৎ থামিল, তখন সে উঠিয়া তাহার পাশে আসিল। সরিতের সুন্দর মুখখানা সে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল। তাহার অধরে একটি চুম্বন দিল। সরিতের সব বেদনার বোঝা যেন নিঃশেষে নামিয়া গেল।

মেঘনাদ বেশী কথা বলিতে পারিল না। তার মন তখন গভীর ভাবে আলোড়িত হইতেছিল। একবার তার সন্ন্যাসী-হৃদয় আবেগের মদিরায় চঞ্চল হইয়া উঠিল; এই

অপরিমেয় সুখ যে সে পিছনে ফেলিয়া চলিয়াছে, ভাবিতে তার একটু ব্যথা লাগিল। তাই সে একটু চুপ করিয়া রহিল।

তৎপরে কতকটা মোহাবিষ্টের মত হইয়া সে বলিল, "দেখ, ভগবান্ আমার জন্ম বিনা খরচে এত সুখের আয়োজন করে রেখেছেন; আর আমি এত দিন সুখ বলে টাকা-টাকা করে হায়রাণ হ'য়ে বেড়িয়েছি। কি কাজ আমার টাকায়! শাক-ভাত খেয়ে যদি একখানা কুঁড়ে ঘরে মাথা রাখতে পাই, তবু তো জ্যোছনা আমার হাত-ধরা,—তবু তো তোমার গান, তোমার সেতারের ঝঙ্কার আমার নিজস্ব থাকবে! তুমি আমার অন্তর আলোয় ভরে দেবে, ফুলের সুবাসে মধুর করে রাখবে—সুখের জন্য আর কি চাই?"

সরিতের মন বলিল, "আমার সুখের জন্য কিছুই চাই না; কেবল তোমাকে চাই।" কিন্তু এ কথা বলিতে তার বড় লজ্জা করিল। সে স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

মেঘনাদ এ নীরবতার ভিন্ন অর্থ করিল। সে খুব খুসী হইল না। (ক্রমশঃ)

ভিখারী শিশু

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ]

(১)

দাঁড়িয়ে দ্বারের কাছে,
কে রয়েছিস্, অম্‌নি সাজে
সাজতে কি রে আছে?
কোমল ও তোর স্কন্ধে তুলি
কে দিল এই দারুণ ঝুলি,
ওই চারা-গাছ দোলনা বয়ে,
কেমন করে বাঁচে?

(২)

মুখটী মলিন অতি,
ছাই দিয়ে হায় কে ঢেকেছে
স্বর্ণ যুঁইএর জ্যোতি।
গোপাল তাহার কোপীন পরে
বেড়ায় দ্বারে ভিক্ষা করে,
কেমন করে পরাণ ধরে
দেখবে যশোমতী?

(৩)

দুঃখে নয়ন ঝোরে,
তোর কাছে কি সন্ধ্যা এলো
বসন্তের এই ভোরে?
নাই ক্ষতি শিব ভিক্ষা করুক,
দুঃখে সতী বাকল পরুক,
কুমার বেড়াক হাস্য মুখে
শিখীর পিঠে চড়ে।

বঙ্গে সুলতানী আমল

[অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ]

(২)

সুলতানী আমল সম্বন্ধে অবশিষ্ট বিবরণ এইবার বলিব।

(২) শমস্-ই-সিরাজ আফিফ্-প্রণীত তারিখ-ই ফিরোজশাহী।

আফিফ্ ফিরোজশাহের সমসাময়িক ঐতিহাসিক। তিনি শুধু ফিরোজশাহের রাজত্বকালের ঘটনাবলিই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। Dawson and Elliott's History of India by its own Historians নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে আফিফের পুস্তকের অধিকাংশ ইংরেজীতে অনূদিত আছে। নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ দেওয়া গেল।

"খাঁজাহানকে দিল্লীতে প্রতিনিধি রাখিয়া, ফিরোজশাহ ৭০০০০ সৈন্য লইয়া লক্ষ্মণাবতী-বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। বাঙ্গালার সীমায় পৌঁছিয়া দেখিলেন, কুশী নদীর অপর তীরে গঙ্গার সহিত ইহার সঙ্গমের অল্প দূরে, ইলিয়াস সৈন্য সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছে। এইখানে নদী পার হওয়া কঠিন দেখিয়া, সুলতান কুশীর পারে-পারে ১০০ ক্রোশ উত্তরে চলিয়া গেলেন; এবং যেখানে কুশী পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়াছে, সেখানে, চম্পারণের নীচে, কুশী পার হইলেন। এইখানে খুঁজিয়া অল্পজলবিশিষ্ট একটি স্থান মিলিয়াছিল; কিন্তু সেখানে জলের বেগ এত বেশী যে, ৫০০ মণ ওজনের পাথর সকল খড়ের মত ভাসাইয়া লইতেছিল। সুলতানের আদেশে সেই অল্পজলবিশিষ্ট স্থানটির উপরে ও নীচে এক-এক সারি হাতী দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। উপরের সারি স্রোতের বেগ মন্দীভূত করিবে; এবং নীচের সারির হাতীগুলির পায়ে লম্বা-লম্বা দড়ি বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যেন স্রোতের বেগে যাহারা ভাসিয়া যাইবে, তাহারা সেই দড়ি ধরিয়া পারে উঠিতে পারে।*

শামসুদ্দিন ইলিয়াস যখন শুনিল যে, সুলতান কুশী পার হইয়াছেন, তখন সে পাণ্ডুয়া শূন্য করিয়া, তাহার সমস্ত সৈন্য-সামন্ত লইয়া একডালায় পলাইয়া গেল। সুলতান তথায়

---

* কুশী বা কৌশিকী নদী পূর্ণিয়া জেলায়; ভাগলপুর হইতে প্রায় ২০ মাইল পূর্ব্বে লালগোলায় ইহা গঙ্গায় পড়িয়াছে। এই সঙ্গম-স্থানে গঙ্গা প্রায় ৭ মাইল প্রশস্ত। এই সঙ্গম-স্থানের প্রায় ১২৫ মাইল সোজা উত্তরে কুশী পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়াছে। গঙ্গা-কুশী সঙ্গমে সম্রাট্‌কে বাধা প্রদান করায় সেনাপতিত্বে ইলিয়াসের কিরূপ নিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা, শত বর্ষ পূর্ব্বে বুকামন হ্যামিল্টন কুশীর যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে;—

"The Kosi descends from the lower hills of the northern mountains by three cataracts or rather violent rapids; for I learn from undoubted authority that canoes can shoot through at least the lower cataract which is nearly 40 British miles north and between three and four miles east from Nathpoor, (নাথপুর কুশী-গঙ্গা-সঙ্গম হইতে ৭০ মাইল উত্তরে। লেখক) Below this, the breadth of Kosi is said to be fully a mile...... It comes to the Company's boundary 20 miles north of Nathpoor about two miles in width and filled with sands and islands. From the cataract to the Company's boundary, the river is said to be very rapid and its channel is filled with rocks and large stones and is nowhere fordable. The Kosi continues for about 18 miles to form the boundary between the Company and the Raja of Gorkha......Its course is more gentle and is free from rocks or large stone, but it is nowhere fordable. The channel is about two miles in width and in the rainy season is filled from bank to bank......In ordinary years, the river is nowhere fordable.

"From this account it will appear that where both rivers come from the mountains, the Kosi is a more considerable stream than the Ganges as this river is every year forded in several places between Hardwar and Prayag."

Hamilton and Martin's Eastern India,

Vol. III P. 10—11.

তাহাকে অবরুদ্ধ করিলেন। ইলিয়াসের সৈন্য প্রত্যহ একডালা হইতে যুদ্ধোদ্যমে বাহির হইত; এবং সুলতানের সৈন্যগণ অজস্র বাণবর্ষণ করিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিত। এইরূপে কিছুদিন বিবাদ চলিলে পর বর্ষা আসিয়া পড়িল; সূর্য্যের কর্কটরাশিতে প্রবেশ করিবার সময় হইল। (অর্থাৎ শ্রাবণ মাস আসিয়া পড়িল।) সুলতান গুপ্ত সামরিক-সভা আহ্বান করিলেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর এই সিদ্ধান্ত হইল যে, বর্ষায় সুলতান অবরোধ উঠাইয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন, এই আশায় ইলিয়াস একডালায় আশ্রয় লইয়াছে। এই অবস্থায় সুপরামর্শ এই যে, কৌশলে কয়েক ক্রোশ হঠিয়া গিয়া দেখা যাউক, কি অবস্থা দাঁড়ায়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাই পরদিন সুলতান দিল্লীর দিকে ৭ ক্রোশ হঠিয়া গেলেন। কয়েকটি ফকিরকে এই উপদেশ দিয়া একডালায় পাঠান হইল যে, ধরা পড়িলে যেন তাহারা বলে যে, সুলতান দ্রুতগতিতে দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। ফকিরগণ ধরা পড়িয়া তাহাই বলিল; এবং ইলিয়াস ইহা বিশ্বাস করিয়া, সম্রাটের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে বিঘ্ন জন্মাইতে মনস্থ করিল।

তদনুসারে ইলিয়াস ১০০০০ অশ্বারোহী এবং ২০০০০০ পদাতিক ও ৫০টি হস্তী লইয়া সুলতানের পশ্চাদ্ধাবন করিল। ফিরোজশাহ কুচ করিয়া ৭ ক্রোশ গিয়াছিলেন; এবং যেখানে তিনি ইলিয়াসের অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেখানে নদীতীরে একটি স্বল্প জলবিশিষ্ট যায়গায় তাঁহার রসদ, তাম্বু, ইত্যাদি নদী পার হইতেছিল। সহসা অপ্রত্যাশিত রূপে ইলিয়াস আসিয়া সম্রাট্-সৈন্যের উপর পড়িল। সুলতান যখন শুনিলেন যে, ইলিয়াস আসিয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি নিজ সেনাদলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক এক ভাগে ৩০০০০ সৈন্য। দক্ষিণ ভাগের সেনাপতি মালিক দীলানের অধীনে ৩০০০০ অশ্বারোহী। বাম দিকে মালিক হিসাম নবার অধীনে ৩০০০০ পদাতিক। মধ্যে তাতার খাঁর অধীনে ৩০০০০ পদাতিক। সুলতান নিজে একভাগ হইতে অন্য ভাগে যাইয়া-যাইয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ইলিয়াস সম্রাটের সৈন্যসজ্জা দেখিয়াই বুঝিতে পারিল যে, সে ফকিরগণের মিথ্যা কথায় প্রতারিত হইয়াছে।

যাহা হউক, যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হিসামউদ্দিনের বাম ভাগে প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হইল; এবং পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। মালিক দীলানের দক্ষিণ ভাগেও ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পরে শামসুদ্দিন নিজ রাজধানীর দিকে হটিয়া যাইতে লাগিল। সুলতানের মধ্য-ভাগের সেনাপতি তাতার খাঁ বাম ও দক্ষিণ ভাগ হইতে

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পুর্ণিয়া জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ ভেদ করিয়া, ত্রিহুত হইতে নেপালের সীমান্ত পর্য্যন্ত কুশীর পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড এক মৃৎপ্রাকার বর্ত্তমান আছে। পুর্ণিয়া জেলায়ই তাহার ২০ মাইল পড়িয়াছে। কেহ যেন উপরাংশে, যেখানে কুশীর শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে, সেই দিকটা শত্রুর অভেদ্য করিবার জন্য বিপুল প্রয়াসে এই মৃৎপ্রাকার নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। হ্যামিল্টন বলেন, এই মৃৎপ্রাকার সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই; শেষ দুই এক মাইল দেখিয়া মনে হয়, কাজ শেষ হইবার পূর্ব্বেই যেন মজুরগণ কাজ ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছিল।

"There is a line of fortifications which extends due north from the source of the Daus river to the hills... ...This line had evidently been intended to form a frontier towards the west and had undoubtedly been abandoned in the process of building.......The lines are said to extend to the hills. The works were never completed and have the appearance of being suddenly deserted. Eastern India, III. P. 45. আবার —"The most remarkable antiquity is the line of fortifications running through the north-west corner of the district for about [illegible] miles. It is called Majuurnikhat (মজুর-নিখাত) or dug by hired men .....I traced it from the boundary of the Gorkha to Tirhoot at which it terminates; but all natives agree that it reaches Tiljuga, a river which comes from the west to join Kosi.......Where the Majurnikhata enters the company's territories, it is a very high and broad rampart of earth with a ditch on its west side. The counter-scarp is wide but at the distance of every bowshot has been strengthened by square projections reaching the edge of the ditch. For the last miles, it consists merely of a few irregular heaps clustered together apparently as if the workmen had just deserted it." P. 56.

বাঙ্গালায় যেমন প্রাচীন কীর্ত্তি মাত্রেই জনপ্রবাদে বল্লাল সেনের, মিথিলায় লক্ষ্মণ সেন তেমনি জনপ্রিয়; এবং এই মজুর-নিখাত জনপ্রবাদ অনুসারে লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। কে বলিতে পারে, ইহা ফিরোজ-শাহকে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে ইলিয়াস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কি না!

সাহায্য লইয়া পশ্চাদ্ধাবন করিল। শামসুদ্দিন ইলিয়াস পাণ্ডুয়ায় না থামিয়া, একডালায় গিয়া আশ্রয় লইল। ৪৮টি হাতী ধরা পড়িল। বাঙ্গালার সুলতানের সৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল, সে সাতজন মাত্র সৈন্য লইয়া একডালায় পলাইয়া গেল। বহু চেষ্টায় দুর্গাধ্যক্ষ দুর্গের দরজা বন্ধ করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু সুলতানের সৈন্য সহর দখল করিল। সুলতানের আগমন ঘোষিত হইলে, ভদ্র-মহিলাগণ তাঁহাকে দেখিয়া, দুর্গের ছাদে গিয়া নিজ-নিজ অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া, নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিল। সুলতান তাহা দেখিয়া চিন্তা করিলেন,—আমি সহর দখল করিয়াছি; বহু মুসলমান পরাজিত করিয়াছি; রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে; আমার নামে খুৎবা পঠিত হইতেছে। এখন আবার দুর্গ দখল করিয়া বহু মুসলমান হত্যা করিলে, এবং ভদ্র-মহিলাগণের লাঞ্ছনার কারণ হইলে, শেষ বিচারের দিনে জবাব দিবার আমার কিছুই থাকিবে না। তাতার খাঁ বারবার সুলতানকে বিজিত দেশের দখল ছাড়িতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু বাঙ্গালা জলা-দেশ বলিয়া সুলতানের তাহাতে মত হইল না। তিনি শুধু একডালার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া আজাদপুর করিলেন।

সুলতান দিল্লীতে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলে, তাঁহার সৈন্যগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল। মৃত বাঙ্গালীদের মস্তক সংগ্রহের জন্য ঘোষণা প্রচার করা হইয়াছিল; এবং এক-এক মস্তকের জন্য এক-এক তঙ্কা পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। মস্তক গণনা হইলে দেখা গেল যে, ১৮০০০০-এরও অধিক হইয়াছে; কারণ, প্রায় সাতক্রোশ-ব্যাপী স্থানে সমস্ত দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল।

নৌকায় কুশী পার হইয়া সম্রাট্ ১১মাস পরে দিল্লীতে পৌঁছিলেন। শামসুদ্দিন একডালায় প্রবেশ করিয়া, যে দুর্গাধ্যক্ষ দুর্গের দরজা বন্ধ করিয়াছিল, তাহাকে হত্যা করিয়াছিল।

৩। ইয়াহিয়া-বিন্-আহ্‌ম্মদ প্রণীত তারিখ-ই-মুবারকশাহী।

তুঘ্‌লক্ বংশের পরবর্ত্তী সৈয়দ-বংশীয় মুবারক শাহের আমলে (৮২৪—৮৩৭ হিঃ—খৃঃ ১৪২১—১৪৩৩) এই ইতিহাস লিখিত হয়। সৈয়দ বংশের ইতিহাসের জন্য এই পুস্তকই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। ফিরোজশাহের সিংহাসনে অধিরোহণকাল পর্য্যন্ত ইতিহাস ইয়াহিয়া অন্যের পুঁথি হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন। পরে বিশ্বাসযোগ্য সমাচার ও নিজ চোখে দেখা ঘটনা অবলম্বন করিয়া ইতিহাস লিখিয়াছেন। ফিরিস্তা, বাদাওনী এবং তবকৃৎ-ই-আকবরীর গ্রন্থকার নিজামুদ্দিন এই পুস্তকের নিকট বিশেষ ঋণ স্বীকার করিয়াছেন; বিশেষতঃ নিজামুদ্দিন। ফিরোজশাহের ১ম লক্ষ্মণাবতী অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র এই পুস্তকে আছে। নিম্নে ইলিয়াটের অনুবাদ হইতে (Dawson and Elliott, vol. IV, page 7-8.) তাহার মর্ম্মানুবাদ দেওয়া হইল।

"খান ই-জোহানকে রাজ্যের ভার দিয়া রাজধানীতে রাখিয়া ফিরোজশাহ সৈন্য-সামন্ত সহকারে লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিতে চলিলেন। ২৮শে রবি অল্-আওয়াল তারিখে তিনি একডালা পৌঁছিলেন; এবং খুব খানিক যুদ্ধ হইল। বাঙ্গালীরা পরাজিত হইল এবং অনেকে হত হইল। সহদেও নামে তাহাদের সেনাপতিও মারা পড়িলেন।

এই মাসের ২৯ তারিখে সম্রাট-বাহিনী ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, গঙ্গার তীরে আসিয়া ছাউনী ফেলিল। রবি-অল্-আখির মাসের ৫ তারিখে ইলিয়াস তাহার অসংখ্য বাঙ্গালী সৈন্য ও অনুচর লইয়া একডালা হইতে বহির্গত হইল। সুলতান তাহাকে যুদ্ধ দিবার জন্য সৈন্য-সজ্জা করিলেন। ইলিয়াস তাঁহার সাজ দেখিয়াই ভীত হইয়া পলাইয়া গেল। সুলতানের সেনাগণ আক্রমণ করিল। ইলিয়াসের ৪০টি হাতী ও রাজছত্র ধরা পড়িল; বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক হত হইল। দুইদিন সুলতান ছাউনী ফেলিয়া রহিলেন। তৃতীয় দিনে তিনি দিল্লী অভিমুখে রওনা হইলেন।"

৪। নিজামুদ্দিন আহাম্মদ বক্‌সী প্রণীত তবকাত্-ই-আকবরী।

ইনি আকবরের গুজরাট সুবার বক্সী ছিলেন। ইঁহার লিখিত ইতিহাস খুব প্রামাণিক। ১০০৩ হিজরিতে তিনি পরলোকে গমন করেন। ১০০৩ হিঃ = ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দ। ইঁহার লিখিত বিবরণ হইতে, ফিরোজশাহের প্রথম লক্ষ্মণাবতী অভিযানের নিম্নলিখিত ঘটনা-পারম্পর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১০ই শাওয়াল, ৭৫৪ হিঃ—ফিরোজশাহ দিল্লী হইতে রওনা হইলেন।

৭ই রবি-অল্-আওল—৭৫৫ হিঃ—ফিরোজশাহ একডালায় পৌছিলেন। (কাজেই তিনি পাঁচ মাসে একডালা আসিয়াছিলেন।)

২৯শে রবি-অল্-আওল। ৭৫৫ হিঃ—ফিরোজশাহ প্রত্যাবর্ত্তনের ভাণ করেন।

৫ই রবি-অল্-আখির—৭৫৫ হিঃ। ইলিয়াস ফিরোজশাহকে অক্রেমণ করেন।

৭ই রবি-অল্-আখির ৭৫৫ হিঃ। ফিরোজশাহ গৌড়ের বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করেন।

২৭শে রবি-অল-আখির। ইলিয়াস ও ফিরোজশাহের সন্ধি। ফিরোজশাহের দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ।

১২ই শাবন—৭৫৫ হিঃ। ফিরোজশাহের দিল্লী প্রবেশ। (কাজেই তিনি সাড়ে তিনমাসে দিল্লী ফিরিয়াছিলেন)।

৫। মোল্লা আবদুল কাদের বাদায়ুনী প্রণীত মুস্তাখাবুৎ তাওরিখ্ বা তারিখ-ই বাদায়ুনী।

ইনি তবকৎ-ই-আক্‌বরী প্রণেতা নিজামুদ্দিনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ইনি গোড়া মুসলমান ছিলেন; এবং আকবর ও তাঁহার সহচরবর্গের (তাঁহার মতে) স্বেচ্ছাচারিতার সুতীব্র সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত ইতিহাস আকবর বাঁচিয়া থাকিতে বাহির করা হয় নাই। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের মধ্যভাগে ইহা সর্ব্ব-সাধারণ্যে বাহির করা হইয়াছিল; এবং বাদায়ুনীর পুত্রগণ সম্রাটের বিরাগ-ভাজন হইয়াছিল। বস্তুতঃ, এমন ঝালে-লবণে-কটকটে ইতিহাস মুসলমান যুগের আর একখানাও নাই। ইহার অতিরিক্ত গোড়ামী সত্ত্বেও, ঝাঁঝাল লেখার গুণে তারিখ-ই-বাদায়ুনী একান্ত উপভোগ্য। ১০০৪ হিজরিতে বাদায়ুনী তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। তবকৎ-ই-আকবরীর গ্রন্থকারের উপর বাদায়ুনীর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। এমন কি, প্রথমাংশে তিনি তবকৎ-ই-আকবরী-ই সংক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। নিম্নে তৎপ্রদত্ত ফিরোজশাহের প্রথম লক্ষ্মণাবতী-অভিযানের বিবরণের অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"৭৫৪ হিজরির শেষভাগে সুলতান হাজি ইলিয়াসের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য লক্ষ্মণাবতী রওনা হইলেন। ইলিয়াস শামসুদ্দিন উপাধি ধারণ করিয়াছিল। সে একডালা দুর্গে আশ্রয় লইল। বাঙ্গালাদেশে একডালার মত দুর্ভেদ্য দুর্গ আর ছিল না। ইলিয়াস কিছুকাল উদ্যমহীনের মত যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিল। পরে তাহার হাতী, যুদ্ধের উপকরণ, সৈন্য-সামন্ত হাওয়ায় ভাসাইয়া দিল; এবং তাহার সমস্ত সুলতানের হাতে পড়িল। বর্ষা আগত দেখিয়া, সুলতান তাহার সহিত সন্ধি করিয়া, দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।"

(বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত বাদায়ুনীর ইংরেজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।)

৬। মুহম্মদ কাশিম হিন্দু-শাহ্ ফিরিস্তা প্রণীত তারিখ-ই-ফিরিস্তা।

বিজাপুর রাজ ইব্রাহিম আদিলশাহের আশ্রয়ে থাকিয়া ফিরিস্তা তাঁহার ইতিহাস রচনা করেন। আদিলশাহ তাঁহাকে বলেন যে, নিজামুদ্দিনের তবকৎ-ই-আকবরী ভিন্ন ভারতবর্ষের কোন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস নাই; এবং ঐ পুস্তকেও দাক্ষিণাত্যের বিবরণ খুব সংক্ষিপ্ত। তিনি ফিরিস্তাকে এই অভাব পূরণ করিতে আদেশ করেন; এবং এই শ্রেণীর পুস্তকের দুইটি মারাত্মক দোষ,—অযথা প্রশংসা ও সত্য-গোপন—সম্পূর্ণ এড়াইয়া পুস্তক লিখিতে বলেন। ফিরিস্তা তদনুসারে তাঁহার অমর গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৬১২ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে পরলোকে গমন করেন। ব্রিগ্ সাহেব তাঁহার সম্পূর্ণ পুস্তক ইংরেজীতে অনূদিত করিয়াছেন। Dawson and Elliott সম্পাদিত History of India by its own Historians পুস্তকের ৬ষ্ঠ খণ্ডে ২২৪-২২৫ পৃষ্ঠায় ফিরিস্তার কোন সম্পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ হইতে ফিরোজশাহের প্রথম লক্ষ্মণাবতী-অভিযানের বিবরণ অনূদিত আছে। নিম্নে তাহারই অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"৭৫৪ হিজরিতে শাওল মাসে খাঁ জাহানকে অসীম ক্ষমতা দিয়া দিল্লীতে প্রতিনিধি রাখিয়া, বহু সৈন্য লইয়া সুলতান হাজি ইলিয়াসকে দমন করিবার জন্য লক্ষ্মণাবতীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ইলিয়াস রাজসম্মান ও শামসুদ্দিন উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজ সৈন্যের সহায়তায় বাঙ্গালা ও বিহার সম্পূর্ণ দখল করিয়াছিল; এবং বারাণসী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। সুলতান গোরখ্‌পুর পৌছিলে উদয়সিংহ ও গোরক্ষপুরের রাজা নানা উপঢৌকন দিয়া সুলতানের প্রসন্নতা লাভ করিল; এবং সুলতানের সহিত লক্ষ্মণাবতী চলিল। সুলতান বাঙ্গালার রাজধানী পাণ্ডুয়া দখল

করিলেন এবং ইলিয়াস একডালায় আশ্রয় লইল। একডালার একধারে জল এবং একধারে জঙ্গল; এবং ইহা অত্যন্ত দুর্ভেদ্য। সুলতান পাণ্ডুয়ার অধিবাসিগণকে উত্যক্ত না করিয়া একডালার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং ৭ই রবি-অল-আউল তথায় পৌঁছিলেন। সেইদিনই এক যুদ্ধ হইল; কিন্তু ইলিয়াস একডালার চতুর্দ্দিকে এমনি আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিল যে, সুলতান একডালা অবরোধ করিতে বাধ্য হইলেন। ২০ দিন পর্য্যন্ত অবরোধ চলিল। অবশেষে ৫ই রবি-অল-আখির তারিখে ছাউনী অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় সুলতান স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া গঙ্গাতীরে ছাউনী স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে স্থান অনুসন্ধানে চলিলেন। ইলিয়াস মনে করিল যে, সম্রাট্ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তাই সে একডালা ছাড়িয়া যুদ্ধ দিতে বাহির হইল। কিন্তু যেই সে দেখিল যে, সম্রাট্ তাহাকে আক্রমণের জন্য উদ্যত, অমনি সে হটিয়া আসিল; কিন্তু এমনি তাড়াতাড়ি এবং গোলমালের মধ্যে হটিতে হইল যে, ৪৪টি হাতী, অনেক পতাকা, রাজছত্র-দণ্ডাদি রাজচিহ্ন সম্রাটের হাতে পড়িল। অনেক পদাতিক হত হইল এবং অনেক বন্দী হইল। পরদিন যুদ্ধক্ষেত্রে সম্রাটের ছাউনী পড়িল; এবং সম্রাট্ আদেশ দিলেন যে, লক্ষ্মণাবতীর বন্দিগণকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিছুদিন পরেই বিষম বিক্রমে বর্ষাকাল আসিয়া পড়িল,—বাঙ্গালাদেশে যেমন চিরদিনই আসে। সুলতান ভাবিলেন যে, যখন তিনি একটি জয়লাভ করিয়াছেন এবং ইলিয়াসের রাজচিহ্নাদি সমস্ত হস্তগত করিয়াছেন, তখন তিনি এখন ফিরিয়া যাইবেন; এবং আগামী বৎসর আবার আসিবেন। এইরূপে সম্রাট্ নিজ উদ্দেশ্য-সাধন না করিয়াই দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

* * * ৭৫৫ হিজরির জিলহিজ্জা মাসে শামসুদ্দিন শাহ উপাধিধারী হাজি ইলিয়াসের নিকট হইতে নূতন সন্ধির প্রস্তাব লইয়া, এবং অনেক দুষ্প্রাপ্য এবং মহার্ঘ উপঢৌকন লইয়া দূত আসিল। এবং সুলতান সন্ধিতে সম্মত হইয়া বহু মান সহকারে ইলিয়াসের দূতগণকে বিদায় দিলেন।"

৭। গোলাম হোসেন প্রণীত রিয়াজ-উস্-সালাতিন।

গোলাম হোসেন মালদহের ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ জর্জ উড্‌নি সাহেবের ডাক-মুন্সী ছিলেন। উড্‌নি সাহেবের অনুরোধে তিনি ১৭৮৬—১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনা করেন। বাঙ্গালার মুসলমান আমলের সম্পূর্ণ ইতিহাস মাত্র এই রিয়াজ-উস্-সালাতিনেই পাওয়া যায়। কোন্-কোন্ পুস্তক অবলম্বন করিয়া তিনি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, গোলাম হোসেন তাহার উল্লেখ করেন নাই। ফিরোজ-শাহের ১ম লক্ষ্মণাবতী-অভিযান সম্বন্ধে গোলাম হোসেনের পুস্তকে বিশেষ কোন নূতন কথা নাই। তাহার বিবরণের মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"৭৫৪ হিজরিতে সম্রাট্ লক্ষ্মণাবতী অভিযানে বাহির হইলেন। ইলিয়াস নিজ পুত্রকে পাণ্ডুয়ায় রাখিয়া, নিজে এক-ডালায় আশ্রয় লইলেন। সম্রাট্ পাণ্ডুয়ার অধিবাসিগণের উপর কোন অত্যাচার না করিয়া, ইলিয়াসের পুত্রকে যুদ্ধে বন্দী করিলেন; এবং একডালা অবরোধ করিলেন। প্রথম দিনে একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। তাহার পর ২২দিন পর্য্যন্ত একডালা অবরোধ করিয়া রহিলেন। ইহাতে বিফল-মনোরথ হইয়া, তিনি গঙ্গার পারে নিজ শিবির সরাইয়া লইতে মনস্থ করিলেন। সুলতান শামসুদ্দিন মনে করিলেন, ফিরোজ শাহ বুঝি প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তিনি সৈন্য লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। উভয় পক্ষে অনেক হত ও আহত হইলে, জয়লক্ষ্মী ফিরোজশাহের দিকে ঢলিয়া পড়িলেন। ইলিয়াসের ৪৪টি হাতী ও রাজ-চিহ্ন সম্রাট্-সৈন্যের হস্তগত হইল। ইলিয়াস আবার এক-ডালায় যাইয়া আশ্রয় লইল। সম্রাট্ আবার তাহাকে অবরুদ্ধ করিলেন। এই অবরোধের সময় সেখ রাজা বিয়াবাণীর মৃত্যু হইল। ইলিয়াস ইঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি গোপনে একডালা হইতে ফকিরের বেশে এই সাধুর প্রেতকৃত্যে যোগদান করিয়া, ঐ বেশেই ফিরোজশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পুনরায় দুর্গে প্রবেশ করিলেন। ফিরোজশাহ ইলিয়াসকে চিনিতে পারেন নাই। অবশেষে বর্ষা আসিয়া পড়িল; এবং ফিরোজশাহ সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। শাম-সুদ্দিনও অবরোধে বিশেষ অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন; তাই অংশতঃ বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং সন্ধি হইল। সুলতান লক্ষ্মণাবতীর বন্দিদিগকে ও ইলিয়াসের পুত্রকে মুক্তি দিলেন এবং দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন। ৭৫৫ হিজরিতে ইলিয়াস দিল্লীতে নানা উপঢৌকন সহ দূত পাঠাইলেন। তাহারা সম্মানিত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

ফিরোজশাহের ১ম লক্ষ্মণাবতী-অভিযানের বিবরণ যে-যে ইতিহাসে আমি যেমন পাইয়াছি, উপরে দিলাম। ইতিহাস-গুলি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া, তুলনার সমালোচনা দ্বারা এই অভিযানের সঠিক ইতিহাস সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিব। প্রথম জিয়া-বার্ণি। ফিরোজশাহ ৭৫২ হিজরিতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। লক্ষ্মণাবতী-অভিযান ৭৫৪এর শেষে এবং ৭৫৫এর ৮ মাস ব্যাপিয়া হয়। জিয়া-বার্ণি ফিরোজশাহের প্রথম ছয় বৎসর রাজত্বের মাত্র ইতিহাস লিখেন। কাজেই ৭৫৭ পর্য্যন্তের ঘটনা তাঁহার পুস্তকে আছে। এই হিসাবে দেখা যায় যে, অভিযানের দুই বৎসরের মধ্যে জিয়া-বার্ণি তাঁহার বিবরণ লিখিয়াছিলেন। কাজেই জিয়া-বার্ণির বিবরণই সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য হইত, যদি উহার একটি মারাত্মক দোষ না থাকিত। বার্ণির বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; আর সুলতানের এমনি অযথা প্রশংসা ও অগৌরবজনক সত্য-গোপনে ভরা যে, পড়িয়া বিরক্তি ধরিয়া যায়। পরবর্ত্তী ইতিহাসকার আফিফের বিবরণ সমস্ত বিবরণের মধ্যে পূর্ণতম; কিন্তু সত্য-গোপনের হাত তিনিও এড়াইতে পারেন নাই; পারা অসম্ভবও ছিল; কারণ, সর্ব্বদা ফিরোজশাহের চোখের সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার অগৌরবজনক কোন কথা স্বীয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে, তাঁহাকে অতিমানুষ বলা যাইত। পরবর্ত্তী গ্রন্থকার ইয়াহিয়ার বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। নিজামুদ্দিন তাঁহার বিবরণে এত তারিখ কোথায় পাইলেন, বুঝা যাইতেছে না। বোধ হইতেছে, পূর্ব্ববর্ত্তী তিনখানি ইতিহাস ভিন্ন তিনি অন্য পুস্তকও (যাহা আমরা পাই নাই) দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বাদায়ুনীর বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ফিরিস্তা নিরপেক্ষ ভাবে সত্য বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গোলাম হোসেন ইলিয়াসের পুত্রের বন্দিত্ব ও রাজা বিয়াবানির প্রেতকৃত্যে ইলিয়াসের যোগদান, এই দুইটি নূতন কথা বলিয়াছেন। অন্যথা তাঁহার বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তীদের বিবরণের সঙ্কলন মাত্র।

এখন ফিরোজশাহের ১ম লক্ষ্মণাবতী অভিযানের একটি সত্যানুযায়ী বিবরণ সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করা যাউক।

১। ফিরোজশাহের যাত্রা।

৭৫৪ হিজরির ১০ই শাওয়াল তারিখে ফিরোজশাহ যাত্রা করেন। তিনি গঙ্গার উত্তর তীরবর্ত্তী পথ দিয়া পাণ্ডুয়া অভিমুখে আসিতেছিলেন। অযোধ্যায় পৌছিয়া সরযূ পার হইলে ইলিয়াস ত্রিহুতে হঠিয়া গেল (বার্ণি)। সম্রাট্ গোরক্ষপুর ও ত্রিহুত অতিক্রম করিয়া কুশী নদীর তীরে আসিয়া দেখিলেন, কুশীর অপর পারে কুশী-গঙ্গা সঙ্গমের নিকট ইলিয়াস সসৈন্যে তাঁহার নদী উত্তরণে বাধা দিবার জন্য সজ্জিত আছে। এখান হইতে পাণ্ডুয়া ৪৫ মাইল মাত্র দূর; কিন্তু পূর্ব্বে উদ্ধৃত কুশীর বর্ণনা হইতেই দেখা গিয়াছে যে, বাড়ীর এত কাছে হঠিয়া আসিয়া বাধা দিবার কারণ কি। সুলতান এই বাধার সম্মুখে কুশী পার হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া, কুশীর তীরে-তীরে উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া, পারের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে হিমালয়ের পাদমূলে, যেখানে কুশী পর্ব্বত হইতে নামিয়াছে, সেখানে যাইয়া স্বল্পজলবিশিষ্ট স্থান পাইয়া সুলতান কুশী পার হইলেন। এখানে কুশীর জলের অত্যন্ত বেগ ছিল; এবং নানা ফিকির করিয়া সুলতানকে কুশী পার হইতে হইয়াছিল। এখানে ইলিয়াস সুলতানকে আক্রমণ করিলে নিশ্চয় তাঁহাকে বিপন্ন করিতে পারিত। ইলিয়াসেরই হউক, অথবা সুলতানের উত্তরণে বাধা দিবার ভার প্রাপ্ত ইলিয়াসের সেনাপতিরই হউক,—অনবধানতায় সুলতান নিরাপদে কুশী উত্তীর্ণ হইলেন। তাহার পরে আর পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত রাস্তায় কোন বাধা নাই।

২। পাণ্ডুয়া দখল ও একডালা অবরোধ।

ফিরোজশাহের কুশী উত্তীর্ণ হইবার সংবাদ পাইয়া, ইলিয়াস পাণ্ডুয়া শূন্য করিয়া সমস্ত লোকজন সৈন্য-সামন্ত লইয়া, একডালা দুর্গে যাইয়া আশ্রয় লইল।

ফিরোজশাহ পাণ্ডুয়া দখল করিলেন। পাণ্ডুয়া প্রায় জনশূন্য অবস্থায়ই ছিল; অবশিষ্ট অধিবাসিবর্গের প্রতি অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়া তিনি ফারমান জারি করিলেন। রিয়াজের মতে ইলিয়াসের পুত্র পাণ্ডুয়ায় বন্দী হইয়াছিল। পুত্রকে বাঘের মুখে জনশূন্য পাণ্ডুয়ায় রাখিয়া, ইলিয়াস নিজে যাইয়া একডালায় আশ্রয় লইবেন, ইহা বিশেষ সম্ভবপর মনে হয় না।

পাণ্ডুয়া দখল করিয়া সুলতান ৭ই রবি-অল-আওল একডালার সম্মুখে আসিয়া ছাউনী ফেলিলেন। সেই দিনই এক যুদ্ধ হইল; এবং ইলিয়াসের অন্যতম সেনাপতি সহদেব মারা পড়িলেন। কিন্তু কোন মীমাংসা না হওয়ায়, ফিরোজ-

শাহ মধ্যবর্ত্তী নদী পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তারিখ-ই-মুবারকশাহীতে এই তারিখ ২৮শে রবি-অল-আউল বলিয়া লিখিত আছে। ইহা স্পষ্টই ভুল। তিনি এইরূপে ২২দিন (নিজামুদ্দিন, গোলামহোসেন। ফিরিস্তা, ২০দিন) একডালা অবরোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। প্রত্যেক দিন (বোধ হয় সুলতানের সেনা পার হইবার চেষ্টা করিলে) ইলিয়াসের সেনা একডালা হইতে বাহির হইয়া আসিত; এবং উভয় পক্ষে ঘোর বাণবর্ষণ হইত।

৩। একডালার অবস্থান।

একডালার অবস্থান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সূত্র কয়টি বিবেচ্য।

ক। একডালা অত্যন্ত দুর্ভেদ্য ছিল।

খ। ইহা পাণ্ডুয়ার নিকটে অবস্থিত।

গ। বর্ণনা দেখিয়া মনে হয়, একডালা পাণ্ডুয়ার আট-দশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ফিরোজশাহ একডালা হইতে ৭ ক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে যাইয়া ছাউনী ফেলিলেন। মধ্যে কোন নদী পার হইতে হইল না। যে নদীতীরে ছাউনী ফেলিলেন, তাহাতে জল এত অল্প ছিল যে, সৈন্যগণ হাঁটিয়া পার হইতেছিল। তখন শ্রাবণ-ভাদ্র মাস। কাজেই, এই নদী গঙ্গা হইতে পারে না। মালদহের ম্যাপ দেখুন। পূর্ণিয়া জেলায় যাইতে গঙ্গা পার হওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু মহানন্দা পার হওয়া আবশ্যক। পীরগঞ্জের নিকট প্রাচীন নবাবী রাস্তা মহানন্দা পার হইয়া এবং কালিন্দীর তীরে-তীরে কতকদূর গিয়া সোজা পূর্ণিয়ায় চলিয়া গিয়াছে। কাজেই বোধ হইতেছে যে, পীরগঞ্জের কাছা-কাছি কোন স্থানে সম্রাটের নূতন ছাউনী পড়িয়াছিল। ম্যাপ দেখিলেই বুঝা যাইবে, এখান হইতে দক্ষিণে বা পশ্চিমে একডালা হইতে পারে না,—উত্তরে বা পূর্ব্বে হইবে। এই স্থান ও একডালার মধ্যে পাণ্ডুয়া ছিল; কারণ, আফিফ্ লিখিয়াছেন, ইলিয়াস এইখানে যুদ্ধে হারিয়া, পাণ্ডুয়ায় না থামিয়া, একেবারে সোজা একডালায় গিয়া আশ্রয় লইল। পাণ্ডুয়া হইতে পীরগঞ্জ মাইল-চারি দূর।

ঘ। একডালার এক ধারে জল ও এক ধারে জঙ্গল ছিল। আফিফের মতে একডালা জলের মধ্যে দ্বীপাকারে শোভা পাইত। ইহা দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয়, একডালা কোন নদীতীরে ছিল না; কোন বিলের মধ্যে কোন দ্বীপের উপর অবস্থিত ছিল। পীরগঞ্জকে কেন্দ্র ধরিয়া ১৪ মাইল লম্বা একটা সূত্রের বৃত্ত আঁকিলে দেখা যাইবে যে, পীরগঞ্জের উত্তর দক্ষিণে বৃত্তের রেখায় চারিটি বিল আছে; টাঙ্গন নদীর তীরে তীরে তিনটি এবং পীরগঞ্জের উত্তরে গোবিন্দপুরের নিকট একটা। ম্যাপ হাতে করিয়া প্রাচীন স্থানের অবস্থান নির্ণয় করা নিষ্ফল। কিন্তু আমার মনে হইতেছে যে, এই চারিটি বিলের ধারে বা কাছে খুঁজিলে, একডালার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। যাঁহাদের সুযোগ আছে, খুঁজিয়া দেখিতে পারেন।

৪। ফিরোজশাহের প্রত্যাবর্ত্তন-স্থল।

অবরোধে বসিয়া বসিয়া হয়রাণ হইয়া "সম্রাট্ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, নদী পার হইয়া একডালা দখল করিলে, অনেক নির্দ্দোষ লোক মারা যাইবে···। ইলিয়াস জল ও জঙ্গল দ্বারা যেরূপ আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছে, তাহাতে হাতী ছাড়া তাহাকে জয় করিবার সুবিধা হইবে না। এই আশঙ্কা করিয়া সম্রাট্ কাতর ভাবে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, ইলিয়াস যেন বুদ্ধিভ্রমে একডালা হইতে বাহিরে আসে। এক দিন প্রাতে ফারমান বাহির হইল যে, ছাউনী অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠায়, ···ভিন্ন এক স্থানে যাইয়া সৈন্য সমাবেশ হইবে। ইলিয়াস ভাবিল···সম্রাট্-সৈন্য হটিয়া যাইতেছে এবং···একডালা হইতে বাহির হইয়া আসিল।" (বার্ণি) সম্রাট্-সৈন্য নদী পার হইতেছিল, এমন সময়—"অপ্রত্যাশিত রূপে ইলিয়াস আসিয়া সম্রাট্ সৈন্যের উপর পড়িল।" (আফিফ)

সত্যসন্ধ ফিরিস্তার বিবরণঃ—"২০ দিন পর্য্যন্ত অবরোধ চলিল। অবশেষে ৫ই রবি-অল-আখির তারিখে ছাউনী অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় সুলতান স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া গঙ্গাতীরে ছাউনী স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে চলিলেন। ইলিয়াস মনে করিল যে, সম্রাট্ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তাই সে একডালা ছাড়িয়া যুদ্ধ দিতে বাহির হইল।"

(ক) প্রত্যাবর্ত্তনের তারিখ।

বার্ণি ও আফিফের বিবরণ পড়িয়া বুঝা যায়, যে তারিখে ভোরবেলা ফিরোজশাহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই তারিখেই ইলিয়াস বাহির হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল;

এবং ইহাই সম্ভবপর ঘটনা। তারিখ-ই-মুবারক্-শাহীতে প্রথম দেখা যায়, তিনি ২৯ রবি-অল-আউল তারিখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; এবং পরের মাসের পাঁচ তারিখে ইলিয়াস তাঁহাকে আক্রমণ করে। তবকৎ-ই-আকবরীতে এই দুই তারিখই নির্ব্বিচারে গৃহীত হইয়াছে। ফিরিস্তা কিন্তু ৫ই রবি-অল্-আখিরেই প্রত্যাবর্ত্তন এবং ইলিয়াসের আক্রমণ ধরিয়াছেন। ইহাই খুব সম্ভবতঃ ঠিক তারিখ। অবরোধ-কাল তাহা হইলে ২৭—২৮ দিন হয়। তারিখ-ই-মুবারক্-শাহীর "২৮শে তিনি একডালা পৌঁছিলেন" যে ভুল, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। "২৮ দিন তিনি একডালা অবরোধ করিলেন" আদি মূলে হয় ত ইহাই ছিল।

(খ) প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ।

বার্ণি ও ফিরিস্তার মতে প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ একডালার দুর্ভেদ্যতা, বর্ষার আগমন ও ছাউনীর অস্বাস্থ্যকরতা। এই-গুলিই ঠিক কারণ বলিয়া বোধ হয়। আফিফের কালন্দর বা ফকীর সাহায্যে ইলিয়াসকে প্রতারণার গল্প পরবর্ত্তী চিন্তার ফল বলিয়া বোধ হয়। কারণ, ইলিয়াসকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া যুদ্ধ করাই যদি উদ্দেশ্য হইত, তবে সম্রাট্-সৈন্য অপ্রত্যাশিত রূপে কি করিয়া ইলিয়াস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইত? সম্রাট্ একডালা হইতে মাত্র ৭ ক্রোশ হাঁটিয়া আসিয়া, পাঁচ-ছয় দিন ইলিয়াসের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন; এবং ইলিয়াস ৫-৬ দিন চিন্তার ও সত্য নির্ণয়ের অবসর পাইয়াও ফিরোজশাহের ফাঁদে পড়িলেন, ইহা একেবারেই অসম্ভব।

আসল কথা, সম্রাট্ ভাবিয়াছিলেন, বাঙ্গালীদের তিন তুড়িতে হারাইয়া দিয়া, বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন। বহুদিন এক-ডালার সম্মুখে বসিয়া থাকিয়াও যখন কিছুই সুবিধা হইল না, পরন্তু ছাউনীতে মড়ক লাগিয়া গেল, তখন ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরিয়া চলিয়াছিলেন। এমন সময় ইলিয়াস আসিয়া লাফাইয়া ঘাড়ে পড়িল।

৪। যুদ্ধ।

ইলিয়াসের আসিবার বার্ত্তা পাইবামাত্র যে ফিরোজশাহ নিজ সৈন্য তিন ভাগ করিয়া ইলিয়াসকে ভেটিতে আসিয়া-ছিলেন, ইহাতে তাঁহার সেনাপতিত্বে সুদক্ষতা প্রকাশ পাইতেছে। প্রত্যেক ভাগে ৩০০০০ করিয়া সৈন্য ছিল, অর্থাৎ মোট ৯০০০০। যাত্রার সময় তাঁহার সৈন্য ৭০০০০ ছিল, বাকী ২০০০০ ত্রিহুত ও গোরখপুর হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। সুলতানকে বিনা বাধায় কুশী পার হইতে দেওয়ায় ইলিয়াসের প্রথম ভুল হইয়াছিল। একডালা হইতে বাহির হইবার প্রলোভন সামলাইতে না পারা তাহার দ্বিতীয় ভুল। আফিফের ইতিহাসে যুদ্ধের বিশদ বিবরণ আছে। তাহা হইতে, এবং বার্ণির পুস্তকে হইতে বুঝা যায় যে, সারাদিন ধরিয়া (অর্থাৎ প্রহরেক বেলা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) সুলতানের নূতন ছাউনী হইতে একডালা পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিয়া-ছিল। বাঙ্গালার ধানুক ও পদাতিকগণ মাত্র ১০০০০ বাঙ্গালী অশ্বারোহীর সহায়তায় ফিরোজশাহের সুশিক্ষিত ৩০০০০ অশ্বারোহীর আক্রমণ সহিতে পারিল না। তবুও প্রত্যেক পদ ভূমি যুদ্ধ করিয়া, ইলিয়াস হঠিয়া গিয়া, আবার একডালায় দুর্গাধ্যক্ষকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিল। কারণ পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না। এই অনুমান মাত্র করা যাইতে পারে যে, ইলিয়াস নিরাপদে দুর্গে প্রবেশ করা মাত্র, দুর্গাধ্যক্ষ দুর্গের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়; এবং তাহার এই কার্য্যে ইলিয়াসের হস্তিযূথ ও রাজদণ্ডাদি বাহিরেই থাকিয়া যায়, ও ফিরোজশাহের হস্তগত হয়। এই অপরাধেই বোধ হয় দুর্গাধ্যক্ষের প্রাণদণ্ড বিধান হইয়াছিল।

৫। হতাহত।

আফিফ অধ্যায়-নামে লিখিয়াছেন—"সুলতান ফিরোজ ও শামসুদ্দিনের যুদ্ধ। ৫০টি হাতী গ্রেপ্তার এবং বঙ্গ ও বাঙ্গালার একলাখ লোক হত্যা।" যুদ্ধের পরে সুলতান ঘোষণা করিলেন যে, নিহত বাঙ্গালীদের মাথা আনিলে প্রত্যেক মাথায় এক তঙ্কা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। ফিরোজশাহের সমস্ত সৈন্য মাথা কুড়াইতে লাগিল; এবং দেখা গেল যে, ১৮০০০০ মাথা সংগৃহীত হইয়াছে। তঙ্কার লোভে যে শুধু বাঙ্গালীদের মাথাই সংগৃহীত হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না; এবং সংখ্যায় অত্যুক্তিও আছে বলিয়া মনে হইতেছে। যাহা হউক, লাখ বাঙ্গালী যুদ্ধে হত হইয়া থাকিলে, এবং প্রায় সমস্ত দিন ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিয়া থাকিলে, বার্ণির কথামত সম্রাট্ পক্ষের কাহারও মাথায় চুলগাছিও কাটা যায় নাই—ইহা যে নিতান্তই শিশুসুলভ অত্যুক্তি,

ইহা সহজেই বুঝা যায়। খুব কম করিয়া ধরিলেও, সম্রাট্ পক্ষেরও ২০-২৫ হাজার লোক মারা যাওয়া সম্ভব।

৬। বিজয়-লব্ধ দ্রব্য।

প্রধান জিনিস হাতী। আফিফ বলেন, ৪৮টি হাতী ধরা পড়িয়াছিল। বার্ণি বলেন ৪৪টি; ফিরিস্তা এবং গোলাম হোসেনও বলেন ৪৪। ইয়াহিয়া বলেন ৪০। ৪৪ই ঠিক সংখ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে।

৭। যুদ্ধের পরে অবরোধ।

বার্ণি ও আফিফের বিবরণ পড়িয়া মনে হয় যে, সুলতান যুদ্ধের দুই-এক দিনের মধ্যেই দিল্লী অভিমুখে ফিরিয়াছিলেন। তারিখ-ই-মুবারকশাহীতেও আছে যে, ৫ই রবি-অল্-আখির, তারিখে যুদ্ধ হয়; এবং দুই দিন পরে ৭ই তিনি দিল্লী রওনা হন। তবকৎ-ই-আকবরীতে আছে, তিনি ২৭শে রওনা হন। এইখানে প্রাচীনতর ঐতিহাসিকগণের কথাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও ফিরোজশাহের হতাহতের সংখ্যা নিশ্চয়ই বড় কম ছিল না। তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্ত্তনই এই স্থলে স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। বার্ণির বিবরণ হইতে ফিরোজশাহের মনের ভাব বেশ বুঝা যায়:—"বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে, তাই আমাদের চেষ্টা এই হওয়া উচিত যে, আমাদের সৈন্যদল, যাহা এ পর্য্যন্ত নিরাপদে আছে, তাহা যেন নিরাপদেই বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারে। এই রকম জয়লাভের পর অতিরিক্ত করিতে যাওয়া সুপরামর্শ নহে।" আফিফ-লিখিত একডালার স্ত্রীলোকগণের ছাদে উঠিয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচনের গল্প, গল্প বলিয়াই বোধ হয়।

৮। সন্ধি ও ফলাফল।

প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের বিবরণে পরিষ্কার বুঝা যায়, যুদ্ধের পরে কোন সন্ধি হয় নাই। বর্ষা আগত দেখিয়া ফিরোজশাহ অবরোধ উঠাইয়া দ্রুত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরে তিনি দিল্লীতে পৌঁছিলে, সন্ধির প্রস্তাব লইয়া ইলিয়াসের দূত দিল্লীতে গিয়াছিল; এবং বহু অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিল। তাহারা সন্ধি করিয়া দুই রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া ফিরিয়াছিল।

ফিরোজশাহের ১ম লক্ষ্মণাবতী-অভিযান যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছিল, তাহা ফিরিস্তার তীক্ষ্ণ এবং সত্যপর দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। ফিরোজশাহ যে এই বিফলতার আক্রোশ ভুলিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার ২য় লক্ষ্মণাবতী-অভিযানের বিবরণ পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ভাঙ্গর ইলিয়াস যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন আর তিনি এই সজারুর গায়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু তাহার মৃত্যু সংবাদ পাইবামাত্র তিনি অকারণে দ্বিতীয় বার লক্ষ্মণাবতী-বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন।

ফিরোজশাহের ১ম লক্ষ্মণাবতী অভিযানের বিবরণ পড়িতে-পড়িতে বড়ই দুঃখ হয় যে, সমসাময়িক বাঙ্গালী ঐতিহাসিক লিখিত এই ঘটনার কোন ইতিহাস নাই। থাকিলে হয় ত দিল্লীর সম্রাটের সহিত বাঙ্গালী সুলতানের,—মিলিত বাঙ্গালীজাতির সঙ্ঘর্ষের এমন বিবরণ আমরা পাইতাম, যাহা পড়িতে-পড়িতে গর্ব্বে আমাদের বুক ফুলিয়া উঠিত।

পথহারা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিমলের জীবন-তরণী এম্‌নি করিয়াই খেয়াঘাটের অনেক দূরে বিপথের অভিমুখে পাড়ি দিতে-দিতে অকূলে ভাসিয়া চলিল। খেয়ালের ঝোঁকে এই যে জীবনের যাত্রা-পথকে সে নির্ব্বাচন করিয়া বসিল, এর মধ্যের জগৎটুকু তার বড় সঙ্কীর্ণ; মণ্ডুকের কূপের চাইতে বেশী বড় নয়। কলেজ সে পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিয়াছিল। অমৃতকে দূর করিয়াছে। রামদয়াল মধ্যে-মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন; তাঁর রোগ এবং মৃত্যু সে জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছে। তারার স্থান হয় ত অনেকটাই উৎপলা অধিকার করিয়া লইয়াছিল। আর বাকিটা বড় একটা আর বাকি নাই। এই সর্ব্বাপদ-শান্তির মাঝখানে

একটা আপদ এখনও চুকিতে বাকি,—সেটা দিদিমা। কিন্তু এম্‌নি অদ্ভুত ভাবেই বিমলেন্দু সেই পরিত্যক্ত জীবটাকে ভুলিয়া বসিয়াছিল যে, তাঁর কথা হঠাৎ একটি দিন যখন পাঁচ কথার সঙ্গে জড়াইয়া পড়িয়া মনে আসিল, তখন একটা সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কারের মতই যেন সে বিস্ময় বোধ করিয়া বসিল। সত্য!—দিদিমা বলিয়া একটা জিনিষ এ সংসারে এখনও আছে বটে!

কথাটা এই।—উৎপলার সখ হইয়াছে, ঘোড়ায় চড়িয়া তাহারা সদলবলে কলিকাতা হইতে একদিন কোন একটা পল্লী-ভবনে পৌঁছিয়া একটুখানি আমোদ আহ্লাদ করিয়া আসিবে। স্থান নির্ণয় আর হইয়াই উঠে না। অবশেষে উৎপলাই হঠাৎ এক সময় বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, বিমলেন্দু বাবুদের বাড়ী তো কল্‌কাতা থেকে খুব অনেক দূরে নয়; সেখানে যদি যাওয়া যায়, তাহ'লে বিমলেন্দ বাবুর কিছু আপত্তি আছে?"

বিমল প্রথম মুহূর্ত্তে ঈষৎ চম্‌কাইয়া উঠিয়াই, নিমেষ মধ্যে সে ভাব ঢাকা দিয়া ফেলিয়া, সহজ ভাবেই জবাব দিল, "আপত্তি!—কি জন্যে?"

উৎপলা কহিল, "নেই তো? তা'হলে তাই কেন চল যাওয়া যাক না?"

বিমল সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "সে তো আমার ভাগ্য! কি বলো অসমঞ্জ?"

এমন করিয়া কথা বলিতেও আর এখন বিমলের কিছুমাত্র বাধে না। অসমঞ্জও এখন আর উহার কাছে অসমঞ্জ বাবু নয়—এতই সে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। অসমঞ্জ হৃষ্ট হইয়া কহিল, "বেশ তো,—রথ দেখা এবং কলা বেচা দুইই হবে। এই উপলক্ষে আমাদেরও বিমলের বাড়াটা দেখা হবে। কে বলতে পারে যে, সুদূর অতীতের কোন একটা দিনে সেই যে ঘরখানিতে বিমলেন্দুপ্রকাশের জন্ম হয়েছিল, তারই এতটুকু মৃত্তিকাকণা মাথায় ছোঁয়াবার জন্য সহস্র-সহস্র ভক্ত বীরের মহামেলাই না হবে। সেই ক্ষুদ্র গ্রাম যে একদিন ইতিহাসের শীর্ষ-স্থানীয় হয়ে উঠবে না, তারও তো কোন প্রমাণ নেই।"

অনাগত মহাকালের মহা রহস্যের জাল-জড়িত অদৃশ্য বিরাট্ জঠর মধ্যে কি সঞ্চিত আছে কে বলিবে? তবে বর্ত্তমানে বিমলেন্দুর বহুদিন-পরিত্যক্ত গৃহের অবস্থাটা এই সব তাহার মাননীয় এবং একান্ত প্রেমাস্পদ বান্ধব-বান্ধবীবর্গের অভ্যর্থনার বেশ উপযোগী আছে কি না, সেইটাই একবার তদারক করিয়া দেখা যাক্। এই উভয় সঙ্কটের দোটানা চিন্তায় পড়িয়া বিমলেন্দুকেও ঈষৎ বিমর্ষ করিয়া তুলিয়াছিল। সেখানের সম্বন্ধে কোন কথাই যে সে বহুকাল যাবৎ ভাবিবার পর্য্যন্ত আবশ্যকতা বোধ করে নাই। সেখানে এখন কে আছে? দিদিমা এতকালের পর তাহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন! সেই তো মানুষ! ইহাদের সাম্‌নে বিশেষতঃ এই উৎপলার সাক্ষাতে, হয় ত কান্নায় ফাটাইয়া ফেলিয়া, দুখে বলিয়াই তাহাকে টানাটানি বাধাইয়া দিবেন। এই উৎপলার একে তো পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত হিন্দুনারী সম্বন্ধে যেরূপ কঠোর ধারণা আছে, অনেক তর্ক করিয়াও যে সে তাহা আজ পর্য্যন্ত ঘুচাইতে পারে নাই। আজ কি উহারই যুক্তিকে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করাইতেই সে তাহার নিজের ঘরের ছিদ্র তাহারই চোখের সামনে তুলিয়া ধরিতে সঙ্গে করিয়া উহাকে লইয়া চলিল! উৎপলার বিশ্বাস, ইংরেজী-লেখাপড়া শেখা জনকয়েক কলিকাতার মেয়ে ছাড়া আর সমস্ত বঙ্গনারীরই চিত্ত অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। কোন্দল-শাস্ত্রে উহারা প্রায় দিগ্বিজয়িনী; সভ্যতা, ভব্যতা, নম্রতা, এমন কি, শীলতারও কোন ধার উহারা ধারে না। কথা কহে উহারা হাত নাড়িয়া; গলার আওয়াজ হুগলী হইতে বর্দ্ধমানে না ছুটাইয়া ভাল কথাটাও কহিতে পারে না। শরীরে উহাদের অসুরের বল; আর সেটা মধ্যে-মধ্যে স্বামী পুত্র প্রভৃতি পরিজনবর্গের উপরেও উহারা পরীক্ষা করিতে ছাড়ে না; ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজের ঘরের কথা মনে করিয়া, এই সখের পিক্‌নিকের সকল আনন্দই বিমলের পক্ষে ঘোর নিরানন্দের কারণ হইয়া উঠিল।

কয়েকটা তেজী ঘোড়া আসিল। অধিকাংশ ভাড়া করা বা ধার করা। সখের অশ্বারোহীরা সাজ-সাজ শব্দে রব তুলিয়া যাত্রার উদ্যোগে মহা হল্লা জুড়িয়া দিল। সকলেরই খুব উৎসাহ। কেবল একা বিমলেন্দুই বিমর্ষ, ম্লান মুখে যেন শ্মশান-যাত্রীর মত নিরুদ্যম ভাবে ঘোড়ায় চড়িয়া বসিল। ইতঃপূর্ব্বে এই ঘোড়ায় চড়া লইয়াও সে উৎপলার কাছে মস্তবড় খোঁচা খাইয়াছে। ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস নাই বলিয়া, অসমঞ্জ এই দুটা দিনের চারিটি বেলায় অনেক যত্নে উহাকে অশ্বারোহণ-বিদ্যাটা শিক্ষা দিতেছিল। বিমলেরও এ সব কাজে বিশেষ

জিদ থাকায়, সেও বিদ্যাটাকে এই স্বল্পাবসর মধ্যেই যথাসম্ভব আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। তা সত্বেও মনের মধ্যে তাহার যে একটুখানি ভয়-ভয় লাগিতেছিল না, সে কথা বলা যায় না। ঘোড়ায় চড়িতে গিয়া সে জড়সড় হইতেছে দেখিয়া, অসমঞ্জ চিন্তিত হইয়া কহিল, "দেখ, পারবে তো? শেষকালে পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙ্গে এক কাণ্ড না হয়!"—

বিমলের মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইতে না হইতে উৎপলা চট্ করিয়া বলিয়া দিল, "কুচ পরোয়া নেই! হাত-পা ভেঙ্গে যায়, আমরা নার্স করবো।—আচ্ছা বেশ, আপনি আমার ঘোড়ার পাশে-পাশে আসুন বিমলেন্দুবাবু! আমি আপনাকে 'থরোলি' হেল্প করে নিয়ে যেতে পারবো।"

অসমঞ্জ বোনের পিঠ ঠুকিয়া দিয়া, সগর্বে ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "তা আমাদের সেন্টপল পারে। ওর মতন ঘোড়-সওয়ার কসাকদের মধ্যেও আছে কি না আমার সন্দেহ!"

বিমলেন্দুর মুখখানা অবমানিত লজ্জায় রক্ত জবার মতই লোহিতাভ হইয়া উঠিল।

সারা পথ বিমলেন্দুর ক্ষুব্ধ, শঙ্কিত ও লজ্জিত অন্তর শুধু একান্ত ভাবে এই কামনাটাকেই জপ করিতে করিতে আসিয়াছে যে, যেন পৌঁছিয়া সে তাহার বহুদিনের পরিত্যক্ত নিজ গৃহে তারাকে দেখিতে পায়। আরও এক-জনকে দেখিতে বা দেখাইতে পারিবার জন্যও তাহার পরাভূত, পীড়িত অন্তর ভিতরে-ভিতরে যে কতখানি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, সে কথাটা সে হঠাৎ জানিতে পারিল ঠিক যে মুহূর্ত্তে তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনী অশ্বারোহিণী সঙ্গিনী তাহাদেরই গ্রামপ্রান্তে পৌঁছিয়া এক গ্রাম্য নারীর নব-অভ্যাগতগণের প্রতি ভয়চকিত উগ্র কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি ও অর্দ্ধাবরিত বেশভূষার সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়া টীকা কাটিল "এই সব পাড়াগেঁয়ে মাগীগুলোই আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করচে। অসভ্যর শেষ; কোন হাই আইডিয়ার এরা ধারই ধারে না। মানুষ হয়ে জন্মানই এদের পক্ষে বিড়ম্বনা হয়েছে।"

অমনি বিমলের মনোদর্পণে ফুটিয়া উঠিল, তাহার বিমাতা ইন্দ্রাণীর প্রতিমূর্ত্তিখানা! তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, "পাড়াগাঁয়ের সব মেয়েরাই অমন নয়। ওদের মধ্যেও খুব উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে আছেন।" উৎপলার নবীনোদ্গত বসন্ত-পত্র-মঞ্জরীর মত ঢলঢল তরুণ মুখ পরিহাস ও অবিশ্বাসের মিশ্রিত ব্যঙ্গ-হাস্যের আভাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হুল বিঁধাইয়া দিয়া সে তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল "তাই না কি! সে বিদুষীটি কে, শুনতে পাই না, বিমলবাবু? বোধ হয় তিনি আপনার সেই অতুলনীয়া রূপসী বোন তারা।"

উৎপলার দুই চোখে একটা অস্বাভাবিক জ্বালাময়ী প্রদীপ্তি ও তাহার সমস্ত মুখখানা যেন আভ্যন্তরিক ঈর্ষার রংয়ে কালো দেখাইল। গলার স্বরেও মনের উষ্মা স্পষ্ট প্রকাশ পাওয়ায়, বিমলেন্দু কিছু আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। উহার এই অহেতুক অসন্তোষের মূল তত্বানুসন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়া, অথচ কিছু থতমত খাইয়া অপ্রতিভ ভাবেই জবাব দিল, "হাঁ, তারার কথাই বলছি।"

উৎপলার কালিমামাখা মুখ পাংশু হইয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরব ঔদাস্যে চলিতে-চলিতে যেন আপনাকে সামলাইয়া লইয়াই, নিরুত্তম ভগ্নকণ্ঠে সে কহিল, "চলুন তো, আপনার সেই রূপসী আর বিদুষী ভগ্নীকে চর্ম্মচক্ষে দেখেই আসা যাক। আপনার বোধ হয় মনে মনে খুবই বিশ্বাস আছে যে, তেমন আর কেউ হয় না, না?"

বিমলেন্দু সহসা মুখ ফিরাইয়া, বিস্ফারিত চক্ষে-সমভি-ব্যাহারিণীর মুখের পানে চাহিয়া, ঘোড়ার রাশ টানিয়া ধরিল। এটা সে নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই করিয়া থাকিবে। স্থান এবং কাল কিছুই অনুকূল নয়, অথচ কি করিয়া যে কি হইয়া গেল, সে কেবল সেই অঘটনঘটনপটীয়সী ভাগ্যদেবীই জানেন। অন্তরের নিভৃত বিজনে অত্যন্ত সন্তর্পণে যে একটা অতি গোপন বাসনা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছিল,—বুঝি তখনও সম্পূর্ণ রূপে জাগে নাই,—আধ স্বপ্নে, আধ ঘুমঘোরে বিজড়িত হইয়া অন্তরের কোন নিভৃত নিরালায় ফোটো-ফোটো হইয়া কিসের প্রতীক্ষায় ছিল,—সহসা সে যেন সেই এতটুকু একটুখানি তীক্ষ্ণগলার কণ্ঠস্বরের স্পর্শেই, সেই নারীজনোচিত ঈষৎ অভিমানভরে আধফিরানো মুখের আভা সে আজ যেন কোন বসন্তমলয়ানিল স্পর্শে সর্ব্ব দেহে-মনে অননুভূতপূর্ব্ব পুলকের তাড়িতাহত হইয়া অর্দ্ধ নিমেষের মধ্যেই বিমলের মুদিত অন্তঃকরণের মধ্যে নব-নব আশা ও আনন্দের শতদলরূপে পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত মুখ উদয়াচলের মতই লালে-লাল হইয়া গিয়া, তাহার দৃষ্টিতে নব অনুরাগের অক্ষয় অমৃতের মধুধারা

চালিয়া দিল। এক হাতে ঘোড়ার রাশটা টানিয়া ধরিয়া, আর একটা হাত তাহার অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী উৎপলার জানুর উপর স্থাপন করিয়া সে অকস্মাৎ মুগ্ধ মধুর কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল "পলা!"

অশ্বারোহীর দল অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল; নিকটে বা পশ্চাতে কেহ কোথাও নাই। পাশেই বিমলের আশৈশব-জীবনের চিরপরিচিত দত্তপুকুর, এখনও বিগত বর্ষণের জলভার বক্ষে বহিয়া নিথর হইয়া আছে। তাহার সবুজ বক্ষে বিস্তৃত শৈবালদলোপরি ফুটন্ত এবং অস্ফুট কহ্লারের দল কৌতুক-নর্ত্তনে নাচিয়া-নাচিয়া যেন উপহাসের হাসি হাসিতেছিল। মাথার উপরে শরতের স্বচ্ছ নির্ম্মল আকাশ সমুজ্জ্বল অনন্ত নীলিমা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। চারি পাশে বর্ষাজল-ধৌত শ্যামলতার অপূর্ব্ব শোভাসম্ভার। রাজধানীর কর্ম্ম-কোলাহলের বাহিরে, শান্ত বিজনে, স্নিগ্ধ বাতাসে, আকাশে সর্ব্বত্র ভরিয়াই যেন কি একটা মোহময় আনন্দময় প্রেমের পুলক বহিয়া চলিয়াছিল। স্বয়ং প্রকৃতি-রাণী যেন সেই প্রেমের পরশে পুলকাঙ্কিত শরীরে আবেশ-অলস নয়নে চাহিয়া-চাহিয়া এই দুটি নিঃসঙ্গ তরুণ-তরুণীর বিস্মৃত যৌবনকে জাগ্রত করিতে নিজের মায়াজাল বিস্তৃত করিতে চাহিতে-ছিলেন। আর তাহারই সহায় স্বরূপে সুপ্রচুর স্নিগ্ধ সেফালিকা-গন্ধ বহিয়া লইয়া কুটজ কুসুমসম্ভারে আনম্র ধনুঃ-শর ধারণ পূর্ব্বক পুষ্পধন্বা গোপনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া উহারই একটী শর সন্ধান করিলেন।

তা সেই ফুলের ধনুকের ফুলবাণটা গিয়া বিঁধিয়াছিল শুধু বিমলেন্দুরই বুকে। তাহার সুপ্ত যৌবন সহসা এই শারদ-প্রাতে, সেই শরাহত হইয়া জাগিয়া উঠিয়া, তাই প্রণয়াবেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। গভীর আবেগভরে ব্যাকুল চক্ষে চাহিয়া, সে আবার তখন কম্পিত স্বরে ডাকিল, "উৎপলা!"

বিমলের পিছনে ঘোড়ার গায়ের উপর শপাং করিয়া একটা চাবুক পড়িল। তীক্ষ্ণ উচ্চহাস্যের সহিত উৎপলা কহিল "বিমলেন্দুবাবু, সাবধান! ঘোড়ার রাশ টেনে ধরুন। মরণকে আপনার মনে-মনে যথেষ্টই ভয় আছে।"

কশাঘাতাঙ্কিত অশ্ব তড়বড় করিয়া ছুট দিল। পড়িতে-পড়িতে কোনমতে বিমলেন্দু নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল।

এই তো বিমলেন্দুদের বাড়ী! অসমঞ্জ নিজে এক লাফে নামিয়া পড়িয়া, বিমলকে নামিবার সাহায্য করিতে যাইতেই, কোথা হইতে তীব্রবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া, তড়াক করিয়া লাফাইয়া নামিয়াই, উৎপলা ব্যস্ত-ত্রস্ত ভাবে বলিয়া উঠিল "ছোড়দা, তা হবে না। বিমলেন্দুবাবুকে নাম্‌বার সাহায্য যে আমি করবো,—তুমি মাঝে থেকে আমার কাজে হাত দিতে আসচো কেন বলো তো?" এই বলিয়াই কাছে আসিয়া, হাসিহাসি মুখে অত্যন্ত সহজ ভাবেই নিজের হাত বিমলেন্দুর দিকে তাহার আশ্রয় স্বরূপে বাড়াইয়া দিল। তাহা দেখিয়া, একদিকে যেমন ঘোর বিস্ময়ে, অপর পক্ষে তেমনি অবর্ণনীয় আনন্দে বিমলেন্দুর এতক্ষণকার লজ্জা-জ্বালায় একান্ত ক্ষুব্ধ, পীড়িত এবং ঈষৎ ভীত চিত্ত যেন পরিপ্লুত হইয়া গেল। বক্ষের মধ্য হইতে যেন একটা বিশ-মণী বোঝা তাহার নামিয়া পড়িয়াছে, এম্‌নি স্বস্তির সহিত নিঃশ্বাস লইয়া, সে মনে-মনে এই ক্ষমাকে মাথায় তুলিয়া লইল, এবং আপনার কাছেই পুনঃপুনঃ শপথ করিয়া কহিল যে, অতঃপর আর কখন তাহার মধ্যে এমন দুর্ব্বলতা কোনমতেই আশ্রয় পাইবে না; জীবনের এই প্রথমোদ্গত প্রেমকে সে পায়ের তলায় ফেলিয়া দলিত করিবে। অথচ নারীর মধ্যে এতটাই নারীত্বহীনতায় সে যেন অনেকখানিই মর্ম্মাহত হইয়া গেল। এ কি চিত্ত? পাথর দিয়া গড়া না কি!

বাড়ীটা কতকাল মেরামত হয় নাই। ইহার ছাদে বড়-বড় অশ্বত্থ-বট জন্মিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ হইতে চাঙ্গড়-চাঙ্গড় চূণ-বালি খসিয়া ভিতরের জীর্ণ কঙ্কাল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বাড়ীর পাশেই গৃহস্থদের নিত্য ব্যবহার্য্য পুষ্করিণীটা মজিয়া গিয়া, পানকলের গাছে ভর্ত্তি হইয়া আছে। বিমলেন্দু ঈষৎ বিমনা এবং সলজ্জ ভাবে নিজের অবজ্ঞাত, সুদীর্ঘকাল-বিস্মৃত গৃহদ্বারে আসিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সদর দরজা ভিতর দিক হইতে বন্ধ। দ্বার ঠেলিতে বা কাহারও নাম ধরিয়া ডাকিতে তাহার যেন সাহসে কুলাইতেছিল না। কেবলি ভয় হইতে লাগিল যে, ডাকিতে গেলেই হয় ত বা এই মুহূর্ত্তে ওই রুদ্ধদ্বার ঠেলিয়া খুলিয়াই কি একটা লাঞ্ছনার বিরাট্ ঝঞ্ঝা বাহির হইয়া ভীমবলে তাহারই উপরে পতিত হইবে। এই সকল মার্জ্জিত-রুচি, শিক্ষিত-সৌখীন সঙ্গীদলের মাঝখানে, বিশেষতঃ উৎপলার ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টির সাক্ষাতে, তাহার একান্ত লজ্জাকর আবির্ভাব-কল্পনার এই শেষ মুহূর্ত্তেও অন্তরের কুণ্ঠায় তাহার সর্ব্ব শরীর-

মন যেন গুটাইয়া এতটুকু হইয়া রহিল। শুষ্ক জিহ্বা তাহার শব্দ উচ্চারণ করিতেই সমর্থ হইল না।

কিন্তু সঙ্কোচ যাহাকে, তাহার এ সঙ্কুচিত অবস্থাটা নজরে ঠেকিল তাহারই। অসমঞ্জর দল তখন ঘোড়া বাঁধিবার উপায় ঠাহরিবার জন্য ব্যস্ত। রাধিকা নিজের ঘোড়াটার পিঠ ঠুকিয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করিতেছিল। উৎপলা তাহাকে হাঁক দিয়া কহিল "রাধিকা দা, আমার ঘোড়াটা ধরো তো।"

পরম আপ্যায়িত হইয়া গিয়াই, রাধিকাচরণ এক হাতে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া, আর একটা হাতে উৎপলার বাহনটার জিম্মা লইল। তখন নিজের হণ্টিং বুটের খটাখট শব্দ তুলিয়া, হাতের চাবুক শূন্যে আস্ফালন করিতে-করিতে লঘুগতি বালকের মত ছুটিয়া আসিয়া, উৎপলা, যেখানে বিপন্ন গৃহস্বামী তখনও কর্ত্তব্য-বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে আসিয়া কল-ঝঙ্কারে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিয়া, যেন তাহার সমস্ত সঙ্কুচিত চিন্তাজালকে একটা উদ্দাম আনন্দের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াই কহিয়া উঠিল, "দোর খোলাবার জন্যে ভাবনায় পড়েছেন বিমলেন্দুবাবু? দোর আমাদের তো খোলাবার দরকার নেই। আসুন, আমরা আজ এর পাঁচিল দিয়ে চড়াও করে, আপনার এই কাস্‌লটাকে দখল করে নিই। কি বলেন?" বলিয়াই সে শিশুর মত মুক্তস্বরে হাসিয়া উঠিয়া, বিমলের কাঁধের উপর হাত দিয়া একটুখানি ঠেলিয়া দিল, "চলুন চলুন, আজ একটা বড় কাজের মহলা দেওয়া যাক্। তা' এতে তো আর কোন দোষও নেই। আপনারই তো বাড়ী! কিন্তু আমি ভাব্‌ছি, আমরা ওই পাঁচিলটা দিয়ে ধপাস্ করে লাফিয়ে পড়লে আপনার দিদিমা আর আপনার তারা না জানি কি রকমই ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবেন! আমি শুনেছি, পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা ভারি ভূতের ভয় করে।" এই বলিয়াই আবার এক চোট হাসিয়া লইয়া সে বিমলেন্দুকে একরকম টানিয়া আনিয়া, ভাঙ্গা পাঁচিলের তলায় দাঁড় করাইল।

পাঁচিলে ওঠা বিমলেন্দুর ছোটবেলায় যথেষ্ট অভ্যাস ছিল; সে অনায়াসেই উঠিয়া পড়িল; এবং এবার এ কার্য্যে সে তাহার সঙ্গিনীর সাহায্যকারী হইতে পারায়, কিছু গৌরব বোধও করে নাই এমন নয়; কিন্তু তথাপি এই হাসি-খেলার তলায়-তলায় তাহার অপরাধ-পীড়িত চিত্ত সব দিক দিয়াই যেন অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিতেছিল; কোন মতেই সেটুকুকে সে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিতেছিল না।

পাঁচিলে উঠিতেই ভিতরের দিকে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য নজরে পড়িল। বিমলেন্দু দেখিল সদর দরজা বন্ধ থাকিলেও, খিড়কি-দ্বার খোলাই ছিল; এবং শুধু তাই নয়;—সেই দ্বারপথে এই বাটীর মধ্যে জনসমাগমও হইয়াছে বড় কম নয়। ভিতরের অঙ্গনে তুলসীতলায় একটা মলিন শয্যায় কেহ একজন সোজা হইয়া শুইয়া আছে, আর তাহার মুখের ঠিক সাম্‌নে বসিয়া একটী অল্পবয়সী মেয়ে—খোলা চুলের রাশিতে নত মুখখানি প্রায় ঢাকা,—সে উচ্চকণ্ঠে গীতা পাঠ করিতেছে—বিমলের কাণে ঢুকিল।

ইহাদের দুজনকে বেষ্টন করিয়া জন-পাঁচ-সাত লোকের সামান্য একটুখানি ভিড়।

উৎপলা এমন দৃশ্য আর কখনও দেখে নাই। সে ক্ষণকাল অবাক্ আশ্চর্য্য হইয়া থাকিয়া, পরে হাসি-হাসি মুখে বিদ্রূপের টঙ্কার দিয়া নির্ব্বাক্ নিথর বিমলকে খোঁচা দিবার মতলবেই কহিয়া উঠিল, "এ হচ্চে কি বিমলেন্দুবাবু! কারুকে ভূতে পেয়েছে বুঝি,—তাই ঝাড়ানো হচ্চে?"

কোন কথাই না কহিয়া, যেমন পাঁচিল বহিয়া উঠিয়াছিল, তেম্‌নি করিয়া নামিয়া, খিড়কির খোলা দরজার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়াই, দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে হইতে বিমল ডাকিল "দিদিমা!"

গীতা-পাঠ থামিয়া গেল। ঝুলিয়া-পড়া চুলের চামর হাত দিয়া সরাইয়া তরুণী পাঠিকা ত্রস্তে মুখ তুলিয়া ডাকিয়া উঠিল "দাদা!"

মুমূর্ষুর নির্ব্বাক্ ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়াও যেন একটা অস্ফুট ধ্বনি বহু কষ্টে নির্গত হইয়া আসিল "দুখে!"—তাঁহার প্রায় নিশ্চল শরীরে একটা প্রবল তাড়িতের ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিয়া, স্নায়ুতন্ত্রীতে তাড়িতের স্পর্শের মত বারেকের জন্য যেন একটা আকুল চঞ্চলতা জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। অর্দ্ধ-মুদিত চোখ দুইটাকে পূর্ণ বিস্তৃত করিয়া তিনি শব্দানুসরণে ব্যাকুল ভাবে ইতস্ততঃ চাহিয়াই, সমীপাগত বিমলেন্দুকে দেখিতে পাইয়া, আবার একটা অর্দ্ধস্ফুট আনন্দধ্বনি করিয়া নিজের বহু-পূর্ব্বকার অবসন্ন হাতখানি উঠাইতে চেষ্টা করিতেছেন দেখিতে পাইয়া, তারা তাড়াতাড়ি সরিয়া

আসিয়া সযত্নে তাহা উঠাইয়া ধরিল ; এবং ইহার মর্ম্ম বুঝিয়াই বিমলেন্দুকে ইসারায় সেই হাতের স্পর্শের কাছে সরিয়া আসিতে ইঙ্গিত করিল। বিমলেন্দু বিস্মিত এবং যেন কতকটা সম্মোহিত ভাবেই অগ্রসর হইয়া, মুমূর্ষু দিদিমার শয্যা-পার্শ্বে জানু পাতিয়া নত মস্তক তাঁহার সেই থরকম্পিত শীর্ণ হস্তের উপর ঠেকাইয়াই, যেন আহতবৎ চমকাইয়া উঠিল। সেই তাহার আজন্মের পরিচিত, আবার বহুকাল হইতে যায় যে হাতের স্পর্শ হইতে সে বহু দূরে সরিয়া আছে, আজ তাহা শবহস্তের ন্যায় শীতল! আর ওই মুখ! যে মুখ তাহার প্রথম জ্ঞানোন্মেষাবধি সে দেখিয়াছে, আবার বহুদিনই দেখে নাই, দেখিবার কোন স্পৃহাও তো কই ছিল না। সেই এ জগতের একমাত্র আত্মজনের মুখ! কি ভয়ানক বিবর্ণ, বিকৃত এ মুখের ছবি! মঙ্গলার বাক্ রোধ হইয়াছিল ; কিন্তু অন্তঃসলিলা নদীধারার মত ভিতরে-ভিতরে জ্ঞানের সঞ্চার ছিল। শক্তি-সামর্থ্যহীন হাতখানা অন্যের সহায়তাকেও উপেক্ষা করিয়া নির্জীব ভাবে এলাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। তারা ভীত-ত্রস্ত ভাবে হাতখানি নিজের উষ্ণ ও কোমল হস্তে তুলিয়া লইতেই, আবার একবার তাহা বহু কষ্টে তাহার মস্তক স্পর্শ করিল। মুখে পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হইল, 'সুখী হও!' দেখিতে-দেখিতে সেই হাত পুনশ্চ অবশ হইয়া পড়িল।

ঠোটে মুখে জল দিয়া তারা ডাকিল, "দিদিমা!"

কোন সাড়া নাই। বিমলেন্দু ডাকিল, "দিদা! দিদা!"

আর কে উত্তর দিবে? মঙ্গলাদেবীর সেই শাণিত ক্ষুর-ধার-তুল্য তীক্ষ্ণ রসনা ততক্ষণে চির-নীরবতা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

* * * ইহারই ঠিক একমাস পূর্ব্বের কথা। ইন্দ্রাণী নিজের বিধবা ভ্রাতৃজায়া সাবিত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌদি, খুড়িমা লিখেচেন, পুরের মায়ের অসুখ বড় বেশী বেড়েছে, আমি তারাকে নিয়ে একবার যদি দেখতে যাই, তুমি কি ক'দিন বাবার সেবা একলাটি পেরে উঠবে?"

সাবিত্রী সম্মতি জানাইল।

অনেক দিন পরে ইন্দ্রাণী নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল ; এবং সেই প্রথম আসার দিনেও যে অতবড় অনাদরে গৃহীত হইয়াছিল, সে-ই আজ এখানে যেরূপ স্নেহ-সূচিত সমাদর লাভ করিল, তাহাতেও যেন তাহার মনটা কাঁদিতে লাগিল। দুঃখে ও রোগে কি মানুষটা কি হইয়া রহিয়াছে! এ কয় বৎসর মঙ্গলাদেবীর জীবনের বড়ই দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। প্রথম তিন বৎসর তিনি যা-হোক অন্নবস্ত্রের দুঃখটাও পান নাই ; এবং মধ্যে-মধ্যে দু'দশ দিন বাদ ইন্দ্রাণীর হাতের ঠাকুরসেবাও তাঁহার বজায় ছিল। স্বভাব-গুণেই তাহাকে তখনও তিনি মন্দ কথা বলিয়া গিয়াছেন ; তথাপি সে কটুকাটব্যের মধ্যের তীব্রতাটা অনেকখানিই কম পড়িয়া গিয়াছিল। কে যে শত্রু আর কে যে মিত্র, সেটা চিনিতে তো আর কিছুই বাকি ছিল না। কিন্তু তারপর গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে ইন্দ্রাণী যখন হইতে বারিৎপুরে গিয়া বাস করিল এবং ক্রমশঃ যখন অমৃত নিজের অংশটাকে ভারি করিয়া তুলিতে গিয়া, ইঁহাদের অংশকে খণ্ডিত করিতে আরম্ভ করিল, তখন হইতে এই অসহায়া বৃদ্ধার অশন-বসনেরও অভাব ঘটিতে লাগিল। অবশ্য নিজের কাছে সঞ্চয় বড় মন্দ ছিল না ; কিন্তু কেমন যে কৃপণ স্বভাব, সেগুলি খসাইয়া নিজের কাজে লাগাইলেও মমতা হয় ; সে-সব মোটা সুদে খাটিতেছে। সুহাসিনীর অনেকগুলি অলঙ্কার আছে। সে সব যে তাঁহার দুখের বউ আসিয়া গায়ে পরিবে! কাজেই যক্ষের মত সে সব আগলাইয়া লইয়া, দুঃখের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া, অবিশ্রান্ত চোখের জল, ও সে ভাইপো দুগ্ধপোষিত কাল-সর্পবৎ তাঁহার বক্ষে অহেতুক দংশনে তাঁহাকে এত জ্বালাইল, তাহার উদ্দেশে অজস্র গালি ও অভিশাপ বর্ষণ করিতে-করিতে কোন মতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। ইন্দ্রাণীর ইহাতে এক জ্বালা হইল। সে ইঁহার সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে চাহে; ইনি রাজী হন না। মুখ বাকাইয়া বলেন, "বলো কি বউ, দুখের এই ঘর-দোর, দুখের আমার গহনা-গাঁটি, বাসন-কোশন এ সব আমি কার কাছে রেখে যাব? বাপ্‌রে, সে আমি পারবো না। তুমি আমায় মাসে গোটা-কতক করে টাকা পাঠিও, অসুখ হলে খবর দেবো, এসে সেবা করে যেও ; থাকতে আমায় এখানেই হবে। যদি কখন দুখে আসে, তার মুখটা দেখি, একটা বউ এনে দিই, আবার তাদের নিয়ে সংসার পাত্‌বো, ততদিন এমনি করেই কাটুক আমার।"

অগত্যা ইন্দ্রাণীকে সেই ব্যবস্থাই করিতে হইল। এবার এখানে আসার স্বল্পকাল পরেই ওখানে রামদয়ালের রোগ-বৃদ্ধির সংবাদে তাহাকে আবার বাপের কাছে ছুটিতে হয়। বহুদিনের বিতাড়িত সেই ক্ষ্যান্তি ঝির কাছে তারাকে

সঁপিয়া দিয়া, তাহারই সেবার উপর ইঁহাকে রাখিয়া বারিৎপুরে গেল। মঙ্গলার যদিও ক্ষ্যামার প্রতি কোন দিনই সুদৃষ্টি ছিল না, তথাপি তাঁহাকে নিতান্তই অসহায় ও অক্ষম দেখিয়া, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আবার প্রায় বৎসরাধিক কাল হইতেই তাঁহার সেবা-যত্ন করিতেছিল। চাকরী সে অন্যত্র করিত, এবং রাত্রে ও প্রাতে ইঁহার সমস্ত কাজ-কর্ম্ম ও সেবা করিত।

একদিন মঙ্গলা বলিলেন, "চার-পাঁচখানা চিঠি দিলি তারি, দুখে তো একখানার জবাবও দিলে না। তবে কি তার কোন ভাল-মন্দ হলো না কি? কে'জানে মা, কি যে কপালে আছে।"

তারা চমকিয়া উঠিয়া জিব কাটিয়া বলিল, "ও কি কথা! না—না, হয় ত দাদা আর সে বাসায় নেই। তাই সম্ভব! অমৃতদা'কে না কি সে ঝগড়া করে সরিয়ে দিয়েছে, না কি করেছে; মা দাদুকে কি যেন ঐরকম কি সব কথা একদিন বলছিলেন। তাই বোধ হয় তিনি এখন অন্য বাসায় গেছেন!"

শুনিয়া মঙ্গলা ঈষৎ একটুখানি সান্ত্বনাপূর্ণ এবং অনেকখানি হতাশাসূচিত একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক কহিয়া উঠিলেন, "পুঁটে সর্ব্বনেশেকে কেউ বেড়া আগুনে পুড়িয়ে মেরেচে—এই খবরটা আমায় দেবার জন্যে কি আমার কেউ কোথাও নেই রে!"

আর একদিন বলিলেন, "দেখ্ তারি! আমার শরীর দিন-দিন বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে,—এ ত ভাল না! তোর মাকে একবার আসতে লেখ্। আর দেখ্, যদিই ভগবান্ না করুন, আমার ভাল-মন্দই কিছু ঘটে, তাহলে—এই আমার চাবিকাটিটী দেখে রাখ্, দুখে এলে এতে যা' আছে সব তাকেই দিস্, বুঝলি? লক্ষ্মী মেয়ে, তুই যেন ওর থেকে কিছুটী হাত করিসনে ভাই। ওসব দুখের মার। তোর মায়েরও তো ঢের সোণা-দানা হয়েছিল। তোর বাপ নিজে সাধ করে কিবা গড়নের পালিশ-পাতার বালা, মুক্তর সীতাহার গড়িয়ে দিয়েছিল; দেখে আমি বরং বুক করকর করে মরি। বলি, ও মা, আমার সুখির অমন হয় নি। আর তোর মাতামহ—সে মিনষেও একেবারে মুড়ে দিয়েছিল। তা বাছা, মা তোর জন্যে একখানিও যে ফেলে রাখতে পারেনি, সে আর কার দোষ? তোরই কপালে নেই, আমি কি করবো বলো? তা তুমি আমার অনেক সেবা-যত্ন করলে—তোমায়ও আমি কিছু যে না দেব তা নয়; বেঁচে থাকি তো, তোমার বিয়ের সময় আমার নিজের কাণের কাণ-বালা আর হাতে দেবার মুড়কি-মাদুলী—এ আমি তোমায় যৌতুক দেবো ভেবেই রেখেছি। আমি কোন জিনিষটী নষ্ট করেচি? না তেমন আক্কুটে তুমি আমায় পাওনি। আমার নিজের বিয়ের চেলীখানি শুদ্ধ আমার ওই বড় সিন্দুকে জিরে-কর্পূর দেওয়া কাপড়ে বাঁধা আছে। বরঞ্চ সেইখানা তুমি নিয়ে পূজোর কাজ করবার সময় পরো—তবু কখন-কখন দিদিমাকে মনে পড়বে।"

এমনি করিয়া নিজের স্মৃতি-রক্ষার সুলভ চেষ্টা, এবং বিস্মৃতের স্মৃতি স্মরণে জীবনের একঘেয়ে দীর্ঘ দিনকে কোন মতে পরাভবে আনিয়া, একদিন মঙ্গলা দেবী নিজের সম্পূর্ণ রূপ এবং সবিশেষ অনিচ্ছার সহিতই কোন এক অজানা পথে যাত্রা করিলেন; এবং অকস্মাৎ সেই শেষ মুহূর্ত্তেই প্রতি-মুহূর্ত্তে প্রতীক্ষিতের দুর্লভ দর্শনও তাঁহার লাভ ঘটিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ডাকাতি করা কাজটা বেশ মোলায়েম নহে দেখিয়া, বিমলেন্দুর একখানা কলিকাতার বাড়ীই বিক্রয় করা সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। জনকয়েক নিষ্কর্ম্মা ছেলে অসমঞ্জদের ঘাড়ে চড়িয়া খায়-পরে। ইহারা ফার্ষ্ট-ক্লাসে যায়-আসে। পরে ভাল। বলে, না হইলে পুলিশের সন্দেহের দৃষ্টি পড়িবে। এদেশ-ওদেশ ঘুরিয়া বেড়ায়। খরচ যোগাইত পূর্ব্বে অসমঞ্জ। এখন তাহার হাত খালি হওয়ায়, বিমলেন্দুর ঘাড়েই সেই ভারটা পড়িল, এবং সে ইহাকে দেশের কাজ নাম দিয়া বেশ শ্রদ্ধার সহিতই গ্রহণ করিল। বিমলের দিদিমার মৃত্যুতে একসঙ্গে অনেকগুলা টাকা ও গহনা সে হাতে পাইয়া, বাড়ী-বিক্রির অভিসন্ধি তখনকার মতন ত্যাগ করিল; এবং সেইগুলাকে পোদ্দারের দোকানে গালানী-দরে ধরিয়া দিয়া, যে টাকাটা লাভ করিল, সেও বড় কম নয়। তারা চাবি খুলিয়া তাহার দাদাকে যখন মৃতা দিদিমার ধন-ভাণ্ডার বুঝাইয়া দেয়, তখন তাহার নিজের প্রাপ্য কাণ-বালা ও মুড়কি-মাদুলী দুটিও তার মধ্য হইতে বাহির

করিয়া লয় নাই। যখন গহনার বাক্সর চাবি খোলা হয়, তখন সেখানে উৎপলাও উপস্থিত ছিল। বিশেষ কার্য্যে অসমঞ্জ আর সকলকে লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, শুধু উৎপলা ও অপরেশ কয়টা দিন বিমলের সহিত এই বাড়ীতেই কাটাইতেছিল। মস্ত মোটা গার্ড-চেনের সহিত সংবদ্ধ পূর্ণেন্দুর সোণার ঘড়ি, যেটা সে দিদিমার শিক্ষামত ইন্দ্রাণীর নিকটে পৈতার সময় আদায় করিয়াছিল, সেইটা সে থপ করিয়া তুলিয়া লইয়া, হাসিতে-হাসিতে গলায় পরিয়া নিজের ছোট্ট রূপার ঘড়িটি বিমলের বাক্সের মধ্যে ভরিয়া দিল; এবং তার পর আর কোন সময়ে এই জিনিষ দুটার বদল করার কথা উঠিয়াছিল কি না, তারা শোনে নাই। কিন্তু আবার যখন অসমঞ্জ আসিয়া ইহাদের লইয়া গেল, অশ্বারোহীদ্বয়ের মধ্য-বর্ত্তিনী হইয়া এই ঘোড়ায়-চড়া মেয়েটী কলিকাতার পথে যাত্রা করিল, তখনও ইহার গলায় সেই তাহার পিতার গলার মোটা চেনগাছা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। বহু দূর পর্য্যন্ত চাহিয়া-চাহিয়া, অশ্বখুরোত্থিত ধূলির সহিত উহার আরোহীদল নয়নান্তরালবর্ত্তী হইয়া গেলে পর, একটা সুবিপুল ভারাক্রান্ত দীর্ঘশ্বাস তারার কোমল বক্ষ মথিত করিয়া উঠিয়া আসিল। মনে-মনে বেদনা-বিদ্ধ হইয়া সে ভাবিল, যতদূর দেখলাম, ঐ মেয়েই দাদার বউ হবে! মাগো! ও কি বউ? একটা কেল্লার গোরাকে তার চাইতে তো বিয়ে করলেই হয়!" —বিমলেন্দু যে ইচ্ছাসত্ত্বেও, ইহারই সান্নিধ্য জন্য, তারার দিকে বেশ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেও অবসর পায় নাই, ইহা তারা লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহার এই অবহেলায় সে যতটুকু দুঃখ পাইল, তার চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট তাহার বোধ হইয়াছিল, তাহার দাদার এই অদ্ভুত 'কনে' নির্ব্বাচন দেখিয়া। তথাপি সে যে বহুদিন পরে তাহাকে একটীবার চোখেও দেখিতে পাইল, সে জন্য তাহার মনে সুখ ধরিতেছিল না।

দিনে-দিনে বিমলের সহায়তা ও সাহসের খ্যাতি বাড়িয়া উঠিল।

একদিন পথ দিয়া চলিতে-চলিতে, বার দুই যেন কোন পিছনের শব্দ শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া, পরে আবার চলিতে-চলিতে অসমঞ্জ একটু নিম্নস্বরে বিমলেন্দুকে বলিল, "আমাদের পিছনে নিশ্চয় কোন লোক লেগেছে।"

বিমলও খানিকটা স্থির হইয়া থাকিয়া, নির্জ্জন নিরালা পল্লীর ঝিল্লীরবমাত্র শুনিতে-শুনিতে অর্দ্ধ-অবিশ্বাসে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোমার ভুল হয়ে থাকবে।"

অসমঞ্জ আবার দাঁড়াইয়া পড়িল। কাণ খাড়া করিয়া কোন সতর্ক ধ্বনি শ্রবণ-চেষ্টায় সতর্ক থাকিয়া, পরে কহিল,—"কিন্তু আজ বারেবারেই বা এ সন্দেহ হচ্চে কেন?"

বিমল এবার পূর্ণ অবিশ্বাসে জবাব দিল—"ও তোমার মনের সঙ্কোচ মাত্র! যাক্, বৃথা সংশয়ে সময় নষ্ট কেন? যে সব বড় কাজের আইডিয়া নিয়ে আমাদের এ সভার সৃষ্টি, আজ পর্য্যন্ত তার তো কিছুই কাজে পরিণত হচ্চে না! এইবার বড় গোছের একটা—কি?"

"পথে ওসব কথা নয়। কিন্তু বিমল! একটা কথা ক'দিন ধরেই ভাবচি।"

"কি?" "আমার এখন যেন মনে হচ্চে, আমরা উল্টো পথে চলেছি। দেশের কাজ করবার জন্য এ সুঁড়ি পথ ধরবার আমাদের কোন দরকারই ছিল না,—আজও নেই। অনায়াসেই আমরা এখনও সহজ ও সরল পথেই অগ্রসর হ'তে পারি।"

ম্লান-জ্যোৎস্নায় বিমলেন্দুর চোখ নক্ষত্র-দীপ্ত দেখাইল—"এ পথই বা অসরল কিসে! এই পথই বা বিপথ কেন? সহজ পথে দেশের কাজ করা কি সম্ভব?"

অসমঞ্জ ঈষৎ সলজ্জ, ঈষৎ অপরাধী ভাবে ধীরে-ধীরে বলিল,—"আমরা যা করতে চাইচি, তা পারা কতদূর সম্ভব, ঈশ্বর জানেন। আমাদের সঞ্চয় নেই, সহায় নেই, কিছুই আমাদের নেই; অথচ আমরা চাই এক প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটাতে। সে সব করতে অযুত বাধা ঠেলতে হবে। সমুদ্রে ভেলা ভাসিয়ে পার হতে চাইচি; ভীষণ তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ না হয় করলুম প্রাণপণে; তবুও কি পার হতে পারবো? তার চেয়ে যদি তীর থেকে—"

বিমল অসহিষ্ণু হইয়া বাধা দিল,—"এসব ভাব-রাজ্যের কল্পনা-কুহক মঞ্জু, তোমার মুখে সাজে না।"

লজ্জারক্ত বিমর্ষ মুখে অসমঞ্জ নীরব হইয়া রহিল। তাহার মুখে যে সাজে না, সে কথা সেও যে জানে। কিন্তু —কিন্তু—হায়, কেন সাজিল না? যদি সে আজ কোন মতে সাধারণ সবারই মত এই কথাগুলাকে তাহার মুখে শোভন করিয়া তুলিতে পারিত! যদি পারিত! তবে আরও

কয়েকজনের সহিত তাহারও এই জীবনটা যে কতবড় সঙ্কটের মুখ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সফল ও সার্থক হইয়া উঠিতে পারিত, সে শুধু আজ সে-ই জানে!

অসমঞ্জকে বিদায় দিয়া বিমল আবার সেই পথে নিজের বাসায় ফিরিয়া চলিল। রাত্রি গভীর হইয়াছে; পথের দু' ধারের স্বল্প গৃহে অধিবাসীদের জাগরণ-চিহ্ন পাওয়া যায় না। স্বল্প জ্যোৎস্নায় পূর্ণ গৃহগুলা তাহাদের আশেপাশের বৃক্ষলতার মাঝখানে যেন মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। ঋজু পথ আঁকা-বাঁকা হইয়া, সেই আরণ্য-ভাবাপন্ন দৃশ্যের মধ্য-স্থলে লুকাইয়া গিয়াছে। একটা বাঁকের মুখে ফিরিতে গিয়া, অন্যমনস্ক বিমল হঠাৎ দেখিতে পাইল, তাহারি পিছনে কেহ আসিতেছিল;—সে যেন তাহাকে থামিতে দেখিয়া, পাশের দিকে সরিয়া গেল। সত্য, না ভ্রান্তি? প্রথমতঃ বিমলের মনে হইল, কিছু নয়,—এ শুধু অসমঞ্জর সন্দেহের ফল। অসমঞ্জর কথায় আবার সে গভীর অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল; এবং ভাবিতে লাগিল, আচ্ছা, সত্যই কি তার মধ্যে এই হেয় দুর্ব্বলতা জাগ্রত হচ্চে? সেই মঞ্জু, সেই অটল ধৈর্য্য, অসীম সাহস,—সে সর্ব্ব কে তবে দিনে-দিনে হরণ করে নিচ্চে? তার চোখের আর সেই বৈদ্যুতিক শক্তি নেই; গলার স্বরে আর বোধ করি তেমন করে কাউকে বশ কর্‌তে পারে না। সেই অতুলনীয় ঝঙ্কারী হাসিই বা তার কোথায় গেল? দেশ-সেবার সে সব বড়-বড় প্ল্যানই বা কি হলো? এখন দেখচি যত রাজ্যের পচা ডোবা ছেঁচা, ভাঙ্গা রাস্তা জোড়া লাগানো, পড়ো বাগান সাফ্ করা—এই সব যত ইতুরে কাজকেই সে তাঁর কার্য্যসিদ্ধির সোপান করে তুলেচে। এই উদ্দেশ্যে পাড়াগাঁয়ে পাড়াগাঁয়ে ঘুরে লাভের মধ্যে লাভ হোল—ম্যালেরিয়া জ্বরটুকু। বোধ করি তারই থেকে স্বাস্থ্য ও সঙ্গে-সঙ্গে সাহসও ওর ফুরিয়ে যাচ্ছে!—কে?"

আবার একটা বাঁকের মুখে আসিয়া, বড়-বড় গাছের ছায়ায়, প্রায় অন্ধকারে কোন পশ্চাদাগত ব্যক্তির সহিত সংঘর্ষ ঘটিয়া গেল। লোকটা বোধ করি উহাকেই অনুসরণ করিতে-করিতে, অন্ধকারে অদৃশ্য ব্যক্তির অতি-নৈকট্য ঠিক রাখিতে পারে নাই। সে নিরুত্তরে তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইতে গেলে, সহসা উদিত সংশয়ে বিমলেন্দু তাহার একটা হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"কে তুমি?" ধৃত ব্যক্তি সবলে তাহার হস্ত-মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে-করিতে, পকেট হইতে অপর হস্তে কি একটা শীতল-স্পর্শ বস্তু টানিয়া বাহির করিয়াছে, বেশ বোঝা গেল। কিন্তু একটা শব্দও সে উচ্চারণ করিল না। বিমলেন্দুর পদতল হইতে মস্তকের কেশাবধি সমস্তটাই যেন একবার একটা বিপুল শিহরণে কাঁপিয়া স্থির হইয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে, কেমন করিয়া বলা যায় না, তাহার শরীরে ও মনে একসঙ্গে যেন একটা অপূর্ব্ব বলাধান হইয়া গেল। নিমেষ মধ্যেই সে যেন সমুদায় দ্বিধা, সঙ্কোচ, আতঙ্ক সমস্তকেই একসঙ্গে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, মরিয়া হইয়া গিয়া, সেই অজ্ঞাত আততায়ীর হস্ত হইতে সেই ভীষণ বস্তুটাকে প্রাণান্ত বলে ছিনাইয়া লইয়াই—তাহারই বক্ষে কণ্ঠে বা কপালে ঠিক বুঝা গেল না, কোন্‌খানে লক্ষ্য করিয়া ধরিল। এক লহমামাত্র! ইহারই মধ্যে এতটা ঘটিয়া গেল। খট্ করিয়া উঠিয়াই একটা বড় শব্দ; তার পরই অস্ফুট আর্ত্তনাদের সহিত লোকটা পড়িয়া গেল। সেই একটিবার ভিন্ন আর তাহার কোন সাড়াই পাওয়া গেল না।

একটি মুহূর্ত্ত! এ কতটুকুই বা সময়? কিন্তু ইহারই মধ্যে কি না ঘটিতে পারে? একটা নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল জীবন এই এতটুকু একটি মুহূর্ত্তের মাঝখানে এই যে চিরজীবনের মত ঘোর কলঙ্কের কালিমা মাখিয়া কালো হইয়া গেল, এ কি আর কখন এই অভিশপ্ত মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বের জীবনের স্বাদ এ জন্মে ফিরিয়া পাইবে? আর যে জীবনটাকে এই অশুভ মুহূর্ত্ত গ্রাস করিয়া লইল, সে ত গেলই। তেমন তো নিত্যই কত যায়। কিন্তু এই যে নিজেরও অজ্ঞাতসারে ভীষণ নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হইয়া সে বাঁচিয়া রহিল, এর মত দুর্গতি আজ আর কাহার? * * *

পরদিন সংবাদপত্রে বড়-বড় অক্ষরে বাহির হইল:—"পুলিশ খুন! শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসগুপ্ত নামক সি আই-ডির একজন ইন্‌সপেক্টর গত পরশ্ব রাত্রে রাস্তার পার্শ্বে কোন গুপ্ত-হত্যাকারীর হস্তে হত হইয়াছে। লোকটি পুলিশ-বিভাগে কয়েক মাস মাত্র প্রবেশ করিলেও, নিজ অধ্যবসায় বলে ইতঃমধ্যেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিল। শুনা যায়, একটা নূতন দলের অনুসন্ধান কার্য্যে রত ছিল। খুব সম্ভব সেই দলস্থ কোন ব্যক্তির দ্বারাই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অসমঞ্জর মনের মধ্যে যে একটা ঘোর পরিবর্ত্তনের হাওয়া বহিতেছে, এ খবরটা কাহারও মুখে-মুখে রাষ্ট্র না হইতে পাইলেও, সকলেরই মনে-মনে যে এ সংবাদটা উহ্যও ছিল না, তাহার কারণ, সেটা বড়ই সুস্পষ্ট। অসমঞ্জই ছিল তাহাদের দলপতি; তাহাদের সঞ্জীবনী-সভার সঞ্জীবন-শক্তি; অথচ ইদানীং সে যেন একেবারে দলছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় যায়, কোথায় থাকে, কি করে, কিছুই যেন তার জানা যায় না—এম্‌নি তাহার চালচলন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মধ্যে-মধ্যে সে কাহাকেও কোন খবর না দিয়া, কোথায় যে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বাহির হইয়া যায়, দু'চার দিন বাড়ীর লোকের দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না। কখনও জ্বর লইয়া ফিরিয়া আসিয়া, দিন পনরই বিছানা লয়। জিজ্ঞাসা করিলে কখনও শুধু হাসে,—কখনও কোন পাড়াগাঁর পচা ডোবার পঙ্কোদ্ধার কার্য্যের ইতিহাস শুনায়। একদিন বড় বেশী রাগ করিয়া উৎপলা তাহাকে কঠিন কণ্ঠে কহিল "যদি পচা ডোবাতেই লাভের আশাকে ডুবিয়ে মারবে, তবে আর সকলকে এত আশা দিয়ে এ পথে টেনে এনেছিলে কেন?"

অসমঞ্জর মনের মধ্যে এর যে জবাব তৈরি হইয়াছিল, তাহা সে তাহার এই বিচারকর্ত্রী ছোট বোনের মুখের উপর কোন মতেই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না। বাস্তবিকই এ হিসাবে তাহার যে অপরাধের সীমা হয় না! নিজের পথে একদিন সে অপরকেও গভীর প্রলোভনের ফাঁদ পাতিয়া টানিয়া আনিয়াছে; নিজের হাতে তাহাদের মুখে মাদকের পাত্র তুলিয়া ধরিয়াছে। আজ নিজের নেশা তাহার ছুটিতে পারে; কিন্তু সেই সঙ্গেই যে সবারই ছুটিবে, তেমন আশা উন্মাদেই করিয়া থাকে। একজন লোক—সে হয় ত বিপথে ও সুপথে সমানই অটল থাকিতে সমর্থ; কিন্তু সকলের মধ্যেই সেই একই রূপ রক্ষা-শক্তি নাই! অসমঞ্জ দেশ-হিতের যে আদর্শকে নিজের অন্তরের পূজা দিয়া আসিয়াছে,—আজ কোন্ গৌরবান্বিত গুরু-মন্ত্রে সে আদর্শ তাহার খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে!—দেশের প্রকৃত পূজা-মন্ত্র দরিদ্র-নারায়ণের সেবাব্রতকেই তাহার আজন্ম ভ্রান্তি-মদ-মত্ত অন্তরের ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক, সে সর্ব্বান্তঃকরণেই গ্রহণ করিয়াছে। সে মন্ত্র সে তাহারই স্বহস্ত-নির্ম্মিত তাহারই শিষ্য-বর্গের কর্ণেও আজ ঢালিতে চাহিতেছে। কিন্তু না—নিজেকে সে এত দিন যাহা ভাবিত, বাস্তবিকই তত শক্তি তাহার মধ্যে তো নাই! এই সব তরুণ চিত্ত লইয়া সে যে তাহা মন্থন পূর্ব্বক হলাহল তুলিয়াছে, আজ তাহাকে অমৃতে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য কোথা হইতে সে মৃত্যুঞ্জয়ের শক্তি আহরণ করিবে? অসমঞ্জর সারা চিত্ত-প্রাণ ঘোর অনুতাপের অগ্নিতে যেন তুঁষের আগুনে গুমিয়া-গুমিয়া পুড়িতে লাগিল। যে সংহারাস্ত্র সে বাল-চপলতার বশীভূত হইয়া, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই, গড়িয়া তুলিয়াছে, এখন তাহাকে সংহরণ করিবার সামর্থ্য তাহার কোথায়? সে এখন করে কি? তবে কি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াও সে শুধু গড্ডলিকা-প্রবাহের মত স্রোতের মুখেই ভাসিয়া এবং ভাসাইয়াই চলিয়া যাইবে? তীরে উঠিবার, তীরে তুলিবার উপায় কি নাই? চেষ্টা কি অনুচিত?

একদিন এই কথাই সে তার গুরুর নিকট উত্থাপন করিল। রুগ্ন ও বৃদ্ধ রামদয়াল বহুদিন যাবৎ শয্যাশ্রিত। শুধু কষ্টে দু'একটা বালিশ ঠেশ দিয়া একটু-একটু বসিতে পারেন। তিনি তাঁহার এই সংশয়াচ্ছন্ন, দুশ্চিন্তা-পীড়িত ভক্তটিকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"সে কি কথা! দেখ অসমঞ্জ, ভুল হওয়া মানুষের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়; বরং নানা মত এবং নানা পথ থাকাতে, ভুল না হওয়াটাই যেন কতকটা আশ্চর্য্য বলে মনে হয়। তা ভিন্ন, ভুলই বা কি, আর ঠিকই বা কোন্‌টা, তারই বা আমরা কতটুকু বুঝি? তবে কি না, কথা হচ্চে এই যে, যে কাজটা আমরা করবো, সেটার যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমাদের যাচাই করে নেবার নিক্তি এইটুকু, যে সে কাজটার ফলে আমার বিবেক, আমার বুদ্ধি কোথাও কোনও আঘাত পাচ্চে কি না? মাথার উপর যিনি বসে সবই দেখচেন, তাঁর সঙ্গে আমার যখনই চোখো-চোখি হবে, তখন আমায় চোখ নামাতে হবে না ত? এর চেয়ে কঠিন সমস্যা আমার মতে আর কিছুতেই নয়। তা ছাড়া দেখ, মতই বা তুমি বদলাচ্চো কই? তোমার প্রতিজ্ঞা ছিল, দেশের সেবা করবে। এখনও সে প্রতিজ্ঞা তোমার ভঙ্গ হচ্চে কই? তখন কতকগুলো বড়-বড় আধ-পাগলাটে আইডিয়ার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে—তা ছাড়া আর তাকে বলি কি বলো না? জার্ম্মাণরা তাদের অপরিসীম শক্তি, অর্থ ও অমানুষিক উদ্যম-আয়োজন নিয়ে যেখানে ব্যর্থ হচ্চে, সেইখানে তোমরা ক'টা ছোট ছেলের

চুরি-করা আধডজন রিভলবার ও কার্টিজের জোরে কাজ আদায় করবে! তাও কি হয়? তা, এখনই বরং এই তো তুমি দেশের প্রকৃত সেবা আরম্ভ করেছ! দেখ দেখি, সেদিন নিজের হাতে পাঁক ঘেঁটে তোমরা চল্লিশজন ভদ্র-সন্তানে যে কুমোরপাড়ার পচা পুকুরটাকে উদ্ধার করে দিলে, নতুন তক্‌তকে জল পেয়ে অন্ততঃ হাজার লোক তোমাদের এই যে আশীর্ব্বাদ করচে,—আজ এর সাড়া কি তাঁর কাণের কাছে গিয়ে পৌছায় নি, তুমি মনে করো? তা নয় বাবা! যে কাজে মনুষ্যত্ব জাগে, ঈশ্বরও জেগে উঠেন তাতেই। মানুষের অন্তরেই যে তিনি আছেন। মানুষকে যখন তাঁর থাকার গৌরব করতে দেখেন, তখনই প্রীত হন। এই পথ। দেশ-রক্ষা ভিন্ন, দেশ-সেবা ভিন্ন, দেশ উদ্ধার হয় না। দেশের রোগ দূর করো, দেশের হৃত স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আন;—আর কিছু না পারো, শুধু এইটুকুর জন্য প্রাণপাত করে যাও,—এই মন্ত্রে দীক্ষা নাও, এই মন্ত্রে দীক্ষিত করো। অকাল-মৃত্যু-হরণ, সর্ব্বব্যাধি-বিনাশন' এই বিষ্ণু-পাদোদক সকলকে পান করাও, দেশের প্রকৃত সেবা করা হবে। রোগে, শোকে, মৃত্যুতে জর্জ্জরিত হয়ে রয়েছে যে দেশ, তার সঙ্গে কি আর ছেলেমানুষী করা চলে, না সে অপব্যয়ের অবসরই আছে।"

অসমঞ্জ কহিল—"সে তো আমি নিজে সবই বুঝ্‌ছি; কিন্তু যাদের এই ভ্রমের মধ্যে টেনে এনেছি, তারা যদি আর ফিরতে না চায়? এখন তো আর তাদের আমি ত্যাগ করতেও পারি না।"

রামদয়াল কহিলেন, "ত্যাগ বা গ্রহণের কথা নয়, ভ্রম জেনেও সেই ভ্রান্তির মধ্যেই বিচরণ করা শুধু পাপই নয়, অপরাধও। ভুল বলে যখন বুঝতেই পেরেছ, তখন নিজেও সেই ভুল পথ থেকে সরে এসে অপর পথিকদেরও ফেরবার জন্য যতটা সাধ্য হয় করতে ছাড়বে না; তাতেও যদি না পারো, নিরুপায়; কিন্তু তাই বলে নিজেও তো আর তাদের সঙ্গে সেই ভ্রান্তি-কুহকের মধ্যে কোন মতেই ফিরে যেতে পার না।"

অসমঞ্জ একেবারে ব্যাকুল শিশুর ন্যায় অপরিসীম আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল, "ফিরে যেতে পারি না?"

রামদয়াল কথার উপর জোর দিয়া উচ্চারণ করিলেন—"না, পারো না।"

অসমঞ্জ তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। তার পর পুনশ্চ একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন পূর্ব্বক কহিল, "কিন্তু, আমাদের যে শপথ আছে।"

রামদয়াল মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"কি শপথ আছে? কেউ বিশ্বাসঘাতক হবে না, বা দেশহিতৈষণা ত্যাগ করবে না—এই সব তো, না আর কিছু? তা যদি হয়, তবে গলদ কোথায় পাচ্চো? বিশ্বাসঘাতকতা কারু সম্বন্ধেই, তা কি সভা-ভুক্ত, কি অ-ভুক্ত—কোনদিনই কারু করে কাজ নেই। আর দেশের এবং দশের হিতৈষী কায়-মনোবাক্যে হয়ে, সে শপথটা সার্থক করেই যেন তুলতে পারো,—এই বলে আবার একটা নূতন শপথ বরং নিজের কাছে করে ফেল। মিহি ধুতি ছেড়ে মোটা পরো, তুলার চাষ, আখের চাষ যাতে বাড়ে, ঘরে-ঘরে মেয়েরা বিবিয়ানি ছেড়ে গড়া ধরে, তাঁতি-জোলার ছেলেরা কেরাণীগিরি ফেলে তাঁত বোনে, বদ্যির ছেলে জাত-ব্যবসার ধর্ম্ম বজায় রাখতে চেষ্টা করে,—মকরধ্বজে স্বর্ণ-ভস্ম দিতে শুধু ভস্ম না ঢালে,—এই সকল দিকে সজাগ দৃষ্টি, সতেজ চিত্ত দাও এবং দেওয়াতে চেষ্টা করো দেখি,—দেশ ধন্যা এবং জননী কৃতার্থা হয়ে যাবেন,—তুমি তো তুমি! ওমা ইন্দু! অনেকখানি বেলা হয়ে গেছে যে মা,—অসমঞ্জকে একটু জলটল খেতে দিয়ে গেলে না?"

অসমঞ্জ মৃদু-স্বরে কি একটুখানি বলিতে গিয়াই থামিয়া গেল। গরীবের ঘরের এই সাত্ত্বিক দানটুকু তাহার যে বড়ই লোভনীয়।

খাবারের আসনের কাছে বসিয়া ইন্দ্রাণী সযত্নে তাহাকে পাখার বাতাস দিতে-দিতে বলিল,—"এবার কিন্তু একদিন তোমার বোনটিকে নিয়ে এসো বাবা! এ তো তোমার দেশ! মধ্যে-মধ্যে এলে-গেলেই হয়।"

অসমঞ্জ অন্তরের সহিত সায় দিয়া কহিল, "আমারও সেই ইচ্ছা। পল্লী-জীবনের মত আরামের জিনিষ কেনই যে আমরা এমন করে ত্যাগ করচি! আমার খুবই সাধ যায় যে, পলা আপনাদের সঙ্গে মিশতে সুযোগ পায়।"

কিন্তু সে সুযোগ মিলিল না। পাড়াগাঁয়ে যাইবার প্রস্তাবেই উৎপলা শিহরিয়া মুখ ফিরাইল। "বাপ্ রে! তোমার মতন ম্যালেরিয়া জ্বর ঘাড়ে করে নিয়ে এসে, ঘাড়-

মুড় ভেঙ্গে পড়ে থাকি আর কি! ছোড়দার যে দিনকের-দিন কি পছন্দরই শ্রী হচ্চে!"

অসমঞ্জ সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "সেখানে একজনরা আছেন; এত ভদ্র ও শিক্ষিত সেই পরিবারটী যে, সে তোকে কি বল্‌বো। আমার খুব ইচ্ছা, তাদের তুই একবারও অন্ততঃ দেখিস্।"

উৎপলা সকোপ অবজ্ঞায় ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল, "তারাই তোমার মাথা খাচ্চে, বুঝেছি। তা একজনেরই থাক্, আমার শুদ্ধ আর খেয়ে কাজ নেই।"

ভাই-বোনে এখন এম্‌নি করিয়াই আলাপ চলে। একদিন—একদিন কেন এত দিনই, উৎপলা ছিল অসমঞ্জরই ছায়াটুকুরই মত। (ক্রমশঃ)

খাজুরাহো-মন্দির

[শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ]

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ অনাদিকাল হইতে স্বীয় ধর্ম্মপ্রবণতার প্রমাণ স্বরূপ যে সমুদয় চিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছে, দেব-মন্দিরসমূহ তাহাদের অন্যতম। বেদ, উপনিষদাদি ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ যেমন ভারতীয় আর্য্যগণের উচ্চতম ধর্ম্মজ্ঞানের নিদর্শন, ভারত-ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে প্রতিষ্ঠিত মনোহর কারু-কার্য্য-শোভিত দেবমন্দিরগুলিও সেইরূপ তাঁহাদের দেব-ভক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কি উত্তর, কি দক্ষিণ, কি পূর্ব্ব, কি পশ্চিম—যে প্রদেশেই ভ্রমণ করিতে যাও, সর্ব্বত্রই দেবমন্দির, মঠ, আজিও আর্য্য হিন্দুগণের ধার্ম্মিকতার সাক্ষ্য-স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে, দেখিতে পাইবে।

কালের কুটিল গতিতে কত-কত মঠ, মন্দির ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, কত বা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপি এখনও যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহাই হিন্দু-গৌরব-খ্যাপনের পক্ষে যথেষ্ট।

এই সমুদায় মন্দিরের স্থাপত্য-কৌশল এতই সুন্দর যে, তাহা বৈদেশিক পর্য্যটকগণের নিকটে অনেক সময়ে বিস্ময়-জনক বলিয়া বোধ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যখন এই সমুদায় অতি সৌষ্ঠবসম্পন্ন উচ্চ মন্দিরগুলির নির্ম্মাণ-কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তখন স্বতঃই মনে একটা বিস্ময়ের উদ্রেক হয় যে, সেই প্রাচীনকালের নানা অসুবিধার মধ্যে কিরূপে এইরূপ অপূর্ব্ব কলা-কৌশল-শোভিত প্রকাণ্ড মন্দির-সমুদায় প্রস্তুত হইয়াছিল! উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দির, পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির, দাক্ষিণাত্যের নানা মন্দিরসমূহ, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতির দেবমন্দিরসমূহ, বিহারের বৌদ্ধকীর্ত্তি, ইত্যাদির প্রশংসা বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃকও শতমুখে গীত হইয়াছে।

আমরা আজ এই প্রবন্ধে যে মন্দিরগুলির যৎসামান্য পরিচয় প্রদান করিতেছি, সেগুলিও কারুকার্য্য এবং প্রাচীনত্ব হিসাবে অতি উচ্চ স্থান পাইবার উপযুক্ত, সন্দেহ নাই।

এই মন্দিরগুলি স্বাধীন রাজ্য ছত্রপুরের রাজনগর মহকুমার অন্তর্গত খাজুরাহো নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে অবস্থিত। খাজুরাহো গ্রাম ছত্রপুর রাজধানী হইতে ২৭ মাইল পূর্ব্বে। নওগাঁও-সাত্‌না রোডের এমোঠা নামক গ্রাম হইতে খাজুরাহো পর্য্যন্ত একটি পাকা রাস্তা আছে। গ্রামটির লোক-সংখ্যা ১৯১১ সালের গণনা অনুসারে ১২৫৫ জন মাত্র। এখানে প্রতি বৎসর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে একটি মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলা প্রায় এক মাস কাল স্থায়ী; এবং তদুপলক্ষে এখানে নানা স্থান হইতে বহু যাত্রী এবং ব্যবসায়িগণের ভিড় হয়।

প্রাচীন শিলালিপি অনুসারে এই গ্রামের পুরাতন নাম খর্জ্জুর-বাটিকা। চাঁদকবির পৃথ্বীরায় রাসৌতে খর্জ্জুরপুর অথবা খজ্জনপুর নামে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। ইহার এই নামকরণ সম্বন্ধে প্রাচীন প্রবাদ এই যে, অতি পূর্ব্বকালে এই গ্রামের সিংহদ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি স্বর্ণময় খর্জ্জুর-বৃক্ষ স্থাপিত ছিল। এই বৃক্ষ হইতেই ইহার খর্জ্জুর-বাটিকা বা খর্জ্জুরপুর নাম দেওয়া হয়।

এই জন-প্রবাদ মিথ্যা বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। প্রাচীন কালে যে এই স্থান বিশেষরূপ সমৃদ্ধ

ছিল, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং ইহার সেই সৌভাগ্যের দিনে ইহার সিংহদ্বারে হৈম-খর্জ্জুর বৃক্ষদ্বয়ের স্থাপনা আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

এই স্থান পূর্ব্বে জিঝৌতি রাজগণের রাজধানী ছিল। এই জিঝৌতি রাজ্যই বর্ত্তমান বুন্দেলখন্দ। সে সময়ে চন্দেল-বংশীয়গণ এখানে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। ইঁহারা প্রায় তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক গগনের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রগণের একতম রূপে স্বীয় যশোভাতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শৌর্য্য, বীর্য্য এবং পরাক্রমের গাথা তাৎকালিক ভাট-চারণগণের বীণায় উচ্চরবে ধ্বনিত হইত।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ইঁহারা আপন রাজ্যসীমা বর্ত্তমান বুন্দেলখন্দের দিকে বিস্তার করিতে-করিতে একেবারে যমুনাতীর পর্য্যন্ত অধিকার করেন। এইরূপ অনুমিত হয় যে, এই রাজ্যই এখন সেণ্ট্রাল-ইণ্ডিয়া-এজেন্সির অন্তর্গত বর্ত্তমান ছত্রপুর রাজ্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

জেজক-ভুক্তি অথবা জিঝৌতি রাজ্যের প্রধান নগর-গুলির মধ্যে অধুনা ছত্রপুরান্তর্গত খাজুরাহো, হমিরপুর জেলার অধীন মহোবা এবং বান্দা জেলায় অবস্থিত কালঞ্জর প্রাচীন হিন্দু-স্থাপত্যের অপূর্ব্ব নিদর্শনসমূহ বক্ষে ধারণ করিয়াই প্রধানতঃ ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আমরা আজ খাজুরাহোরই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি। এই খাজুরাহো মন্দিরগুলি যে বহু প্রাচীন-কালে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১০২১ খৃঃ অব্দে যখন গজনীর সুলতান মামুদ কালঞ্জর রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন আবুরিহাঁ নামক প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। তিনি স্বীয় পুস্তকে খাজুরাহোকে জিঝৌতির রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ সে সময় এই নগর চন্দেল-বংশীয়গণের রাজধানী ছিল।

১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে ইবন্ বতুতা নামক মুসলমান ঐতিহাসিক এই স্থান পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ইহাকে 'কজুরা' নামে অভিহিত করিয়াছেন; এবং লিখিয়া গিয়াছেন যে, এখানে হিন্দু দেবতাদের অনেক মন্দির আছে। আর এই-সব মান্দরে এক সম্প্রদায়ের যোগী প্রায়শঃই আসিয়া থাকেন। তাঁহারা মন্ত্র-তন্ত্র, ইন্দ্রজাল ইত্যাদিতে এরূপ পারদর্শী যে, অনেক মুসলমান পর্য্যন্ত ঐ সমুদয় বিদ্যা শিখিবার জন্য তাঁহাদের শরণাপন্ন হইতেন।

১৪৯৪—৯৫ খৃষ্টাব্দে যে সময় সিকেন্দর লোদী বাঘেব-খণ্ডের অভিযানের শেষে এই প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন ঐ সকল মন্দিরের অনেকগুলি ধ্বংস করিয়া গিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান অযথার্থ বোধ হয় না।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ সাহেবও তাঁহার 'ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস' নামক পুস্তকে এই খাজুরাহো মন্দিরসমূহের উল্লেখ এবং প্রশংসা করিয়াছেন।

যাহা হউক, এইরূপ অত্যাচার সত্ত্বেও, এখনও এই স্থানে যে সুগঠিত মন্দির-শ্রেণী বিধর্ম্মীদিগের ধ্বংসনীতি এবং কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান আছে, তাহাদের জন্যই খাজুরাহো হিন্দুর এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট আজও বিশেষভাবে সম্মানিত। এই সব মন্দির শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবে প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর মন্দিরের নিম্নেই আসন পাইবার যোগ্য বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের অভিমত। এই মন্দির-শ্রেণীকে পাঁচখণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম এবং মধ্য ভাগ।

প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে ছত্রপুর রাজ্যের বর্ত্তমান অধীশ্বরের পিতামহ মহারাজ প্রতাপ সিংহজি এই মন্দির-গুলির জীর্ণ-সংস্কার করাইয়াছিলেন। যদি তিনি এইরূপ মেরামত না করাইতেন, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে অধিকাংশ বিখ্যাত মন্দিরই ভূমিসাৎ হইয়া যাইত। বর্ত্তমান ছত্রপুরাধীপ শ্রীমন্মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহ বাহাদুরও এই মন্দিরগুলির রক্ষার সম্বন্ধে বিশেষরূপ যত্ন করিয়া থাকেন। ভারতগবর্ণমেণ্টও এই প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষাকল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই মন্দিরসমূহের সংস্কার-সাধনে প্রায় এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। তন্মধ্যে অর্দ্ধেক ছত্রপুর রাজকোষ হইতে, এবং অপরার্দ্ধ ভারতগবর্ণমেণ্ট-ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে আর একটি সদনুষ্ঠানও এখানে করা হইয়াছে। তাহা এই যে, পশ্চিমভাগে জারডাইন মিউজিয়ম (Jardine museum) নামে একটি যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং সেখানে খাজুরাহোতে ইতস্ততঃ প্রাপ্ত নানারূপ প্রস্তরমূর্ত্তি এবং কারুকার্য্য-সমন্বিত প্রস্তরাদি সংগৃহীত হইয়া সুশৃঙ্খল ভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

এইসব প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষার উদ্যোগ পুনরায় পূর্ণ উদ্যমে আরম্ভ হইয়াছে; এবং পুরাতত্ত্ব-বিভাগীয় ডাইরেক্টর জেন্যরেল মহোদয়ের পরামর্শ ক্রমে একজন প্রত্নতত্ত্ববিশারদ এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা ব্যয় সম্বন্ধে মোটামুটি যে আন্দাজ করিয়াছেন, তাহাতে এই কার্য্যে কুড়ি হাজার টাকার বেশী খরচ হইবার সম্ভাবনা। ইহার মধ্যে অর্দ্ধেক গবর্ণমেন্ট দিবেন; অপরার্দ্ধ ছত্রপুর রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে।

এই সকল মন্দিরের অধিকাংশই খৃঃ অব্দ ৯৫০ হইতে ১০৫৯এর মধ্যে নির্ম্মিত বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মধ্যভাগের ব্রহ্মাজির মন্দির এবং ঘণ্টাইএর মন্দির ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে প্রস্তুত বলিয়া সকলে মনে করেন। আর পশ্চিমভাগের চৌষট্টিযোগিনীর মন্দির এতদপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। এই মন্দিরটি প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।

মূর্ত্তিধ্বংসকারী বিধর্ম্মিগণের হস্তে এই শ্রেণীর অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প-কৌশলসম্পন্ন মন্দিরগুলির অধিকাংশেরই শোভা-সম্পদের অনেক হানি হইলেও, সৌভাগ্যক্রমে অন্যান্য অনেক স্থানের এইরূপ মন্দিরের দুর্দ্দশার তুলনায় এগুলির ক্ষতি তেমন বেশী হইতে পারে নাই। ইহাদের গঠন-সৌন্দর্য্য প্রায় পূর্ব্ববৎ অব্যাহতই আছে। ইহাদের মধ্যে পশ্চিম-ভাগাবস্থিত লক্ষ্মণের মূর্ত্তি এবং চিত্রগুপ্তের মূর্ত্তি, আর উত্তরভাগস্থ বিষ্ণুমূর্ত্তি বিধর্ম্মী সংস্পর্শ-দোষে অপবিত্র হইয়া যাওয়াতে, আজকাল ইহাদের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত দেব-মূর্ত্তিগুলি পূজার্হ বলিয়া বিবেচিত হয় না।

উপরে এই মন্দির-শ্রেণীকে যে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে মধ্যভাগে ব্রহ্মাজি এবং ঘণ্টাইএর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঘণ্টাইএর মন্দিরে যে মনোহর প্রস্তর-স্তম্ভ শ্রেণী আছে, তাহাতে ঘণ্টাসমূহ উৎকীর্ণ থাকায়, উহাকে ঘণ্টাইএর মন্দির বলা হয়।

বালুকা-প্রস্তর-নির্ম্মিত সুন্দর স্তম্ভ-শ্রেণীর গাত্রে ঐ ঘণ্টাগুলির সুগঠিত আকৃতি সহজেই দর্শকগণের প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। যতদূর জানা যায়, তাহাতে অনুমান হয়, খাজুরাহো মন্দির-শ্রেণীর মধ্যে এইটিই এক-মাত্র বৌদ্ধ-মন্দির।

উত্তরভাগে বান্‌দেব এবং বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। এই বিষ্ণু-মন্দিরটি যবের ক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপিত বলিয়া, লোকে উহাকে 'যবারি' অথবা 'যবান' বলে।

পূর্ব্বভাগে জৈনদিগের মন্দির। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত। ইহাদের মধ্যে পার্শ্বনাথ অথবা জিননাথের মন্দিরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই মন্দির-গাত্রে যে প্রস্তর-লিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ইহা যশোবর্ম্মন্ দেবের পুত্র রাজা বঙ্গের সহায়তা এবং উৎসাহে ৯৫৫—১০০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ভিন্‌সেন্ট স্মিথ সাহেবের ইতিহাসেও ইহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-প্রণালী একটু অসাধারণ। ইহা একটি আয়ত-ক্ষেত্রের আকারে গঠিত। সম্মুখে উচ্চ স্তম্ভ-শোভিত বিস্তৃত দরদালান, তৎপরে কক্ষদ্বার এবং পবিত্র দেববেদী।

দক্ষিণ অংশে অতীব মনোরম দুইটি মন্দির। একটির নাম দুলহাদেব, বা নীলকণ্ঠ অথবা কুমার মঠ; অপরটি চতুর্ভুজ জাতকরা (?)।

পশ্চিম অংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠাপন্ন। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছয়টির নাম ও চিত্র-পরিচয় নিম্নে লিখিতেছি :—

১। মাতঙ্গেশ্বর; ২। চতুর্ভুজ; ৩। বিশ্বনাথ; ৪। খান্দর্য্য; ৫। চিত্রগুপ্ত; ৬। দেবীজি (খান্দর্য্যের সম্মুখ দৃশ্যের সহিত দেবীজির মন্দির-চিত্র একত্রই তোলা হইয়াছে); আর একখানি চিত্রে শিব, চতুর্ভুজ এবং বরাহ-মন্দিরের একটা সাধারণ দৃশ্য দেখান হইয়াছে।

ধর্ম্মের দিক হইতে দেখিতে গেলে, মাতঙ্গেশ্বরই আজ কাল শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। শিবরাত্রির দিবস এই মন্দিরে পূজানুষ্ঠান হইয়া থাকে; এবং এই দিন মহারাজ বাহাদুর সদলে শোভা-যাত্রা করিয়া, খাজুরাহো প্রাসাদ হইতে এই মন্দিরে পূজা দিতে গমন করিয়া থাকেন। এই শিব-রাত্রির দিন হইতেই খাজুরাহো মেলার আরম্ভ হইয়া থাকে।

মাতঙ্গেশ্বরের মূর্ত্তিটি সুবৃহৎ; এবং ইহার গাত্রে অনেক লেখা দেখা যায়। তাহাদের অধিকাংশই দেবনাগরী অক্ষরে। তবে আরবী অক্ষরের লেখাও একটা আছে।

খান্দর্য্য মহাদেবের মন্দিরের গঠনটি একটু নূতন ধরণের। ইহাতে দেবতার স্থান মন্দিরটির প্রস্থভাগ

খান্দর্যা মন্দির (সম্মুখভাগ)
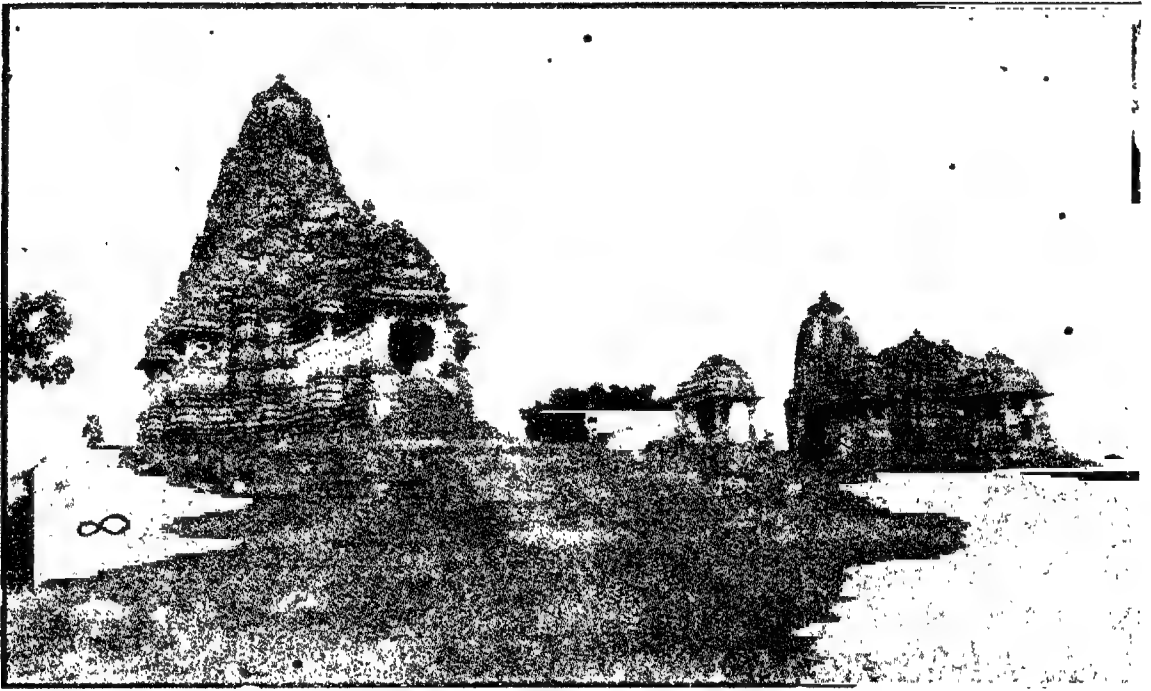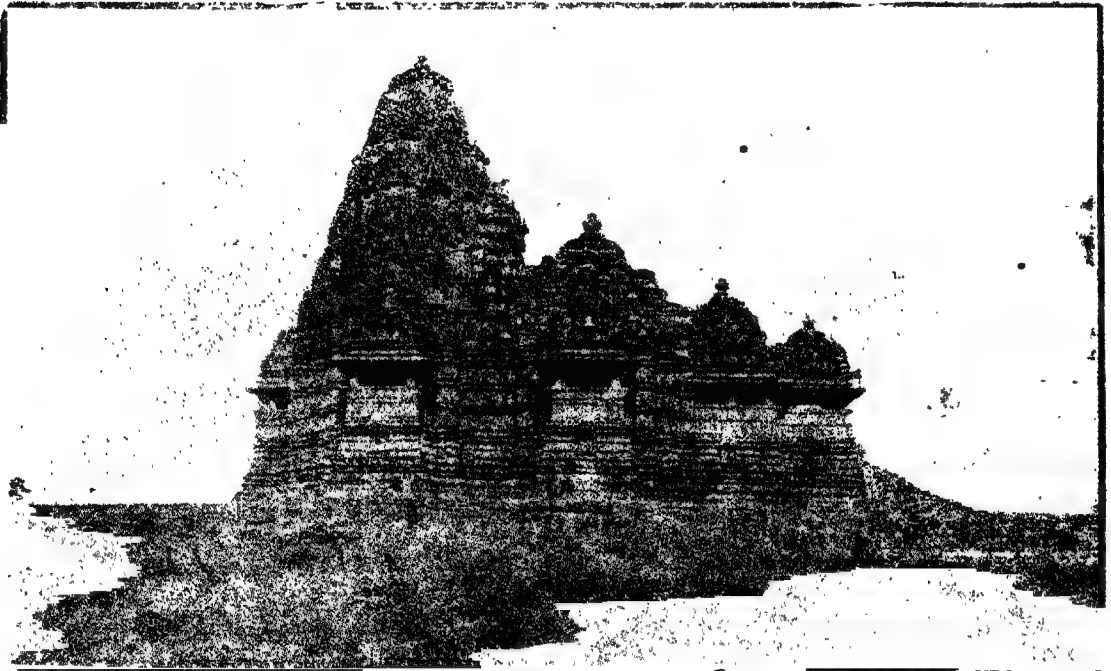
খান্দর্যা মন্দির (পার্শ্বের দৃশ্য)
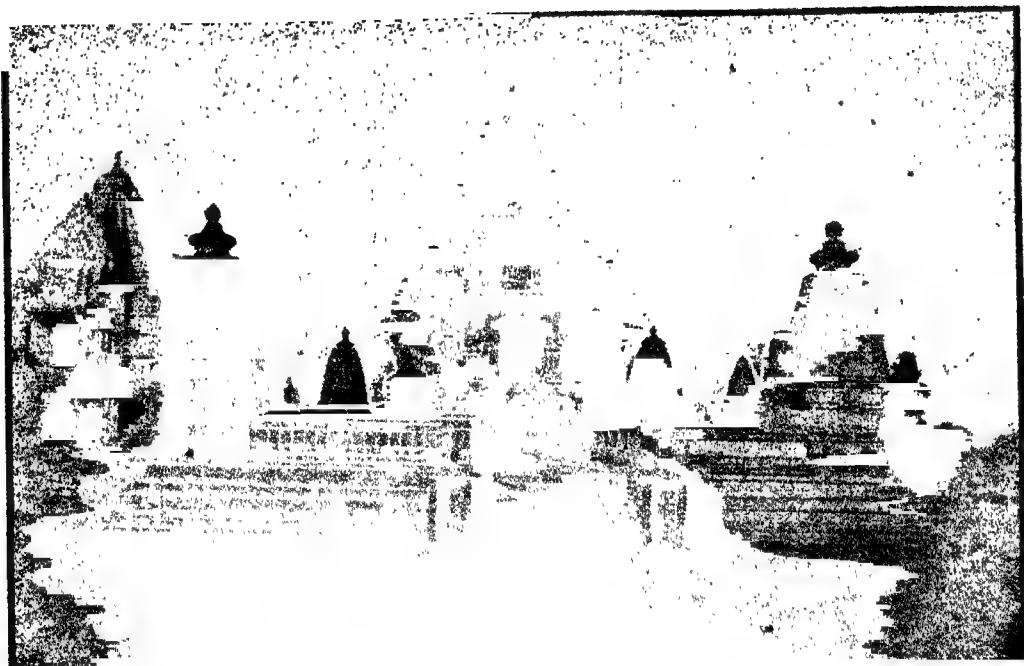
চতুর্ভুজ মন্দির
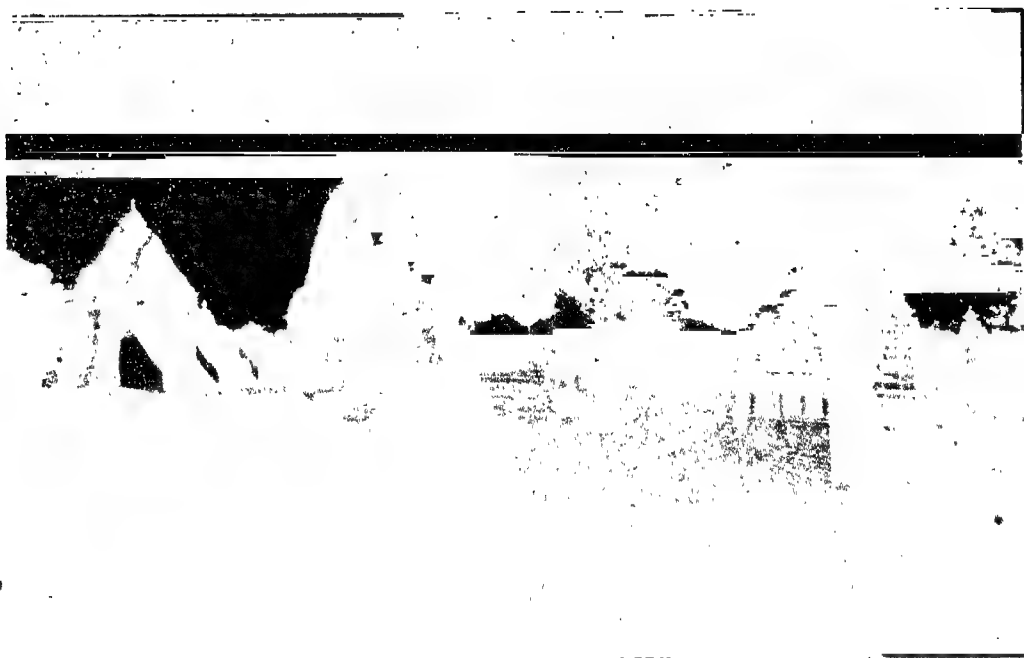
দেবীজি মন্দির

খাজুরাহো মন্দির

মতঙ্গেশ্বর বা মৃত্যুঞ্জয় মন্দির
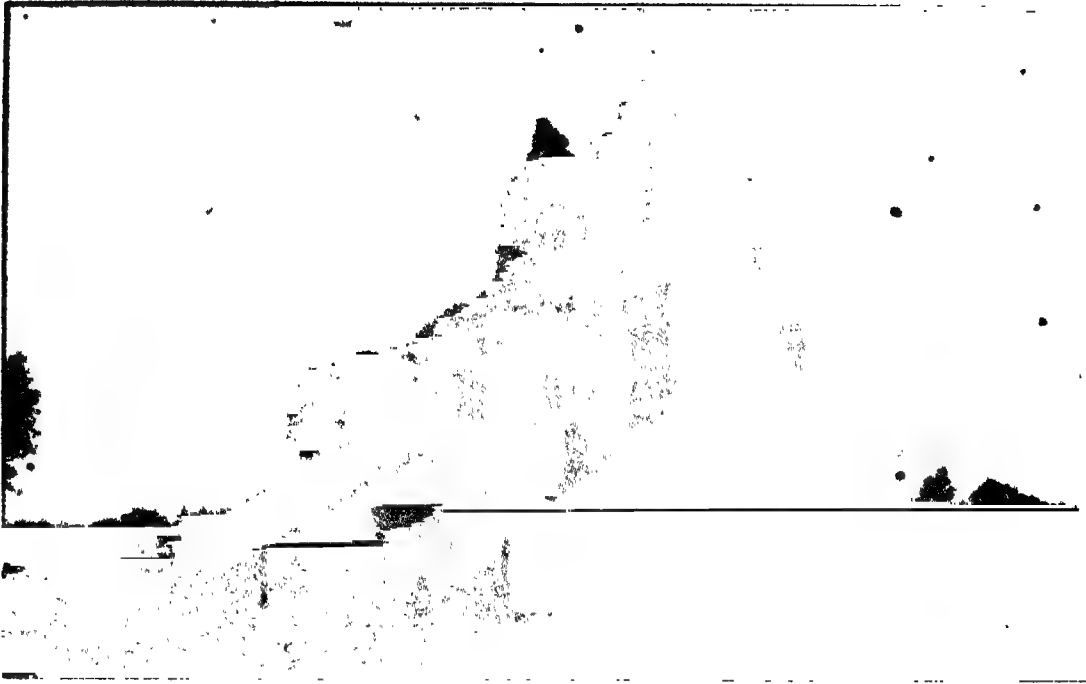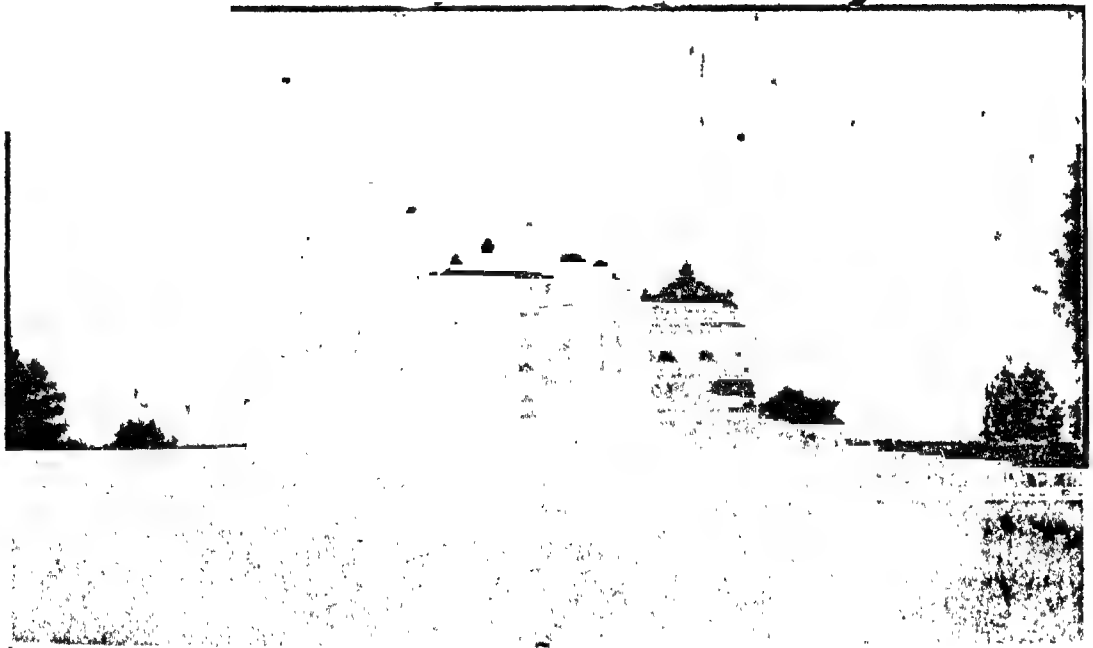
চিত্রগুপ্ত মন্দির
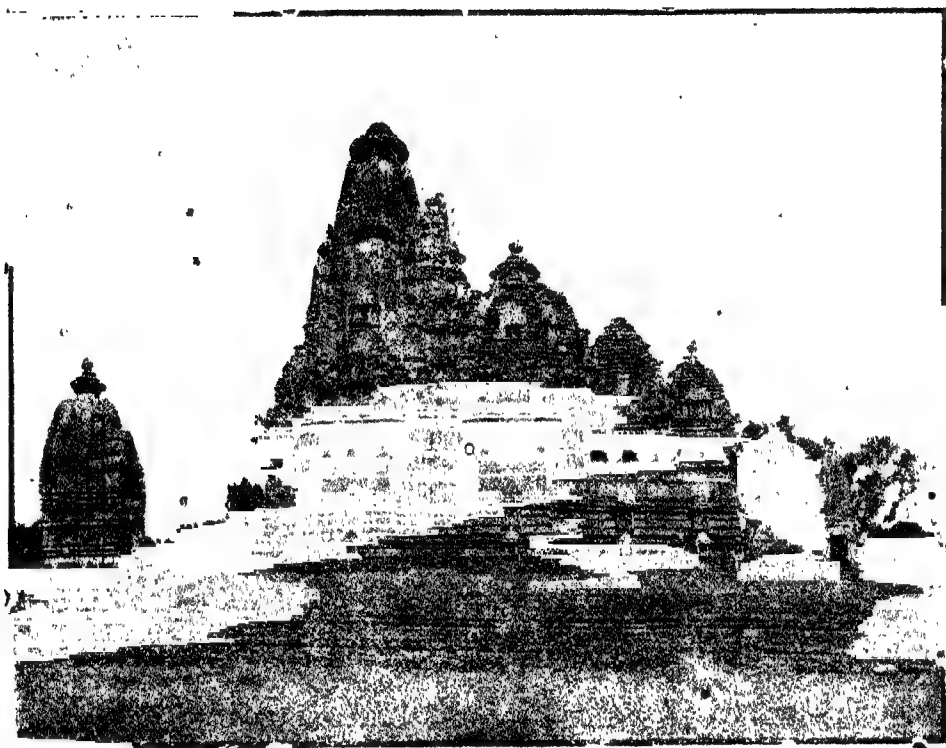
বিশ্বনাথ মন্দির

সম্পূর্ণ অধিকার করে নাই। মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে পরিক্রমার জন্য দেবস্থানের চারিদিকে পথ রাখা হইয়াছে। এই পথ আলোকিত রাখিবার জন্য মন্দিরের বাহিরের দিকের দেওয়ালে তিনটি চাঁদনি রাখা হইয়াছে। এতদ্দারা মন্দিরটিকে দোহারা ত্রিশূলের আকৃতিতে পরিণত করা হইয়াছে।

চৌষট্টি যোগিনী এবং ঘণ্টাইএর মন্দির ব্যতীত আর সকল মন্দিরের গঠন-প্রণালী একই ধরণের, এবং এগুলি সবই বালুকাপ্রস্তরে নির্ম্মিত। এমন কি, জৈন মন্দির-গুলিতেও ঐ ধর্ম্মের বিশেষ-বিশেষ লক্ষণগুলির কোনটিই দেখিতে পাওয়া যায় না।

জৈনমন্দিরগুলির অলিন্দ বা প্রকোষ্ঠ অপেক্ষা চূড়ার প্রয়োজনীয়তাই অধিক; আর উহাতে অঙ্গন এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে ছোট-ছোট কুঠরীও দেখা যায় না। বড়-বড় গম্বুজও ঐসব মন্দিরে নাই। বাহিরের দিক হইতে দেখিলে এগুলি ঠিক হিন্দু-মন্দিরের মতই প্রতীয়মান হয়।

চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় বালুকা-প্রস্তরে নির্ম্মিত নহে,—স্ফটিক-প্রস্তর বিশেষ (বিল্লোরি প্রস্তর gneiss) দ্বারা নির্ম্মিত।

ঘণ্টাই মন্দিরের স্তম্ভগুলি বালুকা-প্রস্তরের, কিন্তু ইহার দেওয়ালগুলি ঐ বিল্লোরী (gneiss) প্রস্তর-গঠিত। গঠন সম্পূর্ণ সাদাসিদা ধরণের। এ স্থানে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রবন্ধের উপাদান প্রধানতঃ এলাহাবাদ হইতে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে প্রকাশিত সাপ্তাহিক U. P. Journal নামক পত্র হইতে সংগৃহীত হইল। আর ফটোগ্রাফগুলি সংগ্রহ করিয়া দিবার পক্ষে ঐ পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ যোগী বি-এ মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

কন্যাকুমারী

[শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি-এল্]

"যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই কবি-বাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায় যাহাই হউক, সংসার-ক্ষেত্রে মানুষের অনেক বাসনাই অপূর্ণ থাকিতে দেখা যায়। বিশেষতঃ দেশ-ভ্রমণ সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই অবস্থা—

"ইচ্ছা সম্যক্ দেশ-ভ্রমণে, কিন্তু পাথেয়ো নাস্তি।"

এবং পাথেয়ের ভাবনা না থাকিলেও,

"পায়ে শিকলি, মনে উড়ু-উড়ু—এ কি দৈবের শাস্তি।"

মান্দ্রাজে আসিয়া অবধি ভারতবর্ষের সর্ব্বদক্ষিণ কোণে অবস্থিত কন্যাকুমারী তীর্থ দর্শন করিবার জন্য আমার মনে খুব একটা আগ্রহ ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ দেশটা বুঝাইবার জন্য বক্তৃতার মুখে যখন-তখন "হিমালয় হইতে কুমারিকা" বলা হয়। হিমালয়ের অন্ততঃ একটি অংশ—দার্জ্জিলিঙ—বাঙ্গালাদেশের অঙ্গীভূত। কিন্তু সুদূর কুমারিকা দেখিবার সুযোগ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? এই স্থান ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত। গত বৎসর কার্য্য-ব্যপদেশে ত্রিবন্দ্রমে আসিয়াও কন্যাকুমারী যাইতে পারি নাই। এবার সেই সাধ পূর্ণ হইয়াছে।

মান্দ্রাজ এগ্‌মোর-ষ্টেশন

কন্যাকুমারী কোন রেলওয়ে লাইনের নিকটে নহে। মান্দ্রাজ হইতে তিনেভেলি (৪৪৩ মাইল) সাউথ-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের গাড়ীতে যাইতে হয়; সেখান হইতে কন্যাকুমারী ৬২ মাইল। মান্দ্রাজ (এগ্‌মোর ষ্টেশন) হইতে 'ত্রিবন্দ্রম-এক্সপ্রেস্" নামক একখানি ট্রেণ মাদুরা-তিনেভেলি-কুইলন হইয়া ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবন্দ্রম যায়। এই ট্রেণ অপরাহ্ণ ৩॥০টায় এগ্‌মোর ছাড়ে। কিন্তু রাত্রি ৮ টায় "সিলোন বোট-মেলে" রওনা হইলেও, পরদিন দ্বিপ্রহরে মাদুরা জংসনে ঐ 'এক্সপ্রেস্' ধরা যায়। সুতরাং 'বোট-মেলে' যাওয়াই সুবিধা। ২৩শে শ্রাবণ রবিবার এগ্‌মোর ষ্টেশন হইতে 'বোট-মেলে' রওনা হইয়া, পরদিন সন্ধ্যা ৬টায় 'তিনেভেলি-ব্রিজ' ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। মাদুরায় গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

(২)

তিনেভেলি তাম্রপর্ণী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। অপর পারে, প্রায় দুইমাইল দূরে; জিলার প্রধান সহর (হেড্-কোয়ার্টার্স) পালামকোটা। একটি প্রশস্ত সেতু দ্বারা দুইটি নগর সংযুক্ত। সেইজন্য এই ষ্টেশনের নাম "তিনেভেলি-ব্রিজ"। সরকারী আফিস-আদালত, ডাক-বাংলা সমস্তই পালামকোটা সহরে; কেবল "হিন্দু কলেজ"টি নদীর এপারে—রেল-ষ্টেশনের নিকটে। হিন্দু যাত্রিগণের জন্য ষ্টেশনের কাছেই একটি "সত্র" আছে। সেতু পার হইয়া পালামকোটায় আমার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে উপস্থিত হইলাম।

তাম্রপর্ণী নদীর সেতু ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সুলোচন মুদালিয়ার নামক একজন তিনেভেলিবাসীর অর্থে নির্ম্মিত

হয়। সুলোচন ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর আমলে স্থানীয় কালেক্‌টারীর নায়েব-সেরেস্তাদার ছিলেন। এই সেতু-নির্ম্মাণ-কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট নানা রূপে সহায়তা করিয়াছিলেন; তথাপি ইহাতে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। সেতুটি প্রায় ৩১০ গজ দীর্ঘ। উত্তর-সীমায় পথি-পার্শ্বে ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী কর্তৃক স্থাপিত একটি প্রস্তর-স্তম্ভ সুলোচনের বদান্যতার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

তাম্রপর্ণী প্রাচীন পাণ্ড্যদেশের সুপ্রসিদ্ধ নদী। রামায়ণ-মহাভারতেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়। "তাম্রপর্ণী-মাহাত্ম্য" নামক এতদঞ্চলে প্রচলিত একখানি উপপুরাণে এই নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে উপাখ্যান আছে, তাহা এইরূপ—
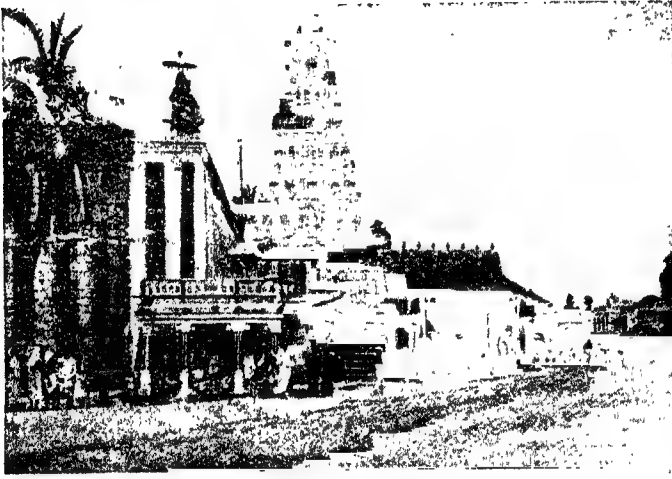
তিনেভেলির মন্দির

পুরাকালে হর-পার্ব্বতীর বিবাহোৎসব উপলক্ষে সমস্ত দেববৃন্দ কৈলাসে সমবেত হইলে, পৃথিবীর ভারের সামঞ্জস্য রক্ষায় জন্য মহামুনি অগস্ত্যকে দক্ষিণে প্রেরণ করা আবশ্যক হয়। অগস্ত্য একগাছি পদ্মফুলের মালা সঙ্গে করিয়া দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছিলেন। এই পদ্মমালা, ফুটন্ত পদ্মের মত সুন্দর এক কন্যার মূর্ত্তি গ্রহণ করে। বিবাহের পরে দেব-দম্পতী পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালায় অগস্ত্য-শিখরে আসিয়া অগস্ত্যকে দর্শন দেন। তখন, তাঁহাদের আদেশে, সেই দিব্যলাবণ্যসম্পন্না তরুণী সহসা রূপান্তরিত হইয়া একটি স্রোতস্বিনী হয়। উহারই নাম তাম্রপর্ণী। অগস্ত্যমুনি এই নদীর তীরে-তীরে অনেকগুলি তীর্থ প্রতিষ্ঠিত করেন।

অগস্ত্য ঋষির সহিত তাম্রপর্ণী নদীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রামায়ণেও সূচিত হইয়াছে। সুগ্রীব সীতান্বেষণে নিযুক্ত দক্ষিণ-যাত্রী বানরদিগকে বলিয়াছিলেন—"সেই মলয়পর্ব্বতের অগ্রভাগে সমাসীন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে দর্শন করিবে। মহাত্মা অগস্ত্য প্রসন্ন হইলে, তাঁহার আজ্ঞানুসারে গ্রাহকুল-সমাকুলা মহানদী তাম্রপর্ণী উত্তীর্ণ হইবে।" [কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৪১ সর্গ।]

রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে কালিদাস লিখিয়াছেন যে, দক্ষিণ দিকে পাণ্ড্যরাজগণ রঘুর প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে তাম্রপর্ণী-সমুদ্রসঙ্গমের মুক্তা দান করিয়াছিলেন। তাম্রপর্ণী পূর্ব্ববাহিনী হইয়া মান্নার উপসাগরে আসিয়া মিশিয়াছে। এই উপসাগর বহু-প্রাচীন-কাল হইতে মুক্তার জন্য বিখ্যাত। এখন মুক্তা দুর্লভ হইলেও, এই সাগর হইতে প্রচুর পরিমাণে শঙ্খ উত্তোলিত হইয়া দেশ-বিদেশে প্রেরিত হয়। যে কুন্দেন্দু-ধবল শঙ্খ-বলয় বঙ্গ-লক্ষ্মীদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, উহার উপাদান এই সুদূর দক্ষিণ হইতে সংগৃহীত হয়। কিন্তু এ দেশের রমণীগণ শঙ্খাভরণ ধারণ করেন না। "চৈতন্য-চরিতামৃতে" লিখিত আছে, "দক্ষিণ মথুরা" অর্থাৎ মাদুরা হইতে

পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী আইলা গৌরহরি।
তাম্রপর্ণী স্নান করি' তাম্রপর্ণী তীরে
'নয়ত্রিপদী' দেখি বুলে কুতূহলে।
"শ্রীবৈকুণ্ঠে" বিষ্ণু আসি কৈল দরশন।

এই তিনটি দেব-স্থানই তিনেভেলির পূর্ব্ব-দক্ষিণে তাম্রপর্ণী নদীতীরে অবস্থিত। 'নয়ত্রিপদী'র বর্ত্তমান নাম "আলোয়ার তিরু নগরী"। এই নগরের আশেপাশে নয়টি বিষ্ণুমন্দির আছে। পর্ব্বোপলক্ষে এই নয়টি মন্দিরের 'তিরু-পতি' অর্থাৎ বিষ্ণু-বিগ্রহ এখানে একত্র করা হয়। সেইজন্য ইহার অন্য নাম 'নব-তিরুপতি'। (১) এই নগরের ৪ মাইল দূরে তাম্রপর্ণীর অপর তীরে শ্রীবৈকুণ্ঠম্।

(৩)

'তিনেভেলি' সংস্কৃত 'তৃণবল্লীর' প্রাকৃত রূপ নহে। তামিল "তিরু-নেল-ভেলী" ('পবিত্র ধানের বেড়া') সংক্ষেপে

(১) বিষ্ণুর 'তিরুপতি' নাম দ্রাবিড় দেশে খুব প্রচলিত। 'তিরু' সংস্কৃত 'শ্রী'র অপভ্রংশ। তিরুপতি = শ্রীপতি।

তিনেভেলি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নগরটির এক সীমায় নদী এবং অন্য সকল দিকেই ধান্যক্ষেত্র :—সেইজন্য ইহার এইরূপ নামকরণ অসম্ভব নহে। কিন্তু কিম্বদন্তী অনুসারে এই নামের মধ্যে একটা অলৌকিক ঘটনার ইতিহাস রহিয়াছে।

বহুকাল পূর্ব্বে বেদশর্ম্মা নামক একজন শিবভক্ত ব্রাহ্মণ এই স্থানে বাস করিতেন। তিনি প্রত্যহ মাঠ হইতে ধান কুড়াইয়া আনিয়া তদ্দ্বারা শিবপূজা করিতেন। একদিন ব্রাহ্মণ বহু পরিশ্রমেও এক মুষ্টির অধিক ধান্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। এই ধান্যমুষ্টি নদীতীরে রাখিয়া যেমন তিনি স্নান করিতে জলে নামিয়াছেন, অমনি প্রবল বেগে ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়া দেখেন, সেই ধান্যমুষ্টি ঘিরিয়া সহসা প্রাচীরের ন্যায় গুল্মের সারি জন্মিয়াছে। সেই জন্য ঐ ধান বৃষ্টির জলে ভাসিয়া যায় নাই; এবং ধানের উপরেও এক ফোঁটা জল পড়ে নাই। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, স্বয়ং ভগবান্ গাছের বেড়ার সৃষ্টি করিয়া, ঐ ধান্যমুষ্টি রক্ষা করিয়াছেন। সেই হইতে এই স্থানের নাম হইল—"তিরু-নেল-ভেলি।"

দাক্ষিণ-ত্রিবাঙ্কুরের পল্লী-দৃশ্য

তিনেভেলি ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষের সর্ব্ব-দক্ষিণ জেলা। ইহার একদিকে মান্নার উপসাগর; অন্যদিকে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য। এই জেলায় দেশীয় খ্রীষ্টানের সংখ্যা খুব বেশী,—শতকরা ১০ জন। এত খৃষ্টান বোধ হয় ভারতবর্ষের অন্য কোন জিলায় নাই। পালামকোটায় মিশনারীদের পরিচালিত ২টি স্কুল, একটি বড় কলেজ, বালিকাদের জন্য কলেজ, অন্ধ বিদ্যালয় ও মূক-বধির আশ্রম দেখিলাম। এই সহরে একটি শিব-মন্দির ও একটি বিষ্ণু-মন্দির আছে। এক সময়ে এখানে একটি দুর্গ (তামিল ভাষায় "কোটা") ছিল। একটি প্রাচীরের ভগ্নাংশ উহার সাক্ষী স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। সহরের এক সীমায় "হাই-গ্রাউণ্ড" নামক বিস্তৃত ময়দান। উহাই সান্ধ্য-ভ্রমণের প্রকৃষ্ট স্থান।

তিনেভেলির 'হিন্দু কলেজের' উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। ইহা একটি দ্বিতীয়-শ্রেণীর কলেজ। গত-পূর্ব্ব বৎসর (১৩২৬ সনে) একজন বাঙ্গালী ইহার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। তিনি যখন প্রথম তিনেভেলি আসিয়াছিলেন, তখন মান্দ্রাজে অতি অল্প সময়ের জন্য আমার সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। এগ্‌মোর ষ্টেশনের সম্মুখবর্ত্তী পথের অপর পারে একটা বাড়ীর বহির্দ্বারে বাঙ্গালীর নাম দেখিয়া কৌতূহলবশতঃ তিনি খোঁজ লইতে আসেন। কিন্তু তখন ট্রেণের সময় বেশী বাকি ছিল না;—সুতরাং অতি সংক্ষেপেই আলাপ শেষ করিতে হয়। "সম্বন্ধমাভাষণপূর্ব্বমাহুঃ" সেই সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া আমি—পালামকোটায় তাঁহাকে খুঁজিয়া লইলাম। এই বাঙ্গালী-বর্জ্জিত দেশে তিনি আমাকে শুধু অতিথি নহে—পুরাতন বন্ধু রূপে গ্রহণ করিলেন।

তিনি এখানে সপরিবারে বাস করিতেছেন। সুতরাং এই সুদূর তামিল দেশেও আমি বাঙ্গালার নিজস্ব মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জনাদির শ্রেষ্ঠতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। এখানকার সাধারণ লোক তামিল ভিন্ন অন্য কোন ভাষা বুঝে না। দেখিলাম, অধ্যক্ষ মহাশয়ের বালিকা কন্যা অল্প দিনের মধ্যেই কাজ চালাইবার মত তামিল ভাষা শিখিয়া লইয়াছে;—সে-ই দোভাষীর কাজ করিয়া দেয়। এদেশের ভাষা প্রসঙ্গে সে বলিল—কেমন অদ্ভুত দেশ! এরা চোখকে বলে "কাণ"

আর নাককে বলে "মুখ!" তামিল ভাষায় আমার নিজের দখল—"পো" যাও, "ইল্লে" না, এবং "তেরিমা?" বুঝে, এই পর্য্যন্ত।

বসু মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া তিনেভেলির প্রাচীন শিবমন্দির দেখিতে গেলাম। এই বৃহৎ মন্দিরের চারিদিকেই রাজ-পথ। মন্দিরটি দুই খণ্ডে বিভক্ত; এক খণ্ডে মহাদেব ও অন্য খণ্ডে দেবী-মূর্ত্তি স্থাপিত। দেবতার নাম "নেলি-আপ্পা"—অর্থাৎ ধান্যেশ্বর—সংস্কৃতে "ব্রীহি বৃতেশ্বর"। তিনেভেলি নাম সংক্রান্ত কিম্বদন্তী হইতেই এই নামের সার্থকতা বুঝা যাইবে। দেবীর নাম "কান্তিমতী।" দ্রাবিড় দেশের বড়-

কন্যাকুমারী—সমুদ্রতীর

বড় দেবমন্দিরের "গোপুরম" (উচ্চচূড় তোরণ), ধ্বজস্তম্ভ "মণ্ডপম্" (নাট-মন্দির), "তেপা-কুলম্" (জল-বিহারের পুষ্করিণী) প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গই এই মন্দিরে আছে। অধিকন্তু, শিব-মন্দিরের এক কোণে "কৈলাস" নামক কৃত্রিম পাহাড়, ও মন্দির-সংলগ্ন "বসন্ত-উদ্যান" নামক একটি উদ্যান দেখিলাম। একটি গৃহে "শুভ্রমণ্যম্" অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের সুন্দর মূর্ত্তি শিল্প-নৈপুণ্যের নিদর্শন,—ময়ূরের উপর উপবিষ্ট কার্ত্তিকেয় একখণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তর খুদিয়া তৈরী হইয়াছে। মন্দিরের প্রাচীরে অনেকগুলি অনুশাসন উৎকীর্ণ আছে—সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন লিপি ৯৫০ খৃষ্টাব্দে খোদিত। এই মন্দিরের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে বার্ষিক ১৮ হাজার টাকা বৃত্তি মঞ্জুর আছে। ইহা ছাড়া অন্য আয়ও যথেষ্ট।

(৪)

দুই দিন পালামকোটায় অবস্থান করিয়া, বৃহস্পতিবার প্রাতে ৮টায় মোটর গাড়ীতে নাগেরবাইল রওনা হইলাম। নাগেরবাইল ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত—তিনেভেলি হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণে। রেলওয়ে বিস্তারের পূর্ব্বে এই পথেই ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবন্দ্রমে যাইতে হইত। এখন রেলওয়ে লাইন পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া পশ্চিম উপকূলে কুইলন—এবং সেখান হইতে ৪৫ মাইল দক্ষিণে ত্রিবন্দ্রম পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। ত্রিবন্দ্রম হইতে নাগেরবাইল ৪৩ মাইল। নাগেরবাইলের ১২ মাইল দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ বা 'কন্যা-কুমারী।' তিনেভেলি ও ত্রিবন্দ্রম, এই উভয় স্থান হইতেই প্রত্যহ দুইবার যাত্রী লইয়া মোটর-বাস্ নাগেরবাইল পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। ভাড়া তিনেভেলি হইতে ২৷৹ ও ত্রিবন্দ্রম হইতে ১৷৹ মাত্র। ইহাতে কন্যাকুমারীর পথ অনেকটা সুগম হইয়াছে। অদূর-ভবিষ্যতে কন্যাকুমারী রেলওয়ে লাইন দ্বারা ত্রিবন্দ্রমের সহিত সংযুক্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

তিনেভেলি হইতে নাগেরবাইল অভিমুখে রাজপথ ক্রমাগত প্রান্তরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। পথের দুইধারে ছায়া-সমন্বিত বৃক্ষ-শ্রেণী। মাঠে ইতস্ততঃ অগণ্য তালগাছ। পালামকোটা হইতে ১৯ মাইল আসিয়া আমরা নাঙ্গানুরী নামক একটি গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হইলাম। এখানকার বিষ্ণু-মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। ইহার নাম "তোতাদ্রি মঠ।" এই মঠ 'তেন কানাই' বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ। গবর্ণমেণ্ট এই মঠের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বার্ষিক ৮৭০০ টাকা বৃত্তি দান করেন। এই মঠের মহান্তের অধীনে ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রায় দুইশত মঠ আছে।

নাঙ্গানুরীর ১৪ মাইল দক্ষিণে পানাগুড়ি। এখানে একটি পুরাতন শিব-মন্দির দেখিলাম। দেবতার নাম রামলিঙ্গ স্বামী। মন্দিরটি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে স্থাপিত। শিব-মন্দিরের অঙ্গনে একটি ক্ষুদ্র বিষ্ণু-মন্দিরও আছে। চৈতন্য চরিতামৃতে পানাগুড়ির উল্লেখ দেখিয়া জানা যায়, মহাপ্রভু

এই পথেই কন্যাকুমারী গিয়াছিলেন। পথের ধারে মাঝে-মাঝে যে সকল গ্রাম দেখিলাম, তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই শিব-মন্দির আছে।

আমাদের পথ ক্রমশঃই ডা'ন দিকের পশ্চিম ঘাট বা মলয়-পর্ব্বতমালার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। পানাগুড়ির ৭ মাইল দক্ষিণে, প্রায় দুই মাইল প্রশস্ত "আরামবলি পাস্" নামক গিরিপথে পৌছিলাম। এই স্থান হইতে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের আরম্ভ। আরামবলির শুল্ক-(Customs) আফিসে আমাদিগকে গাড়ী থামাইয়া নাম-ধাম ইত্যাদি লিখাইয়া দিতে হইল। মাইল দুই পরে, পথের পার্শ্বে এক স্থানে ছোট একটি পাহাড়ের উপর 'শুভ্রমণ্য' অর্থাৎ কার্ত্তিকের ক্ষুদ্র একটি মন্দির দেখিলাম। এই গ্রামের নাম শুনিলাম "তোবালা" বা "তোবালে।" চৈতন্যচরিতামৃতে, চৈতন্যদেবের দক্ষিণ দেশ তীর্থভ্রমণ প্রসঙ্গে

"তমাল কার্ত্তিক দেখি আইলা বাতাপানি
রঘুনাথ দেখি তাহাঁ বঞ্চিলা রজনী ॥"

পাঠ করিয়া, বাতাপানি যে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের "ভূতাপাণ্ডি" নামক স্থান, তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু "তমাল কার্ত্তিক" দ্বারা কি নির্দেশ করা হইয়াছে, বুঝিতে পারি নাই। এখন মনে হইল, উহা এই "তোবালার" কার্ত্তিক। ভূতাপাণ্ডি গ্রাম তোবালা-তালুকের অন্তর্গত; এবং "ভূতনাথ স্বামীর" মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। আশা করি, এই প্রত্ন-তত্ত্বানুরাগের দিনে কোন যোগ্য ব্যক্তি দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিয়া চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত তীর্থগুলি খুঁজিয়া বাহির করিবেন।

(৫)

আরামবলি হইতে নাগেরবাইল ৮ মাইল পথ। বেলা দ্বিপ্রহরে আমরা নাগেরবাইল পৌছিলাম। লোক-সংখ্যার হিসাবে, একমাত্র রাজধানী ত্রিবন্দ্রম ব্যতীত ইহাই ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সহর। একজন ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ এখানে অধিষ্ঠান করেন। নাগেরবাইল খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের একটি প্রধান কার্য্যক্ষেত্র; ইহার চারিদিকে বহু খৃষ্টানের বাস। ত্রিবাঙ্কুরের প্রথম ইংরাজী স্কুল মিশনারীগণ কর্ত্তৃক ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই সহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন উহা দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ-আকারে বিদ্যমান। ত্রিবাঙ্কুরের প্রথম মুদ্রা-যন্ত্রও তাঁহারা নাগেরবাইলে স্থাপন করেন; এবং প্রধান সংবাদপত্রও এখান হইতে প্রকাশিত হয়। এই হিসাবে ইহাকে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের "শ্রীরামপুর" বলা চলে। এই নগরে নাগরাজ অনন্তের একটি মন্দির আছে। সেইজন্য ইহার নাম নাগেরবাইল অর্থাৎ নাগ-মন্দির। লোকের বিশ্বাস, এই দেবতার অনুগ্রহে মন্দিরের এক মাইলের মধ্যে কাহারও সর্প-দংশনে মৃত্যু হইবার আশঙ্কা নাই।

"পান্থ-আশ্রম" বা ডাক-বাংলায় মধ্যাহ্ন যাপন করিয়া বিকালবেলা কন্যাকুমারী যাত্রা করিলাম। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে প্রবেশ করিবার পর হইতেই, পথি-পার্শ্বের প্রান্তররাজির এক নবীন শ্রী লক্ষ্য করিতেছিলাম; নাগেরবাইলের দক্ষিণে উহা আরও জাজ্জ্বল্যমান হইল। খাল কাটিয়া জল সরবরাহের ব্যবস্থার গুণে, এই অঞ্চলের ভূমি সুজলা ও শস্য-শ্যামলা। হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র দেখিয়া বাঙ্গালাদেশের দৃশ্য মনে পড়ে। তালগাছ ভিন্ন এক প্রকার বাবলাগাছ এদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে,—উহা দেখিতে ছাতার ন্যায়। ইংরাজীতে এইজন্য ইহাকে umbrella tree (ছত্র-বৃক্ষ) বলা হয়।

নাগেরবাইলের আড়াই মাইল দক্ষিণে, একটি খালের ধারে, শুচীন্দ্রম্। দূর হইতে এখানকার প্রাচীন শিব-মন্দির দেখিতে পাইলাম। ত্রিবন্দ্রমের পদ্মনাভ-স্বামীর মন্দিরের পরে, এতবড় দেব-মন্দির ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে আর নাই। মন্দিরটি অন্ততঃ হাজার বৎসরের প্রাচীন। এই স্থানের নাম ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাহিনী প্রচলিত :—

পৌরাণিক যুগে এই স্থানে অত্রিমুনির আশ্রম ছিল। অত্রির পত্নী অনসূয়া ছিলেন আদর্শ সতী। তাঁহার সতীত্ব পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, একদা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া অত্রির আশ্রমে আতিথ্য যাচ্ঞা করেন। অত্রি তখন গৃহে ছিলেন না; সুতরাং অতিথি-সৎকারের ভার দেবী অনসূয়াকেই গ্রহণ করিতে হইল। আহার করিতে বসিয়া অতিথি তিনজন বলিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকই এই পণ করিয়াছেন যে, কোন বস্ত্র-পরিহিত ব্যক্তি পরিবেশন করিলে, সে অন্ন স্পর্শ করিবেন না। সাধ্বী অনসূয়া তখন মহা সমস্যায় পড়িলেন। স্বামী কখন আসিবেন, স্থির নাই; এদিকে ক্ষুধার্ত্ত অতিথি অভুক্ত থাকিলেও ধর্ম্ম-হানি ঘটে। তখন তিনি বিপদভঞ্জন

ত্রিবিক্রমের সহিত আর কথা না কহিয়া, হরিনারায়ণকে কহিলেন, "বিদ্যালঙ্কার মহাশয়, আর বিলম্বে কাজ নাই,— সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আপনি ছিপে আসুন।" এই সময়ে ত্রিবিক্রম বলিয়া উঠিলেন, "বুড়া মানুষ, আর ছিপে তুলিয়া কাজ কি বাপু, ছিপখানাকে বল না, নৌকাখানাকে টানিয়া লইয়া চলুক। বেলা দুই দণ্ড বাকী আছে, অনুকূল স্রোতের মুখে চলিতে বিলম্ব হইবে না।" অসীম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনুকূল স্রোতের মুখে?" "বাপু হে, রাজমহল কি প্রতিকূল স্রোতের মুখে?" "রাজমহল, কর্ত্তা কি—" হরিনারায়ণ বলিয়া উঠিলেন, "তুমি ত্রিবিক্রমের কথা কাণে তুলিও না অসীম; চল, আমি এখনই ফিরিয়া যাইব।" ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "সাধ্য কি, ছিপও পাটনায় ফিরিবে না,—তোমরাও কেহ পাটনায় ফিরিবে না —সকলকেই দেশে ফিরিতে হইবে।"

অসীম হাসিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "মহাশয়, যদি বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের গৃহে এই বিপদ না হইত, তাহা হইলেও আমি দেশে ফিরিতাম না। আমি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, স্বয়ং বাদশাহ আমার অন্নদাতা; সুতরাং আমাকে এখনই দিল্লী যাত্রা করিতে হইবে।" "যাত্রা করিতে পার; কিন্তু কোথায় পৌছিবে, তাহা কে বলিতে পারে।" এই সময়ে অসীম পুনর্ব্বার কহিলেন, "আমি ভৃত্য,—প্রভু যখন যাহা আদেশ করিবেন, তাহা আমার শিরোধার্য্য। প্রভু যখন আদেশ করিয়াছেন, দিল্লী যাইতে হইবে, তখন আমাকে যাইতেই হইবে।" "প্রভুর ক্ষমতা কি, তোমাকে দিল্লী লইয়া যান! জান, প্রভুরও প্রভু আছেন?"

হরিনারায়ণ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ত্রিবিক্রম, উপস্থিত কন্যা ও পুত্রবধূর সন্ধানে আমি পাটনায় চলিলাম। তুমি অগ্রসর হও, আমি শীঘ্রই দেশে ফিরিব। এখন বড় বিপদের সময়; সুতরাং আর বাধা দিও না ভাই।" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "আমি বাধা দিব না ভাই। কিন্তু তোমাদের কাহারও পাটনায় ফেরা হইবে না। কন্যা ও পুত্রবধূর জন্য চিন্তিত হইও না। তাহারা নিকটেই আছে এবং সত্বর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।" "কি বলে পাগল! তাহাদিগকে ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। ছাড়াইয়া না দিলে কেমন করিয়া আসিবে?" "যে তাহাদিগকে মুক্ত করিবে, সে তাহাদিগের সঙ্গেই আছে। তোমরা কেহ তাহাদিগকে মুক্ত করিতে পারিবে না। এমন কি চেষ্টা করিলেও তাহাদিগের সাক্ষাৎ পাইবে না।" কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি করিব?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "ছিপ ও নৌকা তীরে লাগাও, নামিতে হইবে।"

পঞ্চষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

যে প্রকোষ্ঠে দুর্গা এবং তাঁহার ভ্রাতৃ-বধূ আবদ্ধা ছিলেন, তাহার সম্মুখে কিয়দ্দূরে একটা বৃহৎ দীর্ঘিকা ছিল। দীর্ঘিকা-তীরে একটা অতি প্রাচীন অশ্বত্থ বয়সের ভারে দীর্ঘিকা-গর্ভে হেলিয়া পড়িয়াছিল; এবং তাহার বহু শাখা-প্রশাখা বাহু বিস্তার করিয়া, অনেক নূতন কাণ্ড স্থাপন করিয়াছিল। নবীন যখন তাহার বন্দিনীদ্বয়কে আহার করিতে অনুরোধ করিবার জন্য সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল, তখন যে দুইজন রমণী তাহাদিগের অনুসরণ করিয়াছিল, তাহারা সেই রমণীয় অশ্বত্থকুঞ্জে একটা স্থূল মূলের উপরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল।

নবীন কক্ষে প্রবেশ করিল; কিন্তু বন্দিনীদ্বয়ের একজনও মুখ তুলিয়া চাহিল না। নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "বলি, মা ঠাকুরাণরা, সেবা হবে না?" আপাদমস্তক বস্ত্র-মণ্ডিতা রমণীদ্বয় মৃতবৎ পড়িয়া রহিল, কেহই উত্তর দিল না। নবীন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "বেলা যে তিন পহর হ'ল?" তথাপি কেহ উত্তর দিল না। এই সময়ে দীর্ঘিকা-তীরে অশ্বত্থকুঞ্জে উপবিষ্টা রমণীদ্বয়ের মধ্যে একজন গান ধরিল:—

মাহ্ কি জোছনা হোয়ে আঁধিয়ার।
যব তুঁহু ছোড়ি গয়ে হমারে পিয়ার॥

আকাশে বিদ্যুৎ চমকিলে পাদপহীন প্রান্তরে পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, গায়িকার কণ্ঠস্বর শুনিয়া নবীন সেইরূপ চমকিয়া উঠিল; এবং তৎক্ষণাৎ বন্দি-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। সে যখন কক্ষের দ্বাররুদ্ধ করিয়া দীর্ঘিকা-তটে আসিল, তখন রমণী গায়িতেছে:—

ভর দিবসে মিহির কি রোশনী,
নয়ন ছোড়ে মেরে হোয়ে রজনী,
তুঁহু বিনে আজি দুনিয়া আঁধার॥

নবীন দাস ভয় বিস্মৃত হইল। সহসা যেন তাহার যৌবন ফিরিয়া আসিল। সে বাধা-বিপত্তি অবহেলা করিয়া
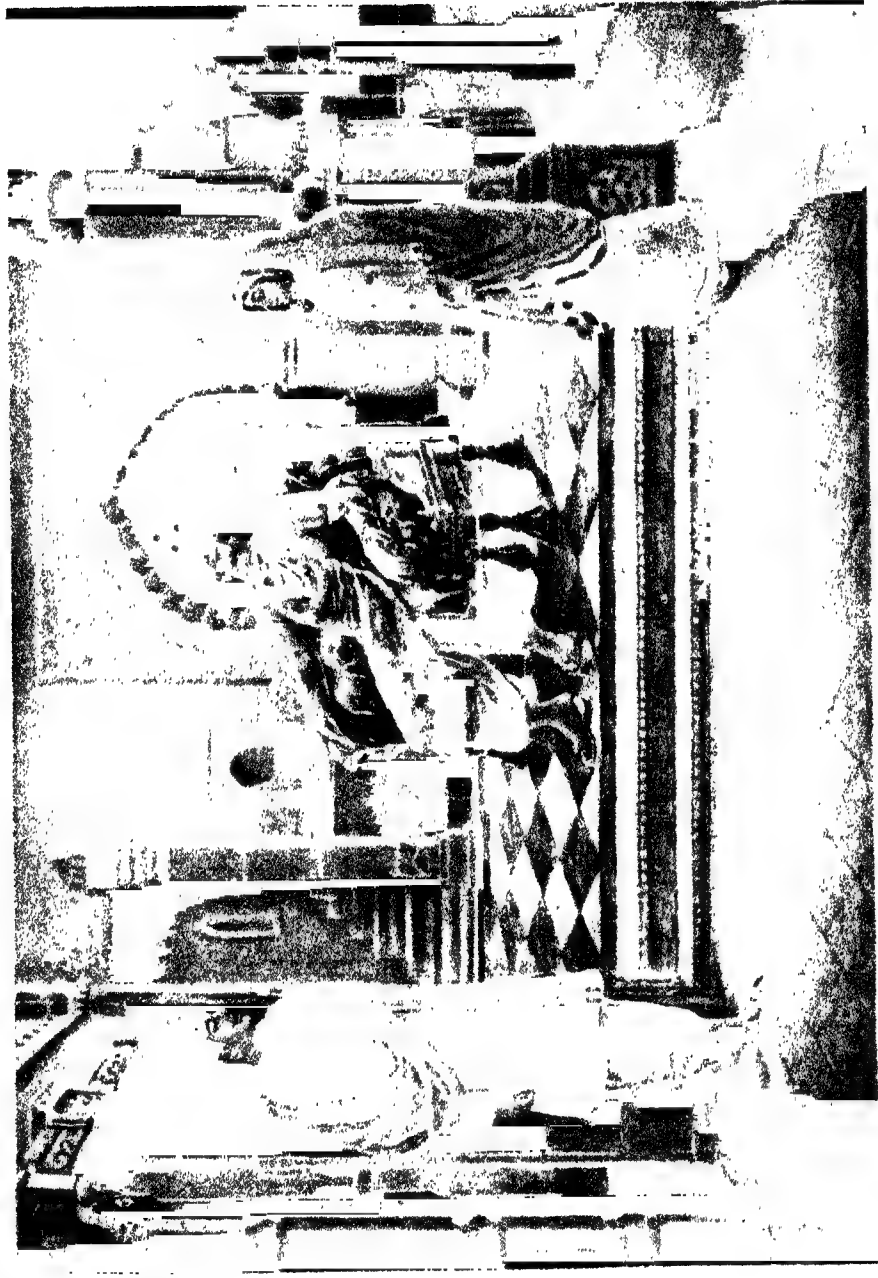
"চন্দ্রমুখী, ইনিই তোমার স্বামী!"

শিল্পী—শ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়

যুগলাঙ্গুরীয়—বঙ্কিম

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

Blocks by Bharatvarsha Halftone Works

অশ্বত্থতলে ছুটিল। গায়িকা কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। সে একমনে গায়িতে লাগিল :—

যৌবন গুজরে যব ভর যৌবনী,
রূপ গয়ে মেরে যব ভর রূপিনী,
তুঁহারি বিহনে মেরি দিলদার॥

গীত থামিল, নবীন ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি,—আপনি—এখানে?" গায়িকা কহিল, "বাবুসাহেব, আমি ভিখারিণী; নিত্যই কি একস্থানে ভিক্ষা মেলে? সেইজন্য এক-একদিন এক-এক গ্রামে যাই।" "কই, তুমি কাল আসিলে না?" "ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলাম; কিন্তু আমি ত লোক পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।" "কাহাকে?" "কেন, মণিয়া বাঈয়ের কাফ্রী গোলামকে।" "সে কি তোমার লোক? আমি তাহার কথা বুঝিতে পারি নাই। আর তাহার যে চেহারা!" এইবার মণিয়া হাসিল; এবং সে হাসি দেখিয়া প্রৌঢ় নবীন দাসের মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইল। মণিয়া কহিল, "বাবুসাহেব, ভাল চেহারা মন্দ চেহারায় তোমার প্রয়োজন কি? তুমি যাইবে মণিয়া বাঈয়ের বাড়ীতে; তাহাকে রাজী করিয়া যাহাতে পাটনা সহরে দুই পয়সা রোজগার করিতে পার তাহার চেষ্টায়। মন্দ চেহারার লোক দিয়া যদি সে কাজ ভাল হয়, তাহা হইলে খুব্‌সুরৎ চেহারার আবশ্যক কি? তুমি কি জান যে, সেই কাফ্রী গোলাম মণিয়া বাঈয়ের ছাতীর ছাতী, কলিজার কলিজা? পাটনা সহরের লোক বলে, মণিয়া বাঈও যে, হাবশী গোলামও সে।" "এত কথা কি জানি বিবিসাহেব? আমি তোমার গোলামের মত তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। তুমি যখন আসিলে না, তখন হাবশী গোলামকে ফিরাইয়া দিলাম।" "ভাল কর নাই বাবুসাহেব! এ সকল কাজে কি মেজাজ দেখাইতে আছে?" "বিবিসাহেব, তুমি কি এখনই পাটনায় ফিরিবে?" "না, এখন ফিরিব না; আজি বোধ হয় এই গ্রামেই থাকিব।" "এইখানেই থাকিবে? আমিও বোধ হয় থাকিব। চল, তোমার বাসা দেখিয়া আসি।" "ভিখারিণীর আবার বাসা কি বাবুসাহেব? যেখানে সন্ধ্যা হইবে, সেইখানেই আবাস। হয় ত একটা মশজিদে, না হয় ত একটা ভাঙ্গা কবরে মাথা গুঁজিয়া রাত্রিটা কাটাইয়া দিব।" এই সময়ে মণিয়ার সঙ্গিনী বলিয়া উঠিল, "নিকটেই একটা মশজিদ্ আছে,—আজ রাত্রিটা সেইখানেই কাটাইলে হয় না?" মণিয়া সাগ্রহে কহিল, "চল, দেখিয়া আসি।" তাহারা কেহ নবীনকে আহ্বান করিল না; অথচ নবীন মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় তাহাদিগের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিল।

দীর্ঘিকার পরপারে আম্র-পনসের বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে একটা পুরাতন মশ্‌জিদ ছিল। মশ্‌জিদটি ক্ষুদ্র কিন্তু দ্বিতল। নিম্নতলের খিলানগুলায় দুয়ার বসাইয়া ক্ষুদ্র কক্ষে পরিণত করা হইয়াছে।

মণিয়া প্রথমে উপরে উঠিল এবং দেখিল, মশ্‌জিদের ভিতরে দুই-তিনখানা ছিন্ন খর্জ্জুর-পত্রের চাটাই, দুই-তিনটা ঘৃতভাণ্ড এবং একখানা ছিন্ন কোরাণ সরিফের পুঁথি পড়িয়া আছে। নীচে আসিয়া মণিয়া দেখিল যে, চারিদিকে বারটা খিলান; তাহার মধ্যে এগারটা রুদ্ধ এবং একটি মাত্র মুক্ত। ভিতরে শব-বহন করিবার দুই-তিনখানা খাটিয়া, মহরমের তাজিয়ার একখানা কাঠাম এবং একটা বহু পুরাতন খর্জ্জুর-পত্রের সম্মার্জ্জনী পড়িয়া আছে। মণিয়া সেই সম্মার্জ্জনী লইয়া গৃহের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। নবীন ব্যস্ত হইয়া তাহার হস্ত হইতে সম্মার্জ্জনী লইতে গেল; কিন্তু মণিয়া তাহা দিল না। তখন নবীন তাজিয়ার কাঠামখানা গৃহের মধ্য হইতে টানিয়া এককোণে লইয়া গেল। সেই অবসরে মণিয়া তাহার সঙ্গিনীকে বাহিরে যাইতে ইঙ্গিতে করিল; এবং স্বয়ং গৃহতল পরিষ্কার করিতে-করিতে, দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। নবীন তখন একখানা শব-বহনের গুরুভার খাটিয়া গৃহের এক কোণ হইতে অপর কোণে লইয়া যাইতেছে। মণিয়া তাহা দেখিয়া, বিদ্যুদ্বেগে গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল; এবং বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। রুদ্ধদ্বারে শিকল লাগাইয়া মণিয়া সঙ্গিনীকে কহিল, "তুই এইখানে বসিয়া থাক্। যদি গ্রামের কেহ আসে, তাহা হইলে বলিস যে ফরীদ খাঁর হুকুম,—তিনি না আসিলে এই দুয়ার যেন কেহ না খোলে।" তখন নবীন দুয়ারের নিকট আসিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, "বিবিসাহেব, ও বিবিসাহেব, দুয়ার দিলে কেন গো?" মণিয়া তাহার কথার উত্তর না দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

রন্ধন করিতে-করিতে সরস্বতী বৈষ্ণবী নবীনদাসের সন্ধান করিতে আসিয়া দেখিল, গৃহে কেহই নাই। প্রৌঢ়া তখন

আপন মনে বকিতে আরম্ভ করিল, "বুড়ার যেন ভীমরতি ধরিয়াছে। দুই-দুইটা ব্রাহ্মণের মেয়ে খামকা ধরিয়া আনিল; তিন-পহর বেলা হইয়া গেল,—তাহারা কি খায় তাহার ঠিক নাই। নিজের পেটে দানাপানি নাই; কোথায় গিয়াছে তাহারও ঠিক নাই।" সম্মুখে একটা ক্ষেত্রে একজন কৃষক হল-কর্ষণ করিতেছিল। বৈষ্ণবী তাহাকে নবীনের কথা জিজ্ঞাসা করিল। সে নবীনকে দীর্ঘিকা-তীরে যাইতে দেখিয়াছিল; সুতরাং অশ্বত্থতল দেখাইয়া দিল। তখন বৈষ্ণবী ভাতের হাঁড়ীতে জল ঢালিয়া, ভিজা গামছা মাথায় দিয়া, নবীনদাসের সন্ধানে দীর্ঘিকা-তীরে, অশ্বত্থতলে চলিল।

দূর হইতে মণিয়া দেখিতে পাইল যে, সরস্বতী গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়াছে। সে তীরবেগে ছুটিয়া গৃহের অপর পার্শ্ব দিয়া প্রবেশ করিল; এবং একে-একে সকল প্রকোষ্ঠ সন্ধান করিয়া রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মণিয়ার কণ্ঠস্বর শুনিয়া নবীনের মন এতই চঞ্চল হইয়াছিল যে, সে যখন বাহিরে চলিয়া যায়, তখন দুয়ারে তালা লাগাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। দুয়ার খুলিয়া মণিয়া দেখিল যে, তখনও দুর্গা ও বড়বধূ শয়ন করিয়া আছেন। সে ডাকিল, "বহিন্, বহিন্, শীঘ্র উঠ। আমি মণিয়া, ভয় নাই, আমি তোমাদের মুক্ত করিতে আসিয়াছি। পুরুষটাকে এক জায়গায় বন্ধ করিয়া আসিয়াছি; আর বৈষ্ণবী বাহিরে গিয়াছে। সে হয় ত এখনই ফিরিবে। উঠ, শীঘ্র উঠ, পলাও।" দুর্গা ও বড়বধূ উঠিলেন। মণিয়া তাঁহাদের হাত ধরিয়া, যে-পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই গৃহ ত্যাগ করিল। তখন দিবসের চতুর্থ প্রহর আরম্ভ হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

বিধবা

(আলোচনা)

'কৃষ্ণকান্তের উইল'

(১)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ]

শেক্স্পীয়ার-সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলিয়াছেন যে শেক্স্পীয়ার্ এক শ্রেণীর দুইটি চিত্র ঠিক একই ভাবে অঙ্কিত করেন নাই; বেশ একটু প্রভেদ রাখিয়া, বেশ একটু বৈচিত্র্য দেখাইয়া, নূতনত্ব ও মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্বন্ধেও একথা খাটে। তিনি 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আখ্যায়িকাদ্বয়ে বিধবার আদর্শচ্যুতির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; উভয়ের মধ্যে কতকটা মিল আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর প্রভেদও আছে। উভয় আখ্যায়িকায়ই পতি-পত্নীর প্রেম প্রধান আখ্যানবস্তু; অবৈধ প্রণয় অপ্রধান আখ্যানবস্তু; উভয়ত্রই বিবাহিত নায়কের সহিত বিধবার প্রণয়ব্যাপার; উভয়ত্রই যুবতী বিধবা, মাতৃস্বঞ্চিতা, মাতৃভাববর্জ্জিতা, স্বামিভক্তিরহিতা, পরপুরুষে অনুরাগবতী ও পরপুরুষের অনুরাগপাত্রী; উভয়ত্রই প্রেমিক-প্রেমিকা এই অবৈধপ্রণয়ের সহিত অনেকদিন ধরিয়া প্রাণপণে যুঝিয়াছে, শেষে পরাস্ত হইয়াছে; উভয়ত্রই হৃদয়ের এই দ্বন্দ্বের অবসানে প্রেমিক-প্রেমিকা কিছুদিন পরস্পরকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে; উভয়ত্রই আখ্যায়িকাকার এই অবৈধ প্রণয়ের শোকাবহ পরিণাম ঘটাইয়াছেন; উভয়ত্রই তিনি স্পষ্টবাক্যে এই অবৈধ প্রণয়ের (Condemnation) দোষ-ঘোষণা করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত উভয় আখ্যায়িকায় মিল আছে। কুন্দনন্দিনীর প্রতি দুইজন প্রণয়বান্—নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র; রোহিণীকেও দুইজন প্রণয়জ্ঞাপন করিয়াছেন—হরলাল ও গোবিন্দলাল, এ অংশেও উভয় আখ্যায়িকায় মিল আছে। কিন্তু প্রভেদও যথেষ্ট আছে। ক্রমে ক্রমে দেখাইতেছি।

কুন্দের প্রতি দুইজন প্রণয়বান্ বটে, কিন্তু দেবেন্দ্রের প্রতি কুন্দের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও ভালবাসা নাই। পক্ষান্তরে, হরলাল স্বার্থসিদ্ধির জন্য রোহিণীর প্রতি প্রণয়ের ভান

করিয়াছিল ; এ অংশে বরং হীরার প্রতি দেবেন্দ্রের প্রণয়ের ভান ইহার সহিত তুলনীয়। দেবেন্দ্র ও হরলাল উভয়েই মন্দলোক হইলেও উভয়ের চরিত্রে প্রভেদ আছে। কুন্দ-রোহিণীর চরিত্রে ত সম্পূর্ণ প্রভেদ। কুন্দ স্থির, ধীর, গম্ভীর, অসামান্য সরলা, শান্তস্বভাবা, অবাক্‌পটু বালিকা ; তাহার প্রণয় নীরব, গভীর, একনিষ্ঠ। পক্ষান্তরে রোহিণী বয়সে কুন্দ অপেক্ষা সম্ভবতঃ বড়, প্রগল্‌ভা, সাহসিকা, চতুরা (জাঁহাবাজ) ; তাহার তীব্র লালসা, অতৃপ্ত বাসনা, সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ নহে। (হীরাও তাহার তুলনায় একনিষ্ঠা।)

ঘটনার সমাবেশে ও প্লটের বিবর্ত্তনেও বিস্তর প্রভেদ। 'বিষবৃক্ষে' প্লটের যতটা জটিলতা আছে (একাধিক অবৈধ প্রণয়ের ব্যাপার আছে) 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ততটা নাই ; হরলাল-রোহিণীর ব্যাপার-মাত্র একটা ফ্যাড়া আছে, কিন্তু তাহা প্রথম দিকের ২।১টি পরিচ্ছেদেই (৩য় ও ৫ম) সমাপ্ত হইয়াছে। কুন্দর কুমারী-অবস্থা হইতেই নগেন্দ্র-কুন্দর প্রণয়ের সূত্রপাত হয় ; দেবেন্দ্র তাহাকে সধবা-অবস্থায় দেখিয়া আত্মহারা হয়েন ; পক্ষান্তরে হরলাল-গোবিন্দলাল-রোহিণীর ব্যাপারের আরম্ভ রোহিণীর বৈধব্যদশায়। কুন্দর বিবাহের, স্বামীর প্রসঙ্গ আছে ; রোহিণী যে কবে বিধবা হইয়াছিল তাহার ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নাই। তাহার কুমারী-জীবন ও বিবাহিত জীবনের চিত্র নাই। কুন্দর স্বামীকে অবশ্য মনে ছিল, কেননা নিতান্ত শিশুকালে বিবাহ হয় নাই, কিন্তু স্বামিস্মৃতিতে মাধুর্য্য ছিল না। পক্ষান্তরে রোহিণীর স্বামীর প্রসঙ্গই নাই। এ অংশে * (ও চরিত্র-অংশে) রোহিণীর বরং হীরার সহিত মিল আছে। কুন্দ-রোহিণীর প্রথম প্রণয়সঞ্চারের ব্যাপারেও সম্পূর্ণ অমিল।

বাস্তবজগতে অবৈধ প্রণয়, হয় নিজ পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির সহিত, না হয় আবাল্যপরিচিত কোন প্রতিবেশীর সহিত, ঘটিবার সম্ভাবনা ; কচিৎ অন্যত্রদৃষ্ট ব্যক্তি বা গৃহে আগত আত্মীয়-কুটুম্বের বা অতিথির সহিত ঘটিতে পারে। একান্নবর্ত্তী পরিবারে অনেক সময়ে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় থাকেন, হয়ত নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিও পরিবারভুক্ত হইয়া পড়েন ; সুতরাং এক পরিবারে বাস করিলেও এরূপ আসক্তি সব সময়ে ঠিক সম্পর্কবিরুদ্ধ (incest) শ্রেণীতে পড়ে না। যে সকল আখ্যায়িকাকার হিন্দুসমাজের অনাচার পাঠক-দিগের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার জন্য কুৎসিত বাস্তব-চিত্র (realistic picture) অঙ্কিত করেন, তাঁহারা এরূপ সম্পর্কবিরুদ্ধ আসক্তির চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছেন। (কাব্য-নাটক হইতে এ সব নোংরা জিনিসের আর দৃষ্টান্ত দিতে চাহি না।) বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে' একান্নবর্ত্তিপরিবারে ধনীর অন্তঃপুরে বিধবার সহিত অবৈধ প্রণয়ের ব্যাপার ঘটাইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা সম্পর্কবিরুদ্ধ নহে। কুন্দ তাঁরাচরণের বিধবা পত্নী, তারাচরণের মৃত্যুর পরে অভিভাবকহীনা 'কুন্দকে সূর্য্যমুখী আপন বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন।' তারাচরণকে 'সূর্য্যমুখী ভ্রাতৃবৎ ভাবিতেন বটে, সেই ভ্রাতৃস্নেহের বশে তিনি 'ভদ্রকায়স্থের সুরূপা কন্যা' কুন্দকে 'ভাইজ' করিয়া-ছিলেন তাহাও বটে, কিন্তু তারাচরণ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ভ্রাতা ছিল না, সে সূর্য্যমুখীর পিতৃগৃহের দাসী বিধবা কায়স্থ-কন্যা শ্রীমতীর পুত্র, মাতার কুলত্যাগের পর ঐ গৃহে সযত্নে প্রতিপালিত, এই পর্য্যন্ত। সুতরাং কুন্দ ঘটনাচক্রে নগেন্দ্র-নাথের অন্তঃপুরিকা হইলেও তাঁহার সহিত নিঃসম্পর্ক। *

'বিষবৃক্ষে' দেবেন্দ্র বন্ধুপত্নীর সহিত 'আলাপ' করিতে গিয়া মোহাভিভূত হইল, ইহা প্রতিবেশীর প্রণয়ের দৃষ্টান্ত। যাহা হউক এটি অপ্রধান আখ্যান। 'বিষবৃক্ষে' অবৈধ প্রণয়ের প্রধান আখ্যানে একান্নবর্ত্তিপরিবারে উক্তরূপ ঘটনার সমাবেশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' অন্য পথ লইয়াছেন। রোহিণীর প্রথমে হরলালের, পরে গোবিন্দ-লালের প্রতি আসক্তি প্রতিবেশীর সহিত যোগাযোগের দৃষ্টান্ত। ইহারা সজাতি হইলেও নিঃসম্পর্ক। ('দেখ, তোমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রাম-সুবাদ মাত্র, সম্পর্কে বাধে না' —হরলালের এই উক্তি স্মর্ত্তব্য। ১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।) পল্লীগ্রামে অবরোধপ্রথা তত কঠোর নহে, প্রতিবেশীদিগের অন্তঃপুরে অনেক সময়ে পুরুষদিগের গতিবিধি থাকে, বাল্যকাল হইতে 'ঝিউড়ি'দিগের সহিত অসঙ্কোচে মেলামেশা থাকে, পথেঘাটে ও অন্তঃপুরে দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তার বাধা নাই। ('হরলাল ঘরের ছেলে, সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে

* 'হীরা বালবিধবা বলিয়া গোবিন্দপুরে পরিচিতা। কেহ কখন তাহার স্বামীর কোন প্রসঙ্গ শুনে নাই।' ('বিষবৃক্ষ' ১৫শ পরিচ্ছেদ।)

* সংস্কৃত সাহিত্যে অন্তঃপুরিকার সহিত প্রণয়ের বহু ঘটনা আছে, তবে সে সব স্থলে অবশ্য বিবাহিত রাজার অজাতোপযমা নবযৌবনার সহিত প্রণয়, বিধবার সহিত নহে। কচিৎ দুই একস্থলে সধবার সহিত প্রণয়ের ব্যাপারও সংস্কৃত-সাহিত্যে আছে।

পারেন ?' ১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।) উপরি-নির্দ্দিষ্ট দুইটি প্রণালীর মধ্যে দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত ভাল; তজ্জন্য বঙ্কিমচন্দ্র একটি স্থল ভিন্ন অন্যত্র এই দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন; পরবর্ত্তী লেখকেরাও অনেকে করিয়াছেন, যথা ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার', ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর 'বিরাজমোহন' ও 'ভিখারী', শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর 'তরুবালা' নাটক, ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'শাস্তি কি শান্তি' নাটক, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রনাথ' ও 'পল্লী-সমাজ', শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দোটানা' ইত্যাদি।

নগেন্দ্রনাথ শুধু যে বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন, বিধবাবিবাহের পক্ষাবলম্বনকারী পণ্ডিতকে পুরস্কৃত করিয়াছেন, কুন্দের বাল্যবৈধব্যের অনাথিনীত্বের প্রসঙ্গ উঠিলে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন তাহা নহে, তিনি মোহের চরম অবস্থায় শ্রীশচন্দ্রের সহিত (পত্রযোগে) বিধবাবিবাহের পক্ষে কোমর বাঁধিয়া তর্ক করিয়াছেন ও কুন্দকে বিধবাবিবাহ করিয়াছেন। অতএব বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধবাদীরা যাহাই বলুন, কুন্দ (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রব্যাখ্যানুসারে) নগেন্দ্রনাথের বিবাহিতা পত্নী। পক্ষান্তরে, গোবিন্দলাল কোনও দিন বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই, রোহিণীর নিকট সে প্রস্তাব করেন নাই, সরাসরিভাবে রোহিণীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছেন। এই প্রভেদের কারণ কি? গোবিন্দলালের স্ত্রী বর্ত্তমান ছিল, তাহা ত নগেন্দ্রেরও ছিল; বরং ভ্রমর গোবিন্দলালকে সন্দেহ করিয়া আগেভাগেই পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন, সূর্য্যমুখী বিধবাবিবাহের পূর্ব্বে গৃহ ত্যাগ করেন নাই; সুতরাং গোবিন্দলালেরই বরং পত্নীর অপরাধের অজুহাতে বিধবাবিবাহ করিবার সুযোগ ছিল। রূপমোহের প্রথম অবস্থায় গোবিন্দলালের মাথার উপর জ্যেঠা মহাশয় ও মা-ঠাকুরাণী ছিলেন, তাঁহারা এরূপ অপকর্ম্ম করিতে দিতেন না। নগেন্দ্রনাথ স্বাধীন; কিন্তু ইহাই এই প্রভেদের একমাত্র কারণ নহে। গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া অন্যত্র গিয়াছিলেন, সেখানে ত বিধবাবিবাহ করিতে পারিতেন। আসল কথা, এক্ষেত্রেও কুন্দ-রোহিণীর চরিত্রের প্রভেদই ঘটনার এই প্রভেদের কারণ। কুন্দর প্রণয় অবৈধ হইলেও একনিষ্ঠ, কুন্দর কুমারী-অবস্থা হইতেই ইহা তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল, সুতরাং মন্ত্রপূত বিবাহ তাহার বেলায়ই সাজে; রোহিণী লালসাময়ী, প্রথমে হরলালের সহিত তাহার আচরণে (১ম খণ্ড ৩য় ও ৫ম পরিচ্ছেদে) ও শেষে নিশাকরের সহিত তাহার আচরণে (২য় খণ্ড ষষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পরিচ্ছেদে) বুঝা যায় তাহার প্রণয় একনিষ্ঠ, অবিচলিত, নির্ম্মল নহে, লালসাই তাহার হৃদয়ে প্রবল। হরলাল সত্যরক্ষা করিলে সে হরলাল-দ্বারাই লালসা চরিতার্থ করিত, অথচ তখনও 'গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী'র সুখ দেখিয়া সে হিংসা করিত (১ম খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ), ইহা একনিষ্ঠতার লক্ষণ নহে। ফলতঃ অবৈধ হইলেও সরলা কুন্দর প্রণয়ে যে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য আছে, রোহিণীর তীব্র লালসায় তাহা নাই।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ তুলিয়াছে পিতৃ-দ্রোহী ধাপ্পাবাজ জালিয়াত হরলাল। কিন্তু বেশ বুঝা যায় ইহা তাহার ধাপ্পা-মাত্র। সে সেকেলে রক্ষণশীল সম্প্রদায়-ভুক্ত পিতাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া উইল পরিবর্ত্তন করাইবার চেষ্টায় কৃষ্ণকান্ত রায়কে জানাইয়াছে, 'কলিকাতায় পণ্ডিতেরা মত করিয়াছেন যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত। আমি মানস করিয়াছি যে একটি বিধবা-বিবাহ করিব।' 'ইহার কিছু পরে হরলাল সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি বিধবা-বিবাহ করিয়াছেন।' (১ম খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।) অথচ তাহার পরে রোহিণীর কাছে যেরূপ কথা বলিতেছে, তাহাতে জানা যায় যে সে তখনও বিধবা-বিবাহ করে নাই। হরলাল রোহিণীকে ঐ লোভ দেখাইয়া উইল চুরি করিতে প্ররোচিত করিল, তাহার পর কার্য্যসিদ্ধি হইলে সত্যভঙ্গ করিল। (১ম খণ্ড ৩য় ও ৫ম পরিচ্ছেদ।) ফলতঃ ইহা বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব নহে, বিধবা-বিবাহের (travesty) ভেংচান। (নতুবা বিপত্নীক হরলাল বিধবা-বিবাহ করিলে বরং শোভন হইত।) পক্ষান্তরে, 'বিষবৃক্ষে' দেবেন্দ্র কুন্দকে বিধবা-বিবাহ করার প্রস্তাব করে নাই।

'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্র-কুন্দর প্রণয়-ব্যাপার যখন চরমে উঠিল, তখন সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিলেন, নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া গৃহে রহিলেন—অবশ্য অল্প দিনের জন্য; তাহার পর তিনি সূর্য্যমুখীর বিরহে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহার সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিলেন। পক্ষান্তরে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমর ২।১ বার পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গোবিন্দলাল-রোহিণীর ব্যাপার যখন চরমে উঠিল, তখন ভ্রমর গৃহে রহিলেন, গোবিন্দলাল দূরদেশে অজ্ঞাতবাসে রোহিণীর সহিত মিলিত হইলেন। মাতা বর্ত্তমান থাকাতে (যদিও

তখন 'কাশীবাসিনী) গোবিন্দলাল প্রকাশ্যে স্বগ্রামে স্থায়ি-ভাবে এ কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন, ইহাই এই প্রভেদের অন্যতম কারণ হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে এক্ষেত্রেও কুন্দ-রোহিণীর তথা সূর্য্যমুখী-ভ্রমরের চরিত্রের প্রভেদ ইহার মূলে আছে। কুন্দ এরূপ অবস্থায় বোধ হয় নগেন্দ্রনাথের অনুরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইত না। নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখীর পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে এবং গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারেও বিস্তর প্রভেদ আছে। ভ্রমরের অভিমান সূর্য্যমুখীর অভিমান অপেক্ষা সাঙ্ঘাতিক। ভ্রমরের ব্যবহারে উত্ত্যক্ত গোবিন্দ-লালের অসংযমও নগেন্দ্রনাথের অসংযম অপেক্ষা উদ্দাম (যদিও কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্ষমার্হ)।

কুন্দ একবার সূর্য্যমুখীর কর্কশ ব্যবহারে গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া সূর্য্যমুখীর নিকট সস্নেহ ব্যবহার পাইয়াছিল, কেননা ইত্যবসরে নগেন্দ্রনাথ-সূর্য্যমুখীর মধ্যে বুঝাপড়া হইয়া গিয়াছিল। সূর্য্যমুখী স্বয়ং উদ্‌যোগী হইয়া বিধবা-বিবাহ দিলেন। (অবশ্য এই অপূর্ব্ব পতিপ্রাণতা ও স্বার্থত্যাগের পরে তিনি শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন না।) পক্ষান্তরে রোহিণী ভ্রমরের ও প্রতিবেশিনী-দিগের দুর্ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হইয়া গোবিন্দলালের প্রস্তাবে গৃহত্যাগ করিল। সূর্য্যমুখী ও কুন্দর পরস্পরের প্রতি ব্যবহার এবং ভ্রমর ও রোহিণীর পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে।

গোবিন্দলাল-সম্বন্ধে আখ্যায়িকাকার বলিয়াছেন, 'গোবিন্দলাল দুইজন স্ত্রীলোককে ভাল বাসিয়াছিলেন—ভ্রমরকে আর রোহিণীকে।...রোহিণীকে গোবিন্দলাল স্বহস্তে বধ করিয়াছিলেন—ভ্রমরকেও প্রায় স্বহস্তে বধ করিয়াছেন।' (২য় খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ।) নগেন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে এই কথাই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বলা যায় যে, নগেন্দ্রনাথ কুন্দ-নন্দিনীর আত্মহত্যার কারণ। এই মর্ম্মান্তিক ব্যাপারে তাঁহার চূড়ান্ত শিক্ষা ও শাস্তি হইয়াছে। আবার তাঁহার ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া গৃহত্যাগিনী সূর্য্যমুখীও প্রায় মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইয়াছিলেন এবং মরণাধিক যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। নগেন্দ্রের দোষ গুরুতর, 'প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর হইল।'

আবার গোবিন্দলালের পাপ নগেন্দ্রনাথের পাপ অপেক্ষা গুরুতর। তিনি শুধু পত্নীত্যাগী ব্যাভিচারী নহেন, নারীহত্যার পাতকী। ভ্রমরের প্রতি তাঁহার দুর্ব্যবহারও কঠোরতর (যদিও কতকটা ভ্রমরেরও দোষে)। সুতরাং শাস্তিও গুরুতর হইয়াছে। সে কথা সবিস্তারে যথাস্থানে বলিব।

শেষ কথা, কুন্দ-রোহিণীর শোচনীয় পরিণাম তাহাদিগের স্ব স্ব প্রকৃতির অনুরূপ। নগেন্দ্রনাথের ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িতা কুন্দ কতকটা নৈরাশ্যে ও কতকটা 'আর সূর্য্যমুখীর সুখের পথে কাঁটা হইবে না' বলিয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিল। পক্ষান্তরে, লালসাময়ী রোহিণী বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ প্রণয়ীর হস্তে নিহত হইল। উৎকট লালসার কি ভয়ঙ্কর পরিণাম! কুন্দ অবৈধ প্রণয়ে কলঙ্কিতা হইলেও তাহার প্রতি শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের সমবেদনা হয়। পক্ষান্তরে রোহিণীর প্রতি প্রথম অবস্থায় সমবেদনা হইতে পারে। কিন্তু শেষে তাহার লালসা-দর্শনে তাহার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়।

তুলনায় সমালোচনা আপাততঃ এই পর্য্যন্ত করিয়া এক্ষণে স্বতন্ত্র-ভাবে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আখ্যায়িকাকার রোহিণীর আসক্তির, লালসার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে তাহার প্রকৃতির আভাস দিয়াছেন। 'রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহাতে ছিল। দোষ, সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পাণও বুঝি খাইত।'...(১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।) আবার অন্যত্র (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে) আছে—'রোহিণীর চাল চলনও ভারি। তবে রোহিণী বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পাণের রাগ, হাতে বালা, ফিতাপেড়ে ধুতি পরা, আর কাঁধের উপর চারুবিনির্ম্মিতা কাল-ভুজঙ্গিনীতুল্যা কুণ্ডলীকৃতা লোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী।...হেলিয়া দুলিয়া পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে, রোহিণী সুন্দরী সরোবরপথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল।' তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত অংশটির সঙ্গে রোহিণীর গৃহকর্ম্মপটুতা কারুকার্য্যকুশলতা প্রভৃতির কথাও আছে; আমাদের বক্তব্য বিষয়ে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তাহা উদ্ধৃত করি নাই।

উভয় আখ্যায়িকার তুলনায় সমালোচনা-কালে বলিয়াছি যে কুন্দ অপেক্ষা বরং হীরার সহিত রোহিণীর প্রকৃতির মিল আছে। রোহিণীর প্রকৃতির এই আভাসের সহিত ('বিষবৃক্ষ' ১৫শ পরিচ্ছেদে প্রদত্ত) হীরার প্রকৃতির আভাস পাশাপাশি রাখিলে কতটা মিল, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। হীরার বেলায় যাহা বলিয়াছি এখানেও সেই একই কথা। সধবার ন্যায় বেশবিন্যাস করা ইত্যাদি দ্বারা আখ্যায়িকাকার বুঝাইতে চাহেন যে সে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের বাহ্য অনুষ্ঠান করে না, ভিতরে ভিতরে তাহার প্রাণে সখ আছে। অবশ্য ইহাতেই যে চরিত্র মন্দ হয় তাহা নহে। তবে ইহা সুলক্ষণ নহে। এই বিলাসস্পৃহা সংযমের পথে একটি বাধা। হীরা দাসী অপেক্ষা ভদ্র-ঘরের মেয়ে রোহিণীর পক্ষে ইহা আরও অশোভন।*

রাঁধিতে রাঁধিতে, 'পশুজাতি রমণীদিগের বিদ্যুদ্দাম-কটাক্ষে শিহরে কিনা দেখিবার জন্য, রোহিণী বিড়ালের উপরে মধ্যে মধ্যে বিষপূর্ণ মধুর কটাক্ষ করিতেছিল'। (১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ); আবার জল আনিতে গিয়া, কোকিলের প্রতি প্রযুক্ত 'রোহিণীর ঊর্দ্ধবিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ' (১ম খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ);—এই দুইবার কটাক্ষের উল্লেখে কলা-কৌশলী বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীচরিত্রের উপর একটু বঙ্কিম কটাক্ষ করিয়াছেন!

তাহার পর 'ঘরের ছেলে' 'বড় কাকা' ('গ্রাম সুবাদ-মাত্র') হরলালের সহিত কথাবার্ত্তায়, ধরণ-ধারণে, হাব-ভাবে,—'নখে নখ খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিল' 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে' হরলালের এই বাক্যে 'রোহিণী শিহরিল'.† হরলাল কিরূপে রোহিণীকে বিপন্মুক্ত করিয়াছিল সেই পুরাতন কথা তুলিলে রোহিণী 'আপনি' ছাড়িয়া ২।১ বার 'তুমি' বলিল, (আবার উইল চুরির পর কখনও 'আপনি' কখনও 'তুমি' বলিয়াছে), হরলাল বিধবাবিবাহের প্রস্তাব করিলে 'রোহিণী মাথার কাপড় একটু টানিয়া মুখ ফিরাইল',—ইত্যাদি ব্যাপারে (to read between the lines) তলায় তলায় লক্ষ্য করিবার কিছু আছে। 'প্রেমের কথা'য় বলিয়াছি, বিপদ্-উদ্ধারে প্রেমের সঞ্চার হয় এইরূপ বহু ঘটনা কাব্য-নাটকে দেখা যায়। এক্ষেত্রেও পূর্ব্ব-ঘটনায় রোহিণীর হৃদয়ে হরলালের প্রতি ভিতরে ভিতরে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল, অনুমান করা যায় না কি? 'প্রাণ দিয়াও আপনার উপকার করিব', 'করিবার হইত আপনার কথাতেই করিতাম',—রোহিণীর এই দুইটি উক্তি শুধু কৃতজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া মনে হয় না। তাহার পর ফন্দী-বাজ হরলাল যখন বিধবাবিবাহের লোভ দেখাইল, তখন রোহিণী ঘৃণিত 'চুরি'র কার্য্য করিতে রাজি হইল—'হরলালের লোভে' (৯ম পরিচ্ছেদ); টাকার লোভে নহে, টাকা সে প্রত্যাখ্যান করিল। প্রথমে হরলাল যখন উইল চুরির প্রস্তাব করিল, তখন 'রোহিণী শিহরিল।' দৃঢ়স্বরে বলিল 'পারিব না'। বুঝা গেল, চুরির বেলায় তাহার ধর্ম্মজ্ঞান আছে। কিন্তু এই 'বড় লোভে'র কাছে ধর্ম্মজ্ঞান ম্লান হইয়া পড়িল।

উইল চুরির ব্যাপারে রোহিণীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কৌশল ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা হইতেও বুঝা যায় তাহার 'হরলালের লোভ' কত প্রবল; ইহার জন্য সে দুঃসাধ্য কার্য্যেও অগ্রসর। কার্য্যসিদ্ধির পর হরলাল যখন রোহিণীর বড় আশায় নিরাশ করিল, 'যাহা দিবে বলিয়াছিলে তাই চাই' লালসাময়ী রোহিণীর এই দাবি হরলাল অগ্রাহ্য করিল, তখন 'রোহিণীর মুখ শুকাইল'; অপমানিতা মর্ম্মাহতা রোহিণীর তীব্র উত্তর হইতে অতৃপ্তবাসনা যুবতী বিধবার ব্যর্থ লালসার কি পরিস্ফুট চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়! 'তার চোখে জল আসিতেছিল!' কি গভীর নৈরাশ্যে, কি মর্ম্মান্তিক আশাভঙ্গে এই চোখের জলের উৎপত্তি!

আখ্যায়িকার প্রথম পাঁচটি পরিচ্ছেদ শুধু যে উইলের ব্যাপারের জন্য, প্লটের দিক্ হইতে, ঘটনা-পরম্পরা-হিসাবে প্রয়োজনীয় তাহা নহে; এগুলি রোহিণীর চরিত্র-বিকাশের (prelude) সূচনা হিসাবেও রোহিণীর ইতিহাসের অপরিহার্য্য অংশ। যেমন রোমিও জুলিয়েটের প্রেমে পড়িবার পূর্ব্বে অন্যার জন্য পাগল হইয়াছিলেন, তাহার পর জুলিয়েট্ তাঁহার হৃদয় গভীর প্রেমে নিমজ্জিত করিল;

* তবে আজকাল অল্পবয়স্কা ও যুবতী বিধবার সধবাবেশ সহর জায়গায় চলিত হইয়াছে। অনেক সময়ে সহরে ও পল্লীগ্রামেও মাতা-পিতা স্নেহবশতঃ এইরূপ ব্যবস্থা করেন, কন্যার বিধবাবেশ বৈধব্যদশা অপেক্ষাও মর্ম্মবিদারক। ইহাতে যে বিশেষ দূষ্য আছে বিবেচনা করি না।

† Good, Sir, why do you start? and seem to fear
Things that do sound so f ?—Macbeth.

তেমনই রোহিণী গোবিন্দলালকে তীব্র লালসার চক্ষে দেখিবার পূর্ব্বে হরলালের প্রতি লালসাময়ী ছিল, তাহার পর গোবিন্দলাল তাহার হৃদয় তীব্র লালসায় পরিপূর্ণ করিল। (অবশ্য রোমিওর প্রেম ও রোহিণীর লালসায় অনেক প্রভেদ।)

প্রথমেই রোহিণী-চরিত্রের খারাপ দিক্‌টার আংশিক চিত্র দিয়া আখ্যায়িকাকার পরে তাহার প্রতি সমবেদনা উদ্রেকের জন্য, তাহার হৃদয়ের ব্যথার, অতৃপ্ত বাসনার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; রোহিণীকে কাঁদাইয়াছেন, রোহিণীর দুঃখে গোবিন্দলালকে দুঃখিত সমবেদনাময় করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ও করুণার্দ্র করিয়াছেন। সমবেদনা-করুণা-সঞ্চারের জন্য আখ্যায়িকাকার এই স্থলে (১ম খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) তিন তিন বার 'রোহিণী বিধবা' পাঠককে তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ('কা রৌতি দীনা মধুযামিনীষু?') হালকা সুরে কোকিলের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া বিষাদের সুরে শেষ করিয়া ইংরেজ আখ্যায়িকাকার Sterne বা Dickens-এর মত humour ও pathos-এর, হাস্যরস ও করুণরসের অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়াছেন। হরলাল বহুকাল পরে রোহিণীর সুপ্ত বাসনা জাগাইয়াছিল, আশাভঙ্গে তাহার হৃদয় দুর্ব্বল হইয়াছিল, তাই রোহিণী কোকিলের ডাক শুনিয়া কাঁদিতে বসিল। 'কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কি যেন হারাইয়াছি—যেন তাই হারাইবাতে জীবনসর্ব্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে, যেন তাহা আর পাইব না।* যেন কি নাই, কে যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা যেন পূরিল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।' রোহিণী অনুভব করিল বাহ্যপ্রকৃতিতে সকলই আনন্দের সহিত, সুন্দরের সহিত সুরবাঁধা, 'সেই কুহু রবের সঙ্গে সুর-বাঁধা', অদূরে গোবিন্দলাল দাঁড়াইয়া—'এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা।' 'স এব যমুনাতীরঃ স এব মলয়ানিলঃ', কেবল রোহিণীর হৃদয়ই বেসুরা। 'রোহিণী কাঁদিতে বসিল।' (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) স্থান, ক্ষণ, সবই মধুর, সবই উজ্জ্বল, সবই আনন্দময়, কেবল রোহিণীর হৃদয় আঁধার। 'রোহিণী বোধ হয় ভাবিতেছিল যে, কি অপরাধে এ বাল বৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখ ভোগ করিতে পাইলাম না? কোন্ দোষে আমাকে এ রূপ-যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহ-জীবন কাটাইতে হইল? যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী—মনে কর ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী—তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী—কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপালে শূন্য? দূর হৌক—পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই—কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন? আমার এ অসুখের জীবন রাখিয়া কি করি?' (সপ্তম পরিচ্ছেদ) পূর্ব্বে বলিয়াছি, হীরার সহিত রোহিণীর চরিত্রের কতকটা মিল আছে। এই 'হিংসাটুকু' হীরার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তবে সেরূপ তীব্র ক্রূর ও নীচ নহে।

'গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী'কে হিংসায় ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রথম ক্ষীণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আখ্যায়িকাকার রোহিণীর দোষের কথা সরলভাবে স্বীকার করিয়াও তাহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন ও পাঠকের সমবেদনার উদ্রেক করিতেছেন। 'তা আমরা ত বলিয়াছি, রোহিণী লোক ভাল নয়। দেখ, এইটুকুতে কত হিংসা। রোহিণীর অনেক দোষ—তার কান্না দেখে কাঁদতে ইচ্ছা করে কি? করে না। কিন্তু অত বিচারে কাজ নাই—পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সম্বরণ করে না। তা, তোমরা রোহিণীর জন্য একবার আহা বল।'

এইবার রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের সমবেদনা-প্রকাশের চিত্র। 'এতক্ষণ অবলা * একা বসিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া, তাঁহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল, যে এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ—আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ; অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি

* Quoth the Raven—'Navermore'.—E. A. Boe. অবশ্য ইংরেজী কবিতাটিতে কোকিল নহে, কাক।

* এ 'অবলা' দুর্ব্বলা অর্থে প্রযুক্ত নহে। ইহা চণ্ডীদাসের অবলা= অবোলা। 'বদন থাকিতে না পারি বলিতে তেঁই সে অবলা নাম।'

—তবে কেন করিব না?' ইহা অবশ্য অবিমিশ্র করুণা, এখনও গোবিন্দলালের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয় নাই, এখনও ইংরেজ কবি-বর্ণিত 'I pity you' 'That's a degree to love.' 'Pity melts the mind to love,' —এর অবস্থা নহে, অর্থাৎ 'একই সূত্রে প্রেম করুণা গাঁথা' নহে।

গোবিন্দলাল 'কুসুমিত লতার অন্তরাল' হইতে রোহিণীকে দেখিতেছিলেন বটে, কিন্তু সে করুণার চক্ষে, দুষ্যন্তের মত প্রেমের চক্ষে নহে। গোবিন্দলাল পুনঃ পুনঃ রোহিণীকে তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরুষের নিকট বলিতে না পারিলে 'বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের' অর্থাৎ গোবিন্দলালের স্ত্রীর মারফত জানাইতে বলিলেন। 'যে রোহিণী হরলালের সম্মুখে মুখরার ন্যায় কথোপকথন করিয়াছিল—গোবিন্দলালের সম্মুখে সে রোহিণী একটি কথাও কহিতে পারিল না।' ইহার বোধ হয় দুইটি কারণ—(১) হরলালের প্রতি মনোভাব অনেক দিন অপ্রকাশিত থাকিলেও সদ্যোজাত নহে, গোবিন্দলালের প্রতি মনোভাব সদ্যোজাত; (২) উইলের ব্যাপারে রোহিণী গোবিন্দলালের নিকট অপরাধিনী। (এই পরিচ্ছেদের শেষ ভাগ ও পর-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।) তাই তাহার কথা ফুটিতেছিল না। যাহা হউক শেষে বলিল "একদিন বলিব। আজ নহে। একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।" 'আপনি' না বলিয়া 'তুমি' বলাতে রোহিণীর মনোভাবের আভাস পাওয়া গেল। (রোহিণীর ভবিষ্যদ্‌বাণী একদিন সফল হইবে, অতএব এই উক্তির Irony লক্ষণীয়।)

এই পরিচ্ছেদে রোহিণীর পূর্ব্বরাগের সূত্রপাত হইল। গোবিন্দলাল এখনও নির্লিপ্ত। সুতরাং রোহিণীর পূর্ব্বরাগের আভাস দিয়া আখ্যায়িকাকার শুধু যে 'আদৌ বাচ্যঃ স্ত্রিয়া রাগঃ' এই নিয়ম অনুসরণ করিয়াছেন তাহা নহে, 'স্ত্রিয়া রাগঃ' এ ক্ষেত্রে পুরুষের পূর্ব্বরাগের পূর্ব্বকালবর্ত্তী। 'এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বাল্যকাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন?' পরে ৯ম পরিচ্ছেদে আখ্যায়িকাকার এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া 'জানি না,' 'বলিতে পারি না' স্ত্রীচরিত্র-সম্বন্ধে এইরূপ অজ্ঞতার ভান করিয়াও শেষে তাহার উত্তর দিয়াছেনঃ—'সেই দুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি; সেই বাপীতীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব, তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা—আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ - এই সকল উপলক্ষে কিছু কাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল।' হরলাল সম্প্রতি তাহার হৃদয়ে নৈরাশ্যের, শূন্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল; তাই 'হঠাৎ' সে গোবিন্দলালকে—'চম্পকবর্ণ চন্দ্রকিরণে' তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান 'চম্পক নির্ম্মিত মূর্ত্তি', করুণার সমবেদনার 'দেবমূর্ত্তি' গোবিন্দলালকে হৃদয়ে আসন দিয়া সেই শূন্যতা পূর্ণ করিল। অসময়ে করুণাশীল গোবিন্দলালের প্রতি তাহার (উইল-সম্বন্ধে) অন্যায়াচরণ স্মরণ করিয়া 'সেই বাপীতীরবিরাজিত, চন্দ্রালোক-প্রতিভাসিত, চম্পকদাম-বিনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি আনিয়া, রোহিণীর মানসচক্ষের অগ্রে ধরিল। রোহিণী দেখিতে লাগিল—দেখিতে দেখিতে কাঁদিল। রোহিণী সে রাত্রে ঘুমাইল না।' (৮ম পরিচ্ছেদ।) (হীরার অনিদ্রা তুলনীয়।) কবি এ স্থলে 'দেখিল আর মজিল' ধরণের আসক্তির পরিবর্ত্তে আসক্তির জটিল কারণ-পরম্পরার বিশ্লেষণ করিয়া অভিনবত্বের, মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

ছাত্র-শিক্ষা

[শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল]

সংযম

আজকাল দেশময় ছাত্রজীবনের শিক্ষা সম্বন্ধে একটা আন্দোলন চলিতেছে। কি শিক্ষিত, কি অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজে,—কি বিদ্যামন্দিরে, কি তাহার বাহিরে,—কি রাজনৈতিক কেন্দ্রে, কি অন্যত্র—কি সহরে, কি পল্লীগ্রামে—কি ঘরে, কি বাহিরে,—কি দৈনিক, কি সাপ্তাহিক, কি মাসিক সংবাদপত্রে, কি জনসাধারণের মধ্যে,—কি প্রকাশ্য সভায়, কি ব্যক্তিবিশেষের বৈঠকে,—কি চরমপন্থী, কি নরমপন্থী, কি "অপন্থী,"—সকলের মধ্যেই সর্ব্বত্র,—কাল যাহারা "মানুষ" হইয়া উঠিবে, কাল যাহারা দেশের মুখপাত্র হইয়া উঠিবে, সেই বালকগণের,—সেই ছাত্রগণের শিক্ষা বর্ত্তমান সময়ে কি প্রণালীতে হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে একটা তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। ইউনিভারসিটি কমিশন বসিল; তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। তাহাতে প্রকাশ যে, এযাবৎ যেরূপ শিক্ষা হইয়া আসিতেছে, সে শিক্ষা এদেশের,—এ সময়ের পক্ষে যথেষ্ট বা উপযুক্ত নহে;—ভিন্ন ভাবে শিক্ষা হওয়া উচিত। সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সকল স্থানেই ঐ এক কথা,—যে প্রণালীতে এ পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া চলিতেছে, তাহা ভ্রমসঙ্কুল,—সে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে;—নূতন পন্থায়, নূতন প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এমন আলোচনাও হইতেছে যে, এদেশে বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য ধরণের শিক্ষা উপযুক্ত নহে;—এদেশের, এ সময়ের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।—বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীতে নানা দোষ আছে,—তাহা "গোলামখানা।"—জাতীয় বিদ্যাপীঠ বা বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া আবশ্যক;—যেখানে এদেশের এই সময়ের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য ধরণের শিক্ষা-প্রণালী উঠাইয়া দিয়া, "খাঁটি" এদেশের অনুকরণে শিক্ষা দেওয়া উচিত,—এইরূপও আন্দোলন হইতেছে।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী যে যথেষ্ট বা উপযুক্ত নহে, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। কিন্তু নূতন শিক্ষা-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, সেই বিষয়ের আলোচনায়, কিরূপ শিক্ষা দিলে অধিক অর্থোপার্জ্জন হয় বা নানারূপ অর্থোপার্জ্জনের পথ উদ্‌ঘাটিত হয়, কিরূপ শিক্ষা দিলে মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেই দিকেই বেশী দৃষ্টিপাত। কিরূপ শিক্ষা-প্রণালীতে দৈহিক উন্নতি লাভ হয়, সে বিষয়েও অল্প-বিস্তর আন্দোলন দেখা যাইতেছে। কিন্তু কিরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে নৈতিক বা ধর্ম্ম-জীবনে উন্নতি লাভ করা যাইতে পারে, সে বিষয়ের আলোচনা কচিৎ দুই-এক স্থলে হইলেও, তাহা তুলনায় অতি অল্প।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, মানুষকে প্রকৃত "মানুষ" হইতে হইলে তাহাকে দৈহিক, মানসিক, নৈতিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রকৃত "মানুষ" হইতে হইলে, একসঙ্গেই দেহের, মনের, নীতির এবং ধর্ম্মের দিক দিয়া তাহাকে উন্নতি লাভ করিতে হইবে;—এই সকল বিষয়ের শিক্ষা একসঙ্গেই, একই ভাবে হওয়া কর্ত্তব্য। যে শিক্ষায় দেহের ও মনের এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি পরিস্ফুট হয়, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। একের অভাবে অন্য অঙ্গ পরিস্ফুট হইলে তাহা শিক্ষপদবাচ্য হইতে পারে না।

এ সকল বিষয়ের শিক্ষাস্থল নিজের নিজের বাড়ী,—পারিপার্শ্বিক ব্যক্তি বা বস্তু এবং বিদ্যালয়। আধুনিক বিদ্যালয় দৈহিক ও মানসিক শিক্ষার পক্ষে যেরূপ উপযোগী, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার পক্ষে সেইরূপ উপযোগী নহে। আবার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার পক্ষে নিজের-নিজের বাড়ী এবং পারিপার্শ্বিক ব্যক্তি বা বস্তু যেরূপ উপযোগী, বিদ্যালয় সেইরূপ নহে। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও অন্যান্য আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু বান্ধব, সঙ্গী, সহচর প্রভৃতির প্রভাব নৈতিক ও ধর্ম্মজীবন গঠিত করিবার পক্ষে যত বেশী, বিদ্যালয়ের প্রভাব তাহার শতাংশের একাংশও নহে। অথচ, আমার বিবেচনায়, সমুদায় শিক্ষার মূল এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা। ইহার উপর দৈহিক ও মানসিক শিক্ষা ও উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। অতএব, যাহাতে ছাত্রজীবনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা ভালরূপে হইতে পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান বিদ্যালয়ের শিক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকরণে,—পাশ্চাত্য শিক্ষার ভিত্তির উপরে স্থাপিত। বিদ্যালয়ে খুব জোর দৈহিক ও মানসিক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। মানসিক শিক্ষার মধ্যে পুস্তক পড়ান ও মুখস্থ করান হইয়া থাকে; এবং দৈহিক শিক্ষার মধ্যে ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, প্রভৃতি নানাবিধ ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের বাহিরে বাড়ীতে মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়-কুটুম্বগণের নিকট হইতে বর্ত্তমানক্ষেত্রে শিক্ষা বিষয়ে খুব জোর যে উপদেশ বা উৎসাহ পাওয়া যায়, তাহা পুস্তকপাঠ ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে; নৈতিক

বা আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোনও শিক্ষা দেওয়া হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর পারিপার্শ্বিক বস্তু বা ব্যক্তির, বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গী সহচর, অনুচর প্রভৃতির নিকট ঐ দুই বিষয়ে কোনও শিক্ষা পাওয়া ত দূরের কথা—বরং অশিক্ষা বা কুশিক্ষা পাওয়া যায়। ইহার ফলে আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বা ধর্ম্মজীবনের শিক্ষা ত হয়ই না,—বরং ঐ বিষয়ে আমাদের অশিক্ষা বা কুশিক্ষা এত বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, সারা জীবনে আমরা তাহার প্রভাব দূর করিতে পারি না বলিয়াই বোধ হয়। এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার মূলে যে সংযম-শিক্ষা, তাহা আমাদের একেবারেই হয় না। ইহার পরিণাম যে কি ভীষণ এবং তদ্দ্বারা আমাদের নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনের যে কি ক্ষতি হয় এবং দেহের ও মনেরও যে কি ভীষণ অধোগতি হয়, বারান্তরে তাহার আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

এই সংযম-শিক্ষাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রধান কার্য্য ছিল। ছাত্র-জীবন হইতেই এই সংযম শিক্ষা দেওয়াই আত্মীয় কুটুম্বগণের এবং সর্ব্বোপরি গুরুর প্রধান কর্ত্তব্য ছিল; এবং এই সংযম-শিক্ষা এত প্রয়োজনীয় বলিয়াই, ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে এই সংযম-শিক্ষার বিষয়ে এত অনুশাসন ছিল। এই সংযম-শিক্ষাই ছাত্রগণের ব্রহ্মচর্য্য।

এই দিনে, যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমাদের এমন অধোগতি হইতেছে—এই ধারণা আমাদের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে ও হইয়াছে,—এই দিনে, যখন আমরা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের অনুকরণে (পাশ্চাত্য রীতি নীতির অনুকরণে নহে,) জাতীয়-পীঠ বা বিদ্যা-মন্দির গঠিত করিবার জন্য প্রয়াসী বা উদ্যোগী,—এই দিনে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ এই সংযম বা ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা বিষয়ে কিরূপ অনুশাসন করিয়াছেন বা বিধি নিয়মাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার এই স্থানে আলোচনা করা বোধ হয় অসঙ্গত বা অস্থান-সংরম্ভ হইবে না। এই ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম-শিক্ষার বিধি-নিয়মাদির আলোচনার সঙ্গে-সঙ্গে মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ও শিক্ষক বা গুরু প্রভৃতির প্রতি ছাত্রের কর্ত্তব্য, এবং ছাত্রের প্রতি মাতাপিতার বা গুরু প্রভৃতির কর্ত্তব্যের বিষয় যে সকল বিধি-নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল, তৎসম্বন্ধেও আলোচনা করাও বোধ হয় অসঙ্গত বা অস্থান সংরম্ভ হইবে না। এই বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা মনু কি বিধান করিয়াছেন, তাহা অগ্রে দেখা যাউক।

মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণোদক প্রাচীন ঋষিরা যে সংযম বা ব্রহ্মচর্য্যের বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, ঐরূপ সংযম-শিক্ষা বা ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা আহার-নিদ্রা মৈথুনাদি সকল বিষয়ে সংযম শিক্ষা হয়; এবং তদ্দ্বারা যে শুধু নৈতিক ও ধর্ম্ম জীবনের উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা নহে;—তদ্দ্বারা দেহ ও মন শুদ্ধ হয়, এবং দেহের ও মনের ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। ঐরূপ সংযম শিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হওয়া যায়; স্মৃতি-শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়; পঠন-পাঠন বিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতা ও উন্নতি লাভ করা যায়; এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করা যায়। এক কথায়, ঐরূপ শিক্ষার দ্বারা মানুষ যে শুধু প্রকৃত "মানুষ" হয়,—তাহা নহে;—মানুষ দেবসদৃশ হয়। এই সংযম-শিক্ষার অভাবে ও ব্রহ্মচর্য্য অপালনের ফলে এত রোগ-ভোগ, এত দেহের অশান্তি, এত অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকাল-মৃত্যু, এত স্মৃতিশক্তির অল্পতা, এত মানসিক নিস্তেজ, এত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধোগতি।

এই শিক্ষা সম্বন্ধে নিয়মাবলী মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। অধুনা কয়েক বৎসর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় যাঁহারা সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে এই অধ্যায়টি পড়িতে হয়। নিম্নে মনুর ব্যবস্থার মধ্যে আধুনিক সময়ের উপযোগী সারবত্তম কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ এই প্রবন্ধে করিব। আশা করি, জাতীয় বিদ্যাপীঠে বা বিদ্যামন্দিরে ঐ সকল নিয়মের মধ্যে সারবত্তম নিয়ম সকল বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া প্রবর্ত্তিত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ দেশের ভবিষ্যৎ মুখোজ্জ্বলকারী ছাত্রগণের জীবন গঠিত করিবার প্রয়াস পাইবেন।

(১) প্রথমতঃ ভোজন সম্বন্ধে বিধি:—

(ক) পূজয়েদশনং নিত্যমদ্যা উচ্চৈতদকুৎসয়ন্। দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বশঃ॥ পূজিতং হ্যশনং নিত্যং বলমূর্জ্জঞ্চ যচ্ছতি। অপূজিতন্তু তদ্ভুক্তমুভয়ং নাশয়েদিদম্॥"

অর্থাৎ, ব্রহ্মচারী প্রতিদিন ভোজন কালে আহার্য্য বস্তুর (অন্ন) পূজা করিবেন, অর্থাৎ অতি সমাদরের সহিত অন্ন ভোজন করিবেন। অন্নের নিন্দা করিবেন না। অন্ন দেখিয়া খেদ করিবেন না। নিন্দাদি না করিয়া ভোজন করিবেন। অন্নদৃষ্টে হৃষ্ট হইবেন এবং প্রত্যহ আমরা যেন এইরূপ সন্তোষের সহিত অন্ন ভোজন করিতে পারি, এইরূপ প্রার্থনা করিবেন। এইরূপে ভক্তির ও শ্রদ্ধার সহিত অন্নভোজন করিলে, সামর্থ্য ও বীর্য্য লাভ হয়; এবং অন্যথাচরণ করিলে, অর্থাৎ অপূজিত ভাবে অন্নগ্রহণ করিলে, বল বীর্য্য উভয়ই নাশ প্রাপ্ত হয়।

আদিপুরাণেও ঐরূপ ভাবের উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় (কুল্লুক ভট্ট কৃত টীকা দ্রষ্টব্য)। খৃষ্টানদিগের—"grace before meat"ও বোধ হয় এই কারণেই প্রচলিত হইয়াছিল। শারীরতত্ত্ববেত্তা ভিষকগণ এই ব্যবস্থার সহিত স্বাস্থ্য ও বল বীর্য্যের সম্বন্ধ বিশেষ ভাবে বুঝাইতে পারিবেন। তাঁহাদের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে, হৃষ্ট চিত্তে ও অনুদ্বিগ্ন চিত্তে, রাগ-দ্বেষাদি বর্জ্জিত হইয়া, অন্ন ভোজন করা পরিপাকের ও স্বাস্থ্যের পক্ষে শ্রেয়স্কর, এবং অন্যথাচরণ পরিপাকের ও স্বাস্থ্যের বিঘ্নকারক।

(খ) "নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদদ্যান্নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা। ন চৈবাত্যশনং কুর্য্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্ ব্রজেৎ॥ অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্। অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

অর্থাৎ, ভুক্তাবশেষ অন্ন কাহাকেও দিবে না; প্রাতঃকাল ও সায়াহ্ন এই দুই ভোজন-কালের মধ্যে আর ভোজন করিবে না। ঐ দুই বারেও অতিভোজন করিবে না; এবং উচ্ছিষ্ট হইয়া কোথাও যাইবে না। অতিভোজন অনারোগ্য ও অনায়ুষ্য; অর্থাৎ অতিভোজন করিলে (অজীর্ণতা ইত্যাদি হেতু) রোগ হয় এবং (রোগজনিত) আয়ু হ্রাস হয়। অতিভোজন করিলে স্বর্গলাভ হয় না,—অপুণ্য অর্থাৎ পাপ হয়।

অতিভোজন করিলে লোকে (পেটুক ইত্যাদি বলিয়া) নিন্দা করিয়া থাকে। অতএব অতিভোজন পরিত্যাগ করা উচিত।

রোগের জীবাণু দ্বারা রোগ সংক্রমণ হয়; একের লালস্পৃষ্ট খাদ্য অন্যে ভোজন করিলে, প্রথমোক্তের শরীরস্থিত জীবাণু শেষোক্তের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমোক্তের রোগাদি শেষোক্তের দেহে সংক্রামিত হইতে পারে; এইজন্য বোধ হয় উচ্ছিষ্ট অন্নদান নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেই কারণেই উচ্ছিষ্ট-মুখে স্থানান্তরে গমন নিষিদ্ধ। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে দুইবার প্রধান আহারই যথেষ্ট বিবেচনায়, উভয়কালের মধ্যে দ্বিতীয়বার ভোজন নিষিদ্ধ। শীতপ্রধান দেশে অধিকবার আহার যেমন আবশ্যক, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সেরূপ অধিকবার আহার শ্রেয়স্কর নহে। অতি-ভোজন দ্বারা পাকস্থলী ক্লান্ত হইয়া অজীর্ণরোগ উৎপন্ন হইতে পারে; এবং তাহা হইতে সকল রকম রোগ আসিতে পারে; এবং তাহার ফলে পরমায়ু হ্রাস হইতে পারে। এই সকল কারণে গুরুভোজন নিষিদ্ধ। অল্প বা অপ্রচুর আহারের ন্যায়, অতিরিক্ত আহারও অনেক ব্যাধির মূল কারণ, এবং পরমায়ুর হ্রাসকারক। পরিমিত সংযত আহারই শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধক। লোকে যাহাতে নিয়মটি সর্ব্বতোভাবে পালন করে, সেজন্য নিয়ম-লঙ্ঘন করিলে পাপ হয় ও স্বর্গলাভ হয় না, এইরূপ ধর্ম্মের অনুশাসন; এবং অপরদিকে লোক-নিন্দার ভয়।

(গ) একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। ব্রহ্মচারী ভোজন করিতে বসিবার পূর্ব্বে প্রতিদিন নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, মুখ, হাত, পা প্রভৃতি সম্যক্ রূপে প্রক্ষালন করিবেন; এবং তৎপরে সমাহিত হইয়া, অর্থাৎ একমনে আহার করিবেন। "উপস্পৃশ্য দ্বিজো নিত্যমন্নমদ্যাৎ সমাহিতঃ।" এবং আহারের পরও হস্ত, পদ, মুখ প্রভৃতি বিশেষ ভাবে জল দ্বারা ধৌত করিবেন। "ভুক্ত্বা চোপস্পৃশেৎ সম্যগদ্ভিঃ খানি চ সংস্পৃশেৎ।" আহারের পূর্ব্বে ও পরে হস্ত-পদাদি বিশেষভাবে প্রক্ষালনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া, মনকে প্রফুল্ল রাখা, এবং যাহাতে আহারের সময়ে রোগের জীবাণু কোনও প্রকারে ভুক্ত দ্রব্যের সহিত উদরসাৎ না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা। এই নিয়মগুলি ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার বিধির মধ্যে লিপিবদ্ধ হইলেও, এইগুলি যে বিশেষ ভাবে দেহ ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেকালে লোকের ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল। শুধু দেহ ও স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়ম করিলে যদি তাহা পালিত না হয়, সেজন্য বিশেষ রূপে তৎসম্বন্ধে ধর্ম্মের অনুশাসন। আজকাল লোকে,—বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সকলেই যখন বিধি-নিয়মাদির হেতুর অন্বেষণ করিয়া থাকে, তখন ছাত্রগণের শিক্ষার্থ এই সকল নিয়ম বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া, এবং তাহাদের কার্য্যকারিতা ও উপকারিতা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে কিরূপে মন প্রফুল্ল হয়, এবং মন প্রফুল্ল থাকিলে, কিরূপে তাহাতে দেহের ও স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়, এবং হস্ত-পদাদি ধৌত করায় কিরূপে রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ লাভ করিতে না পারে, এবং তজ্জন্য রোগের ও স্বাস্থ্যনাশের হাত হইতে পরিত্রাণ করিতে পারা যায়,—এই সকল তত্ত্ব পরিষ্কার ভাবে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া, ঐ সকল নিয়ম পালন করিতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। এই যুগ-পরিবর্ত্তনের সময়ে, এই প্রাচীন আদর্শে শিক্ষা-দানের আন্দোলনের দিনে, মনুর উপরিউক্ত ব্যবস্থাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। হষ্টেল (ছাত্রবাস) আদিতে এবং অন্যত্র ছাত্রগণের মধ্যে আহারের পূর্ব্বে ও পরে হস্তপদাদি সম্যক্ রূপে ধৌত না করা, এবং পরস্পরের উচ্ছিষ্ট ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়ম না মানা,—যেখানে-সেখানে দেবালয় ও অন্যস্থানের চা পান ও চপ্-কাট্‌লেট্ আদি বিদেশীয় খাদ্য ভোজন করা, এবং অধিকবার ভোজন করা, ও ফলে অজীর্ণাদি রোগগ্রস্ত হওয়া ছাত্রজীবনের নিয়মের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। তাহার প্রতীকার আবশ্যক।

২। প্রাতরুত্থানের নিয়ম:—

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত" ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষ প্রহরে শয্যা-ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তৎপরে মলমূত্র ত্যাগ করতঃ ভগবানের উপাসনা করা উচিত। তৎপরে অধ্যয়নাদি করা বিধেয়। এই প্রাতরুত্থান দেহের ও মনের প্রফুল্লতা ও উৎকর্ষ সাধক। ঐরূপ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া অধ্যয়নাদি হেতু পরিশ্রান্ত হইলেও, পুনরায় শয়ন করা অবিধেয়। প্রাতরুত্থান ও প্রাতরধ্যয়ন যে দেহের ও মনের উৎকর্ষ-সাধক, তাহা বলা বাহুল্য। ইংরাজীতেও বাল্যকালে পড়া গিয়াছে,—"Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise." এইখানে একটি কথা বলা উচিত। আমাদের দেশের শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্মমূলক; এজন্য সর্ব্বকার্য্যে, এমন কি, শুধু দেহের উৎকর্ষ-সাধক কার্য্যাদি সম্বন্ধেও শাস্ত্রাদিতে ধর্ম্মের অনুশাসন। পাশ্চাত্য দেশ প্রধানতঃ জড়বাদী; এজন্য পাশ্চাত্যশিক্ষার মূলে প্রাতরুত্থানের ফলে দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক উন্নতি লাভ করা যায়, এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"মা দিবা স্বাপ্সীঃ।" ব্রহ্মচারী দিবানিদ্রা করিবেন না। দিবানিদ্রা শরীরের হানিকারক এবং মনের অবসাদক। দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ অশুচিত্ব উৎপাদক এবং বুদ্ধি প্রাণ প্রনাশক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আজকাল ছাত্রজীবনে প্রাতঃ-সূর্য্যোদয় দর্শন বিরল হইয়াছে। রাত্রি-জাগরণ করা এবং বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাওয়া ছাত্রগণের একটি নিয়মের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহ স্বাস্থ্যের ও মনের অপকারী। এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে, পুরাতন দেশীয় প্রণালীতে বিদ্যাপীঠ গঠন করিবার উদ্যোগের দিনে, এ বিষয়ে—কর্ত্তৃপক্ষের তথা ছাত্রগণের দৃষ্টিপাত করা উচিত।

৩। এইবার সর্ব্ববর্ণানুষ্ঠেয় সকল পুরুষার্থোপযুক্ত ইন্দ্রিয়-সংযম বিষয়ের ব্যবস্থার উল্লেখ করিব। মনু বলিয়াছেন।

(ক) "ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষপহারিষু। সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্॥" অর্থাৎ রথ-নিযুক্ত অশ্বগণকে সংযত রাখা

সারথির যেমন কর্ত্তব্য, সেইরূপ অপহরণশীল বিষয়ের প্রতি ধাবমান ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত রাখাও বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

এই শ্লোকের দ্বারা মনু সাধারণ ভাবে ইন্দ্রিয়াদি দমন করিবার ও সুসংযত রাখিবার বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিরূপে এই ইন্দ্রিয় দমন বা সংযম করা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাদি পরে উক্ত হইয়াছে। রথ-নিযুক্ত অশ্ব সংযত করিতে না পারিলে, বেগবান্ অশ্ব যেমন রথকে ও রথারোহী ব্যক্তিকে বিপন্ন করিতে পারে, সেইরূপ বেগবান্ ইন্দ্রিয়াদি দমন বা সংযম করিতে না পারিলে, দেহ এবং দেহী উভয়কেই বিপন্ন হইতে হয়।

তৎপরে মনু শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তপদাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে কর্ম্মেন্দ্রিয়, ও মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই একাদশ ইন্দ্রিয় মনের সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন :— "একাদশং মনো জ্ঞেয়ং স্বগুণে নোভয়াত্মকম্। যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ।" অর্থাৎ মনোরূপ অন্তরিন্দ্রিয় একাদশ ইন্দ্রিয়। মন নিজগুণে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয় ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক স্বরূপ। এই মনরূপ ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে পারিলে, ঐ উভয় প্রকার ইন্দ্রিয়ই জিত হয়। সকল ইন্দ্রিয়ের সার ইন্দ্রিয় মনকে সংযত করিতে পারিলে, সকল ইন্দ্রিয়ই বশীভূত হয়। মন সংযত করিতে না পারিলে, কোনও ইন্দ্রিয়ই নিজের বশীভূত হয় না;—সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্যাদিই বিশৃঙ্খল হইয়া যায়;—তাহার ফলে দেহ ও মন উভয়েরই অবনতি হয়। এজন্য মনকে সংযত করাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়গণের বিষয় প্রসক্তি হেতু দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দোষে মানব দূষিত হইয়া থাকে। সেই ইন্দ্রিয় সংযত করিতে পারিলে, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি পুরুষার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এজন্য ইন্দ্রিয় সংযম বিধেয়। কিরূপে ইন্দ্রিয় সংযম করা যাইতে পারে, জিতেন্দ্রিয় কাহাকে বলে, ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা কিরূপে সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে, এবং ইন্দ্রিয় সংযম না করিতে পারিলে তাহার ফলাফল কি, ইন্দ্রিয়-বিষয় ভোগ ও কাম্য বিষয় ত্যাগ—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়স্কর ইত্যাদি বিষয়ের পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে ব্রহ্মচারী ছাত্রের পক্ষে ইন্দ্রিয় সংযম শিক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত মাত্র উক্ত হইল। এই মন সংযত করার শিক্ষা ও চেষ্টা বর্ত্তমান ছাত্রজীবনে কতদূর বিদ্যমান, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক; এবং তাহার অভাব থাকিলে, সেই অভাব দূরীকরণের ও তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

(খ) "সেবেতেমাংস্তু নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্। সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥" অর্থাৎ উপনয়নের পরে অধ্যয়নার্থ গুরুগৃহে বাসকালীন, ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া নিজের তপোবৃদ্ধি-হেতু নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করা ব্রহ্মচারী ছাত্রের কর্ত্তব্য। এই শ্লোকের পরে মনু ব্রহ্মচারী-কর্ত্তব্য সংযমমূলক নিয়মাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। ঐরূপ নিয়ম পালন করিলে নিজের দেহ ও মন উভয়ের, এবং ইহলৌকিক পারলৌকিক মঙ্গল সাধিত হয়; এবং উত্তরোত্তর দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায়। যে সকল অনুষ্ঠেয় কর্ম্মাদির নিয়ম বিহিত আছে, তাহার সহিত আমাদের বর্ত্তমান ছাত্রজীবনে অনুষ্ঠিত আচার-ব্যবহারের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, আমাদের বর্ত্তমান ছাত্রজীবন পুরাকালের শিক্ষা দীক্ষা হইতে কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছে; এবং ঐরূপ তুলনায় সমালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, বর্ত্তমান ছাত্রজীবন দ্রুত যেদিকে ধাবমান হইতেছে ও হইয়াছে, তাহা কতদূর সঙ্গত বা অসঙ্গত। এইরূপ তুলনায় সমালোচনার ফলে বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, এবং বর্ত্তমান ছাত্রজীবন ভবিষ্যতে কিরূপ ভাবে গঠিত হওয়া কর্ত্তব্য, সে বিষয়েও অনেক জ্ঞান অর্জ্জন করা যাইবে।

(গ) "নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষি পিতৃতর্পণম্। দেবতাভ্যর্চ্চনঞ্চৈব সমিদাধানমেবচ॥" অর্থাৎ প্রতিদিন (অবশ্য সুস্থ শরীরে) স্নান করিয়া (বাহিরে ও অভ্যন্তরে) শুচি বা শুদ্ধ হইয়া দেব, ঋষি এবং পিতৃতর্পণ করা এবং দেবতাদিগের পূজা করা ও (প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে) সমিদ্ধোম (সমিধ্ দ্বারা হোম) করা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য।

গৌতম কিন্তু ব্রহ্মচারীর পক্ষে "সুখস্নান" (সাবান গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি বিলাসিতাবর্দ্ধক দ্রব্যমূলক স্নান) নিষেধ করেন। অর্থাৎ গৌতমের মতে ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিত্যস্নান বিধেয় হইলেও, দীর্ঘকাল ধরিয়া সাবান ও গন্ধদ্রব্যাদি ব্যবহার করতঃ স্নান অবিধেয়।

সুস্থ শরীরে (রোগাদি দৌর্ব্বল্যাদি-বর্জিত দেহে) প্রত্যহ স্নান করা যে দেহের ও মনের উৎকর্ষ-সাধক, তাহা বলা বাহুল্য। ইহা চিকিৎসকদিগের মত এবং ভূয়োদর্শনজনিত অভিজ্ঞতামূলক। দৈহিক পরিচ্ছন্নতা এবং মনের প্রফুল্লতা ও পবিত্রতা যে সুস্থ দেহ ও দীর্ঘ জীবন লাভের মূলমন্ত্র, তাহাও বলা বাহুল্য। তবে প্রত্যহ স্নান করা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় হইলেও, নানাবিধ সুখকর বিলাসিতার দ্রব্যাদি ব্যবহারে দীর্ঘ সময় ক্ষেপন করতঃ স্নানাদি নিন্দনীয়;—তাহাতে দীর্ঘস্নানহেতু ও কৃত্রিম দ্রব্যাদি ব্যবহার-জনিত স্বাস্থ্যহানি হওয়া সম্ভব। ইহাতে বিলাসিতা বৃদ্ধি পাইয়া ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয়; এবং উত্তরোত্তর বিলাসিতা বৃদ্ধি পাইয়া জীবদের অন্যান্য যে সকল ক্ষতি বা অমঙ্গল উৎপাদন করে, তাহা নিম্নে বিবৃত করিব। মহাত্মা গান্ধি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই বিলাসিতাবর্জ্জনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; এবং বিলাসিতা-বর্জ্জন ইঁহাদের শিক্ষার অন্যতম আদর্শ। আজকাল ছাত্রদিগের মধ্যে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ছাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। একশ্রেণীর ছাত্র অত্যধিক অধ্যয়ন-স্পৃহা বশতঃ এবং কোন-কোন স্থলে অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণ হেতু প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ না হওয়ায়, প্রাতঃকালে বিদ্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বে সময়াভাব প্রযুক্ত তাড়াতাড়ি যেমন তেমন করিয়া মাথায় একটু তেলজল দিয়া স্নান-কার্য্য সমাধা করেন। আর এক শ্রেণীর ছাত্র সাবান প্রভৃতি বিলাসিতার চরম উপাদানসমূহ ব্যবহার করতঃ অত্যধিক সময় স্নানাদিতে ক্ষেপন করেন। ইহার ফলে এই উভয় প্রকার ছাত্রজীবনই সফল হয় না।

স্নানাদির পরে পূজা হোমাদির ও তর্পণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে বিদ্যালয়াদিতে নানা বর্ণের ও নানা ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রের

সমাবেশ হয়। এজন্য তাহাদের ভগবদারাধনার বা পিতৃপুরুষের আরাধনার প্রকারভেদ হইবেই। কিন্তু প্রত্যহ ছাত্রগণের পক্ষে পিতৃ-পুরুষের স্মরণ ও আরাধনা করা এবং নিজের-নিজের ধর্ম্মানুসারে ভগবদারাধনা করা উচিত। এই শিক্ষা ছাত্রগণকে দেওয়া, এবং যাহাতে ছাত্রগণ এই শিক্ষানুযায়ী কার্য্যানুবর্ত্তী হয় তাহা দেখা প্রধানতঃ মাতা-পিতা প্রভৃতি আত্মীয়কুটুম্ব অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রথমেই বলিয়াছি যে, ধর্ম্মশিক্ষা বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিবার অবসর বা চেষ্টা আমাদের নাই। আমরা খুব জোর ছাত্রগণের মানসিক উৎকর্ষের প্রতি, অর্থাৎ ছাত্র ভাল পড়িতেছে কি না, কি উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইবে, কি উপায়ে শিক্ষালাভ করতঃ অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে—এই সকলের দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া থাকি। ছাত্রগণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করা এবং তাহাদিগকে "মানুষ" করিয়া তোলা যে আমাদের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষও এবিষয়ে যে কারণেই হউক,—(সরকার বাহাদুর প্রজাগণের ধর্ম্ম সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিবেন না, এই কারণেই হউক, বা অন্য কারণেই হউক), সম্পূর্ণ উদাসীন। বরং মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে কতক ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের চেষ্টা হইয়া থাকে—হিন্দুদের মধ্যে তাহা বিরল। তাহার ফলে ছাত্রগণের ধর্ম্মজীবন অন্ধকারময় হয়; এবং ভবিষ্যৎ জীবনে ইহার ফল ভীষণ হয়। আমরা "ধর্ম্মহীন" হইয়া উঠি; ধর্ম্মহেতু যে একটা দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য-বোধ, তাহা আমাদের থাকে না। তাহাতে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিপদে পদস্খলন হওয়া সম্ভব; এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহা হইয়াও থাকে। আমার বিবেচনায় ছাত্র-জীবনে এ বিষয়ে সম্যক্ প্রকারে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য; এবং ছাত্রগণের জীবন প্রধানতঃ ধর্ম্মের দিক দিয়া গঠিত করিয়া তোলা আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় অট্টালিকায়, বৈদ্যুতিক পাখার নীচে, নানাবিধ সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে বিদ্যাদান করিলে, বা ছাত্রদিগের আবাস-স্থান নির্দ্দেশ করিলেও, প্রতীকার হইবে না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধর্ম্মহীন মনুষ্য পশুর সদৃশ; ধর্ম্মহীন শিক্ষা "মানুষ" গড়িয়া তুলিতে পারে না।

(ঘ) (১) বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ। শুক্তানি যানি সর্ব্বানি প্রাণিনাঞ্চৈবহিংসনম্॥ অর্থাৎ মধু ও মাংস, গন্ধা-নুলেপন (এসেন্স প্রভৃতি ব্যবহার), মাল্যধারণ, উদ্রিক্ত রস গুড় প্রভৃতি ভক্ষণ, যে সকল মধুর রস দ্রব্য পর্য্যুসিত ("বাসি") হওয়ায়, বিকৃত হইয়া অম্ল হয়, সেই সকল দ্রব্য ভক্ষণ, প্রাণিহিংসা এবং স্ত্রীসম্ভোগ—এই সকল ব্রহ্মচারী ছাত্রের বর্জ্জন বা পরিত্যাগ করা উচিত। এখানে মধু শব্দের অর্থ কুল্লুক ক্ষৌদ্র (চাকের মধু) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মধুশব্দ সংস্কৃত মদ্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মাংসের সহিত একত্র উল্লেখ জন্য মধুশব্দের এখানে মদ্য অর্থ কি না তাহাও বিবেচ্য।

..এসেন্স প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য ও মাল্যাদি ব্যবহার দ্বারা বিলাসিতা বৃদ্ধি পায় এবং সংযম শিক্ষার হানি হয়। এই কারণে ঐ সকল দ্রব্য পরিবর্জ্জন করিবার উপদেশ। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ শিক্ষা প্রচলিত, ছাত্রগণের আচার-ব্যবহার যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে উত্তরোত্তর বিলাসিতা প্রবল ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বিলাসিতার পরিণাম কি তাহা বলা সুকঠিন। এই বিলাসিতার প্রসারের বিরুদ্ধে দেশে একটা আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু এখনও কলিকাতায় যে কোনও ছাত্রাবাসে গমন করিলে, সহজেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই বিলাসিতা-রাক্ষসী কিরূপ ভাবে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে ও করিতেছে। এই বিলাসিতা দমন করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। সামাজিক ভাবেই হউক, রাজনীতিক ভাবেই হউক, অর্থনীতির দিক্ দিয়াই হউক, স্বদেশপ্রীতির দিক দিয়াই হউক, কি ব্যষ্টি বা সমষ্টির দিক্ দিয়াই হউক,—যে দিক্ দিয়া যে ভাবেই দেখা যাউক না কেন, এই বিলাসিতার ক্রমশঃ হ্রাস করা, এবং ক্রমে তাহা সমূলে নাশ করা একান্ত আবশ্যক। অশন, বসন, ভূষণ,—সকল বিষয়েই বিলাসিতার যে প্রবল স্রোত বহিতেছে,—তাহা রোধ করা কর্ত্তব্য। নচেৎ জাতীয়ত্ব, মনুষ্যত্ব—সব নষ্ট হইয়া যাইবে। মধু শব্দের মদ্য অর্থ হইলে তাহা নিষেধের কারণ বেশ উপলব্ধি হয়। মদ্যবর্জ্জন করা সকল বয়সে, সকল স্থলে যে একান্ত কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না। মধু অর্থাৎ ক্ষৌদ্র, গুড়, মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ বোধ হয় স্বাস্থ্যের হিসাবে, এবং রাজসিক ও তামসিক বৃত্তি নিবারণের জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। যেখানে দ্রব্য "বাসি" হইলে অম্লগুণ প্রাপ্ত হয়, তাহা স্বাস্থ্যনাশের আশঙ্কায় নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রাণিহিংসা ব্যসন মধ্যে পরিগণিত;—তাহাও সাত্ত্বিকবৃত্তির অনুশীলনার্থ, এবং রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিনিরোধার্থ ও ধর্ম্মার্থ নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ছাত্রজীবনে স্ত্রীসম্ভোগ নিষিদ্ধ হইয়াছে;—স্বাস্থ্যও দীর্ঘজীবন লাভের জন্য। এই বিষয়ে নিম্নে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। উপরে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হইল, এবং নিম্নে যে সকল বিষয় নিষেধের করা উল্লিখিত হইবে, তৎসমুদায় অধ্যয়নের বিঘ্নকারক বলিয়াই নিষিদ্ধ হইয়াছে;—কারণ, অধ্যয়নই ছাত্রজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য; এবং যাহা দ্বারা অধ্যয়নের বিঘ্ন হইতে পারে, সেই সমুদায় বিষয়ই ছাত্রজীবনের নিষিদ্ধ তালিকায় গ্রথিত করা হইয়াছে।

(ঘ) (২) "অভ্যঙ্গমপুনঞ্চাক্ষোরুপানচ্ছত্র ধারণম্। কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনংগীতবাদনম্॥ দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরীবাদং তথানৃতম্। স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ॥"

অর্থাৎ তৈলাদি দ্বারা সমস্তক সমুদায় দেহাভ্যঙ্গন, কজ্জলাদির দ্বারা নেত্ররঞ্জন, চর্ম্মপাদুকা ও ছত্রধারণ, কাম অর্থাৎ বিষয়াভিলাষ, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য-গীত বাদ্য, অক্ষাদি দ্যূতক্রীড়া, লোকের সহিত অকারণ বাক্যালাপ বা কলহ, পরনিন্দা বা পরচর্চ্চা, মিথ্যাবাদ, মৈথুনেচ্ছায় স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষপাত বা তাহাদিগকে আলিঙ্গন, এবং পরের অপকার,—এ সকলই ব্রহ্মচারী ছাত্রের পরিবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

মন্বাদি-বিহিত এই সকল নিয়মের সহিত প্রাচীন গ্রীসের অন্তঃপাতী স্পার্টানগরের লাইকার্গাসের নিয়মাবলীর তুলনায় সমালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উভয়দেশের শাস্ত্রপ্রবর্ত্তয়িতাগণ একই উদ্দেশ্যে ঐ সকল কঠোর নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন, যাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ

মুখোজ্জ্বলকারিগণ ব্রত-নিয়ম সংযমাদির দ্বারা প্রকৃত "মানুষ" গঠিত হইয়া পরে নিজেদের ও দেশের উন্নতি ও কল্যাণসাধন করিতে পারেন। যাহাতে লোকের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সংসাধিত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই ঐ সকল নিয়ম বিহিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে আমরা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি! অবশ্য এই সকল নিষেধ-বিধির মধ্যে কতকগুলি বর্ত্তমান সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় তদুপযোগী করিয়া পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রধানতঃ ঐ সকল নিষেধ বাক্য মানিয়া চলা, এবং ঐ সকল উপদেশ অনুসারে আমাদের বর্ত্তমান ছাত্রগণের জীবন গঠিত করা যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। ঐ সকল নিষেধের মধ্যে অভ্যঙ্গ, নেত্রাঞ্জন, চর্ম্মপাদুকা ও ছত্রধারণ প্রভৃতি নিষেধ দেহকে সংযত করা ও কঠোরতা অভ্যাস করা, এবং তাহার ফলে দেহকে সবল ও কষ্টসহিষ্ণু এবং রোগপ্রতিষেধের যোগ্য করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যেই বিহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

দেহকে যতই সুখাভ্যস্ত করা যায়, দেহ ততই রোগের আক্রমণ প্রতিষেধ করিতে অক্ষম হয়। দেহ যত সবল হয় ও কঠোর হয়, তত রোগ-প্রতিষেধক হয়; এবং সংসার-ক্ষেত্রে দৈনিক সংগ্রামের উপযোগী হয়। তবে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বর্ত্তমান যুগে ঐ নিষেধগুলির একটু পরিবর্ত্তন বোধ হয় প্রয়োজনীয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা অনুসারে অধ্যয়ন কালে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি পরিবর্জ্জন করিবার বিধি নাই;—বরং পাঠাভ্যাসের সহিত ব্যায়ামও যেরূপ প্রয়োজনীয়, নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি শিক্ষাও সেইরূপ বা কিঞ্চিৎ নূ্যন প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। আধুনিক বিদ্যালয়সমূহে নৃত্যগীতাদির ও অবৈতনিক নাট্যশিল্পের আলোচনা থাকা উচিত বলিয়াও কেহ-কেহ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু ফলতঃ ঐ সকল নৃত্য-গীতাদির ও নাট্যশিল্পের আলোচনা নিয়মিত ভাবে প্রচলিত করিলে অধ্যয়নের বিঘ্ন হইতে পারে কি না, নৈতিক উন্নতি বা অবনতি হইতে পারে কি না, এই সকল বিষয়ও ভাবিয়া দেখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ছাত্রজীবনে ঐ সকলের আলোচনার ফল ভাল কি মন্দ, তাহাও বিশেষ ভাবিবার বিষয়। উপরের শ্লোকে কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্যূতক্রীড়া, জনবাদ, পরীবাদ, মিথ্যাবাদ, পরের অনিষ্টাচরণ এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ ও স্ত্রীলোককে আলিঙ্গনাদি অষ্ট যে সকল নিষেধ-বিধির উল্লেখ আছে, তৎসমুদায়ই যে ছাত্রজীবনে সর্ব্বথা পরিহার করা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে ছাত্র-জীবনে ঐ সকল নিষিদ্ধ বিষয়গুলির মধ্যে কোন্‌গুলি প্রচলিত আছে, তাহা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া, প্রচলিত রীতিনীতিগুলির সংস্কার করিয়া, ক্রমে একেবারে সেগুলি সমূলে উৎপাটিত করা, এবং ঐগুলি সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিবার চেষ্টা করা মাতা-পিতা প্রভৃতি আত্মীয় কুটুম্বগণের, তথা বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির ও শিক্ষকের কর্ত্তব্য।

(৬) "একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ কচিৎ। কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥ স্বপ্নে সিক্ত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ। স্নাত্বার্কমর্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্মামেত্যৃচং জপেৎ॥" অর্থাৎ ব্রহ্মচারী ছাত্রের সর্ব্বত্র একাকী শয়ন করা উচিত। কখনও ইচ্ছাপূর্ব্বক শুক্রপাত করা উচিত নহে। ইচ্ছাপূর্ব্বক শুক্রপাত করিলে ব্রতভঙ্গ হয়। যদি অকামতঃ (অর্থাৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা অনিচ্ছায়) নিদ্রাকালীন শুক্রক্ষরণ হয়, তাহা হইলে পরদিবস প্রভাতে স্নান করিয়া শুচি হইয়া সূর্য্যদেবকে অর্চ্চনা করা উচিত; এবং আমার বীর্য্য পুনরায় আমাতে প্রত্যাবর্ত্তন করুক, ঐরূপ বেদমন্ত্র তিনবার জপ করা উচিত।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, দেহের মধ্যে শুক্রই প্রধান ধাতু। শুক্ররক্ষার উপর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন প্রধানতঃ নির্ভর করে। ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইয়া রসে পরিণত হয়। রস হইতে অসৃক্ (রক্ত), রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। এই শুক্রই প্রধান ধাতু। এই সপ্ত ধাতুর উপরে ওজঃ ধাতু। ইহাই বৈদ্যশাস্ত্রের মত। শুক্ররক্ষা দ্বারা স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়। শুক্রক্ষয়ে দেহ ও স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়; এবং পরমায়ুর হ্রাস হয়। বিশেষ, যৌবন-কাল আগত হইবার পূর্ব্বে, ছাত্র-জীবনে,—যখন সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্যক্ পরিপুষ্ট হয় না,—তখন, নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক উপায়ে শরীরের এই প্রধান ধাতু-পদার্থ ক্ষয় হইলে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্যক্ পুষ্টি লাভ করে না। তাহার ফলে দেহ দুর্ব্বল হয়; এবং নানা রোগের সহজ-আক্রমণ-যোগ্য হয়। ফলে, দেহ নানা রোগে আক্রান্ত হয়; এবং ক্রমে অকালে জরাজীর্ণ হয়; এবং অকালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এইজন্য বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ; এইজন্য ছাত্র-জীবনে স্বকীয়া বা পরকীয়া রমণী-সম্ভোগ নিষিদ্ধ। এমন কি, এইজন্য রমণীবিষয়ক আলোচনা বা চিন্তা, বা তাহাদিগের প্রতি কটাক্ষ-পাতও নিষিদ্ধ। এজন্য নৈসর্গিক উপায়েও শরীরের এই উৎকৃষ্টতম ধাতু পদার্থ নষ্ট করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অনৈসর্গিক উপায়ে ঐ ধাতু নষ্ট হইলে, তাহার পরিণাম আরও ভয়াবহ। তাহাতে শরীর ও মন আরও নিস্তেজ হয়; এবং শরীর ও মন নানা ব্যাধি পরিপূর্ণ হয়। স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়; অকালে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়; এবং অকাল-মৃত্যুও সংঘটিত হয়। সেইজন্য, যে কোনও প্রকারেই হউক, ঐ ধাতু-পদার্থ যাহাতে নষ্ট না হয়, সেই বিষয়ে এত কঠোর অনুশাসন। অনেক সময়ে সঙ্গদোষে ঐ সকল দোষ আসিয়া পড়ে। তাই সর্ব্বত্র একাকী শয়নের ব্যবস্থা। সেইজন্যই বোধ হয় অনেক বিলাস-সামগ্রী পরিবর্জ্জনের আদেশ; এবং সম্যক্ রূপে দেহকে কঠোর ও সংযত করিবার বিধি-ব্যবস্থা। এই সংযমের অভাবে ও এই নিয়ম অপালন হেতু ছাত্র-জীবনে এবং পরজীবনেও কত অনর্থ সাধিত হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অথচ এত প্রয়োজনীয় যে বিষয়, সে বিষয়ে কোনও শিক্ষা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লজ্জা বা শীলতার অনুরোধেই হউক, বা যে কারণেই হউক, আত্মীয়-স্বজন ও অভিভাবকগণও এই শিক্ষা দিতে বিরত থাকেন। শিক্ষকেরাও এই শিক্ষা দেন না। অকালে নানা রোগগ্রস্ত হইলেও, চিকিৎসকগণ নানা ঔষধ ও পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করেন বটে, কিন্তু এই সকল বিষয়ে কোনও উপযুক্ত ইঙ্গিত বা শিক্ষা দেন না। ফলে, সংযম-শিক্ষার অভাবে অনর্থ বাড়িবে বই কমিবে না। তবে এ কথাও বলা উচিত যে, এই বিষয়ে

শিক্ষা কিরূপ ভাবে দেওয়া কর্ত্তব্য, বা কিরূপ ভাবে দিলে তাহা বিশেষ সুফলপ্রদ হইবে সে বিষয়ে বিশেষ ভাবিয়া দেখা উচিত। এ কথা কিন্তু সত্য যে, প্রথম জীবন হইতে সকল বিষয়ে শাস্ত্রাদিবিহিত বর্ত্তমান কালোপযোগী সংযম-শিক্ষা হইলে, এবং দেহকে বলবান, কঠোর ও কষ্টসহিষ্ণু করিতে পারিলে, এবং মন প্রফুল্ল রাখিতে পারিলে, ও সৎসঙ্গে সাধু চিন্তায় সময় অতিবাহিত করিলে, এবং সর্ব্বোপর ধর্ম্মশিক্ষা হৃদয়ে নিহিত করিতে পারিলে, শুধু এই শুক্র-রক্ষা বিষয়ে কেন, সকল বিষয়েই সংযম-শিক্ষা হইতে বিলম্ব হয় না। এই সংযম-শিক্ষা, এই নীতি-শিক্ষা, এই ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রথম ও প্রধান বস্তু। ইহার অভাবে সকল অনর্থ; ইহার প্রবর্ত্তনে সকল অনর্থনাশ ও ইষ্ট-প্রাপ্তি। সুতরাং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রথম হইতে যাহাতে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, যাহাতে নীতিধর্ম্মহীন পথ পরিত্যাগ করা হয়, ও নীতিধর্ম্মমূলক জীবন প্রথম হইতেই গঠিত হইয়া উঠে,—সে বিষয়ে যত্ন করা ও সে বিষয়ে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বারান্তরে ছাত্র-জীবনের শাস্ত্রসম্মত অন্যান্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

ভারতবর্ষে ছাতা (mushroom) চাষের সম্ভাবনা

[শ্রীসহায়রাম বসু এম-এ, এফ্-এল্-এস্]

ব্যাঙের ছাতা, খড়ের ছাতা, গোবর-ছাতা প্রভৃতি নানাপ্রকার ছাতা সাধারণের অবিদিত নহে। নানা স্থানে বিভিন্ন ঋতুতে এইগুলি জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে কয়েক প্রকার ছাতা ভারতের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীরা খাদ্যরূপে ব্যবহার করে; এবং ঐগুলি সাধারণতঃ বর্ষাকালে জন্মিয়া থাকে। এই সময়ে কলিকাতা (নিউমার্কেট, বহুবাজার, নূতনবাজার, মাধববাবুর বাজার), বাঁকুড়া, দেওঘর, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানের সাধারণ বাজারে এই খাদ্যোপযোগী ছাতা বিক্রয় হইয়া থাকে। যদিও ভারতের আপামর সাধারণ উহা খাদ্যরূপে ব্যবহার করে না, তবুও এক শ্রেণীর লোকের নিকট ইহা অতি উপাদেয় খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে এই ছাতার চাষ কেহই করে না—উহা বর্ষাকালে আপনা-আপনিই জন্মিয়া থাকে।

বাংলাদেশে খাদ্যোপযোগী কয়েক প্রকার ছাতা আমি সংগ্রহ করিয়াছি; তাহাদের নাম, Volvatia terostia, Lepiota albuminosa, Lepecta matrides and sience carpantpa and ejosteromyclis; তাহাদের কয়েকটির সচিত্র বিবরণ ১৯১৮ সালের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বৈজ্ঞানিক বিবরণীর (proceedings of science convention) ১০৬ ৩৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছি; এবং বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় অন্য এক প্রকার ছাতার (Lepiota albuminosa) বিবরণও প্রকাশিত হইবে। মিঃ ম্যাকুরি অন্য এক প্রকার ছাতার (Agaricus Campestris) সচিত্র বিবরণ ভারতের কৃষি-বিষয়ক পত্রিকায় (Agricultural journal of India, Vol. V, Part III. P. 197.) প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পর আমি যাহা অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহার কিয়দংশ এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

আমার সংগৃহীত কয়েকপ্রকার ছাতাই আমি ডাক্তার শ্রীযুত চারুব্রত রায় বি-এস্‌সি, এম্-বি, দ্বারা রাসায়নিক বিশ্লেষণ করাইয়াছি। তাঁহার এই উপকারের জন্য তিনি সত্যই আমার ধন্যবাদার্হ। নিম্নে রাসায়নিক বিশ্লেষণের যে ফল দিলাম, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, ইহাদের কতকগুলি পাশ্চাত্যদেশে খাদ্যার্থ ব্যবহৃত ছাতা (Ag. Campestris) অপেক্ষা পুষ্টিকারিতা হিসাবে কোন অংশে হীন নহে।

স্থানীয় খাদ্যোপযোগী ছাতা :—(শতকরা)

নাম	কার্ব্বো-হাইড্রেট,	প্রোটিন,	চর্ব্বি, (fats)	দাহাবশেষ, Ash	জলীয় পদার্থ
১। ভলভেরিয়া, (Volvaria terastius)	অত্যল্পমাত্র	২'২৮	'১৮	×	শুষ্কাবস্থায় বিশ্লেষণ করা হয়।
২। কলিবিয়া (Collybia albuminosa)	১৪'৮	১২'৮	অত্যল্প	×	ঐ
৩। এগারিকাস (Ag. Campestris)	১'৬	২'৭৩৬	'৩৭	'১৫	৯৫'২
৪। পাফ্‌বল্ (Puffballs)	১'৩৫	২'২	'৫৬	'১৬	৯৩·৮৫

ইংলণ্ডে খাদ্যার্থ ব্যবহৃত ছাতা :—(Ag. Campestris)

প্রোটিন, শতকরা—'১৮। কার্ব্বোহাইড্রেট—'৪৬ শতকরা চর্ব্বি (fats)—শতকরা '০৩।

আমেরিকার ছাতা :—(Ag. Campestris)

প্রোটিন—২'২৫ শতকরা। চর্ব্বি (fats)—'২০। শতকরা কার্ব্বোহাইড্রেট—৪'৯৫ শতকরা। জলীয় পদার্থ—৯১'৩০ শতকরা। আমাদের এই কলিবিয়া ছাতাই দেশে "দুর্গাছাতু" নামে পরিচিত। ইহা সাধারণতঃ শরৎকালে দুর্গাপূজার সময় জন্মিয়া থাকে, এবং অন্যান্য ছাতা অপেক্ষা পুষ্টিকরও বটে।

মিঃ ডুগারের প্রথা অবলম্বনে গোময় সারে আমি দুই প্রকার ছাতা কৃত্রিমরূপে উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই প্রথার বিস্তারিত বিবরণ নাগপুরে ইণ্ডিয়ান্ সায়েন্স্ কংগ্রেসের সপ্তম অধিবেশনে ১৯২০ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে আমেরিকাতেও এই প্রথা অবলম্বন করিয়া কৃষকেরা খুব কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমিও আমার

পরীক্ষাগারে এই প্রথা অবলম্বন করিয়া য়্যাগারিকাস নামক ছাতা উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছি, ফলাফল যথাসময়ে প্রকাশ করিব। এই প্রচেষ্টার ফলে, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে যেরূপ ইহা বিস্তৃতভাবে উৎপন্ন হইতেছে, আমাদের দেশেও যেন সেইরূপ ভাবে ইহা উৎপন্ন হয়, এবং উহার চাষ হইতে পারে, ইহাই আমার উদ্দেশ্য।

১৯০৮ সালে লণ্ডনের কিউ-গার্ডেনের ডিরেক্টর স্যর ডেভিড প্রেণ ভারত গভর্ণমেন্টের কৃষি-বিভাগের সাহায্যে এই খাদ্যোপযোগী ছাতা সম্বন্ধে সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

১৮৯৬—৯৭ সালে দুর্ভিক্ষের সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষতঃ দরিদ্রদিগের মধ্যে ইহা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়ায়, তাঁহার দৃষ্টি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। (Appendix to Indian Forester Feb. 08, P. 20)। এই অনুসন্ধানের ফল মিউজিয়মে এখনও সংরক্ষিত আছে; এবং তাহা হইতে জানা যায় যে, বর্ম্মা, পাঞ্জাব, কাশ্মীর এবং আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থানে যদি ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারা যায়, তবে জনসাধারণ ইহা খাদ্য রূপে ব্যবহার করিতে পারে; বিশেষতঃ বর্ম্মা অধিবাসীরা ইহা অতি সুখাদ্য বলিয়া মনে করে, এমন কি, উহারা প্রতি ছাতা ৸৹ আনা পর্য্যন্ত দিয়া ক্রয় করে।

সময়ে সময়ে ভারতবর্ষীয় পত্রিকা-আদিতে এই খাদ্যোপযোগী ছাতা সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ ইহাতে সংবদ্ধ করিলাম।

(১) Punjab plants নামক কাগজে ১৮৬৯ সালে জে, এল, ষ্টুয়ার্ট ২৬৭ পৃঃ লিখিয়াছেন :—এগারিকাস ছাতা কুম্ভ, সামারো, খুম্বা, খাম্বার, চার্‌্ড্র, মোক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন প্রদেশে অভিহিত হয়। এই ছাতা বৃষ্টিকালের পর মধ্য পাঞ্জাবের নানা গোচারণ-ভূমিতে ও প্রান্তরভাগে এবং দক্ষিণ-পাঞ্জাবেরও প্রান্তরভাগে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কোল্ড্‌ষ্ট্রিম্ বলেন যে, মধ্যপ্রদেশের নিকট ইহার রঙ্ একেবারেই শাদা এবং উপরিভাগ একপ্রকার চূর্ণময় পদার্থে আবৃত; এবং তিনি আরও বলেন যে, ছাতার নিচের দিকে মাছের কানকুয়ার মত যে লম্বা-লম্বা ঘরগুলি (gills) দেখা যায়, তাহা তিনি দেখেন নাই। স্থানীয় অধিবাসীরা ইহা খাদ্যরূপে ব্যবহার করে এবং যে সব ইংরাজ ইহা খাইয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের দেশের ছাতা অপেক্ষা ইহা কোন অংশে হীন নহে এবং অতিশয় সুস্বাদু। ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য ইহা শুষ্ক করিয়া রাখা যাইতে পারে এবং তাহাতে ইহার সুগন্ধও বিনষ্ট হয় না। এই ছাতা কাশ্মীর এবং কুলুতে সাধারণতঃ জন্মিয়া থাকে; আফগানিস্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে ও লাহোরেও মাঝে মাঝে জন্মিতে দেখা যায়। এই সব স্থানে দরিদ্রেরা ইহা খাদ্যরূপে ব্যবহার করে।

(২) Punjab Products নামক পত্রিকায়—১৮৬৩ সালে ২৫৭ পৃষ্ঠায় ব্যাডেন্ পাওয়েল লিখিয়াছেন :—

পেশওয়ার, কাবুল প্রভৃতি স্থানে টাকায় এগার পোয়া হিসাবে বিক্রয় হয়। ইহার পাস্তনাম "খড়ইয়া"। ইহারা সর্ব্বদাই জন্মিয়া থাকে। লাহোরে বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়; এবং কৃষিকার্য্যোপযোগী করিয়া ইহার চাষ করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ পাঞ্জাবে তিন প্রকার খাদ্যোপযোগী ছাতা দেখা যায় :—

(১) সাধারণ ছাতা (Agaricus Campestris)

(২) মরেল ছাতা (Morchella esculenta)

(৩) টাফ্‌ল্ ছাতা (Tuber Cibarium)

(৩) Journal Agri. Horticultural Society of India, Vol. IV, N. S. 1874 P. 29—30.

ছাতা ফ্রান্সে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। রবিনসন্ বলেন যে, কোন ছাতা-বাগানের স্বত্বাধিকারীকে তাঁহার বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রায় তিন দিন কাল খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এ কথাটি অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় না, যখন আমরা শুনি যে, ফ্রান্সে এক-একটি ছাতা-বাগান প্রায় একুশ মাইল বিস্তৃত, ও নিত্য ইহাতে প্রায় তিন হাজার পাউণ্ড (প্রায় ৩৭ মণ) ছাতা উৎপন্ন হয়।

(৪) Indian Agriculturist Vol. XI. April 3. 1886 PP. 158—69. ডবলিনের উদ্যান-ডিরেক্টর ১৮৮৩ সালে মিঃ বার্টারের একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন; উহাতে ছাতা-চাষের সুবিধাগুলি বর্ণিত হইয়াছে। অতি সামান্য মাত্র জমিতে ছাতা-চাষ করিয়া চারিটি পরিবার জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়াছে। ৪০ হাত লম্বা, দুই হাত চওড়া জমিতে প্রতিবারে প্রায় ১৬০ পাউণ্ড (প্রতি পাউণ্ড = আধ সের) ছাতা উৎপন্ন হয়। আর একটি জমিতে (দৈর্ঘ্য ৫০ হাত, প্রস্থ দুই হাত) প্রথমবারে যদিও মাত্র ৭৬ পাউণ্ড ছাতা উৎপন্ন হইয়াছিল, দ্বিতীয়বারে কিন্তু প্রায় দুই শত পাউণ্ড উৎপন্ন হয়; এবং প্রায় এক সপ্তাহ পরে তৃতীয়বারে ৮০ পাউণ্ড উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ তিন সপ্তাহে একটি ক্ষুদ্র জমিতে একুনে প্রায় ৩৬০ পাউণ্ড ছাতা জন্মাইতে পারা যায়।

(৫) ইণ্ডিয়ান প্ল্যান্টিং এণ্ড গার্ডেনিং ১৯শে সেপ্টেম্বর ১০২৩

বঙ্গদেশে আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত ছাতা।

("ইণ্ডিয়ান প্ল্যান্টিং এবং গার্ডেনিং"র জন্য)

আমরা এমন লোকের কথা জানি, যাঁহারা এঁ দেশের ছাতা ব্যবহার করিতে একান্ত নারাজ; কিন্তু ইয়োরোপের যে কোন দেশে তাঁহারা মাংসের সহিত ছাতা আহার করিতে আনন্দ বোধ করেন। এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশে কি সুস্বাদ বস্তু পাওয়া যায়, তাহার সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ইহার কারণ। জুনের মধ্যভাগ হইতে নভেম্বরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইতর লোকে ছাতাকে প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে; এবং এই সময়ে সাঁওতাল ও পারিয়া স্ত্রীলোকগণকে আহারোপযোগী ছাতা কুড়াইয়া বেড়াইতে দেখা যায়। এই ছাতা জঙ্গলে এবং অকর্ষিত জমিতে এত অধিক জন্মে যে, আদিম অধিবাসিগণ ইহার চাষ করিবার প্রয়োজনীয়তা কখনও অনুভব করে নাই।

(৬) ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচরিষ্ট ৩রা এপ্রিল ১৮৮৬

ছাতার চাষ।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির একজন সভ্য বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষও এই

বিষয়ে কতকগুলি কৌতুহলজনক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—সেগুলি সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে—খাদ্যরূপে ব্যবহৃত কয়েক প্রকার ছাতা দেখিতে সুন্দর বলিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে লোকে সেইগুলিকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করিবার জন্য আকৃষ্ট হইয়াছে। বিষাক্ত এবং খাদ্যোপযোগী ছাতা চিনিতে পারা কঠিন বলিয়া শাস্ত্রে এই খাদ্য ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ছাতার ব্যবহার ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা মনুর সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশের শুষ্ক স্থানসমূহে এবং কাশ্মীরে ইহা এখনও বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশে নিম্নলিখিত প্রকারের ছাতাই সাধারণের নিকট পরিচিত।

১। ফুদকী ছাতা (ছোট এবং বড়); ২। পোয়াল ছাতা; ৩। কদন ছাতা; ৪। দুর্গাছাতা; ৫। উর্জ্জি ছাতা; ৬। কুদকুদি ছাতা; ৭। কাঠ ছাতা; ৮। গোবর ছাতা; ৯। ইন্দু ছাতা; ১০। পাঁচন ছাতা; ১১। কোন্দক ছাতা; ১২। শুশুরা ছাতা।

এই গুলির মধ্যে ৪,৭,৮ এবং ১১ চিহ্নিত ছাতা খাদ্যের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। উপরে লিখিত ১২শ প্রকার ছাতার মধ্যে কোন প্রকার ছাতাই বাঙ্গলা দেশে হয় না। বস্তুতঃ এই স্বল্প-প্রাণ উদ্ভিদের আবাদ অজ্ঞাত। কেহ কেহ শুষ্ক ধান্যের খড় পচাইয়া, এবং প্রকৃতির উপর ছাতা উৎপত্তির জন্য নির্ভর করিয়া, পোয়াল ছাতা জন্মাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। নিম্নবঙ্গের কৃষকেরা এ প্রথা জানে না যে বীজ (spawn) হইতে এই খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার ছাতার মধ্যে উর্জ্জি ছাতাই সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু বলিয়া বিবেচিত হয়। সাধারণতঃ সেগুলি পাহাড় অথবা ঢিপির নীচেই দৃষ্ট হয়। বাঁকুড়া এবং বীরভূম জেলাতে বুনো নামে অভিহিত জঙ্গলবাসী নিম্ন-জাতিগণ এইগুলি সংগ্রহ করে এবং চাউল তামাক ও লবণের পরিবর্ত্তে গ্রামবাসীদিগের নিকট এইগুলি বিক্রয় করে। এই ছাতার দ্বারা একপ্রকার পোলাও প্রস্তুত হয়; সেই পোলাও মাংসের দ্বারা প্রস্তুত পোলাও হইতে কোন অংশে হীন নহে। কাশ্মীরে গুছা খুব বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইয়োরোপের টাফ্‌ল্‌ ছাতার সহিত এই ছাতার খুব সাদৃশ্য আছে। এইগুলি শুষ্ক করিয়া কাশ্মীরের দোকানে বিক্রয় হইয়া থাকে; এবং যত পুরাতন হয়, ইহার দাম তত বাড়ে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, কাশ্মীরের লোকেরা জানে যে, কিছুকাল রাখিয়া দিলে ছাতার খারাপ গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

নিম্নলিখিত কয়েকটী বিবরণী হইতে বুঝা যাইবে, আজকাল ইয়োরোপ এবং আমেরিকাতে ছাতার ব্যবসায় কি ভাবে বাড়িয়াছে—

ডুগার লিখিত ছাতা আবাদ সম্বন্ধীয় পুস্তক হইতে জানা যায়, ফ্রান্সে লায়ন গরে (১৯০৭ সালে) ২৬০০০ পাউণ্ড ছাতা বিক্রীত হইয়াছিল; লসানীতে ৬০০০ পাউণ্ড ছাতা বিক্রীত হইয়াছিল। সুইজরল্যাণ্ডে জেনেভাতে বাজারের এক চতুর্থাংশ স্থান প্রধানতঃ ছাতা বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট। জার্ম্মানীতে মিউনীকে ১৮৫০০০০ পাউণ্ড খাদ্যোপযোগী ছাতা বিক্রীত হইয়াছিল। ইহা পৃথিবীর মধ্যে একটি অতিবৃহৎ ছাতা বিক্রয়ের স্থান।

আমেরিকার সি, জি, লয়েডের মাইকোলজিক্যাল জার্ণাল হইতে—

"বাণিজ্যে ছাতা"—পৃথিবীর একার্দ্ধ জানে না, অপরার্দ্ধ কি ভাবে জীবন ধারণ করে,—এই উক্তি সত্য। ছাতা ব্যবসায়ের দ্বারাই নিউজিলণ্ডের তারানাকী প্রথমতঃ উদ্ধার লাভ করে। নিউজিলণ্ডে দেড় কোটী ডলারের ছাতা সংগ্রহীত হইয়াছিল; এবং চীনদেশে জাহাজ বোঝাই করিয়া পাঠান হইয়াছিল। ১৯০৪ সাল হইতে ১৯০৭ সালের মধ্যে ৫৮৭৯৩ পাউণ্ড মুদ্রা ছাতা ব্যবসায়ের জন্য নিউজিলণ্ডকে দেওয়া হইয়াছিল। ৪০ বৎসরের মোট ক্রয়-বিক্রয় ৭০০০০০ পাউণ্ড।

এই সম্বন্ধে সম্প্রতি ১৯১৭ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখের Scientific American পত্রিকার ৩৭০ পৃষ্ঠায় মিঃ এ হানসেনের যে মন্তব্যটী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন—"ছাতার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, জীবন-ধারণের জন্য বহুব্যয়-সাধ্যতার অনেকটা মীমাংসা হইতে পারে। ইহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য এইরূপ কোটী কোটী সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য আমাদের মাঠে ও জঙ্গলে নষ্ট হইয়া যায়। ছাতা যে কেবল পুষ্টিকর তাহা নহে, অধিকন্তু ইহার দ্বারা আমরা দৈনিক আহার্য্যের মধ্যে স্বল্পব্যয়ে, উৎকৃষ্ট সুস্বাদু নূতন প্রকারের খাদ্য প্রাপ্ত হই। বর্ত্তমানে যে পরিমাণে ইহা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে এগুলির ব্যবহার করা যাইতে পারে; এবং ব্যবহার হওয়াও উচিত।" এই খাদ্য দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতার দিনে এবং বর্ষাকালে যখন মাছের দাম অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পায়, এবং শাক-সব্জী দুর্লভ হইয়া উঠে, তখন যদি ভারতবর্ষীয় ছাতা দৈনিক খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে জীবনধারণের জন্য বহুব্যয়সাধ্যতার কতকটা মীমাংসা হইতে পারে এবং ছাতার আবাদ ভারতবর্ষে একটী বিশেষ ব্যবসায় পরিণীত হইতে পারে।

অবশ্য ইহা সত্য যে, এ দেশের কনজারভেটিব্‌ সাধারণ লোকের মধ্যে ইহাকে দৈনিক আহার্য্য রূপে চালাইতে হইলে, যথেষ্ট পরিমাণে প্রচার কার্য্য আবশ্যক। আমার মনে হয়, ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ জেলাস্থিত কৃষিবিভাগগুলির সাহায্যে এই কার্য্য সহজেই করিতে পারেন, যদি তাঁহারা আগ্রহের সহিত ইহাতে মন দেন; এবং ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, ইহা তাঁহাদেরই কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত; কেন না ইহার চাষের দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি হইবে।

রসায়ন-শিল্পের এক অধ্যায়

[শ্রীআশুতোষ দত্ত এম্‌-এস্‌সি]

আজ একটা লাভের কারবারের কথা বলবো। কারবারটা হচ্ছে গন্ধক-দ্রাবক-শিল্প। গন্ধক দ্রাবকই রসায়ন-শিল্পের মূল। ইহার অপর নাম মহাদ্রাবক বা "গন্ধক কা তেজাব"। লবণ-দ্রাবক (Hy-

drochloric acid), যবক্ষার দ্রাবক (Nitric acid), জাম্বা-দ্রাবক (Citric acid), তিন্তিড়ি-দ্রাবক (Tartaric acid), আমরুল দ্রাবক (Oxalic acid), লবণক্ষার (Soda ash ; Washing soda or Sodium Carbonate), নীলতুঁতিয়া (Copper Sulphate), হীরাকষ (Iron Sulphate or Ferrous Sulphate), ফটকিরি (Alum), প্রভৃতি সকল প্রকার রসায়ন, রাং ও বঙ্গের কলাই (Tinning and galvanising), ধাতু ও তৈলাদির পরিষ্কার, রেশম ও পশমের রং, জুতার কালী, জমির সার, সাবান, বিস্ফোরক (Explosives) প্রভৃতি সকল শিল্পেই ইহার প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর সকল দেশে যত গন্ধক-দ্রাবক প্রস্তুত হয়, তাহার শতকরা ৬৬ ভাগ Superphosphate ও Ammonia Sulphate নামক জমির সারের জন্য ব্যয়িত হয়।

গন্ধক-দ্রাবকই বর্ত্তমান সভ্যতার মানদণ্ড। অর্থাৎ যে দেশ যত বেশী গন্ধক-দ্রাবক খরচ করে, সেই দেশ সেই অনুপাতে শিল্প ও ব্যবসায়ে উন্নত ও সভ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে প্রতি বৎসর প্রায় এক কোটি টনেরও উপর গন্ধক-দ্রাবক প্রস্তুত হইয়া বিবিধ শিল্পে খরচ হইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ টন ছিল। সুতরাং এই শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর শিল্প প্রায় দশ গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

প্রস্তুত-প্রণালী।

গন্ধক, অম্লজান ও জলজানের রাসায়নিক সংযোগে গন্ধক-দ্রাবক উৎপন্ন হয়। গন্ধক জ্বালিতে উহা বাতাসের অম্লজানের সহিত মিশিয়া গন্ধকদ্ব্যম্ল (Sulphur dioxide) নামে একটা উগ্র গন্ধযুক্ত সাদা ধোঁয়ায় (gas) * পরিণত হয়। এখন এই গন্ধকদ্ব্যম্লের সহিত যদি কোনও উপায়ে আরও খানিকটা অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগ করা যায়, তাহা হইলে গন্ধকত্র্যম্ল (Sulpher troxide) নামে আর একটী জিনিস উৎপন্ন হয়। এই গন্ধকত্র্যম্লই নির্জ্জলা গন্ধক-দ্রাবক (Sulphuric Anhydride) অর্থাৎ ইহার সহিত হিসাবমত জল বা জলীয়-বাষ্প মিশিলেই গন্ধক-দ্রাবক তৈয়ারী হয়। কিন্তু স্বাভাবিক উপায়ে গন্ধকদ্ব্যম্লকে ত্র্যম্লে পরিণত করা যায় না। এই রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের জন্য অপর একটী জিনিসের দরকার হয়। যবক্ষারাম্ল বা শ্বেত স্বর্ণ (Platinum), লৌহাম্ল (Ferric oxide) প্রভৃতি এ কার্য্যের সহায়তা করে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যবক্ষারাম্লের সাহায্যে গন্ধক-দ্রাবক প্রস্তুত করিবার উপায় বলিব।

গন্ধকাম্ল ও যবক্ষারাম্ল প্রস্তুত করিবার জন্য ছোট-ছোট চুল্লির প্রয়োজন। এই সকল চুল্লির তলদেশ মোটা লোহার চাদরের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এই চাদরের উপর গন্ধক জ্বালান হয় এবং যবক্ষারাম্ল প্রস্তুতের জন্য লোহার বাটী করিয়া সোরা ও গন্ধক-দ্রাবক রাখা হয়। লোহার চাদরটী গরম রাখিবার জন্য চাদরের নীচে আগুন জ্বালাইতে হয়। কিন্তু একবার গন্ধক জ্বলিতে আরম্ভ হইলে আর চাদরের নীচে আগুন জ্বালাইবার প্রয়োজন হয় না। চুল্লির মুখ বা দরজাও মোটা লোহার চাদরে তৈয়ারী হয়। দরজার চাদরের নিম্ন প্রান্তে ছোট ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র দিয়া চুল্লির মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিয়া গন্ধকের সহিত মিলিত হয়। প্রয়োজনানুসারে এই ছিদ্র কম-বেশী করা যাইতে পারে। অর্থাৎ যদি চুল্লির মধ্যে বেশী বাতাসের প্রয়োজন হয়, তবে ছিদ্রের মুখ বড় করিয়া দিতে হয়। চুল্লির দরজাটী সম্পূর্ণ Gas-tight হওয়া উচিত।

চুল্লির অপর প্রান্ত চিমনীর আকারের নালীর সহিত সংযুক্ত থাকে। এই নালী সাধারণতঃ ৮।১০ ফুট লম্বা ৮।১০ ফুট চওড়া ও ৩০।৪০ ফুট উচ্চ হয়। ইহাকে Gloves Tower বলে। এই Towerএর মধ্যে বাষ্পগুলির (গন্ধকদ্ব্যম্ল ও অম্লজান) মিশ্রণ কার্য্য কতকটা আরম্ভ হয়। Gloves Towerএর উপর দিক হইতে আর একটী মোটা নল সীসার ঘর বা কামরার সহিত সংযুক্ত থাকে। এই সীসার কামরার বাষ্পগুলি জলীয় বাষ্পের সহিত মিশিয়া দ্রাবকে পরিণত হয়। সীসার কামরাগুলির আয়তন যত বড় হইবে, বাষ্পগুলির মিশ্রণও তত সুচারু রূপে সম্পন্ন হইবে। এই ঘর বা কামরা নির্ম্মাণের একটু বিশেষত্ব আছে। কারণ, কামরার ভিতরের দিকে কড়ি বা বরগা দেওয়া যাইতে পারে না। এজন্য প্রথমে লোহা বা কাঠের কাঠামো, প্রস্তুত করিয়া, তাহার মধ্যে সীসার চাদর সাজাইয়া কামরা তৈয়ারী করিতে হয়। এই চাদরগুলির বাহির দিক হইতে কাঠামো কড়ি বরগার সহিত বাঁধন দিতে হয়। ঘরের ছাদের চাদর দেওয়ালের চাদরের সহিত ঝালিয়া জুড়িয়া দিতে হয়। ঘরের মেঝেও সীসার চাদরে প্রস্তুত হয়। মেঝের চাদরের চারি ধার প্রায় দেড় ফুট করিয়া খাড়া করিয়া, কোণগুলি মুড়িয়া, চৌবাচ্চার আকারে গড়িতে হয়। দেওয়ালের চাদরগুলি এই চৌবাচ্চার ভিতরে মেঝে হইতে প্রায় আধ ইঞ্চি উপরে ঝুলিতে থাকে। এইরূপ ২।৩ বা ততোধিক সীসার কামরা সীসার নল দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। একাধিক কামরা রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাষ্পগুলি যত অধিক স্থান পাইবে, রাসায়নিক ক্রিয়া ততই সম্পূর্ণ হইবে, অথচ অপচয় কম হইবে। সকলের শেষ কামরাটী Glover Tower এর ন্যায় আর একটী Towerএর সহিত সংযুক্ত থাকে। ইহাকে Guy Lussae Tower বলে। রাসায়নিক সংযোগের পর যে অতিরিক্ত বাষ্প থাকে, তাহা হইতে যবক্ষারাম্ল সংরক্ষণের জন্য এই Towerএর উপর হইতে পাতলা গন্ধক-দ্রাবক Towerএর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যবক্ষারাম্লকে দ্রবীভূত করে। অবশিষ্ট বাষ্প (যবক্ষারজান ও অম্লজান) এই Tower হইতে অপর একটী নল দিয়া বাহির হইয়া ধূমবাহী চিমনীর মধ্য দিয়া উড়িয়া যায়। Guy Lussae Tower হইতে প্রাপ্ত দ্রাবক Glover Towerএর মধ্যে চুয়াইয়া দেওয়া হয়। সেখানে

* শুষ্ক গন্ধকদ্ব্যম্ল বর্ণহীন। কিন্তু জলীয় বাষ্পের স্পর্শে আসিলেই ইহার বর্ণ সাদা হয়।

ইহা হইতে প্রায় সমস্ত যবক্ষারায় বিশ্লিষ্ট হইয়া গন্ধকদ্ব্যম্ল ও অম্লজানের সংযোগে কার্য্যের সহায় হয়। সাধারণতঃ প্রতি ১০০ মণ গন্ধককে গন্ধকত্রায়ে পরিণত করিতে প্রায় ৮ হইতে ১২ মণ পর্য্যন্ত সোরা খরচ হয়। কিন্তু এই দুইটী Tower থাকিলে ৩।৪ মণ সোরাতেই এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। ছোট-ছোট কারখানায় এ দুটি Towerএর কোনটী থাকে না; তবে Glover Towerএর আকারের একটী বাষ্পবাহী নালী থাকে মাত্র।

কামরার মধ্যে জলীয় বাষ্প (Steam) দিবার জন্য কামরার দেওয়ালে বা ছাদে সীসার নল সংযুক্ত থাকে। বয়লার হইতে জলীয় বাষ্প আসিয়া এই নলের সাহায্যে কামরার মধ্যে প্রবেশ করে। এক-একটী কামরায় এরূপ ৩।৪টী নল থাকে।

সীসার চাদরগুলি পরস্পর জুড়িতে হইলে, চাদরের প্রান্তদেশ বেশ পরিষ্কার করিয়া অম্লজলজান (Oxy-hydrogen) শিখায় গলাইয়া জুড়িতে হয়।

গন্ধক ব্যতীত Spent Oxide, রূপামাক্ষি (Iron Pyrites), স্বর্ণমাক্ষি (Copper pyrites), Zinc Blende প্রভৃতি গন্ধক বহুল খনিজ হইতে গন্ধকদ্ব্যম্ল প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে যে কয়টী গন্ধক-দ্রাবকের কারখানা আছে, তাহাদের প্রায় সকল গুলিতেই গন্ধক হইতে গন্ধকদ্ব্যম্ল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার কারণ, আমাদের দেশে ঐ সকল খনিজ তেমন সুবিধা মত পাওয়া যায় না। ভারতে কাশ্মীর, পাতিয়ালা ষ্টেট ও ছোটনাগপুরের কোন-কোন স্থানে রূপামাক্ষি পাওয়া যায়; কিন্তু উহাতে গন্ধকের পরিমাণ এত অল্প যে, তাহা কাজে লাগান ছোট-খাট কারখানার পক্ষে সুবিধাজনক নহে। যেখানে পাথুরে কয়লা হইতে গ্যাস তৈয়ারী হয়, সেই সকল কারখানায় Spent Oxide নামে একটী জিনিস গ্যাস পরিশোধকের মধ্য হইতে পাওয়া যায়। এ জিনিসটী খুবই মূল্যবান (আর একদিন এই Spent Oxideএর কথা বল্‌বো)। এই Spent Oxideএ গন্ধকের ভাগ কখন-কখনও খুব বেশী থাকে। সুতরাং গন্ধকের পরিবর্ত্তে এটাও বেশ ব্যবহার করা যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মেসার্স ডি ওয়াল্‌ডি এণ্ড কোম্পানি এই Spent Oxide হইতে দ্রাবক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন তাঁরা ইহা ব্যবহার করেন কি না, তাহা বলিতে পারি না।

সীসার কামরার মধ্যে যে দ্রাবক সঞ্চিত হয়, তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (Sp. gravity) ১·৫ হইতে ১·৫৬ পর্য্যন্ত হয়। ইহার বেশী গাঢ় দ্রাবক কামরায় জমিলে, কামরার সীসা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বাজার-চলতি দ্রাবকের (Commercial acid) গুরুত্ব ১·৭৫। সুতরাং কামরার দ্রাবককে সীসার কড়ায় বা Acid Resisting লোহার কড়ায় আগুনের উত্তাপে জাল দিয়া গাঢ় করিতে হয়।

বেশ ভাল করিয়া কাজ চালাইতে পারিলে, এক টন গন্ধক হইতে প্রায় ৩ টন ১·৭৫ গুরুত্বের দ্রাবক পাওয়া যায়। মাসিক ২০ টন গন্ধক-দ্রাবক প্রস্তুত করণোপযোগী একটী কারখানা চালাইতে যে খরচ হয়, তাহার একটী আভাস দেওয়া গেল।

২০ টন সীসার চাদর, ৬৪০ টাকা টন হিঃ	১২,৮০০৲
ইমারত ইত্যাদি	৬,০০০৲
কাঠের মঞ্চ, কড়ি বরগা ইত্যাদি	২,৫০০৲
লোহার চাদর, সোরা জ্বালাইবার বাটী ইত্যাদি	৫০০৲
৬০ পাউণ্ড প্রেসারের একটী বয়লার	১,৪০০৲
মজুরী	২০০০৲
অন্যান্য বাড়তি খরচ	৫০০৲
মোট	২৫,৭০০৲

মাসিক কাজ চালাইবার খরচ।

(Working expenses)

৭টন গন্ধক প্রতি টন ২২৫৲ হিঃ—		১৫৭৫৲
১৪ হন্দর বিলাতী সোরা (Sodium Nitrate) ১৮৲ হন্দর হিঃ		২৫২৲
৫ টন পাথুরে কয়লা ১৫৲ টন হিঃ		৭৫৲
		১৯০২৲
১ জন মিস্ত্রী ৩৫৲ হিঃ	৩৫৲	
১ জন বয়লার মিস্ত্রী ৪০৲ হিঃ	৪০৲	
১ জন হিসাব-রক্ষক ও বাজার সরকার ৪০৲ হিঃ	৪০৲	
৬ জন কুলি ১৪৲ হিঃ	৮৪৲	
দপ্তর খরচ	৫০৲	
মেরামত প্রভৃতি খুচরা খরচ	৭০৲	
	৩১৯৲	
মোট মাসিক খরচ		২২২১৲

মাসিক আয়

২০ টন গন্ধক দ্রাবক, ২১০৲ টন হিঃ	৪২০০৲
১২ হন্দর সোডিয়ম সল্‌ফেট ৩৲ হন্দর হিঃ	৩৬৲
মোট মাসিক আয়	৪২৩৬৲

লাভালাভ

মাসিক আয়	৪২৩৬৲	
মাসিক ব্যয়	২২২১৲	
	২০১৫৲	মাসিক লাভ
	১২৲	
	২৪১৮০৲	বাৎসরিক লাভ।

যদি ৩০,০০০৲ টাকা মূলধন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা হয়, তাহা হইলে দুই বৎসরের মধ্যে মূলধনের টাকা ত উঠিয়া আসিবেই, উপরন্তু বেশ মোটা লাভ থাকিবে। এ কারবারে বেশী ঝঞ্ঝাট নাই; কেবল মূলধনটী কিছু বেশী প্রয়োজন। সীসার কামরাগুলি ২০।২৫

বৎসর পর্য্যন্ত বেশ থাকে। সুতরাং এই ৩০,০০০৲ টাকা মূলধনের জন্ত যদি প্রতি বৎসরের লাভ হইতে শতকরা ১০৲ হিসাবে রাখা হয়, তাহা হইলেও (২৪১৮০—৩০০০৲) বৎসরান্তে ২১১৮০৲ টাকা লাভ থাকে; অর্থাৎ মূলধনের শতকরা ৭০ টাকার উপর লাভ থাকে। কোম্পানীর কাগজ বা অন্ত কোনও রকমে টাকা সুদে খাটিয়ে এই লাভের অষ্টমাংশও পাওয়া যায় না। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এ ব্যবসা সম্ভবপর নয়; কিন্তু ২।৪ জন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মিলে, যৌথ কারবার করে অক্লেশে বেশ লাভবান হতে পারেন। ইহাতে অভিজ্ঞতার বিশেষ প্রয়োজন নাই। একজন বেশ পারদর্শী মিস্ত্রী থাকিলে সুন্দর রূপে কাজ চলতে পারে। পাঞ্জাব প্রদেশে এমন অনেকগুলি গন্ধক-দ্রাবকের কারখানা আছে, যাদের সত্ত্বাধিকারীরা রসায়ন-শাস্ত্রের বিন্দু-বিসর্গ জানে না, অথচ এই কারবার করে বেশ দু পয়সা রোজগার করে।

এ ত গেল বাজার-চলতি দ্রাবকের কথা। এই দ্রাবক থেকে ১'৮৪ আপেক্ষিক গুরুত্বের গাঢ় দ্রাবক (Concentrated acid), বিশুদ্ধ দ্রাবক, লবণ-দ্রাবক, যবক্ষার দ্রাবক প্রভৃতি প্রস্তুত করিলে লাভ আরও ঢের বেশী হয়। বারান্তরে এ সকল রসায়নের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

১৯১৩ খৃঃ যে দেশে যত গন্ধক দ্রাবক প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার একটী হিসাব দেওয়া গেল।—

		হাজার-করা—
আমেরিকা	৩৭,৫০,০০০ টন	৪৬৮'৮ টন।
জার্ম্মাণী	১৬,৫৭,০০০ „	২০৭'১ „
ইংল্যাণ্ড	১৪,৭০,০০০ „	১৮৩'৭ „
ফ্রান্স	৬,০০,০০০ „	৭৫'০ „
রুষিয়া	১,৮০,০০০ „	২২'৫ „
অষ্ট্রিয়া, ইটালি প্রভৃতি	২,০০,০০০ „	২৫'০ „
জাপান	৬০,০০০ „	৭'৫ „
ভারতবর্ষ	১,৮০০ „	০'২ „

ঐ বৎসর ভারতে মাত্র ১৮০০ টন দ্রাবক প্রস্তুত হয়েছে, আর খরচ হয়েছে ২২০০০ টন; অর্থাৎ প্রায় ২০ হাজার টন বিদেশ থেকে এসে এদেশের ক্ষুদ্র অভাবটুকু মিটিয়াছে। ১৯১৮।১৯ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র আমেরিকায় ৭০ লক্ষ টন গন্ধক-দ্রাবক প্রস্তুত হইয়াছিল। এই দ্রাবকের মধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ টন জমির সারের জন্ত খরচ হয়েছে।

এদেশে গন্ধক-দ্রাবকের যে কয়টী কারখানা আছে, তাদের একটী তালিকা দিলে মন্দ হয় না।

১। ডি, ওয়ালডি এণ্ড কোং লিমিটেডএর ৪টী কারখানা (ক) কোন্নগর, (খ) গিরিধির নিকট বেনিয়াডিহি, (গ) ধানবাদের নিকট লয়লাবাদ, (ঘ) কানপুর।

২। বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড, কলিকাতা।

৩। মাধবচন্দ্র দত্তের এ্যাসিড ফ্যাক্টরী কলিকাতা।

৪। টাটা লৌহ-কারখানায় বাই-প্রডাক্ট প্লাণ্ট, জেমশেদপুর।

৫। কৃষ্ণ কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস্, বেণারস।

৬। অযোধ্যাপ্রসাদ এণ্ড কোং কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস্, গাজিয়াবাদ।

৭। ইম্পিরিয়েল কেমিক্যাল্ কোঃ, সব্জীমণ্ডি, দিল্লী।

৮। শম্ভুনাথ এণ্ড সন্স্ এ্যাসিড ফ্যাক্টরী, অমৃতসর।

৯। রাধাকৃষ্ণ এ্যাসিড ফ্যাক্টরী, লাহোর।

১০। লালা নন্দলাল এ্যাসিড ফ্যাক্টরী, লাহোর।

১১। পঞ্জাব কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস্, শাহদারা, লাহোর।

১২। ফ্রন্টীয়ার কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, রাউয়লপিণ্ডি।

১৩। এলেম্বিক কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস্, বরোদা।

১৪। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ডিষ্টিলারী এণ্ড সুগার ফ্যাক্টরী, রাণীপথ।

১৫। ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল্ কোঃ লিমিটেড, বোম্বাই।

১৬। বর্ম্মা কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, রেঙ্গুণ।

এই সকল কারখানার অধিকাংশেরই উৎপন্ন অতি অল্প। সুতরাং ভারতে যত গন্ধক দ্রাবক খরচ হয়, তাহা এ সকল কারখানা জোগাইয়া উঠিতে পারে না। এখনও প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে বিদেশজাত দ্রাবক আমাদের ক্ষুদ্র অভাবটুকু পুরণ করছে।

লোলা

[অধ্যাপক শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার]

চক্‌চকে তার চোখের তলে, রাঙ্গা গালের বিভা,
উড়ে-পড়া চুলের ছায়া ভেঙ্গে জাগায় দিবা।
ঝাঁকে ঝাঁকে দীপ্তি ছুটে ঠোঁটেতে দোদুল্;
তড়িৎ-লতার বোঁটায় বোঁটায় ফোটে সোনার ফুল।
নিটোল গায়ে টোল খেয়ে ধায় হিরণ-বরণ ঢেউ;
হাওয়ার বনে পাদুখানির পায় না সাড়া কেউ।
স্বচ্ছনদীর স্রোতের মত অতি ললিত গতি;
তালের ভেলায় জল ভেসে যায়, জ্যোতির দোলায় জ্যোতি।
উড়িয়ে দে'যায় আকুল প্রাণের প্রেমে বাঁধা দোলা,
শুধুই খেলা, হাসির মেলা, ভালবাসে লোলা।

গৌরী-ভাব

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

মদন ভস্ম হইয়া গেল।

এইবার কবির বর্ণনা ছাড়িয়া দিয়া, আমাদের সাধনার বিজ্ঞানময় নেত্রযোগে একবার বক্ষ্যমান উপাখ্যানের মধ্যে দৃষ্টিপাত করা যাউক। কে গৌরী? যিনি সতী ছিলেন, যিনি সতী হইবেন, সতীপদের জন্য যিনি সাধনা করিতেছেন,—তিনি গৌরী। মূলতঃ তিনি সতী; কেবলমাত্র জন্মান্তর জন্য আত্মবিস্মৃতা। সম্বিৎরূপ সূত্রযোগে সেই সঞ্চিত কন্যারূপী সত্তার মধ্যে আপনাকে তুলিয়া ধরিলেই, তাঁহার ছুটি হইয়া যায়। হিমালয়ের গৃহ, মেনকার মাতৃত্ব, আপনার কন্যাপদবী—সমস্তই অসীমে লীন হইয়া যায়। জীবগণ্ডী ডিঙ্গাইয়া শিব-সোহাগিনী আবার শিবের কোলে ফিরিয়া যান!

তিনি কেন এমনই বা চাহিতেছেন? যে হিমালয়—"অনন্ত রত্ন প্রভবস্য তস্য হিমং ন সৌভাগ্য বিলোপী জাতুং", তাঁহার ঘরের সকল আদরের আদরিণী হইয়া, সেই হারান-পুরানো শিব সোহাগে আবার এত আকিঞ্চন কেন? পাগলী মেয়ের এ কি আবদার? ইহার উত্তর—এ তো আবদার নয়, ও যে সত্য! প্রকৃতিকে কে রোধ করিবে? স্বভাব অভাবে দাঁড়াইলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আবার থাকে কি? মায়ের প্রাণ মা-ই বুঝে;—তুমি-আমি সন্তান হইয়া কি বুঝিব? চিনি মিষ্ট লাগে, এই ত জানি; তাই চিনি বড় ভালবাসি। তোমার-আমার মুখে মিষ্টরস যোগাইয়া চিনির কি সুখ—এ ভাবনা যদি ভাবিতে বসি, হয় ত চমকিয়া উঠিয়া আপনাদেরই আপনারা আমরা পাগল বলিব।

কেন যে হিমালয়ের মণিমালায়-গড়া ঘরে মায়ের মন বসিল না, প্রকৃতি রুদ্ধ হইল না, গৌরী সতী হইতে চাহিলেন—সে কেনর উত্তর দিয়া কাজ নাই। শুধু শুনিয়া রাখ সতী-হারা হইলে জগৎ কেমন হয়। দেবীভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। (৭ম স্কন্ধ ৩০শ অধ্যায়) যোগাগ্নিতে সতীদেহ ভর্জিত হইলে, ভগবান শঙ্কর উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে ভ্রমণ করতঃ এক স্থানে স্থিরতা প্রাপ্ত হইলেন; এবং বিশ্বপ্রপঞ্চের নানাত্ব-জ্ঞান-বিরহিত হইয়া, সমাধি অবলম্বন করতঃ, নিরুদ্ধ চিত্তে দেবীরূপ-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া, কালযাপন করিতে লাগিলেন। তৎকালে পরমাশক্তির অংশভূতা জগজ্জননী সতী দেবীর অভাবে ত্রিলোক ঐশ্বর্য্যবিহীন এবং সমুদয় দ্বীপ,

পর্ব্বত ও সাগর-সম্বলিত চরাচর—সমস্ত জগৎই শক্তিশূন্য হইয়া পড়িল। সকল প্রাণীরই অন্তরে আনন্দরস শুকাইয়া গেল; এবং সকল লোকই সতত চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরিত হইতে থাকিল। সকল বিষয়েই তাহাদের ঔদাস্য আসিয়া পড়িল। তখন সকলেই দুঃখার্ণবে মগ্ন ও রোগগ্রস্ত হইতে আরম্ভ করিল; এবং গ্রহগণের বিপরীত গতি, ও দেবতাগণের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। হে নৃপ! ঐ সময় সতীদেবীর অভাব নিবন্ধন সমুদয় আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক কার্য্যেরও বৈপরীত্য দৃষ্ট হইতে লাগিল।

জগতের এইরূপ অবস্থায় তারকাসুরের আবির্ভাব—অবশ্য ইহা বর্ণিত ঘটনা।

অতঃপর মদন-ভস্মের তাৎপর্য্য ও দেবতাদিগের ভ্রম আমাদের বোধগম্য হইবে। দেখা যাউক, সর্ব্বাগ্রেই দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গেলেন কেন? ব্রহ্মা ত সৃষ্টি করেন। শিব সংহার-কর্ত্তা। অসুর সংহারের নিমিত্ত তাঁহার দ্বার ধরাই ত উচিত ছিল। না হয় বিষ্ণুর কাছে গেলেও ত চলিত। জগতের পালনকর্ত্তা তিনি; অসুরদের একটু কি আর আঁচড় দিতে পারিতেন না? Police এবং administrative department ছাড়িয়া legislative councilএ move করিতে গেলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, তা ভিন্ন গতি ছিল না। তারকাসুর আইন বাঁধিয়াই বিপ্লব পাকাইয়াছিল। ব্রহ্মার সেই কথা—"ইতঃ স দৈত্য প্রাপ্ত শ্রীঃ।" এই legal law-breakerকে বাঁধিতে নূতন Rowlat act না হইলে যে চলিত না। শিব মঙ্গলার্থে সুমঙ্গল উপায়েই ধ্বংস করিবেন। বিষ্ণু, যে যেমন, তাহাকে তেমন করিয়াই পালন করিবেন; সুতরাং দেবতাদের উপায় ব্রহ্মা। এখন এমন কিছুর সৃজন করিতে হইবে, যাহার স্বত্বে অসুরের স্বত্বসাব্যস্ত উচ্ছেদ হইয়া যায়,—পদ্মযোনী তাহারই মালমসলা চাহিলেন। আইনের ফাঁকি বাৎলাইয়া দিলেন।

মদন-ভস্মের গূঢ় তাৎপর্য্য স্পষ্ট হইলে, মনের অনেক উদ্ভট কল্পনা ও অন্ধকার কাটিবার কথা।

দেবতাদিগের বুঝা ছাড়া যখন আর উপায় রহিল না যে, reformation প্রয়োজন,—তখন নূতন দেবতা, নূতন ব্যবস্থা না হইলেই নয়। ব্রহ্মার কাছে গৌরীরও সন্ধান মিলিল; কার্য্যের বাসনা জন্মিল; চেষ্টাও চলিতে লাগিল। কিন্তু ভুল উপায়ে। তাঁহারা পুরাতন পদ্ধতি বজায় রাখিতে গেলেন। গৌরী সতীর স্থান লইবেন; কারণ, গৌরী সতী হইতে চান। এখন সতীনাথ গৌরীকে সতীর স্থান ছাড়িয়া দিবেন, ইহারই কেবল কারণ সৃষ্টি করিলে হয়; নতুবা, কারণ বিনা কার্য্য হইবে কি করিয়া। শিব যে উন্মত্ত সিদ্ধির নেশায়, তাঁহার কার্য্য যে অকারণ—দেবতারা তাহা বুঝি বুঝিলেন না। তাঁহারা স্থির করিলেন, শিব গৌরীকে সতীর মত চাহিলেই, কারণের অভাব হইবে না। এই চাওয়াইবার চেষ্টাই মদনের শর-সন্ধান। এ সব পূর্ব্বে বলা কথা। মদন-ভস্মের পর কি হইল, তাহাই বলি। আদর্শকে জানিলেই পাওয়া যায় না; আদর্শের অভিমুখে মনকে ব্যগ্র করাই যথেষ্ট নহে; শুধু তাহাতেই আদর্শ আয়ত্ত হয় না,—মদন-ভস্মের পর এই ইঙ্গিত যখন সুস্পষ্ট হইল, তখন কি হইল, তাহাই বলি।

> তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং
> পিনাকিনা ভগ্নমনোরথা সতী।
> নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্ব্বতী
> প্রিয়েষু সৌভাগ্য ফলা হি চারুতা॥
> ইয়েষ সা কর্ত্তুমবন্ধ্য রূপতাং
> সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ
> অবাপ্যতে বা কথমণ্যতা দ্বয়ং
> তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ॥ (১)
>
> ৫।১-২ কুমার-সম্ভবম্।

অনন্যানুরাগিণী বালা সেই রমণীয় নির্জ্জন প্রদেশে এতদিন ত শঙ্কর-পার্শ্বচারিণী রহিলেন। সুকেশিনী একান্ত তৎপরতা সহকারে এতদিন ত তাঁহার সেবা করিলেন। কুসুম চয়নে বনান্তর ভ্রমণ করিয়া, বেদী সম্মার্জ্জনা করিয়া, গুরুশ্রম-ভারে দেহ যখন এলাইয়া পড়িত, তাঁহারই ত পদমূলে শ্রস্তকেশে ঘন-বিগলিতশ্বাসা বেপমানা কতদিন ত বসিয়া পড়িতেন। কই, হর-শির-শোভিত চন্দ্রকিরণ ত সর্ব্বাঙ্গে মূচ্ছিতবৎ লুটাইয়া পড়িয়াছে; শঙ্করের স্নিগ্ধ দৃষ্টি শীকরসিক্ত সমীরের মত মুখের উপর আসিয়া ত পড়িয়াছে;—শঙ্কর

---

(১) অনুবাদ। এইরূপে তাঁহার সমক্ষেই পিনাকীর দ্বারা মনোভব মদন দগ্ধ হইলে, পার্ব্বতী মনে আপনার সৌন্দর্য্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন; যেহেতু প্রিয়জনের নিকট প্রীতিভাজন হওয়াই সৌন্দর্য্যের ফল। তখন তিনি তপস্যা দ্বারা সমাধি অবলম্বনে স্বীয় রূপ সফল করিবার ইচ্ছা করিলেন; নতুবা অপর কি উপায়ের দ্বারাই বা তিনি তেমন পতি ও তাঁহার উপযুক্ত প্রেম এই দুইটী বস্তু পাইতে পারেন।

শঙ্করই রহিলেন; রাজকুমারী রাজকুমারীই রহিলেন;—নূতন যোগাযোগ কিছুই ত হইল না। মদনের দুর্গতি দেখিয়া স্তব্ধচিত্তে পার্ব্বতী যখন দাঁড়াইয়া রহিলেন, বোধ হয় তখনই তাঁর চিত্ত-কমল প্রস্ফুটিত হইল—সত্য দেখিতে পাইলেন। অন্তর্যামী ব্যথিত হইয়া সেই দিন বোধ হয় চরম তত্ত্ব বলিয়া দিলেন।

জগন্নাথ কাহার উপর পক্ষপাত দেখাইবেন? শিবকে ত সবাই চাহিতেছে। রাজকন্যা তিনি ছাড়া কি কেহই আর শিবের কথা মনে স্থান দেয় না? ঋষির ভবিষ্যৎ বাণী যেন এতকাল আলো-আঁধারে ঢাকা ছিল। এইবার অন্ধকার সরিয়া গেলে পার্ব্বতী দেখিলেন, তিনি গিরিরাজ কুমারী নন; তিনি শঙ্করের সেবিকা নন। তাঁর কুসুম-সুকোমল দেহ, অনন্যসাধারণ গুণ, অতুল বিদ্যা, অদম্য উচ্চাভিলাষ—সমস্তই তুচ্ছ। এই সকল উপাধির আবরণে আবৃত ছিল তাঁহার সত্য। এই তত্ত্ব যে তিনি স্বয়ং শিবশক্তি। মহাকালী হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন।

কালীর অট্টহাস্যে মানস-সাগর আলোড়িয়া উঠিল; লহরীর পর লহরী উঠিয়া বীচিভঙ্গ-তাড়নে উপাধির আবরণ সরাইতে লাগিল। বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে গৌরী দেখিতে লাগিলেন—জগতের আদ্যন্ত সমস্তই কেমন করিয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে। চমৎকার! মাটীর পুতুল সাজিয়া মা আমার যখন দাসীপনা করিতেছিলেন, তখন শিবকে চিনেন নাই। যেমন সাজিয়াছিলেন, তেমনই সাজাইয়া লইয়া কত কি আপন মনে রচিতেছিলেন। সম্ভ্রমে আকুল হইয়া ক্ষুদ্র হৃদয়-গণ্ডীটুকুর মধ্যে আপনাকে ধরিয়া রাখিয়া, মা সলাজে, সসঙ্কোচে তাঁহার দিকে চাহিতেছিলেন। সেই উন্নত বৃষস্কন্ধ দেহ বুঝি বা হিমালয়ের ধবলগিরি-চূড়া বলিয়াই ভ্রম হইতেছিল। সেই অটল গাম্ভীর্য্য বুঝি-বা কোনও গভীর রহস্যময় আতঙ্ক-নিকেতন দুর্গম প্রাসাদের লৌহদ্বারবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল।

চিৎস্ফুরণে গৌরীর অনুভব হইল, তিনি যখন পতিকামা কুমারীর ছদ্মবেশে শিবকে পরিচর্য্যা করিতেছেন, শিবও তখন স্থাণুবৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়-দেহ-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, পরমাশক্তি-রূপিণী তাঁকেই ধ্যান করিতেছিলেন। শিবের ধ্যান শেষ হইল। মদন উপযুক্ত সময়েই তাহা ভাঙ্গিয়াছে। আর ধ্যানে প্রয়োজন কি? যাঁর জন্য ধ্যানীর ধ্যান, তিনি ত প্রস্তুত। কেবল চেতনা জাগিলেই হয়। আপনাকে চিনিলেই হয়। গৌরীও বুঝিলেন, শিবকে তাঁহার অখণ্ড-রূপেই পাওয়া আছে,—এখন আপনাকে পাওয়া লইয়াই কথা। তিনি শিবশক্তি,—সেই স্তরে আপনাকে তাঁহার তুলিয়া ধরিতে হইবে। শিবকে আবার পাওয়া না পাওয়া কি,—শিব ত শক্তির। এতদিনের এ অনুষ্ঠান এই জানার জন্যই,—এই ভুলটুকু ভাঙ্গার জন্যই। আর? হাসি চাপিয়া বলিতেছি? ভুলের ভিতর আঁধারে-আঁধারে একটা কাজও হইয়া গেল! যাহার জিনিষ, এই ধ্যান-বিহ্বল অবস্থায় সেই-ই এতদিন তাহার তত্ত্বাবধান করিল। পরে কি তেমন করিয়া পারিত!

এতক্ষণ পর্য্যন্ত গৌরী-চরিত্র, আমাদের প্রাণের স্তর দিয়া, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সহিত মেলে। এইবার এমন একটা অবস্থা আসিবে, যাহা আমাদের অভ্যাস, আচরণ, এমন কি, ধারণারও অতীত। সেটা গার্হস্থ্য জীবনের সহিত কেমন করিয়া মানাইতে পারে, আশ্চর্য্য! কিন্তু অস্বীকার করিবার,—না বুঝিয়া, বা না মানিয়াও চলিবার উপায় নাই। কথা এই, গৌরী এইবার তপস্যা করিতে চলিলেন। অবশ্য চিৎস্ফুরণ কি, যিনি বুঝেন—তিনি অস্বাভাবিকত্ব কিছুই দেখিবেন না। কিন্তু আমি, যাঁহারা বুঝেন না, সেই সাধারণ লোকের দিক হইতেই বলিতেছি। চিৎস্ফুরণের পরবর্ত্তী অবস্থাটাকে আমরা গার্হস্থ্য এবং সামাজিক জীবনের বাহিরেই রাখিয়াছি;—সেটাকে বলি সন্ন্যাস। বর্ত্তমান দেশ-কালে তপস্বীকে সন্ন্যাসের আশ্রয় লইতে হয়। নতুবা, নখদন্তহীনের ব্যাঘ্র-সঙ্ঘে অবস্থানবৎ অসূয়া অক্ষমা এবং অহঙ্কার-বিরহিতের সংসার-সমাজ-বাসটাও ভয়াবহ বলিয়া, ঘটনা এবং বিভিন্ন প্রকৃতি-সম্পন্নের ঘাত-প্রতিঘাতে তপঃপ্রবণত্ব নিয়তই ভঙ্গ হইতে থাকে। পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি চাপ দিয়াই তপস্বী প্রকৃতিকে ভাঙ্গিয়া দেয়।

মোটের উপর এই বলিতেছি যে, এতক্ষণ পর্য্যন্ত গৌরী প্রাণী হিসাবে আমাদের সহিত এক ধাপেই ছিলেন; এইবার যেন একটু উচাইয়া উঠিলেন। এইবার তিনি এমন প্রাণের আদর্শ দেখাইলেন, যে প্রাণ আমাদের প্রাণের কাছে আদর্শই থাকে, বাস্তবে দাঁড়ায় না।

বোধ হয় এই জন্যই মহাশক্তির অংশভূতা হইলেও, নারী বর্ত্তমানে এমন স্তম্ভিতা ও স্তিমিতা। সেই মহাশক্তি সতীই প্রতি গৃহে আধারে-আধারে গৌরীর অখণ্ড ভাবসম্পদ

লইয়া জন্মিতেছেন। সে ভাব পরিপূর্ণ অবয়বে সমস্তটা প্রকাশ পায় না; মাঝখানে হঠাৎ কে যেন লাথি মারিয়া ভাবের ঘট ভাঙ্গিয়া দেয়; মাটীর ঘটে কামের বারি পরিপূর্ণ করিয়া, মদনের গলায় মালা দিয়াই বুঝি বা মেয়েরা আজকাল কুমারী-বেলার শিবপূজা সাঙ্গ করে।

সেইজন্যই এতক্ষণ হইতে এইবার বুঝা-পড়াটা শক্ত হইয়া পড়িল। অতঃপর প্রসঙ্গটাকে একটু গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আলোচনা করিতে হইবে। মধ্যে এইরূপ ছেদ পড়িয়াছে বলিয়াই বোধ হয় গৌরী এইখানে উমা হইয়াছেন। নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

আমরাও গৌরী নাম পরিত্যাগ করিলাম। এবার হইতে মাকে উমা বলিব।

উমার কথা

যতক্ষণ পর্য্যন্ত গঠন-ভার নিসর্গের হাতে ছিল,—কেবল সংস্কারের খেলা,—সেই পর্য্যন্ত গৌরী। তার পর যখন সঙ্কল্পের কার্য্য আসিল, জ্ঞানের প্রভাব আসিল, তখনই উমা। সত্যই ত জীবনে দুইটা দিক আছে। একটা ধাতুগত দিক, যেটা প্রকৃতির দান; অপরটা উপযোগত দিক, যেটা শিক্ষার দান। গৌরী প্রকৃতির দিক,—শিবশক্তির আধার চিনিবার ভাবরূপী নিকষ-মণি। উমা সেই আধারে শিবশক্তি বিকাশের পথ। নারীত্বের ঠিক যেটা নিজস্ব দিক, অর্থাৎ স্বতন্ত্র culture (আধ্যাত্মিকতা), উমায় সেইটাই ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য cultureএ গৌরী পাই, উমা পাই না। অথবা হয় ত পাইতে পারি,—তাহাদের culture স্বতন্ত্র হেতু চিনিতে পারি না। যে ভাবকে আমরা সর্ব্বদোষপরিশূন্য করিয়া আদর্শ আলেখ্যে মূর্ত্তিমতী করিয়া গৌরী গড়িয়াছি, সেই ভাবই তাহাদের প্রতিভায় ও তাহাদের ক্ষমতায় চরমে ফুটিয়া দাঁড়াইয়াছে মিরান্দা, বিয়েট্রিস্ প্রভৃতিতে।

পাশ্চাত্য যাহা পারে, ততদুর পর্য্যন্ত পৌঁছানই যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে উমা-ভাব প্রাণের স্তর পর্য্যন্ত টানিয়া না আনিলে অবশ্য ক্ষতি নাই। তবে আমরা না কি মেয়েদের বলি—দেবীস্বরূপিণী,—আমাদের আদর্শে মেয়েদের ধর্ম্মের আদর্শ সতীত্ব chastityটুকু পর্য্যন্ত নহে,—সেইজন্যই মন-মুখ এক করিবার জন্য একটু-আধটু চেষ্টা করা ভাল। অন্ততঃ বুঝিবারও।

বিশ্ব-রহস্যের দুইটা দিক আছে; একটা উৎসাহের দিক (প্রকৃতি), একটা চেতনার দিক (পুরুষ)। ইহারই সঙ্গে বিজড়িত আমাদের কারণরূপী সত্তা। সে যে কেমন, তা অচিন্ত্য, অজ্ঞেয়। ভাব এই কারণ সত্তারই জ্যোতিঃ! উমার পার্থিব মাতা পিতা মেনকা ও হিমালয়। অধ্যাত্ম হিসাবে এই মাতা-পিতা—প্রকৃতি-পুরুষের ইঙ্গিতও যেন ভুলিয়া না যাই।

কন্যা গিরীশের প্রতি আসক্ত-মন হইয়া তপস্যার জন্য উদ্যোগিনী হইয়াছেন,—উমা-জননী মেনকা যখন ইহা শ্রবণ করিলেন,—মায়ের প্রাণে মায়েরই মত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। সেই অতি মহৎ মুনি-ব্রত হইতে নিবারণ পূর্ব্বক, বক্ষঃস্থল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া বলিলেনঃ—

> মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতাস্তপঃ
> ক্ক বৎসে ক্ক চ তাবকং বপুঃ।
> পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
> শিরীষ পুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিনঃ॥ (২)
>
> ৫।৪। কুমার সম্ভবম্।

কিন্তু ধ্রুবেচ্ছামনুশাসতী সতীকে কিছুতেই মায়ের মন রোধ করিতে পারিল না। সে কি হয়? ক ঈপ্সিতার্থ স্থির নিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ। সঙ্কল্পিত বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় মনকে এবং নিম্নাভিমুখী বারিপ্রবাহকে কে ফিরাইতে পারে? কোনও অন্তরঙ্গ সখী-মুখে পিতাকে পার্ব্বতী আপনার মনোভাব ব্যক্ত করাইলেন; জানাইলেন, যে অক্ষমতার জন্য এবার কার্যসিদ্ধি ঘটিল না, সেই অক্ষমতাকে মন হইতে দূর করিব। নিজের বুকের তার শক্ত করিয়া বাঁধিব। যতদিন তা না পারি, আমায় বনবাসের অনুমতি দিন। তাহাই হইল। হিমালয় অনুমতি দিলে গৌরী চলিলেন। হিংস্র জন্তু পরিবর্জ্জিত, ময়ূরাদি সমন্বিত নির্জ্জন এক শিখর-প্রদেশ তাঁহার বাসস্থান হইল। উমা

(২) অনুবাদ—বৎসে, আমার এই গৃহেই অনেক মনোমত দেবতা আছেন; তুমি তাঁহাদিগের আরাধনা কর। তোমার এই অতি সুকোমল দেহই বা কোথায়, এবং কঠোরতর দেহসাধ্য তপস্যাই বা কোথায়? সুকুমার শিরীষ পুষ্প ভ্রমরেরই চরণপাত সহ্য করিতে পারে; কিন্তু পক্ষীর চরণঘাত কদাচই সহ্য করিতে সমর্থ হয় না।

তপস্যা আরম্ভ করিলেন। যাহার সঞ্চালনে স্তনস্থিত চন্দন মুছিয়া যাইত, সে হার খুলিয়া রাখিলেন; পরিলেন সামান্য বসন, যাহার পারিপাট্যে এতটুকুও সময়ের অপব্যয় হইবে না। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, এরূপে কেশ-বেশ-বিন্যাস পরিত্যাগ করিলে, রাজকুমারীর সৌন্দর্য্যের হানি হইবে না ত? কিন্তু জগতে যিনি সৌন্দর্য্যের সর্ব্বপ্রধান বোদ্ধা, সেই কালিদাস এখানে উমার রূপ বর্ণনাচ্ছলে বলিতেছেন,

"ন ষট্‌পদশ্রেণিভিরেব পঙ্কজং স শৈবলা সঙ্গমপি প্রকাশতে।"—ষট্‌পদসমূহ দ্বারাই যে পঙ্কজের শোভা হয় এরূপ নহে; শৈবাল সংযোগেও উহার সেইরূপই শোভা হইতে পারে। কবি তাঁহার স্বাভাবিক রসিকতা সহ সুন্দর ভাবে উমার তপকৃচ্ছ্র অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছেন—

পুনর্গ্রহীতুং নিয়মস্থয়া তয়া
দ্বয়েপি নিঃক্ষেপ ইবার্পিতং দ্বয়ম।
লতাসু তন্বীষু বিলাস চেষ্টিতং
বিলোল দৃষ্টং হরিণাঙ্গনাসু চ॥ (৩)

দুদিন নিয়ম সংযমের আবরণ পরিলেই বা। উচ্চাকাঙ্ক্ষার অদম্য প্রেরণায় শক্তি প্রকাশোপযোগী করিয়া আধারকে গড়িয়া লইতে যদিই বা কিছু দিনের জন্য ধ্যানের প্রসাদ গুণে রমণীর রমণীয়তা ঢাকা পড়িয়া থাকে, প্রকৃতি-দত্ত বস্তু কি যাইবার? উমার চারিদিকে দোদুল্যমানা লতা-বল্লরী যেন বিশ্বের রমণীয় শোভা একত্র জড়ো করিয়া কুঞ্জ-বেষ্টনী রচনা করিল। তাপসীর কাছ ঘেঁসিয়া হরিণা-ঙ্গনারা যে দৃষ্টি হানিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, কোন্ বিলাসিনীর চঞ্চলাপাঙ্গে তাহার দ্যুতি ঝলিয়া-ঝলিয়া পড়ে? এমনি করিয়া অন্তর্মুখী মনে স্বরূপ জ্যোতিঃটুকু ধ্যানমার্গে ধরিয়া উমা আমিত্বের অনুভূতিকে সেই স্তরে টানিয়া তুলিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন স্নান, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, বল্কলের উত্তরীয় ধারণ ও বিহিত অধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ সদনুষ্ঠানের কথা শ্রবণ করিয়া, সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত মহর্ষিগণ তথায় আগমন করিতেন; যে-হেতু, যাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহা-দিগের বয়ঃক্রমের বিষয় কেহই বিবেচনা করেন না। ক্রমে-ক্রমে চড়িতে লাগিল। যত মন প্রস্তুত হইতে লাগিল, অন্তর্জগতে শক্তিময়ী অজেয়া হইয়া উঠিতে লাগিলেন; বহির্জগৎ দিনে-দিনে ততই তুচ্ছ হইয়া উঠিতে লাগিল। দুঃখ, কষ্ট, শঙ্কা, ত্রাস, শৈথিল্য প্রভৃতির বীজগুলিকে মনো-মধ্যে ধ্বংস করিয়া, উমা বাহিরের আচরণে একবার তাহার অকিঞ্চিৎকরত্ব মিলাইয়া লইতে বসিলেন। "তদানপেক্ষ্য স্ব শরীরমার্দ্দবং তপোমহৎসা চরিতুং প্রচক্রমে।" তখন স্বীয় শরীরের কোমলতা অগ্রাহ্য করিয়া, তিনি অধিকতর কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ইহার তালিকায় চারি দিকে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া বসাও ছিল; রৌদ্র বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত অগ্রাহ্য করিয়া উন্মুক্ত আকাশতলে গভীর ধ্যানে বসাও ছিল; দুরন্ত শীতে বারি-মধ্যে অবগাহনও ছিল। কেন যে ছিল, সে তর্কে প্রয়োজন নাই। কৃচ্ছ্র সাধনে মনের উপর প্রভাব ঘটে, সে কথা বলিতে চাহি না, তবে মনের কৃচ্ছ্র সাধনের উপর যথেষ্ট প্রভাব আছে; আর কৃচ্ছ্র সাধন মানসিক বলেরই পরীক্ষা; এ কথা না বলিলেও চলে না। হয় ত উমা সেই অর্থেই এ সমস্ত সহ্য করিয়াছিলেন।—তার পর দেশ, কাল, পাত্রের কথাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না। যে সময় উমার আদর্শ গঠিত হইয়াছিল, হয় ত তখন মনুষ্য জাতির স্বাস্থ্য এখনকার মত ভঙ্গপ্রবণ ছিল না। আর তখন ত বস্তু-তান্ত্রিক সভ্যতার এত উন্নতি হয় নাই—বড় কাজের জন্য শরীরকেও বড়-বড় ধকল পোহাইতে হইত। তখনকার গৌতম বুদ্ধ অথবা আচার্য্য শঙ্করকে তরুতলে বাস করিতে হইয়াছে; পদব্রজে ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। তখন শারীরিক ব্যাধি-ক্লান্তি দৈবশক্তির অভাব বলিয়াই গণ্য হইত। এখন কি আর সে দিন আছে?

কালিদাসের কাব্য অনেক দূর পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছে। আমাদের আর ততদূর পর্য্যন্ত যাইতে হইবে না। মাতৃ-জাতির সাধনার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি; জগন্মাতার জীবনের সাধনার অবস্থাটুকুই বর্ণনা করিলাম। কেবল মাত্র এইটুকুই দেখাইতে চাই যে, বর্ত্তমান সমাজের অস্বচ্ছ

(৩) অনুবাদ। কঠোর অনুশাসন বদ্ধ তাঁহার দ্বারা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবার নিমিত্তই যেন দুইটী বস্তু আপাতঃ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তিনি মনোহর লতা সকলের অঙ্গে স্বীয় অঙ্গের বিলাস চেষ্টা ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং চঞ্চল লোচন হরিণাঙ্গনীতে নয়নের কটাক্ষ সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ভাব-মণ্ডলকে বিদীর্ণ করিয়া মাতৃ-শক্তির স্ফুরণ বিনা তপস্যায় হইবে না।

এইবার আমাদের আপনাদের কথা বলিব। ঠিক এ ধারাটুকু মেয়েরা ত ধরিতে এখনও পারে নাই। মেয়েদের জাগাইবার যাঁহারা প্রয়াসী, তাঁহাদের মন এখনও দেবরাজের মনস্তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। তাঁহারা মেয়েদের উত্তেজনা-বাক্যে বর্ত্তমান জীবনের ব্যবস্থার প্রতি বিবাইয়া তুলিতেছেন। ওগো! রক্ষা কর, ও cupid দাদাকে সঙ্গে দিয়ো না। অবশ্য বলিতে পার—"নহি বিনা ভয়াভিলাষৌ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি"। ভয় ও অভিলাষ ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সংঘটিত হইতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলেও এ কথাই বা কেমন করিয়া বলিতে পার যে, শুদ্ধ প্রকৃতির উপরই তোমরা কৃতকার্য্য হইবে। যদি বল যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, দুই-ই চাই। তবে, কোথায় সে বোঝা-পড়া যে ভয় ও অভিলাষ কোন-কোন ক্ষেত্রে কেমন করিয়া চালাইতে হইবে? দুই-ই ত আর এক সঙ্গে চলে না।

আমি যে কথা বলিতেছি, সে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুয়েরই অতীত স্তরের কথা। অথবা বলিতে পার, এ শুদ্ধা প্রবৃত্তির কথা। মোট কথা এই যে, আমি construction-এর দিক হইতে বলিতেছি। হতভাগ্য ভারতে ভাঙ্গিবার আর কিছুই বাকি নাই।

সীবনাঞ্জলি

[অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়]

ভারতের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অস্বচ্ছল অবস্থাপন্ন যুবকগণকে স্বাবলম্বী হইয়া জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে "সীবনাঞ্জলি" ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিবার বাসনা। পরে, যথা সময়ে, সহজ-বোধ্য চিত্রগুলি সন্নিবেশিত করা যাইবে।

সীবন-শিক্ষা কাজটী আরামসাধ্য; পরন্তু, আমোদজনক, অত্যাবশ্যক গৃহকার্য্য। শিক্ষারম্ভে সেলাইয়ের সময় একটু বিরক্তির ভাব আসে বটে, কিন্তু ক্রমান্বয়ে (স্তরে-স্তরে) যখন শিক্ষা করা যায়, তখন কাজটীর সফলতায় চিত্ত আত্ম-সম্পদে ভরিয়া উঠে এবং সহজও হইয়া আসে। যাহাতে চাকরীর মায়া কাটাইয়া প্রত্যেকেই উপার্জ্জনক্ষম হয়,—মেয়েরা যাহাতে ছোট-খাট কাট-ছাঁট ও সেলাইয়ের কাজগুলি সময় মত নিজ হাতে সম্পন্ন করিতে পারে, তৎপ্রতি প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

প্রথম পর্য্যায়

(১)

সীবন—দুয়ের বা ততোঽধিক কাপড়ের সংমিশ্রণে সূচ-সূতার দ্বারা ফোঁড় উঠাইয়া, গেথে নেওয়ার নামই সীবন বা সেলাই। এই সীবনাঞ্জলিতে সেলাই ও কাপড় কাটা (Tailoring & Cutting) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সেলাই ও কাপড় কাটার জন্য নিম্নলিখিত জিনিষগুলি দরকার—

সূচ বা সূঁই (Needle), সূতা (Thread), অঙ্গুস্ত্রাণ (Thimble), কাঁচি (Scissors), মাপের ফিতা (Tape), মোম (wax), খড়ি (Chalk), স্কোয়ার (Square), হাতের সেপ (Sleeve curve) ও ইস্ত্রি (Ironing), সেলাইয়ের কল (sewing machine)। শিক্ষা দিবার সময় আরও কয়টী জিনিষ বিশেষ দরকার হয়—মাপযন্ত্রের বাক্স (Instrument Box), বনাত ও ব্রাস (Milton & Brass), টেবিল ও বোর্ড (Table & Board)।

সূঁইয়ে সূতা ব্যবহার—প্রথমতঃ ১।০ হাত বা ১॥০ হাত পরিমাণ সূতা লইয়া, সূতা এক দিকে পাকাইয়া লইতে হইবে। সেই পাকান দিকটা ডান হাতের বৃদ্ধা ও তর্জ্জনীর সাহায্যে বাম হাতের বৃদ্ধা ও তর্জ্জনীর আঙ্গুলে সূঁই রাখিয়া সূঁইয়ের ছিদ্রে সূতা পরাইবার সময় নিজের চোখের সামনে এমন ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে সূঁইয়ের ছিদ্রে ডান হাতে সূতা পরাইয়া দেওয়া সহজসাধ্য হয়। সূঁইয়ের

ছিদ্র দিয়া যে অংশটুকু বাহির হইবে, তাহা ডান হাতের বৃদ্ধা ও তর্জ্জনীর সাহায্যে টানিয়া লইলেই সূতা পরান হইল। এই যে ১৷০ হাত বা ১৷৷০ হাত সূতা লইতে বলিয়াছি, তাহা যে দিক সূঁইতে সূতা পরাইয়া লওয়া হইল, সেই দিকে একটী গিঁটো দিলে সম্পূর্ণ সূতা পরান হইল। সূতা বেশী নিতে নিষেধ করিলাম কেন? বেশী সূতা লইয়া সেলাই করিতে সূতা জড়াইয়া যায়; সেলাই করিতে খুব অসুবিধা হয়। সেলাইয়ের কাজের জন্য ১৬০নং ১৫০নং ১২৪নং ৩৯০নং গুলি, আর ৫০নং ৬০নং ২০নং কাটিম ও ১২ নং সিল্ক সচরাচর ব্যবহার করা চলে।

আঙ্গু'স্ত্রাণ ব্যবহার—ডান হাতের মধ্যমার ডগায় আঙ্গু'-স্ত্রাণ পরিতে হয়। আঙ্গু'স্ত্রাণ ব্যবহার প্রথমে খুব বিরক্তি-কর বোধ হয়; কিন্তু দিন কয়েক পরে যখন তাহার ব্যবহার ঠিক হইয়া আসিবে, তখন শুধু হাতে সেলাই করিতে বিরক্তি বোধ হইবে। আঙ্গু'স্ত্রাণ ব্যবহারে ডান হাতের মধ্যমা আঙ্গুলটীর কোনরূপ যন্ত্রণা বোধ হয় না। শুধু হাতে যদি সেলাই করা হয়, তাহা হইলে দেখিবেন, মধ্যমার মাথায় বড়ই ফুটো ফুটো হইয়া বেদনা অনুভব হয়। দুই একদিন সেলাই করা যায়; তৃতীয় দিন আর আঙ্গুলের বেদনার জন্য কাজ করিতে ইচ্ছা যাইবে না। কিছু দিন পরে দেখিবেন, আঙ্গুলে কড়া পড়িয়া গিয়াছে। সেইজন্য আঙ্গু'স্ত্রাণ ব্যবহার করা খুব দরকার।

সূঁইচের ব্যবহার—সূঁইচে যে দিকে সূতা পরান হইল, সেই দিক ডান হাতের মধ্যমার আঙ্গু'স্ত্রাণের উপর রাখিতে হইবে; তার পর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বারা ধরিয়া, মধ্যমার আঙ্গু'স্ত্রাণ দ্বারা যেন ঠেলিতে পারা যায়, এরূপ অবস্থায় সূঁই ধরিতে হইবে। সূঁইয়ের অগ্রভাগ তর্জ্জনীর অগ্রভাগের নীচে থাকিবে।

কাপড় সেলাই—প্রথমতঃ এক খণ্ড কাপড় লইয়া সূতা পরান সূঁইয়ে যে ভাবে সূঁই ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই ভাবে ধরিয়া কাপড় সেলাই করিতে হইবে। কাপড় বাম হাতে রাখিয়া সূঁইচের অগ্রভাগ কাপড়ের যে লাইনে সেলাই করিতে হইবে, সে লাইন লক্ষ্য রাখিয়া বাম হাতের বৃদ্ধা, তর্জ্জনী ও মধ্যমার সাহায্যে সেলাই করিতে হইবে। এইখানে একটী কথা বলিয়া রাখা দরকার। কাপড়ের যে অংশ সেলাই করিতে হইবে, তাহার বেশীর ভাগ অংশ ডান দিকে বরাবর রাখিতে হইবে। প্রথম যেখান হইতে সেলাই আরম্ভ হইবে, সেই অংশ নীচের দিকে রাখিতে হইবে; সেলাইয়ের দিক উপর দিকে থাকিবে। আর যেখানে সেলাই প্রথম আরম্ভ করিতে হইবে, সেলাই দিক উপর দিকে থাকিবে। আর যেখান হইতে সেলাই প্রথম আরম্ভ করিতে হইবে, তার ১ ইঞ্চি ১৷৷০ ইঞ্চি সামনে বাম হাতের তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা কাপড়ের নীচে রাখিয়া, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উপরে রাখিয়া, কাপড়কে একটু টান অবস্থায় ধরিতে হইবে। আর ডান হাতে যে সূঁই আছে, সূঁইচের অগ্রভাগ তর্জ্জনীর নীচে রাখিয়া, ফোঁড় দিয়া বাম হাতের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা সূঁইচের অগ্রভাগ উপর দিকে উঠাইয়া দিতে হইবে। এই রূপে যেমন সেলাই হউক না কেন, সূঁইকে একবার নীচে নামাইবে, একবার উপর দিক উঠাইতে হইবে। এই ভাবে নামা-উঠা করে কাপড়কে বিঁধে সূতা চালাইয়া দিতে হইবে। এই অবস্থায় কতকদূর সেলাই হইয়া গেলে, তাড়াতাড়ি সেলাই করিবার জন্য প্রথম সেলাইয়ের অংশটুকু বাম পা পাতিয়া, তার উপর সেলাইয়ের অংশটুকু রাখিয়া, ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া, পূর্ব্ববৎ সেলাই, করিয়া গেলে সেলাই করা হইল।

মাপের ফিতা ব্যবহার—ভারতীয় দর্জ্জিরা গিরা বলিয়া এক রকম ফিতা নিজেরাই তৈয়ারি করিয়া লয়; সেই ফিতার মাপ ২৷০ ইঞ্চিতে এক গিরা হয়। এইটার প্রচলন বেশী ছিল; এখন কিন্তু ইঞ্চির প্রচলন একটু বেশী হইয়া উঠিয়াছে। কাটার (cutter)দের কাজের জন্য ৬০ ইঞ্চি পরিমাণ এক রকম ফিতা বাহির হইয়াছে; তার দ্বারা মাপ লওয়া হয়। এই ৬০ ইঞ্চি ফিতাখানির প্রত্যেক ইঞ্চিকে ½", ¼" ও ⅛" অংশ ভাগ করা হইয়াছে। ইহাতে কাটিবার পক্ষে ও মাপ লইবার পক্ষে বড়ই সুবিধা হয়। কিন্তু গিরার কাজে একটু অসুবিধায় পড়িতে হয়। এইজন্য এই ৬০ ইঞ্চি পরিমাণ ফিতার মাপের উল্লেখ এই পুস্তকে থাকিবে।

কাঁচির ব্যবহার—এইখানে দুই রকম কাঁচির উল্লেখ থাকিবে। এক রকম কাঁচি আছে, তাহার দুই মুখ সরু; এইটী দর্জ্জিদের হাতের কাজে লাগে। তাহাতে সূতা খোলা, সূতা কাটা, জামার পরিবর্ত্তন (Altering),

জামার সূতা খোলার কাজে ও বোতামের ঘর কাটা কাজে খুব সুন্দররূপে ব্যবহার চলে। আর এক রকম কাঁচি আছে, তাহার এক মুখ সরু, আর এক মুখ মোটা; তাহা কাপড় কাটা কাজে লাগে। এই কাঁচির যে মুখ সরু, তাহা কাপড়ের নীচে রাখিয়া, মোটা মুখ ফলকটা উপরে রাখিয়া,—কাঁচির যে দুইটা রিং আছে—সরু মুখ ফলকের রিংএ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরাইয়া আর মোটা মুখ ফলকের রিংএ তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, ও কনিষ্ঠা দ্বারা ধরিয়া, যে কাপড়ের অংশটুকু মাঝে রাখা হইয়াছে,—তাহা এই দুই ফলকের চাপে কাটা যাইবে।

খড়ি ও চকের ব্যবহার—দুই রকম খড়ি আছে। এক রকম খড়ি বোর্ডে ব্যবহার হয়। এই খড়ি বোর্ডে জামার চিত্রাদি দেখাইতে ও বুঝাইতে লাগে। আর এক রকম খড়ি আছে; তাহা জামা কাটা কাজে ব্যবহৃত হয়। এই খড়ি নানা রংয়ের পাওয়া যায়। কাল, সাদা, সবুজ, নীল এই চারি রকম চক হইলেই, যে কোন রংয়ের কাপড় হউক না কেন, কাপড় দাগিবার পক্ষে সুবিধা হয়। এই খড়ির একটী গুণ এই যে, কোন কাপড়ে দাগ দিয়া, ঝাড়িয়া ফেলিলেই উঠিয়া যায়। বনাত (Milton) কাপড়ে চিত্র দেখাইতে ও বুঝাইতে এই খড়িতে বড়ই সুবিধা হয়। ইহার আর একটা নাম ক্রেয়ন (Crayon).

মোমের ব্যবহার—যদি কোন কাপড়ে সূঁই চালাইতে অসুবিধা হয়, সেই অবস্থায় একটু মোম ঘসিয়া দিলে, কলের সূঁচ বা হাতের সূঁচ চালাইতে কষ্ট পাইতে হয় না। অধিকাংশ সময় সেলাইয়ের কলের কাজে ব্যবহৃত হয়। হয় ত সূঁই চলিলেও সেলাই (stitch) পড়ছে না; তখন একটু মোম ঘসিয়া দিলে, কল চলিতে থাকিবে। অনেক সময় মোম ব্যবহারের উপকারিতা বুঝা যায়।

বাঙ্গালীর গৃহিণী

[শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্, এম্, এস্]

আজ এই বিশ্বের বিরাট কার্য্য ক্ষেত্রে, বাঙ্গালী পুরুষদিগের মনুষ্যত্বের যতটা সঙ্কোচ ঘটিয়াছে, বাঙ্গালীর সংসারে বাঙ্গালী-গৃহিণীর কার্য্য-ক্ষেত্র তাদৃশ সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ পৃথিবীর কোনও জাতির সঙ্গে বাঙ্গালী পাংক্তেয় নয়,—আজ বাঙ্গালী-গৃহিণীও একান্নপরিবারভুক্তা নন এবং তিনি হিন্দু-সমাজের গণ্ডীর ভিতরে যে কতটা আছেন ও বাহিরে যে কতটা গিয়া পড়িয়াছেন, তাহা ঠিক্ করিয়া বলা যায় না। আমাদিগের মুস্কিল হইয়াছে এই যে, যদিও আমাদের চক্ষু আমাদিগের নিজস্ব যন্ত্র, তথাপি বিলাতী উপচক্ষুর রঙ্গীন্ কাচের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে সমস্ত জিনিস দেখিতে হইতেছে। এই দৃষ্টির দৈন্য, বিচার শক্তিকে পুরাতন করিতেছে।

পুরুষের আজীবন শিক্ষা এবং সাধনার চরম পরীক্ষা, তাঁহার জীবনের সাফল্য; রমণী-জীবনের চরম পরীক্ষা, তাঁহার গৃহিণীপনার সাফল্য। "গৃহিণীপনা" বলিলে কত কি বিষয় বুঝায়, সে সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা করিয়া লইলে, আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব, বাঙ্গালীর গৃহিণী হিন্দু-আদর্শ হইতে কতদূরে যাইয়া পড়িয়াছেন। "শ্রী" এই অতি ক্ষুদ্র কথাটিতে গৃহিণীপনার পূর্ণ বিকাশের বর্ণনা পাওয়া যায়। "শ্রী" শব্দটি সেবা ও আশ্রয় জ্ঞাপক "শ্রি" ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ইহার দ্বারা শোভা, সম্পত্তি, বিভূতি, সিদ্ধি, বৃদ্ধি সমস্তই বুঝায়। যে গৃহিণীর কার্য্যে একাধারে সেবা ও আশ্রয়দাত্রীত্ব পরিস্ফুট, তিনিই পরম গৃহিণী।

গৃহিণীর কাযের বিষয়গুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ, এই এই বিষয়ে তাঁহাকে অবহিত থাকিতে হয়ঃ—(১) সামাজিক ব্যবহার বা লৌকিকতা। (২) ধর্ম্ম ও কর্ম্মানুষ্ঠান। (৩) সংসার প্রতিপালন—আত্মীয় ও পোষ্যবর্গ, অতিথি-অভ্যাগত। (৪) মাতৃত্বের বিকাশ সাধন।

এই বারে এই গুলি একে একে লইয়া, দু এক কথা বলিব। প্রথমতঃ, সামাজিক ব্যবহারের কথা ধরা যাউক।

কলিকাতার মত সহরে-সমাজ এক রকমের, পল্লীগ্রামে সমাজ অন্য রকমের। সহরে, স্ব স্ব রুচি ও স্ব স্ব আর্থিক অবস্থানুযায়ী কয়েকটি ঘরের সহিত অপর কয়েকটি ঘরের মেলা-মেশাই, সেই প্রকৃতিগত বা শ্রেণীর লোকেদের "সমাজ" ;—এইভাবে, "শিক্ষিতদিগের সমাজ," "বিলাত ফেরত-দিগের সমাজ," "ব্রাহ্ম-সমাজ" প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল সমাজের নিয়ম-কানুন হাওয়ার মত নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ;—কতকটা সাময়িক উত্তেজনা, কতকটা কার্য্যগতিক, কতকটা বা বিলাতী আবহাওয়ার উপরে এই সমাজের নিয়ম-কানুন নির্ভর করে। এই সকল সঙ্কীর্ণ সমাজের নিয়ম-কানুন যখন বাঁধাবাঁধি ভিতরে নাই, তখন ইহাদিগের সম্পর্কে "সামাজিকতা" বলিতে কোনও বিশিষ্ট ভাব-জ্ঞাপক কোনও ব্যবহার বুঝিবার উপায় নাই।

পল্লীগ্রামের মধ্যে এক হিন্দুসমাজ বর্ত্তমান থাকিলেও, তাহার এতাদৃশ বিকার ঘটিয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-সমাজের শবকেই আমরা হিন্দু-সমাজ বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি, একথা বলা নিতান্ত অন্যায় নহে। মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে, ব্যষ্টিভাবে স্ব স্ব কার্য্যের সুবিধার জন্য এবং সমষ্টির উন্নতির জন্য। একত্রে, এক মন ও প্রাণ হইয়া থাকাকেই এক সমাজভুক্ত হইয়া থাকা কহে। সংঘবদ্ধ হইলে, সাধারণ স্বার্থের সুবিধা। প্রত্যেক সংঘেরই একজন দলপতি থাকেন। হিন্দু-সমাজেও, প্রত্যেক পল্লী-গ্রামে, একজন দলপতি থাকিবার কথা। ব্রাহ্মণই দলপতি হওয়া স্বাভাবিক—যে, ব্রাহ্মণের ত্যাগই ধর্ম্ম, ঈশ্বর-সেবা পরম কর্ম্ম, জগতের ও জীবের মঙ্গল-চিন্তাই পরম সাধন ছিল। কিন্তু, আজ সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের শবের উপরে, নানা জাতীয় "আচার" নামক দুষ্ট-ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছে ; এবং যাহাদিগের ত্যাগের মহিমায়, হিন্দু-ধর্ম্মের দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাঁহারা অনেকেই আজ বিদ্যা-শূন্য, আত্ম-মর্য্যাদাহীন, অর্থ-লোলুপ। কাযেই, পল্লীগ্রামে নামতঃ সমাজ থাকিলেও, যথার্থ সমাজপতির অভাবে, ততোঽধিক নীচ-আদর্শযুক্ত সমাজপতির বিড়ম্বনায় সেখানে দলাদলি ও হিংসা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। সে সমাজে ভগবচ্চিন্তার মাহাত্ম্য নাই, মনুষ্যত্বের মর্যাদা নাই, জ্ঞানের সমাদর নাই। সেখানে আছে স্বার্থের পূতিগন্ধ। এইরূপ সমাজে, হিন্দু-গৃহিণীর স্থান আজ অতি নিম্নে। যতদিন সমাজ-প্রাণ ব্রাহ্মণেরা বিদ্যার কথঞ্চিৎ আদর করিতেন, ততদিন হিন্দু-সমাজ তৎপরিমাণেও সজীব ছিল ; কাযেই হিন্দু-গৃহিণীর কর্ত্তব্যও যথেষ্ট ছিল, স্থানও উচ্চে ছিল।

হিন্দু-সমাজে হিন্দু-রমণীর স্থান কোথায় ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চক্ষুর্দ্বয় আমাদিগের অঙ্গ হইলেও, বর্ত্তমান সময়ে বিলাতী-উপচক্ষুর সাহায্য ভিন্ন, আমাদিগের কোনও জিনিস দেখিবার সামর্থ্য নাই। কাযেই, বিলাতের সমাজে রমণীর স্থান কোথায়, আগেই সেইটা বর্ণনা করা প্রয়োজন। আমরা দেখিতে পাই, যে সমষ্টি হিসাবে, বিলাতে অধিকাংশ রমণীরা শিক্ষিতা, স্বাস্থ্য-সম্পন্না এবং সেবা-শুশ্রূষা কার্য্যে তাঁহারাই অগ্রণী ; রোগী-পরিচর্য্যা, আর্ত্ত-সেবা, দীন-দরিদ্রের সেবা, প্রভৃতি দেশ-হিতকর যাবতীয় অনুষ্ঠানে রমণীরা অগ্রণী। কিন্তু, ব্যষ্টি হিসাবে দেখিতে গেলে, আমরা দেখি যে, তাঁহারা মাতৃত্বের দিকে ঘেঁসিতে চান না ; শিশু লালন-পালনের জন্য সেবা-দাসী রাখিয়া থাকেন ; অতিথিসেবা তাঁহাদিগের সমাজে নাই। গৃহকার্য্যে নৈপুণ্য ও গৃহস্থালীর সুশৃঙ্খলা তাঁহাদিগের বেশ আছে। সেদেশে রমণীরা রন্ধন-পটু না হইলেও, সীবনকার্য্য, চিত্রকলা বিদ্যা প্রভৃতিতে নাম কিনিতে ব্যস্ত। ফল কথা, সকল কাযেই ভোগেচ্ছা সে ধনীদেশে অবশ্যম্ভাবী। এইবারে দেখা যাউক, ত্যাগে তৃপ্ত আমাদের এই দরিদ্র-দেশে কি অবস্থা ছিল। আমাদের দেশে, বাঙ্গালী গৃহিণীরা ব্যক্তিগত ভাবে এক রকম নিরক্ষর থাকিলেও, কর্ত্তব্য-পরায়ণা ও ক্ষুরধার বুদ্ধি-সম্পন্না ছিলেন। প্রত্যেকেই এক-একজন সৈরিন্ধ্রী ছিলেন ; রোগী-পরিচর্য্যায় তাঁহারা সদাই প্রস্তুত এবং সিদ্ধহস্তা ত ছিলেনই, পরন্তু কেহ-কেহ নাড়ীজ্ঞান ও দ্রব্যগুণের জ্ঞানেরও যথেষ্ট দাবী রাখিতেন। গ্রামে কাহারো বাড়ীতে "যজ্ঞ" হইলেই, গৃহিণীগণ অনাহূত হইয়াই, "জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ" পর্য্যন্ত সমস্তই করিতেন—না করিতে পাইলে, দুঃখিনী হইতেন। বিপন্ন প্রতিবেশীকে কায়মনোবাক্যে সাহায্য করা ছাড়াও, দেবতা-স্থানে তাহার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করিতেও ভুলিতেন না। সেকালে একজনের বাগান বা ক্ষেত, শুধু সেই ব্যক্তিরই নিজস্ব উপভোগের জন্য থাকিত না। ফল কথা, তথাকথিতা "অশিক্ষিতা" হইলেও, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির ও প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সহিত, গৃহিণীর সম্বন্ধ যেমন ঘনিষ্ঠ ছিল, তেমনি আন্তরিকও ছিল। তাঁহার "রেড্ ক্রস" বা "সিটার্স-সিস্টার্স

অফ দি পুয়র" প্রভৃতি কোনও নামে জাহির না হইলেও, *সামাজিক সমস্ত কর্ত্তব্যই যথাজ্ঞানে নীরবে অনুষ্ঠান করিতেন*। কিন্তু দুইটি দোষে সকল জিনিষই দূষিত ছিল। প্রথম দোষ ছিল, পাশ্চাত্য মতে আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি, সেই জ্ঞানের অভাব, বা শিক্ষার অভাব; দ্বিতীয় দোষ ছিল, ব্যাপকতার অভাব। অর্থাৎ, তাঁহারা "গতর" খাটাইতেন, কিন্তু কি করিলে সকল সময়ে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে সে জ্ঞানের নিতান্ত অভাব ছিল; তাহার ফলে, কোন-কোন পল্লীগ্রামে, এক-আধজন গৃহিণী "সবজান্তা-বাগীশ" হইয়া, অপরের অন্ধ-বিশ্বাসের দাবী করিতেন—বাকী গৃহিণীরা, কতকটা ভয়ে, কতকটা লজ্জাশীলতার বশবর্ত্তিনী হইয়া, তাঁহারই আনুগত্য স্বীকার করিয়া, না বুঝিয়া-সুঝিয়া, কাজের খাতিরে, কর্ত্তব্যবোধে, কায করিয়া যাইতেন। ইহার ফলে, জ্ঞানের বা সত্যের প্রচার হইত না,—কর্ত্তব্যের দায়ে কায করা হইত মাত্র। সে কর্ত্তব্য-পালনে প্রাণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত, কিন্তু প্রেরণার উৎস ক্রমশঃই শুষ্ক হইয়া আসিত। এইজন্য, এখনো পল্লী-গ্রামে পরার্থ-পরতার অভাব নাই; কিন্তু, যে জ্ঞান পরার্থ-পরতার প্রেরণা দিবে, তাহার অভাব হওয়ায়, সাধারণ ভাবেই গৃহিণীরা আজকাল ঐ বিষয়ে উদাসীনা হইয়া পড়িতেছেন। যদি এমন কোনও সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করা যায়, যাহার ফলে প্রত্যেক নারীই বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার দায়ীত্ব কোথায় ও কতটুকু, কেন এটা করা উচিত, ওটা না করিলে কি হয়, কিভাবে এটা করিলে বেশী ফলপ্রদ হয়, কি করিলে ঐ কাজটা ফলে না,—অর্থাৎ, যেমন ভাবে এখন পাশ্চাত্যদেশসমূহে নারীগণকে "মাতৃ-মঙ্গল", "শিশু-মঙ্গল", সেবা-শুশ্রূষা বিধান, আহতদিগের প্রতি প্রাথমিক-বিধান, পাক-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, সেই প্রণালীতে ঐ সকল কায শেখান যায়, তবে আবার পল্লীগ্রামে বঙ্গ-গৃহিণীগণের সেবা-ব্রত জাগিয়া উঠে। মানুষ যে কাযটা বুঝিয়া করে, সেটায় তাহার উৎসাহ জন্মে; মানুষ যে কাযটা প্রাণের উন্মাদনায় বা ভাবের উদ্দীপনায় করে, সেটায় সে প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত থাকে; কিন্তু অন্ধ অনুচিকীর্ষা বা গতানুগতিকতার বশে, বা সখ করিয়া, অথবা ক্ষীণ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ফলে, বা মৌখিক আত্মীয়তার ছলে, যে কায করে, তাহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। আজ যদি প্রাসাদ হইতে কুটিরবাসিনী আমাদের বঙ্গ-জননীরা, ঘরে-ঘরে দেশের কি ভীষণ দারিদ্র্য, কি ঘোর অজ্ঞতা, কি নিদারুণ অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, নিজের শক্তির প্রতি কি তীব্র অবিশ্বাস, কি উগ্র স্বজাতি-দ্রোহ, মানুষকে মনুষ্যত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার কি প্রচণ্ড প্রয়াস,—এই সকল কথা বেশ করিয়া তলাইয়া বুঝিবার ও মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিবার সুযোগ পান; যদি তাঁহারা সেই সঙ্গে শিক্ষা পান যে, সমাজ-দেহের এই সকল ব্যাধি নিরাকরণের উপায়, পুরুষদিগের সহিত তাঁহাদিগের আন্তরিক সাহচর্য্য করিবার সৎসাহস; যদি কেহ তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেন যে, আগে নিজে বাঁচিয়া থাকা ও অপর সকলকে সুস্থ শরীরে বাঁচাইয়া রাখাই পরম ধর্ম্ম; অর্থাৎ, কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ভগবানের সন্ধান না করিয়া, তাঁহার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সেবাই পরম ধর্ম্ম;—যদি এই সমস্ত কথা তাঁহারা মর্ম্মের অন্তঃস্থলে গ্রহণ করিতে পারেন, তবেই কায হইবে, নতুবা বাঙ্গালী-গৃহিণীর সে ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী দশভূজা মহামায়া মূর্ত্তি বুঝি আর দেখিতে পাইব না!

ব্যাপকতার অভাব এদেশে অনেক অনুষ্ঠানেরই কাল-স্বরূপ হইয়াছে। এই ভারতভূমি একটি মহাদেশ—ইহাতে যত বা দেশ-বৈচিত্র্য, তত ভাষা, আচার ও ব্যবহার-বৈচিত্র্য! নদী-মাতৃক, সুজলা, সুফলা বিধায়ে, বঙ্গভূমি যাঁহাদিগকে বুকে করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা স্বতঃই বহির্বিমুখ। কতকটা ভূ-বৈচিত্র্য বশতঃ, কতকটা ভিন্ন-ভিন্ন দেশগত আচার-বৈষম্য বশতঃ, সমগ্র ভারতে এককালে অন্নের প্রাচুর্য্য বশতঃ, এবং দেশবাসীদের স্বল্পতোষ স্বভাবের জন্য, ভারতবর্ষের যিনি যেখানে থাকেন, তিনি সে গণ্ডীর বাহিরে যাইবার প্রয়োজন কম বোধ করিয়া, বাস্তু-মোহগ্রস্ত "বাস্তু-ঘুঘু" হইয়াই থাকিতে ভালবাসেন। বহুকালের এই অভ্যাসের সঙ্গে, ধর্ম্মের নামে নানা আচার ও বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তিত হইয়া, এখন সেই কূপমণ্ডুকতার বিশেষ পরিপোষক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে, আজ বাঙ্গালী যে সুধু বিদেশে যাইতে চাহে না, তাহা নহে; ঘরের কোণে, কর্ম্মহীন অবস্থায় বসিয়া থাকিয়া, সে সবচেয়ে বেশী দলাদলির সৃষ্টি করে; এই দলাদলির অজুহাতে, পাতকুয়ায় জল তোলা, এজমালী পুষ্করিণীতে "জল-সরা" প্রভৃতি ব্যাপারেও সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় দেয়। সেই বাঙ্গালীর গৃহিণী হইয়া, রমণীরা যে সেবাব্রত করেন,

তাহাও আজ দলাদলি, জাতি-বিচার, ছোঁয়া-ছুঁই'র ভয়ে এত সামান্য গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে যে, আজ একই পল্লীতে একই "জাতের" লোক উৎসব-বিশেষে, পাংক্তেয় বা অপাংক্তেয় হইয়া পড়েন! এক পল্লীর উৎসব বা স্নেহধারা অপর পল্লীবাসীর পাওয়া দূরের কথা, একই গ্রামের মধ্যে সকলের পক্ষেই সে সুখের অভাব হয়! মা আমার যেন ছিন্নমস্তা হইয়া, নিজের রক্ত (ইষ্ট) নিজেই পান করিতেছেন—অথবা (নৈতিক) খর্ব্বাকৃতি হইয়া, কুব্জ দেহে, ধূমাবতী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, আপন ইষ্ট কুলার বাতাসে বিদায় দিতেছেন!

এইবার ধর্ম্মের দিকটা পরীক্ষা করা যাউক। যে শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য করিলে, ইহকালে মনের শান্তি ও পরকালে ঈশ্বরের সান্নিধ্য বা তাঁহার সহিত একত্ব লাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম,—"সনাতন" যাহা "নিত্য"। কিন্তু এখনকার ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় যে, মানুষ অপেক্ষা আচার বড়, মানুষ অপেক্ষা পশুও শ্রেষ্ঠ! হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-পুস্তকাদি বুঝিতে পারেন এমন পুরোহিত ও মন্ত্রদাতা গুরু বর্ত্তমানে কয়জন আছেন, তাহা জানি না। বেদই হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি; কিন্তু আজকাল অধিকাংশ ব্রাহ্মণই সেই বৈদিক অনুষ্ঠান যথার্থরূপে করিতে জানেন না, অধিকাংশ স্থলে তাহার ভণ্ডামিই করিয়া থাকেন। আবার এদিকে দেখা যায় যে, যাঁহারা পৌরোহিত্য করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বিদ্যাশূন্য; এই বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা রমণীকুলের বিশ্বাসের ষোল-আনা (অ)"সদ্ব্যবহার" করিয়া থাকেন; কাযেই,—সুধু যে "ধর্ম্মগত আচারে"র পরগাছা আজ সমাজ-অট্টালিকার প্রাচীর দীর্ণ করিতে বসিয়াছে তাহা নহে, "স্ত্রী-আচার", "দেশাচার", "লোকাচার", "বংশ বা কুলগত আচার", "ব্যক্তিগত আচার" আজ ধর্ম্মের নামে বাঙ্গালায় যথা-তথা। এই আচারের মহাহোমে হোতা বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ; সেই হোমাগ্নিতে প্রকৃত বা সনাতন বা যাহা নিত্য, সেই ধর্ম্ম ভস্মীভূত হইতে বসিয়াছে। তাই আজ গৃহিণীরা সনাতন ধর্ম্ম হইতে বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছেন;—এতদূরে গিয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা যে জল নারায়ণকে নিবেদন করেন, সময়ান্তরে সেই জলেই শৌচত্যাগ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না; তাঁহারা যে গাভীর বিষ্ঠাকে পরম পবিত্র জ্ঞান করেন, সেই গাভীর সেবা করেন না;—ফলে, বাঙ্গালাদেশের মত দুর্দ্দশাপন্ন গাভী জগতে আর কোথাও নাই। শুচি-তত্ত্ব তাঁহাদিগের মতে অতি অদ্ভুত রকমের; কাপড় যত ময়লা ও দুর্গন্ধময় হউক না কেন, কাপড় ছাড়িলেই শুচিত্ব রক্ষিত হয়; স্বর্ণ ও রজতপাত্র এবং বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি কখনো অশুদ্ধ হয় না—যত অশুদ্ধ হয়, স্বল্পমূল্যের পাত্র ও বস্ত্রাদি; তথাকথিত "নীচ" জাতির ছায়াস্পর্শে দোষ জন্মায়, কিন্তু তাহার ঘরের গো-দুগ্ধ বা অপর পণ্যদ্রব্য মূল্য দিয়া গ্রহণ করিলে, কখনো অশুদ্ধ হয় না; মুচি অস্পৃশ্য; কিন্তু উপনয়ন-কালে, যজ্ঞস্থলে জুতা আনিতে প্রত্যবায় নাই; হাড়ীরা শিশুর নাড়িচ্ছেদ করিবার সময়ে মা ও ছেলের রক্ত স্পর্শ করে—তাহাতে দোষ জন্মে না, যতদোষ তাহার ছায়াস্পর্শে। স্বামী মদ্যপায়ী ও লম্পট হইলেও তাহার সঙ্গে থাকায় ধর্ম্মের হানি হয় না, এবং সে ব্যক্তি সমাজে অনায়াসেই পাংক্তেয় হয়; অনাথ আতুরগণ কাহারো-কাহারো মতে কৃপাপাত্র নহে, যেহেতু, তাহারা ভগবান কর্ত্তৃক দুর্দ্দশাগ্রস্ত, অভিশপ্ত। আর দৃষ্টান্ত দেওয়া বৃথা। নৈতিক ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের সোপান; এখন নৈতিক ক্রিয়ার অভাব ঘটিয়াছে এবং তথাকথিত বৈদিক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াগুলি কতকটা সংস্কার-মূলক, কতকটা বাধ্যতামূলক ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে এবং আসল বৈদিক ক্রিয়া হইতে বিভিন্ন হইয়াছে। চারিদিকেই বড় গলায় আজকাল শুনিতে পাওয়া যায়—"বাঙ্গালীর মেয়েরাই হিন্দুধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।" আমি এ কথার সার্থকতা কিছুই বুঝিতে পারি না। বঙ্গ-গৃহিণীরা ষোড়শোপচারে অশেষবিধ আচারেরই পূজা করেন; যাবতীয় "ব্রত-বারের" অনুষ্ঠানে আনন্দ লাভ করেন, অধিকাংশ স্থলে অহংকার পূজাই করেন, দীক্ষার নামে প্রাণহীন মন্ত্রের জপ করেন, এবং সামাজিক যাবতীয় ক্রিয়া-কাণ্ডে বৈদিক-অনুষ্ঠানের বিকার বা নকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত করান। তাঁহারাই এই ভাবে গুরু ও পুরোহিত নামধেয়ী বহু সংখ্যক বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যকে প্রতিপালন করেন। অবশ্য সকল গুরু বা সকল পুরোহিত মূর্খ নহেন—যদিও অনেকেই তাই। সুধু ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করা হিসাবে ইঁহাদিগকে প্রতিপালন করা উচিত নয়। কারণ, যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাহীন ও শাস্ত্রের অর্থ জানেন না, বরং প্রকাশ্যে প্রকৃত বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের জ্ঞানকৃত নকলনবিশী

করেন, যিনি বিদ্যাহীন বিধায়ে, অধিকাংশ স্থলে চরিত্রহীনও বটে, তাহাকে প্রতিপালন করা, আমি অধর্ম্ম মনে করি। সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণবংশে জন্মাইলেও, ত্যাগধর্ম্ম ও বিদ্যার বলে ব্রাহ্মণ্যের দাবী তাহার কোথায়? আমার মনে হয়, এই লোকেরাই উচ্চকণ্ঠে ধার্ম্মিকতার প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন;—বলিতে হইবে না—সেটা বেশীর ভাগ স্বার্থের প্রেরণায়। যাহা সনাতন অর্থাৎ নিত্য, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে গরিষ্ঠ, তাহারা সে ধর্ম্মের কতটুকু জানে?

এইবারে সংসারে বঙ্গ-গৃহিণীকে দেখিব। সত্য-সত্যই প্রকৃত হিন্দুর সংসারে তাহার, গৃহিণীর দশ-প্রহরণ-ধারিণী দশভুজা মূর্ত্তিতে বিরাজমানা থাকিবার কথা। একাধারে—স্বামীর সর্ব্বতোভাবে সহধর্ম্মিণী, সন্তানদিগের জননী ও আদর্শ-দেবী, আত্মীয়বর্গের আশ্রয়দাত্রী, পোষ্য ও দাস-দাসীদিগের সমদর্শিনী প্রভু-মাতা; প্রতিবেশীদিগের ভরসা-স্থল, রন্ধন-শালায় সৈরিন্ধ্রী, ভাণ্ডার-গৃহে কমলা, ঠাকুর-ঘরে দীন সেবিকা; স্নেহে মাতা, দয়ায় ভগবতী, আত্মত্যাগে দধিচী, শাসনে বরাভয়া;—এ দৃশ্য পৃথিবীতে আর কোথায় দেখিব? কিন্তু হায়, আজ এ দৃশ্য ক্রমশঃই বিরল হইতে চলিল! দেশ-ব্যাপী অবিদ্যার প্রভাবে, আজ মহামায়ার সন্ধান হারাইয়াছে।

আজ হিন্দুর সংসার নীচ স্বার্থের দ্বন্দ্বে খণ্ডীকৃত, অর্থের অনর্থে এবং বিলাতী বিলাস-ব্যসনের অনুকরণে নিজ সমাজের প্রতি অন্ধ। আজ হিন্দুর প্রকৃত সমাজ নাই; আজ হিন্দুর গৃহিণী সুধু আপনার স্বামী পুত্রকেই চিনেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের হিতাহিত সম্বন্ধে ("জগদ্ধিতায়") উদাসীনা। সংসারের আয় যত বেশীই হউক বা যত কমই হউক, গৃহিণীর বিলাসের মাত্রা সেই অনুপাতে বাড়ে বৈ কমে না; কাযেই, গো-ব্রাহ্মণে ও জগতের হিতার্থে ব্যয় করিবার প্রবৃত্তির অভাবে, সামর্থ্যেও কুলায় না। পূর্ব্বে যে আদর্শে, যেমন-তেমন অবস্থায় পড়িয়াও, গৃহিণী অতিথি-অভ্যাগতের সেবা করিতে পারিতেন এবং সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য-পরায়ণা ছিলেন, এখন সে আদর্শ নাই—এখন বিলাতী ঢংয়ের স্ব-স্ব প্রাধান্য ও স্বার্থের প্রাবল্যই বেশী। যে হিন্দু সমগ্র বিশ্বের সহিত নিজ আত্মার সম্বন্ধ অহরহঃ অনুভব করিত এবং দৈনন্দিন প্রত্যেক কাযেই বিশ্ব-সত্ত্বার সহিত আত্মার সংযোগ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইত, সেই হিন্দু আজ ব্রহ্মাণ্ডকে ক্রমশঃ "স্বদেশ", "স্বজাতি", "সমাজ" এবং অবশেষে "আপনি ও কৌপিনের" ক্ষুদ্রত্বে পরিণত করিয়াছে; আজ তাহার কাছে এমন অবস্থায় কি আশা করা যাইতে পারে? জাতির বিড়ম্বনা, বিলাসিতার উন্মাদনাই তাহার হৃদয়ের দেবতা!!!

বিলাসিতার বাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে, আত্ম-বঞ্চনা, আত্ম-অবিশ্বাস ও আত্ম-মর্য্যাদাহীনতার আধিক্য ঘটিয়াছে। সেটা যে ষোল-আনা বিলাসিতারই ফল, এমন কথা বলা চলে না;—সেটা অনেক পরিমাণে বহুবর্ষব্যাপী পরাধীনতারও ফল। পরাধীন জাতি কখনো স্বধর্ম্ম, স্বকর্ম্ম ও স্বাবলম্বন বজায় রাখিতে পারে না। ইহার ফলে, আমরা না বুঝিয়া অনেক কায করিয়া থাকি, এবং না বুঝিয়া অনেক মতামতও পোষণ করিয়া থাকি। তাহার উপর, "শিক্ষা" নামে যে অধীত বিদ্যায় আমরা অভ্যস্ত হই, সে তথাকথিত "বিদ্যা" আমাদিগের যাহা কিছু অন্তরের নিজস্ব তাহা একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া দেয়; ও তৎস্থানে পরের পড়ান বুলি, পরের শিখান মন্ত্র বসাইয়া দেয়; তাহার ফলে, আমরা মর্কটত্ব প্রাপ্ত হই। যে পর্দ্দানশীন গৃহিণীরা পাশ্চাত্য মতে "শিক্ষার" বেশী দাবী রাখেন না, তাঁহারাও বিলাসিতা ও বিলাতি ঢংয়ের নভেল পাঠে এত অভ্যস্তা হইয়া পড়েন যে, সংসারের অনেক কর্ত্তব্যেই তাঁহাদিগের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, অনেক স্থলে আদর্শ হইতে তাঁহারা অনেক নিম্নে আসিয়া পড়েন। যে রমণীরা রীতিমত "শিক্ষার" অভিমান রাখেন, তাঁহারা এদেশ ও এদেশীয় সকল বস্তুকেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখাটা শ্লাঘার বিষয় মনে করেন। এমনই অধীত বিদ্যার বিড়ম্বনা!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, "শ্রী" এই ক্ষুদ্র কথাটির মধ্যে সুগৃহিণীপনার পূর্ণ পরিচয় রহিয়াছে। একবার দেখি, সেই শ্রীর বিকাশ কতটুকু ঘটিয়াছে। সুবর্ণ-খচিত প্রাসাদ-তুল্য হর্ম্ম্য, বিদ্যুতালোকের স্ফটিকাধারমালা, আশাসোঁটাধারী দ্বারীর পাল, যান-বাহনের ছড়াছড়ি বা দাসদাসীর হুড়াহুড়ি প্রভৃতিতে যে "শ্রী" ফুটিয়া উঠে, আমরা সে শ্রীর কথা বলিতেছি না। বুকভরা ভক্তি, হাতভরা সেবা, চোখভরা স্নেহ, প্রাণভরা ভালবাসায় যে "শ্রীর" পরিচয় পাওয়া যায়, আমরা সেই শ্রীরই অনুসন্ধান করিতেছি। আচারের বিড়ম্বনার বহুউর্দ্ধে প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মে যাঁহার আস্থা, যিনি জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে তাবৎ মনুষ্যের মধ্যে ভগবান্ বাসুদেবেরই মূর্ত্তি

দেখেন, বিবেকই যাঁহার জ্ঞানের উৎস, "শ্রী" তাঁহারই বিকাশ। যিনি জ্ঞানে ঐশ্বর্য্যময়ী, ভক্তিতে নমিতাঙ্গী, সেবায় আত্মহারা, কর্ম্মে দশভূজা, সেই "শ্রী" মূর্ত্তিকে আমি প্রণাম করি।

কিন্তু প্রণাম করিতে যাইয়া, মায়ের মহিমামণ্ডিত ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তি না দেখিয়া, অসিত কালিকামূর্ত্তি দেখিতে পাই! মায়ের শান্ত সংযত লীলা না দেখিয়া, প্রকৃতির উদ্দাম নৃত্য দেখিতে পাই। এখন রূপক ছাড়িয়া, কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাগুলি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

গৃহিণীর "গৃহ" আজ কোথায়? "গৃহ" বলিতে শয়ন-মন্দির, বাসগৃহ ও "সংসার" বুঝায়। শয়ন-মন্দির সকলেরই আছে—কিন্তু নিজস্ব (বা পৈতৃক বা শ্বশুর প্রদত্ত) বাসগৃহ ক্রমশঃই বিরলতা প্রাপ্ত হইতে চলিল। বাঙ্গালী আজ যাযাবর হইতে বসিয়াছে;—বাস্তুভিটায় প্রত্যেক ইষ্টকের সহিত যে স্নেহ ও সুখ-গাথা জড়িত থাকে, তাহার আকর্ষণ বা মূল্য অল্প না হইলেও, তাহার মোহে চিরকাল আবদ্ধ থাকিয়া, সুধু মায়ের কোলে শয়নসুখের আশায় আত্ম-উন্নতি ত্যাগ করা, সুবিবেচনার কায বলিয়া আমি মনে করি না। কিন্তু এক সংসারে বসিয়া, ক্রমাগত সকল বিষয়ে "দুই" ভাব যিনি করেন, তাঁহার "গৃহ" থাকিলেও, তিনি মনে ও ব্যবহারে যাযাবর। তাঁহার ছেলেরা একরকমের ব্যবহার পাইবে, মেয়েরা অপর রকমের ব্যবহার পাইবে এবং দাস-দাসীরা দৈনিক কর্ম্মের বোঝার অন্তরালে তাহাদিগের মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া রাখিবে—এই শিক্ষা প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে আজকালকার গৃহিণী দিয়া থাকেন। উপার্জ্জন-সক্ষম পুত্রের বধূ ও উপার্জ্জন-অক্ষম বা স্বল্প-উপার্জ্জনশীল পুত্রের বধূ, নিত্য ব্যবহারে তারতম্য অনুভব করিয়া থাকে। পুত্রেরা বাটির উপর বাটি দুধ সর খাইতে পায়, পরের "মেয়ে" বিধায়ে, পুত্রবধূ বহুমূল্যতাবশতঃ প্রত্যহ সধবার লক্ষণ স্বরূপ মাছও খাইতে পাইবে না। অল্প বা না-উপার্জ্জনশীল পুত্রের নিরপরাধ পরম-হংসবৎ সন্তানেরাও গৃহিণীর ব্যবহারের তারতম্য ভোগ করিয়া থাকে! হায় মা বঙ্গগৃহিণী! আজ সত্যসত্যই তোমার শিবকে শব করিয়া তাঁহার বুকে উদ্দাম নৃত্য করিতেছ!

গৃহস্থালীর কথার আর একদিক দেখা যাউক। বোধ হয় এই বিশ্বে আর কোথাও এমনটি ঘটে না, যেমনটি বাঙ্গালায় ঘটিয়া থাকে;—বাঙ্গালীর গৃহিণী, সর্ব্ববিষয়ে অজ্ঞানের ঘনান্ধকারে থাকিয়াও, সকল কথার উপরে কথা বলিয়া থাকেন। দেশের ও দশের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন কার্য্যতঃ ছিন্ন করিয়া, দেশের ও দশের কোনও ধার না ধারিয়া, অনায়াসে গৃহিণী ঠাকুরাণীরা ইহাকে "একঘরে" করেন, উহাকে "জাতে ঠেলেন" এবং পরচর্চ্চা-কালীন কত অসহায়া রমণীর সর্ব্বনাশ করিয়া বসেন!

রমণীর জীবনে মাতৃত্ব পরম ও চরম উৎকর্ষ। যে গৃহিণী স্বয়ং নিজ সমাজকে, সুস্থকায় ও সবল, সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত সন্তান উপহার দিতে পারেন এবং নিজ সংসারে ও সমাজে সুমাতা ও সুগৃহিণীর সৃষ্টি করিতে পারেন, তাঁহার জীবন ধন্য। বর্ত্তমানে রমণীরা মাতৃত্বকে বালাই মনে করেন এবং মাতৃত্বের অনুকূল কোন অনুষ্ঠান জানেনও না, করেনও না। এ সম্বন্ধে হিন্দুসমাজ চিরকাল উদাসীন ছিল না; অন্ততঃ হিন্দুদিগের কতকগুলি আচার অনুষ্ঠানের বর্ত্তমান ধিক্কার-জনক অনুকরণ দেখিয়াও সেকথা জোর করিয়া বলা চলে। কিন্তু বর্ত্তমানের হিন্দু-নামধারী যাহারা, তাঁহারা হিন্দুর সকল ধর্ম্ম ও সকল মর্ম্ম কতকগুলি আচার অনুষ্ঠানের আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া, পাশ্চাত্য ভাবের অন্ধ অনুকরণে, সুবিধাবাদের সুখকর কিন্তু অশুভকর পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। শিক্ষা আজ বিদেশীর হস্তগত; স্বাস্থ্য আজ ব্যারামের চিকিৎসার সময়ে চিকিৎসকের চিন্তনীয় বিষয়; জ্ঞান আজ কুসংস্কার কুহেলিকাচ্ছন্ন এবং নাটক নভেল সমুদ্রের তুফানে দোলায়মান; সনাতন-ধর্ম্ম আজ বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়-গণের লোলুপ দৃষ্টিতে ভস্মীভূত; পুরুষেরা আজ অহোরাত্র কায়ে ও মনে সাহেবেরই, সাহেবেরই, সাহেবেরই; ছেলেরা আজ জন্মে, কর্ম্মে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, আচারে ও ব্যবহারে সর্ব্বতোভাবে ভুঁই-ফোড়! আজ গৃহিণীর স্বত্ত্বা কোথায়?

এই অবস্থার জন্য দায়ী কে বা কাহারা? রমণীরা নিজ স্বত্ত্বা মুছিয়া ফেলিয়া পুরুষদিগের হস্তে ষোল-আনা আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। পুরাকালেও তাঁহারা তাহাই করিতেন। কিন্তু পুরুষেরা বর্ত্তমানকালে নিজের কায় ও মন, হয় স্ববৃত্তিতে নয় বিলাসিতার পল্বলে মগ্ন রাখিয়াছেন; কাযেই, রমণীদিগের ভার লইয়াও পুরুষেরা নিজ দায়িত্বানুযায়ী কার্য্য করিতেছেন না; পরন্তু এই রকম বিবেকহীন পুরুষ-দিগের সংসর্গে রমণীদিগের স্পর্শদোষ ঘটিতেছে। রমণীরাও নিজ মাহাত্ম্য, নিজ মর্য্যাদা, নিজ কর্ত্তব্য, সমস্ত ভুলিয়া গিয়া,

সুধু বিলাসিতা, সুধু স্বার্থপরতার দিকে পুরুষদিগের সহিত ধাবিত হইতেছেন। তাই আজ নিজ ও দেশের মঙ্গল-প্রার্থিনী প্রত্যেক রমণীকে নিজের ভিতরের দিকে তাকাইতে হইবে; মনে-মনে বেশ করিয়া নিজ ভাবনা ভাবিতে হইবে; নিজ অবস্থা ও আত্ম-শক্তি বেশ করিয়া বোধ করিতে হইবে; এবং সেই অনুভূতির ফলে রমণীকে জাগিতে হইবে।

তাঁহারা ভিতরে ও বাহিরে ভাল করিয়া জাগিলে আবার আমরা সকল জিনিষই ফিরিয়া পাইব। মা চৈতন্যরূপিনী বরাভয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে, আবার আমরা পরমানন্দ প্রাপ্ত হইব। আজ প্রত্যেক বাঙ্গালীকেই সেই সঙ্গে একান্ত প্রাণে প্রতিক্ষণেই আরাধনা করিতে হইবে এবং সেই শক্তিকে জাগাইবার জন্য, পলে-পলে ঘন-ঘন বলিতে হইবে—

জননি, জাগৃহি!!!

গোপন ব্যথা

[শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি-এস্‌সি]

কিশোর যখন ভিখিরীর মত আশ্রয়ের খোঁজে এসেছিল, তখন তাকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল বিনি-মাইনের চাকর হিসাবে,—অনুকম্পায় নয়। তার কচি মুখখানিতে বেদনার এমন একটা করুণ ছাপ লেগেছিল যে, আমার হৃদয় তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়েই পারে নি। নানা দিক দিয়ে নানা ব্যথা সয়ে-সয়ে, ব্যথার বেদন আমি ভাল বুঝতাম;—ঐ ব্যথাতুর কিশোরের জন্য আমার সহানুভূতির সঞ্চার এমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। তার কাতর আহ্বানে সে গৃহের কোনও নারীর প্রাণে কোমলতার সাড়া পড়ে নি; কারণ, তারা নিজেরটা লয়েই মগ্ন; কিন্তু ঐ কিশোর, কেমন করে জানি না, প্রথম থেকেই যেন আমায় অবলম্বন বলে বেছে নিয়েছিল। চোখের বোধ হয় একটা নীরব ভাষা আছে, যা অন্তরের অন্তরকে স্পর্শ করে,—যা নিমেষের ভেতর অপরিচিতকেও চির পরিচিত করে দেয়। এ গৃহে এসে সে আহার পেত যতগুণ, কাজের ফরমাস পেত তার দ্বিগুণ, এবং চারগুণ পেত লাঞ্ছনা। কিন্তু লাঞ্ছিত শিশু যেমন ব্যথায় ঠোঁট ফুলিয়ে মায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়,—সেও তেম্নি পীড়িত হয়ে দূর থেকে করুণ নেত্রে আমার পানে চেয়ে থাকৃত! আমার সজল নয়নে ব্যথাহারী কি সান্ত্বনা থাকৃত, সেই জানে; তার বিষণ্ণ নয়ন কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

তার সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয় হয় সেদিন, যেদিন প্রাণ-ঢালা সেবায় সে আমায় মরণের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। হিন্দু-গৃহে বিধবার যে স্থান, আমার আসন তার চেয়ে ঊর্দ্ধে ছিল না। একাদশীর নির্জ্জলা উপোসের পর, সারা রাত জ্বরে ভুগেও, পরদিন রান্নার জন্য আমি হেঁসেলে ঢুকেছিলেম। ছেলেপিলে ও সীমন্তিনীরা তখনো যে যার ঘরে ঘুমুচ্ছে,—ঘুম থেকে উঠেই তাদের গরম ভাত চাই। শরীর দুর্ব্বল,—ভাতের হাঁড়িটা নামাবার সময় হঠাৎ মাথা ভিরমী দিয়ে পড়ে গেলাম,—গরম ফেনে পা ঝল্‌সে গেল। একটা আর্ত্তনাদ করে চেতনা হারালেম।

যখন জ্ঞান হল, দেখি—আমার স্যাঁৎ-সেঁতে ঘরে ছেঁড়া মাদুরটিতে পড়ে আছি,—সাম্‌নে বসে কিশোর বাতাস কচ্ছে,—তার চোখে জল। আমি মাথায় কাপড় টান্‌বার চেষ্টা কর্ত্তেই সে বল্লে, "আমায় সঙ্কোচ কেন মা,—আমি যে ছেলে।" যে অনাস্বাদিত সুধা-রসের অভাবে আমার হৃদয় ভিতরে-ভিতরে গুম্‌রে কাঁদছিল,—আজ সে যেন সহসা আমার সে সাধ পূর্ণ করে দিল। আমার শ্রবণ শীতল হয়ে গেল। আহা! কি মধুর ঐ ডাক—মা! বিশ্বের সমস্ত রস ঐ একটি কথায়।

সে বল্ল, "মানুষের আকৃতি হলেই মানুষ হয় না মা,—যদি প্রকৃতি মানুষের মত না হয়। একটিবার কেউ খোঁজ করে নি। বড্ড কষ্ট আপনার মা।"

তার চোখ দিয়ে ধারা বয়ে গেল,—আমারও তাই। এ সম্মিলিত ধারায় সেদিন মাতা-পুত্র কি স্বর্গীয় শীতলতা অনুভব করেছিলেম, তা বোঝাবার ভাষা নেই।......

যে ক'দিন শয্যাগত ছিলেম, সন্তানের প্রাণ-পোরা শ্রদ্ধা-মমতা লয়ে সে আমার শুশ্রূষা করেছে। দরিদ্র সে, কোথা থেকে ওষুধ, পথ্য, ফল আনৃত, জানি না; কিন্তু তা

প্রত্যাখ্যান কর্ব্বার উপায় ছিল না,—তা যে তার অন্তরের মমতা নিংড়ান! বাড়ীর লোক ভাল-মন্দ কিছু বলে নি; বোধ করি তাদের ব্যয়-সংক্ষেপের জন্যই এ উদারতা।

বিপদে যেমন আপন-পর চেনা যায়, তেমনটি আর কথনো নয়। ঐ ঘটনায় আমাদের সঙ্গোচের ব্যবধান কেটে গেল। আমার উদ্বেলিত হৃদয় সংসার-সমাজের পানে চাইতে ভুলে গেল। মাতৃ-স্নেহে কিশোরকে থাওয়াবার জন্য লুকোচুরি, নিভৃতে মায়ে-পোয়ে সুখ-দুঃখের আলাপন —এ সবে আমার শূন্য প্রাণ ভরাট হয়ে এলো। ভুলে গেলুম—কিশোর যুবক, আমি যুবতী। যশোদার মাতৃ-স্নেহ আমায় ছাপিয়ে তুলেছিল, তেম্নি করে পরের ছেলেকে আমি আপন ছেলে করে তুলেছিলেম।

কিশোর তার ভবিষ্য জীবনের চিত্র আঁকত,—মাকে লয়ে সে কেমন সুখের সংসার বাঁধবে, কোনও দুঃখের আঁচ তাঁর গায়ে লাগতে দেবে না, ইত্যাদি;—আর আনন্দে, গর্ব্বে, বাৎসল্যে আমার বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠত।

কিন্তু আমাদের এই গোপন স্নেহের অভিনয় বেশী দিন টিকল না। একদিন রাত্রিতে সবাই যখন বিরাম-মগ্ন, —আমি আমার পিণ্ডি সামনে লয়ে কিশোরের কথাই ভাবছিলেম। রাত্রিতে প্রায়ই খেতাম না; কিশোর মাথার দিব্বি দেওয়ায়, একবার পাতে বস্তে হত। হঠাৎ পেছনে লঘু পদশব্দ শুনে চেয়ে দেখি—কিশোর, হাতে তার খাবারের ঠোঙ্গা। ছেলেটার কাণ্ড বুঝতে বাকী রইল না। বল্লুম, "কি রে কিশোর?"

"প্রসাদ পাব বলে এসেছি মা,—পেট ভরে নি।"

"না রে না, অসুখ কর্ব্বে। এত রাতে প্রসাদ পায় না।"

"না মা, সত্যি বড় ইচ্ছা হচ্ছে,—নৈলে ঘুম হবে না।" বলে সে ঠোঙ্গাটা আমার পাতে উজোড় করে দিল।

"আচ্ছা পাগল ত!"

"না মা, হাত গুটিও না। ভাল বামুণের দোকান থেকে থালি পায়ে এনেছি। কাল একাদশী,—নিরম্বু উপোস! এই কটি ছাতু খেয়েছ, দেখি নি বুঝি? এম্নি করে মানুষ বাঁচে না।"

"বিধবার আবার বাঁচা মরা কি,—সে যে অজর অমর। মরণ হলে ত—"

"মা—" কিশোরের চোখে শ্রাবণের ধারা নেবে এলো।

"আরে পাগল ছেলে, মরা কি এতই সোজা।"

"তুমি অমন কথা বল্লে, আমি বিরাগী হয়ে যাব। বল্চি খাও মা,—নৈলে তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মর্ব্ব।"

গুটি-দুই সন্দেশ দাঁতে কাটতেই হল—তাতে অমৃতের স্বাদ। কিশোর গোপালের মত হাত পেতে বস্‌ল,—যশোদার মত পরিপূর্ণ স্নেহে আমি তার হাতে তুলে দিলাম। আহা! সেদিন আমার নিখিলের মাঝে স্বর্গ এসে নেমেছিল!

কিন্তু মুহূর্ত্তে সব ভেঙ্গে গেল। কখন বড় মা এসে পেছনে দাঁড়িয়েছিল, টের পাই নি। তার কণ্ঠ থেকে যে বিষ নেবে এলো, তাতে আমার সমস্ত নারীত্ব ঘৃণায় অধোবদন হয়ে গেল!…

পুরুষেরা কেউ বাড়ী ছিল না, তাই আমার অপরাধের বিচার সম্প্রতি মুলতবি রইল। কিন্তু কিশোরের অন্দরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। আমার প্রাণের ভেতর বিভিন্ন ভাবের যে তরঙ্গ উঠেছিল, তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার পর আলোর সন্ধান পেয়েও যে বঞ্চিত, তার জীবন যে কত দুর্ব্বহ, তা ত ভাষায় বুঝান যায় না। তার পর ঐ কলঙ্ক আমায় যেন ক্ষিপ্ত করে দিল। অকলঙ্ক হয়েও যার কলঙ্কী আখ্যা রটে, তার বুকের ব্যথা কি অসহ, তা কজন জানে? পরদিন কিশোরের ভয়ঙ্কর জ্বর হয়েছিল। বাইরের ঘর থেকে তার যাতনা-কাতর ধ্বনি আমায় আকুল করে দিচ্ছিল। আহা বাঁচা রে! এ জগতে তোর কেউ নেই। কি করা যায়, ভেবে অধীর হয়ে উঠ্‌লাম। ভেবে-ভেবে মাথা যেন গুলিয়ে গেল।

গভীর রাতে যখন সবাই নিদ্রামগ্ন, আমি ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেম। সেদিন ঝড়ের মাতামাতি, বিদ্যুৎ-চমক, বিষাণ রব। আমি আলুথালু বেশে ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেম। দ্বার খোলা ছিল, ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টিকণা এসে তাকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। বিদ্যুৎ-চমকে দেখ্‌লাম, সে জেগে আছে,—মুখে কি বিষণ্ণতা! রক্তের লেশ সেখানে নেই।

সে পাশ ফিরে একবার আর্ত্তনাদের স্বরে ডাক্‌লে, "মা, —মাগো!"

আমার অন্তর কেঁদে গড়িয়ে উঠ্‌ল। "বাবা, বাবা, এই ত আমি"—

• "এসেছ মা। আস্‌বে তা জানি। আমার আকুল ক্রন্দন তোমার বুকে না পৌঁছে পারে না। কিন্তু এ দুর্য্যোগে ঘর ছেড়ে এলে,—বাইরের সকল দ্বার হয় ত তোমার পেছনে বন্ধ হয়ে গেল।"

"বাবা, সাগরের ডাকে নদী যখন উন্মাদিনীর মত পাহাড় ছেড়ে বেরয়, তখন সে কি আর পেছনের পানে তাকায়? তাকালে সে ত বেরুতে পারে না। সত্য যা, তা চিরদিন সত্য, সুন্দর, পবিত্র। আমাদের মায়ে-পোয়ের এই সত্যিকার সম্পর্কে যে যাই কলঙ্ক আরোপ করুক, তা ভেঙ্গে চুরমার কর্ব্বার মত দুর্ভেদ্য বর্ম্ম পরে আমি বেরিয়েছি।... কত কষ্ট হচ্ছে বাবা, আমার কোলে মাথা দাও।"

"আর ত কষ্ট নেই, মা। মায়ের কোলে সন্তান সমস্ত ব্যথা মুক্ত হয়। আঃ! মায়ের কোলে এত আরাম, এত তৃপ্তি!"

সে আমার হাতখানি তার তপ্ত ললাটে চেপে, খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। আমিও নীরব। বিশ্ব-প্রকৃতি তখন তার লীলায় মগ্ন,—কি যে প্রাণ-খোলা মাতামাতি,—সে আনন্দের ঢেউ আমাদের গায়ে এসে ভাঙ্গতে লাগল!

একটু ক্ষণ পরে কিশোর বল্লে, "ভগবানের পরিপূর্ণ বিশ্বের ভেতর মানুষই শুধু অপরিপূর্ণ, মা। তাদের সঙ্কীর্ণতা সমস্ত পূর্ণতা মলিন করে দেয়। তারা বোঝে না—নীচতা, সঙ্কীর্ণতায় উদার, পবিত্র প্রাণটা শুধু ক্ষীণ, পঙ্গু হয়ে যায়। নারীর ভেতর যে মাতৃত্ব, তার পূজার অক্ষমতার দরুণ তাদের এ সব আইন-কানুন; কিন্তু অন্তরটা যদি উদার, মহান্ কর্ত্তে পার্ত্ত, তা হলে সমাজের বাঁধাবাঁধির কোনও প্রয়োজন ছিল না।...বোধ হয় আমার দিন ফুরিয়ে এলো; কিন্তু একটা তৃপ্তি লয়ে যাচ্ছি, বিশ্বের মাঝে মানুষ নিজকে যত কাঙ্গাল মনে করে, ততটা সে নয়,—অন্ততঃ একটি প্রাণীও তার জন্য দুয়ার খুলে দাঁড়িয়ে থাকে।..."

সে পদধূলির জন্য হাত বাড়াল,—আমি ঠেকালেম না। বল্লেম, "ভয় কি বাবা, সেরে উঠবে; নৈলে, আমি কাকে নিয়ে থাক্‌ব?"

সে বল্লে, "ভুল, মা। মানুষের পানে চাইলে, দুঃখ ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। বাইরের পানে চেয়ে দেখ, কি আনন্দ! এর এককণাও জগতে নেই। যদি কখনো ব্যথায় অধীর হও, বাইরের প্রকৃতির পানে চেয়ে দেখো, হাজার কিশোর সেখানে মা, মা বলে নৃত্য কচ্ছে।—বাস্তব জগতের পানে চেও না;—সেখানে শুধু অবহেলা, নির্ম্মমতা নীচতা।—কিন্তু মূক প্রকৃতির মাঝেই সুখ, শান্তি। সেখানেই তোমার কিশোর।"......

ধীরে-ধীরে দীপনির্ব্বাণ হল। একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে আমি তার মুখের উপর লুটিয়ে পড়লাম।—

যথাসময়েই সমাজের বিচিত্র শাসন পদ্ধতিতে আমি পিতৃ-গৃহে নির্ব্বাসিত হলেম। সে গৃহের সবাই আমার কলঙ্ক আবিষ্কার করেছিল। আমি তাতে দুঃখিত নই;— কিন্তু সেদিন থেকে আমি আত্ম-নির্ব্বাসন ব্রত অবলম্বন করেছি। জাগ্রত জগতের সাথে আমার সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে ফেলেছি। তার দানব মূর্ত্তির পানে ঘৃণায় আমি তাকাই না। ঘুমন্ত জগতের বুকের মাঝে যে স্নেহময়ী নারী লুকিয়ে আছে, গভীর রাতে আমি তার সাথে কথা কই। সে যখন কোমলতার আঁচল ছড়িয়ে বিশ্বের অঙ্গনে এসে দাঁড়ায়, তখন তাকে ঘিরে আমার কিশোর খেলা করে, নৃত্য করে।......আজিকার দিনে সেদিনকার রাতের কথা মনে পড়ে। মনে হয়, কিশোর মরে নি। সে আজ শরীরী নয়, কিন্তু বিশ্বব্যাপী। সে যে আমার স্নেহের একটা মূর্ত্তি,—তার ত বিনাশ নেই। মায়ের প্রাণ লয়ে যখন তাকে ডাকি, সে দেখা দেয়। ঐ ত প্রকৃতির প্রাণখোলা লীলার মাঝে সে ছুটোছুটি কচ্ছে; আর মন-ভুলান স্বরে ডাক্‌ছে—মা, মা, মা!

পাগ্‌লী মা

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[আলোকচিত্র - শ্রী এ. এন, ভাদুড়ী-গৃহীত

নিখিল-প্রবাহ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]
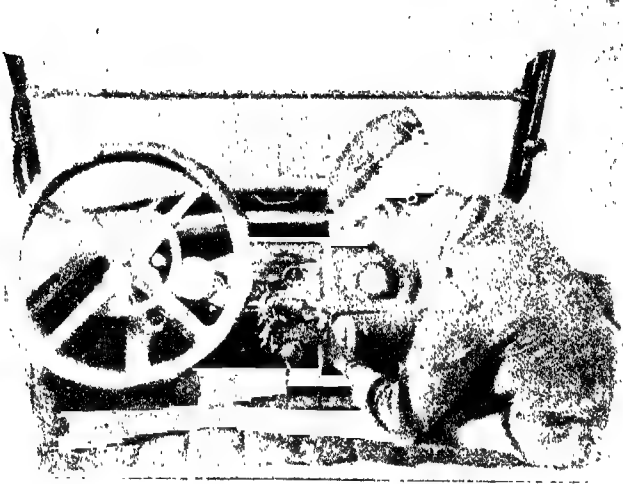
'সব-খোল' চাবি

'মটো-মিটার' রক্ষা

১। মোটর-চুরি নিবারণ।

একদল চোর আছে, যাহাদের পেশা কেবল মোটর গাড়ীর আসবাবপত্র চুরি করা। তাহাদের সবার কাছেই প্রায় এক একটা চাবির রিং থাকে ; তাহাতে অনেক গুলা করিয়া সব-খোল চাবি (Master Skeleton Keys)
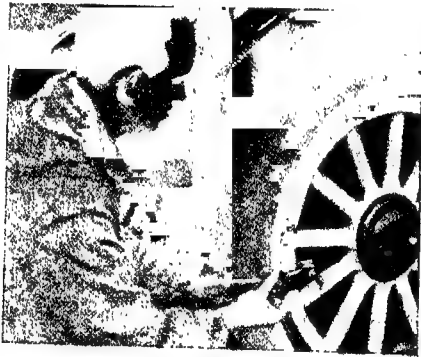
গাড়ীর চাকায় শব্দ যন্ত্র

তাহারা সংগ্রহ করিয়া রাখে। সেই চাবির সাহায্যে গাড়ীর অগ্নি-সংযোজক যন্ত্রটির (Ignition Switch) তালা খুলিয়া লওয়া যায়। চোরেরা এই 'সুইচ্'গুলি প্রায়ই চুরি করে বলিয়াই, তালা আঁটিয়া রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তাহারাও আবার তালা খুলিয়া লইবার উপায় করিয়াছে দেখিয়া, এখন নূতন ধরণের এক প্রকার চোর-ঠকানো তালা উদ্ভাবিত হইয়াছে। যে সকল ছিঁচ্‌কে চোর তাপ-নিবারক পাত্রের মুখটার (radiator cap) উপর হইতে 'মটো-মিটার' পর্য্যন্ত চুরি করিতে ছাড়ে না, তাহাদের জব্দ করিবার জন্য মুখটার তালা হইতে শিক্‌লি আঁটা একটি ডাণ্ডা তাপ-নিবারক পাত্রের ভিতর আড়া-আড়ি ভাবে ঝুলাইয়া রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহারা

চোর ঠকানো তালা

কেবল চুম্বকাধার (Magneto) চুরি করে, তাহাদের ভয়ে গাড়ী আস্তাবলে তুলিবার পর, 'ম্যাগনেটো' খুলিয়া বাড়ীতে;

আনিয়া রাখা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কিন্তু যাহারা গাড়ীকে গাড়ীই চুরি করিয়া লইয়া যায়, তাহাদের ঠকাইবার অনেক উপায় বাহির হইয়াছে। যেমন—চাকার সহিত একটা তীব্র শব্দকারী যন্ত্র আঁটিয়া রাখা;—যাহাতে গাড়ী চালাইতে

অপসারী গতি-পরিবর্ত্তন-দণ্ড

স্ফুলিঙ্গ পরিবেশনী তার বিচ্ছিন্ন করিয়া চুম্বকাধার নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখা

গেলেই বা নাড়াচাড়া করিলেই, উক্ত যন্ত্রোত্থিত তীব্র শব্দ চোরের শুভাগমন ঘোষণা করিয়া দিবে। কিম্বা গাড়ীর চালন-গ্রন্থি (Steering Knuckle) ও আকর্ষণী আংটায় (Drag Link) শিকল লাগাইয়া চাবি আঁটিয়া রাখা—তাহা হইলে গাড়ীখানি আর কেহ এক পা'ও চালাইতে পারিবে না। তৃতীয়—গাড়ীর গতি পরিবর্ত্তন-দণ্ডটি (Gear Shift Lever) চালকের আসন মূলে সংযুক্ত একটি অর্গলের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখা। চতুর্থ—গাড়ীর চালন চক্রটী (Steering Wheel) চক্রদণ্ডের সহিত চেন দিয়া তালা-বদ্ধ করিয়া রাখা। পঞ্চম—গাড়ীর তৈলাধার-সংলগ্ন নলের
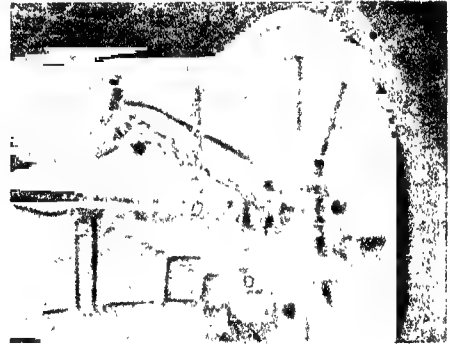
চালনগ্রন্থি ও আকর্ষণী আংটায় শিকল আঁটিয়া রাখা

মুখে আর একটী অতিরিক্ত ঢাক্‌নী (Extra Valve) আঁটিয়া রাখা—যাহাতে তৈলাভাবে গাড়ী অধিক দূর লইয়া যাইতে না পারে। ষষ্ঠ—ইঞ্জিনের ভিতরের পরিবেশনী-বাহু (Distribution Arm) একটা খুলিয়া রাখা;—ইহাতে ইঞ্জিন অচল হইয়া থাকে। সপ্তম—যাত্রা-যন্ত্রের (Star-

গতি-পরিবর্ত্তন-দণ্ডটী চালকের আসনমূলের সহিত অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখা

ter) সহিত বৈদ্যুতিক জাঁতি-কল সংযুক্ত করিয়া রাখা; কারণ, গাড়ী চালাইতে হইলে যাত্রা-যন্ত্রের উপর পা দিতেই হইবে, এবং উহার উপর পা পড়িবামাত্র বৈদ্যুতিক জাঁতি-কলে উহার পা আটক হইয়া যাইবে। অষ্টম—নূতন ধরণের

অপসারী গতি পরিবর্তন দণ্ড (Removable Geer Shift Lever) ব্যবহার করা। ইহা খুলিয়া রাখিলে চোরের পক্ষে গাড়ী লইয়া যাওয়া অসম্ভব। ইঞ্জিনের স্ফুলিঙ্গ পরিবেশনীর (Spark Distributor) কোনও একটি

চালন-চক্রটী চক্রদণ্ডের সহিত চেন দিয়া বাঁধিয়া রাখা

তারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া চোরকারবারের নিষ্ফল করণ সম্পাদন করা। অনেকে গাড়ীতে কাপড়ের তৈয়ারী একটা নকল আরোহীর কৃত্রিম প্রতিমূর্তি সঙ্গে রাখে। পথে গাড়ী ছাড়িয়া যাইবার আবশ্যক হইলে, ঐ নকল মূর্ত্তিকে চালকের আসনে খাড়া করিয়া বসাইয়া যাইতে হয়। দূর হইতে মানুষ আছে মনে করিয়া, চোর আর সে দিকে ঘেঁস দেয় না। অনেকে ঢাকা গাড়ীর কাচের দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়; কিন্তু সকালে উঠিয়া হয় ত দেখিতে পায় যে, চোরে কাচের দরজাটি কাটিয়া গাড়ীখানি চুরি করিয়া পালাইয়াছে। একবার গাড়ীখানি সরাইতে পারিলে,

ইঞ্জিনের পরিবেশনী বাক্স খুলিয়া রাখা

চোরেরা একেবারে বদলাইয়া ফেলে; এমন কি, ইঞ্জিনের নম্বরটি পর্য্যন্ত ছেনি দিয়া কাটিয়া বেমালুম উড়াইয়া দেয়।

(Popular Science).

তেলাধার সংযুক্ত নলের মুখে একটি অতিরিক্ত ঢাকনা আঁটিয়া রাখা

৩। হেঁচকা বন্ধ করা।

কোথাও কিছু নাই, তথাপি মাঝে মাঝে এমন হেঁচ্‌কা উঠিতে থাকে যে, মানুষ অস্থির হইয়া পড়ে। অনেক সময় দুর্বল ও অসুস্থ লোকের হেঁচ্‌কা বন্ধ না হওয়ায় মৃত্যু হইয়াছে—এরূপও দেখা গিয়াছে। ডাক্তার কোপ্‌ল্যাণ্ড

বৈদ্যুতিক জাঁতিকল

এই হেঁচ্‌কা উঠিবার কারণ ও তাহার প্রতিবিধানের উপায় সম্বন্ধে বহু দিন গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, উদর-বক্ষ-ব্যবধায়ক পেশীর (diaphragm) আচম্বিত সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে কণ্ঠনালীর বায়ুদ্বার (Glottis) বাধা

পাওয়ায়, হেঁচ্‌কীর উৎপত্তি হয়। তিনি বলেন, উদর-বক্ষ ব্যবধায়ক পেশীর সঙ্কোচন বন্ধ করিতে পারিলেই, হেঁচ্‌কী থামাইতে পারা যায়। রোগীর দুই দিকের সন্ধানিয় পঞ্জর তলে দুই হাতে অঙ্গুলির চাপ দিলে, উদর-বক্ষ-ব্যবধায়ক

গতি-পরিবর্ত্তন-দণ্ড বন্ধ করিবার চাবি

[এই চাবি আঁটা থাকিলে উক্ত দণ্ড অচল হইয়া যায়, সুতরাং কেহ গাড়ী চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে না।]

পেশীর সঙ্কোচন প্রসারণ বন্ধ করিতে পারা যায়; কিন্তু যে স্নায়বীয় উত্তেজনার ফলে উদর বক্ষ-ব্যবধায়ক পেশীর আচম্বিত সঙ্কোচন-প্রসারণ উপস্থিত হয় সেই গ্রৈবেয়ক
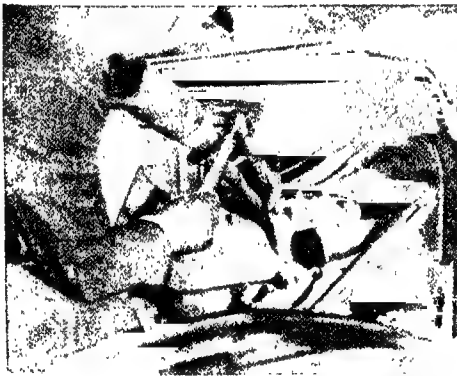
ইঞ্জিনের নম্বর ছেনি দিয়া তুলিয়া ফেলিতেছে

স্নায়ুটী (Cervicular Nerve) অঙ্গুলির চাপ দিয়া শান্ত করিতে পারিলে, হেঁচ্‌কী উঠা অচিরে বন্ধ করিতে পারা যায়।

(Popular Science).

৩। নাসিকা সংস্কার।

খাঁদা, বোঁচা, কড়ো, বাঁকা, চ্যাপ্টা কি ঢিবি নাক যাহাদের মুখশ্রী বিকৃত করিয়া রাখে, তাহারা এখন ইচ্ছা করিলেই নাকের সংস্কার করিয়া লইতে পারে। বিকৃত

বাক্সের দরজা কাটিয়া ফেলিতে

মুখ আবার সুশ্রী দেখাইবে। ডাক্তার স্থলিয়ে বোদেয়েত্ সূক্ষ্ম অস্ত্র-চিকিৎসার দ্বারা [illegible]কে প্রিয়দর্শন করিয়া দিতেছেন। তিনি চামড়া না কাটিয়াও হাড়ে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে পারেন; এই জন্য তাঁহার অস্ত্র চিকিৎসার পর ক্ষত-

কৃত্রিম আরোহীর মূর্ত্তি

চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। অস্ত্র প্রয়োগের এক হপ্তা পরেই রোগী রাস্তায় বাহির হইতে পারে। তিনি একজন সুনিপুণ ভাস্কর-শিল্পীর মত নাকটির পরীক্ষা করিয়া, উহার গলদ্ কোনখানে, সহজেই তাহা ধরিয়া ফেলেন; এবং

উদর-বক্ষ-ব্যবধায়ক পেশীর উপর চাপ দিয়া হেঁচ্‌কী বন্ধ করা

গ্রৈবেয়ক স্নায়ুর উপর চাপ দিয়া হেঁচ্‌কী বন্ধ করা

ততোধিক নিপুণতার সহিত সন্তর্পণে অস্ত্র প্রয়োগে নাকের দৈর্ঘ্য দূর করিয়া দেন।

ঢিবি নাকের যেখানে হাড়টি উঁচু হইয়া আছে, তিনি তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া, নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়া অস্ত্রপ্রয়োগে উহাকে সমান করিয়া দেন। ডোবা নাকের পরীক্ষা করিয়া তিনি, উহার দোষ কোথায়, এবং কেন, তাহা বুঝিতে পারেন; এবং তদনুযায়ী চিকিৎসার দ্বারা নাকের লুপ্ত অস্থি পুনরুজ্জীবিত করেন। বাঁকা চোরা নাকের হাড় আগাগোড়া বদলাইয়া ফেলিয়া, তিনি বাঁশীর মত সোজা নাক গড়িয়া তুলিতে পারেন। এমন ক্ষেত্রে রোগীকে দু' তিন হপ্তা চিকিৎসাধীন থাকিতে হয়। উপরের চামড়াটি অবিকৃত রাখিয়া তিনি ভিতর দিকে অস্ত্রাঘাত করেন বলিয়া, রোগীর মুখে কোনও প্রকার ক্ষত চিহ্ন থাকে না।

(Popular Science).

ঢিবি নাক

ঢিবি নাক (সংস্কারের পর)

দৌড়বাজ
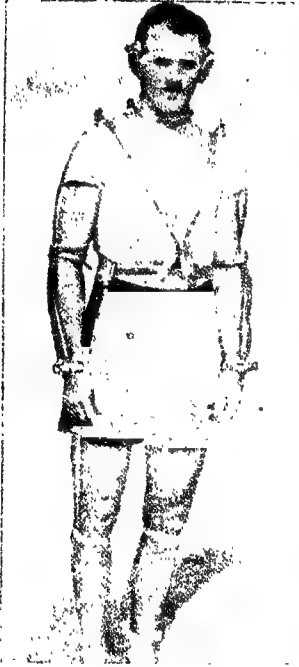
সাঁতারের পর খেলোয়াড়ের হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থা, রক্তপ্রবাহের গতি ও স্নায়ুর অবস্থা পরীক্ষা

দৌড়াইয়া আসিবার পরে পরীক্ষা

[মাটি হইতে এক-পা তুলিতে ও আর এক-পা ফেলিতে কতটা সময় লাগে এবং একবারের পদক্ষেপে কতটা জমী অতিক্রম করিতে পারে, তাহার হিসাব লওয়া হইতেছে]

ঝাঁপ দিতে খেলোয়াড়ের কতটা জোর লাগে এবং তাহার স্নায়ু শক্তির অবস্থা কিরূপ, তাহার পরীক্ষা

সঙ্গীত শ্রবণ

[হাজার মাইল দূর হইতেও রেডিয়োফোনের সাহায্যে সঙ্গীত শ্রবণ]

বক্তৃতা শ্রবণ

[শত শত মাইল দূরে বসিয়াও নিউইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃতা শ্রবণ।]

রেডিয়োফোনে সঙ্গীত প্রেরণ

শিক্ষা লাভ

[সুদূর পল্লীগ্রামের কুটীরবাসী ছাত্র আপন গৃহে বসিয়াই নিউইয়র্কের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিতেছে।]

বা আকারের উপর যতটা না হউক—মাংসপেশীর অবস্থা, গতিশক্তি, ক্ষিপ্রতা এবং দেহে রক্তপ্রবাহের স্বচ্ছন্দতার উপর খেলোয়াড়ের বাজী জেতার শক্তি নির্ভর করে। কিন্তু উক্ত কয়েকটি বিশেষ গুণ কাহার আছে না আছে, তাহা কেবল বাহির হইতে চেহারা দেখিয়া বলা যায় না। তাহার স্নায়ু, মাংসপেশী ও মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ এবং হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থা, দেহের রক্তপ্রবাহের গতি-নিরূপণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষিপ্রকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা লওয়ার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কয়েকটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। যেমন সাঁতারুর পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হয়, সে জলে পড়িবার উপক্রম করিতে কতটা সময় নেয়, এবং কতখানি জোর লাগে তাহার ঝাঁপ দিতে; তাহার স্নায়ু-শক্তির অবস্থা কিরূপ; সাঁতারের পর তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থা কেমন; রক্ত-চলাচলের গতি কি ভাবের, ইত্যাদি। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে, তাহার মস্তিষ্কের শক্তির পরিমাণ

নিউইয়র্ক মন্ত্রীসভা হইতে চিকাগোর বার্ত্তা প্রেরণ

[এই সংবাদ চিকাগো সহরে টেলিফোন অপেক্ষাও দ্রুত পৌঁছাইয়াছিল ।]

ছেলে ঘুম-পাড়ানো

বোতল বাড়ী ঐ সিঁড়ি ঐ পশ্চাদ্‌ভাগ
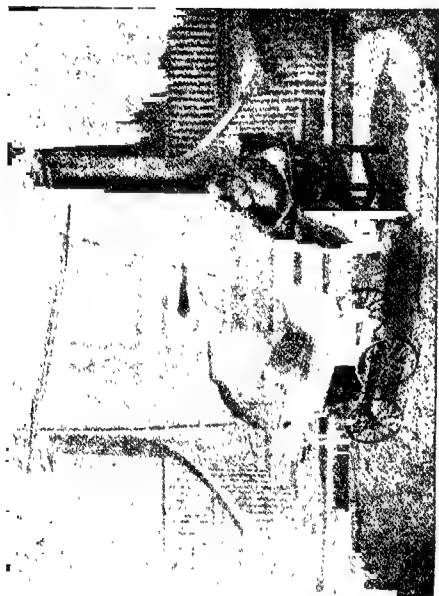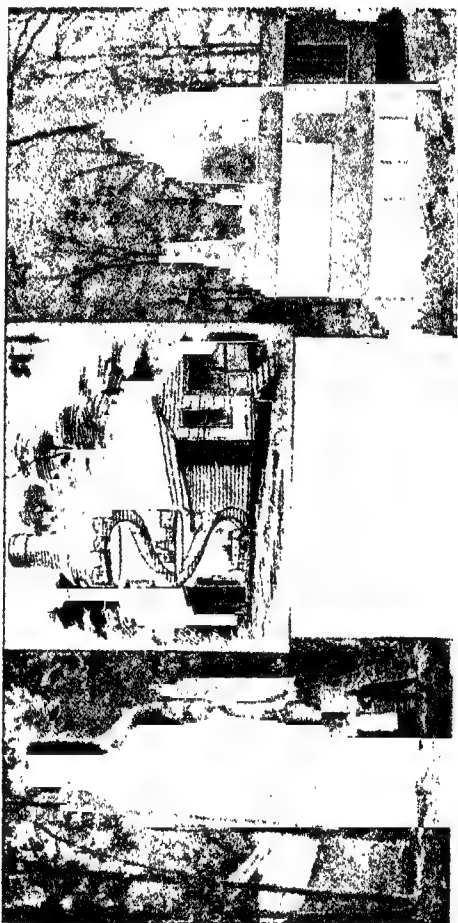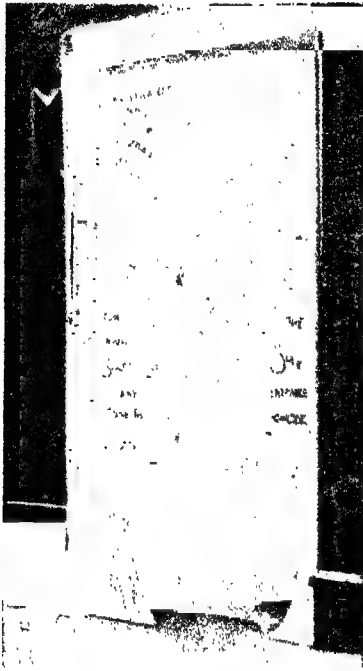
সুকতলা দ্বার

কি? সাধারণ লোকের অপেক্ষা দশগুণ বেশী মস্তিষ্কের শক্তি না থাকিলে, সে কোনও কালে সব-সেরা খেলোয়াড় হইতে পারে না। (Popular Science).

৫। চুল ইস্ত্রি করা

যাদের চুল সোজা, তারা অনেকেই কোঁকড়ান চুল পছন্দ করে। আবার যাদের চুল স্বভাবতই কোঁকড়া, তারা অনেকে সোজা চুল ভালবাসে; অর্থাৎ মানুষের এমনি স্বভাবের দুর্ব্বলতা যে, যার যেটি নাই, সে সেইটিই কামনা করে। বিলাতের কেশ-প্রসাধনাগারে (Hair-dressing saloon) আজকাল অনেক কুঞ্চিতকেশা যুবতী চুল ইস্ত্রি করাইয়া আসেন, সোজা চুলের সাধ মিটাইবার জন্য। কেশ-প্রসাধকদের এই জন্য চুল ইস্ত্রি করিবার একপ্রকার নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। এই যন্ত্রের ভিতর দিয়া বারকতক কোঁকড়ান চুলগুলি টানিয়া দিলে, উহা কয়েক ঘণ্টার জন্য সোজা হইয়া থাকে। চুল ইস্ত্রি করিবার পূর্ব্বে উহা এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থে ভিজাইয়া লইতে হয়। পরে ইস্ত্রির চাপে ও তদভ্যন্তরস্থ তৈলাধার হইতে নির্গত বিন্দু-বিন্দু তৈলের সংস্পর্শে অত্যন্ত কোঁকড়া চুলও কিছুক্ষণের জন্য সোজা হইয়া যায়।

(Popular Science).

৬। রেডিয়োফোন

টেলিফোনের সাহায্যে যেমন সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে অবস্থিত লোকের সহিত কথোপকথন চলিতেছে, সেইরূপ রেডিয়োফোনের সাহায্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে অবস্থিত লোকের সহিত ঘরে বসিয়া যদৃচ্ছাক্রমে কথোপকথন করা সম্ভব হইবে। কলিকাতা হইতে যখন ইচ্ছা আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রবাসী কোনও বন্ধুর সহিত বাড়ীতে বসিয়া আলাপ করা এতকাল স্বপ্নাতীত ছিল, কিন্তু রেডিয়োফোনের আবিষ্কার হওয়ায়, এইবার তাহা সম্ভব হইবে। সমুদ্র-বক্ষে ভাসমান জাহাজে অবস্থিত কোনও আত্মীয়ের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার ইচ্ছা হইলেও, এই রেডিয়োফোনের সাহায্যে লোকের সে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। টেলিফোনের সহিত রেডিয়োফোন বা বেতার বার্ত্তা-বহ যন্ত্রের সংযোগ সাধন করিয়াই এই অসম্ভব ব্যাপার সংসাধিত করা হইয়াছে। টেলিফোনের তারে প্রবাহিত ধ্বনি রেডিয়ো-ফোনের সাহায্যে বহুগুণ প্রবলতর হইয়া, বেতার বার্ত্তালোকে ছড়াইয়া পড়ে; এবং অপর প্রান্তস্থ রেডিয়োফোনে উহা

চায়ের কেট্‌লী

সাশীওয়ালা · গোয়ালা

কামারশালা · ছাতাওয়ালা
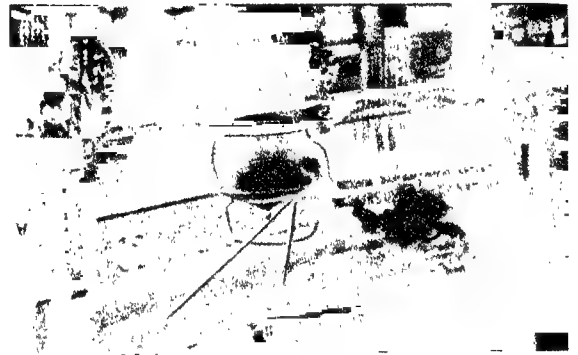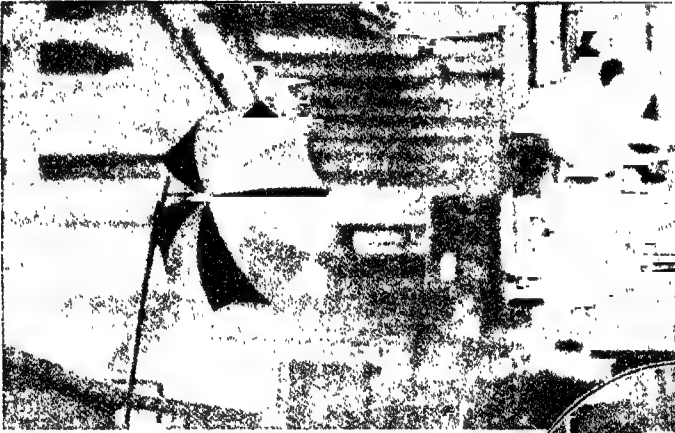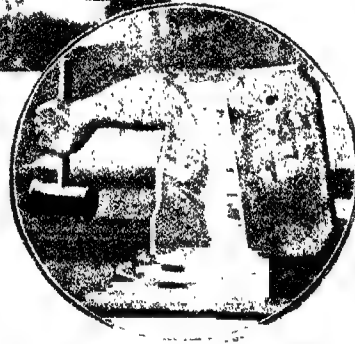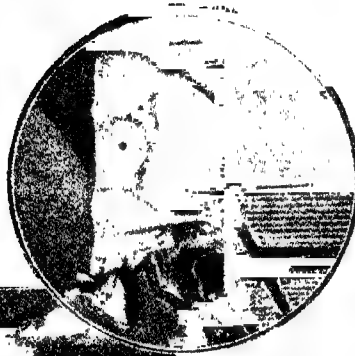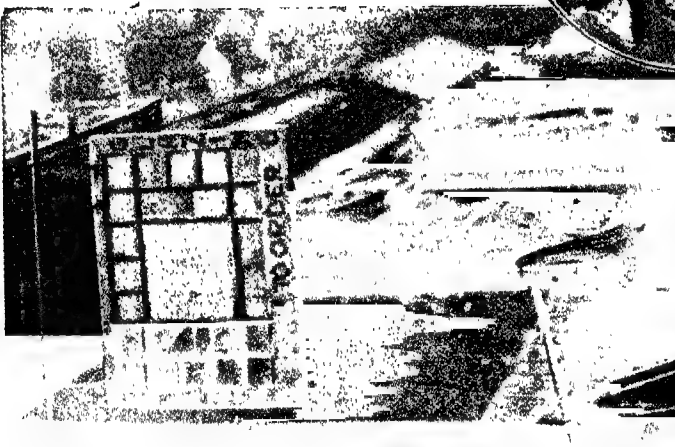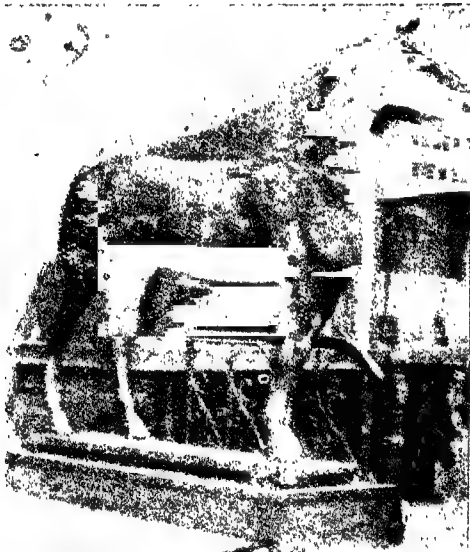
প্রতিধ্বনিত হইয়া, টেলিফোনের সাহায্যে ইপ্সিত ব্যক্তির নিকট গিয়া পৌঁছে। লণ্ডনের কোনও বন্ধুর গৃহে গান হইতেছে, প্যারিসের রঙ্গমঞ্চে কোনও বিখ্যাত অভিনেত্রীর অভিনয় হইতেছে, নিউইয়র্কে কেহ বক্তৃতা করিতেছেন, বর্লিনে কোনও ম্যাচ খেলা হইতেছে, সমুদ্রে কোথাও বাচ্‌ খেলা হইতেছে,—এ সমস্তই এখন কলিকাতায় নিজের ঘরে বসিয়া উপভোগ করা সম্ভব হইবে। বিলাতে একটী ঘুম-পাড়ানী মাসী-পিসীর দল হইয়াছে; তাহারা পারিশ্রমিক লইয়া ছেলে-মেয়েদের রেডিয়োফোনের সাহায্যে গান শুনাইয়া ঘুম পাড়াইয়া দেন। (Popular Science).

ঘোড়ার সাজ বিক্রেতা

চুরুটওয়ালা

[রেড ইণ্ডিয়ানরাই সর্ব্বপ্রথম চুরুট প্রচলিত করিয়াছিল।]
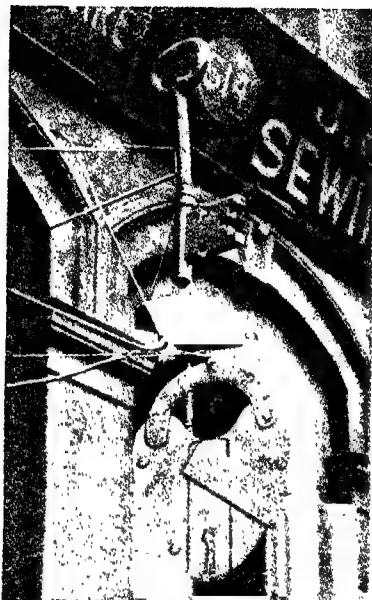
চাবিতালা ব্যবসায়ী

৭। বড়-বড় লোকের মাথা।

প্যারিসের চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে যে যাদুঘর আছে, তাহার একটি তাকে দেশের অনেক বিখ্যাত লোকের মস্তিষ্ক রক্ষিত আছে। চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাহাদের কাঁচা মস্তিষ্কগুলি বড় বড় কাঁচের জারের মধ্যে পুরিয়া আরকে ডুবাইয়া রাখা হয় নাই; এগুলি প্ল্যাষ্টারে গঠিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মস্তিষ্কের ছাঁচ মাত্র—তাকের উপর সযত্নে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। উপর দিক হইতে যে দ্বিতীয়

বড়-বড় লোকের মাথা

তাকটি, তাহার উপর বাম দিক হইতে দেখিলে যে দ্বিতীয় মস্তিষ্কের ছাঁচটি দেখিতে পাওয়া যায়, উহা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বার্থেলটের (Berthelot) মস্তিষ্ক। ইহারই মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়াছিল যে, চিনি চর্ব্বি প্রভৃতি পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহার পার্শ্বেই প্রসিদ্ধ ফরাসী রাষ্ট্রনীতিবিদ্ গাম্বেটার (Gambetta) মস্তিষ্ক রহিয়াছে; এবং ঐ তাকেই উক্ত মনীষীগণের মস্তিষ্কের সহিত একত্রে রক্ষিত হইয়াছে ডাকসাইটে ফরাসী বদমায়েস্ ট্রপ্‌মানের (Troppman) মস্তিষ্ক। এটি তাকের উপরের চতুর্থ ছাঁচ। (Popular Science).

৮। বোতলের মধ্যে বাড়ী।

হ্যাম্প্‌শায়ারের একজন মদের ব্যবসাদার তাহার বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছে প্রকাণ্ড একটি বোতলের আকারে। বোতলটি ৩৫ ফুট উঁচু, ব্যাসের পরিমাপ ১০ ফুট। আগাগোড়া কাঠের তৈরি। বোতল-বাড়ীটি ত্রিতল বিশিষ্ট। নীচের তলে খাবার ঘর এবং দ্বিতল ও ত্রিতলে শয়ন-কক্ষ। উপরে উঠিবার জন্য বোতলের মধ্যে ঘোরানো সিঁড়ি আছে। রন্ধনাদি ও চাকর-লোকজন থাকিবার জন্য বোতলবাড়ীর পশ্চাতে একটী বাংলো-গোছের ছোট বাড়ী সংলগ্ন আছে। মদের বোতল বেচিয়া তাহার পয়সা হইয়াছে এবং সেই বোতল বিক্রীর পয়সায় সে বাড়ী তৈয়ার করিতে পারিয়াছে বলিয়া, বোধ হয় বোতলের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য এই বিলাতী শুঁড়িটি তাহার বসত-বাড়ীখানি বোতলের আকারেই নির্ম্মাণ করাইয়াছে। তাছাড়া এই বিরাট বোতল-গৃহটি তাহার মদের বোতলের বিজ্ঞাপনও জাহির করিতেছে। বিলাতী ব্যবসাদারেরা অনেকেই স্ব স্ব ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনের জন্য অদ্ভুত ভাবে এইরূপ কোন একটা নিশানা তাহাদের বাটিতে বা দোকানে সংলগ্ন করিয়া রাখে। নিউইয়র্কের এক জুতা-ব্যবসায়ী তাহার দোকানের প্রবেশ দ্বার জুতার সুকতলার আকারে করাইয়া রাখিয়াছে। বোষ্টনের একজন চা বিক্রেতা তাহার দোকানের সম্মুখে এক বিরাট চায়ের কেট্‌লী ঝুলাইয়া দিয়াছে। ঐ কেট্‌লীর নলের মুখ হইতে অনবরত গরম জলের ধোঁয়া বাহির হইয়া পথিকগণকে 'চা গরম' ঘোষণা করিতে থাকে। ঐ বিরাট কেট্‌লীর উদরের মধ্যে একটি ষ্টোভ, এবং তাহার উপর জলপূর্ণ একটি ছোট কেট্‌লী সর্ব্বদা বসানো থাকে বলিয়া জলটা গরম হইলেই ছোট কেট্‌লী হইতে ধোঁয়া বাহির হইয়া বড় কেট্‌লীর মুখ দিয়া নির্গত হয়। বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের আরও কতকগুলি নিশানার চিত্র প্রদত্ত হইল, পাঠকগণ ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে কার কি ব্যবসায়?

(Popular Mechanics).

দুখের নবজীবন

[শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী]

দুখে আচার্য্য বামুণের ছেলে। তার বাপ মহেশ আচার্য্য দুখেকে দ্বিতীয় ভাগ শেষ না করিয়ে মর্‌তে পারে নি। দুখের দ্বিতীয় ভাগও শেষ হ'ল—আর মহেশেরও পৃথিবীতে থাকার মেয়াদ ফুরোলো। তখন দুখে ১৫ বছরের।

তার পর সাতটা বছর দেশের গাঁজার আড্ডায় নিয়মিত রূপে উপস্থিত থেকে, দুখে সে বিদ্যাটা উত্তম রূপে শিখে নিল। দুখের মা ছেলেকে কুপথে যেতে দেখে, প্রায়ই তাকে কল্‌কাতায় উপায়ের জন্যে যেতে বলতো। দুখে এতে বিরক্ত হোতো। অবশেষে একদিন রাগ করে সত্য-সত্যই চাকরীর সন্ধানে কল্‌কাতায় গেল। সঙ্গে ছিল তার ২০টা টাকা, আর দুখানা কাপড়।

কল্‌কাতায় গিয়ে, দুখে নানা পল্লী ঘুরে ঠিক কর্‌লে, সে বামুণের ছেলে,—অন্য কোন কাজ না করে, একটা পাঁউরুটীর দোকান কর্‌বে। চিৎপুরের উপর একখানা ছোট খোলার ঘর মাসিক ৪৲ ভাড়ায় ঠিক করে, সে পাঁউরুটীর দোকান খুলে বস্‌ল।

দুখের দোকানের সম্মুখে একটা গলির মধ্যে কতকগুলা গুণ্ডার আড্ডা ছিল। তাদের কাজ, পকেট-কাটা। তারা প্রায়ই রাত্রে দুখের দোকান থেকে রুটী নিয়ে যেত। তাদের সঙ্গে দুখের পরিচয়ও হয়েছিল। একদিন সে তাদের আড্ডায় গিয়ে গাঁজা খেয়ে, তাদের সঙ্গে পরিচয়টা আরো ঘনিষ্ঠ করে তুল্‌লে।

কয়েক দিন গুণ্ডাদের গাঁজার আড্ডায় গিয়ে,—রুটীর দোকানে বসে-বসে রুটী বিক্রী করা কাজটা সে একেবারেই পছন্দ করলে না। সেই আড্ডায় নিতাই নামে এক নাপ্‌তের ছেলের সঙ্গে দুখের খুব আলাপ হয়েছিল।

একদিন দুপুরবেলা নিতাই যখন দোকানে রুটী নিতে এল, তখন নানান কথার পর দুখে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা নিতাই-দা, মাসে-মাসে তোমাদের কত করে উপায় হয়?"

নিতাই বিজ্ঞের মত গম্ভীর সুরে বললে—"তার কি কিছু ঠিক আছে ভাই! কোন মাসে ৫০০৲ টাকাও হয়, আবার কোনও মাসে বা কিছুই হয় না;—তার কিছুই ঠিক নেই।"

দুখে উদাসীন ভাবে বল্‌লে "মন্দই বা কি।" নিতাই তার এ উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পার্‌ল না; সে বল্‌লে—"খুব ভাল! কিন্তু যখন জেলে যেতে হয়, তখন—"

নিতাই মনে করেছিল, দুখে জেলখানার নাম শুন্‌লে ভয় পাবে। কিন্তু সাহসী দুখে তাতে বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে বল্‌লে—"তা মাঝে-মাঝে যেতে হবে বৈ কি নিতাইদা!"

"আমার কিন্তু ভাই ভাল লাগে না।"

"আচ্ছা নিতাই-দা, সরদারকে বলে আমায় তোমাদের দলে টেনে নিতে পার?"

নিতাই মাথা নেড়ে জানালে—সে পারে। তবে খুব বিশ্বাসী, সাহসী লোক ভিন্ন তাদের দলে লওয়া হয় না। দুখে বল্‌লে "সাহস আমার খুব আছে; তবে বিশ্বাস করা না করা, কাজ দেখে হয়,—মুখের কথায় হয় না।"

নিতাই তার কথা সরদারকে বলবে বলে ভরসা দিয়ে চলে গেল।

২

তার চেহারাখানা ছিল ভাল,—বেশ নধর, সুন্দর। বামুণের ছেলে, দু-চারটা ধর্ম্মের কথাও বলতে পার্‌ত। আড্ডার সর্দ্দার দুখেকে নানা রকমে পরীক্ষা করে, শেষে বল্‌ল—"কাশীতে আমাদের একটা দল আছে; সেখানকার দলে লোকের দরকার। তুমি বামুণের ছেলে, শাস্তরও জান; তোমাকে কাশী পাঠাতে পারি। কিন্তু তোমাকে সন্ন্যাসী সেজে থাকতে হবে। কেমন, রাজী?"

দুখে সর্দ্দারের কথায় রাজী হলো; তার কারণ, কাশী দেখবার লোভ সে সামলাতে পারল না।

সর্দ্দার দুখের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে বললে "তুমি আজ রাত্রের টেণেই চলে যাও। আমি একখানা চিঠি লিখে

দিচ্চি,—এখানা তাদের দেখালেই, তারা তোমার সব বন্দোবস্ত করে দেবে।”

পত্রখানা নিয়ে দুখে বাইরে এসে দেখল, নিতাই জোরে গাঁজার কলিকায় এক দম মেরে উপর দিকে ধোঁয়া ছেড়ে দিচ্চে। দুখে কিছু প্রসাদ পাবার প্রত্যাশায় নিতাইয়ের কাছে গিয়ে বস্‌লো। নিতাই আর একটা শেষ টান দিয়ে, কলিকাটা দুখের হাতে দিতে-দিতে জিজ্ঞাসা করলে—“কি হোলো রে দুখে?”

দুখে তখন নিতাইয়ের কথার জবাব দেওয়ার চেয়ে, গাঁজার সদ্ব্যবহার করতে এতই ব্যস্ত যে, তার কথাটা শুনেও জবাব দিল না।

নিতাই ভাবল, দুখে শুনতে পায় নি। তাই আবার জিজ্ঞাসা করলে “তোর চাকরীর কি হলো রে দুখে?”

দুখে কলিকাটা নামিয়ে, মুখ হতে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বল্‌লে, “আমার চাকরী কাশীতে হল, নিতাই-দা! আজ রাতেই যেতে হবে।”

নিতাই কলিকাটা উল্টে দিয়ে বল্‌লে, “সত্যি না কি? সে দেশে গাঁজা না কি খুব সস্তা। শুনেছি, বাবা বিশ্বেশ্বর দুবেলা সোণার কল্‌কে করে গাঁজা খান। আর—সেখানে মরতে পারলেই—একেবারে শিব।”

নিতাইয়ের কথা শুনে, দুখে বিমর্ষ মুখে বল্‌লে, “কিন্তু, সন্ন্যাসী সেজে, সেই ঠাকুর-দেবতার দেশে কি করে জুয়াচুরি করব, বল ত নিতাই-দা?”

নিতাই দেব-দেবতা একেবারেই বিশ্বাস করত না। দুখের এ দৌর্ব্বল্য দেখে বল্‌লে, “তুই পাগল হলি না কি রে দুখে? ঠাকুর আছে তা তোর কি? অত ভালমানুষ হ'লে এ কাজ চলে না।”

৩

কাশীতে গিয়ে গোধোলীর নিকটে আড্ডা দুখে সহজেই খুঁজে বার করলে। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে দেখ্‌লে, বাটী-খানা তেমন ভাল নয়;—বহু পুরাতন, অন্ধকার। অনেক জানালা ভেঙ্গে গেছে। চূণ-বালি খসে পড়ছে। একটা ঘরের মধ্যে তিনজন লোক কিসের হিসাবে ব্যস্ত। দালানের এক কোণে আর এক ব্যক্তি উনানের উপর হাঁড়ি চাপিয়ে বসে রয়েছে। দুখেকে সেখানে আসতে দেখেই, যে লোকটা উনানের কাছে ছিল, সে অতি কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে বলে উঠলো—“কাকে চাও?”

দুখে বল্‌লে—“রতনবাবুকে।” যারা হিসাব নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তাদের মধ্যে যে রতনবাবু, সে গম্ভীর স্বরে দুখেকে জিজ্ঞাসা করলে, “কি দরকার?”

“তাঁর কাছেই বল্‌বো।”

রতন সহজে নিজের পরিচয় অপরিচিতের নিকট দিত না। পুলীশের ভয়টা তার কিছু বেশী। এই রকমে সে দু একবার ঠকেছিল; সেই জন্যই এতটা সাবধানতা। রতন পুনরায় বল্‌লে, “কোথা থেকে আসছ?”

দুখে রতনের সন্দেহ দেখে তাদের সাঙ্কেতিক নাম বল্‌লে—“বিজনকর্ত্তার হাতের এই পত্র!” পত্রখানি রতন হাত পেতে নিতে নিতে বললে—“আমিই রতন।” পত্র পড়ে রতনের সাহস হল। দুখেকে দু'চারটে প্রশ্ন করে, স্নান আহারের বন্দোবস্ত করে দিলো।

* * * *

দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর একটী ছোট ঘরে এক শিবলিঙ্গ ছিল। রতন সেই মন্দিরের পুরোহিত। তবে সে অল্পক্ষণই মন্দিরে থাকত। দুখে মন্দিরের সমস্ত কাজের জন্য, সর্ব্ব সময় হাজির থাকতে [illegible] নিযুক্ত হল।

সপ্তাহ খানেক [illegible] কোন রকমে কাটাল। কিন্তু তার পর এ ব্যবস্থা তার আর ভাল লাগল না।

প্রাতঃকালে যাত্রীর দল গঙ্গায় স্নান ক'রে, পবিত্র অন্তঃকরণে যখন সেই মন্দিরে প্রবেশ করে, প্রথমে দেবতার উদ্দেশে মাথা নত ক'রে, তার পরই—দেবতার পাশে এই সুশ্রী নবীন সন্ন্যাসীকে দেখতে পেতো, তখনি তাদের ভক্তির উদ্রেক হ'ত। আর তারা দুখের পায়ের উপর মাথা ঠেকাত। তখন দুখে বড়ই বিপদে পড়ত। সে নিশ্চল হ'য়ে বসে থাকত। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল—তার এ সম্মান পাওয়াটা ততই অসহ্য হ'য়ে উঠতে লাগলো। তার মনে হ'ল সে সাধুও নয়—সদ্‌ব্রাহ্মণকুলেও জন্মায় নি; অথচ এদের মধ্যে যারা [illegible] আছে, তারা তার চেয়ে সব বিষয়েই বড়! তার্দিকে [illegible] বসে, হিন্দুর আরাধ্য দেবতা শিবের সম্মুখে এসে, ভণ্ড সাধু সেজে, সে নিজের পাপের বোঝা বাড়াচ্ছে। অথচ সে যাহার জন্য

স্বদেশ ছেড়ে সুদূর পশ্চিমে এসেছে, তাও সফল হ'চ্ছে না। তবে কেন সে সাধু সেজে আর এ পাপের বোঝা বাড়ায়?

সে ঠিক করলে, আর কাকেও প্রণাম করতে দেবে না। কাজেও কতকটা সেইরূপ করতে লাগলো। সমাগত যাত্রীরা যখন দুখেকে প্রণাম করবার জন্য শির নত করত, দুখে তখন ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌ত, "ও কি করেন—ও কি করেন, আমি যে আপনাদের দাসানুদাস মাত্র! আমায় প্রণাম করবেন না।" কিন্তু এতেও বিপদ বাড়ল ছাড়া কমল না। যাত্রীরা মনে করলে, এ ভক্ত সন্ন্যাসীর হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ। ক্রমে দুখের উপর সকলেরই ভক্তি বেড়ে যেতে লাগলো; সকলেই এই নবীন সন্ন্যাসীটাকে ভক্তির চক্ষে দেখ্‌তে থাকলো।

৪

দু'একজন নবাগত যাত্রী দুপুরের সময়ও ঘাটে স্নান করতে-করতে মৃদুমন্দ-স্বরে 'দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে' বলে কলুষনাশিনী গঙ্গার স্তব পাঠ করছেন। কেউ বা স্নান-শেষে আপন মনে দেবদেবীর ধ্যান পড়্‌ছেন। অদূরে কর্ম্মশ্রান্ত মাঝিরা নৌকার মধ্যে বসে রন্ধন করছে। এই জনবিরল মধ্যাহ্নে দুখে গালে হাত দিয়ে ভাবছে—এ ব্যবসা সে ত্যাগ করবে কি না। পয়সার জন্য সে আর এমন করে ছদ্মবেশী হ'য়ে থাকবে না। তার কিসের অভাব! বাপের সে এক ছেলে। পৈত্রিক যা দু'এক বিঘা আছে, তাতেই তার সংসার চলতে পারে। সে দেশে চলে যাবে স্থির করল। নিজের কর্ম্মের জন্যে অনুতপ্ত হ'য়ে দুখে এই সব ভাবছে, এমন সময় একটা বুড়ী অতি ব্যাকুল হ'য়ে এসে বল্‌লে—'ঠাকুর, আমায় রক্ষা করুন। আমার নাতিকে বাঁচান। আপনারা দেবতা—আপনারা একটু দয়া করুন।"

দুখে ব্যাপার কিছুই বুঝতে না পেরে, বললে, "কি হয়েছে?"

বুড়ী কাঁদ-কাঁদ স্বরে বল্‌লে—"আমার এক নাতী আজ তিনদিনের জ্বরে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে রয়েছে। আপনাকে একবার দয়া করে তার মাথায় পায়ের ধূলো দিতে হবে। আপনার পায়ের ধূলো পেলেই বাছা আমার ভাল হবে।"

দুখের প্রাণটা কেঁদে উঠল। সে তখনই তার গেরুয়া বস্ত্রের চাদরটী কাঁধে ফেলে, বুড়ীর অনুসরণ করলে।

নিকটেই বুড়ীর বাড়ী। দুখে তার ঘরের ভিতর ঢুকে দেখলে, এক আট বৎসরের শিশু জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হ'য়ে বিছানায় পড়ে রয়েছে। পাশে বসে তার মা সেবা কচ্ছেন। বালকটী খুব সুশ্রী। তার ঢলঢলে মুখখানি দেখে দুখে মুগ্ধ হ'ল। বুড়ীর সঙ্গে গিয়ে দুখে বালকটীর বিছানার পার্শ্বে বসে, তার সুকোমল মুখচ্ছবি একদৃষ্টে দেখতে লাগল। দুখে ভাবল, এ বালককে সে কিছুতেই তার বাজে ওষধ দেবে না। তার কৃত্রিম ওষধ এই শিশুকে দিয়ে কি সে তার মৃত্যুর কারণ হবে?

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে দুখে বল্‌লে "মা, বালককে ভাল করা আমার কর্ম্ম নয়। আমায় ক্ষমা করবেন। আপনারা অন্য ব্যবস্থা করুন।"

বুড়ী বল্লে, "কেন বাবা, যদি দয়া করে গরীবের বাড়ীতে এলে, তবে আবার ও-কথা বলছ কেন। একটু পায়ের ধূলো বাছার মাথায় দাও—নিশ্চয় ভাল হবে।"

চোখ ফেটে দুখের জল এলো। হায়, সে যদি আজ জুয়াচোর না হ'য়ে প্রকৃতই সাধু হ'ত, তাহলে এই অসহায়া বিপদগ্রস্তা বৃদ্ধার কিছু না কিছু উপকার করতে পারত। দুখে চক্ষের জল মুছতে-মুছতে বলল "মা আমি সাধু নই; আমি ওষধ জানি নে। ওষধ ব'লে যা-তা খাইয়ে এ বালককে হত্যা করতে পারব না।"

বুড়ী কাতর ভাবে বললে—"আর ছলনা করো না বাবা!"

"না মা, আমি দেবতার চরণামৃত এনে দিচ্ছি; আমার বিশ্বাস, তাতেই আরোগ্য হবে।" এই বলে দুখে তাড়াতাড়ি সেখান হ'তে চলে গেল।

ঘণ্টাক দেড়ে, একটা মাটীর ভাঁড়ে ক'রে দেব-চরণামৃত নিয়ে, দুখে আবার বুড়ীর বাড়ীতে এলো। বালকটীকে চরণামৃত খাইয়ে, বুড়ীর হাতে ভাঁড়টা দিয়ে বললে,—"মা, যদি দেবতায় বিশ্বাস থাকে, ভক্তি থাকে—এতে তোমার নাতিটী ভাল হ'য়ে যাবে।"

বুড়ী আর কিছুই বল্‌তে পারল না। ভক্তিভরে পাত্রটি তুলে রেখে, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ দু'বিন্দু চক্ষের জল ফেলে বল্‌লে, "বাবা, আমাদের আর কেউ নেই; একবার করে দেখে যেও।—বাছাকে আশীর্ব্বাদ কোরো।"

আবার আসবে স্বীকার করে, দুখে সেদিনকার মত চলে এল।

* * * *

দুখের শুশ্রূষায় সপ্তাহের ভিতর ছেলেটা ভাল হ'য়ে উঠলো। বালকটীকে দেখা-শুনার জন্য অধিকাংশ সময় তাকে বুড়ীর বাড়ীতে থাকতে হ'তো। রতন কিন্তু দুখের এ ব্যবহারে সন্তুষ্ট হ'ল না। প্রথম-প্রথম রতন ভাবত, তাদেরই স্বার্থের জন্য দুখে রুগী দেখবার ছল করে, পয়সা উপায়ের জন্যে যাচ্ছে। সুবিধা পেলেই দুখে যে নিশ্চয় কিছু টাকা এনে দেবে, এ আশা রতন অনেক দিন থেকে করছিল। কিন্তু সপ্তাহ কেটে গেল---দুখে কিছুই আনলে না দেখে---একদিন রতন তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "একটা পয়সা আনতে পার না কি রকম কাজ করছো। কি রকম রোগীর সেবা কর?"

দুখে বললে- "তারা খুব গরীব। তাদের কাছে পয়সার লোভে যাই নি। আমি এক শ্রেষ্ঠ সামগ্রী তাদের কাছে পেয়েছি।"

"কি শুনি সে শ্রেষ্ঠ সামগ্রীটা। আসল কাজ ফেলে তুমি উড়ে বেড়াবে---আমাদের চক্ষে ধূলো দেবে---তা হচ্ছে না। এ রকম খামখেয়ালী কাজ করলে, তোমার এখানে থাকা হবে না। তুমি অন্যত্র যোগাড় দেখ।" আমি আজই কলকাতায় সরদারকে চিঠি লিখে দেব।"

দুখে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। সে বল্লে, "রতন বাবু, আমার উপার্জ্জনের সাধ মিটেছে। পয়সার চেয়ে শতগুণে মূল্যবান জিনিস কি, আমি তা এখানে এসে বুঝতে পেরেছি। আমি আর তোমার দলে থাকব না; গরীব-দুঃখীর সেবা করে এতদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। বুড়ীর বাড়ীতে এই রত্নই আমার লাভ হয়েছে। বাবা বিশ্বেশ্বরের কৃপায় আমার নবজীবন লাভ হয়েছে। আমি আজই দেশে চলে যাব; মায়ের ছেলে মায়ের কোলে যাব, আর দশজনের সেবা করব। আর আমি দুখে নই, আমি আজ সুখে। জয়, বাবা বিশ্বেশ্বরের জয়!"

নির্ম্মম

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

তোমার ওষ্ঠ গুল্-বদনের
একটা শুধু তিলের দাগ'
রূপের পাগল ইরাণ কবির
আঁখির কোণে ছিলাম জাগ
অধর ছুঁয়ে প'ড়্‌ত সুধা
পরশ-মণির পেয়ালা ব'য়ে-
জনমটা মোর কাট্‌ল কি সেই
রূপের নেশায় বিভোর হ'য়ে?

রূপের নেশা? তাই যদি হয়---
পেয়ালা পুনঃ ভ'র্‌ত সাকী?
দীপ্ত আঁখির উষার আলোয়
মেঘের ছায়া প'ড়ত না কি?

থাক্‌ত না কি বুকটা ভ'রে
মিলন-রাতের আগুন-স্মৃতি,
বাজ্‌ত না কি প্রাণের তারে
বিদায়-ভোরের করুণ গীতি?

মোদের মিলন? কোথায়---কবে?
প্রেমের মন্ত্র কোথায় শেখা?
অনন্ত মোর বাসর-ঘরের
দীপের আলোয় নাইকো লেখা।
স্মৃতির পটে রূপের ছায়া—
নইকো তাহার দরশকামী,
রূপের পারের, মোহের পারের,
মিলন-পারের যাত্রী আমি।

"সাজাহানে"র গান

দ্বিতীয় গীত
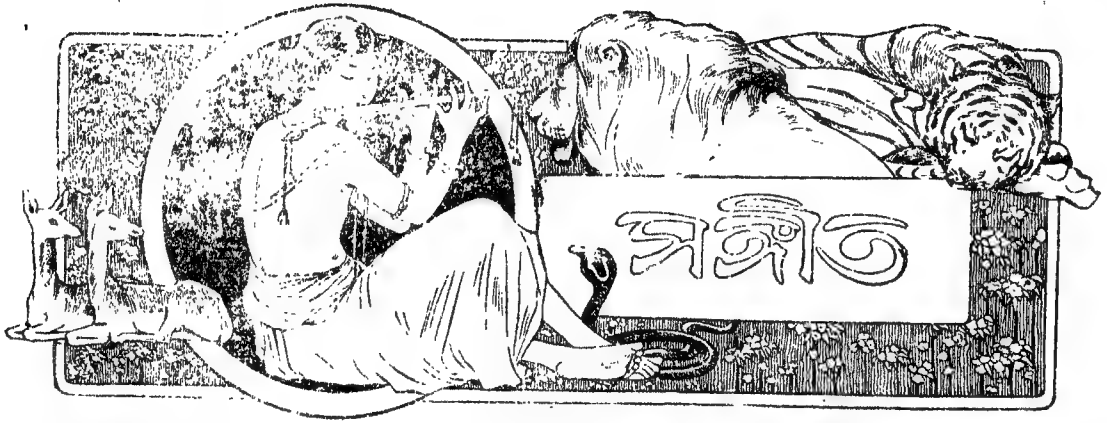
[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ইমন মিশ্র— খেমটা।

চারণীগণ।

১

সেথা, গিয়াছেন তিনি সমরে, আনিতে জয়গৌরব জিনি';
সেথা, গিয়াছেন তিনি মহা আহ্বানে—
মানের চরণে প্রাণ বলিদানে,
মথিতে অমর মরণ সিন্ধু, আজি গিয়াছেন তিনি।

(ধুয়া)—
সধবা, অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চ শির;—
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।

২

সেথা, গিয়াছেন তিনি করিতে রক্ষা শত্রুর নিমন্ত্রণে;
সেথা, বক্ষে বক্ষে কোলাকুলি হয়,
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়,
ভ্রূকুটীর সহ গর্জ্জন মিশে, রক্ত রক্ত সনে।

(ধুয়া)—
সধবা, অথবা বিধবা··················এ অশ্রুনীর।

৩

সেথা, নাহি অনুনয় নাহি পলায়ন—সে ভীম সমর মাঝে;
সেথা, রুধিররক্ত অসিত অঙ্গে,
মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে,
গভীর আর্ত্তনাদের সঙ্গে বিজয় বাদ্য বাজে।

(ধুয়া)—
সধবা, অথবা বিধবা··················এ অশ্রুনীর।

৪

সেথা, গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা
হেথা, হয়ত ফিরিতে জিনিয়া সমর,
হয়ত মরিয়া হইতে অমর,
সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া হাসিয়া তুমিও মরিবে বালা।

(ধুয়া)—
সধবা, অথবা বিধবা··················এ অশ্রুনীর।

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

০ ১ ২´

। সা ঋা II { গা গা গা | -। । গা গা I গা গা মা
(১) ০ সে থা গি য়া ছে ন্ তি নি স ম রে
(৪) ০ সে থা গি য়া ছে ন্ তি নি ক রি তে

| গা গা -। I
(৭) ০ সে থা না হি অ নু ন য় না হি প

| -। গা গা I
(৯) ০ সে থা গি য়া ছে ন্ তি নি সে ম হা

৩ ০ ১ ২´

| গমগা ঋা ঋা | ঋা গা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞপা I গজ্ঞা পা
(১ক) আ০০ নি তে জ০ য় গ উ ব ব০ জি০ নি

| গমা -গা ঋা | ঋা -গা জ্ঞা |
(৪ক) র০ ০ ক্ষা শ ০ ত্রু র নি মন্ ত্র০ ণে

| গমগা ঋা -। | ঋা গা জ্ঞা |
(৭ক) লা০০ য় ন্ সে ভী ম্ স ম র০ মা০ ঝে

| গমা গা ঋা | ঋা গা জ্ঞা |
(৯ক) আ০ হ বে জু ড়া ই তে স ০ব্ জ্বা০ লা

৩ ৩ ০ ১

| (। সা ঋা) } | । পা পা | { পা পা পা | -ধা ধা ধা I
(২) ০ সে থা ০ সে থা গি য়া ছে ন্ তি নি

| (। সা সা) } | | { পা -। পা | ধা -। ধা I
(৫) ০ সে থা ০ সে থা ব র্ ষে ব র্ ষে

| (। সা ঋা) } | | { পা পা পা |
(৮) ০ সে থা ০ সে থা রু ধি র র ক্ত

| { পা -। পা | ধা ধা ধা I
(১০) ০ সে থা ০ হে থা হ য় ত ফি রি তে

৩ ০ ১

I ধা ধা ধা | -া ধা ধা | পা ধা -না | না না না I

(২ক) ম হা আ হ্ বা নে মা নে র্ চ র ণে

| ধা ধা -া | পা -া ধা | না -া না I

(৫ক) কো লা কু লি হ য় খ ড়্ গে খ ড়্ গে

| ধা -া ধা | পা -া ধা | না -া না I

(৮ক) অ সি ত অ ঙ্ গে মৃ ০ ত্যু নৃ ০ ত্য

| ধা ধা -া | | না না না I

(১০ক) জি নি য়া স ম র্ হ য় ত ম রি য়া

২´ ৩ ০ ১

I না -নর্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সর্রা I

(৩) প্রা ০ণ ব লি দা নে ম থি তে অ ম র০

| র্সা র্সা -া | | -া র্সা র্সর্রা I

(৫খ) ভী ০ম প রি চ য় দী কু টী র স হ০

I ধা নর্সা র্সা | র্সা -া র্সা | | র্সা -া র্সর্রা I

(৮খ) ক রি০ ছে র ঙ্ গে গ ভী র আ র্ তো০

| র্সা র্সা -া | | র্সা র্সা র্সর্রা I

(১০খ) হ ই০ তে অ ম র্ সে ম হি মা ক্রো ড়ে০

২´ ৩ ০ ১

I না না না | ধা -া ধা | গা গা গা | গা গা -পা I

(৩ক) ম র ণ সি ন্ ধু আ জি গি য়া ছে ন্

I না -া না | ধা ধা ধা | গা -া গা | গা -পা পা I

(৬) গ র জ ন মি শে র ক্ ত র ক্ ত

I না না না | ধা -া ধা | | গা -া পা I

(৮গ) না দে র স ঙ্ গে বি জ য় বা ০ দ্য

| ধা ধা ধা | | গা গা পা I

(১০গ) ধ রি যা হা সি য়া তু মি ও ম রি বে

(ধুয়া)—

২ ৩ ০ ১

I পা পা -া | -া -া -া } | র্সা র্মা র্সা | র্সা র্সা র্সর্া I

(৩খ) তি নি ০ ০ ০ ০ স ধ বা অ থ বা ০

(৬খ) স নে ০ ০ ০ ০

(৮ঘ) বা জে ০ ০ ০ ০

(১০ঘ(বা লা ০ ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১

I না না না | ধা ধা -া | পা ধা পা | পা -া গা I

বি ধ বা তো মা র র হি বে উ চ্ চ

২ ৩ ০ ১

I র্গা -া -া | -া -া -া | র্রা র্গা র্মা | -া র্গা র্গা I

শি ০ ০ ০ ০ র উ ঠ বী র জা য়া

I র্রা র্রা র্সর্রা | -র্গা র্রা র্সনা | ধা না র্সা | র্গা -া র্রর্রা I

বাঁ ধো কু ০ ন ত ল ০ মু ছ এ অ ০ শ্রু

২ ৩ ১

I র্সা -া -া | (া া া) | | া সা রা II II এই সুরে ও

নী ০ র ০ ০ ০ ০ "সে থা"

তালে, ধুয়া চার্ বার গেয়।

"সাজাহানে"র গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে। একতালা তালে গাইতে ইচ্ছা হইলে, উল্লিখিত তালগুলির তখন কিছুই পরিবর্তন করিতে হইবে না। কেবল এই :—

৩ ০ ১

| ধা ধুন্ না | ক ত্তে ধাগে | তেরেকেটে ধিন্ ধা I

২ ৩ ০

I ধিন্ ধিন্ ধা | ধা থুন্ না | ক ত্তে ধাগে

১

| তেরেকেটে ধিন্ ধা I একতালার ঠেকাটির ঢং ও গতিতে গাইলেই চলিবে।

—লেখিকা

ঘৃণা *

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ]

একটি কৃষকের কুটীরে একদল শিকারী রাত্রি-বাস করতে এল। তারা যে বিছানা পেল শুতে, সামান্য হলেও তা যেমন নরম, তেম্নি গরম; কারণ নতুন খড়ের বিছানা এ দুই বিষয়েই কোনো শয্যার চেয়েই নিকৃষ্ট নয়। তখন শীতের চাঁদ নিদারুণ মধ্য-রজনীতে একাকী প্রহরীর মত যেন আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না-ভাণ্ডারে পাহারা দিচ্ছিল,—মুখ তার আশঙ্কায় ভয়ে যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। বাহিরে একটা বাঁশী বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে তার ক্ষীণ করুণ আপত্তি জানাবার চেষ্টা করছিল। শিকারীরা সারাদিনের শ্রান্তির পর আরাম-শয্যায় শুয়ে নিজেদের মধ্যে নানান্ গল্প করতে আরম্ভ করে দিলে;—কেউ কুকুরের, কেউ ঘোড়ার, কেউ প্রথম প্রণয়ের;—যার যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা, সে সেই বিষয়ে অনর্গল বকে যাচ্ছিল। যখন তাদের গল্প প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন দলের মধ্যে সবচেয়ে মোটাসোটা, মাতব্বর গোছের লোকটি হাই তুলে বল্লেন—

"ভালবাসা পাবার মধ্যে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই; কারণ, মেয়েদের জন্ম ভালবাসার জন্যে। কিন্তু আপনাদের মধ্যে কেউ কি গর্ব্ব করে বলতে পারেন যে, তিনি কোনো নারীর কাছ থেকে যথার্থ ঘৃণা পেয়েছেন—শয়তান যেমন ঘৃণা করে? কেউ কি ঘৃণার মধ্যে উল্লাস অনুভব করেছেন?"

কোনো উত্তর নেই।

তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন, "বোধ হয় আপনাদের ভাগ্যে তা ঘটে নি। আমার কপালে কিন্তু এটা ঘটেছে। আমাকে ঘৃণা করেছে একটি মেয়ে;—সে আবার পরমাসুন্দরী। ভালবাসা বা ঘৃণা অনুভব করার শক্তি ভাল করে হবার পূর্ব্বেই, আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমি তখন মোটে এগারো বছরের। যাই হোক্......শুনুন্!

"সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার শিক্ষয়িত্রী জিনোচ্‌কার সঙ্গে ঘরে বসে ছিলুম;—তখনো পাঠ-চর্চ্চা চল্‌ছিল। জিনোচ্‌কা সুন্দরী,—সবে ইস্কুল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে; তার মুখ-লাবণ্যের ওপর সংসারের কালো ছায়া পড়বার অবকাশ পায় নি। সে জান্‌লার দিকে তাকিয়ে বল্‌তে লাগল—

"হ্যাঁ, ভুলো না কিন্তু,—আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে যা গ্রহণ করি, তা হচ্ছে Oxygen। আর প্রশ্বাসের সঙ্গে যা ত্যাগ করি,—আচ্ছা বল ত দেখি সেটা কি?"

"Carbonic acid gas—আমার বুঝি মনে নেই!"

সে বল্‌লে, "ঠিক্ বলেছ। কিন্তু গাছ Carbonic acid gas নেয় ও Oxygen ফেলে। Carbonic acid gas বিষাক্ত; জান, Naplesএর কাছে একটা গহ্বর আছে—সেটা ঐ gas'এ পূর্ণ। তার ভেতর কুকুর ফেলে দিলে মরে যায়—তাই তার নামও দিয়েছে Dog's Cave."

জিনোচ্‌কা রসায়নবিদ্যা না জান্‌লেও, এটুকু শিক্ষা দিতে তার বাধত না।

বাবা শিকারে যাবেন, তার সমস্ত ব্যবস্থা বন্দোবস্ত উঠানে চলছিল। সে কত গোলমাল!—কুকুরগুলো চীৎকার করছে; ঘোড়াগুলো অসহিষ্ণু ভাবে পা ছুঁড়ছে; চাকরেরা সব ব্যস্ত ভাবে ব্যাগে খাবার সাজাচ্ছে। বাইরে একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে—মা আর দিদি কাদের বাড়ী যেন দেখা করতে যাবেন। সবাই চলে গেল,—কেবল আমি ও দাদা বাড়ীতে রইলুম। দাদার না কি দাঁতের গোড়ায় খুব ব্যথা,—তাই সে যায় নি।

গাড়ী যেই বেরিয়ে গেল, জিনোচ্‌কা পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বার করে, মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে, কপালে ঠেকালে। তার পর চম্‌কে উঠে ঘড়ির দিকে তাকালে।

কম্পিত হস্তে অঙ্কের বইখানা তুলে নিয়ে বল্‌লে—"তুমি ৩২৫ নম্বরের অঙ্কটা কষ', আমি এই আস্‌ছি।"

জিনোচ্‌কা ঘর ছেড়ে চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌বার শব্দ পেলুম,—তার নীল কাপড় আস্তে-আস্তে বাগানের গেটের বাহিরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার চাঞ্চল্য, তার গালের

* Tchekoffএর গল্পের ভাবানুবাদ।

রক্তিমাভা, তার উদ্বিগ্ন ভাব আমার মনে কৌতূহল জাগিয়ে তুল্লে। কোথায় এবং কেনই বা সে গেল? আমি খুব চালাক কি না, তাই সব বুঝ্লুম। বাবা, মা বাড়ী নেই ব'লে, টেপারী কিম্বা চেরী পাড়তে গেছে! নিশ্চয়ই তাই! পড়তে আর আমার মন কিছুতেই বস্‌তে চাইল না। বই ছুঁড়ে ফেলে চুপি-চুপি আমিও চল্লুম। কিন্তু কৈ?—চেরীগাছগুলোর দিকে ত সে যায় নি! প্রতি শব্দে চম্‌কে উঠে, দারোয়ানের কুটীরের পাশ দিয়ে, সে পুকুরের পানে চলেছে। আস্তে-আস্তে তার পিছনে গিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখ্‌লুম। পুকুর-পাড়ে একটি গাছের গুঁড়ির উপর ঠেস্ দিয়ে আমার দাদা দাঁড়িয়ে রয়েছে,—দাঁতের-গোড়ায় কোনো বেদনার চিহ্নমাত্রও নেই। দাদা জিনোচ্‌কার দিকে চেয়ে ছিল। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে দাদার মুখ সূর্য্যের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। জিনোচ্‌কা ঘন-ঘন নিঃশ্বাস ফেলে, ত্রস্তপদে দাদার দিকে এগিয়ে চলেছে। জীবনে বোধ হয় এই তার প্রথম অভিসারে গমন। খানিকক্ষণ দুজনে দুজনার পানে নীরবে চেয়ে রইল-- যেন চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।......কোন্ অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে, জিনোচ্‌কা দাদার গলা জড়িয়ে ধরে, তার বুকে মুখ লুকোল। দাদা হেসে দুহাত দিয়ে তার মুখখানি তুলে ধরল। আশ্চর্য্য ব্যাপার!·· দূরে পাহাড়ের পরপারে সূর্য্য অস্তাচলে যাচ্ছে;......হল্‌দে ফুলের গাছ দুটি...... সবুজ তীর......সান্ধ্যচ্ছটারঞ্জিত মেঘখণ্ড......পুকুরের জলে এ সমস্তই প্রতিফলিত হয়েছিল। চারিদিক নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। ঝোপের উপর দিয়ে সোণালি রংএর অসংখ্য প্রজাপতি উড়ে গেল। বাগানের ওধারে একটি মেষপালক একদল মেষ তাড়িয়ে নিয়ে আস্‌ছিল।......আর, এর মধ্যে দাদা আর জিনোচ্‌কার এই অদ্ভুত কাণ্ড! আমি ঠিক কিছু বুঝতে পারলুম না; কিন্তু ভারি অবাক্ হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলুম।

এ সকলের মাঝে একটা জিনিস বেশ বুঝতে পারলুম—দাদা আমার শিক্ষয়িত্রীকে লুকিয়ে চুম্বন করছিল। কি অন্যায়! মা যদি জান্‌তে পার্‌তেন!

আর বেশী কিছু না দেখে বাড়ী ফিরলুম। সাম্‌নে বই খুলে সব কথা ভাবতে লাগ্‌লুম। জয়ের আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। প্রথমতঃ, পরের গুপ্ত কথা জানা কম নয়; এবং দাদা ও জিনোচ্‌কাকে হাতে রাখতে পারব,—ইচ্ছে হলে তাদের শাস্তিও দেওয়াতে পারব ত! বিশেষতঃ জিনোচ্‌কাকে! সে পড়া না হলেই আমাকে অমন করে জ্বালায় কেন? কিন্তু এখন থেকে!—আচ্ছা, এইবার দেখা যাবে!

রাত্তিরে আমি কাপড়জামা ছেড়ে ঠিকমত শুয়েছি কি না দেখতে জিনা এল। এটা তার একটা নিত্য কাজ। তার সুন্দর, দীপ্ত মুখের দিকে আমি ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলুম। রহস্যটি বল্‌বার জন্যে প্রাণ ছট্‌ফট করছিল। আমি বল্লুম—"হুঁ! হুঁ! আমি জানি।"

"কি জান? কি?"

"তুমি গাছগুলোর ওপাশে দাদাকে কি করছিলে জানি না বুঝি। আমি লুকিয়ে সব দেখেছি!"

জিনোচ্‌কা চম্‌কে আগুনের মত লাল হয়ে উঠ্‌ল। সাম্‌নে একটা চেয়ার ছিল,—বোবার মত তার ওপর তখুনি বসে পড়ল।

আবার বল্লুম—"তোমাদের চুম্বন করতে দেখেছি! দাঁড়াও, মাকে বলে দিচ্ছি!"

প্রথমে সে ব্যাকুল হয়ে আমার দিকে চাইলে। তার পর হতাশ ভাবে আমার হাত ধরে কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে—"ঈশ্বরের দিব্যি, বোলো না! আমি তোমায় অনুরোধ করছি, প্রার্থনা করছি, বোলো না! এত নীচ হোয়ো না!"

জিনা মাকে যে কি ভয়ই করত! মা যে আমার সাধ্বী!

আমার দোষে বেচারী সমস্ত রাত জেগে কাটিয়েছে; সকালে তার চোখের চারদিকে কালির দাগ পড়ে গিয়েছে দেখেছিলুম। কিন্তু একবার দাদাকেও জব্দ করার ইচ্ছে ছাড়তে পারলুম না।

সকালে তাকে দেখামাত্র বল্লাম "হুঁ! আমি জানি! তুমি জিনাকে কি করছিলে, আমি দেখেছি।"

দাদা বল্‌লে—"তুই একটা বোকা।" একটু দমে গেলুম। পড়ানর সময় জিনার মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখলুম না; সব বিষয়েই পূরো নম্বর দিলে; বাবার কাছে কোনো কথা বল্‌লে না।

এক সপ্তাহ গেল। আমার অত-বড় গোপন অভিজ্ঞতাটা কাজে না লাগাতে, বিশেষ কষ্ট অনুভব করতে লাগ্‌লুম। সেদিন জিনা আমাকে অঙ্কের সময় ভুল নিয়ে আবার ভয়ানক বকাবকি করলে। নাঃ, আর একবার

চেষ্টা করে দেখতে হবে। একদিন সকলে মিলে খাচ্ছি ; হঠাৎ জিনার দিকে খুব এক সব-জান্‌তা হাসি হেসে বল্‌লুম, "আমি কিন্তু ভুলি নি!···আমি দেখেছি!"...মা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কি দেখেছিস্ বাছা?"

আমি জিনার দিকে আর দাদার দিকে চেয়ে, খুব হেসে উঠ্‌লুম। জিনার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে এসেছে ; দাদার চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি। আমি জিভ্ কাম্‌ড়ে চুপ করলুম। টেবিলে বাবা, মা, দিদি,—কেউ কিছু বল্‌লেন না। জিনা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে রইল...কিছু খেতে পারল না।

সেদিন পড়বার সময় জিনার মুখে বেশ একটা পরিবর্ত্তন দেখ্‌লুম। তার মুখ পাথরের মত কঠিন ; চোখে তার অস্বাভাবিক দৃষ্টি। কুকুরে যখন শেয়ালকে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে কামড়াতে উদ্যত হয়, তখনো তাদের চোখে অমন গ্রাসকারী, ধ্বংসকারী দৃষ্টি দেখি নি। অল্পক্ষণেই ঐ চাউনির অর্থ সব পরিষ্কার হয়ে গেল। পড়াতে-পড়াতে হঠাৎ জিনা আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত কড়্‌মড়িয়ে বলে উঠ্‌ল—

"আমি তোকে ঘৃণা করি! ওরে হতভাগা, যদি জান্‌তিস্ কি ভয়ানক ঘৃণা করি—তোর ঐ বিশ্রী মুখ, আর গাধার মত চোখ দুটোকে!"

আবার পরমুহূর্ত্তেই বল্‌লে—"না, না, তোমাকে উদ্দেশ করে বলি নি। একটা নাটক থেকে বক্তৃতা করছি।"

তার পর হতে রোজ রাত্রে আমার বিছানার কাছে এসে জিনা আমার চোখের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে থাক্‌ত। আমায় গভীর ভাবে ঘৃণা করত; কিন্তু তবু আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারত না। আমার ঘৃণিত মুখের দিকে তার চেয়ে থাক্‌তেই হোতো! একটি সন্ধ্যার কথা আমার বেশ মনে আছে। আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠেছে। বাগানের একটি পথে আমি পায়চারি করছিলাম। হঠাৎ জিনা পাণ্ডুবর্ণ মুখে, কম্পিত হস্তে আমার হাত সজোরে ধরে বল্‌লে—

"ওরে লক্ষ্মীছাড়া! তোকে আমি সাপ, ব্যাঙ্, বিষের মত আন্তরিক ঘৃণা করি! তোর যত অমঙ্গল আমি সর্ব্বদা চিন্তা করি, এমন কাহারো কখনো করি নি,—করতে পারি না। বুঝ্‌লি রে শয়তান!"

ভেবে দেখুন একবার! আকাশে চাঁদ, সাম্‌নে ঘৃণা-বিকৃত সুন্দরী রমণীর মুখ,—কাছাকাছি জনপ্রাণী নেই—আর আমি তার মাঝখানে! জিনার কথা শুনে আমি তার মুখের দিকে চাইলুম।...প্রথমে কিছুই বল্‌তে পারলুম না ; কারণ, এ অভিজ্ঞতা একেবারেই নতুন। পরক্ষণেই ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়্‌লুম। চীৎকার করে বাড়ীর দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলুম।

মাকে তখনি সব কথা বল্লুম। মা চুপ করে শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন ; তার পর আমাকে বল্লেন—

"তুই ছোট ছেলে, এসব কথা তোর বলা উচিত নয়। ছোট ছেলে, ছোট ছেলের মত থাক্‌বি। যা গিয়ে, দিদির সঙ্গে খেলা করগে যা।"

মা যেমন ধর্ম্মপরায়ণা, তেম্‌নি বুদ্ধিমতী। কুৎসা যাতে না রটে সেদিকে নজর রাখ্‌লেন। তার পর আস্তে-আস্তে জিনাকে বিদায় করে দিলেন! গাড়ী করে চলে যাবার সময়, জিনা শেষবার জান্‌লার দিকে তাকালে। সে চাউনি জীবনে ভুল্‌ব না।

অল্পদিনের মধ্যেই জিনা দাদার বিবাহিতা পত্নী হল। এখন তার ঢের সম্মান, অনেক চাকর, মস্ত বাড়ী। এর পর তার সঙ্গে দেখা হয় অনেক দিন পরে। শ্মশ্রু বিলম্বিত, সংসার-ছায়া-চিহ্নিত, পরিবর্ত্তিত আমার মুখাবয়বে সেই অতীতের ঘৃণিত ছাত্র বলে চিন্‌তে তাকে বিশেষ কষ্ট পেতে হয়েছিল ;—কিন্তু তখনো সে আমার প্রতি আত্মীয়ের মত ব্যবহার করে নি। আজ পর্য্যন্ত (আমার এমন হাস্যোদ্দীপক কেশবিহীন মাথা, শান্তিপ্রিয় মুখের ভাব, নিরীহ চাউনি থাকা সত্ত্বেও) জিনা আমাকে সন্দেহপূর্ণ বক্রদৃষ্টিতে দেখে। তা ছাড়া আমি যখন দাদার ওখানে যাই, সে বিশেষ অস্বস্তি বোধ করে।······তা'হলেই দেখছেন, প্রথম ঘৃণা প্রথম প্রণয়ের মতই ভোলা যায় না।······এ কি! ভোর হয়ে গেল যে! মুরগী ডাক্‌তে সুরু করেছে! এবার ত বেরিয়ে পড়তে হবে! তবে আসি। নমস্কার!"

রূপ

[শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্]

কি অনন্ত রূপরাশি বিকশিয়া যুগ যুগান্তর
দিক্ হ'তে দিগন্তরে নিরন্তর শোভিছ সাগর!
আবরিয়া কলেবর নিরমল সূক্ষ্ম নীল বাসে
অপরূপ রূপ তব গোপনের বিফল প্রয়াসে
হে সুন্দরি নীলাম্বরি! আরও তুমি হও সুপ্রকাশ
তোমারি নীলিমা ল'য়ে নীল হ'য়ে শোভে যে আকাশ,
নীল সাড়ি নীল আঁখি শোভা পায় তোমারই আভাযে
হেরে তায়'ছবি তব সকলেই নীল ভালবাসে।
হে পয়োধি! হেরে তোমা প্রেমানন্দে চিত্তমাঝে জাগে
সর্ব্ব নীলরূপখণি নীলমণি, নব অনুরাগে,
পুরোভাগে হেরি যেন নিরমল নীল দুব্বাদল
সিন্ধুরূপে বৃন্দারণ্য বিছায়েছে তরল অঞ্চল,
তরঙ্গ হেরিয়া ভাবি শ্যাম-নীল তমালের শ্রেণী
দোলে যেন মাঝে তার গোপীকার আলুলিতা বেণী;
নিত্য নব নৃত্যে তব শুনি কভু ভ্রমর-গুঞ্জন,
কখন নূপুর ধ্বনি, কভু গুরু মেঘের গর্জ্জন;
শ্যামরূপ জাগাইয়া করিলে'হে বড় উপকার,
হে বন্ধু শ্যামল সিন্ধু, লহ মোর লক্ষ নমস্কার!

ধূমকেতু

[শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ]

রোগটা সেরে গেছে অথচ রোগের সমস্ত গ্লানিটা যায় নি—এমন অবস্থায় মনের যে একটা সমতা ভাব আনে, তা' জীবনের কর্ম্মব্যস্ত দিনগুলোতে থাকা সম্ভব নয়। এই সন্ধি দিনগুলোই জীবনের সব চেয়ে বেশী উপভোগ্য, কেননা মন একেবারে দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হ'য়ে পরিপূর্ণ শান্তিতে বিরাজ করে একমাত্র এই দিনগুলোতেই।

এ সত্যটার সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছে সবে মাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে সেরে উঠে।

শীতকালের মধ্যাহ্ন। দক্ষিণের ঢাকা বারান্দায় আরাম-কেদারায় শুয়ে আছি। গায়ে বালাপোষ জড়ানো; পাশের টিপয়ে ওষুধের শিশি আর গ্লাস।......বারান্দার কোণে শা'-চৌধুরীদের কাঁঠাল গাছের পত্রঘন ডালগুলি এসে প'ড়েছে; তাদেরই বাড়ী-সংলগ্ন বাগানে একটা গাভী রোদে পিঠ দিয়ে প'ড়ে আছে; একটা কাকের ক্লান্ত রব মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে।......আকাশের ঘন-নীল, সূর্য্যের মৃদু তাপ, বাতাসে ঈষৎ শীতাভাষ—পৃথিবীর এই নিতান্ত পুরাণো জিনিষগুলো আমাকে আবার নূতন ক'রে অনুভব ক'রতে হ'চ্ছে।...... সিমেন্ট-করা ধূলিবিহীন সিঁড়ির উপর কর্ম্মরতা স্ত্রীর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি; স্নিগ্ধ-শীতল ঘরের ভিতর থেকে তার চুড়ীর মৃদু আওয়াজ আর সাড়ীর খস্খসানি কাণে আসছে। মনে হ'চ্ছে এগুলোর ভিতর দিয়ে যেন আবার নূতন ক'রে স্ত্রীর সঙ্গেও পরিচিত হ'তে হবে।

নূতন ক'রেই বটে। মীরাকে যেন আজ আবার ফিরে পেয়েছি।......কিন্তু তাকে হারিয়েছিলুমই বা কবে?

হারিয়েছি আমার বাল্য-বন্ধুকে। অসুখের দরুণ মাঝ-খানে যে মেঘটা উঠেছিল, সেটা কেটে গেছে এবং তার সঙ্গে বাল্যবন্ধু সমী-ও বিদায় নিয়েছে। দুঃখের বিষয়। সেটা যে কত বড় দুঃখের বিষয়, তা' কেউ বুঝবে না। কিন্তু আমি নিজে এটা বুঝেছি যে বাল্যবন্ধুকে হারিয়েও বেঁচে থাকতে পারব, কিন্তু স্ত্রী নৈলে আমার জীবনের দিনগুলো একেবারেই অচল হবে।

আজ রোগজীর্ণ দেহ নিয়ে আরাম-কেদারায় শুয়ে ভাবছি—যার সেবা পাবার অধিকার নিয়ে জন্মেছি, তাকে কি কখনো পূর্ণ ভাবে পেয়েছিলাম? তার হৃদয়ের সঙ্গে সত্যই কি আমার কখনো পরিচয় হ'য়েছিল? না একজনের ত্যাগের ভিতর দিয়েই তাকে আবার বরণ ক'রে নিতে হবে?

ফিরে পাওয়া নয়—হয়ত সমস্ত পুঁথিটাই আবার গোড়ার পাতা থেকে সুরু ক'রতে হবে।

সেই থেকে বন্ধু সমী-র তো কোন খবর নিতে পারিনি। একবার শুনলাম, হাঁসপাতালেই তার মৃত্যু হ'য়েছে; আবার কে যেন ব'ললে, সেখান থেকে সেরে উঠে চ'লে গেছে।

যেখানেই যাক্, সে আমাকে জীবন এবং জীবনের চেয়েও বেশী কিছু দিয়ে চ'লে গেছে। তার পরিবর্ত্তে সঙ্গে নিয়ে গেছে—তার নিজের জীবনের এই অনিশ্চিত পরিণাম।

ধূমকেতুর মতই সে আমার ভাগ্য-গগনে দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু——

কিন্তু, গোড়ার কথাটা এখনো বলা হয়নি।

এইবার ব'ল্‌ব—একেবারে গোড়া থেকেই।

*　　*　　*　　*

কলিকাতার বুকের উপর দিয়ে যে বড় রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে, তারই সমান্তরাল একটা মাঝারি গোছের রাস্তার পশ্চিম দিক থেকে যে গলিটা আরম্ভ হয়ে উত্তর দিকের আর একটা রাস্তায় শেষ হ'য়েছে—সেই গলিটার সমস্তটা জুড়ে ব'সেছিলাম আমরা ঊনিশ ঘর ভদ্র গৃহস্থ। আমাদের মধ্যে কেউ ছিলেন উকীল, কেউ ছিলেন কেরাণী, একজন ডাক্তার ছিলেন এবং দু'একজন উমেদার-বেকারও না ছিলেন এমন নয়।

আমাদের এ ঊনিশটা ঘর ছিল যেন একটা সমগ্র পরিবার। আমরা সকলেই চিন্তা ক'রতাম একই রকমে এবং কাজ ক'রতাম একই নিয়মে। নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য-গুলো—দন্তধাবন থেকে শয্যাগ্রহণ পর্য্যন্ত—আমাদের এমনিই প্রণালীবদ্ধ ছিল যে, আমরা যে-কেউ যখন ইচ্ছা ব'লে দিতে পারতাম যে আমাদের মধ্যে আর-কেউ এখন কি ক'রছে। এবং পাছে এইটে না ব'ল্‌তে পারি, এই ভয়ে বাইরের লোকের এই গলিতে এসে থাকাটা বড় পছন্দ ক'রতাম না।

আমাদের এই ঊনিশটী পরিবারের মধ্যে পরিচয়টা খুব ঘনিষ্ঠ এবং সেটাকে অটুট ক'রে নিয়েছিলাম একটা না একটা কিছু সম্পর্ক পাতিয়ে।

এই থেকেই একটু আঁচ পাওয়া যাবে যে, আমরা কলিকাতায় বাস ক'রলেও ঠিক কলিকাতার অধিবাসী ছিলাম না। কলিকাতার লোকের তরল বন্ধুত্বটা আমাদের কাছে নিতান্ত মৌখিক হৃদয়হীন ব'লেই বোধ হ'ত। তাদের ভদ্রতা এবং সামাজিকতায় আমরা ঠিক স্বস্তি অনুভব ক'রতে পারতাম না। এবং কেন যে পারতাম না তা' তখন না হ'লেও এখন কতকটা বুঝ্‌তে পারি। সম্পর্কিত মিত্র এবং অসম্পর্কিত শত্রু—এ দুয়ের মাঝখানে পরিচিত বন্ধু ব'লে যে একটা জীবেরও স্থান থাকতে পারে, তা' আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন ছিল। পরিচিতেরা হয় সম্পর্কিত, নয় শত্রু;—আশ্চর্য্য নয়, যে সমাজ থেকে আমরা এসেছিলাম, সেখানে আলো এবং অন্ধকারের ব্যবধান যতটা সুস্পষ্ট, সামাজিকতার সেতু দিয়ে সেটাকে মিলিয়ে দিবার চেষ্টারও তেমনি একান্ত অভাব।

কিন্তু এসত্বেও আমরা যে মূর্খ বা অশিক্ষিত ছিলাম, এ কথা এমন-কি কলিকাতার লোকেরাও ব'লতে পারত না। আমাদের মধ্যে সকলেই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি-ধারী। এমন-কি, আমাদের এই ঊনিশ বাড়ীর মেয়েদের মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয় না হলেও বিদ্যালয়-শিক্ষার অভাব ছিল না। তাঁরা বাংলা চিঠি লিখতে বানান ভুল ক'রতেন না, ইংরাজীতে খামের উপর শিরোনামা লিখতে পারতেন এবং ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই ধোপা এবং গয়লার হিসাব রাখতে পারতেন। তাঁদের মধ্যে শিল্পকলা শিক্ষারও অভাব ছিল না এবং তার পরিচয় পাওয়া যেত আমাদের ব্যয়ের এবং পাড়ার দর্জ্জির আয়ের স্বল্পতায়। তাঁদের মধ্যে স্বাধীনতাও যথেষ্ট ছিল। পাড়ার মধ্যে পদব্রজে এবং পাড়ার বাইরে গাড়ীর দরজা খুলে যাতায়াত ক'রতে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন। অন্য বিষয়ে যাই হোক্, এ-সব বিষয়ে আমরা কলিকাতাবাসীদের চেয়ে অনেক উন্নত ছিলাম এবং এই সম্পর্কে তাদের নীরব উপেক্ষা অথবা তরল পরিহাস যে নিতান্তই ঈর্ষ্যাসঞ্জাত ছিল, সে বিষয়ে আমাদের কাহারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

কলিকাতার লোকের মত আমরা কোনরূপ কু-অভ্যাস—ধূমপান, মদ্যপান প্রভৃতি—সহ্য ক'রতে পারতাম না। তার কারণ আমাদের মধ্যে নীতি-চর্চ্চাটা খুবই ছিল। এই পাপ পৃথিবীতে নিষ্পাপভাবে জীবন-যাত্রা করবার মত সম্বল আমরা গুরুজনের কাছে থেকে যথেষ্টই পেয়েছিলাম।

সমী পরিহাস করে ব'লত—আমরা নিজেরা যে সমস্ত পাপের ঊর্দ্ধে ছিলাম—শুধুই তা' নয়, অপরে যে সমস্ত পাপ-

গুলো একচেটে ক'রে নেবে, এ কল্পনাও আমাদের পীড়া দিত। কিন্তু সমী ছিল পাড়ার—যাকে বলে—l'enfant terrible, অতএব তার কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

আমাদের এই ঊনিশটী পরিবারের মধ্যে সমী-র পিতা সর্ব্বেশ্বর বাবুই ছিলেন একমাত্র নিজ্-কলিকাতার অধিবাসী। তিনি থাকতেন ১৭ নম্বর বাড়ীটায়। সেটা তাঁর নিজেরি ছিল, আগে ভাড়া খাট্‌ত। মকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হবার পর ভাড়াটে তুলে দিয়ে নিজেই সেখানে এসে বসবাস ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন। আমাদের গলির সৌর-চক্রের মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট গ্রহ না হ'লেও তাঁর গতিটা আর সকলের মতই অনেকটা নিয়মিত ছিল। তাঁর ভদ্র এবং অমায়িক ব্যবহারে অনেক সময় ভুলে যেতে হ'ত যে তিনি আমাদেরই একজন নন্। কিন্তু সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশ্যবর্ত্তী হয়ে যখনই তাঁর সঙ্গে কোন একটা কিছু সম্পর্ক পাতাতে গেছি, তখনই তাঁর ভিতরের একটা অনির্দ্দেশ্য-কিছু আমাদের সরল উচ্ছ্বাসকে বাধা দিত। অতিমাত্র শিষ্টাচারের বর্ম্ম ভেদ ক'রে তাঁর অন্তস্থলের পরিচয় পাবার সম্ভাবনা আমাদের কিছুমাত্র ছিল না। খুব খোলাখুলী ভাবে মিশলেও আমরা যে তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলাম না, এটা বুঝ্‌তে বিশেষ বেগ পেতে হত না। আমাদের মধ্যে যাঁদের উপার্জ্জনের কড়ি তিন-চার হাজারের কোটাও পেরিয়ে যেত, তাঁরাও এই কলিকাতার বনিয়াদি বংশের নষ্ট-সম্পত্তি বংশধরের সঙ্গটা খুব স্বস্তিকর ব'লে বোধ ক'রতেন না। তাঁরা নিজে হতেই বুঝ্‌তে পার্‌তেন যে, গরীব হ'লেও এ ব্যক্তিটী জাত্যংশে অর্থাৎ সামাজিক স্তরে তাঁদের অনেক উঁচুতে। এবং এ অনুভূতিটা তাঁদের পক্ষে যে খুব সুখকর ছিল তা' নয়।

এ সব সত্ত্বেও তিনি প্রথমটা আমাদের সৌর-চক্রের গতিটা এড়িয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু বিপত্নীক হওয়ার পর থেকে গতির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মতিও ব'দ্‌লে গেল। বয়স্কদের কোন মজলিসেই তাঁর আর দেখা পাওয়া যেত না;—এমন ভাবে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিলেন যে, পাড়ার পরহিত-কামীরাও তাঁর বিষয়ে একেবারে হতাশ হ'য়ে প'ড়ল। তাঁর সকাল-সন্ধ্যার অবসর কাট্‌ত নিজের পাঠাগারে—বই আর চুরুট নিয়ে, এবং ভৃত্য-প্রতিপালিত তাঁর পুত্র সমী-র ত্রিসন্ধ্যা কাট্‌তে লাগল ছাদের উপরে ঘুঁড়ি আর পায়রা নিয়ে।

সমী-র স্বাধীনতায় আমাদের হিংসাও হ'ত, ভয়ও হ'ত। হিংসা হ'ত, কেননা সেটা ছেলেমানুষের স্বভাব; ভয় হ'ত, কেননা আমাদের মধ্যে ছিল ছেলেমানুষির অভাব। আমরা যাকে ছাত্রজীবনের আদর্শ ব'লে মনে ক'রতাম, তাঁর বাল্যকালটায় ভালমানুষির প্রভাবটা বড় বেশী ছিল—ঠিক বিদ্যাসাগরের মত নয়।

ইস্কুলের গণ্ডিটা কোন রকমে পেরিয়ে কলেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সমী-র সামনেকার চুলগুলো অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেলে এবং পিছনের চুলগুলো ঠিক্ সেই অনুপাতে খাটো হ'য়ে এল। এতে আমরা সকলেই শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌লাম; কিন্তু যখন তার সিগারেটের ধোঁয়া শুধু আমাদের নয় আমাদের গুরুজনদেরও নাসারন্ধ্রে ঢুকতে লাগল, তখন আমরা একেবারেই স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। পাড়ার পরহিত-কামীরা যখন এ সংবাদটা সর্ব্বেশ্বর বাবুর গোচর ক'রলেন, তখন তিনি তাতে একটুও বিচলিত হ'লেন ব'লে বোধ হ'ল না।

সমী-র কিন্তু এ সবেতে মোটেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। অপরের মুখ চেয়ে কাজ করা সে বড় শ্রেয় বলে মনে ক'রত না এবং নিজের মুখ লুকিয়ে কাজ করা সে বড় হেয় ব'লেই জানত।

সমী-র সে-সময়কার চেহারাটা আমার এখনও মনে পড়ে—বিশেষ ক'রে তার প্রতিভাদীপ্ত চোখ দুটো। কিন্তু তার সমস্ত প্রতিভা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছিল যত আজগুবি খেয়ালে। পরীক্ষা পাশ করবার মত শক্তি তার যথেষ্ট ছিল; কিন্তু পরীক্ষার দিন যখন ঘনিয়ে এল, তখন পিতাকে জানালে যে সে এক-রকম লেখাপড়া ছেড়ে দিতেই মনস্থ ক'রেছে, সুতরাং—

সর্ব্বেশ্বর বাবু হাঁ-না কিছুই ব'ললেন না।

কলেজ ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কিন্তু সমী-র একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সেও তার পিতার মত একেবারে বই-এর মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে ফেললে। সেই কয় বৎসরের নীরব সাধনায় তার ভিতরে যে জ্ঞানস্পৃহার আভাষ পাওয়া

যেত, তা' যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক থেকে পূরণ হবার নয়, সে বোঝবার বয়স আমার তখনও হয়নি। তাই মনে করতাম, সমী নিজেকে একেবারেই নষ্ট ক'রে ফেললে।

এই সময়টাতে আমি তার কাছে মধ্যে-মধ্যে যেতাম বটে; কিন্তু বিশেষ আমল পেতাম না।

তার পর কি থেকে কি হ'ল জানিনা—একদিন শুনলাম সমী কাউকে কিছু না বলে কলিকাতা ছেড়ে চ'লে গেছে। খবরটাতে মন খারাপ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল, কেননা শত তাচ্ছিল্য সত্ত্বেও সমী-র উপর আমার একটা টান ছিল। সেটা প্রতিভার আকর্ষণ, কি মাতৃহীন স্নেহক্ষুধিত হৃদয়ের উপর একটা মমতার ভাব—তা' ঠিক বুঝতে পারতাম না। সর্ব্বেশ্বর বাবুকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা জান্‌তাম; তাঁর মধ্যে কোন ভাবান্তরও লক্ষ্য ক'রলাম না।

পরে যখন শুনলাম, সমী লাহোরের একটা খবরের কাগজে কাজ আরম্ভ ক'রেছে, তখন কতকটা আশ্বস্ত হলাম বটে,—কিন্তু মন থেকে ক্ষুব্ধ অভিমানের ভাবটা একেবারে গেল না।

বৎসর কয়েক কাটবার পর পরপার থেকে সর্ব্বেশ্বর বাবুর ডাক পড়ল। বুকের ক্রিয়াটা বন্ধ হ'য়ে যাবার সময় তিনি চেয়ারেই ব'সে ছিলেন এবং তাঁর আঙুলের মধ্যে একটা ধূমায়িত চুরুট তখনও ছিল। হাত থেকে যে বই-খানা প'ড়ে গিছল, তার লেখককে কখনও আস্তিক্যদোষ-দুষ্ট ব'ল্‌তে পারা যায় না এবং তার পাঠকও যে ইদানীং সে দোষ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা ক'রছিলেন, সেটাও বেশ বোঝা গেল। সর্ব্বেশ্বর বাবুর সঙ্গে এতদিনে তাঁর সৃষ্টিকর্ত্তার বিচারপড়া হয়েছে কি না জানি না—তবে তাঁর বিষয় নিয়ে পাড়ার কাউকে কখন বিচার ক'রতে দিই নি এবং নিজেও করিনি।

লাহোরে চিঠি লিখে জানলাম—সমী বছর দুই হ'ল কি-একটা খেয়ালের ঝোঁকে সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে কোথায় চ'লে গেছে কেউ জানে না।

তার পিতার মৃত্যু-সংবাদ সমী খবরের কাগজ থেকেই পায়—তা' জানলাম মাসকতক পরে বোম্বাই থেকে তা'র একখানা চিঠি পেয়ে।

হাওড়াতে গাড়ী থেকে নেমেই সমী আমার দাড়ী ধ'রে ব'ললে—সখি মণিমালিনী, তোমার যে এতবড় দাড়ী গজাবে, এমন তো কোন কথা ছিল না।

আমার নাম মণি বটে, কিন্তু আমার মধ্যে সখিত্ব এবং মালিনীত্ব খুঁজে বার ক'রতে একটু বিশেষ রকমের দৃষ্টি-শক্তির আবশ্যক। তবে সমী-র মুখ থেকে যে "অমৃত হলাহলের মিশ্র গন্ধ"টা বেরোচ্ছিল, তাইতেই যে তাকে অন্ধ ক'রেছিল তা' নয়; সমী-র ধরণই ছিল ওই রকম। আটবৎসর পরের প্রথম আলাপের আড়ষ্ট ভাবটা এইরূপ একটা হাল্‌কা পরিহাসে অনেকটা সহজ হ'য়ে এল।

বাড়ীর চাবি খুলে সমী-কে সমস্তই বুঝিয়ে দিলাম। তার এই নূতন অধঃপতনের পরিচয় পেয়ে মনটা যে খুব প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল,—তা' নয়।

বাড়ী এসে স্ত্রীকে ব'ললাম—সমী-র খাবারটা তাকে পাঠিয়েই দিও। সে বোধ হয় আস্‌তে পারবে না, বড়ই ক্লান্ত।

মীরা শুনে একটুও বিচলিত হ'ল না। ব'ললে, তারই বা দরকার কি? ওঁর সঙ্গে লোকজন আছে নিশ্চয়, নিজেই বন্দোবস্ত ক'রে নিতে পারবেন বোধ হয়।

নিছক অভিমানের কথা—তবে অভিমানটা আমার উপর কি সমী-র উপর, তা বুঝ্‌তে পারলাম না। ব'ললাম, সেটা কি ভাল হবে? স্ত্রীজাতি স্বামীর বাল্যবন্ধুদের উপর মনে মনে তুষ্টিভাব পোষণ করে না জানি। তবু এতটা তাচ্ছিল্য—

খাবার যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছল। মীরা আর কিছু উচ্চবাচ্য ক'রলে না।

তার পরদিন সমী-র বাড়ী গিয়ে দেখি, নীচেকার ঘর-গুলা সব অন্ধকার। শুনলাম, সমী ছাদে আছে।

ছাদের উপর সতরঞ্চি পাতা। চীনেদের তৈরী দু'খানা আরাম-কেদারা—তার একখানায় সমী চুপ ক'রে শুয়ে

আছে। পাশে একটা টিপয়, তার উপর পূর্ণ ডিক্যাণ্টার, অর্দ্ধশূন্য গ্লাস এবং প্রায়-শূন্য সিগারেট-কেস্। একটা বোলে কয়েকটা সযত্ন-রক্ষিত গোলাপ, আর তার নীচের থালায় একরাশ ছোট ফুল।

সেদিন যত পুরাণো কথাই হ'ল। পাড়ার চিরাচরিত জীবন-যাত্রার কোন্ ফাঁকে কার ভণ্ডামি ধরা পড়েছিল, কার পদোন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে চরিত্রের অবনতি ঘটেছিল, কার কীর্ত্তিকলাপ আদালত পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল—এই সব পর-চর্চ্চার মধ্যে সমী-র নিজের অতীত জীবনের কথাও বাদ যায়নি। সেই কবে কলেজ পালিয়ে ঘোড়-দৌড়ে যাওয়া এবং বাজী জিতে একটা ইংরাজী হোটেলে অর্দ্ধ-রাত্রি পর্য্যন্ত যাপন করা—সে সব কথাও হ'ল। সমী জিজ্ঞাসা করলে, মণি, এখনও কি তোমার সে রকম ভয়-ভয় ভাব আছে?

এখনও মদ খাওয়া অভ্যাস করিনি শুনে, সমী ব'ললে—খুব ভাল। তবে একটা কথা আমি এখনও বুঝে উঠ্‌তে পারি না। তোমরা তো সকলেই ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ, কিন্তু তোমরা সব গলা চিরে, মাথা ঘুরিয়ে হাজার রকমের কসরৎ ক'রে যে আনন্দটা পাও—যার তোমরাই নাম দিয়েছ কারণানন্দ—সেটা যদি দু'একগ্লাস সত্যিকারের কারণবারি পান ক'রে পাওয়া যায়, তাতে লাভ বৈ লোকসান আছে কিনা।

আমি কারণানন্দের বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কাজেই কিছু উত্তর দিতে পারলাম না। সমীকে এটাও সঠিক খবর দিতে পারলাম না যে, সোমরস ব'লতে পাতা-চোয়ানো ভাঙ্‌ কি ফুল-চোয়ানো মদ বোঝায়। আমার বৈদিক সাহিত্যে বিশেষ গবেষণা নেই শুনে সমী নিজেই মদের অনেক গুণ ব্যাখ্যা আরম্ভ ক'রলে।

এতক্ষণ সে চেয়ার ছেড়ে পায়চারি করছিল। একটু থেমে গ্লাসটী শূন্য ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলে—মণি, তুমি বিয়ে ক'রেছ?

—ক'রেছি বৈ কি।

—কোথায়?

—লাহোরে। বিরাজ রায়ের মেয়েকে।

—বিরাজ বাবুর?—কোন্ মেয়ে?

—মেজ—মীরা—তুমি তাঁদের চিন্‌তে নাকি?

সমী ততক্ষণ বোলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে নাকে, মুখে, চোখে গোলাপের স্পর্শ অনুভব ক'রছিল। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ব'ললে—ভাখ মণি, এ জিনিসটা—অর্থাৎ ফুলকে ছিঁড়ে চট্‌কে মট্‌কে ভোগ করাটা—একেবারে নিছাঁক বর্ব্বরতা। অথচ মানুষ ভোগ্য বস্তুর পীড়ন না ক'রে ভোগ ক'রতেই জানে না। তাতে ভোগ জিনিস-টাকে একেবারে নর্দ্দামায় টেনে আনা হয় এবং ভোগের অবসান না হ'য়ে ভোগেচ্ছাটা বেড়েই যায়।

—কিন্তু তাতে যে মাদকতা আছে সেইটেই কি আসল ভোগ নয়?

—কিন্তু তার প্রতিক্রিয়াটা? সেইখানেই তো যত গোল। এই গোলটার সমাধান ক'রতে না পেরে বেচারা ওমর খৈয়াম কতই না হা-হুতাশ ক'রে গেছে। সে জানত না যে এর সমাধানের একমাত্র উপায় হ'চ্ছে—সংযম।

সমী-র মুখে সংযমের কথা! তখনও যে অর্দ্ধ-শূন্য ডিক্যাণ্টার সামনে!

মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া বার ক'রে সমী ব'লতে লাগল—এই খানেই আমাদের দেশের দার্শনিকেরা ইরাণ কবির উপর 'স্কোর' ক'রেছে। ভোগ ক'রতে হবে, কিন্তু নির্লিপ্ত হ'য়ে—অর্থাৎ ভোগ ক'রবে প্রভুর মতন, কোন কিছুতে বাঁধা না প'ড়ে। এই যেমন প্রেম—সেটা উপভোগ করা যায় তখনই, যখন প্রেমাস্পদকে নিজের ক'রে নোবার ইচ্ছার উপরে উঠতে পারা যায়। এই ধর না বৈষ্ণবদের মধুর ভাবের আইডিয়াটা—

বাধা দিয়ে ব'ললাম—অর্থাৎ ইহকাল পরকাল সমস্ত কালের ভোগের গোড়ার কথাটাই হচ্ছে সংযম?

—ঠিক বুঝেছ মণি—।

—এবং সেই সংযম-সাধনার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে হুইস্কি-যোগ, কেমন?

সমী হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল। ব'ললে—দ্রাক্ষারস না হোক্, অন্তত একটা রসও গ্রহণ করবার শক্তি তোমার ভিতর আছে শুনে আশান্বিত হলুম।

সে রাত্রে মীরাকে গিয়ে ব'ললাম—কিন্তু মীরার কথা বলবার আগে সমী-র কথাটা একেবারেই শেষ করা ভাল।

সমী-র মদ খাওয়াটা পছন্দ করতাম না, কিন্তু তার কাছে

না গিয়েও থাকতে পারতাম না—তার এমনই একটা আকর্ষণী ছিল।

তাকে প্রায়ই প্রথম দিনের অবস্থাতেই দেখতাম—সেটাই ছিল তার স্বাভাবিক অবস্থা; তখন তার সঙ্গে অনেক রকম কথাই হ'ত। আবার এক-একদিন দেখতাম, একখানা বই নিয়ে এমন একাগ্র হ'য়ে আছে যাতে দুটো-একটা অন্যমনস্ক উত্তর ছাড়া কথার উত্তরই পেতাম না। উঠে আসতুম—তাও সে জানতে পারত কিনা সন্দেহ। আবার এক সময়ে এমন স্ফূর্ত্তির ভাব দেখতুম, যাতে আমার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য কোথায় উড়ে যেত, তার ঠিকানা থাকত না; সমী-র জিভ্‌কে সে-দিন ঠেকিয়ে রাখাই ভার হ'ত। আবার এক-একদিন দেখতাম, ইজি-চেয়ারে শুয়ে আছে, এমন বিষাদ-গম্ভীর, এমন একটা অবসাদের ভাব, যার জন্যে তাকে বেশী নাড়াচাড়া ক'রতে সাহস ক'রতাম না।

এ সব ভাবের আভাষ ছেলেবেলাতেই সমী-র চরিত্রে পাওয়া যেত; এখন সেগুলো খুব বেশী স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে বুঝলাম।

সমী-র মনের সাম্য-অবস্থাতেই তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা চ'লত ভাল। সে কত রকমের কথা; আর সমী-র কথা বলবার ভঙ্গীই ছিল আলাদা। তার মতামতের এমন একটা অনন্যতন্ত্রতা ছিল, যা' এক-এক সময়ে অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকলেও প্রাণের ভিতর একটা সাড়া না দিয়ে ছাড়ত না। তার আর একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে গম্ভীর বিষয়ের আলোচনার সময় যখন উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তার কথা শুনছি, তখন হঠাৎ অতর্কিত ভাবে একটা তরল পরিহাসে সে সমস্ত বিষয়টাকে একেবারে উঁচু থেকে নীচুতে নাবিয়ে দিত। ফলে এই হ'ত যে, সমী যে কোথায় তাত্ত্বিক এবং কোথায় পরিহাস-পরায়ণ, এটা বোঝা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ত। তার ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং তার চেয়েও ধারালো পরিহাস-প্রবৃত্তি —এই দুটো নিয়ে খেলা করা সমী-র পক্ষে যত সহজ ছিল, সেগুলো ঠিক-মত বোঝা তার শ্রোতার পক্ষে সেইরূপই কঠিন হ'ত। কিন্তু এ সমস্তেরই ভিতর দিয়ে তার যে ব্যক্তিত্ব ফুটে বেরুত, তার সামনে মাথা নত না ক'রে থাকতে পারা যেত না। আসলে, সমী তার প্রতিভাটা নষ্ট ক'রছিল, এবং সেই নষ্ট করাতেই সে একটা তীব্র আমোদ পেত;—বেদুইন যেমন নিজের উরুতে বর্শাফলক পূরে দিয়ে আনন্দ পায়—অনেকটা সেই রকম।

পাঞ্জাবের অনেক কথা সমী ব'লত—তার ঘর-মুখো বন্ধুর কাছে সেগুলো শোনাতো আরব্য উপন্যাসের মত। মনে হ'ত একাধিক-সহস্র রজনীর অনেকগুলো রজনীর ইতিহাস যেন সমী-র গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।...... মনের চক্ষে ভেসে উঠ্‌ত লাহোরের এক-একটা চাঁদনি রাত। গ্রীষ্মে ছাদের উপর তরুণীর মেলা; মল্লিকা ফুলের মত তাদের রং, সুতীক্ষ্ণ নাসা, সুতীব্র কটাক্ষ, আধ-আলো, আধ-ছায়ায় তাদের "কত কাণাকাণি" আর "মন জানাজানি।"......শীত্‌কালের দুপুরে সরু গলি-পথ খাটিয়া পেতে জুড়ে ব'সত যত সুন্দরী পুরনারী; বিদেশী যুবকের সলজ্জ দৃষ্টি তাদের উপর প'ড়ত; পাশ দিয়ে একটু পথ খুঁজে নেবার চেষ্টায় তাদের বীণা-কণ্ঠে তরল হাস্য-লহরী খেলে যেত, আর তাদের সেই দুর্ব্বোধ্য ভাষায় পরিহাস—এ সব কল্প-কথার মতই মনে হ'ত, আর আমার প্রাণের ভিতরটা একটা ক্ষণিক চঞ্চলতায় অভিভূত ক'রে তুলত।... ..বুক-উঁচু ছাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে রাতে লুকোচুরী খেলা, কাশ্মীরি ললনার আহ্বান-দৃষ্টি, পাঞ্জাবী শ্রেষ্ঠিকন্যার ঈর্ষ্যা এবং তার পরিণতি—এ সমস্ত কথাই সমী নিঃসঙ্কোচে ব'লে যেত। প্রহসন যে কত সময় ট্র্যাজেডিতে পরিণত হ'তে-হ'তে রয়ে গিছল, তা শুনে এক-এক সময় আমার বুকের রক্ত দ্রুত চলতে আরম্ভ ক'রত। এর ভিতরে ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি-দুর্নীতির কথা মনেই উঠত না; সমী-র বলবার ভঙ্গিতে সমস্ত জিনিসটা যেন একটা হালকা ছেলেমানুষি ব্যাপার ব'লেই মনে হ'ত।

কল্পকথার পাঞ্জাব বোগ্‌দাদি আবহাওয়ার সূক্ষ্ম বোর্‌কায় আবৃত হ'য়ে আমার কাছে দেখা দিত। সমী ব'লত—সে আবহাওয়ার একটা নেশা আছে, একেবারে চেপে ধরে। কিন্তু সে নেশা কাট্‌তেও সময় লাগে না বেশী।

—কি রকম?

—কোমল নারী-কণ্ঠে "সাডা" "তোয়াডা" শুনলেই ও নেশাটা ছুটে যায়। ওদের মাতৃভাষাটা পুরুষদের মধ্যেই

আবদ্ধ থাকা উচিত, মেয়েদের জন্য উর্দ্দুর ব্যবস্থা করাই ভাল। কিন্তু কেই বা ক'রবে? আর্য্যসমাজ আগাগোড়া হিন্দি চালাবার পক্ষপাতী। মন্দ নয়, উর্দ্দুর মত না হলেও পাঞ্জাবী ভাষার চেয়ে ঢের বেশী শ্রুতিমধুর।

পাঞ্জাবী আবহাওয়ার নেশায় সমী আরও ব'লত—ওটা শ্যাম্পেনের নেশার মত—একেবারে মাথায় চড়ে যায়— ইতর মস্তিষ্কে সহ্য হয় না; কিপ্‌লিংএর অবস্থা হয়। কিপ্‌লিংএর শক্তি অসাধারণ, সেটা অস্বীকার করবার যো নেই; তার ভিতর যদি আভিজাত্য অথবা কাল্‌চারের একটুও লেশ থাকত, তাহ'লে সে একটা বড় আর্টিষ্ট হ'তে পারতও বা। কিন্তু সে ছিল একটা ছোট জাতের ইংরেজ; তাই নেশায় ডুবে সে যা রত্ন তুলেছে, তার সঙ্গে সমাকর্ষণী শক্তিতে উঠে এসেছে অনেকটা কাদা ও পাঁক।......আসল পাঞ্জাবকে যদি কেউ এঁকে দেখাতে পারত, তো সে বলেন্দ্র ঠাকুর। তার অসমাপ্ত লাহোর-চিত্রের খসড়া দেখলেই তা বোঝা যায়।

এই কথা থেকে চিত্রকলা-পদ্ধতির কথা উঠল। পাঞ্জাবে-আদৃত কাংড়া পদ্ধতিতে আঁকা নারীর মুখে যে কোমল লাবণ্যের ভাব আছে, তা' কোনো দেশের কোন শিল্পীই অনুকরণ করতে পারেনি। আশ্চর্য্য কিন্তু, ও-দেশের নারীর মুখে আর্য্য তীক্ষ্ণতার ভাবটাই বেশী পরিস্ফুট।

সমী ব'ললে—ওইখানেই আদর্শ আর বাস্তবের সঙ্গে যত বিবাদ। আসল শিল্প তো প্রকৃতির নকল ক'রে তৃপ্তি পায় না। সে একটা নূতন কিছু সৃষ্টি ক'রতে চায় এবং সেই নূতনত্বতাই কালে প্রকৃতিকে অনুসরণ ক'রতে হয়। এই হিসাবে আদর্শটাই সত্য, সেটা real না হ'লেও সত্য, আর প্রকৃতিই অনুকরণকারী, শিল্পী নয়; শিল্পী সৃজনকারী।

আমি একটু কুণ্ঠিত ভাবে ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির অস্বাভাবিকত্বের দিকে সমী-র দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলুম।

সমী একটু উত্তেজিত হয়েই ব'লতে লাগল—কিন্তু এ অস্বাভাবিকত্বের ধারণাটা এল কোত্থেকে? কুশিক্ষাটা হচ্ছে একেবারে গোড়াকারই গলদ। ধ্যানে যে মূর্ত্তি ফুটে ওঠে, দর্শনে তা মনে একটা বিশেষ ভাব জাগিয়ে তোলে, তখন কোথায় থাকে অস্থিসংস্থানের জ্ঞান, আর পরিপ্রেক্ষণের খোঁজ? সে খোঁজটা যখন আসে তখন সৌন্দর্য্য-ভোগটা একেবারেই শেষ হয়ে গেছে জেনো।

এই থেকে স্বভাবতই রাস্কিন-স্থাপিত pre-raphelite brotherhood এর পরিণামের কথা উঠল এবং সেই সূত্রে য়ুরোপের আদর্শ এবং বাস্তব—দুই রকম শিল্পেরই বিকাশ ও পরিণতি বিষয়ে সমী অনেক কথা ব'লেছিল মনে আছে; কিন্তু সে সব কথা তুলে আজ আর কথা বাড়াবার দরকার বোধ করি না।

পরিশেষে সমী ব'ললে—একটা কথা মনে রেখো, মণি! সেটা হ'চ্ছে অধিকারী-ভেদ। উচ্চাঙ্গের শিল্প সকলের জন্য নয়। ইতরের জন্য রবিবর্ম্মাই ব্যবস্থা।

তারপর চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠে ব'ললে—আমার নিজের মতামত ছেড়ে দিলেও, তোমরা যে বাস্তব-বাস্তব কর, বাস্তবিক কটা লোক তোমাদের মধ্যে বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত? তোমরা যে ছবিতে লতানে আঙ্গুলের আপত্তি কর, আমি সে তা' নিজের চক্ষে দেখেছি।

—কোথায়?

—লাহোরে—সব্জি মণ্ডির একটা ড্রেনের ধারে।

প্রথমটা আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম, তারপর সমী বুঝিয়ে দেবার পর ব্যাপারটা বোধগম্য হ'ল।

সমী একদিন প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে ওই রকম তিনটা আঙুল দেখেছিল—কোনও সুন্দরীর হাত থেকে যেন অতর্কিতে অস্ত্র দিয়ে কাটা। একটা আঙুলে আংটার পাতলা কালো দাগটা তখনও ছিল।

সমী ব'ললে—আমি অবশ্য পুলিশে খবর দিইনি। নিজেই তদন্ত আরম্ভ করলুম।

শিল্পের কথা ভুলে গিয়ে গল্পের কথায় মেতে উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—তারপর?

—তারপর আর কি—তদন্তটা ছেড়ে দিতে হ'ল একটা বেনামী চিঠি পেয়ে। স্ত্রী-হস্তের লেখা চিঠি। তাতে ছিল—আপনার প্রতি অনুনয়, তদন্তটা শেষ ক'রবেন না যদি এক পুরমহিলার সম্ভ্রমের উপর আপনার এতটুকুও শ্রদ্ধা থাকে।

ব'ললাম—চিঠিটা পেয়ে তুমি একটুও বিচলিত হলে না?

—হ'তুম, যদি সেদিন তার চেয়েও একটা গুরুতর কাজে না ব্যস্ত থাক্‌তুম!

গল্পটা শুনে আমি নিজে একটু বিচলিত হ'য়েছিলাম, তাই জিজ্ঞাসা ক'রলাম—এর চেয়েও কি গুরুতর কাজ থাকতে পারে তোমার?

—একটা ফর্‌সী তৈরী ক'রতে দিয়েছিলুম, তার আওয়াজের পরখ্ ক'রতেই অর্দ্ধেকটা দিন কেটে গিছল।

আমার বন্ধু সমী-র এই পরিচয়ই যথেষ্ট বোধ হয়।

(আগামী বারে সমাপ্য)

বিশ্ব-ভারতী

[শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল্]

ছন্দ ও অবয়ব (Rhythm and Form)

বিশ্ব-বিশ্রুত কলা-কুশলী ষ্টকহলম্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার অসওয়াল্ড সাইরেণ প্রণীত Essential in Art পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। আর্ট বিষয়ক ৫টী প্রবন্ধ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে প্রথম প্রবন্ধ "Rhythm and Form" ১৯১৭ সালে সুইডেন ভাষায় চীনদেশীয় চিত্রকলাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীর উপক্রমণিকা রূপে লিখিত হয়। ইহা যে কেবল মাত্র প্রাচ্য চিত্র-কলা সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাহা নহে; ইহা সকল দেশের চিত্র সম্বন্ধে উপযোগী বলিয়া আমরা নিম্নে এই সুচিন্তিত প্রবন্ধের সার মর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

(১)

প্রকৃতির পন্থানুসরণ করাই কলার উদ্দেশ্য। চিত্রকর ও ভাস্করের প্রধান কর্ত্তব্য প্রকৃতির যথাযথ বর্ণন। কথাটা সত্য হইলেও, সম্পূর্ণ সত্য নহে। চিত্রকর ও ভাস্কর কেবল মাত্র নকল-নবীশ পটুয়া নহে। প্রকৃতি-বর্ণন, দর্শন ভিন্ন সম্ভবপর নয়। আর এই দর্শন ব্যাপারটা সকল সময়ে আমরা নিজের চক্ষে করি না। আমাদের পূর্ব্বসূরীরা, যাঁহারা যশের উন্নত শিখরে উঠিয়াছেন, তাঁহারা যে ভাবে দেখিয়াছেন, আমরাও অনেক সময়ে সেই সকল মহাজনদিগের পথানুসরণ করিয়া দেখিয়া থাকি। আবার পুরাতন সংস্কার লইয়াও অনেক সময় দর্শন করিয়া থাকি। এই সংস্কারের (prejudice) হাত হইতে রক্ষা পাওয়া বড় সোজা কথা নয়। এখন প্রকৃতি বলিতে বাহ্য-জগৎই ধরা হউক। চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে বাহ্য-জগতের বিষয় ফুটানও বড় শক্ত। আপনার বাগানের যে গাছটা, অথবা আপনার প্রাচীর-গাত্র-বিলম্বিত নানা বর্ণের কাগজখানি, যাহা আপনি প্রত্যহ দেখিয়া থাকেন, তাহা স্মৃতির সাহায্যে উদ্ধার করিয়া অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়া দেখুন,—যথাযথ অঙ্কন করিতে পারিবেন না। উহারা আপনার মনে সাধারণ ভাবের (General Idea) যে ছাপ দিয়া যায়, তাহারই বলে আলো ও আঁধারের (light and shade) নিয়মানুসারে চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিবেন।

বাহ্য-জগতের চিত্রই যখন প্রকৃতির অনুরূপ হয় না, তখন অন্তর্জ্জগতের চিত্র ফুটাইয়া তোলা আরও যে কত দুরূহ ব্যাপার, তাহা আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। প্রকৃতি বলিতে বাহ্য-জগতের ব্যষ্টি বা সমষ্টি বুঝায় না। বাহ্য-জগৎ সৎ নহে। মানবের মনের ভাবের পরিবর্ত্তনের সহিত বাহ্য-জগৎ ও রূপান্তরিত হইয়া থাকে। বাহ্য-জগতের সত্তা আমাদের বোধ-শক্তির উপর নির্ভর করে। বাস্তবিকই প্রকৃতি মানবের ভাবরাজির সমষ্টি মাত্র।

আর্টের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, প্রকৃতির সত্তা তখনই

বুঝা যায়, যখনি ইহা আমাদের সংবিদের ঘরে বর্ণ ও অবয়বের ভাব লইয়া উপস্থিত হয়। চিত্রকর বা ভাস্কর কেবল মাত্র দ্রষ্টা নহে স্রষ্টা। দর্শন মানসিক প্রক্রিয়া মাত্র; কিন্তু এই প্রক্রিয়া নানাবিধ সাধারণ ভাব (concepts) ও ভাব-সন্নিবেশ (association of ideas) বশে পরিচালিত হইয়া থাকে। সাধারণ দর্শকের সহিত, চিত্রকর দর্শকের পার্থক্য এই স্থানে।

তবে এখানে একটা কথা উঠিতে পারে, যদি প্রত্যেক লোকের বিভিন্ন ভাবের সহিত প্রকৃতি জড়িত হয়, তাহা হইলে কি করিয়া সাধারণ ভাবের চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে? উত্তরে এই কথা বলিতে পারা যায়, দর্শন ও দ্রষ্টব্য পদার্থ হইতে ভাব গ্রহণ অধিকাংশ সময়ে অনেক লোকেই একরূপ করিয়া থাকে। তাই কলা-বিদ্যায় সার্ব্বজনীনত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে অবয়ব (Form) ও কার্য্যকরী শক্তি (Function) এই দুইটী সাধারণ ভাবের নিদর্শন সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়।

অবয়বের ভাব (Concept of Form) বুঝিতে পারা যায়, স্থানের ব্যাপকতা (Space) লইয়া। দ্রষ্টব্য পদার্থগুলি আমাদের মনে যে সুস্পষ্ট ও দৃঢ় ভাবের উদ্রেক করে, তাহার দ্বারাই তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

কার্য্যকরী শক্তির ভাবের (Conception of function) উদয় হয় বস্তুর অবয়বের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে। মানসিক বৃত্তিগুলির সহিত দেহের অংশবিশেষের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। মানসিক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ (Expression) আছে। এই সকল কার্য্যকরী শক্তি মুখ্যতঃ ভাবের উপর, এবং গৌণ ভাবে বাহিরের দ্রব্যের উপর নির্ভর করে। চিত্রকর এবং ভাস্কর তিনিই, যিনি অঙ্কিত চিত্রের বা মূর্ত্তির মধ্য দিয়া ভাবের খেলা দেখাইতে পারিবেন; কিন্তু এই ভাবের খেলা দেখাইতে গিয়া, অবয়বকে একেবারে বাদ দিলে চলিবে না। তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কলাবিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকৃতির অনুসরণ অথবা বস্তু বা দ্রব্যের যথাযথ চিত্রণ নয়; ঐ সকল দ্রব্যের মানসিক ভাবের স্ফূরণ ও বিকাশ সাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে কি কলাবিৎ চিত্রবিদ্যার কোনও আইন-কানুন কিংবা তর্ক-শাস্ত্রের নিয়মগুলি মানিয়া চলিবেন না? নিশ্চয়ই তাঁহাকে ঐ সকল নিয়মের বশে চলিতে হইবে। মানসিক ভাবের চিত্রণ তখনই কলা নামে অভিহিত হইবে, যখন বর্ণ ও রেখা-সম্পাতে অবয়বগুলি প্রকৃতির অনুসারী হইবে। তবে এ কথাও ঠিক, অবয়ব বলিতে তিন দিক—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ—যে বুঝিতে হইবে তাহা নহে; সমতল (flat)ও বুঝিতে হইবে। বস্তু-চিত্রণে অবয়বের তিন দিকই আবশ্যক; কিন্তু এইরূপ চিত্র-বিদ্যার সহিত অপর এক প্রকার চিত্রবিদ্যা আছে, যাহাতে কেবল মাত্র ভাবের স্ফূরণই দেখিতে পাওয়া যায়; এবং এইগুলি স্থান, কাল বা অবয়বের আইনকানুন মানিয়া চলে না। পাশ্চাত্যজগতের চিত্রবিদ্যায় শেষোক্ত পদ্ধতি সর্ব্বত্র অবলম্বিত হয় নাই; কিন্তু প্রাচ্যজগতে বিশেষতঃ প্রাচীন চীনদেশীয় চিত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ ভাবে অনুসৃত হইয়াছে।

(২)

যে চিত্রকর কেবল মাত্র প্রকৃতির অনুসরণ করে, তাহার চিত্র যথাযথ নকল হইতে পারে, কিন্তু তাহার ভিতর প্রাণের স্পন্দন বা সাড়া পাওয়া যায় না। শুধু অবয়বের দিকে লক্ষ্য রাখিলে, প্রাণহীন পুত্তলিকা নির্ম্মিত হইবে। চিত্র বা মূর্ত্তিকে প্রাণবন্ত করিতে হইলে, কলাবিদ্‌কে যে শক্তি সঞ্চারিত করিতে হইবে তাহাই ছন্দ। কলার ছন্দ আর গানের তাল একই। গান আবৃত্তি করিলে তাহা হৃদয়গ্রাহী হয় না; সুর সংযোগে তালের বশে গীত হইলে, হৃদয়ে ভাবের ঝঙ্কার উঠিয়া থাকে—হৃদয়ের পরতে-পরতে স্পন্দন অনুভূত হয়। তালকে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় না, ছন্দকেও সেই রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাল কর্ণপটহে ঝঙ্কৃত হইয়া হৃদয়ে ভাবের বন্যা যেরূপ ছুটাইয়া থাকে, ছন্দও সেইরূপ দর্শনেন্দ্রিয়ে আঘাত দিয়া ভাবের লহর ছুটায়।

এই ছন্দের দ্বারা ভাবের গতি, গভীরতা ও প্রসার বুঝিতে পারা যায়। ছন্দ বাহ্য ও অন্তর উভয় প্রকার ভাবের দ্যোতক। ভ্রমণ ও নর্ত্তনে ছন্দ আছে; কার্য্যে ও অবসাদে ছন্দ আছে। ছন্দ হইতে বুঝিতে পারা যায়, কোনও শক্তিধর পুরুষ চিত্রের ভিতর আপনার শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন।

ছন্দ উৎপাদন করাই কলাবিদের অন্যতম লক্ষ্য। এই ছন্দ চিত্রের অবয়বের উপর নির্ভর করে না। অবয়বগুলির সংস্থান প্রকৃতির অনুসারী হইলে যে বেশী ছন্দ উৎপন্ন হইবে, তাহা সকল সময়ে বলিতে পারা যায় না। অবয়বের ভিতর দিয়া শক্তি সঞ্চারণেই ছন্দের উৎপত্তি। (It is to be

found rather in the revelation of forces than in the display of forms, and is therefore not greatly affected by any attempts to accomplish the illusion of objective reality).

এই ছন্দ যে কেবল কাব্যে ও গানে, চিত্রে ও ভাস্কর-খোদিত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা নয় ; বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই ছন্দ দেখিতে পাওয়া যায়।

চিত্রে রেখায় (line) ও তুলিকার কোমলতায় (tone) ছন্দের উৎপাদন করিতে পারা যায়। সরল ভাবে বলিবার জন্য দুইটা উপায়ের নাম করা হইয়াছে। বাস্তবিক উপায় দুইটী অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এ স্থলে রেখা অর্থে বিন্দুর সমষ্টি বুঝিলে চলিবে না—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা বেধ বুঝিলে চলিবে না—সমতল বা অবয়বের অংশ বিশেষ বুঝিতে হইবে ; বুঝিতে হইবে অনেকগুলি রেখা সমন্বয়ে সমতলের উপর যে ছবি ফুটিয়া উঠে। আর দ্বিতীয় উপায়টী হইতেছে আলো ও আঁধারের (light and shade) নিয়ম বশে তুলিকার সাহায্যে কোমলতা উৎপাদন করা। গাঢ় রং বা বিভিন্ন রংএর মিশ্রণে ইহা উৎপন্ন হয় না। এই উপায় দ্বারা যাহারা ছন্দ উৎপাদন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা অনেক স্থলেই এক রং ব্যবহার করিয়াছেন (The tonal mode of expression is not dependent on variegated, vivid, or intense colours ; on the contrary artists who have carried this mode of expression to the highest perfection have most nearly approached the use of pure monochrome.) Rembrandtএর শেষ জীবনের চিত্রগুলিতে ও Velasquezএর চিত্রে এই উপায়ে ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহারা কেবল মাত্র সোণালী ও রূপালি রং ব্যবহার করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই পথানুসারী চীন ও জাপানী চিত্রে ভারতীয় কালিতে অঙ্কিত চিত্রগুলিতে যে দিব্য ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অন্যত্র সুদুর্লভ। সরল উপায়ে অঙ্কিত এই সকল চিত্র দর্শকের মনে শক্তি ও জীবন সঞ্চার করিয়া ছন্দ উৎপাদন করে। লেখক মহাশয় ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই।

(৩)

এক্ষণে দেখা যাউক, চিত্রকলা প্রকৃতিকে কতটা পরিবর্ত্তন করিতে পারে ; আর প্রকৃতিই বা কতটা চিত্রকলাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। ফটোগ্রাফ সাহায্যে বস্তুর স্বরূপ তুলিতে পারা যায় বলিয়া অনেকের ধারণা আছে ; কিন্তু কথাটার মধ্যে খুব যে সত্য নিহিত আছে তাহা নয়। ফটোগ্রাফ সাহায্যে গতিশীল বস্তুর অসংখ্য অবস্থার ভিতর এক বা ততোধিক অবস্থার চিত্র উঠিতে পারে সত্য ; কিন্তু যে কার্য্যকরী শক্তি বলে ঐ সকল অবস্থার সংঘটন হয়, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না ;—পাওয়া যায় না ভাবের চিত্র—আর পাওয়া যায় না, যে স্থানে ঐ বস্তু অবস্থিত তাহার উদ্দেশ্য। এক কথায় বলিতে গেলে, ফটোগ্রাফ প্রাণহীন চিত্র। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ফটোগ্রাফ সাহায্যে প্রকৃতির অনুরূপ চিত্র তুলিতে পারা যায় না। বাস্তব চিত্র (Realistic paintings) বলিয়া যে সকল চিত্রের আদর আছে, তাহা ফটোগ্রাফ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই সকল চিত্রকরকে শ্রেষ্ঠ কলাবিৎ বলিতে পারা যায় না ; কারণ, তাঁহারা 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' শ্রেণীর লোক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চক্ষু দ্বারা যে দর্শন কার্য্য আমরা সম্পন্ন করি, তাহার পশ্চাতে প্রাণ থাকা চাই। এ সকল চিত্রকরের চিত্রে তাহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণ দর্শক ফটোগ্রাফ ও এই শ্রেণীর চিত্র দেখিয়া কোনরূপ প্রাণের সাড়া পায় না। লেখক মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন,—The painter who produces such pictures may have a wonderful command of all technical means, yet he is not a great master if his visual perception, which is not simply an action of the eyes but of soul and mind, does not carry him beyond that which is perceived by any ordinary observer.

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, চিত্রকলা প্রকৃতির ভিতর প্রাণের স্পন্দন আনিতে পারে ; জড় ও অচেতনকে প্রাণবন্ত করিতে পারে। প্রকৃতি চিত্রকলাকে কিন্তু সেরূপ কিছুই করিতে পারে না। অবয়ব ও ছন্দ হইতেছে দেহ ও প্রাণ। প্রকৃতি বা অবয়ব যেমন চিত্রকলায় আবশ্যক, ছন্দও তেমনি আবশ্যক।

(৪)

ছন্দের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা বা লক্ষণ বর্ণনা করা সহজ নয়। প্রাচীন চীনদেশীয় চিত্রকলা পদ্ধতিতে ছয়টা নিয়ম আছে; যথা—(১) দিব্য ছন্দ ও জীবনের গতি, (২) গৃহাদির চিত্রে তুলির ব্যবহার, (৩) প্রকৃতির অনুসারী অবয়ব-সংস্থান, (৪) বস্তুর স্বাভাবিক বর্ণ-যোজন, (৫) গঠন ও ভঙ্গী, (৬) আদর্শের অনুকরণ। চীনের প্রাচীন চিত্রকরেরা এই ছয়টী নিয়ম মানিয়া চিত্র অঙ্কিত করিতেন। তাঁহাদের চিত্রে দিব্য উদ্দেশ্য পরিস্ফুট থাকিত। আর এই ছয়টার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়ম সকল শিল্পীরই মানিয়া চলা উচিত। নব্যপন্থীরা এই সকল নিয়ম মানিয়া চলেন না; তাঁহারা কেবল মাত্র দিব্য ছন্দ ও জীবনের গতিকে (Spiritual rhythm and movement of life) প্রাধান্য দিয়া থাকেন।

য়ুরোপীয়, চিত্রকলায় এই ছন্দের দিকটা ততটা পরিস্ফুট হয় নাই। মানবের মূর্ত্তির যথাযথ অঙ্কন ও দৈহিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ সাধনই ইহার প্রধান লক্ষ্য। দেবতাকেও এই শ্রেণীর চিত্র-করেরা মানবের দৈহিক সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া অঙ্কিত করিয়া থাকে। যে অসীম এই সীমাবদ্ধ জীব-জন্তুর জনক, তাঁহার বিষয় তাহারা ধারণাই করেন-না। পাশ্চাত্য চীন ও জাপানী চিত্রকরেরা এই অসীমের প্রভাব উপলব্ধি করিয়া, উদ্দেশ্যমূলক চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। তাহাদের চিত্রে দেহের সৌন্দর্য্য বা নগ্ন-সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

তথাগত

[জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ]

যৌবনেতে যুবরাজ হইয়া সন্ন্যাসী
ত্যাগের মাহাত্ম্য দেব করিলে প্রচার;
প্রেমময়ী প্রণয়িনী বাহু-ডোরে তোমা
পারেনি রাখিতে বেঁধে;—পুত্র সুকুমার,
বিশাল সাম্রাজ্য আর কেহই পারেনি
তিলমাত্র বিচলিতে সাহসে দুর্ব্বার!

তোমার অমৃতবাণী অশ্রুত অপূর্ব্ব,
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" করিয়া ব্যাখ্যা
জগতে স্থাপিলে তুমি বিরাট্ বিশাল
শান্তিরাজ্য ভ্রাতৃপ্রেম—অতি সুমহান্;
সত্য আর ন্যায় ধর্ম্ম তোমার কল্যাণে
নববেশে নবভাবে পাইল "নির্ব্বাণ"!

তোমার আত্মার প্রভো, অমোঘ প্রভাবে
স্বৈরিণীও মুক্তি পেল হরসিত মনে,
তাহার সর্ব্বস্ব আনি সঁপিল চরণে;
অম্বপালি সরণিও হ'ল জেতবনে।
সেইরূপ হয় যেন নিষ্কাম সাধনে
অগ্রসর দেশবাসী—প্রণমি চরণে!

সম্পাদকের বৈঠক

[২৪]

১। গো-দুগ্ধই শিশুদের প্রধান খাদ্য। দৈবাৎ কোনও দিন গো-দুগ্ধের অভাব হইলে, অথবা দুগ্ধ পাইতে বিলম্ব হইলে, শিশুদের উৎকৃষ্ট এমন কোন খাদ্য আছে কি, যাহার দ্বারা দুগ্ধের স্থান কতকটা পূরণ হইতে পারে? আজকাল বাজারে শিশুদের নানারূপ কৃত্রিম খাদ্য পাওয়া যায়। ঐ সকল Patent শিশু-খাদ্যের মধ্যে কোন্‌টী সর্ব্বোৎকৃষ্ট?

২। অনেক শিশু দেখা যায়, দুগ্ধ পান করাইবার অব্যবহিত পরেই উহা বমি করিয়া দেয়; এবং কতকটা দুগ্ধ ছানার আকারে পতিত হয়। শিশুর এ প্রকার বমি হওয়ার কারণ কি? এবং উহা নিবারণের কোনও সহজ উপায় আছে কি না?

শ্রীস্নেহলতা ঘোষ, কাজিপুর।

[২৫]

গড়-ভবানীপুরের বাদশাহ কে?

আমতার উত্তর-পশ্চিমে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে গড়-ভবানীপুর নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। সেখানে গিয়া পূর্ব্বকালের ইষ্টক-নির্ম্মিত কোন অট্টালিকার ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ সকল দেখিতে পাইয়াছিলাম। গ্রামবাসীরা বলিল, "এখানে একটী গড় ছিল; এখন কালের গতিকে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া মাটীর ভিতর বসিয়া গিয়াছে। এই গড়ে না কি কোন বাদশাহ বাস করিতেন। যদি করিতেন, তাহা হইলে কোন্ বাদশাহ, কত সালে এখানে বাস করিতেন? আর তাঁহার নামই বা কি?

শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহিড়ী, শিলিগুড়ি।

[২৬]

কৌলিক উপাধি-রহস্য

১। কৌলিক উপাধি সকল কতদিন হইতে এদেশে প্রচলিত হইয়াছে? উহাদের অর্থ কি এবং প্রত্যেক নামের পশ্চাতে যুক্ত থাকিয়া বিভিন্ন জাতি কিংবা শ্রেণী ভিন্ন উহা দ্বারা অন্য কোনও কিছু বোঝা যায় কি? ২। গোত্র সমুদায়ের উৎপত্তির কারণ কি? কবে এবং কিরূপে উহারা প্রচলিত হইয়াছে? পুরাকালেও কি উহাদের প্রচলন ছিল? একই গোত্র নানা জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় কেন?

শ্রীবিনয়েন্দ্র কিশোর গুপ্ত, বেলেঘাটা।

[২৭]

বিবিধ প্রশ্ন।

(ক) এমন কোন প্রকার ঔষধ আছে কি, যা গায়ে লাগাইলে মশা কামড়ায় না? (খ) ভারতবর্ষে কত প্রকার চাউল আছে? কোন্ চাউল ভাল, কোথায় বেশী জন্মে? (গ) ব্রাহ্মণ-বধূরা তাঁহাদের স্বামীর উপাধি পান না কেন? স্বামীর উপাধি লইলে কোনও প্রকার দোষ স্পর্শিবে কি? (ঘ) টক্ দেখিলেই সরসরিয়ে জিহ্বায় জল আসে কেন? বৈজ্ঞানিকেরা উত্তর করিবেন। (ঙ) তাস খেলার আবিষ্কারক কে? এ খেলা আমাদের দেশে আমদানি করিলই বা কে?

শ্রীনগেন্দ্র ভট্টশালী।

[২৮]

উদ্ভিদ ও জাতিতত্ত্ব

১। পাতি গাঁদাফুলের গাছের ডাল উল্টা করিয়া পুতিয়া দিলে বড় গাঁদা হতে দেখা যায়; উহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কি? ২। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর ভিতর কতপ্রকার জাতি আছে? প্রত্যেক জাতির নামসহ উত্তর চাই। ৩। সময় সময় চোখের পাতা ঘন-ঘন পড়িতে দেখা যায়। স্ত্রীলোকের বাঁ চোখ, আর পুরুষের ডান চোখ নাচা মঙ্গলের, এবং স্ত্রীলোকের ডান চোখ ও পুরুষের বাম চোখ নাচা অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ কি?

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, গৌহাটী।

[২৯]

এণ্ডি সূতা ও কাপড়

আসামজাত এণ্ডির সূতা গুটি হইতে কি কলের সাহায্যে প্রস্তুত হয়, না, চরকা বা টাকুর সাহায্যে হয়? প্রথম প্রকারে হইলে সেইরূপ সূতা প্রস্তুতের কল আমাদের দেশে পাওয়া যায়, কি ইউরোপ, আমেরিকা হইতে আনাইতে হয়? দ্বিতীয় প্রকারে মজুরদিগের দ্বারা চরকা কিম্বা টাকুতে প্রস্তুত হইলে, তাহা পড়তায় পোষায় কি না,—এবং এই এণ্ডি কাপড় তাঁতে প্রস্তুত হয় কি কলে হয়?

শ্রীআলতিফ করিম, হাজারিবাগ।

[৩০]

শ্লেট পেনশিল

শ্লেট পেনশিল সহজ উপায়ে প্রস্তুত করিবার প্রণালী কি? সাধারণতঃ ছোট ছেলে-মেয়েরা শিবমাটী দ্বারা দুই প্রকার পেনশিল প্রস্তুত করে। তাহা অতি সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। ইহা শক্ত করিবার কোন উপায় থাকিলে, কি উপায়? আমি দুই-একটী উপায় জানি—১। শিবমাটীকে গুঁড়া করিয়া জল দ্বারা মিশাইয়া লম্বা ভাবে গোল করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া অল্প আগুনে পোড়াইতে হয়। পোড়া হইয়া গেলে দেখিতে কাল বা লাল রং ধারণ করে। ২। ইহাও পূর্ব্ব নিয়মে গুঁড়া করিয়া ন্যাকড়া দ্বারা ছাঁকিয়া, সরিষার তৈলের সহিত মিলাইয়া, সামান্য রৌদ্রের তাপ দিয়া আগুনে রাখিতে হয়। ইহা পূর্ব্ব প্রণালীর পেনশিল হইতে কিছু শক্ত বলিয়া মনে হয়। ইহা ঠিক কি না? যদি এ বিষয়ে কিছু জানেন, আপনার ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া সাধারণকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীপ্রেমলতা সরকার।

[৩১]

অদ্ভুত কৌতূহল

(১) বর্ষাকালের প্রথম ভাগেই বৃষ্টি হইলে দেখা যায়, পুকুরের কিনারায় পুঁটী ও মৌরলা মাছ দল বাঁধিয়া খেলা করে। তাহাদের প্রায় সকলেরই দুই পার্শ্বে (মুখ হইতে লেজ পর্য্যন্ত) গাঢ় লাল দুইটী ডোরা পড়ে। ডোরাটী এক যবোদরের কম প্রশস্ত নহে; ঐ ডোরা মাছের কাঁটা পর্য্যন্ত পৌঁছান থাকে। লোক বলে মাছ 'সাড়ি' পরিয়াছে। ব্যাপারটা প্রকৃত পক্ষে কি? (২) রুই, কাতলা, মৃগেল, বাউস প্রভৃতি মাছ পুকুরে পোনা উঠায় না কেন? কোন উপায়ে পুকুরে মাছের পোনা করা যায় কি না? (৩) শীতকালে মাছ বঁড়সীতে টোপ খায় না। তখন মাছ কি খাইয়া থাকে? (৪) যাহারা নদীতে চার ফেলিয়া বঁড়সীতে মাছ ধরেন, তাঁহারা কাছিম ও কড়িকাটুকার উপদ্রবে বিব্রত হন। মাছ না পলায় অথচ ঐ সকল উপদ্রব না থাকে, এমন কোন ব্যবস্থা বিশ্বকর্ম্মা করিতে পারেন কি? (৫) ঢাকা অঞ্চলে বঁড়সীতে বহু কাতল মাছ মারা পড়ে। কিন্তু ময়মনসিংহে অনেক কম পড়ে। নদীতে কাতল মাছ আমি গত ১৮ বৎসরে একটীও ধরিতে পারি নাই। কেন? (৬) কেহ-কেহ মাটীতে

বঁড়সী ফেলেন, কেহ ৩৷৪ আঙ্গুল ঝুলাইয়া দেন, কোন্‌টা শ্রেয়ঃ? (৭) মাছের টোপ সম্বন্ধেও কি ঋতুভেদ আছে? কোন্‌ টোপ কোন্‌ মাছ কখন খায়? শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মস্‌য়া (ময়মনসিংহ)।

[৩২]

ব্যাকরণের পুরাতত্ত্ব

গীতার দশম অধ্যায়ে ৩৩শ শ্লোকের প্রথম চরণে আছে—

"অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।"

অর্থাৎ অক্ষরসমূহমধ্যে আমি অকার এবং সমাসসমূহমধ্যে আমি দ্বন্দ্ব। সুতরাং প্রশ্ন হইতেছে—১। গীতার সময় কোন সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল কি না? থাকিলে, উহার নাম কি জানা গিয়াছে? ২। পাণিনির বয়স কত? ৩। গীতা কি পাণিনির পরবর্ত্তী? অথবা ৪। গীতার এই অংশ কি পরে রচিত এবং প্রক্ষিপ্ত?

শ্রীনরেন্দ্রকুমার ঘোষ, নদীয়া।

(৩৩)

জ্যোতিষিক প্রশ্ন

আকাশের কোন-কোন তারাকে লাল দেখা যায় কেন? ভারতবর্ষের কোন্‌-কোন্‌ স্থানে observatory (মানমন্দির) আছে? এবং কোথাকার observatory সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন?

শ্রীশরৎকুমার সেন, দিনাজপুর।

(৩৪)

নিব তৈয়ারীর কল

১। নিব তৈয়ারী করিবার জন্য সুলভ কোন কল আছে কি না, এবং তাহাতে Hinksএর G nibএর মত নিব তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর কি না? কত মূলধনে নিবের ব্যবসায় আরম্ভ করা যাইতে পারে? ছুঁচ, আলপিন, তারকাটা প্রভৃতি লৌহের জিনিষ প্রস্তুত করিবার সহজ কোন পন্থা আছে কি না? ২। জুতার, পোষাকের, চুলের, ঘোড়ার বুরুষ তৈয়ারী করিবার প্রণালী আলোচনা করিলে সুখী হইব।

শ্রীআশুতোষ দাসগুপ্ত, উজিরপুর, বরিশাল।

(৩৫)

কলাগাছের ক্ষার

কলাগাছ হইতে কি প্রণালীতে ক্ষার উৎপাদন করা হয়, উহার সবিশেষ বিবরণ চাই। শ্রীরাধাগোবিন্দ মিত্র, গজিনা, দাসপুর, হুগলী।

(৩৬)

কলাগাছের লবণ

১৩২৮সালের আশ্বিন সংখ্যায় সম্পাদকের বৈঠকে জানিলাম যে কলাগাছের ক্ষারে পটাশ সোডা আদি আছে। কিন্তু উহা কি উপায়ে কেমন করিয়া পৃথক করিতে পারা যায়?

শ্রীরামকুমার চন্দ্র, পানাবাজার, মেদিনীপুর।

[৩৭]

লা-গালার চাষ

'লা' গালার চাষ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিবার জন্য একান্ত বাসনা।

শ্রীঅমূল্যরতন মুখোপাধ্যায়, বি-এল, কুমারভোগ, ঢাকা।

উত্তর

বইএর পোকা নিবারণ

ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩২৮ সংখ্যায় সম্পাদকের বৈঠকের [২] সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর—বই, বাক্স কিংবা আলমারী বন্ধ করিয়া রাখিতে নাই—খোলা তাকে (shelfএ) রাখা ভাল। য়ুরোপে, আমেরিকায় এবং ভারতের বড়-বড় লাইব্রেরীতে খোলা বা র‍্যাকে বই রাখিয়া বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে। বইএ হাওয়া লাগানো দরকার। আলমারি বন্ধ থাকিলে দিনের মধ্যে একবার অন্ততঃ ঘণ্টা খানেকের জন্যও কবাট খুলিয়া রাখা উচিত, এবং অন্ততঃ সপ্তাহে একবার বই বাহির করিয়া সামান্য রৌদ্রে ১০।২০ মিনিট রাখা দরকার। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া বই ঝাড়িতে হইবে। বইএর গোড়ালীতে (সেলাইএর স্থানে) ধূলা জমে; বই উপুড় করিয়া সামান্য আঘাতে ধূলা বাহির করিতে হইবে, এবং নরম ব্রাস্‌ বা কাপড়ের টুকরা দিয়া মুছিতে হইবে।

ড্যাম্প বা স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় বই রাখিবে না। শেল্‌ফ দেয়ালের গায়ে লাগানো হবে না, এবং তাহার চারি পায়ের নীচে পাথরের বা মাটীর খাদা দিতে হবে, তাহাতে ফিনাইল অথবা আল্‌কাতরা দিতে হবে; অভাবে বাল্‌। শেল্‌ফএ কিছু-কিছু ন্যাফথলিন রাখিবে। কেহ-কেহ কৌটায় করিয়া তরল ক্রিয়োজোট রাখেন; তাহাও ভাল। কিন্তু এতদুভয়ই ব্যয়সাধ্য। অথচ একটা থাকা চাই। কেহ-কেহ কর্পূর রাখেন; তাহাতে আরো বেশি খরচ—কারণ, কর্পূর সহজেই উড়িয়া যায়। বইএর মলাটের ঠিক নীচে ২।১টি করিয়া নিমপাতা রাখিলে বেশ উপকার হয়। তুঁতের গুড়া মলাটের নীচে দিবে। মলাটে বা পাতায় ছিদ্র হইলে, তাহাতে অবশ্য তুঁতের গুড়া দিবে। দপ্তরীর লেইএ তুঁতে নিশ্চয়ই থাকে। বেশি তুঁতে দিয়া paste করিয়া মলাটের ছিদ্র বুজাইতে হইবে। জনৈক লাইব্রেরিয়ান্‌।

কাঞ্চী কোথায়?

"গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "কাঞ্চী কোথায়?" প্রশ্ন করিয়া লিখিয়াছেন,—"কেহ কেহ বলেন উত্তরবঙ্গে কাঞ্চী নামে দেশ ছিল।" ইহা ঠিক নয়। অযোধ্যা ও হরিদ্বারের পাণ্ডারা নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়ায়—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।

পুরী দ্বারবতী জ্ঞেয় সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥ গরুড়-পুরাণম্‌।

এই কাঞ্চীদেশ মান্দ্রাজের অধীন কঞ্জিভরম্‌ স্থানের নাম। পূর্ব্বে কাঞ্চী চলিত; এখন নব্য শিক্ষায় ধর্ম্ম-বিপ্লবের সঙ্গে-সঙ্গে নামেরও বিপ্লব ঘটিয়াছে। তথায় "শিব কাঞ্চী" ও "বিষ্ণু কাঞ্চী" নামে দুইটি

স্থান আছে। শ্রীরাজেন্দ্রকুমার সেন, ডিজু বাগান, উত্তর লক্ষ্মীপুর—আসাম।

কাঞ্চীপুর মান্দ্রাজ হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমায় ২৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কাঞ্চীপুর যাইতে হইলে আকনিম লাইনে কাঞ্চিপুরম ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। শ্রীহেমন্তকুমার রায়, মহাদেবপুর, বুড়ুল, ২৪ পরগণা।

কাঞ্চী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

ইতিহাসে অনুসন্ধান করিয়া কাঞ্চী সম্বন্ধে যে যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।—প্রবাদ আছে, নগরেষু কাঞ্চী:—নগরের মধ্যে কাঞ্চী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাস্তবিক, এককালে কাঞ্চী জগতের সর্ব্বপ্রধান নগর বলিয়া বিদিত ছিল। সে দেড় হাজার বৎসর আগেকার কথা। (১) কাঞ্চী অতি প্রাচীন সহর। অতি পূর্ব্বে (অবশ্য যে সময় হইতে হিন্দুগণের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায়) দাক্ষিণাত্যে তিনটী বিশেষ প্রসিদ্ধ পরাক্রমশালী দ্রাবিড় রাজ্য ছিল—চেরা (কেরল), চেলা এবং পাণ্ড্য। চেরা মালাবার উপকূলে, চেলা করমণ্ডল উপকূলে, এবং পাণ্ড্য ঐ দুই রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত ছিল। উহাদের অভ্যুদয়ের কিছু কাল পরে, প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, উহাদের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া পল্লব বংশীয় রাজগণ কাঞ্চীতে (কৃষ্ণা ও কাবেরীর মধ্যস্থলে) প্রবল হইয়া উঠেন এবং কাঞ্চীই তাঁহাদের রাজধানী হয়। (২) ইতিহাসে এই স্থানে কাঞ্চীর নাম পাওয়া যায়; কিন্তু পরাশর তাঁহার মহাভাষ্যে কাঞ্চীনগর ও কাবেরী নদীর নাম করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, পল্লবগণের আগমনের পূর্ব্বেও বোধ হয় কাঞ্চীর সত্তা বিদ্যমান ছিল। রাজধানীর নামানুসারে পল্লবগণ তাঁহাদের রাজ্য কাঞ্চীমণ্ডল নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়েন কাঞ্চীতে আসিয়া, তাহার ঐশ্বর্য্য দর্শনে এরূপ মুগ্ধ হন যে, তিনি কাঞ্চীকে জগতের শ্রেষ্ঠতম নগর বলিয়াছেন। আমি এই কারণে, দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে কাঞ্চী যে সর্ব্বপ্রধান নগর বলিয়া বিদিত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তৎকালে নাগরিকগণ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল রাজা বৌদ্ধ হইলেও হিন্দু ও জৈন-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। এই কারণে কাঞ্চী রাজ্যে তৎকালে সুন্দর-সুন্দর হিন্দু ও জৈন-মন্দির ও বৌদ্ধদিগের বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অন্য প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েন্‌সাং কাঞ্চীনগরে গিয়াছিলেন। সে সময় কাঞ্চীর চরমোৎকর্ষ সাধিত হয় পল্লবগণ দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ চালুক্যবংশীয়।

রাজা পুলকেশিন দ্বিতীয়কে পরাস্ত করিয়া অতীব পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন। (৩) হুয়েন্‌সাং কাঞ্চীর খুব প্রশংসা করিয়াছেন কাঞ্চী তখন দৈর্ঘ্যে ছয় মাইল ছিল। জ্ঞানে, বিদ্যায়, বিক্রমে, শিল্পে ও সাহিত্যে সকল বিষয়ে কাঞ্চীর অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় কাঞ্চী সম্বন্ধে চীন পর্য্যটকদ্বয় বড় বেশী কিছু বলেন নাই।

ইহার পর দুই-এক শতাব্দী পর্য্যন্ত পল্লবদিগের প্রতিপত্তি সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চীর প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। খ্রীষ্টীয় একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে পল্লবগণ হীনবল হইয়া পড়েন। (৪) সেই সময় হইতে কাঞ্চীর প্রাধান্য লোপ পায়। তৎপরে কাঞ্চী সম্বন্ধে ইতিহাসে উল্লেখ যোগ্য কিছুই পাওয়া যায় না। এই ত গেল ঐতিহাসিক তথ্য এক্ষণে কাঞ্চীর বর্ত্তমান অবস্থার কথা যৎকিঞ্চিৎ বলিলেই আমার বক্তব্য শেষ হয়।

কাঞ্চীর বর্ত্তমান নাম কঞ্জিভরাম (Conjeeveram)। মান্দ্রাজ হইতে রেলে ৫৬ মাইল দূরে কঞ্জিভরাম। মান্দ্রাজ হইতে পশ্চিমে বম্বে পর্য্যন্ত বড় লাইন গিয়াছে এবং দক্ষিণে লঙ্কা পর্য্যন্ত ছোট লাইন গিয়াছে বম্বের পথে ৪৩ মাইল দূরে আরকোনম ষ্টেশন এবং লঙ্কার পথে ৩০ মাইল দূরে চিঙ্গলপট ষ্টেশন; আরকোনম ও চিঙ্গলপটের মধ্যে ছোট লাইনের একটী শাখাপথ। এই দুই ষ্টেশনের মাঝামাঝি কঞ্জিভরাম ষ্টেশন

কাঞ্চী-নগর বা কঞ্জিভরাম দুই অংশে বিভক্ত। যে অংশে শৈবদিগের বাস, তাহার নাম শিবকাঞ্চী; যে অংশে বৈষ্ণবদিগের বাস, তাহার নাম বিষ্ণুকাঞ্চী। আয়তনে ও ঐশ্বর্য্যে শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী হইতে বড়। শিবকাঞ্চীতে ১০৮টা শিবমন্দির আছে। বিষ্ণুকাঞ্চীতে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধান প্রধান মন্দিরের কারুকার্য্য বড় সুন্দর ও সূক্ষ্ম। কতকগুলি অতি প্রাচীন দেবমন্দির আছে। বর্ত্তমান কাঞ্চীর লোক-সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বড় বেশী হইবে না। নাগরিক সংখ্যা এত হইলেও দেব

---

(১) In the fifth century, the Chinese traveller Fahian regarded it (Kanchi) as the grandest city of the world.—Sastri, ch. x, p. 49.

(২) In later times, (After the rise of the three Kingdoms Chera, Chela and Pandya) the Pahlavas, probably a branch of the Parthean Kings of Persia, rose to power at Kanchi—A. C. Mookerjee, ch. III, p. 31.

The ancient Dravidian States were disturbed and overshadowed by......the Pahlavas who made Kanchi their capital.—V. A. Smith, ch. ix, p. 61.

(৩) The Pahlavas attained the maximum of their power in the seventh century when they destroyed Pulkesin II, Chalukya.—V. A. Smith, ch. ix, p. 61.

(৪) The ancient kingdom Chera, Chela, Pandya and Palhava had been by this time (eleventh and twelfth century) reduced to lowest stage of their political existence.

মন্দিরগুলি ব্যতীত বাসের জন্য অট্টালিকা কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় সকলেই কুটীরবাসী। এখানে ব্রাহ্মণদিগের সম্মান অত্যন্ত অধিক। একপথে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র চলিলে শূদ্রকে ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া চলিতে হয়। কাঞ্চীর বর্ত্তমান অবস্থা তথায় যাইলেই সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায়; কিন্তু তৎসম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন; বিশেষতঃ মাদৃশ ব্যক্তির শক্তি ও জ্ঞানে কুলায় না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলে সুখী হইব।

কেহ-কেহ উত্তরবঙ্গে কাঞ্চীর অবস্থিতির কথা বলিয়াছেন। তাহা অন্য কাঞ্চী হইলেও হইতে পারে; কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত ঐ কথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মজুমদার, নলহাটী।

লেবু গাছের পোকা

লেবু গাছের পোকাগুলি হল্‌দেবর্ণ লম্বায় একইঞ্চি বা কিছু বেশী। যে গাছে পোকা ধরিয়াছে তাহার ডাল কাটা ও করাতের গুঁড়ার মত নীচে দেখিতে পাইলেই, পোকা ধরিয়াছে বুঝা যায়। আর ডালে ছিদ্র দেখিলেই পোকা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যে সকল ডালে পোকা হইয়াছে, তাহা চিরিয়া ফেলিলেই পোকা পাওয়া যায়। সেই পোকা মারিয়া ফেলিতে হয়। এক একটা গাছে শতাধিক পোকাও পাওয়া যায়। ডাল খাইয়া ভিতর দিয়া গোড়ায় পোকা পঁহুছিলেই গাছ মরিয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পোকা মারিয়া মাঝে-মাঝে গাছে ধূম লাগাইলে ও তামাক পাতার জল মাসে মাসে দিলে ভবিষ্যতে পোকা হইতে পারে না।

আলুর পোকা

আলুর পোকা মাটীর নীচে থাকে। রাত্রে তাহারা উপরে উঠিয়া গাছ খায়। অতি প্রত্যুষে বা রাত্রেই উহাদিগকে মাটীর উপরে পাওয়া যায়, তখন উহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে হয়। ক্ষেত্রে মানুষ আসিয়াছে বুঝিতে পারিলে তাড়াতাড়ি গিয়া মাটীর নীচে পালায়। মাটী খুঁড়িলেও পোকা পাওয়া যায়। উহাদিগকে মারিয়া মাঝে-মাঝে তামাক পাতার বা চূণের জল দিলে তাদের বংশ নাশ হয়। গোবরের সার আলুর পক্ষে বিশেষ উপকারী। দোআঁশ বেলেমাটী ভাল। তাজা গোবরে পোকা ধরিয়া গাছ মরিয়া যায়। উল্লিখিত উপায়ে পোকা মারিলে গাছের কোন ক্ষতি হইবে না। শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ, এম-আর-এ-এস।

লাক্ষার সন্ধান

নিম্নলিখিত বইগুলিতে লাক্ষা সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য পাওয়া যাইবে—

(1) Lac Production, manufacture and trade.
By I. E. O'connor.

(2) Lac and Lac cultivation,
By D. A. Avasia.

(3) Lac and Lac Industries,
By George Watt.

(4) Cultivation of Lac in the plains of India,
By C. S. Misra.

নিম্নোক্ত ঠিকানায় নিব তৈয়ারীর কল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে—

The Bengal Small Industries Co.,
91, Durga Charan Mitter St., Calcutta.

দেশী পেন্সিল ও কলম

(1) Small Industries Development Co. Ltd.
38, Russa Road South, Calcutta.

(2) Messrs. F. N. Gupta,
12, Beliaghatta Road, Calcutta.

পেন্সিল

(3) The Madras Pencil Factory,
Washermanpet, Madras.

কলম

(4) The Eastern Small Industries Ltd., Dacca.

(5) Messrs. S. Gupta & Co. Ltd.,
45-1, Harrison Road, Calcutta.

ভাদ্রমাসের ১৪নং প্রশ্নের উত্তর।

কোনও পাত্রে খানিকটা কার্ব্বলিক এসিড ঢালিয়া তাহার ভিতর একখণ্ড উত্তপ্ত লৌহ ফেলিয়া দিলে, কিছুক্ষণ পরে উহার মধ্য হইতে এক প্রকার গ্যাস উঠিবে। দরজা জানালা বন্ধ থাকিলে ঐ গ্যাসের জোরে ঘরের মাছি মশা সব মরিয়া যাইবে। দরজা জানালা খোলা থাকিলে, মাছি মশা তিষ্ঠিতে না পারিয়া পলাইয়া যাইবে। ঔষধটি পরীক্ষিত।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী। পাইকপাড়া, ঢাকা।

আশ্বিন মাসের ১৪নং প্রশ্নের উত্তর।

খানিকটা গরম জলে সাবান গুলিয়া তাহার সহিত খানিকটা কেরোসিন তৈল মিশাইতে হয়। ঐ কেরোসিন মিশান জল, যে গাছে পোকা ধরিয়াছে, সেই গাছে ছিটাইয়া দিতে হয়। এরূপ ভাবে দুই-তিন দিন লেবু-গাছে জল ছিটাইলে, পোকা আর থাকে না।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী। পাইকপাড়া, ঢাকা।

সুন্দরবনে লোকাবাস

গত পৌষ মাসের "ভারতবর্ষে" সম্পাদকের বৈঠকে "সুন্দরবনে লোকাবাস" শীর্ষক ১৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরে, অল্প সময়ের মধ্যে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা লিখিতেছি।

পূর্ব্বে সুন্দরবন অঞ্চলে যে লোকের বসতি ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। পুরাতন ভগ্নাবশেষ অট্টালিকাও একাধিক দেখা গিয়াছে।

ফরাসি পর্য্যটক বার্ণিয়ার (Bernier) ১৬৫৫ খৃঃ অব্দে ভারতে আগমন করেন। তিনি দক্ষিণ-বঙ্গের অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন :—

"মোগলদের ভয়ে আরাকান-রাজ নিজ রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে চাটগাঁও নামক বন্দরে পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগকে জমি দিয়া বসতি করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এই পর্ত্তুগীজের ব্যবসা জলপথে এবং স্থলপথে লুঠ করা। ছোট এবং বড় নানাবিধ পোত-সাহায্যে উহারা প্রায়ই গঙ্গার শাখা, প্রশাখা দিয়া ৬০।৭০ ক্রোশ পর্য্যন্ত দেশের ভিতরে প্রবেশ করিয়া লুঠপাঠ করিত। তাহারা অকস্মাৎ আপতিত হইয়া বহু নগর, স্থানবিশেষে সমবেত লোকসমষ্টি, হাট বাজার, ভোজ বা বিবাহ সভা প্রভৃতি লুঠ করিয়া সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী এবং লোকসমষ্টি হরণ করিয়া লইয়া যাইত। ছোট বড় সব স্ত্রীলোককে তাহারা বন্দী করিয়া রাখিয়া অদ্ভুত প্রকারে যন্ত্রণা দিত, এবং যে সমস্ত বস্তু তাহারা হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারিত না, তাহা পোড়াইয়া ফেলিত। এই কারণে গঙ্গার মোহানার নিকট এমন অনেক সুন্দর জনশূন্য দ্বীপ দেখা যায়, যেখানে পূর্ব্বে বহু লোক বাস করিত, কিন্তু এখন সেখানে বন্য পশু বিশেষতঃ ব্যাঘ্র বাস করে।"

Bernier's Travels, p. 156-857 (Bangabasi edition).

Good Old Days of Honourable John Company নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের (vol II.) ৮৫।৮৬ পৃষ্ঠায় সুন্দরবন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য আছে :—

"কলিকাতার দক্ষিণস্থিত যে সুন্দরবন অধুনা ব্যাঘ্র, গণ্ডার এবং কুম্ভীরের আবাস হইয়াছে, পূর্ব্বে উহা উর্ব্বরাভূমি ছিল; এবং বহু জনপূর্ণ অনেক নগরও ঐ অঞ্চলে ছিল। প্রাচীন ভ্রমণকারীরা সুন্দরবন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, ঐ অঞ্চলের নিবিড়তম অংশে আবিষ্কৃত প্রাচীন অট্টালিকাসমূহের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে তাহা প্রমাণিত হয়। ১৬৫৫ খৃঃ অব্দ বার্ণিয়ার, যে কারণে সুন্দরবন জনশূন্য হইয়াছে, তাহা বলিয়া গিয়াছেন (বার্ণিয়ারের কথা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে)। ১৪৪০ খৃঃ অব্দে ভিনিস্ দেশীয় কণ্টি (Conti) নামক পর্য্যটক গঙ্গার মোহানার নিকটে সমস্ত তীরভূমি নগর ও উপবনে পরিপূর্ণ দেখিয়াছেন। ১৬১৩ খৃঃ অব্দে আরাকান-রাজ দক্ষিণবঙ্গ উৎসন্ন করিয়া, সমস্ত অধিবাসীকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। Bolts (বোল্‌টস্) তাঁহার "ভারতের কয়েকটী বিষয়" (Indian Affairs) নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন যে, মগদিগের অত্যাচারে সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রায় ১৬২০ খৃঃ অব্দে ঐ প্রদেশ ত্যাগ করে। তিনি বলেন যে ঐ প্রদেশ অতিশয় উর্ব্বর এবং পূর্ব্বকালে খুব জনবহুলও ছিল।

পর্ত্তুগীজ ও মগ দস্যুরা দাস বিক্রয়ের ব্যবসা করিত; এবং দক্ষিণবঙ্গ লুণ্ঠন করিয়া তাহারা ঐ ব্যবসা চালাইত।

"গত শতাব্দীতে (অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে) পর্ত্তুগীজরা দাসবিক্রয় প্রথা আরম্ভ করে। সুন্দরবন অঞ্চলের অনেক ভগ্নাবশেষ প্রাচীন অট্টালিকা তাহার প্রমাণ। এমন কি ১৭৬০ খৃঃ অব্দেও আক্রা ও বজবজের নিকটস্থ স্থান সকল বিক্রয়ার্থ দাসপূর্ণ পর্ত্তুগীজ ও মগদিগের পোতে পরিপূর্ণ হইত।

১৭৫৮ খৃঃ অব্দের ইষ্ট ইণ্ডিয়া ক্রনিকল্ (East India Chronicle) নামক পত্রিকায় নিম্নলিখিত উক্তি আছে :—

'ফেব্রুয়ারী ১৭১৭—বাঙ্গালার দক্ষিণ অঞ্চল হইতে মগেরা ১৮০০ আঠারশত নগরবাসী ও বালক-বালিকাকে ধরিয়া লইয়া যায়। দশ দিনের মধ্যে তাহারা আরাকান দেশে পৌছিল। আরাকান-রাজের সম্মুখে বন্দীগণকে উপস্থিত করা হয় এবং তিনি শিল্পকার্য্য কুশল লোকদিগকে বাছিয়া লইয়া (উহারা সমগ্র বন্দী সংখ্যার চতুর্থাংশ) নিজের দাসরূপে গ্রহণ করিলেন। অবশিষ্ট বন্দীগণকে গলায় রজ্জু সংযোগে বাজারে লইয়া গিয়া শারীরিক বলের তারতম্যানুসারে কুড়ি হইতে সত্তর মুদ্রা দরে বিক্রয় করা হইল। ক্রয়কারীরা দাসগণকে জমি চাষ করিতে নিযুক্ত করিল; এবং মাসিক ১৫ পনর সের চাউল খোরাকের জন্য দিল। আরাকানের প্রায় বার আনা (চারি ভাগের তিন ভাগ) লোক বন্দীকৃত বাঙ্গালার অধিবাসী অথবা তাহাদের বংশধর।"

Good Old Days of Honourable John Company vol. I. p. 465.

এই রকম অত্যাচারের ফলে দক্ষিণবঙ্গ জনশূন্য হইয়া অরণ্যে পরিণত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি ?

এ বিষয়ে সমসাময়িক প্রমাণও আছে। ইতিহাসাচার্য্য শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় "Studies in Mughal India" বা "মোগল যুগের ভারত" নামক গ্রন্থে "চাটগাঁওএর ফিরিঙ্গি দস্যু" নামক প্রবন্ধে, সামসুদ্দীন তালিস্ নামক জনৈক মুসলমানের মূল পার্সী প্রবন্ধের অনুবাদ দিয়াছেন। মগ ও আরাকানের পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের অত্যাচার কিরূপ ছিল, যাহার ফলে দক্ষিণবঙ্গ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, তাহা এই সমসাময়িক বিবরণ হইতে সুন্দররূপে বুঝা যায়; এই নিমিত্ত ঐ প্রবন্ধ হইতে নিম্নলিখিত অংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম :—

"সম্রাট্ আকবরের সময় হইতে শায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম বিজয় (১৬৬৬ খৃঃ অব্দ) পর্য্যন্ত আরাকানদেশীয় মগ এবং পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ জলপথে আসিয়া বাঙ্গালা লুণ্ঠন করিত। তাহারা হিন্দু, মুসলমান, ছোট বড় স্ত্রী পুরুষ, অল্প কি বেশী, সমস্ত লোককেই বন্দী করিয়া, তাহাদের হাতের পাতা ছিদ্র করিয়া, তাহার মধ্যে সরু বেত প্রবেশ করাইয়া বাঁধিত; এবং একজনের উপর আর একজনকে চাপ দিয়া জাহাজের পাটাতনের নিম্নে ফেলিয়া রাখিত। যেমন লোকে পাখীকে আহার দেয়, সেইরূপ তাহারা উপর হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ও সকালে বন্দীদিগের আহারের নিমিত্ত চাউল ছড়াইয়া দিত। দেশে ফিরিয়া গিয়া, যে সমস্ত বন্দী এত কষ্ট পাইয়াও বাঁচিয়া থাকিত, তাহাদিগকে বলের তারতম্যানুসারে চাষ বা অন্যান্য কাজে লাগাইত; এবং নানা রূপে অপমান ও নির্য্যাতন করিত। অপর বন্দীগণকে উহারা দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে লইয়া গিয়া ওলন্দাজ, ইংরাজ এবং ফরাসী

বণিকগণের নিকট বিক্রয় করিত। কখনও বা উচ্চমূল্য পাইবার আশায় বন্দীগণকে তমলুক বা বালেশ্বরের বন্দরে বিক্রয় করিতে আসিত। ... ফিরিঙ্গী দস্যুরাই বন্দীগণকে বিক্রয় করিতে আনিত। মগেরা সকল বন্দীকে নিজের দেশে কৃষিকার্য্যে ও অন্যান্য কর্ম্মে নিযুক্ত করে। বহু সৈয়দ ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান ভদ্রলোক ঐ সমস্ত দুষ্ট লোকদিগের দাসত্ব করিতে বাধ্য হইয়াছে; এবং বহু সদ্বংশজাত ও সৈয়দবংশীয় মুসলমান মহিলা উহাদের দাসী ও উপপত্নী হইয়াছেন। ঐ অঞ্চলে মুসলমানরা এত অত্যাচার সহ্য করিয়াছে যে, ইউরোপেও সেরূপ লাঞ্ছনা পাইতে হয় নাই। এই লাঞ্ছনা কোন শাসনকর্ত্তার সময়ে কম, কাহারও সময়ে বা বেশী হইত।

"মগেরা বহুকাল ধরিয়া অনবরত দস্যুতা করার ফলে, তাহাদের দেশ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে; এবং তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়াছে। পরন্তু বাঙ্গালা দেশ ক্রমেই জনশূন্য হইয়াছে; এবং দস্যুদিগকে বাধা দিবার শক্তিও ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে দস্যুদিগের যাতায়াতের পথে নদী সকলের উভয় পার্শ্বে একজন গৃহস্থও রহিল না। তাহাদের সচরাচর যাতায়াতের পথে বাক্‌লা অঞ্চল ও বাঙ্গালার অন্যান্য অংশ পূর্ব্বে কৃষিপূর্ণ ও গৃহস্থের বাটী সকল দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল; এবং প্রতি বৎসর ঐ প্রদেশ হইতে প্রভূত পরিমাণে সুপারির কর আদায় হইয়া রাজকোষ পূর্ণ করিত। উক্ত দস্যুরা লুণ্ঠন ও নরনারী হরণ দ্বারা ঐ প্রদেশের অবস্থা এমন করিয়া ফেলিয়াছে যে, তথায় একখানি বসতবাটীও নাই; অথবা একটী প্রদীপ জ্বালাইবার লোকও নাই। অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হইল যে, ঢাকায় শাসনকর্ত্তা কি উপায়ে ঐ নগর রক্ষা করিবেন এবং দস্যুদিগের ঢাকায় আগমনে বাধা দিবেন, কেবল এই চেষ্টায় মন ও শক্তি নিয়োগ করিলেন;—অন্য স্থান রক্ষা করা তো দূরের কথা। ঢাকা-রক্ষার জন্য নিকটবর্ত্তী খালের মধ্যে লৌহশৃঙ্খল সকল এ পার হইতে ও পার পর্য্যন্ত টানাইয়া রাখা হইল; এবং খালের উপরে বাঁশের পোল তৈয়ার করিয়া রাখা হইল।

"মোগল নাবিকেরা মগদিগকে এত ভয় করিত যে, বহুদূর হইতে চারিখানি মগের জাহাজ দেখিলে, একশতখানি মোগল পোত থাকিলেও, মোগল নাবিকেরা কোন রকমে প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলেই সাহস ও বীরত্বের জন্য প্রশংসিত হইত। আর যদি দৈবাৎ মোগল ও মগ পোত কাছাকাছি আসিয়া পড়িত, তবে মোগলেরা অবিলম্বে জলে ঝাঁপ দিত; এবং ডুবিয়া মরাকেও বন্দীত্ব অপেক্ষা শ্রেয়ঃ মনে করিত। ব্রহ্মপুত্র হইতে একটী ক্ষুদ্র নদীর মত একটী নালা খিজিরপুরের ধার দিয়া আসিয়া ঢাকার নিম্নস্থ নালার সহিত মিলিত ছিল। জাহাঙ্গীরের সময় মগেরা এই পথ দিয়া ঢাকা লুঠ করিতে আসিত। ক্রমে এই নালা শুকাইয়া গিয়া এই পথ বন্ধ হয়; এবং মগেরাও ঢাকার অন্যান্য পরগণার গ্রাম সকল লুঠ করিতে আরম্ভ করায়, সহরের দিকে আসিতে চেষ্টা করিত না। অন্যান্য স্থানের সঙ্গে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি মগেরা লুঠ করিতে আসিত; যথা, ভুলুয়া, সন্দীপ, সংগ্রামগড় (অধুনা লুপ্ত), ঢাকা, বিক্রমপুর, যশোর, হুগলী, ভূষণা, সোণার গাঁও, ইত্যাদি।"

Studies in Mughal India, p. 123.

কি অমানুষিক অত্যাচারের ফলে দক্ষিণ বঙ্গ সুন্দরবনে পরিণত হইয়াছে, তাহার কিছু আভাষ দিবার জন্য এত কথা বলিতে হইল। মহাপরাক্রান্ত সম্রাট আকবর, তেজস্বী আরঙ্গজেব প্রভৃতি কেহই মগের অত্যাচার একেবারে বন্ধ করিতে পারেন নাই। শায়েস্তা খাঁর চেষ্টায় মগেরা কিছুকাল খুব জব্দ ছিল; কিন্তু পরে আবার লুণ্ঠন কার্য্য ক্রমশঃ আরম্ভ করে; তাহার প্রমাণ ১৭১৭ খৃঃ অব্দের ঘটনা। কালক্রমে মগের ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়া আসিল; এবং ভারতে পরাক্রান্ত ইংরাজের আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে জলদস্যুর লুণ্ঠন ব্যবসা একেবারেই লোপ পাইয়াছে। ফলে, সুন্দরবনে আবার লোকের বাস আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ,
অধ্যাপক, নড়াল ভিক্টোরিয়া কলেজ,
রতনগঞ্জ, যশোহর।

পিতলের বাসন ঝালাই

পিতল ৵১সের, দস্তা পাঁচছটাক, মিশাইয়া অগ্নি-তাপে গলাইয়া, পাইন প্রস্তুত করিতে হয়। উপরিউক্ত প্রকারে আমাদের বাসনের কারখানায় পিতলের পাইন প্রস্তুত হয়। শ্রীযদুনাথ কর ও শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র কর। কাঁসারিপাড়া, মোঃ সিমলা। ১০৯, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা পুঃ—পাইন ঝালিতে হইলে বিশেষ অভিজ্ঞতা দরকার।

পিপুলের চাষ

সামান্য নরম মাটিতে উত্তমরূপে চাষ দিয়া বড়-বড় মাটির খণ্ডগুলি ধূলার মত গুঁড়া করিয়া ৪ হাত অন্তর এক একটী লতা (পিপুলের) পুতিবেন। যত দিন চারা সতেজ না হয়, ততদিন মধ্যে-মধ্যে একটু-একটু জল দিবেন। লতা বড় হইলে মাচা অথবা ধনিচা গাছ রোপণ করিয়া দিবেন। কেন না লতার অবলম্বন ও ছায়ার প্রয়োজন। ইহার আর কোন পাইট নাই। কেবল কোন স্থানে ছায়ায় ঘাস না জন্মায়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই হইল। একবার লতা পুতিলে ১০ বৎসরের মধ্যে আর কিছু করিতে হয় না। কেবল ঘাস মারিয়া দেওয়া, নূতন লতা রাখিয়া পুরাতনগুলি কাটিয়া ফেলা ইত্যাদি। প্রতি বিঘায় ইহা ১৫মণ পর্য্যন্ত জন্মায়। ফল পাকিলে লতা হইতে এক-একটি করিয়া তুলিয়া তাহা শুষ্ক করিতে দিবেন। অল্প পরিমাণে শুষ্ক হইলে চটের উপর রাখিয়া সাবধানে দলিয়া দিতে হইবে, ইহাতে পিপুলের দানা গোল হইবে। যাহার যেমন দানা, যে পিপুল যেমন গোল, সেইরূপ দরে ইহা বিক্রী হইয়া থাকে। পিপুলের বাগানে আমের কিম্বা কাঁটালের চারা রোপণ করিলে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই গাছ সতেজ ও বৃদ্ধি হইয়া উঠে। বৃক্ষ ফলবান হইলে পিপুলের চাষ বন্ধ করিয়া দিলেই হইল। এ বাগান প্রস্তুতে বিশেষ খরচ নাই।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাশালী, পাইকপাড়া, ঢাকা।

বঙ্গদেশে কচিৎ কোন-কোন স্থানে পিপুল চাষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা একটী মূল্যবান ফসল। পিপুল-চাষে কৃষকের বেশী কিছু পরিশ্রম নাই ; অথচ লাভ খুব বেশী।

ইহা রোপণের সময় বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত। দোয়াসা মৃত্তিকাযুক্ত উচ্চভূমিই (ডাঙ্গা) পিপুল চাষের প্রশস্ত জমি। এক বৎসর ধরিয়া পিপুলের জমি প্রতি মাসে ২।১ বার লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিয়া রাখিতে হয় ; এবং পিপুল রোপণের সময় পুনরায় উত্তম রূপে চষিয়া, মই দিয়া ক্ষেত্রের মাটী ধূলিবৎ চূর্ণ করিতে হয়। এইরূপে জমি প্রস্তুত করিয়া, একফুট অন্তর এক-একটী সারি করিয়া, প্রতি সারিতে অর্দ্ধ হস্ত ব্যবধানে এক-একটী শিকড় অথবা গ্রন্থিযুক্ত পিপুলের লতা (১ ফুট আন্দাজ লম্বা) রোপণ করিয়া, গোড়ায় একটু একটু জল দিতে হয়। এই প্রকারে রোপিত হইলে পর, কিছুদিনের মধ্যে লতাগুলি সতেজ হইয়া উঠে। তখন ক্ষেত্রে আগাছা থাকিলে নিড়াইয়া, কোদালী দ্বারা পিপুল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়।

এইরূপ মাঝে-মাঝে পিপুল ক্ষেত্র নিড়াইয়া, কোদালী দ্বারা খুঁড়িয়া দেওয়া ব্যতীত, ইহার আর কোন বিশেষ পাইট নাই। তবে এই সময় অল্প পরিমাণে ধঞ্চের বীজ ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। কারণ, এই বীজোৎপন্ন বৃক্ষ সকল পিপুল লতাকে ছায়া ও আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকে।

পল্লীগ্রামে বন জঙ্গলে যে সকল পিপুলের লতা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাও ক্ষেত্রে রোপণ করা যাইতে পারে। তবে ইহার মধ্যে আবার দুই জাতীয় পিপুল আছে। এক জাতীয় লম্বা ও সরু ; ইহাকে "ঘোড়া" পিপুল বলে। অন্য জাতীয় অপেক্ষাকৃত মোটা ও বেঁটে ; এই জাতীয় পিপুলই উৎকৃষ্ট। ইহারই লতা সংগ্রহ করিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করা কর্ত্তব্য।

মাঘ মাস হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে পিপুল পাকিয়া উঠে। এই সময় ক্ষেত্র হইতে সুপক্ব পিপুল সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। এইরূপে সমস্ত পিপুল সংগৃহীত হইলে পর, পিপুল গাছের মূল রাখিয়া লতা গুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আবশ্যক মত নিড়ানী ও কোদালী দ্বারা ক্ষেত্র খুঁড়িয়া পুনরায় ইহার পাইট করিতে হয়।

এই প্রকারে পিপুল লতা একবার রোপণ করিলে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর পর্য্যন্ত উত্তমরূপ পিপুল উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরে যখন দেখা যাইবে যে, ক্ষেত্রে আর ভালরূপ পিপুল ধরিতেছে না, তখন উক্ত ক্ষেত্রে অন্যান্য ফসল বপন করিয়া পিপুল চাষ অন্যত্র করা আবশ্যক।

প্রথম বৎসর ইহার ফলন সাধারণতঃ কম হইয়া থাকে। প্রতি বিঘায় গড়ে অর্দ্ধ মণ হইতে এক মণ পর্য্যন্ত হয়। ২য় ও ৩য় বৎসরে দেড় হইতে দুই মণ পর্য্যন্ত পিপুল উৎপন্ন হইয়া থাকে। শুষ্ক পিপুলের দর প্রতি মণ ৪০৲ টাকার কম নহে। আমাদের দেশে এই প্রকার লাভজনক কৃষিতে কেন যে লোকে মনোযোগ করে না, বলিতে পারি না। শ্রীখুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, আদিত্যপুর, শান্তি-নিকেতন (বীরভূম)।

শয়নের সঙ্কেত।

ভারতবর্ষের পৌষএর সংখ্যায় সম্পাদকের বৈঠকে "কয়েকটী প্রশ্ন" (২১)। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর "উত্তর-পশ্চিম দিকে শিয়র না দেওয়ার কারণ এই যে, শরীরের তাড়িত (Electricity) সমুদায় বহির্ভূত হইয়া যায়। ফলে শরীরের ক্ষতি হয়, মাথা ধরে।" শ্রীবাণী দেবী, মোরাদাবাদ।

ভাতের ফেনের সার

ভারতবর্ষের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় দেখিলাম, একজন পাঠক ভাতের মাড়ে গাছের সার হয় কি না তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। তদুত্তরে আমি জানাইতেছি যে, ভাতের মাড় গাছের সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। উহার গাছের একটি উৎকৃষ্ট সার। আমি ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। শ্রীইন্দুমোহন ভট্টাচার্য্য, সোনপুর রাজ, সম্বলপুর (উড়িষ্যা)।

নিরঞ্জন

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু]

১

একদিন সত্য ছিলে, আজ সুধু ছবি—
ছায়ালোকে আঁকা তনু,
মেঘে যথা ইন্দ্রধনু,
রেখায়-রেখায় লেখা—মনে আছে সবি,
গেছে ফুল—রয়েছে সুরভি।

২

একদিন রক্তে তব তুলিয়ে গুঞ্জন—
কত আশা, ভালবাসা
বুকে বেঁধেছিল বাসা,
সেই তুমি আজ সুধু চিত্রিত স্বপন,
ছিলে—মাত্র তারি নিদর্শন।

৩

সেই সে বদন-রাগ হয় নি মলিন,
সেই কুসুমিত হাসি,
আজিও হয় নি বাসি,
সেই কেশরাশি, সেই নয়ন-নলিন,
সেই সবি, সুধু প্রাণহীন।

৪

চারিদিকে জীবনের স্রোত টলমল,
কল-কোলাহলময়
মানব-পুতলিচয়,
হর্ষ-শোক-আশা-ভয়-তরঙ্গ-চঞ্চল,
তুমি সুধু স্তব্ধ অবিচল।

৫

পড়ে মনে যেই দিন প্রথম মিলনে—
চর্চ্চিত-চন্দন-লেখা
হাসিমুখে দিলে দেখা,
চিনিলাম চিরলুব্ধ ভিখারীর ধনে-
চেয়ে সুধু নয়নে-নয়নে।

৬

তোমার মনের কথা জানি না কেমন,
আমি পেয়ে মনোমত,
স্বপ্নঘোর অবিরত,
সহসা জাগালে দিয়ে বিদায়-চুম্বন—
চোখে-চোখে মুদিলে নয়ন।

৭

আঁখি মেলি দেখিলাম সত্যের সংসার,
কালের কালিমা-মাখা
শব-অঙ্গ ফুলে ঢাকা,
আঁখি দুটি পটে আঁকা—আশ্চর্য্য অপার—
আমি কাঁদি, তুমি নির্ব্বিকার!

৮

চলে গেলে সাঙ্গ হ'ল কুসুম-চয়ন,
সাঙ্গ হল ধূলাখেলা,
মাঝে ভেঙ্গে গেল মেলা,
না হ'তে আরতি শেষ—বিজয়া বরণ,
নয়নের নীরে নিরঞ্জন।

৯

এই ত তোমার সেই পাতা খেলা-ঘর,
আশায় জড়ানো ছবি
ছড়ানো রয়েছে সবি,
যা ছিল তেমনি আছে সাজানো বাসর—
নাই সুধু খেলার দোসর।

১০

কে জানে কি ভাবে আছ, কোথায় এখন,
বাজে কি না বাজে ব্যথা,
সুধালে কহ না কথা,
সুধু চেয়ে থাক তুলে নিশ্চল নয়ন,
ভুলেছ কি সকল বন্ধন?

১১

সে কি বিস্মৃতির দেশ? নাই কি সেথায়
আলোকের সনে ছায়া—
মাটীর মমতা-মায়া?
স্নেহ ছিঁড়ে নীড় ছেড়ে পাখী উড়ে যায়—
পিছুপানে ফিরে নাহি চায়?

১২

জ্বেলেছিলে যেই শিখা নয়ন-কিরণে
মানস মন্দিরে মম,
পুষ্পিত সুষমা সম
ছড়ায়ে পড়েছে বিশ্বে বিচিত্র বরণে,
দীপ সুধু নিবেছে ভবনে।

১৩

তীব্র হাহাকারময় হৃদয় শ্মশান—
ধিকিধিকি স্মৃতি জ্বলে,
নিবে না নয়ন-জলে,
পলাইতে চাই—নাই পথের সন্ধান,
ফাঁদে পড়ে কাঁদে সুধু প্রাণ।

১৪

মুছে গেছে জীবনের দীর্ঘ পথ রেখা,
রাত্রিদিন একাকার,
সুধু ধূধূ নিরাশার,
দূর পর-পার চেয়ে ভাবি বসে একা,
কতদিনে পাব পুন দেখা।

জীব-বিজ্ঞান

[শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি]

অম্লজান।

অম্লজান (Oxygen) পাওয়া যায় বাতাস থেকে। আমাদের চারিদিকে যে বাতাস রয়েছে, তার উপাদান ১ ভাগ অম্লজান ও ৪ ভাগ নাইট্রোজেন। বাতাস থেকে অম্লজান পেতে গেলে বাতাসের সঙ্গে রক্তের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা চাই। এ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কি করে হতে পারে? মনে কর, যদি খুব পাতলা চামড়ার এমন একটা থলি থাকে, যার গায়ে সরু সরু রক্তবাহী ক্যাপিলারি ছড়ান আছে এবং যার ভেতরে বাতাস ভরা; তাহলে থলির বাতাস এবং ক্যাপিলারির রক্ত, এদের মধ্যে আদান-প্রদান চলবে, চুইয়ে-চুইয়ে। থলির চামড়া এবং ক্যাপিলারির গায়ের ব্যবধান থাকা সত্তেও এই আদান প্রদান চলবে, ক্যাপিলারির রক্ত এবং সেলদের মধ্যে যেমন করে চলে। এই আদান-প্রদানের ফলে বাতাস থেকে খানিকটা অম্লজান রক্তে যাবে, এবং রক্ত থেকে খানিকটা ময়লা বাতাসে এসে হাজির হবে, অর্থাৎ রক্ত শোধিত হবে। থলি যত বড় হবে, তত বেশী ক্যাপিলারি তার ওপর ছড়ান যাবে, তত বেশী রক্ত একবারে শোধিত হবে, তত বেশী অম্লজান একবারে রক্তে গিয়ে হাজির হবে।

দেহের মধ্যে এই রকম দুটো প্রকাণ্ড থলি আছে। তাদের রাখা হয়েছে আমাদের পাঁজরের ভিতর,—দুদিক জুড়ে দুটী। পাঁজরের ভিতরের গহ্বর কতটুকুই বা! তার ভেতর খুব বড় দুটী থলিকে পূরলে যা হবার তাই হয়েছে; অর্থাৎ, থলি দুটো কুঁকড়ে কুঁচকে এমন হয়ে গেছে যে, তাদের প্রায় নিরেট বলেই মনে হয়। তবে কেটে দেখ্‌লে দেখা যায়, তার ভেতর অসংখ্য ছোট ছোট গর্ত্ত আছে—দেখতে অনেকটা স্পঞ্জের মত। এই দুটো থলির নাম ফুস্‌ফুস্‌। প্রত্যেক ফুস্‌ফুস্‌ থেকে বোঁটার মত একটা করে নল বেরিয়েছে। দুটো নল মিশে একটা বড় নল হয়েছে। সেই বড় নল বুকের ভেতর থেকে উঠে আমাদের গলা পর্য্যন্ত এবং মুখের গহ্বরে এসে শেষ হয়েছে। এই নলকে আমরা গলার নলী বলি। হাত দিয়ে দেখ্‌লে এটা কিরকিরে
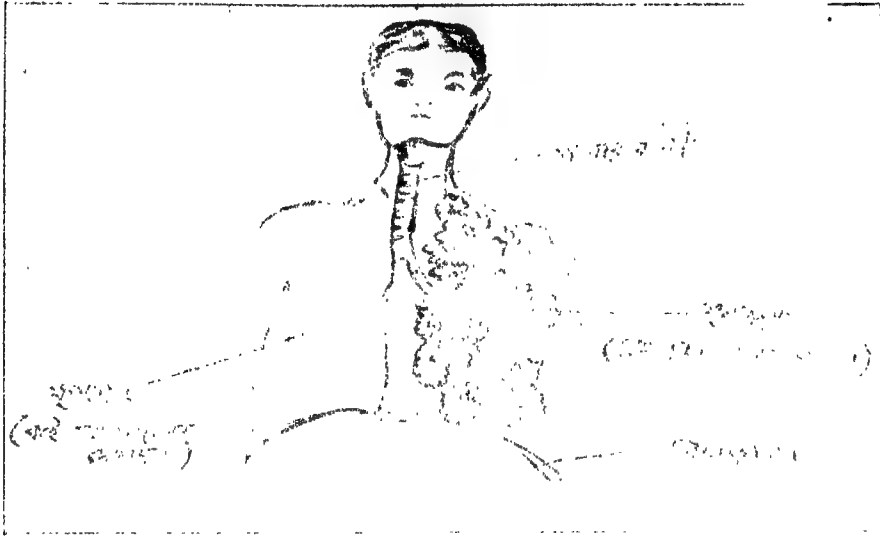
গলার নলী

বলে মনে হয়। আমরা যখন নিঃশ্বাস নিই, তখন নাক বা মুখ দিয়ে বাতাস ঢুকে, এই গলার নলী বেয়ে ফুস্‌ফুসে গিয়ে হাজির হয়। ফুস্‌ফুসের গায়ে, বাইরের দিকে অসংখ্য ক্যাপিলারি ছড়ান আছে। সেল-পাড়ার সমস্ত আবর্জ্জনা কুড়িয়ে রক্ত এই ক্যাপিলারিতে এসে দেখলে আবর্জ্জনা নিক্ষেপের সুবিধা আছে—বাতাসের সঙ্গে নিজের ব্যবধান খুব কম। অমনি কতকটা ময়লা সে ফুস্‌ফুসের বাতাসে ত্যাগ করলে, এবং সেই বাতাস থেকে যতটা পারে অম্লজান নিয়ে নিলে। এই রকম করে রক্তটা হল পরিষ্কার, আর বাতাসটা হল ময়লা। তার পর যখন নিঃশ্বাস ফেললুম, তখন এই ময়লা বাতাস গলার নলী দিয়ে বেরিয়ে গেল। আবার নিঃশ্বাস নিলুম, আবার ভাল বাতাসে ফুস্‌ফুস্ ভরাট হল। এই রকম চল্‌চে, দিনরাত। আমাদের কোন চেষ্টা করতে হচ্চে না, আপনিই চল্‌চে। যখন ঘুমিয়ে পড়ি, বা অজ্ঞান হই, তখনও চলচে। কি করে চলে?

ফুস্‌ফুস্ রয়েছে বুকের গহ্বরে। এই গহ্বরে ঢোকবার একমাত্র পথ গলার নলী দিয়ে; আর কোথাও পথ নেই। পাঁজরার হাড় আর মাংসে চারিদিক আঁটা; এবং তলাতে একটা পর্দ্দা আছে যেটা বুক ও পেটের মধ্যে পার্টিশনের কাজ করচে। এই পর্দ্দাটার নাম ডায়ফ্রাম। এটা পেশী-সেল্ দিয়ে তৈরী, এবং কচ্ছপের পিঠের মত ফুলে বুকের ভেতর ঠেলে আছে। পেশী-সেল্‌গুলা আপনা-আপনি একবার ছোট হচ্চে, একবার বড় হচ্চে। যখন সকলে মিলে ছোট হচ্চে, তখন পর্দ্দাটা চেপ্টে যাচ্চে; আর যখন বড় হচ্চে, তখন ফুলে উঠ্‌চে।

বুকটা যেন একটা পিচকারী। গলার নলীটা তার মুখ, আর ডায়াফ্রাম তার ডাণ্ডি। এই ডাণ্ডি একবার নীচু হচ্চে, একবার উঁচু হচ্চে। নীচু হবার সময় বাতাস ভেতরে ঢুক্‌চে এবং উঁচু হবার সময় বেরিয়ে যাচ্চে।

আর একটা কাজ হচ্চে। ডায়াফ্রাম যখন চেপ্টে যায়, ঠিক সেই সময়ে কতকগুলা পেশীর চেষ্টায় বুকটা ফুলে উঠে, বুকের গহ্বর বেশী বাড়ে এবং বেশী বাতাস ভেতরে ঢোকে; এবং ডায়াফ্রামের ফোলার সঙ্গে-সঙ্গে বুক চেপ্টে যায় এবং ফুস্‌ফুসের বাতাসকে আরও বেশী নিংড়ে বার করে দেয়। অজ্ঞানে, অসাবধানে গলার নলী চেপ্টে গিয়ে পাছে বাতাস যাতায়াতের ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে তার গায়ে কতকগুলা কচি-কচি হাড়ের রিং বসিয়ে সেটাকে শক্ত করা হয়েছে; এত শক্ত যে টিপে সহজে বন্ধ করা যায় না।

এত আয়োজনের অর্থ এই যে, অক্‌সিজেন না হলে আমাদের এক পলও চলে না। সেলগুলা অক্‌সিজেনের জন্য ক্ষুধিত গরুড়ের মত চব্বিশ ঘণ্টা টা টা করচে। রক্তে অক্‌সিজেনের পরিমাণ একটু কম হলে আমরা হাঁফিয়ে উঠি।

তখন আপনা-আপনি লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস পড়তে থাকে এবং বেশী বেশী বাতাস টেনে নিয়ে রক্তে অক্‌সিজেনের অভাব দূর করবার চেষ্টা হয়। অক্‌সিজেন আছে বলেই বাতাস আমাদের প্রাণ। তা নইলে ওতে আমাদের কোন দরকার নেই। জলের মধ্যে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে যদি মাথার উপর একটা বাল্‌তি এমন ভাবে উপুড় করে দাও যে, তার মুখটা জলে একটু ডুবে থাকে এবং তারির ভেতর নিঃশ্বাস নিতে থাক, ত দেখা যাবে যে, প্রত্যেকবার নিঃশ্বাস টানার সঙ্গে-সঙ্গে বাল্‌তিটা জলে ডুবে ডুবে যেতে থাকবে—বাল্‌তির বাতাসের যেটুকু বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছ, খানিকটা জল ঢুকে সেই স্থান পূরণ হচ্চে। যত সময় যাবে, তত লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস টানতে থাকবে, এবং বাল্‌তি তত বেশী করে জলে ডুবতে থাকবে এবং খানিকক্ষণ বাদে বাল্‌তির ভেতর মাথা রাখা অসহ্য হয়ে উঠ্‌বে। এমন হয় কেন? বাল্‌তির ভিতরে বাতাস আগে যতখানি ছিল, এখনও তাই আছে; কিন্তু সে না থাকার মধ্যে। কারণ তার অক্‌সিজেন আমরা নিয়ে খরচ করে ফেলেছি। অক্সিজেন ব্যবহার করেছি, এর মানে অক্সিজেনের সঙ্গে আমাদের Cell-গুলোর রাসায়নিক সংযোগ ঘটেছে। দুটো জিনিসের মধ্যে যখন রাসায়নিক সংযোগ হয়, তখন ঐ দুটো জিনিসের কোনটাই থাকে না, একটা নতুন জিনিস তৈরী হয়। তার গুণ আগেকার দুই জিনিস থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; যেমন তামার পাত্রে তেঁতুল রাখলে তেঁতুল ও তামার মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ হয়ে নীল মত একটা জিনিস তৈরী হয়—কলুঙ্কে যায়। এই পদার্থটা তামাও নয়, তেঁতুলও নয়, একটা নতুন জিনিস,—খেলে কলেরার মত লক্ষণ প্রকাশ করে। অক্সিজেন যখন সেল্‌এর সঙ্গে মেশে, তখনও একটা নতুন জিনিস তৈরী হয়। সেল্‌এর একটা উপাদান কাবন, যাথেকে কয়লা হয়। দেহে যে অনেক কার্বন আছে, তা পোড়ালেই টের পাওয়া যায়। লোহা পোড়ালে কিন্তু কয়লা পাওয়া যায় না, কারণ তার উপাদানে কার্বন নেই।

এক ভাগ কার্বন আর দুভাগ অক্সিজেন মিশে এই জিনিসটা তৈরী হয়, নাম কার্বন-ডাই-অক্সাইড = কার্বন-দুই-অক্সিত। তৈরী হওয়া মাত্র সেলরা এটাকে বার করে দেয়, আবর্জ্জনা বলে। সমস্ত সেল-পরিত্যক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড রক্তে এসে মেশে, সেখান থেকে ফুস্‌ফুসে এসে হাজির হয়, তার পর প্রশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

পৃথিবীতে যত জীবৎ পদার্থ আছে, গাছ-পালাই বল আর জীব-জন্তুই বল, সকলে নিঃশ্বাস নিচ্চে—অক্সিজেন ব্যবহার কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দিচ্চে; যত জিনিস পচ্‌ছে, তাদের সকলের সঙ্গে অক্সিজেন মিশচে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেরুচ্চে; যত আলো জ্বলছে, সকলে অক্সিজেন ব্যবহার করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরী করচে—বাতাসে দীপ জ্বলার মানে দীপের কার্বনের সঙ্গে অক্সিজেনের মিলন। কত যুগযুগান্তর ধরে এমনি চল্‌চে। এখনও বাতাসের পাঁচ ভাগের এক ভাগ অক্সিজেন ফুরিয়ে গেল না? ফুরিয়ে ত যায় নি। কারণ, রোজ অক্‌সিজেন তৈরী হচ্চে। প্রত্যেক গাছের সবুজ অংশের এমন শক্তি আছে যে, একটু রৌদ্রের আলো পেলে তারা বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্‌সাইডকে ভেঙ্গে ফেলে কার্বনটা গ্রহণ করে,—এই থেকে তার কাঠ তৈরী হয়, আর অক্‌সিজেনটা ছেড়ে দেয়। রৌদ্রের আলোতে এই কাজ ভাল করে হয়, রৌদ্রে না। এইজন্য সকাল-বেলায় গাছপালাওলা জায়গায় অক্‌সিজেন বেশী থাকে, তাই সেখানে বেড়াতে এত ভাল লাগে। ভাল না লাগার জো নেই, অক্‌সিজেন যে আনন্দস্বরূপ!

মনে কর, একটা ছোট ঘরে দোর-জানালা বন্ধ করে তোমরা কজনে তাস খেল্‌চ। ঘরে আলো জ্বল্‌চে, এবং শীতকাল বলে একটা আগুনের মালশা একধারে বসান আছে। কজনের নিঃশ্বাসে এবং আলো আর আগুন জলায় ঘরের অক্‌সিজেন হু হু করে কমে আসবে, এবং তার জায়গায় জমতে থাকবে কার্বন-ডাই-অক্‌সাইড। এমন ঘরে বেশী ক্ষণ থাক্‌তে ভাল লাগবে না। ঘামের সঙ্গে প্রশ্বাসের সঙ্গে দেহের নানা ময়লা বেরিয়ে ঘরে একটা দুর্গন্ধ টের পাওয়া যাবে, (বাইরে থেকে কেউ এলে বেশী টের পাবে); প্রাণটা হাঁফাই হাঁফাই করতে থাকবে, হাই উঠ্‌বে, মাথা ধরে যাবে;—তোমাদের অন্তরাত্মা বলতে থাক্‌বেন "পালাও, পালাও, বিষের মধ্যে ডুবে আছ।" যদি তাঁর কথা শোন এবং বাইরে এসো বা দরজা-জানালা খুলে দাও, অমনি মনে হবে "আঃ বাঁচলুম!" কিন্তু যদি না শোন এবং যেমন বসে আছ তেমনি থাক, তবে হয় ত আর বাইরে আসতে হবে না।

ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে একটী বিষ জমা হচ্চে; ঐ আগুনের মালশার ভেতরে যেখানে অক্‌সিজেন কম আছে, সেইখানে একভাগ কার্বন, মেশবার মত দুভাগ অক্‌সিজেন না পেয়ে, একভাগ অক্‌সিজেনের সঙ্গে মিশবে। মিশে যা দাঁড়াচ্চে, সেটী হচ্ছে উগ্র বিষ; তা মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এর নাম কার্বন-মনক্‌সাইড। কার্বন-মনক্‌সাইডের অনেকটা আগুন ফুঁড়ে আস্‌তে-আস্‌তে আর এক ভাগ অক্‌সিজেনের সঙ্গে মিশে কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। বাতাসের অক্সিজেনের পরিমাণ যত কমতে লাগলো, কার্বন-মনক্সাইডের প্রতিপত্তি তত বাড়তে লাগল। এই বিষ ভাম্পায়ার বাদুড়ের মত তোমাদের আস্তে-আস্তে ঘুম পাড়িয়ে ফেলবে। তোমরা বুঝতেও পারবে না যে, তোমাদের এই নিদ্রা মহানিদ্রার প্রথম অঙ্ক। পালাবার চেষ্টাটী পর্য্যন্ত না করে গড়া-গড়া শুয়ে পড়বে এবং পরের দিন সকালে বাইরের লোক এসে দেখবে তোমরা মরে কাঠ হয়ে আছ। বদ্ধ ঘরের মধ্যে এই-রকম দলকে-দল লোক মারা গেছে, এমন খবর মাঝে-মাঝে কাগজে দেখা যায়।

আফিঙের মত উগ্র বিষও একটু-একটু করে অনেকটা সওয়ান যায়। আমাদের দেশের অনেকে সেই রকম বদ্ধ বাতাসে থাকা বেশ অভ্যাস করে নিয়েছেন। দোর-জানালা নিশ্ছিদ্ররূপে বন্ধ ক'রে, লেপের ভেতর মুখ ঢকিয়ে যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করচেন, তাই আবার গ্রহণ করচেন। এ যেন নিজের পরিত্যক্ত ঘর্ম্ম বা মূত্র খেয়ে থাকা। শিশুদের ত এতটা বিষ খাওয়া অভ্যাস হয় নি। তাদের মধ্যে কেউ এ অত্যাচার সহ্য করতে পারে না, লেপের ভেতর থেকে মাথা বা'র করে বাঁচতে চায়। বাপ কিন্তু কিছুতেই তা করতে দেবেন না। টানাটানি ব্যাপার! শেষে ডাক্তারের কাছে ছুটে যান, বলেন "ছেলের বড় গরম। কিছুতেই লেপের ভেতর মাথা রাখতে চায় না।" এই রকম করে তাঁরা বেঁচেও থাকেন। তবে ঐ বেঁচে থাকা মাত্র। গাল ফ্যাকাসে, ঠোঁটে রক্ত নেই, মনে স্ফূর্ত্তি নেই; দেশে কোন রোগ উপস্থিত হলে একবার অন্ততঃ তাতে ভুগে নিতেই হবে, এমনি করে বেঁচে থাকা!

আমরা অমৃতের অধিকারী; আমরা ডুবে রয়েছি বাতাসের অমৃত-সমুদ্রে। তবে বিষ খেয়ে এমন ক'রে মরি কেন? বড় ভয়, ঠাণ্ডা লাগবে! মিথ্যা কথা। ফাঁকা হাওয়ায় ঠাণ্ডা লাগে না। ঠাণ্ডা লাগে তাদের, যারা বিষাক্ত বাতাসে থেকে নিজেদের জীবনীশক্তি পলে পলে পরিক্ষীণ করচে। গলায় কম্ফর্টার জড়িয়ে, বুকে-পিঠে তেল মালিশ করে, মাথায় বালাপোস জড়িয়ে হিম থেকে আত্মরক্ষা করে এবং ঘরের ফোকরে-ফোকরে বুজো দিয়ে ঠাণ্ডাকে দেশছাড়া করবার এত চেষ্টা সত্ত্বেও সর্দ্দিকাশী তাদের লাগাই আছে। শুধু কাশী নয়, তার বাড়া যক্ষ্মাকাশ তাদের ঘরে-ঘরে।

জোর ঠাণ্ডা বাতাস লাগালে শরীরের ক্ষতি হতে পারে সত্য। তার উপায় আছে, গায়ে গরম কাপড় দিয়ে এবং বাতাসটা ঠিক গায়ে না লাগে এমন ভাবে শুয়ে। কিন্তু ঠাণ্ডা সামলাতে গিয়ে ঘরে বাতাস ঢোকা বন্ধ করলে "বাঁচবার উপায়" নেই যে! কোন্‌টা নেবে, বদ্ধ-ঘরের মৃত্যু, না মুক্ত বাতাসের অমৃত?

জাতি-বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ]

ভাষা দ্বারা সকল সময় জাতির পরিচয় পাওয়া যায় না, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ বুঝিলে চলিবে না যে, জাতিতত্ত্বালোচনায় ভাষার কোন মূল্য নাই। পক্ষান্তরে যদি বিচক্ষণ বিচার সহকারে ভাষার নিয়মগুলি (principles) স্থির করিয়া খাটান যায়, তাহা হইলে ভাষার সাহায্য অতি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। সকলের চেয়ে দরকারী একটা কথা আমরা ভুলিয়া যাই যে, জাতি পরস্পর সংমিশ্রিত হইতে পারে, হইয়াও থাকে, কিন্তু এক ভাষার আভ্যন্তর গঠন অপর ভাষার আভ্যন্তর গঠনের সহিত মিশিয়া যায় না। এ হিসাবে এক ভাষা আর এক ভাষার সহিত মিশ্রিত হয় না। তবে একেবারেই যে মিশে না, এ কথাও বলা যায় না।

কিন্তু সে মিশ্রণ অতি বিরল এবং জাতিতত্ত্ব বিচারে একেবারেই ধর্তব্য নয়। একটা দৃষ্টান্ত লইয়া বিষয়টা বোঝা যাক্। মাডাগাস্কারের মালাগাসী একটী মিশ্র জাতি। মলয় ও আফ্রিকার বাণ্টু নিগ্রোর সংমিশ্রণের একটা মাত্র বৈশিষ্ট্য তাহাদের দেহে সুস্পষ্ট। ইহাদের অপর বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ শিরোস্থি (cranium) বা অন্যান্য অবয়বের পরীক্ষায় জানা যায় নাই। ইহারা বিশুদ্ধ মলয়-পলিনেসীয় ভাষায় কথা কহিয়া থাকে। দু'-দশটা বাহিরের শব্দ তাহাদের ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে মাত্র। ইহাদের ভাষা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সুমাত্রা, জাভা ও মালেসিয়ার অন্যান্য ভাষার সহিত ইহাদের ভাষার মুখ্য সম্বন্ধ আছে। অতি প্রাচীনকালে কতকগুলি হিন্দুপ্রচারক মালেসিয়ায় আগমন করিয়াছিল। সেই সময় হইতে অনেক সংস্কৃত শব্দ ইহাদের ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু মালাগাসীদের ভাষায় একটীও সংস্কৃত শব্দ নাই। ইহা হইতে আমরা স্থির করিতে পারি যে, মালাগাসী ও নিগ্রো সংমিশ্রণের প্রধান অজ্ঞাত উপাদান যেটুকু, তাহা মালেসিয়া হইতেই আসিয়াছে। আর এই সংমিশ্রণ মালেসিয়ায় হিন্দুপ্রভাব বিস্তারের পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে। এ ছাড়া এ জাতির ভাষায় কতকগুলি হিমরাইটিক আরবীয় শব্দ আছে। ঐ শব্দগুলি দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমান-যুগের বহু পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন সাবীয় ও মিনীয় সাম্রাজ্যের পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি-সমুদয়ে এই ভাষার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই ব্যাপার হইতে আমরা আর একটী সিদ্ধান্ত করিতে পারি। ভাষাপ্রমাণের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে বলিতে পারা যায় যে, মাডাগাস্কারের সহিত হিমারাইটদিগের সম্বন্ধ ছিল। থিওডর বেণ্ট (Theodore Bent) ইহাদের ভাষার নজিরে বিদেশী হিমারাইটদের কয়েকটা কীর্ত্তির ইঙ্গিতও করিয়াছেন। অতএব আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, জাতি-বিজ্ঞানের আলোচনা ও অনুসন্ধানে ক্ষেত্রবিশেষে ভাষার সাহায্য না লইলে একেবারেই চলে না।

সাধারণ হিসাবে ঐতিহাসিক যুগের মানবজাতিকে প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদের নাম,—

(১) ইথিয়পীয় বা কৃষ্ণশাখা (Ethiopic or Black division), (২) মোঙ্গোলীয় বা পীত শাখা (Mongolic or Yellow division), (৩) আমেরিকান বা লোহিত-শাখা (American or Red division) এবং (৪) ককেসীয় বা শ্বেতশাখা (Caucasic or White division) এই বিভাগগুলি সাঙ্কেতিক বা রূঢ়ি (conventional) বিভাগ। যতদূর সম্ভব, অবয়বের পরস্পর সম্বন্ধসূত্রের উপর এই বিভাগগুলি প্রতিষ্ঠিত। মানবজাতির বিকাশের প্রথম অবস্থায় কয়েকটি দৈহিক লক্ষণের পরস্পর সামঞ্জস্য দেখা যায় এবং সেগুলির পরস্পর সম্বন্ধ কিয়দংশে সম্পূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু পরে যখন প্রব্রজনে (migrations), সংমিশ্রণে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে কেশ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি দেহাবয়বের আদর্শ typeগুলি তাহাদের অবিমিশ্র বিশুদ্ধ ভাব রাখিতে পারে না, অথবা মাত্র কতকগুলি স্ত্রী ও শিশুতে কিংবা টাসমানিয়া ও আণ্ডা-মান দ্বীপের ন্যায় দু' একটী স্থানে বর্ত্তমান থাকে, তখন দেহাবয়বের পরস্পর সম্বন্ধের প্রশ্ন উঠে। কোন কোন স্থানে typeএর একত্বের ব্যত্যয় দেখা যায় না। যেমন ফিজি দ্বীপের কৈকারোলোদের মধ্যে সকলের কটা একরূপ। কিন্তু এরূপ একত্ব অতি বিরল। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রায় সর্ব্বত্র এই সামঞ্জস্যের ব্যতিরেক দেখিয়া পরস্পর সমঞ্জসীভূত অবয়বের সংখ্যা কমাইয়া জাতির চারিটি বিভাগ বিহিত করিয়াছেন। অবয়বের প্রধান নয়টি বিষয় সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন। জাতি বিচারে কেশ, ত্বক্, নিম্ন-হনু, নাসিকা, ওষ্ঠ, চক্ষু, কপোলফলক, শিরোস্থির উচ্চতা কিরূপ, তাহা ভাল করিয়া বোঝা দরকার। এই সমস্ত বিচারে সাধারণতঃ দেখিতে এগুলি কিরূপ, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহাদের সাধারণ প্রকার নিম্নে দেওয়া গেল। পরে এগুলি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আলোচনা করা যাইবে।

১। কেশ—দীর্ঘ, সরু এবং কাল; ছোট, পশমী বা কুঞ্চিত এবং কাল; লম্বা, সোজা, ঢেউখেলান বা কোঁকড়ান এবং সকল রকমের পিঙ্গল, সোনালী, লাল, এমন কি, কাল।

২। ত্বক্—অত্যন্ত ঘন-পিঙ্গল অথবা কৃষ্ণ, এবং মসৃণ; পীতাভ, ঈষৎ পীতবর্ণযুক্ত পিঙ্গল, অথবা হরিতাভ; তামাটে কিংবা অল্প লাল, মসৃণ ও লোমশূন্য; শ্বেত (পাণ্ডু বা রক্তবর্ণ), সামান্য রোমযুক্ত অথবা প্রচুর লোমশ (hirsute), সম্পূর্ণ শ্মশ্রুযুক্ত।

৩। নিম্নহনু—হয় প্রলম্ব (prognathous বা projecting), নয় সরল (orthognathous বা straight), না হয় মাঝামাঝি রকমের (mesognathous বা medium)।

৪। নাসিকা—হয় ক্ষুদ্র ও আয়ত (platyrrhine), নয় দীর্ঘ, খাড়া, অঙ্কুশাকার; না হয় পাতলা বা সরু (leptorrhine)।

৫। ওষ্ঠ—পুরু, স্ফীত, (tumid) এবং এরূপ বিপর্য্যস্ত (everted) যে, ভিতরের লাল চামড়া দেখা যায়; পাতলা, সোজা ও সঙ্কুচিত; অধর কিছু বিপর্য্যস্ত ও গোল বা মাঝামাঝি রকমের।

৬। চক্ষু—বড়, গোল, সরল এবং কৃষ্ণ অথচ সামান্য পীতাভ; ক্ষুদ্র, অবসর্পী ও কৃষ্ণ—ভিতরের আবেষ্টন বা আবরণ (tegument) আল্‌গা; সরল, মধ্যমাকারের, গোল—এরূপ চক্ষু পিঙ্গল, নীল, ঈষৎ কপিশ ও কৃষ্ণ হইয়া থাকে।

৭। গণ্ডফলক—প্রলম্ব, উচ্চ বা ছোট (দেহও অনুরূপ আকারের হইয়া থাকে)।

৮। কপাল (skull)—বিস্তৃত (brachycephalous); দীর্ঘ (dolichocephalous); মধ্যমাকার (mesocephalous)। কপালের বা শিরোস্থির লক্ষণগুলি খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করা দরকার। শিরোস্থির পরিমাণ স্থির করিয়াই এইরূপ নাম হইয়াছে। বিস্তার ও দৈর্ঘ্যের অনুপাত ৭৫ঃ ১০০র কম হইলে দীর্ঘকপালী, ৭৫ অপেক্ষা অধিক এবং ৮৩ অপেক্ষা কম হইলে মধ্য-কপালী; এবং ৮৩ কিংবা তদপেক্ষা অধিক হইলে বিস্তৃত-কপালী হয়। পরিমাণের অনুপাত প্রায় ৬৫ অপেক্ষা নূন এবং ৯৫ অপেক্ষা অধিক হইতে দেখা যায় না। আবার মধ্যকপালীর পরিমাণের অনুপাত ৭৭র কিংবা ৭৮র কম হইলে তাহাকে sub-dolichocephalous এবং তাহা অপেক্ষা অধিক হইলে sub-brachycephalous বলা হইয়া থাকে।

৯। উচ্চতা বা খাড়াই (stature)—সম্প্রতি জাতি-তত্ত্ববিদ্‌গণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, উচ্চতা ৪ ফুট বা তদপেক্ষা নূন হইতে ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি ও তদূর্দ্ধ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। আফ্রিকার নিগ্রিটো ও ভালপেক্সদের মধ্যে কাহারও কাহারও উচ্চতা ৪ ফুটেরও কম। ব্রেজিলের বরোরদের (Brazilian Bororos) ৬ ফুট ৪ ইঞ্চির বেশী।

প্রাথমিক বিভাগের এই সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে, আদর্শ typeগুলি এক্ষণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি এখনও তাহা পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা শ্রেণীবিভাগের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে। জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ দেখিয়াছেন যে, প্রায় সমস্ত আফ্রিকান ও ওশনিক নিগ্রোদের বিশেষ লক্ষণ—তাহারা অত্যন্ত ঘোর পিঙ্গলবর্ণ; তাহাদের ত্বক্ কৃষ্ণাভ। তাহাদের চুল ছোট, পশমী অথবা কুঞ্চিত—চুলের রঙ্ কাল। নিম্নহনু প্রলম্বিত; চক্ষু গোল, সরল, কৃষ্ণ, মস্তক দীর্ঘ-কপালযুক্ত। ইহাদের উচ্চতা, নাসিকা ও ওষ্ঠের তারতম্য খুব বেশী। এইরূপ দেখা যায় যে, মোঙ্গোলদের প্রায় সকলেই ঈষৎ পীত অথবা পীতাভ পিঙ্গলবর্ণ। তাহাদের কেশ অশ্বপুচ্ছ ধরণের (type)—দীর্ঘ ও ক্ষীণ। চক্ষু—অবসর্পী, ক্ষুদ্র, কৃষ্ণ, গণ্ডাস্থি বেশ সুস্পষ্ট (prominent); আকৃতি নাতি-দীর্ঘ ও নাতি হ্রস্ব অথবা খর্ব্ব; গণ্ড মধ্যমাকৃতি; নাসিকা খর্ব্ব; ওষ্ঠ অপুল। ইহারা বিস্তৃত-কপালী অথবা মধ্য-কপালী। আমেরিকানদের সাধারণতঃ এক রকমের আকার-বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু তাহাদের মধ্যে আকৃতির বৈষম্য যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ উচ্চতা সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেহ পাঁচ ফুটের কম, কেহ পাঁচ ফুট, কেহ ছয় ফুট, কেহ ছয় ফুটেরও বেশী উচ্চ। তাহাদের উচ্চতা পাঁচ ফুট অপেক্ষা নূন হইতে ছয় ফুট অপেক্ষা অধিক পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণ কাহারও তামাটে লাল, ঘোর পিঙ্গল, পীতাভ, কাহারও বা অল্প চর্ম্মের বর্ণের ন্যায়। তাহাদের মধ্যে সকল রকমের দীর্ঘ ও বিস্তৃত-কপালী আছে। দৈহিক অনুক্রমে কেহ ককেসীয়দিগের ন্যায়, কাহারও বা গঠন আয়ত, নিবিড় স্থূল ও গুরু। তবে অত্যন্ত দীর্ঘ, কৃষ্ণ, ক্ষীণ কেশে তাহারা সকলেই একরূপ। তাহারা সকলেই সরল নাসিকাবিশিষ্ট বা শুকন্যাস (কোথাও কোথাও ব্যতিক্রমও আছে)। তাহাদের কৃষ্ণ চক্ষু অপেক্ষাকৃত ছোট, সরল ও গোল। ইহাদের সকলেরই হাব-ভাব-বিলাসে এমনই একটু বিশেষত্ব আছে যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তবে তাহারা যে অসভ্য আমেরিকান, ইহা দেখিয়াই চিনিতে পারা যায়।

ককেসীয় বিভাগে কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম আছে। ইহাদের কেশ সোজা, ঢেউ-খেলান, কোঁকড়ান; কেশের রঙ্‌ কাল, লাল, শণের ন্যায়, এবং সকল রকমের পিঙ্গল। ইহাদের মাথার খুলি ৭৩° হইতে ৯০°, এমন কি ৯৫° পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; রঙ্‌ রক্ত, পাণ্ডু, পিঙ্গল, কৃষ্ণাভ, ও শ্যাম, চক্ষু—কৃষ্ণ, নীল, ধূসর, পিঙ্গল; উচ্চতা পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি হইতে ছয় ফুট দুই বা তিন ইঞ্চি পর্য্যন্ত; নাসিকা—বড়, সরল বা শুক-নাসাবৎ; খর্ব্ব, উত্তান (concave) ও চিপিটবৎ নত (snub)।

ককেসীয় বিভাগের এই সমস্ত নানাবিধ পার্থক্য বুঝাইবার জন্য বহু প্রকারের মতবাদ আছে। এখানে আমরা তাহাদের সম্পর্কে কোন কথাই বলিব না। যথাস্থানে তৎসমুদয় আলোচিত হইবে। উত্তর আফ্রিকা, ইউরোপের অধিকাংশ এবং পশ্চিম এসিয়ায় সুপ্রাচীন কাল হইতে ককেসীয় প্রদেশ miscegenationএর ভূমি ছিল। কাজেই এক্ষণে জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ বিভাগ করিতে গিয়া নানা গোলে পড়িতেছেন। এ কথা খুব সত্য। আর আমরা দেখিতেও পাই যে, প্রস্তাবিত বিভাগের অনেকগুলিই যত বেশী ভাষার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তত অন্য কিছুর উপর নয়। কেল্ট, টিউটন ও স্লাভদের যে এক থাকে ফেলা হইয়াছে, সে শুধু ভাষার জোরে। তাহারা সকলে একই আর্য্যভাষা না বলিলে এরূপ ব্যবস্থা হইত না। এই যে বিভাগ—ইহা জাতির বিভাগ নয়—ভাষার বিভাগ। ছোট-খাট কতকগুলি লক্ষণ লইয়া কখনও কখনও বিপদে পড়িতে হয়। কিন্তু সেগুলি যতখানি সামাজিক কারণে সঞ্জাত, ততখানি জাতিগত কারণে নয়। সুতরাং সেগুলি অকিঞ্চিৎকর লক্ষণ বলিয়া ছাড়িয়া দিলে সকল গোল মিটিয়া যায়। ধরা যাক, একই স্থানে, এমন কি—একই বংশে সকল রকম চক্ষু ও কেশ বিদ্যমান। ইহা লইয়া মস্তিষ্ক সঞ্চালন না করিয়া, ছোট-খাট লক্ষণ বলিয়া ইহাকে বুঝিতে হইবে। বিখ্যাত ফরাসী নৃতত্ত্ববিৎ মুসিয়ে দে লাপুজ (M. de Laponge) সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ সামাজিক কারণে দীর্ঘ-কপালত্ব বিস্তৃত-কপালত্বে পর্য্যবসিত হইতে পারে।

প্রধানতঃ এই সকল কারণেই cultural group বা শিষ্টসম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বত্র পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। নৃতত্ত্বজ্ঞগণ বলেন, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা বড় লোক ও ছোট লোকদের মধ্যবর্ত্তী। স্থূল প্রমাণে ইহাদের মধ্যেই জাতির বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের লইয়াই তাঁহারা বড়লোকদের সংস্কৃত (refined) typeএর সহিত ছোট লোকের অসংস্কৃত, স্থূল (coarse) typeএর পার্থক্য নিরূপিত করিয়া থাকেন। বড় বড় সহরে বড় লোকদের সুঠাম সুগঠিত আকারের সঙ্গে ছোট লোকদের চেহারার তুলনা করিলে, এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে।

আলোর খেলা—সকাল বেলা

[অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ]

নিত্যধামের অবিরাম আনন্দধারা ছিটেফোঁটা ভাবে এ জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসগুলার মধ্যে মিশে থেকে আনন্দের খেলা খেলছে। এখানকার শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণের বাহ্য উপভোগ্য জিনিস গুলির মতই জিনিস সেখানে পাওয়া যায়। তবে সেগুলির ভোগে স্থায়ী আনন্দ; আর এগুলির ভোগে আনন্দ কতটা স্থায়ী তা বলা যায় না। এগুলির ভোগে শারীর ধর্ম্মের জন্য পরে একটী তাপ সঞ্চার করে; ওগুলিতে স্নিগ্ধ মাধুর্য্য দান করে। বাস্তবিক, এ দেহে নিত্যজগতের অবিমিশ্র রসাস্বাদন ঠিক হয় না; অন্ততঃ স্থূল দেহের স্মৃতিটা ভুলে যাওয়ার একটী অবসরে সাময়িক ভাবে সে নিত্যধামের নিত্য-লীলায় রসাস্বাদন ঘটে। তনু-মন তখন কাম-কামনার জগৎ থেকে ফিরে, সেই অনন্ত প্রেমের ঠাকুরের নিকেতনে তাঁর সেবার বিলাসী হয়ে নিজেকে ভুলে যায়।

সে জগতের রসাস্বাদন আমাদের নিজের সাধন-বলে ঘটতে পারে; আবার শরীরী বা অশরীরিভাবে অবস্থিত কোন মহাপুরুষের কৃপা ও ইচ্ছাতেও হতে পারে। সাধনায় বিশেষ-বিশেষ অবস্থা লাভ হয়। সেই-সেই অবস্থার লক্ষণ-সমূহের মধ্যেই এই অধ্যাত্ম-অনুভূতি; অনন্তের আনন্দের

বাস্তব সন্ধান—শুধু কবিত্বে বা ভাবুকতায় নয়। অবস্থাগুলি তাদের লক্ষণ ও ভাবসহ পরপর গাঁথা আছে। আবার যাকে আমরা সাধু মহাপুরুষের কৃপা বলি, তাতেও ঐ অবস্থা-বিশেষের পরিণতি বর্ত্তমান থাকে। যিনি যে ভাবেই হোক না কেন, ভিতরে যেমন অবস্থাটিতে উপনীত হন, তেমন অবস্থার স্বভাবসুলভ অনুভূতি তিনি পেতে থাকেন। অবশ্য এ সকল অনুভূতি পাওয়াই ভগবদ্-কৃপার বা সাধনার চরম লাভ নয়,—এ কথা বলাই বাহুল্য।

এই অনুভূতি-রাজ্যে দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণবিষয়ে কয়টী কথা বলিব।

একদিন সন্ধ্যার পর জগদ্বন্ধু-আশ্রমে আরতি-কীর্ত্তন শুনছিলাম; মন তখন কোন্ জগতে চলে গিয়েছিল। বহুক্ষণ শ্রবণের পর চলে আসছি; কীর্ত্তনের মধ্য হতে একজন বার হয়ে এসে আমার সঙ্গে কি কথা বল্‌তে লাগলেন। সেই কথার সময়েই আমার চোখের সামনে নিকটে আকাশের খানিকটা জায়গা ঝলমল্ কর্‌ছিল—রজত-স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বহু-খণ্ডিত ও তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। সে জ্যোতিঃ ক্রমেই পিছাইয়া আকাশপটে সংলগ্ন ও বহুদূর প্রসারিত হ'ল। উহা শেষে বিদ্যুৎপ্রভায় পরিণত হ'ল। দিগবলয়সমূহ ক্ষণে-ক্ষণে বিজলী-হিল্লোলে আকম্পিত দেখাচ্ছিল। তখন আকাশে মেঘ ছিল না, বা আর কেউ জ্যোতিঃ বা বিদ্যুৎ দেখে নি। ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের গীতা পাঠ করার সময় এরূপ জ্যোতিঃ দেখার ইচ্ছা মনে কয় দিন ধরে হয়েছিল।

একদিন গভীর রাত্রিতে কয় সেকেণ্ডের জন্য ঘুম ভেঙে-ছিল। খোলা চোখ শূন্যে চেয়ে ছিল। শূন্যে এক অপূর্ব্ব মুখশ্রী তিনবার দেখা দিয়ে মিশে গেল। প্রশান্ত, জ্যোতির্ম্ময়, অরুণ-লোহিত স্বর্ণকান্তি মনে খুব শান্তি ঢেলে দিয়ে চলে গেল। আর এক দিন অরুণোদয় হচ্ছিল। তখনও নিদ্রিত; একটী লোহিত রশ্মি ললাটে পড়েছে,—পূর্ব্ব দৃষ্ট মুখ শূন্যে ভাসছিল। ঘুম ভেঙে গেল। এ মূর্ত্তি দর্শনের রহস্য পরে কতকটা জানতে পেরেছিলাম, প্রথমে পারি নি।

এখানে পিটার্সবার্গের ম্যানাসিনের একটী স্বপ্নের কথার উল্লেখ না করে থাকতে পারলাম না। তিনি তাঁর "Sleep" নামে বইতে তার কথা লিখেছেন। তিনি বলেন, যে সকল স্বপ্ন স্বপ্নরাজ্যের সীমা পার হয়ে আমাদের জীবরাজ্যে এসে পড়ে, সেগুলি বাস্তবিকই অদ্ভুত। তাঁর মতে স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙে গেলে, চোখ যদি অন্য দিকে ফিরে না যায়, তাহলে স্বপ্নে দেখা জিনিসই আবার চোখের সামনে দেখা যায়। তিনি অসুস্থ অবস্থায় এক সময়ে খৃষ্টের বিষাদভার মুখ দেখলেন; জাগার পরও সেই মুখ। তবে ক্রমে তা বিষণ্ণ-ভাব ছেড়ে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হয়ে উঠল। ঘুম যখন ভেঙে-ছিল, তখন সকাল বেলার আলো এসেছে।

কয় দিন ধরে মনে শিক্ষা, দীক্ষা ও জ্ঞানের বিষয়ে নানা প্রশ্ন উঠছিল। একদিন দুপুর-বেলা এক সেকেণ্ডের জন্য তন্দ্রা এসেছে। অমনি অদ্ভুত দর্শন,—আমার মুখের সমুখে প্রভু বন্ধুর চেহারার মত এক মুখ;—অগ্নিপ্রভ কান্তি, বিশালায়ত নেত্র ও বঙ্কিম ভ্রূযুগ; কেশ নাই;—দৃঢ়তাব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে বলে গেল—

"'ভাল হও'—শিক্ষা;
'ভাল হও'—দীক্ষা;
—সকল জ্ঞানের ঋদ্ধি।"

এ কথাগুলির অর্থ তখন মনে হয়েছিল যে, ভাল হওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পরিণতি; গুরু অর্থাৎ পরম-পিতার অভিপ্রেত কাজই ভাল কাজ; তার মধ্য দিয়েই জীবনকে ফুটিয়ে তোলা; আর তাতেই ভাল হওয়া—এই হল দীক্ষা; আর দীক্ষা কিছু নয়। জীবনের সকল অবস্থাতেই এই মন্ত্র সকল জ্ঞানের মূল ও পরিণতি। বড়-বড় মহাপুরুষের জীবন থেকে এর বেশী আর কিছুই শিখিবার নেই—
"ভাল হও"—এই দুটী কথা।

আর এক সময়ে কোন একটী বিষয়ে চিন্তান্বিত ছিলাম। স্বপ্নে একদিন এক উদাসীনের দর্শন;—পরিধানে গৈরিক বাস, চোখে ও মুখে সাধারণ ভাবের মধ্য দিয়ে এক অসাধারণ অমানুষী ভাব ফুটে বার হচ্ছিল। বিজলীর ন্যায় চপলা গতি, বাস্তবের মাঝে কি এক অস্বাভাবিকতা। পিছন হতে আশ্বাস দিয়ে তিনি অন্তর্ধান হয়ে গেলেন।

একদিন রাত্রিতে ঠিক নিদ্রার অবস্থায় ছিলাম না—এক সজাগ নিদ্রার অবস্থা—শব্দমালায় জগৎ যেন হারিয়েছিলাম। সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্ত্তির দর্শন;—আশ্চর্য্যের বিষয় কোন ভয়াবহতা ও-মূর্ত্তিতে ছিল না। দেবীর ভাব স্থির, ঘনীভূত শান্তি সকল হাতেই দিচ্ছেন—কোন উচ্ছৃঙ্খল বা ভয়ঙ্কর ভাব তাতে ছিল না। পরক্ষণেই একজন এসে বললেন, "গৌর লীলাতো আবার হ'ল।" বলামাত্রই সমুখে এক

দৃশ্য প্রকট হয়ে গেল—মূর্ত্তিগুলি যেন কোন দিকে ছুটে চলেছে; তাদের মাঝে গৌরের স্থান শূন্য। করতাল, মাদল বাজছে—সকলেরই মুখে মৃদুমধুর হাসির খেলা, সকলেরই ভিতর হতে আলোর আভা বার হচ্ছে; বায়স্কোপের ছবির মত কাঁপছে। গৌরলীলার কথা মাঝে-মিশেলে যে না ভেবেছি তা নয়; কিন্তু কালীর সঙ্গে এ লীলার যোগাযোগের কথা মনে বড় একটা খেয়াল হয় নি।

আর একদিন অমৃতসরের ব্যাপার শুনে মনে কষ্ট হ'ল। ভবিষ্যৎ জানার প্রবল ইচ্ছা হল। সান্ধ্য উপাসনার পর একটু শয়ন করেছি। তন্দ্রা এল। দেখলাম, আমার মাথা স্পর্শ করেছেন হেমবর্ণ প্রভু জগদ্বন্ধু। নিজের মধ্যে অনন্ত জগৎ পরমপিতার নামে প্রেমে টলমল—সকলেই নাচছে;—মহা উদ্ধরণে ভাসছে। কূটস্থে দেখি, সব আকাশে আগুন লেগেছে;—ভয়ব্যঞ্জক, ত্রাসকারী, সহস্রহস্তা দেবীমূর্ত্তি পক্ষিরাজ ঘোড়ায় আরূঢ়া—উর্দ্ধে উঠছেন—দেবীমূর্ত্তি আগুন আকাশ-পটে তাম্রবর্ণা। দেখে ত্রাস হচ্ছে; তখনই তন্দ্রাভঙ্গ।

পীত স্বর্ণকান্তি সূক্ষ্মদেহীও স্বপ্নের মাঝে অনেকবার দেখেছিলাম। লক্ষ্য করেছিলাম যে, মনের অবস্থা যত পবিত্র থাকে, তত আলোময় মূর্ত্তি দেখা যায়। মন ঘুলিয়ে এলে, স্বপ্নে দেখা জিনিসগুলির রঙও তেমন খোলতাই দেখা যায় না।

অপ্রাকৃত দর্শনের কথা এখন একটু আলোচনা করি। এ দর্শন জাগ্রত অবস্থায়, তন্দ্রায়, বা নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নে ঘটতে পারে। এ সকল দৃশ্য অতীতের হতে পারে। নিজের সাধনবলে অবস্থাবিশেষে উপনীত হলে, স্বতঃই এ সকল দর্শন হয়; কিম্বা কোন-কোন মহাপুরুষ দয়া করেও এ সকল দেখাতে পারেন। সাংসারিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বা অন্য রকমে, ক্ষণেকের জন্য বা আরও বেশী সময়ের জন্য, তাঁদের কৃপাতে জীব মানসিক স্তরবিশেষে পৌঁছে অপ্রাকৃত আনন্দের আস্বাদ-লাভের সুযোগ পায়। সে সকল কৃপাকারী মহাপুরুষ শরীরীও হতে পারেন বা অশরীরীও হতে পারেন। এঁরা পবিত্র সরল আধারের সন্ধান পেয়ে তার মধ্যে সাময়িক ভাবে অবস্থিত হয়ে আবেশে সমস্ত দেখাতেও পারেন;—অবশ্য যেটুকু দেখানর দরকার হয়, তার বেশী তাঁরা দেখান না। আধারের অবস্থানুযায়ী এ সকল দর্শনানুভূতি—জাগ্রত, তন্দ্রা বা স্বপ্নাবস্থার আশ্রয় নিয়ে হয়; যিনি অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের জীব, তিনি একেবারে জাগ্রত অবস্থায় অপ্রাকৃত জিনিস (vision) দেখেন; যিনি মধ্য স্তরের জীব, তিনি সমাধিতে বা তন্দ্রায় দেখেন; আর যিনি নিম্নস্তরের জীব অর্থাৎ নিম্ন-অধিকারী, তিনি উচ্চস্তরের অনুভূতি হঠাৎ পেলে সহ্য করতে পারেন না; তাই তাঁর উপর কৃপা স্বপ্নাশ্রয়ে বা ঘটনাচক্রের অবলম্বনে হয়। অন্য জগতের এবং জড়-জগতেরও অসংখ্য স্তর আছে। এখনকার আলোচনার সুবিধার জন্য এই এক ধরণে স্তর ভাগ করলাম। ভাগবত-স্বপ্ন মিথ্যা নয়; এ কথা পরমহংসদেব বলেছিলেন। যেদিক দিয়েই হোক, সেগুলি অন্ততঃ একটা মানসিক অবস্থা-ব্যঞ্জক; সাধক বা ভক্তের পক্ষে অন্ততঃ সেগুলির সার্থকতা আছে। স্বপ্ন-বিশ্লেষণ ব্যাপারই কঠিন—মানসিক অবস্থা ও বাহ্য পারিপার্শ্বিকের বিচার স্বপ্নবিশ্লেষণে বিশেষ দরকার। একই অবস্থাচক্রের মধ্যে বিভিন্ন লোকে একই স্বপ্ন দেখতে পারে। নিউটো বলেন, ডানজিগ হোটেলে এক ঝড়ের রাতে কয়জন যাত্রী আশ্রয় নেয়। সে রাতে সকলেই স্বপ্ন দেখে যে, একখানা গাড়ী করে কে এক ভদ্রলোক হোটেলে এলেন। পরদিন প্রভাতে সকলেই চাকরকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, কেউই রাতে সেখানে গাড়ীতে আসেন নি। তখন সবাই অবাক্। স্বপ্ন নিজেদের পারিপার্শ্বিক, সংস্কারানুযায়ী বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হয়; দৈনন্দিন কাজের ছাপ মনের উপর থেকে যায়; সেগুলি নিদ্রার মধ্যে আর পাঁচটা ছাপের সাথে উঁকি ঝুঁকি মারলে, বেশ একটা সম্পূর্ণ ঘটনার চিত্র স্বপ্নে দেখা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পরীক্ষার দ্বারা স্থির হয়েছে যে, পাঁচ বছর বয়সের পূর্ব্বে যারা অন্ধ হয়েছে, তারা স্বপ্নে শোনা, ছোঁয়া ছাড়া কিছু দেখতে পায় না। আমাদের "বর্ত্তমান সংস্কারমণ্ডল" ব'লে একটা কথা বলব। জন্মান্তরের দিক দিয়ে পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্মের ছাপকে প্রাক্তন সংস্কার বলতে পারি। আর বংশানুক্রমধারার দিক দিয়ে পূর্ব্বপুরুষদের কৃত কর্ম্মের ছাপ আমাদের শারীর-যন্ত্রের উপর রয়ে যায়। হেল্‌নে বলেন, আমাদের প্রতি যন্ত্র, শিরা ও পেশীর স্মরণ-শক্তি বা সংস্কার আছে। অ্যারিষ্টটলের মতে এগুলিই পরে নিদ্রায় উঁকি-ঝুঁকি দিলে, আমরা স্বপ্ন দেখি। শারীর ও মানসিক ধর্ম্মের অনুক্রমণ বংশানুক্রম-

...ারার দিক দিয়ে এই শারীর-যন্ত্র, শিরা, পেশী প্রভৃতির স্মরণ-শক্তি বা সংস্কারের মধ্য দিয়ে ঘটে। অনেকের এই মত। এরূপও হতে পারে, পূর্ব্বপুরুষের অনুষ্ঠিত বা পূর্ব্ব-জন্মে কৃত কাজের সংস্কার হয়তো এ পুরুষে বহুদিন পরে হঠাৎ এক অবসরে ঝুপ করে উঁকি মেরে গেল। এ সমস্ত এক সাথে মিলে, আমাদের বর্ত্তমান কাজের ছাপের সঙ্গে আমাদের "বর্ত্তমান সংস্কারমণ্ডল" বা মানসিক স্তর গড়ে তোলে। শারীর ধর্ম্ম ও প্রাক্তন সংস্কার এ দুয়ের বাইরে অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে আমাদের বর্ত্তমান সংস্কারের বাইরে যে সকল অনুভূতি বাহ্যিক,—নিকট কারণ বিনা স্বপ্নাদির মধ্যে দিয়ে হয়, সে সকলকে আমরা অপ্রাকৃত আখ্যা দিব। স্বপ্নটা কোন দূর বস্তুর চিত্র কি না, অতীতের ঘটনার কি না, বা ভবিষ্যতের কোন ছায়া বা আভাস কি না,—তা' ঠিক করতে দর্শনকারীরও বিশেষ সাবধানতার দরকার। একজনের ভাগ্যে অপ্রাকৃত দর্শন-শ্রবণ হয় তো অনেক ঘটতে পারে; কিন্তু তাই ব'লে তাঁর সকল অবস্থার দর্শনাদি অনুভূতির উপর সমান জোর দেওয়া চলতে পারে না। তবে ভাগবত স্বপ্ন প্রায়ই মনের অমল-ধবল পবিত্র অবস্থার অপেক্ষা করে; এবং তাতে সেই সময়েই কেমন যেন একটা বিশ্বাস ঢেলে দিয়ে যায়। সে স্বপ্ন দর্শনের পর মনে একটা অভূতপূর্ব্ব স্নিগ্ধ আনন্দের অবস্থা থাকে। তার পর দৃষ্ট বিষয়টা একটা আলোময় জগতে দেখা যায়;—সেখানে অভিনেতৃ জীবগণের ভিতর দিয়েও আলো ফুটে বার হয়। সে আলো নীলাভ, পীত, লোহিত বা পীত-লোহিত হতে পারে; বিদ্যুৎ বা চন্দ্রালোকের মত ঝলসান বা স্নিগ্ধতাপূর্ণ হতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখার পর মেনাসিনের "Sleep" নামে পুস্তকে স্বপ্নে আলোর কথাও (অন্য ভাবে) আলোচিত হয়েছে দেখে বিস্মিত হ'লাম। তাতেও বোধ হল, স্বপ্নে বা অন্য রকমে,—আলোতে চোখ বুজে, বা আঁধারে চোখ খুলে বা বুজে রঙ-বেরঙের আলো দেখা শুধু আধারের বিশেষত্ব ও পার্থক্য সূচনা করে; এটা আলোচনাকারী ম্যানাসিন ঠিক ধরতে পারেন নি। আর এক কথা বলবার আছে; ভাগবত স্বপ্নগুলার মধ্যে এলো-মেলো কিছু থাকে না; বেশ একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। এসব স্বপ্নে লক্ষ্য করেছি, প্রায়ই হাব-ভাবে, আকার-ইঙ্গিতে কথা হয়; যত অল্প কথায় ভাব প্রকাশ হয়। আর এক কথা, যখন এ স্বপ্নগুলি দেখা যায়—তখন বিশেষ একটা কিছু ব'লে মনে হয় না; ক্রমে সাধারণের ভিতর দিয়ে একটা অসাধারণ কিছু ফুটে উঠে মনে কেমন একটা ছাপ রেখে যায়। ঠিক-ঠিক দর্শন বস্তুগুলি অনেক সময়ে পূর্ব্ব-দৃষ্ট বা অনুষ্ঠিত কোন কিছুর বা সংস্কারের সঙ্গে খাপ খায় না। এ ধরণের স্বপ্ন বা দর্শন বিষয়কে আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত অবস্থা-বিচারে মহাপুরুষের কৃপা বা অপ্রাকৃত অনুভূতি ব'লে জানব।

এখন শব্দ বিষয়ে একটু বলি।

একদিন শীতকালে শেষ রাতে ঘুম ভেঙেছে। অবিরাম শব্দস্রোত অনন্ত আকাশ থেকে আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করছিল। ঐ শব্দ বাঁশের বাঁশীর আওয়াজের মত একটা ফু-উ-উ শব্দ। গ্রীক যোগী পাইথাগোরাসের "ভূগোলকের গান" (Music of the Sphere) এইরূপ কোন শব্দ কি না, আমার সন্দেহ হয়।

একদিন কীর্ত্তন-শ্রবণান্তে বাড়ী ফিরে সান্ধ্য উপাসনার পর বসে আছি। সেদিন বিকালে মন দুঃখিত ছিল। বাম কপালের কাছে আকাশে যেন মুদ্রাপরিমিত স্থান ছিদ্রবহুল হয়ে গেল। প্রতি ছিদ্রের ভিতর হতে এক একটা সুর বার হয়ে এক সাথে বাজতে লাগল। বেশীক্ষণ ছিল না। নূপুর, করতাল, মৃদঙ্গ, ঘণ্টা, কাঁসরের শব্দ ও ওঁকার ধ্বনি শোনা যায়। এ সকল ধ্বনি স্বপ্নে যে না শোনা যায় তা নয়। আগেই বলেছি, চিন্তায় ও কাজে, দৈনন্দিন জীবনে স্মরণ-মননে থাকলে স্বপ্ন-জগৎটাও প্রাণজগতের ভাবময় হয়ে যায়। প্রণব বা বংশীধ্বনি শুধু কবিত্বের মধ্যেই বাজে না,—এ কথাটা অনেকে জানেন না।

তড়িৎপ্রবাহের মত আধ্যাত্মিক জগতের তরঙ্গমালারও অনুভূতি হয়। কাম-কামনা আত্মার আগুনে পুড়ে গেলে, দেহ-স্মৃতি ও মন লয় হলে, তা ঘটে। সেগুলি চট্‌চট্ করে হয়। তরঙ্গ মনের একটা বিশেষ অবস্থাতে ধরা যায়। ভাগবত স্বপ্ন বা অপ্রাকৃত দর্শনের সময়েও তা অনুভব করা যেতে পারে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শান্তিপুরের কাছে বাব্‌লাতে যে অপ্রাকৃত সংকীর্ত্তন শুনেছিলেন, তা হয় তো একটা অতীত বস্তুর (প্রকট গৌরলীলার) একটা অনুভূতি হতে পারে, বা নিত্য লীলারও অনুভূতি হতে পারে। গোস্বামীজী ইহাকে নিত্য গৌরলীলার অনুভূতি ব'লেই ধরেছিলেন।

এই অপ্রাকৃত কীর্ত্তন সশিষ্যে তিনি শুনেছিলেন। ভাগবত-দর্শন বিষয়ে যেমন অতীত দৃশ্য, দূরে স্থিত বর্ত্তমান দৃশ্য, ভাবী দৃশ্য বা নিত্যধামের দৃশ্য যে নিত্যের প্রকট, এ জগৎ শ্রবণ বিষয়েও তেমনিই অতীত বিষয়, দূর-ঘটিত বর্ত্তমান বিষয় বা নিত্য-জগতের নিত্য সুরের অনুভূতি হতে পারে। ধ্বনি যে নিজের দেহের ভিতর হতে হয়, ঠিক সে ভাবে আমি কথাটা বুঝি না। উহা নিত্যধামের নিত্য অসংখ্য অনন্ত শব্দের ধ্বনি, যা সময়বিশেষে অবস্থাবিশেষে ধরা যায়। তারা ধরা দেওয়ার অবসরের অপেক্ষা করে, আধার উপযুক্ত হইলে ধরা পাওয়া যায়। আধারটা ধরার যন্ত্র মাত্র,—শব্দের ফোয়ারা নয়।

এবার আঘ্রাণ বিষয়ে কিছু বলি। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেছেন, সাধু মহাপুরুষেরা সূক্ষ্মদেহে এলে, ভাল গন্ধ পাওয়া যায়,—তাতে মনের সাত্ত্বিক ভাব বেড়ে যায়। ধূপ, গোবিন্দভোগ-আতপসিদ্ধ, খস্-খস্-তৃণসার, পদ্ম, শালফুল প্রভৃতির ঘ্রাণ পাওয়া যায়। এ সকল গন্ধ মানুষ নিজের গায়েও পেতে পারে—যদি সে পবিত্র জীবন যাপন করে। কীর্ত্তনের মধ্যেও সময়-সময় দেখা গিয়েছে, কোথা হতে যেন পবিত্র গন্ধ এসে বাতাস ছেয়ে গেল। এ সকল গন্ধ শুধু যে ব্যক্তি-বিশেষে পায় তা নয়,—এক সঙ্গে বহু লোকে পায়। আবার ব্যক্তিবিশেষ সময়বিশেষের জন্য অন্তর্জগতের কোন একটা স্তরে পৌঁছে, কেবল নিজেই সুগন্ধ উপভোগ করেন,—অপরে তার ভাগ পায় না। যা হোক, মোটামুটি ধারণা এই যে, ধূপাদির গন্ধ নিম্নস্তরে সাত্ত্বিক জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় পাওয়া যায় (তমোগুণে স্থিত মানুষের দেহ এক পশু-বিশেষের গন্ধ ছাড়ে)। সাত্ত্বিক জীবনের উপরের অবস্থায় পৌঁছিলে, পদ্ম ও শালফুলের গন্ধের মত গন্ধ পাওয়া যায়। শেষোক্ত গন্ধ প্রকৃত প্রেম-ভক্তির উদয় হলে তবে মিলে। নিজে-নিজে ভিতরে-ভিতরে সেই উচ্চস্তরে মুহূর্ত্তের জন্য কারো ভাগ্যে যাওয়া ঘটলে, সে গন্ধ অনুভূত হয়। আবার ঐ স্তরে নিত্য-স্থিত সূক্ষ্ম শরীরে লীলাকারী জীবসকলের নিকটে দয়া করে এসে ভক্তের অনুরাগ বর্দ্ধনের জন্য ঐ অনুভূতির আস্বাদ দিতে পারেন। আবার বলি, এ সকল সাধনের বা মানব জীবনের চরম লক্ষ্য নয়; দগ্ধীভূত কাম-কামনার ভস্মস্তূপময় শ্মশানভূমে প্রেমের উৎস ও তার প্রেরণানুসারী কাজ কেবলই নিত্য জগতে থেকে, নিত্য লীলারসে মজে, বা এ জগতে থেকে সে লীলার অনুকারী—লোকশিক্ষার্থ অবতীর্ণ গুরুর অভিপ্রেত—কর্ম্ম করে, দশা, সমাধি প্রভৃতির স্তর অতিক্রম করে, খুব উচ্চে উঠে গেলেই, এ দেহেই কোন উচ্চ অশরীরীর আবেশে কাজ সম্ভব হয়; বা লীলার সময়ের ইচ্ছানুসারী কাজ হয়। তেমন কাজ করেন অবতার-স্থানীয় মহাজনেরা—তাতেই জীবনের পরিণতি ও সার্থকতা।

এই প্রবন্ধ লেখার পরে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের পুস্তকাগার হতে বিখ্যাত আইরিশ কবি A.E. র Candle of Vision নামে বই লয়ে পড়লাম। তাতে A. E. সাহেবের দেবদূত-দেখা, পাহাড়ের ধারে নির্জনে বসে করতাল, গির্জা ঘণ্টা, বাঁশী শোনা প্রভৃতি অনুভূতি ও চিন্তার মিল দেখে আশ্চর্য্য হলাম। তিনিও ভাগবত স্বপ্নের মত অপ্রাকৃত স্বপ্ন ও দর্শনে বিশ্বাসী। বিখ্যাত বেলজিয়ান সাহিত্যিক ইয়োরোপীর কন্টিনেণ্টের সেক্সপীয়ার মেটারলিঙ্কও অশরীরী ও অপ্রাকৃত জগতের কথা আজকাল মানছেন। চিন্তা ও ভাবরাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ক্রমেই বুঝি আসন্ন হয়ে এল।

কৈশোর প্রেম

[শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু]

ভালো লাগে না, বুঝলি তারা, জীবনটা মোটেই ভালো লাগে না—ধূসর সন্ধ্যায় শূন্য ছাদের সম্মুখে অনাদৃত বিজন ঘরে বসিয়া একটি যুবক আকাশের দিকে চাহিল। আকাশের এক কোণে একটি তারা তেমি করুণোজ্জ্বল নয়নে তাকাইয়া রহিল। রঙীন স্বপ্নগুলো সব ভেঙ্গে গেছে; আলোর একটু রেখা নেই কি?

পশ্চিমাকাশ হইতে একটু সোণালী আলোর রেখা সন্ধ্যা-সুন্দরীর রাঙা শাড়ীর আঁচলের মত শূন্য ঘরটিকে উজ্জ্বল

করিয়া তুলিল। সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলিয়া, মুখে আঁচল ঢাকিয়া বসন্তের প্রথম বাতাসের মত এক তরুণী আসিয়া আলো-ছায়াময় ঘরে দাঁড়াইল। শিহরিয়া উঠিয়া যুবকটি স্বপ্নাবিষ্টের মত বলিল, কে তুমি? সাতরংএর আঁচলে আনন ঢেকে এলে, আমার বিজন ঘরে আঁধারে একা এসে দাঁড়ালে—কে তুমি?

ঝর্ণার সুরে তরুণী বলিল, চিন্‌তে পারছো না আমায়? ওই কণ্ঠ, ওই মূর্ত্তি, ওই সুর, পদ-নখ-প্রান্ত হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত যেন তাহার অতি পরিচিত; তবু যুবকটির মনে হইল, এ কোন্ চির-অজানা তরুণী তাহার ঘরে আসিল।

ব্যথিত স্বরে যুবকটি বলিল, কোন্ পূর্ব্বজন্মে তোমার সঙ্গে যেন অতি নিবিড় পরিচয় হয়েছিলো; কিন্তু পার্‌ছি না, চিন্‌তে পার্‌ছি না—

সাতরংএর বস্ত্র সরাইয়া, আলো ঝলমল মুখ বাহির করিয়া, তরুণী যুবকটির দিকে তারার আলোর মত চাহিল,—অশ্রু-সায়রে শতদলের মত তাহার চোখ দু'টি।

অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া যুবকটি বলিল, তুমি!

—হাঁ, আমি, আমি তোমার কৈশোরের প্রেম।

—আমি ভেবেছিলুম, তুমি মরে গেছো;—তুমি এতদিন বেচে আছো?

—আমি তোমার প্রথম যৌবনের প্রথম প্রেম—আমি ত মরিনি, আমি ত মর্‌তে পারি না, যতদিন তোমার সেই কিশোরী প্রিয়া তাহার হৃদয়ে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বে—

—তবে, তবে কি তুমি ঘুমিয়েছিলে এতদিন?

—ঘুমোবো? আমি চির-জীবন্ত, চির-জাগ্রত আছি। যতদিন সে তোমায় ভুলবে না, ততদিন আমি অমর।

—কিন্তু সে ত কিশোরী নেই; তার বয়স তেরো থেকে সাতাশে এসে পৌঁছেচে;—তার ঘর বাঁধা হয়ে গেছে—

—তার প্রাণের পুলকের সঙ্গে কেঁপে, তার কথা-গানের সুরের সঙ্গে বেজে, তার চাউনির আলোয় জ্বলে, তার দেহের আনন্দের সঙ্গে জড়িয়ে, আমিও চির-বিকশিত ফুলের মত দিনে-দিনে বেড়ে উঠেছি।

—কিন্তু আমি ত জানি নি—

—তুমি ত খোঁজ নাও নি। তুমি ভেবেছিলে, আমি এখনও ঘুমিয়ে আছি। আমার মন-ভোলানো রূপটাকে রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যার মত তুমি তোমার হৃদয়-অলকায় শুইয়ে, শিয়রে অনির্ব্বাণ প্রেম-প্রদীপ জ্বালিয়ে, অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে ছিলে,—খেয়াল ছিলো না, সত্যিকার রাজকন্যা কখন জেগে উঠেছে। তোমার আলোয় তার প্রথম আরতি হোল, দিনে—দিনে বয়স তার বেড়েছে,—তার রাজপুত্র এসে তাকে জয় করে নিয়ে গেলো,—তা'ত তুমি চেয়ে দেখো নি;—তুমি ভেবেছো, এখনো সে ঘুমিয়ে আছে,—তার শিয়রে সারাজীবন প্রতীক্ষা করতে হবে।

—বড় ভুল হয়ে গেছে দেখ্‌ছি—

—কিন্তু এমন হিসেবের ভুলে জীবন দেউলে হয়ে যায়; এর গরমিল মেলাতে যে সারাজীবনের অশ্রু লাগে।

—কিন্তু তুমি ত ফিরে এসেছো,—হিসেব এবার মিলে যাবে।

—হায় রে, আমি ত থাকতে আসি নি,—আমি শুধু এসেছি, আমি মরিনি,—বেচে আছি।

—জানাতে,—একটু বস্‌বে না?

তরুণী ধীরে সম্মুখের শয্যায় অঞ্চল পাতিয়া বসিল।

যুবকটি ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

—আমি এতদিন তোমার প্রিয়ার বুকে ছিলুম; আজ তোমার বেদনা দেখে, দ্বার খুলে বেরিয়ে এলুম।

—কি বলে দিয়েছে, সে তোমায় কি বলে দিয়েছে?

—সে তোমাকে এই কথাটি বল্‌তে বলে দিয়েছে,—তারও অন্তরে বেদনা আছে।

—আচ্ছা, আমার কিছু করা না করায়, যাওয়া না যাওয়ায় তারও কি কিছু যায়-আসে?

—খুব যায়-আসে—

—আমার যাওয়া-আসায় তারও কিছু যায়-আসে—এ যে এক পরমাশ্চর্য্যকর অপরূপ সত্য আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হোল! এ সত্যের ঘাটটির সন্ধান আগে পেলে, তরীটা তুফানে এত দুল্‌তো না।

—সন্ধান কি কোন দিন করেছিলে?

—ঠিক্ বলেছো,—সন্ধান কোন দিন করি নি; আমি নিজের প্রেম নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম,—তার প্রেমের দিকে তাকাবার অবসর হয় নি। এতদিন যেন স্বপ্নের ঘোরে চলে এসেছি; ভেবেছি, গান-ভোলা পথিকের মত প্রাণটাকে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে

যাই ; কুড়োবার আমার দরকার কি ? পেতে আমি চাই নি, দিয়ে চলে যাই—

—সত্যই কি কিছু পেতে চাও নি ?

—প্রথম প্রেমে যৌবন-স্বপ্নে উদ্বেলিত অন্তরে উজাড় করে দেবার গানই বেজেছিলো—পাবার কথা সত্যি মনে হয় নি। কুঞ্জ-দ্বারে বসে-বসে তার নামে বাঁশী বাজাচ্ছিলুম—যদি তার ডাক আসে, তবে ভিতরে যাবো। নিজের গানে এতই নিমগ্ন ছিলুম যে, দেখি নি, কখন দখিণ হাওয়া বিজয়ীর মত এসে কুঞ্জ-দুয়ার খুলে প্রবেশ করেছে,—বসন্ত তাহার ফুলের মালা নিয়ে চলে গেলো। হায় রে হতভাগা, এখন পত্রহীন, শুষ্ক, জীর্ণ বৃক্ষ-দলে শীতের হাওয়ার হা-হা'র মত বাঁশীতে কিসের গান বাজ্ছে—

—দুঃখ নেই, ভালো করে শোন। আজ ঝরা পাতার তানে কিসের গান বাজ্ছে—সে যে নব সৃষ্টির, নব প্রেমের জন্মের গান।

—আমি চাই—জীবনটা কি আবার ঊনত্রিশ বছর থেকে উনিশ বছরের ঘাটে ফিরে যেতে পারে না ? জগতের বিধাতা যদি শুধু আমাদের দুজনের জন্য জগতের ঘড়িটাকে পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেন—সে ও আমি আবার যদি সেই চোদ্দ বছরের জীবনে ফিরে যেতে পারি—যা ভুল হয়েছে তা শুধ্রে,যা ভেঙে গেছে তা গড়ে তুলি—তার কাছে কোন দিন কিছু চাইনি বলে কি তার এতদিনের হৃদয়-সঞ্চিত অমৃত আমার কাছে ব্যর্থ যাবে—

—ব্যর্থ যাবে না, ব্যর্থ হবে না—যা হারিয়েছো, তাকে নূতন অপরূপ রূপে পাবে—তোমার অশ্রুর সরোবরে শতদলের মত এই সত্যটি প্রস্ফুটিত হোল—তোমার প্রেম ব্যর্থ হয় নি—তোমার ভালোবাসাকে সে ভালোবেসেছে।

—কিন্তু এ খবর কেন পাই নি? কেন এ কথা আগে মনে হয় নি ? কেন ভেবেছি, আমার প্রতি তাহার ব্যবহার, তাহার সহজ স্বভাব, তাহার আন্তরিক ভদ্রতা, তাহার অমল সরলতা—

—সে হেসে কি বলেছে জানো ? সে বলেছে, এই ভাবটাই সহজ কি না,—নিজের মত পরকে ভাবা—

—কেমন করে তোমায় জানাবো, আমার কৈশোরের পেয়ালা তোমার স্বপ্নসুধায় দ্রাক্ষারসের মত কানায়-কানায় ভরেছে,—তোমার একটি দৃষ্টিতে আবার সুমধুর যৌবনের প্রতি দিনের পাত্রে আনন্দ-মদিরা উপছে-উপছে পড়েছে,—তোমার একটি কথায় সমস্ত রাত্রি মধুর স্বপ্নের জাল রচনা করেছে,—তোমার একটি হাসিতে জ্যোৎস্না-বিহ্বল রজনী বিনিদ্র কেটেছে ;—কেমন করে তোমায় বল্বো, তোমার প্রেমকে আমি ভুলেছিলুম বলে, তোমায় আমি ভুলি নি,—তোমার একটু চলা, একটু হাসি, একটু চাওয়া, একটু কথা-গান দেহে-মনে আনন্দের তুফান এনেছে ; —তাই, ভালোবাসো কি না বাসো খোঁজ নিতে ভুলে গেছিলুম ;—কেমন করে তোমায় বুঝোবো, আমার প্রাণের প্রেম মাটির প্রদীপের মত জালিয়ে তোমার ঘরের দুয়ারের পাশে পথের ধারে সেই কিশোর বয়স থেকে বসে আছি ; সাহস হয় নি, দরজা পেরিয়ে নির্মল মন্দিরে প্রবেশ করে, তাই দিয়ে তোমার আরতি করি। কিশোর গিয়াছে, যৌবন এসেছে ; বর্ষার পর শরৎ, তার পর বসন্ত-ঋতুর পর ঋতু ফুলে-ফুলে পা মেলে চলে গেছে ;—আমার প্রদীপের শিখা অচঞ্চল অম্লান রাখ্বার জন্যই আমি ব্যস্ত হয়েছিলুম,—চেয়ে দেখি নি, সেই প্রদীপের দিকে তুমি কখনও চাইলে কি না,—সেই প্রদীপের আলোয় তোমার অন্তর একটু রাঙা হোল কি না ;—চেয়ে দেখি নি, কারা জয়ধ্বনি করে তোমার ঘরে ঢুক্লো, কারা তোমায় বন্দনা করে জয় করে নিয়ে গেলো। মণিময় সোনার প্রদীপের আরতির শেষে আমার মাটির প্রদীপে তোমার পূজা হবে, তাই বসেছিলুম আনমনা ; সহসা চাইতে, আজ সমুখে এ কি দেখি ! কোন্ খুসির আনন্দে তুমি ঘর ছেড়ে বাইরে এসে, পথের ধূলা থেকে আমার প্রদীপ তোমার কমল হাতে তুলে নিলে ! তার আলোর আভা তোমার মুখে পড়েছে,—পৌছেচে ; আমার প্রেমের শিখা তোমার অন্তরাকাশের কোণে-কোণে পৌছে রাঙা হয়ে উঠেছে। সারা জীবনের প্রদীপজ্বালা ব্যর্থ হয় নি। আজ তুমি জানালে এই পথের পাশে একটি মাটির প্রদীপের আলোয় কি দেওয়ালী উৎসব হয়েছিলো। তোমারও দিনরাত এর শিখায় দীপ্ত হয়েছে। তাই দেখে, তোমার অনুপম প্রেমের স্পর্শে আমি ধন্য হোলুম। কেমন করে তোমায় জানাবো, আজ আমার সমস্ত দেহ-মন আলোয় আলো হয়ে উঠেছে।—তোমার ঘরের এক কোণ উজ্জ্বল করে নিরালায় তোমার আরতি কর্বো বলে এতদিন ধরে প্রাণের আনন্দে যে আলো জালিয়ে

রেখেছি, তোমার অমল আঁখি-পাতে সে আলো আর ঘরের আলো রইলো না,—সে সবার পথের আনন্দ-আলো যাত্রী প্রাণের আলো-সাথী হোল। কেমন করে তোমায় জানাবো, তোমার এ নিরুপম অমল ভালবাসা আমার কত ভালো লেগেছে—আজ সে আমার নব-জন্ম দিলো।

বিদ্যুৎ-উজ্জ্বল নয়নে তরুণী যুবকটির দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত দেহ সুধারস-সিঞ্চিত করিয়া ধীরে উঠিল; সাতরংএর বসনে আপনাকে অবগুণ্ঠিত করিয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

—চলে যাচ্ছো?

—হাঁ।

—একটু দাঁড়াও—চোখে জল ভরে আসে যে—সমস্ত-যৌবন-সঞ্চিত অশ্রুরাশি তোমার পায়ে ঝরে পড়তে চায়;—এ কি অন্তরের দুর্নিবার ক্রন্দন আরম্ভ হোল—

—ধন্য হোলুম আমি এ অশ্রুমাল্য পরে,—তোমার জীবনে আমার কাজ শেষ হয়েছে।

যুবকটি আবেগের সহিত তরুণীর হাত ধরিতে অগ্রসর হইল। নিমেষের মধ্যে সে কোথায় অন্তর্ধান করিল, তাহার সাতরংএর আঁচল যেন জ্যোৎস্নার আলোয় মিলাইয়া গেল। নীলাকাশের অসীম জ্যোৎস্নালোকের মধ্যে সে হারাইয়া গেল,—বসন্ত-নিশীথের আলো, হাওয়া, গীত-গন্ধের মধ্যে সে মিলাইয়া গেল।

যুবকটির দুই চোখ দিয়া সারারাত্রি যে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল, তাহার প্রতি বিন্দু আকাশে তারার পর তারা হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়া, সেই হারিয়ে-যাওয়া কিশোরীর অদৃশ্য তনু ঝলমল করিয়া মণিহারে সাজাইতে লাগিল।

ভোরের আলো যখন তাহার দুয়ারে আসিয়া পৌঁছাইল, ঊষার সোণার তোরণ-দ্বার খুলিয়া সাতসুরের সাতরংএর রঙীন বসন পরিয়া, মূর্ত্তিমতী সঙ্গীতের মত কে তাহার নবজন্মের অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। আনন্দে শিহরিয়া যুবকটি দেখিল, এ যে সেই কিশোরী, নারীরূপে এলো। দীপ্তকণ্ঠে সে বলিল, মূর্ত্তিমতী আনন্দ, তোমাকে প্রণাম। তোমার অনুপম পুণ্য প্রেম আমার সুদিন-দুর্দ্দিনের প্রতিক্ষণ প্রভাতের অরুণ-আলোর মত উজ্জ্বল রাখবে। তোমার চন্দন-সম স্নিগ্ধ প্রেম সুখসুপ্তরাত্রি, নিদ্রাহীন দুঃখরাত্রিতে গানের সুরের কোমল অঞ্চল পেতে তারার আলোর মত শিয়রে জেগে থাকবে। আমার ভাষার ভাণ্ডারে এমন কথা-সম্পদ খুঁজিয়া পাই না তোমার এ নিরুপম প্রেমকে আমি বর্ণনা করি। মানব-ভাষায় তোমার প্রেমকে ঠিক বোঝাইবার মত কথা নেই বুঝি! এই চির-পথিকের পথের প্রদীপ, অক্ষয় আনন্দ পাথেয় তোমার প্রেম আমার অন্তরে অমৃত-মধুর মত চিরসঞ্চিত থেকে, জীবন-পদ্মটিকে চির-প্রস্ফুটিত, চির-অম্লান, চিরক্ষণ গন্ধময় বর্ণময় করে রাখবে। তার পর পৃথিবীর সব পথচলা শেষে মৃত্যু যখন এসে এই সুন্দরী ধরণীর বৃন্ত হতে পুষ্পটিকে ছিঁড়ে তুলবে, তাহার হাতের স্পর্শে পদ্মের পাপড়ির পর পাপড়ি ঝরিয়া পড়ে, তাহার গোপন বক্ষে তোমার নাম লেখা দেখে, সেই মৃত্যুদূতেরও চক্ষে হয় ত এক ফোঁটা জল ঝরে পড়বে।

অশ্রুঘন নয়নে মৃদু হাসিয়া নারী বলিল, পারবে কি, তুমি পারবে কি? আমার এইটুকু ভালোবাসার ছোট দীপটি কি অন্তরের ঝঞ্ঝাঘন রাতে তৃষ্ণার ঝোড়ো হাওয়ায় বারবার নিভে যাবে না? জীবনের কত কামপিচ্ছিল মোহময় পথে এই ছোট ফুলটিকে হাতে করে নির্ভয়ে চলে যেতে পারবে;—দেহের স্পর্শ হাতের সেবা তুমি পাবে না, দিন-রাতের সঙ্গ গোপন প্রাণের ব্যথা তুমি জানবে না,—সুখ-দুঃখের ভাগে বাঁধা ঘরের আনন্দ তুমি বুঝবে না;—কত স্নিগ্ধ শরৎপ্রাতে মেঘমেদুর বর্ষার দিনে দখিণ হাওয়ায়, বসন্ত-সন্ধ্যায়, জ্যোৎস্না-মুখর মাধবী-রাতে পুষ্পিত কুঞ্জবনের পাশে এ শূন্য ঘরে চাহিয়া কি অন্তর হায় হায় করে উঠবে না বন্ধু?

দীপ্ত কণ্ঠে যুবকটি বলিল, পারবো,—খুব পারবো, সাকী, তোমার ওইটুকু প্রেমে জীবনের পেয়ালা কানায়-কানায় ভরে উঠেছে—এই পেয়ালাভরা আনন্দ সারাজীবন পান করতে করতে বাঁশীতে নব-নব তানপুরে গানে,—গানে ঘর ভরে তুলবো—পথের সব পথিক ঘরের দুয়ারে থেমে সেই গান শুনে তোমারি জয়ধ্বনি করে যাবে—এই পেয়ালা আর কবিতা আর গান—

A Flask of Wine, a Book of Verse—and Thou
Beside me singing in the Wilderness—
And Wilderness is Paradise now.

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

বস্ত্র বা সূত্র রঞ্জনের কার্য্যে হাত দিতে হইলে, প্রথমে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে; এবং গোড়াতেই যথেষ্ট আয়োজন করিয়া রাখিতে হইবে, যেন কাজ করিবার সময় কোন অসুবিধায় পড়িতে না হয়। অবশ্য প্রথমেই সকল বিষয় ধরিতে পারা যাইবে না। কাজ করিতে করিতে যেমন-যেমন অভিজ্ঞতা জন্মিবে, উদ্যোগ আয়োজন ততই সম্পূর্ণ হইয়া আসিবে।

প্রথম কথা, জল। রংয়ের কার্য্যের জন্য যে জল ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা যতদূর সাধ্য বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। তাহাতে যেন কোন রকম ময়লা বা অন্য কিছু না থাকে। জল যত বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার হইবে, রংও তত ভাল হইবে, সফলতাও তত বেশী হইবে। কলিকাতায় কলের জল অনেকটা বিশুদ্ধ; তাহাতে কাজ চলিতে পারে। পাড়াগাঁয়ে যেখানে-যেখানে জলের কল আছে, সে সকল স্থানে জলের অবস্থা কেমন তাহা জানি না। অনেক মফস্বলের সংবাদপত্রে স্থানীয় কলের জলের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ দেখিতে পাই। আবার, জল দেখিতে পরিষ্কার হইলেও, অনেক সময়ে রাসায়নিক হিসাবে, সে জল বিশুদ্ধ নয়। সেই রকম জলে এমন অনেক পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকিতে পারে, যাহা রাসায়নিক পরীক্ষায়ই কেবল ধরা পড়ে—সাধারণ চক্ষে ধরা পড়ে না। এরূপ জল ফুটাইয়া সিদ্ধ করিয়া লইয়া, শীতল হইলে দেখা যাইবে, তলায় অনেক ময়লা থিতাইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং জল ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে তাহা উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া, শীতল হইলে ফিল্‌টার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় কথা, পাত্র। রংয়ের কাজে চীনা মাটীর বাসন, কলাই-করা বাসন অর্থাৎ এনামেলের বাসন, পাথরের বাসন ও মাটীর বাসন প্রশস্ত। ধাতু-পাত্র কোন মতেই ব্যবহার করা চলে না। কলাই-করা বাসনের চটা উঠিয়া গিয়া যদি লোহা বাহির হইয়া পড়িয়া থাকে, তবে সে বাসন পরিত্যাগ করিতে হইবে। বাসনগুলি এমন আকারের হওয়া চাই যে, তাহাতে রংয়ের উপাদান ভিজাইতে, মিশাইতে এবং বস্ত্র বা সূত্র তাহাতে উত্তমরূপে ভিজাইয়া লইতে, পারা যায়। ভিন্ন-ভিন্ন রংয়ের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন এক সেট করিয়া পাত্র থাকিলেই ভাল হয়। যদি পাত্র কম থাকে,—একই পাত্রে যদি বিভিন্ন রং তৈয়ার করিতে হয়,—তাহা হইলে একটা রং ব্যবহার করিবার পর পাত্রটী উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লওয়া উচিত। এই বিষয়ে সতর্ক না হইলে অধিকাংশ স্থলেই রং ভাল খোলে না।

তৃতীয় কথা, যে বস্ত্র বা সূত্র রঞ্জিত করিতে হইবে, তাহা অতি উত্তম রূপে কাচিয়া লইতে হইবে। কেবল জল-কাচার কথা বলিতেছি না,—Bleach করিয়া অর্থাৎ বর্ণহীন করিয়া লইতে হইবে। Bleach করিবার পূর্ব্বে ক্ষার-জলে ভালরূপ সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে তাহাতে কোনরূপ ময়লা কিম্বা তৈলাক্ত পদার্থ না থাকে। কোরা কাপড় যেমন সহজে জলে ভিজে না, দুই এক ধোপ পরে তাহা সহজেই ভিজিতে পারে, সেইরূপ raw তূলা সহজে জলে ভিজে না। সুতরাং রংও তাহাতে ধরে না। ক্ষার-জলে সিদ্ধ করিয়া লইলে তাহাতে সহজে রং ধরাইতে পারা যায়।

এইরূপ আয়োজনের পর কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য ধুতি সাড়ীর পাড় প্রধানতঃ কালো এবং লালই হইয়া থাকে। ধুতি সাড়ীর পাড় প্রস্তুত করিবার জন্য সুতরাং লাল ও কালো রংয়ে সূত্রকে প্রধানতঃ রঞ্জিত করিতে হইবে। এই দুই রংই কিন্তু এখন এখানে পাকা হইতেছে না। প্রথমে কালো রংয়ের কথাই ধরা যাক। কালো রংয়ের জন্য কষায় জিনিস অর্থাৎ tannic acid-বহুল জিনিস রঞ্জন-উপাদান এবং হীরাকষ mordant স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এই দুইটী জিনিস সাধারণ কালো রং উৎপাদন করিতে পারে; এবং সে রং তত গাঢ় হয় না; আর খুব উত্তম রূপ পাকাও হয় না—মাঝামাঝি রকমের পাকা হয়। আগে এই রংয়ে কিছু কাজ করিলে, প্রকৃত পাকা কালো রংয়ের কাজে হাত আসিবে।

হরীতকী, বহেড়া, খয়ের, মাজুফল, বাবলা ছাল ও ফল, গরাণের ছাল প্রভৃতি যে সব জিনিসে ট্যানিক এসিড আছে,

সেই সব জিনিসই এই কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। তন্মধ্যে মাজুফলেই ট্যানিক এসিডের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; এই জিনিস ব্যবহার করিলে উত্তম কালো রং উৎপন্ন হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত মসলাগুলি ভিন্ন-ভিন্ন পাত্রে, অথবা কয়েকটি মসলা লইয়া একই পাত্রে, যথেষ্ট জল দিয়া দুই-একদিন ভিজাইয়া রাখিলে উহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ কষায় রস বাহির হইয়া জলে দ্রব হইয়া থাকিবে। দুই দিন স্থির ভাবে রাখিয়া দিলে, উপরে কেবল দ্রবীভূত ট্যানিক এসিড-যুক্ত পরিষ্কার জল থাকিবে; আর জিনিসগুলি ও সমস্ত ময়লা তলায় থিতাইয়া পড়িবে। সেই পরিষ্কার জলটি সাবধানে—যেন তলার মসলা ও ময়লা জলের সঙ্গে ঘোলাইয়া না যায়—অন্য পাত্রে তুলিয়া লইতে হইবে। হীরাকষও অপর একটি পাত্রে ভিজাইয়া লইয়া কিছুক্ষণ স্থির ভাবে রাখিয়া দিলে, সমস্ত ময়লা তলায় থিতাইয়া গিয়া, উপরে পরিষ্কার হীরাকষের জল থাকিবে। এই জলও পূর্ব্বোক্ত রূপে অন্য পাত্রে ঢালিয়া লইতে হইবে। পরে ক্ষার-জলে ধোওয়া এবং Bleach করা সূত্র বা বস্ত্র প্রথমে কষ জলে ভিজাইয়া লইয়া, পরে হীরাকষের জলে ভিজাইয়া লইয়া ছায়ায় শুকাইতে হইবে। একবারে যদি যথেষ্ট গাঢ় কালো রং উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে দুই-তিনবার এই প্রক্রিয়া করিলে অনেকটা গাঢ় কালো রং উৎপন্ন হইবে। ইহা পাকা হইবে বটে, কিন্তু খুব পাকা নহে।

খুব গাঢ় ও আরও বেশী পাকা রংয়ের জন্য হীরাকষ (sulphate of iron) ব্যবহার না করিয়া, acetate of iron ব্যবহার করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সেনগুপ্ত (পঞ্চকোটরাজ পোঃ, ভায়া আদরা, বি, এন, আর) অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কিছু পলাশফুলের (শুষ্ক) নমুনা পাঠাইয়াছিলেন। ইহা হইতে দুই প্রকার রং বাহির হইতে পারে। ফুলের দলগুলি হইতে বাসন্তী রং এবং কেশরগুলি হইতে লাল রং বাহির হইয়াছিল। কিন্তু দল হইতে কেশর বিচ্ছিন্ন করা বহু সময়-সাপেক্ষ; এবং তাহা পরিমাণেও কম। সেইজন্য স্বতন্ত্র ভাবে তাহাদের পরীক্ষা সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই। দুই-ই এক সঙ্গে ভিজাইয়া তাহার জল লইয়া, যথাক্রমে সোরা, ফট্‌কিরি, সোডা, হীরাকষ ও তুঁতে মর্ড্যাণ্ট স্বরূপ ব্যবহার করিয়া, নিম্নলিখিত ভাবের রংগুলি পাইয়াছি; যথা, সোরার জলের সঙ্গে মিশাইয়া ফিকে হলদে রং বাহির হইয়াছিল। ইহা তত উজ্জ্বল নহে; তবে রেশম অস্থায়ী ভাবে রং করা যায়। ফট্‌কিরির জলে ভিজাইয়া হলদে রং পাওয়া যায়। ইহা প্রথমোক্ত অপেক্ষা কিছু উজ্জ্বল বটে; কিন্তু পাকা নয়। সোডার জলে ভিজাইয়া ঘোর বাসন্তী রং পাওয়া গিয়াছিল। ইহা যেমন দেখিতে উজ্জ্বল, তেমনি কতকটা পাকা; কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। হীরাকষের জলে ভিজাইয়া যে রং বাহির হইল, তাহা অল্প কালো, এবং তেমন সুবিধাজনক নহে। তুঁতের জলে মিশানোতে হলদের মত রং বাহির হয়। ইহাও পাকা নয়। এই পলাশ ফুলের পরীক্ষা আমার এখনও শেষ হয় নাই। দল ও কেশর স্বতন্ত্র করিয়া আর একবার পরীক্ষা করিতে পারিলে, একটা পাকা রং পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

খুব পাকা কালো রং করিতে হইলে সুমাক (sumach) ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হয়। এই জিনিসটি একটি উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং ইহাতে ট্যানিক এসিডের পরিমাণ যথেষ্ট। ডাক্তারখানায় ইহা পাওয়া যাইতে পারে। এক পোয়া সুমাক দুই গ্যালন জলে আধঘণ্টা ধরিয়া সিদ্ধ করিয়া লইলে গাছগুলির ডাল ও ছাল হইতে নির্য্যাস বাহির হইয়া আসিবে। এই জলে কাপড় ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে উহা হইতে তুলিয়া লইয়া চূণের জলে আধঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবেন। পরে সুমাকের জলে দেড় আউন্স তুঁতে মিশাইয়া সেই জলে কাপড়গুলি একঘণ্টা রাখিয়া দিন। তার পর কাপড়গুলি সুমাকের জল হইতে তুলিয়া মিনিট পনেরো আবার চূণের জলে ভিজাইয়া রাখুন। ইতোমধ্যে এক পোয়া লগউড দুই গ্যালন জলে একঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া, তাহাতে কাপড়গুলি তিনঘণ্টা ভিজাইয়া রাখুন। তার পর ঐ লগউডের জলে অর্দ্ধ আউন্স বাইক্রোমেট অব পটাশ মিশাইয়া, সেই জলে কাপড়গুলি একঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবার পর, পরিষ্কার জলে কাচিয়া ছায়ায় শুকাইতে দিন। ইহা বেশ পাকা কালো রং।

খানিকটা জলে কিছু হীরাকষ ভিজাইয়া লউন। একখানি কাপড়ের জন্য দুই কি আড়াই ভরি হীরাকষ লইলেই হইবে। একখানি সাদা ধোপ-দেওয়া কাপড় জলে ভিজাইয়া

নিঙড়াইয়া লইয়া, ঐ হীরাকষের জলে ভিজাইয়া লউন, যেন কাপড়খানির সমস্ত জায়গা হীরাকষের জলে ভিজিয়া যায়। তার পর ঐ কাপড়খানিকে চূণের জলে ভিজান দেখি। দেখিবেন, চমৎকার শ্যামবর্ণ হইয়াছে। ইহা দূর্ব্বা ঘাসের রং। কিন্তু এই রং পাকাও নয়, আসল রংও নয়। ছায়ায় ঐ কাপড়খানিকে শুকাইতে দিলে, উহাতে যতই হাওয়া লাগিবে, ততই উহার রং বদলাইয়া চাঁপা ফুলের রং বাহির হইবে। ইহাই আসল রং। বায়ুর অম্লজান যোগে এই যে বর্ণ-পরিবর্ত্তন হইল, ইহা অতি পাকা রং।

একখানি নূতন সাদা গামছা প্রথমে জল-কাচা করিয়া, তার পর বাটা হলুদ-গোলা জলে ভিজাইয়া লউন। তার পর একখানি গসেজের এম্প্রেস পেল সোপ, বা পূর্ব্বে যে বিলাতী বার সাবান যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইত, সেই সাবান দিয়া হলুদে-ছোবানো গামছাখানি কাচিয়া লউন। সাবানের ক্ষার সংযোগে হলুদের রং বদলাইয়া গিয়া গোলাপী রং দাঁড়াইয়া যাইবে। এই রং নেহাত কাঁচা নয়—কিছুদিন বেশ থাকে।

আমাদের নিতান্ত নিজস্ব নিত্য-ব্যবহার্য্য ঘরের জিনিস খয়ের একটী অতি উৎকৃষ্ট রঞ্জন-উপাদান। তবে অবশ্য যে খয়ের সাধারণতঃ পানের সঙ্গে খাওয়া যায়, সে খয়ের নয়—কালো খয়ের বা মঘা খয়ের। এই খয়ের এক দিন কি দুই দিন ভিজাইয়া খয়েরের জল প্রস্তুত করিয়া লউন। সেই খয়েরের জলে কয়েক টুক্‌রা পরিষ্কার কাপড় ভিজাইয়া ছায়ায় শুকাইয়া লউন। ইতোমধ্যে সোডা, তুঁতে, হীরাকষ আলাদা-আলাদা পাত্রে ভিজাইয়া উহাদের জল তৈয়ার করিয়া রাখুন। বস্ত্র-খণ্ডগুলি শুকাইয়া গেলে, এক-একখণ্ড বস্ত্র এক-এক প্রকার মর্ডাণ্টের জলে ভিজাইয়া লইয়া দেখুন, একই খয়ের হইতে কত রকম রংয়ের বাহার খোলে। সোডার জলে ভিজাইলে ফিকে বাদামী বা pale brown রং হইবে; তুঁতের জলে পাটকিলে বা ইটের মত রং হইবে; হীরাকষের জলে ভিজাইলে লইলে কতকটা গোলাপীর মত রং হইবে। এই সকল রংই পাকা।

কলিকাতায় সাজা পানের দোকানে যে খয়ের ব্যবহৃত হয়, তাহা সম্ভবতঃ এই মঘা খয়ের। পানের দোকানদারেরা পান সাজিবার উপযুক্ত খয়ের এই মঘা খয়ের হইতে তৈয়ার করিয়া লয়। এই খয়ের তৈয়ারী করিবার জন্য তাহারা যে প্রণালী অবলম্বন করে, তাহাতে খয়েরের এই রঞ্জন-গুণজনক পদার্থটি নষ্ট হইয়া যায়। পানওয়ালারা খয়ের জলে ভিজাইয়া লইয়া খয়েরের জলটুকু ফেলিয়া দেয়, এবং কঠিন অদ্রবনীয় অংশটুকু ব্যবহার করে। রঞ্জন-শিল্পের দিক হইতে ইহা একটা মস্ত লোকসান। কোন চতুর ব্যক্তি যদি ঐ খয়ের-ভিজানো জল সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি economy-র দিক হইতে একটা কাজের মত কাজ করিতে পারিবেন—একটা মূল্যবান রঞ্জন দ্রব্য অপচয় হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে রঞ্জন কার্য্যে প্রয়োগ করিবেন। ইহাতে হয় ত তাঁহার কিছু অর্থাগমেরও সুবিধা হইতে পারে।

কৈন্দ্রিকাকর্ষণ

[শ্রীঅনিলকৃষ্ণ চৌধুরী]

পরমাণু বেড়ি ঘুরিয়া-ঘুরিয়া
অণু দলে দলে ক্লান্ত,
ভুবনের ধারে ছুটিয়া-ছুটিয়া
চাঁদ আজি বড় শ্রান্ত,
সূর্য্য-পরিধি বেষ্টন করি'—
ভুবন আজিকে সারা,
জ্যোতি-বলয় পরিবেষ করি'—
গ্রহগুলি পথ-হারা।
জগতের মাঝে আমি যে ঘুরিয়া,
পথ খুঁজে নাহি পাই;

বসে আছ তুমি কেন্দ্রের মাঝে;
কেমনে বা সেথা যাই?
সমকেন্দ্রিক বৃত্তের মাঝে
আমারি মত সবে,
পথ-হারা আজ। তোমার সকাশে
কেমনে ইহারা যাবে?
প্রকৃতি হাসিয়া দিল সে উত্তর
অতি মৃদু মৃদু কাণে,
"পাবে খুঁজে পথ, যখনি পড়িবে
কেন্দ্রাভিমুখ টানে।"

পুস্তক-পরিচয়

অযোধ্যার বেগম।—শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। 'অযোধ্যার বেগম' এ দেশের একাধিক সহস্র রজনীর একটী রাত—তাহার দুর্ভাগ্যের ইতিহাসের একটী বড় পাতা। 'অযোধ্যার বেগম' নাটকখানির নাম; কিন্তু ইহার গৌণ লক্ষ্য বাঙ্গালার শেষ নবাব মীর কাশেম আলি খাঁর পরিণাম; আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে অযোধ্যার বেগম ও বীরবিক্রম রোহিলাদের জীবন-মরণের শোচনীয় কাহিনী। ওস্তাদ নাট্যকার অপরেশ বাবু অতি সুকৌশলে এই নাট্যশালার—এই ভারত-রঙ্গমঞ্চের সেই সময়ের প্রধান অভিনেতা-দিগকে একেবারে নেপথ্যে রাখিয়াছেন;—এমন কি, তাঁহাদের নামটী পর্য্যন্তও করেন নাই। প্রাতঃস্মরণীয়া অযোধ্যার বেগম মনস্বিনী বউ-বেগমের মহনীয় চরিত্রের এক অংশ মাত্র—অবশ্য সেটী অতি পবিত্র অংশ—অতি উজ্জ্বল বর্ণবিভায় রঞ্জিত করিয়াছেন। কঠোর ঐতি-হাসিককেও স্বীকার করিতে হইবে, সে চিত্র অতিরঞ্জিত নহে,—কবির অতিরঞ্জনও সে বাস্তব চিত্রের অনেক নিম্নে থাকে;—ফয়জা-বাদের সমাধি-মন্দির এখনও সেই লোকললামভূতা মহিয়সী মহিলার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। নাট্যকার অপরেশবাবু বাঙ্গালার শেষ নবাব হতভাগ্য মীর কাশেম ও অযোধ্যার বউবেগমের পবিত্র কাহিনী লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন; বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক উপহার দিয়া সাহিত্যের সম্পৎ বৃদ্ধি করিয়াছেন। আর একটী কথা বলা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক চরিত্রের বাহিরে তিনি স্বকপোল-কল্পিত যে 'ছায়া'র চিত্র দিয়াছেন, তাহা অনুপম; তাহাতে অপরেশ বাবুর কৃতিত্ব বিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহার অধিক পরিচয় যাঁহারা চান, তাঁহারা নাটকখানি কিনিয়া পড়িবেন এবং রঙ্গালয়ে তাহার অভিনয় দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

অতীতের ব্রাহ্মসমাজ।—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দেব প্রণীত; মূল্য এক টাকা। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দেব মহাশয় সে-কালের লোক; তিনি সাধন-ভজনেই শেষ জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন,—কোন গ্রন্থ লিখিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে এতকাল উপস্থিত হয় নাই। তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুগণ এতদিন পরে তাঁহাকে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাধ্য করিয়াছেন; তাই তিনি এই 'অতীতের ব্রাহ্মসমাজ' লিখিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের ধারাবাহিক ইতিহাস তিনি লিপিবদ্ধ করেন নাই; তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়াছেন। সকল কথা বলিবার তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই; যে কথাটি যে ভাবে মনে উঠিয়াছে, তাহা ঠিক তেমনই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; তাঁহার ন্যায় সংযতমনা সাধক যে কোন প্রকার বাগাড়ম্বর করেন নাই, এ কথা না বলিলেও চলে। আমরা পরম আগ্রহে, ভক্তি-নম্র চিত্তে এই বইখানি পাঠ করিয়াছি। ইহাতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কথা, তাঁহার সহিত পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ, নগেন্দ্রনাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের অনেক সাধকের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। আর আছে পরম ভক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অলৌকিক জীবন-কথা। ভক্ত উমেশচন্দ্রের কথা পড়িতে-পড়িতে আমরা যেন আর এক লোকে উপস্থিত হইয়াছিলাম। কি তাঁহার প্রেম পিপাসা, কি তাঁহার স্বধর্ম্মে দৃঢ়তা, কি তাঁহার ত্যাগ-স্বীকার, কি তাঁহার পরোপকারস্পৃহা, আর কি তাঁহার ক্ষমাশীলতা! এই পুস্তকখানির মধ্যে এ ভাবের অনেক দৃশ্য আছে। জ্ঞান ও ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

পায়ের ধুলো।—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত; মূল্য দুই টাকা। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবাবুর 'পায়ের ধুলো' মাথায় করিয়া লইতে হয়। যে সামাজিক অত্যাচার, নৃশংস ব্যবহার দেখিয়াও, বুঝিয়াও আমরা চোখ বুজিয়া আছি, যে নিরপরাধা সাধ্বী যুবতীদিগের আকুল ক্রন্দনে আমাদের দেশের গগন-পবন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, যে করুণ কাহিনী কত জন কত ভাবে বলিতেছেন, সেই কথাই হেমেন্দ্রবাবু আজ দৃঢ়স্বরে, তেজের সহিত বলিয়াছেন। শুধু গল্প লিখিবার জন্যই বলেন নাই; প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, হৃদয়ের গভীর আবেগে তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার লেখা পড়িয়া, তাঁহার গল্পের অনুসরণ করিয়া আমরা বুঝিয়াছি, তিনি কি গভীর মনোবেদনা পাইয়া এ গল্প লিখিয়াছেন; তাই তাঁহার 'পায়ের ধুলো' মাথায় করিয়া লইলাম।

রংমশাল।—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শ্রীচারুচন্দ্র রায় সম্পাদিত, মূল্য ১৷৵৹। শ্রীমান প্রেমাঙ্কুর ও চারুচন্দ্র আজ এই দুই বৎসর ছেলে-মেয়েদের জন্য পূজার সময় রংমশাল জ্বালেন। এই রংমশালের আলোতে ছেলেদের সুন্দর মুখ যে আরও সুন্দর দেখায়, তাহা আমরা জানি। যাঁহারা এই রংমশালের মশলা যোগান, তাঁহারা অনেকেই উচ্চ দরের শিল্পী; কি জিনিস যে ছেলেমেয়েদের ভাল লাগে, তাহা বেশ জানেন। কাজেই এই রংমশাল ছেলেদের হাতে বড়ই শোভা পায়। একাধারে আমোদ ও শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা এই রং-মশালে আছে; সেই জন্যই প্রতি বৎসর আমরা এই রং-মশালের আগমন প্রতীক্ষা করি। এক কথায় বলিতে পারি, পূর্ব্ব বৎসরের রংমশাল অপেক্ষা এ বৎসরের রংমশাল ভাল হইয়াছে, আলো আরও খুলিয়াছে।

মোহের প্রায়শ্চিত্ত।—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত, মূল্য ১৷৹। শ্রীমতী ঘোষজায়া একটী ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়া মাত্র অবলম্বন করিয়া এই পঞ্চাঙ্ক নাটকখানি লিখিয়াছেন। ঔপন্যাসিকের লিখিত নাটক; সুতরাং ইহাতে নাটকীয় আর্ট অপেক্ষা উপন্যাসের ভাবই বেশী ফুটিয়াছে। আমাদের মনে হয়, যে ঘটনা অবলম্বন করিয়া

এই নাটকখানি লিখিত হইয়াছে, তাহা উপন্যাসেই ভাল খুলিত। যাহা হউক, নাটক লেখা বোধ হয় লেখিকা মহাশয়ার এই প্রথম; তাঁহার এই প্রথম চেষ্টা নিতান্তই যে ব্যর্থ হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না।

ললিত গাথা।—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র প্রণীত, মূল্য এক টাকা। পরলোকগত নাট্যরথী দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্র, সাহিত্য-সেবক ললিতবাবু এতদিন যে সমস্ত কবিতা লিখিয়াছেন, তাহারই কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া এই 'ললিত-গাথা' প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা নানা সভা-সমিতিতে এবং সংবাদ ও সাময়িক পত্রে তাঁহার অনেক কবিতার পরিচয় পাইয়াছি; সেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া ললিতবাবু ভাল কাজ করিয়াছেন। তাঁহার পরম বন্ধু স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহারই ছন্দে, যে কয়েকটী কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা বেশ হইয়াছে।

ঝড়ের দোলা।—মূল্য বার আনা। চারিজন লেখক লেখিকার চারিটি গল্পে এই 'ঝড়ের দোলা'। সেই চারিজনের নাম—শ্রীসুনীতি দেবী, শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ, শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু ও শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস। চারিজনই লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, মনীন্দ্রবাবু ও গোকুল বাবুর লেখা ত আমরা কত ছাপিয়াছি। সুতরাং এ দোলা যে সুন্দর হইয়াছে, তাহা না বলিলেও চলে। গল্প কয়টীর উপাখ্যানভাগও অতি সুন্দর।

জন্ম-অভিশপ্তা।—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত; মূল্য দেড় টাকা। এখানি উপন্যাস। লেখিকা মহোদয়া তাঁহার হৃদয় ঢালিয়া দিয়া, তন্ময় হইয়া এই উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন। নির্দ্দয় স্বামীর অত্যাচারে ধর্ম্মপরায়ণা সহিষ্ণুতার অবতার বঙ্গ গৃহলক্ষ্মী যে কেমন ভাবে তিলে তিলে মরণের পথে অগ্রসর হন, সহস্র চেষ্টা করিয়াও যে নিষ্ঠুরতার পাশ ছিন্ন করিতে পারেন না, তাহারই চিত্র এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় রক্তের অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই কাহিনী বলিতে গিয়া লেখিকা মহোদয়া নিজেই আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন, তাহার পরিচয় এই গ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

স্বায়ত্ত শাসনের ইতিহাস।—শ্রীঅনাথবন্ধু রায় বি এ প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতি সাধন ও দেশে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে স্বায়ত্ত শাসন বিষয়ক আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দেশের লোকে যাহাতে এই ব্যবস্থার উপকারিতা বুঝিতে পারে, এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। বইখানি সময়োপযোগী হইয়াছে।

বৈষ্ণব দর্শনে জীবতত্ত্ব।—শ্রীঅভয়কুমার গুহ এম-এ, বি-এল্, পি-এইচ-ডি প্রণীত; মূল্য আট আনা। 'সৌন্দর্য্য-তত্ত্বে'র সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ এই 'বৈষ্ণব দর্শনে জীবতত্ত্ব' আলোচনা করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণব দর্শনের চূড়ান্ত গ্রন্থ। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সুপণ্ডিত গুহ মহাশয় জীব-তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন। সোজা কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই গ্রন্থখানি ভক্তি-তত্ত্বের সুন্দর বিশ্লেষণ। এই দুর্ম্মূল্যের দিনে আট আনায় এমন সুন্দর গ্রন্থখানি দান করিয়া গ্রন্থকার ভক্তগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইবেন।

দেবতার দান।—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য একটাকা আট আনা। এখানি উপন্যাস। গ্রন্থকার 'ভূমিকা'য় বলিয়াছেন, এটী সুদীর্ঘ আখ্যায়িকার একাংশ। আমরাও গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, ইহাতে মূল আখ্যায়িকার অঙ্গহানি হইয়াছে, অনেকগুলি চরিত্র সম্যক পরিস্ফুট হয় নাই। এমন অবস্থায় উপন্যাসখানির আলোচনা করা সঙ্গত হইবে না, আমরা পরিচয়ে কেবল গ্রন্থকারের লিপি-কুশলতার প্রশংসা করিয়াই নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলাম।

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা।—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য একটাকা। এই 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা'র গ্রন্থকারের পরিচয় দিলেই গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হইবে। বাঙ্গালা দেশের 'স্বদেশী'র আমলের মাণিকতলার বোমার ব্যাপার যাঁহাদের মনে আছে, তাঁহারাই গ্রন্থকার উপেন্দ্র বাবুকে চিনিতে পারিবেন। এই মামলায় শাস্তি লাভ করিয়া অন্যান্য অনেকের সহিত গ্রন্থকার উপেন্দ্রনাথকেও নির্ব্বাসনে গমন করিতে হইয়াছিল। এখন তিনি দেশে ফিরিয়া তাঁহার নির্ব্বাসন-কাহিনী লিখিয়াছেন। উপেন্দ্রবাবু যে সুলেখক, তাহা আমরা পূর্ব্বেও জানিতাম। এই গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। তিনি বেশ সরল সুন্দর ও রসপূর্ণ ভাষায় তাঁহার নির্ব্বাসন-কাহিনী লিখিয়াছেন।

আসুর বানি-পাল।—শ্রীবিভূতিভূষণ লাহিড়ী প্রণীত; মূল্য একটাকা। এই নাটকখানি রাজকবিশ্রেষ্ঠ বায়রণের 'Sardanapalus'র অনুবাদ। তবুও ইহাকে বিভূতিবাবুর 'প্রণীত' বলিবার কারণ এই যে, এই নাটকে তিনি মূল চরিত্রগুলি বায়রণের গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিলেও, অনেক স্থানে নিজের কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তাহাতে মূল গ্রন্থের কোন প্রকার অঙ্গহানি না হইয়া বরঞ্চ সৌষ্ঠব বৃদ্ধিই হইয়াছে। আমরা এই নাটকখানি পাঠ করিয়া বিভূতি বাবুর লিপি-কুশলতার প্রশংসা করিতেছি।

সাহিত্য-সংবাদ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে অভিনীত 'আলমগীর' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৷৹।

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের নূতন উপন্যাস 'সোনার বালা' প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৷৹।

শ্রীমতী সরসীবালা বসু প্রণীত 'শ্রেয়সী' প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৷৹।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত 'শনির দৃষ্টি' প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত নূতন ছবির বই নব হিল্লোল বাহির হইয়াছে; মূল্য ৩৲।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, Calcutta.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, Calcutta.

বাললীলা

শিল্পী— শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

Blocks by—BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.

ফাল্গুন, ১৩২৮

দ্বিতীয় খণ্ড] নবম বর্ষ [তৃতীয় সংখ্যা

বঙ্গসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি

[শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী]

সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির আলোচনা করার পূর্ব্বে উহার উৎপত্তির কাহিনী একটু স্মরণ করিয়া দেখিতে হইবে। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে ইহা এখন স্পষ্টীকৃত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় অষ্টম কি নবম শতাব্দীতেও বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন ছিল। সে বাঙ্গালা অবশ্য এখনকার বাঙ্গালা হইতে অনেক স্বতন্ত্র; সুতরাং সে বাঙ্গালা আধুনিক বাঙ্গালী অতি কষ্টেই বুঝিতে পারে। চসারের ইংরাজীর সঙ্গে এখনকার ইংরাজীর যতটা পার্থক্য, তৎসাময়িক কাহ্নুর গীত হইতে আমাদের ভক্ত কবি রামপ্রসাদ বা নীলকণ্ঠের গানের প্রায় ততটাই প্রভেদ। এই কাহ্নুর গীত ও অপরাপর সহজ-মতাবলম্বী সাধকগণের সঙ্গীত বাস্তবিক আমাদের এই বাঙ্গালা ভাষার বেদীস্বরূপ। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরাও খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে অনেক দোঁহা ও গীতিকা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সিদ্ধাচার্য্যগণের সে সব সঙ্গীত সে সময়ের লেখা ও সেকালের লোকের লিখিত টীকার সহিত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কাজেই বলিতে হয় যে, অন্ততঃ সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার প্রচলিত বঙ্গভাষার প্রকৃত নমুনা বা নিদর্শন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে পার্শী শব্দ বা কথার লেশ নাই; বড়-বড় সমাসবহুল সংস্কৃত শব্দাদিও একেবারে নাই। হাজার বছর আগে আমরা ঘরে ও বাহিরে যে রকম

ভাষা ব্যবহার করিতাম, ইহাতে তাহারই আভাষ বা পরিচয় আমরা পাইয়াছি।

ইহার পরে গোবিন্দচন্দ্রের গীত। সে গীতের প্রচুর পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, তাহাও সেই মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বের লেখা। তখন লোকে কি ভাবে ও কেমন করিয়া যে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইত, তাহার একটা ছবি এই গোবিন্দচন্দ্রের গীতে লক্ষ্য করা যায়। অতঃপর, মুসলমান আক্রমণের সময়ে রমাই পণ্ডিতের "শূন্য পুরাণ" প্রণীত হয়। উহাতে "নিরঞ্জনের উষ্মা" নামে যে ছড়া আছে, তাহাতে মুসলমান আক্রমণের বর্ণনা পরিস্ফুট হইয়া আছে। খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী হইতে এই মুসলমান আক্রমণের সময়, অর্থাৎ প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার যতখানি পুষ্টি ও বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল, তাহাতে, আমার বোধ হয়, বৈদেশিক প্রভাব একেবারে ছিল না; কিন্তু, তাহার উপাদান বিভাগে সহজ-ধর্ম্মমত, নাথপন্থিগণের ধর্ম্মমত, বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত বিশেষ ভাবেই বিবৃত রহিয়াছে। এই সব দেখিলে ইহা একরূপ নিঃসন্দেহই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রথমে জনমণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্মমত বা ভাবপ্রচার করার উদ্দেশ্যেই বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধরা বিশেষতঃ "সহজিয়া" সম্প্রদায়, দেশের আপামরসাধারণকে ধর্ম্মের কথা বা বৃত্তান্ত শুনাইবার জন্য যে বিশেষ ব্যস্ত বা সমুৎসুক ছিলেন, সে আগ্রহ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের রচিত দোঁহা ও গীতিকায় এখনও সুস্পষ্ট বোধগম্য হয়। ধর্ম্মমত প্রচারের জন্যই যখন আমাদের এই ভাষার উৎপত্তি, তখন বুঝিতে হইবে, আমাদের বাঙ্গালা ভাষা মূলতঃ ও মুখ্যতঃ সম্যক রূপেই Democratic। এ সময়ের বাঙ্গালাতে রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ নাই,—পুরাণ-সমূহের কোন উল্লেখ নাই; আছে কেবল বৌদ্ধ সন্ন্যাসের মত, নাথপন্থী যোগিগণের মত এবং "সহজ" ধর্ম্মমূলক সাধারণ নীতি-কথার আবৃত্তি।

ইহার পর মুসলমান-বিজয়। পাঠানগণ এ দেশে আসিলে, বাঙ্গালার বৌদ্ধসমাজে যে কি ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এখন আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। পাঠানগণ প্রথমেই বৌদ্ধ বিহার, মন্দির প্রভৃতি ধ্বংস বা নষ্ট করিতে লাগিলেন। অনেকের অনুমান যে, মূলে বাঙ্গালার বৌদ্ধগণই বস্তুতঃ হিন্দুদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া, বক্তিয়ার খিলিজী ও তাঁর অনুচর পাঠানগণকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। রমাই পণ্ডিতের "শূন্য পুরাণ" পাঠ করিলে, এ অনুমান অনেকটা দৃঢ়ই হয়। কিন্তু সে যাহা হোক, পাঠানদের আক্রমণের পর এবং পরিণামে, বাঙ্গালার হিন্দুগণই আবার জাগিয়া উঠিলেন। আদিশূরের আমল হইতে লক্ষ্মণ সেনের সময় পর্য্যন্ত, বাঙ্গালায় নবাগত কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্য তেমন বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই; তাঁরা রাজার আশ্রয়ে থাকিতেন, অনবরত যাগযজ্ঞ করিতেন, এবং নিজ-নিজ জাতিগত শুদ্ধিরক্ষার জন্য সততই বিধিমতে সচেষ্ট ও সাবধান থাকিতেন মাত্র। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের অধঃপতনান্তে ও পাঠানগণের অভ্যুদয়ের সময়ে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ বুঝিলেন, আর পূর্ব্ববৎ উদাসীন থাকিলে চলিবে না; নিজেদের চিরাচরিত সেই সব ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-পদ্ধতির যথোচিত প্রচার লোকসমাজে আর না করিলেই নয়। ফলতঃ, পূর্ব্বগামী সিদ্ধাচার্য্যগণ, নাথপন্থের যোগিগণ, এবং সহজিয়াগণ যে পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাদের ধর্ম্মমত জনসমাজে প্রচার করিতেন, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণও তখন সেই পন্থার অনুসরণ করিলেন; এবং ক্রমশঃ তাহারই সঙ্গে-সঙ্গে 'মনসার গান', 'মঙ্গলচণ্ডীর গান', 'শিবায়ন' প্রভৃতি ব্রাহ্মণ মতের অনুগামী করিয়া লিখিত হইতে লাগিল। সিদ্ধাচার্য্যেরা যে বাঙ্গালা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্র বা অলঙ্কারের কোন প্রাধান্য ছিল না। ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ-মহাভারত লিখিবার সময়ে, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধি-নিষেধ মান্য করিয়া, পুরাণাদির আদর্শানুসারেই বঙ্গসাহিত্য গড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর খাঁটি বাঙ্গালীয়ানা কৃত্তিবাসের রামায়ণে, কাশীদাসের মহাভারতে ও মুকুন্দরামের চণ্ডীতে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করিল; সংস্কৃত ভাব, সংস্কৃত অলঙ্কার, সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্টতা বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকট হইয়া উঠিল; এবং এই সময়ে বঙ্গভাষা সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে অজস্র ঋণ করিলেন।

অপর পক্ষে মুসলমানগণ আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের শাসন-পদ্ধতি এদেশে প্রচলিত হইয়াছিল; আরবী-পার্শীরও পঠন-পাঠন সুরু হইয়া গিয়াছিল। ফলে, এই ব্রাহ্মণ-পুষ্ট, নবোন্মেষিত, অভিনব বঙ্গসাহিত্যে পার্শী ও আরবী ভাষারও প্রচুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। কেবল ইহাই নহে। যে

সময়ে ঐই বঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি ও উন্নতি হইতেছিল, সে সময়ে পাঞ্জাবে ও যুক্তপ্রদেশে অর্থাৎ পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দী ও ব্রজভাষারও উন্মেষ ঘটিতেছিল। বৈজু বাওরা হইতে তুলসীদাস, শ্যামদাস, বিহারীদাস প্রভৃতি বড়-বড় হিন্দী কবিরা মহাকাব্য প্রণয়নে নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহারা রামলীলা ও ব্রজলীলার বর্ণনা করিতেছিলেন; এবং সে সকলের মাধুরীচ্ছটায় ও সুধাস্বাদে উত্তরভারত পূর্ণ ও পরম প্রমত্ত হইয়া উঠিতেছিল। সে সাহিত্যের সমাদর মোগল ও পাঠান বাদশাহগণ পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আলাউদ্দীন হইতে আকবর পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরগণ হিন্দী কবি ও হিন্দী কাব্যের যথেষ্ট আদর-মর্য্যাদা করিতেন; কাজেই, হিন্দীভাষা তৎকালে এই ভারতের সর্ব্বত্র সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আদরের প্রবাহ-বেগ আসিয়া এদেশেও আমাদের ভাষার অঙ্গে তরঙ্গ তুলিল। তৎকালীন বাঙ্গালা ভাষাও তাই হিন্দীর কাছেও অনেকটা ঋণী। শুধু ঋণীই নহে,—সুরদাস ও শ্যামদাসের বহু গান বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত হইয়া, নরোত্তমদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী রূপে আমাদের সাহিত্যের শোভা ও গৌরব বর্দ্ধন করিতেছে! এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, এই হিন্দীভাষাও সেই বিশ্ব-সাহিত্যের আদিজননী সংস্কৃত ভাষারই বিধি নিষেধ মানিয়া চলিত; এবং ক্রমশঃ সংস্কৃত শব্দবহুল হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং বলা বাহুল্য, তখনকার সে হিন্দীর সঙ্গে তৎকালীন বঙ্গভাষার বেশ একটু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সৃষ্টি হইয়াছিল। ক্রিয়াপদের কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনেই সেই হিন্দী দোঁহা ও চৌপদী বা 'চৌপায়ী' বাঙ্গালায় পরিণত হইয়া যাইত। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আমরা তুলসীদাসের অনেক পদ দেখিতে পাই; এবং ঘনরামের "ধর্ম্মমঙ্গলে"র বহু স্থল নরহর কবির যুদ্ধ-বর্ণনার আকারান্তর মাত্র।

ইহার পর পতিতপাবন মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের যুগ। এই সময়ে বঙ্গভাষা ভাদ্রের ভরা ভাগীরথীর মত দুই কূল পরিপ্লাবিত করিয়া, খরস্রোতে হেলিয়া-দুলিয়া, নাচিতে-নাচিতে অনন্তের অভিমুখে আপন আনন্দের অদম্য আবেগে একাগ্র ভাবেই ধাইয়া চলিয়াছে! ভাষার সে অগাধ শব্দসম্পৎ, সেই বর্ণন-বৈচিত্র্য ও প্রগাঢ় ভাব-গাম্ভীর্য্য,—সে সুমধুর ও নিরাবিল রস-বিলাস সত্যই যেন বর্ষার প্রবীণা তরঙ্গিনীর মত! তাহাতে অগাধ সলিলের অপূর্ব্ব কল-কল্লোল কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতেছে! ভাষার সেই তেজ,—তেমন গৌরব, তাদৃশী গরিমা ও মহিমা অদ্যাপি আর কোথাও কোন কবি-সম্প্রদায় ঘটাইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন,—"কাব্য ও নাটকই চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রাণ; অলঙ্কারের রস ও ভাবই তাহার দেবতা। নয় রস, বিয়াল্লীশ ভাব ও আটটি সাত্বিক ভাব লইয়াই বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের কীর্ত্তন। পদকর্ত্তারা দেখিতেন, এই-এই ভাবের গান আছে,—এই-এই ভাবের গান নাই। যাহা নাই, তাহা নূতন করিয়া রচিয়া, তাঁহারা কীর্ত্তনে জুড়িয়া দিতেন। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, এক গানে একজন ভাব দিয়াছে,—আর একজন তাহাতে অন্য ভাব লাগাইল। এইরূপে নানা ভাবে, নানা রূপে, নানা রসে সঙ্কীর্ত্তনের গান হইতে লাগিল। তাহার পর অনেক গান, অনেক পদ জমিয়া গেল। সেই পদ ও গান সংগ্রহ করিয়া "পদকল্পতরু" প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইল।" ইহা ত গেল, শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্মের একটি দিক। ইহার আরও একটি প্রধান দিক আছে। শাস্ত্রী মহাশয় জানি না কেন, সে দিকের কোন সন্ধান বা পরিচয় দেন নাই। তাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরিচয়ের দিক। জয়ানন্দের "চৈতন্য মঙ্গল", কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্য-চরিতামৃত", বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্যভাগবত" প্রভৃতি গ্রন্থ-নিচয় এই পরিচয়ের দিকটি পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটি এক-একখানি মহাকাব্য। ভাবে, রসে এবং সে সময়ের তুলনায়, এ সকলের ভাষায় এগুলি অপূর্ব্ব, অনুপম ও অতুল! এই সকল পুস্তকের সাহায্যে লোক-সমাজে চৈতন্য-ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল; এবং এতদ্বারা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ বিশ্ব-জগতে যথার্থই দিব্য চৈতন্য সঞ্চারিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় এই সকল গ্রন্থের প্রভাবে তৎকালে বিধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সঙ্কোচ ও সংহার ঘটিয়াছিল। ধর্ম্ম-প্রচারের গ্রন্থ বলিয়া, এসব গ্রন্থের ও সঙ্গীতসমূহের প্রায় অধিকাংশেরই ভাষা সজীব, সতেজ এবং অত্যন্ত প্রসাদগুণ-সম্পন্ন। এইরূপে এই বৈষ্ণব-ধর্ম্মই প্রকৃত পক্ষে আমাদের মাতৃভাষাকে এক অপূর্ব্ব বা অভিনব ও অমোঘ প্রাণ-শক্তি-প্রভাবে উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত, অর্থাৎ জীবন্ত ও প্রবল বেগবতী করিয়া তুলিল; এবং অদ্যাপি সেই ভাষার তড়িৎ-স্পন্দনে এ দেশের আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলে এক পুণ্য-সরস ভাব-প্রভাবে

অনুপ্রাণিত ও স্নিগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই শুভ অবসরে বাঙ্গালা ভাষা এক অপরূপ আকার ধারণ করিল ;—স্বভাব-শোভন শৌর্য্যে ও নিরুপম মাধুর্য্যে তাহা একটি নির্দ্দিষ্ট গতি ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হইল।

প্রসঙ্গতঃ এইখানে বৈষ্ণব-সাহিত্যের একাংশ, যাহা পদাবলী-সাহিত্য নামে পরিচিত, তৎসম্পর্কে এই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ প্রবন্ধে অতি সামান্য ভাবে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখমাত্র করিয়া যাইব। মহাকবি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ব্যতীত অপরাপর যাবতীয় পদকর্ত্তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক বা তৎপরবর্ত্তী। উৎকল-কবি সদানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে "হরিনাম মূর্ত্তি"—এই অপূর্ব্ব আখ্যাটি প্রদান করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, এমন ভাবে "এক কথায়"—একটি মাত্র শব্দে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের যথাযোগ্য প্রকৃত পরিচয় আর কেহই প্রদান করিতে পারেন নাই। যে মহাভাব অতুল-অম্লান দৃশ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে এই নশ্বর ধরণীকে ধন্য করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে ভাবের আভাস অগ্রদূত-রূপী কবিগুরু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির ঐ অপূর্ব্ব পদাবলীতে সর্ব্বপ্রথম স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া, পরে রসস্বরূপ স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের চরণ-রেণু স্পর্শে সার্থক ও ধন্য হইয়া, প্রমত্ত বেগে উদ্দাম তরঙ্গ-ভঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক, পরিণামে আবার সেই অনন্ত ও অপার মহাপারাবারেরই ক্রোড়ে গিয়া, আকুল আগ্রহে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল! বৈষ্ণব-পদাবলী প্রকৃতই এ ভূমণ্ডলের কবিত্ব-ভাণ্ডারের চিরন্তন, অবিনশ্বর ও অমূল্য সম্পৎ! বঙ্গভাষা অন্য বহুবিধ ঐশ্বর্য্য-সম্ভারের জন্য বিশ্বের অপরাপর সাহিত্যের নিকটে নানা ভাবে নতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত, স্বীকার করি ; কিন্তু এই যথার্থ কবিত্ব-বৈভবে, অর্থাৎ সকল সৌন্দর্য্য ও কবিত্বের নিদান বা মূলাধার, এই ঐশ্বরিক প্রেম ও ভক্তি-ভাবের অতুল বর্ণন-নৈপুণ্যে ও বিচিত্র রসবিন্যাসে আমাদের এ সাহিত্য অখিল সংসারের অনন্য ও অনুপম মুকুট-মণি রূপেই চিরদিন গণ্য থাকিবার যোগ্য, সন্দেহ নাই।

ইহার পরে বাঙ্গালা ভাষার সৌখীন যুগ দেখা দিল। রাজসভায় ইহার আদর হইল। পার্শীনবীশ ও সংস্কৃতজ্ঞ সুধী ব্রাহ্মণগণ ক্রমে এ ভাষাকে সংস্কৃত ও সম্মার্জ্জিত করিতে উদ্যত হইলেন। ভাষাসুন্দরীও যেন কাল-প্রভাবে কতকটা বিলাসিনীর বেশ ধারণ করিল। এই সৌখীন যুগের প্রারম্ভে বঙ্গসাহিত্যে ভারতচন্দ্রই প্রধান কবি ও কর্ণধার। সর্ব্ব-প্রথম এ বাঙ্গালা ভাষাকে ইনিই চাঁচিয়া-ছুলিয়া, মাজিয়া-ঘষিয়া অপূর্ব্ব সামগ্রীতে পরিণত করিলেন। শ্লীলতা বা সুরুচির অত্যন্ত অভাব সত্ত্বেও, ভাষার হিসাবে ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" ও "বিদ্যাসুন্দর" এই সুমার্জ্জিত সাহিত্য-শ্রীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভারতচন্দ্র কবিতা লিখিতে যাইয়া, ভাষার উপরে যে কারিগরি ফলাইয়াছেন,- যে নিপুণ ভাস্কর-শিল্পের, কলা-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, সে সময়ের পক্ষে তাহা সত্য-সত্যই বিচিত্র, বিস্ময়াবহ ও অনুপম। ভারতচন্দ্রের সেই মাজা-ঘষা, সুমধুর ভাষা আজিও আমাদের আদর্শ ;—এখনও কবিকুলে কিংবা সাহিত্যিক সমাজে, সেই ভাষাই প্রধানতঃ প্রচলিত। কিন্তু এ সময়ে আরও একটি বিশেষ স্মরণীয় ব্যাপার ঘটিল। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের মত সরল, সোজা প্রাণের ভাষায় সঙ্গীতাবলী রচনা করিয়া, বঙ্গভাষাকে আর একটা অমূল্য বৈভব দান করিয়া গেলেন। আজ এই দেড় শত বৎসর পরে এখনও সেই রামপ্রসাদের গান ও সুর বাঙ্গালীর কাছে পুরাতন হয় নাই ;—সে ভাষা আজও বাঙ্গালীর অব্যবহার্য্য নহে। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ বাঙ্গলা ভাষাকে রাজপ্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণ-কুটীর পর্য্যন্ত এ দেশের সর্ব্বত্র সমভাবে মুঠো-মুঠো অমূল্য মুক্তাফলের মত নির্ব্বিচারে ছড়াইয়া দিলেন। উঁহাদের প্রভাববশে কাল-ক্রমে পাঁচালীওয়ালা, কবিওয়ালা নিধুবাবু ও দাশুরায়, হরু-ঠাকুর ও মধুকান এ ভাষাকে লইয়া যথার্থই যেন এ দেশময় 'হরির লুট' খেলিয়া গেলেন। ভাষার এমন প্রচার, এতদূর বিস্তৃতি, এ হেন গৌরব ও এতটা সমাদর বাঙ্গালায় আর কখনও হইয়াছে কি না সন্দেহ। শ্রীহট্ট হইতে মালদহ পর্য্যন্ত রামপ্রসাদের মালসী সঙ্গীতের স্রোত দুর্ব্বার বেগে বহিয়া চলিল ; হরুঠাকুরের কবি-গান সকলেই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। বলিয়া রাখা উচিত ও আবশ্যক যে, সেই গোড়াতেও যাহা ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর এই সূচনা সময়েও এত কাল বঙ্গভাষার সেই ভঙ্গী ও সেই ধাতটি ঠিক অব্যাহতই রহিল। গোড়ায় যে ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে, সংযম-সন্ন্যাস শিখাইবার জন্য, বাঙ্গালা ভাষার বিকাশ, এখন এই ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সময়ে হরু-ঠাকুর ও দাশুরায়ের যুগেও সে ভাষা ধর্ম্মপ্রচারার্থ, লোক-শিক্ষাকল্পেই নিয়োজিত ও প্রচলিত রহিল। ভারতচন্দ্রের

"অন্নদামঙ্গল" শক্তিসাধনা প্রচারের পুস্তক মাত্র; উহা কাব্যও বটে, পুরাণও বটে। রামপ্রসাদের গান সেই সিদ্ধাচার্যাদের সঙ্গীতের মত;—তাহা কেবল সংযম-সন্ন্যাস, যোগ ও ভক্তি, সাধনা শিখাইবার উদ্দেশ্যে কবির স্বতঃউচ্ছ্বসিত স্বাভাবিক ভাবাবেশে বিরচিত।

অষ্টম শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত—এই এক-হাজার বৎসর বাঙ্গালা ভাষার মূল প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে নাই;—এই হাজার বৎসর ব্যাপিয়া বাঙ্গালার পুষ্টি ও বিস্তৃতি, বঙ্গসাহিত্যের অভ্যুদয় ও প্রচার লোক-শিক্ষার জন্যই হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে কখনও বৌদ্ধ স্বীয় ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিয়াছেন; কখনও ব্রাহ্মণ আপন পুরাণ কথার প্রচার করিয়াছেন; কখনও তান্ত্রিক বিশ্বজননী জগদম্বার পূজা ও ধ্যানের নিগূঢ় তত্ত্ব-বিজ্ঞান বাঙ্গালীকে শুনাইয়াছেন; এবং কখনও বা বৈষ্ণব সেই পরাপ্রেম বা আদিরসের বিচিত্র মাধুরী-বিলাসে আপনি নিমগ্ন ও তন্ময় হইয়া, শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা বা শ্রীগৌরাঙ্গ-রস মহিমার আলাপন করিয়াছেন। সকল সময়েই শ্রোতা এই বাঙ্গালার আপামরসাধারণ; সম্ভোগী—বাঙ্গালার বিদ্বজ্জনবৃন্দ, যত রসিক-সুজন; এবং বক্তা—সেই সব ভক্ত, ভাবুক, সাধু, প্রেমিক ও সিদ্ধ সাধকবর্গ। তবে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিব যে, যুগে-যুগে, কাল-প্রভাবে যেমন লোকরুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তেমনই আমাদের এ বাঙ্গালা ভাষার গতি ও প্রকৃতিও অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু, এ অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও, মুখ্যতঃ, মূলে এই হাজার বৎসরের মধ্যেও বাঙ্গালা ভাষার ধাতুগত বা স্বাভাবিক প্রকৃতিগত কোন বৈষম্য বা অবস্থান্তর সংঘটিত হয় নাই।

যাহা হোক, অতঃপর এখন এই ইংরাজী যুগের কথা বলিব। ইংরাজ এ দেশে শাসনপদ্ধতি প্রচলিত করার পর বিচারালয় হইতে, সরকারী দপ্তর হইতে, পার্শী ও উর্দ্দু ভাষা উঠাইয়া দিলেন; বাঙ্গলায়—বাঙ্গালীর এই বাঙ্গালা ভাষাই মোটামুটি হিসাবে প্রচলিত করিলেন; এবং সেই সঙ্গে তাঁহারা ইহাও সঙ্কল্প করিলেন যে, এ দেশের ইংরাজ শাসক-সম্প্রদায়কে যৎকিঞ্চিৎ বাঙ্গালাও শিখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তাই "ফোর্ট হ্বিলিয়মে" একটি কলেজ স্থাপিত হইল; এবং সেই কলেজে নবাগত ইংরেজ যুবকদিগকে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা শিখাইবার জন্য মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রভৃতি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিযুক্ত হইলেন। বাস্তবিক "ফোর্ট হ্বিলিয়াম্" কলেজের এই পণ্ডিতগণই ইংরাজী যুগের এই আধুনিক বাঙ্গালার বনিয়াদ তৈরী করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় সেই ভাষাকে আরও সহজ, প্রাঞ্জল ও সুমার্জ্জিত করিয়া, তাহাকে স্কুল-পাঠ্য ভাষায় পরিণত করিয়াছেন। ইংরাজের শিক্ষা-বিভাগের কল্যাণে ক্রমশঃ এই বিদ্যাসাগর-লিখিত পাঠ্য-পুস্তকগুলি শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া, সেই মানভূম, সিংভূম পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পঠিত ও পাঠিত হইতে লাগিল; এবং ইহার ফলে, ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় বিভিন্ন জেলাগত যে বৈষম্য, পার্থক্য বা প্রাদেশিকতাটুকু ছিল, তাহা অতি সহজেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের কবিগণের লিখিত কাব্য-পুস্তকে তৎপ্রদেশের প্রাদেশিকতা স্থানে-স্থানে লক্ষিত হইত; পক্ষান্তরে, রাঢ়ের মুকুন্দরাম ও ঘনরাম প্রভৃতির লেখাতেও প্রাদেশিকতা প্রস্ফুট ছিল। কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের এই নবীন শিক্ষা-পদ্ধতির কল্যাণে এই স্বাভাবিক বৈষম্যটুকু ঐ উপায়ে প্রায় একেবারেই বর্জ্জিত ও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের ভাষাকে যে ছাঁচে ঢালিয়া তৈরী করিয়া দিলেন, ক্রমে তাহা এ দেশের সর্ব্বস্থানেই অসঙ্কোচে ও নির্ব্বিরোধে গৃহীত হইল; এবং সেই ফলে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির একটা বিশিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ ঐক্যের পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল।

আবার, এই ইংরাজের আমলেই আমাদের ভাষায় অনুকরণের যুগ আরম্ভ হইল। ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালী বাবুরা কেবল ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা করিয়া ভাবিলেন—ইংরাজীতে যাহা আছে, তাহা আমাদের সাহিত্যে নাই; অতএব, উন্নতি বিধানের জন্য, আমাদেরও ঐ ইংরাজী ধরণে, বিলাতী সাহিত্যের অনুকরণে একটা অভিনব সাহিত্য রচনা করিতে হইবে। কিন্তু, একমাত্র কবি ঈশ্বর গুপ্ত নিজে ইংরাজীনবীশ হইয়াও, ঠিক এ দলের লোক, অর্থাৎ এ ভাবের ভাবুক ছিলেন না। তিনি বঙ্গভাষার পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, বাঙ্গালার সেই পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদীই বজায় রাখিয়া, মাঝে-মাঝে শুধু বাঙ্গালায় কিছু-কিছু ইংরাজী ভাবের আমদানী করিয়াছিলেন মাত্র। আসলে, বাস্তবিক, এই ইংরাজীয়ানা বা সাহেবীয়ানা প্রবর্ত্তনের যুগাবতার বা নেতা ছিলেন আমাদের কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মাইকেল

বহুভাষাবিদ্ প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মিল্টনের Paradise Lostএর অনুকরণে তাঁহার "মেঘনাদবধ" কাব্যখানি রচনা করিলেন। "মেঘনাদবধের" ভাষা ঠিক বাঙ্গালা নহে;—উহা অনেকাংশেই বিভক্তি-বর্জ্জিত সংস্কৃত। উহার রস, অলঙ্কার প্রভৃতি প্রায় সবই সংস্কৃত হইতে সংগৃহীত। উহার শব্দ-সম্পৎও সংস্কৃতের ভাণ্ডার হইতে সমাহৃত বা প্রাপ্ত। কিন্তু, আসলে উহার ভাব, ভঙ্গী, লিখন-বিন্যাস, এমন কি মূল আদর্শ বা লক্ষ্যটি পর্য্যন্ত খাঁটি য়ুরোপীয় অনুকরণ। একজন খাঁটি বিলাতী সাহেবকে ধুতি-চাদর পরাইয়া, বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত করাইয়া, আমাদের সমাজে চালাইয়া লইতে চেষ্টা করিলে তা যেমন হয়,—মাইকেলের এই সংস্কৃত-বাঙ্গালার মুখোস-পরা, ছদ্মবেশী বিলাতী ধাতের অতুলনীয় কাব্যখানিও যেন কতকটা তেমনই ধারা প্রয়াসে পরিণত হইল। এ পক্ষে মাইকেলের প্রধান শিষ্য ও তাঁহার পথাবলম্বী হইলেও, কবি হেমচন্দ্র মাইকেলের মত অমন নিখুঁত সাহেবিয়ানায় সাফল্য লাভ করেন নাই। তিনি উক্ত "মেঘনাদ বধে"র পরিচয় প্রসঙ্গে বাঙ্গালার নিজস্ব সেই পুরাতন সাহিত্যকে বিদ্রূপ করিয়া, এ দেশকে "পয়ার প্লাবিত বঙ্গদেশ" বলিয়াছিলেন বটে; কিন্তু, নিজেও তাঁর "বৃত্রসংহার" কাব্যে তিনি আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর বজায় রাখিতে পারেন নাই। এই সময় হইতে ইংরাজীর অনুকরণ অতি প্রবল বেগে চলিতে লাগিল; এবং তদবধি এ দেশে যত কবি হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই এই শ্রেণীর কবি। মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি সকলেই এই দলভুক্ত।

বাঙ্গালার গদ্যেও ভাবের দিক্ দিয়া এমনই একটা 'ওলোট্‌পালট্' ঘটিল। যতদূর জানা যায় পূর্ব্বে (অর্থাৎ মুসলমান আমল পর্য্যন্ত) বাঙ্গালায় গদ্য-সাহিত্য ছিল না। ইংরাজ-যুগেই গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের সেই কাদম্বরীর অনুবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও রবিবাবুর ও ইঁহাদের শিষ্যবর্গের নাটক ও নভেলে আসিয়া সেই গদ্যের পর্য্যবসান ঘটিয়াছে। এই গদ্য-সাহিত্যের সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র। প্রকৃত পক্ষে তিনিই বাঙ্গালীকে গদ্য লিখিতে শিখাইয়াছেন;—তাঁহারই গদ্য এখনও বাঙ্গলা লেখকগণের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সেই আদর্শ অনুসারে আজও প্রধানতঃ বাঙ্গলার সমাচার ও মাসিক-পত্র-সমূহ লিখিত হইতেছে;—কতই না নব-নব বিচিত্র পুস্তকাদি প্রণীত হইতেছে; বাঙ্গালার গদ্য একটা বিশিষ্ট আকার ও প্রকার লাভ করিয়াছে। কিন্তু, এইখানে এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরাজের আমলে বাঙ্গালার বৈচিত্র্য ও প্রচার সাধিত হইলেও, এই গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেই, বঙ্গ-সাহিত্যের ধাতুগত প্রকৃতিটা যেন একটু বিশেষ ভাবেই ব্যাহত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা বা বাঙ্গালীর সাহিত্য এখন আর কোন নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য নিয়োজিত নহে। এখন ইহা secular; বিশেষ ভাবেই যেন বিষয়ীর ব্যবসাদারী সাহিত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন ইহা এক হিসাবে সম্পূর্ণ সখের সামগ্রী। কাজেই, এখন ইহার লক্ষ্য কেবল আত্ম-তৃপ্তি বা চিত্ত-বিনোদন। ইহা এক্ষণে বহু বিচিত্র কলা-কৌশলে খুব জমকালো ও মনোহর হইয়াছে সত্য; কিন্তু, পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর ইহার কোন স্থির উদ্দেশ্য বা বাঁধাধরা লক্ষ্য নাই। যে প্রণালীর মধ্য দিয়া রামায়ণ-মহাভারত ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে প্রণালীর মধ্য দিয়া "অন্নদামঙ্গল" প্রভৃতি রচিত হইত, বাঙ্গালা সাহিত্যের সে পুরাতন প্রণালী এখন আর মোটেই নাই। তাই আজ এ সাহিত্য শুধুই আত্ম-তৃপ্তি বা পাঠকের মনস্তুষ্টির একটা উপায়-বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তেমন প্রতিভান্বিত কবি ও লেখক ব্যতীত, মুখ্যতঃ, এখন ইহা সাধারণ সাহিত্যিক বা লেখকের পক্ষে য়ুরোপীয় ভাব, ধরণ-ধারণ ও সিদ্ধান্তসমূহ এদেশে আমদানী করিবার একটা পন্থামাত্র। এই কারণেই আধুনিক এ বাঙ্গালা সাহিত্য এখন নিতান্ত বৈশিষ্ট্যহীন ও স্বরূপবর্জ্জিত। এখন এ ভাষায় যাঁহার যেমন ইচ্ছা বা 'মর্জ্জি', তিনি তেমনই লিখিয়া যাইতেছেন। ইহা এখন যেন অনেকটা নাওয়ারিস্ নাবালকের মত অত্যন্ত দুরন্ত ও যথেচ্ছাচারী।

কিন্তু, তা' বলিয়া, ইহা যে অবিমিশ্র দুর্লক্ষণ, বা সাহিত্যের পক্ষে অতিমাত্র অনিষ্টকর, তাহা হয় ত আজ-কাল অনেকেই মানিতে বা স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন না। এ ভাষার গতি আজ যতই কেন অনির্দ্দিষ্ট, অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল ও বিভিন্ন বিচিত্র ভাব পন্থামুখী হোক্ না, এক হিসাবে সত্য হইলেও, প্রকৃত পক্ষে তাহা যে এ ভাষার অদম্য প্রাণ-শক্তিরই পরিচায়ক, এবং ইহাতে যে উদ্দাম ও অনিবার্য্য

যৌবনোচ্ছ্বাসেরই পরিচয় বা প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা যায়, এ সম্বন্ধে সকলকেই সম্ভবতঃ আজ একমত হইতে হইবে। সাহিত্যের এই বর্ত্তমান অবস্থা ভাল না মন্দ, বিবেচক যোগ্য জন তাহার বিচার করুন। আমি আজ এ ক্ষেত্রে প্রধানতঃ সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির কিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ করিয়াই, আমার বক্তব্যটি শেষ করিতে চাই।

ইংরাজের আমলে এ দেশে প্রথম মুদ্রা-যন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়; এবং সেই সঙ্গে অতি সস্তায় কাগজও বিকাইতে আরম্ভ করে। বলা বাহুল্য—এই দুইটীর সাহায্যে বাঙ্গালায় আজ অজস্র পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু, পূর্ব্বে যখন মুদ্রা-যন্ত্র ছিল না, এত কাগজেরও প্রচলন ছিল না, যখন বাঙ্গালার সাহিত্য ধর্ম্ম-প্রধান ও শিক্ষা-মূলক ছিল,—যখন কীর্ত্তন, পাঁচালী প্রভৃতি উহার প্রধান অঙ্গ ছিল, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের ব্যাপ্তি বা প্রসার এখনকার অপেক্ষা কম ত ছিলই না, বরং যেন এক হিসাবে অনেক বেশীই ছিল বলিয়া বোধ হয়। ভাল-ভাল গায়ক এক-একটা মজ্‌লিসে পাঁচ-দশ হাজার শ্রোতার সম্মুখে এক-একটা পালা গান করিত; গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে, পর্ব্বাহে-উৎসবে কীর্ত্তন ও পাঁচালী প্রভৃতি নিয়মিত রূপে নিয়তই গীত হইত; এবং এই উপায়ে, এই সব গান ও কথকতা প্রভৃতির সাহায্যে, বাঙ্গালার জন-সাধারণ নূতন-নূতন পালার, নূতন-নূতন কীর্ত্তনের ও নানাবিধ পদাবলীর সর্ব্বদাই সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইত। ফলতঃ, ভাল গান, ভাল পদ, ভাল পালা, তখন এ দেশের অধিকাংশ নর-নারীর কণ্ঠস্থ ছিল। সে হিসাবে ভাবিয়া দেখিলে—বাঙ্গালায় "মেঘনাদবধ", "ব্রজাঙ্গনা", "কুরুক্ষেত্র", "বৃত্রসংহার", এমন কি, বিশ্ব-বিখ্যাত "গীতাঞ্জলি"রও তাদৃশ সম্প্রসার বা সার্ব্বজনীন সমাদর ও প্রতিষ্ঠা অদ্যাপি সম্ভবপর হয় নাই। এখন গ্রন্থ-বাহুল্য সত্ত্বেও, বাঙ্গালার জন-সাধারণ আধুনিক এ সাহিত্যের তেমন ঘনিষ্ঠ ভাবে কোন পরিচয়ই পাইতেছে না। এই পরিচয়ের অভাবে, বঙ্গীয় সমাজে আধুনিক আমাদের এ বঙ্গ-সাহিত্যের তাদৃশ কোন প্রভাব নাই। একে ত এ সাহিত্য বিলাতী ধরণে ও য়ুরোপীয় আদর্শের অনুকরণে গ্রথিত হওয়ায়, ইহা আসলে বাঙ্গালী জাতির স্বভাবের বা ধাতেরই অনুকূল নহে; তার উপরে, অপরিচয় হেতু জনসাধারণ এখনও ইহাকে আয়ত্ত করিতে, বা নিজস্ব-বোধে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। রামপ্রসাদের গান, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস ও বলরামদাসের পদ কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রভৃতি যেরূপ সহজে ও অনায়াসে, এবং যে ভাবে বাঙ্গালীর একেবারে মর্ম্মে গিয়া মিলিয়া যায়, সে রূপে ও সে ভাবে "মেঘনাদবধ", "ব্রজাঙ্গনা"র পদ, কিংবা জগন্মান্য কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গান আজও বাস্তবিক বাঙ্গালীর প্রাণকে স্পর্শ বা আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। এ সব রচনা পাশ্চাত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বুদ্ধি ও মনেরই "খোরাক" রূপে গণ্য, মান্য বা স্বীকৃত হইয়াছে, জানি; কিন্তু, আজও এ বাঙ্গালী জাতির অন্তরের বা হৃদয়ের আসল পিপাসা, আশা, আকাঙ্ক্ষা বা যথার্থ অভাব মিটাইয়া, এখনও ইহা তাহার প্রকৃত প্রাণের বস্তু হইয়া উঠে নাই। কারণ, এ সাহিত্য উপভোগের প্রধান ও প্রথম অবলম্বনই হইল—ইংরাজী শিক্ষা। যাহারা ইংরাজী জানে না, ইংরাজী সাহিত্যের এবং বিলাতী ভাব, আদর্শ বা ধরণের মোটেই কোন খোঁজ-খবর রাখে না, কিম্বা ও-সব কিছুরই ধার ধারে না, তাহারা এ সাহিত্যের মহিমা ও তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গমই বা করিবে কিরূপে? ইহার উপর আবার কোন-কোন শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী বাবু সম্পাদকের আসনে সমাসীন হইয়া, বাঙ্গালা ভাষাটাকে এমন ভাবেই গড়িয়া তুলিতেছেন, ইংরাজী 'Idiom ও Epigram' গুলি এমন নিছক্ সাহেবী ঢঙ্গে এ ভাষায় আমদানী করিতেছেন যে, এখনকার সে সব বাঙ্গালা গদ্য ও পদ্য বুঝিতে হইলে, আগে তাহাকে মনে-মনে ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া, তবে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। এ অধিকার, এ ক্ষমতা, এরূপ ধৈর্য্য ও প্রকৃতি বাঙ্গালার শতকরা বোধ হয় নব্বই জনেরই নাই। সুতরাং, এরূপ 'ধাতুছাড়া', 'বেখাপ্' ও বিজাতীয় সাহিত্যের মর্ম্ম-গ্রহণে বা রসাস্বাদনে অধিকাংশ নর নারীই, নিরুপায় রূপে নিতান্তই বঞ্চিত! ঐ ঘরের আলমারীতে 'মোরোক্কো' ও সিল্কে বাঁধানো কতই সব সুন্দর-সুন্দর বই তাকে-তাকে সাজানো রহিয়াছে! তাহা দেখিতে ভাল, দেখাইতেও ভাল; কিন্তু, তাহাতে কাহারও অন্তর্ভাবের, রুচির বা স্বভাবের কোন কল্যাণই সাধিত হয় না; কিম্বা নৈতিক জীবনের প্রবাহ-ভঙ্গীরও কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি,—আমাদের এই বাঙ্গালা গদ্যের স্রষ্টা (রাজা রামমোহন কিংবা) বিদ্যাসাগর; এবং ইহার পোষ্টা,

সংস্কারক ও পরিচালক স্বয়ং সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু, ইঁহারা যে ভাষা চালাইয়া গেলেন, আজও তাহা বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের ভাষা হইয়াছে কি না, সন্দেহের বিষয়। রাজদ্বারে, বিচারালয়ে যে বাঙ্গালার প্রচলন, তাহা বঙ্কিমের বাঙ্গালা নহে; বেলেঘাটা, হাট্‌খোলা বা ব্যবসায়-বাণিজ্যক্ষেত্রে যে ভাষা ব্যবহৃত, তাহাও বঙ্কিমী, বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা নহে; ঘরে আমরা পুত্র-পরিবারের সঙ্গে যে বাঙ্গালায় কথা কহি,—সভায়, বৈঠকখানায় বা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যে বাঙ্গালায় আলাপ করি, সে বাঙ্গালাও বঙ্কিম বা বিদ্যাসাগরের ভাষা নহে। কাজেই, বলিতে হয়—সে দিক্ দিয়া এখনও আমাদের এ বাঙ্গালা গদ্য বা পদ্য-সাহিত্য আমাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় তেমন কোন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। কখনও তাহা পারিবে কি না, বুঝি তাহাতেও সন্দেহ।

কিন্তু, পূর্ব্বে যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, সেই যে 'সেকেলে,' পুরানো অসংস্কৃত ভাষা,—সে সাহিত্য আজ আমাদের শিক্ষিত লেখকদের কাছে নামঞ্জুর ও অচল রূপে অগ্রাহ্য ও উপেক্ষিত হইয়া থাকিলেও,—এক দিন সেই সাহিত্যের দ্বারাই এই গোটা বাঙ্গালা জাতটার জীবন পালিত ও গঠিত হইয়াছে; তদ্দ্বারা এ দেশবাসীর মানসিক গতি স্বধর্ম্মের একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত ও বিধিবদ্ধ ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। আমরা খেয়ালের ঝোঁকে ও বর্ত্তমান শিক্ষার তাড়নায় যদিও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া আজ ভিন্ন পথে বহুদূরেই চলিয়া আসিয়াছি, তবু বলিব কি—আজও সেই সাহিত্যেরই প্রভাব আমাদের এ জাতীয় চরিত্রের উপরে প্রবল ভাবে ক্রিয়া করিতেছে।

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়া-হিয়া রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

এ পদটি শুনিবামাত্র এখনও বাঙ্গালী সেই তেমনই ভাবে শিহরিয়া, চমকিয়া ওঠে; তাই, এখনও রামায়ণ-গান বা 'অমৃত সমান' ভারত-কথা শুনিতে গিয়া, বাঙ্গালীর অশ্রুধারা ঝরে, আনন্দ ও গৌরবে শরীর রোমাঞ্চিত, পুলকিত হয়; এবং আজও কীর্ত্তনের কালে মৃদঙ্গের প্রমত্ত তালে তাহার চিত্ত আত্ম-বিস্মৃত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। সে সাহিত্য সর্ব্বথাই ধর্ম্মপ্রাণ ও প্রকৃতি মূলক ছিল। এই ধর্ম্মের পুণ্য বেদী হইতে নামিয়া আসিয়া, আধুনিক বাঙ্গালী লেখক ও বাঙ্গালার কবি ভালো কাজ করিয়াছেন, না ম নব বিচিত্র করিয়াছেন, তাহার বিচার নিরপেক্ষ সুধীজনই ক কটা বিশিষ্ট আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে সে পক্ষে কো এইখানে প্রকাশ করা অনাবশ্যক। তবে, সম্ভবতঃ সকলে বাঙ্গালার এটুকু অন্ততঃ স্বীকার করিবেন যে, ঐ আদর্শ ও পদবী ্যর সৃষ্টি করার ফলে আজ আমাদের এই বাঙ্গালা-সাহিত্য বিশেষ শূন্য, বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত, স্বধর্ম্ম-চ্যুত, অসামাজিক, গণ্ডীবদ্ধ অর্থাৎ—শুধু আজ বিশেষ ভাবে এই সংক্ষিপ্ত সংখ্যক ইংরাজী-শিক্ষিতগণেরই একটা যেন সাম্প্রদায়িক সম্পত্তি-বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু, সাহিত্যের স্থায়িত্ব তাহার প্রসার ও প্রভাবের উপরেই নির্ভর করে। যে ভাষা বা সাহিত্য যত অধিক ব্যাপ্ত, সে ভাষা ও সাহিত্য ততই দীর্ঘকালস্থায়ী হয়; এবং তাহার প্রভাবও সেই অনুপাতে প্রভূত ও দুর্নিবার্য্য হইয়া থাকে। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের আবিষ্কার হইতে জানা যায় যে, জাপান হইতে মিশর পর্য্যন্ত, ম্যাডাগাস্কার হইতে সেই অষ্ট্রেলিয়ার কোণ পর্য্যন্ত কোন এক বিস্মৃত অতীত যুগে মাতামহী সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বিশেষ ভাবেই বিস্তৃত ছিল। মঙ্গোলিয়ার উর্গা নগরে গোবি-মরুভূমির ভূগর্ভ-কত বিস্মৃত লোকালয়ের ভগ্নাবশেষের স্তর-বিন্যাসে আজ সেই সংস্কৃত পুঁথিপত্রের অসংখ্য নিদর্শন—বহুবিধ চিহ্নরাশি উদ্ধৃত ও আবিষ্কৃত হইতেছে। বালি, লম্বক, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি স্থানসমূহেও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের এই অতিপ্রসার হেতু, উহার সহিত ধর্ম্মের ও ধর্ম্মভাবের অবিনশ্বর সম্বন্ধ জন্য, এখনও উহা এ ভারতবর্ষে এতটা সজীব ও সমাদৃত রহিয়াছে। য়ুরোপে এই মহাসমরের গতি দেখিয়া, ফরাসী লেখক জীন বেঞ্জা বলিয়াছেন যে, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড, ফ্রা ও আধুনিক য়ুরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই যে সব খেয়ালী ও সখের সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা আর কোনমতেই স্থায়ী হইতে পারিবে না; কারণ, সে সাহিত্য সমাজের আসল প্রাণের কথা, মর্ম্মের নিগূঢ় ব্যথা তেমন অকপটে প্রকাশ করে নাই। সে সাহিত্য সর্ব্বপ্রকারেই সখ-সোহাগের বহির্ম্মুখ, পোষাকী সাহিত্য। সখ্-সোহাগ যতদিন থাকে, এ সখের সাহিত্যও ততদিন টেঁকে; কিন্তু, এই সুখ-সম্ভোগ-স্বস্তি এসব সখ্-সোহাগের সঙ্গে-সঙ্গে যখন কালক্রমে বিলীন হয়,—সমাজে

যখন যেমন একটা বিষম বিপ্লব-ঝঞ্ঝা ও বিরাট্ বা উৎকট 'ওলোট্-পালট্' ঘটে, তখন এ ধরণের 'মৎলবী' বা 'খেয়ালী' সাহিত্য মিলাইয়া বা তলাইয়া যাইবেই। শুনিয়াছি, আজকাল য়ুরোপেও না কি অনেক প্রাজ্ঞ ও মনীষী ব্যক্তি এ কথাটার যাথার্থ্য অল্পাধিক পরিমাণে প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেখা যাক্, এই ভীষণ, প্রলয়ঙ্কর, তুমুল সংগ্রামের অবসানে, য়ুরোপের "সুসভ্য" খৃষ্টান সমাজ পুনর্ব্বার নূতন ভাবে সংগঠিত হইলে, উনবিংশ শতাব্দীর এ সাহিত্য তখন সে সব দেশের বা সমাজের উপরে কতখানি প্রভাব বা প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে পারে। অশেষ যত্ন ও আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক ইংরাজ যুগের আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যকে আমরা ঐ উনবিংশ শতাব্দীর বিলাতী, বহির্ম্মুখ, ইহসর্ব্বস্ব ও পেশাদারী সাহিত্যের (Secular literatureএর) ভিত্তির উপরেই এতকাল ধরিয়া এ ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছি; বায়রণ, শেলী, ব্রাউনিং, কীটস্, টেনিসান্, হিউগো, সুইন্‌বার্ণ হইতে সুরু করিয়া, স্কট্, ডিকেন্স্, কনান ডয়েল্, জোলা, মোপাসাঁ, নিট্‌সে, এমন কি, ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পর্য্যন্ত যেখানকার যত বিলাতী কবি ঔপন্যাসিক প্রভৃতির বিচিত্র রকমের যত-কিছু ভাব, ভাষা ও আদর্শ পর্য্যন্ত নির্ব্বিচারে ও অসঙ্কোচে, শুধু একটু সংস্কৃত আবরণে ঢাকিয়া, বড় বাহাদুরী করিয়া আমরা এ সাহিত্যের বহু পরিমাণেই আমদানী করিয়াছি। কিন্তু, এখন কথা এই যে, যদি দৈব বিড়ম্বনায়, কালবশে, সেই মূল ভিত্তিই না টেঁকে, তবে এই যে আমাদের এত সাধের ইমারৎ,-তা হাজার বিচিত্র ও মনোহর হইলেও, টিঁকিবে কি? কথাটা (আমার কাছে অন্ততঃ) একটু বিশেষ ভাবেই বিবেচ্য বলিয়া বোধ হইয়াছে বলিয়াই, প্রসঙ্গতঃ এখানে তাহার একটু আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি—এজন্য আমার আধুনিক সতীর্থ সাহিত্যিকগণ আমাকে অকারণ ভুল বুঝিয়া, পক্ষপাত ও স্বার্থবুদ্ধির বশে প্রবঞ্চিত হইবেন না। যাক্, আর এ অপ্রিয় প্রসঙ্গে কথা বাড়াইব না।

এখন আবার আমাদের আলোচ্য বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করি। এই আধুনিক বাঙ্গালার একটা অতি গরিমান্বিত, সমুজ্জ্বল দিক্ এ দেশে ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে পরিস্ফুট ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। রামমোহন, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, চিরঞ্জীব শর্ম্মা, বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের বিরচিত ব্রহ্মসঙ্গীত ও কাঙ্গাল হরিনাথের বাউল সঙ্গীতগুলি, মনে হয়, যেন এ বঙ্গভারতীর কমকণ্ঠে অমূল্য হীরক-কণ্ঠীর মত দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আর কোন দেশের কোনও সাহিত্যে, এমন সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়মূলক, অসাম্প্রদায়িক, ঈশ্বরানুভূতি, এ হেন শোভন কলানৈপুণ্যে উজ্জ্বল ও জীবন্ত রূপে স্ফূর্ত্ত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে কি না জানি না।

পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মসমাজের সংঘাতে এদিকে আবার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নব্য হিন্দুয়ানীর উদ্ভব হইল। জার্ম্মাণ 'ফিলজফী' বা দর্শনের মালমশল্লা দিয়া, বেদান্ত-সিদ্ধান্ত সমূহ বিলাতী ধরণে বুঝিবার বা বুঝাইবার প্রয়াসে, বাঙ্গালা সাহিত্যের আর একটা অঙ্গ উদ্গত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনখানা উপন্যাস, নবীনচন্দ্রের সর্ব্বশেষ তিনখানি কাব্য—এই নূতন অঙ্গের দুই দিক্‌কার দুই প্রকার প্রধান আভরণ। এ হিন্দুয়ানী যদি স্থায়ী হয় এ সকল মত ও সিদ্ধান্ত যদি কোন দিন বাঙ্গালার জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার সুযোগ ঘটে, তবে অবশ্যই এ সাহিত্য টিঁকিয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন, পুরাতন ভাবের, পুরাতন মত ও সিদ্ধান্তের দূরাগত বংশীধ্বনির মত যে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি এখনও মাঝে-মাঝে শ্রুত হওয়া যায়, তাহার ফলেও আধুনিক এ সাহিত্যের একটা বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে; সে ভাব-সম্পদ্‌ও কতকাংশে স্থায়ী হওয়া সম্ভব। কারণ, বাঙ্গালী আজ যতই কেন ইংরাজী শিখুক না, এবং তদ্‌ভাবে ভাবিত ও অনুপ্রাণিত হোক না, তাহার স্বধর্ম্মসিদ্ধ, সহজাত, ও মজ্জাগত যে স্বাদেশিকতা, জাতীয়তা বা আসল বাঙ্গালীয়ানা, সেটুকুকে, শত হইলেও, সে কখনও কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। সে স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তা যখনই যে ভাবে ফুটিয়া উঠিবে, তখনই সে ভাবটা কথঞ্চিৎ স্থায়িত্ব লাভ করিবেই।

আধুনিক সাহিত্যের একটা প্রধান বা বিশেষ লক্ষণ—বিলাতী ধরণের Patriotism,—স্বদেশপ্রেম বা দেশাত্ম-বোধ। (অবশ্য ইহার মধ্যে জাতি-বৈরের ভাবও বিজড়িত বা লুক্কায়িত আছে!) রঙ্গলালের "পদ্মিনী" কাব্য দেশাত্মবোধের সর্ব্বপ্রথম সূচনা বা শঙ্খ-নাদ; এবং হেমচন্দ্রের "কবিতাবলী" তাহার উদাত্ত দুন্দুভিধ্বনি। হেমচন্দ্র এই স্বদেশ-ভক্তি বা দেশাত্মবোধের সঞ্জীবন সুরে

এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব, উন্মাদনাময় ও আবেগপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গেলেন। আমার যাহা তাহা আমার উপযোগী, —আমিত্বের প্রভাবেই আমার কাছে "আমার" বলিতে যাহা কিছু তাহাই শ্রেষ্ঠ ও শোভন,—এই ভাব লইয়াই হেমচন্দ্রের কবিতার উদ্ভব, এবং ইহাই তাহার বিশেষত্ব। তার পর, বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্তে"ও এই ভাবটি সূত্রাকারে হতাশার আক্ষেপে ও বিদ্রূপ-কশার উত্তেজনায় অপূর্ব্ব রূপে গ্রথিত হইয়াছে। এই সুর একটু প্রণিধান পূর্ব্বক শুনিলে, তাঁহার "ধর্ম্মতত্ত্ব" ও "কৃষ্ণ চরিত্রে"ও সুস্পষ্ট রূপে শুনিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমের শেষ তিনখানি উপন্যাসও এই ভাবেরই বিচিত্র ও অপরূপ অভিব্যঞ্জনা মাত্র। এই ফোটা ফুলটি কাল ক্রমে ক্ষণজন্মা কবি দ্বিজেন্দ্রলালের "রাণা প্রতাপ" "দুর্গাদাস" "মেবার পতন" এবং নাট্যগুরু গিরীশচন্দ্রের "সিরাজদ্দৌলা", "মীরকাশিম" প্রভৃতি নাটকসমূহে স্বাদু ও পুষ্টিকর সুফলে পরিণত হইয়াছে। ভূদেবচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের "বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম্ম", ইন্দ্রনাথের ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসমূলক বিবিধ প্রবন্ধাদি, চন্দ্রনাথের "ত্রিধারা" "হিন্দুত্ব", পণ্ডিত শশধরের "ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা," এমন কি পুণ্যশ্লোক রাজনারায়ণের "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা", রবীন্দ্রনাথের "ব্রাহ্মণ", "গোরা" প্রভৃতি বহুবিধ প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সন্দর্ভ ও পুস্তকগুলি এই 'Patriotism'এর—দেশাত্মবোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাবটা সমাজে যতই ব্যাপ্ত হইবে, ছড়াইয়া পড়িবে,—ইহার তীব-মধুর, অত্যুগ্র উন্মাদনার আস্বাদ গ্রহণ করিতে এ দেশের জনসাধারণ যতই উৎসুক ও আগ্রহান্বিত হইবে, ততই এবংবিধ সাহিত্যের পুষ্টি, প্রসার ও প্রভাব ঘটিবে। কিন্তু ইহাও শিক্ষা ও প্রচার-সাপেক্ষ। আমাদের দেশের জনমণ্ডলী প্রেম-ভক্তি বোঝে, সংযম-সন্ন্যাসের বা সাধনার শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বথা নতশিরে স্বীকার করে; (কারণ, সে সব কথা শত সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া বাঙ্গালায় সিদ্ধ মহাত্মাগণ ও পণ্ডিত-পরম্পরা বাঙ্গালীকে নানা ভাবেই বুঝাইয়া ও শিখাইয়া গিয়াছেন।) কিন্তু, এই দেশাত্মবোধ অর্থাৎ দেশগত জাতিবৈরের ভাব মেশানো Patriotism এর মূল মর্ম্মটুকু বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ ভাবেই একটু অভিনব আদর্শ। এ ভাবে বাঙ্গালী জাতিকে তাদৃশ দীক্ষিত ও শিক্ষিত করার জন্য, উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে, তেমন কোন প্রয়াস এতকাল হয় নাই। যত দিন তাহা না হইতেছে, যত দিন আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এ সব ভাব ও রস এই বিরাট বাঙ্গালী সমাজের সকল স্তর ভেদ করিয়া, এই সমগ্র বাঙ্গালী জাতটাকে মজাইয়া ও মাতাইয়া না তুলিতেছে, তত দিন এ সাহিত্যকে দেশের সর্ব্বসাধারণ নিজস্ব জিনিস বলিয়া সহজে বিশ্বাস বা গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না।

এখানে আর একটা বিষয়ের অল্প একটু প্রসঙ্গ তুলিব। মোগল-পাঠানের যুগে, পূর্ব্বে এ দেশের কবিগণ সাহিত্যে বহু কাব্য ও কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তবে চণ্ডীদাস হইতে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার অধিকাংশ সুপরিচিত কবিকুল সকলেই প্রায় রাঢ় দেশের লোক হওয়াতে, বঙ্গসাহিত্যের উপর রাঢ়ের প্রাধান্য স্বতঃই একটু অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তার পর ও দিকে "ফোর্ট হুইলিয়াম" কলেজের পণ্ডিতগণও প্রত্যেকে রাঢ়ীয় ছিলেন। বিদ্যাসাগর হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার প্রায় পোনেরো আনা সুপ্রতিষ্ঠিত, সুখ্যাত ও প্রতিপত্তিশালী লেখকই রাঢ়ের বা কলিকাতার লোক। তা ছাড়া, আসলে সেই গোড়ায় যাহার প্রতিভা ও প্রভাব বলে বাঙ্গালা ভাষার সমন্বয় বা ঐক্য সাধন সম্ভবপর হইয়াছিল, সেই বিদ্যাসাগর মহাশয় জ্ঞাতসারেই হৌক্ কিম্বা অজ্ঞাতসারেই হৌক্, তল্লিখিত পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নে ও অন্যবিধ পুস্তকাদিতেও রাঢ়ের প্রাদেশিক শব্দই একটু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছিলেন। ফলে, আজ রাঢ়ের বাঙ্গালা সমগ্র বাঙ্গালা দেশের ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহা এখন সকলের সুখ-বোধ্য, সকলের পক্ষেই অনায়াসসাধ্য। জাতির সংহতি-শক্তি বাড়াইতে হইলে, জাতিকে একভাষী করিতেই হইবে। ভাষার বন্ধনেই জাতির পুষ্টি ও সংহতি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইংরাজের শিক্ষাবিভাগের কল্যাণে, মাইকেল, বঙ্কিম, হেম, নবীন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনস্বী লেখক ও যশস্বী কবিকুলের প্রভাবে, এবং কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রচারিত মাসিক ও সংবাদপত্রাদির ক্রমশঃ-বর্দ্ধমান বহুল-প্রচারে যখন আমরা এখন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাষা পাইয়াছি, তখন সে ভাষাকে আজ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রাদেশিকতার সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ প্রভাবে তাহাকে অকারণ বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া, এখন আমাদের পক্ষে কোন ক্রমেই উচিত হইবে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি—লোক-শিক্ষার জন্য, এ দেশের

পামরসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মকর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। এই জন্ম-বৃত্তান্তের কারণটিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বাঙ্গালীকে নূতন কথা শুনাইতে,—বাঙ্গালীকে অখিল বিশ্বের অগণ্য ও বিচিত্র ভাব ও চিন্তার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত করাইবার জন্য, ভাইকে ভাইয়ের মনের কথা, মর্ম্মের ব্যথা ব্যক্ত করিয়া বলিবার, জানাইবার উদ্দেশ্যেই আমাদের এ বাঙ্গালা লেখা। যে ভাষায় রামপ্রসাদ বাঙ্গালীকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন, দাশুরায় বাঙ্গালীকে হাসাইতেন ও কাঁদাইতেন, ভারতচন্দ্র আপন অনায়াস, স্বচ্ছন্দ গতি ও অপূর্ব্ব কলা-কৌশলে ও অনুপম মাধুরী-চ্ছটায় একদিন এ বঙ্গবাসীকে বিমোহিত করিয়া গিয়াছেন, সেই ভাষাই বস্তুতঃ বাঙ্গালীর যথার্থ ব্যবহার্য্য ভাষা। অতএব, আজ অযথা খেয়ালের ঝোঁকে বা জেদের জোরে, আমাদের লিখিত কোন বিষয় দুর্ব্বোধ, "একদেশদর্শী" বা বিকৃত করিয়া তুলিলে চলিবে না। এই চিরকালের Democratic ভাষাকে আজ যদি কেহ দুর্ব্বোধ, প্রাদেশিকতায় দুষ্ট করিয়া ফেলেন, তবে তিনি দেশেরই প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিবেন।

"মনে পড়িল রে আমার সে ব্রজভূমি!"

—স্মৃতির উদ্দাম আলোড়নে ও অসহ বৃশ্চিক-দংশনে অধীর হইয়া, যখন এই ভাবে আকুল-কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিব, তখন বাঙ্গালায়, বাঙ্গালী সমাজের নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত সকল স্তরের সমুদায় লোক যদি হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া না ওঠে, তবে আমার এ রোদনের ফল কি? এই কারণেই ত আমার এ বাঙ্গালা সাহিত্য করুণ-রস-প্রধান। বাঙ্গালা যদি রাজার ভাষা বা রাজ-দরবারের ভাষা হইত, তবু না হয় উহাকে নানারূপ অজ্ঞাত ও অভাবিতপূর্ব্ব ভাব-ভঙ্গী, ধরণ-ধারণ, এবং অনভ্যস্ত ও বিজাতীয় অলঙ্কার-আভরণে, বেশ-ভূষায় ভারাক্রান্ত, দুর্ব্বোধ বা দুরধিগম্য করিয়া তুলিলেও তত ক্ষতি ছিল না। কিন্তু, এ ত আর তাহা নহে! এ যে একেবারেই প্রজার ভাষা; পরাধীন, পদানত, দীন-দুঃখী জনসাধারণের অন্তর্নিহিত গুপ্ত ও গভীর বেদনার অভিব্যঞ্জনার উপায়;—এ যে আর্ত্ত ও ব্যথিতের আকুল সহমর্ম্মিতার বড় করুণ ও কাতর অভিব্যক্তি মাত্র! এ ভাষাকে অমন বহুরূপীর মত অচ্ছেদ্য, দুর্ব্বোধ ও বিকৃত করিয়া তুলিলে, সে যে বড়ই বিপদের ও অনিষ্টের কারণ হইবে! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম বিধৌত করিয়া যে প্রীতি-পীযূষ-নিস্যন্দিনী ত্রিদিব-মন্দাকিনীর ন্যায় স্বচ্ছ-শুদ্ধ ধারা-প্রবাহ আজও এই স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমি প্লাবিত, পরিশুদ্ধ ও স্নিগ্ধ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে,—বঙ্গভাষার সেই পুণ্য করুণ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, এবং ইহার সার্ব্বজনীন প্রভাবের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, যিনি আজ শুধু আপন প্রবৃত্তিবশে বা খেয়ালের ঝোঁকে, বাহাদুরী বা নকল-করা নূতনত্ব দেখাইবার জন্য একটা কিছু বিসদৃশ, উদ্ভট, অসঙ্গত ও অশোভন সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইবেন, তাঁহাকে পরিণামে কোন দিন নিশ্চয়ই ঠকিতে হইবে। মাইকেলের মত এত বড় প্রতিভাশালী কবি সম্পূর্ণ বিলাতী ঢঙ্গে তাঁহার "মেঘনাদ বধ" কাব্যখানা রচনা করিতে গিয়াও, আসলে কিন্তু বাঙ্গালীর মূল 'ধাতু'টাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; বাঙ্গালীর করুণা-প্রধান এই যে প্রেমময় স্বভাব বা প্রকৃতি, সেটিকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে সাহসী হন নাই। তাই মেঘনাদবধ কাব্যখানি অপূর্ণ করুণার উৎস!

বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির কথা একটা তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বলা হয় না,—বলা যায় না। তবে, আমি যে ভাবে এ বিষয়টা বুঝিয়াছি বা ভাবিয়াছি, সেইটুকুই শুধু আমার সামান্য সামর্থ্যানুসারে আজ আপনাদের গোচর করিলাম। আপনারা অনেকেই বিবেচক, বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও ভাবুক। আমার এই কয়েকটা কথায় আপনাদের চিন্তা-স্রোত যদি কোন নূতন ও নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে প্রবাহিত হয়, তবেই আমার এ লেখনী শ্রম সার্থক হইল, মনে করিব। আমরা, অর্থাৎ এই ইংরাজী-শিক্ষিত লেখক-সম্প্রদায় বাস্তবিক বাঙ্গালার জনসাধারণকে অনেকটা উপেক্ষা করিয়াই, বিস্মৃত হইয়াই, এ যাবৎ সাহিত্য-সাধনা বা লেখনী চালনা করিয়া আসিয়াছি। আমরা যেন মনে-মনে ইহা ধরিয়া লইয়াছি যে, আমরা যা' লিখিব, সে সমস্তই এ বাঙ্গালার জনসাধারণ পড়িতে, শুনিতে ও বুঝিয়া লইতে বাধ্য। বাঙ্গালা যদি বাঙ্গলা দেশের রাজভাষা হইত, আমরা যদি সকলেই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ও প্রতিভাশালী লেখক বা কবি হইতাম, তাহা হইলেও না হয় আমাদের এ আশা বা স্পর্দ্ধা কতকটা সাজিত। বিলাতে Literature-এর পঠন-পাঠন যে হিসাবে হয়, আমাদের দেশে এখনও সংস্কৃতের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা যে রীতিতে হয়,—এতকাল ধরিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যেরও সেইরূপ

চর্চ্চা ও সমাদর থাকিলে তবু হয় ত বা আমাদের এ আব্দার মানাইত। কিন্তু বাঙ্গালার যে সে সব সুবিধা কি সুযোগ কিছুই নাই! এ যে চিরকাল আমাদের স্বাভাবিক ব্যথার ভাষা—বাঙ্গালা যে এতদিন ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্রের কঠিন ও জটিল তত্ত্বগুলিকে তাই' অতি সরল ও সহজ করিয়া, এ সংসারের অনিত্যতা ও বিনশ্বরতা অতি অনায়াসবোধ্য বা হৃদয়ঙ্গম-যোগ্য রূপে এদেশের আপামরসাধারণ সকলেরই শ্রুতিগোচর করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালার বাঙ্গালী মনে করে, এ ভাষায় যাহাই লিখিত,বা উক্ত হইবে, তাহা অনায়াসে আমরা সকলেই বেশ বুঝিতে ও জানিতে পারিব! অতএব এ ভাষায় আমাদের কিছু লিখিতে হইলে, ইংরাজী হিসাবে বাঙ্গালায় একটা Literatureএর সৃষ্টি করিতে হইলে, উহাকে আমাদের সর্ব্বজনগ্রাহ্য Democratic করিতে হইবে;—উহাকে সকলেরই বোধ-শক্তির বিষয়ীভূত করিতে হইবে। যেটুকু এ বাঙ্গালার জনসাধারণ মাথায় করিয়া লইয়াছে,—বাঙ্গালা সাহিত্যে আজও বিশেষ ভাবে সেইটুকুই মাত্র স্থায়ী ভাবে বিরাজ করিতেছে।

কেহ-কেহ বলেন যে, ভাবের মৌলিকতা, বৈচিত্র্য ও গভীরতার জন্যই আধুনিক সাহিত্য সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুবোধ্য হইতেছে না। এ কথাটা একেবারে অযৌক্তিক না হইলেও, একটু নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এটুকু আমরা সহজে বুঝিতে পারিব, এবং অবশ্যই স্বীকার করিব যে, আগের ন্যায় এখনকার লেখকগণ আর রচনা করার সময়ে দেশের জনসাধারণের কথা মোটেই মনে রাখেন না;—তাঁহাদের এখন একমাত্র লক্ষ্যই থাকে, ঐ ইংরাজী বা পাশ্চাত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর। সুতরাং, এ অবস্থায় তাঁদের সে লেখার মর্ম্ম-গ্রহণ বা রসাস্বাদ করা স্বভাবতঃই এই সব সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। বৈষ্ণব-সাহিত্যে ভাবের বৈচিত্র্য, মৌলিকতা বা গভীরতাও যে নিতান্ত নগণ্য বা অল্প ছিল, তা' তো কোনমতেই মানিয়া লওয়া চলে না; তথাপি সে সকল সাহিত্যের মোটামুটি আসল মর্ম্ম বা ভাবটা যে সাধারণতঃ বেশ সহজেই অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকেরা বুঝিতে ও ধরিতে পারে, বস্তুতঃ ইহার কারণ সন্ধান করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, (সে ভাবরাশি শত জটিল ও গভীর হইলেও,) তাহা সাধারণের জন্যই মুখ্যতঃ রচিত বা উদ্দিষ্ট হওয়ায়, প্রকাশের স্বাভাবিকতা ও কৌশলগুণে তাহা তাহাদের পক্ষে অবোধ্য বা অধৃষ্য হয় নাই। অতএব, উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হইলেই যে তাহা জনসাধারণের দুর্জ্ঞেয়, অগম্য বা অবোধ্য হইবেই, এ কথার যাথার্থ্য সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিতে পারি না। তবে, যদি এ সাহিত্যের গতি, প্রকৃতি ও পরিণতির প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি না দিয়া, বাঙ্গালী জাতির স্বধর্ম্ম, স্বভাব, বৈশিষ্ট্য বা ধাত্টার বিষয়ে অণুমাত্রও মনোযোগী না হইয়া, কেবল নিজেদের সখ্ কি খেয়াল চরিতার্থ করিতে, বাহাদুরী দেখাইতে, বা নবার্জ্জিত বিদ্যা ফলাইতে, সংক্ষিপ্ত সংখ্যক কোন এক বিশেষ দলের বা সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টি সাধনার্থই আমরা নানা রকম অজ্ঞাত, অপরীক্ষিত ও অভাবিত ধরণের নকলনবিশী সাহিত্যের আমদানী করি, তবে জনসাধারণ সে সাহিত্যকে কি করিয়া আপন বোধে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবে? অপ্রিয় হইলেও এ কথা খুবই সত্য যে, মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত আধুনিক সাহিত্যরথী ও লেখকগণ, বাস্তবিক (বাঙ্গালা-সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া) এই যে অপূর্ব্ব ও অভিনব সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এ দেশের স্বধর্ম্ম, স্বভাব বা জনসাধারণের মতি-গতির প্রতি মোটেই দৃষ্টি না রাখিয়া। ফলে, এ সমস্ত শুধু ঐ পাশ্চাত্য-শিক্ষিতগণেরই রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে রচিত হওয়ায়, এখনও তাহা ঠিক এ বাঙ্গালী জাতির মর্ম্ম স্পর্শ করে নাই; এবং তাই, আজও তাহা এ দেশের জনসাধারণ মাথায় তুলিয়া লয় নাই। যত দিন দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচার ও প্রভাব ততদূর সার্ব্বজনীন না হইবে, তত দিন এ সাহিত্যের সার্থকতাও সম্পূর্ণ হইবে কি না, বিশেষ সন্দেহ।

সাহিত্যের সর্ব্ববিধ পার্থক্য ও বিরোধ সম্যকরূপে বিদূরিত করিয়া দিয়া, দেশের স্বধর্ম্ম, স্বভাব ও জন্ম-জাত মূল প্রকৃতিটির প্রতি লক্ষ্যশীল ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, আমরা আমাদের এই জাতীয় সাহিত্যের বনিয়াদ যতই দৃঢ়তর রূপে সার্ব্বজনীন চিত্তভূমির উপরে সুপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইব, ততই আমরা অসংশয়ে নিশ্চিন্ত, কালজয়ী, সফলকাম ও ধন্য হইব। আমি অকপটেই বিশ্বাস করি যে, আমাদের এই সোনার বাঙ্গালার এবংবিধ সাধন'ই এক দিন এই অধঃপতিত জাতির অবাধ ও নির্ব্বিঘ্ন মুক্তিমার্গ সর্ব্বথা উন্মুক্ত করিয়া দিবে; এবং অদূর-ভবিষ্যে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি সাহিত্যের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, জ্ঞানে, কর্ম্মে ও চিন্তায় আবার এ বিশ্বের বিস্ময়-কেন্দ্র রূপে পরিগণিত হইতে পারিবে। বাঞ্ছাকল্পতরু বিধাতা আমাদের এ শুভ সঙ্কল্পের সহায় হৌন্!

মাতৃ-বন্দনা

[মহারাজকুমার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়]

(১)

ওগো ও পথিক! তুমি তো জান না, এ যে আমাদের বঙ্গমাতা।
দুঃখীর লাগি খুলে আছে দ্বার, দুস্থের তরে আঁচল পাতা॥
প্রকৃতির চির-সম্পদ-শোভা মোর জননীর চরণে রাজে।
ছয়-ঋতু সেথা উৎসব করে নিত্য-নূতন মোহন সাজে॥
শীর্ষে বসিয়া সন্ন্যাসী শিব নিত্য মোদের আশীস্ করে।
মন্দাকিনীর মঙ্গল-ধারা মোর জননীর অঙ্গে ঝরে॥
অন্ধ সাগর অনুরাগে মা'র চরণের তলে উলসি উঠে।
বিশ্বের যত শস্যের মেলা মা'র অঙ্গনে উঠেছে ফুটে॥
হেথায় পান্থ! এক শুভ দিনে, সুরাঙ্গনার শঙ্খ-রবে।
উঠেছিল সাম-সঙ্গীত-ধ্বনি স্তম্ভিত করি নিখিল ভবে॥
রাজার দুলাল রাজ-পাট্ ছাড়ি, বৈরাগী-রাজে বরিল চিতে।
বিশ্ব-মোহন মৈত্রী-বাণীর বার্ত্তা পাঠাল বিশ্ব-হিতে॥
কাঞ্চন-তনু, শচী-নন্দন পল্লীর বুকে উঠিল ফুটি।
আপনারে চির-অমর করিল পরের চরণ-প্রান্তে লুটি॥

(২)

বৈষ্ণব-চূড়া জয়দেব কবি রচিল বৃন্দাবনের গাথা।
আজও ভারতের কবি-কুল তাঁর স্মৃতির চরণে নোয়ায় মাথা॥
চণ্ডীদাসের দাস ব'লে আজ ধন্য মানিছে যতেক কবি।
কাব্যের সুধা-সরোবরে চির-বিম্বিত তাঁর মোহন ছবি॥
তুমি তো জান না, পান্থ বিদেশী! মোর জননীর বক্ষ-মণি।
আরও কত কবি ফুটেছিল হেথা, কত কাব্যের দীপ্ত-খনি॥
তুমি তো জান না, তরুণ তাপস, রঘুনাথ শিরোমণির কথা।
গুরুর প্রসাদে গুরুকে জিনিল—পাণ্ডব-কুল-তিলক যথা॥
নবদ্বীপের রায়-গুণাকর, কৃষ্ণচন্দ্র সভার আলো।
যাহার গরবে গরব রাজার, রাজ্যের চেয়ে বাসিল ভালো॥
হেথা একদিন ভবানীর রূপে জননী ভবানী করিল লীলা॥
যাঁর কীর্ত্তির বিরাট কাহিনী বক্ষে ধরেছে কাশীর শিলা॥
অন্নদানের অপরূপ কথা রূপ-কথা সম শোনায় আজি।
সেই রাজ-রাণী আমারি মায়ের চরণে জোগাত ফুলের সাজি॥

(৩)

হেথা একদিন মেঘের মন্দ্রে ধ্বনিয়া উঠিল ঐক্য-বাণী।
স্বপনের ছবি মূর্ত্ত করিল রামমোহনের স্পর্শখানি॥
বিবেকের ধ্বজা বিবেকানন্দ উড়ায়ে আসিল অন্য-দেশে।
মোর জননীর বিজয়ী পুত্র বিশ্ব বিজয় করিল হেসে॥
হরিনাম হেথা কাঙ্গালের সাথে কণ্ঠ মিলাল দিবস-রাতি।
রামপ্রসাদের ভক্তি-হবিতে জ্বলিয়া উঠিল জ্ঞানের ভাতি॥
মোর জননীর স্নেহ-সুধা লাগি ঈশ্বর হেথা জনম লভে।
স্বপ্ন-অতীত অপরূপ কথা, তুলনা কোথাও নাই রে ভবে॥
মোর জননীর বক্ষ-দুলাল বীর সিংহের দেব-তনয়।
করুণার চির-নির্ঝর-ধারা, আর্ত্ত-জনার চিরাশ্রয়॥
হেথা বঙ্কিম অনল-আখরে রচিল কমলাকান্ত-কথা।
নাশিল নিখিল ভ্রান্তির নিশা, খর-সূর্য্যের রশ্মি যথা॥
নূতন যুগের নব মন্ত্রেতে জাগায়ে তুলিল অমৃত হিয়া।
মাতার চরণ বন্দিল বীর নিজের জীবন অর্ঘ্য দিয়া॥

(৪)

মধুসূদনের মোহন-ছন্দে নাচিল সূর্য্য-চন্দ্র-তারা।
ধোয়াল মায়ের চরণ-দুখানি হেম-নবীনের নয়নধারা॥
বঙ্গ-জননী অঙ্কের পরে নন্দন-বন-দীপ্ত ছবি।
অমরার চির-ভাণ্ডার হ'তে উদিল হেথায় তরুণ রবি॥
কল্পনা-সখা, কাব্যকুমার, কুঞ্জ-কাননে বসিয়া ধ্যানে।
বিশ্বেরে সুধু সুন্দর দেখে চির-সুন্দরে জানিয়া জ্ঞানে॥
হেথা জগদীশ, জড়ের পরাণে, দেখেছে বেদনা-বহ্নি-শিখা।
তরু-পল্লবে, শ্যাম-প্রান্তরে, কত অজ্ঞাত কাহিনী লিখা॥
ভগীরথ সম শঙ্খ-নিনাদি রসায়ন-রস-বন্যা আনি।
নবীন সাধক ধোয়াইল মা'র, ফুল্ল-কমল-চরণখানি॥
হে মোর অতিথি, বিদেশী পথিক! এ যে আমাদের বঙ্গভূমি।
আট কোটি মোরা, মিলি একসাথে, রয়েছি মায়ের চরণ-চুমি॥
তুমিও পান্থ এস গো হেথায়, জীবনের ধারা ধন্য কর।
জননীর স্নেহ-আশীসে হউক্ মধুর জীবন মধুরতর॥

আমরা বাঙ্গালী, মোদের জননী, বিশ্ব-রাণীর উজ্জলমণি।
সত্য-শিবের পূজার লাগিয়া শঙ্কারে মোরা কিছু না গণি॥

মেঘনাদ

[শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল]

(৩৫)

কলিকাতা ছাড়িবার তিন দিন পূর্ব্বে মেঘনাদ সংবাদ পাইল, মনোরমা পীড়িত,—সে একবার মেঘনাদকে দেখিতে চাহিয়াছে।

এ কথায় মেঘনাদ অপ্রসন্ন হইল। মনোরমা তাহার জীবনের শনিগ্রহ! তাহা হইতেই মেঘনাদের যত দুর্দ্দশা। তাই মনোরমার উপর মেঘনাদের একটা দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। তাই আজ তার নূতন জীবনের প্রারম্ভেই এই ধূমকেতুর আবির্ভাবে, তার মন একটা অন্ধ ক্ষোভে পীড়িত হইল। কিন্তু সে মনোরমার নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিল না।

মণিমিঞা অনেক দিন হইল মনোরমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। তার পর মনোরমা বেশ্যা বৃত্তি আরম্ভ করে। কিছুদিন ইহাতে বেশ আনন্দেই কাটিল; কিন্তু শেসে সে একটা কুৎসিত ব্যাধিতে একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িল। তাহার বাড়ীওয়ালী কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহার সেবা-যত্ন করিল; কিন্তু তার পর সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনোরমা তার একখানা ঘর খামখা দখল করিয়া বসিয়া আছে; এতটা লোকসান সে কত দিন বসিয়া সহ্য করিবে? কাজেই সে মনোরমাকে হাসপাতালে যাইবার পরামর্শ দিল। সে হাসপাতালে গেল। সেখানে রোগের কিছু উপশম হইল। তখন হাসপাতাল হইতে তাহাকে বিদায় দিয়া দিল। তখনও সে চলচ্ছক্তি রহিত, অত্যন্ত দুর্ব্বল। আর তার হাতে তখন টাকা-পয়সা প্রায় কিছুই নাই।

সে কোনও মতে একখানা খোলার ঘরে গিয়া বাসা করিয়া রহিল। তাহার গহনার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা বেচিয়া কোনও মতে কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। যখন তার দুঃখ-কষ্ট একেবারে অসহ্য হইল, তখন সে মেঘনাদের বাসার ঠিকানায় একখানা চিঠি লিখিল। সেই চিঠি অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া মেঘনাদের কাছে পৌছিল।

মেঘনাদ দেখিল, মনোরমা তখনও অত্যন্ত পীড়িত। সে মেঘনাদকে দেখিয়া অনেক কান্নাকাটি করিল, মেঘনাদ তাহাতে বিচলিত হইল। সে মনোরমার ঔষধের ব্যবস্থা করিল, পুষ্টিকর খাদ্য আনিয়া দিল; অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া তাহার হাতে কিছু টাকা দিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

পথে ফিরিতে সে ভয়ানক ভাবিতে লাগিল। মনোরমার দুরবস্থা দেখিয়া তার হৃদয় করুণায় ভরিয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে হইল যে, মনোরমার বর্ত্তমান অবস্থার জন্য তা'র, যতটুকুই হউক, দায়িত্ব আছে। আর তাহা থাকুক আর নাই থাকুক,—এই আশ্রিত, পীড়িত, পাপ-নিমজ্জিত নারীকে সাহায্য করিতে সে বাধ্য। এই কথাটাই তাহাকে অপ্রসন্ন করিয়া তুলিল। তার নূতন সেবার জীবনে সে যে

অবাধ স্বাধীনতার সহিত যাইবে মনে করিয়াছিল, তাহার কল্পনা মনোরমার জন্য তাহার কর্ত্তব্যের বোঝা রূঢ় ভাবে ভাঙ্গিয়া দিল। সে দেখিল, মনোরমার প্রতি তার কর্ত্তব্যের দেনা শোধ না করিয়া সে কোথাও যাইতে পারে না।

তার মনে পড়িল সেই পূর্ব্ব-কথা, যখন সে স্থির করিয়াছিল যে, মনোরমার জীবনের সমস্ত ভার সে লইবে। যখন সবাই মিলিয়া তাহাকে উদ্ধারাশ্রমে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, তখন সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই আজ মনোরমাকে কোন উদ্ধারাশ্রমে বা মিশনে পাঠাইয়া, নিজের বোঝা পরের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা সে কল্পনা করিতে পারিল না। সে তার প্রথম সংকল্প হইতে চ্যুত হইয়া কর্ত্তব্যের কাছে দেনদার রহিয়া গিয়াছে,—সে কর্ত্তব্য সে পালন করিবে। মনোরমাকে সে তখন যাহা দিবে মনে করিয়াছিল, তাহা এখন সে দিতে পারে না,—দিবার প্রবৃত্তিও নাই। কিন্তু প্রেম না দিলেও, স্নেহ দিয়া সে মনোরমার জীবন সার্থক করিয়া দিতে পারে।

তাহার মনে হইল যে, তাহার সেবার সঙ্কল্পের সঙ্গে-সঙ্গে যে মনোরমা তার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়াছে, এটা তাহার বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা। ইহাই তাহার সেবার প্রথম আধান,—নূতন জীবনে তাহার প্রথম কার্য্য। এই কার্য্যে যদি সে পরাঙ্মুখ হয়,—এই পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়, তবে তার ব্রত ব্যর্থ হইবে। সে সঙ্কল্প করিল, পরীক্ষায় সে হটিবে না। বীরের মত এ বাধা সে অতিক্রম করিবে,—তার কর্ত্তব্য পালন করিবে।

তাই সে মনোরমার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিল। তাহাকে কতকটা সুস্থ করিয়া দেশে যাইবার সময় তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে সরিৎকে এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই স্থির করিল।

* * *

পৈতৃক ভিটায় গিয়া মেঘনাদ একখানা ছোট খড়ের ঘর তুলিল। তার ভিতর দুইটী প্রকোষ্ঠ করিয়া, একটিতে সে শুইত, আর একটিতে মনোরমা থাকিত।

একখানা ছোট চালা তুলিল, সেখানে রান্না হইত। আর একখানা চালায় সে তার ডিস্পেন্সারী করিল।

গ্রামবাসীরা মেঘনাদকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইল না। মনোরমার কাহিনী তাহাদের জানা ছিল,—মেঘনাদের সঙ্গে মনোরমা-ঘটিত কিছু কাণাঘুষাও তাহারা শুনিয়াছিল। তাই যখন সে মনোরমাকে লইয়া গ্রামে আসিয়া পৌছিল, তখন তাহারা মেঘনাদের উপর ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল।

মেঘনাদের দূর সম্পর্কীয় এক জ্ঞাতি এতদিন মেঘনাদের পৈতৃক ভিটায় 'পালান' করিয়া নির্ব্বিবাদে তরকারীর আবাদ করিতেছিল। মেঘনাদ যখন হঠাৎ আসিয়া সে ভিটা দখল করিয়া বসিল, তখন সে ক্ষুণ্ণ হইল। সে ঘোঁট পাকাইতে লাগিল। গ্রামের আর কতকগুলি লোকের সঙ্গে মিলিয়া তাহারা মেঘনাদকে অতিষ্ঠ করিবার উদ্যোগ করিল। ইঁহারা যে সবাই সাধু বা সচ্চরিত্র ছিলেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁহারা স্থির করিলেন যে, মেঘনাদ যে গ্রামের বুকের উপর বসিয়া মনোরমার সঙ্গে প্রকাশ্য ভাবে ঘর করিবে, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না।

মেঘনাদের সৌভাগ্যক্রমে এ গামে তেমন সম্পন্ন বা পরাক্রান্ত ব্যক্তি কেহ ছিল না; ভদ্রলোকের মধ্যে সকলেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। তাই অত্যাচার করিতে গিয়া কেহ সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার বেপরোয়া ভাবে, যাহা ইচ্ছা তাই করিতে সাহস করিল না। একবার অন্ধকারে তাহারা মেঘনাদকে ধরিয়া মারিল; একবার ঘর পোড়াইয়া দিল; মনোরমার গায়ে তফাৎ হইতে ঢিল ছুঁড়িল—এই পর্য্যন্ত। তা ছাড়া সামাজিক হিসাবে মেঘনাদের উপর যথাসম্ভব অত্যাচার করিল। কেহ তাহার সঙ্গে কোনও সামাজিক সম্পর্ক রাখিত না; কাহার বাড়ীতে গেলে, তাহাকে কেহ ঘরে উঠিতে দিত না; ধোপা ও নাপিতের সহায়তা মেঘনাদ পাইত না।

কিন্তু কিছুতেই মেঘনাদকে তাহারা জব্দ করিতে পারিল না। মেঘনাদের একটা আশ্চর্য্য সর্ব্বংসহ অটুট সহিষ্ণুতা জন্মিয়াছিল, যাহাতে সে এ সমস্ত মোটেই গ্রাহ্য করিত না। আর তার জীবন যাত্রার পক্ষে কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না। তার সমস্ত কাজ সে নিজে করিত। হাট হইতে চালের বোঝা সে মাথায় করিয়া আনিত; নিজে কাঠ কাটিত; ঘর নিকাইত; কাপড় কাচিত। সে চুল দাড়ী বাড়িতে দিল, তাই নাপিতের তার কোনও প্রয়োজন রহিল না। সে নিজ

হাতে তরীতরকারীর আবাদ করিত; বাগান করিত; এ কাজে সে জেলখানায় দীক্ষিত হইয়াছিল।

তার খাওয়া-দাওয়া ঠিক জেলখানার কয়েদীর বরাদ্দে ছিল। অন্যান্য সব বিষয়েই সে জেলের জীবনের কঠোরতা ষোলআনা বজায় রাখিয়াছিল। তবে মনোরমার জন্য সব বিষয়েই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল।

এদিকে সে অল্পদিনের মধ্যেই লোক-সেবার দ্বারা অনেক লোককে, বিশেষতঃ দরিদ্রদিগকে একেবারে মুগ্ধ ও পদানত করিয়া ফেলিল। সে চিকিৎসা করিত,—বিনামূল্যে ঔষধ যোগাইত,—স্থানবিশেষে পথ্যও যোগাইত। তা' ছাড়াও সে যখন যেখানে কাহাকেও কোনও সাহায্য করিবার সুযোগ পাইত, তখনই তাহা করিত। গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিল। বীরভূম জেলে থাকতে সে একটা Tube well খুঁড়িবার কাজ করিয়াছিল। সে যন্ত্রপাতি আনাইয়া নিজের বাড়ীতে একটা গভীর Tube well খুঁড়িয়া, তাহার সঙ্গে পাম্প ও দশটি tap জুড়িয়া দিয়া, গ্রামবাসীদিগকে সেইখান হইতে জল লইতে বলিয়া দিল। তাহা দেখিয়া গ্রামের অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন কয়েকজন লোক নিজ-নিজ বাড়ীতে Tube well করাইলেন; আশে-পাশে অন্য গ্রামেও সে টিউব ওয়েল করিয়া দিতে লাগিল।

সে গ্রামের একখানা বিস্তারিত নক্সা প্রস্তুত করিয়া, তাহার এক এঞ্জিনীয়ার বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দিল। বন্ধু তাহা লইয়া একটা Drainage systemএর প্ল্যান করিয়া দিলেন। মেঘনাদ সেই প্ল্যান অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেল। দেখিল, এ কাজ ভয়ানক কঠিন; কেবল যে অনেক ব্যয়-সাপেক্ষ তাই নয়,—ইহাতে বাধা-বিঘ্ন অনেক। গ্রামের লোকে ম্যালেরিয়ায় মরিতে কুণ্ঠিত নয়; কিন্তু জল-নিকাশের জন্য একটা নালা কাটিবার জন্য এক ফোঁটা জমী ছাড়িতে রাজী নয়। কিন্তু বাধা দেখিয়া মেঘনাদ হটিল না। গ্রামবাসীদিগকে সে বুঝাইতে লাগিল; জমীদারের বাড়ী হাঁটাহাঁটি করিল; লোকাল বোর্ডে তদ্বির করিতে লাগিল; সবডিভিসন্যাল অফিসারকে জপাইতে লাগিল। কাজ বেশী দূর অগ্রসর হইল না; কিন্তু মেঘনাদ ইহা আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল।

গ্রামের জঙ্গল কাটাইবার জন্য সে গ্রামবাসীকে ধরিল। এখানেও কঠিন বাধা! গ্রামের কেহ তা'র আগাছাটিও কাটিতে দিতে সম্মত হয় না। বড় গাছে ফল হয়, আগাছায় জ্বালানি কাঠ হয়। মেঘনাদ তাহাদিগকে হিসাব করিয়া দেখাইতে গেল যে, তাহারা গাছ হইতে যে লাভ পায়, তাহা অপেক্ষা ক্ষতিটা অনেক বেশী; কিন্তু সে হিসাব কেহ বুঝিল না। অনেক স্থানে বিফল-মনোরথ হইয়াও মেঘনাদ নিরাশ হইল না। সে লোককে বুঝাইতে লাগিল। আর অনেক চেষ্টা করিয়া গ্রামে একটা ইউনিয়ন কমিটি প্রতিষ্ঠিত করিল।

কেবল ইহাতেই মেঘনাদের কার্য্য পরিসমাপ্ত হইল না। সে বিশেষ ভাবে লাগিয়া গেল লোক-শিক্ষায়। লোককে সে শিখাইতে স্বাস্থ্যরক্ষার তত্ত্ব; ব্যাধির প্রতিকারের উপায়; শক্তি বৃদ্ধির উপায়। কিন্তু তার প্রধান শিক্ষার বিষয় ছিল, গ্রামবাসীকে মনুষ্যত্বের গৌরব,—মানব জীবনের প্রকৃত মর্য্যাদা শিক্ষা দেওয়া। সে শিখাইত—মানুষ হইয়া জন্মিয়া, পশুর মত কেবল খাইয়া-পরিয়া জীবন কাটাইলে, জীবনটা ব্যর্থ গেল। আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য সে সর্ব্বদা সকলকে উৎসাহিত করিত। কাহারও কাছে মাথা নত না করিয়া, মনুষ্যত্বের অধিকার যে আত্মার সার্থকতা লাভ, তাই পাইবার জন্য লোককে চেষ্টা করিতে শিখাইত। সে দারুণ ব্যথার সহিত অনুভব করিত যে, তার কথা কেহ বুঝিত না। যারা তার সঙ্গে মুখে-মুখে 'হাঁ, হাঁ' করিয়া যাইত, তারাও কাজের বেলায় তার শিক্ষা খাটাইতনা।

এমনি করিয়া লোকের সেবায় সার্থক ও অসার্থক ভাবে তার জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটিয়া যাইত।

মনোরমাকে সে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিয়া মাস দুয়েকের ভিতর খাড়া করিয়া তুলিল। মনোরমা তার কাজে বিশেষ কোনও সহায়তা করিতে পারিত না; কিন্তু সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে, তার গৃহকার্য্যের ভার লইয়া মেঘনাদের অনেকটা সহায়তা করিল। মেঘনাদ এখন কেবল খাইবার ও শুইবার জন্য বাড়ী আসিত; তা'ছাড়া সমস্ত সময় সে দেশময় ঘুরিয়া পরের কাজ করিয়া বেড়াইত।

(৩৬)

শরীর যখন সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিল, তখন মনোরমার মধ্যে তার প্রাচীন বুভুক্ষা জাগিয়া উঠিল। মেঘনাদকে সে তার এত কাছে পাইয়া, যেন আরও কাছে পাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল।

সে মেঘনাদের গৃহকার্য্য বেশ সৌষ্ঠবের সহিত সম্পাদন করিত। কিন্তু ক্রমে মেঘনাদ তাহার কাজকর্ম্মে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। মেঘনাদকে একটু ভাল খাওয়াইবার পরাইবার চেষ্টা মেঘনাদ কিছুতেই সফল হইতে দিত না; কিন্তু আর এক রকমে সে মেঘনাদের অতিরিক্ত যত্ন আরম্ভ করিল। তার কাজকর্ম্ম, কথাবার্ত্তা, চাহনীর ভঙ্গী সবার ভিতর মেঘনাদ যে প্রচ্ছন্ন লালসা দেখিতে পাইল, তাহাতে সে ভীত হইল। অতি অল্পক্ষণ মেঘনাদ বাড়ী থাকিত; কিন্তু সেই অল্প সময় সে যত্ন-আদরে ভরিয়া দিত, হাস্য-পরিহাসে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিত। তার প্রত্যেক কথার ইঙ্গিতে, প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীতে সে লালসার প্রজ্জ্বলিত বহ্নির নিঃশ্বাস দেখিতে পাইল।

যে দানব বহুদিন পূর্ব্বে টাঙ্গাইলে একদিন মেঘনাদের রক্তের ভিতর তাণ্ডব নৃত্য লাগাইয়া দিয়াছিল, সে তার দীর্ঘ সুসুপ্তি ভাঙ্গিয়া তার প্রাণের ভিতর সাড়া দিয়া উঠিল। কিন্তু মেঘনাদের অন্তরের প্রহরী এখন সম্পূর্ণ সজাগ ছিল; সে ইহাকে পিষিয়া মারিল। কিন্তু মনোরমাকে কেমন করিয়া সে নিবৃত্ত করিবে, তাহাকে কিরূপে শান্ত করিবে?

মনোরমার প্রতি মেঘনাদ সম্পূর্ণ সদয় ব্যবহার করিত। যাতে সে কোনওরূপ বেদনা পায়, তাহা করিতে সে একান্ত বিমুখ ছিল। তাই সে ভাবিয়া পাইল না, কি উপায়ে সে এই বিপদ হইতে মনোরমাকে রক্ষা করিবে।

মনোরমাকে সে ধর্ম্মোপদেশ দিত; তার লোক-সেবা কার্য্যে সে তাহাকে নিযুক্ত করিত। মনোরমা নিতান্ত বাধ্য ভাবে তাহার কথা শুনিত; তা'র কাজ করিত। যতক্ষণ তাহাকে কাজ করিতে হইত, ততক্ষণ সে অনেকটা শান্ত থাকিত। তাই মেঘনাদ সদাসর্ব্বদা মনোরমার হাতে কাজ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকিত। এমনি করিয়া অনেক কষ্টে সে মনোরমাকে বাঁচাইয়া চলিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে মেঘনাদ মনোরমার চিত্ত-বিকৃতির কতকটা শমতা লক্ষ্য করিল। সে সন্তুষ্ট হইল; এবং আশা হইল যে, তার ব্যবস্থায় ক্রমে সে হয় তো তার সহজ পাপাশয়তা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে। মেঘনাদের কাণ্ডজ্ঞান খুব সজাগ ছিল না,—চারিদিকে দৃষ্টি দেওয়া তার কোনও কালে অভ্যাস ছিল না। কিন্তু এরূপ ভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর, সেও লক্ষ্য করিল যে, একটি মুসলমান যুবকের তার বাড়ীতে গতিবিধি অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। মেঘনাদের বাড়ীতে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের সব সময় অবারিত গতি ছিল; সুতরাং ইহাতে তাহার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না। কিন্তু মেঘনাদের মনে হইল যে, সে যখন বাড়ী আসে, তখনই সেই যুবককে দেখিতে পায়; এবং মেঘনাদ আসিলেই সে চলিয়া যায়। ক্রমে আর তাহার সন্দেহ রহিল না, যে, এ যুবক কিসের জন্য আসে।

মেঘনাদ ইহাতে ব্যথিত হইল। তার মনে পড়িল, লম্ব্রোসো, গ্যারোফালো প্রভৃতির কথা; তাহার মনে পড়িল যে, মনোরমার মত স্বভাব-অপরাধীর পক্ষে, সুযোগ পাইলে, অপরাধ না করিয়া থাকা একেবারেই অসম্ভব। সে মনোরমার উপর অসন্তুষ্ট হইতে পারিল না; কেন না, তাহার মনে হইল যে, সে এমন একটা অভিশাপ লইয়া জন্মিয়াছে যে তার পক্ষে অপরাধ না করিয়া থাকা কোনও মতেই সম্ভব নয়। কি অপরাধে তার উপর বিধাতার এ অভিশাপ, তাই ভাবিয়া সে ব্যাপৃত হইল।

কিছুদিন পরে একদিন রাত্রে হঠাৎ মেঘনাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে অনুভব করিল, মনোরমা তার বিছানার পাশে বসিয়া আছে। মেঘনাদ চক্ষু মেলিবামাত্র, সে তার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মেঘনাদ লাফাইয়া উঠিল; বহু কষ্টে সে মনোরমার বাহুবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া, মুক্ত দ্বার দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

তাহার সর্ব্বশরীর ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; তার মাথার ভিতর দুপদপ্ করিতে লাগিল। বুক কাঁপিতে লাগিল; সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ বাহিরে পায়চারী করিয়া সে শান্ত হইল। মন স্থির করিয়া সে ঘরের ভিতর আসিল। মনোরমা তখনও সে ঘরে। সে মেঘনাদের বিছানায় শুইয়া, বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে।

মেঘনাদের তাহার সহিত কথা কহিতে সাহস হইল না; তাহার দিকে চাহিতে সে সঙ্কুচিত হইল। সে বাতি জ্বালিয়া মাদুর বিছাইয়া একখানা বই লইয়া পড়িতে বসিল।

এমনি ভাবে রাত কাটিয়া গেল। ভোরের বেলায় পাখীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে মেঘনাদ তাহার দুয়ারে মানুষের কথা শুনিতে পাইল। মেঘনাদ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া

আসিল। মনোরমাও তাড়াতাড়ি উঠিয়া মেঘনাদের পিছু-পিছু বাহির হইল।

মেঘনাদ বাহির হইয়া দেখিল, উঠানে দাঁড়াইয়া সরিৎ ও অজিত। উৎফুল্ল অন্তরে সে বলিয়া উঠিল, "সরিৎ! কি রকম? কোনও খবর না দিয়ে হঠাৎ?"

সরিৎ মেঘনাদকে প্রণাম করিতে যাইয়া দেখিল, তাহার পিছু-পিছু মনোরমা বাহির হইয়া আসিল। সে এক পা পিছু হটিয়া গেল। তার মুখ একদম সাদা হইয়া গেল। সে শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে?"

মেঘনাদের শরীরের ভিতর বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। সে একটা প্রবল ধাক্কা খাইয়া অনুভব করিল যে, মনোরমা তার পিছু-পিছু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। সরিৎ যে এই ব্যাপারের কি অর্থ বুঝিবে, অজিত যে কি বুঝিবে, তাহা এক মুহূর্ত্তে সে বুঝিয়া ফেলিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য সে বিরত হইয়া পড়িল। তার পর প্রবল শক্তির দ্বারা সমস্ত সঙ্কোচ দূর করিয়া ফেলিয়া সে বলিল, "ও মনোরমা।"

সরিৎ আর কোনও কথা কহিল না। সে নীরবে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। (ক্রমশঃ)

মেসোপটেমিয়ায় সূর্য্য-বংশীয় রাজত্ব

[অধ্যাপক শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম এ]

মেসোপটেমিয়ার সহিত সম্প্রতি, ব্রিটীশ মহাশক্তির বিজয়ের দ্বারা, ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ যোগ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে। পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিলে, এই যোগটা অভিনব যোগ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। পুরাবৃত্তে স্মরণাতীত কালেই ভারতীয় আর্য্যদিগের সহিত মেসোপটেমিয়ার গাঢ়তম সম্বন্ধের প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। আমরা উপস্থিত প্রসঙ্গে সেই সম্বন্ধটা প্রদর্শন করিবার প্রয়াস পাইব।

মেসোপটেমিয়া টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটাস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের নাম। পুরাকালে মেসোপটেমিয়ায় "মিতান্নী" নামে একটা স্থান ছিল। এই স্থানে যে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ভারতীয় বৈদিক সভ্যতারই অনুরূপ। যে রাজবংশ এই প্রাচীন সভ্যতার নেতা হইয়াছিলেন, তাঁহারা সূর্য্য-বংশীয় ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পরন্তু, ইঁহাদিগের মধ্যে ভারতীয় সূর্য্য-বংশীয় রাজার নামও রহিয়াছে। এই সমস্ত কারণে ভারতীয় সূর্য্য-বংশীয়গণের ন্যায় "মিতান্নী"র অধিষ্ঠাতাগণ যে আর্য্য-বংশধর, এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদের সহিত একই বংশধর, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণই পাওয়া যাইতেছে।

মিতান্নীর প্রাচীন সভ্যতায় বৈদিক প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় তদীয় গবেষণার ফল এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন—

"মিসর দেশের 'তেল-এল্-অর্ম্ম' নামক স্থানে যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, অন্ততঃ পক্ষে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৬০০ সংবৎসরে এসিয়া মাইনরের "মিতানি" নামক স্থানে যে রাজারা রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের নামকরণ বৈদিক ভাষায় হইত; এবং তাঁহারা বৈদিক দেবতার পূজা করিতেন। ইঁহাদের নামের বর্ণবিন্যাসে ইরাণীয় প্রাদেশিকতা নাই; কাজেই, এই জাতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতের আর্য্য সভ্যতা লাভ করিয়াছিল।" প্রাচীন সভ্যতা, ৭২ পৃঃ।

মিতানি বা মিতান্নীর উল্লিখিত রাজগণ যে সূর্য্য-বংশীয় বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারেন, তাহা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদিগের গবেষণায় এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে—

"Suryya was the chief deity of the Aryans in Babylonia in the second millennium before Christ * ; so we may assume that the Aryan King of the Mitanni, Dushratta who ruled in Babylon at that time, was one of the Suryyavansa." The History of the Aryan Rule in India, by E. B. Havell. p. 41.

উপরি উল্লিখিত Dushratta নামটী যে 'দশরথ' নামেরই রূপান্তর মাত্র,—বাবু বিজয়চন্দ্র মজুমদার তদীয় "প্রাচীন সভ্যতায়" মিতান্নীর রাজবংশের যে বৃত্তান্ত দিয়াছেন,

* Hall's Ancieut History of the Nea East, p. 201.

তাহা পাঠ করিলে, তৎ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ মাত্র থাকে না—

"এই সময়ে † বেবিলন ও আসীরিয়ার পশ্চিমে খাঁটি বৈদিক দেবতা-পূজক একটী রাজবংশের ইতিহাস পাওয়া যায়। ইঁহাদের অধিকৃত ভূমির নাম ছিল মিতানি; এবং কয়েকজন রাজার নাম অর্ন্তমতম, অর্ন্তমুম, স্বুতর্ণ এবং দশরথ বলিয়া পাওয়া যায়॥" প্রাচীন সভ্যতা, ২৫ পৃঃ।

দশরথ স্বনামখ্যাত সূর্য্য-বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে মিতান্নীর একটী রাজনাম যে কল্পিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মিতান্নীর রাজবংশ ও ভারতীয় সূর্য্য-বংশ যে একই সূর্য্য-বংশ, তাহার যথেষ্ট প্রমাণই পাওয়া যায়। এমন কি "মিতান্নী" নামটীও সূর্য্য সম্পর্কেরই দ্বারা কল্পিত বলিয়া মনে করি। বিজয় বাবু এই নাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"মিতানি" শব্দটী সূর্য্য দেবতার মিত্র নামের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে হয়॥"

আমরা অনুমান করি যে, সূর্য্য-বংশীয়দিগের বাসভূমি এই অর্থে সূর্য্যবাচক মিত্র ও বাসস্থান বাচক 'অয়ন' শব্দদ্বয়ের যোগে 'মিত্রায়ন' শব্দ সাধিত হইয়া, তাহারই স্ত্রীপ্রত্যয়রূপে 'মিত্রায়নী' নাম প্রচলিত হইয়া থাকিবে। উহারই অপভ্রংশে 'মিতান্নী' বা 'মিতানি' নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

সূর্য্যবংশীয় দশরথ রাজার নাম মিতান্নীর রাজবংশের অন্তর্নিবিষ্ট দেখিতে পাইলেও, আমরা দশরথ রাজার সহিত ঐ বংশের সাক্ষাৎ যোগ ছিল বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। কারণ, দশরথের এরূপ কোন বৈদেশিক অধিকারের কোন বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। এমন কি, তৎপুত্র প্রসিদ্ধ রাক্ষস-বিজয়ী রামচন্দ্রেরও কোনও বৈদেশিক অধিকারের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। আমাদের বোধ হয় যে, রামচন্দ্রের বংশধরেরাই এইরূপ বৈদেশিক অধিকার বিস্তার করিয়া, পূর্ব্বপুরুষের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব পুরুষের স্মৃতিরক্ষা করিয়াছিলেন।

মিতান্নীতে যে সময়ে আর্য্য-সভ্যতা প্রতিষ্ঠার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রায় তৎ-সমকালেই বেবিলনেও আর্য্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক হেভেল লিখিয়াছেন—

† অর্থাৎ ১৮৮০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে।

"About 1740 B. C. the Kassites, another branch of the Aryans made themselves masters of Babylon, and thus an Aryan dynasty ruled over Babylonia for the following six hundred years." The History of Aryan Rule in India, p. 4.

বেবিলনে প্রতিষ্ঠিত আর্য্য কাশ জাতি যে সূর্য্যের উপাসক ছিল, এবং ইহারা যে ভারতীয় আর্য্য সভ্যতারই অধিকারী ছিল, প্রত্নতাত্ত্বিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার এইরূপে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন—

"এই কাশদিগের দেববর্গে "সুরিয়স্" ঠিক্ সূর্য্য অর্থে পাওয়া যায়। বানান এবং উচ্চারণ সম্পূর্ণ রূপে "সূর্য্যঃ" শব্দের অনুরূপ। ইরাণ দেশীয়েরা তাহাদের ভাষায় আর্য্য-ভাষাকে যে প্রকার প্রাদেশিক বিকৃতিতে লইয়াছিল, এখানে সেই প্রাদেশিক বিকৃতি নাই। কাশেরা বেবিলনের বহু দূর পূর্ব্ব প্রদেশ হইতে আসিয়া দেশজয় করিয়াছিল, এ কথা বেবিলনের ইতিহাসে সুস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে যাহারা পূর্ব্বে বাস করিত, তাহারা যে ভারত হইতে বিস্তৃত আর্য্য সভ্যতা লাভ করে নাই, এ কথা বলিতে যাওয়া দুঃসাহসের কথা॥" প্রাচীন সভ্যতা পৃঃ, ৭১—৭২।

এখানে সূর্য্য নামের প্রমাণের দ্বারা কাশদিগকেও সূর্য্য-বংশীয় বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

মিশরের রাজবংশ যে মিতান্নী ও বেবিলন উভয় রাজ-বংশেরই সহিত বিবাহ-সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন, প্রাচীন ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিজয়বাবু সেই ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"মিতানি রাজবংশের একটী কন্যা মিশরের একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠাতা ইকুন্ এটন্ বা চতুর্থ এমেন্ হোটেপ্ রাজার মহিষী ছিলেন; হয় ত বা পত্নীর ধর্ম্মমতবাদের প্রভাবেই রাজার একেশ্বরবাদের জন্ম; তৃতীয় এমেন হোটেপ্ বেবিলনের কাশ-রাজবংশের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন॥" প্রাচীন সভ্যতা, ২৫ পৃঃ।

এই বিবাহ সম্বন্ধের ফলেই হউক, বা অন্য কোন রূপেই হউক, মিতান্নীর রাজাদিগের মধ্যে যেমন আমরা সূর্য্য-বংশের দশরথের নাম প্রাপ্ত হই, তেমনই মিশরের রাজা-

দিগের মধ্যেও আমরা রামনামের অনুরূপ Rameses নাম প্রাপ্ত হই। এই নামের ১৩ জন রাজা মিশরে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। Rameses নামটী যেন রাম শব্দের সংস্কৃত রূপ হইতে গৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত 'রাম' শব্দ প্রথমা বিভক্তির এক বচনে রামঃ অর্থাৎ 'রামস্' এই আকার প্রাপ্ত হয়। রামের বংশধর বুঝাইতে সংস্কৃত রাম শব্দের বহুবচনে—'রামাঃ' অর্থাৎ রামাস্ এইরূপ হওয়া উচিত হয়। একবচনান্ত 'রামস্' শব্দের সহিত বহুবচনের চিহ্ন অস্ যুক্ত হইয়া যেন রামসস্ হইতে রামেসেস্ হইয়া পড়িয়াছে। 'রামেসেস্' নামটীকে 'রাম' নামের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করিবার আরও কারণ এই যে—'রাম' যেমন সূর্য্য-বংশীয় ছিলেন, এই নামটীতেও তেমনই 'সূর্য্য-বংশীয়' এই অর্থই পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে রামেসেস্ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ একটা প্রামাণিক ইংরেজী অভিধান হইতে সঙ্কলিত করিয়া দিতেছি; তাহা হইতে আমাদিগের বক্তব্যের যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যাইবে:—

"Rameses (Born of the Sun) the name of 13 Egyptian Kings, commemorated on monuments." Beeton's Dictionary of Universal Information.

'রামসেস্' নামের সঙ্গে-সঙ্গে মিশরের 'সেতি' নামক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই 'সেতি' নামের সহিত রাম-মহিষী 'সীতা' নামের কোন যোগ থাকা বিশেষ সম্ভবপর মনে হয়।

মিশরের প্রাচীনতম ইতিহাসে মনেস্ নামক আদি রাজার উল্লেখ দেখা যায়। এই মনেস্ নাম মনুনামের স্পষ্ট অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত হয়। বৈবস্বত মনু সূর্য্য-বংশেরই আদি রাজা ছিলেন। ইহাতেও 'মনেস্' প্রভৃতি রাজগণ সূর্য্যবংশীয় বলিয়াই প্রমাণিত হয়। বিশ্বকোষে এই রাজগণ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

"তৎপর ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে দেবকল্প মনেস্ (Manes) প্রমুখ ভূপতিগণ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সমস্ত রাজগণের অধিকাংশ নাম সূর্য্যের একার্থবোধক। ইহাতে বোধ হয়, সূর্য্য-বংশ বহুকাল মিশরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।"

এক্ষণে সূর্য্য-বংশ কিরূপে উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমরা যতদূর অনুমান করিতে পারি, তাহাতে বোধ হয়, রামের পরে তদীয় বংশধরদিগের দ্বারাই এই বৈদেশিক উপনিবেশ সকল স্থাপনের উদ্যোগ ও উৎসাহ উপস্থিত হয়। রামায়ণে রাম ও ভরতের পুত্রগণের ভারতবর্ষের মধ্যে রাজ্য স্থাপনেরই বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু বাহিরে রাজ্যস্থাপনের কোনও বৃত্তান্ত প্রদত্ত হয় নাই।

কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা কখনও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না যে, যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ভারত-বহির্ভাগে প্রবল রাক্ষস-রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বদেশেই নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিয়াছিলেন; এবং বিজিত রাক্ষস-রাজ্যের নিকটবর্ত্তী কোন দেশের সংবাদ লইতে আগ্রহান্বিত হন নাই। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ যখন সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা যে সাহসপূর্ব্বক সমুদ্র অতিক্রম করিয়া মেসোপটেমিয়া ও মিশরে রাজ্য-বিস্তারে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। বেবিলনের আর্য্য অধিকারের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষ ও মেসোপটেমিয়ার মধ্যে যাতায়াত ছিল, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের দ্বারাই তাহার প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে—

Intercourse between India and Mesopotamia had existed even before Aryan Kings ruled in Babylon. The History of Aryan Rule in India, p. 256.

রামের বংশধরদিগের দ্বারা মেসোপটেমিয়ায় আর্য্যোপনিবেশ স্থাপিত হয় বলিয়াই, মিতান্নীর রাজবংশের প্রতাপান্বিত রাজা আদি পুরুষ রূপ রামচন্দ্রের পিতা দশরথের নাম ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। বেবিলনে যে কাশবংশ অধিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার সহিতও যেন রামের বংশধরদিগের সংস্রবের প্রমাণ পাওয়া যায়। রামের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল কুশ। এই কুশের পুত্র বা বংশধরের তাঁহার নামের অনুকরণে 'কাশ' নাম প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভাব্য বোধ হয় না; কারণ কুশ ও কাশ তুল্য জাতীয় তৃণ বলিয়া সর্ব্বদাই একসঙ্গে উক্ত হইয়া থাকে। কুশের সন্তানগণই কাশরাজবংশ বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকিবেন।

'কুশের' নামের সহিত বেবিলনের 'কাশ' রাজবংশের

যোগ থাকা সম্বন্ধে আমরা যে অনুমান করিয়াছি, তাহার আশ্চর্য্য একটী প্রমাণ আমরা নব-প্রকাশিত একটী প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"The remnants of the Kashshu, who did not advance to the conquest of Babylon or to that of Southern Babylonia and of the country of the Sea,' remained behind in the mountains, where they were attacked by Nebuchadnezar I, and again by Senna Cherib and in Alexander's time they were mentioned as Kosseans. A tribe of the Kissians is also mentioned as dwelling in Elam new Susa; it is possible that they were descendants of the Kassites who had settled in Elam." Harmsworth's History of the World.

উপরি উল্লিখিত 'কাশ্শু' ও 'কেশিয়ান' নাম যে 'কাশ' ও 'কুশ' নামের স্পষ্ট রূপান্তর, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। কাশ্শুদিগের কেশিয়ান্ নামে উল্লেখ হইতে, তাহারা যে একই বংশ এবং আদিতে ইহা যে কুশের নামে পরিচিত ছিল, তাহা বিশেষ রূপে অনুমিত হয়। পরন্তু, কাশজাতির সহিত পূর্ব্বোক্ত উভয় জাতির জ্ঞাতিত্বের সম্ভাবনা হইতে এই তিন জাতিই যে মূলে ভারতীয় জাতি তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

কাশ বংশের বেবিলনে অধিষ্ঠান হইতে, তাহাদের প্রাধান্য-বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে রাম নামের প্রভাবও এসিয়া মাইনরে ব্যাপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর সার উইলিয়াম জোনস্, বাইবেলে 'রাম নামক' রাজার উল্লেখ দেখিয়া, তাঁহার সময়ের সহিত রামায়ণ সময়ের ঐক্য সাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন—"But this era was brought down by Sir William Jones to 2029 B. C., and reconciled to the Rama of Scripture. Cyclopædia of India.

রামনামের বিশেষ একটী নিদর্শন প্যালেষ্টাইনেও বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। প্যালেষ্টাইনে রাম নামে একটী নগরেরই নাম রহিয়াছে—

"Rama or Ramalia a town of Palestine, 26 miles N. W. of Jerusalem." There is a large convent." Beeton's Dictionary of Universal Information.

এই নগরের নাম বাইবেলেও উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা যে সবিশেষ প্রাচীন স্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা তীর্থস্থানরূপে পরিচিত হওয়ায়, ইহা রামের স্মৃতির আরও বিশেষরূপ নির্দ্দেশক বলিয়াই বোধ হয়।

দশরথ ও রামের সহিত যখন প্রাচীন নিদর্শন সকলের যোগ দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু সূর্য্য-বংশীয় অন্য কোন প্রাচীন রাজার সহিত যোগ দৃষ্ট হইতেছে না, তখন ইহা সহজে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, রামের বংশধরগণ কর্তৃকই আসিয়া মাইনর ও মিশরে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সূর্য্য-বংশীয় রাজাদিগের বংশধরদিগের দ্বারা উপনিবেশ স্থাপিত হয় নাই। কেহ-কেহ মেসোপটেমিয়া হইতেই সূর্য্য-বংশের ভারতে উপনিবিষ্ট হওয়ার মত প্রখ্যাপন করেন; তাহাও এতদ্দ্বারা বিশেষরূপেই নিরাকৃত হয়। কারণ, যদি আদিতে মেসোপটেমিয়াতেই সূর্য্য বংশের অধিষ্ঠান হইবে, তবে তাহাতে সূর্য্য-বংশের প্রাচীন রাজাদিগের নাম না থাকিয়া, শেষ রাজাদিগেরই নাম থাকিবে কেন? বিশেষতঃ মেসোপটেমিয়ায় যদি বৈদিক সভ্যতা প্রথমেই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে, তবে তথায় সংস্কৃত নাম সকল প্রকৃত রূপে বর্ত্তমান না থাকিয়া বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হইবে কেন?

মেসোপটেমিয়ায় সূর্য্য-বংশের পরিণাম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক হেভেল লিখিয়াছেন যে, মিতান্নীর পরাক্রান্ত রাজা দশরথের মৃত্যুর পর, মিতান্নীতে অরাজকতা উপস্থিত হইলে, মিতান্নীর আর্য্যগণ পূর্ব্বদিকে এসিরিয়দিগের দ্বারা এবং পশ্চিম দিকে হিটাইটদিগের দ্বারা আক্রান্ত ও নিপীড়িত হইয়া পরাভব প্রাপ্ত হয়। তখন নদী বাহিয়া সমুদ্র-পথে পলায়ন ব্যতীত তাহাদের আর গত্যন্তর ছিল না। ইহা হইতে পাঞ্জাবে জলপথে আর্য্যদিগের অধিনিবেশের এক প্রবল বেগ উপস্থিত হয়। এই ঘটনা খৃষ্টপূর্ব্ব ১৩৬৭ অব্দে সংঘটিত হইয়াছিল—

"A great impulse to Aryan immigration into the Punjab by sea probably came about 1367 B. C. When after the death of king Dushratta a name familiar in ancient Indian

literature by the story of the Ramayana— Mitanni was thrown into a state of anarchy, being harried on the east by the Assyrians and on the west by the Hittites, so that the only way of escape for vanquished Aryan warriors would have been down the river to the sea." The History of Aryan Rule in India, p. 3.

এইরূপে ঔপনিবেশিক ভারতীয় সূর্য্য-বংশীয় আর্য্যগণ আবার মাতৃভূমির ক্রোড়েই আসিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। এই নবাগত আর্য্যগণের দ্বারাই সম্ভবতঃ রাজপুত জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাতেই রাজপুতদিগের মধ্যে অনেক রাজাই সূর্য্য-বংশীয় বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন। রাজপুত রাজগণের বংশ-পরিচয় আমরা নিম্নে বিশ্বকোষ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

সূর্য্য-বংশীয় রাজপুতগণের মধ্যে গহলোত, রাঠোর ও কচ্ছবহ নামে তিনটী থাক আছে। গহলোতবংশের ২৪টী শাখা, তন্মধ্যে শিশোদিয় কুল বিখ্যাত। বাপ্পা বংশধর উদয়পুরের রাণাগণ এই বংশীয়। রাঠোরগণ কুশের বংশধর বলিয়া পরিচিত। ইহাদের মধ্যে ২৪টী শাখা দৃষ্ট হয়। যোধপুরের রাজপুত রাজারা এই বংশ সমুদ্ভূত। কচ্ছবহগণ কুশকে আপনাদের আদিপুরুষ বলেন। জয়পুরের রাজারা এই বংশীয়॥"

এখানে রাজপুতদিগের ৩টী বিভাগের মধ্যে ২টী বিভাগই যে কুশবংশীয়, তাহার স্পষ্ট উল্লেখই আমরা পাইতেছি। এইরূপে রাজপুতদিগের পূর্ব্বপুরুষ রূপে কুশেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হইতেছে।

রাজপুত রাজগণ যে সূর্য্য-বংশের আদি কোন রাজার বংশধর বলিয়া পরিচিত না হইয়া, রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইয়াই সন্তুষ্ট, ইহাতে রাম-পুত্র কুশের বংশধরগণই যে মিতান্নীর উপনিবেশের স্থাপয়িতা ছিলেন, তৎসম্বন্ধে পরিপোষক দৃঢ় প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই প্রকারে মেসোপটেমিয়ার লুপ্ত ইতিহাসে ভারতীয় ইতিহাস হইতে যেমন আশ্চর্য্য রূপে আলোক-পাত হয়, তেমনই মেসোপটেমিয়া, এসিয়া মাইনর ও মিশরের ইতিহাসেও ভারত-ইতিহাসের ছিন্ন সূত্রেরই আশ্চর্য্য রূপে সন্ধান পাওয়া যায়।

বধূর পত্র

[শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

ঐ বধূর-কণ্ঠের ভেতর থেকে কি ইঙ্গিত ভেসে আসে!
সে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে "আয় চলে আয়,
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে!"

দেখে, আয় রে ছুটে আয় রে ত্বরা,
হেথা, নাইক পাশ নাইক পড়া,
হেথায়, মুখের কথা মধু-ভরা চির-স্নিগ্ধ বার মাসে!
হেথায়, চির-শান্তি আগাগোড়া, চির-জ্যোৎস্না প্রাণাকাশে!

কেন, পুঁথির বোঝা বহিস্ পিছে,
পাশের, ব্যাগার খেটে মরিস্ মিছে,
ত্যাখ্, এই প্রাণ-সিন্ধু উছলিছে মুখ-ইন্দু বুঝি ভাসে!
পুঁথির, বোঝা ফেলে বাঁধন খুলে আয় ওরে শুক, সারির পাশে!

কেন, কলেজ-গৃহে থাকিস্ বন্ধ,
ওরে, ওরে বোকা ওরে অন্ধ
ওরে, সেই সে 'পড়ুয়া চন্দ্র' যে আমারে ভালবাসে!
কেন, বোকার মত আমায় ছেড়ে পড়ে থাকিস্ ছাত্রাবাসে!

পথহারা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

তারার বয়স ষোল বৎসর পূর্ণ হইয়া গেলেও যখন তারার বিবাহ দিতে পারা গেল না, তখনই ইন্দ্রাণী আর একবার বিষম ভাবনার জালে জড়াইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রাণীর পিতা বৃদ্ধ এবং রোগজীর্ণ; কবে আছেন, কবে নাই। বাড়ীতে দুইটী বিধবা এবং একটী অনূঢ়া কন্যা। ইন্দ্রাণী ভাবে, মেয়েটা যদি একটু কুৎসিত দেখিতেও হইত, তো না হয় তাহাকে আইবুড়ই রাখিয়া দিতাম। এ মেয়ের দিকে বড় শীঘ্র নজর পড়ে,—এও যে এক বিষম জ্বালা! বিমলের ঠিকানা কিছুই জানা নাই। অমৃতের আকস্মিক ও শোচনীয় মৃত্যু ঘটনায়, ইন্দ্রাণীর মনের ভিতরটায় যে কি ভীষণ আতঙ্ক জমিয়া আছে, সে শুধু সে-ই জানে। সেই অবধি ভরসা করিয়া সে বিমলের কোন খোঁজ-খবর নেওয়ার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতে পারে না, পাছে কোন রূপে কেহ এমন কিছু একটা ভয়াবহ সংবাদ দিয়া ফেলে! খবরের কাগজ দেখিলেই তাহার বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির ঘা' পড়িতে থাকে। এমন করিয়া নিদারুণ দুশ্চিন্তায়-দুশ্চিন্তায় প্রায় দু'মাস কাটাইয়া হঠাৎ একদিন কাহার মুখে শুনিল যে, বিমল এখন নিজের পৈতৃক ভিটায় আসিয়া বাস করিতেছে। শুনিয়া, অনেক দিন পরে ইন্দ্রাণীর দু'চোখ ভর্ত্তি করিয়া, অনেকখানি আনন্দের অশ্রু অকস্মাৎ উথলাইয়া উঠিয়া, ধীরে-ধীরে গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। পাড়াপ্রতিবেসীর সাহায্যে তারার বিবাহের একটা ভাল সম্বন্ধ স্থির হইলে, ইন্দ্রাণী বিমলকে এই বিবাহে সাহায্যের জন্য হাজার কয়েক টাকা চাহিয়া, অনেক অনুনয় পূর্ব্বক পত্র লিখিল। ক্রমে একখানার পর দুইখানা পত্র লিখিয়াও তাহার নিরুত্তর ভাব নষ্ট করিতে না পারায়, শেষে একদিন সে নিজেই তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাড়ীখানা ইতঃপূর্ব্বে পতনোন্মুখ হইয়াছিল; ইন্দ্রাণী দেখিয়া প্রীত হইল যে, উত্তম রূপে মেরামত না হউক, তথাপি ইহার আপাততঃ রক্ষাকল্পে বিমল কতকটা চেষ্টা করিয়াছে। অশথ-বটগুলা উৎপাটিত ও ভাঙ্গা-চোরা দেওয়ালে, প্রাচীরে দাগরাজী, ভগ্ন কবাটে জোড় লাগান—আজ যেন এই বহু-দিনের পরিত্যক্ত অনাদৃত গৃহের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হইল।

ক্ষান্তি ঝি এই বাড়ীতে আজও পড়িয়া আছে। তাহার মাথার চুলের সব কয়গাছিই পাকিয়া গিয়াছে; গলার স্বরও ভাঙ্গিয়া মৃদু হইয়াছে। তা' ভিন্ন, সুর চড়াইবার আর তো এখন প্রয়োজনও হয় না। এই অভাবটাই এ বাটীতে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রাণীর পক্ষে কেমন যেন আশ্চর্য্য-আশ্চর্য্য ঠেকিতে লাগিল। পূর্ব্বের তো কথাই নাই—ইদানীংও যখনই সে আসিয়া বাড়ী ঢুকিয়াছে, তখনি একলা বাড়ীতে বসিয়া মঙ্গলাদেবীকে বোধ করি কোন অলক্ষ্য গৃহদেবতা বা অপদেবতাকেই উদ্দেশ করিয়া আপন মনেই চড়াগলায় গালাগালি করিতে শুনিতে শুনিতেই ঢুকিয়াছে, "হে ঠাকুর! হে ঠাকুর! আমার বুকে শেল বিঁধে আমার দুখেকে যে ছিঁড়ে নিয়েছে, তার বুকে যেন ওমনি করেই সত্যিকারের শেল বেঁধে। হে মা কালি! যেদিন এই কাণ দিয়ে শুনবো যে, পুঁটে পোড়াকপালে মুখে রক্ত উঠে মরেচে, সেইদিনই তোমায় জোড়া পাঁঠা দিয়ে পূজো দোব মা"—সেদিনেরই মত সর্ব্বাঙ্গে শিহরিয়া উঠিয়া, ইন্দ্রাণীর আজ সেই ভয়ানক কথা-গুলাই স্মরণ হইল,—উঃ, সত্যই যে পিতৃষ্বসার সেই দুর্জ্জয় অভিশাপই হতভাগ্যের জীবনে সফল হইল! মা কালী পূজা পান না পান, বক্ষে কাহার হস্তের সেই অব্যর্থ শেলাহত হইয়াই তাহার জীবন-লীলার অবসান হইয়া গেল! অমৃতের কথা স্মরণ করিতে ইন্দ্রাণীর চোখ দিয়া অনেকবারই জল পড়িয়াছে। সে যাই হোক, তবু সে তাহাদের আত্মীয়। এক দিন হয় ত তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিল। বিমলের অপকার করিলেও, উপকারও সে নেহাৎ কম করে নাই। তার পর সেই তারাকে চাওয়া! সে কথাও সে ইন্দ্রাণী ভুলিতে পারে না। লোক সে যতই মন্দ হোক, তবু তাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিল। আর তা না হইলেও, সে

একটা মানুষ তো! অমন হইয়া মরা! আহা, এ যে একটা জন্তুর পক্ষেও কষ্টকর!

ক্ষ্যান্তি বলিল "এইবারে মহাপাপের তো শাস্তি হয়েচে বৌমা,—ছেলেমেয়ের বে'থা দিয়ে এইবার নিজের ঘরে এসে ঘর করোসে' মা। তা হ্যাঁগা, আমার তারাদিদি আসে নি কেন গা? তাঁকে যে দেখচি নে!"

"তাকে বাবার কাছে রেখে আসতে হলো। হাঁা ক্ষ্যান্তি, বিমল কোথায়?"

ঝি বলিল "বোধ করি ঘরেই আছেন। এসো বৌমা, হাতে-মুখে একটু জল দাওসে। তোমার হেঁসেল ঘরে ততক্ষণ রান্বার উদ্যোগ করে দিই,—তুমি তো চান করে রান্না চাপাবে?"

ইন্দ্রাণী ঈষৎ ক্লান্ত স্বরে কহিলেন "রান্না থাক্— শরীরও আমার ভাল নেই। আগে আমি বিমলের কাছ থেকে আসি, তার পর সে যা হয় হবে!" এই বলিয়াই তিনি বিমলের পড়িবার ঘরের দিকে চিরদিনের অভ্যাস প্রযুক্ত অগ্রসর হইয়া গেলে, ক্ষ্যান্তি তাড়াতাড়ি সংশোধন করিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল "ও ঘরে তো নয় মা, দাদাবাবু এখন তোমার শোবার ঘরখানায় যে বসে। তা হ্যাঁগা মা, আমার তারাদিদির বিয়ে কবে দেবে গা! এইখানেই তো বিয়ে হবে মা?"

ইন্দ্রাণী এ প্রশ্নের উত্তর ঈষৎ মাত্র হাস্যে সমাধা করিয়া দিয়া, নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সে ঘরে, সেই তাহার চিরপরিচিত গৃহে, আজ আর চিরদিনের গৃহসজ্জা বর্ত্তমান ছিল না। জোড়া খাটের পরিবর্ত্তে লিখিবার টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি। কাঁচের আলমারিটা আছে; কিন্তু ইন্দ্রাণীর সহস্র টুকিটাকি সৌখীন বস্তুর ভাণ্ডার আর তাহাতে সঞ্চিত নাই; তাহার বদলে বৈদেশিক পুস্তকাবলী নিজেদের আভ্যন্তরিক তীব্র তাপ বিচিত্র বর্ণের বাহ্যাবরণে ঢাকা দিয়া শোভা পাইতেছে। ইন্দ্রাণীর বুক চিরিয়া একটা নিঃশ্বাস কণ্ঠের কাছ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। সযত্নে উহাকে নিরোধ পূর্ব্বক তিনি ডাকিলেন "বিমল!"

ইন্দ্রাণী যে আসিয়াছেন, বিমল বোধ করি ইতোমধ্যেই সে সংবাদ পাইয়াছিল, এবং কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন, তাহাও তাহার আন্দাজ ছিল। সে এই সাক্ষাতের জন্য বোধ করি প্রস্তুত হইয়াই বসিয়া ছিল। হাতে যে পুস্তকখানা ছিল, সেখান হইতে চোখ পর্য্যন্ত না তুলিয়াই কহিল "কি?"

ইন্দ্রাণী মুহূর্ত্ত কাল বিস্মিত নেত্রে পাঠশীল, স্থিরমূর্ত্তি তরুণের সংযত মুখের অপরিবর্ত্তিত, অবিচলিত রেখা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তার পর একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিয়া, তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "আজ আট বৎসর হয়ে গেল— এখান থেকে কিছুই পাই নি বিমল; কিন্তু এখন তারার বিয়ে দিতে হবে; চার হাজার টাকা আমায় তুমি আনিয়ে দাও। অনেক চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু এ রকমে তো আর পেলুম না।"

বইয়ের পঠিত পত্রখানা উল্টাইয়া, নূতন আর একখানা পাতায় চোখ রাখিয়া বিমল কহিল, "চার হাজার টাকা আমি তোমায় কোথা থেকে দেবো?"

ইন্দ্রাণী শান্ত স্বরে কহিলেন "আমার অংশ থেকে।"

মুহূর্ত্ত কালের জন্য চোখের দৃষ্টি ক্ষুদ্র অথচ সেই আগুনভরা পুস্তিকার উপর হইতে উঠাইয়া, বিমলেন্দু ইন্দ্রাণীর মুখের উপর স্থাপন করিল; স্থির স্বরে কহিল, "তোমার অংশ? সে তো তুমি আমায় ছেড়ে দিয়ে গেছ!"

এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ইন্দ্রাণীও যেন বিমূঢ় হইয়া গেলেন। বিহ্বলের ন্যায় ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া, পরে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "বেশ! তা'হলে তোমার বোনটির বিয়ে তুমিই দিয়ে দাও।"

বিমলেন্দু কহিল, "আমার টাকা নেই।"

ইন্দ্রাণী কহিলেন, "তা'হলে— "

বিমলেন্দু অত্যন্তই অনায়াসে জবাব দিল, "তা'হলে নালিস করা ভিন্ন আমি তো আর কোন উপায় দেখি নে।"

দেশলাইয়ের এতটুকু কাঠি চাপিয়া ঘষিলে, তাহা হইতে মুহূর্ত্তে যেমন আগুন ঠিকরাইয়া জ্বলিয়া উঠে, ইন্দ্রাণীর দুই শান্ত নেত্র তেম্নি করিয়া নিমেষের মধ্যে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বারেক সেই অগ্নিময় দৃষ্টিতে সেই পাষাণ-প্রশান্ত মুখখানা দর্শন করিলেন। তার পর বেদনাময় অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন, "পয়সা নিয়ে তোমার সঙ্গে মামলা করবার মতলব আমার কোন দিনই নেই। থাকলে, এত বৎসর ধরে, সঙ্গতিপন্নের স্ত্রী হয়েও, আমি পথের ফকির হয়ে বেড়াতুম না। যা' করবো না, তা কোন দিনই করবো না। কিন্তু তার জন্য নয় বিমল! আমি তোমার জন্যই ভাবছি। আমি না হয় তোমায় আজও ক্ষমা করে গেলুম; কিন্তু ঈশ্বর ক্ষমা করতে পারবেন কি? আজ তুমি যে কত বড় মহাপাপ

করলে, ওই রাশি-রাশি সোসিয়ালিজ্‌ম, বল্‌সেভিজমের বইপড়া মাথায় সে যে ধারণা করতেও পারবে না।"

এই বলিয়া, আর কিছু না বলিয়াই, তিনি দ্বারের কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া, আর একবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। অত্যন্ত ব্যথিত, অতিশয় স্নেহপূর্ণ, করুণা শীতল কণ্ঠে কহিলেন, "যে দিন এ বাড়ীতে প্রথম এসে ঢুকেছিলুম, নিজ স্বামীকে তখনও ভাল করে চিনি নি; কিন্তু তখন থেকেই মনে উদ্দেশ্য ছিল, তোমার মা হবো। তুমি কোন দিন আমায় মা বলে মনে করবার সুবিধা পাও নি বটে, কিন্তু আমার সেই প্রথম দিনের স্নেহ চিরদিনই অক্ষুন্ন হয়ে আছে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণেই তোমায় ক্ষমা করে যাচ্চি বাবা! ভরসা হচ্চে, ঈশ্বরও হয় ত কর্ব্বেন। নিরাপদে দীর্ঘজীবী হয়ে থেকো।"

ইন্দ্রাণী চলিয়া গেলেও, বিমলেন্দু বহুক্ষণ পুস্তক পাঠের ভান করিয়া রহিল; কিন্তু একবর্ণও সে আর পড়িতে পারিল না। ইন্দ্রাণীর সেই অগ্নিশিখার ন্যায় তপস্যা-দীপ্ত মূর্ত্তি, — তাঁহার সেই কয়টি তেজঃপূর্ণ স্নেহগর্ভ বাণী কিছুতেই তাড়ান গেল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলি সেই অনাহত মাতৃ-হৃদয়-ফাটিয়া পড়া শোণিতবিন্দু কয়টাই মনের চক্ষে রক্তের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। একবার তাহার মনে হইল, উঠিয়া গিয়া ইন্দ্রাণীকে ডাকিয়া আনে; ডাকিয়া আনিয়া, নিজের জটিল জীবনের গোপন কথা তাঁহাকে জানায়। তাহার এই বিপাকগ্রস্ত দ্বন্দ্বময় জীবনই যে তাঁহাকে এতবড় অবমাননা করার অংশতঃ মূল, ইহা জানাইতে পারিলেও যেন অনেকখানি স্বস্তি হইত—এমনও একটা দুর্ব্বলতা তাহার মনের মধ্যে উচ্চকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু না, কিসের দ্বিধা? বিমাতার তাঁহার স্বামীর ধনে কিসের অধিকার? 'পিণ্ড' দত্বা ধনং হরেৎ'—পুত্র পিণ্ডাধিকারী সে, সেই তো অধিকারী! পিণ্ড দিক না দিক, পুত্রই পিতৃ-ধন গ্রহণ করিবে। পুত্র বর্ত্তমানে পুনর্ব্বার বিবাহে পিতার কি অধিকার ছিল? তার পর বৈমাত্র ভগিনীর বিবাহ! সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বিবাহ তো অনাবশ্যক ভারমাত্র। প্রথমতঃ, বরপণ দ্বারা সাধারণ হিতকর কার্য্যের সহায়ক বিপুল ধন অর্থলোলুপ বরকর্ত্তার কোম্পানীর কাগজে বদ্ধ হইবে; দ্বিতীয়তঃ, দেশের কার্য্যের উপযোগী একজন শিক্ষিত যুবক নিজের সুখ-স্বার্থ মাত্র সার করিবে। তার ফলে, কতকগুলা অন্নজীবী, দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক সন্তান দরিদ্র দেশের দারিদ্য বর্দ্ধনার্থ জগতে আসিবে মাত্র। না, নিশ্চয়, বিশেষতঃ, এই নবজাগ্রতের শিক্ষিত যুবকবৃন্দের মধ্যে [illegible] কল্পনা মাত্র! এই [illegible] নহে, নিজের জীবনপথের [illegible] একেবারেই অসম্ভব।

বিমলেন্দু উঠিল না, নড়িল না, যেমন তেমন বসিয়া থাকিয়া, বইএর উপর চোখ রাখিয়া, বসিয়া রহিল। যখন ইন্দ্রাণীর গাড়ীখানা ষ্টেশনের অর্দ্ধেক পথ প্রায় চলিয়া গিয়াছে, তখনও তাহার মনের ভিতর মধ্যে মধ্যে কিসের যেন একটা অস্পষ্ট অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়া, ইন্দ্রাণীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য জোর দিতেছিল। একদিকে প্রবল কর্ত্তব্য বোধের সঙ্গে একখানি ক্ষুদ্র মুখের স্মৃতি যেন সহসাই আবার কেমন করিয়া জড়াইয়া গিয়াছিল! [illegible] সে ছোট্ট তারাটি এতদিন [illegible] একা একা বসিয়া ছিল, কোন দিনই [illegible] পায় নাই, সেই তারার বিবাহ? আহা, সে যে আমার এতটুকু সেই [illegible] রে! না, এ কি সে ভাবিতেছে! এই [illegible] দিবার সে কে? বিশেষতঃ, বিবাহ যে তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্যের বিরোধী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অপূর্ব্ব, রাধিকা, বিমলেন্দু ও ইন্দ্রাণী [illegible] অত্যন্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক [illegible] চোটাইয়া তেজারতি কারবার করিতেছিল; সুদের দায়ে অনেক অধমর্ণের ভিটা সে মাটী করাইতে কসুর করে নাই। সংসারে তাহার আপন বলিতে বড় কেহ ছিল না; ছিল শুধু তার টাকা। কাজেই, [illegible] সেই বিপুল ধনের উত্তরাধিকারিত্ব দান করা উচিত বোধে, [illegible] প্রায় ষাটের কোঠায় [illegible] এক [illegible] বয়স্কার পাণিপীড়ন করিয়া বসিল! এক্ষণে উক্ত ধনী মহাজনটির মৃত্যু ঘটিয়াছে। কৃপণ স্বভাবের জন্য আত্মীয় বা দাসদাসীর সংখ্যা অত্যল্প। গৃহে ষোড়শী নববিধবা এবং তাহার এক [illegible] বর্ষীয়া ভগিনী ও তাহার চব্বিশ বর্ষীয় পতি [illegible]। বাড়ীখানি [illegible], এবং প্রাচীরগুলি ভাঙ্গা-চোরা। এমন সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়া কোন মতেই সুযুক্তি নহে—এই কথাই সে দিন অমলেন্দুর [illegible] কয়জনে তাহাকে বুঝাইতে চাহিতেছিল। বিমলেন্দুর বাড়ী কম্পানি

ভিন্ন নগদ টাকা আর কাহারও নাই। অসমঞ্জ প্রথমে হাসিয়া উড়াইতে চাহিল। শেষে বলিল, "বিধবার স্ত্রীধনে হাত দেওয়া কাপুরুষতা।" শুনিয়া সকলে অবাক্ হইল। বিমল বলিল, "ছলে-বলে কার্য্যসিদ্ধি করাতেই পৌরুষ! বালিকা বিধবা ওই অতুল ধনসম্পত্তি নিয়ে করবে কি? মাত্র দশজনে ওকে ঠকিয়ে খাবে। চাই কি, ওই টাকার জন্য ওর ইহ-পর উভয় কালই ঝরঝরে হয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে দেশের কাজে ওই দেশের লোকের রক্ত-শোষা, অন্যায়-লব্ধ ধন লাগিলে, দেশেরও ভাল, ওদেরও মঙ্গল।"

অসমঞ্জ কহিল, "সুদখোরের টাকাকে যদি অন্যায়-লব্ধ বলো, তা'হলে এই চুরির টাকাটাকে কোন্ পর্য্যায়ে দাঁড় করাবে?"

বিমল গরম হইয়া বলিল, "এ দেশের জন্য নেওয়া,—এতে চুরি হয় না।"

অসমঞ্জ কহিল, "দেশের কার্য্য, দেশবাসীকে রক্ষা করা, —তাদের বিপন্ন করা নয়।"

বিমল ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "মেয়েটীকে তার সবচেয়ে বড় বিপদ হ'তে উদ্ধার করবার জন্যই এই পন্থা নেওয়া হচ্চে। এতে তার ধন-লালসায় তার উপরে আর কেউ নজর করবে না।"

অসমঞ্জ হাসিয়া কহিল, "সেটা ভুল! ধনই একমাত্র আপদ নয়। তার রূপ-যৌবনকে তো আর চুরি করে নিতে পারবো না। তার চেয়ে, ওকে যদি রক্ষা করতে চাও, তো, ওদের মতন দুর্ভাগিনীদের জন্য একটী নারী-সম্প্রদায় গঠন করো,—তারা বাড়ী-বাড়ী গিয়ে এই সব অরক্ষিতা মেয়েদের সঙ্গে সর্ব্বদা মিশবে,—ওদের ধর্ম্মশিক্ষা দেবে। যাদের ধন আছে, সেই ধন ধর্ম্ম এবং কর্ম্মে নিয়োগ করবার প্রবৃত্তি জাগাবে। যাদের নেই, তাদের জীবিকা নির্ব্বাহের পথ দেখিয়ে দেবে; অর্থাৎ কোন রকম কার্য্যকরী বিদ্যাশিক্ষা দেবে। তবেই প্রকৃত রক্ষার উপায় হয়।"

বিমল ও উৎপলা একসঙ্গেই অসহিষ্ণু প্রশ্ন করিল, "অত মেয়ে আমরা পাই কোথায়?"

অসমঞ্জ দিব্য নিশ্চিন্ত ভাবেই জবাব দিল, "সবাই বিয়ে করে-করে, নিজের-নিজের স্ত্রীকে এই কাজটা দিয়ে ফেল্লেই হয়।"

গৃহমধ্যে যেন বজ্রপাত হইয়াছে, এম্নি স্তম্ভিত থাকিয়া, সর্ব্বপ্রথম উৎপলার লজ্জাকুব্ধ ও রোষকম্পিত বিস্মিত কণ্ঠ ধ্বনিয়া উঠিল—"বিয়ে! বল কি ছোড়্দা!"

তাহাদের এই বিস্ময়-বিহ্বলতা লক্ষ্য করিয়া, অসমঞ্জের এক মুহূর্ত্তে আকর্ণ ললাট রঞ্জিত হইয়া উঠিল। কেন আজ এ বিস্ময়? এই যে একটা চিরন্তন বিধির প্রতিপালন-ব্যবস্থা তাহার মুখে উচ্চারিত হইবামাত্র এতগুলি পুরুষ-নারী এমন করিয়া চম্‌কাইয়া উঠিল, ইহাদের চিত্তে এই নিগূঢ় বিস্ময়-রসের সৃষ্টি কে করিয়া রাখিয়াছিল? অসমঞ্জ বুঝিল, বড় কঠিন নিগড়েই সে নিজের পা বাঁধিয়াছে। কিন্তু নিজের সেই অপরিসীম লজ্জা-ক্ষোভকে যথাসাধ্য দমনে রাখিয়াই, বাহিরে শান্ত ঔদাস্যের সহিত কথা কহিল; বলিল "বিয়ে না করলে, কতকগুলো কমবয়সী ছেলের দলে কতকগুলো মেয়ে এনে জোটাবি কোথা থেকে, তাই বল্ তো? অথচ, এ একটা খুব মস্ত বড় কাজ আমাদের দেশে করবার রয়েচে। কত বড়-বড় রাণী মহারাণী, কত ছোট-বড় জমিদারের ঘরানা, বাংলা-বেহার-উড়িষ্যায় সর্ব্বদাই এই রকম একটা সাহায্যের অভাবে, মন্দ লোকের প্রলোভনে পড়ে, নিজেদের ও শ্বশুর-বংশের সর্ব্বনাশ সাধন করে ফেল্‌চে। বিমল এটা ধরেছে ঠিক,—কিন্তু পথটাই শুধু খুঁজে পায় নি।"

বিমল রোখ করিয়া বলিল, "ভুল তুমিই করচো। ধর্ম্ম-উপদেশের অভাবেই যে মানুষগুলো বিগড়ে বসে থাকে, তা কখন স্বপ্নেও ভেবো না। উপদেষ্টার অভাব সংসারে কিছুমাত্র নেই;—যা কিছু অভাব ঘটেচে, সেই উপদেশগুলো কাজে লাগাবার। ও-সব তোমার মিথ্যা কল্পনা রেখে দাও মঞ্জু! ও সব আন্‌প্র্যাকটিক্যাল,—ওতে এক কড়ার কিছু হবে-টবে না। যা সম্ভব, তারই কথা ভাবো। অপরেশ খুব ভাল করে জেনে এসেচে,—ওদের শোবার ঘরের আয়রণ-চেষ্টের মধ্যে এখন নগদ সাতাশ হাজার টাকা আছে। তা'ভিন্ন, বন্ধকী ও নিজের গহনাও না কি আন্দাজ দশ হাজারের কম নয় সেই সিন্দুকের মধ্যে মজুদ! বাড়ীতে ঐ ভগ্নীপতি,—সেটাও একটা পিলে-রুগী, দু'একটা ঝি, আর একটা মালি মাত্র। এমন সুযোগ তুমি পাবে কোথায়?"

অসমঞ্জ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিল। নিজেরই এক-দিনকার শেখানো মতের বিরুদ্ধ যুক্তি দিয়া, তাহারই স্বহস্তে গঠিত শিষ্যদের সহিত তর্কাতর্কি করিতে যত লজ্জা, ততদূরই যেন অপমান তাহার বোধ হইতেছিল। এ

দুর্ব্বলতাটুকুকে যে কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না! অথচ, এই স্বহস্ত-রোপিত বিষবৃক্ষ তাঁহাকে যে স্বহস্তেই উৎপাটিত করিতে হইবে! উপায়ই বা কি? মনে-মনে বল সংগ্রহ করিয়া পুনশ্চ কহিল, "অনেক ভেবে দেখেছি বিমু, —এ সব 'আইডিয়া'গুলো আমাদের ঠিক নয়। যে পথে আমরা চল্‌তে চেয়েচি, সে পথ, যেখানে আমরা যেতে চাই, তার ঠিক উল্টো দিকে। দেশকে পূজা করতে হলে দেশবাসীকে অর্চ্চনা করতেই হবে। তা'ভিন্ন দেশের সেবা হবার যো তো নেই। সবার সঙ্গে মিশতে হবে,—গ্রামের স্বাস্থ্য, গ্রামের শ্রী ফিরিয়ে আনতে হবে। নিরক্ষর চাষা, ইতর জাতি, তাদের জ্ঞান দিতে হবে; তাদের মনে দেশভক্তির স্রোত বহাতে হবে;—সে কি অত্যাচারে হয়? এই পথেই প্রকৃত মুক্তি; এই পথেই আমাদের এবার থেকে চলতে হবে।"

বিমল আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, উচ্চ কম্পিত স্বরে কহিয়া উঠিল, "ছি ছি! অসমঞ্জ! এই তোমার পৌরুষ! অন্ধের মত এরই এতদিন পূজা করে এসেছি আমরা! তুমি যে সব ছেলে-ভুলান ছড়া কাট্‌চো, ও মার পেট থেকে পড়ে অবধি সব্বাই না হোক তো হাজারো বার শুনেচে। ওর নাম শুধু পর নয়, আত্মপ্রতারণা! ক'জন বড়-বড় লোকে ভাল-ভাল চাকরীর মায়া ত্যাগ করে, শেষ পর্য্যন্ত নাইটস্কুলে চাষা পড়ান আর পল্লীপ্রীতি বজায় রেখে চল্‌তে পারলে, দুটো দৃষ্টান্ত দেখাবে কি?"

অসমঞ্জ কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "আমরাই তো তার দৃষ্টান্তস্থল হ'তে পারি। কেউ পারে নি বলেই তো সেই পথ ধরা উচিত আমাদের। এই যে, দক্ষিণ মেরুর আবিষ্কার করতে গিয়ে অনেকেই ফিরে এসেছে; তা'বলে কি আর কেউ যাবে না, না যাচ্চে না।"

বিমল সরোষে কহিয়া উঠিল, "অসম্ভব! যে পথে চলেচি, এর থেকে আমরা এক পাও ফিরবো না। যখন এত দূরে এসে পড়েছি, তখন সোজা চলে যেতেই হবে,—কেউ আর এ থেকে ফিরতে পাব্বে না। আপনি কি বলেন? আপনার কি মত? আমি জোর করে বল্‌চি যে, এই পথেই আমরা একদিন স্বাধীনতা লাভ করবো! এ দিনের মত সত্য!"

উৎপলা অসমঞ্জের নত মুখের দিকে একটা তড়িৎ-কটাক্ষ করিয়াই, সশ্রদ্ধ চক্ষের পূর্ণ দৃষ্টি বিমলেন্দুর মুখে সংস্থাপিত করিয়া কহিল, "আমি আপনার সঙ্গেই সম্পূর্ণ একমত। ছোড়্‌দা, তোমার যদি অসুখ করে থাকে, দিনকতক না হয় কোথাও হাওয়া-টাওয়া খেয়ে এসো না কেন?"

অসমঞ্জর মনে হইল, এর চেয়ে তাহার মাথাটা কেহ কাটিয়া লইলে যেন ভাল হইত!

যুক্তি-স্থির ও উদ্যোগ-আয়োজনেই দু'তিন দিন কাটিয়া গেল। যে রাত্রে নব-বিধবার টাকা লুঠ করিতে যাওয়ার কথা, সে দিন অপরাহ্নে অত্যন্ত মেঘ করিয়া, দেখিতে-দেখিতে তুমুল শব্দে ঝড় উঠিল; এবং সেই ভয়ানক ঝড়ের মাঝখান দিয়া যেন অফুরন্ত জলের ধারা প্রকৃতির অফুরন্ত বন্যার মতই ধরণীবক্ষকে প্লাবিত করিতে লাগিল। সে রাত্রে সেই চন্দ্রহীনা যামিনীর সূচীভেদ্য অন্ধকার যেন কিসের একটা ভীষণ লজ্জায় সারা জগতের মুখ লজ্জাবস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল। সেই অকথ্য, অপরিসীম লজ্জার বেদনা যেন বিশ্বের প্রাণতন্ত্রীতেও গিয়া আঘাত জাগাইতে ছাড়ে নাই। তাই যেন সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিই ক্ষণে-ক্ষণে তড়িৎবিকাশে শিহরিয়া সুগভীর বেদনার দীর্ঘশ্বাস হুহু শব্দে মোচন করিতেছিলেন।

সেই দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া আসিয়া বিমল ডাকিল "মঞ্জু!"

উৎপলা একাই তাহাদের বসিবার ঘরের ছোট টেবিলটার নিকট নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া ছিল। বিমলের এই অতর্কিত আহ্বানে, সুস্পষ্ট চমকে চমকিত হইয়া, ফিরিয়া দেখিয়া বলিল, "আপনি! এই দুর্য্যোগে?"

বিমল নিজের সর্ব্বাঙ্গের জল-ঝরা এবং উৎপলার কণ্ঠের বিস্ময়ধ্বনি আমলে না আনিয়াই শুধু মৃদু মৃদু হাসির সহিত আওড়াইল—"আজিকে খেলিতে হইবে মরণ খেলা
রাত্রি বেলা।
—কই, মঞ্জু—এরা সব কোথায়?"

অরুণবর্ণ মুখে উৎপলা কহিল "কেউ আসে নি।"

"মঞ্জু! মঞ্জু কোথায়?"

প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে পুনশ্চ উৎপলা কহিল "বাড়ী নেই।"

"তবে?"—বিমল বসিয়া পড়িল। তার পর হঠাৎ যেন ভিতর হইতে একটা কঠিন ধাক্কা খাইয়া, উঠিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল "আমি একাই যাবো। দেশের কাজে যা উৎসর্গ করেচি, তা হস্তচ্যুত হ'তে দে'বো না।" ফিরিতে গিয়া ব্যগ্র আহ্বান শুনিল, "বিমলেন্দুবাবু! আমাকেও নিয়ে যান।"

ফিরিয়া দাঁড়াইতেই বিদ্যুতের আলোকে এই দুটি কিশোর-কিশোরীর চোখে-চোখে পরিপূর্ণ মিলন ঘটিল। হায়, বিধি বিড়ম্বিত অপূর্ব সৃষ্টি নরনারী! এ মিলনে কাহারও চক্ষে অনুরাগের রাঙ্গাবাতি জ্বলিয়া উঠিল না; জাগিল শুধু বিমলেন্দুর দুটি নেত্র ভরিয়া একরাশি বিস্ময়মিশ্র প্রশংসা, আর উৎপলার চোখে শুধু অসীম আগ্রহ। বিমলেন্দু তথাপি একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "না, আপনার গিয়ে কাজ নেই।"

অচঞ্চল তড়িৎস্ফূর্তির ন্যায় দীপ্ত দুটি চোখের তারা বিমলেন্দুর মুখে তুলিয়া ধরিয়া উৎপলা প্রশ্ন করিল, "কেন?"

"হাজার হলেও আপনি স্ত্রীলোক।"

ইহার উত্তরে উৎপলার মৃদু ও সমধুর হাস্যলোর হাস্যে অপমান বর্ধিত হইয়া আসিল, "বিমলেন্দুবাবু যে দেখাচ্ছি স্ত্রীলোকদের আজকাল খুব তুচ্ছ করতেও শিখেছেন।"

বিমলেন্দুর ভ্রূযুগ কুঞ্চিত হইল, কিন্তু সে হাসিয়া উত্তর করিল, "কি জানি, যেমন সব শেখাচ্ছেন! দেশকেই যদি তুচ্ছ করা চলে, তো মানুষকে করা খুব বিচিত্র নাও হতে পারে।" বিমলেন্দু চলিয়া গেল,—অসমঞ্জের প্রতি উৎপলার মনের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রবাহিত করিয়া দিয়া গেল। আজ যদি সে পলাইয়া না থাকিত, তাহা হইলে বিমল কি আজিকার সমস্ত গৌরবটুকু আত্মসাৎ করিয়া লইয়া, তাহাকে বিদ্রূপের কশাঘাত করিয়া যাইতে পারিত—সেই তাহাদেরই হাতে-গড়া মুখচোরা বিমল!

সমস্ত প্রকৃতিই তখন রোষ-ক্ষিপ্ত অভিমানে আত্মহারা এবং প্রতিশোধের স্পৃহায় উদ্দাম হইয়া উঠিয়া, সারা জগতকে লণ্ডভণ্ড করিতেছিল। বৃষ্টিধারা মুষল-প্রহারের মতই প্রচণ্ড আঘাতে ধরণী-বক্ষকে চূর্ণিত-প্রায় করিয়া বাজিতেছিল ঝম্-ঝম ঝম্।

(ক্রমশঃ)

চিত্রকূট

[শ্রীনীরজনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, এল-এল বি]

শ্রীমৎ ভগবান্ স্বয়ম্—

যিনি সংসারের সার, অবসাদের উত্তেজনা, শ্রান্তের আরাম, দেহের শক্তি, জীবনের আশ্রয়, তাঁহার পদরেণু যে স্থানে পড়েছে, সে স্থান ধন্য; যে সে স্থানের ধুলা গায়ে মেখেছে, সে ধন্য। এ হেন স্থান চিত্রকূটে আমরা কয়টী প্রবাসী বাঙ্গালী গত কোজাগর লক্ষ্মীপূজার সময় বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

রামায়ণে কথিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র বনগমনের সময়ে গুহকালয় হয়ে প্রয়াগে ভরদ্বাজের আশ্রমে আসিয়াছিলেন; এবং ভরদ্বাজ মুনিই রামচন্দ্রকে চিত্রকূটের কথা প্রথমে বলেন—

গোলাঙ্গুলানুচরিতো বানরর্ক্ষনিষেবিতঃ
চিত্রকূট ইতি খ্যাতো গন্ধমাদন সন্নিভঃ।

এবং তিনি ইহাও বলেন যে, তুমি সেইস্থানেই গিয়া বিশ্রাম কর।

গমাতাং ভবতো শৈলশ্চিত্রকূটে সবিশ্রুতঃ
পুণ্যশ্চ রমণীয়শ্চ বহুমূল ফলায়ুতঃ॥

সে যে একটা পুণ্য-স্থান, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যখন মনে হয় যে, এইখানেই ভক্তশ্রেষ্ঠ তুলসীদাসের মুক্তি হয়েছিল, তখন, কাহারও মন যতই অস্থির হক না কেন, এখানে এলে তার মনে একটু শান্তি আসবেই। সেখানে তুষারাবৃত গিরিশ্রেণী, নির্ঝরের প্রপাত, খরস্রোতা নদী, কিংবা অভ্রভেদী মন্দির চূড়া প্রভৃতি কিছুই নাই। থাকবার মধ্যে প্রচুর স্থান-মাহাত্ম্য, আর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে রামনাম;—শুধু যে নাম জপ করে তুলসীদাস মুক্ত হয়েছিলেন, যে নামে ভক্তের আনন্দ, শিষ্টের শান্তি, দুষ্টের তাড়না।

চিত্রকূট কিংবা কামদানাথ একটি ছোট পাহাড়ের নাম। ইহাকে কামগিরিও বলিয়া থাকে: প্রবাদ এই যে, ইহা দর্শন করিলে সকল প্রকার কামনা পূর্ণ হয়।

চিত্রকূটে যাইতে হইলে, জব্বলপুর (Jubbulpur) লাইনে মাণিকপুর ষ্টেসনে নামিয়া, ঝাঁসির গাড়ী ধরিতে হয়; এবং মাণিকপুর হইতে দুই ষ্টেসন পরেই, করবী নামক ষ্টেসনে নামিয়া পড়িতে হয়। যদিও চিত্রকূট নামে, আর

একটি ষ্টেসন আছে, এবং সেটি প্রকৃত তীর্থস্থান হ'তে নিকটেও বটে ; কিন্তু সেখানে গরুর গাড়ী পাওয়া যায় না। তবে করবী থেকেও গোশকটারোহণে চিত্রকূট যাইতে হয়, গরুর গাড়ী ছাড়া আর কোনও প্রকার যানবাহন সেখানে পাওয়া যায় না ; তবে পাল্কী কিম্বা ডুলির ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে করিলে করা যাইতে পারে।

যদিও চিত্রকূট পর্ব্বতকে ভরদ্বাজ গন্ধমাদন-সন্নিভ বলিয়াছেন, কিন্তু সে প্রকার কিছুই নয়। ইহা একটি খুবই ছোট পাহাড় (Hillock) ; এবং ইহার তলদেশ ঘেরিয়া কতকগুলি মন্দির স্থাপিত করা হইয়াছে। কামদানাথ পর্ব্বত (ইহার পরিধি প্রায় ১॥০ মাইল হইবে) প্রদক্ষিণ করা ও মন্দিরগুলি পরিদর্শন করাই প্রধান তীর্থকৃত্য। এই স্থানে ভরতের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। সেই কারণে এই পর্ব্বতের এত মাহাত্ম্য। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের পর্ণ-কুটীর ইহা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে, মন্দাকিনী নামক ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত। শ্রীরামচন্দ্রের পর্ণ-কুটীর এখন অবশ্য পাকা বাড়ীতে পরিণত হইয়াছে ; করবী ষ্টেসন হইতে তাহা প্রায় ৫।৬ মাইল পথ হইবে। ইহার আশে পাশে ও নদীর ধারে বড়-বড়, সুন্দর-সুন্দর ধর্ম্মশালা রাজা-মহারাজারা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। সমাগত যাত্রীবর্গ এই সকল ধর্ম্মশালায় কিম্বা পাণ্ডাদের বাড়ীতে গিয়া উঠেন। আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, আমরা কয়েকজন প্রবাসী বাঙ্গালী ত্রয়োদশীর দিন রাত্রে প্রয়াগতীর্থ-স্থান হইতে চিত্রকূট দর্শনের জন্য যাত্রা করিলাম।

আমাদের সঙ্গীদলের প্রকৃতি এ রকম বিভিন্ন যে তাহা পাঠকদের জানা উচিত ; কেন না, এ রকম সংঘটন সচরাচর হয় না।

প্রথম, যিনি কর্ত্তা, তিনি বিসয়জ্ঞানশূন্য ; যা হ'বার, হ'য়ে যাক—তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই ; তিনি একেবারেই নির্ব্বিকার। দ্বিতীয় জন, নিরীহ ; যা বলা যায়, তাহাতেই রাজী আছেন। তৃতীয় অহং-জ্ঞানে পূর্ণ ; নিজের বুদ্ধির উপর তাঁর বিশেষ আস্থা। কাজে কাজেই দলকে তাঁর জন্য প্রায়ই অপদস্থ হতে হয়। চতুর্থ, তার্কিক ; তাঁর তর্কের জ্বালায় আমাদের প্রায় সংসার ত্যাগ করিয়া আসল চিত্রকূটে বাস করিতে হইয়াছিল। পঞ্চম, ষষ্ঠ, এইরূপ নয়জন। আর last but not the least—আমাদের সঙ্গে এক সন্ন্যাসী ঠাকুর ছিলেন। তাঁহার কথায় বলুন, কি মন্ত্রণায় বলুন, কি তপো-বলেই বলুন, এযাত্রা আমরা ভালয় ভালয় বাড়ী ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমরা সর্ব্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী তিথিতে এলাহাবাদ হইতে যাত্রা করিলাম বটে, কিন্তু ষ্টেসনে গিয়াই জ্ঞান হইল যে, every rule has its exception। সর্ব্বসিদ্ধা যাহার জন্যই হউক, আমাদের জন্য নয়। আমরা ষ্টেসনে গিয়া দেখিলাম ট্রেণে যায়গা নাই ; সব শ্রেণীতেই লোক ঠাসা। খোঁজ করায় টের পাওয়া গেল, অধিকাংশই চিত্রকূটে চলেছে ; কেন না, পূর্ণিমার রাত্রে মেলা। গাড়ীতে যে উঠিব, তাহার মোটেই উপায় ছিল না, কেন না, দরজার সামনে যত লোক বিছানা মাদুর নিয়ে মেঝেতে বসে আছে। কি করা যায় ! ভেবে-চিন্তে আমাদের সন্ন্যাসী ঠাকুরকে এগিয়ে দেওয়া গেল ; - মৎলবটা, যা হবার, তাঁরই উপর দিয়া হয়ে যাক্। কিন্তু ফল তার উল্টা হল। দু'একজন তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসী দেখে যায়গা ছেড়ে দিলে। পশ্চিমের লোক তারা, সন্ন্যাসীটা-আসটা দেখলে কতকটা খাতির করে ; বাঙ্গালীদের মতন সন্ন্যাসী বেটাদের চোর বলে মনে করে না। যায়গা পাইয়া আমরা সকলেই গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। বসিবার স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া থাকা গেল।

সর্ব্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী,— রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময় গাড়ী ছাড়িল বটে, কিন্তু গাড়ীর ভিতর আর এক বিপদ—বিপদ একাকী আসে না। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখি, প্রায় এক-এক করিয়া সকল যাত্রীই কাশিতে আরম্ভ করিয়াছে। Laughing Gasএর ত নাম শুনিয়াছি ; কিন্তু এ প্রকার সংক্রামক কাশির হাওয়া ইতি-পূর্ব্বে শ্রুতি-গোচর হয় নাই। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় বুঝিলাম, অধিকাংশই হাঁপানি কাশির রোগী ;—পূর্ণিমার রাত্রিতে একজন সন্ন্যাসী বছরে একবার চিত্রকূটে হাঁপানীর ঔষধ দেন ; তাই সকলে সেই ঔষধ লইতে চলিয়াছে ; এবং যাহারা সৌভাগ্যবশতঃ কাশিতেছিলেন না, তাঁহারা, বুঝিলাম রোগীদের সঙ্গী। তাঁহাদের কথায় জানা গেল যে, এ সময়কার মেলাটা হাঁপানী রোগীদের। আমরা যে এই সময়ে ঔষধ লইতে যাইতেছি না, শুধু বেড়াইতে যাইতেছি,—শুনিয়া তাঁহারা একেবারেই অবাক্। আমাদের তার্কিক বলিলেন, —"আপনাদের সংসর্গে কিছুক্ষণ থাকিলেই, আমাদেরও ঔষধ নিতে হবে,—আপনারা কুণ্ঠিত হবেন না।" যা'হোক্

কোন ক্রমে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, রাত প্রায় দুপুর নাগাদ মাণিকপুর জংসনে পঁহুছান গেল। সেখানে জি-আই-পি রেল কোম্পানীর এমন সুন্দর ব্যবস্থা যে, সমস্ত রাত পড়িয়া থাকিতে হয়। তার পর দিন সকাল ৭টার পর চিত্রকূটের গাড়ী। চিত্রকূটের গাড়ী যদিও প্ল্যাট-ফরমে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু ভিড় অত্যন্ত বেশী হওয়ায়, তাহাতে উঠিয়া শুইবার বা বিশ্রাম করিবার যো ছিল না। আমরা অনেক-বিচার করিয়া, যাত্রীদিগের বিশ্রামাগারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া দেখি, একদল মাড়োয়ারী! আর তাহাদের কি রকম কাশির ধূম! কোথায় যাবে? চিত্রকূটে। কেন? না, কাশির ঔষধ। তারা বৌ-মেয়ে কলিকাতা থেকে এসে, ষ্টেসনে পড়ে আছে। বুঝিলাম যে চিত্রকূটের সন্ন্যাসীর প্রভাব অতুল। ধীরে-ধীরে Waiting room (ওয়েটিং রুম) থেকে বেরুচ্চি, এমন সময় শুনিতে পাইলাম যে, চিত্রকূটের গাড়ী যাহা প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া ছিল—তাহাতে ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য গিয়া দেখি কি, যাঁহারা ছুটিয়া আগে থাকিতে গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামাইয়া দেওয়া হইতেছে। এগিয়ে গিয়ে পুলিশম্যান বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাপু হে, এর কারণ কি?" সে বলিল, "যাত্রীরা গাড়ীতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে—আর তাদের বিছানা-পত্তর প্রায়ই চুরি যায়; তাই নামিয়ে দেওয়া হচ্চে।" আমাদের তাকিকের রোখ চড়ে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "নামিয়ে দিলে বুঝি প্ল্যাটফরম্ হইতে আর কাহারও মাল চুরি যায় না?" সে অম্লান বদনে উত্তর করিল, "না! আর এই রকমই নিয়ম। আমরা গাড়ীতে কাহাকেও উঠিতে দিই না।" বুঝিলাম, সর্ব্বসিদ্ধা ত্রয়োদশীর শুধু আমাদের জন্যই নয়,—দলে আরও আছেন।

সর্ব্বস্থান হইতে অকৃতকার্য্য হইয়া, ব্যবস্থা লইতে আমরা সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইলাম। অনেক অনু-সন্ধানের পর, তাঁহাকে open platformএ এক গাছের তলায় দেখিতে পাইলাম। দেখি, তিনি আসন জমিয়ে বসে ভোলা ভোগ (গাঁজা) খাচ্ছেন। "রথীন্দ্র নিমগ্ন তপে, চন্দ্রচূড় যথা- যোগীন্দ্র কৈলাস গিরি তব উচ্চ চূড়ে।" কতকটা সেই ভাব। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, পরদিন বুধবার মঙ্গলের ঊষা বুধে পা করে বেরিয়ে পড়া যাবে; তা'হলে আর কোনও কষ্ট থাকবে না। দুর্ভাবনা যত ছিল, সব কাটিয়া গেল। তবে এর নিষ্পত্তি হইল না যে, সমস্ত রাত্রি হিমে পায়চারি করিয়া, তার পরদিন আমরা কি দেখিব। আমাদের মধ্যে যিনি বুদ্ধিমান, তিনি তখন চটিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "যখন তোমাদের পাল্লায় পড়েছি তখন আগেই জানতাম এ রকম একটা কিছু হবেই।" মনে-মনে ভদ্রলোকের বুদ্ধির বিস্তর প্রশংসা করিয়া প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে আপনি আমাদের সঙ্গে এলেন কেন?" ইহার উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন, তাহা আর কহতব্য নয়।

যা হোক, আমাদের মধ্যে দু'তিনজন সন্ন্যাসী ঠাকুরের ব্যবস্থা নিয়ে খোলা হাওয়ায় বেড়াচ্চি, এমন সময়ে একজন পাগড়ী-মাথায়, লাঠী-হাতে, কৃষ্ণাকৃতি বেঁটে লোক আমাদের সম্মুখে আসিয়া লম্বা সেলাম করিল। তাহার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "আমি চিত্রকূটের কাশীনাথ পাণ্ডার লোক। যদি অনুমতি হয় ত, আপনাদের নিয়ে গিয়ে চিত্রকূটের সব দেখতে পারি; আর সেখানে থাকিবারও সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি।" আমি বলিলাম, "দেখ, চিত্রকূটের ব্যবস্থা যেন করলে, কিন্তু এখন এই তিন-চার ঘণ্টা রাত কাটে কেমন করে, তার একটা ব্যবস্থা ক'রতে পার ত উপকার হয়।" সে বলিল, "তার আর ভাবনা কি! আপনারা একস্থানে বসুন, আমি চিত্রকূট-মাহাত্ম্য বর্ণনা করি তা হলেই রাত কেটে যাবে।" ব্যবস্থা মন্দ নয়—তাহাতেই সকলে সায় দিলাম। অতঃপর আমরা প্লাটফরমের এক বেঞ্চিতে বসিলাম; আর পাণ্ডা নীচে বসিয়া বলিতে লাগিল -

"মনে করুন, চিত্রকূট সেই পুণ্যময় স্থান, যেখানে—

চিত্রকূটকে ঘাট পর ভই সন্তন কি ভীর,
তুলসীদাস প্রভু চন্দন রগরে তিলক ধঁরে রঘুবীর।

অর্থাৎ চিত্রকূটের ঘাটে সব সাধুগণেরই জনতা হইয়া থাকে, যে ঘাটে, তুলসীদাস বলেচেন, শ্রীরামচন্দ্র নিজে চন্দন ঘসিয়া মাথায় পরিয়াছিলেন। এ স্থানের মহিমা অপার। সেখানে গেলে—

কাম ক্রোধ মদ মান ন মোহা,
লোভন ক্ষোভন রাগ ন দ্রোহা।

এ সকলের কিছুই থাকে না। লোকে সংসার ভুলে যায়। বেশী কথার প্রয়োজন কি,—মনুষ্য সকল রকম দুঃখ ভুলে, পরম পদের অধিকারী হয়।"

পাণ্ডা বলিতে লাগিল "অগস্ত্য যখন সুতীক্ষ্ণকে শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী বলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, 'শ্রীরামচন্দ্র সেবকবৃন্দ সহিত সদা এই স্থানেই বিরাজমান আছেন।' সুতীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে স্থান কোথায়?' অগস্ত্য উত্তর করিলেন, 'এই চিত্রকূটের মধ্যস্থলে সনতানক নামক বন আছে, যেখানে শীতল মন্দ ত্রিতাপনাশক বায়ু চিরকাল বিচরণ করে। সেখানে অনেক ছোট ছোট মনোহর পুষ্প-বাটিকা আছে, যার মধ্য স্থলে একটা পদ্মপুষ্পে সুশোভিত পুষ্করিণী আছে, যার মাঝখানে নানা-ধাতু-নির্ম্মিত একটা মন্দির আছে। সেই মন্দিরে দশরথ-নন্দন ভব-ভয়-খণ্ডন মর্য্যাদাপুরুষ সদা বাস করেন। সে মনুষ্য পৃথিবীতে ধন্য, যে এ হেন চিত্রকূটে তিন রাত্রি বাস করিয়াছে। আর, তাহার পুণ্য কে বর্ণনা করিতে পারে, যে এখানে চিরকাল বাস করে!'' এইরূপে পাণ্ডা ক্রমাগত বলিয়া যাইতে লাগিল। তাহার কথার ভাবে বুঝিলাম যে, সে আমাদের কম করে' এখানে তিন দিন রাখিতে চায়। পাণ্ডার কথা-মাহাত্ম্য এ রকম (intresting) চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, আমাদের সঙ্গীদলের অধিকাংশই বেঞ্চিতে বসিয়াই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু পাণ্ডা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, —"এই পুণিত কথা অগস্ত্য সুতীক্ষ্ণকে কহেন। সুতীক্ষ্ণ আবার শাণ্ডিল্যকে বলেন। তিনি আবার ভুসুণ্ডিকে বলেন, এবং এই রকমেই আমাদের কাছে এসেছে।"

আমাদের কাহারও টিপ্পনীর অপেক্ষা না করিয়া, পাণ্ডা বলিয়া যাইতে লাগিল—"এই কথা-মাহাত্ম্য শুনিলে, দেহ পবিত্র ও অন্তকালে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়; যিনি এখানে দান-ধ্যান, দর্শনাদি করিয়া নিজেকে ধন্য করিবেন, তাঁর মনস্কামনা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। দ্বাপরে যুধিষ্ঠির দুর্যোধন কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়ে মনোরথ পূরণার্থ এই চিত্রকূটেই যজ্ঞ করেন; এবং কুরুক্ষেত্রে জয়লাভ করেন। আপনাদেরও মনোবাঞ্ছা যদি কিছু থাকে, অবশ্য পূর্ণ হবে"। পাণ্ডার কথা শেষ হইলে, কর্ত্তা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এত পুণ্যের ভার আমরা সইতে পারব ত?"

কিন্তু সে কথার উত্তর পাওয়া গেল না; কেন না এই সময়ে ঠিক ভোরের ঘণ্টা দেওয়াতে, যাত্রীরা গাড়ীতে যায়গা লওয়ার জন্য ছুটিতে লাগিল; আমরাও কতকটা ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু পাণ্ডা আশ্বাস দিয়া, আমাদের জন্য গাড়ীতে জায়গা দেখিতে গেল। আমরা যখন তল্পী-তল্পা লইয়া পাণ্ডাকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম, তখন দেখি তাহার অবস্থা বড়ই কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের জন্য জায়গা দেখিতে গিয়া, আরোহীদের নিকট চড়টা-চাপড়টাও পাইয়াছে। কিন্তু আমাদের আট-নয়টি ভুরমুশ চেহারা দেখিয়া, আরোহীগণ কতকটা দমে গেলেন। একজন আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "বাবুজী, তোমরা বেড়াতে যাচ্ছ, একদিন ট্রেণ না পেলেও কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু আমরা না পঁহুচিতে পারিলে, জাঁপানীর ওষধ পাইব না। তা, যখন উঠেছেন, তখন আপনারা আসুন, জায়গা হবে এখন।" কি করি, একেবারে কোম্পানীর দোহাই—আর কিছু বলাও যায় না; গাড়ীতে উঠে বসা গেল। আমাদের মধ্যে নিরীহ ভদ্র-লোকটি বলিলেন, "মশাই, এ রকম পরের জন্য নিজের সুবিধা ত্যাগের দৃষ্টান্তের পূর্ব্বে বড় একটা দেখি নি।" যখন গাড়ী ছাড়িল তখন প্রায় সকাল ৭টা।

জি-আই-পির যাত্রীগাড়ী যদি ছাড়ল ত আর এগোয় না। যাহোক আমরা ক্রমে বান্দা জেলার পাহাড়ের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। আমাদের সকলের অবস্থাই সমান শোচনীয়। একে সারারাত্রি হিমে পায়চারী দেওয়া হইয়াছে; তার পর এখন গাড়ীতে কুপোর মতন বসিয়া আছি। সকলের মনেই এক ভাব যে, পঁহুছাতে পারিলে হয়। কিন্তু সেই সময় পাহাড়ের যে সুন্দর দৃশ্য আমাদের চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া গেল, তাহা বড়ই প্রীতিকর। একদিকে নাতি-উচ্চ পাহাড়ের, গা কাটিয়া রেলের রাস্তা বাহির হইয়াছে। আর আপর পার্শ্বে প্রশস্ত উপত্যকা। দূরে আবার গিরিশ্রেণী। সেই পাহাড় ভেদ করিয়া, লাইনের নীচে দিয়া, পাহাড়ী নদী, কোথাও উদ্দাম আবেগে, কোথাও বা ধীর-মন্থর গমনে ব'য়ে যাচ্ছে। উপত্যকার মাঝে-মাঝে কৃষকদের গৃহ; আর তার আশে-পাশে হরিত ক্ষেত্র প্রভাত-সূর্য্য-কিরণে ঝলমল করিতেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের উপর মনুষ্যের এ কারুকার্য্য আমাদের রাত্রি-জাগরণ-জনিত ক্লেশের অনেক উপশম

করিল। কবি সত্যই বলিয়াছেন, "Rich the treasure, sweet the pleasure; sweet is pleasure after pain."

প্রায় বেলা দশটার সময় রেলগাড়ী করবী ষ্টেসনে পঁহুছিল। আমরা তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া ৩৲টাকা দিয়া একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিলাম। তাহাতে নিজেদের মালপত্রাদি চড়াইয়া, বিবেচনা করিতে লাগিলাম যে, গরুর গাড়ী চড়িয়া, না, হাঁটিয়া যাওয়া উচিত? পাণ্ডা বলিল, "বাবুজি, হেঁটে গেলে হয় ত পায়ে ব্যথা হবে; কিন্তু গরুর গাড়ীতে গেলে আর গায়ের ব্যথায় উঠিতে পারিবেন না।" যাহোক্ আমরা অনেক ভাবিয়া হাটিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম।

আমাদের গাড়ী প্রথমেই চলিয়া গিয়াছিল। আমরা ধীরে-ধীরে বাজার দেখিতে-দেখিতে চলিলাম।

তখন আর এক সমস্যা;—সম্মুখে মেঠাইয়ের দোকান দেখিয়া সঙ্গীদের মধ্যে অনেকেই অগ্রসর হইতে চান না; আর ক্রমাগত তাহার দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ত্তা অটল। তিনি স্থির করিলেন যে, আমাদের চিত্রকূটে গিয়া, নদীতে স্নানাদি করিয়া, তবে খাওয়া-দাওয়া করা উচিত। অগত্যা আমরা ক্ষুণ্ণ মনে গরুর গাড়ীর অনুসরণ করিলাম।

করবী জায়গাটি ছোট, কিন্তু পরিস্কার। এখানে কাছারি বাড়ী, থানা-পুলিশ, ইত্যাদি সবই আছে। একটি ছোট পুকুর দেখিলাম, তাহার মাঝখানে কোনও রাণী একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এইরূপ দেখিতে-দেখিতে আমরা বসতি ছাড়াইয়া মাঠে আসিয়া পড়িলাম। মন্দাকিনী নদী, করবীর ধার দিয়া আসিয়া, যমুনায় মিলিয়াছে;—চিত্রকূটে যাইতে হইলে এই নদী পার হইতে হয়। ইহাতে এক হাঁটু বই জল নাই। আমরা যখন নদী গর্ভে গিয়া নামিলাম, তখন দেখি কতকগুলি গরুর গাড়ী কাদায় আট্‌কাইয়া গিয়াছে। আমাদের গাড়ীখানি কার ভাগ্যে পার হইয়া গিয়াছিল। তখন রৌদ্রের তেজ অতি ভীষণ। আবার সকাল থেকে পেটেও কিছু পড়ে নাই; কাজে-কাজেই আদত বাঙ্গালীর মতন অন্যান্য যাত্রীগণের (যাহাদের গাড়ী কর্দ্দমে পড়িয়াছে) করুণ দৃষ্টির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, দ্রুত চিত্রকূটাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। যখন আমরা চিত্রকূটে (পর্ণকুটীরে) পঁহুছিলাম, তখন বেলা প্রায় ১২টা কি ১টা হইবে। সেখানে আমাদের পাণ্ডা রাজা পাটিয়ালার ধর্ম্মশালায় থাকিবার স্থান ঠিক করিয়াছিল। স্থানটী সুন্দর; নদীর উপর; বেশ নির্জ্জন। নদীর উপরেই একটা বারান্দা ছিল; সেইখানে আমরা বিশ্রাম করিয়া, রামঘাটে স্নান করিলাম (এই ঘাট ঠিক পর্ণকুটীরের সিঁড়ির নীচে)। জলযোগ সারিয়া দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের জন্য আবার ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। বিকালে আমরা রামচন্দ্রের পর্ণকুটীর দেখিবার জন্য বাহির হইলাম।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রি র্বিবিধান্দ্রুমান্।
আজহার ততশ্চক্রে পর্ণশালা মরিন্দম॥

অবশ্যই, এ এখন সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ-রচিত পর্ণশালা নয়;—ইহা এখন রাণী পান্না নির্ম্মিত বৃহৎ প্রস্তর-গঠিত মন্দির। এই মন্দিরে যাইতে হইলে, নদী হইতে প্রায় ৮০ ধাপ সিঁড়ি উঠিতে হয়। আর পাশ্চমের কাণ্ড সবই বেয়াড়া; কাজে-কাজেই, সিঁড়ির ধাপগুলি কম করে প্রায় দেড়ফুট করিয়া উঁচু। এই সোপানাবলী উত্তীর্ণ হইয়া আমরা মন্দিরে পঁহুছিলাম। মন্দিরটা দেখিতে মোটেই সুশ্রী নয়; কিন্তু খুব উঁচু প্রশস্ত যায়গায় নির্ম্মিত; আর তাহার চতুর্দ্দিকে ভরতজীর মন্দির ও অন্যান্য অনেক মন্দির আছে। সেখান হইতে নামিয়া, আমরা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া, তুলসীদাসের আশ্রম ও তাঁহার কাছে যাহা কিছু ছিল দেখিয়া, এবং সেখানে বানরদের ছোলা খাওয়াইয়া, নিজেদের বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সাধারণ ভাষায় চিত্রকূট বলিতে গেলে এই পর্ণকুটীর ও তাহার চারিপাশের বসতি, বাজার ও ধর্ম্মশালা ইত্যাদি বুঝায়—যদিও আসল তীর্থস্থান হইল কামদানাথ পর্ব্বত। চিত্রকূটের বাজার যাহা আমরা দেখিলাম, সেটা খুবই ছোট; আর এই সময়ে মেলা বলে' নদীর ধারে-ধারে আরও অনেক নূতন দোকানও বসিয়াছিল। অনুমানে বোধ হইল, এখানে প্রায় পাঁচশত ঘরের বেশী বসতি নাই।

পরদিন প্রভাতে, আমরা রামঘাটে মন্দাকিনী জলে স্নান করিয়া, কামদানাথের পাহাড় দর্শনে চলিলাম। রাস্তাটি উঁচু-নীচু বটে; তবে পরিষ্কার। রাস্তায় আমরা "যজ্ঞবেদী" দেখিলাম,—যেখানে অত্রিপত্নী অনসূয়া ব্রত করিয়া বিষ্ণুকে

পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন। যজ্ঞবেদীর সম্মুখেই "ব্রহ্মকুণ্ড"। শুনিলাম যে, গঙ্গার মর্ত্ত্যাগমনের সময়ে ব্রহ্মা নিজ কমণ্ডলু হইতে তাহাতে জল নিক্ষেপ করেন; এবং রামচন্দ্র পঞ্চবটী গমনের সময়ে এই কুণ্ডেই পিতার শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাপন করেন।

করণী (পুকুরের মাঝে মন্দির)

এইরূপ নানা রকম পাণ্ডার বর্ণনা শুনিতে শুনিতে আমরা কামদা বাজারে উপস্থিত হইলাম। ছোট বাজার; রাস্তার দুধারে দোকান-ঘর; আর ঠিক কামদানাথ পাহাড়ের নীচেই। সেদিন সেখানে বড়ই ভীড়; কেন না, রাত্রে সন্ন্যাসী হাঁপানির ঔষধ দিবেন। বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম, যাহাকে ঔষধ লইতে হয় তাহাকে সকালে গঙ্গাস্নান করিয়া এক বাটী দুধ লইয়া, এই স্থানেই অপেক্ষা করিতে হয়। মধ্যরাত্রে এক জটাধারী সন্ন্যাসী আসেন,—কোথা হইতে, কেহই জানে না। তিনি দুধের সঙ্গে কি একরকম গুঁড়া মিশাইয়া দেন। সেই দুধ খাইয়া রোগীকে সেই রাত্রেই কামদানাথ পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিতে হয়। বৎসরে একদিন এই কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রে তিনি ঔষধ দেন। এই ঔষধ তিনবার খাইতে হয়, অর্থাৎ পর-পর তিন বৎসর গিয়া খাইয়া আসিতে হয়, তবে রোগ আরাম হয়। আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, রোগী শুধু হিন্দুস্থানী নয়,—অন্যান্য জাতিও আছে, এমন কি মুসলমান ও খ্রীষ্টান পর্য্যন্ত। আমরা বাজার ছাড়াইয়া রামচবুতরায় পড়িছিলাম। এইখান হইতেই কামদানাথের প্রদক্ষিণ আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমেই মুখারবিন্দ, সেটা একটা পাহাড়ের গায়ে মন্দির, তাহার ভিতর রামচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি আছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পাহাড়ের গায়ে-গায়ে অনেক ছোট-বড়

রামঘাটের উপর পর্ণকুটীর ও তুলসীদাসের আশ্রম

মন্দির আছে যথা, রামগোট, ভরত-মিলন, কালী, লক্ষ্মণ-পাহাড়ী, চরণ-পাদুকা ইত্যাদি। আমরা এই সকল দর্শন করিতে-করিতে প্রদক্ষিণ করিয়া আবার বাজারে ফিরিয়া আসিলাম।

গরুর গাড়ীর নদী পার হওয়া

ধর্ম্মশালায় ছিলাম, ঠিক তাহার নীচে। মন্দাকিনীতে একটি নালা আসিয়া মিশিয়াছে; তাহার নাম পয়ঃস্বিনী। প্রথমে পয়ঃস্বিনীর রূপ দেখিয়া মিউনিসিপালিটীর ড্রেণ বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল; কিন্তু তদন্তে প্রকাশ পাইল যে, ইহা একটি পাহাড়ী নদীই বটে।

আমরা স্নান সমাপন করিয়া, "নয়াগাঁ"র ভিতর দিয়া চলিলাম। এইখানে একটি প্রকাণ্ড রাবণের মূর্ত্তি আছে। আমাদের অনেক গবেষণাতেও বোধগম্য হইল না যে, দশানন এখানে কি করিতে আসিয়াছিলেন।

কোটিতীর্থ, দেবাঙ্গনা, "সীতারসুই" ও "হনুমানধারা" তীর্থস্থানগুলি একটি প্রশস্ত নাতিউচ্চ পর্ব্বতমালার উপর অবস্থিত। এগুলি চিত্রকূটের পূর্ব্বদিকে মন্দাকিনীর পরপারে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা যখন নয়াগাঁ হইতে বাহির হইয়া পর্ব্বতমালার নিম্নে উপস্থিত হইলাম, তখন প্রভাত-কিরণ সবে অল্প-অল্প পর্ব্বত-শিখরে পড়িয়াছে; আর অরুণবর্ণে সমস্ত পর্ব্বত-শির রঞ্জিত করিয়াছে। সেই সুপ্রশান্ত স্বর্ণকিরীটি গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ

সেখানে যে শুধু রোগীর জনতা, তাহা নহে; সাধু, সন্ন্যাসীও অনেক আসিয়া জুটিয়াছেন। একজন সাধু দেখি, ধুনী জ্বালিয়ে ব'সেছেন; পার্শ্বে একটা সাইনবোর্ড,— তা'তে লেখা, "ফলাহারী বাবা"; অর্থাৎ তিনি শুদ্ধ ফল খাইয়া থাকেন। আর বোধ হয় ইহাও ব্যক্ত করিতেছেন, যেন ভক্তরা তাঁর উপরে বেশী করে ফল চড়ায়। এই রকম নানা রং বেরংএর লোকজন দেখিয়া, "গৃরিয়া", "ফটকশিলা", "প্রমোদ বন" ইত্যাদি দেখিতে-দেখিতে বাসায় ফিরিলাম।

ফটকশিলাতে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির ও মূর্ত্তি আছে। বৃন্দাবনে যেমন সব মন্দিরেই শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি, সেই রকম এখানে সকল মন্দিরেই শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি। ফটকশিলা স্থানটি মন্দাকিনীর ধারে,—চিত্রকূট হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে মন্দিরের সম্মুখে একটি প্রশস্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদীর উপর শ্রীরামচন্দ্রের বীর-আসনের চিহ্ন অঙ্কিত আছে।

তৃতীয় দিন সকালে আমরা "রাঘব প্রয়াগে" স্নান করিয়া "কোটতীর্থ" অভিমুখে চলিলাম।

"রাঘব প্রয়াগ", আমরা যে

রামঘাট পর্ণকুটীরের সিঁড়ির নীচে

রামঘাটে বানর-ভোজ

হইল, যেন গিরিবর বাহু বিস্তার করিয়া আমাদের নিজ বক্ষে আহ্বান করিতেছেন। আমরা সকলেই স্তব্ধ হইয়া প্রকৃতির সেই প্রাভাতিক কমনীয় সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলাম। সেই সময়ে পাণ্ডা বলিল, "বাবুজি, আপনারা আর দেরী করিলে রৌদ্র উঠে পড়বে,—পাহাড়ে বেড়াতে কষ্ট হবে।" আমরা পাণ্ডার কথামত কোটতীর্থাভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইলাম। যাঁহারা বিন্ধ্যাচলে ত্রিকোণ ও বিন্দুবাসিনী দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, এ স্থানটিও প্রায় সেইরূপ।

আমরা প্রায় সাড়ে তিন শত পাহাড়ী সিঁড়ি উঠিয়া কোট-তীর্থে উপস্থিত হইলাম। স্থানটি অতি মনোহর, বেশ শীতল ও ছায়াসঙ্কুল। এখানে মন্দিরের নীচে একটি কুণ্ড আছে, তাহা স্বাভাবিক ঝরণার জলে পরিপুষ্ট। আর প্রবাদ যে, এই কুণ্ডে কোটী তীর্থের জল সংগ্রহ করা আছে। এখান হইতে পাহাড়ের উপর দিয়াই আমরা দেবাঙ্গনা হইয়া, প্রায় দুই মাইল পথ হাটিয়া সীতারসুইতে উপস্থিত হইলাম। এ স্থানটি পাহাড়ের উপর সকলের চেয়ে উঁচু। এখানে মন্দিরে সীতার মূর্ত্তি ও চতুঃপার্শে সন্ন্যাসীর বাস। এখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া, আমরা হনুমানধারায় নামিয়া আসিলাম। প্রায় ১০০ ধাপ পাহাড়ী সিঁড়ি। এ স্থানে আর একটি মাঝারি রকমের ঝরণা আছে। ইহার জল অতি নির্ম্মল ও ক্লেদনাশক। ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই ঝরণার জল পাহাড়ের গা গড়াইয়া নীচে যায় না; মাঝামাঝি কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

চিত্রকূটের এই স্থানটি সকল স্থানের অপেক্ষা মনোরম বলিয়া বোধ হইল। ইহার চারিধারে ছোট-বড় অনেক গুহা আছে, তাহা কাটিয়া নানা প্রকার ঘর ও মন্দির তৈয়ারী করা হইয়াছে। আর তাহার চতুর্দ্দিকে নয়ন-স্নিগ্ধকর, শ্যামল তরুগুল্ম, তাহাদের মধ্য দিয়া শীতল, শান্তিদায়ক সমীরণ মৃদুমন্দ স্বনে বহিয়া আসে; এবং জলপ্রপাতের সুমধুর সঙ্গীতে ক্লান্তি দূর হয়; এবং দূরে মন্দাকিনী-বেষ্টিত চিত্রকূট। তাহার শোভার ইয়ত্তা নাই, দেখিলে মনে প্রেম, ভক্তি ও উল্লাসের উদয় হয়।

নয়াগাঁয়ে রাবণের মূর্ত্তি

মন্দাকিনী তীরে ধর্ম্মশালা

সন্ধ্যা, চাঁদ উঠিয়াছে। আমরা তাহার পরদিনই ফিরিয়া আসিব বলিয়া, নদীর উপরেই ধর্ম্মশালার বারান্দায় বসিয়া আছি। চিত্রকূটের শোভার যতটুকু দেখিয়া লইতে পারা যায়, তাহাই আমাদের ইচ্ছা। রামায়ণে লিখিত আছে যে, চিত্রকূট এরূপ সুরম্য স্থান যে, এখানে আসিয়া রামচন্দ্র নিজ দেশত্যাগ-জনিত দুঃখও ভুলিয়া গিয়াছিলেন-

সুরম্য মাসাদ্য তু চিত্রকূটং,
নদীং চ তাং মাল্যবতীং সতীর্থাং
ননন্দ হৃষ্টো মৃগপক্ষী জুষ্টাং
জহৌচ দুঃখং পুরবী প্রবাসাৎ ।

এ কথা যে সত্য, তাহা আমরা সেই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া বেশ অনুভব করিলাম। উপরে উন্মুক্ত সুনীল আকাশ; সম্মুখে দূরে গিরিশ্রেণী, নিম্নে স্বচ্ছ, শান্ত-সলিলা মন্দাকিনীর অপরূপ শোভা; যেন আমাদের অহংজ্ঞান দূর করে আত্মযোগাপ্লিত করিয়াছিল। আমাদের সন্ন্যাসীঠাকুর তখন গাহিতেছিলেন-

সেই ঘন বিড়ম্বী নিবিড় নীল
মূর্ত্তিটি যেন ভুলি না নিল,
নিত্য নৃত্য করে যেন মোর চিত্ত পুলিনেরে।
বেদবিধি ছাড়ি বেদনা তার
হরিনাম সদা গাইরে॥

ফরাসী সভ্যতা

[অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ]

(১)

ফরাসী আঁস্তিতিউয়ের (Institut France) বার্ষিক অধিবেশন হইল। নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। রাস্তায় হাঁকা হাঁকি করিয়া "ইন্‌স্টিটিউট্, ইন্‌স্টিটিউট" বলিয়া গলা ফাটাইলেও প্যারিসের কোনো লোক পথ দেখাইয়া দিবে না। বলিতে হইবে ঠিক আঁস্তিতিউ। তথাস্তু। প্রকাণ্ড বাড়ী। সেইন নদীর কিনারার রাস্তার উপর এক বিরাট সৌধ। প্রবেশ করিতে-করিতে মনে হইতে লাগিল, যেন বা সেনাপতি মার্শাল ফশের সঙ্গেই মোলাকাত করিতে চলিয়াছি। আশে-পাশে ঘোড়-সওয়ার, এখানে-ওখানে সশস্ত্র, সুসজ্জিত পল্টনের দল।

সভাস্থানে আসন গ্রহণ করিলাম। গোলযোগ খুব। শ তিনেক লোকের জায়গা। সবই ভরা। আমার চোখের

আঁস্তিত্যু

ত্রোকাদেরো
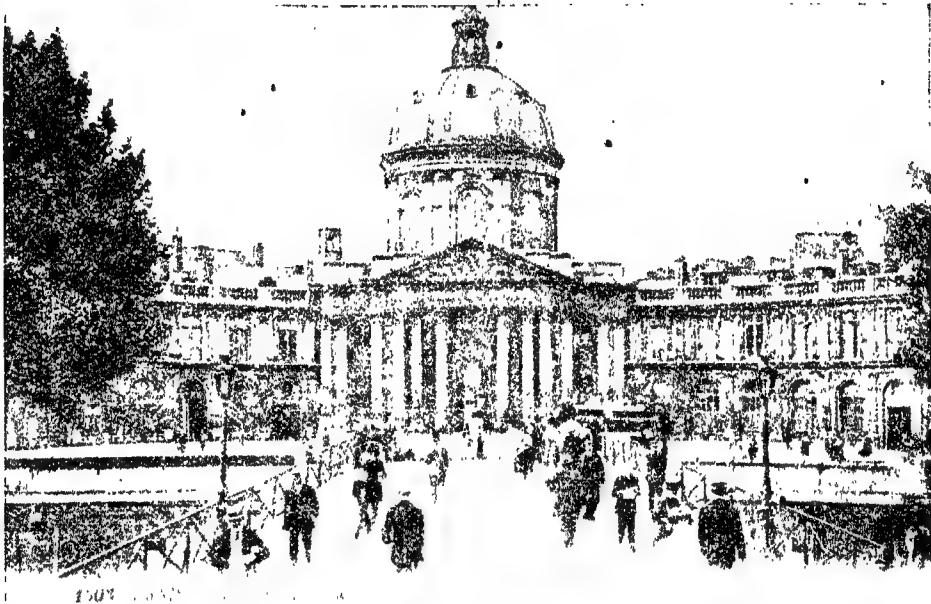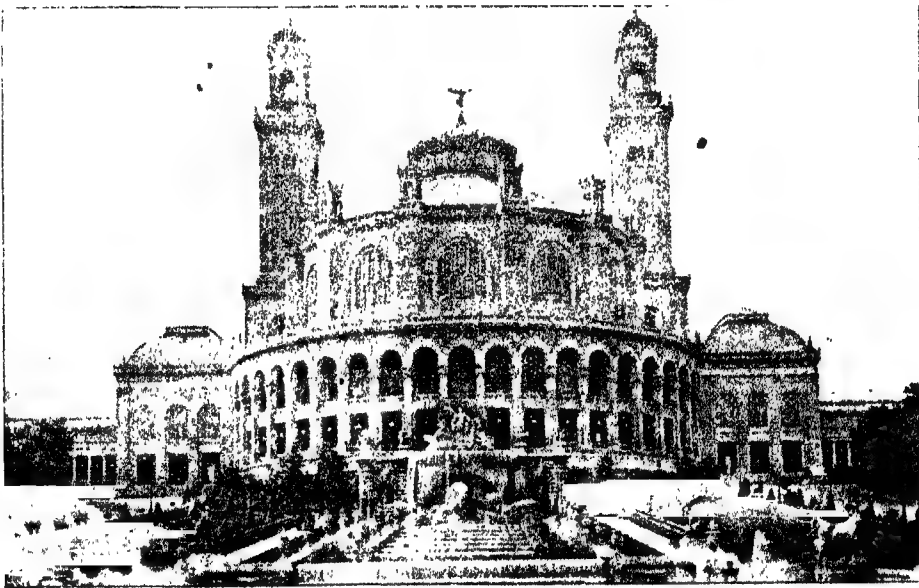
সম্মুখের দেওয়ালে বাঁ দিকে লেখা "ও সিয়াঁস" (aux sciences); ডাইনে লেখা "ও বোজোর" (aux beaux-arts)। আর আর মাঝে-মাঝে লেখা "ও লেতর" (aux lettres); অর্থাৎ ভবনটা বা আঁস্তিতিউ স্বয়ই বিজ্ঞান, সুকুমার শিল্প আর সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে!

ঠিক একটা বাজিল,—অমনি বাহিরে ভাঁপো ভাঁপো করিয়া আওয়াজ। দেখিতে-দেখিতে ধড়াচূড়া পরিয়া পল্টনী পোষাকে গৃহে প্রবেশ করিলেন ২৫।৩০ জন আধবুড়ো লোক। বুঝিলাম, ইহারাই জ্ঞানেন বয়সা চ বৃদ্ধ, আঁস্তি-তিউয়ের মেম্বর। কোমরে তলোয়ার ঝুলিতেছে; কোটের চওড়া কলারে সোনালি জরির কাজ আর মাথায়

নেপোলিয়ানী টুপী। এই টুপির রেওয়াজ আজকাল ফ্রান্সে এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। কখনো-কখনো রাস্তায় কোনো দ্বারোয়ান, বরকন্দাজ, চাপরাশি বা পত্রবাহকের মাথায় নেপোলিয়ানের ষ্টাইল বিরাজ করে মাত্র। যাহা হউক, অ্যাঁস্তিতিউয়ের আদব-কায়দা নেপোলিয়ানকে আজও বাচাইয়া রাখিয়াছে।

রিশলিয়োর মূর্ত্তি
(পতিপ্যালের স্থাপত্যশালায়)

অ্যাঁস্তিতিউয়ের সভাপতি শার্ল্ ডীল (Charles Dihle) প্রধান স্থানে বসিলেন। অন্যান্য মেম্বারদের জন্য স্বতন্ত্র আসন আছে। অধিবেশনের কার্য্য সুরু হউক, এই কথা বলিয়া ডীল এক লম্বা বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার পর জানানো হইল, অমুক-অমুক লোককে অ্যাঁস্তিতিউ অমুক-অমুক পুরস্কার বা পদক প্রদান করিয়াছেন। বিজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্নতত্ত্ব পর্য্যন্ত, আর আফ্রিকার কঙ্গো মুলুকের ভৌগোলিক বিবরণ ও নৃতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ফরাসী লোক-সাহিত্যের ছড়া পর্য্যন্ত, এমন কোনো বিদ্যা নাই, যে বিদ্যার ব্যাপারীদের এই সম্বর্দ্ধনার তালিকায় দেখিলাম না। ডীলের বক্তৃতার পর আর দুইটা বক্তৃতা হইল। দুই ঘণ্টা পরে সভা হ'ল ভঙ্গ। দুইধারের পল্টনের দেওয়াল ভেদ করিয়া রাস্তায় আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তিনটা বক্তৃতার মধ্যে ত্রিশটা শব্দও দখল করিতে পারি নাই। ফিরিবার সময় ঘরের ভিতরকার পাঁচটা মূর্ত্তি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। চার কোণে বোসে (Bossaut), ফেনেলঁ (Fenelon), দেকার্ত্ত (Descartes) ও সুল্লী (Sully)—চার দিগ্‌গজ। যে দেওয়ালে লেখা তিনটা খোদা, সেই দেওয়ালের মধ্যস্থলের মূর্ত্তি ওর্লিয়ঁার নবাবের; ইনি অ্যাঁস্তিতিউ ভবনের জন্য ভূমি দান করিয়াছিলেন বলিয়া।

কয়েকদিন পরে খাইতে গিয়াছিলাম শার্ল্ জিডের বাড়ীতে। উপস্থিত ছিলেন সেন্তর্। কথা উঠিল—"হাঁ মহাশয়, আপনি না কি অ্যাঁস্তিতিউয়ের অধিবেশনে গিয়াছিলেন। কিরীচ তলোয়ারের ঝন্‌ঝনানি কেমন লাগল?" আমি বলিলাম—"তাই ত! কিছুই যেন বুঝিতে পারিলাম না। ব্যাপারটা কি?" দুইজনে একসঙ্গে বলিলেন—"ব্যাপার আর কি;—নেপোলিয়ানের কাণ্ড!" ফ্রান্সের যা কিছু—গির্জ্জাই হউক বা ইস্কুলই হউক—নেপোলিয়ান সব প্রতিষ্ঠানের উপর পল্টনী কায়দা চাপাইয়াছিল। এই যে অ্যাঁস্তিতিউ—এটাও নেপোলিয়ানের কীর্ত্তি। কাজেই, নেপোলিয়ানী রীতি এখানে ১৯২০ সালেও চলিতেছে।

ফ্রান্সে মোটের উপর পাঁচটা অ্যাকাডেমী বা পরিষদ। সর্ব্বপুরাতন অ্যাকাডেমী গঠিত হইয়াছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে চতুর্দ্দশ লুইয়ের আমলে। সেটা মন্ত্রিপ্রধান পাদ্রী রিশলিয়ো (Richelieu) এর গড়া। পরিষদ্ বলিলে দুনিয়ার লোকে এবং ফরাসীরাও এই রিশলিয়ো-প্রবর্ত্তিত অ্যাকাডেমীই বুঝিয়া থাকে। এই অ্যাকাডেমীরই জগতে যা কিছু নাম-ডাক। এই অ্যাকাডেমীর মেম্বর নির্ব্বাচিত হওয়া

ফরাসী পণ্ডিতগণের চিন্তায় নরজন্ম সার্থক হওয়ার সমান। ফরাসী রিপাবলিকের যিনি প্রেসিডেণ্ট, তিনি ঘটনাচক্রে পাণ্ডিত্যের জোরে যদি কখনো অ্যাকাডেমীর মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে গোটা দেশের মাথায় বসিয়াও, কাগজ-পত্রে নিজ নামের সঙ্গে লিখিয়া জানান যে তিনি অ্যাকাডেমীর মেম্বর। এই পদবীর দাম এতই বেশী। বোধ হয় বিলাতী রয়্যাল সোসাইটির মেম্বর পদবীও ইংরেজ সমাজে এত উঁচু কি না সন্দেহ।

যাহা হউক, নেপোলিয়ান রিশলিয়োর মুখে ঝাল খাইবার পাত্র নন। তাই রিশলিয়ো গঠিত অ্যাকাডেমীকে টেক্কা দিবার মতলবে নেপোলিয়ান নয়া চার চারটা অ্যাকাডেমী কায়েম করেন। তাহার পর এই পাঁচটা অ্যাকাডেমীকে এক শাসনে আনিয়া, এক সর্ব্বগ্রাসী সঙ্ঘ গঠন করিলেন। সেই সঙ্ঘের নাম আঁস্তিতিউ। অ্যাকাডেমী পাঁচটার মেম্বারী, কাজকর্ম্ম, নিয়মকানুন, সভাসমিতি—সবই পৃথক্-পৃথক্ চলে। তবে কতকগুলা বিষয়ে পাঁচটায় একত্র মিলিয়া কাজ হয়। আর বৎসরে একবার করিয়া সম্মিলিত বৈঠক বসে। সেই বৈঠকেই আমি গিয়াছিলাম।

নেপোলিয়ান রিশলিয়োকে হারাইতে পারে নাই। কারণ, নেপোলিয়ানের অ্যাকাডেমীগুলিকে ফরাসীরা পুছে না। এইগুলার ইজ্জত এমন বিশেষ কিছু নয়। যাঁহারা রিশলিয়োর অ্যাকাডেমীর সভ্য, তাঁহারা নিজ নিজ নামের পশ্চাতে লিখিয়া থাকেন "মাম্ব্ দ ল্যাকাদেমি member de l' academie)। কিন্তু যাহারা নেপোলিয়ানী অ্যাকাডেমীর সভ্য, তাঁহারা আঁস্তিতিউয়ের সভ্য (ম' দ্যাঁস্তিতিউ de l' Institut) বলিয়া নিজের পরিচয় দেন। অবশ্য যাঁহারা রিশলিয়োর অ্যাকাডেমীর সভ্য, তাঁহারাও আঁস্তিতিউয়েরও সভ্য ত বটেই। কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে এই পরিচয় দেওয়া কুলে খাটো হইবার সমান বিবেচিত হয়।

ভারতবাসীর সুপরিচিত কোনো ফরাসী পণ্ডিত আকাডেমীর মেম্বর কি না, মনে পড়িতেছে না। কিন্তু আঁস্তিতিউয়ের

প্যারিসের সদর থানা

মেম্বার অন্ততঃ একজনকে ভারতবর্ষে জানে। তাঁহার নাম সেনার (Senart)। তিনি হিন্দুর জাতিভেদ বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধ। অফরাসীরাও আঁস্তিতিউয়ের সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। ম্যাক্সমূলার এইরূপ সভ্য ছিলেন। মেম্বার হইতে হইলে আগে আঁস্তিতিউয়ের কোন প্রকার পুরস্কার বা মেডেল পাওয়া আবশ্যক। আর পুরস্কার মেডেল ইত্যাদি পাইতে হইলে নিজ প্রণীত গ্রন্থ গবেষণাদি অ্যাকাডেমীতে যাচাই হওয়া চাই। অবশ্য এই দুই দফায়েই হাঁটাহাটি, আনাগোনা, দস্তুরমত, ইত্যাদি দস্তুর মতনই দরকার। ফ্রান্স ত আর সৃষ্টি-ছাড়া মুল্লুক নয়।

(২)

জাহাজের সহযাত্রী দুইটি মার্কিণ রমণী বলিতেছেন —"মহাশয় এই কয় সপ্তাহ প্যারিসে কাটাইয়া কোনো দিন একজনও আহত লোক দেখিলাম না। কাগজে-কলমে ত পড়িয়াছি যে, ফরাসীদের পুরুষের অনেকেরই হাত পা ভাঙা বা নাক চোখ জখম ইত্যাদি! অথচ স্বচক্ষে যুদ্ধের কোন লক্ষণ ত দেখিতে পাইতেছি না। আর একটা জিনিষও বেশ লক্ষ্য করিতেছি। হোটেলে, ক্যাফেতে, থিয়েটারে, বড় বড় দোকানে লোকের ছড়াছড়ি যথেষ্ট। ব্যবসা জগৎ যুদ্ধে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বিবেচনা করা সুকঠিন।"

গ্রাঁপ্যালে

নিউইয়র্কের বাজারহাটে আর প্যারিসের বাজারহাটে খরিদদারের সংখ্যা হিসাবে কোন প্রভেদ নাই; এদিকে জিনিসের দামও একপ্রকার। যুদ্ধ লড়াই হাঙ্গামের কথা যারা খবরের কাগজে পড়ে, তারা অনেক কাল্পনিক দৈন্য-দুঃখ আবিষ্কার করিয়া থাকে। কিন্তু যারা যুদ্ধে লড়িতে লাগিয়া যায়, তাদের অভিজ্ঞতা অন্যবিধ। তারা হেসে খেলে বেড়াইবার সুযোগও ঢুঁড়িয়া লইতে জানে। দূর হইতে যুদ্ধ যত ভয়াবহ, কাছে আসিলে তত নয়। কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। কারণ, লড়াই মানুষের সংসারে একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। যুদ্ধের উপক্রম দেখিবামাত্র, মানুষের পক্ষে আঁতকাইয়া উঠা অস্বাভাবিক।

প্যারিসে কতকগুলা "বাঙাল" দেখিতেছি। ইহাদের কথা শুনিবামাত্র বুঝিতে পারি। বস্তুতঃ, যখনই কোনো ব্যক্তির মুখের ফরাসী বোল সহজে ধরিতেছি, তখনই সন্দেহ করি যে লোকটা নিশ্চয়ই বিদেশী। যে কোনো ইয়োরোপীয় বিদেশীদের ফরাসী উচ্চারণ প্রায় আমারই মতন। ফ্রান্সে এই ধরণের বাঙাল আসে ক্যানাডা হইতে, ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ হইতে, ইংল্যাণ্ড হইতে, আর রুশিয়া হইতে। এত পর্য্যন্ত কোনো খাঁটি ফরাসীর বক্তৃতা শুনিয়া বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু রুশিয়ার একব্যক্তি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-সম্মিলনে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তা করিবামাত্র ইহার কথা অন্ততঃ অর্দ্ধেক পাকড়াও করিয়া ফেলিলাম। ইনি পেট্রোগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক। নাম গ্রিম্ (Grim)। ইনি বলিলেন, "রুশিয়ায় আজকাল বাজারে কালী কলম কাগজ পেন্সিল পাওয়া যায় না। ইস্কুলে টেবল নাই, চেয়ার নাই। রাস্তায় আলো নাই। কাজেই বুঝিতে পারিতেছেন—রুশ সমাজে শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ কতটুকু। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা কিই বা বলিব? বুঝিয়া রাখুন যে, ঐ বস্তু রুশিয়ায় আর নাই।" প্রবীণ মাষ্টার মহাশয়েরা গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িলেন। বোল্শেভিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন ফরাসী সমাজে বেশ প্রীতিকর। বোধ হয় প্রবন্ধটা কোন বৈজ্ঞানিক ফরাসী কাগজে ছাপা হইবে।

মুক্তার ব্যাপারী কয়েকজন গুজরাটীর সঙ্গে আলাপ হইল।

বৎসরে প্রায় দুই কোটি টাকার ব্যবসায় এই ৫০।৬০ জন ভারতবাসীর হাতে চলিতেছে। ব্যবসাটা ইহাদের এক প্রকার একচেটিয়া। মুক্তা উঠে পারস্যোপসাগরে। তোলে আরব জেলেরা। পারস্যের লোকেরা না কি আনাড়ি। ইয়োরোপীয় জহুরিরা খরিদ করিতে চায় খোদ আরবদের নিকট হইতে। কিন্তু আরবরা পশ্চিমাদের সঙ্গে কারবার করিতে নারাজ। আবার জেলেরা সাগর হইতে উঠায় যে অবস্থায়, সেই অবস্থায় মুক্তার কদর বুঝা পশ্চিমাদের অসাধ্য। কাজেই মুক্তার বাজার আসিয়া ঠেকিয়াছে বোম্বাইয়ে। কিন্তু মারাঠা সিন্ধী বা পার্শীরা এদিকে ঝোঁকে নাই। ঝুঁকিয়াছে গুজরাতীরা। গুজরাতীদের হাতে ব্যবসাটা নিতান্ত "পাড়াগেঁয়ে" অবস্থায় রহিয়াছে।

একজন বলিলেন—"আমাদের একমাত্র কাজ—মুক্তা গুলা পরিষ্কার অবস্থায় ফরাসীদের কাছে বেচা। কিন্তু এইগুলা ব্যবহার করিয়া অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতে, এবং ইয়োরোপে ও আমেরিকায় সেই সকল অলঙ্কার চালাইতে, যত মূলধনের প্রয়োজন, তত মূলধন আমাদের নাই। কাজেই, যে সকল ব্যবসাতে লাভ বেশী হইতে পারে, সেই ব্যবসাগুলা ইয়োরোপীয়ানদের হাতে। বস্তুতঃ, ফরাসীদেরই একচেটিয়া। ইংরেজ, মার্কিণ, জার্ম্মাণ, দক্ষিণ আমেরিকাবাসী ইত্যাদি সকল জাতিই বেশী দামের মুক্তার গহনা প্যারিসের "সোণার"দের দ্বারাই তৈয়ারি করাইয়া লয়। অলঙ্কার-শিল্পে এবং সৌখীন সাজসজ্জা সংক্রান্ত সকল কারবারেই ফ্রান্সের একাধিপত্য। অন্যান্য দিকেও যেমন, মুক্তার ব্যবসাতে ভারতবাসী কেবল প্রকৃতিগত উৎপন্ন দ্রব্যগুলা রপ্তানি করিয়াই খালাস। এই সমুদায়ের "শিল্পের" দিকটা পশ্চিমা ওস্তাদদের হাতে। ফ্রান্সে গুজরাতীরা এই শিল্পের দিকে আজও নজর দিতে সাহসী নয়। নূতন পথে চলিতে অভ্যাস করা কঠিন। ১৯১৯।২০ সালের নব-স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে যদি বা কোনো ধনীর মাথা খুলিয়া যায়।

ম্যালেঁ দোতনের শিল্প-প্রদর্শনীর সঙ্গে প্রায় রোজই একটা করিয়া বক্তৃতা হয়। একদিন বক্তৃতা শুনিলাম পোষাক সম্বন্ধে। বাঙলা দেশের কোনো দর্জ্জি আসিয়া যদি বক্তৃতা দ্বারা বুঝায় কোন্ জামার কি বাহার ইত্যাদি, তাহা হইলে এই ফরাসী বক্তৃতার আলোচ্য বিষয় বুঝা যাইবে। বক্তৃতার পর পিয়ানো বাজিতে থাকিল। আর একে-একে ৪।৫ রমণী ভিন্ন-ভিন্ন পোষাকে সাজিয়া মঞ্চের উপর হাঁটিয়া যাইতে লাগিল। দর্শক-সংখ্যায় ঘর ভরিয়া গিয়াছে। কোন্ পোষাকে কার চেহারা কেমন খুলিবে, লোকেরা ঠাওরাইয়া লইতেছে।

সিল্ভাঁ লেভির বাড়ীতে একপাল জাপানী মাষ্টারের সঙ্গে দেখা হইল। ইহারা সকলেই আসিয়াছেন কিয়োতোর এক বৌদ্ধ কলেজ হইতে। প্রত্যেকেই ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় ব্যাপৃত। সিল্ভাঁ লেভির বৈঠকখানায় প্রত্যেক শনিবার রাত্রি নয়টার সময় অনেক লোকের গতিবিধি হয়। তিনি তখন "শে লুই" (chezlui)। ইংরাজীতে বলে অ্যাট্ হোম্। অর্থাৎ বাবু তখন ঘরে। ফরাসী অধ্যাপকদের অনেকেরই এই দস্তুর। এই সময়ে ছাত্র মাষ্টার এবং অতিথিদের সঙ্গে হরেক রকম কথাবার্ত্তার পালা। জাপানীরা ইংরাজীতে যেমন ওস্তাদ, ফরাসীতেও ঠিক তেমনি মনে হইতেছে। গীমে (Gimmet) প্রতিষ্ঠিত মিউজিয়ামে মিজে গীমেতে (Music (Gimmet) প্রাচীন ধর্ম্ম বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মিশর, চীন, জাপান ও ভারত এই চার দেশের মূর্ত্তি, চিত্রও গ্রন্থাদি এখানে রক্ষিত হইতেছে। মাঝে মাঝে বক্তৃতাদি হয় এবং সেইগুলা ছাপাইয়া গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয়। একদিন বিকালে এখানে সান্ধ্য-সম্মিলন হইল প্যারিসের চীনা ছাত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য। জলযোগেরও ব্যবস্থা ছিল। এক ফরাসী নারী চীনা-কবিতা পাঠ করিলেন। কয়েকজন চীনা ছাত্র বীণা-যন্ত্রসঙ্গীতের নমুনা শুনাইল। আয়োজন করিয়াছিলেন "আমি দ' লোরিআ" "প্রাচ্য সুহৃৎ সমিতি।" ফ্রান্সে Amis de l'orient নামে এক কমিটি গঠিত হইয়াছে। ইহাদের কর্ত্তা সোরার (Seriart)। সমিতির কার্য্যালয় সম্প্রতি মিয়জে গীমেতে। এখানে ৩০।৩২ জন চীনা যুবক উপস্থিত ছিল। আর কোনো এশিয়ান্‌কে দেখিলাম না।

থিয়েটারে এক রুশ ওস্তাদের গান শুনিলাম। গান হইল রুশ ভাষায়, অনুবাদ ছাপা হইয়াছে ফরাসীতে। বিশটা গানের ভিতর গায়িকার গলায় একটা মাত্র সুরই নানা ভাবে বাহির হইল, করুণ, করুণতর, করুণতম। গানগুলার ভাবার্থও একদম তাই। এই গানের আয়োজনেও কি বোলশেভিকীর বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে? কে জানে?

বাছিয়া বাছিয়া পূরাপূরি মরার কান্না শুনাইবার আর ত কোন কারণ দেখিতেছি না।

(৩)

খৃষ্টান-জগতের সর্ব্বত্র ইহুদি-বিদ্বেষ প্রবল, এমন কি আমেরিকায়ও যে পাড়ায় বা যে বাড়ীতে ইহুদিরা বাস করে, সেই পাড়ায় ও সেই বাড়ীতে খৃষ্টানেরা ঘর করে না। নিউ ইয়র্কে কোন ইহুদির বৈঠকখানায় বিশ পঁচিশজন বন্ধু-সমাগমের সময়ে কদাচ একজন খৃষ্টান দেখা যায়। ইয়াঙ্কি-স্থানে এমন অনেক হোটেল আছে, যেখানে রংএর বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও ভারতসন্তানের ঠাঁই মিলে, কিন্তু ইহুদিকে ঘর দেওয়া একদম নিষিদ্ধ। বলা বাহুল্য, ইয়োরোপে ইহুদি-নির্য্যাতন আমেরিকা হইতেও বেশী হইবারই কথা। শুনিতে পাই ফরাসীরা যুদ্ধের সময়েও ফ্রান্সের ইহুদি সিপাহীদিগকে অনেকটা সেই চোখেই দেখিয়াছে। ইহুদি হইয়া জন্মগ্রহণ করা সামাজিক হিসাবে অস্পৃশ্য হইয়া থাকার সমান। অথচ ইয়োরামেরিকার বড় বড় ব্যাঙ্কে, মহাজনীতে, বিজ্ঞান-চর্চ্চায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে, দর্শনে, সুকুমার-শিল্পে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে—সকল ক্ষেত্রেই ইহুদিরা মাত্রায় এবং গুণতিতে যারপর নাই অগ্রণী। ইয়োরামেরিকার যে কোন দেশের দশবিশ জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামজাদা লোকের নাম করিতে হইলে অন্ততঃ আট দশজন ইহুদির নাম না করিয়া উপায় নাই। আমরা বিদেশী বলিয়া নাম শুনিবামাত্র জাতিভেদটা ধরিয়া লইতে পারি না; কিন্তু সমাজের লোকেরা এক ডাকে বুঝে—কার কার "জল চল" আর কার কার সঙ্গেই বা "পংক্তি-ভোজন" চলিবে না।

ইহুদিরা স্বজাতি-বৎসল জাত। যথাসম্ভব আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য ইহারা স্বজাতীয় নরনারীর অভাব দূর করিতে সচেষ্ট। নানাপ্রকার ফণ্ড, ধর্ম্মগোলা সেবাসমিতি, ইত্যাদি গঠন করা ইহুদিদের একপ্রকার স্বধর্ম্মে দাঁড়াইয়াছে। ফ্রান্সের সর্ব্ববৃহৎ ইহুদি হিতসাধক-মণ্ডলীর নাম "বিয়েঁফেজাঁৎ ইজরায়েলিৎ" (La Bienfaisante Israelite)। এই মণ্ডলী অনেক দিনের পুরাণো। ১৮৪৩ সালে স্থাপিত। ইহুদিদের বার্ষিক সভা এক প্রকাণ্ড হোটেলে অনুষ্ঠিত হইল। লাখ লাখ টাকা খয়রাতির হিসাব শুনিলাম। প্যারিসের বহু ধনীলোকের এবং গণ্যমান্য করিৎ-কর্ম্মা লোকের পরিচয় পাওয়া গেল। ফরাসী রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্টের পত্নী ফুলের তোড়া উপহার পাঠাইয়াছেন। উৎসবটা একপ্রকার দিবসব্যাপী। "হোটেল লুটোনিয়া" প্যারিসে সুপরিচিত; ইস্কুল পাড়ার নিকটে ইহার অবস্থান।

প্যারিস, ভিয়েনা, কনষ্ট্যাণ্টিনোপল ইত্যাদি সহর ষড়যন্ত্র-প্রধান। এই সকল কেন্দ্রে ইউরোপের সকল দেশের এবং আজকাল এসিয়ারও নানা মতলবী লোক নানা ফিকিরে বসবাস করিয়া থাকে। এই লোকগুলাকে নাকে দড়ী দিয়া ঘুরাইবার মতলবে এক শ্রেণীর পশ্চিমা-মহিলা ব্যবসা খুলিয়াছে। এই মহিলারা লিখাপড়া জানা লোক; খবরের কাগজওয়ালাদের পরিচিত; দুই চারজন নামজাদা লোকেরও বন্ধু। ইহাদের পাল্লা এড়াইয়া কাজ করা কোনো বিদেশীর পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব; বিশেষতঃ যাহারা দুই চার সপ্তাহ অথবা দুইচার মাস মাত্র প্যারিসে ভিয়েনাতে কিম্বা কনষ্ট্যাণ্টিনোপলে থাকিতে চায়, তাহারা এই ধরণের মহিলাদের সাহায্য না লইয়া উঠিতে-বসিতেই পারে না। অথচ খাঁটি কথায়, ইহাদের দ্বারা মতলব হাসিল হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; কেবল অর্থব্যয় করা। কথাটা ভারতবাসীর কাণে বিশেষ করিয়া পৌছান আবশ্যক। ফরাসী ভাষায় ওস্তাদজি না হইয়া, অথবা হইতে চেষ্টা না করিয়া, ফ্রান্সে রাষ্ট্রনৈতিক কিম্বা আর কোনো আন্দোলন চালাইতে আসা ঝকমারি। জলের মতন টাকা খরচ করিতে পারিলেই, অথবা বেকুবের মতন কতকগুলা মেয়ে-মানুষের সঙ্গে লাফালাফি করিলেই, বিদেশীয় রাষ্ট্র-নায়কদের "লোকমত" তৈয়ারি করা হয় না। কি রকম লোক তোমার পেছন ধরিয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতেও খানিকটা সমজদার হওয়া চাই। এই উদ্দেশ্যে বিদেশেই করিৎ-কর্ম্মা ভারত-সন্তানের স্থায়ী উপনিবেশ থাকা দরকার।

প্যারিসের লাইব্রেরীগুলা দুর্গ বা জেলখানা-বিশেষ। আমেরিকার গ্রন্থশালাগুলা যেমন খোলা, ফ্রান্সের কেতাবখানাগুলা তেমন আটক। যে-সে লোকের পক্ষে যখন-তখন প্রবেশ করা অসাধ্য। ছাড়পত্র বা কার্ড প্রত্যেক লাইব্রেরিতেই দরকার। কার্ড সংগ্রহ করাও কঠিন ব্যাপার। কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি-বিশেষের সার্টিফিকেট চাই। অবশ্য ছাত্রেরা সহজেই এই সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু হঠাৎ কোনো দরকার উপস্থিত হইলে, এক

মিনিটের জন্য কোনো লাইব্রেরিতে গিয়া কোনো কেতাব দেখিয়া আসা প্যারিসে অসম্ভব।

পাঁচ-সাতটা লাইব্রেরীতে কর্তাদের নিকট হইতেই কার্ড পাইয়াছি। ঘটনাচক্রে এজন্য কোনো আফিসী কায়দার ভিতর দিয়া চলিতে হয় নাই। কিন্তু প্যারিসের লাইব্রেরিগুলায়, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতেও ব্যবস্থা, কলম্বিয়া, হার্ভার্ড অথবা নিউইয়র্ক পাব্লিক লাইব্রেরীর মতন সুবিধা-জনক নয়। কোনো এক জায়গায় বসিয়া সহজে কম সময়ে দুনিয়ার যে কোনো গ্রন্থ বা পত্রিকার সন্ধান পাওয়া প্যারিসে এক-প্রকার কঠিন।

এখানকার সর্ব্ব-বৃহৎ লাইব্রেরির নাম বিব্লিওটেক্ ন্যাশন্যাল (Bibliotheque Nationale)। বিদেশীর পক্ষে এখানে প্রবেশলাভ করা এক মহা হাঙ্গামা! এমন কি, একদিনের জন্য মাত্র প্রবেশ করিতে চাহিলেও পাশপোর্ট দেখাইতে হয়। তার পর যদি কেহ একটা স্থায়ী বাৎসরিক কার্ড চাহে, তবে নিজ-দেশীয় অ্যাম্ব্যাসাডারের সহি করা এক সার্টিফিকেট আবশ্যক হয়। বলা বাহুল্য, পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা বিদ্যা-চর্চ্চায় ইস্তাফা দিতে রাজি, তথাপি এম্বাসীর ত্রিসীমানায়ও পা-মাড়াইতে নারাজ। ফ্রান্স আগাগোড়া আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা ;—এই হিসাবে মার্কিণমুল্লুক সত্য-সত্যই স্বাধীন এবং ডেমোক্র্যাটিক।

পঞ্জাবের আর্য্যসমাজীরা পতিত-হিন্দুকে এবং বোধ হয় অহিন্দুকেও হিন্দু করিয়া তুলে। ইহার নাম শুদ্ধি। আমেরিকায় এই ধরণের এক প্রক্রিয়া আছে। ইয়োরোপ হইতে আমদানি করা ইতালীয় গ্রীক, হাঙ্গারিয়ান, পোল, চেকো স্লোভাক ইত্যাদি জাতীয় লোকগুলিকে ইংরেজি শিখানো মার্কিণ রাষ্ট্রের এক প্রধান সমস্যা। এই কাণ্ডটাকে মার্কিণ পারিভাষিকে বলা হয় "আমেরিকানিজেশন" (Americanization) বা মার্কিণীকরণ। ফ্রান্সেও দেখিতেছি এই শ্রেণীর এক আন্দোলন। "ফরাসী সম্মিলন" নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য বিদেশী ছাত্র, শিক্ষক ও পর্য্যটকগণকে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য শিখানো। কেন্দ্রের নাম আলিয়ান্স ফ্রান্সেজ (Alliance Francaise)। অনেক বিদেশীই এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্য লইয়া থাকে।

এক পরিবারে কয়েক ঘণ্টা কাটানো গেল নৈশ-বৈঠকে। কর্তা ছিলেন যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় সিপাহীদের তত্ত্বাবধানে। ইঁহার পত্নী ও কন্যা বন্ধুবর্গকে গুর্খাদের এক কুক্রি দেখাইলেন। কর্তা মহাশয় ইয়ারদিগকে বুঝাইয়া দিলেন—"নেপাল দেশটা পুরাপুরি স্বাধীন। তথাপি নেপালবাসীরা 'সেচে এসে' ইংরেজকে সাহায্য করিয়াছিল। ভারতবর্ষ কি আর কখনো স্বাধীন হইতে পারে?"

প্যারিসে বহু পোল-জাতীয়ের বাস। যুদ্ধের পূর্ব্বে ত অনেকেই ছিল। এখনও সংখ্যায় কয়েক হাজার হইবে। এই পরিবারে দেখিতেছি স্ত্রীও চিত্রকর, স্বামীও চিত্রকর। স্বামীর শিল্প বিল্কুল কিউবিক,—স্ত্রী চলেন অনেকটা বাঁধা পথে। স্ত্রী-শিল্পীর কোনো-কোনো ছবি ইতিমধ্যে বিলাতের চিত্র-পত্রিকায় স্থান পাইয়াছে। ইঁহাদের নাম মার্ক্স্।

ভিক্টর বাশ্ একজন বক্তা বটে। অধ্যাপক মহলে এই ধরণের বাগ্মী সাধারণতঃ বড় চোখে পড়ে না। বাশের দুই বক্তৃতা শুনিলাম। একটাতে সাধারণের প্রবেশ অনুমোদিত। ইহাতে লোক উপস্থিত বুড়ায় বুড়ায় এবং স্ত্রী-পুরুষে প্রায় পাঁচশত। বক্তৃতার বিষয় নৃত্যকলা। দ্বিতীয় বক্তৃতায় উপস্থিত একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। সংখ্যা ৭৫। ইঁহাদের পঞ্চাশ জন বিদেশী। স্ত্রীরাই অধিকাংশ; তবে ইংরেজ, মার্কিণ, পোল, হাঙ্গারিয়ান, স্পেনিয়, রুমেনিয়াণ, চেক এবং সার্ব্বও আছে। আলোচ্য বিষয় সুকুমার শিল্প।

বাশ্ বলিলেন, প্যারিস ছাড়া জগতে আর কোথাও এস্থেটিক্স্ শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র অধ্যাপক নাই। বার্লিণে, হার্ভার্ডে সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব সাধারণ দর্শনের এক শাখা স্বরূপ আলোচিত হয় মাত্র। বাশ্ প্রণীত "কাণ্টের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব" অতি প্রসিদ্ধ। ইতালীর দার্শনিক ক্রোচে (Croce) স্বকীয় "এস্থেটিক্" গ্রন্থে বাশের কবিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বাশ্ বলিতেছেন—"ক্রোচে নিতান্ত অগভীর ও ভাসা-ভাসা। ইতালীর সকল পণ্ডিতই প্রায় এই ধরণের। ইহাঁদের চিন্তায় একটা গাম্ভীর্য্য বা নিরেট গবেষণা ঢুঁড়িয়া পাই না।" কয়েক মাস হইল বাশের দুইখানা নূতন বহি বাহির হইয়াছে। একখানা চিত্র-শিল্পী টিসিয়ান (Titien) সম্বন্ধে। আর একখানার নাম Etudes d'esthetique dramatique। বাশ্ সুকুমার-শিল্প বলিতে নাচ গান, বাজনা হইতে আরম্ভ করিয়া নাটক, সাহিত্য, উপন্যাস সবই

বুঝিয়া থাকেন। এক হিসাবে গোটা সভ্যতাই বাশের আলোচ্য বিষয়। একল দেজ ওৎ এতুদ্ সেসিয়াল (Ecole-des hautes etudes socia es) নামক সমাজ-বিদ্যার কলেজে ইনি বক্তৃতা করিতেছেন, "থিয়েটার ও মানব-জীবন" সম্বন্ধে।

(৪)

ফুল বিক্রী হয় প্যারিসে বিস্তর। ইয়াঙ্কিস্থানে ফুলের রেওয়াজ এত বেশী দেখি নাই। এখানে সদরথানার সম্মুখেও এক প্রকাণ্ড ফুলের বাজার। নীল গোলাপ কেহ কখনো দেখিয়াছে কি? তাহাও দেখিলাম—ম্যাদলেইন (Madeleine) গির্জ্জার লাগা, ফুলের বাজারে।

বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির ভাষা যত সহজ, নাটক বা কাব্যের ভাষা তত সহজ নয়। আজও ফরাসী নাটক পড়িয়া সহজে বুঝিতে পারিতেছি না। কবি, নাট্যকারেরা অনেক সময়ে নিতান্ত ঘরোয়া শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অধিকন্তু বহু লেখকের রচনাতেই নিজ-নিজ মার্কামারা অনেক শব্দ দেখা যায়। কাজেই অভিধানের সাহায্য না লইয়া নব্য ফরাসী কবিদের টাট্‌কা লেখাগুলা বুঝিতে পারিলে বলা যাইতে পারে যে, ফরাসী দখল হইয়াছে দস্তুর মত। তাহার পূর্ব্বে নয়। খবরের কাগজ পড়িতে পারা বিশেষ বাহাদুরীর কাজ নয়।

এদিকে কথা বলার এক নূতন পরীক্ষা আবিষ্কার করিয়াছি। পুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করা যত সোজা, স্ত্রীলোকের সঙ্গে তত সোজা নয়। পুরুষের উচ্চারণ আজ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বোধ হয় বুঝি; কিন্তু স্ত্রীলোকের আওয়াজ দশভাগও কাণে ধরিতে পারি না। কাজেই যে বিদেশী ফরাসী মেয়েদের কথা বুঝিতে পারে, সে ভাষাটা আয়ত্ত করিয়াছে বলিতে পারে।

লড়াইয়ের ধাক্কায় ফরাসীরা অনেকে ইংরেজি শিখিয়াছে। রাস্তায়-ঘাটে যেখানে-সেখানে ইংরেজি-জানা স্ত্রী-পুরুষের সন্ধান পাই। ছোট-খাটো হোটেলে, ক্যাফেতে এবং দোকানেও একটা বিজ্ঞাপন প্রায়ই চোখে পড়ে। তাহার মর্ম্ম এই :—"এখানে ইংরেজি বলা হয়।" আর পণ্ডিত-মহলে ত দেখিতেছি, ইংরেজি জানে না, এমন লোক এক প্রকার বিরল।

বৃটানি প্রদেশের পৈতৃক ভিটা হইতে আনাটোল লে-ব্রাজ (Anatole Le-Braj) লিখিয়াছেন :—আপনি আমাদের আদ্রো বেণাকের (Audre Benac) সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন কি? তাঁহাকে আমরা বন্ধুবর্গ যীশুখৃষ্ট জ্ঞানে সম্মান করি। ইনি এতই অমায়িক ভাল মানুষ।" বেণাক্ ব্যাঙ্কারদের এক অগ্রণী লোক। প্রকাণ্ড কয়লার খনির কারবারের ইনি প্রেসিডেণ্ট। ব্যবসা সম্বন্ধে নানা কথা হইল। লে-ব্রাজ মধ্য-যুগের ফরাসী-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ। সরকারী খাতিরে ইনি উচ্চ-পদস্থ।

গ্যালিয়েরা প্রতিষ্ঠিত মিউজিয়ামে ফরাসী শিল্পকলার প্রদর্শনী খোলা হইল। এই শিল্প নব্য-তন্ত্রের কিউবিষ্ট বা ফিউচারিষ্ট মাল নয়। বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল আসবাব-পত্রগুলা। কাচ, পাথর, সোণা, রূপা, পোর্সলেন ইত্যাদি নির্ম্মিত বাসন-কোসন সু-প্রচলিত ফরাসী সৌখীনতার নিদর্শন। হাতীর দাঁতের ফুল, বই বাঁধাইবার নানা প্রকার মলাট এবং ঘর, টেবিল ইত্যাদি সাজাইবার জিনিস—সবই দেখিতে চমৎকার। শিল্পের ধারাটা যদি বজায় থাকিত, আর লোক-জনের যদি খরিদ্দ করিবার টাকা থাকিত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের কারিগরেরাও এই ধরণের মাল আজকাল-কার বাজারে জাহির করিতে পারিত। কাজেই ফরাসী বিলাসদ্রব্য দেখিয়া আমাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগিবার কিছু নাই। এ সব পয়সার খেলা।

প্যারিসের মাষ্টারগুলা দেখিতেছি প্রায় সকলেই বাগ্মীবিশেষ; এমন কি চিত্তবিজ্ঞানের ক্লাশেও লোকের ঝুলাঝুলি। বসিবার দাঁড়াইবার ঠাঁই নাই। অধ্যাপকের নাম ব্রুন্‌শ্বিগ্ (Brunschvicg)। ইনি রিআলিজ্‌ম্, নমিনালিজ্‌ম্ ইত্যাদি বুঝাইতেছেন ঠিক কোনো উকীল বা "স্বদেশী বক্তা"র মতন। আর বুড়া-বুড়ী ছোঁড়া-ছুঁড়ীরা শুনিতেছে হাঁ করিয়া। অদ্ভুত ক্ষমতা। বলিবার ভঙ্গীটাই চিত্তাকর্ষক।

এক স্পেনিষ ভাস্কর প্যারিসে বসতি করেন বহুকাল। তাঁহার ষ্টুডিওতে দেখিলাম, একজন স্পেনিষ মহিলা টুলের উপর বসা। শিল্পী কাদামাটি দিয়া তাঁহার মূর্ত্তি গড়িতেছেন। অল্পক্ষণের ভিতরই একটা জ্যান্ত মুখমণ্ডল সৃষ্টি হইল। শিল্পীর হাত পাকা। ইঁহার নাম ক্রেফ্‌ট (Creeft)। ক্রেফ্‌টের কর্ম্মশালায় অনেকগুলা ভাল ভাল কল্পনায় গড়া

মূর্ত্তি দেখিলাম। মামুলির চেয়ে উঁচু। স্বাধীন চিন্তা দেখিতে পাই রেখার টানে এবং অঙ্গের গড়নে। কিন্তু ক্রেফ্‌ট বলিলেন—"এগুলা বাজারে বিক্রী হয় না। অন্ন-বস্ত্রের জন্য আমাকে বাজারে জোগাইতে হয় অন্য প্রকার মাল।"

আলেঁদি একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। ইনি আলোচনা করেন জ্যোতিষ। এই সম্পর্কে ভারতের পরিচয়। সম্প্রতি বাতিক দেখিতেছি দ্বাদশ রাশিচক্রের প্রত্নতত্ত্বে। জোডিয়াক (Zodiac) সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ দেখিলাম ইহাঁর বৈঠকখানায়। থিয়জফি হইতে ইনি জোডিয়াকে পৌঁছিয়াছেন, কি জোডিয়াক হইতে থিয়জফিতে ঝুঁকিয়াছেন, বুঝা গেল না।

আমেরিকার ল্যাবরেটারিগুলার তুলনায় এখানকার কলেজ দ' ফ্রান্সে" (College de France) এর ল্যাবরেটরি সব গোয়াল-ঘরের সমান। অথচ প্যারিসে যত বড় বড় আবিষ্কার হইয়াছে ও হইতেছে, ইয়াঙ্কিস্থানে তাহার জুড়ি বেশী নাই। বায়োলজির ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করিয়া ভাবিলাম যেন একটা সাদাসিধা তৃতীয় শ্রেণীর হাঁসপাতালের কয়েকটা ঘর দেখিতেছি। বহির্দৃশ্য ত নেহাৎ কদাকার বটেই। পরীক্ষালয়ের কর্ত্তার নাম গ্লে (Gley)। ইনি শারীরতত্ত্ব (ফিজিয়লজি) বিদ্যায় একজন ১ নং ফরাসী বৈজ্ঞানিক। গ্লে বলিতেছেন—"আমরা এখানে ছেলে পিটিয়া মানুষ করি না। লেখাপড়া শেষ করিবার পর যাহারা প্রাণবিজ্ঞানের সীমানা বাড়াইতে চায়, তাহাদের জন্য কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করা কলেজ দ' ফ্রান্সের উদ্দেশ্য।" সম্প্রতি দুইজন সুইডেনের ডাক্তার, দুইজন জাপানী অধ্যাপক, কয়েকজন স্পেনের বৈজ্ঞানিক গ্লে'র তত্ত্বাবধানে গবেষণা করিতেছেন।

সমর-মিউজিয়ামের কর্ত্তা ক্যামিল ব্লক (Camille Block) বলিলেন, "যুদ্ধের হিড়িকে পৃথিবীর সকল দেশেই সমর-লাইব্রেরী এবং সমর-মিউজিয়াম স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়ে দুই পক্ষের গবর্মেণ্টগুলা ছাপাখানার কাজে যত টাকা খরচ করিয়াছে, আর কোন যুদ্ধে তত খরচ করে নাই। প্রথমতঃ নিজ দেশীয় নরনারীকে যুদ্ধের উদ্দেশ্য বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ শত্রুপক্ষের নিন্দা প্রচার করিতে হইয়াছে। তৃতীয়তঃ মিত্রশত্রু-রাষ্ট্রের বা উদাসীন রাষ্ট্রের জনগণের সহানুভূতি সৃষ্টি করিবার আয়োজন করিতে হইয়াছে। ফলতঃ ছবি, পুস্তিকা, হ্যাণ্ডবিল, পোষ্টকার্ড, খবরের কাগজ, মাসিক পত্র ইত্যাদির লড়াই অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনানি এবং এরোপ্লান সাবমেরিণের গুঁতাগুঁতি অপেক্ষা কোন হিসাবে কম চলে নাই।

"বাগ্‌-যুদ্ধের মাত্রা জাপানী লড়াইয়েও খুব বেশীই হইবে। কাজেই এখন হইতে বিলাতে, জাপানে, জার্ম্মাণিতে, ইটালীতে, আমেরিকায় সর্ব্বত্রই পুরাণ যুদ্ধে ব্যবহৃত সকল প্রকার সাহিত্য রক্ষিত হইতেছে। ফ্রান্সেও আমরা এই গ্রন্থশালা ও মিউজিয়াম সুরু করিয়াছি।"

দেখিলাম দুনিয়ার সব ঠাঁই হইতে হরেক রকম-কেতাব, বুলেটিন বিজ্ঞাপন-পত্র মজুত করা হইতেছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে যে সকল নিতান্ত নগণ্য চিরকুট ছাপা হইতেছে, তাহাও বাদ পড়িতেছে না। হাজার হইলেও ইংরেজ যদিও ঘটনাচক্রে মিত্রই বটে, মিউজিয়ামের সংগ্রহালয়ে সবই সাদরে গ্রহণীয়।

প্যারিসে বইয়ের দোকান বেশী, কি মদের দোকান বেশী, গুণিয়া উঠিতে পারিতেছি না। শিল্প-দ্রব্যের ছোট, বড়, মাঝারি দোকান প্রায়ই চোখে পড়ে। নেহাৎ ছোট বইয়ের দোকানে—অতি উঁচুদরের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক কেতাব পাওয়া যায়।

মিউজিয়ামের সংখ্যাও কম নয়। ত্রোকাদেরো (Trocadero) মিউজিয়ামে দেখিতেছি, ফরাসী স্থাপত্যের নমুনা ও নকল। ফ্রান্সের নানা জেলার যে সকল সৌধ ও মূর্ত্তি দর্শনযোগ্য, সেইগুলা এইখানে একসঙ্গে দেখা যায়। এই জন্য মিউজিয়ামের নাম স্কল্‌তুর কঁপারাতিফ্‌।

লড়াইয়ের হাঙ্গামায় উত্তর অঞ্চলের যে সকল গির্জ্জা লুপ্ত হইয়াছে, সেইগুলির কোন-কোন অংশের নকলও ত্রোকাদেরোতে আছে। আর মিউজিয়ামে গোটা ফ্রান্সের শিল্প-পরিচয় পাইলাম। এই পরিচয় লাভ হইল যুগ হিসাবে, —জেলা হিসাবে নয়। ভবনের নাম মিউজে দেজ্‌ আর দেকোরাতিফ্‌ (Muse'e des arts decoratifs)। বাড়ীটা প্রাসাদতুল্য।

লুভ্‌র্ (Louvre) মিউজিয়ামের নাম ভারতে অজানা নাই। অন্ততঃ, এখানকার "ভেনুস্‌" মূর্ত্তির কথা অনেকেই জানে। লুভ্‌র্ বলিলেই সাধারণ লোকেরা Venus

(des Milo) অর্থাৎ মিসে বা মেলস দ্বীপে হঠাৎ প্রাপ্ত ভিনাসের মর্ম্মর-দেহ সমজিয়ে থাকে।

লুভ্রে ইচ্ছা করিলে সারা জীবন কাটানো যায়। এখানকার সংগ্রহ-সম্পৎ এতই বিপুল। শিল্পী সৌন্দর্য্যের তরফ হইতে, অথবা নিজ মন মাফিক কলা-সৃষ্টির মতলবে, এখান হইতে অসংখ্য ইঙ্গিত বহন করিয়া লইতে পারেন। ঐতিহাসিক গোটা দুনিয়া মন্থনের সুযোগ পাইবেন। কথায় বলে, লুভ্রে কোনো ব্যক্তি যদি এক ঘর হইতে আর এক ঘর করিয়া একবার মাত্র হাটিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে অন্ততঃ ছয় ঘণ্টা কাটাইতে হইবে।

লুভ্রটা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দুর্গ ছিল;—পরে বর্দ্ধিত ও প্রাসাদে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গোটা বাড়ীটা আর প্রাসাদরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। কোন-কোন অংশ জনসাধারণের দেখিবার জন্য খুলিয়া দেওয়া হয়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের সঙ্গে-সঙ্গে গোটা প্রাসাদই মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়। আজ যে বাড়ীটা দেখিতেছি, তাহার নবীনতম অংশগুলা তৈয়ারী হইয়াছে ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে—তৃতীয় নেপোলিয়ানের আমলে। এখন লুভ্র-পাড়ায় আসিলে, সেইনের কিনারা হইতে এক বিপুল প্রাসাদ-শ্রেণী দৃষ্টি-গোচর হয়। অপর পারে "আঁস্তিতিউ"—ভবন।

শীতকালে এফেল (Eiffel) মনুমেণ্টের মাথায় উঠিতে দেয় না। দোতলা পর্য্যন্ত উঠিলাম। কুয়াশায় বেশী কিছু দেখা গেল না। গোটা সহরটা অবশ্য নজরে আসে। উঠিতে হয়, বলা বাহুল্য, বিদ্যুতের গাড়ীতে। মনুমেণ্টটা বিখ্যাত "শাঁ দ' মারস্" নামক এক "গড়ের মাঠের" সীমান্তে অবস্থিত; সেইনের এক সাঁকোর মাথার নিকট। ব্যস্তিয় (Bastille) জেলটা যেখানে ছিল, সেখানে আজকাল এক মনুমেণ্ট বিরাজ করিতেছে। ঐটা কিন্তু প্রথম বিপ্লবের (১৭৮৯) স্মৃতি-চিহ্ন নয়; ইহা ১৮৩০ সালের জুলাই মাসের সাক্ষী। মনুমেণ্টে উঠা যায়। উঁচু যদিও অতি বেশী নয়,—সহরের অনেকটাই একবারে ভাল করিয়া দেখা গেল। প্যারিসের সৌধ-গৌরবের তারিফ করিতেই হইবে।

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

ষট্‌ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গ্রামের চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া, সরস্বতী হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল, এবং চুল্লীর নির্ব্বাপিত অগ্নি পুনরায় জ্বালিয়া রন্ধনে মনঃসংযোগ করিল। রন্ধনান্তে আহার করিতে-করিতে তাহার স্মরণ হইল যে, দুইটি ব্রাহ্মণকন্যা তখনও অভুক্তা আছে! সরস্বতী স্বভাবতঃ কঠিন-হৃদয়া ছিল না। দুর্গা ও বড়বধূর অবস্থা স্মরণ হওয়ায়, তাহার অন্নে রুচি সহসা অন্তর্হিত হইল। অর্দ্ধভুক্ত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া সে উপরে গেল। তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখী যে পলাইয়াছে এবং পিঞ্জর যে শূন্য, সরস্বতী তাহা বুঝিতে পারিল না। সে অন্ধকারে শূন্য কক্ষের দুয়ারে দাঁড়াইয়া, বারবার ডাকিয়াও যখন উত্তর পাইল না, তখন সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে হাতড়াইতে আরম্ভ করিল। অনুসন্ধান শেষ হইলে তাহার মনে হইল, ধূর্ত্ত নবীনদাস তাহাকে ফাঁকী দিবার জন্য বন্দিনীদ্বয়কে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। দুঃখে ও ক্রোধে গর্জ্জন করিতে-করিতে সরস্বতী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে এক বৃদ্ধ মুসলমান একাকী সেই পুরাতন মস্‌জিদে আসিয়াছিল। বৃদ্ধ প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন, এবং বার্দ্ধক্যবশতঃ প্রায় কোন কথাই শুনিতে পাইত না। তাহার কর্ণের নিকটে আসিয়া গগনভেদী রব না করিলে, তাহাকে কোন কথা শুনান অসম্ভব ছিল। বৃদ্ধ যখন মস্‌জিদের নিকটে আসিল, তখন কারারুদ্ধ নবীনদাস তাহার পদ-শব্দ শুনিতে পাইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নরসুন্দরকুলতিলকের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সিংহনাদের কণামাত্র বৃদ্ধের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। মস্‌জিদের নিকটে আসিয়া বৃদ্ধ যখন সোপানে আরোহণ করিতে

আরম্ভ করিল, তখন নবীন হতাশ হইয়া সবলে কবাটে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। প্রচণ্ড আঘাতে কবাটের সহিত প্রাচীন মস্‌জিদের ভিত্তি কাঁপিয়া উঠিল। দৃষ্টি ও স্মৃতিশক্তিহীন বৃদ্ধ সে কম্পন অনুভব করিল। সে সোপান অবলম্বন করিয়া নামিয়া আসিল, এবং দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কম্পনের কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, দ্রুতপদে গ্রামে ফিরিয়া গেল।

গ্রামের সীমায় এক যুবাকে দেখিতে পাইয়া, বৃদ্ধ তাহাকে প্রত্যাগমনের কারণ জানাইল। যুবা মুসলমান,—দিনান্তে লাঙ্গল-স্কন্ধে গৃহে ফিরিতেছিল। সে প্রথমে বৃদ্ধের কথায় পুরাতন মস্‌জিদে ফিরিতে সম্মত হইল না; কিন্তু অবশেষে কৌতূহলপ্রণোদিত হইয়া বৃদ্ধের সহিত চলিল। তাহারা মস্‌জিদের নিকটে আসিলে, নবীনদাস তাহাদিগের পদশব্দ শুনিতে পাইয়া, পুনরায় চীৎকার করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। সে ধ্বনি বৃদ্ধ শুনিতে পাইল না বটে, কিন্তু কৃষক-যুবা তাহা শুনিয়া, ভয়ে রুদ্ধ-গতি হইয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ অনেক অনুরোধ করিয়াও তাহাকে দুয়ারের নিকটে আনিতে পারিল না।

মণিয়া যখন প্রথমে নবীনদাসকে বন্দী করে, তখন প্রৌঢ় নরসুন্দর প্রথমে কিঞ্চিৎ চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল যে, মণিয়া ক্রমশঃ তাহার প্রতি অনুরাগিনী হইতেছে; এবং এই বন্দীকরণ সেই অনুরাগের প্রথম লক্ষণ মাত্র। কিন্তু এক দণ্ডকাল পরেও বিবি সাহেব যখন দুয়ার খুলিয়া দিল না, এমন কি তাহার কাতর অনুরোধে বিচলিত হইয়া উত্তর পর্য্যন্ত দিল না, তখন নবীনের মনে সন্দেহ হইল। সে তখন স্বয়ং মুক্তির উপায় অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই পুরাতন মস্‌জিদের নিম্নে প্রতিদিকে তিনটি করিয়া চারিদিকে দ্বাদশটি খিলান ছিল; কিন্তু নবীনের দুরদৃষ্টবশতঃ তাহার মধ্যে একাদশটি চিররুদ্ধ; এবং একমাত্র দ্বার বহির্দ্দেশ হইতে অর্গলবদ্ধ।

দুয়ার খুলিতে না পারিয়া নবীন ভিতর হইতে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; এবং সেই উপলক্ষে শববহনের খট্বা দুইখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। দুয়ার ভাঙ্গিল না দেখিয়া, সে তারস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; এবং কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইলে নিবৃত্ত হইল। পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ যখন প্রথমবার মস্‌জিদে আসিয়াছিল, তখন নবীন সেইমাত্র নীরব হইয়াছে।

বৃদ্ধ যখন কৃষক-যুবাকে লইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন নবীনের স্বরভঙ্গ হইয়াছে। অন্ধকারে, জনশূন্য প্রান্তরে তাহার বিকৃত কণ্ঠের চীৎকার যুবাকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। চীৎকার করিয়াও যখন সে উত্তর পাইল না, তখন সবলে কবাটে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। প্রথম আঘাতের শব্দ শুনিয়াই যুবা জিন্, শয়তান, এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। বৃদ্ধ তাহার কথা শুনিতে পাইল না বটে, কিন্তু ভাবে বুঝিতে পারিল যে, যুবা অত্যন্ত ভীত হইয়াছে; সুতরাং সে অযথা কালক্ষেপ না করিয়া, মস্‌জিদ পরিত্যাগ করিল।

কৃষক-যুবা যখন গ্রামসীমায় উপস্থিত হইল, তখন একজন বিদেশী হিন্দু গ্রাম্য-পথ দিয়া গ্রামের বাহিরে আসিতেছিল। সে যুবাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধু, এই গ্রামে কি মুসাফিরখানা আছে?" যুবা তাহা শুনিতে না পাইয়া কহিল, "শয়তান—জিন্"; এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া, দ্রুত-পদে পলায়ন করিল। আগন্তুক বিদেশী, তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছিল। যুবাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, সে বলিয়া উঠিল, "গ্রামের জিন্ ও শয়তান হয় ত গ্রামের লোক অপেক্ষা মেহেরবাণ; সুতরাং মানুষের আশ্রয়ের অভাবে জিন্ বা শয়তানের আশ্রয়ে দোষ নাই।" কিয়দ্দূর গমন করিতে-করিতে, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধের সাক্ষাৎ হইল। সে যথাসম্ভব নম্রতা সংগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব, জিন্ কোথায়?" বৃদ্ধ কিছুই শুনিতে পাইল না বটে, কিন্তু সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া মস্‌জিদটি দেখাইয়া দিল। আগন্তুক দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া, বৃদ্ধের নির্দ্দেশমত চলিতে আরম্ভ করিল।

তাহার পদশব্দ শুনিয়া, নবীন দাস পূর্ব্ববৎ চীৎকার ও কবাটে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু আগন্তুক বিচলিত না হইয়া, মস্‌জিদের সোপানে আরোহণ করিল। ক্লান্ত, বিকৃত-কণ্ঠ নবীন যখন নিবৃত্ত হইল, তখন আগন্তুক ধীরে-ধীরে দুয়ারের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দোস্ত্, তুমি কি সত্য-সত্যই শয়তান?" প্রশ্ন শুনিয়া নবীন স্তম্ভিত হইয়া গেল; কোনও উত্তর দিল না। অল্পক্ষণ পরে আগন্তুক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি দোস্ত, জবাব দাও

না কেন? তুমি কি সত্যই শয়তান? আমার উপস্থিত শয়তানের বিশেষ প্রয়োজন।” নবীন তাহার প্রশ্ন এবারেও বুঝিতে পারিল না; কিন্তু সে ভরসা করিয়া কথা কহিল। সে কহিল, “আমি শয়তান নহি, মানুষ। তুমি দুয়ার খুলিয়া দাও, আমি তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিব।” আগন্তুক হাসিয়া কহিল, “এ কথা জিন্ মাত্রেই বলিয়া থাকে। তাহার পর মুক্ত করিয়া দিলে, ঘাড়টি ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যায়। তুমি আমাকে যতটা বেকুব মনে করিতেছ জিন্, আমি ততটা বেকুব নহি। তুমি কোন্ দেশের জিন্?” নবীন ভাবিল, আগন্তুক তাহার সহিত রহস্য করিতেছে; সুতরাং সে উত্তরে কহিল, “আমার নিবাস বাঙ্গালা দেশে।” “হুঁ। শুনিয়াছি, মুসলমান বাঙ্গালা দেশে গেলেই ভূত হয়; এইজন্য দিল্লীতে বাঙ্গালা দেশের নাম দোজখ্। তুমি যখন মস্‌জিদে আবদ্ধ আছ, তখন তুমি নিশ্চয়ই মুসলমানের ভূত। আর আমি হিন্দু, সুতরাং দরজা খুলিলে, ঘাড়টি না ভাঙ্গিয়া ছাড়িবে না;—সঙ্গে-সঙ্গে চেলা বানাইবে। হরে, হরে, দোস্ত্, তোমাদের খোদা তোমার সদ্গতি করুন।” আগন্তুক উঠিয়া যায় দেখিয়া, নবীন দাস প্রথমে অনুনয়, বিনয়, তাহার পরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। আগন্তুক কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; সে কহিল “আমি দরিদ্রের সন্তান;—পঞ্জাব হইতে বিহারে পয়সা রোজগার করিতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু জান্ দিতে ত আসি নাই। জান্‌ই যদি গেল, তবে পয়সায় প্রয়োজন কি?” ব্যাকুল হইয়া নবীন দাস ক্রমশঃ মূল্যবৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইল। ক্রমে এক আশরফি হইতে মূল্য পাঁচ আশরফিতে গিয়া দাঁড়াইল। তখন আগন্তুক কহিল, “দোস্ত্, শয়তানের আশরফি মানুষের হাতে আসিলে, হাওয়া হইয়া উড়িয়া যাইবে না ত? একটা নমুনা ছাড় দেখি।” নবীন দাস ব্যগ্র হইয়া দুয়ারের নিম্নে একটা আশরফি গড়াইয়া দিল। আগন্তুক তাহা লইয়া, টিপিয়া, বাজাইয়া, নানা রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিল; এবং কহিল, “দেখ জিন্ সাহেব, পাঁচ-পাঁচ আশরফির লোভে দুয়ার ত খুলিয়া দিতে রাজি হইয়াছি; কিন্তু দুয়ার খুলিয়া দিলে যদি আশরফি না দাও?” নবীন যতগুলা দেবতার নাম জানিত, সকলের নাম লইয়া শপথ করিল; কিন্তু আগন্তুক তাহাতেও নরম হইল না। সে কহিল, “এ সকলগুলা ত হিন্দুর ঠাকুর; আর তুমি ত মুসলমানের ভূত?” নবীন কহিল, “দোহাই ধর্ম্মের, আমি হিন্দু।” “তোবা, তোবা! আওরঙ্গজেব বাদশাহের পরে হিন্দুর ভূত ভুলিয়াও মস্‌জিদের কাছ দিয়া না।” “তবে কি করিলে তোমার বিশ্বাস হইবে?” “নগদ তিন আশরফি বায়না ছাড়—আর বাকি দুইটা দুয়ারের নীচে গলাইয়া রাখ,—আমি এক হাতে টিপিয়া ধরি, আর এক হাতে দুয়ার খুলি।” নবীন একে-একে আরও দুইটি আশরফি গলাইয়া দিল। তিনটি আশরফি হস্তগত হইলে, আগন্তুক কহিল, “জিন্ সাহেব, তুমি আমীর ছিলে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। যাহাই হউক, তুমি যখন জিন্,—মুসলমানের ভূত—আর আমি হিন্দু, তখন সাবধানে চলাই কর্ত্তব্য। তুমি একটু বিলম্ব কর, আমি আশরফি তিনটা একজনকে দিয়া আসি।” নবীনদাস তাহার কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। আগন্তুক তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া সুদীর্ঘ পাদক্ষেপে প্রস্থান করিল। (ক্রমশঃ)

বাণীর বরাত

[শ্রীশৈলেশচন্দ্র ঘোষ]

কি আর বয়স তার! কচি—খুকী মেয়ে
বাণী মোর এক রত্তি, বাড়ন্ত গঠন।
চোখে মুখে বুলি তার কম কার চেয়ে?
সব লীলা শিখেছে সে,—না মানে বাঁধন।
নিজ গুণে সব' মন করিয়া হরণ
আদরের অত্যাচারে ওষ্ঠাগত প্রাণ;
হলেও বয়সে ছোট, প্রেমিক অগণ—
অন্তঃসার হীনবটে, আবেশে অজ্ঞান।
ছোট বড় সবাকার বড়ই কদর,
ঠিক কিছু নাহি হ'স কোন্ আভরণ
সাজে তারে; এই ল'য়ে বিতর্ক বিস্তর
প্রকৃতি ভূষণ কি গো এত অশোভন?
কত বল সহে হেন প্রেমের উৎপাত?
দেখে মোর ভয় হয় বাণীর বরাত্।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বঙ্গের পোর্টুগীজ আড্ডা

[অরুণ দত্ত]

(১) ঐতিহাসিক উপকরণ

বঙ্গদেশের সাগরতীরে এককালে পোর্টুগীজদের কি রকম আড্ডা ছিল, বাণিজ্য করিয়া তাহারা কি রকম সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, পরে কিরূপ অত্যাচার করিত, এবং পরিশেষে কি করিয়া তাহাদের প্রতিপত্তির লোপ হইল, সুখের বিষয়, এই সকল ঘটনার বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়া যায়। এ বিষয়ে প্রধানতঃ Portuguese in India নামক পুস্তক সবিশেষ কাজে লাগে। ইহা ইংরেজীতে লিখিত এবং দুই ভলুমে সমাপ্ত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া, নিকোলাস পিমেণ্টা নামক একজন জেসুইট পাদরী ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে Relatio Hutorica de Rebus in India Orientali নামক পুস্তক প্রণীত করেন; এই পুস্তক পাঠে তৎকালীন পোর্টুগীজদের চালচলনের আভাস পাওয়া যায়।

আর একজন জেসুইট পাদরী পিয়ার দ্যু জারিকের লেখা Historie der Indes Orientales (IV partie) এসিয়া খণ্ডে খৃষ্ট-ধর্ম্মপ্রচারের সুবিস্তৃত ইতিহাস। ইহার তৃতীয় খণ্ড আমাদের সবিশেষ প্রয়োজনে আসে। তাহাতে প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায়ের বিষয় বর্ণিত আছে। পোর্টুগীজ সেনাপতি কার্ভালোর ইতিহাস আমরা এই গ্রন্থে প্রাপ্ত হই।

ড ব্যারোসের পোর্টুগীজ পুস্তক Da Asia হইতে পোর্টুগীজ বাণিজ্য বিস্তারের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কোন কোন সংবাদ পাওয়া যায়।

এই সব ছাড়া, মার্শম্যান্ ও ইলিয়ট সাহেবের ভারতের ইতিহাস; রিয়াজ-উস্-সালাতিন, Hooghly Past and Present; Stewart's History of Bengal; History of the Portuguese in Bengal (camps); ফার্সী ইতিহাস পাদিশাহ্‌নামা ইত্যাদি পুস্তক হইতে অনেক উপকরণ প্রাপ্ত হই।

(২) প্রথম পোর্টুগীজ আড্ডা

আকবরের সময় হইতেই পোর্টুগীজ আড্ডা স্থাপিত হইতে থাকে। তাঁহার অন্তঃপুরিকা মেরীর সাহায্যে পোর্টুগীজরা অনেক রকম সুযোগ লাভ করে। দেশে রোমান-ক্যাথলিক গীর্জা স্থাপিত হইতে থাকে। পোর্টুগীজরা পাদিশাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও তাঁহাকে রকমারি উপঢৌকন দিয়া অত্যন্ত তুষ্ট করে। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে পেড্রো তাভারেস নামক এক পোর্টুগীজকে সম্রাট্ বাঙলা দেশে সহর তৈরী করিবার এক ফর্ম্মাণ দান করিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ইহারা অনেকে কলকারখানা স্থাপন করে; এবং সমস্ত ব্যবসায় নিজেদের করতলগত করে।

পোর্টুগীজরা সাতগাঁতেও ব্যবসায় চালাইতে থাকে; এইরূপে সপ্তগ্রাম প্রধান পোর্টুগীজ বন্দর হইয়া উঠে।

বাঙলা দেশের সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টান গীর্জা ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে সরস্বতীর উপরিস্থিত হুগলীর অনতিদূরে ব্যাণ্ডেল বন্দরে বিলর্লেবোম্ নামক এক পোর্টুগীজ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

(৩) রাজত্ব স্থাপন

পোর্টুগীজরা প্রথমে মোগলদের সংস্পর্শে তত আসে নাই। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইহারা প্রথম আরাকানে গমন করে। তাহার পর ফিলিপ ড নিকোতে নামক এক পোর্টুগীজ আরাকান-রাজের অধীনে কাজ লয়। পোর্টুগীজদের সাহায্যে পেগু আরাকান রাজের অধিকারে আসে। প্রতিদানে ইহারা সিরাম বন্দর প্রাপ্ত হইল। নিকোতে পরে পোর্টুগীজ রাজ্য বাড়াইবার মৎলব করিতে এবং দেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ইহাতে আরাকানের রাজা পোর্টুগীজদের দমন করিবার ফন্দী করে। নিকোতে পূর্ব্ব উপদ্বীপের রাজাদের কাছে দূত পাঠায় এবং তাহাদের পেগুর সিংহাসনের লোভ দেখাইয়া, সাহায্য আদায় করে। যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে আরাকান-পতি পরাজিত হইল। পরিশেষে প্রোমের রাজা তাহার সহিত যোগদান করিল; এবং ৮ মাস ধরিয়া যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কিন্তু গৃহ বিবাদের দরুণ পোর্টুগীজদের অনেক ক্ষতি হইল। যাহা হউক, গোয়া হইতে একদল সৈন্য আসায়, নিকোতের দল পুষ্ট হইল; ব্রহ্মবাসীরা পরাজিত হইল, সিরাম পোর্টুগীজ-রাজ্য বলিয়া গণ্য হইল এবং নিকোতে সেখানকার রাজা মনোনীত হইল।

পোর্টুগীজদের প্রতিপত্তি দেখিয়া, আরাকানের রাজা তাহাদের অস্তিত্ব লোপ করিবার জন্য টোঙ্গুর রাজার সহিত সন্ধি করে; ও প্রোম এবং আভার রাজারাও তাহার সহিত যোগ দেয়। কিন্তু যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে পোর্টুগীজরা বিজয়ী হয় (১৬০৫)। এই সব যুদ্ধ জলযুদ্ধ। জলযুদ্ধে পোর্টুগীজরা কেমন ওস্তাদ ছিল, আমরা তাহার প্রমাণ পাই।

আভা আর আরাকানের রাজারা আবার যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। এইবার নিকোতে সিরাম বন্দর রক্ষা করিতে পারিল না; বল্প নামক একজন লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় পোর্টুগীজরা পরাজিত হয়। নিকোতেকে নিষ্ঠুরতা সহকারে হত্যা করা হইল; অনেক পর্টুগীজ বন্দী ও নিহত হইল। তবে কেহ কেহ পলায়ন করিল। যাহারা পলায়ন করিল, তাহাদের মধ্যে সিবেস্তা গঞ্জালিস একজন। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পোর্টুগীজরা জলদস্যুর বৃত্তি অবলম্বন করিল। লুঠপাট চলিতে লাগিল।

(৪) সোণদ্বীপ অধিকার

শ্রীপুর হইতে ৬ লীগ্ দূরে সোণদ্বীপ অবস্থিত। এই দ্বীপ শ্রীপুরাধিপতি কেদার রায়ের সম্পত্তি কিন্তু মোগলেরা ইহা গায়ের জোরে দখল করিয়াছিল। কেদার রায়ের অধীনে নির্ভীকচেতা কার্ভালো নামক এক পোর্টুগীজ বীর কাজ করিত; তাহারই সাহায্যে কেদার রায় সোণদ্বীপ অধিকার করিলেন। পরে এই ডোমিনিক কার্ভালো ঐ দ্বীপের স্বত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আরাকানের রাজা ও প্রতাপাদিত্য উভয়েরই নজর এই দ্বীপের উপর পড়ে। কেন না, ইহা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। এখানে প্রচুর লবণ উৎপন্ন হইত। সেই সময় লবণের ব্যবসায় খুব লাভজনক ছিল। যাহা হউক, আরাকানের মগরাজা এই দ্বীপ অধিকার করিল, এবং প্রতাপাদিত্যকে ধ্বংস করিবার মৎলব করিল।

তাহার ভয়ে প্রতাপাদিত্য তাহার শত্রু পোর্টুগীজদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কার্ভালোকে হত্যা করা হয় (?) ও প্রতাপাদিত্যের রাজ্য চন্দিকান হইতে ফাদারদের তাড়াইয়া দেওয়া হয়।

কিন্তু বাহারিস্থান্-ই-ঘাইবীর লেখক আলাউদ্দীন ইসফাহানের মতে, প্রতাপাদিত্য হত্যাকারী নহেন। ঐ ফার্সী ইতিহাসের ১৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, সুবাদার কাসিমখাঁর আমলে ডোরমশ কার্ভালো লড়াই করে। এই ডোরমশ শব্দ ডোমিঙ্গো শব্দের অপভ্রংশ। (অধ্যাপক যদুনাথ সরকার।)

সুবাদার ইসলামখাঁর শাসনকালে প্রতাপাদিত্যের পতন হয় (বাহারিস্তান-ই-ঘাইবী)। কিন্তু ইসলামখাঁ পোর্টুগীজ জলদস্যুদের দমন করিতে পারেন নাই। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে কাসিমখাঁ বাঙলাদেশের সুবাদার হন। মগ্ রাজা ম্যানুয়েল ডু মাটোস নামক এক পোর্টুগীজকে সোণদ্বীপ ও ডিয়াঙ্গা বন্দর দান করে; কিন্তু তাহার হঠাৎ মৃত্যু হইলে, ফতেখাঁ সোণদ্বীপ অধিকার করিয়া সমস্ত পোর্টুগীজকে বধ করিল। গঞ্জালিস বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মগ রাজার বহু রণতরী অধিকার করিয়া, সোণদ্বীপ অধিকারের জন্য যুদ্ধযাত্রা করিল, ফতেখাঁর ভ্রাতা খুব যুদ্ধ করিল। কিন্তু ফতেখাঁ মারা পড়াতে, গঞ্জালিস জয়ী হয় এবং সোণদ্বীপ অধিকার করে। ১০০০ মুসলমানকে হত্যা করা হয়। গঞ্জালিস তথাকার স্বাধীন রাজা হয় (১৬০৯)। এইরূপে পোর্টুগীজ প্রতিপত্তি ফিরিয়া আসিল। নানান্ দেশের ব্যবসায়ীরা আবার বাণিজ্য করিতে লাগিল।

(৫) ভুলুয়া জয়

এই সময়ে জাহাঙ্গীর ভুলুয়া রাজ্য জয় করিবেন স্থির করিলেন। এই ভুলুয়া সোণদ্বীপের খুব নিকটে। সেইজন্য গঞ্জালিস মগ রাজার সাহায্য চাহিল; এবং মগের সাহায্যে মুঘলকে পরাজিত করিবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে গঞ্জালিস মগদের সহিত যোগদান করিল না। মগ রাজা পরাজিত হইয়া চাটগাঁতে পলায়ন করিল। তখন গঞ্জালিস আরাকানের বন্দর লুণ্ঠন করিতে লাগিল। কিন্তু মগ রাজা ওলন্দাজদের সহিত যোগ দিয়া, পোর্টুগীজদের পরাজিত করিল। ইহার পর হইতেই গঞ্জালিসের নাম লোপ পায়। তখন আরাকানের রাজা সোণদ্বীপ অধিকার করিয়া লইল।

(৬) পোর্টুগীজ প্রতিপত্তির লোপ

শাহজাহান যখন পিতার বিরোধী হইয়াছিলেন, তখন তিনি বাঙ্লা দেশ জয় করিয়া, দুই বৎসর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া পিতার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন (১৬২৫)। যাহা হউক, তিনি যখন এ দেশে ছিলেন, তখন পোর্টুগীজদের অত্যাচার স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাহারা এ দেশের লোককে বলপূর্ব্বক খৃষ্টান করিত; নানারূপ বীভৎস অত্যাচার করিত। এই সব দেখিয়া শাহজাহান পোর্টুগীজদের দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

শাহজাহানের প্রিয়তমা পত্নী মমতাজমহল পোর্টুগীজদের বিরোধী ছিলেন; কেন না, তাঁহার দুই কন্যাকে জেসুইটরা ধরিয়া লইয়া বলপূর্ব্বক খৃষ্টান করিয়াছিল। শাহাজাহান সম্রাট হইয়া পোর্টুগীজদের দমনার্থ কাসিমখাঁ জায়ানকে পাঠাইলেন। মুঘল সৈন্য তিনমাসে হুগলী জয় করিল (১৬৩২)। এই যুদ্ধে ১০০০ পোর্টুগীজ নিহত হইয়াছিল এবং ৪০০০ জনকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে পাঠানো হইয়াছিল। (কিন্তু এই সব বন্দীরা, দিল্লীতে পৌঁছাইবার আগেই মমতাজমহলের মৃত্যু হয়।) মুঘলেরা পোর্টুগীজ কারখানা ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। পোর্টুগীজদের এইরূপে পরাজিত হইবার কারণ, মার্টিন আফোন্সো মেলো নামক একজনের বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বজাতিদ্রোহিতা।

এইরূপে পোর্টুগীজরা তাড়িত হইলে, হুগলী রাজকীয় বন্দর হয়। পোর্টুগীজদের সমস্ত বাণিজ্য প্রায় লোপ পাইল; তবে সাতগাঁতে তাহাদের একটু আধটু ব্যবসায় চলিতেছিল। যাহা হউক, ইহার পর এ দেশে পোর্টুগীজরা মাথা তুলিতে পারে নাই। তাহাদের প্রতিপত্তি সবই লোপ পাইল।

জীবিকার্জ্জনোপযোগী শিক্ষা প্রচারের প্রথম সোপান।

(৩)

[অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-টি]

জীবিকার্জ্জনোপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই। এই বিংশ-শতাব্দীতে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই উক্ত প্রকার শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল দেশের ব্যবসায়-গত শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাদান-প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও, ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই ঐকমত্য লক্ষিত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে, ইহার উদ্দেশ্য—দেশের জনসাধারণকে তাহাদের সামাজিক অবস্থার উপযোগী কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদান করিয়া, স্বাধীন ভাবে ও সুচারু রূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযুক্ত করিয়া তোলা।

দেশের জন-সাধারণ প্রধানতঃ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে। বঙ্গদেশের প্রায় শতকরা ৭০ জন লোকই কৃষিজীবী। কিন্তু কৃষিকার্য্য তাহাদের জীবন-ধারণের প্রধান উপায় হইলেও, শুধু কৃষির উপর তাহারা নির্ভর করিয়া চলিতে পারে না। তাই আজ যে মাঠে ধান বপন করিতেছে, কাল অবসর সময়ে আবার সে ধনী প্রতিবেশীর বাড়ীতে মজুরের কাজ করিতেছে। কোন-কোন কৃষক কৃষি-কার্য্যের দ্বারা জীবন ধারণোপযোগী অর্থ উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হইয়া, সূত্রধরের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। কোন-কোন তন্তুবায় তাহার বস্ত্র-বয়ন-শিল্পের সাহায্যে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হইয়া, নিজ বাড়ীতেই একটি মুদীর দোকান খুলিয়াছে। এইরূপে, গ্রামে গ্রামেই অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা বর্ত্তমান সময়ে শুধু একটি বৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিতেছে না। সুতরাং গ্রামের কৃষক, শিল্পী, দোকানদার বা শ্রমজীবী সকলকেই উন্নত ও বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী শিক্ষা প্রদান করিয়া, যথেষ্ট উপার্জ্জনক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের উপার্জ্জন-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য স্থানে-স্থানে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, জীবিকার্জ্জনের বিভিন্ন পথ তাহাদের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

বিষয়টি অতীব প্রয়োজনীয়। এখন আর ইহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। এ বিষয়ে দেশবাসীর যেরূপ কর্ত্তব্য রহিয়াছে, সরকার বাহাদুরেরও সেইরূপ দায়িত্ব রহিয়াছে। বিষয়টির সুমীমাংসা সাধন করিতে হইলে, শাসক ও শাসিত উভয়ের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়া, সকলকেই ধীর, স্থির ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। এই নূতন ধরণের ব্যবসায়গত শিক্ষাকে জন-সাধারণ কি ভাবে গ্রহণ করে, তাহা না দেখিয়া, বড়-বড় প্রস্তাবের অবতারণা এক পক্ষে দেশবাসীর পক্ষে যেরূপ অবিবেচনার কার্য্য, অপর পক্ষে অর্থকৃচ্ছ্রতার দোহাই দিয়া সময়োপযোগী প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে অযথা সময়ক্ষেপ করাও সরকার বাহাদুরের পক্ষে ততদূর অদূরদর্শিতার কার্য্য। বর্ত্তমান সময়ে উভয় পক্ষেরই প্রধান কর্ত্তব্য, ব্যবসায়গত শিক্ষার পক্ষে লোকমত গঠন করা, এবং সঙ্গে-সঙ্গে আদর্শ বিদ্যালয়াদি স্থাপন করা। এ বিষয়ে আমেরিকার কানাডা-রাজ্য যে পথ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য।

কানাডা দেশের শিক্ষার ইতিহাসে স্যার উইলিয়াম ম্যাকডোনাণ্ডের (The late Sir William Macdonald) নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তাঁহার বদান্যতা এবং তাঁহার দূরদর্শিতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ব্যতীত কানাডা রাজ্যে ব্যবসায়-গত শিক্ষার এত দ্রুত বিস্তার হইত কি না সন্দেহ। শিক্ষার সাহায্যে দরিদ্র জন-সাধারণের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন-কল্পে তিনি তাঁহার জীবনের কষ্টার্জ্জিত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত অর্থ-সাহায্যে এবং তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায়, ড্রইং, প্রকৃতিপাঠ (Nature study), পরীক্ষা-মূলক বিজ্ঞান (Experimental science), হস্ত-শিল্প (Manual Training), কৃষি এবং গৃহস্থালী প্রভৃতি কার্য্যকরী বিষয় শিক্ষা-ক্ষেত্রে নূতন ভাবে প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি জানিতেন যে, গ্রামের লোক সাধারণতঃ নগরের লোকের অনুকরণ করে; সুতরাং এই সকল বিষয় নগরের বিদ্যালয়ে একবার প্রবর্ত্তিত হইলেই, গ্রামের বিদ্যালয়ও উহার অনুকরণ করিবে।

তাই কতিপয় নির্দ্দিষ্ট বিদ্যালয়ে হস্তশিল্প শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিবার জন্য তিনি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে "ম্যাকডোনাল্ড হস্তশিল্প ভাণ্ডার" বলিয়া একটি তহবিল প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার সাহায্যে কানাডার বিভিন্ন অংশে একুশটি সাধারণ বিদ্যালয়ের সংশ্রবে হস্তশিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইল। এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থিগণ বিনা বেতনে পড়িতে পাইত। তাহাদের শিক্ষারও বেশ সুবন্দোবস্ত ছিল। প্রথমতঃ ইংলণ্ড হইতে হস্তশিল্প শিক্ষাভিজ্ঞ লোক আনাইয়া, তাহাদের হস্তে এই সকল শিক্ষা-কেন্দ্রের ভার অর্পণ করা হইল। ধীরে-ধীরে কানাডাবাসিগণই এই ভার গ্রহণের উপযুক্ত হইলে বিদেশ হইতে শিক্ষক আনাইবার আর কোনও প্রয়োজন রহিল না। এইরূপে ত্রিবর্ষব্যাপী পরীক্ষাকাল উত্তীর্ণ হইয়া, হস্ত-শিল্প-শিক্ষা যখন দিন দিন জনপ্রিয় হইয়া উঠিল, তখন স্থানীয় ও প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষ এই শিক্ষা বিস্তারের ভার গ্রহণ করিলেন। তখন হস্তশিল্প শিক্ষা-বিস্তারের আর কোনও আবশ্যকতা রহিল না। তাই এই তহবিলের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহাদের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিতরণ করিয়া দিলেন; এবং তাঁহারা অন্য একটি নূতন কাজের ভার গ্রহণ করিলেন।

ক্ষেত্রের যথেষ্ট উৎপাদিকা-শক্তি থাকিলেও, ভাল বীজের অভাবে অনেক সময়ে আশানুরূপ ফসল ফলে না। তাই কানাডার ন্যায় কৃষি-প্রধান দেশে কি করিয়া ভাল বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ করা যায়, এ বিষয়ে তাঁহারা মনোযোগ করিলেন। সর্ব্বপ্রথম তাঁহারা তিন বৎসরের জন্য একটি "পুরস্কার তহবিল" খুলিলেন। যে সকল বালক-বালিকা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে সজীব ও সতেজ শস্য উৎপন্ন করিয়া, ভাল বীজ সংগ্রহ করিয়া প্রদান করিতে পারিত, এই তহবিল হইতে তাহাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করা হইত। ইহার ফলে ভাল-ভাল বীজ সংগৃহীত হইতে লাগিল। এইরূপে সংগৃহীত বীজ হইতে ১৯০৩ সালে যে গম উৎপন্ন হইল, উহার পরিমাণ ১৯০০ সালের উৎপন্ন গম হইতে শতকরা ২৮গুণ বৃদ্ধি পাইল। এই চেষ্টারই শেষ পরিণতি "কানাডা দেশের বীজ উৎপাদন-সমিতি" (Canadian Seed Grower's Association)। তাঁহাদের চেষ্টায় কানাডা রাজ্যে কৃষিজাত দ্রব্যোৎপাদন ব্যাপারে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। শস্যের দানার আকার ও ওজন বৃদ্ধি পাইয়াছে; চিটার (chaff) ভাগ কমিয়া পরিপুষ্ট দানার সংখ্যা বাড়িয়াছে; ক্ষেত্রের উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে; শস্যসমূহের মধ্যে রোগ-দমনের শক্তি সঞ্চাত হইয়াছে।

তার পর খোলা হইল "ম্যাকডোনাল্ড গ্রাম্য বিদ্যালয় তহবিল" (Macdonald Rural School Fund)। এই তহবিলের সাহায্যে কানাডার পাঁচটি প্রদেশের কতকগুলি গ্রাম্য বিদ্যালয়ের সংশ্রবে উদ্যান

প্রতিষ্ঠা করা হইল। প্রত্যেক পাঁচটি বিদ্যালয়ের জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ইনি ঘুরিয়া-ঘুরিয়া এই সকল বিদ্যালয়ের উদ্যান পরিদর্শন করিতেন; এবং প্রকৃতি-পাঠ (Nature Study) শিক্ষা দিতেন। এই কার্য্যের বাবদ যে খরচ লাগিত, তাহা এই তহবিল হইতে দেওয়া হইত। বীজ বাছনীর প্রয়োজনীয়তা (Selection of Seed), বৎসরের বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী বিভিন্ন ফসল (rotation of crops), আগাছা, পোকা ও রোগ হইতে ফসল রক্ষার উপায়, প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রদিগকে মনোযোগ সহকারে শিক্ষা দেওয়া হইত। তৎপরে এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার সরকার বাহাদুর নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। সরকারের ব্যয়ে নূতন বিদ্যালয়টী নির্ম্মিত হইল। তাহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন গৃহ ও সকল ছাত্রের এক সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য একটী সভা-গৃহেরও ব্যবস্থা হইল। হস্তশিল্প, গৃহস্থালী এবং বিদ্যালয়-সংলগ্ন উদ্যানে প্রকৃতি-পাঠ শিক্ষা প্রদানের সুবন্দোবস্ত করা হইল।

এইরূপ আড়ম্বরহীন সহজ ও সরল উপায়ে ব্যবসায়-গত শিক্ষার দিকে লোকমত গঠন করিয়া, পরে 'ম্যাকডোনাল্ড' নব ভাবের শিক্ষা প্রদানের উপযুক্ত শিক্ষক গঠনের জন্য ওন্টেরিও (Ontario) কৃষি-কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে বহু অর্থ প্রদান করেন। এই নূতন বিদ্যালয়ের নাম হইল ম্যাকডোনাল্ড ইন্‌ষ্টিটিউট্ (Macdonald Institute)। এখানে হস্ত-শিল্প ও গৃহস্থালী শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইল। কৃষক-পত্নী ও কৃষক-দুহিতাদিগকে রন্ধন, সীবন এবং অন্যান্য গৃহোপযোগী শিল্প-শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাও এখানে করা হইল।

অবশেষে ম্যাকডোনাল্ড মন্ট্রিল (Montreal) নগরের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে বহু অর্থব্যয়ে এক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিনটি বিভাগ আছে—(১) গৃহশিল্প বিভাগ, (২) শিক্ষক-গঠন-বিভাগ, (৩) কৃষি-বিদ্যালয়-বিভাগ। গৃহশিল্প বিভাগে খাদ্যাখাদ্য, পোষাক পরিচ্ছদ, ও বাস ভবন প্রভৃতি জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রদত্ত হয়। শিক্ষক-গঠন বিভাগে গ্রামের ও নগরের বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক প্রস্তুত করা হয়। এই সকল বিভাগ পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে; এবং কোন কোন সাধারণ বিষয় সকলে এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। কাজেই পরবর্ত্তী কালে যাহারা শিক্ষক, কৃষক বা গৃহস্থ হইবে, তাহারা সকলেই পরস্পরের জীবনের অভাব, অভিযোগ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া, পরস্পরের প্রতি সাহানুভূতিসম্পন্ন ও অনুরক্ত হইয়া উঠে।

কানাডারাজ্যে ব্যবসায়গত শিক্ষার ব্যবস্থার আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম যে, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে উক্ত প্রকার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যক্ষ ভাবে সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন; এবং ব্যবসায়-গত শিক্ষাকে লোকের নিকট প্রিয় ও আদরণীয় করিয়া তুলিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। বঙ্গদেশেও এই ভাবে লোক-মত গঠন করিবার চেষ্টা না করিলে, ব্যবসায়-গত শিক্ষা আদৃত হইবে কি না সন্দেহ। বর্ত্তমান সময়ে যদিও জীবিকার্জ্জনোপযোগী শিক্ষার দিকে লোকের সাগ্রহ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, তথাপি কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্য-ব্যবসায়কে এখনও তাঁহারা সম্মানের চক্ষে দেখিতে সমর্থ হয় নাই। এখনও বঙ্গের ভদ্র-সমাজ, বিশেষতঃ গ্রাম্য সমাজ ভূমি-কর্ষণ, বস্ত্র-বয়ন, গৃহ-নির্ম্মাণ, এবং সূত্রধর, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতির কাজকে হীন ও ঘৃণ্য মনে করে। তাহাদের হৃদয় হইতে এই ঘৃণার ভাব দূর করিবার জন্য, প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে উচ্চ বিদ্যালয়, এমন কি কলেজ বিভাগে পর্য্যন্ত, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে জীবিকার্জ্জনোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। কেহ-কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার্জ্জনোপযোগী শিক্ষার বন্দোবস্ত হইলে, প্রকৃত ব্যবসায় গত শিক্ষা লাভ করা অসম্ভব। ইহা ঠিক যে, পূর্ণ শিক্ষা লাভ করিতে হইলে, স্বতন্ত্র ব্যবসায় গত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা অতীব প্রয়োজনীয়; কিন্তু জীবিকার্জ্জনোপযোগী শিক্ষার প্রতি লোকের অনুরাগ ও ভক্তি আকর্ষণ করিবার জন্য সাধারণ বিদ্যালয়েও জীবিকার্জ্জনোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আছে—এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। বরং এইরূপ ব্যবস্থা ব্যবসায় গত শিক্ষাবিস্তারের সহায়তা করিবে।

এই গেল ভদ্র-সমাজের কথা। বঙ্গের জন-সাধারণ, কৃষি-জীবীই বল বা কুটীর-শিল্পীই বল, সকলেই একটু রক্ষণশীল। মান্ধাতার আমলের ভূমিকর্ষণ বা বস্ত্রবয়ন প্রথা তাহারা সহজে পরিত্যাগ করিতে চায় না। অতীতের প্রতি তাহাদের ভক্তি এত বলবতী যে, নূতনকে ভাল বলিয়া স্বীকার করিতে ও গ্রহণ করিতে তাহারা সহজে রাজী হয় না। সুতরাং তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য প্রদর্শনী খোলা আবশ্যক। শুধু সাময়িক প্রদর্শনীতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। বিভিন্ন স্থানে আদর্শ কৃষি-উদ্যান ও স্থায়ী শিল্প-প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠা করিয়া, জন-সাধারণকে প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এইরূপে একবার লোকমত গঠন করিতে পারিলে, ব্যবসায় গত শিক্ষার দ্রুত উন্নতি সাধিত হইবে। নতুবা শুধু কৃষি-অনুসন্ধান বিভাগ বা গবেষণার প্রতিষ্ঠা করিলে, অথবা যেখানে-সেখানে কতকগুলি ব্যবসায় গত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলে, কোনও ফলোদয় হইবে না।

আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক—এই সকল বিষয় যে সে শিক্ষা দিতে পারে না। যিনি শিক্ষা দিবেন, তিনি এ সকল বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইবেন। তিনি যদি উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া, কৃষি বা শিল্প-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হন, তবে সকল উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে। অনুপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে পতিত হইয়া, "কুমার-কানন" শিক্ষা-পদ্ধতি নিষ্ফল প্রয়াসে পরিণত হইয়াছে; অনুপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে পতিত হইয়া প্রকৃতি-পাঠ ও বস্তু-পাঠ বঙ্গদেশের বিদ্যালয়ে নীরস বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। শিক্ষকের অনুপযুক্ততার কারণ দুইটী। প্রথম কারণ, তাঁহার নাম-মাত্র বেতন; দ্বিতীয় কারণ, তাঁহার ট্রেনিংএর অভাব। ব্যবসায়-গত শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে এই দুইটী বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিক্ষককে ট্রেনিং দিতে হইবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা

করিতে হইবে। ইহা না করিলে কোন শিক্ষা-ব্যবস্থাই ফলপ্রদ হইবে না।

এতগুলি কর্ত্তব্য শুধু শিক্ষা-সচিবের উপর চাপাইয়া দেওয়া ন্যায়-সঙ্গত নয়। তাঁহার উপর জাতিগঠন বিভাগের ভার অর্পিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ তাঁহার হস্তে অর্পিত হয় নাই। আত্ম-শিক্ষার প্রসারোদ্দেশ্যে, মধ্যশিক্ষার উন্নতিকল্পে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-সাধন-ব্যাপারে শিক্ষা-সচিবের অনেক করিবার আছে; কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহার হস্ত-পদ বদ্ধ। তিনি শিক্ষা-সংস্কার ও শিক্ষা প্রসার-কল্পে মুক্ত-হস্তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া, এই বন্ধনমোচনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় গবর্ণমেন্টের যেরূপ অর্থ-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষা-সচিব তাঁহার ইচ্ছানুরূপ পথে চলিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। সুতরাং, এ বিষয়ে যতদুর সম্ভব, গবর্ণমেন্টের অন্যান্য বিভাগের ও দেশের জন সাধারণের সহায়তা অতীব প্রয়োজনীয়।

তাই, জীবিকার্জ্জনোপযোগী শিক্ষার প্রসার-কল্পে স্থানে-স্থানে যে স্থায়ী শিল্প প্রদর্শনী খোলার প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহার ভার শিল্প-বিভাগ গ্রহণ করিবেন। স্থানে-স্থানে যে স্থায়ী কৃষি-প্রদর্শনী খোলার কথা হইয়াছে, তাহার ভার কৃষি-বিভাগ গ্রহণ করিবেন। ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি-কল্পে কো-অপারেটিভ সোসাইটি আরও বিস্তৃত ভাবে কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন। স্থানে-স্থানে যে কৃষি-উদ্যান খুলিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহার ভার জমিদারগণ গ্রহণ করিবেন। শিক্ষা সচিব উপযুক্ত শিক্ষক গঠন, শিক্ষকের যথোপযুক্ত পুরস্কার বিধান, ও বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন। যদি গবর্ণমেন্টের অন্যান্য বিভাগ ও জন সাধারণ শিক্ষা সচিবের সাহায্য-কল্পে আগ্রহ ভরে অগ্রসর না হন, তবে তাঁহার পক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন অসম্ভব ব্যাপারে পর্য্যবসিত হইবে।

বাঙ্গালীর ব্যায়াম শিক্ষার আবশ্যকতা।

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ সেনগুপ্ত এম্-এ]

পাশ্চাত্য দেশে শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শক্তিবৃদ্ধির প্রতি লোকে সবিশেষ যত্নশীল। আমাদের দেশে প্রাচীন মনীষিগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সুশিক্ষার অভাবে অধুনাতন জনসাধারণ এদিকে একপ্রকার উদাসীন বলিলেও চলে। একে ত নানাবিধ রোগে দেশ উৎসন্ন প্রায়; অজন্মা ও দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ অতি সাধারণ আহার্য্য মেলাই ভার। তাহার উপর ইয়োরোপীয়দিগের সংস্পর্শে আহার-বিহারে নানাবিধ অস্বাভাবিকতার বশীভূত হইয়া আমরা দিনে-দিনে স্বাস্থ্য হারাইতেছি। আমাদের বোধ হয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়, এ বিষয়ে বাঙ্গালার অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়।

প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলেও কিরূপে শারীরিক ব্যায়াম-চর্চ্চার দ্বারা স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখা যাইতে পারে, তাহা আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের বিদ্যালয়সমূহে, কেবল লেখাপড়াই শিখান হইত,—ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইত না। এখনও যেমন সাধারণ বিদ্যালয়ে শিশুদিগের ধর্ম্ম শিক্ষার কোনও বন্দোবস্ত নাই, তখনও সেইরূপ ছাত্রদিগের ব্যায়াম শিক্ষার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। আজকাল কর্ত্তৃপক্ষের ও অভিভাবকদিগের এদিকে দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। তাঁহারা ছেলেদের ঘরের বাহিরে মাঠে ময়দানে খেলিতে দেখিলে, এখন আর তাড়া করিয়া যান না; ছেলেদের ফুটবল, মুগুর বা ডাম্বেল কিনিয়া দিতে হইলে, পয়সাটা একেবারে অপব্যয় হইল, এরূপ ভাবেন না।

আমাদের দেশে পালোয়ানেরা ও সার্কাসের শক্তিশালী ক্রীড়কেরাই বলশালিতার আদর্শ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ নিরক্ষর এবং কেবল বল-চর্চ্চাতেই জীবন অতিবাহিত করে; মনো-বৃত্তির উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না। ইহাদের ভূরিভোজন এবং আলস্যপূর্ণ, উদ্যমহীন জীবন আমাদের নিকট হইতে অবিমিশ্র শ্রদ্ধা বা সম্মানের দাবী করিতে পারে না। কিন্তু তথাপি ইহাদের মধ্যে যাঁহারা সমধিক গুণসম্পন্ন, তাঁহারা যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। সুরেশ বিশ্বাস, শ্যামাচরণ, প্রফেসর বসু, প্রফেসর রামমূর্ত্তি, উত্তর পশ্চিমের কাল্লু, কিঙ্কর, গামা, বঙ্গের ভীমভবানী, গোবর, মহেন্দ্র ইত্যাদির নাম কাহার না সুপরিচিত? ইহারা কেহ বা মল্লযুদ্ধে প্রবীণতার জন্য, কেহ বা বিপুল শারীরিক বলের জন্য বিখ্যাত। প্রফেসর রামমূর্ত্তি এ দেশীয় শিক্ষিতদিগের নিকটে সবিশেষ পরিচিত। অনেকেই এই হৃদয়বান্, স্বদেশভক্ত বীরপুরুষের আত্মত্যাগ ও সৎশিক্ষার পরিচয় পাইয়াছেন। ইহার নিকটে অনেকেই ব্যায়াম সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, অল্প সময়ে আশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছেন। বিলাতী বলীদিগের মধ্যে ইউজেন্ স্যাণ্ডো আমাদের বিশেষ পরিচিত। কিন্তু তিনি অর্থোপার্জ্জন করিতে এদেশে আসিয়াছিলেন, দর্শনী ব্যতীত তাঁহার পরামর্শ পাওয়া যাইত না। তাঁহার বিস্ময়কর শক্তি এবং স্বাস্থ্যময় দেহের অনিন্দ্য পূর্ণতা ও পুরুষোচিত সৌন্দর্য্য দেখিয়া এ দেশের লোকেরা মুগ্ধ হন। যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারাও প্রতিকৃতিতে তাঁহার বলিষ্ঠ শরীরের আভাস পাইয়া চমৎকৃত হন। ইহার পর এক গ্রিপ্ ডাম্বেল বেচিয়াই স্যাণ্ডো সাহেব ভারতবর্ষ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেন।

বিলাতে ব্যায়ামচর্চ্চা শিক্ষার একটী অঙ্গ। সেখানে ব্যায়াম-গুরুদিগের অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রও এইজন্য বিলক্ষণ প্রশস্ত। ইয়োরোপ ও আমেরিকার সাধারণ মল্লগণ কিরূপ শক্তিশালী, তাহা নিম্নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বুঝা যাইতে পারিবে:

(১) এপোলো—ইনি দুইটী পূর্ণবয়স্ক লোক সমেত একখানি দুই চাকার গাড়ী, সর্ব্বশুদ্ধ চার মণ, ডান হাত দিয়া মাথার উপরে উঁচু করিয়া ধরিয়াছিলেন। দাঁত দিয়া কামড়াইয়া পাঁচ মণ ভার মাটী হইতে উঠাইয়াছিলেন।

(২) মার্কুইস্ বিবেরো—ইনি ৮০ বৎসর বয়সে ব্রুকলিন্ হইতে নিউ ইয়র্কে সাঁতরাইয়া যান। ৮২ বৎসর বয়সে ৬½ ঘণ্টা কাল ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতার দিয়াছিলেন।

(৩) ক্যামেরন, এ, এ—২৮ সের হাতুড়ী ২৮ হাত দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

(৪) কোহেন, এস্, পি—হাত ও পায়ের জোরে পোলের মতন হইয়া বুকের উপর সাড়ে বার মণ ভার বহন করিয়াছিলেন। মাথার উপরে এক মণ গোলা লইয়া দুই হাতে লোফালুফি করিতেন।

(৫) লুই সির্—সম্মুখে হাত বাড়াইয়া, সেই হাতে এক মণ ছাব্বিশ সের ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। সওয়া তিন মণ ভার মাটী হইতে একেবারে মাথার উপরে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরেন। দুইহাতে সাড়ে চার মণ ভার ঐরূপে তুলিয়াছিলেন। জমি হইতে এক হাতে ১২½ মণ তুলিয়াছিলেন। দুই হাতে জমি হইতে ২৪মণ জিনিষ তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। পীঠের চাড়ে ৫৪ মণ ভার উঁচু করিয়া ধরিয়াছিলেন, কোনও উপকরণ ব্যতীত কেবল মাত্র একটী আঙ্গুলে ৭ মণ জিনিষ উঠাইয়াছিলেন। ১৫ মণ করিয়া চারিটী বলবান্ ঘোড়া সর্ব্বশুদ্ধ ওজনে ষাট মণ, দুইটী-দুইটী করিয়া দুই হাতে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল; এক ব্যক্তি চাবুক মারিয়া ঐ চারিটী অশ্বকে বিপরীত দিকে প্রাণপণে চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু পুরা এক মিনিট কাল তাহারা এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইতে পারে নাই।

(৬) ফিনি, এলেক্স—৮ সের হাতুড়ী ৭৬ হাত দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। ৮ সের গোলা ৩০ হাত দূরে ছুঁড়িয়াছিলেন।

(৭) ম্যাকেঞ্জি—৮ সের হাতুড়ী ৭৮ হাত দূরে ছুঁড়িয়াছিলেন।

(৮) মরিসন্—৮ সের হাতুড়ী ৮০ হাত দূরে ছুঁড়িয়াছিলেন।

(৯) রস্, জি, এম্—২৮ সের ওজন ২০ হাত দূরে ছুঁড়িয়াছিলেন।

(১০) স্যাণ্ডো, ইউজেন্—৩½ মণ ডাম্বেল মাথার উপরে উঁচু করিয়া ধরিতে পারেন। ডান হাতে ৩৫ সের ও বাঁ হাতে ২৮ সের ডাম্বেল একসঙ্গে মাথার উপরে উঁচু করিয়া তুলিয়া, প্রসারিত অবস্থায় হাত ক্রমে-ক্রমে নামাইয়া স্কন্ধের সমান উঁচু করিয়া ধরিতে পারেন।

(১১) স্যাক্সন, আর্থার্—ডান্ হাতে ৪ মণ বারবেল তুলিয়া ঊর্দ্ধে ছুড়িয়া বাঁ হাতে লুফিয়া ধরিতে পারিতেন।

(১২) ব্যান্‌সিটার্ট, সি, ই, বি—কেবল হাতের জোরে ১৬ মণ ভার উঠাইয়াছিলেন; ১৫৬ খানা তাস ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন; একটা আধ ইঞ্চি মোটা ৯ ইঞ্চি লম্বা লোহার পেরেক মুচড়াইয়া মুখে মুখে যোগ করিয়া দিতে পারিতেন; পৌণে দুই মণ জিনিষ প্রায় এক মিনিট ধরিয়া সম্মুখে হাত বাড়াইয়া ঝুলাইয়া রাখিতে পারিতেন।

(১৩) ষ্টেনব্যাক্, জোসেফ্—বিস্তারিত বক্ষঃস্থল ৪২ ইঞ্চি। ৩½ মণ জিনিষ বুক পর্য্যন্ত উঠাইয়া, সম্মুখভাগে হাত বাড়াইয়া দুইবার ঝাঁকি দিয়াছিলেন, (১৯০৫)।

(১৪) ডিনি, ডোণাল্ড্—৭১ বৎসর বয়সেও নবীন যুবকের মত। ১১ সের গোলা ২৬ হাত দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। হাত বাড়াইয়া হাতের চেটোতে ১½ মণ ভার কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য রাখিয়াছিলেন।

(১৫) ইয়ং জেমস্—ডান্ হাতে ২½ মণ, বাঁ হাতে ২½ মণ উঠাইতে পারিতেন (১৯১৯)।

ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এইরূপ কত নামজাদা বলবান্ ব্যক্তি যে আছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। বিশেষ-বিশেষ বলের কার্য্যে কে কিরূপ উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, তাহার একটু বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

ভার উঠান—আমেরিকার জেফার্শন্ সাহেব কেবল হস্ত দ্বারা প্রায় কুড়ি মণ ভার উঠাইয়াছিলেন। মিঃ কেনেডি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৩২ মণ উঠাইয়াছিলেন। লুইসির পৃষ্ঠে করিয়া সাড়ে পয়তাল্লিশ মণ ভার উঠাইয়াছিলেন; এবং এক আঙ্গুলে প্রায় সাত মণ তুলিয়াছিলেন। স্যামসন্ সাহেব ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কাঁধে করিয়া সাড়ে সাতচল্লিশ মণ ভার উঠাইয়াছিলেন।

মিঃ মিচেল—এক আঙ্গুলে পুরা ৭ মণ তুলিয়াছিলেন।

ডাম্বেল—ক্রিফোর্ড সাহেব ২৮সের ওজনের ডাম্বেল মিনিটে ১২০ বার মাথার উপর উঠাইয়াছিলেন নামাইয়াছলেন। মিঃ কাস্‌ওয়েল ২৮ সের ডাম্বেল পৌণে ৫ মিনিটে ১০০ বার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিয়াছিলেন।

মিঃ পিভিয়ার্—পৌণে ৩ মণ ডান্ হাতে ও দুই মণ পঁচিশ সের বাঁ হাতে ব্যবহার করিতেন। ভিক্টোরিয়াস ১ মণ সাত সের ডাম্বেল কাঁধের সমান উঠাইয়া সম্মুখে হাত বাড়াইয়া ধরিতেন।

হাতুড়ী ছোড়া—মিঃ ট্যালবট ছয় সের হাতুড়ী ১২৬ হাত দূরে নিক্ষেপ করেন।

মিঃ ম্যাক্‌গ্র্যাথ—৮ সের হাতুড়ী ১১৬ হাত দূরে নিক্ষেপ করেন।

মিঃ ক্যামেরন্—২৮ সের হাতুড়ী ২৮ হাত দূরে নিক্ষেপ করেন।

কিন্তু বলের কার্য্য ছাড়া হাঁটা, দৌড়ান, লাফান, সাঁতার দেওয়া, সাইকেল চালান ইত্যাদি বিবিধ কার্য্যেও ইয়োরোপীয় ও মার্কিণবাসীরা আশ্চর্য্য পটুত্ব দেখাইয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ বা ১ ঘণ্টায় আট মাইল হাঁটিতে পারেন; কেহ বা ১ ঘণ্টায় ১২ মাইল ছুটিতে পারেন। কেহ বা ১৬ ঘণ্টায় ৯২ মাইল ছুটিয়া যাইতেছেন; কেহ বা ১৭ ঘণ্টায় ১০০ মাইল দৌড়াইতেছেন। কেহ বা ৬॥ মিনিটে এক মাইল হাঁটিতেছেন। কেহ বা ১৩৮ ঘণ্টায় ৫৩১ মাইল হাঁটিয়া যাইতেছেন। কেহ বা ১৯ কি ২০ মিনিটে ৪॥ মাইল নৌকা চালাইতেছেন।

কাপ্তেন ম্যাথু ওয়েব পৌণে ২২ ঘণ্টা সাঁতার দিয়া ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে পৌছিয়াছিলেন। হল বন্ সাহেব টেমস্ নদীতে ১২॥ ঘণ্টায় ৪৩ মাইল সাঁতার দিয়াছিলেন। আর একবার সমুদ্রে ১২ ঘণ্টায় ৪৭ মাইল গিয়াছিলেন।

মিস্ বেকুইথ—৬॥ ঘণ্টায় টেমস্ নদীতে ২০ মাইল সাঁতার দিয়াছিলেন।

টম্ বারোজ—১২ মিনিট ১৯ সেকেণ্ডে ১ সের ওজনের মুগুর

আড়াই হাজার বার অবিশ্রান্ত ঘুরাইয়াছিলেন ; এক ঘণ্টায় ১১৯৩ রূপ বিভিন্ন ভাবে ১০,৭৮৪বার ঘুরাইয়াছিলেন ; অনবরত ৪২ ঘণ্টায় ৩৩০১২০বার মুগুর ঘুরাইয়াছিলেন। আর একবার ২ সের ওজনের মুগুর ৪৩ ঘণ্টায় ৪২০,২৩০বার ঘুরাইয়াছিলেন। ইনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ৬১ ঘণ্টা অবিরাম মুগুর ঘুরাইয়াছিলেন। ১৯০৭ সালে ১½ পাউণ্ড মুগুর উপর্য্যুপরি ৬ দিন ঘুরাইয়াছিলেন ; এবং ৪ পাউণ্ড মুগুর ৬১½ ঘণ্টা ঘুরাইয়াছিলেন।

মিঃ টম বারোজ ও মিঃ গ্রিফিথস্—একত্র ৬৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট মুগুর ঘুরাইয়াছিলেন।

কিন্তু বিশিষ্ট বলীদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, স্বাস্থ্য ও শক্তি-বিজ্ঞানের প্রভাবে ইয়োরোপ ও মার্কিন্‌বাসীদিগের মধ্যে শতকরা মৃত্যুর হার ভারতবর্ষ অপেক্ষা ঢের অল্প। তাহারা ভারতবাসী, বিশেষতঃ বঙ্গবাসী, অপেক্ষা দীর্ঘজীবী, নীরোগ ও বলবান। আমরা যেরূপ আবেষ্টনের মধ্যে বাস করিতেছি, সেই আবেষ্টনের উপর এবং খাদ্য ও দেহের অবস্থার উপর আমাদের শারীরিক বল স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ-জীবন নির্ভর করে। আমাদের দেশে যাহাতে ছাত্রদের মধ্যে ব্যায়ামের সুবন্দোবস্ত হয়, তাহা অবিলম্বে করিতে হইবে। গ্রামে-গ্রামে সাধারণ গোচারণ-ক্ষেত্রের ন্যায় সাধারণ ব্যায়াম-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বস্তুতঃ, বিলাতের ছেলেরা যেমন ছেলেবেলা হইতেই আপনারা দেহের শক্তি-বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যত্নবান্ হয়, এতদ্দেশীয় বালকেরা যাহাতে তদ্রূপ হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য।

দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে সবল করিতে হইবে। দেহ ও পাকস্থলী সবল হইলে, অল্প-মূল্যের চাণা, ভুট্টা ও মোটা চাউল ব্যবহারে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না ; প্রত্যুত বলবৃদ্ধি হয়। ডাল, রুটি ও ভুট্টাভোজী পশ্চিমারা এই জন্য সামান্য আয়েও সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

সকলকেই যে কুস্তিগির পলোয়ান হইতে হইবে, এ কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু দেহের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া সুস্থ ও সবল হইতে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। ইচ্ছা পূর্ব্বক দুর্ব্বল, ক্ষীণজীবী ও চিররুগ্ন হইয়া থাকিবার অধিকার কাহারও নাই। সংসারে পরের গলগ্রহ না হইয়া, নিজের অক্ষুণ্ন স্বাস্থ্য ও শক্তির উপরে যে নির্ভর করিতে পারে, সেই যথার্থ মানুষ। কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালায় এরূপ মানুষের একান্ত অভাব ঘটে নাই। সেদিনও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বন্যা প্লাবিত দামোদরের তরঙ্গ-সঙ্কুল প্রবাহ বাহুবলে পার হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে ৬০ মাইল দূরে কাল্‌নানগরে একদিনে পদব্রজে গিয়া, পরদিনেই পদব্রজে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। এরূপ ক্ষমতা, এরূপ শ্রম-সহিষ্ণুতা ও শরীরের দৃঢ়তা কি বাঞ্ছনীয় নহে ?

আমরা আশা করি, ভারতের এই নবীন জাগরণের যুগে, সুশিক্ষার দ্বারা সামাজিক ও ব্যক্তিগত আচার ব্যবহারে নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়া, আবার ভারতবাসীকে বিলাস-বিমুখ, সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে পারিবে, এবং বাঙ্গালী তাহার চির-প্রসিদ্ধ পলায়ন-পটুত্বের অপবাদ মুছিয়া ফেলিয়া, কেবল মনের জোরে নয়, গায়ের জোরেও কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

বঙ্গভাষায় কথ্য-সাহিত্য

[মুহম্মদ আবদুল্লাহ্]

কিছুদিন হইতে বঙ্গ-সাহিত্যে দুইটী বিশিষ্ট ধারা দেখা যাইতেছে। ধারা দুইটীর মধ্যে একটী লেখ্য ভাষা, অপরটী কথ্য-ভাষা। এই লেখ্য-ভাষাই বরাবর সাহিত্যে প্রচলিত ছিল, এবং এক্ষণেও আছে। কথ্য-ভাষা তাহাই, যাহা প্রাচীন কাল হইতে, অর্থাৎ ভাষার সৃষ্টি-কাল হইতে কেবলমাত্র কথোপকথনেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রায় সকল ভাষাতেই লেখ্য ও কথ্য, এই দুইটী ধারা প্রচলিত। তবে এখনও দুই একটী ভাষা দেখা যায়, যাহাদের সাহিত্য বলিয়া কিছুই নাই। সে সকল ভাষায় কেবল মাত্র কথ্য ধারাই আছে। সাঁওতালী ভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

বাঙ্গালায় কথ্য-ভাষা ইহার সৃষ্টি-কাল হইতে কথোপকথনেই ব্যবহৃত হইত ; কিন্তু আজকাল ইহা সাহিত্যেও চলিতেছে। অনেক খ্যাতনামা লেখক এই কথ্যভাষা সাহিত্যে প্রচলিত করিবার পক্ষপাতী, এবং তাহাই করিতেছেন। পূর্ব্বে উপন্যাস ও নাটকাদিতে কথোপকথনচ্ছলে কথ্য-ভাষা ব্যবহৃত হইত ; কিন্তু অধুনা তাহার প্রভাব সে গণ্ডী পার হইয়া, আরও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

এই কথ্য ভাষা সাহিত্যে প্রচলিত করিতে, সাহিত্য-সেবীদিগের মধ্যে মত বিরোধ আছে। তাঁহারা প্রধানতঃ দুইটী দলে বিভক্ত ;- একদল বলেন, কথ্য ভাষা যথেচ্ছরূপে সাহিত্যে চালাইতে পারা যায়। অপর দল বলেন, তাহা হইতে পারে না ; কথ্য-ভাষা কথোপকথনেই প্রচলিত থাকিতে পারে,—সাহিত্যে চলিবার ইহার কোনও অধিকার নাই। এ বিষয় তৃতীয় দল যে আছে, সে দলের লোক হাঁ না কিছুই বলেন না,— ইচ্ছামত কথ্য ও লেখ্য ভাষায় কলম চালাইয়া যান। এই দলের লোক-সংখ্যাই অধিক। যাহা হউক, এ বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত কিছুই হয় নাই; এবং তাহার প্রয়োজনও বোধ হয় নাই। বুদ্ধিমান্ লোক ইহার মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইলেন না ; কারণ তাঁহারা বেশ বুঝেন, ইহার মীমাংসা করিতে গেলে, প্রত্যক্ষ ভাবে না হউক, পরোক্ষ ভাবেও অনেকের বিরাগ-ভাজন হইতে হইবে। সুতরাং বুদ্ধিমান্ লোকের কার্য্য-কলাপের অনুকরণে আমিও এই বিষয়ের আলোচনা হইতে নিরস্ত হইলাম।

ব্যাকরণের নিয়মের অনুগামিনী শুদ্ধ ভাষাই সাহিত্যের ভাষা। কথোপকথনে এইরূপ ভাষা ব্যবহার করা সুবিধাজনক হয় না বলিয়া, সেই সাহিত্যের ভাষাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া, যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়া যে ভাষার সৃষ্টি হয়, তাহাই কথ্য ভাষা বলিয়া প্রচলিত হয়। শব্দবিশেষ কখনও কথ্য-ভাষা বা লেখ্য-ভাষা—কাহারই নিজস্ব সম্পত্তি হইতে পারে না। শব্দ-সম্পদের উপর ভাষার সকল ধারারই সমান অধিকার।

তবে সাহিত্যে যে ভাষার প্রচলন, ব্যাকরণ-মতে সম্পূর্ণ রূপে শুদ্ধ এবং কথ্যভাষায় চলিত শব্দের অনেকগুলিই তাহাদের অপভ্রংশ বা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। মোটের উপর মূলে উভয়ই এক। বাঙ্গালার কথ্য ভাষায় অনেক শব্দ আছে। তাহারা সকলেই বরাবর মূল শব্দ হইতে অপভ্রষ্ট নহে;—প্রাকৃত বা অপর কোনও ভাষার মারফতে ঘুরিয়া-ফিরিয়া অপভ্রষ্ট হইয়াছে।

অল্পসংখ্যক হইলেও কয়েকজন মৌলিকতা প্রিয় মনস্বীর মতে, বঙ্গভাষাকে আরও শুদ্ধ করিয়া ব্যবহার করা উচিত। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে বঙ্গভাষাকে এরূপ ভাবে লেখা উচিত, যাহা বিভক্ত্যাদিবিশিষ্ট ও ব্যাকরণ মতে সংশোধিত হইলেই সংস্কৃত আখ্যা পাইতে পারে। কিন্তু এরূপ করা সঙ্গত হইবে না; কারণ, বঙ্গভাষা কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষার উপর সর্ব্বাংশে নির্ভর করে না। তাহা ছাড়া, এরূপ করিলে, বঙ্গভাষার যে নিজস্ব বিশিষ্ট লালিত্য আছে, তাহা উপভোগ করিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিবে না।

বঙ্গসাহিত্যে লেখ্য এবং কথ্য উভয় ধারাতেই কতকগুলি শব্দ আছে, —অচিরেই তাহাদের সংস্কার আবশ্যক; কারণ, অনেক স্থলে তাহাদের অর্থ মূল অর্থ হইতে এতদূর বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, সম্ভবতঃ কিছুকাল পরে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ চিনিতে পারা কঠিন হইয়া পড়িবে। মূল শব্দ হইতে অপভ্রষ্ট কতকগুলি শব্দের বানানও বিকৃত হইয়াছে। ইহাদেরও সংশোধনের প্রয়োজন। মূল শব্দের সহিত অপভ্রষ্ট শব্দের যথাসম্ভব মিলন রাখিয়া চলাই উচিত।

শুদ্ধাচারী মূল শব্দগুলি সহজে ভ্রষ্ট বা অপভ্রষ্ট হইতে চাহে না: কারণ, তাহাতে, তাহাদের আভিজাত্যের মর্য্যাদায় আঘাত লাগে। অথচ তাহাদিগকে যে কোনও প্রকারে অপবাদ দ্বারা ভ্রষ্ট (অপভ্রষ্ট) করিবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন আমরা দমন করিতে পারি না। উচ্চশ্রেণী হইতে নিম্নশ্রেণীতে অবতরণ করা তাহারা অপমান সূচক বোধ করে বলিয়া, নানাবিধ নিয়ম-কানুন রচনা করিয়া তাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে হয়। এরূপ না করিয়া, যদি বল পূর্ব্বক এ কাজ করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের আকৃতি বিকৃতি হইতে পারে। সুতরাং স্থূলভাবে কয়েকটী নিয়ম রচনা করা হইল, যাহাতে তাহারা নিম্নশ্রেণীতে অধিক সম্মান পাইবার লোভে, যথাযোগ্য ভাবেই আপনাদের পদমর্য্যাদা হইতে অপভ্রষ্ট হইতে সম্মত হইবে।

কথ্যভাষার বিষয়ে আলোচনা, অর্থাৎ কথ্যভাষা সাহিত্যে লিখিত হইলে তাহার আকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত তাহার আলোচনা করাই উচিত, তাহার আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তবে প্রথমতঃ লেখ্য-ভাষার বিষয়েও অল্প-বিস্তর আলোচনা করা হইয়াছে। নিম্নে কথ্যভাষায় প্রচলিত বিবিধ-প্রকারের কতিপয় শব্দের বিষয়ে যৎসামান্য আলোচনা ও মতপ্রকাশ করা হইল।

ক্ষণ-শব্দের অপভ্রংশ খণ। খণের ণ মূর্দ্ধন্য ণ। সুতরাং খণেরও তদ্রূপ হওয়াই উচিত। কিন্তু সাধারণতঃ দন্ত্য-ন দিয়াই ইহা লিখিত হয়। যথা,—এখন (ইদম্+ক্ষণ), যখন (যদ্+ক্ষণ), তখন (তদ্+ক্ষণ), কখন (কিম্+ক্ষণ)। এখন কখনও-কখনও অখণ হইয়াও ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে এক্ষণ বা অখণের অর্থ এই সময় নহে; ইহার অর্থ, নিকটবর্ত্তী কোনও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ কাল। এই অখণ, অদস্+ক্ষণ হইতে উদ্ভূত নহে, কারণ, এইরূপ স্থলে এখণ ও অখণ ঠিক একই অর্থ-প্রকাশ করে। কথা-বার্ত্তায় অখণ সংক্ষিপ্ত হইয়া খণও হয়। যথা, যাব'খণ।

যথা (যদ্+থাচ্), তথা (তদ্+থাচ); প্রকারার্থে—থাচ্ প্রত্যয়। কোথা (কিম্+থাচ্)—কোথায় থাচ্ প্রত্যয় সর্ব্বত্রই স্থানার্থে ব্যবহৃত হয়। যথা (বা যেথা) এবং তথা (বা সেথা, এস্থলে তদ্ সে হইয়াছে) —ইহাদের থাচ্ প্রত্যয় স্থানার্থেও ব্যবহৃত হয়। যথা—তোমার এমন যথা-তথা (বা যেথা সেথা) যাওয়া আমার ভাল লাগে না। এই প্রকারের আরও দুইটী শব্দ আছে;—এথা। এই স্থান—ইদম্+থাচ্; ইহা প্রচলিত নহে, ইহার পরিবর্ত্তে হেথা প্রচলিত) এবং ওথা (ওই স্থান —অদস্+থাচ্; ওথার পরিবর্ত্তে হোথা প্রচলিত)।

স্থানের অপভ্রংশ থান হয়। যথা—এখান, ওখান, সেখান, স্থান ঠাঁইও হয়, কিন্তু এখান প্রভৃতির ন্যায় সমাসে ব্যবহৃত হয় না।

পারমাণার্থে এত, অত, যত, তত, কত ব্যবহৃত হয়। ইহারা যথাক্রমে ইদম্, অদস্ যদ্, তদ্, কিম্ হইতে নিষ্পন্ন।

এমন, অমন, যেমন, তেমন, কেমন- ইদম্ প্রভৃতির উত্তর প্রকারার্থে 'মন' প্রত্যয় করিয়া ইহারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই প্রত্যয়টী বাঙ্গালার নিজস্ব। উপরি-লিখিত শব্দগুলি যথাক্রমে ইদম্, অদস্, যদ্, তদ্, কিম্ হইতে উৎপন্ন। যেমন ও অমন এই দুইটী শব্দের মন প্রত্যয় কালার্থেও ব্যবহৃত হয়। কালার্থে ব্যবহৃত হইবার সময় অমন শব্দের উত্তর দৃঢ়তা বাচক (emphasis) ই প্রত্যয় হয়। যথা- যেমন (যে সময়) তিনি এলেন, অমনই (তৎক্ষণাৎ) সে চ'লে গেল।

যদা, তদা, কদা—ইহাদের দা প্রত্যয় কালার্থে (সংস্কৃত ব্যাকরণ)। কথ্য-ভাষায় ইহাদের ব্যবহার নাই। বঙ্গ সাহিত্যে লেখ্য ভাষায়ও ইহার প্রচলন কচিৎ দেখা যায়, সংস্কৃতেই ইহাদের ব্যবহার হয়। কথ্য-ভাষায় কদার পরিবর্ত্তে কবে (কোন্‌দিন) প্রচলিত। যবে (যেদিন) কবিতায় সমধিক প্রচলিত। তবে'র অর্থ তাহা হইলে। কখনও কখনও তবে'র অর্থ সেদিন হইতেও দেখা যায়। যথা—সে যবে আসবে, তবেই যা'ব।

আকারান্ত শব্দ অনেকগুলি দেখা যায়, যাহাদের আকৃতি স্ত্রীলিঙ্গ-শব্দের ন্যায় হইলেও অর্থ এবং ব্যবহার পুংলিঙ্গের মত। ইহাদের স্ত্রীলিঙ্গে শব্দের অন্ত্য আকার ঈকার হয়। ফারসী ব্যাকরণে এরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে। সংখ্যায় এরূপ শব্দ নিতান্ত অল্প নহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কতকগুলির উল্লেখ করা হইল। যথা—শ্যামা পুংলিঙ্গ শ্যাম শব্দের কথ্য সংস্করণ বা অপভ্রংশ; আহ্বানকালেও শ্যাম শ্যামার আকার লাভ করে), শ্যামী। তথা- বামা (বাম), বামী; দেবা (দেব),

'[illegible] কাজ' এই অর্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর গিরি প্রত্যয় হয়। যথা—কেরাণীগিরি, ডেপুটীগিরি, রাঁধুনীগিরি ইত্যাদি। উপরি উক্ত অর্থে ঈ প্রত্যয়ও হয়। ইহা সম্ভবতঃ ফারসী ব্যাকরণের অনুকরণে হইয়াছে। যথা—গোলামী, ডাকাতী, মাষ্টারী। এই ঈকার ইকার নহে; কারণ, ফার্সী উচ্চারণানুসারে ইহা ঈকার হওয়াই উচিত।

অধিকার এবং করণ এই দুই অর্থে, অর্থাৎ আছে যার বা করে যে এইরূপ অর্থ বুঝাইলে, অনেক শব্দের উত্তর 'দার' প্রত্যয় হয়। কথ্য ভাষায় প্রচলিত থাকিলেও এই সকল প্রত্যয় প্রায়ই বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পৎ নহে। এ প্রত্যয়টী উর্দ্দু (বা হিন্দী) ব্যাকরণ হইতে গৃহীত। অধিকার, যথা—দোকানদার, ব্যবসাদার ইত্যাদি। করণ, যথা—খরীদ্‌দার (খদ্দের), লেখনদার, পড়নদার, কেননদার (ক্রেতা), বেচনদার (বিক্রেতা) ইত্যাদি।

কথ্য ভাষায় প্রচলিত কয়েকটী শব্দে একটু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শব্দগুলি—বড়্‌দা, ছোড়্‌দা, বড়্‌দি, ছোড়্‌দি, বড়্‌কা, ছোট্‌কা। ইহারা শুদ্ধ ভাষায় যথাক্রমে—বড়দাদা, ছোটদাদা, বড়দিদি, ছোটদিদি, বড়কাকা, ছোটকাকা। এই সকল সংযুক্ত শব্দের (compound word) প্রত্যেকটীরই দ্বিতীয় অংশে একই বর্ণ দুইটী করিয়া আছে। সাধারণ কথোপকথনে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণের জন্য এই দুইটী বর্ণের একটী লোপ পাইয়াছে। এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ একই কারণে হসন্ত হইয়াছে। এস্থলে প্রয়োজন-মত শুদ্ধ ব্যাকরণের নিয়মও পালিত হইয়াছে। যথা,—ছোটদাদা—ছোটদা—ছোট্‌দা—ছোড়্‌দা। ছোট্‌দা অপেক্ষা ছোড়্‌দা অধিক শ্রুতিমধুর। ভাষার শ্রুতিমাধুর্য্যের উপর যথাসম্ভব লক্ষ্য না রাখিয়া ব্যাকরণ কখনও নিয়ম প্রণয়ন করে না। এই সূত্রে মামা কতকটা ব্যতিক্রমের মধ্যে। যথা,—বড়মামা। ঝটিতি উচ্চারণের জন্য কদাচিৎ বড়্‌মা ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যথা,—"বড়্‌মা, বড়্‌মা (উচ্চারণ বড়োম্‌মা), আমাদের সে বড়্‌বালিশটা ছিঁড়ে গেছে।"

দুইটী শব্দ প্রায়ই দেখা যায়—দায়িক ও গতিক। দায়ক ও দায়িন্ আমরা সংস্কৃতে দেখিতে পাই, দায়িক পাই না। ইহার অর্থ দায়ী। দায়িন্ শব্দে বাঙ্গালার নিজস্ব প্রত্যয় স্বার্থে ক করিয়া ইহা নিষ্পন্ন। গতিকও এইরূপ—গতি+ক। গতি ও গতিকের অর্থ কিন্তু ঠিক একই নহে। গতিকের অর্থ অবস্থা। হবেক, করবেক, যাবেক, আস্‌বেক ইত্যাদির ক এই ক নহে। ক্রিয়াপদের জন্য ইহার বিশিষ্ট সৃষ্টি। প্রাচীন কালের এমন কি বিদ্যাসাগরী আমলেরও বঙ্গসাহিত্যে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আধুনিক পদ্যসাহিত্যে কখনও কখনও ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

কতকগুলি বিশেষ্য শব্দের উত্তর গুণবাচক (১) 'আমি' বা 'আম' প্রত্যয় হইলে তাহা বিশেষ্যে পরিবর্ত্তিত হয়। আম প্রত্যয় অপেক্ষা আমি প্রত্যয়ের প্রচলন অধিক। যথা,—বোকা, বোকামি; জ্যাকা (অজ্ঞ) জ্যাকামি, জ্যাকাম; ভণ্ড, ভণ্ডামি; ভাঁড়, ভাঁড়ামি, ভাঁড়াম। গুণবাচক প্রত্যয় (২) পণা; যথা,—গৃহিণীপণা। (৩) আনি বা আনা; যথা,—বাবু-আনি বা বাবু-আনা।

কতকগুলি দ্বিবর্ণ অকারান্ত বিশেষ্য শব্দের অন্ত্য অকার ওকারে পরিবর্ত্তিত হইলে, তাহারা গুণপ্রকাশক বিশেষণে পরিণত হয়। যথা,—চোখ, চোখো (একচোখো লোক); ইহার প্রথম বর্ণ আকার সংযুক্ত হইলে সেই আকার একারে পরিবর্ত্তিত হয়। যথা,—টাক, টেকো; মাছ, মেছো; ভাত, ভেতো (ভেতো বাঙ্গালী)। প্রথম বর্ণ অকার সংযুক্ত হইলে সেই অকার ওকার হয়। যথা,—খড়, খোড়ো; মদ, মোদো (মদ্যপ); জল, জোলো (জোলো বাতাস)।

অর্থবিশেষে শব্দের উত্তর ট, টে এবং চে প্রত্যয় হয়। যথা,—তুলো (তুল, কিন্তু তুলা বা তূলা (প্রচলিত উচ্চারণ তুলো) হইতে তুলোট (তুলজাত)। ভাড়া, ভাড়াটে, অর্থ যে ভাড়া দেয় বা যাহার জন্য ভাড়া দেওয়া হয়; যথা,—ভাড়াটে ঘর। ঈষদূনার্থে টে প্রত্যয় হয়; যথা,—শাদাটে, পাগ্‌লাটে (পাগল হইতে)। বোকাটে, মেদাটে (উচ্চারণ ম্যাদাটে), অর্থ অল্পভাষী বোকা। লম্বাটে, ঘোলাটে, মন্দাটে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বেঁটে (বামন) বেঁ—শব্দের উত্তর টে প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন নহে। ঈষদূনার্থে চে প্রত্যয়ও হয়; যথা,—লালচে (রক্তাভ)।

আলি প্রত্যয়—অর্থ সম বা মত। যথা,—সোণালি, রূপালি। পাটালি—অর্থ, পাটার মত অর্থাৎ চেপ্টা, লম্বা, চওড়া। গাঁ আলি গাঁ (সন্ধির নিয়মানুসারে গাঁলিগাঁ নহে)—অর্থ, পুরো পাড়া গাঁ, সহরের মত নহে। স্থলবিশেষে আলি প্রত্যয়ের আ লুপ্ত হয়। যথা,—মেয়েলি।

বাঙ্গালায় দুইটী প্রত্যয় আছে,—ওকার এবং ইকার। সংকল্প, বক্তব্য প্রভৃতির দৃঢ়তা নির্দ্দেশের (emphasis) জন্যই ইহাদের ব্যবহার। যথা,—আমারও, এদেরই। ইহাদের উচ্চারণ যথাক্রমে আমারো, এদেরি। এই কারণে অনেক স্থলে ইহারা এই ভাবেই লিখিত হয়। কিন্তু যে স্থলে শব্দের অন্ত্য অকার উচ্চার্য্য থাকে, সে স্থলে পৃথগ্‌ভাবে ওকার এবং ইকার লিখিত হয়। যথা,—আমি এ কাজ ক'রবই; তোমার এখানে আস্‌বও না, ব'স্‌বও না। দেখিতে গেলে এই সকল শব্দের প্রায় সকলগুলিই স্বরান্ত। সুতরাং আমারো প্রভৃতির পরিবর্ত্তে আমারও প্রভৃতি লেখাই সঙ্গত। তবে অবশ্য কবিজনের লেখায় কোনও বাঁধাবাঁধুনি খাটিবে না।

এই প্রত্যয় লইয়া আরও একটু গোলমাল আছে—ইহাদের অবস্থিতির বিষয় লইয়া। যথা,—এ কথা তাকে বলেওছি ত; এ কথা তাকে বলেছিও ত। ইহাতে অর্থের বিশিষ্ট পার্থক্য দেখা যায় না। সুতরাং বলেওছি অপেক্ষা বলেছিও লেখাই সঙ্গত।

উচ্চক্কা বলিয়া একটী শব্দ দেখা যায়। ইহার অর্থ অন্ধপ্রায়। ইহার উৎপত্তি-প্রকার একটু উদ্ভট। সম্ভবতঃ ইহা নিম্নলিখিত প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে;—উৎ+চক্ষুঃ=উৎ+চক্ষঃ (চক্ষুঃ, চক্ষঃ এবং তাহা হইতে চক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে; যথা,—স্বচক্ষে দেখেছি);—ইহা হইতে সন্ধি ও সমাসের নিয়মানুসারে উচ্চক্ষাঃ হইয়াছে এবং তাহার অপভ্রংশ হইয়াছে উচ্চক্কা।

মাথা গুলিয়ে যাওয়া ও মাথা ঘুলিয়ে যাওয়া—এই দুইটী কথা সমস্ত

সময় বড়ই গোলমাল বাধাইয়া ফেলে। ঘোলান আর গোলান উভয়ই দেখা যায়। মাথা ঘোলান—মাথা আবিল করা অর্থাৎ মস্তিকের স্বাভাবিক অবস্থায় বিকৃতি-সংঘটন। গোলমাল—শব্দের বা অবস্থার অস্বাভাবিকতা প্রাপ্তি বা বিকৃতি। গোলমালের সংক্ষিপ্ত আকার গোলও অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই গোল হইতে গোলান ধাতুর সৃষ্টি এবং তাহা হইতে গোলাইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারই অপভ্রংশ গুলিয়ে। সুতরাং উভয়ই শুদ্ধ।

ভরা সাধারণতঃ বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হয়—অর্থ, পূর্ণ। কিন্তু ভার বা বোঝা অর্থে বিশেষণরূপেও ইহার ব্যবহার আছে। যথা,—"হীরার পাপের ভরা (১) পূর্ণ হইল।"

কতকগুলি শব্দের ণ্ড-এর ড ড় হয় এবং বর্গের পঞ্চমবর্ণ ণ-এর অনুনাসিকত্ব রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্ববর্ণে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) ব্যবহৃত হয়। যথা,—শুণ্ড—শুঁড়; ভাণ্ডার, ভাঁড়ার। ণ্ড-এর পূর্ব্ববর্ণ আকার বা অকার সংযুক্ত হইলে সেই অকার আকার হয়। যথা,—দণ্ড (দণ্ডাদি অর্থে), দাঁড়; ভণ্ড, ভাঁড়; চণ্ডাল, চাঁড়াল; ভণ্ডামি, ভাঁড়ামি; ষণ্ড, ষাঁড়। ণ্ড এর পূর্ব্ববর্ণ অনুনাসিক হইলে তাহাতে আর চন্দ্রবিন্দু দিবার প্রয়োজন হয় না। যথা,—মণ্ড, মাড়। চণ্ড, গণ্ডগোল, লণ্ডভণ্ড প্রভৃতির পক্ষে এ নিয়ম খাটে না।

উপরি উক্ত নিয়মানুসারে আরও কতকগুলি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যথা,—বন্ধন হইতে বাঁধন; রন্ধন, রাঁধা (রাঁধন কদাচিৎ শুনা যায়)। যন্ত্র, যাঁতা (যাঁত নহে); যাঁতী ব্যাকরণ মতে যাঁতার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হইলেও উভয়ে একার্থক নহে। যাঁতীর অর্থ, সুপারি কাটিবার যন্ত্রবিশেষ। তবে ভাজন ছাড়া গড়নের কাজ কাহারই নহে; এই কারণে ইহারা কতকটা একজাতীয় হইতে পারে। অন্ত্র হইতে আঁত (২)। তাঁত তন্ত্রোৎপন্ন নহে, ইহা তন্তু হইতে নিষ্পন্ন। সেইরূপ মাত মন্ত্র হইতে নহে, মত্ত হইতে অপভ্রষ্ট।

এই নিয়মে আরও কয়েকটী শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যথা,—ঝম্প, ঝাঁপ; কম্প, কাঁপ (যথা—কাঁপ দিয়ে জ্বর আসছে)। মঞ্চ, মাচা; মাচ নহে। ইহা নিপাতনে সিদ্ধ।

এই জাতীয় আরও কতকগুলি শব্দ আছে, তাহারা অপর একটী শাখাসম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে একটী অনুস্বার (ং) আছে। অপভ্রষ্ট হইলে এই অনুস্বারটী চন্দ্রবিন্দু হইয়া পূর্ব্ববর্ণের মস্তকে আরোহণ করে এবং পূর্ব্বনিয়মবৎ অনুস্বারের পূর্ব্বস্থিত অকার আকার হয় ও পূর্ব্ববর্ণ অনুনাসিক হইলে সেক্ষেত্রে অমাবস্থার আবির্ভাব হয়। যথা,—বংশ, বাঁশ; হংস, হাঁস। মাংস, মাস (মাঁস নহে)। পাংশু (স্থ), পাঁশ (স); পংক্তি, পাঁতি; কাংস্য (স), কাঁসা;—ইহারা নিপাতনে সিদ্ধ হয়। শাঁসের উৎপত্তি শংস হইতে নহে, শস্য হইতে।

---

(১) এখানে ভরা শব্দ ভারার্থ বাচক নহে; এখানে ভরা অর্থে নৌকা। পাপের ভরা পূর্ণ হইল—এইবার উহা ডুবিবে।

(২) নৈঋতের ন্যায় খাঁত প্রভৃতি কতিপয় শব্দের স্বরবর্ণের হলবর্ণ সাধর্ম্য দেখা যায়।

অনেক লেখক কার্য্য হইতে অপভ্রংশ করিয়া কায লিখিবার পক্ষপাতী। তাহাদের মধ্যে কাহারও মতে বর্গীয় জ দিয়া কাজ লেখা ভুল। কিন্তু কার্য্যের প্রাকৃত কজ্জ এবং তাহার অপভ্রংশ কাজ। সুতরাং কাজ লেখা মোটেই ভুল নহে।

ঘোরতর অন্ধকার, গুরুতর ব্যাপার—ইহাতে বিশেষণের উত্তর তুলনাবাচক তর প্রত্যয় নিষ্প্রয়োজন। কথ্য ও লেখ্য উভয় ভাষাতেই, দরকার না থাকিলেও, ইহা এই সকল শব্দের নিকট আত্মীয়ের ন্যায়, বিনা নিমন্ত্রণেই আসিয়া পার্শ্বে আসন গ্রহণ করে। ইহারা ভাষার এত বেশী চলিয়া গিয়াছে যে, ইহাকে তুলিয়া কেবলমাত্র বিশেষণটী বসাইলে তাহা শুনিতে যেন ভাল লাগে না। ঘোর অন্ধকার বরং চলিতে পারে, কিন্তু গুরু ব্যাপার চালান দায়। সমাস করিয়া লিখিলে গুরুভার চলে।

অর্থ-বিজ্ঞান

[শ্রীদ্বারকানাথ দত্ত এম-এ, বি-এল্]

মুদ্রার কথা

সামাজিক অবস্থার প্রতি বিশেষ প্রণিধানতার সহিত লক্ষ্য করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে, পণ্য দ্রব্যের ন্যায় মুদ্রার মূল্যও তাহার টান-যোগানের প্রভাবে বাধ্য হইয়া থাকে। মুদ্রাগত ধাতব বস্তুর অন্য কোন ব্যবহার না থাকিলে, তাহার চাহিদা (demand) বলিতে সাক্ষাৎ বিনিময়ের উপর তাহার যে কার্য্যকরী শক্তি ও উপযোগিতা আছে, তাহাই বুঝা যাইবে। কোন ব্যক্তিবিশেষকে, তাহার উদ্বৃত্ত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী অর্জ্জন করিতে হইলে, সাক্ষাৎ বিনিময়ে সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে যে ব্যয় পড়িত, সেই ব্যয়ের উপরে, মুদ্রার যে পরিমাণ উপযোগিতা বা ব্যয়াল্পতা আছে, তদনুসারেই মুদ্রা লইবার টান হয়। কাহারও পক্ষে বিনা ব্যয়ে এই উপকার লাভ করা সম্ভব নহে। সুতরাং কাহাকেও মুদ্রা লাভ করিতে হইলে, তাহাকে এই ব্যয়াল্পতার সমানে-সমানে ব্যয় বহন করা আবশ্যক হইবে। কেন না, যাহার অধিকারে এই মুদ্রা থাকিবে, সে তাহার এই অধিকৃত সুবিধা বিনা মূল্যে পরিত্যাগ করিবে কেন? বলিয়াছি, মুদ্রার আয়োজন করিতে যে ব্যয় হয়, তাহা তাহার বিনিময়ের উপরে কোন কার্য্য করে না। তাহার অর্থ এই যে, সমাজ এই ব্যয় বহন করে; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষকে সে ব্যয় বহন করিয়া বিনিময় করিতে হয় না। কিন্তু তাহার যোগে বিনিময় করিতে যে লভ্য বা ব্যয় লাঘব ঘটে, তাহা লাভ করিবার জন্য সকলকেই কিন্তু ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং যাহারা বাজারে পণ্য লইয়া বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয়, উহারা এই উপকার লাভের মূল্য স্বরূপ পণ্যদ্রব্য দিতে প্রস্তুত হয়। কেন না, তাহা না দিয়া সাক্ষাৎ বিনিময়ের অনুসরণ করিলে, অধিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। কিন্তু যাহারা পণ্য লইয়া টাকা পাইবার জন্য এই ভাবে প্রতিযোগিতা

করিতে সম্মত হয়, তাহাদের নিকট মুদ্রার এই উপযোগিতা বা বিনিময়-মূল্য সমান নহে। নানা কারণে ও বিভিন্ন সুবিধা-সুযোগে ভিন্ন ভিন্ন পণ্য-বিক্রেতা বা মুদ্রাগ্রাহকগণ কমবেশী ব্যয় দিয়া সাক্ষাৎ ভাবেও বিনিময় করিতে পারে। সুতরাং তাহারা তাহাদের নিজ-নিজ সুবিধা, সুযোগ ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, মুদ্রার উপযোগিতা লাভ করার জন্য ভিন্ন-ভিন্ন পরিমাণ পণ্য দ্রব্য দিতে প্রস্তুত হয়। ইহাই মুদ্রার প্রয়োজন মূল্য বা টানদার (demand price)। আর যাহারা মুদ্রা লইয়া উপস্থিত হইবে, তাহাদের সমবেত মোট মুদ্রা নিঃশেষে ব্যবহৃত হইতে হইলে, তাহারাও অধিকারগত এই উপযোগিতা পরিত্যাগ করিবার মূল্য স্বরূপ, বিভিন্ন পরিমাণ পণ্য দ্রব্য পাইবার দাবী করিবে। ইহা তাহার যোগান মূল্য (supply price)। এই পণ্য-ওয়ালা ও টাকাওয়ালার মধ্যে প্রতিযোগিতা হইয়া অন্তীনক্রেতা ও বিক্রেতার মূল্যের সমতা ঘটিয়া, মুদ্রার এই বাজার বা সামাজিক (social) মূল্য ধার্য্য হইবে। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মুদ্রার মূল্যও, পণ্য দ্রব্যের স্থায়, তাহার টান-যোগানের প্রভাবেই ধার্য্য হয়। সেই পণ্য বস্তু কোন বিশেষ সামগ্রী হউক, বা আমাদের কথিত সমবায়ী পণ্য হউক, তাহাতে আমাদের এই সিদ্ধান্তের কোন ইতর-বিশেষ হইবে না।

এইরূপে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত মুদ্রা নিঃশেষে ব্যবহৃত হইয়া মুদ্রার মূল্য ধার্য্য হয়; তাহার তারতম্য ঘটিলে, পণ্য দ্রব্যের স্থায় তাহারও টান যোগানের তারতম্য ঘটে। এই টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে, পূর্ব্ব মূল্যে যাহারা টাকা লইয়া পণ্য দিতে সম্মত ছিল না,—কম পণ্য দিয়া টাকা ক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল, তাহাদের এই পণ্য এক্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া, তাহাদের অন্তীন উপযোগিতার সমানে টাকার মূল্য ধার্য্য হইবে। আর মুদ্রার পরিমাণ সঙ্কোচ করিলে, যাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী মাত্রায় সামগ্রী দিয়া ও মুদ্রা লইবার জন্ম লালাইত ও প্রস্তুত ছিল, এখন তাহাদের অন্তীন মূল্যের সমান মুদ্রার মূল্য ধার্য্য হইয়া তাহার মূল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং পণ্যের মূল্য কমিয়া আসিবে। পণ্যের মূল্য বেশী হইলে, অনেকে হাতের টাকা ছাড়েন না, আর কমিয়া গেলে টাকা লইয়া উপস্থিত হন। সর্ব্বাবস্থায়ই উপস্থিত মুদ্রা নিঃশেষে ব্যবহৃত হইয়া বিনিময় হইতে হইলে, যত পণ্য সেই বিনিময়ে আসে, তাহার শেষ সমবায়ী মাত্রায় উপযোগিতার সমান-সমানে মুদ্রার মূল্য ধার্য্য হইবে। সুতরাং দেশের প্রচলিত সমগ্র মুদ্রার বেলায়ও নিঃসন্দেহ এ কথা বলা যাইতে পারিবে যে, ঐ সকল মুদ্রা নিঃশেষে ব্যবহৃত হইয়া তাহার যে মূল্য উদ্ভূত হইবে, সেই বিনিময়ে যত পণ্য আসিয়াছে, তাহার মূল্য সেই পণ্যের শেষ মাত্রায় উপযোগিতার সমান। আর এই মুদ্রার পরিমাণই বা কত হইবে, তাহাও সামাজিক প্রতিযোগিতা প্রভাবে বিনিময় অপর পক্ষের শেষোপযোগিতার সমীকরণ হইয়া ধার্য্য হইবে। কেন না দেখা যায় যে, যাহারা বাজারে পণ্য-সামগ্রী লইয়া বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা বাজার-দরাপেক্ষা তাহাদের সামগ্রীর মূল্য বেশী বলিয়া মনে করে, তাহারা হয় উহা ফিরাইয়া নিজেরা উপভোগ করে, না হয়, অন্য সময়ে বা অন্য উপায় বিনিময় করিতে চেষ্টা করে। আর যদি একান্ত বাজার-দরেই বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, তথাপি ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে—এইরূপ একটা বোধ থাকিয়া যায়। সুতরাং সামাজিক প্রতিযোগিতা প্রভাবেই কত মুদ্রা ব্যবহৃত হইবে, এবং কত পণ্য দ্রব্য মুদ্রার মধ্যবর্ত্তিতায় বিনিময় হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সর্ব্বাবস্থাতেই মোট পণ্যের শেষ মাত্রার উপযোগিতার সমানে মুদ্রার ব্যষ্টি মাত্রায় মূল্য ধার্য্য হয়।

আমাদের এই আলোচনার ফলে যে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইতেছে, তাহার প্রতি একটু প্রণিধান করিলেই, মুদ্রার পরিমাণ সহ তাহার সম্বন্ধ কি তাহা পরিস্ফুট হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি কল্পনা করা যায় যে, দেশে হাজার মাত্রা সমবায়ী পণ্য (composit units of goods) মুদ্রার যোগে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে, তবে প্রচলিত মুদ্রাকে সমান হাজার ভাগে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক ভাগের মূল্য পণ্য দ্রব্যের শেষ মাত্রার উপযোগিতার সমান হইবে। যদি শেষ মাত্রার যোগ্যতা-শক্তি ৩ মাত্রা হয়, তবে মুদ্রার মূল্য ৩ মাত্রা উপযোগিতা হইবে। তখন মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ করিলে, পূর্ব্ব মাত্রা মুদ্রার মূল্য অর্দ্ধেক কমিয়া ১২ মাত্রা হইবে। কেন না, পণ্যের শেষ মাত্রার ব্যবহার যোগ্য শক্তি এখনও ৩ মাত্রাই আছে; এবং এই ৩ মাত্রা পূর্ব্ব-মুদ্রার দুই মাত্রায় ক্রয় করিবে। পণ্য পরিমাণ ঠিক রাখিয়া মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে, বিরুদ্ধানুপাত সম্বন্ধ ধার্য্য হয়। মুদ্রার উর্দ্ধ সীমার ও তাহার মোট মূল্যের আলোচনায়ও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া গিয়াছে।

আদর্শ সুবর্ণ মুদ্রা ও তাহার ক্ষয়-শক্তি।

দায় শূন্য পত্র-মুদ্রা (Inconvertible paper-money) সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত বেশ প্রযুক্ত হয়। কিন্তু ধাতব মুদ্রার বেলায় তাহার শিল্প ব্যবহারকেও হিসাবে আনিতে হয়। এই পর্য্যন্ত আমরা বিনিময়ে মধ্যবর্ত্তিতা করার বিষয় চিন্তা করিয়া, এই মূল্য-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু আর্ট বা শিল্প কার্য্যের জন্য সোণার যে ব্যবহার আছে, তাহার ফলে তাহার একটা নিজস্ব উপযোগিতাও আছে। মুদ্রার এই সাক্ষাৎ ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এই পরিমাণবাদ সিদ্ধান্ত অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব দৃষ্টান্তের প্রতি প্রণিধান করিলেই আমাদের বাক্যের সত্যতার উপলব্ধি হইবে। পূর্ব্ব দৃষ্টান্তে মুদ্রা ও পণ্যের শেষ মাত্রায় উভয়ের উপযোগিতা ছিল; কিন্তু মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিলে, তাহার উপযোগিতা অর্দ্ধেক কমিয়া আসা সম্ভব নহে। উপভোগ্য কোন সামগ্রীর পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিলে, তাহার অন্তীনোপযোগিতা (marginal utility) অর্দ্ধেক কমিয়া আসা স্বাভাবিক নহে। ধান্যের পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে, তাহার অন্তীন মাত্রার উপযোগিতা কত কমিয়া আসিবে, তাহা ঠিক বলা যায় না; তবে অর্দ্ধেক কমার সম্ভাবনা নাই। যদি এক-তৃতীয়াংশ কমিয়া আসা

কল্পনা করা যায়, তবে আমাদের কল্পিত দৃষ্টান্তের পূর্ব্ব ব্যষ্টি মাত্রায় উপযোগিতা এখন ২ মাত্রা হইবে; এবং দুইটীর উপযোগিতা ৪ মাত্রা হইবে। পণ্যের উপযোগিতা স্থির থাকায়, মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ হইলেও, পূর্ব্ব মাত্রার হিসাবে দুই মাত্রা দিয়া এই পণ্য মাত্রা ক্রয় করা হইবে না। প্রতি মাত্রার উপযোগিতা ২ মাত্রা হওয়ায়, ১২ মাত্রা মুদ্রার উপযোগিতাই ৩ মাত্রা হয়। তবে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, আমরা সোণার শিল্প ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য করিয়াই, তাহার উপযোগিতা এক তৃতীয়াংশ হ্রাস হওয়ার কল্পনা করিয়াছি; কিন্তু বাস্তব জীবনের সহিত ঐক্য স্থাপন করিতে হইলে, তাহার উভয় ব্যবহারের সমবেত ফল চিন্তা করিতে হয়। এই দুই প্রয়োজনের জন্য তাহার যে টান, তাহার ফলে তাহার অন্তীনোপযোগিতা যদি কিছু বেশীও কমিয়া আসে, তথাপি কোন অবস্থায়ই উহা কমিয়া ১২ মাত্রা হইবে না। সুতরাং মুদ্রার মূল্যের সহিত তাঁহার পরিমাণের বিরুদ্ধানুপাত সম্বন্ধ ধার্য্য হয় না। আর পণ্য দ্রব্যের পরিমাণ স্থির থাকিলে, দায়-শূন্য পত্র-মুদ্রার সহিত এই সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু পণ্যের পরিমাণ কখনও স্থির থাকা স্বাভাবিক নহে। আর তাহার পরিমাণের সঙ্কোচ কি বৃদ্ধি ঘটিলে, তাহার অন্তীনোপযোগিতা কোন নির্দ্দিষ্টানুপাতে উত্থান-পতন করিবে না। তখন দায় শূন্য পত্রের সহিতও এই সম্বন্ধ রক্ষিত হইবে না।

এই সুদীর্ঘ আলোচনার ফলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, মুদ্রা ও পণ্যের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলেও, মুদ্রা কি পণ্যের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হইলে, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে সেই অনুপাতে মুদ্রার ক্রয় শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটে না। পণ্য সামগ্রীর পরিমাণ স্থির রাখিয়া মুদ্রা বৃদ্ধি করিলে, কিম্বা মুদ্রার পরিমাণ স্থির রাখিয়া পণ্য সামগ্রীর পরিমাণ সঙ্কোচ করিলে, মুদ্রার ক্রয় শক্তি হ্রাস ও পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়, এবং মুদ্রার পরিমাণ স্থির রাখিয়া পণ্য দ্রব্যের বৃদ্ধি করিলে, কিম্বা পণ্যের পরিমাণ স্থির রাখিয়া মুদ্রার পরিমাণ সঙ্কোচ করিলে, মুদ্রার ক্রয় শক্তি বৃদ্ধি ও পণ্যের মূল্য হ্রাস হওয়ার দিকে একটা স্থির গতি হয়; এবং এই গতির অনুযায়ী ফলোৎপন্ন হইলেও, যে অনুপাতে মুদ্রার পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি করা যায়, সেই অনুপাতে তাহার ক্রয়-শক্তির উত্থান-পতন হয় না। তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে যদি বা তাহার মূল্য হ্রাস হয়, তথাপি, যে অনুপাতে পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে, সেই অনুপাতে ত হ্রাস হইবেই না; বরং অনেক কম পরিমাণে হ্রাস হইবে। যে সকল দেশে একমাত্র ধাতুর মুদ্রাই ব্যবহৃত হইয়া বিনিময় কার্য্য সম্পন্ন হয়, তথায়ও তেমন কোন বেশী পরিমাণে মূল্য হ্রাস হইয়া আসিবে না। বিশেষ, সোণার পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেও সম্যক সোণা বিনিময়, কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। কতক শিল্পাদি কার্য্যে চলিয়া যায়, এবং আর কতক সাক্ষাৎ ও ধারের ভিত্তিতে ভাগাভাগি হইয়া পড়ে। সুতরাং মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধিতে যতটা পণ্য দ্রব্যের দরের হারের বৃদ্ধি হওয়া কল্পিত হয়, ঠিক সেইরূপ ফল ফলিতে পারে না।

মুদ্রাগত ধাতব বস্তুর বিভিন্ন ব্যবহারের শেষ যোগ্যতার সমীকরণ

মুদ্রাগত ধাতব সোণার বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য যে তাহার চাহিদা (Demand), তাহাদের শেষোপযোগিতার সমীকরণ করিয়া লওয়া একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে। ব্যক্তিবিশেষ তাহার ক্রয়-তালিকায় শেষ যোগ্যতার (marginal utilityর) যে ভাবে সমীকরণ করিয়া লন, ইহা সেরূপ ব্যাপার নহে। ইহার বিভিন্নাঙ্গের সমীকরণ একটা সামাজিক বিষয়। সামাজিক প্রতিযোগিতা প্রভাবেই তাহাদের বিভিন্নাঙ্গের সমন্বয় ও সমীকরণ হইয়া থাকে।

বিনিময়ের মধ্যবর্ত্তিতা-করণ জন্য এবং শিল্পাদির (আর্টের—artএর) প্রয়োজনে যে সোণার টান পড়ে, তাহাও একান্ত সহজ ব্যাপার নহে। এই দুই কার্য্যের শেষ যোগ্যতায় সমীকরণ করার পূর্ব্বে, ক্রয়-বিক্রয় সময়ে নগদ মূল্য আদান-প্রদান এবং ক্রেডিটের কার্য্য পরিচালন জন্য তাহার মাতব্বরীর ভিত্তি রক্ষা, এই দুই কার্য্যের প্রয়োজনে যে মুদ্রার টান হয়, তাহাদেরও শেষোপযোগিতায় সমীকরণ হওয়া আবশ্যক। তেমন, অলঙ্কারাদি শিল্পকর্ম্মের জন্য কত ভাবে যে সোণার টান পড়ে, তাহাদের একটা তালিকা করিয়া লওয়াও অসাধ্য। এই সকল বিভিন্ন ব্যবহারের অন্তীনোপযোগিতারও সমীকরণ করার আবশ্যকতা আছে। এই সকল বিভিন্নাঙ্গের সমন্বয় সাধন করার পরই কেবল মুদ্রা ও আর্টের ব্যবহারের শেষ যোগ্যতার সমীকরণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অবশেষে পণ্য দ্রব্যের সহিত তাহাদের সমন্বয় ও সমীকরণ সমাধান করিতে হইবে। এই সকল বহু অঙ্গের অন্তীনোপযোগিতার সমীকরণ একটা বিষম জটিল ব্যাপার। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মাত্র আর্ট এবং বিনিময়ের মধ্যবর্ত্তিতার জন্য যে সোণার টান হয়, তাহাদের শেষ যোগ্যতার সমীকরণ প্রণালী প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাহারা সমবায়ী পণ্য সামগ্রী লইয়া আর্টের কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য সোণা ক্রয় করিয়া লইতে উপস্থিত হয়, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যানুসারে প্রতিমাত্রা সোণার জন্য ভিন্ন-ভিন্ন পরিমাণ পণ্য সামগ্রী দিতে প্রস্তুত ও স্বীকৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তাহাদের সকলের প্রয়োজন কিম্বা পণ্য দ্রব্যের উপযোগিতা সমান সমান হওয়া স্বাভাবিক নহে। প্রতি মাত্রা সোণার জন্য যে পরিমাণ সামগ্রী দিতে স্বীকৃত হইবে, তাহাই তাহার প্রয়োজন মূল্য (Demand price)। আর যাহারা সোণার অধিকারী তাহারা যদি মুদ্রা স্বরূপ যে পরিমাণ সমবায়ী পণ্য পাওয়া যাইবে বলিয়া কল্পনা করিবে, সেই পরিমাণ পণ্য লইয়া সোণা ছাড়িতে প্রতিযোগিতা করে, তবে তাহাই তাহাদের যোগান মূল্য (Supply price) হইবে। এই যোগান দরও ব্যক্তিভেদে স্বতন্ত্র। কেন না, মুদ্রা স্বরূপ যে উপযোগিতা, তাহা সকলের পক্ষে সমান নহে। বাজারের প্রতিযোগিতা বশে এই বিভিন্ন টান যোগান দরের সমতা ঘটিয়া, সোণার পণ্য-মূল্য ধার্য্য হইবে। এই পণ্য-মূল্যে যে—ব্যষ্টি মাত্র সোণা আর্টের জন্য ক্রয়

করিতে পারা যাইবে, সেই ব্যক্তি মাত্রা সোণার মুদ্রা স্বরূপেও সেই পরিমাণ পণ্য সামগ্রী লাভ করিতে পারা যাইবে। এই পণ্যের দরেই সোণার ক্রয়-বিক্রয় হইবে। তখন পণ্য-সামগ্রী স্বরূপে পণ্যদ্রব্যের তুলনায় সোণা লাভ করার যে উপযোগিতা, তাহা মুদ্রার ও সেই পরিমাণ ক্রয় শক্তির হিসাবে মুদ্রালাভের উপযোগিতার সমান হইবে। এই ভাবে মুদ্রা ও আর্টের ব্যবহারের জন্য সোণার টান-যোগানের সমতা ঘটিয়া তাহাদের অন্তীনোপযোগিতায় সমীকরণ হইয়া যাইবে, এবং পণ্য সাধারণের আপেক্ষিক মূল্যের সহিত ও সোণার আপেক্ষিক মূল্যের অনুপাতে সমতা ঘটিবে।

এই সকল বিস্তৃত আলোচনার ফলে ইহাই প্রতীত হয় যে, এক প্রস্থ পণ্য-সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় হইতে মুদ্রার যে ক্রয়-শক্তির উদ্ভব হয়, তাহা কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বা অবস্থার পরিণত ফল নহে; বহু অবস্থা ও কারণের সমবেত কার্য্য ফল স্বরূপে তাহার প্রতিষ্ঠা হয়। তাহার ক্রয়-শক্তির উদ্ভব হইতে হইলে, বিভিন্নাবস্থায় সমতা ও সমন্বয় সম্পাদন করিয়া লইতে হয়।

প্রথমতঃ, মুদ্রা লাভ করিতে হইলে যে ব্যয় বহন করিতে হয়, তাহার সহিত তাহার মূল্যের সমতা সম্পন্ন হওয়া চাই।

দ্বিতীয়তঃ, আর্ট ও বিনিময়ের জন্য সোণার শেষ যোগ্যতার সমীকরণ।

তৃতীয়তঃ, বিনিময়ের বিভিন্ন ক্রমের শেষ যোগ্যতার সমতা সম্পাদন।

চতুর্থতঃ, নগদ আদান প্রদান ও ধারের ভিত্তি রক্ষার জন্য মুদ্রার যে ব্যবহার আছে, তাহাদের শেষ যোগ্যতার সমীকরণ।

পঞ্চমতঃ, মুদ্রা ও তাহার ব্যবহারে যে সকল পণ্য-সামগ্রীর বিনিময় হয়, তাহাদের শেষ যোগ্যতার সমতা সম্পাদন।

ষষ্ঠতঃ, পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং পণ্যের অন্তীনোপযোগিতার সমতা সম্পাদন।

এই সকল বিভিন্নাঙ্গের শেষ যোগ্যতার সমীকরণ হইয়াই মুদ্রার ক্রয়-শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। এতগুলি অঙ্গের সমীকরণ করিয়া লওয়া অতিশয় জটিল ব্যাপার। আমরা এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা করিয়াছি, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে যে মুদ্রার পরিমাণ সহ তাহার কোন বিরুদ্ধানুপাত সম্বন্ধ (Inverse ratio) নাই। উহার ক্রয়-শক্তি একটা অতি জটিল ব্যাপার; মুদ্রার হ্রাস-বৃদ্ধিতে তাহার ক্রয়-শক্তির কতটা ইতর-বিশেষ হইবে, তাহা বলা দুরূহ।

ধানের খবর।

[শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।]

যে দিন-কাল পড়িয়াছে, তাতে কে কার খবর রাখে? এমন কি, যে ধান-চাল নইলে বাঙ্গালীর একবেলাও চলে না, তার খবরও নয়। এখন সকলে খবর রাখি কেবল অর্থের; কারণ তাতে অশান্তি ও বখাট যতই বাড়ুক না কেন, অন্ন, বস্ত্র, বিলাস, বৈভব প্রভৃতি আর সবই মেলে;—তা সে অর্থকে পণ্ডিতেরা চোখ রাঙ্গিয়ে যত অনর্থের মূলই বলুন না কেন, আর তার যত ভয়ঙ্কর কাযই আমরা হাতে হাতে দেখতে পাই না কেন। কাহারও দরজায় একজন অতিথি আসুক, খাইয়ে তাঁকে পরিতোষ করতে পারা যায়; কিন্তু অর্থে তাঁকে তুষ্ট করতে কেউ কখনও পেরেছে, তাঁর খোরাকের শতসহস্রগুণ মূল্য রজত-কাঞ্চনে ভরিয়েও? আমরাও তেমনি ঈশ্বরের দ্বারে অতিথি; আর তিনিও কখনও রজত-কাঞ্চনে আমাদের পরিতোষ করতে পারেন নি। কিন্তু শস্য দিয়ে বরাবর আমাদের 'খাই' মিটিয়ে আসছেন,—যখনই তা প্রাণ দিয়ে চেয়েছি, ও পাবার জন্য খেটেছি। তবু যে ক্ষুধা মেটবার নয়—আমরা খোরাক চাই তারই, খবরও রাখি তারই; আর ক্ষুধা যাতে মেটে, তা ত কই চাই না! বিশেষ খবরও তার রাখি না! অনেকে হয় তো ধানের খবর রাখেন; কিন্তু বলতে পারেন কি—একটা ধানের গাছে কতগুলি শীষ হ'তে পারে,—প্রত্যেক শীষে কতগুলি ধান হ'তে পারে,—একটি ধান এক বৎসরে কতগুলি সন্তান-সন্ততি প্রসব করতে পারে, আর তাদের সমষ্টির ওজন কতদূর পর্য্যন্ত হ'তে পারে? আমাদের পুরুষানুক্রমিক ধানের চাষ আছে; এবং জ্ঞান হওয়া অবধি আজ ২০।২৫ বৎসর ধানের খবর রেখেও আমি নিজেই এ সকল তথ্য জানতাম না। মোটা-মুটি এইটুকু জানতাম যে, একবিঘা (৮০×৮০ হাত) জমির 'আবাদ' করতে দশ-বার সের বীজ ধান লাগে; আর তা থেকে ৮।১০ মণ ধান ফলিয়া থাকে। নিকৃষ্ট জমি হ'লে ৬/০ মণ ফলে; আবার খুব উৎকৃষ্ট জমিতে ১২।১৪ মণও পাওয়া যায়। আর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিয়া ঐ পরিমাণ বীজধান হইতে ২৪।২৫/০ ধান পাওয়া গিয়াছে, তাও শুনেছি। কিন্তু এ বৎসর দৈবক্রমে যে সকল তথ্য আমার গোচরে এসে প'ড়লো, তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

আমি যে স্থানের কথা লিখছি, সে আমাদের সুজলা-সুফলা বাঙ্গলাদেশ নয়; বিহার অঞ্চলের বালুকা-কঙ্করময় পার্ব্বত্য প্রদেশ। এতদঞ্চলে ফলমূলাদির গাছ রোপণ করিতে গেলে, বিশেষ যত্ন ছাড়া 'লাগে' না। গত বৎসর শীতকালে এক উরুত গভীর ও দুই হাত ব্যাসের গুটীকতক গর্ত্ত খানিকটা কাঁকুরে জমির উপর করিয়ে রাখি; এবং এই সকল গর্ত্তে অর্দ্ধেক গোবর ও অর্দ্ধেক পলিমাটি ভরিয়ে প'চতে দেওয়া হয়। বর্ষার জলে ভরাটি 'সার' কিছু ব'সে গিয়ে, তাতে আগাছা জন্মিতে থাকে। এই সকল আগাছায় ভরাটি মাটির উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট ক'রে ফেলবে এবং পরবর্ত্তী রোপণীয় গাছ তাতে ভাল লাগবে না। এই ভয়ে আগাছার জঙ্গল অনবরত সাফ করিয়ে রাখা হয়। জঙ্গল সাফ করবার সময় একটি গর্ত্তে দৈবক্রমে একটি ধানগাছ দেখা যায়; এবং মজুরদের ধান-গাছের উপর প্রাকৃতিক মমতা বশতঃ গাছটি থাকিয়াই যায়; তাহাকে কেহ উপড়াইয়া ফেলিয়া দেয় নাই। আমি নিজেও ইচ্ছা সত্বেও দীর্ঘসূত্রতা বশতঃ তাকে স্বহস্তে নষ্ট করি নাই। গাছে যখনই কতকগুলি নবীন পাতা দেখা যেত, তখনই তাহা বাছুরকে দিয়ে খাইয়েছি। এইরূপ দুই-তিন বার বাছুরে তাকে 'মুড়িয়ে খেয়েছে; তবুও গাছটি বেড়েই চ'লেছিল।

ইতিমধ্যে একবারও প্রায় ২০-২৫ দিন গাছটার দিকে কাহারও নজর পড়ে নাই। অকস্মাৎ একদিন দেখলাম, সে গাছটি এক বৃহৎ 'ঝাড়ে' পরিণত হ'য়েছে; এবং দুএকটি "থোড়" মাত্র দেখা দিতেছে। তখন গাছটির শ্রী দেখে, তাকে রক্ষা করবার ইচ্ছা হ'লো। এত দিন বৃষ্টির জল পাহাড়ে ঢালু জমিতে তার যতটুকু পরিচর্য্যা করবার, করে এসেছিলো। কিন্তু এখন দেখলাম গোড়া শুষ্ক। প্রথমেই বলেছি যে, গর্ত্তের ভরাট মাটি বৃষ্টির জলে ব'সে গিছলো; তখন তাতে বেশ জল দাঁড় করানো যায়। আমি প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া ২০।২৫ কলস জলে গাছের গোড়া ভরিয়ে দিতে লাগলাম; এবং প্রত্যহ গাছটির প্রতি লক্ষ্য রাখলাম, —জলাভাব আর হতে দিলাম না। দুই সপ্তাহ কাল পরে দেখলাম যে, অজস্র শীষ বাহির হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে। প্রায় মাসাধিক কাল এই শীষগুলিকে পাকতে দিয়ে কার্ত্তিকের শেষভাগে ৬০টি (ষাটটি পাকা ধানের শীষ গাছ হ'তে সংগ্রহ করলাম। তখনও গাছে কিন্তু কাঁচা শীষ ২০টি মজুত রয়েছে; আর নূতন 'থোড়' তখনও বার হচ্ছে। পরে অগ্রহায়ণ মাসে ঐ গাছ হ'তেও আরও ৩০টি শীষ সংগ্রহ করি; এবং এই মোট সংগৃহীত শস্যের বিবরণ নিয়ে লিপিবদ্ধ করলাম।

১। ৯০টি শীষের প্রত্যেকটি গড়ে ১০ ইঞ্চি করিয়া লম্বা।

২। প্রত্যেক শীষ কতকগুলি শাখা শীষের সমষ্টি মাত্র ও এই শাখা শীষের সংখ্যা প্রতি মূল শীষে ছিল গড়ে ১৩টি করিয়া।

৩। প্রত্যেক শাখা শীষে গড়ে ১৯২টি করিয়া ধান ছিল ও প্রত্যেক মূল শীষে গড়ে ২৫০টি করিয়া ধান পাওয়া গিয়াছে।

৪। মোট ৯০টি শীষের ধান গণনা করিয়া দেখা গেল, তাহার, সংখ্যায় বাইশ হাজার পাঁচশত।

৫। ওজন করিয়া দেখা গেল ৮টি ধানে এক রতি হইলেও মোট ২২৫০০ ধানের ওজন পাওয়া গেল ২৮৷৷০ তোলা (প্রায় দেড় পোয়া)।

এখন দেখা যাচ্ছে যে, মাত্র একটি ধানের 'আবাদ' খুব যত্নের সহিত করলে, তা থেকে ২২৫০০ ধান, ও ⅛ রতি ধানের আবাদ করলে, তা থেকে ২২৫০০ হাজার ⅛ রতি=২৮১২½ রতি প্রায় ৪৬৯ আনি প্রায় ৩৯ তোলা ধান পাওয়া অপ্রাকৃতিক নয়। হয় তো এর চেয়েও ভাল ফল কেহ-কেহ পেয়ে থাকবেন; কিন্তু যা জানি না, তার কথা ছেড়ে দিয়ে, উপস্থিত লব্ধ ফলের উপর একটা মোটামুটি হিসাব ধরা যাক।

একবিঘা (৮০×৮০ হাত, জমিতে হয় ৬৪০০ বর্গ হাত; প্রত্যেক গাছের জন্য যদি এক বর্গহাত জমি নিয়োগ করা যায়, তাহলে একবিঘা জমিতে ৬৪০০ ধান গাছ হবে। অবশ্য, সাধারণতঃ, আধহাত অন্তরই ধানগাছ 'লাগাতে' হয়; কিন্তু যে সব গাছ খুব বড় ঝাড় বাঁধবে, তাদের একটু বেশী স্থান দেওয়া দরকার। আমার গাছটির নীচের শিকড় একবর্গ হাত জমি অতিক্রম করে নাই; এবং উপরেও 'ঝাড়টি' ঐ পরিমাণ জমিতেই বিস্তৃত ছিল। ৬৪০০ ধান গাছের জন্য ৬৪০০টী বীজের প্রয়োজন, যাহার ওজন মাত্র সওয়া আট তোলা। প্রত্যেক গাছ থেকে দেড়পোয়া করে ধান পাওয়া গেলে, একবিঘা জমি থেকে পাওয়া যাবে ৬৪০০শত দেড়পোয়া=৯৬০০ পোয়া=২৪০০ সের=৬০/০ মণ। একটা গাছে যা ফলা সম্ভব ১০ বা ততোধিক গাছের পক্ষেও তাই, যদি সকলে সমান অনুকূল অবস্থা পায়। সব বীজ অঙ্কুরিত না হ'তে পারে; পশু-পক্ষীতে ক্ষেত্র হইতে কতক বীজ খুঁটে খেতে পারে; জলে-কতক বীজ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে; এবং অনেক শিশু চারা কীট পতঙ্গতে নষ্ট করে দিতে পারে। সে কারণ না হয়, আমার হিসাবের চতুর্গুণ অর্থাৎ ৮¼ তোলা স্থলে ৪০ তোলাই বীজ লাগুক। তাহলেও একবিঘা জমির আবাদ করতে অর্দ্ধসেরের অধিক বীজের আবশ্যক তো হয় না।

এখন কথা এই যে, গুটিকতক গর্ত্ত কেটে তাতে সার দিয়ে ভরাতে ও একটি গাছে নিয়ম-মত জল সেচন করিতে আমার যা খরচ হয়েছে, সেরূপ ব্যয় একবিঘা জমির উপর করা যেতে পারে কি না, পারলেও সে ক্ষেত্রজ ফসল থেকে সে খরচ উঠতে পারে কি না। যত গোবর দিয়ে আমি গর্ত্ত ভরাট করেছিলাম, ধান গাছের জন্য তত গোবরের আবশ্যক হয় না; কারণ ধানগাছের শিকড় বড় জোর আধ হাত পর্য্যন্ত যায়। এখন অর্দ্ধেক মাটী অর্দ্ধেক গোবরে যদি জমি প্রস্তুত করিতে হয়, তবে এক বিঘা জমির জন্য গোবর চাই ¼×৮০×৮০=১৬০০ ঘন হাত। এক ঘন ফুট পুরানো গোবরের ওজন চৌদ্দসের; এবং এই অনুপাতে এক ঘন-হাত গোবরের ওজন হবে ১/৭ একমণ, সাতসের। সুতরাং ১৬০০ ঘনহাত গোবরের ওজন হচ্ছে ১৮৮০/০ মণ। এই পরিমাণ গোবর একবিঘা জমির জন্য সংগ্রহ করতে পারা গেলেও খরচ এত বেশি পড়বে যে, হয় তো অনেক সময়ে শস্যের দাম এতদূর উঠবে না। তবে যদি কৃষী নিজের বাটীতে গোপালন করিতে পারে, তবেই ইহা সম্ভব। ঘরে গোপালন করতে গেলে, একবিঘার জন্য বারটি পশুর দরকার। ১২টি পশুর যদি দিন-রাতের সমস্ত গোবরই সংগ্রহ করা যায়, তবে এক বৎসরে কিছু কম-বেশি ১৬০০ ঘন হাত গোবর পাওয়া যাবে। আমি ছয়টি-মাত্র পশুর রাত্রের গোবর সংগ্রহ ক'রে দেখেছি, এক মাসে ৩৬ ঘন হাত হয়েছে। অবশ্য যেখানে গোপালনের সুবিধা আছে, সেখানে ১০।১২ টা কেন, দুই-এক শত পশুও পালন করা যায়। এতদঞ্চলে গোপালনের কোন হাঙ্গামাই নাই; গোয়াল ঘরও তুলিতে হয় না; পশুদিগকে 'জাবও' দিতে হয় না। একটি রাখাল সমস্ত দিন পশুদের জঙ্গলে 'চরিয়ে' এনে সন্ধ্যার সময় 'বাথানে' (চারিদিক ঘেরা গরুর জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান) এনে ছেড়ে দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে মাত্র একটি গাভী পালন করতে যে কত কষ্ট, তাও আমার অবিদিত নাই। কিন্তু আজ কাল 'সারে'র জন্য গোপালন না করলেও চলে; কারণ অনেক রকম 'সারের' কারখানা এখন হ'য়েছে; এবং সেখান থেকে যত ইচ্ছা সার পাওয়া যেতে পারে। এই সকল সারের অধিকাংশই খনিজ; এবং তাহাদের উৎপাদিকা শক্তি অনেক; আর দামও খুব কম। কিন্তু এ সকল সম্বন্ধে আমার বিশেষ বিচক্ষণতা কিছুই না থাকায়, সরকারি কৃষি বিভাগ হ'তে আমি নিম্নলিখিত বিষয়-গুলির উত্তর চেয়ে পাঠিয়েছিলাম—

1. The maximum quantity of paddy obtainable from one bigha (80×80 cubit) of land in Bengal if cultivated on up-to-date Scientific principles.

2. The least quantity of grain required in such cultivation per bigha.

3. Which sort of manure employed in such cultivation, the quantity used per bigha and their local value.

4. What is the highest record of the yield of paddy in an individual plant.

5. The highest area of land alloted for each plant.

পত্রখানি শিবপুরের গভর্ণমেণ্ট এগ্রিকাল্‌চারাল কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে লিখিত হ'য়েছিল ; কিন্তু সাবুরের প্রিন্সিপ্যাল আমায় জানান যে, ভাগলপুর সার্কেলের ডেপুটী ডিরেক্টর সাহেব আমার পত্রের যথাযথ উত্তর দিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সহিত তিনখানি পত্রের আদান-প্রদানের পরও সন্তোষজনক কোন উত্তরই পেলাম না। সুতরাং সে সকল পত্রে পাঠকগণের কোন উপকারই হইবে না বলিয়া, তাহা আর এ স্থলে উল্লেখ করলাম না।

যাহা হউক, দেখলাম, সরকারি বিভাগও এ সকল সম্বন্ধে হয় বিশেষ খবর রাখেন না ; অথবা যেখানে ঠিক খবর পাওয়া যায়, তার সন্ধান আমি জানি না ; সুতরাং পুঁথিগত যতটুকু আমার জানা আছে, নিম্নে তারই একটু আলোচনা করলাম।

Johnson's Fertiliser নামক পুস্তকে উল্লিখিত আছে, "If a given quantity of land sown without manure yields three times the seed employed, then the same quantity of land will produce five times the quantity sown when manured with old herbage, putrid grass or leaves, garden stuff etc ; seven times with cow-dung ; nine times with pigeon's dung ; ten times with horse dung ; twelve times with human urine, goat's and sheep's dung ; and fourteen times with human manure or bullock's blood. But if the land be of such quality as to produce without manure five times the sown quantity then the horse's dung manure will yield fourteen times and human manure nineteen and two thirds the sown quantity.

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের ময়লাই সারের মধ্যে উৎকৃষ্ট ; এবং যেখানে গোবর ১৮০০/০ মণ লাগ্‌বে, সেখানে এর শক্তি অনুযায়ী ৬০০/০ মণ হ'লেই চল্‌বে। এই ময়লাও না কি শুনতে পাই বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। অবশ্য এর দাম কত, আর এক বিঘা জমি আবাদ করতে কত মণ ঠিক লাগে, তা আমার জানা নাই।

তার পর Prince of Gardening নামক পুস্তকে উল্লিখিত আছে, "It would evidently be of great benefit, if every plant could be manured with the decaying parts of its own species ; the ancients made this a particular object."

অনেকে হয় তো ইহাও পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন ; এটি নিতান্তই সুবিধাজনক ;—মাত্র ধানের শীষগুলি কেটে নিয়ে, সমস্ত খড় যদি মাটির সঙ্গে 'চ'ষে' মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে তার ফল কিরূপ হয়, যদি কেহ জানেন, তবে সাধারণ্যে প্রকাশ করলে ভাল হয়।

পুনরায় ঐ পুস্তকেই অন্য স্থানে উল্লিখিত আছে, "A soil when first turned up by the spade or plough, has generally a red tint of various intensity, which by a few hour's exposure to the air subsides into a grey or black hue. The first colour appears to arise from the oxide of iron which all soils contain, being in the state of the red or protoxide ; by absorbing more Oxygen during the exposure it is converted into the black or peroxide. Hence one of the benefit of frequently stirring soils ; the roots of incumbent plants abstract the extra dose of Oxygen and reconvert it to the protoxide."

আমাদের দেশে "১৬ চাষে মূলো, তার অর্দ্ধেক তুলো, তার অর্দ্ধেক ধান, বিনা চাষে পান" ; অর্থাৎ চার চাষে ধান। এখন যদি চার চাষের স্থলে বার চাষ দেওয়া যায় (অবশ্য একেবারে নয়, প্রতি মাসে ২।১ বার করিয়া,—যাতে মাটি যবক্ষারযান আকর্ষণ করিবার যথেষ্ট অবসর পায়) ও তার ফলে তিনগুণ অধিক ফসল পাওয়া যায়, তবে ইহা চেষ্টা করে দেখবার বিষয় বটে। ফরাসি দেশের বিখ্যাত কৃষক Poin Gaud এ বিষয় পরীক্ষা করে দেখেছেন ; তিনি প্রকাশ ক'রছেন যে—"অনেক দিনের পতিত থাক খানিকটা জমি আবাদ করবার সংকল্প করি। বহু পূর্ব্বে প্রতিবেশীদের কোন-কোন পূর্ব্ব পুরুষ এই জমিতে আবাদ করবার চেষ্টা করে অকৃতকার্য্য হ'য়েছিলো। আমার এ সঙ্কল্প দেখে প্রতিবেশীরা উপহাস করে বলেছিলো যে, এ জমি থেকে ফসল পেতে গেলে, বোঝাই বোঝাই গাড়ী-গাড়ী সার ঢালতে হবে। আমার পূর্ব্ব হতেই একটা সংস্কার জন্মে গিয়েছিলো যে, যখন আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ হ'তো না, খনিজ সারও পাওয়া যেতো না, এবং পশুও খুব কম ছিল, তখন প্রাচীনেরা ভাল শস্য পে'তো নিশ্চয় তাদের শারীরিক পরিশ্রমের গুণে। আমি জানতাম যে, বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে যবক্ষারযান (Azote) আছে, যাহা শস্যাদি উৎপাদনে পরম মিত্রের কায করে ; সুতরাং বারম্বার চাষ দিয়া এই যবক্ষারযান মৃত্তিকা মধ্যে চালিত করতে থাকি। আমার ইচ্ছা ছিল এই, জমিতে ১৮।২০ বার চাষ দিতে ; কিন্তু তাহা পেরে উঠি নাই—মাত্র ১২ বার চাষ দিয়েছিলাম ; এবং আমার প্রতিবেশীরা তাঁহাদের ভাল জমিতে সাধারণতঃ যে পরিমাণ 'সার' দিয়া থাকেন আমি মাত্র তাহার দশমাংশের একাংশ সার ব্যবহার করে'ছিলাম। ফলে প্রতিবেশীদের চাইতে সওয়াগুণ বেশী গম ও তদুপযুক্ত খড় পাই। বীজ ও খুব কম ব্যবহার করেছিলাম ; সাধারণতঃ লোকে তাহার চতুর্গুণ বা ততোধিক বীজ ব্যবহার করে থাকে।" ফরাসি-দেশের সরকারি কৃষি-বিভাগ এই সূত্রে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে,

যদি দেশে এই ভাবে চাষ চলে, তবে উদ্বৃত্ত বীজ ও অতিরিক্ত শস্যের পরিমাণ এত বেশী হবে যে, ফরাসিদেশের এক বৎসরের 'খোরাক' যুগিয়েও, তারা বহু পরিমাণ শস্য বিদেশে রপ্তানি করতে পারবে এক বৎসর হঠাৎ এরূপ ফল পাওয়া গেছে; কিন্তু এই প্রণালীতে চাষ করে প্রতি বৎসর ঐরূপ ফল পাওয়া যেতে পারে কি না, ফরাসিদেশে এখন তার পরীক্ষা চলচে।"

আমাদের দেশে এত হাঙ্গামা করবার আবশ্যকই নেই, কারণ প্রচুর জমিও আছে, আর সস্তায় মজুরও আছে। এক বিঘা জমি থেকে ৩০/০ মণ ধান পাওয়াও যা, আর ৭।৮ বিঘা জমি থেকে ৩০/০ মণ ধান পাওয়াও তাই। তবে এত মাথা ঘামাবার দরকার কি? কিন্তু আমার বিশ্বাস যথা সময়ে যদি আমাদের মাথা চাষের সম্বন্ধে একটু ঘামিয়ে রাখা যেতো, তবে দু' একটা যুদ্ধ বিপ্লবে ভারতে চালের মূল্য ১০৲ মণে তুলতে পারতো না। দিন এখন পাল্টে গেছে। আগে যত মজুর ধানের ক্ষেতে নিযুক্ত থাকতো, এখন তাদের অনেককে কলকারখানা রেল, জাহাজ ও খাদের (Mine) কাষে ছেড়ে দিতে হয়েছে। কাষেই এখন অল্প লোকের দ্বারা অল্প জমিতে বেশী ফসল না পেলে আর রক্ষা নাই। তার পর যখন ১৲।১।০ ধানের মণ ছিল, তখন বীজ 'বুনতে' বিঘা-করা দশ সের ধানই লাগুক, বা বেশীই লাগুক, কারও তত গায়ে লাগতো না। এখন ৪৲ মণের ধান থেকে বিঘা প্রতি যদি ৮।১০ সের বীজের অপব্যয় হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়; তবে সেটা সামান্য নয়।

আমি দু' এক জন প্রবীণ পদস্থ ও বিচক্ষণ লোকের মুখে শুনেছি, তাঁরা বলেন, "আমাদের দেশের প্রাচীন লোক বোকা ছিল না, তারা ওসব ঢের ক'রে-ক'ম্মে দেখেছে। ওতে কিছু হয় না। ওসব বিলিতি কায়দা এদেশে চলবে না বাপু।" তাঁদের অপরাধও নেই। তার প্রথম কারণ এই যে, যাঁরা বিলাত প্রভৃতি দেশ থেকে চাষ আবাদ শিখে আসচেন, তাঁরা আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেচেন ব'লে শুনি নি। যে দু'জনের ঘটনা আমি জানি, তাঁরা দু'জনেই অকৃতকার্য্য হয়েচেন; একজন এ পথই একেবারে পরিত্যাগ করেচেন, আর একজন পথ ছাড়েন নি বটে, তবে বিলাতি সাজ-সরঞ্জাম ছেড়েচেন। তাঁদের অকৃতকার্য্য হবার কারণ, বোধ হয়, শ্রমজীবীদের উপর বেশী নির্ভর করা। শ্রমজীবীদের উপর নির্ভরের ফলে, উৎপন্ন ফসলের কতদূর তারতম্য হয়, তাহা আমার পরবর্ত্তী "কপির খবর" ও "বেগুনের খবর" প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। এ সব কাষ, "খাটে খাটায় লাভে গাঁতি" অথবা "আপন চক্ষে সুবর্ণ বর্ষে, দাদার চক্ষে আধা, আর পরকে সে জন বিশ্বাস করে সে জন বড় গাধা"; সমস্ত জ্ঞান মূলে এই কথাই সার। দূরে দাঁড়িয়ে মজুরকে যত ভাল করেই জমির 'পাট' করতে বল না কেন বা যতই ভাল 'সার' এনে তাদের জিম্মা করে দাও না কেন, নিজে তাদের সঙ্গে ধুলো কাদা মেখে উদয়াস্ত না খাটলে সিকি ফসল অনিবার্য্য। আর বেলা ৮টায় ঘুম থেকে উঠে, চায়ের 'ধাক্কায়' এক ঘণ্টা কাটিয়ে, একটু আধটু ক্ষেত্র "পরিদর্শন" করে এসে খবরের কাগজ নিয়ে বসলে একেবারেই কিছু হবে না। প্রবীণদের উচ্চাঙ্গের চাষে আস্থা না থাকার এইতো গেল প্রথম কারণ; দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমার প্রথম উদ্ধৃত 'বচন' হ'তে বেশ বুঝতে পারা যায় যে পাশ্চাত্য দেশে শ্রেষ্ঠ জমিতে শ্রেষ্ঠ সার দিয়া বোণা বীজের ২০ গুণের অধিক ফল পায় না, অথচ আমাদের দেশে সাধারণ জমিতে কোন সার না দিয়া ১০।১২ সের বীজ হ'তে ৮।১০ মন ফসল অর্থাৎ বোণা বীজের ৪০ গুণ পাইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশবাসীরা বহু আয়াসে যাহা পায় আমরা বিনা আয়াসে তার দ্বিগুণ পাই; কাযেই প্রবীণরা পূর্ব্বোক্ত কথা বলতে পারেন। কিন্তু যে যাই বলুন বা যে যাই করুন, আমি যখন হাতে হাতে ফল পেয়েছি তখন প্রত্যেক কর্ম্মীকেই অনুরোধ করি, যাঁদের সুবিধা আছে তাঁরা যেন চেষ্টা ক'রে দেখেন; বিঘা প্রতি ৩০/০ মণ ধান পাওয়া বোধ হয় অসম্ভব হবে না। আর এসব সম্বন্ধে যাঁদের বিচক্ষণতা আছে, তাঁদেরও প্রতি অনুরোধ যে আমার প্রবন্ধের বিষয় গুলি কতদূর কার্য্য করা হ'তে পারে, না পারে তাহা আলোচনা ক'রে সাধারণে প্রকাশ করতে; কারণ সামান্য জমি থেকে এরূপ ফল পাওয়া সম্ভব হলে চাষ আবাদ সকলেরই আয়ত্তের মধ্যে আসতে পারবে। আমি অবশ্য বৈদ্যুতিক মটর পরিচালিত লাঙ্গল বা টীকা দেওয়া বীজ ব্যবহার করবার প্রস্তাব করচি না—সে যাঁরা পারেন করুন তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। আমি যে ফল পেয়েছি, অর্থাৎ বীজের ২২৫০০ গুণ, তাহা আপনিই হ'য়েছিলো, কোন জ্ঞান বিজ্ঞানের তাতে আবশ্যক হয় নি—সেই ধ'রে;—প্রকৃতিতে যা সম্ভব তাই ধরে, একটু চেষ্টা করতে বলচি মাত্র। অবশ্য এ ভাবে বেশী জমি চাষ করা যায় না—আর তার দরকারই বা কি? দশ কাঠা জমি আবাদ করলে অল্পায়াসে যদি এক বৎসরের জন্য ভাতের দুঃখ ঘোচে, তবে—"দুটো ভাত" এর জন্য অনেক সময় মনুষ্যত্ব ত্যাগ করতে হয় না। তবে আমাদের দেশের সাবেক ব্যবস্থায় চল্‌লে এ ভাবে চাষ কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব। আমাদের থাকবার ঘর একস্থানে, ধানের জমি অন্য স্থানে, অনেক ক্ষেত্রে ঘরের বহুদূরে, তাহাও বিস্তৃত ক্ষেত্র মধ্যে। সেখানে দৈবের উপর কোন হাত নাই। এক ক্ষুদ্র পল্লীতে সকলে মিলে নড়্‌বার স্থান না রেখে গায়ে গায়ে বাড়ী তোলবার মায়া কাটিয়ে ফাঁকা জায়গায় ২।৩ বিঘা জমি ঘিরে সেই খানেই 'কুঁড়ে' বাঁধতে হয় ও সেইখানেই চাষের জমি তৈরি ক'রে নিতে হয়। একটি ছোট জলাশয় রাখতে হয় ও ৫।৭টি গোপালন করতে হয়। এরূপ বন্দোবস্ত করে নিলে চাকরি করতে করতেও চাষ চলে, ব্যবসা করতে করতেও চাষ চলে। এক বিঘা জমির কমে হয় না ও পাঁচ বিঘা জমির অধিক আবশ্যকই নাই; যেহেতু একটি বৃহৎ পরিবার এর অধিক জমি সুচারুরূপে সাম্‌লাতে পারবে না। আমার বিশ্বাস, এরূপ ভাবে চলা সম্ভব হলে বিলেতে গিয়ে আমাদের চাষ আবাদ শিখে আসতে হবে না, বিলেত থেকেই লোক এসে আমাদের কাছে চাষ আবাদ শিখে যাবে॥

দীঘির ধারে

(পল্লী-চিত্র)

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়]

পৌষের শেষ, শনিবার। মধ্যাহ্ন নিদ্রা শেষ করিয়া, হাত-মুখ ধুইতেছি,—ছেলে আসিয়া সংবাদ দিল, হী-বাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন।

হী-বাবু আমাদের এই অঞ্চলের একজন সদাশয় জমীদার। অতি অমায়িক লোক। সেকালের প্রাচীন জমীদারগণের বহু গুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান; তন্মধ্যে অতিথি-বাৎসল্য সর্ব্বপ্রধান। তাঁহাদের গ্রামের ভিতর দিয়া জেলা-বোর্ডের সুদীর্ঘ পথ প্রসারিত। এই পথে বহু ভদ্রলোককে কার্য্যোপলক্ষে নানা স্থানে যাতায়াত করিতে হয়। তাঁহার পরিচিত-অপরিচিত যে কোন ভদ্রলোক তাঁহার গ্রামের ভিতর দিয়া গ্রামান্তরে যাইবেন, হী-বাবুর চরেরা তাঁহাকে পথিমধ্যে আটক করিয়া, জমীদারবাবুকে সংবাদ দিবেই। হী-বাবু তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া, ভোজন না করাইয়া ছাড়িয়া দিবেন না। অসময় হইলেও, অন্ততঃ একটু জলযোগ করিতেই হইবে। তাঁহার বিনয় ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া, সকলকেই তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিতে হয়। হী-বাবু প্রাচীন হইয়াছেন। আমাদের আশঙ্কা হয়, প্রাচীন যুগের বঙ্গপল্লীর এই বিশেষত্ব তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের এই অঞ্চল হইতে বিলুপ্ত হইবে। পল্লী-জীবনের অনেক আদর্শ তাঁহাতে মূর্ত্তিমান দেখা যায়।

আমি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, আমার গৃহ সম্মুখস্থ কামিনী-গাছের ছায়ায় তিনি সঙ্গী-সহ দণ্ডায়মান। হী-বাবু বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনার কাছে একটু অনুগ্রহ প্রার্থনায় আসিয়াছি। পৌষমাস ত যায়,—আজ পর্য্যন্ত পোষলা করা হইল না। কাল রবিবার; মনে করিতেছি, বন্ধু-বান্ধবদের লইয়া কাল রায়পুরের পুকুরের পাড়ে পোষলা করিব। আপনি যোগ না দিলে চলিবে না।"

অন্য কেহ এরূপ প্রস্তাব করিলে বিস্মিত হইতাম; এবং সন্দেহ হইত, লোকটার কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে। আমাদের গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ দূরে যাঁহার বাড়ী, তিনি এই দূরবর্ত্তী গ্রামের সমুদায় ভদ্র-সন্তানদের নিমন্ত্রণ করিয়া, পোষলা উপলক্ষে ভোজন করাইবার মনস্থ করিয়াছেন, অথচ এখনও আমাদের পল্লীতে নয় টাকা চাউলের মণ, টাকায় আধসের ঘি এবং ছয় সের দুধ! এইরূপ পাগলামী হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার লোক কি কেহই নাই? পল্লীগ্রামে কায়েমী ভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিয়া অবধি, দীর্ঘকাল পোষলার আনন্দ উপভোগ অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই; সুতরাং হী-বাবুর প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম।

আরও একটু প্রলোভন ছিল। মৎস্য-শিকারে সু-বাবু আমাদের পাণ্ডা। তিনি বলিয়াছিলেন, রায়পুরের পুকুরে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড লোহিতবর্ণ রোহিত মৎস্য "ঝপাং"-"ঝপাং" শব্দে ঘাই মারিয়া, শিকারীর চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে! বড়শীতে টোপ গাঁথিয়া ফেলিবার যা কিছু বিলম্ব! যাহার মৎস্য-শিকারের বাতিক আছে,—এ লোভ সংবরণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। একজন শিকারী বলিলেন, "অস্ত্রে শান দিয়া রাখুন,—কাল রথ দেখা, কলা-বেচা, দুই-ই এক-সঙ্গে চলিবে।"

রবিবার সকালে কিন্তু একটু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতে হইল। সংবাদ পাইলাম, গ্রামস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছে,—কিন্তু যানের কোন ব্যবস্থা নাই। পোষলার জন্য যে স্থানটি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেই স্থান আমাদের গ্রাম হইতে দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। জেলাবোর্ডের পথ;—মেটে পথে ক্রমাগত গরুর গাড়ী চলিলে, পথের কিরূপ দুর্দ্দশা হয়, যাহারা সেরূপ পথে গমনাগমন করেন নাই;—তাঁহাদিগকে তাহা বুঝাইবার উপায় নাই। বর্ষাকালে এই সকল রাজমার্গে যাইতে হইলে, এক-হাঁটু কাদা ভাঙ্গিতে হয়; এবং শীত-গ্রীষ্মে বৃষ্টির অভাব হইলে, ধূলায় হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়,—ধূলিরাশি নাকে-মুখে প্রবেশ করিয়া, শ্বাসরোধের উপক্রম করে। এই দুর্গম পথে পদব্রজে একপোয়া অগ্রসর হইতেই, প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ,—দেড় ক্রোশের ত কথাই নাই। মধ্যাহ্ন-

কালে পদব্রজে এই পথ অতিক্রম করিয়া, পোষলায় যোগদান করা অসম্ভব মনে হইল। কিন্তু দুই-একটী বন্ধুর উৎসাহ এতই প্রবল যে, তাঁহারা হাঁটিয়া যাইবার জন্যই প্রস্তুত হইলেন; এবং আমাকেও তাঁহাদের দলে লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমার প্রতিবেশী উকীল বন্ধু তাঁহার টমটমে যাওয়াই স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আরও তিনজন পূর্ব্বেই জুটিয়াছিল; তাঁহার গাড়িতে স্থান নাই বুঝিয়া, সেজন্য চেষ্টা করিলাম না।

বেলা প্রায় এগারটার সময় ভিন্ন গ্রামবাসী একটি বন্ধুর পুত্র টমটম লইয়া আসিলেন। তাঁহার টমটমে তিনি একা ছিলেন বলিয়া, তাঁহার সঙ্গেই যাইব, এইরূপ স্থির হইল। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করিয়া, শীতবস্ত্রাদিতে মণ্ডিত হইলাম; জানিতাম, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিবার আশা নাই। বেলা বারটার সময় 'দুর্গা-শ্রীহরি' বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ছোট ছেলে বলিল, 'বাবা, ছিপ সঙ্গে নিলেন না?' আমি বলিলাম, 'শীত-কালে মাছে টোপ স্পর্শও করিবে না,—অনর্থক বোঝা বহিয়া ফল কি?' ছেলে বলিল, 'অনেকেই ছিপ লইয়া যাইতেছে; বড়-বড় রুই-কাতলা যখন বঁড়শী মুখে লইয়া জলের মধ্যে ছুটাছুটি করিবে—আর ঘ্যার-ঘ্যার, ঘ্যার-ঘ্যার শব্দে হুইল ডাকিতে আরম্ভ করিবে—তখন আপনার মনে হইবে, ছিপখানা না আনিয়া কি ভুলই করিয়াছি!' আমি বলিলাম, 'কে কটা রুই-কাতলা বাধায়, দেখা যাবে।'

টমটমখানি ক্ষুদ্র। অশ্বটি যেন বিধাতা-পুরুষের কারখানায় ফরমাস দিয়া, এই 'স্বদেশী' টমটমের উপযুক্ত করিয়া নির্ম্মিত; আয়তনে গর্দ্দভের রাজ-সংকরণ। এই টমটমে আরোহণ করিয়া, আমরা ইষ্টকবদ্ধ রাজপথে অগ্রসর হইলাম। গ্রামে মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য-তৎপরতার নিদর্শন স্বরূপ, পথের ইটগুলি দন্ত বিকাশ করিয়া, নীরবে স্বায়ত্ত-শাসনের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। সেই সকল ইটে টমটমের চাকা ক্রমাগত বাধিয়া যাইতে লাগিল। সেই সঙ্গে আমাদের মাথা একবার সম্মুখে, একবার পশ্চাতে ঢলিয়া শকটারোহণজনিত আরামের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে লাগিল।

এই ভাবে প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, নগর-প্রান্তে আমরা জেলাবোর্ডের মেটে রাস্তা পাইলাম। এই স্থানে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত, লোকালবোর্ড আফিস, ডাকবাঙ্গালা, সবডিভিসনাল অফিসারের বাস-গৃহ, জেলখানা প্রভৃতি অবস্থিত।' আফিস-আদালত প্রভৃতির হাতার বাহিরে কয়েকখানি খড়ের ঘর ভস্মস্তূপে পরিণত দেখিলাম। এই ঘরগুলি একজন মুসলমানের দোকান ছিল। অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে এক দিন গভীর রাত্রে ঘরগুলি ব্রহ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে। নগরের বাহিরে গভীর রাত্রে অকস্মাৎ বৈশ্বানরের আবির্ভাব রহস্যজনক ব্যাপার বলিয়াই মনে হইল। ইহার কারণ জানিবার জন্য আগ্রহ হইল। শুনিলাম এই দোকানগুলির মালিক মুসলমানটির যথেষ্ট চাষ-আবাদ আছে। সেই সকল জমিতে ছোলা, গম, মসিনা প্রভৃতি রবি-শস্যের আবাদ হইয়াছে। অদূরে গোপ-পল্লী। গোয়ালাদের গরু কোন-কোন দিন তাহার শস্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিত; বোধ হয় কিছু-কিছু ফসলও তস্রূপ করিত। এইজন্য গোয়ালাদের সহিত তাহার মধ্যে-মধ্যে বাগ্যুদ্ধ চলিত। এক দিন না কি গোয়ালারা তাহার 'অঙ্গসেবা'ও করিয়াছিল; এবং তাহার ফলে সে মাথায় ফ্যাটা বাঁধিয়া কয়েক দিন স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে যাতায়াত করিয়াছিল তাহাও দেখিয়াছি। শুনিয়াছি, সেই ব্যাপার ফৌজদারী আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়া-ছিল; কিন্তু কি ফল হইয়াছিল, সংবাদ লই নাই। যাহা হউক, ইহার কিছুদিন পরে একদিন নিশীথকালে এই লঙ্কা-কাণ্ড! এখনও, এই অসহযোগের যুগেও, পল্লীগ্রামের অধিবাসীগণের মধ্যে মনান্তর থাকিলে, তাহার ফল কোথায় গিয়া দাঁড়ায়—তাহার প্রমাণ স্বরূপ এই দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করিলাম। এই দোকানদারটির মৌখিক বিনয় ও বাহ্যিক সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। আমাদের কোন-কোন আত্মীয়-বন্ধুর ফলের বাগান সে কয়েক বৎসরের জন্য মেয়াদী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে; কিন্তু কাহাকেও এক পয়সা খাজনা দেওয়া তাহার অভ্যাস নহে। বাগানের মালিকেরা খাজনা চাহিলে, তাহাকে অবলীলাক্রমে বলিতে শুনিয়াছি, 'আজ্ঞে কাল দিয়া আসিব, —কোন্ হারামখোর কাল না দেয়!' ইত্যাদি।—কিন্তু বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়—কাল আর আসে না। ইহার মত "চিজ" পল্লী অঞ্চলে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার এই ক্ষতিতে একটি লোকও 'আহা' বলিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করে নাই!

'শবব্যবচ্ছেদাগার' বামে রাখিয়া, জেলাবোর্ডের সুপ্রশস্ত

মেঠো রাস্তা দিয়া, আমাদের ক্ষুদ্র টমটম রায়পুর অভিমুখে অগ্রসর হইল। আমাদের অগ্রে ও পশ্চাতে কয়েকখানি গরুর গাড়ী,—দুই-তিনজন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক এক-একখানি গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া পোষলায় বাহির হইয়াছেন। কেহ গাড়ীর ভিতর লম্বা হইয়া শুইয়া;—পাশে কেহ বা জড়-সড় হইয়া বসিয়া, পদদ্বয়ের বিশ্রামজনিত সুখ উপভোগ করিতেছেন; খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবিয়া পার হইবার সুখ বোধ হয় ঠিক এই প্রকার! অসমান পথ,—কোন স্থানে আধ হাত উঁচু,—তাহার পাশেই আধ হাত গভীর খাদ। গাড়ীর চাকা তাহার ভিতর 'হড়াং' করিয়া পড়িতেছে, আর, আরোহীর মাথার সহিত গাড়ীর ছৈয়ের সবেগে সংঘর্ষণ হইতেছে; এবং যে ভাগ্যবান আরোহীটি শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার মস্তকে তাঁহার সঙ্গীর হাঁটুর গুঁতা এমন জোরে লাগিতেছে যে, উভয়ের মুখভঙ্গি দেখিয়া, হাঁটুর গুঁতা ও ছৈয়ের গুঁতা, এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি অধিক আরামদায়ক, তাহা অনুমান করা কঠিন হইতেছে। তবে এই দুই মাইলের মধ্যে উপর্য্যুপরি ঠোক্কর খাইয়া হাঁটু ও মাথা উভয়েই যদি রসার্দ্র না হয়—তাহা হইলে পোষলার আমোদ উপভোগ্য হইবে—এ আশা তাঁহারা ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

কিন্তু আমাদের অবস্থাও অল্প আশাপ্রদ নহে! পথের দুই ধারে 'নয়ঞ্জুলি'। বর্ষাকালে এই নয়ঞ্জুলি জলপূর্ণ থাকে; এখন তাহা শস্য-শ্যামল প্রান্তরের অঙ্গে শুষ্ক ক্ষতবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। দীর্ঘকাল বৃষ্টির অভাবে ও প্রখর রৌদ্রে তাহা ফাটিয়া চৌচির হইয়াছে। কোথাও বা তাহা 'কেশে' খড়ে পূর্ণ,—খড়গুলি অর্দ্ধ-শুষ্ক হওয়ায় বাদামী রঙ্গ ধারণ করিয়াছে। নয়ঞ্জুলির ধারে স্থানে-স্থানে রাস্তা ঢালু;—গরুর গাড়ীর সহিত সংঘর্ষণের আশঙ্কায় আমাদের টমটমখানি এক-একবার পথের ধার ঘেঁসিয়া চালাইতে হইল; তখন মনে হইতে লাগিল, ঢালু পথ হইতে যদি হঠাৎ টমটমের চাকা পিছলাইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা ডিগ্‌বাজি খেলিবার সুযোগ পাইব;—গাড়ী সমেৎ উল্টাইয়া গিয়া একেবারে নয়ঞ্জুলি-দাখিল হইতে হইবে! পশ্চাতেই 'শবব্যবচ্ছেদাগার'—কষ্ট করিয়া অধিক দূর বহিয়া লইয়া যাইতে হইবে না। সুতরাং অবস্থা কতদূর আশাপ্রদ, তাহা স্মরণ করিয়া আনন্দাশ্রু রোধ করা কঠিন হইয়া উঠিল।

আমাদের এই শকটযাত্রা যে পরম উপভোগ্য হইয়াছিল, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে এই পৌষের শীতেও আমরা ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়াছি। গরুর গাড়ীর কঁ্যা-কোঁ শব্দের সহিত আমাদের টমটমের 'খন্‌-খন্‌ ঝন্‌-ঝন্' ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া যে অপূর্ব্ব শব্দ-সমন্বয়ের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' প্রাণমন আকুল করিতেছে। কিন্তু খোলা মাঠের উপর দিয়া মধ্যে-মধ্যে যে দম্‌কা হাওয়া বহিয়া যাইতেছে, তাহাতে আর যাহাই করুক, 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে'র স্মৃতি বহন করে না। সেই বায়ু-প্রবাহে পথের আজানু-সমুত্থিত ধূলি-রাশি উড়িয়া আসিয়া আমাদের অগ্রবর্ত্তী শকট-চক্রোৎক্ষিপ্ত ধূলি-পটল সংযোগে ঘনীভূত হইতেছে; এবং তাহা ব্রজের রজের মত আমাদের সর্ব্বাঙ্গ ধূসরিত করিয়া, কতক নাকে-মুখে প্রবেশ করিতেছে,—কতক আমাদের কাঁচা-পাকা চুলের উপর সঞ্চিত হইয়া যে স্তরের সৃষ্টি করিতেছে,—সেকালের নীলকর সাহেবদের সুযোগ্য গোপীনাথের দল ইচ্ছা করিলে তাহাতে নীলের আবাদ করিতে পারিতেন! মাথায় ভিজা মাটি রাখিয়া, তাহার উপর নীল বপন পূর্ব্বক, বিদ্রোহী প্রজাদের দণ্ডদানের যে অনিন্দ্যসুন্দর রীতি পূর্ব্বে নীল-গুদামের আইনে প্রচলিত ছিল, তাহা এ যুগের উপদ্রববিহীন (অসহযোগী) বিদ্রোহীদের কারাদণ্ড দানের পর বেত্রাঘাতের ও 'কি দিবসে কি নিশীথে' অষ্টপ্রহর সমভাবে লৌহ-বলয় ধারণের যে অমল-ধবল-সভ্যতালোক-সমুদ্ভাসিত রীতি সংপ্রতি কোন-কোন জেল-গুদামের আইনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে —প্রাচীন ও আধুনিক এই উভয় নীতির মধ্যে কোন্‌টিতে খৃষ্টোক্ত প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইতেছে—তাহা নির্ণয় করিবার ভার ভবিষ্যৎ যুগের মেকলেগণের হস্তে নির্ব্বিঘ্নে দেওয়া যাইতে পারে।

বেলা একটার সময় রায়পুরের দীঘির পাড়ে উপস্থিত হইলাম। এতক্ষণ পথের কষ্টের কথাই বলিয়াছি; কিন্তু পথের দুই ধারে বহুদূরব্যাপী প্রান্তর বিবিধ হৈমন্তিক শস্যের যে শ্যামল শোভা বিস্তার করিয়াছে, তাহা দেখিলে সে দিক হইতে আর চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না;—কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়,—

"ওরূপ দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
মা তোর দুয়ার আজি খুলে গেছে সোণার মন্দিরে!"

সত্যই শীতের মধ্যাহ্নে পল্লী-প্রান্তরের শোভা কি মনোমুগ্ধকর! ধূলি-ধূসরিত নির্জ্জন প্রান্তর-মধ্যবর্ত্তী পথ বিসর্পিত গতিতে কোন দূরান্তে চলিয়া গিয়াছে,—মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে তাহা বহুদূর পর্য্যন্ত ধূধূ করিতেছে, পথিকগণের কত বিচিত্র স্মৃতিসম্ভার এই পথের ধূলায় মিশিয়া আছে! এখনও দূর পল্লীতে কোন্ পুত্র শোকাতুরা জননীর সন্তপ্ত হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে আকুল আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছে, তাহার প্রতিধ্বনি এই পথের ধূলা ভেদ করিয়া ধরণীর উত্তপ্ত বক্ষে বিলীন হইতেছে। এই করুণ আর্ত্তস্বর মানব-হৃদয়ের প্রিয়-বিরহ-বেদনা ও অতৃপ্তিকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিতেছে; এবং মনে হইতেছে, মানব-জীবন একাকী সম্মুখের ঐ শুষ্ক, নির্জ্জন, রবিকর-প্রতপ্ত উদাসীন পথের মতই কোন অজ্ঞাত দেশের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে—তাহার সম্বল বুঝি পথপ্রান্তবর্ত্তী কাহার বিদীর্ণ হৃদয়ের এই তৃষিত হাহাকার!

কোথাও অড়হর-ক্ষেত্র;—গুচ্ছগুচ্ছ ফল-সমন্বিত অত্যুচ্চ অড়হর বৃক্ষগুলি শ্যামল পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া কমলার অঞ্চলের ন্যায় বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বেই গোধুম ক্ষেত্র; গমের শীষগুলি এখনও সম্পূর্ণ বিকশিত হয় নাই,—বায়ু-প্রবাহে তাহা আন্দোলিত হইতেছে—যেন জননী অন্নপূর্ণা শ্যামাঞ্চলে তাঁহার 'আড়ি' ঢাকিয়া রাখিয়াছেন,—পল্লী-প্রকৃতি তাঁহাকে যে চামর বীজন করিতেছেন, তাহারই অগ্রভাগ গোধুম-শীর্ষ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। কোথাও ছোলা বা মসিনার ক্ষেত্র, সবুজ মখমলের মত প্রসারিত। কোথাও লঙ্কার ক্ষেত্রে লোহিত ও পীতবর্ণ লঙ্কা পাকিয়া আছে,—যেন দেবীর নাসিকায় হিঙ্গুল ও হরিতালের নোলক দুলিতেছে। আরও দূরে, ইক্ষু-ক্ষেত্র;—রাখাল বালকেরা তাহার ছায়ায় বসিয়া গল্প করিতেছে। পাশেই খোলা মাঠ,—সেখানে কোন শস্য নাই; তাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘাসও নাই। সেখানে একদল গরু চরিতেছে,—দূর হইতে বোধ হইতেছে, তাহারা অবনত মস্তকে এই স্থানে দাঁড়াইয়া আছে,—যেন চিত্রপটে অঙ্কিত একদল গাভী। গাভীগুলি যে চরিতেছে—তাহা তাহাদের লাঙ্গুল আন্দোলন দেখিয়াই বুঝিতে পারা যাইতেছে; প্রত্যেক গাভীর লাঙ্গুল তাহার মেরুদণ্ডের উভয় প্রান্তে পড়িতেছে, ঘুরিতেছে, পশ্চাতে লম্বিত হইতেছে। একটি নবজাত সাদা বাছুর পুচ্ছ উর্দ্ধে তুলিয়া স্খলিত পদে ইক্ষু-ক্ষেত্রের দিকে দৌড়াইতেছে। পাছে সে কোন বিপদে পড়ে, ভাবিয়া তাহার মাতা উর্দ্ধ-মুখে আতঙ্ক-বিস্ফারিত নেত্রে তাহার অনুসরণ করিতেছে;—দেখিয়া রাখাল মাথাল মাথায় আঁটিয়া তৃণাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং পাচন হস্তে দ্রুতপদে তাহাকে ফিরাইতে চলিল।

পথের ধারে স্থানে-স্থানে আম-কাঁঠালের বাগান, বাঁশের ঝাড়, কুল গাছ। কোন-কোন গাছের কুলগুলি পুষ্ট হইয়াছে, এখনও পাকে নাই। কিন্তু রাখাল ও অন্যান্য পল্লী বালকের ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইয়াছে। তাহারা পথের ধারে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত 'এড়ো' ছুড়িতেছে রাশিরাশি কুল গাছের তলায় পড়িতেছে, বালকেরা তাহা কুড়াইয়া কোঁচড়ে পূরিতেছে। গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী পথের ধারে দরিদ্র পল্লীবাসিগণের কুটীরগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কয়েকটী উলঙ্গ শিশু পথের ধূলায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া জন-সমাগম দেখিতেছে। টমটমে, দ্বিচক্র-যানে, গো-শকটে, ঘোড়ার গাড়ীতে এতগুলি লোককে একসঙ্গে যাইতে দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

পুষ্করিণীর ধারে টমটম হইতে নামিলাম। আমাদের 'হোষ্ট' হী-বাবু অগ্রসর হইয়া তাঁহার প্রত্যেক অতিথিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন; হাসিয়া বলিলেন, "এই বুঝি আপনাদের সকালে আসা? আপনাদের ভরসাতেই এ কাজে হাত দিয়াছি; যোগাড়-যন্ত্র কিছুই এখনও হয় নাই। আপনাদের কাজ, আপনারা দেখিয়া-শুনিয়া করুন।"

শীতের বেলা। দুই ক্রোশ তফাৎ হইতে গরুর গাড়ীতে ও বাহক স্কন্ধে তাঁহাকে সমস্ত জিনিস এখানে আনাইতে হইয়াছে। তাঁহার আগ্রহ ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি নাই; কিন্তু কর্ম্মীরা সকলে তখনও সেখানে উপস্থিত হন নাই; অথচ দুই শতাধিক লোকের পোষলার আয়োজন হইয়াছে। এ অবস্থায় বিলম্ব অপরিহার্য্য।

স্থানটি পোষলার উপযোগী ও সুনির্ব্বাচিত। পুষ্করিণীটি অতি বৃহৎ। জলে শৈবাল দাম, বা কোন প্রকার জলজ উদ্ভিদ নাই,—নির্ম্মল জল টলটল করিতেছে। পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে এক প্রকাণ্ড সামিয়ানা উঠিয়াছে, তাহার নীচে সুপ্রশস্ত সতরঞ্চি প্রসারিত। দুই-চারিখানি চেয়ার-বেঞ্চিও সংগৃহীত হইয়াছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সেখানে বিশ্রাম করিতেছেন, কেহ-কেহ সতরঞ্চির উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছেন;

এবং গাত্র-বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া মুদিত নেত্রে নিদ্রা-দেবীর উপাসনা করিতেছেন। কেহ-কেহ বসিয়া গল্প করিতেছেন। সামিয়ানার অদূরে অনেকখানি স্থান কানাত দ্বারা ঘিরিয়া, সেখানে রন্ধন আরম্ভ হইয়াছে। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ডেকচিতে লম্বা উনানে মাংস চাপিয়াছে। মাংসের পরিমাণ এক মণেরও অধিক। অনেকগুলি 'কৃষ্ণের জীব'কে পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিতে হইয়াছে। হী-বাবু জানেন, তিনি রবাহুত, অনাহুত কাহাকেও ফিরাইতে পারিবেন না। যদি মাংসের অনাটন হয়—তাহার প্রতিবিধানের জন্য একটি কালো নধর পাঁঠা তখন পর্য্যন্ত একটি কাঁঠাল গাছে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পরাতে বেগুন-ভাজা, ও পিতলের গামলায় কপির ডালনা বাঁধিয়া ঢালিয়া রাখা হইয়াছে। যাঁহারা মাংসাশী নহেন, তাঁহাদের জন্য একখানি বৃহৎ কটাহে মাছের কালিয়া চাপিয়াছে। স্থানীয় আদালতের কয়েকজন আমলা স্বেচ্ছাসেবক রূপে পাচকগণের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। একটি বৃহৎ পাত্রে টাট্‌কা গাওয়া ঘি; সোণার মত রঙ্গ; তাহার মধুর সৌরভ ভোক্তাগণের ক্ষুধানলে ইন্ধন যোগাইতেছিল। বিবিধ মশলা ও পলাণ্ডুর উগ্র গন্ধ মুক্ত প্রান্তরের বায়ু-প্রবাহে বহুদূরে ভাসিয়া যাইতেছিল; এবং এই গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অসংখ্য কুকুর অদূরবর্ত্তী বৃক্ষমূলে সমবেত হইয়াছিল। রন্ধনশালার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া তাহাদের প্রসারিত জিহ্বা হইতে লালা নিঃসৃত হইতেছিল।

পুষ্করিণীর দক্ষিণে আম-কাঁঠালের বাগান; তদ্ভিন্ন প্রায় সকল দিকেই খোলা মাঠ। শ্যামল শস্যরাশিতে প্রান্তর পরিপূর্ণ। পুষ্করিণীর উত্তর পাড়ে স্নানের ঘাট। পল্লীরমণী-গণ দলে-দলে সেই ঘাটে নামিয়া স্নান করিতেছে। কেহ তীরে বসিয়া তেল মাখিতেছে; কেহ বালি দিয়া ঘড়া মাজিতেছে; সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের সুখ-দুঃখের গল্প চলিতেছে। চাষার ছেলেমেয়েরা এই দারুণ শীতেও একবুক জলে নামিয়া লাফালাফি করিতেছে,—ডুবিতেছে, সাঁতার দিতেছে, পাঁক তুলিয়া পরস্পরের গায়ে নিক্ষেপ করিতেছে। কোন বর্ষিয়সী স্নানার্থিনী রমণী নিষেধ করিলে, দূরে গিয়া তাহাকে ভ্যাঙ্গ-চাইতেছে। কতকগুলি পাতি হাঁস সার বাঁধিয়া জলে সাঁতার দিতেছে; এবং মধ্যে-মধ্যে ডুব দিয়া পাঁকের ভিতর হইতে সামুক, গুগলি তুলিয়া ভক্ষণ করিতেছে। দুই চারিটা গরু পুষ্করিণী-তীরস্থ বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া রোমন্থন করিতেছে। এক ঝাঁক পায়রা উড়িয়া আসিয়া জলের ধারে বসিল; কিন্তু অদূরে জন-সমাগম দেখিয়া তৎক্ষণাৎ উড়িয়া গেল।'

পুষ্করিণীর ধারে দুই-তিনজন শিকারী কম্বলাসনে বসিয়া মৎস্য-শিকার করিতেছিলেন। প্রত্যেকের পাশে দুই-তিন-জন দর্শক। আমিও ধীরে-ধীরে একজনের পাশে গিয়া বসিলাম। শিকারী বঁড়শীতে টোপ গাথিয়া, জলে ফেলিয়া, ফাত্‌নার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। সকলেই যেন ধ্যানস্থ তপস্বী! কিন্তু কাহারও ফাত্‌না এক মুহূর্ত্তের জন্য নড়িতে দেখিলাম না। কেহ বলিল, 'পুকুরে মাছ নাই'; কেহ বলিল, 'বিস্তর মাছ আছে,—শীতকালে কি মাছে টোপ মুখে করে?' আর একজন বলিল, 'ঢেঁকির মত যে সকল রুই মাছ আছে, তাহারা জলের মধ্যে 'হাড়োল' (গর্ত্ত) করিয়াছে,—বঁড়শী মুখে লইয়া সেই 'হাড়োলে' গিয়া লুকায়; টানাটানি করিলে সূতা ছিঁড়িয়া যায়, তাহাদের টানিয়া বাহির করা যায় না।'—আমাদের একটি ওভারসিয়ার বন্ধু উভচর শিকারী; অর্থাৎ তিনি বন্দুক দিয়া স্থলের বাঘ, এবং ছিপ দিয়া জলের মাছ শিকার করেন। তিনি এই গল্প শুনিয়া গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ঠিক কথা,—বর্ষাকালে এই পুকুরে আমি সাত সের একটা রুই বাধাইয়াছিলাম; মাছটা টোপ মুখে লইয়া ফাত্‌না ভাসাইতেই, দিলাম এক উড়ো ঝিঁক্‌,—আর কোথায় যাবে? মাছটা বঁড়শী মুখে লইয়া, গুলির মত বেগে ছুটিয়া গেল,—ঘ্যার-ঘ্যার শব্দে 'হুইল' ডাকিতে লাগিল। এস্‌, রায়ের দোকানের 'ফার্ষ্ট কোয়ালিটী'র হাতে-ভাঙ্গা মুগা সূতা,—এক টন ভার সহিতে পারে। যাবে কোথায় বেটা? কাঁদালের মত বঁড়শী, শক্ত করিয়া 'গুটানো' ছিল,—কাঁঠাল গাছে বাধাইয়া ঝুল খাইলে ছেঁড়ে না! মাছটা ভোঁ করিয়া তাহার হাড়োলে ঢুকিল। সে টানে প্রাণের দায়ে, আমি টানি পেটের দায়ে! টানিতে-টানিতে ফটাং,—বঁড়শী তাহার মুখে থাকিল, আমি সূতা জড়াইয়া লইলাম। আজ আর ছাড়াছাড়ি নাই। আজ মাংসের টোপ দিব।"—তিনি রন্ধনশালা হইতে খানিক মাংস আনিয়া হাঁড়োলবাসী রোহিতের প্রীত্যর্থে তাহা বঁড়শীতে গাঁথিলেন; এবং চার লক্ষ্য করিয়া টোপ নিক্ষেপ করিলেন। আমরা এক টন ভারবহ সূতার শক্তি পরীক্ষার

সুযোগ প্রতীক্ষায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বসিয়া রহিলাম। ইতিমধ্যে পুষ্করিণীর মালিক আসিয়া বলিলেন, 'তোমরা অনর্থক হয়রাণ হইতেছ,—এ পুকুরে কি মাছ আছে ? একটা মাছও নাই।' —তাঁহার কথা শুনিয়া, শিকারীদের মুখের যেরূপ ভঙ্গি হইল, তাহা দেখিলে অতি গম্ভীর ব্যক্তিও হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেন না। শিকারের লোভে ছিপ ঘাড়ে করিয়া এত দূর আসি নাই ভাবিয়া, তখন মনে কিরূপ আত্মপ্রসাদের সঞ্চার হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। অতঃপর বন্ধুবর সু-বাবুকে ছিপ-হস্তে পুষ্করিণী-তীরে সমাগত দেখিয়া, উৎকেন্দ্রীয় পঞ্চা কুণ্ডু বলিল, 'আসুন উকীল বাবু, আপনার জন্য এমন চার আনিয়া রাখিয়াছি যে, তাহার লোভে মাছ জল হইতে লাফাইয়া আপনার কোলে আসিবে,—ছিপ ফেলিবারও দরকার নাই; আপনি জলের ধারে চেয়ার পাতিয়া বসুন, আমি চার করি।' পাগল কোঁচড় হইতে মুঠা-মুঠা মুড়ি লইয়া জলে ফেলিতে লাগিল।

পাগলকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "মুড়ি কোথা হইতে আসিল, পঞ্চানন!"

সে বলিল, "পেটে আগুন জ্বলে উঠেছে! এদিকে জল-খাবারের কোন ব্যবস্থা নেই। গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে এই মুড়ি মুড়কী আর তিলুয়া কিনে এনেছি। বাবা, দশটি হাজার টাকা এই উদর-গহ্বরে ঢেলেছি,—কিছুতেই পেট ভরে নি! হী-বাবু মহাশয় বেক্তি,—খুব সৎকাজ করচেন; আমাদের উদর দেবতার পূজার জন্যে অনেক পাঁটা বলি দিয়েছেন। কিন্তু এত বেলা পর্য্যন্ত জলখাবারের আয়োজন না করায়, অনেক-গুলি গো-হত্যা হবে। আর গবর্মেণ্ট তাঁকে শীঘ্র খাঁ-সাহেব টাইটেল দেবেন।"

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "খাঁ-সাহেব কেন? হিন্দু কি খাঁ-সাহেব হয়?"

পাগল বলিল, "হিন্দু কি গোহত্যা করে? উনি বিশ্বাস, অনেক মুসলমানের খেতাব বিশ্বাস। আর তাঁহার মুখে মস্ত লম্বা পাকা দাড়ী,—এজন্য খাঁ-সাহেব খেতাব উঁহার দাড়ীর সঙ্গে খুব মানাবে।"

পাগলটির কথাবার্ত্তা সকল সময় পাগলের মত নয়। সে তাহার মাতামহের প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। কলিকাতায় লোহালক্কড়ের একখানি বড় দোকানও পাইয়া-ছিল; যুদ্ধের সময় এই দোকানখানি শৃঙ্খলার সহিত চালাইতে পারিলে সে লক্ষপতি হইতে পারিত। কিন্তু হঠাৎ ক্ষেপিয়া গিয়া সকলই নষ্ট করিয়াছে। এখনও যথেষ্ট সম্পত্তি আছে; তাহা সে হাতে পায় না। এখন সে মাতুলাশ্রম ত্যাগ করিয়া তাহার কাকার অন্ন ধ্বংস করিতেছে; তাহার কাকা স্থানীয় আদালতের কোন উকিলের মুহুরী। তাহার বিশ্বাস, সে তাহার কাকার অপেক্ষা ভাল মুহুরী হইতে পারিবে। এই জন্য সে সকল উকিলের সেরেস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং সকলকেই বিস্তর মক্কেল আনিয়া দিবে বলিয়া লোভ দেখায়।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "পঞ্চু, তুমি কো-অপারেটার, না নন্‌-কো-অপারেটার?"

পাগল বলিল, "অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতির কাছে আমি প্রকাণ্ড কো-অপারেটার। আর গান্ধি মহারাজের (উদ্দেশে প্রণাম করিল) শিষ্য-শাবকের কাছে নন-কো-অপারেটার। আমি লঙ্কাপ্রাশন করি, আবার করিও না। আমি একই গানে আখর বদল করিয়া দুই দলকেই খুসী করি।"

প্রশ্ন হইল, "কিরূপ?"

পাগল বলিল, "ডেপুটী বাবু আমার গান শুন্‌তে চাইলে আমি গাই—'তারা' চাহি না চাহি না স্বরাজ ধাম।" আবার নন্‌-কো-অপারেটার গান গায়িতে বলিলে গাই—

'তারা, চাহি মা, চাহি মা, স্বরাজ-ধাম।'

"হরতালের দিন 'পুয়োর ফিডিং' হয় কি না! কর্ত্তা বল্লেন 'পঞ্চু, ভিকিরী জুটিয়ে আন্‌তে পারবে? তারা পেট ভরে লুচি-মণ্ডা খাবে।' আমি বল্লাম, 'নিশ্চয়ই।' আমি ভিকিরী জুটিয়ে বেড়াচ্চি দেখে, নন-কো-অপারেসনের পাণ্ডারা বল্লে, 'পঞ্চানন, এই কি তোমার উচিত? মহাত্মা গান্ধির হুকুম মান্‌বে না?' আমি বল্লাম, 'নিশ্চয়ই।' তার পর মশায়, হাজার খানেক ভিকিরী জুটিয়ে ফেল্লাম। লুচি মণ্ডার লোভ দেখিয়ে তাদের মচ্ছবের কাছে নিয়ে চল্লাম। কিছু দূর এনে তাদের বল্লাম, 'লুচি ত খাবি, খৃষ্টান হবি ত?' তারা হিঁদু-মোচলমান, বল্লে—'খৃষ্টান হতে যাব কি দুঃখে?' আমি বল্লাম, 'তোদের খৃষ্টান করবার জন্যে গোরু আর শূয়োরের চর্ব্বি দিয়ে লুচি ভাজা হচ্ছে তা জানিস্‌। রাজপুত্তুর এসেচে,—তোদের খৃষ্টান করতে খানা দিচ্ছে, এই জন্যে তোদের নিয়ে যাচ্ছি।' আমার কথা শুনে ন-শ নিরেনব্বই জন পালিয়ে গেল। একজন

থাকলো। শেষে জমাদার সাহেব বল্লে 'যা, ওকে নিয়ে গিয়ে খোঁয়াড়ে পুরে রাখ, –না খাইয়ে ছাড়বি নে।' লাল পাক্‌ড়ীর কথা শুনে ভিকিরী বল্লে, 'আমার রক্ত-আমাশা হয়েছে, লুচি খাব না।'—সে এমন দৌড় দিলে যে, জমাদারের বাপেরও সাধ্যি হলো না তাকে ধরে। ডেপুটি বাবু বল্লেন, 'পঞ্চানন, তোমার এমন কাজ? মিথ্যা কথা বলে ভিকিরী গুলোকে ভাগ্‌ড়া কল্লে!" আমি বল্লাম, 'নন্‌-কো-অপারেটর-রাই রটিয়েছে, গরু শূয়োরের চর্ব্বি দিয়ে লুচি হচ্ছে,—আমার কি দোষ?' ডেপুটী বাবু জেলে পুরবেন বলে তাদের পাঁচ-জনকে গেপ্তার করলেন। তারা 'পাদমেকং ন গচ্ছামি' বলে সটান শুয়ে পড়ল। তাদের হাজতে নিয়ে যাবার জন্যে গরুর গাড়ী আনা হ'লো। দেশের ভাইকে জেলে নিয়ে যেতে হবে শুনে, গাড়োয়ান বলদ নিয়ে সট্‌কালো। চৌকিদারদের বলা হলো 'গাড়ী টান্‌।' তারা বল্লে 'আমরা কি গরু? থাকলো তোমার চাপরাস্‌, অমন চাকরীর মুখে—করি।'—শ্রীকৃষ্ণ কোচম্যানকে তার গাড়ী সমেত হাজির করা হলো। দেশের ভাইকে জেলে নিয়ে যেতে হবে শুনে, সে গাড়ী ঘোড়া ফেলে মারলে দৌড়। তখন আমি সরকারের সিভিল গার্ড হলাম; বল্লাম, 'আমি ওদের হাজতে নিয়ে যাচ্ছি,—গাড়ীতে তুলে দেন।'—ছোঁড়াদের কাণে-কাণে বল্লাম, 'কুচ পরোয়া নেই, তোমরা দুর্গা বলে গাড়ীতে ওঠ, খানিক দূর গিয়েই তোমরা পয়ষট্টি করো।' কিন্তু আমার পরামর্শ কেউ নিলে না; অনেকের মত আমি আল্লাও বল্‌চি, কাছাও খুল্‌চি,—তবু আমাকে বলে পাগল!"

পাগল আপন মনে বকিতে-বকিতে একখানি গরুর গাড়ীর ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিল। বেলা দুইটার পর হইতে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা সাইকেলে ও গরুর গাড়ীতে আসিয়া দল পুষ্ট করিতে লাগিলেন। হাকিম, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ইন্সপেক্টার, দারোগা প্রভৃতির সমাগমে মজলিস্‌ পূর্ণ হইল। আসরে এতক্ষণ বিড়ি চলিতেছিল। 'ষ্টেট এক্সপ্রেসের' কৌটা আসিবামাত্র স্বদেশী বিড়িকে লজ্জায় মুখ লুকাইতে হইল। কয়েক জোড়া তাস আসিয়াছে। ক্ষুধাতুর যুবকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বাগানের ভিতর কম্বলাসনে খেলা আরম্ভ করিলেন। প্রবীণেরা সতরঞ্চির উপর বসিয়া দেশের দুরবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সুযোগ্য মুন্সেফ বাবু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, কিন্তু আহার করেন না,—এমন কি, শ্বশুরবাড়ীতেও না! তিনি কেবল তামাক পাইলেন।

মহকুমার কর্ত্তা স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি এইমাত্র বাসায় ফিরিয়াছেন শুনিয়া, হী-বাবু একখানি টমটম লইয়া তাঁহাকে আনিতে চলিলেন।' ডেপুটী বাবু সামাজিক শিষ্টাচারের আদর্শ স্বরূপ। তিনি দীর্ঘ পর্যাটনে পরিশ্রান্ত হইয়াও টমটমে পোষলা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা তিনটা। খিচুড়ী চড়িল।

হঠাৎ শুনিলাম, দধির হাঁড়ি মাঠে মারা গিয়াছে। একজন গোপনন্দন উৎকৃষ্ট দধি লইয়া আসিতেছিল; নয়ঞ্জুলি পার হইবার সময় সে হোঁচট্‌ লাগিয়া পড়িয়া যায়। সঙ্গে-সঙ্গে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া সমস্ত দধি নষ্ট হইয়াছে। এই সংবাদে হী-বাবুর মনস্তাপের সীমা রহিল না। পুনর্ব্বার দধি সংগ্রহের জন্য তিনি লোক পাঠাইলেন; সে সময় নূতন করিয়া দধি সংগ্রহ করা অন্যের পক্ষে অসম্ভব হইলেও, হী-বাবুর আন্তরিক চেষ্টা নিষ্ফল হইল না। অবশ্য যে দধি এই অসময়ে সংগৃহীত হইল, তাহা তেমন উৎকৃষ্ট হইবে, ইহা আশা করাই অন্যায়।

সূর্য্যাস্তের অল্প কাল পূর্ব্বে পরিবেশনের স্থান হইলে, নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া চক্রাকারে ভোজন করিতে বসিলেন। ব্যঞ্জনাদি প্রচুর হইয়াছিল,—তাহার উপর ক্ষুধারও অভাব ছিল না। সুতরাং খিচুরী আনিতে মাংস ফুরায়, মাংস আনিয়া পরিবেশকেরা দেখেন পাত্র খালি! কিন্তু আয়োজনও অপর্য্যাপ্ত—সকলেই আকণ্ঠ ভোজন করিলেন। আমরা আহার করিতে-করিতে ডেপুটীবাবুর গল্প শুনিতে লাগিলাম। শুনিলাম, কোথায় নন্‌-কো-অপারেশনের ভারি ধুম। কুলিরা দলে-দলে ভলন্‌টিয়ার হইয়াছে। একজন দোকানদার এক নৌকা বিলাতী কাপড় লইয়া যাইতেছিল; ভলন্‌টিয়ার দল তাহার সন্ধান পাইয়া, নদীতেই তাহার নৌকা আটক করে। তাহাদের সঙ্গে নাপিত এবং ঘোলের ভাঁড়। নাপিতের ভাঁড় ও ঘোলের ভাঁড় একত্র সংগ্রহ করিয়া অসহযোগীরা সহযোগের চূড়ান্ত নমুনা দেখাইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহারা বিলাতী বস্ত্রবিক্রেতার মাথা মুড়াইয়া, ভাঁড়ের সমস্ত ঘোল তাহার মাথায় ঢালিয়া দিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এরূপ দণ্ডের সমর্থন করিবেন কি না, জানিতে আগ্রহ হয়। ডেপুটীবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ইহা কি নিরুপদ্রব অসহযোগ?' আমি

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নাই। ক্ষুরের ধার 'ভায়োলেন্ট' বটে,—কিন্তু ঘোলের ধার বড়ই স্নিগ্ধকর,—অন্ততঃ পাক-যন্ত্রের পক্ষে। তবে ক্ষুর ও ঘোল একযোগে বিলাতী পণ্যানুরাগীর চেতনাসম্পাদনের অব্যর্থ মুষ্টিযোগ কি না, মস্তিষ্ক রোগের চিকিৎসক ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর তাহা বলিতে পারেন।

আহারান্তে আমরা যখন পুষ্করিণীতে হাত-মুখ প্রক্ষালন করিলাম, তখন এক ঘোষনন্দন এক বাল্‌তি ক্ষীর লইয়া আসিল। তখন উদরে ক্ষীর ধারণের স্থান ছিল না, সুযোগও ছিল না। হী-বাবু সায়ংকালে ক্ষীরের আবির্ভাবে এতই রুষ্ট হইলেন যে, আমার আশঙ্কা হইল, তিনি হয় ত নাপিত ডাকিয়া (তাঁহার নাপিতও পোষলা করিতে আসিয়াছিল) গোপনন্দনের মাথা মুড়াইয়া, উক্ত ক্ষীরের বাল্‌তি তাহার মাথায় ঢালিবেন। কিন্তু সন্ধ্যা সমাগত-প্রায় দেখিয়া আমরা এই প্রহসনের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তবে তখনও বহু লোক অভুক্ত ছিল, এবং চাষারা দলে-দলে প্রসাদ পাইতে আসিতেছিল। তাহারা জানিত, অতিথিবৎসল হী-বাবু কাহাকেও অভুক্ত রাখিবেন না। আমরা কয়েক বন্ধুতে আলোয়ানে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, ভিন্ন পথে মাঠে প্রবেশ করিলাম, এবং শস্যক্ষেত্রগুলির ভিতর দিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলাম। দুই পাশে শস্যক্ষেত্র মধ্যে সঙ্কীর্ণ আইল। তাহার উপর দিয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে জেলা-বোর্ডের পথে পদার্পণ করিলাম। সেই স্থান হইতে কোর্টের দূরত্ব অধিক নহে। যখন কোর্টের সম্মুখে আসিলাম, তখন খাজনাখানার পেটা-ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া ছয়টা বাজিল।—তাহা শুনিয়া পোষ্ট মাষ্টার বাবু 'আজ আর বুঝি চাকরী থাকে না' বলিয়া আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়াই দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন; কারণ, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় তাঁহাকে ডাক বন্ধ করিতে হয়। তাঁহাকে দৌড়াইতে দেখিয়া একজন বলিলেন, "উঃ, বুড়ো বয়সেও চাকরীর কি মায়া!"—বক্তা কৃষিজীবী।

যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন চন্দ্রালোকে সমগ্র প্রকৃতি হাস্যময় দেখাইতেছিল; এবং দূর কাননে শৃগালের দল সমস্বরে সন্ধ্যা-বন্দনা আরম্ভ করিয়াছিল।

ফিরোজ শাহের দ্বিতীয় লক্ষ্মণাবতী অভিযান (১)

[অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ]

ফিরোজ শাহের দ্বিতীয় লক্ষ্মণাবতী অভিযানের আদি ঐতিহাসিক শামসি সিরাজ আফিফ্। এই অভিযানে আফিফের পিতা আগাগোড়া ফিরোজ শাহের সঙ্গে ছিলেন। (২) আফিফের পিতা ফিরোজ শাহের 'খাবাস' বা খাস অনুচর ছিলেন; কাজেই এই অভিযানের প্রত্যেক ঘটনা তাঁহার নিজ চোখে দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। আফিফ্ পিতার নিকট হইতে শুনিয়া, এই অভিযানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাজেই, সম্রাট-পক্ষের ঘটনার জন্য আফিফের বিবরণ হইতে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এমন বিবরণেও বাঙ্গালা দেশের কথায় ভুল রহিয়া গিয়াছে।

ডসন ও ইলিয়াটের পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে আফিফের তারিখ-ই-ফিরোজশাহীর প্রায় সম্পূর্ণ বিবরণটার অনুবাদ আছে। নিম্নে তাহা হইতে ফিরোজ শাহের দ্বিতীয় লক্ষ্মণাবতী অভিযানের বিবরণের মর্ম্মানুবাদ সঙ্কলিত হইল।

সোণারগাঁয়ের সুলতান ফখরুদ্দিনের জামাতার নাম ছিল জাফর খাঁ। সোণারগাঁয়ের মসনদ পাণ্ডুয়ার মসনদ হইতে প্রাচীনতর। সুলতান ফিরোজ শাহ তাঁহার প্রথম লক্ষ্মণাবতী অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, পাণ্ডুয়ার সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া, নৌকায় অভিযান করিয়া কয়েকদিনের মধ্যে সোণারগাঁয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ফখরুদ্দিন নিশ্চিন্ত মনে সোণারগাঁয়ে বাস করিতেছিলেন। শামসুদ্দিন অনায়াসে তাঁহাকে বন্দী করিয়া হত্যা করিলেন; এবং তাঁহার রাজ্য দখল করিয়া লইলেন। ফখরুদ্দিনের দল বিচ্ছিন্ন হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

(১) বঙ্গে সুলতানী আমল; তৃতীয় প্রস্তাব।

(২) Elliot. III. P. 306, 312, 315, 318.

ফখরুদ্দিনের জামাতা জাফর খাঁ মফস্বলে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে এবং তহশিলদারগণের হিসাব পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার নিকট ফখরুদ্দিনের পতন-সংবাদ পৌঁছিবামাত্র, তিনি নৌকায় চড়িয়া সমুদ্র-পথে পলায়ন করিলেন; এবং অনেক দুঃখ-কষ্টের পরে দিল্লীতে ফিরোজ শাহ সমীপে উপস্থিত হইলেন।

জাফর খাঁকে ফিরোজ শাহ খুব সমাদরে গ্রহণ করিলেন; এবং বহু পুরস্কার দিয়া উজীর নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন পরে একদিন জাফর খাঁর মলিন বদন দেখিয়া সুলতান স্থির করিলেন যে, জাফর খাঁর স্বত্ব উদ্ধারার্থ আবার লক্ষ্মণাবতীতে যুদ্ধ-যাত্রা করিতে হইবে।

বাঙ্গালায় সুলতান শামসুদ্দিন যখন সুলতানের রণসজ্জার বিষয় অবগত হইলেন, তখন তিনি এমনই ভীত হইলেন যে, একডালার দ্বীপে বাস করা তিনি আর নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি সোণারগাঁয়ে হটিয়া গিয়া, সেখানে আত্ম-রক্ষার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সোণারগাঁয়ের অধিবাসীরা শামসুদ্দিনের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ ফিরোজ শাহের নিকট আবেদন করিল।

লক্ষ্মণাবতীর প্রথম অভিযানের মত সম্রাটের সৈন্যদলে এবারও ৭০,০০০ অশ্বারোহী ও অসংখ্য পদাতি ছিল। ইহা ছাড়া, ৪৭০টি রণহস্তী এবং অনেকগুলি নৌকা ছিল। খান্-ই জাহানকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া সুলতান অগ্রসর হইলেন, এবং কনোজ ও অযোধ্যার মধ্য দিয়া কুচ্ করিয়া, জৌনপুরে উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি ছয় মাস কাটাইলেন; এবং মুহম্মদ তুগলকের কৌমার নামে 'জুনা' অনুসারে এক প্রকাণ্ড সহর প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ইহার নাম জুনান্‌পুর বা জৌনপুর রাখিলেন। অতঃপর তিনি বাঙ্গালায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

ইতোমধ্যে সুলতান শামসুদ্দিন পরলোকে গমন করিয়াছেন; এবং সুলতান সেকন্দর বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। তিনি ভয়ে একডালার দ্বীপসমূহে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। ফিরোজ শাহ এই দ্বীপসমূহ বেষ্টন করিয়া সৈন্য বসাইলেন; এবং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

অতঃপর উভয় পক্ষে শস্ত্র-যুদ্ধ চলিতে লাগিল; এবং প্রত্যেক দিনই খণ্ডযুদ্ধ হইতে লাগিল। উভয় পক্ষেই দিনরাত কড়া পাহারা থাকিত। একদিন সেকন্দরের দুর্গের এক বুরুজ, উপরে আরূঢ় যোদ্ধাদের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সম্রাট তাড়াতাড়ি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহার হিসাম-উল্ মুল্ক নামক অমাত্য এই সুযোগে আক্রমণ করিয়া একডালা দখল করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু সম্রাট চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, যদিও একডালার পতন অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এই রকম সহসা আক্রমণ করিয়া একডালা দখল করিলে, অনেক নির্দোষ ব্যক্তি প্রাণ হারাইবে এবং অনেক ভদ্র মহিলার সম্মান নষ্ট হইবে। কাজেই তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না; ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া তিনি অপেক্ষা করাই সঙ্গত বলিয়া স্থির করিলেন। সেকন্দর এক রাত্রে তাঁহার বাঙ্গালীদের সহায়তায় ভগ্ন অংশ পুনরায় গড়িয়া তুলিলেন। একডালা দুর্গ মাটির তৈয়ারী ছিল বলিয়া, উহা মেরামত করিতে বেশী সময় লাগিল না।

আবার যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে দুর্গে খাদ্যদ্রব্য ফুরাইয়া আসিল; এবং দুই পক্ষেরই যুদ্ধে বিষম বিরক্তি ধরিয়া গেল। ভগবান অবশেষে দুই রাজাকেই শান্তি-স্থাপনের প্রবৃত্তি দিলেন।

সুলতান সেকন্দর ও তাঁহার দলের লোকজনের কষ্টের অবধি ছিল না। তিনি মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া, এই বিপদে কি করা কর্তব্য, সেই বিষয়ে পরামর্শ চাহিলেন। মন্ত্রীরা বলিল যে, পশ্চিম-দেশীয় লোকদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের কস্মিন কালেও বনিবনাও ছিল না (হইবেও না); তবে সুলতান অনুমতি করিলে, সন্ধি স্থাপিত হইতে পারে কি না, চেষ্টা করিয়া দেখা যাইতে পারে। সুলতান সেকন্দর চুপ করিয়া রহিলেন; এবং মন্ত্রীগণ মৌন সম্মতি-লক্ষণ মনে করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহারা গোপনে একজন সুচতুর ব্যক্তিকে সুলতান ফিরোজ শাহের মন্ত্রীগণের নিকট প্রেরণ করিলেন। এই ব্যক্তি যাইয়া ফিরোজ শাহের মন্ত্রীগণকে বুঝাইল যে, যুদ্ধমান উভয় পক্ষই মুসলমান। এই অবস্থায় যুদ্ধ চলায় মুসলমানগণেরই ক্ষতি। সেকন্দর সন্ধিতে সম্মত হইয়াছেন। ফিরোজ শাহের মন্ত্রীগণেরও ফিরোজ শাহকে সন্ধিতে মতি লওয়ানই উচিত। ফিরোজ শাহের মন্ত্রীগণ এই প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বোধ করিয়া, সন্ধিতে ফিরোজ শাহের মতি লওয়াইতে সম্মত হইলেন। তাঁহারা ফিরোজ শাহের নিকট

নিকট গিয়া, সুলতান সেকন্দরের প্রস্তাব তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। ফিরোজ শাহ বলিলেন যে, সেকন্দর যখন এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তখন আর তাহাকে কষ্ট দেওয়া ঠিক নহে। তিনি সন্ধি করিবেন। কিঞ্চিৎ বিবেচনার পর তিনি বলিলেন যে, তিনি সন্ধিতে সম্মত আছেন; কিন্তু জাফর খাঁকে সোণারগাঁ ছাড়িয়া দিতে হইবে। ফিরোজ শাহের কথা শুনিয়া তাঁহার মন্ত্রীগণ সন্ধির সর্ত্ত ধার্য্য করিবার জন্য হয়বত খাঁ নামক দূতকে সেকন্দরের নিকট প্রেরণ করিলেন।

সেকন্দরের মন্ত্রীগণ দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেকন্দর যদিও আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারই অবগত ছিলেন, তবু তিনি এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন যে, যেন সন্ধির প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন ব্যাপারই তিনি অবগত নহেন। হয়বত খাঁ বঙ্গদেশবাসী ছিলেন; এবং তাঁহার দুই পুত্র সেকন্দরের অধীনে কাজ করিতেছিল। যে-যে সর্ত্তে সন্ধি হইতে পারে, হয়বত খাঁ তাহা বিবৃত করিলে, সেকন্দর বলিলেন যে, তিনি ফিরোজ শাহের নিকট হইতে সদয় ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড আর চলে, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। হয়বত খাঁ চতুর রাজদূতের মত কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তব্য তিনি প্রাণস্পর্শী, ভাবপূর্ণ ভাষায় উত্তম রূপে বলিলেন; এবং যখন দেখিলেন যে, সেকন্দরেরও সন্ধি করিবার মতি হইয়াছে, তখন তিনি বলিলেন যে, এই অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য, জাফর খাঁকে সোণারগাঁয়ের সিংহাসনে পুনঃস্থাপন। সেকন্দর প্রস্তাবিত সর্ত্তে সন্ধি করিতে এবং জাফর খাঁকে সোণারগাঁ প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু বলিলেন যে, এই অভিযানের উদ্দেশ্য যদি ইহাই হয়, তবে সম্রাট অনর্থক এতটা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, দিল্লী হইতে তাঁহাকে আদেশ পাঠাইলেই, তিনি জাফর খাঁকে সোণারগাঁ ফিরাইয়া দিতেন।

হয়বত খাঁ মহা আনন্দে ফিরোজ শাহের নিকট ফিরিয়া আসিয়া, সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন; এবং সেকন্দর যে জাফর খাঁকে সোণারগাঁ ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহাও বলিলেন। সুলতান খুব খুসী হইলেন, সেকন্দরের সহিত চিরকাল শান্তিতে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাকে ভাইপো-স্নেহে দেখিবেন, ইহাও বলিলেন। হয়বত খাঁ সেকন্দরকে কোন-রকম উপঢৌকন দিতে সম্রাটকে অনুরোধ করিলেন। সম্রাট্ মালিক কাবুলের হাতে ৮০০০০ তঙ্কা মূল্যের এক মুকুট, এবং ৫০০ শত আরবী ঘোড়া সেকন্দরকে উপহার পাঠাইলেন। আর যেন তাঁহাদের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত না হয়, এমন অভিলাষও বিজ্ঞাপন করিলেন। সুলতান সেকন্দরও তাঁহার সন্তোষ জানাইবার জন্য সম্রাটকে ৪০টি হাতী উপহার পাঠাইলেন। সম্রাট্ জাফর খাঁকে ডাকিয়া সোণারগাঁয়ে যাইতে বলিলেন; এবং দরকার হইলে তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ করিবার জন্য তিনি কিছুকাল সসৈন্য বাঙ্গালায় থাকিতে প্রস্তুত আছেন, ইহাও বলিলেন। বন্ধু-বান্ধবদের সহিত পরামর্শ করিয়া জাফর খাঁ স্থির করিলেন যে, তাঁহার দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং দলের প্রধান সব মরিয়া গিয়াছে; এ অবস্থায় সোণারগাঁয়ে থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাই সুলতানের অনেক উপরোধ সত্ত্বেও জাফর খাঁ দিল্লীর নিরাপদ শান্তিতে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। সম্রাট অতঃপর জৌনপুরে ফিরিয়া গেলেন; এবং তথা হইতে লক্ষ্মণাবতীর ৪০টী হাতী লইয়া জাজনগর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। লক্ষ্মণাবতী ও জাজনগরে ২ বৎসর ৭ মাস কাটাইয়া তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।"

Elliott III P. 303-317.

ফিরোজ শাহের দ্বিতীয় লক্ষ্মণাবতী অভিযানের তারিখ-ই মুবারকশাহীতে প্রদত্ত বিবরণ এই ঃ—

"এই বৎসরের (৭৫৯ হিঃ - ১৩৫৮ খৃঃ) শেষে তাজ-উদ্দিন বেতাহ্ অনেক আমীর সঙ্গে লইয়া, লক্ষ্মণাবতী হইতে সম্রাট-সদনে দূত রূপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সঙ্গে নানা উপহার লইয়া আসিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

৭৬০ হিজরীতে সম্রাট বহু সৈন্য লইয়া লক্ষ্মণাবতীর বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। সুলতান জাফরাবাদ পৌছিলে বর্ষা আসিয়া পড়িল; এবং তিনি সেখানে ছাউনী পাড়িলেন। লক্ষ্মণাবতীর দূতগণের সহিত ছৈয়দ্ রসুল্দার আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্মণাবতী পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সুলতান সেকন্দর তাঁহাকে পাঁচটি হস্তী ও নানা মূল্যবান উপহার সহ ফেরৎ সম্রাটের নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি পৌছিবার পূর্ব্বেই লক্ষ্মণাবতী হইতে আলম্ খাঁ আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে বলিলেন যে, সুলতান সেকন্দর বুদ্ধিহীন ও অনভিজ্ঞ; এবং সৎপথে চলিতেছেন না। প্রথমে সেকন্দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় সম্রাটের ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু সে যখন অধীনতার কর্ত্তব্য পালন করে নাই, তখন সে অবগত হউক যে, এই অভিযান তাহার বিরুদ্ধেই।

বর্ষা অবসানে সুলতান লক্ষ্মণাবতীর দিকে অগ্রসর হইলেন। সুলতান পাণ্ডুয়ায় পৌঁছিলে, সেকন্দর একডালায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। ৭৬১ হিঃ ১৬ই জমাদি-অল্-আউয়লে সুলতান একডালা অবরোধ করিলেন। অবরুদ্ধ সৈন্যগণ দেখিল যে, আক্রমণকারীদের আক্রমণ সহ্য করা তাহাদের সাধ্য নহে। তাই তাহারা আত্ম-সমর্পণ করিয়া হস্তী ইত্যাদি কর দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। ২০শে

ইণ্ডিয়ান মিউ নং ৩৮ ইণ্ডিয়ান মিউ নং ৩৯

সেকন্দর শাহের মুদ্রা

জমাদি-অল্-আউয়লে সম্রাট্ একডালা হইতে অবরোধ উঠাইয়া ফিরিয়া চলিলেন; এবং পাণ্ডুয়া পৌঁছিলে, সুলতান সেকন্দর তাঁহাকে ৩৭টি হস্তী এবং আরও অনেক মূল্যবান জিনিস কর স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট্ জৌনপুরে পৌঁছিলে বর্ষা আরম্ভ হইল; এবং সম্রাট্ সেখানে বিশ্রাম করিলেন। ঐ বৎসরেরই জিলহিজ্জ মাসে তিনি জাজনগর যাত্রা করিলেন। ৭৬২ হিজরীর রজব মাসে তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

Elliott. IV. P. 9-11.

তবকত্-ই-আক্‌বরী হইতে ফিরোজ শাহের দ্বিতীয় লক্ষ্মণাবতী অভিযানের নিম্নলিখিতরূপ ঘটনা-পারম্পর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৭৫৮ হিঃ—সোণারগাঁয়ের আমির জাফর খাঁ আসিয়া সম্রাট্-সদনে পৌঁছিলেন।

৭৫৯ হিজরীর শেষ। (কোন্ মাস? জিল্‌কিদা?) শামসুদ্দিনের দূত তাজউদ্দিন নানা উপহার সহ সম্রাট্-সদনে পৌঁছিলেন।

৭৫৯ হিজরী। (জিলহিজ্জা?) সম্রাট্ নানা উপহার সহ মালিক ছৈফুদ্দিনকে তাজউদ্দিনের সহিত সুলতান শামসুদ্দিনের নিকট প্রেরণ করিলেন।

৭৬০ হিঃ বসন্তকাল। (কোন মাস? মুহরম?) সম্রাট্-সদনে (বোধ হয়) বিহার হইতে মালিক ছৈফুদ্দিন সংবাদ পাঠাইলেন যে, সুলতান শামসুদ্দিন পরলোকগত হইয়াছেন; এবং তদীয় পুত্র সুলতান সেকন্দর শাহ বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। সম্রাট্ আদেশ পাঠাইলেন যে, প্রেরিত উপহার সকল ফেরত আনা হউক, দূত ফিরিয়া আসুক এবং উপহারের ঘোড়াগুলি সম্রাটের বিহারস্থিত সৈন্যদলের কাজে লাগান হউক।

৭৬০ হিঃ (মুহরম?) সম্রাট্ সৈন্য লইয়া দ্বিতীয় লক্ষ্মণাবতী অভিযানে বাহির হইলেন। জাফরপুরের নিকটে বর্ষার জন্য তাঁবু গাড়িতে বাধ্য হইলেন। সেকন্দরের নিকট হইতে দূত আসিল; কিন্তু শান্তি স্থাপিত হইল না। "কিছুদিন" পরে লক্ষ্মণাবতীর দিকে চলিলেন।

২০শে জমাদি-অল্ আউয়ল। (কোন্ বৎসর? এই বিবরণ মতে ৭৬০ হিঃ ই হইবে) সম্রাট্ লক্ষ্মণাবতী হইতে ফিরিয়া চলিলেন।

বর্ষাকাল। জৌনপুরে বর্ষা যাপন। জিলহিজ্জা। জাজনগর অভিযান। ৭৬২ হিঃ রজব্। সম্রাটের দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন।

বাদায়ুনী ফিরোজ শাহের দ্বিতীয় লক্ষ্মণাবতী অভিযানের বিবরণ অবিকল তারিখ-ই মুবারক শাহী হইতে নকল করিয়াছেন; কাজেই তাঁহার বর্ণনায় নূতন কথা কিছুই নাই।

তায়পর ফিরিস্তার বিবরণেও কিছু নূতনত্ব নাই। তবে একটি মন্তব্যের জন্য তাঁহার বিবরণ নিম্নে অনূদিত হইল।

"৭৫৯ হিজরায় বাঙ্গালার রাজা অনেক উপহার সহ দিল্লীতে দূত প্রেরণ করিলেন। সম্রাট্ প্রতি-উপহার স্বরূপ আরব্য ও পারস্য অশ্ব ও নানা রত্নাদি দিয়া বাঙ্গালায় দূত পাঠাইলেন। কিন্তু বিহারে পৌঁছিয়াই দূত অবগত হইল যে, শামসুদ্দিন পরলোকগত হইয়াছেন; এবং তৎপুত্র সেকন্দর বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। দূত তাই দিল্লীতে ফিরিয়া আসিল।

৭৬০ হিজরায় সম্রাট্ সৈন্য লইয়া লক্ষ্মণাবতীর দিকে চলিলেন এবং জাফরাবাদে ভয়ঙ্কর বৃষ্টি নামায়, সেখানেই বর্ষা

কাটাইতে বাধ্য হইলেন। সেকন্দরের কাছে দূত গেল; এবং উত্তরে পাঁচটি হাতী ও অন্যান্য বহুমূল্য উপহার সহ সেকন্দর প্রতি-দূত পাঠাইলেন। কিন্তু এই প্রকার দূত-বিনিময় সত্বেও, বৃষ্টি শেষ হইলেই ফিরোজ শাহ্ লক্ষ্মণাবতীর দিকে যাত্রা করিলেন।

ফিরোজশাহ পাণ্ডুয়ায় পৌঁছিলে, সেকন্দর একডালায় আশ্রয় লইলেন। কিন্তু অবরুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়া ৪৮ হাতী ও নানা ধনরত্ন দিয়া ফিরোজশাহের সহিত সন্ধি করিলেন।

রিয়াজ-উস্-সালাতিনের বিবরণেও নূতন খবর বিশেষ কিছু নাই। তাজউদ্দিনের দৌত্য (৭৫৯ হিঃ) এবং সম্রাটের প্রতি-দূতগণের বিহারে শামসুদ্দিনের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে প্রত্যাবর্ত্তন ইত্যাদির বর্ণনা করিয়া, রিয়াজ একটি নূতন খবর দিয়াছেন যে, সুলতান সেকন্দর পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সম্রাট্‌কে ৫০টি হস্তী ও অন্য উপহার দানে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পরে জাফরাবাদে সম্রাটের বর্ষা যাপন; এইখানে পুনরায় সেকন্দর শাহের শান্তি-স্থাপনে চেষ্টা ও তাহাতে বিফলতা; সম্রাটের একডালা অবরোধ, এবং ৪০টি হস্তী প্রদানে সেকন্দরের সন্ধি-ভিক্ষা ইত্যাদি রিয়াজেও আছে।

ফিরোজ শাহের ২য় লক্ষ্মণাবতী অভিযানের যে বিবরণ আফিফ দিয়াছেন, তাহা হইতে নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, এবারেও ফিরোজ শাহ তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু এই অভিযানের আদি ঐতিহাসিক আফিফ সুলতান ফিরোজ শাহের পার্শ্বচর ছিলেন। তিনি সাহস করিয়া সবটা সত্য লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। আর সুলতানের একেবারে চোখের উপর বসিয়া, সুলতানের অসঙ্গত খেয়াল ও লজ্জাজনক ব্যর্থতাগুলির ঠিক বিবরণ দেওয়া, শুধু সেই আমলের ঐতিহাসিক কেন, এই আমলের ঐতিহাসিকগণের পক্ষেও সম্পূর্ণ সম্ভব নহে। (৩) বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের লেখা বিবরণ পাইলে দেখা যাইত যে, আফিফ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য হইলেও, অনেকটা সত্য চাপিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

কিন্তু ইচ্ছাকৃত সত্য গোপন ভিন্ন আফিফের বিবরণে সত্য ভুলই গুটি-দুই আছে। প্রথম ভুল, শামসুদ্দিনের সোণারগাঁ বিজয়ের বিবরণে। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে (প্রথম প্রস্তাব ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন গাজী শাহ্—৫১৯ পৃঃ), শামসুদ্দিনের সোণারগাঁ জয়ের বহু পূর্ব্বেই (৭৫০ হিঃ) ফখরুদ্দিন পরলোকে গমন করিয়াছিলেন; এবং ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন সোণারগাঁয়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কাজেই আফিফ লিখিয়াছেন যে, শামসুদ্দিন সোণারগাঁ জয় করিয়া ফখরুদ্দিনকে ধরিয়া বধ করিয়াছিলেন, ইহাই আফিফের এক নম্বর ভুল। সোণারগাঁর সিংহাসনে তখন ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন অধিষ্ঠিত। তিনিই নিশ্চয় ধৃত ও নিহত হইয়াছিলেন।

তার পরে আফিফ লিখিয়াছেন যে, ফিরোজ শাহের প্রথম লক্ষ্মণাবতী অভিযানের পরে অর্থাৎ ৭৫৫ হিঃ-তে শামসুদ্দিন কর্তৃক সোণারগাঁ বিজিত হইয়াছিল। ইহা তাঁহার দুই নম্বর ভুল। ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন প্রসঙ্গেই দেখাইয়াছি যে, ফখরুদ্দিনের সোণারগাঁয়ে মুদ্রিত মুদ্রা ৭৫০ হিজ্‌রী পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ঐ বৎসরই সোণারগাঁ হইতে ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিনের মুদ্রা দেখা দেয়, এবং ৭৫৩ হিঃ পর্য্যন্ত চলে। এই ৭৫৩ হিজরীতেই আবার সোণারগাঁ হইতে ঐ একই শিল্পীর তৈয়ারী একই ঢঙ্গের শামসুদ্দিনের মুদ্রা দেখা দেয়, এবং পর-পর বৎসর চলিতে থাকে। টমাস (Initial Coinage p. 63) শামসুদ্দিনের সোণারগাঁয়ে মুদ্রিত ৭৫৩ হইতে ৭৫৮ হিজরার প্রত্যেক বৎসরের মুদ্রার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম পেটিকার ৩২—৩০—৩১ (a)—৩১—৩১ (b) নম্বর মুদ্রাগুলি শামসুদ্দিনের সোণারগাঁয়ে মুদ্রিত মুদ্রা; এবং এইগুলির তারিখ যথাক্রমে ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭ এবং ৭৫৮ হিজরি। শিলং পেটিকার ৬৯, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৩ এবং ৬৭ নম্বর মুদ্রাগুলিও শামসুদ্দিনের সোণার গাঁয়ে মুদ্রিত মুদ্রা। এই গুলির তারিখ যথাক্রমে ৭৫৩, ৭৫৪, ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭ এবং ৭৫৮ হিঃ। এখানে সিদ্ধান্ত করা অনিবার্য্য যে, ৭৫৩ হিজরীতে শামসুদ্দিন কর্তৃক সোণারগাঁ বিজিত হইয়াছিল। সোণারগাঁর পতন-সংবাদে বিচলিত হইয়াই বোধ হয় ফিরোজ

(৩) পাঠকগণ উদাহরণ স্বরূপ Rushbrook Williams সাহেবের ১৯১৯ ও ১৯২০ সালের ভারতের বার্ষিক বিবরণ দুইটি পড়িয়া দেখিতে পারেন। উক্ত সাহেব যে সত্য কথা বলিতে চেষ্টা করেন নাই, তাহা নহে। তবু তাহাতে "কোণ-কর্ত্তন"এর অভাব নাই। "চাকরী যা পেয়েছি তা রাখ্‌তে তো হবে বজায়!"

শাহ শামসুদ্দিনকে দমনের আবশ্যকতা বুঝিয়া ৭৫৪ হিঃতে ১ম লক্ষ্মণাবতী অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন। আমি নিজ চোখে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম পেটিকার ৭৫৪ হিজরীর ৩২নং মুদ্রা এবং শিলং পেটিকার ৭৫৩ হিজরির ৬২ নং মুদ্রা দুইটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। প্রথমটির তারিখ নিঃসন্দেহ ৭৫৪ এবং দ্বিতীয়টির তারিখ নিঃসন্দেহ ৭৫৩ হিঃ। শিলংএর মুদ্রাটির ছবি দেওয়া গেল।

আমরা দেখিলাম যে, সোণারগাঁ বিজয়ের সময় ফখরুদ্দিন সোণারগাঁয়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন না,—ছিলেন ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন। সোণারগাঁ ৭৫৫ হিজরীতে, প্রথম লক্ষ্মণাবতী অভিযানের অব্যবহিত পরে, অধিকৃত হয় নাই,—হইয়াছিল তাহার দুই বৎসর আগে—৭৫৩ হিজরীতে। সোণারগাঁ-বিজয় ফিরোজ শাহের প্রথম লক্ষ্মণাবতী-অভিযানের অব্যবহিত কারণ হইতে পারে; কিন্তু উহা দ্বিতীয় লক্ষ্মণাবতী অভিযানের কারণ হইতে পারে না। তবে দ্বিতীয় লক্ষ্মণাবতী অভিযানের প্রকৃত কারণ কি?

প্রকৃত কারণ কি, তাহার উল্লেখ দ্বিতীয় প্রস্তাবে করিয়াছি। প্রথম লক্ষ্মণাবতী অভিযানে ফিরোজ শাহ হেলে ধরিতে আসিয়া কেউটে ধরিয়াছিলেন; এবং উদ্দেশ্য সাধন না করিয়াই ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সম্রাটের মন হইতে সেই বিফলতার আক্রোশ যায় নাই। কিন্তু ইলিয়াস শাহকে সহজে ঘাঁটাইতেও তিনি সাহস করেন নাই। ৭৫৭ হিজরীতে সন্ধি হইয়া দুই রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল; এবং পরস্পর দূত-বিনিময়ে দুই রাজার মধ্যে শান্তির বন্ধন প্রত্যেক বৎসরই দৃঢ়তর হইতেছিল। কিন্তু ৭৫৮ হিজরীতে সোণারগাঁয়ের অমাত্য জাফর খাঁ যখন সমুদ্র-পথে আসিয়া সম্রাট-সদনে উপস্থিত হইলেন, এবং ইলিয়াসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিলেন, তখন ফিরোজ শাহ অন্ততঃ তাঁহার সম্রাট্‌-গৌরব বজায় রাখিতেও, সেই অভিযোগ শুনিতে বাধ্য হইলেন। আর, মনে মনে তো প্রথমবারের বিফলতার আক্রোশ ছিলই। কৌশলী ইলিয়াস বোধ হয় এই খবর পাইয়াই, তাজউদ্দিনকে ৭৫৯ হিজরীর শেষে বহু উপহার দিয়া সম্রাট্‌-সদনে প্রেরণ করিলেন। ব্যাপারটা যেন এইরূপ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। সম্রাট্ চুপচাপ ইলিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময়ে ইলিয়াসের দূত নানা উপহার সহ আসিয়া বেশ নরম-গরম ভাবে সম্রাট্‌কে জিজ্ঞাসা করিল—"জনাব না কি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রার আয়োজন করিতেছেন?" সম্রাট্ ফিরোজ শাহ, অবস্থা ভাল নয় দেখিয়া, বলিলেন,—"আরে যাও! কে বলে? ইলিয়াস আমার মিতা,—ফি বছর দুই রাজ্যে দূত-বিনিময় চলিতেছে,—তবু তুমি এই মিথ্যা কথা বিশ্বাস কর? মিতাকে বলিও, ও কিছুই নয়,—শিকারে যাইবার আয়োজন করিতেছিলাম। মিতা যদি বিশ্বাস না করেন, তবে তুমি যে আদর-অভ্যর্থনাটা এখানে পাইয়া গেলে, মিতাকে তাহার বিবরণটা শুনাইয়া দিও! আর এই তোমার সঙ্গে মালিক ছৈফুদ্দিন যাইতেছে,—সঙ্গে যা উপহার দিয়া দিলাম, তাহা দেখিলেই মিতার ভ্রম দূর হইবে!"

শিলং নং ৬২   শিলং নং ৬২

ইলিয়াস্ শাহের মুদ্রা

তাজউদ্দিনকে এইরূপে বিদায় দেওয়া হইল; কিন্তু বোধ হইতেছে, যুদ্ধের আয়োজন চুপচাপ সমানেই চলিতে লাগিল। এদিকে মালিক ছৈফুদ্দিন যখন বিহার পৌঁছিয়া শুনিলেন যে ইলিয়াস মারা গিয়াছেন ও তৎপুত্র সেকন্দর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, এবং সেই খবর সম্রাট্‌কে জানাইলেন, তখন বৃদ্ধ সিংহ পরলোকে গিয়াছেন শুনিয়া, সম্রাট্ মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ আদেশ পাঠাইলেন যে, দূত ফিরিয়া আসুক,—উপহার ফিরাইয়া আনা হউক এবং ঘোড়াগুলি বিহারে সম্রাট্ সৈন্যদলের ব্যবহারের জন্য দেওয়া

হউক। এই দূত-প্রত্যাহার একরকম যুদ্ধ-ঘোষণা ও বন্ধুত্ব উচ্ছেদ। তবকত্-ই আক্‌বরির মতে ৭৬০ হিজরির বসন্তকালে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। এ দিকে তারিখ-ই-মুবারকশাহীতে দেখা যায়, তিনি ৭৬২ হিজরির রজব মাসে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহার সহিত শাম্‌স্ সিরাজ আফিফের উক্তি, যে, সম্রাট ২য় লক্ষ্মণাবতী অভিযানে ও জাজনগর অভিযানে ২ বৎসর ৭ মাস কাটাইয়া দিল্লী ফিরিয়াছিলেন, ইহা মিলাইয়া হিসাব করিলেই দেখা যায় যে, ৭৬২ হিজরির রজব হইতে পেছন দিকে ২ বৎসর ৭ মাস গণিয়া ৭৬০ হিজরির প্রথম মাস মহরমে উপস্থিত হইতে হয়। এই হিসাবে, তবকত্-ই-আক্‌বরির উক্তি, যে, ইলিয়াসের মৃত্যু-সংবাদ ফিরোজ শাহের নিকট ৭৬০ হিজরীর প্রারম্ভে পৌছিয়াছিল, ইহা যদি সত্য হয়, তবে এই সংবাদ পাইবামাত্র ১০।১৫ দিনের মধ্যে ফিরোজ শাহ দ্বিতীয় লক্ষ্মণাবতী অভিযানে বাহির করিয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে। ৭৫৯ হিজরীর একেবারে শেষে দূত-বিনিময় এবং ৭৬০ হিজরির একেবারে প্রথমে ইলিয়াসের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণমাত্র দ্বিতীয় লক্ষ্মণাবতী অভিযানে যাত্রা হইতে, ফিরোজ শাহ ইলিয়াসকে কি পরিমাণ সমিহা করিয়া চলিতেন, এবং প্রথমবার অভিযানের বার্থতার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি কি পরিমাণে ব্যস্ত ছিলেন, তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে।

ফিরোজ শাহের এই সকল কূটনীতি ও ইলিয়াস-ভীতির বিবরণ আফিফ একেবারে চাপিয়া গিয়াছেন। এমন কি, তাঁহার বিবরণ পড়িয়া বুঝাই যায় না যে, কখন ইলিয়াসের মৃত্যু হইল,—দ্বিতীয় অভিযানে যাত্রার আগে না পরে! তাহা ছাড়া, তিনি তাজউদ্দিনের দৌত্য ও ছৈফুদ্দিনের প্রতি-দৌত্য, জৌনপুরে সেকন্দর ও ফিরোজশাহের দূত-বিনিময় ইত্যাদির বিবরণ একদম বাদ দিয়া গিয়াছেন; কারণ, এই সকল বিবৃত করিলে ফিরোজ শাহের খামখেয়ালী এবং অগৌরব একান্ত স্পষ্ট হইয়া পড়ে!

তারিখ-ই মুবারকশাহী এবং রিয়াজ-উস্-সালাতিন মিলাইয়া পড়িলে, আরও কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার ধরা যায়।

রিয়াজ লিখিয়াছেন যে, সেকন্দর পিতার মৃত্যুর পর বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সম্রাট্‌কে ৫০টা হাতী ও নানা ধনরত্ন নজর পাঠাইয়াছিলেন। ইহা খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু আফিফ ইহার কোন উল্লেখই করেন নাই তারিখ-ই-মুবারকশাহী পাঠে কিন্তু জানা যায় যে, সম্রাট্ জৌনপুরে পৌছিলে—"লক্ষ্মণাবতীর দূতগণের সহিত যে ছৈয়দ রসুলদার আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্মণাবতী পাঠাইয়া দেওয়া হউক।" এই ছৈয়দ রসুলদার কবে লক্ষ্মণাবতী হইতে দূত রূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন? তাজউদ্দিনের ৭৫৯ হিজরীর দৌত্যেরই কি কোন লোক ইনি? তা' কি করিয়া হইবে? সে দৌত্যের সমস্ত লোক তো সম্রাট-প্রেরিত দূত ছৈফুদ্দিনের সহিত অনেক আগেই লক্ষ্মণাবতী ফিরিয়া গিয়াছে। পরিষ্কার বুঝা যায় যে সেকন্দরের সিংহাসনারোহণের পরে ৫০টা হাতী নজর লইয়া যে দূত সম্রাট্-সমীপে আগমন করিয়াছিলেন, এই ব্যক্তি সেই দূত। সম্রাট্ তাঁহাকে আটক করিয়াছিলেন,—জৌনপুরে প্রায় সেকন্দরের রাজ্য-সীমায় আসিয়া তাঁহাদের ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও যেন সম্রাট্ নিজের মনোভাব পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দেন নাই। তিনি যে লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিতেই আসিয়াছেন, তাহা তখনও স্পষ্ট নহে। অতঃপর আবার তারিখ-ই-মুবারকশাহী পাঠ করা যাউক—

"জাফরাবাদে পৌছিলে বর্ষা আসিয়া পড়িল; এবং সম্রাট্ সেখানে ছাউনী গাড়িলেন। লক্ষ্মণাবতীর দূতগণের সহিত ছৈয়দ রসুল্‌দার আসিয়াছিলেন; তাঁহাকে লক্ষ্মণাবতী পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সুলতান সেকন্দর তাঁহাকে পাঁচটি হস্তী ও নানা মূল্যবান উপহার সহ পুনরায় সম্রাটের নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু সে পৌছিবার পূর্ব্বেই লক্ষ্মণাবতী হইতে আলম্ খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্রাট তাহাকে বলিলেন যে, সুলতান সেকন্দর বুদ্ধিহীন ও অনভিজ্ঞ, এবং সৎপথে চলিতেছেন না। প্রথমে সেকেন্দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কোন ইচ্ছা সম্রাটের ছিল না; কিন্তু সে যখন অধীনতার কর্ত্তব্য পালন করে নাই, তখন সে অবগত হউক যে এই অভিযান তাহার বিরুদ্ধেই।"

এই বিবরণ হইতে অত্যন্ত সঙ্গত রূপে নিম্নরূপ ঘটনা-পর্য্যায় অবধারণ করা যায়। সেকন্দর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ৫০টি হাতী ও নানা উপহার দিয়া সম্রাট্-সদনে ছৈয়দ রসুলদার নামক দূতকে পাঠাইলেন। খুব সম্ভব সম্রাটের সহিত তাহার দিল্লী হইতে জৌনপুরের রাস্তায় দেখা হয়। সম্রাট্ ছৈয়দ রসুলদারকে নানা

ছলে দেরি করাইয়া, অবশেষে জৌনপুরে আসিয়া বিদায় দেন ; কিন্তু তখনও বলিয়া দেন না যে, অভিযান বাঙ্গালা দেশের বিরুদ্ধে। এদিকে ছৈয়দ রসুলদারের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া, ও সম্রাট বাঙ্গালা দেশের দিকেই আসিতেছেন অবগত হইয়া, সেকন্দর শাহ আলম্ খাঁকে খবর লইতে পাঠান। আলম খাঁ যখন আসিয়া জৌনপুরে সম্রাট-সদনে পৌছিলেন তখন ছৈয়দ রসুলদার বিদায় লইয়া লক্ষ্ণাবতীর দিকে রওনা হইয়া গিয়াছেন। আলম খাঁর নিকটে প্রথম সম্রাট নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। সেকন্দর অধীনতার কর্ত্তব্য পালন করেন নাই, সৎপথে চলিতেছেন না, ইত্যাদি।

এই স্থানে ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর ঠিক তারিখ অবধারণ করিতে চেষ্টা করিব। এই বিষয়ে যত দিক হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা একে একে বিবৃত করা যাক্।

১। তারিখ-ই-মুবারকশাহী, তবকৎ-ই-আকবরী ইত্যাদি ইতিহাসের মতে তাজউদ্দিন ইলিয়াসের দূত স্বরূপ ৭৫৯ হিজরীর শেষ ভাগে সম্রাট-সদনে পৌছেন এবং তাহার কিছু দিন পরেই সম্রাটের দূত তাজউদ্দিনের সহিত লক্ষ্ণাবতী রওনা হন। ৭৬০ হিজরীর প্রথম ভাগে এই দূত বিহার হইতে ইলিয়াসের মৃত্যু-সংবাদ সম্রাট সদনে প্রেরণ করে। ফিরোজ শাহ এই সংবাদ পাইয়া ৭৬০ হিজরীর

…রুদ্দিনের মুদ্রা

নেকড়ে বাঘ মেষ শাবককে যে যুক্তিতে আক্রমণ করিয়াছিল, সেই শ্রেণীর যুক্তি আর কি ! সম্রাটের আসল মনের ভাব এই যে, প্রথমবার নাকাল হইয়া গিয়াছি ; এইবার বৃদ্ধ সিংহ ইলিয়াস মরিয়াছে, এইবার শোধ তুলিব, এখন আর আমাকে কে বাধা দেয় ! জাফর খাঁর দাবীর অজুহাত তো আছেই। আক্রোশে পূর্ব্ববর্ত্তী সন্ধি ও বন্ধুত্ব সবই scrap of paper (বাজে কাগজ) হইয়া গেল !

এদিকে ছৈয়দ রসুলদার গিয়া যখন সেকন্দরের কাছে খবর পেশ্ করিল যে, ব্যাপার বড় সুবিধার নহে, তখন তিনি তাড়াতাড়ি ছৈয়দ রসুলদারকেই ৫টি হস্তী উপহার সহ সম্রাটের নিকট ফিরিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু এই সব শান্তি চেষ্টায় কোন ফলই হইল না ; কারণ ফিরোজ শাহ প্রথমবারের বিফলতার কথা ভুলেন নাই। বর্ষা অবসানে তিনি আবার বাঙ্গালার বল পরীক্ষা করিতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

মুহরম মাসেই লক্ষ্ণাবতীর দ্বিতীয় অভিযানে বাহির হইয়া পড়েন। এই হিসাবে ৭৫৯ হিজরীর শেষ মাসের শেষ কয় দিনের কোন এক দিনে বা ৭৬০ হিজরীর প্রথম মাসের প্রথম দুই তিন দিনের কোন এক দিনে ইলিয়াস পরলোকে গমন করেন।

২। রিয়াজ-উস্ সালাতিনকারের মতে সুলতান শামসুদ্দিন ১৬ বছর কয়েক মাস রাজত্ব করিয়া পরলোকগত হন। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ইলিয়াস শাহ মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণে ৭৪৩ হিজরীর শেষ ভাগে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া অবধারিত হয়। এই হিসাবেও তাঁহার রাজ্যাবসান ৭৫৯ হিজরীর শেষে বা ৭৬০ হিজরীর আরম্ভে বলিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

৩। মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ আলোচনা করিতে হইলে, ইলিয়াসের নিম্নলিখিত মুদ্রাগুলির আলোচনা করিতে হয়।

কোন পুস্তকে বর্ণিত	টাকশাল	তারিখ
ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম পেটিকার তালিকা, ২য় খণ্ড, ২৯ নং।	ফিরোজাবাদ	৭৫৮ হিঃ
ঐ নং ৩১ (b)	সোণারগাঁ	৭৫৮ হিঃ
শিলং পেটিকা তালিকা পরিশিষ্ট নং ২/৯৯১	ফিরোজাবাদ	৭৫৮ হিঃ
ঐ নং ২/৫৩	ফিরোজাবাদ	৭৫৯ হিঃ
ঐ নং ২/৮৩	ফিরোজাবাদ	৭৬০ হিঃ
টমাসের ইনিশিএল্ কয়নেইজ পৃঃ ৬২—নং ১৫	ফিরোজাবাদ	৭৫৮ হিঃ
ঐ পৃঃ ৬৩ নং ১৬	সোণারগাঁ	৭৫৮ হিঃ
ব্লখম্যানের প্রবন্ধ, প্রথম প্রস্তাব, বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা, ১৮৭৩, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৫৫ পাদটীকায় উল্লিখিত	সোণার গাঁ	৭৬০ হিঃ

উপরিউল্লিখিত মুদ্রাগুলি হইতে দেখা যাইবে, ইলিয়াসের ৭৫৮ হিজরীর মুদ্রা অনেকগুলিই পাওয়া গিয়াছে। ৭৫৯ হিজরীর মুদ্রা মাত্র একটি এবং ৭৬০ হিজরীর মুদ্রা মাত্র দুইটি এ যাবৎ পাওয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, শিলং পেটিকার মুদ্রা দুইটি আমি নিজে দেখি নাই; এবং ব্লখম্যানের উল্লিখিত ৭৬০ হিজরীর মুদ্রাটিও দেখিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু ইতিহাসের প্রমাণাবলি আলোচনা করিয়া মনে হয় যে, ইহাদের তারিখগুলি হয়ত ঠিকই পাঠ করা হইয়াছে। ৭৬০ হিজরীর মুদ্রা দুইটার পাঠ ঠিক হইয়া থাকিলে বলিতে হইবে যে, ৭৬০ হিজরী প্রথম মাস মুহরমের তিন-চারি তারিখের মধ্যে ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হইয়াছিল।

ইলিয়াস-পুত্র সেকন্দর শাহের ৭৫৮ হিজরির, ৭৫৯ হিজরীর এবং ৭৬০ হিজরীর কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া যায়। নিম্নে তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল। এই প্রসঙ্গে ইহাদেরও আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

কোন পুস্তকে বর্ণিত	টাকশাল	তারিখ
ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম পেটিকা তালিকা, ২য় খণ্ড ৩৭ নং মুদ্রা	ফিরোজাবাদ	৭৫৯ হিঃ
৩৮ নং	কামরূ	৭৫৯ হিঃ
৩৯ নং	সোণারগাঁ	৭৫৯ হিঃ
৪০ নং	সোণারগাঁ	৭৬০ হিঃ
৪২ নং	মুয়াজ্জমাবাদ	৭৬০ হিঃ
৬৩ নং	সোণারগাঁ	৭৫৮ হিঃ
৬৪ নং	সোণারগাঁ	৭৫৯ হিঃ
শিলং পেটিকা তালিকা পরিশিষ্ট নং ২/৯১	ফিরোজাবাদ	৭৫৯ হিঃ
নং ২/১১২	সোণার গাঁ	৭৫৮ হিঃ
টমাস, ইনিশিএল কয়নেইজ্ ৬৭ পৃষ্ঠা, ১৭ নংএর ধরণের মুদ্রা সমূহ	ফিরোজাবাদ	৭৫০-৭৬০হিঃ
৬৮ পৃঃ—১৮ নম্বরের ধরণ	সোণারগাঁ	৭৫৬-৭৬৩ হিঃ
ঐ পৃঃ, ১৯ নম্বরের ধরণ	মুয়াজ্জমাবাদ	৭৬০ হিঃ
৬৯ পৃঃ, ২১ নং	সোণারগাঁ	৭৫৮-৭৫৯ হিঃ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিলং পেটিকাস্থ ইলিয়াস শাহের ৭৫৯ ও ৭৬০ হিজরীর মুদ্রা দুইটি আমি নিজে দেখি নাই। ঐ দুইটি মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া দেখা অত্যাবশ্যক। ঐ মুদ্রা দুইটির পাঠ ঠিক হইলেও, উপরের তালিকা দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, ৭৫৯ হিজরী হইতে ইলিয়াস শাহ সমস্ত রাজ্যভার প্রকৃতপক্ষে সেকন্দর শাহের উপর চাপাইয়া দিয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহের মাত্র একটি ৭৫৯ হিজরীর মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উপরের তালিকায় সেকন্দর শাহের আটটি ৭৫৯ হিজরীর মুদ্রা আছে, এবং কয়েকটি ৭৫৮ হিজরীর মুদ্রাও আছে।

টমাসের তালিকায় দেখা যাইবে যে, তিনি সেকন্দর শাহের ৭৫৮ হিজরীরও পূর্ব্ববর্ত্তী মুদ্রা পাইয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন। ৭৫৮ হিজরীর পূর্ব্ববর্ত্তী সেকন্দর শাহের মুদ্রা তিনি সত্যই পাইয়াছিলেন কি না, এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া বিশেষ ফল নাই। কারণ, এই সকল মুদ্রার ছবি যখন তিনি দেন নাই, তখন বিশেষ-প্রমাণ-ব্যতীত-অবিশ্বাস্য এই কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সম্ভবতঃ মুদ্রাগুলির তারিখ তিনি ঠিক পড়িতে না পারিয়াই ঐরূপ কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কারণ, যে কুচবিহারে পাওয়া মুদ্রা হইতে তৃতীয় দফায় নির্ব্বাচিত মুদ্রা সমূহের উপর তাঁহার মন্তব্য প্রতিষ্ঠিত, তাহার সারভাগ বর্ত্তমানে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে এবং ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের তালিকায় সেকন্দর শাহের ৭৫৮ হিজরীর পূর্ব্বের একটি মুদ্রাও নাই।

সেকন্দর শাহের দুইটি ৭৫৮ হিজরীর মুদ্রা বর্ত্তমানে আমরা আলোচনা করিতে পারি। একটি ইণ্ডিয়ান মিউ-জিয়মের ৬৩ নং মুদ্রা, অপরটি শিলং পেটিকার ১১২ নং মুদ্রা। সৌভাগ্যক্রমে শিলং তালিকার পরিশিষ্টে ১১২ নং মুদ্রাটির চিত্র দেওয়া আছে। চিত্র দেখিয়া মুদ্রাটির তারিখ বেশ পড়া যায়; এবং উহা যে ৭৫৮ হিঃ, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ৬৩ নং মুদ্রাটিও আমি নিজে দেখিয়াছি। উহার তারিখও যে ৭৫৮ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ৩৮ ও ৩৯ নং মুদ্রা দুইটি ও আমি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি (চিত্র দ্রষ্টব্য)। উহাদের তারিখ যে ৭৫৯ হিঃ, তাহাও নিঃসন্দেহ। কিন্তু লক্ষ্যের বিষয় এই যে, শুধু সোনারগাঁয়ে মুদ্রিত মুদ্রায়ই সেকন্দর শাহ নিজকে সুলতান বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। অন্য সমস্ত মুদ্রায়ই তিনি শুধু "শাহ সেকন্দর, সুলতান ইলিয়াস শাহের পুত্র।"

যাহা হউক, তিনি মুদ্রায় নিজকে শুধু শাহ সেকন্দরই বলুন, অথবা সুলতান সেকন্দরই বলুন, যদি ৭৬০ হিজরীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ইলিয়াস শাহ বাঁচিয়া ছিলেন, তবে ৭৫৮ হিজরীতে এবং ৭৫৯ হিজরীতে যে সেকন্দর শাহ বিস্তর মুদ্রা নিজ নামে মুদ্রিত করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন, ইহা একটি অসাধারণ ঘটনা। এই ঘটনার কারণ দ্বিবিধ হইতে পারে।

১ম, ৭৫৮ হিজরীতে সেকন্দর বিদ্রোহী হইয়া নিজ নামে মুদ্রা মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

• ২য়, ৭৫৮ হিজরীতে ইলিয়াস বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত সেকন্দর শাহকে যুবরাজ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে নিজ নামে মুদ্রা প্রচারের অনুমতি দিয়াছিলেন; এবং রাজকার্য্যের ভারও অধিকাংশ তাঁহার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

প্রথম অনুমানের সমর্থন কোন ইতিহাসেই দেখা যায় না। আর ফিরোজ শাহের আসন্ন আক্রমণের সম্মুখে পিতা-পুত্রে এমন বিচ্ছেদ হইবে, ইহা সম্ভবপর নহে। হইয়া থাকিলে, আফিফ এমন ঘটনার উল্লেখ করিতে ভুলিতেন না। কাজেই, দ্বিতীয় অনুমানই সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ৩৮ নং মুদ্রাটিও দ্বিতীয় অনুমানেরই সমর্থন করে। এই মুদ্রাটি কামরূপ টাকশাল হইতে মুদ্রিত। যে, বীর পুত্র কামরূপ জয় করিয়াছিল, তাহাকে যুবরাজ নির্ব্বাচিত করিয়া, তাহার নামে মুদ্রা মুদ্রিত করান খুবই স্বাভাবিক। ফিরোজ শাহ দ্বিতীয় লক্ষ্মণাবতী অভিযানে জৌনপুর হইতে পাণ্ডুয়া যাইবার পথে, তৎপুত্র ফতে শাহকে রাজচিহ্ন ইত্যাদিতে ভূষিত করিয়া, তাহার নামে মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। তারিখ-ই-মুবারকশাহী, Elliott IV. p. 10।

এখন লক্ষ্মণাবতী অভিযানের বিবরণ আবার অনুসরণ করা যাউক। প্রথমতঃ ঘটনা-পারম্পর্য্য বিচার করা যাউক। ফিরোজ শাহ ৭৬০ হিজরীর প্রথম মাস মুহররমের ১৫।২০ তারিখে দিল্লী ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন। ৭৬০ হিজরীর ১লা মুহরম = ৩রা ডিসেম্বর, ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ। কাজেই ডিসেম্বরের শেষে অর্থাৎ পৌষের প্রথমে তিনি রওনা হন। দিল্লী হইতে জৌনপুর পৌছিতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি সাধারণতঃ চৈত্রে আরম্ভ হয়। কাজেই তিনি রবি-অল্-আখেরের শেষভাগে জৌনপুর পৌছিয়াছিলেন। ইহার পর ছয় মাস বর্ষা যাপন। কাজেই শাওয়াল মাসের শেষে তিনি পাণ্ডুয়া রওনা হইয়াছিলেন। জৌনপুর হইতে পাণ্ডুয়া পৌছিয়া একডালা অবরোধ করিতে ফিরোজ শাহের মাসখানেক কি মাস দেড়েক লাগিতে পারে। কাজেই জিলকাদার শেষে বা জিলহিজ্জার প্রথমে সম্রাট একডালা অবরোধ করেন। তারিখ-ই-মুবারকশাহীতে লিখিত আছে যে, ৭৬১ হিঃ ১৬ই জমাদি-অল্-আউয়লে সম্রাট একডালা অবরোধ করেন; এবং ২০শে অবরোধ উঠাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তবকাৎ-ই-আকবরীতেও ইহাই অধিকতর ভুলের সহিত পুনরুক্ত হইয়াছে। ইহা যে নিতান্তই ভুল, যুদ্ধ যে মোটে চারি দিন ধরিয়া হয় নাই,—অনেক দিন ধরিয়া অবরোধ চলিয়াছিল, তাহা আফিফের বিবরণ পড়িয়া বেশ বুঝা যায়। ৭৬০ হিজরীর জিলহিজ্জা হইতে ৭৬১ হিজরীর ২০শে জমাদি-অল্-আউয়ল এই ছয় মাস পর্য্যন্ত অবরোধ ও যুদ্ধ চলিয়াছিল, ইহাই বোধ হয় সত্য ঘটনা। বঙ্গীয় সুলতান ও সেনা এই ছয় মাস পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। জমাদি-অল্-আউয়লের শেষে ব্যতিব্যস্ত হইয়া এবং বর্ষা আগত-প্রায় দেখিয়া (তখন বৈশাখের আরম্ভ) তাড়াতাড়ি সন্ধি করিয়া ফিরোজ শাহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। আবার বর্ষা জৌনপুরে কাটাইয়া, বর্ষান্তে জিলহিজ্জ মাসে জাজনগর

অভিযান করিয়া ৭৬২ হিজরীর রজব মাসে দিল্লী ফিরিয়া যান। তবেই বিশুদ্ধ ঘটনা-পারম্পর্য্য এই দাঁড়াইতেছে—

৭৬০ হিঃ মুহররমের মাঝামাঝি ২য় লক্ষ্মণাবতী অভিযান আরম্ভ।

৭৬০ হিঃ রবিঅল্ আখেরের শেষ—জৌনপুরে পৌঁছান।

৭৬০ হিঃ রবিয়ল আখেরের শেষ হইতে ৭৬০ হিজরীর শাওয়লের শেষ জৌনপুরে প্রতিষ্ঠা। জৌনপুরে বর্ষা যাপন।

৭৬০ হিঃ জিলহিজ্জা হইতে ৭৬১ হিঃ ২০শে জমাজি-অল্-আউল—একডালা অবরোধ।

৭৬১ হিঃ, ২০শে জমাদি অল্-আউল—সন্ধি।

৭৬১ হিঃ জমাদি-অল্-আখের হইতে জিলকিদা—জৌনপুরে বর্ষা যাপন।

৭৬১ হিঃ জিলহিজ্জা—জাজনগর অভিযান আরম্ভ।

৭৬২ হিঃ রজব—দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন।

দ্বিতীয় লক্ষ্মণাবতী অভিযানে একডালা অবরোধ ও যুদ্ধের বিবরণ আফিফেই ভাল করিয়া আছে। যুদ্ধে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে ফিরোজ শাহ ফতেশাহকে যুবরাজ নির্ব্বাচন করিয়া, রাজচিহ্নাদিতে ভূষিত করিয়া, শেষে যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহাতেই, যুদ্ধটি কিরূপ গুরুতর হইবে বলিয়া ফিরোজ শাহ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায়। তার পরে, ছয় মাসব্যাপী অবরোধ ও বাঙ্গালীদের আত্মরক্ষা, পতিত দুর্গাংশ-পথে ফিরোজ শাহের একডালা আক্রমণে উদ্যমের অভাব, এক রাত্রে সেকন্দর কর্ত্তৃক পতিত অংশের পুনর্গঠন, বর্ষাগমে সন্ধি করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন,—সম্রাট্ পক্ষের লেখকের লেখা বিচার করিয়াই এই সকল তথ্য অবগত হওয়া যায়। এই সকল বিচার করিয়া সন্দেহমাত্র থাকে না যে, ফিরোজ শাহ এই দ্বিতীয় অভিযানে প্রথমবার অপেক্ষাও নাকাল হইয়া ফিরিয়াছিলেন।

সন্ধি-চেষ্টার ঘটনাবলীর বিচার করিলে এই ব্যাপার আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ফেরিস্তা পর্য্যন্ত এই সন্ধির সঠিক বিচার করেন নাই, বা করিতে চেষ্টা করেন নাই। আফিফের বিবরণ অনুসরণ করা যাউক। আফিফ লিখিয়াছেন যে, যখন সেকন্দর অবরোধের জন্য নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইলেন, তখন তিনি নিজ মন্ত্রীগণকে ডাকিয়া কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রীগণ বলিলেন যে, সুলতান অনুমতি দিলে, তাঁহারা সন্ধির চেষ্টা দেখিতে পারেন। সুলতান সেকন্দর চুপ করিয়া রহিলেন। মন্ত্রীগণ বুদ্ধি করিয়া, মৌন সম্মতি লক্ষণ ধরিয়া, সন্ধিতে সুলতান সেকন্দরের সম্মতি জানাইয়া, ফিরোজ শাহের মন্ত্রীগণের নিকট দূত পাঠাইলেন, যেন তাঁহারাও ফিরোজ শাহকে সন্ধিতে সম্মত করাইতে চেষ্টা করেন! আফিফ (অথবা তাঁহার পিতা) একডালার গুপ্ত কক্ষের এই গুপ্ত পরামর্শ কি করিয়া জানিতে পারিলেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে! সে যাহাই হউক, ফিরোজ শাহের মন্ত্রীগণ সেকন্দরের মন্ত্রীগণ প্রেরিত এই দূতকে পাইয়া যেন হাতে আকাশ পাইলেন; এবং সন্ধিতে সম্রাটের মতি করিতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইল না। কিন্তু সম্রাট্ কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া কহিলেন যে, জাফর খাঁকে সোণারগাঁ ফিরাইয়া দিতে হইবে। সন্ধির সর্ত্ত ধার্য্য করিতে হয়বত খাঁ নামক দূত সেকন্দরের নিকট প্রেরিত হইল। সাধারণতঃ বিজিত পক্ষ বিজেতার নিকট সন্ধি ভিক্ষা করিতে, সন্ধির সর্ত্ত ধার্য্য করিতে যায়। এ স্থানে উল্টা হইল,—ইহা লক্ষ্যের যোগ্য।

আফিফের বিবরণের পরবর্ত্তী অংশ অত্যন্ত কৌতূহল-জনক!—"সেকন্দরের মন্ত্রীগণ দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেকন্দর যদিও আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারই অবগত ছিলেন, তবু এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন, যেন সন্ধির প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন ব্যাপারই তিনি অবগত নহেন। ....যে-যে সর্ত্তে সন্ধি হইতে পারে, হয়বত খাঁ তাহা বিবৃত করিলে, সেকন্দর বলিলেন যে, তিনি ফিরোজ শাহের নিকট হইতে সদয় ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন,—তাঁহার সহিত, যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড আর চলে, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। হয়বত খাঁ চতুর রাজদূতের মত কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তব্য তিনি প্রাণস্পর্শী ভাবপূর্ণ ভাষায় উত্তম রূপে বলিলেন, এবং যখন দেখিলেন যে, সেকন্দরেরও সন্ধি করিবার মতি হইয়াছে, তখন তিনি বলিলেন যে, এই অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য, জাফর খাঁকে সোণারগাঁয়ের সিংহাসনে পুনঃস্থাপন (সেকন্দর এই সর্ত্তে সম্মত হইলেন)। হয়বত খাঁ মহা আনন্দে ফিরোজ শাহের নিকট ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন।......সুলতান শুনিয়া খুব খুশী হইলেন, সেকন্দরের সহিত চিরকাল শান্তিতে

থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। (হয়ত খাঁর পরামর্শে সম্রাট্ সেকন্দরকে ৮০,০০০ টাকা মূল্যের একটি মুকুট এবং ৬০০ আরবী ঘোড়া উপহার দিলেন।) সুলতান সেকন্দরও তাঁহার সন্তোষ জানাইবার জন্য সম্রাট্‌কে ৪০টি হাতী উপহার পাঠাইলেন। (জাফর খাঁ সোণারগাঁয়ে থাকিতে সাহস করিলেন না, সম্রাটের সহিত ফিরিয়া গেলেন)।"

সম্রাট্-পক্ষের লেখকের লিখিত সন্ধির এই বিবরণের উপর আর টীকা অনাবশ্যক। কে সন্ধি ভিক্ষা করিয়াছিল, তা' বেশই বুঝা যায়। তবে আফিফ যতদূর পারেন, নিজ প্রভুকে ঢাকিয়া চলিয়াছেন।

ফিরোজ শাহের দ্বিতীয় লক্ষ্মণাবতী অভিযানের বিবরণ পড়িতে-পড়িতেও কেবলি দুঃখ হয় যে, সমসাময়িক বাঙ্গালীর লেখা বিবরণ আমরা এ যাবৎ পাইলাম না। পাইলে হয় ত ঢালের অপর পৃষ্ঠা—উজ্জ্বল গৌরবমণ্ডিত পৃষ্ঠা—দেখিতে পাইতাম।

করিম

[শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল]

বদলী হয়ে এসে এ দেশে যে বাড়ীটা পেলাম, সেটা, যারা দিন-মজুরী ক'রে খেটে খায়, তাদের পল্লীতে। আমার বাড়ীর সামনে খানিকটা খোলা জায়গা; আর তাতে গোটা-কতক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ চারপাশ আঁধার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের আশে-পাশে গোটা-পাঁচ-সাত গোর; আর ঠিক তাদেরই পাশে একটা জীর্ণ খোড়ো বাড়ী।

এই নতুন জায়গায় কাজের বহর আর পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলো মনকে যেন কতকটা দমিয়েই ফেলেছিল। কাজের পর সন্ধ্যাবেলায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে, আমার বাহিরের অপ্রশস্ত বারান্দায় ব'সে-ব'সে দেখছিলাম, তেঁতুল-গাছের নীচে ঘনায়মান অন্ধকার কেমন ক'রে আস্তে আস্তে আরো কালো জমাট বেঁধে আস্‌ছিল।

এমন সময়ে সামনের সেই জীর্ণ বাড়ীগুলার মধ্য থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। তার পরনে একটা ছেঁড়া কাপড়; পায়ের দুটা গাঁট জীর্ণ বস্ত্র-খণ্ডে বাঁধা; আর সমস্ত শরীরটা নুয়ে পড়েছে, যেন কিসের কঠিন অত্যাচারে। একটা মোটা লাঠি ধ'রে, সে তার শরীরকে রক্ষা করছিল,—বোধ করি, ভূতল-শয়ন থেকে।

এসে সে একবার সান্ধ্য আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে। আকাশ তখন রূপসীর লীলা-ছটার মত অপূর্ব্ব গোলাপী-লাল্-বেগুনে-সাদা-রঙ্গের ইন্দ্রজালে পরিপূর্ণ! দেখে সে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, "ইয়া আল্লা! ইয়া দুনিয়া তুমহারা বানায়া হুয়া হায়।"

তার গম্ভীর কণ্ঠের সেই বিপুল চীৎকার, সেই সান্ধ্য আকাশে ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ল,—দিগ্বিদিক্ ভ'রে বারবার প্রতিধ্বনিত হ'ল! সে রুদ্ধ চীৎকার যেন আমার বুকের ভেতরে এসে ধাক্কা দিলে। গৈরিক-নিস্রাবের মত এক মুহূর্ত্তে তীব্র বেগে বেরিয়ে যে শব্দ দিগ্বিদিক আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্লে, এ কি ভগবানের ওপর অভিযোগ, না ক্রোধ, না পরিহাস, না আরও কিছু? পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ যেমন ক'রে আবদ্ধকারী কৌতূহলী নরনারীকে দেখে হুঙ্কার করে, এ যেন তেমনি এই জীর্ণ মনুষ্য দেহের সমস্ত অন্তস্তলকে আলোড়িত, মথিত করে নিঃসারিত হয়েছিল।

এমনি করে বারবার তিনবার গর্জ্জন করে, সে সেইখেনে ব'সে পড়ল!

আমার কাছে সেই-দেশী যে চাপরাসী ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "উহ্ কোন্ হায় জী।"

সে বল্লে, "পাগ্‌লা, বাবুজী।"

আমার কৌতূহল নিবৃত্তি হোল না; কেন না ভগবানের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ এতবড় ক'রে জানাতে পারে, এমন সাহসী পাগল ইতিপূর্ব্বে দেখি নি। বল্লাম, বল ওর ইতিহাস,—কেন না, ওর ইতিহাস নিশ্চয়ই আছে।

চাপরাসী বল্লে, "আছে, কিন্তু তেমন অসাধারণ নয়।

হুজুরের শোনবার মত নয়। ছোট-ঘরের কথা। ওর নাম করিম;—জাতে জোলা। ওর মত পাহাল্‌ওয়ান লোক এ তল্লাটে ছিল না। করিম ওস্তাদকে সবাই খাতির করতো।

এমনি করে কিছু দিন গেল। ওর সংসার তখন বড়ই সুখের ছিল। ওরা স্ত্রী-পুরুষে বুনতো কাপড়। আর ও গিয়ে বাজারে বেচে আসত। যা লাভ হ'তো, তাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার চলত।

তার পর ওর একটি ছেলে হ'লো। সেই থেকে হ'লো ওর দুঃখের আরম্ভ। প্রসব হ'তে গিয়ে ওর স্ত্রী—যাকে করিম নিজের প্রাণের চেয়ে ভালবাসত—মারা গেল।

২

করিমের সমস্ত স্নেহ গিয়ে পড়ল তার মা-মরা ছেলের ওপর। অতবড় পাহাল্‌ওয়ান করিম সেই একরত্তি ছেলেটির কাছে কি রকম যে হ'য়ে থাক্‌ত, তা দেখলে দয়া হোত! স্নেহ মানুষকে কি না ক'ত্তে পারে বাবুজী! জাগ্রত দুই চোখ ছেলেটির ওপর রেখে, করিম তাকে নিয়তই রক্ষা করত।

কিন্তু তাতেও ছেলের সব অভাব পূর্ণ হ'ত না—এতটুকু ছোট ছেলের কি মা নইলে চলে? তাই জন্যে করিম অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে বিয়ে করলে।

ওইখানেই করিম সবচেয়ে বড় ভুল ক'রেছিল। ফতিমা,—যাকে সে বিয়ে করলে—তার ছিল নবীন বয়স, আর অতুল রূপ। লোকে ফতিমার দোষ দেয়; কিন্তু তারই বা এমন দোষ কি? সে ত একেবারেই মা হয়নি, যে, ঠিক মায়ের মত আদর যত্ন সে করিমের ছেলেকে করবে? তারও ত একটা জীবন আছে, যার শেষ করিমের ছেলের মা হওয়াতেই নয়। সে বেচারী ছেলেকে আদর-যত্ন করত না, এমন নয়। কিন্তু করিমের তাতে মন উঠ্‌ত না। এই নিয়ে দু'জনের ভেতর মন-কষাকষি চলতে লাগলো,- ঝগড়া হ'তে লাগলো।

এইরকম কিছুদিন যাওয়ার পর, ভগবান্ আরও একটা জোট পাকিয়ে তুল্‌লেন—করিমের ছেলেটি গেল মারা।

সেই থেকে দু'জনের মনো ববাদ আরও বেড়ে গেল,—প্রতিদিন কলহ, প্রতিদিন ঝগড়া। তার ওপর দুঃখে-শোকে করিমকে বাতে ধরল। সে আর কাপড়ও তেমন বুনতে পারে না, বাজারে বিক্রীও করতে পারতো না। মনের কষ্টের সমান হ'য়ে উঠল খাবার কষ্ট।

এমন অহরহ কষ্ট আর কতদিন সহ্য হয়?—অথচ বোধ করি তেমন দোষ কারুরই ছিল না।

একদিন সকালে উঠে শুনলাম যে, ফতিমা চ'লে গেছে; আর খবর পাওয়া গেল, মাস দুই-তিনএর মধ্যেই সে কিছু দূরে একটা গ্রামে নিকে ক'রেছে।

করিমের মনের অবস্থা যা হ'য়ে আসছিল, তাকে পুরো সুস্থ বলা চলে না; কিন্তু এর পরে সে একেবারেই পাগল হ'য়ে গেলো। পাড়ার লোক তাকে এখন খেতে দেয়;—কোনও দিন বা সে খায়, কোনও দিন নয়!"

৩

ততক্ষণে চাঁদ উঠেছিল; আর তারই অস্পষ্ট আলোকে আবছায়ার মত করিমকে দেখা যাচ্ছিল। বোধ হয় ওইটেই ঠিক দেখা। কেন না, গল্পের সঙ্গে আগাগোড়া মিলিয়ে দেখ্‌লাম যে, যে লোকটিকে দেখা যাচ্ছে, ও সত্যই করিম নয়—ও তার একটা প্রেত-ছায়া মাত্র। তার জীবনে দ্রুত-পর্যায়ে সে সবই উপভোগ ক'রেছে; অথচ এমন সুন্দর রাত্রিতে তার মত রিক্ত আর কে আছে? তার স্ত্রী নেই, পুত্র নেই,—এমন কি, সে নিজেকেও হারিয়েছে!

তখন তার দিকে চেয়ে, আর এই হাস্যময়ী, সৌন্দর্য্যময়ী ধরিত্রীর দিকে চেয়ে, কতকটা বুঝতে পারলাম কি সে বলতে চায়! কিন্তু বোধ হয় সবটা বুঝতে পারি নি,—এখনও পারি নি! হয় ত' বা বিধাতার সিংহাসনে জলদ-গম্ভীর স্বরে সে তার অভিযোগ জানায়; হয় ত বা তার জীবন-নাটকে অভিনীত এই অত্যন্ত বিপরীত ঘটনাগুলি মনে ক'রে সে উচ্চৈঃস্বরে বিধাতৃ-বিধানকে বিদ্রূপ করে; এবং হয় ত এও হ'তে পারে যে, এমনি করে চীৎকার করে সে আপনাকে এক-একবার ঝাঁকিয়ে নেয়,—বোধ করি এই ভেবে যে, দুর্ভাগা তার পায়ের তলা থেকে মাটিটা পর্য্যন্ত না স'রে যায়!

* * * * *

তার এই কাহিনী মনটাকে দু'তিন দিন বিষণ্ণ ক'রে রেখেছিল। কিন্তু তা একেবারে বিস্ময়ে পরিণত হোল, যখন সেদিন কাছারী থেকে ফিরে এসে দেখলাম যে, আমার এ

বাড়ীর বারান্দার উপর উঠে, সে একটা টিনের টুকরো নিয়ে আমার ছোট ছেলে মন্টুর সঙ্গে খেলা করছে!

মন্টু যেমন দুরন্ত, তেমনি সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'র্ত্তে ওস্তাদ; কিন্তু এতবড় ইতিহাস যার পেছনে, এমনধারা একটা পালোয়ানের সঙ্গে সে যে কেমন ক'রে এরি মধ্যে আলাপ ক'রলে, তা' আমিও ঠিক বুঝতে পারলাম না। অথচ এদের ভাষারও মিল নেই; এবং হিন্দী ভাষা বোঝা যদি বা মন্টুর পক্ষে কিছু সম্ভব হয়, ত' বাংলা বোঝা করিমের পক্ষে মোটেই নয়। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এমন বন্ধুত্ব মোটেই নিরাপদ নয়।

অথচ এর ইতিহাস মনকে আর্দ্র ক'রে রেখেছে,—একে কঠিন কথা বলতেও ইচ্ছে হয় না!

এই সময়ে আমার পক্ষে ঠিক কি করা উচিত ভাবছি, এমন সময় করিম উঠে দাঁড়িয়ে, খুব নীচু হ'য়ে আমাকে অভিবাদন করলে "সেলাম বাবুজি!"

গলার আওয়াজ কতকটা কঠিন ক'রেই বল্লাম, "এখানে কি হ'চ্ছে করিম?"

করিম বল্লে "বাবুয়াকে দেখতে এলাম,—বাবুয়া, আমার বাবুয়া—" বলতে-বলতে তার গলার স্বর আরও নরম হ'য়ে এলো;—চোখ দুটো বুজে এলো; আমার ঠিক মনে হোল, যেন একটি ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে সে আদর করছে। তার পর চোখ চেয়ে বললে, কেমন করে আজ দু'দিন চেষ্টা করে, সে বাবুয়ার নাগাল পেয়েছে। আজ একটা ছাগল ধরে এনে সে বাবুয়াকে পেয়েছে। তার পায়ে কি না বাত, এবং ছাগলও দৌড়ায় ভারি। সে জন্যে দু'দিন পারে নি; কিন্তু আজ সকাল থেকে চেষ্টা করে ধরেছিল। তাইতে আলাপের সূত্রপাত। তার পর এখন টিনের চাকতিতেই চলছে; কেন না, ছাগলটা আবার পালিয়েছে!

কথাগুলোর ভেতর পাগলামির কিছুই ছিল না; এবং যে বক্তা, তার মুখে-চোখে একটা আত্মতৃপ্তির ভাব স্ফুরিত হ'চ্ছিল।

আমার এই ছেলেটি তার অন্তরের যে গোপন তন্ত্রীটি স্পর্শ করেছিল, তা আমি স্পষ্টই অনুভব করে নিতে পারলাম। সে সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছে—তার ব্যাধি-পীড়িত শরীর নিয়ে তার বাবুয়াকে একটু সুখী করবার জন্যে। এবং খুশী করতে পেরেচে বলে, তার সমস্ত অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়েছে।

অথচ পাগল ত' বটে;—প্রশ্রয় দেওয়াও চলে না। তাকে বল্লাম, "আচ্ছা যাও, সন্ধ্যা হ'য়ে আসচে।"

তখন সে সেই চাকতিটি কুড়িয়ে নিয়ে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল।

বাড়ীতে এসে মন্টুর মাকে বল্লাম যে, ছেলেকে যদি বাঁচাতে চাও, ত' ঐ পাগলের হাত থেকে রক্ষা করো। সব শুনে তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন; ছেলেকে রক্ষার জন্যে গোটা-দুই মাদুলি তখনই তার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন; আর পরদিন এমনি কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করলেন যে, নিশ্চিন্ত হয়ে কাছারী যাওয়ার আমার আর কোন বাধা রইল না।

কাছারী থেকে ফিরে এসে দেখলাম, সেই টিনের চাকতি আর একরাশ টিন পাটকেল, পট, পুতুল নিয়ে করিম একাটি ব'সে আছে। তার সজল চখের দিকে চাইতেই এক-মুহূর্ত্তে বুঝতে পারলাম, তার বুকের মাঝখানে কি অব্যক্ত বেদনা ফুঁপিয়ে উঠছে।

সে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "বাবুয়াকে আসতে দিলে না।"

তার সেই নিরীহ, নির্দ্দোষ মুখের দিকে চেয়ে আমার মনে হোল যে, আমার এত কড়াকাড়ি অন্যায় হ'য়েছে, এর দ্বারা মন্টুর কোনও অপকার সম্ভব নয়। কিন্তু মন্টুর মা ত' তা বুঝবেন না! সুতরাং উপায় কি হয়? অথচ এই একটা মানুষের প্রাণ যে স্নেহ-স্পর্শের জন্য উন্মুখ হ'য়েছে, তা থেকে তাকে বঞ্চিত করলে, হয় ত' বা বিশ্বদেবতার সিংহাসনে আমার তরফে বলবার কিছুই থাকবে না।

সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত এই রকম দাঁড়াল যে, আমি যে সময় থাকব, সেই সময়টিতে মন্টু করিমের সঙ্গে খেলা করতে পাবে।

মন্টুকে নিয়ে খেলা করতে করিম যে আনন্দ পেত, তা বোধ করি জীবনে সে কম পেয়েছে। এক বালক আর এক প্রৌঢ়ের আনন্দ-কলরোলে সমস্ত সকালের দিকটা আমার বাড়ী উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠত; আর প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে নীচে ডাক পড়ত "বাবু—য়া!"

৪

ধীরে-ধীরে এই মুক্ত আনন্দের প্রভাব করিমের ওপর স্পষ্ট বোঝা গেল। তার পাগলামী আর নেই; সে এখন সকলের সঙ্গেই সাধারণ মানুষের মত কথাবার্ত্তা কয়; এবং তার সেই বাত-রোগও ধীরে-ধীরে অন্তর্হিত হ'য়েছে। বোধ করি, তার সকল ব্যাধিই মন থেকে, আর তার পারিপার্শ্বিক বিষণ্ণতা থেকে জন্ম-লাভ করেছিল; আজ যখন আবার মুক্ত আনন্দের বাতাসে তার মন নব জন্ম লাভ করলে, তখন শরীরও নীরোগ হোল। আমার মনুকে উপলক্ষ করে ভগবান্ যে এই দেহ-মনে ব্যাধিগ্রস্ত মানুষটিকে তার সকল দীনতা থেকে উদ্ধার ক'রলেন, এতে আমাদের আনন্দের অবধি ছিল না।

করিম এখন আবার কাপড় বোনে; আবার বাজারে বিক্রী করে; তার জীর্ণ কুটীর মেরামত করে, তার শ্রী ফিরিয়ে এনেছে। এখন সে আবার মানুষ হ'য়েছে।

এমনি ক'রে বছর আড়াই কাটার পর, হঠাৎ আমার বদ্‌লীর হুকুম এলো।

বদ্‌লীর জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতেই হয়। সে জন্যে একে খুব একটা বড় বিপদ্‌পাত বলে মনে করলাম না। আমার স্ত্রী অনুযোগ করতে লাগলেন; কিন্তু বজ্রপাত হোল যেন করিমের মাথায়। সে বল্লে, সেও যাবে। তাকে অনেক ক'রে বোঝালাম,—তাকে নিয়ে আমার কোন সুবিধাই হবে না; দিনকতক পরে তারও অসুবিধা বোধ হবে; সুতরাং এ কল্পনা তার ত্যাগ করাই ভাল। সে বল্লে, বাবুয়াকে ছেড়ে আমি কেমন ক'রে থাক,—আমি আবার পাগল হব। তখন সে জিদ্ ধ'রে বসল যে, সে আমাদের সঙ্গে গিয়ে অন্ততঃ নতুন দেশটা পর্য্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে। অগত্যা তাইতেই রাজী হ'তে হ'লো।

৫

খুব বড় একটা ষ্টেশনে গাড়ী বদল করতে হবে; অথচ সময়ের তফাৎও বড় কম। একরাশ জিনিসপত্র নিয়ে, গাড়ী থেকে সকলকে নামিয়ে বল্লাম, "করিম, তুমি জিনিসপত্র হেফাজৎ ক'রে নিয়ে চলো,—সময় বড় কম; আমি সকলকে নিয়ে যাচ্ছি।"

ওভার ব্রীজের মাঝখানে এসে করিম চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "বাবু, বাবুয়া কই?"

সত্যিই ত'—মনু নেই! দুরন্ত ছেলে কখন যে কি বিপদ করবে, তার ঠিক নেই। আমার স্ত্রীর মুখ মুহূর্ত্তে সাদা হ'য়ে গেল। তিনি কোনও রকম ক'রে মুখ থেকে কথা বার ক'রে বল্লেন, "দেখতে বলো—ওকে।"

আমি বল্লাম, "করিম দেখো, দেখো"—তার পূর্ব্বেই করিম সে স্থান ত্যাগ করেছে।

আমরা ভয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে প্রমাদ গুণতে লাগলাম। আমার স্ত্রী ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে-কাঁপতে ব'সে পড়লেন।

এমন সময় অদূরে উচ্চ কণ্ঠে "বাবুয়া" চীৎকারে চেয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার সমস্ত রক্ত হিম হয়ে গেল। মনু দাঁড়িয়ে আছে একটা লাইনের মাঝখানে,—আর অদূরে রক্তলোলুপ সিংহের মত প্রকাণ্ড গাড়ীসমেত এঞ্জিন তার দিকে হু হু ক'রে ছুটে আসছে!

চারিদিক যেন অন্ধকার হয়ে আসতে লাগলো; কিন্তু তবুও দেখতে পেলাম, করিম অবহেলায় এবং অবলীলাক্রমে প্লাট-ফরম থেকে লাফিয়ে পড়ে, চলন্ত এঞ্জিনের সামনে মনুকে ধরে, নিরাপদ স্থানে ফেলে দিলে। তার পর যখন এঞ্জিনের কলরোল, লোকের হৈ-হৈ শব্দ, এবং ভীড়ের চীৎকারের গোলোক-ধাঁধার ভেতর থেকে সে বেরুলো, তখন তার আধখানা পা থেকে অবিশ্রান্ত হুহু করে রক্ত বেরোচ্ছে। তবুও সে কোনও রকম ক'রে গড়িয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে এসে অক্ষত মনুকে যখন তার বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরলে, তখন তার মুখে যে হাসি ফুটে উঠেছিল, তার মত স্বচ্ছ সুন্দর হাসি আর কখনো দেখি নি!

রাস্তার বাকী পথটা তাকে শুয়েই কাটাতে হ'য়েছিল; এবং তখন এও জানা ছিল না যে, তার সারতে ছ'মাস লাগবে, কি মোটেই সারবে না। কিন্তু সমস্ত রাস্তা সে বাবুয়া বাবুয়া ব'লে ডেকেছে, আর সেই অপরূপ হাসি হেসেছে,—যা আমাদের মন থেকে এই বিপদের সমস্ত গ্লানি নিঃশেষে দূর ক'রে দিয়েছিল।

স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়।

[স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠাতৃবর্গ]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার অধীন কলেজ ও স্কুল-সমূহে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার দ্বারা অনেক উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাও অনেকে অনুভব করেন যে, এখন সে শিক্ষার অনেক সংস্কার আবশ্যক। বিশেষতঃ, এ শিক্ষা পুরুষদেরই উপযোগী করিয়া উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে স্ত্রী ও পুরুষের সামাজিক বৈষম্য এত অধিক যে, পুরুষের উপযোগী শিক্ষাপ্রণালী স্ত্রীলোকের পক্ষে খাটিতে পারে না। সেই জন্য শিক্ষার সাধারণ সংস্কার ছাড়া, স্ত্রীলোকদের নিমিত্ত আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী এক নূতন প্রণালীর শিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বাল্য-বিবাহ, পরদা ও দারিদ্র্য আমাদের সমাজের অধিকাংশ স্ত্রীলোককেই বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর উপকারিতা লাভে বঞ্চিত করিতেছে। যতদিন না এ সকল বাধা অতিক্রম করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত হইবে, ততদিন আমাদের দেশে কখনই স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার হইবে না।

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর লক্ষ্যও তত উচ্চ নয়; কেন না, চাকুরীই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য,—তাহাও আজকাল মিলে না। যে বিজ্ঞান ও শিল্প-শিক্ষা পাশ্চাত্য জাতির ঐহিক উন্নতির মূল,—এ শিক্ষায় তাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে। অথচ, যে আধ্যাত্মিক উন্নতি আমাদের প্রাচীন শিক্ষার প্রধান গৌরব ছিল,—এ শিক্ষায় তাহাও আমরা হারাইয়াছি। তাহার পরিবর্ত্তে ভোগাসক্তি, বিলাস প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষগুলি আমরা পাইয়াছি। তাই বলিয়া, পাশ্চাত্য সভ্যতা বর্জ্জনের দ্বারা আমরা কখনও উঠিতে পারিব না। প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয়ের দ্বারাই আমাদের উঠিতে হইবে। সুতরাং আমাদের শিক্ষা-প্রণালীও তদনুরূপ করিতে হইবে!

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর আরও একটী প্রধান দোষ এই যে, শিক্ষা-কার্য্য ও পরীক্ষা উভয়ই এক বিদেশীয় ভাষার ভিতর দিয়া সম্পন্ন হওয়ায় যেরূপ সময় ও সামর্থ্যের অপচয় হয়, তাহার অনুরূপ ফল হয় না।

এই সকল কারণে আমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা ও ভারতবর্ষীয় রমণীর আদর্শ সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া, আধুনিক সময়ের উপযোগী পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তারের জন্য, এবং তাহাদের সময়, সামর্থ্য, ও স্বাস্থ্য আধুনিক পরীক্ষা-প্রণালীর নিষ্পেষণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, মাতৃভাষার

মধ্য দিয়া নূতন প্রণালীর শিক্ষার প্রচলন সত্বর আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার বা নূতন শিক্ষাবোর্ড গঠনের দ্বারা যদি এই সকল অভাব কতক দূর হয়, মঙ্গল; যদি সম্পূর্ণ দূর হয়, তাহা হইলে স্বতন্ত্র স্ত্রী-*বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রয়োজন* থাকে না। কিন্তু এই সকল অভাব যতদিন না সম্পূর্ণ রূপে দূর হয়, ততদিন দেশবাসীর নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়।

যদি প্রচলিত কলেজ ও স্কুলের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য এরূপ নূতন প্রণালীর শিক্ষা প্রচলিত করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে পাঠক-পাঠিকাগণকে কলিকাতা স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়-সমিতির সভ্য হইতে এবং নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে সমিতিকে তাঁহাদের অভিমত জানাইতে অনুরোধ করি।

১। নিম্নলিখিত এই তিন শ্রেণীর শিক্ষার্থিনীদের জন্য কিরূপ নূতন শিক্ষার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে :—

(ক) যাঁরা উপার্জ্জনের জন্য বা পাশের জন্য শিক্ষা করেন না, মনের উৎকর্ষ সাধন ও গৃহকার্য্যে দক্ষতা লাভ যাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য এইরূপ অধিকাংশ বাঙ্গালীর মেয়েদের উপযোগী সাধারণ স্কুলশিক্ষা (Elementary School Education)।

(খ) যে সকল বিবাহিতা বালিকা ও পরিণত-বয়স্কা স্ত্রীলোক দেশাচারের অনুরোধে অথবা সময়াভাবে বিদ্যালয়ে যাইতে পারেন না, তাঁহাদের উপযোগী অন্তঃপুর শিক্ষা (Zenana Education)।

(গ) যে সকল অনাথা বিধবা, স্বামীপরিত্যক্তা স্ত্রী বা অবিবাহিতা বালিকা এখন উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে ভরণ-পোষণের জন্য আত্মীয় স্বজনের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করেন, অথবা অন্য কোন অপ্রীতিকর উপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হন, কিন্তু যাঁহারা হয় ত উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ পাইলে, এই দুর্ম্মূল্যের দিনে নিজের উপার্জ্জনে আপনাদের পারিবারিক অবস্থা স্বচ্ছল করিতে পারিতেন, বা স্বাধীন ভাবে সম্মানের সহিত জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁদের জন্য আশ্রম বা বিদ্যামঠ প্রতিষ্ঠা ও সেই সঙ্গে জীবিকা উপার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা (Vocational Education)।

২। এখন আমাদের দেশে যে সকল বিদ্যালয় বা সমিতি স্ত্রী-শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছে, সেই সকল বিদ্যালয়ের বা সমিতির অন্ততঃ কতকগুলি কি এরূপে গঠিত করা সম্ভব, যাহাতে উপরিউক্ত এই তিন শ্রেণীর শিক্ষার্থিনীদের উপযোগী শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হইতে পারে ; এবং যদি সম্ভব হয়, তবে কি প্রকারে ঐ সকল বিদ্যালয় বা সমিতিকে গঠিত করিলে, সেগুলিকে এই অভিনব শিক্ষা-প্রণালীর পরস্পর সাপেক্ষ অঙ্গরূপে পরিণত করা যাইতে পারে ?

৩। ঐ সকল বিদ্যালয় বা সমিতির পরিচালকগণ যদি এই স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়-সমিতিতে যোগ দেন, এবং সকলে মিলিত হইয়া এক নূতন শিক্ষা-প্রণালী গঠিত করিয়া, যদি ঐ বিদ্যালয়-গুলিকে ঐ নূতন স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত করেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা অতি সহজেই ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় ও বাহিরে কতকগুলি স্ত্রীলোকদের কলেজ বা বিদ্যামঠ স্থাপন করিতে পারেন না ? এই সকল কলেজ বা বিদ্যামঠে স্ত্রীলোকদের শিক্ষার উপযোগী সকল বিষয়েই উপাধিলাভের উপযুক্ত উচ্চশিক্ষা মাতৃভাষাতেই দেওয়া যাইতে পারিবে; ইংরাজী প্রাচীন ভাষার ন্যায় আনুসঙ্গিক ভাষা রূপে দেওয়া যাইবে; এবং পরে এই কলেজগুলি একটী স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইতে পারিবে (University Education)।

নিম্নে স্বাক্ষরকারীগণের এই অনুরোধ যে, পাঠক-পাঠিকারা এই প্রশ্নগুলির উত্তর আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে শেষ স্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় সমিতিকে পাঠাইয়া অনু-গৃহীত করিবেন। তাহা হইলে তাঁহারা অবিলম্বে আমাদের সমাজের স্ত্রীলোকদের উপযোগী নূতন শিক্ষা-প্রণালীর একটী পূর্ব্বাভাস প্রস্তুত করিয়া একটী পরামর্শ-সভা আহ্বান করিয়া তাহার সম্মুখে বিচারের জন্য উপস্থিত করিবেন ; এবং সকলের অভিমত হইলে, তাহা গ্রহণ করিয়া সম্মিলিত ভাবে স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবেন।

অত্র পাঠক-পাঠিকার মতে যদি এইরূপ নূতন প্রণালীর শিক্ষার জন্য বা স্ত্রীলোকদের জন্য কোন স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে প্রার্থনা এই যে, তাঁহাদের আপত্তিগুলিও অনুগ্রহ করিয়া সত্বর আমাদিগকে জানাইবেন।

প্রতিভা দেবী চৌধুরী। ইন্দিরা দেবী চৌধুরী। প্রসন্ন-ময়ী দেবী। প্রিয়ম্বদা দেবী। গিরীন্দ্রবালা রায়। সত্যবালা

দেবী। হিরণ্ময়ী দেবী। নগেন্দ্রবালা রায়। জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়। সরলাবালা মিত্র। আর, এস্, হোসেন্। বিধুমুখী বসু। বিন্দুবাসিনী বসু। বিভাবতী মিত্র। আশুতোষ চৌধুরী। প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রমথ চৌধুরী। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক। মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২ নং কার্ম্ম রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

নারীর কথা

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-প্রসঙ্গে)

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী]

শুনছি—আমাদের না কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা হবে,—আর তাই হলেই দেশের অশিক্ষা, অন্ন-বস্ত্র আদি যত সমস্যা, কষ্ট, দুঃখ, সব দূর হবে। সেখানে চরকা কাটিতে শিখিয়ে বস্ত্র-সমস্যার, আর একলিপি-বিস্তার-সমিতির মতানুযায়ী হিন্দী ভাষা শিখিয়ে শিক্ষা-সমস্যার মীমাংসা করা হবে; অন্ন-সমস্যার জন্য কৃষিবিদ্যা শেখানো হবে কি না, ঠিক জানি না। এর আদর্শ না কি খুব উঁচু,—কোন অংশে বিলিতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চেয়ে কম নয়! পাঠ্য বইগুলির সংখ্যাও খুব কম হবে না; ছাত্রদের বেশ গভীর জ্ঞান যাতে হয়, সেই রূপ সংখ্যা থাকবে। মোট কথা, যদি আমাদের এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তার বোঝার ভার বিলিতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চেয়ে হাল্কা ত হবেই না,—বরং আরও ভারীই হবে; আর এইটে মনে করে আমরাও অনেকেই বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠছি; মনে করছি, এতদিন ছেলেদের বিদ্যে আল্গা গাঁথুনি ছিল; এইবার বেশ নিরেট গাঁথুনি হবে। আর এটা আমাদের জাতীয় জিনিস,—সেটাও আমাদের কাছে খুব গর্ব্বের বিষয়।

যদি-ই এই সমস্ত বাস্তবিক হয়, তা'হলে আমাদের ভাব্বার কথা এই যে, এতে আমাদের কতখানি লাভ হচ্ছে; আর ছেলেরা কতটা আনন্দ অনুভব করছে। গর্ব্ব নয়, আনন্দ;—কেন না, গর্ব্ব হ'লে অনেক সময় আনন্দ হয় বটে, কিন্তু সেটা স্থায়ী নয়, সাময়িক। ভিতরে যদি সত্য বস্তু না থাকে, শীঘ্রই সে আনন্দে অবসাদ এসে পড়ে।

আমাদের ছেলেরা ত হুজুগে মেতে 'নন-কো-অপারেশন' করলে,—জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়তে ঢুকলো। কিন্তু এরও কি সেই পরীক্ষা দেওয়া,—২।৩ তিন নম্বরের জন্যে ফেল হয়ে, আবার সম্বৎসর সেই সব পড়া! কত বই বদলে গেছে; ফলে, আবার ফেল,—আবার পড়া; হয় ত পাশ, নয় ত ক্লান্ত হয়ে সেই চিরন্তন চাকরীর উমেদারী। অবশ্য পাশ হলেও যে চাকরী ছাড়া আর কিছু করে, তা' নয়; তবু যখন পড়ে, তখন ত একটা আকাঙ্ক্ষা-আশা মনে পোষণ করে। যাক্, আমাদের শুধু ভাব্বার কথা এই যে, সেই পরীক্ষা, সেই পাশ, সেই ফেল? না, অপকারিতা বুঝাতে পেরে, তার প্রতিকারের কোন চেষ্টায় এইটা করা হচ্ছে,—যাতে ছেলেদের শরীর-মন, দুটোরই স্বাস্থ্য ভাল থাকে?

যদি সেই পাশ-ফেল, সেই একটা বিষয়ের জন্য সম্বৎসরের পরিশ্রম মাটি,—সেই মুখস্থ বিদ্যা,—পরীক্ষার পর কোথায় বা দর্শন, কোথায় বা বিজ্ঞান, কোথায় বা অঙ্কশাস্ত্র,—(সাহিত্য বলিতে ত লঘু মাসিক পত্রিকা ছাড়া সাধারণতঃ আর কিছু পড়ে বলে মনে হয় না)—তা'হলে এ মিথ্যা, অনাবশ্যক, পৃথক চেষ্টার সার্থকতা কি?

রাশি-রাশি বই, রাত জেগে পড়া,—এ ত ঘরে-ঘরে দেখছি! দেখে শুধু কষ্ট হয়। মা, বোন, স্ত্রী সব সশঙ্কিত! 'ও'রে, 'ও'র পড়ার ক্ষতি না হয়!' বাড়ী স্তব্ধ!

পড়া শেষ,—পরীক্ষা শেষ,—ফেল হলেন,—কান্নাকাটি। যত বা ছেলের কষ্ট, তত বা আত্মীয়-স্বজনের কষ্ট। বোধ হয়, দ্বিতীয়বার স্ত্রী-বিয়োগ হ'লেও, এ দেশের লোকে অত শোকার্ত্ত হয় না। পাশ হ'লে খুব ভালো,—ছেলে বিদ্যের জাহাজ হয়ে বাড়ী এলেন,—উৎসব আরম্ভ হলো—ঘরে-বাহিরে, বিয়ের বাজারে। বছর খানেক পরে, কি মাস ছয়েক পরে, ছেলেকে সেই সব বিষয়ের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে দেখলে, তার বিদ্যের বহরটা উপলব্ধি

হয়—ভালো করে। বেচারার দোষ কি? অতগুলো জ্ঞান-সাগর পার হ'তে লাফিয়ে যাওয়া ছাড়া গতি কি? সে যত পেরেছে, মুখস্থ করে পাশ হয়েছে! কোন জিনিসই মনের ভিতর তল পায় নি,—সব ভাসা-ভাসা ছিল। শেষ অবধি তার পড়ায় অরুচি ধরে গিয়ে, দিনকতক একেবারে বাণীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যে জ্ঞান লাভের আনন্দ, সে বস্তুটা তার কাছে বিভীষিকাই রয়ে যায়! বড় জোর ঐ লঘু মাসিক পত্রিকা পড়া। সে না পারে সৃষ্টি করতে, না পারে জীবনটাকে ভোগ করতে। আনন্দের সময়টা তাকে পাশ-ফেলের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। বাকি সারা জীবনটা ঐ ঘূর্ণির ঘুরটা তার মাথাটা বেঠিক রেখে দেয়। সে জীবনটাকে সংগ্রামই মনে করে। তার কোনো দিকেই আনন্দ নেই। এই কি? এইটিই কি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের, আর জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য আর আদর্শ?

অবশ্য আমাদের বলা হয় ত ধৃষ্টতা হ'তে পারে,—কেন না, আমরা মেয়েরা না কি বেশী বুঝিনে (বুঝতে পাইনে)। কিন্তু তবু যখন ছেলেদের, ভাইদের কষ্ট দেখি, তখন মনে হয় যে, এটাকে আলাদা করে, বিশেস করে স্থাপন করার চাইতে, যদি ঐ বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়েরই কতকগুলো নিয়ম বদলে দিতে পারা যায়,—তবে হয় ত আমরা এতগুলি স্বাস্থ্যহীন, নিরুৎসাহ ছেলের পরিবর্ত্তে, বলিষ্ঠ, উৎসাহী, দীর্ঘায়ু ছেলে দেখতে পাই। অকাল-মৃত্যুও হয় ত যুবকদের মধ্য থেকে কমে যায়।

আমাদের মনে হয়, ৭টা থেকে ১১।১২টা পর্য্যন্ত স্কুল-কলেজে পড়ানো হ'লে, ছেলেরা তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে দৌড়ানোজনিত 'কলিক' ব্যথা থেকে অব্যাহতি পায়। এই ব্যথাটী এমন কষ্টদায়ক, এমন চিরস্থায়ী রোগ যে, স্কুলে ছাত্র-জীবনে আরম্ভ হয়ে, প্রৌঢ় বয়সেও সামান্য অনিয়মে ঐ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। সারা জীবনটা যকৃতঘটিত অসুখে ভুগে, ৫০।৫৫তে সব শেষ। আমি একবার একটী ছোট মেয়েকে দেখেছিলাম। শীতকালে ৯টার সময় স্কুলের গাড়ী আসত; কাজেই সে বেচারা ৮৷৷০টায় খেয়ে প্রস্তুত হ'ত। মাস-তিনেক ঐ কর্ম্মভোগের পর, বেচারীর এমন 'কলিক'ব্যথা আরম্ভ হ'ল, যে, তার যন্ত্রণা তার অসহ্য হ'তো। নেহাৎ ছোট্ট ছিল,—বছর খানেক ভুগে, শেষে মারা গেল। তার বাপ-মা সেই ক্ষোভে অন্য মেয়েদের আর স্কুলে দি[illegible] না। কিন্তু ছেলেদের আমরা তা' করতে পারি না।

আমার জানা ঘটনা এই ত একটী। এমন কত আছে, জানে। সকলেই যে মারা যায়, বা মারাত্মক রোগে ভো[illegible] তা'না হ'তে পারে, কিন্তু কষ্ট ত সকলেই পায়। আমা[illegible] বিশ্বাস, না চিবিয়ে খেয়ে দৌড়ানোর ফল, ঐ ব্যথা। অধিকাংশ ঘরেই আছে,—অবশ্য যারা স্কুল-কলেজে প[illegible] সকাল-বেলা পড়া হলে, দুপুরটা বিশ্রাম, পড়ায় কাট[illegible] পারে। বিকালটা ব্যায়াম, খেলা, বেড়ানো যে স্বা[illegible] পক্ষে উপকারক, তা' আমরা মেয়েরাও বুঝতে পারি ব[illegible] হয় ত স্পর্দ্ধা হবে না। তার পর পরীক্ষার পাঠ্য বই কি রকম করে পড়ালে বা পড়লে সুবিধা হবে, তা আ[illegible] নিজেরা স্কুল-কলেজে না পড়ার জন্যে ও-বিষয়ে অনভি[illegible] কিন্তু ঐ হেঁয়ালী বা কাণামাছি খেলার মতন পাশ হওয়া জীবনের কোন সার্থকতাই নেই,—একমাত্র রুগ্নতা ছা[illegible] —তা' বেশ বুঝতে পারি।

পাঠ্য পুস্তকের অসম্ভব রকম সংখ্যা। আর, [illegible] সময়ে সবগুলি উদ্গীরণ করে পরীক্ষা দেওয়া। অকৃতকা[illegible] হ'লে সম্বৎসর 'চর্ব্বিত চর্ব্বণ', কিম্বা নতুন-নতুন [illegible] পড়ানো;—এ যে কি শাস্তি দেওয়া, তা জানি না। [illegible] প্রতিকার করা কি অসম্ভব? ছেলেদের আবার সুযো[illegible] দেওয়া যায় না, কিম্বা বিভাগীয় পরীক্ষার নিয়ম প্রবর্ত্ত[illegible] করা চলে না? একেবারে যে সব বিষয়ের পরী[illegible] দিতে হবে বা নিতে হবে, তাই বা কেন? এর চেয়ে [illegible] কালের গুরুগৃহে ছেলে পাঠানো আমাদের ভালো ছিল গরু চরানো, জলের আলে শুয়ে থাকা—সেও যে ছেলেদে[illegible] সহজ ছিল। পড়া কে হ'ত না, তা' ত নয়। সে ভদ্রলো[illegible] ব্রাহ্মণেরা তোষামোদেই তুষ্ট হ'তেন। অন্ততঃ, সে স[illegible] পাঠ্য বই ছাত্রদের কাছে ধাঁধাঁ বা হেঁয়ালী ছিল না; আ[illegible] বিশ্ববিদ্যালয় কাণামাছি বা লুকোচুরী খেলার ঘর ছিল না যাদের এত বই একসঙ্গে পড়তে হবে, পরীক্ষা দিতে হবে,—কি প্রশ্ন হবে জানে না, তাদের কা'জেই আগাগোড়া কণ্ঠ[illegible] করা ছাড়া কোন উপায় আছে? কেবলি নোট মুখ[illegible] করতে হয়।

এই পরীক্ষাই আমাদের ছেলেদের স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, ভরস[illegible] সব গ্রাস করে। এক-একটী পরীক্ষায় পাঠ্য বইয়ে[illegible]

সংখ্যাই বা কি ! সেইগুলি সব একসঙ্গে পরীক্ষা দিতে গেলে, মানুষ যে দুর্ভাবনায় পাগল হয়ে যায় না, এই আশ্চর্য্য। তার পর সব সার্থকতা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। শুধু ভাগ্যের দোষই বা কেন দিই,—ভাগ্য-নিয়ন্তা আমাদের পরীক্ষকদের দয়ার উপর নির্ভর করে। 'তাঁরা আবার 'বধূ-কণ্টক' শাশুড়ীর উপরে যান। নিজেরা যে যত কষ্ট পেয়েছেন, সেই পরিমাণে তিনি তত বেশী নির্ম্মম ব্যবহার করেন। যিনি নিজে কষ্ট পেয়েছেন, তাঁরও কি বিবেক-বুদ্ধি বা অনুকম্পা জাগে না? মেডিকেল কলেজেরই বা কি বীভৎস সংখ্যক বই! দেখ্‌লে আতঙ্ক হয়। ৩০।৩২ খানা বে-আড়া রকম মোটা বই এক বৎসরের মধ্যে পড়ে, একসঙ্গে পরীক্ষা দেওয়া, স্বয়ং ধন্বন্তরী পারতেন কি না সন্দেহ,—আমাদের দুর্ভাগা ছেলেরা ত কোন্ ছার! তবু আশ্চর্য্য ছেলেদের শক্তি!—তারা পাশ হয়! যেমন করেই হোক, পাঁচ-ছ'বার অনুত্তীর্ণ হয়েই হোক, আর দৈবাৎ মেধাবীরা একেবারে পাশ হয়েই হোক। আবার এমনি অপূর্ব্ব দেশ যে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের মতে, চাকরী, মান-সম্ভ্রম থেকে বিবাহটা পর্য্যন্ত ঐ পাশের উপর নির্ভর করে। আর এটা যে কতদূর সত্যি, তা' আমরা, এই পর-নির্ভরশীল মেয়েরা যত হাড়ে-হাড়ে অনুভব করি, তেমন পুরুষেরাও করেন না। স্বামী ফেল হ'লে, বধূ বেচারীর 'অপয়া' যশ ঘোষিত হয়। এই জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় যদি এই পুরোনো নিয়মেই চলেন, তবে আলাদা করার ফল কি ভালো হবে?

আমাদের মনে হয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোন দিন প্রতিষ্ঠা হয় ত হোক; যদি নাও হয়, তা হলেও, আমাদের এই পরিবর্ত্তনহীন বিরাট নিয়মের বোঝাকে ভেঙ্গে, উত্তর-পুরুষদের শিক্ষার পথ সুগম করা হোক। দেশের যদি কিছু উন্নতি হ'য়ে থাকে, তা হয় ত এর ফল; কেন না, আমরা আমাদের অবস্থা বুঝতে পেরেছি। যদি অবনতি হয়ে থাকে, তাও এর ফল; কেন না, আমরা আমাদের ছেলেদের স্বাস্থ্যহীন, অকালে-বৃদ্ধ দেখছি।

পরিশেষে, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলেও, তাতে আমাদের বিশেষ উপকার বা কল্যাণ হবে বলে মনে হয় না; কারণ, ওটার উদ্দেশ্য আর আদর্শ যতই মহৎ হোক না কেন, ওটা শুধু আমাদের কল্পনার মধ্যেই আছে। ঠিক যে কি রকম হবে, তা আমরা নিজেরাই জানি না। কাজেই, ওর উপকারিতায় আমাদের বিশ্বাস নেই। ফলে, জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা যেমন এখন আছে, তেমনিই থাকবে; জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ও যে তিমিরে সেই তিমিরে থাকবেন।

অনেকটা, 'স্বদেশী' যুগের জাতীয় বিদ্যালয়ের, ব্যাঙ্কের, মিলের অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছিল, সেই রকম হবে।

আমাদের আদর্শ থাকে মহৎ, কল্পনা থাকে খুব চমৎকার; কিন্তু বিশ্বাস মোটেই থাকে না। সেই জন্যে আমাদের কাজ কখনো সফল হয় না। আমরা 'স্বদেশী' যুগের 'বয়কট',—এখনকার নন-কো অপারেশন থেকেই কি আমাদের চিনতে পারছি নি? অবশ্য সকলেই কিছু নয়; কিন্তু ব্যতিক্রম চিরদিনই ব্যতিক্রম। সাধারণের সঙ্গে তাকে বিচার করা চলে না। আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের এই রকম চঞ্চল হ'তে বাধ্য করে, এটা মানছি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাসহীনতা এর মূল।

আমাদের মনে হয়, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতারা যদি পুরোনো পন্থা ছেড়ে, ছেলেদের স্বাস্থ্য, পরিশ্রম, সময়ের অপব্যয়ের দিক লক্ষ্য রেখে, নতুন কোন পন্থা আবিষ্কার করতে পারেন, তা'হলে হয় ত সফল হলেও হতে পারেন। নইলে, গতানুগতিক হলে কতদূর কি হবে, বলা যায় না। জাতীয় বিদ্যালয়ের উন্নতি, আর ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়, বাস্তবিক স্থাপন করিতে যাইলে, আমাদের কল্পনাকে সুসম্বদ্ধ, সুগঠিত করে দিতে হবে। নইলে ইচ্ছা থাকলেও, ভবিষ্যতের 'অন্ন-চিন্তা চমৎকারার' ভয়ে অনেকেই ছেলেদের ওখানে পড়তে দিতে পারবেন না। ফলে, সমবেত চেষ্টার, সাহায্যের, বিশ্বাসের অভাবে, অন্য সব সৎ-অনুষ্ঠানের মতন এরও অকাল-মৃত্যু ঘটবে।

দুর্গাবতী শিক্ষাশ্রম

[শ্রীঅশ্রুমালা বসু]

গত চৈত্র মাসে ২টী মেয়ে নিয়ে যে কাজ প্রথম আরম্ভ করি, সেটা তিন মাসে কতটা এগিয়েছে তার পরিচয় দিই।

আমি কাহারও কাছে অর্থ সাহায্য চাই নি; একমাত্র ভগবানের নাম ক'রে কাজ আরম্ভ করি। তা সত্ত্বেও ১২৮৲ টাকা অযাচিত দান স্বরূপ পাই। এর মধ্যে শ্রীযুক্ত নির্ম্মল-চন্দ্র চন্দ্রের ৫০৲ টাকা ও কুমারী অশোকার ৩০৲ টাকা উল্লেখযোগ্য। এই টাকার মধ্যে ৮৩৷৶০ আনা খরচ হ'য়ে গেছে; উৎবৃত্ত আছে মাত্র ৪৪৷৶০ আনা। এ টাকাও খরচ হ'য়ে গেলে কি হবে, সে ভাবনা আমার নাই; কারণ আমার সামান্য কাজের ফলাফল আমি নারায়ণে অর্পণ করেছি। তাঁর কাজ তিনিই চালিয়ে দিবেন। এই জন্য অনেকেই পরামর্শ দিয়াছিলেন, সাধারণের কাছে চাঁদা তুলতে; আমি তাতে রাজি হই নাই। এইEconomic distressএর দিনে চাঁদার খাতার চোটে লোকে অস্থির হ'য়ে উঠেছে;—আমি আর তার উপর বাড়াতে প্রস্তুত নই।

অনেকেই চিঠি লিখে আমার এখানে কি ভাবে কাজ হয়, জান্‌তে চান। তাঁদের অবগতির জন্য আমি সংক্ষেপে লিখছি।

"Home Training" (নিজের ঘরের মতন শিক্ষা) বলে ব্যাপার আমাদের দেশে নিতান্ত বিরল। মার কাছে স্নেহ, ভালবাসা ও আদরের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা হয়, তার তুলনা নেই। আমাদের দেশে স্কুলে দিলেই অভিভাবকেরা ভাবেন, তাঁদের কর্ত্তব্য হ'য়ে গেল। সেই স্কুলগুলোকে কিন্তু ছেলেমেয়েরা জেলখানার মতই দেখে থাকে। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে তাদের অধিকাংশ স্থলে ভালবাসার সম্পর্ক তো নাই-ই, বরং তাঁদের যমদূতের পার্থিব সংস্করণ স্বরূপ বলেই বোধ করে থাকে। ছোট ছেলে-মেয়েদের নরম মন গ'ড়ে তুলতে গেলে স্নেহ, ভালবাসা, আদর যে আগে দরকার।

এই স্নেহাদর দিয়ে আমি মেয়েদের গড়ে তুল্‌তে চাই। আমি জানি, যথার্থ ভালবাসলে, তারা না ভালবেসে থাকতে পারে না। আর তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিন মাসে আ[মি] পেয়েছি।

আমার কোন সাহেব মিশনারী বন্ধু আমার আশ্রমে অবৈতনিক শিক্ষা শুনে মত প্রকাশ করেছিলেন [যে] মেয়েরা নিয়মিত ভাবে আসবে না। তিনি বলেন [যে] পাড়ায় পাড়ায় মিশনারী স্কুলে চারি আনা বা আট আ[না] ফী নেওয়ার কারণ, মেয়েদের বাপ-মায়েরা তাদের নিয়মি[ত] ভাবে স্কুলে পাঠাবেন। চারি আনা পয়সা দিয়েও যদি মে[য়ে] শুধু-শুধু কামাই করে, তা হলে পয়সাটা বৃথায় খরচ হ'[বে] ভেবে তাঁরা মেয়েদের তাড়া দিবেন। কিন্তু আমার বি[না] ফী'তে শিক্ষার ফলে অভিভাবকদের এদিকে তত নজ[র] থাকবে না। এর উত্তরে আমি তাঁকে জানাই, যে মেয়েদে[র] নিয়েই আমার কাজ,—মেয়েদের অভিভাবকদের নিয়ে নয় আমার ব্যবস্থানুসারে মেয়েরা নিজেরাই চাড় করে এখানে আসবে। আজ তিন মাস পরে দেখছি যে, আমার কথ[া] আমি সম্পূর্ণ রাখতে পেরেছি। মেয়েরা এখানে আসতে কতখানি চায়, কতখানি আগ্রহ প্রকাশ করে, তা আমিই জানি, আর অভিভাবকেরাও ভাল জানেন।

অভিভাবকদের মধ্যে অনেকেই তাই আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, মেয়েরা স্কুলে যেতে মোটেই চাইত না; অথচ এখানে আসবার জন্য এত ব্যস্ত হয় কেন? তার কারণ, মেয়েরাও জানে এটা স্কুল নয়, "কাকিমার বাড়ী।" এখানে তারা খেলা করতে পায়, গল্প শুনতে পায়; স্কুলের মত ধরা-কাট নেই, বোর্ড নেই, টেবিল নেই; আছে খালি কাকিমার আদর, আর ষোল আনা "Home training" (ঘরোয়া শিক্ষা)।

কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে মেয়েদের সাধারণ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। বই না পড়িয়ে শুধু ছবি, ম্যাপ ও চার্টের সাহায্যে গল্প ক'রে আকাশের কথা, পৃথিবীর কথা, দেশের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার কথা, আর তারি সঙ্গে সেলাই, বোনা, চরকায় সূতা কাটা, ক্লে-মডেলিং,

আলপানা দেওয়া, শ্রী-গড়া, প্রভৃতি শেখান হয়ে থাকে। রান্না শেখাবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু সুবিধা করে উঠ্‌তে পাচ্ছি না।

আমি একলা, সেজন্য সমস্ত ভারটা খুব বেশী ব'লেই প্রথমে মনে হ'ত। এখন অনেকটা সয়ে গেছে। বিশেষ, মনে সন্তোষ আছে যে ভালর জন্যই করেছি। এই কারণে, ২০টীর বেশী মেয়ে আমি নিতে পারি না;—অধিক নিলে তো সকলকে সে রকম যত্ন করা সম্ভব হবে না। বর্ত্তমানে ১৮টী মেয়ে আছে, ২টী ছেড়ে গেছে, বিয়ের জন্য। এই দুইটী মাত্র মেয়ে আর আমি নিতে পারব।

চরকা ক্লাশের সুবন্দোবস্তের জন্য নারী-কর্ম্ম-মন্দিরের শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবীর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তিনি সাহায্য না করিলে আমি চরকা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পার্‌তুম না। ক্লাশটী তাঁদেরই ষোল আনা;—আমি স্থান দিয়েছি মাত্র। তাঁরাই চরকা দিয়েছেন, তুলা দিয়েছেন, আর সপ্তাহে তিন দিন একজন মহিলাকে পাঠিয়ে থাকেন।

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সম্পাদিকা শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ প্রথম থেকেই আমায় উৎসাহিত করেছেন। তাঁর সৎ-পরামর্শ না পেলে, নিঃসহায় ও নিঃসম্বল আমি, এ কাজে হাত দিতে সাহস কর্‌তুম কি না সন্দেহ। মহামণ্ডলের স্থাপয়িত্রী দেবী কৃষ্ণভাবিনী আমার আদর্শ।

বালীগঞ্জ ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীমতী সরলাবালা মিত্র বি-এ মহাশয়া কয়েকটী চার্ট আর ক্লে-মডেল দিয়েছেন; ও দুই দিন এসে মেয়েদের কাজ ও খেলা দেখে তাদের উৎসাহ দিয়ে গেছেন। আরো কয়েকপ্রকার চার্ট ও ম্যাপ এবং একটা ছোট-খাট গ্লোব দরকার; কেহ যদি দয়া করে দান করেন, বিশেষ বাধিত হব।

রামায়ণ ও মহাভারতের জন্য শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মেয়েদের পারিতোষিক দিবেন বলেছেন। তিনি উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত একটা চরকা দিতেও প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এজন্য তিনি আমার ধন্যবাদভাজন।

সনাতন বিদ্যালয়ের শ্রীমান সুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সপ্তাহে দুই দিন এসে চরকা শিখায়ে যান।

এই আশ্রম ৪৪ নং মলঙ্গা লেনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা

[শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি]

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাদ্রের নির্ম্মল আকাশে ধূম উদ্গীরণ করিতে-করিতে গাড়ী উত্তরাভিমুখে ছুটিতেছে। একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রকোষ্ঠে আমি, একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা, এবং তাহার পিসী। বালিকা তাহার পিসীর দিকে পশ্চাৎ ফিরাইয়া, কখনো চন্দ্রকরোজ্জল আকাশের দিকে, কখনো রেলপার্শ্বস্থ জলভরা থানার দিকে, কখনো বা শস্যশ্যামল ক্ষেত্রের দিকে তাকাইতেছে;,এবং ঘন-ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। চক্ষু দুটীও জলভরা। শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে যাইতেছে; সুতরাং এই বিপরীত ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, লক্ষণ ভাল নয়। পিসী স্নানাগারে প্রবেশ করিলে, বালিকাকে চুপি-চুপি বলিলাম, "তুমি আমার নাতনীর বয়সী; বয়স ত সবে মাত্র চৌদ্দ,—এখনই নাত-জামাইয়ের বিরহে এত ভাবনা? 'মাহ ভাদর' বটে, কিন্তু 'ভরা বাদর' যখন সম্মুখে উপস্থিত নাই, তখন "শূন্য হৃদয়" কল্পনা করে ঘনশ্বাসের চাপে তাকে এতটা ব্যতিব্যস্ত কর্‌বার প্রয়োজন কি?" বালিকাটী হাসিয়া ফেলিল; বাঁচিলাম! মেঘ কাটিয়া গেল। ততক্ষণে পিসী আসিয়া পড়িলেন। তখন দুজনে মিলিয়া আকাশের শোভা দেখিতে লাগিলাম। এবার পিসীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি ব্যস্ত হইয়া আমাকে বলিলেন, "কি হবে মা? নষ্টচন্দ্র যে দেখে ফেলেছি!" আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আজ ভাদ্রের শুক্লা চতুর্থী। বলিলাম "তা বটে! 'নষ্টচন্দ্র নদৃশ্যশ্চ ভাদ্রে মাসি সিতাসিতে' এই দিনে চন্দ্র গুরুপত্নী হরণ করেছিলেন বটে!' শ্লোকটা আর কথাটা হঠাৎ আসিয়া পড়িল। পিসী মনে করিলেন, আমি

একটা মহা পণ্ডিত। আমার নিকট ব্যবস্থা চাহিলেন। দেখিলাম, তিনি এখনও যৌবন-প্রৌঢ়ত্বের সন্ধিস্থলে; আর ব্রাহ্মণের বিধবা; সুতরাং কলঙ্কের ভয়টা স্বাভাবিক। আমি একটু গম্ভীর হইয়া বলিলাম "ভয় কি পিসী-মা? আমি ইহার ব্যবস্থা জানি।' পূর্ব্বমুখী বা উত্তরমুখী হয়ে বসুন। এই জল আছে; হাতে নিয়ে এই মন্ত্র পড়ে জল খেয়ে ফেলুন

"সিংহঃ প্রসেন মবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদী স্তবহ্যেষ স্যমন্তকঃ॥"

ব্রাহ্মণ-কন্যা অনেক কষ্টে শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া জলপান করিলেন। আমি বলিলাম, "এবার স্যমন্তক উপাখ্যান শুনুন, —আর কলঙ্কের ভয় থাকবে না।" সংক্ষেপে বলিলাম:—

সূর্য্যদেব স্বীয় ভক্ত সত্রাজিতকে স্যমন্তক নামক মণি প্রদান করেন। এই মণি প্রতিদিন ১৬০ তুলা স্বর্ণ প্রসব করিত। যে স্থানে ইহার স্থাপনা ও আরাধনা হয়, সে স্থানে দুর্ভিক্ষ, মারী, কি কোন অমঙ্গলের ভয় থাকে না। একদা সত্রাজিৎ সেই মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া দ্বারকায় প্রবেশ করেন। দ্বারকাবাসী লোক অক্ষক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণকে গিয়া বলিল "ভগবন্! আপনাকে দর্শন করিবার জন্য সূর্য্যদেব আসিতেছেন; তাঁহার তেজে আমাদের চক্ষু অন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।" শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করতঃ বলিলেন, "এ সূর্য্যদেব নহেন, স্যমন্তকমণি-ভূষিত সত্রাজিৎ দ্বারকায় আসিতেছেন। এই জ্যোতিঃ তাঁহারই।" পূর্ব্বে এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ যদুরাজের জন্য সত্রাজিতের নিকট এই মণিটী যাচ্ঞা করিয়াছিলেন; কিন্তু অর্থ-কামুক সত্রাজিৎ তাঁহার প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়াছিল। একদা সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন সেই মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া, মৃগয়ার্থ বনে গমন করেন। তথায় এক সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়া, মণি গ্রহণ পূর্ব্বক গিরিগুহায় প্রবেশ করিল। পরে জাম্ববান সেই সিংহকে নিহত করিয়া মণি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় কুমারের ক্রীড়াদ্রব্য করিয়া দিলেন। সত্রাজিৎ ভ্রাতাকে পুনরাগমন করিতে না দেখিয়া বলিল, 'মণিলোভে সে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে।' শ্রীকৃষ্ণ লোক-পরম্পরায় তাহা শ্রবণ করিয়া, বৃথা কলঙ্ক মোচন মানসে প্রসেনের অন্বেষণে গমন করিলেন; এবং দেখিলেন, প্রসেন নিহত, এবং নিকটে প্রসেন-ঘাতী সিংহের শব। অবশেষে ভল্লুকরাজের গুহায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার বালক স্যমন্তক লইয়া ক্রীড়া করিতেছে! নিকটে ছিল বালকের ধাত্রী। ভল্লুকী-ধাত্রী কখনও মানুষ দেখেন নাই। তিনি ভয়ে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। ক্রন্দন শুনিয়া জাম্ববান ক্রোধান্ধ হইয়া আসিলেন; এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অষ্টাবিংশতি দিবস ঘোর যুদ্ধ চলিল। পরে জাম্ববান পরাস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া বলিলেন "তুমিই আমার দশাননঘাতী রঘুনাথ"। শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হইয়া যখন আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন, জাম্ববান কেবল সে স্যমন্তক রত্ন দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন, তাহা নয়; অধিকন্তু তৎসহ আপনার কন্যারত্ন জাম্ববতীকে উপহার দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নগরে প্রত্যাগমন করিয়া সত্রাজিৎকে সভায় আহ্বান করিলেন; এবং মণি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার নিকট মণিহরণ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। সত্রাজিৎ লজ্জিত হইয়া আপনার পুরীতে প্রবেশ করিল; এবং কিছুকাল পরে অনুতপ্ত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন করিয়া, জাম্ববানের অনুকরণে মহারত্ন স্যমন্তক এবং কন্যারত্ন সত্যভামাকে উপহার প্রদান করিল। শ্রীকৃষ্ণ যথাবিধি সত্যভামাকে বিবাহ করিলেন; কিন্তু মণি ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, আপনি সূর্য্য-ভক্ত, এ মণি এখন আপনারই থাকুক। আর আপনি যখন অপুত্রক, তখন এ মণি পরে ত আমাদেরই প্রাপ্য।" পিসীমা উপাখ্যান শুনিয়া অত্যন্ত আশ্বস্ত হইলেন; এবং আমাকে বলিলেন "মা, আমাকে বাঁচালে। জানই ত ব্রাহ্মণ-বিধবার কলঙ্ক অপেক্ষা মরণই ভাল।" বিরহিণীর অবস্থাও অনেকটা আশাপ্রদ। বহন-ক্লান্ত লৌহশকট হাঁপাইতে-হাঁপাইতে যখন নৈহাটী ষ্টেসনে আসিয়া থামিল, পিসীমা বলিলেন "মা, আমার দাদার এই একমাত্র সন্তান। মা-মরা মেয়েটীকে অনেক কষ্টে মানুষ করেছি। এই অল্প বয়সেই পোয়াতি হয়েছে। বড়ই ভাবনা। আমাদের বাড়ী ত্রিবেণী; নৈহাটী কুটুমবাড়ী হয়ে যাব। সময়মত খবর দিলে, তোমাকে গিয়ে মেয়েটীকে রক্ষা করতে হবে মা।"

(ক্রমশঃ)
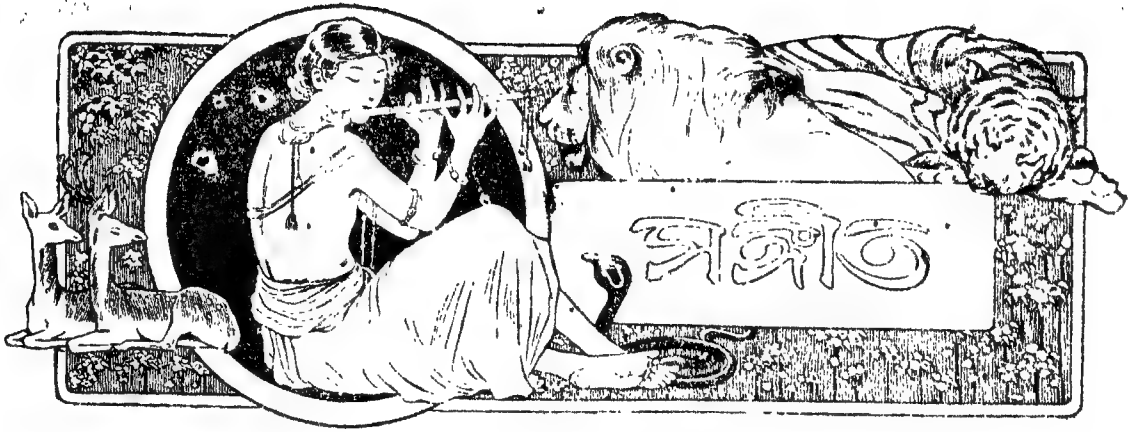
"সাজাহানের" গান। *

তৃতীয় গীত

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

মিশ্র ইমন্—কাওয়ালী।

নর্ত্তকীগণ।

আজি এসেছি—আজি এসেছি,
এসেছি বঁধু হে,—
নিয়ে এই হাসি, রূপ, গান।
আজি, আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে,
তোমায় করিতে সব দান।
আজি তোমারি চরণতলে রাখি এ কুসুমভার,
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি' তোমার অধরে ধরি,—
কর বঁধু কর তায় পান;
আজি হৃদয়ের সব আশা,
সব সুখ, ভালবাসা,
তোমাতে হউক অবসান।

ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছলজলদলকলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান;
আজি, এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভাল,
সে মরণ স্বরগ সমান।
আজি, তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই,
তোমার জীবনতলে ডুবিয়ে মরিতে চাই,
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব বলে',
আসিয়াছি তোমার নিধান;
আজি সব ভাষা সব বাক্—নীরব হইয়া যাক্,
প্রাণে শুধু মিশে যাক্—প্রাণ॥

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

			০					১							
সা	ন্‌া	II {	সা	মা	মা	-া |	-া	-া	মা	গা I	মা	ধা	ধা	-া |
আ	জি		এ	সে	ছি	•	•	•	আ	জি	এ	সে	ছি	•

* "সাজাহানে"র গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

—লেখিকা।

| -া -া -া -া | ণা ণা ণা -ধা | র্সা না র্সা -া I
০ ০ ০ ০ এ সে ছি ০ বঁ ধু হে ০

২´ ৩ ০
I -া -া -া -া | -া -া -া -া | ণা ণা ণা -া |
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ নি য়ে এ ই

১ ২´ ৩
| ধা ধা মা পা I ধা -া -া -া | (া া সা ন্া)} |
হা সি রূ প গা ০ ০ ন্ ০ ০ "আ জি"

৩ ০ ১
| া া সা ন্া | { ধা ধা -া ধা | ধা ধা র্সা র্সা I
০ ০ আ জি আ মা র্ যা কি ছু আ ছে

২´ ৩ ০
I পা পা পা পা | মপা -ধা ধা ধা | মা মা -া মা |
এ নে ছি তো মা০ র্ কা ছে তো মা য়্ ক

১ ২´ ৩
| গা মা ধা পা I মা -া -া -া | া া সা ন্া }II
রি তে স ব দা ০ ০ ন্ ০ ০ আ জি

০ ১ ২´
II{ মা গমা পা পা | পা পা পা পা I মা পা মপা ধা |
তো মা০ রি চ র ণ ত লে রা খি এ০ কু

৩ ০ ১
| ধা ধা ধধা া | পধা ণা -া ণা | ণা -া ণা ধা I
সু ম ভার্ ০ এ০ হা র্ তো মা র্ গ লে

২´ ৩ ০
I পা ধা পা র্সা | র্সা র্সা র্সর্সা া | র্সা র্সা -া র্সা |
দি ই বঁ ধু উ প হার্ ০ সু ধা র্ আ

১ ২´ ৩
| র্সা -া র্রা র্সা I ণা ণা -া ণা | ণা ণা র্সা ণা |
ধা র্ ভ রি তো মা র্ অ ধ রে ধ রি

০ ১ ২´
| ধা ণা ধা ণধা | পা ধা মা -পা I ধা -া -া -া |
ক র বঁ ধুং ক র ছা য় পা ০ ০ ন্

৩ ৩ ০
| (া া সা ন্া) } | া া ধা ধা | { ধধা র্গা র্গা র্গা |
০ ০ 'আ জি' ০ ০ আ জি হৃ দ য়ে র

১ ১´ ৩
| র্গা র্গা র্মা র্গা I র্রা র্রা র্গা র্রা | র্সা না র্রা র্সা |
স ব আ শা স ব সু খ ভা ল বা সা

০ ১ ২´
| ণা ণা ণা ণা | ধা -া র্সা র্সা I মা -া -া -া |
তো মা তে হ উ ক্ অ ব সা ০ ০ ন্

৩ ৩
| (া া ধা ধা) } | া া সন্া া II
০ ০ 'আ জি' ০ ০ ঐ ০

০ ১ ২
II { সা সা সা সরা | রা রা রা রা I সা রা গা গা |
ভে সে আ সেং কু সু মি ত উ প ব ন

৩ ০ ১
| রগা মা মমা -া | মা মা মা গমপা | পা -া পপা পা I
সোং উ রভ ০ ভে সে আ সেং০ উ ০ চ্ছ ল

২´ ৩ ০
I মা পা ধা ধা | পা পধা ণণা -া | ধা ধা ধা ধা |
জ ল দ ল ক লং র ব ০ ভে সে আ সে

১ ২´ ৩
| ধা ধা র্সা র্সা I পপা -পপ পা পা | পপা পা ধা ধা |
রা শি রা শি জো ৎ স্ না র মৃ দু হা সি

০ ১ ২´
| মা মা মা মা | গা মগা সা রা I (পা -া -া -া |
ভে সে আ সে পা পিং য়া র তা ০ ০ ন্

৩ ২´ ৩

| । । পপা ।)} | পা -া -া -া | । । পা ধা

০ ০ ঐ ০ তা ০ ০ ন্ ০ ০ আ জি

০ ১ ২´

| {র্সা র্সা -া র্সা | র্সা -া র্রা র্সা I ণা ণা ণা ণধা

এ ম ন্ চাঁ দে র্ আ লো ম রি য দি০

৩ ০ ১

| পধা ণা ণা ণা | ণা ণা ণা -ণধা | পা ধা ণা ধা I

সে০ ও ভা ল সে ম র ০ণ্ স্ব র গ্ স

২ ৩ ২´

I (পা -া -া -া | । । পা ধা)} | পা -া -া -া |

মা ০ ০ ন্ ০ ০ 'আ জি' মা ০ ০ ন্

৩ ০ ১

| । । মা মা | {মা মা -পা পা | পা -া পা পা I

০ ০ আ জি তো মা র্ চ র ণ্ ত লে

২´ ৩ ০

I মা পা মা ধা | ধা ধা ধা -া | ণা ণা -া ণা |

লু টা য়ে প ড়ি তে চা ই তো মা র্ জী

১ ২´ ৩

| ণা -া ণা ণধা | পা ধা পা ধা | র্সা র্সা র্সা -া |

ব ন্ ত লে০ ডু বি য়ে ম রি তে চা ই

০ ১ ২´

| র্সা র্সা -া র্সা | র্সা -া র্রর্সা । I ণা ণা -া ণা |

তো মা র্ ন য় ন্ তলে ০ শ য় ন্ ল

৩ ০ ১

| ণা ণা র্সণা । | ধা ণা ধা ণধা | পা ধা মা পা I

ভি ব বলে ০ আ সি য়া ছি০ তো মা র নি

২´ ৩

I ধা -া -া -া | । । মা মা } II

ধা ০ ০ ন্ ০ ০ 'আ জি'

॥{ র্মা র্গা র্গা র্গা | র্গা র্গা র্ম্া -র্গা | র্রা র্রা -া র্রা |
স ব ভা ষা স ব বা ক্ নী র ব্ হ

| র্সনা র্রা র্সা -া | ণ্ণা ণা ণা ণা | ধা ধা র্সা -া I
ই • য়া যা ক্ প্রা ণে শু ধু মি শে পা ক্

I (মা -া -া -া | া া মা মা) | মা -া -া -া |
প্রা • • ণ্ • • 'আ জি' প্রা • • ণ্

| া া সা না ॥ ॥
• • "আ জি"

ধূমকেতু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ]

সমী-কে প্রথম দিনে নিজের বাড়ীতে এনে না খাওয়ানোতে মীরার উক্তিটা অভিমান-সঞ্জাত বলেই মনে হয়েছিল এবং তাতে একটু খুসীও হ'য়েছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই যখন মীরার স্বাভাবিক ঔদাসীন্যের কথা মনে প'ড়ল, তখন তার মধ্যে খুসী হবার কোন কারণই আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

মীরার কাছে একদিন সমী-র মদ খাওয়ার কথাটা বলেই ফেললুম—অতর্কিতে নয়, ইচ্ছা ক'রেই। সমী-র সে অবস্থায় তাকে আমার বাড়ীতে না আনাটা যে শুধু মীরার আত্ম-সম্মানটা অ রাখবার জন্যেই, তা জেনে মীরা খুসী হ'য়েছিল নিশ্চয়, কিন্তু মুখভাবে তার এতটুকুও আভাষ পাওয়া গেল না।

আমার এবং মীরার সম্পর্কের মধ্যে বিশেষত্ব ছিল ওইটুকুই।

স্ত্রীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে আমার মস্তিষ্ক চালনা ক'রতে হ'ত কম নয়; স্ত্রীও ছিল সব বিষয়ে আমার একান্ত অনুগত;—কিন্তু তার দেহ মনে এমন একটা ঔদাসীন্য দেখা যেত, যা সাধারণ স্বামীর পক্ষে সহ্য করা একরূপ অসম্ভব ছিল। এমন কি মাঝে মাঝে আমার পক্ষেও সেটা পীড়াদায়ক হ'য়ে উঠত।

আসলে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার ঠিক পরিচয় হয় নাই; মীরাকে আমি চিনি নাই এবং চেনবার কখনো চেষ্টাও করি নাই। আজ রোগশয্যা থেকে উঠে জীবনের যে নূতনত্বের সঙ্গে পরিচয় ক'রে নিতে হ'চ্ছে, তার মধ্যে সব চেয়ে নূতন হ'চ্ছে এই জ্ঞানটাই। স্মৃতির শ্লেট থেকে পুরাতন জীবনের হিজি-বিজি লেখাগুলো একেবারে মুছে ফেলে, নূতন ক'রে আবার লেখা আরম্ভ ক'রতে হবে, এবং সেটা না ক'রলে ভবিষ্যৎ জীবনটা যে আগের মত স্বস্তিতে কাটবে না—অন্ততঃ সে বিশ্বাসটা আমার খুবই বদ্ধমূল হ'য়েছে। এইটুকুই আমার পক্ষে লাভ। স্ত্রীর সঙ্গে আমার নূতন ক'রে পরিচয় ক'রে নিতেই হবে, যদিও—

সমস্যাটা এইখানেই। মীরার চরিত্রে একটু অসাধারণত্ব ছিল। শাস্ত্রকারেরা বলেন, স্ত্রী-চরিত্র পুরুষের ভাগ্যের মতই দুর্জ্ঞেয়। কোন্ এক বিদেশী লেখকের কেতাবে প'ড়েছি, স্ত্রী-চরিত্র অর্দ্ধেকটা ছেলেমানুষী এবং অর্দ্ধেকটা সয়তানী দিয়ে তৈরী। সমী ব'লত—ওর কোনটাই ঠিক নয়। তার মতে—স্ত্রী-চরিত্র তাদেরই কাছে দুর্জ্ঞেয়, যারা স্ত্রীলোকের ভিতর মানবীকে খোঁজে না; খোজে হয় দেবীকে, নয় দানবীকে। তারা যে পুরুষেরই মত রক্তমাংসে গঠিত মানুষ, এ কথাটা মনে রাখলেই আর কোন গোল থাকে না।

হয়ত এটা ঠিক হতে পারে। এটা কিন্তু ঠিক যে আমি মীরাকে ওরূপ কোন চক্ষেই দেখিনি। তাকে দেখতাম, কতকটা সহধর্ম্মিণী এবং কতকটা অনুগত দাসীর ভাবে। এটা খাঁটি সত্য কথা। অন্য সময় হয়ত নিজের কাছেও এ কথাটা স্বীকার ক'রতে পারতুম না; কিন্তু আজ যখন ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে নিতে হচ্ছে, তখন যে আর ভাবের ঘরে ফাঁকি রাখা চ'লবে না—সেটা বেশ বুঝেছি। অন্তরের মণিকোঠায় যে রত্নটি একান্ত যতনে রক্ষিত ছিল বলে মনে ক'রতাম, এখন তার অস্তিত্বের বিষয় নিয়েই তো যথেষ্ট সন্দেহ উপস্থিত হবার কারণ হ'য়েছে।

আমার স্ত্রী ছিল আমার গৃহিনী, ক্বচিৎ সচিবঃ, কচিৎ প্রিয়শিষ্যা, কিন্তু সে আমার সখী ত কোন দিনই ছিল না। অজ-বিলাপের ছন্দের আড়ালে যে ইন্দুমতীর সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল, তাকে কখনো শরীরী প্রণয়িনী বলে মনে করি নাই, রাজ-অন্তঃপুরের রাণী বলেও নয়;—তাকে জানতুম কবির কল্পনা-সৃষ্ট প্রাণহীন ছন্দমূর্ত্তি ব'লেই। এবং আমার নিজের স্ত্রীর ভিতরে তার আভাষ কখনও পেতে চেষ্টা করি নাই।

ভুল একটা হ'য়ে গেছে এবং সেটা শোধরাতে হবে। জীবন-খাতার শেষ পাতাটায় যখন শান্তি-বচন লিখব, তখন যেন সঙ্কীর্ণতার চাপে আমার হাত আড়ষ্ট হ'য়ে না আসে, তখন যেন মুক্ত প্রাণে সত্য কথাটাই লিখে যেতে পারি।

সেই সত্য কথাটারই আভাষ দিতে আজ চেষ্টা ক'রব—যদিও সেটা আভাষ মাত্র।

* * *

মীরাকে যখন বিবাহ করি, তখন আদালতে আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির সূচনা যথেষ্ট দেখা দিয়েছিল। বিবাহ ক'রেছিলাম নিজে দেখেশুনেই—তবে সেটা নিতান্তই নিয়ম রক্ষার্থে। বিবাহটা ঠিক ক'রেছিলেন দু'পক্ষের অভিভাবকগণ এবং একটা পাকাপাকি কথা হ'য়ে যাবার পর দিন কতকের জন্য আমরা একটু আলাপের অবসর পেয়েছিলুম মাত্র।

প্রথম পরিচয়েই মীরার দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছিলাম; কিন্তু সেটা যে তার রূপের জন্য—তা' ঠিক নয়। মীরার চেয়েও অনেক রূপবতী মহিলার দর্শন-সৌভাগ্য ইতিপূর্ব্বে আমার ভাগ্যে ঘটেছিল; এবং তাদের কাহারও রূপ আমার মনের ফলকে একটা বিশেষ কিছু আঁকতে পারেনি।

আমি আকৃষ্ট হ'য়েছিলাম তার গুণপনায়—অন্ততঃ তার গুণপনার কথা শুনে। তার পিতৃমাতৃ উভয় কুলেই বিদ্যা-চর্চ্চাটা খুবই ছিল এবং মীরার নিজের বিদুষী না হলেও উচ্চ-শিক্ষিতা ব'লে পরিচয় ছিল।

তাই প্রথম আলাপের দিন কথা খুঁজে না পেয়ে একান্ত সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—আপনি ব্যর্গসঁ প'ড়েছেন কি?

ব্যর্গসঁর সঙ্গে আমার পরিচয়টা তখন নূতন হ'য়েছে এবং ব্যর্গসঁর সঙ্গে যে বিশ্বের সকলেরই পরিচিত হ'তে হবে, এ বিশ্বাস এমন-কি আমারও ছিল না। তবু মনে ভাবলুম—ভাবী বধূর সঙ্গে প্রথম আলাপটা যদি ব্যর্গসঁর কেতাবের আড়ালেই হ'য়ে যায়, তাতে আমার বিশেষ আপত্তির কারণ কি থাকতে পারে? ও ব্যাপারটার ভিতরে যে হাস্যের উপাদান ছিল, সেটা আমার তখন মনেই ওঠে নি।

কিন্তু মীরা যখন অবনত মুখে জানালে যে ব্যর্গসঁর সঙ্গে তার পরিচয় নেই, তখন একটু আশ্বস্ত হ'লুম—এই ভেবে যে অন্ততঃ আমার কাছ থেকে আমার ভাবী বধূর শেখবার অনেক আছে। কথাবার্ত্তায় এই প্রথম সুযোগে ব্যর্গসঁর ব্যাখ্যা আরম্ভ করবার প্রলোভন সামলাতে পারলুম না। ব'ললুম—আমি সম্প্রতি ব্যর্গসঁর নূতন থিওরিটা নিয়ে আলোচনা ক'রছিলুম;—আচ্ছা আপনার কি মনে হয়—তাঁর মতে time আর space এই দুটো আপাততঃ বিভিন্ন হ'লেও—

এমন সময় মীরার বড়দিদি চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে

ঢুকলেন এবং তার পর থেকে কথাবার্ত্তাটা চায়ের মতই তরলাকার ধারণ করলে। নিতান্ত যে দুঃখিত হ'য়েছিলুম, তা' নয়।

পরদিন গিয়ে দেখি, মীরা একখানা বই-এর পাতা উল্‌টোচ্ছে। মনে মনে খুশী হলুম—নিশ্চয়ই বইখানা ব্যর্গসঁর লেখা, আমারি সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে মীরা হয়ত ওটা পড়ে রাখছে।

উৎফুল্ল হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—কি প'ড়ছেন?

—একখানা রান্নার বই, নতুন বেরিয়েছে।

অনেকটা হতাশ হ'য়ে ব'ললুম—তা' বেশ; ওটা খুব ভাল।

—কোন্‌টা? রান্নাটা না পড়াটা?

একটু অপ্রতিভভাবে উত্তর ক'রলুম—রান্নার বইটা।

মীরা অম্লান বদনে জিজ্ঞাসা ক'রলে—ব্যর্গসঁর চেয়েও?

মীরার তরলতায় একটু বিরক্ত হ'য়েছিলুম। সে ভাবটা চেপে একটু হালকা স্বরেই বললুম—কিন্তু ব্যর্গসঁকেও তো খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

—ঠিক কথা। সেই জন্যেই বইখানা প'ড়ে রাখছি।

মীরার প্রকৃতির তরল দিকটার এই পরিচয় পেয়েও আমি নিরুৎসাহ হই নি। জানতুম, বিবাহ হ'লে আমার উপদেশ এবং উদাহরণে ও-সব দূর হ'য়ে যাবে।

বিবাহের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত মীরাকে 'আপনি' ব'লেই সম্বোধন ক'রতুম। যে আবহাওয়ার মধ্যে প্রতিপালিত হ'য়েছিলুম, সেখানে নারীজাতির প্রতি সম্ভ্রমটা একেবারে অস্থি-মজ্জাগত হ'য়ে গিছল। মীরাকে একদিন অতর্কিতে 'তুমি' সম্বোধন করে ক্ষমা চাইবার সুযোগ পেয়ে যে আত্ম-প্রসাদটা অনুভব ক'রেছিলুম, সেটা এই ভেবে যে মীরা অন্ততঃ জানুক যে, তার ভাবী স্বামী তাকে কতটা সম্ভ্রমের চোখে দ্যাখে।

সেদিন মীরার বড়দিদি ওই কথা নিয়ে অত্যধিক স্নেহে আমার যথেষ্ট সুখ্যাতি ক'রেছিলেন; ব'লেছিলেন,—দেখুন, সাধারণ স্বামী-স্ত্রী 'তুমি' সম্বোধনই ক'রে থাকে, কিন্তু পল্লীগ্রামে ইতর ঘরের স্ত্রী স্বামীকে 'আপনি' সম্বোধন করা ভদ্রানুমোদিত মনে করে। আমার মনে হয়, আপনার মত মার্জ্জিত-রুচি লোকেরা যদি আমাদের সমাজে ঠিক তার উল্টো প্রথাটার প্রচলন করেন, তা'হলে বড় মন্দ হয় না।

কথাটা ঠিক পরিহাসব্যঞ্জক কি না, সেদিন বুঝ্‌তে পারিনি। তাঁর মুখে ছিল গাম্ভীর্য্য, কিন্তু চোখে ছিল হাসি।

ফুলশয্যার রাত্রে মীরার রূপ প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলে। রূপে যে কতটা মাদকতা থাকতে পারে, আমার জীবনে সেই প্রথম অনুভব ক'রলুম। লজ্জার লালিমা, কালো চোখের স্থির কটাক্ষ, সর্ব্বশরীরের একটা মদালস ভাব—আমাকেও চুম্বনাকুল ক'রে তুলেছিল। কিন্তু মনে মনে ভগবানের কাছে বল প্রার্থনা ক'রলুম। আজ যদি চপলতা প্রকাশ করি, তাহলে জীবনে স্ত্রীর কাছে আর সম্ভ্রম পাবার অধিকারী হ'তে পারব না। সংসার-পথের যাত্রা আমাদের আজ থেকে সুরু হ'ল, আজ কি বালক-সুলভ চাপল্যে বৃথা সময় নষ্ট ক'রতে আছে?

স্থির কণ্ঠে ডাকলুম—মীরা!

কোনও উত্তর পেলুম না।

দু'একবার বৃথা চেষ্টা ক'রে ব'ললুম—মীরা, শোন। আমরা উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিক্ষিত।...... তোমার এরকম লজ্জা শোভা পায় না—বিশেষতঃ যখন দুজনেই দুজনের সঙ্গে পূর্ব্ব হতেই পরিচিত।........অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা বিবাহের গুরুত্ব না বুঝ্‌তে পারে, কিন্তু আমাদের সেটা বুঝে নেওয়া উচিত। আমাদের জীবন যে আজ কত দায়িত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল, সেই কথাটাই আমি তোমাকে বোঝাতে চাই।

মীরা উঠে ব'সল। তার আর লজ্জাবগুণ্ঠন ছিল না। দেখলুম, তার মুখ মার্ব্বেল পাথরের মত ফ্যাকাশে এবং তারই মত কঠিন হ'য়ে গেছে। মূর্খ আমি, সেদিনকার তার মনোভাব কিছুই বুঝিনি। তার প্রথমকার লজ্জা নারীসুলভ coyness ব'লেই মনে হ'য়েছিল এবং এখনকার ভাবের শুধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞার দিকটাই বেশী ক'রে নজরে পড়ল।

সেরাত্রে মীরাকে সাংসারিক জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব বুঝিয়ে দিলুম—বিশেষ ক'রে স্ত্রীর কর্ত্তব্যগুলো। পরিশেষে

বিশেষ ক'রে একটা ঘটনা সম্প্রতি আমার প্রাণে লেগেছিল, সেটার উল্লেখ না ক'রে থাকতে পারলাম না। মাড়োয়ারী মক্কেলের মকদ্দমা জিতে প্রাপ্যের চেয়েও অতিরিক্ত অনেকটা টাকা পেয়েছিলুম, তাই দিয়ে নিজে পছন্দ ক'রে মীরার জন্যে কি-একটা গহনা কিনে এনেছিলাম। কিন্তু সেটা যে মীরার পরা উচিত—অন্ততঃ স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্যেও—এ কথাটা তাকে মনে করিয়ে দিতে হ'য়েছিল। স্বরটা আমার একটুও কর্কশ হয় নাই, কেন না ক্রোধ জিনিসটাকে একরূপ জয় ক'রেছিলুম বললেই হয়—কিন্তু মনটা একটু তিক্ত হ'য়ে গিছল।

সমী শুনে ব'ললে—স্ত্রীর উপর যদি মাঝে-মাঝে একটু রাগ কর, তা'হলে বোধ হয় মন্দ না হ'য়ে ভালই হয়।

ব'ললুম—তা' কি ক'রে হ'তে পারে? সে আমায় ভালবাসে এবং আমিও যে তাকে না ভালবাসি—তাতো নয়।

সমী অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলে—সে বিষয়ে কি তুমি স্থির-নিশ্চিত্?

কথাটা ইংরাজীর তর্জ্জমা; অন্যমনস্ক হ'লে সমী-র কথা-বার্ত্তায় ইংরাজীর ভাগটা প্রায় পুরাপুরিই থাক্‌ত।

ব'ললুম—আমার প্রেমের বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। আসলে মীরার বিষয়েও আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমি তাকে বুঝতে পারতুম না বটে, কিন্তু তার প্রেমটাকে আমি স্বতঃসিদ্ধ ব'লেই ধ'রে নিয়েছিলুম। বিবাহিত স্ত্রীর যে একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে, তা' আমার ধারণার অতীত ছিল। স্ত্রী কি কখন স্বামীকে না ভালবেসে থাকতে পারে;—বিশেষতঃ যে স্বামী তার কোন অভাব রাখেনি, কখন রূঢ় ব্যবহার করেনি এবং যার চরিত্র ছিল অনেক স্বামীর আদর্শ এবং অনুকরণীয়!

সমী খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল; তারপর ধীরে-ধীরে ব'ল্‌লে—ভাখ মণি, যে জিনিসটা পাবার উপযুক্ত, সেটা অর্জ্জন ক'রতে হয় এবং যদি সেটা রাখবার উপযুক্ত ব'লে মনে হয়, তা'হলে তাকে প্রতিদিনই নূতন ভাবে অর্জ্জন ক'রে নিতে হয়।

কথাটা সমী ইংরাজীতেই বললে, তাইতে বুঝলুম সমী অন্যমনস্ক হ'য়ে গেছে। সেদিন আর গল্প জমাবার সম্ভাবনা নেই দেখে বাড়ী ফিরে এলুম।

সমী-র কথাটা কিন্তু আমার প্রাণের তারে ঘা দিয়েছিল। মনে ক'রলুম, মীরাকে এমন ক'রে আমার সঙ্গ-সুখ থেকে বঞ্চিত করা উচিত হয় না।

তার পরদিন সন্ধ্যায় মীরাকে ছাদে ডেকে পাঠালুম। মীরা জিজ্ঞাসা ক'রলে—আজ আর বন্ধুর কাছে যাবে না?

— না, আজকে তোমার কাছেই সন্ধ্যাটা কাটাব মনে করেছি।

—সে বেচারা একলা থাকবে?

—তুমিই বা কোন্ দোক্‌লা থাক্‌বে?

মীরা ব'সল, কিন্তু আড়ষ্ট হয়ে। ব'ললে—আমার এখন অনেক কাজ বাকী আছে। রাত্রির খাবার—

সেদিন ছিল্ রবিবার। ছুটীর দিনে বেলা ক'রে খাওয়া হ'ত। খাবার পর বিশ্রাম। দিবা-নিদ্রা থেকে উঠে দেখতুম, মীরা তখনও বৈকালিক জলখাবারের আয়োজনে ব্যস্ত। বিশেষ ক'রে ছুটীর দিনে তার এতটুকু বিশ্রামের অবসর থাক্‌ত না। এটা সব সময় আমার মনোযোগ আকর্ষণ ক'রত না—আমার নিজের কাজেই এত ব্যস্ত থাকতুম। কিন্তু আজ মীরার কথা শুনে তার বিশ্রামহীন কর্ম্ম-বহুল দিনগুলোর কথা মনে প'ড়ল। অনুতপ্ত হ'য়ে ব'ললুম—মীরা, তোমার খাটুনি তো রোজই আছে। আজকে একটু বিশ্রাম নিলে হয় না? আর এইবার থেকে একটু কম খাট্‌লেও চলে নাকি?

—কিন্তু আমি না করলে কে ক'রবে?

সত্যই তো। কাজ তো প'ড়ে থাকতে পারে না। আর মীরা ছাড়া কেই-বা তা ক'রবে?

চুপ ক'রে রইলুম। মীরা একটু সান্ত্বনার স্বরে ব'ললে—তুমি তোমার বন্ধুর কাছেই যাও আজ। আমি ততক্ষণ হাতের কাজগুলো সেরে নি।

সমী-র কাছে যাওয়াতে ইদানীং মীরা আর আপত্তি তুলত না, বরং নিজে থেকেই আমাকে পাঠিয়ে দিত সেখানে। আমার উপর মীরার বিশ্বাসটা অটুট ছিল এবং আমার নিঃসঙ্গ বন্ধুটীর উপরেও বিতৃষ্ণ ভাবটা চলে গিয়ে একটা মমতার ভাব ধীরে-ধীরে মীরার প্রাণে জেগে উঠ্‌ছিল;

অন্ততঃ আমার ধারণাটা তাই ছিল এবং তাতে আমি সুখী বই অসুখী হইনি।

কিন্তু সমী-কে একদিন নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াবার কথায় মীরা যখন আপত্তি তুললে, তখন একেবারে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম। সমী যাই বলুক না কেন, স্ত্রী-চরিত্র বাস্তবিকই দুর্জ্ঞেয়। মীরার জীবনের একটা সত্যকার সুখ ছিল পরিজনবর্গের সেবা করা—বিশেষ ক'রে তাদের খাওয়ানো। এতে তার ক্লান্তি ছিল না। সেই মীরাই সমী-কে খাওয়াবার কথায় ব'লে ব'সল—আমি অত আয়োজন ক'রে উঠ্‌তে পারব না।

—কিন্তু আয়োজনটা কি এত বেশী হবে? তুমি ত জান সমী-র খাওয়ার বিষয়ে কোন হাঙ্গাম নেই।

মীরার অনিচ্ছা দেখে আর বেশী জোর করলুম না। কথাটা ঘুরিয়ে নেবার জন্যে ব'ল্‌লুম—আচ্ছা মীরা, তোমরাও তো লাহোরে ছিলে—সমী-র সঙ্গে আলাপ হয়নি সেখানে?

—ওকে কে না জান্‌ত।

তার পর তোমার খাবার জলে কি একটা প'ড়েছে—এই ব'লে জলের গ্লাসটা হাতে নিয়ে মীরা বেরিয়ে গেল।

সেদিন আর কোন কথাই হ'ল না।

পূর্ব্বেই ব'লেছি, সমী-র আকর্ষণেই আমি তার কাছে যেতুম। সে আমার বাড়ীতে বড়-একটা আসত না। কোন দিন বেড়াতে যাবার খেয়াল হ'লে আমার বাইরের ঘরে উঁকি মেরে যেত, ক্বচিৎ তার সঙ্গে আমার বেড়াতে যাবার সুবিধা হ'ত।

একদিন সমী-কে টেনে নিয়ে একেবারে উপরে শোবার ঘরে গিয়ে উঠ্‌লুম। সেদিন মীরা কোথায় নিমন্ত্রণে গিছল। ঘরে ঢুকে সমী-র দৃষ্টি প্রথম প'ড়ল আমাদের বিবাহের ছবির উপর, তারপর প'ড়ল মীরার চুল বাঁধবার টেবিলের আর্শির সামনে একগুচ্ছ গোলাপ ফুল ছিল—তারি উপর।

ফুলগুলোকে একটু নাড়াচাড়া ক'রে সমী হাসতে-হাসতে ব'ললে—মণি, তোমার ঘরে এ ফুল কেন? জানই ত, গোলাপ ফুলের রং তৈরী হয়, হৃদয়-ছ্যাঁচা রক্ত দিয়ে। তোমার তো সে সব বালাই কিছু নেই।...... কিন্তু রক্তটা যে-সে লোকের হ'লে চ'লবে না—যারা দুঃখটাকে রাজা-রাজড়ার মত ভোগ ক'রতে পারে, রক্তটা তাদেরই বুকের হওয়া চাই। যাদের দীর্ঘ-নিঃশ্বাসটা জমাট বেঁধে তাজ-মহল তৈরী হয় – শুধু তাদেরই —বুঝলে?

বুঝলুম,তো সবই। তবে এটা মনে প'ড়ল যে, মীরা ঠিক ওই কথাই একদিন ব'লেছিল—বোধ হয় কোন কবিতার বই-এ প'ড়ে থাক্‌বে—এবং ঠিক ওই কারণেই সে গোলাপ ফুল ভালবাসত।

সমীকে তাই ব'ল্‌লুম, সে কোন উচ্চ-বাচ্য করলে না। তাকে কিন্তু সেদিন বেশীক্ষণ ধ'রে রাখতে পারা গেল না।

মীরা ফিরে এসে সমী-র কথা শুনে কি একটা পরিহাস ক'রলে, যাতে আমি না হেসে থাকতে পারলুম না। সমী-র কাছে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রলুম—তার ভিতর কি ছিল, যাতে আমার নির্ব্বাক প্রণয়িণীর মুখেও আজ কথা ফুটে উঠল—অতি সহজে এবং অতিশয় অনুরাগে।

হায়, এরূপ ভাবেই যদি চ'ল্‌ত, তা'হলে জীবন-পথের যাত্রাটা ধীরে-ধীরে অতর্কিতে সহজ হয়ে আসত—আক্ষেপের কারণ থাকত না। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ এবং—

পাড়ায় দেখা দিলে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা। প্রথম গুটীকতক রোগীকে সৎকার ক'রে এসে আমায় নিজেই শয্যা-গ্রহণ ক'রতে হল।

সমী ইদানীং ব'লত—চ'লে যাব; পথের ডাক এসেছে; একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগে না।

তার যাওয়া স্থগিত রাখতে হ'ল।

শিয়রে বসে থাকত আমার বাল্যবন্ধু, পায়ের কাছে ব'সে থাকত আমার স্ত্রী। তাদের দু'জনের মধ্যে ঔষধ-পথ্য ছাড়া আর কোন কথাই হ'ত না; কিন্তু যমের সঙ্গে যুদ্ধে যে শক্তিটা প্রয়োগ করা হচ্ছিল, সেটা উভয়েরই সমবেত শক্তি।

নিঃসঙ্কোচে সমী আমার বাড়ীর ভিতর আসত এবং কার্য্য শেষ ক'রে নিঃশব্দেই চ'লে যেত।

জ্বরটা ছেড়ে যাবার পর বিনিদ্র মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেবার জন্য ডাক্তার ঘুমের ওষুধের ব্যবস্থা ক'রলে একদিন। ব'ল্‌লে—আর ভয় নেই, বিপদটা কেটে গেছে।

মীরার নিঃশ্বাসটা সেদিন সহজ ভাবে প'ড়ল। সমী ব'ল্‌লে—আমার তাহ'লে আজ থেকে ছুটী।

ঘুমের ওষুধে নিদ্রাটা যে গভীর হয়, এ কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা ঘুমের ওষুধ কখনো ব্যবহার করেন নি। সে একটা অবস্থা—শরীরটা যাতে অসাড় হয়ে যায়, কিন্তু মনটা কতকটা সজাগ থাকে। স্বপ্নও নয়, জাগরণও নয়, নিদ্রাও নয়—অথচ এই তিনটের মিশ্রণ-জাত একটা অবস্থা।

সেই অবস্থায় মীরার কণ্ঠস্বর কাণে গেল—যেন কোন্ সুদূর স্বপ্নরাজ্যের পরপার থেকে সে সমীকে ব'ল্‌ছে—তুমি কেন এলে আবার?

—ঠিক যে তোমাকে দেখতে এসেছিলুম, তা' নয়।—সমীর শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠস্বরটাও মনে হ'ল অনেক দূর থেকে আস্‌ছে—অতি ক্ষীণ হ'য়ে।

মীরা ব'ল্‌লে—তা' জানি। তবুও—

—এর মধ্যে 'তবুও' কিছু নেই। জানতুম না যে তোমার সঙ্গে মণির বিবাহ হ'য়েছিল। জানলেও যে আসতুম না, তা' নয়।

—এতটুকুও দ্বিধা হ'ত না?

—কিছুমাত্র নয়। তোমার বিষয়ে আমার মন সম্পূর্ণ মুক্ত। আগাগোড়াই তাই ছিল।

তারপর একটু থেমে বল্‌লে—আর যাই কর মীরা, বিবাহিত জীবনে ভাবুকতা জিনিসটাকে প্রশ্রয় দিও না। সেন্টিমেণ্টালিটি বস্তুটা নিতান্তই সস্তা—ওটা নেহাৎ ইতর মনের খোরাক।

সমী-র কণ্ঠস্বরটা কি নিষ্ঠুর! কি কঠিন আঘাত না সে মীরাকে দিলে! আমার কিন্তু করবার কিছুই ছিল না—দেহ একেবারেই নিঃস্পন্দ, অবশ!

মীরা কোনও উত্তর দিলে না। সমী তখন কণ্ঠস্বরকে একটু কোমল ক'রে নিয়ে ব'ল্‌লে—আমি সবই জানি, মীরা। তুমি যে কতবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ-মনোরথ হয়েছ, তা'ও আমার অজানা নেই। আরও একবার চেষ্টা ক'রে দেখো, সফল হবে।......অন্ততঃ এইটুকু মনে ক'রো যে আমার অভিশপ্ত জীবনের মধ্যে জড়িয়ে প'ড়লে তুমি এর চেয়ে বেশী অসুখী হ'তে।......লাহোরের কথা মনে নেই?

সমী উঠে দাঁড়াল।

মীরা হতাশ নয়নে তার দিকে চাইলে—তুমি কি সত্যই চ'লে যাবে?

—কিছুদিন আগেই তো যাচ্ছিলুম।

—কোথায়?

—তোমার জেনে কোনও লাভ নেই।

দরজার কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে সমী বল্‌লে—সংসার-ধর্ম্মটা যখন মাথা পেতে নিয়েছ, তখন সেইটেই ভাল করে পালন কোরো। পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলোকে ভাবের রং-এ ছুপিয়ে নিও—সুখী হতে পারবে।......আর ভাবুকতা জিনিসটাকে উপন্যাসের পাতার ভিতর থেকে সংসারের মধ্যে টেনে আনতে চেষ্টা ক'র না—সর্ব্বনাশ হবে।

তারপর সমী চ'লে গেল। মনশ্চক্ষে দেখলুম, খাটের পায়া ধ'রে মীরা ব'সে আছে;—দ্বারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ, মনের কোনও সাড়া নেই।

মীরার উপর আঘাতটা খুবই কঠিন হ'য়েছিল, কিন্তু সমী নিজেকেও তো বাদ দেয় নি। যাকে ভালবাসত, তাকে আগাগোড়া বাঁচিয়ে এসেছে—নিজের কাছ থেকে। আর আজ? বন্ধুর জন্য, হয় ত বা মীরার জন্যও, পুরাতন ক্ষতের বাঁধনটা নিষ্ঠুর হাতে খুলে ফেলেছে। মীরাকে নিজের মনোভাব এতটুকুও জান্‌তে দেয় নি—সে তাকে ভুল বুঝে যেন সুখী হয়, এই মনে করে।

নিজের উপর সে যা আঘাত ক'রলে, তার গুরুত্বটা মীরাও হয় ত কোন কালে বুঝবে না।......

আর মীরা?......হায় অভিমানিনী, তুমি যে পশরা মাথায় করে আমার কাছে এসেছিলে, তার দুর্ল্লভতা যে কত, তা' একেবারেই বুঝিনি।......স্বামীর চরণে সর্ব্বস্ব দিয়ে তাহারি ভালবাসার প্রলেপে হৃদয়-ক্ষতটা মুছে নিতে চেয়েছিলে, মূঢ় অর্ব্বাচীন আমি তা তো কিছুই জানি নাই, অকর্ম্মণ্য হাতের অস্ত্র-প্রয়োগে ক্ষতটাকে বিঁধিয়ে দিয়েছিলাম মাত্র।......আজ শুনতে পাচ্ছি—বর্ষার দিনে, বসন্তের রাতে তোমার প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ হাহাকার, বুঝতে পাচ্ছি—প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়-যুদ্ধে জয়ী হবার সে কি ব্যর্থ চেষ্টা......

মনে মনে ব'ললুম—তোমায় জয়ী হ'তে সাহায্য ক'রব মীরা!......

তারপর মাথার ভিতর দিয়ে একটা রেখার ঢেউ খেলে গেল—সমস্ত সৃষ্টি—স্বপ্ন ও বাস্তব—এক-সঙ্গে সেই রেখা-সমুদ্রে ডুবে গেল।......

আমি বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়লুম।

*　　　*　　　*

তার পরদিন ডাক্তার এসে জানালে—আমি রোগমুক্ত। তার কাছে থেকেই শুনলুম যে সমীকেও ইনফ্লুয়েঞ্জায় ধ'রেছে এবং তাকে হাঁসপাতালে পাঠান হ'য়েছে।

দুদিন কোন খবর নিতে পারিনি। তৃতীয় দিনে একটা কথা শুনে মীরাকে সন্ধ্যাবেলায় ব'ললুম—সমী হাঁসপাতালে নেই, কোথায় গেছে কেউ জানে না। যে লোক খবর আনতে গিছল, তাকে কে-যেন ব'লেছে—সব শেষ হ'য়ে গেছে হয়ত।

আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে সংবাদটা একরূপ অসহ্যই হ'য়েছিল; মীরা কিন্তু এতটুকুও চাঞ্চল্য প্রকাশ ক'রলে না; এক-মনে আমার পথ্যের ব্যবস্থা ক'রতে লাগল—পূর্ব্বের মতই।

এই কি সেই স্বপ্ন-রজনীর মীরা? যা হারিয়েছে, তার জন্য এঁতটুকুও খেদ নাই? ক্ষুব্ধ মনটা আবার তিক্ত হ'য়ে গেল।......

সমী যাই বলুক না কেন—স্ত্রী-চরিত্র বাস্তবিকই দুর্জ্জ্ঞেয়। 'নারীর মনের কথা ইষ্ট-দেবতারা তো জানেনই না, স্বামী-'দেবতারাও জানেন না।

কিন্তু সে তিক্ত ভাবটা বেশীক্ষণ রইল না।......

রাত্রে জেগে দেখি, মীরা পাশে নাই। আলো জ্বেলে দেখলুম, বিছানার এক কোণে মীরা উপুড় হ'য়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বেচারি মীরা! ভুল বুঝে কি অবিচারটাই না তার উপর করেছি। মমতায় প্রাণটা পূর্ণ হ'য়ে গেল।......

মীরার পাশে ব'সে তার হাতের উপর ধীরে ধীরে হাত রাখলুম। মীরা কোন কথা না ক'য়ে চুপ ক'রে খানিকক্ষণ প'ড়ে রইল।......তারপর উঠে ব'সে আমার দিকে চাইলে। দেখলুম—তার চক্ষু অশ্রুহীন, মুখ প্রস্তর-কঠিন।......তার হাত আমার হাতের ভিতর তখনও ছিল।......

*　　*　　*　　*

আজ রোগমুক্ত হয়ে আরাম-কেদারায় শুয়ে ভাবছি... সে কথা ত পূর্ব্বেই ব'লেছি।

দেশবন্ধু

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

পলাশীর পাপে পতিত যে জাতি পরাধীনতার প্রগাঢ় পাঁকে,
চিরলাঞ্ছনা গঞ্জনাভার, ধিক্কার লোকে দিয়াছে যাকে,
হেলায় হেলিত তর্জ্জনী যত যাহাদের পানে ঘৃণার ভরে,
সহোদর সহ সদ্ভাবহীন, বিবাদ যাদের নিত্য ঘরে,
তারা কি মানুষ? ভীরু, কাপুরুষ, দীন, দুর্ব্বল, স্বার্থসার,
জন্ম অবধি শুনেছিনু যার হেন দুর্নাম তিরস্কার—
সহসা সে কোন্ অভিনব তেজে বঙ্গবিভাগ আন্দোলনে,
হুঙ্কার দিয়া উঠেছিল জাগি বিস্মিত করি বিশ্বজনে!
হিন্দুস্থান অবাক্ হেরিয়া মরণ-মরিয়া তাদের প্রাণ!
বাঙালী সেদিন দেশের পূজ্য পেয়েছে বীরের শ্রদ্ধা মান!

গেছে তারপর কেটে একে একে দীর্ঘ বরষ পঞ্চদশ,
শ্রান্ত বাংলা সুখশয্যায় অবসাদে যবে নিদ্রালস,
এসেছে সহসা সিন্ধু আলোড়ি প্রলয়োচ্ছাসে ঝঞ্ঝাবাত,
সুপ্ত শিবিরে মরণের ভেরী—নিদ্রিত শিরে বজ্রাঘাত!
স্খলিত খলিফা খিলাফৎ হতে, পীড়িত পঞ্চনদের তীর—
নিস্ফল রোষে ফোঁসে আফ্‌শোসে তেত্রিশ কোটী আহত শির,
কাঁপে অগণন বিদ্রোহী মন সহসীমার সূত্রপরে;
অগ্নি-গর্ভ আগ্নেয় যেন তীব্র জ্বালায় গুমরি মরে!
মহা দুর্য্যোগ দুর্ব্বার হেরি গুর্জ্জর-গুরু গর্জ্জি উঠে,
মৈত্র্যের তূর্য্য বাজায়, বীর্য্য জাগায়, শঙ্কা টুটে!

অহিংসা-মূল-অসহযোগের বন্যা ছুটেছে দেশের বুকে,
মুক্তির আশা, মোক্ষ পিপাসা—ফুটিয়া উঠেছে লক্ষ মুখে!
হীন পশুবল করিতে বিকল অন্তর-বল সহায় করি,
হত্যা রুধিতে সত্যাগ্রহ আগ্রহে সবে লয়েছে বরি!
বিরোধ ভুলিয়া সহোদর আজ হিঁদু মোস্‌লেম মারাঠা শিখে
মিলনোল্লাসে উঠে ঘন-রোল, জয়! জয়! বোল্‌ দিগ্বিদিকে!
রুদ্ধ-দুয়ার বাংলার দ্বারে করি করাঘাত বারম্বার
উত্তর আশে উৎসুক হ'য়ে মুখ চেয়ে সবে রয়েছে তার;
সুখ-শয়নের অলস-বিলাসে বাংলা কি শুধু ঘুমায়ে রবে?
নব জাগরণ মহাযুগে আজ লজ্জা কি তার ঘোষিত হবে?

গুরুগম্ভীর জলদকণ্ঠে নিঃসৃত তব অগ্নি বাণী—
মর্ম্মরময় মর্ম্মেরও মাঝে এ কি সজীবতা দিল গো আনি?
সে কি আহ্বান—মেতে ওঠে প্রাণ, শিরায় শিরায় রক্ত নাচে,
শ্রেয় কারাগার, পীড়ন, প্রহার, মৃত্যু মধুর যাহার কাছে!
তোমার তন্ত্রে অভয় মন্ত্রে অসাড় যন্ত্রে জাগায় সাড়া,
দেশ জুড়ে আজ সাজ সাজ রব, রুগ্ন স্থবির হয়েছে খাড়া!
করুণ-কঠোর বজ্র-সজোর অমোঘ তোমার শঙ্খ-রবে
ধনী নির্ধন উচ্চ কি নীচ আসে নর-নারী বালক সবে!
হেসে আগুয়ান বলি দিতে প্রাণ-স্বদেশের মান প্রধান বুকে,
বিধির বিকার না করি স্বীকার বরে কারাগার দীপ্ত মুখে!

পাঞ্জাব-রথ ডাকে লজপৎ বেণী-নিবদ্ধ-কৃপাণ শিরে,
ধনীর দুলাল ডাকে মতিলাল পুণ্য প্রয়াগ-তীর্থ-তীরে,
প্রণবোঙ্কারে শঙ্কর ডাকে মান্দ্রাজমণি সারদা-পীঠে,
ভীমবলশালী ডাকে দুই আলী স্বদেশ-প্রেমের দীপালী দীঠে!
"উঠ উঠ বীর সুখ-যামিনীর আত্মবিনাশী তন্দ্রা ভাঙি,
নিখিল ভারত হতাশ হবে কি বাংলার দ্বারে ভিক্ষা মাঙি?
ধন্য যে জাতি অগ্রগণ্য দেশের জন্য জীবন দিয়া,—
দেশ জোড়া এই জীবন-যজ্ঞে নির্ব্বাণ কেন তাহার হিয়া?
মরণ মেলায় ক্ষণিক খেলায় এলায়ে কি গেছে তাহার স্নায়ু?
বিষ-কণ্টক বিস্ফোটকের নাটকে কি তার ফুরাল' আয়ু?—"

কোন্‌ মহাত্মা অজেয় আত্মা আত্মজয়ের মন্ত্রদানে
জীবনের বীজ শ্রবণে ফুকারি অমর দীক্ষা দিয়াছে প্রাণে!
ভীরু যারা ছিল বর্জ্জিল ভয়, অর্জ্জিল জয় হৃদয়ে আজ,—
দিল গোলামীর সেলামী ফেলিয়া দাসের নিশানা তকমা তাজ!
তরুণ তরল সেবকের দল স্থির অবিচল অত্যাচারে
জনে জনে কয়—'গান্ধীর' জয়!' বুক পেতে সয় পীড়নভারে,
বিধি বাধা চুর, লাজ ভয় দূর, অন্তঃপুর তেয়াগি নারী
পতি পুত্রের সাথী হ'তে চলে স্বদেশ-প্রেমের বহিয়া ঝারি,
মন্দির হ'ল বন্দী-নিলয়, শৃঙ্খলভার পুষ্পহার,—
স্বরাজ-তীর্থ আজ কারাগার, জন্ম-আগার স্বাধীনতার!

না মিলাতে ডাক দূর দিগন্তে কে দিল গো খুলি রুদ্ধ-দ্বার?
হুঙ্কারে কাঁপে ভাগীরথী-তীর 'হাজির' 'হাজির' ধ্বনিতে কার?
বাংলা মুলুক বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করি পূর্ব্বাকাশে
কে তুমি এলে গো মহাজ্যোতিষ্ক, দীপ্ত-অরুণ-কিরণাভাসে!
তোমার ত্যাগের দিব্য বিভায় তরুণ-উষার আলোক-রেখা—
এনে দিল একি নূতন প্রভাত, নবজীবনের বিজয়-লেখা!
তন্দ্রা-অলস বিলাস ফেলিয়া বাঙালী আবার দাঁড়াল উঠে!
শয়ন-সুপ্ত যৌবন তার চঞ্চল বেগে আবার ছুটে!
শীর্ণ-তোয়ার বক্ষে আবার পূর্ণ জোয়ার উচ্ছসিত,
দ্বন্দ্ব-দ্বিধায় অন্ধেরও আজ বন্ধ নয়ন উন্মীলিত!

বন্দি তোমারে, হে রাজ-বন্দী! জাতির জীবন-সন্ধিক্ষণে,—
বন্ধনভয় ঘুচায়ে সবারে অভয় করিয়া তুলেছো মনে;
জন্মভূমির প্রেমে যোগী তুমি মাতৃসেবক হে তপোধন,
অসহযোগের যজ্ঞে তোমার সমাহিত কায় বাক্য মন;
ত্যাগের তিলকে ললাট তোমার সূর্য্যের মত-সমুজ্জ্বল,
অস্ত্র তোমার প্রেমের অনল, বীর্য্য তোমার আত্মবল!
তোমার ত্যাগের তূর্য্য বাজায় ধূর্জ্জটী আজ পিনাকটাটে,
নিখিল ভারত বরিয়াছে দেব, তোমারেই তার রাষ্ট্রপাটে;
স্বরাজের আজ মহা-অধিবাস কাটে নাগপাশ লক্ষ-শির,
মাতৃপূজার পুরোহিত তুমি, যজ্ঞেশ্বর যোগ্য বীর!

প্রেমে অনাবিল যে দরাজ দিল্ দেখায়েছ' আজ দেশের কাজে,
তার গরিমার চরম সীমায়,—মহামানবের মহিমা রাজে!
জাতির গর্ব্ব মান মর্য্যাদা—শিরে ল'য়ে—একা শীর্ষ তুলি,
নির্ভয়ে তুমি দাঁড়ায়েছ বীর, বিঘ্ন বিপদ শঙ্কা ভুলি;
মূক নির্ব্বাকে মুখর করেছ', মৌন কণ্ঠে দিয়েছ ভাষা,—
মৃত্যু-মলিন মৃতদেহে দেছ' মৃত্যুঞ্জয় জীবন আশা!
"ছার কারাগার পরাধীন যার জীবন আধার জন্মভূমি,—
স্বদেশ তাহার মহাকারাগার"—এ কথা প্রথম শোনালে তুমি—
কল্পনা তব সতত বৃহৎ, কামনা মহৎ চিত্ত মাঝে—
পরিচয় তার দিলে কতবার জীবনের তব শতেক কাজে!

কাব্যকুঞ্জ কাননে তোমার গাহিয়াছে বীণা 'সাগর'-গান,
বঙ্গ-বাণীর চরণ-পদ্মে দিয়াছ শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান;
দীনা অসহায়া আশ্রয়হীনা পতি-সুতহারা জননী যত,
অনাথা আতুর আশ্রমে তব আশ্রয় তারা পেয়েছে কত;
দাক্ষিণ্যের তুমি অবতার, হে চির উদার, অমিত-দান—
কত বিপন্ন অভাবগ্রস্তে করেছ' করুণা অপ্রমাণ!
হৃত-বৈভব-বল-বাণিজ্য, বিশ্বে যাহারা নিঃস্ব, হীন,
দীন স্বজাতির কল্যাণ তব জাগ্রত হৃদে রাত্রি দিন।
পরের সেবায় সব ঢেলে দিয়ে নিঃস্ব হয়েছো আপনি শেষ—
কীর্ত্তি তোমার হে দেশবন্ধু! গুণ গৌরবে ভ'রেছ দেশ!

মনে পড়ে তব বিপুল প্রয়াস অরবিন্দের রাখিতে মান,
স্বদেশীর যুগে স্বদেশভক্ত বন্দীগণের বাঁচাতে প্রাণ!
মুক্তি পথের পথিক যাহারা ভাবী ভারতের তরুণ মণি
সদা সমাদর করেছ' তাদের নর-নারায়ণ-তুল্য গণি!
ছার সে শিক্ষা শিক্ষায় যার সার সবাকার ভিক্ষাঝুলি,
মানুষেরে করে অমানুষ যাহে দাস মনোভাব বাড়ায়ে তুলি,
বিদ্যা নয় সে অবিদ্যা জেনে কায়মনে ছিলে বিরোধী তার;
পতিতেরে পুন অতীতে ফিরাতে সতত সেধেছ' কর্ণধার!
শিল্পকলার পুনরুদ্ধার, লুপ্ত জ্ঞানের উদ্বোধন—
নিজ সভ্যতা, স্বজাতীয় প্রথা—রক্ষা করিতে ক'রেছ পণ!

'বাংলার কথা' বাঙালী যেদিন শুনিল প্রথম তোমার মুখে—
'কহিল ধন্য, দেশের জন্য বেদনা যে এত বহিছে বুকে';
শ্রদ্ধা সে দিন দিল নিবেদিয়া সজ্জন যারা তোমার পায়,
অবোধ যাহারা দিল পরিহাস ব্যঙ্গচিত্রে পত্রিকায়,
যশ-বিদ্বেষী ভণ্ড যে জন, চেষ্টা সে আজও করিছে কত
তোমার ত্যাগের বিরাট স্তূপকে ধ্বংস করিতে ধূলার মত!
তোমার প্রসাদ-পুষ্ট-কাঙাল – পুড়ে মরে আজ ঈর্ষ্যানলে,
বিদেশীর পায় আত্ম বিকায়, বিবেকবুদ্ধি ভাসায়ে জলে!
অন্তরে ভরা স্বার্থ-গরল, দেশভক্তের মুখোস পরা,
পয়ো-মুখ যত বিষকুম্ভের কপটতা আজ পড়েছে ধরা!

ছিলে সৌখীন চরম বিলাসী সরমে, সকলি ছেড়েছো আজ,
অঙ্গে তোমার গৌরবে শোভে গরীব দেশের শুভ্র সাজ;
পরকৃতবাস, বিষয়াভিলাষ, বিদেশী আহার-বিহার বিষ,—
মাতৃভূমির মঙ্গলে মন মত্ত এখন অহর্নিশ!
দেশ-জননীর পূজার লাগিয়া বরণ করেছ' কঠোর ব্রত,
সব সুখসাধ করি অবসাদ মায়ের সেবায় হ'য়েছ' রত,
তপো-নিষ্ঠার প্রভাবে তাপস করেছ' আপন আত্মজয়,
ক্রম দীক্ষার শিক্ষা লভিয়া মুক্ত তোমার ভাবনা ভয়;
বাকি ছিল শুধু কারা-বিভীষিকা শবসাধনার শ্মশান মাঝে,
বন্দীবলয় শৃঙ্খলে হ'ল পূর্ণাভিষেক দেশের কাজে!

জন-বরেণ্য, সুকৃতিমন্ত, জন্ম জীবন ধন্য তব,
তোমার পুণ্য প্রভাবে বঙ্গ অর্জ্জিল পুন জন্ম নব!
বর্ব্বরতার গর্ব্বকে আজ খর্ব্ব ক'রেছ' দর্পভরে—
দানব শক্তি মানে পরাভব, জয়ী অহিংসা হিংসা-পরে!
তব পদাঙ্ক-সঙ্কেতে দূর ঘোর সঙ্কটে শঙ্কা আজ,
আসন তোমার সবার উচ্চে তুলিয়া ধরেছে তোমার কাজ!
চিত্ত তোমার সত্যাগ্রহ মহাসাধনায় সিদ্ধকাম,
দেশভক্তের ইতিহাসে রবে স্বর্ণাক্ষরে তোমার নাম!
নমঃ নমঃ নমঃ পুরুষোত্তম স্বাধীন-সোহং-স্বরাট্ তুমি,
সার্থক আজ স্বদেশ তোমার—সার্থক আজ মাতৃভূমি!

বিধবা

আলোচনা

"কৃষ্ণকান্তের উইল'—(২)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন এম-এ]

'গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয়পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগিল। অন্ধকার চিত্রপট—উজ্জ্বল চিত্র! দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল। তখন সংসার তাহার চক্ষে—যাক পুরাতন কথা আমার তুলিয়া কাজ নাই।' 'রোহিণী সহসা গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইল।' (৯ম পরিচ্ছেদ।) 'গভীর জলে ক্ষেপণী-নিক্ষেপে তরঙ্গ উঠিল।' (ইন্দিরা, ১১শ পরিচ্ছেদ) —তুলনীয়।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র অবৈধ প্রণয়ের বর্ণনা-স্থলে স্পষ্টাক্ষরে ইহার দোষ-ঘোষণা (Condemnation) করিয়াছেন, এবং পাত্র-পাত্রী প্রথম হইতেই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন এরূপ চিত্র অঙ্কিত করেন নাই, তাহাদের হৃদয়ের দ্বন্দ্বের, প্রবৃত্তির ও ধর্ম্মজ্ঞানের সংগ্রামের—বিবরণ দিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও সেই পদ্ধতির ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহাই তাঁহার ভাষায় সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব, ইউরোপের মধ্যযুগের ধারণায় Strife between the good angel and the evil angel; ৭ম পরিচ্ছেদের শেষে ইহার আরম্ভ, ৮ম ও ৯ম পরিচ্ছেদে ইহার বেগবৃদ্ধি। গোবিন্দলালের 'অসময়ে করুণা' ও তাঁহার প্রতি অঙ্কুরিত প্রণয়—এই উভয়ের প্রভাবে উইল চুরির ব্যাপারে তাঁহার প্রতি 'বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ' ("এমন লোকেরও সর্ব্বনাশ করিতে আছে?") রোহিণীর মনে বিঁধিতে লাগিল। গোবিন্দলালের প্রতি ন্যায়পরতার সঙ্কল্প ও চেষ্টা তাহার হৃদয়ে প্রবল হইল। কিন্তু উপায় কি? প্রথম অবস্থায় আত্মহত্যার কথা ('কলসী-দড়ি-সহযোগে') মনে হইল। কিন্তু তাহাতে ত গোবিন্দলালের গুরুতর অনিষ্টের প্রতীকার হইবে না। নানা উপায়ের কথা ভাবিয়া শেষে রোহিণী আবার উইল চুরি করাই শ্রেয়ঃকল্প স্থির করিল। কিন্তু 'সে রোহিণী আর নাই।' রোহিণী এখন শীর্ণা, ক্লিষ্টা, বিবশা? 'হরলালের লোভে' যে সাহস দেখাইয়াছিল এখন গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয়ের প্রাবল্যেও সেই সাহস দেখাইয়া সে কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা করিল, কিন্তু 'অদৃষ্টবশাৎ' ধরা পড়িল।

কথায় কথায় অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। ব্যাপার এতদূর গড়াইবার পূর্ব্বে রোহিণীর হৃদয়ে গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয় কেমন বদ্ধমূল হইল তাহার উল্লেখ করিয়াছি। আখ্যায়িকা-কার এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন সুমতি কুমতি দুই জনে সন্ধি করিয়া, 'সখ্যভাবে' গোবিন্দলালের 'দেবমূর্ত্তি রোহিণীর মানস-চক্ষের অগ্রে ধরিল।' এবং বুঝাইয়াছেন 'সুমতি কুমতির সদ্ভাব অতিশয় বিপত্তিজনক।' ফলতঃ কুমতিরই 'জয় হইল।' কিন্তু রোহিণী স্রোতে গা ঢালিয়া দিল না। 'রোহিণী অতি বুদ্ধিমতী, একবারেই বুঝিল যে মরিবার কথা। যদি গোবিন্দলাল ঘৃণাক্ষরে এ কথা জানিতে পারে, তবে কখনও তাহার ছায়া মাড়াইবে না। হয় ত গ্রামের বাহির করিয়া দিবে। কাহারও কাছে এ কথা বলিবার নহে। রোহিণী অতি যত্নে মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিল। কিন্তু যেমন লুক্কায়িত অগ্নি ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া আইসে, রোহিণীর চিত্তে তাহাই হইতে লাগিল।' (৯ম পরিচ্ছেদ। হীরার সহিত তুলনীয়। 'বিষবৃক্ষ' ৩৩শ পরিচ্ছেদ।)—'কার্পাসমধ্যস্থ তপ্ত অঙ্গারের ন্যায় ইত্যাদি) ইহাতে একদিকে রোহিণীর বর্দ্ধমান প্রণয়কে প্রাণপণে চাপিবার চেষ্টা, অপরদিকে গোবিন্দলালের এখন পর্য্যন্ত পাপের প্রতি ঘৃণা ও শুচিতা বুঝা যায়। 'জীবনভার বহন করা, রোহিণীর পক্ষে কষ্টদায়ক হইল। রোহিণী মনে মনে রাত্রি-দিন মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল', বটে, কিন্তু মরিতে পারিল না। এ বিষয়ে সে কুন্দের সহিত ('বিষবৃক্ষ' ১৬শ পরিচ্ছেদ)

তুলনীয়। কুন্দ যেমন নগেন্দ্রনাথকে দূর হইতে শুধু দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় ডুবিয়া মরিতে পারিল না, রোহিণীও সেইরূপ গোবিন্দলালকে দূর হইতে শুধু দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় ডুবিয়া মরিতে পারিল না। সেই আশায়ই (রজনীর রামসদয় মিত্রের বাটীতে যাওয়ার মত) 'সেই অবধি নিত্য কলসী কক্ষে রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়, নিত্য কোকিল ডাকে, নিত্য সেই গোবিন্দলালকে পুষ্পকানন-মধ্যে দেখিতে পায়।'

পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি, উভয় আখ্যায়িকার প্রধান ব্যাপার দাম্পত্যপ্রণয়, অপ্রধান ব্যাপার বিধবা-ঘটিত অবৈধ প্রণয়। সেই জন্য 'বিষবৃক্ষে' দেখা যায় নগেন্দ্রনাথ-কুন্দনন্দিনীর হৃদয়ে প্রণয়-সঞ্চারের পূর্ব্বেই (যদিও সূর্য্যমুখীকে আসরে নামান হয় নাই, তথাপি) ১ম পরিচ্ছেদে 'নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা'র আরম্ভেই রহিয়াছে—'ভার্য্যা সূর্য্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, .. ঝড়ের সময় কখন নৌকায় থাকিও না। নগেন্দ্র স্বীকৃত...নহিলে সূর্য্যমুখী ছাড়িয়া দেন না।' ইহা হইতে বুঝা যায় সূর্য্যমুখী কেমন পতিপ্রাণা, এবং নগেন্দ্রনাথও কেমন পত্নীবৎসল। গ্রন্থারম্ভেই এই দাম্পত্য প্রণয়ের সুর বাঁধা হইল (the key-note is struck)। পরে ৫ম পরিচ্ছেদে সূর্য্যমুখীর পত্রও এই সুরে ভরপূর। বর্ত্তমান আখ্যায়িকায়ও গোবিন্দলালের হৃদয়ে রোহিণীর প্রতি প্রণয়-সঞ্চার হইবার পূর্ব্বেই (১ম খণ্ডের ১০ম ও ১২শ পরিচ্ছেদে) দুইটি পরিচ্ছেদে গোবিন্দলাল-ভ্রমরের গভীর অনাবিল প্রণয়ের, একাত্মতার, উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। উইল চুরির সংবাদ পাইয়া 'রোহিণী যে নিরপরাধিনী, ভ্রমরের তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল।' 'গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন।' আবার উভয়েই 'রোহিণীকে বাঁচাইতে' ব্যগ্র। এ সবই উভয়ের একাত্মতার পরিচয়। ইহারও পূর্ব্বে ৭ম পরিচ্ছেদে 'কুসুমিত বৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে—কি সুর মিলিল!'—ইহার (Symbolism) সঙ্কেত লক্ষ্য করিলেও গোবিন্দলালের উপর ভ্রমরের একান্ত-নির্ভরের 'ধ্বনি' উপলব্ধি করা যায়।

আর একটি কারণে আখ্যায়িকা-কার এই দুইটি পরিচ্ছেদে দাম্পত্য-প্রণয়ের উজ্জ্বল সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। রোহিণীকে বাঁচাইবার এই চেষ্টার সূত্র হইতেই গোবিন্দলাল-ভ্রমরের প্রণয় শিথিলমূল হইবে, তাই ভবিষ্যৎ দুর্দ্দিনের পূর্ব্বে বর্ত্তমান সূর্য্যালোক উজ্জ্বলভাবে পাঠকের হৃদয়মুকুরে প্রতিফলিত করিবার প্রয়াসে এই চিত্র অঙ্কিত। এক্ষণে উইল চুরির ফল কি হইল তাহার আলোচনা করি। উইলচুরির ব্যাপারের সহিত রোহিণীর প্রণয়ের বিকাশ নিবিড়ভাবে সম্বদ্ধ, ইহা আখ্যায়িকা-কারের কলাকৌশলের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

১১শ পরিচ্ছেদে গোবিন্দলাল রোহিণীর উদ্ধারের জন্য 'জ্যেঠা মহাশয়ের' নিকটে উপস্থিত হইলে 'রোহিণী অবগুণ্ঠন ঈষৎ মুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি ক্ষণিক কটাক্ষ করিল'। এ কাতর কটাক্ষের অর্থ ভিক্ষা...বিপদ হইতে উদ্ধার। সেই বাপীতীরে গোবিন্দলাল রোহিণীকে বলিয়াছিলেন, "তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে আমাকে জানাইও।" আজি ত রোহিণীর কষ্ট বটে, বুঝি এই ইঙ্গিতে রোহিণী তাহা জানাইল।'

গোবিন্দলালের হৃদয়ে কেবল দয়া, রোহিণীর 'মঙ্গল সাধি'বার ইচ্ছা; কিন্তু রোহিণীর কটাক্ষে কৃপাভিক্ষা ও কষ্টের ইঙ্গিত ছাড়া আরও কিছু ছিল, ১২শ পরিচ্ছেদে তাহা রোহিণীর মুখে প্রকাশিত হইয়াছে। গোবিন্দলালের উপকারের জন্য রোহিণী কেন উইল বদলাইতে গেল, তাহার উত্তরে সে মনের নিভৃত কোণে যে বেদনা যে নৈরাশ্য লুক্কায়িত ছিল তাহার আভাস দিল।—"যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পাই নাই—যাহা ইহজন্মে আর কখনও পাইব না—আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন। ইহজন্মে আমি বলিতে পারিব না—কি। এ রোগের চিকিৎসা নাই—আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে খাইতাম।" 'গোবিন্দলাল বুঝিলেন। বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার আহ্লাদ হইল না—রাগ হইল না—সমুদ্রবৎ সে হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল।' এবারেও 'Pity melts the mind to love' এই উক্তি সার্থক হইল না। 'মৃত্যুই বোধ হয়' রোহিণীর পক্ষে ভাল ইহা বুঝিয়াও (গ্রন্থকার এখানে নিজের জোবানী কথাটা না বলিলেও বুঝিতে হইবে—কুন্দের বেলায় যেমন তেমনই এক্ষেত্রেও তাঁহার ইহাতে সায় আছে) গোবিন্দলাল তাহাকে দেশত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন—কেন? 'তোমায় আমায় দেখা শুনা না হয়।' 'রোহিণী দেখিল, গোবিন্দলাল

সব বুঝিয়াছেন।' মনে মনে বড় অপ্রতিভ হইল—বড় সুখী হইল। তাহার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল। আবার তাহার বাঁচিতে সাধ হইল। আবার তাহার দেশে থাকিতে বাসনা হইল।' এখনও তাহার হৃদয়ে দ্বন্দ্ব চলিতেছে। 'সে আপাততঃ প্রস্তাবে সম্মত হইল, কিন্তু—সে পরের কথা পরে বলিব। বুদ্ধিমতী রোহিণী তখনও বিচারবুদ্ধি হারায় নাই, উভয়ের কলঙ্কের ভয়ে গোবিন্দলালকে তাহাকে ছাড়াইবার জন্য অনুরোধ করিতে নিষেধ করিল, তিনি ভ্রমরের সাহায্যে কার্য্য উদ্ধার করিবেন বলিলেন। 'রোহিণী সজলনয়নে গোবিন্দলালকে দেখিতে দেখিতে ভ্রমরের অনুসন্ধানে গেল। এইরূপে, কুলঙ্কে, বন্ধনে, রোহিণীর প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ হইল।'

অবশ্য এখন পর্য্যন্ত ইহা একতরফা। গোবিন্দলালের হৃদয়ে কেবল 'দয়ার উচ্ছ্বাস।' গোবিন্দলাল রোহিণীর 'পরীক্ষা'য় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন। রোহিণীর প্রণয়ের কথা শুনিয়াও তিনি অবিচলিত। ভ্রমরের 'বড় লজ্জা করে' বলিয়া শেষে গোবিন্দলালকেই জ্যেঠা মহাশয়ের দ্বারস্থ হইতে হইল;—'রোহিণীর কথা বলিতে প্রাতে কোন লজ্জা করে নাই—এখন একটু লজ্জা করিতে লাগিল। বারুণী পুকুরের কথা হইয়াছিল বলিয়া কি এখন লজ্জা?' যাহা হউক, অনেক কষ্টে কার্য্য উদ্ধার হইল। গোবিন্দলাল জ্যেঠা মহাশয়ের কাছে 'বারুণী পুষ্করিণী-ঘটিত কথাগুলি গোপন করিলেন।' এ লজ্জা-সঙ্কোচ স্বাভাবিক, ইহা তাঁহার চিত্তবিকারের লক্ষণ নহে।

রোহিণী দেশত্যাগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কার্য্যকালে মন বাঁধিতে পারিল না। অবস্থা ঠিক কমলমণির সহিত কলিকাতা যাওয়ার প্রস্তাবে কুন্দের মতই। ('বিষবৃক্ষ', ১৪শ ও ১৬শ পরিচ্ছেদ।) রোহিণী কাঁদিতে বসিল। "এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না—না দেখিয়া মরিয়া যাইব। আমি কলিকাতায় গেলে, গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইব না। আমি যাইব না। এই হরিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্গ, এখানে গোবিন্দলালের মন্দির!... গোবিন্দলাল রাগ করিবে, করে করুক,—তবু আমি তাহাকে দেখিব।...আমি যাব না। কলিকাতায় যাব না—কোথাও যাব না। যাই ত, যমের বাড়ী যাব।" উইলচুরির ব্যাপারে কলঙ্কের ভয়ও সে করে না। 'এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, কালামুখী রোহিণী আবার—"পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ" সেই গোবিন্দলালের কাছে চলিল।' (তাহার অসংযমের condemnation—দোষ-ঘোষণা করিয়া অমনি আখ্যায়িকা-কার তাহাকে 'কালামুখী' বলিয়াছেন ইহা লক্ষণীয়।)

সে তখনও যুঝিতেছে, প্রার্থনা করিতেছে 'হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি—তাহাকে যতবার দেখিব, ততবার আমার অসহ্য যন্ত্রণা—অনন্ত সুখ। আমি বিধবা—আমার ধর্ম্ম গেল—সুখ গেল—হে দেবতা! হে দুর্গা—হে কালি—হে জগন্নাথ—আমায় সুমতি দাও—আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।' এইখানে কুন্দের চরিত্রের সঙ্গে প্রভেদ। কোমলপ্রকৃতি কুন্দ সূর্য্যমুখীর অনিষ্টের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মরক্ষার জন্য, জ্বালা নিবারণের জন্য, সুমতি-লাভের জন্য, এমন ব্যাকুলভাবে জগদীশ্বরের শরণ লয় নাই, সে কুমারীকাল হইতে নগেন্দ্রের প্রেমে ডুবিয়া গিয়াছিল। পক্ষান্তরে দৃঢ়প্রকৃতি (robust-natured) রোহিণী ভ্রমরের অনিষ্টের কথা একবারও ভাবে নাই, বৌঠাকরুণের চুলের দড়ি বিনাইবার জন্য নিজের কেশ কাটিয়া দিতে চাহিতেছে, ভ্রমরের উপর তাহার অনুরাগ এই পর্য্যন্ত। (অবশ্য কুন্দ যেমন সূর্য্যমুখীর নিকট উপকার পাইয়াছিল, রোহিণী ভ্রমরের নিকট তেমন কোনও উপকার পায় নাই যাহার জন্য কৃতজ্ঞ থাকিবে) কিন্তু নিজের চরিত্ররক্ষার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে দেবতাকে ডাকিয়াছিল। (হীরার চরিত্রেও দ্বন্দ্বের প্রথম অবস্থায় এই দৃঢ়তা দেখা যায়।)

অবশ্য এত করিয়াও রোহিণী (ও হীরা) মন বাঁধিতে পারে নাই। "তবু সেই স্ফীত, হৃত, অপরিমিত প্রেম-পরিপূর্ণ হৃদয় থামিল না। কখনও ভাবিল গরল খাই, কখনও ভাবিল গোবিন্দলালের পদপ্রান্তে পড়িয়া, অন্তঃকরণ মুক্ত করিয়া সকল কথা বলি, কখনও ভাবিল পলাইয়া যাই, কখনও ভাবিল বারুণীতে ডুবে মরি, কখনও ভাবিল ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাই।" এতটা প্রবল দ্বন্দ্ব, এতটা আকুলতা, এতটা চাঞ্চল্য, (এতটা "ব্যাপকতাও" বলা যাইতে পারে), কুন্দের

প্রকৃতিতে নাই। রোহিণীর প্রকৃতি যেমন সবল, তাহার প্রবৃত্তিও তেমনই প্রবল। কোমল-প্রকৃতি কুন্দের মনে নগেন্দ্রনাথকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাওয়ার মত উৎকট চিন্তা আসিতে পারে না। নগেন্দ্রনাথ আসিয়া নূতন করিয়া মোহ বিস্তার না করিলে কুন্দ বোধ হয় ("বিষবৃক্ষ" ১৩শ পরিচ্ছেদ) ডুবিয়াই মরিত। যাক্ সে কথা। রোহিণীর দেশত্যাগে অনিচ্ছার কথা শুনিয়া গোবিন্দলাল "অধোবদন হইলেন"। রোহিণী তখন চক্ষের জল লুকাইয়া মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়া গেল। (১৪শ পরিচ্ছেদ।) হরিদাসী বৈষ্ণবীর ব্যাপারে সূর্য্যমুখীর তিরস্কারে কুন্দর জীবন-তরী এক পথে চলিয়াছিল; আর এক্ষেত্রে রোহিণীর আসক্তির কথা শুনিয়া ভ্রমর তাহাকে যে পরামর্শ-চ্ছলে তিরস্কার করিয়া পাঠাইল, তাহার ফলে রোহিণীর জীবন-তরী অন্যপথে চলিল। সে কথা পরে বলিতেছি।

রোহিণী চলিয়া গেলে গোবিন্দলাল নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে ভাবনা অবশ্য রোহিণীর অবস্থা বুঝিয়া তাহার প্রতি গভীর দয়াবশতঃ। এখনও প্রণয় আসিয়া সেই দয়ার উৎস আবিল করে নাই। তখন ভ্রমর আসিয়া উপস্থিত হইল; ভ্রমরের পূর্ব্ববৎ স্বামীর উপর অটল বিশ্বাস, স্বামী যে তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ভাবিতে পারেন ইহা তাহার বুদ্ধির অগম্য, স্বামী রোহিণীকে ভালবাসেন স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া তখনই 'মিছেকথা' ধরিয়া ফেলিল ও প্রণয়-কলহে কুপিত হইয়া স্বামীর গালে 'ঠোনা মারিল'। গভীর দাম্পত্যপ্রণয়ের প্রায় শেষ অঙ্কের এই দৃশ্য প্রাণস্পর্শী। এদিকে ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করিলে গোবিন্দলালের বাক্যগুলির—"সর্ব্বে সর্ব্বময়ী আর কি," "সিয়াকুল-কাঁটা" (রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তুলনীয়) "রোহিণীকে ভাবছিলাম", "আমি রোহিণীকে ভালবাসি" "তোমার সাত রাজার ধন এক মাণিক এখনও ত কেড়ে নেয় নি" Irony লক্ষণীয়। ভ্রমরের কাছে শেষে কথাটা প্রকাশ করিলেন, রোহিণী আমায় ভালবাসে। গোবিন্দলালের এই শেষ ভ্রমরের নিকট অকপটে কোনও কথা না লুকাইয়া প্রকাশ করা। স্বামিসুখগর্ব্বিতা ভ্রমর রাগে, অভিমানে, বালিকাবুদ্ধিবশতঃ রোহিণীকে 'বারুণী পুকুরে সন্ধ্যাবেলা কলসী গলায় দিয়ে' মরিতে বলিয়া পাঠাইল, কিন্তু ইহাতে অহিত হইবে বুঝিল না। গোবিন্দলালকে বলিল, 'সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে—সে কি মরিতে পারে?' (১৪শ পরিচ্ছেদ।) ভ্রমরের এই পরামর্শে কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। ইহারই ফলে ঘটনাচক্রে রোহিণী গোবিন্দলালকে "কাড়িয়া লইয়া" কৃতার্থ হইল। গোবিন্দলাল-ভ্রমরের দাম্পত্যপ্রণয়ের ইতিহাস প্রণয়ন আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু রোহিণীর ব্যাপারের সহিত এই দাম্পত্য প্রণয়ের নিবিড় সংযোগ আছে, সুতরাং ইহার প্রসঙ্গও মধ্যে মধ্যে তুলিতে হইতেছে ও হইবে।

রোহিণী সত্য সত্যই ভ্রমরের উপদেশ পালন করিল। কুন্দ যাহা পারে নাই, সে তাহা করিল। কুন্দর মত ছেলে-মানুষি ভাবে ভাবিল না, 'মরিলে পুড়িয়া থাকিব, দেখিতে রাক্ষসীর মত হব। যদি তিনি দেখেন?' রোহিণীর কলঙ্ক-লাঞ্ছনা উইলচুরির ব্যাপার কুন্দর অগমন্তুত, রোহিণীর প্রকৃতিও দৃঢ়, তাই সে ইতস্ততঃ না করিয়া আত্মহত্যার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল। কিন্তু সে মরিয়াও মরিতে পারিল না, গোবিন্দলাল তাহার 'মরণে প্রতিবাদী' হইলেন। জলতল হইতে মৃতবৎ দেহ উদ্ধার করিয়া নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহাকে বাঁচাইলেন।

এইখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। রোহিণী যখন সন্ধ্যাকালে বারুণী পুষ্করিণীতে আসিল, তখন তাঁহার জলে নামিয়া গাত্রমার্জ্জনা করিবার সম্ভাবনা বুঝিয়া "দৃষ্টিপথে তাহার থাকা অকর্ত্তব্য বলিয়া গোবিন্দলাল সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।" (১৫শ পরিচ্ছেদ।) তখনও পর্য্যন্ত গোবিন্দলালের মন শুদ্ধ, চরিত্রে শুচিতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। জলতলে যখন মগ্নদেহ দৃষ্টিপথে পড়িল, তখন আখ্যায়িকা-কার শুধু নিজের জোবানী যে তাহার রূপের প্রশংসা করিয়াছেন,—"দেখিলেন স্বচ্ছ স্ফটিক-মণ্ডিত হৈমপ্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে।"—তাহা নহে, গোবিন্দলালকে দিয়াও করাইয়াছেন; কিন্তু তখনও তাহাতে রূপমোহ নাই, কেবল "দয়ার উচ্ছ্বাস।" 'গোবিন্দলালের চক্ষে জল পড়িল। বলিলেন "মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন? দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন? এমন করিয়া তুমি চলিলে কেন?" এই সুন্দরীর আত্মঘাতের তিনি নিজেই যে মূল—এ কথা মনে করিয়া তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল।'

(ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের হৃদয়েও সমবেদনার উদ্রেক করে।)

রোহিণীকে বাঁচাইবার চেষ্টাকালে প্রথমতঃ গোবিন্দলাল "সেই পক্কবিম্ববিনিন্দিত, এখনও সুধাপরিপূর্ণ, মদনমদোন্মাদ-হলাহলকলসীতুল্য রাঙ্গা রাঙ্গা মধুর অধরে অধর দিয়া ফুৎকার দিতে, ইচ্ছা করিলেন না—এখানে তাঁহার চরিত্রের শুচিতা লক্ষণীয়। উড়িয়া মালী এ কার্য্যে অস্বীকৃত হইলে অগত্যা 'গোবিন্দলাল তখন সেই ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধর-যুগলে ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া—রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন।" (১৬শ পরিচ্ছেদ।) সেই অধরস্পর্শই তাঁহার কাল হইল। (এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে পরস্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ নিষেধ।) সেই মুহূর্ত্ত হইতে রূপ-মোহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। রূপের মদিরার মাদকতা বুঝাইবার জন্যই আখ্যায়িকা-কার এই (১৬শ) পরিচ্ছেদে রোহিণীর দেহের—বিশেষ অধরের এমন মোহকর (sensuous) চিত্র আঁকিয়াছেন।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত 'শ্বেতপ্রস্তরখোদিত স্ত্রী-প্রতি-মূর্ত্তি, স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধাবৃতা, বিনতলোচনা জলনিষেকনিরতা পাষাণসুন্দরীর পদপ্রান্তে গোবিন্দলাল আসিয়া বসিলেন, (লজ্জাভূষণা কুলস্ত্রী ভ্রমরের এই অর্দ্ধাবৃতা মূর্ত্তির প্রতি ঘৃণাও লক্ষণীয়)—এই বর্ণনাটুকু বর্ণনামাত্রই নহে, ইহার সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য আছে; অর্দ্ধমৃতা অর্দ্ধাবৃতা রোহিণীকে প্রমোদোদ্যানে লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই এই বর্ণনার সমাবেশে একটা সঙ্কেত (symbolism) আছে;—গোবিন্দলাল চরিত্রবান্ হইলেও তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে একটা সৌন্দর্য্য স্পৃহা সুপ্ত আছে (তাই "সেইখানে গোবিন্দলাল বসিতে ভাল বাসিতেন");—রোহিণীর অধরস্পর্শে সেই সুপ্ত স্পৃহা জাগিল। * বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনার ভিতর একটা সূক্ষ্মভাব প্রচ্ছন্ন থাকে, রসগ্রাহী সেইটুকু ধরিতে পারেন। আপাততঃ এই মন্তব্যটি কষ্টকল্পনা বলিয়া পাঠক মনে করিতে পারেন, কিন্তু আর একটু ধৈর্য্য ধরিয়া ১৯শ পরিচ্ছেদের আরম্ভে গ্রন্থকারের উক্তি—'তাহার এই পূর্ণযৌবন' মনোবৃত্তি সকল উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গ-তুল্য প্রবল, রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ, এই চাতকের লোচনপথে উদিত হইল—প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন, রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল।'—পাঠ করিলে আমাদের এই সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবে না। 'ঠিক সেই সময়ে ভ্রমর একটা লাঠি লইয়া একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল।.........লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।'—এই দুর্লক্ষণের (omen) উল্লেখ করিয়াও আখ্যায়িকা-কার বুঝাইতেছেন, সেই মুহূর্ত্তেই ভ্রমরের কপাল ভাঙ্গিল।

এইবার রোহিণীর কথা বলিব। 'জীবনে হউক, মরণে হউক, রোহিণী শেষ গোবিন্দলালের গৃহে প্রবেশ করিল। ভ্রমর ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক কখনও সে উদ্যান-গৃহে প্রবেশ করে নাই।' (১৬শ পরিচ্ছেদ।) (আবার গোবিন্দ-লালের চরিত্রের শুচিতার ইঙ্গিত।)

রোহিণী তথায় পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া 'হৃদয়াধারের জীবন-প্রদীপ' গোবিন্দলালকে দেখিল, তাঁহার 'মৃতসঞ্জীবনী কথা' শ্রবণপথে পান করিয়া মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল।' এ সুখ তাহার স্বপ্নের অগোচর ছিল, কিন্তু সুখের ভিতরও দুঃখ লুকাইয়া ছিল এ যে চণ্ডীদাসের 'বিষামৃত।' সে তাহার বিড়ম্বিত জীবন-রক্ষার জন্য গোবিন্দলালকে বড় দুঃখে তিরস্কার করিল,—'আপনার সঙ্গে আমার এমন কি শত্রুতা যে মরণেও আপনি প্রতিবাদী?' তীব্র যাতনায় অধীর হইয়া বলিল, "আমি পাপ পুণ্য জানি না···মানি না—কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড? পাপ না করিয়াও যদি এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেশী কি হইবে? আমি মরিব? এবার না হয় তুমি রক্ষা করিয়াছ।......* চিরকাল ধরিয়া দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা, একেবারে মরা ভাল।······ রাত্রিদিন দারুণ তৃষ্ণা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। † আশাও নাই।" (১৭শ পরিচ্ছেদ।) এই পরিচ্ছেদ ও ১৪শ পরিচ্ছেদ হইতে বুঝা গেল, রোহিণীর 'মন-তরী' টলমল করিতেছে, গোবিন্দলাল ইহার উপর একটু চাপ দিলেই নৌকাডুবি হইবে। পরের কথা পরে হইবে। আপাততঃ এখনও সে কলঙ্কের, লোকাপবাদের ভয় করে, তাই গোবিন্দলালের সঙ্গ (escort) প্রত্যাখ্যান করিয়া সে একাই গৃহে ফিরিল।

এইখানে গোবিন্দলালের হৃদয়ে বিষবৃক্ষ অঙ্কুরিত হইল। ইহার উৎপত্তি দেখিলাম, পরিণতি পরবর্ত্তী প্রবন্ধে দেখিব।

* ইংরেজী সাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠককে Hawthorneএর 'Marble Faun'এর (symbolism) সঙ্কেত স্মরণ করাইয়া দিই।

* 'আপনি' ছাড়িয়া 'তুমি' বলা লক্ষণীয়। ৭ম পরিচ্ছেদে 'একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে' স্মর্ত্তব্য।

† সে জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে গিয়াও সে বুঝিবে—'বদনমপুরি ক্ষারবারিভিঃ।' অবৈধ প্রণয়ের ধারাই এই।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীনরেন্দ্র দেব]
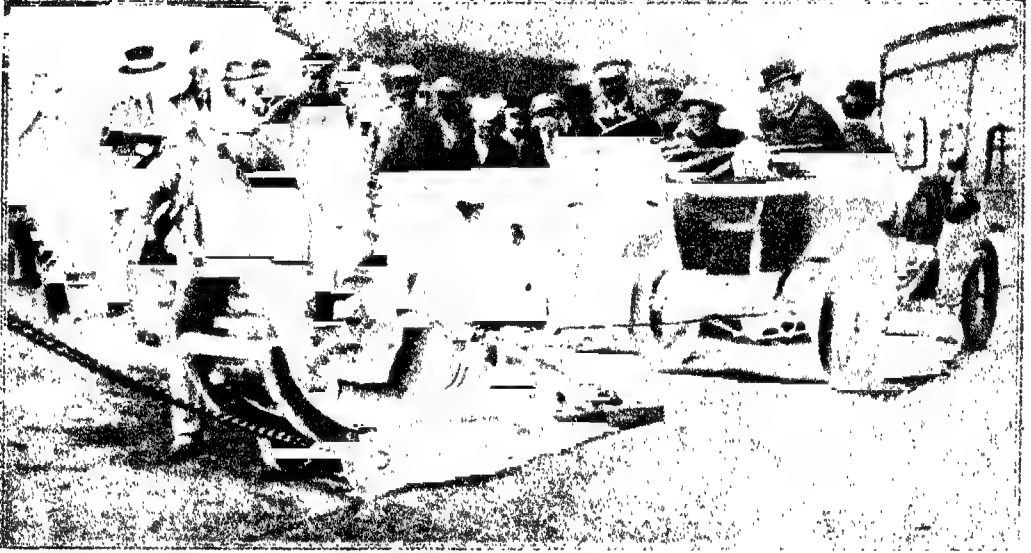
মোটর গাড়ীর গতি-রোধ

১। বিংশ শতাব্দীর ভীম

জার্ম্মাণীতে হার্ গ্রাসার্ নামক এক পালোয়ান আছেন; ইনি রামমূর্ত্তির মত মোটরকার আট্‌কাইয়া রাখিতে পারেন। কেবল মোটরকারের গতিরোধ করিয়াই ইনি শক্তির পরিচয় দেন না; ইঁহার পিঠের উপর দিয়া মোটরকার চালাইতে দিয়াও ইনি দেখাইয়াছেন, তাঁহার শরীরের কোনও ক্ষতি হয় নাই। কার্ল্ মোর্ক্ নামক আর এক পালোয়ান পাঁচ মণ ওজনের 'বারবেল্' ভাঁজিয়া অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। মুশ্যের ভারহের্ট নামে একজন ফরাসী পালোয়ান একসঙ্গে চারটি পিয়ানো, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাঁইত্রিশ মণ ওজনের ভার উত্তোলন করিয়া দর্শকগণকে চমৎকৃত করিয়াছেন। জেম্‌স হোয়াইট নামক একজন আমেরিকান পালোয়ান দাঁতে করিয়া একখানি প্রকাণ্ড মোটরকার রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে পারেন।

(Scientific American)

২। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরিচয়

নিউইয়র্কের যাদুঘরের ভিত্তিগাত্রে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পৃথিবীর ও তদানীন্তন জীবজন্তুর একটা মোটামুটি পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে, কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ও বৃহদাকার চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখা হইয়াছে। আমরা পাঠকগণকে এবার উহার কয়েকটির বিবরণ দিতেছি। ফ্রান্সের দোর্দ্দো প্রদেশের গিরি-গুহাভ্যন্তরে এখনও কয়েকখানি অতি প্রাচীন রঙীন্ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণায় স্থির হইয়াছে যে, পৃথিবীর প্রাগৈতিহাসিক যুগে, মানুষ যখন সম্পূর্ণ সভ্য হইয়া উঠে নাই, সেই সময় ক্রো-ম্যাগ্‌নন্ নামক এক জাতীয় লোক,—অধুনা যাহাদের চিহ্ন ভূ-পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহারাই,—পর্ব্বত-গহ্বরের গিরি-গাত্রে এই রঙীন্ চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছিলেন; কারণ, তখন পর্ব্বত-গুহাই ছিল তাঁহাদের একমাত্র আবাস-স্থল। সেই আবাস-গৃহ সুরমা করিবার উদ্দেশ্যেই পর্ব্বত-গাত্রে

চারিটি পিয়ানো একসঙ্গে তোলা

মোটর গাড়ী পিঠের উপর চালানো
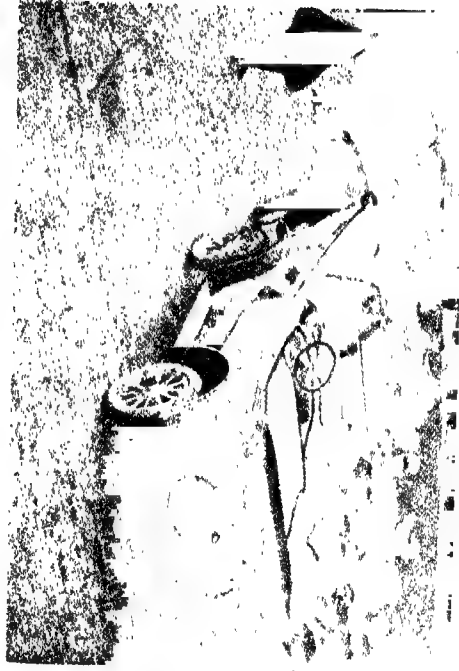
দাঁতে করিয়া মোটর গাড়ী টানা

পাঁচ মণ বারবেল্ ভাঁজা

ক্রোমাগ্নন জাতির চিত্রকর

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঋক্ষ ও কচ্ছপ

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মৃগরাজ, জলহস্তী ও বাইসন

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঐরাবত

প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোমযুক্ত খড়্গাধর গণ্ডার

ম্যামথ ও মাস্তোদন জাতীয় অতিকায় হস্তী ও বৃষরাজ
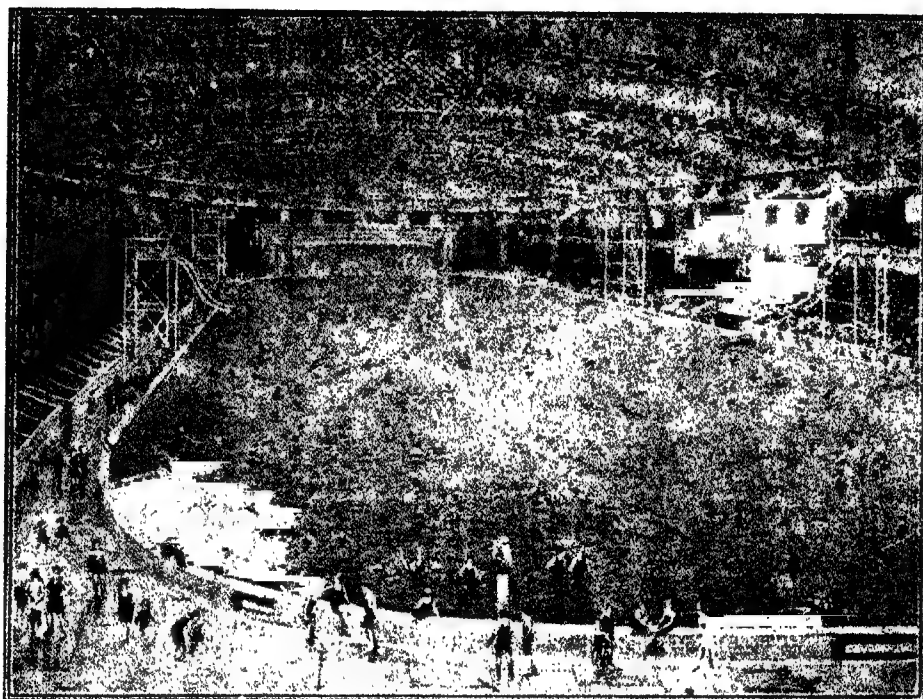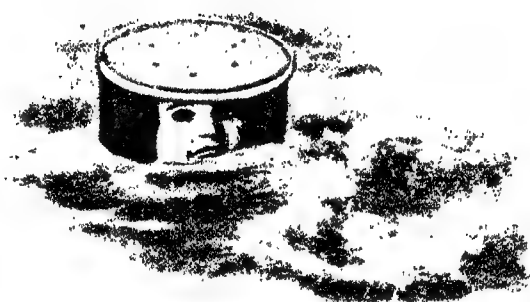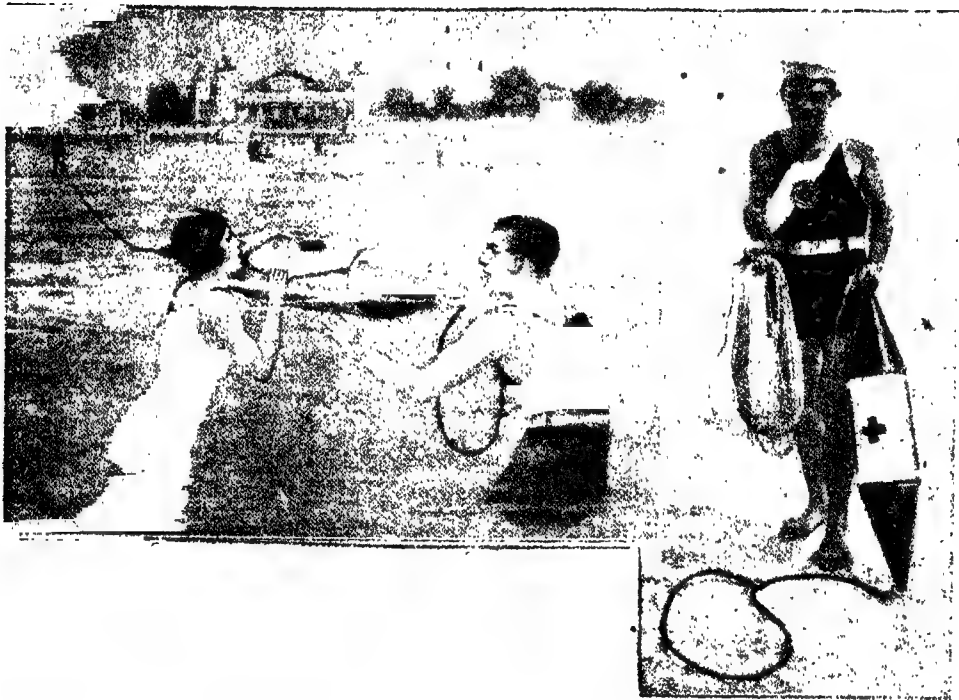
প্রাচীন আর্য্য মানব

ম্যাডিসন্ স্কোয়ার সন্তরণাগার

বারিবারণ সন্তরণ-পোষাক

সাঁতারে টুপী

মগ্ন ত্রাণ 'বয়া'

দুঃসাহসিকের জলে ঝাঁপ খাওয়া

হাঁস-পা

হাত-পাখ্‌না

মগ্ন-ব্যক্তির উদর হইতে জল-নিষ্কাশন

কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস সঞ্চালন

কাঠের চেয়ার, সতরঞ্চ, জুতা, জামা, কোমর-বন্ধ ইত্যাদি
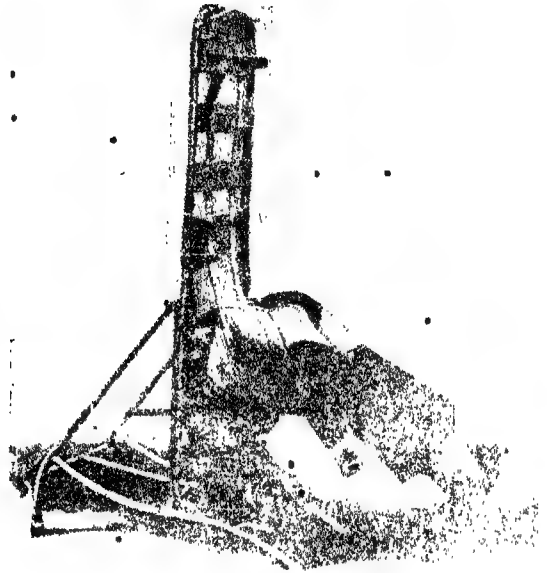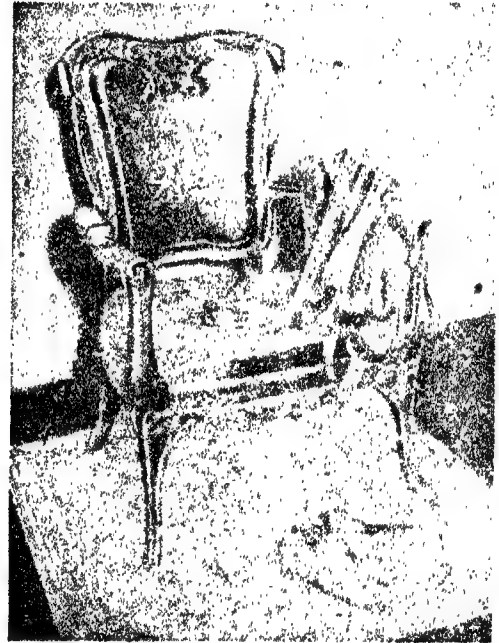
তাঁহারা সুরঞ্জিত চিত্র রচনা করিতেন। নিউইয়র্ক মিউজিয়ামের একখানি চিত্রে দেখানো হইয়াছে, সেই ক্রো-ম্যাগ্‌নন্ জাতীয় লোকেরা কেমন ধরণের মানুষ ছিলেন; এবং কি ভাবে তাঁহারা পর্ব্বত-গহ্বরের মধ্যে সেই বড়-বড় রঙীন্ ছবিগুলি আঁকিয়া গিয়াছেন। চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, উক্ত গিরি-গাত্রের ছবিগুলির কোনখানিই একজনের রচিত নহে; অন্যূন চারিজন চিত্রকর একত্র মিলিয়া এক-একখানি ছবি শেষ করিয়াছেন। তখন মানুষের

কাঠের টেবিল, কার্পেট, টুপী গাত্রবস্ত্র, ঘাগ্‌রা ইত্যাদি
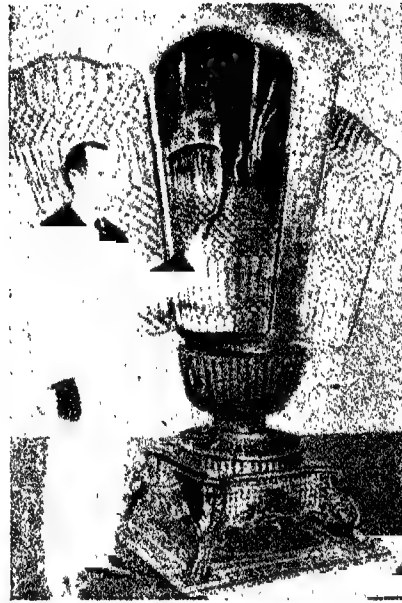
ফুলদানী আলমারী (খোলা)

ফুলদানী আলমারী (বন্ধ)

শিশু-সমিতি

...রিধেয় ছিল পশুচর্ম্মের কৌপীনমাত্র,—অলঙ্কার ছিল অস্থি-...লা; পাত্রাদি প্রস্তর-নির্ম্মিত; অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে দীর্ঘ যষ্টি ও ...ষাণ-ছুরিকা। কেহ-কেহ চর্ম্মনির্ম্মিত মোজার আকারের ...ঢুকাও ব্যবহার করিতেন। রং বাটিবার জন্য শিল-নোড়ার ব্যবহার ছিল; এবং গুহার মধ্যে আগুণ জ্বালিয়া শীত ও অন্ধকার দূর করিবার ব্যবস্থা ছিল। অন্যান্য কয়েকখানি চিত্রে,—বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর অধিকাংশ ভূ-ভাগ যখন তুষারাবৃত থাকিত—সেই সময় ভল্লুকাকৃতি ও গণ্ডারসদৃশ যে

সকল অতিকায় অদ্ভুত জীব, এবং কচ্ছপের মত যে বৃহদাকার জন্তুগুলি ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিত, তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ ছিল,—ম্যামথ ও মাস্তোদন জাতীয় ঐরাবত, মৃগরাজ ও বৃষরাজ প্রভৃতি বিকটাকারের জীব, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড জলহস্তী ও বীবর, যাহাদের অস্তিত্ব'এ জগত হইতে বহুকাল পূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে,—তাহাদের হুবহু প্রতিকৃতি, এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে ইংল্যাণ্ড, উত্তর-ফ্রান্স, সাইবেরীয়া, আর্জেণ্টাইন প্রভৃতি দেশের তদানীন্তন অবস্থা কিরূপ ছিল,—তাহারও যথাযথ ভৌগোলিক পরিচয় দেওয়া আছে। আর একখানি চিত্রে, প্রাচীন আর্য্যজাতি যখন মৃগয়ালব্ধ পশুমাংস ভোজন ও পশুচর্ম্মে দেহাচ্ছাদন করিয়া অরণ্যমধ্যস্থ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত কুটীরে বাস করিতেন, তাহারই আলেখ্য দেওয়া হইয়াছে।

(Literary Digest)

৩। সাঁতার-প্রসঙ্গ

নিউইয়র্ক সহরের 'ম্যাডিসন স্কোয়ার' নামক জনসাধারণের বিচরণ-ক্ষেত্রটি সম্প্রতি পৃথিবীর মধ্যে একটি বৃহত্তম সন্তরণাগারে পরিণত করা হইয়াছে। ১১০ ফিট চওড়া ও ১৫০ ফিট লম্বা একটি মার্ব্বেল পাথরের চৌবাচ্ছা নির্ম্মাণ করিয়া, উহাতে প্রত্যহ পরিষ্কার ও নির্দ্দোষ জল বদ্‌লাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। চৌবাচ্ছাটি একমানুষ-ভোর গভীর। উহা জলপূর্ণ করিতে ছয় ঘণ্টা এবং খালি করিতেও ছয় ঘণ্টা সময় লাগে। চারিপার্শ্বে ছয়টি ঝাঁপ খাইবার মঞ্চ আছে; এবং দুঃসাহসিক সন্তরণকারীদের জন্য দুইটি ১৫ ফিট পরিমাণ উচ্চ 'টঙ্' খাড়া করা আছে। চৌবাচ্ছার ধারে-ধারে দশহাজার লোকের বসিবার মত গ্যালারী স্থাপন করা আছে; কারণ, সন্তরণ-প্রতিযোগিতা দেখিবার জন্য সেখানে অত্যন্ত লোকের ভীড় হয়। একদিকে স্নানার্থীদের জন্য একটী নকল জলপ্রপাত নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। অনেকে স্নান না করিয়া কেবল সন্তরণ-ক্রীড়ায় আমোদ উপভোগ করিতে চায়। সেইজন্য একপ্রকার রবারের বারি-বারণ সাঁতারের পোষাক আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাথা যাহাতে না ভেজে, এজন্য একপ্রকার সাঁতারে টুপীও পাওয়া যায়। এই টুপীর আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, সন্তরণকারীর ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না। হঠাৎ ডুব-জলে গিয়া পড়িলেও, এই টুপীর গুণে মাথাটি জলের উপর ভাসিয়া থাকিবে। সন্তরণকারীদের মধ্যে কেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, তাহাকে কূলে টানিয়া তুলিবার জন্য, ডাঙা হইতে চেনে-বাঁধা একপ্রকার টর্পেডো আকারের নূতন ধরণের মগ্নত্রাণ 'বয়া' স্থানে-স্থানে ভাসানো আছে। ঐ বয়ার সহিত দড়ি-বাঁধা এক-একজন রক্ষকও উপস্থিত থাকেন। এক-একটি 'বয়ায়' ছয়জন করিয়া সাঁতারু অনায়াসে ভাসিয়া আসিতে পারে। সন্তরণ শিখাইবার জন্য এখানে বিশেষ-বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আনাড়ীদের পায়ে 'হাঁস-পা' ও হাতে 'হাতপাখ্‌না' বাঁধিয়া সাঁতার শিখিতে হয়। ইহার সাহায্যে তাহারা অতি সত্বর সন্তরণে অভ্যস্ত হইয়া যায়। কেহ ডুবিয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে তুলিয়া, তাহার পেটের ভিতর হইতে জল বাহির করিয়া দিবার, এবং কৃত্রিম উপায়ে তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস পুনরানয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সুব্যবস্থা আছে।

(Literary Digest)

৪। দারু-শিল্প

ভারতবর্ষে পাথরের উপর যেরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, কাঠের উপরও ততোঽধিক দেখা যায়। কিন্তু সে কেবল ইমারতি গৃহসজ্জার আস্‌বাবপত্রেই সীমাবদ্ধ। দক্ষিণ-আমেরিকায় ইমারতি ও গৃহসজ্জার আস্‌বাবপত্র ছাড়া টুপী, গাত্রবস্ত্র, ঘাগ্‌রা, কটিবন্ধ, জুতা, এমন কি, ঘরের মেঝেয় পাতিবার কার্পেটটি পর্য্যন্ত কাঠের তৈয়ারী পাওয়া যায়; এবং শিল্প ও কারুকার্য্য হিসাবে উহা জগতে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জামা-কাপড় রাখিবার আলমারীটি বাহির হইতে দেখিতে ঠিক ফুলদানীর মত; অথচ উহার কপাট ও ভিতরে পোষাক-পরিচ্ছদ ঝুলাইয়া রাখিবার চমৎকার ব্যবস্থা করা আছে। এই ফুলদানী-আলমারী এক-একটি আট ফিটেরও বেশী উঁচু পাওয়া যায়; এবং উহার আগাগোড়া বিচিত্র কারুকার্য্য-মণ্ডিত।

(Popular Mechanics)

৫। শিশু-সমিতি

আমাদের দেশের মায়েরা নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইবার সময়ে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে দ্বিধা

বোধ করেন না; কিন্তু য়ুরোপের সভ্যসমাজে উহা রীতি-বিরুদ্ধ। সেইজন্য সেখানে এক-একটি শিশু-সমিতি আছে। জননীরা নিমন্ত্রণে বা থিয়েটারে যাইবার সময় ছেলে-মেয়েদের ঐ সমিতিতে রাখিয়া যান। তাঁহারা যতক্ষণ না বাড়ী ফেরেন, ততক্ষণ সমিতির কর্ত্রীরা তাঁহাদের ছেলে-মেয়েদের সযত্নে তত্ত্বাবধান করেন। এজন্য জননীদের উক্ত সমিতির সভ্যা হইতে হয় এবং মাসিক কিছু-কিছু চাঁদা দিতে হয়। যাঁহারা শিশু-সমিতির সভ্যা নহেন, তাঁহাদের ছেলে-মেয়েদের সেখানে লওয়া হয় না।

(Literary Digest)

গুরুর আহ্বান

[শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত]

নয়না দেবীর আশিস লভিয়া গুরু গোবিন্দ একদিন
চিন্তিলা মনে দিবেন দীক্ষা শিখগণে সুনবীন।
প্রান্তরে এক সমবেত সবে উৎসব মত্তর—
আনন্দে নাচে লক্ষ হৃদয়—কল্লোলে কোটি স্বর!
দর্শন দিলা গোবিন্দসিংহ—"জয় গুরুজীকা জয়—"
হাজার কণ্ঠে উঠিল জাগিয়া আলোড়ি ভুবন ত্রয়!
মুক্ত কৃপাণ কাঁপায়ে ঊর্দ্ধে গুরুদেব কন ধীর—
"আকাঙ্ক্ষা মম পঞ্চজনার পবিত্রতম শির!
দিবে কেবা এস!"—বজ্র যেন গো সহসা পড়িল খসি—
স্তব্ধ বিমূঢ় শিখমণ্ডলী শুষ্ক বদন-শশী!
আবার আবার আহ্বানে গুরু কেহ তো না দেয় সাড়া—
বহে কি না বহে অন্তর-মাঝে তপ্ত রুধির-ধারা!
গর্জ্জিলা গুরু তৃতীয়বার—"মরণ-শঙ্কা-হীন
একটীও শিখ নাহি কি হেথায়?"—ছুটে আসে দয়াসিং!
চরণে লুটায়ে মার্জ্জনা চাহে—"আসি নি দু'বার ডাকে!
ক্ষম গুরুদেব! এই মোর শির! কৃপা যেন শুধু থাকে!"
আনন্দে গুরু আশিসি' তাহারে আপন শিবির পানে
চলিলেন ধীরে সাথে করি তারে—দিতে 'বলি' সবে জানে!
সেথায় গোপনে লুকায়ে সেবকে, কাটিলা ছাগের শির,
ভাবিল সকলে দয়াসিংহের নির্ব্বাণ হল চির!
আহ্বান গুরু শিষ্য-সঙ্ঘে করিলা আবার আসি'
একে একে আরো বিশ্বাসী চারি অর্পে আপনা হাসি'! *
সবার বদলে অজের রক্তে জন্মায়ে সবে ভ্রম
কিছুকাল পরে ফিরিলেন গুরু দীপ্ত তপন সম!
সাথে তাঁর সেই ভকত পঞ্চ মৃত্যু-বিজয়ী-বীর,
গুরুর কর্ম্মে উৎসৃষ্ট প্রাণ বরেণ্য অবনীর!
বিস্ময়ে পুলকে শিখগণ সবে করে ঘোর জয়ধ্বনি
কোষে কোষে বাজে শাণিত অসির সুমধুর ঝন্‌ঝনি!
থামায়ে সবারে গোবিন্দসিংহ কহিলা উচ্চ ভাষে—
"এমনি সেবক আমি যে গো চাই, মরণে যে উপহাসে!
গুরুর আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ জেনেছে—ইহারা শ্রেষ্ঠ শিখ,
তনয় অধিক ইহারা আমার, প্রথমে দীক্ষা নিক্!" †

* এই চারিজন আত্মোৎসর্গকারী মহাপুরুষের নাম—(১) ধর্ম্মসিংহ। (২) মাহকম। (৩) সাহেবসিংহ। (৪) হিম্মতসিংহ।

† ইহাই গুরুগোবিন্দ সিংহের সুপ্রসিদ্ধ "খালসা" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শিখসৈন্য গঠনের আদি-ইতিহাস।—জীঃ—

শেষ দেখা

[শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম-এ]

(১)

দেবচরণ মাঝি পাড়াগেঁয়ে মানুষ। তার বাড়ী ভাঙ্গরখালী। সুধু সে কেন,—তার বাপ, পিতামহ, প্রপিতামহ,—সবাই সেই গাঁয়ের লোক ছিলেন। তাই সেই গাঁ-টার সঙ্গে দেবচরণের যে সম্পর্ক, তা 'জন্মাবচ্ছিন্ন' তো বটেই,—'জন্মের' ঢের আগু থেকেই।

—গাঁ-টা ছেড়ে দেবচরণের আর কোথাও যাওয়া হ'য়ে উঠ্‌তো না। আবার গাঁয়ের সব্বাই, তার এমন সুন্দর, বিশুদ্ধ "দেবচরণ" নামটা থাক্‌তে—তাকে খালি ব'ল্‌তো "দেউচরণিয়া"।

গ্রামের ধারে মস্ত নদী।

(২)

দেবচরণ বাল্যকালে গ্রামের বাবুদের বাড়ীর ছেলে-পিলের সঙ্গে খেলা ক'রতো;—আর পাঠশালায় বাংলা পড়তো। বাবুদের বংশধর শশাঙ্কমোহন রায়ের সঙ্গে সে সময়ে তার খুব বন্ধুতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শশাঙ্ক দেবচরণকে আদর করে ডাক্‌তেন,—"দেবু", অথবা "দেবু-ভাই"; আর দেবচরণ শশাঙ্ককে ডাক্‌তো—"শশীবাবু"। শশাঙ্ক শেষটায় তাকে 'বাবু' ছাড়িয়ে সুধু "শশী-ভাই" ব'লে ডাকানো ধরিয়েছিলেন।

তা'হ'লেও কিন্তু মানুষের সাম্‌নে দেবীচরণ শশাঙ্ককে ওরূপ ভাবে ডাক্‌তেই পারুতো না,—যদিও শশাঙ্ক তাকে সর্ব্বদাই 'দেবু' বা 'দেবু-ভাই' বলেই ডাক্‌তেন।

এতে সবার চেয়ে হিংসে হলো গ্রামের বংশী মণ্ডলের। তার খুব ইচ্ছা ছিল, গ্রামের এই ভবিষ্যৎ জমীদারটীর সু-দৃষ্টিতে থাকা; কিন্তু সে দেখ্‌লে, তাঁর সব দৃষ্টিটাই খালি দেউচরণিয়ার উপর; সে দৃষ্টির একটুকু 'রশ্মি' যেন অপরের ওপর পড়বার উপায় নেই! বংশীর যেন সেটা নিজের গাঁটের পয়সা খরচ হচ্ছে বলে মনে হতো।

বংশীও মাঝি। তবে পাঠশালায় পড়বার সময়, 'মাঝি'টে বদলে নাম করে নিয়েছিল 'মণ্ডল'।

তখন শশাঙ্কর বয়স ১০।১১ বছর; দেবচরণেরও তাই। বংশীর বয়স ১৫।১৬।

বংশী সব মাঝিদের ব'লে দিল—"তোমাদের দেউ-চরণিয়া এখন 'দেবু' হ'য়েছে; এর পর 'বাবু' হবে,—গাড়ী চ'ড়বে।"

(৩)

তার পর শশাঙ্ক একটু বড় হয়ে গেল সহরে প'ড়্‌তে। সহরের নাম কেতাবপুর,—খুব জম্‌কালো জায়গা। সেখানে গাড়ী আছে, ঘোড়া আছে; গ্রাম থেকে সহর প্রায় ১০ ক্রোশ দূর।

কেতাবপুর সহরে শশাঙ্ক ইংরেজী পড়ে। দেবচরণ তখন গাঁয়ের পাঠশালা ছেড়ে দিয়ে, নৌকো নিয়ে বেরয়,—মাছ ধরে।

তবু যখন দু-বছর ইংরেজী শিখে, শশাঙ্ক সেবার বাড়ী এলো, তখন সবার চেয়ে বেশী উৎসাহ হলো দেবচরণের;—যেন শশাঙ্কের বাড়ী আসাটার মতন অত-বড় একটা ঘটনা পৃথিবীতে সচরাচর ঘটে না।

সমস্ত রাত্তির নৌকো বেয়ে, সব-চেয়ে বড় যে মাছটা পেয়েছিল তাই নিয়ে, দেবচরণ এসে শশাঙ্কর মাতা আর শশাঙ্ককে প্রণাম করলে;—মাছটা তাঁদের পায়ের কাছে রাখ্‌লে।

মাতার চক্ষুতে জল এলো!

শশাঙ্ক বল্‌লে,—"দেবু ভাই,—আমায় ভোলনি তো!"

দেবচরণ কেঁদেই ফেল্‌লে; এবার আর সে 'শশী ভাই' ব'ল্‌তে পার্‌লে না!

শশাঙ্কের মা ব'ল্‌লেন,—"দেবু, বাবা! আজ দুপুরে এখানে খেয়ে যেও।"

* * * * *

দেবচরণ যখন 'বাবু'দের ওখানে 'প্রসাদ পেয়ে' বাড়ী যাচ্ছে, তখন বেলা প্রায় ৪টা।

(৪)

শশাঙ্ক রাস্তা পর্য্যন্ত সঙ্গে এসে, তার পর বললেন,—"দেবু ভাই,—রোজ কিন্তু একটিবার আস্‌বে।"

দেবচরণ কি উত্তর দেবে,—তখন সেই রাস্তায় বংশী মণ্ডল যাচ্ছে; শশাঙ্কর সাম্‌নেই বংশী ব'ল্‌লে,—

"কি হে দেবু বাবু! গাড়ী চ'ড়ছ কবে?"

শশাঙ্ক ওষ্ঠ চেপে রুষ্ট মুখখানি বংশীর দিক হ'তে ফিরিয়ে নিলেন।

ছিদাম মাঝি বৃদ্ধ; শশাঙ্ক বাবুকে দেখ্‌তে এসেছিল। দেবচরণ সম্পর্কে ছিদামের নাতি। শশাঙ্ক আর দেবচরণ উভয়ে ছিদামকে ব'ল্‌তো 'ছিদাম-দা'; ছিদাম শশাঙ্ককে ব'ল্‌তো 'কর্ত্তাদাদা'।

ছিদাম মাঝীদের মধ্যে 'মাতব্বর'—তখন সেখানেই ছিল। কট্‌-মট্‌ ক'রে ছিদাম বংশীর দিকে চাইলে;—যেন ব'ল্‌ছে, "সাবধান!" মুখে ছিদাম কিছুই বল্‌লে না।

সন্ধ্যায় ভারি ঝড়-ঝট্‌কা হোলো। শশাঙ্ক বুড়ো পাইক আব্‌দুল-দা'কে দিয়ে ব'লে পাঠালেন,—আজ রাত্তিরে যেন 'দেবু-ভাই' আবার নৌকোয় না বেরোয়।

* * * * *

সেবার কেতাবপুর সহরে যাবার সময় ভাঙ্গরথালীর প্রবল-প্রতাপান্বিত জমীদার দুর্লভ রায়ের একমাত্র পুত্র শশাঙ্কমোহন কেন যে গ্রামে এত লোক থাকৃতে, মাঝিপাড়ার 'দেউচরণিয়া'কে ক' দিনের জন্য সঙ্গে নেবার ইচ্ছা জানিয়ে জিদ্‌ ধরে বস্‌লেন, তা গাঁয়ের কেউ জান্‌তে পার্‌ল না। প্রতিবাদ করবে কে?—দুর্ল্ভ রায়ের নামে বুঝি পৃথিবীই সশঙ্কিত হতো—সেই ছোট্টো গ্রামটা তো দূরের কথা।

শশাঙ্ক বলে দিলেন ছিদাম দা দু-চার দিন পর গিয়ে দেবুকে নিয়ে আস্‌বে; তাই ঠিক হলো।

(৫)

কেতাবপুর মস্ত সহর। শশাঙ্ক এখানে গ্রামের সমস্ত বাধা,—ধনী-দরিদ্রের সমস্ত পার্থক্য,—মানুষে-মানুষে সমস্ত ব্যবধান,—পশ্চাতে ফেলে, বিস্তীর্ণ জনপদের মধ্যে এসেছেন। তাই প্রকাশ্য রাজপথে, বিড়ম্বনা-ভীত দেবচরণকে নিজের মতন ভাল জামা-জুতো পরিয়ে, নিজের সঙ্গে জোর ক'রে বসিয়ে, ঘোড়ার গাড়ীতে চলেছেন।

গাড়ী যেখানে একটু থাম্‌ছে, সেখান থেকেই বেচারি দেবচরণ নেমে যাবার চেষ্টা ক'রছে; কিন্তু অপরিচিত সহর,—নেমে যাবেই বা কোথা? তাই আবার যখন শশাঙ্ক জোর করে বসাচ্ছে, তখুনি সে বসে পড়ছে।

শশাঙ্কর বাসার ধারে গাড়ী আসতেই দেখা গেল, সেখানে 'ছিদাম' দাঁড়িয়ে। 'ছিদাম-দা' কি ভাববে,—ছিঃ! তখন লজ্জায় দেবচরণের সুন্দর শ্যামল মুখখানি কালো হচ্ছিল! শশাঙ্ক ছিদামকে বললেন,—"ছিদাম-দা, যা দেখ্‌লে,—বংশী মোড়লকে গিয়ে ব'লো কিন্তু!"

দেবচরণেরও তখন একটা কথা মনে প'ড়ে গেল,—সে গাড়ী থেকে নেমে প'ড়েছিল; ব'ল্‌লে,—"ছিদাম দা,—বংশীকে ব'লো যে,—'দেউচরণিয়া' গাড়ীতে চড়ছে,—গাড়ীতে চড়ছে!" সজোরে বুকে চাপড় দিয়ে দেবচরণ এই কথা বললে!

ছিদাম মাঝির চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছিল। সে ব'ল্‌লে,—"আজ কি দেখলাম, কর্ত্তাদাদা! এই কি আমার শেষ দেখা!"

তার পর শশাঙ্ক দেবচরণকে ছিদামের সঙ্গে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।

শশাঙ্ক মনে-মনে ভেবে রাখ্‌লেন, যদি কোন দিন ক্ষমতা হয়, তিনি দেউচরণকে ভাল জাল কিনে দেবেন, ভাল নৌকো ক'রে দেবেন,—ভাল ক্ষেত-খামার করে দেবেন, ভাল বিয়ে দিয়ে দিবেন! আর ছিদাম-দাদাকে'?—তাকে মোটেই নৌকোয় বেরুতে দেবেন না; তাকে জালের সুতো কিনে দেবেন,—সে বসে-বসে খালি জাল বুন্‌বে, আর সব জেলেদের 'জাল' বুনানো শেখাবে।

(৬)

আরো দশ বৎসর চলে গিয়েছে।

এখন শশাঙ্কর বয়স ২২।২৩ বৎসর। এর মধ্যে আর তিনি দেশে আস্‌তে পারেন নি। তিনি এম্‌-এ পাশ করে, পিতার ইচ্ছামত কিছু দিন নানান্‌ দেশ দেখে বেড়িয়েছেন। তার পর এবার যখন বাড়ী এলেন, তখন বৃদ্ধ পিতা দুর্ল্ভ রায় তাঁর সমস্ত জমীদারীর ভার, আর সংসারের যত কাজ, এই একমাত্র পুত্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে, নিজে অবসর নিলেন; ভাবলেন,—'আর কেন?'

প্রজাদের ডাকিয়ে, তাদের সাম্‌নে সেদিন দুর্ল্ভ রায় পুত্রকে বল্‌লেন,—"দেখ, আমি দুষ্টের যেমন দমন করিছি,

তেমনি শিষ্টের পালন করিছি;—ভগবান্ জানেন করিছি কি না! তুমি শিষ্টকে চিন্‌বে ও তাকে পালন ক'র্‌বে, তা আমি জানি। তবে তুমি দুষ্টকে চিনে চ'ল্‌তে পার্‌বে কি না, জানি নে। তাই দেখবার জন্য আরো ক'দিন আমি এ সংসারে থাক্‌বো। তার পর নিশ্চিন্ত হ'য়ে—"

পুত্রের দিকে চাইতে দুর্লভ রায়ের চক্ষু অশ্রু-রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছিল।

শশাঙ্ক তখন ঝর্‌ঝর্ ক'রে চোখের জল ফেল্‌ছেন; তিনি কথাই কইতে পার্‌লেন না। পিতার দিকে তাকিয়ে শশাঙ্ক কখনই কথা কইতে পারতেন না,— আজ তো তাঁর কণ্ঠই রুদ্ধ।

কিন্তু শশাঙ্ক তাঁর অশ্রুপূর্ণ চোখেই দেখতে পেলেন, 'দেবু-ভাই' আর 'ছিদাম-দা' আজ উপস্থিত প্রজাদের মধ্যে নেই; আর পিতা যখন তাঁকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন বংশী মোড়ল তার ঝাঁক্‌ড়া চুল আর কোমরে-বাঁধা লাল গামছা সহ নবীন জমিদারের দৃষ্টি এড়িয়ে সরে পড়ছে।

কেন যেন শশাঙ্কর মনে হলো, গত রাত্রিতে যে ভীষণ ঝড় হ'য়ে গিয়েছে!

(৭)

সে দিন সন্ধ্যায় শশাঙ্ক একাকী গেলেন দেবচরণের পর্ণ-কুটীরে,—তাদের খোঁজ নিতে।

বংশী সেখানে দাঁড়িয়ে। নবীন ভূম্যধিকারীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে উঠে বংশী দাঁড়ালো;—তার মুখে একটা জয়োল্লাস!

শশাঙ্ক ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—"তুমি এখানে? দেবচরণ আর ছিদাম কই?"

বংশী ব'ললে,—"তারা গত রাত্তিরে 'কর্ত্তার' (শশাঙ্কর) জন্য নদীতে মাছ ধ'রতে গে-ছিল। রাত্তিরে ভাড়ি ঝড়,— তারা দু'জনেই নৌকো ডুবে,— তাদের প্রাণ বোধ হয় এখনো বেরোয় নি—তবে এতক্ষণ কি হ'য়েছে,—নদীর কূলে তাদের,—আমি তাদের-ধরা বড় মাছটা 'কর্ত্তার' জন্য নিয়ে—"

তখন দুর্লভচন্দ্র রায়ের পুত্র শশাঙ্কমোহন বোধ হয় পদাঘাতে বংশীর ঝাঁকড়া চুল বিশিষ্ট মাথাটা গুঁড়ো ক'রে ফেল্‌তে পার্‌তেন।

কিন্তু তা তিনি ক'রলেন না; ব'ললেন,—"কি!"

* * * * * * *

তার পর শশাঙ্ক ভীষণ বেগে নদীর দিকে ছুটলেন। তখন আবার গোঁ-গোঁ ক'রে ঝড় উঠে আস্‌ছিল। শশাঙ্কর সুন্দর মুখখানি তখন সেই সান্ধ্য আকাশের মতনই মেঘাচ্ছন্ন। ঝড়কে পেছনে ফেলে তিনি ছুটেছেন,—তার আগে যাবেন সেই নদীর কূলে,—'শেষ দেখা' যে হয় নি!

চাঁইবাসার পথে

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ]

তুমি কামরূপী বঙ্গে ছোটনাগপুর,
তোমার চুম্বক-দৃষ্টি টানে কি সঘনে;
ও রূপ-শোভায় আঁখি চির-তৃষাতুর,
আজন্ম ঢালিছ কোন্ মদিরা জীবনে!
ভারতে ভ্রমি না কেন বহু দূর-দেশ,
তুমি বিরামের স্নিগ্ধ নীড় নিরজন;
নিবিড় বনানী শৈল ঘনশ্যাম বেশ,
আমারে সহস্র পাকে করেছে বন্ধন।
আজি পুনঃ চিররম্য গিরি-বন-পথে
চলেছি আপন মনে পুষপুষে চড়ি;
কত পরিচিত ছবি পূর্ণি মনোরথে
পথের দু'ধারে আছে চিরদিন পড়ি!
দেখ এ করুণ শোভা তরুণ নয়নে;
বার্দ্ধক্যে তেমতি দীপ্ত যেমতি যৌবনে!

চাঁইবাসার সন্ধ্যা

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ]

মোর চক্ষে তব সন্ধ্যা বড়ই মধুর,
চাঁইবাসা! কোলানের কবরীর ফুল!
একটি-একটি আলো জ্বলে দূর-দূর;
অন্ধকার তরুচ্ছায়ে মাধুর্য্যে অতুল।
গ্রামে-গ্রামে উঠে মৃদু বাদ্য-ভাণ্ড-রব,
হো-নারীর কণ্ঠে ফুটে সঙ্গীত-ঝঙ্কার;
প্রতিদিন এই দেশে সাঁঝের উৎসব,
বিহঙ্গ-কূজন সম কুলায় মাঝার!
ছোটনাগপুর বক্ষে বিচিত্র এ ভূমি,
অজ্ঞাত তিব্বত সম অজানা এ দেশ;
বন্য-বিলাসেতে নাহি কৃত্রিমতা চুমি
বিকাশে স্বভাব-জাত সৌন্দর্য্য অশেষ!
আসিছে সভ্যতা—দিন নহে বহু দূর;
মুছিতে এ সারল্যের চিত্র সুমধুর!

মায়াবাদ ও IDEALISM

[৺প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী]

ধ্যানেতে বহির্বস্তুতে তন্ময় হইলে একটা সংস্কার মাত্র থাকে। দেশ, কাল প্রভৃতির বোধ বিলুপ্ত হয়; এমন কি, ধ্যানে তন্ময় হইলে, কত কাল ধ্যানস্থ ছিলাম, তাহারও বোধ থাকে না। ধ্যান ও চিন্তা একই বস্তু। চিন্তার ধারা একাগ্র হইলেই তাহাকে ধ্যান বলা যায়। বিজাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া সজাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহের বিস্তারকেই ধ্যান বলা যাইতে পারে; প্রত্যয়ান্তর নাই। এক বস্তুগামী চিন্তাই ধ্যান। বস্ত্বন্তরের বোধ যখন নাই, তখন আপেক্ষিকতার বোধও নাই। ধ্যানের অবস্থায় সুতরাং দেশ-কালাদি বোধ থাকে না। বহির্বিষয়ে এইরূপ হয়। এখন আন্তরিক বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। ইউরোপীয় দার্শনিক-গণ Inner sense এবং Outer sense বলেন। বহিঃ-প্রত্যক্ষ Outer sense। দয়া, ভালবাসা প্রভৃতি Inner sense। দয়া প্রভৃতি আন্তরিক উপলব্ধি বিষয়গুলিতে দেশের পরিচ্ছেদ নাই। কেবল কাল পরিচ্ছেদের সাহায্যেই দয়া প্রভৃতির উপলব্ধি হয়। জগৎ বলিতে নাম ও রূপ। নামকে ইউরোপীয় ভাষায় Idea ও concept বলা যাইতে পারে। আর রূপ বলিতে form। পরিমাণগুণ, প্রকার ও সম্বন্ধ প্রভৃতি সকলই রূপের অন্তর্নিবিষ্ট। দার্শনিক কাণ্ট যে সকল পদার্থ (categories) নির্ণয় করিয়া তাহাদের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সকলেই "রূপের" অন্তর্গত। কাণ্টের Quantity (পরিমাণ), Quality (গুণ), Relation (সম্বন্ধ), Modality (প্রকার) সকলই রূপের অন্তর্নিবিষ্ট। কালগত বোধও ঐ রূপের অন্তর্গত। নাম ও রূপ নিয়াই জগৎ। নাম ও রূপকে পৃথক করিতে পারি না। মনোরাজ্যের নাম (Idea) থাকিলেই রূপ বা আকার থাকিবে। কাণ্ট যে matter এবং formএর পৃথকত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা এ জন্যই অশোভন। রূপ বলিলে, বস্তু ও আকার উভয়ই বোধ হয়। বস্তু ও আকার কখনই ভিন্ন নহে। নাম রূপ অপেক্ষা সূক্ষ্ম। বস্তু অপেক্ষা বস্তুর Idea (নাম) সূক্ষ্ম। কিন্তু সূক্ষ্ম হইলেও নামে রূপ বা আকারের বোধ আছে। আকার নাই এরূপ বস্তুর

ধারণা আমাদের হইতে পারে না; নাম ও রূপ সুষুপ্তি অবস্থায় লুপ্ত হয়। ধ্যানের অবস্থায় নাম-রূপ সংস্কারে পরিণত হয়। সুষুপ্তি অবস্থায় লয় পাইলেও, নাম-রূপের সংস্কার মাত্র থাকে। সংস্কার-সম্বন্ধ প্রবুদ্ধ অবস্থায় স্মরণ হয়। সুষুপ্তিতে জ্ঞান অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে। ধ্যানে বা সমাধিতে জ্ঞান পরিস্ফুট থাকে। সুষুপ্তি ও সমাধিতে এই পার্থক্য আছে। বাহিরের বস্তুর অনুধ্যানে একাগ্র হইলে, নাম-রূপ প্রভৃতির বিশেষ-বিশেষ ভেদ পরিদৃষ্ট হয় না। কেবল এক-সংস্কার-প্রবাহ চলিতে থাকে। এখন এই ধ্যানের অবস্থা অন্তর-রাজ্যে কি প্রকার হয়, তাহাই আলোচ্য। দয়া বা ভালবাসার অনুধ্যান করিতে হইবে। বাহিরের প্রত্যক্ষানুভূত বিষয়ে দেশ-কালাদির চিন্তা আরম্ভ করিলাম।

তন্ময় হইলে দেশ-কাল বিলুপ্ত হইল; এক সংস্কার মাত্র রহিল। দয়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে পূর্ব্বে দেখিয়াছি, দেশের আবশ্যকতা নাই। দয়া প্রভৃতি সূক্ষ্ম (abstsact)। ধারণা করিতে কালের আবশ্যকতা আছে। ধারণা পরিপক্ব হইল। ধ্যানে প্রত্যয়ান্তর রহিল না; দয়ায় তন্ময় হইলাম। কালও বিলুপ্ত হইল। একধারা প্রত্যয়-প্রবাহমাত্র রহিল। দয়া প্রভৃতি বৃত্তিগুলির অনুধ্যানেও এক সংস্কারমাত্র থাকে। এখন মনের ধারণা করা যাক্। সমগ্র অন্তঃকরণের ধারণা করিতে কালের আবশ্যকতা আছে। এস্থলে একটী বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মন একটা ভিন্ন দুইটী বস্তু এককালে ভাবনা বা ধারণা করিতে পারে না। একটী unit ভিন্ন দ্বিতীয় unit ভাবিতে হইলেই, কালের পার্থক্য হইবে। যে সেকেণ্ডে ভাবিতেছি, সেই সেকেণ্ডে অথবা তন্ন্যূনকালে সেই বস্তুই ভাবিব। বস্ত্বন্তর ভাবিতে ক্ষণের বা কালের পরিবর্ত্তন হইবেই। একের ধারণা এককালে সম্ভব; কিন্তু বহুর ধারণা এককালে অসম্ভব; ক্ষণের পরিবর্ত্তন অবশ্যই হইবে। একের ধারণা এক। এবং সমষ্টির ধারণাও এক। কিন্তু বহুত্বের ধারণা বহু। একখানা জাহাজের ধারণা এক; বহরের ধারণাও এক। কিন্তু দশখানা জাহাজের ধারণা বহু। দশখানা ভাবিতে দশ ক্ষণের দরকার। একটী বৃক্ষের ভাবনায় এক ক্ষণের আবশ্যকতা। বৃক্ষ-সমষ্টি-রূপ বনের ধারণায় এক ক্ষণ দরকার; কিন্তু নানা রূপ ও বহু বৃক্ষের ধারণায় বহু ক্ষণের আবশ্যকতা। বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরের ধারণার মাঝে ফাঁক আছে। সে কালের পরিমাণ যতই কম হউক না কেন, কালগত ভেদ আছে। মন একই সময়ে দুইটী বস্তু ভাবিতে পারে না; কিন্তু ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে ভাবিতে পারে। মন কোনও একটী বিষয় লইয়া একাগ্র হইতে পারে; সমষ্টি নিয়াও একাগ্র হইতে পারে; সমষ্টি লইয়া একাগ্র হইলেই মন ব্যাপক হয়। মন যখন বিস্তৃত আকাশের চিন্তা করে, তখন আকাশে ব্যাপ্ত হয়। (অবশ্য যে আকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি। প্রকৃত আকাশ প্রত্যক্ষ নহে।) ক্ষুদ্র হউক, মহৎ হউক, সকল বিষয়ই মন ধারণা করিতে পারে। মনের একটী বিশেষ ধর্ম্ম,—যখন কোন বিষয় চিন্তা করে, তখন তদাকারাকারিত হইয়া যায়। সমস্ত বস্তুটীকে ব্যাপিয়া অবস্থিত হয়। মনের কোনও একটী বৃত্তি সম্বন্ধে চিন্তা করা যায়। সমগ্র অন্তঃকরণও চিন্তা করা যাইতে পারে। মানসিক নানা বৃত্তির চিন্তায় মন একাগ্র হয় না; কোনও বৃত্তি-বিশেষের চিন্তায় একাগ্র হয়। আমরা অনেক সময়ে ইহা অনুভব করি। ক্রোধের সময় অন্য কিছুই বোধ থাকে না। অবশ্য কালের গতিতে ক্রমে ক্রমে একাগ্রতা কমিয়া যায়। ক্রোধ ও অন্যান্য ভাবের আবেগে কমিতে থাকে। কারণ, তখন মন এক বিষয় ত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে পরিণামিত হইতে থাকে। মনের চঞ্চলতা যেমন স্বভাব, একাগ্রতাও তেমন স্বভাব। যখন আমরা মন সম্বন্ধে ধারণা করিতে চেষ্টা করি, তখনই মনের তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা করিতে হয়। বৃত্তিগুলির বিচার করিতে ও উহাদের মূল তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিতে হয়। সমগ্র মনটির চিন্তায় একাগ্রতা আসে। সমগ্র মনের ধ্যান করিতে হইলেই, মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হয়। তত্ত্ব-নির্দ্দেশ মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যখন মনের কার্য্যগুলির চিন্তা করি, তখন মনের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারি না। যেহেতু, মূল কারণের ধারণা হয় না। কারণের ধারণা হইলেই, সমগ্র বস্তুটীর বোধ জন্মিতে পারে। কারণে সমগ্র কার্য্যটা নিহিত। মনের কার্য্যগুলি চিন্তা করিলে, কেবল এক অংশের বিচার হইল। ইয়োরোপীয় মনোবিজ্ঞান (Psychology) কেবল মানসিক বৃত্তি বা কার্য্যগুলির বিচারে পর্য্যবসিত। মনের মূল তত্ত্বের অনুসন্ধান বিশেষ ভাবে করা হয় না। ইয়োরোপীয় মনোবৈজ্ঞানিকগণ মনের দুইটী অবস্থার বিষয় বিশেষ অনুধাবন করেন। সে অবস্থা দুইটী —জাগরণ এবং স্বপ্ন (conscious and sub-conscious state)। কারণ, এই দুই অবস্থায় মনের কার্য্য

সম্বন্ধে বিচার করিতে পারা যায়। কিন্তু তাঁহারা সুষুপ্তি অবস্থার বিশেষ বিচার করেন না। আজ-কাল মনো-বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে। এখন দার্শনিকগণ সুষুপ্তি অবস্থাকেও স্বীকার করিতেছেন। এই অবস্থার নাম sub-marginal অথবা subliminal state দেওয়া যাইতে পারে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের উন্নতিতেও মনস্তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয় নাই; কারণ মনস্তত্ত্ব Psychologyর প্রতিপাদ্য নহে। Psychology মনের কার্য্যাবলীর বিচারে নিবদ্ধ। সুতরাং ইয়োরোপীয় মনোবিজ্ঞান Phenomenology of mind। কিন্তু মনের প্রকৃত তত্ত্ব বা স্বরূপ পরিজ্ঞানে সুষুপ্তি অবস্থার বিচার আবশ্যক। কারণ, সুষুপ্তিও মনের অবস্থাবিশেষ। সুষুপ্তি অবস্থায় মন নানাত্ব ত্যাগ করে। এক ভাবে অবস্থিত হয়। মানসিক বৃত্তিগুলি লোপ পায়। আবার সেই লুপ্ত সুপ্ত অবস্থা হইতেই ক্রমশঃ বৃত্তিগুলি অভিব্যক্ত হইতে থাকে। বীজের ভিতরে যেমন সমস্ত বৃক্ষের শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে, সেইরূপ সুষুপ্তি অবস্থায় মনের বৃত্তিগুলি অন্তর্নিহিত থাকে। সুষুপ্তিতে তিরোহিত থাকে; ক্রমশঃ আবির্ভূত হয়। বীজ যেমন বৃক্ষের কারণ, সুষুপ্তিও তেমনই মানসিক কার্য্যের কারণ। সুষুপ্তি অবস্থায় সংস্কারমাত্র থাকে। অতএব সংস্কারকে মানসিক বৃত্তির কারণ বলিতে পারি। সংস্কারেই সকল বৃত্তির বীজ নিহিত। এখন জিজ্ঞাস্য, সংস্কার এক কি বহু? তদুত্তরে বলিব, সুষুপ্তিতে ও ধ্যানে আমরা দেখিতে পাই, সংস্কার এক। তন্ময়ত্ব লাভ করিলে আপেক্ষিকতা থাকে না। আপেক্ষিকতা না থাকায়, সংস্কার এক। সুষুপ্তিতেও আপেক্ষিকতা নাই; সুতরাং এক সংস্কারই মূল কারণ। মনের ধারণা করিতে, এই সংস্কার সম্বন্ধে ধারণা আবশ্যক। সেই সংস্কারের অনুধ্যানে তন্ময় হইলে, বহির্জগতের নানাত্ব ও মানসিক বৃত্তির নানাত্ব থাকিবে না; কেবল মাত্র সংস্কার-প্রবাহ চলিতে থাকিবে। মনস্তত্ত্ব নির্দ্দেশিত হইল। কিন্তু মনের সম্বন্ধে আরও বিবেচ্য বিষয় আছে। মন অণু পরিমাণ, কি ব্যাপক? মন যখন একটি বিষয় এককালে ভাবে, পদার্থান্তর ভাবিতে পারে না, তখন মনকে অণু পরিমাণ বলা যাইতে পারে। আমরা তদুত্তরে বলিব, তাহা অসম্ভব। মন অণু পরিমাণ নহে। কারণ, মন ব্যাপক বলিয়াই, অণু ও মহৎ সকল বস্তুতেই পরিব্যাপ্ত হয়। বস্তুর সকল অংশ ব্যাপিয়াই মন অবস্থিত। মন ক্ষণ মাত্রে ইয়োরোপের বিষয় ভাবিতে পারে; আমেরিকার বিষয় ভাবিতে পারে; সমস্ত পৃথিবীর বিষয় ভাবিতে পারে; আবার ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র পরমাণুর বিষয় ভাবিতে পারে। সূর্য্যরশ্মির ভিতর যে সকল রেণু ভাসিতেছে, মন তাহারও ধারণা করে। বহুত্ব (plurality) ভাবিতে সময়ের ফাঁক থাকে। কিন্তু সমগ্র ব্যাপক বস্তুতে মন ব্যাপ্ত হয়। মন সমগ্র বিশ্বকেও ভাবিতে পারে। আমাদের দৃষ্টি-শক্তি যতদূর প্রসারিত হয়, ততদূরের ও অন্তরালের যাবতীয় বস্তু, স্থান, কাল ব্যাপিয়া মন অবস্থিত হয়। তাহাতেই আমরা বস্তুর দূরত্বাদি ও দিকাদি নির্ণয় করিতে পারি।

বাৎস্যায়নের কামসূত্র

[শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ]

কামসূত্রের নাগরকবৃত্ত-প্রকরণ হইতে আমরা তাৎকালিক জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের একটা ধারা সংগ্রহ করিতে পারি।

ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে গৃহীতবিদ্য হইয়া ধর্ম্মপত্নী-গ্রহণ-পূর্ব্বক চতুর্ব্বর্ণের লোকই গৃহস্থ-ধর্ম্মাচরণ করিয়া ত্রিবর্গ-সাধনে প্রবৃত্ত হইত।

আটশত গ্রাম সমবায়কে নগর বলা হইত। দুইশত গ্রামীর নাম ছিল খর্ব্বট। চারিশত গ্রামীকে দ্রোণমুখ বলিত। রাজধানীর নাম ছিল পত্তন। গৃহস্থ এই সকলের মধ্যে সজ্জনাশ্রয়ে আপন বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন। গ্রামেই হউক, নগরেই হউক, পত্তনেই হউক,—বাসভবন নির্ম্মাণ করিতে এমন স্থান নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য, যে স্থান আসন্নোদক অর্থাৎ নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের সন্নিকটবর্ত্তী; জলাশয়ের দিকে বৃক্ষবাটিকা অর্থাৎ গৃহোদ্যান

থাকিত; বাসভবন প্রয়োজনানুরূপ নানা কক্ষে বিভক্ত হইত; আর বাসভবনের দুইটি অংশ থাকিত,—একাংশে শয়ন করা হইত, অপর অংশে আমোদ-প্রমোদ করা হইত। ভিতর-বাটীতে অন্তঃপুরিকাগণের শয়নের ব্যবস্থা ছিল। বহির্বাটীতে অর্থাৎ বৈঠকখানাতে পুরুষগণ আমোদ-প্রমোদ করিতেন। এই দুই খণ্ড সম্পূর্ণ পৃথক ছিল।

বাহিরের বাসগৃহে যে শয্যা থাকিত, তাহা তূলা প্রভৃতির বিছানা দ্বারা বেশ নরম করিয়া প্রস্তুত করা হইত; এবং তাহা সুরভিত করাও হইত। মাথার দিকে এবং পায়ের দিকে বালিশ দেওয়া থাকিত; মাঝের দিকটা একটু অবনতভাবে থাকিত, যেন আরামদায়ক হয়। উপরে বেশ সাদা ধবধবে চাদর বিছান থাকিত। উহা প্রত্যহ অথবা ২।৩ দিন পরে-পরেই জলে কাচিয়া দেওয়া হইত। ইহারই পার্শ্বে, উহা হইতে কিছু নিম্নে, আর একটা শয্যাও থাকিত। তাহার নাম প্রতিশয্যিকা। সেটা প্রিয়াসহ শয়নের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল।

শয্যাস্থানের শীর্ষদেশে ইষ্ট-দেবতার স্মরণ ধ্যান প্রভৃতির জন্য "কূর্চস্থান" থাকিত। সেখানে বসিয়া শুচি ভাবে ইষ্ট-দেবতার ধ্যান করিয়া পরে শয়ন করার ব্যবস্থা ছিল।

শয্যাপার্শ্বেই, শয্যার সমান উচ্চ, এক হাত বিস্তৃত একটি বেদী থাকিত। সেখানে রাত্রির উপভোগের উপযুক্ত চন্দনাদি অনুলেপন, মাল্য, মোমের কৌটা, সুগন্ধি দ্রব্যের তমালাদি পত্র-নির্ম্মিত পুটিকা বা দোনা, মাতুলুঙ্গ ফলের (ছোলঙ্গ নেবু) খোসা (ইহাদ্বারা মুখের দুর্গন্ধ দুর হয়), তাম্বুল প্রভৃতি সজ্জিত থাকিত। ছোলঙ্গ নেবুর খোসা মধু সহ-যোগে লেহন করিলে মুখের দুর্গন্ধ নাশ হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

শয্যার নিকটস্থ ভূমিতে যথাস্থানে পতদ্গ্রহ অর্থাৎ পিকদানী রাখা হইত; তাহাতে থুথু, পানের পিক ইত্যাদি ফেলা হইত।

ঘরের দেওয়ালে নাগ-দণ্ডে খোলে ঢাকা বীণা (অথবা ঐরূপ বাদ্যযন্ত্র) টাঙ্গান থাকিত; ভাল ভাল ছবি খাটান থাকিত; চিত্রকর্ম্মের উপযুক্ত ফলক (canvas) এবং তৎসাধনোপ-যোগী রং তুলি প্রভৃতিও রাখা হইত। যে কোনও রূপ পুস্তক (সাধারণতঃ তাৎকালিক মনোভাবের উপযোগী কাব্য নাটকাদি পুস্তক)ও সেখানে থাকিত, ইচ্ছা হইলে নাগরক গৃহস্থ পুস্তক বাচন কলার আলোচনা করিতেন। কুরন্টক মালাও নাগদণ্ডে ঝুলাইয়া রাখা হইত। কুরন্টক কবিকল্পিত পীতবর্ণের এক প্রকার অম্লান কুসুম। ইহা কখনও বৈবর্ণ্য প্রাপ্ত হয় না (ইংরেজী Amaranth)। এই সব যথা-স্থানে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া নাগরের সুরুচির পরিচয় দিত। প্রয়োজনানু-সারে উহাদিগকে যে নামাইয়া লওয়া হইত, তাহা বলা বাহুল্য।

শয্যা হইতে নাতিদূরে ঘরের মেজেতে, আর একটি আস্তরণ বা বিছানাও বিছান থাকিত; তাহাতে মাথা রাখি-বার জন্য উপাধানাদিও কিছু থাকিত। সেখানে সাধারণ ভাবে বসা হইত। খেলার জন্য নীচে পাশা এবং জুয়া খেলার ফলকগুলিও সজ্জিত থাকিত। প্রয়োজনানুসারে তাহা প্রসারিত করিয়া খেলা করা হইত। ঐ ঘরের বাহিরে অথচ নিকটেই ক্রীড়াশকুনী (খেলার পাখী)দের খাঁচা নাগদণ্ডে ঝুলান থাকিত। ঘরের মধ্যে বিষ্ঠাদি দ্বারা অপরিষ্কার করিতে পারে, এই আশঙ্কাতেই তাহাদের স্থান বাহিরে করা হইত, তাহা বুঝিতেই পারা যায়। ইহার একদেশে তর্ক তক্ষণ (কুন্দন এবং ছুতারের কাজের) ও অন্যান্য ক্রীড়ার স্থান এমন স্থানে করা হইত যে, হঠাৎ তাহা দৃষ্টিগোচর না হয়। বৃক্ষ-বাটিকার মধ্যে উপরে ঘনশ্যাম লতাদি দ্বারা আচ্ছাদিত সুখদায়ক ঝুলনা থাকিত। আবার পুষ্পলতাদি দ্বারা আচ্ছাদিত, মধ্যে বসিবার আসনযুক্ত কুসুমাস্তীর্ণ লতামণ্ডপেরও ব্যবস্থা তথায় থাকিত। এইরূপ উত্থাপন এবং অবস্থাপনের দ্বারা আবাসগৃহের বিন্যাস হইত। এই আবাসগৃহের শৃঙ্খলা এবং আসবাব আদির ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, ইহা বিন্যাসীর উপযুক্ত সর্ব্ব প্রকার সুখ এবং আরামের স্থল ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আমাদের নাগর এইরূপ বাসগৃহে কিরূপ প্রণালীতে দিন-চর্চ্চা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহাও একবার দেখা যাউক।

প্রাতঃকালে উঠিয়া মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করতঃ, দন্ত-কাষ্ঠাদি দ্বারা দন্তধাবন পূর্ব্বক মুখ প্রক্ষালনাদি করিয়া নিজ সন্ধ্যা-বন্দনাদির অনুষ্ঠান করিতেন। তাহার পর উপযুক্ত মাত্রায় অনুলেপনাদি গ্রহণ করিয়া, অগুরু প্রভৃতির সুগন্ধি ধূপ গ্রহণ পূর্ব্বক, মাল্য ধারণ করিতেন। মোম এবং অলক্তক দ্বারা বিশিষ্ট অঙ্গরাগ সম্পাদন করিতেন। প্রথমে ঈষদার্দ্র

অলক্তকপিণ্ড দ্বারা ওষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণ করিয়া, তাম্বুল চর্ব্বণ পূর্ব্বক মোমের গুলি দ্বারা ওষ্ঠদ্বয়কে তাড়না করা হইত। তাহাতে ওষ্ঠের আরক্ত আভা চিক্কণ এবং স্থায়ী ভাব ধারণ করিত। আমরা ভাবিতাম রুজ্, পাউডার, পমেড, মিল্ক অব রোজ ইত্যাদি বুঝি পাশ্চাত্যদিগেরই সম্পত্তি;—আমাদের নিবৃত্তি-মার্গানুসারী আর্য্যগণের মধ্যে ওসব কৃত্রিমতার বালাই ছিল না: কিন্তু বাৎস্যায়ন আমাদের সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আমাদের নাগর, নাগরীগণের মধ্যেও প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও, এইরূপ সব কৃত্রিম উপকরণের বহুল প্রচলন ছিল দেখিতেছি।

যাহা হউক, এইরূপে ওষ্ঠদ্বয়ের রঞ্জন সমাপন পূর্ব্বক আয়নাতে মুখ দেখা হইত যে, সাজগোজটা বেশ ফিট্‌ফাট্ রকম, মন-ভুলান-গোছ হইয়াছে কি না। তার পর গন্ধযুক্তিসম্বলিত মুখের সুগন্ধ সম্পাদক গুলি (স্ফূর্ত্তির গুলির মত কিছু বোধ হয়) মুখে রাখিয়া, হাতের আধারে তাম্বুল গ্রহণ করিয়া, আমাদের নাগর বাবু স্বীয় কার্য্য সাধনে (যার যে কাজ,—কেহ ধর্ম্ম, কেহ অর্থ, কেহ কামের সেবায়) প্রবৃত্ত হইতেন।

শরীর-সংস্কারের জন্য স্নান প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য ছিল। একদিন অন্তর একদিন উৎসাধন (পদদ্বারা দেহ-মর্দ্দন ৬৪ কলার একবিধ) করান হইত। প্রতি তৃতীয় দিনে জঙ্ঘাদ্বয়ে এক প্রকার ফেণ মর্দ্দন দ্বারা তাহার মসৃণতা সম্পাদন করা হইত। প্রতি চতুর্থ দিনে আয়ুধ্য কর্ম্ম অর্থাৎ দাড়ী কামান হইত। প্রতি পঞ্চম বা দশম দিনে প্রত্যায়ুধ্য কর্ম্ম (গোপনীয় স্থানসমূহের লোমোৎসাদন) করার প্রথা ছিল। এই অনুষ্ঠান অবিকল এইরূপ ভাবেই করার নিয়ম ছিল। অন্যথা—অনাগরকরূপে তিরস্কৃত হইতে হইত। সাহেবদিগের যেমন প্রত্যহ দাড়িটি কামান চাই-ই,—অন্যথা অভদ্র রূপে উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা।

নিজের বক্ষ সর্ব্বদা খোলা রাখিবার আদেশ ছিল। যদি কর্ম্মবশতঃ উহা সংবৃত থাকায় ঘামিয়া উঠে, তবে ঐ ঘর্ম্ম সর্ব্বদা ভাল রূপে মুছিয়া ফেলিতে হইবে; নতুবা দুর্গন্ধ বলিয়া নাগরকে অরসিক বানাইয়া দিবে।

পূর্ব্বাহ্ণে এবং অপরাহ্ণে অথবা সায়ংকালে ভোজনের নিয়ম ছিল। প্রধানতঃ দিন রাত্রিতে দুইবার পূর্ণ ভোজনের প্রথা ছিল। এ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, অজীর্ণে ভোজনও যেমন অনিষ্টকর, জীর্ণে অভোজনও সেইরূপ অনিষ্টকর। আর রাত্রিতে অনাহারও মানবের জীর্ণ-শীর্ণ হইবার একটা কারণ।

আহারের পর পালিত শুক-শারিকা প্রভৃতিকে পড়ান, তাহাদের আলাপ শোনা, লাবক কুক্কুটাদি পক্ষীর এবং মেষাদি পশুর লড়াই দেখা, এবং প্রহেলিকা প্রতিমালা (২য় প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে) প্রভৃতি কলা-ক্রীড়ার আলোচনা, তৎপরে পীঠমর্দ্দ-বিট-বিদূষকাদির আয়ত্ত ব্যাপার-সমূহ শেষ করিয়া দিবানিদ্রা সেবা করিতেন। যদিও দিবা-নিদ্রা অধর্ম্ম বলিয়া পরিজ্ঞাত, তথাপি গ্রীষ্মকালে শরীরের পোষণ জন্য ইহার ব্যবস্থা আছে।

তৎপরে অপরাহ্ণে বিহারোপযোগী বেশাদি পরিধান পূর্ব্বক গোষ্ঠীবিহারে গমন করিতেন, তথায় উপযুক্ত ক্রীড়াদির অনুষ্ঠান করিতেন। এই গোষ্ঠী বলিতে কতকটা বর্ত্তমান সময়ের ক্লাব বুঝায় বলিয়া আমরা মনে করি। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও এই গোষ্ঠী শব্দের এইরূপ অর্থই মানসী ও মর্ম্মবাণীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

এই গোষ্ঠীতে নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়া-কূর্দ্দন এবং কাব্য-কলাদির আলোচনা করা হইত। পানাদিও চলিত। এটা সাধারণের একটা মিলন-ক্ষেত্র ছিল। সংসারের নানা কার্য্যে শ্রান্ত হইয়া, অপরাহ্ণে সকলে এখানে মিলিয়া বিশ্রম্ভালাপে এবং আমোদ-প্রমোদে সুখানুভব করিতেন। তার পর সায়ংকালে নৃত্য-গীত-বাদিত্রাদি সঙ্গীতের আলোচনা করা হইত। ইহাতে কতক রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইত।

পরে বাহিরের বাসগৃহ সম্মার্জ্জনাদি দ্বারা সংস্কৃত, এবং পুষ্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত, ও ধূপাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া, তথায় শয্যাদি রচনা দ্বারা প্রসাধিত করিয়া, নায়ক প্রিয়া-সমাগম অপেক্ষায় উৎসুক রহিতেন।

এই তো গেল নিত্য ব্যাপার। ইহা ছাড়া নৈমিত্তিক ব্যাপার আছে। নৈমিত্তিক ব্যাপারও নানা প্রকারের ছিল।

বিশেষ-বিশেষ দেবতার পূজার দিবসে (যেমন গণেশ-চতুর্থী, বসন্ত-পঞ্চমী, শিবাষ্টমী ইত্যাদি) সরস্বতী ভবনে নাগর-নটাদি একত্র হইয়া পূজা-নৃত্য-গীতাদির অনুষ্ঠান করা হইত। সরস্বতী দেবী বিদ্যা, কলা প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী

দেবী বলিয়া, নাগরকগণের পক্ষে তিনি বিশেষ দেবতারূপে পূজিতা হইতেন। গণিকা-ভবনেও ইহাঁর পূজানুষ্ঠানের প্রথা বিশেষ রূপে প্রচলিত ছিল। এখনও যে কলিকাতাদি সহরে বেশ্যাদিগের বাড়ীতে সরস্বতী পূজার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা এই প্রাচীন প্রথারই অনুকৃতি মাত্র, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই সব বিশেষ-বিশেষ সময়ে অন্যান্য স্থান হইতে নট-নর্ত্তক-গায়কাদি দেবায়তনে আসিয়া, স্বীয় কলা-কৌশলের পরিচয় দিত। তার পর গোষ্ঠী-সমবায়। নিত্য-ক্রিয়াতে গোষ্ঠীতে খেলা-ধূলাই বেশী হইত। সময়-সময় এই গোষ্ঠীতে প্রজ্ঞা বর্দ্ধনের উপযোগী কাব্য-কলাদি নানা গুরুতর বিষয়েরও আলোচনা হইত। এইরূপ সব গোষ্ঠীর মিলন-স্থান কখনও বেশ্যা-ভবন, কখন মণ্ডপ, কখনও বা নাগরকদিগের কাহারও না কাহারও গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইত। এই সব স্থানে সমান বিদ্যা, বুদ্ধি, শীল, বিত্ত, বয়সের নাগরকগণ একত্র হইয়া বিশেষ আমোদ উপভোগ করিতেন। বিদ্যা, বয়স, কুল, শীল, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ে সমান হইলে, যেরূপ পরস্পরের মধ্যে ভাব হয়, অন্যথা তাহার সম্ভাবনা খুব কম।

এইরূপ অবস্থায় নাগরকগণ বেশ্যাদিগের সহিত উপযুক্ত নর্ম্মালাপে নিযুক্ত থাকিতেন। ইহাই গোষ্ঠী। ইহা কখনও ১৫ দিন অন্তর, কখন বা একমাস অন্তর বসিত; পূর্ব্ব হইতে অধিবেশনের দিন নির্দ্দিষ্ট এবং বিজ্ঞাপিত হইত।

এইরূপে সকলে একত্র হইয়া, কাব্য এবং অন্যান্য কলাদির সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এই চর্চ্চার অবসানে গুণী ব্যক্তিকে সুন্দর বস্ত্রাদি উপহার প্রদানে সম্মানিত এবং উৎসাহিত করা হইত। অতএব এই সব গোষ্ঠীতে Literary Clubএর কার্য্যও সাধিত হইত।

তার পর সময় সময় সমাপানক অনুষ্ঠিত হইত, অর্থাৎ কোন দিন একজনের, আবার কোন দিন অন্যজনের বাটীতে সকলে সমবেত হইয়া পানাদি কার্য্য চলিত। এইরূপ সম্মিলনের দিনও মাসে একদিন বা দুইদিন পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট করা হইত যে, কোন্ সময়ে কাহার বাটীতে এইরূপ অনুষ্ঠান করা হইবে। তিনিও সেই অনুসারে প্রস্তুত হইতে পারিতেন। এই সব আপানকে মাধ্বী, মৈরেয় প্রভৃতি নানারূপ আসব এবং নানাবিধ লবণ-কটু-কষায় ফল-শাকাদির সমবায়ে প্রস্তুত আচার-চাটনি প্রভৃতি সেবিত হইত।

এইরূপ আপানক বিধি উদ্যানাদিতে গমন করিয়াও করা হইত। পূর্ব্বে যে গৃহোদ্যানের কথা বলা হইয়াছে, সেটা নিত্য ক্রিয়ারই অন্তর্গত; আর নৈমিত্তিক উদ্যানে গমনটা হচ্ছে পৃথক। নিজের হউক বা অন্যের হউক, বাগান-বাড়ীতে গিয়া পান-ভোজন আমোদ-প্রমোদের বিধি ছিল। বিহারোচিত বেশে ভূষিত হইয়া, অশ্বারোহণে বয়স্য-গণের সহিত, অনুগত পরিচারকাদি সমভিব্যাহারে, পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট দিনে পূর্ব্বাহ্ণে উদ্যানে গমন করা হইত। সেখানেই প্রাত্যহিক দিন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, কুক্কুট-মেষাদির লড়াই এবং দ্যূত-ক্রীড়াদি নিষ্পন্ন করিয়া, নাট্যাভিনয়, নৃত্য প্রভৃতি দর্শন-সুখানুভব পূর্ব্বক, অপরাহ্ণে সেই উদ্যান উপভোগের চিহ্ন, যেমন তত্রত্য কুসুমাদির স্তবক, লতা, কিশলয় প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করা হইত। ঐ সব উদ্যানে বাপী, দীর্ঘিকা প্রভৃতি থাকিলে, গ্রীষ্মকালে তাহাতে নামিয়া জলক্রীড়াদির অনুষ্ঠানও করা হইত।

তার পর সমস্যা ও ক্রীড়ার নৈমিত্তিক বিবরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, কতকগুলি পর্ব্ব সর্ব্বদেশে অনুষ্ঠিত হইত। ইহাদিগকে মাহিমান্য বলিত। আর কতকগুলি দেশ্য অর্থাৎ বিশেষ-বিশেষ দেশের বিশেষ-বিশেষ অনুষ্ঠান (local festivities) ছিল।

কার্ত্তিকী অমাবস্যাতে যক্ষ-রাত্রি বা সুখ-রাত্রির অনুষ্ঠানে দ্যূত-ক্রীড়াদি হইত। এখনও দেওয়ালীতে পশ্চিম প্রদেশে জুয়াখেলার বিশেষ প্রথা বর্ত্তমান আছে। কৌমুদী জাগর আশ্বিন মাসের পৌর্ণমাসীতে অনুষ্ঠিত হইত। তাহাতে দোলায় দোলন এবং দ্যূত-ক্রীড়াদি হইত। আমাদের কোজাগর লক্ষ্মীপূর্ণিমার অনুষ্ঠান বোধ হয় ইহারই স্মৃতি বহন করিতেছে। মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে সুবসন্ত বা মদনোৎসব হইত। তাহাতে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হইত! এইগুলি ছিল মাহিমান্য। আর দেশ্যের মধ্যে অনেক প্রকার অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে গাছের বিয়ে দেওয়া, হোলি, রং খেলা প্রভৃতি এখনও প্রচলিত আছে। তার পর ছোলার ফল শুদ্ধ গাছ আগুনে ঝলসাইয়া তার ফল খাওয়া, পদ্মের মৃণাল তুলিয়া খাওয়া, আম ভাঙ্গিয়া খাওয়া, পুষ্পবহুল একটি সিমুল গাছের নীচে দাঁড়াইয়া তার ফুল লইয়া খেলা, বৈশাখী শুক্লা-চতুর্থীতে পরস্পরের প্রতি সুগন্ধি যবচূর্ণ প্রক্ষেপ করা, শ্রাবণ শুক্লা-চতুর্থীতে হিন্দোল-ক্রীড়া

বা ঝুলান খেলা ;—শ্রীকৃষ্ণের ঝুলান-যাত্রার বিষয় এস্থলে স্মর্ত্তব্য। পশ্চিমদেশে এই ঝুলান খেলার এখনও বেশ প্রচলন আছে।

আখ ভাঙ্গা, অশোক, দমনক প্রভৃতি ফুলের দ্বারা শিরোভূষণ এবং কর্ণভূষণাদি নির্ম্মাণ করণ, প্রস্ফুটিত কদম্ব ফুলের দ্বারা দুই দলে যুদ্ধ ইত্যাদি নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ প্রচলিত ছিল। এই সব নাগরকগণের আবার উপনাগর থাকিত। তাহাদের অর্থ-সামর্থ্যাদি না থাকায়, ইহাদের মোসাহেবী করিয়া আমোদের অংশ উপভোগ করাই তাহাদের কার্য্য ছিল। ইহারাই পীঠমর্দ্দ, বিট, বিদূষকাদি। এখনও ধনী বিলাসী সমাজে এইরূপ মোসাহেবের অভাব নাই। গ্রামবাসীগণ যথাসম্ভব নাগরকগণের বৃত্তির অনুকরণ করিবার লোকদিগকে উৎসাহিত করিয়া, নানারূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা লোকানুরঞ্জন করিতে চেষ্টা পাইত।

গোষ্ঠীতে কথাবার্ত্তা নিতান্ত সংস্কৃত-ভাষায় বা নিতান্ত গ্রাম্য ভাষায় করার নিয়ম ছিল না। কখন সংস্কৃত, কখন দেশ-ভাষা, অর্থাৎ যখন যেরূপ প্রয়োজন, তখন সেইরূপ ভাষারই আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক মনোভাব প্রকাশ করা হইত। যাহারা নিজে গোষ্ঠী স্থাপনে অসমর্থ, তাহারা অন্যের গোষ্ঠীতে যাইত; কিন্তু যে সব গোষ্ঠী লোক-নিন্দিত, স্বেচ্ছাচারী, কোন নিয়মের অধীন নহে, যেখানে পরের নিন্দা করা হয়, সেইরূপ গোষ্ঠীতে জ্ঞানী ব্যক্তিকে যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

যে সব গোষ্ঠী লোকের চিত্তানুরঞ্জন করিতেই সর্ব্বদা প্রবৃত্ত, এবং যেখানে কেবল খেলা-ধূলাদির কার্য্য হয়, অর্থাৎ অন্যের অনিষ্টজনক কোন কার্য্যের কল্পনাও যেখানে হয় না, সেরূপ গোষ্ঠীতে গমন করিলে বিদ্বান ব্যক্তি লোকসিদ্ধ অর্থাৎ লোক-চরিত্রাভিজ্ঞ হইয়া থাকেন।

যাঁহারা নিজে গোষ্ঠী স্থাপন করিতেন, তাঁহাদেরও এইরূপ বিধি মানিয়াই কার্য্য করিতে হইত।

উপরিউক্ত বিবরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, নাগরক-বৃত্ত তখনও যেরূপ ছিল, এখনও অনেকটা সেইরূপই আছে। সেই বাগান-বাড়ী, সেই নর্ম্মালাপ, নৃত্য-গীত, পান ভোজন, সেই ফিট্‌ফাট্ বেশ-বিন্যাস প্রভৃতি বাবুগিরি এখনও আমাদের সমাজে বর্ত্তমান। গোষ্ঠীর প্রচলনও বড়লোক বিলাসীদের বাড়ীতে না আছে তাহা নহে; তবে এইসব গোষ্ঠীতে পূর্ব্বের ন্যায় সাহিত্য, কাব্য ও অন্যান্য কলা-বিদ্যার চর্চ্চা বড় একটা হয় না বোধ হয়। তবে শুনিয়াছি, নাট্যশালার বিখ্যাত অভিনেত্রীদিগের কাহার-কাহারও বাড়ীতে সৌখীন বাবুরা অনেক সময় কেবল নাট্যকলার চর্চ্চা করিতেই গমন করিয়া থাকেন। ইহা কতদূর সত্য, তাহার সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই।

কুক্কুটাদির লড়াই আর বাঙ্গলা দেশে বড় একটা দেখা যায় না। তবে বিড়াল-কুকুরের বিবাহাদির প্রচলন আছে বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন।

বাসস্থানের শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়, সে সময়ের লোকদিগের, বিশেষতঃ বিলাসীদিগের সৌন্দর্য্য-বোধ ছিল। তাঁহারা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে, এবং গৃহাদি ফিট্‌ফাট্ দেখিতে ভালবাসিতেন। আবাস-গৃহের অলঙ্করণাদির প্রতিও তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আলয় সন্নিকটস্থ গৃহোদ্যানটা প্রধানতঃ কুসুমোদ্যান বলিয়াই মনে হয়। মধ্যে-মধ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষের স্থানও অল্প বিস্তর ছিল। পাখী পোষা, পাখী পালন তখন প্রায় লোকেরই সখ ছিল। এখনও বড়লোকের মধ্যে পাখী পোষার সখ বেশ আছে।

অতঃপর কাম-সূত্রে যে সমুদয় প্রকরণাদি বর্ণিত হইয়াছে তাহাদের অনেকগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিই প্রকাশ্যে আলোচনার অযোগ্য; সুতরাং তাহা হইতে বিরত হইলাম। তবে বিবাহ, সতী স্ত্রীর কর্ত্তব্য প্রভৃতি কয়েকটা বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তাহার সঙ্গে আর আর দুই একটা বিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ইহার পরের প্রবন্ধে বলিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব এইরূপ ইচ্ছা থাকিল।

যে সমুদয় প্রকরণ বাদ দিতে হইল, তাহাদের মধ্যে মানব-প্রকৃতির গূঢ় ভাব ও রহস্য বিশ্লেষণের অনেক উৎকৃষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। তাহা হইতেই গ্রন্থকর্ত্তা বাৎস্যায়ন মুনির সূক্ষ্ম-দৃষ্টি এবং মানব-হৃদয়-মন্দিরের প্রত্যেক কক্ষের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিধিলিপি

[অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রদাস চৌধুরী, এম-এ]

১

আজকাল কলিকাতায় সৌখীন লোক বলিলে থিয়েটার, বায়স্কোপ, বাগান-বাড়ী, লাল-পাণি ইত্যাদি যাহা বুঝায়, বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের মদন ঘোষও তাহার মধ্যেই ছিল। তাহার উপর তা'র একটা বিশেষ নেশা ছিল, ঘোড়-দৌড়ে যাওয়া। হঠাৎ একদিন মদনের স্ত্রী একটী মাত্র কন্যা-সন্তান রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিল। আর মাসেকের মধ্যে ঘোড়-দৌড়ে বাজী হারিয়া মদন যখন সর্ব্বস্বান্ত হইল, তখন তাহার দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মিল যে, সে লক্ষ্মী হারাইয়াছে। কলিকাতার বাড়ী মহাজনেরা ভাগ-বণ্টক করিয়া লইয়া, তাহাকে অতিশয় দুঃখের সহিত পরামর্শ দিল যে, এখন তাহার পাড়া-গাঁয়ে গিয়াই থাকা উচিত। মদন অসহায় হইয়া মাতৃভূমি ফরিদপুরের 'মন্ত্রিবাড়ী' গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিল। কিন্তু একাকী কি করিয়া সংসার চালায়? বিশেষতঃ গ্রাম্য বৃদ্ধগণের অনুরোধ উপেক্ষা করাও অভদ্রতা। তাই ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় কুলীন-বংশের আর একটী অষ্টাদশী কন্যাকে মদন ঘরে আনিল। তাহার নাম মুণ্ড-মালিনী;–চেহারাখানি দেখিয়া কোন ব্যক্তিরই দ্বিতীয়বার দেখিবার ইচ্ছা হয় না। মুণ্ড-মালিনীর আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই দেশের যত কুকুর-বিড়াল হরতাল করিয়া সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়াছিল;—কারণ বলিতে পারি না—তবে গ্রামের দুষ্ট ছেলেরা বলিত, মুণ্ড-মালিনীর কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইত না এমন জীব সে দেশে ছিল না।

যাহা হউক, বৃদ্ধ বয়সে তরুণী বিবাহ করিলে, অতি অনিচ্ছাসত্ত্বেও দশ জনের যেমন হইয়া থাকে, মদন ঘোষেরও তেমনি বছর চা'রেকের মধ্যে তিনটী কন্যারত্ন জন্ম গ্রহণ করিল। মুণ্ডমালিনী জেদ্ করিয়া তাহাদের নাম রাখিল—আন্নাকালী, রক্ষাকালী ও ভদ্রকালী। বলা বাহুল্য, বালিকা-গণের শরীরের রঙের সঙ্গে নামের সাদৃশ্য ভয়ঙ্করই হইয়াছিল। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া দরিদ্র মদন ঘোষের মুখ শুকাইয়া গেল।

প্যারীচরণ মিত্রের পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর। তাহার পিতা উমাচরণ কাঠের দোকান করিয়া অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর, কিছুদিনের মধ্যেই বিবাহ-বীমা কোম্পানীর এজেন্সী লইয়া, বহু বিধবার অর্থে প্যারীচরণ বড়লোক হইয়া উঠিয়াছিল; এবং কলিকাতার হিদারাম ব্যানার্জ্জীর লেনে বাড়ী তৈয়ার করিয়া সুখে বসবাস করিতেছিল।

অনিলকুমারের পিতাও যখন মাতার মৃত্যুর কয়েক দিন পর হঠাৎ এক রাত্রে বিসূচিকায় মারা গেলেন, তখন উনিশ বৎসর বয়সের ছোট ভাই সুনীলকে লইয়া, সে দূর-সম্পর্কীয় কাকা প্যারীচরণের বাড়ী আসিয়া আশ্রয় লয়। তখন সে এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়িত। প্যারীচরণ অনেক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়াও এই অসহায় নির্লজ্জ ছেলে দু'টীকে যখন বাড়ীর বাহির করিতে পারিল না, তখন অগত্যা তাহাদের ভরণ-পোষণে এই সর্ত্তে স্বীকৃত হইল যে, অনিল তাহার ছোট ছেলে দুইটিকে দিনরাত্রি পাঠের গৃহে ও মাঠের খেলায় চড়াইয়া মানুষ করিবে; আর তাহার নয় বছরের ছোট ভাই দৈনিক বাজার করিয়া, ঘর দোর ঝাট দিয়া, ও বাকী সময় প্যারীচরণের খুকীকে কোলে লইয়া তাহার চাকরের বেতন বাঁচাইয়া দিবে। ছেলে দুইটী পেটের জ্বালায় তাহাতেই রাজী হইল। প্যারীচরণ অনিলের সঙ্গে আরও এক সর্ত্ত করিয়া লইল যে,—চার বৎসর ধরিয়া বি-এ, পাশ পর্য্যন্ত পড়া চালাইবার ব্যয়ের আংশিক আদান-স্বরূপ, তাহার বিবাহে যাহা যৌতুক ও পণের টাকা পাওয়া যাইবে, সমস্তই বিনা ওজরে প্যারীচরণকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই ভাবে সুখে-দুঃখে ক্রোধে-কলহে দুই পক্ষের কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। অনিল তখন বি-এ পাশ করিয়া চাকরির, ও তাহার কাকাবাবু তাহার তিনটী পাশের সমান ওজনে টাকা লইয়া তাহার বিবাহের, চেষ্টায় ফিরিতেছিল।

মদনের প্রথম পক্ষের কন্যা বিমলার বয়স তখন চৌদ্দ'। বিমলা সুন্দরী, মুখখানি ঠিক গোলাপ ফুলের মত। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কাটিয়া যাইতেছে, মদন তাহার কোনও পাত্র খুজিয়া পাইতেছে না। ম্যালেরিয়া-রোগা, নাক-বোঁচা, কিম্বা মাথায় টাক-পড়া, দু'একটার সময়-সময় খবর পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু পণের টাকার দাবী শুনিয়াই মদনের চক্ষু স্থির হইত। কেউ হাঁকে তিন হাজার, কেউ চায় সাড়ে তিন। মদন নদীর ধারে গোঁসাই-দিঘীর পারে একটা দোকান খুলিয়া গুড়ের ব্যবসা করিত। উহার যৎ-সামান্য আয়ে অতি কষ্টে তাহার সংসার চলিত, তদুপরি মুণ্ড-মালিনীর গয়নার দাবীতে, বৃদ্ধকে সময়-সময় একেবারে ক্ষেপাইয়া দিত। মুণ্ডমালিনী মুখের উপর স্পষ্ট বলিত,—"দু'এক বছর পরে ত আর আমি গয়না পরতে পার্‌বো না!" ও-দিকে আবার কন্যাদায়। বিকাল-বেলা গোঁসাই-দিঘীর ঘাটে বসিয়া পাড়ার অলস বৃদ্ধগণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সভা-পতিত্বে ভূত ভবিষ্যৎ ও সমাজ-শাসন বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। সময়ে সময়ে পাড়ার ওই চৌদ্দ বছরের অরক্ষণীয়া মেয়েটার সম্বন্ধেও কথা উঠিত, আর সকলে ছোঃ-ছোঃ করিয়া মদন ঘোষের চৌদ্দপুরুষের নামে গালি বর্ষণ করিত। বৃদ্ধ মদন দিঘীর ওপারে দোকানে বসিয়া নীরবে সব কথা শুনিত।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহ্নে আমাদের প্যারীচরণ মিত্র অনিলকুমারকে সঙ্গে লইয়াই মদনঘোষের দোকানে হাজির। বৃদ্ধ ছেলেটার রূপে গুণে ও আচরণে এবং প্যারীচরণের বাক্‌-চালে একেবারে গলিয়া গেল, এবং প্রতিজ্ঞা করিল তাহার যথাসর্ব্বস্ব বন্ধক দিয়া, কিম্বা বিক্রয় করিয়াও বিবাহের পণের আড়াই হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবে, তথাপি এমন সোণারচাঁদ ছেলেটাকে হাতছাড়া করিবে না। প্যারী-চরণ 'সাধু সাধু' বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। মুণ্ডমালিনী এই সব শুনিয়া এক দিন এক রাত্রি জল গ্রহণ করিল না; এবং চব্বিশ ঘণ্টা নীরবে তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনিবার পরও যখন মদন দেখিল যে মুণ্ডমালিনীর ক্রোধ ক্রমে বৃদ্ধির মুখেই চলিতেছে, অগত্যা শারীরিক অপমানের আশঙ্কায় ভগ্নীর বাড়ীতে তিন দিন প্রবাস করিয়া আসিল।

(২)

বৈশাখ মাস। পল্লীগ্রামের নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের উদাস গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করিয়া আম্রকাননের মধ্যে থেকে-থেকে দক্ষিণের বাতাস বহিয়া যাইতেছিল। প্যারীচরণ তখন মদন-ঘোষের বাড়ীর ক্ষুদ্র চত্বরে মাদুরের উপর বসিয়া পাথরের উপর পণের টাকা বাজাইয়া লইতেছিল। বর-যাত্রিগণ মদনের রাশিচক্রে বলিতুষ্ট নবগ্রহের মত ইতস্ততঃ বালিসে হেলান দিয়া বসিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর গিলিত-চর্ব্বণ করিতেছিলেন। দুই হাজার টাকার নোট্ ব্যতীত পাঁচ শত নগদ টাকার মধ্য হইতে যে একটা মেকী টাকা বাহির হইয়াছিল, উহা শশব্যস্তে বদ্‌লাইয়া লইয়া প্যারীচরণ আদেশ করিলেন, "ওঠ হে, ওঠ। অনেক বেলা হ'য়ে গেছে, আবার উজান টান্‌তে হ'বে। বেহাই মশায়' মা-লক্ষ্মীকে বিদায় করেন। আর বিলম্ব নহে।" একটু পরেই জয়ঢাকের শব্দ ও উলুধ্বনির মধ্যে প্রফুল্লিত বর ও যাত্রিগণ কলিকাতার উদ্দেশে বাহির হইল।

পদ্মার একটা স্থানে আসিলে মনে হয় যেন সুদূর দিগন্তে তাহার দুইটা অস্পষ্ট তীরভূমি ধূমালো বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে সূক্ষ্ম হইয়া কোথায় মিশিয়া গিয়াছে। সেখানে মেঘ্‌নার ক্রুদ্ধ তরঙ্গ উন্মত্ত বাহিনীর মত আসিয়া পদ্মার প্রতিকূল জলোচ্ছ্বাসের উপর সবেগে আছড়িয়া পড়িতেছে, এই সঙ্গম-স্থলে যখন নৌকাগুলি আসিল, তখন পশ্চিম আকাশের কোণে একখণ্ড কাল মেঘ ধীরে-ধীরে বিদ্যুতের বিকাশ করিয়া সূর্য্যের চারিদিক্ বেষ্টন করিতেছিল। পেছনের পান্‌সীর বুড়া মাঝি ডাকিয়া বলিল, "হুসিয়ার! বহুৎ হুসিয়ার!" দেখিতে-দেখিতে সূর্য্য ঢাকিয়া গেল, পদ্মার জলের মধ্যে রৌদ্রের ঝক্‌ঝকি মুহূর্ত্তে মিশিয়া গিয়া, তাহার মধ্য হইতে বড়-বড় কাল ঢেউ ফুলিয়া উঠিল। পরক্ষণে আকাশে বজ্র ডাকিল, সাঁ সাঁ করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিয়া গেল, চারি দিক্ হইতে জল-হস্তীর মত কয়েকটা কালো-কালো তরঙ্গ আসিয়া সামনের দুইখানি নৌকাই প্রচণ্ড বেগে কোথায় উধাও করিয়া লইল।

পিছনের পান্‌সীর যাহারা অতি কষ্টে বাঁচিয়া গেল, তাহাদের মধ্যে একজন প্যারীচরণ মিত্র ও তাহার আড়াই হাজার টাকা, আর একজন হতভাগিনী বিমলা। যাহারা ডুবিল তাহাদের একজন সদ্য-বিবাহিত অনিলকুমার।

*   *   *   *

'ও গো ঘোষের পো! ও গো ওঠ। দোর্ খোল'—রাত্রি তৃতীয় প্রহরে কে আসিয়া মদন ঘোষের শোয়ার ঘরের দরজায় ঘা দিতেছিল। দুই দিন দুই রাত্রির পরিশ্রমের পর বৃদ্ধ আজ একটু বেশ করিয়া ঘুমাইতেছে,—কোন্ নিষ্ঠুর সে ব্যক্তি, যে অসময়ে তাহার এই সুখের ঘুম ভাঙ্গিয়া দিতে চায়? মদন প্রগাঢ় ঘুমের ঘোরে আগন্তুকের সেই শব্দ শুনিয়াও সাড়া দিতে পারিল না। এইবার উঠানের ডালিম গাছের উপর হইতে একটা কাল-পেচকের কর্কশ চীৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে আগন্তুক আবার গর্জ্জিল—'ওঠ গো, তোমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।'

এই শব্দে মদনের সুষুপ্ত আত্মাও যেন একবার শিহরিয়া উঠিল। সে উঠিয়া শয্যার উপর বসিয়া কাঁপিতে লাগিল। আবার দরজায় করাঘাত! কম্পিত দেহে মদন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখিল—পাড়ার যে ঝিকে বিমলার সঙ্গে কলিকাতা পাঠাইয়াছিল, সে সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাহার সমস্ত দেহ জলার্দ্র। এই শেষ? না, ও আবার কে? ও-ই আঁধারে দাঁড়াইয়া? এ্যাঁ? কে ও? কাঁদিতেছে! হাতে শাঁখাটী পর্য্যন্ত নাই, সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া গিয়াছে, মলিন-বসনা, জলার্দ্র! কে—ও? মদন নয়ন বিস্ফারিত করিয়া দেখিল—সে তাহার অভাগিনী দুহিতা বিমলা!

'ও গো! এ কি হ'ল— পেঁচোর মা? এ কি হ'ল?' বলিয়া হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদের সহিত বৃদ্ধ ভূমিতে আছাড়িয়া পড়িল।

নৌকাডুবির পর সেই পান্সীতেই প্যারীচরণ মল্লি-বাড়ীর ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া বিধবা বালিকাকে বিধবার উপযুক্ত বেশেই সেই মধ্যরাত্রে পেঁচোর মায়ের সঙ্গে ছাড়িয়া গিয়াছিল। এইবার নিষ্কণ্টকে তাহার সঙ্গে গেল—অনিলের আড়াই হাজার,—আর বিমলার সমস্ত নূতন গয়না।

(৩)

কলিকাতায় অবস্থানকালে মদন ঘোষ তাহার বন্ধু-বান্ধব সহ অপরাহ্নে কেবল তামাসার খাতিরেই যে তাৎকালিক ধর্ম্মসমাজগুলির মধ্যে গিয়া চোখ বুজিয়া বসিত তাহা নহে, তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাদের কতকগুলি ভাল-মন্দের ছাপও তাহার হৃদয়ে পড়িয়া গিয়াছিল। তাই সদ্য-বিধবা কন্যাটীর উপর বাড়ীর সকলের তাচ্ছিল্য ও নির্য্যাতন দেখিয়া ও তাহার সুদূর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে একদিন গ্রামে সাহস করিয়া প্রচার করিল যে, সে তাহার মেয়ের আবার বিবাহ দিবে। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের ভোলাণ্টিয়ার, দেশের সখের থিয়েটারের অবৈতনিক সম্পাদক এবং গ্রামের ফুটবল্ ক্লাবের কেপ্‌টেন্, তিন বার এফ্-এ ফেল-করা একটী ছোক্‌রা সাহস করিয়া বলিল, 'আমি তাহার পাণিগ্রহণ করিব।' দেখিতে-দেখিতে নানা কুৎসা-বাদের সহিত মদনের এই প্রস্তাব পাড়াগাঁয়ের সারা সমাজে ছড়াইয়া পড়িল। মদনের ধোপা-নাপিত বন্ধ হইল, গোঁসাই-দিঘীর দোকান-ঘরটী একরাত্রে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল, আর ঐ সৌখীন ছোক্‌রাটা একদিন সন্ধ্যাকালে ফুটবল-মাঠ হইতে ফিরিবার সময় নদীর পারে লাঠির আঘাতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। নিরুপায় হইয়া মদন ঘোষ এই প্রস্তাব করিবার শাস্তি স্বরূপ চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ও গোঁসাই দিঘীর ভট্‌চার্য্যির পায়ে সাড়ে দশ টাকা নজর দিয়া কোনও মতে অব্যাহতি পাইল এবং এই পোড়া মুখ কয়েক দিন মল্লি-বাড়ী হইতে লুকাইয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে গ্রামান্তরে ভগিনীর বাড়ীতে পলায়ন করিল।

*   *   *   *

"বাড়ী ভিটে বন্ধক দিয়ে, পথের ভিখারী হ'য়ে তোর বিয়ে দিয়েছিলেম, তিন ঘণ্টার মধ্যে সোয়ামীর মাথা খেয়ে আবার আমাদের ঘাড়ের রক্ত খেতে ফিরে এসেছিস্" মুণ্ড-মালিনী বিমলার উপর এই রকম সম্ভাষণ বর্ষণ সর্ব্বদাই করিত। খাইতে বসিয়া অনেক দিন বালিকা কে· শাত্মদর্শন ফেলিয়া দিয়াই নীরবে উঠিয়া যাইত। আজ ণ পাশ্চাত্য-ঘোষ বাড়ী ছাড়িয়াছে, দুই দিন দুঃখ অতিমাত্রায় ব্যগ্র—অন্ন জুটে নাই, কাঁদিয়া-কাঁদিয়া স্ত। আর প্রাচ্য-জগৎ গিয়াছে। র এই আত্মাই জগতের

ইতিমধ্যে বিমলার আর এক জ্ঞানী দেখেন সর্ব্বজীবে পেঁচোর মা। পেঁচোর মা দুঃখের তেছে—বিভিন্ন সত্তার দিত, গোপনে আনিয়া খাবার যোগা একত্বের জ্ঞানের নানা প্রকার আশা-ভরসা দিত। কিন্তু হা কিছু দেখিতে হইতে এই কয়েক দিন কেন সেই বুড়ী এক শক্তি সর্ব্বত্র আদর দেখাইতেছিল, সরলা বালিকা তাহ কিছুই করিতে

পারে নাই। কিন্তু পাড়ার যে লোকই উহা লক্ষ্য করিত, সে পেঁচোর মার উপর সন্দেহ করিত। কারণ পেঁচোর মার বদ্নাম ছিল—সে না কি দূর গ্রাম হইতে দুই একটী ভদ্র গৃহস্থের মেয়েকে ভুলাইয়া লইয়া কলিকাতার কোন্ গলিতে বিক্রয় করিয়া আসিয়াছিল। অপরাধ প্রমাণ না হওয়াতে সে বিচারালয়ে অব্যাহতি পাইয়াছিল।

(৪)

এদিকে যতই সমাজের এবং পরিবারের নির্য্যাতন বিমলার উপর বাড়িয়া উঠিতেছিল, ততই পেঁচোর মা তাহাকে গোপনে প্রত্যহ কি ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিয়া যাইত। আর যদি কেহ নজর করিত, স্পষ্ট দেখিতে পাইত যে বিমলা ঘৃণার সহিত তাহার সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিত। মধ্যে দুই তিন দিন বালিকা রাগ করিয়া বুড়ীর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করে নাই। কিন্তু নির্লজ্জা বুড়ী তথাপি বিমলার সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই।

আজ বিমলার উপবাসের তিনদিন, তাহার দেহ কম্পিত, চুল রুক্ষ, চক্ষু রক্তবর্ণ। সন্ধ্যাকালে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল,—মুণ্ডমালিনীর বিষম পদাঘাতে জাগিয়া উঠিয়াছে। বিমলার শরীর থর্ থর্ কাঁপিতেছিল—কিন্তু নয়নে অশ্রু নাই, মুখমণ্ডল স্থির, চক্ষু অগ্নিবর্ণ। মুণ্ডমালিনী গর্জ্জিল—"বলি ও পোড়ারমুখি, এত লোক বিষ খেয়ে মরে,—তোর একটা উপায় হয় না?" বিমলার দেহের প্রত্যেক ধমনীতে ঐ কথাটা প্রতিধ্বনিত হইল। এই ত

শ! এই ত সকল জ্বালা জুড়াইবার একমাত্র
বাক্-৮.

তাহার যথা টা বাজিয়া গিয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন,
পণের আড়াই ডাকিতেছে। অমাবস্যার অন্ধকারে
এমন সোণারচাঁদ ছেলে ছিয়া গিয়াছে; সর্ব্বত্র একটা ভীষণ
চরণ 'সাধু সাধু' বলি টিপিয়া-টিপিয়া বিমলা বাড়ীর বাহির
এই সব শুনিয়া এক
না; এবং চব্বিশ
পরও যখন মদন
বুদ্ধির মুখেই চ
আশঙ্কায় ভগ্নীর
আসিল।

হইল;—কিন্তু সম্মুখে দেখিল কে একজন,—সে পেঁচোর মা। বিমলা চমকিয়া দাঁড়াইল। পেঁচোর মা জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাচ্ছিস্?" বিমলা বলিল—'গোঁসাই দিঘীতে জল আন্‌তে।' বিমলার কক্ষে একটী কলসী। বুড়ী নয়ন-বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"আর হাতে দড়ি কেন?" বিমলা উত্তর করিল না। বৃদ্ধা বলিল—"আমি বুঝেছি। চল্ আমার সঙ্গে। আত্মহত্যার থেকে কলকাতা যাওয়া ভাল।" বিমলা তৎক্ষণাৎ বলিল—'হাঁ। চল যা'ব।' বালিকার দেহ তখন কাঁপিতেছিল। তাহার তখন চিন্তা করিবার শক্তি ছিল না; এতদিন যে অনুরোধ সে অগ্রাহ্য করিয়াছিল, আজ প্রাণের মায়ায় তাহাকে অভিভূত করিল। সে মনে-মনে বলিল, "এখন ত যাই, তার পর আমার পথ আমি দেখে নেব।"

গোঁসাই ঘাটের এক কোণে দুইখানি পান্সী বাঁধা।—চারিধারে পদ্মার জল গর্জ্জন করিতেছিল। দুইটী স্ত্রীলোক আসিয়া ঘাটে ডাকিল—"মাঝি, ও মাঝি?" একখানি হইতে উত্তর হইল 'কে গা?' অন্যটীতে লোকজন কেহ ছিল না। পেঁচোর মা বলিল—'ভাড়া যাবে? গোয়ালন্দ,—এখুনি।' উত্তর হইল—"না গো, আজ রাত্তিরে আর না,—এই দেখ্‌ছ না সবেমাত্র এসে লেগেছি।'

অকস্মাৎ 'কে ও, এঁ্যা? কে—ও?'—বলিয়া সভয়ে বিমলা চীৎকার করিয়া বুড়ীর হাত ধরিল। পেঁচোর মা দেখিল একটী মনুষ্যমূর্ত্তি অন্ধকারে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। 'ওমা। গেলুম্—গেলুম্‌রে—ভূত—ভূত—' বলিয়া বৃদ্ধা পশ্চাতে ছুটিল। এ যে অনিলের প্রেতমূর্ত্তি! বিমলা অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

আগন্তুক সভয়-বিস্ময়ে নিকটে আসিয়া দেখিল—এ যে তাহারই হারানিধি,—তাহারই বিমলা। অনিল সেই নদী-তীরে তাহার হতভাগিনী স্ত্রীর সংজ্ঞাশূন্য দেহ কোলে করিয়া বসিল।

বিশ্ব-ভারতী

[শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল্]
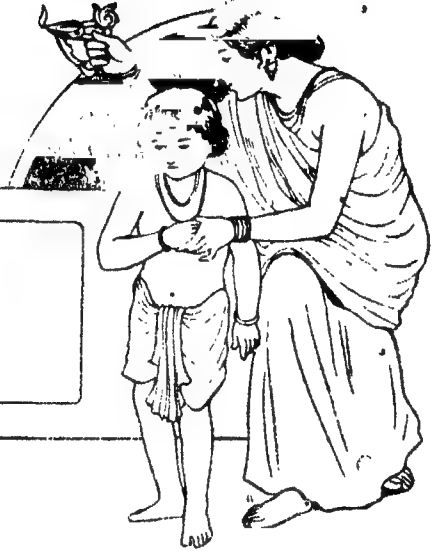
পাশ্চাত্য-সভ্যতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাণী

১৯২১ সালের Bibby's Annual পত্রিকায় মনীষী হিউবার্ট, জি, উড্‌ফোর্ড মহোদয় পাশ্চাত্য-সভ্যতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রচার করিয়া তাঁহার মতের আলোচনা করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাঁহার বক্তব্যের মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

সমসাময়িক ভারতবাসীর ভিতর রবীন্দ্রনাথের মত প্রীতিপ্রদ চমৎকার ব্যক্তি বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ আমাদের হৃদয়ে ভাবের বন্যা ছুটাইয়া দেন। শান্ত সুন্দর মুখশ্রী, কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুদ্বয় দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে 'আত্মদর্শন' (realisation of life) করিয়া তিনি শান্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষার মূল মন্ত্রই হইতেছে শান্তি লাভ।

পাশ্চাত্য মনীষীরা অপরের ভুল ভ্রান্তি দেখিলে খড়্গ-হস্তে তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সংযতভাবে আমাদের সভ্যতার দোষগুলি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এমন দিন আসিবে যে দিন আমরা তাঁহার এই শান্তিলাভের গোপন তথ্যটী বুঝিতে পারিব ;—আর বুঝিব, সেটী না পাইলে জড় জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করা সত্ত্বেও প্রকৃত উন্নতি লাভ হয় না।

তাঁহার মতে. জীবনের উদ্দেশ্য শুধু ভোগ নয়—শুধু পাওয়া নয়। আপনাকে জানা বা আত্মদর্শনই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমরা কেবল পাইবার জন্য ব্যস্ত, জগৎ-সংসারকে করায়ত্ব করিবার জ লালায়িত। ইহার জন্য আমরা আহার করি, কার্য্য করি, কথা কহি ও ভ্রমণ করি। শান্তি জিনিসটা যে কি, তাহা আমরা জানি না। বিশ্রামের সুখ আমরা বুঝি না। প্রাচীর এই উজ্জ্বল তারকা আমাদিগের ক্লান্ত চরণকে শান্তরসাম্পদ পথে লইয়া যাইবে। আপনাকে জানিয়া আমরা দুঃখ-দৈন্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব।

রবীন্দ্রনাথ, আশ্রমবাসী অরণ্যচারী ঋষিদিগের উদ্দেশ্য এইরূপই ছিল, বলিয়াছেন। জগতের দ্রব্য-সম্ভার পাইবার জন্য তাঁহারা কোন দিন লালায়িত ছিলেন না, তাঁহারা আত্মদর্শনের —আপনার স্বরূপ বুঝিবার—চেষ্টা করিতেন। আত্মদর্শন করিয়া তাঁহারা জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিতেন। পাশ্চাত্য-জগৎ প্রকৃতির অন্তঃস্থল বুঝিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র—তাহাকে স্ববশে আনিবার জন্য ব্যস্ত। আর প্রাচ্য-জগৎ আত্মার পরিচয় লইতে সচেষ্ট। আর এই আত্মাই জগতের বিরাট্ আত্মার অংশ মাত্র। প্রকৃত জ্ঞানী দেখেন সর্ব্বজীবে এক অপরিবর্ত্তনীয় আত্মা বিরাজ করিতেছে—বিভিন্ন সত্তার ভিতর একই সত্তা প্রকাশমান। এই একত্বের জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন জগতের যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শক্তিরই বিকাশ। এই এক শক্তি সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করে। মৃত্যু ইহার কিছুই করিতে

পারে না। আমাদের 'আসা' ও 'যাওয়া' সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায়। অবিনাশী আত্মার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই।

রবীন্দ্রনাথের মতে ইতিহাস, মানব-আত্মার তীর্থ-যাত্রার কাহিনী। অজ্ঞাত দেশের অভিমুখে অমর আত্মার সন্ধান জন্য মানবের আত্মা ছুটিয়া যায়। এই আত্মা অবিনাশী। রাজ্য ধ্বংস হইতে পারে, দেশ উৎসন্ন যাইতে পারে, কিন্তু আত্মার মরণ নাই—ধ্বংস নাই। ইহা আপনাকে জানিবেই জানিবে।

মানব-আত্মার চরম উদ্দেশ্যই হইতেছে, সেই এককে খুঁজিয়া বাহির করা; সেই এক তাঁহার ভিতরই রহিয়াছে। ইহাই তাহার নিকট ধ্রুব সত্য। ধর্ম্ম রাজ্যের প্রবেশ-পথের একমাত্র দ্বার হইতেছে আত্মা।

যতই আমরা আমাদিগের আত্মার পরিচয় পাই, ততই আমাদিগের আত্মা জগতের আত্মার সহিত যে একসুরে বাঁধা, তাহা বেশ বুঝিতে পারি।

আজই হউক—দু দিন পরেই হউক এই আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ হইবেই হইবে।

আর এই তথ্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে জগতে দ্বন্দ্ব কোলাহল, বিবাদ বিসংবাদ থাকিবে না। জাতির মধ্যে বিবাদ, মানুষের অত্যাচার, বৈষম্য, ইচ্ছাশক্তির বিরোধ জগত হইতে উঠিয়া যাইবে। যে দিন জগৎবাসী বুঝিবে তাহারা প্রত্যেকেই সেই অনাদি অনন্ত অসীম আত্মার অংশ, তখন কে কাহার শত্রুতাচরণ করিবে? গর্ব্বিত মানব অন্ধ হইয়া জগতের ইতিহাস মসীচ্ছন্ন করিয়া থাকে—সমগ্র আত্মাকে ভুলিয়া আপনার পথে জগতকে লইয়া যাইতে চায়। ফলে জাতি-বৈরিতা, জাতীয় মঙ্গলপ্রদ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস ও ধর্ম্মের অনাচার উপস্থিত হয়। জগতের শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া তাহারা তাহাকে আপনাদের ব্যবহারের জন্য সীমাবদ্ধ করিতে চায়। জগতে এমন পর্ব্বত আছে যাহার সংঘর্ষে প্রত্যেক 'আর্ম্মদা'-জাহাজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ভগবানের রাজ্যে এমন চোরা-বালি আছে যেথানে গিয়া মানবের স্বার্থ আর অগ্রসর হইতে পারে না। নীরো বা নেপোলিয়ন-শ্রেণীর বীরদিগের গতিরোধও হইয়া থাকে। যত বড় শক্তিধর রাজাই হউন, অসীম শক্তিশালী আত্মার বিরুদ্ধে বহুদিন সংগ্রাম করিয়া উঠিতে পারে না। সেই গর্ব্বিত আত্মা পরাজিত হইয়া অসীম শক্তিধর আত্মার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। প্রেমে ও ভক্তিতে ক্রমে উহার মস্তক অবনত হইবে, এবং সেই বিরাট আত্মার সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। ত্যাগেই লাভ হইয়া থাকে। এই আত্ম-বলিদানে মানব-আত্মার মস্তক উন্নত হয়।

আত্মাকে জানিতে হইলে প্রেমের দ্বারা জানিতে পারা যায়। তাই ভগবান্ এই প্রেমের পথ ধরিয়াই চলিয়া থাকেন। জগতের ভিতর দিয়া ভগবান্ আপনাকে পরিচিত করেন। তিনি আমাদিগকে এত অধিক ভালবাসেন যে আমাদিগের জন্য জগতের সকল দ্রব্যই দিয়াছেন।

প্রেম সুধু অনুভূতি নয়। ইহা খাঁটী সত্য। যাঁহার প্রাণে প্রেম নাই, তিনি সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। প্রেমের দ্বারা মানুষ অননুভূত সত্যের উপলব্ধি করিতে পারে। জগতের সকল সৃষ্ট-পদার্থ সেই সত্যের দ্যোতক। সৃষ্ট-পদার্থের ভিতর দিয়া প্রেমিক তত্ত্বজ্ঞান (insight) লাভ করেন। ইন্দ্রিয় দ্বারা অনিত্য বস্তু বুঝিতে বুঝিতে আমরা নিত্য বস্তুর সন্ধান পাইয়া থাকি। প্রেম অন্ধ নয়। প্রেমই চক্ষুষ্মান্। প্রেমের বলেই আমরা ভগবানের সত্তা বুঝিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে এই শিক্ষা পাইয়া আমরা বুঝিতে পারি সংসার হইতে পলায়ন করা, আর আমাদিগের আত্মার পরিচয় না লইয়া দূরে থাকা, উভয়ই আমাদিগের ক্ষতির কারণ। জড় জগতের একটা প্রাণের দিক আছে। সেই প্রাণ ও আমাদের প্রাণ অভিন্ন। আমাদিগের আত্ম-প্রীতি, জগতের সহিত সম্বন্ধকে দৃঢ়তর করিয়া দেয়। তাঁহারা কি ভীষণ ভ্রান্তি করেন, যাঁহারা ভাবিয়া থাকেন আমরা ইতর প্রাণী অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর জীব, বা যাঁহারা সংসার ও আত্মার মধ্যে অচলায়তনের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যে জীবন-প্রবাহ আমার শিরা-উপশিরায় প্রতিনিয়ত ধাবিত হইতেছে, সেই প্রবাহই জড় জগতের ভিতর স্বচ্ছন্দে নৃত্য করিতেছে। সেই জীবন-প্রবাহের ফলে মৃত্তিকার উপর আমরা নানাশ্রেণীর বৃক্ষলতা গুল্মাদি ফল পুষ্পাদি দেখিতে পাই। আমাদিগের ভিতর যে পরিমাণ প্রাণ আছে জড় জগতের ভিতরও সেই পরিমাণ আছে। নয়নাভিরাম কুসুমরাশি ও নক্ষত্ররাজি দেখিতে আমরা এত আনন্দ পাই

কেন? তাহার একমাত্র কারণ জগতের সকলের মূলেই সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা রহিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের বাণী এইখানেই শেষ হয় নাই। ভগবানের সত্ত্বা-বিষয়ক অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের (mystic consciousness of God) সম্বন্ধে দু-চারি কথা না বলিলে তাঁহার বাণী সম্পূর্ণ হইবে না। তিনি ভগবানের সত্ত্বা সেইখানেই দেখিতে পান, যেখানে কৃষক পরিশ্রম দ্বারা শক্ত মৃত্তিকার উপর হলচালনা করে—যেখানে মজুরেরা পাথর ভাঙ্গিয়া পথ প্রস্তুত করে—যেখানে মানুষ দুর্গম অরণ্য কাটিয়া গ্রাম নির্ম্মাণ করে। সাধারণ মানুষের নিকট হইতে কোন মতেই আমাদের দূরে থাকা উচিত নয়। যাঁহারা সংসার হইতে বিদায় লইয়া ভগবান্‌কে পাইতে চান, তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণার মূলে রবীন্দ্রনাথ সবলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। আমরা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইব না। আমরা সাহসের সহিত বলিব, ভগবান এই মুহূর্ত্তে এই স্থানে আছেন।

প্রকৃত স্বাধীনতার বাণীও রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। আধুনিক স্বাধীনতা দাসত্বের নামান্তর মাত্র। আমরা বায়ুমার্গকে জয় করিয়াছি সত্য, কিন্তু বিমানচারী প্রাণঘাতী নৌ-বাহিনীর ভয়ে আমরা সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত। পৃথিবীর বুক বিদীর্ণ করিয়া আমরা তাহার অন্তঃস্থল দেখিয়া থাকি,—তাহার ভিতর দিয়া ট্রেণ চালাইয়া থাকি; জলের উপর দিয়া পাঁচ দিক ও বায়ুমার্গে ১৬ ঘণ্টায় অত্‌লান্তিক মহাসাগর পার হইয়া থাকি; কিন্তু আমরা কি গতির দাস হই নাই। পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রতি-অঙ্গে ক্লান্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। ভয়কে আমরা পৃথিবী হইতে দূর করিয়াছি বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি; কিন্তু কথাটা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক জাতিই আত্মরক্ষার জন্য এত সরঞ্জাম সংগ্রহ করিত না। জ্ঞান, অন্ধকার ও কুসংস্কারকে দূর করিয়াছে বলিয়া আমরা অহঙ্কার করিয়া থাকি। কিন্তু কথাটা কি সত্য। মনুষ্য-রূপধারী হাঙ্গর ও সাব্‌মেরিণের কি আমরা ভয় রাখি না?

ধর্ম্মজগতে আমরা যে স্বাধীন, এ কথা বড় গলায় আমরা বলিয়া থাকি; কিন্তু বাস্তবিক কি আমরা আমাদের ধারণা ও গতানুগতিমূলক বিশ্বাসের দাস নই। আমরা কি কুসংস্কারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছি। চিন্তা-ধারার সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে আমরা কি অগ্রসর হইয়াছি। জগতে এমন দিন আসিবে যে দিন আমরা জাগরিত হইয়া আমাদিগের স্বর্ণপিঞ্জরাবদ্ধ আত্মা-বিহঙ্গকে মুক্ত করিয়া দিব।

রবীন্দ্রনাথের নিকট মৃত্যু, জীবনযাত্রার একটী ঘটনা মাত্র। জীবন সুখের, কারণ প্রতি প্রভাতই আমাদিগকে নূতন নূতন আশ্চর্য্যজনক দ্রব্য বা বিষয়ের সন্ধান দিয়া থাকে। কে বলিতে পারে জীবনের অবসানে আমরা অধিকতর বিস্ময়কর পদার্থের সন্ধান পাইব না? যখন জন্ম-মৃত্যুর চক্রনেমি আমাদিগকে যে শিক্ষা দান করে তাহা আমরা বুঝিতে পারি—যখন আমরা পিতৃভবনের বহু গৃহের ভিতর দিয়া গমন করি—যখন আমরা দেখিতে পাই দুঃখের অমানিশা কাটিয়া যায়—মেঘান্তরালবর্ত্তী তারকার উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাই—যখন আমরা কারখানার কুলী-দিগকে আনন্দের সহিত কাজ করিতে দেখি—যখন মানবকে তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি আনন্দের সহিত সম্পন্ন করিতে দেখি, যেরূপ ভাবে কবি তাহার কাব্যরচনায়, শিল্পী তাহার অনুষ্ঠিত কার্য্যে, বীর তাহার বীরত্বের পরিচয় দিয়া আনন্দ পাইয়া থাকে, সেইরূপ ভাবে প্রাণ-মন নিয়োগ করিয়া কার্য্য করিতে দেখি, তখন আমরা প্রেমময়ের অযাচিত প্রেমের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হই, এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হই।

কলা ও ধর্ম্ম

অধ্যাপক ডাক্তার ওসওয়াল্ড সাইরেণ 'আর্ট ও ধর্ম্ম' সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার সারাংশ এস্থলে উদ্ধার করিয়া দিলাম :—

ধর্ম্মজীবন ও জাতির অভিজ্ঞতা ইচ্ছাশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। প্রকৃত 'কলা' ও (Art) সেই শক্তি হইতে জন্মে। দার্শনিকের চক্ষে দেখিতে গেলে, কলা ও ধর্ম্ম একই বৃক্ষের দুই শাখা। উভয়েই মানবের অনুভূতি হইতে রসগ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে উহারা রসগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হয় না।

সৌন্দর্য্য-রস-পিপাসু দর্শক, কলাবিদের অঙ্কিত চিত্র স্বভাবের অনুযায়ী হইলেই তাহাতে মুগ্ধ হন না—তিনি চান চিত্রের প্রাণের স্পন্দন দেখিতে—তিনি চান চিত্রের ভিতর দিয়া চিত্রকরের ইচ্ছাকৃত ভাবের স্ফূরণ ও বিকাশ দেখিতে (purposive design); তিনি বালক বা বিকৃত মস্তিষ্কের হস্ত-কণ্ডূয়ন দেখিতে চান না।

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

হোলি আসিয়া পড়িল; আসুন, একটু দোল খেলা যাক।

দোল-লীলা যে কত দিনের পুরাতন অনুষ্ঠান, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে ইহা যে স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত, সে কথা সকলেই জানেন। শুনিতে পাই; নব্য বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া থাকেন, ফাগ বা আবীর লইয়া দোল খেলা স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম হিতকর; এই ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময়ে হোলি খেলিলে অনেক চর্ম্ম-রোগ হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। ফাগ বা আবীর লইয়া খেলা করিলে স্বাস্থ্যের উপকার হইতে পারে; অন্ততঃ কোন অপকারের সম্ভাবনা ত দেখি না। কারণ, ফাগ বা আবীর নির্দ্দোষ উদ্ভিজ্জ পদার্থ। কিন্তু জার্ম্মাণ বা বেলজিয়ান এনিলাইন রংগুলির এদেশে আমদানী আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এই নির্দ্দোষ আমোদের বড় অপব্যবহার হইতেছে। এনিলাইন রংগুলি প্রত্যক্ষ বিষ; শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহা বিষবৎ কার্য্য করিয়া থাকে। এই রং হইতে আজ-কাল আবীর প্রস্তুত হয়; এই রং জলে গুলিয়া পিচকারীর সাহায্যে পরস্পরের গাত্রে নিক্ষেপ করা হয়। এই দুই উপায়েই এনিলাইন রং শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। এবং তাহা যে অনিষ্টকর, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। সে যাহা হউক, স্বাস্থ্যের ইষ্টানিষ্ট আজ আমার বিচার্য্য নহে। ফাগ বা আবীর লইয়া খেলা করিতে হইলে, এই জিনিসটি তৈয়ার করিতে হইবে। সুতরাং ইহার প্রস্তুত-প্রণালীই আমার আলোচ্য।

ফাগ বা আবীরের প্রধান উপকরণ দুইটী—শ্বেতসার বা starch ও রং। যে কোন রকমের শ্বেতসার এই কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। চাল, গম, আলু, এরারুট, সাগু, শটী, বনহলুদ প্রভৃতি যে কোন পদার্থ-জাত শ্বেতসার হইলেই চলিতে পারে। কিন্তু আজকাল খাদ্যদ্রব্য যেরূপ দুর্ল্লভ এবং খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য যেরূপ অধিক, তাহাতে যে সব জিনিস খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, সেরূপ কোন জিনিস ফাগ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় নহে। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে শেষোক্তটী (বনহলুদ) বাদে অপর সকলগুলিই মানুষের খাদ্য। এই জন্য, অপর সকল জিনিসগুলি বাদ দিয়া, কেবল বনহলুদ হইতে starch বাহির করিয়া লইয়া, তাহা হইতে ফাগ প্রস্তুত করাই উচিত। কারণ, এই জিনিসটি পল্লীগ্রামে স্বতঃই (বিনা চাষে) প্রচুর পরিমাণে জন্মে, এবং ইহা খাদ্যরূপেও ব্যবহৃত হয় না।

বনহলুদ এক প্রকার গাছের মূল। ইহা দেখিতে হলুদের মত, অথচ স্বভাবজাত; এই জন্যই ইহার নাম বনহলুদ। সাধারণ হলুদের রং যেমন হলদে, ইহার রং সেরূপ নহে, —সাদা। বস্তুতঃ, ইহা হইতে হলুদের মত কোন রঞ্জন পদার্থ পাওয়া যায় না।

ষ্টার্চ কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে শটীর প্রসঙ্গে একবার বলিয়াছি। সে কথা যদি ভুলিয়া গিয়া থাকেন, সেই জন্য আবার একবার বলিয়া দিতেছি।

এই বনহলুদ গাছের মূলগুলি সংগ্রহ করিয়া, প্রথমে উত্তম রূপে ধৌত করিয়া তাহার মাটী ধুইয়া ফেলিতে হইবে। পরে একটা কাঠের বড় টবে রাখিয়া, তাহাতে কিছু জল ঢালিয়া দিয়া, পা দিয়া উত্তম রূপে থেঁতলাইলে, উহার ছাল উঠিয়া যাইবে। সুবিধা হইলে অন্য উপায়েও বনহলুদগুলির ছাল তুলিয়া ফেলা যাইতে পারে। বোধ হয় ইহার কলও পাওয়া যাইতে পারে (অগ্রহায়ণ মাসের ভারতবর্ষে 'ইঙ্গিত' দেখুন)।

ছালশূন্য হলুদগুলি ঢেঁকিতে কিম্বা বড় কাঠের হামান-দিস্তায় অথবা কলে চুর্ণ করিয়া লইতে হয়। সেই চূর্ণ একটা পুরু কাপড়ের থলিতে রাখিয়া, একটা টবে পরিষ্কার জল রাখিয়া, সেই জলের মধ্যে থলিটি ডুবাইয়া প্রবল বেগে ঘুরাইতে থাকিলে, চূর্ণ শ্বেতসার থলির সহস্র-সহস্র ছিদ্র-পথে বাহির হইয়া জলের সহিত মিশিয়া যাইবে,—কিন্তু জলে দ্রব হইবে না। থলিটি একটি টবের মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিয়া, তাহার উপর ধারাকারে জল ঢালিলেও, চূর্ণগুলি থলি হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে। যাহার যেরূপ

সুবিধা বোধ হয়, তিনি সেই প্রণালীতেই কাজ করিতে পারেন। ষ্টার্চ্চ বাহির করিবার বিলাতী কলও পাওয়া যায় (অগ্রহায়ণ, ১৩২৮, ইঙ্গিত)। সাদা গুঁড়া যখন আর বাহির হইবে না, তখন থলিটিকে তুলিয়া হলুদগুলাকে আর একবার কুটিয়া, পুনরায় জলের মধ্যে আলোড়ন করিলে আরও কিছু ষ্টার্চ্চ বাহির হইবে। তাহার পর ষ্টার্চ্চ-শুদ্ধ জল কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া না করিয়া স্থির ভাবে রাখিয়া দিলে, মাধ্যাকর্ষণের বলে সাদা গুঁড়াগুলি জলের তলায় থিতাইয়া পড়িবে, ও উপরে পরিষ্কার জল থাকিবে। শ্বেত-সারগুলি নাড়াচাড়া পাইয়া আবার জলের সঙ্গে মিশাইয়া না যায়, এমন ভাবে খুব সাবধানে উপরের পরিষ্কার জলটুকু মাত্র ফেলিয়া দিয়া, গুঁড়াগুলিকে শুকাইয়া লইলেই উহা শ্বেতসার হইল। কাঁচা অর্থাৎ সরস অবস্থায় যেমন হলুদ-গুলিকে ঢেঁকিতে কুটিয়া starch বাহির করা যায়, সেইরূপ হলুদগুলিকে শুকাইয়া ঢেঁকিতে বা অন্য উপায়ে কুটিয়া গুঁড়াইয়া লইয়া, পরে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে থলির মধ্যে পূরিয়া জলের মধ্যে আলোড়ন করিলেও, শ্বেতসার বাহির হইয়া আসিতে পারে।

ইহা হইল একটী উপাদান। অপর উপাদান রং। বকম কাষ্ঠ হইতে রং বাহির করিয়া লইতে হয়। বকম কাষ্ঠগুলিকে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া লইয়া, গরম জলে আধঘণ্টা কি পৌনে এক ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া লইলে, উহা হইতে রং বাহির হইয়া আসিয়া জলের সঙ্গে দ্রবীভূত হয়। এই রঙ্গীন জলে ফট্‌কিরি দিলে উজ্জ্বল রং বাহির হয়। ইহাতে শুষ্ক শ্বেতসার ভিজাইয়া লইলে, শ্বেতসারগুলিও রঞ্জিত হইয়া যায়। সেই রঞ্জিত শ্বেতসার ছায়ায় শুকাইয়া লইলেই আবীর প্রস্তুত হয়। একবারে অবশ্য শ্বেতসার-গুলি খুব ঘোরালো রংয়ের হয় না। সেই জন্য পুনঃ-পুনঃ বার-কয়েক উহাদিগকে রংয়ের জলে ভিজাইয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইতে হয়। এই জিনিস কদাচ রৌদ্রে শুকাইতে নাই; কারণ, সূর্য্যকিরণের সকল প্রকার রং হরণ করিবার ক্ষমতা আছে। সেই জন্য রৌদ্রে শুকাইতে দিলে আবীরের বর্ণ মলিন বা ফিকে হইয়া যাইতে পারে।

শ্বেতসার প্রকারান্তরে পাউডার নামে মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করে। বকম কাষ্ঠের রংও তত অনিষ্টকর পদার্থ নহে। আবীর শুষ্ক অবস্থায় বা জলে গুলিয়া পিচকারীর সাহায্যে ব্যবহার করিলেও স্বাস্থ্যহানির বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না। কিন্তু আজ-কাল নির্দ্দোষ বকম কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে বিদেশী টীনের কৌটার এনিলাইন রংগুলি ফাগ বা আবীর প্রস্তুত কার্য্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। এই বিষাক্ত রং যে কেবল ফাগ প্রস্তুত করিতেই ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা নহে। কলিকাতার খাবারের দোকানসমূহে অনু-সন্ধান করিলে, এই রংয়ের কৌটা অনেক পাওয়া যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় ইহা অনুমান করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না যে, এই রং কিছু পরিমাণে দোকানের খাবার প্রস্তুত করিতেও ব্যবহৃত হইতেছে। অনেক দোকানদার বিবিধ রঙ্গের খাবার তৈয়ার করিয়া খুব বাহার দিয়া দোকান সাজাইয়া রাখে। খাবার রং করিবার জন্য তাহারা কি রং ব্যবহার করে,—এনিলাইন রং কি নির্দ্দোষ উদ্ভিজ্জ রং তাহার অনুসন্ধান করিতে আমি কলিকাতার কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগীয় খাদ্য-পরীক্ষক মহাশয়গণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

কোন-কোন স্থলে আবীরের সঙ্গে অভ্রচূর্ণ মিশ্রিত হয়। তাহাতে আবীরের ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু অভ্রচূর্ণ দেওয়া ফাগ স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর কি না, তাহা আমি বলিতে পারিলাম না।

দোলযাত্রার সময় পিচকারী ব্যবহৃত হয়; মুঠা-মুঠা ফাগ, আবীর লোকের গায়ে-মাথায় মাখাইয়া দেওয়া হয়; ইহা ছাড়া আরও এক প্রকারে আবীর ব্যবহার করা হয়। তাহার নাম কুঙ্কুম। খুব ধারালো একখানি ছুরি দিয়া সোলা খুব পাতলা করিয়া কাটিয়া লইয়া, তাহার মধ্যে আবীর দিয়া ছোট ছোট পুঁটুলী প্রস্তুত করা হয়। ইহার নাম কুঙ্কুম। এই কুঙ্কুম কাহারও গায়ে জোরে ছুঁড়িয়া মারিলে, সোলার আবরণটি ফাটিয়া গিয়া গা-ময় আবীর ছড়াইয়া পড়ে। পাতলা কাগজেও এই কুঙ্কুম প্রস্তুত হইতে পারে।

বধূ *

[শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী]

পরলোকগতা প্রতিভা দেবী

এসেছিলে আমাদের ঘরে,
চলে গেছ অন্ধকার করে,—
কমলা-রূপিনী বধূ,
কণ্ঠভরা গীত-মধু
সুষমায় আলোকিয়া গেহ ;
কি আনন্দ কি উৎসবে,
প্রথম আসিলে যবে,
সে কথা ভুলিতে নারে কেহ।
সুদীর্ঘ বরষ কত
একত্র হইল গত,
স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা দিয়া
বাঁধিয়াছ সবাকারে,
ভুলি গিয়া আপনারে,
পরকে আপন করি নিয়া।
দীনে দয়া, আর্ত্তে সেবা
তোমার মতন কেবা
করিয়াছে প্রফুল্ল আননে।
তোমারি পরশ লাগি'
সৌভাগ্য উঠিল জাগি
গৃহস্থালী নন্দন-কাননে ;

মুক্ত তব গৃহদ্বার—
অতিথিরে পূজিবার
নিজ হস্তে কত আয়োজন।
স্বদেশী বিদেশী কিবা,
আত্ম-ত্যাগে নিশি-দিবা
করিয়াছ সবারে যতন ;
অজানিত মুক্তদানে
অনাথ আতুর প্রাণে,
ঢালিয়াছ সান্ত্বনার নীর,
জাতি ধর্ম্ম ভেদাভেদ
রাখ নি মনের খেদ
নির্ব্বিচারে নম্র করি শির ;
পতিপরায়ণা সতী,
আছিলে অনন্যমতি,
পতি-প্রেমে আপনা পাশরি ;
ছায়ারূপে তাঁর সনে,
থাকিতে সানন্দ মনে,
পতি-সেবা জীবন তোমারি !
তাঁরে ছাড়ি আজি কেন,
দূরে চলি গেলে হেন,
শোক-বহ্নি অন্তরে জ্বালিয়া ;
কায়মনোবাক্যে যাঁর,
ছিলে প্রেমে একাকার
শূন্যতায় একাকী ছাড়িয়া ?
পুত্র কন্যা পরিজনে,
কাঁদাইয়া জনে-জনে,
চলিয়া গিয়াছ স্বর্গে ; আর
পাইব না তব সঙ্গ
চির-প্রিয় অন্তরঙ্গ,
নামাইতে বেদনার ভার
অকৃত্রিম বান্ধব সবার।

* শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগতা সহধর্ম্মিনী প্রতিভা দেবীর উদ্দেশে।

লেখকের প্রার্থনা *

[শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী]

(১)

চুয়ান্ন মাস আগে যে কলম আমার হাতছাড়া হয়েছে, সেই কলম আবার ধরবার মুহূর্ত্তে সর্ব্বাগ্রে, হে মানবের আত্মা, তোমার কাছে আমি মাথা নত করি। যে ভীষণ প্রলয়কাণ্ড পার হয়ে আমরা এসেছি, তার মধ্যে তুমি সর্ব্বদাই নিজের পথ ও দিক নির্ণয়, নিজের স্বাধীনতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবার চেষ্টায় ফিরেছ, এবং তা পাবার আশা কখনও ত্যাগ করনি ;

হে মানবের বেদনা, তোমার কাছে আমি মাথা নত করি। নীরব তুমি, অসীম তুমি, কখনো তুমি পরীক্ষাদানে কুণ্ঠিত হওনি, সকলপ্রকার শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা তুমি বুক পেতে নিয়েছ,—গোলাবর্ষণ, বারুদ-উৎক্ষেপ, বিষবাষ্প, অগ্নিবাণ, দুষ্টক্ষত, অঙ্গচ্ছেদ, ক্ষুধা, শৈত্য, ভয়, সংশয়, বিচ্ছেদ ও হতাশা ;

হে মানবের করুণা, তোমার কাছে আমি মাথা নত করি। পৃথিবীময় তুমি বিনীত ও একনিষ্ঠ সেবক জাগিয়ে তুলেছ, এবং সর্ব্বত্র যেখানে ব্যথা সেখানে তাদের পাঠিয়ে দিয়েছ। সংক্রামক রোগ, কর্দ্দম ও শীত, বস্ত্রাভাব ও গৃহদাহ, হিংসা নিরাশা ও নিঃসঙ্গতা,—এরাই ছিল তাদের প্রতিদ্বন্দী ;

হে মানবের বন্ধুতা,—পুরুষে পুরুষে বন্ধুতা ও মেয়েতে মেয়েতে বন্ধুতা,—তোমার কাছে আমি মাথা নত করি। মনুষ্যজাতির উচ্ছেদ-সাধনের এই যে প্রচেষ্টা হয়েছিল, সে সময় তুমি প্রকৃতই জাতি-সংযোজনের কাজ করেছ। তুমি আমাদের সকলকে সহ্য করবার ও অগ্রসর হবার শক্তি দিয়েছ, আনন্দ ও আশাপূর্ণ মনে থাকবার বল দিয়েছ ;

মানবের আত্মা, মানবের বেদনা, করুণা ও বন্ধুতা,- তোমাদের এই চতুষ্টয়ের কাছে আমি মাথা নত করি ; কারণ তোমরা আমার মনুষ্যজন্ম-গ্রহণের লজ্জানিবারণ করেছ। তোমরা আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছ যে, নরজন্ম বা নারীজন্ম লাভ করায় যেমন বিপদভয় আছে, তেমনি গৌরবও আছে ; নর এবং নারীর প্রতি তোমরা আমার ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি বর্দ্ধন করেছ।

(২)

আজ আমি ফিরে এসে এক নতুন পৃথিবী দেখেছি। এ পৃথিবী যুদ্ধের আগেকার মতই আছে, সে কথা বল্লে শুনব না ; আমাদের ছেলেরাই ঠিকমত বলতে পারবে যে কি পরিমাণে এখনই আমরা এক আলাদা পৃথিবীতে বাস করছি, এবং কি-পরিমাণে আরও বেশী বদল হবার উপক্রম দেখা যাচ্ছে,—শুভস্য শীঘ্রং।

যে পুরাতন পৃথিবীতে আমরা মানুষ হয়েছি ও যেটি আমাদের

* Jean Richard Bloch-এর Carnaval est mort নামক ফরাসী গ্রন্থ হইতে। এই ফরাসী লেখক চুয়ান্ন মাস ইয়োরোপীয় মহাসমরে যুদ্ধ ক'রে ক'রে কাটিয়েছেন। ফিরে এসে তিনি উপরিউক্ত গ্রন্থ লিখেছেন।

সামনে আদর্শরূপে ধরা হয়েছে, সেই পৃথিবী থেকে হিংসা, অবজ্ঞা, শক্তিমত্তা, আত্মাভিমান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার একটা অবতারবিশেষ লোপ পেয়েছে।

আবার কলম ধরবার মুহূর্ত্তে আমি এই প্রার্থনা করছি যে, এই যে পৃথিবী আমাদের সকলেরই ভার অতি সহজে বহন করতে পারে, এ পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রত্যেক মানুষে যেন আশ্রয়নিমিত্ত একটা সুভব্য চাল, এবং ছেলেদের স্বাস্থ্যপূর্ণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ করবার নিমিত্ত একটা সুযোগ্য ভূমিখণ্ড লাভ করে;

আমি এই প্রার্থনা করছি যে, এই যে পৃথিবী আমাদের সকলকেই অতি সহজে পোষণ করতে পারে, এ পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে শরীরের খাদ্য এবং মনের খাদ্য যেন সমান সুপ্রাপ্য হয়;

আমি এই প্রার্থনা করছি যে, এই যে পৃথিবীতে সকলকারই পক্ষে পর্য্যাপ্ত ক্ষেত্র, সাগর এবং খনি রয়েছে, এ পৃথিবীপৃষ্ঠে আর কখনো যেন বলবীর্য্য, গৌরব, সাম্রাজ্য, আত্মাভিমান, স্বার্থ বা জাতীয় প্রতিযোগিতার দোহাই দিয়ে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট না করা হয়;

আমি এই প্রার্থনা করছি যে, এই যে পৃথিবীর বাতাসে ও ধান্যে কারোর চেয়ে কারো অধিকার কমবেশী নয়, এ পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোক, অথবা কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের দল যেন তার ঐশ্বর্য্য, বংশমর্য্যাদা বা দারিদ্র্যের নামে বাদবাকি সকলের উপর এমন কোন অন্যায় শাসনতন্ত্র স্থাপন করতে না পারে, যার ফলে দুর্দ্দান্ত, ক্রুর এবং শঠ লোকের অভ্যুদয় অনিবার্য্য;

আমি এই প্রার্থনা করছি যে, এই যে পৃথিবী, যেখানে "কিছু না" থেকে 'কিছু' উৎপন্ন হয় না, এ পৃথিবীপৃষ্ঠে যেন শ্রমকে সকলের পক্ষেই সমান কর্ত্তব্যের ও সমান সম্মানের পদবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়,—অথচ এমন ধীর ভাবে যা'তে প্রত্যেকের স্বাভাবিক প্রবণতার ব্যাঘাত না ঘটে।

(৩)

আবার কলম ধরবার মুহূর্ত্তে, যারা এই যুদ্ধে হত হয়েছে, সেই পরিচিত-অপরিচিত বন্ধুদের আমার অন্তরের গভীরতম কৃতজ্ঞতা জানাই; কারণ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, তারাই আমার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করেছে;

যারা চিন্তাক্লিষ্ট মনে অথচ হাস্যমুখে নিয়তির সম্মুখীন হয়েছে, আমার অন্তরের গভীরতম কৃতজ্ঞতা তাদের জানাই; কারণ তারাই আমার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করেছে;

এই যুদ্ধব্যাপারের সময় যাদের মনে নিঃস্বার্থ কোন ভাব স্থান পেয়েছে, আমার অন্তরের গভীরতম কৃতজ্ঞতা তাদের জানাই; কারণ তারাই আমার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করেছে।

এই মুহূর্ত্তে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, মানুষের দুঃখকষ্ট যেখানে দেখ্‌ব সেইখানেই তার খোঁজ করা, প্রতিবাদ করা এবং দূর করার কাজে আরো বেশী করে আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করব;

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, মানুষের মর্য্যাদার যে সকল উপাদান—আত্মশক্তি, বেদনা, করুণা, বন্ধুতা, সহিষ্ণুতা, বিদ্রোহভাব, কাজ, স্বাধীনতা, আনন্দ ও নিঃস্বার্থপরতা,—আমার লিপিচাতুর্য্যকে তারই সাহায্যে ব্রতী করব;

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে কখনো ভুলব না।

(সবুজ পত্র)

ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে ভারতবর্ষে যাদুবিদ্যা

ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে যাদুবিদ্যার অপূর্ব্ব উৎকর্ষ সাধন হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ মাঝে-মাঝে ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারী-দিগের লিখিত পুস্তকাদি হইতে পাওয়া যায়। এই বিদ্যার কৌশল ও চমকপ্রদ কার্য্যকলাপের বিষয় মিঃ কেরী তাঁহার The Good old days of Hon'ble John Company—1600 to 1658 A. D. পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ৩৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "ভারতবর্ষে যে সম্প্রদায় এই বিদ্যার প্রভাবে ভেল্‌কী দেখাইয়া থাকে, তাহাদের কার্য্য-নিপুণতা বড়ই অদ্ভুত। তাহাদিগের ভেল্‌কীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" এই সম্বন্ধে তিনি ১৯১৭ সনের একটা সংবাদপত্র হইতে নিম্নলিখিত যাদুবিদ্যার বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন "ইংলণ্ডেও ঐরূপ ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা রঙ্গমঞ্চের উপর এবং গুপ্তদ্বার ও পর্দ্দার সাহায্যে।" ভারতবর্ষে উন্মুক্ত ময়দানে তাঁবুর নিম্নে এবং বহু দর্শক মণ্ডলীর সমক্ষে যে কি প্রকারে এই ক্রিয়াগুলি সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা গ্রন্থকার মহাশয় নির্ণয় করিতে পারেন নাই। একটা ক্রীড়া এই প্রকার। "একটা কক্ষে সমবেত দর্শকবৃন্দের মধ্যে যাদুকর সুন্দর বস্ত্র পরিহিত ও নানা অলঙ্কারে সুশোভিত একটা যুবতীকে আনয়ন করিল। তৎপরে একটা বেতের ঝুড়িও ঐ কক্ষে আনীত হইল। যুবতী এইবার সকলকে অভিবাদন করিয়া কক্ষটার মধ্যে ভূমিতে উপবেশন করিল। তৎপর তাহাকে ঐ ঝুড়ি দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইল। যাদুকর এইবার দুই টুক্‌রা শুভ্র বস্ত্র দ্বারা ঝুড়িটা আবৃত করিয়া যুবতীর সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল। এইরূপ ক্রীড়ায় প্রায়ই নায়িকার নাম লক্ষ্মী ও নায়িকা স্বয়ং যাদুকরের স্ত্রীরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। কথোপকথনের সারাংশ এই যে যাদুকর যুবতীকে তাহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিল। রমণী ঝুড়ির ভিতর হইতে যথারীতি প্রতিবাদ করিতে লাগিল। যাদুকর ক্রমশই অধিকতর উত্তেজিত-কণ্ঠে গালির মাত্রা চড়াইতে লাগিল; এবং হঠাৎ কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া উহা অনবরত ঝুড়ির নীচের দিকে চালনা করিতে লাগিল। ভিতর হইতে আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে ঝুড়ির চতুষ্পার্শ্ব হইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল; এবং ক্রমশঃ ক্রন্দনধ্বনি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শেষে একেবারে মিলাইয়া গেল। যাদুকর তখন রক্তাক্ত তরবারিখানি অবিচলিত চিত্তে ধীরে-ধীরে মুছিয়া পুনরায় কোষবদ্ধ

করিল; তৎপর ঝুড়ির উপর হইতে বস্ত্রখণ্ড সরাইয়া লইয়া উহা ভাঁজ করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। অতঃপর যখন হঠাৎ এক লাথি মারিয়া ঝুড়িটি দূরে নিক্ষেপ করিল, তখন ঝুড়ির নীচে আর কিছুই দেখা গেল না। যাদুকর যেন ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, লক্ষ্মীকে ডাকিতে লাগিল। হঠাৎ তখন লক্ষ্মীর সাড়া পাওয়া গেল। এইবার বিস্মিত দর্শকগণ লক্ষ্মীকে দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। হঠাৎ কক্ষের দরজার দিকে একটা সাড়া পাওয়া গেল। প্রহরীগণ কাহাকে প্রবেশ করাইবার জন্য লোক সরাইয়া রাস্তা করিতে লাগিল; ও ভূত বিবেচনায় সকলে কাহাকে সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। পরিশেষে লক্ষ্মী একগাল হাসি লইয়া, অক্ষত শরীরে সকলের সমক্ষে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

কেরী সাহেবের গ্রন্থে আরও অধিকতর কৌতুহলোদ্দীপক যাদু-বিদ্যার বৃত্তান্ত লিখিত আছে। আমরা সময়ান্তরে উহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

(ইতিহাস ও আলোচনা)

শিক্ষার আলোচনা কেন আবশ্যক ?

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্-এ, আই-ই-এস্]

অনেক সময় খুব চালাক এক-একটা কুকুর বা কাকপক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের মানুষ অপেক্ষা কোন মতে কম বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যুগের পর যুগ যাইতেছে, অথচ কুকুর ও কাকজাতি সমান বুদ্ধিমান থাকিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন উন্নতি নাই; আজকার অতি চালাক কাকটা বিশ বৎসর অথবা হাজার বৎসর আগেকার চালাক কাকটি হইতে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। কিন্তু মানুষের অবস্থা অন্য রূপ; তাহাদের মধ্যে ক্রমোন্নতি হইতেছে; আজকার শিক্ষিত মানুষটী তাহার এক পুরুষ আগেকার শিক্ষিত মানুষ অপেক্ষাও বেশী জানে। সে তাহার পিতা-পিতামহের সঞ্চিত জ্ঞান ত পাইয়াছেই; তাহার উপর নিজে বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞানও লাভ করিয়াছে। এই প্রণালীতেই মানবজাতির সভ্যতার অভিব্যক্তি হয়; সমস্ত জাতিটাই ক্রমোন্নতি লাভ করে; এবং তাহার ফলে বর্ত্তমান যুগের একজন সভ্য সাধারণ মানুষ হাজার বৎসর আগেকার খুব চালাক লোক হইতেও বেশী বিদ্বান, বেশী কার্য্যদক্ষ। পশু-পক্ষীদের মধ্যে এরূপ নহে, যদিও ঘটনার ফলে অতি ধীরে-ধীরে তাহাদের সহজজ্ঞানগুলির (instincts) অল্প পরিবর্ত্তন হয়।

মানুষ ও পশুপক্ষীর মধ্যে এই যে একটা বিরাট্ পার্থক্য আছে, তাহার কারণ মানুষ কথা বলিতে পারে, পশুরা পারে না। প্রত্যেক মানব নিজ জীবনে অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা, আবিষ্কার বা চিন্তা নিজ পুত্রকে, নিজ সমসাময়িক সমাজকে দিয়া যাইতে পারে, যাহার ফলে প্রত্যেক পরবর্ত্তী যুগের সামান্য লোকও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত যুগের সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়। অর্থাৎ আমরা আমাদের পিতার কাঁধে চড়িয়া উঁচু হই। প্রত্যেক পশুকে কিন্তু (কয়েকটী বংশগত সহজ সংস্কার ছাড়া) সব জ্ঞান সব সত্য নিজে নিজে অর্জ্জন করিতে হয়। যুগের পর যুগ ধরিয়া তাহারা ঠিক একই নীচু জমি হইতে জীবন-যাত্রা আরম্ভ করে,—মানুষের মত পিতার কাঁধে চড়িয়া নহে; তাহারা পূর্ব্বপুরুষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার হইতে বঞ্চিত।

মানুষ ও পশুর মধ্যে এই যে পার্থক্য আছে, ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় মানুষের মধ্যে সেই পার্থক্য দেখা যায়। এই যেমন, একজন ভারতীয় কবিরাজ নিজ প্রতিভার বলে বা দৈবক্রমে কুষ্ঠ রোগের অথবা সাপের বিষের ঔষধ পাইলেন; তিনি তাহা গোপন করিয়া নিজ হাতে বা নিজ বংশে রাখিলেন। ইহার ফলে, হয় সেই ঔষধ তাঁহার মৃত্যুর সহিত লোপ পাইল, না-হয় একজনমাত্র লোকদ্বারা পরীক্ষিত হওয়ায় তাহার কোন উন্নতি হইল না। ইয়োরোপে এরূপ ক্ষেত্রে সেই ঔষধের আবিষ্কারক তৎক্ষণাৎ তাহার স্বরূপ ও ক্রিয়া প্রচার করিয়া দেন; শত-শত চিকিৎসালয়ে তাহা রোগীর উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়; শত-শত রসায়নাগারে তাহার দোষগুলি বাদ দিবার এবং গুণগুলি সতেজ করিবার চেষ্টা হইতে থাকে; ইহার ফলে ঔষধটী চরম উৎকর্ষ লাভ করে; মানবজাতির হিতসাধন হয়। মহাপ্রতিভাশালী একজন মানব যাহা করিতে না পারেন, সহস্র সহস্র সাধারণ মানবের সমবেত চেষ্টায় তাহা সাধিত হয়। এই সমবেত চেষ্টাই সভ্যতার উন্নতির মূল; এইজন্যই ইয়োরোপ এসিয়াকে পরাজিত করিয়াছে। ফরাসী বচনটা সত্য—"নেপোলিয়ন অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী একজন লোক আছেন, ত্যালের‌্যাঁ অপেক্ষাও ধূর্ত্ত একজন লোক আছেন:—সেই লোকটার নাম মানবজাতি।"

শিক্ষাক্ষেত্রেও আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতার, নিষ্ফলতার, এবং ইয়োরোপের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাভবের কারণ এই। আমাদের মধ্যে অনেক দক্ষ শিক্ষক দেখা দেন,—নিজ জীবনে তাঁহারা চূড়ান্ত সফলতা লাভ করেন; কিন্তু তাহা তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই লোপ পায়,—শিক্ষকজাতি তাঁহাদের অভিজ্ঞতার দক্ষতার ফল হইতে বঞ্চিত হয়। কারণ, আমাদের কর্ম্মীদের মধ্যে ভাবের বিনিময় নাই, সমবেত চেষ্টা নাই; শিক্ষা-সম্বন্ধে নূতন নূতন আবিষ্কার, মত (theory) আদর্শ বা পরীক্ষার ফল (experiment) আমাদের শিক্ষকমণ্ডলী আলোচনা করেন না, জানিবার চেষ্টাও করেন না। সকলেই চোখ বুজিয়া নিজের কাজ করিয়া যান। কেহ ভাল করেন, কেহ মন্দ করেন; কিন্তু কাজে এই পার্থক্য তাঁহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি বা ঈশ্বরদত্ত প্রতিভার ফল,—সজ্ঞান স্বকৃত উন্নতি-চেষ্টার ফল নহে। ইহার পূর্ব্বে শিক্ষা সম্বন্ধে মতামত অভিজ্ঞতা বা আদর্শ প্রচার ও বিচার করিবার জন্য একখানিও বাঙ্গলা কাগজ ছিল না; অথচ ইংলণ্ডে এরূপ অনেক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র আছে; তাহার মধ্যে "টাইম্‌স্" পত্রিকার সাপ্তাহিক "শিক্ষা—ক্রোড়পত্র" খানির প্রায় ত্রিশ হাজার কাটতি। সেখানে শিক্ষকদের অনেক সভা আছে, যাহাতে সর্ব্বদাই

এই সব প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়,—দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষক, অথবা শিক্ষা-সম্বন্ধে চিন্তা করেন এরূপ লোকেরা বক্তৃতা দিয়া থাকেন।

ঠিক এইগুলির অভাবই বাঙ্গলাদেশের শিক্ষা প্রণালীর উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় এবং শিক্ষার সফলতার ও বিস্তারের প্রধান শত্রু এ কথা আমি অনেক বৎসর হইতে অনুভব করিতেছি, এবং 'মডার্ণ রিবিউ' পত্রিকায় এই মত প্রচারও করিয়াছি।

* * * * *

এই শ্রেণীর পত্রিকাকে সজীব করিতে হইলে আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও চেষ্টার ফলাফল, অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থাগুলির বিচার অক্লান্ত পরিশ্রমে লিপিবদ্ধ করিয়া ইহাতে প্রকাশ করিবেন, এবং সম্পাদক শিক্ষা-সম্বন্ধে বিলাতের নূতন মত, নূতন চেষ্টা, নূতন আলোচনার রিপোর্টের অনুবাদ মাসের পর মাস ধরিয়া ইহার পৃষ্ঠায় বঙ্গীয় পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। শুধু ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ দিলে চলিবে না; প্রত্যেক প্রবন্ধে একটী ভূমিকা দিয়া বিলাতের ও আমাদের শিক্ষার অবস্থার পার্থক্য, সেখানে বর্ত্তমান উন্নতি কোন্ সিঁড়িতে পৌছিয়াছে, এবং তথায় কি অভাব, কি সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে, অনুবাদের ভাষা সরল এবং ভাবানুকূল (বর্ণানুকূল literal নহে) করিতে হইবে, এবং যতটুকু আমাদের পক্ষে উপকারী—আমাদের দেশে শিক্ষার জন্য আবশ্যক—তাহাই দিতে হইবে। এই কার্য্যের জন্য "টাইম্‌স্—শিক্ষা ক্রোড়পত্র" সর্ব্বদা হাতের কাছে রাখিতে হইবে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইহাতে ইতিহাস শিক্ষা সম্বন্ধে অতি জ্ঞানগর্ভ চিন্তাপ্রসূ দুইটী প্রবন্ধ এবং কয়েকখানি শিক্ষকের চিঠি কয়েকমাস হইল বাহির হইয়াছে। আর সরকারী কমিটি কর্ত্তৃক অল্পদিন হইল প্রকাশিত "ক্লাসিকাল ভাষা" "ইংরেজী ভাষা" ও "বিজ্ঞান" শিক্ষা সম্বন্ধে তিনখানি অতি মূল্যবান্ রিপোর্ট এখন আলোচিত হইতেছে।

কালাপানীর ওপার হইতে এই শিক্ষাতরঙ্গের অতি ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও যজে আমাদের শিক্ষক সম্প্রদায়ের কর্ণে পৌছিয়া তাঁহাদের তন্দ্রার ব্যাঘাত করিতেছে না,—কারণ তাঁহাদের জানাইবার লোক নাই, কাগজ নাই, চেষ্টা নাই। তাঁহারা প্রত্যেকেই ত টাইম্‌সের চাঁদা দিতে অথবা এই তিনখানি ব্লু বুক কিনিতে পারেন না; অনেকে এই সব কাগজ ও গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই। আমাদের শিক্ষকমণ্ডলী যে বঙ্গীয় অন্যান্য ব্যবসায়ী লোক অপেক্ষা অধিক তন্দ্রাপ্রিয়—এ কথা সত্য নহে। আসল কথা, দেশে ভাবিবার, সজাগ অবিচ্ছিন্ন সমবেত উন্নতি-চেষ্টা করিবার নেতা ও কর্ম্মীর অভাব। আমাদের শিক্ষকগণকে সঙ্ঘে গঠিত এবং শিক্ষায় "মুক্তি কোন পথে" তাহা তাঁহাদের দেখাইয়া দিতে, ত্যাগী শ্রমী দূরদর্শী প্রকৃত দেশবন্ধু "শিক্ষাগুরু" কবে আবির্ভূত হইবেন? (শিক্ষক)

গালার চাষ

[শ্রীসনৎকুমার দত্ত]

গালা না দেখিয়াছেন এমন লোক অতি বিরল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেমন করিয়া এই পদার্থটী তৈয়ারী হয়, তাহা হয় ত অনেকেই জানেন না। হয় ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, গালা এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট দ্বারা তৈয়ারী হয়। এই ক্ষুদ্র কীট নিজের লম্বা চঞ্চু গাছের কোমল অংশের মধ্যে ফুটাইয়া দিয়া, তাহার মধ্য হইতে রস টানিয়া লয়; এবং সেই রস তাহার শরীরের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত যন্ত্রাদির ভিতর দিয়া, পরে তাহার বহিঃস্থ আবরণের ছিদ্রগুলি দিয়া, আঠার আকারে বাহির হয়। ক্রমে এই আঠার (Resinous) মত পদার্থটী সেই কীটের চতুর্দ্দিকে একটী শক্ত আধারের মত ঢাকিয়া ফেলে। ইহাকেই গালা কহে।

গালা কীটের খাদ্য—নিম্নলিখিত গাছগুলির রস গালাকীট বড় পছন্দ করে; এবং এই সকল গাছের রসে খুব শীঘ্র-শীঘ্র নিজের বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে। গাছগুলির নাম—কুসুম, কুল, পলাশ, পিপুল, শিরিষ, কবুল, ও অড়হর। আম গাছেও মধ্যে-মধ্যে ইহাদিগকে বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়; কিন্তু ইহার রস ইহারা তত বেশী পছন্দ করে না।

জীবনী (Life history)—স্ত্রী-কীট নিজের ক্ষুদ্র আবরণটীর মধ্যে ডিম পাড়ে। কয়েক দিনের মধ্যে ডিম ফুটিয়া ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বীজ বাহির হয়। এক একটী কীট খুব বেশী হয় ত $\frac{1}{25}$ ইঞ্চি লম্বা। ডিম ফুটিবার সময় যদিও সকল স্থানে এক নয়, তথাপি যে কোন এক জায়গার পক্ষে সময় কাল প্রায় ঠিক থাকে।

এই কীটগুলির রং ঘন লাল। ইহাদের ছয়টী পা, দুইটী কাল চক্ষু ও দুইটী শুঁড় আছে। প্রত্যেক শুঁড়ের উপর আবার একটী করিয়া শাদা সূতার ন্যায় অঙ্গ যোজিত আছে।

ইহারা কোনও দ্রব্য কামড়াইয়া খাইতে পারে না। সকল দ্রব্যেই ইহার সূক্ষ্ম সূচের ন্যায় মুখ চঞ্চু দিয়া ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতর হইতে রস টানিয়া লয়। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কীটগুলি বাহির হইয়াই গাছের সকল স্থানে ছড়াইয়া পড়ে; ও প্রত্যেকে নিজের-নিজের সুবিধা মত স্থান ঠিক করিয়া লয়। যতক্ষণ না তাহারা সুবিধামত স্থান খুঁজিয়া পায় ততক্ষণ তাহারা চঞ্চল থাকে।

একস্থানে স্থির হইয়া বসিবার পর তাহারা তাহাদের ক্ষুদ্র-চঞ্চু গাছের কোনও একটী কোমল স্থানে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয় ও ভিতরের রস টানিয়া লইতে আরম্ভ করে। সেই রস তাহাদের প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তনের পর বহিঃস্থ ছিদ্র-গুলির দ্বারা বাহির হইয়া আসে এবং প্রত্যেকের শরীরটী সমভাবে আবৃত করিয়া দেয়। এই রস ভয়ানক ঘন এবং দেখিতে অনেকটা ধুনার আঠার (Resin) মত। এই সময়ে পুং এবং স্ত্রী-কীটের মধ্যে

বিশেষ কোনও পার্থক্য লক্ষিত হয় না। প্রায় ১৪।১৫ দিবস পরে পুং ও স্ত্রী-কীটের মধ্যে পার্থক্য বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। পুং-কীটের আধারের আকার একটু লম্বা এবং তাহার উপর দিকে দুইটী ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দুইটী দিয়া শাদা সুতার ন্যায় অঙ্গ দুটী বাহির হইয়া থাকে।

স্ত্রী-কীটের আধারের আকার গোল। আধারের ধারগুলিও (margin) অসম। এই আধারের উপরিভাগে তিনটী ছিদ্র আছে এবং এই ছিদ্রগুলি দিয়া পুং-কীটের মত শাদা সুতার ন্যায় অঙ্গগুলি বাহির হইয়া থাকে। এই ছিদ্রগুলি আধারের মধ্যে বায়ু গমনাগমনের সহায়তা করে।

দিন কতক পরেই পক্ষবিশিষ্ট পুং-কীটগুলি নিজেদের আধার হইতে বাহির হইয়া আসে এবং স্ত্রী-কীটগুলিকে fertilise করে। পুং-কীটগুলি কখন স্ত্রী-কীটগুলির আধারের মধ্যে প্রবেশ করে না। আবরণের উপর হইতেই তাহাদের এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। স্ত্রী কীটগুলি কখনও তাহাদের আবরণ হইতে বাহির হয় না।

স্ত্রী-কীটগুলি, পুং-কীটের সহিত সঙ্গম হইবার পর, বেশী পরিমাণে রস টানিতে আরম্ভ করে; সুতরাং বেশী আটা (Resin) তাহাদের শরীরের ছিদ্রগুলি দিয়া বাহির হয়। তাহাদের শরীরগুলিও কিঞ্চিৎ পরিমাণে বড় হয়। শাদা সুতার ন্যায় বায়ু গ্রহণের অঙ্গগুলিও সেই সঙ্গে বর্দ্ধিত হয়। সুস্থ গালা কীটপূর্ণ একটী গাছ সেই কারণে দূর হইতে শাদা দেখায়।

স্ত্রী-কীটগুলি যখন পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়, তখন নিজের আবরণের মধ্যেই ডিম পাড়ে। সেই জন্য তাহাদের দেহ যথেষ্ট পরিমাণে কুঞ্চিত হয়। ১৪।১৫ দিন পরেই ডিমগুলি ফুটিয়া যায় এবং তাহা হইতে বাচ্ছা বাহির হয়।

বীজগালা (Brood lac stick) গাছে বাঁধা (Inoculation)—বীজগালা কোনও ছাঁটা গাছে বাঁধাকে Inoculation বলে। এ বীজগালার মধ্যে সদ্য-স্ফুটনোন্মুখ ডিমগুলি থাকে। ডিম ফুটিবার প্রায় ১০।১২ দিন পূর্ব্বে, কিংবা যখন সদ্যস্ফুট কীটগুলি সবেমাত্র বাহির হইয়াছে, তখনই এই কাজটী করিতে হয়। সেই জন্য যেখানে গালার চাষ হয় সেইখানে (সেই স্থানের জন্য) ডিম ফুটিবার সময়টী জানা অত্যন্ত দরকার। একবার জানা থাকিলে, পরে বিশেষ আর কোন কষ্ট পাইতে হয় না। কারণ, এই সময়টী জানা না থাকিলে, কখন যে কীটগুলি বাহির হইবে তাহা জানা থাকে না; কখন যে বীজগালা গাছ হইতে কাটিতে হইবে, তাহাও জানা থাকে না; সেইজন্য কখন যে বীজগালা গাছে বাঁধিতে হইবে, তাহাও জানিতে পারা যায় না।

যখন বীজ গালা গাছে বাঁধিতে হইবে তখন দেখা যায় হয় ত অনেকগুলি কীট খাদ্যাভাবে মরিয়া গিয়াছে; আর না হয় ত তাহারা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কীটগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়া, তাহারা যদি একবার ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাদিগকে কুড়ান বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে।

স্ত্রী-কীটগুলির আধার কুঞ্চিত হওয়ার দিন জানা থাকিলে ডিম ফুটিবার দিন আন্দাজ করিয়া লওয়া যায়। ডিমগুলি ফুটিবার প্রায় এক পক্ষ পূর্ব্বে এই বীজ-গালাযুক্ত ডালগুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। এই ডালগুলি পরে সুবিধামত (৮।১০ ইঞ্চি) ক্ষুদ্রাকারে বিভক্ত করা হয়; এবং একটা ঠাণ্ডা খোলা জায়গায়, বাঁশের মাচানের উপর উত্তমরূপে হাওয়া লাগাইবার জন্য সারি-সারি করিয়া বিছাইয়া দেওয়া হয়।

তার পর ডিম ফুটিবার ১০।১২ দিন পূর্ব্বে, কিংবা সদ্যস্ফুট কীটগুলি বাহির হইবামাত্র, এই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশগুলি একটী ছাঁটা গাছে শোন দড়ি কিংবা কলার বাস্না (Plantain bast) কিংবা অন্য কোনও সস্তা বাঁধিবার জিনিস দিয়া এমন ভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হয় যে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র অংশের অন্ততঃ একটী দিক গাছের একটী ডালের সহিত লাগিয়া থাকে।

গালার ফসল (Crops of Lac)—এক বৎসরে কয়বার গালা পাওয়া যায়—এক বৎসরে গালার দুইটী 'ফসল' (crops) পাওয়া যাইতে পারে। প্রথম ফসলের নাম বৈশাখী; কারণ, ইহা বৈশাখ মাসে সংগ্রহ করা হয়; এবং দ্বিতীয় ফসলের নাম কার্ত্তিকী; কারণ, ইহা কার্ত্তিক মাসে সংগ্রহ করা হয়। যে ফসল বৈশাখ মাসে সংগ্রহ করা হয়, তাহার জন্য বীজগালা আশ্বিন কিংবা কার্ত্তিক মাসে বাঁধিতে হয়; এবং কার্ত্তিকী ফসলের জন্য, বীজগালা বৈশাখ কিংবা জ্যৈষ্ঠ মাসে বাঁধিতে হয়। এই দুইটী ফসলের মধ্যে বৈশাখী ফসলটীতে বেশী গালা পাওয়া যায়; কেন না ইহা প্রায় আট মাস থাকে। আবার সমস্ত শীতকাল এই ফসলটী বেশ নিরাপদ অবস্থায় থাকে; কারণ, এই কীটের শত্রু প্রভৃতি অন্যান্য কীটাদি এই সময়ে দারুণ শীতে অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে; সুতরাং ইহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। এক বৎসরে একটী গাছ হইতে মাত্র একটী ফসল পাওয়া যায়।

গাছ ছাঁটা (Prunning) যে গাছে বীজগালা বাঁধা হইতেছে, সে গাছে যথেষ্ট পরিমাণে নবোদ্গত কোমল শাখাপল্লব থাকা অত্যাবশ্যক। যদি এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা না হয়, তাহা হইলে সদ্যস্ফুট বীজগুলি ডিম হইতে বাহির হইয়াই আহার না পাওয়ায়, একস্থানে স্থির হইয়া বসিতে পারে না; অধিকন্তু অনেকগুলি মরিয়াও যায়। এইজন্য বীজগালা বাঁধিবার অন্ততঃ ছয় মাস পূর্ব্বে গাছ ছাঁটিয়া ফেলা দরকার পলাশ ও কুসুম গাছ ছাঁটিবার দরকার হয় না; কেন না, এই গাছ-দুটী এত বড় ও ইহাতে এত নূতন শাখা-প্রশাখাদি প্রতি বৎসরে বাহির হয় যে, এই গাছগুলি না ছাঁটিলেও চলে। কুল গাছের শাখাদি এত শীঘ্র বাহির হয় যে, ইহা প্রতি বৎসরে ছাঁটা যাইতে পারে। অন্য গাছগুলি প্রতি বৎসর ছাঁটাই ভাল।

বৈশাখ কিংবা জ্যৈষ্ঠ মাসে যদি বীজগালা বাঁধিতে হয়, ত অন্ততঃ চারি মাস আগে গাছ ছাঁটা দরকার; অর্থাৎ পৌষ কিংবা মাঘ মাসে ছাঁটিতে হইবে। আশ্বিন কিংবা কার্ত্তিক মাসে বীজগালা বাঁধিতে হইলে, বৈশাখ কিংবা জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছ ছাঁটিতে হইবে। গাছের ডালগুলি একটি বড় ভারী ও খুব ধারাল অস্ত্র দ্বারা কাটিতে হইবে;

কেন না, কর্ত্তিত স্থানগুলি যত পরিষ্কার ও সমান হয় ততই ভাল।' তাহা হইলে নূতন শাখা বাহির হইবার সময় গাছের অধিক শক্তি ব্যয় করিতে হয় না, ও ক্ষত স্থানটী খুব শীঘ্র সারিয়া যায়। যদি কোনও ডাল কাটিবার সময় কর্ত্তিত স্থানটী পরিষ্কার ও সমান না হয়, (becomes lacerated), তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিন ভাগ মাটী ও এক ভাগ গোবর উত্তমরূপে মিশাইয়া সেই ক্ষতের উপর লেপন করিয়া দিবে।

গালা সংগ্রহ (Scraping lac) —যে বীজগালা হইতে ডিম্ব ফুটিয়া কীট বাহির হইয়া গিয়াছে, সেইগুলি খুব সাবধানে গাছ হইতে নামান হয়; এবং উপরের গালা একটি ভোঁতা ছুরি দিয়া চাঁচিতে (scraping) হয়। এই চাঁচা গালাকে 'গালাচড়ি' বা stick lac বলে। এই গালা একটী ছায়াশীতল স্থানে শুকাইবার যাঁতায় কিংবা অন্য কোনও রকমে গুঁড়া করা হয় এবং একটী বড় জলপূর্ণ পাত্রে চব্বিশ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখা হয়।

তার পর ইহাকে পুনঃ রগড়াইয়া উত্তম রূপে ধৌত করা হয়। ধৌত জলের সহিত যতক্ষণ লাল রঙ্ আসিতে থাকে, ততক্ষণ এইরূপে ধৌত করা হয়। তৎপরে কিঞ্চিৎ সোডা (Sodium Carbonate) ছড়াইয়া দিয়া পুনরায় তাহা ধৌত করা হয়। এই রকম করিয়া লাল রংএর শেষ কণিকাটি পর্য্যন্ত বাহির করিয়া লওয়া হয়। তখন এই গালার রং ফেঁকাসে নেবু রংএর মত হইয়া যায়। এই গালাকে seed lac, এবং যে লাল রংটি বারবার ধুইয়া বাহির করা হয় তাহাকে আলতা (lac dye) নহে।

এই গুঁড়া গালায় (seed lac) এখন শতকরা ২।০ ভাগ হরিতাল (yellow orpiment, $As_2 s_3$) ইহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করা হয়। এই হরিতাল মিশ্রণে গালার যে রং হয়, তাহাই আমরা বাজারে দেখিতে পাই। গালার এই রং গালা ব্যবসায়ীরা বড়ই পছন্দ করে। পরে ইহার সহিত শতকরা ৪।৫ ভাগ এক প্রকার গঁদ (Pine resin) মিশান হয়। এই গঁদ মিশাইলে ইহা খুব কম উত্তাপে গলিয়া যায় (lowers the melting point)। তৎপরে ইহা একটি লম্বা ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া উনানের উপর রাখা হয়। এইরূপে 'shellac' প্রস্তুত হয়।

গালার ব্যবহার (uses of lac) – গালা এক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। আজকাল প্রত্যেক আফিসে গালা না হইলে একদণ্ড চলে না। গহনার (তাগা বালা ইত্যাদি) ভিতরের শূন্য স্থান ইহা দ্বারা পূর্ণ করা হয়। মাকু, ঘোল ছানিবার কাঠি, বোতাম, গ্রামোফন রেকর্ড, বার্ণিশ, পালিশ ও আরও অনেক দ্রব্য এই গালা হইতে তৈয়ারী হয়।

আলতা, সধবা হিন্দু স্ত্রীগণের একটী নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী। যে লাল রঙ গালা ধুইবার সময় বাহির হয়, তাহাই তুলায় ভিজাইয়া চাপিয়া গোলাকার করিয়া রাখা হয়। বাজারে তাহাই আলতা বলিয়া বিক্রয় হয়। হিন্দুদেবীগণের পূজায় আলতার প্রয়োজন হয়। এই আলতা পূর্ব্বে অন্যান্য দ্রব্যাদি রং করিবার জন্য আবশ্যক হইত; কিন্তু Aniline dye আবিষ্কারের পর ইহার এই বিষয়ে ব্যবহার এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। আলতায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী আছে; সেইজন্য ইহা সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই কয়টী প্রধান উপাদান আলতায় আছে—

নাইট্রোজেন—(nitrogen)—	শতকরা	·০১৪ ভাগ
ফস্ফরিক অন হাইড্রাইড	"	·০০৪ "
পটাশ	"	·০০৮ "

গাছে বীজগালা বাঁধা ও অন্যান্য ব্যয়াদির বিষয় বিশেষভাবে কিছু বলা যায় না; কেন না, ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন প্রকার। যেখানে মজুর অনায়াসে ও অল্পব্যয়ে পাওয়া যায়, সেখানে খরচ কম। বীজগালা ক্রয় করা, গাছ ছাঁটা, বীজগালা, গালা সংগ্রহ করা এবং জমির খাজনা এই কয়টীতেই খরচ পড়ে। তবে বীজগালার খরচ প্রথম বৎসরেই যাহা লাগিবে; পরে নিজের চাষ হইতে বরাবর বীজগালা পাওয়া যাইবে। এই কাজে কোনও গোলমাল নাই; বিশেষ শিক্ষার কোনও প্রয়োজন হয় না; খরচও কম।

কুড়িটী কুলগাছে বীজ বাঁধিতে ও গালা সংগ্রহ করিতে এক সপ্তাহের বেশী সময় লাগে না। গাছ-প্রতি খুব কম আট আনা লাভ রাখা যাইতে পারে। যুদ্ধের সময় গালার দর খুব নামিয়া গিয়াছিল, তাই আট আনা বলিলাম; এখন কিছু বেশীও হইতে পারে।

গালাকীটের শত্রু (Enemy of lac)—কাল পিঁপড়া, ইহাদের দেহ হইতে যে একপ্রকার মধুর মত রস বাহির হয়, তাহা খাইবার জন্য যায়। যাওয়া-আসা করিবার সময় ইহাদের আবরণের শাদা সূত্রগুলি ভাঙ্গিয়া দেয়; এবং সেইজন্য বাতাস অভাবে নিশ্বাস ফেলিতে না পারিয়া দম বন্ধ হইয়া ইহারা মরিয়া যায়। Emblema Coxifera নামক এক প্রকার কীট, এই গালাকীটের উপর জীবন ধারণ করে (Parasite)।

দুই-তিন প্রকার predatory caterpiller গালাকীটের ভয়ানক শত্রু।

শত্রু নিবারণের উপায় –গাছের গুঁড়িতে একটী মোটা ন্যাকড়া আলকাতরায় ভিজাইয়া রাখিলে, কাল পিঁপড়ার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

Carbon Bisulphide এর ধোঁয়া (Fumigation) ঠিক গালা সংগ্রহের পর দিলে Predatory caterpillers যদি থাকে ত মরিয়া যায়। (স্থানাভাবে Fumigationএর বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারিলাম না। পরে এ বিষয়ে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল)।

Emblema coxifera—নিবারণের কোনও উপায় আপাতত জানা নাই।

(আলোক)

বৌমা

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ]

ঠাকুমা মাথা কুটিয়া বলিলেন,—না, নিত্যি নতুন এই ভর দুপুরবেলায় ঝগড়া—এ একটা কিছু না হয়ে নিস্তার নেই দেখ্‌ছি। দেখ বাপু বৌমা, এ বড় বাড়াবাড়ি করে তুলছ দেখ্‌ছি। বৌমা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিলেন,—কেন, বাড়াবাড়ি করে তুলেছি—বাড়ীতে আর আমার জায়গা হবে না, এই ত—এই ত তুমি বল্‌তে চাও! ঠাকুমা অপ্রতিভ হইয়া জিভ কাটিলেন—। সরোজ বলিল,—কি ঠাকুমা, বড় চুপ করে' রইলে যে! সাহসে কুলুলো না আর কিছু বল্‌তে, নয়? বৌমা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—দেখ্‌ সরোজ, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! এখনও বল্‌ছি—বল্‌বি ত বল্‌,—নিশ্চয় শ্যামলকে তুই মেরেছিস্‌।—নিত্যি শ্যামলের মা আস্‌বে তোর নামে নালিশ কর্‌তে! নাঃ তোকে নিয়ে বড় জ্বালা হল দেখছি! মেরে যখন তোকে কিছুই হল না, তোর তখন উপযুক্ত সাজা'—ঠাকুমা বলিলেন,—না বৌমা, মেরে যখন তোমার ছেলেকে কিছু হল না, তখন ও' বালাইকে কেটে ফেলে তোমার হাড় জুড়োও! উজ্জ্বল রক্ত গণ্ড লইয়া বৌমা কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন; ঠাকুমা ঈষৎ চাপা ও গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—বৌমা, ছোটটি যখন তোকে নিয়ে এসেছিলাম, তখন যেমন উঠ্‌তে-বস্‌তে টিপটিপ করে' তোকে মার্‌তাম, এখন ত তেমনটি পারি নে; তাই—বড় ধিঙ্গি হয়ে উঠ্‌ছ! আয় রে আয় সরোজ,—রাক্ষসী মার কাছ থেকে পালিয়ে আয়! সরোজ ঠাকুমার বুকে মাথা লুকাইল। বৌমা মাথা নত করিয়া, সটান্‌ উপরে যাইয়া, শোবার ঘরে গুম্‌ হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

ঝি আসিয়া বলিল,—বৌঠাকরুণ, নিত্যিই কি বেলা পেরিয়ে খেতে হয়? এটা তোমাদের বাড়ীরই ধারা,—চিরকালই রয়ে গেল। বৌমা একটু মৃদুস্বরে বলিলেন,—মন্দা! মন্দা ঝি বলিল,—ঠাকরুণ! বৌমা ঈষৎ মধুর হাসিয়া বলিলেন,—তুই আমাদের বাড়ী কদ্দিন থেকে আছিস্‌ রে মন্দা? মন্দা বলিল,—ওঃ, কর্ত্তা-মা যেম্‌নি এ বাড়ী এসেছে, সঙ্গে-সঙ্গে আমিও এ বাড়ী এসে ঢুকেছি। এ বাড়ীতে শুধু আমি কেন—যা কিছু লোকজন, চাকর-ঝি,—সবই ত ঐ কর্ত্তা-মা এ বাড়ী আসাতে—তোমাদের বাড়ীতে ত আগে কিছুই ছিল না! ঐ কর্ত্তা-মা কি যে লক্ষ্মীর কৌটো আঁচলে বেঁধে ঘরে এল—এ বাড়ীর লক্ষ্মীশ্রী ফুটে উঠ্‌ল! বৌমা চেঁচাইয়া বলিলেন,—আর সরোজ সেই লক্ষ্মীর বুকে গিয়ে লুকিয়েছে বলে আমি তীব্র অভিমানে জলে মর্‌ছি! মন্দা যেন একটু অস্বাভাবিক চাহনি চাহিল। বৌমা বলিয়া উঠিলেন,—কিরে, অমন করে চাইছিস্‌ কেন! যার মাকে ছোটটি থেকে পুষে, কত আব্‌দার স'য়ে মানুষ কর্‌তে পেরেছেন—আর তারই ছেলেটি তাঁর নেওটা বলে' আমি অভিমানে মরে যাই!

ঠাকুমা ঘরে আসিয়া বলিলেন,—বৌ, তোর জ্বালায় কি আমি মাথা খুঁড়ে মরব রে! এই বেলা চার প্রহর হতে চল্‌ল—সকালে একটু কিছু মুখে গুঁজে খেতে দিলেও খাবি নে! নাঃ, এমন যদি জ্বালাস্‌-পোড়াস্‌—আজ থেকেই কড়া হুকুম দেব—বাড়ীর কা'র সাধ্যি না মানে দেখ্‌ব—এগারটার মধ্যে সবাইকে খেয়ে নিতে হবে! বাইরের বারান্দায় আসিয়া বলিলেন,—রদ্দুর একেবারে পড়ে গেছে—এত হতভাগা কি রে তোদের কপাল—আমাদের বাড়ীতে যে ঢোকে, সে-ই কি দুটো খাওয়া, তাও ভুলে যায়!

(২)

পিছন দিকে ঘুরিয়া, খপ্‌ করিয়া সরোজের হাত দু'খানি ধরিয়া, বৌমা বলিলেন,—ধাড়ি ছেলে, একটু খেতে বসেও স্বস্তি নেই রে তোর জ্বালায়! পেছনে এসে আঁচল থেকে আস্তে-আস্তে চাবির রিঙ্‌ খোলা হচ্ছে;—এই রিঙের গোছা দিয়ে মুখ থেঁতো করে দেব।—এখনই চুরি হচ্ছে, বড় হলে ডাকাত হবি যে রে!—বাড়ীর নাম ডুবুবি! মা এলে তোর কীর্ত্তি এখনই দেখাতেম। সরোজ এতটুকু মুখ করিয়া, কাঁচুমাচু হইয়া বলিল,—মা! বৌমা ধমকানর

সুরে বলিলেন,—মা! মাকে আজ কিছুতেই ভোলাতে পারবিনি! ভেবেছিস্ ওই ছোট্ট মুখখানি কাঁচুমাচু করে, ওই উজ্জ্বল গোটা চোখ দু'টো ছলছল করে তোর ঠাকুমাকে যেমন চিরদিন ভোলাস্—আমাকেও তেমনি ভোলাবি! বড় হলে ডাকাত হবি যে রে ছোঁড়া! চোরের মত চুপি-চুপি চাবি খুলে নিতে এসেছিস্—বাক্সের মধ্যে তোর কি আছে রে ছোঁড়া! মন্দা বলিল,—ছিঃ! মাকে কি খাবার সময় অমন করে বিরক্ত করতে আছে! দুটো খেতে বসেছে—অমন করে' দৌরাত্ম্য করে না! বৌমা তখন বড় রাগিয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন,—নে মন্দা! বিনিয়ে-বিনিয়ে এখন আর তোকে শাসন করতে হবে না;—দূর হয়ে যা বল্‌ছি এখান থেকে! বাঁ হাত দিয়া দুই চোখ ঢাকিয়া বলিলেন,—সবাই হয়েছিস্ তোরা মার দিকে! তোদের ত বুঝতে বাকী নেই! এই ত সরোজের কীর্ত্তি চোখের সামনেই দেখ্‌লি! তুই নিজেই কি বরদাস্ত করতে পার্‌ছিস্, বল্ দেখি!—আর যেমন আমি মার কাছে এ কথা বল্‌তে যাব—তোরা সবাই মিলে বল্‌বি,—না, সরোজ এমন আর কিছু করে নি, যাতে তাকে মেরে আধমারা করতে হয়! যাঃ, তোদের চিন্‌তে বাকী নেই! এই বলিয়া, এক রকম সকলের উপর রাগ করিয়াই, বৌমা চাবির থোলো দিয়া ঝপ্ করিয়া সরোজের মুখে সজোরে বাড়ি মারিলেন;—ঝরঝর করিয়া দাঁত দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। বৌমা তাহা দেখিলেন না; আপন মনেই বলিলেন,—তোরা যা খুসি বলিস্ মার কাছে;—আমার শত অপরাধ, শত দোষ ব্যাখ্যা করিস্। ছোট বউ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন; এবার চীৎকার করিয়া বলিলেন,—দিদি, দেখ্‌ছ, সরোজের দু'গাল বেয়ে কি রকম রক্তের ধারা পড়ছে! একেবারে পাষাণী হয়েছ দিদি! তোমার নামে লাগিয়েই বা আমরা কি করব! তুমি যত অপরাধ করতে জান, তার সহস্রগুণ ক্ষমা চাইতেও যে জান! ওরে মন্দা, সরোজ পোড়ারমুখোর মুখ ধোয়াতে শীগগির আর এক ঘটি জল দে—এক ঘটি জলেও যে কিছুতেই রক্ত বন্ধ হল না! বালক শ্যামল দরজার ফাঁকে এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; সেও বড় ব্যথা পাইল।—আগাইয়া আসিয়া একেবারে কাঁদ-কাঁদ সুরে বৌমার দিকে চাহিয়া বলিল,—দেখ, কেন সরোজকে এম্‌নি করে মারলে! আমি বিস্কুট না আন্‌তে বল্‌লে ত' ও' তোমার বাক্সের চাবি নিত না! বৌমার রাগ তখন অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার তখন শ্যামলের কথায় মনে পড়িল, পামারের বিস্কুটের বাক্স তাঁর বাক্সর মধ্যে আছে। চেঁচাইয়া, ভ্রূভঙ্গি করিয়া, সরোজের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ভাব হতেও যতক্ষণ, আবার ঝগড়া হতেও ততক্ষণ! এই ত ও'বেলাতেই শ্যামলের মা নানান্ থান্ করে' তোর নামে নালিশ করে গেল; আবার এরই মধ্যে সুট্ সুট্ করে শ্যামলের সঙ্গে গলায়-গলায় ভাব হয়ে গেল; অমনি বিস্কুট দেবারও তাড়াতাড়ি পড়ে গেল!

শ্যামলের মা পায়ে এক-পা ধূলো নিয়ে, রান্নাবাড়ী আসিয়া, খপ্ করিয়া শ্যামলের হাতখানি ধরিয়া বলিলেন,—কি লক্ষ্মী ছেলে! আমি ভাবলাম, আজ তুমি এ পাড়া থেকে পালিয়েছ! ঠিক এ বাড়ী এসেই জুটেছ! না সরোজের মা, ভাল চাও ত এখনও সরোজকে শাসন কর!—আমিও ত ছেলের মা! যাই বল, আমি'ও' সইতে পারি নে। এই বলিয়া, শ্যামলের দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন,—বেরো বলছি, হতভাগা এ বাড়ী থেকে! পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া বলি-লেন,—বৌ, নিজের ছেলেকে একটু শাসন করতে জান না! —সরোজকে আমাদের বাড়ী আর যেতে দিও না। এত ন্যাকা মেয়ে হলে, ছেলের মা হয়ে বস্‌তে হয় না! সরোজের হাতে এক কুচো নৈবিদ্যির সন্দেশ, কলা, দিয়েছ কি না দিয়েছ, অমনি ছুট্‌ল সে আমাদের বাড়ী! আর ঐ অল্‌প্পেয়ে ড্যাক্‌রা শ্যাম্‌লা সবটুকু বাছার হাত থেকে ভুলিয়ে খেয়ে নেবে! আজ ও' বেলা করেছে কি,—সরোজ এই একমুঠো দিব্যি ঢাক-ঢাক বিস্কুট নিয়ে গিয়ে, ঐ শ্যাম্‌লাটার মুখে পুরে দিচ্ছে! বৌমার মুখ প্রসন্ন হইল। হর্ষের অশ্রু জোর করিয়া চাপিয়া, বৌমা এতক্ষণে উৎসাহে সরোজের কাছে আসিয়া বলিলেন,—সরোজ, বড় লেগেছে? নাঃ, কিছু হয় নি, নয়? ছোট বউ চীৎকার করিয়া বলিলেন,—নাও দিদি, আর মায়া দেখানোর দরকার নেই! এতক্ষণে জ্ঞান হ'ল, সরো-জের লেগেছে কি না! শুধু লেগেছে—এই নিয়ে এখন কতটা গড়ায় দেখো! ডাক্তারকে ডেকে না দেখালে আর নিস্তার নেই! বৌমা জড়সড় হইয়া বলিলেন,—বড় হ'য়ে তোর পায়ে পড়াটা কি তুই এতই চাস্! তোর পায়ে পড়ে' বল্‌ছি রে—ডাক্তার-টাক্তারকে ডাকাস্ নে। মার কাণে উঠ্‌লে যে আর ধড়ে আমার প্রাণ থাক্‌বে না!

শ্যামলের মা ও মন্দা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। বৌমা চেঁচাইয়া বলিলেন,—না, তোরা সবাই মিলে মৎলব করে' আমায় জব্দ কর্‌বি, ঠিক করেছিস্! অমন যদি করিস্ ত বল্—আমি তোদের জনে-জনের পায়ে মাথা খুঁড়ে মরি! এই একটা মস্ত বড় ন্যাকড়া মুখে জড়ান থাক্‌লে, মার আর চোখে ঠাওর হবে না, নয়? আমি ভারি অন্যায় বলেছি!

সত্যি-সত্যিই সরোজ বড় ব্যথা পাইয়াছিল। ডাক্তারকেও দেখাইতে হইয়াছিল। কিন্তু বৌমার সৌভাগ্য যে, সরোজের ঠাকুমা তৎপূর্ব্বেই বাপের বাড়ীর দেশে, যাঁড়েশ্বরের মাথায় জল ঢালিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি কয়েক বৎসর হইতে, এই উপলক্ষ করিয়া গিয়া, কয়েক দিন থাকিয়া আসেন।

(৩)

একদিন রাত্রে সরোজের মাথায় ছোট বউ প্রলেপ লাগাইতেছেন, এমন সময় সরোজ চক্ষু মেলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—কে?—মা? ছোট বউ মধুর স্বরে বলিলেন,—না সরোজ, আমি। সরোজ তথাপি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল,—হাঁ, তুমিই ত আমার মা। ছোটবৌ'য়ের প্রাণ যেন একটু ধড়াস্ করিয়া উঠিল। সরোজের গায়ে তাড়াতাড়ি হাত দিয়া মনে-মনে বলিলেন,—গা' ত বেশ ভালই আছে! সরোজ কথ্‌খন প্রলাপ বক্‌ছে না!—বোধ হয় স্বপ্নের ঘোরেই কাকীমাকে 'মা' বল্‌ছে!

সকালে উঠিয়া সরোজ ছোট বউকে বলিল,—মা, এখন আমার আর ত কোন যন্ত্রণা নেই; আমি আজ বাড়ীতে বেড়িয়ে বেড়াব কিন্তু। ছোট বৌ'য়ের কাছে আজ ক'দিন থেকে এই কথা শোনাটাই বড় আশার ও আনন্দের ছিল—কবে সরোজ আবার উঠে হেঁটে বেড়াতে পার্‌বে! আজ কিন্তু অত বড় কথাটা শুনেও ছোট বৌ'য়ের ভিতর কোন উৎসাহ ও আনন্দের চিহ্ন দেখা গেল না। ছোট বউ একটু ধীর গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—সরোজ, আমি যে তোর কাকী-মা রে, ভুলে গেলি না কি? সরোজ যেন শিখান টিয়া পাখীর মতই এক নিঃশ্বাসে আওড়ে গেল,—দূৎ, মিথ্যে কথা,—তুমিই ত আমার সত্যিকারের মা! যতদিন ছোট ছিলাম, ততদিন কাকীমা কাকীমা বলে ডাক্‌তাম। এখন বড় হয়েছি, এখন কি মাকে 'কাকীমা' বলাটা ভাল দেখায়! ছোটমা হঠাৎ সরোজের বিছানায় বসিয়া পড়িলেন; বলিলেন,—ভাল দেখায় কি না দেখায় এ কথা তোকে কে—। মুখের কথা কাড়িয়াই সরোজ বলিয়া ফেলিল,—কে আবার!—বৌমা বলে দিল—ও' আমারও বৌমা হয়! ছোট বউ ঠিকই অনুমান করিয়াছিলেন। হঠাৎ সরোজের মুখে একমুখ চুমু খাইয়া বলিলেন,—বৌমা এবার ঘরে এলে বলিস্—বলিস্ সরোজ!

মন্দা ঠিকই বলিয়াছিল, এ বাড়ীর খাওয়া-দাওয়া সারা হতেই বেলা গড়িয়ে যায়! খেতে বস্‌তেও যত দেরী, আবার উঠ্‌তেও তত দেরী। সেই জটলা করে' সাত-সতের গল্প আর ফুরোয় না! মন্দা বল্‌লে,—ও পাড়ার তোমাদের ক্ষুদু ঠাকুমারা চল্‌লেন সব তীর্থ কর্‌তে। বিন্দাবন, সীতাকুণ্ড, কেদারনাথ, হৃষীকেশ না সেরে এবার আর ফির্‌বেন না। বৌমা হাতের গ্রাস মুখে না দিয়াই বলিলেন,—মন্দা, তুই ঠিক খবরটা আজকে নিয়ে আসিস্ ত, কবে তাঁরা বেরুবেন। মন্দা বলিল,—কেন, কর্ত্তা-মা যদি যান? তিনি এ সব অনেক দিনই সেরেছেন—একবার শুধু নয়, পাঁচবার করে'। বৌমা বলিলেন,—ওরে না রে, আমি যাব। মন্দা প্রথমটা হাসিয়া ফেলিল। বৌমা বলিলেন,—কেন, বিশ্বাস হয় না না কি?' ছোট বউ বলিলেন,—দেখ দিদি, রঙ্গ রাখ। আমি প্রথম-প্রথম ভাব্‌তাম, তুমি বাড়ীতে না থাক্‌লে কি একেবারেই থাক্‌তে পার্‌ব না!—কিন্তু যেদিন তুমি এই বাড়ীর দুয়োর পেরিয়ে তারকেশ্বরে গিয়ে, পূরো তিনটে দিন কাটিয়ে এলে, সে দিন থেকেই এ' অহঙ্কার আমার ভেঙে গেছে! তুমি বড় ফাঁকি দিয়ে, টুক্‌টাক করে' ইদানীং এক আধ-দিনের জন্যে আমাকে ভুলিয়ে বেড়িয়ে আস। আমি কোন রকমে শিবরাত্রের উপোসের মত এক দিন এক রাত্তির কষ্টে-সৃষ্টে কাটিয়ে দিই। বাপ্‌রে বাপ্!—তুমি তারকেশ্বর গিয়ে সে'বার তিন দিনে আমাকে যে চৌদ্দুড়ি-মাৎ দেখিয়ে দিয়েছ—আর আমি তোমায় ছাড়্‌ছিনে। প্রথম বারেই ভিখিরী বলে, ওমা, এ বাড়ীতে কেউ নেই না কি!—ওগো, আছেও ত দেখ্‌ছি,—ওরা সব ঘুমোয় না কি!—বৌমার বুঝি অসুখ হয়েছে!—তিনি বুঝি উপরে আছেন! মন্দা বলে, আজ এ' বাড়ী আর খাওয়া হ'বে না!—শ্যামলের মা'রা এসে আবার তার উপর সায় দেয়!—আমি সব তাদের বল্‌লাম,

—তোরা সব বেরো দিকিন্ আমার বাড়ী থেকে! এক-আধ দিন নয়—তিন-তিনটে দিন!—আমার সব খাঁ-খাঁ করছে—আমার হাত উঠ্‌লে ত আমি কাজ কর্‌ব! না দিদি, তোমার যাওয়া-টাওয়ার কথা রঙ্গ করেও বোলো না! সরোজ ছোট বৌয়ের পাতে রুই মাছ ভাজা খাইতেছিল। কেবল সরোজই উৎসাহে বলিয়া উঠিল,—না বৌমা, তুমি যখন তারকেশ্বরে গিয়েছিলে, আমার বেশ মজা হয়েছিল! মা আমাকে স্কুলে দু'বার করে' জলখাবার পাঠিয়ে দিত! মাথা দোলাইয়া বলিল,—মা, সে দিন—এই সে দিন তুমি শ্যামলের মাদের বাড়ী যা বল্‌ছিলে, আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুন্‌তে পেয়েছিলাম। অধিকতর মাথা দোলাইয়া ও চপল হাসি হাসিয়া বলিল,—বৌমা, বৌমা! মা বল্‌ছিল, বাছা সরোজ আমার স্কুলে যায় সেই সকালে, আসে কোন্ বিকেলে, দু'বার খাবার না খেলে কি থাক্‌তে পারে!—দিদির জ্বালায় একটিবারের উপর দু'বার খাবার পাঠাতে পারিনে!—সত্যি বৌমা, সত্যি বল্‌ছিল! বৌমা বড় আনন্দে ও উৎসাহে বলিলেন,—কেমন সরোজ, তোর মা ভাল, না, বৌমা ভাল, বল্ দেখি? কেমন থাক্‌তে পার্‌বিনে আমি যদি কাশী যাই—ফিরে আস্‌তে যদি দু'মাস দেরী হয়! সরোজ সঙ্গে-সঙ্গে মৃদু হাততালি দিয়া বলিল,—খুব পার্‌ব বৌমা, তুমি যাও—তুমি এই কুড়ি মাস পরে এসো।' ছোট বউ দলিতা ফণিনীর মত মাথা উঠাইয়া, গর্জ্জিয়া সরোজের মুখ চাপিয়া ধরিলেন, বৌমাকে বলিলেন,—দেখ দিদি, দোহাই, তোমার পায়ে পড়ে বল্‌ছি, এখনও নিজের মাথাটি খেয়ে বস' না! আমি এ সন্দেহ প্রায়ই করে' এসেছি; তাই সরোজকে ছোঁয়া দিয়েও, প্রাণ ভরে' ছোঁয়া দিতে পারি নে! তার পর আস্তে মুখটি বৌমার কাণের কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন,—দিদি, সব কাজ ফেলে, আগে ছেলেকে আপনার কর বল্‌ছি,—এতটা হেলাফেলা হ'য়ো না!—মুখখানি এতটুকু করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—দিদি, যদি নিজে বাঁচ্‌তে চাও, যদি আমাকে বাঁচাতে চাও, তা' হলে তুমি এখন আর কোথাও যেয়ো না। সরোজকে তোমায় মা বলে চিন্‌তে দাও! আমাকে মনের মতন প্রাণ ভরে তা'কে ছোঁয়া-পরা কর্‌তে দাও! বৌমা তাঁহার সুন্দর স্বাভাবিক হাসি হাসিতে লাগিলেন। ছোট বউ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, —না দিদি, কি হাসি হাস, জানি নে!—ও' হাসিতে তুমি বিশ্বের সারা হৃদয়খানিকে আপনার করে' নিতে জান। শুষ্ক মৃদু হাস্যে বলিলেন,—কিন্তু দিদি, কথাটি শোন, যেয়ো না—ও' হাসি যে আমাকে একেবারে কাঁদাতে বসেছে! বৌমা আবার সেই সরল মধুর হাসি হাসিয়া, সরল মধুর দৃষ্টি ছোট বৌয়ের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন,—সংসারের ভার তোমার উপর দিয়ে, সরোজকে তা'র মায়ের কোলে রেখে, তীর্থে গিয়ে যে কি স্বর্গ সুখ পাব, তা' বল্‌বার নয়! ছোট বৌয়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া সোহাগে বলিলেন,—সংসার ত তোমারই, বোন্! সরোজের দিকে চাহিয়া স্নেহ-জড়িত কণ্ঠে বলিলেন,—কেমন রে সরোজ, ছোট বউ-ই ত তোর মা! সরোজ আহ্লাদে ছোট বৌয়ের গলা জড়াইল। ছোট বউ সজোরে সরোজকে ছিনাইয়া ফেলিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, —বেরো হতভাগা,—তোর মা যদি কাশী যায়, তুইও তোর মার সঙ্গে চলে যা! আর যদি এখানে আমার কাছে থাকিস্, তা'হলে তোর কাকীমা তোকে কিছু খেতে দেবে না! সরোজের মুখের কাছে মুখখানি লইয়া, ছোট বউ তীব্রকণ্ঠে, অশ্রুভারাক্রান্ত লোচনে বলিলেন,—বুঝতে পেরেছিস্, সরোজ!—এখানে থাক্‌লে আমি তোকে কিছু খেতে দেব না! বলিয়াই ছোট বউ আর নিজেকে সম্বরণ না করিতে পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বৌমা ছোটবৌয়ের চোখ মুছাইয়া স্নেহ-বিজড়িত কণ্ঠে চিবুকখানি ধরিয়া বলিলেন,—লক্ষ্মীটি আমার, ও কথা সরোজকে শিখিয়ো না! বল, বল ছোট বউ—সরোজ তোমার ছেলে; তা হলে মরে গিয়েও যে শান্তি পাব! ছোট বৌয়ের অশ্রুর বাঁধ প্রবল বেগে ভাঙ্গিয়া পড়িল। একহাতে সরোজকে জাপটাইয়া, অপর হস্তে বৌমার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—সরোজ আমার ছেলে, আমি সরোজের মা। আনন্দাশ্রু ফেলিয়া বৌমা তখন বলিলেন,—বেশ, তবে আমায় যেতে অনুমতি দাও। সরোজকে আমি মায়ের কোলে রেখে নিশ্চিন্তে তীর্থ কর্‌তে পার্‌ব! মা তা'র সমস্ত ভাল-মন্দর ভার গ্রহণ কর্‌বে!

* * * *

ছোট বউ একখানি চিঠি হাতে করিয়া উপরে শোবার ঘরে আসিলেন। সরোজ তখন বিছানায় বসিয়া-বসিয়া একখানি তাসের তিনতালা ঘর উঠাইতেছিল। ছোটবউ আসিতেই সরোজ আস্তে-আস্তে বলিয়া উঠিল,—মা, পায়ে

পড়ি,—আমার কাছে এসো না বল্‌ছি—খাট একটু নড়লেই ঘরখান পড়ে যাবে! দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি চারতলা ঘর উঠিয়ে ফেল্‌ছি। ছোট বউ বলিলেন,—সরোজ, তোর ও' তাসের ঘরের চেয়ে কত ভাল-ভাল জিনিস তোর বৌমা নিয়ে আস্‌বে দেখিস্! এই দেখ্ চিঠিতে লিখেছে, তুই কেমন আছিস্—তোর জন্যে কাশীর কেমন একখানা রাঙা লাঠি আর বৃন্দাবন থেকে কেমন একখানা পাখী-আঁকা চাদর কিনেছে। এবার তারা কেদারনাথে যাবে। সরোজ আহ্লাদে বলে' উঠ্‌ল,—মা, শ্যামলের জন্যেও বৌমা লাঠি কিনেছে? ছোট বউ উত্তর করিলেন'—হ্যাঁ, তার জন্যেও কিনেছে। সরোজ তাসের ঘর তৈয়ার করিতে পুনরায় মনঃসংযোগ করিল। ছোট বউ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে-নামিতে আপন মনেই বলিলেন,—কবে তুমি ফিরে আসবে দিদি! বটে, সরোজ, বটে, মা কেমন আছে তা'ও একটিবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে না!

মন্দা ছোট বৌয়ের ভাতের গ্রাস তোলার ভঙ্গী দেখিয়াই বলিল,—ছোট বোমা, এ রকম করে' যদি তুমি না খেয়ে কাটাবে জান্‌তে তাহ'লে বৌঠাক্‌রুণকে ধরে রাখতে হত।' শ্যামলের মা বলিল,—সত্যিই ত, আমরা ত জানিই তুমি থাক্‌তে পারবে না। তুমি ত পারবেই না—আমাদেরই প্রাণ যেন তোমাদের বাড়ী এলে কেমন-কেমন করে! আর কদ্দিন গো—আর কদ্দিনে ফির্‌বেন! মন্দা বলিল,—মনটা খাঁ-খাঁ করে না গা! তবে উপায় ত নেই। যাক্, আর জোর এক মাস পরেই ফির্‌বেন বোধ হয়! শ্যামল আসিয়া ছোট বৌকে বলিল,—কাকীমা, আজকে সরোজের জ্বর এসেছে। তা'কে তুমি যে এখন ঠেসে-ঠেসে খাবার পাঠাও—তা'র অতগুলো খাবার আজ সব ছেলেরা খেয়ে ফেল্‌লে। আমি কিন্তু কিচ্ছু খাই নি, কাকীমা! সরোজ খুব করে' বল্‌লে, তাই খেলাম! ছোটবউ শ্যামলকে কি বলিতে যাইয়াই দেখিলেন, সরোজ ছলছল চোখে, শুক্‌নো মুখ করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি ছোট বউ বলিলেন,—কাছে আয় দেখি, সরোজ! ছোট বউ সরোজের একবার কপালে একবার বুকে হাত দিয়াই তড়াক্ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। মন্দা বলিল,—যাক্, হ'ল আজকার মতন খাওয়া! ছোট বউ বলিলেন,—দেখ ত শ্যামলের মা একবার গায়ে হাত দিয়ে। শ্যামলের মা সরোজের গায়ে হাত দিয়া বলিল,—না, একটু গরম হয়েছে,—উপরে গিয়ে চুপ করে শুয়ে থাক্‌গে বা! ছোট বউ তাড়াতাড়ি আঁচাইয়া, সরোজকে কোলে করিয়া উপরে যাইয়া, বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। সরোজকে বলিলেন,—মাথাটা খুব কামড়াচ্ছে, নয় সরোজ? সরোজ মাথা নাড়িয়া বলিল,—হুঁ।

* * * *

ঘোমটার মধ্য হইতেই ছোট বউ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ডাক্তার বাবু, কেমন দেখলেন? ডাক্তার বাবু বলিলেন,—কদিনের চেয়ে যেন আজ একটু খারাপ! বৌঠাক্‌রুণকে টেলিগ্রাম করাই ভাল ছিল; কিন্তু তাঁকে কোন্ ঠিকানায় খবর দেবেন! পাড়ার সকলেই সরোজের শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

সে দিন সরোজের বড় বাড়াবাড়ি। সরোজের ঠাকুমা সংবাদ পাইয়া আসিয়া কাঁদিয়া পড়িয়া বলিলেন,—সরোজ, আমার! সরোজ তখন চির বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। ছোট বউ ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, বাহিরের ছাদে যাইয়া পাগলিনীর ন্যায় টলতে-টলতে বসিয়া পড়িলেন! ঠিক সেই সময়ে মন্দা হাঁপাইতে-হাঁপাইতে আসিয়া তাঁহার হাতে একখানি চিঠি দিয়া বলিল,—ছোট বউ, বৌঠাক্‌রুণদের চিঠি এসেছে—আজকেই তাঁদের ঐ ঠিকানায় এখানে ফিরে আস্‌বার জন্য 'তার' করে দিতে হবে। ছোট বউ পত্রখানি চোখের জলে ভিজাইয়া পড়িলেন। লেখা আছে, তাঁহারা হৃষীকেশ যাইতেছেন—সরোজ কেমন আছে? ভিতর হইতে ঠাকুমা হৃদয়-বিদারক চীৎকার করিয়া উঠিলেন! ছোট বউ তাড়াতাড়ি চিঠিখানি সজোরে বক্ষে চাপিয়া, উপুড় হইয়া পড়িয়া, উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিলেন,—ওগো দিদি, ওগো সরোজের বৌমা! মায়ের বুক-ফাটা কান্না কাঁদতে পার্‌বে না বলেই, মায়ের দুর্ব্বহ শোক বইতে পার্‌বে না বলেই কি আমাকে তোমার চরণ স্পর্শ করিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছ, আমি সরোজের মা! ওগো পুণ্যবতি! তবে তাই হোক্! হৃষীকেশে তোমরা যেমন এগিয়ে চলেছ, তেমনি যাও,—আর ফিরে এসো না! নিশ্চিন্তে তীর্থে বেড়িয়ে স্বর্গ-সুখ ভোগ কর্‌বে বলে গেছ, তাই কর! সরোজের সমস্ত ভাল-মন্দর ভার আমাকেই গ্রহণ কর্‌তে হবে বলে' গেছ,—সরোজের মা আজ থেকে পাষাণে বুক বেঁধে তাই কর্‌ছে!

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

[৩৮]

ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান

১। ছোটনাগপুরের কোনও বাংলা ইতিহাস আছে কিনা? যদি থাকে, লেখকের ও পুস্তকের নাম কি?

২। রাঁচী জেলার প্রাগৈতিহাসিক যুগে নাম কি ছিল, এবং বৌদ্ধযুগে ও ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে নাম কি ছিল? কোন্ পুস্তকে ইহার বিবরণ পাওয়া যাইবে?

৩। বৌদ্ধ মঠ বা বিহার রাঁচী জেলার কোনও স্থানে ছিল কি না? তবে সে স্থানের নাম কি ছিল? আধুনিক নামই বা কি?

৪। উক্ত বিষয়গুলি বিশদ ভাবে জানিবার কোনও পুস্তকাদি আছে কি না? যদি থাকে, তাহাদের নাম, তাহাদের গ্রন্থকর্ত্তার নাম এবং প্রকাশকের নাম চাই। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
পোঃ লোহার্দাগা, রাঁচী।

[৩৯]

পশমের কারখানা

ভারতবর্ষে ভারতবর্ষীয়দের দ্বারা পরিচালিত কোন্-কোন্ ঠিকানায় কতগুলি পশমের কারখানা আছে; এবং ভারতবর্ষে অন্যান্য বিদেশী ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত কয়টী কারখানা কোন্-কোন্ স্থানে আছে?

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, লারকা, পোঃ ফুলকোণা, বাঁকুড়া।

[৪০]

স্বপ্নতত্ত্ব

১। লোকে স্বপ্ন দেখেন কি কারণে? অনেকে বলেন যে দিনের বেলায় যে সব কথা ভাবা যায়, সেই সবই রাত্রে আমরা স্বপ্নে দেখি। অনেক ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও হয়। এমন দেখা গিয়াছে যে, যে সব কথা ৪।৫ দিনেও আমাদের মনের মধ্যে আসে নাই, সে সব কথা হয় ত একদিন স্বপ্নে দেখি। ইহার কারণ কি?

২। কথায় আছে, ভোরের স্বপ্ন সত্য হয়। ইহা কি সত্য? যদি না হয়, তবে এই প্রবাদ বাক্য কি কারণে জনসমাজে প্রচলিত হইয়াছে?

শ্রীশান্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৪৪।১ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[৪১]

হবুচন্দ্র রাজার দেশ কোথায়?

একটা কথা প্রচলন আছে—"হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী"; ইহার মূলে কোনও সত্য ঘটনা নিহিত আছে কি না? বিক্রমপুর মধ্যপাড়া নিবাসী জনৈক ভদ্রলোকের নিকট শুনিয়াছি, এই রাজার দেশ বাদা অঞ্চলে ছিল। পরে কালস্রোতে তাহার কোনও চিহ্ন আর বিদ্যমান নাই। এই রাজা প্রথমে না কি খুব ধার্ম্মিক ছিলেন; এবং ন্যায়বিচারক বলিয়া জনসমাজে খ্যাতি ছিল। পরে দৈবচক্রে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে।

শ্রীঅনন্তকুমার সান্যাল, তত্ত্বনিধি, সাংখ্যবেদান্তরত্ন।

[৪২]

সঙ্গত প্রশ্নাবলী

১। সন্ধ্যার সময় ঘরের চৌকাঠে জল দেয় কেন?

২। ভূতচতুর্দ্দশীর দিন দোরের মাথায় সিন্দুর এবং চন্দনের ফোঁটা অনেক দেশে দেয় কেন?

৩। হাত হইতে যদি কোন ধাতুপাত্র দৈবাৎ পতিত হইয়া যায়, তবে বাটীতে কুটুম্ব আসিবে, এ কথার তাৎপর্য্য কি?

৫। মাঘ মাসে মূলা ভক্ষণ নিষিদ্ধ কেন?

৪। কোন জিনিস খাইবার সময় বিষম লাগিলে ষাট বলে কেন?

৬। সন্ধ্যার সময় একটী নক্ষত্র দেখিলে, আর একটী না দেখিয়া স্থান ত্যাগ করিতে নাই, এর অর্থ কি?

৭। রাত্রে চুণ অন্য বাটী হইতে চাহিয়া আনিতে নাই কেন?

৮। রাত্রে দধির সাঁজ কাহাকেও দিতে নাই কেন?

৯। কোজাগর পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যাকালে নারিকেল সহিত চিপিটক ভক্ষণ করিতে হয় কেন?

১০। ঘন ঘন বেঙ ডাকিলে বৃষ্টি হইবে জানা যায়; ইহার কি কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে।

শ্রীবীণাপাণি দেবী, পোঃ কাউনিয়া, রংপুর।

[৪৩]

আমসত্ত্ব-তত্ত্ব

আজকাল বাজারে যে প্রকারের আমসত্ত্ব খরিদ করিতে পাওয়া যায় তাহার প্রস্তুত-প্রণালী আমরা কেন অনেকেই বোধ হয় জানেন না। আমাদের এদিকে "সরুচাকলী পিঠা"র ন্যায় এক-এক খণ্ড আমসত্ত্ব তৈয়ারি হইয়া থাকে। বাজারে ৩।৪ অঙ্গুলী পুরু ও বড় মিষ্ট আমসত্ত্ব তৈয়ারি করিবার প্রক্রিয়া আমরা জানিনা; বাজার-চলতি আমসত্ত্ব কি প্রকারে তৈয়ারি হয়, তাহার প্রক্রিয়াটী যিনি জানেন, তিনি দয়া করিয়া ভারতবর্ষে প্রকাশ করিলে সুখী হইব। আমসত্ত্ব প্রস্তুত করিতে হইলে কিরূপ আম মনোনীত করিতে হইবে, আম হইতে কি প্রকারে ও কোন পাত্রে রাখিয়া সত্ত্ব বাহির করিতে হয় ও জ্বাল দিতে হয় কি না ও চিনি মিশ্রিত হয় কি না এবং কোন্ পাত্রে রাখিয়া শুখাইতে হয় ও এত পুরু কি প্রকারে হয়, ইত্যাদি বিস্তৃত ভাবে লিখিলে আনন্দিত হইব। আমাদের দেশে আমসত্ত্ব ঘিএর ভাঁড়ে রাখিতে হয়, নচেৎ পোকা ধরিয়া যায়; তাহাও মধ্যে মধ্যে দেখিতে হয়। সুতরাং উহা কি প্রকারে এবং অবিকৃত ভাবে রাখিতে পারা যায় তাহাও লিখিলে ভাল

হয়। ভারতবর্ষের কোন গ্রাহকের জানা থাকিলে তিনি অথবা বিশ্বকর্ম্মা মহাশয় দয়া করতঃ লিখিয়া সুখী করিবেন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মহান্তি, মহান্তি ফ্যামিলী লাইব্রেরী।

গ্রাম কাশীপুর, পোঃ পাটিগড়, মেদিনীপুর।

[৪৪]

অভ্র-রঞ্জন

অভ্রের উপর কিরূপ ভাবে রং করিলে উহা লাল, নীল রংএর কাঁচের ন্যায় স্থায়ী ভাবে রঙ্গীন থাকিতে পারে? শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, রায় রামচন্দ্রপুর, জেঃ বর্দ্ধমান।

[৪৫]

পৌরাণিক প্রশ্ন

১। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে চৈতন্যদেবের পারিষদদের নামের মধ্যে আছে—রাম, লক্ষ্মী, গদাধর, গৌরী, বাসু, পুরন্দর। লক্ষ্মী কে ও তাঁর পরিচয় কি?

২। স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। রাজা প্রিয়ব্রতের "রথচক্রে হৈল যার এ সাত সাগর" বলা হইয়াছে। এর পৌরাণিক মূল কি ও কোথায়?

৩। শিবকে শিঙ্গা-ডম্বরু-সর্পধারী বলিয়া বর্ণনা করিবার মূল কোথায় ও কেন শিব ঐ সব বিশেষ বাদ্য ও ভূষণে অনুরক্ত? "খায় শিব ধুতুরার ফল' কোন্ পৌরাণিক প্রমাণে ও কেন?

৪। "শাপ দিতে নন্দী কুশ লৈলা" শাপ দিবার জন্য কুশহস্ত হইবার সার্থকতা কি ও ব্যবস্থা কোথায়?

৫। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বহু গ্রামের নাম আছে; গ্রামগুলি হয় হুগলী, নয় বর্দ্ধমান, অথবা মেদিনীপুর জেলায় থাকা সম্ভব। নিম্নলিখিত গ্রামগুলির সংস্থান কেউ নির্দ্দেশ করিয়া দিলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব।

জড়িয়া নগরী, বেতারগড়, নীলপুর, খেপুত, রাইপুর, বোড়গ্রাম, নাড়িচা, শালঘাট, কুমারহট্ট, নারিকেলডাঙ্গা, কেজাপুর, পাঁচড়া, তালপুর, সাঁতালুক নাউয়ার তারেশ্বর (তাটেশ্বর), সাটীনন্দ্যে, গোমন্থ, নগরকোট, হিঙ্গুলাট, কিরীটকোণা, মেড়।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী কার্য্যালয়, ২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[৪৬]

ঝাঁপ্‌সি কোথায়?

ভারতবর্ষে 'ঝাঁপ্‌সি' নামের কোন জায়গা আছে কি না? যদি থাকে, তবে ভারতবর্ষের কোন জায়গার বা provinceএ?

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু বসু, ঝাঁসি।

[৪৭]

গার্হস্থ্য সংস্কার

লোকে পুত্র সন্তান জন্মের পর হইতে ছেলের জীবিতকাল পর্য্যন্ত উত্তর দিকে মুখ করিয়া খাইতে বসে না কেন? ঐ প্রথার প্রচলন কত দিন হইতে হইয়াছে? খেলে কি দোষ হয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভদ্র, খুলনা।

[৪৮]

সেন্সাস-ঘটিত প্রশ্ন

[ক] বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা কত?

[খ] পুরুষদের মধ্যে কত লোক (১) অশিক্ষিত (২) মাতৃভাষা জানে (৩) ইংরাজী জানে (৪) বিবাহিত (৫) অবিবাহিত (৬) যুবক (৭) বালক ও শিশু?

[গ] স্ত্রীলোকদের মধ্যে কত (১) অশিক্ষিতা (২) মাতৃভাষা জানে (৩) ইংরাজী জানে (৪) বিবাহিতা (৫) অবিবাহিতা (৬) বিধবা (৭) যুবতী (৮) বালিকা ও শিশু?

[ঘ] গত ৫ বৎসরে বাংলায় (১) কতগুলি শিশু জন্মিয়াছে (২) কতগুলির কত বয়সে মৃত্যু হইয়াছে?

[ঙ] গত ৫ বৎসরে বাংলায় কত লোকের (১) ম্যালেরিয়া (২) বসন্ত (৩) কলেরা (৪) প্লেগ (৫) ক্ষয়-রোগে মৃত্যু হয়েছে?

[চ] গত ৫ বৎসরে বাংলায় কত টাকার (১) মদ (২) গাঁজা (৩) আফিম্ (৪) ভাং (৫) এই শ্রেণীর অন্যান্য জিনিস বিক্রয় হয়েছে?

[ছ] গত ৫ বৎসরে বাংলায় কতগুলি (১) চুরি (২) ডাকাতি হয়েছে?

শ্রীজ্যোতিঃকুমার ধর, ৩৪ নং আলিপুর রোড, কলিকাতা।

[৪৯]

'অশ্রু' তত্ত্ব

মনে দুঃখ কিম্বা অধিক আনন্দের উদয় হইলে, অথবা ঝাল জিনিস (মরিচ প্রভৃতি) চিবাইলে চক্ষু থেকে এক প্রকার লবণাক্ত জল বাহির হইয়া থাকে। এই সব কারণে চক্ষু থেকে জল বাহির হয় কেন? Medical Scienceএ এ বিষয়ে কি বলে? আরও শুনিতে পাওয়া যায় যে, 'অশ্রু' তিন প্রকার—শোকাশ্রু প্রেমাশ্রু ও আনন্দাশ্রু। ঐ সম্পর্কে ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, শোকাশ্রু চক্ষুর নাসিকাদিগস্থ কোণ বেয়ে, প্রেমাশ্রু চক্ষুর মাঝখান বেয়ে এবং আনন্দাশ্রু বাহিরদিগস্থ কোণ বেয়ে পতিত হইয়া থাকে। ইহা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তবে কারণ কি! শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, ঢাকা।

[৫০]

কুলগাছের গুটি

কুল গাছে যে এক রকম গুটি পাওয়া যায় তাহা কি? এবং সে গুলিকে প্রচুর পরিমাণে জন্মাইতে হইলে কি করা আবশ্যক?

শ্রীসুধীরকুমার সরকার, বহরমপুর।

[৫১]

জন্মান্তর বাদ

জন্মান্তরবাদের প্রতিকূলে কি কি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে? যদি প্রকাশিত হইয়া থাকে, কোন্ ঠিকানায় কাহার নিকট পাওয়া যাইবে?

শেখ মহাম্মদ ইব্রাহিম, দিনাজপুর টাউন।

[৫২]

বাদশাহী আমলের কামান

১। গত পৌষ মাসের প্রবাসীর "নূতন বাদশাহী আমলের কামান" প্রবন্ধে দেখিলাম * * বিক্রমপুরের এই সকল কামানের তুল্য একটি কামান ঢাকায় ছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা নদীতে পড়িয়া গিয়াছে। বুড়িগঙ্গার পাড়ের, যে স্থানে এই কামানটী বসান ছিল, জল স্রোতে ক্রমশঃ তাহার নিম্নদেশ ক্ষয়িত হওয়ায় পাড় ভাঙ্গিয়া কামানটী নদীগর্ভে পতিত হয়;—আর তাহার উদ্ধার করা হয় নাই।" বুড়িগঙ্গার কোন্ পাড়ে এবং কোন্ জায়গায় কামানটী অবস্থিত ছিল, তাহা জানিতে চাই।

কাপড়ের কল

২। পৌষের প্রবাসীতে পাইলাম, আহমদাবাদে অনেক কাপড়ের কল ও অন্য জিনিসের কারখানা আছে। আহমদাবাদে সর্ব্বশুদ্ধ কতটী কাপড়ের কল এবং অন্যান্য কি জিনিসের কারখানা আছে? কাপড়ের কলগুলির নাম কি? কোন্গুলিতে দেশীয় সূতা দ্বারা কাপড় হয়? এবং তন্মধ্যে কোন্ কোন্ মিলগুলি ভারতবর্ষীয় স্বত্বাধিকারীর?

শ্রীঅযোধ্যানাথ দেব, পোঃ ও গ্রাম, গোকর্ণ, জিলা—ত্রিপুরা।

[৫৩]

কপির পোকা

ফুল এবং বাঁধা কপিতে (cabbage and cauliflower) পোকা লাগিলে তাহা নিবারণের ভাল উপায় কি আছে।

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ১২নং এল রোড, জামসেদপুর।

[৫৪]

খোকার কান্নাকাটি

কচিছেলে অত্যন্ত কাঁদুনে হইলে কি উপায়ে কচিছেলে ঠাণ্ডা হয় তাহা বলিয়া দিবেন। কচি ছেলেদের পেটের অসুখের পক্ষে কোন্ খাদ্য উপকারক?

শ্রীঅমলারাণী দাসী।

উত্তর

প্রশ্নোত্তর (২১)

উত্তর দিকে ও পশ্চিম দিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করিতে একটা নিষেধ আছে। এবং তাহা যে শাস্ত্রসম্মত তাহা আহ্নিকতত্ত্বের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দুটা হ'তে বেশ বোঝা যায়।

স্বগৃহে প্রাক্‌শিরাঃ শেতে
আয়ুষ্যে দক্ষিণশিরাঃ
প্রত্যক্ শিরাঃ প্রবাসে তু
ন কদাচিদুদক্‌শিরাঃ।

(নিজের বাড়ীতে পূর্ব্ব শিয়রী হ'য়ে শোবে। দীর্ঘজীবী হ'বার বাসনা থাকিলে দক্ষিণ শিয়রী হ'য়ে শোবে। প্রবাসে পশ্চিম শিয়রী হ'য়ে শোওয়া যেতে পারে; কিন্তু উত্তর দিকে মাথা রেখে শয়ন করা উচিত নয়।)

প্রাক্ শিরাঃ শয়নে বিদ্যাৎ
বলমায়ুশ্চ দক্ষিণে
পশ্চিমে প্রবলাং চিন্তাং
হানিং মৃত্যুং তথোত্তরে।

এই বিধিনিষেধের পোষক একটী শ্লোক বিষ্ণু পুরাণেও দেখা যায়। যথা:—

প্রাচ্যাং দিশি শিরঃ শস্তং
যাম্যায়ামথবা নৃপ
সদৈব স্বপতঃ পুংসঃ
বিপরীতন্তু রোগদং।

আমি বিশেষজ্ঞ নহি; তবে আমার মনে হয় যে, Animal magnetism সম্বন্ধীয় সত্যের উপর এই বিধি নিষেধ প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীহরিচরণ চট্টোপাধ্যায়, কোন্নগর।

মাঘ মাসের সম্পাদকের বৈঠকের ২নং প্রশ্নের উত্তর

অম্লজন্ম শিশুরা দুগ্ধ তোলে। সমুদ্রের ছোট ঝিনুক ১খানি গলায় ঝুলাইয়া দিলে উহা নিবারণ হয়। এবং প্রত্যেকবার দুগ্ধ খাওয়ানের পর ১০ ফোঁটা চুণের জল খাওয়াইলে কাজ হয়।

শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, পোঃ কাউনিয়া, জেলা রংপুর।

লাক্ষার চাষ।

মাঘের সম্পাদকের বৈঠকে "লাক্ষার চাষ" সম্বন্ধে কয়েকখানা বইয়ের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ বইগুলি ছাড়াও নিম্নলিখিত এই গুলিতে "লাক্ষার চাষের" বিস্তৃত খবর পাওয়া যায়।

(a) A Note on the Lac Insect. Its Life History, Vol. I, Part III A, E. P. Stabbling.

(b) The Indian Forest Memoirs Vol. I, Part III By E. P. Stabbling.

(c) The Indian Forest Memoirs Vol. III, Part I, By A. D. Imms and N. C. Chatterjee.

(d) Note on the Lac Industry of Assam, By B. C. Bose, Bulletin No. 6.

(e) Note on the Chemistry and Trade of Lac By Puren Singh.

মাঘমাসের ২৯নং প্রশ্নের উত্তর।

আসামজাত এণ্ডির গুটি হইতে কি প্রকারে সূতা বাহির করিতে হয়;—তা' সত্যভূষণ দত্ত মহাশয় অগ্রহায়ণের 'ইঙ্গিতে' বলিয়াছেন। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ঐ প্রণালীতে সূতা প্রস্তুত করিয়া, চরকা বা টাকুর সাহায্যে সূতা পাক দিয়া শক্ত করিতে হয়। তাঁতের সাহায্যে এই সূতা দ্বারা অনায়াসে কাপড় তৈয়ার করা যায়। এণ্ডির সূতা, তূলার সূতার চেয়ে অনেক বেশী শক্ত।

মাঘ মাসের ৩৫নং প্রশ্নের উত্তর

সব রকম কলাগাছের চেয়ে, বীচে কলাগাছে (আঠিয়া কলাগাছে) ক্ষারের পরিমাণ খুব বেশী। প্রথমতঃ আগাগোড়া চিরিয়া ফেলিয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। ভালরূপে শুকাইলে, কোনও পরিষ্কার জায়গায় কলাগাছ পোড়াইয়া লইয়া,—ছাইগুলি খুব ছোট ছিদ্রওয়ালা চালুনি দিয়া ছাঁকিতে হয়। কয়েকবার ছাঁকিবার পর, যে মোলায়েম ছাই বাহির হয়—উহাই "ক্ষার।" এই ক্ষার ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ১০।১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিলে, অপরিষ্কার অংশ তলায় থিতাইয়া যায়। উপরের জলেই লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

মাঘ মাসের ৩২নং প্রশ্নের উত্তর।

পাণিনি ব্যাকরণ রামায়ণ, ও মহাভারতের চেয়ে প্রাচীন। সুতরাং গীতাও পাণিনির পরে রচিত। কারণ, গীতা মহাভারতেরই একটি অধ্যায়। পাণিনির বয়স খৃষ্টপূর্ব্ব ১৩৯২ বৎসরের নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী, পাইকপাড়া, ঢাকা।

শিশুর খাদ্য।

শিশুকে দুধ খাওয়াবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। অনেক সময়ই আমরা মনে করি যে, যত বেশীবার ও যত বেশী পরিমাণে শিশু দুধ প্রভৃতি খায় ততই উহার স্বাস্থ্য ভাল থাকে; কিন্তু এটা ঠিক যে শিশুর পাকযন্ত্রাদি আমাদের মায়েদের এতটা জুলুম সহিবার মত সবল নয়। দিনের মধ্যে কিছু বেশীবার খাওয়ানটা তত দোষের নয় যত দোষের হইতেছে একেবারে অনেকটা দুধ একসঙ্গে জোর করিয়া গলাধঃকরণ করান। অতি ভোজনের ফলে অজীর্ণ হয়; পাকস্থলীতে খাদ্য পৌছান মাত্রই তাহা অম্ল হইয়া যায়; তখনই শিশু বমি করিয়া ফেলে। আমাদের আর একটা দোষ—হাত না ধুইয়াই অনেক সময় শিশুকে খাওয়াইতে বসি; দুধ গরম হইলে ময়লা হাতেই তাহা নাড়িয়া দেখি ঠাণ্ডা হইল কি না; এই সমস্ত ব্যাপারেও আমাদিগকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।

দুধ একেবারে খাঁটী ব্যবহার করা ভাল নয়। বার্লি কিম্বা কিছু চূণের জল মিশাইয়া দিলে শিশুর বমি নিবারণ হইতে পারে। শিশুকে খাওয়াবার আগেই দুধ গরম করিয়া লওয়া উচিত। খুব ছোট ছেলে মেয়েদের দুধ ১ ভাগ দুধে ৩।৪ ভাগ জল মিশাইয়া গরম করিয়া দেওয়া উচিত। বিলাতী ফুড আদি এক আধ দিন দুধ না পাওয়া গেলে ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু দুধের পরিবর্ত্তে substitute হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। পেটেণ্ট শিশুখাদ্যের মধ্যে বেশীর ভাগই, আমাদের বাঙালী শিশুদের ধাতে সয় না। যদি একান্তই দুধ কোনও দিন দুর্ল্লভ হয়, শটী ফুড খাওয়ান যাইতে পারে।

শিশু আট-নয় মাসের হইলে, সুজি, মোহনভোগ, বেল প্রভৃতি ফলের মোরব্বা, মাঝে মাঝে রুটী, দেওয়া উচিত। এরারুটের বিস্কুটও খাওয়ান ভাল।

শ্রীমৃন্ময়ী দেবী, ১০২।১ নং ঝাউতলা রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

কাঁচা পেঁপের আঠা

কাঁচা পেঁপের বোঁটা ও গাত্র হইতে যে একপ্রকার শ্বেত গাঢ়, দুগ্ধের মত রস নির্গম হইয়া থাকে, তাহাতে আমাদের বহু উপকার সাধিত হয়। সেইজন্য লোকে আমাদের দেশে কাঁচা পেঁপে ভাতে দিয়া ও অন্যান্য ব্যঞ্জনে দিয়া আহার করে। এই শ্বেত রসের একটী প্রধান গুণ এই যে, মাংস সিদ্ধ করিবার সময় কয়েক ফোঁটা রস দিলে উহা শীঘ্র গলিয়া যায়। কাঁচা মাংসে ঐ আঠা মাখাইয়া লইলেও অতি শীঘ্র রন্ধন সম্পন্ন হয়। কাঁচা পেঁপে কুটিয়া মাংসে ফেলিয়া দিলেও কতকটা একরূপ কার্য্য করে। অপিচ যদি মাংস কাটিয়া পেঁপে গাছের পাতায় ঢাকিয়া রাখা যায় তাহা হইলেও মাংস খুব সহজে সিদ্ধ হয়। এমন কি অনেকের বিশ্বাস মাংস কাটিয়া পেঁপে গাছে ঝুলাইয়া রাখিলেও তাহা শীঘ্র শীঘ্র সিদ্ধ হইয়া যায়। পৃথিবীর যে যে স্থানে পেঁপে আছে, সেই সেই স্থানের অধিবাসীরা উহার আঠায় মাংস সিদ্ধ হইবার তথ্য বহু পুরাকাল হইতেই জ্ঞাত আছে।

কাঁচা পেঁপের অনেক গুণ আছে; উহা অর্শ রোগের ঔষধ ও ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণকারক। উপরিউক্ত শ্বেত আঠা নানাবিধ ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। উহাতে কৃমি কীট নষ্ট হইয়া থাকে। এক চামচ আঠা ও এক চামচ মধু উভয়কে খুব উত্তমরূপে মিশাইয়া উহাতে অল্পে অল্পে ৪।৫ চামচ গরম জল যোগ কর। দুই ঘণ্টা বাদে বিশুদ্ধ রেড়ির তৈল (castor oil) লেবুর রস বা সির্কার (vinegar) সহ সেব্য। দুই দিনের মধ্যে সমস্ত কীট নষ্ট হইয়া যাইবে। কাঁচা পেঁপের গায়ে আঁচড় কাটিলে শ্বেত রস নির্গত হইবে। উহা শুকাইয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। অজীর্ণ রোগীকে ২।১ গ্রেণ এই আঠা চিনি কিম্বা দুগ্ধের সহিত আহারের পর সেবন করিতে দিলে প্রভূত উপকার দর্শিবে। কাঁচা পেঁপের শ্বেতরসে প্লীহার আয়তন ক্রমশঃ কমিয়া যায়। ছোট চামচের এক চামচ শুকনা আঠা ও সেই পরিমাণ চিনি একত্র প্রত্যহ তিনবার সেবন করিলে প্লীহা একেবারে সারিয়া যায়। একটা কাঁচা পেঁপে থেঁতো করিয়া সমস্ত রাত্রি হিমে ফেলিয়া রাখিয়া প্রাতে লবণ দিয়া সেবন করাতে প্লীহা সম্পূর্ণ আরাম হইতে দেখা গিয়াছে। পেঁপের ভিতরে যে গোল মরিচের মত কাল বীজ থাকে, তাহাতেও পেটের পোকা নষ্ট হয়। কাচা পেঁপের আঠায় দাদও আরোগ্য করে। পেঁপে ডুমা ডুমা করিয়া কাটিয়া দাদের উপর ঘষিলে সহজেই ফল লাভ করা যায়।

কাঁচা পেঁপের আঠা পুরাতন অতিসার ও ডিপথেরিয়ার পক্ষে উপকারী। উহা চর্ম্মরোগেরও ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলোকেরা ত্বকের জতুর দাগ লোপ করিবার জন্যও এই আঠা ব্যবহার করে। যে কোন স্থানে পোকা নষ্ট করিতে হইলে এই আঠা লাগান চলে।

"Papain"

কাঁচা পেঁপের যে সমস্ত গুণাবলী উপরে বিবৃত হইল তৎসমুদায় উহার শ্বেত আঠায় বিদ্যমান আছে। আবার শ্বেত আঠার বীর্য্যও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বিযুক্ত করা যায়। বৈদ্যকুল উহাকে "Papain" বা "Papayotin" আখ্যা দিয়াছেন।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে Pepsin নামে একটী আবশ্যকীয় ভেষজের উল্লেখ আছে। উহা সদ্যহত শূকরের যকৃত হইতে প্রস্তুত হয়। অনেক রোগের ঔষধে এই Pepsin মিশ্রণ করা হয়। কিন্তু ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বীরই উহাতে ধর্ম্মগত আপত্তি আছে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, Papain ও Pepsin প্রায় সমান গুণাবলম্বী। বরং Papain কোন-কোনও অংশে Pepsin অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফলদায়ক। এই কারণে Papainকে উদ্ভিজ্জ Pepsin বলা হয়। অনেক সুবিখ্যাত ডাক্তার বলেন যে, প্রাণিজ Pepsin হইতে এ Pepsin অনেকাংশে তীক্ষ্ণ; কারণ পাকস্থলীস্থিত দ্রব্য পরিপাক করিতে আর কোন রকম দ্রাবক ও ক্ষার পদার্থের প্রয়োজন হয় না। অতএব অজীর্ণতা রোগের ইহা অব্যর্থ মহৌষধ। পেঁপের Pepsin অপেক্ষা স্বল্পায়াসলভ্য উৎকৃষ্ট Pepsin আর কিছুই নাই।

সাধারণ ব্যবহারোপযোগী Papain প্রস্তুত করিবার একটী সহজ প্রক্রিয়া আছে; তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহা বিশুদ্ধ করিয়া লইতে পারা যায়।

কাঁচা পেঁপের শ্বেত আঠা সংগ্রহ করিয়া, উহা দ্বিগুণ পরিমাণ (মাপে) rectified spiritএ রীতিমত মিশাইয়া কয়েক ঘণ্টা একপার্শ্বে রাখিয়া দাও। পরে filter paperএর ভিতর দিয়া উহা ছাঁকিয়া লও। যে থিতান বস্তুটা পড়িয়া থাকিবে, তাহা vacuumএ শুষ্ক কর। রৌদ্রে শুকাইলেও চলিতে পারে, তবে ধুলা না পড়ে। উহা বেশ মিহি করিয়া গুঁড়াইয়া ভাল ছিপি আঁটা শিশিতে রাখ।

আমাদের দেশে কাঁচা পেঁপের আঠা হইতে Papain প্রস্তুত করিলে, দেশ-বিদেশে বিক্রয় হইতে পারে। এইরূপে শিক্ষিত যুবকেরা একটী সুন্দর ব্যবসা দাঁড় করাইতে পারে। কিছু দিন পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের কোনও এক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি আমাকে দেখাইলেন, কিরূপে বিলাত হইতে শিশি করিয়া Papain আনান হইয়াছে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, উহা আমাদের দেশেরই পেঁপের আঠা হইতে তৈয়ারী হইয়াছে।

কিন্তু Papainএর ব্যবসা বিশেষ লাভ জনক করিতে হইলে ভাল করিয়া পেঁপের চাষ করিতে হইবে। তাহাতে দুই ধারেই লাভ। কারণ, কলিকাতায় পাকা পেঁপের বড় অভাব।

শ্রীজীবনতারা হালদার এম্-এস্‌সি, ২২-১, জেলেটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাঘএর সংখ্যায় [২৪] প্রশ্নের ২য় প্রশ্নের উত্তর—যে শিশু দুগ্ধ পান করাইবার পরই তাহা বমি করিয়া ফেলে ও তাহার কতক অংশ ছানার আকারে পরিণত হয়, তাহাকে দুগ্ধের সহিত সকালে এক ঝিনুক বা বড় এক চামচ চূণের জল সেবন করাইলে তাহা নিবারণ হয়। এক সপ্তাহ নিয়মিত রূপে সেবন করান হইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। বমনের দুগ্ধ ছানা হয় সাধারণতঃ একটু অম্বলের দোষ হইলে। চূণের জল নিম্নলিখিত ভাবে প্রস্তুত করাই প্রশস্ত—চূণের হাঁড়িতে জল দিয়া তাহা একটু ঘোলাইয়া দিতে হয়। পরে একখণ্ড ব্লটিং পেপার দিয়া তাহা ছাঁকিয়া একটী পরিষ্কার পাত্রে রাখিতে হয়। পাত্র কাচ বা পাথরের হওয়াই উচিত। ঐ জল ২৪ ঘণ্টা বা ততোধিক সময় রাখাই শ্রেয়ঃ। বিলম্বে চূণ থিতাইয়া জলটি বেশ পরিষ্কার হয়। শ্রীবাণী দেবী। মোরাদাবাদ।

পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর নিম্নে লিখিলাম।

পৈত্রিক বা পৈতৃক, উভয় শব্দই এক অর্থ প্রতিপাদক; অর্থাৎ পিতৃ সম্বন্ধীয় বুঝায়। পিতৃ=ষ্ণিক্ করিলে উপরি উক্ত দুইটি পদই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রথমে পৈত্রিক কি করিয়া হইয়াছে, দেখা যাউক। পিতৃ=ষ্ণিক্ =পৈত্রিক "বৃদ্ধিরাদৌষণে" এই সূত্রানুসারে "ই"কারের স্থানে "ঐ"-কার হইয়াছে; এবং পরে সন্ধি হইয়া "পৈত্রিক" পদ হইল। এখন দেখা যাউক "পৈতৃক" কি প্রকারে হইল। পিতৃ+ষ্ণিক্ করিয়া প্রথমে—

"ঋবর্ণোবর্ণেদুসৃতাস্তদোর্ভাঃ" এই সূত্রানুসারে ষ্ণিক্ প্রত্যয়ের "ই"-কার লোপ হইল; সুতরাং ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকায় সন্ধি হইল না; কেবল "বৃদ্ধিরাদৌষণে" এই সূত্রাবলম্বনে "ই"কার বৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র। ইহাই প্রভেদ। "পৈতৃক" কথাটি অশুদ্ধ নহে; তজ্জন্য উভয় পদই ব্যবহৃত হয়; তবে "পৈত্রিক" কথার প্রচলন বেশী দেখা যায়।

শ্রীঅনন্তকুমার সান্ন্যাল।

পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী মহাশয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

১। কার্ত্তিক মাসে আকাশপ্রদীপ দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? নরক ভয় নিবারণার্থ এইরূপ করা হয়। তাহার প্রমাণ—

লিঙ্গ পুরাণং যথা:—

"নরকায় প্রদাতব্যোদীপঃ সংপূজ্য
—দেবতা"
ইতি—"তিথিতত্ত্বম্"
নরকায়—নরক নিবৃত্তয়ে ইত্যর্থঃ—

এই শাস্ত্রীয় যুক্তির বলে সাধারণ ঘোর নরক যন্ত্রণা হইতে ত্রাণ পাইবার নিমিত্তই এ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বলিতে পারেন কার্ত্তিক মাসে দিবারই বা তাৎপর্য্য কি? [দ্বিতীয় প্রশ্ন (১)] তাহার উত্তর এই যে, বৎসরের মধ্যে দুইটি "অয়ণ" দেখা যায়। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। তন্মধ্যে মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ;

ইহাই দেবতা ও পিতৃলোকের দিন বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে; এবং শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্যান্ত দক্ষিণায়ণ। ইহা দেব ও পিতৃলোকের রাত্রি বলিয়া অভিহিত। আবার ইহার মধ্যে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের কিয়দংশ প্রেতপক্ষ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। এই সময় দেব ও পিতৃলোকের স্বচ্ছন্দ গমনাগমনের জন্য শাস্ত্রকর্ত্তা আকাশ প্রদীপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই মতানুসারে (২) কার্ত্তিক মাসেই দীপাবলী প্রদান করা হয়। দীপাবলীর মন্ত্রাদির অর্থ করিলেও তাহাই প্রতীয়মান হয়। কতদিন হইতে এই প্রথার প্রচলন, তাহা ঠিক নির্দ্দেশ করা সুকঠিন; তবে রঘুনন্দনোক্ত যে সমস্ত ক্রিয়ার প্রচলন অস্মদ্দেশে বিদ্যমান আছে, তাহার অধিকাংশই কলিযুগের জন্য বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীযুক্ত অমূল্যগোবিন্দ মৈত্র মহাশয়ের পৌরাণিক প্রশ্নোত্তর।

১। লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাক কাণ কাটিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু আধুনিক প্রথা বা সামর্থ্য অনুসারে অসি দ্বারা নাকটী বা কাণটা কাটিয়াছেন, এইরূপ কোনও উক্তি দেখা যায় না। লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধারী বীর। সে যুগে ধনুকে বাণ যোজনা করিলে, তদ্দ্বারাই আশানুরূপ বা ইচ্ছানুরূপ ফল হইত এই কার্য্য যে বাণ প্রয়োগ দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং সূর্পণখার মুখাবলোকনের প্রয়োজন হয় নাই।

পৌরাণিক রামায়ণে দেখা যায় দশরথ রাজা শব্দভেদী বাণে সিন্ধুকে বিনাশ করিয়াছিলেন। আবার মহাভারতে দেখা যায়, গান্ধারীর সহিত শিবপূজা লইয়া যখন কুন্তীর বিরোধ হয়, তখন গান্ধারীর আদেশে শত শত শিল্পী সহস্র কনকপদ্ম নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অর্জ্জুন মায়ের বিষণ্ণতা দেখিয়া, অদ্ভুত শিক্ষা প্রভাবে, বাণের দ্বারা সেই স্থান হইতেই কুবেরের পুরী হইতে অজস্র পুষ্প উড়াইয়া আনিয়া শিবলিঙ্গের উপর বর্ষণ করিলেন। সুতরাং কুন্তীর জয় হইল। বাণের দ্বারা এইরূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়া যদি সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে না দেখিয়া বাণ দ্বারা সূর্পণখার নাক কাণ কাটা অসম্ভব নহে।

শ্রীঅনন্তকুমার সান্ন্যাল।

পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্যাকরণ-ঘটিত প্রশ্নোত্তর—

সাধন প্রণালী। তাহা হইতে আগত এই—অর্থে = পিতৃ + কণ্ = পৈতৃক।

সূত্র। যে সকল তদ্ধিতের "ণ" ইৎ যায়, সেইগুলি পরে থাকিলে শব্দের আদিস্বরের বৃদ্ধি হয়।

টীকা। গুণ বৃদ্ধি বা অন্য কোন বিশেষ কার্য্য বুঝাইবার জন্য যে বর্ণগুলি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু যে গুলি কার্য্যকালে থাকে না, সেই বর্ণ গুলিকে ইৎ কহে।

পৈত্রিক এবং পৈতৃক উভয়েরই অর্থ পিতৃ সম্বন্ধীয়। কিন্তু পৈত্রিক অপেক্ষা পৈতৃক শব্দে পিতৃ সম্বন্ধীয় অর্থ বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া থাকে। পিতৃ সম্বন্ধীয় এই অর্থে পিতৃ—ষ্ণিক—পৈত্রিক শব্দটী যদিও শুদ্ধ বলিয়া সাহিত্যে চলিয়া আসিতেছে, তথাপি এই পদটি ঠিক শুদ্ধ নয়। পৈতৃক শব্দটিই শুদ্ধ (অভিধান অনুসারে)। শ্রীশর্ম্মারাম দেববর্ম্মা।

ব্যাকরণের পুরাতত্ত্ব।

(৩২ নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য)

গীতা মহাভারতের অংশ; এবং মহাভারত ব্যাসদেব রচিত। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গীতার সময় পাণিনির জন্ম হয় নাই বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তখনও ব্যাকরণ ছিল। আমরা মাহেশ ব্যাকরণের নাম শুনিতে পাই। কথিত আছে, কোন পণ্ডিত ব্যাসদেবকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমার পেটে কত ব্যাস-কূট আছে? তাহাতে দৈববাণী হয়—

যান্যুজ্জহার মাহেশাৎ ব্যাসঃ ব্যাকরণার্ণবাৎ।

তানি কিং পদ রত্নানি সন্তি পাণিনি গোষ্পদে।

অর্থাৎ ব্যাস ব্যাকরণের সমুদ্রবিশেষ মাহেশ ব্যাকরণ হইতে যে সকল পদরত্ন উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা কি গোষ্পদ তুল্য পাণিনিতে থাকিতে পারে? ইহাতে মনে হয় ব্যাসদেবের সময় মাহেশ ব্যাকরণ ছিল।

মহাভারতের কোন কোন অংশ মূল মহাভারতের অনেক পরে রচিত। গীতার এই অংশও তাহাই বলিয়া মনে হয়। পাণিনি ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। কারণ ঐ সময়ে রচিত কোন-কোন সাংখ্য ও বৌদ্ধ পুস্তকে পাণিনির নামোল্লেখ দেখা গিয়াছে।

আলু গাছের পোকা (১৪নং দ্রষ্টব্য)

আলুগাছের নিম্নে ছাই অথবা হলুদের গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া রাখিলে অথবা গোবর সার ঘুঁটের ছাইএর সহিত ব্যবহার করিলে আলু গাছে পোকা ধরে না বা পোকা ধরিলে দূরীভূত হয়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দৌলতপুর, খুলনা।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

লক্ষ্মণের এ প্রতিজ্ঞার বিষয় বাঙ্গালা রামায়ণে উল্লেখ থাকিলেও মূল বাল্মীকি রামায়ণে ইহার কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণের নিমিত্ত রচিত বাঙ্গালা রামায়ণে এরূপ অসঙ্গতি বিচিত্র নহে।

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

২। প্রশ্নকর্ত্তা শাস্ত্রীয় উত্তরে সন্তুষ্ট হইবেন কি না জানি না। তবে তিনি যে লিখিয়াছেন, এমন একটা সংস্কার কোন কোনও স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে বলি যে, এটা কেবলমাত্র স্থানীয় সংস্কার নহে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে প্রমাণ আছে। রঘুনন্দন আহ্নিক তত্ত্বে এ সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই—

"প্রাক্‌শিরাঃ শয়নে বিদ্যাদ্ ধনমায়ুশ্চদক্ষিণে।

পশ্চিমে প্রবলাং চিন্তাং হানিং মৃত্যুং তথোত্তরে॥

পশ্চিম দিকে মাথা দিয়া শুইলে প্রবল চিন্তা হয়, উত্তর দিকে মাথা দিয়া শুইলে ক্ষতি এবং মৃত্যু হয়।

পৈত্রিক ও পৈতৃক

৩। পৈতৃক শব্দ পিতৃ শব্দের উত্তর কণ্ করিয়া হইয়া থাকে। 'ণ' ইৎ বলিয়া 'ঐ' কারের বৃদ্ধি ঐকার হইল। সুতরাং শব্দটী সম্পূর্ণ শুদ্ধ। ইহার অর্থও পৈত্রিক শব্দেরই সমান। মুগ্ধবোধের সূত্র— "ঢযে কাৎস্বীককণ্ নীনেয়াশ্চানিতঃশ্চ।" পাণিনির মতে প্রত্যয়টী ঠঞ্। সূত্রমৃতষ্ঠঞ্।

শ্রীচণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তী, ৬।১১ চৌধুরী লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

২য় খণ্ডের ১ম সংখ্যার ১ম প্রশ্নের উত্তর।

আসামে সাধারণতঃ বট ও অড়হর গাছের গালার গুটী লাগান হয়। এখানে এক রকম বনজাত অড়হর গাছ আছে; তাহাতেই ভাল ও বেশী লা হয়।

আমার বিশ্বাস আমাদের গালা (বালা) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখানে মিকির, লালং, কাছাড়ী, "ইজাই" প্রভৃতি পাহাড়ী জাতিতেই ইহার ভাল চাষ করে, তাহাদের অনেকের এই "লার" চাষই একমাত্র সম্বল। বৎসরে দুই বার গুটীর পোকা গাছে লাগাইতে হয়। একবার আষাঢ় শ্রাবণ মাসে লাগাইতে হয়; তাহা কার্ত্তিক মাস হইতে তোলা আরম্ভ হয়। ইহাই ভাল গালা। ইহাকে "বতরের" লা বলে। আবার অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে গুটী লাগাইতে হয়, তাহা জ্যৈষ্ঠমাসে তোলা যায়। ইহার নাম "জেঠুয়া লা"। ইহার ফলন বড় ভাল হয় না, যে গাছের গালা সতেজ, ও যাহাতে সজীব পোকা যথেষ্ট আছে, সেইগুলি যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া রাখে। পরে বেতের ছোট-ছোট ঠুলা তৈয়ার করিয়া, তাহাতে ছটাক আধ পোয়া পরিমাণ ঐ সজীব পোকা থাকা গালা দিয়া, গাছের ডালের মধ্যে ঝুলাইয়া বাধিয়া দেয়। কিছুদিন এই ভাবে রাখিলেই, ঠুলা হইতে সমস্ত পোকা গাছে উঠিয়া যায়। তখন পিপীলিকা কিম্বা অন্য পাখী যাহাতে পোকাগুলি নষ্ট না করে, সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। একটু যত্ন লইলেই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না; ঐ পোকাই গাছ থেকে গালা সংগ্রহ করে। উপরিউক্ত সময়ে গাছ থেকে উঠাইয়া লইতে হয়। একটা ভাল সতেজ অড়হর গাছে ৫ ৬ সের লা হয়। বড় বট্ গাছে এক মণ পর্য্যন্ত হয়।

শ্রীযামিনীকান্ত রক্ষিত, ডাক্তার, যমুনামুখ, আসাম।

মার্কিণ-মুলুক

[শ্রীইন্দুভূষণ দে মজুমদার এম্-এস্‌সি]

আমেরিকা ও আমেরিকান্

আমেরিকা ও আমেরিকান্‌দের নামকরণে কতকগুলি গোলমাল পরিলক্ষিত হয়। কলম্বাস্ পৃথিবীর পশ্চিমার্দ্ধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু পরবর্ত্তী ভ্রমণকারী আমেরিগো ভেস্‌পুছি (Amerigo Vespuchi) হইতে ঐ মহাদেশের নাম হইল "আমেরিকা"। কলম্বাস্ প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি কোন নূতন দেশ আবিষ্কার করেন নাই; তিনি সহজ পথে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন মাত্র; সুতরাং যে সকল আদিম অধিবাসিগণের সহিত দেখা হইল, তিনি তাহাদিগকে ইণ্ডিয়ান্ (ভারতবাসী) মনে করিলেন। সেই হইতে আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা "ইণ্ডিয়ান্" নামে পরিচিত। অধুনা কোন ভারতবাসী আমেরিকায় গেলে তাঁহাকে "ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্" বা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে। আমেরিকার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তিনি "ইণ্ডিয়ান্" বলিয়া নিজের পরিচয় দেন, তবে সে দেশের লোকে তাঁহাকে আমেরিকার আদিম অধিবাসী "রেড্ ইণ্ডিয়ান্" বলিয়া মনে করিবে; এবং তিনি ঐ সকল আদিম অধিবাসীদিগের ন্যায় কম্বলে দেহ আচ্ছাদন না করিয়া, এবং পাখীর পালকে কেশের শোভা বৃদ্ধি না করিয়া, সভ্যবেশে সজ্জিত হইয়াছেন মনে করিয়া আশ্চর্য্য হইবে। তর্কচ্ছলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, মহাদেশটীর যদি "আমেরিকা" নামকরণই হইয়া থাকে, তবে আদিম অধিবাসীদিগকেই "আমেরিকান্" নামে অভিহিত করা উচিত; কিন্তু যে সকল শ্বেতাঙ্গজাতি আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, তাহারা যে কেবল আদিম অধিবাসীদিগের দেশটী কাড়িয়া লইয়াছে, তাহা নহে; তাহাদের ন্যায্য নাম হইতেও তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে।

যদিও মার্কিণরা ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন, তথাপি, ইংরাজীই উহাদের জাতীয় ভাষা। কিন্তু আমেরিকায় এত নূতন কথার সৃষ্টি হইয়াছে যে, চলতি অসাধু শব্দগুলি বাদ দিলেও, কোন ইংরাজ বা ইংরাজী-নবীশ বিদেশী আমেরিকার অনেক সাধু কথাই প্রথমবার শুনিয়া বুঝিতে পারিবে না। যে সকল ইংরাজী কথা বাঙ্গালা ভাষায় পর্য্যন্ত চল হইয়াছে, আমেরিকায় অনেক স্থলে ঐ সকল শব্দের পরিবর্ত্তে অন্য শব্দের ব্যবহার লক্ষিত হইবে। ষ্টীমার হইতে নামিয়াই বিদেশীকে ভাষা-বিভ্রাটে ভুগিতে হইবে। তিনি অবিলম্বেই শিক্ষালাভ করিবেন যে, আমেরিকায় ট্রামের নাম কার্ (Car), লিফ্‌টের নাম এলিভেটর (Elevator), রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম ডিপো (Depot), গার্ডের নাম কণ্ডাক্‌টার (Conductor), ব্যাগের নাম (Grip), ও থিয়েটারের নাম শো (Show)। মার্কিণ মুলুকে ইংরাজী ভাষার এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়াই, পারী (Paris) নগরীর রুদ্ রিভোলি (Rue de Rivoli) নামক ষ্ট্রীটের কোন হাস্যরসিক ফরাসী দোকানদার পরিহাসচ্ছলে তাহার দোকানের সাইনবোর্ডে লিখিয়া রাখিয়াছে, "আমরা ইংরাজী বলিতে পারি, ও আমেরিকান্ ভাষা বুঝিতে পারি।" বলা বাহুল্য যে, ঐ বিজ্ঞাপন দেখিয়া কৌতুকপ্রিয় মার্কিণরা ঐ দোকানেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে।

শ্বেতাঙ্গ জাতিরা যখন আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিল, তখন হইতেই তাহাদের উপলব্ধি হইল যে, এই বিশাল মহাদেশে দ্রব্য-সামগ্রীর অভাব নাই, কেবল খাটিবার লোকের অভাব। কাজেই যাহাতে সহজে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে, তজ্জন্য মার্কিণরা সর্ব্বদাই সচেষ্ট। তাহাদের উপায়-উদ্ভাবনী শক্তিও অপরিসীম; এবং দেশে নূতন আবিষ্কার ও পেটেন্টের (Patent) ছড়াছড়ি। এই কারণেই বর্ত্তমানে মার্কিণরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগামী জাতি। কোন কাজ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া একজন ইংরাজকে প্রশ্ন করিলে, সে যেখানে সম্মতিসূচক উত্তর দিয়া বলিবে All right (বেশ, বেশ), একজন আমেরিকান্ সেখানে বলিবে Go ahead (অগ্রসর হও)। এই বাক্য দুটীতেই আমেরিকানদের জাতীয় চরিত্রের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এই যে—

"আগে চল, আগে চল ভাই!
প'ড়ে থাকা পিছে
ম'রে থাকা মিছে।"

এই মূল মন্ত্র, ও সকল বিষয়ে একাগ্র সাধনাই আমেরিকানদের জাতীয় উন্নতির কারণ। কোন পুরাতন প্রথার সুদৃঢ় শৃঙ্খলে মার্কিণরা বদ্ধ নহে। সে অপরের পদাঙ্কের অনুসরণ না করিয়া, নিজেই নিজের পথ খুলিয়া লয়। জীবনের প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই তাহার সংস্কারের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। অযথা কালক্ষেপণের তাহার সময় নাই; জীবনের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তই তাহার নিকট মূল্যবান। ব্যায়াম, ক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদে পর্য্যন্ত তাহার সময়-সংক্ষেপের প্রয়াস। যে ক্রিকেট্ খেলা লইয়া ইংরাজ জাতি মত্ত,— একটী ম্যাচ খেলিতে হয় ত দুই দিনই অতিবাহিত হইয়া যায়,—সে ক্রিকেট্ খেলায় আমেরিকা-বাসীদিগের ধৈর্য্য ধারণ করা অসম্ভব। এই জন্যই তাহারা ক্রিকেট্ পরিত্যাগ করিয়া, ক্রিকেটেরই অনুরূপ স্বল্প-সময়ব্যাপী বেস্‌বল (Baseball) ক্রীড়ার প্রচলন করিয়াছে। কেবল ইংরাজী খেলা নহে, ইংরাজী ভাষারও তাহারা সংস্কার করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। ভাষা সংস্কার সম্বন্ধেও তাহারা বহুকাল-প্রচলিত কোন প্রথার ধার ধারে নাই। মার্কিণরা অনেক ইংরাজী শব্দ সংক্ষিপ্ত করিয়া, বর্ণবিন্যাসের বাহুল্য বর্জ্জন করিয়াছে; যথা ইংরাজী plough, though, programme, honour প্রভৃতি শব্দ আমেরিকায় plow, tho, program, honorএ পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ব-পুরুষের নামগুলি ছাঁটিতেও মার্কিণদিগের কোন দ্বিধা বোধ নাই। সুবিধার জন্য মার্কিণ বংশধরেরা নেভিন্‌স্কি (Nevinsky), অলকোউইস্‌কি (Wolkowisky) প্রভৃতি রুশ দেশীয় পূর্ব্বপুরুষগণের কটমট নামগুলি ছাঁটিয়া নেভিন্‌স্ (Nevins) ওয়াকার (Walker) প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়াছে। আদিম অধিবাসীদিগের অনেক কবিত্ব-পূর্ণ ও ঐতিহাসিক নামগুলিও উচ্চারণের সুবিধার জন্য মার্কিণরা ছাঁটিয়া ছোট করিয়াছে। কর্ম্মজগতের সুবিধার জন্য আমেরিকানরা স্থানীয় স্মৃতিগুলিকেও বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। ভারতবর্ষে কি বিলাতে যেমন বড়-বড় লোকের নামে রাস্তা, গলি প্রভৃতির নামকরণ হইয়া থাকে, আমেরিকার নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি সহরে তেমন হয় না। সেখানে ষ্ট্রীটগুলি পর্য্যায়ক্রমে এক, দুই, করিয়া নম্বর দেওয়া। সুতরাং

একজন আগন্তুকেরও, কোন স্থানে যাইতে হইলে, রাস্তা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয় না।

স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরতা আমেরিকায় যতটা দেখা যায়, ততটা অন্য কোন দেশে পরিলক্ষিত হয় কি না সন্দেহ। পৃথিবীর এই নবাবিষ্কৃত দেশে লোক-সংখ্যা আয়তন হিসাবে প্রাচীন দেশগুলি হইতে অনেক কম। যুক্তরাজ্য আয়তনে ভারতবর্ষের আড়াইগুণ; কিন্তু ঐ দেশের লোকসংখ্যা ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ হইতেও কম। লোকসংখ্যার অল্পতা হেতু অধিবাসীদিগের কাহারও প্রচুর দাসদাসী রাখিবার উপায় নাই; কাজেই বাধ্য হইয়া স্ব-স্ব কার্য্য নিজেদেরই করিয়া লইতে হয়। এই কারণে প্রায় সকল নর নারীই কর্ম্মব্যস্ত; এবং অনেক সময়ে নারীদিগকে পুরুষের কার্য্যও নির্ব্বাহ করিতে হয়। এই বিশাল দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যখন সকলকেই সমান ভাবে খাটিতে হয়, তখন কোন জীবিকাই যে আমেরিকায় ঘৃণার চক্ষুতে দৃষ্ট হয় না, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। এদেশে যে কোন প্রকারের শ্রমজীবীই অপরের সহিত সমান ভাবে চলিতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকাই একমাত্র দেশ, যেখানে কুলী-মজুরের জীবিকাও গৌরব-মণ্ডিত; যেখানে আজ যে চাষা, কাল সে দেশের প্রেসিডেন্ট।

আমাদের দেশে একজন ভদ্রলোকের ছেলে বরঞ্চ আত্মীয়-স্বজনের গল-গ্রহ হইয়া থাকিবে, তবু নিম্নজাতির জীবিকা অবলম্বন করিবে না। কিন্তু মার্কিণ-মুলুকে, অর্থাভাবে পড়িলে, একজন সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকও কুলী-মজুরের কার্য্য করিবে; তথাপি কাহারও গল-গ্রহ হইবে না, বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবে না। আমেরিকায় সকল লোকেরই স্থান আছে, কেবল অলস ও নিষ্কর্ম্মা লোকের এবং ভিক্ষুকের স্থান নাই। যে কয় বৎসর আমেরিকায় অবস্থান করিয়াছিলাম, তখন কেবল বষ্টন্ নগরে একটী লোককে ভিক্ষা চাহিতে শুনিয়াছিলাম। লোকটীর বয়স আনুমানিক ৩৫ বৎসর; দেখিতে সবল, সুস্থকায়। আমার মাথায় পাগ্‌ড়ী ছিল; তাহা দেখিয়াই বোধ হয়, সে আমাকে বিদেশী মনে করিয়া, ভিক্ষা চাহিতে সাহসী হইয়াছিল। সে বলিল যে, সে বড়ই ক্ষুধার্ত্ত; মিসিগান্ হইতে সে আসিতেছে; সঙ্গে তাহার একটী কপর্দ্দকও নাই। তাহাকে দেখিয়া আমার ধারণা হইল যে, সে একজন কারামুক্ত জেলের কয়েদী; সুতরাং তাহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, চলিয়া যাইবার জন্যই আমার প্রথমে ইচ্ছা হইল। কিন্তু আমেরিকায় কোন দিন ভিক্ষা দানের বিলাসিতা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই; তাই তাহাকে একটী রজতখণ্ড প্রদান করিয়া গমনে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু দেখিলাম, তাহাতেও নিস্তার নাই। সে আমাকে ডাকিয়া ফিরাইল; এবং করমর্দ্দনের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিল, "মিষ্টার, আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন।" অন্য দেশের ভিক্ষুদিগের ন্যায় সে কোন প্রকার হীনতা প্রকাশ করিল না। তাহার ব্যবহার দেখিয়া মনে হইল, যেন দাতা আর গ্রহীতা উভয়েই সমান। সে যেমন গৌরবের সহিত ভিক্ষা আদায় করিল, আমি কোন সৎ-কার্য্যের জন্য তেমন ভাবে চাঁদা আদায় করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ!

আমি একদিন একজন মার্কিণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা এ দেশে কোন্ জীবিকাকে সর্ব্বাপেক্ষা হেয় মনে করেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "কোনটাকেই নহে।" আমাদের দেশে মেথরের কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা হীন; কিন্তু আমেরিকায় দেখিয়াছি, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কেবল যে পরিচারকের কার্য্য করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়া থাকে, তাহা নহে; দরকার হইলে তাহারা রাস্তা ঝাঁট দিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত। আমেরিকার কোন বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যক্ষকে (Dean) এক দিন রাস্তার ধারে, তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে, মজুরের পোষাক পরিধান করিয়া, সাবল হস্তে বরফ সরাইতে দেখিলাম। আমার মত ভারতবাসীর পক্ষে প্রথম-প্রথম উহাতে আশ্চর্য্য হইবারই কথা। আমেরিকার ছাত্রেরা কিন্তু এ দৃশ্য দেখিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না; অধ্যক্ষও সপ্রতিভ ভাবে প্রাঙ্গনা পরিষ্কার করিতে লাগিলেন; আর আমি অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

ভারতবর্ষে কিম্বা ইয়োরোপে কোন দিন নিজ হাতে জুতা ব্রাশ্ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু আমেরিকায় সেই বিষয়ে হাতেখড়ি দিতে হইয়াছিল। নিউইয়র্ক প্রভৃতি বড় সহরে, রাস্তার মোড়ে, ফুট্‌পাথের উপর অবস্থিত মুচী-দিগের গদি-আঁটা উচ্চ চেয়ারে বসিয়া পাঁচ সেণ্ট (দশ পয়সা) কি দশ সেণ্ট দিয়া মাঝে-মাঝে জুতা ব্রাশ্ করাইয়া লইতাম বটে, কিন্তু কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐরূপ কোন বন্দোবস্ত না থাকায়, নিজের জুতা নিজেই ব্রাশ্ করিতাম। বিলাতে

রাত্রিকালে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে শয়ন-কক্ষের দরজার বাহিরে জুতা ছাড়িয়া রাখিতে হয়। পরদিন ভোর না, হইতেই, গৃহের পরিচারিকা তাহা ব্রাশ্ করিয়া রাখিয়া যায়। আমারই একজন বন্ধু ভারতবাসী ছাত্র কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া মনে করিলেন যে, এখানেও'বুঝি ঐ প্রথা প্রচলিত; কিন্তু যখন প্রথম রাত্রিতে জুতা বাহিরে রাখিয়া পরদিন দেখিলেন যে, তাহা পূর্ব্বের অবস্থাতেই পড়িয়া আছে, তখন তাঁহার জ্ঞান লাভ হইল; এবং তিনি অবিলম্বে দোকান হইতে ব্রাশ্ কালী প্রভৃতি মুচীর সরঞ্জাম কিনিয়া আনিলেন।

শ্রমের মর্য্যাদা আছে বলিয়াই, আমেরিকায় উচ্চ-নীচ ভেদ-জ্ঞান নাই। একদিন ট্রেণে ভ্রমণ করিবার সময় ম্যারিলাণ্ড্-নিবাসী একজন গার্ডের সহিত আলাপ-কালে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ম্যারিলণ্ড্ ষ্টেটের এখন শাসনকর্ত্তা (Governor) কে?" সে উত্তর দিল, "A fellow of the name of Crothers" অর্থাৎ "ক্রোথার্স নামক একটা লোক।" নিজের ষ্টেটের শাসনকর্ত্তা সম্বন্ধে তাহার এই তাচ্ছিল্যপূর্ণ উক্তি অবশ্যই আমার কাণে বাজিল। একজন বিদেশীর নিকট নিজের দেশের একজন শাসনকর্ত্তা সম্বন্ধে অন্য কোন দেশের লোক এরূপ অবজ্ঞাসূচক ভাবে বলিতে পারিত কি না সন্দেহ! এই প্রকার সাম্যভাব দেশের পক্ষে যতই মঙ্গলকর হউক না কেন, ইহাতে যে কথাবার্ত্তায় ও আচার ব্যবহারে আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে কতক পরিমাণে সৌজন্যের ও শিষ্টাচারের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। বিলাতে পুলিশের নিকট, দোকান-দারদিগের নিকট ট্রামের কণ্ডাক্‌টার্‌দিগের নিকট সকলে যেরূপ সৌজন্য পাইয়া থাকে, গণতান্ত্রিক আমেরিকায় তাহা আশা করিতে পারা যায় না। একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অসম্মান করিতে পারিলেই যে তাহার সমকক্ষ হওয়া যায়, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা যে আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে একেবারেই নাই, তাহা বলা যায় না।

ইংরাজ ভদ্রলোকদিগের নিকট চিঠি লিখিতে হইলে, শিরোনামায় এস্কোয়ার্ (Esquire) না লিখিয়া নামের পূর্ব্বে মিষ্টার কথাটা লিখিলে তাঁহাদিগকে অসম্মান করা হয়। কেবল দোকানদার প্রভৃতির শিরোনামাতেই মিষ্টার কথা লেখা যাইতে পারে। আমেরিকায় কিন্তু প্রেসিডেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকেই মিষ্টার্ লিখিবার নিয়ম। আফিসের চিঠি, রিপোর্ট প্রভৃতিতেও শেষ ভাগে "Your most obedient servant" (আপনার একান্ত বাধ্য ভৃত্য) লিখিত না হইয়া "Yours respectfully" (বিনয়াবনত) এই পাঠ মাত্র লিখিত হইয়া থাকে। আমি প্রথমে অজ্ঞতাবশতঃ একজন মার্কিণ কর্ম্মচারীকে "I have the honour to be, Sir, Your most obedient servant" এই ভাবে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে তিনি লিখিলেন, "আপনার অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ পত্রের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ।" ধর্ম্মযাজকদিগের নামের পূর্ব্বে রেভারেণ্ড্ (Reverend—ভক্তিভাজন) শব্দটী ব্যবহার করার রীতি আছে। আমেরিকায় অনেকে ঐ প্রথারও বিরোধী। শুনিয়াছি, একজন পাদ্রি তাঁহার নিজের নামে একখানা চিঠি পাঠাইয়াছিলেন, তাহার শিরোনামায় ব্যঙ্গ্যসহকারে লিখিত ছিল, "মিষ্টার অমুক, যিনি নিজেকে রেভারেণ্ড্ আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন।" আমেরিকার কোন কাগজে একটী স্কুলের মেয়ে—তাহার বাপ কোন ক্ষুদ্র স্থানে এক মুদি দোকানের মালীক—জনতার সহিত যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টের সহিত করমর্দ্দন করিতে গিয়াছে। সে ফিরিবার সময় বলিতেছে, "এখন বিদায় হই, মিষ্টার্ প্রেসিডেণ্ট, পরে আবার দেখা হইবে।"

শোক-সংবাদ

স্বর্গীয়া প্রতিভা দেবী

শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী প্রতিভা দেবী, স্বামী-পুত্র-কন্যা ও আত্মীয়-স্বজনকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অকস্মাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি কোন রোগে কষ্ট পান নাই; হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হইয়া অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সাধ্বী প্রতিভা দেবী সতী-স্বর্গে চলিয়া গেলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার সহিত পরিচিত। ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনা ও তাহার উৎকর্ষ সাধন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। নারীজাতির

সর্ব্ববিষয়ে কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান হইয়াছে, তিনি সকলের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। শৈশবে তাঁহার পিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া, এবং পরে ব্রাহ্ম-পরিবারে বিবাহিতা হইয়াও, তিনি পাতর মঙ্গল-কামনায় প্রতি বৎসর হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত সাবিত্রী-ব্রতের যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান করিতেন এবং সন্তানবতী জননীর অনুষ্ঠেয় প্রতি ষষ্ঠীতে শাস্ত্রবিধি পালন করিতেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনের গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৺ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

৺দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

আমাদের সোদরোপম সুহৃদ্, সুধী, সর্ব্বজনপ্রিয় দেবেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ আর ইহজগতে নাই। অল্প কয়েক দিনের জ্বরে অকালে, ৪৮ বৎসর বয়সে দেবেন্দ্র বাবু সংসারের সকল মায়া কাটাইয়া আনন্দধামে চলিয়া গিয়াছেন। দেবেন্দ্র প্রসাদের সাহিত্য-সাধনার কথা মাসিকপত্র পাঠকগণের অবিদিত নাই; বাঙ্গালার প্রধান-প্রধান সকল মাসিকপত্রেই তাঁহার প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের 'ভারত-বর্ষে'ও তিনি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অমায়িক, সদা-প্রফুল্ল, উদারচেতা বন্ধু হারাইয়া আমরা বড়ই শোক-সন্তপ্ত হইয়াছি। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ ও তাঁহার পুত্র-কন্যাদিগকে এই গভীর শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না।
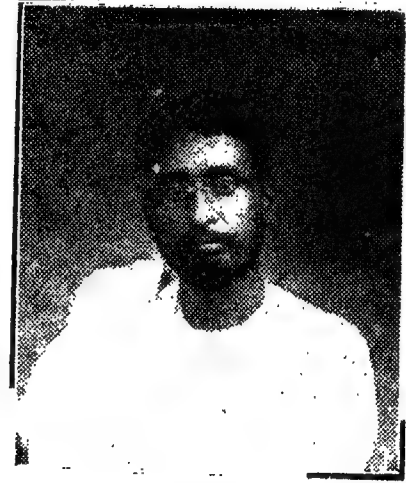
সাহিত্য-সংবাদ

পদক পুরস্কার।—পাবনা কিশোরীমোহন ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরীর অষ্টম বার্ষিক উৎসব সম্মিলনী উপলক্ষে যিনি নিম্নলিখিত বিষয়ে বঙ্গভাষায় শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখিবেন, তাঁহাকে এই পদক প্রদত্ত হইবে। সকল শ্রেণীর লেখক বা লেখিকা এই প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিবেন।

১। বীণাপাণি রৌপ্যপদক—দাতা—শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র লাহিড়ী বি-এ। বিষয়—(ক) বঙ্গসাহিত্যে বাংলার সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনের ক্রম-পরিবর্ত্তনের ইতিহাস; অথবা (খ) আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার সহিত গার্হস্থ্য জীবনের সামঞ্জস্য। ২। স্বর্ণনলিনী রৌপ্যপদক। দাতা—শ্রীগিরিজাশঙ্কর জোয়াদ্দার। বিষয়—(ক) গ্রাম্য কবিতা ও গ্রাম্য গীতি অথবা (খ) বঙ্গীয় নারী-সাহিত্যিক কর্ত্তৃক বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি। প্রবন্ধ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। আগামী ১৩২৮ সালের ২০শে চৈত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময় নকল রাখিয়া পাঠাইবেন; কারণ প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র লাহিড়ী বি-এ মহাশয় জ্ঞানদাসুন্দরী স্বর্ণপদক নামে আর একটী স্বর্ণপদক পুরস্কার দিবেন। যিনি কোন বিপন্ন ব্যক্তির জীবন রক্ষার্থে নিজের প্রাণ সঙ্কটাপন্ন করিয়াও আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে তাহার জীবন রক্ষা করিবেন, তাঁহাকে এই পদক প্রদত্ত হইবে। অবশ্য এই কার্য্যের উপযুক্ত প্রমাণ আগামী ১৩২৮ সালের ৩০শে চৈত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। গিরিজাশঙ্কর জোয়াদ্দার, কিশোরীমোহন ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, পাবনা। শ্রীজাহ্নবীচরণ ভৌমিক, বি এল, সেক্রেটারী, কিশোরীমোহন ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, পাবনা।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় বি-এল প্রণীত সামাজিক উপন্যাস "অরুণা" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য পাঁচসিকা।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সঙ্কলিত "লালা লাজপত রায়" প্রকাশিত হইয়াছে. মূল্য চারি আনা।

শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রণীত নূতন নাটক "বিনকাশিম" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য পাঁচসিকা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত রঙ্গ-গীতিনাট্য প্রাণের টান প্রকাশিত হইল। মূল্য অর্দ্ধমুদ্রা।

শ্রীযুক্ত হিমাংশুপ্রকাশ রায় "রত্ন দীপ" জ্বালিয়াছেন। দর্শনী দশ আনা।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chandhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

অর্ঘ্য

শিল্পী– লাফায়েট

Emerald Ptg. Works, Calcutta. Blocks by BHARATVARSHA HALFTONE WORKS

চৈত্র, ১৩২৮

দ্বিতীয় খণ্ড] নবম বর্ষ [চতুর্থ সংখ্যা

বৈশেষিক দর্শন

[অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

পঞ্চভূত

"সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে"র ঔলুক্য দর্শনে মাধবাচার্য্য একটী কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"দ্বিত্বে চ পাকজোৎপত্তৌ বিভাগে চ বিভাগজে।
যস্য ন স্খলিতা বুদ্ধি স্তং বৈ বৈশেষিকং বিদুঃ॥"

ইহার অর্থ এই যে, দ্বিত্বসংখ্যা, রূপ-রসাদির পাকজোৎপত্তি এবং বিভাগজ বিভাগের নিরূপণে যাহার বুদ্ধি স্খলিত হয় না, তাহার নাম 'বৈশেষিক'।

"কিরণাবলী"তে জগৎপ্রসিদ্ধ দার্শনিক আচার্য্য উদয়ন লিখিয়াছেন,—

"বিশেষো ব্যবচ্ছেদ স্তত্ত্ব-নিশ্চয়ঃ।
তেন ব্যবহরতীত্যর্থঃ।" (৩৩১ পৃঃ)

উদয়নাচার্য্যের মতে যে দর্শনে তত্ত্ব-নিশ্চয়ের কথা আছে, তাহাই 'বৈশেষিক'।

কেহ-কেহ বলেন, বৈশেষিক দর্শনে অন্যদর্শনানভিমত 'বিশেষ' পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে বলিয়াই এই শাস্ত্রকে বৈশেষিক দর্শন বলা হয়।

উদয়নাচার্য্য, 'দর্শন' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন,

—'দর্শনং' দৃশ্যতেঽনেন পারলৌকিকঃ পন্থাঃ।—(কিরণাবলী, ২৬৭ পৃঃ)

মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক সূত্রের রচয়িতা। ইঁহার 'কণাদ' নাম কেন হইল, এ সম্বন্ধে "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধরাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"কণাদমিতি তস্য কাপোতীং বৃত্তিমনুতিষ্ঠতো রথ্যানিপতিতাং স্তণ্ডুলকণানাদায় প্রত্যহং কৃতাহার নিমিত্তা সংজ্ঞা।" (২ পৃঃ)

তপস্যাসক্ত এই নিস্পৃহ মহর্ষি, পথে যে সকল তণ্ডুলকণা পড়িয়া থাকিত, কপোতের ন্যায় তাহাই সংগ্রহ করিয়া প্রত্যহ আহার করিতেন; এইজন্যই তাঁহার নাম 'কণাদ'।

কণাদের আর এক নাম উলুক্য। অনেকে 'কাশ্যপ' নামেও কণাদের উল্লেখ করিয়াছেন।

মহর্ষি কণাদ, যোগসমৃদ্ধির প্রভাবে মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহারই বর-প্রসাদে এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ, ভাষ্যের সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন,—

"যোগাচারবিভূত্যা য স্তোষয়িত্বা মহেশ্বরম্।
চক্রে বৈশেষিকং শাস্ত্রং তস্মৈ কণভুজে নমঃ॥"

উদয়নাচার্য্যও কিরণাবলীর প্রথমে বলিয়াছেন,—

"স্মর্য্যতে হি যৎ কণাদো মুনির্মহেশ্বরনিয়োগপ্রসাদাবধিগম্য শাস্ত্রং প্রণীতবান্।" (৪ পৃঃ)

সকল দর্শনেরই উদ্দেশ্য—মুক্তির উপায়-নির্দ্দেশ। মুক্তির উপায় কি, ইহার উত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" (বৃহদারণ্যক, ৪।৫।৬)

আত্মসাক্ষাৎকারই হইল মুমুক্ষুর ইষ্টসাধন। আত্মসাক্ষাৎকারের তিনটী উপায়,—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। বেদবাক্যের দ্বারা আত্মজ্ঞান হইলে মননে অধিকার জন্মে। অনুমিতিরই নামান্তর মনন। আত্মা আত্মেতর শরীরাদি বস্তু হইতে ভিন্ন, এইরূপ অনুমিতি করিতে হইলে, আত্মা এবং আত্মভিন্ন বস্তু কি, তাহা জানা আবশ্যক। এইজন্যই বৈশেষিক দর্শনে পদার্থতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

পদার্থ দ্বিবিধ,—ভাব ও অভাব। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ভেদে ভাব-পদার্থ ছয় প্রকার। শক্তি, সাদৃশ্যাদি পদার্থান্তর নহে; বহ্নির ন্যায় মণ্যাদির অভাবও দাহের প্রতি স্বতন্ত্র কারণ। এই জন্যই প্রতিবন্ধক মণি বা ঔষধ থাকিলে বহ্নিসত্ত্বেও দাহ হয় না। তদ্ভিন্ন পদার্থে বিদ্যমান তদ্গত অসাধারণ ধর্ম্মের নাম সাদৃশ্য;—'চন্দ্রবন্মুখম্' এখানে চন্দ্রগত আহ্লাদকত্ব-ধর্ম্মই মুখে চন্দ্র-সাদৃশ্য।

দ্রব্য নয় প্রকার,—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ।

কোন-কোনও দার্শনিক অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে—

"রূপবত্ত্বাৎ ক্রিয়াবত্ত্বাদ্ দ্রব্যন্তু দশমং তমঃ।"

কিন্তু কণাদের মতে অন্ধকার দ্রব্য নহে,—আলোকের অভাবই অন্ধকার। শ্রীধরাচার্য্য বৈশেষিক ভাষ্যের টীকাকার হইলেও, তাঁহার সিদ্ধান্তে আরোপিত কৃষ্ণরূপই অন্ধকার।

"কণাদরহস্যে" শঙ্করমিশ্র লিখিয়াছেন, প্রভাকরের মতে জ্ঞানাভাবের নাম অন্ধকার—"যত্ত্, প্রাভাকরাণাং জ্ঞানাভাব এব তমঃ—(৫০ পৃঃ), কিন্তু "তার্কিকরক্ষার" টীকায় মল্লিনাথ প্রভাকরের গ্রন্থাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার মতে যেখানে আলোক নাই, তাদৃশ ভূভাগই অন্ধকার (১)।

রঘুনাথ শিরোমণির মতে আকাশ, কাল ও দিক্, পৃথক্ দ্রব্য নহে;—তাহা পরমাত্মারই অন্তর্ভূত। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "তত্ত্বসার" নামক গ্রন্থে স্বতন্ত্র জীবাত্মা খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে মনঃই চৈতন্যাদির আশ্রয়। তিনি লিখিয়াছেন,—

"ভূবারি তেজঃ পবনঃ পরমাত্মা তথা মনঃ।
দ্রব্যানি ষড়্বিধান্যেব———॥"

জৈন দার্শনিকদিগের মতে শব্দ এবং গুরু মতে সংখ্যা দ্রব্য। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে এই দুইটী পদার্থকে গুণ বলা হইয়াছে।

যে দ্রব্যের গন্ধ আছে তাহাই পৃথিবী। প্রস্তরাদিতেও গন্ধ আছে; কিন্তু ঐ গন্ধ উৎকট নহে বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। প্রস্তরে যদি গন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে প্রস্তর-ভস্ম-চূর্ণে গন্ধের উপলব্ধি হইত না। কারণ, যে দ্রব্যের ধ্বংসে যে দ্রব্য উৎপত্তি লাভ করে, তাহাদের উভয়ের উপাদান কারণ এক।

(১) তার্কিকরক্ষা, ১৩৪ পৃঃ।

পৃথিবী ভিন্ন আর কোনও দ্রব্যেই গন্ধ নাই। 'সুগন্ধি জল', 'সুরভি সমীরণ' ইত্যাদি রূপে জল ও বায়ুতে যে গন্ধের প্রতীতি হয়, তাহা তদন্তর্গত পার্থিব অংশের গন্ধ। এই জন্যই পার্থিব অংশের সহিত অমিশ্রিত জল বা বায়ুতে কোনও গন্ধেরই উপলব্ধি হয় না। প্রশস্ত ভাষ্যের "সূক্তি" নামক টীকায় জগদীশ লিখিয়াছেন,—

"জলাদেঃ কুসুমাদিসম্পর্কা দৌপাধিকমেব গন্ধবত্ত্বং ন তু স্বাভাবিকং।"

পৃথিবীর ১৪টী গুণ,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও সংস্কার।

যাহাতে স্নেহ বা স্বাভাবিক দ্রবত্ব আছে, তাহাই জল। যে গুণের জন্য চূর্ণীকৃত বস্তু পিণ্ডীভাব ধারণ করে, তাহারই নাম স্নেহ। পৃথিবীর ন্যায় জলেরও ১৪টী গুণ,—কেবল তাহাতে গন্ধের পরিবর্ত্তে স্নেহ আছে। জলের রূপ শুক্ল ও রস মধুর। জলে মধুর রস থাকিলেও, তাহার উৎকটতা নাই বলিয়া, গুড়াদি মিষ্ট দ্রব্যের মধুর রসের ন্যায় তাহার উপলব্ধি হয় না। তাই আচার্য্য শ্রীধর লিখিয়াছেন,—

"গুড়াদিবদপ্রতিভাসনন্তু মাধুর্য্যাতিশয়াভাবাৎ।"

("ন্যায়কন্দলী", ৩৭ পৃঃ)

বাস্তবিক পক্ষে জলে যে মাধুর্য্য আছে, তাহা ভীষণ গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে তৃষ্ণার সময়ে নির্ম্মল গঙ্গাজল পান করিলেই অনুভূত হয়। "মুক্তাবলী-প্রকাশে" মহাদেব ভট্ট শেষে এই মীমাংসাই করিয়াছেন,—

"বস্তুতো নিদাঘ পীত নির্ম্মল গঙ্গাজল মাধুর্য্যস্যানুভব সিদ্ধস্যাপলাপাসম্ভবান্মধুর এবেতি যুক্তম্।" (১৬৭ পৃঃ)

যাহার উষ্ণ স্পর্শ আছে, তাহা তেজঃ। তেজের ১১টী গুণ,—রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব ও বেগ। তেজের রূপ ভাস্বর শুক্ল। পর-প্রকাশক রূপের নামই ভাস্বর রূপ। মণি-কাঞ্চনাদিও তেজঃ; তাহার উষ্ণ স্পর্শ পার্থিব স্পর্শের দ্বারা অভিভূত, এই জন্যই তাহার উপলব্ধি হয় না। সুবর্ণাদিগত ভাস্বর শুক্ল রূপও পার্থিব পীতাদি বর্ণের দ্বারা অভিভূত। "ন্যায় লীলাবতী"তে বল্লভাচার্য্য লিখিয়াছেন,

"ভূসংসর্গবশাচ্চাস্য রূপং নৈব প্রতীয়তে।
স্ফটিকস্য জপাযোগাদ্ যথা রূপং ন ভাসতে॥ (১৩ পৃঃ)

যাহার রূপ নাই, অথচ স্পর্শ আছে, তাহাই বায়ু। বায়ুর ৯টী গুণ,—স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগ।

বৈশেষিকেরা বায়ুর প্রত্যক্ষতা স্বীকার করেন না। বিজাতীয় স্পর্শ, বিলক্ষণ শব্দ, তৃণাদির ধারণ ও শাখাদির কম্পনের দ্বারা বায়ু অনুমিত হয়। মহর্ষি কণাদ সূত্র করিয়াছেন,—

"স্পর্শশ্চ বায়োঃ।"—(২।১।৯)

ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য্যও লিখিয়াছেন,—"তস্যাপ্রত্যক্ষস্যাপি নানাত্বং সংমূর্চ্ছনেনানুমীয়তে।"—(৪৪ পৃঃ)

বৈশেষিক মতে আত্মভিন্ন দ্রব্যের প্রত্যক্ষের প্রতি রূপ কারণ; কাজেই রূপ নাই বলিয়া বায়ুর প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। শ্রীধর বলিয়াছেন,—

"সত্যপি মহত্ত্বে অনেক দ্রব্যবত্ত্বে চ বায়োরনুপলম্ভাদ্ রূপ প্রকাশো হেতুঃ।"—(ন্যায়কন্দলী, ১৮৩ পৃঃ)

"সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী"তে বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন যে, নব্য মতে বায়ুর স্পার্শন প্রত্যক্ষ হয়। এই মতে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতিই রূপ কারণ; উদ্ভূত স্পর্শ থাকিলেই স্পার্শন প্রত্যক্ষ হইতে পারে। বিশ্বনাথ ইহা নব্য মত বলিয়া উল্লেখ করিলেও, জয়ন্ত ভট্টের "ন্যায় মঞ্জরীতে" আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাচীন কাল হইতেই বায়ুর প্রত্যক্ষতাপক্ষ ছিল। তিনি লিখিয়াছেন,—

"প্রত্যক্ষ পবন বাদিনা, পক্ষে পবন সময়েঽপি বক্তৃবদন নিকট নিহিত হস্তস্পর্শেনৈব স উপলভ্যতে।"—

("ন্যায়মঞ্জরী," ১৩৬ পৃঃ)।

এই জয়ন্ত ভট্টকে নব্যন্যায়ের প্রথম প্রবর্ত্তক, গঙ্গেশোপাধ্যায় তাঁহার "তত্ত্বচিন্তামণি" গ্রন্থে 'জরন্নৈয়ায়িক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আমাদের মনে হয়, নৈয়ায়িকেরাই বায়ুর প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতেন। কারণ, "তার্কিকরক্ষার" টীকায় আমরা এইরূপ একটা ইঙ্গিত পাই। "তার্কিকরক্ষা" ন্যায় মতানুযায়ী গ্রন্থ; তাহাতে "অপ্রত্যক্ষস্যাপি বায়োঃ—" এইরূপ লিখিত থাকায়, টীকাকার মল্লিনাথ বলিয়াছেন,—

"স্বমতে বায়োঃ স্পার্শনত্বেঽপি বৈশেষিকো ভূত্বাহ। অপ্রত্যক্ষস্যেতি।"—(তার্কিকরক্ষা, ১৩৬ পৃঃ)

এখানে 'স্বমতের' অর্থ ন্যায় মত ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।

আলোক-রশ্মিতে উদ্ভূত স্পর্শ না থাকিলেও তাহার যেমন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, বায়ুতে সেইরূপ উদ্ভূত রূপ না থাকিলেও তাহার স্পার্শন প্রত্যক্ষ হইবে, ইহাই হইল বায়ুর প্রত্যক্ষতা-বাদীদিগের মত। ইঁহাদিগের মতে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূত রূপ কারণ, আর স্পার্শন প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূত স্পর্শ কারণ।

'তাৎপর্য্য টীকা'কার বাচস্পতি মিশ্র বহিরিন্দ্রিয় জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষে উদ্ভূত রূপ ও উদ্ভূত স্পর্শ উভয়েরই কারণতা স্বীকার করেন। সুতরাং তাঁহার মতে বায়ু বা আলোক-রশ্মি কাহারও প্রত্যক্ষ হয় না। বাচস্পতি মিশ্রের এই সিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার শঙ্কর মিশ্রও স্বকৃত 'উপস্কারে' (২।১।৯ সূত্র ব্যাখ্যায়) ও 'কণাদরহস্যে' (২৪ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, আলোক-রশ্মিতে উদ্ভূত স্পর্শ না থাকিলেও তাহার প্রত্যক্ষ হয় বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"উদ্ভূত রূপ মনুদ্ভূত স্পর্শং চ প্রত্যক্ষং যথা প্রদীপরশ্ময়ঃ। – (ন্যায়ভাষ্য, ৩।১।৩৬)।

পৃথিব্যাদি চতুষ্টয়ের গুণব্যবস্থা সম্বন্ধে বৈশেষিক দর্শনের যাহা সিদ্ধান্ত, ন্যায় দর্শনেরও তাহাই অনুমত। মহর্ষি গৌতম সূত্র করিয়াছেন,—

"গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দানাং স্পর্শপর্য্যন্তাঃ
পৃথিব্যাঃ।"—৩।১।৬১)
"অপ্‌তেজোবায়ূনাং পূর্ব্বং পূর্ব্বমপোহ্য
কাশস্যোত্তরঃ।"—(৩।১।৬২)

মহর্ষি গৌতম পূর্ব্বপক্ষরূপে একটা মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন যে, গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শের মধ্যে পৃথিবীর কেবল গন্ধই গুণ; এইরূপ জলের কেবল রস, তেজের কেবল রূপ ও বায়ুর কেবল স্পর্শই গুণ। এই মতে পৃথিবীতে রস, রূপ, স্পর্শ, জলে রূপ, স্পর্শ এবং তেজে স্পর্শ নাই। বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, এই মতের বিশদ বিবরণ, 'ভূতসৃষ্টি' গ্রন্থে জ্ঞাতব্য। বাচস্পতি মিশ্র তাহার অর্থ করিয়াছেন, "ভূতসৃষ্টি প্রতিপাদক পুরাণ"। ইহা কোন্ পুরাণের মত, তাহা জানিতে পারি নাই। "ন পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ" (৩।১।৬৭) এই সূত্রে ও ভাষ্যে পূর্ব্বোক্ত মতবাদ বিশেষ ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে।

মহর্ষি চরকের মতে পৃথিবীর গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ; জলের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস; তেজের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ; বায়ুর গুণ—শব্দ ও স্পর্শ (২)।

জৈন দর্শনে পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মনঃ—এই পাঁচটি দ্রব্যেরই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্বীকৃত হইয়াছে। অকলঙ্ক দেব লিখিয়াছেন,—

"পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়ুমনাংসি পুদ্‌গলদ্রব্যেঽন্তর্ভবন্তি রূপরসগন্ধস্পর্শবত্ত্বাৎ। বায়োর্মনসশ্চ রূপাদি যোগাভাব ইতি চেন্ন রূপাদিমত্ত্বাৎ। বায়ুস্তাবৎ রূপাদিমান্ স্পর্শবত্ত্বাৎ ঘটাদিবৎ।"—"(রাজবার্ত্তিক," ১৯৬ পৃঃ)

দ্রব্যের মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু—এই চারিটী পদার্থ নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। পৃথিব্যাদি চারিটী দ্রব্যের পরমাণু নিত্য, তদ্ ভিন্ন অনিত্য। এই পরমাণুতেই অবয়বাবয়বি-প্রবাহের বিশ্রাম, এবং ইহা হইতেই ক্রমশঃ জন্য দ্রব্যের উৎপত্তি। পরমাণু নিরবয়ব। দুইটী পরমাণুতে একটী দ্ব্যণুক ও তিনটী দ্ব্যণুকে একটী ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। ত্রসরেণু পর্য্যন্তই প্রত্যক্ষ হয়,—দ্ব্যণুক ও পরমাণু অতীন্দ্রিয়। গবাক্ষ-পথে সূর্য্য-কিরণ আসিলে যে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম রেণু দৃষ্ট হয়, তাহারই নাম ত্রসরেণু। মনু বলিয়াছেন,—

"জালান্তর গতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ
প্রথমং তৎ প্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রবক্ষ্যতে॥"
(৮ম অঃ, ১৩২ শ্লো)

নৈয়ায়িক ও মীমাংসকেরাও বৈশেষিকের পরমাণুবাদ স্বীকার করেন। বৈশেষিক, নৈয়ায়িক ও মীমাংসক—এই তিন সম্প্রদায়ই আরম্ভবাদী; অর্থাৎ পরমাণুকেই জন্য জগতের উপাদান কারণ বলেন। অতীন্দ্রিয় পরমাণু হইতেই যে জন্য দ্রব্যের উৎপত্তি, তাহা—"অব্যক্তাদীনি ভূতানি—" (২য় অঃ, ২৮ শ্লোঃ) ইত্যাদি ভগবদ্গীতার শ্লোকেও অভিহিত হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনের পরমাণুবাদ সংস্কৃত কাব্য

---

(২) মহাভূতানি খং বায়ু রগ্নিরাপঃ ক্ষিতিস্তথা।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্গুণাঃ॥
তেষামেকো গুণঃ পূর্ব্বো গুণবৃদ্ধিঃ পরে পরে।
পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো গুণশ্চৈব ক্রমশো গুণিষু স্মৃতঃ॥"
চরকসংহিতা, শারীরস্থান।

অলঙ্কারে পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। মহাকবি বাণভট্ট তাঁহার "হর্ষচরিতে" লিখিয়াছেন,—"প্রায়েণ পরমাণব ইব সমবায়েষ্বনুগুণীভূয় দ্রব্যং কুর্ব্বন্তি পার্থিবং ক্ষুদ্রাঃ।" (৪র্থ উচ্ছ্বাস, ১৩৭ পৃঃ, বম্বে সং) জগৎ-প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মট ভট্ট "কাব্যপ্রকাশের" প্রথমেই "পরমাণ্বাদ্যুপাদান কর্ম্মাদি সহকারি কারণ পরতন্ত্রা—" ইত্যাদি অংশে পরমাণু এবং তাহার ক্রিয়াকেই ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণের কারণ রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অনিত্য পৃথিব্যাদি তিন প্রকার,—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। শরীর দ্বিবিধ,—যোনিজ ও অযোনিজ। যে শরীর শুক্র-শোণিতের সহযোগে উৎপত্তি লাভ করে, তাহাই যোনিজ। যোনিজ শরীরও আবার দুই প্রকার—জরায়ুজ ও অণ্ডজ। মনুষ্যাদির শরীর জরায়ুজ ও পক্ষি প্রভৃতির শরীর অণ্ডজ। যাহা শুক্র-শোণিতের অপেক্ষা করে না, এইরূপ শরীর অযোনিজ। মহর্ষি কণাদ সূত্র করিয়াছেন;—

"তৎপুনঃ পৃথিব্যাদি কার্য্য দ্রব্যং ত্রিবিধং শরীরেন্দ্রিয় বিষয় সংজ্ঞকম্।"—(৪।২।১।)

"তত্র শরীরং দ্বিবিধং যোনিজমযোনিজঞ্চ।"—(৪।২।৫)।

বৃক্ষ যে সজীব, ইহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের নবাবিষ্কার নহে,—সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দার্শনিক আচার্য্য উদয়ন বলিয়া গিয়াছেন,—বৃক্ষ-শরীরও অযোনিজ। কারণ, বৃক্ষের যখন জীবন, মরণ, স্বপ্ন, জাগরণ, রোগ ও চিকিৎসা প্রভৃতি আছে, তখন তাহা সজীব, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। মূলে জলসেক করিলে বা দোহদ অর্পণ করিলে, ফল-পুষ্পাদি বর্দ্ধিত হয়; এবং বৃক্ষের কোনও অংশ কাটিয়া ফেলিলে, ক্রমশঃ তাহা পরিপূর্ত্তি লাভ করে; ইহাতেই অনুভূত হয় যে, বৃক্ষের প্রাণ আছে (৩)। বৃক্ষ যে সজীব, এ বিষয়ে বহু শাস্ত্র-প্রমাণও আছে। তাই উদয়নাচার্য্য শেষে লিখিয়াছেন,—"আগমশ্চাত্রার্থে বহুতরোঽনুসন্ধেয়ঃ।" এই অংশের টীকায় বর্দ্ধমানোপাধ্যায় আগম প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"নর্ম্মদাতীর সম্ভূতাঃ সরলার্জ্জুন পাদপাঃ।
নর্ম্মদাতোয়সংস্পর্শাৎ তেঽপি যান্তি পরাং গতিং॥"
"শ্মশানে জায়তে বৃক্ষঃ কঙ্কগৃধ্রোপসেবিতঃ॥"—
("প্রকাশ," ২৪৩ পৃঃ)

"মুক্তাবলী প্রকাশে" মহাদেব ভট্ট শেষোক্ত প্রমাণটী

"গুরুং ত্বঙ্কৃত্য হুঙ্কৃত্য বিপ্রং নির্জ্জিত্য বাদতঃ।
শ্মশানে জায়তে বৃক্ষঃ কঙ্ক গৃধ্রোপসেবিতঃ॥"

এইভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

উদয়নাচার্য্য যে গ্রন্থের ব্যাখ্যাবসরে বৃক্ষের সজীবত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই প্রশস্তপাদ ভাষ্যে কিন্তু মনুষ্যাদির ন্যায় বৃক্ষও যে শরীর, ইহা স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই। ভাষ্যে বরং বৃক্ষলতাদি স্থাবর পদার্থকে 'বিষয়ের' অন্তর্ভূতরূপে গণনা করা হইয়াছে (৪) ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য্য, শরীর নিরূপণের সময়ে বৃক্ষে উল্লেখ না করায়, উদয়নাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, (৫) মনুষ্যাদি-শরীরের ন্যায় বৃক্ষও যখন শরীর, তখন এইখানেই তাহা উল্লেখ করা উচিত ছিল; কিন্তু বৃক্ষের চৈতন্য অতি অস্ফুট এই জন্যই 'বিষয়ে'র অন্তর্ভূত রূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এক পদার্থের অন্তর্ভূত বস্তুও যে ভাষ্যকার পৃথক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উদয়নাচার্য্য তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন। উদয়নের এই আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা দেখিয়া মনে হয় যে, বৃক্ষাদিও যে শরীর, এ সিদ্ধান্ত তাঁহার পূর্বে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে ছিল না;—তিনি একটা নূতন মত প্রচারের আয়োজন করিয়াছেন। ভাষ্যের অন্যতম প্রধান টীকাকার উদয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীধরাচার্য্য শরীর নিরূপণে-ব্যাখ্যাবসরে বৃক্ষ-শরীরের উল্লেখ করেন নাই, প্রত্যুত আত্ম-নিরূপণের প্রস্তাবে বৃক্ষ যে সজীব নহে, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন (৬)। শ্রীধরের মতে বৃক্ষ যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়

(৩) "বৃক্ষাদয়ঃ প্রতিনিয়ত ভোক্ত্রধিষ্ঠিতা জীবন-মরণ স্বপ্ন-জাগরণ-রোগ-ভেষজ প্রয়োগ সজাতীয়ানুবন্ধানুকূলোপ-গম প্রতিকূলাপগমাদিভ্যঃ প্রসিদ্ধ শরীরবৎ। ন চৈতে সন্দিগ্ধা সিদ্ধাঃ আধ্যাত্মিক বায়ু সম্বন্ধাৎ সোঽপি মূলে নিষিক্তানামপাং দোহদস্য চ পার্থিবস্য ধাতো-রভ্যাদানাৎ। তদপি বৃদ্ধি ভগ্ন ক্ষত সংরোহণাভ্যামিতি।"—"কিরণাবলী" ৫৮ পৃঃ।

(৪) "বিষয়স্তু দ্ব্যণুকাদিক্রমেণারব্ধস্ত্রিবিধো মৃৎপাষাণস্থাবর লক্ষণঃ।............স্থাবরাস্তৃণৌষধি-বৃক্ষলতাবতানবনস্পতয়ঃ।"—প্রশস্তপাদভাষ্য, ২৮ পৃঃ।

(৫) "যদ্যপি চোদ্ভিদোঽপি বৃক্ষাদয়ঃ শরীর-ভেদতয়া অত্রৈ ব্যাখ্যাতুমুচিতাঃ তথাপ্যস্তঃ সংজ্ঞতয়া...বিষয়তাং বিবক্ষন্ তেষেবাস্তর্ভা ব্যাখ্যাস্যতি।"—"কিরণাবলী" ৫৭ পৃঃ।

(৬) বৃক্ষাদিগতেন বৃদ্ধ্যাদিনা ব্যভিচার ইতি চেন্ন তত্রাপীশ্বর কৃতত্বাৎ। ন তু বৃক্ষাদয়ঃ সাত্মকাঃ বৃদ্ধ্যাদ্যুৎপাদনসমর্থস্য বিশিষ্টাত্ম সম্বন্ধস্যাভাবাৎ।—"—কন্দলী, ৮৩ পৃঃ।

এবং তাহার ছিন্ন বা ভগ্ন অংশ যে পুনর্ব্বার গঠিত হয়, ইহার প্রতি ঈশ্বরই কারণ। তার পর, উদয়ন অপেক্ষা বহু প্রাচীন বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্টও যে বৃক্ষ-শরীর স্বীকার করিতেন না, তাহা "ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্যটীকা" ও "ন্যায়-মঞ্জরী" দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় (৭)। কিন্তু জৈন দার্শনিকেরা বৃক্ষের সজীবত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে জীব দ্বিবিধ,—ত্রস ও স্থাবর। বৃক্ষ, স্থাবর জীবের অন্তর্ভূত। উমা স্বামী লিখিয়াছেন,—

"পৃথিব্যপ্তেজো বায়ুবনস্পতয়ঃ স্থাবরাঃ।—

(তত্ত্বার্থসূত্র, ২।১৩)

সূত্রের ব্যাখ্যায় অকলঙ্কদেব বলিয়াছেন,—

"পৃথিবীকায়াদয়ঃ সন্তি, তদুদয়নিমিত্তা জীবেষু পৃথিব্যাদয়ঃ সংজ্ঞা বেদিতব্যাঃ।"—("রাজবার্ত্তিক," ৮৮ পৃঃ) জৈন দর্শনের মতে 'স্থাবর' জীবের স্পর্শনেন্দ্রিয় ছাড়া আর কোনও ইন্দ্রিয় নাই।

"কিরণাবলী"র ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বর্দ্ধমানোপাধ্যায় যে শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, বৃক্ষের সজীবত্ব সম্বন্ধে তদ্ভিন্ন বহু প্রমাণ আছে। মনুসংহিতায় লিখিত হইয়াছে যে, মানুষ কর্ম্মদোষে স্থাবরতা প্রাপ্ত হয়;—

"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।"—

(১২ অঃ, ৯ শ্লোঃ)

তপস্যার প্রভাবে বৃক্ষ-গুল্মাদি স্থাবর জীব যে স্বর্গে যাইতে পারে, মনু তাহাও লিখিয়াছেন,—

"কীটাশ্চাহিপতঙ্গাশ্চ পশবশ্চ বয়াংসি চ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি দিবং যান্তি তপোবলাৎ॥"—

(১১ অঃ, ২৪১ শ্লোঃ)

বৃক্ষ যে সজীব, ছান্দোগ্য উপনিষদেও তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে,—

অস্য সোম্য মহতো বৃক্ষস্য যো মূলেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্ যো মধ্যেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্ যোঽগ্রেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেৎ স এষ জীবেনাত্মনানুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি।"—(ছান্দোগ্য, ৬।১১।১)

উদয়নের পরবর্ত্তী বিশ্বনাথ "সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী"তে ও শঙ্করমিশ্র "উপস্কারে" বৃক্ষের যে প্রাণ আছে, তাহা অস্বীকার করেন নাই। "পদার্থদীপিকা"য় কৌণ্ড ভট্টও বলিয়াছেন যে, বৃক্ষ সজীব। তাঁহার মতে পার্থিব শরীর পঞ্চবিধ (৮)।

বেদান্তাদি দর্শনে শরীরের প্রতি পঞ্চভূতকেই উপাদান কারণ বলা হইয়াছে। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনের মতে শরীর পাঞ্চভৌতিক নহে; পার্থিব শরীরের প্রতি পৃথিবীই উপাদান, জলাদি নিমিত্ত কারণ। জলীয়াদি শরীরেও এইরূপ। "ন্যায়কন্দলী'তে আচার্য্য শ্রীধর, শরীরের পাঞ্চভৌতিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন (৯)।

যাহা সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় ভোগসাধন, তাহাই বিষয়। সুখ বা দুঃখের অনুভূতির নাম ভোগ। এই হিসাবে ফল, পুষ্প, হিম, করকা, বহ্নি, স্বর্ণ, প্রাণ, ঝটিকা প্রভৃতি সমস্তই বিষয়ের অন্তর্ভূত। সকল কার্য্যই অদৃষ্টাধীন। যে কার্য্য যাহার অদৃষ্টে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহা সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় তাহার সুখানুভূতি বা দুঃখানুভূতির উৎপাদক হইবেই। কারণ এবং প্রয়োজন ভিন্ন কোনও বস্তুরই উৎপত্তি হয় না।

যাহা শব্দের আশ্রয়, অর্থাৎ যে দ্রব্যের বিশেষ গুণ শব্দ, তাহারই নাম আকাশ। কেহ-কেহ শব্দকে পৃথিব্যাদির গুণ বলিতে চাহেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, শঙ্খ, বীণা, বেণু প্রভৃতিই শব্দের সমবায়ী কারণ। কিন্তু শব্দ শঙ্খাদির বিশেষ গুণ হইতে পারে না। কারণ, শঙ্খাদির যাহা বিশেষ গুণ, তাহা শঙ্খাদির অবয়বগত বিশেষ গুণ

(৭) "চেষ্টা ব্যাপারঃ স চাতিব্যাপকতয়া অব্যাপকতয়া চ ন লক্ষণং বৃক্ষাদিষু ভাবাদ্ অভাবাচ্চ পাষাণমধ্যবর্ত্তিমণ্ডূকাদি শরীর ইতি ভাবঃ।...প্রযুক্তস্যোৎপাদিতস্য ন ব্যাপার মাত্রং চেষ্টাঽভমস্তুতাঽপি তু বিশিষ্টো ব্যাপারঃ স চ ন বৃক্ষাদিষস্তীতি নাতি ব্যাপকতা।"—"তাৎপর্য্যটীকা" ১৪৮ পৃঃ।

"ননু চেষ্টা ক্রিয়া ক্রিয়াবত্ত্বে চ সত্যাপি ন বৃক্ষাদীনাং শরীরত্বমিত্যতিব্যাপকং লক্ষণং বিশিষ্ট চেষ্টাশ্রয়ত্বস্য বিশিষ্ট প্রমেয় লক্ষণ প্রক্রমতোঽবসীয়মানত্বাৎ।"—"ন্যায়মঞ্জরী." ৪৭৪ পৃঃ।

(৮) শরীরং......তৎ পঞ্চধা শুক্র-শোণিতাভ্যাং বিনৈবাদৃষ্ট বিশেষোপগৃহীত পৃথিবী জন্যং জরায়ুজমণ্ডজং স্বেদজমুদ্ভিজ্জঞ্চ।...... পৃথিবীং ভিত্ত্বা জায়মানং উদ্ভিজ্জং বৃক্ষাদি।—পদার্থদীপিকা, ২ পৃঃ।

(৯) যে তু পঞ্চভূত সমবায়িকারণং শরীরমিত্যাস্থিষত তেষামগন্ধং শরীরং স্যাৎ কারণ গন্ধস্যৈকস্যানারম্ভকত্বাৎ চিত্ররূপরসস্পর্শং চ প্রাপ্নোতি কারণেষু নানা রূপ রস স্পর্শ সম্ভবাৎ ন চৈবং দৃষ্টং তস্মান্ন পঞ্চভূত প্রকৃতিকং—ন্যায়কন্দলী, ৩৮ পৃঃ।

হইতে উৎপন্ন। শঙ্খ প্রভৃতিতে রূপরসাদি যে বিশেষ গুণ আছে, তাহা তদীয় অবয়বগত রূপরসাদির সজাতীয়। কিন্তু শব্দ এরূপ নহে,—নিঃশব্দ অবয়ব হইতেও শঙ্খাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। তা'র পর আর এক কথা—শঙ্খাদির যাহা বিশেষ গুণ, তাহা শঙ্খাদি বর্ত্তমান থাকিতে নষ্ট হয় না। কিন্তু শব্দ এরূপ নহে,—শঙ্খ নষ্ট না হইলেও শব্দের নাশ হয়। উদয়নাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"সৎস্বেব বংশশঙ্খাদিষু তন্নিবৃত্তেঃ যে পুনস্তেষাং বিশেষ-গুণাঃ ন তে তেষু সৎসু নিবর্ত্তন্তে।"

(—"কিরণাবলী", ১০৭ পৃঃ)

শব্দকে শঙ্খাদির গুণ বলিলে আরও এক দোষ হয় যে, শব্দের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। শঙ্খের সহিত কর্ণেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয় না; সুতরাং তাহার গুণের সহিতও সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে। গুণ কখনও নিজের আশ্রয়কে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত সম্বন্ধ হয় না। কাজেই, ইন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সম্বন্ধ না হইলে, তাহার প্রত্যক্ষই অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না হইলেও প্রত্যক্ষ হইবে, এ কথা বলিলে সকল স্থানেই সর্ব্বদা সকল শব্দের উপলব্ধির আপত্তি হয়।

তবে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, শব্দ বায়ুরই গুণ; —বায়বীয় সূক্ষ্ম অবয়ব হইতে ক্রমশঃ স্থূল বায়ুতে শব্দ উৎপত্তি লাভ করে। শব্দকে বায়ুর গুণ বলিলে তাহার প্রত্যক্ষেরও কোনও অনুপপত্তি হয় না। কারণ, বায়ুর সহিত কর্ণেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ অসম্ভব নহে। সুতরাং সংযুক্ত সমবায়' সম্বন্ধেই শব্দের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু এ সিদ্ধান্তও যুক্তিযুক্ত নহে। কর্ণ বহিরিন্দ্রিয়; যে হেতু তাহা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—এই পাঁচটী গুণের মধ্যে নিয়মতঃ একটী মাত্র গুণেরই গ্রাহক; যেমন চক্ষুঃ। এখন বহিরিন্দ্রিয়ের নিয়ম এই, তাহার দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের মধ্যে যে গুণের প্রত্যক্ষ হইবে, সেই জাতীয় গুণ তাহাতে থাকা চাই। যদি সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সকল গুণের প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে আর অন্ধ-বধিরের নিয়ম থাকে না। চক্ষুঃ না থাকিলেও ইন্দ্রিয়ান্তরের দ্বারা রূপের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। আবার যদি এক ইন্দ্রিয়কেই সকল গুণের গ্রাহক বলা যায়, তবে চক্ষু নষ্ট হইলে রসাদিরও অপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। এখন শব্দ যদি বায়ুর গুণ হয়, তাহা হইলে কর্ণেন্দ্রিয়কেও বায়বীয় বলিতে হইবে। তাহাতে দোষ কি? দোষ এই যে, এক বায়বীয় ইন্দ্রিয়, স্পর্শ ও শব্দ উভয়েরই গ্রাহক হইয়া পড়ে। কারণ, স্পর্শগ্রাহক ত্বগিন্দ্রিয়ও বায়বীয়। সুতরাং তাহা উভয়ের গ্রাহক বলিয়া আর বহিরিন্দ্রিয় হইতে পারে না। কেন না, বহিরিন্দ্রিয়, নিয়মতঃ একই গুণের গ্রাহক। বায়বীয় হইলেও ত্বক্ ও কর্ণ পরস্পর ভিন্ন; কাজেই, তাহার প্রতিনিয়তার্থগ্রাহকত্বের অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় যে নিয়মতঃ একই গুণের গ্রাহক, তাহার কোনও ব্যাঘাত হইবে না —এ কথা বলা যায় না। কারণ, ব্যক্তি ভেদ হইলেও একোপাদানক ইন্দ্রিয়ের বিষয়-গ্রহণের কোনও বৈলক্ষণ্য হইতে পারে না। ঘ্রাণেন্দ্রিয় শরীর ভেদে ভিন্ন-ভিন্ন; কিন্তু তাহা গন্ধেরই গ্রাহক হয়,—রূপ-গ্রাহক হয় না।

শব্দ বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, অতএব তাহা আত্মারও গুণ হইতে পারে না। যাহা বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য, তাহা আত্মার গুণ নহে,—যেমন রূপ।

শব্দ দিক্, কাল বা মনের গুণও নহে। যে হেতু, শব্দ, ইন্দ্রিয়বেদ্য হইলেও দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। এখানেও দৃষ্টান্ত—রূপ। কাজেই, পরিশেষে শব্দগুণের আশ্রয়রূপে আকাশরূপ নবম দ্রব্যের সিদ্ধি হয়। শব্দ যে আকাশের গুণ, ইহা মহাকবি কালিদাসও লিখিয়াছেন,—

"শ্রুতি বিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম।"

বৈশেষিক মতে আকাশ নিত্য,—তাহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। বৈদান্তিকেরা আকাশের অনিত্যতা স্বীকার করেন; কিন্তু সে সিদ্ধান্ত; যুক্তিসহ নহে। আকাশ যে নিত্য, তাহা মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে; যথা,—

"বিদ্ধি নারদ পঞ্চৈতান্ শাশ্বতানবলান্ ধ্রুবান্।
মহতস্তেজসো রাশীন্ কালষষ্ঠান্ স্বভাবতঃ॥
আপশ্চৈবান্তরীক্ষঞ্চ পৃথিবী বায়ুপাবকৌ॥"

(২৪৭ অঃ, ৬ শ্লোঃ)

আকাশের যে উৎপত্তি-বিনাশ নাই, তাহার প্রমাণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও পাওয়া যায়। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥"—

(১৩ শ অঃ, ৩২ শ্লোঃ)

আকাশ যে সর্ব্বগত, তাহা ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য্য বলিয়াছেন, "আকাশ কালদিগাত্মনাং সর্ব্বগতত্বং—" (২২ পৃঃ) সর্ব্বগতত্বের অর্থ, সমস্ত মূর্ত্তের অর্থাৎ সক্রিয় বস্তুর সহিত সংযোগ। আকাশাদি চারিটী দ্রব্য নিক্রিয়; কাজেই, তাহার সর্ব্বত্র গমন সম্ভবপর নহে। তাই 'সর্ব্বগতত্ব' শব্দের ঈদৃশ অর্থেই তাৎপর্য্য স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীধরাচার্য্য স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—

"সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বৈর্ম্মূর্ত্তৈঃ সহ সংযোগঃ, আকাশাদীনাং ন তু সর্ব্বত্র গমনং তেষাং নিক্রিয়ত্বাৎ।"—

(ন্যায়কন্দলী, ২২ পৃঃ)

সর্ব্বগত আকাশ যেরূপ সূক্ষ্ম বলিয়া তাহার সত্তা, অপর বস্তুর সত্তার প্রতিরোধক নহে, আত্মাও সেইরূপ সকল দেহে অবস্থিত হইয়াও অলিপ্ত—ইহাই পূর্ব্বোক্ত গীতা শ্লোকের মোটামুটি অর্থ। এখানে সূক্ষ্ম শব্দের অর্থ নিরবয়ব অথবা বহিরিন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষের অযোগ্য। সূক্ষ্ম শব্দের শেষোক্ত অর্থ উদয়নাচার্য্যের সম্মত (১০); এই সর্ব্বগতত্ব হেতুর দ্বারা আকাশে অনুমান-প্রমাণ বলে নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে। অনুমানের আকার এই,—'আকাশঃ নিত্যঃ সর্ব্বগতত্বাৎ ব্রহ্মবৎ।' আকাশ নিত্য যে হেতু তাহা সর্ব্বগত, দৃষ্টান্ত—ব্রহ্ম। এই সর্ব্বগতত্বরূপ হেতু স্বরূপাসিদ্ধ অর্থাৎ আকাশরূপ 'পক্ষে' নাই, এ কথা বলা যায় না। কারণ, আকাশ যে সর্ব্বগত তাহা ভগবানও বলিয়াছেন,—আকাশের সর্ব্বগতত্ব বৈশেষিকের স্বকপোলকল্পিত নহে। তার পর, সর্ব্বগত শব্দের অর্থ যে সর্ব্বব্যাপী, তাহা শঙ্করাচার্য্য নিজেও স্বীকার করিয়াছেন।

লাঘবরূপ যুক্তি অনুসারেও আকাশের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। আকাশ অনিত্য বলিলে তাহার ধ্বংস ও প্রাগভাব, আবার সেই ধ্বংসের প্রাগভাব—প্রাগভাবের ধ্বংস, এই ভাবে অনাবশ্যক কোটি-কোটি পদার্থ স্বীকার করিতে হয়। আকাশ যে নিত্য, তাহা আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ"—এই প্রমাণ-বাক্যে স্পষ্ট লিখিত আছে।

আকাশ যে উৎপন্ন দ্রব্য নহে, এ পক্ষে আমরা তর্ককেও সহায়ক রূপে পাই। অনেক উপাদানের সহিত সংযোগ না হইলে কোনও দ্রব্যেরই উৎপত্তি হইতে পারে না। দ্ব্যণুক হইতেই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। উভয় পরমাণুর সংযোগেই দ্ব্যণুকের উৎপত্তি। উৎপন্ন দ্রব্যমাত্রেরই উপাদান অনেক। যে দ্রব্যের অনেক উপাদান নাই, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না,—তাহা নিত্য। সুতরাং—"আকাশং যদি জন্যদ্রব্যং স্যাৎ তর্হি অনেকাবয়ব জন্যং স্যাৎ' এইরূপ তর্কের সহায়তায় আকাশের অজন্যত্বের নিশ্চয় হয়।

আকাশ যে নিত্য নহে,—জন্য দ্রব্য, এ পক্ষে বেদান্তীরা কোনও যুক্তিতর্ক দেখাইতে না পারিলেও, "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈত্তিরীয়, ১।২।১) এই শ্রুতি-প্রমাণ দেখাইয়া থাকেন। শ্রুতির অর্থ, ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, এই শ্রুতিও বৈশেষিক সিদ্ধান্তের প্রতিকূল নহে। অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষণের উৎপত্তি অনুসারে বিশেষ্যের উৎপত্তি ব্যবহার হয়। যেমন, আত্মা নিত্য হইলেও, শরীরের উৎপত্তি অনুসারে "তদাত্মানং সৃজাম্যহম্" ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে। 'আকাশঃ সম্ভূতঃ' এ স্থলেও সেইরূপ কর্ণ-শঙ্কুলীর উৎপত্তি হয় বলিয়া আকাশের উৎপত্তি-ব্যবহার হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে। তার পর, আকাশ পর্য্যায় শব্দে পৃথিবীর সহিত অসংযুক্ত, পৃথিবীর উপরিস্থিত 'স্থির বায়ু'রও বোধ হয়। এই জন্যই 'খেচর' 'খগ' 'আকাশচারী' প্রভৃতি প্রামাণিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। দার্শনিক-চূড়ামণি শ্রীহর্ষও তদীয় মহাকাব্য "নৈষধ-চরিতে" হংসের মুখ দিয়া দময়ন্তীকে বলাইয়াছেন,—

"ধার্য্যঃ কথঙ্কার মহং ভবত্যা
বিয়দ্ বিহারী বসুধৈকগত্যা।"

যদি আকাশ পর্য্যায় বিয়ৎ শব্দে তাদৃশ স্থির বায়ুকে না বুঝাইত, তাহা হইলে দময়ন্তীই বা কেন বিয়দ্-বিহারিণী না হইবেন? আকাশের সহিত দময়ন্তীরও ত সম্বন্ধ আছে; কারণ, আকাশ সর্ব্বব্যাপী। কাজেই বলিতে হইবে, আকাশ পর্য্যায় শব্দে বিশ্বব্যাপী শব্দাধিকরণ নিত্য দ্রব্যের ন্যায় তাদৃশ

(১০) সৌক্ষ্ম্যম্ বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রহণযোগ্যতাবিরহঃ।—
কিরণাবলী ১২৭ পৃঃ।

স্থির বায়ুরও বোধ হয়। 'আকাশঃ সম্ভূতঃ' এই শ্রুতিতে ঐরূপ স্থির বায়ুর উৎপত্তির কথাই বলা হইয়াছে। সেই স্থির বায়ুর সৃষ্টির পর অন্য বায়ুর সৃষ্টি। তা'ই, শ্রুতির পরবর্ত্তী অংশে আছে "আকাশাদ্ বায়ুঃ।" এই শ্রুতিতেই এক জাতীয় বস্তুর বিবিধ সৃষ্টির কথা, পৃথিবীর সৃষ্টি-প্রসঙ্গেও অভিহিত হইয়াছে। যথা,—"অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ।" ওষধি, অন্ন, পুরুষ (শরীর) সমস্তই পৃথিবী। সামান্য ভাবে পৃথিবীর সৃষ্টির কথা বলিয়া, শ্রুতি আবার বিশেষ ভাবে ওষধি প্রভৃতি সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। অতএব "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতি, বৈশেষিক মতের বিরুদ্ধ নহে। "ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।" এই মন্ত্রেও 'চ'কারের পর 'আন্তরীক্ষ' পদ আছে,—অন্তরীক্ষ নহে। 'অন্তরীক্ষস্য ইদং' এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত আন্তরীক্ষ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিধাতা যথাপূর্ব্ব বেদ সৃষ্টি করিলেন, ইহাই "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ……আন্তরীক্ষং—" এই মন্ত্রাংশের অর্থ। সুতরাং দেখা গেল যে, বৈদান্তিকেরা শব্দ বা অনুমান কোনও প্রমাণের সাহায্যেই আকাশের জন্যত্ব সিদ্ধ করিতে পারেন না।

'তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ' ন্যায়ে যদি আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করাও যায়, তাহা হইলেও, আকাশের যে বিনাশ হয়, এ সম্বন্ধে বৈদান্তিকেরা কোনও প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। যে যে ভাব পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশও হয়, এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান বলে আকাশে বিনাশিত্বের [আকাশঃ বিনাশী, জন্যভাবত্বাৎ, ঘটবৎ, এইরূপ] অনুমিতি হইবে, এ কথাও বলা চলে না। কারণ, এ স্থলে উপাধি আছে। সোপাধিক হেতু যে অসদ্ধেতু সেই হেতু দ্বারা যে যথার্থ অনুমিতি হইতে পারে না,—ইহা প্রমাণবিৎ পণ্ডিত মাত্রেই অবগত আছেন। সোপাধিক হেতু সাধ্যের অনুমাপক হইতে পারে না; কারণ উপাধি ব্যভিচারী বলি' তাহা সাধ্যেরও ব্যভিচারী হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, উপাধি অভাবকে হেতু করিলে 'পক্ষে' সাধ্যের অভাবও সিদ্ধ হইয়া যায়। "আকাশঃ বিনাশী, জন্যভাবত্বাৎ"—এ স্থলে 'দ্রব্যানুপাদানক দ্রব্যভিন্নত্ব'ই উপাধি। সুতরাং, 'আকাশঃ অবিনাশী দ্রব্যানুপাদানক দ্রব্যত্বাৎ'—আকাশ অবিনাশী, যে-হেতু তাহা দ্রব্যানুপাদানক দ্রব্য এই ভাবে আকাশের অবিনাশিত্ব সিদ্ধ হয়। সহৃদয়গণ একটু অবহিত হইলেই, এই বিচারাংশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

বিশ্ববিশ্রুত নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি অতিরিক্ত আকাশ স্বীকার করেন না;—তিনি ঈশ্বরকেই শব্দের আশ্রয় বলেন (১১)। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে এ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। তিনি বলেন, তাহা হইলে শ্রুতি-বিরোধ হয়। কারণ,

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।

(কঠ, ১।৩।১৫)

এই শ্রুতিতে ঈশ্বরকে শব্দ-রহিত বলা হইয়াছে। কাজেই, ঈশ্বরকে শব্দের আশ্রয় বলা যায় না, অতিরিক্ত আকাশ স্বীকার করিতেই হইবে।

কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্ন আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়। আকাশ এক হইলেও, কর্ণশষ্কুলীভেদে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভেদ হইয়া থাকে।

(১১) শব্দ নিমিত্ত কারণত্বেন [illegible] ঈশ্বরস্যৈব শব্দ সমবায়ি কারণত্বম্।......শ্রোত্রমপি চ কর্ণশষ্কুলী বিবরাবচ্ছিন্ন ঈশ্বর এব, যথা পরেষাং তথাবিধমাকাশম্। "পদার্থ তত্ত্বনিরূপণ," ৩—১০ পৃঃ।

মেঘনাদ

[অধ্যাপক শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল]

(৩৭)

সরিৎ সেবার ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিল। পরীক্ষা শেষ হইলে সে স্থির করিল, স্বামী তাহাকে ডাকুন বা না ডাকুন, সে তার সহধর্ম্মিণীর অধিকার গ্রহণ করিবে। সে তাই অজিতকে সঙ্গে লইয়া, বিনা সংবাদে দেশে রওনা হইল।

আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সমস্ত সত্ত্বা অসাড় হইয়া গেল। মেঘনাদ তাহাকে বরাবরই চিঠি লিখিয়াছে; তার সমস্ত কাজকর্ম্মের, আশা আকাঙ্ক্ষার কথা জানাইয়াছে; কেমন ভাবে সে দিন কাটাইতেছে তাহা লিখিয়াছে; তার আনন্দের কথা লিখিয়াছে; তার বেদনা জানাইয়াছে; কিন্তু মনোরমার কথা তাহাকে কখনও জানায় নাই। মেঘনাদের চিঠি পড়িয়া সরিৎ ব্যথা পাইয়াছে; কিন্তু গর্ব্বে তার বুক ফুলিয়া উঠিয়াছে। সে মেঘনাদের দেবমূর্ত্তির সামনে নিজেকে বারবার অবনত করিয়া দিয়াছে, তাহার পাশে যাইয়া তার ধর্ম্মের সহায় হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। স্বামীর ভিটায় পা' দিতেই, তার কল্পনার দেবমূর্ত্তি নিমেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। তার সম্মুখে সে দেখিল, অপরাধী, অবিশ্বাসী স্বামী, আর তার চক্ষুঃ-শূল জারিণী।

তার একেবারে মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। মর্ম্মান্তিক ব্যথায় তার বুক ভাঙ্গিয়া গেল; অপমানে সে জর্জ্জরিত হইল। সবচেয়ে বেশী তার মনে বিঁধিল এই কথা যে, তার দাদা চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তার এই অপমান দেখিয়া গেল। তার মনের ভিতর দিয়া জ্বালাময় অসংখ্য চিন্তার বজ্রগর্ভ বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তার কথা কহিবার শক্তি রহিল না।

উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহার মন স্থির করিতে বিলম্ব হইল না। মনোরমা ও অজিতের সম্মুখে সে যদি তার মনের জ্বালা প্রকাশ করিয়া ফেলে, তবে তার অপমান বাড়িবে বই কমিবে না, এ কথা সে বুঝিল। তাই আপাততঃ সে তার মনের জ্বালা মনে লুকাইয়া, বাহ্যিক সৌম্যভাব অবলম্বন করিল; এবং মেঘনাদের সংক্ষিপ্ত গৃহস্থালী গুছাইবার কাজে লাগিয়া গেল। মেঘনাদ ইহাকে সরিতের ক্ষমার পরিচয় বলিয়া ধরিয়া লইয়া, অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। সরিৎ যে এত সহজে তার কল্পিত অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিল, তাহাতে সে সরিতের চরিত্র-গৌরব অনুভব করিয়া গর্ব্বিত হইল। তা' ছাড়া, উপস্থিত গোলযোগটা যখন মিটিয়া গেল, তখন সে সময়ে শান্ত ভাবে সরিৎকে সব কথা বুঝাইতে পারিবে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

সে দিন প্রায় সমস্ত সকালটা সে সরিৎ ও অজিতের সম্বর্দ্ধনার আয়োজনে কাটাইয়া দিল। বেশ একটু ভাল খাওয়ার আয়োজন করিল। সরিৎ রাঁধিতে লাগিয়া গেল।

তা' ছাড়া, সন্ন্যাসীর গৃহস্থালীতে যে সব আরামের আয়োজন মোটেই ছিল না, মেঘনাদ সরিতের জন্য তাহার জোগাড় করিয়া আনিল। এই সব আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া, সে অজিতকে লইয়া তার সকালের কাজে বাহির হইয়া গেল।

অজিত মেঘনাদের উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া গিয়াছিল। মনোরমাকে দেখিয়া তার একবার মনে হইয়াছিল, সরিৎকে লইয়া সে তখনি চলিয়া যায়। একে তো মেঘনাদের গৃহস্থালীতে সম্পদের কোনও লক্ষণই নাই, কাজেই যেমন সুখে থাকিবার আশা লোকে আপনার কন্যা বা ভগ্নীর জন্য করে, তেমন সুখের কোনও সম্ভাবনাই নাই। তার পর সেই গৃহে অধিষ্ঠিতা এক পাপীয়সী বেশ্যা! এখানে সরিৎকে উঠিতে দিতেও তার ভাইয়ের প্রাণে ব্যথা লাগিল। কিন্তু সরিৎ যখন সব অগ্রাহ্য করিয়া শান্ত ভাবে গৃহকার্য্যে লাগিয়া গেল, তখন সে অন্যরূপ ভাবিল। তার আশা হইল যে, সরিৎ চরিত্রের বলে মেঘনাদকে ফিরাইতে পারিবে, তাহার স্কন্ধ হইতে এই প্রেতযোনকে তাড়াইয়া, নিজের সুখের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে। এই সাধু কার্য্যে অন্তরায় হওয়া ভাইয়ের পক্ষে সংকার্য্য হইবে না। তাই অজিত চুপ করিয়া গেল। সে পরদিনই ফিরিবার সঙ্কল্প করিয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছিল; কিন্তু এ সব দেখিয়া-শুনিয়া, সে কিছুদিন থাকিয়া যাওয়া স্থির করিল।

পথে সে মেঘনাদকে তার কাজকর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিল। মেঘনাদ খুব উৎসাহের সহিত উত্তর করিল না। এখন মেঘনাদের মনের অত্যন্ত অপ্রসন্ন অবস্থা; তার মনে কেবল তার জীবনের নিরাশার কথাটাই উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে বলিল, "ভগবানের ইচ্ছা নয় যে আমি কোনও একটা কাজ সার্থক করি। এখানে এসে অবধি আমি যে কাজে হাত দিচ্ছি, তাতেই বাধা পাচ্ছি। এমন বিরাট সব বাধা যে, একজন লোকের ক্ষুদ্র জীবনে তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ওঠা অসম্ভব!" বলিয়া সে কোথায় কোন্ কাজে কি রকম বিফল-মনোরথ হইয়াছে, তাহা বিস্তারিত করিয়া বলিয়া গেল। সবশেষে সে মনোরমার কথা পাড়িল। তাহার সব দোষের কথা প্রকাশ করিল। শেষে কাল রাত্রের কথা বলিয়া বলিল, "আমি ভেবেছিলাম যে, সমস্ত জীবনের অক্লান্ত সেবা ও যত্ন দিয়ে, অন্ততঃ এই একটা মেয়ের স্থায়ী হিতসাধন ক'রবো। তা' তো পারলামই না। সে আমার জীবনটাকে এমন ভাবেই জড়িয়ে ধ'রেছে যে, আমার ... বেরোবার উপক্রম হ'য়েছে। ওকে নিয়ে আমি কি যে ক... ভেবে পাচ্ছি নে।"

অজিত মেঘনাদের সাফাই সর্ব্বান্তঃকরণে অবিশ্বা... করিল; কিন্তু এই ছুতা ধরিয়া সে বলিল, "তবে ও... ভালয়-ভালয় বিদায় কর না কেন?"

"কোথায় বিদায় ক'রবো। একমাত্র বিদায় ক'রবা... জায়গা হ'চ্ছে যেখানে, সেখানে ওর শারীরিক ও আধ্যাত্মি... বিনাশ ছাড়া অন্য উপায় নেই। নিজে জেনে-শু... একটা মানুষকে এমন দুর্গতির মুখে হাতে ধরে কি ক... পাঠিয়ে দি।"

অজিত অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "আমার মনে ... যে, ওর একমাত্র উপায় হয়, যদি কেউ ওকে বি... করে।"

মেঘনাদ একটু চমকিয়া উঠিল! এই কথা সেও একদি... ভাবিয়াছিল! বেশী কথা না বলিয়া, সে কেবল বলিল, "ও... আর কে বিয়ে ক'র্‌বে?"

অজিত বলিল, "আমি কর্‌বো।"

মেঘনাদ ব্যস্ত ভাবে বলিল, "পাগল!"

"কেন, দোষ কি? তুমি ওকে বিয়ে ক'রতে পার না, ওকে কাছেও রাখতে পার না; কেন না, তোমার ... আছে। আমার তো সে বাধা নেই।"

"কিন্তু আমি তোমাকেও ওকে বিয়ে ক'রতে দিতে পা... না। তার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ, ওর যে ব্যারা... হ'য়েছে, তা'তে ওর ছেলেপিলে হ'তে দিলে, কেবল পৃথিবী... একটা দুষ্ট ব্যাধির পুষ্টি করা হ'বে মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, স্বভাব-অপরাধী; ও যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সুযো... পেলেই অপরাধ ক'রবে। এমন একটা স্ত্রী নিয়ে কার... সংসার করার মানে হ'চ্ছে, তার নিজের জীবনটা একেবা... বরবাদ ক'রে দেওয়া। তা' ছাড়া, Criminologistদের মতে এ রকম লোকের বংশবৃদ্ধি হ'তে দিলে, পৃথিবীর পাপের ভা... বৃদ্ধি করা হয় মাত্র; কেন না, ওদের বংশানুক্রমে স্বভা... অপরাধী হওয়ারই খুব বেশী সম্ভাবনা। তা' ছাড়া, তুমি হয় একটা প্রকাণ্ড ত্যাগের সঙ্কল্প করে' এ বোঝা ঘাড়ে তু... নিলে। কিন্তু তোমার বাপ-মার এতে কষ্ট হ'বে; তা আ... তাঁদের দিতে পারি না। আর, সবার উপর এই কথা...

আমি আমার পাপের বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হব, এত বড় পাপিষ্ঠ আমি নই।"

কিছুক্ষণ বাদে অজিত বলিল, "তা' না হয় নাই হ'ল। আমি তবু ওকে নিয়ে যাই। ক'লকাতায় নিয়ে ওকে একটা কোনও আশ্রম-টাশ্রমে ঢুকিয়ে দিয়ে, ওর একটা গতি ক'রতে পারবো।"

মেঘনাদ ভাবিয়া বলিল, "তাই বোধ হয় ক'রতে হবে। কিন্তু তাও আমি তোমার ঘাড়ে ওকে চাপাচ্ছি নে। ও যে ভয়ানক জন্তু, ওর হাতে তোমাকে কি কাউকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সঁপে দিতে আমার সাহস নেই।"

শেষে স্থির হইল, মেঘনাদ সেই দিনই হরিচরণকে লিখিবে, সে মনোরমার জন্য একটা উপযুক্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে কি না। হরিচরণ যদি একটা ব্যবস্থা করিতে পারে, তবে অজিত মনোরমাকে লইয়া বরাবর হরিচরণের হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া দিবে।

দুই-তিন দিন এমনি ভাবে চলিয়া গেল। সরিৎ তার দাদাকে বিদায় করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু অজিত এটা-ওটা অছিলা করিয়া, দিন কাটাইতে লাগিল। অন্তরের দারুণ বেদনা অন্তরে চাপিয়া, সরিৎ ক্লিষ্ট ও পীড়িত হইল। এমন একটা প্রলয় ঝড় বুকে বহিয়া শান্ত মুখে সে দিন কাটাইতে পারিল না। চার দিন বাদে তাহার হঠাৎ ফিট হইল। ক্রমে তার শরীর বেশী অসুস্থ হইয়া পড়িল,—বার-বার ফিট হইতে লাগিল। মেঘনাদ অস্থির হইয়া পড়িল।

শেষে অজিত বলিল, "আমি একে ক'লকাতায় নিয়ে যাই।"

মেঘনাদ সরিতের অসুখটা ঠিক ধরিতে পারিয়াছিল। সরিৎ যে মনের ভিতর একটা দারুণ বেদনার সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছে, তার সমস্ত তীব্র মনোবৃত্তি যে সে মনের ভিতর নিয়ত নিষ্পেষিত করিতেছে, এই ব্যাধিতে সে তাহা বুঝিতে পারিল। কিসের এ বেদনা, তাহাও তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। সে অজিতকে বলিল, "তুমি যদি একে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাও, তবে এ ব্যারাম সারবে না। আমার সঙ্গে যেতে হ'বে।"

তাই স্থির হইল। হরিচরণেরও চিঠি পাওয়া গেল,—সে মনোরমার জন্য সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়া, তাহাকে পাঠাইতে বলিয়াছে। কাজেই তাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাওয়া স্থির হইল। পরের দিন কলিকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা হইল।

(৩৮)

মেঘনাদ নিজেকে নিঃশেষ ভাবে সরিতের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিল। সে নিজ হাতে তাহাকে ঔষধ-পথ্য খাওয়াইত। দিন-রাত্রি সে তাহার কাছে বসিয়া থাকিত; তাহাকে উৎসাহ দিয়া, আদর করিয়া, যত্ন করিয়া সে সর্ব্বদা তাহাকে প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিত। দিবারাত্রি সে এমনি অক্লান্ত সেবা ও যত্ন করিত।

সরিতের মনের মেঘ কাটে নাই; সে সম্বন্ধে সে মেঘনাদকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলেও নাই। কিন্তু তবু মেঘনাদের যত্ন ও শুশ্রূষায় সে তৃপ্ত হইত। সে তার মনের বেদনার কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে বড় লজ্জা বোধ করিত। তা ছাড়া, সে মনে-মনে সাব্যস্ত করিয়াছিল, সে আর বাঁচিবে না। সে মরিলেই সব লেঠা চুকিয়া যাইবে,—তবে আর এ কথা লইয়া গোলমাল করা কেন? তাই সে মেঘনাদের সঙ্গে বেশ হাসিয়াই কথাবার্ত্তা বলিত।

কলিকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা স্থির হইলে, অজিত সরিৎকে তাহা জানাইল। সরিতের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অজিত আরও বলিল, মনোরমাকে লইয়া গিয়া, কলিকাতায় একটা আশ্রমে রাখিয়া দেওয়া হইবে। সে কথায় তার আনন্দ হইল,—আবার বাঁচিতে সাধ হইল; আশা হইল, কলিকাতায় গেলে সে বাঁচিতে পারিবে।

সে মেঘনাদকে বলিল, "আচ্ছা, আমার মত হ'লেও কি লোক সত্যি-সত্যি বাঁচে?"

মেঘনাদ হাসিয়া বলিল, "তোমার না বাঁচবার কোনও ব্যারামই হয় নি। ক'লকাতায় গিয়ে দু'চার দিন থাকলেই, এ ব্যারাম সেরে যাবে।"

সরিৎ বলিল, "কিন্তু ক'লকাতা পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারবো কি? আমার এই শরীর;—পাশ ফিরে শুতে কষ্ট হয়; আমাকে কি তোমরা এত দূরের রাস্তা নিয়ে যেতে পারবে?"

"পারবো গো পারবো। শুধু তাই নয়, আমি জোর করে' বলছি যে, তুমি কলকাতায় হেঁটে গাড়ীতে যেতে পারবে; আর গাড়ী থেকে নেমে একলা হেঁটে বাড়ীতে উঠতে পারবে।"

সরিৎ শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমার যা' কথা। আমার ভিতর কি হ'চ্ছে, সে কেবল আমিই বুঝ্‌ছি। তোমরা তো কিছু টের পাচ্ছ না, তাই এ কথা ব'ল্‌ছো। আমার মনে হয়, আমি ষ্টীমার পর্য্যন্তও পৌঁছব না।"

মেঘনাদ হাসিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিল। তার পর সে ও অজিত অন্য নানা কথা পাড়িয়া, তাহাকে উৎফুল্ল করিতে চেষ্টা করিল। সে সেদিন মোটের উপর বেশ ভালই বোধ করিল; এবং রাত্রে অনেক দিন পরে আপনি ঘুমাইয়া পড়িল।

সরিৎ যখন ঘুমাইল, তখন অজিত তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল। মেঘনাদ একটা স্বতন্ত্র বিছানায় ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সরিৎ ঘুমাইবার কিছুক্ষণ পরে অজিত উঠিয়া ল্যাম্পের আলোটা খুব কমাইয়া দিয়া, খুব মৃদুস্বরে মেঘনাদকে ডাকিয়া জাগাইল। মেঘনাদ সরিতের শিয়রের কাছে কোনও মতে মাথা গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল; অজিত অপর বিছানায় গিয়া ঘুমাইল।

গভীর রাত্রে মেঘনাদ একটা শব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠিল। অস্পষ্ট আলোকে অজিতের শিয়রের কাছে একটা লোক দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া, লাফাইয়া উঠিয়া বাতি চড়াইয়া দিল। যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার গায়ের রক্ত হিম হইয়া গেল।

অজিত একগঙ্গা রক্তের মধ্যে শুইয়া আছে। তার শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া মনোরমা তার হাতের মধ্যে একটা ক্ষুর গুঁজিয়া দিতেছে। অজিতের গলা কাটা। ক্ষুরখানা অজিতের।

আলো বাড়িতেই মনোরমা চমকিয়া উঠিল। সে মেঘনাদের মুখের দিকে চাহিয়াই অজিতের দিকে চাহিল। ভ্রূকুটী করিয়া সে তাড়াতাড়ি অজিতের নিশ্চল হস্ত হইতে ক্ষুরখানা তুলিয়া লইতে গেল। মেঘনাদ মনে করিয়া সে অন্ধকারে অজিতকে খুন করিয়াছিল। এখন সে মরিয়া হইয়া জাগ্রত অবস্থাতেই মেঘনাদকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিল।

একটা অন্ধ উত্তেজনা-বশে মেঘনাদ চীৎকার করিয়া মনোরমার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল; এবং তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া চেঁচাইতে লাগিল। সরিৎ লাফাইয়া উঠিল। একবার সে দিকে চাহিয়াই, সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

পাশের বাড়ীর লোক তাড়াতাড়ি আসিয়া জুটিল। মনোরমার হাত-পা বাঁধিয়া, তাহারা প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎকে ডাকিতে পাঠাইল। মেঘনাদ কম্পিত হস্তে সরিতের শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিল।

* * * *

মনোরমা আবার আদালতে। মেঘনাদ তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। মেঘনাদের মনে হইল আর এক দিনের কথা, যে-দিন মনোরমাকে ফাঁসি হইতে বাঁচাইবার জন্য সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল। সমস্ত অতীতটা তা'র চক্ষে ছবির মত ভাসিয়া উঠিল; কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সে সেই অতীতের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সে কথা ভাবিতে আজ সে শিহরিয়া উঠিল।

মনোরমা তাহার উত্তরে বলিয়াছিল যে, মেঘনাদ তাহার জার। সেইজন্য অজিত মেঘনাদকে তিরস্কার করে। সেই রাগে মেঘনাদ তাহাকে হত্যা করিয়াছে। মনোরমা শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া যাইতেই, মেঘনাদ তাহাকে ধরিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল।

বিচারে এ কথা টিকিল না,—মনোরমার মৃত্যুদণ্ড হইল।

মৃত্যুর পূর্ব্বে মনোরমা মেঘনাদকে একবার দেখিতে চাহিয়াছিল। মেঘনাদ তখন কলিকাতায়। তাহার শ্বশুর ও শাশুড়ী তখন শোকে আচ্ছন্ন। সরিৎ শয্যাগত। তার মুহুর্মুহুঃ ফিট হয়; থাকিয়া-থাকিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠে; এবং প্রায়ই সম্বিৎশূন্য হইয়া পড়ে। ডাক্তাররা তাহাকে লইয়া ভয়ানক বিব্রত। সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, সরিৎ হয় তো পাগল হইয়া যাইবে।

মেঘনাদ মনোরমার সঙ্গে দেখা করিল না।

(সমাপ্ত)

মৌর্য্যযুগে ভারত

[অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ]

কিছু দিন পূর্ব্বেও ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকগণ ভারতেতিহাসের আলোচনা-কালে ভারতবাসিগণের এ বিষয়ে কৃপণতার উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিতেন। কিন্তু সুখের বিষয়, এখন আর তাঁহারা আমাদিগকে সে দোষে দোষী করিতে পারেন না, এবং চাহেনও না। বর্ত্তমানে ভারতেতিহাসের পর্য্যালোচনা-কল্পে বহু ভারতবাসীকে কায়মনোবাক্যে ব্রতী দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই বিষয়ে উৎসাহ দৃষ্ট হইতেছে। আমাদের বঙ্গদেশ এই বিষয়ে যে বিশেষ রূপ অগ্রণী, তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। অন্য কারণের সহিত, পূজনীয় স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতেতিহাস শিক্ষার ও আলোচনার যে প্রকৃষ্ট পন্থাবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ রূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফলে, দিন-দিন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইতেছে; এবং আমরা আমাদের মাতৃভূমির প্রকৃত ইতিহাস শিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছি। (১)

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে আধুনিক কালে যে সকল আবিষ্কার হইয়াছে, তন্মধ্যে মহীশূরের রাজকীয় পুস্তকাগারাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্যাম শাস্ত্রী কর্ত্তৃক চাণক্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রের আবিষ্কার নানা কারণে প্রধান স্থান পাইতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় শাসন, আইন, বাণিজ্য, যুদ্ধ-সংক্রান্ত সকল বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতীয় নিয়মতন্ত্রের উৎপত্তি ও উন্নতির বিবরণ জানিতে হইলে, এই পুস্তক পাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য। (২)

অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিলে, মৌর্য্যযুগে ভারতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য মৌর্য্য সম্রাটগণ কিরূপ প্রয়াস পাইতেন, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এ উন্নতির জন্য তাঁহারা অনেকগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন আমরা সর্ব্বপ্রথমে এই সকল কর্ম্মচারীদের উল্লেখ ও তাঁহাদের কার্য্যাবলী আলোচনা করিব।

[১] এই সকল রাজকর্ম্মচারীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে আকরাধ্যক্ষের উল্লেখ করা যাইতে পারে (৩)। ইঁহাকে তাম্র ও অন্যান্য ধাতু শাস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শী, নিঃসরণ ও রসপাকাভিজ্ঞ, এবং রত্ন পরীক্ষায় সুদক্ষ হইতে হইত। ইঁহার সঙ্গে ধাতু বিদ্যায় পারদর্শী উপযুক্ত কারিকর থাকিত উপযুক্ত যন্ত্রাদি সহযোগে ইঁহাকে,—যে সকল আকরে কিট্ট মুচি, কয়লা এবং ভস্ম থাকার জন্য পূর্ব্বে কার্য্যারম্ভ হইয়াছে এরূপ বোধ হইত, অথবা গুরুতর বর্ণ, ও উগ্রগন্ধ দ্বারা যে সকল সমতল ভূমিতে বা সানুদেশে ধাতু থাকা সম্ভব বোধ হইত, তাহা পরীক্ষা করিতে হইত। ধাতুদ্রব্যজাত পণ্যের ব্যবসায় কেন্দ্রীভূত হইত; এবং নির্দ্ধারিত স্থানের বহির্দ্দেশে ব্যবসায় করিলে, শিল্পী, ক্রেতা ও বিক্রেতার দণ্ড হইত। কৌটিল্য উপদেশ দিয়াছেন যে, খনিজ ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে রাজার একচেটিয়া ক্ষমতা থাকাই সমীচীন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে, মৌর্য্যযুগে, শুধু মৌর্য্যযুগে কেন, প্রাচীন ভারতে আকর সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য, আমাদের জ্ঞান মেগস্থেনিসের বৃত্তান্তেই

---

(১) অর্থাভাব, উৎসাহের দৈন্য, গুণগ্রাহিতার অভাব প্রভৃতি কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক, পার্লিমেন্টের সভ্য এবং রাজকীয় ঐতিহাসিক সমিতির সভাপতি মাণ্যবর ওমান্ সাহেব সম্প্রতি আমাকে লিখিয়াছেন, It is a sad pity that while we have so much reigious, literary and philosophical materials in early books, no one wrote definite *history as history* till a very late date in India" কলঙ্ক বাদ হইয়াছে, তাহার প্রতীকারের একমাত্র উপায় ইতিহাসের স্তায় ইতিহাস লেখা। যে সুগতাস বাহতে আরম্ভ হইয়াছে; মনে হয়, তাহাতে এ কলঙ্ক মোচন হইবেই হইবে।

(২) "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'ভারতীয় অর্থশাস্ত্র" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। মৎ-সম্পাদিত অর্থশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ ৩-৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কৌটিল্যের পুস্তক প্রণিধান করিতে হইলে কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের "Studies in ancient Indian Polity" অবশ্য পাঠ্য।

(৩) "অর্থশাস্ত্র" (বঙ্গানুবাদ) ৯২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সীমাবদ্ধ ছিল। মেগস্থেনিস্ বলিয়াছেন, "ভূমির উপরিভাগে যেরূপ সকল প্রকার কৃষিজাত শস্য উৎপন্ন হয়, ইহার নিম্ন-দেশে সেইরূপ সকল প্রকার ধাতুর খনি আছে। প্রচুর পরিমাণে যে সুবর্ণ, রৌপ্য তাম্র, লৌহ টিন এবং অন্যান্য ধাতু পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা আবশ্যক দ্রব্যাদি ও অলঙ্কার এবং যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র ও উপকরণাদি প্রস্তুত হয়। (৪) মেগস্থেনিসের এই যৎসামান্য বৃত্তান্তে আমরা ভারতের তাৎকালীন আকরিক শিল্পের আংশিক নিদর্শনই পাই। কৌটিল্যে আমরা যে অধিকতর পরিস্ফুট চিত্র পাই, তাহার আভাষ আমরা নিম্নে প্রদান করিতেছি।

আমরা পূর্ব্বেই আকরাধ্যক্ষের কথা এবং তাঁহার ও তাঁহার সহকারীদের কার্য্যাবলীর কথার উল্লেখ করিয়াছি। তৎকালে তাঁহাদের কার্য্য স্থলভূমি এবং পার্ব্বতীয় প্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শঙ্খ, হীরক, মূল্যবান প্রস্তর, মুক্তা, প্রবাল এবং লবণের জন্য সামুদ্রিক আকরসমূহও অনুসন্ধান করা হইত। ইহা হইতে বুঝা যাইতে পারে যে, এই উদ্দেশ্যে সমুদ্রের সারোদ্ধার করা হইত।

চাণক্য যে রূপে আকরসমূহ শ্রেণীবদ্ধ এবং তাহাদের শুদ্ধ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন, তাহা হইতে বেশ অনুমিত হয় যে, তাৎকালীন তথাকথিত "অসভ্য সমাজেও") দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য মৌর্য্য নৃপতিগণ আকরের কাজের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন।

আকর হইতে দশ প্রকারের আয় হইত উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য, উৎপাদিত দ্রব্যের অংশ, পঞ্চমাংশ ব্যাজী, মুদ্রা পরীক্ষার জন্য শুল্ক, আত্যয়, শুল্ক, রাজকীয় বাণিজ্যের লোকসানের জন্য ক্ষতিপূরণ, দণ্ড, রূপ (মুদ্রা এবং শতকরা ৮ রূপিকা বা "প্রিমিয়ম্"।

কৌটিল্য উপদেশ দিয়াছেন যে, অত্যধিক ব্যয় না করিয়া যে সকল আকরে কার্য্য করা অসম্ভব, সেগুলি রাজা নিজ হস্তে রাখিবেন। তাঁহার মতে আকর ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত সকল কার্য্যই রাজা কেন্দ্রীভূত করিয়া, নিজেই তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবেন। যাহাতে স্বল্প পরিশ্রমে ও স্বল্প ব্যয়ে আকরের কার্য্য হইতে পারে, তাহার উপর দৃষ্টি রাখা হইত। বাণিজ্য-পথ যাহাতে আকরাদির সন্নিকট হইতে পারে, তজ্জন্য উপদেশ দেওয়া হইত।

(৪) "সমসাময়িক ভারত" (দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা।)

[২] লোহাধ্যক্ষ নামক অন্যতম কর্ম্মচারী তা[ম্র], সীসক, টিন, পারদ, পিত্তল, কাংস্য, তাল, লোধ্র এবং এ[ই] সকল ধাতুজ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেন।

[৩] লক্ষণাধ্যক্ষ (৫) নানা প্রকার রৌপ্য ও সীস[ক] অঞ্জন প্রভৃতি দ্বারা রৌপ্য নির্ম্মাণে ব্রতী থাকিতেন।

[৪] রূপদর্শক নামে পরিচিত রাজকর্ম্মচারী ব্যবহা[র] এবং বিনিময়ের উপযোগী মুদ্রা পরীক্ষা করিতেন। এই প্রস[ঙ্গে] কৌটিল্য যে সকল নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদ্দৃ[ষ্টে] সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মুদ্রার বিশুদ্ধতা রক্ষণে রাজ কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। মুদ্রার বিশুদ্ধতা-সহিত যে বৈদেশিক বাণিজ্য-বৃদ্ধির বিশেষ সম্পর্ক ছিল, তাহ[া] বলা বাহুল্য।

[৫] সমুদ্র-মধ্যস্থ আকরাদির উপর যে দৃষ্টি রা[খা] হইত, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সমুদ্রমধ্য-[স্থ] শঙ্খ, হীরক, মূল্যবান প্রস্তর, লবণ সংগ্রহ ও এই সক[ল] পণ্যের বাণিজ্যের প্রতি একজন কর্ম্মচারীকে দৃষ্টি রাখিতে হইত।

[৬] সুবর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার নির্ম্মাণের জন্য সুবর্ণাধ্য[ক্ষ] ছিলেন। ইঁহার অধীনে একজন রাজকীয় সৌবর্ণি[ক] থাকিতেন। অলঙ্কার ব্যতীত ইঁহাকে সুবর্ণ ও রৌপ্যমুদ্[রা] প্রস্তুতকারী শ্রমিকগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইত। [এ] সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইত।

[৭] একজন কোষাগারাধ্যক্ষ থাকিতেন। তি[নি] কৃষিজাত দ্রব্য, রাষ্ট্র-সংক্রান্ত রাজকর, বাণিজ্য, বিনিম[য়] প্রামিত্যক আপমিত্যক, সিংহনিক, অন্যজাত, ব্যয়প্রত্যায় এবং উপস্থান সংক্রান্ত হিসাব রক্ষণ ও পরিদর্শন করিতেন এই প্রকারে সংরক্ষিত দ্রব্যাদির অর্দ্ধাংশ জনসাধারণে[র] আপদের জন্য রক্ষা করিতে হইত মাত্র, অপরার্দ্ধ ব্যয় করিতে হইত। অধিকন্তু নূতনের সহিত পুরাতনের পরিবর্ত্তন করি[য়া] লইতে হইত।

[৮] পণ্যাধ্যক্ষ নামে অন্য একজন কর্ম্মচারী থাকিতেন তাঁহাকে স্থলজ বা জলজাত পণ্য এবং যে সকল পণ্য নদী স্থলপথে আনীত হইয়াছে, তাহাদের (৬) ব্যাপকতা-

(৫) টীকাকার "টঙ্কশালাধিকারী" লিখিয়াছেন।

(৬) অর্থশাস্ত্র, বঙ্গানুবাদ। ১১১ পৃষ্ঠা।

মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিতে হইত। যে সকল পণ্য নানা দেশে পাওয়া যাইত, তাহা একস্থানে একত্র করিয়া উহাদের মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইত। রাজকীয় ভূমিতে যে সকল পণ্য উৎপাদিত হইত, তাহাও একত্র করিতে হইত। বৈদেশিক পণ্য ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে রক্ষিত হইত। চাণক্য নিয়ম করিয়াছিলেন, "প্রজাকে উভয় প্রকার পণ্যই সুবিধাজনক দরে বিক্রয় করিতে হইত। যাহাতে প্রজার ক্ষতি হয়, রাজা সেরূপ উচ্চ মূল্য গ্রহণ করিতেন না।"

কৌটিল্যের দ্বিতীয় ভাগের ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত এই পণ্যাধ্যক্ষ ও তাঁহার কার্য্যাবলী পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইত। বৈদেশিক পণ্য আমদানী-কারকগণের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইত। যে সকল নাবিক ও সার্থবাহ বৈদেশিক পণ্য আনয়ন করিতেন, তাঁহারা শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইতেন। রাজকীয় পণ্য বিদেশে বিক্রয় করিতে হইলে, নিম্নলিখিত প্রথা অবলম্বন করা হইত:—"বৈদেশিক ও স্থানীয় পণ্যের বিনিময়ের তুলনা করিয়া শুল্ক, বর্ত্তনি (রোড-সেস্), অতিবাহিক (যানকর), গুল্মদেয় (দুর্গে প্রদত্ত কর), তরদেয় (খেয়া-ঘাটে দত্ত করবিশেষ) ভক্ত (বণিক্ ও তাহার কর্ম্মচারীদের বেতন) এবং ভাগ (বৈদেশিক রাজাকে পণ্যের যে অংশ প্রদান করা হইবে)—এই সকল বায় করিয়া লভ্যাংশ থাকে কি না, উহা অধ্যক্ষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। যদি লভ্যাংশ না থাকে, দেশজাত পণ্যের সহিত বৈদেশিক পণ্যের বিনিময় করিলে লাভ হয় কি না, অধ্যক্ষ বিবেচনা করিবেন। যদি লাভ হয় এরূপ বোধ করেন, তবে তিনি স্থলপথে তাঁহার পণ্যের চতুর্থাংশ ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিতে পারেন। যে বণিক্‌কে পণ্যাধ্যক্ষ এই কার্য্যে বিদেশে প্রেরণ করিবেন, তিনি অধিক লাভের জন্য সীমান্ত-রক্ষক এবং নগর ও জনপদের কর্ম্মচারিগণের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিবেন। যদি তিনি নির্দ্ধারিত স্থানে না পৌঁছিতে পারেন, তবে তিনি সুবিধা বুঝিয়া পণ্য বিক্রয় করিবেন।

যাহাতে ভবিষ্যতে কোনরূপ প্রতিবন্ধক বা অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য বণিক্ যানভাগ, দেশীয় পণ্যের বিনিময়ে বৈদেশিক পণ্যের মূল্য, যাত্রাকালে পথিমধ্যে বিপদ প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ এবং বাণিজ্যক নগরসমূহে ইতিহাস সংগ্রহ করিতে আদিষ্ট হইতেন।

[৯] বর্ত্তমানে ইংরাজ-সরকার বনভূমি রক্ষণে বিশেষ তৎপরতা দেখাইয়া থাকেন। মৌর্য্যযুগেও বনভূমির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। বনভূমি হইতে যাহাতে আয় হয়, তাহার চেষ্টা করা হইত।

[১০] শুল্কাধ্যক্ষ নামক অন্যতম কর্ম্মচারী নগরের সিংহদ্বারের নিকট উত্তর বা দক্ষিণাভিমুখী করিয়া শুল্কগৃহ এবং শুল্কধ্বজ স্থাপন করিতেন। বণিকগণ পণ্য সহ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে, শুল্ক-আদায়কারীগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিতেন—বণিকগণ কে, কোন্ স্থান হইতে তাহারা আগমন করিল, কত পণ্য তাহারা আনয়ন করিয়াছে, এবং প্রথম কোন্ স্থানে তাহাদের পণ্যের উপর অভিজ্ঞান মুদ্রা দেওয়া হইয়াছে। আমদানী ও রপ্তানী পণ্যের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইত।

পণ্যসমূহকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইত (৭)। বাহ্যিক (প্রদেশজাত), আভ্যন্তরীণ (দুর্গমধ্যে প্রস্তুত), বৈদেশিক পণ্যসমূহকে সাধারণতঃ এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইত। অযথা মূল্য-বৃদ্ধির প্রতিবিধান করা হইত। এরূপ ক্ষেত্রে শুল্ক ও বর্দ্ধিত মূল্য রাজকোষে প্রদান করা হইত। পণ্যসমূহকে ঠিক ভাবে তৌল করিয়া সংখ্যাভুক্ত করা হইত। আমদানী বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইত, অথচ রপ্তানীর প্রতিবন্ধক করা হইত না।

[১১] সূত্রাধ্যক্ষ নামক কর্ম্মচারী সূত্র, বর্ম্ম, বস্ত্র এবং রজ্জু নির্ম্মাণে উপযুক্ত শ্রমিক নিযুক্ত করিতেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষ বয়নশিল্পে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। মৌর্য্যযুগেও যে সকল শিল্পী উৎকৃষ্ট বস্ত্র, পরিচ্ছদ, রেশমী ও পশমী বস্ত্র এবং উত্তম সূত্র প্রস্তুত করিতে পারিত, তাহাদিগকে গন্ধ, মাল্য এবং অন্যান্য উপহার প্রদান করিয়া উৎসাহ দেওয়া হইত। তাৎকালীন অধিবাসীবৃন্দের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার বস্ত্রই মৌর্য্যরাজ্যে প্রস্তুত হইত।

[১২] কৃষিতন্ত্র এবং গুল্ম, বৃক্ষ ও আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ সীতাধ্যক্ষ স্বয়ং বা যাহারা এই সকল বিদ্যায় পারদর্শী, তাহাদিগের সাহায্যে শস্য, পুষ্প, ফল, শাক, কন্দ, মূল, ক্ষৌম ও

(৭) অর্থশাস্ত্র ১২৮ পৃষ্ঠা।

কার্পাসের বীজ যথা সময়ানুসারে সংগ্রহ করিতেন। তৎকালে, বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধীয় জ্ঞানে ভারতবাসী প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। অর্থশাস্ত্রের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় পাঠে ইহা সুপ্রতীয়মান হয়।

[১৩] নাবধাক্ষ নামক কর্ম্মচারীকে সমুদ্রগামী ও নদীগামী জাহাজ, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম হ্রদ ও স্থানীয় অন্যান্য সুরক্ষিত দুর্গের নিকটবর্ত্তী নদীতে গমনাগমনকারী জাহাজের হিসাব পরীক্ষা করিতে হইত (৮)। বাণিজ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। পণ্য-পত্তনে বাত্যাহত কোন জাহাজ উপনীত হইলে, পত্তনাধ্যক্ষকে তাহার প্রতি অনুগ্রহ দেখাইতে হইত। যে সকল জাহাজের পণ্য জলদুষ্ট হইত, তাহাদিগকে শুল্ক হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত, অথবা অর্দ্ধেক পরিমাণে শুল্ক গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করিবার অনুমতি দেওয়া হইত। হিংস্রিকা (দস্যু জাহাজ) সমূহকে বিনষ্ট করা হইত। বৈদেশিক বণিকগণের সুবিধার্থ তাহাদিগকে নির্ব্বিরোধে পণ্যপত্তনে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত।

চন্দ্রগুপ্তের সময়ে প্রচলিত এই সকল নিয়মাদি যে অশোকের সময়েও প্রচলিত ছিল, তাহা ভিন্সেন্ট স্মিথ্ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ, বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর আখ্যান পাওয়া যায়। তাহাতে কথিত হইয়াছে যে, এক দিবস মৌর্য্যসম্রাট্ অশোক পাটলিপুত্র রাজধানীতে সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, এমন সময়ে বৈদেশিক রাজ্যে বাণিজ্যব্রত কয়েকজন ভারতীয় নাবিক তাঁহার নিকট নিবেদন করিল যে, জলদস্যুগণের উপদ্রবে বৈদেশিক বাণিজ্য নষ্ট হইতেছে; এবং যদি রাজচক্রবর্ত্তী উঁহাদিগকে দমন না করেন, তবে তাহারা বাধ্য হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে; এবং তাহা হইলে রাজকোষের আয়ও হ্রাস পাইবে। অশোক উপদ্রব নিরাকরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

মৌর্য্যযুগে এই সকল কর্ম্মচারী দ্বারা দেশের আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইত।

চাণক্য লিখিয়াছেন, বাণিজ্যের উন্নতি হইলে, দেশের আর্থিক উন্নতি হয়। আমরা ইতঃপূর্ব্বে নাবধ্যক্ষ ও পণ্যাধ্যক্ষ নামক কর্ম্মচারীদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহাদের কর্ত্তব্যের কথাও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বৈদেশিক বণিকদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের কথাও প্রকাশ করিয়াছি। স্থল ও জল উভয় পথে যাহাতে বণিকগণ সহজ উপায়ে পণ্যাদি বহন করিতে পারেন, তজ্জন্য চাণক্য উপদেশ দিয়াছেন। বণিকগণের লোক্সান হইলে রাজ-কর্ম্মচারী তাহা পূরণ করিয়া দিতেন।

এই প্রসঙ্গে গ্রীক দূত মেগস্থেনিস্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "ভারতবাসীদের মধ্যে বৈদেশিকগণের জন্যও কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এই সকল কর্ম্মচারী, যাহাতে কোন বৈদেশিকই ক্ষতিগ্রস্ত না হন, তাহা ব্যবস্থা করেন। বৈদেশিকগণের কেহ পীড়িত হইলে এই সকল কর্ম্মচারী চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক আনয়ন করেন এবং অন্যান্য প্রকারে সেবা-শুশ্রূষা করেন। বৈদেশিকের মৃত্যু হইলে, তাঁহাকে প্রোথিত করেন; এবং মৃতের ত্যক্ত সম্পত্তি তাঁহার আত্মীয়গণের হস্তে প্রদান করেন। বৈদেশিকগণ যে সকল মোকদ্দমায় লিপ্ত থাকেন, বিচারকগণ সেই সকল বিষয় সূক্ষ্মভাবে বিচার করেন; এবং যাহারা বৈদেশিকদের সহিত অন্যায় ব্যবহার করে, তাহাদের যথোচিত শাস্তি প্রদান করেন (৯)।" তাই ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ্ বলিয়াছেন যে, এই সকল নিয়মাবলী দর্শনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্যরাজত্বের সহিত বৈদেশিক দেশসমূহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল; এবং বহু সংখ্যক বৈদেশিক কার্য্য-ব্যপদেশে রাজধানীতে আগমন করিত (১০)। তাই অন্যতম গ্রীক লেখক বলিয়াছেন যে, জাহাজ নির্ম্মাতৃগণ এবং নাবিকগণকে কোন কর দিতে হয় না; অধিকন্তু, তাহারা সরকার হইতে বেতন পায় (১১)। এই সকল কারণেই পূজনীয় জ্ঞানী ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলিয়াছেন যে, দুইশত বৎসর পূর্ব্বে সভ্য-জগতে ভারতবর্ষের যে স্থানে ছিল, তাহা পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস লেখকগণ যেন লক্ষ্য করেন। কেবল যে সামাজিক, নৈতিক বা কলা সংক্রান্ত ব্যাপারেই ভারতবর্ষ প্রধান স্থান অধিকার

(৮) অর্থশাস্ত্র ১৩৭ পৃষ্ঠা।

(৯) 'সমসাময়িক ভারত,' দ্বিতীয় খণ্ড—৫০ পৃষ্ঠা ও ১২০ পৃষ্ঠা।

(১০) ইতিহাস, ১২৭ পৃষ্ঠা।

(১১) 'সমসাময়িক ভারত,' দ্বিতীয় খণ্ড—১১১ ও ১১৮ পৃষ্ঠা।

করিয়াছিল তাহা নহে; বাণিজ্যিক, ঔপনিবেশিক, এবং শিল্প-ক্ষেত্রেও সে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল (১২)।

মৌর্য্যযুগের এই সকল বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে, তাৎকালীন যুগের জাহাজ নির্ম্মাণের ইতিহাস আলোচনা করা অতীব আবশ্যক। ঐ সম্বন্ধে বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মূল্যবান পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিব।

যাঁহারা আলেক্‌জান্দারের অভিযানের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন (১৩), তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, আলেক্‌জান্দার তাঁহার সৈন্যদের জন্য ভারতীয় নৌবাহিনী ব্যবহার করিয়াছিলেন। ভারতীয় নাবিকের সাহায্যেই তিনি সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অপিচ, আলেক্‌জান্দার যখন তাঁহার নৌসেনাপতি নিয়াকাসের (১৪) অধীনে সিন্ধুনদ হইয়া সমুদ্রাভিমুখী অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন জাত্রই নামক এক ভারতীয় জাতি (১৫) তাঁহাকে ত্রিংশতিক্ষেপণী-সংযুক্ত নৌকা ও পারাপারের প্রয়োজনীয় নৌকা সরবরাহ করিয়াছিল। মাসিদন-বীরের দ্বিসহস্র তরণীর অধিকাংশ যে ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ডাক্তার ভিন্‌সেণ্ট নামক সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক বলিয়াছেন যে, আইন আকবরীর সময়ে সিন্ধু ও তাহার শাখায় বাণিজ্যার্থ চল্লিশ সহস্র নৌকার গতিবিধি ছিল। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, আলেক্‌জান্দারের সময়ে তাঁহার লক্ষাধিক সৈন্যের প্রয়োজনীয় নৌবাহিনী পঞ্চনদেই প্রস্তুত হইয়াছিল। অন্য একজন লেখক প্রসঙ্গান্তরে লিখিয়াছেন যে সেমিরামিসের অভিযানের সময় পঞ্চনদে ৪০,০০০ নৌকা তাঁহার গতিরোধার্থ সমবেত হইয়াছিল। (১৬) মেগস্থেনিস্ যে নাবধ্যক্ষের কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। চাণক্য পাঠেই ইহাও প্রতীয়মান হয় যে তাৎকালীন হিন্দুগণ কূপমণ্ডুক ছিলেন না। উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শিল্পোন্নতির জন্যও বিশেষ চেষ্টা করা হইত। শিল্পীগণ কেবল যে কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইত তাহা নহে; তাহারা রাজকোষ হইতে ভরণ-পোষণ পাইত। কেহ শিল্পীর অঙ্গহানি করিলে বিশেষ রূপে শাস্তি পাইত। শিল্প রক্ষণার্থই আমাদের মনে হয় যে গ্রীক্ লিখিত 'বোর্ডের' কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এবং এই জন্যই চাণক্য বিশেষ ভাবে শিল্পীদের কথা নিজ গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণাদি পাঠ করিলে মনে হয় যে, মৌর্য্যযুগে দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য নৃপতিগণ বদ্ধপরিকর ছিলেন; এবং তাহার ফলে দেশে নানা দিকে নানা প্রকারেই এই উন্নতি উপলব্ধি হইত। আজকাল আমাদের দেশে শিল্পোন্নতির জন্য চতুর্দ্দিকে যে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী; এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিল্প-শিক্ষার প্রসারার্থ যে উদ্যোগ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা যে সময়োপযোগী হইয়াছে তাহাও বলা বাহুল্য। (১৭)

(১২) Dr. Mookerjee's "History of Shipping and Maritime activity."

(১৩) "সমসাময়িক ভারত," চতুর্থ খণ্ড।

(১৪) "সমসাময়িক ভারত", তৃতীয় খণ্ড।

(১৫) ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করেন।

(১৬) রাজ্ঞী সেমিরামিসের অভিযান "সমসাময়িক ভারত" প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৭) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত বক্তৃতার সারাংশ।

দাক্ষিণাত্যের একদিক

[শ্রীমোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি-এল্]

মানুষের প্রস্তাবগুলির গতিনির্দ্দেশ স্বয়ং ভগবান্ করিয়া দেন,—এই ইংরাজী প্রবাদটির সত্যটুকু জীবনের অনেক ঘটনার ভিতর দিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাসিত হয় বটে, কিন্তু, এবারকার ঘটনায় যেমন সে সত্যটির প্রত্যক্ষানুভূতি হইয়াছে, এমন আর কখনও হয় নাই। এক সহস্র মাইলের উপর দেশ পর্য্যটন ব্যাপারে মনের মত সঙ্গীর সংযোগ না ঘটিলে প্রায়ই তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না,—অন্যান্য বিঘ্নপাত সম্ভাবনার কথা ছাড়িয়াই দিই। পুরী যাইব কি না যাইব, ভাবিতে ভাবিতে যখন পুরী-গমন বাস্তবে সহসা পরিণত হইয়া গেল, তখন উক্ত সত্যটির ক্ষীণ আভাসটুকু মাত্র পাইলাম।

দৈনিক কর্ম্মের উৎপীড়নে অবসন্ন মানবের অবকাশ-সময় পর্ব্বতের বা সমুদ্রের গম্ভীর সৌন্দর্য্য দর্শনে ও উপভোগে যেমন সুন্দর ভাবে অতিবাহিত হয়, এমন বুঝি আর কিছুতেই হয় না। পর্ব্বতের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ইতঃপূর্ব্বেই হইয়াছিল। কিন্তু সমুদ্র সম্বন্ধে এই প্রথম পরিচয়ের পূর্ব্বে আমার যে ধারণা ছিল, তাহা দৃষ্টি মাত্রেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মনে করিতাম, সমুদ্র বুঝি অতি বহুদুর-বিস্তৃত, অসীম, স্থির, শান্ত, গম্ভীর, নীলাভ লবণাম্বুরাশি। অবশ্য সেই বিপুল নীল জলরাশির বিরাট বিস্তৃতি যে প্রায় অসীম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তটভূমির নিকট যেখানে সমুদ্র নিতান্ত অগভীর, এবং বালুরাশির খনিবিশেষ হইয়া আছে, সেখানে আদৌ তথাকল্পিত শান্ত গাম্ভীর্য্যের চিহ্ন মাত্রও নাই। তীরে দৃষ্টিপাত মাত্রেই দিগন্তবিস্তৃত উত্তাল উদ্বেগ-সঙ্কুল শুভ্র-ফেনিল বীচিমালার প্রচণ্ড সংঘাত-প্রতিঘাত অবিরত, কি দর্শন কি শ্রবণ উভয় ইন্দ্রিয়েরই যুগপৎ এক বর্ণনাতীত, বিস্ময়-বিজড়িত ভীতি-বিহ্বলতার উৎপাদন করে। এই ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত, বিকার-গ্রস্ততার সীমা অতিক্রম করিলেই, সমুদ্রের সর্ব্বত্র এক অনন্ত অপরিমেয় বিরাট গম্ভীর সংযমের রাজ্য বিস্তৃত। তটের নিকটে যে ঘোর ভীমনাদী অবিশ্রান্ত-গর্জ্জন আপন শক্তিক্ষয়জনিত অবসাদে, কখনও ক্লান্ত হওয়ার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখায় না, তাহা তীর-নিবাসীদের নিকট প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রবল ঝঞ্ঝার হুঙ্কার বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

পুরীর মাহাত্ম্য অবশ্য জগন্নাথদেবকে লইয়া। আর ভারতবর্ষের চারিটি তীর্থধামের মধ্যে পুরী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ৺বিমলাদেবীর ক্ষেত্র বলিয়াও শ্রীক্ষেত্রের এত প্রসিদ্ধি। মন্দিরের তথ্য তথা হিন্দুস্থাপত্য-বিদ্যার উৎকর্ষাদির আলোচনা ইহার পূর্ব্বে যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে; আমার নূতন বলিবার কিছুই নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য চারিটি ধামে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পুরীর শঙ্কর-মঠের নাম গোবর্দ্ধন মঠ। সে মঠের অধ্যক্ষের সহিত ক্ষণকাল কথোপকথন করিলে মন-প্রাণ তৃপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। তিনি একজন সুপণ্ডিত, ব্রহ্মচারী, বৈদান্তিক-কুলচূড়ামণি, অসাধারণ জ্ঞানী, সংসার-বিরাগী,—নাম শ্রীশ্রীমধুসূদন তীর্থস্বামী বাবাজী। গোবর্দ্ধন মঠে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত শঙ্কর-মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর, বাস্তবিকই নয়নাভিরাম; ছদ্মবেশী ভগবানের স্মিতানন-শোভিত বালক মূর্ত্তির জীবন্ত আভাস। আর এই সময়ে (গত কার্ত্তিক মাসে) পুরীতে আর একজন মহাপুরুষ উপস্থিত ছিলেন। নাম বিমলানন্দ স্বামী। তিনিও অতি বৃদ্ধ এবং কর্ম্মযোগী। তিনি অনবরতই পরম নাদের অব্যাহত ধ্বনি শুনিতেছেন—কর্ণেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাহ্য-ধ্বনি আর প্রবেশ করে না।

প্রত্যেক প্রধান-প্রধান তীর্থস্থানে যেমন শ্রেষ্ঠতম মন্দিরটির চতুষ্পার্শ্বে ও সান্নিধ্যে ছোট-ছোট মন্দিরের অভাব হয় না, পুরীতে ও ভুবনেশ্বরেও তাই। তবে এই দেবদেবীর বিগ্রহ-মন্দিরাদির জন্য পুরীর যে সনাতন মাহাত্ম্য আজও অটুট রহিয়াছে, তাহার আর একটি প্রধান কারণ হইতেছে নিকটে সমুদ্র। সমুদ্রের গর্জ্জন, ভীষণতা, অসীমতা ও বিরাট গাম্ভীর্য্য একবেয়ে হইলেও কখনও পুরাতন হইবার নহে। যতই দেখি, যতই স্নান করি, আশা আর মেটে না। স্বাস্থ্যের উপকারিতার কথা ছাড়িয়াই দিই।

পুরী আসার সময় আর কোথাও যে পর্য্যটনে বহির্গত

হইব, ইহা স্বপ্নের অগোচর ছিল। সঙ্গের গুণ এম্‌নি, আর বিশ্ব-নিয়ন্তার কৌশল এম্‌ন যে, দু' এক দিনের মধ্যে জন-কয়েকে মিলিয়া সহসা সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাত্রা করিবার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া উঠিলাম। রামেশ্বরের মন্দির রামেশ্বরম্ নামক দ্বীপে অবস্থিত। রামেশ্বর দ্বীপটি ভারতবর্ষের বাহিরে এবং সেতুর দ্বারা ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত। এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে ট্রেণেও বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হইবে; সুতরাং পথিমধ্যে প্রধান-প্রধান স্থানে অবতরণ ও পরিভ্রমণ করিতে-করিতে রামেশ্বরে যাওয়া ও সেখান হইতে ফেরা হয়।

যাহা নাই ভারতে তাহা নাই জগতে,—এই ভাবে চির-প্রসিদ্ধ প্রবাদটির অল্প পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আর যতই দেখা যায়, ততই এ কথাটির গভীরতা উপলব্ধি হয়। প্রকৃতি দেবীর অনন্ত বৈচিত্র্যের অক্ষয় আস্পদ এই ভারতবর্ষের কোথাও পর্ব্বতের গভীর নীরবতায়, কোথাও বেগবতী স্রোতস্বিনীদের শ্রবণ-মধুর অশ্রান্ত মুখরতায়, কোথাও সমুদ্র-হ্রদাদির শান্ত নিবিড়তায় সৌন্দর্য্য; আবার কোথাও শোভাবৈচিত্র্যের আকর, বিহগ-কাকলীর সুতানধ্বনিত মঞ্জু-কুঞ্জের অমৃত-নিক্কণ সকলে মিলিয়া এক স্বরে বিশ্ব-স্রষ্টার এদেশের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অবিসম্বাদী প্রমাণ প্রতি মুহূর্ত্তেই ঘোষণা করিতেছে। যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই সে সৌন্দর্য্য-বর্ণনার শেষ করিয়া আশা মিটাইতে পারেন নাই; তিনিই মুগ্ধ, মূক, আত্মহারা হইয়াছেন। পুরী ছাড়াইয়াই অতুলনীয় শোভাসম্পদ পূর্ব্বঘাট পর্ব্বত-শ্রেণী। যতদূর স্থল, প্রায় ততদূরই সমুদ্রের তীরে-তীরে যেন রেল গাড়ীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রণোদিত হইয়া দক্ষিণমুখে ছুটিয়াছে। এই পর্ব্বতমালার এক-একটি স্তূপ এক-এক রকমের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আশ্চর্য্য-আশ্চর্য্য কল্পনা দ্রষ্টার মনের মধ্যে জাগাইয়া দেয়; আর পিপাসু চক্ষুর দৃষ্টি সহসা যে তাহার উপর হইতে অপসৃত হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। কোথাও একটি পীরামিডাকৃতি স্তূপ সাধারণ শ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উপত্যকার মধ্যে যেন আসনবদ্ধ হইয়া, জাগতিক ঝঞ্ঝাবর্ত্তের কঠোর শাসনে অবিচলিত,—সাধারণ বিঘ্ন-বিপদে অনালোড়িত ধীর ধ্যানমগ্ন নগ্নদেহ অটল বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি মহাযোগীর ন্যায় অবস্থিত। কোথাও আর একটি স্তূপ ভীমকায় পশুরাজের মত নিম্নতলস্থ সাধারণ পাশবিক বৃত্তির লীলাভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত-বিমুখ হই যোজন-বিস্তৃত অংসদেশের বিরাট মহিমা ঊর্দ্ধমুখে বহ করিয়া রহিয়াছে। আবার কোথাও আর একটি বিশাল বৃষভাকার স্তূপ তাহার ককুৎটি উন্নত করিয়া জগতে-শুভাকাঙ্ক্ষাবশবর্ত্তী হইয়া আকাশকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিতেছে "তোমার যা কিছু অত্যাচার, যা কিছু নৃশংসতা, তা আমার এই ভারবহন-নিপুণ দেহের উপরই বর্ষণ কর।" আর তাহার নত শির যুগযুগান্তর ধরিয়া চির-শান্ত নম্রতার পরিচয় দিয়া আসিতেছে। বোধ হয় সৃষ্টির প্রারম্ভে অপের একাধিপত্য অংশতঃ ধ্বংস করিয়া স্থল নিজের প্রাধান্য মস্তকোন্নত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল বলিয়া জলে ও স্থলে বৈরিতা চিরস্থায়ী হইয়া গেল। তাই দাক্ষিণাত্যের দুই দিকেই সমুদ্রের সহিত সেই শাশ্বত সংগ্রাম-স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য দুই অক্ষয় প্রাচীরের সৃষ্টি। পূর্ব্বঘাটের ত স্থানে-স্থানে স্পষ্ট লক্ষিত হয় যে, পর্ব্বত-মালা ভূখণ্ডের পক্ষাবলম্বন করিয়া সুবিশস্ত পরাক্রান্ত প্রহরীর মত সমুদ্রের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া ভৈরব-গর্জ্জন জলরাশির ভীষণ ঘাত-প্রতিঘাতগুলি ফিরাইয়া দিতেছে।

পুরীর সমুদ্র-শোভা দৃষ্টি বা স্মৃতির অগোচর হইতে না হইতে, পূর্ব্বঘাটের দৃশ্যে মন মাতোয়ারা হইয়া উঠে। সে দৃশ্যের যবনিকা উঠিতে না উঠিতে, সে উন্মত্ততার মোহ কাটিতে না কাটিতে চিল্কা-হ্রদের নূতন সৌন্দর্য্যে আবার অভিনব আত্ম-বিস্মৃতির অভিনয় আরম্ভ হয়। প্রকৃতির এই অপরূপ রূপ-লাবণ্যের সাগরে মগ্ন হইবামাত্র, পৃথিবীর সকল কথা মন হইতে স্বতঃই সরিয়া যায়;—মনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব শূন্যতার রাজত্ব বিরাজ করিতে থাকে। আর সেই নামহীন, রূপহীন, শব্দহীন, বর্ণহীন, ছন্দহীন অপূর্ণতার শূন্য ভরিয়া অজ্ঞাতসারে অনাদি অনন্ত বিশ্বরূপের আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। পুলকাতিশয্যে বিস্ময়-বিহ্বল মস্তিষ্ক স্বতঃ নত হইয়া পড়ে। চিল্কার অবিচলিত স্রোত-শান্তি ভঙ্গ করিয়া, মধ্যে-মধ্যে যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রস্তরস্তূপ জলগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া শূন্যে বেশ কিছুদূর পর্য্যন্ত মস্তক উন্নত করিয়া ত্রিভুজের মত দাঁড়াইয়া আছে, সেগুলিকে দেখিলেই ভাগলপুর নিকটবর্ত্তী গঙ্গাবক্ষোত্থিত জহ্নু মুনির আশ্রম গৈবীনাথের পাহাড়ের কথা মনে পড়িয়া যায়। প্রভেদ এই—গৈবীনাথ সমগ্র গঙ্গাবক্ষে একটি মাত্র পর্ব্বত;

তাই তার চারিদিকে গঙ্গার ভীষণ প্রবাহ-নিনাদ ব্যতীত সমস্ত শূন্যমার্গ একটা ভীষণ নীরবতার আধার হইয়া আছে। আর চিল্কা-বক্ষে অমন শত-শত গৈবীনাথ এখানে-সেখানে প্রক্ষিপ্ত হইয়া আছে; তাদের চতুষ্পার্শ্বে স্রোতের ভয়াবহ কল্লোল নাই; আর শূন্যমার্গে যেন একটা হাস্যময় নিস্তব্ধতার ভিতর হইতে কি এক অজ্ঞাত-প্রীতির ভাব বিচ্ছুরিত হইতেছে। আমাদের মধ্যে চিল্কার দৈর্ঘ্য লইয়া আলোচনা হওয়ায় কেহ বলিলেন, একুশ মাইল। আমি প্রথম দর্শন মাত্রেই তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়া মাতৃস্থানীয়া সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা সহযাত্রীটিকে বুঝাইয়া দিলাম যে, হ্রদটি দৈর্ঘ্যে ১০।১১ ক্রোশ। তিনি প্রস্থ দেখিয়াই দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে আমাদের মত অগ্রাহ্য করিয়া স্বভাব-সুলভ সরলতা মাখানো জোরের সহিত বলিলেন "এ ৫০ মাইল লম্বা না হইয়া থাকিতে পারে না।" আর এই গর্ব্ব-দৃপ্ত সাহস-সহকারে প্রকাশিত মত-প্রসূত সাধারণ হাস্য-কলরবে তিনি অভ্যাসানুযায়ী যোগদান করিলেন। ক্রমে রম্ভা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়াও যখন চিল্কার অন্ত পাওয়া গেল না, তখন ঘড়ির সাহায্যে ট্রেণের গতির পরিমাণ দ্বারা স্থির করা হইল যে, হ্রদটি, ৪০ মাইলের একটুও কম নয়। অপর পারটি দৃষ্টির গোচরে না থাকিলে, ইহাকেও একটি ছোট-খাটো সমুদ্র-বিশেষ বলা যায়।

তার পর ওয়াল্‌টেয়ার বা বিশাখাপত্তন (Vizagapatan)—ইহা একটি সুবিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত, ফলরাজি-শোভিত উপত্যকায় অবস্থিত। দেখিলেই মনে হয়, পুরাকালে একটি দুর্গবিশেষ ছিল। আজ-কাল কিন্তু রোগীর হাঁসপাতাল হইয়া উঠিয়াছে। এখানে খাদ্য দ্রব্যাদির সুবিধা বিশেষ নাই; একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল আছে। এখানকার বিশেষত্ব পর্ব্বত ও সমুদ্রের মহাসম্মিলন—ডলফিন্‌স্ নোসের নিকট হইতে চলিয়া আসিতে মন আর কিছুতেই চায় না। দুটি প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পদার্থে কি ভীষণ সঙ্গম। পর্ব্বত, স্থল-দেবতার দুর্গের অটল ভীমকায় দ্বার-রক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন; আর "চরণ নিম্নে উৎসবময়ী" জলদেবী কত ছলে-বলে-কৌশলে দ্বারীর চরণ ধৌত করিতে-করিতে স্বীয় রাজত্ব বিস্তারের অবসর অন্বেষণে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের যে দুটি সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ, সেই দুটিই এখানে আশ মিটাইয়া উপভোগ করা যায়। আর বাকী কি? স্বাস্থ্যের সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী উপাদান শৈল-ভ্রমণ অথবা সমুদ্র-বায়ু-সেবন কিংবা সমুদ্র-স্নান, সে সুবিধা যুগপৎ এখানে বিরাজমান। এমন লোক-সমাগম-বর্জ্জিত, দেবতা-বাঞ্ছিত পর্ব্বতের উপত্যকায় ঘোর পাপীরও ইচ্ছা হয়, একবার ধ্যানমগ্ন হইয়া এই নিখিল সৌন্দর্য্যের স্রষ্টাকে মুহূর্ত্তের জন্য পূজা করিয়া লই, পাছে সংসার আবার কখন মন কেড়ে লয়। কিছু দূরেই পর্ব্বত-মালার মধ্যে সীমাচলমের শ্বেতবর্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির। কারু-কার্য্য যথেষ্ট। মূর্ত্তি নৃসিংহাবতারের। ভগবান্ এখানে নৃসিংহাবতার ব্যতীত অন্য কোন রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইতে পারেন না। নাস্তিকের দম্ভ, ভগবৎ-বিদ্বেষীর গর্ব্বিত অভিমান, বিশ্বস্রষ্টা পরম কারুণিকের সৃষ্টিশৃঙ্খলার প্রতি বৈরিতাচরণ এখানে আপনি ব্যাহত, ক্ষুদ্র, হীন, ক্ষুব্ধ, সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে। ভগবানের অবতার নিমিত্ত বা উপলক্ষ মাত্র। স্বভাব-নির্ম্মিত, ক্ষয়-লেশ-মাত্রহীন, অভেদ্য, কল্পান্ত-স্থায়ী, পার্ব্বত্য-পরিখা বেষ্টিত প্রকৃতির প্রফুল্লতাপ্রদীপ্ত হাস্য মুখরিত উপত্যকায় বাহুবল মাত্রে নির্ভরশীল দৈত্য শ্রেষ্ঠের পার্থিব ঐশ্বর্য্যোপভোগ-স্পৃহা নিরাপদে সার্থক করিবার জন্য বিলাসোদ্যানের বা দুর্গ-প্রাকারের যথেষ্ট স্থান ও উপকরণ আছে বটে; কিন্তু সেই অলৌকিক গম্ভীর নির্জ্জনতার মধ্যে আসিয়া পড়িলেই, ইহকাল-সর্ব্বস্বতার আকাঙ্ক্ষা, দৈবশক্তির প্রতি অবিশ্বাস, আসুরিকতার আত্মপ্রসাদ, রাজ্য-বৈভবের অহঙ্কার মন হইতে কোথায় আপনি ধুইয়া-মুছিয়া অন্তর্হিত হয়, তাহার বিন্দুমাত্রও জ্ঞান থাকে না। হিরণ্যকশিপুর যদি প্রহ্লাদে আত্ম-বিসর্জ্জন কোথাও সম্ভব হয়, ত এই খানেই।

এইবার মান্দ্রাজ। মান্দ্রাজে পৌঁছিবার পূর্ব্বে রাজমহেন্দ্রী ছাড়াইয়া গোদাবরী নদী পাওয়া যায়। গোদাবরীর উপর সেতুটি দৈর্ঘ্যে বোধ হয় ভারতবর্ষের সব সেতু অপেক্ষা বড়। মান্দ্রাজ সহরটি কলিকাতা অপেক্ষা অনেক ছোট; তবে রাস্তাঘাট বড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সহরের মধ্যে সমুদ্রের তীরে যে রাস্তাটি, সেইটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও একপার্শ্বে অনেকগুলি সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত অট্টালিকায় সুশোভিত। রাস্তাটির অপরদিকে একটি সুগঠিত ও সুরক্ষিত ষ্ট্রাণ্ড্। এখানকার ট্রামগুলির আকৃতি পুরাতন আমলের। তবে এখানে মোটর-লরির প্রভাব কিছু বেশী। বোধ হয় সেই জন্য ট্রাম কোম্পানী একটু জব্দ হইয়া আছে। সহরের মধ্যে

বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু দুইটি—যথা, বন্দর ও "মচ্ছিহাউস।" বন্দরটি বেশ প্রশস্ত। মান্দ্রাজে সমুদ্রের তটভূমিতে আস্ফালন কিছু ভীষণতর; তাই জাহাজগুলির বিশ্রামার্থ একটি দীর্ঘিকার মত জলাশয় তৈয়ারী করিতে গিয়া, সমুদ্রকে একটি বহুদূর-বিস্তৃত সুবিশাল, অর্দ্ধ বৃত্তাকারপ্রাচীর দ্বারা বাঁধিতে হইয়াছে। এই জলাশয়টির ভিতর নানাবর্ণ-চিত্রিত কূর্ম্মাদি জলজন্তু বিচরণ করিতে দেখা যায়। ইহার ভিতর একটি জাহাজে বিশিষ্ট নম্র-স্বভাবাপন্ন কাপ্তেনের সহিত আমাদের আলাপ হয়। তাঁহার সাহায্যে তাঁহার জাহাজটি সমস্ত পরিভ্রমণ করিয়া লওয়া গেল। কাপ্তেনটি আমাদের সহিত ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক সুবিবেচনার কথা কহিলেন। আমাদের সহযাত্রী আত্মীয়ারা, আমাদের ইংরাজী কথোপকথনের রস-গ্রহণে অসমর্থা বলিয়া, দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন দেখিয়া, সাহেব মত প্রকাশ করিলেন যে, এ দেশীয় স্ত্রীলোক বড়ই অবহেলার পাত্রী দেখিতে পাই। তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণের উপায় চিন্তা এদেশে বড় বিরল। এম্‌ডেনের কীর্ত্তিস্থল দেখাইয়া তিনি জার্ম্মাণ নাবিকের পলায়ন-কৌশলের কথা বলিতে-বলিতে তাহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিলেন; এবং সেই প্রসঙ্গে বাঙ্গালী যোদ্ধার অভাবের কথা তুলিয়া, একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ করিয়া লইতে ছাড়িলেন না। "বাঙ্গালী পল্টন গঠিত হওয়ার কখনও অবসর দেওয়া হয় নাই, গালাগালি দেওয়া বৃথা" উত্তরে এইটুকু মাত্রই বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। তখন সাহেব তাঁহার অনেকগুলি বাঙ্গালী সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার বন্ধুর গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। সুযোগ পাইয়া আমি বলিয়া লইতে ছাড়ি নাই যে, যে জাতির অগ্রণী মুখোজ্জ্বল ধুরন্ধরদিগকে বন্ধু-স্বরূপে পাইয়া তিনি নিজেকে কৃত-কৃতার্থ মনে করেন, তাঁরই মুখ থেকে সেই জাতির প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বহির্গত হওয়া কোন্ দেশী ভদ্রতা, তা আধুনিক ইয়োরোপীয় নীতি-বিদ্যাবিশারদ জাতিরই ভাল উপলব্ধি হয়। "মচ্ছি-হাউসটি" (Marine Acquarium) সমুদ্রতীরেই বালুরাশির উপর অবস্থিত। মচ্ছি-হাউসে সমুদ্র-গর্ভ হইতে সংগৃহীত অশেষ বৈচিত্র্যময় অত্যাশ্চর্য্য বর্ণ-সমষ্টি দ্বারা সুচিত্রিত অঙ্গ বিশিষ্ট জীবিত সমুদ্র-মৎস্যের "চিড়িয়াখানা"। কোন জাতীয় মৎস্যের অঙ্গ ভেলভেট-বিনিন্দিত মসৃণতায় সুশোভিত, আবার কোন জাতীয়ের সুচিক্কণ রেশমী শল্কগুলির উপর সপ্তবর্ণের শত রকমের বিহার-স্থল বিরাজমান। অধিকাংশ মৎস্যগুলিকে দে[illegible] একই সঙ্গে আনন্দ ও ভয় আসিয়া মনের মধ্যে স্থান পা[illegible] এই মৎস্য-সংগ্রহ দেখিবামাত্রই মনে হয়, এই অসীম নী[illegible] ভিতর কি অপূর্ব্ব লীলাই চলিতেছে! উপর দেখিয়া ভি[illegible] চিনিবার কোন উপায় নাই। কেবল ঐহিক সুখের আধা[illegible] রত্নের আকরই সেথা লুক্কায়িত নয়,—শোভা-সৌন্দর্য্যে ভিতর যে একটা অপ্রশমনীয়, অদম্য, স্বর্গীয়, বিশুদ্ধ ভা-স্বতঃ নিহিত থাকে, তাহারও অফুরন্ত ভাণ্ডার সেখানে [illegible] চির-বিরাজমান, তাহা সাধারণতঃ ভাবিয়া পাওয়া যায় না বিজ্ঞানে, দর্শনে যে শিক্ষার প্রচার হইয়াছে, তাহার সীম[illegible] খুঁজিয়া পাওয়া যায়; কিন্তু অনন্ত মহিমার আধার ভগবানের সৃষ্টির উপরে-বাহিরে যে কত কি লেখা, তাহার গণ্ডী অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়।

মান্দ্রাজ পার হইলেই কতকগুলি প্রসিদ্ধ, অপ্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থানের সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন দেবী-পত্তন, দর্ভশয়ন, পক্ষতীর্থ, কাঞ্চী, তাঞ্জোর ও শ্রীরঙ্গম্। ভারতবর্ষের এ অংশটায় আসিয়া পড়িলে মনে হয় যেন, দাক্ষিণাত্যটা মন্দিরেরই দেশ। তাঞ্জোরের মন্দিরটির কারুকার্য্য উল্লেখ-যোগ্য। সেতুবন্ধ-রামেশ্বর তীর্থ-যাত্রীরা দেবীপত্তন ও দর্ভশয়ন তীর্থ করিয়া তবে রামেশ্বরে যান। শ্রীরঙ্গম্ কাবেরী নদীর ভিতর। ভগবান্ বিষ্ণুর অনন্ত-শয্যা হোলো মন্দিরটির বিগ্রহ। অতি মনোরম স্থান। এ অঞ্চলের মন্দিরের গঠন-প্রণালী বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখানে মন্দির বা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতারা পুরাকালে কেবল মন্দির স্থাপনা করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অনেক-খানি জায়গা লইয়া, এ দেশের ধর্ম্মপ্রাণ রাজারা দুর্গের পরিখার মত বহুচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেন; আর এই প্রাচীরের ফটকগুলি এত উচ্চ করিতেন যে, দেখিলেই চমকাইতে হয়।

মাদুরার ও রামেশ্বরের মন্দির দেখিলেই বিশ্বাস হয়, পুরাতন হিন্দুধর্ম্ম-পরায়ণ রাজাদের কারুকার্য্যের বা কীর্ত্তি-কলাপাদির ভিতর একটা প্রগাঢ় আস্তিকতা ও স্বধর্ম্মে অচল আস্থা বেশ প্রকাশ্য ভাবে আত্মগোপন করিয়া আছে। সেকালে (সে যে কোন্ কাল তাহার ইতিহাস নাই) রাজারা অর্থব্যয়-আগ্রহে বিচলিত হইয়া উঠিলেই, কিসে সে অর্থব্যয় মোক্ষের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিবে, সেই চেষ্টায়ই তৎপর

থাকিতেন। নিষ্ঠা বা ধর্ম্মশীলতার প্রাধান্য সে যুগের মহা-পুরুষদের চরিত্রে অত বড় আসন পাইলেও, তাঁহারা যে সৌন্দর্য্য-কলা-চর্চ্চায় অনিপুণ ছিলেন, এ কথা কোন রকমেই স্বীকার করা বা বলা যায় না। তবে সে সৌন্দর্য্যালোচনায় বিলাসের বিন্দুমাত্র স্থান যাহাতে না থাকে, সে বিষয়েই তাঁহারা সমধিক চেষ্টাবান্ ছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে মহামেডান্ আমলে কলা বা সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানে বিলাস-প্রাধান্য আসিয়া পড়িয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলির অলৌকিক, বৃহৎ ও নয়নাভিরাম আকৃতি দেখিবামাত্রই, সাধারণ লোকের নিকট ভগবান্ যে একটি অসাধারণ অসীম বর্ণনাতীত বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। লোক-শিক্ষার অমন সহজ-সুন্দর অথচ অত্যাশ্চর্য্য উপায় পৃথিবীর আর কোথাও কাহারও মস্তিষ্ক প্রসব করিয়াছে কি না সন্দেহ।

এই সুগভীর ধর্ম্মপ্রাণতার পরাকাষ্ঠা মাদুরার মন্দির দেখিয়া জনৈক পর্য্যটনে-বহির্গত কলিকাতা কলেজের অধ্যাপক বলিয়া ফেলিলেন যে, যিনি দাক্ষিণাত্যে মাদুরার মন্দির ও আর্য্যাবর্ত্তে আগ্রার তাজ না দেখিয়াছেন, তাঁর ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দিবার কিছু নাই। মাদুরার বা রামেশ্বরের মন্দির এক-একটি বিশাল ব্যাপার। রামেশ্বরের মন্দির মাদুরা অপেক্ষা পুরাতন বলিয়া প্রতীত হয়। মাদুরার মন্দিরের ভিতর কতকগুলি অত্যাশ্চর্য্য শিল্প-কীর্ত্তি আছে; তাহা দেখিয়াই মনে হয়, হিন্দুদের রাজত্বকালে স্থাপত্য-বিদ্যার যে চরমোৎকর্ষ হইয়াছিল, তাহার কিছুই এখন নাই; এবং প্রতীচ্যের নিকট এখনও তাহার অনেক কথা দুর্ব্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে। মাদুরার ও রামেশ্বরের মন্দির দুইটিই দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এত বড় ও ভিতরে এত অসাধারণ কীর্ত্তি-কলাপে পরিপূর্ণ যে, তাহাদের ভিতর নূতন মানুষ প্রবেশ করিলেই দিক্‌ভ্রমে পতিত হইতে বাধ্য। মাদুরার মন্দির-গঠনে কারুকার্য্য কিছু বেশী ও জমকাল রকমের। মন্দিরের প্রাচীর পরিবেষ্টন করিতে-করিতে পরিশ্রম-কাতরতা আসিয়া উপস্থিত হয়। আর অনবরত উঁচু দিকে চাহিয়া কারুকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে-করিতে বাস্তবিক স্কন্ধব্যথার উৎপত্তি হয়। মন্দির-প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে পরিপাটি বিরাট-বিরাট অভ্রভেদী ফটক বিদ্যমান। বাহির হইতে দেখিবামাত্র মনে হয়, চারিদিকে চারিটি পর্ব্বত মন্দির-রক্ষণে নিযুক্ত। আর সেই পর্ব্বত-গাত্রের ভিতরে বাহিরে উভয়দিকেই তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর পুরাণাদি বর্ণিত কীর্ত্তি কলাপ প্রস্তরে খোদিত। মূর্ত্তিগুলির আকৃতি অতি সুস্পষ্ট মনুষ্যাকার পরিমাণ,—দোষ বা খুঁত-বর্জ্জিত শিল্প-নিপুণতার চিরন্তন উজ্জ্বল সাক্ষী। মাদুরার মন্দির প্রাচীরের ভিতরে একটি পুষ্করিণী বা কুণ্ড, নাম শ্বেতগঙ্গ (যদিও জল আদৌ শুভ্র নয়)। তার পর মন্দির। মন্দিরের অভ্যন্তরটি অন্ধকারময়। মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ গবর্ণমেন্টের হাতে যাওয়ায় মন্দিরের ভিতর আলোকের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। বিগ্রহ মীনাক্ষি দেবীর ভৈরব, নটরাজ মহাদেব। প্রতি বৎসর বসন্ত-সমাগমে ভগবান্ ও ভগবতীর এখানে বিবাহোপলক্ষে উৎসবাদি হয়। সে উৎসবের জন্য মন্দির-প্রাচীরের ভিতর বেশ বিস্তৃত ও সুশোভিত একটি স্থান রহিয়াছে। মন্দির-প্রাচীরের অভ্যন্তরে অনেকগুলি বড়-বড় রাস্তা,—সমস্তই প্রস্তর-নির্ম্মিত; এবং এই সব রাস্তার উভয়-পার্শ্বে কত-শত দেব-দেবীর বৃহৎ-বৃহৎ প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তি বিদ্যমান, তাহা দেখিয়া ও বুঝিয়া শেষ করা যায় না। ছাদে যে সমস্ত দেব-দেবীর চিত্রাঙ্কণ কতক স্পষ্ট, কতক অস্পষ্ট ভাবে আজও বিদ্যমান, তাহার উপর চোখ বুলাইয়া গেলে পুরাণের অর্দ্ধেক না পড়িয়া আয়ত্ত করা যায় না। মন্দির-প্রাচীরের ভিতর একটা হলঘর আছে; তাহার আধুনিক আখ্যা "a hall of thousand pillars" (সহস্র স্তম্ভের গৃহ)। সেখানে উপস্থিত হইলে বিস্ময়-বিহ্বলতার সীমা চুরমার হইয়া কোথায় চলিয়া যায়। কি বিরাট অক্ষয়-কীর্ত্তি! সে হলে না কি লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজন হইত। আর উত্তর-প্রাঙ্গণে ফটকের নিকট পাঁচটি প্রস্তর-স্তম্ভ দাঁড় করান রহিয়াছে। সেই স্তম্ভ কয়টির গায়ে প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আঘাত করিলেই, সুর-সপ্তকের মধুর নিনাদ বহির্গত হয়। স্থাপত্য-বিদ্যার উৎকর্ষ আর কত উচ্চে উঠিতে পারে! কল্পনা-প্রভাব আর কত বেশী সম্ভব হইতে পারে! বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি আর কত বেশী আশ্চর্য্য ঘটনার জন্মদান করিতে পারে!

মন্দিরটি একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত, প্রাচীর-বেষ্টিত গ্রাম-বিশেষ। ভিতরে দস্তুরমত বড় একটি বাজার নিত্য বসিতেছে। মন্দিরের কোন অংশ জীর্ণ-সংস্কার করিতে গিয়া চারিশত বৎসর পূর্ব্বে তিরুমল নায়কর নামক কোন

রাজা ১৪।১৫ কোটি টাকা খরচ করিয়া যান; তাহাতেও কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। দেখিয়া-শুনিয়া মনে হয়, সমস্ত ব্যাপারটি কোন ব্যক্তি-বিশেষের কীর্ত্তি নহে। আর একজন লোকের জীবদ্দশাতেও এতবড় কাণ্ড গঠিত হইয়া উঠিতে পারে না। উক্ত রাজা মন্দির-প্রাচীরের বাহিরে পান্থ-নিবাসার্থ একটি প্রস্তরখচিত "ছত্র" নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন,—তাহাতে লক্ষ লোকের বাস সম্ভব। এখন সেখানে "চাঁদনীর" মত বাজার বসে। ঐ রাজার মাদুরাতে আর দুইটি কীর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। একটি "ব্যাবিলনের টাওয়ারের" মত অভ্রভেদী কীর্ত্তিস্তম্ভ অসম্পূর্ণ রাখিয়া রাজা ইহলোক ত্যাগ করেন। তাহাও নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আর তাঁহার প্রাসাদ গঠিত হইবার সময় যে স্থান হইতে মৃত্তিকা খনন হইয়াছিল, তাহার মধ্যস্থলে একটি মৃত্তিকা-পরিমাণার্থ বিস্তৃত স্তূপ রাখিয়া দিয়াছিলেন। সেই স্তূপের চতুষ্পার্শ্বে জল নির্গত হইয়া একটি সুচারু দীর্ঘিকায় পরিণত হইয়াছে; এবং স্তূপটি দ্বীপাকারে আজও সেখানে বর্ত্তমান। সেই স্তূপের উপর আজকাল সুরক্ষিত ফলের বাগান। ঐ রাজা বাগানের চারি কোণে চারিটি শিব-মন্দির এবং কেন্দ্রস্থলে বিষ্ণু-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করাইয়া যান্। এতদ্ব্যতীত রাজ-প্রাসাদটির অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তবে তাহার যে অংশটুকু এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহার সুবৃহৎ অত্যুচ্চ খিলান ও মহাকায় স্তম্ভগুলি আজও সে রাজার বিপুল কীর্ত্তি ঘোষিত করিতেছে।

সেতুবন্ধে পৌঁছিয়া জীবনের একটি দৃঢ় বিশ্বাস একেবারে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল। যুগ-মাহাত্ম্যের প্রভাবেই হৌক, আর ইংরাজী বিদ্যা-শিক্ষার ফলেই হৌক, এতদিন এই ধারণাটা মনে-মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, সেতুবন্ধটা সমুদ্রের স্বাভাবিক প্রস্তরময় তলভূমি বিশেষ। সমুদ্রে এমন গুপ্ত শৈলের অভাব নাই। ভগবান্ রামচন্দ্র বড় জোর তাহাকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন,—নির্ম্মাণ করা দূরের কথা। চক্ষে দেখিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সে বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সেতুটি স্বাভাবিক প্রস্তর-বিন্যাসে প্রস্তুত নহে,—কৃত্রিম উপায়ে যে গঠিত, তাহা দেখিবামাত্র দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গেল। বেশ বড়-বড় শিলাখণ্ড পাশাপাশি মসলার সাহায্যে একত্র করিয়া বা জমাট বাঁধাইয়া বসানো। ইহার ভারতবর্ষ হইতে রামেশ্বর দ্বীপ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় মাইল দেড়েক; আর প্রস্থও প্রায় শতহস্ত পরিমিত। অ… কাল সেই কল্পান্তস্থায়ী অক্ষয় অটুট সেতুকে ভিত্তি ক… তাহারি উপরে রেল কোম্পানী Adam's Bridg- (আদ… পোল) প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহারই সাহায্যে ভার… বর্ষের প্রান্তভাগ হইতে বহির্গত হইয়া ট্রেণ (Ceylon Bo… mail) সমুদ্রের উপর দিয়া ছুটিতে-ছুটিতে ধনুষ্কোটি… যাইয়া বিশ্রাম লাভ করে। Adam's Bridge এর উ… দিয়া যাইতে-যাইতেই সেতুবন্ধের পূর্ণাকৃতি স্পষ্টতঃ দৃ… গোচরে আসে; আর অনাদি অনন্ত কাল ব্যাপিয়া সমু… তর্জ্জন, বায়ুপ্রবাহের দারুণ অত্যাচার, আর প্রাকৃতি… যাবতীয় ধ্বংসসঙ্কুল উৎপাতাদি সহ্য করিতে-করিতে … অমর বিরাট কীর্ত্তি আজও সকলের নিকট হইতেই সে… ত্রেতা যুগের মহাপুরুষটির উল্লেখে বিস্ময়-বিহ্বলতা-বিজড়ি… ভক্তি-মিশ্রিত প্রশংসাবাক্য প্রকাশ্য ভাবে টানিয়া বাহি… করে, তাহা যে গাঁজাখুরি রামায়ণী অলীক কল্পনা নহে, … ধারণা মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। নলাদি সামন্ত বানর জাতী… ছিল কি না, সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারা খুবই কঠিন। তবে… তাহারা যে আজকার দৈনিক পত্রাদিতে বিজ্ঞাপনের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ-নীতি-বিশারদ ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানীদের অপেক্ষা স্থাপত্য-কলায় অনেক বেশী অভিজ্ঞ ছিল, তাহাতে দুই মত থাকিতে পারে না। পুরাকালে এ বিদ্যার উৎকর্ষ যে কেবল অত্যাশ্চর্য্য অতি-বৃহৎ ব্যাপারাদি নির্ম্মাণে পর্য্যবসিত, তাহা নহে; সে কালের কীর্ত্তিমাত্রেই যে অটুট যুগযুগান্তব্যাপী অক্ষয় অমর হইয়া থাকিবে, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়।

এই সেতুবন্ধের সাহায্যে দ্বীপের পর দ্বীপ অতিক্রম করিয়া রামচন্দ্র সিংহলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কালের গতি এমনি যে, রাবণের কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আর কিছুই বিদ্যমান নাই। সে লঙ্কাই আছে কি না সে বিষয়ে অনেকে সন্দিহান। কিন্তু রামচন্দ্রের কীর্ত্তির সময় ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক সকলেরই ধারণার অতীত; আরও কত যুগ ব্যাপিয়া সেই অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলার অস্তিত্ব স্থায়ী হইয়া থাকিবে, তাহা মানুষের বলা সাধ্য নয়।

রামেশ্বরের সনাতন হিন্দু তীর্থ হিসাবে প্রাধান্য অপরিমেয়। মন্দিরের গঠন মাদুরার মত। তবে রামেশ্বরের মন্দির মাদুরার মন্দির অপেক্ষা অধিকতর পুরাতন ইহা দেখিবামাত্র প্রতীতি হয়। পর্ব্বত-পরিমাণ ফটক, তাহার উপর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য

প্রস্তর-মূর্ত্তি বিগ্রহাদির সুচারু সন্নিবেশ, অভ্যন্তরে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ; অদ্ভুত চির নবীন কারুকার্য্যখচিত বিশাল স্তম্ভ-রাশির এবং নয়ন-সুখকর চিত্রাঙ্কনের সুবিন্যস্ত শোভা—এগুলি দেখিতে-দেখিতে মন্দিরেশ্বরের প্রতি ভক্তি অপেক্ষা বিস্ময়-মুগ্ধতাই সর্ব্বাগ্রে মনের সমগ্র স্থানটি অধিকার করিয়া বসে। মন্দির-নির্ম্মাতাদের কি কল্পনাতীত অদ্ভুত বিচিত্র কীর্ত্তি! কত যুগ ধরিয়াই না এই সব কীর্ত্তি ভগবান্ রামচন্দ্রের আদর্শকে ভারতের পূজার সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছে। ক্রমে বিস্ময়-বিহ্বলতার ভার লঘু হইয়া আসিলে, মনে ভক্তির স্থান সম্ভব হয়। রামেশ্বর মন্দিরটির ভিতর অনেকগুলি কুণ্ড-নামাভিহিত ছোট-ছোট পুষ্করিণী ও কূপাদি বিরাজ করিতেছে। সে সবগুলি রামচন্দ্রের ভিন্নভিন্ন প্রধান অনুচরবর্গের নামে উৎসর্গীকৃত। মন্দিরের বাহিরে কিছুদূরে রামকুণ্ড, সীতাকুণ্ড ও লক্ষ্মণকুণ্ড বর্ত্তমান। তন্মধ্যে লক্ষ্মণকুণ্ডই প্রধান তীর্থ। সেখানে অনেকেই স্নানাদি করিয়া থাকেন।

রামেশ্বরের পরই ধনুষ্কোটি। সমুদ্রকে বন্ধন-মুক্ত করিবার জন্য, আর বিভীষণের হীনবল রাজ্যের ভিতর সহজে আসিয়া অধিকতর বলশালী কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী রাজা পাছে বিভীষণকে সিংহাসনচ্যুত করিতে না পারে, সেই জন্য এই স্থানে রামচন্দ্র ধনুষ্কোটি দ্বারা সেতুর কিছু অংশ ধ্বংস করিয়া দেন। আজকাল আর কোন কোম্পানী আদি মানবের নাম-ধাম দিয়া আর কোন সেতু নির্ম্মাণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেখান হইতে সিংহল যাইতে হইলে জাহাজে উঠিতে হয়।

উপসংহারে দু' একটি দেশ দেশান্তরের আনুসঙ্গিক কথা বলিয়া বৃত্তান্ত শেষ করিব। ভারতবর্ষের এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে যাইলে একটা নূতন কিছুর অভিজ্ঞতা লাভ হইবেই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মহিমার ত কথাই নাই—সঙ্গে-সঙ্গে ভাষা বা জাতীয় চরিত্রেরও কম বেশী অনেক পরিবর্ত্তন নয়ন-গোচর হয়। নভেম্বর মাসে মান্দ্রাজ-অঞ্চলে গিয়া দেখি, ঘোর বর্ষা নামিয়াছে। অল্প দূর গিয়াই ঋতু লীলার এই অসুখকর পটপরিবর্ত্তনে কিন্তু একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখি, তামিল তেলুগুর বৃষ্টি আশে-পাশে, সম্মুখে পশ্চাতে বেশ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; চা পরিত্যাগ করিয়া লোকে কাফি ধরিয়াছে আর সে তরল পদার্থটির সেবনের কোন সময়-বিচার নাই চাষের মধ্যে এ অঞ্চলে তাল, নারিকেল ও কলার অসাধারণ প্রাচুর্য্য। বাব্‌লা (কাঁটা) গাছেরও অপর্য্যাপ্ত উৎপাদন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের জাতীয় প্রকৃতি আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা অনেক বেশী নরম আর্য্যাবর্ত্তের লোক দেখিবামাত্রই মনে হয় যেন তাহারা বীর, রণপ্রিয় হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; আর সেই রকম অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্য দিয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সে উদ্ধত যোদ্ধাপ্রকৃতির বা পরিপুষ্টির কোন অবসর নাই।

পথহারা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে ঝড়-জল মাথায় লইয়া বিমলেন্দু, সেই যে একটা মূর্ত্তিমান ঝঞ্ঝারই মত, তাহাদের সেই ঈপ্সিত ধন-ভাণ্ডারের দ্বারদেশে অনেক বাধা-বিঘ্ন ঠেলিয়া বহু আয়াসে প্রায় মধ্য-রাত্রে পৌঁছিয়া দেখিল, সে বাড়ীর সদর-দরজায় প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলিতেছে; বাড়ীটার আগাগোড়া, ভিতর-বাহির সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া মাত্র একটা স্তব্ধতাপূর্ণ বিরাট অন্ধকার। সেদিন মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত গৃহের অধিবাসীরা যে এই বাড়ীতেই ছিল, তাহা বিমলের নিজেরই চাক্ষুষ প্রমাণ। ইহারই ভিতর, এই মেঘ, ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে ইহারা কোথায় এবং কি জন্য বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল? তবে কি ঐ তালা লাগানটা একটা মিথ্যা ছলনা মাত্র? নিজের চক্ষুকে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিয়া, বিমলেন্দু প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বাড়ীর মধ্যে লাফাইয়া পড়িল; এবং একটা জীর্ণ দ্বারের কড়া খসাইয়া ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক, গৃহবাসীদের

প্রস্থান সম্বন্ধে এবার কৃত-নিশ্চয় হইল। তখন তাহার মনের মধ্যে আনন্দের তড়িৎ সবেগে প্রবাহিত হইয়া, তাহাকে, একেবারে সুখ-কল্পনার কল্পলোকে উন্নত করিয়া তুলিতে লাগিল। এই সামান্য আয়াসেই সে এখনই এক বিপুল সম্পত্তির অধিকার লাভ করিবে! এর জন্য কাহারও কোন ক্ষতি,—চাই কি, কোন প্রাণীর একটা কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে হইবে না। ধরা পড়িবার ভয়-ভাবনা নাই। এর চেয়ে সহজে কে কোথায় কোন্ কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছে! পকেট হইতে গুপ্ত-লণ্ঠন বাহির করিয়া আলো জ্বালিয়া লইয়া, সে দ্বিতলে উঠিয়া গেল; এবং অপরেশ কর্তৃক বর্ণিত বাড়ীর প্ল্যানের সঙ্গে মিলাইয়া, যে ঘরে বিপুল ধন-সম্পদ গর্ভে ধরিয়া লোহার সিন্দুক বিরাজ করিতেছে, সহজেই সে ঘরও খুঁজিয়া লইতে সমর্থ হইল। এইবার একটা মাত্র চিন্তা,—কি উপায়ে সেই কঠিন লৌহময় বন্দী গৃহ হইতে মুক্তি দিয়া, ওই ধন-সম্ভার সে তাহার 'দেশের কাজে' সঁপিয়া দিবে? অনির্ব্বচনীয় গৌরবানন্দে ও তাহার সহিত মিশ্রিত একটা প্রচ্ছন্ন সন্দেহ ও শঙ্কায় বিমলেন্দুর বক্ষের মধ্যে দুরু-দুরু করিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু কি বিস্ময়। গৃহের মধ্যে আলোক-জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইয়া সেই অন্ধকারাবৃত গৃহের যাবতীয় বস্তুজাতকে যেমনই দ্রষ্টার উৎকণ্ঠিত নেত্রে প্রতিভাত করিল, অমনি হতাশমিশ্র আশ্চর্য্যের একটা তীক্ষ্ণ অস্ফুট ধ্বনি তাহার কণ্ঠ-মধ্য হইতে নির্গত হইয়া পড়িল। প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুকটার ডালা তোলা। ঠিক সামনে বিপুল-ভার পিত্তলের তালা আধ হাত মাপের চাবি-সমেত মেজের উপর পড়িয়া আছে।

বিমলেন্দুর বুঝিতে বাকি থাকিল না যে, বিকালে ও সন্ধ্যার মাঝখানের সময়টুকুর মধ্যেই গৃহবাসীগণ তাহাদের ভবিষ্য অভিযান সংবাদ কোন প্রকারে পাইয়া, ধনরত্ন-সমেত এই দুর্যোগের মধ্যেই বাড়ী ছাড়িয়াছে। এত ব্যস্ত যে, ফিরিয়া সিন্দুকটা বন্ধ করিতেও অবকাশ পায় নাই। তাহারা কেমন করিয়া জানিল?

বিমলেন্দু ক্ষোভ ও বিরক্তি মনের মধ্যে পুঞ্জীকৃত করিয়া লইয়া ফিরিয়া চলিল। প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইল! এ কি উৎপলা বিশ্বাস করিবে? তদ্ভিন্ন, এই নৈশ-অভিযানের সবটুকুকেই উপকথার সহিত উপমিত করিয়া দিয়া উৎপলা যে উপহাসের হাসি হাসিবেই, ইহা একেবারে দিনের মতই সত্য! অথচ, যদি কোন কথা না বলে, তাহাতেও পার নাই। সে বলিবে সেদিন যে বড় বড়াই করিয়া যে একাই যাইতেছিলে, তবে আবার পিছাইলে কেন?

সিঁড়ির শেষ ধাপে একখানা সাদা রুমালে বাঁধা কি একটা কঠিন বস্তুর উপর পা পড়িল। শব্দ হইল টাকার মত। হেঁট হইয়া বিমল সেটা খুলিয়া ফেলিতেই প্রকাশ পাইল, কয়েকটা টাকা ও একখানা দোমড়ান চিঠির কাগজ। নোট মনে করিয়া সেখানার ভাঁজ খুলিতেই, অকস্মাৎ সেখান হইতে যেন দুইটা অতি তীক্ষ্ণ তীরের ফলা আসিয়া বিমলের দুই চোখে বিঁধিয়া গেল। হাত হইতে রুমাল-শুদ্ধ টাকা-গুলা পায়ের তলায় ছড়াইয়া পড়িয়া গেল। বিস্ময়াহত অবস্থায় থাকিয়া সে তাহা জানিতে পারিল না। কতক্ষণ তেমনই অস্পষ্ট অসাড় থাকিবার পরে, যেন একটুখানি আত্ম-সংবরণ পূর্ব্বক সে শুধু সেই চিঠিখানা মাত্র লইয়াই, সেই জনহীন পুরী পরিত্যাগ করিল।

ইহার পরদিন সকালে অনিদ্রা ও দুঃস্বপ্নপূর্ণ রাত্রি যাপনান্তে উৎপলা বাহিরে আসিতেই, তাহার সহিত অসমঞ্জর সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। উৎপলাকে দেখিয়া অসমঞ্জ একটু যেন অপ্রতিভ ভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল; এবং তাহার বিশুষ্ক ও চিন্তাক্লিষ্ট মুখে চেষ্টা করিয়া টানিয়া আনিয়া ঈষৎ মাত্র হাসি ফুটাইতে সমর্থ হইল। "তার পর, মিঃ পল! কাল রাত্রের ঝড়-বৃষ্টিটা লাগলো কেমন?"

উৎপলা এ প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়াই, স্থির অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রতিপ্রশ্ন করিল, "পরশু থেকে ছিলে কোথায়?" অসমঞ্জের শুষ্ক মুখ এ প্রশ্নে আরও একটুখানি শুকাইয়া আসিল। তথাপি সে সচেষ্ট হাসির অন্তরালে, ভিতরের শঙ্কিত সঙ্কোচকে ঢাকা দিতে চাহিয়া, রঙ্গ করিয়া গাহিল—"যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে—"

উৎপলার কণ্ঠে বিরক্তি উথলিয়া উঠিল—"ছোড়দা! এসব হাসি-ঠাট্টার কথা নয়! তোমার ব্যবহার আমরা আজ-কাল বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি নে। একটু সোজা ভাবে সব বুঝিয়ে দাও দেখি? কাল সেই যে কাজটায় সব্বার একত্র হবার কথা ছিল,—কেন তুমি এলে না?"

"কাল সেই দুর্য্যোগে! পাগল হয়েছিস্!"

"ছোড়দা! যেদিন বিমলেন্দুবাবুকে প্রথম আমাদের বাড়ীতে তুমিই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলে, সেদিনের কথাটা

একবারটী মনে করে দেখ দেখি ! আর কাল তুমি তার পায়ের তলায় পড়ে রইলে ; আর সে অবলীলাক্রমে তোমার মাথার উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল ! সেই জল-ঝড় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অনায়াসেই সে—শুধু তাই নয়—একা অনন্য-সহায় হয়ে দেশের সেবা করতে গেছে। আজ আমরা কোথায় পড়ে রইলুম ছোড়দা !"

এক মুহূর্ত্তের জন্য অসমঞ্জের সুন্দর মুখ লজ্জারক্ত হইয়া উঠিয়াই, আবার পরক্ষণে তাহা যেন মরা-মুখের মতই পাংশু দেখাইল। ধীর ক্লান্ত স্বরে সে কহিল, "পলা ! আমি যে আর গোপনতার আড়ালে থেকে দেশের লোকেরই ক্ষতি দিয়ে এই সফলতার আশাহীন সংশয়ের পথে চলতে পারচিনে ভাই ! আমি তার চেয়ে মনে করেচি, গ্রামে-গ্রামে ঘুরে—"

অসমঞ্জের এই অসমাপ্ত আত্ম-সমর্থনে কি যে সে সুগভীর করুণ বেদনার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল,—সে শুনিয়া কেমন করিয়াই যে উৎপলা,—তাহার আজন্মের চির-সাথী উৎপলা—আহুতিপ্রাপ্ত অগ্নি-শিখার মতই গর্জ্জিয়া উঠিল,"ধিক্ ছোড়দা ! এ দুর্গতি হবার আগে কেন তুমি মরে গেলে না।"

* * * *

উৎপলার মা সারাদিনেও মেয়ের ঘরের রুদ্ধ দ্বার খোলাইয়া তাহাকে ভাত খাওয়াইতে না পারিয়া, তাঁহার এই অনাসৃষ্টি মেয়ের জ্বালা একান্ত অসহ্য বোধ করিতে থাকিলেও, ইহার কিছুমাত্র উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, মনে-মনেই পুড়িতে-ছিলেন ; এমন সময়ে সশরীরে সে নিজে আসিয়া ডাকিল, "মা !" মা মুখ না তুলিয়াই ভারি গলায় কহিলেন, "কি !"

"ছোড়দা কোথায় ?"

মা চমকিয়া উঠিয়া হাতের কাজে একটু নিবিষ্ট হইয়া পড়িলেন,—মুখে কোন কথাই বলিলেন না। বুকের ভিতরটা ধড়াস্-ধড়াস্ করিতে লাগিল।

মেয়ে আবার ডাকিল, "মা !"

মা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, "কি বলোই না ?"

"ছোড়দা কি আজও বাড়ী থেকে চলে গেছে ? ঠিক করে বলো মা, সে কোথায় যায় ? নিশ্চয়ই তুমি জানো। তা' নৈলে, রাতের পর রাত সে বাইরে কাটায়, আর তুমি তাকে কিছুই বলো না ?"

অসমঞ্জর মা ঈষৎ কুপিতা হইয়া বলিলেন, "দেখ্ পলা, ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষের মতন থাক্,—সকল খবর তোর নেওয়া কেন ? ক্ষিধে পেয়ে থাকে তো খেতে বে দেখি।"

উৎপলা কঠিন হইয়া থাকিয়া, কঠোর কণ্ঠে কহিল, "ম ভাল করলে না। ছোড়দা এই যে চোরের মতন লুকোচুরি করে কোথায় কি করচে, আর তাতে তুমি ওকে প্রশ্রয় দিচ্চে এর ফল কিন্তু ভাল হবে না, তা' বলে দিচ্চি।"

মাও রাগিয়া, গিয়া সক্রোধে মুখ তুলিয়া কহিয়া উঠিলেন "তা আমি জানি গো জানি। তার ভাল কি আর তোমর হতে দেবে ! যে তুমি তার পেছনে শনি জন্মেছ ! মেয়ে-মানুষ যদি তার নিজের ধম্ম ছাড়ে পলি, তা'হলে সে পুরুষের চেয়েও বেয়াড়া হয়, এ আমি তোমায় দেখেই হাড়ে-হাড়ে বুঝে নিয়েচি ! তোমায় যে গর্ভে ধরেছিলুম, তাতে আমার আগুন ধরিয়ে দিতে ইচ্চে করচে।" বলিতে-বলিতে তাঁহার কণ্ঠে চাপা দুঃখ-সিন্ধু যেন শতধারায় উথলিয়া উঠিল। চোখ দিয়া জলের ফোয়ারা উৎসারিত করিয়া দিয়া, তিনি বলিতে লাগিলেন "মঞ্জুর মতন ছেলে কি আর ভূ-ভারতে আছে ? তাকে পাঁচ জনে মিলেই নষ্ট করতে বসেচে। তাতে তুই তার ছোট বোন— কোথায় তাকে বুঝিয়ে সমজিয়ে সোজা পথে নিয়ে আসবি, ভালব চেষ্টা করবি, তা'না হয়ে কি না, উল্টে তার মার পেটের বোন হয়ে তুই-ই তাকে টেনে-হিঁচড়ে আরো কাঁটাবনের মধ্যে ফেলে দিতে চাস ! তুই মেয়েমানুষ না রাক্ষসী ? ধিঙ্গীপনার তো অন্ত রাখ নি। আমি তো কখন সাতে-পাঁচে কোন কথা কই না ! কইলেও তো কোন দিন আমার কথা কেউ কাণে তোলে না ! বোকা মুখ্যু এক ধারে সরেই থাকি। কিন্তু তার যদি আজ মতি ফেরে, তুই হতভাগী কোন্ মুখ নিয়ে তাকে সর্ব্বনাশের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে চাস্ ? তোর কি শরীরে একটুক আক্কেল নেই,— মনে মায়া-মমতার লেশ নেই ? তুই কি চাস যে, তোর ভাই আন্দামানে না হয় ত ফাঁসি-কাঠে প্রাণ দেয় ?" অশ্রু-সাগর কূল ছাপাইতেই, নিরুত্তরে তিনি রোদন করিতেই মনোযোগী হইলেন।

অত কথা শুনিয়াও, উৎপলার মুখের পাথর-কঠিন ভাবের কোন বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। সে কিছুক্ষণ মাকে কাঁদিয়া শান্ত হইবার সময় দিয়া, এবার তবু একটুখানি নরম সুরে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল—

"তা ছোড়দা এখন গেছে কোথা ?"

মা প্রথমে উত্তর দিলেন না। পরে কি যেন ভাবিয়া লইয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন, "তার শরীর ভাল নেই—দিন-কতর জন্যে হাওয়া খেতে গেছে।"

নিরতিশয় বিস্ময়ের স্বরে উৎপলার মুখ হইতে ধ্বনিয়া উঠিল,—"হাওয়া খেতে গেছে!"

মা কহিলেন "হ্যাঁ। তা'তেও কি তোমাদের আপত্তি আছে? কেন বাছা, সে কি জেলখানার কয়েদী, যে, তার কোথাও একটু নড়বারও যো' নেই?"

উৎপলা মায়ের এ কঠিন অভিযোগে কর্ণপাত পর্য্যন্ত না করিয়াই অনিশ্চিত সন্দেহে ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি গেছে?"

মা ঝাঁঝিয়া কহিলেন "হ্যাঁ গো হ্যাঁ,—সত্যিই গেছে।"

"কোথায় গেছে?"

মা উত্তর দিলেন, "অত জানি নে।"

মেয়ে কহিল "মা, এটাও কি সত্যি?"

মা আর সে কথার জবাব না দিয়া, মুখ ফিরাইয়া লইয়া, সেলাইএর কলের মধ্যে জামার প্রান্ত চাপিয়া ধরিলেন,—শব্দ উঠিল ঘর্ ঘর্ ঘর্—

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রাগে, দুঃখে, অভিমানে, এবং ততোঽধিক অপমানে আত্মহারা হইয়া, উৎপলা কি করিবে কিছুরই ঠিকানা করিতে না পারিয়া, অসমঞ্জর ঘরের দিকে চলিল। তাহার জিনিসপত্র সব আছে,—শুধু হাত-ব্যাগটা নাই। আর সকলের ছোট একটা কানপুরী ড্রেসিং কেস্‌টা সে নতুন কিনিয়াছিল, সেই-টাকেই দেখিতে পাইল না। ঘর হইতে বাহির হইতেছে—বাড়ীর বুড়ি ঝি—তার মাকে মানুষ-করা পুরাতন দাসী—তাহাকে দেখিয়া, কাপড়ের মধ্যে কি যেন লুকাইয়া ফেলিল; এবং তাহার দিকে একটা সভয় কটাক্ষ করিয়া পলাইতে গেল। "কি গো হরিমতি দিদি, আমি কি চিল না কি, যে তোমাকে ছোঁ মেরে নেব? কি লুকুলে দেখিই না?"

হরিমতি বাড়ীর এই দুর্দ্দান্ত মেয়েটাকে তাহার শৈশব হইতেই ভয় করিয়া চলে। আরও সে জানে, ইহার নিকট আর সকলের যদি বা পরিত্রাণ আছে,—মিথ্যা কথা বলার একবারেই নাই। ভয়ে এতটুকু হইয়া গিয়া, সে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া গেল। তখন উৎপলা আসিয়া তাহার কাপড়ে-ঢাকা বস্তুটাকে টানিয়া বাহির করিতেই দেখা গেল যে, সে খানা নতুন-ন্যাকড়ায়-জড়ান চুনে-হলুদ রংয়ের বেণা সাড়ী।

"এ কি হবে?" বলিয়াই সাড়ীখানা ফিরাইয়া দি কৌতূহলের সহিত সে হরিমতির মুখের দিকে চাহিতে মনিবের পুনঃপুনঃ সাবধানতা-পূর্ণ নিষেধ স্মরণে এক-ঘামিয়া উঠিয়া, হরিমতি ভয়ে সঙ্কোচে জড়াইয়া বলিয়া ফেলি "মা আনিয়েছিল—ফেরৎ দিচ্চে।"

"আনালেই যদি, ফেরৎ দিলে যে?"

"কি জানি ভাই; একটা বুঝি নিয়েচে।" "একটা নিয়েচেন! কার জন্যে?" "তা কি জানি ভাই,—দাদাবাবু বাক্সে দিলে তো।"

"ছোড়দার বাক্সে?"—নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত পুনশ্চ অসমঞ্জর কথা স্মরণে আসিতেই, উৎপলার মনের অভিমানটা এবার যেন সবার উপর দিয়া মাথা তুলিল। যে অসমঞ্জ জ্ঞানের প্রথম উন্মেষাবধি, উৎপলাকে তাহার একখানি ছায়ার মতই অহরহঃ সন্নিকটবর্ত্তী রাখিয়া, নিজের হাতে সম্পূর্ণ রূপেই তাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে,—মাত্র স্কুল-কলেজের সময়টুকু ভিন্ন যাহাদের কখন একমুহূর্ত্ত ছাড়াছাড়ি ছিল না; রোগে, ভোগে, সুখে, সম্পদে, শাসনে, আদরে এতটুকুও যাহারা কখন নিজেদের পৃথক বলিয়া মনে করিতে পারে নাই,—যার নিয়ত সঙ্গ-লাভাশায় উৎপলা মেয়ে-জন্মে জন্মিয়াও কখন মেয়ে-সজ্জা অঙ্গে লয় নাই,—তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহারই সঙ্গের লোভে সে পুরুষ-ছাঁদে মাথার চুল ছাঁটিয়া, পুরুষের পোষাক পরিয়া ট্রামে, পদব্রজে সর্ব্বত্র তাহার সঙ্গে-সঙ্গে ফিরিয়াছে,—দশ-বার বৎসরাবধি সমানে ছেলেদের স্কুলে নাম ভাঁড়াইয়া পড়িয়াছে,—তাহার সেই ছোড়দা কি না আজ তাহাকে লুকাইয়া-লুকাইয়া গোপনে কোথায় কি কার্য্যে ফিরিতে থাকিল! একজন বাহিরের—পরের নিকট তাহাকে মাথা নত করিতে বাধ্য করিয়া আবার, সেই দুঃখে আত্মহারা হইয়া কি না কি একটা বলিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই, তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, একটা কথা পর্য্যন্ত না বলিয়াই, দেশান্তরে চলিয়া গেল। এমন রূঢ় কথা তাহাকে কতই তো সে বলিয়াছে,—কখন ও তো এমন নিঃশব্দে তাহাকে এতবড় কঠিন দণ্ড দিয়া সে সরিয়া যায় নাই! বরং সহস্র অত্যাচারও তাহার সে যে পরম স্নেহে হাসি মুখে মাথা পাতিয়া লইয়াছে

এ কি তাহার সেই স্নেহময়, আনন্দময়, গৌরবময় ছোড়দা! আজ এ কি দুর্ব্বল, এ কি অসহিষ্ণু, এ কি নির্ম্মম হইয়া উঠিল—কেমন করিয়া! সে কি আর উৎপলার স্নেহ, সঙ্গ, সেবা কিছুই চাহে না? উৎপলা আজ তার কাছে এতই অবহেলার পাত্রী! উঃ! নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর! তাহার প্রতি নিজের ব্যবহার-টাকেও যতই অক্ষমনীয় বোধ হইতে লাগিল, ক্ষোভের সঙ্গে মিশিয়া কোপটা ততই যেন প্রবল উগ্র হইয়া দেখা দিল। কি এমন অন্যায় বলিয়াছে সে! অমন লোকের জীবনে-মরণে প্রভেদটাই কি,—যে নিজের অক্ষুন্ন যশোমাল্য এমন অনায়াসে মর্দ্দিত করিয়া, পথের ধূলায় লুটাইয়া দিতে পারে?—তার রাজার মত ছোড়্দাকে সে অমন দীন, ভিখারীর মূর্ত্তিতে দেখিতে পারিতেছে না, তাই সে অত অসহিষ্ণু হইয়াছে, এটাও কি সে বুঝিল না!

সে দিনের সন্ধ্যাটা যেন পূর্ব্ববর্ত্তী সন্ধ্যার উচ্ছৃঙ্খলতার প্রায়শ্চিত্ত লইয়া অতি নম্র ও শান্ত মধুর বেশে আসিয়া দেখা দিয়াছিল। নীলপদ্মের মত চোখ-জুড়ান, অতি কোমল ও নির্ম্মল নীলে দিগ্বলয়ের শেষ প্রান্তটা পর্য্যন্ত যেন ভরিয়া রহিয়াছে। ইহার নীচে গাঢ় সবুজ বৃক্ষশ্রেণী ঠিক যেন সেই নীলবসনাচ্ছাদিত বরণডালাখানা মাথায় লইয়া স্বয়ং বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বেশ্বরীর শয়ন-আরতির বরণ-প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদের মধ্যভাগে বিচিত্র বর্ণের মণি-খণ্ডের মত কত হর্ম্ম্য-শীর্ষ কত মন্দির-চূড়া, কতই না বিপণী-সজ্জিত অফুরন্ত পথিকের গমনাগমন-মুখরিত রাজপথ। বৃষ্টি-জলে ধোয়া ছাদের উপর উৎপলা কিছুক্ষণ বিমনা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। অতিশয় সুখস্পর্শ মন্দ-মধুর বাতাস বহিতে-ছিল। কিন্তু উৎপলার উষ্ণ মস্তিষ্ক সে কিছুতেই স্নিগ্ধ করিতে পারিল না। গত রাত্রি হইতে একবার বিমলের উপর একবার অসমঞ্জর প্রতি প্রায় সমানভাবেই তাহার মনের মধ্য হইতে একটা অতি বিসাক্ত, অপমানিত ক্রোধের জ্বালা জ্বলন্ত হইয়া রহিয়াছে। বিমল এখন মস্ত লোক হইয়াছে। সে এখন আর তাহাকে গ্রাহ্যও করে না; উপরন্তু তাচ্ছিল্য করিয়াও চলিতে অপারগ নয়, তাহা গত কল্যই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। আর অসমঞ্জ, সে তো তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত অনায়াসে ত্যাগই করিয়া গেল! উৎপলার সমুদায় প্রাণটাও যেন তাহার চিত্তের অনল-পর্ব্বতের দাহের মধ্যে পুড়িয়া পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে—এমনি একটা দাহ-জ্বালা সে তা নিজের ভিতরে এবং বাহিরেও যেন অনুভব করিয়া অ হইয়া উঠিল। তাহার এমনও মনে হইল যে, এর চেয়ে বাড়ীটার সর্ব্বত্রই আগুন জ্বালাইয়া দিয়া পুড়িয়া মরাই পক্ষে সবচেয়ে কম কষ্টের। এমন অনাবশ্যক অপমা জীবন বহন করিয়া সে কি লাভ করিবে? তার পর ভৃত্য আসিয়া বিমল বাবুর আগমন-বার্ত্তা জানাইল, আবার আর একটা নূতন ভয়ে ও লজ্জায় তাহার বুক আধহাত ধ্বসিয়া আসিল। আজ সেই বিজয়ীর বিজয়-গ পরিপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া, সে তাহার প্রশ্নের উত্তরে কে করিয়া জানাইবে যে, তাহার ভাই,—তাহাদের দলপতি, মন্ত্রদা গুরু—কঠিন কার্য্যের সময় আগত দেখিয়া, কোথায় কে গোপন বিবরে লুক্কায়িত, পলাতক। আর সে কোথায়, তা উৎপলাও জানে না! যদি এ কথা বিমল বিশ্বাস না করে এখন হয় ত সে তাও পারে।

বিমলের মুখের ভাব স্বাভাবিক; কিন্তু সে যখন ক কহিল, তাহা শ্রবণ মাত্র উৎপলার সমস্ত দেহের প্রত্যে রোমকূপ যেন খাড়া হইয়া উঠিল। গলার স্বরে তাহা অশ্রুতপূর্ব্ব, অস্বাভাবিক কোন কিছু ছিল।

বিমল বলিল "কাল আমি অকৃতকার্য্য হয়ে ফিরে এসেছি শুনিয়া একদিকে উৎপলার মনে অনেকখানি দুঃখ বো হইলেও, বিমলেন্দুর যে গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে, ইহা ভাবিতেও অনেকটাই সান্ত্বনা বোধ করিল। এবং সেজন্য ভা মানুষটী সাজিয়া, অত্যন্ত চাপা পরিহাসে কহিল, "যে ঝ কাল গেছে! অন্ধকারে পথ ভুলে গেছলেন বুঝি?"

বিমলেন্দু স্থির, অচঞ্চল নেত্র-তারকা এক লহমার জ নিরুত্তরে উৎপলার গূঢ় ব্যঙ্গে সমুজ্জ্বল নেত্রের উপরে স্থাপ করিয়াই, অপসৃত করিয়া লইল; শান্ত, উদাস কণ্ঠে উ করিল, "হ্যাঁ, ভুল একটা কোনখানে হয়েছিল বই কি! যা'হোক, আপনি দয়া করে একবার আমাদের 'সঞ্জীবনী সভা'র খাতাখানা এনে একটা জিনিস দেখে নিতে আমা-সাহায্য করবেন কি?"

উৎপলার অন্তরের মধ্যটা বিমলেন্দুর এই স্থৈর্য্যপূ অথচ কেমন যেন একটা রহস্যময় ব্যবহারে চমকিয়া উঠিল বিমলেন্দু এখন অবশ্য সেই মুখচোরা লাজুক বিমলেন্দু নাই কিন্তু এমন অচঞ্চল স্থির কটাক্ষের আঘাত, এমন অবিচ

দৃঢ়তাব্যঞ্জক আদেশপূর্ণ কণ্ঠও তো সে তাহার নিকট হইতে কোন দিন পায় নাই।

আজ তাহার এ কি ভাব? চলিতে গিয়া উৎপলার পা একবার বাধিয়া গেল।

খাতার পাতা উল্টাইয়া, বিমলেন্দু আলোর সাম্‌নে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, দু'একটা লাইন একবার দুইবার, বোধ করি বার-তিনেকই বা পড়িয়া গেল। উৎপলা তখন আর কৌতূহল দমনে রাখিতে না পারিয়া সরিয়া আসিয়া পড়িয়া দেখিল—"বিশ্বাসঘাতকতা বা শপথ-ভঙ্গের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।" উৎপলার বুকের মধ্যের রক্তটা ছলাৎ-ছলাৎ করিয়া বার-কয়েক ধাক্কা মারিয়া গেল। বিমলেন্দু হঠাৎ খাতা দেখা বন্ধ করিয়া উঠিয়া, উৎপলার মুখের দিকে চাহিল—"এ কার লেখা?"

উৎপলা কহিল "আমারই।"

বিমল পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিই তো সমিতির সেক্রেটারী?"

উৎপলা জবাব দিল "হ্যাঁ"—তাহার কণ্ঠে নিরতিশয় বিস্ময়ের রোষ বাজিয়া উঠিল, "এ সব হেঁয়ালির অর্থ কি বিমলেন্দুবাবু?"

বিমল ধীরস্বরে উত্তর করিল, "কথাটা তো নেহাৎ সোজা নয়; তাই ক্রমেক্রমেই বলি। আচ্ছা, এই যে সব নিয়মগুলি এক দুই তিন নম্বর দিয়ে লেখা আছে,—এগুলি কে তৈরি করেছিল জানেন?"

উৎপলা তেমনি আশ্চর্য্য ভাবে থাকিয়াই জবাব দিল, "ছোড়দা আর আমি।"

"এ নিয়মগুলোকে আপনারা এখনও মান্য করা আবশ্যক বোধ করে থাকেন? অথবা এসব একদিনের ছেলেখেলা বোধে এখন এ সমস্তই প্রত্যাহার করে…"

"বিমলেন্দুবাবু!"

বিমল কোনরূপ অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন না করিয়া, মাত্র কথা বন্ধ করিল। "বিমলেন্দুবাবু! এ সভা আপনি প্রতিষ্ঠা করেন নি, আমরা করেছি। আপনি এখানের সবচেয়ে-নূতন-ভর্ত্তি-হওয়া সভ্য। কেমন করে জানলেন যে আমরা এখন এর সমস্ত নিয়ম প্রত্যাহার করে নিয়েচি?"

বিমলেন্দু তেমনি নিঃশব্দে নিজের বুক-পকেটের মধ্য হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া সেটা মেলিয়া ধরিল। উৎপলা দেখিল সভাপতি অসমঞ্জের অনুপস্থিতি-কালের জ… বিমলেন্দুকে সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ করা হইয়াছে। ইঁহা… কার্য্যকালে সভাভুক্ত সকলেই নির্ব্বিচারে ইহাঁরই আদে… পালনে বাধ্য থাকিবে,—এই কথাটার মূল সেই খাতাখানা… মধ্যেই যে লিখিত রহিয়াছে, উৎপলার তাহা ভালরূপেই জান… ছিল। তলায় অসমঞ্জ ও উৎপলা ব্যতীত অপর সকলেরই নামের স্বাক্ষর আছে। উৎপলার উহা পড়া শেষ হইয়া গেলে, বিমলেন্দু জিজ্ঞাসা করিল "কোন আপত্তি আছে?"

উৎপলা বিমলেন্দুর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল "আছে।"

"কি?"

"ছোড়দার বদলে আমি ভিন্ন আর কেউ কার্য্যাধ্যক্ষ হ'তে পারে না,—মূল কাগজের ৩২এর পাতায় নিয়মটা দেখে নিন।"

বিমল আজ্ঞা প্রতিপালন করিল; এবং তৎক্ষণাৎ তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ পদের মঞ্জুরী-পত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে আর একখানা কাগজে আর একখানা মঞ্জুরী-পত্র লিখিয়া আনিয়া, উৎপলার সামনে ধরিয়া বলিল, "এই খাতায় লেখা নিয়মের সম্মান নিজের জীবন দিয়ে করবার প্রতিজ্ঞা আপনারাই করিয়ে নিয়েছেন। একচুল তফাৎ প্রাণ থাকতে হবে না। আজ থেকে আপনিই সভাপতি; আর অনুমতি করেন তো আমি আপনার সহকারী হ'তে পারি? আর কেউ অমত করবে না। আচ্ছা, এখন তা হলে যে দুরূহ কার্য্যের সম্পাদন-ভার আপনার ও আমার উপর পড়লো, তাও শুনুন। সেদিন যে সেই সাতাশ হাজার টাকা আমাদের সমিতির হাত থেকে স্খলিত হ'য়ে গেল, সে আমার অক্ষমতায় নয়; আমাদেরই দলস্থ একজনের বিশ্বাস-ঘাতকতায়"—"অসম্ভব!" বলিয়া উৎপলা উদ্ধত ভাবে মাথা তুলিল। "এই চিঠিখানা আমি সেই বন্ধ বাড়ীর সিঁড়িতে কুড়িয়ে পেয়েছি। পড়চি শুনুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন সম্ভব কি অসম্ভব।—'মহাশয়! আমি আপনাদের অপরিচিত হইলেও আপনাদের অথবা সকলেরই হিতকামী। আপনাদের বাটীর দ্বিতলের উত্তর দিকের বড় ঘরের পূর্ব্বধারের লোহার সিন্দুকে যে সাতাশ হাজার টাকা ও অলঙ্কার আছে, অদ্য রাত্রে সেই টাকা লুঠ করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। সুহৃদের পরামর্শ যদি গ্রহণ করিতে চাহেন, যে কোন বাধা উপেক্ষা

করিয়াও, অর্থাদি সমেত অদ্য সন্ধ্যার মধ্যে বাটী ছাড়িয়া চলিয়া যান,—নতুবা বিশেষরূপ বিপন্ন হইবেন ইহা সুনিশ্চিত। বন্ধু।"

উৎপলার মুখ অরুণোদয়ে পূর্ব্বাকাশের মতই লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। কম্পিত উচ্চকণ্ঠে সে উচ্চারণ করিল, "বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতক!" "ঠিক তাই! সেই বিশ্বাস-ঘাতকতার দণ্ড দিতে আমাদের প্রস্তুত হ'তে হবে,—হ'তে আমরা বাধ্য।"

উৎপলা প্রতিধ্বনির মতই উত্তেজিত স্বরে উত্তর করিল, "নিঃসন্দেহ!—আমরা দণ্ড দিতে বাধ্য!"

পরক্ষণেই তাহার মুখ ঈষৎ শুকাইয়া আসিল,—বিশ্বাস-ঘাতকের দণ্ড মৃত্যু—ইহা এই আইন-সচিবের অজ্ঞাত নয়!

একখানা পরোয়ানা-লিখিত কাগজ উৎপলার সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া দিয়া, ঠিক তেমনি অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে চাহিয়া, যেন কাহার কাছে ধার-করা অভূতপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের সহিত বিমলেন্দু ধীরকণ্ঠে কহিল, "তাহলে এইখানে আপনার নাম সই করুন। সমিতি-শুদ্ধ সকলকারই নামের সই এতে দেখতেই পাচ্চেন! এ বিষয়ে সকলেই এক-মত। আরও শুনুন,—শুধু এই নয়, আরও একটা বড় রকম চার্জ্জ এর বিরুদ্ধে উপস্থিত হয়েছে;—আজ তিন দিন হ'লো এ ব্যক্তি বিবাহিত হয়েচে।"

খাতার পাতাখানা ক্ষিপ্রহস্তে উল্টাইয়া, উৎপলা বিচারক জজের মতই গম্ভীর স্বরে পাঠ করিল "এই সমিতির কেহ জীবনে কখন বিবাহ করিতে পারিবে না,—করিলে, তাহার দণ্ড মৃত্যু!"

"বিবাহের প্রমাণ এই সরযুপ্রিয়াদের পত্র—...."বিব হইয়া গিয়াছে। কিছু পূর্ব্বেও যদি পাত্রীপক্ষের নিশা পাইতাম,—এই অমূল্য জীবনরত্ন রক্ষায় সচেষ্ট হইতাম কিন্তু হতভাগ্য আমরা আজ এতটুকু অক্ষমতার জন্য ি হারাইতে বসিয়াছি! লেখনী চলে না, সাক্ষাতে সব কং বলিব। কনে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

উৎপলা ত্বরিৎহস্তে কলম তুলিয়া লইয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিজের নাম সই করিয়া দিল। দিতে দু'একবার হাত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল; পাছে বিমলেন্দু জানিতে পারে, মনে-মনে হাসে, তাই নারীত্বের এই বিকাশটুকুকে প্রচণ্ড অহঙ্কারের আগুণে আহুতি দিয়া, মুখোসপরা মুখের মত ভাবশূন্য মুখে অনায়াসেই সে সেই ভীষণ কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিল। সে যে স্বেচ্ছায় এই কঠিন ব্রত পুরুষের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে!

লেখা সমাধা হইবামাত্র, বিমল কাগজখানা তুলিয়া লইতে গেলে, আকস্মিক বিস্ময়ে বিস্মৃত একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা উৎপলার স্মরণ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি কাগজখানা টানিয়া লইয়া, সে এই নিদারুণ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর নামের জায়গাটায় চোখ বুলাইল; এবং সঙ্গে-সঙ্গেই একটা মর্ম্মবিদারী তীব্র আর্ত্তনাদ তাহার কণ্ঠকে চিরিয়া-চিরিয়া বহির্গত হইয়া গেল; এবং একটীমাত্র নিমেষের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী তাহার পদতলে কম্পিত, সমস্ত আকাশ তাহার মাথার উপর হইতে অপসৃত, জগতের সমুদয় বায়ুলহরী তাহার নিকট হইতে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া সে মাটিতে পড়িয়া গেল।

সে নাম—অসমঞ্জ রায়। (ক্রমশঃ)

সর্ব্বময়

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

ভেবেছিনু বসি শুধু সাগর-বেলায়
হেরিব লহরী-লীলা স্বচ্ছন্দ হেলায়;
নাই বা জানুক কেহ, নাই বা চিনুক,
আমি শুধু তট-তলে কুড়াব ঝিনুক;
কে জানিত ওই নীল পাথারের বুকে
ভাতিবে তোমারি মূর্ত্তি নয়ন-সম্মুখে;
সেই শ্যাম কলেবর, উদ্দাম কৌতুকে
ছুটে এসে বুকে পড়া সেই হাসি মুখে,
প্রেমোচ্ছ্বাসগর্ব্ব ভরে চুমিয়া বদন
ছল করি' সেই পুনঃ দূরে পলায়ন,
যেথা থাকি, যেথা যাই—বিপথে বিজনে
আনন্দ-প্রতিমা তব না জানি কেমনে
অন্তরে বাহিরে জাগে, কহে বারবার
ছায়া সে কায়ারি গড়া, সম গতি তার।

লেডী ডাক্তার

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

হিমাদ্রি বয়সে নবীন, সুশিক্ষিত, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত সে অনেক বৃদ্ধ ও উপাধিধারীর চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে। মন দিয়া সে সর্ব্বশক্তিমান্‌কে বিশ্বাস করিত, আর প্রাণের মধ্যে গাঢ় করিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিত। এতটা বিশ্বাস ও ভক্তি সত্ত্বেও কেন যে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা তাহার প্রতি এমন নিষ্করুণ হইয়া পড়িয়াছিলেন, ছল-ছল নেত্রে এই কয়টি কথা ভাবিতে ভাবিতেই সে রুগ্না তারকার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল। তারকার চক্ষু দু'টি নিমীলিত ছিল; রক্তশূন্য পাংশু অধরোষ্ঠ সম্বদ্ধ, তবুও হিমাদ্রির মনে হইল যেন সেই বদ্ধ অধরোষ্ঠ ভেদ করিয়া তারকার চিরদিনের হাসিটি এই মাত্র ফুটিয়া উঠিল! হিমাদ্রি পত্নীর ললাটে কর স্পর্শ করিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—তারকা!

দুইমাস একাদিক্রমে জ্বরে ভুগিয়া ও অন্য বহুবিধ রোগের তাড়নায় তারকা আজকাল কাণে কম শুনিতেছে। জ্বরটা ম্যালেরিয়া, কিন্তু অন্য উপসর্গগুলির সংবাদ হিমাদ্রি সঠিক জানিত না, জানিত ডাক্তার কালীকুমার বাবু আর রোগিণী নিজে। ডাক্তার রোগের চিকিৎসা করিত, আলোচনা করিত না, আর তারকা রোগ ভোগ করিত, স্বামীর ম্লান-মুখ চাহিয়া তাহার প্রাণের মধ্যে কাঁদিয়া উঠিত, কিন্তু রোগের বিবরণ শুনাইয়া স্বামীকে অধিকতর ব্যাকুল করিতে চাহিত না। হিমাদ্রির যেদিন তারকার সহিত বিবাহ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তারকা জানিয়াছিল, তাহার মত খোলা-ভোলা লোক সংসারে খুব বেশী নাই। তাই সে ছয় বৎসর স্বামীকে যে কি করিয়া রাখিয়াছিল, সেই জানিত না। হিমাদ্রি প্রথম সেই দিন বুঝিল, যেদিন প্রভাতে কোন মতেই তারকা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিল না; সেই দিনই বুঝিল যে বিগত ছয় বৎসর সংসারে বাস করিয়াও সে কোন্ স্বর্গে ছিল এবং হঠাৎ কাহার নিদারুণ আর্ত্তশোকে স্বর্গচ্যুত হইয়া কঠিন মর্ত্ত্যে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সে দুইমাস আগের কথা।

ডাক্তার আসিবার সময় হইয়াছে বুঝিয়া হিমাদ্রি সযত্নে তারকার কাপড়-চোপড়গুলি ঠিক করিয়া দিল। তার· আবেশময় নেত্রে দু'একবার দয়িতের পানে চাহিয়াই আবা চক্ষু মুদিল। বোধ করি তাহার চোখ দু'টী সেই দুই মুহূ সময়ের মধ্যেই সজল হইয়া উঠিয়াছিল; তাহা গোপ করিতেই সে চক্ষু মুদিল। কিন্তু যে লোক তাহার পা বসিয়া, শুধু দু'টি চোখের দ্বারা নয়, সর্ব্বেন্দ্রিয় সজাগ করি তাহাকে দেখিতেছিল, তাহার চোখে বারিবিন্দুগুলি আপন আপনি টল্ টল্ করিয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বে রুদ্ধ করিয়া সে অতি সন্তর্পনে নত হইল; ততোধি সন্তর্পনে সেই মুদ্রিত চোখের পাতাতেই নিজের মনের অনে· ব্যথা, অনেক বেদনা নমিত করিয়া পুনরায় স্নেহস্বে ডাকিল—তারকা!

তারকা হাসি-হাসি মুখখানি লজ্জা-নত করিয়া উত্তর দি· কি বলছ?

হিমাদ্রি তাহার পাশে শুইয়া পড়িয়া বলিল—এখা ডাক্তার আস্‌বে; দেখি আজ কি বলে।—কাল না হ কলকাতা থেকে ডকটর দাসকেই আন্‌বো।

তারকা এক মিনিট পরে বলিল—তার চেয়ে একজ মেয়ে ডাক্তার আন্‌লে হয় না? দেখ, ঐ সব পুরুষ-মানুষ .

হিমাদ্রি বলিল আচ্ছা, তাই। কালী বাবু আসুন আজকে জ্বরটা কিন্তু কম আছে।

তারকা ম্লানহাস্যে কহিল—ভয় নেই, বিকেলে আস্‌ খন।...কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল—তা'ও যা ৮।১০ ডিগ্রী হয়—তাহ'লেও বা হয় বুঝি যে শীঘ্র শীঘ্র যে‌ পারি।

কালও এই রকমের কি একটা কথা তারকা বলিয়াছিল আজও সেই কথা শুনিয়া হিমাদ্রি অভিমানের স্বরে কহি· আমার এত কষ্টের পরেও তোমার মুখে ঐ কথা তারক!

তারকা স্বামীর ব্যথা অনুভব করিয়াই বলিল সেই জন্যই ত শীঘ্র যেতে চাই। এই যে দু'মাস বিছানা পড়ে আছি, কি আছে না আছে সে দেখা ত দূরের কথা,

সারারাত এই বিছানার পাশে খাড়া বসিয়ে রেখেছি, রোগের ভাবনা-চিন্তায়, তোমায় যে শেষ করে ফেললাম আমি।

কে বল্লে আমাকে শেষ করে ফেলেছ। আমি বেশ আছি। রাত জাগতে আমার কোন কষ্ট হয় না,—জানই ত বিয়ের আগে আমি হপ্তায় তিন দিন রাত জেগে ইংরেজী বাংলা থিয়েটার দেখে বেড়াতাম। আর সেবা! কি বল্‌ছ তারক! আমার প্রাণটা ঢেলে দিয়েও যদি তোমার সারিয়ে ফেল্‌তে পারতাম!······তারক, তুমি যে বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছ, দিনের পর দিন তোমার মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে যাচ্ছে, কৈ তারক, আমার সেবায় ত তোমার কিছু উপকার হ'চ্ছে না। কি জানি, আমার সেবার অবহেলা হ'চ্ছে বলেই কি তিনি···বলিতে বলিতে হিমাদ্রির মুখখানি জলে ভাসিয়া গেল। তাহার স্ত্রী চক্ষু বুজিয়াই বলিল, ছিঃ কেঁদো না। ভগবান্‌ আমাকে সারিয়ে দেবেন—তোমার প্রার্থনা কি তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন?

দ্বারের বাহির হইতে ঝি বলিল, দাদাবাবু গো, ডাক্তার বাবু।

হিমাদ্রি কালীকুমারকে অভ্যর্থনা করিয়া চেয়ারে বসাইয়া বলিল, জরটা কাল রাত থেকে কমেছে।

কত হয়েছিল?

হ'য়েছিল ৪-ই, কমেছে ভোরে দুই।

হুঁ—বলিয়া কালীকুমার রোগিণীর শীর্ণ হাতখানি হাতের মধ্যে লইয়া জিজ্ঞাসলেন, আজ কেমন আছ মা? তুমি নিজে বল। এখনি এত কথা কইছিলে, আর আমি জিজ্ঞাসা করতেই যে ··

তারকা বলিয়া উঠিল, জরটা কমেছে।

ডাক্তার জিজ্ঞাসিলেন, আর?

হিমাদ্রি বাহির হইয়া গেল। দশ মিনিট পরে ডাক্তার বাহিরে আসিয়া বলিলেন—আপনার পত্নীর বড় দুঃখ হ'য়েছে; বল্লেন, ওঁর বড় কষ্ট হ'চ্ছে—আমাকে কলকাতার কোন মেয়ে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিন, ডাক্তারবাবু! কত বড়-বড় ঘরের মেয়েরাও ত দুরারোগ্য ব্যাধিতে সেখানেই যায়।

হিমাদ্রি নিশ্চল, নির্ব্বাক্‌!

আমি বলি কি—ডাক্তার দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিয়া কহিলেন—ওঁর মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। বাস্তবিক, আপনাকে দেখবার শুনবার কেউ নেই, তার ওপর দিনরাত রোগের সেবা; এতে কোন্‌ স্ত্রীর প্রাণে না কষ্ট হয়! তাই বলি কি, একটা মেয়ে-ডাক্তার—এই নার্শ-টার্শ গোছের, আনিয়ে নিতে ক্ষতি কি? দেখবে শুনবে, সেবা শুশ্রূষা করবে, ওষুধ খাওয়াবে, ট্রিটমেন্টও কতক-কতক করতে পারবে, বিশেষতঃ ওঁর...

হিমাদ্রি কহিল, আমিও তাই বল্‌ছি।

ডাক্তার বলিলেন, এ'টা আমাদের আগেই করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি বল্‌তে সাহস পাই নি কেন জানেন? আপনারা যে আবার বিশেষ হিঁদু, কি না! সত্যি-মিথ্যে জানি নে, আমাদের বাড়ীর মেয়েরা ত বলে ওরা নাকি বৈষ্ণব-চূড়ামণি অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য!

হিমাদ্রি নতমুখে কহিল—নার্শ রাখায় আমার কোন অমত নেই। আমার পত্নী ও সব আগে পছন্দ করতেন না। ওঁর যখন মত হয়েছে······

সাধে কি আর মত হয়েছে? আপনার কষ্ট দেখেই হ'য়েছে। আচ্ছা, হিমাদ্রিবাবু, আপনার কোন আত্মীয়া স্ত্রীলোক-ট্রীলোক নেই?

কেন?

মুস্কিল কি হয়েছে জানেন? আমি নার্শের কথা বল্‌তে উনি বল্লেন—সে ত আমার সেবাই করবে, কিন্তু ওঁর কি হ'বে!

হিমাদ্রি হাসিয়া বলিল—আমার কি দরকার ডাক্তার বাবু? আমাকে খাইয়ে দেবে, না তেল মাখাবে?

ডাক্তার বাবু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তা যা বলেছেন হিমাদ্রি বাবু!···যাক্‌। একটা লোক দিন দুপুরের গাড়ীতে কলকাতায় পাঠিয়ে—একটা ওষুধ বাথগেটের ওখান থেকে আনাতে হ'বে; আর একখানা চিঠি দেব চারুলতাকে, তা'কেও নিয়ে আস্‌বে সঙ্গে করে। দেখুন, দুটি নার্শ আমার জানা আছে। একটি এই চারুলতা, তার চার্জ্জ একটু বেশী বটে, কিন্তু বেশ গৃহস্থ পোষ, আর অতি সচ্চরিত্রা ও যত্নশীলা। আর একটি প্রিয়ম্বদা হালদার! সেও নার্স হিসাবে বেশ বটে, চার্জ্জ চারুলতার চেয়ে কম, কিন্তু একটু কি জানেন? সাহেবী মেজাজের লোক। তা বলুন আপনি কাকে আনাব?

ঐ চারুলতাকেই চিঠি দেবেন। তিনি যদি না পারেন আসতে—প্রিয়ম্বদাকেই আন্‌তে হ'বে।

হাঁ,তবে চারুলতা বাইরের কেস্ বড় একটা ছাড়ে না। পয়সা মোটা পাওয়া যায় কি না। দশ টাকা দৈনিক, ফুডিং, লজিং সার্ভেন্ট ফ্রি।

তা হোক্।

আমি বাইরে গিয়ে চিঠি আর প্রেসক্রিপ্‌সন লিখে দিচ্ছি, বলিয়া ডাক্তার বাবু নীচে নামিয়া গেলেন। বৃদ্ধ ভৃত্য ঈশ্বরার উপর প্রভুর আদেশ দেওয়া আছে, সে রোজই গাড়ীতে উঠিবার কালে ৮টি করিয়া টাকা হাতে গুঁজিয়া দিয়া থাকে।

হিমাদ্রি ঘরে আসিয়া বলিল, নার্স আন্‌তে পাঠাচ্ছি, তারকা!

পাঠাচ্ছ! আচ্ছা। তখন কিন্তু এক কাজ করতে হবে।

হিমাদ্রি শঙ্কিত হইয়া কহিল, কি, তারক? তখন তোমার জন্য কাজ ত থাকবে না—তুমি সময়-মত খাওয়া-দাওয়া করবে। আমার এইখানে, সামনে বসে খাবে, আর ঐ ঘরটায় শোবে—মাঝের দরজা খোলা থাক্‌বে। কেমন?

হিমাদ্রির পিতা-মাতা বহুকাল স্বর্গীয় হইয়াছেন ;—এক বৃদ্ধা খুড়িমা কাশী-বাস করিতেছেন। অপর কোন আত্মীয় বা আত্মীয়ার সন্ধান সে জানিত না। শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে তারকার বড় বোন নক্ষত্র স্বামী-পুত্র লইয়া মিরাটে চাকরী করেন। আর কেহ থাকিলেও তারকার তাহা বিদিত ছিল না। বিবাহ হওয়া অবধি তারকার মনের মধ্যে অসীম তৃপ্তি ছিল যে, সংসারে তাহার স্বামীকে দেখিবার, তাঁহাকে সুখী করিবার পূর্ণ অধিকার পাইয়া একমাত্র সে'ই আছে। যতদিন না বিবাহ হইয়াছিল, মীরাটে সে দিদির সংসারে একছত্র ছিল। বিবাহের পর তাহার আসন ক্ষুণ্ণ ত হইলই না, বরং গৌরব বৃদ্ধি হইল। দিদির সংসারের আধিপত্য তাহার থাকিলেও দিদির ছেলেপুলে এবং স্বামীর পরিচর্য্যা ও সেবার ভারটি কতক দিদির হাতেই থাকিয়া গিয়াছিল। তাহার দিদি কিছুতেই সবটা এতটুকু একটা মেয়ের হাতে দিতে পারেন নাই। কিন্তু এই নূতন গৃহে আসিয়া সে দেখিল, এখানের সে রাণী, তাহার স্বামী সমস্তটাই তাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া বোম্ ভোলানাথ হইয়া, বসিয়া রহিল। লাখরাজ জমীগুলির খাজনার হিসাব-নিকাশ করিবার জন্য খানকতক বালির কাগজে বাঁধা খাতা, আর কতকগুলা কোম্পানীর কাগজ, দু'পাঁচখানা দলিল, ব্যাঙ্কের একখানি খাতা ও খান দুই চেক্ বহি সমেত একটা বাক্স চতুর্দ্দশবর্ষীয়া তারকার হাতে দিয়া বলিয়া দিল—আমি তোমার যথা, আর এই তোমার সর্ব্বস্ব। যথাসর্ব্বস্ব যখন আসিল, তখন বৃদ্ধ ভৃত্য ঈশ্বরা আর সেকেলে ঝি কুসুম হাতের মধ্যে আসিতে দ্বিধা করিল না। উড়িয়া পাচকটা অবাধ্য রহিয়া গেল; নুণ বেশী বলিলে পরের দিন আলুনী রাঁধিত; লুচি পুড়ি গেছে বলিলে কাঁচা নামাইয়া থালায় সাজাইয়া দিয়া যাইত। এই লোকটাকে বশে আনিতে তারকা নিজেই তাহার সহকারী হইয়া সকাল সন্ধ্যা রান্নাঘরেই থাকিয়া যাইত। লাখরাজ জমীর প্রজারা খাজনা দিয়া দাখিলা লইত, হিমাদ্রি কুমার চট্টোপাধ্যায় বং তারকামালা দেবী; কোম্পানী কাগজের সুদ আসিত তাহারই সহিতে, ব্যাঙ্কে জমা দিতে ও চেক্ ভাঙ্গাইতে তাহার সহি-ই একমাত্র ও অদ্বিতীয় ছিল।

ছ'বছরের পর তারকা শয্যায় পড়িয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটাইতে লাগিল। তাহার এত সুখের সংসার, এত যত্নের স্বামীকে দেখিবার কেহ নাই, সেবা করিবারও কেহ নাই! হা বিধাতঃ!

ঈশ্বরা কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবামাত্র হিমাদ্রি ঔষধগুলি ও ধাত্রীর চিঠিখানা তাহার হাত হইতে লইয়া বিছানায় আসিয়া চিঠি খুলিয়া বলিল, কাল ৭টার ট্রেনে আস্‌বেন, ষ্টেসনে লোক রাখতে বলেছেন। ওরে ঈশ্বর, কাল তোকে—এই সাতটার সময়—

জানে। মেম্ নিজেই বলিয়া দিয়াছেন—বলিয়া ঈশ্বরা প্রভুপত্নীর পানে চাহিয়া কহিল, বেশ লোক, মা, তিনি আমাকে সব কথা জিজ্ঞেস্‌লেন। বাড়ীতে আর কে আছে, বাবু কি করেন, মা'র আমার কত বয়েস—

তারকা জিজ্ঞাসিল, ঈশ্বর, কাপড় পরে?

সে একগাল হাসিয়া বলিল হ্যাঁ মা, কাপড় বৈ-কি, তোমাদরই মত কাপড়, সেমিজ, বুলুস—

হিমাদ্রি স্ত্রীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল—বুলুস কি আবার?

তারকাও হাসিয়া বলিল, ও ব্লাউজ বল্‌তে পারে না, বলে বুলুস. আগে সেমিজও বল্‌তে পারত না, চামিচ চামিচ করত।

ওঃ, তাই বল।

ঈশ্বরা বলিল—আমি ত দেখনু বাঙ্গালীই, মা, তার আয়া মাগীটা কিন্তু আমাকে বল্লে—মেম। সে মাগী-টা মা ঘাঘরা পরে, ফিনিস্ চটি—

ফিনিস্ চটি কি রে?

তারকা তাহার হইয়া বলিল, ফ্যান্সি চটি বুঝি, না ঈশ্বরা?

ঈশ্বরা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ মা। মেম্ খালি পায়ে বেড়াচ্ছে, আর আয়াটা ঐ চটি পরে' ফটর্ ফটর্ করে' ঘরের ভেতর চলাফেরা করছে। ও মাগীটাও না কি আস্‌বে মা? আমাকে বল্লে, একখানা গাড়ী নিয়ে ইষ্টিসনে থাক্‌বি--বুঝ্‌লি রে? তোদের দেশে ঘোড়ার গাড়ী আছে ত?—কি বলব কোলকাতা সহর। নইলে তুই-তোকারী করা তার আমি বের করতুম্ একবার। তার মুনিব করে 'বাপ্ বাচ্ছা' আর—ঈশ্বরা দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতেছে দেখিয়া হিমাদ্রি বলিল—এখানে যখন আস্‌বে তুই ও শোধ নিবি।

ঈশ্বরা প্রভুর দিকে একটিবার চাহিয়াই দৃষ্টি নামাইয়া লইল। কথা না কহিলেও যে ভাবটা সে প্রকাশ করিল, প্রভু ও প্রভুপত্নী তাহা ঠিকই বুঝিলেন।

তারকা স্বামীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, হাঁগা, ঐ আয়া না-কি সে মাগীও থাক্‌বে এসে?

কি জানি। না এলে কি করে' বল্‌ব বল? তবে যদি দরকার হয়, রাখতে হবে বৈ-কি।

ঈশ্বরা বলিল, থাকবে মা। মাগী থাক্‌তেই আস্‌ছে। আমাকে জিজ্ঞসছিল, বাবুর পয়সা-কড়ি আছে কি না, কে বাজার করে, দু'বেলা রান্না হয়—না এক বেলা, এই সব।

তারকা বলিল, খরচ ত বড় কম হ'বে না—দেখ্‌ছি।

স্বামী তাহার হাতটি হাতের মধ্যে লইয়া নাড়িতে নাড়িতে কহিল—তা আর কি হ'বে তারক! তুমি ভাল হ'লে যে আমার সব খরচ সার্থক হ'বে।

তারকা আস্তে আস্তে বলিল, কি জানি! আর কোন খরচ ত করতে হয় নি, রোগের খরচই কর।—বলিয়া সে দুঃখপূর্ণ মুখখানি অন্যদিকে করিয়া শুইয়া রহিল।

ঈশ্বরা চলিয়া যাইতেছিল; হিমাদ্রি তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, খুব ভোরে উঠে ষ্টেশনে চলে যাস্ ঈশ্বরা। পাড়া গাঁ, অচেনা জায়গা, তাদের যেন কষ্ট না হয়।

ঈশ্বরা 'যাইবে' বলিয়া নামিয়া গেল। হিমাদ্রি জিজ্ঞাসিল, কি ভাবছ তারক?

ভাবছি...

কি ভাবছ, বল?

ভাবছি, কত সুখ তোমায় দিয়েছি! কত দুঃখই দিচ্ছি!

কেন একশ'বার ঐ কথা ভাবছ, পাগল। তুমি ভাল হও, দেখ্‌বে আমার সব দুঃখ সুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুনেছ ত ডকটর দাস সেদিন কি বলেছিলেন?

তারকা দুঃখ-জড়িত কণ্ঠে বলিল, এত কাল হ'ল না, তুমিও যেমন!

এত কাল যে অসুখ ছিল তোমার! এই অসুখ যদি গোড়াতেই ধরা পড়ত...! তুমি ত বল্‌তে না কোন কথা আমাকে। তখন থেকে চিকিৎসা হ'লে তোমার দিদির বড় মেয়ে মালতীর মত তুমি তিন চার ছেলের মা হ'য়ে, একটাকে কাঁখে, একটাকে পিঠে, একটাকে হাতে করে' ষষ্ঠী বুড়ীটি সেজে বসে থাক্‌তে!

তারকার পাণ্ডু কপোলও ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল, পরমুহূর্ত্তেই নিরাশার মালিমা পুনরায় দেখা দিল।

সেই রাত্রে ভোরের দিকে ঘুমটি ভাঙ্গিতেই তারকা স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, একটু শোও। সারা রাত বসে আছ, আমার মাথা খাও, একটু-খানি গড়িয়ে নাও। উঠে না যাও—এইখানেই একটু শুয়ে পড়।

তোমার জ্বরটা দেখি আগে। হিমাদ্রি থার্মোমিটারে উত্তাপ দেখিয়া উদ্বিগ্নস্বরে কহিল, আজ এখনো কম্‌ল না কেন? ৪-ই ত রয়েছে।

না, গো না, আমি বেশ আছি। তুমি একটু শোও, এখনি সকাল হ'বে—আর শুতে পাবে না।

হিমাদ্রি বলিল কেন কাল থেকে খুব ঘুমব আমি। তুমি যে বলেছ ও ঘরে শুয়ে—

তা ত বলেছি। আজও একটু শোও।

আচ্ছা, শুচ্ছি, শুচ্ছি।

কিন্তু শোয়া আর হইল না। বাড়ীর নিচের রাস্তা দিয়া একটা চাষার ছেলে বোধ করি বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়া, নিরীহ গো-শাবকের লাঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া মাঠের পথে যাইতেছিল, সে গাহিল:—

ভুগে জ্বরে জ্বরে, আমার বউ গেল মরে ;
ওরে, বউরে বউ ! ইয়া আ-ইয়া হ্যা হ্যা হ্যা !
হেট্ হেট্—ওরে বউরে বউ-ইয়া যা-ইয়া য্যা...

হিমাদ্রি সসব্যস্তে উঠিয়া জানালা খুলিয়া বলিল, সকাল হ'য়ে গেছে, তারক, আর শোব না।

তারক কথা কহিল না।

ঘণ্টাখানেক পরেই ঈশ্বরাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মিস্ চারুলতা সোম সস্মিতমুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—নমস্কার।

হিমাদ্রি দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রতি-নমস্কার করিল।

তারকা একদৃষ্টিতে আগন্তুককে দেখিয়া লইয়া ঈশ্বরাকে বলিল, চেয়ারটা দে না ঈশ্বর।

মেয়েটি হাসিয়া—'চেয়ারের দরকার নেই' বলিয়া তাহার শয্যার একাংশেই উপবেশন করিয়া স্নেহ-কোমল স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, জ্বরটা কি আপনার গোড়া থেকেই হয়? না আগে—

তারকা বলিল, জ্বর ত সমানেই আছে।

মেয়েটি তারকার কৃশ হাতখানি তুলিয়া হিমাদ্রিকে বলিল—আপনি দাঁড়িয়ে কেন? একটু বাইরে যান্।

তারকা হাতটা সরাইয়া লইয়া বলিল—জ্বরের খবর উনিই দিতে পারবেন।

সে খবরে দরকার নেই। আর কেউ ধাই-টাই এসেছিল?

না।

কোন ডাক্তার? মানে ধাত্রীবিদ্যার।

আমার স্বামী বল্‌তে পারেন।

আপনিই বলুন না। ওঁকে ও-সব কথা না জিজ্ঞাসা করাই—

তারকা কহিল, দু'জন ডাক্তার দু'বার ক'রে চারবার এসেছিলেন। দু'জনেরই নাম দাস।

বুঝেছি। আপনার বয়স কত? উনিশ না। কুড়ী পার হয়ে গেছে একুশ। কত বছরে বিয়ে হ'য়েছিল আপনার।

চৌদ্দো।

সাত বছর?

না। ছ'বছর চার মাস।

আপনার স্বামী কি নীচে গেলেন? হিমাদ্রি বাহি ছিল, উঁকি মারিল।

চারুলতা বলিল—আমার বাক্সটা আনিয়ে দিন-না ও আর আমার দাই-টাকে গরম জলটলগুলো—

বলি—বলিয়া হিমাদ্রি চলিয়া গেল।

আপনার নাম কি বলুন?

তারকামালা। আপনার?

মেয়েটি একগাল হাসিয়া বলিল—আমার! আ নাম লেডী ডাক্তার।

তারকা বলিল—আপনার নিজের নাম নেই?

মেয়েটি আবার হাসিল। হাসিমাখা মুখখানি নত করি বলিল, তা একটা আছে বৈ-কি ভাই। আমার ন চারুলতা সোম—মিসেস্।

আপনার বিয়ে হ'য়েছে? সধবা নিশ্চয়ই?

চারুলতা হাসিল; বলিল, না ভাই, সধবাও নয়, বিধবা নয়। কুমারী।

তারকা জিজ্ঞাসিল—তবে যে বল্লেন মিসেস্!

মেয়েটি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া বলিল, ভুলে গেছি।

তারকা কিছুক্ষণ পরে বলিল—আপনাকে আমিই আনিয়েছি, জানেন?

ইহা গর্ব্বের কথা, এই ভাবিয়া চারুলতা মুখখানি এ-দিকে ফিরাইয়াছিল। ঠিক সেই সময়েই রোগিণী তাহার শিথিল হাতখানি বাড়াইয়া লেডী ডাক্তারের হাতটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আমার স্বামী বড় কাতর হ'য়ে পড়েছেন, আমার কাছে রাত্রি-দিন বসে-বসে আর ভেবে-ভেবে তাঁর শরীরের অবস্থা যে কি হ'য়েছে, সে কেবল আমিই জানি। দেখ্‌লেন ত ওঁকে। আর ঐ মাস-চারেক আগের তোলা ছবিও রয়েছে, ঐ দেখুন—বলিয়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে সে কক্ষ-বিলম্বিত একখানা যুগল-মূর্ত্তি দেখাইয়া দিল; বলিল, চেনা যায়?

চারু অবশ্য চিনিতে পারিল; কিন্তু সে কথা বলিয়া তারকার ভাবাতিশয্যে আঘাত দিল না; কহিল—বিশ্রী হ'য়ে গেছেন।

তারকা তাহার হাতটি আরো জোরে চাপিয়া বলিল—আপনি যদি আমার ভারটি নেন্, উনি একটু বিশ্রাম করতে পারেন,—শরীরটাও থাকে। নইলে......কথাটা সে শেষ

করিবার আগেই কণ্ঠটি তাহার বাষ্পোচ্ছ্বাসে রুদ্ধ হইয়া আসিল।

চারুলতা নীরবে বসিয়া ছিল। তারকা একটু পরে পুনশ্চ কহিল—অবশ্য, সে উপকার কেবল্ পয়সা দিয়েই পাওয়া যায় না; কিন্তু জানি না কেন, আপনাকে দেখে আমার বড্ড আপনার বলে মনে হ'চ্ছে। আপনার কাছে পাব বলেই আশা হ'চ্ছে।

চারুলতা বলিল—আমার সাধ্য যদি থাকে, পাবেন।

পরম পরিতৃপ্তিতে রোগিণীর পাণ্ডুর আননও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে স্নিগ্ধ স্বরে কহিল—আপনাকে কি বলে ডাকব?

চারুলতা কহিল—তোমাকে আমি তারকা বলেই ডাকব। তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট।

অনেক নয় বলিয়া—তারকা হাসিল। তার পর বলিল—আমিও আপনাকে—তোমাকে চারুদিদি বলে ডাক্‌ব।

লেডী ডাক্তার বলিল—আমি তোমার দিদি?

চারু সে কথার উত্তর না দিয়া, কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—তাহ'লে দিদি, আমি নিশ্চিন্ত হ'লুম?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কতবার বল্‌ব ভাই তোমাকে আমি।—বলিয়া সে যত্নসহকারে তারকার ছল-ছল মুখখানি তুলিয়া ধরিল।

তারকা বলিল—দেখ দিদি, তুমি ভাই ডাক্তার। ডাক্তারী ভয় দেখিয়ে ওঁকে বল্‌বে এখানে যেন না থাকেন, দিন-রাত যেন ছট্‌ ফট্‌ না করেন, নইলে উনি শুন্‌বেন না।

হ'বে গো হ'বে—বলিয়া চারু তাহার আয়ার হাত হইতে বাক্স, ব্যাগ প্রভৃতি নামাইয়া লইতে গেল।

হিমাদ্রি স্নান করিয়া উপরে উঠিতেই সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া চারুলতা বলিল, শব্দ করতে মানা করে দিন না, উনি ঘুমিয়েছেন।

হিমাদ্রি নীচে চাকর-বাকরকে সাবধান করিয়া দিয়া ফিরিতে বলিল—আপনার ঠাঁই ওঁর সামনেই হ'য়েছে, আপনি আসুন।

হিমাদ্রি ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, অন্যদিনের চেয়ে তারকার মুখখানি আজ যেন একটু প্রফুল্ল; নিদ্রার স্নেহ-সুকোমল ছায়া পড়িয়া, পাংশু মুখখানিকেই শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। উপাধানের উপরিভাগে তারকার বহুদিনের অসংস্কৃত রুক্ষ কুন্তলের পরিবর্তে, সংস্কৃত ও তৈলসিক্ত কেশদাম ছড়া রহিয়াছে কে তাহার মধ্যস্থল বিভক্ত করিয়া গাঢ় সিন্দু রেখা টানিয়া দিয়াছে। হিমাদ্রি দুই মুহূর্ত্ত মুগ্ধনেত্রে চা ভাবিল, কাল-পর্‌শু জ্বরটা হয় নি,—অমনি আমার তার কেমন সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

ঠাকুরের পশ্চাতে চারুলতা ঘরে ঢুকিয়া, একটুখা লজ্জিত হইয়াই বলিয়া উঠিল, কৈ, মাথাটাথা আঁচড়ান নি

এই আঁচড়াই—বলিয়া হিমাদ্রি ও ঘরে চলিয়া গে সেই অত্যল্প সময়টুকুর মধ্যেই লেডী ডাক্তার তারকার চু গুলি নাড়িয়া-নাড়িয়া, আস্তে আস্তে বাতাস দিয়া শুকাই তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। হিমাদ্রি ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞা সিল—আজ কি মাথাটা একটু ধুইয়ে দিলেন না কি মোটে দু'দিন জ্বর হয় নি!

কিছু অন্যায় করি নি। আপনি খেতে বসুন।—বলি চারুলতা অনেক দূরে বসিয়া, সজোরে পাখার বাতাস করি লাগিল। হিমাদ্রি নিষেধ করিতে মুখ তুলিয়া দেখিল, তখনও তারকার চুলগুলিই নাড়া-চাড়া করিতেছে, এদিকে তাহার দৃষ্টিও নাই।

হিমাদ্রি জিজ্ঞাসিল—ক'দিনই দেখ্‌ছি এই রকম সম ঘুমিয়ে পড়ছে—ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করছিলুম, তিনি বল্লে ভালোই।

লেডী ডাক্তারও বলিল—ভালোই ত! আচ্ছা—কতক্ষ ঘুমোয়?

বেলা দুটো আড়াইটে অবধি।

রাত্রে বেশ ঘুম হয়?

হয় বৈ-কি।—বলিয়া, চারুলতা হিমাদ্রির পাতের দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিল - আপনি খেয়ে নিন্।

হিমাদ্রি এক গ্রাস মুখে করিয়াই মুখ তুলিল; আবার বলিল—কি রকম বুঝছেন?

ভালো। আপনি খেয়ে নিন্। আর আমার ধাইটাকে আজ কলকাতায় পাঠাচ্ছি;—আপনার চাকরকে বলে দেবেন, টিকিট-ঠিকিট করে যেন গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসে।

ওকে আর দরকার নেই?

না। আপনাদের কুসুমকে একটু-আধটু পেলেই আমার কাজ চলে যাবে। মিছি-মিছি ওকে বসিয়ে খাইয়ে লাভ ত নেই।

হিমাদ্রি সভয়ে জিজ্ঞাসিল, ওকে কি দিতে হ'বে? তাহার ভয় হইতেছিল। এই যে সাত দিন এখানে ছিল,—না-জানি তাহারই জন্য কত 'দণ্ড' দিতে হইবে! কাজ ত করিয়াছিল,—কেবল ঈশ্বরার সঙ্গে ঝগড়া, আর পাচকের সহিত নিভৃতে আহারের পরামর্শ।

চারুলতা বলিল, ঐ থার্ড ক্লাসের টিকিট করিয়ে দেবেন, আর ছ'টা পয়সা ট্রাম-ভাড়া······

আর?

আবার কি? ও ত আমার মাইনে-করা লোক। আর কিছু না।······এক মিনিট থামিয়া আবার কহিল—হাতী-ঘোড়া এমন কিছু করতেও হয় নি যে বথ্‌শিশ্‌ টথ্‌শিশ্‌ পাওনা হ'বে।

তবুও হিমাদ্রি উদ্বিগ্ন স্বরে কহিল, তবু?

কিছু না। কিছু না। ওকে আনাই আমার ভুল হ'য়েছিল। কিন্তু তখন ত আর আমি জানতাম না যে, এমন পরিবারটি আপনাদের,—আর এমন সুন্দর সুবন্দোবস্ত ······বিদেশে গেলে আমরা একা যাই-ও নে।

হিমাদ্রি কথা কহিল না। আপন মনে খাইয়া সে যখন হাত-মুখ ধুইয়া আসিল,—ডিবার খোলে চারিটী পান লইয়া চারু দাঁড়াইয়া ছিল। হিমাদ্রি বলিল, পানের জোগাড় হ'ল কোত্থেকে?

চারুলতা বাম হস্তের মুষ্টি খুলিয়া ক্ষুদ্র একটি কৌটা দেখাইয়া বলিল—ক'দিন পান না খেয়ে কষ্ট হ'চ্ছিল; ওঁকে বলতে, উনি বল্লেন, ছ'মাস আপনিও পানের মুখ দেখেন নি। ঈশ্বরকে দিয়ে পান আনিয়ে নিলাম।...খাবেন?

খাই, বলিয়া হিমাদ্রি কৌটাটি তুলিয়া লইল। সে ত তাহারই। এবং তন্মধ্যে রৌপ্যবর্ণ যে সুগন্ধি তামাকের সুবাস আবরণ-মুক্ত হইয়া প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহাও যেন ছ'মাসের আগের আনা তাহারই দুই টাকা ভরির জরদা বলিয়া মনে হইল।

চারুলতা কহিল—আসবার সময় তাড়াতাড়িতে আমার কৌটাটি ভুলে এসেছিলাম; বোধ করি আমার কষ্ট লাঘব করতেই এ'টি ঐ সেল্‌ফে ছিল।

হিমাদ্রি আর কিছু বলিল না। বারান্দার নীচে বার-দুই পিচ্‌ ফেলিয়া বলিল, আমি এইবার বসি ওঁর কাছে,—আপনি খেয়ে আসুন।

না, না—আপনাকে বসতে হ'বে না। আপনি নি যান্‌। শুনলাম, আপনার ক'জন প্রজা এসে বসে আছে।

প্রজা আমার? কে এল আবার?

প্রজার আগমন বিরক্তিকর, কোন কেতাবেই এ ক লেখে না কিন্তু।

হিমাদ্রি হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমি এখানে না বসলে আপনিই বা খাওয়া-দাওয়া করতে নামবেন কি করে খাওয়া ত চাই; বেলাও ঢের হ'য়েছে।

না, ঢের হয় নি। আর খাওয়া যে চাই-ই তার মা নাই। হাওয়া খেয়েও বাঁচা যায়।

হিমাদ্রি হাসিয়া বলিল—আপনাদেরও আমার ত জা আছে—কলকাতার বড়লোকেরাই হাওয়া খেয়ে বে থাকে। আপনারাও থাকতে পারেন তবে?

পারি বৈকি। আপনি নীচে যান। আর ঈশ্বরাকে বলে দিই। হিমাদ্রি নামিয়া গেল। পাচক সে'খানেই চারুর আহার্য্য আনিয়া দিল। চারুলতা সত্বর আহার শে করিয়া, আচমন করিয়া, রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, একখানা ডাক্তারি কেতাব পড়িতে লাগিল। জরদার কৌটাটি তখন খাটের পার্শ্বেই তেপায়াটার উপরে রাখিয়াছিল। হাসিয়া সে'টিকে সেল্‌ফে উঠাইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল।

দুইটা বাজিবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে হিমাদ্রি বাহির হইতে জিজ্ঞাসিল—আমি আসব?

চারুলতা হাসিয়া বলিল, আসুন।

দ্বার-খোলার শব্দেই বোধ করি তারকার ঘুমটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। হিমাদ্রিকে দেখিয়া সে মাথার কাপড় ঈষৎ টানিয়া দিল। চারুলতা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল—আপনি একটু বসুন তবে।

হিমাদ্রি লজ্জিত ভাবে কহিল—আপনি কোথা যাচ্ছেন?

একটু হাওয়া খেয়ে আসি।—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তারকা চক্ষের ইঙ্গিতে প্রিয়তমকে পার্শ্বে বসাইয়া বলিল, আহা, যাক্‌, যাক্‌,—দিন-রাত ঠায় বসে থাকে। একটিবার যদি ওঠে কি শোয়! পয়সাই না-হয় নিচ্ছে, কিন্তু শরীর ত! এমন বুড়ো-হাবড়াও কিছু নয়—ছেলেমানুষ-ই ত!

হিমাদ্রি বলিল—তুমি সেরে ওঠ,—ওকে আমি খুসী করে' বিদায় করব।

তাই করো—বলিয়া দয়িতা উপাধান হইতে মাথাটি

তুলিয়া এমন এক স্থানে রক্ষা করিল, যাহা কেবলমাত্র অনুমেয়, বর্ণনীয় নহে!

তারকা আপন মনে কত কি বলিয়া যাইতে লাগিল। হিমাদ্রি সব কথায় যেন অন্যদিনের মত সায় দিতেও পারিতেছিল না। তাহা লক্ষ্য করিয়াই তারকা বলিল, কি ভাবছ?

হিমাদ্রি প্রথমটা কথা কহিল না। কিন্তু তারকার পুনঃপুনঃ প্রশ্নে সচকিত হইয়া বলিল, ভাবি নি বিশেষ কিছু।

তবে কি, হাঁ৷ গা। বল্‌তে অমন করছ কেন তুমি?

ঐ উত্তর সীমানার জমি ক'বিঘে বেচব বলে গোয়ালপাড়ার প্রজাদের খবর দিয়েছিলুম। তারা এইমাত্র বলে গেল যে, ঐ বিশ বিঘে জমি কুণ্ডুরা হঠাৎ আজ সকালে বাঁশগাড়ী করে গেছে। মামলা মোকর্দ্দমা না করলে, অধিকার সাব্যস্ত না হ'লে, কেউ নেবে না--বুঝতেই ত পারছ!

তারা বাঁশগাড়ী করলে কেন?

বোধ হয় আমাকে দুর্ব্বল আর অর্থহীন ভেবে।

তুমি করবে ত মোকর্দ্দমা?

দেখি।--বলিয়া হিমাদ্রি নীরব হইল। একটু পরে বলিল--পরশু মিসেস্ সোম তোমার চাবি দিয়ে আলমারি খুলে ব্যাঙ্কের খাতাটা দিতে, খুলে দেখি চারশ'টি টাকা পড়ে আছে। তাই...

তারকা আকুল স্বরে বলিয়া উঠিল—মোটে? আমার যে বেশ মনে আছে, দু'হাজার সাতশো কত টাকা ছিল। ওর—বলিয়া সে দুই হাতে মুখ ঢাকিল। তাহার স্বামী হাত দু'টি টানিয়া নিজের স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল—টাকা—ত আমার যায় নি তারক! এই যে আমার টাকা, টাকার বড় টাকা—মোহর, মোহর।

তবুও তারকা ম্লান, কাতর মুখে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া আছে দেখিয়া স্নেহদ্রবস্বরে বলিল, তোমার চেয়ে টাকা আমার বড়? তারক, তুমি না আমার সব,—আমি না তোমার সব;—এই না ছিল কথা চিরদিন! আজ আবার অন্য কথা কেন?

তারক ম্লান মুখে কহিল, অন্য কথা নয়। আমি ভাবছি, আরও কিছুদিন' যদি এমনি পড়ে থাকি,—তোমাকে পথে দাঁড় করাতে পারব কি-না! তার চেয়ে...

হিমাদ্রির কণ্ঠে অশ্রু উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। সে তারকার মুখের উপর হাত চাপা দিয়া, যেন হাসিতেছে—এমনি ভাবে বলিল, বেশ ত আমি হব সহকার—তু হ'বে—

তারকা অল্পক্ষণ পরে বলিল, কিন্তু মোকর্দ্দমা ত করতে হ'বে। নগদ টাকা ত ঐ চার-শ ভরসা।

না, ও চার-শ' মিসেস্ সোমের জন্যে থাক্। ওর কতদিন হ'বে তার ত ঠিক নেই। আর, মোকর্দ্দমা আ করব না।

তারকা সবিস্ময়ে কহিল, সে কি? অতখানি জমি যাবে

হিমাদ্রি বলিল—আদালত করতে আমি যাব নিশ্চয়ই। উৎসন্ন যাবার অমন পথ আর নেই। যায়---তবুও

কি বলছ?

আমি একবার কুণ্ডুদের সঙ্গে দেখা করব। তাঁদের শু জানাব যে, সম্পত্তি আমার, তাঁদের নয়। তা'তেও তাঁ যদি নেন্—সে উপরের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিল।

বাহিরের লোকে শুনিলে স্তম্ভিত হইত। কিন্তু দু'বছ যাবৎ যে নারী তাহাকে দিনে দিনে, পলে পলে দেখিয় আসিতেছে, সে কেবলমাত্র তাহার স্থির মুখের পানে চাহিয় চুপই করিয়া গেল।

হিমাদ্রি বলিল—কালই যেতে চাই। কিন্তু তোমাকে ফেলে যাই বা কেমন করে?

চারুলতা ঘরে ঢুকিয়া হিমাদ্রিকে বলিল, আপনি বাইরে যান্—আমার কাজ আছে।

তারকা চারুর সাক্ষাতে কথা কহিত না। সে অঞ্চ টানিয়া দিল। হিমাদ্রি বাহিরে যাইতেই, মস্ত চামড়া ব্যাগটা খুলিতে, খুলিতে চারু জিজ্ঞাসিল, উনি আমাকে খু নির্দ্দয় ভাবলেন, না?

তারকা সলজ্জভাবে বলিল, কেন?

চারুলতা সহাস নেত্রে চাহিয়া জবাব দিল—বেশ দু'টিতে মুখোমুখী করে' গল্প হ'চ্ছিল,—হঠাৎ আমি...

তোমার কথাই হ'চ্ছিল?

আমার কথা?

হাঁ, কলকাতায় কি কাজ আছে,—যেতেই হবে,—তাই বলছিলেন...

কি? আমার হাতে ভার দিয়ে যেতে পারবেন কি-না? এই কথা বোধ হয়?

হাঁ।

তা কি স্থির হল, পারবেন ?

তারকা বলিল, তা যদি না পারবেন...

হ্যাঁ। বলিয়া চারুলতা থার্ম্মোমিটারটি রোগিনীর বগলে চাপিয়া কহিল, কথা কয়ো না।

একমিনিট পরে তারকা বলিল, তুমি কি আমার পাতানো দিদি, যে, তোমার হাতে ভার দিয়ে যেতে পারবেন না! সেই সম্বন্ধ আমাদের ?

চারুলতা 'নয়?' প্রশ্ন করিল, এবং উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই, কুসুমকে গরম জল আনিবার আদেশ দিতে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

কাল ভোরেই হিমাদ্রি কলিকাতা যাইবে, আসিতে হয় ত রাত্রিই হইবে। ইচ্ছাটা, আজ সে তারকার কাছেই রাত্রিটুকু কাটায়। সন্ধ্যার পরই সে চেয়ারখানা খাটের কাছে টানিয়া আনিয়া বসিল। চারু নিঃশব্দে ঘরের কোণে ষ্টোভ জ্বালিয়া পথ্য প্রস্তুত করিয়া তারকাকে খাওয়াইল। দু'পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া, এক পেয়ালা তেপয়টার উপর রাখিয়া, অন্যটি হাতে লইয়া চলিয়া গেল। হিমাদ্রি চা খাইতে-খাইতে বলিল, তুমি বুঝি বলেছ ওঁকে তারক? কেন ওঁকে অত কষ্ট দেওয়া।

আমি কেন কষ্ট দেব? আমি বল্লুম, তোমার চা খাওয়া অভ্যাস ছিল—তা কতদিন খেতে পাও নি। তাও সে কথা উঠ্‌ল—কুসুম একখানা প্লেট্ ভেঙ্গে ফেলেছিল, তাইতেই। তখন উনিই সাগ্রহে বল্লেন, আছে ভাই জোগাড়-যন্ত্র? আমারও এমনি হাই উঠ্‌ছে ক'দিন—কি বল্‌ব!

হিমাদ্রি আর কথা কহিল না। নিঃশব্দে চা-টুকু নিঃশেষ করিয়া, বাটীটা নামাইয়া রাখিতে, তারক বলিল, দেখ-দেকিন,—সেল্‌ফের ভিতরে পান আছে বোধ হয়।

হিমাদ্রি পান লইয়া বলিল, প্রথম ক'দিন ওঁর খুবই কষ্ট গেছে, কি বল? না পেয়েছিলেন চা, না পেয়েছিলেন পান তামাক!

চারুলতা ঘরে আসিয়া কহিল, আপনি যান, এবার—আমি এসেছি। ভোরেই ত যাচ্ছেন, গোছাতে-গাছাতেও কিছু হ'বে ত?

এমন কিছু না—বলিয়া চলিয়া গেল। নীচে নামিয়া সে ঈশ্বরাকে খুঁজতে দালানে আসিয়াছিল। কুসুম একাকী বসিয়া, ফু ফু করিয়া একটা কলাই-করা বাটীতে কি পান করিতেছিল। ওমা' দাদাবাবু যে! বলিয়া বাটীটা ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার ঠিক পাশেই হিমাদ্রি চায়ের বাটী দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, কি খাচ্ছ কুসুম?

কুসুম লজ্জিত হইয়া বলিল, গা-গতরে বড্ড বেথা হয়েছে;—মেম্-ডাক্তার একবাটী চা দিলেন কি-না!

অবশ্য সত্যবাদিনী কুসুম সত্য কথা বলে নাই। ইহাদের প্রতিবেশী, দরিদ্রের বন্ধু, অসহায়ের সহায়, দেশের যাবতীয় অহিফেন সেবীর একমাত্র আশ্রয়স্থল কৃষ্ণবাবুর কাছে একটু করিয়া অহিফেন প্রসাদ পাইতে সুরু করিয়াছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যায় 'গা-গতরের বেথা' না থাকিলেও, অতিমাত্রায় শর্করা ও দুগ্ধ মিশ্রিত এক খোরা চা তাহার বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছিল। আজ গৃহেই সেই খোরা উপহার পাইয়া, সে কৃষ্ণবাবুর বৈঠকের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া, মেম্-ডাক্তারকে মনে-প্রাণে আশীর্ব্বচন কহিয়া, চা-টুকু শেষ করিতেছিল। হিমাদ্রি চলিয়া যাইতে, সে বাটীটা তুলিয়া লইল বটে, কিন্তু আর যেন জমিল না। দাদা বাবু বেজার হইয়া গেছেন, এই ভাবনাতে তাহার জমাট নেশাটাও যেন কমিয়া আসিতেছিল। বাটী ধুইতে-ধুইতে সে শপথ করিল—আর এখানে বসিয়া চা খাইবে না। কৃষ্ণবাবুর বৈঠকে 'উপদ্দ' নাই—সেখানেই যাইবে।

দাদাবাবু 'বেজার' হন নাই,—কুসুম তাহা কোনমতেই জানিতে পারিল না। দাদাবাবু কেবল একবার—তবে যে তারকা বলিল, মিসেস্ সোম নিজে চায়ের জন্য—এই রকম ভাবিতে-ভাবিতে সম্মুখে ঈশ্বরাকে দেখিয়া একখানা কাপড় কোঁচাইয়া রাখিতে বলিয়া, উপরে উঠিয়া, নিজের ঘরে দলিল-দস্তাবেজের পুঁটুলীটি খুলিয়া বসিয়া গেল।

কিন্তু এই খোলা-ভোলা হিমাদ্রিটিও আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে, ৪-৫২ মিনিটের ট্রেণ ধরিবার জন্য যখন সে ঠিক পৌনে চারটার সময় একবার তারকাকে দেখিবার মানসেই এ ঘরের দ্বার ঠেলিয়া মুখ বাড়াইল, তখন সস্মিত মুখে তাহার সম্মুখে আসিয়া, সেই কৃশাঙ্গী নারীটি নিঃশব্দে এক রেকাবী সন্দেশ ও এক পেয়ালা চা রাখিয়া বলিয়া গেল, কত বেলা হ'বে তার ঠিক কি? আর উনি জাগলে আমাকে ত জিজ্ঞাসা করবেনই!—তখন হিমাদ্রি বিস্মিত নেত্রদ্বয় তুলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে দেখিয়া লইয়া ভাবিল, এ কি, শুধুই তারকার

আকুল প্রশ্নের ভয়েই এই নারীটি অমন সেবা-তৎপরা হইয়া উঠিয়াছে ?

কোনমতে খাবারগুলা খাইয়া সে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যারাত্রে হিমাদ্রি ফিরিয়া আসিল। তারকার ঘরে ঢুকিতেই, চারুলতা বাহির হইয়া গেল। তারকা প্রশ্নের পর প্রশ্নে সব কথা জানিয়া লইয়া মনে-মনে সহস্রবার কর-যোড় করিয়া মঙ্গলময়কে নতি করিয়া বলিল, তুমিও যেমন সুখবর এনেছ,—আমিও তোমাকে একটি সুসংবাদ দিই। আজ ডাক্তার বাবু বলে গেছেন, পেটের ভেতরকার ফোড়াটা অস্ত্র করতে হবে না,—আপনা থেকেই কমে আস্‌ছে।

শুনিয়া হিমাদ্রি পত্নীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, আজ কার মুখ দেখে আমার প্রভাত হ'য়েছিল! আঃ বাঁচলুম—বলিয়া রোগজীর্ণ পাংশু কপোলকে রক্তিম করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিল।

কার মুখ দেখে, হ্যাঁ গা ? আমার মুখ দেখে নয় ?

হিমাদ্রি বলিল, তোমাকে দেখ্‌তেই এসেছিলুম আমি ; কিন্তু প্রথম দেখেছিলাম মিসেস্ সোমকে।

তারকা হাসি-হাসি মুখে বলিল, হাঁা গো,—ঐ যে আমাকে দেখ্‌বে মনে করে' এসেছিলে কি না, তাই,—বুঝ্‌লে ?

হ্যাঁ, তাই। বলিয়া সে দুই বাহু ধরিয়া, পত্নীকে তুলিয়া, প্রায় বুকের কাছাকাছি আনিয়া,আবার একটি চুম্বনাকাঙ্ক্ষায় তুলিয়াছে,—লেডী ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আহা নাড়া-চাড়া করবেন না। যান্ আপনি,—এখানে আর আস্‌বেন না,—আপাততঃ কিছুদিন। বলিয়া, কোন দিকে না চাহিয়াই, সোজা ঔষধের শিশি ও কাঁচের গ্লাসটি আনিয়া বলিল, খেয়ে ফেল।

তাহার এই আকস্মিক গৃহ-প্রবেশে উভয়েই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। হিমাদ্রি নত মুখে বাহির হইয়া গেল এবং তারকা কোন ওজর-আপত্তি না করিয়াই, ঢক্ করিয়া ঔষধ খাইয়া ফেলিল।

চারুলতা বলিল—দেখ ভাই, অনেক কষ্টে ওটাকে কমিয়ে এনেছি। এখন্ যদি এতটুকু অত্যাচার হয়—ফল যে কি দাঁড়াবে, তা বুঝ্‌তেই পাচ্ছ ত! এই আড়াই মাস বিছানায় পড়ে দেখ্‌লে ত ভাই!

তারকা কথা কহিল না দেখিয়া, চারুলতার মনের আঁধার ঘুচিল না। সে স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিল, এই কারণেই ওঁর প্রতি একটু রুক্ষ হ'য়ে পড়েছিলাম। তুমি কিছু মনে কর না।—বলিয়া তারকার শীর্ণ হাতখানি তুলিয়া লইল।

তারকা বলিল—না দিদি, মনে করব কেন ? মনে আমি ত করব না, উনিও করবেন না। দোষ ত তোমার নয়,—আমাদেরই—সে চুপ করিল। আর একটু পরে বলিল, তবু একটা কথা বল্‌ব দিদি ?

চারুলতা সস্নেহে কহিল · বল।

তারকা বলিল, ভাই, ওঁর উপর রুক্ষ হ'ও না। ওঁর যে কি কষ্ট যাচ্ছে···

চারুলতা ম্লান মুখে কহিল—আর হ'ব না।

তারকা ভাবিল, চারুলতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অশ্রু-সজল মুখে তাহার পানে চাহিয়া আর্ত্তস্বরে বলিল, রাগ কর' না।

তুমি ভাই বড্ড ছেলেমানুষ—বলিয়া চারুলতা তাহার গালটি টিপিয়া দিয়া বলিল, তুমি একটুখানি চুপ করে' থাক, আমি আসছি।

বাহিরে আসিয়া, সংবাদ লইয়া জানিল, হিমাদ্রি হাত-মুখ ধুইয়া বৈঠকখানায় গেছে। চায়ের সরঞ্জাম প্রস্তুত ছিল। গরম জল কাৎলিতে পুরিয়া, চা ফেলিয়া, ঈশ্বরার মারফৎ বাহিরে পাঠাইয়া দিল।

ফিরিয়া আসিতেই তারকা জিজ্ঞাসিল, কি করছিলে দিদি ?

চারুলতা বলিল, চায়ের জোগাড়। বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে এলাম।

তুমি খাও না ?

না ভাই। শরীরটা আজ অমনিই গরম হ'য়ে রয়েছে—কে জানে কেন ? আমার আবার অম্বলের ধাত কি না,—একটুতেই······

তারকা বলিল, অম্বলের আর অপরাধ কি বল। অনিয়ম, অত্যাচার, কষ্ট ত বড় কম হ'চ্ছে না। কি খাও না খাও, কেই বা দেখ্‌ছে! খাও কি-না তাই বা কে জানে!

তা জান-না বুঝি! আমরা হাওয়া খেয়েই বেঁচে থাকি।

সত্যি তাই! আমি ত যখনই দেখি—এমনি বসে আছ তুমি! কি দিন, কি রাত্রি! এত কষ্টও সহ্য হয় ?

চারুলতা হাসিয়া বলিল, স্বামীর ভাবনা গিয়ে বুঝি এখন আমার ভাবনা নিয়েই পড়লে। বেশ যা হোক্।

তারকা সে কথায় কাণ না দিয়াই বলিল, এমন সময়ে এলে দিদি,—যত্ন করা, আদর করা ত দূরের কথা,—কত কষ্টই সইতে হ'চ্ছে।

চারুলতা বলিল, দুঃখই যদি হ'য়ে থাকে,—সেরে উঠে, ঘর-সংসার গুছিয়ে নেমন্তন্ন করো, এসে দু'দশ দিন থেকে যাবো।

তারকা সাগ্রহে কহিল, আস্‌বে দিদি, আস্‌বে? চুপ করে রইলে কেন? বল আস্‌বে? ছোট বোনটিকে ভুল্‌বে না?

আমি ভুলব না। তোমার মনে থাক্‌বে কি না সেই-টেই হচ্ছে কথা।

ইস্, তা আর বলতে হয় না। জন্মে অবধি এত যত্ন কারু কাছে পাই নি দিদি, যে ভুলে যাব। মনে আমার খুব থাক্‌বে। আর জান দিদি, আজ তোমার মুখ দেখে প্রভাত হ'য়েছিল বলে' বলছিলেন যে, ওঁর দিনটি খুবই ভালো গেছে।

কি বলছিলেন?

তারকা কহিল, আমাদের একটা জমি কুণ্ডুরা জোর করে' দখল করবার জন্যে কাল সকালে বাঁশগাড়ী করেছিল। তা মামলা-মোকর্দ্দমা করতে ত উনি চান্ না; কুণ্ডুদের এখন-কার যে কর্ত্তা, তারই সঙ্গে দেখা করতে গেছলেন। জমি-দার নবীন যুবক; লেখাপড়া জানা। সব কথা শুনে এখান-কার নায়েবকে ডিস্‌মিস্ করেছেন। আর ওঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আসল কথা কি জান দিদি? জমিদার থাকেন কলকাতায়। বড়লোকের ছেলে, আমোদে-আহ্লাদে কাটান। সব খবরও তাঁর কাছে পৌঁছায় না। যা করে এখানকার কর্ত্তারা। তারাই আমাদের দুর্ব্বল পেয়ে···

যে জমিটা তিনি বিক্রী কর্‌বেন বলে পর্শু সকালে সেই ক'জন লোককে বলছিলেন, সেইটে বুঝি?

হ্যাঁ। জমিদারের নায়েব-গোমস্তা দেখ্‌লে যে, এদের অর্থাভাব হ'য়েছে; আর অর্থাভাব হ'লেই দুর্ব্বলও হ'য়েছে নিশ্চয়ই। অমনি চিলের মত ছোঁ মারবার চেষ্টাতেই এসেছিল। এই ক'রে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ করে, তার আর সীমা নেই।

চারুলতা বলিল, তাই ত দেখছি। কিন্তু আমার উঠ্‌ল কেন?

তারকা বলিল, ঐ যে, তোমার মুখ দেখেই প্রভাত হ'য়েছিল...

ও! বলিয়া সে অন্য দিকে মন দিল। নারীর মন স্ব- কোমল। তারকা ভাবিল—এবারে সে নিশ্চয়ই করিয়াছে। একজন পুরুষ-মানুষ যে তাহার ক- আলোচনা করিয়াছে,—এ শুনিলে, অল্প মেয়েই আছে রাগ না করিয়া থাকিতে পারে।

তারকা তাহাকে প্রসন্ন করিবার মানসেই কহিল—ভা- আমাদের এ হেন দুঃখ-কষ্টের সময়ে যে তোমার একজনকে পেয়েছিলুম, সে অনেক পুণ্যের ফলে, ভাই গোড়াতে আমরা ত ভয়েই আড়ষ্ট হ'য়ে গেছলুম যে, জানি কি রকম জুতো-মোজা-পরা বিবি খৃশ্চান মিশ- আস্‌বে। তা না হ'য়ে যে তুমি...

কেন, আমিও ত জুতো-মোজা পরি। লোকে আমাদের মেম্-ডাক্তার বলে ডাকে।

তা ডাকুক গে। যারা ডাকে, তারা ডাকে। তুমি কোনখান্‌টায় মেম্, বল ত ভাই? সেই যে প্রথম দি- জুতোটি ছেড়েছ—সে'টা আছে ত ভাই? দেখো মাঝে-মাঝে গে গোছানে সংসার,—খোওয়া না যায় আবার।—বলিয়া সে'ও হাসিল, চারুলতাও হাসিল।

বলিল—নাঃ, যায় নি, আছে নীচের ঘরে।

ঈশ্বরী চায়ের বাটি ধুইয়া সেল্‌ফে রাখিতে-রাখিতে তারকার দিকে চাহিয়াই বলিল—বাবু চা খান নি মা।

কেন রে?

বল্লেন, নিয়ে যা। খাব না। তা, কুসুম খেয়ে ফেলেছে। ...আজ কেমন আছ, মা?

ভালো আছি। বাবু কোথায় রে?

বাইরে আছেন। ডাক্‌ব?

না।—বলিয়া তারকা অন্যদিকে ফিরিয়া শুইল। সে দেখিতে পাইল না, তাহার শয্যাপার্শ্বোপবিষ্টা নারীটির চোখ্ দু'টিতে যে তীব্রতা ফুটিয়া উঠিল, তাহা কোন দেশের কোন আলোক-সম্পাতেই তেমন ভীষণ আকার ধারণ করে না।

তারকা জিজ্ঞাসিল, কটা বাজল দিদি?

চারুলতা প্রশ্নটি বোধ হয় শুনিতে পায় নাই, বলিল, ওষুধ খাবার দেরী আছে তোমার।

তারকা বলিল, তা নয়। ঠাকুরকে বল না দিদি, খাবারটা এখানেই আনুক—একটু পরে যদি আবার ঘুমিয়ে পড়ি। অনেক দিন ওঁর খাওয়া-দাওয়া চোখে দেখি নি।

বল্‌ছি—বলিয়া সে উঠিয়া গেল। নীচে নামিয়া, বৈঠকখানার পাশের ঘরেই ঈশ্বরাকে দেখিয়া, বাবুকে ডাকিতে বলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল; শুনিল হিমাদ্রি বলিতেছে, তুমি জান না মধু, টাকাটার আমার কত দরকার। ডাক্তার, ওষুধ, পথ্য, এ সব আছেই! বাড়ার ভাগ,—একটা মোটা দেনা আছে;—ঐ যে লেডী ডাক্তারটা এসেছেন—তাঁর রোজকার ফি দশটাকা ক'রে! আর কত দিন যে লাগবে তারও ঠিক নেই। তুমি কালই একজন লোক নিয়ে এস মধু। কিছু কম পাই, তা'তেও আমার দুঃখ নেই—টাকাটা আমার চাই-ই।

উত্তরে অন্য লোকটা কি বলিল, শুনিবার স্পৃহা চারুলতার রহিল না। যে উদ্দেশ্যে সে নীচে আসিয়াছিল, তাহাও তাহার মনে রহিল না। যেমন আসিয়াছিল, তেমনি উপরে চলিয়া গেল।

তারকা জিজ্ঞাসিল, বলে এসেছ দিদি?

না, বাইরে কে লোক রয়েছে, ব্যস্ত আছেন।—বলিয়া সে ধীরে-ধীরে তারকার পাশটাতে বসিয়া পড়িল।

আধঘণ্টা পরে তারকা সসঙ্কোচে বলিল—আর একবার দেখবে দিদি!

মেয়েটির আলস্য-বিরক্তি যেন নাই-ই। দেখছি—বলিয়া সে বাহিরে গেল। সিঁড়িতেই পাচকঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ। সে, মেম্‌-ডাক্তারের খাবার উপরে আনিবে কি না, জিজ্ঞাসা করিল।

বাবু?

বাবু বাহিরেই খাইয়াছেন।

নিয়ে এসে ঐ পাশের ঘরে চাপা দিয়ে রেখে যাও ঠাকুর।—বলিয়া চারুলতা তারকার নিকটে আসিতে, তারকা ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, কি হ'ল?

তিনি বাইরেই খেয়েছেন।

ঠিক সেই সময়েই হিমাদ্রি ঘরে ঢুকিয়া বলিল, মধু ডাক্তার এসেছিল তারক! জমিটার খদ্দের আন্‌বে বলে গেছে। সে'ও খেলে আমার সঙ্গে। বামুনের ভারি রাগ হ'য়েছিল। বল্লে, জমির খদ্দেরের সময় আমি,—আর ডাক্তার ডাকবার বেলায় আস্‌বে কেলো। কেন, আমরা কি চিকিৎসে করতে পারি নে? না, হোমিওপ্যাথিকে রোগ সারে না? শেষে ভোজন টোজন করে রাগ কম্‌ল—বল্লে, কাল নিয়ে আস্‌বে—তবে দরটা হয় ত একটু কমই পাবে—যাক্‌গে। দরকার যখন!—বক্তব্য শেষ করিয়া সে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চারুলতাকে বলিল, আমি বস্‌ব কি একবার।

সে বলিল, না।

হিমাদ্রি বলিল, তা'হলে আমি একটু শুই গে। শরীরটা বড়ই ক্লান্ত হ'য়ে আছে।

তারকা ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—ওকে শুতে যেতে বল।

চারুলতা বলিল, আপনি যান।

হিমাদ্রি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। চারুলতা ক'দিনের পর তাহার ডাক্তারী বইখানি খুঁজিয়া, বাতির নীচে ঝুঁকিয়া পড়িতে বসিল। তারকা নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

* * * *

ফোড়া অস্ত্র না করিতেই সারিয়া গেছে; অন্যান্য উপসর্গও নাই। আজ পাঁচদিন তারকা বেশ সুস্থ আছে। তবুও হিমাদ্রির মনে সুখ নাই। দর অনেক কম করিয়াও জমিটা সে বিক্রয় করিতে পারে নাই। কুণ্ডুদের চাকরী হারাইয়াও নায়েব বাবু গ্রামে থাকিয়া, হিমাদ্রিকে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া জলে বাস করার সুখটি অনুভব করাইতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। গ্রামে না মিলিল খরিদ্দার, না জুটিল বন্ধকের মহাজন। অথচ এদিকের খরচ কিছুমাত্র কমে নাই। ডাক্তারকে রোজই আসিতে হইতেছে, কলিকাতা হইতে একদিন অন্তর ৭৲ ৮৲ টাকার বেদানা আঙ্গুর আনিতে হয়, অন্য খরচও বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই।

আজ শ্রীরামপুর হইতে পটল ঘোষের আসিবার কথা আছে,—সেই একমাত্র ভরসা! সে বিদেশী লোক;—নায়েব যে তাহার উপর প্রভুত্ব চালাইতে পারিবেন না—এই আশাতেই সে সকালে কালী ডাক্তারকে বলিল—তাহ'লে আপনি বল্‌ছেন, ওকে আর রাখবার দরকার নেই?

ডাক্তার বলিলেন অবশ্য, আর, দু'পাঁচদিন থাক্‌লে মন্দ হত না। তবে আপনি বল্‌ছেন, এখন আপনিই চালিয়ে নিতে

পারবেন, তবে এখন দিন মিটিয়ে-মাটিয়ে! ক'দিন হ'য়েছে ওর?

হিমাদ্রি হিসাব করিয়াই রাখিয়াছিল; বলিল, একমাস বারো দিন হ'য়ে গেছে, আজ তেরো দিন।

ডাক্তার বলিল—তেতাল্লিস দিন?

না, চুয়াল্লিস। ও-মাসের ১লা এসেছিলেন—৩১ দিনে মাস। চারশো চল্লিশ···

সাড়ে চারশ দিয়ে দিবেন। অবশ্য চল্লিশ দিলেও ও কথা কইবে না। অনেক দিন থেকে জানি আমি ওকে। বড় সুশীলা মেয়ে চারু! খাঁই নেই বল্লেই হয়। না? আর লোকটিও বেশ, কি বলেন?

হিমাদ্রি কথা কহিল না দেখিয়া ডাক্তার বিস্মিত হইয়া কহিল, কি ব্যাপার বলুন ত?

হিমাদ্রি বলিল, যত ভালো বল্‌ছেন, ঠিক তা নয়।

না? চারু···

না।

ডাক্তার বলিলেন, কি হ'য়েছে বলুন না?

হিমাদ্রি বলিল, সে বলা চলে না।

কেন? হাতটান-টাতটান আছে না কি?

সে সব নয়। আচ্ছা, আপনি ত বলেছিলেন—উনি মিসেস্ সোম, না? বিবাহিতা?

মিসেস্ বলে বটে, কিন্তু বিবাহিতা নয়। তার হ'য়েছে কি?

লেখবার উদ্দেশ্য?

উদ্দেশ্য কি জানেন? এক ত আমাদের দেশে ঐ সব লেডী ডাক্তারদের ওপর লোকের শ্রদ্ধা কত! তার পর কুমারী অর্থাৎ মিস্ শুন্‌লে আরও অভক্তি হ'য়ে যায়—

হিমাদ্রি বলিল, সেটা কিন্তু মিথ্যে নয়!

ডাক্তার নিজের মনেই কহিতে লাগিলেন, তাই ওরা অনূঢ়া থেকেও ব্যবসার খাতিরে নামের আগে মিসেস্‌ই জুড়ে দেয়।

সবাই?

সবাই নয়। তবে, একে আমি অনেক দিন থেকে জানি বলেই বল্‌তে পারলাম। আর সবাই কি, তা আমি জানি নে। চারুর স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল। আর যেখানে যায় ও, খুব নাম কিনে আসে।

হিমাদ্রি নীরব। ডাক্তার পুনশ্চ কহিলেন—আর এ মস্ত গুণ ওর আছে, যা ডাক্তার-জাতের মধ্যেই দেখা না। সে'টি হ'চ্ছে গৃহস্থ-পোষা! হ্যান্ কর, ত্যান ক' এ-সব উপদ্রব নেই। এত চাই, তত চাই—এ'ও ও কথ বলে না।—বলিয়া ডাক্তার উঠিলেন। দ্বারের ক আসিয়া দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত যুগাশ্ব-বাহিত "ঘরের গাড়ী সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন—তাহ'লে আজই ও'কে দি থুয়ে দেবেন পাঠিয়ে, আপনার একজন লোক সঙ্গে দিয়ে।

দেব।—বলিয়া, হিমাদ্রি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, উ' আসিয়া স্ত্রীর কক্ষে ঢুকিয়া দেখিল, তারকা নিদ্রিতা; পা' বসিয়া চারুলতা সেলাই করিতেছে। তাহাকে দেখিয় সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—একটুখানি বসবেন আপ হিমাদ্রিবাবু? এখনি আসচি স্নানটা সেরে।

বসব—বলিয়া সে নিকটে আসিল। চারুলতা বলিল· ঐখানে বেদানার রস করে রেখেছি,—ছেঁকা আছে; অ একবার ছেঁকে আধ গ্লাশ খাইয়ে দেবেন।—সে বাহি হইয়া গেল।

মেয়েটি সুন্দরী। রূপের বর্ণনায় প্রয়োজন নাই; কি তাহার সেই কৃশ দেহ, ততোহধিক কৃশ মুখখানির মধ্যে এম একটা কিছু ছিল, যাহা সাধারণ মুখ-চোখে থাকে না হিমাদ্রি মনে মনে বলিল—সুন্দরী বটে!

কেন যে সে আপন মনে এ কথা দু'টি বলিল, কে জানে বোধ করি, সৌন্দর্য্য দর্শনে নীরব থাকিতে একমাত্র মূকে পারে! হিমাদ্রি মূক নয়,—হিমাদ্রি যুবক।

দশ মিনিটের মধ্যেই চারু ফিরিয়া আসিল। দে' চৌড়া কালাপাড় কাপড় পরনে। তন্নিম্ন হইতে সেমিজে-ফুলগুলি দেখা যাইতেছে। পিঠের উপর ঈষৎ সিক্ত চুলগুলি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হাতে দু'গাছি মাত্র সোণার সু' ব্রেসলেট; অঙ্গে আর অলঙ্কারের চিহ্নটুকুও নাই। হাত দু'টি জোড় করিয়া, বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—এইবার আপনি যান। আচ্ছা হিমাদ্রিবাবু, এ-কি রোগ আপনার?

হিমাদ্রি বিস্মিত নেত্রে জিজ্ঞাসিল, কৈ?

চারুলতা হাসিমুখে বলিল—দেখ্‌ছেন ত উনি সেরে উঠ্‌ছেন! আর পাঁচ-সাতদিনের মধ্যে ওঁকে পথ্যও দিতে পারব। কিন্তু তবুও, এই বিছানার কাছে এলেই আপনার মুখ এত বিষণ্ণ হ'য়ে যায় কেন, বলুন ত! সত্যি এ

ভালো নয়। আর, এই জন্যেই আপনাকে আমি আস্‌তে দিতে চাই-নে। নিন্, রাখুন পাখা, উঠুন,—উঠুন বল্‌ছি।

হিমাদ্রি বলিল, আমার স্নানের সময় হয় নি।

কে বল্লে হয় নি? ক'টা বেজেছে দেখেছেন? স' এগারোটা বেজে গেছে। এগারোটার ভেতর আপনার খাওয়া অভ্যাস,—আমি বুঝি জানি নে ভেবেছেন?

হোক্ গে।

হোক্ নয়! উঠুন। নৈলে ওঁকে ডেকে তুলে আপনাকে বকুনি খাওয়াব,—তখন মজাটি টের পাবেন।—সে মিটিমিটি হাসিতেছিল। এবং সেই স্নিগ্ধ হাস্য দেখিয়াই, আর একজন মনের মধ্যে কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। সে উঠিল না, কথাও কহিল না। যেমন বসিয়া ছিল, তেমনি বসিয়া পাখা নাড়িতে লাগিল।

চারুলতা পাখাখানা টানিয়া লইয়া বলিল,—আমি ডাকি তবে? ভাঙাই ঘুম? আমার কথায় না ওঠেন, ওঁর কথা ত অমান্য করতে পারবেন না!

হিমাদ্রি এইবার কণ্ঠে বল সঞ্চয় করিয়া কহিল—করি না একটু সেবা। চিরকাল করে এসেছি,—করতেও হ'বে।—সে ভাবিল খুব বলিয়াছে। কিন্তু শ্রোতাটি উপহাসের সহিত কহিল, সে ত বটেই। বিংশ শতাব্দীতে জন্মে, পত্নী-সেবা করে নি, এমন পাষণ্ড ত নজরে পড়ে না।

হিমাদ্রি লজ্জারক্ত মুখখানি তুলিবার উপক্রম করিতেছে,—চারুলতা জোরের সহিতই বলিয়া উঠিল, কোন কথা নয়। আপনি স্নান করে আসুন। এখানেই আপনার ভাত দিতে বলে এসেছি আমি।—যান—যান।

নীচেই খাই আমি,—সেখানেই খাব।

না—খাবেন না। এইখানে বসে খেতে হ'বে আপনাকে!—বলিয়া, পাখাখানা বিছানায় ফেলিয়া, দ্রুতপদে কক্ষান্তর হইতে একখানা কার্পেটের আসন ও একগ্লাস জল আনিয়া, ঠাঁই করিয়া বলিল, যান, স্নান করে আসুন।

এই সমস্ত কার্য্য সে এতই অকস্মাৎ করিয়া গেল যে, হিমাদ্রি আর একটা কথাও বলিতে সাহস পাইল না; আস্তে-আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেল।

যতই অপছন্দ করুক না কেন, হিমাদ্রি স্নানশেষে উপরেই আসিল; এবং যেখানে চারু বসিয়া আস্তে-আস্তে পাখা নাড়িয়া মাছি তাড়াইতেছিল, সেইখানেই আহার করিতে বসিল। খাওয়া অর্দ্ধেক হইয়াছে,—তারকা জাগি হস্তেঙ্গিতে চারুলতাকে ডাকিয়া চুপি-চুপি বলিল, দু গরম করে দিও, দিদি।

কথাটা হিমাদ্রি শুনিতে পাইল না; কিন্তু ইহার উক্তি সে অনুরোধটা বুঝিয়াই কহিল,—থাক্, গরমে আর ক নেই।

হিমাদ্রির কথা শুনিয়া চারুলতা হাসিয়া বলিল তুমি উঠে গরম করে দিতে পার ত উনি হাসিমুখে খান্

অবগুণ্ঠনের মধ্যে তারকা হাসিল; চারুলতাও হাসি হিমাদ্রি হাসিল না, মুখখানা ভার করিয়া—গ্রাসের গ্রাস গলাধঃকরণ করিতে লাগিল।

সিঁড়ির মুখে আজও চারু পান, জর্দ্দা লইয়া দাঁড়াই ছিল। হিমাদ্রি রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—দেখুন, আম জন্যে এত করার কোন দরকার দেখি নে। আপ নিজে চা'ও খান না, পান না খেয়েও আপনার অ হয় না। তবে কেন কতকগুলা মিথ্যে কষ্ট বাড়াচ্ছেন।

কে বল্লে আপনাকে, আমি চা খাই নে, পান খ নে।—বলিয়া আরক্ত মুখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

খান? কৈ, এত দিনে ত দেখ্‌লুম না কেউ আমর অদৃশ্যে খান বুঝি? লোকচক্ষুর অন্তরালে?

অন্তরালে খেতে যাব কেন?

কৈ, খান ত দেখি!

দেখ্‌বেন? বলিয়া সে চারিটি পান ও অনেকখা জর্দ্দা গালে ফেলিয়া দিল।

আপনি বসুন গে, আবার সেজে দিচ্ছি—বলি তারকার ঘরে ঢুকিয়া চারু পান সাজিতে বসিল। তার জাগিয়াই ছিল,—হাসি হাসি মুখে চাহিয়া রহিল; ক কহিল না।

যে জিনিসটা লোকে কত নিরুপদ্রবে সহ্য করিয়া বোধ করিয়া থাকে,—দুই মিনিটের মধ্যেই তাহার প্রভা চারুর কাণ-মাথা ঝাঁঝাঁ করিতে লাগিল। এবং ভি হইতে কি একটা ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টায়, ক্রমাগত (হেঁক্ শব্দ করিতে লাগিল। অথচ দমন করিবার (করিতে গিয়া, এমন কাণ্ড করিয়া বসিল যে, খাটের উপ কনুয়ে ভর দিয়া তারকাও উঠিয়া পড়িল।

চারু বলিতে গেল, বড় কড়া ভাই…

তারকা বলিল, জল খেয়ে ফেল দিদি!

চারুলতা এক গ্লাস জল খাইতে যাইবে,—আবার হেঁক্‌চো, হেঁক্‌চো!

শব্দ শুনিয়া, ও-পাশের দ্বার খুলিয়া, হিমাদ্রি ঘরে ঢুকিয়া, আবার নিঃশব্দে দ্বারটি বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। আগমন ও নির্গমন দুইটাই ইহারা দেখিয়াছিল; কেহই কোন কথা বলিল না। চারু তখন জল ঢালিয়া স্থানটা পরিষ্কার করিতেছিল,—আর তারকা মিটি মিটি হাসিতেছিল।

ও-ঘর হইতে হিমাদ্রি বলিল, পান আমার চাই নে,—ওঁকে একটু শুতে বল তারক! অনভ্যাসের ফোঁটা······

কপাল চড়-চড় করে! কেন উনি আমাকে অমন করে বল্‌লেন!

তারকা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—ভারি অন্যায়। আমি বারণ করে দেব'খন।

চারুর মাথা তখনও যেন ভোঁ-ভোঁ করিতেছিল; হিমাদ্রির ব্যবস্থাই অগত্যা মানিয়া লইতে হইল। কম্পিত হস্তে তারকাকে বেদানা ও আঙ্গুরের রস সেবন করাইয়া, চারু দু'হাতে কপালটা চাপিয়া ধরিয়া শুইয়া পড়িল।

হিমাদ্রি ঘরে ঢুকিয়া হাসিল;—সে হাসি দেখিয়া তারকাও হাসিল। কিন্তু যাহার তরে তাহাদের এই হাসি, সে একেবারে মাটিতে মিশিয়া গেল।

পটল ঘোষ আসিবে—তাহারই প্রতীক্ষায় হিমাদ্রি নামিয়া যাইতেই, তারকা ডাকিল, দিদি, ও-দিদি! ঘুমুচ্ছ?

চারুলতা সাড়া দিল না। মাথার অসুখ তাহার কমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু অন্য একটা অসুখ এতই প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল,—যদি পারিত, সে তন্মুহূর্ত্তেই ওই দম্পতীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিত।

ঘণ্টা দুই পরে যখন সে জাগিয়া উঠিল, তাহার দেহ সুস্থ, মন শান্ত-সংযত হইয়া গেছে। তারকা বলিল—ঠাকুরকে যেতে দিই নি আমি দিদি, তোমার ভাত-তরকারী গরম করে দেবে বলে আট্‌কে রেখেছি। কুসুমকে ডেকে বল না ভাই।

চারুলতা কুসুমকে বলিয়া আসিয়া বলিল,—উঃ, গোঁয়ার্ত্তুমির এমন হাতে হাতে শাস্তি যদি জানতাম—আমি কি যেতাম হিমাদ্রি বাবুর সঙ্গে পাল্লা দিতে?

কি হয়েছিল ভাই?

হিমাদ্রিবাবু বল্লেন, আমি পান খাই নে, অথচ তাঁর জন্যে কষ্ট করে কেন চা, পান তৈরী করতে যাই—এই কথা! তখন যদি ছাই বলি যে, কষ্ট করতে আমার কষ্ট হয় না, সব গোল মিটে যায়। তা-না,—তর্ক করতে গেলাম, খাই। হিমাদ্রিবাবু বল্লেন, খান ত দেখি! আমি অমনি পান চারটে, আর এই এতখানি জর্দ্দা······

তারকা হাসিয়া জিজ্ঞাসিল—তুমিই ত ওটা আনালে মধুকে দিয়ে—একটু নরম আনাও নি কেন?

চারুলতা বলিল—তোমার ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি বল্লেন, দু'টাকা সেরের রূপালী। তাই আনালাম।

কুসুম ডাকিল, মেম-দিদিমণি!

* * * *

চারুলতা আহার করিয়া আসিয়া, তারকার পাশে বসিয়া বলিল—আজ আর কোন কষ্ট নেই তারকা?

না।—বলিয়া তারকা চুপ করিল। যেন তাহার আরও বলিবার ছিল, এমনি ভাবে হঠাৎ চুপ করিল।

চারুলতা তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল—আছে কোন যন্ত্রণা-টন্ত্রণা?

না দিদি, আমি বেশ আছি।...দিদি, একটা কথা বল্‌ব?

কেন বল্‌বে না ভাই?

ভাই, রাত্রে উনি আজ এখানে থাক্‌বেন।

চারুলতা বিস্মিত হইয়াছিল; কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিল—বেশ ত ভাই!—বলিয়া যেন অত্যন্ত খুশী হইয়াছে, এমনি ভাবে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া, তারকাকে জড়াইয়া ধরিয়া, বিহ্বলের মত বলিতে লাগিল, কিন্তু দিদিকে যেন ভুলিস্‌ নে ভাই? কথা দিয়েছিস!

তারকা বলিতে যাইতেছিল—ভুলিবে, এমন অকৃতজ্ঞ সে নয়। চারুলতা তাহার দক্ষিণ হস্তের অনামিকার এমারেল্ড-বসানো আংটিটি নাড়িতে-নাড়িতে বলিল—এইটি কেন দিদিকে দাও না দিদি!

এখুনি, দিদি—বলিয়া তারকা সেটি খুলিয়া চারুলতার হাতে পরাইয়া দিল। একটু পরে বলিল—তুমি কি দেবে দিদি, ছোট বোন্‌টিকে?

চারুলতা তাহার সুকোমল বেষ্টনে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কি দেব বোন্‌, তোমাকে আমি? কি-ই বা আছে আমার?······তবে একটু এই হাতের চিহ্ন তোমার ঘরে

রেখে যাচ্ছি তারকা,—যা থেকে কখনো-কখনো তোমার এই গরীব দিদিটিকে তোমার মনে পড়বে।—বলিয়া মাথার দিকে দেওয়াল নির্দ্দেশ করিল।

তারকা মুখ ফিরাইয়া দেখিল, তাহাদের যুগ্ম প্রতি-মূর্ত্তিখানির উপরে অতি সূক্ষ্ম একটি আবরণ—যেন আর একখানা স্বচ্ছ কাচের মত বসানো হইয়াছে। তাহার চারিধারে পশমের কাজ করা,—ফ্রেমের পাশে-পাশে আঁটা। কেবল মধ্যস্থলটি কিসের, সেইটি তারকা বুঝিতে পারিল না। এত স্বচ্ছ যে, তাহাদের চিত্র সুস্পষ্ট রহিয়াছে; অথচ কি একটা জিনিস যে তাহার উপরে ঝুলানো, তাহাও বুঝিতে বাকী রহিল না।

তারকা বলিল—ওটা কিসের দিদি?

রেশমের।

তাই বুঝি ক'দিন ধরে সেলাই করছিলে?

হ্যাঁ—বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। একটা কাচের গ্লাসে কি ঢালিয়া আনিয়া, তারকাকে খাওয়াইয়া দিয়া বলিল, —আর ক'দিনই বা আছি তারকা?

তারকা বলিল—এখনি যাবে?

চারুলতা ম্লান হাসিয়া বলিল—এখনি না অবশ্য। তবে যেতেই ত হ'বে বোন্—আজ না হয় কাল, এই ত!

তারকা অল্পক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর অতি করুণ স্বরে কহিল—দু'চারদিন থাক না দিদি?' সে থামিল। পুনরায় কহিল—কি জানি কেন ভাই, এত কষ্ট হ'চ্ছে তোমায় ছাড়তে। যেন মনে হচ্ছে, আর তুমি আস্‌বে না!

কেন আস্‌ব না ভাই? যখনই তুমি দিদি বলে ডাক্‌বে, তখনি আসব।—তাহার কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

তবুও এখনি তোমায় ছাড়ছি নে আমি।—বলিয়া সে চারুলতার ক্ষীণ হাতটি তুলিয়া বুকের উপরে স্থাপিত করিল।

সন্ধ্যার পরেই অতি ম্লান মুখে হিমাদ্রি ঘরে আসিয়া বসিল। আসিবে বলিয়াও পটল ঘোষ আসে নাই,—কোন খবর দিয়াও বাধিত করে নাই। বোধ করি এই জন্যই হিমাদ্রির মুখ-চোখ অত্যন্ত বেদনাপূর্ণ, ব্যথা-কাতর।

চারুলতা নীচে গিয়াছিল। তারকা স্বামীকে প্রসন্ন করিতে কত রকমের সুখের, ভবিষ্যতের ঘর-কন্নার কত কথাই আলোচনা করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু স্বামি মুখের বিষণ্ণতা দূর হইল না।

তারকা জিজ্ঞাসিল, কি ভাবছ গা?

হিমাদ্রি ভাবিল, থাক্, বলিয়া কাজ নাই। কথা শুনিলে, তারকার রোগ-শিথিল স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হই উঠিবে। তাহাতে অপকার হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে এখন বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই। পটল যা ঈশ্বরেচ্ছায় কালই আসিয়া পড়ে, কালই পত্র পাঠ নির্লজ্জাকে বিদায় করিয়া সুস্থ হইবে এবং তার আরোগ্য হইলে, তখন ত সব কথাই সে শুনিবে। মিথ এখন উহাকে উত্তেজিত করিয়া আঘাত দেওয়া! আ তারকা এমন নয়,—সে কথা শুনিবার পর ঐ স্ত্রীলোকটা হাতে জলবিন্দু গ্রহণ করিবে না। যখন দু' একদি বাধ্য হইয়া উহাকে রাখিতেই হইল...ইত্যাদি।

তারকা পুনরায় জিজ্ঞাসিল, বল্লে না, কি ভাবছ? তাহার স্বরটি নৈরাশ্য-জনিত, অভিমান-ক্ষুব্ধ।

হিমাদ্রি বলিল—শ্রীরামপুর থেকে পটলের আসবা কথা ছিল। তা সে ত এলো না তারক।—বলিতে-বলিতেই না আসিবার যত রকমের হেতু হইতে পারে, তাহার তর্ক-বিচার নিঃশব্দে করিয়া যাইতে লাগিল।

তারকা প্রিয়তমের মুখের পানে চাহিয়া, সান্ত্বনার স্বরে কহিল—কাল আস্‌বে বোধ হয়। না না, কাল যে বৃহস্পতিবার,—পরশু নিশ্চয়ই আস্‌বে। তা এলই ব দু'দিন বাদে,—ক্ষতি আর কি হচ্ছে?

হিমাদ্রি আপন মনেই কহিল—ক্ষতি যে কি হইতেছে, তাহা তারকা কিছুই জানে না বটে! কিন্তু সে নিজে জানে,—বিশেষ করিয়াই জানে!

তারকা বলিল—জমি না বেচে আমার গহনাপত্রগুলো...

আবার!—বলিয়া সে স্নেহপূর্ণ ভর্ৎসনার স্বরে তারকাকে ধমক দিল।

তারকা কথা কহিল না।

হিমাদ্রি বলিল—টাকাটা হাতে এলেই, লেডী ডাক্তারের পাওনাটা মিটিয়ে দিতে পারি।

তারকা বলিল—দু'দিন পরেই দিও না হয়।

হিমাদ্রি বলিল—সেই দুদিনেই আবার এতগুলি টাকা

বেরিয়ে যাবে যে!— খোলা দ্বারটির পানে চাহিয়া সে নীরব হইল।

চারুলতা ঘরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে আসন পাতিল। জলের গ্লাস রাখিয়া বলিল, আসুন।

ঠাকুর খাবার দিয়া গেল। চারুলতা বলিল—বল না তারকা, খাবার যে জুড়িয়ে যাচ্ছে।

হিমাদ্রি উঠিয়া আসিল। কিন্তু মন তাহার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, সঙ্কুচিত হইয়া রহিল। অব্যক্ত কণ্ঠে সে আপনাকেই আপনি বলিল—উঃ, কি নির্লজ্জ! কি নির্লজ্জ!

চারুলতা পানের ডিবা আনিয়া, তাহার সম্মুখে বসিয়া বলিল, পান খাবেন ত? না, কড়া জর্দ্দা খাইয়ে আমার দফাটা শেষ করবেন?

হিমাদ্রি সাড়া দিল না; কিন্তু ইহার আচরণে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তারকা কি ঘুমাইয়া পড়িল? না, ঐ ত সে এদিকেই চাহিয়া রহিয়াছে! উঃ—ইহারই চোখের সামনে!

চারুলতা জিজ্ঞাসিল—কি বলুন? এতটা কষ্ট আমার বৃথাই যাবে!

তারকা নিম্ন কণ্ঠে কহিল, খাবেন'খন।

হিমাদ্রি মনে মনে কহিল, তারক! তারক! যদি জানিতে তুমি ..

সে রাত্রে হিমাদ্রি তারকার শিয়রে খাড়া বসিয়া রহিল। চারুলতা বাধা দিল না। আপত্তি করিল না। একটু দূরে নিজের বহি খুলিয়া বসিয়া রহিল।

ভোরের দিকে বই হইতে মুখ তুলিয়া কহিল—রাত' যে পুইয়ে এল,—শোবেন না?

গম্ভীর মুখে হিমাদ্রি কহিল, না।

কিন্তু রাত জাগবার আর দরকার নেই, বুঝলেন! এখন থেকে একটু সতর্ক হ'য়েই শোবেন আপনি ওর কাছে।

দরকার যদি নেই, আপনি কেন বসে রইলেন?

চারুলতা হাসিল। নিশা-জাগরণ ক্লান্ত হাসি-মুখখানি অপরাহ্লের রৌদ্রদগ্ধ ফুলটির মত দেখাইল। বলিল, আমার জায়গা ত অধিকার করে বসে রইলেন আপনি! ও-ঘরে একটা বিছানা থাকলেও বা যা হয় একটু শোওয়া চলতে পারত!

হিমাদ্রি অপরাধ স্বীকার করিল। ঈশ্বরার দ্বারা একটা শয্যা পাতিয়া দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কথা বলিল না।

চারুলতা বলিল, একটু সাবধানে রাত্রে কাছে থাকলেই চলবে। অনেক দিন জেগেছেন,—শরীর যথেষ্টই খারাপ হ'য়েছে। এখন যখন দরকার নেই, আর শরীর নষ্ট করবেন না।

হিমাদ্রি শুধু ভাবিল,'আমাকে উপদেশ দিয়া আর কাজ নাই তোমার! খুব হইয়াছে। পটল ঘোষটা কি যে করিল!

তারকা চোখ মেলিয়া বলিল—সকাল হ'য়ে গেছে।

বাস্তবিক বহির্জ্জগৎ তখন আলোকোদ্ভাসিত হইয়া গেছে।

হিমাদ্রি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও চা-টুকু খাইয়া ফেলিল। বাহিরের ঘরে বসিয়া পটল, অভাবে ঝিঙে, উচ্ছে সকলেরই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু অগাধ জলের মাছ অগাধেই রহিয়া গেল।

একখানা আপ্ ট্রেনের সময় হইয়া আসিয়াছে—পৌণে দশটায় আসিবে। হয় ত পটল সেই ট্রেনেই আসিতেছে। আজ বৃহস্পতিবার, টাকা না-ই বা দিল। কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া যাইতে দোষ কি? কাল সকালেই টাকাটা যদি হস্তগত হয়—বৈকালেই—! এবং পরশু শ্রীপুরে যাইয়া রেজেষ্টারী করিয়া দিয়া আসিলেই চলিবে! কিন্তু পরশু যদি রেজেষ্ট্রী আফিসে যাইতে হয়, তারকাকে একলা ফেলিয়া যাওয়া ত চলিবে না! বরং কাল-পরশু দুইটা দিন উহাকে রাখা যাইবে! তারকার কথাও রহিবে,—আমারও কার্য্যোদ্ধার হইবে।

এই সময়ে ঈশ্বরার মাথায় ব্যাগ, বগলে ড্রেসিং কেস্ চাপাইয়া, তাহার পশ্চাৎ চারুলতা দ্বারের সম্মুখীন হইয়া, দু'টি হাত তুলিয়া কহিল, নমস্কার, হিমাদ্রি বাবু!

আপনি যাচ্ছেন না কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আবার আস্‌ব—পূজার সময় এসে তারকাকে দেখে যাব।

আপনার টাকাটা!

সে আমি পেয়েছি—বলিয়া, সে আবার হাত দু'টি কপালে ঠেকাইয়া বলিল, নমস্কার!

হিমাদ্রি যখন মুখ তুলিয়া বাহিরের প্রান্তরের দিকে চাহিল—এই মেয়েটিকে আর দেখিতে পাইল না। কেবল ঈশ্বরার মাথায় ব্যাগ রৌদ্রে ঝলমল্ করিয়া দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া যাইতেছিল।

হিমাদ্রি উপরে আসিয়া বলিল —তারকা, ওর টাকাটা!

সে হ'য়ে গেছে।

কি রকম হ'ল শুনি?

তারকা বিস্মিত হইয়া কহিল, শুনে তোমার কি হ'বে? বল্‌ছি, হয়ে গেছে।

হিমাদ্রি বলিল, তাই বুঝি তোমার এমারেল্ডের আংটীটা ওর হাতে দেখলুম! কিন্তু সেটা ত কুড়ি-পঁচিশ টাকার বেশী হ'বে না। আর কি দিতে হ'ল গয়না-টয়না?

কিছু না।

তার মানে?

কিছু না—এই মানে। ঐ আংটীটাই যা তিনি নিয়ে গেছেন।

হিমাদ্রি কহিল, আবার যে আসবে বল্লে,—তখনই দেবে বলেছ বুঝি টাকাটা? তার চেয়ে ওর ঠিকানাটা রেখে দিলেই ভাল করতে—টাকাটা পাঠিয়ে দিতুম।

তারকা বলিল, দেখ, টাকার কথা তুলে ওর অসম্মান কর' না,—অন্ততঃ আমার কাছে কর' না।

হিমাদ্রি এক মিনিট পত্নীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল, ওকে আর আস্‌তে দিতেই আমার ইচ্ছে নেই।

তারকা রোগজীর্ণ মুখখানি তুলিতে-তুলিতে কহিল—কেন বল ত? কি অন্যায় তিনি করেছেন! এত অকৃতজ্ঞ কি হওয়া ভাল!

হিমাদ্রি ঐ কথাটাই পুনরুচ্চারণ করিল—অকৃতজ্ঞ!

তারকা বলিতে লাগিল, প্রথম দিন যখন এসেছিলেন,—আমি বলেছিলুম, দিদি! তা আমার মা'র পেটের বোন্ দিদির চেয়ে কি কম করাটা করে গেছেন শুনি? সেই দিন আমি বলেছিলুম, দিদি! ওঁর যেন কষ্ট না হয়। আমার রোগের প্রাণপাত সেবা ত করেইছেন,—তার ওপর আমারই মুখ চেয়ে মা'য়ের মত—দিদিতেও অত পারে না—মায়ের মত—তোমার খাওয়া-দাওয়া, আরাম, বিরাম?—কে এত করে বল ত? তার ওপর···

বাধা দিয়া হিমাদ্রি বলিল, আমি বলছি কি—ওর ঐ যখন হ'ল ব্যবসা, টাকাটা থেকে বঞ্চিত করা কি উচিত হ'বে?

খুব হ'বে, খুব হ'বে! আপনার লোককে কেউ টাকা দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানায়—এমন ত আমি দেখি নি, শুনিও নি।

হিমাদ্রি কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেছিল,—তারকা আস্তে-আস্তে তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল, মীরাটে দিদিকে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন,—কুসুমকে বল ত—ওখানা ডাকে দিয়ে আসুক।

হিমাদ্রি খামে-বন্ধ চিঠিখানি নাড়িতে-নাড়িতে বলিল, কি আছে এতে দেখেছ?

দেখেছি। আমরা যে তিনটি বোন্—এই কথাই লিখেছেন।

হিমাদ্রি খামটার উপরে দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, বেশ লেখাটি ত!

তারকা হাসিয়া বলিল—আমাদেরই মন্দ না কি? দিদির—আমার?

তোমারটা কিন্তু সবচেয়ে ভালো।—বলিয়া হিমাদ্রি নত হইল, এবং...

বিবিধ-প্রসঙ্গ

সূর্য্য-চন্দ্র ও পৃথিবী

[শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সাংখ্য-পুরাণ কাব্যতীর্থ]

বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দময়ী, কাল-দিগ্‌-দেহ-শালিনী এই পৃথিবীর বয়সের পরিমাণ কত তাহা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের বিভাগে কতক উপলব্ধি হয়। পৃথিবীর অতি প্রাচীনতম ইতিহাসের অনুসন্ধান করিতে গিয়া, কেহ-কেহ উল্লিখিত চারি যুগকে নিজেদের গবেষণার সৌকর্য্যার্থ সাত যুগে পৃথক্ করিয়া লইয়াছেন. (১) সত্য, (২) ত্রেতা, (৩) দ্বাপর, (৪) কলি, (৫) সত্য-ত্রেতা, (৬) ত্রেতা-দ্বাপর (৭) দ্বাপর-কলি। এই ব্যাপক বিভাগের অবশ্যই কোন গূঢ় অভিসন্ধি থাকিবে। বর্ণাশ্রমীদের জীবিত কালকে প্রাচীন ঋষিগণ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য এই চারি বিভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু শিষ্যমণ্ডলীরসহজ

বোধের নিমিত্ত কেহ-কেহ উক্ত চারি আশ্রমকে দশভাগে বিভক্ত করিয়া মনুষ্য-জীবনের "দশ দশা" প্রকটিত করিয়াছেন। প্রতিপাদ্য বিষয় এক হইলেও, এবং গন্তব্য স্থান সাধারণ হইলেও, লোকে স্ব-স্ব অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে, স্বতন্ত্র রুচি ও স্বতন্ত্র প্রকৃতি অনুসারে, বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিবার কালে, আমি এখানে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগকে সাত যুগে বিভক্ত না করিয়া, বৈদিক যুগ, পৌরাণিক যুগ ও বৈজ্ঞানিক যুগ এই তিন যুগে পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করি। অবশ্য ইহাতে আমাকে পূর্ব্ব-পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যাপকবাদের দিকে না যাইয়া, সংক্ষিপ্তবাদের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। যেহেতু চারি যুগকে কেহ-কেহ সপ্ত যুগে বিভক্ত করেন ; চতুরাশ্রমকে দশাশ্রমে বিভক্ত করেন ; কিন্তু আমি বিভক্ত করিতেছি চারি যুগকে তিন যুগে।

বৈদিক যুগে সূর্য্য, চন্দ্র এবং পৃথিবীর উৎপত্তি, স্থিতি, গতি ও অবলম্বন প্রভৃতির যাদৃশ বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়, পৌরাণিক যুগে সে সমস্ত বর্ণনা রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। অথচ বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে বৈদিক ও পৌরাণিক উভয় ব্যাখ্যাই না কি অজ্ঞানতার গভীর গহ্বরে লুক্কায়িত হইতে চলিয়াছে। সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে কিংবদন্তী বলা চলে কি না, সেই সম্বন্ধে কোনও তর্ক আমরা এ স্থলে সামান্য ভাবে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না ; কিন্তু বৈদিক ভাষার বর্ণনার সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বর্ণনার যে এই বিষয়ে অনেকটা সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করাই এই ক্ষুদ্রতম সন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। পৌরাণিক কাহিনীতে বলে, শ্রীমান্ কশ্যপ-নন্দন জবা-কুসুম সঙ্কাশ, মহাদ্যুতি, তিমিরারি, সর্ব্বপাপহন্তা সূর্য্যদেব প্রত্যহ প্রাতঃকালে তরুণ অরুণ সারথির সহিত উদয়াচল-শিখরে আরোহণ করিয়া, তাঁহার সাত রংএর সাত ঘোড়াযুক্ত রথে আকাশমার্গে ভ্রমণ করিতে-করিতে, ঠিক মধ্যাহ্নকালে ভ্রমণের মধ্যপথে মধ্যগগনে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া, দিবাবসানে অস্তাচলের কোলে এলাইয়া পড়েন ; এবং কবির বর্ণনায় সুন্দরী পশ্চিমা দিগ্‌বধূ উজ্জ্বল সিন্দুর-রাগে রঞ্জিত হইয়া, পরিশ্রান্ত সূর্য্যদেবকে মন্দ-মলয়-মারুত সঞ্চালনে ব্যজন করিতে থাকে। বিজ্ঞানের গবেষণায় সূর্য্যের এই প্রকার উদয়াচল হইতে অস্তাচলে গমনাগমন রূপ সচল অবস্থা কাল্পনিকই (theoretical) বটে ; কিন্তু বাস্তবিক (practical) নহে। বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত আমরা বেদের ভাষায় অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হই। অতএব সূর্য্য যে অচল পদার্থ এবং পৃথিবীই যে প্রকৃত পক্ষে সচল, তাহাই আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

পুরাণের বর্ণনায় অত্রিমুনি হইতে চন্দ্রদেবের জন্ম ; অথবা দেবাসুর কর্ত্তৃক সমুদ্র মন্থনকালে চন্দ্রের উৎপত্তি। তদনুসারেই কাব্যকলার কমনীয়তা-প্রসঙ্গে নিশাপতি, নক্ষত্রপতি, কুমুদবান্ধব, ওষধীশ, শশলাঞ্ছন, হিমাংশু ও কলানিধি প্রভৃতি সংজ্ঞায় চন্দ্রদেবের আখ্যা ও ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞান বলিতেছে যে, না, তাহা নহে। চন্দ্র কখনও স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ নহে। দর্পণে সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত হইলে, তাহা হইতে যে প্রকার প্রতিবিম্বের স্ফু... সূর্য্য-রশ্মি চন্দ্রে প্রতিফলিত হইলে, চন্দ্র হইতেও সেই প্রকার প্রতি... হইয়া থাকে। আমাদের প্রাচীনতম বেদও বলেন, 'হাঁ, এই কথাই ; এই দেখুন আমার অঙ্গেও (বেদাঙ্গ বটে কি ?) এই তত্ত্বই ... আছে।" বেদের ভাষা অগ্রে (প্রবন্ধের আদিতে নহে, অগ্রভা...

পুরাণ বলিয়া দিতেছে, কূর্ম্ম ও বরাহ-অবতারে এই পরিদৃশ্য পৃথিবী রসাতল হইতে সমুদ্রের গর্ভ মধ্যে উত্থিত হইয়া, স্থিতিশী... লাভ করিয়াছে। ভগবান্ নারায়ণের কূর্ম্মাবতার কালে ইহা কূ... পৃষ্ঠে অবস্থাপিতা ; অথচ বরাহ অবতার সময়ে বরাহ-দন্তে সংলগ্ন এবং বরাহরূপী নারায়ণ কর্ত্তৃক উপভুক্তা। পৃথিবীর এক ... 'কু'। এই সময়ে বরাহরূপী নারায়ণের পৃথিবী ক্ষেত্রে' "কুজ" (কু পৃথিবী, তাহা হইতে জাত) অর্থাৎ মঙ্গলের জন্ম হইয়াছিল। ... মঙ্গলই আমাদের নবগ্রহের অন্যতম মঙ্গলগ্রহ কি না, তাহা মঙ্গলগ্র... উদ্দেশে অভিযান (expedition) কারীগণ দিঙ্‌নির্ণয় প্রভৃ... যন্ত্রাদির সাহায্যে বিচার করিবেন, এবং (ভবিষ্যতে অভিযানে... ফল) বিস্তার করিবেন। পুরাণের অপর এক স্থানে দেখিতে পাও... যায় আমাদের এই বিশাল পৃথিবী পাতাল দেশে অবস্থিত অন... বা শেষ নাগের মস্তকে বিধৃত হইয়া আছে। এই অনন্ত নাগে... শরীর স্পন্দনেই না কি সময়-সময় ভূমিকম্প অনুভূত হয় পরন্ত এই ভূমিকম্প এবং নাগদেহ-স্পন্দনের মুখ্য কারণ না কি পৃথিবীস্থিত প্রাণী সমুদয়ের পাপের মাত্রা বৃদ্ধি ও তজ্জনিত পা... রাক্ষসের গুরুভার।

পৃথিবীর আকার সম্বন্ধেও পুরাণে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। কোথাও বা বসুমতী যুবতী মূর্ত্তিমতী ; কোথাও বা ত্রিকোণবিশিষ্টা অবনী মেদিনী। মধু ও কৈটভ নামক দুই দানবের মেদ হইতে জন্ম বিধায় ইহার মেদিনী সংজ্ঞা ; অথচ এই মেদিনী কোণত্রয় পরিমিতা ভূমি। পৃথিবী ত্রিকোণবিশিষ্টা, এই ধারণা যে ভারতীয়দের অন্তঃকরণে কোন্ সময় হইতে বদ্ধমূল হইতে বসিয়াছিল, তাহা আমাদের জানা নাই ; অথচ দেখিতে পাওয়া যে, বাঙ্গালীর হিন্দু ঘরের মেয়েদের ব্রত কথায় পর্য্যন্ত উহার ছড়া গাঁথা রহিয়াছে।—

"তিন কোণা পিথিমী পূজন,
নিষ্কণ্টকে রাজ্যি ভোজন,
রাজ্যি গেল ভাসিয়া,
আমি বর্ত্তী বর্ত্ত (১) করি সিংহাসনে বসিয়া।"

আমাদের মনে হয়, হিন্দুদের রাজত্ব-কাল হইতেই অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত লোকের ধারণা ছিল, এই ভারতবর্ষটাই সমগ্রা পৃথিবী। যেহেতু ভারতবর্ষের স্থলভাগের আকৃতি ত্রিকোণ, সেই হেতু সমগ্রা পৃথিবীই ত্রিকোণ। অথচ অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির বর্ণনাতেও ভারতকেই পৃথিবীরূপে ধরা হইয়াছে, এমন আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। "সসাগরা পৃথিবীর

(১) পিথিমী—পৃথিবী। বর্ত্তী—ব্রতী। বর্ত্ত—ব্রত।

মহামতি রাজা হরিশ্চন্দ্র" এবং "সূর্য্য-বংশাবতংস সত্যসন্ধ রাজা দিলীপ হিমালয় অবধি কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্রা পৃথিবীকে 'একটী মাত্র নগরীর ন্যায় শাসন করিতেন।"

(২) এই সমস্ত পদে "সসাগরা পৃথিবী" ও "সমগ্রা পৃথিবী" বলিতে ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কিছুই বুঝাইবে না। পার্থিব, পৃথিবীপতি, মহীপতি, ক্ষপতি, পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি শব্দের পৃথিবী কি শুধুই ভারত অর্থ প্রকাশ করে না? পৃথিবীর এতাদৃশ বর্ণনা শুনিয়াই আধুনিক বিজ্ঞান হিন্দুদের পুরাণ কাহিনীকে, তথা ধর্ম্ম বিশ্বাসকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু এই অবজ্ঞার কোন ভিত্তি নাই। হিন্দুজাতির প্রাচীনতম ঋষিগণের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞান লইয়া আলোচনা করিয়াছেন; ভূগোল, খগোল, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতির তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পৃথিবী ত্রিকোণ নহে। পৃথিবী যে গোল ইহা জ্যোতির্বিজ্ঞানের "গোলাধ্যায়" নামক গ্রন্থে এবং ভূ-গোল খ-গোল প্রভৃতি শব্দের মধ্যেই স্পষ্টতঃ ব্যক্ত হইয়াছে। তবে ইহা কমলা লেবুর ন্যায় গোল কি না, অথবা বাতাবি লেবুর ন্যায় গোল, এই বিষয়ে গোলযোগই রহিয়া গিয়াছে, বিশেষ (particulars) কিছুর উল্লেখ নাই। সংস্কৃত সাহিত্য এবং ব্যাকরণের পাতায়ও মাঝে-মাঝে পৃথিবীর গোলত্বের কথা বাহির হইয়া পড়ে।(১) "অমুক ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানজ্ঞ ত্রিকালদর্শী ঋষি সমগ্র পৃথিবীটাকে করতলগত আমলক ফলের ন্যায় দর্শন করিতেন।" কেহ কেহ বা করতলগত বদরী ফলের ন্যায় দর্শন করিতেন। ইত্যাদি বহু বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। এতদ্দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, পৃথিবী আমলকী ফল অথবা বদরী ফলের ন্যায় গোলাকার,এই বদরী ফল আবার কাশীর বদরী কিংবা বদরিকাশ্রমের বদরী, তাহার উল্লেখ নাই। পৃথিবীটা যে সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, এই প্রমাণ আমরা বেদের ভাষায় প্রকাশ করিব। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান এই ত্রিবিধ প্রমাণের যেখানে প্রবেশ লাভ হয় না, সেখানে আমরা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে বাধ্য। বেদের এই প্রমাণই শাব্দ-প্রমাণ (words of authority) নামে অভিহিত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও যাহারা শুধু বেদের বচনে আস্থা-সম্পন্ন তাহারা নাস্তিক হইলেও আস্তিক; পক্ষান্তরে, ভূঁয়া ঈশ্বর স্বীকার-কারীগণ আস্তিক হইয়াও নাস্তিক। অতএব ঈশ্বর হইতে যে বেদ শ্রেষ্ঠ এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে বেদের ভাষা হইতেই পূর্ব্বোল্লিখিত সন্দিগ্ধ বিষয়গুলির সমাধান স্বরূপ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব; সুতরাং

"প্রত্নে দধামি প্রথমায় মন্যবেহ
হন্‌দস্যুং নর্য্যং বিবেরপঃ।
উভে যত্বা রোদসী ধাবতামনু
ভ্যসাতে শুষ্মাৎ পৃথিবী চিদদ্রিবঃ।"

সামবেদ, ঐন্দ্র পর্ব্ব। ৪ প্রপাঠক, ২য় অর্দ্ধ ৪র্থ দশতি, ২য়া ঋক্।

এই ঋকের সায়ন ভাষ্য উদ্ধৃত না করিয়া, অন্বয়ানুযায়ী ভাবার্থ সরল বাঙ্গালায় প্রকাশ করিতেছি।

"হে ইন্দ্ররূপী সূর্য্য (২) আপনার মুখ্য তেজের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছি। যে তেজ দ্বারা আপনি জগতের বিঘ্নস্বরূপ অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন, এবং যে তেজ দ্বারা এই ভূমণ্ডল হইতে বারি গ্রহণপূর্ব্বক তাহা ভূমণ্ডলেরই হিতের নিমিত্ত যথাকালে বর্ষণ করিয়া থাকেন। আকাশ এবং পৃথিবী আপনাকে লক্ষ্য করিয়া, অর্থাৎ আপনাকে কেন্দ্র করিয়া অহরহঃ ধাবিত হইতেছে। আপনার সেই প্রধান (উগ্র) তেজে পৃথিবীও ভীত এবং স্পন্দিত হয়। তৎপরবর্ত্তী ঋক্‌টি এই প্রকার:—

সমেত বিশ্বা ওজসা পতিং দিবো
য এক ইদ্ভুরতিথির্জনানাম্।
স পূর্ব্ব্যো নূতন মাজি গীষন্তং
বর্ত্তনী রনু বাবৃত এক ইৎ॥

অর্থাৎ, হে বিশ্ববাসী প্রজা সমুদায়! তোমরা সকলে অন্ত আকাশ-মণির উদ্দেশে সমবেত হও। এইনি একাই সমস্ত বিশ্ববাসীর নিকট অতিথিবৎ পূজনীয়। তিনি তোমাদের প্রদত্ত হবিঃপ্রাপ্ত হইলে,নূতন ভাবে উদ্দীপিত হইয়া, একাকী কেন্দ্রস্থলে উপবেশনপূর্ব্বক, পৃথিবীর বর্ত্ম অর্থাৎ পন্থাকে আবর্ত্তিত করিবেন।

উল্লিখিত ঋক্ সমূহ দ্বারা সূর্য্য ও পৃথিবীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সূর্য্য মধ্যস্থানে কেন্দ্রপ্রদেশে বিরাজ করিতেছেন; এবং পৃথিবী উহার চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিতেছেন। যজমানের হবি দ্বারা সূর্য্যের ওজঃ শক্তি বর্দ্ধিত হয়, এ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। যেহেতু সূর্য্যমণ্ডল জ্বলন্ত উদজান সমূহেরই সমষ্টিমাত্র; অথচ সেই উদজান ঘৃত মিশ্রিত অগ্নির বাষ্প সংযোগে দ্বিগুণতর শক্তি সম্পন্ন হয়, এবং অবশেষে সেই অতিরিক্ত উদজান আকাশস্থ অম্লজানের সহিত রাসায়নিক অনুপাতে সংশ্লিষ্ট হইয়া জল সঞ্চার করে। এই জলই মেঘ। অতএব এই মেঘের অধিপতি সূর্য্য বা ইন্দ্র। পূর্ব্বে যে সূর্য্যদেবের সপ্তবিধ বর্ণের সাতটি ঘোড়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও বৈজ্ঞানিকদিগের স্বীকৃত। অবশ্য ঘোড়ারূপে নহে,—সপ্তবর্ণরূপে। (Poominent Seven Colours)।

এক্ষণে চন্দ্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

"অত্রাহ গোরমন্বত নামত্বষ্টুরপীচ্যম্।
ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে॥"

(১) স বেলাবপ্রবলয়াং পরিখীকৃত সাগরাম্।
অনন্য শাসনামুর্ব্বীং শশাসৈক পুরীমিব॥
"রঘু।"

(২) ইন্দ্র:—ইন্দ্রো রমতে, অর্থাৎ চন্দ্রতে যিনি ক্রীড়া করেন। এই অর্থে ইন্দ্র শব্দ দ্বারা সূর্য্যকেও বুঝায়।

এই ঋক্‌টি সামবেদের দুই স্থানে একইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ২য় প্রপাঠক, ২য় অর্দ্ধ, ১ম দশাতি, ৩য় ঋক্ এবং ৩য় প্রপাঠক, ১ম অর্দ্ধ ৯ম সূক্ত, ৩য় ঋক্। ইহার ঋষি গোতম ; ছন্দ ককুপ্। ঋক্‌টি অতি সুন্দর, অতএব শব্দানুক্রমে সায়ন ভাষ্য উদ্ধৃত করিলেও বোধ হয় কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না।'

"অত্রাহ (অস্মিন্নেব) গোঃ (গন্তুঃ) চন্দ্রমসঃ (চন্দ্রস্য) গৃহে (মণ্ডলে) চন্দ্রমণ্ডলে ইত্যর্থঃ। ত্বষ্টুঃ (এতৎ সংজ্ঞকস্য সূর্য্যস্য) অপীচ্যং (রাত্রৌ অন্তর্হিতং স্বকীয়ং) যৎ নাম তেজঃ তদাদিত্যস্য রশ্ময়ঃ। ইত্থা (অনেন প্রকারেণ) অমন্বত (অজানন্)। উদক ময়ে স্বচ্ছে চন্দ্র বিম্বে সূর্য্য কিরণাঃ সূর্য্যে যাদৃশীং সংজ্ঞাং লভন্তে তাদৃশীং (সংজ্ঞাং) চন্দ্রেঽপি বর্ত্তমানা লভন্তে ইতি। এতদুক্তং ভবতি যত্রাত্রাবন্তর্হিতং সৌরং তেজঃ তচ্চন্দ্রমণ্ডলং প্রবিশ্যাহনীব নৈশং তমো নিবার্য্য সর্ব্বং প্রকাশয়তি।

সংস্কৃত ভাষায় সামান্য জ্ঞান যাঁহার আছে, তিনি অনায়াসেই উল্লিখিত সায়ন ভাষ্যের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারিবেন। তথাপি এই স্থলে উহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদত্ত হইতেছে। গমনশীল এই চন্দ্রমণ্ডলে সূর্য্যের রশ্মিসমূহ অন্তর্হিত থাকে। এই প্রকারে রাত্রিকালে সূর্য্যের (ইন্দ্ররূপী সূর্য্যের) রশ্মিসমূহ চন্দ্ররশ্মিরূপে আখ্যাত হয়। ইন্দ্ররূপী সূর্য্যদেবের প্রশংসাচ্ছলে বলা হইতেছে যে, সূর্য্য শুধু দিবাভাগে রশ্মি বিকীরণ করিয়াই ক্ষান্ত হন না; সমস্ত প্রজার মঙ্গলার্থ রাত্রিতেও তিনি চন্দ্রমণ্ডলের মধ্য দিয়া স্বীয় রশ্মি বিকীরণ করেন। এইস্থলে চন্দ্রবিম্বকে উদয়াময় অর্থাৎ জলময় বলা হইয়াছে। সায়নাচার্য্যের এই উক্তি কতদূর সত্য, তাহা বিজ্ঞানাচার্য্যগণ প্রতিপন্ন করিবেন। শুনিতে পাই, চন্দ্রলোক না কি শুধুই নীরস মরুভূমিসদৃশ অসংখ্য পর্ব্বতমালায় পরিপূর্ণ। নীরসের মধ্যে কি প্রকারে রসের সঞ্চার হয় তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। জোনাকি পোকা ও কেঁচো প্রভৃতি জীবের মধ্যেই বা এমন কি ভূতপদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহার আলোক দিবাভাগে সৌরকিরণে অভিভূত থাকে ; অথচ রাত্রিতে প্রকাশ পায়! তথাপি এইস্থলে "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্।" সায়নাচার্য্য যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই পুনঃ উদ্ধৃত হইল। চন্দ্রমণ্ডল সম্বন্ধে কত কাহিনী কত লোকের মুখে প্রচলিত আছে; তত সংবাদ আমরা রাখি না। ঠাকুরমার ঝুলিতে বা ঠানদিদির ঝুলিতে অবগত হওয়া যায় যে, চন্দ্রমণ্ডলে বসিয়া এক বুড়ী দিনরাত সূতা কাটিতেছে ; এবং চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে ঐ যে কালো রেখা দৃষ্টিগোচর হয়, উহা শশক অর্থাৎ খরগোসের ছায়া ; এবং এইজন্যই উহার নাম শশাঙ্ক। কেহ বলেন, অমোঘবাক্ ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে "শশাঙ্কে কলঙ্করাশি ক্ষতাঙ্ক বাসবে, জরাপ্রাপ্তি যযাতি রাজায়।" কোথাও দেখিতে পাই, দেবগণ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক কলা করিয়া কলানিধির কলা সেবন করেন এবং এই প্রকারে পনর তিথিতে পনর কলা হ্রাস পায় ; এবং ষোল কলার এক কলা মাত্র বাকী থাকে। চন্দ্র শব্দের পর্য্যায়ে উহার এক নাম সোম প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথচ বিষ্ণুপুরাণে "অত্রেঃ সোমঃ"—অত্রি মুনি হইতে সোমের জন্ম, এই উল্লেখ আছে। দেবতাগণকে সোমপ বা সোমপায়ী বলা হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, দেবতা কোন সোমকে পান করিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে সোম নামে একপ্রকার ওষধিলতার অনুসন্ধান পাওয়া যায়। প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা এই সোমলতার রস পানোপযোগী করিয়া ও নিংড়াইয়া নিতে পারিলে উহা একপ্রকার উৎকৃষ্ট সুরাসারে (Alcohol) পরিণত হয়, অথচ উহা অমৃততুল্য স্বাস্থ্যবর্দ্ধক। এই সোমরসের সঙ্গে সুধা, অমৃত ও আধুনিক মদ্যের প্রভেদ কতদূর, তাহা ঢাকার প্রতিভা পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সমুদ্রমন্থনে সুধা উৎপন্ন হইল; অথচ সঙ্গে-সঙ্গে সোমের আবির্ভাব হইল। ইহা দ্বারা সুধা ও সোমের কতক পার্থক্য অনুমান করা যায়,—যদিও এই সোমকে আমরা আকাশমার্গে পরিভ্রমণশীল চন্দ্ররূপে গণনা করিব না। সমুদ্র হইতে উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, ধন্বন্তরি, লক্ষ্মী, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, অলম্বুষা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরাদের উদ্ভব, এবং নন্দনের পারিজাত প্রভৃতি বৃক্ষের উৎপত্তি, এই সমুদায়ের অর্থ কতক রূপক কতক অর্থবাদ, কতক কাল্পনিক! এ সমস্ত বৃত্তান্তের স্বরূপ ব্যাখ্যা যাহা আমরা জানি, তাহা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে বলিয়া উল্লিখিত হইল না।

এইক্ষণে চন্দ্র সম্বন্ধে দুই একটী "বেদবাক্য" উদ্ধৃত করিয়াই বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার করিব।

"চন্দ্রমা অপ্স্বাঽন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি।
নবো হিরণ্যনেময়ঃ পদং বিন্দন্তি
বিদ্যুতো বিত্তং মে অস্য রোদসী॥"

৫ম প্রঃ, ১ম অর্দ্ধ, ৩দ ;, ৯ ঋক্।

সায়ন ভাষ্য—অপ্সু (আন্তরিক্ষ্যাসু, উদকময়ে মণ্ডলে) অন্তঃ (মধ্যে বর্ত্তমানঃ) সুপর্ণঃ (সুষুম্নাখ্যেন সূর্য্যরশ্মিনা যুক্তঃ) চন্দ্রমা দিবি (দ্যুলোকে, আকাশমার্গে) আ-ধাবতে (দ্রুতংগচ্ছতি) ইত্যাদি।

ইহার ভাবার্থ এই যে, উদকময় মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমা সূর্য্যদেবের সুষুম্ন নামক রশ্মির যোগে আকাশমার্গে দ্রুত পরিভ্রমণ করিতেছেন। অত্র নিরুক্তম্। এই বিষয়ে নিরুক্তে উক্ত হইয়াছে।

"অথাপ্যস্যৈকো রশ্মিশ্চন্দ্রমসং প্রতি দীপ্যতে, তদেতে নোপেক্ষিতব্য-মাদিত্যতোঽস্য দীপ্তি র্ভবতীতি, সুষুম্নঃ সূর্য্য রশ্মিঃ, চন্দ্রমা গন্ধর্ব্ব ইত্যপি নিগমো ভবতি, সো-পি গৌরুচ্যতে।"

সূর্য্যের সুষুম্ন-নামধেয় রশ্মি চন্দ্রে প্রদীপ্ত হয় এবং তন্নিমিত্ত চন্দ্রের জ্যোতিঃ বা জ্যোৎস্না পৃথিবীস্থিত নৈশ অন্ধকার দূরীভূত করে।

শিক্ষা

[শ্রীপৃথ্বী—]

শিক্ষা স্বর্গীয় সামগ্রী—মানবের সঞ্জীবনী শক্তি। ইহার প্রভাবে শরীর ও মন উভয়ই সজীবতা ও উৎকর্ষ লাভ করে। ইহা শুধু পুস্তক পাঠে হয় না, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-মালায় ভূষিত হইলেও হয় না। ইহার পূর্ণ বিকাশ চিন্তায়—আত্মোন্নতি ও পরোন্নতিতে। যিনি শিক্ষিত, তিনি প্রেমিক, ভাবুক, বিশ্ববন্ধু,—জগতে অতুল্য। মানব-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের শিক্ষা তরলতাময়ী, স্বার্থময়ী, অর্থকরী। অর্জ্জন-স্পৃহাই পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার তাড়নায় আমরা অন্য সকল সৎবৃত্তিকে বলি দিতেছি। চাটুকারী হইয়া, সত্যের অপলাপ করিয়া, ন্যায়কে উৎপীড়িত করিয়া, বুদ্ধিকে বিড়ম্বিত করিয়া, শ্বাপদাবস্থায় পরিণত হইয়া আমরা মানবাবাসে প্যাণ্ডিমোনিয়ামের সৃষ্টি করিয়াছি। সৃষ্টি-রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া আমরা পদ, মান ও ধনাকাঙ্ক্ষায় দাসত্বের দুর্মোচ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার জন্য লালায়িত,·উদ্‌ভ্রান্ত। এই আত্ম-বিক্রয়ের ফলে আমরা অর্থরাশি সংগ্রহ করিতে পারি; বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারি; চাকচিক্যশালী বেশ-ভূষা ও গৃহ-সজ্জায় মানবকে চমকিত করিতে পারি। কিন্তু বলুন দেখি, এই শিক্ষাই কি সুফলপ্রদ? যে শিক্ষার প্রবল স্রোতে পড়িয়া মানুষ আত্মহারা হয়, সদসৎ ভাবিবার অবসর পায় না, তাহা শিক্ষা নামে অভিহিত পারে কি? চিন্তাহীন মনুষ্য কর্ণধারহীন তরণীর মত। প্রথমটি যেমন কর্ম্ম-ভূমির সামান্য ঘাত-প্রতিঘাতে অবসন্ন হইয়া পড়ে, দ্বিতীয়টি তেমনি অল্প বায়ুর হিল্লোলেই ঘন-ঘন আন্দোলিত হইতে থাকে। শিক্ষা মানব-পরিবারের মধ্যে সদ্ভাব প্রচার করিবে; দ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা পরিহার করিবে; একতার উপাসক হইয়া আত্মাদর দূর করিয়া অনুন্নত ও বিশৃঙ্খল সমাজে উন্নতি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করিবে। শিক্ষাই চিত্তশুদ্ধির মূল। ইহার প্রভাবেই কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উদ্রেক হয়—যাহা জগতের অত্যন্ত হিতকর ও অপরিসীম সুখের উৎপাদক। তোমাতে-আমাতে এমন সম্বন্ধ আছে যে, তোমার ক্লেশে আমার ক্লেশ অনিবার্য্য। ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড। জগতের ভিন্ন-ভিন্ন পদার্থের সহিত আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেই যথেচ্ছাচারিতা পরিম্লান হইবে। মনুষ্যের জ্ঞান সামান্য ও সীমাবদ্ধ নহে। ক্ষুদ্র হইয়াও মনুষ্যের শক্তি বিপুল। জগতের অনেক বিষয়ে দর্শন দৃষ্টিহীন, বিজ্ঞান নিরুত্তর। মনুষ্যের শিক্ষা স্বতঃ,পরতঃ ও পরম্পরাগত। ইহার পরিণতি কোথায়, কে বলিবে? আজ যাহা সুমেরুর তুলনায় সর্ষপ বলিয়া প্রতীতি জন্মিতেছে, কালে তাহাই যে স্ফীতাবয়ব হইয়া অতুল্য হইবে না, কে বলিবে? গগনস্পর্শী বিশালায়তন তরু সকল সামান্য শৈবাল হইতে ক্রমে-ক্রমে সমুৎপন্ন হয়। শুষ্ক স্রোতস্বিনীর বেগ অতি ধীর। শুভফল-প্রসবিনী শিক্ষার বিস্তার ও গতিও মন্দ। আত্মাদরে যে উন্নতি, সেস্থলে পরোন্নতি কোথায়? আত্মাদরে ভরিয়া আমরা কত বাগ্‌জাল রচনা করিতেছি বাক্যের ফোয়ারা বড় মধুর,—বর্ণে-বর্ণে কত মধু ক্ষরণ করে, কত পিকের সুস্বর ঝঙ্কৃত হয়। কিন্তু বিচারপরায়ণ হইয়া বল দেখি, উহা মাঙ্গল্য-শঙ্খ-নিনাদে সংসারের কতখানি অমঙ্গল বিদূরিত হইয়াছে কয়টি গৃহ উজ্জ্বল হইয়াছে? অনেকের মনে ধারণা যে, আমেরিকা য়ুরোপবাসী সুখী ও সৌভাগ্যশালী; এবং সেখানে শিক্ষাও সফল হইয়াছে। তাহারা প্রাচ্য-জাতিকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া উন্নতিবর্ত্মে অগ্রসর হইয়াছে। ইহা কি সত্য? এই শিক্ষার দ্বারাই কি মানব জাতির অশেষ উন্নতি সাধিত হইবে? ইহাই কি শিক্ষার চরমোদ্দেশ্য; সদ্‌বুদ্ধি ও সৎচিন্তার পরিপোষক? ক্ষিপ্ত স্বার্থের আবাহন ও ধর্ম্মে-গ্লানি দ্বারা বিশ্বের মঙ্গল হইবে কি? তোমরা ত ইন্দ্রধনু দেখিয়াছ। তাহার সৌন্দর্য্য-সম্ভার-ভূষিত অনির্ব্বচনীয় শোভা ও দৃশ্য-বৈচিত্র্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছ। ঐ ঐন্দ্রজালিক বর্ণরাগ, নিসর্গ-সুন্দরীর সম্পদশালী শোভা তোমাদের নয়নাভিরাম হইয়াছে,—হৃদয়ে স্পন্দন আনিয়াছে, চক্ষু সার্থক করিয়াছে। আর কিছু মিলিয়াছে কি? বর্ত্তমান সভ্য-জগতের শিক্ষার ফলও ঐরূপ ক্ষণস্থায়ী। নানাবর্ণের পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য, নানা বর্ণমালাবিশিষ্ট উপাধির উদ্বেলতা; কি বিচিত্র দৃশ্য! "জগৎ মুখের পানে চায়, জগৎ পাগল হয়ে যায়।" যেদিন পৃথিবীব্যাপী একটি সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হইবে, এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, এক আচার-ব্যবহার, এক স্বার্থ, এক জাতীয় ভাব পরিপুষ্ট হইয়া মানব-সমাজ একটি মহাজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিবে, সেইদিন বুঝিতে হইবে, প্রকৃত শিক্ষার অভ্যুদয় হইয়াছে; জ্ঞানার্জ্জন সার্থক হইয়াছে। যে শিক্ষায় লঘু-গুরু ভেদ নাই, আত্ম-পর ভেদ নাই; শ্বেত-কৃষ্ণও অপৃথক্, সব একাকার। ইহা অসম্ভব নহে। মানব মনের উন্নতির স্রোত নানা কারণে রুদ্ধ। জন-সমাজে আমরা কি সকল সময়ে নিরবচ্ছিন্ন মানব-প্রকৃতি দর্শন করি? নানা প্রকার শাসনে ও নিয়মে মনুষ্য-প্রকৃতি কি উত্তেজিত হয় নাই, ভিন্নভাব ধারণ করে নাই? সুতরাং অনেক সময়ে জ্ঞানী ব্যক্তির চিন্তা যে ভ্রান্তি-বিজ্‌ম্ভিত হইবে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? সঙ্কীর্ণ, অনুদার চিন্তাশক্তিহীন, ক্ষণস্থায়ী। বদ্ধ, সাম্প্রদায়িক শিক্ষাসম্ভূত ফল জগতের সম্পত্তি হইতে পারে না। সঙ্গীতে একটি বিবাদী সুর যেমন রাগরূপ নষ্ট করে, তেমনি এক সঙ্কীর্ণতা সঞ্জীবনী শিক্ষাকে গরলময় করিয়া তুলে। অনুদার শিক্ষা অভ্রান্ত ভাবে উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে পারে না। উহা হিতবাদ ও সুখবাদ-পুষ্ট নহে। প্রকৃত শিক্ষার মূলে সমত্ববাদ থাকা চাই। পৃথিবীতে সাম্য দৃষ্ট হয় না। না হউক, যে বৈষম্যের জন্য মানব দায়ী নহে, তাহার তীব্রতা সহনীয়। দেবধর্ম্মী মানব বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের স্ফূর্ত্তি প্রকট করিতে সমর্থ। অনাবিল প্রেম ও সমদর্শিতা চাই। জ্ঞান-বিজ্ঞানালোকে প্রতিভাত এ যুগে কেহ ইহা অস্বীকার করিতে পারেন কি? সাম্যতত্ত্ব বুঝিতে হইবে, সাম্য-মন্ত্রের সাধক হইতে হইবে। একদিন ভারতবর্ষই এই কথার প্রচার করিয়াছিল।

আধ্যাত্মিক রাজ্যের মহারথী গৌতম বুদ্ধ বলিতেন, "যাহাদিগকে রক্ষা করিবার আমার সামর্থ্য আছে, তাহাদের একজনকেও আমি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দিব না।" মহাত্মা তুলসীদাসও বলিয়া গিয়াছেন—"তুলসী যব জগমে আয়ো, জগ হসে তুম রোয়ে, য্যাসী করণী কর চলো, যো তুম হসো জগ রোয়ে।" মানব-জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইলে, এই শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শুধু কল্পনা বিস্ফুরিত কাব্য পাঠে এ শিক্ষা হয় না—হইবে না। বিলক্ষণ রূপে ইহার মর্ম্ম অবগত হইয়া, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, পৃথিবীর প্রত্যেক নর-নারীকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। পেটিকাবদ্ধ ঘটিকা-যন্ত্রের সার্থকতা কোথায়? অহঙ্কার-স্ফীত ব্যক্তিগণই উহাতে উন্নতির লক্ষণ দেখিতেছেন। একের বা দশের উন্নতি হইল দেখিয়া, সমগ্রের উন্নতি হইল বা হইবে ভাবা, সুচিন্তার পরিচায়ক নহে। আমাদের চিন্তা-শক্তির সম্যক প্রস্ফুরণ হইয়াছে কি! চরিত্র গঠিত হইয়াছে কি? কায়মনোবাক্যে কয়জন ঐগুলির সাধনে যত্নবান্? বর্ত্তমানে আমরা জগতবাসী অবনতির শেষ সোপানে দণ্ডায়মান। খাস কামরায় বসিয়া আমাদের শিক্ষা ও সভ্যতার গৌরব-বর্দ্ধন শোভন হইতে পারে; কিন্তু মানব-মণ্ডলীর পূর্ণ মজলিসে তাহা হইতে পারে কি? শ্রীবশিষ্ঠদেব লিখিয়াছেন—"যদি কর্দ্দমে ভেক হইয়া থাকিতে হয়, তাহাও ভাল; মলকীট হইয়া থাকিতে হয়, তাহাও ভাল; কিম্বা যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহায় সর্প হইয়া থাকিতে হয়, তাহাও ভাল; তথাপি বিচারহীন মানব হওয়া কোন ক্রমে ভাল নয়। সকল অনর্থের আবাস ভূমি, সকল সাধুগণ কর্তৃক তিরস্কৃত, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের আধি স্বরূপ অবিচার পরিত্যাগ করা উচিত। প্রকৃত শিক্ষা উর্দ্ধগামী, প্রীতিদায়ক; তাহা উষর ক্ষেত্র উর্ব্বর করে; পঙ্কিল, পুতিগন্ধময় প্রাণে শান্তিবারি বর্ষণ করে; ভগ্নদেহে নব-জীবন সঞ্চার করে; মনুষ্যত্বের বীজ বপন করিয়া মানব-জন্ম সার্থক করে। প্রচলিত শিক্ষা অস্বাভাবিক, প্রাণহীন, পাষাণবৎ। উন্নত ভাব সমূহকে উহা উত্তেজিত ও পরিপুষ্ট করিতে পারে না। এই শিক্ষার সাহায্যে আমরা ভূ যান, অর্ণব-যান, ব্যোম-যান নির্ম্মাণ করিতে পারি; ভূভাগকে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারি; বিশ্ব-বিশ্রুত প্যানামার খাল খনন করিয়া সাহঙ্কারে অধ্যবসায়ের বিজয়-কেতন উড্ডীন করিতে পারি; আফ্রিকার দিগন্তব্যাপী মরুভূমি ভূমধ্য সাগরের বারিরাশি দ্বারা পোত-প্লাবন-মুখরা মহাবারিধিতে পরিণত করিয়া জয়োল্লাসে স্ফীত হইয়া লক্কা-পারাবতের ন্যায় শস্য-শ্যামলা, সাগরাম্বরা অভ্রিশেখরা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণ করিতে পারি; নরলোকে বিপন্ন আর্ত্তকে দলিত করিয়া নরকের সৃষ্টি করিতে পারি। কিন্তু বল দেখি, একটি পুষ্পের পাপড়ী খসিয়া পড়িলে জোড়া দিতে পারিব কি? একটি ভগ্ন হৃদয়ে আশ্বাস দিয়া শান্তি আনয়ন করিতে পারিব কি? একটি দূর্ব্বা নীরস হইলে সরস করিতে পারিব কি? ত্রিতাপ পুষ্ট জগৎ একটুও তাপহীন করিতে পারিব কি? ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে। কতকগুলি বারিবিন্দু লইয়াই মহাসিন্ধু-কণা বালুকা লইয়াই গগন-স্পর্শী হিমাচল। এই বিরাট সমাজ কতকগুলি মনুষ্যের সমষ্টি মাত্র। জগতের যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই ঐক্যের অসীম শক্তি নিরীক্ষণ করিবে। মনুষ্য-সমাজে, জগতের শ্রেষ্ঠ-জীব সঙ্ঘের মধ্যে—ঐ শক্তির কতখানি বিস্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়? ঐক্য বিস্তারের জন্য সমদর্শিতা প্রয়োজন; শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে সমান ভালবাসা উচিত। সেই সমদর্শিতা, সেই ভালবাসা কোথায়? যাহা আছে, তাহা স্পন্দহীন, স্বার্থদূষিত, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, ছাড়া-ছাড়া। "আমি কে, মানবের শক্তি কত" তাহা কয়জন কায়মনে ভাবিয়া থাকেন? যে সকল মহাত্মা বিশ্বের গুপ্ত রহস্য ভেদ করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন তাঁহারাই অমূল্য ফলপ্রদ তত্ত্বসকল আবিষ্কার করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। অধ্যবসায়ের বলে এই আবরণ অল্পে-অল্পে অপসৃত হইতেছে। কালে যে উহার সম্পূর্ণ উন্মোচন সম্ভবপর, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বিশ্ববাসীর সমবেত চেষ্টা কদাপি নিষ্ফল হইতে পারে না। এক মন, এক প্রাণ, এক সঙ্কল্প লইয়া অগ্রসর হইলে, বিশ্বপ্রহেলিকা বিদূরিত হইবে,—সংসার নূতন শ্রী ধারণ করিবে। ইহা প্রলাপ নহে। শিক্ষা চাই, ধৈর্য্য চাই, সাহস চাই। অপরিমিত সহানুভূতি ব্যতিরেকে জগতে অপরিসীম উন্নতি অসম্ভব। সুতরাং, যতদিন আমাদের চিত্ত দুর্ব্বল থাকিবে, বাক্য ও বচন অসংযত থাকিবে, হতাশে বা প্রলোভনে সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটিবে, স্বার্থরূপ অক্টোপাস আঁকড়িয়া থাকিবে, ততদিন কাহারও মঙ্গল নাই। এক সময়ে না এক সময়ে মানব সমাজকে এই আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইতেই হইবে। এই উদ্দেশ্য সংসাধনে আমরা উদাসীন থাকিলে বুঝিব, "এই পৃথিবীরূপ বাতুলাশ্রমে আমরা সবাই পাগল" (We are all lunatics in this sub-lunar lunatic asylum.)

জাহাজে প্রদর্শনী

[শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু]

সমগ্র দেশ বিশেষ ভাবে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, গত কয়েক বর্ষে বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বৃটেনের ব্যবসায়-প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য জাতিসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নিজেদের বাণিজ্য-বিস্তারের বিশেষ সুযোগ লাভ করিয়াছে। এক্ষণে যাহাতে সর্ব্বত্র বৃটেনের বাণিজ্য-প্রভাব পুনঃ স্থাপিত হয়, এবং ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করে, সেজন্য বৃটিশরা একান্ত চেষ্টার আবশ্যকতা বোধ করিতেছেন।

বৃটেনের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ধীমান ব্যক্তি নানারূপ আলোচনার পর স্থির করিয়াছেন যে, বৃটিশ পণ্যের একটি প্রদর্শনী নির্ম্মাণ করিয়া বিভিন্ন দেশে তাহা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিশেষ ভাবে প্রস্তুত একটি

বাণিজ্য-জাহাজের সাহায্যেই কেবল এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। সেই উপায়ই অবলম্বন করা হইতেছে—বৃটেনের বাণিজ্য জাহাজের গঠন প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

বাণিজ্য জাহাজ "বৃটিশ ইণ্ডষ্ট্রি" ভাসমান প্রদর্শনী হলের মত সজ্জিত হইবার উপযোগী করিয়া গঠিত হইতেছে। এই জাহাজ নিজেই যাহাতে আধুনিক বৃটিশ জাহাজ-নির্ম্মাণ শিল্পের একটি আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে, সে দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং সুদূর প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরগুলিই প্রধান বাণিজ্যের স্থান এবং সেই সকল স্থান হইতেই দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়া থাকে। প্রথম যাত্রায় "বৃটিশ ইণ্ডষ্ট্রি" জাহাজ ঐ সকল দেশেই গমন করিবে। বিশেষ বিবেচনার সহিত তাহার যাত্রা-স্থানসমূহের তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

এই জাহাজী প্রদর্শনীর যে কিরূপ সুবিধা তাহা সহজেই অনুমেয়। জনাকীর্ণ বন্দরে প্রদর্শনীর উপযোগী স্থান নির্ব্বাচনের কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না, শিল্পসম্ভার বহনের বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে না, কাষ্টম বিভাগের হস্তে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে না, প্রদর্শনীর জন্য সাময়িক গৃহ নির্ম্মাণের আবশ্যকতা থাকিবে না, প্রদর্শনীর শেষে সামগ্রীগুলি প্যাক করিয়া পাঠাইবার হাঙ্গামা ভোগ করিতে হইবে না এবং সাময়িক প্রদর্শনীর জন্য যে অত্যধিক অর্থব্যয় হয়, তাহা হইতেও নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক বন্দরে এক একটী করিয়া প্রদর্শনী নির্ম্মাণ করিতে অজস্র অর্থব্যয় করিতে হইত ; জাহাজী প্রদর্শনীতে একবার মাত্র অর্থব্যয় করিয়াই সহস্র স্থানের সহস্র প্রদর্শনীর কাজ হইবে। এই সকল নানা সুবিধা ব্যতীত এই প্রদর্শনীতে সময় নাশ বিশেষ নিবারিত হইবে এবং বিভিন্ন দেশবাসী অসংখ্য লোকে ইহার দর্শক হইতে পারিবেন।

এই ভাসমান প্রদর্শনীর কার্য্য সুসম্পাদনের জন্য লণ্ডন সহরে 'বৃটিশ-ট্রেড-সিপ্ লিমিটেড' নামে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। কানাডার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল আর্ল গ্রে এই কোম্পানীর সভাপতি এবং ইংলণ্ডের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইহার ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। বৃটেনের সুপ্রসিদ্ধ জাহাজ-নির্ম্মাণ ব্যবসায়ী 'হণ্টার এণ্ড উইগহাম্ রিচার্ডসন্ লিমিটেড' বাণিজ্য-জাহাজের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন।

বাণিজ্য জাহাজ "বৃটিশ ইণ্ডষ্ট্রি ২০,০০০ টনের এবং ৫৫০ ফিট দীর্ঘ হইবে। প্রদর্শনী লইয়া ইহা ঘণ্টায় প্রায় ১২½ নট্স্ গতিতে ভ্রমণ করিবে। তৈলের দ্বারা চালিত ইঞ্জিন সংযুক্ত হইবে বলিয়া জাহাজে বড় বড় চিমনি বা কৃষ্ণবর্ণের ধূম থাকিবে না। জাহাজের সমুদায় যন্ত্রাদি যথাসম্ভব এক প্রান্তে রাখায়, মধ্যের ও সম্মুখের সমস্ত স্থান সকল সময়েই প্রদর্শনীর কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

প্রধান চারিটি প্রদর্শনী-ডেকে ষ্ট্যাণ্ড এবং সো-কেশ সমূহ বসান থাকিবে। ষ্টলগুলি এরূপভাবে সাজান হইবে, যাহাতে প্রদর্শনীর দর্শকরা প্রত্যেক ষ্টলের সম্মুখ দিয়া এবং ডেকের সমস্ত দৈর্ঘ্য অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন। জাহাজের উপরের ডেক সমূহে ব্যবসা-প্রতিনিধি এবং প্রদর্শনীর কর্ম্মচারী ইত্যাদির বসবাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একটি প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর জাহাজে যতটা সুবিধা থাকে এই জাহাজের যাত্রীরা ততটা সুখ-সুবিধাই ভোগ করিতে পাইবেন মোট কথা, অন্যান্য সাধারণ প্রদর্শনীর অপেক্ষা এই ভাসমান প্রদর্শনী ব্যবস্থা উৎকৃষ্টই হইবে।

জাহাজের প্রত্যেক পার্শ্বে তিনটি করিয়া প্রশস্ত প্রবেশ-দ্বার রাখা হইয়াছে। দর্শক এবং কর্ম্মচারীগণকে বিভিন্ন ডেকে পৌছিয়া দিবার জন্য সেই সঙ্গে লিফট্ এবং সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে। মধ্যের (নিমন্ত্রিত ও বিশিষ্ট দর্শকগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট) প্রবেশ-দ্বার দিয়া একটি অভ্যর্থনা-হলে পৌছান যাইবে। এই হলের চতুর্দ্দিকে প্রদর্শনী প্রধান অফিসসমূহ স্থাপিত থাকিবে। অফিসসমূহের মধ্যে অনুসন্ধান-অফিস, দোভাষীগণের অফিস, একটি ব্যাঙ্ক, একটি ইন্‌সিউরেন্স অফিস একটি বড় সাধারণ অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, বিশ্রাম গৃহ এবং সজ্জার গৃহ থাকিবে। অপর দুইটি করিয়া প্রবেশদ্বার প্রদর্শনী ডেকের দুই প্রান্তে অবস্থিত এবং খাস প্রদর্শনীর সহিত মিলিত হইবে। প্রধান হল দিয়াই ভোজনাগারে পৌছান যাইবে। এইখানে একসঙ্গে যাহাতে ৫০০ লোক আহারে বসিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেণ্টার, ব্রিজ এবং প্রমিনেড ডেক্‌সমূহে ব্যবসায় প্রতিনিধিগণের বাসের জন্য সিঙ্গেল এবং ডবল কেবিন গঠিত হইয়াছে। বোট-ডেকে প্রদর্শনীর কর্ম্মচারীগণের বাসের কেবিনসহ কমিটি গৃহ, অভ্যর্থনা গৃহ প্রভৃতিও আছে। প্রমিনেড ডেকে সাধারণের ব্যবহারের ঘরগুলি আকারে বেশ বড় করা হইয়াছে ; এবং সেই সঙ্গে একটি সুসজ্জিত লাইব্রেরী, লিখিবার গৃহ এবং ধূমপানাগারও রাখা হইয়াছে।

বোট ডেকে একটি অতি বিস্তৃত বল-নাচ এবং অভ্যর্থনার গৃহ প্রস্তুত করা হইয়াছে। শেষপ্রান্তে প্রদর্শনীর কার্য্যে ব্যবহারের উপযোগী একটি বায়স্কোপ যন্ত্র স্থাপিত রহিয়াছে। অভ্যর্থনা-হল এরূপ ভাবে রাখা হইয়াছে যে, আবশ্যক হইলে তাহার অংশবিশেষ পর্দ্দার দ্বারা পৃথক করিয়া লওয়া যাইবে। বোট ডেকের এক সীমানায় বারাণ্ডায় বসিয়া আহারাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোন কারণে এক অংশে আগুণ লাগিলে, যাহাতে তাহা সহজে অপর অংশে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে না পারে সেজন্য আগাগোড়া ষ্টিলের নির্ম্মিত দ্বার এবং ব্লকহেডস্ বসান হইয়াছে।

এই জাহাজ নিজে একটি ভাসমান প্রদর্শনী হইলেও, ইহার আর একটি প্রধান বিশেষত্ব এই থাকিবে যে, জাহাজের প্রত্যেক অংশ এবং প্রত্যেক সজ্জাই বৃটিশ-জাহাজ-নির্ম্মাণ-শিল্পের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিবে। অধিকাংশ স্থলেই জাহাজের বিভিন্ন অংশ প্রদর্শনী মধ্যে রক্ষিত অন্যান্য শিল্পের ন্যায় প্রধান দর্শনীয় রূপে গণ্য হইবে।

জাহাজে নানারূপ যন্ত্রাদি যুক্ত একটি আদর্শ ধোপাখানা থাকিবে। প্রোগ্রাম, ক্যাটালগ্, ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন এবং একখানি দৈনিক সংবাদ-

পত্র মুদ্রণের জন্য ছাপাখানা স্থাপিত হইবে। সর্ব্বসাধারণের জন্য অভ্যর্থনা-গৃহ, সভা-গৃহ, পরামর্শ গৃহ, অনুসন্ধান-অফিস, ব্যবসায়ের নানাবিধ ক্যাটালগ এবং বিজ্ঞাপন পত্রাদিপূর্ণ একটি লাইব্রেরী, লিখিবার গৃহ, ব্যাঙ্ক ও করেন্সি অফিস্, ইন্সিওরেন্স অফিস, টেলিফোঁ, টেলিগ্রাম এবং তারহীন টেলিগ্রাফের অফিস থাকিবে।

১৯২৩ অব্দের ২১শে আগষ্ট এই বাণিজ্য-জাহাজ ইংলণ্ড হইতে প্রথম যাত্রা করিবে। বিশেষ বিবেচনার পর এই তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথমে দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড যাইবার ব্যবস্থা আছে। তথা হইতে ক্রমান্বয়ে জাপান, চীন, ফিলিপাইন, যাভা, ষ্ট্রেট্স সেটেলমেণ্টস্, ও ভারতবর্ষ ঘুরিয়া জাহাজ সুয়েজের পথে ইংল্যাণ্ডে ফিরিবে। সমস্ত প্রধান বন্দরে বাণিজ্য-জাহাজ থামিবে।

যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে ১৯২৪ অব্দের ২২শে অক্টোবর তারিখে বাণিজ্য-জাহাজের কলিকাতায় পৌঁছিবার কথা। অন্ততঃ দুই সপ্তাহকাল জাহাজ এখানে অপেক্ষা করিবে। নভেম্বরের ১৬ই তারিখে মান্দ্রাজ এবং তাহার দশ দিন পরে কলম্বো পৌঁছিবে। বোম্বাই সহরে ১৭ই ডিসেম্বর এবং করাচীতে ৩১শে ডিসেম্বর পৌঁছিবার কথা। ১৯২৫ অব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী আন্দাজ বাণিজ্য-জাহাজ ফিরিয়া লণ্ডনে পৌঁছিবে।

যে সকল বন্দরে বাণিজ্য জাহাজ যাইবে, সেই সকল বন্দরে পূর্ব্ব হইতে অভ্যর্থনা-কমিটি স্থাপিত হইবে। ডাইরেক্টরগণ এ সম্বন্ধে স্থানীয় গভর্মেণ্ট হইতেও সাহায্য পাইবেন। অভ্যর্থনা-কমিটির উপর প্রদর্শনী সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দিবার, প্রধান ব্যবসায়ীদের ও ব্যবসায়ের তালিকা প্রস্তুত করিবার এবং অন্যান্য আবশ্যক সংবাদ সংগ্রহের ভার থাকিবে।

সরকারী অভ্যর্থনা এবং ভোজ ব্যতীত, প্রদর্শক ব্যবসায়ীরাও নিজ-নিজ বন্ধুগণকে ভোজ দিতে পারিবেন। উৎকৃষ্ট হোটেল বা ক্লাবের সর্ব্ববিধ সুবিধাই জাহাজে থাকিবে।

প্রদর্শনীর বায়স্কোপ বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিস হইবে। ইহার সাহায্যে ব্যবসায়ীগণ নিজেদের প্রদর্শিত দ্রব্যাদির প্রস্তুত প্রণালী, কারখানার বিভিন্ন বিভাগের দৃশ্য ইত্যাদি সাধারণকে দেখাইতে সমর্থ হইবেন। এই সকল চিত্র যাহাতে বন্দরের অন্যত্রও দেখাইতে পারা যায় তাহার প্রস্তাবও করা হইয়াছে।

সম্ভব হইলে, প্রত্যেক বন্দরের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানসমূহ হইতে যাহাতে লোকের প্রদর্শনী দেখার সুবিধা হয়, সেজন্য ট্রেনের বিশেষ সুবিধা করা হইবে। এ বিষয় পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞাপন দিয়া সকলকে জানান হইবে।

ব্রিটিশ শিল্পসম্ভারপূর্ণ এই ভাসমান প্রদর্শনী বিদেশীয়গণের মনে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে, এরূপ আর কোন প্রদর্শনীই করিতে সমর্থ হয় নাই। বিলাতের জনসাধারণ এক বৎসরের অধিককাল ধরিয়া "বৃটিশ ইণ্ডষ্ট্রি" জাহাজের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিবে। ব্যবসায়ী প্রদর্শকেরা এই প্রদর্শনীর সাহায্যে যে সাফল্য লাভ করিবেন, তাহা বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি পাঠাইয়া লাভ করা একরূপ অসম্ভব।

স্বামী অভেদানন্দ

[শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

বিশ্ববাসীকে বেদান্তের বাণী বিতরণ করিতে, বিপুল-বিশ্বে বেদান্তের বিজয়-বার্ত্তা বিঘোষিত করিতে, বেদান্তের বিজয়-বৈজয়ন্তীর বহু বিস্তৃতির বিধান করিতে, বদ্ধপরিকর বেদান্তবিদ্ বিদ্বদ্বর্গের অন্যতম প্রধান ও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য পরিব্রাজক সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ আজ সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

যাঁহারা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা স্বামী অভেদানন্দ সম্বন্ধে কিয়ৎপরিমাণে পরিজ্ঞাত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের পাঠকবর্গ কালী-তপস্বীকে নিঃসন্দেহ অবগত আছেন। পিতৃবিয়োগের পর বিষয়-বিরাগী বিবেকানন্দ, তখনকার নরেন দত্ত, যখন বৈষয়িক মামলা-মোকদ্দমায় আদালতে গতায়াত করিতেছেন, সন্ন্যাসানুরাগী কালী-তপস্বী তখন বিবেকানন্দের বিষয়-বিপাকের প্রসঙ্গ লইয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতেন। শ্যামপুকুরে ভগবান্ শ্রীরাম-কৃষ্ণের রোগ-শয্যায় যে কয়েকজন যুবকের উপর বিবেকানন্দ শুশ্রূষা-কার্য্যের ভার অর্পণ করেন, কালী-তপস্বী তাঁহাদেরই একজন, সুতরাং পরমহংস দেবের একজন বিশিষ্ট সেবক।

ভগবদন্বেষী অভেদানন্দের হৃদয়ে সাধু দর্শন ও তীর্থ ভ্রমণাকাঙ্ক্ষা প্রথমাবধিই প্রবল। সুতরাং "অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল" হইতে কন্যাকুমারী চরণ-চুম্বি, নীল-সিন্ধু-তট পর্য্যন্ত পদব্রজে পরিভ্রমণ তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল। ভক্তের সহিত ভগবানের সখ্যভাবে চির-দিনই শিষ্যমাঝে বিশেষ ভাবে বিকসিত।

যুবক কালী-তপস্বী পদব্রজে কখনও তারকেশ্বর হইতে কাশীশ্বরের স্মরণ লইতেছেন, কখনও কলিকাতা হইতে নিক্রান্ত হইয়া ছোট নাগ-পুর ও সাঁওতাল পরগণার সর্প ও শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী-গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়া তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছেন, হিমাচলের তুষার হিমানী অগ্রাহ্য করিয়া, দুরন্ত শীত-আতপ-বর্ষাকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, নিভৃত গিরিশ্রেণীর গহ্বরে কন্দরে নিশি যাপন করিয়া, ভগবৎ-প্রদত্ত প্রস্রবণ-বারি ও কিঞ্চিন্মাত্র আহারে পরিতুষ্ট হইয়া, নগ্নদেহ সংসার বিরাগী, বিলাস-বিষয় ত্যাগী, সন্ন্যাসী স্বামী অভেদানন্দ রূপে, কেদারনাথের চরণপ্রান্ত হইতে বদ্রিনাথের চরণাম্বুজের দর্শনাভিলাষী হইয়া তুষাররাশির উপর দিয়া পর্ব্বতে-পর্ব্বতে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, এমনি সময়ে বিশ্ববাসীকে বিশ্বনাথের বিশ্বরূপের ব্যাখ্যা শুনাইতে, বেদান্তের বাণীতে বিশ্ববাসীর অন্তর প্লাবিত করিতে, মহাসমুদ্রের পরপারস্থিত পৃথিবীর অপর প্রান্ত হইতে ভারতের আধুনিক ধর্ম্মযুগের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গসম কর্ম্মযোগী বেদান্তবিৎ বিবেকানন্দের নিকট হইতে তাঁহার কর্ত্তব্যের আহ্বান আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার এই পরিব্রাজক জীবনের কোন এক সময়ে হৃষীকেশে তিনি অতিশয় পীড়িত

হইয়া পড়েন। বিবেকানন্দ তখন পাওহাড়ী বাবার নিকট অবস্থান করিতেছিলেন; তথা হইতে অবিলম্বে হৃষীকেশে উপস্থিত হইয়া অভেদানন্দের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হন।

বিবেকানন্দের আহ্বান-বাণীতে অভেদানন্দকে হিমাদ্রি ভ্রমণ স্থগিত রাখিতে হইল। সন্ন্যাসীর কৌপীন কম্বল, শীত-সজ্জায় রূপান্তরিত হইল, প্রাচ্যের পুণ্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রতীচ্যের পথোদ্দেশ্যে সমুদ্রের পরপারে যাত্রার উদ্যোগ করিতে হইল।

১৮৯৬ খৃঃ অভেদানন্দ লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দের কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং বিবেকানন্দের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্যান্য অনেক কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলেন। সে আজ পঁচিশ বৎসরের কথা। পঞ্চবিংশ বৎসর অল্প সময় নহে,—শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ। বিবেকানন্দ যে মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া যান, অভেদানন্দ এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সেই কার্য্যের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। একই ভাবে, একই প্রেরণায়, উদ্বুদ্ধ হইয়া গুরু-ভ্রাতা বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত কার্য্যের উন্নতি সাধন করিয়াছেন। এক বৎসর ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পর—তিনি লণ্ডনে বেদান্ত-সমিতির অধ্যক্ষ পদে বৃত হন এবং আরও এক বৎসর পরে আমেরিকার বেদান্তানুরাগীদের আহ্বানে ও বিবেকানন্দের অনুসৃত প্রণালীর প্রচার সাধনে নিউইয়র্ক নগরে আগমন করেন। তদবধি আমেরিকার নানা স্থানে, নগরে, জনপদে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে, বেদান্ত-ধর্ম্মের প্রচার-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার ছাত্রবর্গ ও শিষ্যবর্গ আজ সর্ব্বসমক্ষে নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদানে গৌরবানুভব করেন ও রামদাস, হরিদাস, গুরুদাস, শিবদাস, সত্যপ্রিয়া ইত্যাদি গুরুপ্রদত্ত নামে নিজেদের অভিহিত করেন। শ্রীমতি সত্যপ্রিয়া একটি অতি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ; তিনি এরূপ প্রগাঢ় পণ্ডিতা ও বুদ্ধিমতী যে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগন অনেক সময়ে বহু জটিল বিষয়ে তাঁহার মতামতের অপেক্ষা করেন।

পাশ্চাত্যদেশে পঁহুছিয়া বক্তৃতায় অনভ্যস্ত অভেদানন্দ ঐ কার্য্য আরম্ভ করিতে আদিষ্ট হইলেন। আদেশ পালনের পর বিবেকানন্দ তাঁহাকে বারবার উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। সাধনা-তৎপর সন্ন্যাসীর পক্ষে সকল সাধনাই সম্ভব। অচিরেই অভেদানন্দ ঘণ্টার পর ঘণ্টা আত্মবিস্মৃত হইয়া সাধারণ-সমক্ষে ভগবদ্-বিষয়ক বক্তৃতা দ্বারা সকলকে স্তম্ভিত করিতে লাগিলেন।

শ্রীযুক্ত স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী অভেদানন্দ সম্প্রতি জেম্‌সেদপুরে পদার্পণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তত্রত্য অধিবাসীগণ তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছিলেন।

১৯০৬ অব্দে স্বামী অভেদানন্দ একবার কয়েক মাসের জন্য ভারতে আসেন ও নানাস্থানে বক্তৃতা করেন। ব্যাঙ্গালোরে যখন তিনি মহীশূর-রাজের অতিথিরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, ভারতের স্যাণ্ডো রামমূর্ত্তি তখন তথায় তাঁহার ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করেন। রামমূর্ত্তির অদ্ভুত শক্তি নিরীক্ষণ করিয়া স্বামিজী তাঁহার সহিত প্রাণায়ামের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র তিনি স্বামীজির পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করেন। স্বামিজী, সেদিন, জেম্‌সেদপুরের এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া দেহ ও মনকে সুগঠিত করিবার জন্য সকলকে

জেমসেদপুরে স্বামীজি ও তাঁহার শিষ্যগণ

প্রাণায়ামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন;—দেহ ও মনকে সংযত ও পবিত্র রাখিলে তবে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার আগ্রহ আসে—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষে জগতে কত প্রলয়, মহাপ্রলয়ের সংঘটন হইয়াছে, প্রাচীনের কত নিদর্শন বিস্মৃতির অতলে মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারত সেই যুগ-যুগান্তরের আর্য্যধর্ম্মের ভিত্তির উপর আজও দাঁড়াইয়া,—যুগে যুগে বিশ্বময় বিশ্বনাথের বাণীর বিচিত্রতার ব্যাখ্যা করিতে,—আলোকের রশ্মিরেখা দেখাইয়া সারা জগতকে সঞ্জীবিত করিতে। বর্ত্তমান যুগেও ভারতের জীবন্ত বাণী পশ্চিমে বহিয়া লইয়া যাইবার জন্ত কর্ম্মবীর সাধকের অভাব হয় নাই,—রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও অন্যান্য আনন্দবৃন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সকল ব্রতীরই চেষ্টা শ্লাঘনীয়। বিগত পঞ্চবিংশতি বর্ষ যাবৎ ভারতের প্রাণের বার্ত্তা পশ্চিমে প্রচার করিয়া অধুনা স্বামী অভেদানন্দ আবার মাতৃ-ক্রোড়ে উপস্থিত। আমরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছি।

অক্ষর ও লিখন-প্রণালী

[শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন]

পাশ্চাত্যগণ বলিয়া থাকেন যে হিন্দুরা অক্ষর ও লিখন-প্রণালী সেমেতিক জাতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহারা ও তাঁহাদিগের শিষ্য ভারতীয় যুবকগণ যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদয়ই অলীক ও অমূলক। পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এ বিষয়ে Indian world এবং সাহিত্য-সংহিতাতে ইংরাজী ও বাঙ্গালাভাষায় যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়া চলেন, প্রবীণগণ তাহা পাঠ করিয়া দেখিবেন। দুঃখের বিষয় এই যে কেহই একবার ইহা ভাবিয়াও দেখিলেন না যে হিন্দুরা কতদিনের, আর অবরজবয়াঃ সেমেতিকগণই বা কতদিনের, আর জগতের আদি অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ-উদ্ভাবিত অক্ষর এবং লিখন-প্রণালীরই বা বয়ঃক্রম কত?

পাশ্চাত্যগণ বলিয়া থাকেন যে আরেবিক, কালডিয়ান, হিব্রু এবং আরসানিয়ানগণ দ্বারা সেমেতিক জাতি সঙ্গঠিত। কিন্তু তাঁহাদিগের এই কথাগুলির মূলে কোনও সত্য বিনিহিত নাই। ফলতঃ—

I think so, He thought so,
Perhaps if may be so,

ইহা ভিন্ন তাঁহারা এ পর্য্যন্ত অন্য কোনও প্রমাণদ্বারা আপনাদিগের কথার সমর্থন করিতে পারেন নাই। ফলতঃ—

ইথিওপিয়ান, আরেবিক, হিব্রু
এবং গ্রীকগণই সেমেতিক জাতি

কেন? যেহেতু সংস্কৃত "সোমাত্মক" শব্দের অপভ্রংশেই বৈলাতিক Sematic শব্দের উৎপত্তি। সোম অর্থাৎ অত্রিনন্দন চন্দ্রই হইয়াছেন আত্মা মূলবীজী যাঁহাদিগের, সেই চন্দ্রবংশীয় গণই যখন "সেমেতিক রেস"।—ফলতঃ তুর্বশোর্যবনা জাতাঃ। মহাভারত ও বায়ুপুরাণ।

চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরুরবাঃ, পুরুরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র নহুষ (নোওয়া বা নু) নহুষের পুত্র যযাতি (জাফেত) যযাতির পুত্র তুর্বস্তু। তুর্বস্তুর পুত্রই যবন এবং এই চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় যবনগণই মিশরে ইথিওপিয়ান্, আরবে মুসলমান, প্যালেষ্টাইনে হিব্রু ও গ্রীক দেশে গ্রীকরূপে বিরাজমান।

যবনেরা তান্ত্রিক যুগে তান্ত্রিক ধর্ম্ম লইয়া ভারত হইতে আফ্রিকায় গমন করেন। তাই আফ্রিকায় ভারতের ভগবান্ ঈশ (ঈশাঃ - শিব) বা আইশয়কের উপাসনা প্রচলিত। তথা হইতে ভারতীয়গণ সেই তান্ত্রিক ধর্ম্ম লইয়া একদল যবন আরবে ও অন্যদল প্যালেষ্টাইনে যাইয়া তথায় প্রতিমা পূজার প্রচার করেন। মোজেশ উহারই নিবারণ করিতে যাইয়া বাইবেল রচনা করিয়াছেন। উক্ত পুরাতন বাইবেলের বয়ঃক্রম ৩৯ • বৎসর।

সুতরাং এ হেন নাবালকদিগের নিকট হইতে জগতের আদিসভ্য জ্যেষ্ঠতাত হিন্দুরা কি প্রকারে অক্ষর বা লিখন-প্রণালী গ্রহণ করিতে পারেন? যে সময়ে হিন্দুদিগের পূর্ব্ব পিতামহ দেবতা বা ব্রাহ্মণগণ আদিস্বর্গ মঙ্গলিয়াতে অক্ষর বা লিখন-প্রণালীর উদ্ভাবন করেন, তখন হরিযূপীয়া বা ইউরোপ এবং আফ্রিকায় জন্মও হইয়াছিল না। তুরস্ক, পারস্য এবং অপোগস্থান, তখন কেবল সদ্যঃপ্রসূত, তখনও সে হামা দিয়া চলিতে শিখে নাই। উহা তখন জলপ্রধান ছিল, এজন্য ইহার নাম সমুদ্র উহা তখন মরুময় এজন্য উহার নামান্তর ত্রিধন্ব।

হিন্দুরা কখন ও কি কারণে অক্ষর এবং লিখন প্রণালীর উদ্ভাবন করেন? যখন দেবতারা স্বর্গে বা মঙ্গলিয়াতে সর্ব্বাদৌ মনুষ্যভাষায় অর্থাৎ গীর্ব্বাণ বাণী দেবভাষায় সৃষ্টি করেন, তখন উহা অব্যাকৃত ছিল। তখন ভাষা সম্পূর্ণ বকলোজ ছিল।

অস্মৎ গম যুষ্মৎ গম্,

অস্মৎ হন্ যুষ্মৎ হন্

কেহ সহসা এই সকল বাক্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিতেন না। কেননা তখন কাল, বচন, পুরুষ এবং বিভক্তি উদ্ভাবিত হইয়াছিল না, এ কারণ দেবতারা অনেকে মিলিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বলেন—

"ইন্দ্র ব্যাকুরু"।

হে ইন্দ্র ব্যাকরণ রচনা কর। তাহাতে ইন্দ্র একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন, উহাই জগতে "ঐন্দ্র" ব্যাকরণ নামে প্রথিত। ঐ সময়ে চন্দ্র এবং শিবও এক-একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন, উহাদের নাম চান্দ্র এবং মাহেশ ব্যাকরণ। ঐ সকল ব্যাকরণ এখন আর বিদ্যমান নাই। তবে আমাদিগের বিশ্বাস পাণিনির ব্যাকরণই মাহেশ ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণ।

যাহা হউক, যখন ব্যাকরণ প্রণীত হয়, তখন অবশ্যই বুঝিয়া লইতে এবং স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ সময়ে নিশ্চয়ই অক্ষর এবং লিখন প্রণালীর উদ্ভাবন ও প্রচলন হইয়াছিল। কেন না লিখিত গ্রন্থ ভিন্ন ব্যাকরণের শিক্ষা এবং উপদেশ ও বর্ণ-পরিচয় মুখে মুখে হইতে পারে না। সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র ও চন্দ্র ত্রেতাযুগের প্রভাত-কালের লোক। আমরা পৌরাণিক গণনা অগ্রাহ্য করিলেও ত্রেতা যুগের প্রথম বয়সের পরিমাণ যে অন্যূন দুই লক্ষ বৎসর,—ইহা না কারণে স্বীকার করিতে হইবে। কেন?

যেহেতু নতুবা আমরা পূর্ব্বকালের সকল কথা সহজে ভুলিয়া যাইতা না। স্বর্গ বা মঙ্গলীয়া আমাদিগের পূর্ব্ব নিবাস বা পিতৃভূমি, আম ইহা ভুলিয়াছি। কেবল ভুলি নাই, সে ভৌমস্বর্গকে আমরা প্রোমোস দিয়া পরলোকে লইয়া গিয়াছি। সে পিতৃলোক বা Father landc আমরা পারলৌকিক প্রেতলোক করিয়া ফেলিয়াছি, ভৌমস্বর্গ ও ভৌম নরক পারলৌকিক হইয়াছে, জ্ঞাতি দেবগণ উপাস্য ও অমর হইয়াছেন আমরা যে পায়ে হাঁটিয়া উত্তর কুরু ব্রহ্মলোকে বেদ পড়িতে ও লেখা পড়া শিখিতে যাইতাম তাহা ভুলিয়া যাই। যে পথে যাইতাম তাহ অর্থাৎ দেবযান ও পিতৃযান পথকে আমরা পারলৌকিক কাল্পনিক পথে পরিণত করিয়াছি, আমাদের যে কামান বন্দুক-বিমান বাইশাইকেল ও ট্রাইশাইকেল ছিল; তাহা ভুলিয়াছি লৌহময় বজ্র বিদ্যুৎপাতে পরিণত হইয়াছে, ভারতবর্ষ হইতে উত্তর কুরু পর্য্যন্ত লৌহবর্ত্ম ছিল ও সেই লৌহ বর্ত্ম দিয়া বাষ্পীয় শকট যাতায়াত করিত তাহা ভুলিয়াছি, তাড়িত বার্ত্তাবহ এবং লৌহময় সংক্রম সকলের কথা ভুলিয়াছি, মঙ্গলিয়ার নামই যে আকাশ ও ব্যোম, তাহা ভুলিয়াছি, ভুলিয়া শেষে শূন্য গগনকে আকাশ, ব্যোম নভঃ ও অন্তরীক্ষ নাম দিয়া বসিয়াছি। এত কথা ভুলিতে কত দিন লাগে? তাই আমরা বহুবার বহুস্থলেই বলিয়াছি যে, যখন সামবেদের প্রথম মন্ত্রসকল গীত হইয়া আকাশ মুখরিত ও অক্ষরের উৎপত্তি হয়, যখন ঋক, যজুঃ ও সাম লিখিত হইয়া ত্রয়ীনাম ধারণ করে, ঐ সময়ের পরিমাণ দুই লক্ষ বৎসরের কম হইতে পারে না। ছান্দোগ্য বলিতেছেন যে—

প্রজাপতির্লোকান্ অভ্যতপৎ, তেষাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহৎ অগ্নিং পৃথিব্যা বায়ুং অন্তরিক্ষাৎ আদিত্যং দিবঃ। অগ্নের্ঋচঃ বায়োর্যজূংষি, সামান্যাদিত্যাৎ। ৩•• পৃ মহেশপাল সংস্করণ।

প্রজাপতি সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা অনুসন্ধান করিলেন যে কাহার কাহার প্রতি ভার দিলে বেদমন্ত্র সকল সমাহৃত হইয়া লিখিত গ্রন্থে পরিণত হইতে পারে। তৎপর তিনি পৃথিবী বা ভারতবর্ষ হইতে মহর্ষি অগ্নি-দেব, অন্তরীক্ষের একদেশ অপোগস্থান হইতে মহর্ষি বায়ুদেব এবং স্বর্গ হইতে আপনার ভ্রাতা সূর্য্যদেবকে বেদমন্ত্র সমাহারে নিযুক্ত করেন। তাহাতে অগ্নি ভারতবর্ষ হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু অন্তরীক্ষ অর্থাৎ তুরস্ক, পারস্য এবং অপোগস্থান হইতে যজুর্ব্বেদ ও সূর্য্য আদিস্বর্গ মঙ্গলিয়া হইতে সামবেদের মন্ত্র সমাহার করিয়া দেন।

কি প্রকারে? ঐ সময়ে স্বর্গ, ভারতবর্ষ এবং তুরস্কাদি দেশে অক্ষর সকল সৃষ্ট ও লিখন পঠনের প্রচলন হইয়াছিল। বেদত্রিতয় লিখিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট প্রেরিত হয়। তখন ব্রহ্মা উত্তরকুরু বা পরম-ব্যোমে বাস করিতেছিলেন।

আচ্ছা, ব্রহ্মার নিকট যে লিখিত বেদ প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা

প্রমাণ কি? সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা আঠাইশ জন বেদব্যাসের মধ্যে প্রথম বেদব্যাস।

ত্রেতায়াং প্রথমে ব্যস্তাঃস্বয়ং বেদাঃ স্বয়ম্ভুবা বিষ্ণু পুরাণ। ৩অংশ ১১।৩অ।

বেদত্রিতয় ব্রহ্মার নিকট প্রেরিত হইলে দৈত্য এবং দানবগণ উহা চুরি করিয়া পাতাল বা আমেরিকায় লইয়া যান। তৎপর মহর্ষি মৎস্যদেব ব্রহ্মার আদেশে পাতাল হইতে বেদের উদ্ধার সাধন করে।

তাই গীতগোবিন্দে বৈষ্ণকুলচূড়ামণি জয়দেব কবিরাজ এইরূপে বর্ণনা করেন—

প্রলয় জলধি জলে ধৃতবানসি বেদং।
বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদং।
কেশব ধৃত মীন শরীর জয় জগদীশ হরে॥

বেদ লিখিত বস্তু, উহা সাগর জলে নিমজ্জিত হইয়া ছিল না। ফলতঃ দৈত্য দানবগণ উহা চুরি করিয়া পাতালে লইয়া গেলে মৎস্যদেব উহাদের উদ্ধার সাধন করেন। তত্র পুরাণং—

আদেশতো ব্রহ্মণ এব পূর্ব্বং
গত্বাথ পাতাল মলং হি মৎস্যঃ।
নিহত্য শঙ্খাসুর মত্যাদগ্রং
বেদত্রয়ং উদ্ধৃতবান্ বলেন॥

মহর্ষি মৎস্য ব্রহ্মার আদেশে পাতালে যাইয়া অতি উদ্ধত শঙ্খাসুরকে বধ করিয়া বেদের উদ্ধারসাধন করেন। তথাহি বরাহপুরাণং—

বেদেষু চৈব নষ্টেষু মৎস্যো ভূত্বা রসাতলাৎ।
প্রবিশ্য তান্ অথোদ্ধৃত্য ব্রহ্মণে দত্তবানসি॥ ৬।১৩।

বেদত্রিতয় অপহৃত হইলে নারায়ণ মৎস্য হইয়া পাতালে যাইয়া বেদের উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে প্রদান করেন।

এখন পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখুন, লিখিত গ্রন্থ না হইলে কি প্রকারে উহার অপহরণ ও উদ্ধারসাধন হইতে পারে? অতএব ব্রহ্মার সময়েই যে ত্রেতাযুগের প্রথমে আমাদিগের দেশে অক্ষর এবং লিখন-পঠনের প্রচার হইয়াছিল, ইহা ধ্রুবই।

তবে কেন সাহেবেরা বলেন যে হিন্দুরা পূর্ব্বে লিখিতে পড়িতে জানিতেন না? লেথব্রিজ সাহেব তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালীরা গারোগণ হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত। সত্যভীরু সর্ব্বজ্ঞ সাহেবেরা কি না বলিতে পারেন? কিন্তু সাহেবেরা আমাদিগের বেদ ও উপনিষৎ পড়েন, কিন্তু বুঝেন না; আর ছোকরা বাবুরা তাঁহাদের মিথ্যা কথা পড়িয়া এম-এ বি-এ পাশ করিয়া তথাস্তু বলিয়া বাহু তুলিয়া নৃত্য করেন? হে ভ্রাতৃগণ, কয়জন মহামহোপাধ্যায় ও কয়জন সংস্কৃতে এম-এ পাশ করা যুবক বেদ উপনিষৎ এবং হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন?

যদি কিছু লিখনং
বিবাহের কারণং

উপাধি পাইবার জন্য যাহা পাঠ করিতে হয়, এ ভূমণ্ডলে তদতিরিক্ত কাহাকেও কিছু পড়িতে হয় না। আর যে সকল উপাধির নিদান বাবুমনঃ-প্রসাদন, তাহাতে পাঠের প্রয়োজনও হইতে পারে না ভগবান্ পাণিনির বহু সূত্র গ্রন্থেও লিপির কথা আছে।

অদর্শনং লোপঃ
দৃষ্টং সাম।

এই সকল পাণিনি সূত্রপাঠে কি জানা যায় না যে পাণিনির বহু পূর্ব্বেই ভারতে লিখন পঠনের প্রচলন হইয়াছিল? মনু, রামায়ণ মহাভারতে ও বহু স্মৃতিতে করণ বা তমকসুক লিখিবার ও পরিবর্ত্তন করিয়া দিবার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। বলক্রমে লিখিত করণ গ্রাহ্য নহে একথাও স্মৃতিতে বিদ্যমান। জগতের আদি গ্রন্থ সামবেদে অক্ষর শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু উহার অর্থ অকারাদি বর্ণ নহে। জগতের দ্বিতীয় গ্রন্থ ঋগ্বেদের একত্র আছে যে—

দেবানাং নু বয়ং জানা প্রবোচাম বিপর্য্যয়াৎ।
উক্থেষু শস্যমানেষু যঃ পশ্যাৎ উত্তরে যুগে॥ ১।৭২।১০ম

আমরা বিশদ ভাষায় বেদমন্ত্রে দেবতাদিগের জন্মের কথা বর্ণনা করিব। যাহাতে পরবর্ত্তী যুগের লোকেরা উহা দেখিতে পাইবে।

এই মন্ত্রে যে "পশ্যাৎ" ক্রিয়াপদ রহিয়াছে, ইহা দ্বারা জানা যায় যে বৈদিক যুগেই হিন্দুদিগের লিখন পঠন সমারব্ধ হইয়াছিল যদি তাহা না হইত তাহা হইলে ঋষি লিখিতেন—

যঃ শৃণুয়াৎ উত্তরে যুগে।

ফলতঃ পাণিনি যখন বলিতেছিলেন যে, "অধিকৃতে গ্রন্থে", দৃষ্টং সাম, তখন বুঝিতে হইবে যে তাঁহার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই আমাদিগের দেশে লিখিত গ্রন্থ ও সামবেদ যে লিখিত বস্তু, ইহা জানা ছিল।

ঋগ্বেদ এবং যজুর্ব্বেদে কি অক্ষরের কথা আছে? আমাকে একদিন একজন মহামহোপাধ্যায় এম-এ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে—

উমেশ বাবু, বেদে কি অক্ষর শব্দ আছে?

আমি শুনিয়া বিস্মিত ক্রুদ্ধ এবং স্তম্ভিত হইলাম। ফলতঃ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের ব্যবস্থানুসারে যে বেদের পঠন-পাঠনা এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইতেছে এবং হইয়া থাকে, তাহাতে তথা হইতে এইরূপ এম এ সকলই বাহির হইবার কথা। কেন না তাঁহাদিগের অধ্যাপকগণ পালি ভাষ্যকে ও সায়ণভাষ্যকেও অপৌরুষেয় বলিয়া মনে করেন। সায়ণ যে অক্ষর শব্দের মিথ্যা ব্যাখ্যা (সূর্য্য !!!) করিয়াছেন, অধ্যাপকগণ তাহা তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিষ্যগণকেও বুঝিতে দেন নাই। ফলতঃ কি এদেশের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ কি পাশ্চাত্য হোব্বা-চোব্বাগণ কেহই যেন বেদ মন্ত্রের প্রকৃতার্থ বুঝিতে পারেন নাই। তবে বুদ্ধিমান ছাত্রেরা যে কেন 'এই সকল মিথ্যা ব্যাখ্যার প্রতিকূলে ধাবমান হয়েন না—ইহাই তীব্র মর্ম্মবেদনার বিষয়।

পাঠক! ঋগ্বেদেই অক্ষরের উৎপত্তি ও বিবৃতির কথা বিদ্যমান আছে, তথাপি কেবল সায়ণ, দয়ানন্দ, রমেশচন্দ্র ও বৈদান্তিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের মিথ্যা ব্যাখ্যার দোষে কেহ তাহা জানিতেও

পারেন নাই। হে ভ্রাতৃগণ দেখ জগদ্বরেণ্য ঋগ্বেদ তারস্বরেই বলিতেছেন যে—

উষসং পূর্ব্বা অধ যৎ বিউষুঃ, মহৎ বিজজ্ঞে অক্ষরং পদে গোঃ।
এতা দেবানাং উপ নু প্রভূষন্, মহৎ দেবানাং অসুরত্বং একম্॥

১।৫৫।৩৪

তত্র সায়ণ ভাষ্যং—পূর্ব্বা উদয়কালাৎ প্রাচীনা উষসো যদ্ যদা ব্যুষুঃ ব্যুচ্ছন্তি অধ তদানীং অক্ষরং ন ক্ষরতি ইতি অক্ষরং অবিনাশি আদিত্যাখ্যং মহৎ প্রভূতং জ্যোতিঃ গোঃ উদকস্য পদে স্থানে সমুদ্রে নভসি বা বিজজ্ঞে উৎপদ্যতে। অথ উদিতে সূর্য্যে প্রভুষম্ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসু প্রভবিতু মিচ্ছন্ যজমানঃ ব্রতা কর্ম্মাণি দেবানাং নু ক্ষিপ্রং উপ সমীপং তিষ্ঠতি। যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ। তদিদং দেবানাং একং মুখ্যং অসুরত্বং প্রাবল্যং মহৎ ঐশ্বর্য্যং।

দয়ানন্দভাষ্যং—উষসঃ প্রভাতাৎ পূর্ব্বাঃ অধ অথ যৎ ব্যুষুঃ বিবসন্তি মহৎ বিজজ্ঞে জাতং অক্ষরং পদে স্থানে গোঃ পৃথিব্যাঃ ব্রতা নিয়মাঃ দেবানাং বিদুষাং উপ সমীপে নু সদ্যঃ প্রভূষন্ অলঙ্কুর্বন্ মহৎ দেবানাং পৃথিব্যাদীনাং অসুরত্বং যৎ অসুষু প্রাণেষু রমতে তৎ একং অদ্বিতীয়ং অসহায়ং।

গ্রীফিতানুবাদ—At the first shining of the earliest Mornings, in the Cow's home was from the Great Eternal.

দত্তজানুবাদ—উষা যখন পূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়েন, তখন অবিনাশী মহান্ (সূর্য্য) জলের স্থানে উৎপন্ন হয়েন। যজমান দেবগণের সমীপে শীঘ্র ব্রত সকল উপস্থিত করেন। দেবগণের মহৎ বল একই।

আমরা এই সকল ভাষ্য ও অনুবাদ পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। অক্ষর অর্থ সূর্য্য, ইহা সায়ণ কোথায় পাইলেন? অন্য পদার্থ কি মরণশীল নহে? দয়ানন্দই বা অক্ষরের অক্ষরার্থ প্রকটনে এত বৈকল্য প্রদর্শন করিলেন কেন? "গোঃ পদে" বাক্যের অর্থ Cow's home? ইহাই বা কিরূপ ব্যাখ্যা!!! মন্ত্রে কি গরু বাছুরের কোনও প্রমাণ আছে? পাঠক তোমরা কি ইহাঁদিগের একজনেরও ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া উহার কোনও অর্থ গ্রহে সমর্থ হইতেছ? ফলতঃ দেবতারা আদিস্বর্গে দেবনাগরাক্ষর উদ্ভাবন বা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি এখানে তাহাই বলিতেছেন। ইহার প্রকৃতার্থ ইহাই—

প্রকৃতার্থবাহিনী—যৎ যদা পূর্ব্বাঃ প্রাক্তনাঃ উষসঃ উষা ব্যুষুঃ বিগতাঃ যদা আনন্ত প্রথমঃ প্রভাতকালঃ সমাগতঃ অধ অথ অনন্তরং তদা গোঃ আদিস্বর্গস্য পদে স্থানে আদিস্বর্গে ইলাবৃতবর্ষে মঙ্গজনপদে মহৎ অত্যুপকারজনকং অক্ষরং অকারাদি দেবনাগরাক্ষরং জজ্ঞে উদপদ্যত। নু তো দেবানাং অক্ষরোৎপাদকানাং ইন্দ্রাদীনাং বিদুষাং ব্রতা ব্রতানি অক্ষরসৃষ্টিরূপাণি কর্ম্মাণি তান্ দেবান্ ইতি শেষঃ, উপ প্রভূষন্ অত্যলঙ্কৃতান্ চক্রুঃ। দেবানাং স্বর্গভারতবাসিনাং ব্রাহ্মণানাং অসুরত্বং শ্রেষ্ঠত্বং একং অভিন্নং তে সর্ব্বে সমানাঃ।

যখন আদিস্বর্গ ইলাবৃতবর্ষে (মঙ্গলিয়াতে) জ্ঞানের প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন সেই আদিস্বর্গে দেবতারা জগতের অ... কল্যাণকর দেবনাগরাক্ষরের উদ্ভাবন করেন। তাঁহাদিগের এই মহ কার্য্য তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। দেবগণের মহত্ত্ব একই তথাহি—

তস্যাঃ সমুদ্রা অধি বিক্ষরন্তি তেন জীবন্তি প্রদিশ শ্চতস্রঃ।
ততঃ ক্ষরতি অক্ষরং তৎ বিশ্বং উপজীবতি॥ ৪২। ১৬৪। ১ম।

তত্র যাস্কনির্বচনং......তস্যাঃ সমুদ্রা অধিবিক্ষরন্তি বর্ষন্তি মেঘা তেন জীবন্তি দিগাশ্রয়াণি ভূতানি। ততঃ ক্ষরতি অক্ষরং উদকং তৎ সর্ব্বাণি ভূতানি উপজীবন্তি ইতি। ১১। ৪১।

সায়ণভাষ্যং......তস্যাঃ উক্তায়াঃ গোঃ সকাশাৎ সমুদ্রাঃ বৃষ্ট্যুদক সস্যন্দনাধিকরণভূতা মেঘা অধি আধিক্যং প্রভূতং উদকং বিক্ষরন্তি বিবিধং ক্ষরন্তি। তেন উদকেন প্রদিশ শ্চতস্রঃ বিদিশ শ্চতস্রো দিশশ্চ অথবা প্রকৃষ্টা দিশো মুখ্যা শ্চতস্রঃ তৎস্থাঃ পুরুষা জীবন্তি। ততঃ পশ্চাৎ তৎ অক্ষরং উদকং ক্ষরতি শস্যাদিকং উৎপাদয়তি ইত্যর্থঃ। তৎ শস্যাদিকং বিশ্বং জগৎ উপজীবতি।

দয়ানন্দভাষ্যং......তস্যাঃ বাণ্যাঃ সমুদ্রাঃ শব্দার্ণবাঃ অধি বিক্ষরন্তি অক্ষরাণি বর্ষন্তি। তেন কারণেন জীবন্তি প্রাণিনঃ দিশঃ উপ দিশঃ চতস্রঃ চতুঃসংখ্যোপেতাঃ ততঃ ক্ষরন্তি অক্ষরং অক্ষরসমূহঃ তৎ তস্মাৎ বিশ্বং সর্বং জগৎ উপজীবতি।

গ্রীফিতানুবাদ—From her descend in stream the seas of water there by the world's four regions have their being.

দত্তজানুবাদ—তাঁহার নিকট হইতে মেঘ সকল বর্ষণ করে। তাঁহা হইতে চতুর্দিক্ আশ্রিত ভূতজাত রক্ষা হয়। তাঁহা হইতে জল উৎপন্ন হয়। জল হইতে সমস্ত জীব প্রাণ ধারণ করে।

প্রিয় পাঠকগণ! অক্ষর অর্থ সূর্য্য, সমুদ্র অর্থ মেঘ, ইহা কিন্তু সেই বিদগ্ধ বাণী শ্রোতা বৃহদারণ্যকাচার্য্য শ্রীমান্ শৃগালেরও কর্ণগোচর হয় নাই। আমরা আর এই সকল ভাষ্য এবং অনুবাদের কথায় পুথী না বাড়াইয়া আমাদিগের কথা বলিব। ফলতঃ যাস্কই সকলকে কুপথগামী করিয়াছেন।

প্রকৃতার্থবাহিনী......তস্যাঃ পূর্ব্বোক্তায়া গোঃ আদিস্বর্গাৎ (যদ্যপি ভারতভূমিরপি গোঃ তুরুষ্কপারস্যাদিকং অন্তরীক্ষ গোঃ তথাপি তত্র তত্র অক্ষরোৎপত্তের্নাভূৎ তস্মাৎ গো শব্দেন অত্র কেবলং আদিস্বর্গস্যৈব গ্রহণং অভবৎ) অক্ষরাণি অকারাদয়ো বর্ণাঃ সমুদ্রাঃ (ব্যত্যয়েন) সমুদ্রেষু তুরুষ্ক-পারস্যাপোগস্থানেষু ভারতবর্ষেষু চ অধি উপরি বিক্ষরন্তি বিশেষেণ ক্ষরিতানি ভবন্তি আদিস্বর্গাৎ ভারতবর্ষে তুরুষ্কাদৌ চ দেবনাগরাক্ষরাণাং আনয়নং লিখনপঠনঞ্চ প্রচলিতং বভূব ইত্যর্থঃ। লিখনপঠনানাং প্রচলনেন চতস্রঃ প্রদিশঃ প্রধান দিশঃ চতুর্দ্দিগ্বাসিনো জনাঃ জীবন্তি প্রাণন্তি ইব। ততস্তস্মাৎ সমুদ্রাৎ তুরুষ্কাদিজনপদাৎ কিনিশিয়াদি-দেশাচ্চ অক্ষরং ক্ষরতি চলতি অচলৎ হরিয়ুপীয়াদিমহাজনপদে

অগচ্ছৎ তত্রাপি দেবনাগরাক্ষরস্ত লিখনপঠনাদিকং প্রচলিতং বভূব। বিশ্বং সর্বং ভূমণ্ডলং তৎ দেবনাগরাক্ষরং উপজীবতি তেন লিখন-পঠনাদিকং কৃত্বা স্ব স্ব মনোভাবাদিকং পরস্পরং জ্ঞাপয়ৎ সৎ জীবিতমিব অভবৎ ইতিভাবঃ।

সেই আদি স্বর্গ গো হইতে অক্ষর সকল ভারতবর্ষ, তুরুষ্ক, পারস্ত ও অপোগস্থানে আনীত হইলে এই সকল দেশে লিখনপঠনের প্রচলন হইয়াছিল। তাহাতে চারিদিকের লোক সকল যেন জীবন প্রাপ্ত হইল। ভারতবর্ষাদি হইতেও অক্ষর সকল ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশে যাইয়া উপনীত হইল। সকল ভূমণ্ডলের লোক সকল দেবনাগরাক্ষরকে উপজীব্য করিল।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও বলিয়া থাকেন যে তাঁহাদিগের দেশে

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, তপঃ, সত্য ও জন, এই সপ্ত লো[illegible] আশিয়া মহাদেশ) সপ্ত দেবলোক। কেননা আদি স্বর্গের স[illegible] একে একে এই সপ্ত জনপদে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। [illegible] গীর্বাণবাণী সপ্ত প্রাদেশিক ভাষাতে পরিণত হইয়া স্বতন্ত্র ভা[illegible] প্রাপ্ত হয়। ইহাই সপ্ত বাণী। এই সপ্ত বাণী দেবনাগরাক্ষরে হইত।

আচ্ছা ঋগ্‌বেদে যে অক্ষরের উৎপত্তি এবং বিস্তৃতির কথা তাহা স্বীকার করিলাম। কিন্তু অন্যান্য বেদে কি অক্ষরের কথা নাই? যখন সামবেদের মন্ত্র সকল বিরচিত হয়, তখ[illegible] শ্রুতি ছিল। ঋগ্‌বেদেরও বহু অংশ রচনার পর অক্ষরের সৃষ্টি[illegible]

মিনীহি শ্লোকমাস্তে। ঋগ বেদ

ঋষিগণ অক্ষর যোজনাদ্বারা গায়ত্রীচ্ছন্দের দেহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তদ্দ্বারা অর্ক অর্থাৎ অর্চনা মন্ত্রসকল রচনা করিলেন। সাম সেই অর্চনা মন্ত্রসমূহের সমবায়সম্ভূত পদার্থবিশেষ। ইহা উচ্চৈঃস্বরে গেয় উক্‌থময়। তৎপর কেহ বা ত্রিষ্টুপচ্ছন্দে বাক্য রচনা করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা দ্বিপদ ত্রিপদ যোজনাদ্বারা বাক্‌ ও অনুবাক সকল রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ অক্ষরযোজনা দ্বারা সপ্ত গীর্বাণবাণী অর্থাৎ ভূঃ (ভারতবর্ষ), ভুবঃ (তুরুষ্কপারস্ত অপোগস্থান), স্বঃ (তিব্বত, তাতার, মঙ্গলিয়া), মহঃ (উত্তর সংবৎসর বা রস্তক বর্ষ দক্ষিণ সাইবেরিয়া), তপঃ (অহর্লোক ও রাত্রিলোক বা মধ্য সাইবেরিয়া), সত্য (ঋতলোক বা উত্তরকুরু বা উত্তর সাইবেরিয়া), জন (বর্ত্তমান চীনদেশ) প্রাচীন চীনদেশ নেপাল যেখানে চীনাংশুক প্রস্তুত হইত), এই সপ্ত জনপদে সপ্ত প্রাদেশিক সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত। উক্তঞ্চ মৎস্যপুরাণে—

ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহর্জনঃ।
তপঃ সত্যঞ্চ সপ্তৈতে দেবলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

নাম ধারণ করে, আমাদিগের অক্ষর সেই সময়ের; তখন কেহ ঈশ্বরের সত্তারও অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। আর যে সময়ে জগতে গ্রীক্ হিব্রু আরেবিক ও মেশর প্রভৃতি অর্ব্বাচীন জাতির উৎপত্তি ও অভ্যুদয় হয় তখন জগতে, বঙ্গদেশপ্রণীত তান্ত্রিক যুগ এবং তান্ত্রিক ধর্ম্ম ও প্রতিমা পূজার মহাপ্রাদুর্ভাব। সুতরাং এ হেন জ্যেষ্ঠতাতের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ আমরা কি প্রকারে তান্ত্রিক যুগের সেমেতিকদিগের নিকট হইতে অক্ষর ও লিখনপ্রণালী পাইতে পারি?

আচ্ছা যেন স্বীকার করিলাম দেবতারাই আদিস্বর্গে প্রথমে অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন (দেবনগরে ভবং দেবনাগরং) কিন্তু কেন ও কাহার দ্বারা অক্ষরের উদ্ভাবন হইয়াছিল?

হাঁ একথাও আমাদিগের শাস্ত্রে বিশদাক্ষরেই বিবৃত রহিয়াছে। একজন ঋষি বলিতেছেন যে—

ষাণ্মাসিকে তু সম্প্রাপ্তে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়াণ্যতঃ পরং॥

সেই সময়ে ছয় মাসের পরই লোক সকল আর সকল বেদ মন্ত্র স্মরণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইতেছিলেন না ; যিনি যে বেদ মন্ত্র জানিতেন, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বহু মন্ত্রের বিলোপ ঘটিতেছিল, ইন্দ্রাদির ব্যাকরণও প্রণীত হইতে পারিতেছিল না, একারণ সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা ধাতার (কশ্যপের জ্যেষ্ঠ পুত্র) আদেশে দ্যৌ বা আদিস্বর্গে দেবগণকর্ত্তৃক অক্ষর সকল উদ্ভাবিত হয়, পরে উহারা ভূর্জ্জপত্রে আরূঢ় হইয়াছিল। তথাহি নারদ :—

নাকরিষ্যৎ যদি ব্রহ্মা লিখিতং চক্ষুরুত্তমং।

তত্রেয়মস্য লোকস্য নাভবিষ্যৎ শুভা গতিঃ ॥ ৬৬ পৃঃ

যদি ব্রহ্মা অক্ষরের সৃষ্টি এবং লিখন পঠনের প্রচলন না করিতেন, তাহা হইলে লিখন পঠন প্রচলনে জগতের যে অতি শুভ হইয়াছে, তাহা হইত না।

ব্রহ্মা কি নিজেই অক্ষরোদ্ভাবন করিয়াছিলেন? না তাহা নহে, ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিতেছিলেন যে—

সর্ব্বে স্বরা ইন্দ্রস্য আত্মানঃ, সর্ব্বে উষ্মাণঃ প্রজাপতেরাত্মানঃ ;

সর্ব্বে স্পর্শা মৃত্যোরাত্মানঃ। ১৩২ পৃ মহেশ পাল সংস্করণ

[illegible] লিঙ্গশঙ্করঃ সর্ব্বে স্বরা অকারাদয়ঃ ইন্দ্রস্য বলকর্ম্মণঃ প্রাণস্য [illegible] দেহাবয়বস্থানীয়াঃ, সর্ব্বে উষ্মাণঃ শবসহাদয়ঃ প্রজাপতে বিরাজঃ [illegible] বা আত্মানঃ, সর্ব্বে স্পর্শাঃ কাদয়ো ব্যঞ্জনানি মৃত্যোরাত্মানঃ। [illegible] শঙ্করভাষ্য হইল না। ইন্দ্র বলকর্ম্মা কেন? প্রাণই বা কেন? [illegible] একতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবরাজ। আর বিরাট্ আদি মানব ও [illegible] প্রজাপতিও বটেন। কিন্তু তাঁহার সময়ে অক্ষর বা কালীর আঁচড় [illegible]য় ? আর ধাতার আদেশে তাঁহার পিতা কশ্যপ অক্ষর গড়িয়াছিলেন, [illegible]ও কাজের কথা নহে। ফলতঃ যখন ধাতা দেখিলেন যে মানুষ দীর্ঘকাল কোনও কথা ঠিক স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না, মানুষের মৃত্যুর সহিত বেদ মন্ত্র সকলও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তখনই তিনি লিখন পঠনের আবশ্যকতার অনুভব করিয়া ভ্রাতা ইন্দ্র, খুড়া চন্দ্র (প্রজাপতি) এবং শিবকে অক্ষর সৃষ্টি বিষয়ে আদেশ দেন।

মৃত্যু শব্দের অর্থ এখানে শিব হইল কেন? অথর্ব্ববেদে শিব ও যম উভয়ই মৃত্যু নামে প্রখ্যাপিত। তাঁহারা স্বর্গে মৃত্যুদণ্ডের বিধান করিতেন। কিন্তু যমের কোনও ব্যাকরণ নাই, এ কারণ আমরা এখানে মৃত্যু শব্দে শিব, এবং প্রজাপতি শব্দে চান্দ্র ব্যাকরণ প্রণেতা চন্দ্রকেই বুঝিয়া লইলাম।

আচ্ছা তাহা হইলে কেন একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য বিদ্যায় মহাপারদর্শী মহাত্মা বলিতেছেন যে—

মিশ্রদেশ শিখায়েছে লিখিবার প্রথা।

পারে কি লেখনী লিখে হৃদয়ের কথা ॥

প্রেমিক হৃদয়ে গড়ে প্রেমিকা হৃদয়।

পারে কি অনল কভু তুষেতে লুকায় ॥

প্রখ্যাতনামা প্রেমদাসবাবাজী এই পংক্তি চতুষ্টয়ের বিধাতা পুরুষ। বলা বাহুল্য যে তাঁহাকে বৈলাতিক ভট্টাচার্য্যগণ কুপথগামী করিয়াছিলেন।

এই বৈতালিক ভট্টাচার্য্য [illegible]।

সত্য বাইবেল হইতে সমাগত" ইহা লিখিয়া সাহেব[illegible] লইয়াছেন। এ তথাস্তক দিগের কথাও যে আমরা সন্তানগণ ভুলিও না , মরে নাম্নী একজন বিবি তাঁহার Hand Book of Egypt না[illegible] গ্রন্থের প্রারম্ভভাগেই বলিতেছিলেন যে—

The Hieroglyphic names on the tablets and the statues are no longer meie hard words to me, they call up the rememberance of persons and places, and serve as a link to carry me back in thought to the far, far off ages which I can now ful' really were ! when mankind and the world were young, when poetry, art, science, Government and languagek were begining to be. P 2.

বিবি মরে কেন এমন কথা মুখে আনয়ন করিলেন? যেহেতু যে প্রকার কুয়ার বাঙ কূপ হইতে বাহির হইয়া একটা ডোবা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয় ও উহাকেই মহাসাগর ভাবে তদ্রূপ অর্বাচীন দেশের বিবি মরেও মিশরে যাইয়া তথাকার অভ্যুদয় দেখিয়া ঠাওরিয়া বসিলেন যে জগতে এইস্থানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম এবং এতদ্দেশীয় লোক সকলই ভাষা, অক্ষর, বিজ্ঞান ও সভ্যতা ভব্যতার আদি নিদান। কিন্তু উইলকিন্স, হার্ব্বাস ও পোকক প্রভৃতি সত্যবাদিগণ ভারতবর্ষকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদি নিকেতন বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পোকক আপনার India in Greece নামক গ্রন্থের ২০৫ পৃষ্ঠায় বলিতে-ছেন যে—

An Egyptian is made to remark that he heard from his father, that the Indians were the wisest of men, and that the Eithopians, a colony of the Indians, preserved the wisdom and usages of their fathers, and acknodledged their ancient origin. P. 205.

ইহার পরও কি কেহ বিবি মরের কথায় আস্থা প্রদর্শন করিবেন? ফলতঃ মঙ্গলিয়ার দেবতাখ্য ব্রাহ্মণেরা ভারতে আসিয়া আর্য্য নাম গ্রহণ করেন, সেই আর্য্যস্রোতঃ তুরুস্ক, পারস্য অপোগস্থান, ইউরোপ, আফ্রিকা, আরব, আমেরিকা, চীন, জাপান, বালিদ্বীপ, জাভা প্রভৃতি জনপদে যাইয়া ভারতীয় ভাষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা এবং অক্ষর ও লিখনপ্রণালীর বিস্তার ও প্রচলন করিয়াছিলেন। মহর্ষি চরক এবং মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন যে—

যদিহাস্তি তদন্যত্র

যন্নেহাস্তি ন তৎ কচিৎ।

যাহা ভারতবর্ষে আছে, তাহাই অন্যত্র গিয়াছে, যাহা ভারতবর্ষে নাই তাহা অন্যত্রও দেখিতে পাইবেনা। অতএব প্রেমদাস বাবাজী ও বিবি মরের একটি কথাও সত্য নহে।

আচ্ছা কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন যে, যখন হিন্দুদিগের ব্যাকরণ ও অক্ষর এত সুসম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, আর অন্য দেশের ভাষা ও অক্ষর অল্প এবং অসম্পূর্ণ, তখন ঐ সকল অসম্পূর্ণ অক্ষরাদিই প্রাক্তন।

এ অতি অর্ব্বাচীনের কথা। হিন্দুদিগের ভাষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও অক্ষরাদি অন্যূন দুই লক্ষ বৎসরের। প্রথমে ঐন্দ্র, চান্দ্র, মাহেশ, এই তিন খানি ব্যাকরণ ছিল। পরে স্ফোটায়ন, গার্গ্য, আপিশলি এবং শাকটায়নপ্রভৃতি বহু ব্যাকরণের আবির্ভাবের পর তবে অর্ব্বাচীন পাণিনি-ব্যাকরণের আবির্ভাব হয়। এ সময়ে ভাষা এবং অক্ষরের পরিপাক ও পূর্ণাবস্থা ঘটিয়া ছিল। ক্রমে গীর্ব্বাণবাণীর বিকারে জগতের সকল ভাষার (আরবী ভিন্ন) উৎপত্তি হইয়াছে, আরবি অক্ষরও অভিনব উদ্ভাবিত, কিন্তু অন্যান্য অক্ষরাবলীও দেবনাগরাক্ষরের আসন্ন বিকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বৈদিক যুগে অক্ষরের সংখ্যা কত ছিল! বহু ছিল। কিন্তু উচ্চারণ দোষ এবং অন্যান্য কারণে অক্ষর সংখ্যা কমিয়া যায়। দেখ মহামান্য যজুর্ব্বেদে আছে যে—

প্র। কতি অক্ষরাণি? কতি হোমাঃ? (৫৭) ২৩ অ।

উ। শতং অক্ষরাণি অশীতি হোমাঃ। ঐ

অক্ষর ও যজ্ঞের সংখ্যা কত? অক্ষরের সংখ্যা একশত, যজ্ঞের সংখ্যা অশীতি। অ হইতে ঔ ১৪টী; ক হইতে হ পর্যন্ত ৩৩টী, এই ৪৭টী। তৎপর ং ঃ ক্ষ লইয়া পঞ্চাশৎ। তৎপর ँ (ফগুস্ক) ও ঽং (অনুস্বার বিশেষ) এবং বজ্র ও কুম্ভ প্রভৃতি লইয়া (া, ৈ ৌ, প্রভৃতিও বটে) অক্ষর সংখ্যা একশত হইয়াছিল। পাণিনির শিক্ষা গ্রন্থও বলিতেছিলেন যে—

ত্রিষষ্টিশ্চতুঃষষ্টির্বা বর্ণাঃ শম্ভুমতে স্থিতাঃ।

শিবের মাহেশ ব্যাকরণমতে অক্ষরসংখ্যা ৬৩টী কি ৬৪টী। ইহারাই কমিয়া হিব্রুতে ২২টী, গ্রীকে ২৪টী, ইংরাজীতে ২৬টী ও পারসীতে ৩০টীতে পঁহুছিয়া ছিল। কমিল কেন?

কমিবার কারণ উচ্চারণ দোষ এবং অন্যান্য কারণ। দেখ পূর্ব্ব বঙ্গের লোকেরা ঘ ঝ ড় ঢ ঢ় ধ উচ্চারণ করিতে পারেন না। ঐ দোষ গ্রীকপ্রভৃতি জাতিতেও ঘটিয়াছিল। তৎপর দেখ বাঙ্গলায় এখন আর অন্তস্থ ব ও বর্গীয় বকারের কোনও ভেদ দেখা যায় না। অমরার্থ চন্দ্রিকা অন্তঃস্থ বকে বিদায় দিয়াছেন। হিব্রুগণও অ (বেথ) ও ব (বাব) এই দুইটী ব ঠিকই রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আরেবিক, গ্রীক ও লাটিন প্রভৃতি জাতি কেবল একটী ব (বে—বিটা—B) লইয়া থাকিলেন। আরবগত যবনেরা আমাদিগের উপর অত্যন্ত চটিয়া যাইয়া পৈতৃক ভাষা ত্যাগ করিলেন, পৈতৃক অক্ষরও ছাড়িয়া দিয়া কাকড়া বা কাগাবগায় ঠ্যাং দিয়া অক্ষর গড়িয়া লইলেন, বামাবর্ত্ত লিপিকেও দক্ষিণাবর্ত্ত করিয়া বসিলেন। হিব্রুরাও দক্ষিণাবর্ত্ত লিপি ধরিয়াছিলেন। গ্রীকগণ বাম হইতে দক্ষিণ, দক্ষিণ হইতে বাম এইরূপে লিখন প্রণালীর পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া শেষে উহা অত্যন্ত অসৌকর্য্যকর দেখিয়া পুনরায় পৈতৃক প্রথার অনুকরণ করেন। আর মৈশর যবনগণ পশুপক্ষী দিয়া অক্ষর প্রস্তুত করিয়া লইলেন। কিন্তু আরেবিক, গ্রীক এবং হিব্রুগণ অক্ষরের নূতন নাম রাখিলেও কার্য্যতঃ ঐ সকল অক্ষর হিন্দুদিগের সেই অ আ ও ক খ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

হিব্রু	সংস্কৃত।	আরবী	সংস্কৃত।	গ্রীক	সংখ্যা
আলেক	অ	আলেফ	আ	আলফা	আ
বেথ	ব	বে	ব	বিটা	ব
গীমেল	গ	তে	ত	গামা	গ
দালেথ	দ	ছে	স	তেলটা	ড
হে	হ	জিম	জ	এপসাইলন	এ
বাব	ব	হে	হ	জিটা	জ
জায়িন	জ	খে	খ	ঈটা	ঈ
হেথ	হ	দাল	দ	থিটা	থ
তেথ	ট	জাল্	জ	আয়োটা	ই
যোদ	য	রে	র	কাপা	ক
কাফ	থ	জে	জ	লামডা	ল
লামেদ	ল	শীন	স	মু	ম
মেম	ম	সীন	স	নু	ন
নূন্	ন	ছোয়াদ	ছ	কুসাই	ক্ষ
সামেখ	স	দোয়াদ	দ	আমক্রণ	অ
আয়িন	অ	তয়	ত	পাই	প
পে	ক	জয়	য	রো	র
সাদে	স	আয়েন	আ	সিগমা	স
কোফ	ক	লায়েন	গ	টাউ	ট
রেশ	র	কে	ক	আপসাইলন	উ
শীন	শ,স	কাক	প	থাই	প
তবে	থ	কাপ	ক	ফাই	ক
		লাম	ল	পসাই	প্স
		মিন্	ম	ওমেগনা	ও
		নু	ন		
		ওয়াও	ব		
		লাম আলেপ	লা		
		হাম্না	হ		
		ইয়া	য়		

পাঠক এখন ভাবিয়া দেখ, অ বা আকে আলেক বা আলফা বলার কি প্রয়োজন ছিল? ও-কেই বা ওমেগা বলা কেন? নূতন করিব? কিন্তু যবন গণের সে দুরাশা সফল হয় নাই।

আচ্ছা লাটিন ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার অক্ষর-সংখ্যা কমিল কেন? উহাও উচ্চারণ দোষে ঘটিয়াছিল। তাই এই সকল ভাষায় থ, ঘ, চ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ভ, দেখা যায় না। তবে এই সকল ভাষায় ব দুইটা এখনও আছে। যেমন—b = ব, v = ব।
তোমরা দেখ সংস্কৃত চর্চ্চা, ইংরাজী search, প্রতিচর্চ্চা = research. ভ = bh, ঘ = gh, ঝ = jh, থ = th, দ = th, ধ = dh, ঢ = dh, ইত্যাদি। আর ইঁহারা ককে k, রকে r (র্), ফকে f (ফ্) প্রভৃতি করিলেও বুঝিতে হইবে যে উহারা ভূতে পঞ্চভি বর্বরাঃ সংস্কৃত ভিন্ন আর কিছু নয়।

ফলতঃ ভারতের লোক সকল ঐ সকল দেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। গমনকালে তাঁহারা ভাষা ও অক্ষর খেয়াঘাটে রাখিয়া খেয়া পার হন নাই। সুতরাং ভারতের সংস্কৃত ভাষার বিকারে যেমন গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, জেন্দা ও জর্ম্মাণ প্রভৃতি সকল ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল, তদ্রূপ দেবনাগরাক্ষরের বিকারেই ঐ সকল দেশের অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছিল ইহা ধ্রুবই।

হে ভ্রাতৃগণ, জগতে অতি অর্বাচীন জাতি হিন্দুরা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম মানববংশ। বর্ত্তমান সময়ের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই হিন্দু-জাতির ভাষা ও অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছিল। ওয়েবার, মোক্ষমূলার, গ্রীণশেপ ও ম্যাকডোনাল প্রভৃতি সাহেবদিগের কথা সম্পূর্ণই অলীক এবং অমূলক। তাঁহারা কেবল মিথ্যা কল্পনা-সাগরে সাঁতার দিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষকে ত খাট করা চাই!!

মালাচোর

[শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি-এস্ সি]

মুচিপাড়া থানার লাগোয়া একটা মেসে থাকিয়া হিল্লোল প্রেসিডেন্সী কলেজে এম্-এ পড়িত। অখিল মিস্ত্রীর লেনে তাদের বাড়ী; তা সত্ত্বেও সে মেসে থাকিত কেন, তাহার একটা ইতিহাস আছে।

বাপ দুলালবাবু বড়মানুষ; কিন্তু অতীত যৌবনের অনেক গোপন প্রতিবন্ধকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তেমন গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই; অথচ তিনি মেধাবী ছিলেন। সমস্ত সুখের ভিতর তাঁহার এই ক্ষোভটুকু ছিল; এবং তাহা পুত্র দ্বারা মিটাইবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছিল। তাঁহার প্রাণপাত চেষ্টায় এ যাবৎ তাহা সফল হইয়া আসিতেছিল,—এণ্ট্রাস ও এফ্-এতে বৃত্তি এবং বি-এতে প্রথম শ্রেণীর অনার পাইয়া হিল্লোল এম্-এ পড়িতেছিল।

একটি মাত্র পুত্র,—গৃহিণীর সাধ একটি টুকটুকে ঘর-উজল-করা বৌ আনেন; এবং এ বিষয় লইয়া এই পড়ন্ত বেলায়ও কর্ত্তা-গৃহিণীর দস্তুরমত মান-অভিমান হইয়াছে। কিন্তু বিবাহের পর তরলমতি যুবকদের প্রাণে কাব্যের যে ঢল নামিয়া আসে, তাহার বন্যায় কলেজ, পাঠ, যশঃ কোন্ অতল সমুদ্রে ভাসিয়া যায়—নিজের অতীত জীবন হইতেই দুলালবাবু তাহা জানিতেন; তাই এ-যাবৎ গৃহিণীর সমস্ত চোখের জল তিনি অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সহসা গৃহিণীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়, এবং একটি নামজাদা লোক পণ ও যৌতুকের বহরে তাঁহাকে লুব্ধ করায়, তিনি অগত্যা তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে পুত্রবধূরূপে ঘরে আনিয়াছিলেন,—অবশ্য গৃহিণীর সহিত বোঝাপড়া করিয়া যে, এম্-এ উপাধি না পাওয়া পর্য্যন্ত হিল্লোল মেসে থাকিবে; বধূ এ বাড়ীতে থাকিলে, এখানে তাহার প্রবেশাধিকার থাকিবে না; এবং কেবল মাত্র বধূটিকে লইয়া গৃহিণীকে সম্প্রতি তৃপ্ত থাকিতে হইবে। গৃহিণী অগত্যা স্বীকৃত হইয়াছিলেন; ভাবিয়াছিলেন বিবাহ আগে হউক ত! কিন্তু বিবাহের পর স্ত্রীর সহিত পরিচয় নিবিড় হইবার পূর্ব্বে সত্যসত্যই হিল্লোলকে মেসে যাইতে হইল,—মায়ের আপত্তি টিঁকিল না। হিল্লোল ক্ষুণ্ণ মনে মেসে গেল, কলেজও করিতে লাগিল। কিন্তু জ্যোৎস্না-রাতে যখন বিগলিত স্বর্ণধারা মুক্ত জানালা দিয়া তাহার বহির পাতায় লুকোচুরি খেলিত, তখন ছাপার হরফগুলি যেন মুছিয়া যাইত;—সে বাহিরের পানে চাহিয়া দেখিত, আকাশ কেমন নীল, চাঁদের আলো কেমন স্নিগ্ধ, শুভ্র মেঘমালার জড়াজড়ি কেমন মনোরম, আবার তখনি তাহার বাস্তব জীবনের পানে ফিরিয়া দেখিত, তাহার বহির-পাতার-প্রাচীর-বদ্ধ দিনগুলি কি নীরস, নির্ম্মম, কঠোর!...এই ভাবে সে পাঠে অগ্রসর হইতেছিল; কিন্তু বাপ ভাবিতেছিলেন, পুত্রের সমস্ত বিঘ্ন তিনি নিজ বুদ্ধিবলে দূর করিয়াছেন!

পাশের থানায় সন্ধ্যার সময় সেদিন ক্লারিয়নেটের যে সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, হিল্লোলের বেদনাক্লান্ত মনে তাহা একটু ব্যথাহারী বোধ হওয়ায়, সে অনেকটা আন্‌মনে মেস হইতে থানার ফটকের কাছে যাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বড়ই প্রাণোন্মাদিনী সুর!—বাদক যেন বাঁশীর মুখে তাহারই যুগ-যুগান্তের বেদনাগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছিল!...বাঁশী থামিলেও হিল্লোল কিছুক্ষণ মুগ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল; এমন সময় একটি যুবক ফটকের কাছে আসিয়া বলিলেন, "ওঃ, আপনি! ভিতরে আসুন না।"

হিল্লোল বলিল,"সরিৎবাবু যে! এখানে বাঁশী বাজাচ্ছিলেন কে? ভারি মিষ্টি ত! দাঁড়িয়ে শুনছিলাম।"

"ভিতরে আসুন,—ভাল লাগলে আরো শুনবেন।"

হিল্লোল তাঁহার পানে প্রশংসমান নেত্রে তাকাইয়া বলিল, "আপনিই বাজাচ্ছিলেন? চমৎকার বাজান আপনি। বাঁশী শুনে আমি মেস থেকে এসে দাঁড়িয়েছি।"

সরিৎবাবু মৃদু হাসিলেন। দুজনে ভিতরের একটা ঘরে যাইয়া বসিলে, সরিৎবাবু বাঁশী তুলিয়া বলিলেন, "কি বাজাব—ইমন না পূরবী?"

হিল্লোল বলিল, "রাগ-রাগিণীর খোঁজ ত রাখি না। যা প্রাণ স্পর্শ করে, এমন কিছু বাজান।"

সরিৎবাবু একটা পূরবী সাধিলেন। হিল্লোল ভারি প্রীত হইল; বলিল, "কৈ, কলেজের থিয়েটারে ত আপনাকে বাজাতে দেখি নি,—অথচ আপনি এমন একজন ওস্তাদ। কিন্তু এ সবের আর অবসর পাবেন না, যে বিভাগে ঢুকেচেন। আচ্ছা এম্‌ এ না দিয়ে আপনি পুলিশে ঢুক্‌লেন কেন? প্রফেসর, উকিল, এমন কিছু না হয়ে অবশেষে—"

সরিৎবাবু বাঁশীটা রাখিয়া বলিলেন, "হিল্লোলবাবু, কলেজে পড়ার সময় মনে হয়, একটা কিছু হওয়া বড় কিছুই নয়, কিন্তু যাই কলেজের বড় ফটকটি পার হয়ে বাস্তব জগতের মাঝে দাঁড়ান যায়, তখন বোঝা যায় ঐ একটা কিছু হওয়া, কি শক্ত! ভাল কাজ পেতে মুরুব্বীর জোর চাই। তার পর ব্যবসা—য়ুনিভার্সিটি ত তা শেখান প্রয়োজন বোধ করেন নি। শিখিয়েছেন শুধু হোমার, ভার্জ্জিল, সেক্‌সপীয়ার থেকে রস নিংড়ে বার কর্ত্তে। অন্তরের প্রচুর আহার তাঁরা দিয়েছেন; কিন্তু বাস্তব রাজ্যে যে উদরকে উপেক্ষা করা চলে না, ঐটুকু তাঁরা ভাবেন নি। কাজেই উপাধির স্বর্ণ-মুকুটের বোঝা মাথায় করে আমাদের সংসার-পথে ছুটতে হয় হা হা করে উল্কার মত; এবং অনন্যোপায় হয়ে কেউ হন আমারি মত,—কেউ হোসে,—কেউ বা বটতলায়!" ..

হিল্লোল বলিল, "খাপ খাচ্ছে?"

সরিৎবাবু বলিলেন, "খেতেই হবে; কারণ এ দিনে 'নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'। তবে এটাও ঠিক,—কর্ত্তব্য হিসাবে যা করা যায়, তাতেই একটা তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ আছে। জগতের নাট্যশালায় রাজা, মন্ত্রী, বিচারকের মত সৈনিক, পাহারাওয়ালা, ভিস্তি, মুটেরও দরকার; এবং নির্দ্দিষ্ট পার্ট-টুকুই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করলে, নিরপেক্ষ দর্শকের মত তিনি প্রীত হন। Wordsworth বলেছেন, 'They also serve who stand and wait.—"

হিল্লোল বলিল, "তা বটে; তবে—"

সরিৎবাবু বুঝিলেন; বলিলেন, "পারিপার্শ্বিক ঘটনায় সংক্রামিত হয়ে, যে নিজের নিজস্বটুকু হারিয়ে ফেলে, তার পতনের পথ সব সময়েই মুক্ত। কিন্তু সোণার মত যে সমস্ত অবস্থায় উজ্জ্বল থাকতে পারে, সেই শুধু খাঁটি। আমি আমার কর্ত্তব্য তুলাদণ্ডে মেপে রেখেছি বিবেকের কষ্টি-পাথরে কষে। আমরা আফিস-ঘরে Penal Code, Criminal Procedure, হাতকড়ি, চাবুক;—বিশ্রাম-কক্ষে মিল্টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টলষ্টয়, মেটারলিঙ্ক, বঙ্কিম, মাইকেল, এস্রাজ, ক্লারিয়নেট।"

হিল্লোল হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "ঠিক এলেক্‌জেণ্ডারের প্রতি দস্যুর সেই উক্তিই আপনি কল্লেন, 'Alexander, I am a robber, but a soldier.' যদিও এলেক্‌জেণ্ডারের মত কৈফিয়ৎ চাওয়ার অধিকার আমার নেই।"

সরিৎবাবুও হাসিয়া বলিলেন, "সত্য হিল্লোলবাবু, I am a Policeman, but a philosopher, আশা করি, আমার শেষোক্ত জিনিসটুকু আপনার পুলিশ-ভীতি দূর কর্ব্বে। মাঝে-মাঝে আসবেন কিন্তু। একটু চা খাবেন?"

চা পান করিয়া একটু হাল্কা মনে হিল্লোল মেসে ফিরিল।

(২)

পরদিন বৈকাল-বেলা থানায় উপস্থিত হইয়া হিল্লোল দেখিল, একগাদা কাগজ লইয়া কাচের সাহায্যে সরিৎবাবু তাহা দেখিতেছেন। সরিৎবাবু তাহাকে সাদরে বসাইলে সে বলিল—"আঙ্গুলের টিপ বুঝি? আচ্ছা এ দিয়ে আপনারা না কি চোর ধরে ফেলেন? ভারি আশ্চর্য্য ত!"

সরিৎবাবু কাচখানি মুছিতে-মুছিতে বলিলেন, "আশ্চর্য্যের কিছু নেই এতে। এ যে একটা দস্তুরমত সায়েন্স।"

হিল্লোল বলিল, "Astrology-র (জ্যোতিষ) মত না কি? হাতের রেখা থেকে মানুষের ভবিষ্যতের মত এ

থেকে চোরেদের ভাবী কার্য্যকলাপের খোঁজ পান না কি? তা হলে বলুন, আপনারা খুনী-ডাকাতের জ্যোতিষী।"

সরিৎ বলিলেন, "হাঁ, অনেকটা সেই রকম দাঁড়ায়, যদি অপরাধীরা তাদের কর্ম্মের সময় দয়া করে আঙ্গুলের ছাপ রেখে যায়। এই রেখাগুলোর অন্য নাম তাই—Burglar's Visiting Cards."

হিল্লোল সাগ্রহে বলিল, "কি রকম?"

"এই ধরুন, একটা লোক চুরি কর্বার সময় কোনও মসৃণ জিনিসে, যেমন কাচে, হাত দিয়েছে; অমি সেখানে তার আঙ্গুলের ছাপ পড়ে যায়। আপনারা হয় ত তা নজর করেন না, কিন্তু আমরা—"

"সত্যি না কি? দেখি ত" বলিয়া হিল্লোল কাগজ চাপিবার কাচটায় আঙ্গুল চাপিয়া আলোর কাছে লইয়া বলিল, "সত্যি ত! কিন্তু খুব অস্পষ্ট। তার পর?"

"এক রকম পাউডারের সাহায্যে তা স্পষ্ট করা যায়। তার পর যাদের ওপর সন্দেহ হয়, তার হাতের টিপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। যদি মিলে, সেই চোর; কারণ, এটা পরীক্ষিত যে, একজনের টিপ অপরের সঙ্গে মিলে না।"

"বটে! আচ্ছা দেখি ত, আমার টিপের সঙ্গে এ সব মিলে কি না। দেখ্বেন, মিলে গেলে আবার ফ্যাসাদে ফেল্বেন না।" বলিয়া টেবিলের উপর টিপ তুলিবার যে কালী ছিল, তাহা আঙ্গুলের ডগায় মাখাইয়া, হিল্লোল একটা সাদা কাগজে ছাপ তুলিল। সরিৎবাবু কাচের সাহায্যে তাহা দেখিয়া বলিলেন, "এই দেখুন. মিল্ছে না। এটার typeই স্বতন্ত্র। ঐটের যদিও এক রকম, তবু ঢের তফাৎ।" তিনি সায়েন্সটা বুঝাইয়া দিলেন। শুনিয়া হিল্লোল বলিল, "ভারি চমৎকার ত! যার মাথা দিয়ে বেরিয়েছে, তিনি নিউটন, গেলিলিওর চেয়ে কম আবিষ্কার করেন নি।"

"নিশ্চয়!" বলিয়া সরিৎবাবু হাতের কাজ শীঘ্র সারিতে লাগিলেন। হিল্লোল, Finger Printএর বহিটায় যে অসংখ্য টিপ ছিল, তাহার সহিত নিজের টিপ মিলাইয়া দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর সরিৎবাবু বলিলেন, "বস্, এবার খানিকক্ষণ বিশ্রাম। চলুন দোতলার ঘরে যাই। একজন ভাল গায়ক আস্বার কথা আছে। আপনাকেও আজ ছাড়্চি না।"

হিল্লোল বলিল, "কিন্তু পাপে ধোবাপাড়া নেই ত?"

সরিৎবাবু হাসিয়া বলিলেন "বাঁশীর সুরে মেস থেকে যিনি ভরাবহ থানার ফটকে এসে দাঁড়ান, তাঁর ভেতরের লিপি প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়।"

হিল্লোল কৌতুক করিয়া কহিল, "কিন্তু অশোকের শিলার চেয়েও অধিক চেষ্টায় তার লিপিগুলি ভিতরে চেপে রাখে; কারণ, সে জানে এ আবিষ্কারের স্পন্দনে অনেকের কর্ণপটহে ছিদ্র হবার সম্ভাবনা।"

উভয়ে উঠিয়া পড়িল। হিল্লোলের আঙ্গুলের টিপ বহির পাতায় রহিয়া গেল

গায়কটি থিয়েটারের একটা হেণ্ডবিল হস্তে দর্শন দিয়া কহিলেন, "থিয়েটারে আজ কৃষ্ণকান্তের উইল। ওদের ফুল্ পার্টি নামবে,—অনেক দিন বায়স্কোপে দেখাবে। চলুন না, দেখে আসি। গান না হয় আর একদিন হবে।"

সরিৎ বাবুর আপত্তি দেখা গেল না। তিনি হিল্লোলের দিকে চাহিলেন। হিল্লোল বলিল, "আপনারা যান—আমার পড়ার ক্ষতি হবে।"

সরিৎবাবু বলিলেন, "ভারি ক্ষতি। সেরে নেবেন এখন। গোবিন্দলাল আর ভ্রমরের পার্ট দেখ্বার মত, রোহিণীও excellent। দেখ্ছেন না, কারা নামবে।"

হিল্লোল বিজ্ঞাপনে চোখ বুলাইয়া ভাবিল, মেসে পড়িয়া বিনিদ্র রজনী কাটানর চেয়ে তবু থিয়েটারে সময়টা কাটিবে একরকম। সে চুপ করিয়া রহিল। সরিৎবাবু তৎক্ষণাৎ তাহাদের জন্য অরচেষ্ট্রা রিজার্ভ করিবার জন্য থিয়েটারের ম্যানেজারকে টেলিফোঁ করিলেন।

ট্যাক্সি করিয়া তাঁহারা থিয়েটারে যাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিলেন। কন্সার্টের পর ড্রপ উঠিল। হিল্লোলের কাছে অভিনয় বেশ লাগিল। ভ্রমরের পতিপ্রাণতা দেখিয়া তাহার প্রাণ পুলকিত হইল। জরুরী একটা সংবাদ আসায়, সরিৎ বাবু তাহাদের অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিলেন। হিল্লোল অভিনয় দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রোহিণীকে লইয়া গোবিন্দলালের মাতামাতির ও বিরহিণী ভ্রমরের ব্যথাতুর জীবনাঙ্ক দেখিয়া, তাহার মনে পড়িল স্ত্রীর কথা। স্ত্রীর সহিত নিবিড় পরিচয় লাভের সৌভাগ্য তাহার না ঘটিলেও, ঐ আয়ত আঁখির লাজ-নত চাহনীর চারি পাশে সে অনেক কাব্য কল্পনায় গাঁথিয়া রাখিয়াছিল। সে ভাবিল, হয় ত ঐ ভ্রমরের মত তাহার স্ত্রীও তাহারি চিন্তায় বিনিদ্র রজনী যাপন

করিতেছে। বোধ হয়, তাহার চিত্তও এমনি বেদনাতুর, বিরহক্লিষ্ট ; এবং তাহাকে ঐ দুঃখ-সমুদ্রে ডুবাইয়া রাখিয়া, সেও গোবিন্দলালের মত অন্যায় করিতেছে। বিরহ চিরদিনই বিরহ, তাহার মাঝে রোহিণী থাকুক আর নাই থাকুক ইত্যাদি।

হঠাৎ কতকগুলি চিত্তবিভ্রমকারী কল্পনা তাহার মস্তিষ্ক ছাইয়া ফেলিল। সে হাত-ঘড়িটায় চাহিয়া দেখিল, রাত বারটা। ভাবিয়া দেখিল, দ্রুত হাঁটিয়া গেলে, এখান হইতে অখিল মিস্ত্রীর লেনে যাইতে আধঘণ্টাও লাগিবে না। বাড়ীর লোক অত রাত অবধি জাগিয়া থাকে না। লোহার রেলিং টপ্‌কাইয়া ভিতরে যাওয়া কঠিন নয়। তার পর বাহিরের লোহার সিঁড়ি দিয়া ঠিক স্ত্রী যে ঘরে ঘুমাইয়া থাকে, সেই ঘরের সম্মুখে যাওয়া চলে। ঘণ্টা তিনেক সেখানে বেশ থাকা চলিবে। তার পর অন্ধকার থাকিতেই চম্পট।...স্ত্রী তাহাকে কি ভাবে সম্ভাষণ করিবে, এবং সে কি উত্তর দিবে, তাহার একটা খস্‌ড়া করিয়া প্রাণটা পুলকে পূর্ণ হইল।

সে সটান রাস্তায় আসিয়া নামিল ; এবং প্রথমেই একখান গাড়ী খুঁজিল। সৌভাগ্যক্রমে সিম্‌লা পোষ্টাপিসের কাছে একটা গাড়ী মিলিয়া গেল। তাহার চঞ্চল অবস্থা দেখিয়া গাড়োয়ান বুঝিল, বাবুর খোস মেজাজ ; কাজেই দর-দস্তুর করিল না। বিডনষ্ট্রীটের দিকে গাড়ীর মোড় ফিরাইতে হিল্লোল চেঁচাইয়া বলিল "কাঁহা যাতা ?—মির্জ্জাপুর—জোর্‌সে হাঁকাও।" গাড়োয়ান যেন একটু নিরাশ হইল, বলিল,"মির্জ্জাপুর ! বিডন ইষ্ট্রীট যায়েঙ্গে নেই ? আগাড়ি দর-দস্তুর কর্ লিজিয়ে বাবুসাব্‌পিছাড়ি—" "বখশিস্ মিলেগা। খুব জোরসে হাঁকাও।—"

(৩)

মির্জ্জাপুর পার্কের কাছে গাড়ী বিদায় করিয়া, হিল্লোল যখন অখিল মিস্ত্রীর লেনে গেল, তখন ঘড়িতে সাড়ে বারটা। বাড়ীর সামনে যাইয়া, তাহার বুকটা ঢিপঢিপ করিয়া উঠিল। এদিক্‌-ওদিক্‌ চাহিয়া সে ফটক ঠেলিল। সৌভাগ্যক্রমে তাহাতে কুলুপ লাগান ছিল না। সে স্পন্দিত বক্ষে ভিতরে ঢুকিয়া একটা শেফালী গাছের গোড়ায় দাঁড়াইল। তখনো আকাশে চাঁদ ছিল। সে দেখিল, স্ত্রীর কক্ষের একটি জানালা খোলা,—বাড়ীর সকলে নিদ্রামগ্ন। সে সদরের দিক দিয়া গেল না। দালানের এক পার্শ্বে মেথরের ব্যবহারের জন্য যে লোহার সিঁড়ি ছিল, তাহা বহিয়া সন্তর্পণে উপরে উঠিল ; এবং চারিদিক চাহিয়া লইয়া, নির্দ্দিষ্ট কক্ষটির দ্বারে যাইয়া পৌছিল। দ্বারের পাখী তুলিয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিল ঘরে আলো নাই ; কিন্তু খোলা জানালা দিয়া সুপ্রচুর জ্যোৎস্না আসিয়া নিদ্রিতা পত্নীর গায়ে একরাশি ফুল ছড়াইয়া দিয়াছে,—সে ঘরে অপর কেহই নাই। দ্বারের পাখীর ভিতর হাত গলাইয়া কৌশলে দুয়ার খুলিতে বেশী হাঙ্গাম হইল না। দ্বার ভেজাইয়া, সে স্ত্রীর জ্যোৎস্নালোকিত মুখখানির প্রতি চাহিয়া, তৃপ্তির গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণ করিল। তার পর পা টিপিয়া অগ্রসর হইয়া, তাহার শিয়রে যাইয়া দাঁড়াইল। বিছানার উপর হইতে মাটিতে মালার মত কিছু ঝুলিতেছিল। সে তাহা তুলিয়া দেখিল, স্ত্রীর মুক্তার মালা। বুঝিল, ভ্রমরের মত এই বিরহিণীও বেশভূষা ছাড়িয়াছে ; এবং ইহাতে তাহার গভীর অনুরাগের পরিচয় পাইয়া, বেশ একটু তৃপ্তি পাইল। মালাটি তুলিয়া নিজের গলায় পরিয়া তাহার বক্ষ কাব্যে ভরিয়া উঠিল, এবং মুখ নত করিবার সময়, নিকেলের সিগারেট-কেস ও প্রোগ্রামটা বুক-পকেট হইতে নীচে পড়িয়া গেল। তখন সে সব লক্ষ্য করিবার মত অবস্থা তাহার নয় ; সে পত্নীর কাছে বসিল। তাহাকে গভীর প্রেমে স্পর্শ করিল। তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ এমনি সময় পত্নী স্বপ্ন দেখিতেছিল, যেন জানালার গরাদে ভাঙ্গিয়া চোর আসিয়া তাহার মুক্তার মালাটি চুরি করিতেছে। স্বামীর উষ্ণ স্পর্শে ঘুম ভাঙ্গিয়া, তন্দ্রাজড়িত চক্ষে শিয়রের কাছে লোক দেখিয়া, সে সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—"চোর, চোর !" এইরূপ অতর্কিত চীৎকারের জন্য হিল্লোল আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সে চমকিয়া এক লম্ফে যে স্থানে সরিয়া গেল, সে দিকটা অন্ধকার। তখনও স্ত্রীর ঘুমের ঘোর কাটে নাই ; সে তাহাকে চিনিল না ; শুধু সে বুঝিল একটা মানুষ, এবং প্রাণপণে চীৎকার সুরু করিল।

পাশের ঘরে দুলালবাবু ঘুমাইয়া ছিলেন। তাঁহার ঘুম সতর্ক। তিনি 'কে, কে' করিয়া উঠিলেন। পরক্ষণে দ্বারে সঘন করাঘাত বর্ষিত হইল। পিতার শব্দ পাইয়া হিল্লোলের কাব্যের নেশা ছুটিয়া গেল। সে কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, যে পন্থায় আসিয়াছিল, তদবলম্বনে পলায়ন করিল।

মালাছড়া গলায় ছিল,—তাহা আর স্ত্রীকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল না।

দুলাল বাবু ও অন্যান্য পরিজন এই ঘরে আসিয়া বধূর নিকট হইতে চোরের বিবরণ সংগ্রহ করিলেন। আলোর সাহায্যে চোরাই জিনিসের তালিকা করিয়া দেখা গেল, হাজার টাকা দামের মুক্তার মালাটি অপহৃত।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক নিমন্ত্রণ হইতে ফিরিয়া বধূর তাহা বাক্সে রাখিতে মনে ছিল না, বালিশের তলায় রাখিয়াছিল। শুধু তাহাই অপহৃত,—চোর অন্যান্য জিনিসে হস্তক্ষেপ করে নাই।

লছমন সিং শিং উঠাইয়া চারিদিক খুঁজিয়া মরিল; কিন্তু তাহার দিব্য চক্ষু থাকিলে দেখিতে পাইত, চোরটি তখন মুক্তার মালা গলায় তাহার মেসের বিছানায় পড়িয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

প্রাতে যথানিয়মে থানায় এত্তলা দেওয়া হইল। সরিৎ বাবু তদন্তে আসিলেন। তিনি আসিয়া ঘরটি তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিলেন,—নিকেল-কেস ও প্রোগ্রামটি সংগ্রহ করিলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন, ইতিমধ্যে এ বাটীর কেহই থিয়েটারে যায় নাই। নিকেল-কেসে দুটি সুস্পষ্ট আঙ্গুলের ছাপ দেখিতে পাইলেন। গৃহের পরিজন হইতে আবশ্যক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ফিরিবার সময় লোহার সিঁড়িটার নীচে একটা অরচেষ্ট্রার টিকিট পাইলেন।

ব্যাপারটা তাঁহার একটু ঘোরাল বোধ হইল; কারণ, চোর সাধারণ শ্রেণীর লোক নহে। সে অরচেষ্ট্রায় বসিয়া থিয়েটার দেখে; এবং সৌখীন সিগারেট-কেস ব্যবহার করে,—যাহার বাহিরই শুধু সৌখীন নয়, ভিতরে হাভানা চুরুট স্থান পায়। প্রোগ্রামটি ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন, ইহা তাঁহারা যে থিয়েটারে গিয়াছিলেন সেখানকার এবং টাটকা।

থানায় ফিরিয়া তিনি প্রাপ্ত টিপের ফটো তুলাইলেন; এবং সেই থিয়েটারে টেলিফোঁ করিয়া জানিলেন, মাসখানেকের ভিতর সেই ষ্টেজে অন্য কোনও রাতে কৃষ্ণকান্তের উইল অভিনীত হয় নাই। তিনি ভাবিয়া লইলেন, তাঁহারা যে রাত্রে থিয়েটারে গিয়াছিলেন, সে রাত্রিতে চোরও অরচেষ্ট্রায় বসিয়া থিয়েটার দেখিয়াছে, এবং সেই রাতেই যে উদ্দেশ্য লইয়া এই গৃহের কক্ষটিতে ঢুকিয়াছিল, তাহা হয় ত চুরি নয়। তিনি স্থির করিলেন, সেই রাত্রিতে অরচেষ্ট্রায় বসিয়া যে সব লোকে থিয়েটার দেখিয়াছিল, তাহাদের ভিতর যাহারা যুবক, তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া চিন্তা করিয়া, তাঁহার যতটুকু স্মরণ হইল—সে রাত্রে তিনটা প্রাণী ছাড়া অরচেষ্ট্রায় অপর কেহ যেন ছিল না। অথচ ব্যাপারটা যেন শুধু সেই সব দর্শককে লইয়াই কেন্দ্রীভূত হইয়া দাঁড়ায়। টেবিলে Finger-print-এর যে বহিটা ছিল, অন্যমনে তাহার পাতা উল্টাইয়া, তিনি এই প্রমাণের প্রকৃত রহস্যোদ্ঘাটনের পন্থা ভাবিতে লাগিলেন। সহসা পাতার ভিতর হিল্লোলের সেদিনকার টিপযুক্ত যে কাগজখানি মিলিল, তাহাতে চক্ষু পড়ায় তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। কাচ-সাহায্যে ভাল করিয়া মিলাইয়া এক মিনিটের জন্য তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। নিকেল-কেসের টিপ এবং এই টিপ হুবহু এক।

কাজের সময় তিনি কাব্য ভুলিতেন। তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটার আগাগোড়া ঘটনা-শৃঙ্খল তৈয়েরী করিয়া ফেলিলেন। তাহা এইরূপ—অরচেষ্ট্রায় বসিয়া থিয়েটার দেখিয়া মেসের পথে ঘটনার রাত্রে হিল্লোল ঐ কক্ষটিতে প্রবেশ করিয়াছিল;—এবং যতক্ষণ না বিপরীত প্রমাণ হয়,—ঐ মুক্তার মালা ছড়া চুরি করিয়াছিল। অমনি তিনি তাহার অনুসন্ধানের সূত্রগুলি গুছাইয়া লইলেন; যথা—ঐ কক্ষটিতে যে উদ্দেশ্যে সে গিয়াছিল, তাহা কি? ঐ বধূটির সহিত তাহার কোনও গোপন সম্পর্ক আছে কি না? মালাছড়াটি সেই আনিয়াছে কি না? আনিয়া থাকিলে, তাহা লইয়া কি করিয়াছে?

তিনি একটু ভাবিয়া সেই দিনই হিল্লোলকে চায়ের নিমন্ত্রণে ডাকিলেন।

হিল্লোল আসিলে, তাহার সহিত দোতালার ঘরটিতে বসিয়া চা পান করিতে-করিতে সরিৎবাবু সেদিনকার থিয়েটারের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। কে কি রকম অভিনয় করিয়াছিল, কোন্ দৃশ্যটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল, এই সব আলোচনার ফাঁকে তিনি হিল্লোলের মুখের ভাব গোপনে লক্ষ্য করিতেছিলেন। কিন্তু সেখানে অপরাধীর চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তথাপি গুছাইয়া বলিলেন, "কাজের হাঙ্গামায় আমার আগেই ফিরতে হল; আপনি শেষ অবধি ছিলেন ত?"

হিল্লোল "না, বারটায় বেরিয়েছিলাম।"

"বারটায়? কেন, শেষ না দেখে? আপনার ভাল লাগছিল না?"

"ভাল খুবই লাগছিল, তবে—"কিসের টানে তাহাকে ফিরিতে হইয়াছিল মনে করিয়া, হিল্লোল রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

সরিৎবাবু বলিলেন "তবেটা কি আবার?" পিতার অকরুণ ব্যবস্থায় পল্লী হইতে নির্ব্বাসিত এই যুবকটি তাহার গোপন ব্যথা গুহাবদ্ধ অগ্নির মত অন্তরের ভিতরই লুকাইয়া রাখিতে চাহিত। সে একটুখানি কাশিয়া লইয়া বলিল, "ঠাণ্ডা লাগায় বুকে ব্যথা হয়েছিল।"

"বুকে!" বলিয়া সরিৎবাবু একটু দুষ্ট ইঙ্গিত করিলেন। হিল্লোল আরক্ত মুখে বলিল, "যান, তাই বুঝি?"

"অত রাতে ফির্‌লেন কি করে একা?"

"তা ছাড়া গতি কি?"

চা পান শেষ হইয়াছিল। রুমালে মুখ মুছিয়া সরিৎ বাবু বলিলেন, "অগতিরও গতির অভাব হয় না, যদি সাহস আর বুদ্ধি থাকে। চুরুট আছে সঙ্গে? আমারটা গেছে ফুরিয়ে।" হিল্লোল পকেট খুঁজিয়া বলিল, "ঐ যা, ফেলে এসেছি।"

সরিৎবাবু বলিলেন, "আমি আনাবার সময় পাই নি। সিগারেট বড় খাই না, আপনি খান? দেখি কটা আছে বোধ হয়।"

তিনি পকেট হইতে ম্যাচ ও নিকেলের সিগারেট-কেস্‌টা বাহির করিয়া হিল্লোলের দিকে আগাইয়া দিলেন। কেস্‌টা হাতে করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া, হিল্লোল একটু বিস্মিত ভাবে বলিল, "পকেট থেকে সরিয়েছিলেন বুঝি? আচ্ছা চালাক আপনি। আমি খুঁজে-খুঁজে হয়রাণ।" সরিৎবাবু বিস্ময় ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "কি রকম? সৌখীন জিনিস দেখ্‌লেই বুঝি দাবী কর্ত্তে হয়। আপনার মত সৌখীন লোকেরও অভাব নেই ত।"

হিল্লোল হাসিয়া বলিল, "তা জানি। এই দেখুন, ডালার ভিতর আমার নামের অক্ষর H. R. H."

"এই অক্ষরে ঢের নাম হতে পারে। যদি এটা আপনার হয়, তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে আপনাকে স্বীকার কর্ত্তে হবে, থিয়েটার দেখে আপনি একবার চীৎপুরের দিকে পদার্পণ করেছিলেন। এটা আমার নয়, কিন্তু পাওয়া গেছে ঐ দিকটায়।—"

হিল্লোল তাহার দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া বলিল, "অসম্ভব। অখিল মিস্ত্রীর লেনেও আমি কেস থেকে সিগার বার করে খেয়েছি। মেসে ফিরে খুঁজে না পেয়ে ভেবেছিলাম রাস্তায় পড়ে গেছে। কিন্তু এর ভেতর ত আপনার সঙ্গে দেখা নেই। কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছেন?"

সরিৎবাবু তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "যদি বলি, অখিল মিস্ত্রীর লেনে ৭ নম্বর বাড়ীটার দক্ষিণ কোণের কক্ষে—"

হিল্লোল বিপুল বিস্ময়ে বলিল, "৭ নম্বর বাড়ীর—"

"যেখানে সে বাড়ীর বৌটি ঘুমিয়ে ছিল—"

বিস্ময়ে হিল্লোলের বাক্‌রোধ হইয়া আসিল। সরিৎবাবু বলিতে লাগিলেন, "সেখানে কেস্ আর প্রোগ্রাম ফেলে বৌটির মুক্তার মালাছড়া!"

"মুক্তার মালা! মশাই এ সব খবর—!"

"জানি। চোর সাবধানতা সত্ত্বেও অজ্ঞাতে যে সব চিহ্ন রেখে আসে, অভিজ্ঞ পুলিশের কাছে তাই যথেষ্ট। শুনবেন? মুক্তার মালাটি আপনিই এনেছেন। হয় ত চুরির উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এ সব আলোচনার আগে এটুকু জান্‌তে চাই—ঐ বৌটির কাছে আপনার ঐ নৈশ অভিসারের গোপন কারণ কি? সত্যি বল্‌বেন; কারণ, ঐ মালাচুরির দস্তুর-মত এজাহার হয়েছে; এবং জোর তদন্ত চলেছে। হয় ত এই সংশ্রবে আমাকেই অনেক অপ্রিয় কাজ কর্ত্তে হবে।"

"এজাহার হয়েছে মালার জন্য?"

"হাঁ, এবং প্রমাণ যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে আপনাকেই অপরাধীর কলঙ্কিত স্থানে দাঁড়াতে হয়। ঐ সব কলঙ্ক থেকে নিজকে বাঁচাতে হলে, আপনার কিছু গোপন না করে প্রকৃত ব্যাপার এখনি বলা উচিত। চুরি হয় ত করেন নি; কিন্তু ঐ বৌটির সঙ্গে—"

হিল্লোল জিভ কাম্‌ড়াইয়া বলিল, "ছি—ছি! সে যে আমার স্ত্রী।"

সরিৎ বাবু বলিলেন "আপনার স্ত্রী! তবে আপনার এত লুকোচুরি কেন? আর এ বয়সে গৃহবাসিনী স্ত্রী ছেড়ে সেই সহরে মেসবাসী কেন?"

হিল্লোল চোখ নত করিল; কম্পিত স্বরে বলিল, "সে,

জন্যই ত ব্যাপার এমন গড়িয়েছে সরিৎ বাবু! শুনবেন আমার দুঃখের কাহিনী?" সে তাহার করুণ ইতিহাস কহিয়া, মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল, "এখন এর কি বিহিত সরিৎ বাবু? বাবা জান্‌লে যে উপায় নেই।"

সরিৎ বাবু বলিলেন—"অন্যায় আপনার বাবার—ছেলেকে এ ভাবে tantalise করা! যাক্, আমি সব গুছিয়ে নোবখন। মালাছড়া কোথায়?"

"সঙ্গেই আছে।" বলিয়া সার্টের বোতাম খুলিয়া, হিল্লোল দেখাইল। সরিৎ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ছেলের এত কাব্য বাপ বুঝ্‌লেন না।"

হিল্লোল বলিল, "আচ্ছা বলুন ত,—ও রকম না করে কি উপায় ছিল? যান্ মশাই, আপনি abettor! কেন আমায় ভ্রমর দেখ্‌তে সঙ্গে নিয়েছিলেন?"

"সে মন্দ করি নি; বরং কবির সুমস্ত কাব্যে সোণার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিলেম। কিন্তু চুরি কল্লেন কেন? ধরা না পড়ে চুরি কর্ব্বার মত ঢের দামী জিনিস সেখানে ছিল।"

"আর মশাই, মালাছড়া গলায় পরে থালি—এম্নি সময় চেঁচামিচি। তখন পালাবার পথ পাই না, মালা রেখে আসা চুলোয় যাক।"

"তা কবির সমাদর সর্ব্বত্র। আপনার বাপকে সব বল্লে, হয় ত নোবেল প্রাইজ—"

হিল্লোল হাত যোড় করিয়া বলিল, "দোহাই আপনার,—বাবা জান্‌লে, আমায় দেশত্যাগী হতে হবে।"

"তাও বটে। এ দেশে কবি পুত্রের মর্ম্ম পিতারা বোঝে না। আচ্ছা, ভয় নেই।" তিনি হাসতে লাগিলেন।

এমন সময় নীচে হইতে এক ভদ্রলোক সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানাইলে, হিল্লোলকে অপেক্ষা করিতে কহিয়া, সরিৎ বাবু নীচে নামিলেন; এবং দুলাল বাবুকে দেখিয়া, তাঁহাকে লইয়া অফিস-ঘরে বসিলেন। মালা-প্রাপ্তির সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া দুলাল বাবু বলিলেন, "আপনাদের অসীম ক্ষমতা মশাই। চোরও ধরেছেন নাকি? এই বিস্তীর্ণ সহরে চোরের চেহারা না জেনেও কি করে আস্কারা কল্লেন? বলুন ত ইতিহাস্‌টা।"

সরিৎ বাবু স্মিতহাস্যে বলিলেন, "চোর আপনার মতই বিশিষ্ট ভদ্রলোক; এবং সে চুরির উদ্দেশ্যে মালা নেয় নি।—"

দুলাল বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "কি রকম মশাই? ব্যাপার যেন ঘোরাল করে তুল্‌ছেন।"

"হাঁ ঘোরালই বটে। চোর ঘটনার রাত্রে অরচেষ্ট্রায় বসে থিয়েটার দেখে ফেরার পথে বিশেষ উদ্দেশ্যে ঐ ঘরে ঢোকে। তার পর চাঁদের আলোয় বিছানার পাশে মালাছড়া দেখে, তা গলায় পরে' আপনার নিদ্রিতা বধূটির পাশে বসে। এই সময় কোনও রূপে তার সিগারেট-কেস ও প্রোগ্রামটা পড়ে যায়। তার পর বৌটির চেঁচামিচিতে আপনাদের ঘুম ভাঙ্গায়, কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে, মালা রাখ্‌বার কথা ভুলে সে পালায়। চুরির উদ্দেশ্য তার ছিল না।"

প্রকাণ্ড টাকটিতে হাত বুলাইয়া দুলাল বাবু তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, "তাই ত, ভারি বিশ্রী ব্যাপার হল যে।"

যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে সরিৎ বাবু বলিলেন, "নিশ্চয়। সম্ভ্রান্ত বংশের সোমত্ত বৌ। আচ্ছা, আপনার ছেলে কদ্দিন বিদেশে আছেন? কি করেন তিনি?"

প্রশ্নের ধরণে চঞ্চল হইয়া দুলাল বাবু বলিলেন, "বিদেশে থাক্‌বে কেন? প্রেসিডেন্সীতে এম্-এ পড়ে সে।"

"প্রেসিডেন্সীতে! তা হলে বলুন, ছেলে রাত্তিরে বাড়ী থাকে না! শিক্ষিত, বিবাহিত, অথচ ঐ রোগ! ছিঃ!"

দুলাল বাবু তীব্র বেগে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না,—না, মশায়, আমার ছেলে অমন নয়,—চমৎকার স্বভাব তার। বরাবর বৃত্তি পাচ্ছে, আমার কড়া শাসনে বড় হচ্ছে। পরীক্ষার বছর, আর অল্প দিন হল বে হয়েছে। পড়াশুনার পাছে ক্ষতি হয়, এই ভয়ে আমি তাকে মেসে রেখেছি।"

গম্ভীর ভাবে মাথা দুলাইয়া সরিৎ বাবু বলিলেন, "ভাল করেন নি। হয় ত চোর তা জানে এবং সেই সুযোগে যা চুরি কর্ত্তে এসেছিল, তা অলঙ্কার নয়। চোর নিশ্চয় উকিল নিযুক্ত কর্ব্বে; এবং কত যে কেলেঙ্কারী হবে, বুঝ্‌তেই পাচ্ছেন। সে ত আর এম্নি জেল বরণ করে নেবে না।"

দুলাল বাবু হাত কচলাইয়া বলিলেন, "তাই ত! যাক্ গে মশাই, আমি কেস কর্ত্তে চাই না। মালাছড়া বরং ফিরিয়ে দিন,—চোরকে টেনে দরকার নেই।"

"কিন্তু মুক্তি পেয়ে যে আর সে আপনার বাড়ীর দিকে লুকিয়ে যাবে না, এমন বণ্ড ত সে দেবে না। অত রেতে প্রাণের মায়া ছেড়ে যে ঐটুকু লোহার সিঁড়ির সাহায্যে ওঠে,

তা'র আকর্ষণ যে কত বড়, বুঝতেই পাচ্ছেন। রোমিও-জুলিয়েটের কাছে—"

দুলালবাবু তিক্ত কণ্ঠে কহিলেন—"মশাই, ছেলের বে' দেওয়াটাই মস্ত ভুল হয়ে গেছে। গিন্নির কাঁদাকাটিতে দিতেই হল; কিন্তু দেখুন কি ফ্যাঁসাদ! ছেলের পড়ার ব্যাঘাতের ভয়ে তাকে বাইরে রাখতে হল; এদিকে ভেতরে কোন্ ছুঁচো উপদ্রব আরম্ভ কর্ল্লে। ইচ্ছা হচ্ছে, একে চাবকে লাল করি। লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগা কোথাকার।"

"ছেলেকে মেসে না রাখলে হয় ত আপনাকে এ হাঙ্গাম পোয়াতে হত না। বিয়ের পর কত ছেলে পাশ করে। যার কিছু হবার নয়, বাধা তার অনেকই আছে। আপনার এ ব্যবস্থায় সে যে খুসি হয়ে লক্ষ্মীছেলের মত পড়াশুনা কচ্ছে, কে জানে?"

"তবুও বাড়ী থেকে যা কর্ত্ত, তার চেয়ে বেশী কচ্ছে। কিন্তু এ মালা-চুরির ব্যাপার শুন্‌লে হয় ত তার ক্ষতি হবে,—বড্ড sensitive কি না। আমি কিছুই জানাই নি। কিন্তু যদি জানে—" বলিয়া, ললাট কুঞ্চিত করিয়া, দুলালবাবু মনে-মনে নানা ভাবে এই বিশ্রী ঘটনাটার আলোচনা করিতে লাগিলেন। সরিৎবাবুও নীরবে ভাবিতে লাগিলেন,—হিল্লোলের নায়কোচিত আচরণ তাহার পিতার কাছে গোপন রাখিয়াও, কিরূপে তাহার গৃহে ফিরিবার ব্যবস্থা করা যায়। ঐ বিরহী বন্ধুটির জন্য তাঁহার করুণা হইতেছিল অপার।

(৫)

হিল্লোল বহুক্ষণ সরিৎবাবুর প্রতীক্ষায় থাকিয়া অতিষ্ঠ ভাবে নীচে নামিয়া পড়িল। সরিৎবাবু আফিস-ঘরের দুয়ারের মুখোমুখি বসিয়া ছিলেন, দুলালবাবু ছিলেন দেয়ালের আড়ালে। হিল্লোল তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। সে দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইতেই সরিৎবাবু চক্ষু টিপিলেন; কিন্তু তাহার মর্ম্ম না বুঝিয়া হিল্লোল বলিল, "মেসে যাচ্ছি সরিৎবাবু, মালাছড়া রেখে যাই—ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু হুঁসিয়ার! আমি যে চোর, এ কথা যেন কিছুতেই প্রকাশ না পায়। তা হলে কিন্তু আমায় দেশত্যাগী হতে হবে। প্রেমিক ছেলের নৈশ অভিসার কোনও বাপ ঠিক কাব্যের চোখে দেখে না,—বিশেষ আমার—"

ততক্ষণে সরিৎবাবু বাহিরে আসিয়া, হিল্লোলকে প্রায় টানিয়া, বাহিরের ফটকের দিকে অগ্রসর হইলেন। হিল্লোলের কণ্ঠ দুলালবাবুর শ্রবণ এড়ায় নাই। তিনি ঘাড় তুলিয়া জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিলেন, বক্তা তাঁহারি পুত্র গলা হইতে অপহৃত মালাছড়া খুলিয়া সরিৎবাবুর হাতে অর্পণ করিল! তিনি বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। হিল্লোল জানিলও না,—শিস্ দিতে-দিতে মেসের দিকে চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া দুলালবাবুর শ্রাবণের আকাশের মত মুখ দেখিয়া সরিৎবাবুর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন তাঁহার হিল্লোলের পক্ষে ওকালতি করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। তিনি মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "প্রকৃত ব্যাপার যখন আপনার অগোচর নাই, তখন কটি কথা আমার বলতে হচ্ছে দুলালবাবু। বয়সে আপনি পিতৃতুল্য; তবু আপনার একটু ভুলের আলোচনা কচ্ছি,—মাফ কর্ব্বেন। দেখুন, নদীতে যখন বান ডাকে, তার উচ্ছ্বাসে বাধা না দিয়ে, বইতে দিতে হয়; নৈলে ভয়ঙ্কর আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়। তেমন বিভিন্ন বয়সে যে বিভিন্ন প্রবৃত্তি মানুষের উপাদান ভেদে মাথা উঁচু করে ওঠে, তা শান্ত কর্বার সবচেয়ে সহজ উপায় তার পরিপূরণ। কিন্তু তাতে বাধা দিলে প্রকৃতিগুলো আরো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। অবিলতাহীন স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানুষকে না ডুবিয়ে বরং বেশী সময় ঢেউয়ের মত পারে যেতে সাহায্য করে। পুত্রটির অন্তঃস্রোতে রুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন,—কতদূর সফল হয়েছেন, আপনার অগোচর নেই। এইবার তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনুন। দেখবেন, উপাধি-লাভে তার কোনও বিঘ্ন হবে না। তবে আপনাকে যথেষ্ট হুঁসিয়ার হতে হবে,—আপনি যে এসব জেনেছেন, সে যেন তা টের না পায়।"

দুলালবাবু কথাগুলি কাণ পাতিয়া শুনিলেন; বুঝিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের যুগ আর নাই। এ যুগের ছেলেরা প্রবৃত্তির অনুজ্ঞাই প্রধান মনে করে; এবং সুযোগ পাইলে পিতার আদেশে প্রাচীর টপকাইয়া যায়। কাজেই দশরথের মত কঠোর আদেশ জারি করিবার পূর্ব্বে পিতার অনেক বিবেচনা করা উচিত; নতুবা ফল দাঁড়ায় এইরূপ!

সে দিনই তিনি পুত্রকে মেস হইতে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন; কিন্তু তাহাকে ইহার প্রকৃত কারণ জানাইলেন

না। হিল্লোল ভাবিল, পিতা আসল ব্যাপার জানেন না,— দয়াল ভগবান্ তাঁহাকে সুমতি দিয়াছেন। সে মহোৎসাহে পড়িতে লাগিল এবং পড়ার ফাঁকে স্ত্রীর সহিত গল্পগুজব সত্ত্বেও পর-বৎসর প্রথম শ্রেণীর এম-এ উপাধি লাভ করিল। তাহার গভীর অনুরাগের পরিচায়ক সেই নৈশ অভিসারের কথা সে স্ত্রীর কাছে গোপন রাখিতে পারে নাই। ফলে তাহার প্রকাণ্ড উপাধি সত্ত্বেও স্ত্রী তাহাকে সম্বোধন করিত "মালাচোর"।

পাঁচুবাবুর পরিণাম

[শ্রীকালীপ্রসন্ন পাইন]

প্রথম পর্ব

প্র্যাক্‌টিস

বস্ত্রাবৃত মৃতদেহ প্রাঙ্গণে শায়িত, একপাশে ডাক্তারবাবু দাঁড়াইয়া ও অপর পাশে মৃতের আত্মীয় উপবিষ্ট। কাতর-কণ্ঠে মৃতের আত্মীয় ডাক্তারকে কহিলেন, "মশায়, রোগী মারা গিয়েছে, আপনি কি চাইচেন ?"

ডাক্তারবাবু হাত বাড়াইয়া নিষ্কম্প স্বরে কহিলেন, "রোগী মরতে পারে, আমি তো মরি নি, দিন দিন, ফি দিন।"

মৃতের আত্মীয় নীরবে উঠিয়া টাকা আনিয়া দিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, এ ডাক্তার না পিশাচ ! ডাক্তারবাবু পকেটে টাকা ফেলিয়া বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে চলিয়া গেলেন। তখন সবে মাত্র ভোর হ'য়েছে, রাস্তায় লোক চলা সুরু হ'য়েছে, কাকের কলরবও বেশ জমকালো।

অসংখ্য ডাক্তার পরিশোভিত কলিকাতার মধ্যে উপার উক্ত ডাক্তারবাবুটিও থাকেন। নাম শ্রীপাঁচুগোপাল

মৃতের আত্মীয় ও ডাক্তার বাবু।

আত্মীয়। "মশায়, রোগী মারা গিয়েছে, আর আপনি কি চাইচেন ?"

ডাক্তার। "রোগী ম'রতে পারে, আমি তো মরিনি, দিন দিন, ফি দিন।"

দাস, জাতিতে ময়রা। সাধারণে তাঁকে পাঁচু ডাক্তার বলিয়াই ডাকে। পাঁচুবাবুর পিতা বড় আশায় বুক বাঁধিয়া, বিষয়-সম্পত্তি প্রায় সমস্তই বাঁধা দিয়া, ছেলেকে জাতীয় ব্যবসা না শিখাইয়া ডাক্তারী পড়াইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! ছেলে পাশ হইবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। পাঁচুবাবু বিবাহিত; সংসারে স্ত্রী ও একটী মাত্র কন্যা। মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় একটা বাটীতে থাকেন। বাঙ্গালা দেশে সব জাতিরই বেশ চলে, কিন্তু বাঙ্গালীরই চলে না, সব জাতিই এখানে আসিয়া বড়লোক হয়,—খেতে পায়; আর বাঙ্গালী দাসত্ব করে,—রাস্তার ভিখারী হয়,—না খেতে পেয়ে মরে। বাঙ্গালী সব অপরের উপর নির্ভর করে'—অবলম্বন ক'রেছে চাকরী। কি বুদ্ধিমান্ জাতি!

পাঁচুবাবুর আছে সব—টেবল্, চেয়ার, আলমারী বাক্স, ডাক্তারী বই, হ্যাট, কোট, প্যাণ্ট, বুট; কিন্তু নাই ঘরে অন্ন, বস্ত্র, পয়সা। মুটে, মজুর, পানওয়ালা, চানাচুরওয়ালা পেট ভরিয়া খাইতে পায়; কিন্তু পাঁচুবাবু ডাক্তার হইয়া আধপেটাও ভাল করিয়া খাইতে পান না। কিন্তু হইলে কি হয়,—আমরা যে বাবু!

পাঁচুবাবুর দিন আর চলে না। চাকরের ছ'মাসের মাহিনা দিতে পারেন নি,—সে চলে গিয়েছে; বাটী ভাড়াও ছ'মাসের বাকি প'ড়েছে। তার উপর মুদীর দোকানেও দেনা ঢের। বাহিরে পাওনাদারের তাড়া,—ঘরে গৃহিণীর মুখনাড়া। কাজেই ডাক্তারবাবু, যেখানে যতটা পারেন, চোখ-কাণ বুজিয়া আদায় করিয়া লন। মাঝে মাঝে ভাবেন,—ময়রার ছেলে যদি খাবারের দোকান ক'রতুম।

এইরূপে ডাক্তারবাবুর দিন কাটে; কিন্তু অভাব তো কাটে না। যে বাটীতে ডাক্তারবাবু থাকেন, তার পাশের বাটীতেই বাড়ীওয়ালার বাস। মধ্যে একটা প্রাচীর আছে এবং তাহাতে একটা দরজাও আছে। মেয়েরা ঐ রাস্তায় যাতায়াত করেন। বাড়ীওয়ালার বয়স প্রায় ষাট,—মাথার চুল একটিও কাল নাই। তাঁর একটা সুনাম আছে, যে, তিনি বড় ভাগ্যবান্; কারণ, বাঙ্গলা দেশে যার স্ত্রী মারা যায়, সাধারণে তাকে ভাগ্যবান্ বলে। বর্ত্তমানে এঁর স্ত্রী একটী বালিকা; এটী বৃদ্ধের পঞ্চম পক্ষের অর্দ্ধাঙ্গিনী। আর চারিটী স্ত্রী একে একে পৃথিবী হ'তে বিদায় নিয়েছেন।

মানুষে কত কথাই বৃদ্ধকে বলে; কিন্তু তিনি বুদ্ধিমানের

বালিকা স্ত্রী ও বৃদ্ধ স্বামী।

স্ত্রী। (ভয়ে জড়সড় হইয়া বসিয়া)।

স্বামী। "একবার আক্কেল দেখ, আমি সাত মুল্লুক খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর উনি এখানে ব'সে গল্প কচ্ছেন।"

মত বেশী কথা কন না। আর যদিও বলেন, তাও রহস্যের ছলে। কখন-কখনও যুবকদের বলেন, ওহে, তোমরা ছেলে মানুষ—বোঝো না। মানুষের দেহটাই বুড়ো হয়,—প্রাণ কি বুড়ো হয়? স্ত্রীর উপর বৃদ্ধের আদেশ সর্বদাই বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা থাকা। তিনিও তাই থাকেন। বৃদ্ধ স্বামী, বালিকা স্ত্রী,—কাজেই বৃদ্ধ সদাই স্ত্রীকে পাহারা দিয়া থাকেন, সদাই স্ত্রীকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন। বাহিরের লোকের অন্তঃপুরে প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ। খোজা প্রহরী থাকিলেই মোগলের অন্তঃপুর বলা চলিত। বৃদ্ধের বালিকা কার দোষে আজ বালিকার এ অবস্থা? তার পিতার, তার অদৃষ্টের, না পিশাচ সমাজের?

বিরক্ত হইয়া কমল বাটীর মধ্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন তুমি ডাক্তারবাবুকে উঠে যাবার নোটীশ দিও। ভ্রাতুষ্পুত্রটী বয়সের [illegible]। ডাক্তারবাবুর নিকট হইতে মাঝে মাঝে কিছু আধটু বা ও চাহিয়া নেশার মান রাখে; কাজেই ডাক্তারবাবুর প্রতি তার সদয়। খুড়া-মহাশয়কে কহিল,—"দেখুন, ডাক্তারবাবুকে নোটিশ দেবার

[illegible]

বাড়ীওয়ালা। "যদি [illegible]"

ভাড়াটিয়া। "[illegible]?"

স্ত্রীর নাম "কমল"। একদিন দুপুর বেলায় কমল খিড়কির দরজা দিয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর কাছে আসিয়া গল্প করিতেছিল। বৃদ্ধ অন্তঃপুরে কমলকে না দেখিয়া, খিড়কির দরজা খোলা দেখিয়া, উন্মাদের মত ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে আসিয়াই হাজির। ডাক্তারগৃহিণী শশব্যস্তে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তখন বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—"একবার আক্কেল দেখ! আমি সাত মুল্লুক বেড়াচ্ছি, আর উনি এখানে বসে গল্প ক'চ্ছেন।" কমল তখন আনতাননা, ম্রিয়মাণা, মৌন। আগে [illegible] উচিত,—ওর দোষ সব [illegible]।"

"[illegible] তুমি আজই বোলে দিও।" পূজারী [illegible]। ভ্রাতুষ্পুত্র ঘাড় [illegible] প্রস্থান করিল।

পূজারী [illegible] পাচ্ছে, বৈরাগীর পুত্র একলা সমস্ত পূজা [illegible] বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; এমন সময় গুণধর ভ্রাতুষ্পুত্র আসিয়া

বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে, "ভট্‌চায্যি মশায়, বাড়ী আছেন ?"

বাটীর ভিতর হইতে ব্রাহ্মণ-পুত্র "হা যাই" বলিয়া বাহিরে আসিলেন। তখনও তাঁর আহারাদি হয় নি।

"দেখুন, যদি দশ টাকা ভাড়া বেশী দিতে পারেন, থাকবেন ; নয় ত অন্য বাড়ী দেখবেন।"

শুষ্ক মুখে ব্রাহ্মণ-পুত্র এক হাতে দরজা ধরিয়া কহিলেন, "এই ভাঙ্গা দরজা, এই বাড়ী—এর আবার দশ টাকা ভাড়া বাড়াতে চাইচেন ?"

"হা, হা" বলিয়া মিলিটারী ভ্রাতুষ্পুত্র প্রস্থান করিলেন।

কাপড় ও আটপৌরে পরিবার আর কিছুই নাই। তোলা কাপড় পরিয়াই আটপৌরের কাজ চলিতেছে।

প্রাতেই ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর সহিত একটু কথা-কাটাকাটি হয় ; ব্যাপারটা অভাব-ঘটিত। স্ত্রী বলেন, আমার যা কিছু ছিল সবই বাঁধা প'ড়ল ; আর পরবার একখানা কাপড়ও নাই। ডাক্তারবাবু তিরস্কার করিয়া রাগিয়া বাড়ী হইতে বাজারে কাপড় ক্রয় করিতে চলিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীও অভিমান করিয়া ঘরে শুইয়া আছেন। কন্যাটী কিছু বুঝিতে না পারিয়া মার কাছে যাইতেছে ; কিন্তু আদরের বদলে প্রহার লাভ করিয়া কাঁদিতেছে।
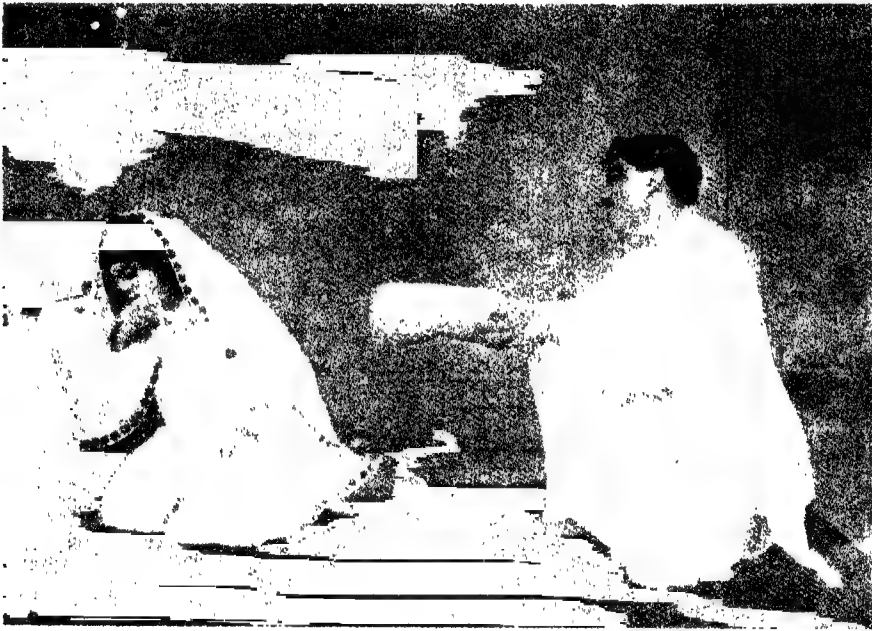
স্ত্রী ও স্বামী।

স্বামী। "রাগ কোরো না চেয়ে দেখ, নতুন দেশী কাপড় এনেছি।" স্ত্রী। (অভিমানভরে বসিয়া আছে)।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্রাহ্মণ-পুত্র এই ভাবিতে-ভাবিতে প্রবেশ করিলেন, "সহরে যার নিজের বাড়ী নাই, আর অবস্থাও ভাল নয়—পরিবারবর্গ নিয়ে তার সহরে বাস করা মহাপাপের ফল।"

দ্বিতীয় পর্ব্ব

দেনার দায়

অভাবের জ্বালায় ডাক্তারবাবু স্ত্রীর যা দু'-একখানা গহনাপত্র ছিল, একে একে সমস্তই বাঁধা দিয়াছেন। মাত্র একগাছি হার, চুড়ি ও একজোড়া বালা আছে।

কিছুক্ষণ পরেই কাপড় কিনিয়া ডাক্তারবাবু বাটীতে ফিরিলেন। স্ত্রী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া, অভিমানভরে দালানে আসিয়া পাছু ফিরিয়া বসিয়া রহিল। ডাক্তারবাবু স্ত্রীর এই ভাব দেখিয়া, নিকটে আসিয়া, কাপড়ের বাণ্ডিলটী দুই হাতে লইয়া, থিয়েটারী ধরণে বসিয়া, একটু ঘাড় হেলাইয়া কহিলেন, "আর ও কাপড় পরতে হবে না, রাগ কোরো না, চেয়ে দেখ, নতুন দেশী কাপড় নিয়ে এসেছি।" মনে-মনে কহিলেন, "দেহি দৃষ্টি সুন্দরমুদারম্।" তখন বাহিরে বাড়ীওয়ালা ডাকিতেছেন, "ডাক্তারবাবু আছেন ?" "হাঁ,

যাই" বলিয়া কাপড় রাখিয়া ডাক্তারবাবু বাহিরের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

বাড়ীওয়ালাকে গম্ভীর ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া ডাক্তারবাবু মনে-মনে প্রমাদ গণিলেন। প্রকাশ্যে হাসিয়া কহিলেন, "আজ আমার সৌভাগ্য—আপনার পায়ের ধলো প'ড়েছে।"

"না—না, সে কি কথা। তা দেখুন ডাক্তারবাবু! আমার এ বাড়িটার বিশেষ আবশ্যক। আপনাকে তো আর নোটাস দিতে পারি নে। আপনি অন্য বাড়ী দেখুন।

"না, না, তাই বলছি। তবে কি জানেন, এখন হাতটা বড় টানাটানি যাচ্ছে, আর—"

কথাটা শেষ হইতে না হইতেই, বাড়ীওয়ালা একেবারে একটু রুদ্ধ স্বরে "ও আর টার চ'লবে না, আপনি অন্য বাড়ী দেখবেন।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"রাগের কি কারণ আছে, বসুন, বসুন।"

"রাগের অনেক কারণ আছে। মেয়েছেলে যে এমন হয়, জানতুম না।"

বাবু ও মাড়োয়ারী।

বাবু। "হাম ডক্তারী পাশ হায়।"

মাড়োয়ারী। "হাম কাহকা আদমী মা হা কি এ এম এ পাশ নেহি মাংতা।"

আর এই কটা দিন বাদেই ভাড়াটা চুকিয়ে দিয়ে উঠে যাবেন।"

অপ্রত্যাশিত কথাটা শুনিয়া ডাক্তারবাবু মনে-মনে খুব দমিয়া গেলেন। হাতে একটাও পয়সা নেই,—ভায় দু'মাসের ভাড়া বাকী আছে। এ কটা দিন গেলেই তিন মাসের জমবে। খুব বিনীত ভাবে ডাক্তারবাবু কহিলেন, "আপনার কি নিতান্তই আবশ্যক?"

"তা নইলে কি অমনি বলতে এসেছি।"

ডাক্তারবাবু খুব ধীর ভাবে কহিলেন, "আপনি বসুন না।"

"না, এখন আর বসবার সময় নাই। আপনি বাকী ভাড়াটা আজই চুকিয়ে দেবেন।" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ডাক্তারবাবু পূর্ব্বদিনের বাড়ীওয়ালার স্ত্রীর ও বাড়ীওয়ালার সমস্ত ব্যাপার শুনিয়াছিলেন; এবং তাঁহার স্ত্রীও যে সেই ব্যাপারে ছিল, তাহাও জানিতেন। মনে-মনে ভাবিলেন "সবই আমার অদৃষ্ট: তা নইলে এ ব্যাপারই বা ঘটবে কেন! ওঃ, কি বরাতই নিয়ে জন্মেছিলুম! আর কি কুক্ষণে বাবা

ডাক্তারী পড়তে পাঠিয়েছিলেন! এর চেয়ে যদি পটল ফেরী ক'রতে শেখাতেন, আজ সুখে থাকতুম। না, আর এ ছাই ডাক্তারী ক'রব না। অন্য কিছু ব্যবসা ক'রব। কিন্তু টাকা কৈ? না, চাকরীই ক'রব। তার পর যা অদৃষ্টে আছে, তাই হবে। এই টেবিল, চেয়ার, আলমারী সব বেচে

ত্রস্ত ভাবে রেস টিকিট ক্রয়।

পাঁচু ডাক্তার! (মনে মনে "টিকিট পাই কি না পাই")।

ফেলব। আর ডাক্তারী বই! ওঃ, আমার কত যত্নের বই! কি হবে? স~ হকারকে ডেকে বেচে ফেলব। যা হয়, এক ছিচও তো চলবে।"

দেন দরখাস্ত লিখিয়া, একটা কাল কোট

অভাবের জ্বালায় ডাক্তা লইয়া চাকরীর চেষ্টায় বাহির হইয়া গহনাপত্র ছিল, একে একে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আজ একটা একগাছি হার, চুড়ি ও একজোড়াটা ফিরব।

স্মা গিয়াছে,—ডাক্তারবাবু এখন অফিস কোয়ার্টারে। দরখাস্ত পকেটে পরিচিত-অপরিচি অনেকের ছোট-বড় অফিসে উঠা নামা করিয়া, ডাক্তারবা ক্লান্ত হইয়া ফুটপাথের ধারে একটা গাছতলায় আসিয় দাঁড়াইয়াছেন। আহা! বেচারীর অবস্থা দেখিলে চোখে জল আসে, তখনও তাঁর খাওয়া হয় নি। অপরিচিত ব্যক্তি তবু দু'একটা কথা কহিয়াছে;—পরিচিতেরা এত ব্যস্ত যে ভাল ক'রে কথা কইতেই পারেন নি।

ডাক্তারবাবু ধীরে-ধীরে লালদীঘির ভিতরে বিলাতি খেজুর-কুঞ্জে আসিয়া বসিলেন। হাতে এক ঠোঙা চাল কড়াই ভাজা,—বাঙ্গালী কেরাণীবাবুর প্রিয় জলখাবার। দেখিলেন, তাঁর মত রৌদ্রতপ্ত বেগুনবৎ অনেকগুলি বাঙ্গালী বাবু বসিয়া আছেন। সকলেরই মুখ জ্যোতিঃহীন, চ নিষ্প্রভ, শরীর ম্যালেরিয়া-পীড়িতের মত। কিন্তু মাথা

সকলেরই তেড়ি, মুখে বিঁড়ি, আর পায়ে পরিষ্কার পাদুকা।

ডাক্তারবাবু চাল-কড়াইভাজাগুলি খাইয়া, লালদীঘির পরিষ্কার জল আকণ্ঠ পান করিলেন; মুখে চোখে জল দিলেন, শরীরটা একটু শীতল হইল। হঠাৎ স্ত্রীর কথা মনে পড়িয়া গেল। মনে করিলেন, তার কি খাওয়াদাওয়া হ'য়েছে! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চাকরীর বিষয়ে নিরাশ হইয়া বাটীর দিকে চলিলেন। তখন বেলা তিনটা। রাস্তায় যাইতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন, কে ডাকিতেছে—পাঁচুগোপাল, পাচুগোপাল! চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিলেন, একটা বাড়ীর গাড়ী হইতে একটী ভদ্রলোক ডাকিতেছে। একটু নিকটে আসিয়াই চিনিতে পারিয়া কহিলেন, "আরে নরেন! কেমন, ভাল তো?"

"হাঁ ভাই, একরকম চ'লে যাচ্ছে। তুমি কেমন?"

"আমারও অমনি চ'লচে।" মনে মনে কহিলেন, যা চ'লচে তা আমিই জানি।

নরেনবাবু কহিলেন, "একদিন এসো।"

"আচ্ছা ভাই।" নরেনের গাড়ী চলিয়া গেল। ডাক্তারবাবু ভাবিতেছেন। এরই নাম অদৃষ্ট। এই নরেন, একে আমরা ক্লাসশুদ্ধ চাষা ব'লে ডাকতুম,—ওর আজ এই অবস্থা। আর বিদ্যেও ফোর্থ ক্লাস পর্য্যন্ত। আর আমি? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তারবাবু চলিতে-চলিতে চিৎপুর ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হকার হাঁকিয়া খবরের কাগজ বেচিতেছে। একখানি বাঙ্গলা কাগজ কিনিয়া পাতা উল্টাইতেই, বিজ্ঞাপন কলমে দেখিলেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় মাড়োয়ারী ফার্ম্মের জন্য একটী বাঙ্গালীবাবু চাই।

রেসে হারিয়া গিয়া চিন্তা।

পাঁচু ডাক্তার। (মনে মনে "ওঃ যদি চায়না এগে লাগাতুম।।"

ডাক্তারবাবু আশার শেষ আলোকরশ্মি ধরিয়া সেই ঠিকানায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শেঠজী তখন গদীতে বসিয়া, বাক্সের উপর খাতা খুলিয়া, চোখে চসমা দিয়া, হিসাব করিতেছেন। ডাক্তারবাবু সম্মুখে যাইয়া 'রাম রাম, বাবু সায়েব!' বলিয়া গদীর একপাশে বসিয়া পড়িলেন। শেঠজী চসমাটা কপালে আটকাইয়া দিয়া কহিলেন "আপ কেয়া মাংতা?"

"আপকা লোকের দরকার হায়, কাগজমে দেখা, তাই আয়া।"

তৃতীয় পর্ব্ব।

পথে পথে।

প্রায় দশ দিন হইল ডাক্তারবাবু স্ত্রীকে তার বাপের বাটী বরানগরে পাঠাইয়া দিয়াছেন। জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া বাড়ীভাড়া প্রভৃতি মিটাইয়া দিয়া ভবানীপুরে একটা মেসে আসিয়া বাস করিতেছেন। কাজ-কর্ম্ম কিছু জোগাড় করিতে পারেন নাই। তবে মনে-মনে সঙ্কল্প করিয়াছেন, আজ

কাবুলী ও মাতাল ডাক্তার।

কাবুলী। "এঃ সুদ লে আও।" ডাক্তার। "এ সময় সুদ কি বাবা!—স'রে পড়।"

"আপ দেশী হিসাব জানতা?"

ডাক্তারবাবু বিনীতভাবে দরখাস্তখানি হাতে করিয়া কহিলেন, "শেঠজী! হাম দেশী হিসাব জানতা নেই বটে, তবে হাম ইংরাজী হিসাব খুব ভাল জানতা। হাম ডাক্তারী পাশ হায়।"

শেঠজী হাত তুলিয়া দাড়ি নাড়িয়া কহিলেন "হাম কামকা আদমী মাঙতা,—বি-এ, এম-এ পাশ নেহি মাংতা।"

সেখান হইতে নিরাশ অন্তঃকরণে উঠিয়া ডাক্তারবাবু বাটীর দিকে চলিলেন। তখন বেলা পাঁচটা।

হইতে রেস খেলিবেন। আজই শনিবার খিদিরপুরের মাঠে ঘোড়দৌড়।

কলিকাতার ইতর, ভদ্র, বালক, বৃদ্ধ, বাঙ্গালী, ইংরেজী মাড়োয়ারী, মুসলমান প্রভৃতি অনেকেই আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল, এবং তার সঙ্গে একটা চিন্তায় অভিভূত। যেন এক দল উন্মাদ একদিকে ছুটিয়াছে,—এক জায়গায় দলবদ্ধ হইয়াছে। শূন্য ময়দান আজ নর-সমুদ্র। এতগুলির মধ্যে আমাদের ডাক্তারবাবুও আসিয়াছেন।

আজ আর ডাক্তারবাবুকে চিনিবার উপায় নাই। কাল পাঞ্জাবী গায়, দিল্লীর নাগরা পায়,—হাতে খবরের কাগজ ও রেশিং-গাইড, সিগারেট তো আছেই। প্রথম বাজী দৌড় হয় হয়, এমন সময় ডাক্তারবাবু দৌড়িয়া যাইয়া টিকিট কিনিয়া আনিলেন।
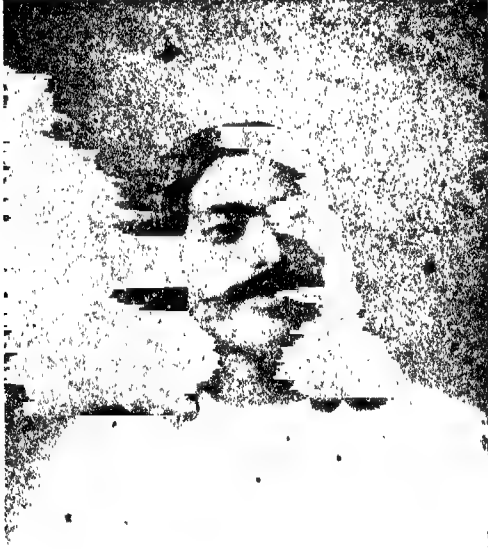
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন পাইন
(ইনিই গল্পের লেখক; এবং চিত্রের সমস্ত ভূমিকার অভিনেতা)।

ঘোড়া দৌড়িল, নর-সমুদ্র মধ্যে আশা ও নিরাশার ভাব-তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। প্রথম বাজী শেষ হইয়াছে; সকলে বলিয়া উঠিল "রুবে ফার্ষ্ট।" ডাক্তারবাবু পুলক-চঞ্চল হৃদয়ে দ্রুতপদে যাইয়া জিতের টাকা লইয়া আসিলেন। ভাবিলেন এইবার বুঝি বরাত ফিরিল। চারিদিকে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। এখনি দ্বিতীয় বাজী আরম্ভ হইবে। ডাক্তারবাবু দ্বিগুণ উৎসাহে একটা বেশী দরের ঘোড়ায় সমস্ত টাকা লাগাইয়া দিলেন।

আবার ঘোড়া দৌড়িয়াছে, নর-সমুদ্র পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক তরঙ্গায়িত; দ্বিতীয় বাজি শেষ হইয়াছে—"চায়না এগ্ ফার্ষ্ট!"

সর্ব্বনাশ! ডাক্তারবাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল। কথাটা বিশ্বাস হইল না। তিনি পাগলের মত লোককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সকলের মুখেই এক কথা "চায়না এগ্।"

তখন ডাক্তারবাবুর গলা শুকাইয়া গিয়াছে, চোখে ধোঁয়া দেখিতেছেন। সিগারেটের আগুনে আঙ্গুল পোড়ে-পোড়ে; কিন্তু পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন, "ওঃ, যদি চায়না এগে লাগাতুম।"

প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, ডাক্তার বাবু মদের বোতল হাতে রাস্তায় চলিয়াছেন। সম্মুখে পাওনাদার কাবুলী লাঠি উঠাইয়া ডাক্তারবাবুকে বলিতেছে—"এঃ, সুদ লে আও।"

ডাক্তারবাবু এখন নেশায় চুর-চুরে;—কাবুলীকে বলিতেছেন—"এ সময় সুদ কি বাবা! স'রে পড়।"

ডাক্তারবাবু এখন মাতাল, দেনদার, রাস্তার ভিখারী। মদই এখন তাঁর বন্ধু,—মদের দোকানই শান্তি-আশ্রম। ডাক্তারবাবুর কেন এমন হলো? শিক্ষার অভাবে? না, অদৃষ্টের দোষে?

প্রথম ভাগ

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

নামটী তাহার নিধিরাম
 এই গাঁয়েতে বাড়ী,
বড়ই জবর গাড়োয়ান,
 চালায় গরুর গাড়ী।
একটী তাহার ছোট্ট ছেলে
 সবাই ডাকে 'নিতে,'
এই বয়সেই বাপকে পারে
 তামাক সেজে দিতে।
হেসে নিধু একটী দিবস
 আমার কাছে এলো,
বল্লে' "বাবু, বিদ্যারম্ভের
 দিনটা কবে ভালো?

দেখুন দেখি বেটাকে কি
মূর্খ করে থোবো,
ভাবছি তারে এবার থেকে
পাঠশালাতে দেবো।
আর দেখুন এ প্রথম ভাগটা
ছিল আমার ঘরে,
হয়নি পড়া, ছেড়েছিলাম
আধেকখানা পড়ে।
বাবার আমার হাতের কেনা
ফেলবো কেন ছিঁড়ি,
অমূল্য ধন নয়ত উহা
তুচ্ছ সামগ্‌গিরী।"
এতেক বলি বইখানিকে
প্রণাম ক'রে কত,
দিলে নিধু আমার হাতে
ফুল-তুলসীর মত।
লেগে আছে এখনো তায়
হাত-খড়িরই গুঁড়ি
ভক্তি এবং বিস্ময়ে তার
পাতটা আছে জুড়ি।
অভ্রভেদী মন্দিরের এই
প্রথম সোপান পরে,
প্রণাম করে ফিরেছে সে
কৃতাঞ্জলি করে।

প্রসাদী এই কমল-কলির
ভাঁজ খোলেনি তাই,
কি আছে এই কৌটা মাঝে
দেখতে চাহে নাই।
বংশে যদি যোগ্যতর
জন্মে তাহার কেহ,
সেই আশাতে রেখেছিল—
ধন্য তাহার স্নেহ।
আমরা ভুল মাহাত্ম্য যে
থাকি বাণীর কাছে;
অকৈতব ভক্তি যা, তা
ওদের কাছেই আছে।
বীণাপাণির ভাণ্ডারেতে
পেলাম কি তাই ভাবি;
মাণিক আছে তারাই ভাবে,
পায়নি যারা চাবী।
ওরাই শুধু পায় যে সুধা,
আমরা ত পাই আলো;
বুঝতে নারি সত্য কাহার,
কাহার দেখা ভালো।
দেখছি আমি পুরাতন এক
তুচ্ছ প্রথম ভাগ,
ও তার পাতে দেখাচ্ছে কোন্
দেবীর চরণ-দাগ।

ভৌগোলিক অনুসন্ধান

[শ্রীসত্যভূষণ সেন]

আমাদের দেশে ভূগোল বিষয়ের আলোচনা খুবই কম। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের পক্ষে উপযোগী অনুপযোগী যাহাই হউক, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আমাদের গতি নাই, অন্ততঃ এখনও হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমরা যে শিক্ষা লাভ করি, তাহাই সাধারণতঃ আমাদের জীবনের মূল ভিত্তি। সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ব্যবস্থায় এখন ভূগোল-বিবরণ আর অবশ্য পঠনীয় নয়; কাজেই ভূগোলের সংস্পর্শে না আসিয়াও যে কেহ বিশ্ববিদ্যালয় পার হইয়া যাইতে পারে। বৈকল্পিক ভাবে ভূগোল পড়িবার ব্যবস্থায় যাহারা পড়ে, তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। যাহারা ভূগোল পড়ে না, তাহাদের এই পৃথিবীটার কোথায় কি আছে না আছে, সে সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানও লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। এই সেদিনই একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি বলিতে-ছিলেন যে, খবরের কাগজে উল্লিখিত অনেক যায়গার

অবস্থান বুঝিতে না পারিয়া বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হয়। ভদ্রলোক দুই একজন বিশিষ্ট বন্ধুর নিকট কথাটা বলিয়া একখানা ভূগোলের সন্ধান করিতেছিলেন। আমাদের সময় ভূগোল অবশ্য পঠনীয় ছিল; কাজেই অন্ততঃ বড়-বড় যায়গার অবস্থান বুঝিতে গিয়া দুর্ভাবনায় পড়িতে হইত না। ভূগোল-বিদ্যার আদর আমাদের সময়ও বেশী ছিল না, এখনও নাই। তা না হইলে পদার্থ-বিদ্যা এবং বিশেষ করিয়া রসায়ন-শিক্ষার্থীদিগের জন্য কলেজে স্থান সংকুলান করা যায় না; আর ভূগোলের বেলায় ম্যাট্রিকুলেশন ছাড়িয়া কলেজেও ভূগোল পড়ে এমন ছেলে প্রায় দেখা যায় না;—ভূগোল পড়াইবার বন্দোবস্তও বর্ত্তমানে খুব কম কলেজে আছে। ইহার কারণ বোধ হয় যে, ভূগোলের উপকারিতা ততটা প্রত্যক্ষ নয়; কাজেই সাধারণতঃ লোকে ইহার মধ্যে ততটা রসও পায় না। ভূগোলের উপকারিতা কি, কোন্ কোন্ স্থলে ভূগোলের বিদ্যার দরকার হয় এবং সে সব বিষয়ে সাধারণ লোক কতটা অজ্ঞ, দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। অবশ্য যাঁহারা উচ্চ-শিক্ষিত, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না; যাহারা আমাদেরই মত অর্দ্ধশিক্ষিত, তাঁহাদিগকেই সাধারণ লোক বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। অনেকের Standard time ও Local time এর সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা নাই; আগেকার Railway time-এর সঙ্গে বর্ত্তমান Standard time-এর পার্থক্য কোথায় এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে Local time-এর বা কত বিভিন্নতা হইতে পারে, এ সব তাঁহারা জানেন না। ঋতুভেদে দিনও রাত্রির পরিমাণে পার্থক্য, স্থানবিশেষে সেই পার্থক্যের পরিমাণ, এ সব তাঁহাদের চিন্তায়ও আসে না। মেঘ, বৃষ্টি, বাত্যা, বিদ্যুৎ, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, জোয়ার, ভাটা এ সকল কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। যাহারা নব পর্য্যায়ের ভূগোলের সঙ্গে পুরাপুরি অসহযোগিতা করিয়াই বসিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা যায়, চিন্তার বিষয়। এই ত গেল সাধারণ কথা। এই সব বিষয়ে কৌতূহল হইলে যে কেহ বই পড়িয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতে পারেন। কিন্তু এ সব ছাড়াও ভূগোলের আর একটা দিক আছে, সেটা অনুসন্ধানের দিক;—যেগুলি আমাদের জানা নাই, সে সব দেশ অথবা স্থান আবিষ্কারের কথা। আমরা এখন পৃথিবীর যতগুলি দেশের খবর জানি, চিরকালই যে এই সব আমাদের জানা ছিল, তা নয়। শিক্ষা এবং সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, যেমন আর সকল বিষয়েও আমাদের জ্ঞান বাড়িতেছে, তেমনই ক্রমে-ক্রমে অনেক নূতন দেশের খবর আমরা জানিতে পারিতেছি, যে সব দেশের অস্তিত্বও আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না।

আমেরিকা আবিষ্কার প্রায় সাড়ে পাঁচশত বৎসরের কথা। তার আগে আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ ছিল। বর্ত্তমানের তুলনায় তখনকার কালে আমাদের সামর্থ্যও ছিল সামান্য; পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও ছিল অপরিণত; কাজেই ঘটনাচক্রে আমেরিকার মত এত বড় একটা দেশই আবিষ্কৃত হইতে পারিল। এখন আর সেদিন নাই। ক্রমশঃ অনুসন্ধানের ফলে আমরা এতটা জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, আমরা এখন নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, যে আমেরিকার মত এত বড় একটা দেশ আর অনাবিষ্কৃত পড়িয়া নাই। বাস্তবিক পক্ষে অনাবিষ্কৃত দেশ আর নাই বলিলেই চলে। পৃথিবীর কোথায় কি আছে, সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান অমাদের খুবই আছে। কেবল কতকগুলি স্থান অত্যন্ত দুর্গম বলিয়া এখনও সভ্য-জগতের জ্ঞান-গোচরে আনিতে পারা যায় নাই। এই সকল দুর্গম স্থানগুলি অধিকারে আনা, স্থলবিশেষে যাতায়াত করিয়া স্থানীয় তথ্য সংগ্রহ করা এবং দেশগুলির সহিত পরিচিত হওয়া, ইহাই বর্ত্তমানে আবিষ্কারের কাজ। এইরূপ আবিষ্কারের কাজও ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছে।

এই সে দিনের কথা—আমাদের এই বিংশ শতাব্দীতে ভৌগোলিক জগতের এক বিরাট আবিষ্কার সমাধা হইল। যে দিন আমেরিকার বীরপুরুষ উত্তর মেরুতে যাইয়া জাতীয় পতাকা উড্ডয়ন করিয়া আসিলেন, ভৌগোলিক ইতিহাসে সে একটা স্মরণীয় দিন। এই আবিষ্কারের জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে কত বার কত চেষ্টা হইয়াছে, কত বীরপুরুষ এই চেষ্টায় প্রাণ হারাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই; তবু ত চেষ্টার বিরাম ছিল না। Peary সাহেব বলিয়াছেন যে, তাঁহার জীবনের বিশ বৎসর এই আবিষ্কারের চেষ্টাই ছিল তাঁহার নিদ্রার স্বপ্ন, জাগ্রতের ধ্যান। যাহারা খবর রাখেন, তাঁহারাই জানেন, এ সব অভিযানে কত বিপদ, কত অনিশ্চয়তার মধ্যে অগ্রসর হইতে হয়। কোথায় কত অভাবনীয় ব্যাপার আসিয়া তাঁহাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে; তখন

দেখুন দেখি বেটাকে কি
 মূর্খ করে থোবো,
ভাবছি তারে এবার থেকে
 পাঠশালাতে দেবো।
আর দেখুন এ প্রথম ভাগটা
 ছিল আমার ঘরে,
হয়নি পড়া, ছেড়েছিলাম
 আধেকখানা পড়ে।
বাবার দাদার হাতের কেনা
 ফেলবো কেন ছিঁড়ি,
অমূল্য ধন নয়ত উহা
 তুচ্ছ সামগ্গিরী।"
এতেক বলি বইখানিকে
 প্রণাম ক'রে কত,
দিলে নিধু আমার হাতে
 ফুল-তুলসীর মত।
লেগে আছে এখনো তায়
 হাত-খড়িরই গুঁড়ি
ভক্তি এবং বিস্ময়ে তার
 পাতটা আছে জুড়ি।
গগনভেদী মন্দিরের এই
 প্রথম সোপান পরে,
প্রণাম করে ফিরেছে সে
 কৃতাঞ্জলি করে।

প্রসাদী এই কমল-কলির
 ভাঁজ খোলেনি তাই,
কি আছে এই কৌটা মাঝে
 দেখতে চাহে নাই।
বংশে যদি যোগ্যতর
 জন্মে তাহার কেহ,
সেই আশাতে রেখেছিল—
 ধন্য তাহার স্নেহ।
আমরা ভুলি মাহাত্ম্য যে
 থাকে বাণীর কাছে;
অকৈতব ভক্তি যা, তা
 ওদের কাছেই আছে।
বীণাপাণির ভাণ্ডারেতে
 পেলাম কি তাই ভাবি;
মাণিক আছে তারাই ভাবে,
 পায়নি যারা চাবী।
ওরাই শুধু পায় যে সুধা,
 আমরা ত পাই আলো;
রাতে নারীর সভা কাহার,
 বাহার দেখা ভালো।
দেখছি আমি পুরাতন এক
 ছেঁড়া প্রথম ভাগ,
ও তার পাতে দেখাচ্ছে কোন্
 দেবীর চরণ-দাগ।

ভৌগোলিক অনুসন্ধান

[শ্রীসত্যভূষণ সেন]

আমাদের দেশে ভূগোল বিষয়ের আলোচনা খুবই কম। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের পক্ষে উপযোগী অনুপযোগী যাহাই হউক, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আমাদের গতি নাই, অন্ততঃ এখনও হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমরা যে শিক্ষা লাভ করি, তাহাই সাধারণতঃ আমাদের জীবনের মূল ভিত্তি। সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ব্যবস্থায় এখন ভূগোল-বিবরণ আর অবশ্য পঠনীয় নয়; কাজেই ভূগোলের সংস্পর্শে না আসিয়াও যে কেহ বিশ্ববিদ্যালয় পার হইয়া যাইতে পারে। বৈকল্পিক ভাবে ভূগোল পড়িবার ব্যবস্থায় যাহারা পড়ে, তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। যাহারা ভূগোল পড়ে না, তাহাদের এই পৃথিবীটার কোথায় কি আছে না আছে, সে সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানও লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। এই সেদিনই একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি বলিতেছিলেন যে, খবরের কাগজে উল্লিখিত অনেক যায়গার

অবস্থান বুঝিতে না পারিয়া বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হয়। ভদ্রলোক দুই একজন বিশিষ্ঠ বন্ধুর নিকট কথাটা বলিয়া একখানা ভূগোলের সন্ধান করিতেছিলেন। আমাদের সময় ভূগোল অবশ্য পঠনীয় ছিল; কাজেই অন্ততঃ বড়-বড় যায়গার অবস্থান বুঝিতে গিয়া দুর্ভাবনায় পড়িতে হইত না। ভূগোল-বিদ্যার আদর আমাদের সময়ও বেশী ছিল না, এখনও নাই। তা না হইলে পদার্থ বিদ্যা এবং বিশেষ করিয়া রসায়ন শিক্ষার্থীদিগের জন্য কলেজে স্থান সংকুলান করা যায় না; আর ভূগোলের বেলায় ম্যাট্রিকুলেশন ছাড়িয়া কলেজেও ভূগোল পড়ে এমন ছেলে প্রায় দেখা যায় না;—ভূগোল পড়াইবার বন্দোবস্তও বর্ত্তমানে খুব কম কলেজে আছে। ইহার কারণ বোধ হয় যে, ভূগোলের উপকারিতা তত্টা প্রত্যক্ষ নয়; কাজেই সাধারণতঃ লোকে ইহার মধ্যে ততটা রসও পায় না। ভূগোলের উপকারিতা কি, কোন্ কোন্ স্থলে ভূগোলের বিদ্যার দরকার হয় এবং সে সব বিষয়ে সাধারণ লোক কতটা অজ্ঞ, দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। অবশ্য যাহারা উচ্চ-শিক্ষিত, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না; যাহারা আমাদেরই মত অর্দ্ধশিক্ষিত, তাঁহাদিগকেই সাধারণ লোক বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। অনেকের Standard time ও Local timeএর সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা নাই; আগেকার Railway time-এর সঙ্গে বর্ত্তমান Standard time-এর পার্থক্য কোথায় এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে Local time-এর বা কত বিভিন্নতা হইতে পারে, এ সব তাঁহারা জানেন না। ঋতুভেদে দিনও রাত্রির পরিমাণে পার্থক্য, স্থানবিশেষে সেই পার্থক্যের পরিমাণ, এ সব তাঁহাদের চিন্তায়ও আসে না। মেঘ, বৃষ্টি, বাত্যা, বিদ্যুৎ, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, জোয়ার, ভাটা এ সকল কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। যাহারা নব পর্য্যায়ের ভূগোলের সঙ্গে পুরাপূরি অসহযোগিতা করিয়াই বসিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা যায়, চিন্তার বিষয়। এই ত গেল সাধারণ কথা। এই সব বিষয়ে কৌতূহল হইলে যে কেহ বই পড়িয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতে পারেন। কিন্তু এ সব ছাড়াও ভূগোলের আর একটা দিক আছে, সেটা অনুসন্ধানের দিক;—যেগুলি আমাদের জানা নাই, সে সব দেশ অথবা স্থান আবিষ্কারের কথা। আমরা এখন পৃথিবীর যতগুলি দেশের খবর জানি, চিরকালই যে এই সব আমাদের জানা ছিল, তা নয়। শিক্ষা এবং সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, যেমন আর সকল বিষয়েও আমাদের জ্ঞান বাড়িতেছে, তেমনই ক্রমে-ক্রমে অনেক নূতন দেশের খবর আমরা জানিতে পারিতেছি, যে সব দেশের অস্তিত্বও আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না।

আমেরিকা আবিষ্কার প্রায় সাড়ে পাঁচশত বৎসরের কথা। তার আগে আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ ছিল! বর্ত্তমানের তুলনায় তখনকার কালে আমাদের সামর্থ্যও ছিল সামান্য; পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও ছিল অপরিণত; কাজেই ঘটনাচক্রে আমেরিকার মত এত বড় একটা দেশই আবিষ্কৃত হইতে পারিল। এখন আর সেদিন নাই। ক্রমশঃ অনুসন্ধানের ফলে আমরা এতটা জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, আমরা এখন নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, যে আমেরিকার মত এত বড় একটা দেশ আর অনাবিষ্কৃত পড়িয়া নাই। বাস্তবিক পক্ষে অনাবিষ্কৃত দেশ আর নাই বলিলেই চলে। পৃথিবীর কোথায় কি আছে, সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান অমাদের খুবই আছে। কেবল কতকগুলি স্থান অত্যন্ত দুর্গম বলিয়া এখনও সভ্য-জগতের জ্ঞান-গোচরে আনিতে পারা যায় নাই। এই সকল দুর্গম স্থানগুলি অধিকারে আনা, স্থলবিশেষে যাতায়াত করিয়া স্থানীয় তথ্য সংগ্রহ করা এবং দেশগুলির সহিত পরিচিত হওয়া, ইহাই বর্ত্তমানে আবিষ্কারের কাজ। এইরূপ অবিষ্কারের কাজও ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছে।

এই সে দিনের কথা—আমাদের এই বিংশ শতাব্দীতে ভৌগোলিক জগতের এক বিরাট আবিষ্কার সমাধা হইল। যে দিন আমেরিকার বীরপুরুষ উত্তর মেরুতে যাইয়া জাতীয় পতাকা উড্ডয়ন করিয়া আসিলেন, ভৌগোলিক ইতিহাসে সে একটা স্মরণীয় দিন। এই আবিষ্কারের জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে কত বার কত চেষ্টা হইয়াছে, কত বীরপুরুষ এই চেষ্টায় প্রাণ হারাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই; তবু ত চেষ্টার বিরাম ছিল না। Peary সাহেব বলিয়াছেন যে, তাঁহার জীবনের বিশ বৎসর এই আবিষ্কারের চেষ্টাই ছিল তাঁহার নিদ্রার স্বপ্ন, জাগ্রতের ধ্যান। যাহারা খবর রাখেন, তাঁহারাই জানেন, এ সব অভিযানে কত বিপদ, কত অনিশ্চয়-তার মধ্যে অগ্রসর হইতে হয়। কোথায় কত অভাবনীয় ব্যাপার আসিয়া তাঁহাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে; তখন

তাঁহারা বুঝিতে পারেন, যে মানুষের জ্ঞান কত সামান্য; তার তুলনায় তার অজ্ঞানতার পরিমাণ কত বেশী। Peary সাহেব জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করিয়া এই বিঘ্নসঙ্কুল পথে ভ্রাম্যমান ধূমকেতুর ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে জীবনের অপরাহ্ণ-কালে সে দিন উত্তর মেরুতে আসিয়া তাঁহার জীবনের চরম স্বপ্নের সার্থকতা লাভ করিলেন। তাঁহার মনুষ্যজন্ম সার্থক হইল, তাঁহার দেশও তাঁহার কীর্ত্তিতে সম্মানিত হইল।

বর্ত্তমান শতাব্দীর আর একজন পর্য্যটকের কথাও আমাদের পরিচিত। ইনি সুইডেনের বিশ্ববিখ্যাত নোবেল (Nobel) সাহেবের বন্ধু—ডাক্তার স্বেন হেডিন (Dr. Sven Hedin)। হেডিন সাহেবের পর্য্যটন-কাহিনী অতি বিস্তৃত, তাঁহার একখানা পুস্তকের নাম—From Pole to Pole. তিনি দেশে দেশে কত তুষারের রাজ্য, কত মরুভূমির প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে পর্য্যটন করিয়া যে সকল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া জীবন বহন করিয়া লইয়া বেড়াইয়াছেন, তাহার কাহিনী পাঠ করিলেও অভিভূত হইতে হয়।

তার পরে তিনি হিমালয় পর্য্যটন করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসিবার আয়োজন করেন। ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জ্জন গুণী ব্যক্তির প্রীতি সৌজন্য দেখাইবার অভিপ্রায়ে পর্ব্বত-পর্য্যটনে হেডিন সাহেবকে সাহায্য করিবার জন্য তিনজন দেশীয় ওভারসিয়ারকে ৬ মাস কাল যথোপযোগী শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় হেডিন সাহেবের আসিবার পূর্ব্বেই লর্ড কার্জ্জন অবসর গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। লর্ড মিন্টোর আমলে বিটিশ গবর্ণমেণ্ট হেডিন সাহেবকে ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে প্রবেশের অনুমতি দিতে অসম্মত হইলেন। হেডিন সাহেব ইহাতে তাঁহার অভিযানের সংকল্প ছাড়িয়া দিলেন না; বরং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া তিনি যে পন্থা অবলম্বন করিলেন, তাহা স্বাধীন দেশের লোকের প্রকৃতিতেই সম্ভবে। তিনি নিজের দায়িত্বে তিব্বত পরিভ্রমণ করিয়া প্রকাণ্ড তিন খণ্ড পুস্তকে তাঁহার পর্য্যটন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এ সখের ভ্রমণ-কাহিনী নয়। এই পুস্তকের শত শত চিত্র তাঁহার নিজের হাতে আঁকা; আর তাঁহার অভিযানে কত বিরাট আয়োজন করিতে হইয়াছিল, তাহার পরিচয়ে এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কতকগুলি পার্ব্বত্য হ্রদে বিচরণ করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি এই শত শত ক্রোশ-ব্যাপী দীর্ঘ পথ বহিয়া একখানা নৌকা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই এক অভিযানেই খরচ হইয়াছিল লক্ষ টাকারও অধিক। তিব্বতীয়েরা অমনই তাহাদের দেশে কোন বিদেশীয়কে আমল দেয় না; তার উপরে আবার কতকগুলি বিধি-ব্যবস্থা সন্ধি-সূত্রের জোরে তিব্বত দেশে ইউরোপীয়দের প্রবেশ বিশেষ ভাবেই নিষিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই সব জানিয়া-শুনিয়াও হেডিন সাহেব শুধু ভৌগোলিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সমস্ত বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া নিজকে বার বার বিপন্ন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিব্বতের মানচিত্রের বর্ত্তমান সুস্পষ্ট অবস্থা হেডিন সাহেবেরই কৃতিত্বের পরিচায়ক।

আমাদের দেশে হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে একটা আবিষ্কারের বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা হিমালয়কে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত একটা অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী বলিয়াই জানি; কিন্তু এই পর্ব্বতশ্রেণীই যে ইহার উত্তর দক্ষিণের বিস্তৃতিতে কতটা জায়গা জুড়িয়া রহিয়াছে, সে জ্ঞান অনেকেরই নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, নেপাল, ভূটান এবং সিকিম সম্পূর্ণভাবে এবং তিব্বতেরও অনেকটা অংশ এই হিমালয়ের সীমানার মধ্যেই অবস্থিত। তিব্বতের সমগ্র প্রদেশটাই প্রায় সভ্য জগতের কাছে অপরিচিত—বিদেশীয়দের (বিশেষতঃ ইওরোপীয়দের) কাছে ওটা নিষিদ্ধ প্রদেশ (forbidden land)। বস্তুতঃ মানচিত্রে হিমালয়ের পর্ব্বতরাজ্যে বিভিন্ন প্রদেশের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেখান হয় বটে; কিন্তু অনেকটা অংশ এখনও জরীপ করা হয় নাই। ভিন্ন-ভিন্ন কালের পর্য্যটকেরা আসিয়া যে কথা বলেন, তাহাই ঐ সব দেশের আধুনিকতম তথ্য। তিব্বতের মানচিত্রে অনেকটা স্থান unexplored (অনাবিষ্কৃত) বলিয়া লিখিত ছিল; হেডিন সাহেব এই অনাবিষ্কৃত দেশের অনেক খবর সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছেন।

আমাদের দেশে যাঁহারা হিমালয় পর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই সাধু সন্ন্যাসীর দল; আর বাকী যাঁহারা, তাঁহারাও প্রায়ই তীর্থদর্শনপ্রয়াসী;—তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট পথে আসিয়া তীর্থদর্শন করিয়া আবার গতানুগতিক ভাবেই ফিরিয়া যান। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভ্রমণকাহিনীও

লিখিয়া গিয়াছেন সত্য; কিন্তু ভৌগোলিক হিসাবে তাহার মূল্য নাই। আর যাহারা শৈল-নিবাস দেখিতে যান, তাঁহাদের জ্ঞান আরও সীমাবদ্ধ। যাহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহারা দার্জিলিংএ যান; যাহাদের সামর্থ্য আরও বেশী, তাঁহারা হয় ত শিমলা পর্য্যন্তও যান—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। চোখ বুলাইয়া যতটুকু দেখা যায়, তাঁহাদের হিমালয়ের অভিজ্ঞতা হয় ততটুকু মাত্র। দার্জিলিং শিমলা দেখিয়া যে হিমালয়ের অভিজ্ঞতা না হয়, এমন কথা বলি না; কিন্তু আমাদের যে দেখিবার চেষ্টা, জানিবার জন্য একটা ব্যাকুলতা নাই, সেইটুকুই আমাদের দুর্ব্বলতা। আমাদেরই দেশে এভারেষ্ট আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ বলিয়া পরিচিত; কিন্তু আমাদের দেশে এ জ্ঞানটুকু ভূগোলের পৃষ্ঠায়ই তোলা আছে;—এভারেষ্টের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিবার দুরাকাঙ্ক্ষায় কাহারও নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। অথচ এই হিমালয় পর্ব্বত দেখিবার জন্যই অর্দ্ধ পৃথিবীর দূরত্ব অতিক্রম করিয়া আমেরিকা হইতে দলে দলে পর্য্যটক আসিয়া থাকেন। তাঁহারা হিমালয় দেখিতে আসিয়া দার্জিলিংএ পৌছিয়া রেলপথের সমাপ্তি দেখিয়া সেখান হইতেই ফিরিয়া যান না। দার্জিলিংএর পরেও হিমালয়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিতে হইলে পর্য্যটকের নিকট যে পথ চিরদিনই উন্মুক্ত, তাহাও তাঁহারাই খুব বোঝেন। হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে কোথায় কোথায় আশ্রয়স্থল (Dak Bungalow) আছে, তাহাও তাঁহাদের অনুসন্ধানে অজানা থাকে না। আমাদের মধ্যে যাহারা দার্জিলিং হইতে যোগাড়যন্ত্র করিয়া Tiger Hill পর্য্যন্ত যাইয়া সৌভাগ্যক্রমে কোন্ সুদূরে অবস্থিত এভারেষ্টের চূড়াটুকু মাত্র দেখিতে পান কি না পান, তাঁহারাই কত বাহাদুর হইয়া ওঠেন। আর ইহারা যে সেই এভারেষ্ট দেখিবার উদ্দেশ্যে কত অসুবিধার মধ্যেও বিজন পার্ব্বত্য-প্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করেন। আমেরিকার পর্য্যটকেরাও নিঃস্ব ব্যক্তি নন; তাঁহাদের দেশেও শৈল-নিবাস আছে; বিলাসের সামগ্রীর অথবা উপভোগ করিবার শক্তি সামর্থ্যেরও তাঁহাদের অভাব নাই। তাঁহারা যে উদ্ভ্রান্তভাবে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শৈল-নিবাসে আরাম-প্রয়াসী কোন ব্যক্তির চেয়ে কম সুখ বোধ করেন, তাহা ত মনে হয় না। আমরা হিমালয়ের এসব স্থান সম্বন্ধে যেটুকু জানিতে পাইতেছি, তাহাও ইহাদেরই অভিজ্ঞতার কাহিনী পড়িয়া।

যাহারা শুধুই কাজের লোক, তাঁহারা হয় ত বলিবেন যে, এ রকম পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়া লাভ কি? এই কথাটাই যে চড়ান্ত কথা, তাহা আমরাও মানি,—কিন্তু লাভের ব্যাখ্যাটা লইয়াই যত আপত্তির কারণ। যদি টাকা আনা পাই অথবা কোন অঙ্কের সমষ্টি না দেখাইতে পারিলেই লাভ না হয়, তবে একটু বিবাদের কথাই বটে। কারণ প্যারী সাহেব যখন উত্তর মেরু আবিষ্কার করিতে যান, তিনি সেখানে গিয়া একটা সোণার খনি লাভ করিবেন, এমন আশা করিয়া যান নাই; অথবা সেখানে গিয়া ধন-ধান্য-পুষ্পে-ভরা একটা বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, এমনও দেখিতে পান নাই! সেখানে তাঁহার জয়ের অপেক্ষায় অস্ত্র-শস্ত্র গোলা বারুদে পরিপূর্ণ কোষাগার সমেত কোন দুর্গও ছিল না; অথবা কোন দেশ জয় করিয়া অধিবাসীদিগকে সুসভ্য করিবার জন্য একদল সেনাও তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল না। তবে লাভ কি হইল? উত্তর মেরুও একটা আছেই, সেখানে না গিয়াও ত আমরা তাহা জানিতাম; আর সেখানে যে বরফের রাজ্য ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাইবে না, তাহাও ত বুঝাই যায়। তবে এই স্বর্ণমৃগের সন্ধানে গিয়া যুগে যুগে এত লোক মরে কোন্ বুদ্ধিতে? সারা জীবন এই আলেয়ার পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া প্যারী সাহেবেরই বা এত বাহাদুরী করিবার কি আছে, আর তাঁহার দেশের লোকেরই বা উহা লইয়া এত নাচানাচি কেন? কেন, তাহা এক কথায় বুঝান যায় না বটে, কিন্তু দুই একটা অঙ্কের সংখ্যা দেখাইতে পারিলে সকলেরই মুখ বন্ধ হয়। যদি দেখাইতে পারা যায় যে ২৯০০০ ফিট ছাড়াইয়া ৩০০৩০ ফিট উচ্চ একটা পর্ব্বত-শৃঙ্গের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, অথবা একটা নদীর দৈর্ঘ্য মাপিয়া সেটাতে ২৫০০ মাইল দীর্ঘ বলিয়া জানা গিয়াছে, তাহা হইলে সকলেই অবনত-মস্তক হইবেন। বাস্তব পক্ষেও তাহাই ঘটিতেছে—এই অঙ্ক-সংখ্যার কথাই আসিতেছে।

যে সকল দেশ অনাবিষ্কৃত বা অজ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, সেগুলি অনাবিষ্কৃত বলিয়াই যে সোণার মাটিতে তৈয়ারী, তাহা নয়। সে সব স্থানও নদনদী হ্রদ পাহাড়

পর্ব্বত লইয়াই গঠিত, অথবা তুষারের রাজ্য, সাগরের বিস্তার অথবা মরুভূমির বালুকার দৃশ্য। পর্য্যটকেরা এসব স্থলে যাইয়া কোথায় কি আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করেন; যাহা অপরিজ্ঞাত তাহা বিজ্ঞাপিত করেন; যাহা অভিনব, অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রকৃত তথ্য প্রচার করেন। এইরূপ পর্য্যটনের ফলেই আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছিল; সাগরের গভীরতা, ভূধরের উচ্চতা পরিমাণ করিতেও এই সকল পর্য্যটকেরই দরকার হয়। হিমালয় পর্ব্বতের এই বিশাল অবয়বের মধ্যে কোথায় কি আছে, সব খবর কেহ বলিতে পারে না! পর্ব্বত-শৃঙ্গ যে কত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা শুনিলেই অবাক হইতে হয়। এগার শতেরও অধিক পর্ব্বত-শৃঙ্গ আছে, যাহাদের প্রত্যেকের উচ্চতা ২০০০০ ফিটের উপরে। তারপরে কত তুষারের দৃশ্য, কত বরফের নদী, কত নদনদী হ্রদ উপত্যকা, বন উপবন! যতগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সমস্ত পর্য্যটককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে অবশ্যই তাহার একটা হিসাব পাওয়া যায়; কিন্তু কতগুলি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, তাহা কেহ বলিতে পারে না। আবিষ্কার ছাড়াও এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যে সম্বন্ধে পূরাপুরি খবর এখনও পাওয়া যায় নাই—সেগুলি অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। এসব স্থলে অনুসন্ধানের ধারা কোন্ দিকে, তাহা চোখের সম্মুখেই দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন এভারেষ্ট পর্ব্বতের কথা।

এভারেষ্ট পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ; তাহার অর্থ এই যে, যতগুলি পর্ব্বত-শৃঙ্গ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোনটাই এভারেষ্টের মত এত উচ্চ নয়! কিন্তু বর্ত্তমানে সন্ধান পাওয়া যাইতেছে যে, এই হিমালয়ের মধ্যেই—তিব্বত প্রদেশে এমন পর্ব্বত-শৃঙ্গও আছে, যাহার উচ্চতা এভারেষ্টের চেয়েও বেশী। এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য এখনও স্থির হয় নাই। ইহা অনুসন্ধান-সাপেক্ষ।

এভারেষ্ট পর্ব্বতের নামকরণ হয় Col. Everestএর নাম হইতে। Col. Everest ছিলেন এদেশে Survey Depertmentএর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত Survey Depertment যখন এই পর্ব্বতের উচ্চতার মাপ ধরিয়া দেখিলেন যে, ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ তখন তাঁহারা অনুসন্ধানের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য তাঁহারই নামে ইহার নামকরণ হইল।

ব্রহ্মপুত্র আমাদের দেশে একটা খুব বড় নদী। শুধু বড় বলিয়া নয়—আমাদের শাস্ত্রে পুরাণে ইহার খ্যাতিও যথেষ্ট। বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক ইহার জলে স্নান করিয়া নিজেকে পবিত্র জ্ঞান করেন। কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কয়জনে খবর রাখেন যে, এই নদীর উৎপত্তি-স্থান সম্বন্ধে এখনও অনিশ্চয়তা রহিয়া গিয়াছে। সাধারণ হিসাবে আমরা জানি যে, তিব্বত হইতে ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি হইয়াছে;—তিব্বতের সামপূ (Tsampvo) এবং ভারতের ব্রহ্মপুত্র একই নদী। কিন্তু ইহা এখনও নিশ্চিতরূপে অবধারিত হয় নাই। তিব্বতের দিক হইতে সামপূতে অনেকে আনাগোনা করিয়াছেন, আবার এদিকেও ভারতের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু সামপূর প্রবাহ ধরিয়া এখন পর্য্যন্ত কেহই ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া নামিতে পারেন নাই,—মাঝখানে কতকটা স্থান অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। লর্ড কার্জ্জনের আমলে তিব্বতে একটা অভিযান গিয়াছিল। তাঁহারাই ফিরিবার পথে ব্রহ্মপুত্রের খোঁজে বাহির হইবার প্রস্তাব করেন। কে কে যাইবেন, তাহা স্থির করিয়া একটা দলও গঠিত হইয়াছিল। শেষকালে খবর আসিল যে, গভর্ণমেণ্ট এই অভিযান মঞ্জুর করেন নাই।" ইহার পরে আর কেহ এ কাজে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়াও জানা যায় নাই। অতএব এস্থলেও একটা অনুসন্ধানের কাজ রহিয়া গিয়াছে।

এইরূপে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলে উপলব্ধি হইবে যে, অনুসন্ধানের ক্ষেত্র কত বিস্তৃত—অনেক স্থানে পথও উন্মুক্ত। কিন্তু সেই অনুসন্ধান কে করে? লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া অভিযান প্রেরণ করা আমাদের দেশে সম্ভব নয়। কিন্তু লক্ষ টাকা খরচ না করিলেই যে কোন কাজ হয় না, এমন কথা বলা চলে না। আমাদের দেশে ভৌগোলিক অনুসন্ধানের জন্য কোন সঙ্ঘ বা সমিতি নাই বলিলেই হয়। মনে করিয়াছিলাম যে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এসব কাজ তাঁহাদের কার্য্য-বিবরণীর অঙ্গীভূত বলিয়া গ্রহণ না করিলেও অন্ততঃ এবিষয়ে একটা আন্দোলন জাগাইয়া তুলিতে পারিবেন। এখন দেখিতেছি, এ সব বিষয় আলোচনা করিবার অবসর বা উৎসাহ আমাদের নাই।

বর্ত্তমানে এভারেষ্ট পর্ব্বতে আরোহণ করিবার উদ্দেশ্যে এক অভিযান সংগঠিত হইয়াছে। তাঁহারা এবৎসর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আপাততঃ কাজ বন্ধ করিয়াছেন—শীতের অবসানে আবার কাজ আরম্ভ হইবে। ইঁহাদের কার্য্য-বিবরণী ইংরেজদের কাগজেই বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। দেশীয় সংবাদপত্রে উহার সামান্য উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়! ইহার একটা সহজ অজুহাত স্বভাবতঃই মনে আসে যে, দেশের লোক এখন দেশের কাজে ব্যস্ত; এসব অবান্তর বিষয়ে মনোযোগ দিবার তাঁহাদের অবসর নাই। দেশের কাজে মুখ্যভাবে বা গৌণভাবে অনেকেই সংশ্লিষ্ট থাকিলেও অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়ার অবসর নাই, এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। অতএব এ সব বিষয়ে তাচ্ছিল্য শুধু অবকাশের অভাব নয়, অনেকটা অনিচ্ছারই পরিচায়ক। সংবাদপত্রে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার বিবরণ যত জনে পড়েন, এভারেষ্টের অভিযান বিবরণ বোধ হয় তাহার অর্দ্ধেক লোকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদেরই এক বন্ধু বগুড়ার উকীল শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত পত্রিকান্তরে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীর জীবনে এবং জীবন-প্রণালীতে যে মৌলিকতার অভাব, তাহার একটি নিদর্শন ভৌগোলিক অনুসন্ধানে বাঙ্গালীর উৎসাহের অভাব। বাস্তবিক কথাটা খুবই ঠিক। এই মৌলিকতার অভাব অর্থাৎ গতানুগতিক ভাবে জীবন কাটাইবার প্রবৃত্তিই প্রকৃত অন্তরায়; তাহা না হইলে বাঙ্গালীর বিদ্যাবুদ্ধি কৃতিত্বের পরিচয় যথেষ্টই পাওয়া গিয়াছে; এবং তাঁহারা যে শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম, এমনও নয়। গত যুদ্ধের সময় দেখিয়াছি, কত বাঙ্গালী যুবক বেলুচিস্থানে এবং পারস্যের মরুভূমি ও পার্ব্বত্য প্রদেশের শীতাতপের তীব্রতার মধ্যে, কত তুষারবৃষ্টি মাথায় করিয়া নানাভাবে যুদ্ধের কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। সময়-বিশেষে অভাবনীয় ভাবে কত অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়িয়া তাঁহারা শারীরিক সুখ এমন কি আহার নিদ্রা হইতে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইয়া স্থল-বিশেষে জীবন-সঙ্কটেও পড়িয়াছেন, তবু তাঁহারা কাজ উদ্ধার করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহা খুবই স্পর্দ্ধার বিষয় সন্দেহ নাই: কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভুলিতে পারি না যে, ইহারা সকলেই চাকুরীজীবী। দেশের দুর্দ্দৈব যে এমন কর্ম্মক্ষম উদ্যমশীল যুবকেরাও কোন প্রকার স্বাধীন কর্ম্ম-প্রচেষ্টার দিকে অগ্রসর না হইয়া চাকুরীতে ভর্ত্তি হইয়া গতানুগতিক ভাবে জীবন কাটাইতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন।

বর্ত্তমান এভারেষ্ট অভিযান আমাদের দেশ হইতে পরিচালিত হইলেও ইহাতে আমাদের কোন হাত নাই; ইহার ফলাফলে আমাদের কৃতিত্বের গর্ব্ব করিবারও কিছু থাকিবে না। এই অভিযানে যত বেশী ফল পাওয়া যায়, ততই সুখের বিষয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহা পরিতাপেরও বিষয়, আমাদের মধ্যে কেহ এ রকম একটা কাজ হাতে লইয়া নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই; এবং এখনও চেষ্টা করিতেছেন না।

এসব কাজে একা বা ব্যক্তিগত ভাবে অগ্রসর হইয়া কেহ কিছু করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না; কাজেই ইহার জন্য কোন সঙ্ঘ বা সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। কবে, কাহার দ্বারা বা কোথায় প্রথম সমিতির প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না; তবে এটুকু খুবই বলা যায় যে, যতই এ সব বিষয় লইয়া আলোচনা হইবে এবং দেশের লোকের ইহাতে যতই অনুরাগ জন্মিবে, ততই ইহার পথ পরিষ্কৃত হইবে। সকল বিষয়েই শিক্ষিত সম্প্রদায়ই দেশের নেতা; দায়িত্বও তাঁহাদেরই বেশী। ভৌগোলিক অনুসন্ধানের জন্যও কোন সঙ্ঘ বা সমিতি যখনই হউক, তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উৎসাহ এবং চেষ্টাতেই গড়িয়া উঠিবে। সেই ভরসা করিয়াই আমার এই আবেদন উপস্থিত করিলাম।

পাপের ফল

[শ্রীআশুতোষ শান্যাল]

যতীনের পিতা রাখাল হালদার সারা জীবন পোষ্টমাষ্টারী করে পুত্রের কৃতিত্বে পেনশন নিতে সমর্থ হয়ে, তাঁর সেই সুদীর্ঘকালের দাসত্বের কষ্ট, আর সামান্য আয়ে পুত্রকে মানুষ করতে তাঁরা স্বামী স্ত্রী সংসারের যে সকল ধাক্কা, নীরবে সহ্য করে এসেছিলেন, পুত্রের গৌরবে সে সব ভুলে গিয়ে ভগবানের কাছে পুত্রের দীর্ঘজীবন কামনা করতেন।

ষোল বছর বয়সে যতীন কলিকাতার কলেজে পড়িতে যায়। কলিকাতার বোর্ডিংয়ে রেখে ছেলেকে পড়ান দরিদ্র রাখাল হালদারের মত লোকের যে কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তা অনেকেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন। যতীনও পিতার সেই কষ্টার্জ্জিত অর্থের অপব্যয় করে নি, বরং পিতামাতার দুঃখ-কষ্ট সে এমনই ভাবে অনুভব করত যে, ব্যয়ের সঙ্কীর্ণতার জন্য সে প্রাণপণ সহ্য করত, একদিনও লেখা-পড়ায় অবহেলা করে নি। আর তারই ফলে সে সংসারের মধ্যে একজন মানুষের মত মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল। পুত্র যখন সদাশয় সরকারের অনুগ্রহে ডেপুটিত্ব লাভ করে পশ্চিমের একটা সব-ডিভিসনের হাকিম হয়ে পিতাকে কাযো অবসর লইতে অনুরোধ করিল, তখন বৃদ্ধ চোখের জল সামলাতে পারিলেন না। পুত্রের সৌভাগ্যে তিনি অতীতের সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে পুত্রের মঙ্গল কামনায় দেবতার কাছে বুকচিরে রক্ত দিয়ে পূজা দিলেন। তবে আজ এত বড় আনন্দটাও তাঁর বুকে ব্যথা এনে দিল, যতীনের পরলোকগতা মায়ের কথা মনে করে; আজ এই আনন্দের অংশ নিজের সারা জীবনের সুখ দুঃখের সঙ্গিনীকে দিতে পারিলেন না ভেবে। তাই এই আনন্দের উচ্ছ্বাসের মধ্যেও দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তাঁর জীর্ণ বক্ষপঞ্জরের উপর গড়িয়ে পড়ল।

সময় ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের অবস্থাও এমনই এক জায়গায় এসে দাঁড়ায়, যে মানুষ প্রায়ই তার প্রবল ইচ্ছার বেগ দমন করিতে অক্ষম হয়। আর এটা সংসারের এমনই একটা নিয়ম, যাতে করে তার এই বিরাট পরিবর্ত্তন, সে নিজে বুঝেও প্রতিকার করতে একেবারেই অসমর্থ হয়ে পড়ে। যতীনও এই পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে পড়ে নিজেকে সামলাতে পারে নি; সে যখন হাকিমের গদিতে বসল, তখন সেও তার পুরাতন পুঁথির অনেকগুলো পাতা ছিঁড়ে ফেলে, নূতন ভাবে সেগুলো ভরিয়ে নিল। আর এই পরিবর্ত্তনের আরও একটা বিশেষ কারণ ছিল। সুসজ্জিত বাঙ্গলায়, চাকর, দাসী, খানসামা, আরদালিতে পরিবেষ্টিত হয়ে বাস করে, আর সহরের সকল লোকের মাথা নিচু করে সেলাম প্রভৃতি উপসর্গ অহরহ লাভ করে, তার অনভ্যস্ত মস্তিষ্কের মধ্যে গোলমাল হয়ে গেল। কোথায় কলিকাতা বোর্ডিংয়ের একটা ক্ষুদ্র কক্ষের একপার্শ্ব অধিকার করে দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবন যাপন, আর কোথায় এই অভাবনীয় সুখ-সম্মান। কাজেই তার মাথা ঠিক রাখা দুষ্কর হবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি। সুতরাং জেনে-শুনেই সে সংসারের এই ঘূর্ণাবর্ত্তে আপনা হতেই ধরা দিল। হাকিমীর সঙ্গে সঙ্গে সে আপনার পদমর্য্যাদা আরও একটু বাড়িয়ে ফেলল সাহেবীতে। হাকিম হয়ে পুরাদস্তর সাহেব হতে তার বেশী দিন লাগল না; নব অনুরাগের শিক্ষা এমনই দাঁড়াল, যে নেশার মত সাহেবিয়ানাটা তার দিন দিন বেড়েই যেতে লাগল। হাকিম হবার আগেই তার বিবাহ হয়েছিল; সে জন্য নিজের মেজাজ-মাফিক স্ত্রী-লাভ তার ভাগ্যে ঘটে নাই। বিশেষ এমন ঘরে তার বিবাহ হয়েছিল, সেখানে এমন কি মৎস্য পর্য্যন্ত অতি সন্তর্পনে ঢোকে। যতীনকে প্রথমটা একটু কষ্ট পেতে হলেও সে হটবার পাত্র নয়। কারণ স্ত্রীর শিক্ষা-দীক্ষা যখন সম্পূর্ণভাবে স্বামীর হস্তেই ন্যস্ত; আর হিন্দুর ঘরের মেয়ের যখন স্বামীকে তুষ্ট করাই একমাত্র গতি, তখন স্ত্রী শশীমুখীকে নিজের মনের মত গড়ে নিতে যতীনের বেশী দেরী হল না। প্রথম-প্রথম শশীমুখীর একটু বাধবাধ ঠেকলেও, অল্পদিনের মধ্যেই সেও কায়দা-দোরস্ত হয়ে পড়ল। বিশেষ যতীন যখন তাকে বুঝিয়ে দিল যে, সে হাকিমের স্ত্রী, এবং হাকিমের স্ত্রীর লজ্জা বা ভয় থাকা আদৌ উচিত নয়, তখন শশীমুখীর চক্ষুলজ্জা যে টুকু ছিল—তাও কেটে গেল।

যতীনের পিতা যখন পুত্রের বাসায় এসে দেখলেন যে তাঁর পুত্র সকল বিষয়েই উন্নতি লাভ করেছে, আর সেই সঙ্গে বৌমাটীকেও নিজের মত করে তুলেছে, তখন ধর্ম্মভীরু বৃদ্ধ, নানা রকম ওজর আপত্তি করে দেশে গিয়ে বাস করাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করলেন। পিতাকে নিজের কাছে রাখবার ইচ্ছা যতীনের থাকলেও নানারূপ অসুবিধা বিবেচনায় অবশেষে তাকে পিতার মতেই রাজী হতে হল। বৃদ্ধ দেশে ফিরে গেলেন।

নিজের অধ্যবসায় ও কর্ম্মপটুতায় যতীন অল্পদিনের মধ্যেই সরকারের নেক্-নজরে পড়ল, এবং একবছর এধার-ওধার করার 'পর, ছাপরা জেলার এক সব-ডিভিসনে একেবারে প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী হয়ে বদলী হ'ল। অর্থ সম্মান পদমর্য্যাদা লাভ করে সে নিজেকে ধন্য মনে করল। আরও এই সময়ের মধ্যে ভাগ্যের সঙ্গে-সঙ্গে সে একটী পুত্রও লাভ করেছিল। শিশুর জন্মে পিতার সৌভাগ্যোদয় মনে করে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এই নয়নরঞ্জন শিশুটীর মায়ায় অত্যন্ত জড়িয়ে পড়ল। যতীন এই শিশুটাকে তাঁর হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ, মমতায় ঢেকে রেখেছিল। যতীনের পিতারও এই শিশুটির আগমনে একটু পরিবর্ত্তন হল। পৌত্রকে দেখে বৃদ্ধ এই শেষ বয়সে তার উপর এমনই আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন, যে তাকে ছেড়ে তিনি আর দেশে গিয়ে বেশীদিন থাকতে পারলেন না। প্রায়ই তিনি শিশুটীর আকর্ষণে পুত্রের বাসায় এসে বাস করতে লাগলেন; এবং ক্রমে এই ক্ষুদ্র শিশু ধীরে-ধীরে তাঁকে এমনই আঁকড়ে ধরল, যে তিনি পুত্রের বাসায় সহস্র অনিয়ম অনাচারের মধ্যেও থাকতে বাধ্য হলেন। তবে সাধ্যমত তিনি নিজেকে বাঁচিয়ে চলতেন এবং পুত্রকেও এই বিজাতীয় অনাচারগুলার হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু বিলাস-বাসনা যখন তার উদ্দাম তরঙ্গ নিয়ে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে ভাসিয়ে নিতে ধেয়ে আসে, তখন কেউ তার গতিরোধ করতে পারে না। তিনি এ সকল বুঝে সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় বসে ছিলেন। যতীনের স্ত্রী স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য প্রথম দিনকতক স্বামীর ইচ্ছাতেই গা ঢেলে দিলেও, যখন বুঝতে পারল যে, এই সব অনাচার ও অত্যাচার তার স্বামীকে সর্ব্বনাশের পথেই নিয়ে যাচ্ছে, আর সে সহধর্ম্মিণী হয়েও তাতে বাধা না দিয়ে বরং সেই বহ্নির ইন্ধন যোগাচ্ছে, তখন স্বামী ও পুত্রের ভবিষ্যত ভেবে সে ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে নিল। হিঁদুর মেয়ে, হিঁদুর কুলবধূ, সে চিরদিন যেগুলাকে অপবিত্র ভেবে ঘৃণা করে এসেছে, আজ সেইগুলাই তার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য মনে করে লজ্জায় ঘৃণায় সে মর্ম্মে-মর্ম্মে বেদনা অনুভব করল। স্বামীর অসন্তুষ্টির কারণ হলেও শ্বশুরের দোহাই দিয়ে সে আবার অন্তঃপুরচারিণী কুলবধূ হল। যতীন যখন নিজের সংসারে আপনার প্রিয়জনের কাছে তার উদ্দাম গতির বাধা পেল, তখন তার সেই ঘাড়ের ভূতটা একেবারে বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াল; আর সেই বিদ্রোহিতার ফলে সংসারেও অশান্তির ছায়া 'পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে তার আদালতের গরীব আসামী ব্যাচারীরা পর্য্যন্ত সেই ধাক্কায় ত্রস্ত হয়ে উঠল। এত দিনের যে সুনামটা সে প্রাণপাত যত্নে অর্জ্জন করেছিল, সেটাও দিন দিন ক্ষীণ হতে লাগল; আর সেই অখ্যাতি ও অশান্তির তীব্র তাড়নায় যতীন তার মেজাজের কড়া তারটা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে দিল। পুত্রের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে যতীনের পিতা ব্যথিত হলেন। কিন্তু তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার বেগ পাছে সীমা অতিক্রম ক'রে তাঁকেও আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় নীরব রইলেন। শশীমুখী স্বামীকে এই সব অন্যায় আচরণ হতে নিরস্ত করতে গিয়ে, নিজে অপমানিত হয়েও অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কোন ফলই হল না।

যতীন নিজের জেদ বজায় রাখতে, তার সম্মুখের সব বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে নিজেকে একেবারে যখন সংসার থেকে অনেক দূরে ঠেলে এনে ফেলল, তখন যারা তাকে বাধা দিতে গেছল, তারাও তার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে পিছিয়ে গেল। সে সব বাধা মুক্ত হয়ে তার স্বেচ্ছাচারিতার বেগটা আরও বাড়িয়ে দিল। বাড়ীর লোকের পক্ষে তার এই উচ্ছৃঙ্খলতা যখন অসহ্য হয়ে দাঁড়াল, তখন যতীন এতদিন যেটা ইচ্ছা করেই পরিহার করে এসেছিল, সেইটাই অবলম্বন করে বসল। সহরের বাইরে নীলকুঠীর সাহেবদের সঙ্গে মিশে পড়ল। সে এখানে বদলী হয়ে আসা পর্য্যন্তই এই কুঠীওয়ালারা তাকে নিজেদের দলে মিশিয়ে নেবার অনেক চেষ্টা করেছিল; কিন্তু কি জানি কেন, তারা এত-দিন সুবিধা করে উঠতে পারে নি। যতীন যখন আপনা হতেই তাদের জালে ধরা দিল, তখন তারাও সুযোগ পেয়ে তার চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে, রংভিন চশমা পরিয়ে দিল।

আসল সাহেব-মেমের সঙ্গে এমন প্রাণখোলা মেশা-মিশিতে তার সাহেবী নেশার রং আরও একটু গাঢ় করে রংয়িয়ে দিল।

যে সময়ের এই ঘটনা, সে সময় নীলকুঠীর সাহেবরা এক-রকম সে দেশের রাজা ছিল। সাহেবীয়ানার ঢেউটাও তখন দেশের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়ে তাদের আরও সুবিধা করে দিয়েছিল। সব-ডিভিসনের হাকিম যখন তাদের হাতের পুতুল হয়ে পড়ল, তখন তারা সে সুযোগের একটুও অপব্যবহার করল না।

পর পর কয়েকটা মামলায় কুঠীওয়ালারা যখন গ্রাম-বাসীদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলল, তখন তারা প্রতিকারের আশায় ছুটে এসে হাকিমের পায়ে ধরে সুবিচার প্রার্থনা করল। এইটুকু আশা তারা করেছিল, যে তাদেরই দেশের একজন লোক যখন হাকিম, তখন তাদের দুঃখ কষ্ট সে বুঝতে পারবে। কিন্তু তাদের সেই বুকফাটা ক্রন্দন, কাতর আবেদন হাকিমকে এতটুকুও বিচলিত করতে পারল না। অভিযোগ শোনা দূরের কথা, তারা শেয়াল কুকুরের মত বিতাড়িত হল। যে জলভরা চোখ নিয়ে তারা এসেছিল, সেই চোখেই তারা ফিরে গেল। যাবার সময় শুধু তাদের জীর্ণ পাঁজরের বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাস ঐ ওপরের হাকিমের পায়ে নিবেদিত হল। দরিদ্র গ্রামবাসীদের আবেদনে যতীনের মন না টললেও, একজনকে বড়ই ব্যথিত করে তুলেছিল। তিনি তার পূজনীয় পিতা রাখাল হালদার। তিনি যখন পুত্রের এই অমানুষিক অবিচার নিজের চোখে দেখলেন, তখন সে দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারলেন না। এতদিন যে অবিচার অত্যাচার তিনি নীরবে সহ্য করে আসছিলেন, আজ সেই জ্বালা, পুত্রের বিরুদ্ধে তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলল। তিনি পিতা; তবুও পুত্রের কাছে এই সব গরীব ব্যাচারীদের জন্য সুবিচার প্রার্থনা করে বললেন, "যতীন বাবা, এ সব কি ভাল করছ, এই গরীব বেচারীরা প্রাণের যাতনায়, তোমার কাছে সুবিচারের জন্য এসেছিল, আর তুমি, তাদের এমনি করে তাড়িয়ে দিলে, তাদের একটা কথাও না শুনে।" বৃদ্ধের চোখ জলে ভরে গেল, কণ্ঠ রুদ্ধ হল। যতীন কিন্তু পিতার এই কাতর অনুযোগ একটুও অনুভব করতে পারল না; বরং বিরক্ত হয়েই উত্তর দিল, "আপনি জানেন না, ওরা কি রকম পাজী! সব হচ্ছে ধর্ম্মঘটীর দল, ওদের যা অভিযোগ, তার ষোল আনা হচ্ছে বদমায়েসি।" "কিন্তু সেটা একবার তদন্ত করে দেখলে ক্ষতি কি? আর সেটা যখন তোমার কর্ত্তব্য।" পিতার কথায় যতীন একটু উত্তেজিত হয়ে বল্লে, "আমি কি তদন্ত না করেই ওদের তাড়িয়ে দিইচি। কুঠীওয়ালাদের কাছে দাদন নিয়ে এখন কাজ করবে না বলে, গোঁ ধরে বসেছে। ওদের এমনি মতিভ্রম ঘটেছে যে, ওরা গভর্ণমেণ্টের পর্য্যন্ত কথা শুনতে চায় না।" যতীনের কথায় বৃদ্ধ একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, "সরকারের সঙ্গে বিবাদ ওরা মোটেই করতে চায় না। যারা একটা মাত্র চড়া কথায় ভয়ে জড়সড় হয়, তারা যাবে সরকারের সঙ্গে বিবাদ করতে, এটা কি তুমি বিশ্বাস কর? কুঠীওয়ালাদের জেদ ত' বড় কম নয়, আর সেটা দেশ শুদ্ধ লোকের জানতেও বাকী নেই। কিন্তু কেন যে তুমি, দোষ কার বেশী, সেটা দেখার দরকার বিবেচনা করছ না, তা বুঝতে পারছি না।" যতীন মনে-মনে বিরক্ত হলেও এতক্ষণ ধীর ভাবেই উত্তর দিচ্ছিল; কিন্তু সে তার মেজাজকে আর বেশীক্ষণ নিজের আয়ত্তে রাখতে পারল না। বেশ একটু উষ্ণভাবেই বলে উঠল "আমার দায়িত্ব কি আমি বুঝি না? আমি যে সরকারের বেতনভোগী লোক, এটাও ত' মনে রাখা উচিত।" বৃদ্ধ এতক্ষণ পুত্রের মন ফেরাতে নিজের সম্মানের দিকেও দৃষ্টিপাত করেন নাই; কিন্তু পুত্রের উচ্ছৃঙ্খল ভাব দেখে ও তার দুর্ব্যবহারে নিজের উচ্চ হৃদয়কে আর বেশী অবনত করতে পারলেন না। তিনি রেগে উঠে বললেন "দেখ যতীন, তুমি মনে ক'র না যে তুমি হাকিম হয়েছ বলে বেশী বুদ্ধিমান হয়েছ। বুদ্ধি দূরের কথা, নিজের দুর্ব্বুদ্ধিতায় তুমি নিজের কতখানি সর্ব্বনাশ ডেকে আনছ, তা' এখনও বুঝতে পারছ না। এই সব গরীবের চোখের জল ও বুকফাটা অভিশাপ বৃথায় যাবে ভাবছ? একজন আছেন হাকিমেরও হাকিম—তাঁর কাছে সব হাকিমেরই বিচার হবে, এ কথা ভুলে যেও না।" ক্রোধে দুঃখে বৃদ্ধের কপালের শিরা ফুলে দপ্ দপ করে উঠল, তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সামলে তিনি বললেন, "তুমি ছেলে, তোমার মঙ্গল কামনাই আমার কর্ত্তব্য। আমি কোন দিন তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলি নি।

তোমার যাতে সুখ, তোমার যাতে শান্তি হয়, সেই আমার কামনা। কিন্তু আজ তোমার ব্যবহারে আমি এত মর্ম্মাহত হইচি যে, আজ আমাকে বাধ্য হয়েও তোমার সংস্রব ত্যাগ করতে হবে।" পিতার কথায় যতীনের অনেক পূর্ব্বেই ধৈর্য্যচ্যুতি হয়েছিল; তাই সে এবার চড়া সুরেই বলে উঠল, "আপনার সঙ্গে আমি মিছে তর্ক করতে চাই না। আপনি যদি প্রকৃত অবস্থা না বোঝেন, তবে আর কি করব। আপনার কথামত চলতে গেলে, চাকরী করা চলে না। আপনার যদি আমার আচার-বিচার নাই পছন্দ হয়, বেশ, আপনি দেশে গিয়েই বাস করুন।"

"বেশ তাই যাব। আজই আমি চলে যাব। তোমার এই পাপার্জ্জিত অন্ন আর আমার গলায় উঠবে না। তবে সুনীলের জন্য এই বুড়ো বয়সে একটু,---তা হোক---ভগবান্ তাকে দীর্ঘজীবী করুন। যাবার সময় একটা কথা তোমায় বলে যাই,—দেখ,—গরীব নারায়ণ, তাদের প্রাণে ব্যথা দিলে ভগবান্ সহ্য করবেন না। তাদের উপর অবিচার ক'র না, তাহলে কখনও মঙ্গল হবে না। আর যদি এ সব না করলে তোমার চাকরি না থাকে, তবে এই মুহূর্ত্তে চাকরি ছেড়ে দাও। এতদিন যেমন করে তোমায় এতবড় করেছি, তেমনি করেই সংসার চলে যাবে। দরিদ্রের অশাসক্ত রাজভোগের চাইতে শাক-অন্নও মিষ্ট।" যতীন পিতার কথার কোনই উত্তর দিল না। তার উদ্ধত মেজাজ কেবলই ভিতরে-ভিতরে গুমরে উঠছিল; সে ভ্রূকুটী করে চলে গেল। বৃদ্ধ শুধু পুত্রের ভবিষ্যত অমঙ্গল আশঙ্কায়, একটা নিষ্ফল দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে নিজের ব্যথিত বুকখানাকে কাঁপিয়ে তুললেন—তার পর ধীরে-ধীরে স্থান ত্যাগ করলেন।

পিতা দেশে চলে যাওয়ার পর যতীন আরও উদ্ধত হয়ে উঠল। কুঠীওয়ালাদের সংস্পর্শে সেও দিন দিন অনাচারী হয়ে দাঁড়াল। তার ব্যবহারে যখন আত্মীয়-স্বজন তার দিক থেকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল, তখন সেও তার একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানে, কুঠীওয়ালাদের ইচ্ছায় গা ঢেলে দিল। বাড়ীতে সে আর সুখ বা শান্তি পায় না। শশীমুখী স্বামীর হীনতায় ক্ষুণ্ণ হয়ে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর একটুও দাঁড়ায় না। পুত্রকে একটু আদর-যত্ন করা ছাড়া সংসারে সে আর কোনই কাজ দেখত না। আদালতের সময় ব্যতীত সর্ব্বদাই সে কুঠীতেই কাটাত।

এদিকে নানা রকমে বিপন্ন হয়ে প্রজারা সব মরিয়া হয়ে দাঁড়াল। যে আগুণ এতদিন ধিকিধিকি জ্বলছিল, এখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। গ্রামবাসীরা যখন নিরুপায় হয়ে দেখল, প্রতিকার তাদের নিজেদের না করলে আর উপায় নেই, তখন তারাও চারদিকে বিদ্রোহের আগুণ ছড়িয়ে দিল। আর সেই বিদ্রোহের মাঝখানে পড়ে যতীনের মস্তিষ্ক একেবারে গোলমাল হয়ে গেল।

সেদিন রবিবার, আদালত বন্ধ। যতীন সকালে চা পান করতে-করতে সুনীলের সঙ্গে খেলা করছিল; সেই সময় কুঠীর একজন চাপরাসী এসে যতীনের হাতে একখানা চিঠি দিল। যতীন চিঠি পড়ে, একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। চাপরাসীকে বিদায় দিয়ে সে পোষাক বদলে নীলকুঠীর দিকে চলে গেল।

যতীনের বাঙ্গালার কিছু দূরে একটা যায়গায় রবিবারে হাট হয়। হাটটা ছিল নীলকুঠীর জমিদারিভুক্ত। কুঠীর বড় সাহেব হতে চুনাপুঁটি সবাই চিরদিন এই হাটটার উপর একাধিপত্য করত। গ্রামবাসী ও হাটের ব্যাপারীরা কুঠীওয়ালাদের জুলুম দিনদিন বৃদ্ধি দেখে, ক্রমেই বেঁকে দাঁড়াল যে, তারা আর ঐ হাটে বেচাকেনা করতে আসবে না। গ্রামের একজন মোড়লের জমির ওপর তারা হাট বসানোর ব্যবস্থা করল। সকাল থেকেই লোক দোকান-পশার নিয়ে এই নূতন হাটে বসতে লাগল। কুঠীর লোকেরা এই ব্যাপার দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠল। এ হাট থেকে প্রতি সপ্তাহে তাদের অনেক টাকা আয় হয়; সেটা যদি বন্ধ হয়, তাহলে লোকসান ত' বটেই—সঙ্গে সঙ্গে অপমানও কম নয়। তারা ব্যাপারীদের নানা রকম প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে নিজেদের হাটে বসাতে চেষ্টা করতে লাগল। গ্রামবাসীরা দু'একজন যখন বাধা দিতে এল, তখন বেশ একটু গোলমাল বেধে উঠল। কুঠীওয়ালারা যখন দেখলে যে এ ব্যাপারের হেস্তনেস্ত করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য; তখন তারা যতীনকে ডেকে পাঠাল। যতীন কুঠীতে এসে পৌঁছিতেই ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত হয়ে তার কাণে গেল। তখন সে থানায় হুকুম পাঠাল, যেন এই মুহূর্ত্তেই নূতন হাট বন্দুকধারী সেপাই

দিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। আর সেও এর রীতিমত বন্দোবস্ত করতে এখনি হাটে যাচ্ছে।

হাকিমের হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই, সেপাই কনেষ্টবলে হাট ভরে গেল। পুলিসের উপর হুকুম জারি করে, যতীন সাহেবদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে হাটের দিকে রওনা হল। যতীন যখন তার বাঙ্গলার কাছে এসে পৌছল, তখন দেখল তার পুত্র সুনীল চাকরের সঙ্গে রাস্তার উপর বল খেলছে। পিতাকে দেখে পুত্র আনন্দে চীৎকার করে উঠল; যতীন ও সাহেবরা সুনীলকে হাত নেড়ে আদর দেখিয়ে হাটের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। এই গোলমালের দিনে পুত্রকে রাস্তার উপর দেখে, যতীন একটু চিন্তিত হয়ে উঠল। কিন্তু পাছে সাহেবরা তার মনের দুর্ব্বলতা টের পায়, সেই জন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও সে ফিরে গিয়ে বারণ করতে পারল না। যতীন হাটে গিয়ে দেখল, চারিদিকে একটা বিপদের ছায়া পড়েছে। ব্যাপার বেশীদূর গড়ান উচিত নয় বিবেচনায় সে নূতন হাট ভেঙ্গে দিয়ে ব্যাপারীদের পুরাতন হাটে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হুকুম দিল।

এই হুকুমের ফল কিন্তু বিপরীত হয়ে দাঁড়াল। ব্যাপার যে এতদূর গড়াবে, যতীন প্রথমটা মনে করে নাই; সে ধারণা করেছিল সেপাইদের বন্দুক দেখলেই চঞ্চল গ্রামবাসীরা পালিয়ে যাবে। কিন্তু, গ্রামবাসীরা সব মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ঘোড়া ছুটিয়ে যতীন যখন ভিড়ের মধ্যে এসে পড়ল, তখন কুঠীর বড় সাহেব তার পাশে এসে চেঁচিয়ে বলে উঠল "ম্যাজিষ্ট্রেট কি দেখছ, শীঘ্র ফায়ার করতে হুকুম দাও, নইলে সর্ব্বনাশ হবে। আমরা ত' মরবই, সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্ত্রী-পুত্রও মারা যাবে। দেখচ না বিদ্রোহীরা তোমার বাঙ্গলার দিকে ছুটছে।" সাহেবের কথায় যতীন চমকে উঠল। সত্যই ত'—কি সর্ব্বনাশ! সে আসবার সময় পুত্রকে রাস্তার ওপর খেলা করতে দেখে এসেছিল; সে যদি এখনও সেখানে থাকে? তা হলে—উঃ—কি ভয়ানক—

সে আর ভাবতে পারল না, তার সব ওলট্-পালট্ হয়ে গেল। সে অনেক চেষ্টা করল, অনেক চীৎকার করে তাদের বারণ করল; কিন্তু কে কার কথা শোনে। যতীনের তখন স্ত্রী-পুত্রের কথা মনে হোলো: সে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বাসায় পৌছে যখন গেটে ঢুকতে যাবে, তার চাকর ছুটে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলল "সাহেব—সাহেব—খোকাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মাইজি ভীরমি গেছে"—

চাকরের কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই যতীন দৌড়ে বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখল শশীমুখী ঠিক পাগলের মত বসে কাদছে। তাকে দেখে সে আরও কেঁদে উঠে তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল "ওগো আমার খোকন—আমার সুনীল কোথায় গেল! আমার খোকনকে এনে"—সে আর বলতে পারল না, যতীনের বুকের উপরই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

স্ত্রীকে কোন রকমে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, সে পুত্রের অন্বেষণে পাগলের মত ছুটে বাইরে চলে গেল। বাগান পার হয়ে সে যখন গেটের বাইরে এসে দাড়াল, তখন দেখল, তার সহিস সুনীলকে বুকে করে নিয়ে আসছে। যতীন দৌড়ে গিয়ে দেখল সুনীলের দেহ রক্তাক্ত, শরীর তুষার-শীতল। অসহ্য জ্বালায় সুনীলের রক্তাক্ত শীতল দেহটাকে বুকে চেপে ধরে যতীন অচেতন হয়ে পড়ে গেল।

মুষ্টি ভিক্ষা

[শ্রীভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস]

দু'টি বেলা খাই মোরা সুখে পেট ভ'রে,
পাত্র-পাশে রাশি রাশি অন্ন থাকে প'ড়ে;
তাহা হ'তে মুষ্টি মাত্র দিলে খুসী মনে
কমেনা মোদের কিছু, বাঁচে অন্য জনে।

নিভৃতে

বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা

[শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মুখুর্য্যে মহাশয়ের লোক আসিয়া বলিল, পাল্কীর ব্যবস্থা অসম্ভব। সুতরাং গরুর গাড়ীতে যাইতে হইবে। গাড়ী দেখিয়াই চক্ষু স্থির; ইতিপূর্ব্বে এই প্রকার যানে কখনও আরোহণ করি নাই। নিরুপায়; সুতরাং, ব্যায়ামকৌশলানভিজ্ঞার পক্ষে নৌকার মতন ছাপ্পরের মধ্যে প্রবেশ করা দুরূহ ব্যাপার হইলেও, অতি কষ্টে দেহটাকে টানিয়া লইয়া লম্বিত ভাবে শয়ন করাইলাম। ক্যাঁকোচ-ক্যাঁকোচ শব্দে গ্রামের নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যান মুখুর্য্যে ভবনাভিমুখে মন্থর গতিতে ধাবিত হইল। একবার যখন মস্তক স্বর্গের দিকে উঠিল, গুঁড়িগুঁড়ি তখন বৃষ্টিকণা-মিশ্রিত বায়ুহিল্লোল-স্পর্শে একটু শীত অনুভব করিলাম। অকস্মাৎ শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হইল। আমি মনে করিলাম, কৈলাসনাথবাহন বৃদ্ধাকে কৃপাপূর্ব্বক কৈলাস পর্ব্বতে লইয়া আসিয়াছেন।

কিন্তু যখন আবার পরক্ষণেই পাদদেশ স্বর্গের দিকে উঠিতে লাগিল, তখন ভাবিলাম কোন অপরাধবশতঃ ক্রোধান্বিত হইয়া তিনি আমাকে পর্ব্বত-শিখর হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করিতেছেন। এই ভ্রম শীঘ্রই দূর হইল। গো-যানের অপূর্ব্ব কৌশলই যে এই প্রকার নাগরদোলায় দোলায়মান হইবার কারণ, তাহা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইল না। অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম না করিতে-করিতেই অনুভব করিলাম, সমুদায় অস্থি দেহের মধ্যবিন্দুর দিকে অগ্রসর হইয়া তাল পাকাইতেছে। আমার নিদ্রিতা সঙ্গিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কোন প্রকার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিলাম না। তাঁহার হস্ত পদ মস্তকাদি স্বস্থানেই আছে; অথচ আমি যে একটা চর্ম্মাবৃত মাংসাস্থিপিণ্ড হইয়াছি; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তিনি জাগরিত হইয়া আমাকে দেখিয়া যখন আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন না, তখন আমার দ্বিতীয় ভ্রান্তি অপসারিত হইল।

দুই ঘণ্টা পরে এই প্রকার গো-দোলায় ও সংশয়-দোলায় দোলায়মান হইতে হইতে আমরা মুখুর্য্যে-ভবনে প্রবেশ করিলাম। গাড়ী হইতে অতি কষ্টে অবতরণ করিয়া প্রথমেই গৃহস্বামীকে বলিলাম, "আমাকে এত ব্যয় করিয়া আনিবার প্রয়োজন ছিল না; যে প্রসূতির জন্য আনিয়াছেন, সময়মত তাঁহাকে একবার এই গাড়ীতে তুলিয়া কিছুদূর লইয়া গেলেই, সিরিয়া দেশীয় প্রথানুসারে প্রসব সহজে সম্পন্ন হইত। সেই দেশের প্রসব-প্রণালী বড় সুন্দর ছিল। একখানা পুরু চাদরের চারি কোণ ধরিয়া চারিজন লোক দণ্ডায়মান হইত।

প্রসূতিকে ঠিক মধ্যস্থলে রাখা হইলে, এই চাদরখানা এমন ভাবে নাড়া হইত, যাহাতে প্রসূতি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্তা হইয়া পুনর্ব্বার ঐ চাদরের মধ্যস্থলেই পড়িতেন। এই প্রকারে যতক্ষণ না প্রসব বেদনার বৃদ্ধি হইত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রসূতি লোফালুফির কার্য্য চলিত।” মুখুয্যে মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “তোমার খুব কষ্ট হয়েছে তা জানি। কিন্তু কি করব মা, পাল্কী বেহারা পাওয়া গেল না, তাদের গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব। আসতে-আসতে তাদের কালীপূজার বাদ্যধ্বনি শুনে থাকবে।” রাস্তায় যে শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম, কোথায় আসিয়াছি, এখন তাহার কারণ বুঝিলাম। যাহা হউক, গৃহস্বামীর আদর অভ্যর্থনায় পথ কষ্ট ভুলিয়া গেলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গর্ভিণী গৃহস্বামীর একমাত্র কন্যা। মুখ দেখিয়া বয়স নির্ণয় করা কঠিন; কিন্তু আনুমানিক বিংশতির সীমান্তর্গত। মুখখানি অতি সুন্দর; কিন্তু যৌবন-রক্তিমাভাবিহীন এবং বিষাদ-রেখাঙ্কিত। তাহার মাতার নিকট শুনিলাম, এই বয়সে সাত বৎসরের মধ্যে তাহার ছয়বার গর্ভস্রাব হইয়াছে। প্রথমবার তৃতীয় মাসে, দ্বিতীয়বার চতুর্থ মাসে, তৃতীয় বার পঞ্চম মাসে, চতুর্থ বার সপ্তম মাসে, পঞ্চম বার অষ্টম মাসে, এবং ষষ্ঠ বার পূর্ণমাসে, কিন্তু মৃত প্রসব। এইবার নবম মাস। ভয়বশতঃ আমাকে আনা হইয়াছে; পরে কলিকাতা হইতে বড় ডাক্তার আনা হইবে। জামাতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ। তিনি বলিয়াছেন, এবারেও যদি মৃত সন্তান প্রসব হয়, তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া বংশের ধারা রক্ষা করিবেন। গৃহিণী সজল নয়নে বলিলেন, “মা, বর-পক্ষের জেদে মেয়েকে সাত বৎসরে বিয়ে দিয়েছি। পণ্ডিতেরা বলেছিলেন, ‘নষ্ট পাপ শ্রাবণে।’ অনেক শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা হইয়াছে। অনেক ঘটা করে কার্ত্তিক পূজা করেছি। কার্ত্তিকের কাছে বিফল-মনোরথ হয়ে তাহার পিতা পাঁচু ঠাকুরের কাছে গিয়েছি। তুমি ত জান মা, রঘুনগরের পাঁচু ঠাকুর বড় জাগ্রত। তাঁর কাছে হত্যা দিয়ে পড়েছিলাম। তিনি আবির্ভূত হয়ে বল্লেন, মেয়ের ত কোন দোষ নাই, দোষ জামাইয়ের। তাঁর ধারণের জন্য একটা মাদুলী দিলেন, আর মেয়েকেও নিয়মে থাকবার জন্য উপদেশ কল্লেন। জামাই এম্-এ পাশ করা। তিনি রেগে ফুলে উঠে বল্লেন, ‘আমার আবার দোষ! আমি কখনই মাদুলী-ফাদুলী ধারণ করব না।’ কি করব মা? সবই কপালের দোষ। এবার দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত, দেখা যাক্, ঠাকুরের দয়া হয় কি না।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আজ শুক্লাষ্টমী। গৃহিণী দূর্ব্বাষ্টমীতে ব্রত সঙ্কল্পে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই ব্রত করিলে সাতপুরুষ পর্য্যন্ত সন্তান নষ্ট হয় না; পরন্তু দূর্ব্বার ন্যায় কুল বর্দ্ধিত ও আনন্দিত হয়। দ্রাক্ষা, ডালিম, খেজুর, গুবাক, লেবু, লবঙ্গ, বকুল ও নারিকেল, এই অষ্ট ফল সাজান হইয়াছে। যথাবিধি পূজা পূর্ব্বক ব্রতকর্ত্রী দুগ্ধের দ্বারা দূর্ব্বাকে স্নান করাইয়া এই মন্ত্র আবৃত্তি করিলেন,

ত্বং দূর্ব্বেঽমৃত নামাসি বন্দিতাসি সুরাসুরৈঃ।
সৌভাগ্যসন্ততিং দত্ত্বা সর্ব্বকার্য্যকরী ভব॥
যথা শাখাপ্রশাখাভিবিস্তৃতাসি মহীতলে।
তথা মমাপি সন্তানং দেহি ত্বমজরামরং॥

তৎপরে আটগাছি দূর্ব্বার সহিত হরিদ্রাক্ত ডোর বাম করে বাঁধিয়া ব্রতোৎসর্গ করা হইল। এখন কথা শ্রবণ। দূর্ব্বা ঘাসের আবার কি কথা—তাহা শুনিবার জন্য আমার কৌতূহল জন্মিল। আমিও একজন শ্রোতা। পুরোহিত বলিলেন, “একদিন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উপায়ে স্ত্রীলোকের সন্তান বৃদ্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ভাদ্র শুক্লাষ্টমীতে দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত করিলে, সাত পুরুষ পর্য্যন্ত সন্তান নষ্ট হইবে না; অধিকন্তু, দূর্ব্বার ন্যায় কুল নিত্য বর্দ্ধিত ও আনন্দিত হইবে। সাগর-মন্থনকালে বিষ্ণু বাহু ও জঙ্ঘা দ্বারা মন্দার পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে পর্ব্বতের ঘর্ষণে উৎপাটিত তাঁহার লোমরাজি তরঙ্গাঘাতে সমুদ্র-তটে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অতি সুন্দর দূর্ব্বারূপে পরিণত হইল। দেবতারা তাহারই উপর অমৃত নিক্ষেপ করিয়া পান করিতে লাগিলেন। এই অমৃত-সংস্পর্শে দূর্ব্বা অজরা, অমরা, বন্দনীয়া এবং পবিত্রা হইলেন।” কথা শেষ হইলে, আমরা পায়স, পিষ্টক ইত্যাদি আহার করিয়া, প্রসূতির মঙ্গল কামনা করিলাম। তাহার মন কথঞ্চিৎ প্রসন্ন। তাহার সহিত নানা প্রকার গল্প-গুজবে এক মাস কাটিয়া গেল। সুসময়ে একটী জীবিত পুত্র

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। শঙ্খ-বাদ্য-মুখরিত ভবনে আজ আনন্দের কোলাহল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পৌত্রমুখ দেখিবার জন্য চাটুর্য্যে মহাশয় সপুত্র আসিয়াছেন। চতুর্দ্দশ দিবস আনন্দ-উৎসবে কাটিয়া গেল। পঞ্চদশ দিবসে দেখা গেল, শিশুর নাকে সর্দ্দি লাগার মতন শব্দ হইতেছে। দেহ ক্ষীণ, বৃদ্ধের ন্যায় চামড়া কুঁচকান।

বগলের ও উরুতের ভাঁজে এবং হাতের তেলো ও পায়ের চেটোতে ঘা। তৎক্ষণাৎ কলিকাতার বড় ডাক্তারের জন্য তার গেল। তিনি পরদিন প্রাতে আসিয়া বলিলেন, "এ সমস্ত গরমির ঘা,—ভাল রকম চিকিৎসা অনেকদিন ধরে যদি করা যায়, শিশুর জীবন রক্ষা হওয়া সম্ভব।" শুনিয়া এম্-এ, উপাধিধারী যুবক পিতার নিকট ক্রোধের অভিনয় করিয়া স্ত্রীত্যাগের সঙ্কল্প জানাইলেন। তাঁহার স্ত্রী অসতী, নতুবা সন্তানের উপদংশের সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্ত পিতা এই যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, বৈবাহিককে পুত্রের সঙ্কল্প জানাইলেন। বালিকার প্রতি দয়া প্রকাশেও কার্পণ্য ছিল না; চাটুর্য্যে মহাশয় বলিলেন, "দেখ বেয়াই, বৌমারও শরীর ভাল নয়; আবার সসত্ত্বা হলেই জীবন সংশয়।" সংবাদ যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, প্রসূতির মাতা চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। উৎসব-ভবন বিষাদ দৃশ্যে পরিণত হইল। আমি সমুদায় কথা ডাক্তার-বাবুকে জানাইলাম। তিনি উচিত-বক্তা। আমার সমক্ষেই জামাতাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, আমার নিকট চালাকি চলবে না। মনে করেছ ঘা শুকিয়েছে, আর ডাক্তারের বাবাও কিছু বুঝতে পারবে না। তা ভেবো না, জর্ম্মাণ পণ্ডিতদের কৃপায় এখন আমরা রক্ত পরীক্ষা করেই বলতে পারি, দেহে উপদংশ-বিষ আছে কি না। অধঃপাতে ত গিয়াছিলে, আবার একটা সরলা বালিকার সর্ব্বনাশ করতে বসেছ! তার অপরাধ এই যে, সে তোমার স্ত্রী! তোমাকে ধিক্, আর তোমার ডিগ্রিকেও ধিক্। তোমার বাবা সেকেলে লোক,—পুত্রের পুনর্ব্বিবাহ দিয়ে কিছু লাভের আশা রাখেন। তুমি না সংস্কৃতে এম্-এ? বিবাহ-স্থলে না অগ্নি সাক্ষী করে বলেছিলে, 'যদস্তি হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম'—ভেবে দেখ, তোমারই দোষে ছয়টী প্রাণ নষ্ট হয়েছে। এই হত্যার কারণ তুমি। জান ত, হত্যার প্রায়শ্চিত্ত অগ্নিতে প্রাণত্যাগ। আচ্ছা, কচি-কচি মেয়েগুলি কেরোসিন মেখে পুড়ে মরে কেন? তোমরা ঐ রকমে পুড়ে মরে কি সমাজটাকে ভারমুক্ত করতে পার না? ও সব কথা থাক্, এখন চালাকি ছাড়, সত্য কথা বল, চিকিৎসা দ্বারা নিজে রোগমুক্ত হও। এ রোগ যে কি ভয়ানক তা জান না; তাই তোমাকে এ বিষয়ে কিছু বলছি,—মন দিয়ে শোন।"

(ক্রমশঃ)

সীবনাঞ্জলি

[অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়]

(২)

স্কোয়ার—একখানা ২৭" ইঞ্চি লম্বা, ২½" ইঞ্চি চওড়া, ¼" ইঞ্চি পুরু কাঠ নিয়া আর একখানি ১২" ইঞ্চি লম্বা, ২½" ইঞ্চি চওড়া, ¼" ইঞ্চি পুরু কাঠের সহিত পরস্পর সমকোণে দুই দিকে দুইখানি পিতল দ্বারা আঁটিয়া দিতে হইবে। পরে ইঞ্চির ফিতার মাপে ইঞ্চি দাগ কাটিয়া নিলে স্কোয়ার (square) হইল। এই স্কোয়ার কাপড় সমান দাগে দাগিবার সময় দরকার হয়।

হাতের সেপ—একখানি ৩০" ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা, ২½" ইঞ্চি চওড়া, ⅛" ইঞ্চি পুরু কাঠখানি একদিক সোজা লম্বা রাখিতে হইবে এক দিক এক মাথা ½" ইঞ্চি অপর দিক ১" ইঞ্চি যেই দিক ½" ইঞ্চি রাখা হইয়াছে সেই দিকে ১২" ইঞ্চি নিতে ২½" ইঞ্চি রাখিয়া বাঁকা ভাবে সেপ করিয়া লইতে হইবে, অপর যে ১" ইঞ্চি আছে সেই দিকে সমান বাঁকা ভাবে সেপ করিয়া লইতে হইবে এই হ'ল হাতের সেপ। (sleeve carve)

বনাত ও ব্রাস—এই কাপড়টা ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে জামা

দাগিবার চিত্র শিক্ষা দিতে দরকার হয়। চকের সাহায্যে এই কাপড়ের উপর বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া চলে। তারপর ব্রাস দ্বারা বণাত পরিষ্কার করিয়া অঙ্ক চিত্র দেখাইতে পারা যায়। বোর্ডের চেয়েও বণাত (Milton) কাপড়ে চিত্র বুঝাইতে সুবিধা হয়।

মাপ যন্ত্র—এই মাপ যন্ত্রের সাহায্যে ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দিবার পক্ষে বড়ই সুবিধা হয়। প্রথমতঃ একটা চিত্র আপনি ছাত্রদের বুঝাইয়া দিলেন, যেই মাপে বুঝাইয়া দেওয়া হইল সেই মাপের চেয়ে হয়তঃ ¼" বা ½" ইঞ্চি মাপে চিত্র করিবার জন্য বলিলেন। তখন এই মাপ যন্ত্র (Instruments Book)এর দরকার হয়। মাপ যন্ত্রের মাপ শিক্ষা থাকিলে করিবার পক্ষে বড়ই সুবিধা হয়। মনে করুন একটী মেরজাইয়ের চিত্র লম্বা ২৬" ছাতি ৩২" কোমর ২৮" পুট ৭" পুটহাতা ১৮" সেস্ত ১৫"। এই মেরজাইটী ১" ইঞ্চিকে ৪" ইঞ্চি ধরিয়া বুঝাইয়া দিয়া ছাত্রদের বলিলেন এই চিত্রটার ¼" বা ½" ইঞ্চিতে বুঝাইয়া দাও। তখনই মাপ যন্ত্রের সাহায্যের দরকার।

টেবিল ও বোর্ড—টেবিল ব্যবহারের উপকারিতা যখন কাপড় কাটিতে হইবে তখন বেশ বুঝা যায়। বসে কাটিবার পক্ষে অনেক অসুবিধা হয়, দাগিতে কষ্ট হয়, কিন্তু দাঁড়াইয়া টেবিলে দাগিবার পক্ষে ও কাটিবার পক্ষে বড়ই সহজসাধ্য হয়। ছাত্র-ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দিবার সময় বোর্ড ব্যবহারের দরকার হয়। কাল বোর্ডে চিত্র আঁকিয়া বুঝাইয়া দিয়া ছাত্রদের ¼" ইঞ্চি চিত্রের ভিতর বা ½" ইঞ্চি চিত্রের বাহিরে আঁকিবার জন্য দিলে তখন ছাত্র ও ছাত্রদের চিত্রের মাপ বুঝিবার পক্ষে সুবিধা; সহজে শিখিতে পারে।

ইস্ত্রি—গরম কোট ও সিল্ক কোট বা গরম কাপড়ের কোন জিনিস সেলাই করিবার সময় ইস্ত্রি সঙ্গে সঙ্গে গরম রাখিতে হইবে। ইস্ত্রি গরম থাকিলে সেলাই করিয়া তার উপর ইস্ত্রি ঘসিয়া দিলে খুব পরিষ্কার সেলাই হয়। সম্পূর্ণ কোট সেলাই হইয়া গেলে তাহাকে ভালরূপ ইস্ত্রি করিয়া দিলে গ্রাহকের সন্তুষ্টি উপলব্ধি করা যায়। ইস্ত্রি না দিয়া দিলে সেলাইগুলি কোঁকড়াইয়া আসে, সেজন্য অনেক সময় ভালরূপ কাটিং (cutting) গ্রাহকের অপছন্দ হইয়া যায়। এই সমস্ত কাপড়ে ইস্ত্রি না দিয়া গ্রাহকদের দেওয়া উচিত নয়। যেমন অটেংপেন, পটেলিম, ডসরেট, সিল্ক, সিল্ক সাটিন, আলপাকা, কাশ্মির, ভয়েল ও গরম কাপড় ও সিল্কের অন্যান্য কাপড় এই সমস্ত প্রত্যেক জিনিসে ইস্ত্রি দেওয়া দরকার।

সেলাই কল—তাড়াতাড়ি সেলাইয়ের জন্য সেলাইয়ের কলের দরকার। সেলাইয়ে পরিশ্রম অনেক কম পড়ে। আবার অনেক সেলাইয়ের কাজে সেলাইকলের সেলাই অতি দরকারী হইয়া পড়ে। সেলাইয়ের কল সম্বন্ধে এইখানে বিস্তারিত বর্ণনা করিব না। এই সেলাইয়ের কলের কাজ ১৫ দিন শিক্ষকের উপদেশ নিয়া শিখিলে সেলাইয়ের কলের সাধারণ কাজগুলি বুঝিতে তেমন কষ্টকর হয় না। অতি সহজে শিক্ষা করা যায়। পূর্ব্বে উইলসন মেসিন (Wilson Machine) বেশী প্রচলন ছিল। বর্ত্তমানে সিঙ্গারের কল-এর প্রচলন বেশী। এই সিঙ্গার কলে কাজ অতি সহজে শিক্ষা করা যায়। এই সেলাইয়ের কাজে ১২ বা ১৫কে নম্বর কলের দরকার।

কল চালাইবার সঙ্কেত—মনে করুন সিঙ্গার টেবিল মেসিন। পা-দানিতে পা দিয়া টেবিলের উপরের যে ছোট চাকাটী আছে, তাকে ডান হাতের দ্বারা সামনের দিক ঘুরাইয়া দিয়া চালাইয়া দিয়া পা নাড়িতে থাকিলে ঠিক কল চলিতে থাকিবে। এইটী লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে উপরের ছোট চাকাটা উল্টা না ঘুরে; উল্টা ঘুরিলে সূচের সূতা কাটিয়া যাইবে। কলের সূতা পরান ও বাধনে সূতা পরান, বাধনকেই যে বাধন পড়ান, মেটেলে বাধনকে সই পরান, কুচি করার কাজ ও কলের ফুলের কাজ ইত্যাদি ও অন্যান্য মেসিনারী বিষয় প্রথমে শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। কল সম্বন্ধে এইখানে আর বিশেষ উল্লেখ করিব না।

সেলাইয়ের বিশেষ নাম—সোজা খিলনী, পেস্থ, তোরপাই, গোল দরাজ, তালা তোলা, চাপ সেলাই, টেরা বা বাঁকা ওরমা, কিপর, কুলপী, বকেয়া, রিপু, সমজা, রিবন সেলাই, পাকা টাঁকা, বোতাম টাঁকা, বোতাম ঘর টাঁকা বা কাজ করা।

প্রথম শিক্ষার সময় যে রংয়ের কাপড় হইবে তার বিপরীত রংয়ের সূতার দ্বারা শিক্ষা করিতে হইবে। তা'হলে সেলাইয়ের দোষ গুণ অর্থাৎ বাঁকা সোজা সম্বন্ধে বুঝা যাইবে। মনে করুন, সাদা রংয়ের কাপড় (লংক্লথ) তার

উপর সবুজ কিম্বা লালরংয়ের বা কাল রংয়ের সূতার দ্বারা সেলাই করা যায়, তা' হলে সেলাইয়ের লাইন সোজা গেল কি বাঁকা গেল বা সেলাই গুলি ছোট বড় হইলে বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হয়। ফোড়গুলি সমান হওয়া খুব দরকার।

সোজা থিলনী—এক কাপড়ের সঙ্গে অন্য কাপড় যখন ভালরূপ সেলাই করিতে হইবে, তখন দুই টুকরা কাপড় একত্র করে বাম হাতে কাপড় রাখিয়া ডান হাতের সূচ সূতার দ্বারা সোজা ভাবে ফাঁক ফাঁক সেলাই করিয়া গেলে যে বাঁধন হইল, তাই থিলনী বা লবকী। এই অবস্থায় কতদূর সেলাই হইলে সেই সেলাইয়ের অংশটুকু বাম পা পাতিয়া তার উপর কাপড় রাখিয়া ডান পায়ের বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে চাপিয়া ধরিয়া সোজা ভাবে সেলাই করিয়া যাইতে হইবে; তা' হলে সেলাই খুব সহজসাধ্য হইবে। এই সেলাইগুলি প্রায় ১ইঞ্চি ব্যবধানে দোড় উঠে।

পেস্ সেলাই। দুই বা ততোধিক কাপড় পরস্পর চেপে থাকিবে, কখনও টান পড়িবে না! এমতাবস্থায় পেস্ সেলাই দরকার। পেস্ সেলাই প্রায় থিলনীর মতনই। থিলনীর সেলাই ১ইঞ্চি ব্যবধানে ফোড় উঠে, আর পেস্ সেলাইয়ের ১৬ বা ১৮ ইঞ্চি ব্যবধানে ফোড় উঠিয়া থাকে। পেস্ সেলাই নীচে উপরে দুই দিক সমান ফোড় উঠিয়া থাকে। রোক-বেরোক নাই। এই সেলাই শিক্ষার সময় লাইন সোজা রাখিয়া সেলাই করিতে হয়। তবে অনেক সময় ফুলের কাজ করিতে গিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেলাই করিতে হয়।

তোরপাই সেলাই—যে জায়গায় ধারগুলি খুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা, আর সর্ব্বদা টান পড়িবার সম্ভাবনা আছে, ও যে জায়গায় পরিষ্কার সেলাইয়ের দরকার, সেইখানে তোরপাই সেলাই দরকার হয়। অধিকাংশ সময় কোট, ওয়েষ্ট-কোট, প্যাণ্ট ও পাঞ্জাবীতে দরকার হয়। মনে করুন কোটের ডাউন, নেপেল তোরপাই করিতে হইবে। প্রথমতঃ কাপড়ের কিনারা ভাঁজ করিয়া ধরিয়া থিলনী দ্বারা আটকাইয়া নিয়া তার পর তোরপাই সেলাই করিতে হয়। তোরপাই সেলাইয়ের সময় ফোড় উঠাইয়া একবার টানিয়া লইয়া সূতাটী সূচের মাথার নীচে রাখিয়া আধ ইঞ্চি ব্যবধানে সেলাই উঠাইয়া নিতে হইবে। ফোড় উঠাইবার সময় বাম হাতের মধ্যমার সাহায্যে নীচে থেকে ফেলিয়া সূচের মুখ উপর দিক উঠাইয়া দিতে হইবে। সূচ উঠাইবার সময় এইটী বরাবর লক্ষ্য রাখিবে ফোড়গুলি এক সমান ও ছোট-ছোট ভাবে উঠিতেছে কি না; একটী ছোট একটী বড় হইলে তোরপাই তখন দেখিতে অপছন্দ হইবে। কিয়ংদূর সেলাই করিয়া এক-একবার সেলাইগুলি নীচের দিক দেখিয়া লইতে হয়। সূতার কাপড়ে বা সিল্ক কাপড়ে সেলাইগুলি একটু একটু দেখা যাইবে, কিন্তু গরম কাপড়ে সেলাই করা হইয়াছে কি না, বুঝাই যাইবে না। এইরূপ ভাবে সেলাই করিতে হয়। এই তোরপাই অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়।

কুশল প্রশ্ন

[শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর]

শুধাচ্ছ ভাই কেমন আছি?
শোনো তবে বিনোদ বাবু?
কুশল কোথায়, ঋণের মুষল
করছে যারে সদাই কাবু?
চাইলে টাকা হই গো বোবা,
বন্ধ এখন নাপিত ধোবা,
নানান রোগের ভান করে' ভাই,
রাত্রিকালে খাচ্ছি সাবু।
পুঁজিপাতি যা ছিল তা
নিয়ে বিদেয় হলেন 'সাবি';
ভাবি এখন কেমন করে'
যোগাই আবার 'টেবির' দাবি।

সাক্ষী আছে গিরীশ কাকা,
দিচ্ছি মাসে ত্রিশ টাকা
ভরসা,—দেবেন রাজা করে'
ডিগ্রী পেয়ে শ্রীমান হাবু।
স্বীকার করি জীব দেছে যে
আহার ও সেই দিবেক দিবে,
ওসুধের বিল, ছেলের পড়া,
মেয়ের বিয়ের ভার কে নিবে?
ট্যাক্স, চাঁদা, বাড়ী-ভাড়ার
তাড়ার তোড়ে ভাবছি এবার,
বনবাদারে পালিয়ে যাই,
পাই যদি ভাই একটি তাঁবু।
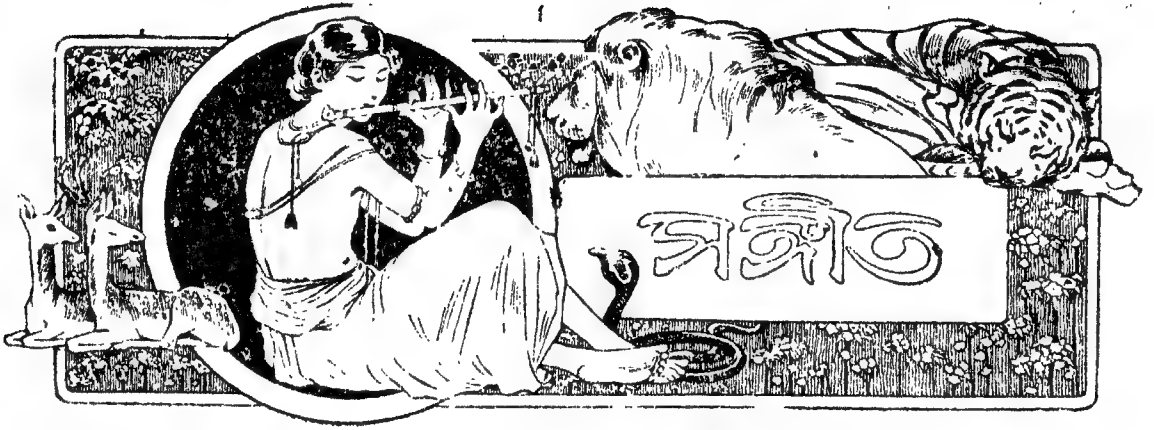
"সাজাহানের" গান। *

(চতুর্থ গীত)

[রচনা—স্বর্গীয় কবি জ্ঞানদাস]

কীর্ত্তন—একতালা।

পিয়ারা।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
সখিরে ————
কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি।

নিচল ছাড়িয়া উঁচলে উঠিতে,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে, কানুর পীরিতি
মরণ অধিক শেল॥

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা]

আরম্ভ, সা লয়ে :—

	০				১				২			
II {	সা	গা	রগমপা	|	মা	গা	গা	|	সা	গা	গা	|
	সু	খে	র০০০		লা	গি	য়া		এ	ঘ	র	

	৩				০				১			
|	র্গর্গা	গমগমগা	-রা	|	র্রর্রা	-রগমগা	রা	|	সঃ	সাঃ	ধ্ঃ	I
	বাঁধি	নু০০ ০০	০		অন	০০০০	লে		পু	ড়ি	য়া	

---

* "সাজাহানে"র গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

—লেখিকা

৩ ০ ১
| গা মা মা | রা গা রা | সা সন্ া ধন্ সা I
(৯ক) উ ঠি তে প ড়ি ছু অ॰ গা॰ ধ॰॰
(১৩ক) সে বি ন্দু ব ন্ধ র প ড়ি॰ য়া॰॰

২ ৩
I রঃ রাঃ -ঃ | -া -া -া } |
(৯খ) হু লে ॰ ॰ ॰ ॰
(১৩খ) গে ল ॰ ॰ ॰ ॰

আরম্ভের ঠা-লয়ের গতিতে :—

০ ১ ২´
| { পধনর্সা -নর্সনা ধা | পঃ -জ্ঞাপধধা ধাঃ I র্রঃ র্রাঃ র্সর্সা |
লছমী॰ ॰॰॰ ॰ চা ॰॰॰হি তে দা রি দ্রা

৩ ০ ১
| নধনর্সা নধা -পা | পপা -জ্ঞাপধা পা | মমা গা রগমা |
বে॰॰॰ ঢ় ল ॰ মাণি ॰॰॰ ক হারা দু ॰॰॰

২´ ৩
I মঃ মাঃ -া | -া -া -া } | ১৩, ১৩ক এবং ১৩খ স্বরলিপি দেখুন।
হে লে ॰ ॰ ॰ ॰

০ ১
| { পঃ ধাঃ পধনর্সর্রা | -র্সনধনর্সা র্সঃ র্সাঃ |
জ্ঞা ন দা॰॰॰॰ ॰॰॰॰স্ ক হে

২´ ৩
I ননননা ধনর্সনা -ধনধনর্সনা | -ধনধনর্সনা -ধনধনর্সনা -র্সনধপা |
কাঙ্গুরপীরি তি॰॰॰ ॰॰॰॰॰॰ ॰॰॰॰॰॰ ॰॰॰॰॰॰ ॰॰॰॰

০ ১ ২´
| পপা -জ্ঞাপধা পা | মমা গা -রগরগমা I মঃ মাঃ -ঃ |
মর ॰॰॰ ণ অধি ক ॰॰॰॰॰ শে ল ॰

৩
| -া -া -া } II II
॰ ॰ ॰

বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধে দু' একটী কথা

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

এক শ্রেণীর পাঠক বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন,—মূল না পড়িয়াই তাঁহারা সমালোচনা পড়িয়া থাকেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও পাঠদশাতেই আমাদের এই রীতিটা অভ্যাস করাইয়া দেয়। এইরূপ শ্রেণীর পাঠকদের নিকট অনুরোধ, তাঁহারা যেন পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত বসন্তবাবুর "বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যা" নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার মিলন" নামক প্রবন্ধের সমালোচনা পড়ার পর, একবার মূলটাও বিশেষ যত্নসহকারে পড়েন; তাহা হইলে বোধ হয় অনেকেরই মনে সন্দেহ হইবে, বসন্তবাবু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের যে মর্ম্ম দেখাইতে চাহিয়াছেন,—কবিবর কি ঠিক তাহাই বলিতে চাহেন? এ সম্বন্ধে কয়েকটী সন্দেহ ব্যক্ত করিতে চাই; সেজন্য বসন্তবাবুর উদারতার উপর নির্ভর করি। বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যার সামঞ্জস্যের কথা রবীন্দ্রনাথ শুধু "জোরের সহিত" প্রচার করিয়াছেন, বলিলে বোধ হয় ঠিক বলা হয় না। তিনি ইহার নিগূঢ় তত্ত্বটুকু তাঁহার লেখনীর বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় যেরূপ সরস ও সুন্দর ভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া ধরিয়াছেন, পূর্ব্বে আর কেহ সেরূপ করিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কোন কথার ব্যাখ্যা করা এ আলোচনার উদ্দেশ্য নহে, এ কথা প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল। চাঁদ দেখাইতে প্রদীপ জ্বালা শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়—হাস্যকর।

বসন্তবাবু প্রথমেই পরাধীন জাতির বিজ্ঞান চর্চ্চা সম্ভবপর কি না, এ সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। পরাধীনতা ও দারিদ্র্য—ইহার মধ্যে পরাধীনতার ফলেই দারিদ্র্য আসিয়াছে,—দারিদ্র্যের ফলে পরাধীনতা আসে নাই—ইতিহাস বোধ হয় এইরূপই সাক্ষ্য দেয়। এখন এই পরাধীনতা আসিল কোথা হইতে? প্রাচীন ভারত অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চ্চায় অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। তখন যদি প্রকৃতই আমাদের রাজনীতি বা সমাজ-বন্ধনে কোন বিশেষ একটা প্যাঁচ একটু আল্‌গা ছিল না, তবে এ পরাধীনতার উৎপত্তি কোথা হইতে? হঠাৎ একদিন মুসলমান আসিয়া হিন্দুদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দিল, অথবা ইংরাজ আসিয়া আমাদিগকে হারাইয়া দিল, আর আমরা পরাধীন হইয়া গেলাম। বসন্তবাবু কি বলিতে চাহেন, পরাধীনতা শুধু

যুদ্ধে পরাজিত হইবার ফল? রাণা প্রতাপ, রবার্ট ব্রুস প্রভৃতি ত যুদ্ধে হারিয়াছিলেন,—তবু পরাধীন হয়েন নাই। শিবাজীকে ত ঘরে বন্ধ করিয়া কামান পাহারা বসাইয়াও ওরঙ্গজেব অধীনতা স্বীকার করাইতে পারেন নাই। বিজেতা যদি সত্য-সত্যই বড় না হয়, তবে সে কখনও বিজিতকে অধীন করিতে পারে না। যদি সত্যই কোন দিন ভারত পাঠান ও মোগলদিগের ভারত ছিল, তবে যে পরিমাণে ইহা ইসলামীয় ভারত হইয়াছিল, সেই পরিমাণে পাঠান মোগলগণ নিশ্চয়ই বিজ্ঞানে বড় ছিল। আর যে পরিমাণে ভারত তাহাদের অপেক্ষা বিজ্ঞানে বড় ছিল, সেই পরিমাণে ইহা হিন্দু ভারতই ছিল। মুসলমানগণ তাহার সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইয়াছিল মাত্র। মুসলমান যুগে ভারত পরাধীন ছিল কি না, এ সম্বন্ধে তাই মতভেদ আছে। বসন্তবাবু নিজেই বলিয়াছেন, "ভারত পরাধীন হইবার পর হইতে বিজ্ঞান-চর্চার যতদূর অনিষ্ট হইয়াছে, অধ্যাত্মবিদ্যা-চর্চার ততদূর অনিষ্ট হয় নাই।" আর বিজ্ঞান চর্চার অভাব হেতু কোন অনিষ্ট ত বসন্তবাবু স্বীকার করেন না; তবে "অধ্যাত্মবিদ্যা চর্চার তত দূর অনিষ্ট" না হওয়া সত্ত্বেও, ভারতে এই পরাধীনতার নাগপাশ আসে কোথা হইতে? নিশ্চয়ই বিজ্ঞান-চর্চার অভাব হেতু। "চাস করিতে-করিতে প্রতি মুহূর্ত্তে ভগবান্‌কে ডাকিবার" অধিকার ত আমাদের কেহ কাড়িয়া লয় নাই বা লইতেও পারে না। আর শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখের মত আমাদের বর্ত্তমান পরাধীনতা-বোধ যদিও একেবারেই ভ্রম, তবে কিসের জন্য আজ আন্দোলন? কই, অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চা ত ভ্রমের নিরসন করিতে পারিতেছে না। এই যে সত্যকারের প্রয়োজন-বোধ, এইটাকে এড়াইয়া চলিতে যিনি চেষ্টা করেন, তিনি যদি ভালমানুষীর অছিলায় ভগবানের সহানুভূতি পাইতে পারেন, তবে ভগবানের ন্যায়-বিচারের উপর মানুষের যথেষ্ট সন্দেহের কারণ থাকিবে বলিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন, "দরকার নেই ব'লে কোন সত্যকারের দরকারকে যে মানুষ খাটো ক'রেছে, তাকে দুঃখ পে'তেই হবে।" কেহ "পর্ণকুটীরে সরল জীবন যাপন করুন, প্রয়োজনীয় সূতা চরকায় কাটাইয়া লইয়া তাঁতীর দ্বারা বস্ত্র বয়ন করাইয়া লউন";—কিন্তু জীবন যাপন করিবার বিজ্ঞানও তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। রোগজীর্ণ ও ক্ষুৎপীড়িত হইয়া এ সমস্ত অনুভূতিগুলি ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ভাবের ঘরে চুরি চলিবে না।

বস্তুতঃ, আত্মশক্তিতে আস্থাহীনতাই পরাধীনতার শৃঙ্খলের প্রথম গ্রন্থি। আমরা পলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্য হারাইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই, আমাদের মন অজ্ঞতা ও সহস্র প্রকার নৈতিক পরাধীনতার বন্ধনে অষ্টে-পৃষ্ঠে বদ্ধ হইয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল। ইতিহাস ইহার অকাট্য প্রমাণ দেয়; এবং তর্কের দিক হইতেও ইহাকে না মানিয়া উপায় নাই। ভীরু মন হঠাৎ একটা শক্তিমান্ জাতির প্রাবল্যে শঙ্কিত হইয়া তাহার অধীনতায় মাথা পাতিয়া লয়। এইরূপে ব্রিটনরা একদিন রোমীয় শাসন মানিয়া লইয়াছিল; কিন্তু ইংরাজরা নর্ম্যাণ বিজেতার বংশধরদিগকে তেমন ভাবে লয় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "পশ্চিম দেশে পলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হ'তে আরম্ভ হ'য়েচে কখন থেকে? * * যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত ক'রেচে।" প্রথমে পরাধীনতা ঘুচাইব, তার পর শুভ দিন দেখিয়া বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে,—এরূপ যুক্তি কতকটা ডাঙ্গায় সাঁতার শিখিয়া তবে জলে নামিবার সঙ্কল্পের মত শুনায় না কি?

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান শব্দে বসন্তবাবু কতকগুলি কল-কারখানার কথাই বেশী করিয়া ভাবিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। দরিদ্র কৃষককে হাল ছাড়িয়া কলেজে বিজ্ঞানচর্চা করিতে যাইতে হইবে ভাবিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়াছেন। তিনি বিজ্ঞান শব্দটাকে Scientific knowledge বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আর Science শব্দের প্রচলিত অর্থ বুঝাইতে, 'ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ-বিদ্যা' এইরূপ কিছু বলিতে হইবে বলিয়াছেন। কিন্তু Science-এর প্রচলিত অর্থেও, অনেক বিষয় ঠিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যপদার্থ নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারা যায়—atom, ether। রবীন্দ্রনাথ যে বিজ্ঞান শব্দে,—এই সমস্তই যার অন্তর্গত, সেই বিশাল ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির কথাই বলিয়াছেন, তাঁহার লেখা পড়িয়া ত আমরা তাহাই বুঝিয়াছি। তিনি "আধ্যাত্মিক মহল" হইতে পৃথক করিয়া, ইহাকে এক কথায় "আধিভৌতিক রাজ্যের বিদ্যা" বলিয়াছেন। তিনি

স্পষ্টই বলিয়াছেন, "এই বিদ্যার জোরে সম্যক্‌রূপে জীবন রক্ষা হয়, জীবন পোষণ হয়, জীবনের সকল প্রকার দুর্গতি দূর হ'তে থাকে; অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব মোচন হয়; জড়ের অত্যাচার, জন্তুর অত্যাচার, মানুষের অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে।" গীতায় আছে আমাদের বেদও "ত্রৈগুণ্যবিষয়া"; বৈদিক যজ্ঞ দ্বারা পর্জ্জন্য, পর্জ্জন্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন ও অন্ন হইতে প্রাণী-রক্ষা বা সৃষ্টি-রক্ষা হয়। এ হিসাবে বেদকেও এই "আধিভৌতিক বিদ্যার" অন্তর্গত বলিলে দোষ হয় না। ইহাকে বস্তুবিদ্যা বলিলে কি দোষ হয়, বুঝিলাম না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "গোড়ায় তার (মানুষের) বিশ্বাস ছিল, জগতে যা কিছু ঘটছে এ সমস্তই একটা অদ্ভুত যাদুশক্তির জোরে; অতএব, তারও যদি যাদুশক্তি থাকে, তবেই শক্তির সঙ্গে অনুরূপ শক্তির যোগে সে কর্তৃত্বলাভ ক'রতে পারে। সেই যাদুশক্তির সাধনায় মানুষ যে চেষ্টা সুরু করেছিল, আজ বিজ্ঞানের সাধনায় তার সেই চেষ্টার পরিণতি।" এই সকল স্থলে বিজ্ঞান শব্দের অর্থটাকে শুধু যন্ত্রপাতি বা কারখানার সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখা হইয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না।

এই বিশ্বের নিয়মের সহিত আমাদিগকে একটা সামঞ্জস্যের মধ্যে আনিতেই হইবে। না পারিলে, তাহার কঠিন পীড়নের আঘাতে পিষিয়া মরিয়া যাইতে হইবে। এখন এই আঘাত হইতে যদি এই জড়দেহটাকে বাঁচাইবার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ইহার চাতুরী বা রহস্যটুকুর সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই প্রচণ্ড জড়শক্তির উপর যাহারা প্রভুত্ব লাভ করিবে, তাহারা ইহার অপব্যবহার করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিলে, অপেক্ষাকৃত কম অগ্রসর ব্যক্তিদিগকে তাহাদিগের হস্তে এই শক্তির দ্বারাই লাঞ্ছিত হইতে হইবে। আর এই লাঞ্ছনার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া যদি তাহারা কেবলই মনে করে, জগতের সকলেই ভালমানুষ হইলেই ত আমাদের আর কোন বিপদ ঘটে না,—তবে এই দ্বন্দ্বসংঘাতময়ী সৃষ্টির ভিতর তাহাদের স্থান নাই বলিতে হইবে। দুর্ব্বলতা রিপুর উত্তেজনার উপকরণ যোগাইয়া দেয়;—সে হিসাবেও ইহা বিশ্বের কল্যাণের পথের বিঘ্ন। আজ যে কতকটা এইরূপ ঘটনারই অভিনয় হইতেছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। তাই আমাদের দেশের কৃষককে জীবনধারণ করিবার জন্য আধিভৌতিক বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হইবে; শারীর-বিজ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান জানিতে হইবে; নতুবা, প্রতি মুহূর্ত্তে ভগবান্‌কে ডাকিবার প্রবৃত্তি হইবে কি না, বলিতে পারি না; তবে অবসর নিশ্চয়ই মিলিবে না। একটা জাতি যতই খাঁটি থাকুক না কেন, তাহার আত্মরক্ষার প্রয়োজন হইবেই;—জড়ের অত্যাচার হইতেই হউক, বা মানুষের অত্যাচার হইতেই হউক। আর এই অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে রিপুর বশবর্ত্তী হইতেই হইবে, এরূপ ও কোন কারণ নাই। কোন সময়ে ক্ষমাবৎ ও অক্রোধী বশিষ্ঠকে ও বিশ্বামিত্রকে নিবারণ করিবার জন্য ব্রহ্মদণ্ড ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। আর "এই নিয়মকে নিজে হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা যে কর্তৃত্ব পেতে পারি" তাহা হতে প্রকৃতই মোহ ছাড়া কেহই আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে না—তালা চাবি দিয়া ঘরে বন্ধ করিলেও না। জেলের ভিতর বসিয়াও মানুষ কি করিতে পারে, তাহার উদাহরণ পাশ্চাত্যদের সাহিত্যে, ইতিহাসে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। আর এ দেশে চরক-সুশ্রুত থাকিতেও যে অনেক অর্থশালী ব্যক্তি—বোধ হয় অশিক্ষিতদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই—ওষুধের পক্ষপাতী, বসন্তবাবু কি তাহা অবগত নহেন?

এই নিয়মকে বুদ্ধির সহিত সামঞ্জস্যে আনিতে পারিলেই, বিশ্বের উপর অধিকার পাওয়া যায়; কিন্তু ভগবান্‌কে তখনই পাওয়া যায় না। আমরা জড়বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব পাইয়া ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারি মাত্র। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ এই কথাই বলিতে চাহেন; এবং এ কথা অস্বীকার করিবার মত কোন বড় দার্শনিক মত আমরা অবগত নহি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বস্তুরাজ্যে আমাকে না হ'লেও তোমার চল্‌বে। ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালাম—এ রাজ্য তোমারই হোক।" এখানে তাঁহার কথাটাকে মতবাদের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টার কি প্রয়োজন, বুঝিলাম না। যত মুনি, তত মত থাকুক; কিন্তু শুধু জড়-প্রকৃতির জ্ঞান দ্বারাই যে ব্রহ্মকে জানা যায় না, এ কথাটা ত অনেক অদার্শনিক ব্যক্তিও স্বীকার করেন। এই বিজ্ঞানের অপব্যবহারের ফলে capitalism, militarism, imperialism প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে; এবং এইরূপ আরও যে সহস্র প্রকার আপদের

উৎপত্তির সম্ভাবনা আছে, এ কথা রবীন্দ্রনাথ যেরূপ প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছেন, তাহার উপর কোনরূপ টীকা নিষ্প্রয়োজন। কোন বৈজ্ঞানিক নিয়মকে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যাহারা কলে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিজ্ঞান সাধকগণ পতিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (আরিষ্টটলের বিখ্যাত উক্তি সকলেই জানেন)। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, "নিয়মের পশ্চাতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের মানবত্বের অন্তরঙ্গ আনন্দময় মিল আছে। নিয়মকে কাজে খাটিয়ে আমরা ফল পাই, কিন্তু ফল পাওয়ার চেয়েও মানুষের একটা বড় লাভ আছে।" "যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড় করে তুলে পশ্চিম-সমাজে মানব সম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটবে।" এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক কথা তুলিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইবে। তিনি তাই এই ভেদবুদ্ধির নিন্দা করিয়া, ঐকান্তের কথাই বলিয়াছেন; এবং জড়বিশ্বের গোলামী মুক্ত আত্মার পাকা ভিতের উপর এই একত্ব গাড়িবার কথাই তিনি বলিয়াছেন।

বসন্তবাবু রহস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কতখানি আধ্যাত্মিক বিদ্যার সহিত কতখানি বৈজ্ঞানিক বিদ্যা মিশাইলে আধ্যাত্মিক বিদ্যার দোষটুকু কাটিয়া যাইবে? ইহার উত্তরে অবশ্য বলা যাইতে পারে, যতখানি বিজ্ঞানের দ্বারা আত্মা জড়ের গোলামী হইতে মুক্ত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে "এক ঝোঁকা আধ্যাত্মিক বিদ্যার" কথা বলিয়াছেন, ঠিক সেই অর্থে বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিদের একঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিই ছিল—বসন্তবাবু ইহাই বলিতে চাহেন, কিন্তু যে সকল ঋষি হইতে আমরা আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, স্মৃতি, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদি সব পাইয়াছি, তাঁহারা ঠিক একঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধি লইয়া দেশকে বা আপনাদিগকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, এ কথা মানিতে অনেকেরই আপত্তি আছে। আর এই সকল ঋষির বিজ্ঞানবুদ্ধি আধুনিকদের অপেক্ষা অল্পই ছিল, এ কথা বলিতে পারার মত মাপকাঠির বিষয় আমরা অবগত নহি। তাঁহাদের মধ্যে এমন কি অনেক মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের কথাও আমরা শুনিতে পাই। ব্রহ্মা সৃষ্টিরক্ষা কল্পে অথর্ববেদের অন্তর্গত করিয়া আয়ুর্বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই আয়ুর্বেদ শিখিবার নিমিত্ত অত্রি ঋষিকে স্বর্গে যাইতে হইয়াছিল। ভরদ্বাজ আশ্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের নিধান ও দীপ্ততেজা পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, ভৃগু, বশিষ্ঠ ইত্যাদি মহর্ষিগণ ও বালখিল্যাদি ঋষিগণ সমবেত হইয়া,—আয়ুর্বিজ্ঞান শিখিবার নিমিত্ত ভরদ্বাজকে ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করেন। ব্রহ্মবিদ্যার আকর এই সমস্ত মহর্ষিদিগেরও অবিদ্যার বিষয় আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। আর যদি মনে করিয়া লওয়া যায়, কোন একদিন দেশের লোক সংসার অসার ভাবিয়া, কৌপীন পরিধান করিয়া, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, বিরাগী হইয়া চলিয়া যাইবে, তাহা হইলে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহাও একবার কল্পনা করিয়া দেখিবার বিষয়। ভগবৎ-সাধনা কি এত সহজেই হইবার বিষয়?

এইবার উপনিষদের কথাটার বিষয়ে আমাদের যাহা বলিবার আছে, বলিব। মুণ্ডকোপনিষদের প্রথমেই "কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি" (ভগবন্ কাহাকে জানিলে এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়,) শৌনকের এই প্রশ্নের উত্তরে অঙ্গিরা বলিলেন, "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা।" এই অপরাই অবিদ্যা, শঙ্করাচার্য্যও তাহাই বলেন। ইহার পরেই বলা হইয়াছে, বেদ-বেদাঙ্গ প্রভৃতি অপরা বিদ্যার বিষয়, আর অক্ষর ব্রহ্ম পরাবিদ্যার বিষয়। এখন এই পরাবিদ্যার বিষয় যে ব্রহ্ম, তাহাকে জানিবার অধিকার কেবল সংসার-বিরক্তদিগেরই আছে; এবং তাহারা অপরা বিদ্যার দ্বারাই এই বৈরাগ্য লাভ করিবে (পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ইত্যাদি মুণ্ডকোপনিষৎ)। শঙ্করও বলিয়াছেন, তদ্দর্শনে (অপরা বিদ্যার বিষয় দর্শনে) তন্নির্ব্বেদোপপত্তিঃ (তাহাতে বৈরাগ্য হয়)

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ।

এই শ্লোকে 'অপ্রমত্তেন' শব্দটার উপর যতটুকু মনোযোগ প্রদান কর্ত্তব্য, সম্ভবতঃ বসন্তবাবু ততটুকু করেন নাই। এই অপ্রমত্ত হইবার জন্যই অপরা বিদ্যার বিষয়-বিজ্ঞানের প্রয়োজন—উপনিষৎ বোধ হয় তাহাই বলেন। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি ইত্যাদি শ্লোকে, রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা যথার্থ নহে মনে করিবার কি হেতু আছে, তাহা বুঝিলাম না। রামানুজ প্রভৃতি অনেক টীকাকারের মতে 'বিদ্যা' অর্থে "জ্ঞান,—আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান।" ইহার ঠিক পরবর্ত্তী শ্লোকে "অসম্ভূতি" শব্দের শঙ্করও ব্যাখ্যা করেন—অবিদ্যা, অব্যাকৃত প্রকৃতি। সুতরাং অবিদ্যা যে সমগ্র

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি,এ কথাও শঙ্কর ঠিক এই শ্লোকের পরেই মানিয়াছেন। অমৃত অর্থে যে মোক্ষ, ইহাও শঙ্কর মানিয়াছেন। (মুণ্ডক ৩৭শ শ্লোকের শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য) শঙ্কর অবশ্য মায়াবাদী; তাই অনেকস্থলে তাঁহাকে কষ্ট-কল্পনার সাহায্য লইতে হইয়াছে। আর শঙ্করের মতটাই কি চূড়ান্ত বলিয়া সকল স্থলেই মানিতে হইবে? তবে অন্য টীকার জগতে কেন প্রয়োজন হইল? আর অখণ্ড এক যদি বৈচিত্র্যের মধ্যেই প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে সমগ্র ভাবে সত্যকে পাইতে হইলে তাহাকে এই দুই দিক হইতেই দেখিতে হইবে,—বিদ্যাং চ অবিদ্যাং ইত্যাদি শ্লোকের ইহাই ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয়। এই সত্যের আংশিক লীলা শুধু বৈচিত্র্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। আবার বৈচিত্র্যহীন যে অখণ্ড একের জ্ঞান, অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তির পক্ষে ইহা আরও অন্ধকার; 'ততো ভূয় ইব' এর অর্থ এইরূপ বলিয়াই মনে হয়। শান্ত অক্ষর ব্রহ্মের অবস্থায় অবিদ্যার অস্তিত্ব লীন হইয়া যাইলেও, তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উপনিষদের ঋষি বস্তুতঃ সামঞ্জস্যই দেখাইতে চাহেন বলিয়া বুঝা যায়। গীতাকারও উপনিষদের ঋষিদের এই সামঞ্জস্যের কথাই আরও স্পষ্ট করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ "বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করেন না—" ইহাতে তিনি কি অপরাধ করিলেন, বুঝিলাম না। বসন্তবাবু বলেন, "বুদ্ধ, খৃষ্ট, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ ইহারা সকলেই ঝুলি শূন্য করিয়াছিলেন";—তবে তিনি নিশ্চয়ই বলিতে চাহেন, ইঁহাদের ঝুলি পূর্ণ ছিল, নতুবা শূন্য করিলেন কি প্রকারে? বাস্তবিক শূন্য ঝুলির বৈরাগ্যটা ঠিক কথামালার শৃগালের আঙ্গুর ফলের প্রতি বৈরাগ্য নয় কি? রবীন্দ্রনাথ এইস্থলে বলিয়াছেন, "বাহিরের বৈরাগ্য অন্তরের পূর্ণতারই সাক্ষ্য দেয়।" আর আমাদের দেশে বৈরাগীর যিনি আদর্শ তাঁহার গৃহিনী অন্নপূর্ণা,—কুবের আজ্ঞাবহ ভৃত্য। বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি "আধিভৌতিক বিশ্বের দায়কে ফাঁকি" দিয়াছিলেন—বসন্তবাবু ইহাই বলিতে চাহেন। এখানে আধিভৌতিক বিশ্বের দায়কে ফাঁকি দিতে পারার অর্থ—"আহার আশ্রয়ের বন্দোবস্ত আগে করা"—যদি বসন্তবাবুর এই মনে হয়, তবে আমাদের মনে হয় তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য সংস্কার-বিমুক্ত ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। যখন শিশুর নিকট তাহার খেলার জগতটিই সত্য, তখন তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা দেওয়া যায় না। যম বিশেষ পরীক্ষা করিয়া লইয়া তবে নচিকেতাকে ব্রহ্মবিদ্যার রহস্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ, চৈতন্য হাঁটিতে শিখিয়াই বৈরাগী হন নাই। আধিভৌতিকের দায় এড়াইবার জন্য প্রতিভার তারতম্য অনুসারে অল্প-বিস্তর সাধন সকলকেই করিতে হয়। আর তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ একেবারেই আহার আচ্ছাদন ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াও শুনি নাই। বুদ্ধদেব কৃচ্ছ্রসাধন নিষেধ করিয়াছিলেন,—চৈতন্য তাঁহার প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দকে সংসারী করিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক ভারত এই আধিভৌতিক দায়কে ফাঁকি দিবার চেষ্টা সতাই করিয়াছে। তাই, সেই দায় সুদে-আসলে আজ চাপিয়া ধরিয়াছে—আজ দেশে তাই অন্ন-বস্ত্রের জন্য হাহাকার। বুদ্ধ, শঙ্করের তথা-কথিত চেলারা পশুর মত জড়ের নিকট বলি হইতেছে। শুনিয়াছি, বিবেকানন্দ মুক্তিপথের জিজ্ঞাসু কয়েকজন যুবককে প্রথমতঃ ফুটবল খেলিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

আমরা আজ জড় প্রকৃতির অত্যাচারে উৎপীড়িত, শঙ্কাভিভূত। আমাদের দেশের শিশু শৈশবেই ভবলীলা সম্বরণ করে। যৌবন কাহাকে বলে, অধিকাংশ নরনারী তাহা জানিবার পূর্ব্বেই, বার্দ্ধক্য আসিয়া তাহাদের চুল চাপিয়া ধরে। আমাদের বৈরাগ্য এখন অগত্যা বলিতে হইবে।

এ স্থলে পশ্চিমকে মোটর-দস্যু বলিয়া গালি দিয়া কিছু আত্মপ্রসাদ লাভ হইতে পারে, কিন্তু আমরা আধিভৌতিক উৎপাত হইতে রক্ষা পাইব না। যদি দুই-তিন শত বৎসরের প্রভুত্বকে না মানি, তবে দুই-তিন সহস্র বৎসরের প্রভুত্বকেই বা কি করিয়া মানা যায়। অনন্ত কালের তুলনায় দুই-ই নগণ্য। আর দস্যুর লোভের দিকটা নিন্দনীয় হইলেও, তাহার আর একটা দিক আছে, যাহা প্রশংসনীয়, এবং যাহার নিমিত্ত অনেক দস্যু পরিণামে মহাপুরুষ হইয়া পড়েন। তাঁহারা বিদ্রোহী বীর; আর এইরূপ ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ভগবদ্দর্শন পান,—আমাদের পুরাণেও এই কথা বলে। বাল্মীকি দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া মহর্ষি হইলেন। কিন্তু আমরা, ভাল মানুষ গৃহস্থ, শ্যাম কুল দুই-ই হারাইয়া বসিয়া থাকি। Blessed are the meek এ কথা খুবই সত্য, কিন্তু এই meek এর সঙ্গে coward বা slave এর কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া ত মনে হয় না।

বেদ ও বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সেদিন বেদের আকাশ এবং বিজ্ঞানের ঈথার সম্বন্ধে যে কথা কয়টা পাড়িয়াছিলাম, আমার আশঙ্কা হয়, সে কথা কয়টা তেমন পরিষ্কার হয় নাই। বেদে 'আকাশ' শব্দটা এবং বিজ্ঞানে 'ঈথার' শব্দটা ঠিক একই অর্থে সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হয় নাই। না হইবারই কথা। যে বিদ্যা পরীক্ষা-পর্য্যবেক্ষণের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ আমাদের চঞ্চল, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিকে সত্যের যথার্থ মূর্ত্তিতে আনিয়া সুস্থির-নিবদ্ধ করিয়া দিতে চায়, সে বিদ্যার পরিভাষাগুলি একঘেয়ে হইলে চলে না। লক্ষ্য শেষ পর্য্যন্ত এক হইলেও, যাত্রার প্রথমে পা বাড়াইয়া তাহার ষোল-আনা কখনই স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় না; চলিতে চলিতে যেমনটা তাহাকে দেখি, তেমনটা তাহাকে বুঝি ও ভাষায় ব্যক্ত করি। দেখা যেমন পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতে থাকে, তাহাকে বোঝা ও বলাও তেমনি যথার্থ হইতে যথার্থতর হইতে থাকে। আত্মা বা ব্রহ্মকেই হয় ত ধরিতে চাহি। কিন্তু চলিবার পথে ব্রহ্ম হয় ত নানা মূর্ত্তিতে আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। প্রথমে যে রূপ তাঁহার দেখিলাম, সেটা অন্ন। খাইয়াই সকল লোক বাঁচিয়া আছে। খোরাক বন্ধ হইলে প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তেরই ক্রমশঃ 'চক্ষুস্থির' হয়। অতএব অন্নের উপরই সব প্রতিষ্ঠিত। অন্নই আত্মা। ইহাই হইল আত্মার বা ব্রহ্মের কাঁচা দেখা। এস্থলে বিচার করিতে যাইব না, তবে ক্রমশঃ নানা স্তরের মধ্য দিয়া এই কাঁচা দেখাটিকে পাকা দেখা করিয়া লইতে হয়। পাকা দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চিন্তা নাই এবং আনন্দ নাই; কারণ, আত্মাকে আনন্দরূপে দেখাই পাকা দেখা। খুঁজিতে বাহির হইয়াই এ পাকা দেখা হয় না। 'পেটের জন্যই যে সব' এ কথা আমাদের বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না; কিন্তু আমার ভিতরে যে বস্তুটি রহিয়াছেন, তিনি যে আনন্দময় পুরুষ, এ কথা শুনিলেও সহসা বিশ্বাস করিতে ভরসা হয় না। "ত্রিবিধ তাপেতে তারা নিশিদিন হতেছি সারা"—এইটেই মনে হয় আমার অন্তরাত্মার সবচেয়ে ঘরওয়া বা মর্ম্মান্তিক খবর। এ খবর যে ঝুঁটা খবর, তাহা বুঝিব কি প্রকারে? অষ্টাবক্রসংহিতায় শিষ্য গুরুকে আত্মানুভবের পরিচয় দিবার প্রসঙ্গে বলিতেছেন—এক সচ্চিদানন্দরূপ আত্মা সীমাহীন মহাসাগরের মত দশদিক ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; এবং তাহাতেই কোটি-কোটি বিশ্ব বুদ্‌বুদের মত উঠিতেছে, মিলাইতেছে। কথাটা শুনিলাম; কিন্তু শুনিয়া মনে হইল, কি এক অদ্ভুত, সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার! ইহা যে আমারই স্বরূপ-পরিচয়, তাহাতে আমার মোটেই সন্দেহ হয় না। সে দিন ঐ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে পরমহংসদেব চিন্ময় কোশা, চিন্ময় কুশী, চিন্ময় গঙ্গাজল, চিন্ময় ঘর-দুয়ার গাছ-পালার কথা বলিয়া আমাদিগকে অবাক্ করিয়াছিলেন। আত্মাই বহুরূপী সাজিয়া, জগৎ সাজিয়া, নিজের চোখে ভেল্কি লাগাইতেছেন,—এ কথা শুনিয়া আমাদের প্রত্যয় হয় না। অথচ এ সব মায়াবাদ, বিবর্ত্তবাদের কথা হাজার-হাজার বৎসর ধরিয়া আমাদের বিরাট সমাজ ও সভ্যতার শিরায় উপ-শিরায় রক্তের মত প্রবাহিত হইয়া, নানা পুরাণে-তিহাসে, গাথা-উপাখ্যানে, দর্শনমতবাদে ও লোকবিশ্বাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন হইতে আমাদের এই ঘরের কথাটার জন্য সাহেবদের কাছে গালি খাইয়া আসিতেছি। "মায়াবাদ" "মায়াবাদ" করিয়াই আমরা না কি অতি নিষ্ঠুর ভাবে সত্য এই জগৎটাকে হিসাব হইতে বাদ দিতে যাইয়া, নিজেরাই বাদ পড়িয়া বসিয়া আছি। জগতের দেনা-পাওনার খাতায় পৃথিবীর পাঁচভাগের একভাগ লোক তাই আজ শূন্য বা ফাজিল অঙ্কের সামিলই হইয়া রহিয়াছে। উইলিয়াম আর্চার প্রভৃতি সাহেব সমালোচকদের মতে আমাদের "সনাতন" সভ্যতাটাই না কি মায়া—একটা প্রকাণ্ড ভুয়াবাজি। সে যাহা হউক, আমরাও ক্রমশঃ সাহেবদের কাছে শিষ্ট বালক হইয়া উঠিতেছি;—নিজেদের ঘরের পরিচয় আর আমরা রাখিতেছি না; শুনিলে বিস্ময়

প্রকাশ করিতে শিখিতেছি। ভয়ের কথা কি ভরসার কথা জানি না,—তবে আত্মতত্ত্ব চিরদিনই দুর্বিজ্ঞেয়; কঠশ্রুতির সুরে সুর দিয়া গীতা তাই বলিয়াছেন—আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ—ইত্যাদি। আত্মার কথা, আমার নিজের কথা, শুনিয়া অবাক্ হওয়া আজ নূতন নহে; চিরদিনই আমাকে আমি আশ্চর্য্যবৎ দেখিতেছি, শুনিতেছি ও বলিতেছি। গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে শুনিয়াও না বুঝা আজ নূতন নহে—শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ। আমাদের সমাজে, শিক্ষা-দীক্ষায়, কথাটাকে ক্রমশঃ সহাইয়া লইবার আয়োজন-অনুষ্ঠান অনেকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল; ফলে, আমাদের পূর্ব্বগামীরা কথাটা শুনিয়া সব সময়ে না বুঝিলেও ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিতেন না এবং সরিয়া পড়িতেন না। পুরাণে, যাত্রায়, কীর্ত্তন-গানে, কথকতায় কথাটাকে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া রকমারি করিয়া দেখিয়া, ইহাকে একেবারে আত্মসাৎ করিতে না পারিলেও, ইহার প্রতি আমাদের মমত্ববোধ ক্রমশঃ বলবত্তর হইয়া উঠিয়াছিল।

"আমার" খবর এত বড় একটা রহস্য বলিয়া, ইচ্ছা হইল আর এ রহস্যোদ্‌ভেদ করিয়া দেখাইলাম, এমনটা আশা করা যায় না। ধীরে ধীরে পরদার পর পরদা সরাইয়া জিজ্ঞাসাকে ক্রমশঃ অন্দরের দিকে লইয়া যাইতে হয়। অরুন্ধতী তারা দেখাইবার সমাচার শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যে দিয়াছেন। আমরাও পূর্ব্বের দুটি-একটি বক্তৃতায় সে সমাচার ভাঙ্গিয়া বলিয়াছি। ছোট তারা দেখাইবার প্রয়োজন হইলে আগে নিকটের একটা বড় তারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ন'হলে প্রথমেই অনভিজ্ঞ চঞ্চল দৃষ্টিকে অভীষ্ট বিষয়ে সুস্থির করিতে পারা যায় না। সাধনশাস্ত্র মাত্রেই সেইজন্য জিজ্ঞাসুর সামর্থ্য ও অধিকার বুঝিয়া লক্ষ্য পদার্থের লক্ষণ প্রয়োজন-মত বদ্‌লাইয়া থাকেন। একই পদার্থের নানা রকমের লক্ষণ বা বিবরণ দেখিয়া তাই আমাদের দুশ্চিন্তায় পড়িবার কারণ নাই। বালক, সূর্য্যের চারিধারে পৃথিবী কেমন ধারা পথে পরিক্রমণ করে, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, প্রথমতঃ বুঝাইবার সুবিধার জন্য বলি বৃত্তাকার পথে; পরে সংশোধন করিয়া বলি ডিম্বের মত বৃত্তাভাস (ellipse) পথে; শেষে, বালক অভিজ্ঞ হইলে বুঝিতে পারে যে, পথ ঠিক বৃত্তাভাসও নহে, তার চেয়ে ঢের জটিল ও কুটিল; তবে হিসাব লওয়ার পক্ষে বৃত্তাভাস মনে করিলে তাদৃশ দোষের হয় না। কিন্তু ও হিসাব মোটামুটি (approximate) হিসাব; গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ কেপলার সাহেবের প্রথম আইন মোটামুটি ভাবেই যথার্থ। একটী গ্রহের গতি-পথ স্থলবিশেষে অনির্দ্দেশ্য কারণে কুটিল (অর্থাৎ বাঁকাচোরা) হইতেছে দেখিয়া, জ্যোতির্ব্বিদের মনে সংশয় হইল, এখানে আর কোনও অজ্ঞাতনামা জ্যোতিষ্ক অলক্ষ্যে থাকিয়া, পদ্মাসুরের মত আমাদের পরিচিত গ্রহটিকে পথ ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছেন; গ্রহটি শান্তশিষ্ট, বেচারি হইলেও, তাহাকে টানা-হেঁচড়া করিয়া বিপথে লইতেছেন। যাই মনে সংশয়, অমনি গুণাগাঁথা আরম্ভ হইল; খড়ি পাতিয়া জ্যোতিষী ঠাকুর গণিয়া দিলেন, কতদূরে কোথায় সেই বিমানচারী পদ্মাসুরের অজ্ঞাতবাস। অজ্ঞাতবাসের ঠিকানা যখন মিলিল, তখন দূরবীক্ষণের মুখে তিনি আর গা-ঢাকা দিয়া থাকিতে পারিলেন না। পদ্মাসুর নূতন একটা গ্রহ হইয়া ধরা পড়িয়া গেলেন; এবং তার পর হইতে পাশ্চাত্য জ্যোতিষী ঠাকুরদের পঞ্জিকায় বেশ সভ্যভব্য হইয়া বসিবার জন্য একখানা ইঁট পাইয়াছেন। যাহা হউক, মোটামুটি হিসাব বাদ দিলে বিজ্ঞানই হয় না। এইজন্য বলিতেছিলাম সে শুধু অধ্যাত্মশাস্ত্রে নয়, বিজ্ঞানেও গোড়ায় মোটামুটি সাদাসিধা লক্ষণ লইয়াই সুরু করিতে হয়। ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও যথার্থ লক্ষণটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, এবং বুদ্ধিতে ধরিবার চেষ্টা করিতে হয়। বিজ্ঞানও সাধনশাস্ত্র, এ কথা মনে রাখিবেন। সাধনশাস্ত্রমাত্রেরই ঐ দস্তুর।

এ কথাটা এ ভাবে দেখিতে গেলে, খুবই স্বাভাবিক বোধ হয় না কি? সজীব পদার্থের মত সে জিনিসটা বা ভাবটা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাকে বরাবরই একটা গণ্ডীর ভিতরেই পূরিয়া রাখা চলে কি? বটগাছের ছোট চারাটিকে টবে রাখিয়া আমার বারান্দার ফুলগাছ-গুলার সামিলই ভাবিতে পারি। কিন্তু সে যত বড় হইতে থাকিবে, ততই সে আমার দেওয়া সকল গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যাইতে চাহিবে। শেষ-কালে আমার সারা গৃহ-প্রাঙ্গণটা তাহাকে ছাড়িয়া দিলেও, সে গা-হাত-পা ছড়াইয়া বসিবার জায়গা পাইবে না। পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ, এক কথায় সাধনা, দ্বারা যেখানে সত্য মূর্ত্তিটিকে ধরিতে চাহিতেছি, সেখানেও আমার গোড়ার ধারণা হয় ত ঐ টবের উপর বটের চারায়ই

মত কৃপণ ও কুণ্ঠিত। কিন্তু ধারণা যতই পূর্ণাবয়ব হইতে থাকিবে, ততই তাহাকে ছোট-ছোট লক্ষণের টব হইতে উঠাইয়া, বড় ও মুক্ত জমিনে শিকড় চালাইয়া, মাথা তুলিয়া, ডাল-পালা ছড়াইয়া, দাঁড়াইতে পাওয়ার সুযোগ দিতে হইবে। একটা লক্ষণের টব আঁকড়াইয়াই যদি তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হয়, তবে তাহাকে তুচ্ছতা ও ব্যর্থতার মধ্যেই একরূপ হাঁপাইয়া মরিতে হইল। কথাটা আর ফলাও করিয়া বলার দরকার নাই; তবে আমাদের শাস্ত্র-রহস্য, এমন কি দার্শনিক প্রস্থানভেদগুলি বুঝিতে গেলেও, এ কথাটায় খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞানাগারে এ কথাটা স্বতঃসিদ্ধের মতই হইয়া আছে; কোনও বস্তু বা ব্যাপারের লক্ষণ কিংবা বিবরণ লইয়া কেহ ভাবে না যে একেবারে চরম তথ্য পাইয়া বসিয়াছি,—আর নড়চড়ের ভয় নাই। সেখানে সমস্তই মোটামুটি রকমের বিবরণ। রসায়ন-বিদ্যাকে শুধাইলাম—সোণা কি একটা মূল বস্তু (element)? তিনি উত্তর দিলেন—আমি এ পর্য্যন্ত চেষ্টা-চরিত্র করিয়া যে বস্তুটিকে ভাঙ্গিয়া আলাদা-আলাদা দুই তিনটি বস্তু (যেমন জল ভাঙ্গিয়া হাইড্রোজন, অক্সিজেন) করিতে পারি নাই, সেইটি আমার লক্ষণমত মূল বস্তু। কিন্তু ভবিষ্যতে কিরূপ দাড়াইবে, আমি তা বলিতে পারি না। কত আর দৃষ্টান্ত লইব,—খাঁটি গণিতের পরিভাষাগুলি বাদ দিলে, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, জীব-বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানাগারের নানা বিভাগে যে সব কথাবার্ত্তা আমরা কহিয়া থাকি বা শুনিতে পাই, তাহার সবই মোটামুটি রকমের—চরম নহে।

যে প্রসঙ্গটা এখানে পাড়িয়াছি, সেটা খুবই কাজের। অধিকারের বা সামর্থ্যের ইতর-বিশেষ সত্য-সত্যই আমাদের মধ্যে রহিয়াছে। আমাদের চোখ, কাণ প্রভৃতি করণগুলি যেমন সমান নহে; আমাদের ধারণাশক্তি, কল্পনা-শক্তি, বিচার-শক্তি প্রভৃতি ভিতরকার শক্তিগুলিও তেমনি একরূপ নহে। এ বৈচিত্র্য অস্বীকার করিবার যো নাই। এই জন্য একই সত্যের ধারণা আমাদের সকলের মধ্যে একই রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে যেমনটা দেখিতেছে, সে তেমনটা ধারণা করিতেছে। আবার এক আমার দেখাও সব সময়ে, সকল অবস্থায় একই রূপ হয় না। আমার শক্তিগুলির ক্রমশঃ উন্মেষ হইতে পারে; কাজেই আমার ধারণা ক্রমেই পুষ্ট ও সুস্থির হইতে পারে। কা'ল যে পথটাকে দেখিয়াছিলাম বৃত্তাকার, আজ সে পথটাকে দেখিতেছি বৃত্তাভাসের মত; আজ যে বস্তুটিকে মনে করিতেছি অবিভাজ্য,—নিরেট এটম, কা'ল হয় ত সেই বস্তুটিকে চিনিব একটা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপে; আজ যে জায়গাটাকে ফাঁকা মনে হইতেছে, কা'ল হয় ত সেখানে সন্ধান পাইব একটা সূক্ষ্ম বায়বীয় ভূতের। আমার দেখার কোথায় গিয়া সে পরিসমাপ্তি—"ইতিশেষঃ"—হইবে, তাহা জানি না; বলিতে পারি না, কোন্ নিত্যধামে পৌঁছিয়া আমি ধরিয়া ফেলিব সত্যের চরম, নিরতিশয় রূপটি। আপাততঃ যতদূর আমার দৃষ্টি চলে, ততদূরই আমি আমার ধারণার ভিতরে টানিয়া লইতে পারিতেছি। আমার দেওয়া বিবৃতি তাই ঐকান্তিক নহে। পূর্ব্বে যে বিবরণ দিয়াছি, এখন হয় ত ঠিক সেইটা দিতেছি না; আজ যে বিবরণ দিতেছি, পরে হয় ত ঠিক সেইটা দিব না। ইহাই স্বাভাবিক ব্যবস্থা। তত্ত্বদর্শী ঋষি যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি আমার সামনে তত্ত্বের স্বরূপ লক্ষণটি একেবারে ফেলিয়া দিলেও, আমার সাধ্য কি যে আমি সেটাকে এখনই পুরাপুরি ধরিয়া ফেলি! আমাকে নিজের সংস্কার-মত ও সামর্থ্যানুরূপই দেখিয়া-শুনিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। এই জন্য—স্বরূপ লক্ষণ আমি সহসা ধরিতে পারিতেছি না বলিয়া,—আমার কাছে নানা-রকমের তটস্থ লক্ষণেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। বিজ্ঞানেও এইরূপ স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণের বিশেষ রহিয়াছে; এবং প্রয়োজন রহিয়াছে দুইএরই। বিজ্ঞানে স্বরূপ লক্ষণটিকে একটা আদর্শ (ideal limit) এর মত সামনে খাড়া রাখিতে হয়; তটস্থ (বা approximate) লক্ষণগুলা লইয়াই কারবার বেশী। এই তটস্থ লক্ষণগুলি ছাড়া বিজ্ঞানের ব্যবহার চলে না। অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রেও এইরূপ হা'ল।

অণুর বা ছোটর দিক্ হইতে হিসাব লইতে গেলে, অণুত্বের যেখানে পরাকাষ্ঠা, তাহাকে বলা হইল এটম্। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লইলে, 'এটম্' মানে, যে জিনিসটাকে আর ভাগ করা যায় না। কিন্তু এটম্ এ ভাবে একটা কল্পিত আদর্শ মাত্র। অন্ততঃ, বিজ্ঞান এখন তাহাই ভাবিতেছেন। রসায়ন-বিদ্যা যেগুলিকে এটম্ বলিয়া ব্যবহার করিতেছেন, সেগুলি দুই কারণে চরম অণু নহে। ইহারা

সাবয়ব, পরিমিত দ্রব্য। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাদের মাপ লইয়া ফেলিয়াছেন। সাবয়ব দ্রব্যের অংশ থাকারই কথা। অপিচ, কেমিকাল এটম্‌এর চেয়ে ঢের ছোট 'কর্‌পাস্‌ল্‌' এখন ধরা পড়িয়া গিয়াছে। রেডিয়ম জাতীয় পদার্থসমূহে খুব সম্ভবতঃ, এটম্‌গুলা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া তাহাদের টুক্‌রাগুলি বাহিরে ছড়াইয়া দিতেছে। অতএব দেখা গেল যে, কেমিকাল এটম্ সত্য-সত্যই পরমাণু বা অণুত্বের পরাকাষ্ঠা নহে। অথচ, কেমিকাল এটমকেই পরমাণুর 'তটস্থ-লক্ষণ' ভাবিয়া রসায়ন-বিদ্যা এখনও তাঁহার সকল কারবারই চালাইতেছেন। সকল প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এই এটম্‌গুলাই এখন পর্য্যন্ত মৌলিক দ্রব্য হইয়া রহিয়াছে। এটমের চেয়ে যে সমস্ত সূক্ষ্ম ভূতগুলা রহিয়াছে, তাহাদের রাসায়নিক সংযোগ ও বিয়োগে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মেলা-মেশা এবং ছাড়াছাড়ি আমরা এখনও ধরিতে পারি নাই। এই জন্য সেই মামুলি এটমগুলাকে লইয়াই আমাদের অনেক কারবার ও হিসাব-নিকাশ এ পর্য্যন্ত চলিতেছে। তার পর, কর্‌পাস্‌ল্‌গুলা এটমের চেয়ে হাজার-হাজার গুণ ছোট জিনিস। কিন্তু এগুলাকে লইয়া আমরা পরমাণুর স্বরূপ লক্ষণ পাইলাম কি?—না। এগুলাও সাবয়ব ও পরিমিত দ্রব্য। এখন ইহাদিগকে আর ভাগ-বাটোয়ারা করিতে না পারিলেও ইহাদের অংশ বা দানা থাকা সম্ভব, ইহা মনে করিতেছি। অতএব, ইলেক্‌ট্রণ বা কর্‌পাস্‌ল্‌ও পরমাণুর তটস্থ লক্ষণ। ইলেক্‌ট্রণকে একটা তাড়িতের সূক্ষ্ম বর্ত্তুল (small sphere of electricity) মনে করিয়াই লোরেঞ্জ, এব্রাহাম, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের সমস্ত হিসাব-পরিচয় দিতেছেন; এমন কি লোরেঞ্জ সাহেবের মতে, ঐ সূক্ষ্ম বর্ত্তুলটি যখন স্থির হইয়া থাকে, (at rest) তখনই উহা ঠিক বর্ত্তুল, কিন্তু চলিতে আরম্ভ করিলে (when in motion) আর ঠিক বর্ত্তুলাকার থাকে না,—ডিমের মত, গতির অভিমুখে একটুখানি চেপ্‌টা হইয়া যায় (becomes an oblate spheroid)। তবেই দেখা গেল যে ঐ ছোট তাড়িত বর্ত্তুলটি নিরেট (rigid) নহে; রবার বল ঠিক নিরেট হইলে, কেহ তাহাকে টিপিয়া সঙ্কুচিত করিয়া দিতে পারিত না। যে জিনিসটা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ চেহারা বদ্‌লাইয়া ফেলে, সে জিনিসের ভিতরে ছোট-ছোট দানাগুলার ঠাঁই অদল-বদল করার অবশ্যই একটা বন্দোবস্ত আছে; এবং তা যদি থাকে, তবে সে জিনিসটা একটা জিনিস নহে, বহুর সমষ্টি; এবং সে জিনিসটা নিরেটও নহে। তাই বলিতেছিলাম, ঐ যে লোরেঞ্জ সাহেবের ছোটখাট তাড়িত বর্ত্তুলটি (যেটাকে এতদিন আমরা ইলেক্‌ট্রণ বলিয়া আসিতেছি) সেটি অণুত্বের পরাকাষ্ঠা নহে; উহাকে পাইয়া আমরা পরমাণুর তটস্থ লক্ষণ পাই মাত্র। এব্রাহাম সাহেব ঐ তাড়িত বর্ত্তুলটিকে নিরেট ভাবিয়া গণাগাঁথা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ওরূপ ভাবনায় গণাগাঁথারই কতকটা সুবিধা হইয়াছে মাত্র। কোন জিনিসকে নিরেট, নিরন্ধ্র ভাবিলে, তাহার ভিতরে আর তাকাইয়া না দেখিলেও চলে; তার বাহিরের খবর লইলেই ভিতরের খবর লওয়া হইয়া যায়; এবং সে জিনিসকে একটা জিনিস মনে করা চলে। ইহাতে গণাগাঁথার মামলা খুবই সহজ হইয়া গেল সন্দেহ নাই; কিন্তু সত্যের চেহারাখানাও অস্বাভাবিক রকমে সরল হইয়া গেল। মানুষের দেহের কালী কষিতে গিয়া, শুধু খানিকটা দৈর্ঘ্য, খানিকটা প্রস্থ, খানিকটা বেধ পাইলেই আমাদের যৎপরোনাস্তি সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু চোখ, কাণ, নাক, মুখ, হাত পা—এগুলো সব সত্য সত্যই থাকিয়া আমাদের হিসাব বেজায় জটিল করিয়া দিয়াছে; ওগুলা সব কাটিয়া-ছাঁটিয়া বাদ দিতে পারিলেই, আমরা আঁকের খুব জুত করিতে পারিতাম। যাহা হউক, ইলেক্‌ট্রণ চরম-সূক্ষ্ম বা পরমাণুর স্বরূপ-বিবৃতি নহে, তটস্থ লক্ষণ মাত্র। 'তটস্থ লক্ষণ কথাটাকে আমরা মোটামুটি বা প্রাথমিক লক্ষণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি। অধ্যাপক লারমর সাহেবের মত একটা 'পয়েণ্ট-চার্জ', অর্থাৎ একটা 'শক্তিবিন্দু'তে গিয়া পর্য্যবসান করিতে না পারিলে, আমরা আর স্বরূপে পৌঁছিতে পারিলাম না। কিন্তু উপসংহারের এই শক্তিবিন্দুটি যে কি চিজ্, তাহা আমরা ত ধারণাই করিতে পারিব না। ইউক্লিডের বিন্দু যেমন আমাদের ধারণার অতীত, শক্তিবিন্দুও সেইরূপ। এটমের, এমন কি কর্‌পাস্‌লেরও, মাপ আছে, "পারিমাণ্ডল্য' আছে; কিন্তু 'বিন্দু' বলিলে আর তার মাপ (magnitude) থাকিল না, শুধু অবস্থিতি (position) মাত্র রহিল। ইউক্লিডের বিন্দুর মত 'point-charge' বা শক্তিবিন্দু কিন্তু অচল, স্থাণু নহে; সকল প্রকার উত্তেজনা ও গতির মূলে ইহারা বলিয়া ইহাদিগকে 'শক্তিবিন্দু' বলিতেছি।

'শক্তিবিন্দু' কথাটা লইয়া আপাততঃ আর আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তবে এটা আমাদের কোন মতেই ভুলিলে চলিবে না যে, সূক্ষ্মতার সীমা খুঁজিতে বাহির হইয়া কেমিকাল এটমে অথবা পদার্থবিদ্যার করপাস্‌লে গিয়া থামিয়া দাঁড়াইলে হইবে না। এটম্, করপাস্‌ল প্রভৃতি লইয়া কারবার ও হিসাব-নিকাশ খুবই চালান যাইতে পারে; কিন্তু এগুলা পরমাণুর তটস্থ লক্ষণ,—এ কথাটা আমাদের সদাই স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে। অপিচ, 'পরমাণু' কথাটাকে আমরা এখানে ঠিক নৈয়ায়িক-বৈশেষিকের দেওয়া লক্ষণ-মাফিক ব্যবহার করিতেছি না। ন্যায়-বৈশেষিক পরমাণুতে যে সমস্ত ধর্ম্ম চাপাইয়াছেন, তাহার ফলে, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির পরমাণুকারণতাবাদখণ্ডন সঙ্গতই হইয়া থাকিবে। হয় ত, কণভক্ষাক্ষপাদ নিজেরাই ঐকান্তিকভাবে পরমাণুগুলিকে চরম কারণ বলিতে চাহিতেন না বলিয়া, তাঁহাদের লক্ষণ বিবৃতি মধ্যে ফাঁকি রাখিয়া গিয়াছেন। যে ফাঁকি ধরিয়া আরও ভিতরে ঢুকিয়া পড়িতে পারে, সে তাই করুক—ইহাই বোধ হয় তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল। আর যে শুধু একটা মোটামুটি হিসাব লইবার সামর্থ্যই ধরিতেছে, তাহাকে পরমাণু, দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু ইত্যাদি লইয়াই নিশ্চিন্ত ভাবে কারবার করার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। কেমিকাল এটম্ লইয়া রসায়ন-বিদ্যা বেশ ত নিশ্চিন্ত ভাবে বহুদিন ধরিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎটার মালমস্‌লার তালিকা ও পাকপ্রণালী লিখিতেছিলেন। এখনও লিখিতেছেন। মোটামুটিভাবে তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। তবে গোঁড়ামি আরম্ভ করিলে, আর আমরা সংযত থাকিতে পারিব না। জগৎটার আসল উপকরণ একই, এ কথা খুব জোর করিয়া এখনও বলিতে না পারিলেও, রসায়ন-বিদ্যার মুখ হইতে ঐ বহু পুরানো কথাটাই পাকে-প্রকারে শুনিতে আমরা উৎসুক হইয়াছি। বিশেষতঃ, রেডিয়াম আসরে দেখা দিয়া, আমাদিগকে ঐ কথাটি শুনিবার জন্য উতলা করিয়া দিয়াছে। আরও একটা কথা। আমরা যেটাকে 'শক্তিবিন্দু' বলিতেছি, সেটা শুধু জড়জগতের এলেকাতেই আবদ্ধ নয়। অর্থাৎ, আধুনিক বিজ্ঞান যেগুলাকে জড়শক্তি (physical energies) বলে, কেবল তাহাদেরই মৌলিক, সামান্য অংশ (common units) আমাদের শক্তিবিন্দুগুলি নহে। প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যে সমস্ত অতীন্দ্রিয় শক্তিগুলি আমাদের ভিতরে নানা ভাবে ক্রিয়া করিতেছে, তাহাদেরও মৌলিক, সাধারণ অংশ (common unit or denominator) ঐ শক্তিবিন্দুগুলি। ফল কথা, শক্তিবিন্দু পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়া আর, জড় এবং প্রাণ, প্রাণ এবং মনের মধ্যে কাজ-চালানো রকমের যে পার্থক্য আমরা করিয়া থাকি, সে পার্থক্য খাড়া করিয়া রাখিলে চলিবে না। অর্থাৎ, জড় সম্বন্ধে যেটা শক্তিবিন্দু, প্রাণ ও মন সম্বন্ধে সেটা নহে; প্রাণ সম্বন্ধে যেটা শক্তিবিন্দু, জড় ও মন সম্বন্ধে সেটা নহে; ইত্যাকার জাতভেদ আর সেখানে বাহাল রাখা যায় না। শক্তির ক্ষেত্র জগন্নাথক্ষেত্র; সেখানে পদার্পণ করিলে জড়, মন, প্রাণ সবই নিজের-নিজের উপাধি হারাইয়া একাকার হইয়া গেল। বিজ্ঞান জড়ের ক্ষেত্রে (physical worldএ) বিভিন্ন প্রকারের শক্তিগুলার মধ্যে সাপেক্ষত্ব (correlativity) একরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; আমাদের বেদ ও তন্ত্র নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে (জড়ে হউক, প্রাণে হউক, মনে হউক) যাবতীয় শক্তির মূল এক বলিয়াই ধরিয়া ফেলিয়াছেন। শক্তি অদ্বিতীয়; তাহার দ্বিতীয় নাই। বিশেষতঃ, তন্ত্রশাস্ত্র এই শক্তির কথাটা খুবই ফলাও করিয়া বলিয়াছেন। শক্তির যে নির্ব্বিশেষ, পক্ষপাতশূন্য অবস্থা (undirected scalar condition) তাহা নহে; এ অবস্থায় শক্তির কোনও এক বিশিষ্টদিকে প্রবণতা (tendency) নাই। যেন সীমাহীন মহাসিন্ধু। নদী কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিকে ছুটিয়া যায়; সীমাহীন সাগরের সেরূপ অভিমুখীনতা নাই। সাগর পূর্ব্বে চলিতেছে, কি পশ্চিমে চলিতেছে, কি উত্তরে চলিতেছে, কি দক্ষিণে চলিতেছে, এরূপ মনে হয় না। নাদ-শক্তির ঐরূপ অবস্থা। আর শক্তির যে সবিশেষ ও অভিমুখীন (directed, vector) অবস্থা, সেই অবস্থা নহিলে সৃষ্টি হয় না, জগতে কোনরূপ ব্যাপার হয় না। পৃথিবী পাক খাইতে-খাইতে সূর্য্যের চারিধারে ঘুরিতেছে; গাছের শিরায়-শিরায় মাটির রস উঠিতেছে; মন কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে অভিনিবেশ করিতেছে;—এ সকলই শক্তির অভিমুখীন অবস্থা। এ সকল উদাহরণেই এক দিক হইতে অপর দিকে একটা প্রবাহ বা গতি হইতেছে। এইরূপ প্রবাহ বা গতি হইতে গেলে বিন্দু বা points দরকার। গতি বুঝিতে গেলেই আরম্ভ করিতে হয় বিন্দুতে, চলিতেও হয়

বিন্দুর পর বিন্দু স্পর্শ করিয়া; এবং আসিতেও হয় বিন্দুতে। মানসিক অভিনিবেশ (attention)এর বেলাতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। কাজেই, ব্যাপার হইতে গেলেই বিন্দু লইয়া কারবার করিতেই হয়। সাগর, সাগর হইয়া একটানা পড়িয়া থাকিলে কারবার চলিবে না; সাগরকে অসংখ্য বিন্দু-বিন্দু রূপে নিজেকে ভাঙ্গিয়া লইতে হইবে। এইরূপ বিন্দুরাশি হইলে, তবে এদিকে-ওদিকে চলা-ফেরা হয়। একটা জিনিস যদি সমস্ত ব্যাপিয়া পড়িয়া থাকে, তবে তার আর চলাফেরা হইবে কোথায়, কি প্রকারে? কিন্তু সেই সর্ব্বব্যাপী বিভু পদার্থটার মধ্যে যদি রাশিরাশি বিন্দু দেখা দেয়, তবে তাহারা ঠাঁই অদল-বদল করিতে পারে,—নানা দিকে নানা ভাবে ছুটাছুটি করিতে পারে। বলা বাহুল্য, 'বিন্দু' এ ক্ষেত্রে ইউক্লিডের 'পয়েণ্ট' নহে—শক্তিবিন্দু। ধরুন, এক গ্লাস জল এমন ভাবে রাখা হইয়াছে যে, তাহা গ্লাস ছাড়িয়া কোন মতেই বাহিরে যাইতে পারে না। গ্লাসটা জলে পূর্ণ রহিয়াছে, আবার মুখটাও বন্ধ। এ অবস্থায় জলের মধ্যে একটা চলাফেরা জন্মাইতে গেলে কি করিব? গ্লাসের নীচে তাপ দিতে থাকিলাম। খানিক পরে দেখি, জলের দানাগুলা চঞ্চল-চরণে উপর নীচ করিয়া বেড়াইতেছে; জলে কুটোকাটা থাকিলে, স্পষ্টই এই নাগরদোলায় পাক খাওয়া দেখিতে পাই। অবশ্য গ্লাসের জল পরিমিত, পরিচ্ছন্ন দ্রব্য; তাহার দৃষ্টান্তে আমাদের 'কারণ বারিধি'কে সর্ব্বথা বুঝিতে পারিব না। তবে একটা কথা স্পষ্ট হইল যে, জলে যেরূপ দানা না থাকিলে, ওরূপ ভাবের চলাফেরা হয় না, সেইরূপ শক্তিও নিজেকে বিন্দু-বিন্দু না করিলে, নির্ব্বিশেষ ভাবে মহাসাগরের মত পড়িয়া থাকিলে, তাহা এই জগৎ হইতে পারে না; এবং এই জগৎটাকে চালাইতে পারে না। সমস্ত জড়জগতে যে তাড়িতশক্তি (electricity) ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ যে শক্তি জড়-জগতের সকল ব্যাপারেরই মূলে (এমন কি মাধ্যাকর্ষণেরও), সে শক্তি যে দানায়-দানায় বিভক্ত হইয়া কাজ করে, এ কথাটা এখন পশ্চিমদেশে সর্ব্ববাদিসম্মত তথ্য হইয়াছে—ইহাই আমাদের পূর্ব্বকথিত atomic structure of electricity। প্রাণের অণুত্ব সেদিন আমরা প্রসঙ্গক্রমে তুলিয়াছিলাম; ভবিষ্যতে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিব। ন্যায়-বৈশেষিক আত্মাকে বিভু বলিলেও, মনকে অণু বলে। এ কথাটারও তলাইয়া অর্থ আমাদের করিতে হইবে। ফল কথা, শক্তিকে বিন্দু-বিন্দু ভাবে না পাইলে জগৎ, জগৎ হয় না—এই কথাটাই ক্রমশঃ প্রতিপন্ন হইতে চলিল মনে হইতেছে। বিভু ও অণু, নাদ ও বিন্দু—এ দুয়ের যে সম্পর্কটা কিরূপ, তাহা আমরা সংক্ষেপে শুধাইয়া লইলাম। শুধু নিরবচ্ছিন্ন একটা লইয়া জগৎ হয় না। ক্রমশঃ তটস্থ লক্ষণের মধ্য দিয়া সূক্ষ্মত্বের পরাকাষ্ঠা খুঁজিতে গিয়া মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠারও একটা হদিশ আমরা পাইয়া বসিলাম।

ছোট জিনিসের চরম কোথায়, ইহাই খুঁজিতে-খুঁজিতে শক্তিবিন্দুতে গিয়া পৌঁছিয়াছি। পশ্চিমে পার্টিকেল, মলিকিউল, এটম্, কর্পাসল্, প্রাইম এটম্—এ সমস্তই সেই চরম সূক্ষ্ম বস্তুটিকে ক্রমশঃ "পরোবরীয়ান্" ভাবে আমাদের ধারণার মধ্যে আসিবার চেষ্টা। অধ্যাপক কার্‌ল পিয়ার্সনের অনুবর্ত্তী হইয়া সেদিন আমরা এ সকলের যে নক্‌সা আঁকিয়া দেখাইয়াছিলাম, তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, ঈথার নামক একটা একটানা জিনিসের (Continuum) অণিষ্ঠ অংশ (elements) কল্পনা করিয়া লইয়া তাহাদের সমাবেশে প্রাইম্ এটম্, কর্পাস্‌ল্ প্রভৃতি জড়ের উত্তরোত্তর স্থূলতর দানাগুলি বুঝিবার চেষ্টা বিজ্ঞান কেমনধারা আজকাল করিতেছেন। আমরা ঈথার-এলিমেন্টসের স্থলে শক্তিবিন্দু-গুলিকে বসাইতেছি। ঈথারের টুকরাগুলি পাইলেও তাহারা নানারকম ব্যূহ রচনা করিয়া, পরস্পর টানাটানি-ঠেলাঠেলি করিয়া, চলাফেরা করিয়া, কেমন করিয়া এ জগৎটাকে বাহাল রাখিয়াছে, এ কথা বুঝি না, যতক্ষণ না সেই ঈথার-টুক্‌রা-গুলির পিছনে শক্তি পাইতেছি। ঈথারে একটা ঘূর্ণিপাক এটম্ বা প্রাইম এটম্? কিন্তু পাক জন্মিল কি প্রকারে? সে ঘূর্ণিপাকের মূলে আমরা শক্তিই পাই। হাইড্রোজেন ও ক্লোরণের এটম্ পরস্পরকে বাঁধিয়া হাইড্রোক্লোরিক এসিডের একটা মলিকিউল সৃষ্টি করিয়াছে? কিন্তু তাহাদিগকে বাঁধিয়াছে কে? শক্তি। বেন্‌জিন্ বা ঐ রকম একটা মলিকিউলের মধ্যে এটম্‌দের ব্যূহ রচনাও আবার কত অদ্ভুত! বৈজ্ঞানিকেরা তাহা লইয়া কতই না মাথা ঘামাইতেছেন! আর বেশী যাইবার দরকার নাই; তবে এখনই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শক্তিই সকল রকম আয়োজনের মূলে। যে সকল পণ্ডিত এনার্জিকোয়াণ্টা

দিয়া জড়ের বিবরণ দেওয়া পছন্দ করিতেছেন, তাঁহারা ঠিক পথই ধরিয়াছেন। যাহা হউক, এ স্থলে দার্শনিক বিচার না পাড়িয়া, এই কথাটি শুধু বলিয়া ক্ষান্ত হইব যে, আমরা ঈথারের স্থানে শক্তির বিভূ বা সর্ব্বব্যাপী অবস্থাটিকে লইতেছি; এবং ঈথারের অণিষ্ঠ অংশ-(elements) গুলির স্থলে শক্তিবিন্দুগুলিকে বসাইতেছি। ঈথার ও তাহার অণিষ্ঠ অংশগুলি রহিয়াছে, আর শক্তি তাহাদের উপর ক্রিয়া করিয়া তাহাদিগকে নানা ভাবে সাজাইতেছে ও চালাইতেছে—এ কথা বলার চেয়ে, সোজাসুজি সবই শক্তিরই খেলা, এ কথা বলায় লাঘব আছে। কাহার শক্তি, কোথায় শক্তি রহিয়াছে, ইত্যাদি নৈয়ায়িক তর্ক তুলিয়াও অনাবশ্যক গোল বাড়াইবার আপাততঃ প্রয়োজন নাই।

দ্রব্যের অণিষ্ঠ অংশ খুঁজিতে-খুঁজিতে পাইলাম শক্তিবিন্দু-ইহার ইংরাজী পরিভাষা করা যাক্ point charge। এই পরিভাষা শুনিয়া যেন মনে না করা হয় যে, ইহা তাড়িতের এলেকাতেই অন্তরীণ হইয়া রহিয়াছে। মনের অণিষ্ঠ অংশগুলি শক্তিবিন্দু, অন্নের অণিষ্ঠগুলিও তাহাই; সুতরাং অন্নের দ্বারা মনের পুষ্টি হয়, ছান্দোগ্যের এ কথা শুনিয়া, আমাদের বিস্ময়ের কিছুই নাই। প্রাণ ও অপের মধ্যেও সম্পর্কটা ঐরূপ। তাপ-শক্তি তাড়িত-শক্তিতে এবং তাড়িত-শক্তি তাপে পরিণত হয়, এ কথা শুনিলে আমাদের বিস্ময় একালে আর মোটেই হয় না। অন্নে শক্তিবিন্দুগুলির যে বিশিষ্ট সন্নিবেশ (configuration) আছে, তাহার ফলেই খুব সম্ভবতঃ অন্ন বিশেষ ভাবে মনের পোষক হইয়া থাকে। নহিলে বায়ুমাত্র আহার করিয়াও যোগীরা ধ্যান-ধারণাদি মানসিক ব্যাপার তীব্র ও একাগ্র ভাবে করিতে পারেন, এ কথাও শুনিয়াছি। কাজেই শুধু, ভাত-ডালে নয়, অক্সিজেন নাইট্রোজেনেও মনের খোরাক-পোষাক নির্ব্বাহ হইলেও হইতে পারে। ফল কথা, 'অন্ন' ও 'আহার' এ কথা দুইটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে, নিখিল বস্তুজাত হইতেই মন নিজের আহার গ্রহণ করিতে পারে। পারিবারই কথা; কারণ মূলতঃ মনও যে উপাদানে নির্ম্মিত; জল, বাতাস, মাটি, পাথর ও সেই উপাদানে নির্ম্মিত। গাছপালারা এই জল, বাতাস ও মাটি হইতেই প্রোটোপ্লাজম্ তৈয়ারী করিবার শক্তি রাখে; জন্তুদের, কাজেই আমাদেরও, সাধারণতঃ এ শক্তি নাই। প্রাণায়াম প্রভৃতি উপায়ে ঐ রকম একটা শক্তি আমরা অর্জ্জন করিতে পারিলে, বাতাস, মাটি, জলের হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্ব্বন, অক্সিজেনের দ্বারাই প্রাণের ক্ষুধা ও মনের ক্ষুধা দুই মিটাইতে পারিব,—এ আশা অর্দ্ধাশন-অনশন-পীড়িত ভারতবাসীকে যোগীরা দিতেছেন; আগামী বৎসরে আমাদের যখন নূতন ব্যবস্থাপক সভা হইবে, তখন আশা করি কোনও কর্ম্মবীর সভ্য জোর করিয়া দেশের লোককে প্রাণায়ামপরায়ণ করিয়া তোলার প্রস্তাব আনিবেন; কেন না, তাহা হইলে ভারতে ফেমিনের ভয় ত চিরদিনের জন্য দূর হইবেই; অপিচ, আমাদের আর খরচা করিয়া এরোপ্লেনের বহর রাখিতে হইবে না; কারণ, আমরা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা দিয়া রাখিয়াছি যে, প্রাণায়াম-মাহাত্ম্যে, আকাশ-গমন খুবই অনায়াসলভ্য সিদ্ধি। সে যাহা হউক, পার্টিকেল, মলিকিউল প্রভৃতির সঙ্গে শক্তিবিন্দুকে যেন গুলাইয়া না ফেলি; পক্ষান্তরে, পরমাণু, দ্ব্যণুক প্রভৃতির সঙ্গেও যেন ইহারা গোল না হইয়া যায়। আর একটা কথা—শক্তিবিন্দু সূক্ষ্মতার পরাকাষ্ঠা—The limiting order of smallness। সুতরাং ইহার ও করপাস্‌লের মধ্যে অনেক স্তর থাকারই কথা।

খুব লম্বা একটা শিকলের একটা দিক আমার হাতে রহিয়াছে; সেই দিকটাকেই আমি বলিতেছি, একটা খড়ির টুক্‌রা। এই টুক্‌রাটি নানা পার্টিকেলের সমষ্টি। পার্টিকেলের পর মলিকিউল; তার পর এটম্; তার পর করপাস্‌ল, তার পর আরও কত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর দানা। এগুলা এখনও মানুষের বুদ্ধিতে ধরা পড়ে নাই। শেষকালে শিকলের ও-মুড়োটা হইতেছে শক্তিবিন্দু—এই খড়ির টুক্‌রার অণিষ্ঠ অংশ। করপাস্‌ল বা ইলেক্‌ট্রনের পরই একলাফে শক্তি-বিন্দু—এ কাজটা করিতে গেলে ঠকিতে হইবে। কয়েক বছর পূর্ব্বে সাদাসিধা গোটাকয়েক ইলেক্‌ট্রন বা করপাস্‌ল সাজাইয়া এটমের নির্ম্মাণ-কৌশল বুঝিয়া ফেলিলাম,—এইরূপ অনেকে মনে করিতেছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে Professor Cunningham তাঁহার Principle of Relativity নামক গ্রন্থে কি বলিতেছেন শুনুন। "It seems that we are entering on a new region of phenomena of untold possibilities for our might into the constitution of matter. Much more must be done before so broad a generalisation can be made as seemed only

a few years ago possible in the conception of a matter built up of simple electrons." বইখানা ১৯১৪ সনে লেখা। প্রকৃত পক্ষে, ইলেক্‌ট্রণে গিয়া গা-হাত-পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না। তার পরও যে কত লম্বা পথ আমাদের সামনে পড়িয়া থাকিবে, তাহা এখান হইতে কে বলিতে পারে? তবে একটা কথা। কিছুদিন পূর্ব্বে এটম্‌কেই চরম সূক্ষ্ম জিনিস মনে করিয়া, নিশ্চিন্ত ভাবে বিজ্ঞানের কারবার চলিতেছিল; এখনও ঠিক নিশ্চিন্ত ভাবে না হইলেও, চলিতেছে। কাজেই, এটম্‌কে পরমাণুর তটস্থ বা ব্যবহারিক প্রতিনিধি মনে করিলে দোষ হয় না; এবং কাজে সুবিধা আছে। 'পরমাণু' শব্দটাকে অণিষ্ঠ অংশ অথবা "সূক্ষ্মতার পরাকাষ্ঠা" অর্থে ব্যবহার করিতেছি। এ হিসাবে, এটম্ যেমন তটস্থ বিবৃতি, কর্‌পাস্‌ল বা ইলেক্‌ট্রণও তেমনি। কর্‌পাস্‌ল বা ইলেক্‌ট্রণগুলা সত্যসত্যই ধরা পড়িয়া গিয়াছে; তাহাদের মাপ, ওজন লওয়া হইয়াছে; তাদের টুর-প্রোগ্রামও বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করিয়াছেন। সুতরাং ইহাদিগকে পরমাণুর প্রতিনিধি-স্থানীয় করিয়া আমাদের বোঝাপড়া চলিতেছে এক রকম মন্দ নয়। কিন্তু ঐ যা বলিলাম,—ইহাদিগকে পাইয়া পরমার্থ পাইয়া বসিলাম, এইটি বিজ্ঞান যেন না মনে করেন। ইহাদিগকে পাইয়া যে লাভ হইয়াছে, তার দাম যে কত বেশী, তাহা হালের বিজ্ঞানের সমজ্‌দারেরা অবগত আছেন। বিজ্ঞানের বিশাল সমাজটাকে একটা নূতন ঐক্যের বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছে ও দিতেছে এই অভিনব তাড়িত-বিদ্যা। কিন্তু লাভ যত বড়ই হউক, পরমার্থ লাভের এখনও ঢের বাকী। আমরা বর্ত্তমানে যে দিকে পরমার্থ খুঁজিতেছি, সেটা সূক্ষ্মের দিক্। অনুসন্ধানের ফলে সূক্ষ্মের যে মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাইয়াছি, তাহাকে ইংরাজিতে an infinitesimal series বলিতে পারি। গণিতবিদ্যায় orders of smallness,—ছোট সংখ্যা বা পরিমাণকে আরও, ছোট আরও ছোট, এই ভাবে ভাবিবার ও তুলনা করিবার প্রথা অনেক দিন হইতেই প্রচলিত আছে; নিউটন-লাইবনিজের দিন হইতে বিশেষতঃ। আমরাও পদার্থবিদ্যায় সূক্ষ্মের একটা series বা ক্রমিক ধারা কল্পনা করিতেছি। এই সিরিজের কয়েকটা স্তর—যেমন পার্টিকেল, মলিকিউল, এটম্, কর্‌পাস্‌ল —আমরা ইতিমধ্যেই ছুঁইতে পারিয়াছি। কিন্তু সিরিজের বিশ্রান্তি এখানে নহে। ধরিতে-ছুঁইতে না পারিলেও ক্রমিক ধারাটিকে কল্পনায় বাহাল রাখিয়াছি। এই ধারার যেখানে শেষ (limit), তাহাই আমাদের পরিভাষায় শক্তিবিন্দু। শক্তি বা Energy'র হিসাব লইবার জন্য বিজ্ঞান নানা রকমের ছোট-বড় বাট্‌খারা (units) কল্পনা করিয়াছে—ডাইন্ (dyne) প্রভৃতি। সেগুলা কিন্তু মোটা-মোটা বাট্‌খারা। 'পয়েন্ট চার্জ' কথাটা দেখিতে-শুনিতে ভাল; কিন্তু বিশেষ ভাবে তাড়িত গোত্রই (electrical relation) জানাইতে চায়। সুতরাং এ কথাটাতেও গোল ঠিক মিটিবে না। আমাদের পরিভাষা এমন হইবে যে, তাহার ফলে, তাড়িত, বা তাপ, বা আলোক, বা মাধ্যাকর্ষণ, বা প্রাণ, বা মন—এ সকলের মধ্যে পক্ষপাত না হয়। মনেরই অণিষ্ঠ অংশ শক্তিবিন্দু, কি প্রাণেরই অণিষ্ঠ অংশ শক্তিবিন্দু, কি তাড়িতেরই অণিষ্ঠ অংশ শক্তিবিন্দু,—তাহা আমরা একচোখো হইয়া বলিতে চাহিব না। এখনও বিজ্ঞান জড়, (matter), প্রাণ ও মনের মধ্যে বড়-বড় খানা কাটিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু খানাগুলা যেরূপ দ্রুত ভরাট হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, আর কিছুদিন পরে পদার্থবিদ্যা (Physics), জীববিদ্যা (Biology), এবং মনোবিদ্যা (Psychology) এর মধ্যে দখলি স্বত্ব-সাব্যস্ত সুস্থির ভাবে করা চলিবে না। ইহাদের জাতিভেদ ও 'শুচিবাই' দূর হইয়া গেলে,—ভিতরে ও বাহিরে একই শক্তির খেলা, এই সংস্কারটা দৃঢ় হইলে, শক্তিবিন্দু লইয়া পরস্পরের মধ্যে কারবার চালাইতে ইহাদের আর আপত্তি থাকিবে না। 'শক্তিবিন্দু'কে energy points বলিব। আমরা এই বক্তৃতাগুলিতে 'লিমিট্' কথাটা বারবার ব্যবহার করিয়াছি। কথাটা গণিতশাস্ত্রের কথা। একটা বৃত্তের মধ্যে একটা বহুভুজ ক্ষেত্র আঁকিয়া, তাহার ভুজ-সংখ্যা যদি ক্রমেই বাড়াইতে থাকি, তবে তাহার চৌহদ্দি ঐ বৃত্তের পরিধির সমান ক্রমেই হইতে থাকে। ভুজসংখ্যা যতই বাড়াই না কেন, আমি হাতে-কলমে, ক্ষেত্রের চৌহদ্দি আর বৃত্তের পরিধি এই দুইটিকে, একান্ত ভাবে মিলাইয়া দিতে পারি না। কিন্তু না পারিলেও কল্পনা করিতে পারি যে, ভুজসংখ্যা গণনাতীত হইলে, ক্ষেত্রটি ঐ বৃত্তের সঙ্গেই মিশিয়া যাইবে। এ উদাহরণে বৃত্তের পরিধি হইল অন্তর্গত বহুভুজ ক্ষেত্রটির চৌহদ্দির লিমিট্ বা পরাকাষ্ঠা বা নিরতিশয়তা।

ভুজগুলির সংখ্যা বাড়িতে-বাড়িতে শেষকালে ক্ষেত্রটির যে দশা হয়, তাহাই বৃত্ত। আপনারা এ ভাবটা মনে রাখিবেন। যেখানেই একটা series বা ক্রমিক ধারা দেখিতে পাই, সেই-খানেই এই রকম একটা চরমদশা বা পরাকাষ্ঠা আমরা ভাবিয়া লইতে পারি। পদার্থবিদ্যা দুইটা সিরিজ লইয়া বড় বিব্রত হইয়া রহিয়াছে। একটা ঐ পূর্ব্বোক্ত infinitesimal series, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মের ধারা। ঐ ধারাটির সঙ্গে এতক্ষণ ধরিয়া আমরা আলাপ-পরিচয় করিলাম। ধারাটির অনুসরণ করিয়া পদার্থবিদ্যা আপাততঃ কর্পাস্‌ল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। কর্পাস্‌ল পদার্থের অণিষ্ঠ অংশ নহে, অণুত্বের পরাকাষ্ঠা নহে। না হইলেও, ইহাকে সেই চরম আদর্শের (limit এর) তটস্থ লক্ষণ অথবা প্রতিনিধিরূপে কাজে লাগান চলিতে পারে। বিজ্ঞান তাহাই করিতেছে। আমরা এই সিরিজ ও লিমিটের কথা যদি বেশ খেয়াল করিয়া না দেখি, তবে বিজ্ঞানের এটম্ ইলেক্‌ট্রণ লইয়া, আর আমাদের অণু-পরমাণু লইয়া, বিষম গোলে পড়িবে।

পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানের ঈথার আর আমাদের শ্রুতির আকাশ লইয়া গোলে পড়ার খুব আশঙ্কা আছে, যদি অপর একটা সিরিজ ও তাহার লিমিটের কথা আমরা বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিয়া না দেখি। বিজ্ঞান এই দ্বিতীয় সিরিজটা লইয়াও বিব্রত হইয়া আছে। ইহার নাম দিতে পারি—Continua series। যেমন ছোটকে খোঁজার বাতিক আমাদের আছে, তেমনি বড়কে, সকলের আধার বা আশ্রয় বা অধিষ্ঠান বস্তুটিকেও খোঁজার নেশা আমাদের আছে। শক্তিবিন্দু শক্তির অণিষ্ঠ পরিমাণ—smallest unit। কল্পনায় তাহাকে পাইলেও, পরীক্ষায় আপাততঃ কর্পাস্‌ল পর্য্যন্তই পাইয়াছি—অন্ততঃ এগুলারই হিসাব দিতে পারিতেছি। শক্তিবিন্দুর এই অপেক্ষাকৃত স্থূল মূর্ত্তি লইয়াই আমাদের আপাততঃ আলোচনা চলিতে থাকুক। ধরুন, এই ঘরের বাতাস। ঘরের সব জায়গাতেই বাতাস রহিয়াছে মনে হইতেছে। আমরা সকলেই বাতাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানিয়া লইতেছি। আমাদের চেয়ে ঢের ছোট-ছোট মশা-মাছি প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাণী এ ঘরে রহিয়াছে, তারাও বাতাস পাইতেছে। কাজেই, আপাততঃ মনে হয় বাতাস সব স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে;—একটা একটানা জিনিস, তার মধ্যে ফাঁক নাই। কিন্তু সামান্য পরীক্ষা দ্বারাই আমরা ধরিতে পারি যে, বাতাস সব জায়গায় নাই। পৃথিবী ছাড়িয়া দু'একশো মাইল গেলে, আর বোধ হয় বাতাস মিলিবে না। যতই উপরের দিকে যাই, হাওয়ার জমাট (density) ততই কমিয়া আসে। পুরাণের যুগে যাঁহারা যোগসিদ্ধির প্রসাদে এ-গ্রহ ও-গ্রহ, এ-লোক ও-লোক করিয়া ফিরিতেন, তাঁহাদের বাতাসের মায়া ছাড়িয়া যাইতে হইত। তার পর, পৃথিবীর গায়ে খানিকদূর পর্য্যন্ত বাতাস লাগিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু সে জায়গাতেও বাতাস তৈল-ধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন (continuous) ভাবে নাই। পূর্ব্বে আর এক দিন, Kinetic theory of gases ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, বাতাস ও অন্যান্য গ্যাসের মধ্যে অনেক ফাঁক আছে। সেই সব ফাঁকা যায়গায় তাহাদের মলিকিউলগুলি ছুটাছুটি, ধাকাধুকি করিয়া বেড়ায়। সামান্য একটু স্থানে কতগুলা মলিকিউল ঐ ভাবে ছুটাছুটি, ঠোকাঠুকি করিতেছে, তাহা পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা গণিয়া-গাথিয়া বলিয়া দিয়াছেন। মোটের উপর, প্রত্যেক মলিকিউলটার অবাধ গতি কতটুকু পথে কতক্ষণে হইয়া থাকে, তাহার হিসাব ম্যাক্‌সওয়েল প্রভৃতি আমাদের দিয়া গিয়াছেন। এ সকল প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিলে আর সন্দেহ থাকে না যে, বাতাস অবিচ্ছিন্ন (continuous) জিনিস নহে। বাতাসের দানা বেশ ফাঁক-ফাঁক হইয়াই বসতি করিতেছে; এবং সেই ফাঁকা যায়গাগুলিতেই মনের সাধে চলাফেরা করিতেছে। তবেই পাইলাম যে, বায়বীয় পদার্থগুলি আপাততঃ বেশ একটানা (continuous) বলিয়া মনে হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। তাদের ভিতরটায় কেবল ছেঁদা। অবশ্য এ সমস্ত সূক্ষ্ম রাজ্যের কথা। চর্ম্ম-চক্ষে, এমন কি অণুবীক্ষণ সাহায্যেও এ সমস্ত ছিদ্রান্বেষণ করিতে যাইলে, নিজের মগজের ভিতরের ফাঁকাটাই ধরা পড়িয়া যাইবে। একটা মলিকিউল বেজায় ছোট। সে দিন হিসাব দিয়াছিলাম যে, একটা প্রায় বায়ুশূন্য স্থানের প্রত্যেক ঘন মিলিমিটারে, ৪ এর পিটে ৯টা শূন্য দিলে যত সংখ্যা হয়, তত সংখ্যক মলিকিউল বসবাস করে। গায়ে-গায়ে ঘেঁষা-ঘেঁষি করিয়া নহে,—বেশ স্বচ্ছন্দে ছুটাছুটি করিয়া। খুব হাড়ভাঙ্গা শীত ও চাপ পাইলে, তাহারা পরস্পরের লেপ ধরিয়া টানাটানি করে বটে, কিন্তু গরমের সময় তারা পরস্পরকে আর আমোলই দিতে চায় না। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, হাওয়ার ভূতগুলোর হাড়ে-

হাড়ে ছেঁদা। আমরা যে 'কন্‌টিনুয়াম' বা অখণ্ড পদার্থ খুঁজিতেছি, হাওয়া সে পদার্থ নহে। হাওয়ার ঐ হ্রস্বকায় মলিকিউল ভূতগুলা যে আশ্রয়ে বাস করিতেছে, চলা ফেরা করিতেছে, সেই আশ্রয়টিকে আমাদের চিনিয়া বাহির করিতে হইবে। তার পূর্ব্বে, এ কথাটাও আর একবার ঝালাইয়া রাখা ভাল যে, জল, তেল প্রভৃতি তরল পদার্থ, আর সোনা-রূপা কঠিন পদার্থও, অল্প-বিস্তর পরিমাণে হাওয়ারই মত। শুধু Kinetic theory of Gases নহে, Kinetic theory of Liquids and Solids'ও দেখা দিয়াছে। জলের হাড়ে-হাড়ে শর্করা-কণিকাগুলি প্রবেশ করে বলিয়াই, আমরা মিঠাপাণি পান করিয়া পরিতৃপ্ত হই। জল নিরেট হইলে আর তার ভিতরে চিনির গুঁড়া ঢুকিতে পারিত না। মগজই হউক আর বুদ্ধিই হউক, কোনও জিনিস নিরেট হইলে যে তাহার মধ্যে কিছুরই প্রবেশ হয় না, এ মহা সত্যটি সেই ছেলেবেলায় পাঠশালার গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ড হইতে নিঃসৃত হইয়া, আমার ত্বগিন্দ্রিয়ে সুদূর প্রবিষ্ট হইয়া, এখনও মর্ম্মান্তিক ভাবে স্মৃতিতে জাগরূক রহিয়াছে। গহনা নিরেট না হইলে, গৃহিণীকে স্রোতের বেগে বেতসী-লতার মত ক্রোধে কাঁপিতে সাক্ষাৎ দেখিয়াছি। কিন্তু স্বর্ণকার মহাশয়ের হাপরের উত্তেজনায় গিনি সোণা যখন গলিয়া গহনা হইবার উপক্রম করে, তখন তাঁহার রেণুগুলি যে কাঁপিতে থাকে (বোধ হয় গৃহিণীর ভাবী প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কায়), তাহা আমরা চোখে না দেখিলেও, টিণ্ডাল প্রমুখ সাহেবদের মুখে আজ শতাব্দীকাল ধরিয়া শুনিতেছি; এবং পদার্থ-বিদ্যার পাঠ্য-পুস্তকে মুখস্থ করিতেছি। সুবর্ণের রেণু যখন কাঁপে, তখন নিশ্চয়ই তাহাদের কাঁপিবার জায়গা আছে। আমাদের এই ত্রিশকোটি নর-নারীর ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্লেগ এবং সর্ব্বোপরি জুজুর ভয়ে কাঁপিয়া মরিবার স্থান এই ভারতবর্ষ। অতএব দাঁড়াইল যে, জলও অখণ্ড, অবিভক্ত জিনিস নহে, সোণাও নহে। আমরা যার অন্বেষণ করিতেছি, তাহাকে এ-সবের একজন বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। শুধু জল ও সোণার ভিতরে ছিদ্র আবিষ্কার করিয়াই কি আমরা খালাস পাইলাম? এটম্‌-এর মধ্যেও যে ফাঁকা আছে, ইলেক্‌ট্রণদের একটা চঞ্চল জগৎ আছে, তাহা আমরা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বক্তৃতায় বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছি। ইলেক্‌ট্রণও চরম পদার্থ নহে। পর-ছিদ্রান্বেষণের চেয়ে প্রীতিকর অনুষ্ঠান আর কিছুই নাই। দিন কতক সবুর করুন, ঐ ইলেক্‌ট্রণদেরও ঘরের ছিদ্র বাহির হইয়া পড়িবে।

হা'ল ত এইরূপ। আমাদের পরিচিত মাটি, জল, বাতাস কিছুই ত অখণ্ড (continuous) সামগ্রী নহে। যে সূক্ষ্ম ভূতগুলা আজ পর্যন্ত ধরা পড়িয়াছে, তাদেরও হাড়ে-হাড়ে ফাঁক। Continuum তবে বুঝি পাইলাম না। এইখানে আবার সিরিজ অথবা ক্রমোন্নত-স্তর শ্রেণীর কল্পনা আমাদের করিতে হইবে। মোটামুটি ভাবে বায়ুমণ্ডলকে একটানা (continuous) জিনিস মনে করিলে দোষ হয় না। তাই মনে করিয়াই আমাদের ব্যবহার চলিতেছে। আমার পঞ্চবটীর কুটীরাভ্যন্তরেই বায়ু চলিতেছে, গোল-দীঘিতে বায়ু চলে না, এরূপ ভাবিলে আমি আর এমুখো হইতাম না। তবে সহজেই বুঝিতে পারি যে, বায়ু ঠিক সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড একটা পদার্থ নহে। তরল ও কঠিন জিনিসকে বায়ুর চেয়ে কতকটা বেশী জমাট মনে করিলেও, সেক্ষেত্রেও সহজে বুঝিতে পারি যে, তাহাদের দানাগুলা ছাড়া-ছাড়া—discrete discontinuous. এমন কি মলিকিউল, এটমের মধ্যেও এই অবস্থা। আচ্ছা, জগতের এই গণনাতীত টুক্‌রা-টুক্‌রা জিনিসগুলা বিধৃত হইয়া রহিয়াছে কোথায়? ইহারা মেলামেশা, ছাড়াছাড়ি করিতেছে কোথায় থাকিয়া? নিখিল বস্তু-জাতের রেণু-গুলির এই যে চঞ্চল-চরণে ছুটাছুটি, নানা ছন্দে, নানা তালে নৃত্যাভিনয়, ইহার আশ্রয়-স্বরূপ মঞ্চ কোথায়? এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর—আকাশ। সকল জিনিসকে ঠাঁই বা অবকাশ দিয়া রাখিয়াছে যে বিভু পদার্থটি, তাহাই আকাশ। এ পদার্থটির আর খণ্ড বা দানা নাই; ইহার ভিতরে আর ফাঁক কল্পনা করা যায় না। কল্পনা করিতে যাইলে, আকাশের পশ্চাতে আবার আকাশ বসাইতে হইবে। একে বলে অনবস্থা দোষ। এই শুদ্ধ, বিভু, অবিচ্ছিন্ন আকাশটিকে ইংরাজীতে Pure Space বলিয়া তরজমা করিলে আপাততঃ চলিতে পারে। 'Pure' এই বিশেষণটি যে কেন দিলাম, তাহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব। আচ্ছা, এই শুদ্ধ, নিরবচ্ছিন্ন, অখণ্ড বস্তুটি কে? আমি বলি, ইনিই চিদাকাশ। ইহাঁকেই ছান্দোগ্য-শ্রুতি সেদিন "জ্যায়ান্‌" ও "পরায়ণ", বলিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন; এবং শঙ্করাচার্য্য

প্রভৃতি ইহাঁরই ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যা দিতে পারিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন। এই চিদাকাশের কথা একটু পরেই আবার বলিতেছি। তবে, ইতিমধ্যে নামটা শুনিয়াই এটা বোধ হয় মনে করিতে পারা গিয়াছে যে, এ জিনিসটা শুধু বাহিরের জিনিস নহে—ইংরাজিতে যাহাকে space বলে তাহা নহে। অন্তরে, বাহিরে, জড়ে, প্রাণে, মনে—সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে এই চিদাকাশ অথবা চৈতন্যরূপী আকাশ।

আমরা যে দ্বিতীয় সিরিজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি, সেই সিরিজেরই পরাকাষ্ঠা বা লিমিট্ হইতেছে এই চিদাকাশ। স্কন্দের দিক্ হইতে সিরিজের চরমপদ যেমন শক্তিবিন্দু (শুধু 'বিন্দু' বলিতেছি না এই কারণে যে, ইহার সঙ্গে ইউক্লিডের পয়েণ্টের গোল হইতে পারে; ইউক্লিডের পয়েণ্ট অবস্থিতি মাত্র—static; কিন্তু ইহা dynamic।) ব্যাপক বা কনটিনুয়ামের দিক্ হইতে চরম-ভূমি তেমনি চিদাকাশ। তন্ত্র ইঁহাকে পরমব্যোম বা শিব বলিয়া শতকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। আমাদের বাতাস ব্যাপক-পদার্থের তটস্থ লক্ষণ বা কাজ-চালানো রকমের প্রতিনিধি। বিজ্ঞানও এই ব্যাপক-সিরিজের শেষ পদটি খুঁজিতেছেন। বেশী দূর আগাইতে পারেন নাই। অণু-সিরিজের বেলাতে যেমন করপাস্‌ল বা ইলেকট্রণে আসিয়া 'কিন্তু' বলিয়া মাথা চুল্‌কাইতেছেন, আরও দূরে ঠেলিয়া পড়িবার জন্য 'energy-quanta' প্রভৃতি নূতন ধারণার অস্ত্র-শস্ত্র শানাইয়া লইতেছেন; ব্যাপক-সিরিজের বেলাতেও তেমনি ঈথারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া, কতকটা "সসেমিরা" গোছ হইয়া আছেন। দুইদিকের এই দুইটা সিরিজ আপনারা ভুলিবেন না। লিমিট্ বা পরাকাষ্ঠার কথাটাও স্মরণ রাখিবেন। আমাদের ভারতবর্ষীয় চিন্তাতেও এই সিরিজ দুটার অনুসরণ চলিয়াছিল; যে তলাইয়া ভাবে, সেই অনুসরণ করে কোথায় গিয়া, "ইতি শেষঃ"। এক ফোঁটা জল লইয়া, Chinese puzzle boxএর মত খোলস ছাড়াইতে-ছাড়াইতে পার্টিকেল, মলিকিউলের মধ্য দিয়া আমরা শেষ লিমিট্ পাইলাম গিয়া শক্তি-বিন্দুতে। বিজ্ঞানও ঐ পাজ্‌ল-বক্সটি লইয়া খোলস ছাড়াইয়া যাইতেছে। করপাস্‌ল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে—ভিতরকার সারসত্তা, অর্থাৎ শক্তির, আস্বাদও একটু-আধটু পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে আবার, মাটি, জল, বাতাস প্রভৃতি লইয়া ব্যাপক হইতে ব্যাপকতরের অন্বেষণ চলিল। আমাদের ঋষিরা, শুধু বাহিরের মাটি-জল কেন, ভিতরের প্রাণ, মন প্রভৃতিকেও হিসাবে টানিয়া লইয়া, আবিষ্কার করিলেন যে বস্তুটিকে, তিনি চিদাকাশ—ব্যাপকতার পরাকাষ্ঠা—Continuum in the limit. বিজ্ঞানও এ পথে বহুদিন হইতে হাঁটিতেছে; সে অবশ্য প্রাণ ও মনের তথ্য এখনও ভাল করিয়া রাখে না; তবে বাহিরের জড়ের যে তথ্য পাইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমানে তাহার গতির অবধি হইতেছে ঈথার। জড়কে (অর্থাৎ matterকে) যে ব্যাপক জিনিসটার পরিমাণ বলিয়া ভাবিতেছে, তাহারই নাম দিয়াছে ঈথার। এ কথাটা আমরা পূর্ব্বেই ফলাও করিয়া বলিয়াছি। ঈথার কিন্তু ব্যাপকতার পরাকাষ্ঠা নহে—continuum in the limit নহে—এ কথাটা আপনারা স্মরণ রাখিবেন। এইজন্য বিজ্ঞানের ঈথার আর ছান্দোগ্যের 'আকাশ' (জ্যায়ান্, পরায়ণ) ঠিক এক নহে। বিজ্ঞানের ঈথার স্থানে-স্থানে রূপান্তর প্রাপ্ত (strained) হইতে পারে; যেমন টিপিয়া ধরিলে রবার বল। আবার, রূপান্তরিত ঈথার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে চায়, যেমন ঐ রবার বল। অতএব ঈথারের strain-and-stress susceptibility আছে; ইহা বিকার্য্য জিনিস। কিন্তু চিদাকাশ বা আত্মা 'অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে"—here strain and stress susceptibility is zero। অপিচ, ঈথার সর্ব্বাঙ্গে সচল না হইলেও অংশ-বিশেষে সচল। এই দুই কারণে বুঝা যাইতেছে যে, বিজ্ঞানের ঈথার ঠিক সর্ব্বব্যাপী বিভু পদার্থ নহে—continuum in the limit নহে। ঈথারের বিস্তারিত বিবরণ ভবিষ্যতে আবার দিব; তবে আপাততঃ এইটুকু দেখিলাম যে, ইহা একটা লক্ষ্যাভিমুখে যাইবার পথে মাঝের একটা আড্ডা—শেষ আস্তানা নহে; বিজ্ঞানের করপাস্‌লও নহে। অথচ শেষ পদবীতে পৌঁছিতে হইলে, মাঝের এই আড্ডাগুলি অতিক্রম করিয়াই যাইতে হয়। এইজন্য বলি, বিজ্ঞানের করপাস্‌ল যেমন অণুর তটস্থ বিবরণ (approximate description), স্বরূপ বিবরণ নহে; বিজ্ঞানের ঈথারও সেইরূপ ব্রহ্মের বা চিদাকাশের মোটামুটি একটা নির্দ্দেশ, স্বরূপ-বিবৃতি নহে। ঈথার একটা 'সৎ' বস্তু, শূন্য নহে; এবং ঈথার বিভু, সর্ব্বাশ্রয়—এ কথাটি বিজ্ঞান বলিতে চাহিতেছেন, কিন্তু

তাহার যে বিবরণ দিতে বাধ্য হইতেছেন (জড়ের ব্যাখ্যার খাতিরে), তাহাতে ঈথারের পশ্চাতে আবার ঈথারের দরকার হইয়া পড়ে। Sir G. Stokes সাহেব একটা জেলি সিরিজেরও কল্পনা করিয়াছিলেন। পরে সে কথা বলিব। এই সিরিজের যে পরাকাষ্ঠা বা লিমিট্, তাহাই ছান্দোগ্যের আকাশ। যথার্থ ভাবে লইলে, এই সিরিজেরই চরম স্তর চিদাকাশ; মাঝের একটা স্তর বিজ্ঞানের সেই ঈথার যাহাতে তরঙ্গ কল্পনা করিয়া আমরা আলোকের ও তাড়িতের ব্যাখ্যা দিতেছি, ওয়ারলেস্ পাঠাইতেছি; তার উপরের একটা স্তর হয় ত সর্ব্বজীবে প্রাণময় কোষ; তার উপরের একটা স্তর হয় ত মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ—যাহা দ্বারা দূরে আমাদের ভাবগুলি সঞ্চারিত (thought transference) হইলেও হইতে পারে। আমাদের বেদান্তের ভূতাকাশ, বায়ু বা মরুৎ প্রভৃতিকেও এই সিরিজের যথাযোগ্য স্থানে বসাইতে হইবে। এ সব ত বিরাট আলোচনা। একটা কথা বলিয়া উপসংহার করিব—'আকাশ', 'ঈথার', 'অণু' প্রভৃতি ধারণাগুলিকে আমাদের আড়ষ্ট করিয়া লইলে চলিবে না। সকল বোঝাপড়া ব্যাপারেই একটা সিরিজ—ক্রমিকতার বন্দোবস্ত আছে, এ কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। এ কথা মনে রাখিলে, আমরা বেদ ও বিজ্ঞানে অকারণ ঝগড়া পাকাইব না।

জীব-বিজ্ঞান

[শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম্-বি]

[অম্লজান]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একজন বেঁচে আছে কি না সন্দেহ হলে আমরা দেখি তার নিঃশ্বাস পড়চে কি না। যদি না পড়ে ত বুঝি, সে বেঁচে নেই। সত্যই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে বেঁচে থাকা যায় না। তবে কখনও কখনও এমন হতে পারে যে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে, তখনও heart চল্‌চে। এ রকম অবস্থায় মানুষ বেশীক্ষণ বাঁচে না। Oxygen এর অভাবে রক্ত শীঘ্রই বিষিয়ে ওঠে এবং সেই বিষে খানিকক্ষণ বাদে heartও বন্ধ হয়ে যায়। এই heart চল্‌তে চল্‌তে বা বন্ধ হবার অব্যবহিত পরে চেষ্টা কর্‌লে অনেক সময়ে মৃতপ্রায় লোককেও বাঁচান যায়। কি রকম চেষ্টা করতে হবে? আমরা দেখ্‌চি oxygenএর অভাবেই মৃত্যু হচ্চে! আমরা যদি কোন রকমে দেহে oxygen ঢোকাতে পারি, আপনা-আপনি যে শ্বাস-ক্রিয়া চল্‌ছিল, সেই কাজ যদি করিয়ে দিতে পারি, অর্থাৎ খানিকটা বাতাস ফুস্‌ফুসের ভেতর ঢোকাতে পারি, এবং খানিকক্ষণ বাদে তাকে বার করে দিতে পারি, তা হলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। রক্ত oxygenএ ভরে উঠবে; এই oxygen সমস্ত দেহে মৃত-সঞ্জীবনীর কাজ করবে; যে সব যন্ত্র অসাড় হয়ে পড়েছিল, তারাও জেগে উঠবে; heart আবার জোরে চল্‌তে থাক্‌বে; আবার নিঃশ্বাস পড়তে থাক্‌বে। মনে কর একজনের নিঃশ্বাস পড়চে না—মর মর। তাকে বাঁচাতে চাও। কি করবে? প্রথমে তাকে চীৎ করে শুইয়ে গলায় আঙ্গুল দিয়ে দেখ, গলার ভেতর কিছু ঢুকে নলী বন্ধ হ'য়ে যায় নি ত। তার পর আঙ্গুলে ন্যাক্‌ড়া জড়িয়ে গলার ভেতর যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করে দাও। একজন লোককে বল, তার জিবটা টেনে ধরে রাখতে। অজ্ঞান অবস্থায় সব অঙ্গ ঢিলে হ'য়ে যায় কি না; তাই জিবটা গিয়ে গলার ভেতরে ঝুলে পড়ে নলী বন্ধ করে দিতে পারে; তাই এই ব্যবস্থা। তার পর তার নিঃশ্বাস পড়াবার চেষ্টা কর, Artificial respiration কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া দ্বারা। Artificial Respiration কয়েক রকমে করা যেতে পারে।

১। রোগীর ডান দিকে বসে বুকের ওপর, মাই এর নীচে, দুদিকে দুটো হাত রাখ। তারপর সামনে ঝুঁকে সমস্ত দেহের ভার দিয়ে একবার চাপ, অমনি বুক থেকে খানিকটা

বাতাস বেরিয়ে যাবে; তারপর ছেড়ে দাও, আর খানিকটা বাতাস ঢুকবে। এই রকম করতে থাক।

২। রোগীর কাঁধের নীচে একটা বালিশ দিয়ে বা তাকে খাটের কিনারে টেনে এনে মাথাটা ঝুলিয়ে দাও। এই রকম করাতে গলার নলীতে আর কোন ব্যাঁক থাকে না; বাতাস বেশ সহজে যাতায়াত করতে পারে। তারপর তার ছুটো হাত পাশের দিকে উঁচু করে কাঁধের সঙ্গে এক লাইনে রাখ। এইবার কনুইয়ের নীচে বেশ করে ধরে মাথার দিকে যতদূর সম্ভব টেনে নিয়ে যাও। এই রকম করাতে বুকের গহ্বর বেশ বাড়ে এবং অনেকটা বাতাস ঢোকে। এইবার হাত ছুটোকে নিয়ে এসে বুকের ওপর চেপে ধর। বুকের দিকে আনবার সময় হাত অবশ্য কনুইএর কাছে মুড়ে যাবে। আবার পাশের দিক থেকে উঁচু করে মাথার দিকে নিয়ে যাও। এই রকম করতে থাক।

(৩) উপুড় করে শোয়াও; বুকের নীচে একটা বালিশ দাও, মাথা ঝুলে পড়ুক। জিভও ঝুলে পড়বে; তাই টেনে ধরবার দরকার নেই। তারপর পাশে বসে (১) এর মত চাপ দাও, আর ছাড়।—জলে ডোবা রোগীর কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া এই নিয়মেই করা ভাল। জলের ভেতর নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে তাদের বুকের ভিতর জল ঢোকে কি না—তাই।

(৪) যদি এমন হয় যে, পাঁজরার হাড় ভাঙ্গা, বুকের ওপর চাপা যায় না! তখন কি করা যাবে? জিব ধরে একবার টান ও তারপর ঠেলে গলার দিকে দাও।

Artificial respiration বেশী তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই। যিনি artificial respiration করচেন, তাঁর যতবার নিঃশ্বাস পড়চে, রোগীর ততবার পড়লেই হবে। কিছুক্ষণ artificial respiration করতে করতে আপনি-আপনি নিঃশ্বাস পড়তে আরম্ভ করবে। প্রথমতঃ এত আস্তে যে, টের পাওয়া শক্ত। এই সময়ে মনে রাখতে হবে যে, সে যখন নিঃশ্বাস টানবে, তখন তোমার উচিত মুখের গহ্বর বাড়িয়ে বেশী বাতাস ঢোকান; এবং সে যখন নিঃশ্বাস ফেলবে, ঠিক সেই সময়ে বুকের ওপর চাপ দিয়ে যথাসম্ভব বেশী বাতাস বার করা।

ফুস্‌ফুসের বর্ণনা করতে এক জায়গায় বলা হয়েছে oxygen এর সাহায্যে রক্ত পরিষ্কার হয়। ব্যাপারটা আরও খোলসা ক'রে বলা দরকার। রক্তকে লাল রঙের এক-প্রকার তরলপদার্থ বলে মনে হয় বটে; কিন্তু তা নয়। রক্তের তরল অংশ দেখতে জলের মত। এই জলে অসংখ্য লাল-লাল দানা ভাসচে। এই গুলোর জন্য সমস্তটাকে লাল দেখায়। একটা সরু শিশিতে খানিকটা রক্ত রেখে দিলে দেখা যায়, তার কঠিন অংশ চাপড়া বেঁধে তলায় জমেছে এবং তার জলীয় অংশ আলাদা হয়ে ওপরে ভাসচে এবং এটা লাল নয়। যে দানার কথা বললুম, অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে দেখা যায়, সে-গুলো লালচে রঙের, চেপটা গোল-গাল, এবং তাদের ধারগুলো মোটা এবং মাঝখানটা পাতলা। এদের নাম লাল corpuscle। মাঝে মাঝে আর এক রকম corpuscle দেখা যায়, তাদের কোন রং নেই; তাদের ভেতর এক বা ততোধিক nucleus আছে; দেখতে অনেকটা স্থির amaebaর মত। এদের আবার আয়তন সমান নয়, কেউ ছোট কেউ বড়। এদের বলে white corpuscles. লাল corpuscleদের কাজ হচ্চে বাতাস থেকে oxygen গ্রহণ করা, এবং নিজেদের মধ্যে সেটাকে আটকে রেখে cellদের কাছে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া এবং cellদের কাছ থেকে কঠিন ডায়কৃসাইড নিয়ে বাতাসে এসে ছেড়ে দেওয়া। লাল corpusclesগুলো যখন oxygenএ ভরে ওঠে, তখন রক্তের রং হয় টকটকে লাল; আর যখন কঠিন ডায়কৃসাইড এসে oxygenএর জায়গা জুড়ে বসে, তখন রক্তের রং হয় খেজুরে গুড়ের মত ময়লা লাল। দেহে এই ছুরকম রক্তই আছে। তারা মিশে একাকার হয়ে না যায়, এই জন্য heartএর মাঝখানে একটা পার্টিশন আছে। এই পার্টিশনের ডান দিককার গহ্বরে যত কাল রক্ত, আর বাঁ দিকে লাল রক্ত। প্রত্যেক গহ্বর আবার ছুভাগে বিভক্ত। ওপরের ছুটা ছোট, নাম auricle; আর নীচের ছুটো বড়, নাম ventricle। প্রত্যেক ventricle থেকে একটা করে আর্টারি বেরিয়েছে। রক্ত একদিকে যাতে বইতে পারে, সেই জন্য প্রত্যেক আরিকল আর ভেন্ট্রিকলের মাঝে এবং ভেন্টিকল থেকে আর্টারির বেরুবার মুখে একটা করে valve আছে। দেহের সমস্ত ময়লা রক্ত ছুটো মোটা vein দিয়ে ডান auricleএ এসে জমে। Auricle ছোট হলে রক্ত ডান ventricleএ গিয়ে হাজির হ'ল। তারপর auricle বড় এবং ventricle ছোট হ'ল, রক্ত auricleএ ফিরে আসবার চেষ্টা করল; কিন্তু মাঝখানে valve আছে;

সেটা অমনি বন্ধ হয়ে গেল; রক্ত auricleএ না যেতে পেয়ে ডান ventricleএর সংলগ্ন arteryতে গিয়ে পৌঁছুল। তার পর ventricle বড় হ'ল; আর্টারি থেকে রক্ত ventricleএ ফিরে আসবার চেষ্টা করল; কিন্তু আর্টারির মুখের valve অমনি বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই তাকে arteryতেই থাকতে হ'ল। ঐ রক্ত ঐ artery ও তার শাখা-প্রশাখা দিয়ে শেষে ফুস্‌ফুসের capillaryতে গিয়ে শেষ হ'ল। এইখানে কঠিন ডায়কসাইড দিয়ে এবং অকসিজেন গিয়ে তা পরিষ্কার হ'ল এবং লাল টক্‌টকে হয়ে, চারটে বড় বড় vein দিয়ে বাঁ auricleএ এলো। সেখান থেকে যে artery বেরুবে তাতে পৌঁছুল। এই artery শিরদাঁড়ার সামনে দিয়ে বরাবর নেমে গেছে। এরির শাখা-প্রশাখা থেকেই সমস্ত দেহে রক্ত সরবরাহ হচ্চে। এই রক্ত লাল টক্‌টকে। লাল টক্‌টকে রক্ত দেখ্‌লেই বুঝতে হবে ওই artery বা capillaryর; আর কাল রক্ত দেখ্‌লেই বুঝবে তা vein থেকে বেরুচ্চে।

ঘরছাড়ার দল

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি এ]

আমাদের একটি দল আছে ঘরছাড়ার দল। পথেই আমরা বাসা বাঁধি। আমাদের সুখ্যাতি নাই। পড়াশুনা আমরা খুব সুশৃঙ্খলরূপে করি নাই। এবং নীতি সম্বন্ধে আমাদের থিওরি এবং প্র্যাক্‌টিশ দুই-ই নাকি একটু স্থিতিস্থাপক—চল্‌তি কথায় যাকে শ্ল্যাক্ বলে। দিনে রাত্রের মধ্যে যখন খুসি চা খাওয়া এবং অনর্গল গল্প করা ছাড়া আর কিছু করিতে কেহ আমাদের দেখে নাই,—আমরা কখন্ ভাত খাই এবং আদৌ খাই কি না, এবং কোথায় ঘুমাই—এ লইয়া আমাদের হিতৈষিণী আত্মীয়াদের বিস্ময়ের আর অন্ত নাই।

আমাদের মধ্যে যদি কোনো একটি নোতুন লোক দিগ্‌ভ্রমবশতঃ হঠাৎ কখনো আসিয়া পড়েন, তবে তাঁর ক্রোধের যে কারণটি সর্ব্বপ্রথমেই ঘটে, সে হচ্ছে আমাদের কথাবার্ত্তায় প্রতি পদে আজগুবি সব পরিভাষায় হোঁচট খাওয়া।

আসলে কোড-বানানো হচ্ছে আমাদের একটা বাতিকের মধ্যে। কোডের সুবিধা এই যে, হাজার লোকের মধ্যে আমরা একে অন্যের নিভৃত সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হই না। সমাজে যেমন আমরা 'পেরিয়া' হইয়া আছি, তেম্‌নি অসংখ্যের ভীড়ের মধ্যেও নিজেদের সংঘবদ্ধতাকে অটুট রাখিয়া আমরা এই একরকম প্রতিহিংসা লইয়াছি।

আমাদের মধ্যে এক জনের নাম আমরা "বনচাঁড়াল" রাখিয়াছি। আমাদের মধ্যে কে প্রথম কি উপলক্ষ্যে কি মনে করিয়া এই নামটি উচ্চারণ করিয়াছিল, বলা শক্ত। দাঁড়াইয়া থাকিলে, এমন কি নিদ্রাকালেও, থাকিয়া থাকিয়া পা-নাচানোটা এর একটা স্বভাব বলিয়াই হোক, বা, জগদীশ বোস্ উক্ত নামধেয় তরুটির পাতায় নৃত্য থেকে উদ্ভিজ্জীবনের অভিনব ব্যাখ্যা বাহির করিয়াছেন, এবং আমাদের এই বন্ধুটির, সর্ব্ব ব্যাপারেই অপূর্ব্ব এক-একটা বক্তব্য থাকে বলিয়া হোক্, এই নামটি আমাদের সভা-কর্ত্তৃক মৌন-সম্মতিক্রমে এবং সার্ব্বজনীন ব্যবহার দ্বারা গৃহীত হইয়াছে।

একদিন পরেশের বৈঠকখানায় বৈষ্ণব কবিতা থেকে সুরু ক'রে রবিবাবুর কবিতার আলোচনা নিঃশেষিত হইয়া "সাক্ষী-গোপাল" কথাটার মানে সম্বন্ধে হঠাৎ তর্ক উঠিয়াছিল। "আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান"—এই লাইনটার মধ্যে উক্ত শব্দটার তাৎপর্য্য বিশদীকৃত হইয়াছে, বনচাঁড়ালের মুখে এই কথাটা শোনার পর, প্রসঙ্গত আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, "লোচন-মঙ্গল" কথাটার আধুনিক অনুবাদ কি করা যায়? কেহ "balm of the eyes", কেহ "bliss" ইত্যাদি সাজেস্‌ট্ করিলেন। তখন বন্ধুর মুখের দিকে তাকাইতেই যে ফ্রেজটা পাওয়া গেল, সে হচ্ছে "চক্ষুর স্নান।"

"অনন্ত মুহূর্ত্ত" কথাটার সঙ্গে আমরা ইতিপূর্ব্বেই পরিচিত ছিলাম। কিন্তু "অক্ষয় খর্জ্জুর" কথাটার জন্য বনচাঁড়ালই দায়ী। তার একটু ইতিহাস আছে।

সে তখন ইস্কুল-মাষ্টারী করিত। Plato-কথিত ও Freud-ব্যাখ্যাত ভালবাসার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। এবং কেরাণী তার নথীগুলিকে, এবং ইষ্টিষনের টিকেট-কলেক্টর

টিকেটগুলিকে যে ভাবে দেখিয়া থাকে, দুর্ভাগ্যক্রমে সে তার ছাত্রগুলিকে তার চেয়ে অতিরিক্ত করিয়া দেখিত। —এইখানেই তার মৃত্যু।—সে যাই হৌক, একদিন ঠিক্ 'সন্ধ্যাটার' সময়, রাস্তার মোড় ফিরিতেই একদল ছেলে আমাদের সম্মুখে পড়িয়াছিল। যেখানে একটা খেজুর গাছ ছিল, ঠিক্ সেই খানটায় সবুজ-চাদর-গায়ে এক বালক দল-থেকে আস্তে এক পা পিছাইয়া পড়িয়া একটু হাসিয়াছিল, যার মানে এ-পৃথিবীর দার্শনিকদের স্বপ্নের অতীত, বন-চাঁড়ালের মতে। একটিমাত্র নিম্পাক্ নিমেষ। কেন না, আমাদের দাঁড়াইবার কোনো অছিলা ছিল না।

সেই রাত্রে যখন বনচাঁড়ালের মুখ ছুটিল, তখন শোনা গেল, "নাটকের থেকে চিত্রের শ্রেষ্ঠতাটা কোন্‌খানে? আমি ত মনে করি একটা জায়গা আছে, যেখানে sculptureও musicএর চেয়েও বড়। সঙ্গীতে সুর থেকে সুরে, চরণ থেকে চরণে চলে যাই, নাটকে দৃশ্য থেকে দৃশ্যে সরে যাই—চঞ্চলও সত্যের একটা দিক নিশ্চয়ই। বিদায়ের মধ্যে যে একটা সকরুণতা আছে, সেই চঞ্চলকে রমণীয় করেছে। কিন্তু, যাকে ছেড়ে আসা গেল, সে এক জায়গায় নির্ণিমেষ স্থির দাঁড়িয়ে রইল, সে যে একেবারে নেই তা নয়; সে আছে, সে রইল—তা যদি না হত, তবে, ট্রেণ যেমন ইষ্টিষণ্ ছাড়ে—নির্ব্বিকার নিষ্করুণ, আমরাও তেমনি অতীতকে ছাড়তুম। ভাস্কর অহল্যাকে পাষাণ করে, এই মৎলবে, যে, যা চলে যাবে নিশ্চয়ই তারও মধ্যে যে একটি চিরস্থির সত্য আছে, সেই কথাটি ঘোষণা করবে বলে। দেখ, Grecian Urn এর উপরে যে চুম্বনটি চিরকাল উদ্যতই রইল, যে কণ্ঠাশেষ-প্রয়াসটি কোন দিন আর পূর্ণকাম হতে পারল না—(কি করে পারবে, ছবি মাত্র যে—হত যদি নাটক, তবে পারত) —তারাই ঐ কারণেই "joy for ever" হয়ে রইল।

"হাঁ, বিদায়ের কথা হচ্ছিল। আমি হঠাৎ আবিষ্কার করেছি, যে, মানুষের শরীরের মধ্যে যে নবদ্বার আছে, তার আটটিই সম্মুখের দিকে। মানুষের সমুদয় কর্ম্মপরতাকে যদি ভোজ্যান্বেষণ ও ভুক্তত্যাগ—এই দুই ভাগ করে দেখি, —তাহলে দেখ্‌ব সম্মুখেই যে সবগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয় রয়েছে, তার কারণ, ঐ গুলোর মূল মৎলবই ঐ এক খাদ্যের খোঁজ। আসল কথা, মানুষের সুমুখভাগ হচ্ছে মানুষের আটপৌরে দিক্। ঐ-খানে মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা হয় সংসারের ক্ষেত্রে;—ঐখানে লৌকিকতায় সম্ভাষণ, আদর, আপ্যায়ন, হাস্য পরিহাস, দর-কসাকসি। বন্ধুর দুইটি দিক্ আছে; এক, যেখানে সে আমার আলাপী মাত্র, সময় কাটাবার অজু-হাত, প্রতি দিবসের গল্প। উৎসবের দিন সেই দিন, যেদিন বন্ধুর মধ্যে যে একটি অসীম তত্ত্ব আছে, সে সহসা শুভ দৈবক্রমে চোখে পড়ে যায়। সেই দিন তার সঙ্গে মুহূর্ত্তেকের জন্য সত্য পরিচয় ঘটে বিনা ভাষায়, সেই দিন তার মধ্যে প্রবেশের পথ পাই। সেই দিন তখন সে আর আপিসের কলীগ্, দোকানের মুদি, হাটের হাটুরিয়া নয়।

"এই জায়গাটাতেই মানুষ সর্ব্বদা আমার দিকে পেছন ফিরিয়ে আছে; কেন না এইখানে মানুষ eternally বিদায়োন্মুখ; উন্মুখ কেন—একেবারে বিদায়-যাত্রী। "হারাই হারাই"—কলীগ যে, তার সঙ্গে ত বিদায় নাই, হাজারো বার ঘূর্ণিপাকে তার সম্মুখীন হব। বন্ধু প্রিয় কেন? এই ঘূর্ণি থেকে একবারটি তার মধ্যে ছাড়া পাই বলে; ঐ একটিবার একজনকে দেখলুম, যার সঙ্গে আমি ঘানিতে জোড়া নই—যে সীধা চলে যাচ্ছে, আমাকে ছেড়ে নয়—আমাকে ছাড়িয়ে আমার বাইরে।

"এই পশ্চাৎ-তত্ত্বই বোধ করি অস্তগামী সূর্য্যের এবং পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রির রমণীয়তার রহস্য।" তার এই আবিষ্কার শুনিয়া আমরা যে চমকিয়া বা ভড়কিয়া গেলাম, তা নয়। এমন যে আমাদের অতন্দ্রিত দরবার, তারও মধ্যে অর্দ্ধেক ততক্ষণ লেপ মুড়ি দিয়াছিল। পরেশ, আতিথেয়তার দরুণই হৌক্, কি খুব ভাল listener বলিয়াই হৌক্, শেষ পর্য্যন্ত খাড়া ছিল। বলা বাহুল্য, বনচাঁড়ালের কাছ থেকে 'আচানক' কথা labyrinthine-ফেষণে, শুনিতে আমরা কোনো দিন পিছ-পাও হই নাই। সে নিজেকে কলম্বস্ ডাকিতে ভাল বাসে, এবং "আমি সংপ্রতি আবিষ্কার করেছি যে," এ হচ্ছে তার একটা মুখের 'লবজ।' যেদিন পরেশের মা-মরা ছেলেটির প্রথম জন্মোৎসব হয়, সেইদিন সন্ধ্যা-বেলাকার তার আবিষ্কারটি দিয়া আজ আমরা বিদায় লইব।

ভোজ্যের পাত্রগুলি লইয়া নিরুপায় পরেশ দৌড়াদৌড়ি করিয়া হয়রাণ হইতেছিল, দেখিয়া, সে আরম্ভ করিল—"আমি সংপ্রতি আবিষ্কার করেছি, যে, absence of the hostই latest fashion from Paris; ভোজ্যের সমস্ত

ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে' দিয়ে গৃহস্থ হাতিয়া বা সন্দীপ চলে' যাবেন। কেউ আলো জ্বাল্‌বে, কেউ গান গাইবে, কেউ বাজনা বাজাবে, কেউ পরিবেশন করবে; কেবল তাঁকেই দেখতে পাওয়া যাবে না। অতিথিদের মধ্যে সবাই জান্‌চেও না, কে আসল নিমন্ত্রণকারী। কেউ বা পরিবেশকদের মধ্যে দুই একজনকেই নিমন্ত্রক ঠাওরাবে। বেশীর ভাগ লোক খাদ্যে, আলোয়, গানে এমন উল্লসিত থাকবে যে, গৃহস্থের সম্বন্ধে প্রশ্নটিমাত্র জাগ্‌তে পাবে না তাদের মনে। যারা hostকে mi-s করবে, তাদের মধ্যে কারু বা খাওয়া হবে না, কারু বা সমুদয় উৎসবটি তাঁর স্মৃতিতে, করুণায় মণ্ডিত হয়ে থাকবে।

আজ এই যে বন্ধুটি আমাদের পরিবেশন করচেন, এঁকে আমরা তাঁরই প্রতিনিধি বলে জান্‌ব, যিনি আজ লোকান্তরে রয়েছেন। ঐ যে আলো জ্বল্‌চে, ওকে স্তিমিত করে দাও। ও আলো vulgar। মৃত্যুর রহস্য আজ দূর গগন থেকে এই ছোট ঘরটিকে ভরাট করে' দিক্ ম্লান দীপের দো আলোয়।

"হে বোহেমি-আন্ দল, বিশ্বভুবনের মধ্যে যদিও তোমাদের গৃহ নাই, শুনে রাখো, যে, তবু এ বিশ্বের অন্তরালে একটি গেহিনী থাকা বিচিত্র নয়। তোমাদের জন্য নিমন্ত্রণ রয়েছে। এত যে আলো, এত যে গান, এত যে গন্ধ—এরা কি কোনো-এক অনুপস্থিত নিমন্ত্রণকারিণীর আয়োজন? জানি না। আপাততঃ যারা পরিবেশন করচ, ভাই সব, ধন্যবাদ জেনো।"

বিরলে

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী]

আমার খেলা করা কে জানে কার সাথ,
আমার গান গাওয়া সারাটী দিন রাত,
আমার ফুল-ভরা আঁচল ছিয়াটীর,
নিশীথ রাতে ঝরা তপ্ত আঁখি-নীর
সকলি করি এক গাঁথিয়া মালা,
সাজানো থাক না সে ভরিয়া ডালা,
মরম মাঝে মোর গোপনে।

শুকানো ফুলদল, সবুজ পাতা আর,
উদাস আন মনে মালাটী গাঁথা তার—
সারাটী দিবসের যত না ভুল ভ্রম—
নয়নে জল ভরে, মুছানো বৃথা শ্রম;
সকলি এঁকে রাখা নিঠুর হাতে
বুকের মাঝে ছেঁড়া মলিন পাতে,
সবার নয়নের আড়ালে;

নাই বা দেখিলে গো অলস খেলা মোর,
ঝিনুক কুড়ানো সে সারাটী বেলা ভোর
কল্প-নদী-কূলে অসীম বেলা-ভূম
ধূলির কোলে যেথা স্মৃতির আধ ঘুম,
তাহাই ফেলে রাখা শিশুর মত
নিরালা গৃহ-কোণে খেলানা শত
কত না দ্বিধা হীন যতনে।

থাক সে লুকানো গো, এনো না তারে আজ
দৃষ্টি অকরুণ নিঠুর সভা-মাঝ;
কে জানে কবে কার নিলাজ পরিহাস
দীর্ণ করিবে সে কোমল স্মৃতি-পাশ—
রহিতে দাও তারে গোপনে আজ
অতীত দিবসের স্বপন মাঝ;
কোথায় পাব তারে হারালে।

কৌতুকাঙ্কন

(Cartoons)

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

দাঁড়-ছাড়া।
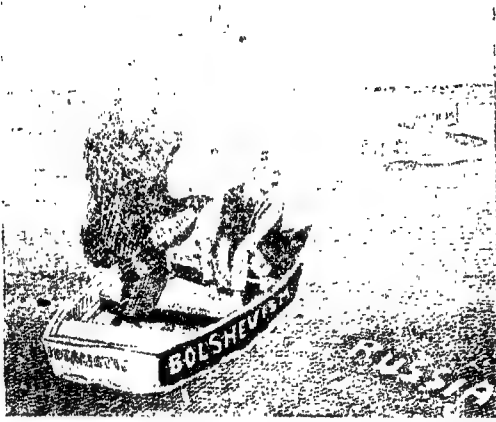
রুষিয়ার 'বলসেবী'দলের পানসি মাঝ-দরিয়ার বাণ চাল হইয়া উঠিয়াছে; কারণ 'কার্য্যক্ষম শাসন পরিষৎ' ও 'ধনিমহাজন'রূপ দাঁড় দুইটিকে তাহারা বাতিল করিয়াছিল। দাঁড়-ছাড়া নৌকা আর অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া এখন আবার তাহারই সাহায্য লইবার জন্য পরিত্রাহী চীৎকার করিতেছে! (Ohio State Journal.)

কার্য্য কারণ!

শক্তির সুরাপানে জগতের আসক্তি যতই বাড়িতেছে, সামরিক ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য ততই তাহার ভারাক্রান্ত মস্তকে অতিরিক্ত কর-ভারের কুঠারাঘাত পড়িতেছে। (Chicago Tribune.)

মা'র কাছে যাবে!

শিশু-জগত আজ পিতা অস্ত্রাসুরের ক্রোড় হইতে জননী অস্ত্র-পরিহারিণীর নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। ওয়াশিংটন সহরে জগতের প্রতিনিধিগণের যে সম্মিলিত অস্ত্র-বর্জ্জন বৈঠক বসিয়াছিল, উহাকেই লক্ষ্য করিয়া এই চিত্রখানি পরিকল্পিত হইয়াছে। (Rochester Chronicle)

একটু ভুল!

আয়ার্ল্যাণ্ড সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আসনে গিয়া বসিয়াছিল; লয়েড জর্জ্জ সবিনয়ে তাহাকে এই বলিয়া তুলিয়া দিতেছেন যে "মহাশয়, আপনি ঠিক জায়গায় আসিয়াছেন বটে কিন্তু আসন-নির্ব্বাচনে একটু ভুল করিয়াছেন।" (Rochestr Chronicle)

শেষ প্রার্থনা!

রুষিয়া আজ করযোড়ে জগতের কাছে প্রার্থনা করিতেছে "ওগো! তোমরা আমাকে আজ বলসেবীকের বিষময় পরিণাম হইতে রক্ষা কর!"

(De Noten kraker)

স্থানাভাব!

ছেলে কিছুতেই জেল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে রাজি নয়। জেলের ফটক আঁক্‌ড়ে ধরে ঝুলছে! পুলিশ শেষে ঘাড় ধরে টেনে বার করে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

(De Amsterdammer.)

নূতন রুষ সম্রাট!

জারের হত্যাকাণ্ডের পর রুষিয়া আজ কার করতলগত? করাল বাহুবিস্তারী ভীষণ দুর্ভিক্ষের! নূতন রুষ-সম্রাট্ আজ স্বয়ং যমরাজ।

(Kolokal. New York

সিংহের খেলা!

আইরিশ সাধারণ-তন্ত্রের অধিনায়ক ডি ভেলেরা চাবুক আস্ফালন করিয়া ব্রিটিশ সিংহকে বলিতেছেন—"বহুৎ আচ্ছা বেটা, অনেক খেলা দেখিয়েছ" এইবার ভাল ছেলের মত সুড়-সুড় করে এই শেষ খেলাটি (ইংলণ্ডের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্নতা) দেখিয়ে দাও বাস্! তা হলেই তুমি রেহাই পাবে।" সিংহ একগুঁয়ের মত চুপচাপ বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মাথা নাড়িয়া তাহার অসম্মতি জানাইতেছে।

(London Opinion)

ঐ জুজু!

পুরাকালে রুষ-ভল্লুক ও ইহকালে আফগান এবং বলসেবীর আক্রমণের অজুহাতে যেমন ভারতের সামরিক ব্যয় প্রতি বৎসর বাড়িয়াই চলিয়াছে, সেইরূপ জাপানের জুজুর ভয়ে আমেরিকা সতত সন্ত্রস্ত হইয়া ক্রমাগত তাহার রণসম্ভার বৃদ্ধি করিতেছে দেখিয়া বিদ্রূপচ্ছলে এই চিত্রে দেখান হইয়াছে যে, ঐ জাপানী জুজু একটা জীবন্ত সত্য নয়, সুতরাং উহার জন্য ভীত হওয়া নিতান্ত বালকোচিত কার্য্য!

(Dayton News.)
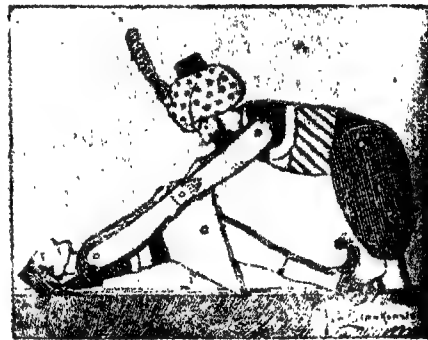
পুতুল-নাচের লড়াই!

গ্রীক ও তুর্কীর যুদ্ধ যেন পুতুল-নাচের লড়াই হইয়া গেল। দড়ীতে যখন যেমন টান পড়িয়াছে—তার তখন সেই অবস্থা, কখন এ হারে ও জেতে; কখন ও হারে এ জেতে; শেষে গ্রীক পুতুলের দড়ী ছিঁড়িয়া গিয়া পুতুলটি শুইয়া পড়িয়াছে। (De Amsterdammer.)
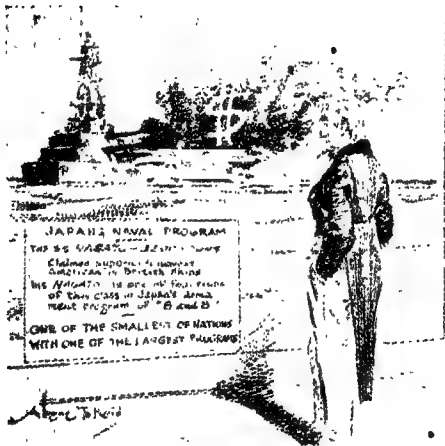
মতলব্ কি ?

ক্ষুদ্র জাপান আজ ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত সমানে পাল্লা দিয়া বড় বড় রণতরী নির্ম্মাণ করিতেছে দেখিয়া "শ্যাম চাচা" চিন্তিত হইয়া ভাবিতেছে উহার মতলব কি ?

(New York Evening Mail)
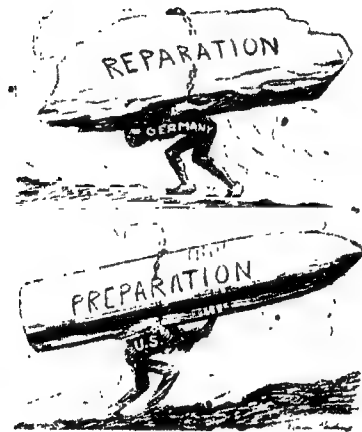
একই হাল !

ক্ষতিপূরণের দাবীর চাপে জার্ম্মেণীর আজ যে দুরবস্থা, সামরিক আয়োজনের ব্যয়ভারে আমেরিকা-যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য দেশেরও যে সেই একই হাল, এই চিত্রখানিতে তাহাই দেখান হইয়াছে।

(Brooklyn Eagle.)
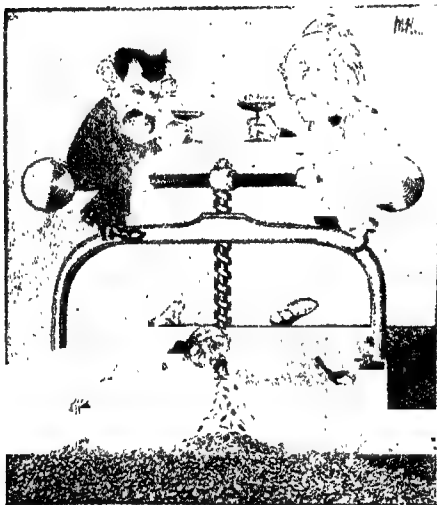
ক'সে চাপ দাও।

ফরাসী ও ইংরাজ জার্ম্মেণীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের দাবী স্বরূপ অনেক টাকা আদায় করিতেছেন বলিয়া এই চিত্রে ঐ দুই জাতিকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। ফরাসী ও ইংরাজের প্রধান মন্ত্রী ব্রায়াণ্ড্ ও লয়েড্ জর্জ্জ জার্ম্মেণীকে পেষণ যন্ত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া উহার দণ্ডের উপর নিজেরা আরোহী হইয়া পরস্পরকে বলিতেছেন 'ক'সে চাপ দাও !'

(Nebelspalter, Zurich.)

পোষা হাতী !

পুলিশ ও সৈন্যবিভাগ যেমন ভারত গভর্মেণ্টের রাজস্বের তিন ভাগ আয় উদরসাৎ করছে, তেমনি আমেরিকার নৌ বাণিজ্য-বিভাগ তাহাদের গভর্মেণ্টের আয়ের অধিকাংশ টাকা গ্রাস করছে ; তাই সেখানকার সংবাদপত্রওয়ালারা গভর্মেণ্টকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছে "তোমার ঐ পোষা হাতিটিকে আর কতকাল আমরা নিজে না খেয়ে খাওয়াবো !"

(Los Angeles Times.)

মগ্ন ত্রাণ !

দুঃখসাগরে নিমজ্জমান জার্ম্মেণীকে রক্ষা করিবার জন্য আমেরিকা যেটুকু দয়ার ভাণ দেখাইয়াছিল, তাহাকেই ব্যঙ্গ করিয়া এই চিত্রে দেখানো হইয়াছে যে, জলমগ্নকে পরিত্রাণ করিবার জন্য মগ্ন-ত্রাণ তরণী হইতে যে 'ভেলা' ভাসানো হইয়াছে, উহা ভীষণ কণ্টকাকীর্ণ !

(Kladderadatsch, Berlin.)

ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা !

মিত্রশক্তির পরস্পরের মধ্যে যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া শত্রু-পক্ষ পরিহাসের হাসি হাসিয়া বলিতেছে "সুন্দরী ! ছেঁড়াচুলে খোঁপাবাঁধা কি আর চলে ? তোমার জরাজীর্ণ কুৎসিৎ মুখখানি দর্পণের সাহায্যে রং চং মাখিয়া আর ক'দিন ঢাকিয়া রাখিবে ? লোলচর্ম্ম ও বলীরেখা যে তোমার সর্বাঙ্গে ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে।"

(Kladderadatsch, Berlin.)

জল-ক্রীড়া !

কণ্টকতরুতলাসীন বিশ্বসুন্দরীর হাত ধরিয়া 'শ্যামচাচা' আজ অস্ত্র-বর্জ্জন-সাগরে জল-ক্রীড়া করিবার জন্য তাঁহাকে টানাটানি করিতেছেন।

(San Francisco Chronicle.)
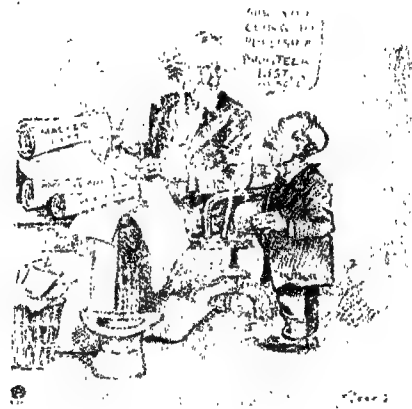
রিপোর্ট দাও !

গভর্মেণ্টের দপ্তর হইতে প্রতি বৎসর বাণিজ্য-রিপোর্ট, পুলিশ-রিপোর্ট কৃষি-রিপোর্ট, শিক্ষা-রিপোর্ট স্বাস্থ্য-রিপোর্ট প্রভৃতি হরেক রকমের রিপোর্ট বাহির হইতেছে দেখিয়া দুর্ম্মূল্য-পীড়িত জনসাধারণ আজ তাহার নিকট হইতে ব্যবসায়ীগণের অতিরিক্ত লাভের একটা রিপোর্ট দাবী করিতেছে !

(George Mathew Adams Service.)

সন্ধির দুরভিসন্ধি !

মিত্রশক্তি যে সন্ধি করিয়াছেন, তাহার ভিতর হইতেও জার্ম্মাণীকে বধ করিবার যে দুরভিসন্ধি ফুটিয়া বাহির হইতেছে, মিত্রশক্তি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা লুকাইতে পারিতেছেন না ।

(Wahre, Stuttgart)

টাকা আদায়ের সহজ উপায় !

করভারে জর্জ্জরিত হইয়া জনসাধারণ যখন আর টাকা দিতে অস্বীকার করিতেছে, গভর্মেণ্ট তখন এই বলিয়া তাহাদের ভয় দেখাইতেছেন যে, তোমরা যদি টাকা না দাও, তাহা হইলে চাহিয়া দেখ তোমাদের মাথার উপর ঐ যে বলসেবী রাক্ষস লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, উহার হাত হইতে তোমাদের রক্ষা করিতে পারিব না !

(De Noten kraker, Amsterdam)

কাজ দাও !

যুদ্ধের পর 'শান্তি দাও', 'অন্ন দাও' 'বেতন দাও' ইত্যাদি দাবী কতকটা দমন হইলেও বেকার লোকদের নিকট হইতে 'কাজ দাও' 'কাজ দাও' বলিয়া যে দাবী আসিতেছে, তাহাতে মিত্র শক্তি, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড অত্যন্ত মুস্কিলে পড়িয়াছেন ।

(Mucha, Warsaw.)
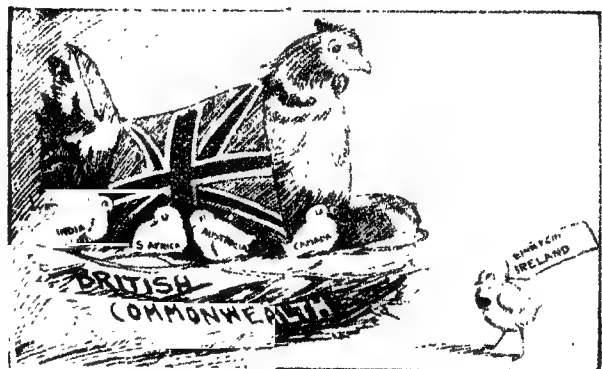
বেয়াড়া বাচ্ছা !

যে বাচ্ছাটা (আয়ার্লাণ্ড) ধাড়ীর (ইংলণ্ড) ডানার আওতা ছাড়িয়া বাহিরে পলাইয়া যাইতেছে, ধাড়ী মুর্গী সেই বেয়াড়া বাচ্ছাকে ডানার ভিতরের নিশ্চিন্ত আরামের লোভ দেখাইয়া ফিরাইতে চায় !

(Manchester Chronicle.)

নিরুপায়।

যুদ্ধের পর ব্যবসায়ের কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, এই চিত্রখানিতে তাহাই সূচিত হইয়াছে।

(Dayton News.)

বেজোড় জুড়ী!

ইংরাজের সহিত আইরিশদের একটা রফা হইয়া শান্তি স্থাপনের উপায় হইল বটে, কিন্তু 'সিনফেন্' ও 'আলষ্টার' এই দুই পরস্পর বিরোধী দলের মধ্যে এখনও সদ্ভাব স্থাপিত হয় নাই; তাই শান্তির পথে এই বেজোড় জুড়ী বেয়াড়া চলিতে সুরু করিয়াছে।

(New York Evening Mail.)

শাস্তিদান।

জার্ম্মেণী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া প্রভৃতিকে ইংরাজ, ফরাসী ও ইটালি যে ভাবে শাস্তি দান করিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তুর্কীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে!

(De Noten kraker, Amsterdam)

রস-চোরা।

লয়েড জর্জ্জ তাঁহার প্রচণ্ড জয়-পেষণীর চাপে অন্য দেশকে পিষিয়া যেটুকু রস বাহির করিতেছেন, জার্ম্মেনী তাহা চুরি করিয়া ভোগ করিতেছে, এবং ফরাসী নিরুপায় দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য দেখিতেছে!

(Warsaw Mucha)

অস্ত্র-বর্জ্জন !

ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি য়ুরোপ ও এশিয়ার অনেকগুলি শক্তি আজ একত্র সমবেত হইয়া, বহু যুক্তি-তর্কের পর অস্ত্র-বর্জ্জন করাই স্থির করিয়াছেন ; কিন্তু কে আগে ফেলিবে সেটা নির্দ্ধারিত হয় নাই বলিয়া, সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে সন্দিগ্ধ নেত্রে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছেন !

(Tacoma News.)

দুঃস্বপ্ন !

যুদ্ধ জিতিয়া জয়ের নেশায় জনবুল যখন বুঁদ হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহার সেই বিজয়োৎসবের সুখ-নিদ্রার মধ্যে কতকগুলা দুঃস্বপ্ন আসিয়া তাহাকে উৎপীড়ন করিতেছে ! আইরিশ-নেকড়ে ডি ভেলেরা, মিশর-কুম্ভীর জগলুল, ভারত-বাসুকী গান্ধী ও তুর্ক-মার্জ্জার কমল পাশা তাহাকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়াছে !

(Mucha, Warsaw.)
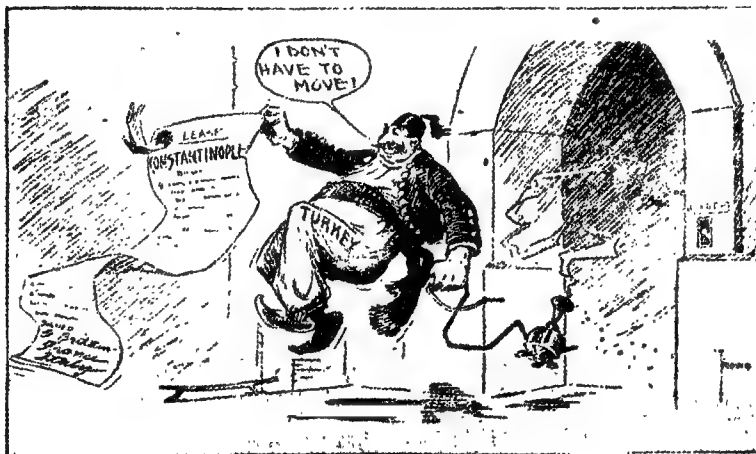
বেঁচে গেছি !

সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্‌ একেবারে ছাড়িতে হইল না বলিয়া, তুরস্কের সুলতান যেন উল্লাসে নৃত্য করিয়া বলিতেছেন, "বড় বেঁচে গেছি বাবা !" (Chicago Daily News.)
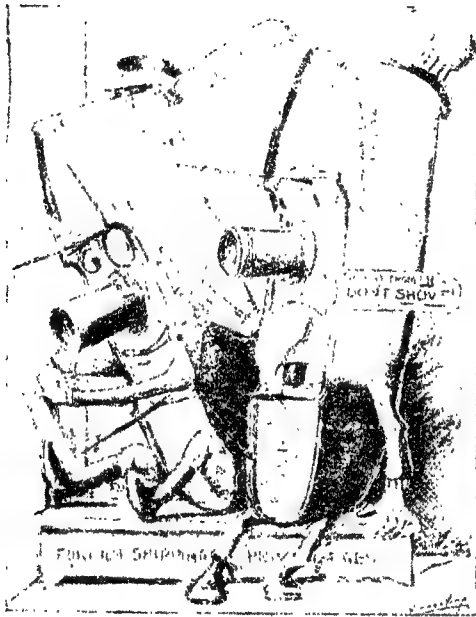
বখ্‌রাদার।

বৈদেশিক নৌ-বাণিজ্যের যে সুবিধাটুকু এতদিন ব্রিটিশ বাণিজ্য-তরীর একচেটিয়া ছিল, আমেরিকার বাণিজ্য-তরী আজ তাহার কিয়দংশ দখল করিয়াছে দেখিয়া, নৌ-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট ব্রিটিশ স্বার্থ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকা তাহাকে উদ্বিগ্ন হইতে দেখিয়া বলিতেছে, "ভয় নেই দাদা, যথেষ্ট জায়গা আছে, দুজনেরই বখরায় কুলোবে।"

(San Francisco Chronicle.)

মাছ ধরা।

গভর্মেণ্টের আয় বাড়াইবার প্রয়োজন হওয়ায়, অমনি ছিপ হাতে বসিয়া গিয়াছেন; এবং আয়-সরোবর হইতে নূতন-নূতন টেক্স-মৎস্য টানিয়া তুলিতেছেন! (Brooklyn Eagle)

নিরাশ্রয়!

সহরে বাড়ীভাড়া খুব বেশী বাড়িয়া যাইতেছে; তাই এই চিত্রে বিদ্রূপচ্ছলে দেখানো হইয়াছে যে, গ্রীক মনীষী ডায়োজেনিস, যিনি একটি পুরাতন পিপের মধ্যে বাস করিতেন বলিয়া ইতিহাসে কথিত, তিনিও আজ নিরাশ্রয় হইয়াছেন; কারণ, সেই পিপেরও মালিক আজ তাঁহার নিকট হইতে মাসিক ১৫্ টাকা ভাড়া চাহিতেছেন!

(Karakituren, Christiania)

ছেলেমানুষি।

ধনী ও মজুরের মধ্যে লাভের অংশ লইয়া যে দ্বন্দ্ব শুরু হইয়াছে, সে লাভ জড় হইতেছে কিন্তু জনসাধারণেরই পকেট হইতে;—অথচ, অল্পমতি বালকদের খেল্‌না লইয়া ঝগড়ার মত, উহা বারম্বার ধর্ম্মঘট ও তাহার নিষ্পত্তি-রূপ আড়ি-ভাবের ভিতর দিয়া, ক্রমেই ছেলেমানুষিতে আসিয়া দাঁড়াইতেছে! খেল্‌নার প্রকৃত মালিক যে—সে ছেলে রহিল বাহিরে পড়িয়া; অথচ, ঝগড়া বাধিল অন্য দুই ছেলের মধ্যে—খেল্‌নাটি যাহাদের কাহারও নয়! (New York Times.)

যমজ সন্তান !

জিনিসপত্রের দর চড়িয়া যাওয়াতে, শ্রমজীবীদের দৈনিক রোজও বাড়িয়া গিয়াছিল ; কিন্তু বাজার-দর কমিতে সুরু হইলেই, তাহাদের মজুরীও যে কমিয়া যাইবে—এই জন্য ঐ দুই যমজ শিশু ভয়ে-শ্রমজীবী আজ অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে !

(Sunday Chronicle.)

পুনরুজ্জীবিত !

ধনী-মজুরের দ্বন্দ্ব চুকাইলাম ভাবিয়া, রুষিয়া যে মহাজনের সোণার হাঁসটির মুণ্ডপাত করিয়াছিল, আজ আবার তাহারই একান্ত প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া, তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছে ।

(Dallas News.)

উভয়-সঙ্কট !
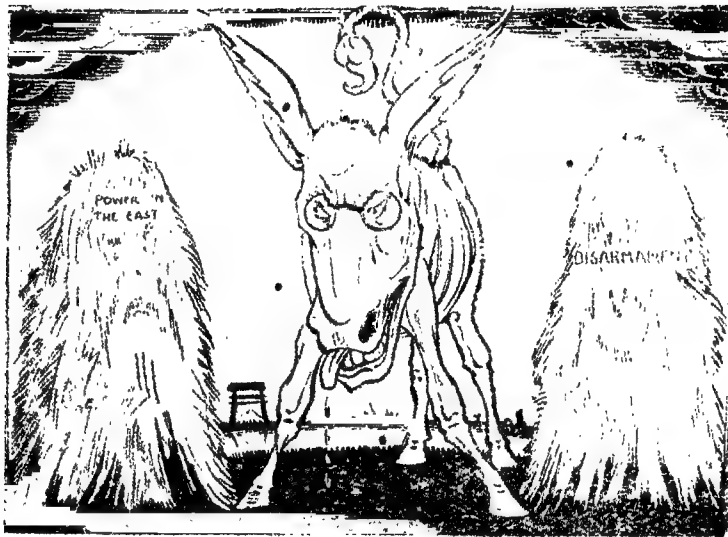
ওয়াশিংটনের অস্ত্র-বর্জ্জন বৈঠকে যোগ দিয়া জাপানের উভয়-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে ! একদিকে চায়না, ম্যাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, সাইবিরীয়া প্রভৃতি প্রদেশে জাপান ধীরে-ধীরে যে প্রভাবটুকু বিস্তার করিয়াছিল, তাহার তিরোভাব, এবং অন্য দিকে তাহার অমিত অস্ত্রবলের সংক্ষেপ এই দুই সমস্যার মধ্যে পড়িয়া জাপান গাধা বনিয়া গিয়াছে !

(De Notenkraker, Amsterdam.)

অস্ত্র ত্যাগ !

ফ্রান্স (1) ইংল্যাণ্ড (2) জাপান (3) রুষিয়া (4) পোলাণ্ড (5) আমেরিকা (6)—সকলেই অস্ত্র-ত্যাগে একমত হইয়াছেন ; এবং তদুদ্দেশ্যে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম উদ্যোগী হইলেন জার্ম্মেনীকে (7) সম্পূর্ণ রূপে নিরস্ত্র করিতে ! (Nebelspalter, Zurich)

ধর্‌লে !

জনবুল একে-একে অনেককেই তাহার মুষ্টিগত করিয়াছে দেখিয়া, আমেরিকার ভয় হইয়াছে, বুঝি তাকেও আবার ধরে ! San Francisco Chronicle.)

বাধা নিষ্পত্তি।

আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বায়ত্ত-শাসন দিবার প্রধান বাধা ছিল সিন্‌ফেন্‌দের ইংল্যাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার দাবী। আজ সেই সিনফেন্‌ শার্দ্দূলকে কৌশলে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, লয়েড জর্জ্জ হাস্যমুখে স্বায়ত্ত-শাসনের সহিত শান্তি দেবীকে আয়ার্ল্যাণ্ডে লইয়া যাইতেছেন।

(News of the World)

জার্ম্মেণীর দর।

যুদ্ধের পর এক আমেরিকান দম্পতি জার্ম্মেনীতে বেড়াইতে গিয়'-ছিলেন। একটি দোকানে ঢুকিয়া, নব-বিবাহিতা পত্নীটি একটি 'রূপ-দান' (Vanity-case) পছন্দ করিয়া দাম জিজ্ঞাসা' করিলেন। দোকানদার বলিল—"মা ঠাকরুণ, বিলাসকর বাবদ (Luxury Tax) ২০০ টাকা, আয়কর বাবদ (Income Tax) ৩০০ টাকা, আর টাকার মূল্য ঘাটতি বাবদ (Exchange value allowance) ৪০০ টাকা, একুনে এই নয় শত টাকা, এবং জিনিসটির দাম ৫০ টাকা—এই সর্ব্বসমেত সাড়ে নয়শত টাকা দিলে "রূপ দানটি' আপনাকে দিতে পা'রি।

(Nebelspalter, Zurich)

চোরের উৎপাত !

মদ্যপান নিবারণের জন্য আমেরিকা আইনের পাঁচিল তুলিয়া, দেশকে মদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল ; কিন্তু দেখা গেল, চোরের মত পাঁচিল টপ্‌কাইয়া দলে দলে বিলাতী মদের বোতল চুপি-চুপি ঘরে প্রবেশ করিতেছে !   (Dayton News.)

প্রত্যাবর্ত্তন।

চড়া বাজার-দর ঈষৎ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে ;—কিন্তু মজুরী তার তুলনায় এত বেশী কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসার ব্যাপার আরও ভীষণ কষ্টদায়ক হইয়া উঠিয়াছে !   (Brooklyn Eagle)
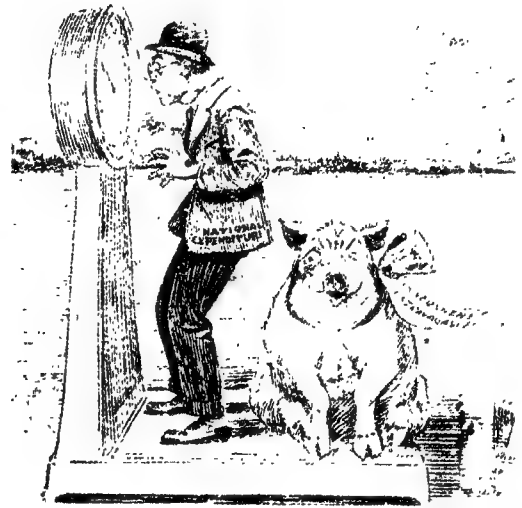
ওজনে বাড়া !

গভর্মেণ্টের আয়ের অপেক্ষা ব্যয়ের ভাগই ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে ; ওজন করিয়া দেখা গেল যে, আমতশয় ও অপব্যয় এত মোটা হইতেছে যে, শাসনের খরচ উপার্জ্জনকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। অতএব অপব্যয় কিছু না কমাইলে গভর্মেণ্ট আর বেশী দিন বাঁচিবে না।   (New York Times.)

বিসর্জ্জন !

ওয়াশিংটন কনফারেন্সের পর যে যার পুরোনো বাতিল জাহাজগুলো বর্জ্জন ক'রে, রণসজ্জার বিসর্জ্জন দিচ্ছি ব'লে, লোক দেখানো বড়াই ক'রছে। জাপান ব'লছে "দেখ ভাই, মুখে যা বল্‌ছি, কাজেও আমি তাই করছি।" আমেরিকা বল্‌ছে "খুব ভাল,— দেখ, আমিও তাই করছি!" ইংরেজ বল্‌ছে "আমিও তাই!" মোটের ওপোর দেখা যাচ্ছে, এটা সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি। (Passing Show, London.)

নব দেলীলা!

বাইবেলের যুগে যেমন সুন্দরী দেলীলা একবার মহাবীর সামসনের কেশ কর্ত্তন করিয়া তাহার শক্তি হরণ করিয়াছিল, তেমনি আজ এ যুগে আবার সুন্দরী কলম্বীয়া (আমেরিকা) সমরাসুরের অস্ত্রচ্ছেদন করিয়া দেলীলার মত তাহার শক্তি হরণ করিতেছেন।

(Passing Show, London)

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

দোলের আনন্দ যথেষ্টই উপভোগ করিয়াছেন। এইবার একটু বাঁশী বাজাইবেন কি? আজকাল ফেরীওয়ালাদের কাছে এবং মনোহারী দোকানে এক রকম সীসার বাঁশী পাওয়া যাইতেছে। আকার অনুসারে ইহাদের মূল্য প্রত্যেকটী এক পয়সা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত। খুব সম্ভব এগুলি জাপান হইতে আমদানি হয়। বাঁশীগুলি ছেলেদের অত্যন্ত প্রিয়। তাহারা ইহা খুব কেনে, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলে। সুতরাং ইহার ব্যবসায় ভালই চলে বলিতে হইবে।

এই বাঁশী এখানে তৈয়ার করা সম্ভব কি না, সে সম্বন্ধে আমি একটী সীসার টাইপ ঢালাইয়ের কারখানার কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলাম। তাঁহারা দুইটী ছোট-ছোট—প্রত্যেকটী এক পয়সা মূল্যের—বাঁশী সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিয়া আমাকে একটা হিসাব দিয়াছেন। ঐ বাঁশী এখানে

স্বচ্ছন্দে তৈয়ার হইতে পারে। তৈয়ার করিতে হইলে যেরূপ উদ্যোগ আয়োজন করিতে হইবে, তাহাও তাঁহারা আমাকে জানাইয়াছেন। সে উদ্যোগ আয়োজনগুলি এই—একটা টাইপ ঢালাইয়ের কল (type casting machine) সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহার মূল্য এখন সম্ভবতঃ ১০০০ টাকা। (যুদ্ধের পূর্ব্বে, অনুমান হয়, এই কল ২০০ কি

টাইপ ঢালাইয়ের কল

২৫০ টাকায় পাওয়া যাইত।) এই কল অবশ্য এখানে পাওয়া যায় না—বিলাত হইতে আনাইয়া লইতে হয়। আমার মনে হয়, প্রসিদ্ধ কাগজ ও ছাপাখানার সরঞ্জাম বিক্রেতা মেসার্স জান ডিকিনসান কোম্পানী এই কল আনাইয়া দিতে পারিবেন। কলটা হাতে চলে—'পাওয়ারের' (power) দরকার হয় না। কলের মধ্যেই সীসা গলাইবার ব্যবস্থা আছে। টাইপ প্রস্তুত করিবার ছাঁচ এই কলে লাগাইয়া দিয়া কল চালাইয়া দিলে, গলানো সীসা আপনি ছাঁচের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং টাইপে পরিণত হয়। এখন অনেক টাইপ ঢালাইয়ের কারখানায় এই কল ব্যবহৃত হইতেছে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে গিয়া ইহার কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া আসিতে পারেন। ইহাতে খুব শীঘ্র টাইপ তৈয়ারী হয়। বাঁশীটাকে দুই অংশে ভাগ করিয়া এক-এক অংশের জন্য এক-একটা ছাঁচ তৈয়ার করিতে হইবে। এইরূপ দুইটা করিয়া ছাঁচে একটা সেট্ হইবে। এইরূপ এক সেট্ ছাঁচ কাটাইতে প্রথমে খরচ পড়িবে ৫০ টাকা। এই এক সেট্ ছাঁচ হইতে অনেকগুলি তাঁবার (electro) প্রতিলিপি প্রস্তুত হইতে পারিবে। তাহাতে অবশ্য খরচ অনেক কম পড়িবে। সুতরাং ১০০ টাকায় মূল ছাঁচ ও তাহার প্রতিলিপি কয়েক সেট্ প্রস্তুত হইতে পারিবে। এক একটা ছাঁচ কলে লাগাইয়া কল চালাইলে, টাইপের ধরণে বাঁশীর এক একটা অংশ ঢালাই হইবে। পরে দুইটা অংশ জুড়িয়া লইলেই বাঁশী তৈয়ার হইবে।

তার পর সীসা। সীসার মূল্য এখন খুব সম্ভব প্রতি মণ ২০ টাকা। এক মণ সীসা হইতে এক পয়সা মূল্যের বাঁশী অনেকগুলি প্রস্তুত হইতে পারিবে। এই এক মণ ওজনের সীসার বাঁশী প্রস্তুত করিতে সীসার মূল্য ও মজুরী সহ পড়তা পড়িবে মণকরা ৬৫ টাকা। সুতরাং খুচরা পড়তা পড়িল পয়সায় ৩।৪টা বাঁশী। তার পর ১২টি কিম্বা ২৪টা বাঁশী এক-একটা বাক্সে রাখিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ পাঠাইতে হইবে। পাতলা পিচবোর্ডের বাক্স হইলে চলিতে পারে। অবশ্য শুধু একটা আকারের বাঁশী তৈয়ার করিলে চলিবে না—বিভিন্ন আকারের বাঁশী তৈয়ার করা চাই। আমার মনে হয়, বাঁশী তৈয়ার করিলে লাভ হইতে পারে। কিন্তু এ কাজে হাত দিবার আগে একবার বাজারের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। যখন দেখা যাইতেছে, জাপান হইতে এই বাঁশী আমদানি হইতেছে, এবং ছেলেরাও কিনিতেছে ও ভাঙ্গিতেছে, তখন ইহা এখানে তৈয়ার করিলে কেন যে চলিবে না, তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। তার পর, কল সংগৃহীত হইলে, ঐ কলে টাইপ ঢালাইয়ের কাজও চলিতে পারে। তবে অবশ্য সেজন্য অনেক ছাঁচ তৈয়ার করাইয়া লইতে হইবে।

বাঁশী তৈয়ার করিবার পরামর্শ দিতেছি বটে, কিন্তু ছেলেদের এই সীসার বাঁশী ব্যবহার করিতে দিতে আমার আপত্তি আছে। ডাক্তারি চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে সীসা বিষ-পর্য্যায় ভুক্ত। ধাতুদ্রব্যগুলির মধ্যে পারদ যেমন

প্রত্যক্ষ বিষ, সীসা তেমন না হইলেও, পরোক্ষ ভাবে উহা মানব শরীরে বিষবৎ কার্য্য করিয়া থাকে। অন্ততঃ সীসার কয়েকটী যৌগিক (Compound) যেমন সাদা রং (white lead) চিকিৎসা শাস্ত্রে বিষ বলিয়াই গণ্য হয়। কিছু দিন হইল ইটালীর জেনোয়া নগরে একটী আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্প কনফারেন্সে এইজন্য সীসা-ঘটিত রংয়ের ব্যবহার সংযত করিবার উদ্দেশ্যে একটী মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় সীসার বাঁশী তৈয়ার করা সঙ্গত কি না, তাহার বিচারের ভার আমি পাঠক-পাঠিকাগণের হস্তেই অর্পণ করিলাম। কিন্তু, আমাদের যদি সীসার বাঁশী তৈয়ার করা সঙ্গত না হয়, তাহা হইলে জাপান হইতে আমদানি বাঁশীগুলি ছেলেদের হাতে দেওয়া কোন ক্রমে সঙ্গত নয়।

এইবার আপনাদের জন্য চাটনীর ব্যবস্থা করিব। বোধ হয় ইহাতে কাহারও অরুচি হইবে না।

চাটনীর ব্যবসায় খুব বড় ব্যবসায়। আজ-কাল কলিকাতায় যে সব চপ-কাটলেটের দোকান, হোটেল, রেষ্টোরাঁ হইয়াছে, সেই সব যায়গায় চাটনী অনেক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। চাটনীর রপ্তানীর বাণিজ্যও খুব চলে। শুনিতে পাই, বিলাতে ভোজনের পর একটু চাটনী অপরিহার্য্য। চাটনীর ন্যায় আমাদের আচার এবং কাসুন্দীও বিলাতের লোকে খুব পছন্দ করেন। এদেশে গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা যেমন পোড়া মাটী ভক্ষণ করেন,—চাটনী, কাসুন্দী, আচার প্রভৃতি তাঁহাদের ততোঽধিক মুখরোচক। আরও শুনিতে পাই, বিলাতী মহিলারা, বিশেষতঃ ফরাসী মহিলারা গর্ভাবস্থায় কাসুন্দী খুব ভালবাসেন। তা' রপ্তানীর কথা পরে হইবে। এখন চাটনী তৈয়ার করিয়া এখানেই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় করা যাইতে পারে।

আমাদের দেশে আম সব বৎসরে সমান ফলে না। এক বৎসরে বেশী ফলে, এক বৎসরে কম ফলে। যে বৎসরে পাতা বেশী গজায়, সে বৎসরে আম কম ফলে; যে বৎসরে আম বেশী উৎপন্ন হয়, সে বৎসরে বেশী নতন পাতা গজায় না। গত বৎসর আম কম জন্মিয়াছিল; সুতরাং এ বৎসর (দৈব দুর্ব্বিপাক না ঘটিলে) বেশীই জন্মিবার কথা।

বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে আম খুব বেশী পরিমাণে জন্মে, কিন্তু সে আম খাইবার লোক কম; এবং অন্যত্র,—যেখানে আম খাইবার লোক যথেষ্ট আছে, সেখানে চালান দিবার অত্যন্ত অসুবিধা; পাকা আম চালান দিতে গেলে, অধিকাংশই পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এই সকল স্থলে যদি কাঁচা আমের চাটনী তৈয়ার করিয়া অন্যত্র চালান দেওয়া যায়, তাহা হইলে অনেক অপচয় নিবারিত হইতে পারে। অবশ্য পাকা আমের আমসত্ত্বও তৈয়ার করা যায়, এবং তাহা চালানও দিতে পারা যায়। তবে আমসত্ত্বের কথা, দেখিতেছি, ভারতবর্ষের সম্পাদকের বৈঠকের পাঠকেরা আলোচনা করিতেছেন; সুতরাং সে বিষয়ে আমি আর কিছু বলা দরকার মনে করি না। বিশেষতঃ আমসত্ত্ব কিরূপে তৈয়ার করিতে হয়, তাহা আমাদের পল্লীবাসিনী মা লক্ষ্মীরা আমার অপেক্ষা খুব ভাল রকমই জানেন। তাঁহাদের এই চিরন্তন অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া, আমি অনধিকার-চর্চ্চা করিতে চাই না। আমি কেবল ইঙ্গিতের পাঠক-পাঠিকাগণকে বিলাতী ধরণের দুই-একটী চাটনী প্রস্তুত করার সম্বন্ধে একটু-আধটু ইঙ্গিত করিতে চাই মাত্র।

সাহেব লোকদিগের মুখরোচক করিয়া চাটনী প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহার একটু বিশেষত্ব আছে। চাটনী জাতীয় পদার্থ অধিক দিন রাখিতে হইলে, তাহা যাহাতে পচিয়া নষ্ট হইয়া না যায়, সর্ব্বাগ্রে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হয়। আমাদের দেশে এরূপ স্থলে প্রধানতঃ (সরিষার) তৈল ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সাহেব লোকদিগের তৈল ততটা মুখরোচক নহে। তৈলের পরিবর্ত্তে তাঁহারা ভিনিগার ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভিনিগার ও তৈলের ব্যবহার এবং উদ্দেশ্য একই,—চাটনীর পচন নিবারণ করা। কিন্তু তৈল ও ভিনিগার-যুক্ত চাটনীর মধ্যে স্বাদের বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। তৈল দেওয়া চাটনী আমাদের মুখে খুব ভাল লাগিবে; কিন্তু ভিনিগার দেওয়া চাটনী আমাদের রসনার পক্ষে তেমন প্রীতিকর হইবে না। ঠিক তেমনি, বিলাতী রসনায় ভিনিগার দেওয়া চাটনী খুব মিষ্ট লাগিবে; তৈল দেওয়া চাটনী তাঁহারা হয় ত পছন্দই করিবেন না। অবশ্য তৈল ও ভিনিগার যেমন দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহাদের গুণের তেমন অনেকটা পার্থক্য রহিয়াছে; সুতরাং চাটনীতে তৈলের পরিবর্ত্তে ভিনিগার দিলে, তাহার আস্বাদের সঙ্গে গুণেরও অনেকটা পার্থক্য ঘটিবে।

ভিনিগার বাজারে যথেষ্টই পাওয়া যায়। আর ভিনিগার চাটনী ছাড়া আরও অনেক কাজে লাগে; সেইজন্য ইহার ব্যবহার প্রচুর। ভিনিগার প্রস্তুত করা কিছু সময়-সাপেক্ষ। তাহার একটা স্বতন্ত্র কারখানা খোলা যাইতে পারে। ভিনিগার সুরা জাতীয় পদার্থ; ইহার কারখানা খুলিতে হইলে সরকারের অনুমতি (লাইসেন্স) লইতে হয় কি না, তাহা আমি জানি না। আর কেবল চাটনীর জন্য যতটা ভিনিগার দরকার হইবে, তাহা প্রস্তুত করিয়া লাভ নাই। তাহা বাজার হইতে কিনিয়া লওয়াই সুবিধা।

ভিনিগারের বদলে সির্কাও ব্যবহার করা চলে। সির্কা আমাদের দেশী ভিনিগার বলিলেও ক্ষতি হয় না। তবে ভিনিগার ও সির্কার গুণের কিছু তফাৎ আছে। তবে চাটনীতে উভয়ের ফল প্রায় সমান। সির্কা তৈয়ার করা ভিনিগারের মত কষ্ট-সাধ্য নহে,—অনেকটা সহজ। ভিনিগার যেমন মিষ্ট ও অম্লস্বাদযুক্ত মিষ্ট রস হইতে প্রস্তুত হয়, সির্কাও তদ্রূপ। এক কথায়, উভয় জিনিসই পচা অম্লমধুর রস ছাড়া আর কিছুই নয়—কেবল প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া স্বতন্ত্র।

কতকগুলা আখ মাড়িয়া খানিকটা রস বাহির করিয়া লউন। রসে যাহাতে আখের ছিবড়া কিম্বা কুটা কি ময়লা না থাকে, সেইজন্য উহা একবার ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই আখের রস একবার জ্বাল দিয়া ফুটাইয়া লইয়া একটা এনামেলের বা চীনা মাটীর পাত্রে ধূলা আদি না পড়িতে পারে, এইরূপ ভাবে ঢাকা দিয়া, স্থির ভাবে এমন এক স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে, যেখানে দিনের বেলা যথেষ্ট রৌদ্র এবং রাত্রিকালে যথেষ্ট ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে। এই পাত্র কয়েক দিনের মধ্যে যেন নাড়াচাড়া করিতে না হয়। তাহা হইলে ইহার মধ্যে পচন ক্রিয়া (fermentation) আরম্ভ হইবে। খানিকটা দুধ একটু গরম বায়গায় স্থির ভাবে একদিন কি দেড় দিন রাখিয়া দিলে তাহা টকিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে একদিন সকালে ডাল রাখিয়া দিলে রাত্রে, কিম্বা পরদিন সকালে চাখিলে দেখা যায় উহা টকিয়া গিয়াছে। দুধ বা ডাল তরকারি টকিয়া যাইবার অর্থ উহা পচিয়া যাওয়া, অর্থাৎ উহার মধ্যে fermentation হওয়া। চিকিৎসা-শাস্ত্র একটু জানা থাকিলে এই fermentationএর অর্থ বেশ বুঝা যায়। এই বায়ুমণ্ডলে অনেক প্রকার জীবাণু (germ) ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদেরই মধ্যে কোন কোনটী অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া ঐ ইক্ষুরস, ডাল, তরকারী প্রভৃতিতে আশ্রয় লয়। তাহার পর তাহারা এত দ্রুত বংশ-বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করে যে, একদিন দুই দিনের মধ্যেই জিনিসটি পচিয়া গিয়া টক হইয়া যায়। দুধ হইতে দধি এই উপায়ে, অর্থাৎ জীবাণুর সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়। ইহা বিশেষ এক প্রকার জীবাণু। ইহাকে দধি বীজ বা দম্বল বলিতে পারা যায়। বিলাতী প্রখ্যাত cheese বা পনীরও এই প্রকার পচন ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়।

ইক্ষুরসের মধ্যে fermentation হইতে আরম্ভ হইলে, এক সপ্তাহ কি দুই সপ্তাহ পরে দেখা যাইবে যে, রসের উপর একটা শেওলার স্তর পড়িয়াছে। এই সময়ে রসটাকে একবার ছাঁকিয়া লইয়া, ঐ শেওলাটী ও তৎসংলগ্ন ময়লা বাদ দিয়া, রস ঐ ভাবে আবার কিছু দিন রাখিয়া দিতে হইবে। ঐরূপ সময় অন্তে দেখা যাইবে, আবার তাহার উপর একটা শেওলার স্তর বা সর পড়িয়াছে। এবারও উহা ছাঁকিয়া বাদ দিতে হইবে। এইরূপে কয়েক বার করিবার পর দেখা যাইবে যে, নির্দিষ্ট সময় অন্তে সর পড়া কমিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ সর তত পুরু নয়, এবং সমস্ত রসটাকে আবৃত করিতে পারে নাই। আরও দুই একবার ঐ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করিবার পর দেখা যাইবে আর সর পড়িতেছে না। তখন বুঝিতে হইবে fermentation সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা এখন সির্কা ভিন্ন আর কিছুই নয়। জীবাণুগুলি যখন ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব, তখন অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় তাহাদেরও খাদ্য চাই। ঐ রস, ডাল, প্রভৃতিতে তাহাদের খাদ্য থাকে। সেই খাদ্যের লোভে তাহারা ঐ সকল পদার্থ আশ্রয় করে এবং সেই খাদ্য খাইয়া জীবন ধারণ ও বংশবৃদ্ধি করে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর দেহ হইতে যেরূপ নানা প্রকার ময়লা নির্গত হয়, তাহাদের দেহ হইতেও ঠিক তাই হয়। সেই জীবাণু-দেহ নির্গত পদার্থও ঐ রসে বা ডালে কিম্বা দধিতে মিশ্রিত হয়। জীবাণুগুলি যতক্ষণ পর্য্যন্ত খাদ্য পায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের বংশবৃদ্ধি চলে, এবং fermentation ক্রিয়াও চলে। খাদ্য ফুরাইয়া গেলেই সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ fermentation ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইক্ষুরসের ন্যায় আঙ্গুরের রস এবং অন্যান্য পদার্থ হইতেও সির্কা ও ভিনিগার প্রস্তুত হয়। ভিনিগার

প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া কিছু জটিল; সেই জন্য আজ আর তাহার আলোচনা করিব না। পরে কোন্ বারে তাহার ইঙ্গিত করিবার চেষ্টা করিব।

আমের চাটনী অনেকেই হয় ত প্রস্তুত করিতে জানেন; আবার হয় ত অনেকে জানেন না। সে যাহা হউক, আমি মোটামুটি একটা আভাষ দিয়া যাইতেছি। সুবুদ্ধি পাঠক-পাঠিকারা হয় ত মসলার ইতর-বিশেষ করিয়া এবং প্রস্তুত করিবার প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া, আরও ভাল জিনিস তৈয়ার করিয়া লইতে পারিবেন।

বিলাতী ধরণের চাটনীতে পেঁয়াজ, রুশুন ও ভিনিগার অপরিহার্য্য। ভিনিগারের বদলে সির্কা ব্যবহার করা যাইবে; কিন্তু তাহাতে স্বাদের ও গুণের কিছু তফাৎ হইয়া যাইবে।

এই চাটনীর আম হইবে কাঁচা বটে, কিন্তু কচি নয়। বেশ আঁটি হইয়াছে, এবং কসির উপরে আবরণ, বেশ শক্ত হইয়াছে, এমন সুপুষ্ট, সুপরিণত অথচ পাকিতে বিলম্ব আছে, এমন একশত আম সংগ্রহ করুন। আমগুলির খোসা ছাড়াইয়া ধুইয়া লউন। তার পর একটা চুপড়ীতে ছুরি দিয়া আমের শাঁসগুলি পাতলা-পাতলা করিয়া কাটিয়া লউন এবং আঁটিগুলি বাদ দিন। এইরূপ খণ্ড-খণ্ড আমের (sliced) প্রতি সেরে পাঁচ ছটাক কি দেড় পোয়া ভিনিগার লইতে হইবে। আম্রখণ্ডগুলি এই ভিনিগারে সিদ্ধ করিয়া লইয়া একদিকে রাখিয়া দিন। Sliced আমের প্রতি সেরে একপোয়া পেঁয়াজ, তিন ছটাক আদা, ও কিছু কম এক ছটাক রুশুন লউন। আদাগুলির খোসা ছাড়াইয়া, বাটিয়া, এবং পেঁয়াজ ও রুশুনগুলি ছেঁচিয়া সিদ্ধ আমের সঙ্গে মিশাইয়া দিন। অন্যান্য মশলার মধ্যে সাদা সরিষা সেরকরা তিন ছটাক হিসাবে ভিনিগারে ভিজাইয়া শুকাইয়া আগেই প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। ঐ শুষ্ক সরিষা গুঁড়া করিয়া, সেরকরা এক পোয়া হিসাবে চিনি লইয়া তাহার রস প্রস্তুত করিয়া, সরিষা-গুঁড়া ঐ চিনির রসে মিশাইয়া দিতে হইবে। সেই চিনির রস এইবার আমের সঙ্গে মিশাইয়া দিন। তার পর আমের সেরকরা অৰ্দ্ধ পোয়া ভিনিগার ঐ মিশ্রণে ঢালিয়া দিন। সর্ব্বশেষে প্রতি সেরে এক ছটাক হিসাবে লঙ্কার গুঁড়া ঐ মিশ্রণে যোগ করিয়া দিয়া, চওড়া-মুখ শিশির ভিতর পূরিয়া, উত্তম রূপে ছিপি আঁটিয়া রাখিয়া দিন। মাস-খানেকের মধ্যে আমগুলি মজিয়া গিয়া, অতি সুন্দর মুখরোচক চাটনী প্রস্তুত হইবে। স্বাদের ইতর-বিশেষ করিবার জন্য এই সকল মসলার একটু-আধটু ইতর-বিশেষ করা যাইতে পারে। যিনি ঝাল কম খান, তিনি লঙ্কা-বাটা একটু কম দিতে পারেন; যিনি পরের মুখে ঝাল খাইতে ভালবাসেন, তিনি না হয় লঙ্কা-বাটা একটু বেশীই দিলেন। এই চাটনীতে ভিনিগারের বদলে সির্কা ব্যবহার করা চলিবে।

আর এক প্রকার চাটনী। ইহার বিলাতে খুব আদর। ৫০টা সুপুষ্ট আম। ভিনিগার তিন বোতল বা ছয় পাঁইট। চিনি দেড় সের। বীজ ছাড়ানো তেঁতুল এক সের। বীজ ছাড়ানো কিসমিস অৰ্দ্ধ সের। আদার কুঁচি আধসের। দারুচিনি চূর্ণ চা চামচের এক চামচ। চা চামচের পূরাপূরি এক-চামচ জায়ফল চূর্ণ; এবং লবণ আধসের। আমগুলির খোসা ছাড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আঁটি বাদ দিয়া পাতলা-পাতলা করিয়া কাটিয়া লউন। তার পর আমগুলিতে লবণ মাখাইয়া দেড় দিন বা ৩৬ ঘণ্টা রাখিয়া দিন। তার পর লোণা জল ঝরাইয়া ফেলিয়া দিন। দেড় বোতল বা তিন পাঁইট আন্দাজ ভিনিগারে চিনিটা ঢালিয়া দিয়া সিদ্ধ করিয়া রস (syrup) তৈয়ার করিয়া লউন। তার পর একটা পাত্রে অবশিষ্ট দেড় বোতল বা তিন পাঁইট ভিনিগার ঢালিয়া, তাহাতে জল-ঝরানো আমগুলি দিয়া উনানে চাপাইয়া সিদ্ধ করিয়া লউন। মরা আঁচে মিনিট দশ সিদ্ধ করিলেই যথেষ্ট হইবে। তার পর উনান হইতে নামাইয়া আমের সঙ্গে তেঁতুল, কিসমিস, আদা, দারুচিনি ও জায়ফল যোগ করিয়া খুব মৃদু তাপে আধঘণ্টা ধরিয়া সিদ্ধ করুন। শেষাশেষি অর্থাৎ উনান হইতে কড়া নামাইবার মিনিট দশ পূর্ব্বে উহার সঙ্গে চিনির রস বা সিরাপটি ক্রমে-ক্রমে মিশাইয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ রস দিবার পর আর দশ মিনিট সিদ্ধ করিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে সিরাপটি আমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, চাটনী খুব ঘন হইয়া উঠিবে। তার পর কড়া উনান হইতে নামাইয়া, চওড়া-মুখ শিশিতে ভরিয়া, উত্তম রূপে ছিপি আঁটিয়া দিতে হইবে। ছিপি দিবার পর, উহাতে গালাবাতি গলাইয়া কিম্বা প্যারাফিন গলাইয়া ছিপিটিকে এমন ভাবে ঢাকিয়া দিতে হইবে, যেন শিশির ভিতর একটুও বায়ু ঢুকিবার পথ না থাকে। শিশিগুলি একটু শুষ্ক স্থানে রাখিয়া দিলে, উহা কিছু দিনের

মধ্যে বেশ মজিয়া গিয়া উত্তম চাটনী তৈয়ার হইবে। ইহার সঙ্গে রুচি অনুসারে পেঁয়াজ ও রশুন দেওয়া যাইতে পারে।

চাটনী সম্বন্ধে আমার আর বেশী কিছু বলা বাহুল্য। আমি কেবল চাটনীর ব্যবসায়ের প্রতি ইঙ্গিতের পাঠক-পাঠিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। চাটনী, কাসুন্দী নানারকমের আছে; আমি হয় ত তাহাদের সকলগুলার নাম পর্য্যন্ত জানি না। এবং আমার ইঙ্গিতের মাননীয়া পাঠিকা মহোদয়াগণ হয় ত খুব উত্তম চাটনীর প্রস্তুত প্রণালী অবগত আছেন। তবে ইহার যে খুব বড় রকমের রপ্তানী বাণিজ্য চলিতে পারে, এবং চলিতেছে, প্রধানতঃ সেই দিকে পাঠক-পাঠিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই এবার চাটনীর কথা পাড়িলাম। আমের সময় আসিয়া পড়িয়াছে —এইবার পরীক্ষার্থ চাটনী প্রস্তুত করিতে লাগিয়া যান।

সম্পাদকের বৈঠক

[পাঠক-পাঠিকাগণের প্রতি সবিনয় নিবেদন—"ভারতবর্ষের" "সম্পাদকের বৈঠক" স্তম্ভে কোন প্রশ্ন কিম্বা উত্তর পাঠাইবার পূর্ব্বে, সেই বিষয়ে পূর্ব্বে কোন প্রশ্ন কিম্বা উত্তর প্রকাশিত হইয়াছে কি না, তাহা অনুগ্রহ করিয়া দেখিবেন। একই প্রশ্ন বা একই উত্তর বার-বার প্রকাশ করিতে আমরা অক্ষম। অনুগ্রহ করিয়া কাগজের এক পৃষ্ঠায় মাত্র লিখিবেন; দুই পিঠে লেখা থাকিলে কম্পোজ করিবার অত্যন্ত অসুবিধা হয়। এবং প্রশ্ন ও উত্তর আলাদা আলাদা কাগজে লিখিবেন; দুই বিষয়ই একখানা কাগজে এক সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া লিখিলেও ছাপিবার অসুবিধা হয়, অনেক ভাল জিনিস বাদ দিয়া যাইতে হয়।—ভারতবর্ষ সম্পাদক।]

প্রশ্ন

[৫৫]

হাম-জ্বরের সংক্রামকতা।

বাটীস্থ ছেলেদের মধ্যে একজনের হাম-জ্বর হইলে, সকল ছেলে-পিলের উহা হয় কেন? ডাক্তাররা বলেন, হাম বসিয়া যাওয়া খারাপ। কিন্তু বসিয়া না যাওয়ার উপায় কি? কাহারও মতে হাম-জ্বরে কোনও ঔষধাদি ব্যবহার না করাই উচিত। ইহা কি সত্য? এবং কেন? শ্রীস্নেহলতা দেবী, আক্কেলপুর, বগুড়া।

প্রবাদ আছে সন্ধ্যার সময় আকাশে কেবল মাত্র একটি তারা দেখিলে, পুনরায় আরও ২।১টি না দেখা পর্য্যন্ত ঘরে প্রবেশ করিতে নাই। কারণ কি? শ্রীস্নেহলতা দেবী, আক্কেলপুর বগুড়া।

[৫৬]

কর্পূর উপিয়া যায় কেন?

১। কর্পূর উড়ে যায় কেন? ইহা রাখিবার কোন উপায় আছে কি?

গহনা পরিষ্কার।

২। কেমিকেল স্বর্ণের গহনা দুদিনেই কাল হইয়া যায়; ইহা পরিষ্কার করিবার কোন সহজ উপায় আছে কি?

শ্রীসুশীলাবালা দাস, লকঘাট, শ্রীহট্ট।

[৫৭]

কাল ফুল।

প্রকৃতির রাজ্যে আমরা কাল ফুল দেখিতে পাই না কেন?

শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়, পাহারতলা, পাবনা।

[৫৮]

প্রশ্ন।

ব্রহ্মাকে কেন লোক-পিতামহ বলা হয়? পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও জ্যোতিষ হইতে উত্তর আবশ্যক।

শ্রীরঘুনাথ চক্রবর্ত্তী জ্যোতিঃরত্ন, ৯, জয়নারায়ণ লেন, কলিকাতা।

[৫৯]

সামাজিক সংস্কার।

পল্লীগ্রামে কেহ মরিলে উঠানের যে স্থানে নামানো হয়, ঐ স্থানে, শব লইয়া গেলে, বাঁশের একখানি কঞ্চি শ্রাদ্ধ দিবস পর্য্যন্ত রাখিয়া দেয়; এবং যে স্থানে শবের মাথাটি ছিল সেখানে একখানি সরু বাঁশ প্রায় ৩।৪ হাত লম্বা, সোজা করিয়া পোঁতে; আর তার মুখটি চিরিয়া তাহার মধ্যে একটি খুরি বসাইয়া তাহাতে দুধ দেয়। উহা "কাক দুধ" বলিয়া কথিত হয়। ইহার তাৎপর্য্য কি?

(২) কোঠা ঘরে কেহ মরিলে, মাথার কাছে একটী পেরেক (লোহার) পুঁতিয়া রাখে। ইহারই বা তাৎপর্য্য কি?

শ্রীহৃষীকেশ সরকার, ইছাপুর, নবাবগঞ্জ।

[৬০]

জিজ্ঞাসা।

"জলনয়নে বহে দরধারা।" এই স্থানে 'দরধারা' শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি?

সত্যসন্ধ সেই নরপতি কখনও পাপের ত্রিসীমায় পদার্পণ করেন নাই। এই স্থানে 'ত্রিসীমার' অর্থ কি?

নটোভেজা শাড়ি পরকাব। এই পদে 'নটোভেজা' বিশেষণের প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা কিরূপ?

ভারতবর্ষ ও লঙ্কার মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রের সেতুবন্ধ, সমুদ্রের [illegible] অংশ ভারতীয় প্রাচীনতম ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঐ স্থানটির রামেশ্বর সেতুবন্ধ নামের পরিবর্ত্তে 'আদম্স ব্রীজ' (Adams Bridge) এরূপ নাম কোথাও কোথাও দেখা যায়। এই নূতন নাম কখন, কাহার আমলে, কাহা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল।

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন [illegible]।

[৬১]

তুলা গাছের পোকা নিবারণ।

১। সাধারণতঃ দেখা যায়, তুলা গাছ কিছু বড় হইলে, পাতা সকল পোকায় কাটিতে আরম্ভ করে এবং গাছের মাথা কাটিয়া ফেলে। এই প্রকার পোকা নিবারণের উপায় কি?

তুলা পেঁজা।

২। চরকায় সূতা কাটিতে তুলার আঁশ রাখিবার জন্য উহা পিঁজিয়াই লইতে হয়, ধুনিয়া লইলে উহার আঁশ নষ্ট হইয়া যায়। অথচ পিঁজিতেও বহু সময় সাপেক্ষ। যাহাতে তুলার আঁশ থাকে এবং অপর দিকে ভাল পিঁজা হয়, এইরূপ কোনও কৌশল বাহির হইয়াছে কি না?

শ্রীকিরণচন্দ্র সেন গুপ্ত, আটপাড়ী।

[৬২]

প্রদীপ ও জোনাকী।

১। প্রদীপ এবং অগ্নিতে জোনাকী পোকা পুড়িয়া গেলে, গুরুতর অমঙ্গল হয়—এই প্রবাদের সার্থকতা আছে কি না?

২। জোনাকী পোকা আগুনে পুড়িলে, তাহা হইতে যে গ্যাস্ বাহির হয়, তাহার দ্বারা মানব শরীরের অপকার হয় কি না? ইহার বৈজ্ঞানিক যুক্তি কি?

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী
পোঃ শিতারবন্দ (রংপুর)

[৬৩]

বেগুন পোড়া—বংশীরব।

(ক) বেগুন পোড়াইয়া খাইলে দোষ হয় না; অথচ ভাতে সিদ্ধ করিয়া খাইতে নিষেধ আছে—এর কারণ কি?

(খ) বাঁশের আড়-বাঁশীর রব শুনিলে পুত্রের মায়ের সেদিন খাওয়া হয় না, তাই সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে গভীর রাত্রে (Dead nightএ) ঐ বাঁশী বাজান হয়। এর শাস্ত্রীয় প্রমাণ চাই।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মজুমদার, পোঃ ব্রহ্মনদী (ফরিদপুর)

[৬৪]

পৌরাণিক প্রশ্ন।

কেহ কেহ বলেন যুধিষ্ঠির "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" বলিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন ও কলঙ্ক কিনিয়াছেন; যাঁহারা ঐ কলঙ্ক আরোপ করেন, জানি না তাঁহারা কি জন্য যুধিষ্ঠিরের অপর একটি গুরুতর অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন না। যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার নিকট আশ্রয়-প্রার্থী হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমার নাম কঙ্ক; আমি যুধিষ্ঠিরের সহচর বা পারিষদ ছিলাম।" ইহা কি একটি মিথ্যা কথা নহে? ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের এ কেমন কথা! বিজ্ঞ ব্যক্তি ইহার সদুত্তর দিবেন কি?

বিবিধ প্রশ্ন।

১। হাই তুলিলে তুড়ি দেয় কেন? (২) হাতে হাতে চূণ দেওয়ার পদ্ধতি নাই কেন? কেহ কেহ বলেন, পরস্পরের সহিত ঝগড়া হয় বলিয়া। ইহার প্রকৃত কারণ কি? ৩। কৌতুক বা ভয় প্রদর্শনের নিমিত্ত কেহ যদি কাহারও উপর দা, বঁটি, ছুরি বা এরূপ কোন অস্ত্র উত্তোলন করে, তবে উত্তোলনকারী স্বীয় অভিপ্রেত কার্য্যান্তে অস্ত্র-খানি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিবার বা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, ইহার দ্বারা একবার ভূমি স্পর্শ করে কেন?

শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ, ১৩নং লছমনপুরা, ৺কাশীধাম।

[৬৫]

পুরাণ ও সাহিত্য।

কালিদাসের কুমারসম্ভব (২য় সর্গ) এবং শিবপুরাণের অনেক শ্লোকে অতি নিকট সাদৃশ্য দেখা যায়। শিবপুরাণের রচনাকাল কালিদাসের পূর্ব্বে না পরে?

শ্রীবিমানবিহারী ঘটক, কৃষ্ণনগর।

[৬৬]

ঐতিহাসিক প্রশ্ন।

(ক) মহাভারত পাঠে জানা যায়, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ১০০ পুত্র ছিল। কিন্তু আমরা মাত্র ৩৭ জনের নাম ভিন্ন, বাকী কাহারও নাম জানি না। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের একশ পুত্রের নাম যদি কেহ জানেন, তবে আগামী বৈঠকে পেশ করিবেন।

(খ) মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত কি সত্য-সত্যই নীচকুলোদ্ভব ছিলেন? কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র কিন্তু মহারাজ চন্দ্রগুপ্তকে নীচবংশজাত বলিয়া স্বীকার করেন না।

(গ) প্রাগ্জ্যোতিষপুরের নাম আমরা সর্ব্ব প্রথম কোন বইএ পাই? সেকালকার দিনে উহা এত প্রসিদ্ধ ছিল কেন? শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টশালী, পাইকপাড়া, ঢাকা।

[৬৭]

জীবদেহের বর্ণপরিবর্ত্তন

আমাদের চাষের একটি বলদ (দামড়া) আছে; তাহার বৎসরে দুইবার করিয়া গায়ের রং বদল হয়। শীতের সময় সাদা ও কালা রংয়ের লোম খুব বেশী রকম থাকে। পরে শীত যেমন ক্রমশঃ ক্রমশঃ কমিতে থাকে, তেমনই গায়ের রংও ক্রমশঃ কাল হইতে কমিয়া একেবারে সাদা হইয়া যায়। বর্ষার সময় পর্য্যন্ত এই সাদা রংই থাকে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের কোন বৈজ্ঞানিক হেতু আছে কি? শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, আহারবেলমা বর্দ্ধমান।

[৬৮]

গরুর রূপান্তর

আমাদের এখানে একটি বলদ আজ প্রায় দুই বৎসর হইল, মধ্যে মধ্যে প্রায়ই রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে; কখনও সাদা একমাস বা দেড়মাস রহিল, পরে অকস্মাৎ পাংশু বর্ণ ধারণ করিল। ঐ রং আবার দুই একমাস থাকিয়া আবার রূপান্তর হয়। এরূপ হওয়ার কারণ কি? গরুটীর বয়স এখন আড়াই বৎসর। শ্রীজয়কৃষ্ণ সামন্ত, বাণেশ্বরপুর, গুজরপুর, হাওড়া।

[৬৯]

সীমন্তিনীর সিঁদুর

স্ত্রীলোকের স্বামীর নিকট হইতে সিঁদুর এবং শাঁখা চাওয়া নিষিদ্ধ কেন? স্ত্রীলোকের এলোচুলে সিঁদুর পরিতে এবং শুইয়া সিঁদুর পরিতে নাই কেন? শ্রীউষারাণী ঘোষ।

[৭০]

ওলা শব্দের অর্থ কি?

১। ওলাবিবি। ওলাই চণ্ডীতলার নাম সকলে জানেন। ওলা-উঠা বা ওলাউঠা শব্দ কলেরার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত। এখনও এ অঞ্চলের সাধারণ স্ত্রীলোকদের মধ্যে গালাগালিপ্রিয় অনেকে রাগিলে ওলাউঠোয় নিমতলাঘাটে, কাশিমিত্রের ঘাটে, কেওড়াতলা যাইতে বলেন। ওলা ওলা ওলা বিষ না মুখে আয়—সাপের বা বিষ-চিকিৎসার মন্ত্রে আছে। বিজয়গুপ্তের মনসার চৌদ্দ পালা গানেও আছে। এই ওলা শব্দের প্রাচীন প্রয়োগ ও তাহার অর্থ জানিতে পারিলে ভাল হয়। উপরিউক্ত ওলা শব্দ কি কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে?

শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

[৭১]

বারমেসে লেবুগাছ

বারমাস কি উপায়ে লেবু গাছে লেবু ফলান যাইতে পারে? আমার বাগানে গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া গোবর-সার দিয়া ও তাহাতে মাঝে মাঝে জল দিয়া বারমাস লেবু ফলাইতেছি। আর গাছের ডাল যেন মাটিতে পড়িতে না পারে তজ্জন্য সাবধান থাকিতে হয়। নীচে বাঁশ দিয়া ঠিকা দিয়া ডাল গুলি উচুতে তুলিয়া রাখিতে হয়। এই উপায় ব্যতীত অন্য কোন উপায় জানা থাকিলে, "ভারতবর্ষে" লিখিয়া জানাইবেন। শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ, এম্-আর্-এ-এস, বেতাগরি (ময়মনসিংহ)।

উত্তর

৪২ দফার পঞ্চম প্রশ্নটির উত্তর—প্রবাদ আছে মাঘমাসে মূলা খাইলে দেহের পিত্ত বৃদ্ধি করে। শ্রীপ্রমীলাবালা নাগ চৌধুরী, ১২নং মোহন লাল মিত্রের লেন, শ্যামবাজার।

৪৫নং প্রশ্নের উত্তর:

বেতারগড়—গড়বেতা থানার অন্তর্গত। থানার পশ্চিমাংশে প্রায় তিন মাইল দূরে।

নীলপুর—কেশপুর থানা। খড়্গপুর রেল ষ্টেষণ হইতে প্রায় চারি মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে।

খেপুত—কোলাঘাট রেল ষ্টেশনের চারিমাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে।

রাইপুর—ডেবরা থানার উত্তর পশ্চিম দিকে নওদার নিকট।

কুমারহট্ট—দাসপুর থানা, নওদার উত্তরে প্রায় তিন মাইল।

নারিকেলডাঙ্গা—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে। মেদিনীপুর জেলায় তমলুকের নিকট নারিকেলড নামে একটি গ্রাম আছে।

তালপুর—বালিচক রেলষ্টেশনের প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণ।

নাউয়ার—সবং দরগণা। বালিচক রেলষ্টেষণ হইতে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণে।

হিঙ্গুলাট—এই নামে কোন গ্রাম আছে বলিয়া জানি না; তবে কাঁথীর নিকটে হিঙ্গুলার নামে একটি গ্রাম আছে। শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সামন্ত রায় রঘুনাথবাড়ী হাইস্কুল।

ভারতবর্ষে এই মাসের ৪৫ নং প্রশ্নে কতকগুলি গ্রামের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা দেখিলাম। তাহার মধ্যে আমি নিম্নলিখিত গ্রামগুলি জানি নীচে তাহাদের ঠিকানা দিলাম।

১। নাড়িচে—ইহা বনবিষ্ণুপুরের (বাকুড়া) চারি ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে একটি তীর্থস্থান। এখানে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির আছে।

২। বোড়গ্রাম—ইহা বি, ডি, আর রেলওয়ের রায়গ্রাম ষ্টেশনের দুই ক্রোশ উত্তরে একটি তীর্থস্থান। এখানে বলরামের মূর্ত্তি আছে ইহা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত।

৩। রাইপুর—ইহা বাকুড়া জেলার একটি গ্রাম। ইহা বি, এন রেলওয়ের গিধনী ষ্টেশন হইতে আট ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে।

৪। মেড়—মেড় গ্রাম কোথায় তাহা আমি জানি না; তবে মেড়া নামক একটি গ্রাম উপরিউক্ত বোড় গ্রামের নিকটে। এখানে কুচ বিহারের স্বর্গীয় কালিকা দাস দত্ত বাহাদুরের বাটী।

৫। পাঁচড়া—পাঁচড়া নামক দুইটী গ্রাম আছে। একটি বর্দ্ধমান জেলা শক্তিগড় ও মেমারী ষ্টেশনের নিকট।

অন্যটি বীরভূম জেলায়। অণ্ডাল সাঁইথিয়া কর্ড লাইনে পাঁচড়া ষ্টেশন।

৬। বেড়্গ্রাম নামক একটি গ্রাম Burdwan Howrah Chord Lineএ মসাগ্রাম Stationএর নিকট আছে। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘোষ চাঁইবাসা (সিংভূম)।

ফাল্গুন মাসের ৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর। পাঁচ দফাতে নিম্নলিখিত গ্রামের সংস্থান সম্বন্ধে নির্দেশ করিতে লিখিয়াছেন। জড়িয়া নগরী কোন গ্রামের নাম নাই। জাড়া একটি গ্রাম আছে। ইহা মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী ঘাঁটাল মহকুমার অন্তর্গত; খেপুত ঘাঁটাল মহকুমার অন্তর্গত; উক্ত গ্রামে একটি পোষ্টঅফিস আছে। রাইপুর ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটি গ্রাম। উহাতে হোরমিলার কোম্পানীর একটি ষ্টিমার ঘাট আছে। কুমারহট্ট বলিয়া কোন গ্রামের নাম আমার তদন্তে পাওয়া যায় নাই। তবে কুকুড়াহাটী নামক একটি ক্ষুদ্র বন্দর আছে। উহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সুতাহাটা থানার এলাকাধীন। নারিকেলডাঙ্গা নামক কোন গ্রাম নাই। তবে নারিকেলদা নামক একটি গ্রাম আছে; উহা তমলুকের সন্নিকট টাউনের নিকট। মেড় নামক কোন গ্রাম নাই; তবে মেদিনীপুর জেলার এলাকাধীন সবং থানার অন্তর্গত মুয়াড় নামক গ্রাম আছে। বোড় গ্রামের কোন সন্ধান পাই নাই। তবে ঝাড়গ্রাম বলিয়া একটি নূতন সবডিভিসন হইতেছে। কিরিটকোনা নাম পাই নাই; তবে চন্দ্রকোনা আছে। সাঁতরাগড় এবং নালিগড় গ্রাম মেদিনীপুর জেলায় আছে। বেতারগড় তদন্ত করিয়া পাই নাই। পাঁচড়া বলিয়া গ্রাম পাওয়া যায় নাই; তবে তমলুক পরগণার অন্তর্গত পাঁচরেঙ্গ ও পেজবেড়ে গ্রাম আছে। শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্ব্বতীপুর, তমলুক, মেদিনীপুর।

[কুমারহট্ট বর্ত্তমান হালিসহর, ই, বি, রেলের প্রধান সেক্সনের একটী ষ্টেশন। এই গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ সাধক-কবি রামপ্রসাদের জন্মভূমি।

—"ভারতবর্ষ" সম্পাদক।]

ফাল্গুনের বৈঠকে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের ৪৫ নং জবাব।

প্রিয়ব্রতের বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে আছে। রাজা প্রিয়ব্রতের রথ-চক্রে সাতটী খাত হইয়াছিল, এই সপ্ত খাতই সপ্ত সমুদ্র। কিন্তু ভাগবতেরই পঞ্চম স্কন্ধে উনবিংশ অধ্যায়ে সগর সন্তানগণ অশ্বের অনুসন্ধান করিতে করিতে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক খনন করিয়া জম্বু-দ্বীপের আটটী উপদ্বীপ বিভাগ করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখ আছে। কৃত্তি-বাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডে ইন্দ্র কর্ত্তৃক সগরের অশ্বমেধের অশ্ব অপহরণ ও কপিলাশ্রমে অশ্ব লুকাইয়া রাখিবার কথা আছে। এই অশ্বের অনুসন্ধানের জন্ত সগরের ষাট হাজার ছেলে মাটি খুঁড়িয়াছিলেন, তাহা হইতেই সাগরের উৎপত্তির কথা জন প্রচলিত মত। কিন্তু মূল রামায়ণে আদি বা বালকাণ্ডে, পঞ্চম অধ্যায় বা পঞ্চম সর্গে সগর রাজা সাগর খনন করাইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মাকেই সমুদ্রের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে। ভৌগোলিক মতে সমুদ্র কোনও মনুষ্য দ্বারা খনিত বলিয়া বোধ হয় উল্লেখ নাই। শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০২ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

ছুটীকথা।

১। গত মাঘের সংখ্যায় শিশুর দুগ্ধবমন নিবারণের জন্য যে প্রশ্ন প্রকাশিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান ফাল্গুন সংখ্যায় তাহার দুইটি উত্তর প্রকাশিত হইয়াছে। উভয় লেখিকাই শিশুকে চূণের জল সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বাস্তবিক চূণের জল শিশুর বমনের পক্ষে খুব উপকারী। কিন্তু এ বিষয়ে আমার একটি বক্তব্য আছে। পান খাওয়ার জন্ত দুই প্রকার চূণের ব্যবহার হয়; একটি শামুক পোড়া চূণ অন্যটি পাথুরে চূণ: পাথুরে চূণই অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত। চূণের জলে কি চূণ ব্যবহার করিতে হইবে, লেখিকারা তাহার কোনই উল্লেখ করেন নাই। চূণের জল করিতে হইলে, শামুক চূণই ব্যবহার করিতে হয়। পাথুরে চূণে কোন উপকার হয় না। চূণের জল করিবার আগে ইহা বিশেষ রূপে দ্রষ্টব্য।

২। শ্রীজীবনতারা হালদার কর্ত্তৃক যে কাঁচা পেঁপের গুণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই আমাদের পূর্ব্ব পরীক্ষিত। ইহা ভিন্ন আমি আর একটি গুণ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। পেঁপের আটা লবণ দিয়া মর্দ্দন করিলে, পোকা বা অন্য কারণে দাঁতের যন্ত্রণার আশু উপশম হয়। প্লীহা ও যকৃতের পীড়ায় পেঁপে কাঁচা ও পাকা দুই খুব উপকারী।—শ্রীমতী শরদিন্দু দত্ত, কটক।

ফাল্গুন মাসের ৪৫ সংখ্যক প্রশ্নগুলির সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। প্রাচীন কাব্যের এইপ্রকার অনেক বিষয়ের মূল স্থানীয় সংস্কার ও পূজা পার্ব্বণাদি হইতে মিলে কি না, তাহারও অনুসন্ধান আবশ্যক। আমাদের অনেক ব্রত পার্ব্বণ প্রভৃতি যেরূপ গ্রামে গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মূল পুরাণ আদিতে মিলে না। সেরূপ বিষয় কিরূপ ভাব লেখকের মনে জাগাইতে সাহায্য করিয়াছে, তাহারও খোঁজ লওয়া প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে এক সংস্কার আছে যে ধুতরার ফল খাইলে পাগল হয়। সে জন্যই পাগল শিবের নিত্যনৈমিত্তিক খাদ্যের মধ্যে ধুতরার ফল উল্লিখিত হইয়াছে মনে করি। আমাদের এ অঞ্চলে প্রবাদ আছে, হইলে মরলে তিন কর্ম্মে কুশের প্রয়োজন। শ্রাদ্ধের সময় কুশের প্রয়োজন। এখানে কুশ হস্তে লইবার আবশ্যকতাও সেই হইতেই অনুভূত হয়। শাপ দিতে যাইয়া নন্দী যেন কুশ হস্তে লইয়া যাহাকে শাপ দিবে তাহার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতেছে, এইরূপ অর্থ ধরিলে এস্থলে কুশ হস্তে লইবার সার্থকতা বুঝা যায়। শ্রীমতী অমিয়-বালা দেবী, কনকসার, ঢাকা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টশালী মহাশয় কর্ত্তৃক উপস্থাপিত মাঘ মাসের ১ম (ক) সংখ্যক প্রশ্নোত্তর—গায়ে সর্ষপ তৈল উত্তমরূপে মালিশ করিয়া বসিয়া থাকিলে মশা কামড়ায় না। শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ, ১৩ নং লছমন পুরা, ৺কাশীধাম। ও শ্রীহৃষীকেশ সরকার, ইছাপুর, নবাবগঞ্জ।

কৌলিক উপাধি স্মরণাতীত কাল পর্য্যন্ত চলিত আছে। এই উপাধি গুলি স্বীয় ব্যবসা বা কর্ম্ম দ্বারাও হইয়াছে। এ দেশে হিন্দুর আমলে যে সকল উপাধি ছিল, মুসলমান রাজার আমলে কর্ম্ম দ্বারা তাহা ছাড়া আরও কতকগুলি উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ সকল উপাধি দ্বারা জাতি ও ধর্ম্ম বোধ হইয়া থাকে। ২। গোত্র দ্বারা জাতির মধ্যে বিভিন্নতা বুঝা যায়। হিন্দুদের মধ্যে ঋষিগণ কর্ত্তৃক উহা প্রচলিত হইয়াছে। যে ঋষি যে গোত্র প্রচলিত করিয়াছেন, তাঁহার নামে তাহাই প্রচলিত হইয়াছে। তাই এক গোত্র বিভিন্ন জাতিতে দেখা যায়। যে ঋষি যে গোত্র চালাইয়াছেন, সেই ঋষির সন্ততি ও তাহাদিগের ভৃত্যাদির মধ্যেও পরিচয়-সূত্রে ঐ গোত্র প্রচলিত হইয়াছেন।

আসামজাত এণ্ডিসূতা গুটি হইতে প্রস্তুত হয়। চরকা, টাকু সাহায্যে তৈয়ারী হয়। ইয়োরোপ আমেরিকার কোন সাহায্য লইতে হয় না। মজুরাদির দ্বারা চরকা, টাকু সাহায্যেই এতকাল পড়তায় পোষাইতেছে। এণ্ডি শীতবস্ত্র তাঁতে প্রস্তুত হয়। শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার, শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ। বেতাগড়ি, মৈমনসিংহ।

সাধারণতঃ ভাল আমসত্ব প্রস্তুত করিবার প্রণালী অনেকেই জানেন না। যে সকল আম খাইতে মিষ্ট এবং যাহার রস অপেক্ষাকৃত গাঢ় সেই সকল আমই আমসত্ব প্রস্তুত করিবার জন্য মনোনীত করিতে হয়। আমগুলি এক প্রকারের হইলেই ভাল হয়। তবে উহা সুস্বাদু ও গাঢ় রসযুক্ত হইলে কয়েক প্রকারের এবং আঁশাল হইলেও কিছু যায় আইসে না। আমগুলির খোসা ছাড়াইয়া পরে নিঙড়াইয়া তাহার রস একটী পাত্রে রাখিতে হইবে। পাত্রটী পাথর এলুমিনিয়ম অথবা Enamel (এনামেল) হইলেই ভাল হয়। এই সময় বাজারের আমসত্ব বিক্রেতারা অনেক সময় আমসত্ব মিষ্ট করিবার জন্য ঐ চিনি মিশ্রিত রস জ্বাল দেওয়ায় আমসত্বের গুণ অনেক নষ্ট হইয়া যায়।

অতঃপর একটী শীতল পাটী অথবা বড় কয়েকটী পিঁড়ীর উপর প্রথমতঃ সামান্য তৈল হাতে লইয়া মাখাইতে হইবে এবং পরে ঐ আমগোলা উহার উপর অল্প করিয়া কিছু ঢালিয়া হাত দিয়া একটী পাতলা layer (স্তর) করিয়া দিতে হইবে। যখন উহা রৌদ্রে বেশ শুকাইয়া যাইবে, তখন তাহার উপর পুনরায় আমগোলা ঢালিয়া হাত দিয়া উহার চারিদিকে সমান করিয়া আর একটী layer (স্তর) দিতে হইবে। এইরূপ ভাবে যে কয়দিনে উহা অভিরুচি মত এক অঙ্গুলী অথবা তদ্রূপ পুরু না হয়, ততদিন উহার উপর আমগোলা পুনঃ পুনঃ দিয়া শুকাইতে হইবে।

পরে উহা বেশ শুকাইলে লম্বা থান থান করিয়া কাটিয়া ভাল ঢাকনি দেওয়া টীন অথবা অন্য কোন পাত্রে রাখিয়া দিতে হইবে; এবং যাহাতে পোকা না ধরে, তজ্জন্য উহা মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হইবে। আমসত্ব ঘিএর ভাঁড়ে রাখিলে উহাতে শীঘ্র পোকা ধরিতে পারে না।

শ্রীকরুণাময় বাগচী। বড়বন্দর, দিনাজপুর।

লাক্ষার চাষ।

১। নিম্নলিখিত গাছের ডালে গালার গুটি জন্মায়। কুসুম (Schleichera Trijuga), পলাস্ (Butea Frondosa) কুল (Zizyphus Injuba), অশ্বত্থ (Ficus Reliogosa), বট (Ficus bengalenesis), বাবলা (Acacia arabica) ইত্যাদি।

ইহার মধ্যে কুসুম গাছের ডাল হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গালা পাওয়া যায়।

২। গালার চাষ কিরূপভাবে করা প্রশস্ত তাহা H. A. F. Lindsay C. B. E, I. C S. এবং C. M. Harlow I. F. S. লিখিত The Indian Forest Record, Report on Lac and Shellac নামক পুস্তকে পাওয়া যাইতে পারে। ঐ পুস্তকে লাক্ষা সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য দেওয়া আছে।

৩। মানভূম, পালামৌ ও হাজারিবাগ জেলায় স্বাধীনভাবে গালার চাষ হয়। সেণ্ট্রাল প্রভিন্সের দামো, জব্বলপুর ও সাগর জেলায় ঘেঁটি (Ziziphus Xylopira) গাছে ভালরূপ গালার চাষ হয়।

৪। গালার গুটির চাষ বৎসরে দুইবার হয়। ইহার চাষ আরম্ভ করিবার সময় একবার নভেম্বর মাসের শেষে, কিম্বা ডিসেম্বর মাসের প্রথমে, এবং অপরবার জুন মাসের শেষে অথবা জুলাই মাসের প্রথমে।

শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার বি-এস্‌সি।

মাঘ মাসের ২৫নং প্রশ্নের উত্তর।

গড় ভবানীপুর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমি যাহা বিবরণ পাইয়াছি তাহাই নিম্নে লিখিলাম। যদিও সেই সময়ের কেহই জীবিত নাই, কিন্তু যাঁহারা সেই স্থানের বাসিন্দা, তাঁহাদের মুখেরই নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিয়া দিলাম।

উক্ত-স্থানে যে গড় উপস্থিত ভগ্ন অবস্থায় দেখা যায়, উহাই "ভারত চন্দ্র রায় গুণাকরের" গড় ছিল, যিনি অন্নদামঙ্গল, চোরপঞ্চাশৎ প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। উপস্থিত বর্দ্ধমান মহারাজার জমীদারিভুক্ত হইয়াছে। ঐ গড় ভারতচন্দ্র রাজার গড় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারা রাঢ়শ্রেণী ব্রাহ্মণ, এখনও ইঁহাদের বংশধরেরা খড়দহে বাস করেন। উঁহাদের গোপীনাথ নামে বিগ্রহ আছেন। এখন উক্ত বিগ্রহের সম্পত্তির খাজনা উঁহারা গড় ভবানীপুর প্রভৃতি হইতে আদায় করিয়া লইয়া আসেন। উক্ত স্থানে একটী ৪ তালা মন্দির এক্ষণে ছাতবিহীন অবস্থায় আছে। কেহ কেহ কৌতুহলী হইয়া দ্বিতল পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন। ত্রিতলে কেহই উঠেন নাই; কারণ দ্বিতলোপরি কে যেন সেতার বাজাইতেছে এইরূপ শব্দ শ্রুত হয়।

ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী চারিটী পুষ্করিণী আছে; ফুলপুকুর, খোসখানা প্রভৃতি নাম দেওয়া আছে। প্রবাদ যে উক্ত স্থানে অনেক ধন সম্পত্তি প্রোথিত অবস্থায় আছে। জলহরিতেও ঐরূপ আছে। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে সমস্তই জাজ্জল্যমান ছিল। কথিত আছে, রাণীর

পিতৃগৃহ উক্ত খোসখানার নিকটেই ছিল ; এবং তাঁহারই খুসীমত উক্ত পুষ্করিণীর নাম খোসখানা হইয়াছে।

পতনের কারণ এরূপ প্রবাদ যে, একজন সাধু পুরুষ উক্ত গড় ভবানী-পুরের সম্মুখস্থ দামোদরের জলের উপর কুশাসন স্থাপন করিয়া তদুপরি পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় উজান বহিয়া যাইতেছিলেন। ইহা দেখিয়া লোকে রাজাকে সংবাদ দেয়। রাজা প্রথমতঃ অবিশ্বাস করেন ; পরে স্বয়ং আসিয়া অনেক স্তবস্তুতি করিলে উক্ত মহাপুরুষের দয়া হয়। তিনি ধ্যান ভঙ্গ করিয়া সেই স্থানে আসন স্থাপন করেন। সেই সময়ে রাজা সাধুর দেহে তীব্র জ্যোতিঃ দেখিতে পান। তিনি সাধুর দেহে কোনও মাণিক লুক্কায়িত অবস্থায় আছে স্থির করেন। তিনি সাধুকে উক্ত মণির কথা বলেন। তাহাতে সাধু মণির কথা অস্বীকার করেন। রাজা দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ একখানি ছুরিকা লইয়া প্রথম যে স্থানে জ্যোতিঃ দেখিতে পান, তাহাতে অস্ত্রাঘাত করেন। পুনরায় অন্য যায়গায় জ্যোতিঃ দেখিতে পান। এইরূপে পুনঃ পুনঃ সাত যায়গায় অস্ত্রাঘাত করেন ; কিন্তু মাণিকের কোনই সন্ধান পান না। তখন সাধু বলেন যে, আমার দেহ ভঙ্গ করিয়াছ আমাকে এখানেই সমাধি দাও। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী সেই স্থানেই তাঁহাকে সমাধি দিয়া তদুপরি এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া "মনীনাথ" নাম দেন। এখনও উক্ত মনীনাথের মোহান্ত দ্বারা পূজা চলিয়া আসিতেছে ; ও খরচপত্র তাঁহারই জমির উপস্বত্ব হইতে চলিতেছে।— উক্ত গড় ভবানীপুরের মাদুরী খুব প্রসিদ্ধ।—

শ্রীলালমোহন ঘোষ—১৮, ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সদনুষ্ঠান

আমরা গত আষাঢ় মাসে কুমারখালী দরিদ্র ভাণ্ডার সংস্থাপন করিয়াছি। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী হইতে প্রতি রবিবারে মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া, ভাণ্ডারের সভ্যগণের নিকট হইতে মাসিক চাঁদা, স্থানীয় প্রত্যেক বিবাহে বৃত্তি ও অপরাপর ভদ্রমহোদয়গণের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়া এই শিশু দরিদ্র ভাণ্ডারের জীবন রক্ষা করা হইতেছে। অতি অল্প দিনের মধ্যে দরিদ্র ভাণ্ডার একাল পর্য্যন্ত পল্লীর ৭।৮ জন সহায়শূন্যা নিরন্না বিধবার, ও ১জন সম্পূর্ণ কার্য্যাক্ষম রুগ্ন পুরুষের অন্ন সংস্থানের নিয়মিত মাসিক সাহায্য,—এবং ১জন বালকের আর্থিক সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছে। "ভারতবর্ষের" সহৃদয় পাঠক পাঠিকারা "দরিদ্রনারায়ণের" মুখের দিকে চাহিয়া, নিম্নলিখিত ঠিকানায় যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা অতি সামান্য হইলেও "দরিদ্র ভাণ্ডার" সাদরে গ্রহণ করিবে। শ্রীব্রজগোপাল কুণ্ড, প্রধান পরিচালক, কুমারখালী পোষ্ট, (জেলা নদীয়া)।

দেনা-পাওনা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।]

(১২)

বিপুলকায় মন্দিরের প্রাচীরতলে জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর পাল্‌কি দুটা নিমিষে অন্তর্হিত হইল। এই অত্যন্ত আঁধারে মাত্র ওই গোটা কয়েক আলোর সাহায্যে মানুষের চক্ষে কিছুই দেখা যায়না, কিন্তু ষোড়শীর মনে হইল লোকটিকে সে যেন দিনের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইল। এবং শুধু কেবল তিনিই নয়, তাঁহার পিছনে ঘেরা-টোপ ঢাকা যে পাল্কিটি গেল, তাহার অবরোধের মধ্যেও যে মানুষটি নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহারও শাড়ীর চওড়া কালা-পাড়ের একপ্রান্ত ঈষন্মুক্ত দ্বারের ফাঁক দিয়া ঝুলিয়া আছে, সেটুকুও যেন তাহার চোখে পড়িল। তাহার হাতের তির-কাটা চুড়ির স্বর্ণাভা লণ্ঠনের আলোকে পলকের জন্য যে খেলিয়া গেল এ বিষয়েও তাহার সংশয় মাত্র রহিলনা। তাহার দুই কাণে হীরার দুল ঝলমল্ করিতেছে, তাহার আঙুলে আঙুটির পাথরে সবুজ রঙ ঠিকরিয়া পড়িতেছে,—সহসা কল্পনা তাহার বাধা পাইয়া থামিল। তাহার স্মরণ হইল এ সমস্তই সে এইমাত্র হৈমর গায়ে দেখিয়াছে। মনে পড়িয়া একাকী অন্ধকারেও সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। চণ্ডী! চণ্ডী! বলিয়া সে সম্মুখের মন্দিরের উদ্দেশে চৌকাটে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, এবং সকল চিন্তা সবলে দূর করিয়া দিয়া দ্বার ছাড়িয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইতে আর দুটি নর নারীর চিন্তায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। ক্ষণেক পূর্ব্বেও সকল কথা-বার্ত্তার মধ্যেও ঝড় ও বৃষ্টির আশু সম্ভাবনা তাহার মনের মধ্যে নাড়া দিয়া গেছে। উপরে কালো ছেঁড়া মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইতেছে, হয়ত, দুর্য্যোগের মাতামাতি অচিরেই আরম্ভ হইয়া যাইবে। বিগত রাত্রির অর্দ্ধেক দুঃখ ত তাহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেছে, বাকী রাতটুকুও মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারে দাঁড়াইয়া কোন মতে কাটিয়াছে, এই প্রকার শারীরিক ক্লেশ সহ্য

করা তাহার অভ্যাস নয়,—দেবীর ভৈরবীকে এ সকল ভোগ করিতেও হয়না,—তবুও কাল তাহার বিশেষ দুঃখ ছিলনা। যে বাড়ী, যে ঘর-দ্বার স্বেচ্ছায় সে তাহার হতভাগ্য পিতাকে দান করিয়া আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে সারাদিন আজ কোন দুশ্চিন্তাই ছিলনা; কিন্তু, এখন হঠাৎ সমস্ত মন যেন তাহার একেবারে বিকল হইয়া গেল। এই নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তে একাকিনী এই ভাঙা স্যাঁত-সেঁতে গৃহের মধ্যে কি করিয়া তাহার রাত্রি কাটিবে? নিজের আশে পাশে চাহিয়া দেখিল। স্তিমিত দীপালোকে ঘরের ও-দিকের কোণ দুটা আবছায়া হইয়া আছে, তাহারই মাঝে মাঝে ইন্দুরের গর্ত্তগুলা যেন কালো কালো চোখ মেলিয়া রহিয়াছে; তাহাদের বুজাইতে হইবে; মাথার উপরে চালে অসংখ্য ছিদ্র, ক্ষণেক পরে বৃষ্টি সুরু হইলে সহস্রধারে জল ঝরিবে, দাঁড়াইবার স্থানটুকু কোথাও রহিবেনা, এই সব লোক ডাকাইয়া মেরামত করিতে হইবে; কবাটের অর্গল নিরতিশয় জীর্ণ; ইহার সংস্কার সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, অথচ, দিন থাকিতে লক্ষ্য করে নাই ভাবিয়া বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এই অরক্ষিত, পরিত্যক্ত পর্ণ-কুটীরে—কেবল আজ নয়—দিনের পর দিন বাস করিবে সে কেমন করিয়া? তাহার মনে পড়িল এইমাত্র বিদায়ক্ষণে নির্ম্মলের কথার উত্তরে কিছুই বলা হয় নাই, অথচ, শীঘ্র আর হয়ত দেখা হইবেনা। সে ভরসা দিয়া বলিয়া গেছে নিজেকে একেবারে নিরুপায় না ভাবিতে। হয়ত, সহস্র কাজের মধ্যে এ কথা তাহার মনেও থাকিবেনা। থাকিলেও, পশ্চিমের কোন্ একটা সুদূর সহরে বসিয়া সে সাহায্য করিবেই বা কি করিয়া, এবং তাহা গ্রহণ করিবেই বা সে কোন্ অধিকারে? আবার হৈমকে মনে পড়িল। যাবার সময় সে একটি কথাও বলে নাই, কিন্তু স্বামীর আহ্বানে যখন তাঁহার হাত ধরিয়া সে অগ্রসর হইল, তখন তাঁহার প্রত্যেক কথাটিকে সে যেন নীরবে অনুমোদন করিয়া গেল। সুতরাং, স্বামী ভুলিলেও ভুলিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রী যে তাহার অনুচ্চারিত বাক্য সহজে বিস্মৃত হইবেনা ষোড়শী তাহা মনে মনে বিশ্বাস করিল।

হৈমর সহিত পরিচয় তাহার বহুদিনব্যাপীও নয়, ঘনিষ্ঠও নয়। অথচ, কোন মতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে যখন তাহার কম্বলের শয্যাটি বিস্তৃত করিয়া ভূমিতলে উপবেশন করিল, তখন এই মেয়েটিকেই তাহার বারবার মনে হইতে লাগিল। সেই যে সে প্রথম দিনটিতেই অযাচিত তাহার দুঃখের অংশ লইয়া গ্রামের সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে, পিতার বিরুদ্ধে, বোধ করি বা আরও একজনের বিরুদ্ধে গোপনে যুদ্ধ করিয়াছিল, সে চলিয়া গেলে কাল তাহার পাশে দাঁড়াইতে এখানে আর কেহ থাকিবেনা; প্রতিকূলতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেই থাকিবে, কিন্তু আপনার বলিতে, একটা সান্ত্বনার বাক্য উচ্চারণ করিতেও লোক মিলিবেনা, অথচ এই ঝঞ্ঝা যে কোথায় গিয়া কি করিয়া নিবৃত্ত হইবে, তাহারও কোন নির্দ্দেশ নাই। এমনি করিয়া এই নিবান্ধব জনহীন আলয়ে চারিদিকের ঘনীভূত অন্ধকারে একাকিনী বসিয়া অদূর ভবিষ্যতের এই সুনিশ্চিত বিপদের ছবিটাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু কখন্ অজ্ঞাতসারে যে এই পরিপূর্ণ উপদ্রবের আশঙ্কাকে সরাইয়া দিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত এক অভিনব অপরিজ্ঞাত ভাবের তরঙ্গ তাহার বিক্ষুব্ধ চিত্তের মাঝে উত্তাল হইয়া উঠিল, সে জানিতে পারিলনা। এতদিন জীবনটাকে সে যে ভাবে পাইয়াছে, সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছে। সে চণ্ডীর ভৈরবী; ইহার দায়িত্ব আছে, কর্ত্তৃত্ব আছে, সম্পদ আছে, বিপদ আছে,—স্মরণাতীত কাল হইতে ইহার অধিকারিণী-গণের পায়ে পায়ে যে পথ পড়িয়াছে, তাহা কোথাও সঙ্কীর্ণ কোথাও প্রশস্ত, পথ চলিতে কেহ বা সোজা হাঁটিয়াছেন, কাহারও বা বাঁকা পদচিহ্ন পরম্পরাগত ইতিহাসের অঙ্কে বিদ্যমান। ইহার অলিখিত পাতাগুলা লোকের মুখে-মুখে কোথাও বা সদাচারের পুণ্য কাহিনীতে উদ্ভাসিত, কোথাও বা ব্যভিচারের গ্লানিতে কালো হইয়া আছে, তথাপি ভৈরবীজীবনের সুনির্দ্দিষ্ট ধারা কোথাও এতটুকু বিলুপ্ত হয় নাই। যাত্রা করিয়া সহজ ও সুগম, দুর্বোধ ও জটিল অনেক গলি-ঘুঁজি অনেকেই পার হইতে পাইয়াছে, তাহার সুখ ও দুঃখভোগ কম নয়; কিন্তু কেন, কিসের জন্য, এ প্রশ্নও বোধ করি কেহ কখনো করেন নাই, কিম্বা ইহাকে অস্বীকার করিয়া আর কোন একটা পথ খুঁজিতেও কাহারো প্রবৃত্তি হয় নাই। ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট সেই পরিচিত খাদের মধ্য দিয়াই ষোড়শীর জীবনের এই পঁচিশটা বছর প্রকাশিত হইয়া গেছে, ইহাতে ভৈরবীর জীবন বলিয়াই সে অসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছে; একটা দিনের

তরেও আপনার জীবন নারীর জীবন বলিয়া ভাবে নাই। চণ্ডীর সেবারত বলিয়া সে নিকটে ও দূরের বহু গ্রাম ও জনপদের গণনাতীত নর-নারীর সহিত সুপরিচিত। কত সংখ্যাতীত রমণী,—কেহ ছোট, কেহ বড়, কেহবা সমবয়সী —তাহাদের কত প্রকারের সুখ দুঃখ, কত প্রকারের আশা ভরসা, কত ব্যর্থতা, কত অপরূপ আকাশ-কুসুমের সে নির্বাক ও নির্বিকার সাক্ষী হইয়া আছে;—দেবীর অনুগ্রহ লাভের জন্য কত কাল ধরিয়া কত কথাই না ইহারা গোপনে মৃদুকণ্ঠে তাহাকে ব্যক্ত করিয়াছে, দুঃখী জীবনের নিভৃততম অধ্যায়গুলি অকপটে তাহার চোখের উপর মেলিয়া ধরিয়া প্রসাদ ভিক্ষা চাহিয়াছে;—এ সমস্তই তাহার চোখে পড়িয়াছে, পড়ে নাই কেবল রমণী-হৃদয়ের কোন্ অন্তঃস্থল ভেদিয়া এই সকল সকরুণ অভাব ও অনুযোগের স্বর উত্থিত হইয়া এতকাল ধরিয়া তাহার কাণে আসিয়া পশিয়াছে। ইহাদের গঠন ও প্রবৃত্তি এম্‌নিই কোন্ এক বিভিন্ন জগতের বস্তু, যাহাকে জানিবার ও চিনিবার কোন হেতু, কোন প্রয়োজন তাহার হয় নাই। এই পরিত্যক্ত অন্ধকার আলয়ে এইখানে এই প্রথম তাহার আঘাত লাগিল। কাল দুর্যোগের রাত্রে নির্ম্মলের হাত ধরিয়া নদী পার করিয়া আনিয়া সে তাহাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল, হয়ত, দুটি লোক ছাড়া এ কথা আর কেহ জানেনা, এবং এখন এইমাত্র সেই স্বল্প-দৃষ্টি লোকটির আহ্বানে হৈম যে তাঁহার হাত ধরিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইল, এ কথাও বোধ করি কয়েকটি লোক ছাড়া আর কেহ জানিবে না, কিন্তু কাল এবং আজিকার এই একই কর্ত্তব্যের কত বড়ই না পার্থক্য!

আর একবার তাহার চোখের উপর হৈমর কাপড়ের পাড়টুকু হইতে তাহার আঙুলের সবুজরঙের আংটি হইতে তাহার কাণের হীরার দুল পর্য্যন্ত সমস্ত খেলিয়া গেল, এবং সর্ব্বপ্রকার দুর্ভেদ্য আবরণ ও অন্ধকার অতিক্রম করিয়া তাহার অভ্রান্ত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ওই মেয়েটির প্রত্যেক পদক্ষেপ যেন অনুসরণ করিয়া চলিল। সে দেখিতে পাইল, স্বামীর হাত ছাড়িয়া এইবার তাহাকে লুকাইয়া বাড়ী ঢুকিতে হইবে, সেখানে তাহার চিন্তিত ও ব্যাকুল পিতামাতার শতসহস্র তিরস্কার ও কৈফিয়ৎ নিরুত্তরে মাথায় করিয়া লজ্জিত দ্রুতপদে নিজের ঘরে গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে, সেখানে হয়ত তাহার নিদ্রিত পুত্র ঘুম ভাঙিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে,—তাহাকে শান্ত করিয়া আবার ঘুম পাড়াইতে হইবে;—কিন্তু ইহাতেই কি অবসর মিলিবে? তখনও কত কাজ বাকী থাকিয়া যাইবে। অন্তরাল হইতে স্বামীর খাওয়াটুকু পর্য্যবেক্ষণ করা চাই,—ত্রুটি না হয়; ছেলেকে তুলিয়া দুধ খাওয়াইতে হইবে,—সে অভুক্ত না থাকে; পরে নিজেও খাইয়া লইয়া যেমন-তেমন করিয়া বাকী রাতটুকু কাটাইয়া আবার প্রত্যূষে উঠিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই। তাহার কত রকমের প্রয়োজন, কত রকমের গুছান-গাছান। তাহার স্বামী, তাহার পুত্র, তাহার লোকজন-দাসী-চাকর তাহাকে আশ্রয় করিয়াই যাত্রা করিবে। দীর্ঘ পথে কাহার কি চাই, তাহাকেই যোগাইতে হইবে; তাহাকেই সমস্ত ভাবিয়া সঙ্গে লইতে হইবে। নিজের জীবনটাকে ষোড়শী কোনদিন পরের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখে নাই, আলোচনা করিবার কথাও কখনো মনে হয় নাই, তবুও সেই মনের মাঝখানে গৃহিণী-পনার সকল দায়িত্ব, সকল ভার, জননীর সকল কর্ত্তব্য, সকল চিন্তাকে যেন কবে সুনিপুণ হাতে সম্পূর্ণ করিয়া সাজাইয়া দিয়া গেছে। তাই কিছু না জানিয়াও সে সব জানে, কখনও কিছু না শিখিয়াও হৈমর সকল কাজ তাহারি মত নিখুঁত করিয়া করিতে পারে।

অনতিদূরে একখণ্ড কাঠের উপর সংস্থাপিত মাটির প্রদীপটা নিব-নিব হইয়া আসিতেছিল, অন্যমনে ইহাকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেই তাহার চমক ভাঙিয়া মনে পড়িল সে চণ্ডীগড়ের ভৈরবী। এত বড় সম্মানিতা গরীয়সী নারী এ প্রদেশে আর কেহ নাই। সে সামান্য একজন রমণীর অত্যন্ত সাধারণ গৃহস্থালীর অতি তুচ্ছ আলোচনায় মুহূর্ত্তের জন্যও আপনাকে বিহ্বল করিয়াছে মনে করিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। ঘরে আর কেহ নাই, ক্ষণকালের এতটুকু দুর্ব্বলতা জগতে কেহ কখনো জানিবেও না, শুধু কেবল যে দেবীর সেবিকা সে, সেই চণ্ডীর উদ্দেশে আর একবার যুক্তকরে নতশিরে কহিল, মা, বৃথা চিন্তায় সময় বয়ে গেল, তুমি ক্ষমা কোরো।

রাত্রি কত হইয়াছে ঠিক জানিবার যো নাই, কিন্তু অনুমান করিল অনেক হইয়াছে। তাই শয্যাটুকু আরও একটু বিস্তৃত করিয়া, এবং প্রদীপে আরও খানিকটা তেল ঢালিয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িল। শ্রান্ত চক্ষে ঘুম আসিতেও

বোধ করি বিলম্ব ঘটিত না, কিন্তু বাহিরে দ্বারের কাছেই একটা শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া বসিল। বাতাসেও একটু জোর ধরিয়াছিল, শিয়াল-কুকুর হওয়াও অসম্ভব নয়, তবুও ক্ষণকাল কাণ পাতিয়া থাকিয়া সভয়ে কহিল, কে ?

বাহিরে হইতে সাড়া আসিল, ভয় নেই মা তুমি ঘুমোও, —আমি সাগর।

কিন্তু, এত রাত্তিরে তুই কেন রে ?

সাগর কহিল, হর খুড়ো বলে দিলে, জমিদার এয়েচে, রাতটাও বড় ভাল নয়,—মা একলা রয়েছে, যা সাগর, লাঠিটা হাতে নিয়ে একবার বস্‌গে। তুমি শুয়ে পড় মা, ভোর না দেখে আমি নড়ব না।

ষোড়শী বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তাই যদি হয় সাগর, একা তুই কি করবি বাবা ?

বাহিরের লোকটি একটু হাসিয়া কহিল, একা কেন মা, খুড়োকে একটা হাঁক্‌ দেব। খুড়ো-ভাইপোয় লাঠি ধরলে জানত মা সব। সে-দিনকার লজ্জাতেই মরে আছি, একটিবার যদি হুকুম দিয়ে পাঠাতে মা।

এই দুটি খুড়া ও ভাইপো হরিহর ও সাগর ডাকাতি অপবাদে একবার বছর দুই করিয়া জেল খাটিয়াছিল। জেলের মধ্যে বরঞ্চ ছিল ভাল, কিন্তু অব্যাহতি পাইয়া ইহাদের প্রতি বহুকাল যাবৎ একদিকে জমিদার ও অন্যদিকে পুলিশ কর্ম্মচারীর দৌরাত্মোর অবধি ছিলনা। কোথাও কিছু একটা ঘটিলে দুইদিকের টানাটানিতে ইহাদের প্রাণান্ত হইত। স্ত্রী পুত্র লইয়া না পাইত ইহারা নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে, না পাইত দেশ ছাড়িয়া কোথাও উঠিয়া যাইতে। এই অযথা পীড়ন ও অহেতুক যন্ত্রণা হইতে ষোড়শী ইহাদের যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধার করিয়াছিল। বীজগাঁর জমিদারী হইতে বাস উঠাইয়া আনিয়া নিজের মধ্যে স্থান দিয়া, এবং নানা উপায়ে পুলিশকে প্রসন্ন করিয়া জীবনযাত্রার ব্যাপারটা ইহাদের অনেকখানি সুসহ করিয়া দিয়াছিল। সেই অবধি দস্যু-অপবাদগ্রস্ত এই দুইটি পরম ভক্ত ষোড়শীর সকল সম্পদে বিপদে একান্ত সহায়। শুধু কেবল নীচ জাতীয় ও অস্পৃশ্য বলিয়াই সঙ্কোচে তাহারা দূরে দূরে থাকিত, এবং, ষোড়শী নিজেও কখনো কোনদিন তাহাদের কাছে ডাকিয়া ঘনিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করে নাই। অনুগ্রহ কেবল দিয়াই আসিয়াছে, ফিরিয়া কখনো গ্রহণ করে নাই, বোধ-করি প্রয়োজনও হয় নাই। আজ এই নির্জ্জন নিশীথে সংশয় ও সঙ্কটের মাঝে তাহাদের আড়ম্বরহীন এই স্নেহ ও নিঃশব্দ এই সেবার চেষ্টায় ষোড়শীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। মুছিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সাগর, তোদের জাতের মধ্যেও বোধ হয় আমার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়, না রে ? কে কি বলে ?

বাহির হইতে সাগর আস্ফালন করিয়া জবাব দিল, ইস্‌! আমাদের সাম্‌নে! দুই তাড়ায় কে কোথা পালাবে ঠিক পায়না মা।

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ সলজ্জে অনুভব করিল, ইহার কাছে এরূপ প্রশ্ন করাই তাহার উচিত হয় নাই। অতএব কথাটাকে আর না বাড়াইয়া মৌন হইয়া রহিল। অথচ, চোখেও তাহার ঘুম ছিলনা। বাহিরে আসন্ন ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া তাহারি খবরদারীতে একজন জাগিয়া বসিয়া আছে জানিলেই যে নিদ্রার সুবিধা হয় তাহা নয়, তাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার সে এই কথাই পাড়িল, কহিল, যদি জল আসে তোর যে ভারি কষ্ট হবে সাগর, এখানে ত কোথাও দাঁড়াবার যায়গা নেই।

সাগর কহিল, নাই থাক্‌ল মা। রাত বেশী নাই, পহর দুই জলে ভিজ্‌লে আমাদের কিছু হয়না।

বাস্তবিক ইহার কোন প্রতিকারও ছিলনা, তাই, আবার কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া ষোড়শী অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল। কহিল, আচ্ছা, তোরা কি সব সত্যিই মনে করেছিস্‌ জমিদারের পিয়াদারা আমাকে সেদিন বাড়ী থেকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ?

সাগর অনুতপ্ত স্বরে কহিল, কি করবে মা, তুমি যে একলা মেয়েমানুষ। এ পাড়ায় মানুষ বল্‌তেও কেউ নেই, আমরা খুড়ো-ভাইপোও সেদিন হাটে গিয়ে তখনও ফির্‌তে পারিনি। নইলে সাধ্য কি মা, তোমার গায়ে কেউ হাত দেয়।

ষোড়শী মনে মনে বুঝিল এ আলোচনাও ঠিক হইতেছে না, কথায় কথায় হয়ত কি একটা শুনিতে হইবে ; কিন্তু থামিতেও পারিলনা, কহিল, তাদের কত লোকজন, তোর দুটিতে থাক্‌লেই কি আট্‌কাতে পারতিস্‌ ?

বাহিরে হইতে সাগর মুখে একটা অস্ফুট ধ্বনি করিয়া বলিল, কি হবে মা আর মনের দুঃখ বাড়িয়ে। হুজুর

এয়েছেন, আমরাও জানি সব। মায়ের কৃপায় আবার যদি কখন দিন আসে, তখন তার জবাব দেব। তুমি মনে কোরোনা মা, হর খুড়ো বুড়ো হয়েচে বলে মরে গেছে। তাকে জান্‌তো মাতু ভৈরবী, তাকে জানে শিরোমণি ঠাকুর। জমিদারের পাইক-পিয়াদা বহুত আছে তাও জানি, গরীব বলে আমাদের দুঃখও তারা কম দেয়নি সেও মনে আছে,—ছোটলোক আমরা নিজেদের জন্যে ভাবিনে—কিন্তু তোমার হুকুম হলে মা ভৈরবীর গায়ে হাত দেবার শোধ দিতে পারি। গলায় দড়ি বেঁধে টেনে এনে ওই হুজুরকেই রাতারাতি মায়ের স্থানে বলি দিতে পারি মা, কোন শালা আট্‌কাবেনা!

ষোড়শী মনে মনে শিহরিয়া কহিল, বলিস্‌ কি সাগর, তোরা এমন নিষ্ঠুর, এমন ভয়ঙ্কর হতে পারিস্‌? এইটুকুর জন্যে একটা মানুষ খুন করবার ইচ্ছে হয় তোদের!

সাগর কহিল, এইটুকু! কেবল এইটুকুর জন্যেই কি আজ তোমার এই দশা! জমিদার এসেছে শুনে খুড়ো যেন জল্‌তে লাগ্‌ল। তুমি ভেবোনা মা, আবার যদি কিছু একটা হয়, তখন সেও কেবল এইটুকুতেই থেমে থাকবে!

ষোড়শী কহিল, হাঁরে সাগর, তুই কখনো গুরুমশায়ের পাঠশালে পড়েছিলি? বাহিরে বসিয়া সাগর যেন লজ্জিত হইয়া উঠিল, বলিল, তোমার আশীর্ব্বাদে অম্‌নি একটু রামায়ণ-মহাভারত নাড়তে-চাড়তে পারি। কিন্তু এ কথা কেন জিজ্ঞেসা করলে মা?

ষোড়শী বলিল, তোর কথা শুন্‌লে মনে হয় খুড়ো তোর না বুঝতেও পারে, কিন্তু তুই বুঝতে পারবি। সেদিন আমাকে কেউ ধরে নিয়ে যায়নি সাগর, কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি, আমি কেবল রাগের মাথায় আপনি চলে গিয়েছিলুম।

সাগর কহিল, সে আমরাও শুনেচি, কিন্তু সারারাত যে ঘরে ফিরতে পারলেনা মা, সেও কি রাগ করে?

ষোড়শী এ প্রশ্নের ঠিক উত্তরটা এড়াইয়া গিয়া কহিল, কিন্তু যে জন্যে তোদের এত রাগ, সে দশা আমার ত আমি নিজেই করেচি। আমি ত নিজের ইচ্ছেতেই বাবাকে বাড়ী ছেড়ে' দিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েচি।

সাগর কহিল, কিন্তু এতকাল ত এ আশ্রয় নেবার ইচ্ছে হয়নি মা। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ তাহার স্বর যেন উগ্র ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, তারাদাস ঠাকুরের ওপরও আমাদের রাগ নেই, রায় মশায়কেও আমরা কেউ কিছু বল্‌বনা, কিন্তু জমিদারকে আমরা সুবিধে পেলে সহজে ছাড়্‌বনা। জান মা, আমাদের বিপিনের সে কি করেছে? সে বাড়ী ছিলনা,—তার লোকজন তার ঘরে ঢুকে—

ষোড়শী তাড়াতাড়ি তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিল, থাক্‌ সাগর, ও সব খবর আর তোরা আমাকে শোনাস্‌নে।

সাগর চুপ করিল, ষোড়শী নিজেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন প্রশ্ন করিলনা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সাগর পুনরায় যখন কথা কহিল, তাহার কণ্ঠস্বরে গূঢ় বিস্ময়ের আভাস ষোড়শী স্পষ্ট অনুভব করিল। সাগর কহিল, মা, আমরা তোমার প্রজা, আমাদের দুঃখ তুমি না শুন্‌লে শুন্‌বে কে?

ষোড়শী কহিল, কিন্তু শুনেও ত অতবড় জমিদারের বিরুদ্ধে আমি প্রতিকার করতে পারবনা বাছা।

সাগর কহিল, একবার ত করেছিলে। আবার যদি দরকার হয়, তুমিই পারবে। তুমি না পারলে আমাদের রক্ষে করতে কেউ নেই মা।

ষোড়শী বলিল, নতুন ভৈরবী যদি কেউ হয় তাকেই তোদের দুঃখ জানাস্‌।

সাগর চমকিয়া কহিল, তা'হলে তুমি কি আমাদের সত্যিই ছেড়ে যাবে মা? গ্রামশুদ্ধ সবাই যে বলাবলি করচে—সে সহসা থামিল, কিন্তু ষোড়শী নিজেও এ প্রশ্নের হঠাৎ উত্তর দিতে পারিলনা। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, দেখ্‌ সাগর, তোদের কাছে এ কথা তুল্‌তে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যায়। কিন্তু আমার সম্বন্ধে সব ত শুনেচিস্‌? গ্রামের আরও দশজনের মত তোরা নিজেও দেখ্‌চি বিশ্বাস করেচিস্‌,—তার পরেও কি তোরা আমাকেই মায়ের ভৈরবী করে রাখতে চাস্‌ রে?

বাহিরে বসিয়া সাগর আস্তে আস্তে উত্তর দিল, অনেক কথাই শুনি মা, এবং আরও দশজনের মত আমরাও ভেবে পাইনে কেনই বা তুমি সে রাত্রে ঘরে ফিরলেনা, আর কেনই বা সকালবেলা সাহেবের হাত থেকে হুজুরকে বাঁচালে। কিন্তু সে যাই হোক্‌ মা, আমরা ক'ঘর ছোটজাত ভূমিজ তোমাকেই মা বলে জেনেচি; যেখানেই যাও, আমরাও সঙ্গে যাব। কিন্তু যাবার আগে একবার জানিয়ে দিয়ে যাব।

ষোড়শী কহিল, কিন্তু তোরা ত আমার প্রজা নয়, মা

চণ্ডীর প্রজা। আমার মত মায়ের দাসী কত হয়ে গেছে, কত হবে। তার জন্যে তোরা কেনই বা ঘর-দোর ছেড়ে যাবি, কেনই বা উপদ্রব অশান্তি ঘটাবি? এমন ত হতে পারে, আমার নিজেরই আর এ সমস্ত ভাল লাগ্‌চেনা!

সাগর সবিস্ময়ে কহিল, ভাল লাগ্‌চেনা?

ষোড়শী বলিল, আশ্চর্য্য কি সাগর? মানুষের মন কি বদলায়না?

এবার প্রত্যুত্তরে লোকটি কেবল একটা হুঁ, বলিয়াই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু রাত আর বেশী বাকী নেই মা, আকাশে মেঘও কেটে যাচ্চে, এইবার তুমি একটু ঘুমোও।

ষোড়শীর নিজেরও এ সকল আলোচনা ভাল লাগিতেছিলনা, তাহাতে সে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সাগরের কথায় আর দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু সে চক্ষে ঘুম যতক্ষণ না আসিল, কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া উহারই কথাগুলা তাহার মনে হইতে লাগিল। এই যে লোকটি বিনিদ্র চক্ষে বাহিরে বসিয়া রহিল, তাহাকে সে ছেলেবেলা হইতেই দেখিয়া আসিয়াছে; ইতর ও অন্ত্যজ বলিয়া এতদিন প্রয়োজনে শুধু তুচ্ছ ও ছোট কাজেই লাগিয়াছে, কোন দিন কোন সম্মানের স্থান পায় নাই, আলাপ করিবার কল্পনা ত কাহারও স্বপ্নেও উঠে নাই,—কিন্তু আজ এই দুঃখের রাত্রে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়া তাহার অনেক কথাই বাহির হইয়া গেছে, এবং তাহার ভাল-মন্দ হিসাবের দিন হয়ত একদিন আসিতেও পারে; কিন্তু শ্রোতা হিসাবে এই ছোটলোকটিকে সে একান্ত ছোট বলিয়া আজ কিছুতেই ভাবিতে পারিল না।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া দেখিল সকাল আর নাই—ঢের বেলা হইয়াছে; এবং অনতিদূরে অনেকগুলা লোক মিলিয়া তাহারই রুদ্ধ দরজার প্রতি চাহিয়া কি যেন একটা তামাসার প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও এতটুকু পর্দ্দা, এতটুকু আব্রু নাই। সহসা মনে হইল তৎক্ষণাৎ দ্বার বন্ধ না করিয়া দিলে এই লোকগুলার উৎসুক দৃষ্টি হইতে বুঝি সে বাঁচিবেনা। এই ক্ষুদ্র গৃহটুকু যত জীর্ণ যত ভগ্নই হোক আত্মরক্ষা করিবার এ ছাড়া আর বুঝি সংসারে দ্বিতীয় স্থান নাই।

এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইল ভিড় ঠেলিয়া এককড়ি নন্দী তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সবিনয়ে কহিল, গ্রামে হুজুর পদার্পণ করেছেন, শুনেছেন বোধ হয়।

জমিদারের গোমস্তা এই এককড়ি ইতিপূর্ব্বে কোনদিন তাহাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করে নাই। তাহার বিনয়, তাহার এই সম্ভাষণের পরিবর্ত্তন ষোড়শীকে যেন বিদ্ধ করিল, কিন্তু, কিছু একটা জবাব দিবার পূর্ব্বেই সে পুনশ্চ সসম্ভ্রমে কহিল, হুজুর একবার আপনাকে স্মরণ করেছেন।

কোথায়?

এই যে কাছারী-বাড়ীতে। সকাল থেকে এসেই প্রজার নালিশ শুন্‌চেন। যদি অনুমতি করেন ত পাল্‌কি আন্‌তে পাঠিয়ে দিই।

সকলে হাঁ করিয়া শুনিতেছিল; ষোড়শীর মনে হইল তাহারা যেন এই কথায় হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার ভিতরটা অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, এটা তাঁর প্রস্তাব, না তোমার সুবিবেচনা?

এককড়ি সসম্ভ্রমে বলিল, আজ্ঞে, আমি ত চাকর, এ হুজুরের স্বয়ং আদেশ।

ষোড়শী হাসিয়া কহিল, তোমার হুজুরের কপাল ভাল। জেলের ঘানি টানার বদলে পাল্‌কি চড়ে বেড়াচ্ছেন, তাও আবার শুধু স্বয়ং নয়, পরের জন্যেও ব্যবস্থা করচেন। কিন্তু বলগে এককড়ি, আমার পাল্‌কি চড়বার ফুরসৎ নেই,—আমার ঢের কাজ।

এককড়ি কহিল, ও-বেলায় কিম্বা কাল সকালেও কি একটু সময় পাবেন না?

ষোড়শী কহিল, না।

এককড়ি কহিল, কিন্তু হলে যে ভাল হোতো। আরও দশজন প্রজার যে নালিশ আছে?

ষোড়শী কঠোর স্বরে উত্তর দিল, বিচার করবার মত বিদ্যে-বুদ্ধি থাকে ত তাঁর নিজের প্রজার করুনগে। কিন্তু আমি তোমার হুজুরের প্রজা নই, আমার বিচার করবার জন্যে রাজার আদালত আছে। এই বলিয়া সে হাতের গামছাটা কাঁধের উপর ফেলিয়া পুষ্করিণীর উদ্দেশে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। (ক্রমশঃ)

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ]

সপ্তষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

ছিপ ও নৌকা তীরে লাগিল; আরোহিগণ অবতরণ করিলেন। সেই স্থানে রাজমহলের পথ তীরের ধারে-ধারে বাঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছিল। হরিনারায়ণ প্রভৃতি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, একখানা রথ অতি দ্রুতবেগে পাটনার দিকে চলিয়াছে। রথখানির সাজসজ্জা অতি মূল্যবান; এবং রথের সারথিকে দেখিলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। দূর হইতে অনেক লোক আসিতে দেখিয়া সারথি কহিল, "মণিয়াজান্, দরিয়া হইতে অনেক লোক আসিতেছে।" রথের অভ্যন্তর হইতে মণিয়া কহিল, "রথ রাখ।" সারথি কহিল, "বাপ! মণিয়াজান্, অমন কাজ ফরীদ খাঁ হইতে হইবে না।" "কেন ফরীদ?" "বেগানা জায়গা,—ফরীদ একা,—ফরীদের হাত হইতে যদি পাটনা সহরের সাত বাদশাহের দৌলত লুঠ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না।" "চালাকী রাখ্, রথ থামা।" "যো হুকুম জনাব।"

রথ থামিল; মণিয়া রথ হইতে নামিল। নদীতীর হইতে যাহারা আসিতেছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া মণিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আল্লা, ও আল্লা, ও হিন্দুর ভগবান্, তবে তুমি আছ! ফরীদ, আমি তোর মজলিসে পূরা একহপ্তা মুজরা করিব। বহিন্, রথ হইতে নাম,—তোমার বাপ ও ভাই আসিয়াছেন।" এই সময়ে অসীম কহিলেন, "দাদা, দূরে গেরুয়া পরিয়া মণিয়ার মত একটা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে না?" সুদর্শন কিয়ৎক্ষণ দেখিয়া কহিলেন, "সেই রকমই ত লাগে! ছোটরায়, ও বেটী কি মনে করিয়া আসিল?" হরিনারায়ণ কহিলেন, "মণিয়াই বটে, এবং আমাদিগকেই ডাকিতেছে।"

সকলে দ্রুতপদে রথের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে রথ হইতে দুর্গাকে অবতরণ করিতে দেখিয়া, বৃদ্ধ বিদ্যালঙ্কার দৌড়িয়া গিয়া, তাহাঁকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তখন অন্ধকার ঘন হইয়া আসিয়াছে। ফরীদ খাঁ রথের দীপ জ্বালিলে, সকলে তাঁহার চারিদিকে উপবেশন করিলেন। মণিয়ার মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অসীম কহিলেন, "এখন আপনারা কি করিবেন?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "এখনই সকলে মুরশিদাবাদ যাত্রা করিবেন।" হরিনারায়ণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "তুমি আবার এই কথা বলিতেছ?"

ত্রিবিক্রম। এ কথা ত তোমাকে বরাবরই বলিয়া আসিতেছি।

হরিনারায়ণ। যাইব কেমন করিয়া?

ত্রিবি। কেন, কন্যা পুত্রবধূ ত পাইয়াছ?

হরি। তৈজসপত্র?

অসীম। বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই। নবীন যাহা রাখিয়া আসিয়াছিল, প্রতিবেশীরা তাহা ভাগ করিয়া লইয়াছে।

মণিয়া। এই রাত্রিতে পাটনায় ফিরিয়া যাওয়া উচিত নহে; কারণ, গুণ্ডার দল আবার আক্রমণ করিতে পারে।

হরি। তৈজসপত্র যখন বিশেষ কিছু নাই, তখন আর পাটনায় ফিরিয়া কি হইবে? ত্রিবিক্রম, তোমার কথাই ঠিক,—আমরা এখনই মুরশিদাবাদ যাত্রা করিব।

ত্রিবি। তবে আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই,—এখন যাত্রা করিলেই ভাল।

হরি। অসীম, তুমি কোথায় যাইবে?

ত্রিবি। অনেকদূর,—সূতীর মোহানা পর্য্যন্ত।

অসীম। চলুন, আপনাদিগকে কিয়দ্দূর অগ্রসর করিয়া দিয়া আসি। বাদশাহ এলাহাবাদ যাত্রা করিয়াছেন; ভূপেন ফৌজের সঙ্গে গিয়াছে।

ত্রিবি। তাই ত ভাই,—বিবাহের সময়ে আমাকেই কোলবর সাজিতে হইবে?

অসীম। বিবাহ! আপনি কি বলিতেছেন?

মণিয়া। পথে আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই। পাটনা সহরের চারিদিক তেমন ভাল জায়গা নহে।

সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। সেই সময়ে মণিয়া ত্রিবিক্রমের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপ্ কেয়া ফর্মাতে হেঁ? ইয়ে বাঙ্গালী রাজা সাহেব কেয়া সাদী করনে কে লিয়ে যা রহেঁ?" ত্রিবিক্রম হাসিয়া উঠিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "জরুর। আপ ভি উনকো সাথ্ সাথ্ আওয়েঙ্গে।" "কবহি নেহি" বলিয়া মণিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। চলিতে-চলিতে সহসা হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণিয়া কোথায় গেল?" সকলে চাহিয়া দেখিলেন, মণিয়া বা ফরীদ খাঁ তাঁহাদিগের সঙ্গে নাই। অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফরীদ খাঁও ত নাই?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "তাহারা দুইজনে রথে ফিরিয়া গিয়াছে। রাত্রি অনেক হইয়াছে,—এখন আর তাহাদের সন্ধানে ফিরিলে চলিবে না।" সকলে নৌকায় উঠিলেন; নৌকা ও ছিপ রাজমহলের দিকে চলিল।

মণিয়া ত্রিবিক্রমের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া, ফরীদ খাঁর বস্ত্রাকর্ষণ করিল; এবং ধীরে-ধীরে তাহার সহিত অন্ধকারে মিশিয়া গেল। ফরীদ অনুভবে বুঝিল যে, তাহারা দুইজনে অন্য পথে চলিয়াছে। ক্রমে উভয়ে রথে ফিরিয়া আসিল। তখন ফরীদ খাঁ জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কোথায় যাইব?" মণিয়া সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, পাটনায়।" ফরীদ সোল্লাসে অভিবাদন করিয়া কহিল, "যো হুকুম, জনাব।" "এখান হইতে সহর কতদূর?" "আট-দশ ক্রোশ হইবে।" "কখন পৌছিব?" "সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে।"

রথ চলিতে আরম্ভ করিল। প্রায় দুইদণ্ড পরে ফরীদ খাঁ রথ থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মণিয়া বিবি, তুমি কি জাগিয়া আছ?" মণিয়া কহিল, "হাঁ। আমি ত ঘুমাই নাই। নানা চিন্তায় ঘুম আসে নাই।" "রথ থামাইলাম তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য। যদি অনুমতি দাও, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি।" "এত বড় কি কথা ফরীদ ভাই, যে রথ থামাইতে হইবে?" "মণিয়াবিবি, হয় ত তোমার কাছে অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু আমার কাছে প্রকাণ্ড। এই সমস্ত দুনিয়াটার মত বড়।" "ফরীদ ভাই, তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? এই দুই-তিন বৎসরের মধ্যে তুমি ত আমাকে মণিয়া বিবি বলিয়া ডাক নাই?" "সে কথা সত্য। দেখ মণিয়া, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহাতে আমার চোখে দুনিয়াটা যেন নূতন চেহারা ধরিল। অনেকদিন ধরিয়া ঝম্‌ঝম্ করিয়া একটা সুর যেন কাণে বাজিতেছিল,—হঠাৎ সেটা যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল; সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া যেন তড়িৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া রথ থামাইলাম। মণিয়া একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব?" "কর।" "তুমি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিও।" "দিব।"

"দেখ মণিয়া, এতদিন ধরিয়া জীবনটা কেমন করিয়া কাটাইয়াছি, তাহা এখন ভাল মনে পড়িতেছে না। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, এতদিন কি করিয়াছ, তাহা হইলে বোধ হয় উত্তর দিতে পারিব না। আমার পিতা, পিতামহ যে ভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, আমার প্রথম জীবনটা ত সে ভাবে যাপন করি নাই! মণিয়া, জীবনের গতিটা পরিবর্ত্তন করিবার সময় বোধ হয় আসিয়াছে। সে পরিবর্ত্তন নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। হয় ত একা পারিব না। তুমি কি আমাকে সাহায্য করিবে?" "কেমন করিয়া ফরীদ ভাই?" "কেমন করিয়া, সে কথা এক কথায় বলিতে পারিব না। মণিয়া, আমার মনে হইতেছে যে, জীবনের পথে প্রতি পদে যদি তোমার সঙ্গ পাই, তাহা হইলে হয় ত কখনও পদস্খলন হইবে না। তোমার সঙ্গ পাইবার আমার অধিকার নাই; কারণ, আমি মদ্যপ, দুশ্চরিত্র;—কখনও উচ্ছৃঙ্খল চিত্তবৃত্তিকে সংযত করিবার চেষ্টা করি নাই। আমার নিকট তুমি দেবী,—তাহা জানিয়াও তোমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি মণিয়া! কারণ, কে যেন আমাকে বলিতেছে যে, তোমার সঙ্গ যদি না পাই, তাহা হইলে প্রথম জীবনের উদ্দাম গতি রোধ করিতে পারিব না।" "ফরীদ, তুমি জান আমি কে, আর তুমি জান তুমি কে?" "জানি, তুমি রূপসী গুণশালিনী দেবী—আর আমি, মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খল লম্পট।" "তুমি জান যে তুমি আমীরের পুত্র,—তোমার পিতা হিন্দুস্থানের একজন বিখ্যাত বীর,—আলমগীর বাদশাহের একজন বিখ্যাত কর্ম্মচারী;—আর আমি হিন্দু বেশ্যার মুসলমান উপপতির কন্যা,—উদরের জন্য পাটনার পথে-পথে দেহ বিক্রয় করিয়া বেড়াই। ফরীদ,

আমি কি তোমার যোগ্যা জীবন-সঙ্গিনী?" "হ্যাঁ মণিয়া, —একবার নহে শতবার, শতবার নহে সহস্রবার। আমি জানি আমি কি। পিতার পুত্র হইলেই সে পিতৃপদ লাভ করে না,—তাহার যোগ্যতা প্রতিপাদন করিতে হয়। প্রথম জীবন আমি তোমার সঙ্গে কাটাইয়াছি; যদি চিরদিন তোমার সঙ্গ পাই, তাহা হইলে হয় ত একদিন হিন্দুস্থানে পিতার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব;—নতুবা নহে। মণিয়া জন্মকথা বিস্মৃত হও। আমি মুসলমান,—আমার ধর্ম্মে, হিন্দুর যে বাধা আছে, তাহা নাই। মণিয়া, আমাকে কি মানুষ হইতে দিবে?" মণিয়া উত্তর দিতে পারিল না। অর্দ্ধদণ্ড পরে ফরীদ পুনরায় ডাকিল, "মণিয়া বিবি!" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মণিয়া কহিল, "কি ভাই?" "আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না?"

মণিয়া সহসা রথের বাহিরে আসিয়া ফরীদ খাঁর উভয় হস্ত ধারণ করিয়া কহিল, "ফরীদ, তাহা হয় না ফরীদ। তুমি আমাকে যে সম্মান করিয়াছ, এ দুনিয়ায় কর্ণবীর কন্যাকে সে সম্মান কয়জন করিতে পারে? কিন্তু আমি সে সম্মানের যোগ্যা নহি;—আমি তোমার সে খাতির রাখিতে পারিলাম কই? ফরীদ, ভাই, আমি তোমাকে ভাইয়ের মত ভালবাসি। আমি জানি, আমার জন্য তুমি কত গঞ্জনা সহ্য করিয়াছ,—কত লাঞ্ছনা, কত অপবাদ হাসিমুখে উড়াইয়া দিয়াছ; কত বিপদে, শত আপদে বুক পাতিয়া দিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছ। ফরীদ ভাই, তোমার ঋণ আমি শোধ করিতে পারিব না। তুমি আমার ভাই,—আমার বড় ভাই। জীবনে কখনও ভ্রাতৃ স্নেহ পাই নাই,—গত দুই বৎসর সে স্থান তোমাকে দিয়া পুরাইয়া রাখিয়াছি। ভাই, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব,—যদি ছোট বহিন্ বলিয়া তোমার মনের কোণে একটু স্থান দাও,—তাহা হইলেই চরিতার্থ হইব।"

ফরীদ খাঁ নীরবে সমস্ত কথা শুনিয়া গেল। শেষ কথাটার সময়ে সে শিহরিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া সে কহিল, "বহুৎ আচ্ছা,—যো হুকুম বিবি সাহেব।" মণিয়া রথের ভিতরে গিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। একদণ্ড পরে মণিয়া যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন রথ শূন্য। মণিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে ডাকিল, "ফরীদ, ফরীদ, ফরীদ ভাই, ফরীদ খাঁ!" দূর পর্ব্বত-প্রান্ত হইতে তাহার আকুল আহ্বানের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল। পর-দিন প্রভাতে ফরীদ খাঁর সুসজ্জিত শূন্য রথ পাটনা সহরে পৌঁছিল।

(ক্রমশঃ)

পূর্ণিমায়।

[শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম এ, বি-এল্]

কিরণে করিয়া স্নান নেমে আসে রূপসী,
এত কি সহিতে পারে আঁখি দুটি উপোসী!
ক্লান্ত নয়ন 'পরে রূপ-সুধা ঝরে পড়ে,
থামিস নে—মায়াপুরে চুপি চুপি চ' পশি;
অলখিতে ভয়ে—পাছে ছল ধরে রূপসী!

নূপুর বাজেনি তার চঞ্চল চরণে
শিঞ্জিনী উঠে নিকো মঞ্জুলাভরণে,—
সুন্দরী মৃদু হেসে নীরব—থামিল এসে
স্তব্ধ নিশুতি রাতে নভোনীল-তোরণে,
আকাশ আকুল আজ রূপে আর বরণে।

এল দুটি তারা-বালা মিটি-মিটি হাসিয়া,
একখানি মেঘ-তরী এল ধীরে ভাসিয়া,
মধুর স্বপ্ন সম কল্পনা এল কম,
অতীত—আশার কূলে লাগিল সে আসিয়া,
অশ্রুত এল অতি সকরুণ হাসিয়া।

তারে - এসে তারা সবে তুলে নিল তরীতে,
ময়ূরকণ্ঠী পাল খুলে দিল ত্বরিতে,
নীলে নীলে ভেসে ভেসে সুন্দরী কোন্ দেশে
করিল প্রয়াণ, প্রিয় সুন্দরে বরিতে,
জ্যোৎস্নার ঢেউ তুলি শুক্লা সে তরীতে!

যামিনীর তীরে তীরে ছুটে ছুটে চলিয়া
ক্লান্ত! স্বপন-ভূমে পড়িলাম ঢলিয়া।
চরণ চলে না আর, পরাণে বেদনা-ভার;
পূরবে রক্ত-আঁখি উঠে বুঝি জ্বলিয়া।
বিরাম! স্বপন-পুরে প্রান্তরে চলিয়া।

বিশ্ব-ভারতী

[শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল্]

সেক্সপীয়ার

কিছুদিন পূর্ব্বে উইলিয়ম জেমস সেক্সপীয়ার সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলেন, সম্প্রতি ফ্রাঙ্ক হ্যারিস সাহেব তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ Saturday Review পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে আমরা তাঁহার বক্তব্যের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া দিলাম!

জেমস সাহেবের মতে সেক্সপীয়ারের অত্যধিক বক্তৃতা অসহ্য। এই বক্তৃতা-স্রোতে গা ভাসান দিয়া, তিনি অনেক স্থানেই বক্তব্য বিষয় হইতে দূরে আসিয়া পড়েন। আশ্চর্য্যের বিষয়, যিনি সাহিত্যে এত ভাল জিনিস দিয়াছেন, কি করিয়া তিনি বক্তৃতার মুখে বাগাড়ম্বর করিয়া লোক ভুলাইতে চান। এইগুলির ভিতর ধারাবাহিক ভাবে কিছুই বলা হয় নাই। জেমস সাহেবের কথায় বলিতে গেলে, It is mighty fun to read him through in order.

প্রধানতঃ সেক্সপীয়ার একজন পেশাদারী ভাঁড় (professional amuser) ছিলেন। ডুমা বা স্ক্রাইবের মত তিনি লোকদিগকে প্রচুর পরিমাণে আনন্দ দিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহাদের ও সেক্সপীয়ারের আনন্দ-দানের প্রণালী একটু বিভিন্ন। সেক্সপীয়ারের বক্তৃতার সহিত গীতিকাব্যের সৌন্দর্য্য জড়িত থাকায়, লোকে তাঁহাকে ভুল করিয়া গম্ভীর প্রকৃতির লোক বলিয়া ধারণা করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি চটুল হাস্যরস-রসিক। স্বভাবতঃ তিনি এইরূপ ধরণের ছিলেন। প্রেমের দিক হইতে দেখিতে গেলেও ঠিক এই কথাই বলা চলে যে, তাঁহার মত আনন্দ দিতে বড় কম লোকেই পারে। তিনি যে খুব গম্ভীর হইতে পারিতেন না, তাহা নহে; তবে যখন ঐরূপ ভাব ধারণ করিতেন, তখনও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি দর্শকদিগের উপর স্থাপিত থাকিত; তাহাদের অবস্থানুসারে তাঁহার গাম্ভীর্য্যের মাত্রা বাড়িত বা কমিত (He could be profoundly melancholy; but even then was controlled by the audience's needs.)

ধর্ম্ম বা চরিত্রের আদর্শের কোন ধারই তিনি ধারিতেন না। রঙ্গালয়ের বা সমাজের প্রচলিত আইন-কানুনগুলি বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়া, সেক্সপীয়ার তাহাদের প্রদর্শিত পথে চলিতেন। হ্যারিস সাহেবের মতে এই মত এমারসনের মতের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। এমারসন ভ্রান্ত ধারণাবশে প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, সেক্সপীয়ারের জীবনে গম্ভীর ভাবের একান্ত অভাব। তিনি লিখিয়াছেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে এটা একটা আশ্চর্য্য বিষয় যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকবি গোপনে চরিত্রহীন জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা লোকদিগকে আনন্দ দিবার জন্যই ব্যয়িত হইয়াছে।' জগৎ, ঋষি-কবির নিকট হইতে চায় বিরোধী

মতগুলির সামঞ্জস্য-সাধন। তিনি নব-নব উন্মেষশালিনী শক্তিবলে দেখিবেন, শিক্ষা দিবেন এবং কার্য্য করিবেন।

ফরাসীরা অভিনয় কার্য্যে সুদক্ষ। ইহা তাহাদের প্রকৃতি-গত দান। প্রকৃতির নিকট হইতে শিক্ষকতা, নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষতা ও অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা ইংরাজ জন্মগত সংস্কারবশে পাইয়াছে। এক্ষণে দু' একটা উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্য বুঝাইয়া দিতে চাই। বাস্তবতার দোহাই দিয়া, বা যে কোন কারণেই হউক, সেক্সপীয়ার কুত্রাপি ঘৃণাকারজনক চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। চরিত্রের উন্নত আদর্শ তিনি আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। চরিত্রের মাহাত্ম্য তিনি সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়াছেন। কুমারীত্ব (Virginity) বালিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ—অমূল্য রত্ন (priceless jewel)। বিবাহের পূর্ব্বে বিবাহিত-জীবন যাপনের চিত্র তিনি কুত্রাপি অঙ্কিত করেন নাই। বিবাহের পূর্ব্বে অতিমাত্রায় পরিচয়কে (intimacy) তিনি ভ্রান্ত ধারণা বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সঙ্গম-লালসা বা কামবৃত্তি (lust) শক্তির অপচায়ক (lust is an expense of spirit)। নারীকে প্রলোভনের দ্বারা ঘরের বাহিরে আনা মহাপাপ। চতুর্দ্দশপদী কবিতার যুগের পর, তাঁহার শরীর ও মনে যেটুকু মলা-মাটি ছিল, তাহা দূর হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর তিনি, প্রত্যেক ঘটনা হইতেই কি শিক্ষা লাভ করা যায়, তাহা দেখাইতে সচেষ্ট হন—ফলশ্রুতি শুনাইতে ব্যগ্র হন।

"দ্বাদশ রজনী"র (Twelfth Night) বিদূষকের গান শুনিয়া ডিউক তাহাকে অর্থ দিয়া বলিলেন, 'তোমার পরি-শ্রমের মূল্য স্বরূপ দিলাম'—উত্তরে বিদূষক বলিয়াছিল, 'পরিশ্রম ত এতে আমার হয় না,—আমি আনন্দ পাই তাই গাহিয়া থাকি।'

ডিঃ। তবে আমি তোমার আনন্দের মূল্য দিলাম।

বিদূষক। সত্য মহাশয়; আনন্দের জন্য মূল্য একদিন না একদিন দিতেই হইবে (pleasure will be paid one time or another)। কি চমৎকার শিক্ষা! আনন্দ স্রোতে গা-ভাসান দিলে মানুষকে যে একদিন না একদিন তাহার ফলভোগ করিতে হইবে, তাহা কত অল্প কথায় তিনি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

আবার ধরুন 'হ্যামলেটে'র সেই দৃশ্য, যেখানে হ্যামলেট লর্ড-চেম্বারলিন পলোনিয়সকে বলিতেছেন, 'অভিনেতাদিগের দিকে একটু সুনজর রাখিবেন; কারণ তাহারা সাময়িক ঘটনা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকে—তাহারা সময়ের পঞ্জীস্বরূপ (brief chronicle of the time)। আপনার দেহাবসানে লোকে আপনাকে একটা বদ নামে অভিহিত করিতে পারে; কিন্তু জীবিত অবস্থায় ইহারা আপনার কু-কীর্ত্তির কাহিনী ঘোষণা করিতে পারে।' উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'তাহাদের গুণানুসারে আমি তাহাদিগকে দেখিব' (My Lord, I will use them according to their desert)। তদুত্তরে হ্যামলেট যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও সকলের প্রণিধান-যোগ্য—তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভগবানের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব মানুষকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখা উচিত। যতটা তাহার প্রাপ্য নয়, ততটা বা ততোঽধিক সম্ভ্রম তাহাকে প্রদান করিলে দাতার কৃতিত্ব অধিক হয়' (the less they deserve, the more merit is in your bounty)। অবশ্য এখানে অভিনেতার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাহাদের প্রতি আদৌ প্রযোজ্য নহে,—নাটককারদিগের প্রতিই প্রযোজ্য। যাহা হউক, এখানে তিনি পলোনিয়াসের মত উচ্চ রাজকর্ম্মচারীকে মানুষের প্রতি ভদ্র-ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিতেছেন। অভিনেতার কর্ত্তব্য কি, তাহা তিনি হ্যামলেটের মুখে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—'লর্ডের অনুসরণ কর; তাঁহাকে বিদ্রূপ করিও না। মানুষের সঙ্গে যথোপযুক্ত ভদ্র ব্যবহার করা যেমন কর্ত্তব্য, তেমনি তাহাকে অযথা বিদ্রূপ করাও অকর্ত্তব্য।'

এই যে ভদ্র ব্যবহারের বিষয় শিক্ষা দেওয়া, ইহা হইতে কি বুঝিতে পারা যায় না যে, বড়-বড় লর্ড বংশধরেরা ভদ্র ব্যবহার না জানিলেও, সেক্সপীয়ার ভদ্রলোক-দিগের সহিত মেলা-মেশা করিয়া ভদ্র ব্যবহারকে নিজস্ব করিয়াছিলেন। অসৎ চরিত্রের লোক ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করিতে কখনই পারে না। ব্যবহার ভিতরের গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন ত আর কিছুই নয়।

সেক্সপীয়ার হইতে শিক্ষা মূলক বচন উদ্ধৃত করিয়া পাঠক-দিগের আর ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহিনা। সংক্ষেপে একটা কথা বলিতে চাই,—কি ভাবে কার্য্য করিলে মানুষ প্রকৃত

মানবপদবাচ্য হইতে পারে তাহা তিনি বহুবার বলিয়া গিয়াছেন।

অনেকে তাঁহার প্রথম যুগের লেখনী হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাহেন, মানবের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আদৌ ছিল না। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। দরিদ্রের প্রতি তাঁহার প্রাণের টান ছিল। তাহাদের সুখ-দুঃখকে তিনি আপনার সুখ-দুঃখের ন্যায় অনুভব করিতেন। Cymbeline নাটকের Posthumusএর স্বগতোক্তিটি একবার পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, দরিদ্রের জন্য তাঁহার প্রাণ কত কাঁদিত। Posthumus সেক্সপীয়ার স্বয়ং। দেউলিয়া আইনের বাঁধা-বাঁধি নিয়ম ঋণভারগ্রস্ত খাতকের যে সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা যদি সেক্সপীয়ারের সময় প্রবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে তিনি তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিতেন।

সেক্সপীয়ার আমাদিগকে যে শিক্ষা দান করিয়াছেন, তাহা অমূল্য। তাঁহার প্রদর্শিত আদর্শ যে কত উচ্চাঙ্গের, তাহার পরিচয় এস্থলে একটু দিব। Sermon on Mount নামক উপদেশাবলী যে খুব উচ্চাঙ্গের, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু অনেকেই ঐ গুলি প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করিয়া কার্য্য করিতে পারেন না। সেক্সপীয়ার তাহা পারিয়াছিলেন; তাই তিনি সাধকের ন্যায় বলিতে পারিয়াছিলেন, 'শত্রুকে ভাল বাসিবে; যে তোমার অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইবে তাহার, শুভকামনা করিবে; যাহারা তোমাকে ঘৃণা করে, তাহাদিগের উপকার করিবে। অত্যাচারীর জন্য প্রার্থনা করিবে।' কবি বারণস্ একস্থানে বলিয়াছিলেন, 'রাগকে মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিবে, এবং সর্ব্বদাই তাহাকে গরম রাখিবে।' সেক্সপীয়ারের মতে কিন্তু এরূপ করা বিপজ্জনক। শত্রুকে ভালবাসা উচিত; কেন না, তাহা হইলে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে। মনের মধ্যে রাগ পুষিয়া রাখিলে, আমাদিগের অন্তঃকরণ তাহার ভারে আহত হইয়া পড়িবে। কারণ, সমস্ত সৎ চিন্তা অন্তঃকরণ হইতেই বাহির হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ সুস্থ ও সবল থাকিলে, আমাদিগের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। রাগ দুষ্ট-ক্ষতের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, সমস্ত অন্তঃকরণকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে। এই যে সত্যের সন্ধান, এ সন্ধান খৃষ্ট জন্মিবার বিংশ শতকের মধ্যে আর কেহ দিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, Timon of Athensএর সেই দৃশ্য যেখানে Alcibiades সেনেটের সম্মুখে বলিতেছেন,—"For pity is the virtue of the law" দয়াপ্রদর্শনই আইনের মুখ্যোদ্দেশ্য। এই সম্পর্কেই তিনি প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর মত বলিয়াছেন, 'প্রকৃত সাহসী তিনিই, যিনি বুদ্ধিমানের মত সহ্য করিতে পারেন।'

প্রাণ-আলোড়নকারী ভাবের পরিচয় সেক্সপীয়ার যত দিয়াছেন, ইংরাজী সাহিত্যে কুত্রাপি আর তত দেখিতে পাওয়া যায় না। সত্যই যিশুখৃষ্টের বাণী ব্যতীত কোথাও এতগুলি সুন্দর ভাবের পরিচায়ক বাক্য একত্রে নাই। (Shakespeare is the author of the finest phrases in English—phrases that for sheer spirit-sweetness can only be compared with those of Jesus)। মনীষীদের ভিতর অদৃষ্টের ধারণা বিভিন্ন রূপ আছে ও ছিল। মহম্মদ ও যিশুখৃষ্টের নিকট বিশ্বাসই সর্ব্বস্ব। নেপোলিয়ন নক্ষত্রের শক্তির উপর আস্থাবান্। সেক্সপীয়ারের নিকট নিয়তি আমাদের উদ্দেশ্যকে নিয়মিত করে। (There is a divinity that shapes our ends.)

মৃত্যুর পর-পারের কথা তিনি একছত্রে বলিয়াছেন, 'সেই অপরিজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত দেশ হইতে কেহই ফিরিয়া আসে না।'

'The undiscovered country from
whose bourn
No traveller returns"

সে দেশের কথা ভাবিবার, সন্দেহ করিবার কোন আবশ্যকতাই নাই।

বিশ্বাস সম্বন্ধে তিনি জগতকে যে সত্য দিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি চিরকালই ধন্যবাদার্হ থাকিবেন—'জগতে কি হইতে পারে, বা না হইতে পারে, তাহা দর্শনশাস্ত্র স্বপ্নে বা কল্পনায়ও আনিতে পারে না'—

'There are more things in
heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your
philosophy.'

সেক্সপীয়ারের প্রতিভার প্রতি যতদূর অবিচার করা হইয়াছে, আমার বোধ হয় কাহারও প্রতিভার প্রতি ততদূর হয়

নাই। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রকৃতই বলা যায়, তাঁহার দোষের তুলনায় তাঁহার প্রতি অবিচার অত্যধিক পরিমাণে হইয়াছে।

"a man more sinned against than sinning"

ভারতীয় কলার উৎপত্তি।

ভারতীয়-চিত্রকলা সম্বন্ধে আজকাল বেশ একটু আলোচনা হইতেছে। ভারত-চিত্রকলাবিশারদ সুবিখ্যাত শিল্পী হ্যাভেল সাহেব ভারতীয়-চিত্রকলার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়া জগতের সমক্ষে আমাদের প্রাচীন রীতির সুখ্যাতি করিয়াছেন। ভারতীয় কলার উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহার অভিমত নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। অবশ্য এ সকল কথা তিনি ১৯০৮ সালে প্রকাশিত Indian Sculpture and Painting পুস্তকে সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত করেন। তার পর যথা তাঁহার সমালোচকগণ তাঁহার অযথা নিন্দাবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি ১৯১১ সালে The Ideals of Indian Art নামক পুস্তক সাধারণে প্রচার করেন। ভূমিকায় তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন, 'ভারতীয় কলার প্রতি আমার যে আগ্রহ, তাহা পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য নয়, কিংবা ইহার প্রত্নতত্ত্বের জন্যও আমি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হই নাই। আমার বিশ্বাস, ভারতীয় শিল্প এখনও জীবন্ত; এবং ইহার ভিতর যে শক্তিবীজ নিহিত আছে, তাহার কার্য্যকরী শক্তিও অসীম। পাশ্চাত্য কলা-সমালোচকেরা তাঁহাদিগের আদর্শানুযায়ী চিত্র দেখিতে পান না বলিয়া, ভারতীয় শিল্পকে বালজনসুলভ বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অধিকন্তু উঁহারা এই পদ্ধতিকে কতকটা ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই—ভারতীয় শিল্প পাশ্চাত্য শিল্পের ন্যায় শিক্ষিত জনগণের আনন্দ-দানের জন্য উদ্ভূত হয় নাই। ভারতীয় শিল্পের উদ্দেশ্য ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনের মূলতত্ত্বগুলি যাহাতে নিরক্ষর কৃষক পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে, এরূপ ভাবে শিল্পী চিত্র-সাহায্যে সম্পাদন করিয়া থাকেন। কেবল মাত্র জ্ঞান গরিমার উচ্চশিখরারূঢ় ভারতীয় ব্রাহ্মণদিগের জন্য এগুলি নির্ম্মিত হয় নাই। ভারতীয় চিত্রগুলি প্রতীক (symbol) মাত্র। শিল্পীর প্রতীক দ্বারা যখন সাধারণে শিক্ষালাভ করিবে, তখন তাহার ব্যবহৃত প্রতীকের দোষ দেওয়া চলিবে না। তখনই শিল্পীর দোষ হইবে, যখন তাহার ব্যবহৃত প্রতীক সৌন্দর্য্যানুভূতি ও ছন্দের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিবে। ভারতীয় শিল্প যে শিক্ষাবিস্তারে সফলতা লাভ করিয়াছে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ভারতীয় কৃষক। তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীর মতে সে নিরক্ষর হইলেও, জগতের অন্য দেশের কৃষকদিগের অপেক্ষা কোন অংশে সে সভ্যতায় নিকৃষ্ট নহে; বরং সে অধিকতর সভ্য' (most cultured of their class anywhere in the world)। হ্যাভেল সাহেবের মতে ভারতীয় শিল্প অনুধাবন করিলে য়ূরোপ অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে—কলা, সঙ্গীত ও নাটকের সংস্কার করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার পুনরুদ্দীপন করিতে পারে।

জাপানী কলা-সমালোচক ওকাকুরা সত্যই বলিয়াছেন, কলা-দর্শন সম্বন্ধে (ar tphilosophy) আসিয়ার সকল দেশই একমত। পাশ্চাত্য দেশে কলা, বিশ্লেষণমূলক (analytical); কলার দর্শনের দিকটা সেখানে শিল্পীদের চক্ষে বড় পড়ে না। প্রাচ্যদেশে এখনও শিল্পের দর্শনের দিকটা বজায় আছে; এবং ইহার জন্যই জাতীয় বিশ্বাস ও সংস্কার অক্ষুণ্ণ আছে। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ (Indian Idealism) সাহায্যে আমরা আসিয়ার শিল্প ও মধ্যযুগের খৃষ্টীয় শিল্পের প্রকৃতি বুঝিতে পারি। আর এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, যে ইচ্ছাশক্তি-প্রণোদিত হইয়া শিল্পী মূর্ত্তি বা চিত্র গঠন বা অঙ্কিত করিয়াছেন, সে শক্তি বহুদিন হইতে সমাজে ও জাতির ভিতর অন্তঃ-সলিলাফল্গুর ন্যায় প্রবাহিত ছিল।

প্রত্নতত্ত্বের কৃপায় যখন বৌদ্ধ স্তূপে প্রথম গান্ধার-শিল্পের পরিচয় পাওয়া গেল, তখন অনেকেই বলিলেন, ভারতীয় শিল্প 'হেলেনিক' শিল্পের প্রভাবান্বিত। কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ভারতীয় শিল্প সেই দিনই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, যেদিন ভারতবাসী সংস্কার (intuition) বলে বুঝিয়াছিল, মানব-আত্মা অমর, চিরস্থায়ী এবং ব্রহ্মার আত্মার সমপর্য্যায়ভুক্ত। বেদে ও উপনিষদে এই ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য সেই সময় হইতে এলিফেণ্ট, ইলোরা বা বরভূধরের তক্ষণ-শিল্পের ন্যায় উন্নত তক্ষণশিল্পের নিদর্শন পাইতে যে অধিক সময় লাগিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য ভারতীয়

শিল্পের উপর নবাগত পারস্য, চীন ও আরব শিল্পেরও প্রভাব লক্ষিত হয়।

জগতের অন্যান্য দেশের লোকেরা যখনই সভ্যতার আলোক দেখিতে পাইয়া থাকে, তখনই তাহারা ভাষার সাহায্যে তাহাদিগের লব্ধ জ্ঞানকে প্রচার করিয়া থাকে; কিন্তু ভারতে ইহার বিপরীতই দেখিতে পাওয়া যায়। কুশাগ্র-বুদ্ধি আর্য্য বেদ ও উপনিষদের জ্ঞান-গরিমার পরিচায়ক শিক্ষাকে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করেন নাই। গর্ব্বিত আর্য্যের প্রচার করিবার ইচ্ছা ছিল না। অপরের সহিত সংঘর্ষে তাঁহাদিগের মানসিক ও নৈতিক অবনতি হইবে এই ধারণাই তাঁহাদের ছিল। তাঁহার ধর্ম্ম, তাঁহার বংশ, তাঁহার সমাজ ও তাঁহার জাতির জন্য; এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহার নিজের জন্য। নির্জ্জন বনমধ্যে কিংবা পর্ব্বতের শিখরোপরি, অথবা আপনার পূজার গৃহকোণে আপনি বসিয়া ধ্যান ধারণা করাই আর্য্যের ধর্ম্ম। সেইখানেই তিনি ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।

বেদ-মন্ত্রের স্রষ্টা ঋষিরা মানবাত্মা ও প্রকৃতির প্রাণের সমতা যখন দেখিতে পাইয়াছিলেন, তখনই শিল্পের (philosophy of art) দর্শনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি তাঁহাদের গোচরীভূত হইয়াছিল। 'হেলনিক'-সভ্যতার প্রভাব আসিয়া মহাদেশে পৌঁছিবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বেদ-গানের সহিত শিল্পের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্য শিল্পীর মনে ভাবের উদ্রেক করিয়া থাকে; এবং এই ভাব-সংঘটন হইতেই আসিয়া মহাদেশের শিল্প, কবিতা ও গানের জন্ম হইয়াছে। ভাব-প্রকাশ প্রতীক (symbol) সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না। ঋষিরা বলিয়াছেন, মূর্খেরা জলের ভিতর দেবতার অধিষ্ঠান দেখিতে চায়। বুদ্ধিমান লোকেরা দিব্যাকাশে দেবতার সত্ত্বা দেখিতে চান। নিরক্ষর যাহারা তাহারা বন, ইষ্টক ও প্রস্তরের ভিতর দেব-দর্শনের অভিলাষ করিয়া থাকে; প্রকৃত জ্ঞানী যাঁহারা তাঁহারা সার্ব্বজনীন আত্মায় (universal self) দেবতার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন।

বৈদিক যুগে সুকুমার কলার উৎকর্ষ সাধিত না হইলেও, এ কথা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, সে সময়ে শিল্পের আদর যথেষ্ট ছিল। সে সময়ে আদর্শ-শিল্পের উন্নতি হইলেও যে বাস্তব-শিল্পের উন্নতি একেবারে হয় নাই, একথা বলিতে পারা যায় না (Nor was the Vedic period entirely barren of art in material form) যজ্ঞানুষ্ঠানের বেদীগুলি ও অন্যান্য উপকরণকে তাঁহারা এরূপ ভাবে সুসজ্জীকৃত করিতেন, যাহাতে তাঁহাদের সৌন্দর্য্যবোধ ও সুসজ্জীকরণের ক্ষমতা বেশ ছিল (decorative craftsmanship) তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। রামায়ণের বশিষ্ঠানুষ্ঠিত যজ্ঞের বিবরণ হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রস্তর ও কাষ্ঠের উপর শিল্পীরা কারুকার্য্য করিয়াছিলেন। গিল্টীকরা যূপদণ্ডগুলি হইতে বুঝা যায়, তাঁহারা এই শিল্পেও অধিকারী ছিলেন। হ্যাভেল সাহেবের মতে মনোহর কারুকার্য্যযুত প্রস্তর-স্তম্ভগুলি সুন্দর সুসজ্জিত যূপদণ্ডের আদর্শে নির্ম্মিত হইয়াছে। ভারতীয়-শিল্পের ধারা বুঝিতে হইলে, বৈদিক যুগের শিল্পের ধারা একটু আলোচনা করা চাই। বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, শিখ, ও সারসেন শিল্পের ভিতর পার্থক্য থাকা সত্বেও, সকলের ভিতর বৈদিক চিন্তার ধারা অনুসৃত হইয়াছে। কাশীধামের গঙ্গার ঘাটের উপর দাঁড়াইলেই দেখিতে পাওয়া যায়, এখনও ভারতীয় নরনারী ও বালকবৃন্দ আপনাদের জাতিগত ও আচারগত পার্থক্য ভুলিয়া, একই দেবেশের উদ্দেশে স্তুতি করিয়া থাকে।" তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও তাহারা এইরূপ ভাবেই উপাসনা করিত। য়ুরোপীয়েরা কিছুতেই বুঝিতে পারেন না, ইহা কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? তাঁহাদের ভিতর ধর্ম্মান্ধতার জন্য যে কত রক্তপাত হইয়াছে, কত অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে, তাহার জলন্ত সাক্ষ্য ইতিহাস এখনও দিয়া থাকে। আর ভারতবর্ষে ধর্ম্মমতের পার্থক্য থাকা সত্বেও, বিষ্ণু-পূজকের সহিত শৈবের বা গাণপত্যের ও সৌরের কোন বিবাদ বিসম্বাদ হয় না কেন? তাহার কারণ, ভারতবাসী জানেন,—তাঁহাদের ইষ্টদেবতা এক অসীম ভগবানের বিভিন্ন সত্তা মাত্র। ধর্ম্ম-মতের পার্থক্য জন্য ভারতে যে মধ্যে-মধ্যে অনল জ্বলিয়া উঠে তাহা কেবল মাত্র ধর্ম্মমতের বিভিন্নতার জন্য নহে; তাহার পশ্চাতে অর্থ, জমীজমা সংক্রান্ত বিবাদ কিংবা রাজনৈতিক বা সামাজিক দলাদলি বর্ত্তমান আছে।

দু'দিনের সহযাত্রী

[শ্রীগোপাল হালদার]

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে ;—কিন্তু আকাশের মাতামাতি থামবার কোন রকম সম্ভাবনাই দেখা গেল না। প্রথম পেয়ালা চা শেষ হবার পরেও তিন-চার পেয়ালা চা উঠে গেল।

যতীন সেদিনকার আড্ডায় এলো সকলের শেষে।—এসে-ও সে কেমন যেন উন্মনা হয়ে বসে রইল। কাঁধে একটা চড় দিয়ে বল্‌লুম,—

"কি হে যতীন, একেবারে Sphynx-like হয়ে উঠলে যে।"

কেমন ?"

"এলেও দেরীতে,—আবার এসেও বসে রয়েছ একেবারে নিশ্চল নিষ্কর্মা ! ভাবছ কি ?"

"অনেক কালের পুরোনো ভাবনা।"—তার স্বরটা খুব গম্ভীর।

"অর্থাৎ—?"

"দুনিয়ার আদি যুগ থেকে যা নিয়ে সবাই ভেবেছে—"

"যেমন ?"

"যেমন প্রেম।"

"পাঁচ বৎসর হ'ল বিয়ে হয়েছে,—এতদিনেও কি ও রসটা অম্ল হয়ে ওঠে নি ?"

"না। সেটা যে অম্ল-মধুরের মিক্‌শ্চার, সে জ্ঞান আমার আছে। তবে বছর-দশেক আগেকার একটি চেনা মুখ দেখে, কথাটা নতুন করে ভাববার অবসর জুটেছে।"

"কে সেই সৌভাগ্যবান্ বা সৌভাগ্যবতী শুনতে পাই ?"

"তাঁকে তোমরা চিন্‌বে না,—কিন্তু কাহিনীটে শোনাতে আমার আপত্তি নেই—"

শোনবার জন্যে আমরা সবাই যতদূর পারি ঝুঁকে পড়লুম। যতীন একবার বাইরের দিকে চেয়ে, আবার আমাদের মুখের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে সুরু করলে,—

"আমার বাবা বর্ম্মায় উকিল ছিলেন, এ কথাটা তোমরা অনেকেই জান। বাবা তখন মারা গেছেন সত্য, কিন্তু মা তখনো আশায় ছিলেন,—অনতিবিলম্বে তাঁর কৃতী পুত্র যখন এসে পিতার মসনদে বসবে, তখন তাঁর পসারের কতকটা তার ভাগ্যে জুটবেই জুটবে। অন্ততঃ বর্ম্মার পথে যে সোণা কুড়িয়ে পাওয়া যায়,—তখনকার বাঙ্গালীর কাছে এ কথাটা মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায় নি। আর জানই ত,—আমার ঘটে কিছু না থাক্‌লেও, আমি তাকে একদিন সোণায় পুরিয়ে নেবার আশায় বর্ম্মায় কয়েকদিন পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করেও বসেছিলেম।

সেবার ছিল আমার ল'এর শেষ পরীক্ষা। আমি বরাবর কল্‌কাতায় পড়াশুনা করছি। দিনক্ষণ দেখে সেবারও বেরিয়ে পড়লুম। বই-এ ভরা তোরঙ্গটার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করে, বিছানাটা সবেমাত্র বিছিয়ে একটু স্থির হয়ে বস্‌বার উপক্রম করছি, এম্‌নি সময়ে একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমার ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, "নমস্কার"।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে কোন রকমে নমস্কারটি ফিরিয়ে অভ্যর্থনা করতে না করতেই তিনি বল্‌লেন, 'এ কেবিন আপনার ?' আমি বল্‌লুম, 'হাঁ।'

'বড় খুসী হলুম। পাশের কেবিনেই আমরা আছি। পথে একজন বাঙ্গালী পেলুম এত কাছে ; বেশ আলাপে সময়টা যাবে।'

আমিও বেশ একটু খুসী হয়েছিলুম। আনন্দ জ্ঞাপন করতে আমিও ত্রুটি করলুম না। ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে আলাপ করতে লাগলুম। আজ বছর-কুড়ি ধরে' তিনি উত্তর-বর্ম্মার একটা সহরে কাঠের কারবার করছেন। বর্ত্তমানে স্বাস্থ্যলাভের আশায় চেঞ্জে আসছেন। সে উপলক্ষে বাঙ্গালা দেশটাকেও বহুদিন পরে একবার দেখে যাবেন। আমার পরিচয়ও তিনি জেনে নিলেন। দেখলুম বাবার নাম তাঁর অজানা নেই। জিজ্ঞেস করলেন, পরীক্ষার পর আমি কি করতে চাই। সাড়েপনেরআনা বাঙ্গালী ছেলে এক্ষেত্রে যা জবাব দিয়ে থাকে, আমিও তাই দিলুম ; বল্লুম, 'ওকালতি করব একরকম ঠিক্ করেছি।'

'বেশ, আপনার বাবার পশারটা যদি অধিকার করে বস্‌তে পারেন'—

'তাই ত আশা'।

'দেখুন ; খুবই সুবিধে আছে আপনার।'

কথা চল্‌ছিল, জাহাজে আমার চেনাশোনা আর কেউ আছেন কি না। আমি বল্‌লুম, 'না, আপনি আর কোনো বাঙ্গালীকে দেখেছেন না কি ?'

'জাহাজে আপনি ও আমরা দু'জন ছাড়া ত আর কাউকে দেখি নি।' এই তৃতীয় ব্যক্তিটির কথা আমি এই প্রথম শুনলুম। পরে শুনলুম, ইনি তাঁর কন্যা,—ইণ্টারমিডিয়েট্ পাশ,—বর্ত্তমানে পিতার শরীর ভাল নেই বলে, তাঁর সাথেই চলেছেন। পরে কল্‌কাতায় বি-এ পড়্‌বেন। ভদ্রলোক কথায়-কথায় আমায় জানালেন, 'আমার ইচ্ছে, ওকে আর না পড়ানো।' কল্‌কাতার দু'একটা দেশ-হিতকর অনুষ্ঠানের আমি উদ্যোগী সভ্য ;—জিজ্ঞেস করলুম, 'না পড়াবার কারণ ?'

'ওর ইচ্ছে পড়ে। আমি কিন্তু ভাবছি,—আমি ত বুড়ো হতে চল্‌লুম। এখন ওর বিয়ে দিয়ে যা হোক্ একটা ব্যবস্থা করে যাই। নইলে শেষে ও দাড়াবে কোথায় ?'

যাঁর সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল,—আমি তখনো তাঁকে চোখেই দেখি নি। তবুও তাঁর জন্য একটা খনা বা লীলাবতীর জীবনের ব্যবস্থা দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করলুম না।—আমার বয়স তখনো পঁচিশের নীচে, আর তাঁর পঞ্চাশের কাছাকাছি।

আরো দু-চার কথার পর ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন ; আমাকে তাঁর ক্যাবিনে নিমন্ত্রণ করলেন। সমস্ত জিনিস তখনো গুছিয়ে উঠ্‌তে পারি নি,—তাই ঘণ্টাখানেক সময় চেয়ে তাঁকে বিদায় দিলুম।

কিছুক্ষণ পরে একটি তরুণী আমার কেবিনের সাম্‌নে দিয়ে ডেকের দিকে চলে গেলেন। ক্ষণিকের তরে তাঁকে দেখ্‌লুম। মনে করো না, চারি চক্ষের মিলন হয়ে গেল। তবে, একটু পরেই আমি যখন দূরের প্রায় মিলিয়ে-যাওয়া বম্মার তট-রেখাটাকে দেখ্‌বার জন্য ডেকে গিয়ে দাড়ালুম, তখন চঞ্চল চোখটা নিষেধ না মেনেও যে তার দিকে দু'একবার ফিরেছিল, এ কথা সত্য। আর আমার এটাও বোধ হয় নিছক কল্পনা নয় যে, আর একজনের আঁখি দুটি ঠিক্ রেঙ্গুনেরই সীমার দিকেই বদ্ধ ছিল না। আমি 'শকুন্তলা' থেকে 'Romeo and Juliet' পর্য্যন্ত সমস্তই একরকম পড়েছি ; কিন্তু কার্য্য-কারণের বিচিত্র সম্বন্ধের অলিগলিতে ঘুরে যে জ্ঞানটা আমার জন্মেছে, তাতে মনে হয়, এটি ঠিক্ দুজনের দুজনকে ভালবাসা নয়,—love at first sight নয়। কেন না, তিনি তরুণী এবং সুন্দরী হলেও, রূপের ভাতিতে আমার চোখ-দুটো ঝল্‌সে দিয়ে যান্ নি, আর আমার সৌন্দর্য্য দেখে যে তাঁর গণ্ডদেশ আরক্তিম হয়ে ওঠে নি, তার সাক্ষী আমি স্বয়ংই আছি। অবশ্য বম্মার কালো রেখাটা মিলিয়ে গেলেও, আমরা ডেকেই দাঁড়িয়েছিলুম সমুদ্রের জলের দিকে দৃষ্টি মেলে ; এবং সে সময়টা যে বরাবর জলের দিকেই চেয়েছিলুম, এমন নয়। কিন্তু তোমরা জানো, 'কিনেমায়' কোনো তরুণী,—তিনি অপরূপ রূপবতী নাই বা হলেন,—যদি অদূরে বসেন, তা হলে অবাধ্য চোখ মাঝে-মাঝে অত সাধের চলন্ত চিত্রকেও অবজ্ঞা করতে দ্বিধা করে না। আমার বেলা ত এই তত্ত্ব খাটে বলে বিশ্বাস ; তাঁর বেলা যে অন্য কিছু ছিল, এমন ভাব্‌বার মত কোনো কারণ আজ পর্য্যন্ত আমার ঘটে নি।

মাঝখানে একবার নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলুম। আকাশ আমি নিত্যই দেখি, আর সমুদ্রও আমি নতুন দেখ্‌ছি নে ; তবু একবার উন্মনা হয়ে তাদেরি মেলামেশাটা দেখ্‌ছিলুম। হঠাৎ হাতের ঘড়ির দিকে চাইতে দেখ্‌লুম—প্রায় একঘণ্টা হল ডেকে এসেছি। কোনো দিকে আর না চেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে যাচ্ছিলুম,—এমন সময় হঠাৎ মনে হল, যেন আমার হাতে কার আঁচল-ঢাকা হাতখানা ঠেকে গেল ; সঙ্গে-সঙ্গে একটা শব্দ হল,—বেশ অস্ফুট—'টুং'। ফিরে চাইতেই দেখ্‌লুম, আমারি দু'ধাপ ওপরে সিঁড়ি বেয়ে নামছেন এক তরুণী !—তিনি আর কেউ নন! অপ্রতিভ হয়ে কি করব ভাব্‌ছিলুম ; কিন্তু ভাব্‌নার শেষ খুঁজে পেতে না পেতেই দেখ্‌লুম, তাড়াতাড়ি নেমে চঞ্চল পদ-বিক্ষেপে তিনি ছুটে পালালেন। তাঁর মুখ লজ্জারুণ ছিল না ; কিন্তু খুব স্বাভাবিক ছিল বলেও মনে হচ্ছে না।

হাবার মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, ধীরে ধীরে কেবিনে গিয়ে ঢুকলুম। মনটা নাড়া খেয়েছিল সত্য, আর ঐ 'টুং'-এর রেশটুকু মাঝে-মাঝে রক্তে নেচে উঠ্‌ছিল, এ-ও সত্য ; কিন্তু ঘণ্টা-দুই বাদে মনোমোহনবাবু যখন অনুযোগ দিয়ে এসে দাড়ালেন, তখন খুব বেশী দ্বিধা না করে, তাঁর সঙ্গে তাঁর কেবিনে চলে গেল্‌ম। এ সময়টা আমি কেবল

কল্পনার গুঞ্জনই শুনি নি,—কাণ পাতলে আমার ঘর থেকে হয় ত ল-এর গুঞ্জনও শুন্‌তে পেতে।

'মা হিরণ, এই সেই যতীনবাবু, যিনি আমাদের পাশের কেবিনে কল্‌কাতা যাচ্ছেন।'

দুজনেই একটু চম্‌কে গেলুম সত্য, কিন্তু দুজনের নমস্কারই যখন খুব অপরিচিতের মত চলে গেল, তখন কি চোখে একটা দুষ্ট মির চটুলতা খেলে গেল না? সে.জানি নে; কিন্তু মনোমোহনবাবু সবিস্তারে আমার পরিচয় দিতে কিছু-মাত্র ত্রুটি করলেন না। কিছুক্ষণ পরে আলাপ একটু জমে উঠ্‌ল। কথাটা হচ্ছিল হিরণের পড়াশুনা নিয়ে। বলা বাহুল্য, আমার তর্কের সুর চড়ে গিয়েছিল; এবং আমি শ্রীমতীর কাছ থেকে মডার্ণ হিসাবেও পুরোপুরি সার্টিফিকেট পেতুম।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে যখন বিদায় নিতে চাইলুম, তখন মনোমোহনবাবু বারবার আমাকে এ কয়টা দিন তাঁদের দু'জনের সাতে একটু আলাপে কাটাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। আমি তাঁর নিমন্ত্রণের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করব বলে ভরসা দিলুম। আবার ছোট একটি নমস্কার করে হিরণ বল্‌লে, 'আপনার পড়াশুনার খুব ক্ষতি হবে জান্‌ছি; তবু স্বার্থের খাতিরে অনুরোধ করতে হচ্ছে,—'

'না—না, সে-কি কথা। আমি পড়াশুনা এ দুদিনে কিই বা করতুম, ইত্যাদি' বলে একটু প্রসন্ন মনে বিদায় নিলুম।

ঘরে ফিরে সে দিনটা আর আমি পড়ি নি, এ কথা ঠিক্। কিন্তু একেবারে বাইরের দিকে চোখ মেলেও বসে রইলুম না। সেদিনটা আমার বেশ একটু মিষ্টি লাগ্‌ল।

পরদিন সমস্ত সকালটা আমি আলাপে মস্‌গুল হয়ে কাটিয়ে দিলুম। বিকালের দিকে ঝড় উঠ্‌ল। সমুদ্রে আমি এই প্রথম নই,—তাই ততটা ভয় পেলুম না। কিন্তু মনোমোহনবাবু ও হিরণের অদৃষ্টে এমনটি আর কখনো ঘটে নি ..তাঁরা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

সূর্য্য অস্ত যেতে তখনো ঘণ্টা-দুই বাকী ছিল; কিন্তু সূর্য্যাস্ত দেখবার জন্য আমরা বেশ ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলুম। দক্ষিণ কোণে একখানা মেঘ ছিল; সূর্য্যের সিঁদুর পরে' গোধূলির লগ্নে যখন সে নব-বধূর বেশে দাঁড়াবে, তখন তার মাধুরিমাটুকু দেখবার জন্য ছিল আমার ও হিরণের যত লোভ। মনোমোহনবাবুও সে দৃশ্যটুকুর অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর তিনি আর থাকবেন না, তা জানা ছিল।—ঠাণ্ডা হাওয়া তাঁর সহ্য হয় না, এই তাঁর আজন্ম বিশ্বাস বলে হিরণের মুখে শুনেছিলুম। কিন্তু সূর্য্যাস্তের লালিমার সূচনা হতে না হতেই দেখলুম, মেঘে পশ্চিম আকাশ ছেয়ে গেল। বড় আপ্‌শোষ হল। কিন্তু মিনিট পনেরর মধ্যে দেখ্‌লুম সমস্ত আকাশ আর জল গাঢ় কালিতে ভরে উঠ্‌ল। মনোমোহনবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, 'চল মা, এবার ঘরে চল।' হিরণ ফিরে বল্‌লে, 'তুমি যাও বাবা,—আমি যাবো'খন।'

মনোমোহনবাবু বল্‌লেন, 'তা হলে আমিও আর একটু বস্‌ছি।' বলে' বস্‌বার চেষ্টা করতেই হিরণ তাঁকে ঠাণ্ডায় থাক্‌তে নিষেধ করে', গায়ের শালখানা আরো একটু এঁটে জড়িয়ে দিয়ে একরকম জোর করে' কেবিনে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি যাবার আগে বারবার আমাকে ঝড়ে বাতাসে বেশী ক্ষণ থাক্‌তে নিষেধ করে নেমে গেলেন।

হাওয়া ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছিল। কিছুক্ষণ পরে রীতিমত ঝড় সুরু হয়ে গেল। সমুদ্রের বুকে অতবড় ঝড় আমার অদৃষ্টেও কখনো ঘটে নি। প্রথমটা দেখে বেশ আনন্দ পেয়েছিলুম; ঢেউয়ের তালে তালে হৃদয়টাও বেশ নেচে উঠ্‌ছিল। কিন্তু কবিত্ব জিনিসটে বাইরেকার আঘাত বেশীক্ষণ সইতে পারে না,—আমরাও পার্‌লুম না।

রেলিং ধরে যতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম, ততক্ষণ ছিলুম বেশ। কিন্তু যখন দেখলুম ঝড়ের দেবতার মাতামাতি বেড়ে উঠ্‌ছে, তখন আর দাঁড়িয়ে থাক্‌বার ভরসা হল না। কেবিনে ফিরবার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। তবু পাশে একটি তরুণী দাঁড়িয়ে, আর আমি পুরুষ হয়েও ডেক্ ছাড়তে পারলে বাঁচি, ভেবে পুরুষত্বের অভিমান জেগে উঠ্‌ল। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু হিরণেরও বোধ হয় বেশীক্ষণ থাক্‌বার সাহস হল না। একটু পরেই সে বল্‌লে, 'চলুন, নীচে যাই,—ঝড় বেড়ে উঠ্‌ল।'

'হাঁ চলুন। উচিত ছিল আগেই ফেরা।'

'কেন?'

'বাবা আবার রাগ করতে পারেন'।

'রাগ করবার ত কোনো কারণ নেই,—আপনি ত আমায় একলাটি ফেলে যাননি—'

চল্‌তে-চল্‌তে আমরা কথা বল্‌ছিলুম। কিন্তু মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল,—তার আর সমাপ্তি হল না। রূপকথার অজগরের মত গর্জ্জাতে-গর্জ্জাতে ঢেউগুলি এসে পড়ল। তাদেরই অগ্রগামী একটা—বিদ্রোহীর সেরা—একেবারে সমস্ত শক্তি সংহত করে, জাহাজটাকে ভীষণ জোরে এক আঘাত করলে। জাহাজের সমস্ত হৃদয়টা কেঁপে উঠ্‌ল,—সমস্ত ওলট্-পালট্ হয়ে গেল। হিরণ হঠাৎ টাল সাম্‌লাতে পারলে না;—একেবারে আমার বুকের ওপর এসে পড়্‌লো। সেই মুহূর্ত্তে আমি এক হাতে রেলিংটাকে ধরে, অপর হাতে তাকে একেবারে সবলে আমার বুকে চেপে ধরলুম। আমার সে ধরার মধ্যে বিন্দুমাত্র চিন্তা ছিল না; কণামাত্র আয়াস ছিল না। যন্ত্রের পুতুলের মত আমি তাকে ঘিরে ধরলুম, অথচ তার কল্পনাটুকুও কোনো দিন আমার মনে ঠাঁই পায় নি। হয় ত আমার জ্ঞান ছিল না; হয় ত আমার অজ্ঞান-লোকের সমস্ত চৈতন্য জেগে উঠেছিল।

দৃঢ়-মুষ্টিতে তার হাত চেপে ধরে, যখন আমি মনোমোহন-বাবুর কেবিনে এসে ঢ়ুক্‌লুম, তখনো আমার সমস্ত হৃদয়টা কাঁপছিল,—আমার চোখ ছুটো উদ্দীপ্ত হয়েছিল; কিন্তু কোনো দিকে আমার নজর ছিল না। মনোমোহনবাবু চেয়ার ছেড়ে হাঁ করে উঠে দাঁড়ালেন,—যেন চকিত হয়ে উঠলেন। কি হল বুঝতে না পেরে হিরণের মুখের দিকে তাকাতেই দেখলুম, তার সমস্ত মুখখানা লজ্জারুণ হয়ে উঠেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝ্‌তে আর আমার দেরী হল না; তৎক্ষণাৎ হাতখানা ছেড়ে দিয়ে একেবারে অপ্রতিভ হয়ে উঠ্‌লুম। চোখে দেখা সম্ভব হলে হয়ত দেখ্‌তে পেতুম, আমার সমস্ত মুখটার ওপর আগুনের ভাতি ফুটে উঠেছে।

যাক্, সেরে নিয়ে হাসি টেনে বল্‌লুম,—"ঝড়ের নাগর-দোলায় উনি টাল সাম্‌লাতে পারছিলেন না। আমাকে কেবিন্ পর্য্যন্ত তাই এগিয়ে দিতে হচ্ছে।"

মনোমোহন বাবু হেসে বল্‌লেন, "আমিও ভাবছিলুম, এ ঝড়ে তোমরা কি করে দাঁড়িয়ে আছ।"

"দাঁড়িয়েছিলুম মন্দ নয়; কিন্তু ফিরবার সময় ঝড়ের নাচুনির সাতে চলাই হয়েছিল দায়।"

এতক্ষণে হিরণের মুখে কথা ফুটল। "আপনাকে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব। আপনি না থাক্‌লে এতক্ষণে ডেকের ওপর মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে থাক্‌তে হত।"

শঙ্কিত মুখে মনোমোহন বাবু বল্‌লেন, "কেন? কি হয়েছে?"

'ফিরবার পথে হঠাৎ যখন প্রকাণ্ড একটা ঢেউ এসে সমস্ত জাহাজখানাকে নিষ্ঠুর ভাবে একটা আছাড় দিয়ে গেল, আমি তখন তাল রাখতে না পেরে উপুড় হয়ে পড়ে যাচ্ছিলুম। ভাগ্যিস্ ইনি ধরে ফেল্‌লেন।'

বৃদ্ধের সরল প্রাণ আমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠ্‌ল। তিনি আমায় বার-বার আশীর্ব্বাদ করতে লাগ্‌লেন। আমি যতই আপত্তি জানাতে লাগলুম, ততই তাঁর প্রশংসার পালা বেড়ে চল্‌ল।

সে দিন সমস্ত রাত্রি ল'-এর মোটা-মোটা বইগুলো কেবিনের কোণে পড়ে রইল। আমি ট্রাঙ্ক থেকে শেলি খুলে নিলুম, বায়রণ পড়্‌লুম। আসন্ন পরীক্ষার জন্য বাঙালীর ছেলেরও কোনো উৎকণ্ঠা দেখা গেল না।

সমুদ্রের জল প্রায় শেষ হয়ে আসছিল;—কাল বিকেলেই কলকাতার জেঠিতে গিয়ে জাহাজ ভিড়বে। সমস্তটা দিন ডেক-এ আর কেবিন-এ যাওয়া-আসাতেই কাটিয়ে দিলুম।

মনোমোহনবাবুর কেবিনে সেদিনও আমাদের খুবই গল্প জমেছিল; কিন্তু সে গল্পের মধ্যে না ছিল আর-আর দিনের সরলতা, না ছিল স্বচ্ছন্দতা। হিরণ ও আমার মধ্যে কথা চল্‌ছিল বেশ; কিন্তু কেমন একটা খাপছাড়া ভাবে। একজন আর একজনের দিকে চোখ তুলে কথা বল্‌তে কেমন একটা বাধ-বাধ ভাব, কেমন একটা লজ্জা এসে জুট্‌ত। এক-আধ কথার বেশী আমরা ছ'জনে এক নিঃশ্বাসে পরস্পরকে বলি নি; আবার তাও নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টিতে হয় নি।

বিকালের দিকে জাহাজ-শুদ্ধ লোক এসে ডেকে ভিড় করলে। সমুদ্রের বুকে শেষ সূর্য্যাস্ত,—তাও আবার কাল্‌কের ঝড়ের পরে,—তাই ডেকে সকলেই এসে জুটেছিলেন। মনোমোহনবাবুরা যখন ডেকে এলেন, তখন জাহাজের প্রায় সকল আসনই অধিকৃত। একখানা মাত্র আসন শূন্য ছিল। তাঁর কোনো আপত্তিই টিঁক্‌ল না,—বাধ্য হয়েই সে আসনখানা তাঁকে অধিকার করতে হল। আমি রেলিং ধরে দাঁড়ালুম। অসংখ্য অনুযোগের পর গল্প চল্‌ল;—আজকের গল্পের মূল ছিল এই বাঙালার পাড়াগাঁ। বাঙালা

আমি দেখেছিলুম ; কিন্তু তার পাড়াগাঁয়ের সাতে চাক্ষুষ পরিচয় আমার তখনো হয় নি। হিরণের ত বাঙালার সাতে পরিচয়ই ছিল না। মনোমোহনবাবু বল্‌ছিলেন তাঁর বাল্যের ও যৌবনের বাঙালার কথা ; কুড়ি বছর আগে যাকে তিনি ছেড়ে এসেছিলেন বড় দুঃখে, বর্ম্মার মুলুকে ভাগ্যান্বেষণে। তাতে প্রবাসীর সমস্ত ব্যথা, সমস্ত করুণা, সমস্ত আপশোষ্ মেশানো ছিল ; নির্ধনের যত দুঃখ, বাঙালার মাটী তাঁকে সে সকলই দিয়েছিল ; কিন্তু ধনীর সমস্ত হৃদয়টাও ভরে উঠ্‌ছিল বাঙালার পল্লীর শান্তির, আনন্দের আবাসগুলির কথা বল্‌তে-বল্‌তে। চোখে তাঁর জল ছিল না ; কিন্তু সেই অদেখা, অচেনা বাঙালার পাড়াগাঁয়ের কথা ভাব্‌তে-ভাব্‌তে আমিও বারবার দীর্ঘশ্বাস যে না ছেড়েছি, তা নয়। সেদিনের শোনা বাঙালার সাতে আজকের বাঙালার কত তফাৎ তা আমায় আর বলতে হবে না। কিন্তু আমি আজও ঠিক্ জানি নে, কোন্ বাঙালা সত্যিকার ;—তাঁর হাসি-আনন্দে উচ্ছল বাঙালা, না আমাদের কলহ-কুশল বাঙালা।

কথার ঘোরে সন্ধ্যা নেমে এসেছিল,—সে দিকে আমাদের দৃষ্টিই ছিল না। হঠাৎ মনোমোহনবাবু একবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বসতে, সেটা তাঁর খেয়ালে এল। তিনি বল্‌লেন, "এই যা। কথায়-কথায় রাত হয়ে গেল যে!—চল, এখন নীচে চল।"

"তুমি যাও বাবা, আমি একটু পরেই নীচে যাচ্ছি।"

"সে কি! না, এ রাত্রে আর ডেকে থাক্‌বার কোনো দরকার নেই।"

"আজকার সন্ধ্যাটাই শুধু বাবা ;—কাল ত কল্‌কাতায় আর এ সমুদ্রের দেখা মিলবে না।"

"আচ্ছা, তবে থাক ; কিন্তু দেখো, কালকে'র মত একটা বিভ্রাট ঘটিয়ে বসো না।"

কি করব ঠিক করতে না পেরে, আমিও তাঁর পিছন-পিছন নেমে যাচ্ছিলুম। কিন্তু তিনি বল্‌লেন, "সে কি যতীনবাবু, আপনিও যে চল্‌লেন দেখছি। আর একটু থেকে যান্ না।"

আমি 'হাঁ' 'না' কি বলতে যাচ্ছিলুম ; কিন্তু তিনি আবার বল্‌লেন, "আপনি একটু থেকেই যান। একেবারে ওকে নিয়ে আস্‌বেন। বেশী দেরী করবেন না, কিন্তু।"

মনোমোহনবাবু চলে গেলেন ; কিন্তু বিপদের পালা এল এবার। হিরণ মুখ নুইয়ে চেয়ারে বসে রইল। আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে সমুদ্রের শোভাটা দেখতে লাগলুম। কিন্তু, কিছু না বলাটাও ক্রমেই বিশ্রী হয়ে উঠ্‌ছিল। মিনিট পাঁচেক পরে আমি বল্‌লুম, 'চলুন, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের বুকে ওই তারাগুলোর ঝিকি-মিকি দেখা যাক্।'

'চলুন' বলিয়া হিরণও উঠে দাঁড়াল।

আবার চুপ করে থাকা বেখাপ্পা হয়ে উঠ্‌ল। কি বলব ভেবে না পেয়ে আমি বল্‌লুম, 'আজ যদি আকাশে চাঁদ থাকত, তাহলে দেখবার মত দৃশ্য দেখতে পেতেন।'

'আজকের দৃশ্যটাও খুবই সুন্দর।'

'কিন্তু এর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর হত, যদি চাঁদ আকাশে থাক্‌ত।'

'হাঁ, কবিতা ও উপন্যাসে সমুদ্রের সে দৃশ্যটার বর্ণনা পড়েছি ; কিন্তু তাকে উপভোগ করবার সৌভাগ্য হল না।'

এ রাত্রিতে আমার কেবলই বায়রণকে মনে পড়ছে,—
Roll on! Roll on! thou deep blue ocean, roll!
—ঐ একটা লোক, যাঁর সাতে সমুদ্রের তুলনা চলে। সমুদ্র ছিল তাঁর পরমাত্মীয়,—ভাইয়ের মত,—একই উপাদানে গঠিত,—উদ্বেল, উচ্ছৃঙ্খল।

দুজনেরই মুখের আগল খুলে গেল,—রেলিংয়ের উপর ভর করে আমাদের গল্প চল্‌ল।—বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই,—স্বচ্ছ অনাবিল ধারে। পদ্মার পারে বাড়ী, আমার এক বন্ধু আমায় একবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন জ্যোৎস্নায় পদ্মার বুকে নৌকা ভাসিয়ে একবার ছুটিটা কাটিয়ে দেবার জন্য। আমি তার-মুখে-শোনা পদ্মার কথা বলছিলুম। হিরণ বললে, বর্ম্মায় তাদের যে বাড়ী আছে, সেও একটা নদীর ধারে। অদূরে পাহাড়,—তারি ভিতর দিয়ে নদীটা এঁকে-বেঁকে এসে তাদের কাঠের বাড়ীখানার পা ছুঁয়ে তরতর করে চঞ্চল-পদে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। পদ্মার মত সে নদী বিশাল নয়, ভয়ঙ্কর নয় ; কিন্তু তার বুকে বজরা ভাসিয়ে কি আনন্দের স্বাদ তারা কত জ্যোৎস্না রাত্রিতে পেয়েছে, সে গল্প হিরণ অশ্রান্ত ভাবে বলে যাচ্ছিল : গল্পের মধ্যে সে ডুবে পড়েছিল ;—তার বিন্দুমাত্রও খেয়াল ছিল না। দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলুম ; গল্পের উৎসাহে কখন অলক্ষ্যে আমরা দুজন দুজনার কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিলুম, তাও দেখি নি। আমি

শুনছিলুম,—তন্ময় হয়ে শুনছিলুম। কিন্তু আমার অভিনিবেশ ভেঙ্গে গেল;—দেখলুম, হিরণের একটা হাত কখন আমার একটা হাতের মধ্যে এসে পড়েছে। ভাবতেই সমস্ত শরীর দিয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল,—শিরায় আমার বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সংযমের চূড়ান্ত পরীক্ষা বোধ হয় আমার সে মুহূর্ত্তে হয়ে গিয়েছিল। আমি পাশ হলুম;—ভয়ে, পাছে হিরণের চোখে পড়ে যায়। কিন্তু তার চোখে তখন ভেসে উঠেছিল সুদূর বর্ম্মার কোন্ একখানা সুশ্রী কুঠী। উৎসাহ তার বেড়েই চলল। সে সরে এল,··আরো কাছে...তার সুগন্ধি কেশ আমার নিঃশ্বাসে কেঁপে উঠ্‌ছে ..তার কাণের দুল দুলে-দুলে আমার গাল স্পর্শ করছে... তার নিঃশ্বাস আমার ঠোটের উপর পড়ছে......কি তীব্র তৃষ্ণা.....ওঃ আর পারি নে......হাতটা সজোরে চেপে ধরলুম· তার পর......সে স্বপ্নোত্থিতের মত চমকে উঠল।

ডেকে প্রায় লোক ছিল না—অন্ততঃ আমাদের কাছে কেউ ছিল না। অল্প অন্ধকারে আমাদের কেউ দেখ্‌তে পেলে না।

ঘণ্টাখানেক পরে কেবিনের দিকে চল্‌লুম। সেদিন সেখানে আমার মনে হল, জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য আজ সফল হয়ে উঠেছে। এর পরে যদি সমস্ত জীবনের উপর ব্যর্থতা ঢেলে দিয়েও আমার সে কাঙ্ক্ষিতা এসে দাঁড়ায়, তবু আমি তাকে বুকে চেপে ধরব সমস্ত প্রাণ দিয়ে। বিজয়-গর্ব্বে আমার বুক বারবার দুলে উঠল; বিজয়-গর্ব্বে হিরণের চোখ বারবার জ্বলে উঠল,—তাও আমি সগর্ব্বে দেখতে পেলুম।

সমস্ত রাত্রিটা আমার আধ-ঘুমে, স্বপ্নের পর স্বপ্নে কেটে গেল। সকাল বেলা নিদ্রা-জড়িত চোখ দুটো নিয়ে যখন দাঁড়ালুম, তখন ডায়মণ্ডহারবার দেখা যাচ্ছে। দেখলুম, হিরণেরও চোখে-মুখে ভালো-ঘুম-না-হওয়ার সমস্ত চিহ্ন প্রস্ফুট রয়েছে। বুঝলুম, আমাদের দুজনার অদৃষ্ট একসঙ্গে গাঁথা হয়ে গেছে।

মনোমোহনবাবু বললেন, 'এই দুটো দিন বাবা, তুমি বড় আনন্দেই আমাদের রেখেছিলে......তোমায় ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হয়।'

তিনি আমার ঠিকানা জেনে নিলেন। আমিও তাঁর কলকাতার ঠিকানা ও বর্ম্মার ঠিকানা টুকে নিলুম। বারবার করে তিনি আমাকে চিঠি দিতে বলে দিলেন।

আউটরাম্ ঘাটে গাড়ীতে মাল চাপিয়ে, আমি শেষবার বিদায়ের জন্য দাঁড়ালুম। বহু আশীর্ব্বাদের মধ্যে পায়ের ধূলি নিয়ে হিরণের দিকে তাকালুম। মুখে আমি কিছু বললুম না, শুধু একটি নমস্কার,—ছোট্ট একটি নমস্কার! কিন্তু আমাদের দুজনের চোখে অনেক কথাই হয়ে গেল।

মেসে ফিরে কোনো রকমে জিনিসপত্র গুছিয়ে, বিছানাটা পেতে আমি শুয়ে পড়লুম;—ঘুম এল না,—এক মিনিটের জন্যেও না। বিকালের দিকে আর মোটে টিকতে পারলুম না। ট্রামের টিকেট কিনে একেবারে ইডেন গার্ডেনে গিয়ে পৌঁছলুম। সেদিনকার বাজনায় আমার মন বসল না; ছেলেদের নাচুনি আমার ভাল লাগল না; বাগানের অসংখ্য আঁকা-বাঁকা পথ আমায় তৃপ্তি দিতে পারলে না। তিন দিন চলে গেল। পরীক্ষার দিন ভোরবেলা দেখলুম, ল'-এর বই-এর ওপরে ধুলা জমেছে। সেবার পরীক্ষায় আমায় ফেল করতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলে; আমি কিন্তু বিন্দুমাত্রও আশ্চর্য্য হই নি। পরীক্ষা দিয়ে আমি ঘরে টিকতে পারলুম না। ভবানীপুরের যে বাড়ীতে তাদের উঠবার কথা, সে বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম। অনেক ডাকাডাকির পর শুনলুম, মনোমোহন বাবু একদিন আগে ওয়াল্টেয়ারের দিকে চলে গেছেন, হিরণ তার সঙ্গে গেছে। তখনই একখানা পত্র মনোমোহনবাবুকে ও একখানা হিরণকে লিখে ডাকে ছেড়ে দিয়ে, আমি ধুঁকতে-ধুঁকতে মেসে এসে পৌঁছে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। দিন চার পরে দুখানা পত্র এসে পৌঁছাল;—খুলতে আমার বুক কাঁপতে লাগল। ছমাস পর্য্যন্ত সপ্তাহে তিনখানা করে পত্র আমি হিরণকে লিখেছি;—সে পত্র যে আমার কত আশা-আকাঙ্ক্ষা-আবেগের অভিব্যক্তি, সে তোমরা বুঝবে না। এক বছর পর্য্যন্ত আমরা বেশ উৎসাহের সঙ্গে চিঠি চালালুম। মনোমোহনবাবু এখনো সারতে পারেন নি,—কাজেই হিরণ সে বছর আর পড়লে না। সে আর কলকাতা এল না। ধীরে-ধীরে আমাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে আসছিল;—এমন সময় একদিন চিঠি এল উত্তর-বর্ম্মার একটা ছোট সহর থেকে। মান্দ্রাজ থেকে তাঁরা বরাবর বর্ম্মায় চলে গেছেন। দু'বছর পরেও আমাদের চিঠি চলত—মাসে এক-খানা বা দু'মাসে এক-খানা। বছর তিন যেতে-না-যেতে সেটুকুও থেমে গেল।

পাঁচবছর পরে এক সন্ধ্যায় অসংখ্য হুলুধ্বনির মধ্যে, যখন আমি আমার ঈপ্সিতাকে পাশ্বর্বর্ত্তিনী করে সমস্ত বন্ধু-বান্ধবের ঈর্ষা ও বিদ্রূপের পাত্র হয়ে পুরোহিতের মন্ত্র শুন্‌ছিলুম,—এই কলকাতা সহরে,—হঠাৎ তখন একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র এসে আমার হাতে পৌঁছাল,—সে শ্রীমতি হিরণ-কণা দেবীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত অরুণ গুহের পরিণয়-পত্র।—একই দিনে—একই সহরে! হৃদয়টা কি দুলেছিল? আমার যতদূর মনে পড়ে,—না। তেমনি আশা-আনন্দ-উদ্বেল অন্তরে—আমি বিবাহের সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করে গেলুম। ক্ষণেকের তরেও আমার মনের কোন কোণে একটা 'কিন্তু' এসে ঠাঁই পেল না।

দশ বছর পরে আজ আমার পদ্মাপারের এক বন্ধু লিখেছেন, কি একটা কাজে তিনি কল্‌কাতা আস্‌ছেন,—আশা করেন, আমি ষ্টেশনে থাকব। ঠিক সময়ে এ দুর্য্যোগের মধ্যেও আমি ষ্টেশনে ছিলুম। বন্ধবর একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা থেকে নেমে এলেন। সে গাড়ী থেকে আরো দু'জন লোক নামলেন,—তাঁরি একটি সহযোগী ডেপুটী ও তাঁর পত্নী, আর বছর তিন-চারের একটি অতি সুন্দর ছেলে। আমার বন্ধুটী আমার পরিচয় করে দিলেন, 'মিষ্টার যতীন্দ্র বোস—কল্‌কাতা হাইকোর্টের উকীল'; আর তাঁর বন্ধুটি 'মিষ্টার অরুণ গুহ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর।' কর-মর্দ্দন করতে-করতে নামটা শুনে মনে হ'ল, যেন আর কোথাও এ নাম শুনেছি। মিসেস্ গুহের দিকে ফিরতেই আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম; সমস্তটা আমার পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনিও আমায় ততক্ষণে চিনতে পেরেছিলেন। নমস্কার করে সহাস্য বদনে দু'জনে আলাপ জুড়ে দিলুম;—বহুকাল পরে দেখা, কেমন আছি, বাড়ীতে কে-কে আছে, ছেলেপিলে কেমন আছে ইত্যাদি। তার পর তিনি সগৌরবে সেই ছোট ছেলেটির দিকে ফিরে বল্‌লেন, 'নন্টু, প্রণাম কর।'

আজ ঝড়ের সন্ধ্যায় আমি সেদিনকার বঙ্গোপসাগরের বুকের ঝড়ের সন্ধ্যার কথাই ভাবছিলুম;—ভাবছিলুম, যদি অদৃষ্টের বিরূপ তাড়নে আমরা ছিট্‌কে না পড়তুম, আর মাসখানেক যদি আমাদের দেখা-শোনা থাক্‌ত, তা হ'লে আজ যাঁকে আমি নিতান্ত অপরিচিতের মত অভ্যর্থনা করতে পারছি, তাঁকেই হৃদয়ের পূজা দিতুম।—সে পূজা ব্যর্থও হ'ত না।—তাঁর সাতে জীবনটাকে বেঁধে দিলে, আমার জীবনটা যে নেহাৎ ছন্নছাড়া হত, এ বিশ্বাস আমার নেই।

সে দু'দিনের সম্পর্কটা কি আমার চোখের নেশাই ছিল? প্রাণের তার একটুও ছুঁতে পারে নি?—বোধ হয় পেরেছিল। তবে আজ কেন তাকে প্রেম বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছি? শুধু দু'দিনের বলে?—হোক্ দু'দিনের, সে কয়টা দিনের জন্য ত সে সত্য ছিল! যাকে ভালবাসা বলি, অনন্ত-কাল সে স্থায়ী হতে না পারলে,—না হবার সুযোগ পেলে কি'সে ভালবাসা নামের অযোগ্য? এই কথাটাই এ সন্ধ্যায় কেবল আমার মনে আস্‌ছে। এর জবাব দেবে কে?

শোক-সংবাদ

৺ রায়সাহেব বিহারীলার সরকার

'বঙ্গবাসী'র বিহারীলাল সরকার—আমাদের এত কালের বিহারী দাদা আর ইহলোকে নাই,—কাশীধামে সেদিন তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। বিহারীদাদার মৃত্যু অকাল-মৃত্যু নহে; তবুও মনে হয়, বিহারীদাদা আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে ভাল হইত। বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবক, 'বঙ্গবাসী'র আমরণ কর্ম্মধার, সুললিত গান-লেখক, চিন্তাশীল প্রবন্ধকার ও ঐতিহাসিক বিহারীদাদার অমায়িকতা, সস্নেহ ব্যবহার, পাণ্ডিত্য আমরা শীঘ্র ভুলিতে পারিব না। এমন নিরহঙ্কার, সরলপ্রকৃতি মানুষ এখন ক্রমেই দুর্লভ হইতেছে; বাঙ্গালা সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে বহুদিন পূর্ব্বে যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, একে-একে তাঁহাদের প্রায় সকলেই অন্তর্হিত হইলেন। আমাদের বিহারীদাদার অভাব আর পূরণ হইবে না। আমরা তাঁহার একমাত্র পুত্রের এই পিতৃশোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

শকুন্তলা

[শ্রী——].

যেই দিন শকুন্তলা কণ্বের আশ্রমে,
অতিথি-সেবার ভার লইলা সম্ভ্রমে;
সেই দিন পুণ্যোজ্জ্বল শান্ত তপোবনে,
লুব্ধ রাজ-শক্তি পশে মৃগ অন্বেষণে।
সরলা তাপসবালা, হৃদয়-কন্দরে
বাজিল বাসন্তী বীণা, উঠিল শিহরে!
না জানি সে আশ্রমের বসি কোন্ থানে
ভুলেছিল আপনারে প্রিয়তম ধ্যানে;
মূর্ত্ত অভিশাপরূপে অতিথি দুর্ব্বাসা;—
কাঁপি উঠে তপোবন, তবু তার ভাষা
না পশিল যোগ-মগ্ন বিভল হৃদয়ে।
পূজা তার হল ব্যর্থ, বিস্মৃতি-নিলয়ে
দেবতা গড়িল ঘর; সব আয়োজন—
প্রথম বিফলতার প্রেম-আবেদন।
ভারতের ভবিষ্যত জন্ম-তিথি, রাশি
যথায় গগন-ভালে উঠেছিল হাসি,
কোথা সেই পুণ্যস্থান? শুধু কথা তার
কাব্যচ্ছন্দে উঠিতেছে বীণার ঝঙ্কার।
সেদিনের ভাব-বন্যা প্রতি স্তরে স্তরে,
ভারতের মর্ম্মে মর্ম্মে উঠিয়াছে ভরে।
রাজ-ইচ্ছা প্রতিরোধি যেই মহাবাণী
তুলেছিলা বৈখানস, লইয়াছে মানি
যুগধর্ম্ম, জীবে প্রেম, অহিংসা বারতা,
সে দিনের প্রেম-খেলা, চোখে চোখে কথা,
সলিল সিঞ্চন পুষ্পে, সকলি সফল।
কত ভক্ত-হৃদয়ের প্রেম-গঙ্গাজল
ধৌত করে দেব-অর্ঘ্য; কত মহা-প্রাণ
ধ্যান-মগ্ন ভুলি ধরা, লভেছে নির্ব্বাণ।
নিত্য-পূজা অতিথির, হেথা মুক্তদ্বার,
পাদ্য, অর্ঘ্য, সুখাসন বহু উপচার
পুঞ্জীভূত; অনাদর নাহি কোন দিন!

আশ্রম-অঙ্গণ-অঙ্কে পরশে নবীন
নিত্য কত পদধূলি; কারে অনাদরে
নাহি জানি, অভিশাপ উঠিয়াছে ভরে
জলেস্থলে নভোদেশে; বুঝি প্রিয়জন
লয়নি অঞ্জলি তার; করুণ বেদন
গুমরি উঠিছে নিত্য; কত নিদর্শন
শুনাইল ইতিহাস, আপনার জন—
তবু সে বিস্মৃতি-মগ্ন; চড়ি পুষ্পরথে
স্বর্গ হতে ফিরি পুন আশ্রমের পথে
হবে না কি পরিচয়? শশি-সূর্য্য-তারা
মুছে নিত্য অন্ধকার, তবু পথহারা।
নিত্য গঙ্গা যমুনার, পীযুষের ধারা—
তবু উঠে হাহাকার, তৃষ্ণার্ত্ত তাহারা।
তথায় মালঞ্চে ফুল, ভ্রমর-গুঞ্জন,
কোকিলের কুহু তান, দক্ষিণ পবন,
সব যেন ব্যর্থ এবে। কোন্ অতিথিরে
এখনো করেনি পূজা? ঘরের বাহিরে
রয়েছে দেবতা তার; কি যে সে কামনা
এখনো হয়নি পূর্ণ, এখনো সাধনা
পায়নি সিদ্ধির পথ। কত গেল চলি
যুগ পর যুগ বহি সে আসিবে বলি।
ওগো প্রিয়, এসে তুমি গিয়েছ কি ফিরে,
শুনিতে পেয়েছ কি সে দেবতা-মন্দিরে
পিশাচের অট্ট হাসি, শাস্ত্র সদাচারে
অসত্য কুটিল ব্যাখ্যা; সত্যের আকারে
মিথ্যার মর্য্যাদা হেথা। বুঝি বা বীণার
প্রথম আলাপ-রাগে ছিড়ে গেছে তার।
তুমি যে আসনি ঘরে; গেছে ব্যর্থ হয়ে
কত নিরমল ঊষা; সন্ধ্যা গেছে বয়ে,
মধ্যাহ্ন বিরহ-জ্বালা, পূর্ণিমা জোছনা
শরতের বসন্তের শুভ আলিপনা।

কত শীত রজনীর শিশির নিকরে
বিরহের অশ্রুকণা পড়িয়াছে ঝরে !
কত বর্ষা মেঘে মেঘে মেদুর অম্বরে
মলিন বসনা, দীর্ঘ বিরহের ভরে !
আঁধার বাড়ায় বাহু আলোক সন্ধানে,
মিলন ছুটিয়া আসে বিরহের গানে ;
স্বপনের পাশে পাশে ফিরে জাগরণ,
সান্ত্বনার পথে ঝরে করুণ নয়ন,
ভ্রান্তি খোজে স্মৃতি কোথা ? যায়নি বিফলে
অভিশাপ। অভিজ্ঞান মালিনীর জলে
পড়ে গেল নিত্য স্নানে ; বিশ্বের দুয়ারে
মলিন-বদনা লাজে, সহস্র ধিক্কারে
সম্রাজ্ঞী ভিখারী বেশে ; ঋষির প্রমাণ
ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। কে দিবে সন্ধান,
কোথা নিদর্শন তার ? কোন্ শুভক্ষণে
হিংসা ভুলি পশুরাজ পুণ্য তপোবনে
খেলিবে শিশুর সনে ! সুতীক্ষ্ণ দশন
একে একে করাঙ্গুলি করিবে গণন
কবে সর্ব্বদমনের ! কবে বিশ্বপিতা
লবে নিজে পুত্রে অঙ্কে ! বিরহ-ব্যথিতা
পশিবে মিলন-ঘরে ! শুভ শঙ্খধ্বনি
উঠিবে জলধি মন্দ্রে, আনন্দে অবনী
সাজাবে বরণডালা ! মিলন-মন্দিরে
জ্বলিবে সোহাগ-বাতি ! আসিবে কি ফিরে
অতীতের সুখ স্বপ্ন ! গোমুখীর তীরে
ভারতের দিকস্তম্ভ হিমগিরি শিরে
তুষার-ধবল পথে বাসন্তী জোছনা
ভ্রমিবেন হরগৌরী হারায়ে আপনা ;
ভাল-তটে চন্দ্রকলা আলোক-রেখায়
উজলিবে প্রিয়া-মুখ ! তন্ত্রের ভাষায়
উঠিবে কল্যাণ-গীতি ! হবে রামলীলা
ত্রেতার শৈশব যুগে ; গুরুভার শিলা
ভাসিবেক পুষ্পসম ! নিজে ভগবান
গাহিবেন গীতা-ছন্দে জাতির কল্যাণ !

পুস্তক-পরিচয়

য়ুরোপে তিনমাস।—শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত ; মূল্য চারিটাকা। শ্রীযুক্ত সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই 'য়ুরোপে তিনমাস' ভ্রমণ-কাহিনীর লেখক। ১৯১২ অব্দের মে মাসে লণ্ডনে Universities Congress of the Empireএর অধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চারিজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। শ্রীযুক্ত সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। তিনি তিন মাস য়ুরোপ পরিভ্রমণ করিয়া তাহার বৃত্তান্ত আমাদেরই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন। তাহাই এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ইহাতে সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অপেক্ষা আমাদেরই আনন্দ অধিকতর। 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণ এই সুললিত ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত ; সুতরাং এই পরিচিতের আর অধিক পরিচয় আমরা কি দিব ? একটী কথা বলিবার আছে ; 'ভারতবর্ষে' যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, পুস্তকে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিমার্জ্জন করা হইয়াছে ; অনেক বিষয় নূতন করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; এবং অনেক নূতন চিত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই কারণে বইখানি আবার নূতন করিয়া আগাগোড়া পড়িতে হইয়াছে। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বর্ণনার প্রধান গুণ এই যে, তিনি যেটি যেমন দেখিয়াছেন, তেমন ভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। সরল, সরস ভাষায় লিখিত হওয়ায়, ইহা অধিকতর মনোজ্ঞ হইয়াছে ; এবং তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত, সুলেখকের লেখনীর মর্য্যাদা সম্পূর্ণ অব্যাহত রহিয়াছে। বহু চিত্র-শোভিত সাড়ে চারিশত পৃষ্ঠাব্যাপী এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিতে ক্লান্তি বোধ হয় না।

গাছপালা।—শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত, মূল্য আড়াই টাকা। ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ার উপযোগী উদ্ভিদ্-বিদ্যার কোন বই বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না। তাই শিশু-শিক্ষাবিষয়ক পুস্তক-প্রণেতৃগণের শীর্ষ স্থানীয় সুপণ্ডিত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় বাঙ্গালা দেশেরই সাধারণ গাছপালার পরিচয় দিয়া এই বইখানি রচনা করিয়াছেন। তিনি উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে গভীর গবেষণা এই পুস্তকে করেন নাই ; করিলে ছেলেরা কেন আমরাও ভয়ে বইখানি হাতে করিতাম না।

জগদানন্দ বাবুর উদ্দেশ্য উদ্ভিদ্-বিদ্যা সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের অনুসন্ধিৎসা জাগানো। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে ছেলেদের জন্য বই লিখিতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই। এমন সরল, এমন সুন্দর, এমন চিত্তাকর্ষক বই আমরা ছেলেবেলায় পড়িতে পাই নাই বলিয়া এখন আক্ষেপ হয়। ছবি-গুলি বড়ই মনোরম। আমাদের দেশের প্রত্যেক ছেলের হাতে এই বইখানি দেখিলে আমরা আনন্দিত হইব।

প্রভাত-স্বপ্ন।—শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য এক টাকা। এখানি ছোট গল্পের সংগ্রহ। ইহার কয়েকটি গল্প 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বাবুর গল্প বলিবার ভঙ্গী বড়ই সুন্দর, বড়ই উপভোগ্য। আমরা এই সংগ্রহের সব কয়টী গল্পেরই প্রশংসা করিতেছি; গল্পগুলি ছোটও বটে, গল্পও বটে; পড়িয়া যথেষ্ট আমোদ পাওয়া যায়, উপদেশও লাভ করা যায়।

সন্তান।—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। এখানি সামাজিক উপন্যাস। লেখক শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটী গুরুতর সামাজিক সমস্যা অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন। বইখানি পড়িলে সর্ব্ব-প্রথমে একটী কথা মনে হয়,—শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় সনাতন আর্য্যধর্ম্মের মহিমা, গরিমা ও তাহার মহান্ ভাবে পরম শ্রদ্ধাবান। তাঁহার অঙ্কিত প্রত্যেক চরিত্রে তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শঙ্করনাথকে তিনি যে ভাবে আমাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা অতীব সুন্দর। চরিত্র-চিত্রণে তিনি অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। 'ব্রাহ্মণ পরিবার' ও 'দেওয়ানজী' প্রকাশ করিয়া তিনি যে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, বর্ত্তমান উপন্যাসখানি তাঁহার সে যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিবে। বইখানির কাগজ, বাঁধাই, ছাপা অতি সুন্দর; কিন্তু ভিতরের সৌন্দর্য্য বাহিরের সৌন্দর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

বাঙ্গালীর বল।—শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ প্রণীত; মূল্য চারি টাকা। 'বাঙ্গালীর বল' নভেল নহে, নাটক নহে; কিন্তু ইহা নাটক-নভেল অপেক্ষাও মনোরম,—এখানি বাঙ্গালীর সামরিক ইতিহাস। পৃথিবীময় আমাদের দুর্নাম আছে যে, আমরা ভীরু, আমরা কাপুরুষ; আমরা যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখিলে ভয়েই মরিয়া যাই; শৌর্য্যবীর্য্য আমাদের কোন দিনই ছিল না—এখনও নাই। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবু আমাদের এই কলঙ্ক-কালিমা ধুইয়া দিবার প্রয়াস করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের প্রথম সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালী জাতি ভীরু নহে, দুর্ব্বল নহে,—তাহারও শরীরে যথেষ্ট বল ছিল; এবং কার্য্যক্ষেত্রে সুবিধা ও সুযোগ পাইলে এখনও বাঙ্গালী তাহার বীর্য্যের পরিচয় দিতে পারে। সুদীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়া রাজেন্দ্র বাবু এই প্রকাণ্ড পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা, সর্ব্বোপরি তাঁহার অকৃত্রিম সহানুভূতি এই পুস্তক-খানির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দেদীপ্যমান। আর বর্ণনা-নৈপুণ্য—আমরা রাজেন্দ্র বাবুর সরস, সুন্দর, প্রাণস্পর্শী ভাষা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি; ইতিহাস পড়িতেছি বলিয়া মনে হয় না;—যেন একখানি উপন্যাস পড়িতেছি। বইখানি সকলেরই পড়া উচিত;—শুধু পড়া নহে, যত্নে রাখা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মে কি শর্ম্মা।—শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ প্রণীত, মূল্য একটাকা। এ একখানি সচিত্র সামাজিক নক্সা। সেনগুপ্ত মহাশয় এই নক্সাখানি আঁকিতে যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন,—অঙ্কনও বেশ হইয়াছে। তাঁহার ভাষা ও বলিবার ভঙ্গীর আমরা প্রশংসা করি।

প্রতীক্ষা।—শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল বি-এল্ প্রণীত; মূল্য আট আনা। এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের আটআনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার একসপ্ততিতম গ্রন্থ। ইহা কয়েকটী ছোট গল্পের সংগ্রহ-পুস্তক। প্রথম গল্প 'প্রতীক্ষা'র নামানুসারে বইখানির নামকরণ হইয়াছে। 'প্রতীক্ষা' গল্পটী একটা বিলাতী গল্পের আখ্যানভাগ লইয়া লিখিত; অন্যান্য গল্পগুলি দিশী। প্রলোভন ও নূতন-বৌ গল্প দুইটী আমাদের বড়ই সুন্দর বোধ হইল; অপর কয়েকটী গল্পও বেশ সুলিখিত। লেখকের ছোট গল্প লিখিবার বেশ হাত আছে, তাহা এই গল্প কয়েকটীতেই বুঝিতে পারা যায়।

জীবন-সঙ্গিনী।—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত; মূল্য আট আনা। আটআনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার দ্বিসপ্ততিতম গ্রন্থ এই জীবন-সঙ্গিনী. গ্রন্থকার শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা গল্প-সাহিত্যে সুপরিচিত; তিনি একাধারে ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং উপন্যাস-লেখক। তাঁহার লেখার প্রধান গুণ এই যে, তিনি লিখিতে বসিয়া কোনপ্রকার আড়ম্বর করেন না; অযথা বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া উৎকট পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন না। তাঁহার যাহা বর্ণনীয় বিষয়, তাহা সহজ, সরল ভাবে সুললিত-ভাষায় বলিয়া যান। এই জীবন-সঙ্গিনীতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। তাঁহার সুরবালার চরিত্রাঙ্কন অতি সুন্দর হইয়াছে; হিন্দু-নারীর মহনীয় আদর্শ তিনি বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আমরা এই উপন্যাসখানি পড়িয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিয়াছি।

দেশের ডাক।—শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য আট আনা। এই 'দেশের ডাক' আট আনা সংস্করণ গ্রন্থাবলীর ত্রিসপ্ততিতম গ্রন্থ। ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তির মুখে কথা দিয়া লেখিকা মহাশয়া এই পরম সুন্দর গল্পটী গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া 'দেশের ডাক' দিলে সকলকেই শুনিতে হইবে। আমরা বইখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। শ্রদ্ধেয়া লেখিকা মহাশয়া প্রাণ ঢালিয়া দিয়া এই

দেশের ডাক লিখিয়াছেন। চরিত্রগুলি জলজল করিতেছে। কোথাও কষ্ট-কল্পনা নাই, কোথাও আড়ষ্ট ভাব নাই, একেবারে তর-তর করিয়া, যাহার মুখে যেরূপ কথা মানায় তাহাই দিয়া, যেন এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি শেষ করিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকাকেও একাসনে বসিয়া এই বইখানির পড়া সমাপ্ত করিতে হইবে; এবং শেষে রাজেনের অবস্থা স্মরণ করিয়া গভীর সহানুভূতিপূর্ণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে হইবে।

Shadows of the Future—by Surendranath Ray. ইংরাজী ভাষায় লিখিত এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ভারতীয় এবং পাশ্চত্য স্বপ্নবিজ্ঞান সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যই জানিতে পারিবেন। গ্রন্থকার বেদ পুরাণাদি ভারতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি হইতে স্বপ্নফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিলেই আমরা সন্তুষ্ট হইতাম।

সাহিত্য-সংবাদ

আগামী ইষ্টারের ছুটির সময় মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। বিগত কয়েক বৎসর কোথাও অধিবেশন হয় নাই। আগামী অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রধান সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সাহিত্য-শাখার সভাপতি হইবেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়; বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর; ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়; এবং দর্শন-শাখার সভাপতি হইবেন শ্রীযুক্ত রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের নামে মেদিনীপুরে প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন উপন্যাস-লেখকের লিখিত দুই-একখানি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে; সেগুলি সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত নহে। শরৎবাবুর সমস্ত উপন্যাসের একমাত্র প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স; কেবল 'বামুনের মেয়ে' ও 'গ্রন্থাবলী' অন্য প্রকাশক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। শরৎবাবুর পুস্তক কিনিবার সময় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত কি না, দেখিয়া লইলে আর কোন গোল হইবে না।

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় বিবৃত স্বর্গীয়া অঘোরকামিনী রায়ের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২৲

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসু রায় প্রণীত মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত 'বঙ্গে বর্গী' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲

শ্রীসুনীতিবালা মজুমদার প্রণীত 'কমলা' উপন্যাস বাহির হইয়াছে; মূল্য ১৷৽

শশিভূষণ দাস প্রণীত নূতন উপন্যাস 'ঋণ-পরিশোধ' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দেব প্রণীত 'অতীতের ব্রাহ্ম-সমাজ' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲

৷৽ আনা সংস্করণ গ্রন্থাবলীর ৭৩ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীসরোজকুমারী দেবী প্রণীত 'দেশের ডাক' প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীবঙ্কিমবিহারী সেনগুপ্ত প্রণীত 'কর্ম্মের সন্ধান' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৷৽

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত 'অদৃষ্ট সংগ্রাম' ও 'রাজকীয় গুপ্ত-কথা' বাহির হইয়াছে; মূল্য প্রত্যেকখানির ৸৽ আনা।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

বৈশাখ, ১৩২৯

দ্বিতীয় খণ্ড]　　নবম বর্ষ　　[পঞ্চম সংখ্যা

ভারতবর্ষের কাল্‌চার ও রবীন্দ্রনাথ

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ]

(১)

কেউ-কেউ কাল্‌চারের অনুবাদ "বৈদগ্ধ্য" করেচেন; এবং ম্যাথু আর্ণল্‌ডের সংজ্ঞার সঙ্গে সেটা মেলে। এ পৃথিবীতে যেখানে যে উৎকৃষ্ট জিনিস ভাবিত এবং উচ্চারিত হয়েছে, তার সঙ্গে অন্তত পরিচয় না থাকিলে কোনো-কোনো দেশে সাধারণ শিষ্টতাও বজায় রেখে চলা শক্ত। য়ূরোপীয় চিন্তার সঙ্গে পরিচয় সাধারণত আমাদের ইংরাজির সূত্রে।—ও-ভাষায়, "গ্রীক্ কাল্‌চার," "ইণ্ডিয়ান্ কাল্‌চার" প্রভৃতি Phrase-এ কথাটার আর একটা ব্যবহার দেখ্‌তে পাই, যা বোধ-করি "বৈদগ্ধ্য" বল্‌তে যা বোঝায় তার-থেকে একটু স্বতন্ত্র। মানব-মনস আদিকাল হ'তে যে সমস্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে এসেছে, এবং যা কিছু অর্জ্জন করেছে, তার সঙ্গে পরিচয় কেবলমাত্র "বিদ্যা" হ'তে পারে। কোনো এক ভূখণ্ডে কোনো এক বিশিষ্ট মানব-সঙ্ঘ, সর্ব্বমানবতার আকার-বিহীন একাকার থেকে ভূগোলে এবং ইতিহাসে পরিচ্ছিন্ন হয়ে, সুখে-দুঃখে যুগে-যুগে আপনার যে ভাগ্যকে বিবর্ত্তিত করেছে, কতক নিজের চেষ্টায়, কতক বাহিরের ঠেলায়, সেই চল্‌তে-চল্‌তে সে যা কিছু পেয়েছে, সে কেবলমাত্র একটা আহরণ নয়, একটা পুঞ্জিত স্তূপ নয়,—কিন্তু একটা বর্দ্ধমান

জরা-মরণ-শীল জৈব পদার্থ,—সেই তার সভ্যতা। চীনের কাল্‌চার বলে আমরা বোধ-করি চীনের সভ্যতাকেই বোঝাতে চাই ?

(২)

ব্যক্তির জীবনে যেমন অধ্যাপক-কথিত ত্রয়ীর একটা সামঞ্জস্য না ঘট্‌লে অসুবিধা হয়ে পড়ে, কেবলমাত্র ভাব-প্রবণ লোক যেমন ধাক্কা খেতে-খেতে মারা যায়, কেবলমাত্র জ্ঞানের তপস্বী যেমন সংসারের কোনো কাজে আসে না, ("বড়দিদি"-র মাষ্টার), কেবলমাত্র কেজো লোক যেমন তার কর্ম্মের লগত আইডিয়াটা থেকে ছিন্ন হয়ে কেবলই পাক খেয়ে মরতে থাকে, (খুঁজ্‌লে নানা ব্যাপারের প্রোপাগ্যাণ্ডিষ্ট্‌দের মধ্যে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে),—তিনটে বিভিন্ন-মুখীন ঠেলার কেন্দ্র আবিষ্কার করতে না পেয়ে যেমন ব্যক্তির ব্যর্থতা, ঠিক তেম্‌নি ভারতীয় ইতিহাসের 'ট্র্যাজেডি'র মূল সূত্রও আমরা ঐ অনাবিষ্কৃত balance-এই খুঁজে পাব হয় ত।

(৩)

যেমন ভূমিকার মধ্যে সংহত আকারে বইএর মূল কথাটির একটিবার সাক্ষাৎ পেয়ে, পরে অধ্যায়গুলির গোলকধাঁধার মধ্যে যতই এগোতে থাকি, আর থই পাই না—তেম্‌নি পঞ্চনদের উষায় ভারত আত্মার সেই যে মূল তানটি একদা শোনা গেল—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—আঁধার সমুদ্র থেকে সদ্য উত্তীর্ণ সেই পরিপূর্ণ প্রভাতটি যতই মেঘে ও রৌদ্রের পর্য্যায়ের ভিতর দিয়ে এগোতে লাগ্‌ল, আমরাও সেই মূল সুরটিকে হারালুম। অনার্য্যের সংঘাতে যজ্ঞের কাণ্ডে সেদিন ভারত-মনস্-এর motor-দিক্‌টি দেখ্‌লুম। এইমাত্র অগ্নি আবিষ্কৃত হয়েছে, গাছকাটার ধুম পড়ে গেছে, পত্তন বস্‌চে, নৌ গড়া চল্‌চে, মাতা ধরিত্রী কর্ষিতা হচ্ছেন। বিশ্রাম-রাত্রি দূর হল, রাক্ষস প্রতি মুহূর্ত্তে সচকিত রাখচে।—কিন্তু দেরি হল না। যেমন 'আর্ট্‌ ফর্‌ আর্ট'স্‌ সেক্‌' বলে একটা কথা আছে—তেমনি অবিলম্বে কর্ম্মেরই-ওআস্তে-কর্ম্ম পশুবলি ইত্যাদির এমন উদ্‌ভটতায় গিয়ে পৌঁছল—যে তাল সাম্‌লাবার জন্য কোথা-থেকে আর এক ধাক্কা উঠে এল একেবারে কর্ম্মবন্ধের গোড়া ছেঁড়বার দিকে রোখ করে। সে ধাক্কায় মাটির শেকড় থেকে উপড়ে নিয়ে এক চোটে ভারতবর্ষকে যে এক নিষ্কর্ম্মের শূন্য-তার মধ্যে নিয়ে উড়িয়ে দিলে, সেখানকার হাওয়াকে বিশ্লেষণ করে-করে, এ-নয় ও-নয় করতে-করতে ছেঁটে ছুঁটে এমন এক কলুষলেশহীন শুদ্ধমাত্র 'কিচ্ছু-না'য় ভর্ত্তি করে রাখা হয়েছিল যে, সেখানে শ্বাসরোধের উপক্রম হল। এই নোতুন এক-রোখামিকে যোঝবার জন্য যাঁরা দাঁড়ালেন, তাঁদেরও দাঁড়িয়ে বাহ্বাস্ফোট করবার জন্য নিজের জায়গা ছিল না, কুস্তি করবার জন্যে তাঁরা ব্যোমযানেই চড়লেন,—এবং শূন্য আর দ্বিতীয়-বর্জ্জিত নির্গুণ একই বস্তুর এ-পিঠ আর ও-পিঠ। শঙ্করের কসরতের কথা এদেশে আমরা বিদেশী-পণ্য-বর্জ্জ-নের বক্তৃতাকারের মুখেও শুনে থাকি। এবং তাঁকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" বলা হয়েছিল, এ রকম একটা গুজবও কোথাও শুনে থাকব। আর, মানবের ফুস্‌ফুসের পক্ষে "কিচ্ছু-না" এবং অমিশ্রিত অদ্বৈত অক্সিজেন একই কথা।

কিন্তু ফ্লেষ যতই দুর্ব্বল হোক্‌, সে এই সময় হঠাৎ বলে উঠ্‌ল,আমি আছি। যে ধমনী সোম পান করেছিল, সে চাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। আর মানবের মধ্যে যে জন্তুটা এতদিন উপবাসে নির্জ্জিত হচ্ছিল, তারি বিদ্রোহকে এই সময়ে আমরা ইতিহাসে তন্ত্রান্দোলন রূপে দেখতে পাই।

কিন্তু কাপালিকের সমুদায় শ্মশানচারী ভয়াবহতার মধ্যে জান্তবিকতার যে প্রকাশ দেখ্‌লেম, সে এক রুদ্র প্রকাশ। মনস্তত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপকের ভাষায় বল্‌তে গেলে, মানবের সে-ই এক চাণ্ডালিক (Sadistic) দিক্‌। কিন্তু Sadism-ই মানব-মনস্‌এর শেষ কথা ত নয়। এই সময়ে যে চণ্ডিকা-দেবী মানবের আরাধ্যা হয়ে উঠ্‌লেন, তিনি তার সকল ক্ষুধা মেটাতে পারলেন না। চতুষ্পদ জন্তু অন্য জন্তুর রক্তপাত করবে; কিন্তু দ্বিপদের বিশেষত্বই এই যে, আপনার রক্তদান করবার জন্যেও তার ব্যগ্রতা সমানই। তাই চাণ্ডালিকতার মধ্যে মানবের সমগ্র জান্তবিকতা আপনার যে balanceকে হারালে, তা-ই ছিন্নমস্তা-পূজায় সাধকের আপন বক্ষের শোণিত মোক্ষণের ভেতর-দিয়ে উলটো গতিটাকে খুঁজে পেয়ে, মানবের ভেতরকার যে অপর গুরুতর সত্য, তার দুঃখ-বুভুক্ষা, (masochism), তারই বিচিত্র প্রকাশের দিকে এই সময়ে ধাবমান হল। পরবর্ত্তী কালের তৃণাদপি সুনীচ তরুরিব সহিষ্ণু, চোখের-জলে-

ভেজানো ধূলায় অবলুণ্ঠিত দাস্তামীর সূচনা এইখানেই দেখতে পাই।

(৪)

যেখানে angel-রা পা বাড়াতেও সাহস পান না, সেইখানটা অপর যে-এক-জাতীয় জীব মাড়িয়ে যেতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না, আমরা সেই দলের লোক—কেননা আমরা বৈজ্ঞানিক নই। মূর্খের সেই ধৃষ্ট নির্ভর নিয়ে এই সন্ধ্যায় এই তত্ত্বটির সঙ্গে আজ আমরা দেখা করতে চাই, যে, বৈষ্ণব আন্দোলনটি হয় ত ভারতের ক্ষেত্র-জাত নয়, কিন্তু দূরাগত এক্জোটিক্। কারণ-কি, জড় এবং প্রথম-প্রাণ-কোষের মধ্যেকার উপসাগরটির উপরে সেতু না বাঁধতে পেরে যেমন ডারুইন্-হেন লোককেও কবিতার ভাষা ব্যবহার করতে হয়েছিল—"ঈশ্বর জলরাশির উপরে জীবনকে নিশ্বসিত করলেন,"—এবং কেউ-কেউ যেমন ইতিমধ্যে বলেওছেন হয় ত, যে, প্রাণ ধরিত্রীর গর্ভজাত নয়, কিন্তু পোষ্যপুত্র, উল্কায় চড়ে গ্রহান্তর থেকে উড়ে এসে মাতা পৃথিবীর কোল জুড়ে বসেছে—তেমি বৈষ্ণব-তত্ত্বের সঙ্গে ভারত-বর্ষের যুগ-যুগ-বাহী চিন্তাধারার হঠাৎ এক-জায়গায় এমনি একটা বিচ্ছেদ দেখতে পাই, যে, মুহূর্ত্তেক আমরা থেমে দাঁড়াই। নির্গুণ ব্রহ্ম কোন্ ফাঁকে এসে মশারিতে ঢুকে পড়ে মুখে আল্বোলার নল গুঁজলেন, তা আমাদের বিষয়-পিপাসু দিঠিকে নিমেষে এড়িয়ে যায়। সত্য হচ্ছেন দুঃখস্বরূপ,—স তপোহতপ্যত ব্রহ্মাণ্ডের বুকের মধ্যে সেই আদিম তপস্যার উত্তাপ আজও তরল হয়ে ধিকিধিকি জ্বলচে, সত্য উদ্যত খড়্গের ন্যায় মাথার ওপরে ঝুলচেন, এই জেনে, যে, ভারতবর্ষ আপন পুরুষকারের অটল প্রতিষ্ঠার উপর দাঁড়িয়ে আপন মুক্তি আপনি অর্জ্জন করছিল, তাকে যে হঠাৎ একদিন বসে'-গিয়ে পরম-দীনহীনতার অশ্রুরস-পানে লিপ্ত দেখ্তে পেলুম, এ ঘটনাটি কি-করে হল?

এশিয়ার পশ্চিম-প্রান্তে একটি জাতি সংসারের নানা ক্ষতি ও বঞ্চনার ভিতরে রাষ্ট্রীয় দুর্গতির দুর্য্যোগ-রাত্রে এক পরিত্রাণের স্বপ্ন দেখেছিল। আপনারা অধ্যাপকের কাছে শুনে থাকবেন, রূপকের আকারে—একটা বিগ্রহের ভিতর দিয়ে কোনো এক অতৃপ্ত বাঞ্ছার যে কাল্পনিক পূরণ, তা-ই স্বপ্ন। ব্যক্তি যেমন রাত্রে স্বপ্ন দেখে থাকে, তেম্নি একটা জাতি যুগে-যুগে যে স্বপ্ন দেখে, আমরা তার পুরাণ-কথা myth-এর আকারে পাই। কালভেরীর যূপ-কাষ্ঠের বিগ্রহের যদি কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাও থাকে, তা'তে কি এসে যায়? যে-কোনো লিপিবদ্ধ ইতিহাসের ঘটনার চেয়ে তা সত্যতর। মানব-সংসারে প্রতি নিমেষে যে পাপ যে তাপ মথিত হয়ে উঠ্ছে, সে হলাহলকে পান করবার জন্য যে এক-জায়গায় সত্য নীলকণ্ঠরূপে বিরাজ করচেন, সেইখানেই যে মানব যুগ-যুগান্তের পরিত্রাণ পাচ্ছে, এই যে চিরকালের ঘটনা, সমস্ত ইতিহাসের এই যে এক তথ্য, এ যদি বাস্তবিকই কোনো এক শতাব্দের কোনো এক তারিখে মূর্ত্তি পেয়ে হাট-বাজার জন্মমৃত্যু বিবাহ কোলাহল দ্বন্দ্ব ইত্যাদি প্রতিদিবসের ব্যাপারের সঙ্গে সমপর্য্যায়ভুক্ত হয়ে ঘটে'-ই থাকে, কি না-ই ঘটে থাকে, তা'তে কি এসে যায়?

সে যা-ই হোক, অন্ধযুগে ভারতবর্ষেরও সেই স্বপ্নের প্রয়োজন ছিল। এবং খৃষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দীর মধ্যে যে সীরিয়ান্ খৃষ্টানদল ভারতের দক্ষিণ-উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তাঁরা আপনাদিগকে ভারত-সমাজের অঙ্গের মধ্যে নিলীন করে দিয়ে, আপনাদের কাল্চারকে এদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করে দিলি। অর্থাৎ যেমন করে নিশীথ রাত্রে একটা স্বপ্ন কখন কেমন করে আর একটা স্বপ্নে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তেম্নি করে দক্ষিণ থেকে এক বৈষ্ণবী ভারতী ক্রমে উত্তরে সঞ্চরণ করে, প্রথমেই ভাবপ্রবণ বাঙলার চৈতন্য, কি না বাঙলার আত্মা-কে দীক্ষাদান করলে। কারণ কি, দ্রাবিড় রক্তের স্রোতে ভাবের দিক্ দিয়ে দক্ষিণের সঙ্গে বাঙ্লার একটা চলাচলের পথ ছিল।

এই নবান্দোলনে ভারতবর্ষ তত্ত্বকে পুরুষ-রূপে চিন্তে পারল। বিশ্বের মধ্যে যিনি সুন্দর, তাঁর বাঁশী বাজতে লাগ্ল। ভারত আবিষ্কার কর্লে, যে, সৃষ্টির মর্ম্মের মধ্যে যে উত্তাপ আছে, সে হৃদয়-রক্তের উত্তাপ। কিন্তু এই ভক্তির উপরে জ্ঞানের বল্গা ছিল না বলে, সুন্দর-বোধ ক্রমে সত্য থেকে যতই ছিন্ন হতে লাগ্ল, ততই সে এমন সব উৎকট ভাবাতিশয্যে গিয়ে পৌছল, যে, অনন্ত তত্ত্বকে সে স্নান করিয়ে মাখন খাওয়াতে বসে গেল। অন্য দিকে মঙ্গলকর্ম্ম-প্রবৃত্তির সংস্রবমাত্র থেকে চ্যুত হয়ে শিবকে এমনি অপমান করলে, যে, ভাববিহ্বল অধ্যাত্ম-বিলাস ক্রমে ঘোর দুর্নীতির দুর্গতির খানায় পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগ্ল।

একটু শুধ্‌রে' নেবার ভারও ভারত-ভাগ্য-বিধাতা বাঙ-লারই জন্যে রেখেছিলেন। কারণ কি, দাঁড়ি-পাল্লা হাতে নিয়ে, মাল-বোঝাই জাহাজে চেপে সাত-সমুদ্র পেরিয়ে যারা এল, তারা বাঙলায়ই নামল। সেই জন্য, এই সময়ে এক দিকে যেমন সদ্য আমদানি মদ্য সমাজের পুরোনো বোতল-গুলি চৌচির করতে লাগ্‌ল, এবং সাহিত্যে মাইকেলী ভাষায় নোতুন ভাণ্ডের সন্ধান চল্‌তে লাগ্‌ল, তেমনি অন্য দিকে বঙ্কিমী প্রতিভার নিক্তি ব্যালান্‌শের নির্ণয়ে বসে গেল। আপনারা জানেন, বঙ্কিমচন্দ্র হচ্ছেন এদেশের প্রথম গ্র্যাজুয়েট; এবং সেই কারণেই প্রথম, এবং হয়ত-বা শেষ, হ্যাশন্যালিষ্ট্‌। কেন না, টোল এমন ক্ষেত্র'নয়, যা স্বদেশিকতার চাষ-আবাদের জন্য বিখ্যাত। সেই কারণেই, গ্যালিলী'র ভ্রাম্যমাণ মিস্ত্রীর মধ্যে পরিপূর্ণ জীবনের যে আদর্শটি ছিল, তারি উজ্জ্বল মূর্ত্তিটিকেই যেই-মাত্র তাঁর প্রতিভার এক্স্‌-রে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমুদায় পণ্যজাতের অন্তরের মধ্যে অকস্মাৎ স্পষ্টরূপে আবিষ্কার করলে, অমনি তাঁর মাথা হয় সম্ভ্রমে নুয়ে পড়্‌ল, নয় দৈন্যে হেঁট হল। কেন না, পরক্ষণেই আমরা তাঁকে বৃন্দাবনের বেণু-বাদকটির উপরে রাঁদা-কার্য্যে নিরত দেখ্‌তে পাই। কেন না মানুষের সমস্ত বিভিন্নমুখীন বৃত্তিনিচয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি সাধনের নিমিত্তে যে অনুশীলনের তত্ত্বটি তিনি লাভ করলেন, তার একটা ঐতিহাসিক embo-diment খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখ্‌লেন, যে, এদেশে মানুষে টিয়ে পাখী পুষলে, তাকে কৃষ্ণ নাম শেখায়। অথচ এই যে একটি পুরাণৈতিহাসিক ব্যক্তির উপরে এ জাতের হৃদয়া-বেগ অনেক দিন থেকে লগ্ন হয়ে আছে, এর উপরে বৈজ্ঞা-নিক কাঁচি এবং প্রথম-শ্রেণীর ক্ষুর না চালালে, নব্য মাপ-কাঠির অনুযায়ী ভব্য সাজ এর হয় না। "কৃষ্ণচরিত্র"-এ সেই ক্ষুরধার প্রতিভার কাজ আমরা দেখ্‌তে পাই। তার পর বাঁটালি ত পাথরকে কুঁদে "পূর্ণাঙ্গ মানবমূর্ত্তি" দাঁড় করাল; এ দেশের ভাবাকুল প্রাণ যে পাথরের বুকের ওঠা-পড়া দেখ্‌তে চায়। অতএব ডাক সেই শিল্পীকে, হৃদয়ের স্পন্দন নিয়ে যার কারবার। "রৈবতক," "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস"এর ত্রয়ী কাব্যে, তার পরেই, তত্ত্বকে রক্তে মাংসে আচ্ছাদিত দেখ্‌তে আর আমাদের দেরি হয় না।

কিন্তু ভারতবর্ষের তপোবনে যে পূর্ণ জীবনটি একবার দেখা গিয়েছিল, কাঠামোর উপর খড়, এঁটেল মাটি, এমন কি জীবনের বর্ণ চাপিয়ে তার কেবলমাত্র নকল চল্‌তে পারে। শোনা যায়, ইতিহাস আপনাকে পুনরাবৃত্ত করে থাকে। তা করে কি না ঠিক্‌ জানি নে। তবে ইতিহাস যে ভারতবর্ষে যুগযুগান্ত ডানা মেলে দিয়ে চলে এসেছে,—"হংস যেমন মানস-যাত্রী" তেম্নি,—উষায় যখন সে যাত্রা সুরু করেছিল, তখন তার কণ্ঠে যে কাকলি শোনা গিয়েছিল—সে অপূর্ব্ব ধ্বনি "এ পূর্ব্ব-ভারতে" আবার আমরা শুন্‌লুম।—যদিও ইতিহাস আজও শেষ হয় নি; তবু তার পরমাশ্চর্য্য পরিণামের এই যে পূর্ব্বাভাষ আমরা পেলাম, কেবলমাত্র এতেই আমরা এ বঙ্গ-জীবনকে কৃতার্থ মনে করতে পারি। এই মুহূর্ত্তে এ দেশের এমন একজন মানুষ বেঁচে আছেন, যাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের চরম বক্তব্যটি গান হয়ে গলে পড়চে,—তাঁরি সঙ্গে একসঙ্গে একই বায়ুমণ্ডল থেকে নিঃশ্বাস টানবার গৌরবান্বিত সৌভাগ্যটি আজ এই সন্ধ্যায় আমরা স্তব্ধ হয়ে একবার অনুভব করি। কেন না, কৃত্রিম উত্তাপ দিয়ে সখের ফুল-বাগান বানান যেতে পারে; কিন্তু কাকচক্ষু সরসীর অন্ধকার গভীরতা থেকে তার পরিপূর্ণতার শতদলটিকে উৎসারিত করবার জন্যে আদিত্যের আহ্বানের প্রয়োজন। মানুষের জীবনের উপরে যে অসীমের আহ্বান আছে, তারি ডাক-হরকরা হয়ে এলেন যে কবি, তাঁরি বার্ত্তায় প্রথম জান্‌লুম, যে, "যাত্রী আমি ওরে।" দুঃখও কূপ নয়, মরণও জীবন-তরীর খেয়ামাঝি। স্বদেশেরও মধ্যে সেই অসীমেরই আহ্বান ভৌগোলিক সীমার রন্ধ্র দিয়ে সুর হয়ে ঝরচে। যাকে আমি ভালবেসেছি, সে ত আমায় বাঁধচে না,—উত্তীর্ণ করে দিচ্ছে পথ হতে পথে। অসীম আমায় ডেকেছেন, তাই ত আমার জীবনের ভুলগুলোও পরম রমণীয়। তারা ত গত বর্ষের ঝরা পাতা নয়, গত রজনীর ছিন্ন মাল্য নয়; নিশীথে প্রাতে তারা অতিথি হয়ে এসেছিল—"যে কেহ মোরে বেসেছ ভালো, জ্বেলেছ ঘরে তাঁহারি আলো, দিয়েছ তাঁরি পরিচয়, সবারে আমি নমি।" যে যে ঘাটে তরী ভিড়িয়েছিলাম, তাদের নমস্কার,—তারা তীর্থ, তারা আমার উত্তীর্ণ করেছে; কেন না, "চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে।"

অসীম ডাক দিয়েছেন। অন্ধকারের মধ্যে আমার হাতখানি বেরিয়েছে তার অদ্ভুত পর্য্যটনে কাঙ্ক্ষিত দেহের উপরে—পর্ব্বত-কন্দর সে মানে না—সকল গোপনীয়তার

গুঠন সম্বন্ধে সে অসহিষ্ণু—বেরিয়েছে সে exploration-এ, এই ত মানুষের Science। "আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী, তোমারে তবু চিনিব আমি," তবু আলো জেলে একবার দেখ্‌ব, তাই ত দর্শন। এ সাতমহলা ভবন তৈরি করে অবধি ত তাঁর তৃপ্তি ছিল না, ডেকেছেন তিনি মানুষকে কোঠায় কোঠায়—তাই ত তাকে প্রজাপতি, গাছপালা, পিঁপড়ে, নক্ষত্রদের জীবন-বৃত্তান্ত বহন করতে হচ্ছে।

অথচ, বিজ্ঞান যে অসীমের সন্ধান দেয়, মানবাত্মার পক্ষে সে অতি মারাত্মক। একদিকে কল্পনাতীত বেগে ঘূর্ণায়মান বিপুলকায় জ্যোতিষ্কদলের মধ্যে ধূলিকণাবৎ পৃথিবী, অপর দিকে তুচ্ছতম ধূলিকণাটিরও মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড;—এই দুই অনন্তের মাঝখানে পড়ে মানুষের অহমিকা নিষ্পেষিত, বিচূর্ণ! কীটের চেয়েও অধম এই যে মানুষ, তারও যে অপরিমেয় গৌরব আছে এক জায়গায়,—সেই জায়গাটি হচ্ছে অনন্ত-তত্ত্বের পুরুষ-ত্ব।

"আমার মিলন লাগি তুমি
আস্‌চ কবে থেকে।"
"আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।"

অসীম যে তাঁর সিংহাসনের আসন ছেড়ে নেমেছেন, অতি চুপি-চুপি লুকিয়ে এসেছেন আমার ঘরে—তাই চারদিকে যে হাসাহাসি কাণাকাণি পড়ে গেল, তারি ধুম দেখ্‌চি সমুদ্রের অশ্রান্ত ফেণোচ্ছ্বাসে, বসন্তের অজস্র পুষ্প-বিলাসে, উদয়াস্তের মেঘে-মেঘে। আমাকেই ধরবেন বলে অনাদি থেকে আয়োজনের আর অন্ত নেই—জাল পাতা হয়েছে বিস্তীর্ণ ছায়াপথে।

অথচ, এ কথা ত চাপা থাকবে না। কারণ কি, "গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে।" সেই জন্যেই ত কেবলমাত্র বনে বিজনে নয়, কিন্তু যেখানে বিশ্বের সাথে যোগে তিনি বিহার করচেন, সেই জনতার মধ্যেও গিয়ে দাঁড়াতে হল আমাকে। নইলে ত মিলন সম্পূর্ণ হত না। কেন না "নয় এ মধুর খেলা, তোমায় আমায় সারাজীবন সকাল সন্ধ্যাবেলা।" উচ্ছ্বাসের মধ্যে ব্যর্থ জীবনের জর্জ্জরতা থেকে জাগাবার জন্যে দুর্গমের আহ্বান এসেছে। যেখানে তিনি অতিমানবদের মন্দর করে জনসমুদ্রকে মন্থন করচেন যুগে-যুগে, সেখানে গিয়ে যদি দড়ি না টানি, ত তাঁর অভিপ্রায় থেকে ছিন্ন হয়ে আমার প্রেম কেবল নিষ্ফল ভাবপ্রবণতায় স্বেদ-কম্প-রোমাঞ্চে পচে গেঁজে উঠবে মাত্র। নয়ন মুদে কেবল আপন মনের কোণে যেমন সত্যকে পাব না—তেম্নি সুন্দরকেও কেবল নির্জ্জন-রস-সম্ভোগের মধ্যে পাব না। যখনি-যখনি তার চেষ্টা হয়েছে, তখনি-তখনি এদেশে আমরা দেখেছি, আসল, "রাজা"র জায়গায় হাজার হাজার নকল বেরিয়েছেন মেলায়। তাই

"অনেক নৃপতির শাসনে
না রব শঙ্কিত আসনে
ফিরিব নির্ভয় গৌরবে
তোমারি ভৃত্যের সাজে হে।"

অথচ একদিকে যেমন ভারতেতিহাসে রবীন্দ্রনাথ unique, একথা বলতে পারব না, তেম্নি অন্যদিকে ভারতেতিহাস যে সোজা একটানা না এসে, অথবা যাত্রার সুরুতেই যাত্রা শেষ না করে, একবার ডাহিনে একবার বাঁয়ে এঁকে-বেঁকে নেমে এসেছে, তার সে সমস্ত ঘোরফের এক হৃত-সামঞ্জস্য টলুনি বৃথা এবং অনর্থক হয়েছে, এ কথাও বলতে পারব না। কারণ, ভগবদ্‌গীতাতেও একবার সামঞ্জস্য সাধনের একটা বিরাট প্রয়াস দেখা গেছে। এবং আরবীর সভ্যতার ঘা খেয়ে ভারত-আত্মা যে আর্ত্তনাদ করেছিলেন, কবীর নানক দাদু ইত্যাদির কণ্ঠ দিয়ে সঙ্গীতের আকারেই তা বেজে উঠেছিল। আর, পাহাড় এবং সমুদ্র একই সমতলে যদি থাকত, তাহ'লে যেমন গ্রাম-নগর-প্রান্তর-ক্ষেত্র-মধ্য-বাহিনী বিচিত্রা নদী সম্ভব হত না, তেম্নি মানুষ সত্যের সন্ধান পেয়ে তক্ষুণি যদি তাকে জীবনে অধিগত করতে পার্‌ত, তাহ'লে ইতিহাসও হ'ত না। সংহত সত্যকে অসীম ক্ষেত্রের মধ্যে প্রসারিত করাই সৃষ্টি। কে না জানে মানবমনের পক্ষে যতদূর ওঠা সম্ভব, উপনিষদের মধ্যে ভারত-মনীষা ততদূরই উঠেছিল। তবু ভারতের ইতিবৃত্ত দুর্গতির কাহিনী কেন? কারণ, সমুদায় ইতিহাসই ভুলের ইতিহাস। যখনই মানুষকে অভ্রান্ত করবার চেষ্টা হয়েছে, তখনি ইতিহাস থেমে গেছে। ভারতবর্ষে ইতিহাস অচল হল কখন? যখন উত্তরে যোগিনী দক্ষিণে ডাকিনী খাড়া করে দিয়ে পঞ্জিকা এবং পরাশর জীবনকে বাঁধান-খালের মধ্যে প্রবাহিত করে দিলে। কারণ, মানুষ কখনও

শয়তান হবে না,—স্বয়ং বিশ্বামিত্র চেষ্টা করলেও না;—, কেন না তা যদি সম্ভব হত, তবে তখনি কেবল মানুষ অভ্রান্ত হত। কে না জানে, সমস্ত ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে "blundering into wisdom"? সমস্ত ব্যাপারটা হচ্ছে একটা ঠোকাঠুকি এবং ধাক্কা-খাওয়ার বৃত্তান্ত। দেখে শেখা নামক ব্যাপার ইতিহাসে (কেন না, তা যদি থাক্‌ত, তাহ'লে রোমের দৃষ্টান্তের পর ব্রিটানিয়ার আর ভাবনা ছিল কি?) নেই। জনগণ এবং রাজগণ, শ্রম এবং মূলধন, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়—দুই দিকে ধাক্কা খেতে-খেতে ক্রমে রফার দিকে পৌছানো,—এই না ইতিহাস?

অতএব, খুলে দাও আজ আমাদের দেশে ভোলানাথের ঝোলাটা—লক্ষ লক্ষ ভুল আজ পাখা-মেলে সোঁ-সোঁ করে বেড়িয়ে পড়ে আচ্ছন্ন করে দিক্ এদেশের তন্দ্রাতুর বাতাসকে;—হুল ফুটিয়ে দিক্ তাদের, যারা দাওয়ায় বসে বাঁধা নিয়মের মধ্যে পরম আরামে ঝিমচ্ছে। সে ভার পড়েছে আজ সবুজ-এর-ই উপর। কেন না, ভুল করবার আশ্চর্য্য অধিকার এ পৃথিবীতে সবুজ-ই প্রথম পেয়েছিল। সমস্ত সৃষ্টির গোড়াতে যেমন ঠেলা এবং টানায় একটা সন্ধি, তেম্নি যেখানেই পাওয়া এবং ছাড়া এসে গ্রন্থি-বন্ধন করবে, সেই-খানেই জীবনের সূত্রপাত। যে জড়, সে বড়জোর দানা বাঁধতে পারে,—সে কেবলমাত্র লয়, স্বীকার করে এবং মানে। সেইখানেই জীবন, যেখানে কেবলমাত্র নির্ব্বিচার গ্রহণ নয়, কিন্তু বাছাই এবং বর্জ্জন। গ্রহণ এবং ত্যাগের সন্ধিপত্র উড়িয়েছে সবুজ। বাছাই মানে-ই ভুলের সম্ভাবনা; কেন না alternatives এর অস্তিত্ব। নিখিলেশের উপরে পীতদলের চটবার একমাত্র কারণই এই যে, তিনি কেন আপনাকে একমাত্র এবং একান্ত করে না তুলে alternativesএর অবসর রাখ্‌লেন!

সবুজের আর একটি mission আছে। তা এই। "যারা মরে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। তারা বল্‌চে—আমরা পথের বিচার করি নি, পাথেয়ের হিসাব রাখি নি—আমরা ছুটে এসেছি—আমরা ফুটে বেরিয়েচি। আমরা যদি ভাব্‌তে বস্‌তুম, তাহলে বসন্তের দশা কি হত?"

পল্লী-গীতি

[কপিঞ্জল—]

কপোত-কূজিত মণিমন্দির, দিগন্তব্যাপী মুক্ত মাঠ,
বট অশথের শ্যামল শিবির, গীত মুখরিত পল্লীবাট,
রুক্ষ সরের স্নিগ্ধ সলিল, দূরা শিরীষের গন্ধ-ভার,
সূর্য্য শশীর নিত্য আদর, শান্তি সন্ধ্যা বন্দনার,
এই ল'য়ে আছি পল্লী দুলাল, ছল কোলাহলে ধায় না মন,
বিলাসের বাস পাইনে, আমরা, পাঠে মাঠে করি দিনযাপন।
গ্রাম ছেড়ে এই ডাঙ্গার মাঝারে র'চেছি মায়ের পুণ্য নীড়,
আকাশ গাঙের ঢেউ লাগে গায়, দূরে আছি বটে জাহ্নবীর।

প্রভাতে মোদের জাগায় কোকিল, পাপিয়া তাহার শুনায় গান,
দীঘি থেকে আসে হংস টিটিভ্ দরদ দারুণ স্নেহের টান।
ফুল নাই আসে ভ্রমিতে ভ্রমর, খঞ্জন আসি চাহিয়া রয়,
করি না সে ভয় আমরা কাহারো আমাদিকে কেহ করে না ভয়;
বন্দি প্রভাতে গুরুর চরণ, মাগি কল্যাণ রাজার দিন,
স্মরি সন্ধ্যায় রাজার রাজায়, অপার করুণা কৃপার ঋণ
গ্রাম ছেড়ে এই ডাঙ্গার মাঝারে র'চেছি মোদের পুণ্য নীড়,
আকাশ গাঙের ঢেউ লাগে গায়, দূরে আছি বটে জাহ্নবীর!

পথহারা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ভোরের আলো চোখে ঠেকিতেই শিহরিয়া উঠিয়া, উৎপলা দু'হাতে দু'চোখ ঢাকা দিল।

মানুষের এতবড় কালরাত্রিরও অবসান হয় ?—কিন্তু তাও হইল। দিনের আলো সশস্ত্র প্রহরণে সজ্জিত দিগ্বিজয়ী বীরের মত অন্ধকারের বুকের উপর লাফাইয়া পড়িয়া, তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়া, নিজের রক্ত-নিশান শূন্য-পথে উড়াইয়া দিল। উহার অগ্নিময় বৃহচ্চক্ষু যেন আততায়ীর ক্ষুধিত দৃষ্টির মত, এই স্তব্ধ নির্জ্জন শোকাগারের বাতায়ন-পথে ঝাঁপাইয়া পড়িতেই, "উঃ" বলিয়া উৎপলা ছুটিয়া আসিয়া, জানালা কয়টা রুদ্ধ করিয়া দিল। অন্ধকার তবু যেন সহ্য হয়,—অন্তরের এই পুঞ্জীভূত অন্ধকার লইয়া আলো যেন বড় অসহ্য !—তার পর একবার মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কান্না; একবার পিঞ্জরাবদ্ধা ব্যাঘ্রীর মত ক্ষিপ্ত রোষে ঘরের মধ্যেই পরিক্রমণ; একবার বা অকথ্য যন্ত্রণাময় পরিতাপে সমস্ত শরীরের স্নায়ুপেশী ও ইন্দ্রিয়গ্রাম একান্তই হাল ছাড়িয়া দিলে, সর্ব্বশরীর ঝিমঝিম ও হাত পা হিম হইয়া আসিয়া, স্খলিত-পদে, কম্পিত-দেহে দেওয়াল বা খাটের দাওয়ায় মাথা ঠুকিয়া মূর্চ্ছাবসন্ন ভাবে ঢলিয়া পড়া,—আর তাহাতেই সেই চিরসুস্থ সবল দেহ অবসাদের চরমাবস্থায় পৌছিয়া তবু সামান্যক্ষণ সময়ের জন্য এতটুকুঁ শান্তি লাভ। এম্‌নি করিয়াই সারারাত্রি কাটিয়াছে; আর এম্‌নি করিয়াই দিনও কাটিতে আরম্ভ হইল। এ কি ভীষণ জীবন-সংগ্রামের ঠিক মাঝখানে সে আজ নিজেকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া দাঁড় করাইল ! এত দূরে পৌছিবার এতটুকুঁ পূর্ব্বেও কি নিজের এতবড় অক্ষমতা সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিল না ! দুর্দ্দশার চরমে না পৌছিলে বুঝি তা জানা যায়ও না ? ওগো দর্পহারি ! এ কি তোমার দর্প চূর্ণ করা ? মনের মধ্যে যতবড় গুমোর, তা ভঙ্গ করিবার দণ্ডও কি তেম্‌নি ভীষণ !

মানুষ এ রকম সময়ে ভাল করিয়া কোন কথা ভাবিতেও পারে কি না সন্দেহ ! তথাপি, এম্‌নি একটা ব্যাকুল আবেদন যেন তাহার সমস্ত প্রাণশক্তিকে উদ্বেজিত করিয়া প্রত্যেক স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্য দিয়া বাজিতেছিল—'বেদ, পুরাণ, বাইবেল, চির-যুগ-যুগান্তরের সমগ্র লোকমত কতই যে তোমায় অপার করুণাসাগর বলে,—যদি অত নাও হোক, ওর এককণামাত্র করুণাও তোমার মধ্যে থাকে, তবে এই ঘটনাটার আগা-গোড়াটাকেই তুমি একটা দুঃস্বপ্নে পরিণত করিয়া দাও।

সত্যই কি পারো না? ওগো সর্ব্বশক্তিমান্! তোমার নাম কি শুধু ভিত্তিহীন কবিকল্পনামাত্র? মিথ্যার শিকড় কি এমন সর্ব্বকাল ও সর্ব্বলোকব্যাপী হইতে পারে? যে কখনও তোমার দ্বারে হাত পাতে নাই, আজ বড় দুর্দ্দিনে তার এই ভিক্ষার ঝুলিতে একমুষ্টি ভিক্ষার দান তুলিয়া দিতে কার্পণ্য করিও না গো—করিও না।

ডাকাতির কল্পনা, সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বিমলেন্দুর সেই বণিক-গৃহে গমন, সেই নামহীন অথচ অসমঞ্জর চিরপরিচিত হস্তাক্ষরের পত্র—সে যেন স্বপ্ন হয়,—চিরস্নেহময় প্রাণাধিক ভাইএর প্রতি সেই—ওরে, সেই অতি কুক্ষণে উচ্চারিত কুবাক্য—সে যেন সবচেয়ে বড় দুঃস্বপ্ন হয় রে! ওঃ ভগবান্! ভগবান্! কেমন করিয়া সে স্মৃতি সে সহ্য করিবে! সেই ভীষণ অভিসম্পাত যে দুদিন গেল না,—ফলিয়া উঠিল! আর তার পরে? উঃ! তার পরে—তার পরে যে উৎপলা, না—না, সর্ব্বনাশী উৎপলা নিজে যাচিয়া নিজের সেই প্রাণাধিক প্রিয় অকলঙ্কচরিত্র ভাইএর মহাপাতকীর মতই নিষ্ঠুর মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা নিজের হাতে সই করিয়া দিয়াছে,—এ কি—আর—কোনমতেই মুছিয়া যাইতে পারে না? উৎপলার যা কিছু আছে, সে সবই যদি গুঁড়া করিয়া পথের লোকের পায়ের তলায় ফেলিয়া দেওয়া যায়, তবু না? তবুও না?

অসমঞ্জর মা পূর্ব্বদিনই কালীঘাটে তাঁর বোনের বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। হরিমতি ঝিও সঙ্গে গেছে; বলিয়া গিয়াছেন, ফিরিতে দিনচারেক দেরী হইবে। আগামী কৃষ্ণাষ্টমীতে কি সব মানত-পূজা শোধ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

উৎপলাকে খাওয়া-দাওয়ার জন্য অনুরোধ করিবার একমাত্র লোক বামুণঠাকরুণ ভর্ৎসিত হইয়া ফিরিয়া গিয়া রান্নাঘরের ঝিকে ডাকিয়া দিব্য করিয়া জানাইয়া দিল যে, ঐ সর্ব্বনেশে মেয়ে একদিন যদি না আগুণ খেয়ে মরে, তো তাহার নাম সে বদলাইয়া ফেলিবে। নেহাৎ যদি মা-ই মরে, তাহা হইলে খৃষ্টান হইয়া যে গির্জ্জেয় গিয়া ঢুকিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই! বিধাতাপুরুষ দুটি-চক্ষের মাথা খেয়ে বিবি না করে কেনই যে ওকে বাঙ্গালীর ঘরে পাঠিয়েছিল, তা সেই বাহাত্তুরে বুড়োই জানে! কাল রাত থেকে এই যে উপোস দিয়ে পড়ে আছে, এর মানেই যে কি, তা 'ভগা'ই জানে বাছা,—নরলোকের বোঝবার সাধ্যি নেই।

একসময়ে ধনুর্ক্ছাড়া তীরের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া অধৈর্য্যে আত্মহারাবৎ উৎপলা ডাকিল, "রামদীন! রামদীন!"

"জি, হুজুর!"—বলিয়া রামদীন দেখা দিল।

"এই চিট্‌ঠিঠো বিমলবাবুকা পাশ লে যাও,—যাও—জল্‌দি যাও—দৌড়ো।"

মায়ের ঘরে প্রবেশ করিতেই, সেখানের একখানা বড় দাঁড়া-আরসীতে উৎপলার ছায়া পড়িল। স্কন্ধবিলম্বী খাটো চুল; সে চুলের সামনে পুরুষের মত ডানদিকে বাঁকা সিঁতা কাটা। পুরুষালি ঢংএর উঁচু-কলার ও বোতাম লাগান, কফওয়ালা বুকের-কাছে-পকেট-দেওয়া জ্যাকেট—সবশুদ্ধ জড়াইয়া এই চিরাভ্যস্ত মূর্ত্তিটার দিকে চোখ পড়িতেই, যেন গভীর ঘৃণায় তাহার সর্ব্বশরীর কুঞ্চিত হইয়া আসিল। এই পরুষ পুরুষ মূর্ত্তিটাকে সে যেন আর একদণ্ডও সহ্য করিতে না পারিয়া, অস্থির আবেগে মায়ের বাক্স-আলমারি ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। নিজের কাছে নারীত্বের বেশভূষার সঞ্চয় তো কিছুমাত্রও নাই। বাহিরে আসিয়া ডাকিল "সুকেশি"!

"কি দিদিমণি" বলিয়া বামুণঠাকরুণ ভয়ে ভয়ে আসিল।

"মার চাবি জানো?"

"না দিদিমণি, সে তো মার আঁচলেই ছিল।"

"তবে কারুকে একটা ছুতোর ডাকতে বলো,—আমি গয়না পরবো।"

বামুণদিদির নাম সুকেশী। সুকেশী অর্দ্ধ-সাহসে কহিল, "মা এলে নয় পরতে! এখন কাঁচের চুড়িওলাকে ডাকতে বলবো কি?"

"তোমায় কেউ গিন্নিপনা করতে ডাকেনি,—কাঁচের চুড়ি আমি ছোঁব! যাও, ছুতোর ডাকতে বলো, শিগ্‌গির যাও—"

সুকেশী আদেশ পালন করিয়া আসিয়া, রান্নাঘরের ঝিকে চুপি-চুপি জানাইল "এদ্দিনে বুঝতে পেয়েচি, বিবিও নয়, কিছুই নয়,—বদ্ধ পাগল! মেয়েমানুষ—শেষে কি দুর্গতিই ঘটবে, বলা যায় না! যদি গারদ-ফারদেই দিতে হয়—আহা রে!"

রামদীনের হাতে চিঠি পাইয়া, নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বিমলেন্দু আসিয়া, আরও কিছু অনিচ্ছুক ভাবে উৎপলার দ্বারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় ডেকেচেন ?"

ঘরের মধ্য হইতে ক্ষীণ শব্দ আসিল "ভিতরে আসুন।"

পর্দ্দা সরাইয়া ঘরের মধ্যে পা দিতেই, বিমলেন্দুর পা বাধিয়া গেল। এ যে স্ত্রীলোকের শয়নকক্ষ! এখানে তাকে কি প্রয়োজনে ডাকা হইল? আবার তারও চেয়ে অধিকতর স্তম্ভিত হইয়া রহিল সে উৎপলার দিকে চোখ পড়িতেই। উৎপলার সেই পূর্ব্বাপর পরিচিত মূর্ত্তি আজ তো চোখে পড়িলই না; গলার স্বর না শুনিলে হয় ত ইহাকে সে উৎপলা বলিয়া চিনিতেও পারিত না। তাহার সেই সব অপূর্ব্ব সাজসজ্জার বদলে আজ এই এতবড় অসময়ে তাহার অঙ্গে একখানা সাঁচ্চা-জরির কাজ-করা টকটকে কমলা রংএর রেশমী সাড়ী। জ্যাকেটটা ঢিলা বলিয়া সাতগণ্ডা সেপ্টীপিন আঁটিয়া সেটাকে পরিতে হইয়াছে। সেটা অবশ্য বিমলের অজ্ঞাতেই রহিল। হাতে, গলায়, কাণে তাহার চওড়া মোটা চকচকে সোণার গহনা। মায়ের সিন্দুক, বাক্স ভাঙ্গাইয়া এর চেয়ে সোজা জিনিস সে কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই; এবং এ সব লইয়া বিচার করিতে বসিবার মত শক্তিও তখন তাহার শরীর-মনে ছিল না। তাই বোধ করি বা অসমঞ্জর বধূকে দিবার পর যে চিক চৌদানি ও আটগাছা চওড়া পালিশপাতের চুড়ি বাকি পড়িয়া ছিল, সেই কখানাকেই সে নিজের গায়ে গলাইয়া লইয়াছে। ইহার অসঙ্গতি তাহার রুদ্ধপ্রায় মনের দ্বারে পৌঁছিতেও পারে নাই। সে শুধু জানিয়াছে সে নারী, আর সেটা জানাইতে চাহিয়াছে; তাতে যাই হোক। তাহাতেই সহসা বিমলেন্দুর মনে হইয়া গেল, সেই পুরুষ-পৌরুষে-ভরা দেহের মধ্যে এত লালিত্য, এত লাবণ্য, যৌবনের এমন পরিপূর্ণতা এতদিন কেমন করিয়া লুকানো ছিল! সে ঈষৎ অপ্রতিভ মৃদুকণ্ঠে ধীরে-ধীরে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় ডেকেছিলেন ?"

"হ্যাঁ" বলিয়া উৎপলা বিমলেন্দুর কাছে আগাইয়া আসিল; এবং চক্ষের নিমেষে বিস্ময়-বিমূঢ় বিমলেন্দুর দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া, আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিল, "ছোড়দাকে তোমায় বাঁচাতে হবে। না হলে আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো।"

বিমলেন্দু তদবস্থ থাকিয়াই কষ্টে উচ্চারণ করিল, "কেমন করে বাঁচাবো আমি ?"

উৎপলা তাহার পায়ের উপর তেমনি করিয়া পড়িয়া থাকিয়াই, রোদনরুদ্ধ ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "তুমি তার ঠিকানাটা আমায় দাও, আর তোমার কিছুই করতে হবে না।"

বন্যা-উচ্ছ্বসিত পরিপূর্ণ-বক্ষ নদীর মত তাহার সমস্ত শরীর ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছিল। খুব বড় একটা বিপ্লব আসন্ন হইয়া আছে। সাবধানে পা সরাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে-করিতে বিস্ময়াপ্লুত স্বরে বিমল কহিয়া উঠিল, "আপনি? আপনাকে— ?"

উৎপলা বিমলেন্দুর পা ছাড়িয়া দিয়া, স্ফুরিত বিদ্যুতের মতই চকিত হইয়া মুখ তুলিল, "শুধু এই ? যদি ওরও চেয়ে ঢের-ঢের বেশী পাপ করলেও আমার এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হয়, ছোড়দা বাঁচে—আমি যে তাও পারি।" বলিতে-বলিতে অসম্বরণীয় অশ্রুর বন্যায় যত্নে বাঁধিয়া রাখা বাঁধ হুহু শব্দে ভাসাইয়া লইয়া গেল। মাটিতে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া এবার সে উর্দ্ধ স্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

"বিমলেন্দু বাবু! সে কি আপনারও আত্মীয়ের চেয়ে বড় বন্ধু নয় ?"

এই আত্মমর্য্যাদায় রাণীর ন্যায় মহিমান্বিতা নারীর এ দীন মূর্ত্তি ও ভিখারিণীর মত করুণ প্রার্থনায় বিমলেন্দুকে একান্তই বিচলিত করিয়া তুলিল। একেই এ কয়দিন ধরিয়া নিয়ত তাহার অন্তরের মধ্যে একটা ভীষণ সঙ্ঘাত বাধিয়াই আছে, তার উপর এখন এ অবস্থায় পড়িয়া তাহার বক্ষের মধ্যের দ্বিধার ঝড়টা প্রচণ্ড বেগেই বহিতে লাগিল। কতবারই যে অন্তরে বিদ্ধ বেদনার তীক্ষ্ণ তীরের ফলাটা ক্ষতস্থানকে কাটিয়া কাটিয়া এই নির্দ্দয় প্রশ্ন তুলিয়াছে— 'অসমঞ্জ তোমার বন্ধু ?'—

আবার বাহিরেও সেই মর্ম্মচ্ছেদী প্রশ্ন!

অসমঞ্জ তাহার বন্ধু নহে তো আর কে এ সংসারে জীবন-যাত্রা-পথের নিঃসম্বল পথিক বিমলেন্দুর বন্ধু? আর কা'র কাছে বিমলেন্দু এমন অচ্ছেদ্য স্নেহের ঋণে আবদ্ধ! কিন্তু, তাই বলিয়াই তো আর বিশ্বাসঘাতককে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-কারীকে ক্ষমা করাও চলে না। এ তো আর বিমলেন্দুর নিজের ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির খতিয়ান নয়। যে মহাব্রত তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কাছে মায়া, দয়া, স্নেহ,

প্রেম, এই সবই যে তুচ্ছ! নিজের প্রতিই যখন ক্ষমা করিবার পথ নাই, তখন অপরকে ক্ষমা করিবে সে কোথা হইতে?

উৎপলা উৎসুক, আকুল নেত্রে বিমলেন্দুর স্তব্ধ, গম্ভীর মুখের অবিচলিত রেখা নিজের অশ্রু-অন্ধ-প্রায় দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়াই যেন আবার চারিদিক অন্ধকার দেখিল। বাষ্প-রুদ্ধ রুদ্ধমান কণ্ঠে কহিল "চুপ করে থেকো না। দেখচো না, আমি মরে যাচ্ছি! দয়া-মায়া বলে কি সংসারে সত্যিই কিছু নেই? খেয়ালটাই কি সবচেয়ে বড়?"

বিমলেন্দুর বক্ষে করুণা-মমতার উৎস সহস্র-ধারে উথলাইয়া উঠিতে গেল; একান্ত অসহায় ও আশা-নিরাশার প্রচণ্ড সংঘাতে ক্ষণে রক্ত ক্ষণে বিবর্ণ মুখের পানে সে বারেক বিপুল হৃদয়োচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ সকরুণ দৃষ্টিপাত করিল। তার পর নিজের সঙ্গীন জীবন-কাহিনী স্মরণ করিয়া, একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক, ধীরে-ধীরে সে কহিল, "দয়া-মায়ার পথ যে আমাদের নিজ হাতে কাঁটা দিয়ে বন্ধ করতে হয়েছে। আমি দয়া দেখালেও তো সমিতির হাত থেকে বাঁচাতে পারা যাবে না। অসমঞ্জর ঠিকানা সরযূপ্রসাদ জানে,—সে আমায় বলে নি। বলা নিয়ম নয়, সেও তুমি জানো।"

"তোমায় জান্‌তে হবে,—যেমন করে হয়, তোমায় জান্‌তেই হ'বে। তুমি ভিন্ন আর যে আমার কেউ নেই।" বিমলেন্দুর একটা হাত সে চাপিয়া ধরিল।

বিমলেন্দুর বিস্ময়-রুদ্ধ কণ্ঠ কোনমতে উচ্চারণ করিল, "আমি ভিন্ন!"

উৎপলার সমস্ত মুখ তাহার সেই একান্ত শোকদীর্ণ অন্তরের প্রতিচ্ছায়ায় রঞ্জিত ম্লান পাণ্ডুতাকেও পরাভূত করিয়া, শারদ-সন্ধ্যার পশ্চিমাকাশের মতই আলোহিত হইয়া উঠিল। তাহার ললাটের ঘর্ম্মজড়িত চূর্ণ কুন্তল চোখের কাছে আসিয়া পড়িল। দীর্ঘ নেত্রপল্লব পরিপুষ্ট গণ্ডের উপর প্রায় নামিয়া আসিল। যে হাতে সে বিমলেন্দুর হাত ধরিয়াছিল, সেখানা ঘর্ম্মজলে আর্দ্র হইয়া গিয়া, সে বন্ধন হইতে খসিয়া পড়িল। বর্ষা তাহার শ্যামলতাকে যেমন পুষ্প-তরুতে তেমনি শুষ্ক দূর্ব্বাদলেও সঞ্চারিত করিতে ছাড়ে না,—এই এতবড় বিপদের বজ্র মাথার উপর লইয়া কে জানে কোন্ অদৃশ্য যাদুকরের যাদু-যষ্টির অজ্ঞাত স্পর্শে আজ সহসা উৎপলার নারী-জীবন জাগিয়া উঠিল। নতমুখে সে কহিল, "আমি এই বিপদে পড়েই বুঝেছি, ছোড়দা ও তুমি ভিন্ন আমার যে আর কেউ নেই। আর কা'কে বল্‌বো আমি,—তুমি যদি না আমার মুখ চাও!" সে মুখ নত করিল।

বিমলেন্দু গভীর কৌতূহলের সহিত মিশ্রিত পরিপূর্ণ বেদনায় তাহার মৌন নত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আবার একটা নূতন গূঢ় বেদনা তাহার আহত বিপর্য্যস্ত অন্তরের মধ্যে বর্ষার তীক্ষ্ণধার ফলকের মত খোঁচা মারিতে লাগিল। এ কি নব জাগরণ! আজ এই একান্ত অসময়ে, এই চিরনিদ্রাগতা, এই পাষাণী কিসের সোণার কাটীর স্পর্শে, কার চরণ-রেণুকণার আশীর্ব্বাদে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু হায় রে, এর চেয়ে যে না জাগাই তার ভাল ছিল!

তবু একটী মুহূর্ত্তের জন্য বিমলেন্দুর সমুদায় শরীর-মন আচ্ছন্ন করিয়া রহিল কেবল এক লহমার সেই একটুখানি স্নিগ্ধ স্পর্শ,—বিপুল আগ্রহে মথিত সেই একটী বাণী "তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে!" আর ওই দুটী দীর্ঘপল্লবের ছায়াঘেরা গভীর অনুরাগের রাগে রঞ্জিত কোমল দৃষ্টিটুকু।

এই কয়টী ক্ষুদ্র অভিব্যক্তিতে মিলিয়া অব্যাহত আনন্দ-রাগিনীর সুরে বাঁধা এস্‌রাজের তারের মত যেন কার অদৃশ্য অঙ্গস্পর্শে বিমলেন্দুর অন্তরের সব কয়টা তন্ত্রীতেই যেন পুলকোচ্ছ্বাসে কাঁপিয়া-কাঁপিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিতে লাগিল। দেশ, ব্রত, প্রতিজ্ঞা, সমুদায়কে আচ্ছন্ন করিয়া সহস্রদল পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিল শুধু যৌবনের মধুময় স্বপ্নে-ঘেরা আশা এবং তার মাঝখানে ভাস্বর হইয়া রহিল শুধু উৎপলার মুখপদ্ম।

কিন্তু সে কতক্ষণ! ভৈরবের বিজয়ভেরীর রুদ্র তান—সে যে দুয়ারের পার্শ্বেই বাজিতেছে! সে তো আর বিয়ের সানাই নয়—বিসর্জ্জনের ঢাকের বাদ্য। সে বাজনা কাণ চাপিলেও কাণে ঢুকিতে পথ পায়, হৃদয়-কবাট রুদ্ধ করিলেও তার শব্দ বন্ধ করা যায় না।

বিমলেন্দুর নেশার ঘোর তখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই; তাই সে ঈষৎ হাসিয়া বলিয়াছিল, "সত্যিই কি এতদিন পরে তোমার যথার্থ বন্ধুর খোঁজ আজ পেলে তুমি? সত্যি? সত্যি তুমি আমায় আত্মীয় বলে, বন্ধু বলে মনে করো, বিশ্বাস করো, নির্ভর করো? বলো বলো, বল—আর একটীবার মুখ ফুটে বলো,—তোমার জন্য তাহ'লে আমি অসাধ্যও বোধ করি সাধন করতে পারবো। উৎপলা, শুধু বলো—

উঃ—না, এ' আমি কি করতে বসেছি! এ আমি কি বল্‌চি।"

বিমলেন্দুর সকল নেশা যেন কার হাতের চাবুকের ঘা খাইয়া এক মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গেল। শর-বিদ্ধ আহত মৃগের ন্যায় সে ত্রস্তে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া—"এমন করে দু'জনকেই মরণের পথে টেনো না উৎপলা! তুমি যা ছিলে তাই থাক! তেমনি রহস্যময়, তেমনি পাষাণ! তোমার ও মূর্ত্তি ঢাকা দাও,—ঢাকা দাও। আমি যাই—আমি যাই;—না··না —আর না;—আর আমায় ডেকো না—ডেকো না—" বলিতে-বলিতেই ব্যাধ-বিতাড়িত ভয়ার্ত্ত পশুর মতই সে প্রাণপণে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। পিছনে একবার ফিরিয়াও চাহিল না; কিন্তু তথাপি পশ্চাতে একটা' যে অস্ফুট ধ্বনি মাত্র শোনা গেল, সেটাকে সে এড়াইয়া যাইতে পারিল না; তাহার দুই কর্ণে তপ্ত শলাকার মত বিদ্ধ হইয়া সে শব্দটা এমনিই বাজিয়া উঠিল, যেন সেটা কোন মর্ম্মবিদ্ধ জন্তুর মরণ-আর্ত্তনাদ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মের দিনে নদীর জল যখন তলায় পড়িয়া থাকে, তখন আকস্মিক বর্ষার প্লাবনে, সে যে কোন কালে কূল ছাপাইয়া উন্মত্ত প্রবাহে ছুটিয়া বাহির হইয়া, তার চারিপাশকেও অকূলে টানিয়া লইবে, এমন সম্ভাবনা কাহারও মনে থাকে না। তাই অকস্মাৎ তেমনটা ঘটিলে লোকে যেন দিশাহারা হয়। বিমলেন্দুরও অনেকটা এইরূপ হইয়াছিল। উৎপলাকে প্রথম দর্শনে তাহার মনে পূর্ব্বরাগ না জন্মিলেও, যতদিন উহার সঙ্গ তাহার ভাল করিয়া সহিয়া যায় নাই, উৎপলার অর্দ্ধ-প্রচ্ছন্ন নারীত্ব জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তাহার মনকে পলে-পলে আকর্ষণ করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, সংসারানভিজ্ঞ বিমলেন্দু উৎপলাকে তাহার উদ্ভট জীবনের মধ্যেও বিশেষ অশোভন ভাবে দেখিতে পারে নাই। তাই তাহার শক্তি-মত্তা—তাহার আত্মনির্ভরতা, তাহার ত্যাগশীলতা ভিতরে-ভিতরে বিমলেন্দুর দৃঢ় সঙ্কল্পের একটা স্থানে একটুখানি ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছিল। সেটা তখন সে জানিতেও পারে নাই। অকস্মাৎ একদিন বর্ষাধারার ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া তাহা বাঁধ ভাসাইতেও গিয়াছিল। সেদিনের সেই সতর্ক প্রহরায় ভগ্নপ্রায় হইয়াও বাঁধের বাঁধন ধ্বসিতে পারে নাই। কিন্তু সেই দিনই সে হঠাৎ যেন সসংজ্ঞ হইয়া উঠিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, তাহার সঙ্কল্পের মূল খুবই দৃঢ় নয়; উৎপলার প্রতি একটা তীব্র অনুরাগের স্রোত তাহার অন্তরের মধ্যের দুই কূল পরিপূর্ণ করিয়াই প্রবাহিত হইতেছে; ইহা তাহার সকল সংযম, সকল ত্যাগের মহিমাকে প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাসাইয়া কোন অকূলের উদ্দেশ্যে গর্জ্জিয়া বাহির হইয়া পড়িতেও হয় ত অসমর্থ নয়! কশাহত চিত্তে বেদনার সঙ্গে সমপরিমাণে বিস্ময়ে ও লজ্জা-ক্ষোভে আকর্ণ ললাট রঞ্জিত হইয়া উঠিয়া, নূতন করিয়া সে তাহার অপরাধী অন্তরের চারিদিকে লোহার বাঁধন দৃঢ় হস্তে রচনা করিতে লাগিয়া গেল। ইহার পর হইতে হৃদয়-বৃত্তির আর কোনই দৌরাত্ম্যের খবর পাওয়া যায় নাই।

আজ আবার সেই অকস্মাৎ-জাগ্রত প্রচণ্ড বন্যাধারা তাহার দৃঢ়ব্রত ঐরাবতকে প্রায় ভাসাইয়া লইবারই উপক্রম করিয়াছিল আর কি! এত করিয়াও মনের এ বিশ্বাস-ঘাতকতা গেল না দেখিয়া, বিমলেন্দু যত বিস্মিত, ততোধিক দুঃখিতও হইয়াছিল।

সে রাত্রে সেই দুর্দ্দমনীয় লোভের হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া আসিয়া সারা দীর্ঘ পথটাই বিমলেন্দু পায়ে হাঁটিয়া বাসায় ফিরিল। সহরতলীর নির্জ্জন পথের দুধারে বড় বড় বাগান ঘন শাখাপল্লবে জমাট অন্ধকারের ঘুট পাকাইয়া স্তব্ধ মুখে চাহিয়া আছে। ঝিল্লির সকরুণ স্বরে যেন তাহাদের সেই আঁধার-ভরা বুকের কান্না গুমরিয়া উঠিতেছে। পথিপার্শ্বের প্রকাণ্ড বাঁশঝাড় আকস্মিক একটা দমকা হাওয়ায় শ্বসিয়া উঠিতেই, বিমলেন্দুর সর্ব্ব শরীরের মধ্যে একটা তাড়িত-প্রবাহ বেগে বহিয়া গেল। সেই অস্ফুট মর্ম্মরে আর একটা অর্দ্ধব্যক্ত আর্ত্ত গুঞ্জন সে যেন এবার স্পষ্ট করিয়াই শুনিতে লাগিল! এদের হাত হইতে মুক্তি লাভাশায় সে দ্বিগুণ বেগে পা ফেলিয়া চলিল; কিন্তু তবুও সেই ছিন্ন-তন্ত্রী বীণার শেষ সুরের রেশের মতই সেই মর্ম্মচ্ছেদী আর্ত্তস্বরটুকু যেন সারা বিশ্ব-সংসার পরিপূর্ণ করিয়াই তাহার দুই কাণের তারে নির্দ্দয় সুরে ঘা দিয়া-দিয়াই সঙ্গে-সঙ্গে বাজিয়া চলিল,—তাহাকে ছাড়ানো চলিল না।

সুপ্তিমগ্ন মধ্যরাত্রের নিজেরও একটী বিচিত্র সুর আছে; উহা বিনিদ্র ব্যক্তির প্রাণের তন্ত্রীতে স্পন্দিত হইতে থাকে,—এ একটা বিশেষ জানা কথা। সে সুর কোথা হইতে ভাসিয়া

আসে, তার তান-লয়ই বা কি,—সে সবের খবর শ্রোতা কখন বিচার করিয়া দেখে না;—দেখিবার কথা মনেও পড়ে না। নিজ-নিজ প্রবৃত্তি-অনুযায়ী কেহ তাহার মধ্য হইতে এক ও অবিচ্ছিন্ন ধ্বনি মাত্র, কেহ কাব্যকলার সাহায্যে বৈচিত্র্য-পূর্ণ শব্দ-জালের রচনা করিয়া লয়। আজ এই সুপ্তিনিমগ্ন স্তব্ধ নিশীথিনীর মধ্যস্থানে বিশ্ব-চরাচরের একমাত্র নিত্য-জাগ্রত অচ্ছেদ্য মহাসঙ্গীতের তালে-তালে শুদ্ধমাত্র সেই একটা মর্ম্মন্তুদ অব্যক্ত যন্ত্রণাধ্বনিই যেন বিমলেন্দুর সমস্ত মনপ্রাণ, ইন্দ্রিয়-গ্রাম আচ্ছন্ন করিয়া কর-তালের মতন ঝমাঝম্ ঝমাঝম্ নাদে বাজিয়া চলিল। তাহার কঠিন হৃদয়, তাহার দৃঢ়ব্রত, সমস্তই যেন সেই বুক-ভাঙ্গা আর্ত্ত কণ্ঠ পলে-পলে তিলে-তিলে হাপরে-ভরা সোণার তালের মত গলাইয়া ফেলিতেছে,—এটা সর্ব্বান্তঃকরণেই অনুভব করিয়া সে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। যে পথে সে চলিয়া আসিয়াছে, তাহার মনটা যে সে পথের ঠিক উপযুক্ত নয়, এই সত্যটা আজ সে ভাল করিয়াই দেখিতে পাইল। বাসনা-কামনার গ্রন্থি যে আজও তাহার অন্তরকে জড়াইয়া আছে। প্রাণটা কাতর হইয়া যেন একটা আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল। কি দিয়া সে নিজের আজিকার এ ক্ষতির ব্যথা ঢাকা দিবে? কতক্ষণ বাহিরে মুক্ত বাতাসে পাইচারী করিয়া বেড়াইয়া যখন নিজেকে একটুখানি ক্লান্ত বলিয়া মনে করিতে পারিল,—তখন সামনের বারান্দায় ঢকিয়া একখানা যে বেতের আরাম-চৌকি রৌদ্র-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া জীর্ণাবস্থায় পড়িয়া ছিল, তাহারই মধ্যে ঝুপ্ করিয়া আপনাকে সে ফেলিয়া দিল। সেখানেও সেই বিলাপ-ব্যক্ত কণ্ঠের সহিত সেই একটুখানি সলজ্জ চাহনি, কোমল একটী ফুলের মত এতটুকু ক্ষুদ্র সেই স্পর্শ টুকু ভোর বেলাকার শিশিরে ভেজা বাসি গোলাপ পাপড়িটীর মত তাহার কঠিন হাতের স্পর্শ পাইয়াই সে যেন ঝরিয়া পড়িয়া গেল।—সেই একটুখানি হাতের ছোঁয়া! আর—আর—"তোমরা ছাড়া আমার কে আছে"—এ কথাটা—এ কথাটা যে কোনমতেই মন হইতে যাইবার নয়। বিমলেন্দু অস্থির হইয়া উঠিল। শুইয়া থাকা দায় হইল। আবার উঠিয়া সে ধীরে-ধীরে সেই সুবৃহৎ দালানটার এ প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অপর প্রান্ত অবধি কতবারই যে ঘুরিয়া আসিল; কিন্তু কিছুতেই সে শান্তি পাইল না। যদি অন্তরের আর্ত্ত স্বর বাহিরে শুনা যাইত, তবে সেই সুখসুপ্ত জ্যোৎস্নারাত্রি তাহার এই অফুরন্ত অন্তর্ব্যথার তীব্র-করুণ বিলাপে বোধ করি বিদীর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু নিঃশব্দেই সে নিজের এই সর্ব্বস্বান্তকারী ক্ষতিটাকে বুকের ভিতর চাপিয়া লইয়া মাতালের মত, পাগলের মত জড়িত স্খলিত চরণে ঘুরিতে লাগিল। তার পর যতটা সময় যাইতে লাগিল, একে-একে সব কথাগুলা—সেই প্রথম পরিচয়ের দিন হইতে আজিকার এই শেষ বিদায়-দৃশ্য পর্য্যন্ত;—যতবারই সে ফিরিয়া-ফিরিয়া উৎপলার কথা মনে করিল, যতবারই তাহার মনের চোখে উৎপলার বিচিত্র মূর্ত্তি পুনঃ-পুনঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে থাকিয়া, তাহার বুকে ব্যথার মোচড় দিয়া-দিয়া স্মরণ করাইয়া দিল;—অশ্বারোহীর কাপড়েও যেমন, বিয়ের কনের বেশেও তেমনি—সকল অবস্থাতেই ওই উৎপলা মনোহারিণী; নব-নব শোভা-সম্পদের তার যেন সীমা নাই। শৌর্য্য-বীর্য্য,—আবার স্নেহ প্রেম সমস্ত হৃদয়-বৃত্তির অধিকার তাহার সুপ্রচুর!—এমন সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী চিরসঙ্গিনী কিসের মূল্যে সে আজ হেলায় হারাইল? বলিতে লজ্জা নাই, সত্য স্বীকারে কিছুমাত্র লজ্জা নাই,—উৎপলাকে সে ত কই দেশের চেয়ে কম ভালবাসে না!—তবে কাহার অযথা অত্যাচার তাহার জীবনের উপর এতবড় একটা প্রকাণ্ড পাষাণ-ভার হইয়া চাপিয়া বসিয়া, তাহাকে ক্রীতদাসের চেয়েও অধম, জেলের কয়েদীর চেয়েও অক্ষম, একটা পাশবদ্ধ জানোয়ার, একটা পরহস্তচালিত যন্ত্রমাত্রে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে, যে, আজ নিজের পরেও তাহার কিছুমাত্র অধিকার নাই? নিজের যাহা প্রেয়, তাহা লাভের অধিকার নাই; শরণাগতকে রক্ষা পর্য্যন্ত করিবার অধিকার নাই। অযাচিত পাওয়া, চির আকাঙ্ক্ষিত সাধনার ফল মূঢ়ের মত তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, নিজের এই বন্ধনহীন, বান্ধবশূন্য জীবনের তরণী শুধু অনির্দ্দেশ্যের অভিমুখেই ভাসাইয়া দিতে হইবে?—অন্তরের মধ্য হইতে আহত হৃদয় ক্ষুব্ধ রোষে গর্জ্জিয়া উঠিল, এর জন্য দায়ী যে, তার মত শত্রু তাহার আর কে?—মানুষের জীবন লইয়া এ কি ছেলেখেলা? অজ্ঞ কিশোর প্রাণ কি তার চির ভবিষ্যতের পূর্ব্বাপর সমুদায় ভালমন্দের বিচার করিতে সমর্থ? সেই অসমাপ্ত মুকুল জীবন ভাল করিয়া ফোটে নাই। তাকে জোর করিয়া ছিঁড়িয়া যে লইতে চায়, নিষ্ঠুর দস্যু ভিন্ন সে কি? বালক যখন প্রথম যৌবন প্রাপ্ত হয়, নূতন-নামা বর্ষার জলের মত সর্ব্বদাই সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে থাকে। সে সময়ে তাহাতেও বাঁধন দিয়া

যে অদূরদর্শী খাল কাটিতে চাহে, সে এটা ভাবে না যে, বর্ষাশেষে এই আকস্মিক-প্রাপ্ত জলের ধারার কতটুকু বাকি পড়িয়া থাকিবে, সেটা না দেখিয়াই ইহাকে ভিন্ন পথে গতি দিলে দুর্গতি ঘটাই বেশী সম্ভব। এই যে এতবড় একটা কঠিন সর্ত্তে একটা কিশোর জীবনকে বাঁধিয়া ফেলা, এর মত নিষ্ঠুরতা আর কোথাও কিছু আছে কি? যাদের অবিচারের প্রতি বিরাগে আজ এই ব্রত তাহারা লইয়াছে, আগাগোড়া খুঁজিলেও তো এতবড় অত্যাচার তাদের ইতিহাসেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! দেশহিতব্রত খুব বড় কথাই; কিন্তু সেটা পালন করিতে হইবে কি দেশের ছেলেদের গলায় ফাঁসের টান মারিয়া? মানুষ নিজের ইচ্ছামত নিজের শ্রেয়ের পথে চলিতেও পাইবে না? দাসখত আর কাহার নাম?—না, অসমঞ্জের প্রতি ক্ষমা করিবার কিছুই নাই। অপ্রকৃতিস্থ-মতি অদূরদর্শী লঘুচিত্ত একটা বালক মাত্র সে—এতবড় একটা দায়িত্বের ভার নিজের অপরিণত বুদ্ধির মিথ্যা গৌরবে অন্ধ হইয়া কিসের সাহসে সে গ্রহণ করিয়া বসিল! বৈচিত্র্যময় মানব-চিত্তের কুটিল রহস্য-লেখা পাঠ করিতে কতটুকু অভিজ্ঞতার সঞ্চয় তাহার আছে, যার নিজের চিত্তবল পর্য্যন্ত অপরীক্ষিত? না—এই দাম্ভিক, তরলমতি, স্বার্থপর অসমঞ্জ কিছুতেই ক্ষমার যোগ্য নয়!

বিমল এতক্ষণে যেন তাহার অসীম চিন্তাসমুদ্রের কূল খুঁজিয়া পাইল। অসমঞ্জের প্রতি শ্রদ্ধা না থাক্, তাহার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহের উপদ্রবে এ কয়দিন তাহার অন্তরের মধ্যে নিয়ত যেন একটা তুমুল ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে। কর্ত্তব্যজ্ঞান স্নেহের বন্যায় ভাসাইয়া লইয়াছে। কিন্তু আজ সহসা তাহাকে বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া, তাহার অপরাধের পরিমাণ মাপকাটিকে ছাপাইয়া গেল; তাহার অবিমৃষ্যকারিতা, তাহার হঠকারিতা, তাহার মানবচরিত্রানভিজ্ঞতার অন্ধকার যেন তাহার পূর্ব্বেকার সমুদায় ঔজ্জ্বল্যকে আবরণ করিয়া দাঁড়াইল। তখন বিমলেন্দু সবিস্ময়ে দেখিল, সেই বুদ্ধিতে প্রদীপ্ত, ত্যাগে মহীয়ান, গৌরবে সমুজ্বল সেই যে বীরচেতা অসমঞ্জকে পাইয়া সে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিল, নিজের সর্ব্বস্ব বোধ করি, ভূত-ভবিষ্যতের—ইহ-পর সকল কালের সকল লোকের সমস্তই তাহার চরণ-প্রান্তে নির্ব্বিচারে সঁপিয়া দিয়া, নিজের জন্ম-মরণকে সফল মনে করিতেও বিন্দু-মাত্র দ্বিধা করে নাই, সে তাহার সত্য রূপ নয়। নাট্যশালার নট যেমন আসল মূর্ত্তিকে চাপা দিয়া কৃত্রিম ভূষায় নিজেকে ভূষিত করে,—ভিখারীও সম্রাটের সাজ পরে, এও তাহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আসলে অতি দৈন্যগ্রস্ত ভিক্ষুকই সে,—রাজা সে নয়। মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা অকথ্য ঘৃণায় বিমলেন্দুর সমস্ত শরীর-মন যেন গুটাইয়া এতটুকু হইয়া আসিল। শুধু দীনই নয়,—হীনতারও যে তার শেষ পাওয়া যায় না। এই ছদ্মবেশী সাধু, এই ময়ূরপুচ্ছশোভিত দাঁড়কাক —এই নীলবর্ণে রঞ্জিত শৃগাল—ইহাকেই সে এত দিন শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে, বিশ্বাস করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ ইহারই নিকটে চিরদিনের মত সমর্পণ করিয়া ফেলিয়াছে, এজন্য তাহার সারা অন্তর ভরিয়াই ধিক্কার উঠিয়া আসিল। যে পাষণ্ড এতবড় মিথ্যার ছলনায় ভুলাইয়া এতগুলা জীবন লইয়া সামান্য ক্রীড়নকেরই মত স্বচ্ছন্দে ছেলেখেলা খেলিতে পারে, আবার সেগুলাকে ভাঙ্গা খেলানার মতই অনায়াসে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ক্রীড়ান্তরে ব্যাপৃত হইতেও যাহার বাধে না, তাহার পরে মায়া? মমতার যোগ্যপাত্র সে? প্রতিজ্ঞা তাহার কাছে হয় ত আজ একটা ক্ষণিকের খেয়াল মাত্র; কিন্তু বিমলেন্দুর পক্ষে যে তাহা অচ্ছেদ্য নাগপাশ! সবই তো আর অসমঞ্জ রায় নহে। না,—আজ ক্ষমা নাই। আর ক্ষমাই বা সে করিবে কোথা হইতে? বিমল ক্ষমা করিলে অসমঞ্জকে দণ্ড দিতে যে দু'জন বেশী উৎসুক, তাহারা ছাড়িবে কেন? সরযূপ্রসাদের অসমঞ্জের প্রতি বিদ্বেষের একটু কারণ ছিল। সরযূর পিতা মধ্যবিত্ত লোক; কিন্তু খুব বড়-ঘরাণা। পুত্রের বিবাহ কোন এক অপুত্রক রাজার কন্যার সহিত স্থির করিয়াছিলেন। ফলে সে বার্ষিক সাত-আট লক্ষ টাকার মালিক হইত। বিবাহের জন্য অসমঞ্জর সম্মতি চাহিতে গেলে, সে কিছুতেই মত দেয় নাই; এবং ইহার ফলে, রাজ-জামাতা তো নহেই,—উপরন্তু, বাপের ত্যাজ্যপুত্র হইয়া সরযূকে এযাবৎ অসমঞ্জরই গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইয়াছে। প্রথম-প্রথম সেটাকে মহৎ ত্যাগের মুখে মহীয়ান করিয়া, আর পাঁচজনের বাহবার সঙ্গে সে নিজেও দেখিয়াছিল। কিন্তু আজকাল লোকের মুখে জয়ধ্বনি যতই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, নিজের নির্ব্বুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধির ধিক্কারের সহিত অসমঞ্জর প্রতি বিরক্তিটা ততই পুঞ্জীভূত হইতেছিল। দু'বছর না যাইতেই সেই অসমঞ্জ নিজে বিবাহ করিয়া বসিল! রাধিকার ক্রোধ বিমলের প্রতি, অসমঞ্জ-পক্ষপাত লইয়া।

কিন্তু অসমঞ্জকে না বাঁচাইলে তাহার রক্ত-রঞ্জিত হইয়া উৎপলার কাছে সে আর কোন্ মুখে গিয়া মুখ দেখাইবে? তবে কি এই শেষ? উৎপলার সহিত আজ হইতে সকল সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল? আর কি এ জীবনে সে তাহাকে দেখিবে না? এত' আকস্মিক, এমন অপ্রত্যাশিত রূপে প্রাপ্ত, এই করতলায়ত্ত রত্ন—সত্যই তাহাকে লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া চির-নিরাশাকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে? অথচ—অথচ সে অনায়াসেই এই সংসারে দুর্ল্লভ, আবার জাতি-ধর্ম্ম-সমাজ সকল বিষয়েই তাহার একান্ত অনুকূল বিধায় পাওয়ার পক্ষে সুলভ উৎপলাকে পাইয়া চির জীবনের মতই ধন্য হইতে পারে। তবে কেন হইবে না? যাক্, তবে ভেঙেই যাক সঞ্জীবনী সভা। দূরে যে সরে যেতে চায়, যাক্ সে। বিমলও তার চিরদিনের ঘাতপ্রতিঘাতময় জীবন-সংগ্রামে দীর্ঘচ্ছেদ ফেলিয়া, নবজীবনে একটুখানি স্বস্তি যদি কুড়াইয়া পায়, কেন তা ছাড়িয়া দেয়? এ জগতে কতটুকুই বা পাইয়াছে সে? উৎপলা শিক্ষিতা, শক্তিময়ী। রূপ প্রচুরতর নাই থাক,—নারী-বেশে আজ তাহাকে কিছুই তো অশোভন বোধ হয় নাই। আহা, সেই জলভরা চোক দুটী—! নাঃ, সে কি ভোলা যায়? তাহাকে ছাড়িবার কথায় জীবন যে একান্ত অবলম্বনহীন মনে হইতেছে।

বিমলেন্দু নিজেকে আর এক রকমে গড়িয়া লইয়া—যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াই, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।—যাক্, বাঁচা গেল! অসমঞ্জ নির্ব্বিঘ্নে তার নববধূর সহিত মধু-বাসর সমাধা করুক; উৎপলা তার আদরের ছোড়দার জীবন-মূল্যে নিশ্চয়ই বিমলেন্দুর নিকট কৃতজ্ঞতার পাশে নিজেকে বাঁধিয়া দিতে পারিবে? কেনই বা বিমলেন্দু এমন সুযোগ ছাড়িয়া দিবে? কেনই বা সে সতীর প্রেম, সন্তানের পিতৃত্ব হইতে নিজের এই স্নেহ-প্রেম-বুভুক্ষিত শুষ্ক হৃদয়টাকে চির-বঞ্চিত করিয়া রাখিবে? যা জগতের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট ব্যক্তিও লাভ করিতে সমর্থ, সেটুকুও সে পাইবে না, এতবড় অপদার্থ সে? এই তো দেশ-সেবা! দেশের জন্য উৎকৃষ্ট সন্তান প্রজনন ও পালনেই দেশকে মুখ্য দান, অসমঞ্জ সেদিন যে বলিতেছিল, সে মিথ্যা নয়।

ঘরে ঢুকিয়া প্রজ্জলিত আলোর সম্মুখে ক্ষিপ্রহস্তে একখানা চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল "উৎপলা! ভাবিয়া দেখিলাম, অসমঞ্জকে বাঁচাইবারই চেষ্টা করা উচিত। না বুঝিয়া যে পথে আমরা চলিতেছি, এ পথে মুক্তি নাই,—এসো এখনও ফিরিয়া যাই। যাবে কি? আমার পাশে দাঁড়াইয়া অর্জ্জুন-সারথি ভদ্রার মত আমার রথের ঘোড়া তুমি চালাইবে কি? যদি ভরসা দাও, তবেই ফিরি; নহিলে অজানা পথে, আনাড়ি আমি, হয় ত আবার পথ হারাইব। মঞ্জুর জন্য ভাবিও না। আমি তার সহায় থাকিলে, যে কোন উপায়েই তার মুক্তি নিশ্চিত"—

বিমলেন্দুর কলম থামিয়া গেল।—আঁা, এ' কি করিতেছে সে!—এ কি—করিতেছে?—এ'—কি করিতেছে সে? ন্যায়ের বিরুদ্ধে, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাতিয়া, নিজের অন্তর্যামীকে শুদ্ধ ফাঁকির মূল্য শোধ করিয়া সেও না কি নারী-প্রেমের কাঙ্গাল হইয়া উঠিল? দেশের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া নিজের স্বার্থ-সুখকেই প্রাধান্য দিতে বসিয়া গেল? কোথায় তাহার চরিত্র-বল? কোথায় তাহার দৃঢ়তা? তবে কি সমস্ত বাঙ্গালী জাতটাই অসমঞ্জ রায়?—নারী মুখের এককণা মিষ্ট হাসিই কি তবে দেশ, প্রতিজ্ঞা, ন্যায়-নিষ্ঠা—স্বর্গের, মর্ত্ত্যের, সব কিছুর চেয়েই বড়?—না, সবাই এ সংসারে অসমঞ্জ নহে। বাঙ্গালীর আদর্শ অত ছোট নয়। চরিত্র-বলের এদেশে কিছুমাত্রও অভাব নাই। কি তুচ্ছ নারী-প্রেমের মোহবিকার! কিসের স্বার্থ—কি তার ক্ষুদ্র সুখ!—বিমলেন্দু অপদার্থ নয়!—

আর উৎপলা? সেই বা কি? চিরগর্ব্বিতা, পুরুষ-প্রকৃতি, উদ্ধত-স্বভাবা নারী—কোথায় তার মনে ভালবাসা? স্বার্থ, স্বার্থ,—শুধু স্বার্থ! যখন সে মৃত্যুদণ্ডে সই দিয়াছিল, তখন পর মনে করিয়া। কই, তাহার জন্য তো প্রাণ কাঁদে নাই! এত বড় স্বার্থপর সে! প্রেমের লীলা—সেটুকুও যে তাহার ছলনা মাত্র নহে, এই বা কে বলিল? অসমঞ্জকে বাঁচাইবার জন্য বিমলেন্দুকে করায়ত্ত করিবার কৌশল যে ওটুকু হইতে পারে না, তারই বা প্রমাণ কোথায়?—নাঃ,—তাও কি কখন কোন ভদ্রলোকের মেয়ের দ্বারা,—তা, এমন অসম্ভবই বা কি? এক রাত্রির মধ্যে অতবড় বিপদের সংবাদে সহসা চিরশুষ্ক চিত্তে যে তাহার এ আকস্মিক প্রেমের প্লাবন দেখা দিল, এও তো বিশ্বাস করা কঠিন!—কিন্তু তা যদি হয়, তবে সে কি? নিজেদের স্বার্থের জন্য এত বড় ঘৃণিত পথও তাহার দ্বারা

গ্রহণ করা সম্ভব, তাহাদেরই খোলস-চাপা মহত্ত্বে বিমলেন্দু নিজেকে এত দিন প্রতারিত করিয়া রাখিয়াছিল? বঞ্চনা সে আজন্ম সবার কাছেই লাভ করিয়াছে; তাহার কড়ায়-গণ্ডায় শোধ দিয়া আসিতেও ছাড়ে নাই। আজই বা না দিবে কেন? না, তাহার মনে দয়া নাই, মায়া নাই—কিছু নাই—কিছু নাই;—সে দেশের কাছে ঘোর অপরাধে অপরাধী অসমঞ্জকে, আর তাহার কাছে অপরাধিনী উৎপলাকে—কাহাকেও ক্ষমা করিতে পারে না—পারিবে না।—

উদ্দাম গতিতে চালিত এঞ্জিনের গতি অকস্মাৎ রোধ করিতে হইলে, পরিচালককে যেমন প্রাণপণে ব্রেক কষিতে হয়, তেমনি করিয়া বিমলেন্দু নিজের যৌবন-বাসনার উদ্দাম আবেগকে কর্ত্তব্যের কঠিন বাঁধ দিয়া প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলিয়া রাখিয়া, নিজের সেই নির্ঝর-ঝরা নদীর স্রোতের মত প্রেমানন্দে পরিপ্লুত প্রথম প্রণয়লিপি শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ঘরময় ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

চিরনিরানন্দ, ক্রন্দনশীল প্রাণটা তাহার সে কাজটা করিতে যতই না মরণ-কান্না কাঁদুক, সে কান্না তার শোনে কে?

(ক্রমশঃ)

কন্যা-কুমারী

[শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, বি-এল]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সম্মুখেই ভারতমহাসাগর। এইবার সত্য-সত্যই ভারতবর্ষের সর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে—বাল্যকালের ভূগোলে পঠিত কুমারিকা-অন্তরীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি দেখিয়া, মনে একটি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। রাজপথ হইতে ক্রমশঃ-নিম্ন অন্তরীপের অগ্রভাগে উচ্চ-প্রাচীর-বেষ্টিত দেবী-মন্দিরের স্বর্ণচূড়াটি মাত্র দেখিতে পাইলাম। বামে, অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে, তীররেখা ধনুকের ন্যায় বক্র; সেইজন্য মন্দিরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ—দুই দিকেই মহাসমুদ্র। পূর্ব্বের উপকূলে তরু-চ্ছায়াশ্রিত কন্যাকুমারীগ্রাম। পশ্চিম দিকে প্রথমেই রেসিডেন্সী—বিস্তীর্ণ দূর্ব্বামণ্ডিত অঙ্গন ও উদ্যান-পরিবৃত সুরম্য দ্বিতল গৃহ। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজের কোন বিশিষ্ট অতিথি আসিলে ইহাতে বাস করেন। রেসিডেন্সীর পাশেই ডাক-বাংলা, এবং তাহার পরে রোমান্ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ভজনালয় ও কুমারী-আশ্রম। কন্যাকুমারিকায়, যেমন হিন্দু-মন্দিরে, তেমনি খৃষ্টানের গির্জ্জায়ও জননী কুমারী-রূপে পূজিতা হইতেছেন।—ইহার পশ্চিমে সৈকত-ভূমি বহুদূর পর্য্যন্ত ফণী-মনসার ঝোপে আবৃত। উচ্চ তীরভূমিতে তালবৃক্ষশ্রেণী মহাকবির "তমালতালীবনরাজিনীলা আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশিঃ" বর্ণনার সার্থকতা রক্ষা করিতেছে।

মন্দিরের উত্তরদ্বারের ঠিক সম্মুখে, পথের দুই পার্শ্বে ত্রিবাঙ্কুর মহারাজের দেশীয় ধরণের দুইটি বাড়ী; একটি স্বয়ং মহারাজার ও অন্যটি তাঁহার অন্তঃপুরিকাগণের জন্য। মহারাজা প্রতি বৎসরেই এখানে আসিয়া কিছুদিন বাস করেন। এই রাস্তার পাশে একটি পাথরে-বাঁধানো ক্ষুদ্র জলাশয়। ব্রাহ্মণগণের বাসও এই দিকে। নিকটেই যাত্রীদিগের জন্য একাধিক "চৌলট্রি" বা ধর্ম্মশালা আছে।

কন্যাকুমারী স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া, তীর্থযাত্রী ব্যতীত আরও অনেকে এখানে আসিয়া থাকেন। সেইজন্য এখানে ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্টের একটি ডাক-বাংলা আছে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ডাক-বাংলার নাম Travellers' Bungalow অর্থাৎ পান্থনিবাস। আমরা পান্থনিবাসেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এরূপ রমণীয় ডাক-বাংলা আর কোথাও দেখি নাই। ইহার সম্মুখে (অর্থাৎ দক্ষিণে) মুক্ত বেলাভূমি—তাহার পর অনন্ত সমুদ্র। নির্জ্জন সমুদ্রতীরে খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, এক স্থানে বসিয়া সমুদ্র-তরঙ্গের শোভা দেখিতে লাগিলাম। "কপালকুণ্ডলার" সেই অতুলনীয় ভাষা-চিত্র মনে পড়িল—

"ফেনিল নীল অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যতদূর দৃষ্টি

যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ-প্রক্ষিপ্ত ফেণার রেখা; স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেণ-রেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে। কানন-কুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীল জলমণ্ডল মধ্যে সহস্র স্থানেও সফেণ তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখনও এমন প্রচণ্ড বায়ু বহন সম্ভব হয় যে তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্র সহস্র স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইয়া থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে।"

সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে এই সময় যদি কোন অপরিচিতা সিন্ধুকূলচারিণী সহসা সেখানে আবির্ভূতা হইয়া করুণাপূর্ণ স্বরে প্রশ্ন করিতেন—"পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?" তাহা হইলে এই নীরস ভ্রমণ-কাহিনী রীতিমত উপন্যাসে পরিণত হইতে পারিত। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যখন আমার একজন সঙ্গী ডাক-বাংলা হইতে আসিয়া বিজাতীয় ভাষায় কহিলেন—"আসুন, এখন মন্দিরে যাইতে হইবে"—তখন কল্পনালোক ছাড়িয়া, আবার কঠিন বাস্তব জগতে ফিরিতে হইল।

কন্যাকুমারীর মন্দিরটি ছোট; দ্রাবীড় দেশের অন্যান্য প্রসিদ্ধ মন্দিরের সহিত তুলনার উপযুক্ত নহে। এমন কি, ইহার সম্মুখভাগে উচ্চ "গোপুরম" পর্য্যন্ত নাই। প্রবেশদ্বারে ত্রিবাঙ্কুররাজ-নিযুক্ত বন্দুকধারী প্রহরী। জুতা এবং জামা এখানে খুলিয়া রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

মূল-মন্দিরের অঙ্গন পর-পর দুইটি অল্প-পরিসর চত্বর দ্বারা বেষ্টিত। গর্ভগৃহ পূর্ব্বদ্বারী। প্রতিমা পাষাণময়ী—দণ্ডায়মান-বালিকা-মূর্ত্তি—দক্ষিণ হস্তে জপমালা—নেত্রযুগ অর্দ্ধনিমীলিত, মুখমণ্ডল চন্দনলিপ্ত। এরূপ লাবণ্যপূর্ণ মুখশ্রী দ্রাবীড় দেশীয় অন্য কোন মূর্ত্তির নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একখানি সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালা মাসিকপত্রে একজন ভ্রমণকারী কন্যাকুমারীর মূর্ত্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, দেবী অসিহস্তে সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষ রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু এখানে ভগবতীর তপস্বিনী মূর্ত্তি—আয়ুধধারিণী শক্তিমূর্ত্তি নহে। আমার মনে হইল, ইহাই ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রকৃত রূপ।

প্রতিমাদর্শন ও মন্দির-প্রদক্ষিণ শেষ হইলে, আমাদের পাণ্ডা হিন্দি ও তামিল মিশ্রিত ভাষায় কন্যাদেবীর পৌরাণিক-কাহিনী আমাদিগকে শুনাইলেন। উহার মর্ম্ম এইরূপ :—

বাণাসুর তপস্যা করিয়া মহাদেবের বরে সকল দেবতার অজেয় হইয়াছিল। দেবগণ তাহাকে দমন করিতে না পারিয়া স্বর্গ হইতে তাড়িত হইলেন। বিপন্ন হইয়া ইন্দ্র তখন মহাবিষ্ণুর শরণ লইলেন। মহাবিষ্ণুর উপদেশে ইন্দ্র এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই যজ্ঞে কন্যাদেবীর উৎপত্তি। মহাদেব যে বর দিয়াছিলেন, তাহাতে কুমারী কন্যার উল্লেখ ছিল না;—সুতরাং বাণাসুর কন্যাকর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইল। দেবতাদিগের অভীষ্ট সাধন করিয়া, কুমারী শিবকে পতিত্বে বরণ করিতে কামনা করিলেন। শুভবিবাহের দিন-ক্ষণ নির্দ্দিষ্ট ও সমস্ত আয়োজন

এগমোর ষ্টেসনের সম্মুখবর্ত্তী রাজপথ ও গৃহ

সম্পূর্ণ হইল। বিবাহ-সভায় সমস্ত দেবগণ সমবেত হইলেন; কিন্তু বর আসিতেছেন না। শিব যখন বরবেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইবেন, এমন সময় সহসা ব্রহ্মর্ষি সেখানে আসিয়া উপস্থিত। অতিথি-সৎকার করিতে যাইয়া শিবের দেরী হইয়া গেল। এইরূপে লগ্ন অতীত হইলে, দেবদেবীগণ ক্ষুণ্ণমনে নিজ-নিজ স্থানে ফিরিয়া গেলেন। তাহার পরে, শিব আসিয়া কুমারীকে আশ্বাসবাণী কহিলেন, আবার এক শুভদিনে আসিয়া তিনি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন,

সেবার লগ্ন হবে না কো পার,
আঁচলের গাঁট খুলবে না কো আর।

এবং এই বিবাহোৎসবের জন্য যে রাশি-রাশি ভোজ্য ও মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে, উহা নষ্ট না হইয়া ততদিন পর্য্যন্ত অক্ষয় হইয়া থাকিবে। সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় দেবী আজিও এখানে তপস্যা করিতেছেন; এবং সেই সকল উপকরণ আজিও বালুকারূপে সমুদ্রতীরে সঞ্চিত রহিয়াছে।

সাধারণ লোকের মধ্যে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত, তদনুসারে কন্যাকুমারী তীর্থের দেবীর সহিত শুচীন্দ্রম তীর্থের অধিপতি "সুন্দরেশ্বরম্" শিবের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু কোন কারণ বশতঃ বিবাহ হইতে পারে নাই। এই কারণটি কি, সে সম্বন্ধে একাধিক কাহিনী শোনা যায়।

চরাচর ব্যগ্র প্রাণে পূরবের পথ পানে
নেহারিছে সমুদ্র অতল।
দেখ চেয়ে মরি মরি, কিরণ মৃণাল' পরি
জ্যোতির্ম্ময় কনক কমল।

এদিন ছিল অমাবস্যা—সাগর-স্নানের একটা প্রশস্ত দিন। প্রাতঃকাল হইতেই মন্দিরের নিকটে সমুদ্র-তীরে বহু যাত্রীর সমাগম হইতে লাগিল।—

সেথা হতে রবি উঠে নব ছবি
লুকায় তাহারি পাছে,
তপ্ত প্রাণের তীর্থ-স্নানের
সাগর সেথায় আছে।
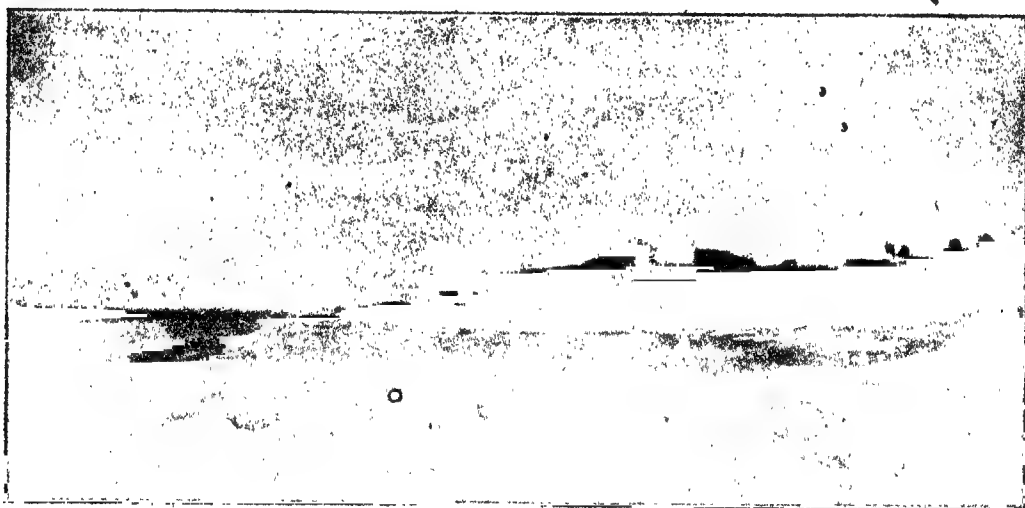
ভারতসমুদ্র-তীরে দেবী-মন্দির

মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া, আহারাদির পর সমুদ্রের কল্লোলগীতি শুনিতে-শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, কুমারিকা অন্তরীপ-প্রান্ত হইতে সমুদ্রে সূর্য্যোদয় দেখিতে হইবে। সেইজন্য পরদিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বদিগন্তপানে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—

"সুদূর সমুদ্র-নীরে অসীম আঁধার তীরে
একটুকু কনকের রেখা,
কি মহা রহস্যময় সমুদ্রে অরুণোদয়
আভাসের মত যায় দেখা।

কেহ-কেহ ত্রিবন্দ্রম্ প্রভৃতি স্থান হইতে সমস্ত পথই মোটর-গাড়ীতে আসিয়াছেন; কিন্তু অধিকাংশই নাগেরকইল (Nagercoil) হইতে পদব্রজে অথবা গো-যানে। আমরাও এই শুভযোগে যাত্রিগণের সঙ্গে মিলিয়া সাগর-স্নান করিতে চলিলাম। মন্দিরের দক্ষিণে সৈকতভূমির প্রান্তে স্নানের ঘাট। এইখানে তিনটি সমুদ্রের মিলন হইয়াছে, বলা হয়। সমুদ্রের কূলে নানা বর্ণের ও নানা আকারের বালুকা দেখিতে পাইলাম। একপ্রকার বালুকা অথবা কঙ্কর হঠাৎ দেখিলে চাউল বলিয়া ভ্রম হয়। এরূপ বিচিত্র বালুকারাশি (Comorin sands) না কি আর কোথাও

নাই। সেইজন্যই বোধ হয় কিম্বদন্তী এই বালিরাশিকে, দেবীর বিবাহ উপলক্ষে সঞ্চিত চাউল ডাল হরিদ্রাচূর্ণ প্রভৃতির রূপান্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করে। আমাদের পাণ্ডা কহিলেন, এই চাউল ধুইয়া সেই জল পান করিলে, গর্ভিনীর সুপ্রসব হয়। দেখিলাম, যাত্রী—বিশেষতঃ যাত্রিণীগণ—সযত্নে এই বালি কুড়াইয়া লইতেছে।*

তীর্থ-ঘাট ও মণ্ডপ

যেখানে তীর্থ-স্নান করিতে হয়, সেখানে কয়েকটি বৃহৎ শিলাখণ্ড এমন ভাবে পড়িয়া আছে যে, তাহাতে দুইটি প্রকাণ্ড জলকুণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। কুণ্ড দুইটি পরস্পর সংযুক্ত; একটির নাম মাতৃকুণ্ড, অপরটির নাম পিতৃকুণ্ড। যথাবিহিত সঙ্কল্প করিয়া এই দুইটি কুণ্ডেই স্নান করিতে হয়। এই স্থান সম্পূর্ণ নিরাপদ; জল অগভীর এবং সিন্ধু-তরঙ্গ শিলা-বেষ্টন অতিক্রম করিয়া কুণ্ডমধ্যে পৌঁছিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা সমুদ্র-স্নানের আনন্দ উপভোগ করিতে চাহেন, তাঁহারা কুণ্ডের বাহিরেই স্নান করেন।

কূল হইতে প্রায় দুইশত গজ দূরে, সমুদ্র-নিমগ্ন একটি পাহাড়ের শৃঙ্গ ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় জলের উপরে উত্থিত রহিয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক কর্ত্তিত-পক্ষ হইলে যে সকল পর্ব্বত দক্ষিণ-সমুদ্রগর্ভে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, এটি বোধ হয় তাহাদেরই অন্যতম।

"নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈল-চূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা।"

"সী-গল্" (Sea-gull) বিহঙ্গেরা ইহার আশে-পাশে উড়িতে-উড়িতে সমুদ্র-তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছিল; কিন্তু এই শৈলশৃঙ্গে তাহাদের নীড় বাঁধিবার কোন স্থান নাই। উত্তাল তরঙ্গমালা প্রতিনিয়ত উহাতে প্রতিহত হইয়া শুভ্র শীকরপুঞ্জরূপে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে; এবং বাষ্পের আকারে আবার সমুদ্রে আসিয়া বিলীন হইতেছে। একজন সঙ্গী বলিলেন, ইহার নাম "শ্বেত চামর"—সমুদ্র কন্যা-দেবীর উদ্দেশে এইরূপে চামর ব্যজন করিতেছে।

কন্যাকুমারীর চরণোপান্তে সাগরোর্ম্মি-ধৌত শিলাতলে বসিয়া আমি নিমেষের তরে মানস-চক্ষে ভারত-জননীর কবি-বর্ণিত অপরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম—

"সদ্যঃস্নান সিক্তবসনা চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত,
ললাটে গরিমা বিমল হাস্যে অমল কমল আনন দীপ্ত।
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র,
মন্ত্রমুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র।
শীর্ষে শুভ্র তুষার-কিরীট সাগর-ঊর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।"

স্নানের ঘাটের উপরে বস্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য একটি ছোট প্রস্তর-নির্ম্মিত 'মণ্ডপ' আছে। স্নানান্তে আমরা পুনর্ব্বার দেবী দর্শন করিতে গেলাম। মন্দিরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে, ছোট একটি মন্দিরে বিঘ্নেশ্বর (গণেশ) পূজা গ্রহণ করেন। দেবী-মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটি প্রবেশ-দ্বার আছে; কিন্তু উহা সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে। এই দিকে সমুদ্র বাঁকিয়া খুব কাছে আসিলেও, উহার পাহাড় খাড়া। এইখানে 'মাইল ষ্টোনের' ন্যায় একখণ্ড পাথর প্রোথিত আছে, উহাতে দেব-নাগরী অক্ষরে উৎকীর্ণ "কন্যাতীর্থং।" আমরা ঘুরিয়া সেই

* ভূতত্ত্ববিদ্গণের মতে, এই "শিলীভূত তণ্ডুল" বহুকালব্যাপী প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত quartz কণা; এবং রঙীণ বালুকা Garnet sapphire titaniferous iron প্রভৃতি খনিজ পদার্থের কণিকামাত্র। কিন্তু তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; এমন যে চন্দ্রমুখ, তাহাতেও তাঁহারা পাহাড় ও মরুভূমিই দেখিতে পান।

উত্তর দ্বার দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে এত অন্ধকার যে আলো জ্বালিতে হইল। রাত্রির ন্যায় দিনের বেলাতেও প্রদীপালোকে প্রতিমা দর্শন করিলাম।

সহসা আমার মনে হইল, পূর্ব্ব ও পশ্চিম-সমুদ্রের মিলন-

মন্দিরের পূর্ব্বসীমায় সমুদ্র

ক্ষেত্রে এই যে দেবী শত ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিপ্লবের মধ্যেও সরল নির্ম্মল চিত্তে, অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত, যুগ-যুগ ধরিয়া শিবের জন্য তপস্যা করিতেছেন, ইনিই কি আমাদের "জনক-জননী-জননী" ভারত-লক্ষ্মী? কবি বলিয়াছেন, আজি পশ্চিম-সমুদ্র-তটে শ্মশানের মাঝে এই যে অক্লান্ত শক্তির সাধনা চলিতেছে, ইহা

তব আরাধনা নহে, হে বিশ্ব-পালক।
তোমার নিখিলপ্লাবী আনন্দ-আলোক
হয় তো লুকায়ে আছে পূর্ব্ব সিন্ধুতীরে
বহু ধৈর্য্যে নম্র স্তব্ধ দুঃখের তিমিরে
সর্ব্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায়
দীর্ঘকাল ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায়।

প্রাচী-পানে চাহিয়া দেবী কি সেই "পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি" জাগিয়া রহিয়াছেন?

কন্যাকুমারী গ্রামের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। ইহা একটি ধীবর-পল্লী। সমুদ্রের মাছ ধরিয়া বিক্রয় করাই পল্লীবাসীর উপজীবিকা। খুব ভোর হইতেই ছোট-ছোট ডিঙ্গি ভাসাইয়া ইহারা মাছ ধরিবার জন্য সমুদ্রে বাহির হয়। ক্ষুব্ধ সাগরের ভীষণ তরঙ্গ তুচ্ছ করিয়া এই ডিঙ্গিগুলি পাল তুলিয়া যেরূপ স্বচ্ছন্দে নাচিতে-নাচিতে চলিয়া যায়, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই উপকূলবাসী মৎস্য-জীবিগণ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। মুসলমানদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে ইহাদের একদল কোচিনে যাইয়া পর্টুগিজ্‌দিগের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করে; এবং তাহার পরেই দলে-দলে ইহারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকে

কন্যাকুমারী অতি প্রাচীন তীর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে বলদেবের তীর্থ-যাত্রার যে বিবরণ আছে, তাহাতে দেখা যায়, তিনি দ্রাবীড় দেশের অন্যান্য প্রসিদ্ধ তীর্থ দর্শন করিয়া, দক্ষিণ-সমুদ্র-কূলে এই তীর্থেও আসিয়াছিলেন। দুইহাজার বৎসরেরও পূর্ব্বেকার গ্রীক্ পর্য্যটকদিগের গ্রন্থে কন্যাকুমারীর উল্লেখ আছে। কন্যাকুমারী গ্রাম বর্ত্তমানে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দক্ষিণাংশ হইলেও, ত্রিবাঙ্কুরের সহিত ইহার সম্বন্ধ বেশী দিনের নহে। তিনেভেলির ন্যায়, এক সময়ে ইহাও প্রাচীন পাণ্ড্য-বংশীয় রাজগণের অধিকারে ছিল। কন্যাদেবীর মন্দিরে তামিল অক্ষরে উৎকীর্ণ একটি লিপি হইতে জানা যায় যে, একাদশ শতাব্দীতে

কন্যাকুমারী—ধীবর-পল্লী

চোলবংশীয় নৃপতি রাজেন্দ্রদেব এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন;—কিন্তু এই আধিপত্য স্থায়ী হয় নাই। কালক্রমে সপ্তদশ শতাব্দীতে কন্যাকুমারী ও মান্নার উপকূল ওলন্দাজদিগের শাসনাধীনে আসে।

ওলন্দাজদিগের পতনের পরে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি দাক্ষিণাত্যের ভাগ্যবিধাতা হইয়া উঠেন। এই সময়ে, ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, ত্রিবাঙ্কুররাজ রামবর্ম্মা বর্ত্তমান তিনেভেলী জেলার নাঙ্গুনেরী তালুকের অন্তর্গত কালাকাদ নামক স্থানের বিনিময়ে, কার্ণাটিকের নবাবের নিকট হইতে কন্যাকুমারী গ্রহণ করেন। ডি-লানয় (De Lanoy) নামক একজন বেলজিয়ান্ (ভূতপূর্ব্ব ওলন্দাজ সৈনিক কর্ম্মচারী) তখন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সেনাপতি ছিলেন। শত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য, তিনি সীমান্তপ্রদেশে কয়েকটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। একটি দুর্গ কন্যাকুমারীর এক মাইল উত্তরে, সমুদ্রের একেবারে উপরে;—উহার নাম "বাট্টা কোটা" দুর্গ। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সৈন্য কর্ত্তৃক এই দুর্গ বিধ্বস্ত হয়। ভগ্নাবস্থায় এখনও উহা বিদ্যমান আছে। সমুদ্রের অবিরাম তরঙ্গ-আঘাত এই দীর্ঘকালেও উহার পাষাণ-প্রাচীরের গাত্রে ক্ষয়-চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে নাই।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের ভাষা পশ্চিম-উপকূল-প্রচলিত মালয়ালী; কিন্তু দক্ষিণ-ত্রিবাঙ্কুর অর্থাৎ নাগেরকইল (Nagercoil) কন্যাকুমারী অঞ্চলের ভাষা তামিল। আচার ব্যবহারেও ত্রিবাঙ্কুর অপেক্ষা তিনেভেলী জিলার সঙ্গেই এই অঞ্চলের নিকট সম্বন্ধ। সাধারণ স্ত্রীলোকগণ দুই কাণে একগোছা করিয়া গুরুভার মাকৃড়ি পরিয়া থাকে; তাহাতে কর্ণপ্রান্ত ক্রমশঃ ঝুলিয়া অস্বাভাবিক দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়। বিদেশীর চক্ষে ইহা বড়ই কদাকার দেখায়।

কুমারিকা অন্তরীপের নৈসর্গিক শোভাসম্পদ উপভোগ করিবার বস্তু—বর্ণনা দ্বারা বুঝাইবার নহে। উদার আকাশ, অপার জলধি, শৈল-প্রতিহত তরঙ্গের উচ্ছ্বাস, বিচিত্র বালুকাখচিত সৈকতভূমি, অসীম নীলিমাপ্রান্তে কিরণ-কমলের বিকাশ—অনুপম সৌন্দর্য্যের এই সকল ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া, কন্যাকুমারী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

বিপর্য্যয়

[অধ্যাপক শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্]

(১)

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পর সুদীর্ঘ অবসর কাটাইবার প্রণালী সম্বন্ধে চিন্তা করিবার পূর্ব্বে, ইন্দ্রনাথ খুব এক চোট ঘুমাইয়া লইল। দীর্ঘ দিবা-নিদ্রার দ্বারা পরীক্ষার উৎকণ্ঠা ও ক্লান্তির কথঞ্চিৎ শমতা সম্পাদিত হইলে, সে নানারকম প্রোগ্রাম স্থির করিতে লাগিল। পূর্ব্ববঙ্গের একটি ক্ষুদ্র পল্লীর অবিচিত্র শান্তির ভিতর, তার মনের চঞ্চলতার যথেষ্ট তৃপ্তির উপাদান খুঁজিয়া পাওয়া তাহার পক্ষে খুব সহজ হইল না; কিন্তু সে এক রকম চলনসই গোছের প্রোগ্রাম ঠিক করিয়া লইল।

কিন্তু ইন্দ্রনাথের পিতা তা'র অবসর বিনোদনের জন্য অন্যরূপ আয়োজন করিতেছিলেন। একদিন সকালে অতি বিলম্বে শয্যাত্যাগ করিয়া ইন্দ্রনাথ পুকুর-ঘাটে বসিয়া দাঁতন করিতেছিল; তখন ভৃত্য ছমির আসিয়া খবর দিল যে, কর্ত্তাবাবু ইন্দ্রকে ডাকিয়াছেন। সে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহির-বাড়ী চলিয়া গেল। খালি পায়ে খালি গায়ে সে অগ্রসর হইল; কিন্তু বাহির-বাড়ীর আটচালাখানায় সুসজ্জিত কয়েকটি ভদ্রলোকের সমাবেশ দেখিয়া, সে কাপড়ের খুঁটটা গায়ে দিয়া অবনত-মস্তকে অগ্রসর হইল।

তাহার পিতা একবার অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া, তাহাকে বসিতে বলিলেন। সে ফরাসের এক কোণে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া পড়িল। তার পর আগন্তুক ভদ্রলোক-দুটি তাহাকে তার পড়াশুনা সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রনাথ সাধারণতঃ লাজুক হইলেও, তাহার পড়াশুনার কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাহার একটু রীতিমত গর্ব্ব ছিল; এবং তাহার পড়াশুনা-ঘটিত প্রশ্নোত্তরে সে বরাবরই বেশ সপ্রতিভ ছিল। সে চটপট সব

প্রশ্নের উত্তর দিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার সমস্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া ফেলিল। তার পর তার বাবা তাকে বাড়ীর ভিতর যাইতে বলিলেন। সে সটান, রান্নাঘরের বারান্দায় মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। মাতা লুচি ভাজিতেছিলেন; ইন্দ্র সেখানে পাতা পাড়িয়া বসিয়া, পরম আরামে দিস্তাখানেক লুচি উদরসাৎ করিয়া, একখানা ইংরাজী উপন্যাস লইয়া তার ঘরে গিয়া পড়িতে বসিল।

আগন্তুকেরা চলিয়া গেলে, তার ছোট বোন তার কাছে গিয়া ভয়ানক হাসিতে লাগিল। ইন্দ্র বলিল, "কিরে মনো, তোর পেট যে ফাটবার জোগাড় হ'ল; কি, হ'ল কি?"

মনো বলিল, "হাঁ দাদা, পরীক্ষায় পাশ হ'লে?"

"এখনি পাশ কিরে? রেজাল্ট বেরুতে তো এখনো ঢের দেরী।"

"না সে পরীক্ষা নয়,—আজকের পরীক্ষায় পাশ হ'লে?"

"আজ আবার কিসের পরীক্ষা?"

"এই যে তোমার শালা এসে তোমায় পরীক্ষা করে' গেল।"

চট্‌ করিয়া সব কথাটা ইন্দ্রনাথের চোখের সামনে পরিষ্কার হইয়া গেল। তখন সে—মাত্র ষোল বছরের ছেলে—বসিয়া-বসিয়া স্বপ্ন গড়িতে লাগিয়া গেল। কি মধুর কৈশোরের সে স্বপ্ন! পুঁথিপড়া প্রেমের রঙে তার মনের ভিতর ছবিগুলি ঝকঝকে হইয়া উঠিল;—জাগিয়া উঠিল আগন্তুক যৌবনের অগ্রদূত স্বরূপ এক অপূর্ব্ব প্রেম-লালসা; যার ভিতর যৌবনের প্রেমের সে আবেগ বা আবিলতা নাই; আছে শুধু মেঘ-ঢাকা জ্যোছনার মত একটা অস্পষ্ট মধুর নেশার ঘোর! কত সুখ, কত দুঃখ গর্ভে ধরিয়া, এই স্বপ্ন কিশোর-কিশোরীর হৃদয়ে আসিয়া ফুলের আসন পাতিয়া বসে! তখন কে জানিতে পারে যে, ইহার তলায় লুকান আছে কত গভীর বেদনা, সংসারের জ্বালাময় পীড়াময় কত ঝঞ্ঝাবাত, কত মৃত্যু, কত হাহাকার!

ইন্দ্রনাথের জীবন-সঙ্গীতে মধুর আস্থায়ীর সুর বাজিয়া উঠিল; তার প্রাণ সে সুরের তালে-তালে নাচিয়া উঠিল। এ গানের অন্তরায় যে হাসি-কান্নার ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে, আভোগ যে চিতার আগুনের হা-হুতাশে মিলাইয়া গিয়াছে, সে কথা ইন্দ্রনাথের শোনা ছিল না, এমন নহে;—কিন্তু সে কেবল শোনা কথা! তার কাণের ভিতর দিয়ে প্রাণে ঢুকিয়া কেবল বাজিতে লাগিল আস্থায়ীর এই নৃত্য-তাল!

সে কেমন? ফরসা, না কালো; সুন্দর, না অসুন্দর? মধুময় তার হৃদয়, না কঠোর? ইন্দ্রনাথ এ সব প্রশ্ন করিল না; কেবল স্বপ্ন গড়িতে লাগিল। সে নিজের মনের মতন করিয়া তাহার প্রিয়াকে গড়িয়া তুলিল; আর তার জন্য মনের ভিতর প্রেমের সিংহাসন রচনা করিয়া লইল।

সে কেমন, জানিতে তার বড় ইচ্ছা হইল। তার চেয়ে বেশী ইচ্ছা হইল, তার সম্বন্ধে কথা কহিতে। কিন্তু কেমন করিয়া সে প্রসঙ্গ সে তুলিবে? মনো'কেও তো সে কথা গায়ে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় না! কিন্তু মনোও না কি তাই চায়;—তাই অল্প সময়ের মধ্যেই ইন্দ্রনাথ তার অভীপ্সিতের সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা জানিয়া ফেলিল; এবং মনোর দৌত্যে সে তার প্রিয়ার হস্তাক্ষরও দেখিয়া ফেলিল।

যখন বাদ্য-মুখরিত, আলোকমালা-সমুজ্জ্বল সভায়, রাঙ্গা চেলীর আবরণ খুলিয়া অবশেষে সরযূর মুখখানা সত্যসত্যই তার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল, তখন সে তাই নূতন কিছুই দেখিতে পাইল না। এ মুখ যেন তার চির-পরিচিত—চির-আকাঙ্ক্ষিত! কারণ, এই শুভ-দৃষ্টিতে সে দেখিয়াছিল কম, মন হইতে জোগাইয়াছিল বেশী। তার পর স্তব্ধ রাত্রে, বাঁশের বেড়ার আড়ালে শত অসংশয়িত উৎসুক চক্ষের সম্মুখে সরযূ তার মৃদু আহ্বানে সাড়া দিয়া হাসিয়া বলিল, "কি?" তখন তার প্রাণের ভিতর যে সঙ্গীতের ঝঙ্কার ধ্বনিত হইয়া উঠিল, সেও যেন তার চির-পরিচিত বলিয়া মনে হইল।

পিত্রালয় ও শ্বশুরালয়ের ভিতর ভাগাভাগি করিয়া তার দীর্ঘ অবসর একটা ছোট্ট মধুর স্বপ্নের মত কোন্‌খান দিয়া কাটিয়া গেল, তাহা ইন্দ্রনাথ বুঝিতেই পারিল না। যখন বিদায়ের দিন আসিল, তখন তার কেবলি মনে হইল যে, ছুটিটা বড় অন্যায় রকম ছোট হইয়া গিয়াছে। বিধাতা ও সমস্ত কর্ত্তৃপক্ষের সমবেত অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ কতকগুলি দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়া ইন্দ্রনাথ কলিকাতা চলিয়া গেল;—সরযূ তার বই, খাতা সামনে লইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

(২)

ইন্দ্রনাথের দুঃখের ভিতর একটা বড় রকমের খাদ ছিল। সে পরীক্ষায় খুব ভাল করিয়া পাশ করিয়াছে এবং কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়াছে। তা'ছাড়া, তার এতদিনকার স্বপ্ন আজ সফল হইতে চলিয়াছে। সে সত্য-সত্যই কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতে যাইতেছে। চিত্ত-বিকারের এত বড় জবর হেতু থাকিতে যে তার মন বিকৃত হইবে না, এতবড় "ধীর" সে ছিল না।

সে ছাতি ফুলাইয়া কলেজে ঢুকিল। সে যে একটা মস্ত বড় লোক, এত বড় ভাল ছেলে, এ জ্ঞানটা তার ভিতর অত্যন্ত টন্‌টনে ছিল; তাই সে বুক ফুলাইয়া কলেজে ঢুকিল। বয়স তার বছর যোল হইলেও, তাহাকে আকারে অত্যন্ত ছোট দেখাইত। এতটুকু ছেলের এত বড় বাহাদুরী দেখিয়া, বিশ্বের সকল লোকের মনে একেবারে তাক্ লাগিয়া যাওয়াটাই তার কাছে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত।

কিছুদিন কলেজে কাটাইবার পর, সে দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইল যে, দেশে থাকিতে সে লোককে যে পরিমাণ তাক্ লাগাইয়া দিতে পারিয়াছে, এখানে তার কিছুই হইল না। কলেজের প্রফেসারেরা আসিয়া ছেলেদের নাম ডাকিয়া যান,—তার নামের কাছে আসিয়া তো তাঁরা থমকিয়া দাঁড়ান না! তার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহেন না;—নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহাদের বক্তৃতা করিয়া যান। ক্লাশে যে এতবড় একটা ভাল ছেলে আছে, তাহা তাঁহারা মোটেই খেয়াল করেন না। ছেলেরাও মোটেই অবাক্ হয় না। অনেক দিন পর্য্যন্ত তো কেউ তাকে গ্রাহ্যই করিল না; তার সঙ্গে কথা কহিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আসা দূরে থাকুক, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিবার কোনও চিহ্ন দেখাইল না। বেশ একটু বেদনার সহিত সে অনুভব করিল যে, তার চেয়ে আরও অনেকগুলি ছেলের পসার অনেক বেশী। ইহারা বেশীর ভাগ হিন্দুস্কুলের ছেলে; তার মধ্যে কেহ-কেহ তারই মত বা তার চেয়েও ভাল ছিল। কিন্তু অনেকে মোটেই ভাল ছেলে নয়;—কিন্তু সহুরে ছেলে,—মুখে-চোখে কথা কয়,—দুনিয়ার রাজ্যের খবর রাখে,—আর বড়-বড় কথা সম্বন্ধে অত্যন্ত সহজ ভাবে মতামত প্রকাশ করিয়া যায়।

ইন্দ্রনাথের বন্ধু না ছিল, এমন নয়। তারই মত নিরীহ, শান্তশিষ্ট কতকগুলি ছেলে,—যারা তারই মত পিছনের বেঞ্চে বসিত,—তা'দের ভিতর সে কয়েকটি বন্ধু পাইল। অবসর সময়ে সে তাদের সঙ্গে মৃদুস্বরে গল্পগুজব করিত; এবং তাদের মধ্যে তার 'ভাল ছেলে' বলিয়া বেশ একটু খাতিরও ছিল। কিন্তু তা'দের খাতিরে ইন্দ্রনাথের মন ভরিত না। ওই যে ছেলেগুলি সামনের বেঞ্চে বসে, বড় গলায় কথা কয়, প্রতি কথায় রাজা-উজীর মারে,—তার বেদনার সহিত ইন্দ্রনাথ অনুভব করিল, যে ওরাই ক্লাশের "লীডার";—উহাদের কাছে তার মন নত হইয়া পড়িল। তার স্বাভাবিক অহঙ্কার খর্ব্ব করিয়া, তার চিত্ত লোলুপ হইয়া, ওই ছেলেদের সাহচর্য্য কামনা করিত।

তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে খুব বেশী বিলম্ব হইল না। কেমন করিয়া কথাটা প্রকাশ হইয়া গেল যে, ইন্দ্রনাথ বিবাহিত। একদিন এই বড়দলের একটি ছেলে আসিয়া, তাহার সঙ্গে ভয়ানক আত্মীয়তা করিয়া বলিল, "বাবা, তোমার ভিতর এত আছে! আগে বল্‌তে হয়—বর্ণচোরা আম!"

ইন্দ্রনাথের মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে এ সম্ভাষণে আনন্দিত হইল। ক্রমে এই ছেলেগুলি তাহাকে দলে টানিয়া লইল। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তার স্ত্রীর সম্বন্ধে আলাপ করাই ছিল ইহাদের প্রধান আনন্দ। ইন্দ্রনাথ এ আলাপে বিমুখ ছিল না। সরযূর সম্বন্ধে কথা বলায় বা শোনায় যে আনন্দ, তাহাতে তাহার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান ভাসাইয়া লইত। সে মন খুলিয়া আলাপ করিত। কবে সরযূর সঙ্গে কি কথা হইয়াছিল, তাহারা পরস্পরকে কবে কি আদর করিয়াছিল, এ সব কথা সে বলিত; এমন কি, সরযূর চিঠিপত্র সে ইহাদিগকে দেখাইত।

অমল ছিল ক্লাশের অবিসম্বাদী সর্দার। ভালছেলে সে নয়,—একটা দশটাকার স্কলারসিপও সে পায় নাই। কিন্তু সে বড়লোকের ছেলে,—ল্যাণ্ডো জুড়ি চড়িয়া কলেজে আসে। তার বাপ মস্ত বড় একজন ব্যারিষ্টার; এবং সে নিজে বার-দুই বিলাত ঘুরিয়া আসিয়াছে। কাজেই, ফ্যাশন ও কায়দাকানুন সম্বন্ধে তার মতামত সকলে নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া লইত। তা' ছাড়া, অন্য সব বিষয়েই সে সবার চেয়ে অনেক বেশী খবর রাখিত; আর সব বিষয়েই তার একটা দৃঢ় মতামত ছিল। সে কাহারও সঙ্গে তর্কাতর্কি করিত না; তর্কস্থলে আসিয়া সে কেবল দেবাদেশের মত তার মত

প্রচার করিত। সকলকে সে অনায়াসে পদানত করিয়া, সবার উপর সর্ব্বদা টেক্কা দিয়া বেড়াইত।.

ইন্দ্রনাথের এই নূতন বন্ধুর ভিড়ের মধ্যে অমল ছিল না। যখন এই বন্ধুরা অমলের কাছে আসিয়া ইন্দ্রের প্রেমের কাহিনী শুনাইত, তখন সে হাসিয়া উঠিত। তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা একটা হাস্যাস্পদ ছেলেমানুষী বলিয়া মনে হইত; এবং সে সেই প্রকার মত অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রকাশ করিত। যখন এই বন্ধুর দলের সঙ্গে নিরিবিলি বসিয়া ইন্দ্রনাথ মৃদুস্বরে কথা কহিত, তখন অমল তফাৎ হইতে দেখিয়া হাসিত। কিন্তু, এমনি দেখিতে-দেখিতে একদিন অমলের মনটা ইন্দ্রনাথের উপর আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ইন্দ্রনাথের মুখখানা প্রথম দৃষ্টিতে খুব সাধারণ গোছের বলিয়া মনে হইত; কিন্তু কিছুদিনের পরিচয় হইলে, লোকে তার ভিতর একটা আশ্চর্য্য রকমের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইত। তার চোখ-দুটির ভিতর একটা আশ্চর্য্য, স্নিগ্ধ, শান্ত-ভাব যে কোথায় লুকাইয়া থাকিত, বলা যায় না; কিন্তু দেখিতে-দেখিতে তাহা নজরে পড়িত। এই স্নিগ্ধ কান্তি হঠাৎ একদিন অমলকে আকৃষ্ট করিল। সেই দিন হইতে সে ইন্দ্রনাথকে আপনার করিয়া লইল। তার মনে হইল যে, ইন্দ্র বেচারাকে ভালমানুষ পাইয়া এই সব হাল্কা ছোকরা তাহার স্ত্রীর প্রসঙ্গ তুলিয়া, তাহাকে মিছামিছি খেলো করিতেছে। তাই সে ইন্দ্রনাথকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইল। ক্ষুদ্র ইন্দ্রনাথকে সে তাহার বিশাল পক্ষপুটের তলায় আশ্রয় দিয়া ধন্য করিল।

এই ছেলেটির উপর ইন্দ্রনাথেরও সবচেয়ে বেশী লোভ ছিল। অমলই যে ঈশ্বর-দত্ত অধিকারে ক্লাশের নায়কত্বে অধিষ্ঠিত, তাহা যে সহজেই বুঝিয়াছিল। প্রথমে সে ইহার আধিপত্যে হিংসা বোধ করিত। পরে, ক্রমে যখন তার আত্মাভিমান খর্ব্ব হইয়া আসিল, তখন সে ইহার সাহচর্য্য কামনা করিত; অমলের মুখে একটা প্রশংসা শুনিলে সে যে সত্যসত্যই ধন্য হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। কাজেই তাহারা অতি সহজেই খুব অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিল।

যতই তাহাদের আলাপ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল, ততই তাহারা পরস্পরের প্রতি অধিক অনুরক্ত হইয়া পড়িল। অমল দেখিল, ইন্দ্রনাথ একটি খাঁটি মানুষ;—সরল, স্বচ্ছ তার অন্তর; কিন্তু প্রতিভায় উজ্জ্বল। সে প্রতিভাকে অমল খুব বড় করিয়াই দেখিতে শিখিল। ইন্দ্রনাথ দেখিল, অমলের চরিত্র-বল অসাধারণ,—তার মনের শক্তি প্রবল। সে ন্যায়নিষ্ঠ,—অন্যায়ের প্রতি তার সহজ তীব্র বিরক্তি লুকাইবার সে কোনও চেষ্টা করিত না।

অমল ইন্দ্রকে তার বন্ধুদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইল। তাহার উপদেশে ইন্দ্রনাথ সরযূর সম্বন্ধে অন্যের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করিল। তবে অমলের সঙ্গে সে সরযূর সব কথাই বলিত। অমলও তৃপ্তির সহিত তার সরল হৃদয়ের অনাবিল প্রেম আর্টিষ্টের মত উপভোগ করিত।

(৩)

অমলের সঙ্গে ইন্দ্রের অনেক বিষয়ে মতভেদ ছিল। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, পত্নীর অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে অমলের সংস্কার ও ইন্দ্রনাথের সংস্কারের মধ্যে অনেকটা প্রভেদ ছিল। ইন্দ্রনাথ হিন্দু-পরিবারের সনাতন আদর্শের পক্ষে খুব জোরের সঙ্গে ওকালতী করিত। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সমস্ত মতামত সঙ্কলন করিয়া সে নিজের মত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিত। অমল সে সব কথা ফুৎকারে উড়াইয়া দিত; এবং হিন্দু নারীর প্রকৃত অবস্থা এমন মসীময় করিয়া অঙ্কিত করিত যে, ইন্দ্র যত জোরেই ওকালতী করুক, তার প্রাণটা দমিয়া যাইত। অমলের যুক্তি যাহাই হউক, সে কথাগুলি এমন জোরের সঙ্গে বলিত যে, সেগুলি ইন্দ্রের মনের ভিতর খুব স্থায়ী রকমের দাগ বসাইয়া যাইত।

একদিন অমল বলিল, "সে সব কথা তো বুঝলাম। কিন্তু এই সাদা কথাটার কি জবাব বল দেখি? পুরুষও মানুষ, স্ত্রীও মানুষ; তাদের দুজনেরই এক আত্মা। পুরুষের আত্মার উন্নতির জন্য যা যা দরকার, স্ত্রীর উন্নতির জন্যও সেই সব জিনিসের দরকার হবে না কেন? এই ধর লেখাপড়া!"

কথাটা অস্বীকার করিবার যো নাই। ইন্দ্র অস্বীকার করিল না; কিন্তু সে বলিল, "লেখাপড়া শিখবে বই কি! কিন্তু তাই বলে ঠিক আমাদেরই মত বি-এ, এম-এ পাশ ক'রতে হ'বে, তার কি মানে আছে? তাদের কাজের ক্ষেত্র আলাদা,—তার জন্যে বিশেষ শিক্ষার দরকার—" ইত্যাদি।

অমল বলিল, "তাদের ক্ষেত্র হাঁড়ি-ঠেলা—কেমন ?"

"না—হাঁ—তা কতকটা বই কি ?"

অমল। সেটা তাদের বিশেষ ক্ষেত্র কিসে? আমাদের বাবুর্চ্চি বা তোমাদের বামুণঠাকুর স্ত্রীলোক না হ'য়েও হাঁড়ি ঠেল্‌ছে,—মেয়েরাই'বা কেন তেমনি পুরুষের অধিকার গ্রহণ ক'রবে না ?"

ইন্দ্র। তা' ছাড়া রান্নটার কথাই আমি ঠিক ব'লছি না,—সমস্ত সংসারটা—ছেলেপিলে মানুষ করা, স্বামী-শ্বশুর-দের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন—এ সবের জন্য বিশেষ একটা শিক্ষা দরকার।"

অমল। হাতী দরকার। এই আমাদের সুপর্ণা-দি' এম-এ পাশ করে বিয়ে করেছেন। এখন তাঁর ছেলেপিলে নিয়ে তিনি সংসার ক'রছেন। তাঁর সংসার দেখ,—আর তোমার বিশেষ ভাবে শিক্ষিত হিন্দুর মেয়ের সংসার দেখ! সেই বিশেষ শিক্ষিতারা বিশ বৎসর সুপর্ণা-দি'র কাছে রান্না থেকে আরম্ভ করে' শিশুপালন পর্য্যন্ত সব শিখে যেতে পারে। আর তা' ছাড়া, বিশেষ শিক্ষা দাও, দাও,—সে তো ভারি একটা শিক্ষা,—তার জন্য ভারি তো সময় লাগে! সে শিক্ষা দিতে হ'বে ব'লে যে কোনও মেয়ে কাব্য, দর্শন বা বিজ্ঞান আলোচনা ক'রে যে আত্মার আনন্দ সেটা লাভ ক'রতে পারবে না, তার কি মানে আছে।"

তার পর অমল তার চারু-দি', চপলা মাসী, সরসী পিসী প্রভৃতির ঝুড়ি-ঝুড়ি দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করিল যে, উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে সব বিষয়েই অশিক্ষিতার চেয়ে বেশী পটুত্ব লাভ করা যায়; এবং প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও বিষয়েই শিক্ষিতা ব্রাহ্ম মহিলার চেয়ে খাঁটি হিন্দুর ঘরের মেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়।

বেচারা ইন্দ্র এত সব জানে না। সুপর্ণাদি, চারুদি জাতীয়া স্ত্রীলোক তার জ্ঞান-বিশ্বাস-মতে কেবলমাত্র কাপড়-পরা মোমের পুতুল;—তাদের যে একটা সংসার আছে, এবং তারা ছেলেপিলে মানুষ করে, তাই তাহার জানা ছিল না। পক্ষান্তরে অমলের অনেক আত্মীয় খাঁটি হিন্দু,—তাদের পরি-বারে অমলের রীতিমত গতিবিধি আছে। কাজেই এ সব ব্যক্তিগত যুক্তিতে ইন্দ্র অমলের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। সুপর্ণাদি, চারুদি প্রভৃতির সম্বন্ধে অমলের মতামত সে মনে-মনে মানিয়া লইতেও পারিল না।

অমলের সকল যুক্তি স্বীকার না করিলেও, ইন্দ্র কতক বিষয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে অমলের মত গ্রহণ করিয়া লইল;—নারীর যে উচ্চশিক্ষা পাওয়া আবশ্যক, সেটা সে স্থির করিল। কিন্তু, তাহার মতে, স্কুল-কলেজে পড়াইয়া শিক্ষা দিলে নারীর নারীত্বের স্ফূর্ত্তিতে বাধা জন্মে; ঘরে বসাইয়া উচ্চশিক্ষা দেওয়া উচিত—ঠিক যেমন ভূদেব বাবু বলিয়াছেন। সে স্থির করিল যে, সরযূকে সে নিজে শিক্ষা দিয়া, পণ্ডিত করিয়া তুলিয়া, হাতে-কলমে দেখাইবে যে উচ্চশিক্ষা ও সাংসারিক বিদ্যার কি চমৎকার সমন্বয় হইতে পারে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে সে অনেকগুলি খাতা, পেন্‌সিল, কলম, বই প্রভৃতি লইয়া বাড়ী চলিল। তার বারো বছরের ক্ষুদ্র বধূটিকে এই আড়াই মাসের ছুটির ভিতর যে সব বিদ্যা শিখাইবার সঙ্কল্প সে করিল, তাহার কথা শুনিলে মিল্‌টনও ঠিকরাইয়া পড়িতেন।

পড়াশুনা বেশীদূর অগ্রসর হইল না। প্রত্যেক দিন রাত্রে ইন্দ্রনাথ বই খাতা গুছাইয়া, টেবিলের কাছে বসিয়া সরযূর প্রতীক্ষা করিত। সরযূ একটু বেশী রাত্রে, সবাই শুইলে, পানের বাটা হাতে করিয়া আসিয়া, প্রথমে দুই-চারিটা পান ইন্দ্রের মুখের ভিতর ভরিয়া দিত। তার পর তার কোল জুড়িয়া বসিয়া পড়িত। তার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনাদৃত পুস্তক নীরব অভিমানে পড়িয়া থাকিত। অনেক ক্ষণ পরে ইন্দ্রের কর্ত্তব্যজ্ঞান সহসা সজাগ হইয়া উঠিলে, সে জোর করিয়া সরযূকে পাশের চেয়ারে বসাইয়া পড়াইতে আরম্ভ করিত। সরযূ পড়া বলিতে পারিত না। সে বলিত যে সমস্ত দিন সে পড়িবার সময়ই পায় নাই। না হয় এমন একটা আশ্চর্য্য রকম মিষ্ট ওজর দিত যে, তার গাল দুটি টিপিয়া ধরিয়া খুব খানিকটা শাস্তি না দিলে আর কিছু-তেই চলিত না। তার পর এটা ওটা সেটা করিয়া সময় কাটিয়া যাইত। শেষে সরযূ গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িত,—সে-দিনকার মত পাঠ সমাধা হইয়া যাইত।

আবার কোনও দিন হয় তো সরযূ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত একটা কঠিন অঙ্ক কষিতেছে। দাঁতের ভিতর পেন্‌সিলটা কামড়াইয়া ধরিয়া, সুগঠিত ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করিয়া, খাতার দিকে একাগ্র স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। ইন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকিয়াই এই দৃশ্য দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল। তার পর পা টিপিয়া অগ্রসর হইয়া, হঠাৎ পিছু

হইতে সরযূর তপ্ত-গণ্ডে চুম্বন করিল—অঙ্কের সেইখানেই অসম্পূর্ণ সমাধি লাভ হইল।

তা ছাড়া, মাত্র ক্ষুদ্র আড়াইটা মাস বই তো নয়—তাও দিনের বেলায় দেখা-শুনা অসম্ভব। রাত্রেও কতকটা ঘুম অনিবার্য্য। এই সংক্ষিপ্ত অবসরের কতটা সময়ই বা লেখাপড়ার মত বাজে কাজে নষ্ট করা যায়? তাই খুব বেশী সময় পড়াশুনায় বাজে-খরচ করা হইল না।

তাই বলিয়া ইন্দ্রনাথের সঙ্কল্প টুটিল না। ছুটি শেষ হইলে, সে সমস্ত অব্যবহৃত বই ও খাতা সরযূকে দিয়া, পূজার ছুটির ভিতর যে সমস্ত পড়া তৈয়ার করিয়া রাখিতে হইবে, তাহার সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দিয়া গেল; এবং কলিকাতায় গিয়া প্রত্যেক চিঠিতে পড়াশুনা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিল।

সরযূও বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রত্যেক মাসের গোড়ায়, মাঝখানে ও শেষে সে একবার করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া পড়িতে বসিত। একবার ইংরাজী, একবার ইতিহাস ও একবার বাঙ্গলা সাহিত্য আরম্ভ করিত, ও তিন দিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়াশুনা করিত। চতুর্থ দিন দ্বিপ্রহরে সে মনে করিত, এখন একবার মনো-ঠাকুরঝির সঙ্গে কড়ি খেলা যা'ক,—রাত্রে পড়া যাইবে! রাত্রি বেলায় খাইয়া-দাইয়া একবার আলস্য কাটাইবার জন্য শয্যায় শুইয়া পড়িত,—ইচ্ছা যে একটু বাদে উঠিয়া পড়িবে। ভোর বেলায় চক্ষু মেলিয়া কোন-কোনও দিন মনে হইত যে, রাত্রে উঠিয়া পড়িবার কথা ছিল; কোনও দিন বা মনেও হইত না। পঞ্চম দিনে আর পড়ার কথা বড় মনে হইত না। এই প্রণালীতে পড়াশুনা করায়, তার প্রত্যেক বইয়ের গোড়ায় চার-পাঁচ পাতা প্রায় পঞ্চাশবার পড়া হইয়া গেল; কিন্তু অবশিষ্ট অংশ একেবারে অপঠিত রহিল। কারণ, যখন মাসান্তে সে বইখানা আবার হাতে করিত, তখন সে অত্যন্ত বিরক্তির সহিত অনুভব করিত যে, একমাস আগে সে যাহা পড়িয়াছিল, তাহা সব ভুলিয়া গিয়াছে। কাজেই আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হইত।

পূজার সময় যখন ইন্দ্রনাথ বাড়ী আসিল, তখন পূজা-পার্ব্বণের হাঙ্গামায় অনেক দিন কাটিয়া গেল। তার পর, ইন্দ্রনাথ একটা নূতন খেয়াল লইয়া আসিয়াছিল। সেই বার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে ছাত্র সভ্যের দ্বারা গ্রামের বিবরণ সংগ্রহের প্রস্তাব হইয়াছিল। ইন্দ্রনাথ পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরিয়া নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিল;—তাহাতেই তাহার দিন কাটিয়া গেল; সরযূর শিক্ষার কথা মনে হইল না। সরযূ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল; কেন না সে যে কিছুই পড়াশুনা করে নাই, সে জন্য সে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া ছিল; এবং স্বামীর কাছে এ বিষয়ে জবাবদিহি করিবার নানা রকম উত্তর তৈয়ার করিয়া রাখিলেও, সে বেশ একটু শঙ্কার সহিত স্বামীর তিরস্কারের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গের ইলিয়াস্-শাহী সুলতানগণ*

[শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ]

সেকন্দর শাহ

বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সুলতান সেকন্দরকে যে কি বিষম ঝড় সামলাইতে হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখিয়াছি। প্রথমবারের লক্ষ্মণাবতী আক্রমণের বিফলতায়, ফিরোজ শাহ দ্বিতীয়বার বিশেষ প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন; এবং দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা জয় না করিয়া আর ফিরিবেন না। জৌনপুরে বর্ষা যাপন, এবং দীর্ঘ ছয় মাস ব্যাপী একডালা অবরোধ দেখিয়াই তাহা বুঝা যায়। এমন আক্রমণ যে সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছিল, ইহাতেই তখনকার বাঙ্গালা দেশের এবং বাঙ্গালী সুলতানের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় আক্রমণ

* বঙ্গে সুলতানী আমল। চতুর্থ প্রস্তাব।

প্রতিরোধের গৌরবও অনেকখানিই ভাঙ্গড় ইলিয়াসের প্রাপ্য। ইলিয়াস্ হিন্দু-মুসলমান মিলাইয়া বাঙ্গালায় রাষ্ট্র-শক্তির যে উদ্বোধন করিয়াছিলেন, তাহাই দিল্লীর সম্রাটের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিল।

কিন্তু নায়কত্বের গৌরব যে ইলিয়াসের বীর পুত্র সেকন্দর শাহের, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সিংহাসনে বসিতে না বসিতেই তাঁহাকে যে বিষম অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল, সিংহাসনে বসিবার পূর্ব্বে তাহার জন্য তিনি কি শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা কিছুই জানিবার উপায় নাই। এই যুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে বসিলে দুঃখে, আক্রোশে নিজের হাত-পা কামড়াইতে ইচ্ছা করে। ইতিহাসের যেটুকু উদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইতে পরিষ্কার আভাস পাই যে, এ যুগ বাঙ্গালার বড় গৌরবময় যুগ। জানিবার ইচ্ছায় মন অধীর হইয়া উঠে। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির কি দুর্ভাগ্য! সমসাময়িক ঐতিহাসিকের লেখা একখানি ইতিহাস এ পর্য্যন্ত বাহির হইল না! ইতিহাস শিখিতে হয় কি না মালদহের কুঠিয়াল উড্নি সাহেবের ডাক-মুন্সী গোলাম হোসেনের শ-দেড়েক বছর আগের লেখা রিয়াজ-উস্-সালাতিন পড়িয়া! মহামূল্য রত্নহার অন্ধ-তমিস্রায় ছিন্নভিন্ন হইয়া হারাইয়া গিয়াছে। আমরা সুবর্ণরেখার রাশিরাশি বালুকা ধুইয়া, দুই-চারিটি, সোণার রেণুর উদ্ধার সাধন করিতেছি;—তাহাতে কি কাহারও জানিবার পিপাসা মিটে?

পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখাইয়াছি যে, যদিও ৭৬০ হিজরীর একেবারে প্রথম ভাগে ইলিয়াস্ শাহের মৃত্যু হয়, ৭৫৮ ও ৭৫৯ হিজরীতে বাঙ্গালার শাসন-ভার অনেকটা বোধ হয় সেকন্দর শাহের হাতেই ন্যস্ত ছিল। এদিকে ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের ৩৮ নং মুদ্রা হইতে জানিতে পারি যে, সেকন্দর শাহ ৭৫৯ হিজরীতে বা তাহার পূর্ব্বে কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। এই দুইটি তথ্যে বুঝা যায় যে, সেকন্দর শাহ বিশেষ যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। সিংহাসন-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই রাজ্য-ভার লাভে ও কামরূপ জয়েই বুঝিতে পারি যে, নিপুণ মল্লের মত রঙ্গক্ষেত্রে পা দিয়াই কি করিয়া সেকন্দর শাহ ফিরোজ শাহের মত প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত অমন ভাবে লড়িতে পারিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয়বার বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিতে আসিয়া দিল্লীর সম্রাট এমন শিক্ষা পাইয়া গেলেন যে, পরবর্ত্তী দুই শত বৎসরের মধ্যে দিল্লীর আর কোন সম্রাট্ বাঙ্গালা-মুখো হন নাই।

দিল্লীর সহিত সংশ্রব হারাইয়া বাঙ্গালা রাজ্য নিজের পথে চলিতে লাগিল। দিল্লীর সহিত যতদিন সম্পর্ক ছিল, ততদিন দিল্লীর ঐতিহাসিকগণ প্রসঙ্গক্রমে বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসের এটা-ওটা উল্লেখ করিতেন। কিন্তু দিল্লীর ইতিহাসের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকায়, এখন হইতে ঐ রকম উল্লেখ করিবার আর কোন প্রয়োজন হইত না। কাজেই, ৭৬০ হিজরীর পরবর্ত্তী বাঙ্গালার ইতিহাস-ক্ষেত্রে ঘোর অন্ধকার বিরাজ করিতেছে। ৭৬০ হিজরীর পরবর্ত্তী বাঙ্গালার ইতিহাস প্রধানতঃ আইনি-আকবরী, ফিরিস্তা এবং রিয়াজ-উস্-সালাতিনই আছে। কিন্তু এই বিবরণগুলি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত এবং সন-তারিখগুলি বিষম ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। টমাস্ সাহেব মুদ্রাতত্ত্বের সাহায্যে এই যুগের নির্ভুল সন তারিখ-সঙ্কুল ইতিহাস সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অগাধ পাণ্ডিত্যজনিত আত্মবিশ্বাসে তিনি এই যুগের মুদ্রাগুলির তারিখ যথেষ্ট সাবহিত হইয়া পাঠ করেন নাই। ফলে, তাঁহার পাঠে অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে। মহাত্মা ব্লথম্যানও পরবর্ত্তী অন্যান্য কর্ম্মিগণ চোখ বুজিয়া টমাসের পাঠ গ্রহণ করায়, এই যুগের ইতিহাসে কতকগুলি ভুল ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এই ক্ষেত্রে আধুনিকতম প্রচেষ্টা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড। এই মূল্যবান পুস্তকে রাখালবাবুর মত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিও টমাসের ভুলগুলি অবিচারে মানিয়া লইয়া ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, এই ভুলগুলি কি পরিমাণে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। যথাস্থানে একটি-একটি করিয়া এই ভুলগুলি দেখাইয়া দিব।

সেকন্দর ৭৬০ হিজরীর মুহররম মাসের প্রথম সপ্তাহে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সুদীর্ঘকাল নির্ব্বিবাদে বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজ্য বোধ হয় চাটগাঁ হইতে বিহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল রাজ্যে শান্তিতে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া সেকন্দর যে অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়; আদিনা মসজিদের মত প্রকাণ্ড মসজিদ নির্ম্মাণেও তাহা উপলব্ধ হয়। সেকন্দর শাহের বহু মুদ্রা এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান আবিষ্কারে তাঁহার

মুদ্রার সংখ্যা ৬০টি। সেকন্দরের মুদ্রাগুলির ভাও ও উল্টা পীঠের নানা রকম মনোরম নক্সা দেখিয়া বুঝা যায় যে, সেকেন্দরের শিল্পীগণ মুদ্রাকে নির্দ্দিষ্ট ওজনের রূপা বলিয়া মনে না করিয়া, উহা যাহাতে দেখিতে সুন্দর হয়, লোকে দেখিয়া যাহাতে বাহবা দেয়, সেই চেষ্টাও করিত।

বর্ত্তমান আবিষ্কারে সেকন্দরের যে ৬০টি মুদ্রা আছে, তাহাদের বর্ণনা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

(1) তিনটি মুদ্রা ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়ম তালিকার দ্বিতীয়-ভাগের ১৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত নমুনার মত। কোনটির উপরেই তারিখ বা টাঁকশাল পড়া যায় না।

(2) তিনটি মুদ্রা ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়ম তালিকার B-নমুনার মত; ইহাদেরও কোনটিরই টাঁকশাল বা তারিখ পড়া যায় না।
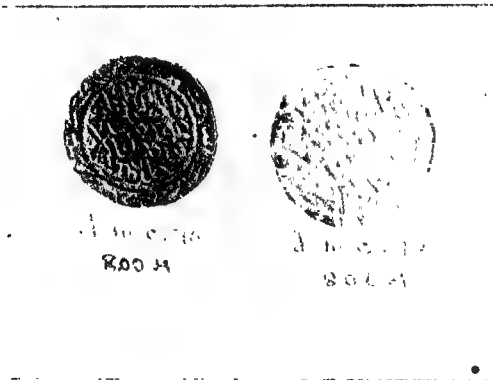
আজাম শাহের মুদ্রা

ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের C-নমুনা বর্ত্তমান আবিষ্কারে নাই।

(3) বিশিষ্ট মুদ্রা ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়ম তালিকার D-নমুনার মত। উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি বিস্তৃত বিবরণের যোগ্য।

(a) সেকন্দর শাহের রৌপ্যমুদ্রা। ওজন ১৬১·৫ গ্রেণ। বেধ ১·১৬ ইঞ্চি।

ভাওপীঠ :—বৃত্তাভ্যন্তরে; কিন্তু অধিকাংশ মুদ্রায়ই বৃত্ত কাটিয়া গিয়াছে। লিপি, ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের D নমুনার অনুরূপ।

উল্টাপীঠ :—ক্ষুদ্রতর বৃত্তাভ্যন্তরে। লিপি ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের D নমুনার অনুরূপ। কিন্তু এই মুদ্রাটিতে এবং অন্য আরও কয়েকটি মুদ্রায় লিপির শেষ কথা কয়টি "খলদ্ আল্লাহ্ মুল্কত্" বলিয়া বোধ হয়।

ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের মুদ্রা-তালিকায় এই নমুনার মুদ্রায় উল্টাপীঠের কিনারার লিপির পাঠ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয় নাই। এই নমুনার মুদ্রা টমাসের "ইনিশিয়েল কয়নেইজের" ৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত চতুর্থ নমুনার ২২ নম্বর মুদ্রার অনুরূপ; এবং শিলং পেটিকা-তালিকা-পরিশিষ্টের ১৬৪ নম্বর মুদ্রার অনুরূপ। উপরে বর্ণিত মুদ্রা হইতে এবং টমাসের ও শিলং-তালিকা-পরিশিষ্টে বর্ণিত মুদ্রা হইতে এবং ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম্ তালিকায় চিত্রিত ৪৯ নম্বর মুদ্রা হইতেও বুঝা যায়, কিনারার সম্পূর্ণ লিপিটি নিম্নরূপে পঠিত হওয়া উচিত—

নজাত্ আস্সিক্কত্ বেহজরত্ ফিরোজাবাদ সনত্ ..

বর্ত্তমান মুদ্রাটির তারিখের শতকের ৭ ০ মাত্র বুঝা যায়। একক দশকের অঙ্ক পড়া যায় না।

(b) উপরে বর্ণিত মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রা; কিন্তু তারিখ ৭৭৭ হিজরী বলিয়া বোধ হয়।

(c) উপরে বর্ণিত দুইটির অনুরূপ মুদ্রা। তারিখ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু টাঁকশাল মুয়া জুমাবাদ বলিয়া বোধ হয়।

বাকী ১৭টি মুদ্রার কোন-কোনটির বেধ ..৯ ইঞ্চি— এত ছোট। অধিকাংশেই টাঁকশাল ও তারিখ পড়া যায় না।

(4) পচিশটি মুদ্রা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের E নমুনার মত। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি বর্ণনার যোগ্য।

(a) সেকন্দর শাহের রৌপ্য মুদ্রা। ওজন ১৬০·৫ গ্রেণ। বেধ ১·২৪ ইঞ্চি। সন ৭৮৫ হিঃ। বৃহদাকারের মুদ্রা, ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের ৫২ নম্বরের মত; কিন্তু টাঁকশাল ফিরোজাবাদের "আল মুহর্উসত্" (দুর্গরক্ষিত) বিশেষণ আছে। কর্ণেল নেভিল্ও খুলনায় প্রাপ্ত সেকন্দর শাহের এই নমুনার মুদ্রায় টাঁকশালের এই বিশেষণ পাইয়াছিলেন। (J. A. S. B. 1915. P. 485.) ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মে এই নমুনার মাত্র তিনটি মুদ্রা আছে। তাহাদের মধ্যে দুইটির তারিখ যথাক্রমে ৭৮১ হিজরী ও ৭৮৭ হিজরী। বর্ত্তমান আবিষ্কারের এই নমুনার ২৫ মুদ্রার মধ্যে ১৭টির তারিখ সম্পূর্ণ বা আংশিক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাকী আটটির তারিখ পড়া যায়। ঐ তারিখগুলি এই;—৭৬৮, ৭৭৫, ৭৭৮, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৬, ৭৮৭ ৭৯১।

(b) শেষ মুদ্রাটি বিশেষ ভাবে বর্ণনার যোগ্য। ওজন ১৫৮·৩ গ্রেণ। বেধ ১·২০ ইঞ্চি। টাঁকশাল ফিরোজাবাদ। তারিখটি অতি পরিষ্কার—

আহাদি ও তসাইন ও সবামাইয়াত্; অর্থাৎ এক ও নব্বই ও সাতশত।

এই মুদ্রাটি এই হিসাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে, সেকন্দর শাহের যত মুদ্রা আমরা আপাততঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইতেছি, তাহাদের মধ্যে ইহাই বর্ত্তমানে সর্ব্বশেষ সনের মুদ্রা। টমাস্ লিখিয়াছেন যে, তিনি এই নমুনার মুদ্রার ৭৯২ হিজরী সনও পাইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এরূপ একটি মুদ্রাও চিত্রিত করেন নাই; কাজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাওয়া যাইতেছে না।

(c)i নমুনা উপরে বর্ণিত-রূপই। ওজন ১৫৮·৯ গ্রেণ। বেধ ১·০৬ ইঞ্চি। কারিগরী আনাড়ি হাতের মত। উল্টাপীঠের অষ্টদল বৃত্ত সু-অঙ্কিত নহে। কিনারার লিপি আংশিক পড়া যায়—

...হজত্ (এই) আস্‌সিক্কত্ (মুদ্রাটি) আল্‌মুবারকত্ (সৌভাগ্যপ্রদ) ফি বল্‌দত্ (সহরে) আল্‌মুয়াজ্জম (মুয়াজ্জম্)...

এই মুদ্রাটি যেন মুয়াজ্জমাবাদ টাঁকশালে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হইতেছে।

(c)ii পূর্ব্ববর্ণিত মুদ্রার অনুরূপ। তবে ভাওপীঠে বৃত্তটি বৃহত্তর; কাজেই কিনারা খুব অল্প-পরিসর। মুদ্রার কারিগরী আগের মুদ্রাটির মতই আনাড়ি হাতের। ওজন ১৬০·৭ গ্রেণ। বেধ ১·১৬ ইঞ্চি। সন সম্ভবতঃ ৭৭৫ হিজরী। উল্টাপীঠের কিনারার লিপি স্থানে-স্থানে কাটিয়াও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নিম্নলিখিত পাঠ প্রায় নিঃসন্দিগ্ধ বলিয়া ধরা যায়:—

"জরব্ (মুদ্রিত) হজত্ (এই) আস্‌সিকত্ (মুদ্রাটি) আল্‌মুবারকত্ (সৌভাগ্যপ্রদ) ইক্‌লিম্ (ভূখণ্ড) মুয়াজ্জমাবাদ (মুয়াজ্জমাবাদে) সনত্ (সন) খমস্ (পাঁচ) ও সবাইন (সত্তর) ও সবামাইয়াত্ (সাতশত)।

বর্ত্তমান আবিষ্কারে ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের F নমুনার মুদ্রা নাই। ঢাকা মিউজিয়মে একটি আছে বটে; কিন্তু উহার তারিখ কাটিয়া গিয়াছে।

(5) তিনটি ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের G-নমুনার মুদ্রা। কোনটিরই টাঁকশাল বা তারিখ পড়া যায় না।

(6) ছয়টি ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের H নমুনার মুদ্রা। তিনটির তারিখ ভারী স্পষ্ট। অসম্পূর্ণ বা সন্দিগ্ধ কিনারার লিপি পাঠের চেষ্টায় অকথ্য এবং অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়া, এই মুদ্রা তিনটি হাতে লইয়া আরামের নিঃশ্বাস ফেলা যায়! মূর্খ পোদ্দারগণ চিত্র-বিচিত্র ভাওপীঠেই তারিখ আছে মনে করিয়া, ভাওপীঠকে কাটিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে। কিন্তু তারিখ-সমন্বিত উল্টাপীঠে একটি আঁচড়ও দেয় নাই! উহার প্রত্যেকটি অক্ষর পড়া যায়।

(a) ওজন ১৫৮ গ্রেণ। বেধ ১·১১ ইঞ্চি। টাঁকশাল ফিরোজাবাদ। সন ৭৬৪ হিঃ।

(b) ওজন ১৫৯·৭ গ্রেণ। বেধ ১·২০ ইঞ্চি। টাঁকশাল ফিরোজাবাদ। সন ৭৮৩ হিঃ।

(c) ওজন ১৫৯·৬ গ্রেণ। বেধ ১·২০ ইঞ্চি। টাঁকশাল ফিরোজাবাদ। সন ৭৮৫ হিঃ।

এই তিনটি মুদ্রার কারিগরীই উৎকৃষ্ট। চতুর্থ মুদ্রাটিও উৎকৃষ্ট কারিগরের হাতেরই; কিন্তু মুদ্রিত করিবার সময় ছাঁচ একদিকে বেশী সরিয়া গিয়াছিল; তাই তারিখ ও টাঁকশাল কাটিয়া গিয়াছে। বাকী দুইটির কারিগরী ভাল নহে; টাঁকশাল ও তারিখ পড়া যায় না; আকারেও ছোট।

সেকন্দর শাহ কোন্ বৎসর মৃত্যু-মুখে পতিত হন, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, তাঁহার শেষ মুদ্রাগুলি ও পরবর্ত্তী রাজা গিয়াসুদ্দিন আজাম শাহের সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাগুলির আলোচনা করা আবশ্যক। বর্ত্তমান আবিষ্কারের মুদ্রাসমূহের মধ্যে উপরে বর্ণিত 4 (b) মুদ্রাটি সেকন্দরের সর্ব্বশেষ মুদ্রা। উহা ৭৯১ হিঃতে ফিরোজাবাদে মুদ্রিত। টমাস্ লিখিয়াছেন যে, ফিরোজাবাদে মুদ্রিত সেকন্দর শাহের ৭৯২ হিজরীর মুদ্রাও তিনি দেখিয়াছেন।

আজাম শাহের রাজত্বের প্রথম দিকের মুদ্রা খুঁজিতে গিয়া বিষম গোলকধাঁধায় পড়িয়া যাইতে হয়। সেকন্দরের রাজত্বের শেষ ভাগে, আজাম শাহ বিদ্রোহী হইয়া, সোনারগাঁয়ে যাইয়া, স্বাধীন ভাবে রাজত্ব আরম্ভ করিয়া দেন। টমাস্ লিখিয়াছেন যে, তিনি আজাম শাহের মুয়াজ্জমাবাদে মুদ্রিত মুদ্রায় ৭৭২ হিজরী সন দেখিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই

যে, যদি তিনি আজাম শাহের মুদ্রায় ৭৭২ হিজরী সত্যই দেখিয়া থাকেন, তবে এই সকল মুদ্রা কোথায় গেল? ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের তালিকায় আজাম শাহের ২২টি মুদ্রা বর্ণিত হইয়াছে। উহার একটিতেও অত পূর্ব্ববর্ত্তী সন দেখা যায় না। বর্ত্তমান আবিষ্কারে আজাম শাহের ৭২ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। আজাম শাহের এত মুদ্রা একত্র বোধ হয় খুব কমই পাওয়া গিয়াছে। পরে দেখা যাইবে যে, উহাদের মধ্যে ৭৯৫ হিজরীর পূর্ব্ববর্ত্তী একটি মুদ্রাও নাই! আরও এক কথা। টমাস্ আজাম শাহের যে শ্রেণীর মুদ্রায় ৭৭২ হিজরীর মত খুব পূর্ব্ববর্ত্তী সন দেখিয়াছেন, তাহাদের একটির ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। (Initial Coinage P. 74. No. 32. Plate II. Fig. 16.) টমাস্ সনটি ৭৭৮ হিজরী বলিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ছবি দেখিলেই বুঝা যায় যে, টাঁকশালের নাম মুয়াজ্জমাবাদ ঠিকই পড়া যায়, কিন্তু সনটির পাঠ একেবারেই কাল্পনিক।

টমাস্ আরও লিখিয়াছেন যে, আজাম শাহের ফিরোজাবাদে মুদ্রিত ৭৯১ হিঃ হইতে ৭৯৯ হিজরী পর্য্যন্ত সমস্ত বৎসরের মুদ্রাই তিনি দেখিয়াছেন। একটি মুদ্রার বর্ণনা ও ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। সনটি পড়িয়াছেন ৭৯৩ হিঃ। কিন্তু ছবিতে স্পষ্ট দেখা যায় যে সনটি ৭৯৫ হিজরী হইতে পারে যে, তিনি যে মুদ্রাটির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারই ছবি দেন নাই, কিন্তু পুস্তক পড়িয়া তিনি এমন অদল-বদল করিয়াছেন বলিয়া কিছুই বুঝা যায় না।

টমাসের বদ্ধমূল ধারণা হইয়া গিয়াছিল, যে তিনি আজাম শাহের ৭৯৯ হিজরীর পরবর্ত্তী মুদ্রা দেখিতে পান নাই। এ দিকে রিয়াজ-উস্-সালাতিনের গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন যে, আজাম শাহ মাত্র ৭ বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। টমাসের ঐ ধারণা এবং রিয়াজের এই উক্তি, এই দুইয়ে মিশিয়া আজাম শাহের রাজত্বের সন-তারিখে এমন খিচুড়ী পাকাইয়া রাখিয়াছে,— আজাম শাহের মুদ্রার পাঠে মহা-মহারথিগণের চোখে এমন ভুলের ভেল্কি লাগাইয়া দিয়াছে যে, নিম্নে একে-একে সেই ভুলগুলি খুলিয়া দেখাইলে, পাঠক অবাক্ হইয়া যাইবেন। মুদ্রাতত্ত্বের,—শুধু মুদ্রাতত্ত্বেরই বা কেন, গোটা প্রত্নতত্ত্বেরই —আলোচনায় সদা-জাগ্রত নয়ন থাকা কিরূপ দরকার, তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন।

প্রথমে টমাস্‌কে লইয়া আরম্ভ করা যাক্। টমাস্ তাঁহার ইনিসিয়েল কয়নেইজএর ৭৫ পৃষ্ঠায় আজাম শাহের একটি মুদ্রার বর্ণনা করিয়াছেন। মুদ্রাটির টাঁকশাল পড়িয়াছেন জান্নতাবাদ, এবং তারিখ পড়িয়াছেন ৭৯০ হিজরী। মুদ্রাটির হাতে-আঁকা একখানা ছবি আছে। ঐ পৃষ্ঠায়ই এই মুদ্রার ২ নম্বর নমুনা বর্ণনা করিবার সময় টমাস্ লিখিয়াছেন, (অনুবাদ) "আর এক শ্রেণীর মুদ্রা পাওয়া যায়; উহা প্রথম নম্বর নমুনারই মত; কিন্তু ক্ষুদ্রতর ছাঁচে মুদ্রিত; এবং লেখার কারিগরীও অনেক নিকৃষ্ট। এইগুলি মুয়াজ্জমাবাদ টাঁকশালে মুদ্রিত; এবং উহাদের তারিখগুলি আনাড়ি হাতের,

সেকেন্দর শাহের মুদ্রা

অস্পষ্ট ও ভুল ; যথা—সবাও সবা মাইয়াত—ছমানু সবাও—ছমা-ছমা—আহাদ্ ও ছমা ছমা। ৭৭০, ৭৭৮, ৭৮০, ও ৭৮১ হিজরী উদ্দেশ্য করিয়া বোধ হয় এই শব্দগুলি লেখা হইয়াছে।"

যাঁহারা হিজরীর ৮০০ হইতে ৮৯৯ পর্য্যন্ত কথায় সন দেওয়া (অঙ্কে নহে) মুসলমানী মুদ্রার সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারাই জানেন যে, "ছমান্ মাইয়াত্"=৮০০ শব্দটি অধিকাংশ মুদ্রায়ই নোক্তা ছাড়া "ছমা নমা ইয়াত্" রূপে লিখিত হইয়া থাকে ; এবং শেষ "ইয়াত্"টুকু হয় খুব ছোট্ট একটি কোণের আকৃতি টানে সারিয়া দেওয়া হয়, অথবা অনেক সময় মোটে আঁকাই হয় না। ফলে অধিকাংশ স্থলেই উহা "ছমা—নমা" এইরূপ ধারণ করে। নোক্তা ছাড়া উহা "ছমা—ছমা" বা "নমা—নমা" যাহা খুসী পাঠ করা যায়। আজাম শাহের ৮০০ হিজরীর পরবর্ত্তী অনেক মুদ্রা বর্ত্তমান আবিষ্কারে আছে। সেইগুলি পাঠ করিয়া, এবং জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহের কথায়-সন-লেখা ৮১৮ হিজরীর বহু মুদ্রা পাঠ করিয়া, সন্দেহমাত্র থাকে না যে, টমাস্ আজাম শাহের মুদ্রায় যে তারিখগুলি পড়িয়া ভুল বলিয়াছেন, এবং কারিগরের দোষ দিয়াছেন, সেগুলি ঠিকই ছিল ; ভুল করিয়াছিলেন টমাস্ই। তাঁহার পঠিত তিন নম্বরের তারিখ "ছমা-ছমা" স্পষ্টই ছমা-নমা-ইয়াত্ =৮০০ হইবে। ৪ নম্বরের তারিখ "আহাদ্ ও ছমা ছমা" স্পষ্টই "আহাদ্ ও ছমা-নমা-ইয়াত্"=৮০১ হইবে। ২নম্বরের তারিখ "ছমানু সবা ও"পড়া হইয়াছে। উহাও খুব সম্ভব "ছমান্ ও ছমান্ মাইয়াত্‌=৮০৮ ছিল। আর, ১ নংএর তারিখ যাহা সবাও সবা মাইয়াত্" পড়া হইয়াছে, তাহাও খুব সম্ভব সবাও ছমান্ মাইয়াত্"=৮০৭ ছিল।

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, টমাস্ সাহেব আজাম শাহের ৮০০ হিজরীর ও তাহার পরবর্ত্তী মুদ্রা হাতে পাইয়াছিলেন ; কিন্তু ঠিক পড়িতে পারেন নাই। ঠিক পড়িতে না পারিয়া কারিগরকে গালি দিয়াছেন এবং আজাম শাহ ৮০০ হিজরীর পূর্ব্বে ৭৯৯ হিজরীতে পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া এমন গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালার ইতিহাস সেই দুর্ভোগ এখনও ভুগিতেছে।

এই গেল টমাস্। এখন ধরা যাক্ অপর মহারথী ব্লখ্‌ম্যান্‌কে। তিনি তাঁহার তিনের দফা বঙ্গের ইতিহাস ও ভূগোল নামক রচনায় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় এশিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকার ২৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—(অনুবাদ)

"আমার প্রথম দফা 'বাঙ্গালার ইতিহাস ও ভূগোল' প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে, রাজা গণেশ নিজের নামে হয় ত মুদ্রা প্রচার করেন নাই। কিন্তু আমরা জানি, তাঁহার আমলে মুদ্রার প্রচার হইয়াছিল,—বায়াজিদ শাহের নামে প্রচারিত এবং আজাম শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার নামে প্রচারিত মুদ্রা রাজা গণেশের আমলেই প্রচারিত হইয়াছিল।......... মাননীয় শ্রীযুক্ত বেইলি সাহেব এশিয়াটিক্ সোসাইটিতে আজাম শাহের মৃত্যুর পরে প্রচারিত মুদ্রার নমুনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন (J. A. S. B. 1874 P. 204, Note) ঐ রকম দুইটি মুদ্রা, কিছুদিন হয়, সোসাইটির মুদ্রাপেটিকার জন্য সংগৃহীত হইয়াছে,—তাহাদের ছবি দেওয়া গেল। উহাদের তারিখ স্পষ্টই ৮১২ হিজরী।"

দেখা যাইতেছে, আজাম শাহের ৮১২ হিজরীর মুদ্রা অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছিল ; কিন্তু তখন মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণের বদ্ধমূল সংস্কার এই যে, আজাম শাহ ৭৯৯ হিজরীতে মরিয়া গিয়াছেন। তাই আজাম শাহের ৮১২ হিজরীর মুদ্রাগুলি সব জাল মুদ্রা ; অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর পরে অন্য কর্ত্তৃক তাঁহার নামে প্রচারিত মুদ্রা হইয়া পড়িয়াছিল। তখনকার ধারণা মতে আজাম শাহ ৭৯৯ হিজরীতে মরিয়া গিয়াছেন এবং পর পর হামজা, শামসুদ্দিন ও বায়াজিদ সিংহাসন লাভ করিয়াছেন। এই তিন পুরুষ পরে কেন যে তিন পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী আজাম শাহের নামে মুদ্রা প্রচারিত হইবে, কে যে প্রচার করিতে পারে, তাহার কোনই সুসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই।

ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের মুদ্রা-তালিকায় আজাম শাহের মুদ্রার বর্ণনায় শ্রীযুক্ত বৌর্ডিলন সাহেব এমন সকল গুরুতর ভুল করিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত রাইট্ সাহেবের মত মুদ্রাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কি করিয়া ঐ সকল ভ্রমসঙ্কুল পাঠ গ্রহণ করিলেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় বটে। বহুব্যয়ে প্রচারিত, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসে মুদ্রিত, বহির্দৃশ্যে এমন মনোহর পুস্তকের মধ্যে যে এমন গুরুতর ভুল থাকিতে পারে, তাহা না দেখাইয়া দিলে কেহ বিশ্বাস করিবেন না। শ্রীযুক্ত বৌর্ডিলন সাহেবও একজন মুদ্রাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। পূর্ব্বতন বদ্ধমূল ধারণা

তাঁহার চোখে ভেল্কি লাগাইয়াছিল, এই বলা ছাড়া এই সকল ভুলের আর কোন ব্যাখ্যাই দেওয়া যায় না।

ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়ম তালিকার দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫৬ পৃষ্ঠায় আজাম শাহের প্রথম যে দুইটি মুদ্রা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের নম্বর ৬৫ ও ৬৬। এই দুইটি এশিয়াটিক্ সোসাইটির মুদ্রা; এবং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই মুদ্রা দুইটিতেই ৮১২ হিজরী সন আছে বলিয়া ব্রথ্ম্যান সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন,—উভয়ের ছবি দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। ব্রথ্ম্যান
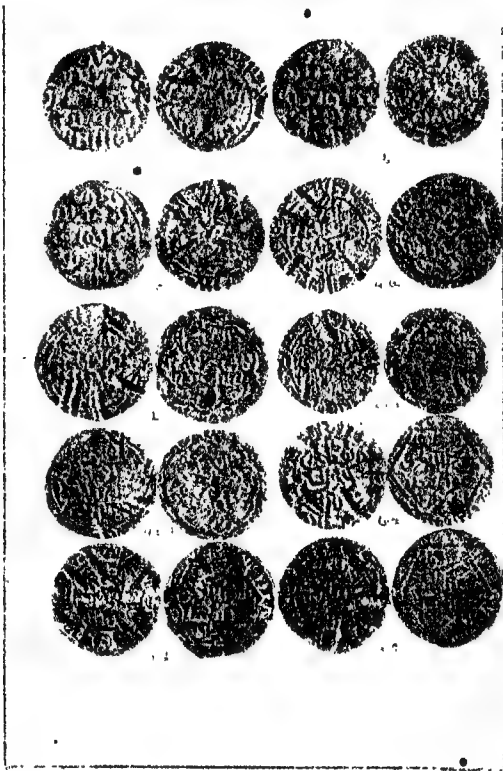
সেকেন্দর শাহের মুদ্রা

সন পড়িলেন ৮১২ হিজরী,—সেই সন অঙ্কে লিখা। আর বৌর্ডিলন্ সন পড়িলেন।—

"ফিরোজাবাদ। তসাইন্ ও সবা মাইয়াত"

অর্থাৎ তিনি পড়িলেন যে, সন কথায় লেখা আছে, এবং উহা ৭৯০ হিজরী, অর্থাৎ ৭৯৯ হিজরীর পূর্ব্ববর্ত্তী! ভেল্কির কুগ্রহ আর কি! ছবি মিলাইয়া দেখুন, সন স্পষ্ট লেখা আছে,—

ফিরোজাবাদ। সনত্ ৮১২

ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়ম তালিকায় বর্ণিত আজাম শাহে ৬৭, ৭৩ ও ৭৪ নম্বর মুদ্রায় ৭৯৩ হিঃ সন আছে বলি উল্লিখিত হইয়াছে। আমি স্বচক্ষে ৭৩ নং মুদ্রাটি পরীক্ষ করিয়া দেখিয়াছি। তারিখের শতক যে ৮০০ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। একক ৬ বলিয়া বোধ হয় কাজেই এই মুদ্রাটি ৮০৬ হিজরীর বলিয়া, অন্ততঃ পক্ষে ৮০০ হিজরীর পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতেছে। অপর মুদ্রা দুইটিও ঐরূপ হইবে, আমি স্বচক্ষে দেখি নাই।

আজাম শাহের ৭০ ও ৭১ নম্বর মুদ্রা ফিরোজাবাদে মুদ্রিত এবং ৭৮৮ হিজরী সনের বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আমি নিজ চোখে ৭০ নম্বর মুদ্রাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। উহার সন নিঃসন্দেহ ছম্মান মাইয়াত ৮০০ হিঃ। উহা এতই স্পষ্ট যে, কাণায়ও পড়িতে পারে। এই সন যে কি করিয়া ৭৮৮ পড়া হইল, তাহা নিতান্তই বিস্ময়ের বিষয় বটে।

এইরূপ আর কত দেখাইব? দুর্ভাগ্যক্রমে ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের আজাম শাহের সমস্তগুলি মুদ্রা আমি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই। পাইলে হয় ত আরও গলদ বাহির হইয়া পড়িবে। কেন, তাহার একটি মাত্র কারণ উল্লেখ করিতেছি। বঙ্গীয় এশিয়াটিক্ সোসাইটির ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের কার্য্যবিবরণীর ১৪২ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে, আগষ্ট মাসের সভায় বঙ্গীয় সুলতানগণের ভাগলপুরে প্রাপ্ত ২৮টি মুদ্রার বিবরণ ৫নং রিপোর্টে পঠিত হইয়াছিল। উহাদিগের মধ্যে আজাম শাহের ৮১০ ও ৮১১ হিজরীর দুইটি মুদ্রা ছিল। এই মুদ্রা দুইটি নিশ্চয়ই এখনও ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মে আছে। কিন্তু ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের তালিকায় আজাম শাহের মুদ্রার বর্ণনায় এই মুদ্রা দুইটির কোন উল্লেখই নাই। খুব সম্ভব ৬৫ ও ৬৬ নম্বর মুদ্রার মত ভুল পড়িয়া, সেই পাঠই মুদ্রিত করা হইয়াছে।

উপরে যাহা দেখাইলাম, তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়ম তালিকায় আজাম শাহের মুদ্রার অধ্যায় ফিরিয়া লিখিত হওয়া উচিত। এবং আজাম শাহের বেলা যিনি এমন ভুল করিতে পারিয়াছেন, স্বভাবতঃই তাঁহার অবশিষ্ট মুদ্রা-পাঠের উপর সন্দেহ আসিয়া পড়ে। কাজেই, বঙ্গীয় সুলতানদের সমস্ত মুদ্রাগুলির পাঠই ফিরিয়া পরীক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত, অনুসন্ধিৎসুগণ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম

তালিকায়, বঙ্গীয় সুলতানদের খণ্ডখানা আর নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, আজাম শাহের মুদ্রা পাঠে এই ভুলের ভেঙ্কির দুর্ভোগ এখনও চলিতেছে। নমুনা দেখুন।

ইংরেজি ১৯১৪ সালে বা তাহার কিছু আগে খুলনা জেলায় শতখানেক সুলতানি মুদ্রা পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত কর্ণেল নেভিল বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের অবৈতনিক মুদ্রা-পরীক্ষক। নেভিল সাহেব পণ্ডিত ব্যক্তি, মুদ্রাতত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি বঙ্গীয় এশিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের খণ্ডের ৪৮৪ পৃষ্ঠায় এই মুদ্রাগুলির পরিচয় দেন। এই আবিষ্কারে আজাম শাহের ৫২টি মুদ্রা ছিল। আজাম শাহের মুদ্রা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে নেভিল সাহেব লিখিয়াছেন :—

কোন কোন ক্ষেত্রে রাজা মরিয়া যাইবার পরও যে তাঁহার নামে মুদ্রা প্রচারিত হইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই আবিষ্কারেই আজাম শাহের নামে ৮১২ হিজরীতে প্রচারিত দুইটি মুদ্রা আছে। এই রকমের মুদ্রা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায় উল্লিখিত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর মুদ্রাগুলি রাজধানী ফিরোজাবাদে মুদ্রিত। স্পষ্টই আজাম শাহের মৃত্যুর পরে বায়াজিদ শাহ কর্ত্তৃক পূর্ণ রাজকীয় ক্ষমতা আহরণ করিবার পূর্ব্বে আজাম শাহের নামে এই মুদ্রাগুলি প্রচারিত হইয়াছিল।

কিন্তু আজাম শাহের আর একটি মুদ্রা এই আবিষ্কারে আছে; সেটি একটু গোলমেলে। এই মুদ্রাটি ফিরোজাবাদে মুদ্রিত সাধারণ মুদ্রারই মত; কিন্তু লেখার ছন্দে একটু বিশেষত্ব আছে। সনটি কথায় দেওয়া আছে; এবং উহা যে ৮০০এর পরবর্ত্তী, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এককের অঙ্কের শব্দটি ইস্নিন্—২এর মত;—অন্য কিছু বলিয়াই পড়া যায় না। কিন্তু তাহা হইলে এই সনটি কি করিয়া ব্যাখ্যা করা যায়?

দেখুন, নেভিল সাহেবের মত মুদ্রাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ১৯১৫ সনেও কিরূপ ঘোল খাইয়াছেন। পরিষ্কার ৭৯৯ হিজরীর পরবর্ত্তী মুদ্রা হাতে পাইয়াছেন; কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছেন না যে এগুলি অকৃত্রিম।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুদ্রাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত। তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি হাত বাড়াইলেই আজাম শাহের মুদ্রাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে টমাসের উপর এবং ইণ্ডিয়ান্-মিউজিয়ম-মুদ্রা তালিকার উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসের ২য় খণ্ড রচনা করিয়া গিয়াছেন। উহার ৬নং পরিশিষ্টে তিনি চীনদূতের সহচর মাহুয়ানের বঙ্গ-বিবরণ আলোচনা করিয়াছেন।

মাহুয়ানের বঙ্গবিবরণটি প্রথমে ফিলিপস্ সাহেব কর্ত্তৃক রয়েল এশিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের খণ্ডে ৫২৯—৩৩ পৃষ্ঠায় মূল চীনভাষা হইতে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে একটি ঘটনা-সাম্য প্রদর্শিত ছিল, যাহার সাহায্যে নিঃসন্দিগ্ধ রূপে স্থাপন করা যাইত যে, গিয়াসুদ্দিন আজাম শাহ ৮১২ হিজরীতে বাঁচিয়া ছিলেন; কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বুঝিয়াই উঠিতে পারিলেন না যে, কি করিয়া ৮১২ হিজরী পর্য্যন্ত গিয়াসুদ্দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারেন!

ব্যাপারটা এই :—চীন সম্রাট দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়াংলো কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছিলেন। ইয়াংলো দৃঢ় রূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে, দুইটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি অনুমান করিলেন যে, সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশগুলির কোনটীর মধ্যে যাইয়া দুইটির লুকাইয়া থাকা সম্ভব। পলায়িত শত্রুর অনুসন্ধানে ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি চেংহো, ওয়াংচিংহুং এবং অন্যান্যকে পশ্চিম সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশসমূহে দূত রূপে পাঠাইয়াছিলেন। এই দূতদলের দোভাষী ছিলেন মাহুয়ান্; মাহুয়ান্ এই দূতদলের সঙ্গে যে-যে দেশে গিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ২০টি দেশের বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। উহাদের মধ্যে বাঙ্গালাও একটি। ফিলিপস্ সাহেব মাহুয়ানের বঙ্গ-বিবরণের অনুবাদ শেষ করিয়া লিখিয়াছেন :—

"এই গেল মাহুয়ানের বাঙ্গালা দেশের বিবরণ। মিঙ্-বংশের ইতিহাস বিদেশীরাজ্যের কথায় মাহুয়ানের অনেক কথাই সমর্থিত আছে। একটি বিবরণে দেখা যায়, গৈয়াস্-জুটিং নামক বাঙ্গালার রাজা ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে চীনে নানা উপহার সহ দূত পাঠাইয়াছিলেন। বাঙ্গালার আর একজন রাজা কিয়েংফুটিং (১৪১৫ খৃষ্টাব্দে) চীন সম্রাটের নিকট

সোণার পাতে লেখা একখানা পত্র পাঠাইয়াছিলেন ; এবং একটি জিরাফ উপহার পাঠাইয়াছিলেন। প্রথম দূতদল ইয়াংলোর রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে চীনে পৌছিয়াছিল। উহা ১৪০৯ খৃষ্টাব্দ (=৮১২ হিজরীর সমান)। ঐ সময়ে বাঙ্গালা দেশে শিহাবুদ্দিন বায়াজিদ শাহ রাজত্ব করিতেছিলেন। পূর্ব্বতন এক রাজা গিয়াসুদ্দিন ১৩৭০ হইতে ১৩৯৬ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। চীনভাষার গৈয়াসজুটিংএর সহিত গিয়াসুদ্দিন নামের বেশ মিল আছে! কিন্তু এই দূতদলের চীনদেশে পৌছিবার অনেক বৎসর আগেই তিনি মারা গিয়াছেন। (!) হইতে পারে, চীনের ইতিহাসের তারিখগুলি ভুল। (!)

ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই জানেন, চীনদেশের সঠিক তারিখের সাহায্যে ভারত-ইতিহাসের কত সমস্যার সমাধান হইয়াছে। এ ক্ষেত্রেও বাঙ্গালার ইতিহাসের এই একটি গুরুতর সমস্যার সমাধান এই চৈনিক ঘটনা-সাম্য-সাহায্যে হইতে পারিত। কিন্তু ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ফিলিপস্ সাহেব যে ভুল করিলেন, ২৫ বৎসর পরে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চক্ষু বুজিয়া সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়া গেলেন!

অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, প্রত্নতত্ত্বসিংহ কানিংহাম সাহেবের চোখে এই ভুল ঠিক ধরা পড়িয়াছিল। তাঁহার Archaeological Survey Reportএর পঞ্চদশ ভাগে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের চৈনিক ঘটনা-সাম্যের মূল্য তিনি ঠিক বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আজাম শাহের ৮১২ হিজরীর মুদ্রাগুলিও যে সাঁচ্চা মুদ্রাই, তাহাও তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বেভারিজ সাহেব ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের এশিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকার ১২২ পৃষ্ঠায় রাজা কংশ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে আজাম শাহ সম্বন্ধে ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আর একজন মুদ্রাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন সাহেবও আজাম শাহের রাজত্ব যে অন্ততঃ ৮১২ হিজরী পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল, তাহা সিদ্ধান্ত করিতে দ্বিধা করেন নাই। ঢাকা রিভিউ পত্রিকার পঞ্চম খণ্ডে (১৯১৫-১৬ খৃঃ) সুলতানী মুদ্রা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আজাম শাহের মুদ্রায় ৭৭২ হিজরী হইতে ৮১২ হিজরী পর্য্যন্ত সন দেখা যায়। কিন্তু ৭৯৯ হইতে ৮১২ পর্য্যন্ত একটী ফাঁক আছে (অর্থাৎ এই কয় বছরের মুদ্রা পাওয়া যায় না)। উহার অর্থ বুঝা যায় না। নিম্নে বর্ণিত মুদ্রাটি এই ব্যবধানস্থিত একটি মুদ্রা হইতে পারে।"

কিন্তু সত্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে পৌছিয়াছিলেন খ্যাতনামা স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় এশিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায় 'প্রাচীন গৌড় ও পাণ্ডুয়া' নামক একটি প্রবন্ধে তিনি ঠিক ধরিয়াছেন যে, আজাম শাহ ৮১৩ হিজরী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর প্রবন্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিশ্চয়ই পাঠ করিয়াছেন। কানিংহাম, বেভারিজের নিবন্ধও নিশ্চয়ই তাঁহার পাঠ করা আছে। এই সমস্ত পড়িয়াও কি করিয়া তিনি অন্ধ ভাবে টমাসের ও ব্লখম্যানের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া গেলেন, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় বটে,—দুঃখের বিষয় ততোঽধিক।

বর্ত্তমান আবিষ্কারে আজাম শাহের ৮১১—৮১২ হিজরীর ১১টি মুদ্রা আছে, এবং ৮০১, ৮০৫, ৮০৬, ৮০৭, ৮০৯, ৮১০ হিজরীরও অনেকগুলি মুদ্রা আছে। যথা-স্থানে এইগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সেকন্দরের রাজত্বের শেষ ভাগে আজাম শাহ বিদ্রোহী হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ দখল করিয়া সোণার গাঁতে স্বাধীন হইয়া বসেন। কোন বৎসর তিনি স্বাধীন হন, তাহা ঠিক করিতে হইলে, পূর্ব্ববঙ্গের টাঁকশালগুলি হইতে কবে সেকন্দরের মুদ্রা শেষ ছাপা হইয়াছে, দেখিতে হইবে। কিন্তু এখানেও আবার গলদ। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম তালিকার ৪১ নং মুদ্রা সেকন্দরের সোণার গাঁয় মুদ্রিত মুদ্রা। সন পড়া হইয়াছে ৭৮৪ হিঃ। মুদ্রাটি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখি। তারিখটি যে ৭৫৯ হিজরী, সেই বিষয়ে এক রকম নিঃসন্দেহ হওয়া যায়! ৫০ নম্বর মুদ্রা মুয়াজ্জমাবাদ টাঁকশালের। এই টাঁকশালটি কোথায় ছিল, এখনও একেবারে স্থির হয় নাই। কেহ-কেহ বলেন, উহা মজুমপুর নামক স্থান—সোণারগাঁ সহরের মাইল ১২-১৪ উত্তরে অবস্থিত। উহাতে যত্নর পুত্র আহাম্মদ শাহের আমলে নির্ম্মিত ছয় গম্বুজওয়ালা প্রকাণ্ড এক মসজিদ আছে। কিন্তু মুয়াজ্জমাবাদ যে পূর্ব্ববঙ্গেরই কোথাও অবস্থিত ছিল, সে বিষয়ে সকলেই একমত। এই মুয়াজ্জমাবাদের ৫০ নং মুদ্রাটির সন ৭৭৭ হিজরী পড়া হইয়াছে। আমি নিজে এই মুদ্রাটি পরীক্ষা করিয়া

দেখি নাই। কিন্তু বর্ত্তমান আবিষ্কারে সেকন্দর শাহের মুয়াজ্জমাবাদে মুদ্রিত ৭৭৫ হিজরীর একটি মুদ্রা আছে বলিয়া, ঐ ৭৭৭ হিঃ পাঠ ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি। এই সনের পরে সেকন্দর শাহের কোন মুদ্রা আর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বাহির হয় নাই। কাজেই ৭৭৮ হিজরীর কিছু আগে-পাছে আজাম বিদ্রোহী হইয়া সোনারগাঁ দখল করিয়াছিলেন বলিয়া ধরা যায়।

আজাম শাহ বিখ্যাত পারস্য কবি হাফেজের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন, রিয়াজ এই কাহিনী লিখিয়াছেন। হাফেজ ৭৯১ হিজরীতে পরলোকে গমন করেন। এদিকে, আজাম শাহের সাতগাঁয়ে মুদ্রিত, ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের ৮০ ও ৮১ নম্বর মুদ্রায় ৭৯০ হিজরী সন দেখা যায়। আমি নিজে এই মুদ্রা দুইটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; কিন্তু অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য। এই ত্রস্ত পরীক্ষায় সন ৭৯০ বলিয়াই বোধ হইল। যদি এই সন সত্য হয়, তবে আজাম শাহের স্বাধীন ভাবে হাফেজের নিকট দূত প্রেরণ এবং ৭৯০ হিজরীতে সাতগাঁ দখলে বুঝা যায়, যে পিতা-পুত্রে যুদ্ধ আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিল এবং বৃদ্ধ সুলতান পুত্রের সহিত যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। সেকন্দর শাহের ক্ষত-বিক্ষত দেহ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হইল, তখন পর্য্যন্ত বৃদ্ধের দেহে প্রাণ আছে। পুত্রের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, বৃদ্ধ প্রাণত্যাগ করিলেন।

বর্ত্তমান অবস্থায় দুইটি সন নিশ্চিত রূপে ধরা যায়। একটি ৭৯১ হিঃ; বর্ত্তমান আবিষ্কারের 4 (b) মুদ্রাটি এই বৎসরে সেকন্দর শাহ ফিরোজাবাদ হইতে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। আর একটি তারিখ ৭৯৫ হিজরী। এই সনে ফিরোজাবাদ হইতে আজামের মুদ্রা মুদ্রিত হইতে দেখা যায়। (Thomas, Initial Coinage, P. 75. No. 35. Plate II, Fig. 15. পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে টমাস্ সন পড়িয়াছেন ৭৯১ কিন্তু উহা ৭৯৫ হইবে।) এই দুই সন এবং মধ্যবর্ত্তী ৭৯২, ৭৯৩, ৭৯৪ সনের কোন সনে সেকন্দর হত হন; এবং আজাম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বর্ত্তমানে উহা ৭৯৫ হিজরী বলিয়া ধরিয়া লইলে দেখা যাইবে যে, কামরূপ-বিজয়ী, আদিনা নির্ম্মাতা, সম্রাট ফিরোজের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতান শাহ সেকন্দর সুদীর্ঘ ৩৬ বৎসর রাজত্বের পরে পরলোকে গমন করেন। আর রিয়াজে তাঁহার রাজ্যকাল দেওয়া আছে মোটে ৯ বৎসর কয়েক মাস!

চিঠি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

(১)

রথতলাতে ওই যে ছোট ঘরে
ডাকঘরটী দেখতে পাওয়া যায়,
ডাকবাবু যে থাক্‌তে নারে ডরে—
গভীর রাতে কে তায় চিঠি চায়।

(২)

শুনতে পাবে শুনতে যদি চাও,
একটী রাতও বিরাম তাহার নাই—
দুয়ার ঠেলে, কেবল বলে দাও
'চিঠি চিঠি চিঠি আমার চাই'।

(৩)

হরকরাদের ঘুঙ্গুর যখন বাজে,
নীরব মাঠে সেই সাড়াটী জাগে,
চকিত তা'রা দাঁড়ায় মাঠের মাঝে—
বুকে দারুণ কি এক ব্যথা লাগে।

(৪)

লোকের মুখে শুনতে পাওয়া যায়,
ওই যে বনে ওই দোতালা বাড়ী,
অনেক আগে থাক্‌তো সেথা হায়
গৃহস্থ এক,—সুনাম তাদের ভারী

(৫)

ক্রমে-ক্রমে ছন্নছাড়া হয়ে,
দেশ-বিদেশে করতে গেল বাস ;
কেবল বুড়ী ঠাকুরটীরে লয়ে,
ভগ্ন ভিটায় রইত বার মাস।

(৬)

পুত্র তাহার চাঁদির চাঁদের লোভে
আফ্রিকাতে চাকরী নিলে বুঝি ;
বুড়ী একা থাকে মনের ক্ষোভে,—
ভগবানই এখন তাহার পুঁজি।

(৭)

প্রতি-দিবস ডাকের সময় হলে
ধীরে-ধীরে ডাকঘরে সে আসে ;
নাইক চিঠি, যায় সে ফিরে চলে,—
জল যে আসে চোখের আশে পাশে।

(৮)

একটী দিনও নাইক বিরাম তার ;
ডাকের সময় আসাটী তার চাই ;—
কই ত চিঠি আস্‌লো না ক' আর,
পিয়ন কাঁদে বলতে, 'চিঠি নাই।'

(৯)

পিয়নরা সব করলে যে ঠিক মনে,—
এবার বুড়ী ডাকঘরেতে এলে,
ফিরবে না আর,—অপর চিঠি এনে
দেবে তারে তাহার চিঠি বলে।

(১০)

আজকে ত কই আসলো না সে আর,—
ডাকের সময় কখন গেছে বয়ে।
দেখা ত আর মিললো না ক তার
গ্রামটি সারা রইলো মলিন হয়ে।

(১১)

বছর পরে কাল রঙের চিঠি
এলো সুদূর তুর্কী শিবির হতে,—
কি যে লেখা, কেউ জানে না সেটী,
হয় না সাহস খুল্‌তে কোনো মতে।

(১২)

চিঠিখানি ফিরিয়ে দিলে, আহা,
আছে যেথায় নিরুদ্দেশের ছেলে ;
কত বড় ভ্রম যে হল তাহা,
জান্‌তে সবাই পারলে দুদিন গেলে।

(১৩)

সে দিন থেকে ধাক্কা দিয়ে দোরে
গভীর রাতে কে ওই ডাকে ভাই,—
ওঠো, ওঠো, আবার বলে জোরে,—
'চিঠি চিঠি চিঠি আমার চাই।'

আবার রাজগিরে

[প্রিন্‌সিপ্যাল শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, এম্ এ, আই-ই-এস্]

এ দুই দিন রাজগিরের সুরে মনের তারগুলি বাঁধা হয় নাই। রাজগিরের বাঙ্গলো লোকে ভরা; পথে-ঘাটে কত লোকের ভিড়, স্নানের জায়গায় কত জনতা! গ্রহণের স্নান, তাই শান্ত রাজগির এ দুই দিন এত ব্যস্ত ও উত্তেজিত ছিল। অনেক দূর থেকে কত গ্রামের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগী এসেছে। এর মধ্যে খদ্দর ও গান্ধি টুপি-পরা লোকের দলও এসেছে। এই রকম ঘোড়ায়-ঘোড়ায় বসে অনেক অবগুণ্ঠনবতীর আনন্দাশ্রু বর্ষণ দেখলাম। ছোট-খাট দু'একটী দোকানও দেখলাম। তীর্থ করিতে আসিয়া গ্রামের মাতা, বধূ এবং কন্যাগণ কিছু-কিছু কিনে নিয়ে যাচ্ছিল। মেয়েরা সব নিজেদের ঘরে প্রস্তুত জামা পরে এসেছিল;—তার মধ্যে অনেক কারুকার্য্য। রাত্রি দু'টা হতে লোকের কি কোলাহল! সমস্ত রাত্রি ও সকাল বেলা সকলেই স্নানে

ব্যস্ত। উষ্ণ-প্রস্রবণগুলির কাছে যাওয়া মুস্কিল। অনেকে অগত্যা নিকটস্থ সরস্বতী নদীর ঘাটে স্নান করিয়া লইল। রামায়ণে এই নদীর নাম ছিল সুমাগধী; গৌতম-বুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের সময় ইহাকে লোকে তপোদা বলিত। এখন সে সব স্মৃতি লুপ্ত,—নদীর নামও নূতন হয়েছে। রামায়ণের কবি বলিয়াছেন, সুমাগধী পঞ্চশৈলের মধ্যে মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। বৌদ্ধ সঙ্গীতিকার তপোদা নদীর বর্ণনায় বলিয়াছেন, তপোদা স্বচ্ছসলিলা, শুভ্র-সলিলা, শীতোদকা, মৎস্য-কচ্ছপ-পূর্ণা এবং প্রস্ফুটিত-কমল শোভিতা। এখন এ নদীর সে অপূর্ব্ব গৌরব নাই। ইনি সারা বছর থাকেন ছোট্ট একটী পার্ব্বত্য নদী; কিন্তু বর্ষায় ইহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড জলের তোড়ে

বেশ করে গান্ধিজির জয়-ঘোষণা, তার সঙ্গে-সঙ্গে বীরদর্পে পদক্ষেপ, এবং সুযোগ পেলে আড়াল থেকে পদস্থ লোকের প্রতি বিদ্রূপ-সূচক ব্যবহার এবং দু'একটী ছোট-খাট গান্ধিজির নামে বিজয়-চীৎকার। এই এদের কাজ;—সেবা-সমিতির সে স্বার্থত্যাগ ও উৎসাহের আভাস বড় কিছু দেখিতে পাইলাম না। এই জনতার মধ্যে এখানকার গ্রাম্য-জীবনের ছোট একটী চিত্র পাওয়া যায়। স্নানের মেলায় দূর গ্রাম হতে অনেক মাতা, ভগিনী পিতৃস্বসা ইত্যাদির আগমন হয়েছে। পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ামাত্র, মেয়েরা অমনি বসে পড়ে' পরস্পরের গলা ধরে ক্রন্দন যুড়ে' দেয়, এবং হৃদয়ের উচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করে। যারা না জানে, তারা ভাবে কি বিপদই যেন ঘটেছে।

ছুটে আসে ; এবং এই শিলাবর্ষণে তপোদার উপরে কোন সেতু থাকিতে পারে না। দুই বৎসর পূর্ব্বে অনেক যত্নে একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত সেতু প্রস্তুত হইয়াছিল। বর্ষার জলে গাছ ভেসে এসে এমন জোরে তাতে আঘাত করেছিল, এবং তার উপর এমন প্রবল শিলা-বর্ষণ হয়েছিল যে, এখন তার ভগ্নাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। সেতুর একটী প্রকাণ্ড খণ্ড জলের আঘাতে অনেক দূরে এসে পড়েছে। সেবারকার বর্ষায় একটী বৃহৎ ভগ্নশীর্ষ বরাহ-দেবতার প্রস্তরমূর্ত্তি জঙ্গল থেকে ধুয়ে এসে পড়েছিল। এখন তা' পাটনার 'মিউজিয়মে' শোভা পাইতেছে।

* * * *

এখন আর পথে ঘাটে জনতা নাই। রাজগির নিজমূর্ত্তি

ধারণ করেছে। সে ব্যস্ততা, সে কোলাহল, সে জয়নাদ ও আনন্দ-ক্রন্দন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছে। আবার রাজগিরের গাছ-পালা, পশু-পক্ষী, আকাশ-পাহাড়, উপত্যকা ও শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র আপনার শান্ত শ্রী ধারণ করেছে ; আবার রাজগিরের জীবনের ধীর স্পন্দন অনুভব করিতেছি। শান্ত-সুরে বাঁধা তারগুলি আবার বেজে উঠেছে। প্রকৃতির এই স্থির, ধীর, মৃদু সঙ্গীতের সঙ্গে আমারও হৃদয়ের তার বেজে উঠেছে। সব একসুরে বাজছে। বিরল-মেঘ নীল আকাশ, মন্থরগতি শুভ্র মেঘখণ্ড, পাহাড়, উপত্যকা ও মাঠে বিছানো প্রকৃতির শ্যামল অঞ্চল, সুবর্ণ-রঞ্জিত সন্ধ্যাকাল, জ্যোৎস্নাসিক্ত, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত দূর-দৃশ্য, পাখীর কোমল-মধুর প্রেম-আবাহন, মৃদু-হিল্লোলে কম্পিত বৃক্ষশাখা, উজ্জ্বল-কিরণে উড্ডীয়মান প্রজাপতির পক্ষ-স্পন্দন—সব যেন কে অলক্ষ্য অঙ্গুলি-স্পর্শে বাজিয়ে এক অপূর্ব্ব ঐকতান বাদ্যের সৃষ্টি করেছে।

আর তার সঙ্গে-সঙ্গে আমার অনেক দিনের সাধা হৃদয়ের তারগুলিও প্রতিস্পন্দিত হচ্ছে।

আজ সন্ধ্যাবেলা সেবারকার মত জ্যোৎস্নার জোয়ার দেখব বলে অনেকক্ষণ বসে ছিলাম। সন্ধ্যার আকাশের রঙগুলি আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল ; আর দূরের পাহাড়গুলি গ্রামের ধোঁয়ার ধূসর মেখলা পরিধান করিল। ক্রমে আঁধার নেমে এসে সব মুছে ফেলে দিল। কেবল নিকটস্থ পাহাড়ের বিপুল কায় আকাশের গায়ে রেখাঙ্কনের আকার ধারণ করিল ; এবং তার মাথার উপর কয়েকটা মিট্‌মিটে তারা জ্বলতে থাকল। আজ দ্বিতীয়া, তাই চাঁদ উঠতে দেরী হতে লাগল। তবে সব আঁধারে ডুবে গিয়ে আবার নূতন করে জেগে উঠল বলে বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল। এমন জ্যোৎস্না কতদিন দেখিনি—আজ প্রাণ ভরে সম্ভোগ করে নিলাম। এখন দিনের গোলমাল একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। প্রকৃতির শান্ত হৃৎ-স্পন্দন ভিন্ন আর কিছুই নাই। দু' একটা ঝিল্লিরব—তাও যেন এই আকাশ ও পৃথিবী-জোড়া জ্যোৎস্না-প্লাবনে নিমগ্ন হয়ে গেছে। সমস্ত রূপ আলোক-নির্ম্মিত। আলোকের অভাবে রূপ একেবারে তিরোহিত হয়। আজ জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া গাছ-পালা বেশ করে দেখে নিলাম। সূর্য্যের আলোকে প্রকৃতি নানা বর্ণে আপনাকে বিভূষিত করে ; কিন্তু সে বর্ণ যেন অস্বচ্ছ।—চাঁদের জ্যোৎস্নায় সব স্বচ্ছ হয়ে গেছে। সূর্য্যের আলোক যেন পৃথিবীর, তাতে সমস্ত বস্তু স্থূল ও ঘনীভূত দেখায় ;—চাঁদের জ্যোৎস্না কোনও আলোকময় স্বর্গরাজ্যের কিরণরাশি। তাই আজ চাঁদের আলোকে বৃক্ষ, লতা, পাহাড়, প্রান্তর সব স্বচ্ছ হয়ে গেছে। চন্দ্রালোকসিক্ত প্রত্যেকটী বস্তু যেন এক-একটী স্বর্গের বীণা। আজ আলোক-স্পর্শে সমস্ত মুখরিত—সব

যেন এক শব্দে সমতালে বাজছে, আর আমার হৃদয়ের তারে ঝঙ্কার দিচ্ছে। সকালে ও সন্ধ্যায় অনেক সৌন্দর্য্য দেখেছি। কিন্তু এর সঙ্গে তুলনা হয় না।

ইহার মধ্যে সসীমের সঙ্গে অসীমের একটা মহামিলন আছে। অনন্ত আকাশের স্বচ্ছ গভীরতা হতে একটা আকুল আহ্বান এসে সমস্ত পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরেছে। পৃথিবী সে আহ্বানের আদরে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে। আকাশে-পৃথিবীতে এমন মিলনের বোধ হয় আর কোন অবসর হয় না। শিশু যেমন ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের কোলে, তেমনি এই প্রকাণ্ড পাহাড়গুলি জ্যোৎস্নাময়ী প্রকৃতি-ক্রোড়ে নিদ্রামগ্ন। রাত্রি-শেষে গভীর নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে রাজগির অলৌকিক নির্ব্বাণ-মূর্ত্তি ধারণ করে। বাঙ্গালী, যদি নির্ব্বাণের দীপ্ত প্রতিমা দেখিতে চাও, রাজগিরে এসে দেখে যাও। আমি গভীর রাত্রে কতবার নির্ব্বাণ-মূর্ত্তির দর্শন লাভ করেছি। সেই লোভে এতবার এখানে আসি এবং শরীরের স্বাস্থ্য ও মনের শান্তি অর্জ্জন করে নিয়ে যাই।

এবার এদেশে তেমন বর্ষা হয় নাই। বৈহার গিরির পার্শ্বে শৈলাসনের ছায়ায় আমরা এসে বসেছি। সাম্নে, দক্ষিণে ও বামে বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর। মাঝে-মাঝে দুই-একখানা ছোট গ্রাম এবং এখানে-ওখানে ঘন তালকুঞ্জ। যাদের এমন স্বর্ণ-প্রসূ ধরণী, তাদের অন্নের কষ্ট কেন? আমাদের অর্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের ইহার কারণ নির্দ্দেশে যত্নবান্ হওয়া উচিত। এখানকার উষ্ণপ্রস্রবণ হইতে যে জল নির্গত হয়, তাহা জলনালি-যোগে বহুদূরে নীত হইয়া শস্যক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু, এই পাহাড়গুলির ভিতর যত জল পড়ে, তাহা যদি জমাইয়া রাখিয়া, সারা বৎসর প্রয়োজন-মত খরচ করা হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত ক্ষেত্র রত্ন প্রসব করিতে পারে। পূর্ব্বে এরূপ করা হইত, তার নিদর্শন এখনও রহিয়াছে। পুরাতন রাজগৃহ নগরের ভগ্নাবশিষ্ট প্রাকারের বাহিরে প্রকাণ্ড বাঁধ আছে; তাহার দ্বারা সরস্বতী ও বানগঙ্গা নদীর জল আট্কানো হইত। খুব সম্ভব ইহাতে দুইটী কার্য্য সিদ্ধ হইত। প্রয়োজন মত এই প্রকাণ্ড সরোবর হইতে জল লইয়া শস্যক্ষেত্রে সেচন করা হইত; এবং নগর-রক্ষার জন্য প্রাকারের চতুর্দ্দিকে খাত পূর্ণ করা হইত। এবার সে পুরাতন পুষ্করিণী ঘাসে পরিপূর্ণ। তাই সেবারকার মত-ছোট্ট-ছোট্ট ঢেউও নাই, আর জলের অভাবে আমার পুরাতন বন্ধু কুমুদগুলির আনন্দ-নৃত্যও দেখিতে পাইলাম না। তবুও ২।৪টী শুভ্র কুমুদ ঘাসের ভিতর থেকে মুখ তুলে চেয়ে রয়েছে। এ স্থানটী পূর্ব্বে নিশ্চয়ই অতি মনোহর ছিল। তাই মহাকাশ্যপ এখানে ক্ষুদ্র একটী গুহার সামনে আপনার বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সম্মুখে জলভরা ফুল্লকুমুদের শুভ্র হাস্য; দূরে প্রান্তরে সবুজ শস্য-ক্ষেত্র; সন্নিকটে শীতবনের ঘন বৃক্ষায়তনী;

এবং দক্ষিণে অতি সান্নিধ্যে প্রস্রবণ-প্রবাহের নিরন্তর মৃদু সঙ্গীত। মহাকাশ্যপ তাঁহার গুহার ভিতর কখন-কখনও সপ্তাহকাল ধ্যান-মগ্ন থাকিতেন। ইনিই প্রথম মহা-সঙ্গীতির (বৌদ্ধ সমিতির) সভাপতির আসন পাইয়াছিলেন। সে দিন কোথায় গেল? সে সব প্রাকৃত প্রস্রবণের স্থানে এখন মানুষের গড়া কুণ্ড; আর পাণ্ডাদের কর্কশ কোলাহল লৌহ-হাতুড়ির মত কর্ণপটহে আঘাত কার।

*   *   *   *
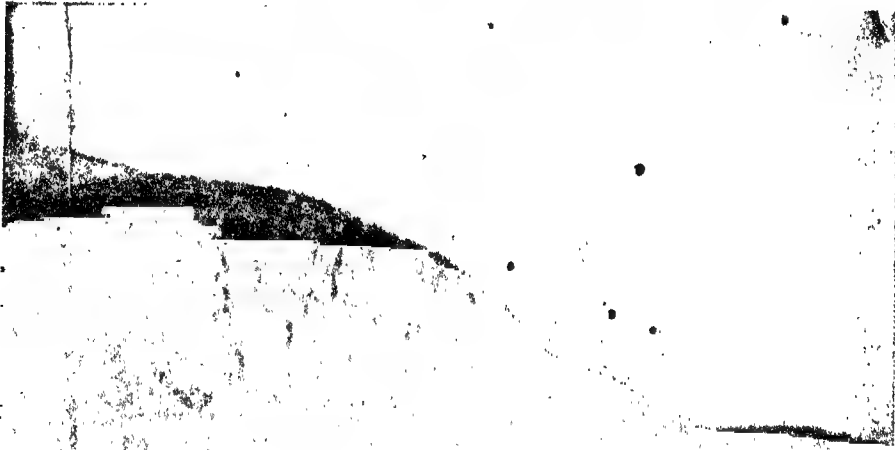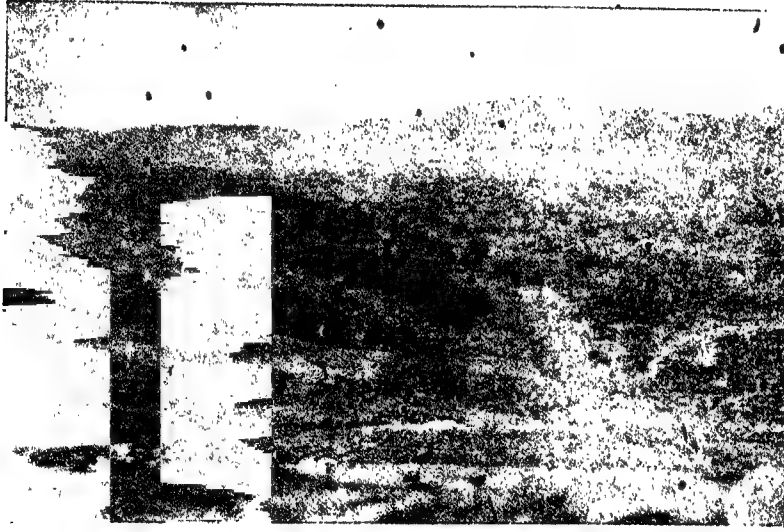
এবার আমরা বৈহার পাহাড়ের উপর উঠেছিলাম। সঙ্গে প্রফেসর হাজারী, বাবু চুনীলাল (শ্রেষ্ঠী) এবং শ্বেতাম্বর ধর্ম্মশালার ম্যানেজার ছিলেন। আমি অনেকবার এখানে এসেছি; কিন্তু এ আড়াই মণ বোঝা নিয়ে উপরে উঠতে পারি নাই। কতকদূর গিয়ে হাঁপিয়ে ও ঘর্ম্মাক্ত হয়ে পড়েছি। সেবার অধিক উঠতে সাহস হয় নাই,—এবার অনায়াসে বেশ উঠতে পারলাম। প্রথম সিকি রাস্তা (অর্দ্ধ মাইল) কিছু দুর্গম। খাড়া উঠতে হয় এবং গ্রানাইট পাথরে মসৃণ প্রাকৃতিক ধাপের উপর পা রাখিয়া চলতে হয়। একটু পদস্খলন হলে বিষম আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা। এ রাস্তাটুকু যেমন উঠতে, তেমনি নামতেও অতি সাবধানে চলতে হয়। নীচে থেকে রাজগিরের চেহারা এক রকম; উপরে উঠতে-উঠতে অন্য রকম হয়ে যায়। উপরের দৃষ্টি-রেখা কত বিস্তীর্ণ, আর কত সঙ্কীর্ণ! যত উপরে উঠা যায়, ততই মনোহর দৃশ্য! সূর্য্যের প্রভাত-কিরণে ফুল্ল কত শস্য-ক্ষেত্র, কত ছোট-ছোট পরিপাটী পল্লী,—"পঞ্চাচলাঙ্কিত" রাজগির

উপত্যকার আলোক-উদ্ভাসিত আকৃতি দেখিতে পাইলাম। যদি চিত্রকর হইতাম, এদৃশ্যগুলি আঁকিয়া লইয়া আসিতাম। পাহাড়ের উপর যত উচ্চ স্থান আছে, তাহার উপর সাদা ধপ্‌ধপে, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন এক-একটী জৈন মন্দির। ইহার মধ্যে প্রধান-প্রধান তীর্থঙ্করের প্রতিমা ও পাদ-লেখা। মন্দিরগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত, কিন্তু অধিক দিনের নহে। পাহাড়ের উপরে বৌদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন এখনও লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু তাহা কেবল পুরাতনের ভগ্নাবশেষ। এই সমস্ত স্থান হইতে পাথর লইয়া কোন-কোন মন্দিরের ধাপ, এবং দ্বার ইত্যাদি গঠিত হইয়াছে। একটী স্থানে দুইটী মন্দির আছে। তাহার নীচে পাহাড়ের পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া একটু নীচে গেলে, বড়-বড় দুইটী গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একটী পুরাতন বৌদ্ধ যুগের প্রসিদ্ধ সপ্তপর্ণী গুহা। বুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের সময় হইতে ভিক্ষুগণ এখানে বাস করিতেন। ধ্যান ও যোগ সাধনের জন্য এর চেয়ে উত্তম স্থান পাওয়া সহজ নহে। ইহার নীচে সমভূমিতে প্রথম মহাসঙ্গীতি-সভার মণ্ডপ রচনা হইয়াছিল। পর্ব্বতের শীর্ষদেশে গৌতম স্বামী তীর্থঙ্করের মন্দির। আমাদের সহযাত্রী চুনীলাল এই মন্দিরমধ্যে বসিয়া অতি মধুর স্বরে স্তোত্র পাঠ করিলেন। সিদ্ধ পুরুষ তীর্থঙ্করের উদ্দেশে এই, সমস্ত স্তোত্র পাঠ করা হয়। কিন্তু তাঁহাদের যে প্রকার গুণ বর্ণনা করা হয়, তাহাতে চিদানন্দ, নির্ব্বিকার, নির্ম্মল, অনাসক্ত ইত্যাদি সমস্তই আছে। সুতরাং যদিও ইঁহারা ঈশ্বরের উপাসক নহেন, তথাপি তীর্থঙ্করের উপর ঈশ্বরের গুণগুলি আরোপ করিয়া, তাঁহাদের পূজা-অর্চ্চনা করেন। যে ক্ষুধা গৌতম বুদ্ধ নির্ব্বাণের জন্য সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া 'অনাগারিক' হইলেন যে মহা অন্বেষণে শ্রীশঙ্কর স্বামী গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন, জৈনদেরও সেই এক আকুল অতন্দ্রিত আয়াস। শেঠজীর লোকেরা ক্ষিপ্রহস্তে শর্করাযুক্ত জাফরাণ-রঞ্জিত সুস্বাদু দুগ্ধ দ্বারা আমাদের পর্ব্বতারোহণের ক্লান্তি দূর করিলেন। ইঁহারা সকলেই দুগ্ধের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সিদ্ধি গ্রহণ করিলেন এবং এই অমূল্য দ্রব্য আমাকেও দিতে চাহিলেন, আমি বলিলাম—"যদি এমন সিদ্ধি দিতে পারেন, যাতে সমস্ত তৃষ্ণার প্রশমন হয়, আমি তা লইতে প্রস্তুত আছি।"

শিল্পী

(টলষ্টয়)

[শ্রীগোপাল হালদার]

কাউণ্ট লিও টলষ্টয়ের জীবনের ধারা প্রধানতঃ দুইটি দিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছিল। পাপ্‌ড়ির পর পাপ্‌ড়ি ছড়াইয়া শিল্পীর অন্তর হইতে ঋষি ফুটিয়া উঠিয়াছেন, এ কথা সত্য;—শিল্প-কলিকার পূর্ণ-বিকাশ হয় ত ঋষিত্বে হইয়াছে;—কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করিবার পথ নাই যে, জীবনের শেষ সীমায় টলষ্টয় যে বাণী প্রচারে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ঋষির বাণী হইতে পারে, কিন্তু শিল্পীর বাণী নয়।

টলষ্টয়ের সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলিয়াছেন, "From the first he has been an artist, and inspite of himself he is an artist to the last." টলষ্টয় ছিলেন প্রাণে-মনে শিল্পী। শিল্প বিষয়ে তাঁহার মতবাদ আজ আর কাহারো অজানা নাই,—শিল্পী নিজেও তাঁহার শিল্প-জীবনের দিকে তাকাইয়া বারম্বার বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন;—কিন্তু তবু তাঁহার সহিত যাঁহার পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে, সে 'আগুণের পরশ-মণি' তাঁহার প্রাণকে ছুঁইয়া গিয়াছিল, তাঁহার প্রাণে-প্রাণে একেবারে 'সুরের আগুণ' লাগিয়া গিয়াছিল। তাপসের সমস্ত শান্তি-বারি ঢালিয়া-ও টলষ্টয় সে উজ্জ্বল শিখাকে নিবাইয়া দিতে পারেন নাই।

টলষ্টয় যে যুগে রাশিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন, অনেকে তাহাকে 'Golden age of Russian Literature.' বলিয়াছেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি গোগল, টুর্গেনিভ, ডষ্টেভ্‌স্কি আদি বহু সাহিত্যিক আপনাদের প্রতিভার দীপালি-

উৎসবে রাশিয়ার সাহিত্যাকাশটাকে একেবারে রঞ্জিত করিয়া দিয়া যান। টলষ্টয় যখন প্রথম সাহিত্যের আসরে নামিয়া আসিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দী তখন চল্লিশের কোঠা পার হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তার পশ্চিম-আকাশের স্বর্ণ-দীপ্তি তখনো তেমনি গরিমায় শোভা পাইতেছিল। সে গরিমার উত্তরাধিকারী হইলেন টলষ্টয়। তাঁহার প্রথম রচনা Childhood ও Boyhood, বলিতে গেলে, সাহিত্যিক আসরে তাঁহার হাত-পাকানো; কিন্তু তাহাই পড়িয়া টুর্গেনিভ্ তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "When this new wine is ripened, there will be a drink fit for the gods."

টলষ্টয়

'Every artist writes his own biography' কথাটা আর যাঁহার জীবন সম্বন্ধেই মিথ্যা হউক, টলষ্টয়ের সম্বন্ধে সর্ব্বাংশে সত্য। প্রায় শতাব্দী-ব্যাপী দীর্ঘ জীবনের ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া তাঁহার যে জীবনের ধারা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা কোন্ ঘাট ছুঁইয়া গেল, কোন্ ঘাট এড়াইয়া গেল, Childhood হইতে Resurrection পর্য্যন্ত অসংখ্য গল্প, নাট্য ও উপন্যাসের পাতায় টলষ্টয় তাহা বেশ সরল, স্পষ্ট বাক্যে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শৈশবের ছবি আছে Childhoodএ, কৈশোরের চিত্র আছে Boyhoodএ, যৌবনের উজ্জ্বলতা আছে youth-এ। পর্দ্দার পর পর্দ্দা তুলিয়া ইর্‌টিনেফ-এর (Irteneff) জীবনের যে অধ্যায়গুলি তিনি আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন, ঘটনা-বৈচিত্র্যে তাহা টলষ্টয়ের জীবনের অনুরূপ নহে বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে; কিন্তু ইর্‌টিনেফ ও টলষ্টয় দুজনের জীবনই যে সম ছন্দে বসানো, সম তানে মন্দ্রিত, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। Youthএ তিনি যে যবনিকা টানিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন, সে যবনিকা ক্ষণকাল পরে সরাইয়া লইয়াছেন The Cossacks-এ, Sevastapol আদিতে।

ককেসাসের তুষার-ধবল শৈলশ্রেণী অনেক রুশ সাহিত্যিকের অদৃষ্ট গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাদের নিজ্জন বৈভব টলষ্টয়ের জীবনটাকে তোলপাড় করিয়া দিয়া গিয়াছিল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে টলষ্টয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দেনা চুকাইয়া, সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, ককেসাসে চলিয়া আসেন। তাঁহার সেদিনকার সে জীবন ফুটিয়া উঠিয়াছে 'The Cossacks' গল্পটিতে। সমস্ত বইখানি জুড়িয়া অশান্ত প্রকৃতি ও তাহারি আবেষ্টনে গঠিত অশান্ত নর-নারীর অনায়াস-জীবনের জন্য একটা ক্রন্দন বাজিয়া উঠিয়াছে। আজন্ম নগরে প্রতি-পালিত ওলিনিন (Olynin) মেরিয়ানার (Mariana) মত কসাক তরুণ-তরুণীর অনুদ্বিগ্ন, নগ্ন জীবন-যাত্রা যতই দেখিতেছেন, ততই আপনার অক্ষমতার কথা ভাবিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন।

The Cossacks গল্পটির সমসাময়িক আর একটি গল্প আছে,—Polikouchka—; কসাকের মত সেটি প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই; কিন্তু টলষ্টয়ের সুচারু শিল্পকলার সেটি একটি সুন্দর সৃষ্টি। পলিকাউস্‌কা মাতাল; সমস্ত জীবনটা সে সুরার তলে ডুবাইয়া দিয়াছে; সে প্রলোভনকে বাধা দিবার মত বিন্দুমাত্র শক্তিও তাহার নাই। তাহার প্রণয়িনী তাহাকে এ প্রলোভন হইতে রক্ষা করিবার জন্য একবার এক মতলব আঁটিলেন। পলিকাউস্‌কাকে তিনি একবার অনেক দূর হইতে অনেকগুলি টাকা আনিবার ভার দিলেন। আপনার পরিবার-পরিজন যে কেহ শুনিল,—এ মূঢ়তার অবশ্যম্ভাবী পরিণামের কথা ভাবিয়া সকলে সমস্বরে তাহাকে দোষ দিতে লাগিল। পলিকাউস্‌কার অন্তরে কিন্তু তখন প্রবল ঝড় চলিয়াছে,—লোভ এক-একবার গর্জ্জিয়া-গর্জ্জিয়া উঠিতেছে; আবার পরক্ষণেই প্রেম ও

কর্ত্তব্য-বুদ্ধির নিকট হার মানিয়া বিদায় লইতেছে। অবশেষে প্রলোভনকে জয় করিয়া সে যখন স্থির হইয়া বসিয়াছে, তখন হঠাৎ দেখিল যে টাকা নাই। তাহার জীবনের সমাপ্তি হইল আত্মহত্যায়। কিন্তু কিছুকাল পরে সে টাকা পুনরায় পাওয়া গেল। সমস্ত কাহিনীটির ভিতর দিয়া টলষ্টয়ের নিপুণতা এমনি সুন্দর রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, মনে হয়, টলষ্টয়ের পর-জীবনের সুপ্রসিদ্ধ গল্পগুলির পর্য্যায়ে এটিকে ফেলিলে অন্যায় হইবে না।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে টলষ্টয় ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান করিয়া স্বেচ্ছায় Sevastapol-এর যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া যান। সেভাষ্টপোলের চারিদিকে তখন মরণের যে দানব-লীলা চলিয়াছিল, ঐ নামের বইখানিতে তাহার তিনি পরিচয় দিয়াছেন। Sevastapol রাশিয়ার আবাল বৃদ্ধের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। স্বয়ং 'জার' পর্য্যন্ত তাহা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেখানে মানুষের চিরন্তন মরণের ভীতিটাকে তিনি কি করিয়া না বিশ্লেষণ করিয়াছেন! আহত প্রাস্কুখিনের (Praskukhin) মৃত্যুকালীন অনুভূতিগুলির বিশ্লেষণের জোড়া মিলে Anna Karenina-র এনার রেলগাড়ীর নীচে পড়িয়া আত্মহত্যায়। টলষ্টয়ের দৃষ্টিশক্তির প্রখরতার পরিচয় আমরা পদে-পদে পাই; কিন্তু তাঁহার বাইরেকার চোখ-দুটির চেয়ে অন্তরের চোখ-দুটিও কোনও ক্রমে কম প্রখর ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক Edmund Gosse তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "With him though observation is vivid, imagination is more vigorous still, and he can not be tied down to describe more than he chooses to create." তাঁহার মতে, এইখানেই ছিল তাঁহাতে এবং জোলা ও হাওএলের মত ঔপন্যাসিকেতে তফাৎ।

সেভাষ্টপোলের সমর-ক্ষেত্র হইতে টলষ্টয় মস্কোতে ফিরিয়া আসেন। টলষ্টয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে, উদীয়মান ঔপন্যাসিক;—মস্কোর সম্ভ্রান্ত সমাজ তাঁহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইল। পর-জীবনে টলষ্টয় তাঁহার এই মস্কো-জীবনকে কশাঘাতের পরে কশাঘাতে রক্তাক্ত করিয়া তুলিয়াছেন; কিন্তু আমাদের ভুলিবার উপায় নাই যে, এই মস্কো-জীবনেই War and Peace-এর জন্ম; এইখানেই একরকম Anna Karenina-র সূচনা; তাঁহার রাশি-রাশি গল্প-উপন্যাসের অনেকগুলিরই উপাদান যোগাইয়াছে এই মস্কোর সম্ভ্রান্ত সমাজের উচ্ছৃঙ্খল জীবন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে War and Peace প্রকাশিত হয়। নেপোলিয়ানের যুগের দুইটি সম্ভ্রান্ত রুশ পরিবার লইয়া উপন্যাসখানি লেখা। আয়তনে ইহার চেয়ে বড় উপন্যাস খুব অল্পই আছে। প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ব্যাপিয়া উপন্যাসের চরিত্রগুলি আমাদের সম্মুখে তাহাদের জীবনের অঙ্কখানি অভিনয় করিয়া যায়; অসংখ্য নরনারীর সহিত আমাদের পরিচয় হয়। "Even Stendhal is defeated by Tolstoi on his own ground."

ইহার পর টলষ্টয় মস্কো ছাড়িয়া Yasnaya Polyana-'য় আপনার জমিদারীতে চলিয়া যান। তাঁহার অন্তরের দ্বন্দ্ব তখন সুরু হইয়া গিয়াছে; তাহারি সমাধান খুঁজিতে তিনি এই পল্লীবাটের শান্ত-শীতলতার আশ্রয় লইলেন। এই সময় হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত প্রায় তিনি Yasnaya Polyanaতেই কাটান। সেখানেই Anna Karenina'র সৃষ্টির সূচনা হয়, ও সেখানেই সেই অতুল উপন্যাসখানা সমাপ্ত হয়। Anna Kerenina প্রথমে ধারাবাহিক রূপে একটি সুবিখ্যাত মাসিকপত্রে বাহির হইতে থাকে; পরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তাহা পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে Anna Karenina আজ আর কোথাও অজানা নাই।

Mathew Arnold (তখনো Resurrection লেখা হয় নাই) Anna Kareninaকে টলষ্টয়ের বুঝিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট উপন্যাস ('representative') বলিয়াছেন। টলষ্টয়ের সমস্ত দোষ হইতে এই উপন্যাসখানা মুক্ত না হইলেও, এটি তাঁহার শিল্পকলার চরম সৃষ্টি। মানুষের বাইরেকার ও ভিতরকার এমন তুচ্ছতম ঘটনাটুকু নাই, যাহা তাঁহার চোখ এড়াইয়াছে; এমন গুহ্যতম ভাবটুকু নাই, যাহার তিনি উদ্দেশ পান নাই। বেশভূষা, কথাবার্ত্তা, আদব-কায়দার সমস্ত খুঁটিনাটিটুকু হইতে আরম্ভ করিয়া, অন্তরের কামনা-বাসনার রেষা-রেষী, হিংসা-দ্বেষের দ্বন্দ্ব, পরিতাপ-অনুশোচনার দুর্ব্বহ ভার টলষ্টয় সমস্ত নিখুঁত ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। বলিতে গেলে, এ রুশ জীবনের 'এপিক্'।

Anna Karenina-র টলষ্টয় বহু সংখ্যক চরিত্রের

সমাবেশ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার মধ্যে এমন একটি নাই, যাহা প্রাণহীন, নিষ্প্রভ। Stepan-এর সেই উচ্ছৃঙ্খল জীবন, মিশুকে স্বভাব; Dolly'র সাধারণ মেয়েমানুষের মত চাল-চলন, চিন্তা ও কাজ; Betsy'র 'society lady'র অনুরূপ সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা, উদ্দামতা, কুটনীতি;—সব লইয়া উপন্যাসখানা টলষ্টয়ের অসীম দূরদৃষ্টির জীবন্ত পরিচয় দান করে। সুদীর্ঘ উপন্যাসখানির অসংখ্য ঘটনা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে একটি চরিত্রও তাহার বিশেষত্ব হারাইয়া বসে নাই; একটি চরিত্রেরও ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় নাই। অথচ প্রত্যেকটিই ক্ষণে-ক্ষণে নব-নব পত্রে-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে।

"There is ho greater proof of the extraordinary genius of Count Tolstoi than this, that through the vast evolution of his plots, his characters, though ever developing and changing, always retain their distinct individuality. The hard metal of reflected life runs ductile through the hands of this giant of imagination."

(Gosse)

উপন্যাসের সমস্ত সৌন্দর্য্য কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিয়াছে নায়িকা এনার চরিত্রে। Phelps বলিয়াছেন, "Never, since the time of Helen,, has there been a woman in literature of more physical charm." ভবিষ্যতের কোনো কবির কাব্য-বীণায় যখন 'Dream of Fair Women' বাজিয়া উঠিবে, অতীতের হেলেন, ক্লিয়োপেট্রার সাথে আধুনিক কালের এনাও হয় ত তখন দাঁড়াইয়া বলিবে আপনার দুর্নিবার কামনার শোকাবহ কাহিনী।—তাহারো জীবনে ফলিয়া উঠিয়াছে কবির সুগভীর আক্ষেপ,—

"Beauty and anguish walking hand in hand,
The downward slope to death."

কি লালিত্য ও লাবণ্য যে তাহার দেহলতা জড়াইয়া ছিল, ভ্রণস্কির (Vronsky) জীবনই তাহার দীপ্যমান দৃষ্টান্ত। এনার সহিত পরিচয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে শুধুমাত্র এক সুশ্রী, উচ্ছৃঙ্খল যুবা;—বহু রমণীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ লইয়া ছিনিমিনি খেলাই তাঁহার স্বভাব। কিন্তু এই চলচ্চিত্ত যুবকের প্রাণের গোপন শিখাটি জ্বলিয়া উঠিল নায়িকার অপরূপ রূপভাতিতে। ধীরে-ধীরে পা-এর পর পা ফেলিয়া সেদিন হইতে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তার পর আখ্যানের যখন সমাপ্তি হয় হয়, তখন দেখি, কখন মনের অগোচরে পঙ্ক ছাড়াইয়া সাধারণ নর-নারীর উপরের স্তরে উঠিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নির্ব্বাক, গম্ভীর, শোকাচ্ছন্ন মুখের দিকে চাহিয়া সেদিন স্বীকার না করিয়া পারি না, 'হাঁ,

মস্কোয় টলষ্টয়ের ভবন

মানুষ বটে।' কিন্তু এনা? সুখহীন, নিরানন্দ জীবনের নিকট বিদায় লইয়া, যে দিন সে বাসনার দুয়ারে আপনাকে বলি দিতে দাঁড়াইল, সে দিন হইতে তাঁহার দুঃখের ইতিহাসের সূচনা। তার পর লাঞ্ছনা, অপমান, দুর্ভাবনা, ঈর্ষা, সন্দেহ,—সকলে মিলিয়া সে বেদনাকে আঘাতের পর আঘাতে বাড়াইয়া তুলিয়া, সেই মলিন অসুন্দর ব্যথাতুর জীবনকে আত্মহত্যায় সমাপ্ত করিয়া দিল!

Madam Bovary-র সহিত Anna Karenina-র তুলনা করিতে যাইয়া Mathew Arnold দেখাইয়াছেন, ফরাসী অমর ঔপন্যাসিক যেন একটা আক্রোশ লইয়াই, নির্দ্দয়, নিকরুণ করে তাঁহার নায়িকার কলঙ্ক-কলুষ জীবনটাকে আঁকিতে বসিয়াছিলেন; কিন্তু রাশিয়ার ঔপন্যাসিক তাঁহার নায়িকার সমস্ত পাপ, সমস্ত কালিমা ধুইয়া দিয়াছেন আপনার

অশ্রুজলে। অথচ Flanbert-এর পাতায়-পাতায় আছে শ্লেষ, বিদ্রোহ আর বিদ্রূপ; আর টলষ্টয়ের ছত্রে-ছত্রে আছে লেভিনের (Levin) জীবনের আধ্যাত্মরাগের ইঙ্গিত। Madame Bovary'র সমস্ত ছাইয়া রহিয়াছে একটা তরলতা; আর Anna Karenina'র আদি-অন্তে রণিয়া উঠে, "Vengeance is mine, I will repay."

এনার স্বামী কারেনিন রাজনীতি-বিশারদ। তাঁহার দিকে আমরা কোনক্রমেই প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাইতে পারি না। তাঁহার আঙুল মট্‌কানো দেখিয়া এনার সহিত আমাদেরও বলিবার ইচ্ছা যায়, "Stop that, I despise it."

টলষ্টয়ের বিস্তৃত সৃষ্টি-জগতের মধ্যে একটি চরিত্রে তিনি আপনার অনুভূতির কতকটুকু পর্য্যবসিত করিয়া, তাহাকে করুণ তুলিকা-সম্পাতে সাজাইয়া তোলেন;—সেই চরিত্রটি কতকাংশে ঔপন্যাসিকেরই ছায়া হইয়া উঠে। এরূপ চরিত্রই War and Peaceএর পিয়ারী বেজৌশভ্ (Pierre Bezouchof), Anna Karenina'র লেভিন (Levin), ও Resurrection-এর নেহলুডফ্ (Nehludof)। লেভিন্ টলষ্টয়েরি মত জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজিতেছেন; অসংখ্য দ্বিধায়, সহস্র প্রশ্নে, সন্দেহে তাঁহার মন আকুলিত; নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় ছিন্ন, রক্তাক্ত। ভবিষ্যতে লেভিনই যদি কোনো দিন নেহলুডফ্ হইয়া উঠে, তাহা হইলে বোধহয় Anna Kareninaর পাঠকবর্গ কেহই বড় বেশী চম্‌কাইয়া যান না। ঠিক তেমনি করিয়া Anna Karenina আদির ভিতর দিয়া যে শিল্পী ফুটিয়া উঠিতেছিলেন, তিনিই যে একদিন তাপস হইবার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিবেন, তাহা আমরা লেভিন আদির সহিত পরিচয়ের প্রারম্ভ হইতেই যেন বুঝিতে পারি। লেভিন তাঁহার স্রষ্টার তৎকালীন মনের প্রতিচ্ছবি, টলষ্টয়ের অধ্যাত্ম জীবনের সন্দেহ-বিশ্বাসই তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে—"It is to live according to God—according to Truth;"—তখন পর্য্যন্ত টলষ্টয় জীবনের 'কঃ পন্থার' এইরূপ সমাধান করিয়াছেন। সামান্য এক মুজিকের (moojik) এই কথাটাই Anna Karenina-র লেভিনের কাছে তাঁহার জীবনের যাত্রাপথ নির্ণয় করিয়া দিয়াছিল।

প্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার Brieuxর Maternityতে দুইটি চরিত্রের মধ্যে তর্ক বাধিয়াছিল, লেভিন ও ভ্রন্‌স্কির মধ্যে কাহাকে বেশী ভালো লাগে। নাট্যকারের সহানুভূতি নাটকের ঘন আবরণের ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে না,—মনে হয়, তিনি ভ্রন্‌স্কিকেই বেশী ভালোবাসেন। খুব সম্ভব, সাহিত্যিক মাত্রই যেন সংস্কারক টলষ্টয় অপেক্ষা শিল্পী টলষ্টয়কে ঢের বেশী বরণীয় বলিয়া মনে করেন, Anna Kareninaর পাঠকমাত্রও তেমনি লেভিনের অপেক্ষা ভ্রন্‌স্কিকে বেশী পছন্দ করেন। লেভিনের চারিপাশের আকাশে ও বাতাসে কেমন যেন একটা হিম আছে, যাহা আমাদের সঙ্কুচিত করিয়া দেয়, মুক্ত বক্ষে আলিঙ্গন করিতে দেয় না। কিন্তু ভ্রন্‌স্কির সমস্ত চঞ্চলতা ও দুর্ব্বলতার মধ্যে-ও কেমনতর একটা স্বচ্ছন্দতা আছে, যাহা আমাদের বারবার নিমন্ত্রণ করে।

Anna Karenina-র সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় টলষ্টয়ের শিল্পী-জীবন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। কিছুকাল পরে তিনি শিল্পকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, সংস্কারক ও প্রচারকের কর্ম্মে লাগিয়া গেলেন। তাঁহার সে সময়কার অধিকাংশ লেখাই ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে পুস্তিকা, প্রবন্ধ ও গল্প। সেই সময়ের সমস্ত লেখাতেই একটা নীতি-উপদেশের সুর লাগিয়া আছে; কিন্তু তখনকার Does a man need much land? Ivan Ilyitch, Power of Darkness প্রভৃতি গল্প ও নাটকগুলিতে একটি সুন্দর সুষমাও ছাইয়া আছে। এই সব লেখায়,—অর্থহীন ভূমির তৃষ্ণাকে জলন্ত করিয়া তুলিতে, নিঃশঙ্ক চিত্তে নিষ্কম্প করে মৃত্যুকে চিত্রিত করিতে, নগ্ন জঘন্যতার মধ্য হইতে একটা স্বর্গীয় মাধুর্য্যকে টানিয়া বাহির করিতে,—যে সৌন্দর্য্য ফলিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, তাপসের সমস্ত তপশ্চর্য্যায়ও তাঁহার অন্তরের শিল্পী শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে নাই;—যখনি মুক্ত-দ্বার পায়, তখনি সে সগৌরবে জয়-যাত্রায় বাহির হইয়া পড়ে।

টুর্গেনিভ্‌কে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলা হয়। আপনার মৃত্যুশয্যা হইতে টুর্গেনিভ্ টলষ্টয়কে শিল্পের দিকে ফিরিবার জন্য ডাকিয়াছিলেন। সংস্কারক তখন তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই; কিন্তু সে অনুরোধ তিনি রক্ষা করিয়াছেন। পর-জীবনে টলষ্টয় আমাদের আর-একখানা অমর উপন্যাস দিয়া গিয়াছেন,—সে Resurrection। শিল্পীর একান্ত ইচ্ছায় তাঁর সমস্ত চিন্তা ও আদর্শ গ্রন্থের পাতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে

সত্য, কিন্তু শিল্প তাঁহার মনের অগোচরে আসিয়া জুটিয়া পড়িয়াছে। পথের ধূলায় যে মানবাত্মা মুখ থুব্‌ড়িয়া পড়িয়া ছিল, Resurrection তাঁহারি অভ্যুত্থান ও বিজয়-যাত্রার চিত্র। লেভিনে যে 'কেন'র মীমাংসার জন্য টলষ্টয় উতলা হইয়া ফিরিয়াছিলেন, নেহলুডফেও তাহারি সমাধানের প্রয়াস পাইয়াছেন।—এ তাঁহারি আপন আত্মার গোপম-গভীর কাহিনী। কিন্তু টলষ্টয়ের দিব্যচক্ষু যে দৃষ্টি হারায় নাই, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় সর্ব্বত্র। ইষ্টারের রাত্রির

টলষ্টয়ের আর-একখানা অপূর্ব্ব সৃষ্টি Kreutzer Sonata। নীতি-কথায় ও তাঁহার নিজস্ব মতবাদে সে বইখানাও ভরিয়া উঠিয়াছে; সেখানাও তাঁহার অনেকানেক গল্প-উপন্যাসের চেয়ে কোনো অংশে কম Didactic নয়। কিন্তু, তাহাতে পাতার পর পাতা জুড়িয়া এমন একটা জ্বালা, এমন একটা শ্লেষ, এমন একটা তীব্র বিদ্রূপ বহিয়া চলিয়াছে,—আর সে এতই করুণ, এতই শোকাবহ, এতই বেদনাময়,—যে, সাহিত্যে তার তুলনা মিলা ভার। এই
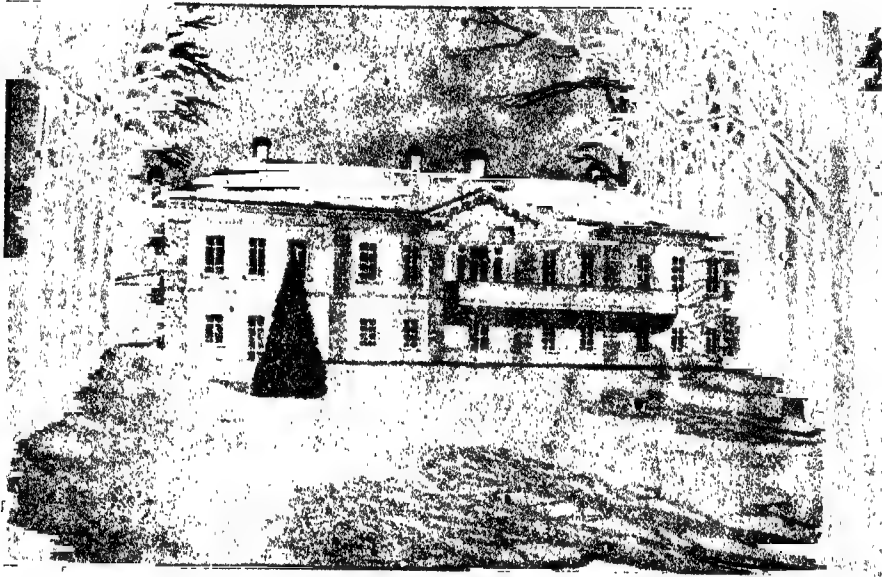
ইয়াস্‌নেয় পলিয়ানা (Yasnaya Polyana)

চুম্বনের সাথে লালসাময় চুম্বনের কত তফাৎ; নেহলুডফের অশান্ত বাসনা মেস্‌লোভাকে (Maslova) পাইবার জন্য কত হিংস্র, কত পাশবিক হইয়া উঠিয়াছিল; বিবাহ-প্রস্তাবে কি করিয়া সে কারাগৃহে আপনাকে সুরার স্রোতে ভাসাইয়া দিল,—এইরূপ ছোট-ছোট অসংখ্য ঘটনার ভিতর দিয়া মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে টলষ্টয় সমস্ত কাহিনীটিকে জীয়ন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কোনো ঘটনাই নায়ক-নায়িকার জীবনটাকে আখ্যান আরম্ভের পর হইতে একেবারে বদ্‌লাইয়া দিয়া যায় নাই; কিন্তু ইহারি ভিতর দিয়া যে মানব-মন কিরূপ করিয়া পলে-পলে বাড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আন্দোলনটুকুর ক্ষীণতম আভাসটুকুও টলষ্টয়ের চোখ এড়ায় নাই।

গল্পটির বিরুদ্ধে বহু লোক বহু দেশে তাঁহাদের তর্জ্জনী তুলিয়াছেন; ইহার উপর কুৎসিততার দোষও আরোপ করিয়াছেন। আমেরিকায় ইহার প্রচার বন্ধ পর্য্যন্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু নৈতিক জীবনের জন্য এতবড় আবেদন বোধ হয় খুব কম গল্পই করিয়াছে; আর খুব কম গল্পের ভিতরই বোধ হয় এমনিতর একটা সত্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধার সুর বাজিয়াছে। প্রচলিত নীতি-শাস্ত্রের ঝুঁটা মাপ-কাঠিতে বিচার করিয়া যাঁহারা নৈতিক অবনতির আশঙ্কায় বইখানার উপর 'অপাঠ্য' এই শিল-মোহরটি আঁটিয়া দিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা না দিয়াছেন উদারতার পরিচয়, না দিয়াছেন বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

টলষ্টয়ের কোনো উপন্যাসই গঠন-সৌকুমার্য্যে আদর্শ

নয়—Anna Karenina-ও না। তাঁহার প্রায় উপন্যাসেই তিনি ঘটনার পর এত ঘটনা যোগ করিয়াছেন, চরিত্রের পর এত চরিত্র টানিয়া আনিয়াছেন, যে, সে ঘটনা বা চরিত্রগুলির direct সার্থকতা বড় কোথাও একটা দেখা যায় না। Anna Kareninaয় দুইটি ঘটনার ধারা পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে; কিন্তু তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক কতটুকু? একমাত্র ষ্টিপান একদিকে এনা ও ভ্রন্স্কি, আর দিকে কিটি ও লেভিনের জীবনকে ছুঁইয়া আছে। তার পর স্থানে-স্থানে পাতার পর পাতা জুড়িয়া লেভিনের গ্রাম্য জীবনটা এমনি বিশদ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, মাঝে-মাঝে সেই বৈচিত্র্যহীন কাহিনী গ্রন্থখানাকে কেমন একটু নীরস করিয়া তোলে। Resurrection-এও পাতার পর পাতা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়িয়া যাই কোনো একটা ভব্য সমাপ্তির আশায়; কিন্তু আখ্যান ফুরাইয়া গেলেও মন কিছুতেই যেন তৃপ্তি খুঁজিয়া পায় না। ইহার জন্য দায়ী টলষ্টয়ের realism,—জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি। Mathew Arnold Anna Karenina'র সমালোচনায় বলিয়াছেন, এ শিল্প নয়,—'it is a piece of life'—জীবনের একটি টুক্‌রো। ঘটনার পর ঘটনা আমাদের জীবনে এমনি আসিয়া হাজির হয়, মানুষের পর মানুষের আগমনে যাত্রার পথ এমনি মুখরিত হইয়া উঠে; কিন্তু তাহাদের কয়জন চির সহচর হইয়া থাকে,—জীবনের পথ বদলাইয়া দেয়? "What his novel in this way loses in art, it gains in reality." টলষ্টয়ের সমস্ত উপন্যাস জুড়িয়া আছে এই 'reality'র আরাধনা, আর এই 'reality'র মূলে আছে তাঁহার জীবন ও অভিজ্ঞতা। "He writes as a man who has touched life at many points, and tasted most that it has to offer." (Havelock Ellis)

রুশ ঔপন্যাসিকদের বাস্তব-অর্চনাকে অনেকেই শিল্প ও নীতিশাস্ত্রের দিক্ হইতে বিচার করিয়া বহু দোষে দুষ্ট বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। Gorky আদি অনেক রুশ বাস্তব-পন্থী শিল্প ও সুরুচিকে সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। তেমনি টুর্গেনিভ্ টলষ্টয় আদি যাঁহারা প্রতিভাবান্ রুশ সাহিত্যিক, তাঁহারা তাঁহাদের বাস্তবতার ভিতর দিয়াই দুনিয়ার শিল্প-ভাণ্ডারে Fathers and Children, Anna Karenina আদি অক্ষয় সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন। Edmund Gosse-এর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,—"It is mere injustice to deny that they have been seekers after truth and life, and that sometimes they have touched both the one and the other." সত্যকে বরণ করিতে যাইয়া যাঁহারা সুন্দরকে হারাইয়া বসেন নাই, টলষ্টয় তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। "Tolstoi's radical optimism, his belief in beauty and nobility of human race, preserves him from the Scylla and the Charybdis of naturalism, from squalor and insipidity."

বর্ষ আবাহন

[শ্রীভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস]

(ভৈরবী)

এস নূতন বরষ ফিরিয়া।
আজি অবসাদ চিত্ত দূরীভূত করিয়া
নববল দাও ভরিয়া।
দীন হীন মন কুটিলতা নিকর
অপনীত হয় যেন আবিল অন্তর,
তোমার পরশে হেথা আনন্দের নির্ঝর
অবিরাম যায় ঝরিয়া।

নূতন তপন ওই নূতন অম্বরে ভাসি'
উজলিছে দশ দিশি হাসিয়া মধুর হাসি,
তব আগমনে ফুটে সুরভি কুসুম রাশি,
পিক মঙ্গল-গীতি গাহে তব স্মরিয়া।
রোগ শোক পরিতাপ হার'ক ও হিংসা ভয়,
তোমারি আশীষে বিশ্ব হউক কল্যাণময়,
উৎসাহে ধরণী কুসুমিত মোহিনী
সাদরে তোমারে বর্ষ লইল গো বরিয়া।

বিধবা

(আলোচনা)

'কৃষ্ণকান্তের উইল' (৩)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্-এ]

পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি, রোহিণীর অচেতন দেহের শুশ্রূষাকালে তাহার অধরে অধর দিয়া গোবিন্দলাল ফুৎকার দিলেন,* সেই মুহূর্ত্ত হইতে রূপমোহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। তিনি তাহা বুঝিলেন, তাই রোহিণী সুস্থ হইয়া গৃহে ফিরিলে 'গোবিন্দলাল সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন, "হা নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর! তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব? আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে।' তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও, আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।" (১৭শ পরিচ্ছেদ।) নগেন্দ্রনাথের ন্যায় গোবিন্দলালও প্রবৃত্তির সহিত প্রাণপণে যুঝিতে আরম্ভ করিলেন, এই আকুল প্রার্থনা তাহারই নিদর্শন। তাহার পর তিনি (হীরার মত) 'মনে মনে স্থির করিলেন যে বিষয়-কর্ম্মে মনোভিনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিব—স্থানান্তরে গেলে নিশ্চিত ভুলিতে পারিব। এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া' তিনি যাচিয়া জমিদারী দেখিতে 'দেহাতে' গেলেন। ইহাও প্রবৃত্তির সহিত যুঝিবার চেষ্টা।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি, রোহিণীকে ভ্রমর যে (আত্মহত্যার) পরামর্শ দিয়াছিল, তাহাতে উল্টা উৎপত্তি হইল, কেননা তাহারই জের, গোবিন্দলাল রোহিণীর মৃতবৎ দেহে জীবন-সঞ্চার করিতে গিয়া রূপমোহে আচ্ছন্ন হইলেন। সেই রাত্রে গৃহে ফিরিয়া তিনি ভ্রমরের পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে রাত্রির ঘটনা বলিলেন না, বলিলেন 'দুই বৎসর পরে বলিব।' (১৮শ পরিচ্ছেদ।) এই তাঁহার ভ্রমরের সহিত প্রথম লুকোচুরি খেলা, সত্য-গোপন, একাত্মতার অভাব। ইহারও ফল ভবিষ্যতে বিষময় হইল। এই ছিদ্রে অনর্থ ঘটিল, এই রন্ধ্রে শনি প্রবেশ করিল। ভ্রমর ব্যথিত হইল, 'তার বুকের ভিতর একখানা মেঘ উঠিয়া সহসা চারিদিক্ আঁধার করিয়া ফেলিল।' (১৮শ পরিচ্ছেদ।) তখনও পর্য্যন্ত তাহার স্বামীর উপর বিশ্বাস অটল।

তাহার পর স্বামিবিরহিণী প্রোষিতভর্ত্তৃকা ভ্রমরের শোকের বাড়াবাড়ি দেখিয়া ক্ষীরি ভ্রমরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া সেই রাত্রের ঘটনা—রোহিণীর কথা কুভাবে বুঝিয়া ভ্রমরকে জানাইল। পুরস্কার-স্বরূপ ভ্রমরের কাছে প্রহার খাইয়া ক্ষীরি ঝোঁকের মাথায় রোহিণীর কথা রং দিয়া পাঁচ জনের কাছে বলিল, ক্রমে এই কুৎসিত কথা মুখে মুখে চারিদিকে রটিল, পাড়ার মেয়েরা ভ্রমরকে সমবেদনা (?) জানাইতে দলে-দলে আসিল। ভ্রমর ক্ষীরিকে মারিল, পাঁচীচাঁড়ালনীর কাছে স্বামীর কুৎসা জানিতে চাহিল না, পাড়ার মেয়েদের ব্যবহারে হাড়ে হাড়ে জ্বলিল, কিন্তু তখনও স্বামিভক্তিপূর্ণহৃদয়া হইলেও তাহার মনের কোণে এক একবার একটু একটু সন্দেহের ছায়া পড়িল। সে 'ঊর্দ্ধমুখে

---

* জলমগ্নার অচেতন দেহে এই উপায়ে জীবন-সঞ্চারের আর একটি ঘটনার শাদাসিধা বর্ণনা নিম্নে একখানি ইংরেজী আখ্যায়িকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

Not too late, perhaps to save her—not too late to try to save her, at least! He placed his lips to hers, and filled her breast with the air from his own panting chest. Again and again he renewed these efforts, hoping, doubting, despairing—once more hoping, and at last, when he had almost ceased to hope, she gasped, she breathed, she moaned, and rolled her eyes wildly round her—She was born again into this mortal life.—O. W. HOLMES: "*The Guardian Angel,*" *Ch. IX.*

সজল নয়নে, যুক্তকরে, মনে মনে গোবিন্দলালকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "হে গুরো! শিক্ষক, ধর্ম্মজ্ঞ, আমার একমাত্র সত্যস্বরূপ! তুমি কি সেদিন এই কথা আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে?" তাহার মনের ভিতর যে মন, হৃদয়ের যে লুক্কায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিতে পায় না—যেখানে আত্মপ্রতারণা নাই, সেখান পর্য্যন্ত ভ্রমর দেখিলেন, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই। অবিশ্বাস হয় না। ভ্রমর কেবল একবারমাত্র মনে ভাবিলেন, "যে তিনি অবিশ্বাসী হইলেই বা এমন দুঃখ কি? আমি মরিলেই সব ফুরাইবে।" হিন্দুর মেয়ে, মরা সহজ মনে করে।' (২০শ পরিচ্ছেদ।) 'ভ্রমর আর সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া ধূলাবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, "হে সন্দেহভঞ্জন! হে প্রাণাধিক! তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বাস! আমার কি সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত্য না হইলে, সকলে বলিবে কেন! তুমি এখানে নাই, আজ আমার সন্দেহভঞ্জন কে করিবে?"' (২১শ পরিচ্ছেদ।) সন্দেহের ছায়া ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে।

প্রথমে তাহার মরিতে ইচ্ছা হইল। (২০শ পরিচ্ছেদ।) কিন্তু এই কলঙ্করটনা ভ্রমরের কাষ, এই সিদ্ধান্ত করিয়া ভ্রমরকে মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিবার জন্য রোহিণী স্বয়ং আসিয়া গহনা দেখাইয়া গেল (২২শ পরিচ্ছেদ)। সুতরাং ভ্রমরের সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। সে স্বামীকে কঠোর ভাষায় পত্র লিখিল, (২৩শ পরিচ্ছেদ) স্বামী ফিরিতেছেন সংবাদ পাইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল (২৪শ পরিচ্ছেদ)। ব্যাপার গুরুতর দাঁড়াইল। এ সবই সেই রাত্রিতে গোবিন্দলালের সত্য-গোপনের পরিণাম। তিনি যে উদ্দেশ্যে (রোহিণীকে ভুলিতে) বিদেশ গমন করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইয়াছিল বলা যায় না, কিন্তু বিদেশগমনের ফল অন্যদিকে বিষময় হইল। 'অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে।...এ সময় দুইজনে একত্র থাকিলে, এ মনের মালিন্য বুঝি ঘটিত না। বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ হইত। ভ্রমরের এত ভ্রম ঘটিত না। এত রাগ হইত না। রাগে এই সর্ব্বনাশ হইত না।' (২৪শ পরিচ্ছেদ।) ভ্রমরের কথা সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক না হইলেও পুনঃ পুনঃ তুলিতে হইতেছে, নতুবা গোবিন্দলালের অধঃপতনের সূত্র ধরা যাইবে না।

গোবিন্দলাল ভ্রমরের পত্র পড়িয়া 'স্তম্ভিত' হইলেন, ব্রহ্মানন্দের পত্রে 'বিস্মিত' হইলেন—'ভ্রমর দ্বারা এই সব কদর্য্য কথা রটিয়াছে!' (২৩শ পরিচ্ছেদ।) তিনি 'অনুকূল পবনে চালিত হইয়া' বিদেশে গিয়াছিলেন, 'বিষণ্ণমনে' গৃহে যাত্রা করিলেন। আসিয়া ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া 'সকলই বুঝিতে পারিলেন।' মনে মনে বড় অভিমান হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল। আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণধারণ করিতে পারে না?" এই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, ভ্রমরকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে মাতাকে নিষেধ করিলেন।' (২৪শ পরিচ্ছেদ।) 'গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমর বড় অবিচার করিয়াছে, একটু কাঁদাইব। ভ্রমরের অবিশ্বাস মনে করিয়া এক একবার একটু কাঁদিলেন। আবার চোখের জল মুছিয়া রাগ করিলেন। রাগ করিয়া ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন। ভুলিবার সাধ্য কি?' (২৫শ পরিচ্ছেদ।) এ পর্য্যন্ত মধুর, সুন্দর।

কিন্তু—তাহার পর? 'শেষ দুর্ব্বুদ্ধি গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায়, রোহিণীর চিন্তা। রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা, একদিনও গোবিন্দলালের হৃদয় পরিত্যাগ করে নাই। গোবিন্দলাল জোর করিয়া তাহাকে স্থান দিতেন না, কিন্তু সে ছাড়িত না। গোবিন্দলাল ভাবিলেন, যদি ভ্রমরকে আপাততঃ ভুলিতে হইবে, তবে রোহিণীর কথাই ভাবি —নহিলে এ দুঃখ ভুলা যায় না।··· গোবিন্দলাল আপন ইচ্ছায় আপনি আপন অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। রোহিণীর কথা প্রথম স্মৃতিমাত্র ছিল, পরে দুঃখে পরিণত হইল। দুঃখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল।' (২৫শ পরিচ্ছেদ।) গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট সেই রাত্রিতে সত্য গোপন করিয়াছিলেন, রোহিণীকে ভুলিবার জন্য বিদেশযাত্রা করিয়াছিলেন। গোবিন্দলাল-রোহিণীর কলঙ্ক রটনা হইলে, এই দুইটি কার্য্যের ফলে, ভ্রমর স্বামীর উপর বিশ্বাস হারাইল, পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। ভ্রমরের এই কার্য্যে গোবিন্দলাল অভিমানভরে ভ্রমরকে ভুলিবার জন্য রোহিণীর চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিলেন। এই কার্য্য-কারণ পরম্পরা লক্ষণীয়।

গোবিন্দলালের হৃদয়ে যখন প্রবৃত্তি ক্রমেই প্রবল

হইতেছে, তখন দৈবগত্যা একটি ঘটনায় ব্যাপার চরমে দাঁড়াইল। গোবিন্দলাল একদিন সন্ধ্যাকালে বারুণীতটে, উদ্যানমধ্যস্থ মণ্ডপ-মধ্যে বসিয়া 'সেই বাসনার জন্য অনুতাপ করিতেছিলেন,' এমন সময় রোহিণী ঘাটে আসিল। গোবিন্দলাল তাহাকে চিনিলেন না,' শুধু স্ত্রীলোক বুঝিয়া 'আজ ঘাটে নামিও না—বড় পিছল, পড়িয়া যাইবে' বলিয়া নিষেধ করিলেন। (বোধ হয় কথাগুলির symbolism সঙ্কেত গ্রন্থকারের অভিপ্রেত।) রোহিণী কথাগুলি শুনিতে না পাইয়া (?) উদ্যানে প্রবেশ করিল, 'সাহস পাইয়া মণ্ডপ-মধ্যে উঠিল।' রোহিণীর আর কলঙ্ক ভয় নাই, কেননা কুৎসা যথেষ্ট রটিয়াছিল। উভয়েরই এই কুৎসা-রটনা সম্বন্ধে বক্তব্য ছিল। রোহিণী বলিল, 'এখানে দাঁড়াইয়া বলিব কি?' এ কথার পর গোবিন্দলাল তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। 'সেখানে উভয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না।' (বঙ্কিমচন্দ্রের reticence লক্ষণীয়। কালের কোন কোন আখ্যায়িকাকার এখানে কি কাণ্ড করিতেন, ভুক্তভোগী পাঠক তাহা অবশ্য জানেন।) 'কেবল এইমাত্র বলিব যে সে রাত্রে রোহিণী, গৃহে যাইবার পূর্ব্বে বুঝিয়া গেলেন যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ।' (২৫শ পরিচ্ছেদ।) দৈব-বিড়ম্বনায় প্রলোভনে পড়িয়া, গোবিন্দলাল সংযমের বন্ধনে হৃদয় আর বাঁধিতে পারিলেন না। 'রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়?......তাতে দোষ কি? রূপ ত মোহেরই জন্য হইয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথমে এইরূপ ভাবিলেন। পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে। কিন্তু যেমন বাহ্যজগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে, প্রতি পদে পতন-শীলের গতি বর্দ্ধিত হয়। গোবিন্দলালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল—কেননা রূপতৃষ্ণা অনেকদিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে; আমরা কেবল কাঁদিতে পারি, অধঃপতন বর্ণনা করিতে পারি না। একদিন গোবিন্দ-লাল অনেক রাত্রে বাগান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।' (২৬শ পরিচ্ছেদ।) এখানেও বঙ্কিমচন্দ্রের reticence, এবং পাপাচরণের দোষ-ঘোষণা (condemnation) অথচ অধঃপতিত সুচরিত্র নায়কের প্রতি সমবেদনা লক্ষণীয়।

রোহিণী গোড়া হইতেই হারের কাত (losing battle) লইয়া জীবনের খেলা আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার হৃদয়ে লালসা সুপ্ত ছিল, হরলাল সেই সুপ্ত লালসা জাগরিত করিয়া পরে তাহার আশাভঙ্গ করিল, সেই শূন্যহৃদয় গোবিন্দলাল পূর্ণ করিলেন। স্বামিস্মৃতিবর্জ্জিতা লালসাময়ী বিধবার এই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। এ অবস্থায় গোবিন্দলালের তরফ হইতে একটু আস্কারা পাইলেই, শুষ্ককাষ্ঠে অগ্নিকুণ্ড হইতে একটি স্ফুলিঙ্গ পড়িলেই, শেষরক্ষা অসম্ভব। ঘটিলও তাহাই। গোবিন্দলালের হৃদয় যখন রূপমোহে আচ্ছন্ন, বাসনায় উদভ্রান্ত, তখন দৈবযোগে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল, উভয় পক্ষেরই অধঃপতনের আর বিলম্ব হইল না। রোহিণী এখনকার ব্যাপারে একটু বেশী অগ্রসর। ('আপনি কি আমাকে ডাকিলেন?'......'এখানে দাঁড়াইয়া বলিব কি?') তাহার আর কলঙ্কভয় নাই। 'যা বলিবার তা বলিতেছে।') বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালের পাপাচরণের দোষ ঘোষণা (condemnation) করিয়াছেন, রোহিণীর অসংযমের নিন্দা পূর্ব্ব হইতেই করিয়াছেন। 'রোহিণী লোক ভাল নয়।' (৭ম পরিচ্ছেদ।) 'রোহিণী না পারে এমন কাজই নাই।' (২২শ পরিচ্ছেদ।) তিনি যে শুধু প্রতিযোগিনী ভ্রমরের মুখ দিয়া তাহাকে 'আবাগী পোড়ারমুখী বাঁদরী' ও ভ্রমরের হিতাকাঙ্ক্ষিণী ক্ষীরির মুখ দিয়া 'কালামুখী' বলাইয়াছেন তাহা নহে, নিজের জোবানীও তাহাকে 'রাক্ষসী পিশাচী' (২২শ পরিচ্ছেদ) 'প্রেতিনী' (২৫শ পরিচ্ছেদ) বলিয়াছেন।

তাহার পর কৃষ্ণকান্তের শেষ উইল আবার নূতন জটিলতার সৃষ্টি করিল।* তিনি গোবিন্দলালের চরিত্রভ্রংশে

* উইলের কথা মাঝে মাঝে তুলিতে হইতেছে, ইহাও পাঠকবর্গের অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইতে পারে। কিন্তু অনেকদিন পূর্ব্বে বলিয়াছি ('বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি', 'ভারতবর্ষ' আষাঢ় ১৩২২)—"কৃষ্ণ-কান্তের উইলে" গোবিন্দলাল-ভ্রমর-রোহিণীর প্রণয়-বৃত্তান্ত মর্ম্মভেদী সন্দেহ নাই, কিন্তু এই কাহিনীর জটিলতার মূলে বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত রায়ের উইল। উহাই ভবিষ্যৎ বহু অনিষ্টের মূল।......ইহাতে রোহিণী-চরিত্রের একদিকের বিকাশ। সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের চরিত্রের প্রথম পরিচয়। উইল চুরি ও পরে জাল উইল চুরির চেষ্টায় এই তিনটি চরিত্রের অধিকতর বিকাশ ও জটিলতার বৃদ্ধি। তাহার পর আবার শেষ উইলে ভ্রমরকে উত্তরাধিকারিণী করাতে, বিপদ আরও ঘনাইল, ব্যাপার আরও জটিল হইয়া পড়িল। অতএব দেখা গেল উইল যেন গ্রন্থখানির রন্ধ্রে রন্ধ্রে রহিয়াছে।

দুঃখিত হইয়া, তাঁহাকে 'কুপথগামী দেখিয়া চরিত্র শোধনের জন্য' 'গোবিন্দলালের শাসন জন্য' ভ্রমরকে (গোবিন্দলালের পরিবর্ত্তে) সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দিয়া গেলেন। ইহাতে গোবিন্দলালের ভ্রমরের প্রতি আরও অভিমান হইল। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর ভ্রমর আসিলে প্রথমে শোকে স্বামি-স্ত্রীর একাত্মতা হইল, আপাততঃ রোহিণীর কথা উঠিল না, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটা কালো পরদা পড়িয়া গেল। (২৭শ পরিচ্ছেদের প্রাণস্পর্শী বিবরণ দ্রষ্টব্য।) 'গোবিন্দলাল সে অন্ধকারে আলো করিবার জন্য, ভাবিত রোহিণী।' স্বামিস্ত্রীর এই (alienation of heart) অনৈক্যের রন্ধ্র দিয়াই অবৈধ প্রণয় দিন দিন গোবিন্দলালের হৃদয়ে সুপরিসর স্থান করিয়া লইতে লাগিল।

তাহার পর গোবিন্দলাল ভ্রমরকে মনের অভিমান জানাইলেন, ভ্রমর 'অসময়ে পিত্রালয়ে' যাওয়ার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিল, 'কেবল তোমায় জানি তাই রাগ করিয়াছিলাম' এই প্রাণের ব্যথা জানাইল, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। কেন? 'গোবিন্দলাল তখন ভাবিতেছিল "এ কালো! রোহিণী কত সুন্দরী! এর গুণ আছে, তাহার রূপ আছে। এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব।"...... গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভাবিতেছিল। 'তীব্রজ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্তপ্রভাশালিনী প্রভাতশুক্রতারারূপিণী রূপতরঙ্গিণী চঞ্চলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল।' (২৮শ পরিচ্ছেদ।) পর-পরিচ্ছেদে আখ্যায়িকাকার এই আসল কারণটা সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্বচ্ছলে সরস ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। 'আসল কথা রোহিণী। রোহিণীতে প্রাণ পড়িয়াছে—তাই আর কালো ভোমরা ভাল লাগে না। এতকাল ভোমরা ভাল লাগিল কিসে? এতকাল রোহিণী জোটে নাই।...... গোল্লায় যাও। সেই চেষ্টায় আছি। রোহিণী সঙ্গে যাবে কি?' (২৯শ পরিচ্ছেদ।) এখানেও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দলালের কার্য্যের (condemnation) দোষ-ঘোষণা লক্ষণীয়।

ভ্রমরের অভিমান, গোবিন্দলালের অভিমান, কৃষ্ণকান্ত রায়ের অভিমান (উইল-বদল-ব্যাপারে) এই তিনে মিলিয়া কি অনিষ্ট ঘটাইল তাহা আমরা দেখিলাম (যদিও 'আসল কথা রোহিণী'।) আবার গোবিন্দলালের মাতার অভিমান এই অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইল। তিনি পুত্রবধূর উপর অভিমান করিয়া কাশীযাত্রার সঙ্কল্প করিলেন। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ত্যাগ ও দেশত্যাগ করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। ভ্রমর 'মুমূর্ষু অবস্থায় কতকটা লুপ্তবুদ্ধি কতকটা ভ্রান্তচিত্ত' জ্যেষ্ঠ-শ্বশুরের 'অবিধেয় কার্য্যে'র প্রতিবিধান করিয়া স্বামীর রাগ-অভিমান দূর করিবার উদ্দেশ্যে স্বামীর নামে দানপত্র রেজিষ্টারি করিল, গোবিন্দলাল তবুও তাহাকে ক্ষমা করিলেন না, শক্ত শক্ত দু'কথা শুনাইয়া দিলেন, 'ধর্ম্ম নাই কি?' ভ্রমরের এই কঠোর প্রশ্নে 'বুঝি আমার তাও নাই' বলিয়া উত্তর দিলেন। ভ্রমর বলিল, "আবার আসিবে ......আবার আমার জন্য কাঁদিবে।......তুমি আমারই—রোহিণীর নও।" (৩০শ পরিচ্ছেদ।) ইহার সত্যতা উপসংহারে উপলব্ধ হইবে। আপাততঃ 'গোবিন্দলাল চোখ মুছিতে মুছিতে আসিলেন। বালিকার অতি সরল যে প্রীতি .....পাইয়া গোবিন্দলাল সুখী হইয়াছিলেন, গোবিন্দ-লালের এখন তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, যাহা ত্যাগ করিলেন, তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না।' ভ্রমরকে ক্ষমা করিতে 'অনেকবার সে ইচ্ছা হইয়াছিল। ..ইচ্ছা.. হইলেও একটু লজ্জা করিল। ..ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলাল অপরাধী। আবার ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। যাহা হয়, একটা স্থির করিবার বুদ্ধি হইল না। যে পথে যাইতেছেন, সেই পথে চলিলেন।...পথে যাইতে যাইতে রোহিণীর রূপরাশি হৃদয়-মধ্যে ফুটিয়া উঠিল।' * (৩১শ পরিচ্ছেদ।) আবার সেই 'আসল কথা রোহিণী।' এখন নব-অনুরাগ, রূপমোহ দাম্পত্য-প্রীতিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। এই গ্রন্থের সন্ধিস্থলে ভ্রমরের সহিত বন্ধন-চ্ছেদন হইল, সংযমের শেষ গ্রন্থি শিথিল হইল, তাই এইখানে ১ম খণ্ড সমাপ্ত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভ্রমরের কথার সহিত রোহিণীর কথার নিবিড় সংযোগ আছে, সেইজন্য ভ্রমরের কথা বাদ দিয়া রোহিণীর কথা বলা যায় না।

দ্বিতীয় খণ্ডে দেশত্যাগী ও পত্নীত্যাগী গোবিন্দলালের এবং দেশত্যাগিনী ও কুলত্যাগিনী রোহিণীর পূর্ণ অধঃপতনের

---

* গোবিন্দলালের অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক কশাঘাত, 'রূপলোলুপ সুন্দরের দড়বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক' স্মরণ করাইয়া দেয়।

ইতিহাস বিবৃত। প্রথম খণ্ডের একত্রিশটি পরিচ্ছেদের মধ্যে অর্দ্ধেকেরও বেশী রোহিণী-সংক্রান্ত, আরও ২।৪ টিতে রোহিণী ও ভ্রমর উভয়েরই প্রসঙ্গ আছে, তবে প্রধানতঃ ভ্রমরের। প্রথম খণ্ডে রোহিণী গোবিন্দলালের অবৈধ প্রণয়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিবৃত, সুতরাং রোহিণীর কথা অধিক স্থান যুড়িয়া আছে, ইহা আশ্চর্য্য নহে, অযথাও নহে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় খণ্ডের পনেরটি পরিচ্ছেদের মধ্যে সাতটি মাত্র পরিচ্ছেদে রোহিণীর ইতিহাস আছে। আমরা পরে দেখিব, এই অধঃপতনের ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র যথাসাধ্য সংক্ষেপে সারিয়াছেন, 'যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব।' (২য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।) তিনি তাহাদের ব্যভিচারের ফলাও বর্ণনা করেন নাই। ইহা তাঁহার reticenceএর নিদর্শন। হালের কোনও কোনও আখ্যায়িকাকার প্রেমিক-প্রেমিকার ব্যভিচার-জীবনের রোজনামচা পাঠক-পাঠিকার নিকট দাখিল করিয়াছেন, তাহাদিগের সহিত তুলনা করিলে বঙ্কিমচন্দ্র সুরুচি ও সনীতির মর্যাদারক্ষায় কতটা যত্নশীল তাহা বুঝা যায়।

গোবিন্দলাল-রোহিণী অনেকদিন ধরিয়া প্রবৃত্তির সহিত বুঝিয়া শেষে যখন স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন, ভিতরের ও বাহিরের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া মিলিত হইলেন, তখনও তাঁহাদের সুখভোগ-কাল অত্যল্প-পরিমাণ। ২য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, গোবিন্দলাল মাতার সহিত কাশী-যাত্রা করার পর ছয়মাস পর্য্যন্ত তাঁহার সংবাদ পাওয়া গেল, তাহার পর তাঁহার মাতা পর্য্যন্ত তাঁহার সংবাদ পাইলেন না, 'বাবুর অজ্ঞাতবাস' আরম্ভ হইল। অবশ্য রোহিণী তখন তাঁহার সহিত মিলিয়াছে। 'এইরূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেল।' তাহার কিছুদিন পরে ভ্রমরের পিতার ও পিতৃবন্ধুর বুদ্ধি-কৌশলে রোহিণী গোবিন্দলালের হস্তে নিহত হইল। ২য় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, প্রায় দুই বৎসর হইল গোবিন্দলাল ভ্রমরকে দেখেন নাই। ইহার প্রথম ছয় মাস রোহিণী তাহার সহিত মিলিত হয় নাই। ফলতঃ তাহার সুখের স্বপন বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। 'বিষবৃক্ষে' কুন্দর বিধবাবিবাহের অতি অল্পদিন পরেই নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে ত্যাগ করিয়া সূর্য্যমুখীর সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। হীরাও দেবেন্দ্রের সঙ্গ অতি অল্পদিন সম্ভোগ করিয়াছিল। অতএব উভয় আখ্যায়িকা হইতেই বুঝা গেল, বঙ্কিমচন্দ্র, পাপাচার-জনিত সুখের দিন দীর্ঘকালস্থায়ী নহে, অচিরেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বা শাস্তি পাইতে হয়, পরোক্ষভাবে এই সৎ শিক্ষা দিতে প্রয়াসী।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। গোবিন্দলাল-রোহিণীর নিরুদ্দেশ হইবার বৃত্তান্ত আখ্যায়িকাকার ঠিক নিজে হইতে বর্ণনা করেন নাই, ভ্রমর 'গোপনে সর্ব্বদা সংবাদ' লইয়া জানিল—এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাহার পর ভ্রমরের দশা দেখিয়া তাহার পিতা গোবিন্দলাল-রোহিণীর উপর জাতক্রোধ হইয়া সেই 'পামর-পামরী কোথায় আছে' তাহার সন্ধান লইতে ও সন্ধান পাইলে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। সেই সূত্রে আমরা উহাদিগের বৃত্তান্ত জানিতে পারি। ফলতঃ এই বৃত্তান্ত ভ্রমরের যন্ত্রণার ইতিহাসের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত, তাহার যন্ত্রণানিবারণের জন্য অনুসন্ধানের ফলে পাঠকবর্গের গোচরে আনীত। এই জন্যই পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, আখ্যায়িকাদ্বয়ের প্রধান আখ্যান-বস্তু দাম্পত্যপ্রণয়, অপ্রধান আখ্যানবস্তু অবৈধ প্রণয়।

এই খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদ হইতে জানা গেল, রোহিণী রোগের ভান করিয়া শয্যা লইল, পরে 'তারকেশ্বরে হত্যা' দিবার ছলে 'একাই' দেশত্যাগ করিল। অনুমান হয় (স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই) এ ব্যাপারে গোবিন্দলালের সহিত তাহার ষড়যন্ত্র ছিল। এদিকে গোবিন্দলালের সংবাদও 'পাঁচছয় মাস পরে আর পাওয়া গেল না, রোহিণীও আর ফিরিল না।' 'ভ্রমর ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ জানেন, রোহিণী কোথায় গেল। আমার মনের সন্দেহ আমি পাপমুখে ব্যক্ত করিব না।' এক্ষেত্রে আখ্যায়িকাকার স্পষ্টবাক্যে কিছুই বলিলেন না, ভ্রমরের সন্দেহ হইতে অনুমানের ভার পাঠকের উপর দিলেন। ইহাও reticence এর পরিচায়ক। 'পামর-পামরী' যে পাপাচারের উদ্দেশে গোপনে দূরদেশে গেল, ইহা মন্দের ভাল। রোহিণীর 'হত্যা' দিবার ছলটুকু—Hypocrisy is the tribute that Vice pays to Virtue!

(আগামীবারে সমাপ্য)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

কৃষ্ণনগরের মাটির কাজ

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ,]

কৃষ্ণনগরের মাটির কাজ বিলাতেও আদৃত হইয়াছে; এ কাজের কদর এখানে তেমন নাই; এ দেশের লোকে শিল্পের মর্য্যাদা জানে না।

মাটির কাজকে মৃৎশিল্প নামেও অভিহিত করা যায়। সমস্ত শিল্পটীকে ছয়ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে;—(১) প্রতিমা-গঠন (২) প্রতিমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ, (৩) ফল, মাছ প্রভৃতি প্রাকৃতিক জিনিসের প্রতিকৃতি তৈয়ার (৪) সামাজিক ও প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রস্তুত (৫) চিত্রপটের অনুকরণে গ্রাসে ঢাকা, পটে আঁকা মাটির পুতুল, মাটির সাজ গড়ন। (৬) মাটির পাত্রাদি গড়ার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই।

মৃৎশিল্প সম্বন্ধে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ের পূর্ব্বেকার কোন কথা আমাদের জানা নাই। প্রতিমা গড়নের কাজ তাঁর সময়েই বিশেষ উন্নতিলাভ করে (ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত)। তবে পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীরাম পাল নামক একজন কারিগর ছিলেন; তাঁর সময় হইতেই এই শিল্পের ইতিহাস ভালরূপে জানা যায়; এই শ্রীরাম পাল লোকটা ঠিক "সেকেলে বাঙালী"ই ছিলেন;—খুব লম্বা, দোহারা ও সাদাসিদে মানুষ। তাঁর হাতে মাটির কাজের যথেষ্ট উন্নতি হয়। প্যারী প্রদর্শনীতে তাঁর কাজের বিশেষ আদর হইয়াছিল। জনৈক ছোটলাটও তাঁকে খুব উৎসাহ দিয়াছিলেন। সে সময়ে ভিতরে খড়ের কাটাম দিয়া পুতুল গড়ার রীতি ছিল। শ্রীরামের সমসাময়িক চণ্ডী পাল ভিতরে তার দিয়া পুতুল গড়ার নূতন পদ্ধতি বাহির করেন। খড়ের কাটামর পুতুলের পোড় সহে না; কিন্তু তারের কাঠামর পুতুলকে পোড় দিয়া বেশ শক্ত করা চলে। শ্রীরাম পালের আমলে কেহ বরাত দিলে ফলমূলাদি তৈয়ার করা হইত; তবে এখনকার মত সস্তা অথচ পরিপাটি মাটির ফল বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী করিয়া রাখা হইত না। লক্ষ্ণৌ সহরের মাটির ফল রঙের জন্য বিখ্যাত; সেরকম রঙের কারিগরী অল্পই দেখা যায়। লক্ষ্ণৌএর মাটির ফল দেখিয়া কৃষ্ণনগরের কারিগরেরা ফল তৈয়ারীর দিকে বেশী ঝোঁক দেন। বোলপুর ইলামবাজারে গালার ফল তৈয়ারী হয়; তার কারিগরীও মন্দ নয়; সুপারী, লবঙ্গ প্রভৃতি বড়ই মনোহারী।

সাধারণের বিশ্বাস, যদুনাথ পাল হইতেই মূর্ত্তি তৈয়ার হয়; কিন্তু, ঠিক তাহা নয়। যদুনাথ, অবশ্য এ বিষয়ে বড় ওস্তাদ সন্দেহ নাই;—কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বেও কেহ-কেহ মূর্ত্তি তৈয়ার করিতেন। মাটির পট বা পটে আঁটা মাটির পুতুলের একটু নূতনত্ব আছে; এগুলিতে সাধারণতঃ পৌরাণিক চিত্রই থাকে। মাটির সাজ বলিতে লোকে মাটি ও সোণালীতে মণ্ডনের মোটা কাজ বুঝে। কৃষ্ণনগরের ডাকের সাজের নামডাক কম নহে; কিন্তু মাটির সাজের নামডাক আজকাল অনেক বেশী। এ কাজ সুচারু ধরণে করা হয়। মাটির সাজ ডাকের সাজ হইতে হীন তো নয়ই; বরং দেখতে অনেক মনোজ্ঞ ও সুশ্রী; প্রতিমা সাজানতেই উহার ব্যবহার হয়। এই নূতন ধরণের মাটির সাজ তৈয়ার আরম্ভ হইয়াছে বেশী দিন নয়।

সাধারণতঃ কারিগরেরা স্বভাবের অনুকরণ করে। কেবল প্রতিমা নির্ম্মাণে শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী সনাতন পদ্ধতির অধীন হইয়া চলে। বর্ত্তমানে কেহ-কেহ পাশ্চাত্য ধরণে প্রতিমা গড়নের চেষ্টা করিতেছে বটে; কিন্তু তাহার ফল ভাল বলিয়া মনে হয় না।

নূতন কারিগরেরা প্রথমে মাটিতে ছাঁচ তোলা হইতে কাজ শিখিতে আরম্ভ করে। ছোকরা ও বিধবারা সাধারণতঃ ছাঁচের পুতুলই তৈয়ার করে। এগুলি অপেক্ষাকৃত সস্তা। ভাল কাজের মধ্যেও ছাঁচের প্রচলন আছে। ফল তৈয়ার করিতেও ছাঁচ লওয়া হয়। বাষ্ট বা চেহারা প্রথমে মাটিতে গড়া হয়; তাহার পরে প্লাষ্টার দিয়া ছাঁচ লওয়া হয়। শেষে ঐ ছাঁচ থেকে প্লাষ্টার দিয়া বাষ্ট তোলা হয়। ছাঁচ তোলার পূর্ব্বে মাঝে মাঝে ফটো লইয়া মূল ফটো বা চেহারার সঙ্গে মিলাইয়া দেখা হয়; ফটোয় ফটোয় বা ফটোয় চেহারায় মিলিলে পর কাজ নিখুঁত হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়।

পুতুল প্রতিমা বা আর কিছু গড়নের কাজে সাধারণতঃ দেশী মাটি, বিশেষ ভাবে তৈয়ারী মসলা দেওয়া মাটি ও প্যারী প্লাষ্টার ব্যবহার করা হয়। কাজের তারতম্য অনুসারে কাজে ব্যবহৃত মাটির তারতম্য করা হয়। দামী মডেল বা পুতুলেই প্লাষ্টারের ব্যবহার হয়। লক্ষ্ণৌএর কারিগরেরা কেবল রঙফলানতেই কেরামতী দেখায়; কিন্তু কৃষ্ণনগরের কারিগরেরা পুতুলে রঙ ছাড়া চুল, কাপড়, জরী, কাঠ, খড়, ইত্যাদি অন্য জিনিসও ব্যবহার করে। ইহাতে স্বাভাবিক ভাবটা যেন একটু ফুটিয়া উঠে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে দেশী রঙের ব্যবহার ছিল, তাহা প্রায় এখন উঠিয়া যাওয়ার মত। তবে রঙ মিশানর পদ্ধতি সেকেলেই আছে।

কৃষ্ণনগর সহরে ১৫।২০ ঘর কুমার আছে। তাহারা নানা রকমের মাটির কাজ করে। একটা পরিবারের ভিতরেই নানা রকমের কাজ আছে; প্রতিমা নির্ম্মাণের সঙ্গে-সঙ্গে বাষ্ট তৈয়ার বা অন্য পুতুল গড়ানও চলে। একজন পুরুষ দৈনিক ৭।৮ ঘণ্টা খাটিয়া মাসে মোটের উপর ৩০৲ টাকার বেশী পায় না। পূজার সময়ে একজনে দৈনিক ২৲ রোজগার করে; এসময়টাতে সকলেরই বেশ দুপয়সা আসে তা

ছাড়া, বিলাত প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ভাল কারিগরেরা মাঝে-মাঝে বরাত পাইয়া থাকে ; এগুলি উপরি পাওনার মধ্যে। একজন কারিগর দিন সাত আট ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া মাসে ৪ ডজন পুতুল তৈয়ার করতে পারে ; প্রতি ডজন ৮৲ হিসাবে কলিকাতার পাইকারকে দিলে মোটের উপর ৩২৲ আসে। খরচ বাদ দিলে আয় মাসে ২৮৲র বেশী দাঁড়ায় না। পাইকার কলিকাতার বাজারে সাধারণতঃ ১২৲ ডজন হিসাবে পুতুলগুলি বিক্রী করে।

মাটির কাজের অবস্থা ২০ বৎসর পূর্ব্বে বেশ ভালই ছিল। সম্প্রতি সে রকম উৎসাহের অভাবে, এবং দেশব্যাপী অভাবের জন্যও কতকটা, এ কাজে কারিগরদের তেমন সুখ নাই। তাহাদেরও যে দোষ নাই তাহা বলা যায় না। অবস্থা-বৈগুণ্যেই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক, তাহারা সকল সময়ে কথা রাখিয়া কাজ চালাতে পারে না এবং কুমার ভিন্ন অন্য শ্রেণীর লোককে সাধারণতঃ শিখায় না। দুতিনটা কুমার পরিবারের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ হয়। ইহারা মেলায়-মেলায় জিনিস পাঠায়। ইহাতে তাহাদের মাসিক আয় মোটের উপর ৭৫৲ টাকার কাছাকাছি হয়। ঘূর্ণীর একটা দোকান থেকে বৎসরে প্রায় দুইশত টাকার মাল ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়। এটা বেশী কিছু নয়। লোকজন ও মূলধনের অভাবে তাহারা সকল বরাত লইতে পারে না ; অনেক ফেরত দিতে বাধ্য হয়। বোম্বাই, মান্দ্রাজেও মাটির জিনিস বিক্রয়ের জন্য পাঠান হয়। কিন্তু সে রকম ভাল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে বলিয়া মনে হয় না। কারিগরের সেরা যদুনাথ পাল কলিকাতা মিউজিয়মের জন্য আর্য্য ও অনার্য্য শাখার বিভিন্ন রকমের মানুষের চেহারা গড়িয়াছিলেন। সেগুলি ও তাঁর হাতের আরও অনেক কাজ সেখানে আছে। তিনি লর্ড নর্থব্রুকের কাছে বিশেষ উৎসাহ পাইতেন। তাঁহার বয়স এখন প্রায় ৮৫ বৎসর হইল। এখনও তিনি কাজ ছাড়েন নাই ;—তাঁহার ভাইপো বক্কেশ্বরও খুবই ভাল কারিগর। চেহারা গড়া ছাড়া আর সব কাজে বক্কেশ্বরের সমান কেহ নাই। তাঁহার হাতের কাজ দেশ-বিদেশে খ্যাত হইয়াছে। যদুনাথের এক নাতি একজন উদীয়মান শিল্পী।

রামায়ণের যুগের শিক্ষা

[অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-টি]

রামায়ণ ও মহাভারত তদানীন্তন ভারত-সমাজের যেরূপ সজীব ও জলন্ত চিত্র সর্ব্ব-সমক্ষে ধারণ করিয়াছে, তদনুরূপ আলেখ্য জগতের অন্য কোনও কাব্য-গ্রন্থে এ পর্য্যন্ত প্রতিফলিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। যদিও রামায়ণ ও মহাভারতকে খাঁটী ইতিহাস-শ্রেণীর গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা যায় না, তথাপি, খৃষ্টের জন্মের প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতের রাজনৈতিক সামাজিক, সাহিত্যিক ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত অবস্থার উজ্জ্বল চিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া ইহারা প্রকৃত ইতিহাসের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে।

ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণের শিক্ষার বর্ণনাকালে বাল্মীকি যে শিক্ষার আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন, সেই শিক্ষা গ্রীকদের উদার শিক্ষা (Liberal Education) হইতেও অধিকতর উদার-ভাবাপন্ন। শরীর-গঠন, অঙ্গ-সৌষ্ঠব, মানসিক উৎকর্ষ এবং ভাবোন্মেষ গ্রীক শিক্ষা-পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। শারীরিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাহারা নানাপ্রকার বলকারক ব্যায়াম ও ক্রীড়াকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করিয়াছিল ; মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাহারা সাহিত্য, ব্যাকরণ ও দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিত ; ভাব-সম্পদে ও রস-মাধুর্য্যে হৃদয়কে সরস ও সজীব করিয়া তুলিবার জন্য তাহারা কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতি সুকুমার কলার চর্চ্চা করিত। শারীরিক উৎকর্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, হৃদয়ের কোমল ভাবরাশির অভিব্যক্তি-সাধনে অবহেলা প্রদর্শন করিয়া, এবং শুধু মানসিক উন্নতি-বিধানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি প্রাণহীন ও স্পন্দন-রহিত অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়া যে অনুদার ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহার সহিত তুলনা করিতে গেলে, বিশেষতঃ ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের তৎকালীন শিক্ষার অবস্থার বিষয় ভাবিতে গেলে, গ্রীক-শিক্ষাকে উদার শিক্ষা না বলিয়া থাকা যায় না। কিন্তু এই উদার শিক্ষার আদর্শও হিন্দু শিক্ষার আদর্শের নিকট হীনপ্রভ ও মলিন হইয়া পড়ে। গ্রীক শিক্ষা-পদ্ধতির আদর্শ প্রশংসনীয় হইলেও, ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে নাই। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন না করায়, ইহা কখনও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। গ্রীক শিক্ষা-সৌধের মূল ভিত্তি বালুকাময় ভূমির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুন্দর ও সুগঠিত দেহ এবং সুশোভন হৃদয় তাহাদের শিক্ষার মূলমন্ত্র ছিল। নীতি ও ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ইহা কখনও স্থাপিত হয় নাই।

পক্ষান্তরে, ভারতের শিক্ষানীতি ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ আত্মার উৎকর্ষ সাধনকে শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা দেহ, মন বা হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনে পশ্চাদপদ হন নাই। বাল্মীকির মহাকাব্যের নায়কের চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে গেলে, আমরা প্রকৃত ভারতীয় বীরের আদর্শ এবং ভারতীয় শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। প্রকৃত বীর কে ? যিনি শুধু দৈহিক বলে বলীয়ান, অথবা যিনি শুধু ধনুর্ব্বিদ্যায় বা অস্ত্রশস্ত্র-চালনায় পারদর্শী ? না, প্রকৃত বীর তীক্ষ্ণ-ধী-সম্পন্ন হইবেন ; তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ও কাব্যামোদী হইবেন ; তিনি নীতি-পরায়ণ ও শাস্ত্রজ্ঞানী হইবেন, সর্ব্বোপরি তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ও ঈশ্বর-পরায়ণ হইবেন। এইরূপে দেহ, মন, হৃদয় ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনই হিন্দু শিক্ষার চরম আদর্শ। গ্রীক শিক্ষা-পদ্ধতিতে যে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার অভাব পরিলক্ষিত হয়, সেই নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষাই হিন্দু শিক্ষা-পদ্ধতির মূল ভিত্তি। শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ এই ভিত্তিমূলের

উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাই হিন্দু শিক্ষা গ্রীকশিক্ষা অপেক্ষা উদারতর, এ কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

রামচন্দ্র নানাবিধ গুণে বিভূষিত ছিলেন বলিয়া, রাজা দশরথ তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি দেহে অপরিমিত বলবীর্য্য ধারণ করিতেন; তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তি অতি প্রখর ছিল; তাঁহার হৃদয় ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি সদগুণরাজিতে ভূষিত ছিল, তাঁহার চরিত্র বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল ছিল; তিনি দেবদ্বিজে ভক্তি-পরায়ণ ও ধর্ম্মাত্মা ছিলেন।

যে শিক্ষার গুণে দেহ, মন, হৃদয় ও আত্মার এককালে সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষার আদর্শ আমরা রামায়ণে বর্ণিত দেখিতে পাই—

"অঙ্গ প্রতি অঙ্গ তাঁর সুলক্ষণ যুত,
সেই প্রতি অঙ্গে তাঁর শকতি প্রভূত।"

ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, দেহ যাহাতে সুগঠিত ও নীরোগ হয়, তদুদ্দেশ্যে নানাপ্রকার শারীরিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা তৎকালে প্রচলিত ছিল। যে ব্যায়ামের গুণে মানুষ দৃঢ় মাংসপেশী বিশিষ্ট হয়, কিন্তু কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি ধারণ করে, সেই ব্যায়াম বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে পরিচালিত হয় না বলিতে হইবে। কিন্তু রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণ যে সকল শারীরিক ব্যায়ামের চর্চ্চা করিতেন, শুধু শক্তি সঞ্চয় ও মাংসপেশী গঠন উহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না; অঙ্গ-সৌষ্ঠবের দিকেও যথোচিত দৃষ্টি রাখিয়া সে সকল ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা হইত; তাই তখনকার হিন্দুগণ শারীরিক ব্যায়ামের বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী অবগত ছিলেন, এ কথা বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

তার পর রামায়ণে আছে—

"মন্ত্রহীন মন্ত্রযুত অস্ত্র শস্ত্র যত
সকলি শিখিলা রাম হয়ে দৃঢ়ব্রত।" (১)

রামচন্দ্র অস্ত্রশস্ত্র-শিক্ষায়ও পারদর্শী হইয়াছিলেন। ধনুর্ব্বেদ সে সময়ে শিক্ষার অন্যতম বিষয় ছিল। এই ধনুর্ব্বেদ উপবেদের অন্তর্গত। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র এই চারিটী উপবেদ বলিয়া কথিত হইত। প্রবাদ আছে যে, ভগবান্ বিশ্বামিত্র ঋষি ধনুর্ব্বেদ নামক উপবেদের প্রণয়ন করেন। ধনুর্ব্বেদ-বিদ্যা সুপ্রণালীবদ্ধ ভাবে প্রদত্ত হইত। ইহা চারিভাগে বিভক্ত ছিল—দীক্ষাপাদ, সংগ্রহপাদ, সিদ্ধিপাদ এবং প্রয়োগপাদ।

প্রথম ভাগে আয়ুধের লক্ষণ ও ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষার অধিকারীর গুণ বর্ণিত হইয়াছে। আয়ুধগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত, ও যন্ত্রমুক্ত। যে সকল আয়ুধ নিক্ষেপ করা যায়, তাহা মুক্তশ্রেণীর অন্তর্গত—যথা চক্র। ইহাদিগকে চলিত কথায় শস্ত্রও বলে। আর যে সকল আয়ুধ হস্তে ধারণ করিয়া শত্রুকে প্রহার করা হয়, তাহাদিগকে অমুক্ত বলে—যথা খড়্গ; ইহাদিগকে চলিত অস্ত্রও বলে। যে সকল আয়ুধ সাধারণতঃ হাতে রাখা হয়, কিন্তু প্রয়োজন হইলে নিক্ষেপও করা যায়, তাহাদিগকে মুক্তামুক্ত বলে; যথা শল্য। আর যে সকল আয়ুধ যন্ত্রের সাহায্যে নিক্ষেপ করা হয়, তাহাদিগকে যন্ত্রমুক্ত বলে—যথা বাণ। এই সকল নানাশ্রেণীর অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহারের অধিকার ভেদে ক্ষত্রিয়-কুমারদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত—পদাতি, রথী, অশ্বারোহী, গজারূঢ়।

ধনুর্ব্বেদের দ্বিতীয় ভাগে সকল প্রকার শস্ত্রের লক্ষণ, আচার্য্যের লক্ষণ, এবং শস্ত্রগ্রহণের প্রকার দর্শিত হইয়াছে। এজন্য ইহাকে সংগ্রহ-প্রকরণ বলা হয়। তৃতীয় বিভাগে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী আচার্য্যের নিকট লব্ধ বিদ্যার অভ্যাসবিধি এবং সিদ্ধিলাভের উপায় নিরূপিত হইয়াছে; এজন্য ইহাকে সিদ্ধিপাদ বলা হয়। তার পর চতুর্থ ভাগে সিদ্ধাস্ত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে নানা কথা বর্ণিত হইয়াছে; এজন্য ইহাকে প্রয়োগপাদ বলা হয়। (২)

তৎকালোচিত সমর-বিদ্যার এরূপ বিজ্ঞান-সম্মত বিভাগ ও রণ-কৌশল শিক্ষাদানের এরূপ সুব্যবস্থার বিবরণ পাঠ করিয়া, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তখন ধনুর্ব্বেদ এক উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান রূপে (science) আলোচিত হইত। ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় যুদ্ধ-বিদ্যালোচনার এবং সমর-কৌশল-শিক্ষার কোনও বন্দোবস্ত না থাকিলেও, প্রাচীন ভারতে উহার সুব্যবস্থা ছিল। রামায়ণে আছে—

"আরোহে বিনয়েচৈব যুক্তো বারণবাজীনাম্ ॥ ২৮
ধনুর্ব্বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো লোকেঽতিরথঃ সম্মতঃ।
অভিজাতা প্রহর্ত্তা চ সেনানয় বিশারদঃ ॥ ২৯

অর্থাৎ গজ ও অশ্ব আরোহণে এবং পরিচালনে রামচন্দ্র উপযুক্ত ছিলেন। ধনুর্ব্বেদজ্ঞদিগের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে 'অতিরথ' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল। তিনি সেনা পরিচালনে ও ব্যূহ রচনায় দক্ষ ছিলেন; এবং শত্রুর অভিমুখে গমন করিয়া প্রহার করিতে পটু ছিলেন।

রামায়ণের যুগে তৎকালোচিত শারীরিক ব্যায়াম, যুদ্ধবিদ্যা ও রণ-কৌশল (Military Training) শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কিন্তু ভারতবাসীর সেই সুপ্ত শৌর্য্য-বীর্য্য এখনও লুপ্ত হয় নাই। শিক্ষা-প্রভাবে সেই ক্ষাত্রধর্ম্ম সহজেই জাগ্রত করিয়া তোলা যাইতে পারে। বিগত ইয়োরোপীয় মহাসমরে আমরা তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। অতএব বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতে সমর-কৌশল শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে, ভারতের ও ব্রীটনের উভয়ের মঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। শরীরের ন্যায়, মনোবৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধনের প্রতিও তৎকালে সমুচিত মনোযোগ প্রদর্শন করা হইত। স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, বিচার-

(১) ইষ্বস্ত্রে চ পিতুঃ শ্রেষ্ঠঃ বভূব ভরতাগ্রজঃ।

(২) রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণের পদ্যানুবাদের পাদটীকা। ৮৫পৃষ্ঠা

সামর্থ্য, হেতুবাদ-প্রদর্শন-কৌশল—এই সকলেরই অনুশীলন হইত। তার পর কাব্য, নাটক প্রভৃতি রসাত্মক সাহিত্যের, বিহারোপযোগী শিল্পের (গীত, বাদ্য, নৃত্য ইত্যাদি কলা-শিল্পাদি) এবং অর্থ-শাস্ত্রেরও চর্চ্চা হইত।

কিন্তু আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়া, অথবা অর্থ-চিন্তায় মগ্ন হইয়া ভারতবাসিগণ কখনও ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করে নাই। (৩) তাই দেখিতে পাই, রামচন্দ্র এই সকল লৌকিক শাস্ত্রের চর্চ্চায় ব্যাপৃত থাকিলেও, ধর্ম্ম শাস্ত্রালোচনাই তাঁহার প্রথম জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গ, এবং পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র বেদের এই চারিটি উপাঙ্গ, তখন গুরুগৃহে যথা-নিয়মে অধীত হইত। বেদের যে অংশে ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে, সেই উপনিষদ্ ভাগ অতি শ্রদ্ধাসহকারে শিষ্য আচার্য্যের নিকট শিক্ষা করিতেন। (৪)

ইহা ভিন্ন আরও চারিটি উপবেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—যথা আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ এবং অর্থ শাস্ত্র। শিষ্য এই সকল লৌকিক জ্ঞান ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আচার্য্যের নিকট লাভ করিতে পারিতেন না বলিয়া, এগুলি, বোধ হয়, অন্যান্য শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করিতে হইত। রামচন্দ্র গান্ধর্ব্ববেদের বা সঙ্গীত শাস্ত্রের রীতিমত চর্চ্চা করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে এস্থানে পরিষ্কার উল্লেখ নাই। কিন্তু কোমল-বয়স্ক লবকুশকে বাল্মীকি মুনি বীণা সংযোগে সুর করিয়া রামায়ণ গান করিবার যে অদ্ভুত কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং যে শিক্ষার বলে তাঁহারা যজ্ঞক্ষেত্রে শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করিয়াছিল, তাহার সুন্দর বর্ণনা রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাল্মীকি কুশীলবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"কুশীলব, এই লও বীণা সুমধুর,
বীণাযন্ত্রে বাঁধা আছে ষড়জাদি সুর।
মূর্চ্ছনার সনে দোঁহে কণ্ঠ মিলাইয়া,
অক্লেশে গাহিও গান ভাবার্থ বুঝিয়া।"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ, ৯১৮ পৃঃ

পরদিন প্রভাত সময়ে কুশীলব স্নান করিয়া হোমাদি সমাপন করিল; এবং যজ্ঞস্থলে বাল্মীকির প্রদর্শিত স্থানে যাইয়া উভয়ে বীণা বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল।

"অপূর্ব্ব অদ্ভুত পূর্ব্ব-রচিত সঙ্গীত
দ্রুত—মধ্য-বিলম্বিত লয়ে হয় গীত।
বালকণ্ঠে গীতি-কাব্য হয় উচ্চারণ,
তার সনে সুধাস্বনে বীণার বাদন।
সঙ্গীত শ্রবণ আশে রাম সবাকারে
ডাকিলেন, সবে আসি ঘেরিল তাঁহারে
ঋষি, রাজা, বেদবিৎ, তালজ্ঞ, পণ্ডিত,
পৌরাণিক, শব্দবিৎ আইল ত্বরিৎ।
সামুদ্রিক-লক্ষণজ্ঞ, জ্ঞানী, জ্যোতিষিক,
স্বরজ্ঞ, সঙ্গীত শাস্ত্র-নিপুণ, তার্কিক,
যাগ-যজ্ঞ-কার্য্যবিৎ, সদাচারবিৎ,
চিত্রকাব্য-রচয়িতা আইলা ত্বরিৎ।
ব্যাকরণ-রচয়িতা, পুরবাসিগণ,
পৌরাণিক আদি দেখে কৈলা আগমন।"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ ৯১৯ পৃঃ।

এস্থলে প্রসঙ্গ-ক্রমে আরও কতকগুলি বিজ্ঞান-শাখার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সেই-সেই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ এই যজ্ঞসভায় উপস্থিত ছিলেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, সে সময়ে উক্ত শাস্ত্রসমূহ বিশেষ ভাবে আলোচিত হইত। তালজ্ঞ, স্বরজ্ঞ, সঙ্গীত-শাস্ত্র-নিপুণ ব্যক্তির এবং চিত্র-কাব্য রচয়িতার উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে, তখন গীত, বাদ্য, আলেখ্য এবং কাব্য প্রভৃতি সুকুমার শিল্পকলার বেশ আলোচনা হইত।

সুতরাং সঙ্গীত যে তৎকালে শিক্ষার এক অঙ্গ ছিল, তৎসম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আজকাল পাশ্চাত্য সভ্য দেশে সঙ্গীত শিক্ষার বিষয় রূপে গৃহীত হইয়াছে। তদনুকরণে কেহ-কেহ সঙ্গীতকে আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে প্রচলন করিতে ইচ্ছুক। সঙ্গীত ভারতের জাতীয় সম্পদ; সুতরাং ইহার প্রবর্ত্তনে কোনও আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু জাতীয় সম্পদকে বিজাতীয় সাজে সজ্জিত করিয়া আনিলে, দেশের মঙ্গল সম্ভাবনা অপেক্ষা অমঙ্গলের আশঙ্কাই অধিক। তাই জাতীয় পোষাকে আচ্ছাদিত করিয়া, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের আশ্রয় লইয়া, সঙ্গীতকে আবার আমাদের দেশে আনয়ন করিতে হইবে। ধর্ম্ম-সঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীতের সাহায্যে ছাত্রজীবনে ধর্ম্মভাব, সমাজ-সেবা, দেশহিতৈষণা প্রভৃতি উচ্চ ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু ছাত্রদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, তরল আমোদ-প্রমোদ সঙ্গীতের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়।

এখন একবার রামচন্দ্রের নৈতিক শিক্ষার একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার পিতৃভক্তি, তাঁহার ভ্রাতৃস্নেহ, এবং তাঁহার

---

(৩) ধর্ম্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভাবনান্।
লৌকিকে সময়াচারে কৃতকল্পো বিশারদঃ॥ ২২
উত্তরোত্তর যুক্তীনাং বক্তাবাচস্পতির্যথা॥ ১৭
শ্রৈষ্ঠ্যং শাস্ত্রসমূহেষু প্রাপ্তো ব্যামিশ্রয়েষু চ।
অর্থ ধর্ম্মৌচ সংগৃহ্য সুখতন্ত্রো ন চালসঃ॥ ২৭
বৈহারিকাণাং শিল্পানাং বিজ্ঞাতার্থ বিভাগবিৎ। ২৮

(৪) সর্ব্ববিদ্যা ব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ।

প্রজাবাৎসল্য সর্ব্বজনবিদিত। বিনয় ও শিষ্টাচার তাঁহার চরিত্রের প্রধান ভূষণ ছিল। তিনি—

"বুদ্ধিমান্ মধুরভাষী পূর্ব্বভাষী প্রিয়ম্বদঃ। ১৩ শ্লোক।
স চ নিত্যং প্রশান্তাত্মা মৃদু পূর্ব্বং চ ভাষতে।
উচ্যমানোঽপিপরুষং নোত্তরং প্রতিপদ্যতে॥ ১০

কৃতজ্ঞতা তাঁহার চরিত্রের এক বিশেষ গুণ ছিল। কেহ কদাচিত কোনও উপকার করিলে, তিনি পরম সন্তোষ লাভ করিতেন। তিনি ক্ষমাশীল ছিলেন; এবং তাহার উদার হৃদয়ে পরের অনিষ্ট-চিন্তা স্থান পাইত না। কেহ তাহার শতশত অপকার সাধন করিলেও, তিনি নিজ মাহাত্ম্য গুণে তাহা ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেন।

তিনি সত্যবাদী (অনৃত কথক), জিতেন্দ্রিয় ও ভক্তিমান্ (দৃঢ় ভক্তি) ছিলেন। তিনি বয়োবৃদ্ধদের সম্মান করিতেন (বৃদ্ধানাং প্রতিপূজকঃ), দীন-দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেন (দীনানুকম্পী), এবং নিজের দোষ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিতেন (স্বদোষবিৎ)। তিনি ত্যাগী, সংযমী ও ধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। কবির ভাষায়—"সুন্দর চরিত্র তার চিরশুদ্ধিময়।"

চরিত্রগঠন তদানীন্তন শিক্ষার চরম লক্ষ্য ছিল। প্রাচীন ভারত নৈতিক শিক্ষার অতীব সমাদর করিতেন। নীতিহীন অসচ্চরিত্র ব্যক্তি সমাজ-চক্ষে শিক্ষিত নামের অযোগ্য ছিল। যে শিক্ষায় দয়া-মায়া প্রভৃতি হৃদয়ের বৃত্তিসমূহ পরিমার্জ্জিত ও বিকশিত করে না, যে শিক্ষা মনোবৃত্তির উন্মেষ সাধন নিয়াই ব্যস্ত থাকে, তাহা প্রকৃত শিক্ষাপদ-বাচ্য হইতে পারে না। মন ও হৃদয় উভয়ের উন্নতির সামঞ্জস্য বিধানেই শিক্ষার পরিণতি। স্নেহ, প্রীতি, প্রণয় ও ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের ভাব-স্রোত, পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী উত্তীর্ণ করিয়া, সমাজের প্রশান্ত বক্ষে যাহাতে প্রেম-প্রবাহ রূপে প্রবাহিত হইতে পারে, এবং তীরভূমি প্লাবিত করিয়া অবশেষে সেই প্রেমময়ের প্রেম-পারাবারে মিলিত হইতে পারে, সেইরূপ শিক্ষার সাধনাতেই ভারতবাসী তাহার সমস্ত জীবন পাত করিয়াছে। তাহার জীবনের প্রতি আশ্রমে, প্রতি স্তরে সেই এক রাগিনীই বাজিয়াছে, এবং সেই এক সুরই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে—

"জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি ভগবানে,
সকল শিক্ষার সার রাখিও স্মরণে।"

এখন-তখন *

[শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার]

বৈঠকের নিমন্ত্রণ-পত্রে প্রবন্ধের নাম 'এখন-তখন' দেখিয়া শ্রদ্ধেয় বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি হে, আমাদের এই এখন-তখন অবস্থার কথা লিখিবে না কি?" আমি হাসিয়া উত্তর করিয়াছিলাম, "না, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা লিখিবার আমার ক্ষমতা নাই; আর লিখিলেও সেটা বড় করুণ-রসাত্মক হইয়া পড়িবে। বৈঠকে গিয়া কি কান্নাকাটি করা ভাল? না, আমি সে দিক্ মাড়াইব না, অন্য পথে দুই-চারিটা আবোল-তাবোল বকিব।" সে যাহাই হউক—আপনারা কিন্তু স্মরণ রাখিবেন যে, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা খুবই এখন তখন—সেই সমেমিরে ভাব।

এইবার আর গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া একেবারে আসল কথা পাড়া যাউক।

এখন আমার মত অর্ব্বাচীনে প্রবন্ধ বা কবন্ধ পাঠ করিলেও, আপনাদের মত ১০।২০ জন সুধী বিদ্বজ্জন সেই অসংবদ্ধ প্রলাপ শুনিতে আসেন; তখন এরূপ হাস্যজনক বিড়ম্বনা ঘটিতেই পাইত না। তখন বক্তৃতা, গলাবাজী বা প্রবন্ধ পাঠ এ সব কিছুই হইত না। তখন হইত—কথকের মুখে কথকতা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে পুরাণ পাঠ; হইত চণ্ডী-মণ্ডপে রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, রামরসায়ণ, শিবায়ণ, ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থের নিয়মিত পাঠ; পল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সেই পাঠ শুনিত,—বিভোর হইয়া, তন্ময় হইয়া শুনিত; আর ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করিত। তখন দেশ ছিল ভক্তপ্রধান,—এখন দেশ হইয়াছে ভাক্তপ্রধান!

'পোষা পাখী সেকালে পড়িত কৃষ্ণনাম,
মানুষে না বলে এবে হরে কৃষ্ণ রাম।'

তখন কাণা ছেলের নাম রাখা হইত পদ্মলোচন,—মায়ের স্নেহের আধিক্য এতই ছিল; এখন পাষণ্ড ভণ্ডের নাম ভাগবৎভূষণ—কালের এমনই মহিমা!

তখন লোকে দুর্গানাম উচ্চারণ করিয়া শয্যাত্যাগ করিত; বলিত—

'প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ং।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥'

এখন সে সব বালাই গিয়াছে,—সে ভক্তিও নাই, সে বিশ্বাসও নাই। এখন বায়সকুল যেমন প্রাতে কা-কা রব করিয়া উঠে, আমরাও শয্যা হইতে চা-চা করিয়া উঠি। তার পর বাসিমুখে চা-বিস্কুট চলিলে পর, শৌচাদির ব্যবস্থা। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্! আগে জীউ ঠাণ্ডা হউক বা গরম হউক, তার পর দুর্গানাম!

তখন ছিল শয়নে পদ্মনাভের স্মরণ; এখন আমরা শয়নে পদ্মিনী লাভের প্রয়াসী!

তখন পিতা—জন্মদাতা, তিনি ছিলেন মহাগুরু। তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে, সন্তানে মহা শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে 'ঠাকুর' বলিয়া উল্লেখ করিত। কাহারও পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিতে হইলে, লোকে জিজ্ঞাসা করিত, "মহাশয়ের ঠাকুরের নাম?" এখন যদি কেহ ঐরূপ প্রশ্ন করেন, তবে আমরা তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে উত্তর দিই "আজ্ঞে, শ্রীধর, বা বলরাম উড়ে!" শ্রীবিষ্ণু! একটা মহা ভুল করিয়া বসিয়াছি। এখন গৃহ-দেবতা "শ্রীধরই" বা আছেন কৈ? তিনি যদিও

* গত ১৪ই ফাল্গুন, চুঁচুড়া-টাউন-ক্লাব-গৃহে সঙ্গীত ও সাহিত্যের বৈঠকে পঠিত।

বা তাগের ভোগে-একটেরে পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার অস্তিত্ব বা তাঁহার নাম আমাদের কাছে ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত! এখন যে—

'পূজা বিনা উপবাসী পৈতৃক ঠাকুর।
রুটী মাংস খায় সুখে পালিত কুকুর॥'

এখন-সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার যুগে বাবাও,যে আমিও সে—পিতা ও আমি এখন সম-পর্য্যায়ভুক্ত, তুল্য মূল্য। তাই তিনি এখন আমাদের "my dear father! আর "we think our fathers fool so wise we grow"—ইহা শুধু ইংরাজ কবির উক্তি নহে—এখন আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার।

আর মা? তখন জননী,—গর্ভধারিণী,—সাক্ষাৎ ভগবতী, গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। আর এখন তিনি আদরের দুলালের অঙ্কশায়িনীর গৃহ-কর্ম্মে দাসী, রন্ধনশালায় পাচিকা, সূতিকা-গৃহে ধাত্রী। এততেও কিন্তু বুড়ীর উপর বৌমার গঞ্জনা, ভর্ৎসনা ও খোঁটার বিরাম নাই। 'বুড়ী শোক-তাপে-দুর্ব্যবহারে ভাজা-ভাজা হইয়া আছে—মৃত্যু হইলে হাড় জুড়ায়!

তখন আমাদের বাপ-ঠাকুরদাদারা ছিলেন মাতৃ-আজ্ঞাকারী,

"(আর) যে হেতু আমরা পত্নী আজ্ঞাকারী,
প্রাণপণে যোগাই গহনা,
আর বাপ্‌রে! তাঁর রুষ্ট [illegible] চাপে
শুকায় প্রেম-নদীর মোহানা।
(সে যে) মাকে বলে 'বেটী'—হেসে দেই উড়িয়ে,
(তার) পিতৃবংশ নিয়ে আসি সব কুড়িয়ে,
(মোদের) চিনিয়ে দিতে হয়, 'এ মাসী, খুড়ী এ'—
ভুলে প্রণাম করি না পুজো।'

তখন লোকে গুরুজন ও বয়োজ্যেষ্ঠগণকে এতই ভক্তি করিত যে, বাঙ্গালা দেশে 'প্রণাম' ও 'নমস্কার' দু'টা পৃথক শব্দের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। সংস্কৃতে দুইটা শব্দের মানে একই; কিন্তু তখনকার লোকে ভিন্ন অর্থে, ভিন্ন স্থলে প্রয়োগ করিত। তখন তাঁহারা গুরুজনদিগকে প্রণাম করিতেন; ব্রাহ্মণেতর বর্ণের লোকে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিত; আর অন্য সকলে পরস্পর-পরস্পরকে নমস্কার করিত। এখন আমরা অত গোলমালে যাইব কেন? বিজ্ঞান পড়িয়া আমরা ত আর অজ্ঞান নই! আমরা এখন পরস্পর মাথা নাড়া-নাড়ি করি, আর পাঞ্জা লড়া-লড়ি করিয়া থাকি! কোন গোলমাল নাই!

তখন মেয়েরা লেখা-পড়া কম শিখিত,—এখন সকলেই নভেলী বিদুষী। বিবাহ হইলেই প্রবল বিরহ, আর সঙ্গে-সঙ্গে ডাকবিভাগের আয়ের অতিরিক্ত বর্দ্ধন! তখন স্ত্রী ছিলেন সহধর্ম্মিণী, স্বামী ছিলেন পরম গুরু। এখন কেবল চিরুণীতে 'পতি পরমগুরু'—নহিলে এখন আমরা দুয়ে এক—একে দুই—বড় ছোটর ধার ধারি না—উভয়ে ভাই-ভাই! ফলে ঘরে-ঘরে সহোদর ভাইয়ের সঙ্গে ঠাই-ঠাই! এখন পত্রে পতি পত্নীকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করেন, পত্নীও ঠিক সেই সুরে, সেই ভাষায় পতিকে পাঠ লেখেন! এখন আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম পেটপূজা; আর থিয়েটার, বায়স্কোপ ও সার্কাস্ দর্শন। তা সে সব সহধর্ম্মিণীকে লইয়া যুগলে করি বৈ কি। সে সব বিষয়ে কোনরূপ ত্রুটি বা বিচ্যুতি ধরিতে পারিবেন না।

তখন গৃহিণীরা ছিলেন রন্ধনে দ্রৌপদী,—সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মত রন্ধনশালায় বিরাজ করিতেন। এখন,

'খেয়ে বামুনের রান্না ভাই আমার আসে কান্না,
তবু পাকঘরে যান না—
গিন্নীর আগুন ছুঁলেই গোল!'

তখন 'বাবু' বলিলে দেশপ্রসিদ্ধ ভূস্বামী বুঝাইত। তখন—

'হাতে ছড়ি মুখে বিড়ি বুকে চেন ঘড়ি।
পথে ঘাটে না ছিল বাবুর ছড়াছড়ি॥

এখন আপনি, আমি, রামা, শ্যামা, ক্যাবলা, মোদো, আমরা সবাই বাবু! এমন কি শ্রীমতী রেণুকাকে, বাড়ীর দাসী "দিদিবাবু" বলিয়া না ডাকিলে, ভগিনী রেণুকার গণ্ডস্থল রক্তিম হইয়া উঠে—তিনি পা হইতে স্লিপার খুলিয়া দাসীর পৃষ্ঠের সহিত উহার পরিচয় করাইয়া দিতে উদ্যত হন! এখন বাড়ীর কর্ত্তা—ছেলে, মেয়ে, জামাই, ভাগ্নে, দাস দাসী, গোমস্তা মুহুরী—এমন কি গৃহিণীও 'বাবু!' এমন দ্বি-অক্ষরবিশিষ্ট common সম্বোধনের পদ আর দেখিয়াছেন কি? টেরির বহর দিয়া, তাতে গড়ী বাঁধিয়া, হাসি হাসি মুখে ছড়ি ঘুরাইতে-ঘুরাইতে জামাতা বাবাজীবন শ্বশুর গৃহে শুভাগমন করিলেন; বাহির-বাড়ীতে একটা সোর-গোল পড়িয়া গেল: চাকর-বাকরে বলিয়া উঠিল, 'জামাইবাবু আসিয়াছেন।' কর্ত্তা বৈঠকখানা হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কে [illegible] যেদো, ছোট জামাইবাবু বুঝি?' দশমবর্ষীয়া লিলি কর্ত্তার অবিবাহিতা কন্যা,—একটা পাজামা ও ফ্রক পরিয়া, কর্ত্তার পার্শ্বে বসিয়া বিজ্ঞান-রিডার পাঠ করিতেছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া জামাতা-বাবাজীবনের কাছে গিয়া, দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন,—"কি জামাইবাবু, এত দিন পরে আমাদের মনে পড়িল বুঝি,—তবু ভাল!" এখন বাড়ীর জামাই—সকলেরই জামাইবাবু। তখন যাঁহার সহিত যেরূপ সম্পর্ক, তিনি জামাতাকে সেই ভাবে সম্বোধন করিতেন। কর্ত্তা বলিতেন—'বাবাজী'। শ্যালক শ্যালিকারা বলিত—রায় মশাই বা দত্ত মশাই, ইত্যাদি। এখন একটি নব্য যুবাকে যদি তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র 'খুড়া মহাশয়' বলিয়া ডাকে—তবে কেমন শোনায়? আপনাদের কাণেও বাজে না কি? বাবুর বাড়া-বাড়ির দৌলতে ইংরাজী অভিধানে 'বাবু' শব্দ স্থান লাভ করিয়াছে। বাবুর কি মানে লিখিত আছে, একবার দয়া করিয়া শুনুন—"Originally the Hindu title corresponding to our Mr., but often applied disparagingly to a Hindu with a superficial English education etc." ইংরাজী Esquire শব্দে, যাহারা সেকালে নাইটদের সঙ্গে ঢাল বহিয়া লইয়া যাইত, তাহাদিগকে বুঝাইত। Baboo শব্দের উৎপত্তি কি 'Baboon' হইতে? বিশেষজ্ঞগণ ইহার আলোচনা করুন।

তখন পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠগণকে কেহই নাম ধরিয়া ডাকিত না;—

ডোম, দুলে, বাগদি হইলেও তাহাদিগকে দাদা, খুড়া, জ্যেঠা বলিয়া সম্বোধন করিত; সকলকেই নিজের পরিবারভুক্ত মনে করিত। এখন তাহাদের ডাকিব কি,—তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেই যে আমাদের ঘৃণা হয়—আমাদের মর্য্যাদার হানি হয়!

তখন বাড়ীর দাসী ছিল কর্ত্তার ঝি বা কন্যাস্থানীয়া; পাচিকা ছিলেন বামুণ মেয়ে; চাকর ছিল তাঁহার সন্তান। এখন ঝি common noun—সে বাড়ীর ছেলে-বুড়া সকলেরই ঝি বা শুধু 'মানুষ'। পাচিকার স্থান উড়ে বামুণ অধিকার করিয়াছে—সে এখন 'ওরে বেটা উৎকল, ডালে নুন দিস্ নি কেন?' আর প্রাচীন ভৃত্য রামচন্দ্র এখন বাড়ীর সকলেরই রামা বেটা বা সাধারণ বেয়ারা!

তখন ব্রাহ্মণের হইত ফলাহারের নিমন্ত্রণ। ক্রমে সেই ফলাহার 'ফলারে' দাঁড়ায়—

'সরু চিড়ে শুকো দই মর্ত্তমান কাকা খই
খাসা মণ্ডা পাত পোরা হ'ত।'

এখন সে ফলার দেশ থেকে উঠিয়া গিয়াছে। বসাবিমিশ্রিত ঘৃতপক্ক লুচি না হইলে ব্রাহ্মণ-ভোজন হয় না। আর তার সঙ্গে যদি গাড়ীর চালানি পচা মাছের কালিয়া থাকে, তবে ভোজন-দক্ষিণা না দিলেও কৃতির অখ্যাতি হয় না! সম্প্রতি একটি ব্রাহ্মণ-ভোজন উপলক্ষে আমার কোন বন্ধু ফলারের ব্যবস্থা করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টার ফলেই রাস্তায় ছেঁড়া পৈতা জড় হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সত্যই সে ক্ষেত্রে লুচির বদলে চিড়া-দৈর ব্যবস্থা হইলে, বন্ধুবরকে হয় ত পুত্রশোকে কাতর হইতে দেখিতাম!

তখন মুষ্টি-ভিক্ষা দিতে লোকে কাতর হইত না; অনাথ, ফকীর দুই হাত তুলিয়া গৃহস্থকে আশীর্ব্বাদ করিত। এখন সব সময়েই গৃহিণীদের 'হাত জোড়া'। আর আমরা,—

'যদি অনাথ বামুণ হাত পেতে যায়
ঘুসি ধ'রে উঠি তবে।
বলি, গতোর আছে—খেটে খেগে
—তোর পেটের ভার কেটা ববে?'

A set of drones! ইহাদের প্রশ্রয় দেওয়া মহাপাপ!

তখন ছেলে-মেয়েরা মুড়ি, মুড়কি ও মোয়া পাইলেই তুষ্ট হইত। 'ছেলের হাতে মোয়া'—বাঙ্গালায় প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে। এখন কিন্তু ছেলেরা অভিধান দেখিয়া মোয়ার মানে শিখে। এখন ছেলে-মেয়েরা লেবেনচুস্, বিস্কুট, চোকলেট না পাইলে প্রাতঃকালে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটায়! তখন ইন্‌ফেণ্টাইল লিভার ছিল দেশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; এখন সেটা ঘরে ঘরে পুরা মাত্রায় বিজ্ঞাত।

তখন ছেলে-মেয়েরা ছিটের রঙ্গীন দোলাই গায়ে দিয়া শীত কাটাইত। এখনকার বালকেরা দোলাই চোখেই দেখেনি; সেটা গায়ে বস্ত্র, কি দোলনা, তাহাই তাহারা জানে না। এখন জুতা, মোজা, টুপী ও বিলাতী র‍্যাপার না হইলে তাহাদের শীত ভাঙ্গে না। এতেও কিন্তু সর্দ্দি, কাশী, ব্রংকাইটিসের হাত হইতে তাহাদের পরিত্রাণ নাই।

তখন সামান্য অসুখ-বিসুখ হইলে, প্রাচীনা গৃহিণীরাই টোট্‌কা প্রভৃতি মুষ্টিযোগ দিয়া রোগ ভাল করিতেন। এখন সে সব পাট উঠিয়া গিয়াছে। মাদুলী ধারণ করিলে অসুখ সারে, বা তেল-পড়া, জল-পড়ায় রোগ ভাল হয়—এ সব কথা এই বৈজ্ঞানিক যুগে কি করিয়া বিশ্বাস করি বলুন? ও সব ত ঘোর কুসংস্কার—silly superstitions, বা ভদ্রভাবে Logic-এর ভাষায় noncausa, procausa বা বড় জোর কাকতালীয় ন্যায়! ও সব মানিতে গেলে ত আর চলে না! কাজেই মাথা কামড়াইলে ডাক্তারবাবু, রগ টিপটিপ করিলে ডাক্তারবাবু; দিনের মধ্যে ২।৫ বার বেশি হাঁচি হইলে ডাক্তারবাবু, দিদিবাবুর ফিটের জোগাড় হইলে ডাক্তারবাবু। কি হাত উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে ডাক্তারবাবুর আর জলসাবুর শরণ লইতে হয়!

তখন রোগ সারিলে যে দিন রোগী পথ্য করিত, সেইদিন বৈদ্য ঔষধের দাম লইতেন। এখন ডাক্তারবাবু দক্ষিণ হস্তে যখন রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করেন, তখন তাঁহার বামহস্ত গৃহ-স্বামীর দিকে প্রসারিত থাকে। যিশু বলিয়াছেন,—'Let not your left hand know what your right hand is doing.—আমরা বলি Vice versa!

তখন বৈদ্যরাজের বাড়ীর সম্মুখে আবর্জ্জনার মধ্যে রাশিকৃত ঔষধি ও গাছ-গাছড়া পড়িয়া থাকিত; এখন কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীর পার্শ্বে কুইনাইনের ভাঙ্গা শিশি আর আরসেনিকের ফাইল গড়াগড়ি যায়। দেখিলে বেশ বুঝা যায়, কবিরাজ মহাশয়ের নবাবিষ্কৃত 'সর্ব্বজ্বরহর-সিন্ধু'র প্রবল তরঙ্গাঘাতে সেগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

তখন প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকগণ বাড়ীতে কালোয়াত রাখিয়া গান-বাজনার চর্চ্চা করিতেন; পালোয়ান রাখিয়া কুস্তি শিখিতেন; আর ভাল ভাল ঘোড়া রাখিয়া, তাহাদের উপর চড়িয়া গমনাগমন করিতেন। এই সকল ছিল বড় লোকদের ছেলেদের চাল। এখন গান-বাজনার চর্চ্চা ত দেশ থেকে উঠিয়া গিয়াছে। বড়লোকের ছেলে বড়জোর সখ করিয়া ২।১০ দিন সখের থিয়েটার চালান। পালোয়ান দেখিবার ইচ্ছা হইলে, টিকিট কিনিয়া, কলিকাতায় গিয়া, কচিৎ কখন কিকর সিং প্রভৃতির কুস্তি দেখিতে হয়। আর ঘোড়ায় চড়িয়া পৈতৃক প্রাণটা কেন বিঘোরে অপঘাতে নষ্ট করি বলুন? একখানা সাইকেল থাকিলেই ত হইল! কিন্তু একটা মোটর রাখিতে না পারিলে, আর ত ভদ্র-সমাজে মুখ দেখান যায় না! তখন—

'কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ' মাসের পথ,
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ।'

এখন যদি কোন গৌর, প্যাটেল বা বসুজার কল্যাণে কোন রাজ-কুমারকে বিদেশী বধূর পাণিপ্রার্থী হইয়া, সুদূর কাঞ্চিভারাম হইতে বঙ্গদেশে আসিতে হয়, তবে তাঁহার একখানা 1st class return টিকিট কিনিলেই চলিবে, কি বলেন? আহা! বিবাহ করিতে আসিয়া ছয় দিন ঘোড়ার পিঠের উপর বেচারি সুন্দরকে না জানি কত কষ্ট, কত নাকাল‌ই ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এখনকার আর তখনকার বাজার-দরের তুলনা করিতে যাওয়া

বিড়ম্বনা মাত্র—সেটা আমরা সকলেই হাড়ে-হাড়ে বুঝিতেছি। চাল, ডাল, ঘী, নুন তেল—এ সকলের কথা তুলিব না। তরি-তরকারি সম্বন্ধে একটি কথা বলিতেছি। তখন বেগুণ পণ দরে বিক্রয় হইত, এখন সের দরে বিক্রয় হয়। বোধ হয় অচিরে 'ফালা' দিয়া বেচা হইবে—

'তবে ভয় হয় বাহিরয় পাছে মধ্যে কাণা,
সে কারণে বেগুণের ফালা দিতে মানা।'

এই একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

তখন লোকে আতাং করিয়া দেহে তৈল মর্দ্দন করিত। তাহাতে এই গরম দেশে শরীরটা স্নিগ্ধ থাকিত; চর্ম্মরোগ কম হইত। তেলে-জলেই ছিল বাঙ্গালীর দেহ। এখন মাগো! তেল মাখিলে গা চট্‌চট্ করে! কাজেই মেয়ে-পুরুষে আমরা সাবানের সেবক। এখন কোন্ দেশ কি পরিমাণে সভ্য,—কিরূপে স্থির হয় জানেন? বিলাসী ফরাসীর মতে,—যে দেশে যত বেশি সাবান ব্যবহৃত হয়, সেই দেশ তত বেশি সভ্য। বিলাসিতা-বর্জ্জিত জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকের মতে, যে দেশে যত অধিক সাল্‌ফিউরিক এসিড্ খরচ হয়, সেই দেশ তত বেশি সুসভ্য। আর আমাদের গান্ধী মহারাজ বলেন,—ও সব বাজে কথা ছাড়িয়া দাও। যে দেশ যত বেশি আত্মনির্ভরশীল,—যাহাকে অন্ন-বস্ত্রের জন্য, ভাত-কাপড়ের জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হয় না,—সেই দেশই অধিক পরিমাণে সুসভ্য। এমন এক দিন ছিল, যখন আমরা জগতের সম্মুখে সুসভ্য বলিয়া বুক ফুলাইয়া পরিচয় দিতে পারিতাম; এখন তেহি নো দিবসা গতা,—সে দিন আর নাই। এখন যাহাদিগকে পরের কাছে ভিক্ষা মাগিয়া মাতা ও পত্নীর লজ্জা নিবারণ করিতে হয়, তাহারা সাবান ঘষিয়া চিকণ্-চাকন্ হইলেও ঘোর অসভ্য—সভ্যসমাজে তাহাদের মুখ দেখান উচিত নয়।

তখন পুরমহিলারা গায়ে সর, বাসম মাখিতেন। এখন সাবানে তাঁহাদের সব কাজ হয়। আর যদি বলি, তখন মেয়েরা গায়ে খোল মাখিতেন, তাহাতে গায়ের ময়লামাটি পরিষ্কার হইয়া গায়ের ত্বক্ বেশ মসৃণ ও স্নিগ্ধ থাকিত,—তবে বোধ হয় আপনারা আমাকে বহরমপুরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন?

তখন লোকে বিলাসিতার ধার ধারিত না। ঘী, দুধ, মাছ প্রচুর খাইতে পাইত। অশীতিপর বৃদ্ধও ৫।৭ ক্রোশ পথ অনায়াসে হাঁটিয়া যাইত। শরীরে জোর ছিল, মনে তেজ ছিল, চক্ষে জ্যোতিঃ ছিল। বুড়ারা অনেকেই বিনা-চশমায় রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিতেন।

'এখন দশ বছরের ডেঁপো ছেলে চশ্‌মা ধরেছে,
আর টেড়ি নইলে চুলের গোড়ায় যায় না মলয় হাওয়া,
আর রমজান্ চাচার হোটেল ভিন্ন হয় না খাদ্দুর খাওয়া।
চব্বিশ ঘণ্টা চুরুট ভিন্ন প্রাণ করে আইঢাই,
আর এক পেয়ালা গরম চা তো ভোরে উঠেই চাই।'

তখন ঠাকুর-দেবতার নামেই ছেলে-মেয়েদের নাম রাখা হইত। এখন মেয়েরা ইন্দু, কুন্দ, রেণু, বীণা; এবং ডলি, কিটি, লিলিরও অভাব নাই। আর এখন যে আমরা অনেকেই সুবোধ ও সুশীল বালক হইয়াছি, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে আমাদের নগরী তখন বৈষ্ণবপ্রধান ছিল বলিয়া, এখনও স্থানীয় নামের ভিতর তাহার জের চলিয়াছে। তাই আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ক্লাবের সম্পাদক সুবল দাদা, এই বৈঠকের উদ্যোক্তা বলাইভাই, আর বার্ত্তাবহের কর্ণধার নিতাইচাঁদের এখনও দর্শন লাভ করিতেছি। কিন্তু এ সকল সাধারণ সূত্রের ব্যতিক্রম বলিতে হইবে। এখন নিজেদের সেকেলে নাম ও সেকেলে উপাধি পরিবর্ত্তন করিবার ঢেউ উঠিয়াছে। যাঁহার নাম গোবর্দ্ধনচন্দ্র মাইতি—তিনি ত লজ্জায় লোকের কাছে নিজের নাম বলেন না। যদিই বা মুখ নীচু করিয়া, মাথা চুল্‌কাইতে-চুলকাইতে কোন প্রকারে আস্তে-আস্তে কচিৎ কখন নিজের নাম উচ্চারণ করেন,—কিন্তু এমনই কালের মহিমা যে, গোবর্দ্ধনচন্দ্র নামটা শুনিবামাত্রই আমরা যেন তাঁহার গাত্র হইতে উৎকট গোময়—গন্ধ আঘ্রাণ করি;—তাঁহার সহিত আর আলাপ করিতে প্রবৃত্তি হয় না;—নাসিকা বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার সান্নিধ্য ত্যাগ করিতে পারিলে বাঁচিয়া যাই!

একটি মজার কথা বলিব। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ টাকার খাঁক্‌তি,—কর্ত্তারা হাঁড়ি চড়াইয়া বসিয়া আছেন—এ কথা বৈঠকে প্রকাশ করিলে বোধ হয় চাকরীটি খোয়াইতে হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা আজকাল এক বড় মজার নিয়ম করিয়াছেন। এক টাকার ষ্ট্যাম্প কাগজে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এফিডেভিড্ করিয়া এবং ২৫ টাকা ফি বা সেলামি দিয়া কর্ত্তাদের নিকট দরখাস্ত করিলেই, যে কোন ব্যক্তির ইচ্ছামত নিজের নাম বা উপাধি অথবা আগাগোড়া বদল হইয়া যায়! এই ভাবে এখন গোবর্দ্ধনচন্দ্র হইতেছেন সুশীলকুমার,—পরাণকৃষ্ণ হইতেছেন সুকুমার, হরেকৃষ্ণ হইতেছেন অনিলকুমার, আর মাইতি, স্বর্ণকার, সূত্রধর প্রভৃতি দত্ত, দাস ও চৌধুরীতে পরিণত হইতেছে। মেডিক্যাল কলেজের পার্শ্বে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরখানায় বসিয়া প্রায়ই স্বহস্তে হরিধনের 'ধনু' কাটিয়া 'সুন্দর' করিয়া দিতে হয়। তবে কায়েতের কলমেই কাজ হাসিল হয়। ছুরি ধরিতে হয় না!

তখন হাডুডুডু, ধাপ্‌সা, নুনকোট—এই সব খেলাই ছেলেরা খেলিত। আরও যে কত-শত খেলার চলন ছিল, তা এখন আমরা জানিই না। আর এখন বলিতে ভয় হয়,—টাউন ক্লাবের খেলোয়াড়গণ যদি কিছু মনে না করেন, যদি ক্ষমা করেন ত বলি; না নিজের ভাষায় বলিতে সাহসে কুলাইতেছে না—আপনাদের কিকের জোর আমার জানা আছে—কবির কথায় অতি সংক্ষেপে বলিতেছি—

'এখন ফুটবল ভিন্ন হাড় পাকে না—
হয় না কষ্টসহ!'

আর একটি বিষয়ের জন্য তখনকার ভাষায় আপনাদের নিকট আমি ক্ষমাপ্রার্থী, আর এখনকার ভাষায় apology চাহিতেছি। Player-দিগকে খেলোয়াড় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। Playerএর কোন গালভরা সাধু শিষ্ট প্রতিশব্দ আমি জানি না। প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, বিদ্বান, বি-এ পাস বন্ধু-বান্ধবের শরণ লইয়াছিলাম—দেখিলাম পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খ দোষো হি কেবলম্। পণ্ডিতের সবই গুণ, কেবল মূর্খতাই তাঁহার

দোষ। তাঁহাদেরও পুঁজি আমারই মত। সুতরাং এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমার্হ।

কবন্ধের গলা নাই বটে, কিন্তু পা-দু'টা ক্রমেই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর, দীর্ঘতম হইয়া উঠিতেছে। কাজেই আর দুই-চারিটি কথা বলিয়াই 'ইতি' করিব।

কবি বলিয়াছেন,—

'সেকালের মুচি শুচি শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে,
একালে মেথর মান্য পয়সা থাকিলে।'

এই দুই ছত্রেই সেকাল-একাল তুলনার সার কথা বলা হইয়াছে—টিপ্পনীর প্রয়োজন নাই।

আপনারা বলিবেন, 'মহাশয়, আপনার মুখে কি কেবল কতকগুলা একালের নিন্দা শুনিতে বৈঠকে আসিয়াছি? তখনকার কি যা ছিল, সবই ভাল,—আর এখনকার সবই যা-তা? এ কি কথা?' আমি বলি, মহাশয়গণ, চটেন কেন? ভাল-মন্দ তখনও ছিল, এখনও আছে। সব কথা, সব দিক আলোচনা করিবার সময় কৈ? আজ এক তরফা গাইলাম; যদি আমার সৌভাগ্যক্রমে আবার আপনাদের সান্নিধ্য লাভ হয়, তবে নব্য ভায়াদের পক্ষে brief লইয়া ঢালের অপর পার্শ্ব আপনাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিব। আপনাদের আশীর্ব্বাদে এখনও উভয় চক্ষে দেখিতে পাই—এক-চোখো হই নাই। তবুও যদি ভায়ারা নেহাৎ মুখ ভার করিয়া থাকেন, তবে ভারতচন্দ্রের ভাষায় বলি,

'অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি,
ভুজ-পাশে বাঁধি কর দণ্ড।'

য়ুরোপে সংস্কৃত-চর্চ্চা

[শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম্-বি-এ-সি (লণ্ডন)]

আমাদিগের দেশের সংস্কৃত-চর্চ্চা যে কতদিন হইতে য়ুরোপে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। সেই কারণে নিম্নে সংস্কৃত-সাহিত্যবিদ্ য়ুরোপীয়দের ইতিহাস কথঞ্চিত দেওয়া গেল।

১৭।১৮ শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথম দুই-চারিজন পাদ্রী বা দেশ-পর্য্যটক ভারতবর্ষে আগমন করতঃ আমাদের দেশের ভাষায় কিঞ্চিৎ পারদর্শিতা লাভ করেন; এমন কি দুই-চারিখানি গ্রন্থও পাঠ করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদিগের চেষ্টা কিন্তু খুব বেশী ফলবতী হয় নাই। ১৬৫১ খৃঃ আব্রাহাম রজার (Abraham Roger) নামক একজন ওলন্দাজ পাদ্রী উত্তর-মান্দ্রাজে পলিকট্ (Policot) নামক স্থানে বাস করেন। সেই সময়ে তিনি ভারতীয় বৈদিক গ্রন্থের সংবাদ পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করেন; এবং জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক পর্ত্তুগীজ ভাষায় তর্জ্জমা-করা ভর্তৃহরির লিখিত অনেকগুলি বচন পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ১৬৯৯ খৃঃ যেশুট্ ফাদার জোহান্ আর্ণষ্ট হান্ক্শেলডেন্ (Jesuit Father, Johann Ernst Hanxleden) ভারতে আসিয়া মালবদেশে প্রায় ৩০ বৎসর-কাল খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকের কাজ করেন। তিনি ভারতবর্ষের চলিত কথা ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহার লিখিত "Grammatica" সর্ব্বপ্রথম বিদেশী-লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ-পুস্তক বলিয়া আখ্যাত। এই পুস্তকখানি তিনি মুদ্রাঙ্কন পূর্ব্বক প্রকাশিত করেন নাই; কিন্তু Fra Polino de St. Bartholomeo ইহা ব্যবহার করিয়াছিলেন। Fra Polino একজন অষ্ট্রিয়ান্;—তিনি কার্‌মেলাইট্ দলভুক্ত ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম ছিল J. Ph. Wessdin। ইনি ভারত-সাহিত্য-চর্চ্চা খুব সুচারু রূপেই করিয়াছিলেন। ১৭৭৬-১৭৮৯ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি মালব দেশে সমুদ্র-তীরে পাদ্রীর কাজ করিয়া বেড়াইতেন এবং রোম নগরীতে ১৮০৫ খৃঃ ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি দুইখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন; এবং আরও অনেক পুস্তকাদি টীকা-টিপ্পনি সহিত রচনা করেন। ইঁহার লিখিত এবং রোমে ১৭৯২ খৃঃ প্রকাশিত, দুইখানি পুস্তক "Systema Brahmanicum" এবং "Travels in the East Indies" তাঁহার বিদ্যার এবং ভারতীয় ভাষা-চর্চ্চার উজ্জ্বল প্রমাণ স্বরূপ বিদ্যমান। এই পুস্তকগুলিতে হিন্দুধর্ম্মের মূল নীতি বিস্তৃত ভাবে লিখিত ছিল; কিন্তু আজকাল এই গ্রন্থ প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই সময়ে ইংরাজ জাতিও আমাদের দেশের ভাষা ও সাহিত্য-আলোচনায় বিশেষ মনঃ-সংযোগ করেন। Warren Hastings সাহেব ইঁহাদের অগ্রণী। তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে, ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতি যদি সুচারু রূপে রাজত্ব করিতে চাহেন, তাহা হইলে এদেশের ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞাত হইয়া, তাহা মানিয়া চলিতে হইবে। এই কারণে তৎকালীন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঠিক করেন যে, ইংরাজ জজেদের দ্বারা সুচারু রূপে শাসন-কার্য্য চালাইতে হইলে, তাঁহাদিগের সহিত একজন করিয়া শিক্ষিত পণ্ডিত থাকা আবশ্যক, যিনি জজসাহেবকে দেশীয় আইন ও আচার-ব্যবহার সংক্রান্ত কানুন সম্পূর্ণ রূপে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন। Warren Hastings সাহেব যখন বড়লাট পদে নিযুক্ত হন, তখন তিনি অনেকগুলি হিন্দু-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত দ্বারা একখানি বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করান; ইহার নামকরণ হয় "বিবাদার্ণবসেতু"। ইহাতে হিন্দু-শাস্ত্র অনুসারে উত্তরাধিকার-স্বত্ব, বিষয়-অধিকার-স্বত্বসংক্রান্ত আইন-কানুন লিখিত হয়। কিন্তু এই সময়ে এমন কেহ ছিলেন না, যিনি এই গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ করিতে পারেন। কাজে-কাজেই তখনকার ব্যবস্থা অনুসারে ইহাকে চলিত আদালতী ভাষায়—অর্থাৎ পারস্য ভাষায় অনূদিত করা হয়। এই পারস্য ভাষা হইতে Nathaniel Brassey Halhed নামক জনৈক ইংরাজ ইহার ইংরাজি তর্জ্জমা করিয়া দেন। এই পুস্তকখানি ১৭৭৬ খৃঃ East India Company "A Code of Gentoo (১) Law" নাম দিয়া প্রকাশ করেন। ১৭৮৮ খৃঃ Hamburg নামক জর্ম্মাণ নগরে এই পুস্তকখানি জর্ম্মাণ ভাষায় প্রকাশিত হয়।

---

(১) "Gentoo" পর্ত্তুগীজ কথা,—মানে "হিন্দু"।

প্রথম ইংরাজ, যিনি সংস্কৃতভাষার প্রকৃত ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, তাঁহার নাম ছিল Charles Wilkins। ইঁহাকে Warren Hastings সাহেব বিশেষ উৎসাহ দানে কাশীতে পণ্ডিতদিগের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ইহার ফলে তিনি ১৭৮৫ খৃঃ ভগবদ্গীতার ইংরাজি অনুবাদ করেন। প্রকৃতপক্ষে ধরিতে গেলে, ইহাই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজি পুস্তক, যাহা সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি হিতোপদেশ ইংরাজিতে অনুবাদ করেন; এবং ১৭৯৫ খৃঃ মহাভারত হইতে শকুন্তলার গল্প ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। ১৮০৮ খৃঃ ইঁহার সংস্কৃতে লিখিত ব্যাকরণের জন্য বিলাতে সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত হরপ তৈয়ার করা হয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই হরপগুলি তিনি স্বয়ং কাটিয়া এবং কুঁদিয়া তৈয়ার করান। ইনি ভারতীয় অপরাপর ভাষা হইতেও কতকগুলি পুস্তক ইংরাজিতে অনুবাদ করেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের আরও অধিক চর্চ্চা করেন Sir William Jones সাহেব। ইনি ১৭৮৩ খৃঃ Fort Williamএর একজন প্রধান কর্ম্মচারী হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। অনেকগুলি প্রাচ্য ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল; এবং অল্প বয়সে আরব্য ও পারস্য ভাষা হইতে কতকগুলি পুস্তক ইংরাজিতে লেখেন। পূর্ব্বে তাঁহার সংস্কৃত ভাষার অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া, বিশেষ উৎসাহের সহিত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি এখানে আসিবার পর এক বৎসরের মধ্যেই Asiatic Society of Bengal নামক মহাসভা স্থাপন করেন। ১৭৮৯ খৃঃ তিনি মহাকবি কালিদাসের বিখ্যাত শকুন্তলা নাটকের ইংরাজি অনুবাদ করেন। এই পুস্তকখানি Forster কর্ত্তৃক ১৮৯১ খৃঃ জর্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদিত হয়। ইহার এত আদর হইয়াছিল যে, বিখ্যাত জর্ম্মাণ কবি গেটে (Goethe) ও হার্ডার (Herder) সাহেবও ইহার উপাসক হইয়াছিলেন। ১৭৯২ খৃঃ তিনি মহাকবি কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্য কলিকাতায় সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করেন। তিনি ১৭৯৪ খৃঃ "Institute of Hindu Law or the Ordinances of Manu" নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থ মনুসংহিতা হইতে ইংরাজিতে লেখেন। Wiemer নামক জর্ম্মাণ সহরে ইহার জর্ম্মাণ অনুবাদ ১৭৯৭ খৃঃ প্রকাশিত হয়। ইনিই প্রথমে জগতে প্রচার করেন যে, গ্রীক ও লাটিন্ ভাষা সংস্কৃতের বংশধর; আরও বলেন যে, জর্ম্মাণ, কেল্ট ও পারস্য ভাষাও সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। তিনি আমাদের পৌরাণিক দেব-দেবীর সহিত রোমান ও গ্রীক দেব-দেবীর সামঞ্জস্য প্রচার করেন।

এই সময়ে, ১৭৮২ খৃঃ Thomas Colebrooke নামক ষোড়শ বৎসর বয়স্ক একটী ইংরাজ বালক কলিকাতায় East India Companyর অধীনে কার্য্য করিতেন। তাঁহার কর্ম্মের প্রথম ১১ বৎসর তিনি আমাদের দেশের ভাষা, সাহিত্য বা সংস্কৃত শিক্ষা করিবার কোনই প্রয়াস পান নাই। কিন্তু যখন ১৭৯৪ খৃঃ Jones সাহেবের মৃত্যু হয়, তখন হইতেই তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন; এবং সংস্কৃত হইতে ইংরাজিতে কতকগুলি হিন্দু-আইনপুস্তক লিখেন। তাঁহার একখানি পুস্তক "A Digest of Hindu Law of Contracts and Successions" ১৭৯৭-৯৮ খৃঃ প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানি বৃহৎ বৃহৎ চারি খণ্ডে বিভক্ত। এই সময় হইতে তাঁহার সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিবার উৎসাহ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়; এবং তিনি Jones সাহেবের ন্যায় কেবল সংস্কৃত কাব্যের আলোচনা না করিয়া, সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিজ্ঞান-পুস্তকেরও আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। এইজন্য তাঁহার দ্বারা আমরা সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত হিন্দু-আইনপুস্তক, পুরাণ, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব এবং গণিত-শাস্ত্রেরও পুস্তক সকল আলোচিত ও প্রকাশিত হইতে দেখি। ১৮০৫ খৃঃ ইনি হিন্দুদের বেদ সংক্রান্ত অনেকগুলি গবেষণা পত্র ছাপান। ১৭৭৮ খৃঃ ফরাসী ভাষায় ও ১৭৭৯ খৃঃ জর্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত একখানি নকল যজুর্ব্বেদ পাদ্রী Robert de Nobilibus য়ুরোপে প্রচার করেন। এই ফরাসী পুস্তকখানি কোন ক্রমে বিখ্যাত ফরাসী কবি ও দার্শনিক Voltaireএর হাতে যাইয়া পৌঁছে; এবং তিনি ঐ পুস্তকখানি Paris নগরীর Royal Libraryতে উপহার প্রদান করেন। কিন্তু Sonnerat নামক জনৈক ফরাসী প্রমাণ করেন যে, ঐ পুস্তকখানি কোন রকমেই আসল যজুর্ব্বেদের অনুবাদ নহে; উহা কেবল একখানি নকল বা জাল পুস্তক মাত্র। Colebrooke সাহেব বিখ্যাত অমরকোষ ও অপরাপর সংস্কৃত অভিধান, পাণিনির ব্যাকরণ, হিতোপদেশের গল্প সকল এবং কিরাতার্জ্জুনীয় পুস্তক সম্পাদিত করেন। তাঁহার স্বরচিত একখানি ব্যাকরণ ছিল; এবং অনেকগুলি পুরাতন পুঁথিও তিনি ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কতকগুলি সংস্কৃত পুঁথি বিলাতে লইয়া যান; এবং সে গুলি তৎকালীন East India Companyকে উপহার প্রদান করেন। এই পুঁথিগুলি আজিও ভারত-সচিবের আফিসের পুস্তকাগারে অতি যত্নের সহিত সংরক্ষিত আছে।

খৃষ্টীয় ১৮ শ শতাব্দীর শেষ ভাগে Jones এবং Colebrooke সাহেবের ন্যায় আরও একজন ইংরাজ ভারতবর্ষে যত্নের সহিত সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার নাম ছিল Alexander Hamilton। তিনি ১৮০২ খৃঃ য়ুরোপে প্রত্যাবর্ত্তনকালে প্যারী নগরীতে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ে একটী ঘটনা ঘটে, যাহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল,—কিন্তু যাহার জন্য আজ সমগ্র য়ুরোপে আমাদের সংস্কৃতভাষার এত সুখ্যাতি প্রচারিত হইয়াছে। য়ুরোপে সেই সময়ে নেপোলিয়নের সহিত সমগ্র য়ুরোপীয় জাতির মহাসমর চলিতেছিল; কিন্তু যে সময়ে Hamilton সাহেব প্যারী নগরীতে গমন করেন, সে সময়ে কিছু দিনের জন্য Amiensএ ফরাসী ও ইংরাজ জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপন হয় (Peace of Amiens)। এই শান্তি কোনক্রমে হঠাৎ ভঙ্গ হওয়ায়, নেপোলিয়ন্ আজ্ঞা প্রচার করেন যে, ফরাসী দেশে যত বিদেশীয় আছে, তাহারা কেহই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে না।

Hamilton সাহেবও, অদৃষ্ট-দোষেই বলুন বা অদৃষ্ট-গুণেই বলুন, প্যারী নগরীতে আটক পড়িলেন। এই সময়ে প্যারী নগরীতে বিখ্যাত জর্ম্মাণ কবি Friedrich Schlegelও আটক ছিলেন। সেই সময় য়ুরোপে শকুন্তলা নাটক ফরাসী ও জর্ম্মাণ ভাষায় প্রকাশিত হইতেছিল; Schlegel সাহেবরা দুই ভ্রাতা ছিলেন; এবং তাঁহারা নিজ দেশে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্ত খুব আন্দোলন করিতেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের সাহিত্যের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন; এবং ইহাও প্রচার করিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা না করিলে, অপর ভাষা শিক্ষা করা বৃথা। কিন্তু তখন জর্ম্মাণীতে কেবল দুই-একখানি অনুবাদিত সংস্কৃত পুস্তক ভিন্ন আর বিশেষ কোনও পুস্তক ছিল না। তাঁহার সহিত Hamilton সাহেবের আলাপ পরিচয় হইলে, তিনি আগ্রহের সহিত সংস্কৃতভাষার চর্চা আরম্ভ করেন। তিনি কেবল মাত্র দুই বৎসর কাল (১৮০৩-৪) Hamilton সাহেবের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি প্যারী নগরীর বিখ্যাত পুস্তকাগার হইতে সংস্কৃত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে ঐ পুস্তকাগারে ২০০ শত সংস্কৃত ও ভারতবর্ষের পুস্তক ছিল। তিনি Hamilton সাহেবের লিখিত অনেক সংস্কৃত পুস্তকের ইংরাজি টীকা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন; এবং ১৮০৮ খৃঃ তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক "On the language and the wisdom of the Indians; a contribution to the foundation of the knowledge of antiquity" প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের মধ্যে রামায়ণ, ভগবদ্গীতা, মনুসংহিতা ও মহাভারত হইতে শকুন্তলা উপাখ্যানও লিখিত ছিল। ইহাই সংস্কৃত হইতে জর্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদিত প্রথম পুস্তক; কারণ, ইহার অগ্রে জর্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদিত যে সকল সংস্কৃত পুস্তক ছিল, তাহা প্রায়ই অপরাপর য়ুরোপীয় ভাষা হইতে অনুবাদিত মাত্র।

যদিও Friedrich Schlegel জার্ম্মাণীতে সংস্কৃত শিক্ষার একটা ঢেউ তুলিয়া দিয়া যান, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা August. W. Schlegelই বিশেষরূপে ইহার প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি তৎকাল-প্রচলিত যাবতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদিত করিয়াছিলেন; এবং এই কারণে ১৮১৮ খৃঃ বিখ্যাত Boun বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনিও অধ্যাপক হইবার পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতার ন্যায় প্যারী নগরীতে তৎকালীন বিখ্যাত ফরাসী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত A. L. Chezy সাহেবের নিকটে সংস্কৃত শিক্ষা ও আলোচনা করেন। এই Chezy সাহেবও Cellege de Franceএর প্রথম সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন; এবং তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত পুস্তক সম্পাদিত ও অনুবাদিত করেন। ১৮২৩ খৃঃ August Schlegel সম্পাদিত "The Indian Library" নামক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে বিশেষ রূপে সংস্কৃতভাষা-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। এই বৎসরেই তিনি ভগবদ্গীতা Latin ভাষায় টীকা সমেত প্রকাশ করেন এবং ১৮২৯ খৃঃ তাঁহার সম্পাদিত রামায়ণের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ গ্রন্থ ঐরূপ অসম্পূর্ণ ভাবেই রহিয়া গিয়াছে।

August Schlegel সাহেবের সমসাময়িক এবং অধ্যাপক Chezyর ছাত্র Eranz Bopp নামক জনৈক জর্ম্মাণও ১৮১২ খৃঃ প্যারী নগরীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন। Schlegel সাহেব সংস্কৃতভাষাটাকে কেবল পদ্যের ও কাব্যের দিক হইতে আলোচনা করিয়াছিলেন, Bopp সাহেব কিন্তু তদ্বিপরীত ভাবে ইহাকে গদ্যের দিক হইতে আলোচনা করিয়াছিলেন। ১৮১৬ খৃঃ তাঁহার প্রবন্ধ Conjugation System of the Sanskrit languages in comparison with that of Greek, Latin, Persian, and German languages" প্রকাশিত হইলে, য়ুরোপের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার একটা নবযুগ উপস্থিত হয়। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, এবং বেদ হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিয়া, সংস্কৃত ভাষায় শব্দ ও ধাতুরূপ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখেন। মহাভারত হইতে নলদময়ন্তী উপাখ্যান লিখিয়া তাহা Latin ভাষায় লিখিত টীকা সমাবেশে প্রকাশ করেন। তাহার রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণ ১৮৩১, ১৮৩২, ও ১৮৩৪ খৃঃ প্রকাশিত হয়; এবং তাঁহার রচিত "Glossarium Sanscritum." নামক অভিধান য়ুরোপে সংস্কৃত শিক্ষা করিবার পথ সহজ ও সুগম করিয়া দেয়।

ইহার পর হইতে য়ুরোপে সংস্কৃতভাষার আদর এত অধিক হইতে লাগিল যে, জগদ্বিখ্যাত জর্ম্মাণ পণ্ডিত W. Humboldt সাহেবও ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তিনি ১৮২১ খৃঃ Schlegel সাহেবের নিকটে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে চাহিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশের ইংরাজি তর্জ্জমা করিয়া দেওয়া গেল, "that without sound grounding in the study of Sanskrit not the least progress could be made either in the knowledge of languages nor in that class of history which is connected with it." Schlegel সাহেবের সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পড়িয়া Humboldt সাহেব ইহার ভিতরকার দার্শনিকতা পাঠে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধু Gentz সাহেবকে ১৮২৭ খৃঃ এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, it is the most profound and loftiest yet seen by the world" অর্থাৎ জগতে ইহা অপেক্ষা কোনো মহৎ ও উচ্চ ভাব এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। তিনি আরও লিখিয়াছিলেন যে, "When I read the Indian poem for the first time and ever since then my sentiment was one of perpetual gratitude for my luck which had kept me still alive to be able to be acquainted with this book"—অর্থাৎ "ভারতবর্ষের এই কাব্য পুস্তকখানি আমি যখন প্রথমে পাঠ করি, তখন নিজেকে মনে-মনে ধন্য মনে করিয়াছিলাম যে, আমার অদৃষ্ট কি সুপ্রসন্ন! এই পুস্তকখানি পড়িবার জন্য আমি আজিও জীবিত আছি।"

Friedrich Ruckert নামক একজন জর্ম্মাণ সাহিত্যিক ভারতবর্ষের মধুর গদ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ইনি অনেকগুলি মধুর সংস্কৃত কবিতা জর্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদ করিয়া স্বদেশে ধন্য হইয়াছেন।

১৮৩৯ খৃঃ পর্য্যন্ত কেবলই য়ুরোপে পৌরাণিক সংস্কৃতের আলোচনা হইত। তৎকালে কেবল শকুন্তলা নাটক, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মনুসংহিতা, ভর্তৃহরির বচন, হিতোপদেশ ও কতকগুলি ছোট-ছোট পৌরাণিক গল্প ভিন্ন আর কিছুই কেহ পড়িতেন না বা কিছুরই আলোচনাও করিতেন না। তখন ভারতবর্ষের যাহা আদি সংস্কৃত পুস্তক অর্থাৎ বেদগ্রন্থ, তাহা আদৌ আলোচিত হয় নাই। এমন কি, তৎকালে কেহই সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থাদির খবরও রাখিতেন না। বেদ সম্বন্ধে তখন যাহা কিছু জানা ছিল, তাহা কেবল উপনিষদ্ মাত্র। উপনিষদ্ গ্রন্থগুলি সম্রাট আওরঙ্গজেব বাদশাহের ভ্রাতা দারা শেকো কর্ত্তৃক পারস্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। ১৯শ শতাব্দী প্রথম ভাগে ফরাসী সাহিত্যিক Anquetil Duprrow এই উপনিষদের পারস্য তর্জ্জমা হইতে Latin তর্জ্জমা করিয়া—"Upnekhat" নাম দিয়া প্রকাশ করেন। যদিও এই অনুবাদে অনেক ভ্রম আছে, তথাপি ইহা পড়িয়া জর্ম্মাণ দার্শনিক Schelling ও Schoepenhauer বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা পড়িয়াই Schoepenhauer বলিয়াছিলেন যে, ইহা মানব-জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ (The issue of supreme human wisdom")। যখন জর্ম্মাণ দেশে বিখ্যাত দার্শনিক Schoepenhauer সাহেব উপনিষদের চর্চ্চা করিতেছিলেন, সেই সময়ে বাঙ্গালাদেশে আমাদের রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়। এই মহাপুরুষই য়ুরোপের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সহিত আমাদের হিন্দুধর্ম্ম, বিশ্বাস সংযোজিত করিয়া এক নব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন, যাহা পরে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নামে প্রচারিত হয়। ইনিই উপনিষদ্ পাঠ করিয়া সর্ব্ব প্রথম লক্ষ্য করেন যে, আমাদের বৈদিক ধর্ম্মে সম্পূর্ণ একেশ্বরবাদিত্ব রহিয়াছে; অতএব ভারতবাসীরা কেন খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইবে? তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মত প্রচার করিতে লাগিলেন; এবং সকল লোককে বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বলিলেন। ১৮১৬ ও ১৮১৯ খৃঃ তিনি অনেকগুলি উপনিষদ্ ইংরাজিতে অনুবাদ করেন; এবং কতকগুলি সংস্কৃতেও সম্পাদিত করিয়া প্রকাশ করেন।

কিন্তু রীতিমত বেদের চর্চ্চা প্রকৃতপক্ষে ১৮৩৮ খৃঃ সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত হয়। Friedrich Rosen নামক জনৈক জর্ম্মাণ সর্ব্বপ্রথমে ১৮৩৮ খৃঃ ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ড কলিকাতায় প্রকাশিত করেন; কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। Eugene Burnouf নামক College de Franceএর বিখ্যাত সংস্কৃত অধ্যাপক এই সময়ে কতকগুলি ছাত্রকে বেদ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করেন; তাঁহার ছাত্রেরাই ভবিষ্যতে সংস্কৃত বেদগুলির বিশদ রূপে আলোচনা করেন। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে অধ্যাপক Burnouf সাহেবই য়ুরোপে বেদ পাঠের প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহার একজন ছাত্র Rudolph Roth ১৮৪৬ খৃঃ একটী প্রবন্ধ লেখেন "Essay on the literature and history of the Vedas"; এবং তিনিই জর্ম্মাণ দেশে সর্ব্বপ্রথম বেদ-শিক্ষার গোড়া-পত্তন করেন। অধ্যাপক Burnouf সাহেবের আর একজন সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্র ছিলেন; ইঁহার নাম আমাদের কাহারও নিকট অপরিচিত নহে। ইনিই F. Max Muller। Max-Muller সাহেব তাঁহার ফরাসী অধ্যাপকের নিকট কেবল বেদপাঠ করিতেন এবং তাঁহারই প্ররোচনায় সায়নের টীকা সমেত ঋগ্বেদের শ্লোকগুলি সম্পূর্ণ রূপে সম্পাদিত করিয়াছিলেন। এই বিশাল পুস্তক ধারাবাহিক ক্রমে ১৮৪৯—১৮৭৬ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহার আবার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৯০-৯২ খৃঃ পুনঃ প্রচারিত হয়। কিন্তু ইহা প্রকাশিত হইবার আগেই, Thomas Aufrecht নামক জনৈক জর্ম্মাণ পণ্ডিত ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে ঋগ্বেদের সম্পূর্ণ শ্লোকগুলি সম্পাদিত করেন।

Eugene Burnouf সাহেব যে কেবলই বেদের সংস্কার করিয়াছিলেন তাহা নহে; তিনি ঐ সময় পালি ভাষারও অনেক উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে অনেক বৌদ্ধ পুস্তকেরও উদ্ধার সাধন করেন। তিনি Christion Lassenএর সহিত ১৮৮৬ খৃঃ "Eassai gur le Pali" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; এবং ১৮৪৪ খৃঃ একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করেন নাম—"Introduction a l' histoire de Bouddhisune Indien"।

Otto Bohtlink এবং Rudolph Roth রচিত সুবৃহৎ সংস্কৃত অভিধান য়ুরোপে সংস্কৃত শিক্ষা এবং আলোচনার একটা বিশেষ শক্তি প্রদান করে। এই পুস্তকখানি St. Petergburg অর্থাৎ আধুনিক Petrograd নগরে Academy of Science দ্বারা প্রকাশিত হয়। ১৮৫২ খৃঃ ইহার প্রথম অংশ প্রকাশিত হয় এবং সুবৃহৎ পুস্তকখানি বৃহদাকারে সাত খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

য়ুরোপে সংস্কৃত চর্চ্চা কিরূপ ভাবে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তাহা পাঠকগণ এইবারে বুঝিতে পারিবেন। ১৮৩৯ খৃঃ St. Petersburg সহরে Friedrich Adelung লিখিত 'Literature of the Sanskrit Language নামক পুস্তকে ৩৫০ খানি বিভিন্ন সংস্কৃত পুস্তকের তালিকা দেন। ১৮৫২ খৃঃ A. Weber সাহেবের "History of Indian Literature" নামক পুস্তকে আমরা মোট ৫০০ পাঁচশত পুস্তকের তালিকা দেখিতে পাই। Theodore Aufrecht সঙ্কলিত "Catalogus Catalogorum" পুস্তকে ভারতীয় প্রায় যাবতীয় পুস্তক ও পুঁথির তালিকা পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানি তিনি ৪০ বৎসর ধরিয়া লেখেন; এবং উহা ধারাবাহিক ভাবে ১৮৯১, ১৮৯৬ এবং ১৯০৩ খৃঃ প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে কয়েক হাজার পুস্তকের তালিকা আছে। কিন্তু ঐ তালিকাগুলিতে সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন পুস্তকের তালিকা নাই, এমন কি, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কোন বৌদ্ধ পুস্তকের তালিকা নাই।

আজকাল পুস্তকের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে সামান্য দুই একজন লেখকের দ্বারা তাহা আর সঙ্কলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আধুনিক বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ জর্ম্মাণ পণ্ডিত George Buhler সাহেব ১৮৯৭ খৃঃ হইতে "Grundriss" নামক সুবৃহৎ বিশ্বকোষ প্রকাশ

করিতেছিলেন। এই পুস্তকে কেবল ভারতীয় আর্য্যজাতির ভাষা-তত্ত্ব ও পুরা-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের সমষ্টি থাকিবে। ইহা লিখিবার জন্য জর্ম্মাণি, ইংলণ্ড, হলাণ্ড, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ হইতে ৩০জন ছাত্র তাঁহাকে সহায়তা করিতে গিয়াছিলেন। Buhler সাহেবের মৃত্যুর পর এক্ষণে ঐ সকল ছাত্রেরা Kiebhorn সাহেবের নিকট কার্য্য করিতেছেন। এই পুস্তক প্রকাশিত হইলে জগতের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের অদ্বিতীয় বিশ্বকোষ হইবে এবং সমগ্র জগতে ভারতের যশঃ ঘোষণা করিবে। এই অল্প সময়ের মধ্যে য়ুরোপে সংস্কৃত চর্চ্চা যত অধিক বিস্তৃত হইয়াছে, অন্য কোন ভাষা বা সাহিত্যের ততটা বিস্তৃতি হয় নাই।

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

অষ্টষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

চীৎকার করিয়া ডাকিয়া, কাঁদিয়া নবীন দাস যখন নিরস্ত হইল, তখন পঞ্জাবী বণিক্ সভাচন্দ্ আম্রবৃক্ষের অন্তরাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া মসজিদের সম্মুখে দাঁড়াইল। অনেকক্ষণ চীৎকার করিয়া বৃদ্ধ নবীনের বোধ হয় তন্দ্রা আসিয়াছিল; কারণ সে সভাচন্দের পদশব্দ শুনিতে পাইল না। সবা মসজিদের নিকটে গিয়া ধীরে-ধীরে ডাকিল, "জিন্ সাহেব!" তাহার কণ্ঠস্বর কর্ণগত হইবামাত্র, নবীন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি আসিয়াছ! আমি আরও দুইটা আশ্রফি—"। সভাচন্দ্ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "জিন্ সাহেব, তোমার চাল আমীরী; তবে জিনের কথা কি না, সেইজন্য ভয় হয় যে, দুয়ার খুলিয়া দিলে, হয় ত তোমার সঙ্গে-সঙ্গে আশ্রফিগুলাও হাওয়া হইয়া উড়িয়া যাইবে। তুমি এক কাজ কর,—বাকী আশ্রফিগুলা দুয়ারের তলা দিয়া অর্দ্ধেক গলাইয়া দাও,—আমি এক হাতে চাপিয়া ধরি, আর এক হাতে দুয়ার খুলিয়া দিই।"

নবীন দুয়ারের নিম্নে চারিটা আশ্রফি রাখিল; তাহা দেখিয়া সভাচন্দ্ দুয়ার খুলিয়া দিল। প্রৌঢ় মুক্তি পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। সভাচন্দ্ তাহাতে বিরক্ত না হইয়া, মোহরগুলি লইয়া প্রস্থান করিল। নবীন মনে-মনে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সন্ন্যাসিনী যখন তাহাকে বন্দী করিয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই কোন উপায়ে তাহার বন্দিনী দুইটিকে মুক্তি দিয়াছে। সে যখন উদ্যানের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, তখন সরস্বতী বৈষ্ণবী আহার শেষ করিয়া তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছে; সুতরাং উদ্যান জনশূন্য। নবীন দুই চারিবার সরস্বতীর নাম ধরিয়া ডাকিল; এবং উত্তর না পাইয়া, উদ্যানের চারিদিকে তাহার সন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। সরস্বতীকে খুঁজিয়া না পাইয়া, তাহার দৃঢ় ধারণা হইল যে, বৈষ্ণবীও সন্ন্যাসিনীর সহিত যোগ দিয়াছে। তখন সে পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইল। তখন অন্ধকার ঘন হইয়াছে,—পথে লোকজন নাই। নবীন অনেকক্ষণ চলিয়াও কাহারই দেখা পাইল না, কিন্তু সে হতাশাস না হইয়া একমনে চলিতে আরম্ভ করিল।

সরস্বতী ততক্ষণ গ্রামে গিয়া মণ্ডলের নিকট নিজের দুঃখের কাহিনী বলিতেছিল। গ্রামের মণ্ডল প্রাচীন ব্যক্তি,—সে সরস্বতীর কথা মন দিয়াই শুনিতেছিল; কারণ, সরস্বতী তাহাকে জানাইয়াছিল যে, সে বাঙ্গালাদেশের কাননগোই হরনারায়ণ রায়ের ভ্রাতৃবধূকে দেশে লইয়া যাইতে পাটনায় আসিয়াছিল। পথে হরনারায়ণ রায়ের বিশ্বাসঘাতক আমলা নবীন দাস কানুনগোইএর ভ্রাতৃবধূ ও তাঁহার ভগিনীকে হরণ করিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহারা দিনের বেলায় এই গ্রামের সীমায় এক উদ্যানে রন্ধন করিতেছিল। সরস্বতী যখন বাজার করিতে গিয়াছিল, সেই অবসরে নবীন দাস স্ত্রীলোক দুইটিকে লইয়া পলাইয়াছে।

মণ্ডল ভাবিল, সুবা বাঙ্গালার কানুনগোইএর ভ্রাতৃবধূকে যদি সে উদ্ধার করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার বরাত ফিরিয়া যাইবে। বকশিশ্ ত পাইবেই; তাহার উপর নবাব সরকারে তাহার নাম জাহির হইবে। হয় ত কিছু নিষ্কর ইনামও মিলিতে পারে। এই আশায় বৃদ্ধ মণ্ডল লোক

সংগ্রহ করিয়া নবীন দাসের সন্ধানে বাহির হইল। গ্রামের বিশ পঁচিশজন জোয়ান লাঠী লইয়া, মশাল জ্বালিয়া গ্রাম হইতে বাহির হইল।

ইত্যবসরে নবীন দাস পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে গিয়া মণ্ডলকে আপনার দুঃখ নিবেদন করিল। সে জানাইল যে, সে নবীন দাস, সুবা বাঙ্গালার কানুনগোই প্রবল পরাক্রান্ত হরনারায়ণ রায়ের অতি বিশ্বস্ত পুরাতন কর্ম্মচারী। সে সরস্বতী বৈষ্ণবী নাম্নী এক পুরাতন দাসীর সহিত প্রভুর ভ্রাতৃবধূকে দেশে লইয়া যাইতে পাটনায় আসিয়াছিল। দাসীটি পুরাতন হইলেও দুশ্চরিত্রা এবং নিমকহারাম। দেশে ফিরিবার পথে আজ তাহারা এই গ্রামের সীমায় মধ্যাহ্নভোজনের জন্য এক উদ্যানে আশ্রয় লইয়াছিল। সে যখন বাজার করিতে গিয়াছে, তখন অবসর বুঝিয়া বিশ্বাসঘাতিনী দাসী সরস্বতী বৈষ্ণবী তাহার মনিবের ভ্রাতৃবধূ এবং তাহার ভগিনীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। গ্রামান্তরে সরস্বতী মধুর মিনতির সহিত চক্ষুর জল মিশাইয়া গ্রামের মণ্ডলকে যেমন বশীভূত করিয়াছিল, নবীন দাস তাহা পারিল না; সুতরাং তাহার কিছু অর্থব্যয় হইল। শিকার হস্তচ্যুত হয় দেখিয়া, পূর্ত্ত নররুন্দর দুই হাতে আশরফি ছড়াইতে আরম্ভ করিল; সুতরাং অবিলম্বে সেই গ্রামের মণ্ডলও লাঠী এবং মশাল লইয়া দুর্গা ঠাকুরাণী ও তাঁহার ভ্রাতৃবধূর সন্ধানে বাহির হইল।

উভয় গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দুই দলের সাক্ষাৎ হইল। পূর্ব্ব হইতেই উভয় গ্রামের লোকদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না; সুতরাং সাক্ষাৎমাত্র বচসা আরম্ভ হইয়া গেল। এমন সময়ে মশালের আলোকে নবীন ও সরস্বতী পরস্পরকে দেখিতে পাইল। উভয়ে উভয়কে দেখাইয়া দিয়া উভয় দলে বিষম যুদ্ধ বাধাইয়া দিল। দুই-চারিজন মরিল; বংশ-যষ্টির আঘাতে দুই চারিজন আহত হইল; অবশেষে নবীনের দল পরাজিত হইল। নবীন পলাইয়া বাঁচিল।

সমস্ত রাত্রি সরস্বতীর দলের লোক দুর্গা ও বড়বধূর সন্ধানে ফিরিল; কিন্তু তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাইল না। ঊষাকালে সরস্বতী সদলে গ্রামে ফিরিল। নবীন তখন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া, দূরে এক বৃক্ষশাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সে বৃক্ষের আর এক শাখায় আর একজন মানুষ আশ্রয় লইয়াছিল। নবীন তাহাকে দেখিতে পায় নাই বটে, কিন্তু সে নবীনকে দেখিতে পাইয়াছে। সে নবীনকে বৃক্ষে আরোহণ করিতে দেখিয়া মনে ভাবিল যে, আগন্তুক তাহারই সন্ধানে আসিয়াছে; কিন্তু নবীন অপর শাখায় উঠিল দেখিয়া, সে ধীরে-ধীরে বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিল।

তখন পূর্ব্বে ঊষার শুভ্রজ্যোতিঃ দেখা দিয়াছে; কিন্তু বৃক্ষতলে অন্ধকার গাঢ়। সেই অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া, সে ব্যক্তি বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরের তলে আশ্রয় লইয়া ক্রমে দূরে সরিয়া গেল। সে যখন প্রথম বৃক্ষ হইতে সহস্র হস্ত দূরে গিয়াছে, তখন সহসা তাহার পদস্খলন হইল। সে অনুভবে বুঝিতে পারিল যে, নরদেহে আঘাত লাগিয়াই তাহার পতন হইয়াছে। তখন সে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া দেখিল, দেহে প্রাণ আছে কি না। দেহ তখনও উষ্ণ দেখিয়া, সে নিকটের এক গর্ত্ত হইতে তাহার বস্ত্রাঞ্চল ভিজাইয়া জল আনিল; এবং অচেতন মানবের মুখে জলসিঞ্চন করিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। যাহার দেহে আঘাত লাগিয়া আগন্তুকের পদস্খলন হইয়াছিল, সে পুরুষ। অল্পক্ষণ পরেই তাহার চেতনা ফিরিল এবং সে উঠিয়া বসিল। তখন ঊষার আলোকে অন্ধকার প্রায় দূর হইয়াছে। আগন্তুক অপরের পরিচ্ছদ দেখিয়া বিস্মিত হইল। নিকটে দ্বিতীয় ব্যক্তির উষ্ণীষ পড়িয়া ছিল,—তাহাতে একখানা হীরকখচিত কলগী সংযুক্ত। ঊষার আলোকে তাহা যেন জ্বলিয়া উঠিল। সুস্থ হইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধু, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ; সুতরাং তুমি নিশ্চয়ই বন্ধু! আমার আর একটি উপকার করিতে পার?" আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল?" "আমার পোষাকের পরিবর্ত্তে তোমার পোষাকগুলা আমাকে দিতে পার?" আগন্তুক বিস্মিত হইল; কারণ, তাহার পরিচ্ছদ জরাজীর্ণ, ছিন্ন ও মলিন; এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিচ্ছদ বহুমূল্য রেশম-নির্ম্মিত ও মুক্তাখচিত। সহসা আগন্তুক অপরকে চিনিতে পারিল; এবং তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিল, "জনাব, আপনি মনিব, আমি তাঁবেদার। অন্ধকারে প্রথমে চিনিতে পারি নাই। আমার নাম সভাচন্দ্, আমি জাতিতে বণিয়া—আপনার পিতার কারকুণ।" ফরীদ খাঁ হাসিয়া কহিল, "ভাল কথা সভাচন্দ্, তবে আমার হুকুম তামিল কর। তোমার পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে আমার পরিচ্ছদ গ্রহণ

কর।" সভাচন্দ্ বিনীত ভাবে কহিল, "জনাব, আমি অতি দীন; আমার এই জীর্ণ, মলিন পোষাক কি আপনার যোগ্য? নিকটেই আপনার পিতার জায়গীর আছে; আপনি একপ্রহর কাল সেখানে বিশ্রাম করুন,—আমি ঘোড়া লইয়া দেখিতে-দেখিতে পাটনা হইতে এলবাস্, পোষাক, সওয়ারী সমস্তই আনিয়া হাজির করিতেছি।" ফরীদ খাঁ পুনরায় কহিলেন, "কিছুই প্রয়োজন নাই,—তুমি হুকুম তামিল কর।" সভাচন্দ্ তখন ফরীদ খাঁর সহিত বেশ-পরিবর্তন করিল। অবশেষে ফরীদ খাঁ মুক্তার মালা হীরার কণ্ঠী ও অঙ্গুরীয়ক সভাচন্দের হস্তে দিয়া কহিলেন, "তোমার সহিত যে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ কথা কাহাকেও জানাইও না। কেবল যদি পিতা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বলিও যে, আমি বাদশাহের সহিত যুদ্ধে চলিয়াছি; যুদ্ধ শেষ হইলে ফিরিব।" সভয়ে যুক্তকর সভাচন্দ্ কহিল, "যো হুকুম।" ফরীদ খাঁ বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন; কিন্তু দুই-চারি পদ গিয়াই ফিরিয়া আসিলেন, এবং সভাচন্দ্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সভাচন্দ্, তুমি মণিয়া বাইকে জান?" সভাচন্দ্ কহিল, "জানি।" "তিনি যদি তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বলিও যে, ফরীদ খাঁ মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে,—সাক্ষাৎ না হইলে ফিরিবে না।

একোনসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

গঙ্গাতীর জনশূন্য। বিস্তৃত, শুভ্র, শুষ্ক সৈকত ঝিল্লীরবে মুখরিত। তীরে জীর্ণ ঘাটের সোপানের উপরে বসিয়া এক তরুণী একমনে মাল্য-রচনা করিতেছিল। অদূরে গ্রামে কোন ধনি-গৃহে রৌসনচৌকী বাজিতেছিল। মধ্যে-মধ্যে তাহার শব্দ আসিয়া যুবতীকে অন্যমনস্ক করিয়া তুলিতেছিল। তখন দিবসের দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে,—শুষ্ক তপ্ত, সৈকত জনশূন্য। বাদ্যধ্বনি শুনিয়া তরুণী মধ্যে-মধ্যে বিরক্ত হইয়া মাল্য-রচনা বন্ধ করিতেছিল; আবার তখনই ক্ষিপ্রহস্তে রাশিরাশি করবী সূত্রে গাঁথিতেছিল।

অদূরে একটা কুকুর প্রহৃত হইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া তরুণী অত্যন্ত বিরক্ত হইল; এবং সূত্র ও সূচী দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া উঠিল। গ্রামের দিক হইতে পরিপূর্ণ থালা লইয়া এক প্রৌঢ়া রমণী আসিতেছিলেন; তরুণী বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কুকুরকে মারিলে কেন কাকি মা?" প্রৌঢ়া কহিলেন, "না মারিলে ছুঁইয়া দেয় যে মা!" "দিলেই বা?" "ও আমার পোড়াকপাল! তোমাকে বুঝাইব কি করিয়া মা? কুকুরের ছোঁয়া কি খাইতে আছে?" এই সময়ে লোষ্ট্রাহত কুকুরটা তরুণীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া সে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া সাদর সম্ভাষণ করিল। কুকুর লাঙ্গুল চালনা করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল। প্রৌঢ়া এই অবসরে দেখিতে পাইলেন যে, ঘাটের উপরে রাশিরাশি করবী ও সেফালী পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৈলর জন্য মালা গাঁথিতেছিল বুঝি মা?" তরুণী কুপিতা হইয়া কহিল, "শৈলর জন্য গাঁথিব কেন,—আমার নিজের জন্য গাঁথিতেছি।" "কেন, তোমার মালা কি হইবে মা?" প্রশ্ন শুনিয়া সহসা তরুণীর সুন্দর মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে মস্তকে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া কহিল, "আজি যে তিনি আসিবেন।" প্রৌঢ়া দুঃখের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "তোমার কপালে আর তিনি আসিয়াছেন! এত দুঃখও ছিল তোমার বরাতে? সতী মা, ফুলগুলা নষ্ট করিও না,—মালা গাঁথিয়া শৈলকে দিয়া এস।" তরুণী প্রৌঢ়ার কথা শুনিয়া রাগিল; এবং মস্তকের বস্ত্র ফেলিয়া দিয়া কহিল, "শৈলকে দিব কেন? তাহার বিবাহের দিন দিব।" প্রৌঢ়া হাসিয়া কহিলেন, "রাগিস কেন মা, আজি ত শৈলের বিবাহ।" "কখ্খনো না।" "পাগলী, অমন অলক্ষণে কথা বলিতে নাই। ঐ শোন্, নহবৎ, রৌসনচৌকী বাজিতেছে।" "তা' হোক, শৈলের বিয়ে আজ হবে না। কাকি মা,—ঐ দেখ পশ্চিমে মেঘ উঠেছে,—ঐ দেখ ঝড় উঠিল,—ঐ দেখ নৌকা ডুবিল,—বর, বরযাত্রী সব ডুবিয়া গেল।—" "থাম্, থাম্, ও সতী, অমন কথা মুখে আনিতে নাই। পাগলী বলে কি গো! হরি রক্ষা কর,—হরি রক্ষা কর। আমি যাই বাছা,—মরিতে তোকে ফুলের কথা বলিতে গিয়াছিলাম।" "কাকি মা, যেও না,—ঐ যে দেখছ সাদা বালির রাশি, এখনই জলে ভরে যাবে,—ঐ অশ্বথ্ তলায় বরের নৌকা শত খণ্ড হয়ে আছড়ে পড়বে—"

প্রৌঢ়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। পলায়ন কালে কুকুরটা তাঁহাকে ছুঁইয়া দিল; তিনি তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। তরুণী পুনরায় মালা গাঁথিতে বসিল। বাদ্য থামিয়া গেল,—গ্রামে কোলাহল বাড়িতে লাগিল। একটা, দুইটা, তিনটা করিয়া ক্রমে অনেকগুলি মালা গাঁথা হইল।

তখন সুকোমল, শুভ্র বাহুতে শুভ্র পুষ্পস্রজঃ সাজাইয়া লইয়া সুন্দরী গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিল।

গ্রামে একখানা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের সম্মুখে বসিয়া এক প্রৌঢ় হুঁকা লইয়া আহারান্তে তামাকু সেবন করিতেছিলেন। তরুণী তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াইল; এবং মস্তকের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া ডাকিল, "বাবা!" বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "কেন মা?" লজ্জাবনতমুখী কন্যা কহিল, "বাবা আজ যে তিনি আসিবেন।" পিতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কে মা?" অবনত বদনে পদনখ দ্বারা মৃত্তিকাখনন করিতে-করিতে কন্যা কহিল, "তোমার জামাই।" কন্যার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ হুঁকা নামাইয়া রাখিয়াছিলেন; এইবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহা আবার উঠাইয়া লইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কন্যা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, জেলে ডাকিয়া আনিব?" অন্যমনস্ক বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "জেলে কি হইবে মা?" "কেন মাছ ধরিবে,—অনেক লোক আসিবে।" "অনেক লোক, কোথা হইতে আসিবে?" "কেন, তাঁহার সঙ্গে!" বিশ্বনাথ মুখ ফিরাইয়া লইয়া দ্বিতীয়বার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কন্যা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "জেলে ডাকিব?" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এস।"

কন্যা সানন্দে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বিশ্বনাথের পত্নী তখন আহারান্তে গৃহের সম্মুখে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। কন্যা তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, জেলে ডাকিতে যাইব কি?" কন্যার শুষ্ক, রুক্ষ কেশগুচ্ছ কপাল হইতে সরাইয়া দিয়া, মাতা সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা?" "আজ যে তিনি আসিবেন।" "তিনি কে?" আদরিণী কন্যা অভিমানে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কেন, তোমার জামাই!" মাতার নয়নদ্বয় অশ্রুজলে অন্ধ হইয়া গেল। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "ঘরে মাছ আছে।" "তাহাতে হইবে না,—তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক আসিবে মা।" মাতার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি চিরদুঃখিনী কন্যাকে বুকে চাপিয়া লইয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন কন্যা মাতার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া কহিল, "মা, লোকে বলে আমি পাগল; কিন্তু আমি ত পাগল নই। তুমি কখনও আমাকে মিথ্যা কথা বলিতে শুনিয়াছ?" রুদ্ধকণ্ঠে মাতা কহিলেন, "না মা।" "তবে শুন মা, মন দিয়া শুন—তিনি ফিরিয়াছেন, সঙ্গে অনেক ভদ্রলোক আছে, তাঁহারা সকলেই নৌকায় আসিতেছেন। সকলেই ব্রাহ্মণ, কেবল একজন কায়স্থ। সন্ধ্যার আগে ঝড় উঠিবে। শ্মশানে যে আমার সহিত কথা কহে, সে বলিয়া দিয়াছে। সে কে, তাহা আমি জানি না। তাহাকে কখনও দেখি নাই; কিন্তু সে নিত্য আমার সহিত কথা কহে,—নিত্য আশ্বাস দেয়,—নিত্য তাঁহার সংবাদ দেয়,—আর তাহার কথা কখনও মিথ্যা হয় না। মা, আমি সতী মায়ের সতী মেয়ে! দেখিও, আমার কথাও মিথ্যা হইবে না। তিনি আসিবেন, নিশ্চয় আসিবেন; অনেক ভদ্রলোক আসিবে, এখন হইতে আয়োজন কর।"

সহসা বিশ্বনাথের পত্নীর দেহ-মধ্যে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইল। তিনি চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "কি আয়োজন করিব বল মা?" "তবে জেলে ডাকিয়া আনি। তুমি দুধের যোগাড় কর,—আর ফল পাড়াইয়া রাখ।" পত্নী পতিকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বিশ্বনাথ আসিয়া সমস্ত শুনিলেন; গৃহিণী বিষণ্ণ-বদনে কহিলেন, "দেখ, সত্য-সত্যই সতী আমার কখনই মিথ্যা কহে নাই। সে বরাবর বলিয়া আসিয়াছে যে, জামাই আসিবে,—শীঘ্র আসিবে। কিন্তু আজ আসিবে, এ কথা সে কখনও বলে নাই। যদি তাহার কথা মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে দুইটা মাছ, দশটা নারিকেল, আর বড় জোর দশ সের দুধ নষ্ট হইবে। এই নষ্ট করিয়া সতী আমার যদি আমোদ পায়, তাহাতে তুমি বাধা দিও না।" বিশ্বনাথ বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "তবে তাহাই হউক।"

মাছ আসিল, দুধ আসিল। সতী একা বিশজনের আহারের আয়োজন করিল। পাড়ার লোকে বলিল, "পাগলের কথায় চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীশুদ্ধ পাগল হইয়াছে।" আয়োজন শেষ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে, সতী যখন মাতাকে রুক্ষ কেশে তৈল দিতে আহ্বান করিল, তখন ঘন কাল মেঘে আকাশ আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে।

সতীর কেশ-বিন্যাস শেষ হইবার পূর্ব্বে ঝড় উঠিল। শতবর্ষ পরেও বাঙ্গালা দেশের লোকে সেদিনের ঝড়ের কথা বিস্মৃত হয় নাই। বায়ুর বেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইল। বিবাহ-মণ্ডপ উড়িয়া গেল। নহবৎখানা ভূমিসাৎ হইল। বড়-বড় গাছ পড়িয়া গ্রামের পথ-ঘাট ভরিয়া গেল। মিত্র-গৃহে সেদিন কন্যার বিবাহ। সন্ধ্যাকালে ঝড়ের বেগ যখন

সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, তখন মিত্র-গৃহে হাহাকার উঠিল। তাহা শুনিয়া সতী হাসিল।

বিবাহের প্রথম লগ্ন পণ্ড হইয়া গেল; কারণ, বর নৌকায় আসিতেছিল,—তখনও আসিয়া পৌঁছিল না। রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হইবার পূর্ব্বে গ্রামের অর্দ্ধেক গৃহ ভূমিসাৎ হইল। দলে-দলে দরিদ্র, গৃহহীন, নিরাশ্রয় গ্রামবাসী ধনি-গৃহে আসিয়া আশ্রয় লইল। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর গৃহও ভরিয়া গেল। গৃহস্বামী বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "সতী মায়ের আয়োজন বৃথা হইবে না। তাহার স্বামী আসুক না আসুক, পুত্র-কন্যায় গৃহ ভরিয়া গিয়াছে।"

দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে, সতী তাহার বিবাহের বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া, শুভ্র পুষ্পের মালাদাম হস্তে লইয়া, পিতামাতাকে প্রণাম করিল। মাতা ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছ মা?" সতী প্রসন্নবদনে কহিল, "তিনি আসিয়াছেন,—আমি তাঁহাকে আনিতে যাইতেছি।" সতীর মাতা আপত্তি করিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু কোথা হইতে একটা অদৃশ্য শক্তি আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিল। সতী যাত্রা করিল।

সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

চারিদিকে ঘন অন্ধকার। প্রবল বায়ুর শব্দে অন্য শব্দ কর্ণগোচর হয় না। ভগ্ন শাখা ও পর্ণশালার আচ্ছাদনে সঙ্কীর্ণ গ্রামপথ রুদ্ধপ্রায়। তরুণী সতী একাকিনী নিশীথ রাত্রিতে সেই পথ অতিবাহন করিয়া ভাগীরথী-তীরে আসিল। দিবসের শুক্ল বেলা অন্তর্হিত হইয়াছে। নক্ষত্র-বীচি-খচিত প্রশান্ত জাহ্নবীবক্ষঃ উত্তাল তরঙ্গ-মালায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নদীর জল বায়ুর তাড়নায় সোপানশ্রেণীর পাদমূলে আছাড়িয়া পড়িতেছে। সহসা বিদ্যুতের উজ্জ্বল শিখায় চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পরেই ভীষণ নাদে একটা বজ্র তরুশিরে আঘাত করিল। কিঞ্চিন্মাত্র ভীতা না হইয়া তরুণী সোপানের উপরে দাঁড়াইয়া রহিল।

আবার বিদ্যুৎ চমকিল। আকাশ যেন সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। তাহার আলোকে সতী দেখিল, একখানা নৌকা বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। আলোক নির্ব্বাপিত হইল, কিন্তু অন্ধকারে তরুণী দেখিতে পাইল যে, দৈত্যের ন্যায় প্রকাণ্ড একটা তরঙ্গ নৌকা ঊর্দ্ধে উঠাইয়া পুনরায় গভীর জলে নিক্ষেপ করিল। বৃহৎ নৌকা সশব্দে চূর্ণ হইয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। তরুণী কম্পিতা হইল। তখন তাহার ইচ্ছা হইতেছিল যে, সে ছুটিয়া গিয়া সেই উত্তাল তরঙ্গমালা হইতে তাহার বাঞ্ছিতকে রক্ষা করে। কিন্তু যে অদৃশ্য হস্ত গৃহ পরিত্যাগ কালে তাহার মাতাকে বাধা দিতে দেয় নাই, সেই অদৃশ্য হস্ত তখন তাহাকে দৃঢ়-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিল,—তরুণী নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষণকাল পরে তরঙ্গমালা দুই-একটা মৃতদেহ ও বহু কাষ্ঠখণ্ড তীরে ফেলিয়া দিয়া গেল। সতীর তখনও ইচ্ছা হইতেছিল যে, সে দেহগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখে; কিন্তু তাহাকে কে আসিয়া বলিয়া গেল, "এ সে নয়।" সতী নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমে বায়ুর বেগ মন্দ হইল; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। তরুণীর পরিধেয় বস্ত্র বাহিয়া স্রোত বহিতে আরম্ভ করিল। তখন দূরে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুত হইল। তাহার হৃদয় সহসা নাচিয়া উঠিল। কে আসিয়া তাহার কর্ণমূলে বলিয়া গেল, "এ-ই সে-ই।" সতী দ্রুতপদে শব্দের দিকে অগ্রসর হইল।

একসঙ্গে তিনজন মানুষ আসিতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি কিছুই দেখিতে পাইতেছ না?" দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "মহাশয়, অনেকক্ষণ ধরিয়াই ত অন্ধকার দেখিতেছি।" প্রথম ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি রায়জী, স্থানটা চিনিতে পারিলে না?" তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, "কেমন করিয়া চিনিব?" "ঐ দেখ গঙ্গার ঘাট, অদূরে পুষ্করিণী, তাহার জীর্ণ ঘাটে একটা শৃগাল দাঁড়াইয়া আছে। গ্রামে আলোক নাই; বোধ হয় অনেক ঘর পড়িয়া গিয়াছে।" এই সময়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি কি সত্য-সত্যই এ সমস্ত দেখিতে পাইতেছেন?" "তোমার কি মনে হইতেছে সুদর্শন?" "আমার মনে হইতেছে, সমস্তই ভোজবাজী।" "ভোজবাজী নহে সুদর্শন! বহু বৎসর অন্ধকারই দেখিয়া আসিয়াছি; সেই জন্য এখন দিবালোকে দেখিতে পাই না। আমার চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে।"

দূর হইতে শেষ কথা সতীর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল।

নারী প্রকৃতি

সে শব্দ-স্পর্শে তরুণীর অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। সে গদগদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্ধকারে দেখ, তুমি কে?" তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনুষ্যত্রয় স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সুদর্শন অসীমের বাহু আকর্ষণ করিয়া কহিল, "ওরে, এও বুঝি অন্ধকারে দেখে! দুর্গা, দুর্গা, কালী, কালী, রাম রাম।" অসীম ভীত হন নাই বটে, কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট উত্তর না পাইয়া, সুদর্শন প্রথম বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, ব্যাপার কঠিন; বোধ হয় নিকটে শ্মশান আছে!" তখন তরুণী দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিল, "অন্ধকারে দেখ, তুমি কে?" প্রথম বক্তা দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" বলিয়াই বক্তা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। সঙ্গে-সঙ্গে ভীতি-বিহ্বল সুদর্শন সজ্ঞানে ধরা-শয্যা গ্রহণ করিল। তখন রমণী তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিল, "অন্ধকারে দেখ, তুমি কে?" অসীম তখন অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। তিনি তাঁহার প্রথম সঙ্গীর অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া বুঝিলেন যে, তাহার চেতনা অপহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় সঙ্গীর অঙ্গস্পর্শ করিবামাত্র, সে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। অসীম বুঝিলেন, সুদর্শন অচেতন হয় নাই। তখন তিনি রমণীর উদ্দেশে কহিলেন, "মা, আমরা মানুষ, তোমার কোন ভয় নাই। আমরা পথ হারাইয়াছি। তুমি যদি পার, আমাদিগের নিকটে আইস।"

তরুণী নিকটে আসিয়া অসীমকে কহিল, "বাবা, কাল তোমার বিবাহ। নিকটে মৃতদেহ পড়িয়া আছে, স্পর্শ করিও না।" মৃতদেহের নাম শুনিবামাত্র সুদর্শন বিকট চীৎকার করিয়া এক লম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন তরুণী আরও নিকটে আসিয়া মূর্চ্ছিত ব্যক্তির পদপ্রান্তে প্রণাম করিল। বিদ্যুতের আলোকে অসীম দেখিলেন, তরুণী সুন্দরী, পূর্ণ যুবতী, বিবাহের বেশে সজ্জিতা। সতী তখন মূর্চ্ছিত ব্যক্তির পদ-প্রান্তে মাল্য-সম্ভার রাখিতেছিল। অসীম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে মা?" উত্তর হইল, "আমি সতী।" "এই দুর্য্যোগে নিশীথ রাত্রিতে কোথায় চলিয়াছ মা?" "স্বামীর নিকটে।" "তোমার স্বামী কোথায়?" সতী মূর্চ্ছিত ত্রিবিক্রমকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, "বাবা, ইনিই আমার স্বামী।"

তখনও প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়িতেছিল। বৃষ্টির জল মুখে পড়িয়া ত্রিবিক্রমের চেতনা ফিরাইয়া আনিল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। তখন সতী তাঁহাকে দ্বিতীয়বার প্রণাম করিল। তাহা দেখিয়া ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" উত্তর হইল, "আমি সতী।" "তুমি তবে আমার নিয়তি?" "তাহা বলিতে পারি না। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে শ্মশানে গেলে, সে আমার সহিত কথা বলে; কিন্তু আমি তাহাকে কখনও দেখি নাই।" "তিনি কি বলিয়াছেন?" "আজ বলিয়াছে যে, দ্বিপ্রহর রাত্রির পর পথ হারাইয়া আপনি এইখানে আসিবেন। তাহার কথামত আপনাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি।"

আবার বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র আলোকে ত্রিবিক্রম দেখিলেন, সতীর পরিধানে রক্তবর্ণ বিবাহের চেলী; তাহাতে রক্তবর্ণ বরের উত্তরীয় সংলগ্ন। তাহা দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। কর্দ্দম হইতে উঠিয়া ত্রিবিক্রম কহিলেন, "আমার সহিত অনেক লোক আছে,—তাহাদিগের আশ্রয়ের কি হইবে? তাহাদিগের আশ্রয়ের ব্যবস্থা না করিয়া আমি ত তোমার পিতৃগৃহে যাইতে পারিব না!" সতী কহিল, "সে কথাও সে বলিয়াছিল। সকলের ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছি। আপনার বন্ধু, তাঁহার কন্যা ও পুত্রবধূ লইয়া দূরে দাঁড়াইয়া আছেন,—সে কথাও সে বলিয়াছে।" অসীম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, সে কেমন করিয়া জানিল যে, বিদ্যালঙ্কার ঠাকুর দুর্গা ও বড়বধূকে লইয়া দূরে দাঁড়াইয়া থাকিবেন?" ত্রিবিক্রম ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "রায়জী, এত কথা বুঝিলে, আর এই সামান্য কথাটা বুঝিতে পারিতেছ না? যে বলিতে পারে—আমি আজ দুর্য্যোগে নিশীথ রাত্রিতে এই জনশূন্য ঘাটে আসিয়া পৌছিব, সে বিদ্যালঙ্কারের কথা কেন বলিতে পারিবে না?" "সে কে?" "এত সহজে বুঝিতে পারিবে না!" ত্রিবিক্রমের আদেশে তরুণী অগ্রে চলিল। ত্রিবিক্রম, অসীম ও সুদর্শন তাহার নির্দ্দিষ্ট পথে গ্রামে প্রবেশ করিলেন।

পিতৃগৃহে প্রবেশ করিয়া সতী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকে কহিল, "বাবা, তিনি আসিয়াছেন।" বিশ্বনাথ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া আগন্তুকত্রয়ের দিকে চাহিলেন। তাঁহার বিস্ময়ের কারণ বুঝিয়া ত্রিবিক্রম তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আমিই আপনার জামাতা ত্রিবিক্রম।" বিশ্বনাথের বিস্ময় কিন্তু তাহাতেও দূর হইল না। তিনি কহিলেন,

"বাপু, মাত্র একটি দিন তোমাকে দেখিয়াছিলাম, চিনিতে পারিলাম না ত! প্রমাণ না পাইলে কেমন করিয়া তোমাকে জামাতা বলিয়া গ্রহণ করিব?" ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "প্রমাণ সাক্ষী সমস্তই আনিয়াছি। এখন আমার এক বন্ধু কন্যা ও পুত্রবধূ লইয়া প্রায় এক ক্রোশ দূরে দাড়াইয়া আছেন। আপনি প্রথমে তাঁহাদিগকে আশ্রয়ে আনুন। জামাতা না হই,—মনে করুন, আমি অতিথি,—বিপন্ন, পথশ্রান্ত।" বিশ্বনাথ দুই-তিনজন গ্রামবাসীকে ডাকিয়া, দুই-তিনটা মশাল প্রস্তুত করিয়া, বিদ্যালঙ্কারের সন্ধানে পাঠাইয়া দিলেন। অসীম ও সুদর্শন তাহাদিগের সহযাত্রী হইল। তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে বিদ্যালঙ্কার, দুর্গা ও সুদর্শনের পত্নী বিশ্বনাথের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন বিশ্বনাথের প্রতিবেশী মিত্র-গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। লোক আসিয়া বলিয়া গেল যে, বরের নৌকা মারা পড়িয়াছে। বর ও দুইজন বরযাত্রীর মৃতদেহ ঘাটের নিকটে পাওয়া গিয়াছে; মাত্র দুইজন বরযাত্রী বাঁচিয়া আছে।

(ক্রমশঃ)

ভুল

[শ্রীলীলা দেবী]

(আমি) না পারি বুঝিতে আমারে!
চাই নব ঘন শ্যামলিমা, ভুলে
ছুটে যাই মরু মাঝারে!
চাই যে কাজল সজল জলদ
ভুলে খর রবি সহিরে,
প্রেমের পসরা বুকে নিতে চাই
পাথরের বোঝা বহিরে!
নব কণিকা নমেরু বকুল
চাই যে অশোক কামিনী,
ভুলে পরি আমি কণ্টক-মালা,
জ'লে মরি সারা যামিনী!

চাই আমি ওগো তপ্ত আকুল
সরাগ রক্ত অধরে,
ভুলে চুমি হায়, ভাঁড় পাষাণের
শীতল ওষ্ঠ আদরে!
চাই আমি চাই তোমার ব্যাকুল
নিবিড় দু'বাহু বাঁধনে;
উদ্দাম প্রেমে জড়াই পাষাণে
কাঁদি বুক ফাটা কাঁদনে!
তোমারে চাহিয়া ফিরি নিশিদিন
উন্মাদ সেই মাতনে,
ভুল ক'রে সখা জীবন সাধিতে
সাধি যে মরণ সাধনে!

মাতৃজাতির শিক্ষা ও বাঙ্গালীর সমাজ

[মুহম্মদ আব্‌দুল্লাহ্]

মাতৃজাতি বা নারীজাতির কথা লইয়া আজকাল সমাজে বেশ আন্দোলন চলিতেছে। নারীজাতির সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রায় সকল সাময়িক পত্রেরই কর্ত্তব্যের একটা বিশিষ্ট অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নারীজাতির উৎসাহ ও উদ্যমেই এই আন্দোলনের সৃষ্টি ; কিন্তু নারীর প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন নিরপেক্ষ অনেক পুরুষও ইহাতে যোগ দিয়াছেন। নারী আজ যাহা চাহিতেছেন, তাহার বিষয়ে সুবিচার করিয়া মীমাংসা করা সমাজের একটী বড় কর্ত্তব্য। কিন্তু সুবিচার বা মীমাংসা আবার কি ? মীমাংসা তো হইয়াই আছে। তবে মধ্যে কিছুকাল চাপা পড়িয়া গিয়াছিল,—নারীর দুর্ভাগ্যক্রমে এবং পুরুষের দোষে। এক্ষণে তাহার পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন। এখন পুরুষের উচিত, নারীর প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, হিসাব করিয়া তাঁহার পাওনাগণ্ডা চুকাইয়া দেওয়া। নারী অংশতঃ তাঁহার নষ্ট শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন,—এক্ষণে নিজের প্রাপ্য তিনি বুঝিয়া লউন।

নারী যে এতদিন অন্ধকারময় স্তরে ডুবিয়া ছিলেন, তাহা কিসের জন্য ? সমাজের নিকট নারীর প্রাপ্য বলিয়া দাবী করিবার বস্তু কি আছে ? যথারীতি আলোচনা করিলে মনে হয়, এ প্রাপ্য শিক্ষা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। একমাত্র শিক্ষার অভাবেই নারী এতকাল এইরূপ হীন হইয়া ছিলেন। এই শিক্ষার অভাবেই আত্ম-সত্তার প্রকৃষ্ট অনুভূতি নারী-হৃদয়ে জাগিবার অবসর পায় নাই। শিক্ষার বলে নারী যে দিন উন্নত হইতে পারিবেন, সে দিন সমাজের নিকট প্রত্যাশা করিবার তাঁহার আর কিছুই থাকিবে না,—সমাজের নিকট দাবী করিবার অধিকারও তাঁহার থাকিবে না। কারণ, সমাজকে ভাঙ্গিবার বা গড়িবার শক্তি তখন নারীরও থাকিবে।

শিক্ষা দিলে তবে নারীজাতির উন্নতি হইবে। কিন্তু নারীজাতির জন্য শিক্ষার বিধান মাতৃত্বের অনুকূল হওয়া চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই-চারিটী উপাধি পাইলেই নারী চতুর্বর্গ ফললাভের অধিকারিণী হইবেন না,—মাতৃত্বের পূর্ণস্ফুরণ কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিতেই হইবে না। নারীর শিক্ষা পুরুষের শিক্ষার সহিত সকল প্রকারে সমভাবাপন্ন হইলে চলিবে না। নারীশিক্ষার জন্য বর্ত্তমান শিক্ষাবিধির অনেক সংস্কার আবশ্যক। কিন্তু এই সংস্কার করিবার অধিকার বাঙ্গালী সমাজের হাতে আছে কি ? তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে ইহার পূর্ব্বেই, সম্পূর্ণ না হউক, অন্ততঃ অনেকখানিও সংস্কার হইয়া যাইত। দেশের রাজশক্তি অনুকূল না হইলে, এই সকল কার্য্য নিতান্ত দুঃসাধ্য। ইহাতে

যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। অর্থের অভাবে ইহা সম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু অর্থ দিবে কে? এ বিষয়ে সরকারী সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা খুবই কম। প্রকৃত কাজের বিষয়েও সরকারের ঔদাসীন্য দেখিতে পাওয়া যায়। আর এক কথা,—সমাজের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিলে চলিতে পারে। কিন্তু সমাজের নিকট হাত পাতিব কিসের ভরসায়? যে সমাজ আজ খায় তো কাল পায় না,—বস্ত্রের অভাবে যাহাকে উলঙ্গ থাকিতে হয়,—সেই সমাজ শিক্ষার জন্য অর্থ-সাহায্য করিবে? হায় রে দুর্ভাগ্য, বাঙ্গালীর কি আজ সে দিন আছে!

কিন্তু শুধু সমাজের দুর্ভাগ্য ভাবিয়া শোক করিলেই তো চলিবে না! নারীর শিক্ষার পথ যে কোনও প্রকারে হউক উন্মুক্ত করিতেই হইবে; নচেৎ সমাজের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। এক্ষণে প্রত্যেক পুরুষের কর্ত্তব্য, আপনাদিগের পত্নী, ভগিনী ও কন্যাদিগকে সযত্নে শিক্ষা দেওয়া। এক বোঝা বই দিয়া তাঁহাদিগকে গাড়ী করিয়া স্কুল-কলেজে পাঠাইবার কথা বলিতেছি না। ইহা ভিন্ন প্রকারের শিক্ষা। প্রথমতঃ সকল প্রকার বিলাস-ব্যসন ছাড়িয়া ত্যাগী ও সংযমী সাজাই পুরুষের কর্ত্তব্য। অতঃপর পরিবারস্থ নারীদিগকেও ত্যাগ ও সংযমের দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করা, নীতিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে মৌখিক ও ব্যবহারিক (practical) শিক্ষা দেওয়া,—ইহাই পুরুষের কাজ। ইহা অবহেলার বিষয় নহে। যে সমাজ অর্থের অভাবে উন্নতির পথে বাধা পায়, ত্যাগ ও সংযমই তাহার উন্নতির একমাত্র উপায়। বাহিরের ঠাট দেখিয়াই মানব-সমাজের প্রকৃত অবস্থার বিচার করা চলে না। মানবের হৃদয় যদি উন্নত না হয়, মানব-প্রকৃতি যদি পবিত্রতামণ্ডিত না হয়, তবে সেই পবিত্রতাহীন, অনুন্নত-হৃদয় মানবের সমাজকে উন্নত বলিব কিরূপে? ত্যাগের পথে, সংযমের পথে, যাহার সাড়া না পাওয়া যায়, তাহার উপর সমাজের ভার ছাড়িয়া দিব কোন্ ভরসায়?

পণ্ডিত চাণক্য বলিয়া গিয়াছেন, "মাতৃবৎ পরদারেষু··· ···যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।" বাল্যকালে ছেলেদের মধ্যে অনেকে এইরূপ শিক্ষা পায় বটে, কিন্তু এই ভাবে শিক্ষা পাইবার সুযোগ তাহারা কি বরাবর পাইয়া থাকে? তাহা যদি পাইত, তবে সমাজের আজ এত অধোগতি হইত না। যে জননী স্বর্গাদপি গরীয়সী, যে "মাতার চরণতলে স্বর্গ অবস্থিত," সেই মাতার মাতৃত্বের আসনে যদি নারীত্বের পূজা করিবার মত শক্তি-সামর্থ্য আমাদের থাকিত, তাহা হইলে কি আজ আমাদের সমাজ এত হীন অবস্থায় পতিত হইতে পারিত? নারীর সম্মান করিতে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি; তাই মাতৃশক্তির পূজা করিতেও আমাদের বাধ-বাধ ঠেকে। এইখানেই আমাদের গলদ,—এইখানে আমাদের সমাজের প্রকাণ্ড ভুলটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

শৈশবে সন্তানকে মায়ের সহিত অনেক দিন কাটাইতে হয়। সেই সময়ে সে মায়ের অনুকরণে ও আদর্শে যাহা শিক্ষা করে, তাহা অধিক বয়সে আর সংশোধন করিতে পারে না। সেই শিক্ষাই তাহার জীবনের সহচর হইয়া, উত্তরকালে তাহার চরিত্র-গঠনের উপাদান হয়। সুতরাং মায়ের শিক্ষা-দীক্ষা ও কার্য্য-কলাপের রুচি যদি মার্জ্জিত না হয়, তাহা হইলে সন্তানের স্বভাবেও কুরুচির ভাব স্বতঃই উদ্রিক্ত হইতে পারে। সমগ্র জীবনটাই তাহার কুরুচিপূর্ণ হইয়া থাকে। অতএব মাতৃজাতির শিক্ষা-দীক্ষার উপর সমগ্র মানব-সমাজের শিক্ষা দীক্ষা বহু পরিমাণে নির্ভর করে। তথাপি আমরা নারীর শিক্ষায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহি।

সন্তান-পালন ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের শিক্ষা আমাদের সমাজে নারীশিক্ষার প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। এই দুইটী বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকিলে, নারীর মাতৃত্বের দাবী করাই বৃথা। কেবলমাত্র এই দুইটী বিষয়ে মাতৃজাতির অজ্ঞতার কারণে, বাঙ্গালী-সমাজ দিন-দিন ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। যে হারে আমাদের সমাজে লোকসংখ্যা কমিতেছে, তাহাতে, দুইশত বৎসরের পর বর্ত্তমান বাঙ্গালীর সত্তা জগতের মুখ হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। শিশুমৃত্যুর হার বাঙ্গালাদেশে যত অধিক, সেরূপ জগতের মধ্যে অন্য কোনও দেশে বোধ হয় নাই। সুতরাং যাহাতে এই আশঙ্কা দূরীভূত হইতে পারে, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া সকল বাঙ্গালীর পক্ষে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

আমাদের পুরুষের শিক্ষাও পূর্ণতা প্রাপ্ত নহে। পুরুষ কোনও প্রকারে রাত্রি জাগিয়া, বই মুখস্থ করিয়া দুই-চারিটী পাশ করিয়া ফেলিলেন। বেশ কতকগুলি ইংরাজী বুলীর বাঁধি

গৎ শিখিয়া লেফাফা-দোরস্ত হইলেন। তার পর নানাবিধ চেষ্টা-চরিত্র করিয়া, ঘুষ প্রভৃতির সাহায্যে হয় তো একটা পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকরী পাইয়া কেরাণীবাবু সাজিলেন। ইহাতেই যেন তিনি পরম পুরুষার্থ লাভ করিলেন,—ইহাই বুঝি বাঙ্গালীর চিরকাম্য। যাহা হউক, অমনই কত-শত কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার গম্ভীর পিতার দ্বারে হত্যা দিতে আরম্ভ করিলেন। বাছিয়া-বাছিয়া কন্যা স্থির করিয়া, শেষে শুভদিনে, শুভলগ্নে কেরাণী বাবুর শুভ-পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সময় মত বাবু 'ফ্যামিলী' লইয়া বিদেশে চাকরী-স্থানে গেলেন। ভরসা সেই পঞ্চাশটা টাকা। খাওয়া-পরাতেই সে টাকা কুলায় না। কিন্তু ওদিকে বৃদ্ধ পিতা আছেন, আর এদিকে আছেন নবোঢ়া পত্নী এবং তাঁহার অভিমানরাশি।

বাঙ্গালীর সমাজের অবস্থা এইরূপই। এক্ষণে শিক্ষার উন্নতির প্রয়োজন। পুরুষ নীতিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া, ত্যাগ ও সংযম শিক্ষা দিয়া, নারীর মহত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে, সমাজ হইতে এই সকল বিপদ দূরীভূত হইতে পারে। শেষে আবার বলিতেছি, শিক্ষার মধ্যে নারী ও পুরুষের প্রভেদ থাকিলে চলিবে না। উপযুক্ত শিক্ষায় সকলেরই সমান অধিকার আছে। বর্ত্তমানের শিক্ষনীয় বিষয় নীতিজ্ঞান—ত্যাগ ও সংযম।

আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

যে যুগে কামানের গোলা ষাট মাইল ছুটে বলিয়া, সেই জড়শক্তি, আপন প্রতিবেশীকে স্বদেশী ব্রত ধরিবার জন্য নিরীহ গ্রামবাসীর অনুনয়, বিনয়, শাস্ত্রবলে থামাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সে যুগে আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ ঘর এবং বাহির উভয়ত্রই অবজ্ঞা এবং উপহাসের মধ্যে থামিয়া যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

আশ্চর্য্য কি ! আমাদের যে বুদ্ধিভ্রংশ অনেক দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিদ্যুৎ-তত্ত্বের যুক্তি দিয়া টিকি রাখা সমর্থন আরম্ভ করিলে, সে একরূপ ঘুরাইয়াই স্বীকার করা হয় যে, বিজ্ঞান নামক পদার্থটা পশ্চিম হইতে তীব্র আলোক রশ্মির মতই আমাদের চোখে আসিয়া লাগিতেছে। অর্থাৎ ও-জিনিসটা পাইয়া আমরা বুঝিলাম, আমাদের আলোচিত এতদিনকার জ্ঞান-বুদ্ধিগুলা আবর্জ্জনা মাত্র।

অবশ্য, আমরা এতদিন ধরিয়া কি জ্ঞান-বুদ্ধির আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, সে কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসার স্থলে দেখিতে পাইব, প্রায় সকলেই আমার মত জিজ্ঞাসু। উত্তর দিবার জন্য কাহাকেও পাওয়া যাইবে না। অবশেষে নানাপ্রকার বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত বাণীকে ও ক্রুদ্ধ অভিযোগকে যোড়াতাড়া দিয়া ইহাই আমাদের খাড়া করিতে হইবে যে, কোন্ তিথিতে কি ভক্ষণ নিষেধ,—শ্বাস রোগটা মহাপাতক, কি কাশ রোগটা মহাপাতক,—স্বগোত্রীয় এবং পরগোত্রীয় কাহার হস্তে সিদ্ধ-পক্ক গ্রাহ্য হইতে পারে—এই সমস্তের বিশদ আলোচনা ব্যাখ্যা এবং তালিকা-প্রস্তুত করিতেই না কি অদূর অতীতে আমাদের সময় কাটিত। এতদতিরিক্ত জ্ঞান-বুদ্ধির আলোচনা আমরা করি নাই। এই 'আমরা' শব্দের গণ্ডীর মধ্যে জাতির কতখানি অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহারও কোনও স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে না। এ সাধুবাদ ব্রাহ্মণেই বর্ত্তিয়া থাকে। সমস্ত জাতিটা ব্রাহ্মণ এখনও নহে; এবং বিশেষ ভাবে ছিল না।

ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া এই প্রকার জ্ঞান-বুদ্ধির আলোচনা করিয়াছেন। নিম্নবর্ণের এই ব্যাপারটাকে কি ভাবে ধরিয়া লওয়া স্বাভাবিক ছিল ? জগতের সকল দেশেই মানুষের এটুকু বুদ্ধি নিশ্চয়ই আছে যে, উচ্চতর সত্যের চর্চ্চা মানুষকে উচ্চতর স্থানে উন্নীত করিবার সোপান। তাহারা তখন কি বুঝিতে পারে নাই যে, ব্রাহ্মণকে ছাড়াইয়া উঠিবার একটা সুযোগ আসিয়াছে ?—বুঝিতে পারিয়াও তাহারা নিশ্চেষ্ট ছিল, ইহা ত স্বীকার করিবার কোনও হেতু দেখি না। এখনকার যুগধর্ম্মে নিম্নবর্ণ উন্নতির ক্ষেত্রে আপনার পুরোভাগে ব্রাহ্মণত্ব বলিয়া খানিকটা সিট রিজার্ভ রাখিবার কোনও প্রয়োজনই দেখে নাই।

অবশ্য জবাব শুনিতে পারি, এখনকার উন্নতি ত তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি নহে। এই অর্থনৈতিক উন্নতি ঠেলা-ঠেলি হুড়া-হুড়ির মধ্য দিয়াই হয়। আর সেদিনকার যুগে ব্রাহ্মণ আপনার উন্নতি পাকা করিয়া গড়িবার জন্য শূদ্রকে কেমন ব্যবহার দিয়াছিল? আধ্যাত্মিক বল পবিত্র বস্তু; তাহার সাহায্যে ব্রাহ্মণ তখন অতটা করিতে পারিয়াছিল। আজ শূদ্র যদি তাহার আওতা হইতে বাহির হইবার সুযোগ পাইয়া, আর্থিক বলে জীবনটাকে একটু পরিপুষ্ট করিয়া লয়, সে কি সত্যই দোষ করিতেছে?

দোষের ছায়াও আমার মনকে স্পর্শ করে নাই। আমি বরং উদাহরণ স্বরূপ দুইটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছি, উন্নতির চেষ্টা এবং তাহার তাড়ায় হিতাহিত-জ্ঞানকে একটুখানি ঘুমাইয়া ফেলাই মনুষ্য-প্রকৃতিতে স্বাভাবিক!

আর, আমার বলিবার একটা গুরুতর কথা আছে যে, আধুনিক উন্নতিতে অর্থনীতির জলুষ দেখিয়া, ব্রাহ্মণেতর নিম্নবর্ণ যে ভাবে জিনিসটাকে গ্রহণ করিয়াছে, তখনকার আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে সে ইহার ঠিক বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়াছিল। তাহার প্রকৃতিতে হয় ত আধ্যাত্মিকতার বিরোধী কতকগুলি প্রবণত্ব ছিল;—নতুবা তাহার প্রতি-যোগিতায় অমন নিশ্চিন্ত হইয়া ত্রয়োদশীর সহিত বার্তাকুর সম্বন্ধ নির্ণয়ের মোহ কবে যে ব্রাহ্মণের ভাঙ্গিয়া যাইত, তাহার স্থিরতা নাই। তাহাকে কল্পিত আধ্যাত্মিকতা বহু দূরে সরাইয়া রাখিতে হইত; কিম্বা, তাহাতে অশক্ত হইলে, ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহার প্রাধান্য টিকিত না। অবশ্য নিম্নবর্ণের মতই বিপরীত-মুখী প্রবণত্ব তাহারও এই জাড্যের হেতু হইতে পারে।

আজিও কি ব্রাহ্মণ, কি ব্রাহ্মণেতর বর্ণ, কাহারই মধ্য হইতে সেই বিপরীত-মুখী প্রবণত্ব টুটিয়া যায় নাই। সমস্ত জাতিটা যাহা হারাইয়াছে, সেটাকে আপনার অন্তরেই আগে হারাইয়াছিল। সেই জন্যই বহির্জগৎ হইতে কবে এবং কিরূপে তাহা খোয়া গেল, তাহা সে জানিতে পারে নাই। এমন কি, সেই অপূর্ব্ব পদার্থটা যে কি গিয়াছে, তাহা আজিও সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বুঝিয়া উঠাও অসম্ভব—সেই তাহার অভিমুখে স্বাভাবিক প্রবণত্ব ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠাও অসম্ভব।

তাহা হইলে আর ষাটমাইল রেঞ্জের কামান, অথবা একমাইল দৈর্ঘ্যের জাহাজের কথা তুলিয়া কেহ আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ পরিহাসে ডুবাইয়া দিত না।

এদিকে কি হারাইয়াছে জাতি, সেটাও যেমন আবছায়ার মধ্যে—তেমনি কি অবলম্বন বর্ত্তমানে তাহার সত্য পথ, তাহাও তাহার প্রাণের স্তরে আসিয়া পৌছাইয়া সাড়া দেয় নাই। বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, নাম কয়টা আমরা মুখেই কপচাইতে শিখিয়াছি। বস্তুতন্ত্র হিসাবে ও-গুলাকে যদি নিজস্ব করিতে পারিতাম, তবে, বিজ্ঞান-শিক্ষা এবং শিল্প-বাণিজ্য-বিস্তারের উপযুক্ত করিয়া আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ধারা গড়িয়া উঠিত, সন্দেহ নাই।

রহস্য এই যে, প্রত্যেক জাতিরই শক্তি-প্রয়োগের একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি থাকে। সেইটাই তাহাদের বিজ্ঞান। তাহারই উপর তাহাদের শিল্প বল, বাণিজ্য বল, রাজনীতি বল—সমস্ত সাফল্য লাভ করে। যন্ত্রতন্ত্র, কলকব্জা, কামান হইতে জাহাজের বহর অবধি—সেই বিজ্ঞানেরই সাহায্যকারী অবয়ব মাত্র। জাতির আত্মা আপনার এই বিজ্ঞান বা শক্তি-প্রয়োগের বিশিষ্ট পদ্ধতির আধার স্বরূপ হইয়া না থাকিলে, তিথি-তত্ত্ব প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বের মতনই কল-কারখানা-জাহাজ শুদ্ধ ময়দানবের কারখানা অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়।

আমরা যে ইংরাজের বলদর্পিত পদতলে এমন ছত্রাকার হইয়া পড়িয়া আছি, ইহার কারণ ইহাও হইতে পারে যে, তাহাদের শক্তি-প্রকাশের বিশিষ্ট পদ্ধতি আমাদের পদ্ধতি অপেক্ষা বলশালী নহে। যে সময়ে আমরা আমাদের বিজ্ঞান হইতে চ্যুত হইয়াছিলাম, সেই সময়েই সে আমাদের হাতে পাইয়াছে,—আমাদের বল-প্রয়োগের বিশিষ্ট পদ্ধতির সহিত তাহার পদ্ধতির কোনও প্রকারেই শক্তি-পরীক্ষা হয় নাই। এমন কি, আমাদের নিজস্ব বল তাহাদের বলের উপর কি প্রকার ক্রিয়া করে, তাহাও আমরা দেখি নাই।

ইংরাজের বিজ্ঞান শিখিবার হইলে আমরা শিখিতাম। সে শিক্ষা নাই, অতএব শিখিতে পারি নাই—এতদপেক্ষা বালকোচিত যুক্তি পৃথিবীতে সম্ভব হইতে পারে না। মানুষ দেখিয়া শেখে, শুনিয়া শেখে, এবং ঠেকিয়া শেখে; বিহঙ্গের চঞ্চুপুটে করিয়া শাবককে আহার দানের মত মানুষকে

শিখাইবার স্বতন্ত্র কোনও পদ্ধতি আছে কি না, ভগবান্ই জানেন।

বোধ হয় আশা করিতে পারি, এই সুদীর্ঘ গৌর-চন্দ্রিকার মধ্য দিয়া আপনাদের মনকে তুচ্ছ আধ্যাত্মিকতা বস্তুটিকে একটু সম্ভ্রমের সহিত শুনিবার উপযুক্ত করিয়াছি। এই অধ্যাত্ম-বিত্তার কালে-কালে সঞ্চিত বিপুল আবর্জ্জনাবৃত দেহের মধ্যেই আমাদের বল-প্রয়োগের নিজস্ব ধারাটুকু এখনও জীবন্ত আছে।

বল-প্রয়োগের পূর্ব্বে বল-সঞ্চয় এবং সঞ্চিত বলের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়। তাহাই অধ্যাত্ম-সাধনা। অনেক পথভ্রষ্ট বীভৎস অবান্তর সাধনা এই অধ্যাত্ম-সাধনার নামে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। দোষান্বেষী বিদেশী পাদ্রিতে তাহারই নিন্দাবাদ করিয়া গিয়াছে। ভালটুকুর সন্ধান পাইলে সযত্নে চাপা দিয়া যাইত। সেই সব কেতাব পড়িয়া আমরাও ত ঘৃণার সংজ্ঞা উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছি! নিজস্ব অনুসন্ধান-স্পৃহার দিক হইতে সমস্তটা কখনও তলাইয়া বুঝিতে যাই নাই।

যে সব ব্যক্তির মস্তিষ্ক পাশ্চাত্য মানব-সমাজের গৌরব-স্তম্ভ স্বরূপ এক-একটা আবিষ্কার জগৎকে দান করিয়া গিয়াছে, সে সকল মস্তিষ্ক একটু না একটু অসাধারণ বুদ্ধির আবাসস্থল ছিল। সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ গভীর অতলের মত সে সব মন আমাদের বুদ্ধির অনধিগম্য এক প্রকার গাম্ভীর্য্য ধারণ করিত। সে গাম্ভীর্য্য আমরা সাধারণ মানবে ঠিক বুঝিতে পারি না। আর্কিমিদিসের শিরশ্ছেদ-দৃশ্য কল্পনা কর। অথবা নিউটনের সম্বন্ধে প্রচলিত সেই উপাখ্যানটি স্মরণ করিতে পার। একদা তিনি গণিতের দুরূহ প্রশ্ন মধ্যে অবগাহন করিয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়া আছেন,—সহসা, তাঁহার এক বন্ধু গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার পদশব্দ নিউটনের চিত্তাকর্ষণ করিল না দেখিয়া, তিনি কৌতুক করিয়া বন্ধুর জন্য আচ্ছাদিত আহার্য্য উদরসাৎ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে নিউটনের প্রশ্নের উত্তর বাহির হইলে, তিনি ফিরিয়া চাহিয়া সেই বন্ধুকে দেখিতে পাইলেন। তার পর তিনি আহার্য্য বস্তু ভক্ষিত দেখিয়া অকপটেই অবধারণা করিলেন যে, কখন অন্যমনস্ক অবস্থাতেই তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

ও-সকল কথা যাক; এইবার আমার বক্তব্য আরম্ভ করি। প্রথমটা অবশ্য একটু অদ্ভুত বোধ হইবে।

পুরাণে কি আছে, কেহ বড় তার সন্ধান রাখে না; রাখিলেও বিশ্বাস করে না। আমিও অবশ্য বিশ্বাস করিতে বলি না; তবে বলি বটে যে, উহার মধ্যে নৈতিক উপদেশ আছে।

মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে সন্ত্রাসিত করিলে, বিষ্ণু তাহাদের সহিত একাকী দশ সহস্র বৎসর যুদ্ধ করিলেন। অবশেষে তাঁহাকে বেশ সম্‌ঝিয়া লইতে হইল যে, তাঁহার চেষ্টায় ইহাদের বধ-সাধন অসম্ভব। তিনি মায়ার শরণাপন্ন হইলেন। মায়া-ঠাকুরাণী দিব্য সৌন্দর্য্য-শালিনী বিলাসিনীর বেশ ধরিয়া আসিয়া, তাহাদের সেই যুদ্ধস্থলে উপস্থিত। তিনি অনুরাগে জর-জর মদন-শরাঘাত-প্রজ্বলিত নয়নে সেই যুধ্যমান ভ্রাতৃদ্বয়কে ঘন-ঘন ইঙ্গিত ও হাব-ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন;—কেবলি বাহবা দিতে লাগিলেন। যেন বিষ্ণুকে যুদ্ধ দিতে পারে এত বড় বীর যখন পৃথিবীতে আছে, তখন তিনি ইহাদের ছাড়িয়া আবার কাহাকে প্রাণনাথ করিবেন?

বিষ্ণু মৃদুহাস্যে বলিলেন, হে বীরদ্বয়, ঐ দেখ, সুন্দরীর অবস্থা দেখ,—আহা বিরহানল-সন্তপ্ত কুসুম! উহার প্রতি উপেক্ষা দেখাইতে চাহি না। তোমরা বর চাও।

দানবদ্বয় ভাবিল, বিষ্ণু ঐ মিলনের খাতিরে যুদ্ধ হইতে উহাদের নিষ্কৃতি দিতে চাহিতেছেন। ধিক্! শত্রুর নিকট হইতে অবকাশ লইয়া সুন্দরীর মনস্তুষ্টি!

তাহারা চাহিয়া দেখিল, বিষ্ণুর কথায় সুন্দরী সকৌতুকে অধর কুঞ্চন করিলেন!

প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ জ্বলিয়া উঠিয়া তাহারা বলিল—তুমি বর চাহ।

বিষ্ণুও অমনি বলিলেন—উত্তম। তোমরা আমার বধ্য হও।

এইরূপে দানবদ্বয় স্বেচ্ছায় তাঁহার হস্তে প্রাণত্যাগ করিল। বিষ্ণুর ছলনার নিকট সত্যাচরণের কি প্রয়োজন ছিল? কোথাকার কে অপরিচিতা সুন্দরী—তাহার উপস্থিতিতে হতভাগ্যদ্বয়ের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিল,—হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হইল।

এমনি আকস্মিক বিপর্য্যস্ত ভাবকে মায়া-মুগ্ধ হওয়া বলে।

আর একটি উদাহরণ দিব,—এটি আরও অস্বাভাবিক। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ ত করিলেন; কিন্তু অতখানি ছলনা ও অন্যায়-যুদ্ধে বধ করিয়া দেবতা বলিয়া না হয় লীলার কৈফিয়তে রক্ষা পাইতে পারেন। দেবরাজ্যের সিংহাসন তাঁহার সাজে না। ঋষিগণ কল্পনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল, ইন্দ্র তপস্যা করিয়া পাপের ক্ষয় করুন গিয়া,—দেবরাজ্য উপযুক্ত লোকের দ্বারা শাসিত হউক। রাজর্ষি নহুষ তখন অনেক পুণ্যকর্ম্মের ফলে অনন্ত স্বর্গবাস লইয়া স্বর্গে আসিয়াছেন,—তাঁহাকেই ইন্দ্রত্ব দেওয়া হইল। দিন-কতক ইন্দ্রত্ব করিতে-করিতেই তাঁহার মাথায় রোখ্ চাপিয়া গেল,—'ইন্দ্র হইলাম যদি, শচী কেন আমায় ভজনা করিবে না!' শচী ভয়ে-ভয়ে বৃহস্পতির বাড়ী পলাইয়া গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। দেবতারা অনেক স্তুতি-নতি করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন—শচী ইন্দ্র ছাড়া আর কাহাকেও ভজনা করে নাই। সে উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতির ন্যায় নহে; অতএব পর-স্ত্রী। এ ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন। নহুষ তাঁহাদের ধমক লাগাইলেন—চোপরও, এ স্বর্গ। বৃহস্পতির বাড়ী ফৌজ গেল। ব্রাহ্মণ বিবিধ প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়া অবশেষে প্রাণের দায়ে শচীকে বাহির করিয়া দিলেন। শচীও তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন। বলিলেন—বেশ, যদি তুই প্রমাণ শুদ্ধ দেখাইতে পারিস যে ইন্দ্র মরিয়াছে, তোকে ভজনা করিব। কাল আসিয়া ইন্দ্র তোকে পদাঘাতে তাড়াইয়া আপন সিংহাসন দখল করিবে,—আজ তোর হাতে নষ্ট হই ত, তখন আমার কি দশা হইবে! নহুষ শুনিয়াছিলেন ইন্দ্র আত্মগোপন করিয়া তপস্যা করিতেছেন। চারিদিকে তপস্বি-কুল উৎপীড়িত হইতে লাগিল। নহুষ একটা বেহুঁস হওয়ার ফলে ইন্দ্রের দোষ সকলে ভুলিয়া গেল। ত্রিভুবনের প্রজা আবার ইন্দ্রকেই চাহিতে লাগিল। ইন্দ্রও পরিচিত আত্মীয়-বন্ধু মধ্যে প্রকাশ দিয়া পাপক্ষয়-কৃৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। শচীর সহিত অবধি গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে একটা পরামর্শ দিয়া,—আপনার সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রের কথামত শচী নহুষকে বলিয়া পাঠাইলেন—মহারাজ, আর অযথা জগতে অত্যাচার করিবেন না। ইন্দ্র মরিয়াছে কি না বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি সত্বর ঋষি-যানে আরোহণ করিয়া আমার মন্দিরে উপস্থিত হউন। নহুষ ত্বরা ঋষি-যান সাজাইয়া ফেলিলেন। শিবিকা আনিয়া মাননীয় বৃদ্ধ ঋষিদিগকে,—যাঁহারা তাঁহাকে ইন্দ্রত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে, বহিতে আজ্ঞা করিলেন। ক্রুদ্ধ রাজার বেত্র-আস্ফালনে অবশেষে তাঁহাদের শিবিকায় কাঁধ দিতে হইল। ঋষি-যানে নহুষ চলিলেন। ওঃ! শচী সত্বর যাইতে বলিয়াছে,—নহুষ সর্প সর্প বলিতে-বলিতে, বারবার ঋষিদিগের মস্তকে পদার্পণ করিতে লাগিলেন। অগস্ত্য মুনি বারবার পদার্পণে ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন—অভিশাপ দিলেন, তুই সর্প যোনি অবলম্বন কর। সঙ্গে-সঙ্গেই নহুষের ইন্দ্রত্ব শচী-লাভ-স্পৃহা সকলই শেষ হইল।

ইহাও মায়া-মুগ্ধ ভাব! কথিত আছে, নহুষের ভয়ে শচী মায়া-দেবীর শরণাপন্না হইয়াছিলেন।

অধ্যাত্ম-শাস্ত্র বলে মধু, কৈটভ ও নহুষের মত সকলেরই অবনতি, দুর্গতি প্রভৃতি এই মায়া-মুগ্ধ হইবার জন্যই ঘটিয়া থাকে। আমাদের মায়া-মুগ্ধ করিবার জন্য কেহ মায়া দেবীর শরণাপন্ন হইয়াছিল কি না জানি না;—দেখিতে পাই ত আমাদের সমষ্টিই নির্ব্বিচারে এই মায়ার সম্মোহন সমুদ্রে ডুবিয়া আছে। কেন ডুবিল, কে ডুবাইল, জানি না। সমস্ত জাতিটাকে এই মায়া-সমুদ্র হইতে কূলে সাঁতারিয়া উঠিতে হইবে —এই বিশাল জাতীয় সাধনা যে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। মায়ায় বিমূঢ় অবস্থায় আমাদের সমস্ত শক্তি মায়ার হস্তেই ন্যস্ত হইয়া থাকে। মায়া-মুক্ত অবস্থা না আসিলে, আমরা আমাদের বল আপনারা প্রয়োগ করিতে পারি না।

এই জন্যই কথা আছে, ভারত ব্রহ্মবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ নামক কোনও সম্প্রদায়-বিশেষ বলশালী থাকিলে, তাঁহাদের বলের উপর ভারত প্রতিষ্ঠিত হয়, এমন কোনও ধারণা যদি থাকে, তাহাও মায়া। ভারত ব্রহ্মবলের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থে, মায়া অর্থাৎ বিমূঢ়তার অতীত অবস্থাতেই ভারত আপনার স্বাভাবিক বল প্রয়োগে সমর্থ হয়। মায়া যে একরূপ ভাবরূপ অঘটন-ঘটন-পটু অনির্দ্দেশ্য বস্তু। ভারতীয় প্রকৃতির সত্যই ভাবুকত্ব। সুতরাং এই ভাব আমাদের যথেচ্ছ চালনা করিতে পারে! আমাদের স্বভাবই আমাদের এমন ভাবে গড়িয়াছে যে, জড়-জগতের সহিত আমাদের সংযোগ একেবারে হইবার নহে। মাঝখানে মন বলিয়া একখানা পর্দ্দা টাঙ্গান থাকে। এই জন্যই জড়

জগতে প্রভুত্ব ত দূরের কথা, প্রাণরক্ষার উপযুক্ত স্থানটুকু রক্ষার বুদ্ধিও আমাদের কুলাইয়া উঠে না।

তার তাৎপর্য্য এই যে, মায়ার ভাব-বিলাস বুদ্ধিকে আপনার মোহে মজাইয়া রাখে। সে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া মনের ঐ পর্দ্দাখানার উপর যতই আঘাত করিতে থাকে, ততই, সেই মনটা যে মানুষের, সে রঙিন স্বপ্নে বিভোর হইতে থাকে। মধু ও কৈটভ এমন বিভোর হইল যে, সম্মুখের স্থূল ঘটনাবর্ত্তও তাঁহাদের সম্মুখ হইতে মিলাইয়া গেল। দশ হাজার বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া যাঁহাকে চিনিয়াছে, তাহাকেও সে ঘুলাইয়া ফেলিল। দশ হাজার বৎসরের যুদ্ধটাও সে গোলমাল করিয়া বসিল। নহুষের পক্ষেও দেখ। সে সুকৃতিবশে ইন্দ্রত্ব পাইয়াছিল। এ জ্ঞানটা থাকা তাহার খুবই প্রয়োজনীয় যে, সুকৃতি ক্ষয় হইলে অবনতিরই সম্ভাবনা। স্পষ্টই সে দেখিল যে, অনাচারে ইন্দ্রের এই দুর্দ্দশা। ঐ মনের উপর অঘটন-ঘটন-পটু ভাবরূপ সেই অনির্দ্দেশ্য বস্তু তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া রঙিন স্বপ্ন জাগাইতে লাগিল। আপাত-মধুর স্বর্গ-সুখ বিশ্বের কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলাকে ঢাকিয়া তীব্র নেশার আমেজ চড়াইয়া দিল;—নহুষ ফুকারিল—শচী চাই, কোথায় শচী। তার পর কি না করিল সে?

উপায় কি? উপায়—আমাদের মধ্যে যেটা 'আমি' সেটাকে বুদ্ধির সাক্ষী স্বরূপ করিয়া নিয়তই জাগাইয়া রাখিতে হইবে। বুদ্ধি যদি সেই 'আমি'কে গ্রাস করে, মন বুদ্ধিকে গ্রাস করিবে, আবার তরঙ্গগুলি মনকে গ্রাস করিবে। এইরূপে সকলই বশ করিয়া সেই তরঙ্গ-লীলাময়ী মায়া রাজত্ব করিতেছে!

এইরূপ চেতনায় প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিতে হইবে যে, আমি অস্ত্রধারী, বুদ্ধি আমার অস্ত্র। বুদ্ধির দ্বারাই আমি মনের অনুভূতিগুলিকে বিচার করিব,—প্রকৃত-অপ্রকৃত নির্দ্ধারণ করিব।

মায়ার ভাবরূপী তরঙ্গগুলি আমার বাহিরেই আছে। আমিও উহাদের মধ্যে নহি,—উহারাও আমার মধ্যে নহে। আমি বুদ্ধির সাক্ষী স্বরূপ থাকিতে না পারিয়া, নির্বুদ্ধি সাজিলেই—উহারা আমায় লইয়া কন্দুক-ক্রীড়া করিতে পায়। নতুবা উহাদের লইয়া কন্দুক-ক্রীড়া করাই আমার স্বাভাবিক অধিকার।

অধ্যাত্ম-প্রসঙ্গের মধ্যে এমনি একটা জাগরণের সাধনা আছে। এই জাগরণ ব্যষ্টিগত ভাবেও যেমন, জাতিগত ভাবেও তেমনি জীবন-সংগ্রামেরই সহায়ক। বেশ দস্তুর-মতই ইহাও একটা বিদ্যা। ধ্যানস্তিমিত সাধু-মূর্ত্তি কোনও প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরীর ইঞ্জিনীয়ারের পার্শ্বে স্থাপিত করিয়া যাহারা দন্তপংক্তি বিস্তার করে, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিতে চাই, ঐ ইঞ্জিনীয়ার আগে, না নিউটন-আর্কিমিদিসের মত পণ্ডিত আগে? তাঁহাদের ধ্যানস্তিমিত মূর্ত্তি সাধু-মূর্ত্তির পার্শ্বে আনিয়া বসাইলে, আকাশ পাতালে বৈসাদৃশ্য থাকে কি?

যে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাইয়া পাশ্চাত্য বড়, তাহার মূল সূত্রগুলি যাহারা বাহির করিয়া গিয়াছেন, বৈষয়িক উন্নতি তাঁহাদেরই সঙ্গে-সঙ্গে আসে নাই। আজ আমরা বৈষয়িক উন্নতিতে বড়ই লুব্ধ বলিয়া বলিতে হইতেছে, ব্রহ্মবিদ্ সাধুগণের কৌপীন-সম্বল মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়গ্রস্ত হইও না। তাঁহাদের বিদ্যার সহিত কৌপীনের কোনও সংস্রব নাই।

ঐ বিদ্যা-বলেই তোমরা মানবের আভ্যন্তরীণ নিগূঢ় জ্ঞানটুকু পাইয়া সুমহান চরিত্র অর্জ্জন করিতে পারিবে। জগতে চলিবার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট ভাব তোমাদের মিলিবে। তার পর, কল, কারখানা গড়িতে পার, কামান-দাগা শিখিতে পার, আপনাদের তৈয়ারী জাহাজ জলে ভাসাইতে পার, সে ত' মণিতে কাঞ্চন-সংযোগ।

বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা

[শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম্‌-বি]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সুর একটু নরম করিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন, "দেখ সত্যপ্রিয়, তোমার মা-বাপ তোমার এই নাম রেখেছিলেন, তুমি সরল সত্যবাদী হবে বলে। সে-কালের বুড়োরা দোষ স্বীকার করত। এখনকার ছেলেরা পথ নোংরা করবে, চোখও রাঙ্গাবে। অন্যায় করে তারা, অপরাধ যেন বুড়ো মা-বাপের, কি গুরুজনের,—যাদের অন্তরে তাদের মঙ্গল-কামনা ভিন্ন আর কিছুই নাই। আর তোমাদেরই বা দোষ কি? ঐ যে চতুষ্পাঠীর বা গুরুগৃহবাসের অনুকরণে সব হোটেল বা হোষ্টেল-বাসের প্রণালী হয়েছে, এতেই ছেলেদের পরকাল ঝর্ঝরে হয়ে যায়! এই নকল গুরুগৃহে গুরুর স্থানে থাকেন এক সুপারিণ্টেন্ডেন্ট, আর অনুগত শিষ্যের স্থানে থাকে গুরুমারার দল, যাদের ভয়ে নকল গুরু শশব্যস্ত। সমস্ত রাত বাহিরে থেকে এসে, দরোয়ানকে ঘুষ দিলেই হল। নব্য-শিক্ষা ও নব্যসভ্যতার প্রধান লক্ষণ যেন বাহিরে চাকচিক্য—মাথার উপরে কৃত্রিম কুঞ্চিত কেশদাম,—মাথার ভিতরে কুৎসিত রোগের বীজ। যে রোগের কথা এতক্ষণ তোমাকে বলছিলাম, সে ত সভ্যতারই আনুষঙ্গিক। আয়ুর্ব্বেদে উপদংশ কথাটা আছে বটে, কিন্তু সে রোগ স্থানবিশেষে আবদ্ধ। আমরা ঐ ভীষণ কুৎসিত সংক্রামক রোগের একটা সভ্য নাম দিয়ে বলি উপদংশ।

পর্টুগীজেরা এই দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে-সঙ্গে এই রোগ আমদানি করেছেন; তাই ভাবমিশ্র ইহার নাম দিয়েছেন ফিরিঙ্গী রোগ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই রোগ ইউরোপ খণ্ডে মহামারীর আকার ধারণ করে' জনপদ উৎসন্ন করেছিল। সম্ভবতঃ পর্টুগীজ বণিকেরা সেই সময়ে বাণিজ্য ক'রতে এসে, এই দেশে এই মূল্যবান বস্তু বিতরণ করেছেন। ভাবমিশ্রও তাই বলেছেন।

"ফিরিঙ্গী সংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যদ্ভবেৎ।
তস্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধির্ব্যাধি-বিশারদৈঃ।
গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোঽয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবং।
ফিরিঙ্গীনোঽতিসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিন্যাঃ প্রসঙ্গতঃ॥"

এই রোগ যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহচর, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও এই কথা ব'লে থাকেন। ডাক্তার মেক্লাওড বলেছেন—

"It has always been the case that as civilization has advanced and new countries have been opened up to commerce, intercourse with the white man has led to the introduction of the disease."

"বণিক শ্বেতাঙ্গ সংসর্গেই এই রোগের উৎপত্তি।" এই সংস্পর্শই আবার শিশুহত্যার কারণ। যে হিসাবে এই রোগের দরুন পাশ্চাত্য দেশে গর্ভপাত ও শৈশব-মৃত্যু হ'য়ে থাকে, সেই অনুপাতে বাঙ্গলা দেশে প্রতি বৎসর সাড়ে তিন লক্ষ গর্ভপাত হয় এবং এগার হাজার শিশু এই রোগে মারা যায়। যাদের বারবার গর্ভস্রাব হয়, তাদের মৃতবৎসা নাম দিয়ে শান্তিস্বস্ত্যয়ন না করে যদি গর্ভিণীর রক্ত পরীক্ষা করা হয়, তা হলেই জানা যায়, মৃতবৎসা ব'লে কোন রোগ নাই। গর্ভপাতের কারণ একটা রোগ। রোগের কারণ—অনেক স্থলে জঘন্য বিষ। সেই বিষ নাশের চেষ্টা ক'রলে, বৎসেরা মৃত্যুর বদলে অমৃত লাভ করে। কেবল তাই নয়, ছেলেদের মায়েরাও আজীবন রোগ ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পান। আর যে সব পুরুষ লজ্জার খাতিরে রোগ পুষে রাখেন, তাঁরাও কষ্ট আর অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। এতে কি কেবল কুৎসিত ও অকর্ম্মণ্য করে? বিষ ১০।১৫।২০ বৎসর রক্তে লুকিয়ে থেকে যখন মাথায় উঠে, মানুষটা পাগল হ'য়ে যায়। সুসভ্য আমেরিকায় প্রায় দুলক্ষ পাগল আছে; এদের মধ্যে ষাট হাজার লোকের ভিতর ঐ জঘন্য বিষ ঢুকেছিল। এদের জন্য যে সব গারদ আর হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার দরুন না কি প্রতি বৎসর বিশ কোটি টাকা খরচ হয়। আমাদের দেশের কথা রেখে দাও,—কে কার খোঁজ নেয়? শেয়াল কুকুরের মতন মরাটাই যেন এদেশের

লোকের পক্ষে স্বাভাবিক। বেঁচে থাকলেই বরং প্রশ্ন আসে, 'কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং ?" দশ বছর আগে বাঙ্গালা দেশে পাগলের সংখ্যা ছিল ২৪,০০৭; এদের মধ্যে যৌবন-চাঞ্চল্যের দণ্ড ভোগ করেছে অন্ততঃ ৭,২০০। বোবা, হাবা, কাণা, খোঁড়ার সংখ্যা দেড় লক্ষ; এদের অধিকাংশই স্বীয় কিম্বা পৈতৃক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। কয়েকটী ঘটনা বলি, তা হ'লেই বুঝবে, এই বিষ-সঞ্চারের পরিণাম কি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি বারোটার সময় ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘন-ঘন কড়া নাড়া আর 'ডকটর ডকটর' রবে ঘুম ভেঙ্গে গেল। নীচে গিয়ে দেখি, আমেরিকা মিশনের ডাক্তার উইল্‌সন। ব্যাকুল স্বরে তিনি বল্‌লেন "ডকটর, আমি বড় ভীত হ'য়ে তোমাকে এই অসময়ে কষ্ট দিতে এসেছি। তুমি ত জান, আমার স্ত্রী আজ দু'মাস হল একটী পুত্র প্রসব করেছেন। স্তনে দুগ্ধ ছিল না বলে' বস্তি থেকে দাই আনিয়েছিলাম। ছেলে তারি দুগ্ধ খাচ্ছিল। আজ দেখি, ছেলের মলদ্বারে, কাণের খাঁজে, মুখের কোণে ঘা। আমার বড়ই সন্দেহ হচ্চে; তোমাকে কষ্ট দিচ্চি, মাপ কর, এখনি ছেলেটাকে একবার দেখে আমাকে নিশ্চিন্ত কর।" তখনই ডাক্তার উইল্‌সনের সঙ্গে গিয়ে ছেলেকে দেখে বল্লুম, "ডক্টর, কুৎসিৎ রোগেরই লক্ষণ দেখছি। দাইকে কে দিলে?" তিনি বল্‌লেন "দাইকে ত পরীক্ষা করে পাঠিয়েছিল।" অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল, ইতঃপূর্ব্বে তাহার কুৎসিত রোগ হ'য়েছিল; ঔষধ ব্যবহার করবার পর ঘা ছিল না। কিন্তু দেহ নির্ব্বিষ হয় নাই। তারই স্তন্য পান ক'রে শিশুটীর এই দশা। দাইকে বিদায় ক'রে দিয়ে, অনেক দিন ধ'রে শিশুর চিকিৎসা করা গেল। এই সূত্রে মিসেস্ উইল্‌সনের সঙ্গে আলাপ। তাঁর নিকট অনেক গল্প শুনে, অনেক সময় অশ্রু সম্বরণ করতে পারি নাই।

মিসেস্ উইল্‌সনের প্রথম গল্প

(১)

বসন্তের বিহঙ্গ-কূজনে নব-পুষ্পিত বৃক্ষগুলি সাড়া দিয়া উঠিয়াছে। আমি শিশু-রক্ষণালয়ের বাগানে সান্ধ্য-বায়ু-হিল্লোলে গোলাপ ফুলের নৃত্য দেখিতেছি; এমন সময় একজন যুবা পুরুষ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিসেস্ এলিস্ কি এখানে থাকেন?" মধুধারা তাঁহার প্রতি বাক্যে; করুণা-বৃষ্টি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতে; দৃঢ়সঙ্কল্পতা তাঁহার প্রতি পদ-বিক্ষেপে। প্রথম দৃষ্টিতেই এই লোকটীর এই প্রকৃতিগুলি আমার সমক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মাকে ডাকিতে গেলাম। শিশুদিগকে তাহাদের মায়ের কোলে ফিরাইয়া দিয়া, তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। সংবাদ পাইয়াই যুবকের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন।

শ্রমজীবী স্ত্রীলোকদের দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বোষ্টনের দেশহিতৈষিগণ কর্ত্তৃক এই শিশু-রক্ষণালয়ের প্রতিষ্ঠা। মায়ের তত্ত্বাবধানে দাসীরা সমস্ত দিন ধরিয়া শিশুদের পরিচর্য্যা করিয়া, তাহাদের মাতার ক্রোড়ে যখন ফিরাইয়া দিতেছিল, এবং মায়েরা ঘরে ফিরিয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে উক্ত যুবক মায়ের নিকটে মেরী নাম্নী একটী দাসীর সন্ধানে আসিয়াছেন। মেরীর সম্বন্ধে আমার ধারণা ভাল ছিল না। একজন সম্ভ্রান্ত যুবক এই প্রকার বালিকার সন্ধানে কেন আসিলেন? একজন অপরিচিত পুরুষ সম্বন্ধে আমার মনেই বা এই প্রশ্ন আসে কেন? সঙ্কুচিত হইলাম। আবার দেখিলাম, চারি সপ্তাহ ধরিয়া ঐ মেরীর সম্বন্ধেই মায়ের সঙ্গে তাঁহার সুদীর্ঘ পরামর্শ। কি আশ্চর্য্য! মেরীর সঙ্গেই বা তাঁহার কি সম্পর্ক? কোন ভাল মেয়ের সঙ্গে কি তাঁহার আলাপ নাই? আলাপ থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে আমার কি? আমিই বা তাঁহার জন্য এত ভাবি কেন? তিনি আমার কে? তাঁহার সঙ্গে কোন বাহ্যিক সম্বন্ধ না থাকিলেও, তিনি অলক্ষিতে আমার অন্তর ধীরে-ধীরে অধিকার করিতেছেন। অবশেষে এক চিরস্মরণীয় মধুর অপরাহ্নে মা আমার সঙ্গে তাঁহার আলাপ করাইয়া দিলেন। তাঁহার নাম ডাক্তার উইলসন্। তাঁহারই যত্নে মেরীর রোগ-কুৎসিত দেহ শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত, এবং মলিন মনটী শুভ্র, নির্ম্মল হইয়াছে। কিছু দিন আলাপের পর এই শক্তিশালী লোকটী—আমার দেহ-মন অধিকার করিয়া বসিলেন। মেরী রহস্য প্রকাশ করিলেন বিবাহের পর।

(২)

"মিলি, তোমার গলায় এই বিশ্রী ঘা কেমন ক'রে হল বল্‌তে পার? তোমাদের বাড়ীর আর কারো এই রকম

ঘা ছিল কি? ডাক্তার উইল্‌সনের এই প্রশ্নের উত্তরে একটী নবম বর্ষীয়া বালিকা চোখ-মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "তা আর ছিল না? এক মাস আগে আমি যেখানে কাজ করেছি, সেখানে মেরী বলে একটী বদ মেয়ে ছিল। তার মুখে দেখেছি এই রকম ঘা। সেখানে আরও ঐ রকম একটী মাণিক-যোড় ছিল। তাদের তালু পর্য্যন্ত ছেঁদা হয়ে গিয়েছিল। এই রকম মেয়ে সস্তায় পেয়ে, তাদের দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিত্। কাজ শেষ হ'লে সকলেই এক পাত্রে খেয়েছি।" এই ইঁচড়ে-পাকা মেয়েটীর নিকট হইতে মেরীর কর্ম্মস্থানের ঠিকানা লইয়া ডাক্তার মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। মেরীকে নির্জ্জনে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহার মুখে কুৎসিত ঘা আছে। এই প্রকার বালিকার উপর ৩৭টী শিশুর খাওয়াবার ও তাহাদের বোতল পরিষ্কার করিবার ভার আছে দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। মেরীকে সঙ্গে লইয়া তাহার বাড়ীর দিকে যাইতে-যাইতে পথে অনেক কথা হইল। "আমার বয়স ষোল, কিন্তু আমি যা জানি, আপনাদের ত্রিশ বছরের মেয়েও তা জানে না। লক্ষ্মীছাড়া মাতাল পিতা কোথা থাকে কোথা যায়, কে জানে? ১২।১৩ বছর বয়সেই ত আমি যুবকদের সঙ্গে মিশেছি। রোগের কথা জিজ্ঞাসা করচেন? এক বছর আগে হয়েছে। কোথা থেকে হয়েছে কে জানে?" কথায়-কথায় একটী সঙ্কীর্ণ গলির একটী ভগ্ন কুটীরে উপস্থিত হইয়া ডাক্তার দেখিলেন, মেরীর মা কাজে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত। তিনি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অনেকগুলি আফিস-ঘর পরিষ্কার করিয়া থাকেন। মেরী ততক্ষণ বাড়ীতে একলাই থাকে। মেয়ের কথা উত্থাপন করিতেই, তাহার মাতা বলিলেন, "হতভাগা মেয়ে কিছুতেই বাগ মানে না। তা যখন খারাপ হয়েছে, রোজগারের টাকাটাই বা আমি পাব না কেন?" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ডাক্তার উইল্‌সন্ অবাক্ হইয়া সহরের এই প্রকার শত-শত অরক্ষিতা বালিকার ভবিষ্যৎ ভাবিতে লাগিলেন। তাহাদের উদ্ধারের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া তিনি আমেরিকান মিশনে যোগ দিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী আমি —সহকর্ম্মিণীর যোগ্যতা লাভের জন্য হাঁসপাতালে যখন ভর্ত্তি হইলাম,—পুণ্য প্রেমোজ্জ্বল দুইটী চক্ষু ঊর্দ্ধে তুলিয়া তিনি বলিলেন "ধন্য যিশু। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" আমাকে বলিলেন, "এমিলী, সেই কর্ম্মহীন বসন্ত-সন্ধ্যায় যখন তুমি বায়ু-হিল্লোলে গোলাপের নৃত্য দেখিতেছিলে, তখন কে জানিত সেই তুমি আমার সহায়তার জন্য রোগী-সেবার কঠোর ব্রত অবলম্বন করিবে? জান এমিলী, শিক্ষা শেষে আমরা মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া সেই দেশে যাইতেছি, যে দেশে মানুষ লাখে-লাখে, কুকুর-বিড়ালের মতন চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে মারা যায়।" জানেন কি ডাক্তার বাবু? এখান হইতে প্রচারকেরা দেশে ফিরিয়া গিয়া, ভারতবাসী স্ত্রী-পুরুষের যে সমস্ত ভীষণ ঘোর কালো অসভ্য চেহারা ছায়াচিত্রে দেখাইতেন, তাহাতে সহানুভূতির পরিবর্ত্তে ঘৃণা ও ভয়েরই উদ্রেক হইত। যে ভারতবর্ষ আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের বহু পূর্ব্বে সভ্যতার উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিয়াছিল, যাহার পুরাতন ধর্ম্ম ও ন্যায়শাস্ত্র আজও পৃথিবীর ভক্তি ও বিস্ময় উৎপাদন করে, যাহার ঐশ্বর্য্যের লোভে বিদেশীয়েরা রক্তপাত ও লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইত, যাহার সন্তানেরা শৌর্য্য-বীর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিল,—যখন শুনিলাম, সেই দেশে আজ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে এবং রোগের আক্রমণে লোক নিষ্প্রভ, হীনবল, এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, তখনই সেই দেশবাসীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইল।

একটি সোয়েটার

[৺বিভা দেবী]

সুন্দর দেখতে, সুগঠন, খুব গরম, খুব নরম সোয়েটারটী বুনতে বেশ সোজা। মাপে ২৯ ইঞ্চি লম্বা—১৮ ইঞ্চি চওড়া; আস্তীন ১৮ ইঞ্চি লম্বা। চাই ১ পাউণ্ড পেটলের পেটিকোটের সাদা পশম ও চারটী ৮ নং বা ৭ নংএর হাড়ের কাঁটা। আলগা, আলগা বুনবে—যেন ৪ ফোঁড়ে ১ ইঞ্চি হয়; তা হলেই টান পড়লেই বাড়বে; তা না হলে গায়ে পরতে টান হবে। তলা থেকে বুনতে আরম্ভ করবে। প্রথম কাটিতে ৮৫ ঘর তুলবে, পেছন দিকের জন্য। সামনের জন্য দ্বিতীয়

কাটিতে ৪৩ ঘর ও তৃতীয় কাটিতে ২৪ ঘর নেবে। তা' হলে মোট ১৭০ ঘর হবে। এই রকম করে ২০ সার ২ উল্টা ২ সোজা বুনে যাও। তার পর এক সার প্লেন বুনে প্যাটার্ণ আরম্ভ হবে।

১ম সার প্যাটার্ণ। সমস্ত ১৭০ ঘরই উল্টা বুনবে।

২য় সার। এক সোজা ১ উল্টা সমস্তটা ঐ রকম; অর্থাৎ ১ সোজা ১ উল্টা, ১ সোজা ১ উল্টা। ক্রমাগত এই রকমে একবার প্রথম সার, একবার দ্বিতীয় সারের মত বুনে যাবে, যতক্ষণ না ১১৬ সার প্যাটার্ণ শেষ হয়। তখন জামাটা লম্বায় ২১ ইঞ্চি হবে। এইবার বগলের গর্ত্তের জন্য ঘর ভাগ করে নিতে হবে।

আগে কাঁটায় ৮৫ ঘর নিয়ে, পেছনটা বুনবে; যথা—

১ম সার। ৮৫ ঘর উল্টা, জামাটা ঘুরিয়ে নিয়ে।

২ সার। ১ ঘর তুলে নিয়ে ১ সোজা, এক উল্টা, ১ সোজা—এইরূপে সবটা;—শেষ ঘরটা উল্টা। এই দুই সার ক্রমান্বয়ে বোনো, যতক্ষণ না ৩৮ সার হয়।

তার পর কাঁধের জন্য কেবল মাত্র ২৭ ঘর উল্টা বুনে কাঁধটা ঘুরিয়ে নেবে। পরের সার না বুনে ১ ঘর খুলে নাও, ১ সোজা, ১ উল্টা এবং ১ সোজা—ক্রমান্বয়ে ১২ বার—১ উল্টায় শেষ।

এই দুই ছোট সার আরও ৭ বার বুনিলে কাঁধের ১৬ সার হবে। তার পর এক সার কেবল উল্টা, ১ সার কেবল সোজা বুনে ২৭ ঘর ছেড়ে দাও (খতম করো)। তার পর বাকী ৩১ ঘর আর একটা ফালতো কাঁটায় তুলে রাখ। আবার এরপর বলা যাবে, এ ঘরগুলোর কি ব্যবস্থা হবে। এগুলো তোলা রইল ঘাড়ের অর্থাৎ গলার পেছনের জন্য। তার পর ওধারকার ২৭ ঘর ওদিকের কাঁধের জন্য ঠিক এইরকম করে বোনো। তা'হলেই পেছনটা হয়ে যাবে। এইবার ঐ রকম করে সামনের ৮৫ ঘরও বুনে নাও; আর কাঁধ-দুটী পরিষ্কার করে শেলাই করে ফেল।

কলার এইবার বুনতে হবে। সামনের ৩১ ঘর ২টা কাঁটায় ভাগ করে নাও। ১ টায় ১৬ এবং একটায় ১৫। ফাঁকটা ঠিক গলার মাঝখানে হবে। জামাটার ডানদিকটা তোমার দিকে রেখে গলার মাঝখান থেকে আরম্ভ করতে হবে। কলারের প্রথম সারের জন্য—প্রথম কাঁটায় সোজা প্লেন বুনবে। ৩ ফোঁড়ের পর একটী করে ফোঁড় বাড়াবে, যতক্ষণ না ৪টী ফোঁড় বাড়ে। তার পর কাঁধের সারের সঙ্গে মিলিয়ে, কাঁধের উপর ২৪ ঘর সোজা বুনে, ঘাড়ের ৩০ ঘর সোজা বুনবে। ৫ ফোঁড় অন্তর বাড়িয়ে যাবে, যতক্ষণ না মোট ৫টা ফোঁড় বাড়ে। তার পর ওদিকের কাঁধে মিলিয়ে নিয়ে ২৪ ঘর বোনো, এবং সামনের অপর অর্দ্ধ সোজা বোনো। তিন-তিন ঘর অন্তর বাড়িয়ে যাবে, যতক্ষণ না মোট ৪টে বাড়ে। এখন মোট ১২৩ ঘর থাকবে।

ঐ।—তিনটে কাঁটায় সমান ভাগ করে নাও (৪১ করে প্রতি কাঁটায়)। তার পর জামাটা ঘুরিয়ে নাও; আর একবার এদিক থেকে, একবার ওদিক থেকে বুনবে।

২য় সার।—৩ সোজা ১ উল্টা, ১ সোজা ক্রমান্বয়ে বুনবে। শেষটায় হবে ১ উল্টা তিন সোজা।

৩য় সার।—২ সোজা ১ উল্টা, ও ১ সোজা ক্রমান্বয়ে বুনিবে। শেষটায় হবে ১ উল্টা ২ সোজা।

৪র্থ সার।—দ্বিতীয় সারের মত।

৫ম সার।—২ সোজা, বাড়াও ১ ঘর খুঁটে নিয়ে, আর দুই ফোঁড়ের মাঝখান দিয়ে বুনে নিয়ে তার পর উল্টা বুনবে শেষ ২. ঘরের আগে পর্য্যন্ত। তার পর ১ ঘর বাড়াও—২ সোজায় শেষ হবে।

৬ষ্ঠ সার।—২ সোজা,—১ উল্টা ও ১ সোজা ক্রমে বুনবে। শেষ হবে ১ উল্টা, ২ সোজায়।

৭ম সার।—২ সোজা, বাকীটা উল্টা। শেষ ২ ঘর সোজা।

৮ম সার। যেদিকটা এতক্ষণ ডানদিক ছিল, এখন সেটাকে উল্টা দিক মনে করতে হবে। এবং যে দিকটা তোমার দিকে ছিল যখন তুমি জোড়া সার (২, ৪, ৬, সার) বুনছিলে, তাকে ডান দিক করে নিতে হবে। তা হলেই কলারটা ঝুলে পড়বে। অতঃপর ২ সোজা ১ বাড়াও; উল্টা বোনো। শেষ ২ ঘরের আগে পর্য্যন্ত ১ ঘর বাড়াও, ২ সোজা বোনো।

৯ম সার।—২ সোজা,—১ উল্টা ও ১ সোজা ক্রমে এই খানে ১ সোজাটা ফোঁড়ের পেছন থেকে নেবে 'এই কথাটী মনে রাখবে। ১ উল্টা, ২ সোজা শেষ।

১০ম সার—২ সোজা, বাকী সব উল্টা। শেষ দুইটা সোজা।

১১শ সার।—নবম সারের মত। তার পর অষ্টম সার

থেকে যেমন বোনা হয়েছে, সেই রকম আরও তিনবার বুনবে। অতঃপর ২ সোজা, বাকিটা উল্টা শেষ দুইটা সোজা বুনে ও ৪ সার প্লেন-বুনে আলগা ভাবে মুড়িয়া ফেল। আস্তিনের জন্য ১ম সার বগলের দিক থেকে আরম্ভ করিবে।

ঘর তুলে নিয়ে বগলের ধার দিয়ে ৮৬ ঘর বুনে নিয়ে তিন কাঁটায় ভাগ করে নেবে—যথা, ৩৪, ২০, ৩২।

২য় সার সমস্তটা ১ সোজা ১ উল্টা।

৩য় সার—সবটা উল্টা।

এইরূপে এই দুই সার বুনে যাবে; ও নজর রাখবে যে জামার প্যাটার্ণের সঙ্গে যেন মিল থাকে; এবং মনে রাখবে যে, তৃতীয় কাঁটায় শেষের উল্টা ঘরটা যেন শেলায়ের ঘর বা ফোঁড়; এবং পাঁচের সারে সেলায়ের ঘরটা কমে আসবে। যেমন মোজার জন্য। এবং ৯ম সারে, ১৩ সারে, ১৭ সারে, ২১ শের সারে, ২৫ শের সারে, ২৯ সারে, এই রকম করে কমিয়ে আনবে। অর্থাৎ ৪।৪ সার অন্তর কমাবে। এবং শেষ কমান যখন হলো, তখন সে সারে ৭২ ঘর থাকবে। তার পর ৬।৬ সার অন্তর ৯বার কমাবে। আর তখন থাকবে ৫৪ ঘর। বিশেষ দৃষ্টি রাখবে যে উল্টা বোনার সারেই কমানটা হবে। এই যে ৫৪ ঘরে দাঁড়াল, ঐ প্যাটার্ণে আরও ২০ সার বা যতখানি লম্বা চাও বুনে নাও।

ঐ আস্তিন। তার পর কমিয়ে নাও ৬ সোজা, ১ জোড়া ক্রমান্বয়ে বোনো। শেষের ৬নর সোজা। অধুনা ৪৮ ঘরে দাঁড়াইয়াছে। তারপর ২০ সার কবজীর জন্য ২।২ ঘর উল্টা, সোজা বুনে আলগা করে মুড়ে ফেল।

বরাকরের চিঠি

[শ্রীবিনয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী বি-এ]

শ্রীচরণকমলেষু—

দাদাবাবু, বহু আরাধনা করে দশরথের পুত্র-লাভের মত আমিও তোমার পত্র লাভ করেছি। আচ্ছা, তোমার এই বিশ্বগ্রাসী খবরের খিধে আমি মেটাই কি দিয়ে বল ত? নিজের চিঠি ত তিন লাইনের বেশী কোন দিনই হয় না; তবু আমাকে বড়—আরো বড় চিঠি লিখতে বল কোন্ মুখে? এত বড় স্বার্থপর তুমি কবে থেকে হলে? আজ যা'হোক একটা খবর দিচ্ছি; এর পর কিন্তু আশা কম।

সেদিন বিকেলে কুমারডুবি sidingএর কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পুবের দিকে একটা বনের মত;—তাতে আছে খালি বড়-বড় বাদামগাছ; আর এঁকে-বেঁকে সমস্ত বন ছেয়ে কতকগুলো অল্প গভীর লম্বা-লম্বা খাদ; যেন একটা বিশাল অক্টোপাস তার ক্ষুধার্ত্ত শুঁড় দিয়ে সমস্ত বনে খাবার খুঁজে ফিরছে; কিন্তু কিছুই না পেয়ে নিষ্ফল আক্রোশে আবার শুঁড় গুটিয়ে নিচ্ছে। দূরে-দূরে গোটা দুই-তিন কূয়ো সুন্দর মিষ্টি জল বুকে করে পথিকের অপেক্ষা করছে। তখনও বেশ বেলা আছে;—শীতের হলদে আলো লাল মাটির উপর পড়ে, যেন রক্তের দাগের মত দেখাচ্ছে। গাছগুলো সির্-সির্ করে পরস্পরের কাণে অতীতের কি এক শোণিতময় ঘটনার কথা চুপি-চুপি বলছে; আর সেই ভয়াবহ ঘটনার যায়গা দিয়ে প্রেতাত্মার মত ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। বেশীক্ষণ সেখানে থাকা আমার পোষাল না। ইচ্ছে ছিল, মাটিটা একটু নেড়ে চেড়ে দেখব—কিসের সন্ধানে এখানে এত টাকা খরচ করে খাদ কাটা হয়েছিল; কিন্তু হয়ে উঠল না। যত বেলা কমে চলল, যায়গাটার নির্জ্জনতাও আরো ভীষণ হয়ে পড়ল। পাখীগুলোও যেন কেমন ভয়ার্ত্ত স্বরে ডেকে-ডেকে, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে তুলতে লাগল। বাঙ্গালীর ছেলে, বলতে লজ্জা নেই, জানই ত—আমার কত ভূতের ভয়। তাই সব কাজ ফেলে, কাছেই যে পথ পেলাম, তাই দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি, সমুখেই যুগলকিশোর মারোয়াড়ীর বাড়ী।

মারোয়াড়ীদের যা দস্তুর, বছর ত্রিশেক আগে এই যুগল-কিশোর যখন দেশ থেকে আসে, তখন তার লোটা আর লাঠি ভিন্ন আর কোন সম্পত্তি কেউ দেখে নি। এসেই কার-খানার পাশে সামান্য একটা দোকান দেয়। তারি দু-পাঁচ বছর পরে, কারখানার বিচালীর contract নিয়ে বেশ মোটা

হাতে লাভ করে; কিন্তু এখনকার তুলনায় সে অবস্থা কিছুই নয়। তখন এ অঞ্চলের সেরা ধনী ছিল সৃষ্টিধর গোড়াই। এক পুরুষে এত বড় জমীদারি বড় কেউ করতে পারে না; আর তার মূলে খালি কপাল। কেন, তাই বলছি। এখন যেখানে কুমারডুবির কারখানা, তারই এক-ধারে ছিল সৃষ্টিধরদের সাবেক ভিটে। অবস্থা অতি দীন; তার বাপ দুটো ঘানি ঘুরিয়ে, কোন রকমে একটী ছেলে আর দুটী মেয়ে মানুষ করত। গরিব দেশ,—তেল কিনবার লোক ছিল অল্প, দামও তেম্নি সামান্য।

তারপর সৃষ্টির বয়স যখন বছর কুড়ি, তখন সাহেবরা, এ দেশে এল খনি খুঁজতে। বাপ বুড়ো, সৃষ্টিই কর্ত্তা! সে নগদ চারহাজার টাকা পেয়ে জমির তল-স্বত্ব, উপর-স্বত্ব সাহেবদের লিখে দিল। তাতেই এই কোম্পানি বড়মানুষ।

যা'ক সে কথা—সৃষ্টিধরের মাথা ছিল বড় পরিষ্কার। সে এই টাকা দিয়ে বড় করে তেলের কারবার সুরু করে দিল। এ দিকের সব সরষে কিনে, তেল করে, কলকাতায় চালান দিতে লাগল—দুদিনে তার অবস্থা ফিরে গেল। তেলের কল, মস্ত বাড়ী, হাস্যময়ী গৃহিণী—সবই তার অম্নি-অম্নি জুটে গেল। তাই ঠিক করল, জমীদারি কিনবে। প্রায় সমস্ত পরগণা মায় তল-স্বত্ব কিনে নিল। আর জমীদারি কিনতে গেলে যা হয়—অনেক অনাথ, বিধবা, পিতৃ-মাতৃহীনের অভিশাপও সেই সঙ্গে কিনতে হয়েছিল। কত জনে বলত, অত পাপের জমীদারি থাকবে না। কিন্তু কে শোনে সে কথা। সে তখন বাবু সৃষ্টিধর গোড়াই, জমীদার। ঘরে স্ত্রী পদ্মাবতী, পুত্র ভাগ্যধর,—সিন্দুক-ভরা টাকা; চারিদিকে জ্বল-জ্বল করছে সোণার সংসার। কিসের ভয় তার? লোকে কি না বলে? ও-সব কথায় কাণ দিতে গেলে আর জমীদারি করা চলে না।

(২)

যুগলকিশোর প্রথমে এসে, এদেরই বাড়ীর পাশে ছোট একটু বাড়ী করেছিল; ক্রমে ক্রমে সেটা পাকাও হল। চিরদিন প্রতিবেশী জমীদারের সঙ্গে সে খুব খাতির রেখে চলত। পরস্পর পরস্পরের দরকার মত দু'পাঁচ হাজার ধারও দিত—অবশ্যি উপযুক্ত দলিল-পত্র রেখে। যুগল-কিশোর বুড়ো হয়ে পড়লে, তার ছেলে শিউনারাণ বাপের কারবার চালাতে আরম্ভ করল। কিন্তু ভাগ্যধর বাপের টাকা খরচ ছাড়া আর কিছুই করে নি। কিন্তু তারও একটা শেষ আছে। ইতস্ততঃ করে-করে, বুড়ো সৃষ্টিধর একদিন তার খেয়ালের খরচ জোগাতে অপারগ কবুল করল। ভাগ্যধরের চোখের আলো নিভে গেল—টাকা কৈ—টাকা?

এমন সময়ে একদিন গ্রীষ্মের তরল সন্ধ্যায় শিউনারাণ ওই বাদাম-বনে তল-স্বত্বের বন্দোবস্ত চাইল। সেদিনের মিঠে জ্যোৎস্নায় দশদিক ক্রমেই ফুটে উঠছিল। বাদাম-বন থেকে একটা মিঠে গন্ধ ভাগ্যধরকে যেন পাগল করে দিয়েছে; বিলাসের ব্যয়ের জন্যে শত-শত সম্ভব-অসম্ভব কল্পনাতে সে অস্থির হয়ে উঠেছিল, এমন সময়ে শিউনারাণ এসে তার কাছে প্রস্তাব করল। বলল, তখনি নগদ দু' হাজার টাকা দেবে, যদি সমস্তটা তাকে লিখে দেয়।

ভাগ্যধর প্রথমে ভাবল দি', লিখে। আপাততঃ স্ফূর্ত্তির খরচটা ত জোগাড় হোক। কিন্তু আবার মনে হল, এত জমী থাকতে মাড়োয়ারী ওই জায়গাটা চায় কেন? আর তল-স্বত্ব নিতেই বা দু' হাজার টাকা দেবে কি লোভে? তখন চারিধারে খুব খনি বন্দোবস্ত হচ্ছে। Bengal Coal Co সবে মাত্র লায়েকডিহি বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। তাই তার মনে হল, নিশ্চয়ই এ জমীর তলায় কয়লা আছে। আর তা' হলে, দু' পাঁচ হাজারে কখনই তা' ছাড়া যেতে পারে না। একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই, শিউ-নারাণ স্বীকার করে ফেলল, তাকে কোন সাহেব না কি বলেছে, ওর তলায় কয়লা আছে। তাই সে ওটা নিতে চায়। ভাগ্যধর বোকা নয়। সে ভাবল, দু' হাজার ত কয়দিনে উড়ে যাবে। অথচ, যদি এই খনিটা কাটান যায়, তবে তার টাকায় বহু দিন তার চলবে। তাই আমতা-আমতা করতে-করতে শিউনারাণ যা বলল, তা'তে যখন বোঝা গেল যে, খুব ভালো কয়লা অনেক আছে,—আর তাতে অনেক বছর চলবে;—তার জন্যে সে আরও না হয় দু' হাজার টাকা বেশী ধার দিতে রাজি আছে,—তখন ভাগ্যধর মনে মনে দুর্য্যোধনের মত পণ করে বসল, সূচ্যগ্র ভূমিও for love or for money সে কাউকে দেবে না। এ খনি সে নিজেই কাজ করাবে।

কিন্তু তাতে টাকা চাই ঢের। অন্ততঃ দশটি হাজারের

কমে এতে হাত দেওয়া যেতে পারে না। কিন্তু সে টাকা তখন তার হাতে নেই। তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বল্লে, "ওটা আমি বন্দোবস্ত করব না। চিরদিন জানি, ওটাতে কয়লা আছে; তাই বেচে না দিয়ে অমনি ফেলে রেখেছি। তা দেখ নারায়ণ, তুমি যদি আমায় কিছু টাকা দেও, ত বড় ভাল হয়। এ বছর আমি ও খনি খুঁড়বই। তবে অপরের কাছ থেকে নিলে ত তুমি কিছুই পাবে না। এতে তোমারও কিছু থাকবে, অথচ আমাকেও আর অন্যের কাছে টাকার জন্যে যেতে হবে না। কি বল হে তুমি?"

শিউ নারাণ নিরুপায়। সব যায় দেখে অল্পতেই সন্তুষ্ট হয়ে, হাণ্ডনোটের উপর সাড়ে সতের টাকা সুদে আট হাজার টাকা দেবার কথা ঠিক করে, সে বাড়ী ফিরে গেল। প্রথম রাত্রে, ঠাণ্ডা বাতাসে, দূর থেকে তার হিন্দি গানের সুর ভেসে আসতে লাগল। ভাগ্যধর ভাবল, "অদ্ভুত লোক! এমন দাঁও ফস্কে গেল, তাতেও গান!" পর দিনই সে লেখা-পড়া করে টাকাটা নিয়ে নিল।

(৩)

এ দেনা করা সৃষ্টিধর মোটেই পছন্দ করে নি। বুড়ো হয়ে অনেক নরম হয়ে পড়েছে, তাই সে বলত, "দেখ বাপ,—পাপের ঘরে বাস করে আগুণ নিয়ে খেলা করলে চলে না। জানিস ত, এই জমীদারি তৈরী কর্ত্তে কত চোখের জল বইয়েছি; কেন তবে ধার করে সর্ব্বনাশের পথ তৈরী কচ্ছিস! নিজের জমী, তা থাক না পড়ে; দুটো বছর একটু সামলে খরচ কর—তখন কি আর আট-দশ হাজারের জন্যে আটকে থাকবে?" বুড়োর এ কষ্ট না করলেও চলত,—কোনই ফল হল না। ভাগ্যধর মনে-মনে হিসেব কচ্ছিল, সেই দু'-বছর টাকা থাকলে, কত রকম ফূর্ত্তি হতে পারত। কাজেই পুরো দমে কাজ আরম্ভ হল। একটা কূয়ো বসান হল; তাতে আঠাশ ফুট নীচেয় কয়লা না উঠে, উঠল জল। বয়লার বসিয়ে জল তুলে আবার গর্ত্ত চলল;—কিন্তু ফলে হল সেই একই;—উঠল লাল মাটি, আর জল। তখন অন্য দিকে খোঁড়ার বন্দোবস্ত হল; কিন্তু কতক কাজে, আর কতক বিলাসে, সমস্ত টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। নতুন করে টাকা ধারের বন্দোবস্ত হল। শিউনারাণই আরো পঁচিশ হাজার টাকা দিল সমস্ত জমীদারি বন্ধক রেখে। এবারেও বুড়ো সৃষ্টিধর বাধা দিল—কত বোঝাল; কিন্তু উপযুক্ত একমাত্র পুত্রের নীরস টাকা আনা পাইএর যুক্তির কাছে, তার কোন স্নেহের দাবী কিংবা অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কা খাটল না। চোখের জল বাঁ হাতে মুছে, বুড়ো থর-থর করে দলিলে নাম সই করে দিল।

তখন ভাগ্যধরের লালসার নেশা ছুটে গিয়ে, কয়লার নেশা ধরেছে। সে নতুন ভাবে কাজ আরম্ভ করেছিল। আবার কূয়ো হল; আবার কয়লা না উঠে, উঠল জল। সেটা ছেড়ে অন্য একটা খুঁড়ল। ঐ একই ফল, শুধু জল! কয়লা কই? এমনি করে অনেক দিন কেটে গেছে; টাকাও ঢের কমে গেছে। তখন একদিন বুড়ো বাপের কথায় হঠাৎ তার নেশা ছুটে গেল,—তাই ত এ কি কচ্ছে সে। একটুও কয়লা থাকলে কি তা পাওয়া যেত না। কলকাতা থেকে সাহেব এনে দেখাতে হবে। যেই কথা, সেই কাজ। খুব মোটা দর্শনী নিয়ে বড় একজন জিয়লজিষ্ট এলেন। মাটী দেখেই তাঁর ত চক্ষু স্থির! "এ কি—এ মাটীতে যে কয়লা খোঁজে, তার মত পাগল ত দুনিয়াতে আর দুটী নেই। এতে কয়লা থাকবে কি। এ ত লোহার মাটী—তাই এত লাল। আর লোহা যা আছে, তা' খুব কম আর খারাপ।" ভাগ্যধরের অবস্থা আর তোমাকে কি লিখব! সে না কি তখুনি ফিট হয়ে পড়ে গিয়েছিল। যাই হোক, যাবার সময় সাহেব একটা জায়গা দেখিয়ে বলে গেলেন, সেখানে তের ফুট নিচেয় খুব ভালো কয়লা আছে। আর অতি সামান্য খরচেই—এই দশ বার হাজার টাকাতেই তার কাজ চলতে পারে। যদি দশ হাজার টাকাও তার হাতে থাকত! হায়, হায়! ভাগ্যধরের হাত যে বিলকুল খালি!

(৪)

তার পরদিন সকাল থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। শ্রাবণের প্রথম ধারা যেন এই কয় মাসের সঞ্চিত জলভাণ্ডার উজার করে ঢেলে দিচ্ছিল। খাদ-নালা সব ভরে গেছে; তারই মাঝে ছাতি মাথায় ভাগ্যধর শিউনারাণের বাড়ী এসে উঠল। অনেকক্ষণ ভিজে কাপড়ে বসে থাকবার পর, শিউনারাণ বাইরে এসেই, গোড়াইকে দেখে হঠাৎ যেন

গম্ভীর হয়ে পড়ল। দুটো, চারটে একথা-সেকথার পর, ভাগ্যধর সব কথা খুলে বল্ল। কেমন করে সাহেব এসে এক নিমেষে তার সব স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছে। সে শুধু মিথ্যে আশা, আর শিউনারাণের কথার ওপর বিশ্বাস করে এত টাকা খরচ করেছে; আকণ্ঠ ঋণে ডুবেছে। তবে এখনও আশা আছে। যদি সে হাজার দশেক টাকা পায়, তবে পাশের জমীটাতে কাজ করে সব টাকা শোধ করে দেবে। শিউনারাণ তা' দেবে কি? সে কি মুহূর্ত্ত, যার উপর ভাগ্যধরের সমস্ত জীবন নির্ভর করছে! শুধু একটু ছোট "হাঁ" শোনবার জন্যে ব্যাকুল ভাবে শিউনারাণের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু কোন উত্তরই সে পেলে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, মাড়োয়ারী তার পেছনের সিন্দুক খুলে, একটা দলিল বার করে, সেটা খুলতে-খুলতে জিজ্ঞাসা কর্ল, 'গোড়াই, আজ কয় তারিখ'? ভাগ্যধর উত্তর দিল 'তেরই শ্রাবণ'! তার পর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল, সেই তার দেনা শোধবার শেষ দিন। নেশায় মত্ত, খেয়াল করে নি, সত্য মেয়াদ কেটে গিয়ে, একেবারে শেষের ১২ ঘণ্টা সুড় সুড় করে সরে যাচ্ছে। তার প্রতি মুহূর্ত্তের গতি যেন হাতের তলায় অনুভব করল।

শিউনারাণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার চমক, আর মুখের বিবর্ণতা সবই ধরা পড়েছিল। মুখখানি কৃত্রিম হাসিতে ঢেকে, মোটা শরীর দুলিয়ে সে বল্ল, "মনে আছে? তা বেশ। তাই আজ যে আমার নেবার, আর তোমার দেবার দিন। এখন উল্টো গান গাইলে চলবে কেন। নাগাদ সন্ধ্যে টাকাটা কি ফেলে দিতে পারবে না?" পাশের খাটে বাঙ্গালা মুহুরী প্রভুর এই রসিকতায় খিল্‌খিল্ করে একটু হেসে, খুব জোরে-জোরে কলম চালাতে সুরু করে দিল।

আর ভাগ্যধর,—সে যে কোন কালেই বিশেষ প্রকৃতিস্থ ছিল, তা ঠিক বলা চলে না,—তবে এখন যেন মাত্রাটা হঠাৎ বেশী চড়ে গেল। কত অনুনয় বিনয়ই না সে করল; কিন্তু কে শোনে তার সে কথা। তার পর একেবারে থেমে গেল যখন শিউনারাণ বল্ল, সে আগে থেকেই জানত—বাদাম তলায় কয়লা নেই, তা আছে পাশের জমীতে। পাকা ব্যবসায়ী গোড়াতেই চুপি-চুপি মাটী পরীক্ষা করিয়েছিল। তবু সে যে গোড়াতে বাদাম-বনই নিতে চায়, সেটা শুধু ভাগ্যধরকে পরীক্ষা করা। সেদিন যদি ও জমীতে কয়লা আছে নেও ছেড়ে দিত, তবে আসলটুকু আরও কিছু দিয়ে বন্দোবস্ত করে নিত। তা না হয়ে, সব শুনে যেমন লোভ করল, তেম্নি তার উপযুক্ত সাজাও দিল। এখন যদি সূর্য্যাস্তের মধ্যে মায় সুদ তেত্রিশ হাজার টাকা শোধ করে দিতে না পারে, তবে ত কাল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে শিউনারাণ সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে। এক মাসের মধ্যে নূতন খাদের কয়লা উঠতে আরম্ভ করবে। সে কেন আজ এ সুযোগ ছাড়বে? ভাগ্যধর তাকে জমী ছেড়েছিল কি? এ কথার আর উত্তর নেই। আর কোন অনুরোধ সে করে নি। চোখ মুছে যখন সে উঠে দাঁড়াল, তখন শিউনারাণ তাকে বলল "দেখ, তুমি ত কিছু লেখা-পড়াও শিখেছিলে। মনে আছে ত সে সব। কাল সকাল থেকে তুমি আমার সেরেস্তায় এখানে এসে বসো। আমার জমীদারি দেখো,—মাসে গোটা পঁচিশেক টাকা পাবে। আর তোমাদের ভিটের কোন খাজনা লাগবে না। তাই এসো তা হলে।"

ভাগ্যধর অবনত মস্তকে বেরিয়ে এল। তখনও ঝম্‌ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। গণ্ডে শুধু বৃষ্টির ধারাই ছিল কি না কেউ জানে না,—প্রকৃতিও যেন তার ব্যথার সঙ্গে সমান তাল দিয়ে হাহা করে ফেটে পড়ছিল। আজও ভাগ্যধর গোড়াই, জমীদার বাবু শিউনারাণ আগরওয়ালার সেরেস্তায় পঁচিশ টাকার মুহুরী। তবে বিনা খাজনায় ভিটেতে সে থাকতে চায় নি। প্রত্যেক বছর পুরো খাজনা দিয়ে আসছে।

কত দিন আগে এই সব কথা শুনেছিলাম; আর আজ যুগলকিশোরের বাড়ী দেখে মনে পড়ে গেল। সেই সব কথা ভাবতে-ভাবতে কোন্ দিকে যাচ্ছি, ঠিক ছিল না; হঠাৎ পেছনে মোটরের হর্ণ শুনে চমক ভেঙ্গে সরে দাড়ালাম। পাশ দিয়ে একখানা মিনার্ভা গাড়ী দশদিক ধূল্যেতে ঢেকে হুহু শব্দে চলে গেল। তাতে বসে শিউনারাণের ছেলে রামকিশোর।

আমার সামনেই একটা প্রৌঢ়া বছর দশেকের একটী মেয়ের হাত ধরে কলসিতে জল নিয়ে চলেছে। দূরে একটা বাড়ীর সাম্নে একজন বুড়ো লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, হাত দিয়ে চোখ ঢেকে সন্ধ্যার অন্ধকারে আমার দিকে কি যেন খুঁজছিল, আর ডাকছিল "লক্ষ্মী-লক্ষ্মী"। কাছে গিয়ে চিনলাম, এরা ভাগ্যধরের স্ত্রী আর মেয়ে; তেত্রিশ হাজার টাকার কূয়ো থেকে জল আনছে। আর পথে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ জমীদার সৃষ্টিধর গোড়াই তাদের অপেক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলাম।

ভাব ও বুদ্ধি

[শ্রীশশধর রায়, এম্‌-এ, বি-এল্‌]

বুদ্ধি কথাটি আমরা সকলেই বুঝি। কিন্তু ভাব কি, তাহা বোধ হয় সকলে বুঝি না। কাম, ক্রোধাদি ভাব; স্নেহ, ভক্তি প্রভৃতি ভাব। ইহারা অনেক সময় বুদ্ধির শাসন মানে না। বুদ্ধিই মানুষকে জীবগণ মধ্যে প্রভুত্ব দিয়াছে; বুদ্ধি মানবের বিশেষত্ব না হইলেও, প্রধান গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধি জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে মানবের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বুদ্ধিবলে মানব ভগবৎ-তত্ত্ব বিষয়েও ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে। বুদ্ধি মহান্‌,—বুদ্ধির সীমা নির্দ্ধারণ করা অসাধ্য। এ স্থলে তাদৃশ ব্যাপক অর্থে এই শব্দ ব্যবহার করিতেছি না। বিষয়-বুদ্ধি, মানব-জীবনের দৈনন্দিন কর্ম্মের ভাল-মন্দ বিচার-বুদ্ধির কথা এ প্রসঙ্গে উত্থাপন করিতেছি। ভাব শব্দও ঐহিক; সুতরাং সঙ্কীর্ণ অর্থেই ব্যবহার করিতেছি। ভগবদ্ভাবের কথা এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি না। ভাব ও বুদ্ধি, দুইটি শব্দই সঙ্কীর্ণ অর্থে বুঝিতে হইবে; মোটা কথায়, ভাব বলিতে মনের গতি, মনের ঝোঁক বুঝিতে হইবে; এবং বুদ্ধি বলিতে ভাল-মন্দ, উপকার-অপকার নির্ণয় করিবার ক্ষমতা বুঝিতে হইবে।

বুদ্ধি ভাবকে সংযত করিবার চেষ্টা করে। কেহ যখন কোন বিশেষ ভাবে মত্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে উদ্যত হয়, বুদ্ধি তখন ভাল-মন্দ বুঝাইয়া দিয়া, কর্ম্মের সহায় অথবা বাধা স্বরূপ হয়। ভাব ভাল-মন্দের, উপকার-অপকারের বিচার করে না। সে কার্য্য করে বুদ্ধি। সে এই উপায়েই ভাবের সহায় অথবা বাধক হইয়া থাকে। ভাবের বাধক ভাবও হইতে পারে। প্রবলতর বিরোধী ভাব দুর্ব্বল ভাবকে প্রতিহত অথবা নষ্ট করিতে পারে। পক্ষান্তরে, এক ভাব অন্য সমধর্ম্মী ভাবের সহায়ও হইতে পারে।

স্নায়ুমণ্ডল এবং তাহার সর্ব্বোচ্চ পরিণতি মস্তিষ্ক—এতদুভয় যন্ত্রই ভাব এবং বুদ্ধি প্রকাশের যন্ত্র। স্নায়ুমধ্যে এবং মস্তিষ্ক-পদার্থে বহু গণ্ড আছে। উপরিস্থ গণ্ড নিম্নস্থ গণ্ডের ক্রিয়া প্রতিহত অথবা নষ্ট করিতে পারে। ক্রমে প্রতিহত করিতে-করিতে কালসহকারে নষ্ট করে। এই হেতু ভাব

ক্রমশঃ অব্যক্ত থাকিতে-থাকিতে অবশেষে নষ্ট হইয়া যায়। পক্ষান্তরে ভাব পুনঃ-পুনঃ ব্যক্ত হইতে-হইতে কালক্রমে অদমনীয় হইয়া উঠে। মঙ্গল-জনক ভাবের বিকাশ এবং অমঙ্গল-জনক ভাবের দমন স্নায়ুমণ্ডলের এবং মস্তিষ্কের অবস্থার উপর এবং অভ্যাসের উপর অধিকাংশে নির্ভর করে।

সাধারণতঃ ভাব হইতে কর্ম্ম জাত হয়। প্রথমে ভাব হয়, তৎপর কর্ম্ম। কোনও কোনও স্থলে, ভাব না হইলেও, অথবা বিরোধী ভাব উপস্থিত হইলেও, কর্ম্ম জাত হইতে পারে। এই সকল স্থলে বুদ্ধি দ্বারাই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সে বুদ্ধি ভ্রমাত্মকও হইতে পারে, যথার্থও হইতে পারে। আর, যখন ভাব অবর্ত্তমানে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তখন অজ্ঞাতসারেই হইয়া থাকে। ব্যক্তির অজ্ঞাতে, অননুভূত ভাব হইতে বহু ক্ষেত্রে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। আমাদিগের মনের যেন দুইটী স্তর আছে; একটা আমরা জানি, অপরটা জানি না। এই অজ্ঞাত স্তরের ক্রিয়ার ফলে বহু কর্ম্ম সিদ্ধ হয়। অনেকে নিদ্রিতাবস্থায় কর্ম্ম করেন; কিন্তু জাগরিত হইবার পর তাহার কিছুই স্মরণ করিতে অথবা বুঝিতে পারেন না। জাগরিত অবস্থাতেও অনেক কর্ম্ম করি, পরে তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হই। এ সকল অবস্থা অনেকেরই জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে, সুতরাং ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক।

ভাব হইতে, বুদ্ধি হইতে, ভাব না হইলেও, কর্ম্ম হইয়া থাকে। জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারেও কর্ম্ম হয়। কিন্তু জ্ঞাতসারে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, এ স্থলে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। এ সকল ক্ষেত্রে ভাব সঙ্কল্প অথবা বিকল্প করে। ইহাকে আমরা মনের কর্ম্ম বলি। মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ইন্দ্রিয়। কোন একটী কর্ম্ম করিব, এই ভাবের নাম সঙ্কল্প; করিব না, এই ভাবের নাম বিকল্প। কর্ম্মটী করিব, এইরূপ ভাব হইলে, বুদ্ধি তাহার ভাল-মন্দ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়; এবং ভাল বিবেচনা হইলে কর্ম্মটী অনুষ্ঠিত হয়, না হইলে, অনুষ্ঠিত হয় না। সাধারণতঃ, এ কথা সত্য। কিন্তু মন যখন কোন প্রবল ভাবে মত্ত হয়, তখন বুদ্ধি নিরস্ত থাকে, অথবা পরাস্ত হয়; অর্থাৎ, সেই প্রবল ভাবের সমক্ষে বুদ্ধি ভাল-মন্দের বিচারই করিল না; অথবা বিচার করিয়াও পরাস্ত হইয়া গেল; মন্দ হইলেও, অমঙ্গল-জনক হইলেও, ভাববশেই সেই কর্ম্মটী অনুষ্ঠিত হইল। ঈদৃশ স্থলে বুদ্ধি এবং বিরোধী ভাবও অনেক সময় পরাস্ত হইয়া যায়। তখন বুঝিতে হইবে যে, যে ভাব কর্ম্ম উৎপন্ন করিল, তাহা অত্যন্ত প্রবল ভাব। বুদ্ধি কিম্বা বিরোধী ভাব দুর্ব্বল। এ স্থলে প্রবলের জয়, দুর্ব্বলের পরাজয়। ঈদৃশ ভাব-প্রাবল্যের কারণ কি? এক কারণ স্নায়ু ও মস্তিষ্কের অবস্থা;—ইহা বোধ হয় প্রধানতঃ বংশানুগত। অপর কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা অথবা বেষ্টনী। কিন্তু কখন-কখন "দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ" উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অত্যন্ত প্রতিকূল, তথাপি প্রহ্লাদ স্বকর্ম্মে অটল। এ সকল স্থলে মনের অজ্ঞাত স্তর হইতে কর্ম্ম জাত হইতেছে, এরূপ মীমাংসা অসঙ্গত নহে। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ একা অসংখ্য নরনারীর অনুষ্ঠিত কর্ম্মের গতির প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; এবং ন্যূনাধিক সফলতাও লাভ করিয়াছিলেন। এ স্থলে তিনি ভাবোন্মত্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধি হয় ত বলিয়াছিল, অথবা বুদ্ধিমানকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয় ত বলিতেন, "একা এক ব্যক্তির দীর্ঘকালের পুরুষানুক্রমিক অনুষ্ঠান রোধ করিতে সমর্থ হওয়া সম্ভবপর নহে; দশজনের সম্মিলিত শক্তি ব্যতীত একার চেষ্টায় কার্য্য হইতে পারে না।" ম্যাট্‌সিনি যখন মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া প্রবল পরাক্রান্ত অষ্ট্রীয়াধিপতির অধীনতা হইতে ইটালী দেশকে মুক্ত করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তখন তিনি প্রবল ভাবের উত্তেজনায় মত্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধিমান হয় ত তাঁহাকে বলিতেন, মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া প্রবল পরাক্রম অষ্ট্রীয়াধিপতির বিরুদ্ধে উত্থান করা মূর্খতা মাত্র। বুদ্ধি ঈদৃশ অনুষ্ঠানের সমর্থন করে না। ওয়াশিংটনও ভাবোন্মত্ততায় সফল হইয়াছিলেন। বিজ্ঞতা এবং বুদ্ধি এ সকল স্থলে ভাবের বন্যায় ভাসিয়া যায়। ঈদৃশ ক্ষেত্রে ভাবই সফলতার জনক;—বুদ্ধি ভাবের অনুগত হইয়া দাসের ন্যায় পরিচর্য্যা করে মাত্র। অর্থনীতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয়—দেশব্যাপী প্রকাণ্ড কর্ম্মসকল বুদ্ধির দ্বারা জগতে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় না; এ সকল স্থলে ভাবই কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হইয়া সফলতা আনয়ন করে। এখানে একটী সামাজিক উদাহরণ দিব। নব্বই বৎসর, একশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের এই অঞ্চলে সর্ব্বসাধারণের সংস্কার ছিল যে, বালিকাকে লেখা-পড়া শিখাইলে সে বিধবা হয়। আমার মাতামহ সর্ব্বাগ্রে আমার মাতা-

ঠাকুরাণীকে স্বয়ং লেখা-পড়া শিক্ষা দেন; এবং তন্নিমিত্ত আমার মাতামহী-ঠাকুরাণী কন্যার বৈধব্য আশঙ্কায় সর্ব্বদা ভীত থাকিতেন। স্বামী-স্ত্রী মধ্যে এই আশঙ্কা হেতু অনেক সময়ে কলহ হইত। তথাপি মাতামহ কন্যাকে শিক্ষা দিতে বিরত হইতেন না। এক্ষণে ঐ অমূলক আশঙ্কা কেহই করেন না; সকলেই কন্যাকে লেখা-পড়া শিক্ষা দিতেছেন। এ অঞ্চলে স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্ত্তক আমার মাতামহ ৺রাজেশ্বর তালুকদার। তিনি কন্যাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কন্যা বিবাহ-অন্তে স্বামী-গৃহে গেলে, সর্ব্বদা তাহার সংবাদ পাইবার আশায় তাহাকে লেখা-পড়া শিখাইয়াছিলেন; তাহা হইলে কন্যা স্ব-হস্তে তাঁহাকে পত্র লিখিতে পারিবে,—তিনিও সর্ব্বদা কন্যার সংবাদ জানিতে পারিবেন। এ স্থলে দেশব্যাপী প্রকাণ্ড একটা কুসংস্কার দূরীভূত হইল কি প্রকারে? কেবলমাত্র অপত্য-স্নেহ তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া লক্ষ-লক্ষ লোকের চিরপোষিত সংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করাইয়াছিল। তাঁহার দৃষ্টান্ত এক্ষণে সর্ব্বজন-গৃহীত হইয়াছে। কেহ কোন দিন বুদ্ধি পূর্ব্বক, পরামর্শ পূর্ব্বক বহুলোকের সহিত মিলিত হইয়া, সভা-সমিতি দ্বারা ঐ কুসংস্কারের প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হয় নাই। কেবল ভাব হইতে জাত উত্তেজনা হইতেই দেশব্যাপী প্রকাণ্ড একটী সংস্কার বিনষ্ট হইয়া গেল। বুদ্ধি এ কার্য্যে কিছুই করে নাই, করিতে পারেও না। বরং অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমার মাতামহের এই কার্য্যে প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন; তাঁহার গুরুজন, বন্ধুজন, তাঁহার স্ত্রী, সকলেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অপত্য স্নেহ কোন বাধাই মানে নাই। ভাবের স্রোতে সমস্ত বাধা তৃণবৎ ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহাতে এ অঞ্চলের মহোপকার সিদ্ধ হইয়াছিল; এবং তিনিও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। এইরূপ সর্ব্ববিষয়েই দেখা যায়। দেশব্যাপী প্রকাণ্ড অনুষ্ঠানমাত্রেই ভাব হইতে প্রবৃত্ত হয়। যখন তান্ত্রিকগণ সুরাপানে বিহ্বল হইয়া রজকিনী, চণ্ডালিনী প্রভৃতি লইয়া ভৈরবী-চক্র করিতেন, তখন পরস্ত্রী-গমন, পশু-হত্যা, নর-হত্যা প্রভৃতি কাণ্ড বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র নিত্য অনুষ্ঠিত হইত। এই বহুজন-আচরিত কর্ম্ম রুদ্ধ হইয়া গেল কিরূপে? সার্দ্ধ-পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপ হইতে যিনি এই সকল আচরণের বিরুদ্ধে পর্ব্বতের ন্যায় অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, বজ্র-গম্ভীর-নির্ঘোষে ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে যাঁহার চেষ্টা অনেকাংশে সফল হইয়াছিল, তিনি শক্তিশালী সম্রাট্ ছিলেন না; কাহাকেও দণ্ড-পুরস্কার দিবার অধিকার তাঁহার ছিল না। তথাপি সুরাপান, * ব্যভিচার, নরহত্যা ইত্যাদি কদাচার নিবৃত্ত হইল কেন? আমার কথা আমার স্ত্রী-পুত্র মান্য করে না; তোমার কথা তোমার নিতান্ত আত্মীয়-স্বগণ গ্রাহ্য করে না; কিন্তু শ্রীহট্ট নিবাসী জনৈক দরিদ্র, দুর্ব্বলদেহ, নিরীহ ব্রাহ্মণের এমন কি ছিল, যাহাতে প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশে যুগান্তর উপস্থিত করিল? সে আর কিছুই নহে,—কেবল একনিষ্ঠ ভাবোন্মত্ততা। আমার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি তখন উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই বলিত, "আপনি এ চেষ্টা ত্যাগ করুন; ইহা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। একা কখনই ঈদৃশ কার্য্য সিদ্ধ করা যায় না। সমস্ত দেশের স্রোত আপনি একা ফিরাইতে কখনই সমর্থ হইবেন না। বরং লক্ষ-লক্ষ লোক আপনার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবে; আপনাকে প্রহার করিবে। আপনার তাহাতে দুঃখ ভিন্ন কোনই ইষ্টসিদ্ধি হইবে না।" বিজ্ঞ, বুদ্ধিমানগণ এইরূপেই চিরদিন ভাবের আবেগকে প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বিজ্ঞতা অথবা বুদ্ধি কোন কালেই ভাবের প্রবল স্রোত নিবারণ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। এ কার্য্য উহাদিগের নহে,—এ কার্য্যের সফলতা উহাদিগের অধিকার-বহির্ভূত। এ কার্য্য ভাবের, একনিষ্ঠ ভাবের। কেমন করিয়া দুর্ব্বল একখণ্ড তৃণ মত্ত হস্তীকে বন্ধন করিতে কৃতকার্য্য হয়, কেমন করিয়া একজনের একটু ফুৎকার-বায়ু দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত পর্ব্বতকে উড়াইয়া দেয়, কেমন করিয়া সহায়হীন, ক্ষমতাহীন একা এক ব্যক্তি প্রবল-পরাক্রান্ত মহাশক্তির প্রতিকূলে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া যুগান্তর আনয়ন করে,—এ সকল বুদ্ধির অবোধ্য, কিন্তু ভাবের নিকট এ সকল অতি সহজসাধ্য। পৃথিবীর ইতিহাস এই মহাশিক্ষা চিরদিনই দিতেছে। তথাপি নির্লজ্জ বুদ্ধি বিজ্ঞতার দোহাই দিতে কোন ক্রমেই নিবৃত্ত হইতেছে না। পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াও বুদ্ধি এ কাল পর্য্যন্ত বিজ্ঞতার ভান ত্যাগ করিল

* পরে অন্য কারণে সুরাপান পুনরায় প্রচলিত হইয়াছে; সে পৃথক কথা।

না। সে তাহার আপন অধিকার বুঝিতে পারে না। তাহার অধিকার দাসত্বে; প্রভুত্বে নহে। ভাবই প্রভু; এ সময়ে মহদনুষ্ঠানে ভাবই প্রভু; বুদ্ধি তাহার দাস। সে দাসের পদে থাকিয়া, ভাবের আদিষ্ট কর্ম্ম কিরূপে সুসিদ্ধ হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবে; ইহাই মাত্র তাহার অধিকার। ইহাতেও সে অকৃতকার্য্য হইতে পারে। হয় হউক, তাহাতেও ক্ষতি নাই। একনিষ্ঠ ভাব স্ব-কর্ম্ম সিদ্ধ করিবেই। বুদ্ধি তাহার সহায় হয়, ভালই; না হইলেও আসে-যায় না। একাগ্র ভাব জনসাধারণের মনে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিবেই; তখনই সিদ্ধি আসিয়া তাহাকে জয়যুক্ত করিবে। কারণ, অসংখ্য লোকের মনে যে ভাব জাগরিত হয়, তাহা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া অনায়াসে অসাধ্য সাধন করে। এ স্থলে ভাব, মনের অজ্ঞাত স্তরের আদেশ; ভাবুক স্বয়ংও জানিতে কিম্বা বুঝিতে পারেন না যে, তিনি কিরূপে চালিত হইতেছেন,—কোন্ উপায় অবলম্বন করিতেছেন,—কোন্ পথে সিদ্ধি আসিয়া তাঁহাকে জয়যুক্ত করিল। যাহা আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে সম্ভব করিবার অন্য পন্থা নাই; তাহা চিরদিনই এই পন্থায় সম্ভব হইয়া আসিতেছে। ভাব ইহার অনুষ্ঠাতা; বুদ্ধি এ ক্ষেত্রে নগণ্য।

কিন্তু ভাব, একাগ্র ভাব, উৎপন্ন হয় কেমন করিয়া? এ ভাবের জন্মস্থান কোথায়? ইহার জন্মস্থান প্রেম, ভালবাসা, প্রীতি, সহানুভূতি। এ সকল এক কথাই। যখন সংখ্যাতীত নর-নারী বিপদ-সাগরে পড়িয়া নানাবিধ দুঃখে জর্জ্জরিত হয়; যখন তাহারা দলিত, অধঃপতিত, ক্লিষ্ট হইয়া মৌন আর্ত্তনাদে ব্যোম-কর্ণ বিদীর্ণ করে, তখন ভাবুক তাহা শ্রবণ করেন, অন্যে শ্রবণ করে না। তিনি ঐ নীরব আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া, প্রেমবশতঃ, সহানুভূতিবশতঃ বিচলিত হইয়া, ক্রমে-ক্রমে আত্মহারা হন। তাঁহার সমস্ত আত্মা হৃন্মর্ম্মস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে তন্ময় করিয়া ফেলে। তিনি তখন একাগ্র সাধনার অধিকারী হন। ইহা তিনিই বুঝেন, অথবা তিনিও বুঝেন না। অন্যে কি বুঝিবে? অন্যের দ্বিধা-সর্ব্বস্ব বুদ্ধি এ রহস্য ভেদ করিতে গিয়া নিয়তই হতমান হইয়া ফিরিয়া আসে। একনিষ্ঠ ভাবুকের সমস্ত স্নায়ু-সংস্থান, সমস্ত মস্তিষ্ক-পদার্থ একমাত্র ভাবেই পরিপূর্ণ হয়। অন্য ভাব, দ্বিধা, তর্ক, সন্দেহ, সকলই নিরুদ্ধ হইয়া যায়। বুদ্ধি এই সকল লইয়া ব্যাপৃত থাকে; সুতরাং এ সকলের নিবৃত্তির সঙ্গে-সঙ্গেই বিরোধী বুদ্ধি নষ্ট হয়! তখন সফলতা অনিবার্য্য, অদমনীয় হইয়া উঠে। পুরাকালে একজন ইয়োরোপীয় রাজা একজন প্রদেশীয় ভাবুকের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, উৎপীড়ক প্রবল পরাক্রান্ত; এবং ভাবুক নিরীহ, দুর্ব্বল-দেহী। ভাবুক প্রজ্বলিত অগ্নিতে স্বীয় হস্ত প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াও, অটল ভাবে, প্রফুল্ল বদনে হস্ত ভস্মীভূত হইতেছে, দেখিতে লাগিলেন। উৎপীড়কের অত্যাচার এ স্থলে ব্যর্থ হইয়া গেল। ভাবুকের দুঃখ-বোধ তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার একাগ্র ভাব অন্য সমস্ত বোধকে নিরুদ্ধ করিয়াছিল। ভাবের এমনই শক্তি! বুদ্ধি ইহা ধারণা করিতেই পারে না। বর্ত্তমান কালেও জনৈক তন্ময় ভাবুক, যিনি চিরদিন উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করতঃ শীত হইতে দেহ রক্ষা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তিনি অকস্মাৎ এক শুভ মুহূর্ত্তে, দারুণ শীতে, দীর্ঘকাল নগ্ন দেহে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন; অথচ এক দিনের জন্যও তাঁহার দুর্ব্বল দেহ পীড়িত হইল না; একটু সর্দ্দিও কখন তাঁহাকে আক্রমণ করিল না। এ সকল কি? এ সকল আর কিছুই নহে; কেবল অনন্যসাধারণ মানব-প্রেমে তাঁহার সমস্ত মন পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাহাতেই এ সকল অসম্ভবও সম্ভবে পরিণত হইল। প্রেমই সর্ব্বত্র জননীকে দারুণ শীতেও সন্তানের মূত্র-সিক্ত আর্দ্র শয্যায় সুখে শয়ান করাইয়া রাখে। মানব-প্রেমের অসাধ্য কিছুই নাই। যে হতভাগ্য ব্যক্তি ঈদৃশ প্রেমের অধিকারী নহে, তাহার বুদ্ধি এ স্থলে কিছুই ধারণা করিতে পারে না। অসীম মানব-প্রেম হইতে অটল বিশ্বাস জাত হয়। সেই বিশ্বাসে পর্ব্বতও টলিয়া যায়। কিন্তু, বুদ্ধিমান তার্কিক এ ক্ষেত্রে পরাস্ত হইয়া যান। এ ক্ষেত্র তাঁহার অগম্য। তাঁহার বিভিন্ন স্নায়ু-সংস্থান, তাঁহার বিভিন্ন ভূয়োদর্শন, তাঁহার নিষ্ফল তর্ককে আরও নিষ্ফল করিয়া তুলে। ভাবুকের এই একাগ্র ভাব আত্মার শক্তি;—অজ্ঞাত, সর্ব্বগ্রাসী শক্তি। ইহার নিকট দেহ পরাজিত, বুদ্ধি পরাজিত, বিরোধীভাবও পরাজিত। ইহা নিষ্ফলতাকেও গ্রাহ্য করে না। পুনঃ-পুনঃ নিষ্ফল হইয়াও একাগ্র ভাবুক তাঁহার ভাবকে ত্যাগ করেন না। পুনঃ-পুনঃ নিষ্ফল হইলেও, পুনঃ-পুনঃ অকৃত-

কার্য্য হইলেও, তিনি স্বীয় ভাব, স্বীয় অনুষ্ঠান হইতে তিল-মাত্র বিচলিত হন না। বরং যে নিষ্ফলতা বিজ্ঞকে প্রতি-নিবৃত্ত করে, তাহাই একনিষ্ঠ ভাবুককে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, সহস্র-গুণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে। সে প্রতিজ্ঞা হইতে যে প্রযত্ন অবলম্বিত হয়, তাহা অদমনীয়; তাহাই সফলতার জনক। এ ক্ষেত্রে আর কিছুই চাই না; চাই কেবল গভীর মানব-প্রেম, ন্যায় ও ধর্ম্মে অবিচলিত মতি, একনিষ্ঠ ভাব, দৃঢ় বিশ্বাস এবং আত্মত্যাগ। মানব-প্রেম হইতে, ধর্ম্মে মতি হইতে একনিষ্ঠ ভাব জাত হয়; তাহা হইতে দৃঢ় বিশ্বাস ও আত্মত্যাগ উৎপন্ন হয়। তাহাতেই সফলতা আনয়ন করে। ধর্ম্মে মতি না থাকিলে, মানব সংশয়বাদী হয়; তখন সে সু(?)সময়ের অপেক্ষা করে। আত্মত্যাগ না থাকিলে মানব আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হয়। নিজেকে বড় দেখে, জন-সাধারণকে ছোট দেখে; সুতরাং তুচ্ছ করে। ইহার ফলে তাহার লোক-প্রেম জাত হইতে পারে না। তাহার সকল অনুষ্ঠানই আত্ম-প্রতিষ্ঠার উপায় মাত্র হইয়া উঠে। সেও সু(?)সময়ের অপেক্ষা করিয়া কৌশল-বাদী হয়। কৌশল-পন্থা ন্যায় ও ধর্ম্মের বিরোধী; সুতরাং চির-নিষ্ফল। ইহার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত চিরকালই মানব-সমাজকে বিধ্বস্ত করিতেছে। বর্ত্তমান যুগে এতদ্দেশে এরূপ নিষ্ফলতার দৃষ্টান্ত সর্ব্বজন-সমক্ষে বিরাজমান রহিয়াছে। অনন্যসাধারণ প্রতিভা, ক্ষুরধার বুদ্ধি, ন্যায় ও ধর্ম্ম হইতে বিকৃত হইয়া, আত্ম-প্রতিষ্ঠায় রত হইতেছে। সুতরাং পরম মঙ্গল-জনক দিগন্ত-বিস্তৃত কামনাও ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। জন-প্রেমের অভাবে বিশাল অনুষ্ঠান, অক্লান্ত শ্রমও নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে। মঙ্গল-কামনা অমঙ্গল প্রসব করিতেছে। এ দৃষ্টান্ত বোধ হয় আজিকার দিনে কাহাকেও চক্ষে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে না। কারণ, বঙ্গদেশে ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এ বৃক্ষে এ ফল ফলিবেই। সিদ্ধির পথ এ পথ নহে।

সিদ্ধি সাধনাকে অনুসরণ করে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার—এই চারি পদার্থ মিলিত হইয়া যে চতুর্বর্গ সাধনা অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই ফল সিদ্ধি। যাহা সাধনার বস্তু তাহা প্রথমতঃ মনে ভাব রূপে উদয় হইবে। তখন মন সঙ্কল্প করিবে। বুদ্ধি তাহা কর্ম্মে পরিণত করিবার নিমিত্ত উপায় উদ্ভাবন করিবে। তৎপরে কর্ম্মে পরিণতির, অর্থাৎ সিদ্ধির মঙ্গল-মূর্ত্তি চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া, সাধককে ভবিষ্যৎ সুখের সলিলে স্নাত করিবে। ইহারই ফলে অনুকূল প্রযত্ন কর্ম্মে আত্ম-প্রকাশ করিবে। সে প্রকাশ সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দলিত করিয়া, পরিণামে সিদ্ধি আনয়ন করিবেই। তখন সাধকের চিত্ত আনন্দে মগ্ন হইয়া অহংজ্ঞানের সহিত যুক্ত হইবে। তখনই এ সাধনা সফল হইবে। ইহার পরিণাম যে আনন্দ, তাহা সকল বন্ধন মোচন করিয়া দেয়। আত্ম-পর বোধ তিরোহিত করে। মানব তখন জীবন্মুক্ত হয়।

এ ফলের অধিকার ভাবের। ভাবই এ সাধনার প্রবর্ত্তক। বুদ্ধি ইহার প্রবর্ত্তক হইতে পারে না। পথ-নির্দ্দেশক হইতে পারে, না হইতেও পারে। একনিষ্ঠ ভাব ত্যাগের মধ্য দিয়া ধর্ম্মকে আশ্রয় করে। ধর্ম্মই ধরা-ধারক। সুতরাং সিদ্ধি অনিবার্য্য। ভাব ও বুদ্ধি যখন অনন্ত প্রসার লাভ করে, তখন উভয়ে অভিন্ন। তখন বুদ্ধি জ্ঞানে পরিণত হয়, এবং জ্ঞান হইতেই মানব মুক্তি লাভ করে। কিন্তু বুদ্ধি যতদিন ব্যবহারিক সীমায় আবদ্ধ থাকে, ততদিন তাহার স্থান ভাবের দাসত্বে। ভাব তাহার প্রভু, সে ভাবের অনুচর। এই সম্বন্ধের ব্যতিক্রম হইলেই জীবের অকল্যাণ; ইহার রক্ষণেই জীবের কল্যাণ। এ কথা বিস্মৃত হইলে বন্ধন-মোচন অসম্ভব; সে আশাও বাতুলতার নামান্তর মাত্র।

Dual mind ও স্বপ্নতত্ত্ব

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের মধ্যে সকলেই ডাক্তার হাড্‌সনের Law of Psychic Phenomenaর Dual mind theory স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ডাক্তার হাড্‌সনের মতের সমালোচনা বা বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; কেবল, তাঁহার Dual mind theory হইতে স্বপ্নতত্ত্বের বিষয়ে কিছু অবগত হওয়া যায় কি না, তাহা দেখাই উদ্দেশ্য।

তাঁহার মতে চিত্ত বা মন দুইটি, এবং তাহা সমস্ত মানবের মধ্যেই বর্ত্তমান। প্রথম mortal, অথবা ভিন্ন-ভিন্ন পণ্ডিতদিগের কথায়, objective, conscious বা voluntary mind; এবং দ্বিতীয় immortal বা subjective, subconscious, involuntary mind। আমরা তাহাদের বহিঃচিত্ত ও অন্তঃচিত্ত বলিব।

জাগ্রত, অথবা সহজ, সজ্ঞান অবস্থায় আমরা যাহা করি বা ভাবি, তাহা আমাদের বহিঃচিত্তের অথবা conscious mindএর দ্বারাই সাধিত হয়। যখন আমরা নিদ্রিত থাকি, তখনকার সমস্ত কার্য্যই subjective বা subconscious mindএর অধীন। এমন কি, আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামান্য কম্পন ও স্পন্দন পর্য্যন্তের উপর প্রভুত্ব subconscious mindএরই থাকে। সহজ অবস্থায় গুপ্ত থাকে; আবার নিদ্রিত অবস্থায় conscious mind নিষ্ক্রিয় থাকে।

পণ্ডিত Herbert Parkyn বলেন, Involuntary mind is the mind that controls us during sleep; one is not conscious of the operations of the involuntary mind. Involuntary mind controls every function of every organ of the body; it is the seat of the emotions and the guardian of memory; our whole educational experience is stored in it; it is amenable to control by the voluntary mind.

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, নিদ্রিত অবস্থায় আমরা অন্তঃচিত্তের অধীন হইলেও, তাহার সমস্ত কার্য্য আমাদের অজানিতই থাকে। আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা—তা সে যতই সামান্য হউক না কেন, সমস্তই—ইহার মধ্যে সঞ্চিত থাকে; এবং আমরা চেষ্টা করিলে, আমাদের voluntary mind দিয়া ইহার উপর কতকটা কর্ত্তৃত্ব করাইয়া লইতে পারি। প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, Hypnotic অবস্থায় মানুষের এই conscious mindকে নিষ্ক্রিয় করিয়া, তাহার subconscious mindকে কতকটা জাগাইয়াই, তাহার দ্বারা নানারূপ কার্য্য করাইয়া লওয়া হয়, যাহা হয় ত সজ্ঞানে তাহার দ্বারা কিছুতেই সম্ভব হইত না।

অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রথম-দর্শনেই কোনও কোনও লোকের উপর একটা অশ্রদ্ধা, ক্রোধ বা ভালবাসার ভাব অকারণেই আমাদের মনের মধ্যে আসিয়া পড়ে। একটু চিন্তা করিলেই কিন্তু বুঝা যায় যে, উক্ত ব্যাপারের মধ্যেও এমন কারণ আছে, যাহা আমাদের মনে অশ্রদ্ধা, রাগ বা ভালবাসার ভাব আনিয়া দেয়; এবং সেই কারণটিও আমাদের subconscious mind ছাড়া আর কিছুই নয়।

পণ্ডিত Perkyn বলেন—A young child may take a dislike to some one who has spoken harshly or done some mean thing in its presence. The man and the incident may be entirely forgotten, but the impression is stored up in that wonderful store-house, the mind; and in after years the child grown to manhood will carry a dislike for any one resembling the disliked man of his childhood and this dislike will not down. * * * * While we can be influenced by the dislikes of

childhood we are just as strongly influenced by the likes and dislikes of childhood.

তাঁহাদের অর্থাৎ মনস্তত্ত্ববিদদের মতে এই subconscious mind সর্ব্বজ্ঞ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিতে পারে, কেন অকারণ আমাদের নির্দ্দোষ ব্যক্তির উপর রাগ বা অশ্রদ্ধা হয়? তাহার কারণ এই যে, Involuntary mind is incapable of reasoning inductively.

কখন-কখনও দেখা যায় যে, আবশ্যক হইলে অনেক চেষ্টাতেও আমাদের জানিত কোনও নাম বা কোনও কথা কিছুতেই মনে পড়িতে চায় না; অথচ পরে অন্যমনস্ক অবস্থায় বিনা চেষ্টাতেই সেই যে কথাটি "পেটে আস্‌ছিল মুখে আস্‌ছিল না" মনে পড়িয়া যায়। তাহারও কারণ ঐ subconscious mind। যদি subsconscious mind সমস্ত অভিজ্ঞতা ও জানার সঞ্চয় করিয়া না রাখিত, তাহা হইলে বিস্মৃত বিষয় কখনই মনে পড়িত না। ইহা হইতে আরও প্রমাণ হয় যে, conscious mindএর দ্বারা subconscious mindকে কতকটা influence করা যায়। কারণ, বিস্মৃত বিষয়টা মনে পড়ে তখনই, যখন conscious mindএর চেষ্টাটা subconscious mindএর উপর কাজ করে।

এখন দেখিতে হইবে যে স্বপ্ন জিনিষটা কি, এবং তাহা কাহার কার্য্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, subconscious mind is incapable of reasoning inductively। অনেকে বলেন যে, দিনের বেলায় যে সব কথা ভাবি, তাহাই রাত্রে স্বপ্ন রূপে দেখা যায়। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে সব চিন্তাই স্বপ্ন রূপে দেখা দিত; এবং যেটুকু ভাবি, সেইটুকুই স্বপ্ন রূপে দেখা যাইত। কিন্তু তাহা হয় না। আবার অনেকে বলেন, স্বপ্ন বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে কোনও স্বপ্ন কখনও সফল হইত না। অথচ স্বপ্ন অনেক সময়ে সফল হইতেও দেখা যায়। তাহা হইলে স্বপ্নটা কি?—তাহা subconscious mindএরই কার্য্য।

আমাদের সমস্ত impressions যে আমাদের জ্ঞাতসারেই হইবে তাহার কোনও অর্থ নাই। যখন subconscious mindও একটা mind, তখন তাহার কার্য্য আমরা জানিতে পারি বা না পারি, কিছু আছেই। আবার, conscious mind দিয়াই হউক, বা subconscious mind দিয়াই হউক, আমরা যা কিছু impressions পাই, সমস্তই সঞ্চিত থাকে। আর সব সময়েই conscious mindএর action subconscious mindএর উপর হয় না। বরং অনেক সময় subconscious mindএর কার্য্য automatic; সেই জন্যই জাগিয়া সজ্ঞান অবস্থায় স্বপ্ন দেখার কথা শুনা যায় না। যাঁহারা ইচ্ছাশক্তির বলে conscious mindএর সমস্ত কার্য্য বন্ধ করিয়া subconscious mindকে জাগাইতে পারেন, তাঁহারাই জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে পারেন; এবং সেই স্বপ্ন আর কিছুই নয় দিব্যদৃষ্টি। ইহারই নাম তৃতীয় নয়ন; এবং যোগের একটি উদ্দেশ্য—এই তৃতীয় নয়নের উন্মীলন করা। যিনি ইহা করিতে পারেন, তিনিই মুক্ত; এবং ঐ অবস্থাটি সমাধি এবং সাধনা-সাপেক্ষ। এখন তবে যাঁহারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের স্বপ্নটা কি, এবং কিরূপে হয়?

স্বপ্ন সাধারণতঃ সেই সব impressionএর ফল এবং sub conscious mindএর চিন্তা—যাহা আমরা জন্মাবধি জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ পাইয়া আসিয়াছি,—তা সে বই পড়িয়াই হউক, গল্প বা কথা শুনিয়াই হউক, বা চিন্তা করিয়াই হউক। আমাদের সে সব কথা মনে না থাকিলেও, তাহা সঞ্চিতই থাকে, একটুও নষ্ট হয় না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই সব সঞ্চিত impressions অবসর পাইলেই স্বপ্নরূপে দেখা দেয়। রাত্রিতে যখন সমস্ত অবয়ব, বহিঃচিত্ত নিদ্রিত থাকে তখনই উৎকৃষ্ট অবসর। সেই জন্যই আমরা স্বপ্ন দেখি, এবং অনেক সময়ে এমন স্বপ্ন দেখি, যাহা হয় ত তিন-চার দিন পূর্ব্বে কেন, কস্মিন-কালেও চিন্তা করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

এখন দেখা যাক্, কোন-কোনও স্বপ্ন সত্য হয় কেন, এবং ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাসই বা কোন-কোনও স্বপ্নে পাই কেন? মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের মতে এই subconscious বা immortal mindই soul এবং "যোগ"এর আত্মা—সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী। Conscions mind যত গাঢ় ভাবে সুপ্ত থাকে, এই subconscious mindএর জাগরণ তত সম্পূর্ণ ও স্পষ্ট হয়। এবং তাহার স্বাধীন কার্য্যকারিতাও

তত বেশী হয়। সেই জন্যই, যে সব স্বপ্ন সত্য হয়, তাহা আমরা তখনই দেখি, যখন আমাদের নিদ্রা খুব গাঢ় হয়। একজন পণ্ডিত বলেন, It (subjective mind) is the most active when one sleeps. Dreams come from the subjective mind. It never forgets anything; it records each and every trifling experience of one's life-time. The subjective mind is "you" or your "self." মেস্‌মেরিক্ অবস্থায় যখন the sleep is calm, refreshing, soothing, the senses slumber, the mind awakens to a fuller independence and to the exhibition of several mental and spiritual powers not dreamt of hitherto, * * * * and is exalted to such a degree as to attach a sensuous condition paving the way to clairvoyance etc. বস্তুতঃ, মেস্‌মেরিজম্‌এর উদ্দেশ্যই বহিঃচিত্তকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিয়া অন্তঃচিত্তের উদ্বোধন করা। বহিঃচিত্তের বিশ্রাম যত পূর্ণ ও perfect হয়, অন্তঃচিত্তের বিকাশ ততই স্পষ্ট ও পরিস্ফুট হয়।

কিন্তু নিদ্রার গভীরতা যে কেবল মাত্র মেস্‌মেরিজম্ বা যোগ-প্রভাবেই হয়, তাহা নহে; কখন-কখনও পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্যে আপনা হইতেই হইতে পারে। কাজেই, যে সময়ে নিদ্রা খুব বেশী গাঢ় হয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয় সমস্তই সম্পূর্ণ সুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, তখন যে সমস্ত স্বপ্ন দেখা যায়, সেই স্বপ্নই সত্য হইতে দেখা যায়।

আমাদের নিদ্রা শেষ রাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা গভীর হয়; কারণ, সেই সময়েই প্রায় পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল থাকে। কাজেই, সেই সময়কার স্বপ্ন প্রায় সত্য হয়। যদি নিদ্রার গাঢ়তা না থাকিলেও শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখা যায়, তবে সে স্বপ্ন সফল হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

ফলতঃ, এমন কোনই কথা থাকিতে পারে না, যে, ভোর বেলার স্বপ্নই সত্য হইবে এবং অন্য সময়ের স্বপ্ন নয়। যখন নিদ্রার গাঢ়তা খুব বেশী হয়, এবং সাধারণ সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, এবং অন্তঃচিত্তের পূর্ণ বিকাশ ও জাগরণ হয়, তখনই, এবং কেবল তখনকার স্বপ্নই সত্য হইতে পারে—তা সে সন্ধ্যার সময়েই হোক অথবা গভীর বা শেষ রাত্রেই হউক। তবে শেষ রাত্রের নিদ্রাই গাঢ়তম হয় বলিয়াই এমন কথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে যে, শেষরাত্রের স্বপ্ন সত্য হয়।

এই dual mind theory যদিও নূতন ভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট হইতে পাইতেছি, তা বলিয়া এ ব্যাপারটা ভারতবর্ষে নূতন শিক্ষা নহে। যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিজ্ঞান বলিয়া কিছুই জানা ছিল না, তখনও আর্য্য জাতির (ভারতবাসীর) নিকট এ বিষয় নূতন ছিল না।

জীব-বিজ্ঞান

[শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি]

খাদ্য *

আমরা জানি, cellদের মুখ নেই যে গিলবে, দাঁত নেই যে চিবুবে। জলে দ্রবীভূত খাদ্য ছাড়া অন্য কোন খাদ্য তাদের কোন কাজেই লাগে না। অথচ দেহের cell-সমষ্টির খোরাক জোগাবার জন্য আমরা খাচ্ছি ভাত, ডাল, আলু, পটল প্রভৃতি কঠিন পদার্থ। এদের দ্বারা cellদের দেহ পুষ্টি করতে হলে এ-গুলাকে দ্রবীভূত করে রক্তের সঙ্গে তাদের কাছে পাঠাতে হবে। আমাদের পাকপ্রণালীর মধ্যে সেই কাজই হচ্চে। কতকগুলা পাচক-রসের সাহায্যে কঠিন পদার্থ গুলে জলের মত হয়ে যাচ্চে, গোঁড়া নেবুর রসে কড়ি যেমন গুলে যায় সেই রকম। এই রস যদি না থাকতো, ত লুচি পলায় আকণ্ঠ খেয়েও শুকিয়ে মরতে। পেট যত বড় জয়ঢাকই হোক না, cell গুলো যে তার থেকে এক কণাও রস পেতো না।

আমরা যা খাই, বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাকে

প্রধানতঃ তিন রকম জিনিস আছে। একটা হচ্চে শ্বেতসার। এ বস্তুটা দেখ্‌তে সাদা, খেতে কোন স্বাদ পাওয়া যায় না, এবং সিদ্ধ করলে আটার মত হয়ে যায়, যেমন বার্লি, এরোরুট ইত্যাদি। আমরা কিছু বার্লি, এরোরুট প্রত্যহ খাচ্চি না। কিন্তু আমরা চাল খাই, আলু খাই, রাঙাআলু খাই। এ-গুলাকে শুকিয়ে গুঁড়া করলে বার্লির মত জিনিসই পাওয়া যায়, এদের মধ্যে শ্বেতসার বেশী পরিমাণে আছে বলে। মাছ, মাংস বা ডিম কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের জিনিস। শুকিয়েই হোক বা যে কোন উপায়েই হোক, এদের ভেতর থেকে বার্লির মত সাদা, স্বাদহীন গুঁড়া একটুও পাবে না। সিদ্ধ করে আটা হওয়া দূরে থাক্, কাঁচা বেলায় যারা আটার মত থাকে, যেমন ডিমের ভিতরটা, তারা সিদ্ধ হলে শক্ত হয়ে যায়। এই সব খাদ্যের প্রধান উপাদান প্রোটীড। জীব বা উদ্ভিদের জীবন্ত অংশে প্রোটীড বেশী পরিমাণে থাকে। প্রোটীড বেশী খেতে ইচ্ছা হলেই যে কতকগুলা মাংস খেতে হবে, তার কোন মানে নেই, তরিতরকারীতেও সে জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে আছে। প্রোটীড এবং শ্বেতসার ছাড়া আর একটা জিনিস আমরা খাই যেমন তেল ঘি প্রভৃতি স্নেহ পদার্থ।

এই তিন প্রকার পদার্থকে গলাবার জন্য তিন প্রকার পাচক রসের দরকার হয়েছে। তাদের একটা থাকে মুখে, একটা থাকে পাকাশয়ে, এবং একটা থাকে অন্ত্রের মধ্যে। মুখের রস বা লালার কাজ হচ্চে শ্বেতসারকে শর্করায় পরিবর্ত্তিত করা; শর্করা হলেই সে জলে গুলে যাবে। আমরা এক গাল মুড়ি মুখে পূরে যখন চিবুতে থাকি, তখন প্রথমটা তত ভাল লাগে না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মিষ্ট লাগতে থাকে। মুড়ির শ্বেতসার শর্করায় পরিবর্ত্তিত হয় বলেই এ রকম হয়। National Hotel এর cutlet কিন্তু এমন মিষ্ট লাগে না। খুব ভাল লাগে সত্য, কিন্তু মিষ্ট লাগে না। পাকাশয়ের রসে প্রোটীড গলে যায়; আর অন্ত্রের রস শ্বেতসার, প্রোটীড ও তেল জাতীয় পদার্থ এই তিন রকম জিনিসকেই গলিয়ে ফেলিতে পারে।

কোন জিনসকে যদি জলে গুলতে চাই এবং তা শীঘ্র না গলে, ত কি করি? সেটাকে গুঁড়িয়ে দিই। আস্ত ডেলার চেয়ে গুঁড়ো খুব সহজে গলে। সুতরাং খাদ্যকে যদি শীঘ্র হজম করতে চাই ত তাকে বেশ গুঁড়িয়ে দেওয়া চাই। এই জন্যই দাঁতের দরকার। খাদ্য মুখে পড়্‌লেই ৩২টা দাঁতের মধ্যে পড়ে ছিঁড়ে কেটে পিশে ছাতু হয়ে যায় এবং লালার সঙ্গে মিশে হড়হড়ে হয়ে গলা দিয়ে সহজে নেবে যায়; সঙ্গে-সঙ্গে লালার সাহায্যে শ্বেতসার শর্করায় পরিণত হতে থাকে। দাঁতে যা গুঁড়ো করা, বা টুক্‌রো করা যায় না, তা হজম করা বড় শক্ত। কারণ পেটের ভিতর দাঁতও নেই, জাঁতাও নেই। এ কথাটা কিন্তু আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই; এবং দাঁতকে বিশ্রাম দিয়ে গপ্ গপ্ করে গিলে খেতে থাকি। ফলে বিকাল বেলায় সোডা খাবার জন্য ছুটাছুটি। আরে, সোডা খেয়ে কি হবে? যার যা কাজ তাকে তাই করতে দাও, দেহযন্ত্র অবাধে চল্‌বে। খাদ্য মুখে পড়বামাত্র তিন জায়গা থেকে এই তিন রকম রস বেরিয়ে তাকে আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। জ্বর প্রভৃতি রোগে কিন্তু এমন হয় না, তখন জিব যেমন ময়লা এবং শুক্‌নো থাকে, পেটের ভিতরের অবস্থাও প্রায় সেই রকম থাকে। এ সময়ে লঘু পথ্য ছাড়া আর কিছু পেটুকের মত খেলে মিছে কষ্ট বাড়ে। তা হজমও হয় না, তা থেকে শরীরে বলাধানও হয় না।

মিছরি জলে গলে যায় আমরা জানি। কিন্তু জলে ফেলবামাত্র গলে যায় না, কিছু সময় লাগে। আমরা যা খাই তাও গলতে বা হজম হতে সময় লাগে, মুখে দিতে-দিতেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। আমরা ত পাঁচ মিনিটে দু-থাল ভাত গলাধঃকরণ করলুম। এ-গুলোর জন্য একটা আধার চাই, যতক্ষণ না সব হজম হয়ে যাচ্ছে। এই রকম একটা আধার ওপর পেট জুড়ে রয়েছে। এর নাম পাকাশয় stomach। পাকাশয় ভিস্তির মশকের মত দেখতে একটা থলি। এর এক-দিকে গলা থেকে খাবার নল এসে পৌঁছেছে, আর এক-দিক থেকে অন্ত্রের আরম্ভ হয়েছে। পাকাশয়ের গায়ে সূতার মত সরু সরু পেশী সব বিছান আছে; কতকগুলো লম্বালম্বি ভাবে, কতকগুলা এড়ো ভাবে এবং কতকগুলা কোণাকুণি ভাবে। এদের আকুঞ্চন-প্রসারণের ফলে পাকাশয় বিভিন্ন আকার ধারণ করতে থাকে, এবং তার ভিতরে যে ভাত ডাল তরকারী আছে, তাকে আচ্ছা করে তারাও পাকাতে থাকে। এ রকম করাতে পাকাশয়ের ভিতরকার পাচক রস সেই খাদ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশতে পারে। এই রসের সঙ্গে মেশায় এবং এই রকম

নাড়া-নাড়ি ঘাঁটাঘাঁটিতে খাদ্যের প্রোটীড অংশ অনেকটা হজম হয়ে যায় এবং সমস্তটা কাদার মত হয়ে আস্তে আস্তে অন্ত্রে গিয়ে হাজির হয়। পাকাশয় থেকে অন্ত্রে যাবার পথ বড় সরু; কাদার মত না হলে সেখান দিয়ে বড় যেতে পারে না। যতক্ষণ না কাদার মত হচ্চে, ততক্ষণ তা পাকাশয়েই জমে থাকে। পাকের পক্ষে পাচক রসের যেমন দরকার, পাকাশয়ের নড়া-চড়ারও তেমনি দরকার। যদি পুনঃপুনঃ অতি-ভোজন করে পাকাশয়কে সর্ব্বদা অতিমাত্রায় ফুলিয়ে রাখি, তবে তার উপরকার মাংসপেশীগুলা অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে, তারা আর আগেকার মত ছোট-বড় হতে পারে না। টানাটানি করে একটা রবারের নলকে খুব লম্বা করে ফেলানতে তার যেমন আকুঞ্চন-প্রসারণ শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, এও সেই রকম। এই রকমে পাকাশয়ের নড়া-চড়া প্রায় বন্ধ হয়ে আসে; এবং এর মধ্যে যে খাদ্য এসে পৌঁছায়, তার সকল অংশের সঙ্গে পাচক রসের ঘনিষ্ঠ সংযোগ হতে পারে না; কাজেই তা হজমও হয় না। হয় ত মাংসপেশীগুলির কোন দোষ ঘটে নি; কিন্তু এমন দ্রব্য আহার করলুম যার উপর পাচক রস সহজে কাজ করতে পারে না। তা হলেও হজমের ব্যাঘাত হবে। তেলে বা ঘীয়ে ভাজা জিনিসের প্রতি কণা ঘীয়ে ডুবে আছে। এই তেল বা ঘীয়ের আবরণ ভেদ করে পাচক রস তাতে পৌঁছুবে কি করে? পৌঁছুতে দেরী হয়। আবার এমনও হতে পারে যে, মাংসপেশীগুলি সুস্থ অবস্থায় আছে, খাদ্যও সুপাচ্য; কিন্তু খেয়ে উঠে গল্‌গল্ করে দু-ঘটী জল খেয়ে পাচক রসকে পাতলা করে ফেললুম। তাতেও ঐ ফল হবে। আধ আউন্স নাইট্রিক এসিডে একটা পয়সা ফেলে দিলে তা অল্পক্ষণেই গলে যায়। কিন্তু তার সঙ্গে দশ বাল্‌তি জল মেশালে এমন গলবে কি?

ভুক্ত অন্ন পাকাশয়ে গিয়ে যদি পরিপাক না হয়, তবে সেইখানেই জমতে জমতে তা পচে উঠে। সাধারণতঃ যা খাই, তা পচলে কি হয়? টকে যায় এবং কতকগুলা গ্যাস তৈরী হয়ে তাতে গাঁজা উঠতে থাকে। পেটের ভিতরেও তাই হয়। গ্যাস তৈরী হয়ে পেটের ভিতর ঘড়ঘড় করতে থাকে, পেট ফাঁপে, ঢেঁকুর উঠে; এবং তাতে অনেক সময়ে দুর্গন্ধ থাকে। তা ছাড়া অম্বল হয়। একটু নেবুর রস চোখে দিলে জ্বালা করে, জল পড়ে; নাকে দিলে জ্বালা করে, জল পড়ে। পেটের ভিতরে যে অম্লরস তৈরী হয়, তারও ফল জ্বালা করা এবং জল পড়া। নাক চোখের জলের মত এ জল অবশ্য বাইরে পড়ে যায় না, পাকাশয়ের মধ্যেই জমে। দেহের যে কোন ফাঁপা যন্ত্রের ভিতরে প্রদাহের কারণ ঘট্‌লে এই রকম জল পড়তে থাকে এবং তাতে কফ বা আমের মত পদার্থ মিশান থাকে। এই রকম জল বেরুবার উদ্দেশ্য, প্রদাহের কারণকে ধুয়ে ফেলা বা তার শক্তি হ্রাস করা। যে বিষ প্রদাহ ঘটাচ্চে, তা যদি উগ্র হয়, ত পাকাশয় তাকে তড়িঘড়ি বমির আকারে বার করে দিবার চেষ্টা করে; এবং যখন বার করে দিতে না পারে, তখন পেটে বড় যন্ত্রণা হয়। এ সময়ে ঐ বিষকে বার করে দেওয়াই চিকিৎসা। এবং বার করবার সহজ উপায় খুব খানিকটা অল্প গরম জল খাওয়া। খেতে-খেতেই বমি হয়ে পাকাশয় ধুয়ে সব বেরিয়ে যাবে এবং যন্ত্রণার উপশম হবে। এ রকম বমি করাতে কষ্টও খুব কম,—গা বমি-বমি নেই, বারবার ওয়াক তোলাও নেই।

কতকগুলা জিনিস পেটের মধ্যে পচে প্রদাহ উপস্থিত করচে; কষ্ট পাচ্চি। বন্ধু বলিলেন, সোডা খাও। সোডা খেলে অম্লরস নষ্ট হয়ে ক্ষণিক শান্তি পাব সন্দেহ নেই। কিন্তু রোগের ত কোন প্রতীকার হয় না—পেটের ভেতর যে কাণ্ড হচ্ছিল, তা হতেই রৈল। পচা জিনিসগুলো সেখান থেকে বেরিয়ে গেল না; তারা আরও পচতে লাগল; আবার নতুন করে অম্লরস তৈরী হতে লাগল। এ অবস্থায় যদি আহার কর ত কি হয়? পাকাশয়ে জল বেরিয়ে পাচক রস পাতলা হয়ে গেছে এবং আম থাকার জন্য এমন অবস্থা হয়েছে যে, তা ফুঁড়ে সে রস খাদ্যের সঙ্গে ভাল করে মিশতে পারে না। তাই সে খাদ্যও আবার পচতে লাগল; আবার তার থেকে অম্বল হল; এই অম্লে নতুন করে পাকাশয়ের প্রদাহ হল; আবার বেশী করে আম ও জল বেরুল; এবং সেগুলোর জন্য এর পরের বারের খাদ্যও পচতে লাগল। এই রকম চল্‌তে রৈল, Dyspepsia পাকা হয়ে দাঁড়াল। রোগের প্রতিকার করতে চাও, ত তার কারণ বর্জ্জন কর:—

১। পেটের মধ্যে পচা জিনিস যা থাকে, তাকে রোজ ধুয়ে বার করে দাও। রোজ সকালে অল্প গরম জল খেয়ে বমি করতে পার বা বেশী গরম (চা'র মত গরম) জল এক গেলাস করে খেতে পার। এই জল পাকাশয় ধুয়ে নিয়ে অন্ত্র-পথে বেরিয়ে যাবে।

২। পেটে কিছু থাকতে খেয়ো না। অনেক সময়ে অম্বল হয়ে যে কষ্ট হয়, তাকে ক্ষুধার জ্বালা বলা ভুল হয়। একটু বুদ্ধি করে সে ভুল কাটাতে হবে।

৩। সিটে, ছিবড়ে, হাড়, শক্ত বীজ বা যে কোন জিনিসকে দাঁতের সাহায্যে ছেঁড়া বা পেশা না যায় সে সব জিনিস স্পর্শ কোর না; তেলে বা ঘীয়ে ভাজা বা মাখান জিনিস, বা যে সব বীজে তেল বেশী আছে, তাও বর্জ্জন কর। চিনি গুড় প্রভৃতি আম বাড়ায়; এই জন্য মুখে দিবামাত্র চট্‌চটে হয়ে উঠে। এগুলা বেশী খাওয়া কোন সময়েই ভাল না; অম্ল রোগে একেবারে না খাওয়াই ভাল।

৪। যা কিছু খাবে, বেশ করে চিবিয়ে খাবে।

৫। খাবার সময়ে বা খাবার পরে দু'ঘণ্টার মধ্যে জল বা কোনও জলীয় পদার্থ খেয়ো না; এবং যা খাবে, তা যথাসম্ভব শুকনো অবস্থায় খাবে। কেবলমাত্র পাচক-রসে তা ভিজুক।

৬। পেট ভরাট করে খেয়ো না।

৭। খেয়ে উঠেই ঘুমিও না। নিদ্রিত অবস্থায় হজম হতে দেরী লাগে। তার প্রমাণ; বেলা দশটায় যা আহার করি, তা পরিপাক হয়ে বিকাল ৪টার মধ্যে বেশ ক্ষুধা-বোধ হতে পারে। কিন্তু রাত্রে দশটার আহারের পর তার পরদিন বেলা দশটার আগে আর বড় ক্ষুধা লাগে না।

৮। রীতিমত শারীরিক পরিশ্রম করে শরীরকে সুস্থ, সবল রাখবার চেষ্টা কর। দুর্ব্বল দেহে হাত-পায়ের পেশীগুলা যেমন রোগা হয়ে যায় এবং তাদের জোর কমে, পাকাশয়ের পেশীদেরও তেমনি হয়। তা ছাড়া পাচক-রসেরও তেমন তেজ থাকে না। পাকাশয়ের মত অন্ত্রের গায়েও পেশীতন্তু সব ছড়ান আছে; এক থাকে লম্বালম্বি ভাবে, এক থাকে এড়ো ভাবে। এড়ো পেশীদের আকুঞ্চন-প্রসারণের একটী ধারা আছে। সবগুলি এক সঙ্গে সঙ্কুচিত হয় না। কতকগুলা ছোট হল, তার নীচের কতকগুলা হল না, তার নীচের কতকগুলা হল; পরক্ষণেই যেগুলা ছোট ছিল, সেগুলা বড় হল, যেগুলা বড় ছিল সেগুলো ছোট হল। দেখলে মনে হয় যেন অন্ত্রের উপর দিয়ে ঢেউ চল্‌ছে, চলন্ত কেঁচোর গায়ে যেমন হতে থাকে। এই ক্রিয়ার নাম peristalsis এবং এর চেষ্টা ভিতরকার জিনিসকে নীচের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া। অর্দ্ধজীর্ণ অন্ন পাকাশয় থেকে অন্ত্রে গিয়ে পৌঁছে peristalsisএর ফলে বরাবর নীচের দিকে নামতে থাকে; সঙ্গে-সঙ্গে অন্ত্রের পাচকরস তার উপর ক্রিয়া করতে থাকে, এবং তাকে একটু একটু করে গলিয়ে জলবৎ করে ফেলে। দ্রবাবস্থায় রক্তে মেশবার আর কোন বাধা নেই, কারণ অন্ত্রের গায়েই অসংখ্য Capillary ছড়ান আছে। (তৈল-জাতীয় পদার্থ একেবারে দ্রব হয় না; তাই শুষে শুষে Capillaryতে ঢুক্‌তে পারে না, একটা আলাদা পথ দিয়ে রক্তে গিয়ে মেশে।) রক্তধারার সঙ্গে এই খাদ্যসকল Cellএ গিয়ে পৌঁছুল এবং তাদের পুষ্টিসাধন করল। এতক্ষণে খাদ্যের সার্থক হল।

যতদুর সম্ভব পরিপাক হয়েও কতকটা জিনিস পড়ে থাকে, বা হজম হবার নয়। এগুলো আবর্জ্জনা। এদের বার করে দিবার জন্য হজম হবার পরও peristalsis চল্‌তে থাকে এবং এদের ঠেলে নিয়ে গিয়ে মলদ্বারের কাছে হাজির করে দেয়। পথে আস্‌তে-আসতে তাদের জলীয় অংশ রক্তে শুষে গিয়ে তারা কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অন্ত্রের শেষ দিকের এই অংশ, যেখানে তারা এসে জমছে, তার নাম Rectum, আমরা নাম দিলাম মলভাণ্ড। মলভাণ্ডে খানিকটা ময়লা জমলেই আমাদের খবর হয়, এবং আমাদের চেষ্টা হয় তাকে বার করে দেওয়া। অনেক সময়ে কাজের ভিড়ে বা লজ্জায় পড়ে বা আলস্য বশতঃ আমরা মলভাণ্ডের আবেদন অগ্রাহ্য করি। এই রকম করতে-করতে এমন অবস্থা হয় যে, অনেক ময়লা জমা হলেও মলভাণ্ড আর সাড়া দেয় না। এ সময়ে পিচকারী দিয়ে হয় ত দু'সের ময়লা বার হয়; কিন্তু রোগী নিজেই আশ্চর্য্য হয় যে, ভিতরে এত ময়লা থাকতেও তার মলত্যাগের চেষ্টা কিছু ছিল না। যা আবর্জ্জনা, অপকারী বলেই তাকে বার করে দিবার জন্য দেহযন্ত্রের এত চেষ্টা, তাকে শরীরের মধ্যে পুষে রেখে দিলে ক্ষতি হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, কোষ্ঠবদ্ধতার কুফল মাথাধরা, ক্ষুধামান্দ্য, জ্বর ইত্যাদি। এ ছাড়া কত বড় বড় রোগ আছে, যার কল্যাণে কত বড়-বড় ডাক্তারের মোটর, জুড়ি চলচে।

কোষ্ঠবদ্ধতার একটী প্রধান কারণ পুর্ব্বেই বলেছি। বেগধারণটা মহাপাপ, কখনো করতে নেই। আর যদি

পূর্ব্বে করে থাক এবং এখন তার ফলভোগ করচ এমন হয়, তবে এখন থেকে এক-বেলা বা তুবেলা সময়মত পায়খানায় গিয়ে মলভাণ্ডের বদ অভ্যাস ছাড়াতে হবে ; সে যাতে সময়-মত সাড়া দেয়, এমন শিক্ষা তাকে দিতে হবে।

আরও কয়েকটী কারণে কোষ্ঠবদ্ধ হতে পারে। উপরে যা বলা হয়েছে, তার থেকে এদের একটু আন্দাজ পাওয়া যাবে। যদি বেছে-বেছে লঘুপথ্য খেতে থাকি, তবে তার সবটা প্রায় হজম হয়ে যাওয়াতে আবর্জ্জনা কম থাকে। এই জন্য মলভাণ্ডে পৌঁছে আমাদের সাড় জাগাতে পারে না, ভিতরেই জমতে থাকে। এর ওষুধ ফলমূল, শাক সবজী, জাঁতাভাঙ্গা আটা প্রভৃতি। এদের মধ্যে তুষ্পাচ্য ছিবড়ে-ছারড়া বেশী থাকাতে সে-গুলো সহজ জোলাপের কাজ করে। চিকিৎসক একজন রোগীকে প্রত্যহ জোলাপ নিতে বলেন। রোগী প্রশ্ন করেন, রোজ জোলাপ নেওয়া কি স্বাভাবিক? চিকিৎসক উত্তর দেন, বেছে-বেছে খোসা ছিবড়ে বাদ দেওয়া fine জিনিস খাওয়া কি স্বাভাবিক? অর্থাৎ খাদ্যের তুষ্পাচ্য অংশ একেবারে বাদ দেবার চেষ্টা করলে জোলাপ না নিয়ে উপায় নেই। একটা কথা কিন্তু মনে রাখা দরকার ; ফল-মূল ইত্যাদি খেলে পেট পরিষ্কার হয় ভাল। না হলে কিন্তু সেগুলো পেটের ভিতরে জমে উল্টা উৎপত্তি হয়।

অনেক সময়ে মল এত কঠিন হয় যে, তাকে বার করা দুষ্কর। যাঁরা জল কম খান তাদের প্রায় এই রকম হয়। এর চিকিৎসা বেশী জল খাওয়া ; অবশ্য সেটা খাবার সময়ে নয়। সকালে এক গেলাস, তুপুরে ও রাত্রের আহারের মধ্যে তু-এক গেলাস, অন্ততঃ জল খাওয়া উচিত।

Paristalsis এর জোর না থাকাও কোষ্ঠবদ্ধতার এক কারণ। অন্ত্রের উপরকার পেশী তুর্ব্বল হলেই Peristalsis এর জোর কমে। এর প্রতীকার ভাল খেয়ে এবং রীতিমত শারীরিক পরিশ্রম করে দেহকে সবল করা। তখন অন্যান্য পেশীর সঙ্গে অন্ত্রের পেশীও সবল হয়ে উঠবে। বিশেষ করে পেটের exercise করা দরকার, তা হলে অন্ত্রের পেশীর উপর কাজ বেশী হবে। পায়খানায় যাবার আগে ১০।১৫ মিনিট পেটে মালিশ করলেও উপকার হয়। মলবাহী অন্ত্র আরম্ভ হয়েছে ডান কুঁচকির কাছে ; সেখান থেকে সোজা উপরে উঠেছে পাঁজরার ভিতর কিছুদূর ; সেখান থেকে পেটের সামনে দিয়ে বাঁ পাঁজরার ভিতর গেছে ; সেখান থেকে বরাবর নেমে গেছে মলদ্বার পর্য্যন্ত। মালিশ করতে হবে এক লাইনে। ডান কুঁচকির কাছ থেকে ডান পাঁজরা পর্য্যন্ত ; সেখান থেকে বাঁ মাইএর কিছু নীচে ; তার পর বাঁ দিক ঘেঁসে বরাবর নীচের দিকে। একটা ভারি বল (গোলা) কাপড়ে জড়িয়ে ঐ লাইনে গড়ালেও হয়। নিয়মিত মালিশ করা চাই।

খাদ্য পরিপাক না হলে পাকাশয়েও যা হয়, অন্ত্রেও তাই হয়,—গ্যাস তৈরী হয়ে পেট ভুটভাট করে পেট ফাঁপে, আম আর জল বেশী করে বেরুতে থাকে, জলে আর বাতাসে মিশে পেটের ভিতর কলকল করতে থাকে। সঞ্চিত মল পচেও এই সব কাণ্ড হয়। দূষিত পদার্থকে পাকাশয় যেমন তাড়াতাড়ি বার করে দিবার চেষ্টা করে, অন্ত্রও তেমনি করে ; তবে পাকাশয় বার করে উপর দিকে বমির আকারে, অন্ত্র বার করে নীচের দিকে। এই রকম করে উদরাময়ের সৃষ্টি হয়। উদরাময় আরম্ভ হলেই বুঝতে হবে পেটে দূষিত পদার্থ আছে এবং অন্ত্র তা বার করে দিবার চেষ্টা করচে। বার করে দেওয়াই মঙ্গল। এই জন্য টপ করে ডায়েরিয়া বন্ধ করতে নেই। দূষিত পদার্থ যা বেরুচ্চে, তাকে বেরিয়ে যেতে দাও। আবার নতুন করে কিছু না জমে, তার চেষ্টা কর। পেটের অসুখের ওপর কিছু আহার কোরো না। তবে যে জল বেরিয়ে যাচ্চে, তার ক্ষতিপূরণ দরকার। এই কারণে বার্লি-ওয়াটার বা ছানার জল প্রভৃতি খেতে পার। অনেক সময় এমন হয় যে, কেবল জলই বেরুতে থাকে, দূষিত পদার্থ যা, তা ভিতরেই থেকে যায়। যাঁরা কোষ্ঠবদ্ধতায় ভোগেন, তাঁদের মধ্যে কারুর কারুর এরকমও প্রায়ই হয়ে থাকে। কঠিন মল জমে জমে যে প্রদাহ সৃষ্টি করে, তার ফলে অন্ত্রের মধ্যে জল আর আম জমতে থাকে। এইগুলো মধ্যে মধ্যে উদরাময়ের আকারে দেখা দেয়। রোগী মনে করে, পেট পরিষ্কার হোলো ; কিন্তু সেটা মহা ভুল।

দূষিত পদার্থকে বার করবার জন্য উদরাময় ; তা যতক্ষণ না নিঃশেষ বেরিয়ে যাচ্চে, ততক্ষণ এ থামবে না। অতএব উদরাময় থামাতে হলে অন্ত্রের ভিতরকার সমস্ত দূষিত পদার্থ বার করে দেওয়া উচিত। তু-চারবার দাস্ত হবার পরও যদি পেটের অসুখ বন্ধ হতে না চায়, ত চিকিৎসকেরা ক্যাষ্টর অয়েল দিয়ে থাকেন। এত বার দাস্ত হ'ল, তার উপর ক্যাষ্টর অয়েল? হাঁ। ক্যাষ্টর অয়েল খেলে আরও তু-চারবার দাস্ত

হয়ে থামতে পারে। না খেলে আর দুবারও হতে পারে, বিশবারও হতে পারে, কিছু ঠিক নেই। আমি এখানে সাধারণ বদ্ হজমের কথা বলচি, যা অনেকে গ্রাহ্য করে না এবং গ্রাহ্য না করলেও শয্যাশায়ী হতে হয় না। দুবার দাস্ত হয়ে নাড়ি ছেড়ে গেল, বা দশ বৎসর ধরে এক-ঘেয়ে পেটের অসুখ চলচে, এসব এ প্রবন্ধের বিষয় নয়। ভাল জিনিসই পেটের ভিতর পচে এত কাণ্ড বাধায়, তবে লোকে পচা জিনিস খায় কোন্ আক্কেলে? পচা মাছ, মাংস খেয়ে কলেরার মত বমি ও দাস্ত হয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লোক মারা যেতে পারে। অন্ত্র কোন জিনিসকে বার করে দিতে চাচ্চে, অথচ কঠিন মলে বা আর কিছুতে পথ বন্ধ থাকাতে পেরে উঠছে না, তখন পেটে যন্ত্রণা হয়, পেট কামড়ায়। আমরা বাধা পেলে পিছিয়ে যাই। অন্ত্র ত আমাদের মত বুদ্ধিমান নয় সে পিছায় না, বাধা অতিক্রম করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। তারির উৎকট peristalsis-এর ফলে এই যন্ত্রণা। পেট কামড়ানি সময়ে সময়ে সাংঘাতিক হতে পারে। সুতরাং ওর চিকিৎসা ডাক্তার কবিরাজের হাতে থাক। আমাদের শুধু এইটুক জেনে রাখা দরকার যে, পেটে চাপ দিলে, বা জোরে একটা কাপড় বাঁধলে বা গরম জলের বোতল বসিয়ে রাখলে ছোটখাট পেট-কামড়ানি উপশম হয়।

ধান ভানতে কি শিবের গীত গাইলুম। খাদ্যের কথা হতে হতে উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধতার আলোচনা আরম্ভ হ'ল কেন? একটু আলোচনা করতে হয় বৈ কি। বাইরের খাদ্য আর দেহের cell, এদের মধ্যে পাক-প্রণালী হচ্চে স্থল-পথ। তার পরে আছে শিরা-উপশিরার জল-পথ। cell-পাড়ায় হাহাকার উঠেছে; ভারে ভারে খাদ্য পাঠাচ্চ; কিন্তু পথের কোথায় পুল ভাঙ্গলে, কোথায় জলে ডুবলো, সে সম্বন্ধে একটু জ্ঞান থাকাও দরকার এবং এ রকম বিপদের হাতা-হাতি প্রতীকারও জানা দরকার। তা না হলে খাদ্যের ভার স্তূপাকার হয়ে পথের মাঝে পচতে থাকবে; আসল যার দরকার, সে একটা কণাও পাবে না।

হারানো আনন্দ

[শ্রীরমলা বসু]

সাগরের নীল বুকের উপর সূর্য্যের আলো ঠিকরে পড়ছিল,—যেন নীলকান্ত মণির চূর্ণ। একের পর এক করিয়া ঢেউগুলি তীরের উপর সাদা ফেণার গুচ্ছ নিয়ে আছড়ে ফেলছিল;—বালীর তীরে বসে জীবন একদৃষ্টিতে তা দেখছিল। বাতাস এসে তার চুলের মধ্যে এক-একবার হাত বুলিয়ে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল; গুচ্ছ-গুচ্ছ কালো চুল নাকে-মুখে এসে পড়ে, তাকে বিব্রত করে তুলছিল। সারা দিন আনমনে বসে, সে যেন কিসের আশায় দূর-দিগন্তের পানে,—যেখানে সাগরের জল গিয়ে আকাশের গায়ে নিবিড় চুম্বনে ভরিয়ে দিচ্ছিল,—সেই দিকে তাকিয়ে ছিল। স্বপ্নভরা বড়-বড় চোখের তারায় তার যেন কিসের একটা ব্যাকুল প্রতীক্ষার ভাব জেগে উঠছিল;—কি, তা যেন সে নিজেই ধরতে পারছিল না।

সারা দিন ধরে সাগরের ঢেউগুলি "ধরি-ছুঁই" খেলা করে। একবার গুড়ি-গুড়ি বালীর তীরের উপর এগিয়ে আসে,—আবার ধরতে গেলে তখনি পালিয়ে যায়,—বাতাসের সাথে হাসির গুঞ্জন মিশিয়ে দিয়ে। ছোট-ছোট গোলাপী ও নীল রঙ্গের ঝিনুকের খোলাগুলি ঢেউএর সঙ্গে এসে বালীর উপর গেঁথে পড়ে থাকে,—মনে হয় যেন ফুল ছিঁড়ে একরাশ পাঁপড়ি কে ছড়িয়ে ফেলে রেখে গিয়েছে।

সারা দিন জীবন বসেই আছে তেমনি ভাবে;—চোখে তার সেই কার আগমন-প্রতীক্ষার উৎসুক দৃষ্টি! বসে-বসে ক্লান্ত হয়ে, শেষ সে হাঁটুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। তবু সে প্রতীক্ষার শেষ নেই! হঠাৎ দূর-দিগন্তের কোণে, একটী কালীর বিন্দুর মত কি জানি কি দেখা গেল; আর তারি সঙ্গে অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা গেল। দেখতে-

দেখতে একখানি নৌকা নীল সাগরের ঢেউএর উপর নাচতে-নাচতে এগিয়ে এলো। তার মাঝে একমাত্র আরোহিনী,—এক তরুণী। তরুণীর কালো চুলের রাশের মধ্যে সমুদ্রের ফেণা ছিটকে পড়ে মনে হচ্ছে যেন শুভ্র ফুলের স্তবক জড়ান রয়েছে; সাগরের ঢেউএর মত সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের ঢেউ খেলে উঠছে,—সৌন্দর্য্যের কান্তিতে ভরিয়ে দিয়ে। মৃদু-হাসি-ভরা মুখে সে গান গাইতে-গাইতে লঘু-ক্ষেপণে তরণী বেয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। তার তরী এসে লাগল ঠিক সেই বালীর চড়ার উপর, যেখানে উৎসুক অপেক্ষায় অবসন্ন হয়ে জীবন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

তরীখানি তীরে রেখে, তরুণী ধীরে-ধীরে নেমে এসে, তরুণের ঘুমন্ত মুখখানির উপর চিরপরিচিতের মত এক-খানি হাত রাখল। খুব ধীরে হাতখানি রাখলেও সেই মৃদু স্পর্শেই জীবনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চমকে উঠে, চোখ মেলেই সে দেখতে পেলে, তরুণীর কালো চোখের তরল দৃষ্টি তারই পানে নিবদ্ধ। দেখেই তার সমস্ত মুখখানি আনন্দের উচ্ছ্বাসে রাঙ্গা হয়ে উঠল। এক নিমেষেই সে জানতে পারল, সারা-দিন কার অপেক্ষায়, কিসের জন্যে সে আশা করে বসে ছিল। এই তো তার চির-আকাঙ্ক্ষিতা!

সে বুঝল, এই তার জীবনের সার্থকতা রূপে ভালবাসা! জীবনের সাথে ভালবাসার মিলন হোল। সে মন-প্রাণের পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও মিলনের ফলে এক অভিনব জীবের সৃষ্টি হোল। ভোরের আকাশে অরুণ-প্রেয়সী ঊষার কপোলের লজ্জারাগের চেয়েও উজ্জ্বল,—মেঘশূন্য, রৌদ্রদীপ্ত, সুনীল আকাশের চেয়েও নির্ম্মল,—শরতের পূর্ণিমার চেয়েও স্নিগ্ধ,—বসন্তের চম্পক-মোদিত মলয়-বাতাসের চেয়েও তীক্ষ্ণ-মধুর। উভয়ের মিলনের আনন্দের ফলে জন্ম বলে নাম হোল তার আনন্দ। যত সে বড় হতে লাগল, তত পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের অধিকারী হয়ে উঠতে লাগল। কথা সে বেশী বলত না বটে, তবে সারা-দিন সে হাসির ফোয়ারায় ও গানে মাতোয়ারা করে রাখত। জীবন ও ভালবাসা তাদের সে প্রিয় শিশুটীর হাসি-খেলা দেখে, দু'জনার পানে দুজনে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসত। কেউ কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলত না বটে, কিন্তু তাদের মন চাইত—"এ যেন চিরদিনের তরে আমাদের পরস্পরের একান্ত নিজস্ব ধন হয়ে থাকে।"

এমনি করে কতদিন অতীতের বুকে গিয়ে আশ্রয় নিল,—কেউ তার ঠিকানা জানে না। ভালোবাসা যেখানে জীবনের সাথী, সেখানে সময়ের গণনা কেহই যেন করে না। কিন্তু এমন দিন শেষে এলো, যখন যেমনটী পূর্ব্বে ছিল, তেমনটী যেন আর রইল না। দিন-দিন সে দেবশিশু আনন্দের দিব্য কান্তিও যেন ম্লান হয়ে আসতে লাগল। আর সে পূর্ব্বের ঔজ্জ্বল্য নেই,—সে তীব্র জ্যোতিঃ নেই,—সে হাসির উচ্চ কলরব নেই। তবু যেন সে জোর করে মাঝে-মাঝে মুখে মলিন হাসি ফুটাবার চেষ্টা করত; ছল করে গানের মধ্যে সুখের সুর ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করত; কিন্তু খানিক পরেই যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ত।

তার এ দশা দেখে জীবন ও ভালবাসা যেন পরস্পরের চোখের পানে তাকাতেও সাহস পেত না। মন তাদের সদাই কেঁদে উঠত "আমাদের সাধের আনন্দের এ কি হোল?" নিজের মনকে সদাই তারা সান্ত্বনা দিত "না,—এ কিছু না! কাল আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার সে নেচে-খেলে বেড়াবে।" কিন্তু সে কাল আর এলো না।

মৃতপ্রায় আনন্দকে নিয়ে তারা দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগল,—কোথাও গেলে যদি আবার তার আগের কান্তি ও আগের স্বাস্থ্য ফিরে পায়! ঘুরে-ঘুরে তারাও একদিন ক্লান্ত হয়ে পথের ধারে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভেঙ্গে চমকে উঠে দেখে, তাদের আনন্দ কোথাও নেই! একটুখানি চিহ্নও তার তাদের মাঝে দেখতে পেলে না। পাগলের মত চারিধারে তারা খুঁজতে লাগল "কোথায় গেল? কোথায় গেল?" হায়! হায়! কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। কিন্তু ছায়ার মত অস্পষ্ট আর একজন যে পাছে-পাছে তাদের অনুসরণ করছিল, তার সন্ধান তারা জানতেও পারলে না,—শুধু হারানো আনন্দের অভাবে উন্মত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল,—কোথায় গেলে আবার তাকে ফিরে পাওয়া যায়। নিজেদের দুঃখে তারা এমনি আচ্ছন্ন হয়েছিল যে, পরস্পর থেকে ক্রমশঃ তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। এমন সময়ে তাদের সেই নীরব সাথীটী পিছন দিক থেকে এসে, তাদের দু'জনার হাত ধরে তাদের মাঝে চলতে লাগল,—যাতে তারা পরস্পর হতে আর দূরে চলে যেতে না পারে। কিন্তু দুঃখে অন্ধ হয়ে তখনও তাদের খেয়াল নেই,—কখন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল,—কে আবার এসে তাদের কাছে ঠেলে আনল।

শুধু যখন কাঁদতে-কাঁদতে জীবনের চোখ মুছবার শক্তি রইল না, তখন দেখল, কে যেন অতি কোমল হস্তে তার চোখের জল মুছিয়ে নিচ্ছে। ভালবাসা যখন চলতে-চলতে অবসন্ন হয়ে "এই আমার শেষ, আর চলবার শক্তি নেই—" বলে পথশ্রান্ত হয়ে বসে পড়তে গেল, কে যেন নীরব অঙ্গুলী তুলে সামনে দেখিয়ে দিলে, যেখানে বেগুনে পাহাড়ের ওপারে, আঁধার ভেদ করে, আশার ইঙ্গিতের মত সূর্য্যের আলো ফুটে উঠছে। তার চলনে কোন উদ্দাম লীলার ভঙ্গী নেই,—ধরণ-ধারণে কোন উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য্য নেই, ধীর স্থির নিস্তব্ধ গতিতে শুধু সে পথশ্রান্ত দুঃখকাতর জীব দুটীর অনুসরণ করে এসেছে।

পথ চলতে-চলতে যখন তাদের পায়ে আঘাত লেগে রক্ত ঝরে পড়ে, ধীরে-ধীরে মুছে নেয় আপন হাতে। সংসারের মরুভূমি পার হতে গিয়ে, যখন তাদের তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে ওঠে, কোথা থেকে গিয়ে অঞ্জলি ভরে জল এনে তাদের মুখে ঢেলে দেয়। এই রকমে নিশিদিন নীরব সেবায় সে তাদের পিছু-পিছু চলেছে। মুখে তার কথাটী নেই; শুধু বড়-বড় চোখের তারা দুটীতে সমবেদনার আলো ফুটে ওঠে, যখনি সে দেখে, দীর্ঘ বন্ধুর পথ চলতে-চলতে তার সহযাত্রী দুটী ক্ষত-বিক্ষত, ক্লান্ত ও অবসন্ন।

এই রকম চলতে-চলতে একদিন তারা একটা উপত্যকায় এসে হাজির হোল। তার চারিদিকে বড়-বড় কালো পাহাড় ঝুলে পড়েছে;—কোনটায় বা বরফের রাশ গলে পড়ে, এক হাঁটু করে বরফ জমে রয়েছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, অন্ধকার, নিঝুম, কুয়াসা ও মেঘে ঢাকা। শুধু সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে, মাঝে-মাঝে হাড়ে কাঁপুনী ধরিয়ে, শীতের বাতাস হুহু শব্দে বয়ে চলেছে। হাত-পা যখন জমে আড়ষ্ট হয়ে যাবার জোগাড়, সেই ছোট্ট প্রাণীটী তার ছোট দুখানি গরম হাত দিয়ে তাদের আড়ষ্ট হাত-পাগুলি ঘষে-ঘষে গরম করে, পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্ল। অবশেষে তারা সে আঁধার রাজ্য অতিক্রম করে আবার একদিন আলোর দেশে এসে পড়ল। যেখানে লতা-পাতা, ফুলে-ফলে চারিদিক ভরে আছে। ডালে-ডালে পাখী গাইছে, মৌমাছি ও প্রজাপতি ফুলে-ফুলে নেচে বেড়াচ্ছে। ছোট-ছোট ঝরণার জল পাহাড়ের উপর রূপালী রেখা এঁকে লাফিয়ে-লাফিয়ে ঝরে পড়ছে। এসব দেখে, তাদের সেই নূতন সাথীটীর মুখখানি হঠাৎ হাসিতে ও আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; তখন তাকে কতকটা তাদের সে হারানো আনন্দের মত দেখাতে লাগল। সে ছুটে-ছুটে, ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে, ডাল নুইয়ে ফল পেড়ে, পাতার ঠোঙ্গায় ঝরণা থেকে জল ভরে তাদের মনের শ্রান্তি দূর করবার জন্য নিয়ে আসতে লাগল। ফুলের মালা গেঁথে তাদের মাথায় মুকুট করে পরিয়ে দিল। তার নীরবতা এত দিনে হাসি ও গানের ভাষা হয়ে ফুটে উঠল। সবি তার আনন্দের মত লাগল, শুধু তার চেয়ে আরো মধুরতর ও গভীরতর হয়ে। শুধু তাতে অনাবিল আনন্দের উপরের চাকচিক্য নয়; স্নিগ্ধ সহানুভূতির তৃপ্তি ও আনন্দও তার সঙ্গে।

এই অপরিচিতের নিশিদিনের সেবা-যত্ন পেয়ে, আনন্দকে হারানোর অভাবের তীব্রতা একটু-একটু করে জীবন ও ভালবাসার মনে কমে আসতে লাগল। এক-একবার তবু দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ত ও আনন্দের সে উন্মাদনকারী প্রাণ-মাতান স্ফূর্ত্তির কথা মনে পড়ে,—আর দুঃখ হোত এর সাথে তাকেও যদি পাওয়া যেত।

অবশেষে একদিন তারা এসে হাজির হোল, যেখানে আদি কাল হতে অতি বৃদ্ধা চিন্তা ঠাকুরাণী বাস করতেন। শত-সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ফলে সমস্ত শরীর তার নুয়ে পড়েছিল। লোল চর্ম্ম চারিদিকে ঝুলে পড়ছিল; শুধু কোটরগত চোখ দুটী জ্বলজ্বল করত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায়। অতীতের ঝুলী থেকে কত কি না সে সংগ্রহ করে রাখত,—ভবিষ্যতের অনভিজ্ঞ পথিকদের সহায়তার জন্যে।

তাকে দেখে দুজনাই তারা সমস্বরে বলে উঠল "ওগো! তুমি তো সব জান, সব বোঝ। বল, আমাদের সেই প্রথম মিলনের সে উজ্জ্বলশ্রী আনন্দ আজ কোথা? কিসের দোষে পথের মাঝে এমন করে তাকে আমরা হারিয়ে ফেল্লাম? কি করলে, কি দিলে তাকে আবার ফিরে পাব?"

তখন বৃদ্ধা বল্ল, "তাকে ফিরে পেতে, তোদের আজ-কালকার এ সাথীটীকে কি হারাতে চাস?"

তারা দু'জনাই তা শুনে এক সাথে ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল, "না,—না, কখন না। কি! একে ছেড়ে দেব! সংসারের কাঁটা-বনে চলতে গিয়ে পায়ে কাঁটা ফুটলে, পরম যত্নে কে তা তুলে দেবে? ক্লান্ত শরীরে যখন আর পা চলতে পারবে না,

কে অনবরত তার সেবায় যত্নে ক্লান্তি দূর করে, নতুন পথ দেখিয়ে দেবে? একে ছেড়ে দেব! পৃথিবীর কোন জিনিসের বিনিময়ে নয়। একে ছাড়লে, মরণও তার চেয়ে ভালো। আনন্দের অভাব তবু সহ্য করা যায়; কিন্তু এর সঙ্গ ও সেবা বিনা সংসার-পথে আমরা যে অচল।"

এ কথা শুনে বৃদ্ধা বলে উঠলেন, "ওরে অন্ধ! একবার চোখ মেলে চা' দেখি। যাকে তোরা হারিয়েছিস বলে বৃথা উন্মত্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলি, সে আনন্দ তো তোদের সাথে-সাথেই রয়েছে। শুধু তার স্বভাবের চপলতা বদলে গিয়ে সহানুভূতি ও তৃপ্তির যোগে আরো পূর্ণতা লাভ করেছে। জীবনের প্রারম্ভে যাকে চঞ্চল যৌবনের উদ্দাম রঙ্গে প্রমোদের সাথী করে পেয়েছিলি, সে ছিল সংসারের বন্ধুরতায় উজ্জ্বল শ্রী বজায় রেখে চলবার অনুপযুক্ত। তাই পথ চলার সাথে-সাথে সে ম্লান হয়ে আসছিল প্রথমে, প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে। ক্রমশঃ আবার সে নতুন শ্রী নতুন শক্তি সঞ্চয় করে, তোদের জীবন-পথের নানা বিচিত্র অবস্থায় উপযুক্ত সাথী হয়ে উঠল,—জীবনের বল, নিরাশার আশা, বিপদের সহায়, দুর্গম পথের পথ-প্রদর্শক, শ্রান্তির বিশ্রাম, অন্ধকারের আলো হয়ে। তার সে ক্ষণভঙ্গুর উজ্জ্বল শ্রী রইল না বটে, কিন্তু তার স্থানে স্থির, ধীর, মহিমান্বিত রূপে চিরদিনের সাথী হয়ে সে তোদের আশ্রয় করেছে।"

এ কথা শুনে সন্তুষ্ট মনে জীবন ও ভালবাসা তাদের সাথীটীর ও পরস্পরের হাত আরো নিবিড় ভাবে ধরে সংসারের পথে যাত্রা করল।

ভালবাসা যেখানে জীবনের চিরসাথী, আনন্দ সেখানে এক মূর্ত্তিতে না হয় অন্য মূর্ত্তিতে সাথে-সাথে আছেই। শুধু চোখ মেলে চাইলেই হয়।

সার্ব্বজনীন বর্ণমালা বা লিখন-পদ্ধতি

[শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ]

মিঃ নোলসের "অশিক্ষিত ভারতবর্ষ" শীর্ষক একখানি পত্র সম্প্রতি ষ্টেটসম্যান পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের অবস্থা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অতি শোচনীয়; এজন্য তিনি উহার উন্নতিপ্রয়াসিগণকে উহার যাবতীয় ভাষাসমূহের একটি সহজ ও শব্দবিজ্ঞানানুযায়ী সাধারণ বর্ণমালা সম্বন্ধীয় সমস্যা বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীকে যদি একটি সহজ বর্ণমালা শিখিতে প্রণোদিত করা হয়, তাহা হইলে তাহারা অল্পকালের মধ্যে জাপানের মত শিক্ষিত হইয়া উঠিতে পারে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে একটি কমিশন নিযুক্ত করুন; এবং উহা কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত সাধারণ বর্ণমালার স্বেচ্ছা-ব্যবহার যাহাতে সকল বিদ্যালয় ও আদালতে আরব্ধ হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন।

আজকাল বর্ণমালা ও বানান-সংস্কার লইয়া অনেকেই আলোচনা করিতেছেন; কিন্তু নানা কারণে তাহা ফলোপধায়ক হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট যদি একটু মনোযোগী হন, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, ভারতবর্ষের শিক্ষা-সুহৃদ্বর্গের মধ্যে অনেকেই এই বিষয়ে কায়মনে ব্রতী হইতে বিরত হইবেন না। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ অল্পাধিক সংস্কৃত বানানের পক্ষপাতী। উহাদের মধ্যে কেহ-কেহ বর্ত্তমান পদ্ধতিকে ভ্রমপূর্ণ ও অতি প্রাচীন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

যাঁহারা এই মতাবলম্বী, তাঁহাদের ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সামাজিক চিন্তা, অদম্য উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষা উহার নিজের ভাষাতেই রক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং উহার যে শব্দটি যে ভাবে ও অর্থে গঠিত ও ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা সম্যক রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। যিনি ভিন্নদেশীয় ভাষা সুন্দর রূপে আয়ত্ত করিতে চাহেন, তাঁহাকে প্রচলিত বা নির্দ্দিষ্ট শব্দাকৃতিগুলিকে সরল করিবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিয়া, সেইগুলিকেই যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিতে হইবে।

অনেকের নিকটে ভাষা-বিষয়ক এই সমস্ত রীতি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত, এমন কি, অননুধাবনীয় বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে, ঐগুলি সহস্র-সহস্র বৎসর

ধরিয়া অতি সুশিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলীর সকল অভাব সম্পূর্ণ করিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক বিশিষ্ট শব্দকে যে নানা রূপান্তরের ও অর্থবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা দেখিয়াও দেখিতে চাহি না। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, শব্দের ব্যুৎপত্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে, ও কোন দুর্বোধ শব্দের অর্থাভাষ দিতে হইলে, ঐগুলির যথাযথ বর্ণনা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। এই সকল বিষয়ে ইহাই একমাত্র উৎকৃষ্ট পন্থা। বিদেশীয় ভাষার উচ্চারণ শুনিয়া, উহার সঠিক পুনরাবৃত্তি করা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। এমন অনেক শব্দ আছে, যাহা কোন জাতিবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ সুচারুরূপে অনুকরণ করিতে অসমর্থ। যে সকল শব্দের ব্যবহার বহুকালাবধি লুপ্ত, অথবা যেগুলির অস্তিত্ব গ্রন্থে নিবদ্ধ, সেগুলির প্রকৃত উচ্চারণ নিরূপণ করা বড়ই দুষ্কর।

আর একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, কতকগুলি ভাষার মধ্যে উচ্চারণ সৌকার্য্যার্থ পূর্ব্বাববোধী পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী ধ্বনির (এপেনথেটিকা প্রোথে টিক ও এনেপটিক টিক) সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং আমাদের যে কি ভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহা শিক্ষা করাই যথেষ্ট নহে; পরন্তু তাহা কি ভাবে শুনিতে হইবে, তাহাও শিখিতে হইবে।

প্রত্যেক শব্দের বর্ণবিন্যাসে অবহেলা না করিয়া, উহার উচ্চারণের ক্রম-রূপান্তর অনুসরণ করাই বৈজ্ঞানিক ভাষাতত্ত্ব-বিদ্‌দিগের কর্ত্তব্য। ইহা যে বেশ একটু সুকঠিন কাজ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সহিষ্ণু ও দক্ষ শব্দ-শাস্ত্রবিদ্ ছাত্রগণের নিকট দৃঢ়ভূত ভ্রমাত্মক বর্ণবিন্যাসগুলি কালে স্বতঃই প্রকটিত হইয়া পড়িবে। বর্ণগুলিকে পদাংশে এবং পদাংশগুলিকে শব্দে সংযোজিত করিবার কৌশল কেবল সৌন্দর্য্য-বিধানের জন্য উপস্থাপিত হয় নাই। উহা কতকগুলি নিয়মের বশবর্ত্তী। বলা বাহুল্য যে, শব্দোৎপত্তি হইতেই ভাবোৎপত্তি ঘটে।

পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই সুসংস্কৃত বর্ণমালার পক্ষ-পাতী। উহার আবশ্যকতা ও কার্য্যোপযোগিতা যে অবিবাদ্য, তাহা আমিও অস্বীকার করি না। কিন্তু বর্ত্তমান বানান-পদ্ধতিকে উঠাইয়া দিয়া, একটি সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হইলেও, আমার বিশ্বাস, উহার দ্বারা আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। একমাত্র শব্দের উপর নির্ভর করা শুধু বাবেল নির্ম্মাণের মত বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁহারা ইংরাজি ভাষা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা উহার কতকগুলি বর্ণসমবায়-ঘটিত স্বরবৈচিত্র্য দৃষ্টে, এবং সেই সম্বন্ধে কোন নিয়ম-প্রণালী না থাকায় মহা অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতীয় ভাষা-সমূহ—কতকাংশে বাঙ্গলা ব্যতীত—এক প্রকার বাধা-বিহীন। অনিয়ন্ত্রিত বর্ণবিন্যাস যে শিক্ষার একটি প্রধান অন্তরায়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে সকল শব্দের বানান অনিয়ন্ত্রিত, সেগুলির সংস্কার সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু ইহাও মনে রাখা উচিত যে, কতকগুলি আরবী বর্ণের যথার্থ উচ্চারণ, বিশেষতঃ 'নুন'এর বিভিন্ন উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করা বড়ই দুরূহ কার্য্য। উহা একজন প্রাচ্য-দেশবাসীর মুখ হইতেই শিক্ষা করা যাইতে পারে।

১৮৯৪ সালে জেনিভা নগরে প্রাচ্যভাষাবিদ্ পণ্ডিত-দিগের যে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে প্রাচ্য ভাষার অক্ষরান্তরীকরণের বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। এই আলোচনা সংস্কৃত, আরবী ও তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য বর্ণমালার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। এগুলির স্বরোচ্চারণ অতি সোজা। অপেক্ষাকৃত স্বরোচ্চারণবহুল ভাষাগুলির পক্ষে, যথা আবেস্তা, কংগ্রেস-নির্দ্ধারিত প্রণালী যথেষ্ট নহে। শব্দান্তর্গত স্বরের স্থিত্যনুসারে অথবা ব্যঞ্জনের সাহায্যে স্বরোচ্চারণের প্রকৃতি যে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। একটি পদাংশ পূর্ব্ববর্ত্তী পদাংশটির উচ্চারণ সাহায্যার্থ কিরূপে রূপান্তরিত হয় তাহাও পরিস্ফুট।

১৯১৪ সালের গবর্ণমেণ্ট সার্কুলারে দেশীয় শব্দগুলিকে রোমক অক্ষরে রূপান্তরিত করিবার রীতি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাও দোষশূন্য নহে। স্বরোচ্চারণের সূক্ষ্ম নিয়মগুলি ইহাতে অনেক স্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে। সমীচীন লিখন-পদ্ধতি তাহাই, যাহা স্বল্পায়াসে ও স্বল্পপরিবর্ত্তনে লিখিত ও অলিখিত সকল ভাষাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঠিক দেশীয় উচ্চারণ প্রকাশে সমর্থ সহজলেখ্য ও অনন্যার্থব্যঞ্জক অক্ষর উপস্থাপনের যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ সন্তোষজনক নহে।

আমি একটি প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছি। আমার বিশ্বাস, উহা সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বপ্রকার শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সংরক্ষণে বিশেষ উপযোগী। ইহা একটি শব্দের "একটি প্রতীরূপক চিহ্ন" এই মূল তত্ত্বের উপর স্থাপিত। অর্থাৎ

ইহাতে একটিমাত্র শব্দকে লিপিবদ্ধ করিতে কতকগুলি বর্ণ-সমবায়ের প্রয়োজন হয় না। অপ্রাকৃত রূপে চক্ষুর পীড়া না জন্মাইয়া, ইহা বেশ সরল ভাবে ও তাড়াতাড়ি পাঠ করা যায়। যতদূর সম্ভব, আমি পরস্পর বিভেদক চিহ্নসমূহ পরিত্যাগ করিয়াছি। যেখানে প্রচলিত অক্ষরগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ, সেখানে পরস্পর বিভেদক চিহ্ন সমন্বিত সাধারণ অক্ষরগুলির ব্যবহার না করিয়া, বিশেষ রূপে পরিবর্তিত অক্ষর ব্যবহার করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে, সুদীর্ঘ অভ্যাসের পরও এই পরস্পর-বিভেদক চিহ্নবহুল প্রণালী পাঠের পক্ষে সহজসাধ্য নহে; মুদ্রাঙ্কনের পক্ষেও ইহা ব্যয়সাপেক্ষ। মৎপ্রণীত প্রণালীর আর একটি বিশেষত্ব এই যে কি-কি বর্ণসমবায়ে যৌগিক অক্ষর সংগঠিত হয়, তাহা ইহা প্রকটিত করে। মূল ভাষার মত উহা সহজেই বিদিত ও উচ্চারিত হয়। বর্ণগুলি পৃথক-পৃথক লিখিত হইলে যৌগিক শব্দের বিভিন্নাংশের সম্বন্ধ স্পষ্টতঃই শিথিল হইয়া পড়ে; সুতরাং উহার বিভিন্নাংশের উচ্চারণে যথাযথ গুরুত্ব রক্ষিত হয় না।

মোহনলাল

[শ্রীপ্রভাতচন্দ্র ঘোষ]

ভোরবেলা হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। সেই এক-ঘেয়ে টিপিটিপি বৃষ্টি;—আমার বিরক্তি শতগুণে বাড়িতেছিল। আজ চুঁচড়ায় যাইবার কথা; আর আজই কি না বিধাতা দেখিয়া-শুনিয়া আমায় জ্বালাতনের জন্য এইরকম বিরক্তি-জনক বৃষ্টি পাঠাইলেন। একে ত অগ্রহায়ণ মাস; তার উপর বৃষ্টি; আবার তারও উপর আজ চুঁচড়ায় না গেলেই নয়। চুঁচড়ায় আমার মামার বাড়ী; সেখানে বড় মামার মেয়ের বিবাহ। দূর হোক্ গে ছাই,—গোড়া হইতে স্থির করিয়াছিলাম যে, শিয়ালদহ হইতে কাঁকনাড়া যাইব, তথা হইতে গঙ্গা পার হইয়া চুঁচড়া যাইব। তাহা ত আর হয় না। এই বৃষ্টি এবং তা'র সঙ্গে বেশ একটু হাওয়াও আছে। এই অবস্থায় গঙ্গা-পার হইতে সাহসে কুলাইল না; সুতরাং হাওড়া হইয়া চুঁচড়া যাওয়াই স্থির করিলাম।

যাহা হউক, অত্যাবশ্যক দু-একখানা কাপড় ও দু-একটি জিনিস একটি ছোট পুঁটুলির ভিতর গুছাইয়া লইলাম। পকেটে গোটা-দশ-বার টাকা গুঁজিয়া লইয়া ট্রামে উঠিয়া পড়িলাম। হাওড়ার পুলের উপর দিয়া যখন চলিয়াছি, তখন হাওয়াটা বেশ বাড়িয়া উঠিল। সেই ছাতামাত্র-সম্বল আমি ভিজিয়া, বহু কষ্টের পর কাঁপিতে-কাঁপিতে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। বিপদের উপর বিপদ—এই মিনিট-দুই আগে একখানা গাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে; এবং সেদিন রবিবার বলিয়া ঘণ্টা-তিনেকের মধ্যে আর গাড়ী নাই। নিতান্ত হতাশ ভাবে ষ্টেশনের একটা মণ্ডলাকার বেঞ্চের উপর বসিয়া-বসিয়া, সকালে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়া এই ভিজা-বিড়ালত্ব ঘটিয়াছে—মনে-মনে সমালোচনা করিতেছি;—এবং পোড়া বিধাতা আর শত্রুতা করিবার দিন পাইলেন না, ইত্যাদি নানারূপ নানাকথা মনে হইতে লাগিল। অবশেষে ভাবিলাম, যাক, আমি না হয় একটু ভিজিলাম; কিন্তু বিয়ে-বাড়ীতে কি কাণ্ডটা হইতেছে। সেখানে লোকজনের কষ্টের অন্ত নাই। যাহা হউক, আমার মত আরও অনেকের এই রকম অবস্থা ভাবিয়া মনকে অনেকটা প্রবোধ দিলাম।

এই রকম কিছুক্ষণ বসিয়া আছি, এমন সময় দেখি, আমার পূর্ব্ব সহাধ্যায়ী নরেন কিছুদূরে যাইতেছে। তাহাকে ডাকিলাম। সে কাছে আসিয়া বলিল "বাঃ, এই যে বেড়ে ওয়েট-ক্যাট হয়ে কোণঠাসা হয়ে বসে আছ! বলি, এই বাদলায় কোথায় হাওয়া খেতে বেরুন হয়েছে?"

আমি বলিলাম "আমি ত না হয় ওয়েট্-ক্যাট্ হয়েছি। কিন্তু মশায়েরও যে বড় ভাল অবস্থা, তা'ত মোটেই বোধ হচ্ছে না। বলি তোমারই বা কোথা যাওয়া হচ্ছে—বর্দ্ধমানে না কি?" নরেনের শ্বশুরালয় বর্দ্ধমানে।

সে বলিল "হুঁ। কি আর করি বল। গিন্নী আবার পড়েছেন। এবার মাত্রাটা কিছু অধিক—চারদিন জ্বর ছাড়ে নি।"

আমি বলিলাম "হুঁ বাবা, ঠিক ধরেছি; নইলে এই বৃষ্টি-বাদলায় কোন ভদ্রলোকে কখন বাড়ীর বার হয়।"

নরেন বলিল, "তা বেশ,—ভদ্রলোক মশায়ই বা এই জলে বেরিয়েছেন কেন?"

আমি—"এ জ্বরের সেবা করতে নয়—এ গরম লুচি দিয়ে নিজের পেটের সেবা করতে যাওয়া;—এই শীতের দিনে।—হুঁ, গরম লুচি বুঝলে? চুঁচড়ায় বড় মামার মেয়ের বিয়ে।"

নরেন "বলি, তা'হলে খবর ভাল; বেড়ে আছ যা হোক।"

এমন সময়ে একজন লোক আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং দুই হাত যোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল। দেখিলাম, লোকটার পোষাকের বেশ পারিপাট্য আছে। জামাটা ছেঁড়া বটে, কিন্তু ময়লা নয়। পরনে লাল-পাড় কাপড়,—তার কোঁচা সম্মুখ দিকে তাঁজ করা (বোধ হয় ছেঁড়া ঢাকিবার জন্য)। মাথা বেশ পরিষ্কার; কিন্তু টেরী কাটা নহে। পায়ে জুতা নাই।

নরেন জিজ্ঞাসা করিল—"কি চাও?"

সে তাহার কথার জবাব না দিয়া বলিল "আজ্ঞে, আজ আমরা দুইদিন কিছু খেতে পাই নি"—বলিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে নরেন বাধা দিয়া বলিল "কিছু হবে না, বাপু।"

দুই দিন কিছু খাইতে পায় নাই! কথাটা যেন কি রকম কি রকম শুনাইল। ভাবিলাম যে এই যথাসম্ভব-ভদ্রলোক-বেশধারী লোকটা সত্য বলিতেছে, না জুয়াচোর? তাহাকে ভালরূপে আবার আপাদমস্তক দেখিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা হইতে তাহার কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ পাইলাম না। তাহার চক্ষু-দুটা কোটরগত—তাহার চোখে কে যেন কালী ঢালিয়া দিয়াছে। মুখ দিয়া দুঃখ-কষ্টের ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ভাবিলাম, লোকটা হয় ত নেশাখোর।

হায়, মানুষের অবিশ্বাস এমনিই জিনিস। চক্ষুতে যাহা দেখাইয়া দিতেছে, প্রাণে পর্য্যন্ত যে দেখার প্রভাব চলিতেছে, তাহার প্রতিঘাত দমনের জন্য মনের মধ্যে অবিশ্বাসের লৌহ-প্রাচীর এমনিই ঠেলিয়া উঠে। যাক্—

লোকটাও নাছোড়বন্দা। দেখিলাম, যেন 'মরিয়া' হইয়া পড়িয়াছে। অপমান-অবজ্ঞা তাহাকে আর কোনও ব্যথা দিতে পারে না। সে আবার বলিল, "দেখুন, আমি জুয়া-চোর নই। বাস্তবিকই আমার ও আমার স্ত্রীর ও তিনটি মেয়ের দু'দিন ধরে কিছুই খাওয়া হয় নি। পনের টাকা মাহিনার একটা চাকরী করতাম; চাকরী যাওয়ায় আমার এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।"

নরেন বলিল, "বেশ ত, চাকরী গেছে ত আর হয়েছে কি? জোয়ান-মদ্দ—ভিক্ষে করতে লজ্জা করে না? কেন, মুটেগিরি ত কেউ কেড়ে নেয় নি?"

সে বলিল, "মশায়, আমি কায়স্থ। আমি আপনার মুটে-গিরি করতে পারি; বলুন না—এখনই রাজী আছি। কিন্তু মোট বওয়া ত কখনও করি নি। জন-মজুরের মত মোট বওয়ার আমার শক্তি নাই। বড় কষ্টে পেটের জ্বালায় এই বাদলায় এত দূরে এসেছি। যা কিছু গায়ের বল ছিল, মনের আগুনে তা অনেক দিন আগেই শুষে নিয়েছে।"

নরেন বলিল "বাঃ, বেড়ে বক্তিমা কর্ত্তে পার ত। তবে ভিক্ষে করে আর দরকার কি? হাইকোর্টে ওকালতী করলেই হয়।"

তাহার কাছে কিছু আশা নাই দেখিয়া, আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনি কি কিছু দয়া করবেন না?"

আমি অভ্যাস মতই হউক, বা নরেনের সম্মুখে মনের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হওয়াতেই হউক, বলিলাম, "না বাপু, মাপ কর।" লোকটা "হা ভগবান্" বলিয়া অদূরে উপবিষ্ট কতকগুলি লোকের নিকট চলিয়া গেল।

নরেন বলিল "দেখচ কি—লোকটা পাকা জুয়াচোর। ভান করা বিদ্যেটার তারিফ্ করতে হয়।"

আমি "মাপ কর" কথা বলিয়া ফেলিয়া, নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম; ভাবিলাম, কিছুদিন না হয় নরেন ঠাট্টাই করিত। যদি সত্য-সত্যই লোকটা বিপদে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার অনেকটা উপকার হইত। আর যদি জুয়াচোরই হয়—আমার না হয় চারআনা, আটআনা পয়সাই যাইত; কিন্তু বাস্তবিক যদি দুইদিন না খাইয়া থাকে তাহা হইলে ত অন্ততঃ উহাদের একবেলা খাইবার উপায় হইত।

এই রকম ভাবিতেছি, এমন সময়ে নরেন বলিল, "ওহে, ট্রেনের ত এখনও তিন ঘণ্টা দেরী। কাঁহাতক এই বেঞ্চের উপর বসে থাকা যায়! চল না, একটু এধার্-ওধার করি।"

আমি বলিলাম, "তুমি না হয় গিন্নীর কাছে চলেছ—মেজাজ সরিফ—তোমার টহল দেওয়া পোষাতে পারে। কিন্তু আমাকে হয় ত বিয়ে-বাড়ীতে গিয়ে এই বৃষ্টিতে আবার খাটতে হবে—আমার দ্বারা এই শীতে ঘুরে বেড়ান পোষাবে না।"

নরেন শুনিয়া একটু হাসিল; এবং বলিল, "আচ্ছা তুমি, বোস—আমি ততক্ষণ একটু আড্ডা দিয়ে আসি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় হে?"

"এই আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোক এখানকার টিকিটের বড় বাবু—ওই যে ফিরিঙ্গি মেয়েদের ঘরে"—বলিয়া একটু মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেল।

আমি মনে-মনে বলিলাম, "শ্বশুরবাড়ী চলেছেন বউএর অসুখ করেচে দেখতে, না—মরণ আর কি!"

দেখিলাম দূরে সেই লোকটা আবার একজন লোকের কাছ হইতে ফিরিল। ফিরিয়া একটু এদিক-ওদিক দেখিয়া, আবার আমার নিকট আসিয়া বলিল, "বাবু, সত্যই কি কিছু দয়া করবেন না?—ভগবান্ সত্য-সত্যই কি আমাদের অনাহারে মারবেন?"

আমি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না। অবিশ্বাসের যে কালো পর্দাটা আমার মনকে ঘিরিয়া ছিল, তাহা যেন কে একটানে সরাইয়া দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে বল দিকি বাপু—সত্যি কথাটা কি?"

সে বলিল, "সত্যি বললে বিশ্বাস করেন কই? ভগবান্ জানেন, আমি মিথ্যা বলি নাই। তবে তাঁর যা ইচ্ছা তাই হোক। কি করব—অনাহারে যদি মরতেই হয়, ত মরব। কিন্তু আর পারি না—সকলেই জুয়াচোর মনে করে। আর ঘুরে-ঘুরে মরি কেন। পেটের জ্বালাটাই কি শুধু যথেষ্ট নয়?" এই কথাগুলা বলিয়া সে ধুপ্ করিয়া আর্দ্র মেঝেতে বসিয়া পড়িল।

আমি নিতান্তই দুর্ব্বল দেখিতেছি! আমার নিতান্ত চেষ্টা সত্বেও, আমার চোখের কোণ জলে ভরিয়া আসিতেছিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া-বসিয়া দেখিতে লাগিলাম যে, লোকটা নির্ব্বাক, নিস্পন্দভাবে উপরের একটা লোহার 'জয়েন্টের' দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছে।

অবশেষে আমি বলিলাম, "এখানে বসে থাক্‌লে কি আর হবে। বাড়ীতে বল্লে না সব আছে? এই নাও কিছু—এই নিয়ে বাড়ী যাও।"

"এঁ্যা" বলিয়া সে মুখ ফিরাইল। আমি তাহাকে আট আনা পয়সা দিলাম।

সে তাহা পাইয়া হাত দুটী যোড় করিয়া শুধু "ভগবান্" বলিয়া আর কিছু বলিতে পারিল না; তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছিল।

বাস্তবিকই আমার মন বড় দুর্ব্বল। আমি সে দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলাম না। পকেট হইতে রুমালখানা বাহির করিয়া নাক ঝাড়া ইত্যাদি নানা কাজে ব্যবহার করিতে লাগিলাম।

এই রকম কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে আমাকে বলিতে লাগিল, "বাবু, আপনি যে আমার আজ কি উপকার করলেন, তা আমি আপনাকে বুঝাতে পারব না। এই যখন সকালবেলা বাড়ী থেকে বেরুই, তখন আমার মেয়েটা—দু'বছরের দুধের মেয়ে—বল্লে, 'বাবা, মা ভারী দুষ্টু—খেতে দেয় না—ক্ষিদে পেলেও না। তুমি খাবার এনে দিও ত বাবা।' অভাগীর মা আর খাবার পাবে কোথায়? আচ্ছা, বলুন দিকি, খাবার না নিয়ে আমি কেমন করে বাড়ী ফিরে যাই? ওদের কি আর অমন অবস্থা ছিল কোন দিন। আমার যখন চাকরী ছিল, তখন যেমন করে হোক্ ওদের দুবেলা খাওয়াটা জুটিয়ে দিতুম,—নিজে খেতুম আর না খেতুম। আমার এইবার দেশে গিয়েই কাল হল। সেখানে গিয়ে অসুখে পড়ে সর্ব্বস্ব খুইয়েছি, এদিকে চাকরীটি পর্য্যন্ত। তা আর কি হবে—চাকরীও মেলে না—আর হাতেও কিছু নেই যে, কিছু একটা দোকান-টোকান করি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার নাম?"

"আজ্ঞে—শ্রীমোহনলাল দাস ঘোষ, কায়স্থ। কি বলব বাবু, বিপদে মানুষকে সবই করতে হয়। যাক্, আর দেরী করে কাজ নেই বাবু, বাড়ী যেতে হবে। বাবু কি ব্রাহ্মণ?"

আমি বলিলাম "না—আমি কায়স্থ।"

"তবে বাবু আসি" বলিয়া, সে একটা ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করিয়া, সেই জল-বৃষ্টি ভাঙ্গিয়া অতি দ্রুত চলিয়া গেল।

মনে-মনে কি একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। একটা কৌতূহলও হইল। ভাবিলাম, ট্রেণ ছাড়িতে এখনও আড়াই ঘণ্টা দেরী। সঙ্গে ত ঘড়ি আছে—লোকটার সঙ্গে-সঙ্গে গিয়া দেখিলে হয় না? আর ভেজা? সে ত হইয়াছেই—বড় জোর আর একটু বেশী করিয়া ভিজিব। আর ফিরতে একটু যদি দেরী হয়, তাহা হইলে তাহার আধ ঘণ্টা পরে আবার ট্রেন আছে তাহাতেই না হয় যাওয়া যাবে। চুঁচড়ায় পৌছাইতে দেরী হবে বটে, কিন্তু যদি কেহ কৈফিয়ৎ চায় ত বলব যে, এই বৃষ্টিতে আসতে হল—সেইজন্যই দেরী হয়ে গেল।

যাক—মোহনলালকে দূর হইতে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। পাছে আমাকে দেখিতে পায়—সেই জন্য ছাতার আড়াল দিয়া চলিতে লাগিলাম। দেখিলাম সে 'ক্যাব' রোড দিয়া বরাবর "বাক্‌ল্যাণ্ড" ব্রিজের উপর উঠিল, এবং হাওড়ার ময়দানের দিকে চলিতে লাগিল। তার পর হাওড়া-আমতা লাইন পার হইয়া, রামকৃষ্ণপুরের দিকে চলিতে লাগিল। অবশেষে একটা রাস্তার মোড়ে অবস্থিত এক উড়িয়ার দোকান হইতে কিছু মুড়ি কিনিয়া লইয়া মোড় ঘুরিল; এবং কিছুদূর গিয়া, বামদিকে এক বস্তির সঙ্কীর্ণ গলির মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে আবার কিছু কাঠ ও চাল কিনিয়া বস্তির ভিতর প্রবেশ করিল; এবং এক জরাজীর্ণ খোলার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া "লক্ষী—লক্ষী, দোর খোল্" বলিয়া ডাকিল। একটি ১০।১১ বৎসরের মেয়ে দরজা খুলিল। দরজা খোলাই রহিল, ভিতরে যাহা দেখিলাম—তাহাতে চক্ষুস্থির! ঘরের ভিতর একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে; আর ৬টি মেয়ে মাথায় গামছা দিয়া গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে। ছাদ হইতে অনবরত জল পড়িতেছিল। এইরূপ নীচে জল উপরে জল-মোহনলালের বাড়ী! গাছতলার চেয়ে কিসে ভাল?

একটি কচি গলার আওয়াজ শুনিলাম—যেন আনন্দ উল্লাসে ঝঙ্কৃত—"মা, মা, বাবা খাবার নিয়ে এসেছে।" মোহনলাল বলিতেছিল—"আরে থাম থাম বেটী—থাম। আর একটুও কি তর সয় না। দাঁড়া দিচ্চি। দাও ত গো, ওদের একটু গুছিয়ে—আমি ভাঁড়ে করে জল নিয়ে আসি।" বলিয়াই সে রাস্তার মোড়ের কল হইতে জল আনিতে বাহির হইল। আমি একটু থমমত খাইয়া ছাতার আড়াল দিব মনে করিতেছি, এমন সময় মোহনলাল আমাকে দেখিয়া ফেলিল; বলিল "অ্যাঁ, বাবু এখানে—এতদূর কষ্ট করে এসেছেন!—বাইরে কেন;—এই এখানটা যদিও বাইরে, তবুও জল পড়ছে কম,—এইখানটায় দাঁড়ান। দেখলেন ত বাবু, সত্যি কি না।—ওগো বেরিয়ে এস—এস না,—লজ্জা কি—বাবু বড় ভাল। ওঁর দয়াতেই আজ হাতে কিছু নিয়ে বাড়ী ফিরতে পেরেছি।"

আমি বাধা দিয়ে বলিলাম "ছিঃ মোহনলাল, তোমার এত কষ্ট, তার জন্যে আমি কি করেছি? যাক্, আমি এখানে আছি। তুমি শিগ্‌গির জল নিয়ে এস।"

"এই যে যাই" বলিয়া মোহনলাল চলিয়া গেল।

আমি দেখিলাম, দরজার পাশে দুইটি আঁখি আমার দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে। মেয়ে তিনটি বাহিরে আসিয়া, পিছনে দুই হাত এক করিয়া, ঘরের মেটে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমার দিকে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত ভাবে তাকাইয়া ছিল। আমি তাহাদের কাছে গেলাম, এবং তাহাদের ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। মেয়েগুলি বেশ সুশ্রী; তবে দৈন্য সেই শ্রীর উপর আপনার কালিমা মাখাইয়াছে। শীর্ণ দেহ শীতে কাঁপিতেছিল। মুখে মুড়ী—সে গুলা চিবাইয়া গিলিবার বহু চেষ্টা সত্বেও বোধ হয় তাড়াতাড়ির জন্য গিলিতে পারিতেছিল না। এমন সময় মোহনলাল জল লইয়া ফিরিল; এবং ভাঁড় হইতে মেয়েদের একটু-একটু করিয়া জল খাওয়াইয়া, আমার নিকটে আসিয়া বসিল।

আমার তখন যে কি মনে হইতেছিল, তাহা আর কি করিয়া বুঝাইব? অশ্রুধারায় ব্যক্ত করিবার মত সামান্য নয়। কি! একটা পরিবারকে পরিবার এইরূপ না খাইয়া এই দুর্দ্দিনে শীতে এমন কষ্ট পাইতেছে! শুধু চোখের জল ইহার অপনোদন করিতে সমর্থ কি?

মোহনলাল বলিতে লাগিল "বাবু, দেখলেন ত। এখন আপনিই বলে দিন, আমি কি করি। আপনি আমার ঘরে এত কষ্ট করে এসেচেন, আপনি দেখ্‌লেন। আর দেখ্‌চেন যিনি মালিক, যিনি আমাদের অবস্থা আজ আপনাকে

দেখাচ্ছেন। যাই হোক, একটা নিবেদন আছে, অনুগ্রহ করে শুনবেন কি ?"

আমি বলিলাম 'কি ?"

সে বলিল, "আজ না হয় আপনার দয়ায় চারটী-চারটী সবাইকার জুটল ; কিন্তু রোজ ত আর চলবে না। আপনি বড়লোক —আমার একটা কাজ জুটাইয়া দেন ত, এই কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে অনাহারে মরতে হয় না। আমি বাঙ্গালা লেখা-পড়া, হিসেব-টিসেব করতে জানি।"

আমি বলিলাম "আমি বড়লোক-টড়লোক কিছুই নই, সামান্য গেরস্ত লোক—আমি তোমার কাজ কোথা পাব। কিন্তু আমার যা সাধ্য—এই দশটা টাকা আছে, এ দিয়ে তোমার যদি কিছু সাহায্য হয় ত নাও। এর থেকে দেখ যদি কিছু করতে পার।" বলিয়া বুক পকেট হইতে একখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া তাহাকে দিলাম।

এই অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিতে সে বিস্ময়াবিষ্ট ভাবে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে হাত যোড় করিয়া ঊর্দ্ধে তাকাইল ; এবং বলিল, "ঠাকুর ! তোমার এত দয়া।" তার পর আমাকে বলিল "কত রকমের লোক হয় বাবু, কিছু বুঝতে পারি না। এই দু'দিন কত জায়গায় হাত পেতে-পেতে বেড়ালাম—কত করে বললাম—কই, কেউ ত আমার কথা শুন্‌ল না।"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম "অন্য লোকে জানত না—তারা দেয় নাই। আমি জান্‌লাম, আমি তাই দিলাম।"

সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "বাবু, অপরাধ নেবেন না ;—এই টাকা দশটা আমাকে দান হিসাবে দেবেন না,—যেন আমাকে ধারই দিলেন মনে করুন। ভিক্ষে করতে আমার লজ্জা হয়। ভগবান্ যদি দিন দেন, ত এ টাকা আমি আপনাকে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেব।"

আমি একটু আশ্চর্য্যান্বিতই হইলাম। ভাবিলাম, লোকটা সাঁচ্চা। বলিলাম, "বেশ ধার বলেই নাও—আর ভগবান্ যেন সে দিন তোমাকে দেন। আচ্ছা, আমি তবে উঠি"—বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

মোহনলাল ডাকিল "লক্ষ্মী, তোরা এঁকে নমস্কার করে যা।" আমি থাক্-থাক্ বলিতে-বলিতে তাহারা আসিয়া প্রণাম করিল। আমি ছোট মেয়েটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া, তাহার গাল ধরিয়া আদর করিয়া বলিলাম—"বাঃ, বেশ মেয়ে ত।"

মোহনলাল আমাকে ট্রামের রাস্তা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিল। আমি ট্রামে উঠিবার পূর্ব্বে সে আমার ঠিকানা জানিয়া লইল। ট্রাম ছাড়িয়া দিলে, সে আমাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

ট্রাম চলিতে লাগিল। আমার মনের বোঝা আজ বড়ই ভারী বোধ হইতে লাগিল। কি ভয়ানক ! না জানি আমাদের অজানায় এই রকম কত পরিবার এই রকম উপবাসে কাটাইতেছে,—কেই বা তাহার খবর রাখে। কত দুঃখ-অভিনয় নীরবে এই সংসার-যবনিকার আড়ালে ঘটিতেছে। সংসারে লোক নীরবে কত দুঃখের বোঝা টানিয়া চলিয়াছে—অদৃষ্টের এ কি নিদারুণ পরিহাস !

আজ মনে হইতে লাগিল—হায়, ওই যে অনাহারে মৃতপ্রায় পরিবারটি যে আজ সামান্য দুটা অন্ন-কণার কাঙ্গালী,—তাহাদেরও এই সংসারের মধ্যে স্থান রহিয়াছে। তাহাদের কি আমাদের প্রত্যেক অতিরিক্ত অন্ন-কণার উপর দাবী নাই ? ওহে ধনি ! ওহে বিলাসি ! তোমাদের অমিতব্যয়িতার—অপব্যয়ের অধিকার আছে কি ? তোমাদের বিলাস-সুখ-ভোগে কোনও ন্যায্য দাবী আছে কি ? মন হইতে আজ কঠিন বিচারক বলিয়া উঠিল, 'নাই ! নিশ্চয়ই নাই ! শুধু তোমাদের ঐশ্বর্য্য-লব্ধ ক্ষমতাই তোমাদের যথেচ্ছচারিতার সমর্থন করিতেছে।'

ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছিল ! বাদলার দিনে সন্ধ্যার প্রারম্ভ। তাহার মাধুর্য্য হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। ট্রাম ধীরে ধীরে আবার বকল্যাণ্ড ব্রীজের উপর উঠিল। আমি ক্যাব রোডের সম্মুখে নামিয়া পড়িলাম।

মামার বাড়ীতে পৌঁছিলাম। সেই চিরন্তন যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহাই ঘটিতে দেখিলাম। সেই বৃথা আড়ম্বর,—মনুষ্য-হৃদয়ের অন্তর্নিহিত মাৎসর্য্যের ক্ষণিক প্ররোচনার অভিব্যক্তি,—সেই জাঁকজমক। উৎসবের মধ্যে পড়িয়া আমি যদিও আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু মধ্যে-মধ্যে বিবেক মনের মধ্যে বিচারকের আসন হইতে যেন বলিতেছিল, 'এই যে অনাবশ্যক ব্যয়—ইহা দুঃখীর জন্যে করিতে হইলে কেহ করিত কি ? সংসারে দুঃখীর

দুঃখ কয়জন বুঝে? এই অপব্যয় তাহাদের অন্নের গ্রাস কাড়িয়া লওয়া নয় কি?'

অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। মোহনলালের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। মানুষের মনের বাঁধ বালির বাঁধ। আজ গড়া, কাল ভাঙ্গা।

আবার সেই রামকৃষ্ণপুর! আমার এক আত্মীয় এইখানে বাসা ভাড়া লইয়াছেন,—তাঁহার সহিত দেখা করিতে চলিয়াছি! এই পরিচিত স্থানে আসিয়া হঠাৎ মোহনলালের কথা মনে পড়িয়া গেল। ভাবিলাম, একবার তাহাদের খোঁজ লইয়া যাই। আবার ভাবিলাম, থাক্, দরকার কি? কিন্তু মানুষের মনের একটা দুর্ব্বলতা আছে। যাহার কোন উপকার করিয়াছি বলিয়া মানুষ মনে করে, তাহার কাছ হইতে অন্ততঃ কোনও না কোনও প্রকারে প্রতিদানের আশা সে রাখে, যতই সামান্য হউক না কেন সে প্রতিদানটুকু। তাই মোহনলালের বাড়ী যাওয়ার অনাবশ্যকতা সত্ত্বেও আমি গেলাম। হায় রে ক্ষুদ্র প্রলোভন!

সেখানে গিয়া দেখিলাম, আর একজন কে রহিয়াছে। শুনিলাম, মোহনলাল অনেক দিন আগে সেখান হইতে উঠিয়া গিয়াছে। একজন লোক বলিল, "বাবু, সে লোকটা অনেককে ঠকিয়ে এখান থেকে পালিয়েছে।" কথাটা মনে বড়ই বাজিল। তার পর লোকটা তাহার বিরুদ্ধে আরও অনেক কথা বলিল। ভাবিলাম, তাই ত, নরেন হাওড়া ষ্টেসনে যাহা বলিয়াছিল, তাহা ত ঠিক। মনে মনে হাসিলাম ও ভাবিলাম, যাক্—ঠকেছি এ কথাটা আর কাহাকেও জানান হচ্ছে না। এইরকম জুয়াচোর! বোধ হয় তখন তাহাকে পাইলে তাহার কাঁচা মাথাটা ছিঁড়িতাম।

অনেক দিন পরে একদিন বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে দেখি, হঠাৎ মোহনলাল উপস্থিত। পরণে সেই আধ-ছেঁড়া জামা—কিন্তু বেশীর মধ্যে পায়ে চটি জুতা উঠিয়াছে। আমি ভাবিলাম, বেটা আমাকে ভালমানুষ মনে করিয়া আবার কিছু টাকার মৎলবে আসিয়াছে। কিন্তু ঠিক করিলাম, হুঁঃ, শর্ম্মা আর ওদিকে নন্। বরং বেটাকে এবার পুলিশে দিব। বেটাকে দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। আমি রূঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আবার কি চাও বাপু?"

নমস্কার করিয়া, আমার কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়াই সে তাহার জামার ভিতরকার পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিল। আমি বিস্মিত ভাবে তাহার কার্য্য-কলাপ দেখিতেছিলাম। সে কাগজটা খুলিল, দেখিলাম, একখানা দশটাকার নোট। নোটটা আমার কাছে রাখিয়া দিয়া, কিছু দূরে হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ যেন সমস্ত কথা পরিষ্কার হইয়া গেল। আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না; বলিলাম, "হঠাৎ এতদিন পরে মোহনলাল যে? আর এ কি?"

সে অতি বিনীত ভাবে বলিল "বাবু, ভুলে গেছেন কি? আপনার সঙ্গে ত এই কথাই ছিল। আজ তাই দিতে এসেছি।"

আমি তাহাকে সবিস্তারে সকল কথা বলিতে বলিলাম। সে যাহা বলিল তাহা সংক্ষেপে এই—আমার দেওয়া দশটাকা হইতে সে একটি ছোট পানের দোকান খুলে; এবং ক্রমশঃ নিজ অধ্যবসায়ে কলিকাতার কাছে একটি ছোট কাঠের গোলা খুলিয়াছে। এখন তাহার বেশ দুপয়সা আয় হইতেছে—অভাব কষ্ট আর নাই। পরিশেষে বলিল "বাবু, আপনার টাকা শোধ দেওয়ার সাধ্য আমার নাই; তবে দশটা টাকা অধীনকে দিয়েছিলেন,—অধীন প্রতিশ্রুত ছিল,—তাই টাকা দিতে সাহস করেছে। আর যখনই দরকার বোধ করবেন, অধীনকে স্মরণ করবেন, অধীন তাহার প্রাণ দিয়ে কাজ করে দেবে।"

আমার চোখে জল আসিতেছিল। আজ আমার মত সুখী কে?

আমি বলিলাম, "তোমার কথা শুনে বড়ই সুখী হলাম। আচ্ছা, টাকা নিলাম। কিন্তু টাকাটা তুমি লইয়া যাও। তুমি আমার চেয়ে দুঃখীর দুঃখ বেশী বুঝ—তাদেরই দিয়ে দিও।"

মোহনলাল নোট কুড়াইয়া লইল। তার পর তাহার বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। অবশেষে বলিলাম, "দেখ, তোমার খোঁজে একবার গিয়েছিলাম। তোমার ওখানকার লোক বল্‌ল, তুমি অনেককে ঠকিয়ে গিয়েছ। ব্যাপার কি হয়েছিল, বল দেখি!"

সে বলিল "হাঁ, সত্যি বটে; যে কয়দিন খাবার সংস্থান ছিল না, সে কয়দিন আমি অনেকের কাছে আমার দুরবস্থার কথা ব'লে টাকা পয়সা নিয়েছি। রোজ চাইতাম বলে, লোকে মনে করত জুয়াচোর। কিন্তু তখন অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু তার পর এখন উপায় হয়েছে—যার যা টাকা নিয়েছিলাম, তা শোধ করেছি।"

অবশেষে সে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

মোহনলাল এখনও আমার বাড়ীতে আসিয়া মধ্যে-মধ্যে দেখা করে; এবং বাড়ীতে কোনও ক্রিয়াকর্ম্ম উপস্থিত হইলে, না বলিতে আপনিই সমস্ত কাজের ভার লয়।

"সাজাহানের" গান। *

(পঞ্চম গীত)

[রচনা —স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

মিশ্র-ভূপালী—একতালা।

পিয়ারা।

আমি, সারা সকালটি বসে' বসে' এই সাধের মালাটি গেঁথেছি।
আমি, পরাব বলিয়ে তোমারই গলায়, মালাটি আমার গেঁথেছি।
আমি, সারা সকালটি করি নাই কিছু, করি নাই কিছু বঁধু আর ;
শুধু, বকুলের তলে বসিয়া বিরলে, মালাটি আমার গেঁথেছি।
তখন, গাহিতেছিল সে তরুশাখা 'পরে সুললিত স্বরে পাপিয়া ;
তখন, দুলিতেছিল সে তরুশাখা ধীরে, প্রভাত সমীরে কাঁপিয়া ;
তখন, প্রভাতের হাসি পড়ে'ছিল আসি', কুসুমকুঞ্জভবনে ;
আমি, তার মাঝখানে, বসিয়া বিজনে, মালাটি আমার গেঁথেছি।
বঁধু, মালাটি আমার গাঁথা নহে শুধু বকুল কুসুম কুড়ায়ে ;
আছে, প্রভাতের প্রীতি, সমীরণ গীতি, কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে ;
আছে, সবার উপরে মাখা তায় বঁধু, তব মধুময় হাসি গো ;
ধর, গলে ফুলহার, মালাটি তোমার, তোমারই কারণে গেঁথেছি ॥

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

		০				১				২´	
{ সসা	II	সসা	-ধ্‌ন্‌সরগা	গা	|	গা	-া	গা	I	গঃ	গাঃ
আমি		সারা	০০০০০	স		কা	ল্‌	টি		ব	সে

* "সাজাহানে"র গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

—লেখিকা।

৩ ০ ১

| গঃ রগমপাঃ রসগা | গা মপধা -পা | মা রগমগমগা গরা I

ব সে০০ ০ এ০ ই সা ধে০০ র্ মা লা০০ ০০০ টি ০

২´ ৩ ০

I পা ক্ষা পা | -া মা মা | মঃ মাঃ মা |

গেঁ থে ছি ০ আ মি প রা ব

১ ২´ ৩

| মমা -ধা পমপমা I মগা -পা মা | গরগা রগমগা -রসা |

বলি ০ য়ে০০ ০ তোমা ০ রি গ০০ লা০০০ ০য়

০ ১ ২´

| ধ্সা ধ্রা রা | সা সরগমা -পা I মা গা সরগা |

মা০ লা০ টি আ মা০০০ র্ গেঁ থে ছি০ ০

৩ ০ ১

| -সরগা -গরসা | সসা | { র্সঃ র্সাঃ র্সা | র্স -া র্সা I

০০০ ০০০ আমি সা রা স কা ল্ টি

২´ ৩ ০

I নর্সা র্সা নর্সধনর্সা | া র্সা না | ধা না ধনর্সর্রা |

ক০ রি না০ ০০ই ০ কি ছু ক রি না০০ ০

১ ২´ ৩

| -া র্সা না I ধা পক্ষা পক্ষপা | া মা মা |

ই কি ছু বঁ ধু ০ আ০ র্ ০ শু ধু

০ ১ ২´

| মঃ মাঃ মমা | া ধা পা I মগা -পা মা |

ব কু লের্ ০ ত লে বসি ০ য়া

৩ ০ ১

| গঃ রগঃ রঃসাঃ | ধ্সা ধ্রা রা | সা সরগমা -পা I

বি র০ লে০০০ মা০ লা০ টি আ মা০০০ র্

২´ ৩

I মা গা সরগা | -সরগা -গরসা সসা } II

গেঁ থে ছি০০ ০০ ০ ০০০ 'আমি'

০ ১ ২´

{ গগগা II সধঃ ধাঃ ধা | ধা ধ্রা ধা I ধঃ ধাঃ নধা |

তথন্ গা০ হি তে ছি ল সে ত রু শাখা

৩ ৩ ১

| -ধনধনা ধা পা | পঃ পাঃ ধনর্সর্া | র্সা না ধা I

০০০০ প রে সু ল লি০০ ০ ত স্ব রে

২´ ৩ ০

I পা ক্ষা পা | -ক্ষপা মা মমা | গঃ গাঃ মগা |

পা পি য়া ০০ ০ ত থন্ তু লি তে০

১ ২´ ৩

| রা রগরা সা I সসা -সরগা রা | সা ন্া ধ্া |

ছি ল০০ সে তরু ০০ ০ শা খা খী রে

০ ১ ২´

| সঃ সাঃ রা | সা সরা স্া I সঃ রাঃ সরগা |

প্র ভা ত স মী০ রে কাঁ পি য়া০০

৩ ০ ১

| -সরগা -া গগগা | র্সঃ র্সাঃ সর্সা | -া র্সা র্সা I

০০০ ০ তথন্ প্র ভা তের ০ হা সি

২´ ৩ ০

I নঃ র্সাঃ নর্সা | নর্সা র্সা নাধ | ধঃ নাঃ ধা |

প ড়ে ছি ল০ আ সি কু সু ম

১ ২´ ৩

| ধনর্সা -র্রা র্সনা I ধা পক্ষা পা | -ক্ষপা মা মা |

কু০০ ঞ্জ০ জ ০ ভ ব ০ নে ০ ০ আ মি

০ ১ ২´

| মা -া মমা | া ধা পা I মগা -পা মা |

তা র্ মাঝ্ ০ খা নে বসি ০ য়া

৩			০			১		
গা	রগা	সা	ধ্সা	ধ্রা	রা	সা	সরগমা	-পা
বি	জ০	নে	মা০	লা০	টি	আ	মা০০০	র্

২´			৩			১
মা	গা	সরগা	-সরগা	-গরসা }		সসা II
গেঁ	থে	ছি০০	০০০	০০০		'আমি'

	০			১			২´		
{ গগা II	সধঃ	ধাঃ	ধা	ধা	ধা	-া I	ধঃ	ধাঃ	নধা
বঁধু	মা০	লা	টি	আ	মা	র্	গাঁ	থা	নহে

৩			০			১		
-ধনধনা	ধঃ	পাঃ	পঁপা	-ধনর্সর্রা	র্সা	না	ধা	ধা I
০০০০	শু	ধু	বকু	০০০ ০	ল	কু	সু	ম

২´			৩			০		
I পা	হ্মা	পা	-হ্মপা	মা	মা	গগঃ	গাঃ	মগা
কু	ড়া	য়ে	০´০	আ	ছে	প্র	ভা	তে০

১			২´			৩		
রা	রগরা	সা I	সঁসা	-সরগা	রা	সা	ন্া	ধ্া
র	প্রী	তি	সমী	০০০	র	ণ	গী	তি

০			১			২´		
সঃ	সাঃ	সার	সঃ	সাঃর	সা I	সঃ	রাঃ	সরগা
কু	সু	মে	কু	সু	মে	জ	ড়া	য়ে০০

৩			০			১		
-সরগা	-া	গগা	র্সঃ	র্সাঃ	-া	র্সা	র্সা	র্সা I
০০০	০	আছে	স	বা	র্	উ	প	রে

২´			৩			০		
I নর্সা	র্সা	নর্সা	া	র্সা	না	ধা	না	ধনর্সর্রা
মা০	খা	তায়	০	বঁ	ধু	ত	ব	ম০০ ০

১			২´			৩		
র্সা	না	ধা I	পা	হ্মা	পা	-হ্মপা	া	মমা
ধু	ম	য়	হা	সি	গো	০´০	০	ধর

| মঃ মাঃ মর্মা | -ধা পা -া | মগা -পা মা |
গ লে ফুল ০ ০ হা র্ মালা ০ টি

| গঃ -রগঃ র্ঃ -সা -ঃ | ধ্সা ধ্সা রা |
তো ০০ মা ০ র্ তো০ মা০ রি

| সসা সরগমা -পা | মা গা সরগা | -সরগা -গরসা | সসা || ||
কার গে০০০ ০ গেঁ থে ছি০০ ০০০ ০০০ 'আমি'

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

৭২। মহাভারতীয় প্রশ্ন

যুধিষ্ঠির দ্রোণ-বধের সময় ভিন্ন আর কখনও মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন কি না; যদি বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কখন বলিয়াছিলেন।

শ্রীমাখনলাল ভাটক।

৭৩। জাতি-নির্ণয়

বসু-মল্লিক ফেলোসিপের লেকচার, ২য় বর্ষ, ২য় সংস্করণ, ৪৯ পৃষ্ঠায় মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন "শরীরের—কেবল শরীরের নহে, কঙ্কালের অংশ বিশেষের, মাপ লইয়া আর্য্য অনার্য্যাদির নির্ণয় করিতে পারা যায়।" কিরূপ ভাবে মাপ লইয়া সঠিক নির্ণয় করিতে পারা যায়, কেহ তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিবেন কি?

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

৭৪। নাড়ী-পরীক্ষা

চিকিৎসকেরা নাড়ী-পরীক্ষা করিবার সময়ে পুরুষের ডান হাত এবং স্ত্রীলোকের বাম হাতের নাড়ী পরীক্ষা করেন কেন? হাঁটিবার সময়ে পুরুষের ডান পদ এবং স্ত্রীলোকের বাম পদ আগে চলে কেন? দধি ও ঘৃতে লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইলে কি উপকার হয়? দুগ্ধে লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে নাই কেন? এতৎসম্বন্ধে চিকিৎসকগণের মত কি? হিন্দুগণ শবকে উত্তর শিয়রে রাখেন কেন? "ভারতে বলিপ্রথা—জীবহত্যা নহে, জীবহত্যা নিবারণের উপায়" এই বাক্যের সার্থকতা কি? কিরূপ পাত্রে ভাত রান্না করা উচিত? লোহের কড়াই বা পিতলের হাঁড়ির ভাত স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কি না? ঠাণ্ডা দুগ্ধে স্বাস্থ্যের কোনরূপ ক্ষতি হয় কি না? গরম দুগ্ধ পানের উপকারিতা কি?

শ্রীরমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ।

৭৫। গ্রহণে শঙ্খনাদ

সন্ধ্যাকালে, গ্রহণের সময় এবং ভূমিকম্প হইলে শাঁক বাজায় কেন? ইহার কি কোনও বৈজ্ঞানিক অর্থ আছে? যদি কেহ জ্ঞাত থাকেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু।

৭৬। লোকাচার ও শাস্ত্র

১। বায়ু প্রতিকূল রহিলে যাত্রা অশুভ—কোন্ শাস্ত্রের নির্দ্দেশ?

২। পঞ্চম বর্ষে বালক বালিকার কর্ণবেধ কর্ত্তব্য—কোন্ শাস্ত্রের নির্দ্দেশ?

৩। সুবেশা নারীর ক্রন্দন অযাত্রা—কোন্ শাস্ত্রের নির্দ্দেশ?

৪। অশ্বশালায় বানর রাখিলে ঘোড়ার পীড়া হয় না—কোন্ শাস্ত্রে আছে?

৫। ধনপতি সদাগর যখন উজানী (বর্দ্ধমানের উত্তর সীমা) হইতে গৌড়রাজ্যে যান, তখন পথে অতিক্রম করেন—মজ্লিসপুর, বারাকপুর, বালিঘাটা, শীতলপুর; এই গ্রামগুলি অতিক্রম করিয়া ধনপতি "বড় গঙ্গা পার হইয়া গৌড় প্রবেশে।"—এই গ্রাম কয়টি কোথায়?

৬। সূর্য্যবংশে শিবিরাজা　　সুত সম পালে প্রজা
দানে কল্পতরুর সমান।
ত্যজে যিনি নিজ বংশ　　কেবল বিষ্ণুর অংশ
জীব নামে বংশের আখ্যান॥

কল্পতরুর প্রার্থিত বস্তু দানের শক্তির কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে? উদ্ধৃত পদটিতে কোন্ পৌরাণিক কাহিনীর ইঙ্গিত (allusion) উল্লিখিত আছে?

৭। বিবাহ করিতে বর উপস্থিত হইলে তার পায়ে দধি ঢালার উল্লেখ কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে পাই। দধি ঢালার শাস্ত্র ও তাৎপর্য্য কি?

৮। দিবস পূর্ব্বযাম রমণীগণ গান
রুদ্রের অধ্যায় মহিমা।—কবিকঙ্কণ।

রুদ্রাধ্যায় কোন্ গ্রন্থের অংশ?

৯। শিবপূজা করিলে রণজয়ী হওয়া—কোন্ শাস্ত্র বলিয়াছে?

১০। গুজরাটে এক পাঁতি সুমুকুন্দ ধব্যা তাঁতি
টুরী বৈসে মহেশমণ্ডপে।
আগু সুতে বাস বুনে রাজকর নাহি গণে
ভরত রাজার অভিশাপে॥—কবিকঙ্কণ।

এইখানে কোন্ আখ্যায়িকার ইঙ্গিত উল্লেখ (allusion) আছে?

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭৭। লালরং

কালরংয়ের ছিপি করা পাড়, খুব ঘন ও পাকা স্থায়ী হয়। ঐরূপ টুকটুকে ঘন লাল রং ছিপি করাইতে পারা যায় কি? যদি না হয়, তবে উৎকৃষ্ট পাকা লাল রং কি প্রকারে প্রস্তুত করা যাইতে পারে?

বাল-বিধবা বিদ্যালয়

বাংলা দেশে বিধবাদের শিক্ষার ও আশ্রয়ের কোনও আশ্রম বা বিদ্যালয় আছে কি না? নিবেদিতা স্কুলে বাল-বিধবাগণ কেহ-কেহ শিক্ষা লাভ করেন বটে, কিন্তু শুধু বিধবাগণেরই উন্নতি ও শিক্ষাকল্পে কোনও ভাল বিদ্যালয় ও ব্রহ্মচর্য্য এবং বৈধব্য জীবন যাপনের আদর্শ লইয়া গঠিত শিক্ষার বন্দোবস্ত কোথাও আছে কি? অনেক অল্পবয়স্কা বালিকা বিধবা শুধু বাল-বিধবার উপযোগী বিদ্যালয় অভাবে সুদীর্ঘ জ্বালাময় জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করিতে অক্ষমা। শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত।

৭৮। ঐতিহাসিক

১। (ক) কৃত্তিবাসী রামায়ণে (যোগীনবাবুর সংস্করণ) লিখিত আছে যে সুমিত্রা সিংহলরাজ সুমিত্রের কন্যা। এই সিংহল রাজ্য কোথায় অবস্থিত? (খ) ঐতিহাসিকগণ বলেন যে লঙ্কাদ্বীপই অধুনা সিংহল (Ceylon) নামে অভিহিত হয়। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত সিংহল রাজ্যের অস্তিত্ব থাকিলে, উহা এখন কি নামে পরিচিত?

২। (ক) নোয়াখালী জিলার ফেণী মহকুমার অনতিদূরে 'কালীদহ' নামে একটী গ্রাম আছে। এখানকার স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে, 'কালীদহ' ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ অতি পুরাকালে সমুদ্রগর্ভস্থিত ছিল; এবং এই কালীদহের আবর্ত্তেই চাঁদ সদাগরের মধুকর ডিঙ্গা জলমগ্ন হয়। এ বিষয়ে কেহ কোন প্রমাণ দিতে পারেন কি? (খ) ফেণী এলাকায় চম্পকনগর নামেও একটী গ্রাম আছে। এই চম্পকনগরের সঙ্গে চাঁদসদাগরের কোন সম্পর্ক ছিল কি না, তদ্বিষয়ে কেহ কিছু বলিতে পারেন কি?

৩। হিন্দুদের বিশ্বাস যে মনুষ্যের জন্ম, জীবন, গতিবিধি প্রভৃতির উপর গ্রহ-নক্ষত্রাদির অশেষ প্রভাব আছে। এই ধারণার কোন বিজ্ঞান-সম্মত কারণ আছে কি না, এবং থাকিলে উহা ইয়োরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন কি না। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষাল এম-এ,

৭৯। প্রত্নতত্ত্ব

ই, আই, রেলওয়ে বোলপুর ষ্টেশনের উত্তর-পূর্ব্বে ৫ মাইল ব্যবধানে ৺কঙ্কালী মহাপীঠে 'কাকাঁখর' নামে একটী দেবতা স্মরণাতীত কাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই দেবতাটীর মূর্ত্তি শ্রীসম্পন্ন প্রস্তরাকৃতি। স্থানীয় প্রবাদ, ইনি কাকীদেশের পূজিত দেবতা। কেউ কি বলিতে পারেন, এই দেবতা সম্বন্ধে কোন পুরাতত্ত্ব পাওয়া যায় কি না?

শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (নলহাটী—বীরভূম)।

৮০। ঐতিহাসিক প্রশ্নাবলী

(১) কোন্ ক্ষত্রিয় রাজার অধীনে বঙ্গদেশ প্রথমে শাসিত হইয়াছিল? (২) ইহার আদিম অধিবাসী কাহারা? (৩) কতকাল পূর্ব্বে এই দেশের সৃষ্টি হইয়াছে? (৪) কতদিন পূর্ব্বে ইহার নাম বঙ্গ হইয়াছে? (৫) কে ইহার বঙ্গ নামকরণ করিয়াছিলেন? (৬) বেদে এই দেশের নাম পাওয়া যায় কি না? যদিই বঙ্গ নাম না পাওয়া যায়—তাহা হইলে এমন কোন নাম কি পাওয়া যায়, যাহা এই দেশকেই নির্দ্দেশ করে? শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মজুমদার।

৮১। টিউব ওয়েল

১। একটী Tube well করাইতে আন্দাজ কত খরচ পড়ে? উহার আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি কোথায় ও কি মূল্যে পাওয়া যায়?

শ্রীউমাশঙ্কর পালিত

৮২। শাস্ত্রীয় প্রশ্ন

১। পিতৃমান ব্যক্তির দক্ষিণ মুখ ও পুত্রবান ব্যক্তির উত্তর মুখ হইয়া ভোজন করা নিষেধ কেন?

২। শিবপূজায় তুলসীপত্র ও বিষ্ণুপূজায় বিল্বপত্র দেওয়ার নিয়ম নাই কেন? বিল্বফল ও ধুতুরা পুষ্প শিবের প্রিয় কেন?

৩। শিবালয়ে শঙ্খধ্বনি ও লক্ষ্মীগৃহে ঘণ্টা বাদ্যের নিষেধ কেন?

৪। সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ বৈজ্ঞানিক মতে রাহু বা কেতুর কোন ক্রিয়া নয়, চন্দ্রের বা পৃথিবীর ছায়া পতনই একমাত্র মূল কারণ। কেন গ্রহণের সময় অন্নাদি ভক্ষণ নিষেধ? কেবল দানের বিধান শাস্ত্রে দেখা যায় ও পূজার বিধান নাই কেন? জ্যোতিষ মতে গ্রহণের পর ১ সপ্তাহ যাত্রা নিষিদ্ধ,—কেন? শ্রীমাখনলাল গুহ।

৮৩। ঐতিহাসিক ও শাস্ত্র।

বিষ্ণুপুরের কোনও ইতিহাস আছে কি না; থাকিলে লেখকের ও পুস্তকের নাম কি এবং কোথায় পাওয়া যায়।

প্রবাদ আছে, বিষ্ণুপুরের রাজার প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন জিউ বর্গী হাঙ্গামার সময় স্বয়ং কামান ধরিয়া বর্গীদিগকে দূরীভূত করিয়াছিলেন। ইহার মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে বলিয়া দিবেন।

উত্তর

ব্যাঙ ডাকা ও বৃষ্টি

ব্যাঙ জল অত্যন্ত ভালবাসে; সেই জন্য মেঘ করিলে অথবা মেঘ ঠিক না করিলেও বৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বে ইহারা বুঝিতে পারে ও তজ্জন্য সশব্দে আনন্দ প্রকাশ করে। কথাটা হচ্ছে,—বেঙ ডাকে ব'লে জল হয় না; বস্তুতঃ জল হবে বলেই বেঙ ডাকে। বেঙগুলো যদি না ডাকে, তা'হলে কি জল হবে না? তা হবে। ভেকের এই জ্ঞানকে তার একটা সংস্কার বলা যেতে পারে। এইরূপে উষ্ট্র প্রভৃতি কোন কোন জন্তু ঘ্রাণ শক্তি বা অন্য কোন সংস্কারের সাহায্যে ২।৩ মাইলের মধ্যে নদী বা কোন জলাশয় থাকিলে তাহা জানিতে পারে। মাছ ভাজিবার সময় বিড়াল ১ মাইল দূরে থেকে মিউ মিউ করে। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়, এম-এ, বিটি, শ্রীশান্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসবিতারাণী দেবী।

তূলা ধোনা ও সূতা কাটা

তুলা ধুনিয়া লইলে টাট্‌কা সুতা কাটা যায় না বটে, কিন্তু কয়েকদিন রাখিয়া দিলে, ধোনা তুলা বেশ চাপ ধরে। তখন সেই তুলা আস্তে তুলিয়া ধরিয়া সুতা বেশ কাটা যায়। আমরা এরূপ ভাবেই আজকাল সূতা কাটিতেছি; এবং সূতাও খুব সুন্দর হইতেছে। শ্রীসুনীতিবালা বসু চৌধুরাণী।

হাম রোগ

হাম ছোঁয়াচে ব্যারাম এবং ইহা সাধারণতঃ ছেলেপিলের মধ্যেই দেখা যায়। বৃদ্ধদের হাম হওয়া আশঙ্কার বিষয়। ছেলেপিলের হাম হইলে তত ভয়ের কিছু নাই। হাম যাহাতে বসিয়া না যায়, বাহির হইয়া পড়ে, সেজন্য ঈষদুষ্ণ জলে গামছা ভিজাইয়া সর্ব্বাঙ্গ ধুইয়া ফেলিতে ডাক্তারেরা উপদেশ দেন। আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথায় হাম হইলে কথা না দিবার রীতি ছিল। সেজন্য উপস্ দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ ছিল; ঘোল ভাত, জল দেওয়া ভাত ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল; সর্ব্বাঙ্গে রোয়াইল পাতা বুলান হইত। স্নানের ব্যবস্থাও ছিল,—শীতল জলে মাথা ধোয়া ত অবশ্য-করণীয়ই ছিল। হাম হইবার তৃতীয় দিবসে লবণ টানা জলে (অর্থাৎ লবণ আগুনে ফুটাইয়া খুব নির্ম্মল করিয়া বাটিয়া গরম জলে মিশাইয়া সেই জলে) সর্ব্বাঙ্গ ধুইয়া ফেলা হইত। আমাদের পরিবারের খুব বেশী রূপ হাম দেখা দেওয়ায়, ডাক্তারী ঔষধ খাইয়া এবং ডাক্তারের উপদেশ অনুযায়ী চলিয়া ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং হাম জ্বরে ঔষধাদি ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ, এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারি না।

একটী মাত্র তারা দেখিয়া আরও ২।১টী তারা দেখার কারণও প্রবাদের মুখেই শুনা যায়:—

"এক দেখিলে দেখি তিন
রাত পোহালে শুভ দিন।

শ্রীঅমিয়বালা দেবী।

গড় ভবানীপুর

গড় ভবানীপুরে কখনও কোন বাদশাহ বাস করেন নাই। এক ব্রাহ্মণ-রাজ-বংশ সেখানে রাজত্ব করতেন বলে শোনা যায়। এ বিষয়ের সম্যক বিবরণ শ্রীযুত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত "বঙ্গ-বীরাঙ্গনা বা রায়বাঘিনী" পড়লেই জানতে পারবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের নাম

চৈত্রের ভারতবর্ষে নগেন্দ্র ভট্টশালীর ৬৬নং ঐতিহাসিক প্রশ্নের উত্তর—ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের সম্পূর্ণ নামগুলি ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে আছে।

এই প্রশ্নের উত্তর বহু লোকে দিয়াছেন। সকল উত্তরদাতা পাঠক-পাঠিকার নাম প্রকাশের স্থান আমাদের নাই। অতএব উত্তরদাতৃগণ নাম প্রকাশিত না হওয়ায় অপরাধ আশা করি ক্ষমা করিবেন।

এক চোখে হাত দিলে দুই চোখে হাত দিতে হয়। শাস্ত্রে প্রমাণ আছে—

পাণিভ্যাং ন স্পৃশেচ্চক্ষু শ্চক্ষুষী নৈক পাণিনা।
চক্ষুঃ পরহিতাকাঙ্ক্ষী ন স্পৃশেদেক পাণিনা॥ (কর্ম্মলোচনম্)

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়।

পাকা রং

যে কোন রং পাকা করিতে হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেওয়া দরকার। (ক) সূতা বা কাপড়টি যেন অম্ল (Acid) বা ক্ষার (Alkali) পদার্থ হইতে মুক্ত হয় (Purifying the cloth)। (খ) রং দ্রবে সূতা যেন উপযুক্ত সময় পর্যন্ত ভিজানো হয়। (গ) উপযুক্ত মর্ডাণ্টের (Mordant) ব্যবহার (ইঙ্গিতে দ্রষ্টব্য)। (ঘ) সূতা যেন ছায়াতে শুকানো হয়। (ঙ) সূতা যেন একাধিকবার উপযুক্ত মর্ডাণ্ট যুক্ত রং দ্রব্যে ছোপানো হয়। (চ) জল যেন বিশুদ্ধ হয় (Soft water)।

শিশুর স্বভাব

শিশু, কেহ না শিখাইয়া দিলেও, যে কোনো জিনিস মুখে পোরে এবং সব শিশুরাই এইরূপ করে। ইহাতে বুঝা যায় যে, শিশুর এইরূপ ব্যবহার তাহার আদিম পূর্ব্ব-পুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত। ডারুইন বলিতেছেন, "Servicable actions became habitual

in association with certain states of the mind, and are performed whether or not of service in each particular case" ইহাই সম্ভবতঃ Inheritanceএ বর্ত্তমানে ওই অবস্থাতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। (See "The expression of the emotions in Man and Animals." by C. Darwin).

২। মনের Mechanical action মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট সুপরিচিত। যে দিকে কেহ আসিবার সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশী, mechanically আমাদের দৃষ্টি প্রথমে সেই দিকেই আকৃষ্ট হয়। হঠাৎ মুখ তুলিলে, দৃষ্টির পরিধির মধ্যে কিছু থাকিলে, তৎক্ষণাৎ মন সেই দিকেই ধাবিত হয়; কিন্তু সেখানে কিছু না থাকিলে, দৃষ্টি অন্তদিকে সঞ্চালিত হয়। অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাজ করাতে একটি বিশেষ স্নায়ু-কেন্দ্র শ্রান্ত হইয়া পড়ে। তখন সম্পূর্ণ বিশ্রান্ত অন্যান্য কেন্দ্রগুলির প্রবণতা বাড়াতে, উভয়বিধ কেন্দ্রের—একটির বিশ্রামের জন্য ও অন্যটির কাজের জন্য—যে এক-মুখী পারস্পরিক চেষ্টা, ইহাতে মনের বিষয়ান্তরে যাইবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এরূপ হওয়াও বিচিত্র নহে।

গাছের পোকা

প্রায় সব গাছেরই পোকা আছে, এবং প্রত্যেক গাছেই বিভিন্ন রকমের পোকা লাগিয়া থাকে। তাহাদের নিবারণোপায় বিভিন্ন ও বিশেষ পোকার জীবন-ইতিহাসের (Life History) উপর নির্ভর করে। প্রায়ই দেখি, পোকা সম্বন্ধে যখন কেহ কোন প্রশ্ন করেন, তখন পোকাটীর ধরণ ধারণ ইত্যাদি কিছুই বোঝা যায় না। যখনই কেহ কোন পোকা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিবেন তখন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া লিখিলে উত্তর দিবার সুবিধা হয়। (১) কি লক্ষ্য করা গিয়াছে, (৩) গাছের কাণ্ড, পাতা, ফুল বা ফল কোন্ অংশ নষ্ট করিতেছে (৪) কাটিয়া খাইতেছে, না রস শুষিয়া লইতেছে (৫) অনিষ্টের প্রকারটা কি রকম (nature of damage) (৬) পোকাটীর মোটামুটি বর্ণনা।

শটী সত্যই বৃক্ষবিশেষ হইতে প্রস্তুত হয় ও সেই বৃক্ষের নাম হইতেই "শটী" নাম পাইয়াছে। অন্য জিনিসকে সেই নামে অভিহিত করা যায় কি না সন্দেহ। তবে শটী ফুডের উপকরণ starch। সাগুও starch। ময়দা প্রধানতঃ starch হইলেও তাহাতে কিছুটা নাইট্রোজেন ও শর্করা (sugar) বা দ্রবনীয়রূপে পরিবর্ত্তিত starch থাকে। শাঁক-আলুতে ও starch (প্রধানতঃ), sugar ও নাইট্রোজেন আছে। (sugar 10—20 % ও starch 13 - 18 %; কোনো কোনো varietyতে 20—220 %)। ময়দা বলিতে বোধ হয় উল্লিখিত ভদ্রলোকটী তাহাই বুঝাইতে চান ও শটী বলিতে starch বুঝাইতে চান। যদি আমার অনুমান সত্য হয় তবে, নিম্ন প্রক্রিয়াগুলি দ্বারা ইহা সম্ভব। (১) washing of starch (২) rasping, (৩) separation (৪) subsiding (৫) cleaning of starch (৬) refining (৭) drying (৮) pulverizing etc.

রেশম-গুটির প্রকার-ভেদ

রেশমগুটি নানাপ্রকার আছে। ৩।৪ রকমের গুটি, যেগুলির চাষ করা হয়, সেগুলি ভিন্ন অন্য গুলি ব্যবসায়ের হিসাবে সফল হইবে না। মুখ-বন্ধ পাত্রে ক্ষার পদার্থ (যথা—borax, soda ইত্যাদি) সহ সিদ্ধ করিলে আঠা পদার্থ (Gummy matters) দ্রব হইয়া যাইবে; তখন সুতা বাহির করা যাইতে পারে।

তৈল বিশোধন

তৈলের Impurities কিছু থাকে in Solution ও বাকীটা in suspension। দ্রব impurities প্রধানতঃ resinous; ইহা Feeply acid.

সাবান প্রস্তুতের জন্য তৈল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ না হইলেও চলে। যতটুকু দরকার, তাহা নিম্নলিখিত ভাবে করিতে পারা যায়।

(ক) তোলা, কয়লার গুঁড়া বা এইরূপ কিছুর ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া লওয়া। পরে (খ) লবণযুক্ত জল বা সোডাযুক্ত জল (বা dry alkaline solution) সহ তৈলকে উত্তম রূপে নাড়িতে হইবে। ইহা হইয়া গেলে ২।৩ দিন স্থির হইয়া বসিতে দেওয়া দরকার।

(গ) সাবধানে নীচের লবণ দ্রব হইতে উপরের তৈলকে ঢালিয়া লওয়া। বলিয়া রাখা ভাল, সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করিতে হইলে, অন্যান্য প্রক্রিয়ার দরকার হয়; কারণ, ইহাতে তৈল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয় না। শ্রীভুপেন্দ্র-কুমার শ্যাম।

গার্হস্থ্য সংস্কার

১। ধূলা হইতে সকল রোগের বীজাণু উৎপন্ন হয়। সেই জন্য চৌকাঠে জল দিলে ঐ বীজাণুগুলি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না, ঐখানেই মরিয়া যায়।

৪। খাইবার সময় বিষম লাগিলে, যে ব্যক্তির বিষম লাগে, তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার নিমিত্তই 'ষাট, ষাট' বলে। ঐ রকম ভাবে সেই ব্যক্তিকে অন্যমনস্ক করিতে না পারিলে, কাশিতে-কাশিতে উহার দম আটকাইয়া মৃত্যুও হইতে পারে। শ্রীশান্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসবিতারাণী দেবী।

ওলা শব্দের অর্থ

ওলা শব্দের অর্থ নামা। ওলাউঠা; অর্থ নামাউঠা অর্থাৎ ভেদবমি। বাহ্যে হওয়া ও বমি হওয়া, এবং এই দুটিই কলেরার লক্ষণ। ওলা ওলা ওলা বিষ যা মুখে আয় অর্থ নাম্ নাম্ নাম্ বিষ যা মুখে আয়। বিষ নামান শব্দ প্রসিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের খুলনা প্রভৃতি স্থান হইতে ওলাউঠা শব্দের উৎপত্তি। ওলাউঠাশান্তির জন্য ওলা দেবীর প্রচার। ওলাউঠা হইতে ওলাদেবী।

ফুলের কালো রং

প্রকৃতির রাজ্যে আমরা মাত্র ৭টি কলার বা রঙ দেখিতে পাই; যথা,—ভায়োলেট, ইনডিগো, ব্লু, গ্রিন, ইয়োলো, অরেঞ্জ এবং রেড।

ইহার মধ্যে যখন কালরঙের কোন আভাষ আমরা পাই না, তখন প্রকৃতির রাজ্যে ফুলের রঙই বা কাল হইবে কেন। শ্রীগণেশচন্দ্র কর।

জোনাকির আলো

জোনাকী পোকা যে আলো দেয়, উহা phosphousএর আলো। ইহা পুড়িলে ঐ phosphovrus অম্লজানের সহিত মিশিয়া বিষাক্ত গ্যাস্ উৎপন্ন করে। তাহাতে মানব শরীরের বিশেষ অপকার সাধিত হয়।

এয়োতির লক্ষণ

সিন্দুর ও শাঁখা এয়োতের লক্ষণ, এবং বিবাহকালে স্বামী স্ত্রীকে সিন্দুর দান করে। পুনরায় স্বামীর সিন্দুর দানের অর্থ সতীন আনা। ইহা কুসংস্কার মাত্র। সাধারণতঃ সধবা স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে চুল এলাইয়া সিন্দুর দেওয়া হয়। সেই কুসংস্কার বশতঃ শুইয়া সিন্দুর পরিতে নাই। ডাক্তার শ্রীযতীশচন্দ্র দেব।

তাসের কথা

পূর্ব্বদেশ হইতেই তাস খেলার উৎপত্তি। সম্ভবতঃ আরব দেশেই ইহা প্রথম আবিস্কৃত হয়। ইহার প্রতিকৃতিগুলি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইহা আরব প্রভৃতি অঞ্চলেরই খেলা। ইহার প্রতিকৃতিগুলির সহিত উক্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণের আকৃতির অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে। আবার কেহ-কেহ বলেন যে, আরব ও সারাসিনেরাই কোন এক ভ্রমণকারী দলের নিকট শিক্ষা করিয়া, ইয়োরোপ অঞ্চলে উক্ত খেলার প্রবর্ত্তন করেন। প্রাচীন রোমক যুগেও এই খেলা ইটালী, ফ্রান্স, জার্ম্মাণ প্রভৃতি দেশেও ছিল। ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ইটালী দেশে কার্ডগুলি হস্ত দ্বারা অঙ্কিত করা হইত। পরে জার্ম্মাণীতে মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা ইহার অনেক উন্নতি সাধন করা হয়। সম্ভবতঃ কালে পাঠানরাই আমাদের দেশে এই খেলার প্রচলন করেন। শ্রীসতীশচন্দ্র দাস।

হবুচন্দ্র রাজার দেশ

প্রয়াগে যেখানে গঙ্গা ও যমুনা নদী মিলিত হইয়াছে, ঠিক তাহার পরপারে 'ঝুঁসী' নামে একটী স্থান আছে। ঐ স্থানের অধিবাসীরা অধিকাংশই হিন্দু;—মুসলমান অতি বিরল। স্থানটী ক্ষুদ্র; কিন্তু অতীব মনোরম ও নির্জ্জন। চারিদিকে উঁচু মাটীর ঢিবি—অধিকাংশ গৃহই মাটীর ভিতর। শুনা যায়, ঐ স্থানে পূর্ব্বে হবুচন্দ্র নামক কোন রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সবই বিচিত্র ছিল (স্থানটী দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়)। রাজ-কার্য্য রাত্রিতে হইত। প্রজারা দিনে নিদ্রা যাইত ও রাত্রে কাজকর্ম্ম করিত। সকল জিনিসের দর তখন সমান ছিল। রাজার গবুচন্দ্র নামক এক মন্ত্রী ছিল। রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে বুদ্ধি নির্গমনের ভয়ে কাণে ও নাকে তুলা দিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া থাকিত। শ্রীসতীশচন্দ্র দাস।

[শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বিজয় বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত তারকেশচন্দ্র চৌধুরীও এই এই প্রশ্নের উত্তরে এক-একটী গল্প বলিয়াছেন। বস্তুতঃ হবুচন্দ্র রাজা ও গবুচন্দ্র মন্ত্রী বলিয়া কেহ কিছুই ছিল কি না তাহা অবধারণ করা যায় না।] সম্পাদক।

কৌলিক উপাধির সৃষ্টি

মহারাজ আদিশূরের পূর্ব্ব হইতেই কৌলিক উপাধি প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়। জাতি ও শ্রেণী বিভাগের উদ্দেশ্যেই এই উপাধি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

গোত্র পুরাকাল হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের বংশের আদিপুরুষের নামই গোত্র স্বরূপ ব্যবহার করেন। কায়স্থ, বৈদ্য সম্প্রদায় তাঁহাদের আদি পুরোহিতের নামই গোত্র স্বরূপ ব্যবহার করিতেছেন। এই জন্যই নানা জাতের মধ্যে একই গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় গুহ বিশ্বাস।

গীতার সময়ের ব্যাকরণ

(১) গীতার সময় নিশ্চয়ই কোন ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল। কেহ-কেহ মাহেশ ব্যাকরণের নাম উল্লেখ করেন; কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ব্যাকরণ না থাকিলে ভাষা এমন শক্তিশালী ও বৈচিত্র্যময় হইতে পারে না। (২) পাণিনি খৃঃ পূঃ একাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। (৩) গীতা মহাভারতেরই একটী অংশ, মহাভারত খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া বঙ্কিমবাবু প্রমাণ করিয়াছেন। কাজেই পাণিনি গীতার পরবর্ত্তী যুগের লোক। (৪) গীতার এই অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করিবার কোন বিশিষ্ট কারণ আছে বলিয়া অনুমিত হয় না।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় গুহ বিশ্বাস।

মনসা পূজা

চুল্লীমুখে উনানের উপর মনসা পূজা হয় কেন?—তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ এ পর্য্যন্ত দৃষ্টি গোচর হয় নাই। কিন্তু শাস্ত্রীয় কিম্বদন্তী এই,—"মনসা" ব্রহ্মার মানসী কন্যা। আবার সাধারণের ধারণা, ব্রহ্মার অর্থ "অগ্নি"। সুতরাং ব্রহ্মা (অগ্নি)র মানসী কন্যা "মনসার" পূজা উনানের উপর হওয়া বিচিত্র নহে। তবে, ইহাও প্রাদেশিক আচার। সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই।

সূর্পণখার নাসাকর্ত্তন

লক্ষ্মণ স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করার কথা মূল রামায়ণে নাই। উহা কেবল কৃত্তিবাস-কৃত বাঙ্গালা রামায়ণেই আছে। আবার প্রবাদ এই, কৃত্তিবাস "কথকের" মুখে শুনিয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা সত্য হইলে, মূল রামায়ণে ও কথক-কথিত রামায়ণে পার্থক্য থাকা অতি স্বাভাবিক।

যদি কৃত্তিবাস-কৃত রামায়ণের মত লইয়া বিচার করা যায়, তবে অর্জ্জুন যেরূপ জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া, 'লক্ষ্য বেধ' করিয়াছিলেন; লক্ষ্মণও সেইরূপ সূর্পণখার ছায়া দেখিয়া "নাক কাণ" কাটিয়াছিলেন বলিয়া আমার ধারণা।

বিজয়া দশমী

"১। (ক) বিজয়ার দিন বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়া বিল্বপত্রে "দুর্গানাম" লিখিবার হেতু এই যে, পূর্ব্বে "শ্লেট" বা কাগজের প্রচলন ছিল না। প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে কলাপাতে লিখিতে হইত। সেই স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে বিজয়ার কলাপাতে "দুর্গানাম" লিখিত হয়। ইহার মূলে শাস্ত্রীয় অনুশাসন আছে কি না জানি না।

(খ) "সিদ্ধি" অর্থ 'সফলতা'। আবার সিদ্ধির পর্য্যায় শব্দ বিজয়া ও সম্বিদা। সুতরাং বিজয়ার দিন ইহার ব্যবহারের উদ্দেশ্য সমস্ত কার্য্যে বিজয় বা সাফল্য লাভ এবং বুদ্ধি-বৃত্তির স্ফুরণ। তন্ত্র-মতেই ইহার সমধিক প্রচলন; পুরাণ-মতে আছে কি না জানি না। তবে এই আচার ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই প্রচলিত।

ভট্টিকাব্যের রচয়িতা

২। ভট্টিকাব্যের প্রকৃত রচয়িতা কে, তাহা ভট্টিকাব্যে স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাসের সাহায্যে "ভট্টিকাব্য" পদটি পাওয়া যায়। সুতরাং ভট্টিকাব্যের রচনা সম্বন্ধে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, "ভট্টি" নামক কোন কবি ইহার রচয়িতা বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ব্যাকরণের পুরাতত্ত্ব

বর্ত্তমান প্রচলিত ব্যাকরণসমূহের মধ্যে "পাণিনি" (সিদ্ধান্ত কৌমুদী) সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কত প্রাচীন, তাহার নির্ণয় করা অসম্ভব। কিন্তু পাণিনির পূর্ব্বে মাহেশ্বর (মাহেশ) ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল। সে ব্যাকরণ এখন পাওয়া দুর্ঘট; শুনিয়াছি নেপাল প্রদেশে আছে। পাণিনিতে ঐ মাহেশ্বর ব্যাকরণের ১৪টী সূত্র (বর্ণমালা প্রকরণ) গৃহীত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর "ভট্টজী দীক্ষিত" বিরচিত "বৃত্তিতে" এইরূপ লিখিত আছে—

ইতি চতুর্দ্দশ মাহেশ্বরাণি সূত্রাণি অনাদি সংজ্ঞার্থানি।" সিদ্ধান্ত কৌমুদী দ্রষ্টব্য।

সঙ্গত প্রশ্নাবলী উত্তর—

১। লক্ষ্মীর প্রীতি সম্পাদবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।

২। অশুভ বিনাশ ও শুভ-সম্পাদন জন্য।

৩। মেয়েলি সংস্কার মাত্র। শাস্ত্রীয়যুক্তি কিছুই নাই।

৪। প্রমাণ—"কার্ত্তিকে শূরণং চৈব, সিংহে চালাবুকং তথা।
মকরে মূলকং চৈব, সত্যো গোমাংস ভক্ষণং॥"

অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে "ওল", ভাদ্র মাসে "লাউ", এবং মাঘ মাসে "মূলা" খাইলে, গোমাংস ভক্ষণের ফল হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই,—বর্ণিত সময়ে ঐ সমস্ত বস্তুর স্বাদ এবং গুণ নষ্ট হওয়াতে, শরীরের হানিজনক হয় বলিয়া নিষিদ্ধ।

৫। "ষাট্" বলার উদ্দেশ্য,—অনেক সময় বিষম লাগিয়া নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়; পরিণামে মৃত্যুও হইতে পারে। কিন্তু ঐ কথাতে মনঃসংযোগ হইলে বিষম উপশমিত হওয়া সম্ভব।

৬। প্রমাণ—"একতারং নভো দৃষ্ট্বা অর্দ্ধব্যো নারদো (কপিলো) মুনিঃ
তাবচ্চণ্ডালতাং যাতি যাবদন্যং ন পশ্যতি॥"

অর্থাৎ আকাশে একটী মাত্র নক্ষত্র দেখিলে, "নারদ (কপিল) মুনিকে স্মরণ করিবে এবং যতক্ষণ অন্য আর একটী নক্ষত্র না দেখিতে পাইবে, ততক্ষণ চণ্ডাল তুল্য হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়া বোধ হয়;—একটী মাত্র নক্ষত্র দেখিলে, দৃষ্টিশক্তি (Hypnotism) প্রভাবে শরীরে বৈদ্যুতিকশক্তি (Flectricity) আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই আঘাত (Shock) সহ্য করিতে না পারিলে, রোগ জন্মিতে পারে। কিন্তু অন্য আর একটী নক্ষত্র দেখিলে, বিকর্ষণ-শক্তি (Negative power) প্রভাবে তাহা শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়; রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না।

৭।৮। মেয়েলি আচার। বিশেষ কোন হেতু পাওয়া যায় না।

৯।৮। নম্বর প্রশ্নের তৃতীয় উত্তর দ্রষ্টব্য।

১০। নৈসর্গিক আকর্ষণ-শক্তি ইহার মূলীভূত কারণ মনে করি।

৪৫ নং পৌরাণিক প্রশ্ন—

২। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে পাওয়া যায়, রাজা প্রিয়ব্রত রথারোহণে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রথচক্রের পেষণে সাতটী সমুদ্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিস্তৃত বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতে দ্রষ্টব্য।

৩। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, বহু বিস্তৃত প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হয়, বর্ত্তমানে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভবিষ্যতে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। তবে আমার অনুরোধ, নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি আলোচনা করিবেন; সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইবে।

১। স্কন্দপুরাণ, ৪। শিবপুরাণ,
২। পদ্মপুরাণ, ৫। লিঙ্গ-পুরাণ,
৩। শ্রীমদ্ভাগবত, ৬। মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

৪। কুশের অপর নাম "পবিত্র"। সেই জন্য পূর্ব্বে নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্ত কার্য্যেই কুশের ব্যবহার ছিল। এখনও প্রত্যেক কার্য্যের প্রত্যেক বিধিতে "কুশাসনে উপবিশ্য", "কুশহস্তঃ আচম্য", "তিল-কুশ-জলান্যাদায় ইত্যাদি প্রয়োগ পাওয়া যায়। সুতরাং 'শাপ'দিতে কুশ হাতে লওয়ায় কোন বৈচিত্র্য নাই।

৪৭ নং প্রশ্ন—গার্হস্থ্য সংস্কার—

উত্তর মুখে খাওয়া সকলেরই পক্ষে সকল সময়েই নিষিদ্ধ। কিন্তু আমরা সন্তান জন্মের পর হইতে সেই নিয়ম পালন করি।

প্রমাণ—আয়ুষ্মান্ প্রাঙ্মুখো ভুঙ্ক্তে যশস্বী দক্ষিণামুখঃ।
শ্রিয়ঃ প্রত্যঙ্মুখো ভুংক্তে, ঋণং? ভুংক্তেতুদঙ্মুখঃ॥

অতএব, কাহারও কোন সময়েই উত্তর মুখে খাওয়া উচিত নহে।

শ্রীতারকেশচন্দ্র চৌধুরী।

ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র

মহাভারতের আদি-পর্ব্বে ৬৭অ ও ১১৭অ ধৃতরাষ্ট্রের ১০১ জন পুত্রের কথা আছে। যুযুৎসু বৈশ্যাগর্ভজাত ও দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন সহ এক-শ পুত্র গান্ধারী-গর্ভজাত। এক'শ ভাইয়ের একজন আদরিণী ভগিনীও ছিলেন। আদি পর্ব্বে ইহাদের পরিচয় ৬৭অ আছে, বেদবেত্তা, রাজনীতি-পারদর্শী, যজুর্বিদ্যাবিশারদ। ১১৭অ আছে, অতিরথ, শূর, যজুর্বিদ্যাবিশারদ, বেদবেত্তা ও সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণ। মহাভারতে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও যুযুৎসু ছাড়া ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য পুত্রগণ কৃতদার ছিলেন, এই মাত্র পরিচয়। শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শেষ ভালো

[শ্রীদেববালা দেবী]

"দেশটা শুদ্ধ যেন কেমনধারা, বিগড়ে উঠেছে। ইস্কুলের ছেলেরা ইস্কুলে না পড়ে, কেবল হৈ-চৈ করবে,—রেয়োতরা খাজনা দেবে না,—চাকররা জল তুলবে না,—কুলি মজুরী করবে না,—সবাই যেন এক-একটা কেউটে সাপের বাচ্চা! কি ক'রে যে চলবে, তা ত' বুঝে উঠ্‌তে পারি না;—নাঃ—দুনিয়াটা অচল ক'রে উঠ্‌ল দেখচি!"

মহকুমার ম্যাজিষ্টেট সুশীলবাবু সমস্ত সকালটা ছুটাছুটির পর, দুইটার সময় দুটি ভাত মুখে দিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন। পাঁচ মাইল দূরে একটা গ্রামে রেয়োতরা জমিদারের কাছারী-বাড়ী লুট করিয়া আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল,—সেই ব্যাপারের অনুসন্ধানে সমস্ত সকালটা হৈ-হৈ করিয়া কাটিয়াছিল। গোটাকতক লোককে গ্রেপ্তার করাইয়া, রৌদ্রে গ্রীষ্মে অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া, ঘণ্টাখানেক আগে ফিরিয়া, স্নান-আহার সমাপনান্তে একটু শয্যা আশ্রয় করিয়া এই সকল চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে স্ত্রী সুষমা একটা পাখা হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন; এবং স্বামীর শয্যার একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া, পাখাটা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে উদ্যত হইলেন।

সুশীল বাবু তাঁহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "থাক্, বাতাসে দরকার নেই, কষ্ট হবে তোমার।"

স্ত্রী হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, "এই গরমে রৌদ্রে কোথায়-কোথায় দৌড়াদৌড়ি করে এলে তুমি,—আর তোমাকে একটু হাওয়া করতে হলে আমার কষ্ট হবে! কি বলো, তার ঠিক নেই! সাধে কি বলি যে, আমার ওপর তোমার ভালবাসা আর একেবারেই নেই!"

যৌবনের প্রখরতায় বোধ করি কতকটা ভাঁটাও পড়িয়াছিল; এবং বোধ করি কতকটা কাজের চাপেও, স্ত্রীর প্রতি ইদানীং মনোযোগটা একটু কমিয়া আসিয়াছিল; সেইজন্য এরূপ অনুযোগ মাঝে-মাঝে শুনিতে হইত। কিন্তু দেশময় যে হৈ-চৈ উঠিয়াছে, তাহাতে মহকুমার হাকিমের প্রেমের অবসর কোথায়? যে রঙ্গীন মেঘে একদিন চারিদিক রাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিল—তাহার আভাষ এখনও সময়-সময় পাওয়া যায় বটে,—কিন্তু তখনি চোখ পড়ে স্তূপীকৃত ফাইলের উপর;—ফাইল, ফাইল, ফাইল! ওই লাল-ফিতা-বাঁধা মূর্ত্তিমান বিঘ্নগুলা যে অশান্তি বক্ষে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার দুঃখ সুদূর-প্রসারী! ফাইল এবং ডেসপ্যাচ,—আজ রাত্রে বসিয়া-বসিয়া হয় ত উহাদের সব শেষ করিতেই হইবে; এবং কালকের ডাকে রওয়ানা করিতেই হইবে—তা' রাত্রি দুটাই বাজুক কি তিনটাই বাজুক, এবং বাহিরে যতই কেন জ্যোৎস্নালোক ফুটিয়া উঠুক না, এবং পিক-কুহরণ হইতে থাকুক না।

কিন্তু নিস্তব্ধ গৃহে যখন স্ত্রী আসিয়া এমন করিয়া অভিযোগ করেন, তখন অতিবড় অপ্রেমিকের হৃদয়েও পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিতে বাধ্য। স্ত্রীর হাতখানি হাতে লইয়া সুশীল বাবু, তাঁহার চুড়ী ও বালা লইয়া অকারণ ঘুরাইতে লাগিলেন। তাহার পর কহিলেন, "সত্যিই সুষি, কাজ একেবারে আমাকে মানুষের কোঠার বাইরে ফেলে দিয়েছে! কিন্তু তবু তুমিও এ কথা বললে যে, তোমাকে আমি ভালবাসি না!"

'সুষি' এই স্নেহের সম্ভাষণ বোধ করি সুষমা আজ চার বৎসর শোনে নাই! আজ হঠাৎ সেই স্নেহ-সম্ভাষণে এবং স্বামীর এই আদরে সে যেন আগেকার দিন ফিরিয়া পাইল। সুশীল বাবু স্ত্রীর মুখখানি আস্তে-আস্তে দুই হাতে ধরিয়া আপনার ব্যগ্র মুখের কাছে—

২

এমন সময় বাহির হইতে আর্দ্দালি কহিল, "হুজুর, জরুরী তার হ্যায়—"

ধড়মড় করিয়া সুষমা উঠিয়া খানিক দূরে একটা চেয়ারে বসিল। সুশীল বাবু উঠিয়া গিয়া তার লইয়া খুলিয়া পড়িয়া স্তম্ভিতের মত বসিয়া পড়িলেন।

নয়াপুরার দারোগা তার করিয়াছে, One male and one female elephant became mad and murder-

ed drivers. People flying, great panic, elephants dived tank, not surrendering, wire instruction"। ইংরেজী যাহাই হউক, ভাবার্থ স্পষ্ট—"একটি মদ্দা এবং একটা মাদী হাতী ক্ষেপিয়া মাহুতদের মারিয়াছে, লোকেরা পলাইতেছে, অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত। হাতী দুটো পুকুরে পড়িয়াছে, কিছুতেই ধরা দিতেছে না, তার করিয়া পরামর্শ দিন।"

সুষমা সুশীল বাবুর পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কিসের তার আবার ?"

সুশীল বাবু একটা ঢোঁক গিলিয়া কহিলেন, 'দুটো হাতী ক্ষেপেছে !'

সুষমা হাসি চাপিবার মত করিয়া কহিল, "তা ক্ষেপলই বা,—তাতে তোমার কি !"

সুশীল বাবু তালু আর জিহ্বায় শব্দ করিয়া কহিলেন,—"murdered—মানুষ মেরেছে গো !"

সুষমা কহিল, "হাতী ক্ষেপে মানুষ মারলেও তোমার দোষ !"

সুশীলবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "দোষ যে আমাদের কিসে নয় তা ত জানি নে! আমার মহকুমায় ক্ষেপলো হাতী, ত তার জন্যে দায়ী আমি নই ত কে ? সুষমা, একটু জল দাও। রইল আমার বিশ্রাম করা। এই চাপরাসী—"

"হুজুর !"

"সেরেস্তাদার বাবুকো বোলাও ; আর ডিপ্‌টি সাহেবকে সেলাম দেও—বহুৎ জরুর বাৎ হ্যায়।"

"যো হুকুম।"

চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িতে-পড়িতে সুশীলবাবু কহিলেন, "মানুষের জ্বালাতেই অস্থির। তার ওপর হাতী-টাঁতীও যদি এমনি করে পেছনে লাগে, তা হলে ত চাকুরী করা দায় ! ছুটি না নিলে আর চলে না।"

* * * * *

সেকেণ্ড অফিসার লাবণ্যবাবু ও সেরেস্তাদার আসিয়া হাজির। সুশীলবাবু টেলিগ্রামখানা লাবণ্যবাবুর কাছে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "দেখুন, এ আবার এক নতুন বিপদ !"

লাবণ্যবাবু টেলিগ্রামখানা পড়িলেন। বেশ করে একটু হাসির রেখাও মুখের কোণে দেখা দিল। কহিলেন, "কি ব্যবস্থা ঠিক করলেন ?"

সুশীলবাবু কহিলেন, "আমি ত কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।"

লাবণ্যবাবু কহিলেন, "গুলি করে মারলে হয় না ?"

সুশীলবাবু কহিলেন, "তা হয়। কিন্তু ও-গুলো valuable property (মূল্যবান সম্পত্তি)। যদি মালিক খেসারতের নালিশ করে দেয়! জানেন ত এ-দেশের লোক, আর সিভিল কোর্টের কারখানা !" লাবণ্যবাবু কহিলেন, "তবে আইনের বইগুলি দেখা যাক্‌। মেকলের কল্যাণে পিনাল-কোডে ত কিছুই বাদ পড়ে নি,—দেখা যাক্‌, ক্ষেপা হাতী-টাতী সম্বন্ধে কিছু আছে কি না !"

একরাশ আইনের বই আসিয়া জমা হইল, সুশীল বাবু লাবণ্য বাবু ও সেরেস্তাদার তাহাদের অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘাঁটিয়া কিছুই বাহির করিতে পারিলেন না। বোঝা গেল যে মেকলেরও ভুল হয়। বরং দেখা গেল, Protection of Elephants নামধেয় একখানি আইনের বই-এ হাতী মারা একটা মস্ত দোষ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

সুশীল বাবু কহিলেন "উপায় ?"

মিনতির সহিত সেরেস্তাদার প্রস্তাব করিল, "হুজুর একশো চোয়াল্লিশ দফা লাগায়া যায়।"

সুশীল বাবু লাবণ্য বাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। লাবণ্য বাবুর মুখে আবার একটু ক্ষীণ হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "ও-সবের দরকার নেই। আমি বন্দুক আর জন-চারেক সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে যাচ্ছি। হাতী ক্ষেপে যখন এমনি ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন প্রয়োজন হ'লে তাদের গুলি করতে কোন বাধা নেই। এ আমি বেশ জানি।"

সুশীল বাবু কহিলেন, "কিন্তু valuable property ; যদি damage suit—"

লাবণ্য বাবু কহিলেন, "তার ব্যবস্থাও আমি করব। এই ত মাইল ৪।৫ রাস্তা, আজই আমি ফিরে আসব।"

৩

সন্ধ্যা হইয়াছে। নির্জ্জনে বারান্দায় একখানা আরাম কেদারার উপর বসিয়া সুশীল বাবু হাতীর কথা ভাবিতেছিলেন। লাবণ্য বাবু এখনও ফিরেন নাই। সকালবেলায় দৌড়াদৌড়ি এবং দুপুরের পর হইতে চিন্তায় শরীর ও মন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সম্মুখের বাগানে লাল, নীল, শুভ্র নানারকমের ফুল ফুটিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল; কিন্তু মন তাহাতে শান্তি পাইতেছিল না। তাহাদের পানে চাহিয়া-চাহিয়া কেমন একটা শ্রান্তি বোধ হইতে লাগিল; শরীর যেন ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল।

* * * * *

ও কি! কিসের কোলাহল? হাতী--হাতী! ওই ক্ষেপা হাতী ছুটিয়া এদিকেই আসিতেছে; খুনে হাতী, ক্ষেপা হাতী দুটো!

সাবধান, সাবধান, সুষমা সাবধান, সত্যই সাবধান! কৈ, বন্দুক কৈ?

এমন সময়ে ঘোর গর্জ্জন করিতে-করিতে হাতী দুটা আসিয়া বাংলার সম্মুখে দাঁড়াইল।

"সেরেস্তাদার, উপায়?"

সেরেস্তাদার সেলাম করিয়া কহিল "হুজুর একশো চুয়াল্লিশ!"

তাই, তাই সই! আপাততঃ উপায় কি! এতবড় পাপিষ্ঠ এই হাতী-দুটা যে, তাহারা স্বয়ং আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—শাস্তির কোন ভয় নাই? তখনি সেরেস্তদার নোটিশ লিখিয়া দিল, Whereas তোমরা দুই হাতী, দুইজনের প্রাণ-নাশ করিয়াছ, এবং বহুবিধ উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছ, যাহাতে শান্তি-নাশ এবং আরও প্রাণ নাশের সম্ভাবনা, সেই হেতু তোমাদের গতিবিধি রোধ করিবার জন্য এবং শুণ্ড আন্দোলন নিবারণ করিবার জন্য এই নোটিশ জারী করা যাইতেছে যে, তোমরা নয়াপুরার পুষ্করিণীর সীমার বাহিরে আজ হইতে দুইমাস কাল বিচরণ করিবে না, এবং শুঁড় নাড়াইবে না; এবং এই নোটিশ তোমাদের বিপক্ষে কেন চূড়ান্ত করা হইবে না, অবিলম্বে তাহার কারণ দেখাইবার জন্য তোমাদিগকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে।

সুশীল বাবু নোটিশে দস্তখত করিয়া কহিলেন, "ঝুলিয়ে দাও ওদের শুঁড়ে।"

কিন্তু ঝুলায় কার সাধ্য! পেয়াদা নোটিশ লইয়া কাছে যাইতেই, হস্তীদ্বয় এমনি বৃংহতিধ্বনি করিল, যে, স-নোটিশ পেয়াদা মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

সুশীল বাবু রাগিয়া কহিলেন, "এঁটে দাও ওই নোটিশ ছুটো ওই পেয়াদার কপালে!"

সেরেস্তাদার সবিনয়ে কহিল, "হুজুর তা হ'লে ত হাতীর ওপর নোটিশ হোল না,—হোল যে পেয়াদার ওপর—আইনে ফেঁসে যাবে হুজুর!"

সুশীল বাবু ধমকাইয়া কহিলেন, "খবর্দ্দার!" সুতরাং পেয়াদার কপালে নোটিশ আঁটিয়া দেওয়া হইল।

কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না দেখিয়া, সুশীল বাবু কহিলেন, "সেরেস্তাদার, এরা খুন ক'রেছে,—এদের খুনের চার্জে গ্রেপ্তার কর। বিচার এখনি হবে।"

* * * *

বিচার আরম্ভ হইল। হাতী-দুটার স্বপক্ষে চেহারায় প্রায় তাহাদেরই মত এবং তাহাদেরই মত এক মোটা-মোটা হাতওয়ালা মোক্তার সিনেহিলাল আসিয়া জুটিয়া গেল।

সিনেহিলাল বক্তৃতা করিয়া কহিল, "হুজুর, ও-চার্জে ওদের গ্রেপ্তার করা চলে না!"

সুশীল বাবু কহিলেন, "আমি কর্ল্লাম। তুমি কি করতে পার?"

সিনেহিলাল কহিল, "শোনা যাচ্ছে, শুঁড় দিয়ে ওরা মাহুতকে খুন ক'রেছিল। সুতরাং যদি কেউ গ্রেপ্তার হ'তে পারে, ত বড় জোর ঐ শুঁড়-দুটো। সুতরাং শুঁড়ের অপরাধে ঐ মূল্যবান দেহ দুটাকে গ্রেপ্তার করা এবং দোষী করা একেবারে বে-আইনী!"

সুশীল বাবু কহিলেন, "যদি কোন নির্ব্বোধের বে-অকুবির জন্য কাণ মলিয়া দেওয়া হয়, ত সে শাস্তি কাণকে দেওয়া হইল, না বে-অকুবটাকে?"

সিনেহিলাল কহিল "ও সম্বন্ধে মান্দ্রাজের একটা রুলিং আছে; সেটা যথাসময়ে হুজুরের কাছে পেশ হবে।"

সুশীল বাবু কহিলেন, "রুলিং মানি না,—ওদের ওপর ওই চার্জ হোলো।"

সিনেহিলাল কহিল, "তার ওপর গুরুতর এবং আকস্মিক উত্তেজনা; (grave and sudden provocation). এতে ওদের সব অপরাধ স্খালন হ'য়ে যায়।"

সুশীল বাবু কহিলেন, "কি প্রভোকেশন?"

তখন সিনেহিলাল একটুখানি মৃদু হাসিয়া, সুশীল বাবুর দিকে বক্র চাহনীতে চাহিয়া কহিল "হুজুর। বসন্ত কাল এসেছে,—আপনার ফুলে-ভরা বাগান তার প্রমাণ। এখন বাঘ বাঘিনীকে চায়, সর্প সর্পিনীকে চায়। সুতরাং হস্তী

হস্তিনীকে চাইবে, তাতে আশ্চর্য্য কি? এ একটা Act of God! আমি প্রমাণ করবো যে, মাহুত দু'জন এই Act of God-এ বাধা দিতে চেয়েছিল; সুতরাং হাতী-দুটার ক্রোধোদ্দীপ্ত হ'য়ে যে তাদের মেরেছিল, তা গ্রেভ এণ্ড সাডেন্ প্রভোকেশন ভিন্ন আর কি?"

সুশীল বাবু কহিলেন, "হাতীর মত বক্তৃতা হোল। অগ্রাহ্য করলাম। আমি রায় দিচ্ছি।"

রায়ের মর্ম্ম এইরূপ, দুইজন মাহুতকে খুন সপ্রমাণ হইয়াছে। সেই হেতু অপরাধীদ্বয়ের ফাঁসির হুকুম হইল। হাতী দুটার গলায় দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে, যে পর্য্যন্ত না তাহারা মরে! (To be hanged by the neck, till they are dead.)

সেরেস্তাদার সভয়ে কহিল, "হুজুর, অন্য প্রকার ফাঁসির আদেশ দেওয়া হউক; কেন না, ইহাতে এত বড় ক্রেনের (crane) দরকার হইবে যে, এ দেশে তাহা মিলিবে না।"

সুশীল বাবু কহিলেন, "খবর্দ্দার, পিনাল কোডে অন্যরূপ ফাঁসির কথা লেখে না। ক্রেন না পাওয়া যায়, তোমাকে লটকাইয়া দিব।"

রায় পড়িয়া শোনান হইল।

তখন সিনেহিলাল কহিল "এই কি চূড়ান্ত রায়?"

সু। হাঁ।

তখন সিনেহিলাল কহিল, "এ রায় একেবারে বে-আইনী। কোন প্রমাণ লওয়া হইল না,—সাক্ষীর এজেহার হইল না, প্রভোকেশনের বিষয় চিন্তা করা হইল না। তাহার পর মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের ফাঁসির হুকুম দেওয়ার ক্ষমতার কথা এই প্রথম শুনলাম। উচিত ছিল দায়রা সোপর্দ্দ করা। হাইকোর্ট এই শাস্তির সমর্থন করা উচিত ছিল। এ-সব কিছুই হয় নি, সুতরাং বে-আইনী।"

সুশীল বাবু। Grave and sudden emergency (গুরুতর এবং আকস্মিক প্রয়োজন)।

সিহেনিলাল বলিল "এ রায় মানিব না।"

সুশীল। মানিতেই হইবে।

তখন সিনেহিলাল হস্তীদ্বয়ের দিকে ফিরিয়া কহিল, "হে করিদ্বয়! এতবড় অবিচার আজ তোমাদের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইতে চলিল। অতএব গর্জ্জ, গর্জ্জ,—ঘন-ঘন শুণ্ড আন্দোলন কর, এবং সংহার মূর্ত্তি ধারণ কর। আমাকে ভিন্ন কাহাকেও বাঁচাইও না।"

তখন সেই হস্তীদ্বয় ঘোর বৃংহতি-ধ্বনি করিয়া শুণ্ড ঘনঘন আস্ফালন করিয়া ছুটিয়া চলিল। তাহাদের পায়ের চাপে এবং শুঁড়ের আঘাতে গাছ মরিল, পেয়াদা মরিল, সেরেস্তাদার আহত হইল। সেই ধাবমান সাক্ষাৎ কালকে দেখিয়া সুশীল বাবু বিচারাসন ত্যাগ করিয়া লম্ফ দিলেন, এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "গেলাম, গেলাম,—সুষি, সুষি।"

* * * *

একটা কোমল করস্পর্শে ঘুম ভাঙ্গিল। সুষমা সস্নেহে কপালে হাত বুলাইয়া কহিল, "ও-রকম কচ্ছ কেন? এমন অসময়ে ঘুমিয়েই বা পড়েছিলে কেন?"

সুশীল বাবু কহিলেন, "একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখছিলাম সুষি।"

সুষমা কহিল, "তোমার জন্যে আমার বড় ভাবনা হয়। এত চিন্তা, এত খাটুনি কদিন সয়? হাঁ, লাবণ্য বাবু ফিরে এসেছেন; তিনি কাল তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। এখন বলে পাঠিয়েছেন, যে হাতীর মালিকের অনুরোধে তিনি সে দুটোকে গুলি ক'রে মেরে এসেছেন।"

সমস্ত দেহের অসাড়তা যেন মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল। সুশীল বাবু চেয়ারের উপর সটান হইয়া বসিয়া কহিলেন, "বাঁচলাম সুষি!" তাহার পর সুষির কপোলে গাঢ় সস্নেহ চুম্বন করিলেন—অনেকদিন পরে, সত্যকার স্নেহের চুম্বন!

মানসিক বিকার

(আবহমান)

• [অধ্যাপক শ্রীরঙীন হালদার, এম-এ]

যৌন অপচার (Sexual Aberration)

"মানুষ বরাবর বাস্তবকে ঢাকা দিয়ে-দিয়ে, বাস্তবকে স্পষ্ট করে' জানবার এবং মানবার উপায় নিজের হাতে নষ্ট করেচে। বাস্তবকে মানুষ লজ্জা করে। তাই মানুষের তৈরী রাশি-রাশি ঢাকাঢুকির ভিতর দিয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে তা'কে নিজের কাজ করতে হয়। এই জন্যে তা'র গতিবিধি জানতে পারি নে। অবশেষে হঠাৎ যখন সে একেবারে ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে, তখন তা'কে আর অস্বীকার করবার জো থাকে না। মানুষ তা'কে সয়তান বলে' বদনাম দিয়ে তাড়াতে চেয়েচে, এই জন্যেই সাপের মূর্ত্তি ধরে' স্বর্গোদ্যানে সে লুকিয়ে প্রবেশ করে।"

ঘরে-বাইরে।

"আমার মতে, যা সত্য তা গোপন করা সুনীতি নয়, এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়।"

বীরবলের হালখাতা

মানসিক বিকারের আলোচনায় কেন যে যৌন সংস্কারের আমদানি করিলাম, তার কৈফিয়ৎ স্বরূপ এ কথাটা বলা দরকার যে, যেখানে যৌনতা স্বাভাবিক, মনোবিকার সেখানে নেই। মনের গোলমাল যেখানে আছে, সেখানেই যৌন ব্যাপারেরও গোলমাল। পূর্ব্বে অ-সংবিদ্ ও নিষ্পেষণের আলোচনা-সম্পর্কে যৌন-ব্যাপারের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি; এবং ইহাও বলিয়াছি যে, অ-সংবিদে স্থিত যাবতীয় ইচ্ছাই যৌন। এই যৌন ইচ্ছা মানব জীবনের সমুদায় চিন্তায় ও কর্ম্মে,—এক কথায়, মানবের চরিত্র-গঠনে কিরূপ কার্য্য করে, তা' আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব।

একটা কথা শোনা যায়, যে সত্যযুগে পাপ ছিল না। কথাটা মিথ্যা নয় কিন্তু। বোয়াল মাছ যখন পুঁটি মাছের ছাঁ গেলে, তখন চৌর্য্য, দস্যুতা, এবং হত্যা—এর কোন অপরাধই তার হয় কি? জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়া থেকেই পাপের এলাকায় সুরু।—অর্থাৎ জ্ঞান থেকেই পাপ আর পুণ্যের উৎপত্তি। এখন কথা হচ্ছে এই যে, মানুষের যৌনতা—যা'কে একটা অন্ধ প্রেরণা বলা যেতে পারে—কি পাপের এলাকার ভিতর, না পাপ ও পুণ্যের বাইরে? যাক্, পাপ-পুণ্যের বিচার না-হয় ছাড়িয়াই দিলাম; কিন্তু সুনীতি-দুর্নীতিকেও নাকচ করিলে চলিবে কেন?—সমাজ ত থাকা চাই! যৌন ব্যাপার আর যা'ই হোক্, তা যে সুনীতি নয় এ হচ্ছে শতকরা নব্বই জনের মত। আর এ মত এত প্রবল বলিয়াই, মনোবিজ্ঞান সর্ব্বত্র নীতি-বিজ্ঞানে দাঁড়াইয়াছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে শ্লীল ও অশ্লীলের কথা উঠিতেই পারে না, এটা এই বিংশ শতাব্দীতেও বঙ্গে বোঝানো দরকার। বিজ্ঞানের কাজ সত্যের অনুসন্ধান। আর সত্যই সুন্দর ও শিব। সত্য যদি অশ্লীল হতে পারে, তবে যৌন ব্যাপারও অশ্লীল। কারণ কি, যৌনতা যে সত্য এবং পুরা সত্য, তা প্রত্যেকেই, মুখে না বল্‌লেও, মনে জানেন। তথা-কথিত সভ্যতা সমুদায় যৌন ব্যাপারের জন্যেই বিধি-নিষেধ তৈয়ার করিয়াছে। ভারতের শাস্ত্রকারগণ স্মরণং কীর্ত্তনং কেলি ইত্যাদি অষ্ট প্রকার মৈথুনের নিগ্রহ করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যের বিধান করিয়াছেন। বাস্তবকে নিরোধ করলেই যদি তাকে খারিজ করা চলিত, তবে দুনিয়ার অনেক গোলমালই সহজে মিটিয়া যাইত; এবং মনের গোলমালের কার্য্য-কারণ লইয়া আজ মাথা ঘামাইতে হইত না।

জীব-বিজ্ঞানে দেখা যায় প্রত্যেক প্রাণী ও প্রত্যেক মানুষই যৌন প্রেরণার অধীন। সাধারণের বিশ্বাস যে, শৈশবে এই যৌনতা মোটেই থাকে না; বয়ঃসন্ধিকালে এর উদ্ভব। আর যৌনতা দেখা দেয়, ইতর লিঙ্গের আকর্ষণের ভিতর দিয়া; এবং তার লক্ষ্য ইতর লিঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

আসলে যৌনতার এ ধারণা মোটেই সত্য নয়।

ফ্রয়ড্ (Freud) দু'টি পারিভাষিক শব্দ এ প্রসঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন—(১) যৌন বস্তু (sexual object), (২) যৌন লক্ষ্য (sexual aim)। যৌন বস্তু তাকেই

বলা যায়, যা যৌন ভাবে আমাদিগকে আকর্ষণ করে ; আর যৌন লক্ষ্য বলিতে আমরা বুঝি সেই ক্রিয়া, যাতে যৌন প্রেরণা পর্য্যবসিত হয়। এ ভাবে যৌনতাকে বিভক্ত করিলে, যৌন অপচার বুঝিবার পক্ষে আমাদের ততটা অসুবিধা হয় না।

(১) যৌন বস্তু সম্পর্কীয় অপচার।

সাধারণ লোকের ধারণা অনেকটা সেই গল্পের মত যে, মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—স্ত্রী এবং পুরুষ ;—তারা প্রেমের ভিতর দিয়া পুনর্মিলিত হতে চায়। সুতরাং যখন দেখা যায় যে, এরূপ পুরুষ মানুষ বিরল নয়, যাদের যৌন বস্তু পুরুষ, এবং এরূপ মেয়ে মানুষও রয়েছে যাদের যৌন বস্তু মেয়ে, তখন ব্যাপারটা বড়ই অস্বাভাবিক ঠেকে। ঈদৃশ ব্যক্তিদিগকে 'বিপরিত যৌনতাশালী' (contrary sexuals) অথবা 'অন্তরাবর্ত্তিত' (inverts) বলা চলে। এদের সংখ্যাও কম নয়।

(ক) অন্তরাবর্ত্তন (Inversion)

অন্তরাবর্ত্তিতদের ক্রিয়াকলাপ :—উপরিউক্ত লোকেরা নানা ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে :—

(ক) যদি তারা পূর্ণ অন্তরাবর্ত্তিত হয়, তবে তাদের যৌন বস্তু সর্ব্বদাই সমলিঙ্গের হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে ইতর লিঙ্গের লোক তাহাদিগকে যৌন ভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না ; বরঞ্চ ইতর লিঙ্গ অনেক সময় তাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে। এরূপ লোকেরা স্বাভাবিক যৌন ক্রিয়ায় অপরাগ থেকে যায় ; অথবা তাতে কোনো আনন্দই পায় না।

(খ) তারা 'উভজাতীয় অন্তরাবর্ত্তিত' (amphigenously inverted) অথবা 'মানসিক যৌন উভলৈঙ্গিক' (psychosexually hermaphroditic) হইতে পারে ; অর্থাৎ তাদের যৌন বস্তু সমলৈঙ্গিক অথবা ইতরলৈঙ্গিক দুইই হইতে পারে। ইত্যাকার অন্তরাবর্ত্তনে বিপরীত যৌনভাবের অভাব থাকে না ; বরং দুইই সমানে মনোরাজ্যে রাজত্ব করিতে পারে। এ ক্ষেত্রে একটি পুরুষ একই সময়ে পুরুষ এবং স্ত্রীলোককে যৌনভাবে ভালবাসিতে পারে ; অথবা একটি স্ত্রীলোক একই সময়ে স্ত্রীলোক ও পুরুষের প্রতি আসক্ত হইতে পারে।

(গ) সাময়িক অন্তরাবর্ত্তন :—বাইরের অবস্থা এ ক্ষেত্রে অন্তরাবর্ত্তনের সাহায্য করে। স্বাভাবিক যৌন বস্তুর এবং যৌন শিক্ষার অভাবে এ ক্ষেত্রে মানুষ অন্তরাবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইস্কুল, হষ্টেল, অথবা কন্‌ভেণ্ট এর ছাত্র ও ছাত্রী, সৈন্য, কয়েদী, ও ঔপনিবেশিক ইত্যাদির মধ্যে এই প্রকার যৌনতা দেখিতে পাওয়া যায়। এ অন্তরাবর্ত্তন বেশী দিন স্থায়ী হয় না। স্বাভাবিক যৌন বস্তু লাভ করিলেই, যৌনতা আবার স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। আমি কলেজের অনেক ছাত্র দেখিয়াছি, যারা বিবাহের পর স্বাভাবিক হইয়াছে।

অন্তরাবর্ত্তিত লোকদের কার্য্যকলাপ নানা প্রকার হইতে পারে। যেমন ধরুন, কেহ তাদের সমলৈঙ্গিক ভালবাসাটাকে স্বাভাবিক মনে করিয়া, অপরাপর লোকদের সঙ্গে সমান অধিকার দাবী করিতে পারে ; আবার কেহ বা তাদের এই আসঙ্গলিপ্সাটাকে একটা বিকার মনে করিয়া, তার নিগ্রহের চেষ্টা করিতে পারে। এ ক্ষেত্রে মনোবিশ্লেষণ তাদের সহজে আরোগ্য করে।

অন্তরাবর্ত্তনকে প্রথমতঃ জন্মগত (congenital) স্নায়বিক অপকর্ষ অথবা অবনতির একটা লক্ষণ বলিয়া ধরা হইয়াছিল ; এর কারণ, চিকিৎসকরা প্রথমতঃ এ ব্যাধি স্নায়বিক রোগগ্রস্তদের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এ মতটার সত্যতা বিচার করিতে হইলে, দু'টি ব্যাপার আমাদের আলোচনা করিতে হইবে :—(১) জন্মগততা (congenitality) ও (২) অপকর্ষ (degeneration)।

এই অপকর্ষ বা অবনতি কথাটাই আপত্তিজনক। স্বাভাবিক লোকদের সকল অ-স্বাভাবিক ব্যাপারকেই, অপকর্ষ বা অবনতি বলার একটা বাতিক আছে। যেখানে সচরাচর তার অভাব, সেখানেই তাঁরা অপকর্ষ কথাটার ব্যবহার করিয়া থাকেন। যৌন অন্তরাবর্ত্তন যে অপকর্ষ নয়, তার অনেকগুলো প্রমাণ দাখিল করা যেতে পারে ; যথা,

প্রথমতঃ—এমন সব লোকের ভিতর যৌন অন্তরাবর্ত্তন পাওয়া যায়, যারা আর-আর সকল বিষয়েই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ—এ প্রকার যৌনতা দুনিয়ার বিখ্যাত মনস্বীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, এই অন্তরাবর্ত্তন তাঁদের মনের ক্ষমতা হ্রাস করে নাই। এখানে দৃষ্টান্তে নামিবার প্রয়োজন।

গ্রীসে যে স্ত্রী-কবির নাম হোমারের নামের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, সেই সাফো (Sappho) সমলৈঙ্গিক (homosexual) ভালবাসার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। হোরেস্

(Horace) বলেন যে, স্যাফো তাঁর প্রেমের কবিতা লেস্‌বস্‌-এর (Lesbos) যুবতীদের উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলেন। এখানে এ কথাটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, মেয়েদের সমলৈঙ্গিক ভালবাসার একটি নাম 'Lesbian love'।

জগতের সেরা চিত্রকর লিওনার্ডো ডা ভিন্সি (Leonardo da Vinci) অন্তরাবর্ত্তিত ছিলেন। সারা জীবন তিনি সুশ্রী যুবকদের দ্বারা পরিবৃত থাকিতে ভালবাসিতেন; এবং তাঁর শিষ্যরা শিল্পের নৈপুণ্য অপেক্ষা চেহারার সৌন্দর্য্যের জন্যই বেশী খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার ২৪ বৎসর বয়স, তখন তিনি ফ্লোরেন্সে এই অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ফ্রয়ড্‌ তাঁর এই সমলিঙ্গাসঙ্গকে "ideal homosexuality" আখ্যা দিয়াছেন।

রেনেসাঁস্‌-যুগের বিখ্যাত আর্টিষ্ট মিকেলাঞ্জেলো (Michelangelo) অন্তরাবর্ত্তিত ছিলেন। তিনি পুরুষের সৌন্দর্য্যেই বিভোর থাকিতেন;—স্ত্রীলোকের-সৌন্দর্য্য তাঁকে মোটেই আকর্ষণ করিতে পারিত না।

নব-গ্রীক্‌-রেনেসাঁস্‌-এর পুরোহিত হ্বিন্‌কেল্‌মান্‌ (Winkelmann) সম্বন্ধেও অন্তরাবর্ত্তনের সন্দেহ পোষণ করা হইয়া থাকে। তিনি তাঁর পুরুষ বন্ধুদিগকে প্রেমপত্র লিখিতেন। তাঁর আকস্মিক অপমৃত্যুর কারণও এই সমলিঙ্গাশংসা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

এলিজাবেথের যুগে ইংল্যাণ্ডে সমলিঙ্গাশংসা অনেক মহামহা রথীর ভিতরে দেখিতে পাওয়া যায়। সেক্সপীয়র এক যুবক বন্ধুকে (W. H.) উদ্দেশ করিয়া অনেকগুলো সনেট লেখেন। আর একটা ব্যাপারও আমাদের চোখ এড়ায় না যে, মিলনান্ত নাটকে তিনি প্রায় মেয়েকে পুরুষ সাজাইয়াছেন। মার্লো (Marlowe) তাঁর Edward II-এ রাজা ও তদীয় প্রিয় পারিষদ্‌দের মধ্যে যে সম্পর্কটা আঁকিয়াছেন, তাতে তাঁকেও এ ব্যাপারে সন্দেহ করা চলে; বেকন (Bacon) পুরাদস্তর অন্তরাবর্ত্তিত ছিলেন। এমন কি, বেকনকে এ অপরাধে অভিযুক্ত করার কথাও তখন উঠিয়াছিল।

বায়রণের (Byron) সম্বন্ধেও অনেকে সমলিঙ্গাশংসার কথা বলেন। এ রকম একটা গুজবও প্রচলিত আছে যে, যদিও কোন-কোনও কবিতায় তিনি মেয়েদের সম্বোধন করিয়াছেন, তথাপি আসলে তারা ছেলেদের উদ্দেশেই লিখিত। বায়রণ লিখিয়াছেন—"My school-friendships were with me passions."

আধুনিক যুগে অস্কার ওআইল্ডের (Oscar Wilde) নাম সর্ব্বাগ্রে বলা যাইতে পারে। তাঁর মত এমন অসীম ক্ষমতাশালী লেখকও এই অপরাধে জেল খাটিয়াছিলেন। যাঁরা তাঁর 'The Picture of Dorian Gray,' পড়িয়াছেন, তাঁরাই জানেন, ওআইল্ডের সমলিঙ্গাশংসা কি তীব্র ছিল! ডোরিআন্‌ গ্রীক্‌রা সমলিঙ্গাসঙ্গের জন্য বিখ্যাত ছিল; এ জন্যেই বোধ হয় তিনি এ নামটি তাঁর নায়কের জন্যে পছন্দ করিয়াছিলেন। বইখানা পড়িলেই বুঝা যায়, নায়কটি কে।

আধুনিক ডেমোক্রাসির প্রবক্তা-কবি ওআল্ট হুইট্‌ম্যান্‌ (Walt Whitman) তাঁর 'Leaves of Grass' নামক কবিতামালায় পুরুষের সঙ্গে প্রেমের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তিনি নিজেই তার নাম দিয়াছেন "manly love".

সুতরাং দৃষ্টান্তের ভিতর দিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম যে, অন্তরাবর্ত্তনের কারণ স্নায়বিক অপকর্ষ বা অবনতি নয়।

তৃতীয়তঃ—(ক) অনেক প্রাচীন সভ্যতার অন্তরের মধ্যেও আমরা এই অন্তরাবর্ত্তন দেখিতে পাই। গ্রীসের সম্পর্কে Havelock Ellis বলিয়াছেন:—"In Greece the homosexual impulse was recognised and idealised; a man could be an open homosexual lover, and yet like Epaminondas, be a great and honoured citizen of his country". এমন কি, অনেক ধর্ম্মের মধ্যেও এটি বেমালুম ঢুকিয়া গেছে। আমাদের দেশের বৈষ্ণবদের গোপী ভাবে উপাসনায় কি নিষ্ক্রিয় সমলিঙ্গাসঙ্গের (passive homosexuality) একটা প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না?

(খ) এ ব্যাপারটা পৃথিবীর আদিম অসভ্য জাতিদের মধ্যে এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। সুতরাং 'অপকর্ষ' কথাটা এ ক্ষেত্রে খাটে কি? যারা সভ্যই হয় নাই, তাদের অপকর্ষ হইবে কি প্রকারে?

অমরনাথ

[শ্রীনন্দলাল কড়ুরি]

সন ১৩২৮ সাল, ১৪ই শ্রাবণ শনিবার, আমরা চারিজন দুর্গানাম স্মরণ করিয়া ৺অমরনাম দর্শন মানসে সন্ধ্যার সময় হাওড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। রাওয়ালপিণ্ডির ৪খানি মধ্যম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া, গাড়ীর উদ্দেশে প্লাটফরমে ছুটিলাম। ৮৷৷০টার সময় গাড়ী ছাড়িবার কথা ছিল। ৭৷৷০ টার সময় গিয়া দেখিলাম, পঞ্জাব মেলে বসিবার তিলমাত্র স্থান নাই। জনতা এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, মধ্যম শ্রেণীর কোন গাড়ীতে উঠিতে পারিলাম না। অগত্যা টিকিট পরিবর্ত্তন করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইতে মনস্থ করিলাম। সেই সময় একজন সদাশয় টিকিট-কলেক্টর, কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিলে উপায় হইতে পারে, বলিয়া আশা দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে একটা "রিজার্ভ কামরার" আরোহিগণ আসিলেন না। একের বাধায় অন্যের সুবিধা হয়,—জগতের এই চিরন্তন নিয়মে, তাঁহাদের শূন্য গাড়ীতে আমাদের উঠিবার সুযোগ হইল। গাড়ী ছাড়িবার ১০ মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া, উক্ত সদাশয় টিকিট-কলেক্টর বাবু আমাদিগকে সেই গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না। "নহি কল্যাণকৃৎ তাত দুর্গতিমধিগচ্ছতি"—শ্রীভগবানের এই শাস্ত্রবাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিলাম; এবং তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। দুইজন মুসলমান আরোহীও সেই গাড়ীতে উঠিলেন। প্রথমতঃ অসুবিধা ভোগ করিয়া, পরে তাঁহারাও আমাদের ন্যায় আনন্দিত হইয়াছিলেন। গাড়ী ছাড়িলে, আমরা নিশ্চিন্ত মনে শ্রীভগবানের নাম লইয়া শান্তি লাভ করিলাম। গাড়ীতে সারা নিশি সুখে কাটাইয়া; পরদিন বেলা ১২টার সময় আমরা প্রয়াগ তীর্থে (বর্ত্তমান নাম নাম এলাহাবাদ) অবতরণ করিলাম; এবং ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মশালায় গমন করিলাম। ধর্ম্মশালার একটা দ্বিতল গৃহে আমাদের জিনিসপত্র রাখিয়া, "একা" চড়িয়া ত্রিবেণীতে স্নান করিতে যাত্রা করিলাম।

নৌকারোহণে পতিত-পাবনী গঙ্গা যমুনা-সঙ্গমে স্নান করিয়া শরীর ও মন পবিত্র হইল।

পাতকরাশি নাশ করিয়া এবং সকল দুঃখের অবসান করিয়া, অন্তরে অনন্ত আনন্দ অনুভব করিবার জন্যই আর্য্য ঋষিগণ তীর্থ-ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

যখন অশান্তিপূর্ণ সংসারে বাস করিতে-করিতে প্রাণের ভিতর অস্থিরতা অনুভব করিবেন, তখন একবার তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া আসিলে, অনেক শান্তি লাভ করিবেন।

প্রয়াগের নাম "ত্রিবেণী"; কিন্তু এখন দুইটী বই বেণী দেখা যায় না। প্রবাদ আছে, সরস্বতীর ধারার উপর মোগল সম্রাট্ আকবর বাদশাহ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, সে ধারা লোপ করিয়া দিয়াছেন।

যাহা হউক, স্নান সমাপন করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলাম; এবং অক্ষয় বট ও নানা দেব-দেবীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। সেই অল্প সময়ের মধ্যে সহরের দর্শনীয় স্থান সকল দেখিয়া, সন্ধ্যার সময় ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম।

এলাহাবাদে প্রাচীন ও আধুনিক অনেক বিষয় দেখিবার আছে। তন্মধ্যে খস্রুবাগ প্রাচীন কীর্ত্তি। মুসলমান সম্রাট্গণের কীর্ত্তি দেখিবার সময় ইতিহাসের কত কথা মনে হয়।

জগতের মধ্যে যে সকল রাজ-বংশের নাম দেখা যায়, তন্মধ্যে মুসলমান সম্রাট্গণের মধ্যে হত্যাকাণ্ড যত দেখা যায়, এরূপ অন্য কোন রাজ-বংশের মধ্যেই দেখা যায় না।

খস্রুবাগ দেখিবার সময় সপরিবার খস্রুর সমাধি দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

কি অমানুষিক হত্যাকাণ্ডই হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শিশুর সমাধি দেখিয়া কত কথাই মনে হইতে লাগিল। পরদিন আহারাদি করিয়া বেলা ১২টার সময় পঞ্জাব মেলে আরোহণ করিলাম।

১৭ই শ্রাবণ প্রাতে গাড়ী অম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। আমরাও তাড়াতাড়ি মালপত্র বাহকের মাথায় দিয়া, অন্য প্লাটফরমে গিয়া (এন, ডব্লিউ, আর) অন্য পঞ্জাব মেলে উঠিলাম। ই, আই, রেলের পঞ্জাব মেল

অন্ত লাইনে কাল্‌কা অভিমুখে যাত্রা করিল। অম্বালা হিন্দুস্থান ও পঞ্জাবের সীমানা বলিয়া, ই, আই, আর কোং পঞ্জাব মেল নাম দিয়াছেন। নচেৎ হাওড়া হইতে এই গাড়ী পঞ্জাবে যায় না। যাহা হউক, আমাদের গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কত ঐতিহাসিক স্থান দেখিতে-দেখিতে (অবশ্য গাড়ীতে বসিয়া) বেলা ১২॥০টার সময় লাহোর ষ্টেসনে পৌছিলাম।

জঠর-জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য আমরা দ্রুত গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম; এবং বাহকের সাহায্যে দ্রব্যাদি লইয়া ষ্টেসনের বাহির হইবামাত্র মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

জলে সকল আগুন নিবিলেও, জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বৃষ্টি-জলে স্নান করিয়া, সিক্ত-মার্জ্জারবৎ হইয়া, নিকটস্থ ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম, বালক, বৃদ্ধ, যুবক সকলেই ধর্ম্মশালার মর্ম্মর-মণ্ডিত অঙ্গনে আনন্দে বৃষ্টি-জলে স্নান করিতেছে। একের যাহাতে দুঃখ, অন্যের তাহাতেই সুখ,—ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, দেড় বৎসর এদেশে বৃষ্টি হয় নাই; অনেক দিনের পর বৃষ্টি হওয়ায়, তাহারা সকলেই আনন্দিত হইয়াছে। সুখ ও দুঃখ প্রাকৃতিক নিয়মে বিদ্যুতের ন্যায় সংক্রামিত হয় বলিয়া, তাঁহাদের আনন্দ দেখিয়া আমাদের ভেজার কষ্ট আর রহিল না।

যথাসময়ে স্নান-আহার সমাপন করিয়া সহর দেখিতে বাহির হইলাম। আহার আমাদের আনন্দদায়ক হয় নাই। স্বপাক আহার পরম সুখের, এ কথা সকলে স্বীকার করিলেও, পথ-ক্লান্তির পর স্বয়ং যখন ভিজে কাঠ ধরাইবার জন্য প্রেমাশ্রু-সলিলে অন্ধবৎ হইতে হয়, তখন স্বতঃই মনে হয় এই দগ্ধোদরকে যদি বাড়ীতে রাখিয়া আসিতাম, তাহা হইলে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। যাঁহারা "ছুঁৎমার্গে" পদাঘাত করিয়া, বিশ্ব-মানব-প্রীতিতে বিভোর হইয়া, "হোটেলে" আহার করেন, তাঁহাদিগকে এ কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। কিন্তু আচার বর্জ্জন ও অন্নদোষ মানুষকে মৃত্যু-পথে অগ্রসর করায়,—মহর্ষি মনুর এই কথাটি তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না।

সহরের যাবতীয় দর্শনীয় স্থান দেখাইয়া আনিবে বলিয়া, একজন "টোঙ্গাওয়ালার" সহিত বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম।

প্রথমেই একটী "গেটের" মধ্য দিয়া সহরে প্রবেশ করিতে হয়। প্রকাণ্ড গেট। সহরে নানা রকমের পণ্য-বীথিকা সুসজ্জিত আছে। দেখিতে-দেখিতে একটী প্রাচীন মসজিদে উপস্থিত হইলাম। প্রাচীন কারুকার্য্য দেখিয়া হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্প দেখিলে জাতীয় মাহাত্ম্য আমরা অনুভব করিতে পারি।

ক্রমশঃ ঘুরিতে-ঘুরিতে আর একটী মসজিদ দেখিলাম। ইহার কারু-কার্য্যও সুন্দর। শেষে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের দুর্গ-সমীপে উপস্থিত হইলাম। গেটের অর্দ্ধমুক্ত দরজার মধ্যে অজাতশ্মশ্রু শ্বেতাঙ্গ বালক বন্দুক লইয়া পাহারা দিতেছে। আমাদের প্রবেশ করিতে দিল না। মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি ভিন্ন অপরিচিত কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবার নিয়ম নাই। মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি ভিক্ষার সময় ছিল না, সুতরাং দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় দর্শনাশা হৃদয়ে বিলীন হইল। কাজেই, বাহির হইতেই চারিদিকে ঘুরিয়া, কতক দৃশ্য চর্ম্ম-চক্ষে, আর কতক অতীত ইতিবৃত্ত মনশ্চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া, মনকে আশ্বস্ত করিলাম। সেই সময় ঐতিহাসিক কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল। দুর্গের সম্মুখেই মহারাজ রণজিৎ সিংহের সমাধি-মন্দির। সে মন্দির সকলেরই অবারিত-দ্বার। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে মন বিমুগ্ধ হইল। সকল দৃশ্যই অতি সুন্দর। স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য্য অতি সুন্দর হইয়াছে। দুই-জন ব্রাহ্মণ তাহার প্রহরায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদিগকে কিছু দর্শনী দিয়া বাহির হইলাম। শুনিলাম, এই মন্দির ৭৫ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। দেখিতে-দেখিতে সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইল। সহরের বাহিরে "ইংলিশ কোয়ার্টারের" রাস্তা দিয়া ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। ইংরাজ বাহাদুর বাহিরে থাকিয়া ভিতর রক্ষা করিতেছেন; কিন্তু ভিতর দেখিবার পথ সহজ-গম্য করিয়া দেন নাই। সন্ধ্যার পর সেখান হইতে যাত্রা করিতে হইবে বলিয়া, আধুনিক দর্শনীয় স্থানসকল আর কিছুই দেখা হইল না। সন্ধ্যার পর আমাদিগকে যাইতে হইবে বলিয়া, তাড়াতাড়ি ধর্ম্মশালায় আসিয়া জিনিসপত্র বাঁধিয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম।

রাত্রি ৯॥০টার সময় গাড়ী ছাড়িয়া দিল। "প্যাসেঞ্জার ট্রেন" বলিয়া, সমস্ত রাত্রি আমাদিগকে গাড়ীতে থাকিতে

হইয়াছিল। পরদিন ১৮ই শ্রাবণ বুধবার বেলা দশটার সময় আমরা রাওয়ালপিণ্ডিতে উপস্থিত হইলাম। সমস্ত রাত্রির ক্লেশ দূর হইল ভাবিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম।

ষ্টেসনের কুলিগণের দ্বারা নিপীড়িত হন নাই, এরূপ রেলওয়ে যাত্রী কমই আছেন; কিন্তু এখানে উহাদের অত্যাচার অনেক বেশী। যাহা হউক, অতি কষ্টে কুলি ঠিক করিয়া, রাওয়ালপিণ্ডির প্রবাসী বাঙ্গালীগণের প্রধান কীর্ত্তি কালীবাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। কালীবাড়ী চিনিয়া লইতে অধিক অনুসন্ধান করিতে হয় নাই। কালী-বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, কয়েকদিনের পর এই সুদূর দেশে বাঙ্গালীর মুখ দেখিয়া, প্রাণে আনন্দ অনুভব করিলাম। এখানকার পুরোহিত মহাশয়ের নিবাসভূমি বাঁকুড়া জেলা, বিষ্ণুপুর গ্রাম। প্রায় দুই বৎসর হইল পুরোহিত মহাশয় সস্ত্রীক এখানে পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বাস করিতে-ছেন। দেশে আত্মীয় কেহ নাই বলিয়া, এবং আর্থিক অবস্থাও ভাল না হওয়ায়, এই দূর দেশে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এখানে আসিয়া স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতেছেন। কালীবাড়ীর মন্দিরের সম্মুখে নাট-মন্দির। নাট মন্দিরের দক্ষিণে থিয়েটারের ষ্টেজ বাঁধা আছে। প্রবাসী বাঙ্গালীগণ এই থিয়েটারে অভিনয় করিয়া থাকেন।

আহারাদি শেষ করিয়া বিকালে সহরের দর্শনীয় স্থান দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। রেল লাইনের উত্তর দিকে প্রাচীন সহর অবস্থিত। প্রকাণ্ড সহর। দোঁকান-পশার পশ্চিমের কোন সহর অপেক্ষা কম নয়। এখানে মটর-ট্যাক্সি এবং মটর লরি যত অধিক আছে, পশ্চিমের কোন সহরে তত নাই।

কাশ্মীরে যাইবার জন্য প্রত্যেকে ২৫৲ টাকা হিসাবে "লরির" বন্দোবস্ত করিয়া দালালকে দশ টাকা বায়না দিলাম। কিন্তু ঘটনা-ক্রমে সে গাড়ী হইল না। শেষে ১৮০৲ টাকায় একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া, পরদিন ১৯ সে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার সময় কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। ক্রমশঃ সম-তলা ছাড়িয়ে যখন চড়াই উঠিতে লাগিল, গাড়ীর গতিও তখন ক্রমশঃ মন্থর হইয়া আসিল। আমাদের শীতানুভব হইতে লাগিল। গাড়ী যত উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, মানুষের ন্যায় তাহারও পিপাসা তত বাড়িতে লাগিল। অনবরত সম্মুখের ছিদ্র-পথে জল ঢালিতে হইল। যাহা হউক, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা "মরি" পাহাড়ের শীর্ষদেশে, সহরের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। ড্রাইভার ট্যাক্সি লইয়া তাহাদের আড্ডায় রহিল। আমরা বাহক-সাহায্যে আশ্রয়ের অনু-সন্ধানে বাহির হইলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর একটী ধর্ম্মশালায় গমন করিলাম। জীর্ণ একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘরে প্রবেশ করিয়া বোধ হইল, সে ঘরে কখন মানুষ বাস করে নাই। অগত্যা তাহাকেই বাসোপযোগী করিয়া লইয়া বিশ্রাম করিতে বসিলাম। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, রাত্রিতে দরজা বন্ধ করিবার কোন উপায় নাই। তখন, পাশের দ্বিতল কাষ্ঠ-নির্ম্মিত গৃহে যিনি বাস করিতেছিলেন, তাঁহাকে আমাদের অবস্থা বুঝাইয়া বলাতে, তিনি দয়া করিয়া আমাদের উপরের ঘরে আশ্রয় দান করিলেন। তখন আমাদের জিনিসপত্র গৃহমধ্যে রাখিয়া, সহর দেখিতে বাহির হইলাম। যেটুকু বেলা ছিল, তাহার মধ্যেই যতদূর সম্ভব সহর দেখিয়া লইলাম। 'মরি' ও দার্জ্জিলিং প্রায় একরূপ সহর। দার্জ্জিলিংএর ন্যায় এখানেও নিয়ত কুয়াশা উঠিতেছে ও বৃষ্টি হইতেছে। এখানে ইংরাজ সৈন্যের প্রকাণ্ড ব্যারাক আছে। অসংখ্য গোরা সৈন্য এখানে বাস করে। সাহেবদের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দোকান আছে। শিক্ষা ও বিলাসের জন্য বায়স্কোপ, থিয়েটার প্রভৃতি আছে। ইংরাজ-গণের বাসস্থান অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। যে দিকে দেশীয়-গণের বসতি ও দোকান আছে, সে স্থান তত পরিষ্কার নয়। বাজারে সমস্ত তরিতরকারী ও খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়। এখানকার ভদ্রলোকের মধ্যে অধিকাংশই পঞ্জাবী। এখানকার বালক-বালিকাগণের সুন্দর আকৃতি দেখিলে প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হয়। সকলেই সুন্দর ও বলবান। সন্ধ্যার সময় আশ্রয়-স্থানে ফিরিয়া আসিলাম; কিন্তু উপবাসে রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা করিতে হইল। আমাদের এইরূপ অনায়াস ব্যবস্থার কথা শুনিয়া আমাদের আশ্রয়দাতা সেই সঙ্কল্পে বাধা দিলেন। তাঁহার সঙ্গী ভদ্রলোক রুটী প্রস্তুত করিয়া আহার করিবার পর, নিজে কষ্ট করিয়া আমাদের জন্য পুরি তৈয়ার করিয়া দিলেন। এই সুদূর বিদেশে, এরূপ অবস্থায়, এরূপ সহানুভূতি শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে হইল। আহারান্তে শয্যা গ্রহণ করিলাম; এদিকে মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

পরদিন বেলা ৮ পর্য্যন্ত বৃষ্টি থামিল না দেখিয়া, অগত্যা ভিজিতে-ভিজিতে মোটরের আড্ডায় উপস্থিত হইলাম। ৯টার সময় আমাদের গাড়ী মরি হইতে বাহির হইয়া, কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করিল। রাস্তা ক্রমশঃই খারাপ বোধ হইতে লাগিল। কোয়াসায় সমস্তই অন্ধকার হইয়া রহিয়াছে। অগত্যা গাড়ী মন্থর-গতিতে গমন করিতে লাগিল। তিন-ঘণ্টার পর নিম্নভূমিতে গাড়ী আসিলে, আমরাও ইংরাজ-রাজ্য ত্যাগ করিয়া, একটী সেতু পার হইয়া, কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। এখানে কুয়াসাও নাই, বৃষ্টিও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, রাস্তা বন্ধ। রাত্রির বৃষ্টিতে পাহাড়ের ধ্বস নামিয়া, রাস্তার উপর দিয়া জল-স্রোত চলিয়াছে, এবং প্রস্তর-খণ্ডে গাড়ী চলা অসম্ভব হইয়াছে। কুলীর অপেক্ষায় কিছুক্ষণ থাকিবার পর, পশ্চাৎ হইতে কতকগুলি মালবাহী গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের দ্বারা কতক পাথর ফেলিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিয়া, গাড়ী কোন গতিকে জলের ওপারে হাজির হইল। আমি জল ভাঙ্গিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিলাম। আমার সহযাত্রীত্রয় পাহাড়ীগণের পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়া জলস্রোত পার হইলেন। আবার গাড়ী চলিতে লাগিল; এবং মধ্যে-মধ্যে বাধাও পাইতে লাগিল; কিন্তু রাস্তায় সর্ব্বত্রই কুলী নিযুক্ত দেখিলাম, কোন স্থানে বেশীক্ষণ দেরী করিতে হইল না। বেলা প্রায় দুইটার সময় যেখানে গাড়ী উপস্থিত হইল, সেই স্থানে পুলিশ কর্ম্মচারীরা আসিয়া আমাদের নাম, ধাম, জাতি, পেশা প্রভৃতি এবং কি উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে যাইতেছি, সমস্ত লিখিয়া লইলেন। কিছুদূর যাইবার পর চুঙ্গি আপিসের লোক আসিয়া আমাদের মালপত্র দেখিতে চাহিলেন। আমরা তীর্থযাত্রী শুনিয়া, কেবল গাড়ী ও যাত্রীর মাশুল বলিয়া পাঁচ টাকা লইয়া ছাড়িয়া দিলেন। এইবার আমাদের গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, একখানি "লরি" খাদের মধ্যে পড়িয়া আছে। সেই দৃশ্য দেখিয়া শরীর শিহরিয়া উঠিল। আমাদের চালককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ঐ গাড়ীখানি ৪ দিন পূর্ব্বে পড়িয়া গিয়াছে। ১৩ জন যাত্রী এই গাড়ীতে ছিল; তাহার মধ্যে ৩ জন মরিয়া গিয়াছে; অবশিষ্ট সকলে হাসপাতালে আছে। তাহাদের অবস্থা কিরূপ, আমাদের চালক ঠিক বলিতে পারিল না।

রাওয়ালপিণ্ডি হইতে কাশ্মীরে যাইতে, পর্ব্বতে-পর্ব্বতে ২০০ মাইল রাস্তা এরূপ ভয়ানক বক্রগতি যে, প্রতিমুহূর্ত্তে যেন মৃত্যুর সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। চালকের সামান্য অসাবধানতার জন্য সকলের প্রাণ-হানি হইতে পারে। যত বেলা যাইতে লাগিল, আমরাও সমতল ভূমিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রাস্তার মধ্যে ঝরণার স্রোতের বলে চালিত বৈদ্যুতিক কারখানা দেখিলাম। এই স্থান হইতে বিদ্যুৎস্রোত শ্রীনগরে প্রবাহিত হইয়া নগর আলোকিত করে। কিছুদূর গিয়া একেবারে সমতল জমিতে উপস্থিত হইলাম। আবার মটর থামাইয়া, জিজ্ঞাসা করিয়া, অনেক কষ্টে গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া, কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। আর ৩০ মাইল যাইতে পারিলে শ্রীনগরে পৌছিতে পারা যায়। গাড়ী দ্রুতগতিতে দুধারে "সবেদা" বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া যাইতে লাগিল; ঠিক যেন রঙ্গালয়ের পটমণ্ডপের মধ্য দিয়া গাড়ী যাইতেছে। বৃক্ষশ্রেণী দেখিয়া মনে হইল, এতক্ষণের পর ভূস্বর্গে আসিয়া পৌছিলাম। সন্ধ্যার সময় আমরা রাজধানী শ্রীনগরে আসিলাম। এইখান হইতেই পাণ্ডারা ঘিরিয়া ধরিল। অনেক চেষ্টার পর, যাঁহার বাড়ীর ঠিকানায় যাইবার কথা ছিল, তাঁহার বাড়ীতে পৌছিলাম। গিয়া দেখি, সে বাড়ী চাবি-বন্ধ রহিয়াছে। যে বালকগণের সঙ্গে বাড়ীতে পৌছিয়াছিলাম, তাঁহাদের দ্বারাই বোস সাহেবের নিকট হইতে চাবি আনাইয়া বাটীতে প্রবেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। পরদিন প্রাতে পাচক ব্রাহ্মণের জন্য চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইলাম। অগত্যা আপনারাই তাজ্জব ব্যাপারের অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিলাম। আহারাদি সমাপন করিয়া বেলা ৫টার সময় কাশ্মীর-প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের মধ্যে দুই এক জন প্রথিতনামা লোকের সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম যে, এখানে ২।৫ দিনের জন্য ভৃত্য পাচক পাওয়া যাইবে না,—শিখ ভৃত্য পাওয়া যায়। কিন্তু অশ্রদ্ধেয় "ছুঁৎমার্গে" আমাদের আস্থা শুনিয়া, "স্বয়ং দাসাঃ তপস্বিনঃ" হইতে পরামর্শ দিলেন। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। দুই আনা মাত্র ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিত। মধ্যবর্ত্তী আর কোন জাতি নাই। সুতরাং শাস্ত্রে বিশ্বাসী হিন্দু দুই-চারিদিনের জন্য এখানে আসিলে, স্বহস্তেই সমস্ত আয়োজন করিয়া আহার করিতে হইবে। নচেৎ দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি এই বচন প্রমাণে, কোন গতিকে হিন্দুধর্ম্ম বজায় রাখিতে হয়।

ক্রমশঃ সমস্ত যাত্রীতে শ্রীনগর পূর্ণ হইয়া গেল। নানা জাতীয় লোকের কোলাহলে সহর মুখরিত হইয়া উঠিল।

২৩ শে শ্রাবণ সোমবার পঞ্চমীর দিন "ছড়ি" অর্থাৎ সাধু-মোহান্তগণের সহিত যাত্রিগণের অমরনাথ দর্শনে যাত্রা করিবার দিন স্থির হইল। বৈকালে শঙ্কর মঠের সম্মুখের প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপতলে বিরাট সভার অধিবেশন হইল। সেই সভায় কাশ্মীরাধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র সপার্ষদ প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া আগমন করিলে, প্রধান মোহান্ত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নানারূপ ক্রীড়া-কৌতুকের পর কুমার-বাহাদুর এক থালি মুদ্রা সাধুদিগকে প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। সভাভঙ্গের পর অগ্রে সন্ন্যাসিনী-গণ, পরে সন্ন্যাসিগণ দল বাঁধিয়া যাত্রা করিলেন। বেলাও শেষ হইল।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতেই সকল যাত্রী আপন-আপন সুবিধামত গমন করিতে লাগিলেন। আমরা যাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া টোঙ্গাওয়ালাকে বুধবার প্রাতে যাইবার জন্য ২৲ টাকা বায়না দিয়া রাখিলাম।

বুধবার প্রাতে সত্বর আহারাদি সমাপন করিয়া, আবশ্যক দ্রব্যাদি ও বস্ত্রাবাস লইয়া টোঙ্গা করিয়া যাত্রা করিলাম। শ্রীনগর হইতে বাহির হইয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বমুখে যাইতে লাগিলাম। পথের মধ্যে স্থানে-স্থানে "চড়াই" পড়ায়, গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে হইল। মধ্যে-মধ্যে ঘোড়াকে ঘাস-জল খাওয়াইতে হইল। প্রায় ২০ মাইল গিয়া অনেকেই প্রাতরাশ সমাধা করিয়া লইলেন। ঘোড়া খুলিয়া দিয়া প্রায় এক ঘণ্টা বিশ্রাম করা হইল। এখানে গরম-গরম পুরি, হালুয়া, দুধ, পেঁড়া, ফল, মূল প্রভৃতি আহার্য্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ অনন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া গমন করিয়া, অনন্ত নাগের জন্মভূমি অনন্ত-নাগ সহরে উপনীত হইলাম। এখানে নবযুগের সভ্যতার নিদর্শন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, আদালত প্রভৃতি সকলই আছে। আর ৪ মাইল গমন করিলেই আমাদের অদ্যকার যাত্রা শেষ হয়। বেলাও শেষ হইয়া আসিয়াছে; রাস্তাও অতি কদর্য্য। যাহা হউক, অতি কষ্টে গাড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ সন্ধ্যার সময় আমরা "মার্ত্তণ্ডে" প্রবেশ করিলাম। একেবারে ৫০।৬০ জন পাণ্ডা আমাদিগকে ঘিরিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। পূর্ব্ব হইতে আমাদের পাণ্ডা স্থির করা ছিল। আমাদের রঘুনাথ পাণ্ডার নাম শুনিয়া সকলে ছাড়িয়া দিল। পরে আমাদের পাণ্ডার সহিত দেখা হইলে, তাঁহার সহিত তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদের বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলেন। আমরা সে রাত্রে অনাহারে থাকিয়া শয়ন করিলাম। কিন্তু সুখ-নিদ্রা হইল না। শয়ন করিবার কিছুক্ষণ পরেই "পিসুঁধ" কামড়ে অস্থির হইয়া উঠিলাম। সেই রাত্রি অনাহার ও অনিদ্রায় কাটিয়া গেল। পর দিন পাণ্ডা ঠাকুরের কৃপায় আহারাদি করিলাম। মার্ত্তণ্ড জায়গাটী বেশ সুন্দর। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত; মধ্যে সমতল স্থান। পর্ব্বত হইতে একটী জলস্রোত আসিয়া একটী পুষ্করিণীতে পড়িতেছে; এবং সমান বেগে বাহির হইয়া যাইতেছে। ইহাতে অসংখ্য মৎস্য পরমানন্দে ক্রীড়া করিতেছে; এবং যাত্রী-দত্ত আটা-গুলি ভোজন করিয়া বেড়াইতেছে।

এই জলাশয়ের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া তাম্বু বা বস্ত্রাবাস পড়িয়াছে। পূর্ব্বদিকে শ্রীনগরের মোহান্তের রৌপ্য-নির্ম্মিত আশাসোটা বা ছড়ি স্থাপিত হইয়া পূজিত হইতেছে। মধ্যে-মধ্যে রাম-শিঙ্গার গভীর নাদে সেই স্থান প্রকম্পিত হইতেছে। সাধু, সন্ন্যাসী, ধর্ম্মপ্রাণ গৃহস্থগণ, দোকানদার, পসারীগণের কলরবে এই স্থানটী ঠিক যেন নগরের আকার ধারণ করিয়াছে। অমরনাথ-যাত্রিগণের জন্য এই স্থানে ঘোড়া ও ডুলি পাওয়া যায়। ঘোড়ার ভাড়া ১৫৲ টাকা, ডুলির ভাড়া ৬৪৲। আমি ডুলি করিব, সঙ্কল্প করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার সঙ্গিগণ পদব্রজে যাওয়াই সঙ্গত স্থির করিলেন। হাঁটিতে-হাঁটিতে যদি কেহ ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তিনি তখন অশ্বারোহণে যাইবেন বলিয়া, কেবল একটী ঘোড়া রাখিলেন। আমাদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠের প্রস্তাব-মত আমরা সকলে চলিতে বাধ্য হইলাম। আর একটী ঘোড়ার পিঠে মালপত্র বোঝাই করিয়া লওয়া হইল; তাহার ভাড়া ১২৲ টাকা।

(আগামী বারে সমাপ্য)

নায়েব মহাশয়

পল্লী-চরিত্র

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়]

প্রথম পরিচ্ছেদ

বহু দিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় যে সকল নীলকুঠী ছিল, সেই সকল কুঠীর কাজকর্ম্ম কি ভাবে পরিচালিত হইত, তাহার অনতিরঞ্জিত চিত্র সুরসিক নাট্যকার স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার অমর নাটক 'নীলদর্পণে' অঙ্কিত করিয়া ইংরাজ নীলকরগণের ও তাহাদের কার্য্য-পরিচালক এদেশী কর্ম্মচারী-বর্গের অত্যাচারের স্মৃতি বঙ্গ-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার 'নীল বিদ্রোহ' চিরসহিষ্ণু কৃষিজীবী নিরীহ প্রজাপুঞ্জের প্রতি 'নীলকর-বিষধর'গণের সেই অত্যাচারের ফল। মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা-স্বরূপিনী পয়স্বিনীকে নির্ব্বিচারে দোহনের ফলে ক্ষীরধারার পরিবর্ত্তে তাহার পয়োধর হইতে শোণিতধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। তখন সে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া, সুদৃঢ় বন্ধন-পাশ ছিন্ন করিল; এবং পদাঘাতে দুষ্টবুদ্ধি লুব্ধ 'দোহালে'র ভাঁড় ভাঙ্গিয়া দিল! তাহার পর হইতে এ-দেশে নীলের চাষ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। বিশেষতঃ বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে সুলভ জার্ম্মাণ নীলের আমদানি বন্ধ হওয়ায়, শ্বেতাঙ্গ নীলকর-সমাজ এদেশে পুনর্ব্বার নীলের চাষে হস্তক্ষেপণ করিয়াছেন। এরূপ লাভজনক ব্যবসায় এদেশে অধিক নাই বলিয়া, এই ব্যবসায়টি শ্বেতাঙ্গ-সমাজের একচেটিয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে তাঁহারাই নদীয়া, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী প্রভৃতি জেলার প্রধান-প্রধান নীলকুঠীসমূহের মালিক ছিলেন; বর্ত্তমান কালে নীলের তেমন প্রাদুর্ভাব না থাকিলেও, সেই সকল কুঠী-সংসৃষ্ট জমী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নীলকর সাহেবদেরই অধিকারে আছে। প্রজারা এখনও ঐ সকল জমীতে স্বেচ্ছানুযায়ী শস্য উৎপন্ন করিতে পারে না। বিশেষতঃ যে সকল জমীতে এখনও নীলের চাষ হয়, সেই সকল জমীর দিকে কোন প্রজার দৃষ্টিপাতেরও অধিকার নাই! কতকগুলি শ্বেতাঙ্গ বণিক 'সম্মিলিত ভূম্যধিকারী' নাম গ্রহণ করিয়া, সুবিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি ও কৃষিকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। ইঁহারা সকল কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিবার জন্য কয়েক জন 'সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ' নিযুক্ত করিয়াছেন। এক-একজন 'সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষে'র অধীনে কয়েকটি বিভিন্ন 'জমীদারি-কেন্দ্র' অবস্থিত; এবং প্রত্যেক কেন্দ্র 'কানসারণ' নামে অভিহিত। এক-একটি 'কানসারণ' আবার এক-এক জন অধ্যক্ষের অধীন। এক-একজন 'সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ' কয়েকটি 'কানসারণের' অধ্যক্ষের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। অধ্যক্ষগণ এই সম্মিলিত ভূম্যধিকারি'গণের বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইলেও, জমীদারিতে তাঁহাদের অংশ আছে; এবং কমিশন হিসাবেও তাঁহারা প্রচুর অর্থলাভ করেন। স্ব-স্ব 'কানসারণে' তাঁহাদের অসীম প্রভুত্ব; তাঁহাদের শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তিরও তুলনা নাই! অর্থ-বলে, সম্মানে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগে, ইঁহারা কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী অপেক্ষা হীন ত নহেনই, বরং কোন-কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এমন কি, ইঁহাদের কাহার-কাহারও পোষা কুকুরও আমাদের দেশের অনেক সৌখীন ও বিলাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর আরাম-বিরাম ও সুখ উপভোগ করিয়া থাকে। দারুণ গ্রীষ্মে আমরা যখন সমতল বঙ্গের পল্লী-ভবনের দ্বার-জানালা রুদ্ধ করিয়াও কালানল-বর্ষী প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রভাব অতিক্রম করিতে অসমর্থ হই, এবং মধ্যাহ্নে প্রখর উত্তাপ গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া শুষ্ক-কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করি, তখন ইঁহাদের কুকুরগুলিও হিমাচলের সুশীতল বক্ষে আশ্রয় লাভ করিয়া, নিদাঘ-ক্লান্তি অপনোদন করে! সুতরাং বলা বাহুল্য, ইঁহাদের কুকুরও আমাদের দেশের ঠাকুর অপেক্ষা ভাগ্যবান!

যাহা হউক, এখন আমরা বক্তব্য বিষয়ের অনুসরণ করি। পূর্ব্বোক্ত জমীদারি 'কানসারণ'গুলিতে যে সকল শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষ নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও অধীনে

এখনও কুঠীর অস্তিত্ব বর্ত্তমান। প্রত্যেক অধ্যক্ষের কার্য্য-পরিচালনের জন্য তাঁহার অধীনে এক-একজন নায়েব আছেন। 'কানসারণ' সংক্রান্ত সকল কার্য্যের জন্য এই নায়েবই পরোক্ষ ভাবে দায়ী। পদে ও গৌরবে, এমন কি, অর্থভাগ্যেও নায়েব মহাশয় আমাদের পল্লী অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। পূর্ব্বজন্মে বিস্তর তপস্যা না করিলে, কোন রমণী এরূপ পুরুষ-শ্রেষ্ঠকে পতি রূপে লাভ করিতে পারেন না। আমাদের দেশে ডেপুটী, মুন্সেফ প্রভৃতির গৃহিণীর পদ নায়েব-গৃহিণীর পদের তুলনায় তুচ্ছ; যেন পূর্ণচন্দ্রের তুলনায় খদ্যোৎ! আমাদের গ্রাম্য স্কুলের সীতানাথ মাষ্টার এইরূপ একটি নায়েবের পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার বৈবাহিক-ভাগ্যের গৌরব করিতেন; এবং বৈবাহিকের পদমর্য্যাদার প্রসঙ্গে যখন-তখন বলিতেন, "আমার বেয়াই মশায়ের উপরি-আয় দেড়টা সদরওয়ালার (সবজজের) ব্যাতোনের সমান!"—সুতরাং এই নায়েবী পদ লাভ করিতে হইলে, বহু প্রকার অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়—এ কথা বলাই বাহুল্য। দেশীয় কর্ম্মচারিগণের মধ্যে নায়েবই প্রধান; তাঁহার অধীনে পেস্কার, জমানবীশ, সুমারনবীশ, নিকাশনবীশ, আমীন, মুহুরী, বরকন্দাজ, হাল-সনা, পাইক, প্রভৃতি কর্ম্মচারী বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ইহাদের বেতনের পরিমাণ যৎসামান্য হইলেও, ইহাদের চাকরীর মূলমন্ত্র, 'যেমন-তেমন চাকরী দুধ-ভাত।' ইহাদের প্রধান লভ্য উপরি-আয়; বেতনটা উপলক্ষ মাত্র। এই সকল 'কানসারণে'র কার্য্য-পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, মহাত্মা গান্ধির স্বরাজ-স্বপ্ন সন্দর্শনের বহু পূর্ব্ব হইতেই স্বরাজ-সাধনায় ইহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এমন কি, ইহাদের বৈষয়িক কার্য্য সম্বন্ধীয় কাগজপত্র অন্যত্র পাঠাইবার জন্য সরকারের ডাক-বিভাগেরও সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না; ইহাদেরই ডাকের ব্যাগ ও ডাকবাহী রাণারের বন্দোবস্ত আছে।

এই সম্মিলিত ইংরাজ ভূস্বামিগণের জমীদারি-কার্য্য পরিচালনার জন্য যে কয়েকটি 'কানসারণ' প্রতিষ্ঠিত আছে, 'মুচিবাড়িয়া' কানসারণ' তাহাদের অন্যতম। ইহাদের কোন 'কানসারণে' উচ্চশিক্ষিতই ধর্ম্মভীরু দেশীয় কর্ম্মচারী দেখিতে পাওয়া যায় না; জমীদারি-সংক্রান্ত কাজ-কর্ম্মে মোটামুটি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, যিনি ঘোড়ায় চড়িয়া যত বেশী ঘুরিতে পারেন, কারণে বা অকারণে বেত চালাইতে ও 'রেকাব দল কশিতে' পারেন, এবং ভদ্রলোকের অশ্রাব্য, অশ্লীল ভাষায় গালি দিয়া মুখ খারাপ করিতে পারেন, 'জবর-দস্ত ও তুখোড়' ম্যানেজার বলিয়া ততই তাঁহার খ্যাতি-প্রতি-পত্তি হইয়া থাকে। তাঁহারা মনে করেন, উচ্চশিক্ষিত, ধর্ম্ম-ভীরু কর্ম্মচারী দ্বারা তাঁহাদের সেরেস্তার কাজ চলিতে পারে না। এইজন্য তাঁহারা বিজ্ঞাপনের সাহায্যে বা অন্য উপায়ে শিক্ষিত কর্ম্মচারী সংগ্রহের চেষ্টা করেন না। দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় কর্ম্মচারীরা যে সকল পদে নিযুক্ত থাকেন, সেই সকল পদের দুই একটি ভিন্ন অন্যগুলির যে বেতন নির্দ্দিষ্ট আছে, কেবল সেই বেতনের উপর নির্ভর করিয়া কোনও শিক্ষিত ভদ্রলোকের পরিবার প্রতিপালনের সম্ভাবনা নাই। অপিচ, পরিবার প্রতিপালনের জন্য তাঁহাদিগকে যে সকল পন্থা অবলম্বন করিতে হয়, তাহা সকলের পক্ষে রুচিকরও নহে। বিশেষতঃ, তাঁহারা উপরওয়ালাদের নিকট হইতে সময়ে-সময়ে যেরূপ ব্যবহার পাইয়া থাকেন, তাহা নিঃশব্দে পরি-পাক করিতে হইলে যেরূপ প্রবল হজমশক্তি আবশ্যক, দীর্ঘ কালের অভ্যাস ভিন্ন হঠাৎ তাহা কেহ আয়ত্ত করিতে পারে না। অধ্যক্ষগণের অধীনে নায়েবী, পেস্কারী প্রভৃতি যে দুই-একটি দুর্লভ পদ আছে, তাহা লাভ করিতে যে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়—ডেপুটীগিরি পরীক্ষা তাহা অপেক্ষা অনেক সহজ; এবং কুঠীর স্নিগ্ধ ছায়ায় দীর্ঘকাল বাস করিয়া, এই পদের উপযোগী করিয়া নিজের চরিত্র গড়িয়া তুলিতে না পারিলে, এই পদের যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায় না। এই যোগ্যতা-বলে মেঠো আমীনও কালে নায়েবী পদে প্রমোসন পাইতে পারে।

সুতরাং বলা বাহুল্য, কুঠীর দেশীয় কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের ধর্ম্মাবতারের নিকট বিদ্যার পরিচয় দিতে না পারিলেও, তাঁহাদিগকে বুদ্ধির ও নানা প্রকার কৌশলের পরিচয় দিতে হয়। 'মুচিবাড়িয়া' কানসারণের নায়েব বাগচী মহাশয়ের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকিলেও, তিনি কিছু শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। এরূপ নায়েব অনেক আছেন, যাঁহারা নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট ও প্রতিকূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া কার্য্য-দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু বাগচী মহাশয় সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না,—কোন রকম ঝঞ্ঝাটই তিনি ভালবাসিতেন না। কার্য্যোদ্ধারের জন্য

নানাস্থানে যাতায়াত বা দৌড়াদৌড়ি করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের কোন গ্রামে তাঁহার বাড়ী বলিয়া, সকলে তাঁহাকে "বাঙ্গাল নায়েব" বলিয়া অভিহিত করিত। তাঁহার চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব ছিল,—'যেরূপে হউক, কিছু আদায় করিতেই হইবে'—তিনি এই নায়েব-সুলভ সাধারণ নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না; সুতরাং যাহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিত, তাহারা তাঁহার বুদ্ধির প্রকৃতিস্থতায় সন্দেহ করিয়া বলিত, "পয়সার দিকে দৃষ্টি নাই, বেচারার নায়েবী করাই বিড়ম্বনা।"—কেহ এ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিত, 'বাঙ্গাল, পুঁটি মাছের কাঙ্গাল'; পয়সার দিকে আবার দৃষ্টি নাই! আসল কথা কি জান? পয়সা লইতে হইলে বুদ্ধি খরচ করিতে হয়। ঘটে বুদ্ধি থাকিলে ত খরচ করিবে। যাহার বুদ্ধি আছে, সে দুই হাতে টাকা লুটিতেছে। সান্যাল মোশাই কি দাপটেই পেস্কারী করিতেছে,—পেশকার বাবুর প্রতাপে বাঘে-বক্‌রীতে এক ঘাটে জল খাইতেছে। বাঙ্গাল নায়েব ত পেস্কারের মুঠোর মধ্যে। পেস্কার তাকে যে কাতে শোয়ায়, সে সেই কাতে শোয়। কাজ উদ্ধার করিতে হইলে পেস্কার ভিন্ন গতি নাই। পেস্কার বাবু নায়েবকে যা বুঝায়, নায়েব তাই বোঝে। সান্যাল মোশাইকে দু'পয়সা দেওয়াও সার্থক।"

সাধারণের এরূপ ধারণা অমূলক নহে। তহশিলদার প্রভৃতি নায়েব মহাশয়ের ধাত বুঝিত। তাহারা কোন দরকারে নায়েব মহাশয়ের নিকটে যাইবার সময়ে ছিন্নপ্রায় মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া যাইত। নায়েব মহাশয় মনে করিতেন, যাহার সাজ-পোষাক এরূপ জঘন্য,—একখানি ধোয়া কাপড় পর্য্যন্ত যে পরিতে পায় না, সে যথাযোগ্য 'নজর' কোথা হইতে সংগ্রহ করিবে? সুতরাং তাহারা যৎসামান্য নজর দিয়াই নায়েব মহাশয়কে খুসী করিতে পারিত। নায়েব মহাশয়ের ধারণা ছিল, যাহার সাজ-পোষাকের পারিপাট্য নাই, সে প্রকৃতই গরীব, দয়ার পাত্র।

কিন্তু পেস্কার সান্যাল মহাশয়ই প্রকৃতপক্ষে নায়েবীর যোগ্য লোক ছিলেন। নায়েব মহাশয়কেও তাঁহার যোগ্যতা স্বীকার করিতে হইত; এবং নায়েব হইয়াও তাঁহাকে নানা বিষয়ে সান্যাল মহাশয়ের সাহায্য-প্রার্থী হইতে হইত। এবং নায়েব মহাশয় অনেক সময়ে তাঁহার অসঙ্গত আবদারও রক্ষা করিতে বাধ্য হইতেন। ইহা দেখিয়া-শুনিয়া সকলেই যে পেস্কারের বশীভূত হইবে, ও তাঁহাকেই সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে তহশিলদারেরা ও কুঠীর নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীরা পেস্কারকেই নায়েবের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করিত; এবং তাঁহাকে নায়েব অপেক্ষা অধিকতর ভয় ও ভক্তি করিত। তহশিলদারেরা কার্য্য উদ্ধারের জন্য নায়েবের প্রাপ্য নজর পেস্কারকেই প্রদান করিত। কিন্তু পেস্কার সান্যাল মহাশয় বড় সহজ 'চিজ' ছিলেন না। ময়লা ও ছেঁড়া কাপড় পরিয়া তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া চলিত না। সান্যাল মহাশয় কায়দা পাইলে কাহাকেও রীতিমত 'দোহন' না করিয়া ছাড়িতেন না। এমন কি, প্রজারাও নায়েব মহাশয়কে উল্লঙ্ঘন করিয়া, তাহাদের অভাব-অভিযোগ পেস্কার মহাশয়কেই জানাইত; এবং তাহা অরণ্যে রোদনের মত নিষ্ফলও হইত না। এ অবস্থায় সান্যাল মহাশয়ের অর্থভাগ্য যে প্রসন্ন হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ কি? তিনি লক্ষ্মীর বরপুত্র ছিলেন। কথিত আছে, পেস্কারবাবু জলপূর্ণ ঘটিটা পশ্চাতে রাখিয়া, কাণে পৈতা গুঁজিয়া প্রস্রাবে বসিতেন, তখনও তাঁহার ঘটির ভিতর; বিশ-পঁচিশ টাকা আসিয়া জমিত। দেখিয়া-শুনিয়া নায়েব বাগচী মহাশয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেন, 'সান্যাল ভায়ার এখন একাদশে বৃহস্পতি! লোকে কাজ পায়, দু'টাকা দেবে না কেন? সুখ চেয়ে স্বস্তি ভাল। আমি ও-সকল ঝঞ্ঝাট বরদাস্ত করিতে পারি না।'—তিনি কোন দিন পেস্কারের বিপক্ষতাচরণ করিতেন না, বা করিতে সাহস পাইতেন না।

পেস্কার সান্যাল মহাশয়ের এইরূপ অক্ষুণ্ণ আধিপত্য, প্রতিপত্তি ও অর্থাগম কুঠীর অন্যান্য আমলারা যে অসহ্য মনে করিতে লাগিল, এ কথা বলাই বাহুল্য। তাহারা পেস্কার বাবুকে অপদস্থ করিবার জন্য তাঁহার ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু কথাটা বড় সহজ হইল না; কারণ, পেস্কার বাবু কেবল যে কুঠীর ভিতর একাধিপত্য করিতেই সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ নহে; নানা কারণে অধিকাংশ লোকই তাঁহার বশীভূত ছিল। তন্মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, তিনি যেমন দুই হাতে উপার্জ্জন করিতেন, সেইরূপ মুক্ত হস্তে ব্যয়ও করিতেন। তিনি কৃপণ—তাঁহার মহাশত্রুতেও তাঁহার এ দুর্নাম করিতে পারিত না।

পেস্কার সান্যাল মহাশয় একটি গুণে মুচিবাড়িয়া অঞ্চলের ইতর-ভদ্র সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন;—অন্নদানে তিনি কোন দিন কাতর হইতেন না। এই অন্নহীন

বুভুক্ষুর দেশে ইহা বড় সামান্য কথা নহে। এ বিষয়ে হিন্দু মুসলমানে তিনি ভেদজ্ঞান করিতেন না। তাঁহার বাসায় প্রত্যহ দুই বেলায় বাহিরের লোকের জন্যই পঞ্চাশ-ষাটখানি পাতা পড়িত। তিনি স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সকলকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতেন। তিনি হিন্দু বলিয়া, যে সকল মুসলমান তাঁহার পাকশালার অন্ন স্পর্শ করিত না,—পেস্কার মহাশয় তাহাদিগকে চিঁড়া, দুধ ও গুড় দিয়া ফলার খাইতে দিতেন। এতদ্ভিন্ন, অন্নব্যঞ্জন নিঃশেষিত হইবার পর হঠাৎ আটদশজন অতিথি তাঁহার গৃহে সমাগত হইলে, তাহাদিগকেও তিনি দুধ-চিঁড়ার ফলার দিতেন; এবং অতিথি নারায়ণকে অন্নব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেন না বলিয়া, আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। কেহ অভুক্ত অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে পেস্কার মহাশয়ের ভাণ্ডারে চিঁড়া, দুধ, গুড় সর্ব্বদাই মজুত থাকিত। তাঁহার গোশালায় যে সকল পয়স্বিনী গাভী ছিল, তাহাদের প্রত্যহ আধমণ ত্রিশসের দুধ হইত। কোন আমলার ঘরে দুধ নষ্ট হইয়াছে, শিশু-সন্তান দুধ অভাবে কষ্ট পাইতেছে,—কোন দরিদ্র রোগীর জন্য কবিরাজ দুধ-সাগুর ব্যবস্থা করিয়াছেন, অথচ সে দুধ সংগ্রহ করিতে পারে নাই,—শুনিলে, পেস্কার মহাশয় সর্ব্বাগ্রে তাহাদের গৃহে দুধ পাঠাইয়া দিতেন। কেহ-কেহ পরিহাস করিয়া বলিত, "পেস্কারবাবু পূর্ব্বজন্মে অন্নপূর্ণা ছিলেন,—শাপভ্রষ্ট হইয়া সাহেব সরকারের পেস্কার হইয়াছেন; কিন্তু পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বাপ রে, অন্নদানের কি ঘটা!"—এ কথা শুনিয়া পেস্কারবাবু জিহ্বা দংশন করিয়া বলিতেন, 'ছি, ছি, ও কথা কি বলিতে আছে! মা ভগবতীর সহিত ক্ষুদ্র মানুষের তুলনা! সংসারে না খাইয়া থাকে কে হে! শিয়াল-কুকুরগুলাও অনাহারে থাকে না। মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি ক্ষুধিত অতিথি-অভ্যাগতকে দুমুঠা অন্ন দিতে না পারিলাম, তবে আর সংসারে আসিয়া করিলাম কি?"

কিন্তু তিনি ইহা অপেক্ষাও অনেক অধিক করিতেন! তিনি প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া, প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া ভ্রমণে বাহির হইতেন; এবং প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া কাহার কি অভাব আছে তাহার সন্ধান লইতেন। প্রতিবেশী ও কুঠীর সাধারণ কর্ম্মচারীদের অভাব মোচনের চেষ্টা ত করিতেনই; কার্য্যোপলক্ষে গ্রামে সরকারী কর্ম্মচারী ও পুলিসের জমাদার দারোগা প্রভৃতি যিনিই আসিতেন, তিনিই পেস্কার মহাশয়ের আতিথ্যে পরিতৃপ্ত হইতেন। দানেও তিনি মুক্ত-হস্ত ছিলেন। কেহ দায়গ্রস্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তাঁহাকে শূন্য হস্তে ফিরিতে হইত না। এ বিষয়ে তাঁহার পাত্রাপাত্র ভেদজ্ঞান ছিল না। তিনি বলিতেন, "অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হওয়া গৌরবের বিষয় নহে। নিতান্ত দায়ে না পড়িলে, কেহ সহজে এই হীনতা স্বীকারে সম্মত হয় না। যাহারা প্রার্থীরূপে আমার দ্বারস্থ হয়, তাহারা নিশ্চয়ই অভাবগ্রস্ত। তাহাদের কথা অবিশ্বাস করা সঙ্গত নহে।"—আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি, একদিন প্রভাতে কন্যাদায়গ্রস্ত একটি ব্রাহ্মণ তাঁহার দ্বারস্থ হইয়া, কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভের আশায় কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি ব্রাহ্মণটিকে বলিলেন, "ঠাকুর, তুমি স্নান আহার করিয়া বিশ্রাম কর। আজ আমি যাহা উপার্জ্জন করিব, তাহা সমস্তই তুমি পাইবে। এখন তোমার অদৃষ্ট!"—পেস্কারবাবু তাঁহার অঙ্গীকার পালন করিলেন; আফিসের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া বাসায় আসিয়া, তাঁহার মেরজাইয়ের দুই পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে স্থাপন করিলেন; গণিয়া দেখিলেন, পেস্কারবাবুর সে দিনের উপার্জ্জন ১৮৮ টাকা।

কুঠীর যে সকল অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারী সপরিবারে মুচিবাড়িয়ায় বাস করিতে পারিত না, তাহাদের কাহারও স্বতন্ত্র বাসা ছিল না। তাহাদের ব্যবস্থা ছিল শয়নং যত্র তত্র—ভোজনং—পেস্কার বাবুর বিনি পয়সার হোটেলে;—পেস্কার মহাশয়ের বাসায় দুই বেলা তাহাদের পাতা পড়িত। বিস্ময়ের কথা এই যে, পেস্কার বাবুর অসাধারণ অভ্যুদয় দেখিয়া কুঠীর যে সকল আমলা তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাঁহার গৃহে দু'বেলা পাতা পাড়িত, এরূপ আমলাও তাহাদের মধ্যে ছিল! এরূপ কৃতঘ্নতা কতখানি নৈতিক অবনতির ফল, পাঠক কল্পনা করুন।

এইবার সেই ষড়যন্ত্রের কথা বলি—

আমলা-শ্রেণীর লোক সহযোগী কর্ম্মচারীগণকে অপদস্থ বা পদচ্যুত করিবার জন্য সাধারণতঃ যে কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে, মুচিবাড়িয়া কানসারণের আমলাবর্গও সেই কৌশল অবলম্বন করিল। তাহারা সদর আমিন রসরাজ বিশ্বাসকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর

সান্যালের বিরুদ্ধে কানসারণের ম্যানেজার মিঃ হাম্‌ফ্রির নিকটে ঠকামি করিতে পাঠাইল।

রসরাজ বিশ্বাস যেমন চতুর, সেইরূপ কুটিল-প্রকৃতি। মুখখানি মিছরীর মত মিষ্ট; কিন্তু মন গরলে পূর্ণ। তাহার কথা শুনিলে ধারণা হইত, এরূপ সরল-প্রকৃতি, পরোপকারী, নিষ্ঠাবান, ধার্ম্মিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয় নাই; কিন্তু তাহার ন্যায় পরশ্রীকাতর, নিষ্ঠুর, ও স্বার্থপর জীব কুঠীর আমলা সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিরল! তাহার গলায় মোটা-মোটা তিন কণ্ঠি তুলসীর মালা ও ফোঁটা-তিলকের ঘটা দেখিয়া মিঃ হাম্‌ফ্রি মনে করিতেন, আর যাহাই হোক, লোকটা ধার্ম্মিক বটে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সাহেব রসরাজকে একটু অনুগ্রহের চক্ষে দেখিতেন। ম্যানেজার সাহেব তাহাকে ভালবাসেন এই বিশ্বাসে, অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা প্রবল পরাক্রান্ত পেস্কারের বিরুদ্ধে তাহাকেই তাহাদের মুরুব্বি স্থির করিয়াছিল।

একদিন অপরাহ্নে হাম্‌ফ্রি সাহেব নীলের ক্ষেত দেখিতে মাঠে বাহির হইলেন। সদর আমিন রসরাজও তাঁহার অনুসরণ করিল। দুই-একজন পাইক-বরকন্দাজ ভিন্ন সঙ্গে অধিক লোক ছিল না। রসরাজ বুঝিল, ইহাই সাহেবের নিকট মনের কথা প্রকাশ করিবার অতি উৎকৃষ্ট অবসর। রসরাজ প্রসঙ্গ ক্রমে 'পেস্কার বাবু'র কথা তুলিল, এবং তিনি দুই হাতে মুঠা-মুঠা 'উৎকোচ' আহার করিয়া প্রতিদিন কিরূপ লাল হইয়া যাইতেছেন, সঙ্গে-সঙ্গে মনিব সরকারের কতদূর অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, হৃদয়গ্রাহী সরস ভাষায় তাহার বর্ণনা করিয়া এরূপ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, যেন মনিব সরকারের অনিষ্ট দর্শনে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সাহেবের নিকট একটু সহানুভূতি বা উৎসাহ পাইলেই বোধ হয় তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইত!

কিন্তু হাম্‌ফ্রি সাহেব বড় চাপা লোক; বিশেষতঃ মূর্খ ও বর্ব্বর নেটিভ আমলাগুলা দুই-চারিটি মন-রাখা কথা বলিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া লইবে, এরূপ তরল হৃদয় লইয়া তিনি এই বাঙ্গলা মুলুকে নীলকুঠীর ম্যানেজারী করিতে আসেন নাই। রসরাজ তাহার বক্তব্য শেষ করিয়া আশ্বস্ত হৃদয়ে সাহেবের মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু সাহেবের মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ ভাব-সংস্পর্শবিহীন দেখিয়া সে মনে বড় ভরসা পাইল না। তাহার পর সাহেব যখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দাড়ি-গোঁফ-বর্জ্জিত, বসন্তের পদাঙ্ক-লাঞ্ছিত সুগোল মুখের দিকে চাহিয়া সুস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "ওয়েল আমিন, টুমি কি মটলব করিয়া পেস্কার বাবুর বিরুড্ঢে টুক্‌লামি করিটেছ, টা বুঝিটে পারিটেছি না!"—তখন আমিন বেচারার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। সে আত্ম-সমর্থনের উদ্দেশ্যে সাহেবকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, যে মনিব-সরকারের নিমক খাইয়া সে সপরিবারে প্রতিপালিত হইতেছে, এবং চিরজীবন প্রতিপালিত হইবার আশা রাখে,—কুঠীর কোন কর্ম্মচারী সেই সরকারের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিলে, যদি তাহা সে হুজুরের নিকট প্রকাশ না করে, তাহা হইলে কেবল যে তাহার নিমকহারামী করা হইবে এরূপ নহে,—তাহার পক্ষে ভয়ানক অধর্ম্মের কাজ হইবে। ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুরোধেই সে ধর্ম্মাবতারের নিকট সত্য কথা প্রকাশ করিতেছে,—কাহারও বিরুদ্ধে 'টুকলামি' করিবার অভ্যাস তাহার নাই!

সাহেব অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন, "হাঁ—হাঁ, টুমি কোম্পানির নিমকের খুব ভক্ট, টা আমার জানা আছে; কিন্তু এখনও টোমার পেটে পেস্কার বাবুর নিমক গজগজ করিটেছে,—এট শীঘ্র টুমি ইহা কিরূপে ভুলিটে পার, টাহা আমি বুঝিতে পারিটেছি না!"

এই রসরাজ বিশ্বাস মেঠো আমিনের পদে নিযুক্ত ছিল। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে পেস্কার বাবুই ম্যানেজার সাহেবের নিকট সুপারিশ করিয়া তাহাকে সদর আমিনের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রসরাজ সে উপকার বিস্মৃত হইলেও, মিঃ হাম্‌ফ্রির সে কথা স্মরণ ছিল। তিনি বোধ হয় ইহা এ দেশের লোকের চরিত্রগত বিশেষত্ব বলিয়াই মনে করিলেন; কিন্তু রসরাজ শেষ চেষ্টা করিতে ছাড়িল না; সে ক্ষীণ স্বরে বলিল, 'হাঁ, হুজুর, আমি পেস্কার বাবুর নিকট যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি, সে কথা ভুলি নাই; কিন্তু তাঁহার নিকট উপকার পাইয়াছি বলিয়াই হুজুরের নিকট তাঁহার দোষ গোপন করিব,—তিনি ঘুস খাইয়া জমীদার সরকারের যে সকল অনিষ্ট করিতেছেন তাহা চাপিয়া যাইব,—ধর্ম্মাবতার আমাকে এতদূর স্বার্থপর মনে করিবেন না। আমি তাঁহাকে আমার মুরুব্বি মনে করিলেও, আমার মনিবের স্বার্থ রক্ষা করাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য।"

হাম্‌ফ্রি সাহেব আর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না; কুঠীতে ফিরিয়া পেস্কার বাবুকে কোন কথা বলিলেন না।

পেস্কারের কার্য্য-দক্ষতায় তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্টই ছিলেন; তথাপি সদর আমিনের অভিযোগ কতদূর সত্য তাহার সন্ধান লইয়া পেস্কারের তেমন কোন গুরুতর অপরাধ আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। নায়েব, পেস্কার ও কুঠীর অন্যান্য কর্ম্মচারীরা যে 'উপরি' লইয়া থাকে, এ কথা সাহেবের অজ্ঞাত ছিল না; এবং ইহা তেমন দোষের কাজ বলিয়াও তাঁহার ধারণা ছিল না। তিনি জানিতেন, অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারীরা যদি দু'পয়সা 'উপরি' না পায়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে সংসার প্রতিপালন করা অসম্ভব।

ষড়যন্ত্রকারীদের প্রথম চেষ্টা এইরূপে ব্যর্থ হইল; কিন্তু ইহাতে তাহারা নিরুৎসাহ হইল না। তাহারা কয়েক দিন পরে আর একটি নূতন ষড়যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিল; এবং তাহাতে কতকটা কৃতকার্য্যও হইল। সেই নূতন ষড়যন্ত্রের বিবরণ আগামী বারে লিপিবদ্ধ করিব।

নিখিল-প্রবাহ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

১। চিত্রে চুরি

য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রাচীন চিত্রের বড় আদর। চার-পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বের প্রসিদ্ধ শিল্পীগণের অঙ্কিত কোনও চিত্র বিক্রয়ের জন্য বাজারে উপস্থিত হইলেই, কোটীপতি ক্রেতার দল উহা কিনিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়েন। অবশ্য ছবির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই যে উহা লাভ করিবার জন্য তাঁহারা ছুটিয়া আসেন, তাহা নহে। ছবিখানির প্রাচীনত্বটুকুই তাঁহাদের এত আকর্ষণ করে; কারণ, প্রাচীন চিত্রের অধিকারী হওয়াটা প্রতীচ্য ধনকুবেরগণের একটা গর্ব্বের ব্যাপার; এবং বিশেষ করিয়া অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে উহা এখনও একটা ফ্যাসান স্বরূপ প্রচলিত রহিয়াছে। সুতরাং, ছবি যত পুরাতন হয়, তাহার মূল্যও তত অসম্ভব রকমে বাড়িতে থাকে। এক-একখানি ছবি দশলক্ষ টাকারও অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে দেখা গিয়াছে। এইজন্য জুয়াচোরেরা অনেক সময়ে অধিক মূল্য পাইবার লোভে, আধুনিক ছবির ঈষৎ অদল-বদল করিয়া, বা প্রাচীন চিত্রের নকলকে প্রাচীন চিত্র বলিয়া, চালাইবার চেষ্টা করে। এতদিন ক্রেতারা, ছবিখানি আসল কি নকল চিনিবার জন্য শিল্পীগণের সাহায্য লইতেন। উক্ত বিশেষ-জ্ঞরা, ছবিখানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া, উহা কতদিন পূর্ব্বের আঁকা, কোন্ সময়ের কোন্ চিত্রকরের, কলা হিসাবে কোন্ শ্রেণীর,—এবং কি পদ্ধতির অনুসরণে ও কোন্ বিষয় অবলম্বনে অঙ্কিত ইত্যাদি বলিয়া দিতেন। বিশেষজ্ঞ হইলেও, এ সকল তথ্য তাঁহাদের বেশীর ভাগ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই বলিতে হইত; সুতরাং সব সময়ে তাঁহা-দের রায় যে একেবারে অভ্রান্ত হইত, তাহা নহে! সম্প্রতি এই প্রাচীন চিত্রের ক্রেতাগণের সাহায্যার্থ এক বৈজ্ঞানিক উপায় বাহির হইয়াছে। ডাঃ ফেবার নামক একজন জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক 'এক্স রে' বা রঞ্জন রশ্মির দ্বারা প্রাচীন চিত্রের কৃত্রিমতা ধরিয়া ফেলিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। 'এক্স-রে'র সাহায্য যেমন মানব-দেহ ভেদ করিয়া, তদভ্যন্তরস্থ অস্থি-পঞ্জর, হৃৎপিণ্ড বা পাকস্থলীর সঠিক আলোক-চিত্র তুলিয়া লওয়া যায়, সেইরূপ 'এক্স-রে'র সাহায্যে একখানি প্রাচীন চিত্রেরও স্বরূপ আলোক-পটে পাওয়া যায়। ঐ আলোক-পট দিনের মত সুস্পষ্ট দেখাইয়া দেয় যে, চিত্র-খানি কয়বার রং করা হইয়াছে, কোথায়-কোথায় অদল-বদল করা হইয়াছে, কি-কি কাটা হইয়াছে, এবং কতটুকু সংশোধন করা হইয়াছে। "ক্রুশবিদ্ধ" নামে একখানি বিখ্যাত চিত্রের কিয়দংশ পরিবর্ত্তিত করিয়া জুয়াচোরেরা বাজারে বিক্রয় করিয়াছিল;—ফেবার সাহেবের প্রবর্ত্তিত উপায়ে 'এক্স-রে' প্রয়োগ করিয়া এই চিত্রের চুরি ধরা পড়িয়াছে।

মিঃ বিটিঙ্গার নামক জনৈক আমেরিকান বৈজ্ঞানিক চিত্রকর রংয়ের উপর আলোকের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, বিভিন্ন রংয়ের আলোকপাতে ভিন্ন-ভিন্ন

"ক্রশ-বিদ্ধ"

যে স্ত্রীলোকটি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছে, উহার চিত্র জুয়াচোরেরা, আসল ছবিখানি যাহাতে সনাক্ত না হয় এই জন্য, বদলাইয়া লইয়াছে, উহা পূর্ব্বে এক খৃষ্ট-ভক্ত সন্ন্যাসীর প্রতিকৃতি ছিল।

পরিশোধিত চিত্র

দক্ষ শিল্পীর দ্বারা নূতন অঙ্কিত স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি তুলিয়া ফেলিয়া পূর্ব্বের সন্ন্যাসীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

এক্স্‌রে আলোকচিত্র

রঞ্জনরশ্মি-সম্পাতে নূতন অঙ্কিত কৃতাঞ্জলিবদ্ধ স্ত্রীলোকের ভিতর হইতে পূর্ব্বের সেই খৃষ্ট-ভক্ত সন্ন্যাসীর প্রতিরূপ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

মিঃ চার্লস বিটিঙ্গার

একই পটে যুগ্মচিত্র অঙ্কিত করিতেছেন।

একই পটে যুগল চিত্র (বালিকা ও অশ্বারোহী)

রং অদৃশ্য হইয়া যায়। অর্থাৎ কতকগুলি রংয়ের এরূপ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে, যাহারা কোন-কোনও বিশেষ রংয়ের আলোক পৃথক ভাবে প্রতিফলিত করিতে পারে না। এই তথ্যটি আবিষ্কার করিবার পর, তিনি ইহার সুযোগ লইয়া, বর্ণ ও আলোকের দ্বন্দ্বের উপর এমন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, যাহা বিভিন্ন আলোকপাতে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক চিত্রে পরিণত হইয়া যায়। যেমন ঐ বালিকা ও অশ্বারোহীর যুগ্ম চিত্র-

বালিকা (শ্বেত আলোকপাতে)

খানি। সাদা আলোকে ছবিখানি কেবলমাত্র একটি বালিকার চিত্র বলিয়াই মনে হইবে; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ঐ চিত্রের উপর লাল আলোক পড়িবে—তৎক্ষণাৎ বালিকার ছবিখানি অদৃশ্য হইয়া অশ্ব ও অশ্বারোহীর চিত্রখানি পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। আলোকের প্রভাবে চিত্রের এইরূপ রূপান্তর হইতে দেখিয়া, য়ুরোপের রঙ্গমঞ্চের শিল্পীরাও ইহার সুযোগ লইতেছেন। একই দৃশ্যপট বিভিন্ন বর্ণের আলোক-পাতে মুহূর্ত্তের মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথক দৃশ্যে পরিণত হইবে। রঙ্গালয়ের গীতাভিনয়ের পক্ষে এ সুযোগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। আলোকের গুণে হেমন্তের হিমশীর্ণ পল্লবচ্যুত বিগত-শ্রী বনরাজি যেমন

অশ্বারোহী (লাল আলোকে)

দেখিতে-দেখিতে চক্ষের পলকে বসন্তের অনন্ত শোভায়, নবকিশলয় কুসুম-সম্ভারে সৌন্দর্য্যময়ী হইয়া উঠিয়া দর্শক-গণকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া দিতে পারে, সেইরূপ রঙ্গ-মঞ্চের উপর নৃত্যপরা নর্ত্তকীগণের বেশভূষারও নিমেষের মধ্যে অদ্ভুত রূপান্তর ঘটাইয়া, তাহাদিগকে অধিকতর চমৎকৃত করিয়া দিতে পারে। বড়-বড় দোকানের বাতায়ন-প্রদর্শনীতে (window-show) বিজ্ঞাপন হিসাবে রাখিবার পক্ষে এই আলোকানুবর্ত্তী চিত্র বিশেষ উপযোগী। উৎসব উপলক্ষে গৃহসজ্জা করিবার সময় যদি এই বর্ণ ও আলোকের দ্বন্দ্ব-টুকুর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, তবে দিবালোকে ছবিখানির যেরূপ শোভা হইবে, রাত্রিকালে দীপালোকে তাহার সম্পূর্ণ

রূপান্তর ঘটাইয়া প্রতিবেশীদিগকে আশ্চর্য্য করিয়া দেওয়া যায়।

(Literary Digest)

২। ঘূর্ণী ক্ষুর

স্বয়ং 'সেফ্‌টি রেজার' ব্যবহার করিয়া বেশ নিরাপদে নিজের ক্ষৌর-কার্য্য সম্পাদন করা চলে বটে; কিন্তু তাহাতে সময় লাগে, এবং অনেকবার করিয়া উহা দাড়ির উপর রগড়াইয়া টানিতে হয়। এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য এক প্রকার ঘূর্ণী ক্ষুর উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই ক্ষুরের ব্লেড বা ফলাটি চাক্‌তির মত গোল; এবং ঘড়ির চাকা ও স্প্রীংয়ের মত কলকব্জার সহিত আঁটা বলিয়া দম দিলেই উহা ঘুরিতে থাকে। হাতলের গায়ে একটি টিপকলের চাবি আছে। উহা টিপিয়া ইচ্ছামত ক্ষুরের ঘোরার গতি নির্দ্দিষ্ট করা চলে। ফলার মুখে 'সেফ্‌টি রেজারের' মত নিরাপদ বেষ্টনী সংযুক্ত আছে। এই ক্ষুরের বিশেষত্ব এই যে, একবার মাত্র টানিলেই, অতি সত্বর শ্মশ্রু নির্ম্মূল হয়, অথচ গালের কোথাও একটুও কাটিয়া যায় না!

ঘূর্ণীক্ষুর

(Popular Science)

৩। অশ্বারোহণে মৎস্যাহরণ।

ঘোড়ায় চড়িয়া মাছধরার কথাটা পরিহাস বলিয়া মনে হইলেও, ব্যাপারটা ঠিক পরিহাস নয়, নিছক সত্য। উত্তর সমুদ্রে (North Sea) একপ্রকার সুস্বাদু চিংড়ি মাছ পাওয়া যায়; লণ্ডন ও প্যারিসের হোটেলে উহার খুব সমাদর। সমুদ্রে জোয়ার আসিলেই জেলেরা ঐ চিংড়িমাছ ধরিবার জন্য সাগর-তটের উপর কয়েক ক্রোশ একেবারে চষিয়া ফেলে। ছিপ হাতে নয়, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড জালের দড়ি ধরিয়া। জালগুলি ত্রিকোণ লোহার ফ্রেমে আঁটা থাকে
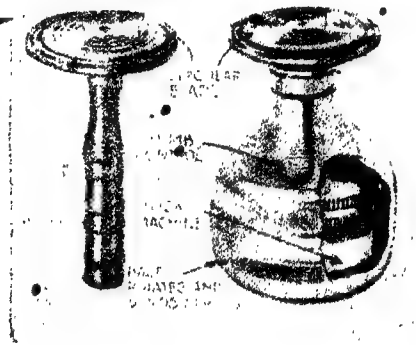
অশ্বারোহণে মৎস্যাহরণ

হাবা-কালার পরিচয়
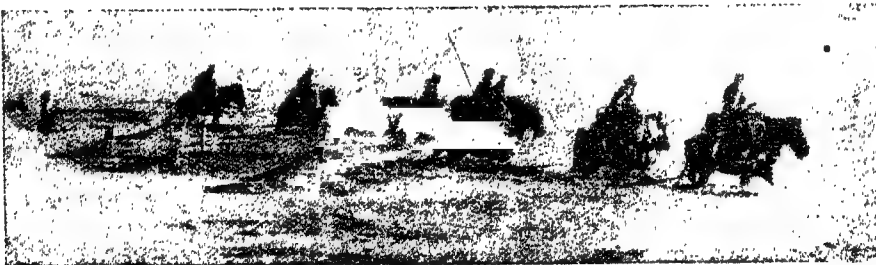
এবং ঐ ফ্রেমগুলি দড়ি দিয়া ঘোড়ার সাজের সহিত বাঁধিয়া লইতে হয়। গাড়ী টানিবার মত ঘোড়ার সাহায্যে জেলেরা সেই জাল টানিয়া সমুদ হইতে চিংড়ি মাছ সংগ্রহ করে। (Popular Science)

৪। হাবা-কালার পরিচয়

আমেরিকার হাবা-কালা ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বেড়াইতে বাহির হইয়া যদি রাস্তা হারাইয়া ফেলে,
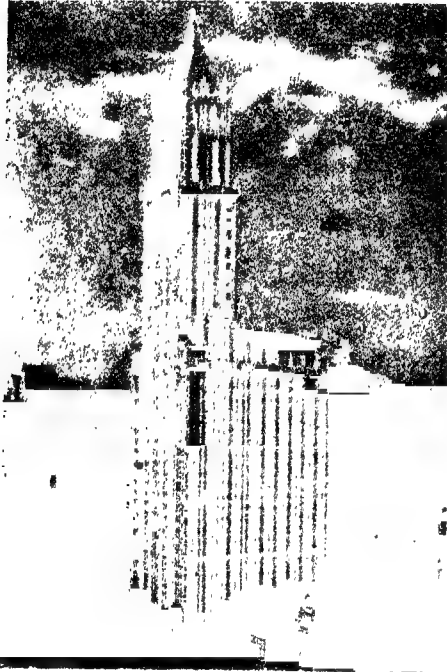
একই সময়ে দিনরাত

তাহা হইলে ইস্কুলে ফিরিয়া আসা বা বাড়ীতে যাওয়া পাছে তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় ইস্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ছেলেমেয়েদের পরিচয়টি তাহাদের ঘাড়ের উপর লিখিয়া রাখিয়া দেন। উলকীর মত নহে,—রঙ্গীন পেন্সিল দিয়া,—যাহাতে ইচ্ছা করিলে লেখাটি তুলিয়া ফেলিতে পারা যায়। (Popular Science)

৫। এক বাড়ীতে দিন ও রাত!

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাড়ীখানির নাম 'উলওয়ার্থ-বিল্ডিং' এটি আমেরিকায় অবস্থিত। বাড়ীখানি বান্নান্ন তলা। উচ্চতার পরিমাণ ৭৯২ ফিট এক ইঞ্চি। সন্ধ্যার

কলে জুতাব্রুশ

সময় যখন সহরের রাস্তা অন্ধকার হইয়া যায়, এবং পথে-পথে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিয়া উঠে, উক্ত উচ্চতম 'উলওয়ার্থ বিল্ডিং'য়ের সর্ব্বোচ্চ তলটি তখনও অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য-কিরণে উদ্ভাসিত থাকে; কিন্তু নীচের তলে সে সময় আলোক না জ্বালিয়া কাজ করা চলে না। একই বাড়ীর নীচের তলে যখন রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠে, উপরতলায় তখনও দিবালোক বর্ত্তমান থাকে। আবার রাত্রি-প্রভাতে সূর্য্যোদয় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঐ 'উলওয়ার্থ বিল্ডিং'য়ের সর্ব্বোচ্চ তলটিই সর্ব্বপ্রথম দিবালোকে দীপ্ত হইয়া উঠে; অথচ সেই বাড়ীরই নীচের তলায় তখনও নিশাবসান

হয় না! এই ভাবে সকালে ও সন্ধ্যায় 'উলওয়ার্থ বিল্ডিং'য়ের সর্ব্বোচ্চ তলের অধিবাসীরা প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া অতিরিক্ত দিবালোক উপভোগ করে।

(Popular Science)

৬। কলে জুতা ব্রূশ

এই কলে দেড় মিনিটের মধ্যে জুতার ধুলা ঝাড়িয়া কালি মাখাইয়া ব্রূশ করিয়া উহা চক্‌চকে করিয়া দিতেছে। কলটি চালাইবার জন্য, মুচী দূরে থাক, অন্য কোনও লোকেরও দরকার হয় না। কোনও ভদ্রলোকের জুতা ব্রূশ করাইবার প্রয়োজন হইলে, তিনি কলের উপরে আঁটা চেয়ারখানিতে বসিয়া, জুতাসমেত পা দুইটি সম্মুখের পা-দানীতে তুলিয়া দিয়া, কলের ভিতর যদি একটি 'আনি' বা 'দুয়ানি'—যেমন যে কলে দিবার জন্য লেখা থাকে সেইরূপ—ফেলিয়া দিয়া, পাশের একটি হাতোল ধরিয়া টান দিলেই, দেড় মিনিটের মধ্যে তাঁহার জুতা ব্রূশ হইয়া যাইবে। প্রথমে এক জোড়া ব্রূশ বাহির হইয়া, জুতার চারপাশ ঝাড়িয়া সমস্ত ধুলা পরিষ্কার করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। তার পরই আর এক জোড়া কালিমাখা ব্রূশ বাহির হইয়া জুতা জোড়ায় কালি মাখাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। তার পর আর একজোড়া ব্রূশ বাহির হইয়া জুতাজোড়াটি ঘসিয়া পালিশ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। সবশেষে একটি ফ্লানেলের বেল্ট্ ঘুরিতে-ঘুরিতে জুতা জোড়াটি মুছিয়া দিয়া, কালি ব্রূশ ও পালিশের বাকি কাজটুকু সুসম্পন্ন করিয়া ছাড়িয়া দেয়। অথচ এত কাণ্ড হইতে এক মিনিট, দেড় মিনিটের বেশি সময় লাগে না।

(Popular Mechanics)

৭। দুচাকায় দশজন

এই দ্বিচক্র-যানে দশজনের একত্রে চড়িবার ও চালাইবার ব্যবস্থা আছে। ফুটবল খেলওয়াড়দের পক্ষে এই দু'চাকা গাড়ীখানি বিশেষ উপযোগী। ম্যাচ খেলিতে কোথাও যাইতে হইলে, সমস্ত 'টীম'টি এই একখানি গাড়ীতে চড়িয়া যাইতে পারিবে। যিনি কাপ্তেন, তিনি কেবল আলাদা একখানি দ্বিচক্রযানে ইহাদের পশ্চাতে-পশ্চাতে যাইবেন। দশজনে সমান জোরে চালাইয়া গেলে, এই গাড়ীখানি ঘণ্টায় ষাট মাইল গেলে যাইতে পারে। গাড়ীর চাকা দুইখানি মোটর-গাড়ীর চাকার মত মোটা ও মজবুত।

দুচাকায় দশজন

(Popular Mechanics)

৮। মহাশক্তি-কেন্দ্র

আমেরিকার নায়েগ্রা জলপ্রপাতের শক্তিকে সম্প্রতি কাজে লাগাইবার চেষ্টা হইতেছে। এই বৃহত্তম জলপ্রপাতের প্রচণ্ড বেগের মধ্যে যে শক্তি নিহিত রহিয়াছে, ইঞ্জিনীয়ারগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, উহা সপ্তলক্ষ 'অশ্ব-শক্তি'র * (Horse-Power) সমতুল্য। এই বিরাট শক্তির সাহায্য লইয়া, সমগ্র আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের পূর্ব্বকূলস্থ নগর, নগরী, কলকারখানা, খনি ও রেল প্রভৃতিতে আলোক, উত্তাপ ও শক্তি সরবরাহ করিবার জন্য এক বৃহত্তম শক্তি-কেন্দ্র স্থাপন করা

* এক অশ্ব-শক্তি (Horse power) অর্থে একটি অশ্ব যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় করিতে পারে অথবা ঠিক উহারই সমতুল্য শক্তি, যেমন তেত্রিশ হাজার পাউণ্ড ওজনের কোনও জিনিস মিনিটে একফুট উচু'তে তুলিতে হইলে যে শক্তির ব্যয় হয়, তাহার পরিমাণ এক অশ্ব-শক্তি। ইঞ্জিনের শক্তির পরিমাণ জ্ঞাপক ওজনের ইহাই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা।

হইবে। কিন্তু এ কাজের জন্য প্রায় এক কোটী সত্তর লক্ষ অশ্ব-শক্তির প্রয়োজন; এই কারণে দেশের অপরাপর শক্তি উৎপাদক কারখানাগুলির চেষ্টাকে এই নায়েগ্রার নূতন কারখানার সহিত যুক্ত করিয়া, উহাকেই সেই মহাশক্তি-কেন্দ্রে পরিণত করা হইবে, যাহার বরে প্রতি বৎসর আমেরিকার নব্বুই কোটী টাকা ও তিন কোটি টন পরিমাণ কয়লার খরচ বাঁচিয়া যাইবে। সত্তর লক্ষ অশ্ব-

মহাশক্তি কেন্দ্র

শক্তির বেগ লইয়া নায়েগ্রা প্রপাত যে বিপুল জলজ-তড়িতের (Hydro-Electric) সৃষ্টি করিবে, আমেরিকার অন্যান্য অসংখ্য শক্তি-কেন্দ্র-প্রসূত তড়িৎ-প্রবাহ তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া, বোষ্টন হইতে ওয়াশিংটন পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি প্রধান পরিবেশনী লাইন ধরিয়া প্রবাহিত হইবে; এবং ঐ লাইন হইতে আবার ছোট-বড় বিভিন্ন শাখা বাহিয়া —খনিগর্ভে, কারখানা-ঘরে, রেলপথে, সহরে-সহরে গৃহে-গৃহে প্রয়োজনানুযায়ী এই প্রাকৃতিক মহাশক্তি পরিবেশিত হইবে। (Popular Science)

৯। নিজের হাতে যাচাই

বাজারে ভেজাল জিনিসের আমদানি এত বাড়িয়াছে যে, আজকাল গৃহস্থালীর নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিশুদ্ধ কি না, তাহা যাচাই না করিয়া ব্যবহার করা বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে প্রোফেসার কাজেলমাস্‌,—গৃহস্থেরা যাহাতে তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেরাই যাচাই করিয়া দেখিয়া লইতে পারেন, এরূপ একটি 'যাচাই-দান' বাহির করিয়া, সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। যে গৃহস্থের বাটীতে উক্ত 'যাচাইদান' একটি থাকিবে, তাহাকে আর ভেজাল বা নকল জিনিস লইয়া ঠকিতে হইবে না। রং বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, এরূপ পুরাতন চা দোকানদারেরা অনেক সময়ে আবার সবুজ রং করিয়া টাট্‌কা বলিয়া বিক্রয় করে। ঐ চা একমুঠা যদি একখানি ধোপদস্ত ন্যাক্‌ড়ায় পুরিয়া জোরে দুহাতে ঘসিয়া দেখা হয়, তাহা হইলে উহার কৃত্রিমতা ধরা পড়িয়া যায়; কারণ, রং-করা চা কিছুতেই ফর্‌সা ন্যাক্‌ড়ার উপর তাহার ছদ্মবেশের ছাপ গোপন রাখিতে পারে না! খাঁটি মাখন এক চাম্‌চে লইয়া যদি বাতির আলোর উপর ধরা হয়, তবে সে নিঃশব্দে গলিয়া ঘৃতে পরিণত হয়; কিন্তু যদি তাহাতে ভেজাল থাকে, তাহা হইলে আগুনের উত্তাপ পাইবামাত্র, চাম্‌চের ভিতর হইতে আর্ত্তনাদ করিয়া, মাখন তাহার কৃত্রিমতা প্রকাশ করিয়া ফেলে! কফি (চূর্ণ) যদি নিছক খাঁটি হয়, তাহা হইলে শীতল জলের উপর ভাসিতে থাকে, কিন্তু অপর কিছু মিশ্রিত থাকিলে তলাইয়া যায়। বোতলের চাট্‌নী ও আচার প্রভৃতিতে অনেক সময় 'কপার-সাল্‌ফেট্‌' (তুঁতে)

মিশান থাকে—রং বজায় রাখিবার জন্য। উহা পরীক্ষা করিতে হইলে বোতলের ছিপি খুলিয়া, একখানি কাচের ডিশের উপর খানিকটা রস ঢালিয়া লইয়া—উহাতে একটি পেরেক ডুবাইয়া রাখিতে হয়। ঘণ্টাখানেক পরে যদি দেখা যায় যে, পেরেকটির গায়ে একপুরু তাহার ছাল পড়িয়া গিয়াছে, তবে বুঝিতে হইবে যে সেই বোতলের চাট্‌নী বা আচার ভক্ষণ করা বিপজ্জনক। রেশম, পশম, সূতি ও শনের তৈয়ারী বস্ত্রের পরীক্ষা করিতে হইলে, টানা-পড়েনের সূতা ছিঁড়িয়া একটা দেশলাইয়ের কাঠিতে পুড়াইয়া দেখিলেই, বস্ত্রের সঠিক পরিচয় পাওয়া যাইবে। কারণ, পশম ধীরে-ধীরে পোড়ে, শীঘ্র নিভিয়া যায়, বিশ্রী গন্ধ বাহির হয়, এবং একপ্রকার ফোঁপ্‌রা ছাই পড়িয়া থাকে। রেশম অত্যন্ত ধীরে ধীরে পোড়ে, হঠাৎ নিভিয়া যায়, বিশ্রী গন্ধ পাওয়া যায় ও আঠা-আঠা ছাই পড়ে। সূতি শীঘ্র পুড়িয়া যায়, সহজে নিভিতে চায় না, গন্ধহীন এবং খুব অল্পই ছাই থাকে। শন সূতির অপেক্ষা আস্তে পোড়ে, সামান্যই ছাই পাওয়া যায়; এবং শিখা নিভিয়া গেলেও ভস্মের মধ্যে অল্পক্ষণের জন্য অগ্নি প্রচ্ছন্ন থাকে।

শক্তি কেন্দ্র ও তাহার শাখা প্রশাখা
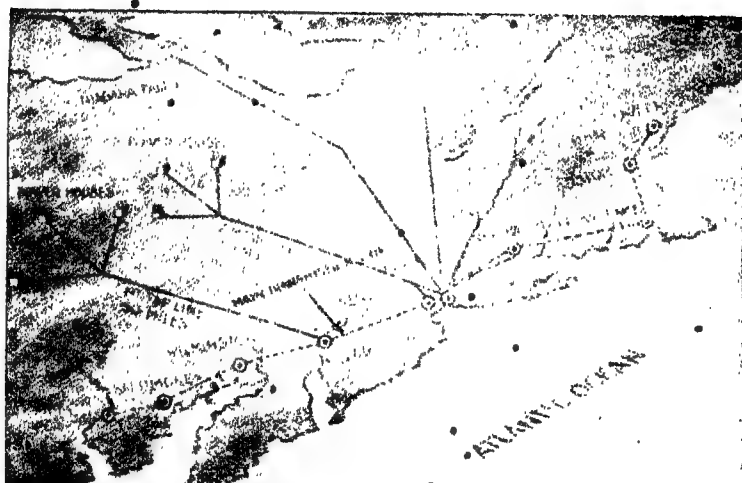
মিশ্রিত বসন, যাহার টানা বা পড়েনে পশম, রেশম সূতি বা শন একটা কিছু অপর কোনও একটার সহিত মিশাইয়া বোনা হয়, তাহা পরখ করিতে হইলে, নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করাই সহজ। একটুকরা কাপড় 'কষ্টিক্ সোডায়' ভিজাইয়া দিলে, রেশমের অংশ লোপ পাইয়া সূতির ভাগ পড়িয়া থাকে। 'জিঙ্ক্ ক্লোরাইডে' ভিজাইয়া দিলে পশম ও সূতির অংশ পড়িয়া থাকে; এবং রেশম গলিয়া যায়। 'নাইট্রিক এসিডে' ভিজাইয়া দিলে, খাঁটি রেশম পীত-বর্ণ ধারণ করে এবং নকল রেশম অবিকৃত অবস্থায় থাকে। 'সালফিউরিক এসিডে' ভিজাইয়া দিলে, সূতির

'চা' যাচাই

চাট্‌নী যাচাই

চিহ্ন লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু শনের ভাগটুকু ঠিক থাকে। সোণা, রূপা ও নিকেলের জিনিস পরীক্ষা করিবারও সহজ উপায় নিম্নে প্রদত্ত হইল। নিকেলের জিনিসের গায়ে এক ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক এসিড লাগাইয়া আগুনে তাতাইলে, সেই স্থানটি নীলবর্ণ ধারণ করিবে। পাত্রটি শীতল হইয়া গেলে, দাগটি আপনি মিলাইয়া যায়। রূপার জিনিস হইলে উহা বেশ করিয়া মুছিয়া উহার গায়ে এক ফোঁটা 'নাইট্রিক্ এসিড' লাগাইয়া, পরে ফিল্টার পেপারের সাহায্যে উহা ছুপিয়া লইতে হইবে। তার পর এক ফোঁটা 'ফর্ম্যালডিহাইড্' ও 'সোডিয়মে হাইড্রক্সাইড্' উহাতে লাগাইয়া দিলে, যদি ঐ স্থানটি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, তবে উহা খাঁটি রূপা না হইয়া যায় না। সোণার জিনিস হইলে, এক টুকরা শিরীশ কাগজ উহাতে ঘষিয়া কাগজের টুক্রাটি একটি কাচের পরীক্ষা-পাত্রের মধ্যে বিশুদ্ধ জলের সহিত গরম করিতে হইবে, যতক্ষণ না উহা গলিয়া যায়। তার পর উহাতে দু'এক ফোঁটা 'ষ্টানাম্ ক্লোরাইড' দিলে যদি উহার রং রক্তাভ নীলে পরিণত হয়, তবে উহা যে খাঁটি সোণা সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহের কারণ থাকে না।

(Popular Sceince)
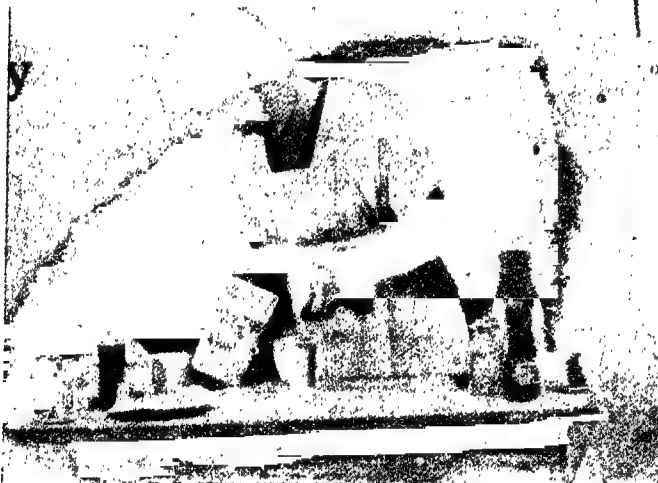
'মাখন' যাচাই

১০। চলার ব্যায়াম

পায়ে হাঁটা মেয়েদের পক্ষেও একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। এই জন্য বিলাতে মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য চিকিৎসকেরই চলাফেরা করিতে উপদেশ দেন। যাহাদের বেড়াইবার সুবিধা হইয়া উঠে না, তাহাদের জন্য সেখানে কৃত্রিম উপায়েও চলার ব্যায়াম প্রচলিত হইয়াছে। পদদ্বয় একটি স্প্রীং-সংযুক্ত ফিতায় বাঁধিয়া, ক্রমাগত এ-পা ও-পা প্রতিবার বদলাইয়া তোলা-নামা করিতে থাকিলে, একই স্থানে দাঁড়াইয়াই একাধিক ক্রোশ পথ চলার মত পরিশ্রম হইতে পারে। (Popular Science)

'কফি' যাচাই

১১। উভচর মোটর

জলে-স্থলে সমানি ভাবে চালাইতে পারা যায়, এরূপ মোটর গাড়ী উদ্ভাবন করিবার জন্য য়ুরোপের একাধিক জাতি চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু ফরাসীরাই এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে কৃতকার্য্য হইয়াছে। তাহাদের উদ্ভাবিত প্রকাণ্ড মোটরকার ১০জন আরোহী ও প্রায় অর্দ্ধটন মাল লইয়া, অনেকগুলি ছোট-বড় নদী-নালার ভিতর দিয়া ও পাহাড়ে জমির উপর দিয়া নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করিতেছে।

(Popular Science)

প্রেফেসার কাজেনমান্ নিকেল যাচাই
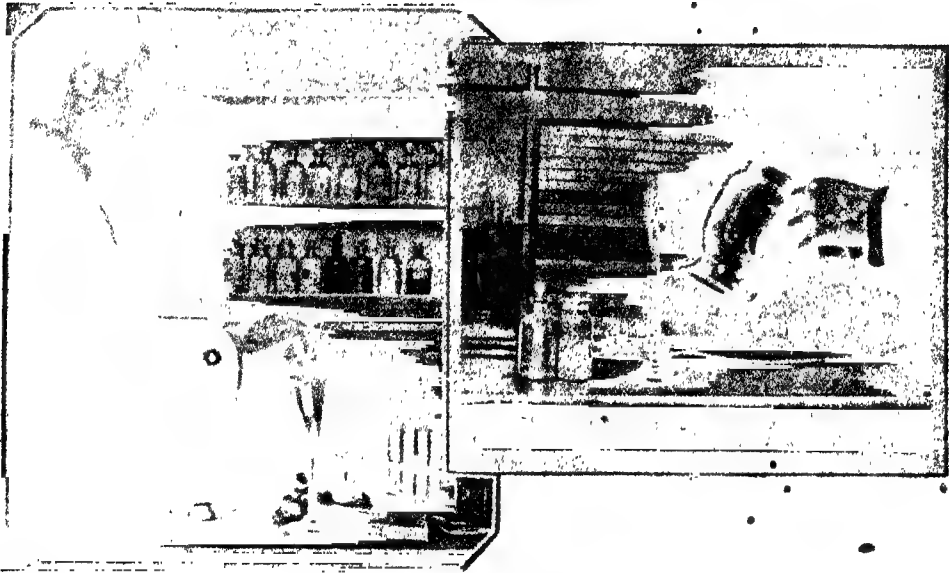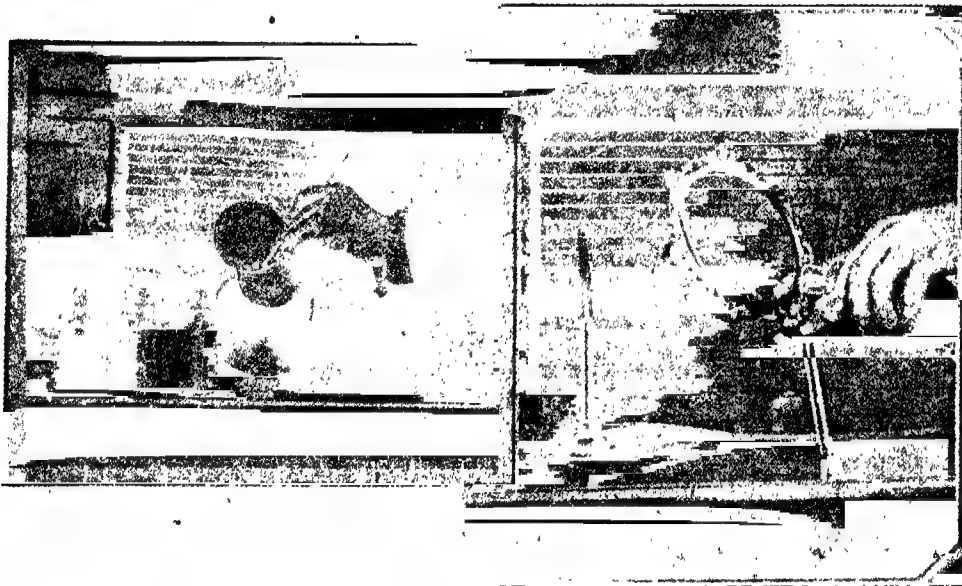
রূপা যাচাই সোনা যাচাই

১২। পকেট-চুলা।

এটিও ফরাসীদের উদ্ভাবিত এক অদ্ভুত কীর্ত্তি। তেল কয়লা, কাঠ, প্রভৃতির প্রয়োজন নাই,—বাতির আকারের এক প্রকার দাহ্য পদার্থ—যাহা পকেটে লইয়া বেড়ানো চলে, তাহাই যখন যেখানে ইচ্ছা জ্বালাইয়া—ভাত পর্য্যন্ত রাঁধিয়া লওয়া যায়। ইহার শিখা অল্প ; কিন্তু ইহার উত্তাপ এত বেশী প্রখর যে, তিন-চার মিনিটের মধ্যে এক কেট্‌লি জল টগ্‌বগ শব্দে ফুটিয়া উঠে। একটি বাতি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বলে।

(Popular Science)

চলার ব্যায়াম

উভচর মোটর
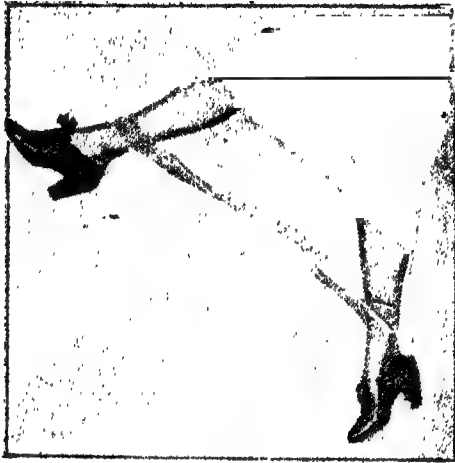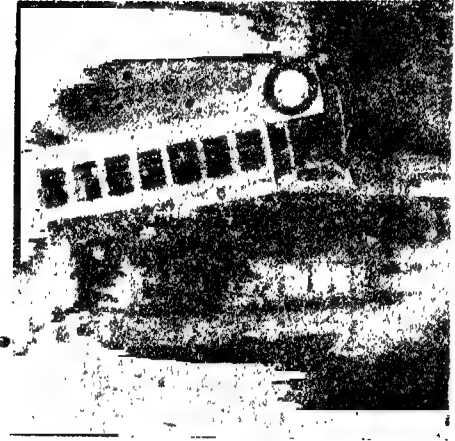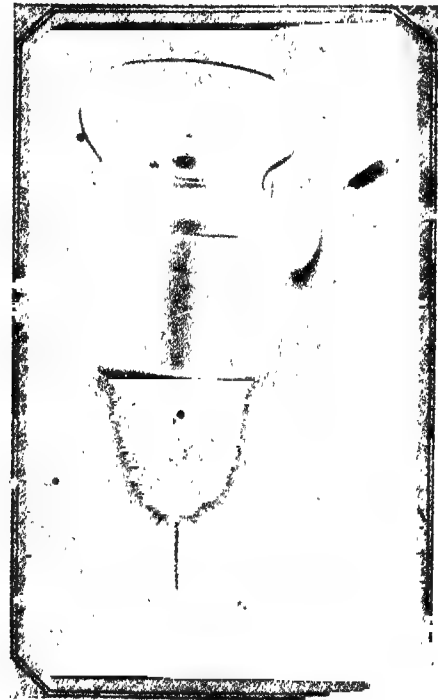
পুলিন্দা বাঁধা কল

পকেট আগুন

১৩। পুলিন্দা-বাঁধা কল।

এই কলের সাহায্যে বড়-বড় মোট ও গাঁটরি অনায়াসে বাঁধিয়া লওয়া যায়। টেবিলের উপর পোঁটলাটি রাখিয়া, কেবল একটি হাতল ধরিয়া ঘুরাইতে থাকিলেই, কলে আপনিই তাহার চারিদিকে দড়ি জড়াইয়া লইয়া, এবং যথা-স্থানে গ্রন্থি বাঁধিয়া, একটি সুন্দর ও সুদৃশ্য পুলিন্দা করিয়া ছাড়িয়া দিবে। অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক গাঁটরি বাঁধিবার প্রয়োজন হইলে, কলটি তাড়িত-শক্তির সাহায্যে পরিচালিত করাই সুবিধাজনক।

(Popular Science)

ইঙ্গিত.

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা].

গত ৩রা মার্চ্চ তারিখের "ইংলিশম্যানে" এই লেখাটুকু বাহির হইয়াছিল—

It is strange that the cane-work industry has not made much headway in Calcutta, or India for that matter. Large quantities of cane-furniture are imported, and the Chinese of Singapore seem to have driven the local manufacturers of cane-furniture practically out of the market.

অর্থাৎ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বেতের কাজ সংক্রান্ত শিল্প, কলিকাতায়, তথা ভারতবর্ষে, বড় বেশী অগ্রসর হয় নাই। বেতের তৈয়ারী অনেক গৃহসজ্জা বিদেশ হইতে আমদানি হয়। দেখা যাইতেছে, সিঙ্গাপুরের চীনারা স্থানীয় বেত্র-শিল্পীদের সম্পূর্ণ রূপে বাজার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে।

ইংলিশম্যান না হয় ভদ্রতার খাতিরে কেবল বিস্ময় প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু, বস্তুতঃ, ইহা কেবল বিস্ময়ের বিষয় নয়,—নিরতিশয় লজ্জারও বিষয়ও বটে। বেতের গৃহ-সজ্জার সমস্ত উপকরণই আমাদের হাতের কাছে রহিয়াছে। ডোম জাতীয় লোকেরা উত্তম রূপ বেতের গৃহসজ্জা তৈয়ার করিতেও জানে। কিন্তু তাহারা ইহার ব্যবসায় করিতে জানে না; তাহাদের উৎসাহ দিবার, পৃষ্ঠপোষকতা করিবার লোক নাই। তাহাদের অবস্থা অতি দরিদ্র। তাহারা বেতের শিল্প-কার্য্য জানে বটে, কিন্তু ইহাতে মূলধন বিনিয়োগ করিবার তাহাদের সামর্থ্য নাই। বেত হইতে আস্‌বাব তৈয়ার করিয়া কোথায় বিক্রয় করিতে হইবে, কি ভাবে ব্যবসায় করিতে হইবে, তাহা বোধ হয় তাহারা জানে না। শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা মজুরী দিয়া ইহাদের দ্বারা সৌখিন আস্‌বাব ও গৃহসজ্জা তৈয়ার করাইয়া লইয়া, যদি ইহার ব্যবসায় করেন, তাহা হইলেই এই জিনিসটির ব্যবসায় বেশ চলে; সুতরাং এই যে ব্যবসায়টি আমাদের হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে, ইহা কাহার দোষ?

বেতের আস্‌বাব তৈয়ার করিবার প্রধান উপকরণ দুইটী—বেত ও বাঁশ, তথা তল্‌তা বাঁশ। এই দুইটী জিনিসই আমাদের দেশে যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়। ইহার অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে দুই-একখানি ধারাল কাটারী ও ছুরী। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দুই-চারি ঘর ডোম, দুলে, বাগ্‌দী, চণ্ডাল প্রভৃতির বাস আছে। ইহাদিগকে কাজে লাগাইয়া মজুরী দিয়া, উহাদের দ্বারা বেতের গৃহসজ্জা তৈয়ার করাইয়া, সহর অঞ্চলে ব্যবসায়ী পল্লীতে দোকান খুলিলে কি ইহার ব্যবসায় চলে না? বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট দিয়া চলিতে-চলিতে রাস্তার দুই ধারে একটু দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইবেন, চীনাদের এই সব জিনিসের কত দোকান রহিয়াছে; এবং আরও একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন, এই সকল দোকানে খরিদ্দারেরও অভাব নাই। তবে কেন আমরাই বা ইহার ব্যবসায় করিতে পারিব না? চীনারা নিজের দেশে এই সব জিনিস তৈয়ার করাইয়া, জাহাজ-ভাড়া দিয়া কলিকাতায় আনিয়া, বাঁশ ও বেতের চেয়ার, ট্রে, টেপয় প্রভৃতি সজ্জা স্বচ্ছন্দে বিক্রয় করিতে পারে; এবং তাহাদের জিনিসের খরিদ্দারেরও অভাব হয় না; আর আমরা নিজেদের ঘরে বসিয়া, নিজেদের গ্রামে-গ্রামে স্বচ্ছন্দজাত বাঁশ ও বেত লইয়া এই গৃহসজ্জা তৈয়ার করাইয়া বিক্রয় করিতে পারি না? ইহা কি আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় নয়? আমাদের এইরূপ ঔদাসীন্যে ইংলিশম্যানের বিস্ময় প্রকাশ করা কি অসঙ্গত?

ডোমেরা বেতের ও বাঁশের শিল্প-কার্য্য জানে বটে, কিন্তু তাহারা ইহার ব্যবসায় করিতে জানে না। বিশেষতঃ, মূলধনের অভাবে তাহারা ইহার ব্যবসায় রীতিমত করিতে পারে না। তার উপর তাড়ী এবং ধান্যেশ্বরী তাহাদের আরও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে। এই শিল্পটি সম্পূর্ণ রূপে তাহাদের হাতে থাকাতে, এবং শিক্ষিত, ব্যবসায়-বুদ্ধি সম্পন্ন ভদ্রলোকেরা কিছু মূলধন লইয়া এই ব্যবসায়ে না নামিলে যে ইহার ব্যবসায় চলিতে পারে না, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা বুঝিতে পারিবেন।

একবার কাশী হইতে আসিতেছিলাম। একটা ষ্টেসনে ট্রেণও পৌছিল, ভোরও হইল। তখনও খুব ফর্সা হয় নাই,—অরুণোদয় হয় নাই,—অথচ অন্ধকারও নয়। ষ্টেসনে বেশী লোক ছিল না, ষ্টেসনটি তেমন বড় নহে;—কোন্ ষ্টেসন, তাহাও এখন মনে নাই। সেই আলো আঁধারের মধ্যে দেখিলাম, কয়েকটি নারী এবং হয় ত দুই একটী পুরুষও,—অবশ্য নিম্ন শ্রেণীর—গাড়ীর ধারে-ধারে দাঁড়াইয়া যাত্রীদের সঙ্গে কি কথা কহিতেছে,—দূর হইতে ভাল বুঝা কিম্বা দেখা যাইতেছিল না। ক্রমে তাহাদিগকে আমাদের কামরার দিকে আসিতে দেখিলাম, এক-একজনের কোলে একটী করিয়া শিশু এবং অপর হাতে দুই, তিন, চারিটী করিয়া বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী মোড়া। মোড়াগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনি মজবুত। উচ্চতায় সওয়া এক হাত হইবে। দাম, শুনিলাম, প্রত্যেকটি চারি আনা করিয়া। অনেক যাত্রী কিনিলেন; আমিও দুইটী কিনিলাম,—অত দূর হইতে কলিকাতায় আনা সুবিধাজনক নহে বলিয়া, আর বেশী লইতে পারিলাম না। মোড়াগুলি দেখিতে এমন লোভনীয় যে, পথে একজন সহযাত্রী নিতান্ত নির্ব্বন্ধ ও আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার দুইটীর মধ্যে একটী কিনিয়া লইলেন। আমি একটী মাত্র বাড়ীতে আনিতে পারিলাম। দিন কতক পরে কলিকাতার পথে এক ব্যক্তিকে একটা বাঁকের দুই ধারে অনেকগুলা মোড়া বাঁধিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া, তাহাকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া দর জিজ্ঞাসা করায়, সে ছোট প্রত্যেকটি বলিল পাঁচ সিকা এবং বড় দুই টাকা কি নয় সিকা। ছোটগুলি মাপে আধ হাত অপেক্ষা একটু উঁচু; আর বড়গুলি এক হাত উঁচু হইবে। অবশেষে অনেক কসামাজার পর ছোট মোড়া টাকায় তিনটার হিসাবে এক টাকার কেনা গেল।

ইহা অবশ্য ব্যবসায়ের দস্তর নহে। একই জিনিসের দামের এত ইতরবিশেষ ব্যবসায়-বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। সেই জন্যই বোধ হয় এই শ্রেণীর লোকে উত্তম শিল্পী হইলেও, উত্তম ব্যবসায়ী হইতে পারে না। কেবল মোড়া বা বেত-বাঁশের শিল্প নহে,—আমাদের দেশের অধিকাংশ শ্রেণীর শিল্পীই এমন বে-হিসাবী জিনিসপত্রের দাম নির্দ্দেশ করে যে, তাহা শুনিলেই খরিদদারের মন চটিয়া যায়। ইহাদিগের দ্বারা শিল্প-দ্রব্য নির্ম্মাণ করাইয়া লইয়া, সুপ্রণালীবদ্ধ ভাবে মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া ব্যবসায় করিলে, শিল্পীদেরও অন্ন-সংস্থান হয়, ব্যবসায়ও ভাল চলে।

তাঁতের কাপড় কিনিতে গেলে কত যে ইতস্ততঃ করিতে হয়, তাহা আর কি বলিব। প্রথমতঃ, মুখপাতে বেশ ঠাস বুনানি,—ভিতরে একেবারে জালের মত। তার পর, একই শ্রেণীর কাপড়ের অর্থাৎ একই নম্বরের সূতায় তৈয়ারী একই মাপের কাপড়ের দামের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। আর কাপড় কিনিয়া বাড়ীতে আনিয়া মাপিতে গেলেই চক্ষু স্থির—এক হাত দেড় হাত মাপে কম হইবেই! আমার প্রস্তাব এই, হয় শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা নিজেদের হাতে এই সব শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ভার তুলিয়া লউন, এবং সততার সহিত ব্যবসায় করুন; আর না হয় শিল্পীদিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া তাহাদের দ্বারা শিল্প-দ্রব্য তৈয়ার করাইয়া লইয়া ন্যায্য লাভ রাখিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করুন।

আমি দেশীয় শিল্পীদিগকে বাঁশ ও বেতের দ্বারা কত যে সুন্দর-সুন্দর জিনিস তৈয়ার করিতে দেখিয়াছি, তাহা আর বলিতে পারি না। ইহাদিগকে উৎসাহ দিলে একটা ভাল ব্যবসায়ের পত্তন হইতে পারে; এবং চীনারা নিজেদের দেশ হইতে বাঁশ বেতের জিনিস আনিয়া, এ দেশে বিক্রয় করিয়া, আমাদের ধন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করিলে, এই সকল জিনিসের খরিদদারের অভাব হইবে না।

বাঁশ ও বেতগুলিকে কাটিবার কায়দায়, অল্প পোড়াইয়া অর্থাৎ ঝলসাইয়া লইয়া, এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিবিধ রংয়ে রঞ্জিত করিয়া, ইহাদের দ্বারা বিবিধ বস্তু প্রস্তুত করিতে পারা যায়। শিল্পীরা যদি কোন একটী বিশেষ জিনিস তৈয়ার করিতে না জানে, তাহা হইলে দু' একটা নমুনা দেখাইয়া দিলেই, তাহারা স্বচ্ছন্দে তাহা প্রস্তুত করিতে পারিবে। বেত-বাঁশ যেমন আমাদের নিতান্তই আপনার এবং ঘরের জিনিস, ইহাদের দ্বারা প্রস্তুত শিল্প-দ্রব্যও তেমনি আমাদের নিজস্ব। কেবল উৎসাহের এবং ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাবে, এই শিল্পের অস্তিত্ব লোপ হইতে চলিয়াছে; এবং সেজন্য আমাদের নিজেদের ছাড়া অপর কাহাকেও দোষ দিতে পারা যায় না।

ইঙ্গিতের কোন-কোন পাঠক ক্রোম চামড়া প্রস্তুত করিবার প্রণালী অবগত হইতে চান। ইঙ্গিতে ক্রোম

চামড়া তৈয়ার করিবার প্রণালী লেখা অপেক্ষা, তাঁহাদিগকে আমি কোন কারখানায় গিয়া হাতে-কলমে এই শিল্পটি শিক্ষা করিয়া আসিবার পরামর্শ দিই। সম্প্রতি ইহা শিক্ষা দিবার একটু সুবিধাজনক বন্দোবস্তও হইয়াছে।

বাঙ্গলার গবর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগ বীরভূম জেলায় ক্রোম-চামড়া-প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য একটী কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। বর্দ্ধমান বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ মিঃ মজুমদারের তত্ত্বাবধানে সিউড়ী হইতে ১২ মাইল দূরে তাঁতিপাড়া গ্রামে উন্নত প্রণালীতে ক্রোম চামড়া প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এখানে অনেক চর্ম্মকারের বাস। ইহারা উদ্ভিজ্জ উপকরণ দিয়া চামড়ার পাইট করিত। এক্ষণে ক্রোম প্রণালীতে চামড়ার পাইট করিবার সুযোগ পাইয়া, তাহারা বেশ উপকৃত হইয়াছে বলিয়া শুনিতেছি। অনেক ভদ্রলোকও এই ক্রোম ট্যানারীতে চামড়ার পাইট করিতে শিখিতেছেন। অনেক যুবক এখানে (গবর্ণমেণ্ট রিসার্চ্চ ট্যানারীতে) শিক্ষানবীশ রূপে ভর্ত্তি হইবার জন্য আবেদন করিতেছেন। ক্রোম চামড়ায় আপাততঃ চুরুটের খাপ, সিগারেটের বাক্স, মণি ব্যাগ প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। জুতা, ট্রাভলিং ট্রাঙ্ক, হোল্ড-অল প্রভৃতি আরও অনেক জিনিস এতদ্দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারিবে।

বাঙ্গলার প্রায় প্রতি গ্রামে একটী করিয়া ভাগাড় আছে। সেখানে অনেক গরু-ভেড়া-ছাগলের মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হয়। চর্ম্মকাররা এই সকল জন্তুর ছাল সংগ্রহ করিয়া, কতক পাইট করিয়া পাকা চামড়ায় পরিণত করে; কতক শুকাইয়া বিদেশে চালান দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, চামারদের চামড়া পাইট করিবার প্রণালী খুব উৎকৃষ্ট নহে। ক্রোম প্রণালীতে ট্যান করিলে চামড়া খুব মজবুত হইবে, এবং বাঙ্গলায় নানা স্থানে ক্রমে অনেক কুটীর-শিল্পের পত্তন হইতে পারিবে।

এবার মনে হইতেছে, আম খুব বেশী ফলিবে। আপনারা কেহ-কেহ নিশ্চয়ই এবার কিছু আমের চাটনী তৈয়ার করিবেন। চাটনী ছাড়া আরও একটা জিনিস আপনারা আম হইতে তৈয়ার করিতে পারেন। আম ঠিক নয়—আমের আঁটি। আমের আঁটিতে কিছু ষ্টার্চ্চ আছে। উহা বাহির করিয়া লইতে পারেন। কাঁচা আমের মধ্যে যাহাদের আঁটি শক্ত হইয়াছে, সেই আঁটি এবং পাকা আমের আঁটি হইতে ষ্টার্চ্চ বাহির হইবে। আমের আঁটিগুলির শক্ত খোসাটা বাদ দিয়া তাহার শাঁস বাহির করিয়া লউন। সেই শাঁস বেশ করিয়া বাটিয়া লউন। সেই আমের আঁটির শাঁস-বাটা জলে গুলিয়া লউন। যাহা তলায় থিতাইয়া পড়িবে, তাহাই ষ্টার্চ্চ। উপরের ময়লা জলীয় অংশ ফেলিয়া দিয়া ষ্টার্চ্চ শুকাইয়া লউন। শটী হইতে যে প্রণালীতে ষ্টার্চ্চ বাহির করিবার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই প্রণালীতেই আমের আঁটি হইতেও ষ্টার্চ্চ বাহির করিতে হইবে। উপরে যে জল থাকিবে, তাহাতে কিছু ট্যানিক এসিড থাকিবে। সে জিনিসটা কালী, কিম্বা সূতা ও বস্ত্রাদি কালো রঙে রঞ্জিত করিবার জন্য ব্যবহার করিতে পারা যাইবে। জলটাকে দুই এক দিন স্থির ভাবে রাখিয়া দিলে সমস্ত ময়লা তলায় থিতাইয়া পড়িয়া, উপরে কেবল পরিষ্কার জল থাকিবে। ট্যানিক এসিড সেই জলে দ্রব অবস্থায় থাকিবে। এই জলে কাপড় বা সূতা ভিজাইয়া লইয়া, শুকাইয়া পরে তাহা আবার পরিষ্কার হীরাকষের জলে ভিজাইয়া লইলেই দিব্যি পাকা কালো রঙে ঐ কাপড় বা সূতা রঞ্জিত হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, কাপড় বা সূতাকে আমের কসির জলে ভিজাইয়া লইবার পূর্ব্বে, উহাকে উত্তম রূপে bleach করিয়া লইতে হইবে ; নহিলে রঙ ধরিবে না।

দেশে যে সব জঙ্গল আছে, সেই জঙ্গলগুলা এক-একটা মস্ত বড় সম্পত্তি। ভারতের অধিকাংশ বড়-বড় জঙ্গল সরকারের খাস-মহল। অনেক দেশীয় রাজার রাজ্যে ও বড়-বড় জমিদারের জমিদারিতেও অনেক জঙ্গল আছে। এই সকল জঙ্গল সুরক্ষিত রাখিবার জন্য সরকারের এক জঙ্গল-বিভাগ বা forest department আছে। জঙ্গল হইতে অনেক দরকারী জিনিস পাওয়া যায়, যাহা হইতে বিক্রয়-যোগ্য পণ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অনেক জঙ্গলে বড়-বড় মৌচাক পাওয়া যায়। মৌচাকে মধু থাকে ; চাক গলাইয়া মোমও পাওয়া যায়। এখানে লক্ষ-লক্ষ মৌমাছি বাস করে। তাহারা জঙ্গলের স্বভাবজাত নানা ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া চাক পূর্ণ করে। তাহা ছাড়া নিজেদের দেহ হইতে মোম বাহির করিয়া তাহাদের চাক নির্ম্মাণ করে। নিষ্ঠুর মানব তাহাদের বহু পরিশ্রমের ধন এবং নিজেদের দেহ হইতে গড়া মধু-পূর্ণ চাক চুরি করিয়া বা লুঠ করিয়া নিজেরা ভোগ করে।

প্রতিহিংসাপরায়ণ লক্ষ-লক্ষ মৌমাছির হুলের বিষ হইতে অনেক কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া মানুষ যখন চাকগুলি গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া গৃহে লইয়া আসে, তখন তাহারা চাক হইতে একটা পাত্রে মধুটুকু সংগ্রহ করিয়া রাখে। তার পর চাকটিকে আগুনের তাপে গলাইয়া মোম বাহির করিয়া লয়। মোম আমাদের অনেক কাজে লাগে—উহা খুব দামী জিনিস। উহা হইতে প্রধানতঃ বাতি তৈয়ার হয়; এবং মোম অন্য অনেক জিনিসের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া নানাবিধ শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

মৌচাক গলাইলেই অমনি মোম পাওয়া যায় না। মোমের সঙ্গে আরও অনেক জিনিস মিশ্রিত থাকে, যাহা বাদ না দিলে খাঁটি মোম পাওয়া যায় না। প্রধানতঃ পুরু শক্ত নূতন কাপড়ে তরল মোম ছাঁকিয়া মলামাটিগুলা বাদ দেওয়া হয়। কাপড় দিয়া ছাঁকিবার সময় অবশ্য কিছু মোম কাপড়ে আটকাইয়া থাকে। সেই কাপড়খানা কিছুক্ষণ গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লইলে, অনেকটা মোম গলিয়া বাহির হইয়া আসিয়া, জলের উপর ভাসিয়া থাকে। পরে কাপড় তুলিয়া লইয়া, জল শীতল হইতে দিলে মোম জমিয়া যায়।

কাপড় দিয়া নানা প্রকারে মৌচাক ছাঁকিয়া মোম বাহির করা যাইতে পারে; তন্মধ্যে একটা উপায়—একটা শক্ত কাপড়—আড়ে-ওসারে সমান মাপের হইলেই ভাল হয়, লইয়া তাহার চারি কোণ চারিটি খুঁটিতে কিম্বা একটা চৌকা কাঠের ফ্রেমে বাঁধিতে হয়। লোহার কড়ায় চাকগুলিকে গলাইয়া তরল থাকিতে-থাকিতে কাপড়ের উপর ঢালিয়া দিলে ছাঁকা হইতে পারে। কিন্তু কড়ার উপর হইতে তরল মোম তুলিয়া লইয়া, কাপড়ের উপর ঢালিতে আরম্ভ করিবার পর, খানিকটা বাদে মোম ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া যাইতে পারে। সেইজন্য কাপড়খানির উপর একটু তাপ প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। জলীয় বাষ্প প্রয়োগ করিলে, মোম তরল অবস্থায় রাখিবার মত তাপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কারণ, যে তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয়, মোম তদপেক্ষা কম তাপে গলে।

মোম গলাইবার ও ছাঁকিবার আর এক উপায়—একটা বড় লোহার কড়া বা মাটীর পাত্রে জল গরম করিতে হয়। জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে, তাহাতে চাক-খণ্ডগুলি ছাড়িয়া দিলে মোম গলিতে আরম্ভ হয়। কাজেই আর একটা পাত্রের উপর কাপড় ঢাকা দিয়া, তাহাতে তরল মোম বা মৌচাক হাতায় করিয়া ঢালিয়া দিতে থাকিলে, ছাঁকা হইয়া যায়।

তৃতীয় উপায়—চাকের খণ্ডগুলিকে কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া, উহাকে পুঁটুলীর মত করিয়া বাঁধিয়া, একটা ভারী পাথরের সঙ্গে পুঁটুলীর কোণের দিকটা বাঁধিয়া, পাথরশুদ্ধ পুঁটুলী একটা বড় পাত্রে জলের মধ্যে স্থাপন করিতে হয়। মোম জিনিসটি জলের অপেক্ষা লঘু বলিয়া পুঁটুলীর যে দিকে মৌচাক আছে, সেই দিকটা ভাসিয়া থাকিবে। তার পর সেই পাত্রের নীচে আগুন দিলে, জল ফুটিতে আরম্ভ হইলেই, ছাঁকা মোম কাপড়ের ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া, জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে থাকিবে; সেই তরল মোম হাতায় করিয়া তুলিয়া অন্য পাত্রে রাখিতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মোম বাহির হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুঁটুলী গরম জলের মধ্যে থাকিবে। এই প্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট; কারণ, ইহাতে তিনটি কাজ এক সঙ্গে হয়। (১) মোম গলানো, (২) উহাকে মলামাটী হইতে ছাঁকিয়া পৃথক করা; এবং (৩) জলের সঙ্গে সিদ্ধ করায়, মোমের কতকটা ক্লেদ জলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া, মোমটাকে অনেকটা পরিষ্কার করিয়া ফেলে। প্রথম দুইটী উপায়ে যে মোম বাহির হয়, তাহা ভয়ঙ্কর কালো; আর, তৃতীয় উপায়ে বহির্গত মোম অতটা কালো নয়,—কিছু কম কালো।

এই কালো মোম বাজারে তেমন আদৃত হয় না। সেই জন্য তাহাকে সাদা করিয়া লইতে হয়। কালো মোমকে সাদা করিতে হইলে, তাহাকে জলের সঙ্গে অনেকবার সিদ্ধ করিতে হয়। সেই জন্য তৃতীয় উপায়ে মোমের কালো রঙ কতকটা দূর করিয়া সাদা করার কাজটা অনেকটা অগ্রসর হইয়া থাকে। প্রথম দুই উপায়ে বাহির করা মোম যতবার সিদ্ধ করিতে হয়, তৃতীয় উপায়ে বাহির করা মোম তদপেক্ষা কমবার সিদ্ধ করিলেই চলে। মোট কথা, মোম যতবার পরিষ্কার জলের সঙ্গে সিদ্ধ করা হইবে, ততই উহার ময়লা জলের সঙ্গে মিশিয়া মোমের কালো রঙ কমাইয়া আনিবে। এইরূপে অনেকবার সিদ্ধ করিলে মোম, ক্রমে হলদে রঙ ধারণ করিবে। হলদে বলিতে একেবারে হলুদের মত গাঢ়...

হলদে রঙ অবশ্য নয়—পীতাভ বলিতে পারা যায়। বাজারে এই মোমের খরিদ-বিক্রয় চলে। তবে পীতাভ মোমে সকল রকম কাজ চলে না, বলিয়া উহাকে আরও পরিষ্কার—অর্থাৎ সাদা করিয়া ফেলিতে হয়। এই সাদা বলিতে দুধের ন্যায় সাদা বুঝাইবে না। তবে তুষার-শুভ্র বা বরফের মত সাদা বলা যাইতে পারে। আর শুধু জলে সিদ্ধ করিলে মোম সাদা করা যাইবে না—মোম সাদা করিবার অন্য উপায় আছে।

কাপড় ও সূতা রঙ করার প্রসঙ্গে আপনাদিগকে বার-বার অনুরোধ করিয়াছি যে, কাপড়, সূতা রঙ করিবার পর, তাহা ছায়ায় শুকাইয়া লইবেন; রৌদ্রে কদাচ শুকাইবেন না। কেন বলুন দেখি? কারণ, রৌদ্রে শুকাইলে রঙ খারাপ হইয়া যায়। সূর্য্য-কিরণের প্রধান গুণ—উহা রঙ খাইয়া ফেলে। মানুষ সূর্য্য-কিরণের এই বর্ণ হরণ করার গুণটি টের পাইয়া, ফাঁকি দিয়া অনেক কাজ করাইয়া লইতেছে। ফটোগ্রাফি শাস্ত্রটা সূর্য্য-কিরণকে, তথা আলোকে, ফাঁকি দেওয়া মাত্র।

ধোবারা অনেক সময়ে কাপড় কাচিবার পর, দেখিয়া থাকিবেন, কাচা কাপডগুলিকে ঘাসের উপর রৌদ্রে বিছাইয়া দেয়। আপনারা মনে করিবেন না, কেবল ভিজা কাপড়ের জল শুকাইয়া লওয়া তাহাদের উদ্দেশ্য। কারণ জল শুকাইবার কাজটা প্রধানতঃ হাওয়ার দ্বারা হইয়া থাকে। সুতরাং ছায়ায় কাপড় স্বচ্ছন্দে শুকাইয়া লওয়া যাইতে পারে। ধোবাদের রৌদ্র-কিরণে ঘাসের উপর কাপড় বিছাইয়া দিবার আর একটা প্রধান উদ্দেশ্য আছে। ক্ষার জলে কাপড় সিদ্ধ করিবার সময়, ময়লা কাপড়ের যতটা ময়লা দূর হইবার তাহা ত হয়ই; বাকীটুকু হয় সূর্য্য-কিরণের সাহায্যে। বস্তুতঃ, এই উপায়ে কাপড়ের শুভ্রতা শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মোম সাদা করিবার জন্যও সূর্য্য-কিরণের সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে।

মোম সিদ্ধ হইবার পর ঠাণ্ডা হইলে, জমাট বাঁধিয়া তাল পাকাইয়া যায়। সেই তাল-পাকানো মোম খুব ছোট-ছোট টুকরা করিয়া কাটিয়া লইতে হয়। টুকরাগুলিকে একটা মুগুরের দ্বারা থেঁতলাইয়া লইতে পারিলে আরও ভাল হয়। মোট কথা, মোম যত ছোট-ছোট খণ্ডে বিভক্ত হইবে, উহাতে তত বেশী সূর্য্য-কিরণ লাগিতে পারিবে, এবং তত শীঘ্র তত অধিক পরিমাণে তাহা সাদা হইতে থাকিবে।

সেই মোমের টুকরা বা থেঁতলানো মোম মসৃণ কাঠের তক্তার উপর স্থাপন করিয়া রৌদ্রে দিতে হয়। কয়েক দিন দিবানিশি এই ভাবে রাখিয়া দিলে, পীত মোমের পীত বর্ণটা সূর্য্য-কিরণ খাইয়া ফেলে; এবং মোম প্রায় বর্ণহীন অবস্থায় আসিয়া পড়ে। দিবানিশি কয়েকদিন ধরিয়া অনাবৃত স্থানে রাখিবার কারণ, শীতকালে শিশির ভোগ করিবার সুবিধা হয়; শীত ছাড়া অন্য ঋতুতে একটু-আধটু জল ছিটাইয়া দিতে হয়। এই আর্দ্রতা শুভ্রীকরণ প্রক্রিয়ার পক্ষে আবশ্যক ব্যাপার। অবশ্য রৌদ্রে দিবার সময় একটু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, যাহাতে ধূলা-বালি উড়িয়া আসিয়া মোমের উপর পড়িয়া, তাহার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া তাহাকে মাটী করিয়া না ফেলে। কাঠের তক্তাগুলি মসৃণ হওয়া এই জন্য দরকার যে, রৌদ্রতাপে মোম একটু গলিয়া গিয়া কাঠে আটকাইয়া যাইবে। কাঠের তক্তা মসৃণ হইলে, তাহা চাঁচিয়া তুলিয়া লইবার সুবিধা হইবে, নচেৎ, অনেকটা মোম নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

মোমের ময়লা বাদ দিবার জন্য উহাকে পুনঃ-পুনঃ সিদ্ধ করিতে হইবে। তাহার মানে, বারবার ময়লা জল বদলাইয়া নূতন পরিষ্কার জল দিতে হইবে। প্রথমবার সিদ্ধ করিবার সময় যে পরিমাণ জল লইতে হইবে, সেই পরিমাণ জলে মোমের যতখানি ময়লা দ্রবীভূত হইতে পারে, তাহা হইয়া যাইবার পর জল না বদলাইলে চলিবে না। কারণ, একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ময়লা দ্রবীভূত হইতে পারিবে। জলের ময়লা গ্রহণের শক্তি সীমাবদ্ধ—তাহার অধিক সে পারে না। দ্বিতীয়বারে আরও খানিকটা ময়লা মোম হইতে বাহির হইয়া গিয়া, পরিষ্কার জলের সঙ্গে মিশিয়া তাহাকে ময়লা করিয়া ফেলিবে। এইরূপে যতবার পরিষ্কার জলে সিদ্ধ করা হইবে, ততই মোমের ময়লা কমিয়া যাইবে।

ঠিক এই উপায়েই অনেক তৈল বিশুদ্ধ করা হয়। নারিকেল তৈল, রেড়ির তৈল, জলপাইয়ের তৈল প্রভৃতি হইতে কেশ-তৈল প্রস্তুত করিবার সময় তাহা নির্ম্মল ও গন্ধহীন করিয়া লইতে হয়। নচেৎ কেশ-তৈল ভাল হয় না। উহা চটচটে থাকে, উহাকে সুগন্ধি করা যায় না। রেড়ির তৈল ত অত্যন্ত চট্‌চটে জিনিস। অথচ বিলাতী বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহা হইতে যে কেশ-তৈল, অর্থাৎ ম্যাকাসার অয়েল, রিফাইণ্ড পারফিউম্‌ড ক্যাষ্টর অয়েল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, তাহাতে চট্‌চটে ভাব আদৌ থাকে না। রেড়ির তৈলের চট্‌চটে ভাব দূর না করিতে পারিলে, উহাকে কোন ক্রমেই কেশ-তৈল স্বরূপ ব্যবহার করা উচিত নহে। গরম জলে সিদ্ধ করিয়া এবং অপরা-পর কয়েকটি উপায়ে রেড়ির তৈলের এই দোষটি পরিহার করা যাইতে পারে। রেড়ীর তৈলে যে সকল পদার্থ থাকার দরুণ উহার চট্‌চটে ভাব হয়, জলে সিদ্ধ করিয়া লইলে, কিম্বা তৈলের সঙ্গে জল মিশাইয়া তৈলের তলদেশ দিয়া গরম বাষ্প চালাইলে, তৈলের ঐ সকল পদার্থ জলের সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়। তাহাতে তৈলের চট্‌চটে ভাব দূর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তৈল কিছু পাতলাও হইয়া যায়। ইহার পর তৈল হাড়-পোড়া কয়লা, অভাবে কাঠ-কয়লার মধ্য দিয়া ফিলটার করিয়া লইলে, তৈল আরও বিশুদ্ধ

হয়। রেড়ীর তৈলের সঙ্গে শতকরা ছুই অংশ গন্ধক-দ্রাবক মিশাইয়া, খুব ঝাঁকাইয়া দ্রাবকটি তৈলের সঙ্গে উত্তম রূপে মিলাইয়া এক সপ্তাহ রাখিয়া দিবার পর দেখা যাইবে, তৈলের বর্ণের কতকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক সপ্তাহ পরে দ্রাবক-মিশ্রিত তৈলে খানিকটা জল ঢালিয়া উত্তম রূপে নাড়িয়া দিলে, দ্রাবক জলের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। এই অবস্থায় তৈল ও জল পৃথক করিয়া লইলে, অনেকটা বিশুদ্ধ তৈল পাওয়া যাইবে। দ্রাবক মিশ্রিত তৈলে জল মিশাইয়া নাড়িয়া লইবার পর, তাহাতে সামান্য চা-খড়ি, কিম্বা পটাশ বা সোডার জল মিশাইয়া, দ্রাবকটিকে neutral করিয়া লইলে জল হইতে তৈল পৃথক করিবার বেশী সুবিধা, এবং তৈল আরও পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ হয়। সর্ব্বশেষে, তৈল ব্লটিং কাগজে ফিলটার করিয়া লইলে, অনেকটা ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে। ইহা ছাড়া, তৈল শোধন করিবার আরও অনেক রাসায়নিক উপায় আছে। এইরূপে তৈল অনেকটা বিশুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু উহার রং উজ্জ্বল হয় না,—কতকটা মলিন থাকিয়া যায়। মলিন তৈল কাচ-পাত্রে রাখিয়া কয়েকদিন রৌদ্র ও শিশির লাগাইলে, মোমের ন্যায় আলোকের ক্রিয়ার প্রভাবে তৈলের বর্ণও উজ্জ্বল হইয়া থাকে। তৎপরে তৈলের সঙ্গে অন্য রঙ মিশাইয়া উহাকে রঞ্জিত এবং আতর প্রভৃতি গন্ধ-দ্রব্য মিশাইয়া উহাকে সুরভিত করা যাইতে পারে।

আমরা বাল্যকালে একটী বচন প্রায় শুনিতাম—সর্ব্বগন্ধ হরে তৈল, তৈল গন্ধ হরে লখি। ইহার অর্থ, তৈল সকল পদার্থের গন্ধ হরণ করিয়া নিজে ঐরূপ গন্ধযুক্ত হয়। আর লখি নামক এক পদার্থের যোগে তৈল গন্ধহীন হয়। এই লখি জিনিসটি অতি দুষ্প্রাপ্য। শুনিয়াছিলাম, উহা বেণের দোকানে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক দোকানে খুঁজিয়াও পাই নাই। লখি কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাও শুনিয়াছিলাম। গেঁড়ির মুখের পাতলা টুপি, যাহার সঙ্গে উহার কোমল দেহ আটকাইয়া থাকে, এবং ভয় পাইয়া গেঁড়ি তাহার খোলার ভিতর আত্ম গোপন করিলে, যে টুপিটা তাহার খোলার দরজার কাজ করে. সেই পাতলা চক্রাকার জিনিসটি শুকাইয়া পোড়াইয়া লখি প্রস্তুত হয়। তবে ঐ চাকা সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া লখি প্রস্তুত করিবার উৎসাহ ছিল না বলিয়া, ঐ জিনিসটি পরীক্ষা করিতে পারি নাই। যদি এই লখির সাহায্যে তৈলকে গন্ধহীন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে উহার সহিত সুমিষ্ট গন্ধ মিশাইয়া তৈলকে স্থায়ী ভাবে সুরভিত করা যায়। ইঙ্গিতের অনেক পাঠক, বিশেষতঃ পাঠিকা মহোদয়াগণ ঘরে সুবাসিত তৈল প্রস্তুত করিতে গিয়া, এই অসুবিধা-টুকু অত্যন্ত তীব্র ভাবে অনুভব করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা অতি উৎকৃষ্ট আতর প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে মিশাইয়াও কেশ-তৈল স্থায়ী ভাবে সুবাসিত করিতে পারিতেছেন না। তাহার কারণ, তৈলের নিজের একটা স্বাভাবিক উৎকট ও উগ্র গন্ধ আছে। তাহা সকল প্রকার সুগন্ধ খাইয়া ফেলে। আতরাদি মিশানো তৈলকে সুবাসিত করিবার সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট উপায়। আর তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে হইলে, তৈলকে আগে গন্ধহীন করিয়া লইতে হয়। লখি যদি কেহ সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তৈলের উপর উহার পরীক্ষা করিয়া, ফলাফল আমাকে জানাইলে ভাল হয়।

তৈলকে সুবাসিত করিতে হইলে, যে পদার্থ হইতে তৈল উৎপন্ন হয়, তাহাকেই প্রথমে সুবাসিত করিয়া, তার পর তাহা হইতে তৈল বাহির করিয়া লওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। এই কার্য্যের পক্ষে তিলই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী; এবং তাহার পরিণাম ফুলল তৈল। তিলগুলিকে যে কোন ফুলের সঙ্গে কয়েক দিন রাখিয়া দিলে, তিল ঐ ফুলের গন্ধ হরণ করিয়া লয়। তখন তিলে ঐ ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। পরে ঐ তিল হইতে তৈল নিষ্কাশন করিয়া লইলে, ফুলের গন্ধযুক্ত তিল-তৈল পাওয়া যায়। আর তিল হইতে তৈল বাহির করিয়া লইবার পর, তাহাতে কোন ফুলের আতর মিশাইয়া লইলে, প্রথম-প্রথম দিন-কয়েক তিল-তৈলে ফুলের আতরের গন্ধ পাওয়া গেলেও, ঐ গন্ধ স্থায়ী হয় না।

আসল খাঁটি ফুলল তৈল তৈয়ার করিতে হইলে, এক-এক জাতীয় ফুল তিলের সঙ্গে কয়েক দিন একত্র রাখিয়া দিতে হয়। অর্থাৎ গোলাপী ফুলল তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে, তিলের সঙ্গে কেবল গোলাপের পাপড়ী—তাহাও আবার এক জাতীয় গোলাপ-পাপড়ী—কিছু দিন রাখিয়া দিতে হয়;—অন্য কোন ফুলের পাপড়ী গোলাপ-পাপড়ীর সঙ্গে ব্যবহার করিতে নাই। সেইরূপ চামেলী তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য কেবল চামেলী ফুল, বেলার জন্য কেবল বেল ফুল ব্যবহার্য্য। প্রথমে একটি বাক্সের তলায় একজাতীয় ফুল বা ফুলের পাপড়ী এক স্তর বিছাইয়া দিয়া, তাহার উপর পাতলা করিয়া এক স্তর তিল, তদুপরি আবার এক স্তর ঐ জাতীয় ফুলের পাপড়ী, তাহার উপর আবার এক স্তর তিল—এইভাবে ফুল ও তিল স্তরে-স্তরে সাজাইয়া রাখিতে হয়। কয়েক দিন পরে শুষ্ক ফুলের পাপড়ীগুলি ফেলিয়া দিয়া, ঐ একই জাতীয় টাট্‌কা ফুলের পাপড়ী আনিয়া, তিলগুলির সঙ্গে পূর্ব্বমত স্তরে-স্তরে সাজাইয়া রাখিতে হয়। ঐরূপে যতবার টাট্‌কা ফুল ব্যবহৃত হইবে, তিল তত বেশী সুগন্ধি হইবে। তার পর সেই তিল হইতে তৈল বাহির করিয়া লইলেই, আসল খাঁটি ফুলল তেল প্রস্তুত হইবে।

বিশ্ব-ভারতী

[শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল্]

সুজনন-বিদ্যা
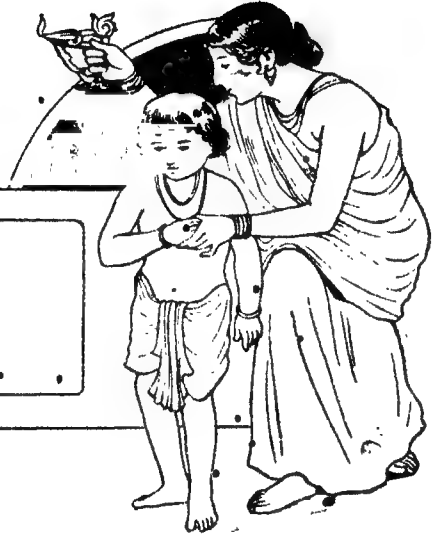
Scientific American পত্রিকায় Albert. A. Hopkins সাহেব সুজনন-বিদ্যা সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন, আমরা তাহার সারাংশের অনুবাদ করিয়া দিয়া একটু আলোচনা করিব। এ যুগে নূতন বিজ্ঞানের অস্তিত্ব আশা করা একপ্রকার দুরূহ ব্যাপার হইলেও, ডারউইন, সার ফ্রান্সিস গ্যাল্টন প্রমুখ পণ্ডিতদিগের অধ্যবসায় ফলে সুজনন-বিদ্যা বিজ্ঞানের গণ্ডীর ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। নিউইয়র্ক সহরে সুজনন-বিদ্যার আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে (Second International Congress of Eugenics) পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণার ফলে আশার আলোক দেখিতে পাইয়া অনেকেই উৎফুল্ল হইয়াছেন। উপযুক্ত পিতার গুণশালী পুত্র মেজার লিওনার্ড ডারউইন ও সুপণ্ডিত গ্যাল্টনের নিকট আত্মীয় প্রথম বক্তৃতা করিতে উঠিয়াই বলিয়াছিলেন, আইন করিয়া মানবের বিবাহবন্ধন বা স্ত্রী-পুরুষের যৌন-সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করিতে যাওয়া বিষম ভুল। নিয়মের বন্ধনের ভিতর দিয়া এ প্রশ্নের সমাধান সম্ভবপর নয়। আমাদের বাঙ্গালা দেশের—বাঙ্গালীর জাতীয় কবি হেমচন্দ্র একদিন সত্যই বলিয়াছিলেন,—

'হাতে সূতা বেঁধে কভু-প্রেমে বাঁধা যায়।
বন্ধন দেখিলে প্রেম তখনি পলায়॥'

আবার কাহারও কাহারও মতে এ ব্যাপারে রোমান্স জিনিসটা থাকিলে আদৌ চলিবে না। নূতনত্ব বা রোমান্সকে স্বামী-স্ত্রী নির্ব্বাচন-ব্যাপারে একেবারেই নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। বাস্তবিক এ কথার কোন মূল্যই নাই। এ ব্যাপারে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে চাই, যাহা দ্বারা আমরা সুন্দর বলশালী সন্তান-সন্ততি লাভ করিতে পারি; আজকাল কৃষকেরা যে পদ্ধতি (Cattle breeding principle) অবলম্বন করিয়া সুন্দর নধর গৃহপালিত পশু পাইয়া থাকে, সেই পদ্ধতিই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া মনে হয়। অপর দিকে এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা, প্রেমের দায়ে যাহারা মিলিত হন তাহাদের মিলনই সুজনন-বিদ্যা সম্মত, আর যাহারা অর্থ বা অন্য লাভের আশায় স্বামী-স্ত্রী ভাবে মিলিত হন বা বিবাহ করেন তাহাদের মিলনের ফল ভাল হয় না—তাহাদের সন্তান-সন্ততি বংশের ধারাকে ক্ষীণ করিয়া দেয়, এইরূপ মত প্রকাশ করেন।

বংশানুক্রম-প্রভাব সুজনন-বিদ্যার সাহায্যে অধীত হইয়া যে সকল সত্য বাহির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ডাক্তার চার্লস বি, দাভানপোর্ট বলিয়াছেন, পিতার দেহের বিশেষত্ব পুত্রে যে বর্ত্তিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অণুমাত্র কারণ নাই। বালকের পিতৃ-সম্বন্ধে কোন রূপ সন্দেহ থাকিলে বালকের মাতা-পিতা, ও অনুমিত জন্মদাতার দেহের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কাহার

দেহগত বিশেষত্বের চিহ্ন বালকের শরীরে প্রকট হইয়াছে। দুইজন পুরুষের মধ্যে যাহার শরীরের কোন বিশেষ চিহ্ন যদ্যপি ঐ পুত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে শতকরা ৭৫ হইতে ৯০টী স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় ঐ পুত্র বিশেষ চিহ্ন-ধারী পুরুষের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জাতক কেবলমাত্র যে বিশেষ চিহ্ন পাইয়া থাকে তাহা নহে, সামান্য সামান্য অনেক চিহ্নও তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। পিতার তিল, আঁচিল ছাড়িয়া দিলেও, জড়ুল, যড়াঙ্গুল, খণ্ডিত-ওষ্ঠ, গজদন্ত, তির্য্যক নেত্র প্রভৃতি দেহের বিশেষ চিহ্ন পুত্র যে লাভ করিয়া থাকে, তাহা আমরাও অনেক স্থলে দেখিয়াছি। সুজনন-বিদ্যার নিয়মগুলি জানা থাকিলে আইন-ব্যবসায়ীদের যে অনেক স্থলে উপকার হইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ধরুন, সেদিন কলিকাতা হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের বিচারে শূদ্রের অবৈধপুত্র উত্তরাধিকারী হইবে স্থির হইয়াছে। যে মোকদ্দমায় এইরূপ রায় প্রকাশ হইয়াছে (কলিকাতা ল-রিপোর্ট ৪৮ ভাগ ৬৪৩ পৃষ্ঠা) তাহাতে স্ত্রীলোকটী বিধবা হইবার পর হইতে শূদ্রের বাটীতে তাহারই রক্ষিতা ভাবে ছিল ; পুত্রের জন্ম সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা খুব কমই ছিল ; কিন্তু যে ক্ষেত্রে ধনী শূদ্র যুবকেরা বারাঙ্গনার বাড়ীতে গিয়া সন্তান উৎপাদন করিবে, তাহারা যে প্রকৃত ঐ শূদ্রের সন্তান তাহা কিরূপে জানিতে পারা যাইবে। কতকগুলি মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা প্রত্যেক বারাঙ্গনার গর্ভজাত কোন পুত্রকে কেহ শূদ্রের বৈধ পুত্রের অর্দ্ধেক বিষয় পাইবার লোভে মোকদ্দমা দায়ের করিয়া সফলকামও যে হইবে না, তাহা বলিতে পারি না। এ সকল ক্ষেত্রে জন্মদাতা ও পুত্রের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী সুজনন-বিদ্যার সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সত্যে উপনীত হইবার সম্ভাবনা অধিক। শুধু যে জন্মদাতার দৈহিক চিহ্নই জাত-সন্তানে বর্ত্তিবে তাহা নহে, সে তাহার দোষ ও গুণের অধিকারীও হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বংশগত রোগ উত্তর-পুরুষে সংক্রামিত হইয়া থাকে, তাহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন।

স্ত্রী-পুরুষের মিলন ব্যাপারে যাহারা রোমান্সকে বিতাড়িত করিয়া দিতে চাহেন, ও যাহারা রক্ষা করিতে চাহেন, তাহারা বিশেষজ্ঞদের নিকট এ বিষয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। বংশানুক্রম-প্রভাব, বিবাহ ব্যাপারে প্রাধান্য লাভ করিবেই করিবে। ভালবাসা জন্মিলেই পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ভাবা উচিত, তাহাদের সম্মিলনে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে তাহার ভবিষ্যৎ কিরূপ হইবে। পাশ্চাত্য-সমাজে আপন বংশের ভিতর খুড়তুত, জ্যাঠতুত, মামাত, পিসতুত ভাই ভগ্নীদের মিলন আর ততটা সংঘটিত হইতেছে না। এ সকল মিলন-ক্ষেত্রে জাত-পুত্র অনেক স্থলেই দুর্ব্বল হইতে দেখা যায়। সগোত্রে বিবাহ হইয়া অনেক রাজ-বংশ ও অন্যান্য বংশ একেবারে যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহার অনেক নিদর্শন আছে। আর আমাদের দেশের ভবিষ্যদ্রষ্টা ঋষি ও শাস্ত্রকারেরা এই কারণেই বোধ হয় অসগোত্র বিবাহ-প্রথা প্রচলন করিয়া গিয়াছেন।

পাশ্চাত্য জগতের বিবাহ প্রথা যে সমাজ ও জাতির স্থায়িত্ব রক্ষার পরিপন্থী হইতেছে না, বিশেষজ্ঞেরা তাহা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। মানব জাতি যে ধ্বংসের মুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, তাহা দেখিয়া তাঁহারা ভীত হইয়াছেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আন্তজাতিক বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া বলিতে চান, দুর্ব্বল জাতির লোক সবল জাতির সহিত মিলিত হইলে, তাহার দোষ গুণগুলি দূরীভূত হইয়া যাইবে ও সবলের নূতন গুণগ্রামগুলি তাহাদের ভিতর বর্ত্তিবে। এই সিদ্ধান্তকে "melting pot theory" বলা হয়। এস্থলে দুর্ব্বল ও সবল অর্থে—কেবল দৈহিক বল বুঝিলে চলিবে না, মানসিক বলও বুঝিতে হইবে। এই মত যে অভ্রান্ত, তাহা কোন মতেই বলিতে পারা যায় না ; কারণ এইরূপ স্থলে উভয় জাতির দোষ-গুণ জাতকে বর্ত্তিয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। অনেক স্থলে জাতকে গুণগুলি সংক্রামিত না হইয়া উভয়ের দোষগুলি সংক্রামিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ের একটা সুমীমাংসা হইবার জন্য যে সকল নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ববিদ্ সুধীগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, দুর্ব্বল শাখার সহিত সবল শাখার কলম উৎপাদন করিলে, সবল শাখার যেমন ক্ষতি হইবে, তেমনি দুর্ব্বল শাখার লাভ হইবে (The mixture of poor stock with a good one does as much harm to the good stock as it does benefit to the poor). ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সবল শাখা দুর্ব্বল হইবে, দুর্ব্বল শাখায় একটু প্রাণের সাড়া দেখা দিবে। কিন্তু ঐ কলমের ফল

যে ভাল হইবে তাহার স্থিরতা কোথায়? উদ্ভিদ জগতে যাহা সত্য, মানব জগতেও ঠিক তাহাই সত্য। কয়েকজন জাতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, সমুদয় জাতিরই উন্নত হইবার শক্তি-বীজ তাহাদের ভিতর আছে; সময়, সুবিধা ও সৎশিক্ষার দ্বারা ঐ বীজ পুষ্ট হইলে, ভবিষ্যতে সুফল ফলিবে। জাতি-মিশ্রণে জাতির ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ হইবে। জাতি-ঘটিত সমস্ত সমস্যা, এমন কি নিগ্রো-সমস্যার সমাধানও এই জাতি-মিশ্রণ মতবাদের সাহায্যে সহজে করা যাইবে। সেদিন সুপ্রসিদ্ধ Franz Boas জাতি-মিশ্রণ ফলে আমেরিকার কত দূর উন্নতি বা অবনতি হইয়াছে, তাহা প্রমাণ-কল্পে যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, য়ুরোপীয় ও নিগ্রোদের রক্ত-মিশ্রণে যে মিশ্রজাতি 'মুলাত্তো' উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের নিগ্রোদের তুলনায় আকৃতিগত পার্থক্যও হইয়াছে, আবার মানসিক শক্তিতেও তাহারা য়ুরোপীয়দের সমকক্ষ না হইলেও তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর হীন নহে। নিগ্রো জাতির কথা ছাড়িয়া দিয়া ভারতের 'ফিরিঙ্গি'-দিগের কথা ভাবিয়া দেখুন। অবশ্য ফিরিঙ্গি শব্দে এখানে আমরা ইংরাজ য়ুরোপীয় অন্য কোন জাতির লোককে বুঝিব না। য়ুরোপীয় ও দেশীয় রক্ত-মিশ্রণে-জাত জাতিই বুঝিব। ইহাদের মধ্যে যাহারা ক্রমশঃ য়ুরোপীয় জাতির সহিত বিবাহ-সূত্রে মিলিত হইতেছে, তাহাদের বংশধরেরা দেখিতেও যেমন সুশ্রী হইতেছে, গুণের উৎকর্ষেও সেইরূপ য়ুরোপীয়দের অপেক্ষা হীন হইতেছে না। সুপণ্ডিত Boas ও এই কথাই বলিতে চান যে মিশ্রিত 'মুলাত্তো' জাতির সহিত যদি য়ুরোপীয়েরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন, তাহা হইলে য়ুরোপীয় রক্ত দূষিত হইবে না, বরং বর্ণ-বিদ্বেষ ভাবটা দূর হইয়া যাইবে। কংগ্রেসের উপস্থিত পণ্ডিত-মণ্ডলী কিন্তু এ কথার সহিত একমত হন নাই। তাঁহাদের মতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন জাতির মিলনফলে জাতিসঙ্কর ও বর্ণসঙ্কর হইয়া আমেরিকার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইতেছে না সত্য; কিন্তু ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় শিক্ষার বিস্তার আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যত হইয়াছে, জগতের কোথাও তত হয় নাই। এই শিক্ষার ফলে, এখানে অল্পব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ সুচারুরূপে করিতে পারা যায় বলিয়া (better economic conditions) জাতিগত ও বংশগত দোষ কতক পরিমাণে দূর হইয়া যায়। য়ুরোপ ও পুরাতন জগতে অবস্থাবশে কতকগুলি জাতি দুর্ব্বল (certain race stocks are poor because of poor environment in the old world). অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে এই জাতির লোকেরা সবল হইবে না।

এ সম্বন্ধে সভাপতি অধ্যাপক অসবর্ণ সাহেব বলিয়াছেন, আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা জাতির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেয় না। আমাদের এখন চেষ্টা করা উচিত যাহাতে আমাদের প্রজাতন্ত্র-মূলক অনুষ্ঠানগুলি স্থায়ী ভাবে থাকিতে পারে। আমরা এই গুলিতে সেই সকল জাতির লোককে প্রবেশ করিতে দিব না, যাহারা আমাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের অংশভাগী হইতে পারিবে না। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রজাতন্ত্রের মূল নীতি হইতেছে যে, সকল মানব একই রূপ ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে; এটাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। অন্য একটী মত রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, সকল মানবই আপনাকে ও অপরকে শাসন করিবার সমান শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে (all men are born with equal character and ability to govern themselves and others). ইহার সহিত প্রজাতন্ত্র-নীতির কোনরূপ সাদৃশ্যই নাই। এই দুইটী মত যে অভিন্ন নয়, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

অধ্যাপক অসবর্ণ আরও বলিয়াছেন, পাঁচ লক্ষ বৎসরের অভিব্যক্তিবাদের ফলে জগতে তিনটী প্রধান জাতির শাখায় ককেসিয়ান, মঙ্গোলীয়ান ও নিগ্রো শ্রেণীর সঙ্করজাতির (Negroid)—যে বিশেষত্বের ছাপ পড়িয়াছে, তাহা মুছিয়া ফেলা সোজা নয়। জীবাণু বীজ হইতেই বংশ-প্রভাব সংক্রামিত হয়। সময়ের ফলে যে বিশিষ্ট শ্রেণীর (type) জীব উৎপন্ন হয়, তাহাও জগৎ হইতে শীঘ্র মুছিয়া যায় না।

জাতির মিশ্রণ-ফলে যে নূতন জাতি উৎপন্ন হইবে, তাহাতে উভয় জাতির উৎকর্ষগুলিই যে দেখা যাইবে একথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না; অধিকাংশ স্থলে দোষগুলিই সংক্রামিত হইতে দেখা যায়।

এখনকার যুগকে 'ব্যক্তিত্বের যুগ' বলিলে অন্যায় হয় না।

সাহিত্যে শিল্পে ও কলায় সর্ব্বত্রই ব্যক্তিত্বের প্রভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। বংশ যখন লোপ পাইবেই, তখন ব্যক্ত তাহার সুখ ও সুবিধার দিকে কেন না যত্নবান হইবে? যৌথ পরিবারের (family) স্থলে স্বামী-স্ত্রী লইয়াই এখন সংসার। বহু সন্তান-সন্ততি এখন অনেকেই চান না। একটী সন্তান জন্মিলেই স্ত্রী-পুরুষ অস্বাভাবিক উপায়ে সন্তান উৎপাদন কার্য্য বন্ধ করিয়া দেন। একশত বৎসরের ভিতর New Englandএ বহু পুত্রকন্যা যুক্ত সংসারের স্থলে, এক-সন্তান-বিশিষ্ট সংসার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; এবং আশা করা যায় ইহার পরে বিবাহের ফলে আর সন্তান জন্মিবে না—বংশলোপ পাইবে। আমাদের এত সাধের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি যাঁহারা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, বংশ-ধরের অভাবে সেগুলিও লোপ পাইবে।

অধ্যাপক অসবর্ণ বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, জাতীয় বিশেষত্বের বিলোপ-সাধন একরূপ অসম্ভব। শিক্ষা ও সময় বশে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে পারে। The Medeterranean, the Alpine ও The Nordic ফ্রান্সের তিনটী বিশেষ জাতি। সমান পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে ১২০০০ বৎসর থাকিয়া ও ১০০০ বৎসর একরূপ শিক্ষা পাইয়া তিনটী জাতির গুণ-বিশেষের সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

বংশানুক্রম-প্রভাব সম্বন্ধে ইব্‌সেন্ ও হপ্টম্যানের অভিমত। পাশ্চাত্য জগতের দুই শক্তিশালী লেখক বংশানুক্রম-প্রভাব সম্বন্ধে দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। উত্তরাধিকার-সূত্রে মানব কি পাইতে পারে, পিতামাতার পাপে বা অপরাধে সন্তানের কি ভীষণ পরিণাম ঘটিতে পারে, ইব্‌সেন্ তাহা তাঁহার (Ghost) নাটকে বিবৃত করিয়াছেন। হপ্টম্যান্‌ও তাঁহার (Reconciliation) নাটকে ইব্‌সনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই গুরুতর বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছেন। Ghost নাটকে পিতার দুর্ব্বল মানসিক বিকৃত অবস্থা কি ভাবে পুত্রে বর্ত্তিয়াছে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। Reconciliation নাটকে পিতামাতার নৈতিক ও পারমার্থিক বিকৃতি কিরূপে সন্তানু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইব্‌সনের Oswald Alving তাহার পিতার নিকট হইতে নৈতিক অবনতি ও মস্তিষ্ক-বিকৃতি ও Resina তাহার পিতামাতার নিকট হইতে চরিত্রের শিথিলতা ও আত্মসুখ-পরায়ণতা উত্তরাধিকারী-সূত্রে যথাক্রমে পাইয়াছিল। হপ্টম্যানের Dr. Scholz পরিমিতাচারী ছিলেন না। রোগ ভোগ করিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল। অসমঞ্জস বিবাহে তিনি অসুখী ছিলেন। আর এ বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছিল। ক্রমে তাঁহার এরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে যেন সর্ব্বদাই নিগ্রহ করিবার মানসে ব্যস্ত। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলেও সময়ে-সময়ে এইরূপ অবস্থা হইতে দেখা যায়। এই নাটকে ডাক্তারের পুত্রকন্যাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বর্ণনা আছে। শুধু বর্ণনা করিয়াই লেখক ক্ষান্ত হইয়াছেন। এস্থলেও তিনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত কি, তাহা জানিবার উপায় নাই। এই ভাব-বিকারগ্রস্ত পিতার পুত্র Wilhelm ও Ida পরিণয়ে আবদ্ধ হইলে শুভ ফল হইবে কি না কিংবা Wilhelmএর মাতাপিতার সংসারের ন্যায় ভীতিপ্রদ সংসারের পুনরাবৃত্তি হইবে কি না, তাহার মীমাংসা হপ্টম্যান্ করিয়া দেন নাই। প্রেম ও সুস্থ সবল অন্তঃকরণ কি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিকারকে দূর করিতে পারে না? এ প্রশ্নের মীমাংসাও তিনি করেন নাই। ইব্‌সেন্ কিন্তু এ প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া বলিয়াছেন, বংশক্রম-প্রভাবের হস্ত হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইতে হইলে, কর্ম্ম করিয়া জীবনের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে ও মনোবৃত্তিগুলিকে সংযত করিতে হইবে। হপ্টম্যানের নাটকগুলির ৩য় খণ্ডের ভূমিকা-লেখক ও সম্পাদক Ludwing Lewisohn সত্যই বলিয়াছেন, "The problem is a constant one in human life. Art and philosophy, no less than science must reckon with it in their interpretative synthesis of man and his world." মানবজীবনে বংশের প্রভাব সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞান ও দর্শন দ্বারা এ প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে। ইব্‌সনের নাটকের সমালোচনা করিতে গিয়া ফ্রান্সিস লর্ড মহোদয় বলিয়াছেন, শরীর ও মনের পাপ দূর করিতে কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুরই ক্ষমতা নাই। পাশ্চাত্য মনীষীরা বংশানুক্রম-প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া কর্ম্মফল পর্য্যন্ত আসিয়াছেন; আর একটু অগ্রসর হইলে আশা করা যায় হিন্দুর জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফল স্বীকার করিয়া এবিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন।

দেনা-পাওনা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(১৩)

জমিদারের নিভৃত নিবাস সাজাইতে গুছাইতে দিন চারেক গিয়াছে; জনশ্রুতি এইরূপ যে হুজুর এবার একাদিক্রমে মাস দুই চণ্ডীগড়ে বিশ্রাম করিয়া যাইবেন। আজ সকাল বেলাতেই উত্তরদিকের বড় হলটায় মজ্‌লিস বসিয়াছিল। ঘড় জোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপরে শাদা জাজিম বিছানো, এবং মাঝে মাঝে দুই-চারিটা মোটা তাকিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। গৃহের একধারে আজ গ্রামের মাতব্বরেরা বার দিয়া বসিয়াছিলেন,—জমিদারের কাছে তাঁহাদের মস্ত নালিশ ছিল। রায় মহাশয় ছিলেন, শিরোমণি ছিলেন, ঘোষজা ছিলেন, বোসজা ছিলেন, এমন কি তারাদাস ঠাকুরও ইঁহাদের আড়ালে মুখ নীচু করিয়া ও কান খাড়া রাখিয়া সতর্ক হইয়া বসিয়া ছিলেন। আরও যাঁহারা যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের কেহই অবহেলার বস্তু নহেন, তবে সমুদয় নাম ধাম ও বিবরণ বিদিত না হইলেও পাঠকের জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিবে না বিবেচনা করিয়াই তাহাতে নিরস্ত হইলাম। যাই হোক, ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায় অভিযোগের ভূমিকাটা একপ্রকার শেষ হইয়া গেলেও আসল কথাটা উঠি-উঠি করিয়াও থামিয়া যাইতেছিল, —ঠিক যেন মুখে আসিয়াও কাহারও বাহির হইতে চাহিতেছিলনা। জীবানন্দ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। সকলের সঙ্গে থাকিয়াও একটুখানি দূরে একটা তাকিয়ার উপর দুই কনুয়ের ভর দিয়া বসিয়া তিনি মন দিয়াই যেন সমস্ত শুনিতেছিলেন। মুখ প্রফুল্ল। একেবারে স্বাভাবিক না হইলেও সম্পূর্ণ কৃত্রিম বলিয়াও সন্দেহ হয় না। খুব সম্ভব মদের ফেনা তখন তাঁহার মগজের সমস্ত অলি-গলিগুলা দখল করিয়া বসে নাই। সুমুখের বড় বড় খোলা দরজা দিয়া বারুইয়ের শুক্‌না বালু ও ভিজা মাটির গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল, এবং পাশের ঘরটাতেই বোধ করি রান্না হইতেছিল বলিয়া তাহারই রুদ্ধ দ্বারের কোন্ একটা ফাঁক দিয়া একজাতীয় শব্দ ও গন্ধ মাঝে মাঝে এই বাতাসেই ভর দিয়া লোকের কানে ও নাকে আসিয়া পৌঁছিতেছিল, তাহা ব্যক্তিবিশেষের কাছে উপাদেয় ও রুচিকর হইলেও শিরোমণি মহাশয় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি বার দুই কাসিয়া ও উত্তরীয়-প্রান্তে নাকের ডগাটা মার্জ্জনা করিয়া উঠিয়া গিয়া আর একধারে বসিতেই জীবানন্দ সহাস্যে কহিলেন, শিরোমণি মশায়ের কি অর্দ্ধভোজন হয়ে গেল না কি?

অনেকেই হাসিয়া উঠিল, শিরোমণির নাকের ডগার মত মুখখানাও রাঙা হইয়া উঠিল। জীবানন্দ তখন হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই ঠাকুর, জাত যাবেনা। ওটা আপনাদের মা চণ্ডীরই মহাপ্রসাদ। তবে, যিনি রাঁধচেন তাঁর গোত্রটা ঠিক জানিনে,—হয়ত এক না হতেও পারে।

শিরোমণি আপনাকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া কহিলেন, তা হোক্ তা হোক্। ব্রাহ্মণ পাচক,—দরিদ্র হলেও গোত্র একটা আছে বই কি।

জীবানন্দ হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল, জানিনে ঠাকুর, ও সব বালাই ওর কিছু আছে কিনা। কিন্তু হাতা-বেড়ির সঙ্গে মিলে সোণার চুড়ির আওয়াজটাও আমার বড় মিঠে লাগে। আর সেই হাতে পরিবেশন করলে,—তা নিমন্ত্রণ করলে ত আর—এই বলিয়া তিনি পুনশ্চ প্রবল হাসির শব্দে ঘর ভরিয়া দিলেন। শিরোমণি অধোবদন হইলেন, এবং ভিতরের কদর্য্য ব্যাপার যদিচ সকলেই জানিতেন, তথাপি এই অভাবনীয় প্রকাশ্য নির্লজ্জতায় উপস্থিত কেহই লোকটার মুখের প্রতি সহসা চাহিতে পর্য্যন্ত পারিলনা।

হাসি থামিলে তিনি কহিলেন, সদালাপ ত হল। এবং দয়া করে মাঝে মাঝে এলে এমন আরও ঢের হতে পারবে, কিন্তু আপনাদের নালিশটা কি শুনি?

কিন্তু উত্তরে কাহারও মুখে কথা ফুটিলনা, সকলে যেমন নীরবে বসিয়াছিল, তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

জীবানন্দ কহিলেন, বল্‌তে কি আপনাদের লজ্জা বোধ হচ্চে?

এবার রায় মহাশয় মুখ তুলিয়া চাহিলেন ; বলিলেন, নন্দী মশায় ত সমস্ত জানেন, তিনি কি হুজুরের গোচর করেন নি ?

জীবানন্দ কহিলেন, হয়ত করেচেন কিন্তু আমার মনে নেই। তা ছাড়া তার গোচর করার প্রতি খুব বেশী আস্থা না রেখে ব্যাপারটা আপনারাই বলুন। দ্বিরুক্তি দোষ ঘটতে পারে, কিন্তু কি আর করা যাবে। জমিদারের গোমস্তা— একটু মোকাবিলে হয়ে থাকা ভাল। ঠিক না ?

প্রভুর মুখে এককড়ির এই সুখ্যাতিটুকুতে রায় মহাশয় মনে মনে আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, হুজুর সর্ব্বজ্ঞ। ভৃত্যের সম্বন্ধে যথা ইচ্ছা আদেশ করতে পারেন, কিন্তু, আমাদের অভিযোগ—

কি অভিযোগ ?

জনার্দ্দন রায় কহিলেন, আমরা গ্রামস্থ যোলআনা ইতর-ভদ্র একত্র হয়ে—

জীবানন্দ একটু হাসিয়া বলিলেন, তা দেখতে পাচ্ছি। ওইটি কি সেই ভৈরবীর বাপ তারাদাস ঠাকুর নয় ? এই বলিয়া তিনি তাহার প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিলেন। তারাদাস সাড়া দিল না, জাজিমটার অংশ-বিশেষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। এবং রায় মহাশয়ের আনত মুখের পরেও একটা ফ্যাকাসে ছায়া পড়িল। কিন্তু মুখ রক্ষা করিলেন, শিরোমণি ঠাকুর। তিনি সবিনয়ে কহিলেন, রাজার কাছে প্রজা সন্তানতুল্য, তা সে দোষ করলেও সন্তান, না করলেও সন্তান। আর কথাটা একরকম ওরই। ওর কন্যা ষোড়শীর সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয় স্থির করেছি, তাকে আর মহাদেবীর ভৈরবী রাখা যেতে পারে না। আমাদের নিবেদন, হুজুর তাকে সেবায়েতের কাজ থেকে অব্যাহতি দেবার আদেশ করুন।

জমিদার চকিত হইয়া উঠিলেন ; কহিলেন, কেন ? তার অপরাধ ?

দুই তিন জন প্রায় সমস্বরে জবাব দিয়া ফেলিল, অপরাধ অতিশয় গুরুতর।

জীবানন্দ একে একে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া অবশেষে জনার্দ্দনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তিনি হঠাৎ এমন কি ভয়ানক দোষ করেছেন রায়মশায়, যার জন্যে তাঁকে তাড়ানো আবশ্যক ?

জনার্দ্দন মুখ তুলিয়া শিরোমণিকে চোখের ইঙ্গিত করিতেই জীবানন্দ বাধা দিয়া কহিলেন, না না, উনি অনেক পরিশ্রম করেছেন, বুড়োমানুষকে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই, ব্যাপারটা আপনিই ব্যক্ত করুন।

রায় মহাশয়ের চোখে ও মুখে দ্বিধা ও অত্যন্ত সঙ্কোচ প্রকাশ পাইল ; মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, ব্রাহ্মণ-কন্যা,—এ আদেশ আমাকে করবেন না।

জীবানন্দ হাসিমুখে কহিলেন, দেব-দ্বিজে আপনার অচলা ভক্তির কথা এদিকে কারও অবিদিত নেই। কিন্তু এতগুলি ইতর-ভদ্রকে নিয়ে আপনি নিজে যখন উপস্থিত হয়েছেন, তখন ব্যাপার যে অতিশয় গুরুতর তা আমার বিশ্বাস হয়েছে। কিন্তু সেটা আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

কিন্তু জনার্দ্দন রায় অত সহজে ভুল করিবার লোক নহেন ; প্রত্যুত্তরে তিনি শিরোমণির প্রতি একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, হুজুর যখন নিজে শুনতে চাচ্চেন তখন আর ভয় কি ঠাকুর ? নির্ভয়ে জানিয়ে দিন্ না।

খোঁচা খাইয়া বৃদ্ধ শিরোমণি হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, সত্যি কথায় ভয় কিসের জনার্দ্দন ? তারাদাসের মেয়েকে আর আমরা কেউ ভৈরবী রাখ্‌বনা হুজুর !—তার স্বভাব-চরিত্র ভারি মন্দ হয়ে গেছে,—এই আপনাকে আমরা জানিয়ে দিচ্চি।

জীবানন্দের পরিহাস-দীপ্ত প্রফুল্ল মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর ও কঠিন হইয়া উঠিল ; একমুহূর্ত্ত নিঃশব্দে থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন, তাঁর স্বভাব-চরিত্র মন্দ হবার খবর আপনারা নিশ্চয় জেনেছেন ?

তৎক্ষণাৎ অনেকেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল যে ইহাতে কাহারও কোন সংশয় নাই—এ কথা গ্রামশুদ্ধ সবাই জানিয়াছে। জনার্দ্দন মুখে কিছু না কহিলেও চুপ করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন। জীবানন্দ আবার ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাঁহারই মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তাই সুবিচারের আশায় বেছে একেবারে ভীষ্মদেবের কাছে এসে পড়েছেন রায় মশায় ? বিশেষ সুবিধে হবে বলে ভরসা হয়না।

এ কথার ইঙ্গিত সকলে বুঝিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু জনার্দ্দন এবং শিরোমণি বুঝিলেন। জনার্দ্দন মৌন হইয়া রহিলেন, কিন্তু শিরোমণি জবাব দিলেন; বলিলেন, আপনি দেশের রাজা,—সুবিচার বলুন অবিচার বলুন আপনাকেই করতে হবে। আমাদেরও তাই মাথা পেতে নিতে হবে। সমস্ত চণ্ডীগড় ত আপনারই।

কথা শুনিয়া জীবানন্দের মুখের ভাব একটু সহজ হইয়া আসিল; মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, দেখুন শিরোমণি মশায়, অতি-বিনয়ে আপনাদেরও খুব হেঁট হয়ে কাজ নেই, অতি-গৌরবে আমাকেও আকাশে তোলবার আবশ্যক নেই। আমি শুধু জান্‌তে চাই এ অভিযোগ কি সত্য?

আগ্রহে রায় মহাশয়ের মুখ আশান্বিত হইয়া উঠিল, শিরোমণি ত একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, অভিযোগ? সত্য কি না!—আচ্ছা, আমরা না হয় পর, কিন্তু, তারাদাস! তুমিই বল ত। রাজদ্বার! যথাধর্ম্ম বোলো—

তারাদাস একবার পাংশু, একবার রাঙা হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু উপস্থিত সকলের একাগ্র দৃষ্টি খোঁচা দিয়া যেন তাহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। সে একবার ঢোক গিলিয়া, একবার কণ্ঠের জড়িমা সাফ করিয়া অবশেষে মরিয়ার মত বলিয়া উঠিল, হুজুর—

জীবানন্দ চক্ষের নিমিষে হাত তুলিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিলেন, থাক্। ওর মুখ থেকে ওর নিজের মেয়ের কাহিনী আমি যথাধর্ম্ম বল্‌লেও শুন্‌বনা। বরঞ্চ আপনাদের কেউ পারেন ত যথাধর্ম্ম বলুন।

সভা পুনশ্চ নীরব হইল, কিন্তু এবার সেই নীরবতার মধ্যে হইতে অস্ফুট উদ্যম পরিস্ফুট হইবার লক্ষণ দেখা দিল। পাশের দরজা খুলিয়া বেহারা টম্‌ব্লার ভরিয়া হুইস্কি ও সোডা প্রভুর হাতে আনিয়া দিল; তিনি এক নিঃশ্বাসে তাহা নিঃশেষে পান করিয়া ভৃত্যের হাতে ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, আঃ—বাঁচলাম। একটু হাসিয়া কহিলেন, সকাল বেলাতেই আপনাদের বাক্য-সুধা পান করে তেষ্টায় বুক পর্য্যন্ত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চুপ্-চাপ্ যে! কি হল আপনাদের যথাধর্ম্মের?

শিরোমণি হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এই যে বলি হুজুর। আমি যথাধর্ম্মই বল্‌ব।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সম্ভব বটে। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ ব্রাহ্মণ, কিন্তু, একজন স্ত্রীলোকের নষ্ট-চরিত্রের কাহিনী তার অসাক্ষাতে বলার মধ্যে আপনার যথাধর্ম্মের যথাটা যদি বা থাকে, ধর্ম্মটা থাক্‌বে কি? আমার নিজের বিশেষ কোন আপত্তি নেই,—ধর্ম্মাধর্ম্মের বালাই আমার বহুদিন ঘুচে গেছে,—তবু আমি বলি ওতে কাজ নেই। বরঞ্চ আমি যা জিজ্ঞাসা করি তার জবাব দিন। বর্ত্তমান ভৈরবীকে আপনারা তাড়াতে চান,—এই না?

সবাই একযোগে মাথা নাড়িয়া জানাইল ঠিক তাই।

এঁকে নিয়ে আর সুবিধে হচ্চেনা?

জনার্দ্দন প্রতিবাদের ভঙ্গীতে মাথা তুলিয়া কহিলেন, সুবিধে অসুবিধে কি হুজুর, গ্রামের ভালর জন্যেই প্রয়োজন।

জীবানন্দ হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, অর্থাৎ 'গ্রামের ভালমন্দের আলোচনা না তুলেও এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আপনার নিজের ভালমন্দ কিছু একটা আছেই। তাড়াবার আমার ক্ষমতা আছে কি না জানিনে, কিন্তু আপত্তি বিশেষ নেই। কিন্তু আর কোন একটা অজুহাত তৈরি করা যায় না? দেখুন না চেষ্টা করে। বরঞ্চ, আমাদের এককড়িকেও না হয় সঙ্গে নিন, এ বিষয়ে তার বেশ একটু সুনাম আছে।

কথা শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। হুজুর একটু থামিয়া কহিলেন, এঁদের সতী-পনার কাহিনী অত্যন্ত প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ, সুতরাং তাকে আর নাড়া-চাড়া করে কাজ নেই। ভৈরবী থাক্‌লেই ভৈরব এসে জোটে এবং ভৈরবদেরও ভৈরবী নইলে চলেনা, এ অতি সনাতন প্রথা,—সহজে টলানো যাবেনা। দেশশুদ্ধ ভক্তের দল চটে যাবে, হয়ত বা দেবী নিজেও খুসি হবেন না,—একটা হাঙ্গামা বেধে যাবে। মাতঙ্গী ভৈরবীর গোটা পাঁচেক ভৈরব ছিল, এবং তাঁর পূর্ব্বে যিনি ছিলেন তাঁর নাকি হাতে গোণা যেতোনা। কি বলেন শিরোমণি মশাই, আপনি ত এ অঞ্চলের প্রাচীন ব্যক্তি, জানেন ত সব? এই বলিয়া তিনি শিরোমণি অপেক্ষা রায় মহাশয়ের প্রতিই বিশেষ করিয়া কটাক্ষপাত করিলেন। এ প্রশ্নের কেহ উত্তর দিবে কি, সকলে যেন বুদ্ধি-বিহ্বল হইয়া গেল। জমিদারের কণ্ঠস্বর সোজা না বাঁকা, বক্তব্য সত্য না মিথ্যা, তাৎপর্য্য বিদ্রূপ না পরিহাস, তামাসা না তিরস্কার, কেহ ঠাহর করিতেই পারিল না।

সম্মুখের বারান্দা ঘুরিয়া একজন ভদ্রবেশধারী সৌখিন

যুবক প্রবেশ করিল। হাতে তাঁর ইংরাজি বাঙলা কয়েকখানা সংবাদপত্র এবং কতকগুলা খোলা চিঠিপত্র। জীবানন্দ দেখিয়া কহিলেন, কিহে প্রফুল্ল, এখানেও ডাকঘর আছে না কি? আঃ—কবে এইগুলো সব উঠে যাবে।

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে ঠিক। গেলে আপনার সুবিধে হোতো। কিন্তু সে যখন হয়নি তখন এগুলো দেখবার কি এখন সময় হবে?

জীবানন্দ কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া কহিলেন, না, এখনও হবেনা, অন্য সময়েও হবেনা। কিন্তু অনেকটা বাইরে থেকেই উপলব্ধি হচ্চে। ওই যে হীরালাল-মোহনলালের দোকানের ছাপ, কি পত্র? উকিলের না একেবারে আদালতের হে? ও খামখানা ত দেখ্‌চি সলোমন সাহেবের। বাবা, বিলিতি সুধার গন্ধ যেন কাগজ ফুঁড়ে বার হচ্চে। কি বলেন সাহেব, ডিক্রীজারি করবেন, না এই রাজবপুখানি নিয়ে টানা-হেঁচড়া করবেন—জানাচ্চেন? আঃ—সেকালের ব্রহ্মণ্য-তেজ কিছু বাকি থাক্‌তো, তো এই ইউদি ব্যাটাকে একেবারে ভস্ম করে দিতাম। মদের দেনা আর শুধ্‌তে হোতো না।

প্রফুল্ল ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, কি বল্‌চেন দাদা? থাক্ থাক্, আর এক সময়ে আলোচনা করা যাবে। এই বলিয়া সে ফিরিতে উদ্যত হইতেই জীবানন্দ সহাস্যে কহিলেন, আরে লজ্জা কি ভায়া, এঁরা সব আপনার লোক, জ্ঞাত-গোষ্ঠী, এমন কি মণি-মাণিক্যের এপিঠ ওপিঠ বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। তা'ছাড়া তোমার দাদাটি যে কস্তুরি-মৃগ; সুগন্ধ আর কত কাল চেপে রাখ্‌বে ভাই? টাকা! টাকা! এর নালিশ আর তার নালিশ, অমুকের ডিক্রী আর তমুকের কিস্তি-খেলাপ,—ওহে, ও তারাদাস, সে দিনটা নেহাৎ ফস্কে গিয়েছিল, কিন্তু হতাশ হয়োনা ঠাকুর, যা' করে ভুলেচি, তাতে মনস্কামনা পূর্ণ হতে তোমার খুব বেশি বিলম্ব হবে বলে আশঙ্কা হয় না। প্রফুল্ল, রাগ কোরোনা ভায়া, আপনার বলতে আর কাউকে বড় বাকি রাখিনি, কিন্তু এই চল্লিশটা বছরের অভ্যাস ছাড়তে পারবো বলেও ভরসা নেই, তার চেয়ে বরঞ্চ, নোট-টোট জাল করতে পারে এমন যদি কাউকে যোগাড় করে আন্‌তে পারতে হে—

প্রফুল্ল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াও হাসিয়া ফেলিল, কহিল দেখুন, সবাই আপনার কথা বুঝবেন না, সত্য ভেবে যদি কেউ—

জীবানন্দ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, যদি কেউ সন্ধান করে আনেন? তা'হলে ত বেঁচে যাই প্রফুল্ল। রায় মশায়, আপনি ত শুনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনার জানাশুনা কি এমন কেউ—

রায় মহাশয় ম্লান মুখে অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বেলা হয়ে গেল, যদি অনুমতি করেন ত এখন আমরা আসি।

জীবানন্দ ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, বসুন, বসুন, নইলে প্রফুল্লের জাঁক বেড়ে যাবে। তাছাড়া ভৈরবীর কথাটাও শেষ হয়ে যাক্। কিন্তু, আমি যাও বল্‌লেই কি সে যাবে?

রায় মহাশয় না বসিয়াই সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, সে ভার আমাদের।

কিন্তু আর কাউকে ত বাহাল করা চাই। ও ত খালি থাক্‌তে পারে না।

এবার অনেকেই জবাব দিল, সে ভারও আমাদের।

জীবানন্দ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, যাক্ বাঁচা গেল, এবার সে যাবেই। এতগুলো মানুষের ভার একা ভৈরবী কেন, স্বয়ং মা চণ্ডীও সাম্‌লাতে পারবেন না, তা বোঝা গেল। আপনাদের লাভ লোকসান আপনারাই জানেন, কিন্তু আমার এমন অবস্থা যে টাকা পেলে আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। নতুন বন্দোবস্তে আমার কিছু পাওয়া চাই। ভাল কথা, কেউ দেখ্‌ত রে, এককড়ি আছে না গেছে? কিন্তু গলাটা যে এদিকে শুকিয়ে একেবারে মরুভূমি হয়ে গেল।

বেহারা আসিয়া প্রভুর ব্যাগ্র ব্যাকুল শ্রীহস্তে পূর্ণ পাত্র দিয়া খবর দিল, সে সদরে বসিয়া খাতা লিখিতেছে। হুজুরের আহ্বানে ক্ষণেক পরে এককড়ি আসিয়া যখন সসম্ভ্রমে এক পাশে দাঁড়াইল, জীবানন্দ শুষ্ক কণ্ঠ আর্দ্র করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে দিন ভৈরবীকে যে কাছারিতে তলব করেছিলাম, কেউ তাঁকে খবর দিয়েছিল?

এককড়ি কহিল, আমি নিজে গিয়েছিলাম।

তিনি এসেছিলেন?

আজ্ঞে না।

না কেন?

এককড়ি অধোমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। জীবানন্দ

উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, তিনি কখন আসবেন জানিয়ে-ছিলেন?

এককড়ি তেমনি অধোমুখে থাকিয়াই অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, এত লোকের সামনে আমি সে কথা হুজুরে পেশ করতে পারব না।

জীবানন্দ হাতের শূন্য গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া হঠাৎ কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এককড়ি, তোমার গোমস্তাগিরি কায়দাটা একটু ছাড়। তিনি আস্‌বেন, না, না?

না।

কেন?

এবার প্রত্যুত্তরে যদিচ এককড়ি তাহার জমিদারি কায়দাটা সম্পূর্ণ ছাড়িল না, কিন্তু সবাই শুনিতে পায় এম্‌নি সুস্পষ্ট করিয়াই কহিল, তিনি আস্‌তে পারবেন না, এ কথা যত লোক দাঁড়িয়ে ছিল সবাই শুনেচে। বলেছিলেন, তোমার হুজুরকে বোলো এককড়ি, তাঁর বিচার করবার মত বিদ্যে-বুদ্ধি থাকে ত নিজের প্রজাদের করুন গে। আমার বিচার কর্‌বার জন্যে রাজার আদালত খোলা আছে।

সহসা মনে হইল জমিদারের এতক্ষণের এত রহস্য এত সরল ঔদার্য্য, হাস্যোজ্জ্বল মুখ ও তরল কণ্ঠস্বর চক্ষের পলকে নিবিয়া যেন অন্ধকার হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে শুধু আস্তে আস্তে কহিলেন, হুঁ। আচ্ছা তুমি যাও। প্রফুল্ল, সেই যে কি একটা চিনির কোম্পানি হাজার বিঘে জমি চেয়েছিল, তাদের কোন জবাব দিয়েছিলে?

আজ্ঞে, না।

তা'হলে লিখে দাও যে জমি তারা পাবে। দেরি কোরোনা।

না, দিচ্চি লিখে, এই বলিয়া সে এককড়িকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিল। আবার কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত গৃহটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। শিরোমণি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আশী-র্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, আমরা আজ তা'হলে আসি?

আসুন।

রায় মহাশয় হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, অনুমতি হয়ত আর একদিন চরণ দর্শন করতে আস্‌ব।

বেশ, আস্‌বেন।

সকলেই ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। বাহিরে আসিয়া তাঁহারা জমিদারের হাঁক শুনিতে পাইলেন, বেয়ারা—

অনেকখানি পথ কেহই কাহারো সহিত বাক্যালাপ করিল না। অবশেষে শিরোমণি আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া রায় মহাশয়কে একপাশে একটু টানিয়া লইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, জনার্দ্দন, জমিদারকে তোমার কিরূপ মনে হল ভায়া?

জনার্দ্দন সংক্ষেপে বলিলেন, মনে ত অনেক রকমই হল।

মহা পাপিষ্ঠ,—লজ্জা সঙ্কোচ আদৌ নেই।

না।

কিন্তু দিব্যি সরল। মাতাল কি না! দেখলে, দেনার দায়ে চুল পর্য্যন্ত বাঁধা, তাও বলে ফেল্‌লে।

জনার্দ্দন বলিলেন, হুঁ।

শিরোমণি বলিলেন, কিন্তু কিছুই থাক্‌বেনা, সব ছারখার হয়ে যাবে, তুমি দেখে নিয়ো।

জনার্দ্দন কহিলেন, খুব সম্ভব।

হয়ত বেশি দিন বাঁচবেও না।

হতেও পারে।

কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিয়া শিরোমণি পুনশ্চ বলিলেন, যা ভাবা গিয়েছিল, বোধ হয় ঠিক তা' নয়,—নেহাৎ হাবা-বোকা বলে মনে হয়না। কি বল?

জনার্দ্দন শুধু জবাব দিলেন, না।

কিন্তু বড় দুর্ম্মুখ। মানীর মান-মর্য্যাদার জ্ঞান নেই।

জনার্দ্দন চুপ করিয়া রহিলেন। উত্তর না পাইয়াও শিরোমণি কহিলেন, কিন্তু দেখেচ ভায়া কথার ভঙ্গী,—অর্দ্ধেক মানে বোঝাই যায়না। সত্য বল্‌চে, না আমাদের বাঁদর নাচাচ্চে ঠাওর করাই শক্ত। জানে সব, কি বল?

রায় মহাশয় তথাপি কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না, তেমনি নীরবে পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বাটীর কাছা-কাছি আসিয়া শিরোমণি আর কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলেন না, আস্তে-আস্তে বলিলেন, ভায়াকে বড় বিমর্ষ দেখাচ্চে,—বিশেষ সুবিধে হবেনা বলেই যেন ভয় হচ্চে, না?

রায় মহাশয় যেন অনিচ্ছা সত্বেও একটু দাঁড়াইয়া কহিলেন, মায়ের অভিরুচি।

শিরোমণি ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তার আর কথা কি! কিন্তু ব্যাপারটা যেন খিচুড়ি পাকিয়ে গেল,—না গেল একে ধরা, না গেল তাকে মারা। তোমার কি ভায়া, পয়সার

জোর আছে,—কিন্তু বাঘের গর্ত্তের মুখে ফাঁদ পাততে গিয়ে না শেষে আমি মারা পড়ি।

জনার্দ্দন একটু রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন, আপনি কি ভয় পেয়ে এলেন না কি ?

শিরোমণি বলিলেন, না না ভয় নয়, ভয় নয়,—কিন্তু তুমিও যে খুব ভরসা পেয়ে এলে, তা ত তোমার মুখ দেখেও অনুভব হচ্চেনা। হুজুরটি ত কানকাটা সেপাই,—কথাও যেমন হেঁয়ালি, কাজও তেমনি অদ্ভুত। ও যে ধরে গলাটিপে মদ খাইয়ে দেয়নি এই আশ্চর্য্য। এককড়ির মুখে ঠাকরুণটির হুম্‌কিও ত শুন্‌লে ? আমিই মেলা কথা কয়ে এসেচি—ভাল করিনি। কি জানি, এককোড়ে ব্যাটা ভেতরে ভেতরে সব বলে দেয় না কি। দুয়ের মাঝে পড়ে শেষকালে না খেড়াজালে ধরা পড়ি !

জনার্দ্দন উল্লাস কণ্ঠে কহিলেন, সকলই চণ্ডীর ইচ্ছা। বেলা হয়ে গেল,—ও-বেলায় একবার আস্‌বেন।

তা' আস্‌বো।

গলির মোড় ফিরিতে বাঁদিকে গাছের ফাঁকে মন্দিরের অগ্রভাগ দেখা দিতেই বৃদ্ধ শিরোমণি হাত তুলিয়া যুক্তকরে প্রণাম করিলেন, কানে এবং নাকে হাত দিলেন, কিন্তু অস্ফুটে কি প্রার্থনা যে করিলেন তাহা শোনা গেলনা। তার পর ধীরে ধীরে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শোক-সংবাদ

৺জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

বাঙ্গালার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি, চট্টগ্রামের উজ্জ্বল রত্ন, আমাদের পরম বন্ধু জীবেন্দ্রকুমার আর ইহজগতে নাই ; অকালে তিনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। বাঙ্গালা মাসিকপত্র যাঁহারা পড়িয়া থাকেন, তাঁহারাই জীবেন্দ্রকুমারের মধুর, পবিত্র ও প্রাণস্পর্শী কবিতার সহিত পরিচিত। জীবেন্দ্রকুমারের পদদ্বয় আংশিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিল ; কিন্তু এই অবস্থাতেই তিনি বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ সাহিত্যিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য, সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া, সুদূর স্থানেও গমন করিতেন ; এবং যখনই যেখানে যাইতেন, সেই স্থানের সকলের সহিত পরম সৌহৃদ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইতেন। এমন বিনয়ী, এমন স্নেহশীল, এমন পবিত্র-স্বভাব এবং এমন বঙ্গজননীর একনিষ্ঠ সেবক ও সাধকের অকালে পরলোক-গমনে আমরা বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত বিধবার হৃদয়ে শান্তি-ধারা বর্ষণ করুন, এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

৺চারুচন্দ্র মিত্র

স্বর্গীয় নাট্যরথী দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পরলোক-গমনের সংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম। তিনি ডাকবিভাগে বহুদিন কার্য্য করিয়া, কিছু দিন হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের সমস্ত সাহিত্যিক অনুষ্ঠানেই তাঁহার যোগ ছিল। দীনধামে প্রতি বৎসর যে সাহিত্যিক সম্মিলন হইত, উপযুক্ত অনুজ-গণের সাহায্যে চারুবাবু তাহার সাফল্যের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিতেন। তিনি যদিও কিছু লিখিয়া যান নাই, কিন্তু তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহার অনুজগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় এখনও নিযুক্ত আছেন। তাঁহার ভগিনীপতি প্রসিদ্ধ দার্শনিক পরলোকগত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় তাঁহারই আগ্রহে গীতার অভিনব সংস্করণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। আমরা চারুবাবুর আত্মীয়গণের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৺রাখালদাস মুখোপাধ্যায়

যাঁহারা আমাদের 'ভারতবর্ষে'র পাঠক, তাঁহারা বৃদ্ধ কবি রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের নাম নিশ্চয়ই জানেন। তিনি সুদীর্ঘকাল কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিতে চাহেন নাই। আমাদেরই অত্যধিক আগ্রহে 'ভারতবর্ষে' দুই-একটি কবিতা দিতেন। তাঁহার 'জামাতা দশমগ্রহ', 'মরিতেছে তারা, যারা চিরকাল মরে' প্রভৃতি কবিতার প্রশংসা আমরা এখনও শুনিতে পাই। তিনি এই শেষ বয়সে আমাদের প্ররোচনায় 'বাসি ফুলহার' নামে একখানি কবিতা-পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন। তিনি সেকেলে ধরণে অতি সহজ, সরল, অথচ মনোজ্ঞ ভাষায় কবিতা লিখিতেন। তাঁহার পরলোক-গমনে আমরা বড়ই শোক পাইয়াছি।

শিক্ষার কথা

[শ্রীহরিহর শেঠ]

কিছুকাল যাবৎ আমাদের ছেলেদের শিক্ষার কথা লইয়া যে একটা আলোচনা, অসন্তুষ্টি দেশের চিন্তাশীল ও ভাবুকদের মধ্যে ফল্গুর মত বহিতেছিল, তাহাই আজ আন্দোলনের আকারে কতকটা বিস্তৃত হইয়া, ফল স্বরূপ কলিকাতায় ও অন্যান্য কোন-কোন স্থানে সংস্থাকারে নবভাবের শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা আনিয়াছে। এই নবভাব সর্ব্বত্র ঠিক এক কি না জানি না; তবে যেরূপ আকস্মিক ভাবে কাজটি আরম্ভ হইয়া এখন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, ও হইতেছে, তাহাতে এক হওয়া যে সম্ভব নয়, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। অবশ্য একই যে হইতে হইবে এমন কথাও নাই। আমাদের অবস্থার কথা মনে করিলে, প্রথমটা এরূপ কতকটা এলোমেলো ভাবে আরম্ভ করিবার কারণও যথেষ্ট আছে বিবেচনা হয়। একটি কথা বলিয়া রাখি,—এখানে আমাদের বলিতে আমি বাঙ্গলার কথা এবং শিক্ষা বলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল-কলেজের বিদ্যাশিক্ষার কথাই বলিতেছি।

কোন একটা কাজ করিতে হইলেই তার মূলে কোন উদ্দেশ্য থাকে। এক কথায়, উদ্দেশ্য প্রথম, কাজ পরে। শিক্ষারও কোন উদ্দেশ্য আছে; আর তাহার উপর দেশের বহু শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, এ কথায় তর্ক বা সংশয় নাই। সেই শিক্ষা শাসক-সম্প্রদায় নিজের হাতে কাড়িয়া না রাখিলেও, যে কারণেই হোক বলিতে গেলে এতাবৎ তাঁহারাই তাহা দিয়া আসিতেছেন বা তাঁহাদিগকেই দিতে হইতেছে। দেশের লোকও সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া সানন্দ চিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন; নির্ব্বিবাদে, দ্বিধাশূন্য মনে তাহাই অমৃতের মত গলাধঃকরণ করিয়া আসিতেছেন; কোন দিন সে শিক্ষার উদ্দেশ্য বা ফলের কথা ভাবিবার অবসর হয় নাই। আজ হঠাৎ বা ক্রমে-ক্রমে অবস্থা যদি অন্যরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে সে বিষয়ে চিন্তারও প্রয়োজন হইয়াছে। বর্ত্তমানে এমনও শুনা যায় যে, যাকে লেখাপড়া শিক্ষা বলে, ছেলেদের সে শিক্ষার সার্থকতা কিছু আছে কি না, তাহাও ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিবার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্যের কথায় এক শ্রেণীর কাছে কথা উঠিতে পারে,—আমাদের নিজের হাতে বা পূর্ব্বে আমাদের শিক্ষার কি উদ্দেশ্য ছিল। শাস্ত্রে বলে, বিদ্যা বিনয় দান করে; বিনয় মানুষকে আর কতকগুলি অমূল্য গুণে শোভিত করিবার মূল। সুতরাং সেই সকল গুণাবলী অর্জ্জনের জন্য বিদ্যাই অস্ত্র। ইহা হইতে পূর্ব্বকালের বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য অন্ততঃ কতকটা বুঝিতে পারা যায়। এখন সে কারণ যে আর নাই, ইহা মনে করিবার পক্ষে কোন যুক্তি দেখা যায় না, বিশেষতঃ যখন পূর্ব্বোক্ত গুণগুলি এখনও মানবের অলঙ্কার বলিয়াই আমরা মনে করিয়া থাকি। এই স্থানে আর একটি কথা উঠিতে পারে;—হয় ত তখনকার দিনে অন্য শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। ধরিয়া লইলাম, জীবন-সংগ্রামের আয়োজনের জন্য প্রস্তুত হওয়া পূর্ব্বকালে দরকার ছিল না, যাহা এখন বিশেষ ভাবেই হইয়াছে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সে আয়োজনের জন্য যাহা এখন আমাদের জানা দরকার হইতেছে, তাহা শিক্ষা করা এই সংজ্ঞার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে কেন?

এক্ষণে তাহা হইলে দাঁড়াইল দুইটি বিষয়। আদৌ লেখাপড়া শিখানর প্রয়োজন আছে কি না, এবং থাকিলে কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন। প্রথমটির স্বপক্ষীয় লোক এত বিরল যে, তাহার আলোচনা না করিলেও ক্ষতি নাই।

শিক্ষা বর্ত্তমানে যাহা প্রচলিত আছে, তাহাতে দেখা যায়, ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত কয়েকটি বিষয় পাঠের পর তিন চারিটি বিষয় লইয়া বি-এ, বি-এসসি, এম-এ, এম-এসসি পর্য্যন্ত বা আইন, ডাক্তারি না হয় এঞ্জিনীয়ারিং পড়িয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার উদ্দেশ্য। যাহারা ঐ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি-ভূষিত হন, তাঁহারাই সাধারণতঃ শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত। আর যিনি ঠিক এ শিক্ষা পান নাই, বা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন নাই, বা ঐ সকল পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়াছেন,

তিনি উক্ত উপাধিবিশিষ্টদের, তথা সমাজের কাছে অশিক্ষিত বা মূর্খের মধ্যে গণ্য। 'প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা বশতঃ তিনি যদি পৃথিবীর বহু দেশের ভৌগোলিক জ্ঞানসম্পন্ন হন, বা নিজ প্রতিভাবলে দেখিয়া-শুনিয়া আপন চেষ্টায় এবং পুস্তকাদি পাঠে যদি চিত্র-বিদ্যা, কাঠের কাজ, বা গৃহাদি নির্ম্মাণ রূপ পূর্ত্ত-কার্য্যে বিশেষ সুদক্ষ হন, বা বৃদ্ধ পিতামহের নিকট বা অন্যত্র উপদেশ পাইয়া ও নিজ চেষ্টায় গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী হন, বা কার্য্য-ক্ষেত্রে লিপ্ত থাকা প্রযুক্ত একজন ব্যবসা-বিদ্যাবিশারদ হন, বা নিজ স্বভাবজাত তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও উপস্থিত-বুদ্ধিতে অনেক ফৌজদারি উকিলের অপেক্ষাও মেধাবী হন, যেহেতু তথাপি তিনি হোনোলুলুর লোক-সংখ্যা বা ওসিয়ানিয়ার ভৌগোলিক বিবরণ জানেন না, ইমারতের flat archএর angle বা factor of safetyর সূক্ষ্ম হিসাব তাঁহার অজ্ঞাত, বা শেলী ও ড্রাইডেনের সঙ্গে তাঁহার তেমন পরিচয় নাই, বা জলের মধ্যে অক্সিজেনের অংশ বা আর্কিমিডিজের তত্ত্ব তাঁর অবিদিত, অথবা আইন, ডাক্তারি কিম্বা এঞ্জিনিয়ারিং পাশের ছাপ পাওয়ার তাঁর সুযোগ হয় নাই, অতএব তিনি উচ্চশিক্ষিতের চক্ষে অশিক্ষিত, নিরক্ষর, অসভ্য বর্ব্বরদের মতই ঘৃণ্য।

নিরক্ষর দরিদ্র শ্রেণীর কথা ছাড়িয়া দিলে, অবশিষ্ট অল্প-সংখ্যক যাহা বাকি থাকে, তন্মধ্যে উক্ত দুই শ্রেণীর লোকই দৃষ্ট হইবে। তাহার মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থাৎ শিক্ষিতদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং সমাজের এখন তাঁহারাই মুখপাত্র। তাঁহাদের কথা, তাঁহাদের মতই যাহা কিছু,—অপরের আর এ সম্বন্ধে কথা কহিবার স্থানই নাই। তাঁহারা যাহা অর্জ্জন করিয়া নিজেদের শিক্ষিত ও সভ্য, এবং সেই সঙ্গে অপরদের মূর্খ ও অসভ্য মনে করিতে পারিয়াছেন, তাহাই যে শিক্ষার একমাত্র আদর্শ, ইহা তাঁহাদের মনে করা স্বাভাবিক। কিছুদিন পরে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থকরী বৃত্তি-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন হয় ত দেখিব, কামার, কুমোর, সূত্রধর প্রভৃতি কারিগরগণ, যাহারা এখন মূর্খ ও অসভ্য, তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমার জোরে শিক্ষিত ও সভ্য পদে উন্নীত হইবে। আবার কিছুদিন পরে পুষ্করিণী খনন ও ঝুড়ি চাঙ্গারি বয়ন বা পশুপালন যদি বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অন্তর্ভূত হয়, তখন বর্ত্তমানে কুলি ও ডোমের কাজ করিয়া যাহারা স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহাদের ঐ পেশার পরিবর্ত্তে সাহেবদের কারখানায় বেতন-ভোগী কুলিগিরি ও ঝুড়ি বোনার কাজ করিবার, এবং সেই সঙ্গে শিক্ষিত ও সভ্য নামার্জ্জনের সুযোগ হইতে পারে। কথাটা শুনিতে কেমন যেন কর্ণে একটু বাধিয়া থাকে; কিন্তু উক্ত শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ফলে কিম্বা ঐ সকল বিষয় শিক্ষা করিয়া যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাওয়া যায়, তবে তাহাদের শিক্ষিত পদবাচ্য হওয়া,—অসম্ভব নহে। অবশ্য ইহা বোধ হয় বুঝাইবার প্রয়োজন নাই যে, কামার, কুমোর প্রভৃতির কাজ শিক্ষা দেওয়ার আমি বিরোধী নই।

অতএব দেখা যাইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয় যাহা শিখাইবেন, তাহাই আমাদের শিক্ষা। যদি অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ ভাবে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে অনুমিত হয়, যাহা দ্বারা কিছু অর্থোপার্জ্জনের পথ হইতে পারে এক্ষণকার সময়ে তাহাই শিক্ষা, অন্ততঃ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ইহা মনে করিবার পক্ষে আরও এই কারণ রহিয়াছে যে, এতাবৎ যতদিন কেরাণীগিরি চাকুরীর দ্বারা কোন প্রকারে সংসার চালাই-বার পথ সহজ ছিল বা ডাক্তারি ওকালতিতে পয়সা উপায়ের পথ প্রশস্ত ছিল, ততদিন আর কেহ নব শিক্ষার আয়োজনের আবশ্যকতা বোধ করে নাই,—এখনই কেবল উহার প্রয়োজনানুভব হইয়াছে। আর ইহাও দেখা যাই-তেছে, কামার কামারই থাক্‌বে, ছুতর ছুতরই থাক্‌বে, চাষা চাষাই থাক্‌বে, যতক্ষণ না তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ মারা না হয়। আর ইহার পর তাদের মৌলিকত্ব ঘুচে যাবে,—তখন তাহারাও পাঁচজনের একজন হইবে।

যাঁহারা শিক্ষার অন্য উদ্দেশ্য আছে বলিয়া কখন মনে করেন না, অন্য আবশ্যকতা যাঁহাদের কল্পনার বাহিরে, বর্ত্ত-মান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাতেই যাঁহারা পরিতৃপ্ত, এবং ছেলেদের সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারিলেই যাঁহারা যথেষ্ট মনে করেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ পুত্রদের সেই শিক্ষা দিতে নিজের দিক দিয়া সম্পূর্ণ রূপে অধিকারী থাকিলেও, দেশের ও সমাজের দিক দিয়া দেখিতে হইলে, যদি শিক্ষার্থ উক্ত শিক্ষা আমাদের পক্ষে অনিষ্টকর ইহা ঠিক হয়, তবে তাহার পোষকতা করা কখন সমীচীন মনে হয় না।

শিক্ষার অর্থ বা উদ্দেশ্য যদি মানুষকে উদার করা,

বিনয়ী করা, এক কথায় মানুষ করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় সে উদ্দেশ্য হইতে অনেকটা দূরে আছে। আর যদি অর্থোপার্জ্জনে বা জীবন-সংগ্রামের উপযোগী হওয়ার নামই শিক্ষা হয়, বা উহা হওয়াই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এই শিক্ষা হইতে আমরা সে দিকে কতটা লাভবান হইয়াছি, তাহাও ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

অর্থের প্রয়োজন যে সংসারে খুব বেশি, সে কথায় অবশ্য দ্বিমত নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতগণ যে এ বিষয়েও যথেষ্ট পারদর্শী হন, কোন ক্রমেই তাহা বলা যাইতে পারে না। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশের পাশ করিয়া অবশ্য চাকরী লাভের প্রবৃত্তি ও সুবিধা হয় সত্য; এবং তদ্দ্বারা যে কিছু অর্থাগম হয় না, তাহাও বলিতেছি না। তাহাতেই তাঁহাদের অধিকাংশের কোন প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হইয়া থাকে, স্বীকার করি। কিন্তু এই পাশ না হওয়া ভিন্ন যে তাঁহাদের আর উক্ত অর্থোপার্জ্জনের দ্বিতীয় উপায় নাই, তাহা নহে। আর এই প্রকারে অর্থোপার্জ্জনের প্রবৃত্তি লইয়া বা উপায় করিয়া কখন কোন জাতি ধনবলে জগতে বড় হইতে পারে না। বরং এ উদাহরণ বিরল নহে, যে এই শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, কিন্তু অন্য উপায়ে স্বল্প শিক্ষিত, এ হেন লোক তুলনায় অধিক উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহারা এমন কোন শিক্ষা পান না বটে যে, কেরাণীগিরি ভিন্ন অর্থাগমের অন্য পথ নাই; কিন্তু অলক্ষিতে তাঁহারা এমনই মনোবৃত্তির অধীন হইয়া পড়েন, যাহাতে উহাই তাঁহাদের উপার্জ্জনের একমাত্র পথ—ইহাই তাঁহারা কেবল দেখিতে পান।

বর্ত্তমান লেখকের বিশ্বাস ও ধারণাই যে পাঠককে ধরিয়া লইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; এক্ষণে এই প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে ব্যবসায়, মূলধন প্রভৃতি একে-একে অনেক কথাই আসিয়া উপস্থিত হইবে। সে বিষয় প্রবন্ধান্তরে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে অবান্তর হইলেও, ইহার সহিত আরও এইটুকু বলিতে চাই যে, নিজেকে উপার্জ্জনের উপযোগী করিয়া লইতে পারিলে, এক কপর্দ্দক মূলধন না লইয়াও লোকে বহু ধনের অধিপতি হইতে পারেন। আর শিক্ষিত পদবী প্রাপ্ত ন'ন, এরূপ অনেক লোক যে চাকুরী ভিন্ন অন্যান্য উপায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, তাহা কলিকাতা ও মফস্বলের সকল ব্যবসায়ী পল্লীতে হিন্দুস্থানী, মারোয়াড়ী, বাঙ্গালী ও অন্যান্য জাতিদের মধ্যে প্রতিনিয়ত দেখিতে পাইবেন। এবং ইহাও লক্ষ্য করিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অধিক উন্নতি করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই অল্প। অন্য স্থানের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বরাবর ব্যবসায়ের দ্বারা উন্নতি করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যবসায়-কার্য্যে বিবিধ সুযোগ সত্ত্বেও কলেজের শিক্ষা প্রাপ্তির সঙ্গে ব্যবসায়ে নিস্পৃহতার উদাহরণও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সে স্থলে এমন দেখা যায়, টাকা জমা দিয়া কোন অফিসে একটা চাকুরী, না হয় ডাক্তারি-ওকালতিই অর্থাগমের পথ বলিয়া গৃহীত হইতেছে।

কিছু দিন পূর্ব্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কাজের জন্য কতকগুলি শিক্ষানবীশ লইবার কথা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন। তাহার ফলে বহু সহস্র যুবক ঐ কার্য্যের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সবই প্রায় এম-এ, এম-এস্‌সি, বা বি-এ, বি-এস্‌সি। শুনা যায় আবেদনকারীদের বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করার পর, তাঁহাদের মধ্যে একজনও যে উপযুক্ত নন, পরীক্ষক মহাশয়েরা এই ভাবের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা গণিত ও অন্যান্য শাস্ত্রের উচ্চ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হিসাব রাখার কাজে শিক্ষানবীশ রূপে গৃহীত হইবারও উপযুক্ত নন,—যদি এ কথার মধ্যে সত্য থাকে, তবে এ শিক্ষা যে কিরূপ কাজের শিক্ষা, তাহাও বুঝিয়া উঠা কঠিন। পক্ষান্তরে, বাঙ্গালা পাঠশালায় নামমাত্র সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াও অনেকে অনেক বিষয় সম্বলিত বড়-বড় বিলাতি ব্যবসায় করিয়া যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন, এ দৃষ্টান্তও অনেক দেখা যায়। এই সকল হইতে, বর্ত্তমানের শিক্ষা যে ধন-সম্পদ বৃদ্ধির যথার্থ সহায় নয়, বরং ঐ পথের পরিপন্থী, ইহাই কি প্রতীয়মান হইতেছে না?

মানুষের সর্ব্বৈব উৎকর্ষ ও পূর্ণতা সাধন বা শিক্ষার্থই শিক্ষার প্রয়োজন, এ কথা ছাড়িয়া দিলেও, মানসিক, শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্বারা নিজ-নিজ সকল প্রকার অভাব যাহাতে দূর করা যাইতে পারে, তাহাকে শিক্ষা বলিয়া ধরিলেও, আধুনিক শিক্ষা অর্থের দিকের

ন্যায় অন্য দিকেও আমাদের সে অভাব যে বিশেষ পরিমাণে দূর করিতে সমর্থ হইতেছে, এরূপও দেখা যায় না। স্বাস্থ্যের কথা তুলিলে, ইহা বলিতেই হইবে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি ত দূরের কথা, বিশেষ রূপে যে অবনতি হইতেছে, ইহা সর্ববাদিসম্মত। জ্ঞানের কথার সম্পর্কে,—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যে-যে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা ছাড়া সাধারণ ভাবে একটা জ্ঞান লাভ হয় না। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে শিক্ষার কোন প্রচেষ্টাই বিশ্ববিদ্যালয় এ পর্য্যন্ত করেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সকল ত্রুটির কথা আমার নিজের নহে; বহু হিন্দু, মুসলমান, এমন কি ইংরাজ মনীষীও গত বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের সাক্ষ্য প্রদান কালে স্পষ্ট ও স্বাধীন ভাবে তাহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন।

কোন্ বনিয়াদের উপর বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা আমার জানা নাই। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-ডি মহাশয় প্রণীত, "হিন্দুজাতি ও শিক্ষা" গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে জানা যায়, খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার ও বিস্তার, বিলাতি জিনিস বিক্রয়, প্রজাকে ইংরাজ-ভক্ত করা, শাসন কার্য্যের সুবিধা, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য, আমাদের সখ ও স্পৃহা বৃদ্ধি, এই সকল উদ্দেশ্য লইয়াই বিদেশীয়েরা তখনকার শিক্ষার পত্তন করিয়াছিলেন। ইহা যদি সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তবে বুঝা যায়, উদ্দেশ্যের মধ্যে তখন একটা দিকই ছিল; সেটা, যাহাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা তাহাদের দিক নহে; —যাহারা ব্যবস্থাকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাদের দিক। এ পক্ষের কথা যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, চাকরীই ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য। সুতরাং ফল যাহা হওয়া সম্ভব, তাহাই হইয়াছে ও হইতেছে। ঠিক এই অবস্থায় টেক্‌নিক্যাল শিক্ষাই দেওয়া হউক, আর ভোকেশনাল শিক্ষা দেওয়াই হউক, ইহারও দরকার যদি ব্যবস্থাকর্ত্তার থাকে, তবে তাহাই হইবে। আমাদের সেই ঘাস জলের অধিক আশা করিবার কিছু নাই।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দেহ, মন, চরিত্র বা নৈতিক বলে বলবান, কর্ম্ম-কুশল, উন্নতমনা লোকের উদ্ভব একেবারে হয় নাই, এমন কথা কেহই বলিতে পারেন না; তবে তুলনায় সে নগণ্য সংখ্যার কথা ধরিয়া বেশি কিছু বলা যায় না।

এ শিক্ষা আমাদিগকে যাহা দিতে অসমর্থ, মোটামুটি তাহা বলা হইল। কিন্তু এই শিক্ষা আমাদের নিকট হইতে আমাদের অলক্ষ্যে যাহা হরণ করিতেছে, তাহার কথা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। সেটি আমাদের মনোবৃত্তি, ইংরাজিতে যাহার নাম mentality। সেই শিক্ষিতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৈন্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও অধ্যবসায়, একতা, একাগ্রতা, বিশ্বাস এবং সাহস—যাহা ইংরাজ জাতির ভূষণ,—এবং ব্যবসায়, যাহা এই জাতির উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিবার মূল সোপান, তাহাদের ঐ সকল গুণাবলীর দিকে আকৃষ্ট না হইয়া শিখিতেছি কি? শিখিতেছি আমাদের সনাতন রীতি, নীতি, চিন্তা ও সভ্যতাকে সরিয়ে রেখে, তার স্থানে পাশ্চাত্য আদর্শে ভোগ বিলাস, রক্ত-মাংসের দেহের তৃপ্তির অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও পশ্চিমের প্রাণহীন সভ্যতা; আর নিত্য নব অভাবের সৃষ্টি, অর্থের বিনিময়ে মনুষ্যত্ব বিক্রয়, অথচ অর্থোপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট পথ গ্রহণে অনাসক্তি বা হতাদর; আবার সেই পাশ্চাত্যদেরই উপাস্য ক'রে পূজা করা।

চিন্তায়, কার্য্যে, আচারে, ব্যবহারে সকল দিকেই ক্রমে আমাদের বিশিষ্টতা হারাইতে বসিয়াছি। এমন কি, আমাদের জাতীয় ভাবে আলাপ, কথাবার্ত্তা, হাসি, কাশিটুকুও ছাড়িয়া, পাশ্চাত্য অনুকরণে প্রবৃত্ত হইতেছি। এমনই আমাদের শিক্ষার প্রভাব, যে, আমরা সাধারণ বিভাগে পাশ করিয়া যেমন সাহেবের অফিসে কেরাণীগিরি করিবার জন্য লালায়িত, তেমনই এঞ্জিনীয়ারিং, ওভারসিয়ার, পাশ করিয়া সাহেবের কারখানায় বা পাবলিক্ ওয়ার্কস বিভাগে চাকরী পাইবার জন্য ব্যস্ত। আবার টেকনিক্যাল বা ভোকেশনাল শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও আমাদের এ মনোবৃত্তিতে আমরা কল-কারখানার ভাইস্‌ম্যানগিরি বা ছুতোর কামারগিরি চাকরীগুলি প্রথমে দখল করিব। সুতরাং যে শিক্ষাই দেওয়া হোক, আমাদের মনোবৃত্তিও এমনই করিয়া যদি সঙ্কুচিত ও হীন হইতে থাকে, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বনাশের আর বিলম্ব কি? জাতির বিশিষ্টতা নষ্ট হইয়া মন যদি এমনই দাস-বৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ হইতে থাকে, তাহা অপেক্ষা অধঃপতন আর কি হইতে পারে?

আমাদের এই সর্ব্বনাশের পরিবর্ত্তে শিক্ষায় দ্বারা কেবল পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি, যাহা পাইতেছি, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। স্যার জগদীশ ও স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের আবিষ্কারে, পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথের দার্শনিক পাণ্ডিত্যে জগৎ সমীপে আমাদের যথেষ্ট গৌরববৃদ্ধি পাইলেও, জাতির বিশিষ্টতা নষ্ট হইয়া একবার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেলে, তাঁহাদের এই গৌরব জাতিকে আবার দাঁড় করাইতে পারিবে কি?

এই সকল কারণে মনে হয়, এখন আমাদের সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য,—আমাদের এখনকার শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, দেশের মনীষিগণ একত্র হইয়া স্থির ভাবে আলোচনা দ্বারা তাহা নির্ণয় করিয়া যেরূপ শিক্ষাদান প্রয়োজন, সাধ্যমত তাহার ব্যবস্থা করা; এবং সাধারণ অভিভাবকদের ছেলেদের শিক্ষা দিবার বিষয়ে দ্বিধা ঘুচাইয়া পথ-নির্দ্দেশের সুযোগ করিয়া দেওয়া। এইরূপ ব্যবস্থা করা ঠিক এখনকার অবস্থায় অতীব দুরূহ হইলেও, কতক পরিমাণেও করা যে একেবারেই অসম্ভব, তাহা মনে হয় না। আর অসম্ভব হইলেও, যদি অন্য উপায় না থাকে, তাহা হইলে যেরূপ ক্ষমতাই থাক, এ কার্য্যের ভার নিজেদের হাতে লইবার চেষ্টা ভিন্ন আর দ্বিতীয় পথ কি আছে? আর কেহ আসিয়া আমাদের এ ভার লইবেন, সে আশা বাতুলতা মাত্র।

পুস্তক-পরিচয়

সঙ্গীত সোপান।—গৌরীপুরাধিপতি সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া প্রণীত। মূল্য দুইটাকা মাত্র। পুস্তকখানি প্রথম-শিক্ষার্থীদিগের কণ্ঠসঙ্গীত সাধনার বিশেষ উপযোগী; তদ্ভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞ-সুধী মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। সুর, লয়, মাত্রা ও সাঙ্কেতিক স্বরলিপি (Staff notation) ইত্যাদি সঙ্গীত সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিশদরূপে বুঝান হইয়াছে, এক কথায় শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবলমাত্র এই পুস্তকের সাহায্যে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় সমুদয় তথ্য ও খুঁটিনাটিগুলি অতি অনায়াসেই বোধগম্য হয়। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক অতি বিরল। ইহাতে ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞ মনীষিগণের বহু সুললিত গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিক্ষার্থী মাত্রেরই এই পুস্তক একখানি দেখা আবশ্যক। ছাপা ও কাগজ সুন্দর।

প্রাণীদের অন্তরের কথা।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত; মূল্য দেড় টাকা। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় বালক-বালিকাদের জন্য যখনই যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই পরম আদরে পরিগৃহীত হইয়াছে। জীব-জন্তুদের কথা তিনি কেমন সুন্দর, কেমন মনোজ্ঞ করিয়া বর্ণনা করিতে পারেন, তাহা এই প্রাণীদের অন্তরের কথা পড়িলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কিশোরদিগের কৌতূহল, কল্পনাশক্তি ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাইবে, নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্তি জাগিবে এবং প্রত্যক্ষানুভূতির বিমল আনন্দ তাহাদিগকে সত্যানুরাগী করিয়া তুলিবে। বইখানির লেখা যেমন সুন্দর, বহিরাবরণও তেমনই মনোহর, ছবিগুলিও উৎকৃষ্ট। এমন সুন্দর বইখানি ছেলেদের অবশ্য পাঠ্য বলিয়া শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

বাজীকর।—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রণীত। মূল্য আট আনা। এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার চতুঃসপ্ততিতম গ্রন্থ। ছোট-গল্প-রচনায় সিদ্ধহস্ত শ্রীমান প্রেমাঙ্কুরের পরিচয় পাঠকগণকে নূতন করিয়া দিতে হইবে না। তিনি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় যে সকল ছোট গল্প লিখিয়াছেন, তাহারই সঙ্গে আরও কয়েকটি নূতন গল্প দিয়া এই বাজীকর পুস্তক ছাপাইয়াছেন। ইহাতে বাজীকর, নিশির ডাক, মল্লারের সুর, আঁধিয়া, পথের বঁধু, হাক্ষেকের, দিগ্বিজয়ীও মঙ্গল মঠ, এই কয়েকটী গল্প আছে। গল্প কয়টীই সুন্দর, কয়টীই মনোরম; কোনটা ফেলিয়া কোনটার নাম করা একেবারে অসম্ভব; যেটী পড়িয়াছি, সেইটীই উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছে; যেমন লেখার ভঙ্গী, তেমনই গল্প বলিবার কায়দা, তেমনই আখ্যানভাগ। বইখানি পড়িয়া সকলকেই বলিতে হইবে হাঁ, কয়েকটা গল্প পড়িলাম বটে!

গৌরী।—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত; মূল্য একটাকা। 'দুর্ব্বাদল' ও 'বিল্বদলের' লেখক মহাশয় এই 'গৌরী'র লেখক। এখানি উপন্যাস। অনেক পাত্রপাত্রী নাই, অনেক ঘটনা-সংস্থান নাই; কিন্তু যাহা আছে, তাহা পরম উপভোগ্য। গৃহস্থ-ঘরের লক্ষ্মীর সুমধুর, সুমহান চিত্র এই গৌরী। তাহার পর লক্ষ্মী আছে, শিশির আছে; চরিত্রগুলি যেন জ্বলজ্বল করিতেছে; আর লেখাও বেশ ঝরঝরে; কোন আড়ম্বর নেই, একেবারে সহজ-গতি। আমরা এই বইখানি পড়িয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি; যিনি পড়িবেন, তিনিও আমাদের কথায় সায় দিবেন।

সোনার ঝরণা।—শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীশোভন-

লাল গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত; দাম বারো আনা। শ্রীমান্ মোহনলাল ও শোভনলাল দুই ভাই, একবৃন্তে দুইটী প্রস্ফুটিত পুষ্প। যে বয়সে ছেলেরা ঠাকুরমার ছড়া লইয়া যত পড়ুক আর না পড়ুক, ছবি দেখে, আর বই ছেঁড়ে, বলিতে গেলে সেই বয়সেই এই দুটী ভাই ছেলেদের জন্ত বই লিখেছে। শ্রীমান মোহনলাল বয়সে বড় অর্থাৎ এই বার তেরো; তাই সে এই ঝরণার পাঁচটা ফুল ভাসাইয়াছে; আর শ্রীমান শোভনলাল ছোট ভাই, তাই সে তিনটী দিয়াছে। বিলাত অঞ্চলে এমন বয়সে পণ্ডিত হবার কথা বইয়ে পড়েছি, কিন্তু কেউ বই লিখেছে, এ খবর আমাদের ত জানা নেই। তাই আমরা অবাক হয়েছি, এ বয়সে এমন সুন্দর বই এই দুইটী ছেলে-মানুষ কি করে লিখল। একে প্রাক্তন-সংস্কার ছাড়া আর কিছুই, আমরা হিন্দু, বলতে পারব না। ছেলেদের কথাই বলিলাম; বইয়ের পরিচয় বারো আনা পয়সা খরচ করে সকলে নিলে সুখী হব।

পুষ্পের মালা।—এখানি শ্রীমান মোহনলাল ও শোভনলালের লেখা; এখানিরও দাম বারো আনা। এতে সাতটী গল্প আছে; চারটী মোহনলালের, তিনটী শোভনলালের। কি সুন্দর গল্প বলবার ভঙ্গী, আর কি গল্পের বাঁধুনী, তার পর আবার ছবি আছে। যেমন 'ঝরণা' তেমনই 'মালা',—এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ। এই দুখানি বই ছেলেদের হাতে দিতেই হইবে।

ছোটদের গল্প।—শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত মূল্য দশ আনা। বালক-বালিকাদিগের মনোরঞ্জনের জন্ত এই ছোট গল্পগুলি লিখিত হইয়াছে। গল্প কয়টীই মনোরম। ছোটদের জন্তই লিখিত বটে, কিন্তু বড়রাও এই গল্পগুলি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবেন। যেমন করিয়া গল্প বলিলে ছেলে মেয়েরা বেশ উপভোগ করিতে পারে, তেমন করিয়াই বলা হইয়াছে।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত "দ্বিজেন্দ্রলালের" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৩॥০।

শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বিজুর বিয়ে" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কবি প্রণীত "কাকাবাবু" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত বিশপতি চৌধুরী প্রণীত নূতন উপন্যাস "ঘরের ডাক" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২৲।

শ্রীমতী ননীবালা দেবী প্রণীত "পাহাড়ের গল্প" বাহির হইয়াছে; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত নূতন উপন্যাস "গৌরী" বাহির হইল; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত নূতন নাটক "তুলসী প্রতিভা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন প্রণীত "ঈশ্বরের উপাসনা" ও "ঈশ্বরের স্বরূপ" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য প্রত্যেকখানি ।০।

শ্রীযুক্ত কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস "বঙ্গের গৃহিণী" বাহির হইয়াছে; মূল্য ১।০।

৺হরকান্ত বসু প্রণীত "নাস্তিক প্রবোধ" পাইলাম; মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিষী প্রণীত "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" গোলাধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

দুর্ব্বাসার অভিশাপ

শিল্পী—শ্রীরামেশ্বরপ্রসাদ

Blocks by BHARATVARSHA HALFTONE WORKS.

Emerald Ptg. Works.

ভারতবর্ষ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

দ্বিতীয় খণ্ড] নবম বর্ষ [ষষ্ঠ সংখ্যা

মায়াবাদ ও IDEALISM

[৺প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী]

মন ব্যাপক বলিয়াই ত্বগ্‌গত সর্ব্বশরীরব্যাপী বোধ আমাদের জন্মে। মন জাগ্রৎ অবস্থায়, স্বপ্নাবস্থায় ও সুষুপ্তি অবস্থায় সমগ্র ভাব ধারণা করিতে পারে। বস্তুত সমষ্টির অন্তর্নিবিষ্ট, নানাত্ব (Plurality) সমষ্টিতে নিহিত। সুতরাং মন ব্যাপক। অণুপরিমাণ নহে। সমস্ত ভূতসমূহের জাগ্রৎ অবস্থার সমষ্টি—এক সমগ্রবস্তু। সেইরূপ সমস্ত জীবের স্বপ্নাবস্থার সমষ্টি এক সমগ্রবস্তু। সুষুপ্তি অবস্থার সমষ্টিও এক সমগ্রবস্তু। মন ব্যষ্টির জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার সমগ্র ভাব যেরূপ ধারণা করিতে পারে, সেইরূপ সমষ্টির জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির ধারণা করিতে পারে। চিন্তায় আমরা সমস্ত বিশ্ব-জগৎ ধারণা করিতে পারি। জাগরণে সমষ্টির ধারণা করিতে-করিতে মন সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়। অথবা বলা যাইতে পারে, সমগ্র বিশ্ব মনে ভাসিয়া উঠে। বিশ্ব ও মন মিলিয়া একাকার হয়। সেইরূপ স্বাপ্নিক সূক্ষ্ম ভাবনাময় জগতের সমষ্টিও মন ভাবিতে পারে। মন সমস্ত ব্যাপ্ত হয়; সমষ্টি সুষুপ্তির সংস্কারেও মন তন্ময় হয়। বেদান্তে ব্যষ্টির তিনটী অবস্থাকে যথাক্রমে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ অবস্থা বলা হইয়াছে; এবং সমষ্টির তিনটী অবস্থাকে যথাক্রমে বিরাট বা বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা এবং ঈশ্বর অবস্থা বলা হইয়াছে। সমষ্টিই ঈশ্বর। ব্যষ্টিই জীব। মন

যখন ব্যাপক হইয়া সমষ্টি স্বরূপ ঈশ্বরাবস্থা প্রাপ্ত হয়, যখন দেশ কাল পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন হইয়া সূক্ষ্ম তেজোময়, তখন মন সংস্কার রূপে বিশ্ব-ব্যাপ্ত হয়। সমষ্টি রূপ হিরণ্য-গর্ভে ব্যাপ্ত হয়, তখনও বিশ্ব ব্যাপ্ত। এইরূপ দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন ও স্থূল ভাবে সমষ্টি রূপে বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হয়। ব্যষ্টির প্রাজ্ঞ অবস্থা কারণ অবস্থা। যেহেতু, প্রাজ্ঞ অবস্থা হইতে সূক্ষ্ম স্বপ্নাবস্থার আবির্ভাব, এবং ক্রমে বিশ্ব অবস্থার উদ্ভব। সমষ্টির ব্যাপারেও তাহাই। ঈশ্বর অবস্থাই কারণ অবস্থা। সুষুপ্তি অবস্থার সমষ্টিকে কারণ অবস্থা বলায়, তমোভিভূত অবস্থা বোধ হইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি, ধ্যানের বা সমাধির অবস্থা এবং সুষুপ্তি অবস্থার সাদৃশ্য আছে; পার্থক্য কেবল জ্ঞানে। আমরা ঈশ্বর অবস্থাকে সমষ্টি, ধ্যান বা সমাধি অবস্থাই বলিব। সমষ্টি সমাধি রূপ জ্ঞানই ঈশ্বর অবস্থা। সুতরাং ঈশ্বরাবস্থাকে তমোভিভূত অবস্থা বলা যাইতে পারে না। এইরূপ হিরণ্যগর্ভ ও বৈশ্বানর অবস্থা সম্বন্ধেও গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যাপক হইলেই বস্তু স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হয়। মন যত ব্যাপক হয়, ততই নির্ম্মল হয়। দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্র দেখিলে মনের যে নির্ম্মলতা জন্মে, তাহা প্রসিদ্ধ। পর্ব্বতমালা দেখিলে মনে যে প্রশান্ত ভাবের উদয় হয়, তাহা সর্ব্বজন-অনুভূত। বস্তু ব্যাপক হইলে সূক্ষ্ম হয়। বায়ু হইতে আকাশ সূক্ষ্ম। বায়ু হইতে আকাশ ব্যাপ্ত। রুদ্ধ গৃহের বদ্ধ বায়ু মলিন হয়। বদ্ধ জল মলিন হয়। সেই বায়ু ও জল পরিব্যাপ্ত হইলেই পরিশুদ্ধ হয়। মনের সম্বন্ধেও তাহাই। প্রাকৃতিক নিয়মেই ব্যাপক বস্তু শুদ্ধ। ক্ষুদ্র বিষয়ে সৎ সত্তা থাকিলে মন মলিন হয়। ব্যাপক, উদার বিষয়ে নিবদ্ধ হইলেই নির্ম্মল হয়। ঈশ্বরাবস্থা পর্য্যন্তই অব-ধারণ করা মনের সামর্থ্য। কারণ, মন সীমা অতিক্রম করিতে পারে না; রূপ ও নামের অতীত ভাব মন ধারণা করিতে পারে না। আমাদের চিন্তাই সাকার। বিশ্বাতীত ভাব ধারণা করিতে মন পারে না। মন বিশ্ব-সীমা।

এ স্থলে একটী বিচারের জিনিস আছে। চিন্তা, ধ্যান, মনন, ধারণা প্রভৃতি মনের কার্য্যই। কিন্তু ইহার অন্তরালে কে চিন্তা, ধারণা প্রভৃতি করিতেছে? অবশ্যই বলিতে হইবে "আমি"। সকল ধ্যান, সকল ধারণা, সকল মনন, সকল চিন্তার অন্তরালে আমি। আত্মা বা আমিই মনের অন্তরালে। 'আমি' না থাকিলে মন চিন্তা করিতে পারে না। মন যখন বিশ্ব-ব্যাপ্ত, তখন আমি বা আত্মাও বিশ্ব-ব্যাপ্ত। বিশ্ব বলিতে নাম ও রূপ। দেশ, কাল, সংস্কার প্রভৃতি লইয়া বিশ্ব। আমি মনের প্রত্যেক বিন্দুতেই আছি। সকল মননেরই আমি। মন যখন বিশ্ব-ব্যাপ্ত, তখন আমিও বিশ্ব-ব্যাপ্ত; তখন আমি দেশ, কাল, সংস্কার প্রভৃতিতে ব্যাপ্ত। মন, ক্ষণ কাল এবং মহৎ কালকে ধারণা করিতে পারে। বর্ত্তমান প্রভৃতি কালের উপাধি মাত্র। বর্ত্তমান না থাকিলে অতীত হইতে পারে না। আবার অতীত না থাকিলে বর্ত্তমান হইতে পারে না। বর্ত্তমান আছে বলিয়াই ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ কালের আকাঙ্ক্ষা করিয়াই বর্ত্তমান। বাস্তবিক এক অখণ্ড কাল রহিয়াছে; আমরা বর্ত্তমান প্রভৃতি উপাধিযোগে কালকে খণ্ডিত করি মাত্র। এই কালকে জানি আমি। বিশ্বব্যাপী কাল সংস্কারে লয় প্রাপ্ত হয়। বিশ্বব্যাপী দেশ সংস্কারে লয় প্রাপ্ত হয়, ইহাও জানি আমি। মন সংস্কার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে; কিন্তু আমি থাকি। সমষ্টি বিশ্ব সংস্কার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া মন নিঃশেষ হয়; কিন্তু আমি তাহা অনুভব করি (অবশ্যই এ স্থলে অনুভব করা বলা যাইতে পারে না)। বিশ্ব পর্য্যন্তই মনের স্ফূর্ত্তি। ইহা হইতেও ব্যাপক আমি। এই আমি বা আত্মা বিশ্ব অতিক্রম করিয়াও অবস্থিত। আমাতেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত; আমাতেই বিশ্ব-মন অবস্থিত। দেশ, কাল সমস্তই আমাতে অবস্থিত। আমি দেশ-কালের অতীত। মন সসীম; কিন্তু আমি অসীম। আমি জ্ঞান স্বরূপ। আমি ব্যাপক। আমি প্রকাশ স্বরূপ। মন জড়। মন প্রকাশ্য; আমিই মনকে প্রকাশ করি। বিশ্ব অবস্থার অন্তরালে আমি; প্রাজ্ঞ অবস্থার অন্তরালে আমি। সেইরূপ সমষ্টি স্বরূপ বিরাটের অন্তরালে আমি। আমি বিরাট, আমি সূত্রাত্মা। আমিই ঈশ্বর। ব্যষ্টিরূপে আমার মন আমা হইতে পৃথক্। সমষ্টিরূপেও আত্মা হইতে সমষ্টি মন পৃথক। সমষ্টি মনই ঈশ্বরের উপাধি। ঈশ্বর সমষ্টি স্বরূপ বলিয়াই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্বব্যাপী, ব্যষ্টি জীব স্বীয় উপাধি মনের ব্যাপকতা সংসাধন করিয়া ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়। আত্মা বা আমি ব্যষ্টি ও সমষ্টি উপাধিতে এক। কেবল উপাধি মনের পার্থক্য। যখনই মন ব্যাপক হইয়া সমষ্টি সংস্কারে অবগাহন করে, তখনই জীব ও ভগবান্ অভিন্ন হয়। এ স্থলে প্রসঙ্গ ক্রমে হেগেলের সম্বন্ধে একটী বিষয় বলা আবশ্যক। হেগেল

বলিয়াছেন, যখন আমরা চিন্তা করি, তখন সত্তা (existence) আমাদের ভিতরে চিন্তা করে—এই কথাটী সত্য। সৎ বা সত্তা আমিই। আমি আছি বলিয়াই আমি চিন্তা করি। ইয়োরোপীয় দার্শনিক ডেকার্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অশোভন। তিনি বলিয়াছেন, আমি চিন্তা করি; সুতরাং আমি আছি (cogito ergo sum—I think, therefore I exist)। এই মত অশোভন। কারণ, আমি চিন্তা করি বলিয়াই আমি আছি—ইহা নহে। আমি আছি এ সম্বন্ধে প্রমাণান্তরের প্রয়োজন হয় না। বরং আমি আছি বলিয়াই চিন্তার ব্যাপার চলিতেছে। এক্ষণে পূর্ব্বানুসৃত বিষয়ের অবতারণা করা যাক্। আমি ও ঈশ্বর অভিন্ন। ঈশ্বর ভাবেও সংস্কার রহিল। চেতন আত্মার সম্মুখে জড় রূপ সংস্কার থাকায় দ্বৈত রহিল। অদ্বৈত কি প্রকারে সম্ভব? আমরা বিচারে দেখিয়াছি, আত্মা বিশ্বাতীত। মন ব্যষ্টি রূপেই হউক, অথবা সমষ্টিরূপেই হউক, পরিচ্ছিন্ন। মন নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। মন দৃশ্য; মন জড়। আমি জ্ঞানস্বরূপ এবং সৎ স্বরূপ। যে বস্তু পরিচ্ছিন্ন, তাহাই মূর্ত্ত অর্থাৎ আকার বিশিষ্ট। আমরা দেখিতে পাই, যাহার আকার আছে, তাহারই বিকার আছে। উপচয়, অপচয়, ক্ষয়, বৃদ্ধি ও নাশ আছে; নিয়ত এক ভাবে থাকে না। মন পরিচ্ছিন্ন; অতএব মূর্ত্ত। মনের আকার আছে। মন সীমাবদ্ধ বলিয়াই আকারবান্। আকার থাকিলেই বিকার আছে। অতএব মন বিকারবান্। বিকারবান্ বস্তুরই নাশ হয়। যে বস্তু নিয়ত স্থির নাই, তাহার বাধ হয়। আমি বা আত্মা জ্ঞান স্বরূপ। আত্মার কখনও বাধ হইতে পারে না। আমি নাই, ইহা যে বলিবে, সে-ই আত্মা। কিন্তু মন নিয়ত বিকারী বলিয়া নিত্য স্থির নহে। অতএব মনের বাধ হইতে পারে। মিথ্যার বাধ হয়। কিন্তু সত্য অবাধিত। সত্য সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে সৎ। সত্যের বাধ হইতে পারে না। মনের যখন বাধ হয়, তখন মন মিথ্যা। স্বপ্নের দৃশ্য জাগরণে বাধিত হয়। স্বপ্নে রাজা হইয়া সুখ অনুভব করিলাম। কিন্তু জাগরণে তাহা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান জন্মিল। স্বপ্নে দেখিলাম, আমার মাথা কাটা গিয়াছে এবং আমিই তাহা দেখিতেছি। এরূপ অসম্ভব ব্যাপার জাগরণে মিথ্যা বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। স্বপ্নে দেখিলাম, আমি হস্তী হইয়াছি। অবশ্যই জাগরণে ইহার বাধ হয়। স্বপ্ন দৃশ্য, অতএব মিথ্যা। স্বপ্নাবস্থায় মনই দ্রষ্টা, মনই দৃশ্য; সুতরাং স্বপ্নাবস্থায় মন মিথ্যা। জাগরণের দৃশ্য ও দৃশ্যত্ব সামান্যে মিথ্যা; কারণ, স্বপ্নের দৃশ্যের ন্যায় জাগরণের দৃশ্যও দৃশ্যই। পরন্তু, রোগের অবস্থায় মানসিক বিকারে যে সকল বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মিথ্যা। বিকারের ঘোর কাটিয়া গেলে, সেইগুলি মিথ্যা বলিয়া প্রতীতি হয়। যদিও ইহা রোগের অবস্থা (Pathological state), তথাপি এই অবস্থাকে বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। বিকারের ঘোর কাটিয়া গেলে, আমাদের অনেক সময়ে বিকারজাত দৃশ্যের বিস্মৃতি জন্মে। এই জন্য কেহ বলিতে পারেন, বিকারজাত দৃশ্যের আলোচনায় কোনও লাভ নাই। আমরা বলিব, তাহা কেন? এ অবস্থার বিষয়ও আলোচনার যোগ্য। ইহাও মানসিক অবস্থা। স্বপ্নের দৃশ্যও আমরা বিস্মৃত হই। তাই বলিয়া স্বপ্নাবস্থাকে বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। বিকারের ঘোর কাটিয়া গেলে, নিকটস্থিত কোনও ব্যক্তি বিকারের অবস্থার বিষয় বলিলে, একটা অস্ফুট স্মরণ হয়। কোন-কোনও স্থলে বিশেষ সুস্পষ্ট স্মরণ হয়। অতএব এ আপত্তির কোনও সার্থকতা নাই। নিতান্ত ক্রোধের অবস্থায় প্রেমিকা সুন্দরী পত্নীর মুখশ্রীও বিরূপ ও কদর্য্য বলিয়া মনে হয়। সুস্থাবস্থায় সেই মুখ বড়ই সুন্দর। কামোন্মাদের সময় অতি কদর্য্য মুখও সুশ্রী বলিয়া মনে হয়।

সুতরাং দেখিতে পাই, মনের অবস্থার উপরেই বাহ্য দৃশ্য নির্ভর করিতেছে। মনের অবস্থার পরিবর্ত্তনে বাহ্য বস্তুর বোধ পরিবর্ত্তিত ও বিপর্য্যস্ত হয়। সম্মোহনের (Hypnotism) বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সম্মোহন মনের জাগ্রৎ অবস্থা। কিন্তু নরেন্দ্র নিজেকে বিরাজ মনে করিতেছে। যখন সম্মোহন (Hypnotic Spell) কাটিয়া যায়, তখন নরেন্দ্র নিজেকে নরেন্দ্রই মনে করে। বিরাজ রূপ ভ্রান্তি কাটিয়া যায়। বিরাজ বলিয়া প্রতীতি মিথ্যা। সম্মোহিত অবস্থায় কাগজকে বাতাসা বলিয়া দিলে, তাহাই বাতাসা বলিয়া বোধ হয়। অতএব দেখিতে পাই, জাগ্রৎ দৃশ্যেরও বাধ হয়। জাগ্রৎ অবস্থার মন স্বপ্নে অন্য রূপ; এবং সুষুপ্তিতে সুপ্ত, সুতরাং মন প্রবাধিত হয়। অতএব মনকে মিথ্যা বলিতে পারি। মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে মনের নানারূপতা অবশ্যম্ভাবী। এক অবস্থা অন্য অবস্থা দ্বারা বাধিত হয়।

ভ্রান্তি, সংশয়, সন্দেহ, জ্ঞানে বাধিত হয়। সুতরাং মনের বাধ হয়। মনের মিথ্যাত্ব নির্ণয় হইলেই দৃশ্য প্রপঞ্চ মিথ্যা। কিন্তু যতক্ষণ মন আছে, ততক্ষণ দৃশ্য প্রপঞ্চের ব্যবহার আছে। মন জড়, মন দৃশ্য। অতএব মন মিথ্যা। মন পরিচ্ছিন্ন, অতএব মন মিথ্যা। পরিচ্ছিন্ন বস্তুই বাধিত হয়। দৃগ্‌ই অবাধিত। মিথ্যাই বাধিত হয়, সত্য অবাধিত। এখন দেখিতে হইবে, মিথ্যা কি? একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। মৃগতৃষ্ণিকায় জল-ভ্রান্তি। ভ্রান্তি বা মিথ্যা জ্ঞান কি? অতস্মিং স্তদ্‌ বোধ হয়। যাহা যাহা নহে, তাহাকে তাহা মনে করাই ভ্রান্তি বা মায়া। মৃগতৃষ্ণিকায় জল নাই, সে স্থলে জলবোধই ভ্রান্তি।

রজ্জুতে সর্প বোধ ভ্রান্তি। ঝিনুকে রজতবোধ ভ্রান্তি। স্থানুতে পুরুষবোধ ভ্রান্তি। ভূমির রেখায় সর্পবোধ ভ্রান্তি। ঐন্দ্রজালিকের মায়ায় সত্যবোধ ভ্রান্তি। পূর্ব্ব দিকে পশ্চিমবোধ ভ্রান্তি। এই সকল ভ্রান্তির দৃষ্টান্ত। এখন দেখা যাক্‌। ভ্রান্তি কি? রজ্জুকে সর্প মনে করাই ভ্রান্তি। রজ্জুতে সর্প নাই। যখন রজ্জুবোধ জন্মিল, তখন সর্প রজ্জুতে লুকাইল ইহাও নহে। যতক্ষণ মিথ্যা জ্ঞান আছে, ততক্ষণ মিথ্যার প্রতীতি আছে। কিন্তু জ্ঞান জন্মিলে আর মিথ্যা বোধ থাকে না। অতএব মিথ্যাকে সৎ বলা যায় না, অসৎ বলা যায় না, অতএব মিথ্যা সদসৎ বিলক্ষণ। রজ্জুরূপ বস্তুতে সর্পরূপ উপাধিই মিথ্যা। কারণ অতস্মিং স্তদ্‌ বোধই মিথ্যা। রজ্জুতে সর্পের তিন কালেই অভাব। রজ্জুর কোন দেশেই সর্প নাই। অভাবের প্রতিযোগীই মিথ্যা। যখন রজ্জুতে সর্প বোধ হইতেছে, তখনও প্রকৃত প্রস্তাবে রজ্জুতে সর্প নাই। মরীচিকায় জল কোনও কালে কোনও দেশেই নাই। জলাভাবের প্রতিযোগীই মিথ্যা বা ভ্রান্তি। সর্প জ্ঞানের আশ্রয়, রজ্জু জ্ঞান। অজ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞান। অজ্ঞানকে জানি আমি—এই অর্থেই আশ্রয় বলা হইয়াছে। এস্থলে দেখিতে পাই আশ্রয়ই সৎ। আধারই সৎ। কিন্তু আশ্রয়ে আশ্রিত বস্তুর একান্ত ও অত্যন্ত অভাব। রজ্জুরূপ আশ্রয়ে সর্পের অত্যন্তাভাব। শুক্তিরূপ আশ্রয়ে রৌপ্য কোনও স্থানেই নাই, পূর্ব্বে দেখিয়াছি উপাধির ত্রৈকালিক অভাব। এখন দেখিলাম আশ্রয়রূপে সর্ব্বদেশেই অভাব। স্থানুর কোনও স্থানেই পুরুষ নাই।

বাঙ্গালীর গান

[শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

(কীর্ত্তন)

বাঙ্গালী, এই কি তুমি, সেই বাঙ্গালী, অনাহারী!
ও যার অন্নছত্র, অহোরাত্র, চল্‌তো আপন বাড়ী-বাড়ী!
কোথায় ধান গোলাভরা, আঙ্গিনাতে গোবর-ছড়া,
স্বাস্থ্যবতী কোথায় সে সব বর-নারী!
কোথায় সব জোয়ান ছেলে, জোয়ান মেয়ে, চলতো
পথে সারি-সারি!
কোথায় ভালবাসা-বাসি, কোথায় সেই বা মিষ্ট হাসি,
কোথায় প্রেয়সী বধূ শঙ্কাহারী!
আজ বেশ-বিলাসী সর্ব্বনাশী অলঙ্কারে অহঙ্কারী!

কোথায় সেই বা পল্লী-শোভা, কোথায় নারী মনোলোভা,
হায় রে এখন কেমন যেন ছাড়াছাড়ি।
না ধরেন চরকা কেহ, সেজে-গুজে পরে বেড়ান সেমিজ-শাড়ী!
কোথায় সে হোলী-খেলা, কোথায় সে চাঁদের মেলা,
কোথায় সে আমোদ-প্রমোদ বাড়াবাড়ি!
এখন পায় না খেতে দিনে-রেতে হায় কি ভীষণ কাড়াকাড়ি!
কোথায় সে পুণ্যচরিত, কোথায় সে প্রাণের সুহৃৎ,
কোথায় সেই প্রাচীন মানুষ সদাচারী!
এখন যেমন দেবা, তেম্‌নি দেবী, ঘরে ঘরে ঝগ্‌ড়া ভারী!

বিপর্য্যয়

[শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্]

(৪)

পৌষ-সংক্রান্তির দিন দুপুরবেলায় অমল হঠাৎ ইন্দ্রনাথের মেসে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন মেসের সব ছেলে মহা ব্যস্ত—মেসে পিঠে তৈয়ার হইতেছে। সকলে মিলিয়া বিপুল আয়োজন করিয়া পিঠে, পায়স এবং লুচি-তরকারী প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করিতেছে। মেসের ভিতর ইন্দ্রনাথের পিঠে সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞান ছিল; তাই তার উপর ভার পড়িয়াছে পাটিসাপ্টা প্রস্তুত করিবার। যখন অমল আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইল, তখন ইন্দ্র চার-পাঁচটা ব্যর্থ চেষ্টার পর, একটা পাটিসাপ্টা জড়াইয়া তুলিয়াছে;—চারিদিকে ছেলেরা "Bravo, Bravo" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। অমল কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। পরের বার পাটিসাপ্টাটা জড়াইতে গিয়া আবার একটু ছিঁড়িয়া গেল। অমল তখন অগ্রসর হইয়া বলিল, "সর, ও তোমার কর্ম্ম নয়!" বলিয়া ইন্দ্রের হাত হইতে ঝিনুকটা কাড়িয়া লইয়া ভাজিতে আরম্ভ করিল। চট্‌পট্‌ করিয়া নিখুঁত পাটিসাপ্টা ভাজা হইয়া উঠিতে লাগিল,—সবাই অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল।

পাটিসাপ্টা ভাজা শেষ হইলে, অমল ইন্দ্রনাথকে লইয়া তাহার ঘরের ভিতর ঢুকিল।

ঘরে আসিয়া সে ইন্দ্রনাথকে তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় পরিয়া লইতে হুকুম করিল। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? কোথায় যেতে হবে?"

"আমাদের ওখানে তোমার পিঠে খাবার নিমন্ত্রণ।"

ইন্দ্র একটু আপত্তি করিল। এ সম্বন্ধে বাগ্‌বিতণ্ডা হইতে-হইতে, মেসের তিন চারিটি ছেলে থালায় করিয়া অমলের জন্য পিঠে আনিয়া উপস্থিত করিল। অমল ইন্দ্রকে টানিয়া লইয়া খাইতে বসিয়া গেল। তার পর ইন্দ্রকে সঙ্গে যাইতেই হইল।

অমলদের বাড়ীতে ইন্দ্রের এই প্রথম খাইবার নিমন্ত্রণ। অমলের বৃহৎ প্রাসাদ, তার আসবাবের ঘটা প্রভৃতি তার দেখা ছিল; কিন্তু আজ তার অমলদের বাড়ীর ভিতরের দিকটা কতক দেখা হইল।

তাহাদের পিঠে খাইবার জায়গা হইয়াছিল অমলের পড়িবার ঘরের সামনে একটা ছোট "লনে"র উপর। সে এবং অমল একখানা বেতের বড় টেবিলের সামনে বসিল। সে টেবিলের উপর খুব দামী একখানা ঢাকনা দেওয়া ছিল। আর তার উপর নানারকম পিঠে ঢাকা-দেওয়া পাত্রে সাজান ছিল। পূর্ব্ববঙ্গ পিঠের দেশ; বিশেষতঃ, ইন্দ্রের মা পিঠের

বিষয়ে বিশেষ নামজাদা কারিগর ছিলেন। কাজেই, নানা জাতীয় পিঠের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কিন্তু সে দেখিতে পাইল যে, তার জানা নানা রকমের পিঠে ছাড়াও, এখানে অজ্ঞাতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব নানাবিধ পিষ্টক সজ্জিত রহিয়াছে।

তাহারা আসিয়া বসিবামাত্র, অমলের মা আসিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিলেন; এবং নিজে এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্রনাথকে দিলেন। খাইতে-খাইতে তাহারা গল্প করিতে লাগিল। অমলের মা একটা সেলাই হাতে করিয়া বুনিতে-বুনিতে, ইন্দ্রের সঙ্গে পিঠে সংক্রান্ত নানাবিধ গল্প জুড়িয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি সদ্যফোটা গন্ধরাজের মত ঝক্ঝকে, নির্ম্মল একটি বালিকা-মূর্ত্তি একখানা প্লেট হাতে করিয়া উপস্থিত হইল। অমল তাহার পরিচয় দিয়া বলিল, "এ আমার বোন অনীতা।"

অনীতার বয়স বছর তের-চৌদ্দ হইবে, কিন্তু তার চাল-চলন, হিন্দু-ঘরের চৌদ্দ বছরের মেয়ের চেয়ে অনেকটা হাল্কা ধরণের। সে যেন একটা মূর্ত্তিমতী প্রাণশক্তির মত নাচিয়া-নাচিয়া চলে। তার চঞ্চল উজ্জ্বল চক্ষু যেন একটু অতিমাত্র অবাধ আনন্দে নৃত্য করে। তার মুখ সুন্দর;—হয় তো সরযূর মত নিখুঁত নয়,—কিন্তু খুব সুন্দর। আর সরযূর অযত্নের শোভার কাছে, ইহার পটুহস্তে প্রসাধিত, উজ্জ্বল, মলালেশশূন্য, সদ্যঃস্নাত মুখখানা একটু যেন বেশী মনোরম বলিয়াই ইন্দ্রনাথের মনে হইল। সরযূ শান্ত-স্নিগ্ধ; এ যেন তরল আনন্দে টল্‌টল্ করিতেছে; জীবন যেন ইহার অঙ্গে-অঙ্গে উছলিয়া পড়িতেছে।

অনীতা প্লেটখানা হইতে একটা নূতন রকমের পিঠে তুলিয়া ইন্দ্রের প্লেটে দিতে গেল। ইন্দ্র আপত্তি করিল; বলিল, "আর কেন দিচ্ছেন,—আমি কিছুতেই আর খেতে পারবো না।"

অনীতা ছাড়িল না। অমল এবং অমলের মা ধরিয়া বসিলেন,—সেটা খাইতে হইল। অমল হাসিয়া বলিল, "অনি, তুই আজ বোধ হয় মাটিতে পা ফেলবি নে,—তোকে ইন্দ্র আপনি ব'লেছে,—প্রায় লেডী হ'য়ে উঠেছিস্ আর কি?"

অনীতা খুব হাসিয়া উঠিল। বলিল, "সত্যি ইন্দ্রবাবু, এ আপনার ভারি অন্যায়! আমাকে 'আপনি' বল্লে আমার ভারি হাসি পায়। ও সব ব'লবেন না।"

অমলের মা বলিলেন, "তা বই কি! এক ফোঁটা মেয়ে—ওকে আবার 'আপনি' কি!"

ইন্দ্র মহা গোলমালে পড়িয়া গেল। চট্ করিয়া সে ইহাকে "তুমি" বলিতে পারিল না; "আপনি" বলাও অসম্ভব। তাই কিছুক্ষণ তার কথা বলিতে বেশ একটু মুশাবিদা করিয়া "তুমি" ও "আপনি" উভয়ই বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইল। শেষ পর্য্যন্ত "তুমিটা" অভ্যস্ত হইয়া আসিল।

ইন্দ্র অমলকে বলিল, "এত রকম পিঠে যে সংসারে আছে, তাই কোনও দিন জানতুম না। আচ্ছা, এ সব কি তোমাদের বাবুর্চ্চি বানায়?"

"তবেই হয়েছে! এ সব মা আর অনি ব'সে বানিয়েছে। আজ সমস্তটা সকাল ব'সে ব'সে এই কীর্ত্তি হ'য়েছে।"

এই সাহেব-বাড়ীর নিমন্ত্রণ ইন্দ্রের মনের ভিতর একটা প্রকাণ্ড ছাপ মারিয়া দিল। সে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার নিজের বাড়ীর পিঠে খাওয়ার কথার তুলনা করিল। রান্না-ঘরের কাঁচা বারান্দায় বসিয়া মা পিঠে ভাজেন; আর বারান্দাময় ছেলে-পিলে,—যে যেমন আছে বসিয়া যায়। তার তুলনায় এ ব্যাপার যে কত সুন্দর, কত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কত নীরব ও কত তৃপ্তিপ্রদ, তাই সে ভাবিল। অমলের মা নিজে-হাতে পিঠে তৈয়ার করিয়া, নিজে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন,—চাকর-বাকরের সংস্পর্শ মাত্রও ইহাতে ছিল না। ইন্দ্রের মা যদি ঠিক এমনি অবস্থায় অমলকে নিমন্ত্রণ করিতেন, তবে, প্রথমতঃ এমন সুন্দর শোভন পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকিতেন না;—খুব সম্ভবতঃ ময়লা, তেঁলেলের কালীযুক্ত একখানা কাপড় পরা থাকিত। বাসন-পত্রগুলি আগাগোড়া এমন থক্-থকে বা পরিচ্ছন্ন হইত না,—কোনও কিছুই এমন হইত না। তা' ছাড়া, একটা মহা হাঙ্গাম হুজ্জত, ডাকাডাকি, চেঁচামেচি হইত। এ কথা ইন্দ্র আজ স্বীকার না করিয়া পারিল না যে, এই ইঙ্গবঙ্গ সমাজের পরিচ্ছন্নতা ও কর্ম্ম-সৌষ্ঠব একটা অনুকরণ করিবার বস্তু!

আর একটা বিষয় তার মনে হইল—সে অনীতা। অনীতা সুন্দরী, অনীতা মনোহারিণী। তাই অনীতার ছবি চোখে পড়িতেই, তার পাশে তার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল তার সরযূর ছবি! সরযূ তার প্রিয়া—অনীতা প্রিয়া নহে। কাজেই, তার মন সরযূকে রূপে অনীতার কাছে খাটো

করিতে পারিল না। কিন্তু অনীতার শিক্ষা, দীক্ষা, তার সহজ প্রসন্নতা, তাহার কথা-বার্ত্তার ভিতর প্রতিভার ছাপ,—এ সব সে অনুভব করিল। সে বুঝিল, সরযূর ইহা নাই। স্থির করিল, সরযূকে সে অনীতার মত করিয়াই গড়িয়া তুলিবে।

অনীতার প্রতি তার মন এমন কোনও ভাবে আকৃষ্ট হয় নাই, যাহাতে সরযূর প্রতি সে বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাসী হয়। তার প্রাণ এখন ওতপ্রোত ভাবে সরযূর প্রেমে ভরপূর। সরযূ উদ্ভিদ্যমানা যৌবনশ্রী তার চোখে একটা এমন নেশার ঘোর লাগাইয়া রাখিয়াছিল যে, সে বিশ্ব-সংসারে আর কাহাকেও প্রেমের চক্ষে দেখিতেই পারিত না। সে সুন্দরী নারীকে দেখিত,—কেবল তুলনায় সরযূর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য। গুণবতী নারীর চরিত্র সে অনুশীলন করিত,—সরযূর ভিতর সেই সমুদয় গুণের বীজ অনুসন্ধান করিতে, এবং সরযূর ভিতর সেই সব গুণ ফুটাইয়া তুলিবে বলিয়া। শিল্পী যেমন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া শিল্প রচনা করে, ইন্দ্র তেমনি আজ অনীতাকে সামনে রাখিয়া তার সরযূর চরিত্র-গঠনের সঙ্কল্প গড়িয়া তুলিতে লাগিল।

ইহার পর সে অনেক দিন অমলদের বাড়ী গিয়াছে; অনেক দিন অনীতার সঙ্গে তার কথাবার্ত্তা হইয়াছে। অনীতা তাহার রীতিমত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'ইন্দ্রদার' মতামতের পক্ষ হইয়া সে দাদার সঙ্গে অনেক তর্ক করে; ইন্দ্রদা'কে কথায়-কথায় সালিস মানে। তার যত সব প্রশ্ন, তার সমাধানের জন্য ইন্দ্রদা'র কাছে আসে। তার এ সবের ভিতর এক ফোঁটা সঙ্কোচ নাই, কোনও উদ্বেগ নাই;—সে অত্যন্ত সহজ, সরল ভাবে ছোট বোনটার মতই ইন্দ্রনাথকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। কাজেই, ইন্দ্রনাথের অনীতার চরিত্র, বিদ্যা, সাধ্য সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট একটা ধারণা গড়িয়া উঠিল।

(৫)

এফ-এ, পরীক্ষা দিয়া ইন্দ্রনাথ যখন বাড়ী আসিল, তখন যেন তার বাড়ীটা বড় শ্রীহীন বোধ হইতে লাগিল। তার মা-বোন এবং স্ত্রী যে প্রায় ময়লা কাপড় পরিয়া থাকেন, ঘর-দুয়ার যে অনাবশ্যক রকম নোংরা এবং অপরিচ্ছন্ন থাকে, খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম যে অনেকটা সংস্কার-সহ—এসব কথা তাহার খুব বেশী মনে হইতে লাগিল। সে এ সম্বন্ধে তার মা ও বোনকে মাঝে-মাঝে বক্তৃতা শুনাইত; এবং অমলদের বাড়ীর আশ্চর্য্য পরিচ্ছন্নতার কথাও দু'চারবার তাঁহাদিগকে শুনাইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে তাঁহারা কেবল হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

সে উঠিয়া-পড়িয়া গৃহ-সংস্কারে লাগিয়া গেল। প্রথম নিজের ঘরটি খুব করিয়া মাজিয়া-ঘসিয়া ঝক্-ঝকে করিল। দুয়ারে-জানালায় পরদা টাঙাইল; টেবিল সাজাইল; আর সরযূকে দিন-রাত ঝাড়া-পোঁছার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিল। তার পর মায়ের ঘর পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। তার পর সে রান্না-খাওয়ার সংস্কার-চেষ্টা করিল। মাকে বলিল, "সাহেবেরা সাতটার সময় চা আর ন'টার সময় ব্রেকফাষ্ট খায়,—তোমরা তা পারবে না কেন?" মা হাসিয়া উড়াইলেন। মনোরমা বলিল, "দাদা, বউকে শিখিয়ে নাও—উনি বিবি হয়ে তোমার বেকফাষ্ট ক'রবেন।" কিন্তু ইন্দ্র সহজে ছাড়িল না। বাড়ীতে তিনটা টাইমপিস্ ছিল। সে একটা রান্নাঘরে, একটা ভাঁড়ার-ঘরে, আর একটা মায়ের ঘরের বারান্দায় লাগাইল। সবাইকে টাইম বাঁধিয়া দিল,—কটায় উঠিতে হইবে,—কটায় তরকারী কুটিতে হইবে,—কটায় রান্না চড়াইতে হইবে ইত্যাদি। সে নিজে যাইয়া সব টাইমে ঘণ্টা দিতে লাগিল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। একদিন বই দুই দিন নিয়ম-মত কিছু চলিল না।

স্ত্রীকে সে অনীতার আদর্শে গড়িবার চেষ্টা করিল। প্রথমতঃ, দিনের মধ্যে কতবার তাহার প্রসাধন করিতে হইবে, তাহা ঠিক করিয়া দিল। কখন কি কাপড় কেমন করিয়া পরিবে, এবং সদা-সর্ব্বদা কেমন ছবির মত থাকিবে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দিল। সরযূ বলিল, "পায়ে পড়ি, আমায় মাপ কর। আমি সব সময় পটের বিবি সেজে থাকলে, লোকে ব'লবে কি?"

ইন্দ্র বলিল, "পটের বিবি তোমায় কে হ'তে ব'লছে! শরীরটা সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন রাখবে! এতে লোকে যা বলে বলুক!"

"আর তা' ছাড়া, সে কি হয়,—ঘর ঝাঁট দেওয়া, রান্না করা, ঘর নিকানো,—এই সব সংসারের কাজে কি পরিষ্কার হয়ে সব সময়ে থাকা যায়?"

"থাকা যায় কি না, যদি দেখতে তবে বুঝতে।" ইন্দ্রনাথ মনঃক্ষুণ্ণ হইল।

সরযূ কাঁদো-কাঁদো মুখে বলিল, "রাগ করো না,—তুমি যা' ব'লবে, আমি তাই ক'রবো। তোমার কাছে আমি কখনও অপরিষ্কার হ'য়ে থাকবো না।"

সরযূ এ প্রতিজ্ঞা রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল,—পারে নাই। ৫।৭ দিনের মধ্যে সবই আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। ইন্দ্র ক্ষুব্ধ হইল; কিন্তু একেবারে হাল ছাড়িল না। সে স্ত্রীর উপর মাঝে-মাঝে বিরক্ত হইতে আরম্ভ করিল। আর সর্ব্বদা তাহাকে সংশোধনের চেষ্টা করিয়া, নিজেকে স্ত্রীর কাছে নিতান্ত ভয়াবহ করিয়া তুলিল। সরযূর যেন সব বুদ্ধি তালগোল পাকাইয়া গেল। সে এমন সব কাণ্ড করিতে লাগিল, এবং এমন এক-একটা কথা বলিতে লাগিল, যাহা অনীতার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। ইন্দ্রনাথ এক-এক সময় ভাবিত যে, অনীতা হইবার যোগ্য গুণ বা শক্তি বুঝি বা সরযূর নাই।

অনীতার অত্যুজ্জ্বল মূর্ত্তি সরযূর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া, সরযূকে সবদিক দিয়া যেন অত্যন্ত খাটো বানাইয়া দিল। ইহাতে ইন্দ্রনাথের মনটা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে বুঝিল যে, চট্ করিয়া সরযূকে অনীতা করিয়া তোলা অসম্ভব। তার বর্ত্তমান আবেষ্টন হইতে তাহাকে সরাইয়া না লইতে পারিলে, সরযূর সম্বন্ধে আশা-ভরসা করা মিথ্যা। সে স্থির করিল, পড়াশুনা শেষ করিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব সে চাকরী আরম্ভ করিয়াই, সরযূকে এই আবেষ্টন হইতে একেবারে মুক্ত করিয়া, নিজের কাছে লইয়া যাইবে। তার পর সরযূকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা যাইবে।

আপাততঃ সে সরযূকে পড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এবার আর তার নিজের ফাঁকিলি বিশেষ হইত না; কিন্তু সরযূ গৃহকর্ম্ম লইয়া এত ব্যস্ত থাকিত যে, পড়াশুনায় যথেষ্ট সময় দিতে পারিত না; এবং রাত্রে প্রায়ই শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িত। ইন্দ্র বলিত, "তুমি এত কাজ করিতে যাও কেন? কে তোমায় এত কাজ ক'রতে বলে?"

সরযূ বলিত, "ওমা, সে কি হয়? মা, ঠাকুরঝি এঁরা সব কাজ ক'রবেন, আর আমি ঘরে বসে' বই নিয়ে থাকবো। তা' হ'লে যে আমায় সবাই থুক্ দেবে।"

"থুক্ দেয় দেবে। লোকের প্রশংসা কুড়িয়ে কেউ পরমার্থ লাভ করে না। নিজের মনটাকে তৈয়ারী ক'রলে, সে প্রশংসার চেয়ে ঢের বেশী উপকার হ'বে।"

"তুমি কি যে বল! আমি কি প্রশংসা চাই না কি? কিন্তু মা ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ আনলেন সেবা ক'রবে বলে। তিনি খেটে মর'বেন, আর আমি ব'সে বই পড়বো,—এটা কোন্ ধর্ম্মে বলে।"

"বলে, আমার ধর্ম্মে বলে। তা' ছাড়া, মা তোমাকে কাজ ক'রতে বলেন না। মাও তোমাকে প'ড়তে বলেন, আমিও বলি। স্বামী আর শাশুড়ীর কথা না শোনা কোন্ ধর্ম্মে বলে।"

"আমি কি শুনি নে তোমার কথা?"

"কই শোন? আমি বলছি, কাল সকালে সাতটা থেকে সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত বসে তুমি প'ড়বে,—উঠতে পাবে না। শুনবে তো?"

"সকাল বেলায়? আর মারা সব রান্নার যোগাড় দেবেন, ঘর নিকোবেন? এ কি হয়? আচ্ছা, কাল দুপুরবেলায় কাজ-কর্ম্ম সেরে আমি পড়বো। কেমন?"

"কাজ-কর্ম্ম তোমাদের মিটতে তো তিনটে। তার পর আর কতক্ষণই বা পড়বে। না, সে হ'বে না। তোমায় প'ড়তেই হ'বে,—আমি মাকে বলবো 'খন।"

"লক্ষ্মীটি, তোমার পায় পড়ি। মাকে তুমি বলো না। আমি তোমায় পড়া করে দেবো,—যেমন করে পারি ক'রবো —তুমি কাউকে কিছু বলো না—আমি তা হ'লে লজ্জায় মরে যাব।"

ইহার পর কয়েক দিন পড়াশুনা রীতিমত চলিল।

একদিন সকালবেলায় সরযূ মনোকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল; বলিল, "ঠাকুরঝি, তোর হ'য়েছে কি?"

বাস্তবিক মনো কাল সারারাত্রি জাগিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছে। ভ্রাতৃজায়ার এ স্নেহ-সম্বোধনে সে কাঁদিয়া ফেলিল। সরযূ ত্রস্ত ভাবে মনোর মুখখানা বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল, "কি হ'য়েছে দিদি, বল্, আমার বড় ভয় ক'রছে।"

মনোরমা বলিল যে, আজ সাত দিন সে স্বামীর কোনও চিঠি-পত্র পায় নাই। শেষ পত্রে স্বামী লিখিয়াছিলেন যে, তাঁর শরীর খারাপ—জ্বর ও কাশি হইয়াছে। তার পর আর সে তাঁর কোনও খবরই পায় নাই। কাল রাত্রে

সে একটা ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া, সেই হইতে কাঁদিয়া কাটাইয়াছে।

মনো বৌদিদির হাত ধরিয়া বলিল, "বৌদি, ভাই, তুমি যদি আজকে ব'লে কয়ে' আমাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবার জোগাড় ক'রে দিতে পার, তবে আমি তোমার চরণামৃত খাব।"

বালিকা সরযূর বুক কাঁপিয়া উঠিল। তার মনোর স্বামীর জন্ম বড় চিন্তা হইল বটে; কিন্তু এ বয়সটা নাকি খুব স্বার্থপরতার বয়স, তাই চিন্তাটা একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া গেল। সেও তো এমনি মাসের পর মাস তার স্বামীটিকে ছাড়িয়া থাকে! যদি তাঁর কোনও দিন কিছু একটা হয়, আর সে এমনি চিঠি না পায়, তবে সে কি ভয়ানক! ভাবিতে সে শিহরিয়া উঠিল; এবং মনোরমার প্রতি সমবেদনায় তার প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

সরযূ তখনি আবার তার ঘরে ফিরিয়া গেল। ইন্দ্রনাথ তখনো ঘর হইতে বাহির হয় নাই। সে তখন—এখন আর দাঁতনে নয়, খুব দামী টুথ ব্রাশে পেষ্ট দিয়া দাঁত মাজিয়া মুখ ধুইয়া কামাইতে বসিয়াছিল—এটা এখন তার নিত্যকর্ম্ম। সরযূ যে দিনের বেলায় ভরসা করিয়া তাহার কাছে আসিতে পারিয়াছে, তাহা দেখিয়া সে খুসী হইল; কিন্তু তার বেদনা-কাতর মুখখানা দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল।

সরযূ সব কথা বলিয়া, মনোরমাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবার প্রস্তাব করিল। ইন্দ্র বলিল, "আরে হাঁ, অত ভয় কিসের? সর্দ্দি জ্বর হ'লেই বুঝি অমনি একটা কিছু হ'বে—চিঠি লেখেনি কি না কি হ'য়েছে—আচ্ছা, আমি একটা টেলিগ্রাফ করে দিচ্ছি।"

সরযূ বলিল, "না গো না, সে একটা ভারি বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছে! তুমি গুরুজন, তোমাকে ব'লতে নেই—সে স্বপ্নে বড় অমঙ্গল!"

"ভাল রে পাগল! স্বপ্নে মঙ্গল বা অমঙ্গল কিছু হ'তে পারে না জান? স্বপ্নগুলো হ'চ্ছে, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আমরা যা চিন্তা করি, তাই। ঘুমান চিন্তা যদি ফলবে, তবে আমাদের জাগ্রত চিন্তাই বা সব সত্যি হ'বে না কেন?"

সরযূ। তা বই কি? স্বপ্ন ফলে না বই কি? এই এবার তুমি যে দিন এলে, সে দিন তোমার আসবার কোনও সম্বাদ ছিল না। সে দিন ভোরের বেলায় আমি স্বপ্ন দেখলাম তুমি এসেছ,—আর তুমি সেই দিনই এলে!"

হো হো করিয়া হাসিয়া ইন্দ্র বলিল, "জান, এই যে যুক্তি, একে আমাদের লজিকে বলে post hoc ergo propter hoc—এর সংস্কৃত কি একটা নাম ভাল, আমাদের প্রফেসার ব'লেছিলেন, কাক বসলো আর—হাঁ হাঁ কাকতালীয় ন্যায়। বেড়াল বসে'-বসে' তপস্যা করে যে, শিকের-তোলা দুধের বাটীটা পড়ে যা'ক। মাঝে মাঝে তার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েও। তাই বলে কি বলতে হ'বে যে, শিকেটা বিড়ালের তপস্যার জোরে ছেঁড়ে?"

সরযূ মনে-মনে বুঝিল যে, এ সব যুক্তি একেবারে ভুল। তার মনের তপস্যা, আর বেড়ালের তপস্যা না কি এক হইল! বা রে! কিন্তু সে কথা লইয়া সে তর্ক করিল না। নিতান্ত জোর করিয়া ধরিয়া বসিল, ঠাকুরঝিকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতেই হইবে।

মনোরমা তখন অন্তঃসত্ত্বা। সেই জন্যই তার শাশুড়ী তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়াছেন। কথা আছে যে ছেলে না হওয়া পর্য্যন্ত সে বাপের বাড়ীতেই থাকিবে। এ অবস্থায় তাকে, খবর নাই, বার্ত্তা নাই, হঠাৎ শ্বশুরবাড়ী পাঠান যায় কি রকমে? এই প্রকার নানা ওজর-আপত্তি ইন্দ্র তুলিল, কিন্তু সরযূ কিছুই শুনিল না। অবশেষে স্থির হইল যে, তখনি আরজেণ্ট টেলিগ্রাফ করিয়া মনোর স্বামীর খবর আনাইতে হইবে। এদিকে মনো প্রস্তুত থাকিবে,—কোনও দরকার হইলে তার অবশ্যই যাইতে হইবে।

টেলিগ্রাফের জবাব যাহা আসিল, তাহা পড়িয়া ইন্দ্রনাথের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। মনোরমার স্বামীর নিউমোনিয়া হইয়াছে,—বিশেষ চিন্তার কারণ,—মনোরমাকে পাঠাইলে ভাল হয়। বুকের ভিতর তার যে সব ভীষণ আশঙ্কা তাল পাকাইয়া উঠিতে লাগিল, তাহা সে কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিল না। মনোরমাকে বিশেষ কিছু বলা হইল না,—শুধু জানান হইল যে, তার স্বামীর অসুখই করিয়াছে বটে,—তার বোধ হয় একবার যাওয়াই ভাল। ইন্দ্র নিজে মনোরমাকে লইয়া গেল। ইন্দ্রের ছুটির বাকী কয়টা দিন মনোরমার স্বামীর শুশ্রূষায় কাটিয়া গেল। [ক্রমশঃ]

অমরনাথ

[শ্রীনন্দলাল কড়ুরি]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২৫ শে ভাদ্র শনিবার প্রাতে আহারাদি শেষ করিয়া, টোঙ্গায় চড়িয়া পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করা হইল। ১০ মাইল দূরে "আসমোকাম" নামক স্থানে গিয়া অবস্থান করা হইল। তখন বেলা ২টা হইয়াছিল। যে সময় ছিল, তাহাতে আরও ১০ মাইল পথ অনায়াসে যাওয়া যাইত; কিন্তু রাজাদেশ—"ছড়ির" অগ্রে কেহ যাইতে পাইবে না। আমাদিগকে এই স্থান হইতে বস্ত্রাবাসে শয়ন করিতে হইল। সৈনিকের ন্যায় আপনারাই ঘোড়াওয়ালার সাহায্যে তাম্বুর দড়া-দড়ি খাটাইয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিলাম। রাত্রিতে পাণ্ডাদের একটী পণ্ডিতের দ্বারা পুরি ও তরকারী প্রস্তুত করাইয়া, দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সম্পন্ন করিলাম; এবং শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলাম। এক্ষণে আর পিস্থর কামড় সহিতে হইল না। কতক রাত্রে বৃষ্টির জন্য নিদ্রা ভঙ্গ হইল। প্রাতে কোন গতিকে আহারাদি করিয়া যাত্রা করা হইল। আমাদের মধ্যে কু বাবু অশ্বারোহণে এবং আমি, হা বাবু, কি বাবু তিনজনে পদব্রজে যাত্রা করিলাম। রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলাম, ভয়ানক কর্দ্দমে রাস্তা পূর্ণ হইয়াছে। কিছুদূর গিয়াই শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল; কিন্তু আর কোন উপায় নাই;—যাইতেই হইবে। যখন সন্ধ্যার সময় "পড়ায়" (চটি) পৌছিলাম, তখন একেবারে মৃতবৎ হইয়া পড়িলাম। এই স্থানের নাম পহল গাঁ। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণী; মধ্যে অতি সামান্য স্থান। সেই-খানেই পার্ব্বতীয় নদীতীরে তাম্বু ফেলিয়া রাত্রি যাপন করা হইল। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রাজার নিয়োজিত প্রহরী, কর্ম্মচারীগণ, ডাক্তারখানা, দোকান-পসারী সমস্তই আছে। পুরি, তরকারী, চাল, ডাল, ঘৃত লবণ ইত্যাদি আহার্য্য বস্তু সকলই পাওয়া যায়। পরদিন অনেক চেষ্টা করিয়া আর তিনটী ঘোড়া সংগ্রহ করা হইল। এক দিনের শিক্ষায় অনেক জ্ঞান লাভ হইয়া গেল। এখানে যদি ঘোড়া না পাওয়া যাইত, তাহা হইলে বোধ হয় অমরনাথ দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটিত না।

২৮শে ভাদ্র মঙ্গলবার প্রাতে আমরা ৪জন অশ্বারোহণে অন্যান্য যাত্রীদিগের সহিত বাহির হইলাম। অশ্বগুলি সমতল ছাড়িয়া যখন সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিতে লাগিল, তখন প্রথমেই প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই সাহস হইতে লাগিল। মনে করিলাম, পঞ্জাবী মহিলাগণ যখন অনায়াসে অশ্বারোহণে যাইতেছে, তখন আমরা পুরুষমানুষ হইয়া পারিব না কেন? অনেক কষ্টে "চড়াই" "ওৎরাই" করিয়া বেলা ১০ টার সময় চন্দনবাড়ী নামক "পড়ায়" উপস্থিত হইলাম। অদ্য রাজা-দেশে এই স্থানেই অবস্থান করিতে হইবে। অগত্যা এই স্থানেই তাম্বু ফেলিয়া আহারাদি সমাপন করা হইল। বিকালে কর্ম্মনাশা তাসের সাহায্যে সময়াতিপাত করিলাম।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া যাত্রা করিলাম। এইবার যেখান দিয়া যাত্রা আরম্ভ করা হইল, সে স্থান একেবারেই লোকালয়শূন্য। গভীর গিরিবর্ত্ম দিয়া শৃঙ্গে-শৃঙ্গে আরোহণ করিতে হইল; এক এক স্থানে ঘোড়ার পৃষ্ঠে যাওয়া নিরাপদ নহে বলিয়া মধ্যে মধ্যে ঘোড়া হইতে অবতরণ করিতে হইল; এবং অতি কষ্টে গমন করিতে লাগিলাম। এক-এক স্থানে নানারূপ ফুলের গন্ধে অনেকের বমি হইতে লাগিল; অনেকে চাটনী মুখে করিয়া চলিতে লাগিলেন। অনেকেই পথশ্রমে নির্জীব হইয়া পড়িতে লাগিলেন। বিপদের উপর বিপদ এই যে, লোকের বিশ্রাম করিবার একটু প্রশস্ত স্থান নাই। অতি কষ্টে বেলা ১১ টার সময় একটা প্রশস্ত সমতল শৃঙ্গে আরোহণ করা গেল। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া, সকলে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা, কেহ-কেহ বা একঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া লইলেন। অনেকেই পূর্ব্ব-সংগৃহীত আহার্য্য ভক্ষণ করিয়া একটু সুস্থ হইলেন। পুনরায় যাত্রা আরম্ভ হইল। কিছুদূর বেশ রাস্তা পাইয়া মনে হইল, বেশ সুখে যাওয়া যাইবে। কিন্তু একটু যাইবার পরই আবার ভয়ানক স্থানে উপস্থিত হইলাম। আবার ঘোড়া হইতে নামিয়া অতি কষ্টে কিছুদূর গিয়া, একটু প্রশস্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া হাঁপাইতে লাগিলাম। অনেক ঘোড়া পড়িয়া গিয়া স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। যে ঘোড়ার পৃষ্ঠে আমাদের

জিনিসপত্র ছিল, সেই ঘোড়াটা পড়িয়া গেল। ৪।৫ জন সহিসে মিলিয়া অতি কষ্টে ঘোড়া ও জিনিস তুলিয়া, বিশ্রামের পর আবার যাত্রা করিলাম। আমাদের চারিজনের মধ্যে হা বাবু বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কিছুদূর গিয়া "শেষ নাগ" নামক হ্রদের নিকট পৌঁছিলাম। এই হ্রদে স্নান দান সমাপন করিয়া, আবার চড়াই ভাঙ্গিয়া একটী সমতল স্থানে উপস্থিত হইলাম। অদ্য এই স্থানেই বিশ্রাম করিতে হইবে।

বেলাও বেশী নাই। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, তাম্বু খাটাইয়া রন্ধনাদি কার্য্য শেষ করিয়া, আহারাদি করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। এই স্থান অতি ভয়ানক। রাত্রিতে শীতে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। যাহা হউক, রাত কাটাইয়া আবার প্রাতে যাত্রা আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর রাস্তায় যাত্রা করিতে লাগিলাম। একটী ওৎরাইএর সময়, ঘোড়ার উপর থাকা নিরাপদ নহে ভাবিয়া, ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলাম; আবার কখনও ঘোড়ায় উঠিতে লাগিলাম। এইরূপে বেলা একটার সময় পঞ্চতরণী নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। অদ্য এই স্থানেই থাকিতে হইল। তাম্বু ফেলিয়া অদ্য সকলেই এইখানে আহারাদি করিয়া রাত্রি যাপন করিলাম। এখানকার চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতশৃঙ্গ বরফে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; মধ্যে-মধ্যে বৃষ্টি পড়িতেছে। কাঁচা কাঠে অগ্নি না হইয়া কেবল ধোঁয়া হইতেছে। মোটের উপর এই স্থানের অবস্থা লেখনী-মুখে বর্ণনা করা যায় না; উপলব্ধি করাই ভাল। যাহা হউক, নিদ্রায় ও অনিদ্রায় রাত্রি কাটাইয়া, বাহকের উপর তাম্বু ও তাম্বুর সমস্ত জিনিসপত্র রক্ষার ভার দিয়া আমরা সকলে অমরনাথ দর্শনে যাত্রা করিলাম। প্রায় তিন মাইল পথ অশ্বারোহণে গমন করিয়া, সকলে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম। এখানে আর অশ্ব যাইতে পারে না। এরূপ কঠিন রাস্তা আরম্ভ হইল যে, মানুষের যাওয়াই অসাধ্য। এইবারে আমরা অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইলাম। ধীরে-ধীরে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে শ্বাস বন্ধ হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, বুঝি বা এইখানেই জীবন শেষ হইল,—আর দেব-দর্শন ভাগ্যে ঘটিল না,—পথেই দেহপাত হইবে। তাহার উপর অবিশ্রাম বৃষ্টি। মাথার উপর বৃষ্টি; এক হাতে ছাতা, আর এক হাতে লাঠি ধরিয়া আরোহণ। কর্দ্দমাক্ত অপ্রশস্ত পথ। এইরূপে সকলে অতি কষ্টে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিলাম। তাহার উপর আবার ওৎরাই। এইবার বরফের উপর দিয়া সকলে চলিতে আরম্ভ করিলাম। অতি কষ্টে বেলা প্রায় ১২টার সময় অমরনাথ গুহামুখে উপস্থিত হইলাম। অমর-গঙ্গার পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া, গুহামধ্যে প্রবেশ করিলাম; অনেক দিনের আশা আজ পূর্ণ হইল। এত কষ্ট স্বীকার সার্থক হইল। যাহা দেখিলাম, তাহা আশ্চর্য্য ও অলৌকিক। গুহমধ্যে তুষার-নির্ম্মিত প্রশস্ত বেদী। সেই বেদীর উপর রজতগিরিনিভ স্বয়ম্ভু স্বয়ং অধিষ্ঠান করিতেছেন। প্রকৃতি-দেবী কণা-কণা বরফ দিয়া স্বয়ং স্বহস্তে এই শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রতিপদ হইতে আরম্ভ হইয়া প্রত্যেক দিনে বিন্দু-বিন্দু তুষার পতনে এই লিঙ্গ-মূর্ত্তি পূর্ণিমার দিনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত শ্রীঅমরনাথ দর্শন করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইলাম; এবং প্রাণে শান্তি লাভ করিলাম।

"ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে"—মহাকবির এই বাক্যের সত্যতা প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করিলাম এবং হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

বহুদিনের অভীপ্সিত ৺অমরনাথ দর্শন করিয়া আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। আবার সেই "চড়াই" "ওৎরাই", সেই দুর্গম রাস্তা দিয়া বেলা প্রায় ৫টার সময় পঞ্চতরণীতে ফিরিয়া আসিলাম। মনে হইল, যেন ধর্ম্মরাজ দয়া করিয়া আমাদিগকে ফেরত দিলেন। যে রক্ষক এতক্ষণ আমাদের তাম্বু রক্ষা করিতেছিল, সে নদী হইতে জল আনিয়া কর্দ্দম প্রক্ষালন করিতে সাহায্য করিল। তৃণ-নির্ম্মিত পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া, তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া, লুই দিয়া গাত্রাচ্ছাদন করিতে গিয়া দেখিলাম, রক্ষকের অবহেলায় সমস্ত বস্ত্রাদি ভিজিয়া গিয়াছে। "গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডমিব" সুখানুভব হইল। অগত্যা কাঁচা ছোট-ছোট গাছ সংগ্রহ করিয়া, কোনো গতিকে তাহাতেই অগ্নি উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। দুরন্ত শীতে তখন হাত-পা অবশ হইয়া পড়িয়াছে। তখন পূর্ব্ব সংগৃহীত কাঁকনী"তে সামান্য অগ্নি বা গরম কাঠ লইয়া বুকের মধ্য দিয়া এক একবার উত্তাপ গ্রহণ করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিনের পর এইবার বাহিরে অগ্নির

অভাব হইলেও, জঠরাগ্নি প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল। কাজেই, পূর্ব্ব-সঞ্চিত কিছু-কিছু চিপিটক কোন রূপে অর্দ্ধ-ভর্জ্জিত করিয়া, এক-এক মুষ্টি ভক্ষণ করিলাম। সন্ধ্যার সময় পণ্ডিতের (রাঁধুনী ব্রাহ্মণের) সাক্ষাৎ পাইলাম, কিন্তু সে সেদিন পুরি তৈয়ার করিয়া দিতে স্বীকৃত হইল না; অগত্যা "দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধতি" এই বচন প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলাম। পুরি কিনিয়া ফিরিতে তাহার প্রহরাধিক সময় লাগিল। সমস্ত দিনের পর তাহাই দুই-একখানি খাইয়া অমৃতাস্বাদ অনুভব করিলাম। পরে সিক্ত কম্বলে শরীর আচ্ছাদন করিয়া, অনিদ্রায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সকলেই যাত্রা করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। আমাদের ঘোড়াওয়ালার আসিতে বেলা ৮॥০টা হইল; কাজেই আমাদের সকলের শেষে পড়িতে হইল। বেলা দশটার সময় যে পথে আসিয়াছিলাম, সে পথ ত্যাগ করিয়া, অন্য পথে চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুদূর আসিয়া ভয়ানক শীত বোধ হইতে লাগিল। যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই শীতে পা জ্বালা করিতে লাগিল। এই সময় উপর হইতে বিন্দু-বিন্দু তুষারপাত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যখন কাশ্যপ হ্রদের নিকট আসিলাম, তখন কি বাবু শীতে একান্ত অভিভূত হইয়া, ঘোড়া হইতে নামিয়া, পাগলের ন্যায় আগুন, আগুন বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই তুষার-শীতল প্রদেশে অনলের আশা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইল। অগত্যা পুনরায় অশ্বারোহণে কিছুদূর গিয়া দেখা গেল, জনৈক রাজ-প্রহরী এই স্থানে অগ্নি জ্বালাইয়া যাত্রীদের সেবা করিতেছে। তখন "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই মহাবাক্যের সত্যতা অনুভব করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। কি বাবু কিছুক্ষণ অগ্নি সেবন করিয়া সুস্থ হইলে পর, আমরা পুনরায় গমন করিতে লাগিলাম। এবারে এরূপ ভয়ানক "ওৎরাই" আরম্ভ হইল যে, আরোহিগণ ডুলি ও ঘোড়া হইতে নামিয়া, সকলেই পদব্রজে চলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় ভয়ানক কুয়াসা আসিয়া চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন না করিলে, আতঙ্কে অনেকেই জ্ঞানশূন্য হইতেন। ইংরাজ কবির Ignorance is bliss এই কথাটী অতি সত্য বলিয়া মনে হইল। ১০।১২ দিন পর্ব্বতে-পর্ব্বতে বেড়াইতেছি; কিন্তু এরূপ কঠিন "ওৎরাই" একদিনও পাই নাই। পর্ব্বতও এরূপ ভয়ানক যে, ঝর-ঝর করিয়া এক-এক স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতে লাগিল, প্রস্তরখণ্ড চাপা পড়িয়া এইবার মৃত্যু হইবে। বেলা প্রায় ১টার সময় সমতল স্থানে পৌঁছিলাম। এই স্থানে পার্ব্বতীয় নদীর জলে হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। এখানে অনেকে জলযোগ করিয়া লইলেন। এক স্থানে পুরি ভাজিতেছে দেখিয়া, কিনিতে গিয়া শুনিলাম, খাদ্য বিক্রেয় নহে,—ইচ্ছা করিলে বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। কিন্তু তীর্থস্থানে দান গ্রহণ অনুচিত মনে হওয়ায়, অনাহারে অশ্বারোহণে আবার যাত্রা আরম্ভ করিলাম। অনেক চড়াই ওৎরাই করিয়া বেলা ৫টার সময় চন্দনবাড়ী নামক স্থানে পৌঁছিলাম। তাম্বু ফেলা হইল। যাইবার সময় এই স্থানে এক রাত্রি অবস্থান করিয়াছিলাম। এখানে স্নান করিয়া, অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিয়া সুস্থ হইলাম। আকাশ পরিষ্কার হওয়ায়, দুই-একখানি কাপড় ও কম্বল শুকাইতে দিলাম। পরে রন্ধনাদি সমাপন করিয়া আহার শেষ করিতে রাত্রি হইল। সেই রাত্রি কতক নিদ্রা, কতক অনিদ্রায় যাপন করিয়া, পর দিন প্রাতে আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। বেলা প্রায় ১১ টার সময় "পহল গাঁ" নামক স্থানে আসিয়া, পুরি কিনিয়া জলযোগ করতঃ, পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই স্থান হইতে অশ্বিনীকুমার ও কুমারী আর চলিতে চাহিল না। অতি ধীরে-ধীরে সন্ধ্যার সময় আসামোকাম নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া, তাম্বু ফেলিয়া আহারাদি সমাপন করা হইল। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া অশ্বারোহণে যাত্রা করিয়া, বেলা ১০ টার সময় মার্ত্তণ্ডে পাণ্ডার বাড়ীতে পৌঁছিলাম। এই দিন এইখানে সকলের প্রাপ্য টাকা মিটাইয়া পরদিন প্রাতঃকালে টোঙ্গা করিয়া বেলা ৩ টার সময় শ্রীনগরে উপস্থিত হইলাম। এক সপ্তাহ কাশ্মীরে বিশ্রাম করিয়া দর্শনীয় স্থান সমূহ দেখিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলাম।

কাশ্মীরে দুইটী জাতির বাস—এক ব্রাহ্মণ, আর মুসলমান। মধ্যবর্ত্তী কোন জাতি নাই। তবে অনেক পঞ্জাবী হিন্দু ও শিখ এখানে বাস করিতেছেন। এখানকার দর্শনীয় স্থান অনেক আছে। "নিনাদ" নামক রাজোদ্যান প্রকৃতির লীলা-নিকেতন। একত্র এরূপ ফল-ফুলের সমাবেশ আর কোন স্থানে আছে কি না সন্দেহ। "সালেমার" উদ্যানটীও অতি সুন্দর স্থান। সিকারী

নামক নৌকা-যোগে একদিনেই দুই স্থানে যাওয়া যায়। তার পর অন্যদিনে ক্ষীর ভবানী দেবীর মন্দির। টোঙ্গায় যাইলে সন্ধ্যার সময় ফেরা যায়। তার পর নিকটে পর্ব্বত-শৃঙ্গে শঙ্করাচার্য্যের মন্দির; রাজ-বাটীর মধ্যে রঘুনাথ-জীর মন্দির; আরও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অনেক দেখিবার বিষয় আছে।

ফিরিবার কালে, লরিতে আসিবার সময়, কাশ্মীরগামী একখানি মোটর-চালককে রাস্তা দিতে গিয়া, আমাদের চালক একবারে একটী পর্ব্বতের গাত্রের একটী ফলার ন্যায় প্রস্তরে ধাক্কা লাগাইয়া দিল। লরির এক ধারের আচ্ছাদন চূর্ণ হইয়া গেল। হা বাবু সেইদিকে ছিলেন; তাঁহাকে টানিয়া কোলের নিকট না লইলে তিনিও সেই সঙ্গে চূর্ণ হইয়া যাইতেন। তবে রাখে হরি, মারে কে? আমরা নিরুপায় হইয়া সকলে নামিয়া পড়িলাম। কুলির সাহায্যে মালপত্র নামাইয়া ফেলিলাম। কিছুক্ষণ পরে রাওয়ালপিণ্ডি হইতে আগত একখানি লরির ড্রাইভারের সাহায্যে আমাদের ড্রাইভার অনেক কষ্টে ২ ঘণ্টার পর গাড়ী ঠিক রাস্তার উপর উঠাইতে সমর্থ হইল। তাহার পর পুনরায় গাড়ী চলিতে লাগিল। বেলা প্রায় ৩টার সময় কাশ্মীর রাজ্য ছাড়িয়া ইংরাজ রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। অদ্য রাওয়ালপিণ্ডিতে পৌঁছিবার কথা; কিন্তু পথে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায়, মরি পার হইয়াই সন্ধ্যা হইল; অগত্যা ট্রে নামক স্থানে ডাক বাঙ্গলায় অনাহারে রাত্রি যাপন করিতে হইল। গত রাত্রিতে শ্রীনগর ছাড়িয়া, রাত্রি-বাস রাম-পুরা ডাক বাঙ্গলায় হইয়াছিল। প্রাতে বেলা ১০টার সময় পুনরায় রাওয়ালপিণ্ডির কালীবাটীতে অবতরণ করিলাম। আহারাদি শেষ করিয়া, রাত্রিটা ট্রেনে কাটাইয়া পর দিন বেলা ১০ টার সময় অমৃতসরে অবতরণ করিয়া, বিখ্যাত স্বর্ণ-মন্দির দেখিতে গেলাম। নামে স্বর্ণ-মন্দির; প্রকৃতপক্ষে পিতলের পাত দিয়া মোড়া; তাহাতে সোণার কলাই করা। আগ্রার তাজমহল যেরূপ হিন্দুস্থানের মধ্যে বিখ্যাত, ইহা সেরূপ না হইলেও, মনোহারিত্বে নিতান্ত কম নয়। প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা-মধ্যে মন্দির। মর্ম্মর-মণ্ডিত সেতু পার হইয়া মন্দির-মধ্যে যাইতে হয়। এই মন্দির-মধ্যে কোন দেব-দেবীর মূর্ত্তি নাই। শিখগুরুগণের গ্রন্থরাজিই ইহার দেবতা। তাঁহাদেরই পূজা হয়, এবং হালুয়া ভোগ দেওয়া হয়। সেই প্রসাদ যাত্রীদিগকে বিতরণ করা হয়।

তার পর জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখিয়া কত কথাই মনে হইতে লাগিল। সে কথা এখানে না তোলাই ভাল। পরাধীন জাতির স্বাধীন চিন্তা বিকাশের উদ্যম বাতুলতামাত্র। কংগ্রেশ-কমিটি হইতে জমী কেনা হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত; কিন্তু স্থানটী আজও পূর্ব্বের মতই আছে। বোধ হয় শীঘ্রই স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মিত হইবে। পর দিন প্রাতে আহারাদি সমাপনান্তে, বেলা ১০টার সময় ট্রেনে উঠিয়া, বেলা ৩।০ টার সময় অম্বালা ষ্টেসনে নামিলাম; এবং রাত্রি ৮টার সময় ই, আই, আর, পঞ্জাব মেলে চড়িয়া, পর দিন অনাহারে কাটাইয়া, তৎপর দিন হাওড়া ষ্টেসনে পৌঁছিলাম।

আর্গলের রাণী।

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, বি-এ]

আর্গল-রাজ গৌতম বীর অমর কীর্ত্তিমান্
লাখো নরনারী আজও গৌরবে গায় যার জয়-গান।
দিল্লীশ্বরে দিবে না সে কর, করিয়াছে মহাপণ,—
স্বাধীনতা তরে বরিবে যুদ্ধ আর্গল বীরগণ।
যায় যাবে প্রাণ ঘুচাতে কালিমা স্বদেশ-মাতৃকার,
পরাধীনতার অভিশাপ-ডোরে বদ্ধ না রবে আর।

শুনি এ বারতা নসিরুদ্দিন দিল্লীর সম্রাট—
চূর্ণ করিতে গৌতম বীরে—ঘুচাইতে রাজ-পাট
অযোধ্যা-দেশ-নবাবে পাঠায় মহাসংগ্রাম তরে,
পিছু যায় তার অযুত যোদ্ধা পরমোৎসাহ-ভরে।
হিংসা-সুরায় বিভোর হইয়া চাহিছে শোণিতপাত,
গৌতম-রাজে বন্দী করিবে, আর্গল ধূলিসাৎ।

জন্মভূমির কল্যাণ তরে, আর্গল বীরগণ
শত্রু-সেনায় ভেটে হুঙ্কারে,—লাগিল ভীষণ রণ।
চারিদিকে উঠে সাজ-সাজ রব, বল দাও ভগবান—
মাতৃ-পূজার বিরাট যজ্ঞে জীবন করিতে দান।
কলঙ্ক মা'র ঘুচাতে এবার আসিয়াছে মহাক্ষণ,
হেলায় হারাতে হেন সুলগন কে রে ঘুমে অচেতন?
নবজাগরণ-গৌরবে জাগো—বিচূর্ণ কর ভয়,
দেশ-জননীর সন্তান সবে গাহ স্বদেশের জয়।
আকাশে-বাতাসে, নদী-কল্লোলে জাগুক্ সে মহা তান,
গর্ব্বিত ওই শত্রু-সেনার কম্পিত হোক্ প্রাণ।

তনয়ে সমরে পাঠায় জননী—উষ্ণীষ দেয় শিরে,
যতনে বর্ম্ম পরায় আপনি, স্নেহ দেয় বুক চিরে।
ভ্রাতার কটিতে গর্ব্বে ভগিনী পরাইছে তরবারি,
কহিছে—'কৃপাণ দিনু যার লা'গ, মর্য্যাদা রেখো তারি।'
সতী, বীর-রাগ-চন্দন দেয় পতির ললাট 'পরি,
বরাভয় সম দিতেছে অভয়, তেজে দেয় বুক ভরি।
অধরে বিদায়-চুম্বন আঁকি কহে গদগদ ভাষে,
'জয়ী হয়ে গৃহে ফিরে এসো নাথ, বেঁচে রব সেই আশে।
এই যদি হয় শেষ দেখা, তবে এ যেন শুনিতে পাই,
তেজোভাস্বর জ্যোতিষ্কদলে লভিয়াছ তুমি ঠাঁই।
কীর্ত্তি তোমার কীর্ত্তিত হোক্ বিশ্বভুবনময়,
গৌরবে তব গরীয়ান্ হয়ে গায় যেন দেশ জয়।'

নিরুদ্ধ শিলা-কন্দর ভেদি চূর্ণি শৈল-কারা—
উচ্ছ্বসি বেগে ছুটিছে যেমনি উদ্দাম স্রোতধারা,
তেমনি অমিত ভীম-উদ্যমে আর্গল বীরগণ
লঙ্ঘি বিপুল বিপদ-তুঙ্গ করিছে ভীষণ রণ।
প্রলয়ের মত কাতারে-কাতারে হনিছে শত্রুচয়,
ভয়ে পলায়ন করে বাকী সব ভাবি' আশু পরাজয়।

সমরে জিনিয়া ফিরে গৌতম, চারিদিকে জয় রব,
রাজ্য ভরিয়া বিজয়োল্লাস, নগরেতে উৎসব।
অর্জ্জিল যারা কীর্ত্তি পরম রক্ষি স্বদেশ-মান,
বরিয়া তাদের লয় পুরজন—গাহে বন্দন-গান।
দুঃখ-বাদল কাটিয়া শরৎ ফিরে এল পুনঃ ঘরে,
সুখের জ্যোছনা ঝরে ঝরঝর—আনন্দ নাহি ধরে!
দিনরাত ধরে রাজার প্রাসাদে চলিতেছে উৎসব,
উজ্জ্বল সাজে সজ্জিত গৃহ—উচ্ছল কলরব।
স্বামীর বিজয়ে ফুল্ল মহিষী, পরম গর্ব্ব-ভরে—
আর্গল-বীরযোদ্ধা সকলে নিতেছে যতনে বরে।

হাসির আড়ালে গোপনে দুখের অশ্রু নীরবে রাজে,
কণ্টকও রহে সুন্দর ওই গোলাপ-বৃন্ত মাঝে;
আলোকের পাশে আঁধার যেমন রহে কালো সাজে সাজি,
তেমনি রাণীর সুখের বীণায় দুখ-গান উঠে বাজি।
অপলক চোখে চিন্তিত চিতে বসি খোলা বাতায়নে,
নীল গগনের পূর্ণিমা-চাঁদ হেরিতেছে সখী সনে।
ভাবিতেছে এল মাঘী-পূর্ণিমা আজি সুরধুনী তটে,
নাহি যদি হয় গঙ্গা-সিনান অশুভ কি জানি ঘটে!
কত না বিপদে সারা দেশখানি হয়ে যাবে ছারখার,
উদ্বেগে রাণী উদ্বেল অতি—কেঁপে উঠে বারবার।
স্নানে যেতে আজ নিশ্চিত নাথ করিবেক মোরে মানা,
শত্রুর সেনা গঙ্গার তীরে গোপনে দিতেছে হানা।
প্রাসাদে চলিছে উৎসব যবে পরমোৎসাহ ভরে,
হেন কালে রাণী সহচরী সনে সকলের হিত তরে
নীরবে গভীর জ্যোছনা নিশীথে সুখ-নিকেতন ছাড়ি,
জাহ্নবী-জলে সিনান করিতে চলে পথে তাড়াতাড়ি।
গঙ্গার তীরে আসিল যখন রাত্রি হয়েছে শেষ,
তরুণীর মত প্রকৃতি পরেছে মধুর সোণালি বেশ।
কিরণ-রথের দীপ্ত সারথি উজ্জ্বলি চারিধার,
মুক্ত উদার বিরাট গঙ্গে নমিতেছে বারবার।
সাধু-সজ্জন বিপুলানন্দে গাহে বন্দন-গান,
ভক্ত প্রাণের তৃষ্ণা মিটায় এরি সুধা করি পান।
মর্ত্ত্যের বুকে মূর্ত্ত করুণা—কল্যাণী অনুপম,
পতিত-পাবনী দেবী সুরধুনী নমো নমো নমো নম।

জাহ্নবী-জলে পুণ্য-প্রতিমা নামিল সিনান তরে,
রূপের কমল বিকশিল যেন চারিদিক আলো করে।
নবাব-শিবিরে প্রহরীরা সবে ভেটে এ বারতা ত্বরা,
হরষে নবাব ভাবে কামজালে পাখী পড়ে বুঝি ধরা।
জলে কে ভাসাল রূপের তরণী কৌশলে আনিবারে—

হীন, কাপুরুষ, বৃদ্ধ নবাব পাঠাইল তনয়ারে।
শুনে যবে ইনি আর্গল-রাণী, এসেছে সিনান লাগি,
শত্রুর বুকে হিংসার সাথে কামানল উঠে জাগি।
সৈন্য সকলে আদেশিল—আজি পরাজয় শোধ লবে,
ছুয়ারে মোদের আর্গল-রাণী, বন্দী করিতে হবে৷
স্নান সমাপিয়া সিক্ত বসনে উঠিয়া মহিষী তীরে,
হেরে বিস্ময়ে শত্রু সৈন্য রহিয়াছে তারে ঘিরে।
নির্ভীক চিতে কহিল নবাবে—"ধিক্ তারে শতবার,
অসহায় জানি নারীর উপরে যে করে অত্যাচার।
সে যে কাপুরুষ, ঘৃণিত পামর কলঙ্ক ধরণীর,
আড়ালে রহিয়া অস্ত্র-বিহীন পথিকে যে হানে তীর।
আর্গল-রণে পরাজিত হলে তবু নাহি লাজ বোধ,—
একাকী পাইয়া তারি মহিলায় ভেবেছ লইবে শোধ!
অটুট রাখিতে সতীর গরব, রক্ষিতে দেশ-মান,
নাহি কি হেথায় হেন রাজপুত শৌর্য্যেতে বলীয়ান্?"
'নির্ভয়' আর 'উভয়' দু' ভাই বীর-কৌস্তুভ-মণি,
ঝঞ্ঝার মত প্রবেশিয়া বেগে শত্রুর সাথে রণি',
অবমাননার কবল হইতে রক্ষিল রাণী-মায়,
'নির্ভয়' দিল নিজের জীবন বিশ্ব-ধাতার পায়।

এ নয় মরণ—এ যে জাগরণ, সফল জনম তার—
প্রতিশোধ তরে বিপদে বরিতে কুণ্ঠা নাহিক যার।

শুনি নবাবের কলঙ্ক-কথা দিল্লীর বাদশাহ,
ধিক্কারে তারে, সাথে যোগ দেয় দরবারী ওমরাহ।
সকল দুয়ারে লাঞ্ছনা লভে, নিতি অপমান বহি,
ঘৃণিত ব্যথিত সে অভিশপ্ত মরে তুষানলে দহি।

'উভয়ে'র করে সঁপে গৌতম প্রাণাধিক তনয়ারে;
দেশবাসী তারে সাজায় যতনে অমলিন যশোহারে।
বীর্য্য তাহার ঘোষে ইতিহাস নিখিল ভুবনময়,
নশ্বর এই বিশ্বে শুধুই কীর্ত্তির নাহি লয়।

ধন্য অজের আর্গল-রাজ, ধন্য তাঁহার পণ,
দেশ-কল্যাণ ব্রতে যারা রত ধন্য সে বীরগণ।
ধর্ম্মে অচলা নিয়ত যে রাণী সার্থক তার প্রাণ,
পুণ্য-উজল ধন্য সে দেশ যার হেন সন্তান!

পাঠান-যুগে ভারত

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

আফঘান্-জাতির উৎপত্তি

আফঘান্ বা পাঠানের নাম শুনিলে এক সময় ভারতবাসী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত। আজিও পশ্চিম-সীমান্তবাসীর চক্ষে আফঘান্ পরস্বাপহারী নৃশংস দস্যু। ইংরেজ তাহাকে ধর্ম্মান্ধ মৃত্যুভয়হীন সাহসী যোদ্ধা ও গুপ্তঘাতক বলিয়া জানে। তথাপি পাঠান সদ্গুণ-বর্জ্জিত নহে। বিধর্ম্মী হইলেও পাঠানের শিরায় শিরায় আর্য্যরক্তই বহিতেছে। সিন্ধুনদের পশ্চিম-তীর হিন্দুর চক্ষে রাক্ষসভূমি; তাহাদের বিশ্বাস, এই সমস্ত স্থানে ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিলে ফললাভ হয় না। তাই এখানকার অধিবাসী হিন্দুরা আটক পার হইয়া, পূর্ব্বপারে আসিয়া শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে। কিন্তু এমনও একদিন ছিল, যখন আফঘানিস্থানের গোমাল নদীতীর হইতে বৈদিক-যজ্ঞের ধূম আকাশে উঠিত, আর তথ্‌ত্-সুলেমানের পর্ব্বত-কন্দর আর্য্যঋষিগণের সামগানে মুখরিত হইত। ঋক্-বেদের সময়ে পিতৃগণের বাসভূমি ছিল—দক্ষিণ-পূর্ব্ব আফঘানিস্থান (রোহ্ প্রদেশ *), উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশ এবং পঞ্চ-নদভূমি (Rapson's *Ancient India*, 39). মহাভারত-যুগেও বাহ্লীক (বল্‌খ্) এবং গান্ধার আর্য্যগণের—

* ইহাই আফঘানগণের আদি বাসভূমি; সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উহারা ক্রমশঃ উত্তর দিকে কাবুল প্রভৃতি স্থানে আপনাদের বসতি বিস্তার করে। রোহ্ হইতে 'রোহিলা' পাঠান নামের উৎপত্তি।

বাসস্থান ছিল। ভারত-যুদ্ধে বৃদ্ধ বাহ্লীকরাজ দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। গান্ধার-রাজকুমারী দুর্য্যোধনাদির জননী। অবশ্য তখনও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ও গঙ্গা-যমুনাতীরবর্ত্তী আর্য্যগণের মধ্যে আচার-ব্যবহারের অনেক পার্থক্য ছিল। মহাভারতের কর্ণপর্ব্ব হইতে জানা যায়, ঝিলাম এবং চিনাবের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশবাসী মদ্রকগণ রসুন-সহযোগে গোমাংস খাইত ও উষ্ট্রের দুগ্ধ পান করিত বলিয়া কর্ণ মদ্ররাজ শল্যকে তিরস্কার করেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণকালেও আফঘানিস্থান, সিস্তান্ ও বলুচিস্তান্ আর্য্যসভ্যতার অন্তর্গত। মগধের মৌর্য্যগণের রাজ্য হিরাত-নগর পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

'আফঘান্'-নামের উৎপত্তি এবং তাহাদের জাতিতত্ত্ব বা কুলজী এখনও সঠিক জানা যায় নাই। আফঘানেরা 'ইস্রাইলের সন্তান' বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়; কিন্তু কেহ তাহাদের 'য়িহুদী' বলিলে অবমানিত মনে করে। মহাভারতে উল্লিখিত 'অশ্বক'-জাতি গান্ধার বা বর্ত্তমান পেশওয়ারের (কান্দাহার নহে) নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিত। কেহ কেহ এই অশ্বক-জাতি হইতে আফঘান্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের মতে, 'অশ্বকের' অপভ্রংশ 'আফঘান্' কোন রূপেই হইতে পারে না। সার উইলিয়ম্ জোন্স্ (Sir Wm. Jones) উহাদিগকে আফঘানিস্থানের আদিম অধিবাসী—প্যারোপামিসাইডি, অর্থাৎ পামির পর্ব্বতের অপর পার্শ্বের অধিবাসিগণের বংশধর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ডর্ন বহু গবেষণার পর জোন্সের মতই সমর্থন করিয়াছেন। (Dorn's *Hist. of the Afghans*, pt. ii. 72). তাঁহার মতে, আফঘানেরা যে ইরানীয় কিংবা আর্য্যবংশীয়—ইহার যথেষ্ট প্রমাণ নাই। সুপণ্ডিত Longsworth Dames কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নানা মতের আলোচনা ও বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত-প্রণালীতে জাতিতত্ত্বের গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন, আফঘানেরা তুর্ক-ইরাণীয়গণের মিশ্রণ। (*Ency. of Islam*, 149.) এই মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। 'নিয়ামৎ-উল্লা লিখিত আফঘান্গণের বংশাবলী, মুহম্মদের সমসাময়িক পাঠানদের পূর্ব্বপুরুষ আব্দর-রসিদের মুসলমান-ধর্ম্মগ্রহণ ও ঘোর প্রদেশে উক্ত ধর্ম্মপ্রচারের কথা,—রাজপুতগণের সূর্য্যবংশোৎপত্তির কাহিনীর মতই অলীক ও ঐতিহাসিক-ভিত্তিহীন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত আফঘানিস্থানের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ, অগ্নি-উপাসক (Zoroastrian) ও মূর্ত্তিপূজক ছিল। (*Ency. of Islam*, 162). ঐতিহাসিক বৈহাকী পার্ব্বত্য-আফঘান্গণকে "অভিশপ্ত কাফের' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (*Ibid*, 162).

উত্তর-ভারতে আফঘান্-শক্তির বিভাগ ও অবস্থা: ১৫০০-১৫২৬

যুদ্ধপ্রিয় আফঘান্গণকে প্রথমে সুলতান মহ্মুদের বৃত্তিভুক্ সৈন্যরূপে দেখা যায়। অল্ উৎবীর 'তারিখ্-ই-যামিনী' গ্রন্থে প্রকাশ, মহ্মুদের তুখরিস্তান-অভিযানে আফঘান্-সেনা ছিল। কিন্তু দুর্দ্দান্ত আফঘানগণ কোনকালেই সম্পূর্ণরূপে মহ্মুদের বশ্যতা স্বীকার করে নাই; সুযোগ পাইলে তাহারা তাঁহার সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিয়া লুঠপাট করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিত না। যজ্নভী-বংশের রাজত্বকালে আফঘানেরা নগণ্য পার্ব্বত্য-জাতি। তখনও তাহাদের বীরত্বের খ্যাতি প্রচারিত হয় নাই। ঘোরী-বংশের প্রাধান্যকালেও তাহারা প্রতিষ্ঠাহীন। দাস-বংশের রাজত্বকালে অল্পসংখ্যক আফঘান্ দিল্লীশ্বরের সৈন্যদলে যোগ দিতে আরম্ভ করে। মেওয়াত্-আক্রমণকালে বল্বনের তিন হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক আফঘান্ বিশেষ বিক্রমের পরিচয় দেয়। পরবর্ত্তী দুইশত বৎসরের ইতিহাসের আলোচনা করিলে জানা যায়, দু'একজন আফঘান্-সর্দ্দার দাক্ষিণাত্যে ও বিহারে জায়গীর পাইয়াছেন, কিন্তু ভারতে আফঘান-শক্তি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাইমূরের ভারতাক্রমণ পর্য্যন্ত তাহারা সাধারণতঃ সুলেমান্ পর্ব্বতের প্রত্যন্তবাসী পার্ব্বত্য-দস্যু বলিয়াই পরিচিত ছিল। 'মলফুজাৎ-ই-তাইমূরী' ও 'জাফর-নামা' পাঠে জানা যায়, তাইমূর আফগানদের বাসস্থান আক্রমণ করিয়া তাহাদের বিধ্বস্ত করেন। তাঁহার ভারতবর্ষ-পরিত্যাগের পর দিল্লী-সাম্রাজ্যের যে দুরবস্থা উপস্থিত হয়, তাহারই সুযোগে আফঘানেরা আপনাদের প্রাধান্যস্থাপন করে। এই সময় লুদী-বংশীয় আফঘানগণ পঞ্জাবে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। ইহারা নামে সৈয়দ-রাজগণের সামন্ত হইলেও কার্য্যে স্বাধীন ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অবশেষে বহ্লুল্ লুদী

সৈয়দ-বংশের শেষ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে ভারতে আফঘান্-ইতিহাসের সূচনা। বহ্‌লুল্ লুদী ক্রমাগত ২৮বর্ষ যুদ্ধ চালাইয়া জৌনপুর-রাজ্য জয় করেন। ইহাই আফঘান্‌দের প্রথম জাতীয় কীর্ত্তি। রোহ্‌বাসী আফঘান্‌গণকে হিন্দুস্থানের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য তিনি পাঠানদের আশাতীত অর্থ ও জায়গীর দিতেন। ইহার ফলে বহু আফঘান্-বংশ ভারতে আগমন করে। ইহাদের মধ্যে লুদীগণ পঞ্জাব, দিল্লী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে; ফরমূলীগণ অযোধ্যা এবং বহ্‌রাইচ্ জিলায়; লুহানীগণ গাজিপুর এবং দক্ষিণ-বিহারে; সরওয়ানীগণ কানপুরে, এবং সুরগণ শাহাবাদ অঞ্চলে উপনিবেশস্থাপন করিয়াছিল। বহ্‌লুল্ লুদীর মৃত্যুর পর, (স্বর্ণকার-নন্দিনীর গর্ভজাত) তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র, 'সুলতান্ সিকন্দর' উপাধি লইয়া সবলে জ্যেষ্ঠের সিংহাসন আরোহণ করেন। শাসনক্ষমতা, শৌর্য্যবীর্য্য, দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণে আফঘান্-সামন্তেরা তাঁহার বশীভূত ছিল। নবপ্রতিষ্ঠিত দিল্লী-সাম্রাজ্য তাঁহার শাসনকালে কতকটা ব্যবস্থিত হইয়া উঠে। সিকন্দরের মৃত্যুর পর সিংহাসন পাইলেন—সুলতান্ ইব্রাহিম্ (১৫১৭)। ইব্রাহিম্ ক্রূর, কপটাচারী, সন্দিগ্ধমনা ও নীতিজ্ঞানহীন সম্রাট্। তাঁহার দুর্ব্যবহারে সামন্তগণ পূর্ব্ব হইতেই বিরক্ত হইয়াছিল। রাজভক্তি অপেক্ষা জ্ঞাতিত্ব-সম্বন্ধকেই তাহারা বড় বলিয়া জানে ও মানে; সুতরাং ইহাই তাহাদের একতার বন্ধন। ইব্রাহিম্ আফঘান্-চরিত্রের এই বিশেষত্বটুকু আদৌ ধরিতে পারেন নাই। সিংহাসনে বসিয়াই তিনি বলিতে লাগিলেন,—'রাজারাজড়ার আবার জ্ঞাতিকুটুম্ব কি? তাহাদের সুবাই প্রজা ও ভৃত্য। অন্ধভাবে আজ্ঞাপালনই তাহাদের ধর্ম্ম।'

যে-সব গণ্যমান্য বৃদ্ধ সামন্ত তাঁহার পিতৃপিতামহের সহিত এক গালিচায়, এক আসনে বসিত, ইব্রাহিমের হুকুমে এখন তাহাদিগকে তাঁহার সিংহাসনতলে করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিতে হইল। আত্মসম্মানের উপর আঘাত আফঘান্‌দের পক্ষে বরদাস্ত করা অসম্ভব। এরূপ আঘাত, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদের সৌহার্দ্দ ও স্বার্থ-সম্বন্ধের মূল শিথিল করিয়া দেয়। এই কারণেই সামন্তগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল, এবং সিকন্দরের অপর পুত্র জলাল্-উদ্দীনের পক্ষ লইয়া বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইল। ইব্রাহিম্ বিদ্রোহ দমন করিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যেরূপভাবে, যেরূপ ছলচাতুরী ও ভেদ-নীতির সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার করিলেন, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াও হইল না। বশ্যতাস্বীকারের পর পাঠান-সর্দ্দারদের অনেকেই কারাকক্ষে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইল,—ইব্রাহিমের উপর সকলেই বিশ্বাস হারাইল। দেখিতে দেখিতে 'নিবানো অনল' আবার দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বিহারের সামন্তপ্রধান দরিয়া খাঁ লুহানীর নেতৃত্বে পূর্ব্বদেশীয় আফঘান্-সর্দ্দারগণ বিদ্রোহী হইয়া গঙ্গার পূর্ব্বতীরে স্বাধীনতার জয়-পতাকা উড়াইল। পঞ্জাবের দৌলৎ খাঁ লুদী, ইব্রাহিমের ভয়ে ভীত ও ত্রস্ত হইয়া কাবুলে দূত পাঠাইলেন—বাবরকে ভারতাক্রমণে উত্তেজিত করিবার জন্য। পরিণাম ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ তাঁহার ছিল না। লুদী-সাম্রাজ্য যখন অন্তর্বিদ্রোহে এইরূপ বিব্রত, তখন মেবারপতি রাণা সংগ্রাম সিংহের দৃষ্টি দিল্লীর রাজসিংহাসনে নিবদ্ধ। মালব এবং গুজরাটের মুসলমান-নৃপতি মহ্‌মুদ খিল্‌জী ও মুজফ্‌ফর শাহ্‌র সমবেত বাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া তিনি সত্যসত্যই নিজ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইব্রাহিমের সৈন্য-দলকেও তিনি অনেকবার পরাজিত করিয়া বাহুবলের পরিচয় দেন। বস্তুতঃ বীরবর সংগ্রামের পতাকাতলে সমবেত রাঠোর, চৌহান, প্রমার, কচ্ছবাহ্, প্রভৃতি রাজপুত-শক্তি বারম্বার যে অভূতপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে, তাহাতে দিল্লীর রাজমহিমা টলটলায়মান হইল। সংগ্রাম সিংহ মনে করিলেন, পশ্চিম-সীমান্তে মোগল-পাঠানে দ্বন্দ্ব বাধাইয়া শত্রুর বলক্ষয় করিবেন, এবং তাহার পর সুবিধামত একসময়ে হিন্দুস্থানে আবার নূতন করিয়া হিন্দুর জয়পতাকা উড়াইবেন। তাই তিনি স্বচ্ছন্দমনে ভারত-বিজয় করিবার প্রলোভন দেখাইয়া বীরবর বাবরকে আমন্ত্রণ করিলেন। বাবর দেখিলেন, মহাসুযোগ—হিন্দুস্থানে দলাদলি, মারামারি—চারিদিকে অশান্তি ও অসন্তোষের আগুন; তার উপর ভারতেরই এক শক্তিধর পুরুষ তাঁহার সহায় হইয়া তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইতে চাহিতেছে। উদ্যোগী পুরুষসিংহ কি এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারেন? সসৈন্য অভিযান করিলেন। পানিপথে যে সংগ্রাম হইল (১৫২৬, এপ্রিল ২৬) তাহাতে ইব্রাহিম্ আপনার গর্ব্বোন্নত শিরকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেন না। অযোধ্যা-বিহারের বিদ্রোহী আফঘান্-সর্দ্দারগণ দূর হইতে তামাশা দেখিতে লাগিল—

তাঁহার সহায়তার জন্য এক পা-ও অগ্রসর হইল না। হতভাগ্য ইব্রাহিম্ পরাজিত ও নিহত হইলেন। বাবর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া সিংহাসনে বসিলেন।

যে-সব আফ্‌ঘান্-সামন্ত বাবরকে ভারতে আমন্ত্রণ করেন তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, বাবর কিছুদিন এদেশে থাকিয়া, তাইমূরের মত ধনদৌলৎ আত্মসাৎ করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন, বাবরের এদেশ হইতে নড়িবার নামগন্ধ নাই—তিনি লুপ্ত লুদী-সাম্রাজ্যের উপর মোগল-রাজত্বের বনিয়াদ্ গাঁথিয়া তুলিতে চাহেন, তখন তাঁহাদের মনে নিজ-নিজ কর্তৃত্ব ও আধিপত্য-লোপের আশঙ্কা হইল; তাঁহারা বাবরের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ করিলেন; এমন কি উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য রাণা সংগ্রামকে প্রভুত্বে বরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। রাণা ত প্রস্তুতই ছিলেন। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে, কানোয়ার (ফতেপুর সিক্রী) রণক্ষেত্রে রণকুশল বাবরের সহিত রাজপুত-শক্তির বল-পরীক্ষা হইল। এই পরীক্ষায় রাণা সংগ্রামের, হিন্দুর বিলুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের আশা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইল। পরাজিত রাণা কিছুদিনের মধ্যেই ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

আফঘান্ চরিত্র

আফঘানিস্থান্ সমতলভূমি নহে,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য-উপত্যকায় বিভক্ত। এক এক উপত্যকায় এক এক বংশের লোকের বাস। এক বংশের সহিত অন্য বংশের বিবাদ প্রায় লাগিয়াই আছে। এই বিবাদ এবং পৃথক ভাবে বাস, জাতি-গঠনের প্রধান্ অন্তরায়। শুনা যায়, আফঘান-দের উপর এক প্রসিদ্ধ ফকীর অভিসম্পাত দিয়াছিলেন, 'তাহারা চিরদিন স্বাধীন থাকিবে, কিন্তু কখনও সঙ্ঘবদ্ধ হইবে না।' (*Aurangzib*, iii. 221*n.*)

আফঘানেরা অত্যন্ত আভিজাত্যাভিমানী। দুইজন বাঙ্গালী কুলীন ব্রাহ্মণের দেখাসাক্ষাৎ হইলে যেমন তাঁহারা পরস্পরে 'গোত্র প্রবর' ইত্যাদি এবং ঊর্দ্ধতন সাত-পুরুষের খবর না লইয়া ছাড়েন না, পাঠানদেরও কতকটা সেইরূপ। বিবাদ এবং রক্তপাতেই পাঠানের আনন্দ, যুদ্ধক্ষেত্র তাহার ক্রীড়াস্থল, মৃত্যু তাহার সুহৃদ্, দস্যুতা তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দস্যুবৃত্তির অভাবে কৃষি তাহার অবলম্বন। প্রাচীন টিউটন্ জাতির মত, রক্তপাতে যাহা লাভ করা যায়, তাহার জন্য ঘর্ম্মপাত করায় সে অপমান বোধ করে। পাঠানের ধর্ম্মোন্মাদনা ও প্রতিহিংসাবৃত্তি অতি ভীষণ। সে অপরাধীকে ক্ষমা করিতে জানে না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের লোকেরা বলিয়া থাকে, বিষাক্ত সর্প কিংবা ক্ষিপ্ত হস্তীর হাত হইতে মানুষ বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে, কিন্তু পাঠানের প্রতিহিংসার কাছে কাহারও অব্যাহতি নাই। জাতীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, আফঘানেরা ইরাণ ও তুরাণবাসীর (ইরাণ=পারস্য; তুরাণ=মধ্য এসিয়া) দোষগুণ কতক পরিমাণে পাইয়াছে, অবশ্য ঠিক অবিকৃতভাবে নয়। যেমন ইরাণীয়ের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি পাঠানে ধূর্ত্ততায় পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ শৌর্য্যের সহিত ধূর্ত্ততার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণই পাঠান চরিত্রের বিশেষত্ব। মারাঠা-চরিত্রেও এই বিশেষত্ব সুপরিস্ফুট। ইতিহাস পাঠানের বীরত্ব ও সাহসিকতায় যেমন উজ্জ্বল, ক্রূরতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় তেমনই কলঙ্কিত। যুদ্ধে অনেক সময় শত্রু কর্ত্তৃক বাহুবলে পরাস্ত না হইয়াও সন্দিগ্ধমনা পাঠান, কল্পিতভয়ে চকিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছে।

আফঘান্-চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব—সাম্য ও স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। পাঠানের স্বজাতি-প্রেম না থাকিতে পারে, কিন্তু স্বদেশ-প্রীতি আছে। পাঠান—অক্লান্ত-শ্রমী, 'মিতাহারী, রণদুর্ম্মদ, অব্যর্থলক্ষ্যভেদী; কিন্তু নিয়ম মানিতে বা দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে অক্ষম; সকলেই স্ব স্ব-প্রধান—খাঁ সাহেব। আফঘান্‌কে পরাজিত করা কঠিন নহে, কিন্তু বশীভূত করা অসম্ভব। প্রবল শত্রুর নিকট ক্ষণকালের জন্য বশ্যতাস্বীকার করিলেও, সুযোগ-সুবিধা পাইলে সে আবার মস্তকোত্তোলন করে। স্বদেশেও তাহারা দীর্ঘকাল যথেচ্ছাচারমূলক শাসন-পদ্ধতির অধীন থাকে নাই। সর্ব্বদা আপনার সহজাত অধিকার—স্বাধীনতা—রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। একজন আফঘান্ এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেবকে বলিয়াছিল,—'বিবাদ-অশান্তিতে আমরা দুঃখিত নহি—যুদ্ধের আশঙ্কায় আমরা ভীত নহি—রক্তপাতেও আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু কাহারও প্রভুত্ব স্বীকার করা অসম্ভব—আমরা কখনও কাহারও প্রভুত্বের পীড়ন সহ্য করিব না।' (Dorn's *Hist. of the Afghans*, Preface vi). ইহাই আফঘান্-চরিত্রের নিখুঁৎ ছবি।

রাজনৈতিক অবস্থা

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ—ঘটনাবৈচিত্র্যময় বিপ্লবযুগ এই সময় রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, এবং সমাজ নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল। হিন্দুস্থান, বিজয়ী বাবরের পদানত; কিন্তু বাবর দিল্লীর পুরাতন সাম্রাজ্য ভাঙ্গিলেন,—গড়িয়া তুলিবার সময় পাইলেন না। রাণা সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর পর বাবরের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ রহিল না। মনে হইল, মোগলের বিজয়-বাহিনী যেন বাঙ্গালা, মালব এবং গুজরাটকে অচিরে আচ্ছন্ন করিবে। এই সময় বাঙ্গালায় নুসরৎ শাহ্, মালবের দক্ষিণাংশে মহ্মুদ্ খিল্জী, এবং গুজরাটে বহাদুর শাহ্ রাজত্ব করিতেছিলেন। নুসরৎ শাহ্ মনে করিয়াছিলেন, লুদী-সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাংশ তিনি হস্তগত করিবেন। কিন্তু মোগলের সঙ্গে সামান্য খণ্ডযুদ্ধে ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। মহ্মুদ্ আলস্যপরায়ণ, অকর্ম্মণ্য—মালবের স্বাধীনতা-রক্ষার চেষ্টা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র। সুচতুর বহাদুর শাহ্ বাবরের অজ্ঞাতে গুজরাট্-রাজ্যকে সুব্যবস্থিত করিয়া বলসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। হিন্দুস্থান জয় করা অপেক্ষা তাহাকে শাসনাধীন রাখা বাবরের পক্ষে কঠিনতর হইয়া উঠিল। অসংখ্য আফঘান্ উত্তর ভারতে জায়গীর ভোগ করিত, তাহারা বিদ্রোহী হইল। এই বিদ্রোহীদলের নেতা হইলেন—ববন্, বায়াজীদ্ ও মারুফ ফরমুলী। বাবরের অবশিষ্ট জীবন এই বিদ্রোহ-দমনের জন্য শিবিরে শিবিরেই অতিবাহিত হইয়াছিল। দাক্ষিণ-ভারতেও তখন বাহমনি সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল; প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা স্বস্ব-প্রধান হইয়া আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি স্থানে স্বতন্ত্র রাজ্যস্থাপনে উদ্যোগী হইল। বিজয়নগরের হিন্দুরাজগণ তখনও মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাইয়া দাক্ষিণাত্যে হিন্দু স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন।

আভ্যন্তরীণ অবস্থা—ধর্ম্ম

মিশ্র বিবাহ, এবং ধর্ম্ম ও আইনের একতন্ত্রতার ফলে ইংলণ্ডে বিজেতা নর্ম্মান্ ও বিজিত সেক্সন্ এক শত বৎসর যাইতে না যাইতেই প্রায় এক হইয়া গেল; কিন্তু এই তিন গুণের অভাবে দুই শত বৎসর একত্র বাস করিয়াও হিন্দু-মুসলমান এক হইতে পারে নাই। জেতা ও জিতের মধ্যে তখনও পার্থক্যের বাধ অত্যন্ত প্রবল। সামাজিক আচার-ব্যবহার-বৈষম্য ও ধর্ম্ম বৈষম্যই মিলনের প্রধান অন্তরায় ছিল। এজন্য ধর্ম্মের দিক্ হইতে উভয় সম্প্রদায়কে এক করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইল। মুসলমান্-সম্রাট্‌দের কেহ কেহ জোর-জুলুম করিয়াও হিন্দুকে মুসলমান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ কল-কৌশল, এমন কি, প্রলোভন আদিরও আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শুধু মুসলমানদের দিক্ হইতেই যে এই চেষ্টা চলিতেছিল, তাহা নহে;—দুই চারিজন উদারমতাবলম্বী হিন্দু সংস্কারকও মত-সামঞ্জস্য করিয়া, মুসলমানকে আপনার করিয়া লইবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন। এই সময়েই গুরু নানক পঞ্জাবে হিন্দু মুসলমান্কে কোরাণ-পুরাণের বৃথা দ্বন্দ্ব না মাতিয়া এক সংশ্রী, অলখ্ নিরঞ্জনের ভজনার উপদেশ দিতে লাগিলেন। কয়েকজন মুসলমানও তাঁহার শিষ্য হইল। ভক্ত কবীর মধ্যভারতে 'রাম-রহিমের' প্রভেদ ঘুচাইয়া হিন্দু মুসলমানকে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবার উপদেশ দিতে লাগিলেন। বাঙ্গালায় চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে প্রেমের মহামন্ত্র শুনাইলেন;—যবন হরিদাসও তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হইল না।

"যেই ভজে সেই শ্রেষ্ঠ, অভক্ত হীন ছার,
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার।"

কিন্তু এই মিলনের যুগেই মুসলমান্-সম্রাট্ সিকন্দর লুদীর ধর্ম্মান্ধতা চরমে পৌঁছিয়াছিল। হিন্দু নির্যাতনে তিনি দ্বিতীয় আওরংজীব্ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সুলতান্ সিকন্দরের আদেশে হিন্দুদের গঙ্গা-যমুনায় স্নান নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের দাড়ি কামাইলে পরমানিককে সাজা পাইতে হইত। (*Tarikh-i-Daudi* in Elliot, iv. 447)। আগ্রার নিকটবর্ত্তী বলিয়া অত্যাচারের মাত্রা প্রবল হইত—মথুরার হিন্দুদের উপর। রাজ্যের যেখানে যত দেবমন্দির এবং দেবমূর্ত্তি ছিল, তাহাদের উপর ধ্বংসের লীলা চলিতে লাগিল। পাথরের মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পাথরের টুকরাগুলি মাংস-বিক্রেতাদিগকে দেওয়া হইত—বাট্খারা রূপে ব্যবহার করিবার জন্য। অত্যাচারিত ও নিপীড়িত প্রজার হাহাকারে ও উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেন;—অধর্ম্ম ও অত্যাচারের ভার সিংহাসন আর বহন করিতে পারিল না। মনে হয়, যেন অত্যাচার-পীড়িত

প্রজার কাতর প্রার্থনার ফলেই আর্ত্তের ভগবান্ ন্যায়বান্ শের শাহ্‌কে হিন্দুস্থানের শাসন-দণ্ডের অধিকারী করিয়া পাঠাইলেন।

দেশের অবস্থা

পানিপথের যুদ্ধের পর বাবর স্বচক্ষে হিন্দুস্থানের যে অবস্থা দেখিয়াছিলেন, তাহাই আত্মচরিতে লিখিয়া গিয়াছেন,—"হিন্দুস্থান জনে এবং ধনধান্যে পূর্ণ" (*Memoirs*, 480); "অধিবাসীদিগের অধিকাংশই কাফের। শিল্পী, মজুর, এবং কর্ম্মচারীরা সকলেই হিন্দু।" (*Ibid*, 518.) নবাগত ইংরেজ সিভিলিয়ানের চক্ষে ভারতবর্ষ প্রথমে যেরূপ প্রতিভাত হয়, বাবরেরও কতকটা সেইরূপই হইয়াছিল। তিনি শুধু যোদ্ধা ন'ন, হৃদয়বান্ সম্রাট্ এবং সৌন্দর্য্যপ্রিয় কবি। মধ্য-এসিয়ার সভ্যতার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ; হিন্দুস্থান তাঁহার চক্ষে সৌন্দর্য্যের চমক লাগাইতে পারে নাই—জন্মভূমিই তাঁহার কল্পনার আনন্দ-কানন। তিনি এখানে অনেক জিনিসেরই অভাব বোধ করিতেন। তাই লিখিয়াছেন,—"এখানকার লোকেরা দৈহিক সৌন্দর্য্যহীন; আচার-ব্যবহারও তদ্রূপ—একেবারেই সভ্যজনোচিত নয়; বরফ কিংবা সুশীতল নীরের এখানে একান্ত অভাব; রুটি বা তৈরী-খানা বাজারে বিক্রয় হয় না। এখানে না-আছে মোমবাতি, না-আছে কলেজ, না-আছে হামাম্। হিন্দুস্থান ভাল এই হিসাবে যে, ইহা একটা মস্তবড় দেশ, আর এখানে সোনা-রূপা পাওয়া যায় বিস্তর। হিন্দুস্থানের রাজস্ব প্রায় ৫২ ক্রোর টঙ্কা।" (*Memoirs*, 518-19).

প্রজার অবস্থা

সে সময়ে শাসন-প্রণালী অনেকটা মধ্যযুগের ইউরোপীয় সামন্ত-প্রথার (Feudal System) ন্যায় ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা কখনও কখনও রাজাকে কিছু উপহার ও নজর পাঠাইতেন। রাজধানীর নিকট এবং গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী অনেকগুলি জিলা খাল্‌সা—অর্থাৎ রাজার নিজস্ব সম্পত্তি ছিল; প্রধানতঃ উহার আয়ের উপরই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইত। রাজ্যের অবশিষ্টাংশে—সৈন্য, সেনাধ্যক্ষ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর জন্য পৃথক পৃথক জায়গীর, এবং অর্দ্ধ-স্বাধীন জমিদারদিগের জমিদারি। জায়গীরদার ও জমিদারগণ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, রক্ষক ও ভক্ষক ছিলেন। তাঁহাদের জায়গীর বা জমিদারিতে শান্তিরক্ষা, বিচার ও শাসন-কার্য্য তাঁহারাই চালাইতেন। প্রায় সমস্ত মুসলমানই জায়গীর ভোগ করিত। জায়গীরদারদের অধিকাংশই অত্যাচারী অথবা প্রজার প্রতি উদাসীন। রাজস্ব-আদায়ের কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না।

মুসলমান-সম্রাট্‌দের মধ্যে অনেকেরই কৃষি এবং কৃষক-দিগের উন্নতিসাধন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারিগণের দোষে তাঁহাদের সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই সময়ে কৃষকদের প্রতি দয়াশীল, রাজস্ব-কর্ম্মচারিগণের চাতুরীজাল ছিন্ন করিতে এবং প্রবল অত্যাচারীর হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে সমর্থ, এরূপ একজন বিচক্ষণ, দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ন্যায়পরায়ণ, পরধর্ম্মে পক্ষপাতশূন্য রাজার প্রয়োজন হইয়াছিল। *

* মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস শাখায় পঠিত।

নায়েব মহাশয়

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'সম্মিলিত ইংরাজ জমীদার'গণের বিভিন্ন কানসারণের কার্য্য সম্পাদনের জন্য যে সকল ইংরাজ অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহার বেতন, কমিশন, সেলামী প্রভৃতিতে যে টাকা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা উচ্চপদস্থ কোন শ্বেতাঙ্গ রাজ-কর্ম্মচারীর উপার্জ্জন অপেক্ষা অল্প নহে।—পূর্ব্বেই এ কথার উল্লেখ করিয়াছি। বেতনের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই সকল ম্যানেজার সাহেব যেরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দতা, আরাম-বিরাম উপভোগ করেন, এ দেশের অনেক সিভিলিয়ান এক-একটি

প্রকাণ্ড জেলার শাসনভার পাইয়াও তাহা প্রত্যাশা করিতে পারেন না! রাজপ্রাসাদের মত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড অট্টালিকায় তাঁহারা বাস করেন। এই অট্টালিকাই পল্লীবাসিগণের নিকট কুঠী নামে পরিচিত। এই সকল কুঠীর 'হাতা' বহুদূর বিস্তৃত। কুঠীগুলি নন্দনকানন-মধ্যবর্ত্তী ইন্দ্রভবনের ন্যায় সুসজ্জিত। অট্টালিকার সম্মুখে সুদৃশ্য পুষ্পকানন; সেখানে অসংখ্য প্রকার নয়নানন্দকর সুগন্ধি কুসুমরাশি বিকশিত হইয়া বায়ুস্তর সুরভিত করিয়া রাখে। পুষ্পকাননের এক প্রান্তে 'টেনিস্' প্রভৃতি ক্রীড়ার উপযোগী শ্যামল তৃণদল-শোভিত সমতল ক্ষেত্র। হাতার অন্য দিকে, ফলের বাগানে, নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট আম্র, লিচু, কুল, পেয়ারা, কলা, আনারস, নারিকেল, জাম, গোলাপজাম, জামরুল, আতা প্রভৃতি ফলের গাছ। যে ঋতুর যে ফল, তাহাই সেখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। রসনাতৃপ্তিকর, গাছ-পাকা, টাট্‌কা ফলের কখন অভাব হয় না। কুঠীর আস্তাবলে বৃহদাকার, সুদৃশ্য, তেজস্বী অশ্ব আট-দশটির কম দেখা যায় না। প্রত্যেকটিই যেন উচ্চৈঃশ্রবার বংশধর। অধ্যক্ষ সাহেব বন্ধুবান্ধববর্গে পরিবৃত হইয়া, এই সকল অশ্ব লইয়া শিকার করিতে যান। জেলার সদরে যখন ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, তখন তাঁহারা এই সকল ঘোড়া লইয়া উৎসব-ক্ষেত্রে বাজি মারিতে যান। একদল মেষপালক ইঁহাদের গাড়োলের পাল চরাইবার জন্য নিযুক্ত আছে। পালে অসংখ্য গাড়োল—দেখিতে ভেড়ার মত; প্রভেদের মধ্যে তাহাদের লেজগুলি লম্বা। ইহারা দানা খাইয়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়; এবং সাহেবের ক্ষুধানলে আহুতি হইবার জন্য প্রস্তুত থাকে। 'গ্রাম-ফেড মটনের' জন্য কলিকাতার কশাই-সাহেব কোম্পানীর দ্বারস্থ হইতে হয় না। কুঠী-সংলগ্ন গোশালায় হাতীর মত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড দুগ্ধবতী গাভী; বৎস উৎপাদনের জন্য বড় জাতের পশ্চিম দেশীয় বৃষও দুই-একটি আছে। আমাদের পল্লী-অঞ্চলের বন্ধনহীন, অব্যাহতগতি ধর্ম্মের ষাঁড় অপেক্ষা অধিকতর সুখে তাহারা আহার-বিহার করিয়া থাকে। কারণ, তাহারা 'ধর্ম্মের ষাঁড়' নহে, 'ধর্ম্মাবতারের ষাঁড়।' তাহারা কোন কৃষকের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ফসল তসরূপ করিলেও টুঁ শব্দটি করিবার যো নাই! কুঠীর গাভীগুলি প্রত্যহ যে দুগ্ধ দান করে, তাহা হইতে প্রত্যহ ছানা, মাখন ও টাট্‌কা ঘি প্রস্তুত হয়। সাহেব ও মেম সাহেব তাহা সেবা করেন। কুঠীর চিড়িয়াখানায় অসংখ্য মুরগী, চীনামুরগী (টর্কি), হাঁস প্রভৃতি প্রতিপালিত হইতেছে। নীরোগ, সুস্থ, বলবান মোরগের মাংস ভিন্ন, অন্য স্থান হইতে সংগৃহীত অপরীক্ষিত মুরগী ম্যানেজার সাহেবের টেবিলে কদাচ স্থান পায় না। এমন কি, তাঁহারা যে ডিম ব্যবহার করেন, তাহা কেবল টাট্‌কা হইলেই চলে না; পাছে কোন খান্‌সামা কি খিৎমদ্‌গার কোন রুগ্ন, ক্ষীণজীবী মুরগীর ডিম সংগ্রহ করিয়া আনে, এই আশঙ্কায় বাবুর্চ্চি-খানসামাকে কড়া আদেশ দেওয়া থাকে —ঘরের মুরগীর টাট্‌কা ডিম ভিন্ন অন্য কোন ডিম যেন তাঁহাদের আহারের জন্য দেওয়া না হয়। এদেশের কয়জন সিভিলিয়ান, লক্ষ-লক্ষ দেশীয় প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াও, এই প্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিতে পান?

মুচিবাড়িয়া কানসারণের ম্যানেজার মিঃ উইলিয়াম হাম্‌ফ্রি, এই কানসারণের অধ্যক্ষতা লাভ করিবার পর হইতেই, এই সকল সুখ-সুবিধা উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য খেয়ালের মধ্যে তাঁহার একটি খেয়াল ছিল, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার কুঠী-সংলগ্ন চিড়িয়াখানায় কয়েকটি চীনামুরগী (টর্কি) ছিল। তিনি সাধারণ মুরগীর ডিমের বড় পক্ষপাতী ছিলেন না,—চীনা-মুরগীর ডিমই তাঁহার বড় আদরের খাদ্য ছিল। তিনি প্রত্যহই তাহা আহার করিতেন; এবং এই ডিম প্রত্যহ যতগুলি সংগৃহীত হইত, তাহা তিনি তাঁহার খানসামা-বাবুর্চ্চির জিম্মায় রাখিতে ভরসা পাইতেন না। পাছে তাহারা দুই-একটি অপহরণ করে, এই আশঙ্কায় তিনি সেগুলি তাঁহার আফিসের খাস কামরায়, একটি আলমারির ভিতর রাখিয়া দিতেন। আহারের সময় সেখান হইতে বাহির করিয়া লইয়া আহার করিতেন; এবং আহারের পর কয়টি ডিম অবশিষ্ট থাকিত—স্বয়ং তাহার হিসাব রাখিতেন! এক-একজন লোকের এক-এক রকম দুর্ব্বলতা থাকে; হাম্‌ফ্রি সাহেবের ইহাও চরিত্রগত দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু এই দুর্ব্বলতা তিনি পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। তাঁহার খানসামা-বাবুর্চ্চির ত কথাই নাই,—কুঠীর ছোট-বড় সকল কর্ম্মচারীই সাহেবের এই দুর্ব্বলতার কথা জানিত। তাহারা ইহাও জানিত—সাহেব শত গুরুতর অপরাধও ক্ষমা করিতে পারেন; কিন্তু যদি কেহ তাঁহার আলমারি হইতে এই

ডিম চুরি করে, তাহা হইলে সে তাঁহার যতই প্রিয়পাত্র হউক, তাহার অপরাধের মার্জ্জনা নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাম্‌ফ্রে সাহেব তাঁহার পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যালের কার্য্যদক্ষতার জন্য তাঁহার প্রতি সদয় ছিলেন। কুঠীর অন্যান্য কর্ম্মচারী পেস্কারের অসাক্ষাতে বলাবলি করিত, "পেস্কার বাবু সাহেবকে গাড়োল বানিয়ে রেখেছে; কোন রকম মন্তর-টন্তর জানে না কি? সাহেবকে যে কাতে শোয়ায়, সাহেব সেই কাতে শোয়!"

সদর আমিন রসরাজ বিশ্বাস বলিল, "কথাটা বড় মিথ্যে নয় হে গুরুচরণ! সেদিন আমি সাহেবের কাছে পেস্কারের ঘুস খাওয়ার কথা বলতেই, সাহেব যে রকম কটমট করে আমার দিকে তাকালে,—আমার ভয় হলো, সেই মাঠের মধ্যেই বা আমার পিঠে রেকাবদল কসে! মুখ ভেংচিয়ে বল্লে, 'টুমি কি মটলবে পেস্কারের নামে চুকলামি করচে, টা আমি বুঝতে পাচ্ছে না! টোমার পেটে পেস্কারের নিমক গজগজ করচে।'—মর আবাগের বেটা ভূত! যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর? না হে ভায়া, পেস্কারের নামে ঠকামী করে কোন ফল নেই।—এখন একটা উপায় আছে,—পেস্কারকে সাহেবের চীনামুরগীর ডিম চুরির দায়ে ফেলতে পার ত একবার দেখা যায়। পেস্কার ওর আলমারি থেকে ডিমগুলো সরিয়েছে—এ বিশ্বাস একবার জন্মিয়ে দিতে পারলেই বস্, কেল্লা মার দিয়া। পেস্কারের পেস্কারী করা ঘুচে যাবে। তার বামনাই শিকেয় উঠবে।"

গুরুচরণ সরকার বহুদিন হইতে জমানবীশের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এক সময়ে সকলেরই ধারণা হইয়াছিল, পেস্কারী পদটা তাহার ভাগ্যেই নাচিতেছে! কিন্তু হঠাৎ তাহার দীর্ঘকালের আশালতা উন্মূলিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পেস্কারের পদে বাহাল হইলেন। সেই সময় হইতেই গুরুচরণ ঈর্ষানলে জ্বলিয়া মরিতেছে; কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত সে পেস্কারকে অপদস্থ করিতে পারে নাই। অথচ বিপদে পড়িয়া কোন দিন সে পেস্কার বাবুর সহায়তা গ্রহণে কুণ্ঠিত হয় নাই; এবং, পেস্কারের অনুগ্রহেই সে বহুবার বহু বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল। এই জন্যেই পেস্কারের সর্ব্বনাশ সাধনে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ। রসরাজ বিশ্বাসের প্রস্তাব তাহার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল। সেই দিনই পরামর্শ সভায় স্থির হইল—সর্দ্দার খানসামা এব্রাহিম সেখকে দিয়া এই কাজ করাইতে হইবে। গুরুচরণ, রসরাজ এবং আরও দুই তিনজন আমলা এব্রাহিমকে গোপনে ডাকিয়া, তাহাদের মহৎ সঙ্কল্প তাহার গোচর করিল; এবং, তাহার হাতের ভিতর পাঁচটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া এ বিষয়ে তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিল। এব্রাহিম পেস্কার বাবুর নিকট নানা ভাবে সাহায্য পাইত; তাঁহাকে যথেষ্ট খাতির করিত; কিন্তু হাতের লক্ষ্মী সে পায়ে ঠেলিতে পারিল না, বিশেষতঃ এতগুলি ভদ্রলোকের অনুরোধ সে কিরূপে অগ্রাহ্য করে? সে অগত্যা বলিল, "তা, আপনারা বল্‌চেন, আমি রাজি না হয়ে করি কি? কিন্তুক, আপনারা, দেখে লেবেন, পেস্কারবাবু কি চিজ্! তিনি সাহেবকে এক হাটে কিনে, আর এক হাটে বিচ্‌তে পারে। আপনাদের 'সার্তচাঙার বুদ্ধি এক চোঙায় ঢুকবে' তা কিন্তুক আমি কয়ে দিলাম।"

হাম্‌ফ্রে সাহেবের বিনানুমতিতে তাঁহার আফিসের খাসকামরায় তাঁহার পেস্কার ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। এমন কি, বাবুর্চ্চি-খানসামারাও সাহেবের আদেশ ভিন্ন সেই কক্ষে প্রবেশ করিত না। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর-দিন প্রভাতে সাহেব তাঁহার আফিসের খাসকামরায় প্রবেশ করিয়া, চীনামুরগীর ডিম বাহির করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট আলমারি খুলিলেন; কিন্তু ডিম রাখিবার আধারে একটি ডিমও দেখিতে পাইলেন না! ডিমগুলি কেহ চুরি করিয়াছে বুঝিয়া, ক্রোধে তাঁহার চোখ-মুখ লাল হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সর্দ্দার-খানসামা এব্রাহিম সেখকে আহ্বান করিলেন;—তাহাকে মুরগীর ডিমগুলি অদৃশ্য হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুঠীর কর্ম্মচারীরা বুঝিল, ঔষধ ধরিয়াছে। তাহারা গম্ভীর ভাবে পেস্কারের মুখের দিকে চাহিল। মুহূর্ত্তে সকলেরই চোখে-চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, কিন্তু কেহই কোন কথা বলিল না। তাহারা খাসকামরার আশে পাশে দাঁড়াইয়া, তাহাদের ষড়যন্ত্রের সাফল্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সর্দ্দার-খানসামা খোদার কসম লইয়া বলিল, খাসকামরায় আল্‌মারি হইতে মুরগীর ডিমগুলি হঠাৎ কিরূপে অদৃশ্য হইল, তাহা তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সাহেবের আদেশ ভিন্ন সে বা অন্য কোন পরিচারক খাস্‌কামরায় প্রবেশ করে না,—একমাত্র পেস্কার বাবুরই সেই কক্ষে প্রবেশের অধিকার

আছে। যদি কেহ অপহৃত ডিমগুলির সন্ধান দিতে পারে— তবে পেস্কারবাবুই তাহা দিতে পারিবেন। এই চুরির সন্ধান অন্যের দেওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ চাকর-বাকরের মধ্যে কাহার ঘাড়ে তিনটা মাথা আছে যে, সে খোদাবন্দের আলমারি হইতে ডিম সরাইতে সাহস করিবে?—ইত্যাদি।

সাহেব গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "পেস্কার শা—কো আবি বোলাও।"—রাগ হইলে সাহেব এই মধুর সম্বোধনে সকল কর্ম্মচারীকেই আপ্যায়িত করিতেন; এমন কি, নায়েব মহাশয়ও বাদ পড়িতেন না!

পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যালের বাসা কুঠীর প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে গ্রামের ভিতর অবস্থিত। এ দেশের জমীদারি-সেরেস্তার কাজকর্ম্মের মত, কুঠীতেও সকালে-বিকালে আফিস বসিত। পেস্কারবাবুর একটি খর্ব্বকায় কষ্টসহ বলিষ্ঠ টাট্টু ঘোড়া ছিল; তিনি সেই ঘোড়ায় বাসা হইতে আফিসে যাতায়াত করিতেন। ম্যানেজার সাহেব যখন পেস্কারবাবুকে তাঁহার নিকট হাজির করিবার জন্য এব্রাহিম সেখকে তাঁহার সন্ধানে পাঠাইলেন, পেস্কার তখন পর্য্যন্ত আফিসে উপস্থিত হন নাই। কুঠীর অন্যান্য কর্ম্মচারী প্রভাতে যথা-নির্দ্দিষ্ট সময়েই আফিসে হাজির হইত; কিন্তু পেস্কার মহাশয় পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ,—প্রভাতে স্নান ও পূজা-আহ্নিক শেষ না করিয়া আফিসে যাইতেন না। এজন্য তাঁহার আফিসে আসিতে প্রত্যহই কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইত। ম্যানেজার সাহেবও এ কথা জানিতেন; কিন্তু এই বিলম্বে কাজের কোন ক্ষতি হইত না বলিয়া, সাহেব তাঁহাকে প্রত্যহ ঠিক সময়ে হাজিরা দেওয়ার জন্য কোন দিন পীড়াপীড় করেন নাই; অথচ, অন্য কোন কর্ম্মচারী কোন কারণে এক-আধ ঘণ্টা বিলম্ব করিলে, তাহাকে সাহেবের বকুনি খাইতে হইত। সুতরাং এক যাত্রার পৃথক ফল দেখিয়া আমলাদের ধারণা হইয়াছিল, সাহেব বড় এক-চোখো,—তাহার কাছে পেস্কারের সাত খুন মাফ! আজ পেস্কার কিরূপে আত্মসমর্থন করেন, তাহা জানিবার জন্য তাহাদের কৌতূহল অত্যন্ত প্রবল হইল।

পেস্কারবাবু কুঠীর সম্মুখে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন; এবং আফিসের আঙ্গিনাস্থিত শাখাবহুল সুবৃহৎ চাঁপা গাছে ঘোড়া বাঁধিয়া, সুপ্রশস্ত বারাণ্ডায় পদার্পণ করিয়াছেন, এমন সময় এব্রাহিম সেখ দ্রুতপদে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া, অভিবাদন করিয়া জানাইল, সাহেব খাসকামরায় তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন,—জরুর তলব!

সাহেব কোন দিন এত সকালে পেস্কারকে খাসকামরায় ডাকিয়া পাঠাইতেন না। এইজন্য ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া, তিনি এব্রাহিমকে বলিলেন, "সাহেব এত সকালে আমার খোঁজ করিতেছে কেন রে এব্রাহিম?"

এব্রাহিম বলিল, "কি জানি হুজুর! সাহেবের ভারি গোসা হয়েছে; আপনি খাসকামরায় গেলেই সব জানতে পারবেন। একটু হুঁসিয়ার থাকবেন,—সাহেব রাগে গোখরো সাপের মত গজরাচ্ছে!"

পেস্কারবাবু সাহেবের গোসার কারণ অনুমান করিতে না পারিয়া, তাড়াতাড়ি খাসকামরায় প্রবেশ করিলেন। অন্যান্য 'কুঠেল' সাহেবের মত হাম্‌ফ্রি সাহেবও অনর্গল বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন। তাঁহার পরিচয় পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। উচ্চারণ-গত বৈষম্যের জন্য তিনি 'ত'বর্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক 'ট'বর্গকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া বচন-বিন্যাস করিলেও, আমরা তাঁহার কথাগুলি স্বাভাবিক ভাবেই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

পেস্কার কুঠীর অন্যান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় দ্বারের বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া, নগ্ন-পদে সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পেস্কার যথারীতি সাহেবকে অভিবাদন করিলে, ক্রুদ্ধ ম্যানেজার তাহাকে প্রত্যভিবাদন না করিয়াই, ভ্রূভঙ্গী সহকারে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "পেস্কার, তোমার এ কি রকম আক্কেল বল ত! ঐ আলমারীর মধ্যে আমি যে সকল ডিম রাখিয়াছিলাম, তাহা কোথায়?"

পেস্কার সবিস্ময়ে বলিলেন, "ডিম! মুরগীর ডিমের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তাহা কি আলমারিতে নাই?"

সাহেব বলিলেন, "না। আলমারিতে থাকিলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব কেন? ডিমগুলা চুরি গিয়াছে!"

পেস্কার বলিলেন, "তাজ্জবের কথা বটে! তা ডিম-গুলা চুরি গিয়া থাকিলে, সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন কেন?"

সাহেব বলিলেন, "তোমাকে ভিন্ন কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? আমার খাসকামরায় তোমার ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। আমার আদেশ ভিন্ন দোসরা আদমী এই কুঠরিতে আসিতে পায় না। এই কুঠরী হইতে কোন

জিনিস চুরি হইলে, তুমিই সে জন্য দায়ী। ডিমগুলি কোথায় রাখিয়াছ বল। সবগুলাই কি পেটে পুরিয়াছ?"

এই ঘৃণিত, মিথ্যা অপবাদে পেস্কার মহাশয় মুহূর্ত্তকাল বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সাহেব তাঁহার সহিত পরিহাস করিতেছেন কি না, তাহা তিনি হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ; তিনি মুরগীর ডিম খাইয়াছেন,—তাহাও আবার চুরি করিয়া! তিনি সাহেবের অধীন কর্ম্মচারী বলিয়াই কি সাহেব তাঁহার এতদূর অপমান করিতে সাহস করিলেন? তিনি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না,—মুহূর্ত্তে তাঁহার ক্রোধানল দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পেস্কার ক্রোধে কাঁপিতে-কাঁপিতে, আরক্ত নেত্রে হাম্‌ফ্রি সাহেবের মুখের দিক চাহিয়া, সুস্পষ্ট ঘৃণার সহিত বলিলেন, "সাহেব, তুমি বলিতেছ কি? আমি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ,—আমার কোন পুরুষে কেহ চাকরী করে নাই,—ম্লেচ্ছের দাসত্ব করা ত দূরের কথা, পেটের দায়ে, পরিবার প্রতিপালনের অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া, অগত্যা তোমাদের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি,—আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট অপমান। মুরগী স্পর্শ করিলে আমাদের জাতিপাত হয়। সেই মুরগীর ডিম আমি তোমার আলমারি হইতে চুরি করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছি? কি ঘৃণার কথা! তুমি মনিব, তোমাকে আর কি বলিব! অন্য কেহ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এ রকম কথা বলিলে, আমি জুতা মারিয়া তাহার মুখ ভাঙ্গিয়া দিতাম,—এ অপমান সহ্য করিতাম না।"

পেস্কারের কথা শুনিয়া সাহেব হুঙ্কার দিয়া লাফাইয়া উঠিলেন; এবং আস্তিন গুটাইয়া ঘুসি তুলিয়া বলিলেন, "ওরে হারামজাদ, বেয়াদপ, শয়তান, তোর গোস্তাকীর প্রতিফল গ্রহণ কর।"

সাহেবকে ঘুসি তুলিয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া, পেস্কার একলম্ফে টেবিলের কাছে আসিয়া, 'ব্লটিং প্যাডে'র উপর হইতে লৌহদণ্ডের ন্যায় স্থূল রুলগাছটা খপ করিয়া তুলিয়া লইলেন; এবং তাহা দৃঢ়-মুষ্টিতে বাগাইয়া ধরিয়া, সতেজে বলিলেন, "খবরদার সাহেব, নিজের মান নিজের কাছে। তুমি আমার গায়ে ঘুসি দিলে, এই রুলের এক ঘা বসাইয়া তোমার মাথা ছাতু করিয়া দিব। সকলেরই আত্মরক্ষা করিবার অধিকার আছে।"

হাম্‌ফ্রি সাহেব জানিতেন দোষ করিলে কালা নেটিভের সকল দোষের আকর, পেট্-জোড়া পীলেই ফাটিয়া আসিতেছে; রুল হাতে লইয়া তাহাদের আত্ম-রক্ষার চেষ্টা তাঁহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় নূতন। তিনি তৎক্ষণাৎ উদ্যত ঘুসি সংবরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার পাইক, বরকন্দাজ প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন।

কুঠীর বহু কর্ম্মচারী এবং হালসানা, পাইক, তাগাদগীর, বরকন্দাজ প্রভৃতি খাসকামরার বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল। সাহেবের আহ্বানমাত্র তাহাদের দশবারজন তাড়াতাড়ি খাসকামরায় প্রবেশ করিল।

সাহেব তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই নিমকহারাম বদমায়েসের হাত হইতে রুল কাড়িয়া লইয়া, উহাকে বাঁধো। উহার বড় তেল হইয়াছে। উহাকে জেলে পুরিয়া, ঘানি টানাইয়া তেল বাহির করিব।"

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে সাহেবের তাঁবেদারগণের মধ্যে এক প্রাণীও তাঁহার হুকুম তামিল করিতে অগ্রসর হইল না। অধীন আমলা ও পরিচারকবর্গের প্রতি সাহেবের এরূপ আচরণ নূতন নহে; সুতরাং ঘুঁটেকে পুড়িতে দেখিয়া গোবর হাসিল না।

সাহেব পুনর্ব্বার রোষ-কষায়িত-নেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "শীঘ্র উহাকে কয়েদ কর।"

যে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, কাঠের পুতুলের মত সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। পেস্কার তখন ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া, রুলগাছটা টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া, প্রশস্ত বারান্দা দিয়া প্রাঙ্গণস্থিত চাঁপা গাছের তলায় আসিলেন; এবং বৃক্ষ-শাখা হইতে তাঁহার ঘোড়ার লাগাম খুলিয়া লইয়া তাহার পিঠে চড়িয়া বসিলেন। সাহেব তখন খাসকামরা হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পেস্কার ঘোড়ার পিঠে বসিয়া সাহেবকে বলিলেন, "সেলাম সাহেব, আমি এখন চলিলাম, তুমি বোধ হয় আমাকে ডিস্‌মিস্ করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু কাজটা তেমন সহজ হইবে না, এ কথাও তোমার স্মরণ থাকিতে পারে। এই কেলেঙ্কারীর জন্য দায়ী আমি না তুমি, তাহাও ভাবিয়া দেখিও।"

পেস্কারকে লইয়া তাঁহার বেগবান তেজস্বী অশ্ব চক্ষুর

নিমেষে কুঠীর হাতা অতিক্রম করিল। সাহেব অধীর ভাবে বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারী ও পরিচারকেরা কোন্ দিক দিয়া কোথায় সরিয়া পড়িল, সাহেব তাহা লক্ষ্য করিলেন না; তাহারা তাঁহার হুকুম তামিল করিল না কেন, এ কথাও তিনি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন না। সেই দিন তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ধারণা হইল, বিপুল অর্থবল ও জনবল তাঁহার আয়ত্তে থাকিলেও, তিনি নিতান্ত একাকী এবং অসহায়!

পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যাল মহাশয় অতঃপর সপ্তাহকাল কুঠীতে আসিলেন না। তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে বাসায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার গুপ্তচরের অভাব ছিল না,—কুঠীর প্রত্যেক সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। তাঁহার বাসায় পূর্ব্বে যেমন দুবেলা পঞ্চাশখান পাতা পড়িত, তাহার বৈলক্ষণ্য হইল না। পূর্ব্বের মতই তিনি পল্লীবাসিগণের বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া, অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করিতে লাগিলেন। ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবও যে দুই-এক দিন গোপনে তাঁহার সন্ধান লন নাই, এ কথা বলিতে পারি না। পেস্কারবাবু কয়েকদিন কাছারীতে অনুপস্থিত থাকায়, সাহেবের কায-কর্ম্মের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল; এমন কি, নায়েব মহাশয় পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। একজন মাত্র কর্ম্মচারী এতবড় একটা 'কানসারণে'র কায-কর্ম্ম একাকী কিরূপে পণ্ড করিয়া দিতে পারে, তাহার প্রমাণ পাইয়া ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবকেও কিঞ্চিৎ বিচলিত হইতে হইল। দুই-এক দিন তাঁহার ইচ্ছা হইল, পেস্কারকে লোক দিয়া ডাকাইয়া পাঠাইবেন; কিন্তু তিনি একে ম্যানেজার, তাহার উপর বর্ণশ্রেষ্ঠ ইংরাজ; একটা সামান্য নেটিভ আমলা প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার অপমান করিয়া, তেজ দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছে; পেস্কারকে ডাকিয়া আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে, সঙ্গে-সঙ্গে পেস্কারের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। বিশেষতঃ, পেস্কার কুঠী ত্যাগ করিবার সময় তাঁহার মুখের উপর স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, "তুমি বোধ হয় আমাকে ডিস্‌মিস্ করিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু কাযটা তেমন সহজ হইবে না,—এ কথাও তোমার স্মরণ থাকিতে পারে!" —যে আমলার মুখ হইতে এরূপ স্পর্দ্ধার কথা বাহির হইতে পারে, কোন্ উপরওয়ালা তাহাকে ডিস্‌মিস্ না করিয়া স্থির থাকে? কিন্তু সাহেব জানিতেন, পেস্কারের এই উক্তি বর্ণে-বর্ণে সত্য; পেস্কার এরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলেও, ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেব তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিলেন না। ফুটবলের ন্যায় পদাঘাতে পেস্কারকে দূরে নিক্ষেপ করা হাম্‌ফ্রি সাহেবের সাধ্য হইলে, কায্-কর্ম্মের শত অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি তাহাতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

মিঃ হাম্‌ফ্রি কূটবুদ্ধি; কুঠীর কায-কর্ম্মে অভিজ্ঞ, অত্যন্ত তেজী ও জেদী ইংরাজ। কিন্তু তিনি যতই চতুর হউন, চালবাজিতে তিনি পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের সমকক্ষ ছিলেন না। সাহেবের সর্দ্দার-খান্‌সামা এব্রাহিম মিঞা এই কুঠীর কার্য্যে চুল পাকাইয়াছিল। সে সত্যই বলিয়াছিল, "তিনি সাহেবকে এক হাটে কিনে, আর এক হাটে বিচ্‌তে পারে।" পেস্কার বাবু তাঁহার পেস্কারী চাকরী কি উপায়ে মৌরুসী করিয়া লইয়াছিলেন, আমরা তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যাল মহাশয়ের পেস্কারী চাকরী নূতন নহে। এই চাকরী করিতে-করিতে তিনিও চুল পাকাইয়াছিলেন; এবং মুচিবাড়িয়া কানসারণের তিনজন ম্যানেজারকে পার করিয়াছেন। মিঃ উইলিয়াম হাম্‌ফ্রি এই কানসারণের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া আসিবার পূর্ব্বে, মিঃ ডেভিড স্মিথ এই কানসারণের ম্যানেজার ছিলেন। স্মিথ সাহেব বড়ই আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি কানসারণের কায-কর্ম্ম প্রায় কিছুই দেখিতেন না; জুয়ায় ও ঘোড়দৌড়ে বিস্তর টাকা উড়াইয়াছিলেন। তাঁহার ঔদাসীন্যেই হউক, আর উচ্ছৃঙ্খলতাতেই হউক, কিছুদিনের মধ্যেই মুচিবাড়িয়া কানসারণে কোম্পানীর নব্বই হাজার টাকা ক্ষতি হয়। এজন্য কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা মিঃ ডেভিড স্মিথকে পদচ্যুত করেন। স্মিথ সাহেব ইংরাজ,—তাঁহার সাত খুন মাফ। তিনি হাত পা ধুইয়া 'হোমে' যাত্রা করিলেন। কিন্তু কোম্পানীর ত ক্ষতি পূরণ হওয়া চাই! সুতরাং সকল চাপ পেস্কারের উপর পড়িল;—পেস্কার যেরূপে পারেন, কোম্পানীর এই ক্ষতি পূরণ করুন,—কোম্পানীর অধ্যক্ষ-সভা এই আদেশ প্রচার করিলেন।

অন্য কেহ হইলে এরূপ প্রকাণ্ড দায়িত্বভার স্কন্ধে লইতে সম্মত হইত কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান লঙ্কাপ্রাশনের যুগ হইলে, এত বড় কাঁঠাল তাহাদের মাথায় ভাঙ্গিতে দিতে নিশ্চয়ই রাজী হইত না। কিন্তু আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, সেই যুগের প্রজারা জলে বাস করিয়া কুমীরের

সহিত বিবাদ করিতে ভয় পাইত। চতুর পেস্কার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর এক বড়ে টিপিয়াই কিস্তিমাৎ করিলেন। তিনি কোম্পানীর এই ক্ষতি-পূরণের জন্য অধ্যক্ষ-সভার নিকট হইতে কৌশলে দুইটি আদেশ মঞ্জুর করাইয়া লইলেন। প্রথম আদেশ এই, টাকা সংগ্রহের জন্য প্রজারা একটা নির্দ্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত কর বা সেলামী দিবে। দ্বিতীয় আদেশ, মুচিবাড়িয়া কানসারণের ম্যানেজার পদে যিনি যখনই নিযুক্ত থাকুন, তিনি অধ্যক্ষ-সভার সকল সদস্যের এক-যোগে সম্মতি না পাইলে, পেস্কার বাবু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্ন্যালকে স্বেচ্ছায় পদচ্যুত করিতে পারিবেন না। ম্যানেজার মিঃ হাম্ফ্রি জানিতেন, তিনি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ম্যানেজার হইলেও, অধ্যক্ষ-সভার সকল সদস্যকে তাঁহার মতানুবর্ত্তী করিয়া, পেস্কারের বরখাস্তের আদেশ বাহির করা সহজ নহে। আর তাহা যদি নিতান্ত অসম্ভব না-ও হয়, তাহা হইলেও, পেস্কার সহজে ছাড়িবেন না, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে রীতিমত লড়িবেন। তখন যদি চীনামুরগীর ডিমচুরির রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাঁহাকেও যথেষ্ট অপদস্থ হইতে হইবে। এই সকল কারণে ম্যানেজার সাহেব পেস্কারকে বরখাস্ত করিতে সাহস করিলেন না; এদিকে কয়েক দিন কাষ-কর্ম্মের অসুবিধা ভোগ করিয়া, তাঁহার মনও অনেকটা নরম হইয়া আসিল। রাগ পড়িলে তিনি বুঝিতে পারিলেন, খাসকামরায় পেস্কারেরই প্রবেশাধিকার ছিল, কেবল এই হেতুবাদে, বিনা প্রমাণে তাঁহাকেই ডিম-চোর বলিয়া সিদ্ধান্ত করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। বিশেষতঃ, পেস্কারের ন্যায় নিষ্ঠাবান ও হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত আচার-অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী 'গোঁড়া' হিন্দু কখন মুরগীর ডিম চুরি করা দূরের কথা, স্পর্শও করিতে পারেন না! এ অবস্থায়,'তুমি চুরি করিয়া ডিম খাইয়াছ'—পেস্কারকে এরূপ রূঢ় কথা বলা অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। এ দেশের ইংরাজদের যত দোষই থাক, তাঁহাদের অনেকেরই চরিত্রে এই একটি গুণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা অন্যায় করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিলে, ত্রুটি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না। কয়েক দিন পরে মিঃ হাম্ফ্রি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোককে পেস্কার মহাশয়ের বাসায় পাঠাইয়া, তাঁহার নিকট দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। উদার-হৃদয় পেস্কার মহাশয় ক্ষোভ ত্যাগ করিয়া, ম্যানেজার সাহেবকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিলেন; এবং পরদিন প্রভাতে আফিসের কার্য্যে যোগ দান করিলেন। কিন্তু এই কয় দিনেই তিনি, কুঠীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে কে কি প্রকৃতির লোক, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য কাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া ম্যানেজার সাহেবকে নাচাইয়াছিল, তাহারও তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কুঠীতে গিয়া কোন আমলার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতেন না; কোন কার্য্যে কাহাকেও সাহায্য করিতেন না; গম্ভীর ভাবে নিজের নির্দ্দিষ্ট কাযটুকু শেষ করিয়া বাসায় চলিয়া আসিতেন। এই ভাবেই কিছুদিন কাটিয়া গেল।

এই সময়েও নীল-কুঠীর দেওয়ানেরা প্রজার প্রতি অত্যাচারে সম্পূর্ণ রূপে বিরত হইয়াছিলেন,—নানা কারণে ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে 'নীলদর্পণে' অত্যাচারের ও উৎপীড়নের যে আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে, এ সময় নীলকর ও তাঁহাদের তাঁবেদারদের অত্যাচার সেরূপ প্রবল ও সংক্রামক ভাবে বর্ত্তমান ছিল না। অত্যাচারের স্রোত তখন অন্তঃসলিলা ফল্গু-স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইত; এবং অনেক প্রজা তাহার প্রভাব মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিত। যে সকল স্থানে নীলের চাষ হইত, সেই সকল স্থানের কুঠীতে এক-একজন দেওয়ান থাকিতেন। দেওয়ানেরা সকলেই এ দেশের লোক, এবং সাধারণতঃ ভদ্র-সন্তান। তবে কানসারণের ইংরাজ ম্যানেজারের অধীন প্রধান-প্রধান আমলাদের আত্মীয় ও অনুগৃহীত লোকেরাই নীলকুঠীর দেওয়ানী পদ লাভ করিতেন। এই সকল দেওয়ানকেও কানসারণের ইংরাজ ম্যানেজারের নিকট নিকাশ দিতে হইত। ম্যানেজার সাহেবের মনোরঞ্জন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। দেওয়ানদের কাষ-কর্ম্মের প্রতি ম্যানেজার সাহেবেরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত।

পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্ন্যাল নির্লিপ্ত ভাবে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কি ম্যানেজার সাহেব, কি নায়েব মহাশয়, কাহারও সহিত তিনি মেলামেশা বা ঘনিষ্ঠতা করেন না। তাঁহারাও তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া, তাঁহার সহিত পূর্ব্ববৎ ঘনিষ্ঠতা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন না। এই ভাবে কাষ-কর্ম্ম চলিতেছে, এমন সময়ে এক দিন, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায়, হঠাৎ সংবাদ আসিল, নীলকুঠীর দেওয়ান পুরন্দর ভাদুড়ীর নিদারুণ অত্যাচার

সহ্য করিতে না পারিয়া প্রজারা দেওয়ানজিকে ধরিয়া 'কোরবানি' করিয়াছে; এবং মৃতদেহ নদী-স্রোতে নিক্ষেপ করিয়া, অত্যাচারের বনিয়াদ পর্য্যন্ত নির্ম্মূল করিয়াছে।

পুলিশের জমাদার-দারোগার প্রমোশন তাহাদের অনুষ্ঠিত অত্যাচারের উপর নির্ভর করে কি না জানি না; তবে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরদের প্রমোশন কিছুদিন পূর্ব্বে আসামী নির্য্যাতনের (conviction) উপর নির্ভর করিত, ইহা কোন-কোন ডেপুটি বন্ধুর মুখেই শুনিয়াছি। নীলকুঠীর নায়েবদের সম্বন্ধেও এ কথা কতকটা খাটিত। তবে যাহারা তিন ডবল প্রমোশন পাইয়া নীলকুঠীর 'দেওয়ানজি' হইয়া বসিয়াছে, তাহারা আর নূতন করিয়া কি প্রমোশন পাইবে? প্রজার প্রতি অত্যাচার না করিলে নীলের কায ভাল হয় না; এবং নীলের কায ভাল হইলেই, দেওয়ানেরা ম্যানেজারের নেক-নজরে থাকিত,—নিজেরাও গুছাইয়া লইত। দেওয়ান পুরন্দর ভাদুড়ীও এই কারণে ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবের নিকট বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন; প্রজারা তাহাকে জবাই করিয়া লাস নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছে শুনিয়া সাহেব রাগিয়া আগুন হইলেন। দেখিতে দেখিতে চারিদিকের সমগ্র পুলিশ-বাহিনী ঘটনাস্থলে সমবেত হইয়া 'কিবা জল, কিবা স্থল, ছাইল আকাশ-তল'; কয়েকজন টিকটিকি পুলিশও কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আন্দোলন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই খুনের কোন কূল-কিনারা করিতে পারিলেন না!—ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবও 'গেল রাজ্য গেল মান' ভাবিয়া স্বয়ং ঘটনাস্থলের অদূরে উপস্থিত হইয়া তাম্বু ফেলিলেন, এবং যথাসাধ্য পুলিশকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইহাতে সেই অঞ্চলের 'মাথালো' 'মাথালো' প্রজাদের উপরেও যে কিছু চাপ পড়ে নাই, এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। কিন্তু ইহার ফল তেমন সুবিধাজনক হইল না; 'দেওয়ান মেদ' যজ্ঞে ইন্দ্রায় স্বাহাঃ' হইবার উপক্রম হইল। জনরব উঠিল, এবার ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবকে পর্য্যন্ত কোরবানি করিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে!—এই সংবাদ পাইয়া সাহেবের আহার নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার অবস্থা তখন 'সাপের ছুঁচো ধরার' মত সঙ্গীন হইয়া উঠিল; এরূপ রোমাঞ্চকর সংবাদ পাইয়া সেই অরক্ষিত স্থানে তাঁহার থাকিতে সাহস হইল না। অথচ তাড়াতাড়ি তাঁহার মুচিবাড়িয়ার সুরক্ষিত দুর্গে প্রত্যাগমন করিবেন, ততখানিও সাহস করিতে পারিলেন না। ম্যানেজার সাহেব অত্যন্ত ভীত হইয়া 'বাঙ্গাল নায়েব' বাগচী মহাশয়কে তাঁহার বিপদের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলেন, এবং তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য অবিলম্বে সশস্ত্র লাঠিয়াল, পাইক প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন।

মুচিবাড়িয়ার কুঠীতে বসিয়া নায়েব মহাশয় ম্যানেজার সাহেবের এই পত্র পাইয়া চতুর্দ্দিকে 'শর্ষপ পুষ্প' দর্শন করিতে লাগিলেন! হঠাৎ তখন উপযুক্ত পরিমাণে সশস্ত্র লাঠিয়াল পাইক কিরূপে সংগ্রহ করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, পেস্কার বাবু যদি এই ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই এই সঙ্কটে ম্যানেজার সাহেবের জীবন রক্ষা হইতে পারে; নতুবা তাঁহার চেষ্টায় কোন ফল হইবে না। নায়েব মহাশয় নিরুপায় হইয়া অগত্যা পেস্কার বাবুর শরণাপন্ন হইলেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রথমে বাঁকিয়া বসিলেন। তিনি বলিলেন, সাহেব নায়েব মহাশয়ের সাহায্য-প্রার্থী হইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন,—বিশেষতঃ তিনিই সাহেবের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। সাহেব পেস্কার মহাশয়কে কোন কথা লেখেন নাই; সাহেবকে ক্ষিপ্তপ্রায় সহস্র-সহস্র প্রজার কবল হইতে নিরাপদে উদ্ধার করিয়া আনিবার শক্তিও তাঁহার নাই।

পেস্কার বাবুর কথা শুনিয়া নায়েব মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিলেন; এবং তাঁর দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "ভাই, এ অভিমান তুমি ত্যাগ কর; তুমি কি পার না পার, তাহা আমার জানা আছে। এই বিষম দায়ে তুমি আমাকে রক্ষা না করিলে আমার আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। আমার মাথা কাটা যাইবে।"

নায়েব মহাশয়ের স্তুতি-মিনতিতে পেস্কার বাবুকে অবশেষে নরম হইতে হইল। পেস্কারবাবুর চরিত্রের এই একটি বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি যে ভার গ্রহণ করিতেন, তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেন। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অদ্ভুত তৎপরতার সহিত অল্প সময়ের মধ্যেই একশত লাঠিয়াল সংগ্রহ করিলেন, এবং দুইখানি ছৈ-ওয়ালা গরুর গাড়ীতে ঢাল, সড়কী, লাঠি প্রভৃতি বোঝাই দিয়া ম্যানেজার সাহেবের সাহায্যের জন্য তাহা

প্রেরণ করিলেন। একশত লাঠিয়াল একত্র দলবদ্ধ হইয়া গমন করিলে পাছে কেহ সন্দেহ করে, এবং পথিমধ্যে তাহারা বাধা পাইতেও পারে, এই আশঙ্কায় পেস্কারবাবু তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন পথে যাইতে আদেশ করিলেন। তাহার পর তিনি স্বয়ং ম্যানেজার সাহেবের আস্তাবল হইতে একটি সুবৃহৎ তেজস্বী দ্রুতগামী আরবী অশ্ব লইয়া সশস্ত্র হইয়া ম্যানেজার সাহেবকে উদ্ধার করিতে চলিলেন।

উন্নতির পথ

[শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ]

জগৎ জুড়ে আজ যে একটা কোলাহল উঠেছে, সে কোলাহল আনন্দের নয়,—অশান্তির এবং অতৃপ্তির।

—:০:—

যিনি বড়, সবার ওপরে যাঁর আসন, তিনি বল্‌ছেন—ঐ যে সব ছোটর দল মাথা তুলে এগিয়ে আস্‌ছে, আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের গণ্ডীটিকে মুছে ফেলবার জন্যে হাত বাড়াচ্ছে,—ঐ এগিয়ে আসা, ঐ হাত-বাড়ানটা ওদের স্পর্দ্ধা ছাড়া আর কিছুই নয়। ও স্পর্দ্ধা আমরা সইব না। আমরা বড়। ওদের পূজা পেয়ে এসেছি চিরদিনই।—এ পূজা আমাদের পেতেই হবে।

—:০:—

ছোট বল্‌ছে—দেবো না। তুমি আমাদের পূজ্য ততক্ষণই, যতক্ষণ আমাদের সমস্ত দীনতা সমস্ত হীনতার সঙ্গে তোমার প্রাণের যোগ, মনের সহানুভূতি আছে। আমাদের মাথা পা দিয়ে মাটিতে চেপে রেখে, আমাদের পেষণ করে শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব্ব করতে দেবো না,—তোমাকে অস্বীকার করব।

—:০:—

এই 'দেবো না' এবং 'নেবোর' যদিও এইখানেই একটা মীমাংসা হয়ে গেল না; কেন না, বড়, এখনও বড়ই আছে,—ছোট, ছোটই রইল। কিন্তু ওদের পরস্পরের সংঘর্ষে যে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল, সে আগুনে যা পুড়ে ছাই হল, তা হচ্ছে—অন্ধকার।

—:০:—

বড় জান্‌ল, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হল ঐ হীন, ঐ দুর্ব্বলরাই। তাই সে যতই আপনার উচ্চ আসনে অচল হয়ে থাক্‌বার চেষ্টা করছে, ছোট ততই সেই আসনটিকে নাড়া দিয়ে-দিয়ে সচল করে তুলছে। কারণ, এখন সেও জান্‌তে পেরেছে—বেড়ে ওঠার অধিকার বিশেষ কোন একটি মানুষের ওপরই ন্যস্ত হয়নি, সবারই আছে। সে ছোট, এ কথা সে অস্বীকার করে না; কিন্তু আর একটি কথাও বড় স্পষ্ট হয়ে তার প্রাণে জেগেছে—সে মানুষ।

—:০:—

দোষী যখন মার খায়, তখন তার সান্ত্বনাই হচ্ছে, সে দোষী। কিন্তু নির্দ্দোষের মার খাওয়ার কোন সান্ত্বনাই নেই। ছোট, ছোট বলে, তুচ্ছ বলে, বড়র কাছ থেকে অত্যাচার সহ্য করতে পারে, করেও। কিন্তু সে যখন নিজেকে মানুষ বলে জগতের কাছে প্রচার করে, তখন আর সে নীরবে সহ্য করে না।

—:০:—

বড়দের তরফ থেকে শোনা গেল—বেশ বাপু, মান্‌লাম তোমরা মানুষ। কিন্তু তোমরা যে অক্ষম, সে কথা ভুলে যাও কেন? আমরাই ত চির দিন তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছি;—তোমাদের চালিয়েছি। এর জন্য আমাদের কাছে তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

—:০:—

ছোট বল্‌ল—ওতে আর ভুলি না। আমাদের ঠাঁই সবার ওপরে না হলেও নীচে নয়। আমাদের—যায়গাতে আমরা গিয়ে দাঁড়াব, তাতে বাধা দাও কেন? তুমি আমাদের অকৃতজ্ঞ বলছ; কিন্তু তুমি নিজে যে অত্যাচারী—আমাদের প্রাপ্য হ'তে বঞ্চিত করে রেখেছ।

—:০:—

ভিক্ষা দিয়ে মানুষ তৃপ্তি পায়, তাই দেয়। কিন্তু ভিখারী যদি দাবী করে বসে,—আমাদের যা প্রাপ্য, তা আমরা ভিক্ষা করে নেবো না, অধিকার আছে বলেই নেবো,—

তা'হলে ওর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, করাটাই দাতার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সে প্রতিবাদটা যে রকমেরই হোক, ও দিয়ে সত্যকে আর চেপে রাখা যায় না। ছোট, তার চারপাশের সঙ্কীর্ণ যায়গাটাকে বড় করে নিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেই; কেন না, অভাবকে ঘোচানই ত মানুষের স্বভাব।

—:০:—

অবশ্য এ কথাটা ঠিক যে, অভাবের একটা সীমা আছে। নদীতে স্নান করতে গিয়ে দেখি, আমার পক্ষে ঐ এক-গলা জলই যথেষ্ট। ওকেই কাজে লাগাই, আর বাকিটা বাড়তিই থেকে যায়। কিন্তু ঐ নদী যদি এক-গলা জলের সীমার মধ্যেই থাক্‌ত, তাহলে ওকে নিয়ে আর তৃপ্তি হত না।

—:০:—

প্রয়োজন আমার যতটুকুই থাক, সমস্তটা না পেলে মন ওঠে না। তাই ছোট আজ যতই মুক্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ছে, বড় ততই সহস্র কৌশলের ফাঁসি তার গলায় পরিয়ে দিয়ে, তাকে চেপে রাখ্‌তে চেষ্টা করছে; কারণ, ছোট যায়গার সঙ্কীর্ণতা না থাকার অর্থই হচ্ছে বড়র যায়গা কমে যাওয়া।

—:০:—

এই অশান্তির কোলাহলের মধ্যে কতকগুলি মানুষ বেরিয়ে এলেন—এঁরা জ্ঞানী। তাঁরা বল্‌লেন—আমাদের মতে চল, তা'হলেই সব পাবে।

—:০:—

ছোটরা সব বিষয়েই দরিদ্র, কিন্তু একটি জিনিস তাদের বড় বেশী করে থাকে,—সেটি তাদের বিশ্বাস। বড় সহজেই ওটা তারা খরচ করে ফেলে। কেন না, তাদের নিজেদের কিছু করবার ক্ষমতা ত নেই; তাই যদি কেউ বলে, আমি তোমাদের করে দেবো, অমনি কোন তর্ক বা বিচার না করে, তার দিকেই এগিয়ে আসে। যিনি বলেছেন করে দেবো, তাঁর ওপর শুধু বিশ্বাস রেখেই এরা সন্তুষ্ট। যদি না পায়, এরা কারো দোষ দেয় না। শুধু বলে, বরাতে ছিল না—পেলাম না। কিন্তু এই ধরণের বিশ্বাস যে 'দুর্ব্বলতা' এবং অবহেলারই নামান্তর, তা' কারো মনে হয় না।

—:০:—

জ্ঞানী বলেছেন—তোমরা যা চাও, তা দেবো। কিন্তু আমাদের পাবার যোগ্যতা হয়েছে কি না, তা তিনিও ভাবেন না, আমরাও না। বাইরের বন্ধনটাকে বড় মনে করে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি; কিন্তু আমাদের ভিতরে ও-হতেও সহস্রগুণ ভীষণ বন্ধনে যে আমরা বাঁধা, তা হ'তে মুক্ত হবার চেষ্টা করি না।

—:০:—

নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে যে পাখী খাঁচায় বসে ডানা ঝটপট করে, ডানা নাড়াই তার সার হয়।

—:০:—

আকাশটা ওড়বার জন্যেই আছে যেমন সত্য, তেমনি সত্য ঐ খাঁচা এবং পায়ের শিকল। যত দিন ঐ খাঁচা না ভাঙ্গবে, শিকল ছিড়্‌বে, তত দিন মুক্তি নেই।

—:০:—

নিজেদের কুসংস্কার-বিষে জর্জ্জরিত,—পদে-পদে আমরা নিজেরাই নিজেদের বাঁধা। আচার-বিচারে, স্বার্থপরতার গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের কয়েদ করে রেখেছি; এ সমস্ত হতে মুক্তি নেবার কথা ত কোন দিন কারো মনে হয় না! পথ চলার জন্যেই পড়ে আছে সত্য,—কিন্তু পায়ে যে আমাদের বেড়ী! ওকেই ত আগে ভাঙ্গতে হ'বে। নইলে খোলা পথটা ত কোন কাজেই আসবে না।

—:০:—

জ্ঞানী বলেছেন, তোমাদের পেতে হ'লে ত্যাগ করতে হবে। কি ত্যাগ করতে হবে? অর্থ? এক গল্পে আছে;—একটি বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষায় বেরিয়েছিলেন। পুরবাসীরা তাঁকে যে যা পারল, তা এনে দিল; কিন্তু ভিক্ষুর ওতে তৃপ্তি হল না। তাঁর কেবলই মনে হ'তে লাগল, যেন কেউ কিছু দেয় নি—সবাই তাঁকে প্রতারণা করেছে।

—:০:—

সন্ধ্যা-বেলা দুঃখে, অবসাদে শ্রান্ত হয়ে, বনের পথ ধরে চলেছেন গান করতে-করতে। গাছের ছায়া হ'তে বেরিয়ে এল এক কঙ্কালসার নারী। সে দিল তার দেহের এক-মাত্র আবরণ,—ছিন্ন বসনের আধখানি! বল্‌ল—ঠাকুর, আমার যা ছিল, তা দিলাম, নাও। ভিক্ষুর মুখ আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল—তাঁর পাওয়া হ'য়েছে।

—:০:—

ঐ ত হ'ল ত্যাগ। ত্যাগ ত শুধু ধন রত্ন দিয়েই হয় না; কেন না, ও ত সবচেয়ে দামী নয়। সব হ'তে বড় প্রাণের আগ্রহ। ঐ দিতে হবে, দেশমাতার আঁচল ভরে-ভরে।

—ঃ০ঃ—

যিনি ধনী, দিন তিনি ধন। কিন্তু দরিদ্র পিছনে থাকে কেন? সে দিক তার সততা, নির্ভীকতা। জ্ঞানী হাজার পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যে সম্পদ পেয়েছেন, তা দিন। বলবান যিনি, তিনি দিন বল। হাত ত শুধু শাসন করবার জন্যেই হয় নি,—পালনও ত ঐ হাতেই হয়। প্রেমিক দিন তাঁর ভালবাসা। দুঃখের আগুনে পুড়ে-পুড়ে যে ভালবাসা নির্ম্মল হয়ে উঠেছে, সোণার মত। ভক্ত দিন তার ভক্তি; মায়ের পূজার আসনে পূজারী হয়ে বসুন। তবেই ত পূজা সার্থক হবে, কল্যাণ হবে। ঐ ত উন্নতির উপায়, উন্নতির পথ। এমনি করে একসঙ্গে সকলে কাজে নামলেই ত কাজ সহজ হয়ে আসে।

—ঃ০ঃ—

বাইরের শত্রুর আক্রমণ নিষ্ফল করতে হলে, প্রথমে নিজেদের প্রস্তুত রাখতে হয়। নইলে মার খাওয়াই সার হয়, কান্নাই সার হয়। আমি নিজেকে বেঁধে রাখব, তা হতে মুক্ত হবার চেষ্টা করব না,—অথচ বাইরের উপদ্রবের বিরুদ্ধে নালিশ করা, এ যে পাগলামি। আমাকে একজন মুক্তি দেবে। কিন্তু আমার মুক্তির জন্যে আমাকে তৈরী হতে হবে না,—শুধু মুক্তিদাতার যশোগানে আকাশ ভরিয়ে তুললেই হবে, এ ধারণা মন হতে বিদায় দিতে হবে। জ্ঞানী বা নেতার মুখের দিকে না তাকিয়ে হতে হবে নিজেকে কর্ম্মী এবং ত্যাগী। গড়ে তুলতে হবে নিজেকে সবার আগে। নইলে বাইরের উপদ্রব হতে নিস্তার নেই,—হতে পারে না।

শুভদৃষ্টি

[শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী]

১

পাল্কিটা তখন আমাদের কাছ থেকে অনেকটা দূরে ছিল। অত দূরের পাল্কির মধ্যে কেউ আছে কি না, দেখবার মত দৃষ্টি-শক্তি ভগবান মানুষকে না দিলেও, প্রশান্ত এদিক্-ওদিক্ ঝুঁকে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে উঠ্‌লো—পাল্কিতে নিশ্চয়ই কেউ আছে।

আমি বল্‌লুম—স্ত্রীলোক না পুরুষ, বল দেখি।

প্রশান্ত মহা ফাঁপরে পড়ল। উত্তর দেবার মত বুদ্ধির অভাবেই সে উল্টে আমায় প্রশ্ন করল—তুই বল দেখি?

মাথা ঘামিয়ে আমি বললুম, 'পুরুষ'। প্রশান্ত আর কিছু বললে না। পাল্কি নিকটে না আসা পর্য্যন্ত সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর যখন পাল্কিটা আমাদের সামনে এলো—দেখলুম, দোর বন্ধ। মুখটা আমার শুকিয়ে গেল। আমার তৎ অবস্থা দেখে, প্রশান্ত বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলে উঠল—জ্যোতিষ বিদ্যাটা শুধু আন্দাজি চলে না হে—একটু শিখতে হয়।

বড়ই লজ্জিত হলুম। স্থির থাকৃতে না পেরে, বিরক্ত হয়ে, চীৎকার করে পল্লী-প্রথামত জিজ্ঞাসা করলুম—কোথাকার পাল্কি, কোথায় যাবে রে?

পাল্কির দরজাটা খুলে একজন বরবেশী যুবক দেখা দিলে। আর প্রশান্তকে দেখে বলে উঠল—আরে প্রশান্ত যে!

প্রশান্তও বিস্মিত নয়নে চেয়ে বল্‌লে—তুমি রাজেন! এ কি! তার পর পাল্কির নিকটে আসিয়া সুর করিয়া বলিয়া উঠিল—সাজিয়া এ মোহন বেশে, যাচ্ছ কোথা দিবা-শেষে।

দেখলুম, যুবকটী প্রশান্তর পরিচিত।—আমি নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার কথাটা ভুলে গিয়ে, কৃত্রিম বিরক্তি দেখিয়ে বল্‌লাম—থাম্, আর কবিত্ব ফলিয়ে কাজ নেই।

প্রশান্ত হেসে বল্‌লে—এমন শান্ত—নিস্তব্ধ ধরণী-বক্ষে দাঁড়িয়ে যদি একটু কাব্যের রসপান না করব, তা'হলে

জন্মই যে বৃথা যাবে। পূর্ণিমার চাঁদ দেখে যদি গর্দ্দভেরও রাগিণীর আলাপে প্রবল বাসনা হতে পারে—তবে আমরা মানুষ বলে কি সে জিনিসটা হারাতে বল।

হারাবে কেন! কিন্তু মনে থাকে যেন, গর্দ্দভের রাগিণীর মধুর স্বর শোনবার পরই—পুরস্কার লগুড়াঘাত। সেটা সহ্য করবার শক্তি যেন থাকে।

আমার কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই রাজেন ব্যগ্র-কাতরতা মিশ্রিত স্বরে বল্‌লে—এখন আমায় ছেড়ে দে ভাই!

প্রশান্ত আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে—রাজেনকে চিন্‌তে পারছিস না দেবী? সেই যে স্কুলে একসঙ্গে পড়তুম—পণ্ডিতের ক্লাসে যত কিছু বদমায়েসি করে সব দোষ দিতুম রাজেনটার ঘাড়ে ফেলে।

কিন্তু রাজেনকে চেনবার মত তখনও তেমন কিছু ঘটনার কথা আমার মনে হ'ল না। আমি তেমনই বিস্মিত নয়নে আর কিছু প্রমাণের জন্যে চেয়ে রইলুম প্রশান্তর দিকে। সে আমার এই নিরেট মস্তিষ্কের নিন্দা করে, কতকটা নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক স্বরে বললে—কি আশ্চর্য্য! মনে আছে, যখন থার্ড ক্লাসে পড়ি, তখন টিফিনের সময়—ঘুমন্ত পণ্ডিতের টিকি কেটে দেবার কথা? বলিয়া প্রশান্ত যেন উত্তরের অপেক্ষায় আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি—'হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বলেই বড়-বড় চোখ দুটো ফেরালুম রাজেনের দিকে। কি আশ্চর্য্য! রাজেন আমার এতটা পরিচিত; অথচ তাকে আমিও চিন্‌তে পারলুম না—সেও নয়! অস্ফুট স্বরে বললাম—রাজেন, তুই এতটা বড় হয়েছিস!

ছেলেবেলায় রাজেন আমাদের ব্যবহারে কোন কালেই সন্তুষ্ট ছিল না। আর তার সন্তুষ্ট না থাকার প্রধান কারণ আমরাই ছিলুম। ছেলেবেলায় তার সঙ্গে কলহের জন্য যতটা দোষী আমরা ছিলুম, তার সিকির সিকি দোষীও বোধ হয় সে নয়। তবুও, তখন স্কুলে মাষ্টারদের নিকট বেত্রাঘাতের ভাগটা সে যতটা বেশী পেত—হিসাব করে দেখলে মনে হয়, তার অনুপাতে আমাদের বেশী প্রাপ্য হলেও, মোটেই সে পাবার সুযোগ দিতুম না। আজ আবার তার বিবাহ! পথিমধ্যে এইরূপে বাধা পেয়ে—একটী শুভ কার্য্যের পূর্ব্বেই আমাদের মত পয়মন্ত বন্ধুদ্বয়ের মুখ দর্শনে, সে যে একেবারেই সন্তুষ্ট হয় নি, এবং মনে-মনে শাপ-মন্দ করছিল, তা তার ছল-ছল চোখ আর স্বভাব-সুন্দর মুখখানা দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

প্রশান্ত সন্দেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করল—হ্যাঁরে, তোর না আর একবার বে' হয়েছিল?

রাজেন অস্বীকার করতে পারল না; কারণ, তার প্রথম বিবাহের সময় আমি কন্যাপক্ষে উপস্থিত। লজ্জা-জড়িত স্বরে বল্‌লে—তিন বছর আগে হয়েছিল বটে।

তবে যে আবার—

সে অনেক কথা।

আমি সব জানতুম। তবুও ছাড়লুম না। নাছোড়-বান্দা হয়ে আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম—বল না ভাই। বলিয়া তার পাল্কির দরজাটা ধরে দাঁড়ালুম। বেয়ারারা গতিক দেখে তাদের কাঁধ থেকে পাল্কিটা নামিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। রাজেন কিন্তু বড়ই বিপদে পড়ল। গোধূলি লগ্নে তার বিবাহ হবে—অথচ এ স্থান হতে যেতে হবে তাকে এখনও দেড় ক্রোশ। সে যোড়-হস্তে আমায় বল্‌লে—আমায় আজকের মত ছেড়ে দে ভাই, আর একদিন বল্‌ব।

কাকস্য পরিবেদনা। কে কার কথা শুনে। আমি জিজ্ঞাসু নয়নে তার দিকে চেয়ে বললুম—তুমি বে করতে যাচ্ছ, সঙ্গে কেউ নেই—একলা। সব খুলে বল,—নইলে ত ছাড়ছি না।

ছেলেবেলা থেকেই সে আমাদের বেশ জানত। আমাদের মত একগুঁয়ে দুনিয়ায় খুব কমই আছে—তাও সে জানত। কাজেই আর তর্ক না করে রাজেন বল্‌লে—এই তিন বছরেও তাঁদের সঙ্গে দেনা-পাওনার মিটমাট না হওয়ায়, বাবার সঙ্গে আমার শ্বশুরের ঝগড়া হয়েছে। সেই জন্যেই—

তা তোমার সঙ্গে বরযাত্রী কৈ?

আমি যে আবার বে করি, এটা আমাদের আত্মীয়-স্বজনের কারুরই ইচ্ছে নয়। বাবাই উদ্‌যোগী হয়ে এই করছেন। জান ত তাঁকে। কয়েকজন বরযাত্রী এগিয়ে গেছে,—তাও পাঁচ কি সাত জন মাত্র।

প্রশান্ত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে, গম্ভীর স্বরে বল্‌লে, আচ্ছা, তোর সঙ্গে কি তোর পরিবারের কিছু হয়েছিল? তার কাছ থেকে এমন কিছু ব্যবহার কি পেয়েছিস, যার জন্যে তার উপর রাগ করা যেতে পারে?

রাজেন্ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে গম্ভীর স্বরে বল্লে, না ভাই, না,—কখনও হয় নি। বরং যতটুকু তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাতেই তার স্মৃতি আমায় জড়িয়ে আছে।

তবে কি জন্যে সেই নিরপরাধাকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে, তার জীবনের সকল সাধ, আশা ভেঙ্গে দেবার ষড়যন্ত্র করছিস। বেয়ায়ে-বেয়ায়ে ঝগড়া হোলো, তার জন্যে কি দোষী হবেন আর একজন অবলা নারী?

কি করবো ভাই, আমিই বাবার একমাত্র সন্তান হয়ে এই বিপদে পড়েছি। কোনরূপে মনকে বোঝাতে না পেরে শেষে স্থির করেছি—পিতৃ-আজ্ঞা।

উত্তম কথা। কিন্তু সে আজ্ঞার উপর হিতাহিত বিচার করবার শক্তি কি আমাদের নাই?

রাজেন বল্লে—এখন আর ও-কথার আলোচনায় কিছু লাভ নেই ভাই। সব প্রস্তুত; আমায় ছেড়ে দাও।

তুমি তা'হলে মত পাল্টাবে না?

উপায় নেই—এখন অমতের সময় কৈ।

জানতে পারি কি বিয়ে কোথায় হবে?

পঞ্চকুশী—তারক বাবুর বাড়ী।

রাজেন চলে গেলে, প্রশান্ত আর স্থির থাক্‌তে পারল না। চীৎকার করে আমার দিকে চেয়ে বললে—ওঃ! কি পাষণ্ড!

খানিকক্ষণ কাটল। আমি অনেক ভেবে-ভেবে একটা মতলব ঠিক করলুম। প্রশান্তর দিকে চেয়ে দেখি, তখনও রাগে মুখখানা তার লাল হয়ে রয়েছে। আমি বললুম—দেখ, রাজেনকে এখনই জব্দ করতে পারতুম, যদি একটা ঘোড়া পেতুম।

উৎসুক নয়নে আমার দিকে চেয়ে প্রশান্ত বললে—আচ্ছা, আমি দোব।—কি করে জব্দ করবি বল দেখি।

তুই আগে একটা ঘোড়া দে দেখি। পরে শুনবি'খন।

২

তখনও সন্ধ্যা হতে বিলম্ব ছিল। সন্ধ্যাদেবী সবে-মাত্র রাত্রির বেশ পরিধান করবার জন্যে নিজের ললাটে সূর্য্যের রক্তিম গোলক-পিণ্ডকেই যেন সিন্দূরের টিপের মত ধারণ করে, একবার প্রকৃতির আয়নায় নিজের মুখখানা দেখে নিয়ে, ঘোমটা টানবার আয়োজন করছিলেন। আমি প্রশান্তর দেওয়া ঘোড়াটীতে চড়ে আমাদের গ্রাম হতে দেড় ক্রোশ দূরে আমার এক পিসীমার বাড়ী যাবার জন্যে বেরুলুম।

নিঃসন্তান পিসীমা—আমায় বড় ভালবাসতেন। আমার সব রকম আব্দার-অত্যাচার তিনি চিরকালটাই নীরবে সহ্য করে এসেছেন। কাজেই তাঁর কাছে, দুনিয়ার যত রকম বেয়াদবী আব্দার আছে—করতে ছাড়তুম না। পিসীমার বাড়ীর পাশেই ছিল রাজেনের শ্বশুরবাড়ী। তার শ্বশুরবাড়ীর সকলের সঙ্গে পিসীমার দৌলতে আমার খুব বেশী রকমই আলাপ হয়েছিল। আমি যখনই পিসীমার বাড়ী যেতুম, তখন রাজেনের শ্বশুরবাড়ীতে দু' একদিন আমায় নিমন্ত্রণ খেতে হ'তো। রাজেনের পত্নী মঙ্গলা আমাকে দাদা বলে ডাকত।

পিসীমার বাড়ী উপস্থিত হয়েই, 'পিসীমা, পিসীমা' বলে ডাকতে-ডাকতে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললাম,—এখনই রাজেনের শ্বশুরবাড়ীতে আমার সঙ্গে চল ত পিসীমা।

পিসীমা কতকটা বিস্মিত নয়নে আমার দিকে চেয়ে বললেন, কেন রে?

সে সব বলবার সময় নেই,—এখন তুমি একবার ওঠ।

বলি ব্যাপারটা কি বল্।

আমি দেখলাম যতক্ষণ প্রকৃত ব্যাপার গোপন রাখবার জন্যে পিসীমাকে আর পাঁচটা কথা বলব—তার চেয়ে এক্ষেত্রে কাজের কথাটাই বলা সহজ হবে। আমি বল্লাম—আজ যে সেই রাজেনটার আবার বে হচ্ছে। তাই জানাতে এসেছি।

একটা অবিশ্বাসের চাহনি চাহিয়া পিসীমা বলিলেন—সত্যি না কি রে!—তা তুই কি বলতে এসেছিস?

আমি মঙ্গলাকে সেই বিয়ে-বাড়ীতে নিয়ে যাব বলে এসেছি। যাদের বাড়ী রাজেনের আজ বিয়ে হবে, তাদের বলব—এই মেয়ের সঙ্গে আগে বে হয়েছিল—একে ত্যাগ করে আবার বে কচ্ছে। আর সতীন বর্ত্তমানে বিবাহ দিলে তাঁদের মেয়ে যে কতটা সুখী হবে, সে বিষয়ে দুচারটে কথা বলে সব উল্টে দেব। নাও ওঠ—দেরী হয়ে গেল। বলিয়াই আমি পিসীমার হাত ধরিয়া এক টান দিলাম।

আঃ, মেরে ফেলবি না কি আমায়! কোত্থেকে আবার কি হাঙ্গামা আন্‌লে দেখ। তোরই বা অত মাথাব্যথা কেন বাপু?

আছে পিসীমা, আছে। আজ যদি আমাদের বাড়ীর কোন মেয়ের ঠিক ঐ অবস্থাটা হ'তো, তা'হলে কতটা দুঃখ আমাদের হ'ত বল দেখি!

পিসীমা নীরব। আর এ বিষয়ে কিছু আলোচনা না করে, আমায় সঙ্গে করে গেলেন রাজেনের শ্বশুরবাড়ীতে।

বৈঠকখানায় জীর্ণ তাকিয়াটা ঠেস দিয়া চিন্তা-ক্লিষ্ট বদনে রাজেনের শ্বশুর বসিয়া ছিলেন। ঘরের এক কোণে একটা প্রদীপ; তার ক্ষীণ আলোকে ঘরটার অন্ধকার কতকটা দূর করেছিল। সেই অস্পষ্ট আলোকে রাজেনের শ্বশুর প্রথমে আমায় চিন্‌তে না পেরে ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—কে?

আমি তাঁর পার্শ্বে গিয়ে বসে নমস্কার করে বললাম—আমি দেবী।

মেঘের কোলে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের ন্যায়, তাঁর অধরে হাসি উঠে তখনই মিশিয়ে গেল। জিজ্ঞাসু নয়নে আমার দিকে চেয়ে বললেন—কি বাবা, ভাল আছ ত? তোমাদের বাড়ীর সব কুশল?

কি বলিয়া এই একটা খামখেয়ালি অভিনয়ের প্রস্তাব আমি করব, তার কোন একটা সদ্যুক্তি আমার মাথায় এলো না। নানান রকমে বলবার জন্যে অনেকবার অনেক রকম করে ভাবলাম। কিন্তু প্রতিবারেই অকৃতকার্য্য হলুম। মনের ভাব মুখে প্রকাশ করবার মত ক্ষমতাটাকে আমি তখন একেবারেই হারিয়ে ফেললুম। কি করা যায়,—তখনকার সময়ের মূল্যটাও বেশী। আমার এ অক্ষমতার জন্যে কতটা অনুশোচনা যে হচ্ছিল, তা স্বয়ং ভগবানই হয় ত দেখেছিলেন, এবং দেখেছিলেন বলেই হয় ত আমার সে দুর্দ্দশার একটা ব্যবস্থাও করে দিলেন।

আমি খুব গম্ভীর হয়ে, একেবারেই লাফিয়ে পড়ার মত মুখ থেকে বার করে ফেললাম, রাজেনের আজ আবার বে হচ্ছে, এ খবর কি আপনি জানেন?

বৃদ্ধ সোজা হইয়া বসিয়া, খুব বড় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসে তাঁর সমস্ত দেহটাকে কাঁপিয়ে, যেন ভয়ে কেঁপে উঠে কান্নার সুরে বললেন, কি রকম? কৈ, আমি ত কিছুই জানি না! কোথায় হচ্ছে?

পঞ্চকুশী—আমি এই কথা জানাবার জন্যেই এসেছি। আর সেই রাস্কেলটার বিয়ে যাতে আজ না হয়, তারও ব্যবস্থা আমি করব। এতে আপনার একটু সাহায্যের মাত্র প্রয়োজন।

আমার দিকে অতি কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—আমি প্রস্তুত আছি—কি আমায় করতে হবে বল?

মঙ্গলাকে আমার সঙ্গে দিন। আমি ওকে নিয়ে গিয়ে সেই কনের বাপকে সমস্ত ব্যাপার জানাব;—আর দেখাব, একজন নিরপরাধাকে যে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে আবার বিবাহ করতে পারে, ভবিষ্যতে তাঁর মেয়েকেও যে সে এই রকম করে ত্যাগ করবে না, সে কথা কে বল্‌তে পারে?

বড় শক্ত কাজে হাত দিয়েছ দেবী! এতে যে কতটা কৃতকার্য্য হতে পারবে,—তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে।

পকেট হতে ঘড়িটী বার করে দেখলুম—৮টা ৩৫ হয়েছে। আমি কতকটা ব্যস্ত হয়েই বললুম, কৃতকার্য্য যে নিশ্চয়ই হব, তাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। সময় আর নেই,—মঙ্গলার যাবার ব্যবস্থা করুন।

দ্বারের নিকটেই পিসীমা দাঁড়াইয়া ছিলেন। মঙ্গলার মা পিসীমাকে বললেন—আপনি বলুন ওঁকে, এখুনি মেয়েটাকে দেবীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে। দেবীর দয়ায় যদি মেয়েটার দুঃখের অবসান হয় ত হোক। ওই মেয়ের বিয়ে দিতেই বাস্তু ভিটে বাড়ী সব বাঁধা পড়ে আছে,—এখনও দেনা শোধ হয়নি।

রাজেনের শ্বশুর আর কোন কথা না বলে, মঙ্গলাকে আমার সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

তারকনাথ বাবুর বাটীতে পৌঁছে দেখলুম, রাজেন তখনও বরের আসনে বসে রয়েছে। বুঝিলাম, এখনও বিয়ে হয় নি। বড়ই আনন্দ হ'ল।

কন্যাকর্ত্তার অনুসন্ধানে আমি বিয়ে-বাড়ীর মধ্যে গেলুম। কিন্তু অত লোকের মধ্যে, একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে, কন্যাকর্ত্তাকে খুঁজে বার করা যে কতটা শক্ত, তা বেশ বুঝতে পারলুম। খানিকক্ষণ এদিক-ওদিকে কন্যাকর্ত্তার অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছি, এমন সময় সম্মুখেই এক পরিচিতকে দেখ্‌তে পেয়ে বললুম—অমিয় যে।

অমিয় আমার বাল্যবন্ধু—বহু পূর্ব্বেকার সহপাঠি। তার সঙ্গে আজ প্রায় ৭ বৎসর পরে দেখা। সে প্রথমে আমায় চিনতে পারে নি। বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে বললে, দেবী না কি?

আমি হেসে বললাম—চিনতে পেরেছ দেখছি যে! তার পর,—তুমি এখানে?

এটা যে আমাদের বাড়ী। আজ আমার ভাই-ঝির বিয়ে। তার পর, তুমি কি বরযাত্রী?

না ভাই, আমি দুয়ের বাইরে। কোন পক্ষেই নয়।

কি রকম?

সে পরে বলব। এখন বল দেখি, এ বরটীর সমস্ত খবর তোমরা জান?

কেন বল দেখি? ব্যাপার কি?

তিন বৎসর আগে এর একবার বিবাহ হয়েছিল। সে স্ত্রী আজও বর্ত্তমান। এ খবর কি তোমরা জান?

বিস্মিত নয়নে আমার দিকে চেয়ে অমিয় বললে—কৈ না, কিছুই ত আমরা জানি না!

যাক, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল, ভালই হোল। এ বিবাহ কিছুতেই ভাই হতে পারে না। যারা বিনা দোষে একজন নিরপরাধাকে ত্যাগ কর্ত্তে পারে, ভবিষ্যতে সে আবার তোমাদের মেয়েকেও সেই রকম ক'রে তাড়িয়ে দেবে না, এ কথা কে বিশ্বাস করবে! আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, তুমি ভাল ক'রে অনুসন্ধান কর।

হতাশাসূচক স্বরে অমিয় বললে—না, অবিশ্বাস হবে কেন বল; তবে—

তবে টবে নয় ভাই। আমি সেই অভাগীকে সঙ্গে করে এনেছি। তার বিষাদ-মাখা মলিন মুখখানা দেখে তোমরা যা হয় একটা ব্যবস্থা কর।

অমিয় উত্তেজিত স্বরে, বলল—উঃ, কি অত্যাচার! সমাজের বুকের উপর দাঁড়িয়ে যাঁরা এতটা অন্যায় করতে পারেন, তাঁদের ঘরে কখন মেয়ে দেওয়া যেতে পারে না। যার সঙ্গে একবার বিবাহ হয়েছিল, আজ আবার তার সঙ্গেই বিবাহ দিয়ে, আমরাও এই প্রতারকদের সঙ্গে প্রতারণা করে বিদেয় দেব। যাই, আমি দাদার কাছে সমস্ত বলে তার ব্যবস্থা করে আসি।

ছাঁদনাতলা। চারি ধারে কুলকামিনী বেষ্টিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রাজেন। কনের সাজে সাজিয়ে মঙ্গলাকে একটা পীঁড়ের উপর বসিয়ে নিয়ে, হাসি চাপবার জন্যে একটা রুমালের অর্দ্ধেকটা আমার মুখে পুরে দিয়ে, আমি আর অমিয় কনেকে বরের পাশে ঘোরাতে লাগলুম। সাত পাকের পর রাজেনের সম্মুখে মঙ্গলাকে নিয়ে গিয়ে, শুভদৃষ্টির জন্যে যখন পীঁড়ি তুলে ধরলুম, তখন রাজেন উৎফুল্ল দৃষ্টিতে সেই মুখখানি দেখবার জন্যে যেন উৎগ্রীব হয়ে উঠল। কনের মুখখানা দেখেই কিন্তু তার নিজের মুখখানা কেমন যেন লজ্জা-রাগে আরক্ত হয়ে উঠল। রাজেনের সেই অবস্থা দেখে, আর চুপ করে থাকতে না পেরে, মুখ থেকে রুমালটা বার করে নিয়ে বললুম—ভাই রাজেন, জানি না—তোমাদের তখনকার সে শুভদৃষ্টিতে বিধাতার করুণা-দৃষ্টি পড়েছিল কি না; কিন্তু আজ যে শুভ-দৃষ্টি হোলো, এ যে তাঁর অসীম করুণা, তা, আমি ঘোর নাস্তিক হলেও, স্বীকার করছি। আজকের এই শুভক্ষণে—তোমাদের চারি চক্ষুর মিলনেই যেন জীবনের বিষাদ মুছে গিয়ে পূর্ণ হোক—"শুভ দৃষ্টি।"

বিবিধ-প্রসঙ্গ

ব্যবসায় ও মূলধন

[শ্রীহরিহর শেঠ]

—ব্যবসায় কার্য্যে বহু দিন লিপ্ত থাকায়, বা ব্যবসাদারের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়কেই উপজীবিকা রূপে গ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই হৌক, অনেক ব্যবসায়ী আমাকে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন ও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এই সকল জিজ্ঞাসুদের মধ্যে তিন শ্রেণীর ব্যবসায়ী সাধারণতঃ দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী অভাবের জন্ত তত না হউক, যে মূলধন আছে, তাহা বৃদ্ধি করিবার জন্তই ব্যবসায় করিয়া থাকেন। অপর শ্রেণীর লোকেরা ব্যবসায়কে অর্থোপার্জ্জনের উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আর এক শ্রেণী পরের অধীনতা পছন্দ না করিয়া স্বাধীন বৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহের জন্ত ব্যবসায় করিয়া থাকেন।

আমার কাছে যাঁহারা পরামর্শের জন্ত আসেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর লোক সর্ব্বাপেক্ষা কম। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর

মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকের সংখ্যাই অধিক দেখিতে পাই। আগ্রহের আতিশয্যের অভাব এই শেষোক্তদিগের মধ্যে খুব কমই দেখিয়াছি। আমি ব্যবসায়-বিষয়ে মোটেই সুপণ্ডিত নহি। এ সম্বন্ধে যুক্তি ও পরামর্শ দিবার মত বিশেষ জ্ঞানও আমার নাই। তথাপি, আমার বিবেচনায় যাহা সুযুক্তি, বলিয়া মনে হয়, তাঁহাদের প্রশ্নোত্তরে বা পরামর্শচ্ছলে আমি তাহাই বলিয়া থাকি। অধিকাংশ স্থলে আমার একই উত্তর,—নিজেকে ব্যবসায় করিবার উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করাই সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কথা; মূলধন বা আর যা কিছু, তাহা ইহার পরে।

বলিতে লজ্জা ও দুঃখ হয়,—শতকরা প্রায় নব্বই জনের নিকট আমার এই উত্তর প্রীতিপ্রদ ত হয়ই না; বরং অনেক সময়ে উৎসাহ-ভঙ্গের কারণ হয়; এবং তাঁহাদের আগ্রহ ও উৎসাহ সেই হইতেই প্রশমিত হইতে দেখা যায়। এমন কি কাহার-কাহারও সহিত আর এ সম্বন্ধে বড় বেশী কথা কহিবার দরকারই হয় না। একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি,—দ্বিতীয় শ্রেণীর যুবকদিগের মধ্যে সকলেই যে ঠিক ব্যবসায় করিবার পরামর্শের জন্যই আসেন, তাহা নহে। কলেজ ছাড়িয়াছেন, অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য কি কাজ গ্রহণ করিবেন, বা চাকরী করিবেন কি না, ইহাই তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য। আমি প্রায়ই চাকরীর পরামর্শ কাহাকেও দিই না। অর্থোপার্জ্জনের জন্য চারিদিকে বিবিধ পথ খোলা আছে। তাহার মধ্য হইতে নিজের উপযোগী পথ নিজে চেষ্টা করিয়া বাছিয়া লইতে পরামর্শ দিই এবং সে সম্বন্ধে আমার বিদ্যায় সামান্য যা কুলায়, তাহাই বলিয়া দিই।

আমার এ উত্তরও অনেকের বেশ ভাল লাগে না। সকল শ্রেণীর কাছেই আমার ঐ সকল কথা অস্পষ্ট, ফাঁকা বলিয়া মনে হয়; এবং কেহ-কেহ এমনও মনে করেন,—এ বিষয়ে ঠিক পরামর্শ বা পথ আমার জানা থাকা সত্ত্বেও, আমি বিশদরূপে তাঁহাদিগকে তাহা জ্ঞাত করিতে কার্পণ্য করিতেছি। আবার কাহার-কাহারও এরূপ মনের ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে,—যাহার মূলধন নাই, তাহার পক্ষে ব্যবসায়ের এ পরামর্শ লওয়া বৃথা।

মোট কথা, আমি তাঁহাদের সহিত কথা কহিয়া বুঝিয়াছি যে, সকলেই মনে করেন,—ব্যবসায়ের মধ্যে এমন কিছু গুহ্য ব্যাপার আমাদের জানা আছে, যাহা বলিয়া দিলেই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন। এ কার্য্যের জন্য যে কোন শিক্ষা বা সাধনা থাকিতে পারে, ইহা যেন তাঁহাদের ধারণার বাহিরে। শ্রদ্ধেয় স্যার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ও অন্ন-সমস্যা, ছাত্রদিগের জীবনগতি প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে, এ সম্বন্ধে তাঁহারও এইরূপ অভিজ্ঞতার কথা একাধিকবার ব্যক্ত করিয়াছেন।

চাকরী ভিন্ন অন্য উপায়ে ধনোপার্জ্জনের জন্য নিজেকে তদুপযোগী করিতে হইলে যে পরিশ্রম ও চেষ্টার প্রয়োজন, তাহা করা এবং পরে সে জন্য মূলধনের বা অপর যাহা কিছু উপাদানের আবশ্যক, তাহা পাওয়া বিশেষ কঠিন নহে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে হয়, ইহার তুলনায় তাহা অনেক বেশী। যুবকগণ কলেজ হইতে বাহির হইবার পর, যাঁহাদের চাকরী-ক্ষেত্রে তেমন মুরুব্বির জোর নাই, বা ডিপজিটের টাকা দিবার সামর্থ্য নাই, তাঁহারা সকলেই জানেন, একটি যেমন-তেমন চাকরী সংগ্রহ করা কত কঠিন। বহু পরিশ্রম ও যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া পাশ করার পর, কত কষ্টে, কত চেষ্টায়, একটি সামান্য কেরাণীগিরি চাকরী সংগ্রহ করিতে হয়, ইহা তাঁহারা ভাল রূপে জানিলেও, আশ্চর্য্যের কথা,—অর্থোপার্জ্জনের জন্য একটি স্বাধীন কার্য্যে অগ্রসর হইবার একটু চেষ্টা করিতে হইলে তাঁহাদের মনে এতটা বিরক্তির ভাব আইসে কেন, অথবা ব্যবসায়ের পথটি যে একেবারে কুসুম-সমাকীর্ণ তখন এ ধারণাটা তাঁহাদের কিরূপে আইসে? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত নহে এরূপ যুবকদের সম্বন্ধে বরং উক্ত অভিমত তত অধিক প্রযোজ্য নহে। তাঁহারা যত অধিক পরিমাণে পরামর্শ গ্রহণ করিতে এবং সেই পরামর্শ মত কার্য্য করিতে প্রস্তুত, শিক্ষিতগণ তত নহেন। অথচ, যাঁহারা ভালরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে যত সহজে ব্যবসায়-কার্য্যে যেরূপ পারদর্শী হইতে পারেন, এত কখনই অপরের নিকট আশা করিতে পারা যায় না।

এই বিরক্তি ভাবের কারণ সম্বন্ধে আমার মনে হয়, নিজেকে কাজ করিবার উপযোগী করা কথাটার ভিতর একটা বড় কঠিন ব্যাপার নিহিত আছে বলিয়া তাঁহাদের মনে হওয়ায়, নৈরাশ্যই তাঁহাদের বাধা দিয়া থাকে। আর মূলধনের সমস্যাও তাঁহাদের মাথায় যে একটা বড় স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধে একটা সুমীমাংসার কথা না পাইয়া, তৎপরিবর্ত্তে, মূলধন কিছুমাত্র না থাকিলেও স্বাধীন ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করা যাইতে পারে, তাঁহারা এই সত্যটিকে সত্য বলিয়া কিছুতেই মানিয়া লইতে পারেন না।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অনেক দিন থাকিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে মূলধন যে ব্যবসায়ের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক জিনিস,—ইহা ব্যতীত অর্থোপার্জ্জনের অন্য পথ থাকিলেও কোন বড় ব্যবসা যে মূলধন ভিন্ন হইতে পারে না, ইহা সুনিশ্চিত। তবে এ কথাও খুবই ঠিক,—কপর্দ্দকশূন্য দরিদ্র লোকও আপনাকে ব্যবসায়-কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া লইতে পারিলে, তাঁহার মূলধনের অভাব কোন দিন হয় না,—উহা প্রায় আপনা হইতেই আসিয়া যুটিয়া থাকে। এই যে কথাটি,—কেন ঠিক বুঝিতে পারি না,—অনেকেরই বেশ ভাল লাগে না বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু ইহা যে সত্য, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। বোধ হয়, কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেমন বাঁধা নির্দ্দিষ্ট পথ আছে, এবং যে পথে চলায় তাঁহারা অভ্যস্ত, সেইরূপ একটা সুনির্দ্দিষ্ট পথ সম্মুখে দেখিতে না পাওয়াতেই তাঁহাদের এই ভয় হয়। আমার এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে এ জন্য সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদেরই দোষী করা যায় না। সে পথ নিতান্ত দুর্গম না হইলেও,

একটু দেখাইয়া দিলে ভাল হয়। তবে কথা এই যে, যুবকগণ এত অল্পে, একটু শুনিতে না শুনিতেই, এরূপ ভগ্নোৎসাহ হন কেন?

রিক্ত হস্তে বাটী হইতে বাহির হইয়া, পরে বিশেষ সম্পদশালী হওয়ার উদাহরণের জন্য ইয়োরোপ-আমেরিকার কার্ণেগী বা রকফেলারের কথা তুলিবার আবশ্যকতা নাই। আমাদের দেশে বাঙ্গলার জেলায়-জেলায়, প্রতি বড় বড় সহরে লক্ষ্য করিলে, সে উদাহরণ সকলে যথেষ্টই দেখিতে পাইবেন। কথাটা এরূপেও বলা যাইতে পারে,—যে সকল প্রাচীন ধনী ব্যবসাদার এখন দেখা যায়, বা যে সকল ধনী জমিদার এখন বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রায় সকলেই ব্যবসায় দ্বারা অতি সামান্য অবস্থা হইতে তাঁহাদের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়া, নিজেদের কোন মূলধন না থাকা সত্ত্বেও যদি এমনই উন্নতি করিতে পারিয়া থাকেন, তবে এখন শিক্ষিত হইয়াও তাহা না পারার কারণ কি? মনে হয়, এখনকার শিক্ষাই তাহার কারণ। এ শিক্ষায় ব্যবসায়ের সাহস লোপ পায়,—কাহারও বা ব্যবসায় করিতে লজ্জা বোধ হয়। কোন শিক্ষিত কায়স্থ বন্ধুর মুখে স্বকর্ণে—ব্যবসায়ে তাঁহাদের সমাজে পদ লাঘব (status low) হইবার আশঙ্কার কথা শুনিয়াছি। অথচ ব্যবসাদারের দোকানে সামান্য চাকরী করিয়া তাঁহারা জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতেছেন মনে করেন। এখন এমনই আমাদের মনো-বৃত্তি।

ব্যবসায়ের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান—বিশ্বাস। তাহাও বোধ হয় এই মনোবৃত্তি হইতেই ক্রমে লোপ পাইতেছে। নচেৎ, দেশে ধনী আছেন,—ধনবৃদ্ধির জন্য তাঁহারা বিশেষ ইচ্ছুক;—অথচ, উপার্জ্জনের ক্ষমতা নিজেদের নাই। আর অন্য দিকে সহস্র সহস্র যুবক, যাঁহারা সামান্য চাকরীর জন্য লালায়িত, সামান্য মূলধনের অভাবে যাঁহারা ব্যবসার কথা ভাবিতেও পারেন না এবং চানও না, এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় হয় না কেন? যুবকগণ যদি কার্য্যক্ষম ও বিশ্বাস-ভাজন বলিয়া নিজেদের প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যে কোন ব্যবসায়ের উপযুক্ত মূলধনের অভাব হয় না। কারণ ধনিগণ যদি, তাঁহাদের অর্থ নষ্ট হইবে না বরং বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব, ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা মূলধন সরবরাহ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তাঁহারা নিজেরা ব্যবসায় করিতে পারেন না বলিয়াই, সামান্য লভ্যাংশের প্রত্যাশায় বিদেশীয় কোম্পানির অংশ বা সামান্য সুদের প্রত্যাশায় সরকারের ঋণ ক্রয় করিয়া, তাহা সম্পত্তি রূপে রাখিয়া থাকেন।

আমরা কথায়-কথায় মাড়োয়ারিদের কথা তুলি,—ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তাঁহাদের অসাধুতার কথার উল্লেখ করিতে সঙ্কোচ বোধ করি না; আর মাড়োয়ারি-ভাটিয়াতে কলিকাতা ছাইয়া ফেলিল বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকি। ছাইয়া ত ফেলিবেই। এমন আত্মবিস্মৃত, উদ্যমহীন লোকের দেশে আসিয়া উৎসাহশীল, বিলাসহীন, কষ্টসহিষ্ণু জাতি যদি দেশ না ছাইয়া ফেলিবে ত ফেলিবে কে? বিকানির, রাজপুতানা হইতে আসিয়া, নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস, একতা, সাহচর্য্য-বলে, একের সঙ্গে অপরে মিলিয়া, সাহসকেই প্রধান সম্বল করিয়া তাঁহারা যে উন্নতি করিতেছেন, আমাদের কর্ম্মার্থী যুবক সকলের ও অর্থবানদের মধ্যে সে সমন্বয় কে ঘটাইয়া দিবে? আমাদেরও অর্থের আবশ্যকতা আছে, পাইবার সাধ এবং আকাঙ্ক্ষা আছে; কিন্তু সে চেষ্টা, সে ব্যাকুলতা, সে উদ্যোগ কোথায়? আর তাহা শিখাইবার ব্যবস্থাই বা কে করিতেছে? অর্থোপার্জ্জনের জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মারফৎ যে বিদ্যা শিখাইতেছেন, তাহা লাভ করিয়া আমরা অকৃতজ্ঞ না হইয়া, সাহেবদের অফিস বা কারখানায় সেই অর্জ্জিত বিদ্যা নিয়োগ করিয়া, তাহার বিনিময়ে যাহা কিছু পাইতেছি, তাহাই যথেষ্ট মনে করিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সকলের জন্য সর্ব্বাংশে যুবকদেরই দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহারা যে দিন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, সেইদিন হইতে, বিদ্যালয় ত্যাগ ও তৎপরে একটি কেরাণীগিরি বা অন্য চাকুরী গ্রহণ করা পর্য্যন্ত, তাঁহাদের নিজের স্বাধীনতা বা বুদ্ধিবৃত্তি চালাইবার অবসর কোথায়? অথচ, এই শিক্ষার মধ্যেও তাঁহারা এমন কিছু পান না, যদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের যে অপর সহজ পথ কিছু আছে, তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন; বরং লেখাপড়া শিক্ষার পর চাকরী করিতে হয়,—উদাহরণে, কথায় এবং অভিভাবকদের ইচ্ছা ও আগ্রহে ইহাই তাঁহারা সর্ব্বদা দেখিতে ও বুঝিতে পারেন। তখন পাশ করার সহিত চাকরীর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা অলক্ষ্যে তাঁহাদের মনোমধ্যে মুদ্রিত হইয়া যাইতে থাকে। ইহার উপর একদিকে অভাবের তাড়না ত আছেই; অপর দিকে গভর্ণমেণ্টের নিয়মে বয়সের সীমা বাঁধা। সুতরাং সম্মুখে সংপ্রসারিত সোনার পথ ত্যাগ করা যে অসম্ভব হইয়া উঠিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? তাহার পর একবার ঐ পথ গ্রহণ করিলে, ধ্রুবের পরিবর্ত্তে অধ্রুবের চিন্তা করা আর হইয়া উঠে না। এইরূপই পরের পর চলিয়া আসিতেছে, এবং অর্থ উপার্জ্জনের জন্য দাস্যবৃত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা সোজা,—ইহাই উপলব্ধি হইয়া, ক্রমে আমাদিগকে একটি দাস-জাতিতে পরিণত করিতেছে।

ইহা দ্বারা জাতির ধন-সম্পদশালী হওয়ার পথেই যে শুধু কাঁটা পড়িতেছে, তাহা নহে; তাহাপেক্ষাও ভীষণ কথা এই যে, একটি জাতির মনোবৃত্তি ক্রমে অধঃপতনের নিম্নস্তরে নামিয়া যাইতেছে। প্রতিকারের কোন চেষ্টা নাই,—নেতাদের এ সব দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর নাই। অর্থ-সমস্যার সহিত বিষয়টি জড়িত। আমাদের এই দরিদ্র জাতির অর্থ-সমস্যাই প্রধান সমস্যা। সুতরাং ইহার সমাধানের জন্য, কোন পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা করিতে যাওয়ায় যে দায়িত্ব আছে, তাহা গ্রহণ করা সহজ নহে। দেশের ধনীদিগের সহায়তা এ বিষয়ে বিশেষ আবশ্যক মনে করি; এবং তদ্দ্বারা তাঁহারাও অধিকতর লাভবান হইতে পারিবেন, ইহাও আমার বিশ্বাস।

জাতি বা ব্যক্তির উন্নতির পন্থা দেখাইয়া দেওয়া অনেক সময়ে অত্যন্ত আবশ্যক। সুযোগের দ্বারা মুকুলোন্মুখ প্রতিভাও বিকশিত হয়; এবং উহার অভাবে বিকাশোন্মুখ প্রতিভাও শুকাইয়া যায়। সেই সুযোগের অভাব থাকিলে, তাহার সৃষ্টি করা আবশ্যক। সেই সৃষ্টির জন্য দেশে যোগ্য লোক ও ধন থাকা আবশ্যক। দেশে লোক

আছে, ধনীও আছেন ; কিন্তু তাঁহাদের একত্র করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্ত যে শিক্ষা আবশ্যক, জাতির স্বার্থকে নিজের স্বার্থের সহিত মিশাইবার জন্ত যে শিক্ষার প্রয়োজন, সে শিক্ষা নাই। আমাদের বাঁচিতে হইলে, আমাদের মনোবৃত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহাকে উন্নত করিতে পারে, এমন যোগ্য শিক্ষার প্রবর্ত্তন করাই আমাদের সর্ব্ব-প্রথম কার্য্য।

ব্যবসায়ের কথা-প্রসঙ্গে একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি ; কিন্তু উহাই মূল কথা। এই বড় ব্যাধির বড় চিকিৎসা আবশ্যক। সে ব্যবস্থা করা বড়লোকের পক্ষেই আয়াসসাধ্য। আমি তাহা ছাড়িয়া দিয়া, সংক্ষেপে সামান্ত মুষ্টিযোগ দ্বারা পরীক্ষা করিবার ইঙ্গিত করিয়া আজি প্রবন্ধ শেষ করিব।

অভিভাবক মহাশয়েরা পুত্রের শিক্ষার জন্ত বহু অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়া থাকেন। আমি তাহার উপর অন্ততঃ আর একটি বৎসরও তাহাদের জন্ত আবশ্যক সামান্ত ব্যয় করিতে অনুরোধ করি। কেরাণীগিরি বা কোন চাকরীই যে শিক্ষার চরমোদ্দেশ্য, এ কথা ছেলেদের তরুণ ও কোমল মস্তিষ্কে বাল্যকাল হইতে অল্পে অল্পে প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা না করিয়া বরং তৎপরিবর্ত্তে "লেখাপড়া শেখে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে" এ শিক্ষা দেওয়াও অর্থ-সমস্তার দিক দিয়া মন্দের ভাল। যুবকদের শিক্ষাশেষে, তাহাদের জীবিকা সংগ্রহ বা ধনোপার্জ্জনের জন্ত উপযুক্ত পথ অন্বেষণার্থ যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া একান্ত দরকার। এ বিষয়ে একটু সাহায্য করিতে পারিলে ভাল হয় ; কিন্তু অনেকেরই পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ বা আত্মীয়-বন্ধুদের কোন ব্যবসায় আছে, তাহাদের, যদি সম্ভব হয়, তাহা অবলম্বন করিয়া, ব্যবসায়ের মোটামুটি মূল সূত্রগুলি শিক্ষা করিয়া, নিজের শরীর, প্রকৃতি ও অবস্থার উপযোগী কার্য্য বাছিয়া লইয়া, তাহা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হওয়া কতকটা সহজ হয়। যাঁহাদের সে সুযোগ নাই, তাঁহারা নিজেই ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাদের গ্রহণযোগ্য পথ অন্বেষণ করা দরকার। এ জন্ত কলিকাতার মত ব্যবসায়বহুল স্থানই উপযুক্ত ক্ষেত্র। নিজের চেষ্টাই এ বিষয়ে প্রধান সম্বল ; আর কিছু যদি নাও থাকে, ক্ষতি নাই। পরের নিকট হইতে তাহার উপযোগী কাজ জানিয়া লইবার চেষ্টা না করাই বিধেয়। নিজের পরিশ্রম, কর্ম্মকুশলতা, উদ্যম ও সাধুতার বিনিময়ে তাহার প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করা অসম্ভব নহে ; এবং এ শিক্ষা যে একটা গুরুতর ব্যাপার, তাহাও নহে। ইহ আয়ত্ত হইবার পর, তাহার সাধুতায় সন্দেহ করিবার কারণ না থাকিলে, অর্থ বা মূলধন তাহার কাছে আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহাই লেখকের ধারণা।

কলিকাতা ভিন্ন সুদূর মফঃস্বলেও কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। কোথায় কোন্ জিনিস, কোন্ পণ্য উৎপন্ন হইয়া সুলভে বিক্রয় হয়, এবং তাহার বাজার কোথায়, এ সকল তথ্য ও সেই সমস্ত দ্রব্য বাজারে পাঠাইবার ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্যক অবগত হইয়াও বহু কাজের অবতারণা করা যাইতে পারে। এ ক্ষেত্রেও পারদর্শীর-মূলধনের অভাব হয় না। কাঁচা মাল হইতে আমাদের সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় ছোট বড় দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিবার বা করাইবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া কৃতকর্ম্মা হইতে পারিলে, মূলধনের অভাবে তাহার শিক্ষা ব্যর্থ হয় না ; এবং অল্পদিনে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারা যায়।

মূলধন নাই, অতএব কোন ব্যবসায় করা অসম্ভব,—এই অমূলক ধারণাটিকে কোন দিনই মাথার মধ্যে স্থান দেওয়া উচিত নহে। আড়ৎ-দারী, দালালি, কমিশন-এজেণ্ট, অর্ডার-সাপ্লাই, কণ্ট্রাক্টারি, এজেন্সি কাজ প্রভৃতিতে মূলধনের বিশেষ প্রয়োজন হয় না ; অথচ এই সকল কাজের দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। অন্য রীতিমত ব্যবসায়েও মূলধনই যে মূল নহে, ইহা মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখা উচিত। মূলধন এবং ধনবৃদ্ধির স্পৃহা উভয়ই বিদ্যমান থাকিতেও, অনেকের সে স্পৃহা ফলবতী হয় না ; বা যথেষ্ট মূলধন লইয়া অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া বিস্তর লোকশান করিতেছেন, এমন কি সর্ব্বস্বান্ত পর্য্যন্ত হইতেছেন, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। যোগ্য লোকের অভাবে বহু স্থলে মূলধন বসিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু বিশ্বাসী কৃতকর্ম্মা ব্যক্তি মূলধনের অভাবে বসিয়া আছেন, ইহা বড় অধিক দেখা যায় না। ইহা হইতেই, অগ্রে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করা যাইতে পারে। ব্যবসায়ের মূলধন অনেক সময়ই টাকা নহে ; কর্ম্ম-পটুতাই অনেক ক্ষেত্রে যথার্থ মূলধন।

অতি সামান্ত অবস্থা হইতে নিজ চেষ্টায় স্বাধীন ব্যবসায়ের দ্বারা কে কিরূপে উন্নতির শিখরে আরূঢ় হইয়াছেন, তাহা জানিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কত বড়-বড় ব্যবসায় কিরূপ সামান্তভাবে আরম্ভ হইয়া কি করিয়া ক্রমে উন্নত অবস্থায় আসিয়াছে, তাহার ইতিহাস সংগ্রহ করা আবশ্যক। আর এই সকল উদাহরণ সম্মুখে রাখিয়া সাহস, সাধুতা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইলে, সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। কথায় বলে, কলিকাতায় টাকা ছড়ান আছে। এ কথা প্রকারান্তরে সত্য ;—খুঁজিয়া সংগ্রহ করাই কাজ।

যাঁহাদের কোন পুরুষে কেহ কখনও ব্যবসায় করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে এ কার্য্য অসম্ভব,—এই সব অমূলক ধারণারও উচ্ছেদ সাধন প্রয়োজন। যাহা আমারই মত মানুষ একজন পারিয়াছে, তাহা আমি পারিব না কেন, এই বিশ্বাস অন্তরে লইয়া, অদম্য চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া উচিত। এই সকলের জন্তই আমি অভিভাবক মহাশয়দিগকে যুবকদের শিক্ষা শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই, তাহার নিকট অর্থের প্রত্যাশা না করিয়া, অন্ততঃ এক বৎসর কাল যাহাতে নিজে চেষ্টা করিয়া তাহার জীবিকা সংগ্রহের শ্রেষ্ঠতর উপায় সন্ধান করিতে পারে, এজন্ত উৎসাহ দিতে, এবং কলিকাতায় বা অন্ত কোন বড় সহরে থাকিয়া, বা প্রতিদিন যাইয়া যাহাতে সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে পারে, সে জন্ত আবশ্যক ব্যয় সরবরাহ করিতে অনুরোধ করি। পুত্রের শিক্ষার জন্ত যিনি অন্ততঃ বার চৌদ্দ বৎসর অপেক্ষা করিতে, এবং বহু অর্থ ব্যয় করিতে পারিয়াছেন, তিনি আর একটি বৎসর এবং কিছু অর্থ পুত্রের অর্থোপার্জ্জনের পথের সন্ধানের জন্ত ব্যয় করিবেন, ইহা কিছু বেশি কথা নহে। ইহাতে একধারে তাঁহার নিজের উপকারের সহিত সমগ্র জাতির উপকার করা হইবে।

উরাঁওদের পর্ব্ব সেরহুল বা খদ্দি

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

ভারতবর্ষের ভূত-পূজক জাতিদিগের মধ্যে উরাঁও অন্যতম। অন্যান্য জাতির মত তাহাদের কোনও ধর্ম্ম-গ্রন্থ নাই। Sermon, Service, Preachings কিছুই নাই; মন্দির, মস্‌জিদ্ বা গির্জ্জা নাই। তবে প্রত্যেক গ্রামেই দেবী-স্থান আছে; এবং সেই স্থানেই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী বাস করেন। ইহাদের এই দেবী-মণ্ডপ তাহাদের নিজের নহে—গ্রামবাসী হিন্দু-মুসলমান সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার।

হিন্দুদিগের মত ইহাদের তেত্রিশ কোটী দেবতা নাই; এবং একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের উপাসনাও ইহারা করে না। ইহারা ভূতের পূজা করে। হিন্দুদের বাহ্যিক অসংখ্য দেব-দেবী থাকিলেও, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বমঙ্গলময়, পরমাত্মা যিনি তিনগুণে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য কেবল আপনার ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা সম্পন্ন করিতেছেন,—তাঁহার উপাসনা করাই প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্ম। হিন্দু-ধর্ম্মের সার উপদেশ জীবাত্মাকে পরমাত্মার লীন করিতে চেষ্টা করা, আর যাহাতে জন্মগ্রহণ না করিতে হয়। উরাঁওদের কোনও ভগবান নাই। তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যের জন্য এক-একটি দেও, দেওতী বা ভূত আছে। প্রত্যেকের স্থানও পৃথক্-পৃথক্,—কোথাও বৃক্ষের উপর, কোথাও দেওয়ালে বা জানালায়; কাহারও রন্ধন-চুলায়,—আর যাহাদের এ সৌভাগ্যও না হইল, তাহাদের—মাঠে মাটির ঢিবিতেই রৌদ্র-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম ভোগ করিয়া কখনও এক-আধটা মুর্গীর প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

উরাঁওদের ধর্ম্ম ও সমাজের নেতা পাহান। তাহারই হাতে সমস্ত পূজা ও তাহার অনুষ্ঠানের ভার। প্রত্যেক তিন বৎসরের পর পাহান গ্রামবাসী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়; এবং সে আপনার উদ্ভাবিত মন্ত্রে ও উপায়ে পূজা ইত্যাদি করিয়া থাকে।

উরাঁওদের দেব-দেবীদিগের প্রধান কার্য্য গ্রামকে রোগ, অজন্মা ইত্যাদি হইতে বাঁচাইয়া রাখা। তাই, দেবতা পাছে ক্রুদ্ধ হইয়া কোনও অনর্থ ঘটাইয়া দেয়, সেইজন্য প্রত্যেকেই সময়ে-সময়ে পূজা পাইয়া থাকে। গ্রামকে নানারূপ বিপদ হইতে রক্ষা করার জন্য যে সকল দেবতা আছে, তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য আরও দুই-একটি দেবতা আছে, যাহারা বৎসরের কোনও নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে 'পূজা' পাইয়া থাকে। সেই সব পূজার মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান,—সেরহুল বা খদ্দি।

ইহাদের পূজা-পার্ব্বণের কোনও নির্দ্দিষ্ট তিথি নাই। পাহান আপনার ইচ্ছামত কোনও দিন স্থির করিয়া দেয়; কিম্বা গ্রামবাসী সকলের মত লইয়া, একটি দিন স্থির করে। পাঁজি-পুঁথির কোনও আবশ্যকতা নাই, দিনক্ষণ লইয়া বাদ-বিসম্বাদ নাই; আর উপকরণ লইয়াও গণ্ডগোল নাই। বৎসরের নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে যে হোক্ একটি দিন সকলের পরামর্শ ও সুবিধা মতে স্থির করিয়া লইয়া পূজা করিলেই হইল। তবে সমস্ত পূজারই অঙ্গ নাচ-গান ও 'হাঁড়িয়া' (১) ইহা বাদ দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

সেরহুল পর্ব্ব না করিয়া ইহারা বৎসরের কার্য্য আরম্ভ করে না এবং ক্ষেতের কোনও কাজই আরম্ভ করে না। কাজেই সেরহুল উরাঁওদের সর্ব্বপ্রধান পর্ব্ব, যেহেতু সেরহুল না মানিলে শস্য উৎপন্ন কিছুই হইবে না।

সেরহুল শব্দের অর্থ 'শালফুল'। যে সময়ে শাল গাছের ফুল হয়, সেই সময়ের পর্ব্ব বলিয়াই, ইহার নাম সেরহুল। যত দিন শাল গাছে ফুল থাকে, তত দিনের মধ্যে পর্ব্বের অনুষ্ঠান করাই সাধারণ নিয়ম। গ্রামের লোকের পরামর্শ মত দিন স্থির করাইয়া শালফুল তোলাইয়া পাহানের দ্বারা প্রত্যেক বাড়ীতে-বাড়ীতে গুঁজাইয়া লওয়া হয়,—যাহাতে সমস্ত বৎসরটি বেশ সুশৃঙ্খলে কাটিয়া যায়; এবং সেইদিন হইতে পূজার দিন পর্য্যন্ত দস্তুরমত নৃত্য-গীতাদি হইয়া থাকে।

বৎসরের কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ভগবানের উদ্দেশে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, এবং কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একবার আমোদ-প্রমোদ করিয়া লওয়া—এই দুইটিই ইহাদের সেরহুল পর্ব্বের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই জন্যই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ইহাতে প্রাণ খুলিয়া যোগদান করে। পৃথিবীতে যে সকল জাতির অবলম্বন কৃষি, সেই সকল জাতির মধ্যেই দেব-দেবীর বাহুল্য ও পূজা-পার্ব্বণের আড়ম্বর দেখা যায়। Plurality of deities তাহাদেরই মধ্যে; কারণ প্রকৃতির উপরেই কৃষিকার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করে; এবং প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে পূজা করা কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়।

ফাল্গুন-পূর্ণিমার পরই গ্রামের লোকে শালফুল সংগ্রহ করিয়া পাহানকে দিয়া বাড়ীর চালে গুঁজাইয়া লয়; ও পূজার জন্য পাহানকে পয়সা বা চাউল দেয়। তাহার পর পূজার দিন স্থির করা হয়। যাহাদের গ্রামে ফাল্গুন মাসেই বৃষ্টি হইয়া যায়, তাহারাই শীঘ্র ফুল গুঁজাইয়া লয়; কারণ ফুল না গুঁজিলে কোনও উরাঁও লাঙ্গল স্পর্শ করিবে না। বৃষ্টি দেরীতে হইলে, চৈত্রে অথবা বৈশাখে 'ফুল গোঁজা' ও পূজা শেষ করা হয়। যাহারা আপনাদের গ্রামে আগেই "ফুল গুঁজাইয়া" লয়, তাহারা আপনাদের গ্রামে (যেখানে ঐ অনুষ্ঠান তখনও হয় নাই) গিয়া, সে গ্রামের কোনও খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করে না; এমন কি পানীয় জল পর্য্যন্ত কাহারও বাড়ীতে গ্রহণ করে না। আবশ্যক হইলে নদী অথবা গ্রামের বাহিরের কোনও জলাশয়ে গিয়া জল পান করিয়া আসে। যে এই নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহাকে স্বীয় গ্রামে বড়ই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়; কারণ, ইহা সমস্ত গ্রামের পক্ষে ভয়ানক অমঙ্গল-সূচক।

সেরহুল পূজার প্রায় একমাস পূর্ব্ব হইতে গ্রাম্য আখড়া (২) প্রতি

(১) এক প্রকার মদ্য; ভাত পচাইয়া প্রস্তুত করা হয়।

(২) আখড়া মাটীর বেদী। সেখানে প্রতিরাত্রে গান ও নাচের জন্য উরাঁওরা একত্র হয় এবং জাতীয় পঞ্চায়েৎ সেখানে বসে।

রাত্রিতেই যুবক-যুবতীদের নৃত্য-গীত ও মাদল, নাগেড়ার (৩) গম্ভীর নিনাদে মুখরিত হইয়া উঠে—সমস্ত গ্রাম জুড়িয়া একটা বিকট উত্তেজনা ও বিরাট আনন্দ বিরাজ করে। পূজার দিন প্রত্যূষ হইতেই এবং কোথাও-কোথাও পূর্ব্ব রজনী হইতেই নিরবচ্ছিন্ন নাচ-গান "বেঃ এচ্ না খদ্দি" আরম্ভ হয়। যেমন উত্তেজনায় পরিপূর্ণ তাণ্ডব নৃত্য. গানও তেমনি বিকট, আর বাদ্যও তেমনি গম্ভীর। সকালে উঠিয়াই সকল স্ত্রী-পুরুষ আখ্ড়ায় গিয়া উপস্থিত হয়; এবং বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়েরা নাচ-গানে যোগ না দিয়া, গ্রামের মধ্যে মুরগী ধরিতে যায়। বলা বাহুল্য, হাঁড়িয়া অনবরতই চলিতে থাকে। বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়ারা নাচ-গানে যোগ না দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়। যতক্ষণ পূজা শেষ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা ক্ষেত্রের কোনও কাজই করে না। এবং গ্রামের অন্যান্য অধিবাসী যাহারা মুসলমান বা হিন্দু, তাহাদিগকেও কোনও কাজ করিতে দেয় না। যাহারা বারণ না শুনিয়া চাষের কাজ করিতে যায়, তাহারা সমস্ত গ্রামবাসী উরাঁওদিগের নিকট হইতে ভবিষ্যতে কোনও কাজই পায় না।

সেরহুল গান যেমন আখ্ড়ায় চলিতে থাকে, তেমি ওদিকে প্রতি বাড়ীর বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়েরা বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়াদিগের সমভিব্যাহারে পাহানের বাটী চাউল ও মুর্গী লইয়া উপস্থিত হয়। পাহান হাত যোড় করিয়া বসিয়া থাকে এবং সেই হাতের উপর চাউল ঢালা হইতে থাকে। গ্রামের সকলে একত্র হইলে, পুরুষেরা পাহানের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ পূজাস্থান সর্ণার (৪) নিকট উপস্থিত হয়। প্রতি বৎসর একই পথ ধরিয়া সর্ণায় যাওয়াই নিয়ম।

পূজার উপকরণ:—হাঁড়িয়া, শালফুল, ধূনা ও মুর্গী কাটিবার জন্য একটি নূতন ছুরী। পাহান নিজেই "সর্ণা বুড়িয়া"র (৫) উদ্দেশে মুর্গী উৎসর্গ করিয়া, স্বহস্তে বলি দেয়; ও সেই রক্ত ও শালফুল দিয়া পূজা করে; এবং আলোচাল ও 'হাঁড়িয়া' নিবেদন করিয়া গাছতলায় ছড়াইয়া দেয়। তার পর হাঁড়িয়া ও ভাত খাওয়া হয়। 'পনাভারা' (৬) দ্বারা রন্ধন কার্য্য, ফুলতোলা, পরিবেশন ইত্যাদি কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। তাহার পর ফুটকল গাছের (৭) নূতন পল্লব সংগ্রহ করিয়া সকলে পাহানের বাড়ীতে পাহানকে কাঁধে করিয়া ফিরিয়া যায় ও 'পনাভারা' আগে-আগে আলো চাউল ছড়াইতে ছড়াইতে যায়।

ইতোমধ্যে বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়ারা পাহানের বাটীতে আসিয়া, পাহানের বাটীতেই তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আসিয়া, আবার তেল মাখে। এই তেল পাহানই দিয়া থাকে। পাহান তৈলের জন্য গ্রামবাসীগণের সাধারণ সম্পত্তি কয়েকটি 'করঞ্জ' গাছ পায়, এবং তাহারই বীজ হইতে তেল বাহির করিয়া রাখে। স্নান সারিয়া স্ত্রীলোকেরা পাহানের বাড়ী আহার করে; এবং পাহান আসিয়া পৌঁছিলে হাঁড়িয়া পান করে।

এদিকে যুবক-যুবতীরা প্রায় দ্বিপ্রহরে নাচ-গান শেষ করিয়া, বাটীতে আহারাদি সম্পন্ন করিবার পর, মাঠে-মাঠে কাঁকড়া ধরিতে যায় এবং বাটী ফিরিয়া, কাঁকড়াগুলির একটিকে উনানের আগুনে উনানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে দান করিয়া, দুইটা জীবিত কাঁকড়া দড়িতে বাঁধিয়া উনানের উপর ঝুলাইয়া দেয়। কাঁকড়াগুলির যাহাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ থাকে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক থাকে। সেই কাঁকড়াগুলি মরিয়া শুকাইয়া গেলে. গুড়াইয়া 'বীজ' ক্ষেত্রে ছড়াইবার আগে মিলাইয়া রাখে; উদ্দেশ্য যেন তাহাদের ক্ষেত্রের ধান্য কাঁকড়ার পায়ের মত সংখ্যায় ও পরিমাণে বেশী হয়।

এই কার্য্যের পর যুবক-যুবতীরা পাহানের বাড়ী গিয়া হাঁড়িয়া পান করে ও আহারাদি সম্পন্ন করিয়া আখ্ড়ায় গিয়া গীত-বাদ্যাদি করে। অবশিষ্ট সকলের কেহু-কেহ নাচ দেখিবার জন্য আখড়ায় যায়; আর অন্যান্য সকলে স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

দ্বিতীয় দিন প্রাতঃকালে পুনরায় সকলে পাহানের বাড়ী গিয়া একত্র হয় এবং ভাত রুটি খায়। সেই দিন 'পনাভারা'কে হাঁড়িয়া বিতরণ করিতে হয়। পাহান সকলের মাথায় শালফুল গুঁজিয়া দেয় ও পয়সা কিম্বা চাউল পায়। নাচ-গান পূর্ব্বদিনের মতই চলিতে থাকে। সন্ধ্যার আহার 'পনাভারা'র বাড়ীতে 'পনাভারা' কর্ত্তৃক বিতরিত হয়। বলাই বাহুল্য, এই সমস্ত খরচের জন্য পাহানও পনাভারার নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র থাকে; এবং তাহার ফসলেই হাঁড়িয়া প্রস্তুত হয় এবং গ্রামবাসীর আহারের ব্যবস্থা হয়। তৃতীয় দিনের কার্য্য প্রাতে ও মধ্যাহ্নে সকলের বাটীতে ফুল গুঁজিয়া দেওয়া। যাহারা ফাল্গুনের বৃষ্টিতে চাষের কাজ আরম্ভ করে, তাহাদের আর তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান আবশ্যক হয় না।

এই পর্ব্বের পর শস্য রোপণ কার্য্যের পূর্ব্বে কোনও পূজা পার্ব্বণ নাই।

(৩) নাগেড়া একরূপ বাদ্যযন্ত্র। ডুগীর মত, কিন্তু অনেক বড়। কাঁধে ঝুলাইয়া কাঠী দিয়া বাজান হয়।

(৪) সর্ণা যেখানে গ্রাম্য দেবতা বাস করে। সাধারণতঃ কয়েকটি শাল গাছের ছোট বাগান।

(৫) সর্ণা বুড়িয়া গ্রামের দেবতা; শাল গাছে থাকে।

(৬) পনাভারা'—ইহার কার্য্য, সামাজিক কার্য্যে জল তোলা, রান্না করা, পূজার ফুল তোলা ইত্যাদি। তিন বৎসর অন্তর নির্ব্বাচিত হয়।

(৭) ফুটকল গাছ পাঁকুড় গাছের মত এক রকম গাছ। ইহার পাতা শাকের মত খাওয়া হয়। সেরহুলের সময় এই শাক প্রথম খাওয়া হয়।

রঞ্জন-রশ্মি

[অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ]

দুইজনে কথোপকথন হইতেছিল। স্থান, রঞ্জন সাহেবের লেবরেটরি। মিঃ ড্যাম্ প্রফেসার রঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনার আবিষ্কারের ইতিহাসটা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিবেন কি?"

রঞ্জন বলিলেন "ইহার কোন ইতিহাস নাই। অনেক দিন হইতেই

ক্যাথোড-রশ্মির আলোচনা আমার খুব ভাল লাগিত। হার্টজ, লেনার্ড ও অপরাপর বৈজ্ঞানিকগণ ক্যাথোড রশ্মি লইয়া যে সকল পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি খুব আগ্রহের সহিত আলোচনা করিতাম। আমি স্থির করিলাম, সময় পাইলে নিজেও এ বিষয়ে পরীক্ষা করিব। ১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাসের শেষে আমার অবসর হইল; কাজ আরম্ভ করিলাম, এবং দিনকয়েকের মধ্যেই আবিষ্কারটা ঘটিল।"

"তারিখটা কি?"

"নবেম্বরের ৮ই।"

"আর আবিষ্কারটা কি?"

"আমি ক্রুকস্ সাহেবের কাঁচের নল লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। কাঁচের নলটা একটা কালো, মোটা কাগজে ঢাকা ছিল। নিকটেই বেরিয়াম-প্লাটিনো-সাএনাইড নামক লবণবিশেষ-মাখান একখণ্ড কাগজ পড়িয়া ছিল। কাঁচের নলটার মধ্যে আমি তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চালিত করিতেছিলাম। তখন ঐ নুণমাখা কাগজখানার উপর একটা কাল দাগ দেখিতে পাইলাম।"

"কাল দাগ! তাতে কি বুঝা গেল?"

"আলোক ভিন্ন এরূপ হয় না। দাগটা কোনও পদার্থের ছায়ার মত দেখাইতেছিল। ছায়া, কাযেই আলো চাই। কাঁচের নলটা হইতে আলো আসিবার পথ ছিল না, উহা ত খুব মোটা কাগজ দিয়াই ঢাকা ছিল। সাধারণ আলোক ঐরূপ মোটা কাগজ ভেদ করিতে পারে না—বা বিদ্যুতের আলোকেও উহা ভেদ করিতে সমর্থ নহে।"

"বটে? আপনি কি অনুমান করিলেন?"

"আমি কিছু অনুমান করিলাম না—অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল যে, যে রশ্মি-সম্পাতে ছায়াটা উৎপন্ন হইয়াছে,—উহা আলোকরশ্মিই হোক বা অন্য কোন রকমের রশ্মিই হোক—উহা ঐ কাঁচের নলটা হইতেই আসিতেছে। অন্য কোন দিক হইতে আলো আসিলে, ঐরূপ স্থানে ছায়া পতন হইত না। আমি ভাল রূপে অনুসন্ধান করিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম, আমার ধারণাটা ঠিক;—কাঁচের নলটা হইতেই যে কতকগুলি রশ্মি বাহির হইতেছিল, এ সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহই রহিল না। ঢাকনিটা ভেদ করিয়াই রশ্মিগুলি নুণমাখা কাগজের উপর পতিত হইয়াছিল। রশ্মির গুণে কাগজখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল; আর মাঝখানে একটা অস্বচ্ছ পদার্থ থাকাতে, রশ্মিগুলি উহাকে ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই। কাগজের উপর কাল দাগটা ঐ অস্বচ্ছ পদার্থেরই ছায়া মাত্র। প্রথমে আমি ইহাকে কোন একটা নূতন রকমের আলোক বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম; তবে—হাঁ, ইহা যে নূতন কিছু, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"ইহা কি আলোক?"

"না। সাধারণ আলোক দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া থাকে; ইহা সেরূপ হয় না। আলোকরশ্মি এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে যাইবার কালে বাঁকিয়া যায়,—ইহা তেমন বাঁকে না।"

"তবে এটা কি বিদ্যুৎ?"

"না, আমাদের পরিচিত কোন রকমের বিদ্যুৎও ইহা নহে।"

"তবে ইহা কি?"

"আমি জানি না। নূতন রশ্মি আবিষ্কারের পর, ইহা দ্বারা কি-কি কায হইতে পারে, আমি তাহাই দেখিতে লাগিলাম। পরীক্ষার ফলে শীঘ্রই দেখিতে পাইলাম যে এই রশ্মিগুলি অনেক পদার্থকেই অক্লেশে ভেদ করিয়া যাইতে সমর্থ। ভেদ করিবার ক্ষমতা ইহাদের অসাধারণ। কাগজ, কাপড়, কাঠ এ সকল দ্রব্য এই নূতন রশ্মির পক্ষে নিতান্তই স্বচ্ছ। ইহা ধাতব পদার্থকেও ভেদ করিতে সক্ষম; তবে ধাতুগুলি সেরূপ স্বচ্ছ নহে। হাল্‌কা ধাতুগুলি যত স্বচ্ছ, ভারী ধাতুগুলি তত স্বচ্ছ নহে।"

অধ্যাপক রঞ্জন তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, উপরে তাহা বিবৃত হইল। অধ্যাপক সিল্‌ভেনাস্ টম্সন্ উক্ত বিবরণ তাঁহার "দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোক" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এখানে ভাষান্তরিত করিয়া তাহাই উদ্ধৃত হইল।

উক্ত বিবরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, রঞ্জন-রশ্মির উৎপত্তিস্থল হইতেছে ক্রুকস্ সাহেবের কাঁচের নলটা। ক্রুকস্ নলের ভিতর তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চালিত করিলেই, ঐ নলটা হইতে, অথবা উহার স্থানবিশেষ হইতে রঞ্জন-রশ্মি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, রঞ্জন-রশ্মির একটা প্রধান গুণ হইতেছে এই যে, উহা যদি বেরিয়াম-প্লাটিনো-সাএনাইড্ নামক দ্রব্য মাখান একখণ্ড কাগজের উপর পতিত হয়, তবে ঐ কাগজখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বেরিয়াম-প্লাটিনো-সাএনাইড্ এক প্রকার লবণ-বিশেষ। এই নুণমাখান কাগজ রঞ্জন-রশ্মির প্রভাবে আলোকিত হইয়া উঠে; ইহাতেই এই রশ্মির আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে।

উক্ত বিবরণে আমরা আরও দেখিতে পাই,—আর এইটাই হইতেছে রঞ্জন-রশ্মির প্রধান ধর্ম্ম যে,—সাধারণ আলোক-রশ্মি যে সকল পদার্থ ভেদ করিতে সমর্থ নহে, এইরূপ অনেক পদার্থকেই রঞ্জন-রশ্মি অক্লেশে ভেদ করিয়া যায়। ক্রুকস্ নল লইয়া পরীক্ষা-কালে রঞ্জন যে মোটা কাগজের ঢাকনিটা ব্যবহার করিয়াছিলেন, উহা এই রশ্মির পক্ষে নিতান্তই স্বচ্ছ। কাগজ, কাপড়, কাঠ, চর্ম্ম, মাংস প্রভৃতি পদার্থ সাধারণ আলোকের পক্ষে অস্বচ্ছ হইলেও, রঞ্জন-রশ্মির পক্ষে বেশ স্বচ্ছ। ধাতুগুলি সাধারণ আলোকের পক্ষেও স্বচ্ছ নহে; আর, রঞ্জন-রশ্মির পক্ষে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ হইলেও, কাগজ বা কাঠের মত অত স্বচ্ছ নহে।

রঞ্জন-রশ্মির এই ভেদ করিবার ক্ষমতা প্রকৃতই অদ্ভুত। বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে রঞ্জন-রশ্মির আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা শ্রুতিগোচর হয় নাই এরূপ ব্যক্তি বিরল। যে রশ্মি সাহায্যে বাক্স না খুলিয়াই ভিতরকার টাকাকড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, চামড়া না চিড়িয়া হাত পায়ের হাড় দেখিতে পাওয়া যায়, বিনা অস্ত্র-প্রয়োগে শরীরের কোন স্থানে গুলিবিদ্ধ হইয়াছে অথবা শরীর-যন্ত্রের কোথায় কোন বিকৃতি ঘটিয়াছে, ইহা

নিরূপণ করিতে পারা যায়, এরূপ রশ্মির আবিষ্কারে যে বিজ্ঞান-জগতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অদৃশ্যকে দেখানই রঞ্জন-রশ্মির প্রধান গুণ; যাহা কল্পনারও অতীত ছিল, রঞ্জন-রশ্মি তাহা সম্ভব করিয়াছে।

এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, বিশেষ কোন আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। চাই কেবল একখানা নুণমাখান কাগজ, আর তাড়িত-প্রবাহ-সমন্বিত বায়ু-শূন্য একটা কাচের নল। অবশ্য ইহা যোটান আমাদের সকলের পক্ষে তেমন সহজ নহে; সুতরাং একটা সহজ রকমের পরীক্ষা দ্বারা আমরা ব্যাপারটা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

অন্ধকার গৃহে একটা হ্যারিকেন ল্যাম্প জ্বালিলে, শাদা দেওয়ালগুলি যে বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, ইহা আমরা প্রত্যহই দেখিয়া থাকি। ল্যাম্পটা ও দেওয়ালের মাঝখানে একটা টাকা বা পয়সা রাখিলে, দেওয়ালের উপর টাকাটার একটা কাল ছায়া পড়ে; কিন্তু একখণ্ড কাচ রাখিলে, উহার সেরূপ স্পষ্ট ছায়া পড়ে না। টাকার ছায়া পড়ে; কেন না, টাকাটা অস্বচ্ছ পদার্থ;—আলোক-রশ্মি টাকাটার ভিতর ঢুকিতেই আটকা পড়িয়া যায়, উহাকে ভেদ করিয়া বাহির হইতে সমর্থ হয় না। ফলে টাকাটার পিছনে দেওয়ালের যে অংশটা থাকে, ঐ স্থানে আলো পড়িতে পায় না। আশেপাশে আলো পড়ে; কিন্তু টাকাটার ঠিক পিছনে থাকে অন্ধকার। ইহাই টাকার ছায়া। অস্বচ্ছ পদার্থেরই ছায়া পড়ে,—স্বচ্ছ পদার্থের পড়ে না। কাচ বেশ স্বচ্ছ; এজন্য টাকা পয়সার মত কাচের অত স্পষ্ট ছায়া পড়ে না।

যদি অস্বচ্ছ টাকাটার উপর একটা স্বচ্ছ আবরণ দেওয়া যায়,—যদি উহাকে একটা কাঁচনির্ম্মিত বাক্সে পুরিয়া বাক্সটাকে ল্যাম্প ও দেওয়ালের মাঝখানে রাখা যায়, তবে দেখা যাইবে, দেওয়ালের উপর কাচের বাক্সটার একটা অস্পষ্ট ছায়া পড়িয়াছে; এবং ঐ অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে টাকার ছায়াটা গাঢ় মসীবর্ণে অঙ্কিত রহিয়াছে।

এখন আমরা ভাষা বদলাইয়া ফেলি। প্রজ্জ্বলিত হ্যারিকেন ল্যাম্পটা হইল যেন তাড়িত-প্রবাহযুক্ত ক্রুকস সাহেবের একটা কাচের নল। প্রদীপ-রশ্মি হইল যেন রঞ্জন-রশ্মি; চূণ-মাখান দেওয়ালটা হইল যেন একখানা নুণমাখান কাগজ; আর টাকার বাক্সটা কাচের না হইয়া হইল যেন,—যেরূপ হইতে হয়, কাঠের। এখন কি দেখা যাইবে? দেখা যাইবে, ঐ নুণমাখা কাগজখানা বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; আর উজ্জ্বল কাগজখানার উপর ঐ কাঠের বাক্সটার—যাহা আলোক-রশ্মির পক্ষে অস্বচ্ছ হইলেও, রঞ্জন-রশ্মির পক্ষে কাচের মতই স্বচ্ছ, উহার—একটা অস্পষ্ট ছায়া পড়িয়াছে; এবং বাক্সটার অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে টাকাটার একটা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাক্সটা সরাইয়া ঐ স্থানে একখানা হাত রাখিলে কি দেখা যাইবে? দেখা যাইবে, হাতখানার স্বচ্ছ চামড়া ও মাংসের অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে অস্বচ্ছ হাড়-গুলির সুস্পষ্ট ছায়া বিদ্যমান। ঐ স্থানে একটি চঞ্চল বালককে ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে, যেন সমাধিক্ষেত্র হইতে একটি গলিত-দেহ নরকঙ্কাল সমুত্থিত হইয়া, উহার শীর্ণ দেহ-যষ্টির বিকট ভঙ্গী দ্বারা একটা বিভীষিকাময় পৈশাচিক নৃত্যের অভিনয় করিতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, রঞ্জন-রশ্মির পরীক্ষায় একখানা নুণমাখান কাগজের আবশ্যকতা কি? উহার উপর ছায়াপাতই বা কেন? অদৃশ্য যদি দেখাই যায়, তবে সহজ দৃষ্টিতে দেখিতে দোষ কি? কাচের বাক্সে টাকা আছে কি না, ইহা, বাক্সটা আলোর দিকে তুলিয়া ধরিলেই ত দেখা যায়, দেওয়ালের উপর ছায়া ফেলিবার ত কোন প্রয়োজন হয় না। তবে রঞ্জন-রশ্মির বেলায় এত আড়ম্বর কেন?—নুণ মাখা কাগজই বা কেন? ইহার উত্তর এই যে রঞ্জন-রশ্মি ঠিক সাধারণ আলোক-রশ্মির মত নহে। এরূপ অনেক রশ্মি আছে, যাহা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া অবিরত যাওয়া-আসা করিলেও, চক্ষু তাহাতে কোন সাড়া দেয় না। রঞ্জন-রশ্মি এইরূপ একটা অদৃশ্য রশ্মি। অদৃশ্য বলিয়াই, এই রশ্মি-পথে হাত রাখিলে, সহজ দৃষ্টিতে হাতের হাড় দেখা যায় না। রঞ্জন-রশ্মি প্রত্যক্ষ গোচর হয়, যখন উহাকে উক্ত নুণমাখা কাগজে অথবা বিশেষ-বিশেষ গোটা-কয়েক পদার্থের উপর ফেলা যায়। এই জন্যই নুণমাখা কাগজের প্রয়োজন। এই রশ্মিগুলি যদি সাধারণ আলোক-রশ্মির ন্যায় প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক রঞ্জন-রশ্মি-প্রদর্শনী-গৃহ কি ভয়ঙ্কর প্রেতের সভাতেই না পর্য্যবসিত হইত!

দেখা যাইতেছে যে রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে ভিতরকার জিনিস প্রত্যক্ষ করিতে হইলে বাহিরটা স্বচ্ছ—অর্থাৎ রঞ্জন-রশ্মির পক্ষে স্বচ্ছ—এবং ভিতরকার দ্রব্যগুলি অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছ হওয়া আবশ্যক। কেন না বাহিরের আবরণটা অস্বচ্ছ হইলে, ভিতরকার পদার্থের ছায়া ঘটিবে না। ধাতুগুলি নিতান্ত পাতলা না হইলে, রঞ্জন-রশ্মির পক্ষেও অস্বচ্ছ। সুতরাং রঞ্জন-রশ্মির পথে একটা লোহার সিন্দুক রাখিলে, পার্শ্বস্থ নুণ-মাখা কাগজের উপর ভিতরকার দ্রব্যের কোনও ছায়া পড়িবে না—প্রদীপের রশ্মিতে যেমন শুধু সিন্দুকটারই ছায়া পড়ে, অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যের ছায়া পড়ে না, রঞ্জন-রশ্মিতেও ঠিক তাহাই ঘটিবে। ফলে সূর্য্যরশ্মিই হৌক বা রঞ্জন-রশ্মিই হৌক, মোটা লোহার সিন্দুক যে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তার পর ফটোগ্রাফির কথা। রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে যে ফটো তোলা হয়, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সাধারণ আলোর সাহায্যে আমরা যে ফটো তুলি, উহা হইতেছে বাহিরের আবরণটার ফটোগ্রাফ মাত্র; উহা হইতে আমরা ভিতরকার খবর পাই না। আর রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে যে ফটো তোলা হয়, উহা হইতেছে ভিতরকার ফটোগ্রাফ—জীবিত ব্যক্তির অস্থিসমূহের ফটোগ্রাফ। ফটো তোলা কিছু কঠিন কার্য্য নহে। যাহার ফটো তুলিতে হইবে, তাহার ছায়াটা নুণমাখা কাগজের উপর না ফেলিয়া, একখানা কাচের প্লেটের উপর ফেলিতে হয়। সাধারণ ফটোগ্রাফিতে যে আরক-মাখান কাচের প্লেট ব্যবহৃত হয়, ঐ প্লেটের উপরই ছায়া ফেলিতে হয় এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে একই প্রণালীতে ছায়াটাকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। রঞ্জন-রশ্মিও যে সাধারণ আলোকের মত আরক-মাখা কাচের প্লেটে একটা রাসায়নিক

পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকে, ইহা রঞ্জনই আবিষ্কার করেন এবং রশ্মির সাহায্যে স্বীয় হস্তের অস্থিমালার ফটো গ্রহণে সমর্থ হইয়া, রঞ্জনই প্রথমে অদৃশ্যের ফটো তুলিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন।

রঞ্জন-রশ্মির আর একটা ধর্ম্ম এই যে, গ্যাস-সমূহ এই রশ্মি-প্রভাবে বিদ্যুৎ-পরিচালন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বায়ু স্বভাবতঃ তড়িতের অপরিচালক। এই জন্যই বায়ু মধ্যে কোনও দ্রব্যকে তড়িত-বিশিষ্ট করিয়া রাখা চলে। কিন্তু যে স্থানে রঞ্জন-রশ্মি উৎপন্ন করা যায়, উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু, লোহা বা তামার ন্যায় বেশ তড়িৎ পরিচালক হইয়া উঠে, এবং নিকটে যদি একটা তড়িদ্দর্শক যন্ত্র (charged elected scope) অথবা অন্য কোন তড়িত বিশিষ্ট দ্রব্য রাখা যায়, তবে উহা অবিলম্বে তড়িন্মুক্ত হইয়া পড়ে, যেন হস্তদ্বারা বা একটা ধাতুদণ্ড দ্বারা তড়িদ্দর্শক যন্ত্রটাকে স্পর্শ করা গিয়াছে। রশ্মিগুলি খুব প্রখর হইলেই, বায়ুটা বেশ ভাল রকমের তড়িৎ-পরিচালক হইয়া উঠে এবং তড়িদ্দর্শক যন্ত্রটাও অবিলম্বে তড়িৎশূন্য হইয়া পড়ে। রশ্মিগুলি সেরূপ প্রখর না হইলে, বায়ুর পরিচালন-ক্ষমতাও অল্প হয়,—তড়িদ্দর্শক যন্ত্রের তড়িতটাও ধীরে ধীরে লোপ পাইতে থাকে। এইরূপে বায়ুর পরিচালন-ক্ষমতা মাপা চলে, এবং এই পরিচালন ক্ষমতাটা মাপিয়া রঞ্জন-রশ্মির প্রখরতাও মাপা চলে।

শরীরস্থ স্নায়ুমণ্ডলীর উপর রঞ্জন-রশ্মির বিশেষ ক্রিয়া দেখা যায়। অধিক দিন রঞ্জন-রশ্মিতে আনাগোনা করিতে থাকিলে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ফুলে ও বেদনা জন্মে,—ঘা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহা দেখিয়া চিকিৎসকগণ এই রশ্মির সাহায্যে বিভিন্ন রোগের বীজাণুনাশের চেষ্টা পাইতেছেন। ক্যান্সার রোগে রঞ্জন-রশ্মি ব্যবহৃত হয়। চর্ম্মরোগেই রঞ্জন-রশ্মি বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা সর্ব্ব-দদ্রু হুতাশন, সর্ব্বজ্বরগজসিংহ কি না, তাহা এখনও বলা যায় না; তবে প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধিতে ইহা প্রযুক্ত হইতেছে।

আমরা দেখিয়াছি, অস্বচ্ছ পদার্থকে ভেদ করিয়া যাওয়াই হইতেছে রঞ্জন-রশ্মির প্রধান গুণ। তবে ভিন্ন-ভিন্ন ক্রুকস্ নল হইতে যে সকল রশ্মি পাওয়া যায়, তাহাদের সকলের ক্ষমতা সমান নহে। ক্রুকস্ নলে অতি সামান্য পরিমাণে বায়ু থাকে,—উহার চাপও অতি সামান্য। বায়ুনিষ্কাশন-যন্ত্র সাহায্যে নলমধ্যস্থ বায়ুর পরিমাণ কমান-বাড়ান যায়। এইরূপে বায়ুর চাপের ইতর বিশেষ ঘটাইলে, রঞ্জন-রশ্মিরও প্রকার-ভেদ ঘটিয়া থাকে। চাপের মাত্রা নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলে যে রশ্মিগুলি পাওয়া যায়, উহাদেরই ভেদ করিবার ক্ষমতা অসাধারণ। উহাদিগকে বলা যায় "তীক্ষ্ণ-রশ্মি"। আর বায়ুর পরিমাণ খুব না কমাইলে যে রশ্মিগুলি পাওয়া যায়, উহারা তত প্রখর নহে। উহাদের বলা যায় "কোমল রশ্মি।"

আবার একই জাতীয় রশ্মির পক্ষে সকল পদার্থ সমান স্বচ্ছ নহে। পুরু কাগজ পুরু কাঠ বেশ স্বচ্ছ—ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কাচ স্বচ্ছ হইলেও, অত স্বচ্ছ নহে। খাঁটি হীরক স্বচ্ছ,—নকল হীরক অস্বচ্ছ। এইরূপে রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে খাঁটি ও নকল হীরক চিনিতে পারা যায়। মোটা ধাতুর পাত অস্বচ্ছ; কিন্তু সকল ধাতুরই খুব সূক্ষ্ম পাত বেশ স্বচ্ছ। রঞ্জন দেখিয়াছিলেন, যে পদার্থ যত হাল্কা, উহা সেই অনুপাতে স্বচ্ছ। লিথিয়াম্, এলুমিনিয়াম্ খুব হাল্কা ধাতু; কাজেই ইহারা বেশ স্বচ্ছ। সীসক, ইউরেনিয়ম প্রভৃতি গুরু ধাতু; সেজন্য ইহারা খুব অস্বচ্ছ। কিন্তু কোন দ্রব্যই কোন রশ্মির পক্ষেই পূর্ণ মাত্রায় স্বচ্ছ নহে। স্বচ্ছ কাচখণ্ডও খানিকটা আলোক শোষণ করিয়া থাকে। সেইরূপ ধাতু বা অধাতু—সমস্ত পদার্থই অল্পাধিক পরিমাণে রঞ্জন-রশ্মি শোষণ করিয়া থাকে।

একখানা প্লেটের উপর রঞ্জন-রশ্মি ফেলিলে, উহার কতকটা মাত্র প্লেটখানা ভেদ করিয়া বাহির হইতে পারে,—বাকী অংশটা প্লেটখানা শুষিয়া লয়। রঞ্জন-রশ্মির একটা নির্দ্দিষ্ট ভগ্নাংশ (½ অংশ) শোষণ করিবার পক্ষে যে প্লেটখানা যত পাতলা হইলে চলে, তাহার দ্বারা প্লেটখানার শোষণ-ক্ষমতা মাপিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। এইরূপে বিভিন্ন দ্রব্যের শোষণ-ক্ষমতার তুলনা করা যায়। তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, রঞ্জনের সিদ্ধান্ত মোটের উপর ঠিক;—যাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব কম, তাহার শোষণ-ক্ষমতাও সেই অনুপাতে কম।

রঞ্জন-রশ্মির প্রধান ধর্ম্মগুলির উল্লেখ করা গেল; এখন ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রঞ্জন-রশ্মির আবিষ্কার ঘটে ক্যাথোড-রশ্মির পরীক্ষা ব্যাপারে; আর রশ্মিগুলি উৎপন্ন হয় ক্রুকস্ নলের স্থানবিশেষ হইতে। সুতরাং প্রথমে ক্রুকস্ নল ও ক্যাথোড্-রশ্মি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন।

ক্রুকস্ নলে কোন জটিলতা নাই। একটা ফাঁপা কাচের নল,—ভিতরটা প্রায় বায়ুশূন্য; এবং উহার দুই দিকে কিঞ্চিৎ দূরে-দূরে দুইটা স্ঁচ বসান। স্ঁচ দু'টার ছিন্নমুখ থাকে বাহিরে,—অপর প্রান্ত থাকে নলের ভিতরে। সকল নলের একপ্রকার চেহারা থাকে না; বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন আকৃতির নল ব্যবহৃত হইয়া থাকে;—কোনটা বেশ লম্বা, কোনটা মোটা, কোনটা বা খুব আঁকাবাঁকা আকৃতির হইয়া থাকে। স্ঁচ দু'টাও নানা আকারের থাকে। লোহার স্ঁচ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না,—প্লাটিনাম্ বা এলুমিনিয়মের স্ঁচই অধিকতর উপযোগী। কখনও-কখনও, স্ঁচের যে প্রান্তটা নলের মধ্যে থাকে, ঐ প্রান্তে এলুমিনিয়মের একটা ছোট বাটি বসান থাকে। কিন্তু মোটামুটি ব্যবস্থা সকল নলেই একপ্রকার। এইরূপ একটা ক্রুকস্-নল লইয়াই রঞ্জন সাহেব পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এই ক্রুকস্ নলের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত করিলেই, ক্যাথোড্-রশ্মি উৎপন্ন হইয়া থাকে। নলের স্ঁচ দু'টাকে তামার তার দ্বারা তড়িতোৎপাদক যন্ত্রের দুই প্রান্তে সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়। তাহাতেই নলের ভিতর প্রবাহ উৎপন্ন হয়। যে স্ঁচটা তড়িতোৎপাদক যন্ত্রের ধন-প্রান্তে সংযুক্ত করা যায় উহাকে বলা যায় ধন-স্ঁচ বা অ্যানোড্ (Anode); আর যে স্ঁচটা উহার ঋণ-প্রান্তে সংযুক্ত হয়, তাহাকে বলা যায় ঋণ-স্ঁচ বা ক্যাথোড্ (Cathode)। প্রবাহ জন্মে উভয় তড়িতেরই। ধনের প্রবাহ ঘটে অ্যানোড্ হইতে ক্যাথোডে; আর ঋণের প্রবাহ ঘটে তাহার উল্টা দিকে—ক্যাথোড্ হইতে অ্যানোডে।

ধনেরই হোক বা ঋণেরই হোক, প্রবাহটা ক্রমে যখন নলের ভিতরকার বায়ুর পরিমাণ খুব কমাইয়া ফেলা যায়। তখন ঐ সূঁচ দু'টার মাঝখানে বিদ্যুৎপ্রবাহ-পথে—একটা আলোক-রশ্মি দেখা যায়। বায়ুর পরিমাণ ক্রমে কমাইতে থাকিলে, এই রশ্মিটা স্তম্ভাকার ধারণ করে; এবং স্তরে স্তরে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তার পর দেখা যায়, আলোক-স্তম্ভটা ক্যাথোড্ সূঁচ হইতে ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছে, আর ক্যাথোডের সম্মুখে একটা অন্ধকারময় স্থান ক্রমেই বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। বায়ুর পরিমাণ খুবই কমাইলে, এই অন্ধকার রাজ্যটা শেষে সম্মুখস্থ কাচের আবরণটাকে স্পর্শ করে। তখন কাচ-নলের ঐ অংশটা বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। অন্ধকার হইতে আলোকের উৎপত্তি,—আশ্চর্য্য কথা বটে! আমরা জানি, আলোক-রশ্মি-সম্পাতেই যাবতীয় পদার্থ আলোকিত হইয়া থাকে। কিন্তু ক্রুক্স্ নলের এই অন্ধকারময় প্রদেশে এমন কোন্ রশ্মি রহিয়াছে, যাহার প্রভাবে সম্মুখস্থ কাচের নলটা এইরূপ জ্যোতিষ্ময় হইয়া উঠে? ক্রুক্স্ ইহার নাম দিলেন অন্ধকার-রশ্মি। অন্ধকার-রশ্মি-সম্পাতেই কাচের নলটা আলোকিত হয়। এই রশ্মিগুলি ক্যাথোড্ সূঁচের ঠিক সম্মুখেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য ক্রুক্সের এই অন্ধকার-রশ্মিগুলি ক্যাথোড্-রশ্মি নামেই বিশেষ ভাবে পরিচিত।

ক্যাথোড্-রশ্মির কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—(১) ইহারা আলোক-রশ্মির ন্যায় সোজা পথে চলে। নলের অন্ধকারময় দেশে একখানা এলুমিনিয়মের চাক্তি বা অন্য কোন ধাতুদ্রব্য রাখিলে, সম্মুখস্থ কাচের দেওয়ালে উহার একটা কাল ছায়া পড়ে। ইহাতে বুঝা যায়, ক্যাথোড্-রশ্মি, সাধারণ আলোকের ন্যায় সরল পথে চলে, এবং ধাতুগুলি এই রশ্মির পক্ষে অস্বচ্ছ। (২) চুণ, হীরক প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ এই রশ্মি-পথে থাকিলে, উহারা ক্রুক্স্ নলের কাচের আবরণের মত, অথবা তদপেক্ষা অধিকতর জ্যোতিষ্মান হয়। (৩) ক্রুক্স্-নলের উজ্জ্বল অংশটাকে বেশ উত্তপ্ত হইতেও দেখা যায়। রশ্মিপথে একটা ধাতুদ্রব্য রাখিলে, কখন-কখন উহা গলিয়া যায়। (৪) ক্রুক্স্-নলের নিকটে একখানা চুম্বক আনিলে, নলের আলোকিত অংশটা একপাশে সরিয়া যাইতে দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায়, চুম্বকের প্রভাবে ক্যাথোড্-রশ্মি বাঁকিয়া যায়;—তড়িৎ-প্রবাহযুক্ত একটা তামার তার যেরূপ বাঁকিয়া যায়, ঠিক সেইরূপই বাঁকিয়া যায়। (৫) নলের ভিতর একটা ছোট লাইন বসাইয়া, উহার উপর একখানা ছোট গাড়ী রাখিয়া দিলে, গাড়ীখানা রশ্মিপথে ছুটিয়া চলে—যেন রশ্মি-মুখে গুলি বর্ষণ হইতেছে।

এই সকল পরীক্ষা হইতে ক্রুক্স্প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিলেন, ক্যাথোড-রশ্মি এক প্রকার কণা-প্রবাহ-মাত্র। এই কণাগুলি জড়-কণা এবং ইহারা ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম,—পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম। এই অতি ক্ষুদ্র তড়িৎ-কণাগুলি বর্ত্তমান কালে ইলেক্ট্রন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ইলেক্ট্রনের সহিত প্রথম পরিচয় ক্রুক্স্ নলের মধ্যে; এবং ইহাদের উৎপত্তি তড়িৎ-শক্তি প্রভাবে। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, ইহারা সর্ব্বত্র বিরাজমান। বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্যর্ জে, জে, টম্সন্ অনুমান করেন, জড়দ্রব্য মাত্রেরই মূল উপাদান হইতেছে ইলেক্ট্রন্। ইহাদের বেগ অতি ভীষণ—প্রায় আলোকের বেগের সমান। ক্রুক্স্ নলের ক্যাথোড্-প্রান্ত হইতে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ইলেক্ট্রন্ ভীমবেগে ছুটিতে থাকে। ইলেক্ট্রনের এই ভীষণ স্রোতই ক্যাথোড-রশ্মি।

রঞ্জন-রশ্মির উৎপত্তি হইতেছে এই ক্যাথোড্-রশ্মি বা ইলেক্ট্রন-প্রবাহ হইতে। কাচ-নলের যেস্থানে ক্যাথোড্-রশ্মি পতিত হয়, উহাই রঞ্জন-রশ্মির উৎপত্তি স্থান্। ঐ স্থানটা যে বেশ উজ্জ্বল হয় ও গরম হয়, ক্রুক্স্প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ইহা দেখিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ স্থান হইতে যে একটা নূতন রকমের রশ্মি নির্গত হইতে থাকে, যাহা কাঠ, কাগজ, রক্ত, মাংস অক্লেশে ভেদ করিয়া যাইতে পারে, ইহা আবিষ্কার করিলেন রঞ্জন। ক্রমে দেখা গেল, যখনই ক্যাথোড-রশ্মি কোন কঠিন পদার্থে বাধা প্রাপ্ত হয়, তখনই ঐ স্থান হইতে রঞ্জন-রশ্মি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্যাথোড্-রশ্মির আবিষ্কার অনেক পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল; এবং সুরু হইতেই এই রশ্মিগুলি কাচের দেওয়ালে বাধা পাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু রঞ্জন-রশ্মির আবিষ্কার ঘটিল অনেক পরে।

বর্ত্তমান কালে রঞ্জন-রশ্মি উৎপাদন জন্য বিশিষ্ট ধরণের একটা কাচের গোলক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোলকের ভিতরটা প্রায় বায়ুশূন্য। ক্যাথোড সূঁচের আকৃতিটা থাকে একটা ছোট বাটির মত। ফলে ক্যাথোড-রশ্মিগুলি গোলকের মাঝখানে ঐ ছোট বাটিটার কেন্দ্রস্থলে আসিয়া মিলিত হয়। ঐ স্থানে প্লাটিনাম ধাতুর একখানা ছোট প্লেট থাকে। এই প্লেটের উপর ইলেক্ট্রনগুলি দলবদ্ধ হইয়া ধাক্কা দিতে থাকে, এবং এইখানেই রঞ্জন-রশ্মির উৎপত্তি হয়। রশ্মিগুলি প্লাটিনাম প্লেটের সামনের দিকে ছড়াইয়া পড়ে; এবং কাচের গোলকের যে অর্দ্ধাংশ উহার সম্মুখে থাকে, উহা হেম-কিরণে রঞ্জিত হইয়া উঠে। এই স্ফটিক চক্রটির নিষ্কলঙ্ক আকৃতিই অদৃশ্য রঞ্জন-রশ্মির অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে।

দেখা গেল, ক্যাথোড্-রশ্মি যদি কোন কঠিন পদার্থে বাধা প্রাপ্ত হয়, তবে রঞ্জন-রশ্মি উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু কেন হয়, কি প্রকারে হয়, তাহারও মীমাংসার দরকার। ক্যাথোড্-রশ্মি হইতে উৎপন্ন হইলেও রঞ্জন-রশ্মি ক্যাথোড্ রশ্মি নহে। কেন না, ক্যাথোড্-রশ্মির এত ভেদ করিবার ক্ষমতা নাই; এবং ক্যাথোড্-রশ্মির মত রঞ্জন-রশ্মির উপর চুম্বকের প্রভাব নাই; ইহা সাধারণ আলোক-রশ্মিও নহে, কেন না, ইহা অদৃশ্য। সাধারণ আলোক-রশ্মি এত তীক্ষ্ণ নহে, এবং সাধারণ আলোকের যেগুলি বিশেষ ধর্ম্ম—প্রতিফলন, তির্য্যকবর্ত্তন, সমতলীভবন—উহার কোনটাই রঞ্জন-রশ্মিতে পরিস্ফুট নহে। ইহা ক্যাথোড্-রশ্মিও নহে, আলোক-রশ্মিও নহে, ধারাবাহিক কণা-প্রবাহও নহে, ধারাবাহিক তরঙ্গ-প্রবাহও নহে; সুতরাং প্রশ্ন হয়, ইহা কোন্ জাতীয় রশ্মি?

এ পর্য্যন্ত যত প্রকার রশ্মি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সকলকেই হয় কণাবাদের, অথবা তরঙ্গ-বাদের অন্তর্গত করা চলে। রঞ্জন-

রশ্মিকেও ইহার একটা কোঠায় না ফেলিতে পারিলে, বৈজ্ঞানিকের তৃপ্তিলাভ ঘটে না।

অধ্যাপক ষ্টোক্স্ একটা মতবাদ প্রচার করিলেন। ষ্টোক্স্ বলিলেন, কণাবাদে চলিবে না, খাঁটি তরঙ্গবাদেও সুবিধা হইবে না—একটা বিশিষ্ট তরঙ্গবাদের প্রয়োজন। ইলেক্ট্রনের ধাক্কা হইতে যাহার উৎপত্তি—যাহাকে বলা যায় রঞ্জন-রশ্মি—উহা কণাজাতীয় নহে, তরঙ্গ-জাতীয়; কিন্তু উহা ঠিক্ আলোক-তরঙ্গ নহে—আলোক-তরঙ্গের তুলনায় ক্ষুদ্র। আরও পার্থক্য এই যে, আলোক-তরঙ্গের ন্যায় উহারা একটির পর একটি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলে না—উহারা খাপছাড়া তরঙ্গ। এই জন্যই আলোক-তরঙ্গের বিশেষ ধর্ম্মগুলি রঞ্জন-রশ্মিতে সেরূপ প্রকট নহে।

ষ্টোক্স্ সাহেব এই মত প্রচার করিলেন। স্যর্ জে, জে, টম্সন্ যুক্তি দ্বারা এই মত প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিরূপেই বা ইলেক্ট্রনের ধাক্কা হইতে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন হইতে পারে, কেনই-বা এই খাপছাড়া তরঙ্গগুলি এত শক্তির আধার হয়, এ সকল কথার বারান্তরে আলোচনা করা যাইতে পারে। এখানে ইহাই বক্তব্য যে, রঞ্জন-রশ্মির মূলপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তের জন্য আমাদিগকে এখনও অপেক্ষা করিতে হইবে। আর ততদিন পর্য্যন্ত যদি এই অদ্ভুত-চরিত্র রশ্মি উহার আবিষ্কারক প্রদত্ত ডাকনামে—X-ray নামে অভিহিত হইতে থাকে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ]

একসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

রথ পরিত্যাগ করিয়া মণিয়া পাগলিনীর ন্যায় ফরীদ খাঁর সন্ধান করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু রজনীর অন্ধকারে, জনশূন্য প্রান্তরে সে ফরীদের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না। তখন তাহার চক্ষু যেদিকে যাইতেছিল, সে সেই দিকেই চলিতেছিল। চলিতে-চলিতে, একপ্রহর পরে, দূরে একটা আলোক দেখিতে পাইয়া, মণিয়া সেই পথে চলিল। নিকটে গিয়া দেখিল, একটা জনশূন্য মন্দিরমধ্যে আলোক জ্বলিতেছে। মণিয়া মন্দিরের দুয়ারের পৃষ্ঠে পৃষ্ঠ রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। মণিয়া জাগরিতা হইয়া দেখিল, এক স্থূলকায় খর্ব্বাকৃতি বৃদ্ধ তাহার দিকে চাহিয়া দূরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া, সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া, মস্তকের বস্ত্র টানিয়া দিল। বৃদ্ধ কহিল, "তোমার কোন ভয় নাই মা,—আমি বুড়া মানুষ, পথ চলিতে-চলিতে তোমাকে একাকিনী দেখিয়া দাঁড়াইয়া আছি। এই নবীন বয়সে ভরা রূপের ডালি লইয়া একা কোথায় চলিয়াছ মা? তুমি গেরুয়া কাপড় পরিয়া আছ বটে, কিন্তু তুমি ত সন্ন্যাসিনী নহ; কারণ, তোমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ভোগের চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি অল্পদিন গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছ।"

মণিয়া কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইল না। তখন বৃদ্ধ কহিল, "মা, আমি বুড়া, তোমার পিতামহের বয়সী, আমার নিকটে লজ্জা করিও না। তোমার অঙ্গুলিতে যে হীরকের অঙ্গুরীয়ক রহিয়াছে, তাহার মূল্য হাজার টাকার কম নহে। তুমি ধনীর বধূ;—যদি স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া চলিয়া আসিয়া থাক, তাহা হইলে চল, আমি তোমাকে স্বামি-গৃহে দিয়া আসি। আমার সঙ্গে গেলে কোন দোষ তোমাকে স্পর্শ করিবে না।" এইবার মণিয়া উত্তর দিতে বাধ্য হইল। সে অবনত মস্তকে ধীরে-ধীরে কহিল, "আমার স্বামী নাই।" "তবে কি তুমি বিধবা?" "না, আমার বিবাহ হয় নাই।" "ভাল কথা। তবে চল, তোমাকে তোমার পিতৃগৃহে রাখিয়া আসি।"

মণিয়া বিষম বিপদে পড়িল। সে তখন ফরীদ খাঁর চিন্তায় বিব্রত। ধনীর পুত্র ফরীদ খাঁ আশৈশব সুখে লালিত,—একাকী তাহার জন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে। একদণ্ড তাহার সংবাদ না পাইলে, তাহার পিতামাতা আকুল হইয়া উঠে। না জানি, আজি দিনান্তে তাহাদিগের অবস্থা কি হইবে। সে কেমন করিয়া ফরীদ খাঁকে বুঝাইয়া, শান্ত করিয়া, পিতৃগৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে, ইহাই তখন মণিয়ার এক মাত্র ধ্যান হইয়াছিল। বৃদ্ধ বৈষ্ণবের কথা তখন তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

বুড়া তাহার মনের ভাব বুঝিল ; বুঝিয়া হাসিল। সে কহিল, "মা, বুড়ার কথাগুলি বড়ই তিক্ত লাগিতেছে, তাহা বুঝিতেছি। কিন্তু কি করিব মা, আমি তোমাকে এই জনশূন্য পথে একাকিনী রাখিয়া যাইতে পারিব না। গোপাল যতক্ষণ তোমাকে সুমতি না দেন, ততক্ষণ তোমার সঙ্গেই রহিলাম।" বৃদ্ধের শেষ কথা শুনিয়া সহসা মণিয়া বলিয়া উঠিল, "গোপাল কে ?" বিস্মিত হইয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি হিন্দুর মেয়ে,—অথচ, গোপালের নাম শুন নাই ? আমরা বাঙ্গালী, আমরা গোপাল বলিয়াই ডাকি। এ দেশেও তাঁহার গোপালজী নামের অভাব নাই। তুমি বোধ হয় পঞ্জাবী ? মা, যিনি গোপাল, তিনিই গোবিন্দ, তিনিই শ্রীচন্দ, তিনিই পাণ্ডুরঙ্গ, তিনিই পার্থ-সারথি।" মণিয়া লজ্জিতা হইল, কারণ, নামগুলা সমস্তই তাহার নিকট অপরিচিত। সে অধোবদনে কহিল, "বাবা, আমি হিন্দুর মেয়ে নহি, আমি মুসলমানী।" বৃদ্ধ বৈষ্ণব অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে গেরুয়া পরিয়াছ কেন মা ?" মণিয়া অধিকতর লজ্জিতা হইয়া কহিল, "আমি হিন্দু হইতে চাহি।" তাহার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিল। মণিয়া পুনরায় কহিল, "বাবা, আমি মুসলমানী, নর্ত্তকীর কন্যা নর্ত্তকী। বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করিব বলিয়াই সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছি।" বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল কথা মা, ধর্ম্মপথ ত মুসলমানেরও আছে, তবে নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে চাহ কেন ? আমাদের শাস্ত্রে বলে যে, নিজধর্ম্মে মৃত্যু পর্য্যন্ত বাঞ্ছনীয়। যিনি গোপাল, তিনিই পরমেশ্বর, তিনিই আল্লা। নামের ভেদ ও উপাসনার আকার-ভেদে কিছুই আসে যায় না। দেখ মা, আমি বুড়া হইয়াছি, সমস্ত দাঁতগুলা পড়িয়া গিয়াছে, চোখেও ভাল দেখিতে পাই না। তবে এই জগতে বহু দিন বাস করিতেছি ; অনেক ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছে। সুতরাং সকল জিনিস দেখিতে না পাইলেও, অনুভবে বুঝিতে পারি। মা, আমার নিকট আত্মগোপন করিতেছ কেন ? গুরুতর কারণ না থাকিলে, লোকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না।"

বুড়ার কথা শুনিয়া মণিয়ার মন গলিয়া গেল। সে কাঁদিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ তাহা দেখিয়া সস্নেহে কহিল, "কাঁদ মা, প্রাণ ভরিয়া মন ভরিয়া কাঁদ,—প্রাণের ব্যথা আর মনের মলা অশ্রুজল ভিন্ন যায় না।" তখন রৌদ্র উঠিয়াছে। বৃদ্ধ মণিয়ার নিকটে আসিয়া বসিল ; এবং তাহার শীর্ণ হস্ত মণিয়ার মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে বুলাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া মণিয়া যখন শান্ত হইল, তখন বৃদ্ধ একে-একে মণিয়ার মনের সকল কথাই টানিয়া বাহির করিয়া লইল। সমস্ত শুনিয়া বুড়া কহিল, "মা, তোমার সমস্যা বড়ই জটিল। আমি কি বলিব বল ? চক্রী ভিন্ন এ চক্রান্ত ভেদ করা অসম্ভব।"

মণিয়াকে শান্ত করিয়া, বুড়া, ঘটিতে দড়ি বাঁধিয়া কূপ হইতে জল উঠাইল ; এবং নিজে হাত মুখ ধুইয়া মণিয়াকে জল তুলিয়া দিল। তখন বুড়া মন্দিরের দুয়ারে বসিয়া কণ্ঠলগ্ন একটি রূপার কৌটা বাহির করিল ; এবং তাহা হইতে একটি স্ফটিকের গোপাল-মূর্ত্তি বাহির করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিল। পূজা শেষ হইলে, বুড়া আপন মনে বকিতে আরম্ভ করিল। মণিয়া একমনে তাহার কথা শুনিতে লাগিল। বুড়া গোপালকে শাসাইয়া কহিল, "বাপু হে, তোমার সহিত আর পারিয়া উঠা যায় না। শেষটা তোমাকে মারিতে হইবে দেখিতেছি। পৃথিবীর যত নষ্টের মূল তুমি। ইহাকে যন্ত্রণা দিয়া তোমার কি সুখ হইতেছে ? আদ্যন্ত কাল তুমি সোজা পথে চলিতে শিখিলে না। এখন ইহার একটা উপায় কর। যবনী বেশ্যাকন্যাকে কোনও সম্ভ্রান্ত হিন্দু বিবাহ করিবে না, এ কথা কি তুমি জান না ?" মণিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তন্ময় হইয়া বৃদ্ধের কথা শুনিতেছিল। তাহার কথা শেষ হইলে সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, গোপাল কি বলিলেন ?" বৃদ্ধ উত্তর না দিয়া, বিগ্রহটিকে রূপার কৌটায় তুলিল ; এবং তাহার কণ্ঠে ঝুলাইয়া কহিল, "মা, গোপাল বড় কিছু বলিল না ; এইমাত্র জানাইল যে, তুমি কাল হইতে উপবাসী আছ ; কিছু আহার কর।" মণিয়া কহিল, "এখানে কোথায় কি পাইব ? কোন একটা গ্রাম পাইলে কিছু কিনিয়া খাইব।" "গ্রাম এখনও অনেক দূরে। উপস্থিত গোপালের প্রসাদ পাও।" বৃদ্ধ বস্ত্রমধ্য হইতে দুই মুষ্টি চূর্ণ বাহির করিল ; এবং এক মুষ্টি অশ্বত্থ-পত্রে মণিয়াকে দিয়া, স্বয়ং আহার করিতে আরম্ভ করিল। আহারান্তে বৃদ্ধ কহিল, "মা, তোমার এখন পূর্ব্বদেশে যাইতে ইচ্ছা করিতেছে—না ?" মণিয়া কহিল, "হাঁ।" "মনের বেগ কি কোন মতে দমন করিতে পারিবে না ?" "উপস্থিত পারিতেছি না বাবা।" "পারিবে কেমন করিয়া মা ? আমরা বলি বটে আমি করি, তুমি কর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোপাল যাহা করান, তাহাই

করি। উপস্থিত তুমি পূর্ব্বদিকে গেলে, তোমার প্রিয়জনের অমঙ্গল সম্ভাবনা। কিন্তু যিনি তাহাকে তোমার প্রিয় করিয়াছেন, তিনিই যখন তাহার অমঙ্গল ঘটাইতে চাহেন, তখন নিবারণ করিবে কে? বেলা বাড়িয়া উঠিল,—চল গ্রামের সন্ধানে যাই।"

উভয়ে মন্দির পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের সন্ধানে চলিল। তখন ফরীদ খাঁ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রয়াগ যাত্রা করিয়াছে।

দ্বিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

রাত্রি শেষে হরিনারায়ণকে লইয়া যখন অসীম ও সুদর্শন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে,—আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। হরিনারায়ণ আসিয়া দেখিলেন যে, ত্রিবিক্রম বিশ্বনাথের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া এক প্রৌঢ়ের সহিত কথা কহিতেছেন। সতী আসিয়া দুর্গা ও সুদর্শনের পত্নীকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলে, সকলে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ত্রিবিক্রমের নিকটে বসিলেন। প্রৌঢ় বলিতেছিল, "আর কি তেমন পয়সার জোর আছে? বাপ-পিতামহের আমলে যাহা ছিল, তাহার দশ ভাগের এক ভাগও নাই। আর পয়সা থাকিলেই বা কি হইত ঠাকুর! গ্রামে আমাদের পর্য্যায়ের পাত্র নাই; সুতরাং আমার আর উপায় নাই। বাগ্‌দত্তা কন্যার বিবাহ হইল না—এ কথা শুনিলে কোন্ কুলীন-সন্তান আমার মেয়েকে বিবাহ করিতে আসিবে? তাহার উপর অলক্ষণা নাম শুনিলে সকলেই পিছাইয়া যাইবে।" প্রৌঢ় একমনে কথা কহিয়া যাইতেছিল। ত্রিবিক্রম উত্তর না দিয়া মন্দ-মন্দ হাসিতেছিলেন। বিশ্বনাথ তাহা দেখিয়া জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, হাসিতেছ কেন?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "অদৃষ্ট-চক্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া।"

প্রৌঢ়। ঠাকুর, শৈল যেদিন ডুবিয়া গিয়াছিল, সেদিনও আপনি অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তখন বুঝিতে পারি নাই যে, শৈল হইতে আমার এমন দুরবস্থা হইবে। এখন জাতি যায়, তাহার উপায় কি?

ত্রিবিক্রম। মিত্রজা, তোমার জাতি যাইবে না।

বিশ্বনাথ। উপস্থিত রাতি পোহাইলেই যে জাতি যাইবে?

ত্রিবি। যাইবে না।

অসীম। কি করিলে আপনার জাতি রক্ষা হয়?

বিশ্ব। অদ্য রাত্রিতে যদি অপর পাত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে জাতি রক্ষা হইতে পারে। কি বল সর্ব্বেশ্বর?

সর্ব্বেশ্বর। সমাজের কথা ত দাদা সমস্তই আপনার জানা আছে। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের সমাজ সমান।

অসীম। যদি আজ রাত্রিতে বিবাহ না হয়, তাহা হইলে কি আপনার কন্যার আর বিবাহ হইবে না?

ত্রিবি। তৃতীয় প্রহরে যে দ্বিতীয় লগ্নটা ছিল, তাহাও অতীত হইয়াছে। তবে বিধির বিধান—কাল গোধূলি লগ্নে বিবাহের যোগ আছে।

অসীম। মিত্র মহাশয়ের যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।

সর্ব্বে। আপনি, তুমি—?

ত্রিবি। ইনি কানুনগোই হরনারায়ণ রায়ের ভ্রাতা, ভূতপূর্ব্ব কানুনগোই জয়নারায়ণ রায়ের পুত্র অসীমচন্দ্র রায়।

সর্ব্বে। বাবা, তুমি আমার স্বঘর। তোমার পিতামহ শ্রীনারায়ণ রায় আমাদের বংশে কন্যাদান করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ উঠিয়া উভয় হস্তে অসীমের হস্ত আকর্ষণ করিয়া ধরিল; এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে-করিতে কহিল, "বাপু, তুমি ভিন্ন আমার উপায় নাই। তুমি আমার অগতির গতি।" এই সময়ে ত্রিবিক্রম পুনরায় হাসিয়া উঠিলেন। তাহা দেখিয়া বিশ্বনাথ ও হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিলে কেন?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "সে কথা পরে জানাইব।" হরিনারায়ণ তখন অসীমকে কহিলেন, "দেখ, মিত্র মহাশয়ের এখন বড় বিপদ। বিপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করাই মহতের কর্ম্ম। তুমি মহৎ বংশ-জাত, সুতরাং তোমার কথা উপযুক্ত। নারায়ণ বোধ হয় মিত্র মহাশয়কে উদ্ধার করিবার জন্যই আমাদের অদ্য রাত্রিতে এখানে আনিয়াছেন।" সুদর্শন এই সময়ে উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "তবে বিবাহ ঠিক!" সর্ব্বেশ্বর কহিলেন, "ঠাকুর, আমার আর অন্য গতি নাই।" "তবে কন্যা দেখিতে হয়।" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "কন্যা পূর্ব্বেই দেখিয়াছ।" হরিনারায়ণ কহিলেন, "যথারীতি আশীর্ব্বাদ ও আভ্যুদয়িক করিতে হইবে। ভূপেন্দ্রকে বা মুরশিদাবাদে সংবাদ দিবার উপায় নাই। অসীম, সমস্তই তোমাকে একা করিতে হইবে।" সর্ব্বেশ্বর সানন্দে কহি-

লেন, "তবে আমি সংবাদটা বাড়ীতে দিয়া আসি ?" হরিনারায়ণ কহিলেন, "যাও।" সর্ব্বেশ্বর প্রস্থান করিলে, ত্রিবিক্রম অসীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায়জী, কোন কথা স্মরণ হয় ?" অসীম বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কৈ, কিছুই নয়।" "না হইবারই কথা,—নিয়তির কি খণ্ডন হয় ?" "আপনি কি বলিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।" "বুঝিতে পারিবে,—ঠিক এখনটা পারিবে না,—ক্রমে সকল কথাই মনে হইবে।"

এই সময়ে কাক ডাকিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া হরিনারায়ণ ও বিশ্বনাথ গাত্রোত্থান করিলেন। বিদ্যালঙ্কার বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, "কি হে, শ্বশুর-বাড়ী আসিয়াছ বলিয়া কি নিত্য-কর্ম্ম ভুলিয়া গেলে ?" ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "নিত্য-কর্ম্মের পূর্ব্বে একটা নূতন কর্ম্ম আছে। তুমি গঙ্গা-তীরে যাও, আমি আসিতেছি।" ত্রিবিক্রম উঠিলে বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, পথ চিনিতে পারিবে ত ?" ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "বিবাহের পূর্ব্বে বহুবার গ্রামের পথে পথে ভিক্ষা করিয়া গিয়াছি।" হরিনারায়ণ ও বিশ্বনাথ বাহির হইয়া গেলে ত্রিবিক্রম অন্য পথে শ্বশুরালয় ত্যাগ করিলেন। তখন পুর্ব্বদিকে আলোক দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু অন্ধকার দূর হয় নাই। গ্রামের সীমায় ত্রিবিক্রম থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাতে পদশব্দ শ্রুত হইল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, এক রমণী তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। রমণী কাছে আসিলে, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আসিলে কেন ? ভয় নাই, আমি পলাইব না। যদি পলাইবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে স্বেচ্ছায় আসিয়া ধরা দিতাম না।" রমণী সতী। সে কহিল, "আমি আপনাকে ধরিয়া রাখিতে আসি নাই। আপনি যেখানে যাইতেছেন, আমাকেও সেখানে যাইতে হইবে।" বিস্মিত হইয়া ত্রিবিক্রম পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকেও যাইতে হইবে ? কেন যাইতে হইবে ?" "তাহা বলিতে পারি না।" "তোমাকে কে বলিল ?" "যে বলে।" "সে কে সতী ?" "তাহা ত বলিতে পারি না—সে কোথা হইতে কোন্ দিক্ দিয়া বলিয়া যায়, তাহাও আমি বলিতে পারি না।"

পতি-পত্নী ক্রমে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জাহ্নবী-তীরে একটা প্রাচীন তিন্তিড়ী বৃক্ষ রাত্রির ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার কাণ্ডের উপরে এক বিকটাকার কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্য বসিয়া ছিল। সে দূর হইতে ত্রিবিক্রমকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া সতী শিহরিয়া উঠিল, এবং স্বামীর পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক আসিয়া প্রথমে ত্রিবিক্রমকে, এবং পরে সতীকে প্রণাম করিল। সতী সঙ্কুচিতা হইয়া স্বামীর অঙ্গে মিশিয়া যাইবার উপক্রম করিল। ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কালীপ্রসাদ, সংবাদ কি ?" আগন্তুক কহিল, "পিতা, আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্তই মঙ্গল। মাতার জন্য ফুল আনিয়াছি।" "ফুল কেন ?" "মহামায়ার আদেশ।" "কেমন করিয়া জানিলে ?" "স্বপ্নে।" "কি ফুল আনিয়াছ, দেখি ?"

কালীপ্রসাদ উত্তরীয়ের কোণ হইতে একটি ফুল বাহির করিয়া ত্রিবিক্রমকে দেখাইল, কিন্তু তাঁহার হস্তে দিল না। ফুল দেখিয়া ত্রিবিক্রম শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কালীপ্রসাদ, ইহার অর্থ বুঝিয়াছ ?" শিষ্য কহিল, "বুঝিয়াছি, প্রভু।" "আবার ভোগ।" "কিন্তু চিরদিন নহে।" "আবশ্যক হইলে সংবাদ দিও।" "মহামায়ার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।" কালীপ্রসাদ তখন সতীকে কহিল, "মা, মহামায়ার প্রসাদের ফুল আনিয়াছি।" সতী হাত পাতিল। কালীপ্রসাদ ফুল দিয়া, উভয়কে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। তখন ত্রিবিক্রম সতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সতী, কালীপ্রসাদকে পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছ কি ?" সতী কহিল, "না।" "তবে তোমার সহিত কে কথা কহিত ?" "তাহা ত বলিতে পারি না।" "কোথা হইতে শব্দ আসিত ?" "তাহাও বলিতে পারি না।" ত্রিবিক্রম অধোবদনে চিন্তা করিতে-করিতে গ্রামে ফিরিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

প্রভাতে সর্ব্বেশ্বর মিত্রের গৃহের সম্মুখে পুনরায় নবহৎ বাজিয়া উঠিল। লোকজন আসিয়া নহবৎখানার বাঁশগুলা উঠাইয়া ফেলিল। ঝড়ে যে গাছ পড়িয়াছিল, তাহা কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে মিত্রগৃহের শ্রী ফিরিয়া গেল। তখন বিশ্বনাথের গৃহে হরিনারায়ণ স্বয়ং পুরোহিত সাজিয়া আভ্যুদয়িকের আয়োজন করিতেছেন। সুদর্শন তাহার সহকারী; সুতরাং দায়ে পড়িয়া ত্রিবিক্রম বরকর্ত্তা হইয়াছেন।

পল্লীগ্রাম,—দুইশত বৎসর পূর্ব্বের কথা সুতরাং অজস্র

অর্থ ব্যয় করিয়াও বরকর্ত্তা বরের মর্য্যাদা অনুযায়ী বসন-ভূষণ পাইলেন না। তাহা দেখিয়া হরিনারায়ণ অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। বাল্যবন্ধুকে ক্ষুব্ধ দেখিয়া ত্রিবিক্রম চিন্তিত হইলেন। এই সময়ে সতী বিষণ্নবদনে তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুখ ভার কেন সতী?" সতী উত্তর না দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সকলের সম্মুখে কন্যাকে কাঁদিতে দেখিয়া, বিশ্বনাথ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে মা, কাঁদ কেন মা?" সকলে মিলিয়া সতীকে শান্ত করিলেন। সে কহিল, "গ্রামের লোক বলিয়াছে,—উনি আমার স্বামী নহেন,—মিথ্যাবাদী জুয়াচোর। তাহারা বাবাকে সমাজে ঠেলিয়া রাখিবে।" বিশ্বনাথ কন্যার কথা শুনিয়া কহিলেন, "কথাটা আমারও মনে হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিবাহের সাক্ষী-সাবুদ সমস্তই উপস্থিত আছে। যে সময়ে সতীর বিবাহ হয়, সেই সময়ে যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় দায় উদ্ধারের চেষ্টায় ছিল। পারে নাই বলিয়া, সেই অবধি আমার উপর রাগিয়া আছে। তাহার জন্য চিন্তা করিও না মা,—জামাই যখন ঘরে লইয়াছি, তখন ত ঠেলিতে পারিব না! তুমি নিশ্চিন্ত মনে বেড়াও।"

পিতার নিকট আশ্বাস পাইয়া সতী প্রফুল্ল হইল। তখন ত্রিবিক্রম তাহাকে কহিলেন, "পিছনের শিবমন্দিরে একটা তাম্রকুণ্ডে গঙ্গাজল লইয়া যাও, আমি আসিতেছি।" হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, কোথা যাও?" "বরাভরণ আনিতে।" "শিবমন্দিরে কি বরাভরণ মিলিবে? এ কি শিবের বিবাহ, যে, শুষ্ক বিল্বপত্র দিয়া বর সাজাইব?" "হিসাবনিকাশ পরে দিব ভাই,—তুমি শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়, আমি দুই দণ্ডের মধ্যেই ফিরিব।"

ত্রিবিক্রম মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সতী পূজার আয়োজন করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি তাহা দেখিয়া কহিলেন, "সতী, পূজার সময় এখনও হয় নাই। তুমি কি শুচি হইয়া আসিয়াছ?" সতী মস্তক চালনা করিয়া সম্মতি জানাইল। ত্রিবিক্রম কহিলেন, "তুমি এই আসনে বসিয়া তাম্রকুণ্ডের জলের দিকে চাহিয়া থাক।" সতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বসিবেন না?" "আমি এই কুশাসনে বসিতেছি।" মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া, পতি-পত্নী আসন গ্রহণ করিলেন। সহসা ত্রিবিক্রম তাম্রকুণ্ডের জলে ফুৎকার দিলেন। দিবামাত্র জলে আগুন লাগিয়া গেল। সতী শিহরিয়া উঠিল। তখন ত্রিবিক্রম সতীর ললাট স্পর্শ করিলেন। অর্দ্ধদণ্ড কাটিয়া গেল,—ক্রমে ধূমে মন্দির পরিপূর্ণ হইল।

ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন, "সতী, কি দেখিতেছ?" সতী কহিল, "তাম্রকুণ্ডে আগুন জ্বলিতেছে। তাহার মধ্যে একটা ছবি। না, বন, নিবিড় বন। বনের মধ্যে একটা সরু পথ। সেই পথ দিয়া একটা লোক চলিতেছে। লোকটা ভয়ানক কাল, বিশ্রী, কদাকার। পরণে রক্ত-বস্ত্র। লোকটা ফিরিল। সে কালীপ্রসাদ। সে উপরের দিকে চাহিয়া আছে।"

ত্রিবিক্রম কহিলেন, "সতী, তুমি কালীপ্রসাদের নিকটে যাও।" উত্তর হইল, "আমার যে ভয় করে!" "তুমি জান, তুমি কে?" "জানি, আমি তোমার স্ত্রী, আমি সতী।" "আর কি?" "আমি শক্তি।" "তবে তোমার ভয় কি?" "কিছু না।" "তুমি কালীপ্রসাদের নিকটে যাও।" "গিয়াছি। কি বলিব?" "বল যে, আমার কতকগুলা অলঙ্কারের প্রয়োজন। মাতার ভাণ্ডারে আমার যে অলঙ্কার আছে, তাহাই আনিতে বল।" "কালীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, অলঙ্কার লইয়া কোথায় যাইবে?" "তাহাকে বল, অলঙ্কার সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই গ্রামে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর গৃহে, পৌঁছাইয়া দিবে।" "বলিয়াছি। এখন কি করিব?" "ফিরিয়া এস। সতী, কি দেখিতেছ?" "কালীপ্রসাদ বনপথ ধরিয়া চলিয়াছে। বনের মধ্যে একটা ভাঙ্গা মন্দির। তাহার সম্মুখে একটা মরা পড়িয়া আছে,—দুইটা শেয়াল বসিয়া আছে। কালীপ্রসাদ মন্দিরে প্রবেশ করিল। একটা জবাফুল মরার উপরে ফেলিয়া দিল। কালীপ্রসাদ মরার উপরে বসিল। শেয়াল দুইটা বসিয়া আছে।"

"সতী, মন্দিরের ভিতর দেখ।" "দেখিতেছি।" "কি দেখিতেছ?" "পাষাণময়ী প্রতিমা।" "কি প্রতিমা?" "বুঝিতে পারিতেছি না,—বড় অন্ধকার।" "সতী, অন্ধকার দূর কর।" "কেমন করিয়া করিব,—আমি ত জানি না!" "ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ।" "দেখিতেছি।" "কি দেখিতেছ?" "মন্দিরে নীল আলো জ্বলিতেছে,—ভিতরে সিংহবাহিনী পার্ব্বতী।" "প্রতিমার মুখ দেখ।" "দেখিতেছি,—মা হাসিতেছেন।" ত্রিবিক্রমের মুখ বিষণ্ণ হইল।

তিনি পুনরায় তাম্রকুণ্ডের জলে ফুৎকার দিলেন। আগুন নিবিয়া গেল,—মুহূর্ত্তের মধ্যে ধূম লুকাইয়া গেল। সতী চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি করিতেছি?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "কিছু না,—চল, গৃহে ফিরিয়া যাই।"

সতী মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া দেখিল, এক দন্তহীন, পলিত-কেশ বৃদ্ধ বৈষ্ণব একটা অপূর্ব্ব রূপবতী তরুণী বৈষ্ণবীর হাত ধরিয়া দাড়াইয়া আছে। তাহাদিগকে দেখিয়া ত্রিবিক্রম হাসিলেন। সতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি হাসিলেন কেন?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "নিয়তি। সমস্ত কথা এখন বুঝিতে পারিবে না, পরে বুঝাইয়া বলিব।" এই সময়ে বৃদ্ধ বৈষ্ণবীকে কহিল, "মা, বুড়া শরীর। কাল ইহার উপর দিয়া অনেক ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে। দুইটা দিন না জিরাইলে, আর চলিতে পারিব না।" বুড়া মন্দিরের সম্মুখে বসিল। বৈষ্ণবী সহসা পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিল, ত্রিবিক্রম ও সতী দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া বুড়াও ফিরিয়া চাহিল। সে ত্রিবিক্রমকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, বড়ই বুড়া হইয়াছি, উঠিয়া প্রণাম করিতে পারিব না। অপরাধ লইবেন না। কাল রাত্রিতে বড় কষ্ট গিয়াছে। দুইটা দিন না জিরাইলে, পথ চলিতে পারিব না। গ্রামে কি বৈষ্ণবের বাস আছে?" তখন রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। আশ্রয়হীন বৃদ্ধকে দেখিয়া সতীর মনে দয়া হইল। সে কহিল, "বৈষ্ণবের বাস নাই বাবা! তুমি আমার সঙ্গে এস,—আমাদের বাড়ীতে থাকিবে।" বৃদ্ধ কহিল, "তুমি কে মা অন্নপূর্ণা আমার,—বুড়া সন্তানের কষ্ট দেখিয়া গলিয়া গিয়াছ?" বৃদ্ধ যষ্টিতে ভর দিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দাড়াইল। ত্রিবিক্রম তখন মন্দ মন্দ হাসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বৃদ্ধ শিহরিয়া উঠিল, এবং দক্ষিণ হস্তে চক্ষু মুছিয়া কহিল, "একি, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি! ঠাকুর, বুড়া হইয়াছি, চোখে দেখিতে পাই না,—ছলনা করিও না, তুমি কি সেই?" ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "হরিদাস, আমি সেই, আমি সেই বটে! তোমার চক্ষু তোমাকে প্রতারণা করে নাই।" সহসা বৃদ্ধ মন্দিরের উপরে উঠিয়া ত্রিবিক্রমের পদতলে লুটাইয়া পড়িল; এবং কহিল, "ঠাকুর, বৃদ্ধ বয়সে বড় বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি,—উদ্ধার কর ঠাকুর।" ত্রিবিক্রম বৃদ্ধের হাত ধরিয়া উঠাইয়া কহিলেন, "হরিদাস, সমস্যা যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই পূরণ করেন—তুমি আমি তাঁহার হাতে খেলার পুতুল মাত্র।" হরিদাস কহিল, "ঠাকুর, বুড়া বয়সে বিদেশে পথে গোপাল এই যুবতী কন্যা গলায় ঝুলাইয়া দিয়াছে,—ইহাকে লইয়া কি করিব ঠাকুর? আমি ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকল ভুলিয়াছি,—সত্তর বৎসর বয়সে আবার ঘোর সংসারী হইয়াছি,—এ কি ধাঁধাঁয় ফেলিলে ঠাকুর?" "গোপালের কন্যা গোপাল দেখিতেছেন,—তুমি কেবল নিমিত্তের ভাগী। বুড়া হইয়া কি এতদিনের শিক্ষা-দীক্ষা সব ভুলিয়া গেলে হরিদাস?" "ভুলিয়া গেলাম বৈ কি ঠাকুর! এখন গোপালের চিন্তা, পরলোকের চিন্তা ভুলিয়া, উহাকে কি খাওয়াইব,—উহাকে কোথায় শোয়াইব,—উহাকে কেমন করিয়া রক্ষা করিব,—এই চিন্তাই পরম চিন্তা।" "বৈষ্ণবী মায়া, হরিদাস! এতদিন বিষ্ণুসেবা করিয়াও কি তাহা বুঝিলে না? গোপাল সেবক দিয়া ভক্ত উদ্ধার করিতেছেন। কন্যা ভক্তিমতী,—তোমার উপযুক্তা কন্যা হইবে। চিন্তা করিও না হরিদাস, গোপাল ছলনা করিতেছেন।" "ঠাকুর, তোমার মত মনের জোর আমার ত নাই,—আমি যে দীনহীন বৈষ্ণব?" "তোমার শক্তি নাই! হরিদাস, সোণারগাঁয়ের মহামারীর বৎসর,—মনে হয়?"

বৃদ্ধ লজ্জায় অধোবদন হইল। তখন সতী ত্রিবিক্রমকে কহিল, "আর রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাজ নাই,—ছেলেকে লইয়া ঘরে যাই।" হরিদাস জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কি—" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "ইনি আমার স্ত্রী।" হরিদাস অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "স্ত্রী! এ আবার কি ছলনা ঠাকুর! আপনার স্ত্রী!" "চক্রীর চক্রান্ত কে ভেদ করিতে পারে হরিদাস?" "ঠাকুর, আবার সংসার?" "মহামায়ার আদেশ,—নিয়তি কাহার বাধ্য?"

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাড়াইয়া থাকিয়া সতীর অনুসরণ করিল। ত্রিবিক্রম মন্দির ত্যাগ করিয়া সর্ব্বেশ্বর মিত্রের গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমণ্ডপে হরিনারায়ণ মন্ত্রপাঠ করাইতেছেন, অসীম আবৃত্তি করিতেছে। সহসা হরিনারায়ণের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল,—সুদর্শন ও দুর্গা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বৃদ্ধ বিশ্বনাথ আকস্মিক বিপত্তির কারণ বুঝিতে না পারিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। অসীমের হস্তে পিণ্ড অর্দ্ধ-পথে রহিয়া গেল, হরিনারায়ণের হস্ত হইতে তালপত্রের পুঁথি ভূমিতে পড়িয়া গেল, সুদর্শনের মুখে অস্ফুট আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইল। সেই সময়ে বৃদ্ধ বৈষ্ণবের হস্ত ধারণ করিয়া সতী পিতৃগৃহে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের পশ্চাতে বৈষ্ণবের তরুণী কন্যাও অঙ্গনে প্রবেশ করিল। সেই সময়ে মনের অজ্ঞাতসারে অসীম ডাকিলেন, "মণিয়া!" (ক্রমশঃ)

মহীশূরে-ভ্রমণ

[শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বি-সি-ই]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অদ্য (৪-৯-১৫), কাবেরী নদীর উপর যে বাঁধ প্রস্তুত করা হইতেছিল, তাহা দেখিতে যাইবার জন্য শীঘ্র-শীঘ্র প্রাতরাশ সমাধা করা গেল। মহীশূর হইতে প্রায় ১১ মাইল দূরে কান্নাম্বাড়ি গ্রামের নিকট কাবেরী প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া বাঁধটি নির্ম্মিত হইতেছে। গ্রামটি নদীর বাম পার্শ্বে অবস্থিত। ইহার নামানুসারে বাঁধটির নামকরণ হইয়াছে। টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় লর্ড কর্ণওয়ালিসকে কান্নামবাড়িতে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির জন্য ও খাদ্য নিঃশেষিত হওয়ায়, তাঁহার কষ্টের অবধি ছিল না; এবং বাধ্য হইয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। বৃহৎ কামানগুলি ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া, লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বাঙ্গালোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। এই কান্নামবাড়ি গ্রামের সম্মুখেই কাবেরী নদীর উপর বাঁধ নির্ম্মিত হইতেছিল। এদেশে আসিয়া এই বিরাট পূর্ত্ত-কার্য্য না দেখিয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। বিশেষতঃ, আমি স্বয়ং এঞ্জিনিয়ার হইয়া যে এরূপ প্রসিদ্ধ কার্য্য না দেখিয়া ফিরিব, ইহা হইতেই পারে না।

পূর্ব্বরাত্রে "ঝটকা" বা অশ্বযান বন্দোবস্ত করা ছিল। কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয়কে তাঁহার বাটী হইতে লইয়া যাত্রা করা গেল। চামুণ্ডা পর্ব্বতকে পিছনে রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম; কুহেলিকাবৃত পর্ব্বত দূর হইতে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। আমি মুগ্ধ নেত্রে দেখিতেছিলাম। পথে রাজকুমারীর প্রাসাদ অতিক্রম করিতে হইল। ক্রমে ক্রমে আমরা বেলগোলা গ্রামের নিকট অবস্থিত মহীশূরের জল সরবরাহের কারখানা বা water worksএর নিকট পৌঁছিলাম। ইহা আয়তনে ক্ষুদ্র; কিন্তু ইহার মধ্যে কর্ম্মচারী-দিগের অনেকগুলি বাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

পথ কোথাও-কোথাও অতিশয় উচ্চে উঠিয়াছে, আবার কোথাও বা বহু নিম্নে গিয়াছে। আমাদের দেশের ন্যায় এখানেও বৃষ্টির সাহায্যে রাস্তা মেরামত করা হয়; এবং আমাদের দেশে যেমন রাস্তা মেরামতের পূর্ব্বে সারিবন্দি করিয়া পাথর সংগ্রহ করা হয়,—এবং তাহার মাপ হইয়া গেলে যেমন মেরামত কার্য্য আরম্ভ করা হয়, এখানেও সেই রীতি দেখিলাম। ইহাতে কোন গোলমাল হইবার সম্ভাবনা থাকে না; এবং আমাদের দেশে যেমন পাথরকে উত্তম রূপে না পিটিয়া বা দৃঢ়ীকৃত না করিয়া, তাহার উপর "রাবিস্" বা মৃত্তিকা চাপা দিয়া, ঠিকাদার মহাশয় তাঁহার কার্য্য শেষ করেন, এখানেও ঠিক সেই রীতি। আমি মনে-মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, ফাঁকি দিবার পদ্ধতি কি সর্ব্বদেশেই এক প্রকার? কৃষ্ণস্বামী মহোদয় মহীশূর লোক্যাল ওয়ার্কস্ অডিটার। তিনি ঠিকাদার জাতি ও এঞ্জিনিয়ারদিগের উদ্দেশে অনেক অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। কোন্ সময়ে কোন এঞ্জিনিয়ারের কি গলদ্ বাহির করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, তাহার গল্প করিতে লাগিলেন। আমার এ সব ভাল লাগিতেছিল না, কেন না, বর্ণনার মধ্যে অনেক অবান্তর ও অপ্রিয় কথার উল্লেখ ছিল; সেগুলি না বলিলেই চলিত। আমি আমার সামান্য অভিজ্ঞতার ফলে দেখিয়াছি যে, অডিটার মহাশয়েরা অনেকেই কার্য্যারম্ভের প্রথম হইতেই আপনাদের কর্ত্তব্যের সীমা হারাইয়া ফেলেন। প্রথম হইতেই দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়া চুরি ধরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন। চুরি ধরিয়া অসৎ নীতির সমূলে বিনাশ সাধন করা প্রশংসার্হ নিশ্চয়ই; কিন্তু তাহা বলিয়া নিজের মনকে নীচ বা কলুষিত করিবার প্রয়োজন কি? কৃষ্ণস্বামী মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আমাকে বলিতে পারেন যে, এঞ্জিনিয়ারেরা রাস্তা মেরামতের কার্য্য কোন্-কোন্ বিষয়ে ফাঁকি দিয়া থাকেন?" আমি ঘৃণার সহিত, "না, জানি না" বলিয়া, মুখ অন্য দিকে ফিরাইলাম। তিনি বুঝিলেন, আমি বিরক্ত হইয়াছি; তখন অন্য কথার অবতারণা করিলেন। এবার কান্নামবাড়ি বাঁধ বা damএর আলোচনা হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন যে, এই নির্ম্মাণ-ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বর্ত্তমান দেওয়ান বা প্রধান অমাত্য মহাশয়কে কতই না পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রধান অমাত্য মহাশয় বর্ত্তমান পদে উন্নীত হইবার পূর্ব্বে রাজ্যের

প্রধান এঞ্জিনিয়ার ছিলেন; সেই সময়েই তিনি এই কার্য্যারম্ভের প্রস্তাব করেন, এবং ইহাতে রাজ্যের যে কত আয় হইবে, এবং আরও কত সুবিধা হইবে তাহা বুঝাইয়া দেন। কিন্তু আয়-ব্যয়-সচিব তাহাতে বাধা প্রদান করাতে, প্রধান এঞ্জিনিয়ার সার এম্, বিশ্বেশ্বরাইয়া মহোদয় কার্য্য ত্যাগ করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে কার্য্যে ইস্তফা দিতে হয় নাই। কেন না, তিনি অচিরেই প্রধান অমাত্য পদে বৃত হইলেন। এইবার খনিতে যাহা প্রেরিত হয়, তাহা শিবসমুদ্রম্ নামক স্থানে উৎপন্ন করা হয়। এ স্থান কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। দুই তিন মাইল দূরে কাবেরীর জল কৃত্রিম খালের মধ্যে প্রেরণ করাইয়া, শিবসমুদ্রমের নিকটে আনয়ন করা হয়; এবং এই জল কতিপয় লোহের নলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, তদ্দ্বারা বল দিয়ে কাবেরী-তীরে অবস্থিত টারবাইন্ (Turbine) যন্ত্র চালিত করা হয়। ইহার দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়। ইহা এক বিরাট ব্যাপার।
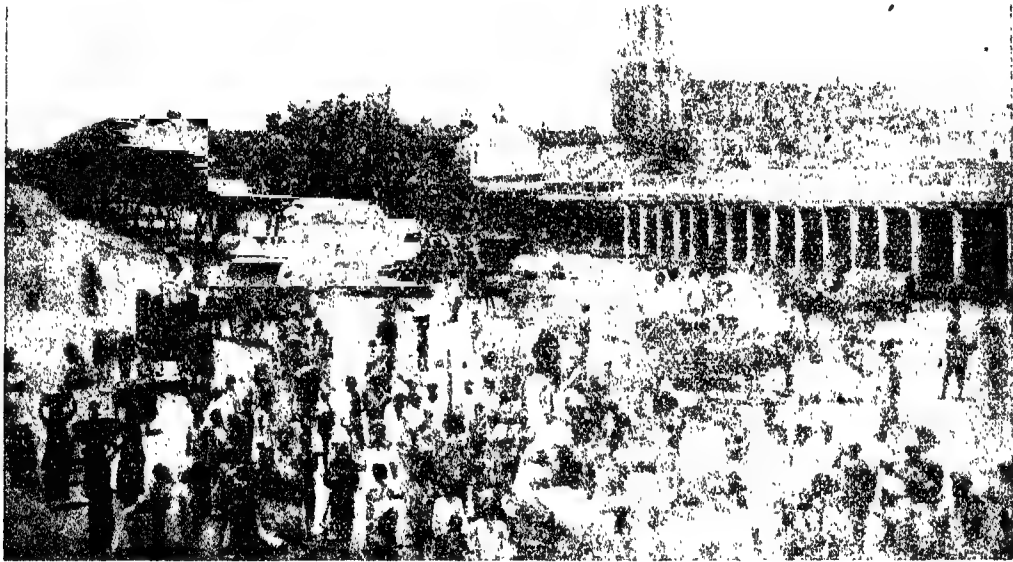
বাঙ্গালোরের নূতন বাজার

তাঁহার সুবিধা হইল; এবং দরবারের বা Council এর অনুমোদিত করাইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এখন বাঁধ নির্ম্মাণ ব্যাপারটি কি, এবং তাহাতে রাজ্যের কি উপকার হইয়াছে, দেখা যাউক। কোলার স্বর্ণখনিতে খনন ও অন্যান্য ব্যাপারের জন্য যে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন, তাহা চুক্তিমত মহীশূর-রাজকে সরবরাহ করিতে হয়। ইনি অবশ্য ইহার জন্য রাজস্ব পাইয়া থাকেন। বাঙ্গালোর, মহীশূর প্রভৃতি স্থানের রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের জন্য, অর্থাৎ নগর আলোকিত ও অন্যান্য কার্য্য করিবার জন্য যে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হয়, ও কোলার স্বর্ণ-পরে ইহার সবিস্তার উল্লেখ করিব। কাবেরী নদীতে জল-প্রবাহ অল্প হইলে, তাহা পূর্ব্বোক্ত কৃত্রিম খালের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আনয়ন করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে, গ্রীষ্মকালে কাবেরী নদীর জল-প্রবাহ যথেষ্ট কমিয়া যায়। এই কারণে শিবসমুদ্রমে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইত না। ইহাতে কোলার স্বর্ণ-খনিতে কার্য্যের বিশেষ অসুবিধা হইত। এই অসুবিধা নিবারণের জন্য প্রস্তাব করা হইল যে, যদি কাবেরী নদীর উপর উচ্চ বাঁধ নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে বর্ষাকালে নদীতে যথেষ্ট পরিমাণে জল সঞ্চিত রাখিয়া, অন্য সময়ে প্রয়োজন মত জল

ড্রামের উপর জড়ান লৌহের পর্দ্দা দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই ড্রামটি ঘুরাইবার জন্য বাঁধের উপর ক্রেন্ (crane) স্থাপিত করা হইয়াছে। ফোকরগুলির মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য উপর হইতে লৌহ-নির্ম্মিত সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে। বাঁধের যে দিক্ হইতে জল প্রবাহিত হয়, সেই দিকে বাঁধের সন্নিকটে পলি পড়িয়া সঞ্চিত জলের পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে; এমন কি ফোকরগুলি কতক পরিমাণে বন্ধ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বাঁধে নদীগর্ভের উপর আটটী ফোকরের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এগুলিকে scouring sluice বলে। এ গুলি মাঝে-মাঝে খুলিয়া দেওয়া হয়।

আমরা যখন কাবেরী নদী-তীরে পৌছলাম, তখন দেখিলাম, দূর হইতে প্রস্তর-খণ্ড বহিবার জন্য ট্রলি-লাইন পাতা রহিয়াছে। নিকটের এক পর্ব্বত হইতে ডাইনামাইট দ্বারা ভাঙ্গিয়া প্রস্তর সংগ্রহ করা হইতেছে। নদীর দুই ধার হইতে কার্য্য চলিতেছে। এখানে প্রায় দশ সহস্র কুলি-মজুর কার্য্য করিতেছে। কি বিরাট ব্যাপার! কিন্তু সমস্ত ঠিক যেন ঘড়ির কলের ন্যায় চলিতেছে। বিশেষ কোন গোলমাল নাই। আর একটি আনন্দের বিষয় যে, এই কার্য্য দেখিবার জন্য একজনও য়ুরোপীয় নিযুক্ত করা হয় নাই বা কোন ঠিকাদারও নিযুক্ত করা হয় নাই। সমস্তই নিজেদের তত্ত্বাবধানে কুলি-মজুরদের দ্বারা করাইয়া লওয়া হইতেছে। ধন্য সার বিশ্বেশ্বরাইয়া! ধন্য তোমার উৎসাহ ও ক্ষমতা! যে সকল য়ুরোপীয় মনে করেন যে, ভারতবাসীরা কোন কার্য্যে নেতৃত্ব করিতে পারে না, তাঁহারা এই বিরাট কার্য্য দেখিয়া আসুন। ইহা দেখিলে তাঁহারা বুঝিবেন যে, সুযোগ পাইলে ভারতবাসী তাঁহাদের অপেক্ষা অল্প কৃতিত্ব লাভ করিবেন না। ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, পাবলিক্ ওয়ার্কস্ প্রভৃতিতে যে সমস্ত য়ুরোপীয় এঞ্জিনিয়ার লওয়া হয়, তাঁহাদের অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় এঞ্জিনিয়ারেরা বিদ্যা-বুদ্ধিতে যথেষ্ট উন্নত। ইহা আমি নিজের অভিজ্ঞতায়

দুর্গমধ্যের রাজপ্রাসাদ—মহীশূর

দেখিয়াছি। আর ইহাও দেখিয়াছি যে, তাঁহারা যে বিদ্যা-বুদ্ধি লইয়া আমাদের উপর নেতৃত্ব করেন, তাহা যদি এ দেশীয়ের ভাগ্যে ঘটিত, তাহা হইলে পোষাকের ভাগ্য অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন হইত, অর্থাৎ তাঁহারা মাসিক ৫০ টাকার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিতেন না। য়ুরোপ হইতে যাঁহারা আইসেন, তাঁহারা অনেক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা ও অবকাশ পান। আমরা তাহা পাই না। এই হিসাবে তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কিন্তু এদেশে সেরূপ কার্য্যের পুনরাবৃত্তি করিতে হইলে তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধিতে কুলায় না, তখন য়ুরোপ হইতে পরিচিত এঞ্জিনিয়ারিং অফিস বা ফার্ম্ (Firm) হইতে সেই সব কার্য্যের নক্সা, এষ্টিমেট প্রভৃতি আনাইয়া লয়েন। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট যদি, আমাদের যে বিদ্যা দিতেছেন, তাহার সহিত কার্য্যগুলি দেখিবার সুবিধা দেন, তাহা হইলে আমরা আদর্শ শিক্ষা লাভ করিতে পারি। তখন আর ব্যাবহারিক জ্ঞান বা Practical knowledge রূপ সর্ব্বাবস্থায় প্রযোজ্য মূর্খত্বের ওজর বা আপত্তি আর চলিবে না।

যে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ এঞ্জিনিয়ারের উপর এই কার্য্যের ভার ন্যস্ত, তাঁহার অফিসে যাইয়া প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত পরিচয় করিলাম। তঁহার উপাধি Manager of the Superintending Engineer's Office। কার্য্যস্থানে যাইবার পূর্ব্বে ইঁহার অনুমতি লইয়া এই বিরাট কার্য্যের নক্সাগুলি দেখিয়া বুঝিয়া লইলাম; এবং ব্যয় সংক্রান্ত অনেক তথ্য সংগ্রহ করিলাম। শুনিলাম যে দশ সহস্র কুলি এখানে কার্য্য করিতেছে; এবং নানাবিধ কার্য্য লইয়া কার্য্যস্থলে মোট ১৪।১৫ সহস্র লোক রহিয়াছে। তিনি বলিলেন যে গত বৎসর (১৯১৪-১৫) প্রতি সপ্তাহে কুলিদিগের পারিশ্রমিক হিসাবে নগদ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ সহস্র) টাকা খরচ করা হইত। কোন-কোন সপ্তাহে নগদ ৬০,০০০ টাকাও খরচ হইয়াছে। এ বৎসর সপ্তাহে চল্লিশ সহস্র টাকা ব্যয় হইতেছে; এবং ১৯১৪-১৫ অব্দের সর্ব্বসমেত ব্যয় ৩২ লক্ষ টাকা। তিনি আরও বলিলেন যে, গত তিন বৎসরে ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, য়ুরোপীয় মহা-সমরের জন্য মহীশূর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বজেটে এই কার্য্যের জন্য অন্য বৎসর অপেক্ষা অল্প সংস্থান করেন নাই।

তাঞ্জোরের পুরাতন পরিখা

ম্যানেজার মহাশয় বলিলেন যে, গত বৎসর মহীশূরের মহারাজা স্বয়ং কার্য্য পরিদর্শন করিতে মাসে একবার করিয়া আসিতেন; প্রধান অমাত্য মহাশয় এখনও প্রত্যেক মাসে কার্য্য দেখিতে আইসেন। ম্যানেজার মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া নক্সা সহ কার্য্যস্থানে গমন করা গেল। তখন প্রায় বেলা ২টা। কুলিমজুররা তাহাদের মাধ্যাহ্নিক আহার শেষ করিয়া কার্য্যস্থানে আসিতেছিল। যখন কার্য্যক্ষেত্রে

পঁহুছিলাম, তখন বিরাট্ জনসঙ্ঘের মস্তকগুলিকে মধুচক্রের মত দেখাইতেছিল। অনেক উচুনীচু পথের উপর দিয়া ও অল্পপরিসর পোলের উপর দিয়া কর্ম্মস্থলে যাইতে হয়। ম্যানেজার মহাশয়ের ২ বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্রও পিতার সঙ্গে যাইবে বলিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল। কর্ম্মস্থলের উপরে যাইবার পথ দুরারোহ বলিয়া, আমি তাহাকে সঙ্গে লইতে নিষেধ করিলাম। তিনি বলিলেন, "মহাশয়, এখন হইতে কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ হইতে শিখুক।" ইহা বলিয়া, একটি ভৃত্যের তত্ত্বাবধানে শিশু পুত্রকে দিয়া, আমার সহিত বাঁধের ভিন্ন-ভিন্ন অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমিও নক্সার সাহায্যে কার্য্যটি মিলাইয়া লইতে লাগিলাম। এই কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবার জন্য আট জন মহীশূর দেশবাসী এসিস্‌টেণ্ট এঞ্জিনিয়ার আছেন। ম্যানেজার মহাশয় ইহাদের মধ্যে একজনকে আহ্বান করিলেন। তিনি আমাদের সমস্ত বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ও রীতিমত উচ্চশিক্ষিত। আমাকে যে এসিস্‌টেণ্ট্ এঞ্জিনিয়ার মহাশয় বাঁধের নির্ম্মাণ-প্রণালী ইত্যাদি বুঝাইয়া দিতেছিলেন, তিনি তখনও প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করেন নাই। আমি তাঁহাকে নানা প্রশ্নে বিরক্ত করিতেছিলাম। তিনি আমার প্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া মৃদু হাস্যের সহিত যথাযথ উত্তর দিতেছিলেন। সমস্ত উত্তরে যেন বিনয় মাখান রহিয়াছে; আমি আমাদের দেশস্থ কোন এসিস্‌ট্যাণ্ট্ এঞ্জিনিয়ার মহাশয়কে ত এত বিনয়ী দেখি নাই। কেন এমন হয়? আমি মহীশূরের পথে-ঘাটে, অরণ্যে বহুশত মাইল ভ্রমণ করিয়াছি; এবং প্রায় সর্ব্বত্রই এই বিনয়ের পরিচয় পাইয়াছি। এখানকার লোকেরা নিজের দেশকে যে কেমন করিয়া ভারতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিবে, এই চিন্তায় সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত। এঁরা হচ্ছেন যেন ভারতবর্ষের জাপানী। এ রকম স্বদেশপ্রিয়তা থাকলে মানুষ বিনয়ী না হয়ে যায় না। এত উচ্চশিক্ষিত হয়েও তাঁরা অল্প বেতনে নিজের রাজ্যে কার্য্য গ্রহণ করে বেশ সন্তুষ্ট আছেন। আমাদের ইংরেজ সরকারের এসিস্‌ট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়ারেরা ২২৫ টাকায় কর্ম্মে প্রবেশ করেন; আর মহীশূর রাজ্যের এসিস্‌ট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়ারেরা একশত টাকায় কর্ম্মে প্রবেশ করেন। অথচ বিদ্যা-বুদ্ধিতে পূর্ব্বোক্তেরা শেষোক্তদিগের অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহেন।

ম্যানেজার মহাশয় বা এসিস্‌ট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়ার মহাশয় জানিতেন না যে আমিও একজন এঞ্জিনিয়ার। আমি কোথাও আমার পরিচয় দিতাম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সাধারণ লোকের ন্যায়, সাধারণ লোকের বেশে ও সাধারণ ভাবে যাইলে, উদ্দেশ্যে সিদ্ধি লাভ ঘটে; এবং যাহা জানিবার ইচ্ছা, তাহা বিশেষ রূপে জানা যায়। আমার প্রশ্নে ও নক্সার সহিত কার্য্য মিলাইবার তৎপরতা দেখিয়া, ইঁহারা, আমি কি করি ইত্যাদি বিষয়ে নানা সন্দেহ করিতেছিলেন, ও আমাকে এতৎ সম্বন্ধে বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমিও তাঁহাদিগের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, অন্য কথার অবতারণা করিয়া তাঁহাদের ভুলাইয়া দিতেছিলাম। অবশেষে আর আত্মগোপন করা গেল না; কেন না, তাহা হইলে আমাকে প্রশ্ন না করিয়া মৌন হইয়া থাকিতে হয়। আমি ত তাহা পারি না; কেন না, আমি যে শিক্ষালাভ করিতে গিয়াছি। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক পড়া ছিল; কিন্তু এ প্রকার বিরাট কার্য্য ত পর্য্যবেক্ষণ করি নাই! এবং আমার যতদূর জানা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষে এ প্রকার প্রকাণ্ড বাঁধ কখনও নির্ম্মিত হয় নাই। সুতরাং মৌন ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এ সুযোগ পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা করিলাম। যখন তাঁহারা জানিলেন যে আমিও একজন এঞ্জিনিয়ার, তখন তাঁহারা আমাকে আরও বিনয় ও সৌজন্যের সহিত সমস্ত বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। এসিস্‌ট্যাণ্ট্ এঞ্জিনিয়ার মহাশয় অত্যন্ত বিনয় সহকারে বলিলেন, "এখানে আমি অনেক বিষয় শিখিয়াছি। আপনি যে অত দূর হইতে আমাদের দেশে আসিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়; আমি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায়, আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।" আমি তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া ও সাদরে করমর্দ্দন করিয়া Superintending Engineerএর অফিসে ফিরিয়া আসিলাম।

Superintending Engineer মহাশয়ের একজন সহকারী বা পার্শোন্যাল এসিস্‌ট্যাণ্ট আছেন। ইনি একজন এসিস্‌ট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়ার। ইনি আমাকে অতিশয় যত্ন-সহকারে বাঁধটির নির্ম্মাণ সময়ের ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থার ফটোগ্রাফ্ দেখাইলেন। ইহাতে বিষয়টি আরও বিশদ হইল। তাঁহার সহিত আমার মহীশূর রাজ্যে ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। তিনি পথঘাট সম্বন্ধে আমায় অনেক উপদেশ দিলেন, এবং যে পথ দিয়া যাইব, তাহার একটা

ম্যাপ দেখাইলেন। তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া ম্যানেজার মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাসায় চলিলাম। ফিরিবার সময় আবার বিরাট জনসঙ্ঘ নয়নগোচর হইল। এখানে বঙ্গ-বেহার ও উড়িষ্যা দেশবাসী ভিন্ন ভারতের সমস্ত জাতির সমাবেশ দেখিলাম। মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, শিখ, রাজপুত, কচ্ছী, মাদ্রাজী প্রভৃতি বহু জাতীয় লোকেরা এ স্থানকে যেন জাতীয় মহাসমিতি রূপে পরিণত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে শিখ ও পঞ্জাবীরা কল-কব্জার কার্য্য করিতেছে। গুজরাটী মিস্ত্রিরা মসৃণ প্রস্তরের কার্য্য বা Ashlar Work করিতেছে। স্থানীয় লোকে কার্য্য-কুশল নহে বলিয়া, বিদেশ হইতে লোক আনিতে হইয়াছে। ইহাতে পারিশ্রমিক অধিক লাগিতেছে বলিয়া, মহীশূর সরকার স্থানীয় লোকদিগকে ক্রমে-ক্রমে কর্ম্মদক্ষ করিয়া লইতেছেন।

এখানে এত লোকের সমাবেশ বলিয়া রাজ-সরকার তাহাদের আবাস-গৃহগুলি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল ভাবে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; যেন একখানি প্রকাণ্ড গ্রাম বা সহর বসিয়াছে। কুলি লাইন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পানীয়ের জন্য পাইপে করিয়া কলের জলের ব্যবস্থা আছে দেখিলাম। কেরাণীদিগের বাসস্থান, ডিস্পেন্সারি, হস্পিটাল, কো-অপারেটিভ্ ষ্টোরস্ (Co-operative Stores), ক্লাব-হাউস্, পূজা করিবার মন্দির, ইত্যাদি অতি মনোহর ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে দেখিলাম। ক্লাবহাউসটি অতি সুন্দর। আমাদের বঙ্গদেশীয় পত্রিকার মধ্যে মডার্ণ্ রিভিউ (Modern Review) লওয়া হয় শুনিলাম। সুপারিন্-টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার, একসিকিউটিভ্ এঞ্জিনিয়ার, এসিস্ট্যাণ্ট, এঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার প্রভৃতি সকল কর্ম্মচারীর জন্যই সুন্দর বাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। দুই জন Land Acquisition Officer তাম্বুর মধ্যে তাঁহাদের অফিসের কার্য্য করিতেছেন।

এখানে সে সময় প্লেগ হইতেছিল বলিয়া সকলের মনে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে দেখিলাম। শুনিলাম ১০।১৫টি কুলি মরিয়াছে; অফিসার মহলেও ৩।৪ জন মারা গিয়াছেন। এই জন্য কুলিদিগের জন্য স্বতন্ত্র কুলিলাইন তৈয়ার করা হইয়াছে; এবং অনেক অফিসার তাঁহাদের সুন্দর আবাস-গৃহ ত্যাগ করিয়া, দূরে পর্ব্বতের পার্শ্বে সামান্য পর্ণাচ্ছাদিত কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। ম্যানেজার মহাশয়ও তাঁহার বাঙ্গলো ত্যাগ করিয়া অতি সামান্য কুটীরে বাস করিতেছেন। ইহা এত সামান্য ও অনুচ্চ যে, দণ্ডায়মান হইলে মস্তকে চাল ঠেকিয়া যায় বলিয়া বোধ হইল। অনেক-গুলি কর্ম্মচারী এই প্রকার সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া একত্র বাস করিতেছেন। দুই ধারে কুটীরশ্রেণী ও তন্মধ্যে প্রশস্ত পথ। এই পথের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমারও বাধ-বাধ বোধ হইতে লাগিল। কেন না, যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখি যে, পুষ্পমালিকা-সংবদ্ধ-কুন্তলা, ঈষদ্ধাস্যস্ফুরিতাধরা চম্পকদামগৌরী বালিকা ও যুবতীরা সায়ংকালীন পাদচারণা করিতেছেন। আমি কোন কালেই chivalrous নহি। স্ত্রীলোক দেখিলেই ইংরাজ কবি কুপারের ন্যায় আমার মানসিক উগ্রতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এ দেশে বা সমগ্র দাক্ষিণাত্যে অবরোধ-প্রথা নাই বলিয়া, এখানকার স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সম্মুখ দিয়া অবাধে যাতায়াত করেন। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগকে অবরোধের অন্ধকারে চিরকাল আবদ্ধ রাখি বলিয়া, স্বাধীনতার তীব্র আলোকে তাঁহাদিগকে আনিতে আমাদের বাধ-বাধ ঠেকে; এবং এই জন্যই মিথ্যা সন্দেহ করিয়া য়ুরোপীয় বা অন্যান্য অবরোধহীন সমাজের লোকদিগের মিথ্যা নিন্দা করিয়া থাকি। ইহা আমাদের ক্ষুদ্রতারই পরিচায়ক। যাহা হউক, ম্যানেজার মহাশয়ের কুটীরের নিকট যাইতে আমার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। তিনি আমাকে নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইলেন; এবং কফি, উষ্ণ দুগ্ধ ও মিষ্টান্নে আপ্যায়িত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা তাঁহাকে নমস্কারাদি করিয়া বিদায় লইলাম। কিন্তু তিনি আমাদের সহিত পদব্রজে প্রায় আধ মাইল পথ অগ্রসর হইলেন। সামান্য আলাপে মানুষ অপরকে কেমন আপনার করিতে পারে, দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কয়েক ঘণ্টার আলাপে তিনি আমাদের যেরূপ আপ্যায়িত ও যত্ন করিলেন, তাহা এ জন্মে ভুলিব না। আমার শরীর পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল; তাঁহার যত্নে আবার সতেজ ও উৎসাহপূর্ণ হইয়া অগ্রসর হইলাম, এবং রাত্রি প্রায় ৯টার সময় শ্রীকৃষ্ণস্বামী মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইলাম। আজ রাত্রে এখানে নিমন্ত্রণ ছিল। সন্ধ্যাবন্দনাদি সারিয়া কৃষ্ণস্বামী মহাশয়ের সহিত আহার করা গেল। এ দেশে

সাধারণ গৃহস্থ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে কিরূপ আহার করান, তাহা জানা উচিত মনে করিয়া সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। ইহা জানিবার জন্য পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। এ দেশে লুচির চলন নাই,—ভাতই সর্ব্বত্র প্রচলিত। এ দেশে আর একটি বিশিষ্টতা দেখিয়াছি। রাত্রিতেও ইঁহারা ভাতের সহিত ঘৃত আহার করিয়া থাকেন। আমাদের বঙ্গদেশে ইহা প্রচলিত নহে। আমাকে প্রথমে ভাত ও সুবাসিত গব্যঘৃত দেওয়া হইল। তৎপরে "কড়ম্বু" দেওয়া হইল। "কড়ম্বু" আর কিছুই নহে,—অনেকটা আমাদের অম্ল-মিশ্রিত ডালের ন্যায়। তবে ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণ ঘৃত, অম্ল ও লঙ্কা মিশ্রিত থাকে। ইহার স্বাদ বিচিত্র। দাক্ষিণাত্য-বাসীরা সকলেই ইহা আনন্দের সহিত উপভোগ করেন; এবং তাঁহাদের ধারণা যে, ইহা অতিশয় পুষ্টিকর। ইহার পর ডাল ও বরবটীর ছেঁচকি, কৎবেলের চাটনি, জারক লেবু ও ডালের বড়া দেওয়া হইল। বড়াকে এ দেশে বড়ে কহে। তৎপরে জাফরান্ ও শর্করা মিশ্রিত এক প্রকার অতিশয় সুস্বাদু দুগ্ধ দেওয়া হইল; এবং সর্ব্বশেষে শর্করাবৃত একখানি মাত্র লুচি বা পরটা এবং দধি দেওয়া হইল। তিনি এত যত্নের সহিত আমায় খাইতে অনুরোধ করিতেছিলেন যে, আমি পরম আপ্যায়িত বোধ করিলাম। তাঁহার স্ত্রী আমাদের পরিবেশন করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার বিশেষ ভক্তি হইল,—মূর্ত্তিমতী শ্রদ্ধা বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার মস্তক অনাবৃত, ও কবরী-কুসুম-মালিকা সম্বদ্ধ ও বরবপু পট্টবস্ত্রাবৃতা। কৃষ্ণস্বামী মহাশয় আহার করিতে করিতে বলিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী অতিশয় আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ ও গুরুমহারাজের (রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়) বিশেষ ভক্ত। তিনি বলিলেন যে, স্ত্রী যদি আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ ও শিক্ষিতা হয়েন, তাহা হইলে স্বামীর ধর্ম্মাচরণ ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করা অতিশয় সহজ। কৃষ্ণস্বামী মহাশয়ের বাটীতে পরমহংস মহাশয়ের নিত্যপূজা হয় শুনিলাম। ইঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে বিশেষ সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন দেখিলাম।

আহার শেষ করিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। আহারান্তে কৃষ্ণস্বামী মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রীকে অভিবাদন করিয়া বাহির হইলাম। কৃষ্ণস্বামী মহাশয় আমাদের সঙ্গে অনেক দূর আসিলেন; তত রাত্রে মহারাজের প্রাসাদের বহির্দ্দেশ ও অঙ্গন দেখিবার জন্য প্রাসাদাভিমুখে যাওয়া গেল। বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত প্রাসাদ অতি সুন্দর দেখাইতেছিল; দ্বারদেশের সন্নিকটে আঞ্জনেয় বা মহাবীরের মন্দির আছে। তাহাও আলোক-মালায় সুশোভিত; এবং তখনও পূজার্থীর সমাগম দেখিলাম। প্রাসাদাঙ্গন দিয়া একজন লোক বাদ্য বাজাইয়া চলিয়া গেল। প্রাসাদ হইতে কার্জ্জন পার্কে (Curzon Park) আসিয়া পঁহুছিতে রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষ্ণস্বামী মহাশয়কে নমস্কার পূর্ব্বক বিদায় দিয়া, ধীরে-ধীরে ডাক্‌বাঙ্‌লো অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। পথে যাইতে-যাইতে দেখিলাম, সমস্ত মহীশূর নগর সুপ্তিমগ্ন; পথে একটিও জন-মানব নাই। মাঝে-মাঝে এক-একটি বাটী হইতে সুমধুর সঙ্গীতের আলাপ কর্ণকে পরিতৃপ্ত করিতেছিল। আমিও পথিমধ্যে মন্ত্রাবিষ্টের ন্যায়, সুধানিষ্যন্দি সঙ্গীতে আত্মহারা হইয়া শ্লথগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমার মন নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন হইল; প্রাচীন পল্লব, কদম্ব, চের, চালুক্য প্রভৃতি রাজ্যের কথা হইতে হায়দর আলি টিপু সুলতান প্রভৃতির কথা আমাকে আকুল করিয়া ফেলিল। ভারতের প্রাচীন গৌরব যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, আমাকে তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য উত্তেজিত করিয়া ফেলিল। এমন সময়ে ভাল করিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখি, নগরের বাহিরে ডাক্‌বাঙ্‌লোর নিকটে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। ডাক্‌বাঙ্‌লোয় যখন উপস্থিত হইলাম, তখন রাত্রি বারটা। দেখিলাম, আমার বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত ভৃত্যটি আমার জন্য জাগিয়া বসিয়া আছে।

সতী-ভাব

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

সতী শিবশক্তি। বায়ু যেমন স্পন্দন-ধর্ম্মে সমীরে রূপান্তরিত হইলে প্রবাহিত হয়,—আমরা তাহার সুখস্পর্শ অনুভব করি, তেমনি শিব-রূপ সতীর স্নেহের রসধারা বাহিয়াই আমাদের মনের গোচরে আসে। জ্ঞানস্বরূপ যে শিব। চিন্ময়ীর রূপের বিজুরি না চমকিলে এ-পারে অজ্ঞানের আঁধারে ডুবিয়া আমরা কথনো কি তাঁকে দেখিতে পাই? জ্ঞান ও-পারের জিনিস,—এ-পার ভাবের এলাকা। ভাব চিত্তের মাঝে প্রবাহের আকারে বহিয়া যায়। জ্ঞান চৈতন্যের মধ্যে বিশুদ্ধ আকাশের মত স্বচ্ছ হইয়া উঠে। বেদ-বেদান্ত নাড়াচাড়া, মনের মাঝে তোলাপাড়া করা আমাদের,—সকলি ভাবের খেলা (means of knowledge)। জ্ঞান উহার প্রতিপাদ্য বস্তু—ঐ ভাব-চেতনায় বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়ান অবস্থা।

তাই শিব ধ্যানাসনবদ্ধ যোগী-মূর্ত্তি; শক্তি-মূর্ত্তির সংখ্যা নাই। অসুর নিধন হইতে আরম্ভ করিয়া সকলি শক্তির খেলা। শিবের অনন্ত সোহাগ মায়ের অনন্ত লীলার মধ্য দিয়াই স্ফুরিত হইতেছে। বিশ্বনাথের বিশ্ব বিশ্বময়ীর মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হইতেছে। যেন মা শিবকে পাইয়াছেন বলিয়াই শিব আমাদের। যেন ত্রিভুবন মাতৃময় বলিয়াই শিবময়।

সতীর প্রতীক (Symbol) গড়িয়া আর্য্য-ঋষি যে-দিন তাহার হস্তে গৃহের সকল ভার সার্থক ভাবে সমর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন, সে দিন সেই সৃষ্টির অক্ষুণ্ণ শৃঙ্খলা, অনবদ্য সৌন্দর্য্য, দেখিয়া বুঝি ব্রহ্মারও মুখ ঈর্ষায় বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তার পর কত যুগ গিয়াছে; কত আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনে ভ্রূক্ষেপ করিতে হয় নাই; সেই পারিবারিক প্রতিষ্ঠান-ন্যস্ত সমাজে পরিপূর্ণ প্রাণ-শক্তিতে আর্য্য-সন্তানের জীবন-ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছে।

কবে কি ওলোট-পালট কেমন করিয়াই বা হইল, সে ইতিহাস সঙ্কলনের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা লইয়া কেহ প্রত্নতত্ত্ব সাধনা কার্য্যে লাগিতে পারিবে কি না জানি না;—এই শ্মশান-ধ্বংসস্তূপে দাঁড়াইয়া আজ শিবেরই অভাব চারিদিকে দেখিতে শিবরাণীর কথা আসিয়া পড়িল।

মা—মা, চিন্ময়ি, তোমারি মহামায়ারূপিণী জঠরে জগৎ সংসারের বিবর্ত্ত-বিলাস। তোমার অতীতে যদি যাই মা, এ জগৎ ত জগৎ থাকে না! এ সংসারই বা তথন কি,—আমিই বা কে? যেমন আছি, যেমন আছে, ইহার মধ্যে ত তুমি ছাড়া আর কেহ নাই। হে বিদ্যারূপিণি, এ জীবগণের মধ্যে তুমি ছাড়া আর কেহই উপাস্য নাই। শিবশক্তি সতীরূপে তুমিই শিব। শিববাণী তোমারই মুখে। তুমিই শিবপদপ্রদায়িনী।

জগৎটা ভাববস্তু। ভাবের অভাবে প্রলয়াবস্থা। আর

যে, অবস্থা ভাব-অভাবের অতীত, তাহা নিরঞ্জনাবস্থা (তুরীয়)। সে অবস্থায় সংসার থাকে না, স্বাতন্ত্র্য থাকে না, নিজের অস্তিত্ব থাকে না। সেই-ই সত্য; কিন্তু "এতো তা' নহে। তাই এটার মধ্যে ভাবই আমাদের অবলম্বন, ভাবই আমাদের মূর্ত্তি। তাই ভাব আমাদের কাছে এত বড়। ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, গোষ্ঠি—সমস্তই ভাবের পরিবেষ্টনীতে বাঁধা। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, সুকুমার-কলা কেবলি ভাবের ভাঙ্গা-গড়া। ভাবের বিলাসে বিলাসিত হইয়াই আমরা Idialistic.

সমাজ-বন্ধনের আদিম অবস্থায় ভাবমুখীন ঋষি যখন সমাজ-জীবনের উপাদানগুলির ভাববস্তু নির্ণয় করিতে বসিলেন, দেখিলেন, জীবন-বিকাশ ও জীবন-ধারণ-ক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া বিকশিয়া উঠিবে নারী। সেই-ই শ্রেষ্ঠ ভাবময়ী উপাদান। বিশ্বের অভ্যন্তরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তির প্রতীক করিয়া তাঁহার শিল্প নারীরই ভাবমূর্ত্তি রচনা করিল। নারীর আদর্শ সকলের আদর্শকে উঁচাইল। মঙ্গল পথে সৃষ্টিকে সতী লইয়া চলিয়াছেন,—ধর্ম্মের পথে নারীও সমাজকে লইয়া চলিল।

তাহার সেই কল্যাণময়ী যাত্রা রামায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া, শত-শত পুরাণ, কাহিনী ছন্দে-বন্দে উপাখ্যানে বর্ণনা করিয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধার চক্ষে নারীর ভাববস্তুর অনুসরণ উদ্দেশ্যে সে সকল যদি পাঠ করি, নূতন চক্ষু খুলিয়া যাইবে। বিপুল বাহ্য-সৌন্দর্য্য কোন সুষমাময় বস্তুর স্পর্শে তাহার শরীরে বিকশিয়া উঠে—আত্মা তন্ময় হইয়া যাহার রস-সাগরে ডুবিয়া যায়। তাহাই মনশ্চক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সতী কাহিনীর শিক্ষা—বিপুল বেদনা, অসীম ত্যাগের মধ্যে আপাত-প্রতীয়মান দৈন্যে নারী যে সংসারকে কতখানি তুচ্ছ করিয়াছে, আবার সংসারের অধিষ্ঠান-আধার রূপে তাহাকে কতখানি সত্য করিয়াছে, লোকতঃ প্রবাদ রূপে প্রচলিত তাহার অধীনতায় আপনাকে সে কতখানি চূর্ণ করিয়াছে, আবার আপনা-আপনিই সে আপনার মধ্যে কি বিরাট মূর্ত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে,—তাহা অনুভবের মধ্যে আনিয়া, ভ্রান্তিতে, সত্যে ফেনায়মান বুদ্‌বুদ-রূপী এই সংসার-রহস্যের পরপারেই আমাদের লইয়া যায়।

যাহা হউক, মঙ্গলের অন্তর্নিহিত মূল শক্তির প্রতীক নারী, দেবশক্তির প্রচুর স্ফুরণে মান্যা নারী;—দারিদ্র্যের ব্রত অকুণ্ঠিত গৌরবে উদ্‌যাপন-স্পর্দ্ধিনী নারী;—জগৎ তাহাকে বন্দনা করিয়াছেন সতী বলিয়া। আজিও সে কথা বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া যায় নাই। আজিও আশীর্ব্বাদচ্ছলে আমরা উচ্চারণ করি—সতী হও। আজিও নারী-জাতির নাম মাতৃজাতি।

কেমন একটা আলো-আঁধারের যুগের মধ্য দিয়া আজ আমরা অগ্রসর হইতেছি;—অতীতের ও বর্ত্তমানের মাঝখানে যেন রহস্য-ঘন কৃষ্ণ যবনিকা পড়িয়া সনাতন ও নূতনের দুর্ভেদ্য ধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছে! ভাব-সম্পদের প্রচুর অধিকারী সেই দেব-ঋষির জাতি একটা extinct race। আমরা সেই মৃত্তিকায় গ্রীসের আধুনিক অধিবাসীদের মত একটা নূতন কিছু, না, তাঁহাদেরই বংশবিস্তার সেই একই বস্তুর কালাকাল-সংলগ্ন অপর প্রান্ত! হঠাৎ কোনও দিন এই ধারণা স্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইতে পারে কি, যে—মাঝখানে একটা দুর্দৈবময়ী আত্মবিস্মৃতি গিয়াছে মাত্র,—দেবত্ব ও ঋষিত্বের প্রচুর সম্ভাবনা লইয়া আমরা প্রত্যেকেই, প্রতিজনেই সেই জাতি! কি হইবে কে জানে; কিন্তু দেখিতেছি, সেই জাতির ছেঁড়া কাণিটুকু অবধি আমরা আমাদের এই জড়তাপন্ন বুদ্ধির যুগেও প্রচুর যত্নে স্মৃতি-কোটরে রক্ষা করিয়া আসিতেছি। তাঁহাদের উপলব্ধ-কাল-সূত্র তোতা পাখীর মত আমাদের চঞ্চুপুটে এখনও লাগিয়া আছে। আরও কত কি,—সমস্তের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

হয় ত আত্মবিস্মৃতির অবসানে মোহমুক্ত আমরা আবার সকলই ফিরিয়া পাইতে পারি। মানবের দেবত্ব, পণ্ডিতের ঋষিত্ব, নারীর সতীত্ব সকলি আবার সেই পুরাতনে যেমন হইয়াছিল, এই নবযুগের নূতন পৃথিবীকে ভোগ করিবার জন্য আমাদের আত্মার মধ্যে বিকশিয়া উঠিতে পারে! শ্রুতির অর্থ মতে নিরাশার হেতু ত দেখিতে পাই না। ইন্দ্রিয়সমূহের নির্ম্মলত্বই দেবতার লক্ষণ; বৃত্তিসমূহের ঋজুতা প্রাপ্তিই ঋষিত্ব। সতীত্বের কথা বুঝাইবার জন্যই ত প্রবন্ধের অবতারণা।

নারীর অধ্যাত্ম-বল অর্থাৎ সতীত্বের আদর্শে পরিচালিত সংসারই শিবলোক। সেই বল তুচ্ছ করিয়া অপরে যখন রাজত্ব করে, তখনই সংসার দক্ষের যজ্ঞশালা হইয়া উঠে। সেখানে শিবের অবমাননা ঘটে; সতী সেখানে দেহ-ত্যাগ করেন। এতক্ষণ পুরুষের কথা বলি নাই; এইবার বলিতে হইল। পুরুষের অভ্যন্তরেও একটা নিজস্ব শক্তি আছে,

সেই শক্তির জন্য তাহারও অভিমান স্বাভাবিক; কিন্তু এই জ্ঞান নিশ্চয়ই থাকা প্রয়োজন—তাহার, সে, সকল শক্তিই শিবশক্তি নহে। আর একটা সমাজকে পরিচালনা করিতে কেবল একই শক্তিও সর্ব্বস্ব নহে।

মঙ্গল কিসে হয়? হয় ত পুরুষের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং দৃষ্টি-শক্তি নারী অপেক্ষা অনেক দ্রুত; তাহা ধরিতে পারে। কিন্তু তাহাই ত মঙ্গলকে লাভ নহে। জ্ঞান লাভ বলিতে যেমন জ্ঞান-সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা নহে; তেমনি মঙ্গললোকের মানচিত্র-কল্পনা মঙ্গল লাভ বলিতে পারি না। মঙ্গল লাভ সেই করিয়াছে, যে একেবারে মঙ্গল-স্বরূপ হইয়া গিয়াছে। নারীর প্রকৃতিতে এই মঙ্গল-সারূপ্য লাভের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। এই প্রবণতার জন্যই সে সতীর প্রতীক। এই প্রকৃতিই তাহার মধ্যে সতীকে বিকশিত করিয়া তোলে! যে উদ্যম মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠা করে, প্রকৃতির দানে তাহার পক্ষে সে স্বাভাবিক। পুরুষ মঙ্গল-লোকের মানচিত্র মস্তিষ্কে আঁকিয়া লইয়া, জ্ঞানের আলোকে পথ বিচ্ছুরিত করিয়াও হয় ত সেখানে পৌছিতে পারিবে না; কিন্তু নারী অন্ধকারে অনির্দ্দিষ্ট পথেও তাহার আগে সেখানে পৌছিতে পারে। এই জন্যই সতী যেখানে থাকেন, স্বর্গ গড়িয়া তোলেন; অথচ তাহার উপাদান বাহির হইতে কেহ যোগাইয়া দেয় না। তিনি অন্তর্লোকেই তাহা সংগ্রহ করিয়া ল'ন।

কিন্তু সমস্তই নারীর জাগিয়া থাকার উপর নির্ভর করে। আত্মা যেখানে তন্দ্রামগ্ন, বিবেক বলিয়া নিজ স্বরূপের যে গতিক, তাহা স্তব্ধ, সেখানে ঘুমাইয়া থাকা মেয়ের মধ্যে সতীত্বের স্ফুরণ দুর্লভ। সতী মেয়ের হাতে শুধু সংসারের দায়িত্ব নহে,—ভগবান সংসারের স্বাভাবিকত্বের অবধি ভার দিয়া রাখিয়াছেন। এ সকল তত্ত্ব জাতি যে দিন বুঝিবে, সে দিন সে সতীকে চাহিবে।

বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা

[শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি]

মিসেস্ উইল্‌সনের দ্বিতীয় গল্প

বিবাহের পর স্বামীর অনুমতি লইয়া রোগীসেবা শিক্ষার জন্য সহরের সর্ব্বপ্রধান প্রসূতি-চিকিৎসালয়ে ভর্ত্তি হইলাম। সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিতাম, এবং প্রাতে ৯টার সময় চিকিৎসালয়ে যাইতাম। একদিন প্রত্যূষে পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছি,—ভৃত্য একখানা পত্র আনিয়া দিল; বাঁকা-বাঁকা অক্ষরে লেখা—

প্রিয়তমা মিসেস্ উইলসন্—

পরপারে যাইবার পূর্ব্বে একবার দেখা করিবার অনুমতি পাইবার জন্য আপনার পুরাতন ছোট মেয়ে লুসী এই পত্র লিখিতেছে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়,—একবার আপনাকে দেখা, এবং আপনার স্নেহশীল হৃদয়ে আমার জন্য একটু স্থান আছে কি না তাহাই জানা। আপনাকে ছাড়িয়া অবধি রোগে দুঃখে শরীর মন অবসন্ন। এই চিঠিখানা অবজ্ঞাভরে জঞ্জাল-ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া দিবেন না। আমি জানি, পশুর অধম হইয়া আমি জীবন যাপন করিয়াছি। কিন্তু অদ্য রাত্রে আমি অনুভব করিতেছি—আমি ঘরে ফিরিয়া আসিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি, এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি। মুখে ফুটে না, কিন্তু অন্তরে জেগেছে প্রার্থনা—

লয়ে মন ভারাক্রান্ত, বিপথ-ভ্রমণ-ক্লান্ত,
আসিলাম তব পদে মাগিতে বিরাম।
প্রেমের নাহিক সীমা, হাসিমুখে কর ক্ষমা,
এই আশা, দয়াময়, অন্তের আরাম॥

আশা করি দর্শনলাভে বঞ্চিত হইব না। আপনার স্নেহের সেই ছোট লুসী।

পত্র পাইয়াই লুসীকে পরবর্ত্তী শনিবারে আসিতে লিখিয়াছি। কত শনিবার আসিয়া চলিয়া গেল,—লুসীর আর দেখা নাই। মনে করিলাম, লুসীর মন আবার নরকে ফিরিয়া গিয়াছে। এক মাস পরে এক দিন ভোরবেলা জানালার নিকট বসিয়া পর্ব্বত-উপত্যকার বরফাচ্ছাদিত

কায়ায় তরুণ-অরুণ-কিরণ-পাতের শোভা দেখিতেছি, এমন সময় দেখি, কে একজন পার্ব্বত্য পথ ধরিয়া আমাদের গৃহের দিকে আসিতেছে। সেই ধীর লঘু পদসঞ্চার, সেই সম্মুখে ঈষদানত মস্তকের ভঙ্গী, সেই টুপী পরিবার ধরণ—নিশ্চয়ই সেই লুসী। পূর্ব্বরাত্রে তুষার বর্ষিত হইয়া আমাদের পর্ব্বতগাত্র একটি কাচের চাদরে আচ্ছাদিত করিয়াছে। পা ঠিক রাখা যায় না। সূর্য্যালোক-রঞ্জিত বৃক্ষগুলি পথের উপর বাহু বিস্তার করিয়া বিগলিত বরফের ধারা বর্ষণ করিতেছে। লুসী কিন্তু হস্তস্থিত ছাতা মাথায় না ধরিয়া, তাহাতে ভর দিয়া চলিতেছে। মাঝে-মাঝে ক্লান্ত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইতেছে, আর চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। তাহাকে দেখিয়া পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে দেখা—প্রসূতি-চিকিৎসালয়ের বারান্দায় শিশু কোলে করিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে, কোথায় যাইবে। আমি ওয়ার্ড হইতে বাহির হইয়া তাহাকে বলিলাম, "তবে লুসী, তোমার ছোট এল্মা ও তুমি আমাদের মায়া পরিত্যাগ ক'রে চল্‌লে? কোথা যাবে?" "জানি না কোথায় যাব" এই কথা বলে লক্ষ্যহীন, গন্তব্যহীন লুসী কোথায় চলিয়া গেল জানি না। সেই দিনই বিকালে সেই মাতৃহীনা অষ্টাদশবর্ষীয়া বালিকা আমাকে আসিয়া বলিল, তাহার ভ্রাতারা তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। আমি এক জায়গায় তাহাকে কাজে লাগাইয়া দিলাম। আট মাস পরে সে কাঁদিতে-কাঁদিতে আসিয়া জানাইল, গৃহকর্ত্রী তাহাকে জবাব দিয়াছে, এবং তাহার কন্যাটী মৃত্যু-শয্যায়। "হায়, হায়, কি দুশ্চারিণী আমি! আমার পাপেই বাছা আমার চলে যাচ্চে। সৎ-পথে থাকবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। রোজ বস্তা সেলাই ক'রে রোজগার ক'রে কেমন ক'রে দিন চলে? কেবল চা ও শুকনো রুটী খেয়ে-খেয়ে বুকের দুধ শুকিয়ে গেল; বাছা আমার খেতে না পেয়ে শুকুতে লাগল। যে ঘরে ছিলাম, সে ত একটা অন্ধকূপ। তাই তাকে হাসপাতালে রেখে এসেছি।" কিছুদিন পরে সে আসিয়া ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিল, এবং তাহার কন্যার মৃত্যু-সংবাদ জানাইল। তাহার সঙ্গে হাসপাতালে গিয়া ডাক্তারের নিকট মৃতদেহ চাহিলাম। ডাক্তার বলিলেন, মাতার পাপে শিশুর মৃত্যু। কুৎসিত রোগের বীজ শিশুর যকৃতে প্রবেশ করিয়াছিল। হজম-শক্তি একেবারেই ছিল না। চোখ, মুখ, শরীর সমস্ত হলদে। প্লীহা প্রকাণ্ড। ব্যবচ্ছেদের পর শেলাই করিয়া দেহ আমার নিকট দিয়া ডাক্তার বলিলেন, "যকৃতের একটা ছবি এঁকে রেখেছি। এই দেখুন, স্ক্রু-প্যাঁচের মতন ঐ রোগ-বীজাণুগুলি কেমন দলে-দলে যকৃতের ভিতরে ঢুকেছে।"

শিশুকে গোর দিয়া মাতাকে ঘরে লইয়া আসিলাম। কিছু দিন পরে সে কোথায় চলিয়া গেল,—তিন বৎসর তাহার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

(২)

তিন বৎসর পরে আজ যখন ঐ বালিকা করকম্পন করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিল,—আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল,—প্রতিনমস্কার-বাক্য ওষ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গেল। তাহার মুখ হইতে চক্ষু ফিরাইবার চেষ্টা করিলাম। চক্ষু যেন বহিঃস্থিত তুষারাবৃত প্রাঙ্গণের ন্যায় জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। এই কি সেই লুসী? সেই গোলাপ-বিনিন্দিত মুখে স্থানে-স্থানে কৃষ্ণবর্ণ ক্ষতচিহ্ন। কোথায় গেল চিত্তাকর্ষক দুটী মৃগনয়ন? দক্ষিণ চক্ষু একটি লাল মাংসখণ্ড বিশেষ; সেই নীলাকাশ-পরিবৃত উজ্জ্বল তারা কোথায়? সেই সুন্দর দুটি ভ্রূধনু,—সেই সুন্দর নয়ন-পল্লবের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। সেই কুঞ্চিত-কাঞ্চন-কেশদাম নাই,—আছে কেবল মসৃণ মস্তকে স্থানে-স্থানে ক্ষত-চিহ্ন। সেই সুন্দর উন্নত নাসিকার মধ্যস্থল বসিয়া গিয়াছে। এই হতভাগ্য, কদাকার জীব চীৎকার করিয়া আমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল; এবং সানুনাসিক স্বরে বলিল, "আপনার ভাব দেখেই বুঝেছি, আমার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। আমি আর সেই লুসী নাই।" এই বলিয়া সে আমার বুকে মুখ লুকাইল। তাহার অশ্রুধারায় আমার বসন সিক্ত হইল। তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলাম "এই তিন বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে বই কি?" আদর পাইয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিল, "এখনও আপনি আমাকে ভালবাসেন?" হাসির সময় দেখিলাম, তাহার মুক্তাপাঁতির মতন সম্মুখের দাঁতগুলি খসিয়া পড়িয়াছে। এই কুৎসিত মুখোসের ভিতরকার অতীত মুখ-সৌন্দর্য্য কল্পনা-পথে জাগিয়া উঠিল। চক্ষের জলে ভাসিতে-ভাসিতে বলিলাম "লুসী, হাঁ, এখনও ভালবাসি,—পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি।" যেখানে আগুন

জ্বলিতেছিল, সেই স্থানে তাহাকে লইয়া গেলাম। জানালা দিয়া সূর্য্যের আলোক আসিয়া যখন তাহার ছিন্ন, মলিন বসনে ও ক্ষত-বিক্ষত মুখে নৃত্য' করিতে লাগিল, তাহার ভিতর হইতে কদর্য্যতা যেন গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। অগ্নিতাপে তাহার সিক্ত বসন হইতে দুর্গন্ধ বাষ্প নির্গত হইয়া গৃহ পরিপূর্ণ করিল।

(৩)

"আমি পুরুষ মানুষকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে প্লড়েছি" লুসী অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল। "পৃথিবীতে একটিও ভাল পুরুষ নাই। বিবাহিত, অবিবাহিত, জজ, উকীল, ডাক্তার, বণিক, সৈন্য, নাবিক, দেশের গণ্যমান্য, যাজকের অগ্রগণ্য,—সবই সমান। যাদের বলে বড় ভাল, তারাই সবচেয়ে খারাপ। একজন সুপুরুষ পাদ্রী আমাদের সর্ব্বনাশ করেছিলেন। এই কুৎসিৎ রোগ তাঁহারই দান। তিনি বললেন, 'প্রকৃতির নিয়ম পালন করাই ভগবানের আদেশ; ইহাতে কোন পাপ নাই।' আমাদের মতন বালিকাকে তারা এই রকম কথা বলেই ভুলায়। কিন্তু তাদের স্ত্রী, ভগিনী, কি বাগ্দত্তা প্রণয়িনীকে কি এই প্রকার উপদেশ দেয়? তারাই আবার জিজ্ঞাসা করে, স্ত্রীলোকেরা এত খারাপ হয় কেন? অথচ, তারা জানে, স্ত্রীলোককে নরকে যাবার পথ তারাই অঙ্গুলী-সঙ্কেতে দেখিয়ে দেয়। তাদের কাছে আমি সপ্তাহে ৪০০৲ টাকা পেয়েছি; কিন্তু কারখানায় মোট পঁচিশটি টাকাও পাই নাই।"

অকস্মাৎ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কথা বন্ধ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "আমি কি বল্‌চি? এই সব কথা বল্‌তে ত আমি আসি নাই। আমি এসেছিলাম বল্‌তে, আমার উপর বিশ্বাস যেন টলে না। আপনার ভালবাসা-তেই আমি বেঁচে আছি। আপনি ভাল, সুতরাং আমার অবস্থা বুঝবেন না; আমাকে ক্ষমা করতেও পারবেন না।" আমি বলিলাম, "আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি, যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর, আর সে পথে যাবে না।" সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি ঐ রকম ক্ষমা চাই না। এই পথে গেলে মেয়েদের কি অবস্থা হয়, তা আপনি জানেন না। তাদের শরীর-মন একেবারে ভেঙ্গে যায়; সৎপথে থেকে পরিশ্রম করবার প্রবৃত্তি আর থাকে না। মাদক ও রোগ জীবনী-শক্তি একদম শুষে নেয়। আমি এখন কি কোন ভাল কাজ করতে পারি?" এই বলিতে-বলিতে অশ্রুধারায় তাহার বক্ষ ভাসিয়া গেল। অবশেষে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আপনি বল্‌চেন ভাল কাজ করতে। একটী কাজ করবার আছে,—সেই কাজ হবে,—যারা আমার পথে চলবার জন্য পুঁটলী বেঁধেছে, সেই যুবতীদের সাবধান করা। এ কাজটী করতে পারলেও মনে হবে, জীবনটা বৃথা যায় নাই। আমি বিবাহ ক'রে ভাল ছেলের মা হতে পারতাম। ওঃ! ছেলে, ছেলে, ছেলে! যদি আগে জানতাম, ঈশ্বর নিজের ও প্রাণাধিক সন্তানের যে জীবন রক্ষার ভার আমার হাতে দিয়েছিলেন, এই পথে গেলে সেই জীবন এমন ক'রে নষ্ট করব, তা হ'লে কি সেই পথে যেতাম? চলুন, আমার সঙ্গে চলুন, ঐ কুৎসিত রোগের হাসপাতালে, যেখানে শত-শত সুন্দরী যুবতী রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করে বল্‌চে, 'হায়, হায়, ডাক্তার মশাই, আগে কেন আপনারা এই অবস্থার আভাস দেন নাই! তা হলে কি আর এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতাম?'" নিম্নে পাতালের দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করে যখন লুসী বল্‌লে, "ঐ স্থানে আমার প্রকৃত শিক্ষা হয়েছে" তখন যেন দেখিলাম, নরকের অগ্নিশিখা তাহার দেহ স্থানে-স্থানে দগ্ধ করিয়াছে। ক্ষত ত নয়,—নরকাগ্নিদহনের চিহ্ন।

লুসী অকস্মাৎ কম্পিত চরণে উনানের নিকটে গিয়া মেরী মেগ্‌ডেলেনের ছবির দিকে তাকাইয়া রহিল। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে বলিল "না, মিথ্যা কথা, এ মেরী মেগ্‌ডেলেন নয়। পুরুষ মানুষ এই ছবি এঁকেছে। আমি যখন আপনার বাড়ী ছিলাম, এ ছবির পদপ্রান্তে পড়ে প্রার্থনা করতাম। আমি মনে করতাম, ছবির গল্প সত্য। এখন মনে করি, সর্ব্বৈব মিথ্যা। চেয়ে দেখুন, রক্তাভ কাঞ্চন কেশ, উন্নত বক্ষ, মনোমুগ্ধকর চাহনি, মণিমুক্তা-শোভিত উজ্জ্বল বসন। যেন একজন রাণী,—তবে রাণীর মতন দর্প ও উগ্রতা নাই। যে মেরী প্রভু যিশুর পদ-প্রান্তে লুণ্ঠিতা হয়েছিল, যাকে তিনি তুলে নিয়ে গিয়ে প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত এবং নব ভাবে সঞ্জীবিত করেছিলেন, এ সেই মেরী মেগ্‌ডেলেন নয়। সে মেরী আমারই মতন, কুৎসিত, রোগজীর্ণ; মুখে এবং অঙ্গে আমারই মতন পাপের কালিমা। বক্ষে বিদারণোন্মুখ হৃদয়ের ঘন আঘাতের চিহ্ন। বেশভূষার ঘন আবরণ ছিল না, তাই প্রভু তার অন্তরাত্মা সহজে দেখ্‌তে পেয়ে

শোধিত করেছিলেন; এবং তাকে প্রেমে সঞ্জীবিত করে নূতন বেশ পরিয়েছিলেন।" মেজের উপর উপুড় হইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "হে প্রভু যিশু, আমি সেই রকম ক্ষমা চাই।"

এক মাইল দূরে একটী গণ্ডগ্রাম। দেড় ঘণ্টা পরে সেই গ্রামের থানা হইতে ফোন্ আসিল "একটী স্ত্রীলোকের লাস আপনাকে সেনাক্ত করিতে হইবে। বয়স কুড়ী হতে পারে, চল্লিশও হতে পারে। চেহারা দেখে বোধ হয়, ভাল ছিল না। তার পকেটে আপনার একখানা চিঠি আছে। শব-ব্যবচ্ছেদ হবার পূর্ব্বে অনুগ্রহ ক'রে আসবেন—বিকাল ৩টার সময়।"

সব ফুরাইল! কত শত-শত ফুল কীট-দষ্ট হইয়া অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে। এ সেই ফুলদলের একটী। শত-শত তরল-মতি বালিকা নরকাগ্নিতে অহরহ পুড়িতেছে। তাহাদেরই একজন দহন-জ্বালা জুড়াইতে ঐ সরোবরে ঝাঁপ দিয়াছে।

সীবনাঞ্জলি

[শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়]

(৩)

ষোল-দরাজ সেলাইঃ—এই সেলাই অধিকাংশ সময় আদ্দি পাঞ্জাবীতে, রেশমী পাঞ্জাবীতে ব্যবহৃত হয়। একটী পাঞ্জাবীর প্রত্যেক অংশ ষোল-দরাজে সেলাই দিতে হইবে। তাহাতে প্রথম সেলাই দিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কাপড়টী ঠিক্ পরিষ্কার কাটা আছে কি না। যে অংশ কাটা আছে, তাহাতে ষোল-দরাজ দিতে হইবে। প্রথমে কাপড়টীর কাটা অংশে খুব সরু করিয়া বাম হাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সাহায্যে ষোল পাঁক দিয়া লইতে হইবে। তার পর প্রায় তোর-পাইয়ের মত $\frac{1}{16}$ ইঞ্চি অংশে সেলাই করিয়া যাইতে হইবে। উপর দিকের সেলাই প্রায় দেখা যাইবে না। এমতাবস্থায় সেলাই দিয়া যাইতে হইবে। মনে করুন দুইটী কাপড়ে ষোল-দরাজ দিতে হইবে,—যেমন পাঞ্জাবীর পাশ সেলাই। সেই সময়ে প্রথমে একটী কলের সেলাই দিয়া লইতে হইবে। তার পর যতদূর সম্ভব সরু করিয়া গোল করিয়া দিয়া, পূর্ব্ববৎ সেলাই করিয়া যাইতে হইবে। আর এক রকম সেলাই আছে। পাঞ্জাবীর নীচের (Down) অংশ সেলাই করিবার সময় ৯০নং সুতার উপর আদ্দি বা সিল্ক কাপড় গোল করিয়া দিয়া, পূর্ব্ববৎ সেলাই করিয়া গেলে সেলাই দেখ্‌তে পরিষ্কার হয়। কাপড় টানে বাড়িবার আর সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপ সেলাইকে ষোল-দরাজ সেলাই বলে।

তাগা-তোলা সেলাইঃ—দুইখানি কাপড়ের রোকে-রোকে জমাইয়া লইয়া, মনে করুন, কোটের চিত্র আঁকা হইল। পাশে দাগ থেকে প্রায় দেড় ইঞ্চি ব্যবধানে কাঁচি দ্বারা কাটিতে হইবে। তখন উপর পাতে দাগ পড়িল বটে, কিন্তু নীচের কাপড়ে দাগ পড়ে নাই। তখন সুঁচে ডবল সুতা পরাইয়া দাগে দাগে ঢিলা-ঢিলা সুতা রাখিয়া, খিলনী সেলাই করিয়া যাইতে হইবে। এইটী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, যেন ফোঁড়গুলি সমান ১ ইঞ্চি অন্তর উঠে, ডবল সুতার দ্বারা সেলাই উঠাইয়া, ঢিলা অবস্থায় রাখিয়া টানিতে হইবে। তার পর কাঁচির দ্বারা আলগা সুতার ঠিক মাঝখানে কাটিয়া দিতে হইবে। এইরূপে সব অংশটুকু কাটা হইয়া গেলে দুই কাপড়ের মাঝখানে আস্তে-আস্তে ফাঁক করিয়া, সুতাগুলি কাটিয়া দিয়া, খুব আস্তে-আস্তে টানিয়া লইতে হইবে। তখন যেন সুতাগুলি কাপড় হইতে বাহির হইয়া না যায়, এইটীর উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। তখন যে সুতার চিহ্ন রহিয়া গেল, তা'কে তাগা-তোলা সেলাই বলে।

চাপ সেলাইঃ—এই সেলাই একমাত্র গরম কাপড়ের জামায় ব্যবহৃত হয়। তবে সব গরম কাপড়ে ব্যবহার করে না। কারণ, এত পারিশ্রমিক দিয়া সেলাই করাইতে অনেকেই পারে না। খুব সৌখিন যাহারা, তাহারা কখন কখন এই সেলাইয়ের কাজ করাইয়া থাকে। এই চাপ সেলাইয়ে যেখানে প্রথম সেলাই আরম্ভ হয়, সেইখান হইতে $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি দূরে আর একটী

ফোঁড় উঠে। আবার ফোঁড় দিবার সময় এইটী লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেখান দিয়া ফোঁড় উঠিয়াছে, সেইখান থেকে ফোঁড়টী পড়িবে। তবে ফোঁড়টী যেন খুলিয়া না আসে, তদবস্থায় ফোঁড়টী দিতে হইবে। পূর্ব্ববৎ ⅛ ইঞ্চি দূরে-দূরে এরূপ ভাবে সেলাই করিয়া যাইতে হইবে। এরূপ সেলাই হইয়া গেলে, সোজা দিক (রোকদিক) সেলাই হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে না। তবে কাপড়ে যে চাপ সেলাই হইয়া গেল, এইটী বেশ মনে হয়। এই সেলাই দেখিতে বেশ সুন্দর।

টেরা বা বাঁক সেলাই :—এই সেলাই অনেক সময়ে মোটা কাপড় সেলাই করিতে ব্যবহৃত হয়। কারণ, অনেক সময়ে দুইটী টুকরা একত্র করে জুড়ে সেলাই করিতে গেলে অনেক পুরু হইয়া যায়; সেই অবস্থায় এই সেলাইটীর দরকার হয়। আর এক অবস্থায় এই সেলাইয়ের দরকার—যখন দুইটী মোটা কাপড়ের মুখে-মুখে সেলাই করিতে হইবে; অথচ এই কাপড়ের কাঁচা ধার, যে ধারে সেলাই থাকে না, সেই ধার ডবল করিয়া দিলেও মোটা হইয়া যায়। এইখানে এই সেলাইয়ের দরকার হয়। প্রথমতঃ বামদিক হইতে ডানদিকে সেলাই হইয়া আসিয়া, বাম দিকে আদত কাপড়ে ফোঁড় উঠাইতে হইবে। তার পর যে কাপড় ভাঁজ দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর সূঁচ ঠিক সোজা ভাবে টান দিয়া, ইহার বাম দিকে উঠিবে; এবং সূতা টানিয়া নীচের কাপড়ে এরূপ ডান দিক হইতে সোজা করে বাম দিকে ফোঁড় উঠাইতে হইবে। তার পর ভাঁজ দেওয়া কাপড়ে সোজা ভাবে ফোঁড় দিতে হইবে। নীচের কাপড়ে এরূপ ফোঁড় দিয়া ও বাম দিক বরাবর এরূপ সেলাই করিয়া গেলে, টেরা বা বাঁক সেলাই হইল। ইংরেজীতে ক্রসষ্টিচ (Cross stich) বলে।

ওরমা সেলাই :—এই সেলাই বোতামের ঘরের মুখে ও জ্যাকেট, ভাল ফ্রগ-জাতীয় জামায় ব্যবহৃত হয়। এমন অনেক কাপড় আছে, কাটিলেই প্রায় সূতা বাহির হইয়া যায়। তখন যাহাতে খুলিয়া না যায়, এরূপ ভাবে সেলাই করিয়া রাখিতে হইবে। তখন এই ওরমা সেলাইয়ের বিশেষ দরকার হয়। মনে করুন, একটী সিল্কের নিমা জ্যাকেট সেলাই করা দরকার হইল। তাহার ভিতরে কাঁচা সেলাই হইয়া রহিল; অথচ ভবিষ্যতে খুলিয়া যদি বড়-বড় করিবার দরকার হয়, তখন এই বাড়ান কাপড়কে ওরমা সেলাই করিয়া রাখিবার খুব দরকার। সেলাইয়ের নিয়ম :—প্রথমতঃ সূঁচ ও সূতার দ্বারা বাম ধার হইতে প্রথম ফোঁড় দিয়া, ডান দিকে ফোঁড় দিয়া যাইতে হইবে। সেলাইগুলি এক সমান ⅛ ইঞ্চি দূরে-দূরে ফোঁড় উঠিবে। বেশী কাপড় লইয়া এই ফোঁড় উঠিবে, —যাহাতে সেলাই শক্ত হয়, দেখিতে সুন্দর হয়। এই যে সেলাই হইল, ইহাকে ওরমা সেলাই বলে।

কিপর সেলাই :—এই সেলাই অধিকাংশ সময়ে গরম কাপড়ের জামায় ব্যবহৃত হয়। যেখানে কিপর সেলাই করিবে, সে সকল স্থানে ইটালিয়ান নামক কাপড়, অথবা সিল্ক অস্তরের কাপড় সরু পটী করে বকেয়া দিয়া জুড়িবে। তার পর সে জোড়া কাপড়টী ডবল ভাঁজ করে ভাঁজ দিবে; এবং ঐ ভাঁজে তোরপাই সেলাই করিতে হইবে। মিহি কাপড়ে ও মোটা গরম কাপড়ে জুড়িয়া দিলে, তত মোটা হয় না। দেখতে পরিষ্কার হয়। কি জন্য মোটা মিহিতে তোরপাই সেলাই করিলে যে সেলাই দাঁড়াল, তাহাকে কিপর সেলাই বলে।

কুন্টী সেলাই :—কোটের কলার অধিকাংশ সময় খোলা গলা (open breast)। কোটের কলারে যেখানে সেলাই করে বাঁক করিতে হইবে, সে সকল স্থানে কুন্টী সেলাইয়ের দরকার হয়। জামার কলার কুন্টী করিতে হইলে, প্রথমে ঐ কলারটাকে বাম হাত দিয়া খাড়া ভাবে ধরিতে হইবে। কাপড়ের রংয়ের সূতার দ্বারা নীচে সূঁচ আংশিক হেলান ভাবে ডান দিকে ফোঁড় উপরদিকে উঠাইতে হইবে। তার পর সূঁচ সোজা ভাবে ধরিয়া সোজা ডান দিক হইতে বামদিকে ফোঁড় উঠাইবে। এরূপে প্রথম লাইন উপর দিকে সেলাই করিয়া যাইবে। প্রথম লাইন সেলাই হইয়া গেলে সেই লাইনের পাশে ফোঁড়টীর যোগে নীচমুখী সেলাই করিয়া আসিবে। এই ভাবে সমুদয় কলারেরর সেলাই শেষ হইলে, উহাও ক্রমান্বয় বাঁকা ভাবের হইবে। সেলাইয়ের দিক বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে উপর দিকের সেলাইটী আংশিকের বেশী যেন দেখা না যায়। মনে হইবে যেন সেলাই হয় নাই। এই কুন্টী সেলাই কলার ভাল বলে, কলারটিক কোটের সঙ্গে পুরিয়া থাকে—কলার উল্টাইয়া থাকে না।

বকেয়া সেলাই :—এই বকেয়া সেলাই সব সেলাই হইতে শক্ত। যে যত মিহি সেলাই উঠাইতে পারে, সে তত প্রশংসনীয়। এই সেলাই রোকের দিক কলের সেলাইয়ের মত দেখায়, তবে বেরোকের দিক কলের সেলাইয়ের মত অবশ্য দেখাইবে না। হাতের উপর অংশ কাপড় (রোকের দিক) সেলাই সঙ্গে কলে সাধারণতঃ যে সেলাই হয়—দেখিতে একই দেখাইবে। যখন কল ছিল না, হাতেই সেলাই হইত, তখন এই হাতের সেলাইয়ের খুব আদর ছিল। এখনও অনেক সেলাই আছে, হাতের সেলাই না দিলে

সেস্থান দেখতে সুন্দর হয় না। অবশ্য দাম অনেক পড়ে যায় বলিয়া অনেকে হাতের সেলাই করাইতে পারে না। বকেয়া সেলাইয়ের সময়ে সূঁচ ও সূতার দ্বারা প্রথমতঃ সকলের নীচে একটা অর্থাৎ আরম্ভে ফোঁড় উঠাইয়া, তার পর দ্বিতীয় ফোঁড়ের বেলায় এই প্রথম ফোঁড়ের ঠিক গোড়া হইতে সূঁচ দ্বারা ফোঁড় নামাইয়া প্রথম ফোঁড়ের ডবল দূরে সূঁচ উঠাইবে। আবার তৃতীয় ফোঁড় উঠাইতে দ্বিতীয় ফোঁড় ঠিক মাঝ হইতে অর্থাৎ প্রথম ফোঁড়ের শেষ হইতে ফোঁড় নামাইয়া ততটা দূরে সূঁচ উঠাইতে হইবে। এইরূপ সমান ভাবে সেলাই করিয়া গেলে, বকেয়া সেলাই হইল। ইংরেজীতে ইহাকে Back-Stitch বলে।

রিপু সেলাইঃ—এই সেলাই কাটা বা ছেঁড়া অংশে সেলাই করিতে হয়। মনে করুন একটা কাপড় হঠাৎ কিছুতে লাগিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তখন যে কাপড়ের মিল করিয়া সেলাই করিতে হয়, তাহাকে রিপু সেলাই বলে। সেলাইয়ের নিয়ম,—যে কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেই কাপড়ের সূতা লইয়া বা সেই রংয়ের সূতা লইয়া, সূঁচে পরাইয়া, যে ভাবে কাপড় বোনা আছে, সেই ভাবে বুনিয়া লইতে হইবে। তখন বোনা অংশটী দেখিতে সেই কাপড়ের মত হইয়া যায়। অনেক সময় বেশী দামি জিনিসে রিপু সেলাই কাজের দরকার হয়।

সমজ সেলাইঃ—এই সেলাইটী অধিকাংশ সময়ে ফ্রগ ও ব্লাউজ জাতীয় জামার কলারের মুখে ব্যবহৃত হয়। এই সেলাইয়ে ১/১৬" ইঞ্চি দূরে-দূরে ফোঁড়গুলি উঠে। যে রংয়ের কাপড় হইবে, তার বিপরীত রংয়ের মোটা সূতা, যার দ্বারা ফুলের কাজ হয়, সে সূতা সূঁচে পরাইয়া লব হইতে ১/৮" ইঞ্চি দূরে ফোঁড় উঠাইয়া, সূঁচের মাথায় একবার করিয়া ফাঁস দিবে, এবং ঐ ফাঁস যেন কলারের মুখে আসিয়া পড়ে, সেইটার উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গাঁটগুলি যেন এক সমান টান থাকে। কোনটী ঢিলা কোনটী টান যেন না হয়। এক সমান টানে যাইবে, তবে দেখিতে সুন্দর হইবে।

রিবণ সেলাইঃ—এই সেলাইটী অধিকাংশ সময় ব্লাউজের মোহোরা আস্তিনের মোহোরারী ও কলারে ব্যবহৃত হয়। আবার পাঞ্জাবীতেও এই সেলাইটী মাঝে-মাঝে দেখা যায়। মনে করুন, আস্তিনের মোহোরা রিবণ সেলাই করিতে হইবে। আস্তিনের কাপড় ও বডির অংশটী লইয়া উভয়ের মুখ জুড়িয়া লইতে হইবে। তার পর ১/৮ ইঞ্চি দূরে রাখিয়া, নীচে কাগজ দিয়া, কাগজের সঙ্গে বডি ও আস্তিন জুড়িয়া লইতে হইবে। তার পর মোটা সূতার দ্বারা প্রথমে বডিতে ফোঁড় দিয়া, তার পর আস্তিনে ফোঁড় উঠাইয়া, আবার সেইটী বডির যে জায়গায় ফোঁড় উঠান হইয়াছে, সেই ফোঁড়ে ফোঁড় দিয়া তার পর উল্টাইয়া একটী গিট দিতে হইবে। যে গিট দেওয়া হইল, তাহা হইতে ১/৮ ইঞ্চি দূরে আর একটী ফোঁড় দিয়া, আবার সোজাসুজি বডিতে ফোঁড় উঠাইয়া, আবার আস্তিনে উঠাইয়া পূর্ব্ববৎ গিট দিয়া, আবার বডিতে গিট দিয়া সেলাই করিতে হইবে। সমভাবে ১/৮ ইঞ্চি দূরে ফোঁড় উঠাইয়া, পূর্ব্ববৎ এই ভাবে মোহোরার সব দিক্ ঘুরাইয়া সেলাই করিতে হইবে। এইরূপ সেলাই হাতের মোহোরাতেও হয়। পাঞ্জাবীর ফাঁদে মোহোরার এইরূপ সেলাই—পাঞ্জাবীতে বাঁকা ভাবে ছোট সেলাই হইয়া থাকে। ইহার আর এক নাম জালিদার সেলাই।

সাড় টাঁকা বা পাকা টাঁকা।—এই সেলাইটী পকেটের মুখের। কর্কের অর্থাৎ কোন কাটা জায়গায় জোর লাগিয়া ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলে, সে সব জায়গায় সাড়টাঁকা দরকার হয়। প্রথমতঃ সূঁচে মোটা সূতা পরাইয়া, যে স্থানে সাড়টাঁকা দিবার দরকার, তাহার ঠিক নীচে উভয় দিক এক ইঞ্চি সাইজের মোটা কাপড় কাটিয়া বসাইয়া, তার পর সূঁচ ও সূতার দ্বারা সোজা ফোঁড় নামাইবে, তাহার ১/৮ ইঞ্চি দূরে-দূরে ফোঁড় উঠাইবে-নামাইবে। এরূপ ৫-৬ বার উঠা-নামার পর যে চোপটী হইল, উহা বেশ ঘন ভাবে ফোঁড় দিয়া, নীচে ও উপরে করে জড়াইবে। তাহাতে যে সেলাই হইল, তাকে সাড়টাঁকা বলে।

বোতাম-ঘর বা কাজ-ঘর। এই বোতাম-ঘর অবশ্য যেমন কষ্টকর, তেমনি বিশেষ দরকারী। এইটী বিশেষ ভাবে অভ্যাস করিতে হয়। বোতামের ঘর সেলাই করিতে হইলে, খুব ধারাল সরু-মুখ কাঁচির দ্বারা বোতামের ঘর কাটিতে হয়। যে স্থানে ঘর হইবে, সেই স্থানে খড়ির দ্বারা চিহ্ন করিয়া লইতে হইবে। এখন এই চিহ্ন জামার লব (অর্থাৎ সম্মুখ ধার) হইতে ১/৪ ইঞ্চি ভিতরে, যে বোতাম এই জামায় লাগান হইবে, তাহার চওড়া হইতে ১/১৬ ইঞ্চি বেশী চওড়া করিয়া, ঠিক সোজা ভাবে খড়ির চিহ্নিত অংশ হইতে সরু-মুখ কাঁচির দ্বারা কাটিয়া লইতে হইবে। তার পর এই কাটা অংশ (মুখগুলি) ওরমা সেলাই দ্বারা সেলাই করিতে হয়। ওরমা সেলাই হইয়া গেলে, একটা সূঁচে মোটা সূতা লইয়া, ঐ বোতাম-ঘরের শেষ দিকের নীচে হইতে ১/৮ ইঞ্চি দূরে সোজা ফোঁড় উঠাইয়া, সেলাই আরম্ভ করিবে; এবং উহা ডান দিকে রাখিয়া, লবের দিকটা বাম দিকে রাখিতে হইবে। সূঁচ ডান দিকে নীচে হইতে উপরে উঠাইতে হইবে। আর প্রতি বারেই সূঁচে লাগান সূতা দিয়া সূঁচের মাথায় একটী করিয়া ফাঁস বা গেরো দিতে হইবে। আর সমান ভাবে টানিতে হইবে। সূতা টানিলেই প্রতিবারে প্রতি ফোঁড়ে একটী-একটী করিয়া গেরো পড়িবে। ফাঁসগুলি এক সমান ভাবে পড়িতে থাকিবে। গাঁটগুলি টান বা ঢিলা না হয়। সকল টান যেন সমান জোরের হয়। তাহা হইলে সমস্ত ফাঁস-গুলি একরূপ টাইট হইবে। এইরূপে প্রতি ফাঁসগুলি সোজা ভাবে ক্রমান্বয়ে গোল হইয়া ঘুরিয়া আরম্ভের জায়গায় আসিবে। তার পর প্রথম ফোঁড়ের মুখে ও শেষ ফোঁড়ের মুখে কয়েকটী

ফোঁড় টেঁকে, নীচের দিকে গেরো দিয়া লইতে হইবে। ইহাতে আর একটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে,—বোতামের ঘর সেলাই করিবার পূর্ব্বে সূঁচে সূতা লইবার সময় যাহাতে ঐ সূতায় সম্পূর্ণ বোতামের ঘর তৈয়ারী হয়। বোতামের ঘরে সূতায় গেরো দেওয়া চলে না। বোতাম-ঘর সেলাইয়ের পর লবের দিকের ফুটোয় কাঁচির মাথার দ্বারা একটু জোরে টানিয়া দিলে, ঘর দেখিতে সুন্দর হয়।

বোতাম টাকা বা বোতাম বসান। জামা সেলাই হইয়া গেলে, খুলিবার ও বন্ধ করিবার জন্য যে সুবিধা করা যায়, সে জন্য বোতাম ঘর ও বোতাম টাঁকা দরকার হয়। এই বোতাম টাঁকিতে হইলে, খুব মোটা সূতা বোতামের রংয়ের ও কাপড়ের রংয়ের এক হওয়া চাই। তার পর বোতাম ঘরের সোজাসুজি লব হইতে অন্ততঃ ১ ইঞ্চি দূরে চিহ্ন করিয়া লইতে হইবে। পরে নীচের দিক হইতে বোতামের ছিদ্রের অংশ দিয়া ফোঁড় উঠাইয়া দ্বিতীয় ফোঁড়ে দিয়া, নীচের দিকে সূঁচকে লইতে হইবে। সেই সূঁচ আবার তৃতীয় ফোঁড় দিয়া উঠাইয়া চতুর্থ ফোঁড়ে নীচে নামিবে। তার এই ভাবে দুই তিনবার উঠা-নামার পর, বোতামকে টানিয়া ধরিয়া গোড়ায় পেটের দিলে, ৪।৫ বার জড়ানের পর, নীচের দিকে সূতা লইয়া গিয়া গেরো দিলে বোতাম টাঁকা হইল।

প্রাইভেট টিউটর

[শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু, বি-এস্‌সি]

(১)

বেলা ১১টা বাজিতে ৫ মিনিট বাকী। চোখে রিম্‌লেস চশ্‌মা-আঁটা, টেরীকাটা চিত্রকুমার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ফুটপাথের উপর দিয়া কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছিল। লোকবহুল পথে পথিকের পদপিষ্টনে বাঁ পায়ের স্লিপারটা ছিঁড়িয়া বারংবার পদচ্যুত হইয়া, তাহার দ্রুত গমনে বাধা জন্মাইতেছিল; তথাপি কলেজের পুঁথিগুলি বগলচাপা করিয়া সে সাধ্যমত ছুটিতেছিল; এবং পুনঃ-পুনঃ হাতঘড়িটায় চক্ষু বুলাইতেছিল। প্রথম ঘণ্টায় যে অধ্যাপকের ক্লাস,—ছেলেদের পরস্পর বন্দোবস্ত সত্ত্বেও, সে ঘণ্টায় proxy দেওয়ার সুবিধা নাই,—অথচ ঠিক এই উপস্থিতিগুলিই তাহার কম।

সারাটা সকাল বেলা একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাস লইয়া কি করিয়া পাঞ্জাব মেলের গতিতে কাটিয়াছে, সে টের পায় নাই। কাজেই উচ্চৈঃশ্রবার অনুকরণে এখন তাহার ক্ষতি-পূরণ করিতে হইতেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এম্নি দিনে ট্রামও বন্ধ। নস্য ঝাড়িবার খাকির রুমালটা ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল। জানালা-কাটা গেঞ্জি ভেদ করিয়া আদির পাঞ্জাবীটা পৌষের পূর্ব্বাহ্নে আর্দ্র হইয়াছিল। কিন্তু গোল-দীঘির কাছে আসিয়া, একটা গ্যাসপোষ্টের কাছে লোকের ভিড় দেখিয়া, কৌতূহলী হইয়া সে থামিয়া পড়িল। এই সব থামের গায়ে বিজ্ঞাপনে মাঝে-মাঝে বেশ মজার সন্ধান মেলে। সে বিজ্ঞাপনে একবার চক্ষু বুলাইয়া, ক্ষণতরে percentageএর কথা ভুলিয়া গেল,—তাহা এমনি চমকপ্রদ। ভিড় কমিলে সে একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া, হঠাৎ বিজ্ঞাপনখানি ছিঁড়িয়া লইয়া পকেটে পুরিল; এবং পকেটে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া কৌশলে তাহা পড়িতে-পড়িতে কলেজের দিকে ছুটিল।

সৌভাগ্যক্রমে অধ্যাপকটি তখনও অনুপস্থিত; এবং সেই সুযোগে পোড়োরা ক্লাশটাকে "মেছোহাটা" করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সে অন্যান্য দিনের মত সেই হট্টগোলে যোগ না দিয়া, লক্ষ্মী ছেলেটির মত ক্লাশের এক নির্জ্জন কোণে বসিয়া, অন্যের অলক্ষিতে বিজ্ঞাপনখানি কৌশলে বহির পাতায় আনিয়া, বই পড়িবার ছলে তাহাই পড়িতে লাগিল। বিজ্ঞাপনটি ইংরাজিতে, তাহার বাঙ্‌লা তরজমা এইরূপ—

"চাই—

বেথুন স্কুলে মেট্রিকুলেশন ক্লাশে পড়ে, এমন একটি ছাত্রীর জন্য একজন সুযোগ্য প্রাইভেট টিউটর আবশ্যক। ইংরাজি ও অঙ্কে বিশেষ পারদর্শী হওয়া চাই। বেতন যোগ্যতানু-সারে।.........."

নীচের খানিকটা অংশ কে বা কাহারা পূর্ব্বেই ছিঁড়িয়া লইয়াছিল,—কাজেই স্বাক্ষরকারীর নাম মিলিল না। আরও নিম্নের অংশ একেবারে ছিঁড়ে নাই,—ছেঁচ্‌ড়াইয়া গিয়াছে।

অনেক আয়াসের পর চিত্রকুমার বুঝিতে পারিল, যেন সেখানে ৪ নং পালপাড়া লেখা ছিল। ঠিকানা উদ্ধার করিয়া চিত্রকুমার সহসা এত পুলকিত হইয়াছিল যে, প্রাচীন প্রস্তরফলকের লিপি উদ্ধার করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ও এতটা হয় না। বিজ্ঞাপনে এমন রোমাঞ্চকর বা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, যাহা লইয়া কাহারও এত উত্তেজিত হইবার কথা। কিন্তু নানাদেশের রোমান্টিক উপন্যাস পড়িয়া, রোমান্সের উপযোগী যথেষ্ট মাল্‌-মসলা চিত্রকুমার মস্তিষ্কে জড় করিয়া রাখিয়াছিল। সে উর্ব্বর কল্পনা-সাহায্যে ধাঁ করিয়া ছাত্রীটির চেহারার একটা নক্সা আঁকিয়া, তৎসঙ্গে একটা পুরাদস্তুর উপন্যাস খাড়া করিয়া ফেলিল; যথা,—মেয়েটি মেট্রিকুলেশন ক্লাশে পড়ে, কাজেই বয়স ষোল সতের;—উদ্ভিন্ন-যৌবনা, অঙ্গের বেলায় যৌবনের তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সে নিবিড় কালো চুলের বেণী পিঠে এলাইয়া, কুচি দেওয়া কাপড় পরিয়া প্রত্যহ স্কুলে যায়,—সন্ধ্যায় অর্গান বাজাইয়া গান করে;—অবসরে কাব্য-উপন্যাস পড়ে। সে সপ্রতিভ, রসিকা,—মাষ্টারের কাছে পড়িতে-পড়িতে টানা চোখের অপাঙ্গ-দৃষ্টি হানিয়া, ঠোঁটে জ্যোৎস্না খেলাইয়া, সরস গল্প জুড়িয়া দিবে। হয় ত মাঝে-মাঝে অর্গান বাজাইয়া শুনাইবে, এবং নিজ-হাতে চা তৈয়ারী করিয়া দিবে, ইত্যাদি।

সঙ্গে-সঙ্গে তাহাকে এক অদ্ভুত খেয়াল চাপিয়া বসিল। আচ্ছা, ক'দিন এই ছাত্রীকে পড়াইলে হয় না? দোষ কি? জীবনে বেশ একটা নূতনতর অভিজ্ঞতা জন্মিবে। এক-ঘেয়ে ভেতো বাঙ্গালী-জীবনের মাঝে একটুখানি রোমান্সের সাড়া পাওয়া মন্দ কি? 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' গোছের একটু অনাস্বাদিত রসের স্বাদ লাভ করিয়া, অবস্থা-দৃষ্টে সরিয়া পড়িলেই হইল। এই বিস্তীর্ণ স্থানে কেই বা কাকে জানে?… চিত্রকুমার যতই এ সব ভাবিতে লাগিল, ততই যেন খেয়ালটা তাহাকে পাইয়া বসিল। বরাবরই সে একটু খামখেয়ালী স্বভাবের এবং তরলমতি। যে ইন্দ্রিয়টি দর্শনের জন্যই সৃষ্ট, তাহার যদৃচ্ছ ব্যবহারে দোষ কোথায়, তাহা সে সম্যক্‌ বুঝিয়া উঠিত না; এবং বিবাহের পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের পরও, সে সুযোগ বুঝিয়া, মেসের পাশের ছাদে বা খোলা গাড়ী মোটরে দৃষ্টি প্রেরণ করিত; এমন কি, ধর্ম্ম-মন্দির-বিশেষে সকলের যখন চোখ বুজিবার কথা, সে চশমার আড়ালে মিটি-মিটি করিয়া ইতি-উতি চাহিত। কিন্তু তথাপি পত্নীকে সে যথাবিধি প্রেমলিপি পাঠাইত।

(২)

মেসে ফিরিয়াও তাহার খেয়ালটা দূর হইল না। ষ্টোভ ধরাইয়া শীঘ্র চা-পর্ব্ব শেষ করিয়া, ওবেলা ক্ষৌরকর্ম্ম সত্ত্বেও সে আবার ক্ষুর লইয়া বসিল; এবং উত্তেজনায় দু-এক স্থান কাটিয়া ফেলিল। আয়নার কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইল, মুখে স্নো-পাউডার ঘসিল। তার পর শ্বশুরের প্রদত্ত ফিন্‌ফিনে ধুতি, পাঞ্জাবী, চাদরে সাজিয়া, সরু ছড়ি হাতে নীচে নামিল। বারান্দায় হাণ্ট্‌লী পামারের বিস্কুটের যে টিনটা চিঠির বাক্স রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাতে নিজের নামীয় একখানি এন্‌ভেলপ পাইয়া, তাহা না খুলিয়াই বুক পকেটে রাখিল; এবং মৃদু শিস্‌ দিতে-দিতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। একটা পানের দোকানের সাম্‌নে, লম্বমান দড়ির আগুনে সিগারেট ধরাইবার ছলে, বেশ করিয়া আপনার প্রতিবিম্বখানি দেখিয়া লইল। তার পর ছড়িখানি মৃদু আন্দোলন করিয়া দ্রুতপদে গন্তব্য পথে চলিল। পথে সহপাঠী ধীরেশ তাহার নটবর বেশ দেখিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসিল, "একেবারে নতুন জামাই? কোথা যাচ্ছ হে?"

চিত্র এড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "যেথা যেতে আছে।"

"ওঃ, তোমার শ্বশুর এসেছেন না কি?"

"খুড়শ্বশুর" বলিয়া চিত্র অন্য ফুটপাথ ধরিল।

নানা গলি ঘুরিয়া যখন সে পালপাড়ায় পৌছিল, তখন সন্ধ্যা। বাতিওয়ালা কাঁধে মই ফেলিয়া তখনো এদিকটায় দর্শন দেয় নাই। ফিরি-ওয়ালারা বিচিত্র কণ্ঠে হাঁকিতেছিল—'অবাক্‌ জলপান, ঘুঙ্‌নি দানা।'

৪নং বাড়ীটার সাম্‌নে আসিয়া সে অকারণে ঘামিয়া উঠিল,—বুকটা টিপ্‌ টিপ্‌ করিতে লাগিল। তখন সে মনকে চোখ ঠারিয়া বুঝাইল, সে ত অপকর্ম্ম করিতে আসে নাই। শ্বশুরের কাছে হাত না পাতিয়া, প্রাইভেট টুইশানী দ্বারা নিজের হাত-খরচ চালান বরং গৌরবের বিষয়; এবং টুইশানী করিবার সময় ছাত্র-ছাত্রী বাছিতে গেলেও চলে না।

সে দ্বারের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। দুয়ার বন্ধ। তখনো মনের দ্বন্দ্ব শান্ত হয় নাই,—কড়া নাড়িবে কি না, যেন

স্থির করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় একটা ফিরি-ওয়ালা ঠিক এই বাড়ীর সামনেই হাঁকিল,—

"এক জিনিসে চার ভাজা,
খেতে লাগে বড় মজা,
কোথা লাগে কোর্ম্মা, খাজা,—
কুড়-মুড় কুড়-মুড় কুড়-মুড় কুড়-মুড় গড়ম্ গড়ম্।"

উপরের একটা জানালা খুট্ করিয়া খুলিয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে চুড়ির মিঠা আওয়াজ হইল টুং টুং। চিত্রকুমারের চশ্‌মা-ঢাকা চোখ আপনি সে দিকে ঘুরিল। শব্দকারিণী কিশোরী,—সে হাঁকিয়া বলিল, "মণ্টে ভাই, পয়সা দিচ্ছি যা না,—চার ভাজা কিনে আন" এবং সঙ্গে-সঙ্গে, বোধ করি পয়সা দিবার জন্য, কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। ততক্ষণে চিত্রকুমারের কাণ দুটি গরম হইয়া উঠিয়াছে। মুহূর্ত্তের ভিতর সে আঁচ করিয়া লইল, ঐ সুন্দরী কিশোরীটিই ছাত্রী; তাহার বুকটা খুব টিপ্ টিপ্ করিয়া উঠিল।

কচি পায়ের জুতার শব্দ হইল,—পরে দ্বার খুলিয়া গেল। একটি সুশ্রী বালক বাহির হইয়া ডাকিল—"হেইও গড়ম্ গড়ম্।"

ফিরি-ওয়ালা ফিরিয়া আসিয়া, কাঁধের ঝুলিটায় হাত পুরিয়া দিয়া, পুনর্ব্বার বিচিত্র স্বরে হাঁকিল। বালক বলিল, "কি আছে ওতে?"

"এক জিনিসে চার-ভাজা। খুব ভালো জিনিস খোকা বাবু, খুব আচ্ছা। এক দিন খেলে রোজ খেতে চাইবে। ক'পয়সার দোব?"

"আট পয়সার দাও। আমার মেজদি এ খেতে খুব ভালোবাসে,—বড়দি, ছোটদিও।"

"হাঁ,—খুব ভালো জিনিস কি না। এই নাও, আর এইটে তোমায় এগ্নি দিলুম।"

"এগ্নি দিলে! তুমি ত বড্ড ভালোমানুষ। যাই, দিদিদের বলিগে'—তুমি আমায় এটা এগ্নি দিয়েছ।"

ফিরি-ওয়ালা মৃদু হাসিয়া বিচিত্র স্বরে হাঁকিয়া প্রস্থান করিল।

চিত্রকুমার বেচা-কেনা দেখিতেছিল। এইবার অগ্রসর হইয়া বালককে বলিল, "তোমার নাম মণ্টু বুঝি? আচ্ছা, দেখ মণ্টু বাবু, বাবু বাড়ী আছেন?"

বালক ফিরিল। মণ্টু বাবু বলাতে সে ভারি খুসী হইয়াছিল। প্রসন্ন কণ্ঠে বলিল, "কোন্ বাবু, বড়বাবু ছোটবাবু?"

"বড়বাবু।"

"তিনি খানিকক্ষণ হ'ল বেরিয়েছেন।"

"কখন ফিরবেন?"

"দেরী হবে। তিনি অনেকের সঙ্গে দেখা কর্ব্বে কি না।"

"আর ছোটবাবু?"

বালক গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমিই ত ছোটবাবু আপনার কি চাই বলুন না।"

"তুমি?" বলিয়া চিত্রকুমার হাসিল। বালক বলিল, "হাঁ। আপনার যা দরকার আমায় বলুন,—আমি বাবা এলে বলব। বসুন না, আমি পান নিয়ে আসি।"

বালক ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। চিত্রকুমার বালক হইতে ঈপ্সিত সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য বাহিরের ঘরে বসিল; এবং একবার ভিতরের দিকে তাকাইয়া, কি ভাবে কথার অবতারণা করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। একটু পরে বালক একডিবা পান আনিয়া বলিল, "পান খান।"

দুটা পান মুখে পুরিয়া, একটু কাশিয়া, চিত্রকুমার বলিল, "বাড়ীতে আর কেউ আছে?"

"মা আছেন, বড়দি, মেজদি, ছোটদি, রঙ্গিয়ার মা, নিধে—কাকে আপনার দরকার বলুন না?"

"না এদের কাকেও না।...তা তুমিই হয় ত বলতে পার্ব্বে মণ্টু বাবু। আচ্ছা, তোমাদের বাড়ী কি মাষ্টার রাখা হবে?" জিজ্ঞাসা করিয়া চিত্রকুমারের ললাটে স্বেদ সঞ্চার হইল। তাহা মুছিবার জন্য পকেট হইতে রুমাল বাহির করিবার সময় চিঠিখানি মেঝেয় পড়িয়া গেল। চিত্রকুমার বা বালক কেহই তাহা দেখিল না।

"আপ্‌নি মাষ্টার মশায়?" বলিয়া বালক শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ের সহিত তাহার চশ্‌মা-মণ্ডিত মুখের পানে তাকাইল।

চিত্রকুমার বলিল "হাঁ।"

বালক বলিল, "আপনার বেত কৈ?"

চিত্রকুমার হাসিয়া বলিল "আছে, কিন্তু ওটা বেড়াবার।"

"ওঃ, বেড়াবার। আপনি মারেন না বুঝি? আপনি ত বড় ভালো মাষ্টার।"

"হাঁ, আমি মারি না। খুব আদর করি, গল্প বলি। মণ্টুবাবু বল্‌তে পার, তোমার দিদিদের জন্য মাষ্টার রাখা হবে কি? মাষ্টার ঠিক হয়েছে কি?"

বালক বিজ্ঞভাবে বলিল, "দূর্, দিদিরা যে মেয়েমানুষ।"

"দিদিরা তাই। তুমি একবার ভেতর থেকে জেনে এসো ত মণ্টুবাবু। তুমিও আমার কাছে পড়্‌বে। আমি কাউকে মারি না,—কত গল্প জানি।"

"রাক্ষস-খোক্কস, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, সাত ভাই চম্পা—এ সব জানেন?"

"হাঁ, সব জানি। তুমি জিজ্ঞেস করে এসো দিকিন।"

বালক আনন্দে প্রায় নাচিয়া বলিল, "ওঃ, কি মজা হয় তা' হলে। আপনি থাকুন মাষ্টার মশায়,—আপনি বড় ভালো। যাই, আমি বলে আসি। কৈ, আপনি আর পান খেলেন না?"

চিত্রকুমার আরও দুটি পান মুখে পুরিয়া বলিল, "তুমি ত ভারি এটিকেট-দুরস্ত, মণ্টুবাবু, না?"

মণ্টু প্রস্থান করিতেছিল; কিন্তু চেয়ারের পেছনে একটা এনভেলপের চিঠি দেখিয়া, তাহাদের চিঠি মনে করিয়া, নিঃশব্দে কুড়াইয়া লইল। আকাশ-কুসুম রচনায় মগ্ন চিত্রকুমার তাহা জানিলও না।

(৩)

উপরের ঘরে সেই সময় কমলা, রমলা ও তরলা বসিয়া, 'এক জিনিসে চার ভাজা'র সদ্ব্যবহার করিতে-করিতে, নানা গল্প-গুজবে মস্‌গুল ছিল। তরলা মণ্টুবাবুর সহোদরা। কমলা ও রমলা ইহাদের খুড়তুতো বোন,—বিবাহিতা। তরলার বাপ উমেশবাবু সিমলাতে বড় কাজ করিতেন,—কলিকাতায় বদ্‌লী হইয়া অদ্য প্রাতে এই বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছেন। আসিবার সময় বাড়ী হইয়া আসিয়াছেন; এবং তথা হইতে কলিকাতার দর্শনীয় জিনিসগুলি দেখাইবার জন্য, ভ্রাতুষ্পুত্রী দুটিকেও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন।

তরলা অনূঢ়া; কিন্তু ভারি দুষ্টু। দু'এক স্থান হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিতেছে; এবং অজানা সুখের ছোটখাট ঢেউ মনের গোপন বেলায় ভাঙ্গিতেছে। কাজেই এই বিবাহিতা দিদিদের খোঁচাইয়া তাদের ফন্তটির সন্ধান করিতে তাহার যথেষ্ট আগ্রহ।

কমলা প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত সঙ্কোচের বড় ধার ধারে না। তাহার বিবাহ হইয়াছে এই পাঁচ বৎসর। একটি ছেলেও জন্মিয়াছে। কাজেই নিজেকে পাকা গৃহিণীর সু-উচ্চ আসনে বৃত করিয়া, সে স্বচ্ছন্দে স্বামীর কথা, শ্বশুর-ঘরের কথা কহিতে পারে। কিন্তু রমলা এখনও অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কুসুম-কোরকের মত নিজের অনেক কথাই গোপন করিতে চায়। তাহার বিবাহ হইয়াছে মোটে এক বৎসর। সেই সুযোগে কমলা ও তরলা তাহাকে খোঁচা দিতেছিল।

কমলা বলিল "বল্ ত তু'র, রমা কি ভাবছে?"

তরলা বলিল "কি ভাবছে? ভাবছে, কখন প্রাবৃটের অন্ধকার দূর ক'রে, পূর্ণিমার চাঁদের অকলঙ্ক গৌরবে তার হৃদয়চন্দ্র হৃদিস্থলে এসে দর্শন দান কর্বেন।" কমলা হাসিয়া বলিল, "ঠিক বঙ্কিমবাবুর ভাষায় বলেছিস্। ভয় নেই রমা,—তোর হৃদয়-সর্ব্বস্ব এলেন বলে। জ্যেঠাবাবু নিজে গেছেন। আর জ্যেঠাবাবুর কষ্ট করে না গেলেও হত। বুঝলি তরি,—মেয়েটি কম সেয়ানা নয়,—সব বন্দোবস্ত ক'রে তবে বাড়ী থেকে পা বাড়িয়েছেন। যথাসময়ে যথাস্থানে ঠিকানা সমেত চিঠিও গেছে।"

তরলা গালে হাত দিয়া রঙ্গ করিয়া বলিল, "সত্যি না কি?

কমলা বলিল, "নয় ত কি মিথ্যে। কি লিখেছিস্ রে রমা? এসো, এসো নাথ,—আমার খোঁপা-শুদ্ধ মাথাটার দিব্য রইল, যেন ওখানে গিয়েই তোমার চন্দ্রবদন দেখ্‌তে পাই। আমি তোমার পথপানে ডব্‌কা-ডব্‌কা চোখ তুলে চেয়ে থাকব।—

আমি তোমার পথ চাহিয়া, রব জানালার ধারে বসিয়া,
তুমি চশ্‌মা পরিয়া, ছড়ি ঘুড়াইয়া, সন্ধ্যে বেলায় আসিও।
নয়রে?"

তরলা উচ্ছ্বসিত হাস্যে বলিল, "বাঃ, বড়দি যে কবি হয়ে গেলে!"

রমলা আরক্ত মুখে দিদিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "যাও! ভারি বিশ্রী তুমি।"

কমলা বলিল, "তাই ত বলে 'ন ব্রূয়াৎ সত্যম্-প্রিয়ম্।' বাবু, আমার কাছে ঢাকাঢাকি নেই। আমার হলে ত এ রকমই হত। আর আমি কি কর্ত্তেম, জানিস্?"

তরলা আগ্রহভরে বলিল, "কি কর্ত্তে বড়দি, বল না ?"

কমলার প্রতি দুষ্ট কটাক্ষ হানিয়া বলিল, "নিখেকে একটা টাকা কবুল করে, একখানা গাড়ী দিয়ে পাঠাতেম। তার পর সুগন্ধি তেলে বেণী বেঁধে, কপালে কাঁচপোকার টিপ কেটে, জানালার গরাদে ধরে, রাস্তার পানে চেয়ে, গুন্ গুন্ করে—"

রমলা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। তরলা হাসিতে-হাসিতে মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

ঠিক এমনি সময়ে মণ্টু আসিয়া সোৎসাহে বলিল, "দিদি, বড়দি, তোমরা মাষ্টার রাখ্‌বে? ভালো মাষ্টার, খু—উ—ব ভা—আ—লো।" তাহার বর্ণনার ভঙ্গীতে সকলে হাসিয়া উঠিল। তরলা বলিল, "এক পয়সায় ক'টা রে ?"

মণ্টু বলিল, "ধ্যেৎ! মাষ্টার বুঝি এক পয়সায় অনেক পাওয়া যায়? মটর নয়—মাষ্টার, পড়াবার মাষ্টার। চোখে চশ্‌মা, হাতে ঘড়ি, সুন্দর মাষ্টার।"

কমলা বলিল, "তা সুন্দর মাষ্টারে আমরা কি কর্ব্ব রে? আমাদের সুন্দর মাষ্টার আছে।"

মণ্টু বলিল, "ছাই আছে! এ মাষ্টার কত গল্প জানে।"

কমলা রঙ্গ করিয়া বলিল, "আমাদের মাষ্টারও কত গল্প বলে—সারারাত।" বলিয়া রমলার পানে চাহিল।

রমলা রাঙ্গা মুখে বলিল, "ভারি অসভ্য তুমি!"

মণ্টু সহানুভূতি পাইয়া বলিল, "তুমি রাখ-না মেজদি,—বড়দি রাখ্‌বে না। বড় ভালো মাষ্টার,—কত আদর কল্লে আমায়,—তোমায়ও কর্ব্বে।"

তরলা উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "রাখ না মেজদি,—খুব আদর কর্ব্বে।"

রমলা আরক্ত মুখে বলিল, "তোর দরকার থাকে, রাখ্‌ না।"

মণ্টু প্রায় নাচিয়া বলিল, "তা'হলে তুমিই রাখ ছোটদি। ওরা ত শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে। আমি বলে আসি।"

তরলা বলিল, "থাক্‌বে তোর মাষ্টার কাণা কড়িতে ?"

মাষ্টার মহাশয়-রূপ মহামহিমান্বিত লোককে মাহিনা বাবদ কিরূপে কাণা কড়ি দেওয়া চলে, মণ্টু ভাবিয়া হতবুদ্ধি হইল। ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "যাও, রাখ্‌বে না তোমরা!" বলিয়া দুপদাপ করিয়া ফিরিয়া চলিল।

তরলা পিছু ডাকিয়া বলিল, "কার চিঠি রে, তোর হাতে ?"

"বাবার!"

"দেখি, দেখি" বলিয়া চিঠিখানা পড়িয়া, তরলা বলিল, "বাঃ, এ চিঠি এখানে এলো কি করে? মেয়ে-হাতের লেখা,—মেজদিদির ছাঁদ।' নামটাও যে জামাইবাবুর।" এক ঝলক রক্ত রমলার গণ্ডে আবির্ভূত হইল। কমলা বলিল, "চিত্রকুমার দত্ত, ৬৫।২।৩ নং হ্যারিসন রোড। চিত্রের ঠিকানা কি রে রমা? দেখি চিঠিটা।...আরে: এ যে রমার লেখা। চিঠি খোলা হয় নি,—অথচ পোষ্টাপিসের শিল-মোহর নিয়ে এখানে এল কি করে? আশ্চর্য্যি ত!"

রমলা অবাক হইল। বাড়ী হইতে রওনা হইবার পূর্ব্বে সত্যই সে স্বামীকে এই চিঠি লিখিয়াছিল। তাহা আজই যথাস্থানে পৌছিবার কথা। কিন্তু তাহা এ ভাবে এখানে আসিল কি করিয়া? সঙ্গে-সঙ্গে তাহার ভয় হইল, এখনি যদি ইহারা চিঠিখানি খুলিয়া বসে! মিলন-প্রয়াসিনী বিরহিনীর তপ্ত প্রাণের অনেক উচ্ছ্বাসই এখানিতে আছে।

কিন্তু কমলা ও তরলা চিঠি খুলিবার দিক দিয়া গেল না। তাহারা মণ্টুকে অন্য ঘরে লইয়া, নানা ভাবে জেরা করিয়া যাহা জানিল, তাহাতে তাহাদের মনে একটা সন্দেহের ছায়াপাত হইল।

কমলা বলিল, "চল্, দেখে আসি, সেই কি না। আজ-কালকার ছোক্‌রাদের বিশ্বাস নেই। হয় ত শুনেছে, কোথায় কোন্ ধাড়ী মেয়ের প্রাইভেট মাষ্টারের দরকার,—অমি ভাব্‌ল, মজা কর্ব্বার এই এক মস্ত সুযোগ।...কিন্তু এ ঠিকানায় হাজির হল কেন?"

তরলা একটু ভাবিয়া বলিল, "চৌদ্দ নম্বর বাড়ীতে এক লেডী ডাক্তার থাকে। বোধ করি সেখানে দরকার; ঠিকানা ভুল করে এখানে এসে হাজির।"

কমলা বলিল, "অসম্ভব নয়। হয় ত পথে বিজ্ঞাপন দেখেছে,—৪ না ১৪ নম্বর ঠিক ঠাহর কর্ত্তে পারে নি। নেশার ঝোঁকে রমার চিঠিও পড়ে নি। ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়েছে কি না,—তাই আমাদের আসার খবরও পায় নি। কি বিতিকিচ্ছি জাত এই পুরুষগুলো! চল্ ত, দেখে আসি।"...

(৪)

নীচে নামিয়া, পুরু, কালো পর্দ্দার আড়াল হইতে মাষ্টারকে দেখিয়া তাহারা নিঃসন্দেহ হইল। কমলা নিম্নস্বরে বলিল "হাঁ, এই চিত্র। বিয়ের আগে এ রোগ কারু-কারুর থাকে,—কিন্তু বিয়ের পর—আশ্চর্য্য! এ ভাবে মজা কর্ত্তে গিয়ে কত ছেলের পা ফস্কে যায়। জানিস ত, সুধীন বাঁড়ুয্যের কেলেঙ্কারী।"

তরলা বলিল "মেজদি বড় ভালমানুষ,—রাশ টেনে রাখ্‌তে জানে না। ওরা যে উচ্ছৃঙ্খল ঘোড়া,—ওষুধ খালি শক্ত রাশ। অদ্ভুত এই চিত্রবাবু। একটা ধেড়ে মেয়েকে পড়াবার কল্পনা,—লজ্জাও নেই।"

কমলা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "লজ্জা আবার! আসাই ত কু-মৎলব নিয়ে। ঘরের যেটা, তা ত আছেই। ভাব্‌ল, বাইরে একটু ইয়ার্কি, ফূর্ত্তি বই ত নয়! আর এ বড় সহরে কেই বা জান্‌বে। অথচ রমাকে চিঠি লেখে,—যেন রমাগত প্রাণ! এম্নি কপট!"

তরলা বলিল, "রাখ এবার,—যাদুকে শিখিয়ে দিচ্ছি, যেন এ পথে আর পা না বাড়ায়। আমি ছাত্রী সাজ্‌ব। বিয়ের সময় দু'দিনের জন্য আমায় দেখেছিল—এক বচ্ছর আগে। আমার চেহারা ঢের বদ্‌লে গেছে,—এখন চিন্তে পার্বে না।"

এ দিকটায় ফিস্‌ফিসানী ও চুড়ির আওয়াজ শুনিয়া চিত্রকুমার দু একবার চোরাচাহনী নিক্ষেপ করিতেছিল। "দেখলি চুড়ির আওয়াজে কাণ কেমন দুরন্ত!"

ত্বরিতে প্রসাধন শেষ করিয়া, কয়েকটি পুঁথি হাতে করিয়া, তরলা লঘু পদক্ষেপে চিত্রকুমারের সম্মুখীন হইল। দিদিদের চপল পরিহাসে ভ্যাবাচাকা খাইয়া, মণ্টু আর এদিকটায় আসে নাই। এমন ভাল মাষ্টারকে উত্তর দিবার মত তাহার কিছুই ছিল না। তথাপি অটল ধৈর্য্যের সহিত চিত্রকুমার অপেক্ষা করিতেছিল কেন, তাহা সেই জানে।

সহসা সুসজ্জিতা, ঈষদুদ্ভিন্ন-যৌবনা, বিদ্যুদ্বরণা অপরিচিতাকে সমীপবর্ত্তিনী হইতে দেখিয়া, সে আঁৎকিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। সুন্দরী ছাত্রীটির এইরূপ অতর্কিত সাক্ষাতের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। আড়াল হইতে চোরা চাহনী নিক্ষেপে পটু হইলেও কোন ভদ্র কুমারীর চোখে-চোখে চাহিবার মত দুঃসাহস তাহার ছিল না,—ঐটুকু তাহার দুর্ব্বলতার বিশেষত্ব।

তরলা বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলিল, "বসুন মাষ্টার মশায়। প্রাইভেট টিউটর রাখা হবে কি করে জান্‌লেন?"

চিত্র ঘামিয়া উঠিতেছিল; বলিল, "গোলদীঘির ধারে—বিজ্ঞাপনে—"

"আপ্‌নি কি স্কুল মাষ্টার?"

"না—হাঁ।"

"কোন্ স্কুলে?"

চিত্র ঢোঁক গিলিয়া মিথ্যা কহিল, "কটন স্কুলে।"

"তা হলে আপনি অর্ডিঞ্জি মাষ্টার। স্কুলে কি পড়ান?"

"ইংরাজি, অঙ্ক।"

"আপ্‌নি এম্-এ?"

"না—হাঁ;—এম্-এ।"

"বাবার ফির্‌তে দেরী হবে। আপনার পরিচয়টা যদি দয়া করে রেখে যান, তাঁকে জানাব। আপনার নাম?"

"শ্রী গোবর্দ্ধন তালুকদার।"

তরলার কুন্দ দন্ত বিকশিত হইল। সে বলিল "গোবর্দ্ধন! বড্ড সেকেলে নাম। না,—না, মাষ্টার মশায়, এ নাম শুন্‌লে বাবা পছন্দ কর্ব্বেন না। তিনি খুব আধুনিক কেতায় দুরন্ত কি না। বরং আপনাকে বাবার কাছে প্রভাত কুসুম, প্রসূনকান্তি বা চিত্রকুমার নামে পরিচিত কর্ব্ব।"

চিত্র তাহার প্রতি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিল; কিন্তু ছাত্রীটিকে পূর্ব্ব-পরিচিতা বলিয়া বোধ হইল না। তাহার চটুল কথাগুলি শুধু তাহার রক্তের স্রোত চঞ্চল করিয়া তুলিল। তরলা বলিতে লাগিল, "আমার নাম কিন্তু তরলা। আচ্ছা, তরলা, রমলা এ সব বেশ আধুনিক নাম, না? আচ্ছা, মাষ্টার মশাই, আপনি ত বিবাহিত। আপনার স্ত্রীর নাম যাই হোক, বদ্‌লে রমলা রাখুন।"

চিত্র বিস্ফারিত নেত্রে তাহার পানে চাহিল। তরলা বলিল "মাপ কর্ব্বেন মাষ্টার মশায়, একটু প্রগল্‌ভতা করে ফেলেছি। আম্‌রা ত হিন্দুসমাজের নই, যে ঘোম্‌টা দিয়ে কোণ-ঘেঁসা হয়ে থাক্‌ব। তারপর আপনাকে আমার অপরিচিত বোধ হচ্ছে না, মনে হয় আপনি চেনা, আমাদের নিকট সম্পর্কীয়, এবং আপনার সঙ্গে আমার রহস্য দোষণীয়ও নয়।" তার পর স্বর একটু গাঢ় করিয়া যেন আপন মনেই বলিল, "জানি না কেন, প্রথম দেখাতেই এক-এক-জনকে এত চেনা মনে হয়।"

চিত্রের মাথাটা চন্‌চন্ করিয়া উঠিল। সে ছাত্রীর ইন্দীবর নয়নের প্রতি চাহিল; এবং এক্ষেত্রে কি উত্তর করা সঙ্গত, তাহা ভুলিয়া যাইয়া, ক্রমাগত ঘামিতে লাগিল।

তরলা বহু কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিল, "আপনি বিবাহ করেছেন মাষ্টার মশায়?"

চিত্র অস্ফুট স্বরে বলিল "না।"

যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তরলা বলিল, "অবিবাহিত! হিন্দু সমাজের আপনি একটি ব্যতিক্রম বল্‌তে হবে। বেশ করেছেন মাষ্টার মশায়। বিয়েটা ত ছেলেখেলা নয়, যে, বাপ-মায়ের নির্ব্বাচনে একটা অচেনা হৃদয়কে নিজের সাথে গেঁথে তুলতে হবে। আজ প্রথম দিনেই কি যে আলাপ জুড়ে দিয়েছি। এ সব পরে হবে।—আপনি চা খান মাষ্টার মশায়?"

চিত্রের মাথার ভিতর তখন অপূর্ব্ব রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। সে যন্ত্র-চালিতের মত মাথা নাড়িল।

তরলা চা আনিল। তাহার মিষ্ট অনুরোধে চিত্র চা ও জলযোগ সমাপন করিল। সুন্দরীর পরিবেষণ—সে যে সাগর-সেঁচা সুধা!

মুখ মুছিতে যাইয়া হঠাৎ চিঠির কথা মনে পড়ায়, চিত্র পকেট খুঁজিতে লাগিল।

তরলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি খুঁজছেন মাষ্টার মশায়? চিঠি নয় ত—এটা কার?" তরলা চিঠি বাহির করিতেই, স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া, চিত্র তাহা হাত বাড়াইয়া লইয়া, পকেটে পুরিল। তাহাতেই তাহার প্রকৃত পরিচয়;—ভয়ে তাহার মুখ পাংশু হইল। তরলা কহিল, "ওঃ, আপনার! আমরা ভেবেছিলাম, হ্যারিসন রোডের চিত্র দত্তের চিঠি এখানে এলো কি করে? আন্দাজে তা হলে আপনার নাম ঠিক বলেছি। মাপ কর্ব্বেন, ভুলে এ চিঠী পড়ে ফেলেছি। মাষ্টার মশায়, আপনি মিথ্যা পরিচয় দিয়েছেন, আপনি বিবাহিত—"

চিত্রের মুখ শীশার মত কালো হইল। সে বার দুই কাশিয়া, ঢোক গিলিয়া বলিল, "এটা আমার নয়, আমার নয়, আমার বন্ধু যতীনের—

তরলা উচ্চহাস্যে বলিল—"যতীনের! পড়ুন ত শিরোনামাটা। কি মিথ্যেবাদী আপনি—ছিঃ। শিক্ষিত হয়ে আপনার এ সব মিথ্যা বল্‌বার প্রয়োজন! আচ্ছা সত্যি বলুন ত, কিসের অভাবে আপনি মাষ্টারীর জন্যে এসেছিলেন। আপনার শ্বশুর আমাদের অপরিচিত নন। পণ ও যৌতুক আপনাকে তিনি কম দেন নি, এখনো পড়ার খরচ যথেষ্ট দিচ্ছেন। তা ছাড়া যে অমূল্য কন্যারত্ন আপনার হাতে নিশ্চিন্ত মনে অর্পণ করেছেন, আপনার এ স্বভাব শুনে—"

চিত্র অপরাধীর মত হাত কচ্‌লাইয়া বলিল "না, না, আমার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মাষ্টারীটা লজ্জাকর, তাই আত্মগোপন—"

"মিছে কথা। মাষ্টারী কখনো লজ্জাকর নয়। সমস্ত চাকরীর ভেতর এ সবচেয়ে পবিত্র। কিন্তু আপনার পক্ষে লজ্জাকর, কারণ আপনি পঙ্কিল মন নিয়ে এসেছিলেন! কি ভেবে আপনি মেয়ে পড়াতে এসেছিলেন, আপনাকে আর বোঝাবার প্রয়োজন নেই। মানুষ জগৎকে ফাঁকি দিতে পারে, নিজের অন্তরকে নয়।...এ ক্ষেত্রে আমার কি করা কর্ত্তব্য জানেন? পুলিশ ডাকা, কারণ জঘন্য উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি ভদ্রলোকের অন্তঃপুরে ঢুকেছেন।"...

চিত্রকুমার ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ভয়ে, ঘৃণায়, লজ্জায় তাহার সকল ইন্দ্রিয় আড়ষ্ট হইতেছিল। এমন অজানা বিপদ যে তাহার স্বপ্নেরও অগোচর।

তরলা বলিতে লাগিল "আপনার কাছে আমার পড়া হতে পারে না, কোনও গৃহস্থ-কন্যারই নয়। তবুও মেয়ের প্রাইভেট টিউটরি কর্‌বার আপনার গোপন আগ্রহটা পূর্ণ হওয়া উচিত। আপনার ছাত্রী আমি নিয়ে আস্‌ছি।" সে উঠিয়া পাশের ঘর হইতে একটি তরুণীকে টানিয়া আনিয়া প্রায় তাহার কোলের কাছে ঠেলিয়া দিল। চিত্র লাফাইয়া ঘরের অপর প্রান্তে হুমড়ি খাইয়া পড়িল। তরুণীর বিস্ময় ধ্বস্তাধ্বস্তি সত্ত্বেও তরলা তাহার মুখের ঘোমটা সরাইয়া চিত্রকে বলিল "দেখুন ত চিত্রবাবু, কি চমৎকার ছাত্রী আপনার।" চিত্র বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল এ তাহারই স্ত্রী রমলা।

তরলা উচ্চহাস্য করিয়া কহিল—"এমন রূপযৌবনসম্পন্না ছাত্রী ঘরে থাকৃতেও পথে-বিপথে বিজ্ঞাপন খুঁজে মরেন চিত্রবাবু। একে পড়াতেই যে আপনার সমস্ত বিদ্যা উদ্ধার হবে। আজ থেকেই একে পড়ান ..।"

দ্বারের নিকট হইতে কমলা ডাকিয়া কহিল "এদিকে আয় তরি। মাষ্টারকে সমঝে দিয়ে আয়, ছাদ্‌নাতলায়

দাম্পত্যের মর্য্যাদা সে লঙ্ঘন করেছে। আর রমাকে বল তার কষ্টের শাস্তির ব্যবস্থা কর্ত্তে।"

তরলা হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া শিকল টানিয়া বলিল "সারারাত ছাত্রীকে পড়ান গোবর্দ্ধনবাবু, যেন কোনও পক্ষেরই আপশোষ না থাকে। মেজদি মাষ্টারকে ভাল করে মাইনে দিস্ ভাই, নৈলে আবার বেশী মাইনার মাষ্টারী খুঁজবে।"

প্রাইভেট টিউটরটি ঘরের ঐ প্রান্তে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত ঘামিতে লাগিল,—সাভরণা, সুন্দরী, যুবতী ছাত্রীটার পানে তাকাইবার সাহস তাহার লোপ পাইয়াছিল।

কড়া হাকিম

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

কড়া হাকিম জ্ঞানেন্দ্র দাস
নয় কো ত আর অন্য,
সপ্তাহ তিন কয়েদ দিতেন
ইক্ষু ভাঙার জন্য।
রাখাল-বাগাল আম পাড়িলে
দিতেন বেত্র-দণ্ড,
দয়া-মায়ার লেশ নাহিক,
চল্‌তো নীতি চণ্ড।

তামাকওয়ালা চন্দন সিং—
বহুৎ কাচ্ছা-বাচ্ছা,
আয়টা তাহার অল্প বটে,
লোকটা কিন্তু সাচ্চা।
বাজারে আর ধার মেলে না,
মহার্ঘ সব দ্রব্য;
তামাক তাহার ফুরিয়ে গেছে,
হয় না কিছুই লভ্য।

সুখের উপর দুঃখ নূতন
এসেছে আজ বন্যা,
দুদিন ধরে উপোস করে
কাঁদছে ছোট কন্যা।
নিরুপায় আজ চন্দন সিং
কর্‌ছে পূজা শিবকে,
বুঝতে নারে কেমন করে
রাখবে এত জীবকে।

কোথাও আহা ঋণ পেলে না,
ধার পেলে না তণ্ডুল,
ছেলে-মেয়ের শুষ্ক বদন
করলে সবই ভণ্ডুল।
বাজারেতে আড়তদার এক,
নাম বেহারী দত্ত,
সেই খানেতে হাকিম নিতেন
সকল জিনিসপত্র।

চন্দন সিং বল্লে তারে
'হুকুম দিলেন সরকার,
দাও দুটী মণ দাদখানি চাল,
শীঘ্র তাঁহার দরকার।'
দত্ত জানেন, দাদখানি চাল
খায় না কেউ আর অন্য,
দিয়ে দিলেন দরটা জবর
হাকিম বাবুর জন্য।

দুমণ চাউল আনন্দেতে
পৃষ্ঠে লয়ে চন্দন,
গৃহে গিয়েই গিন্নিকে তার
করতে বলে রন্ধন;
বলে 'ওগো, পেট ভরে খাও,
সুখেই কাটুক রাত্রি,
কালকে থেকে আমিই হব
জেলের পাকা যাত্রী।

নাইক উপায়, সবাই কে কি
উপোস করে মাসমধ্যে,
তাহার চেয়ে টানতে ঘানি
বছর খানেক প্যারবো।'

দুদিন পরে কোর্ট-দারোগা
বল্‌লে 'কোথা চন্দন'।
কর্‌লে তাহার হাত দুটাকে
হাতকড়াতে বন্ধন।

কাঠগড়াতে কর্‌লে হাজির,
চন্দন কয়, সত্য
দিয়েছিলেন দুমণ চাউল
ওই বেহারী দত্ত।
ছেলেপুলের দুদিন উপোস
বাজলো ব্যথা বক্ষে,
তাই হুজুরের নাম করেছি
করতে তাদের রক্ষে।'
হুজুর ছাড়া অন্যে কে আর
বুঝবে দীনের কষ্ট,
পাপ করেছি শাস্তি দিউন
বল্‌ছি কথা স্পষ্ট।'

কড়া হাকিম দৃষ্টি নত
বদন তাঁহার ফুল্ল,
বলেন ডেকে 'দুমণ চাউল,
নগদ কত মূল্য'
দত্ত কহেন 'চাইনে টাকা,
দিলাম আমি ভিক্ষা'
হাকিম বলেন 'হয় না তাহা,
দিতেই হবে শিক্ষা।'

ডেকে বলেন 'চন্দন সিং
পড়লে ধরা সদ্য,
সেই কারণে হাকিম আমি
হুকুম দিলাম অদ্য,—
আড়ত হতে যাঁহার নামে
আন্‌লে তুমি খাদ্য,
তিনিই তাহার মূল্য দিতে
আইন-মতে বাধ্য।

প্রথম যাঁহার নাম লেখায়ে
হিসাব তুমি খুল্‌লে,
তাঁর নামেতেই আনবে জিনিস
নিত্য বিনা-মূল্যে।

এই যে আইন বাহাল রবে
তিনটী মাসের জন্য।'
আদালতে উঠলো ধ্বনি
ধন্য, সাবাস্ ধন্য।

পথহারা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

একবিংশ পরিচ্ছেদ

চাঁদ অস্ত গিয়াছেন। পাথরের মতন কঠিন কালো আকাশে ছোট-বড় তারাগুলা যেন কাহাদের অযুত রোষ-কটাক্ষের মতই জলন্ত হইয়া আছে। গঙ্গার দুধারের গাছপালা, ঝোপঝাড় সমুদয়ই স্তব্ধ, কালো; এর কোথাও যেন একটা আলোর ছিদ্র পর্য্যন্ত নাই,—সমস্তটাই একটা ছেদশূন্য বিরাট অন্ধকার। সে অন্ধকারটাও আবার কেমন যেন একটা রহস্যে পরিপূর্ণ, থমথমে। ঐ অন্ধকার-দিগন্তে বিলীন তমসাবৃত নদীতীর, ঐ সংখ্যাহীন গগনবিহারী জ্যোতির্ম্মণ্ডলী, এই প্রখর ঝিল্লীরবমন্ত্রিত স্তব্ধ নিশীথিনী,—এরা সকলে মিলিয়াই যেন কি একটা অভাবনীয় ব্যাপারের জন্য সভয়-প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। তাহারই একাগ্রতায় সারা বিশ্বের যেন শ্বাসরোধ হইয়া গিয়াছে; তাহারই ভীতি-

শিহরণ শব্দহীন নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষে অতি মৃদু রোমাঞ্চে কণ্টকিত হইয়া আছে; তাহারই সাগ্রহ উন্মুখতায়, জলের ধারে নদীতীরের বাঁশঝাড়ে পর্য্যন্ত এতটুকু চাঞ্চল্যের ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। নদীর তরঙ্গগুলা পর্য্যন্ত যেন ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছে!

নক্ষত্রের স্বল্পালোকে নদীবক্ষে একখানি মাত্র নৌকা চলিতেছিল। আরোহী তিনজন যুবকের মধ্যে একজন হাল ধরিয়াছে,—দুজনের হাতে দাঁড়। দাঁড়ের উত্থান-পতন প্রায় নিঃশব্দেই চলিতেছিল। আর নৌকার তলায় প্রহত সলিলের অতি অস্ফুট বিলাপ-মর্ম্মরটুকু মাত্র একজন আরোহীরই মর্ম্মের তারে ঘা দিয়া-দিয়া, একটা মর্ম্মন্তুদ যাতনায় আকুল বিলাপের মতই বাজিতেছিল; অপর দুজনের সেদিকে লক্ষ্য-মাত্র নাই।

তিনজনেই নিস্তব্ধ। কথাবার্ত্তা ইহাদের মধ্যে কদাচিৎ এবং স্বল্পাক্ষর-যুক্ত। বহুক্ষণ নীরবেই কাটিবার পর, একজন একবার চাপা সুরে কথা কহিয়া বলিল—"তিনটেই তোমার কাছে, বিমল?"

যে হাল ধরিয়া ছিল, সে শুধু উচ্চারণ করিল, "হুঁ"—তার পর আবার তার সঙ্গীদের মধ্য হইতে তাহাকে কি একটা প্রশ্ন করা হইয়াছিল; সেটা সে নিজের চিন্তা-স্রোতে ভাসিয়া গিয়া শুনিতেও পাইল না।

বিমলের জীবনটা কেমন যেন একটা জটিলতার পাকে-পাকে জড়াইয়া গিয়াছিল। পাক খুলিতে সে চেষ্টা বড় কম করে নাই; কিন্তু জোট-পাকান জীবন-গ্রন্থিটাকে বেশ সরল করিয়া লওয়া কিছুতেই যেন সহজ হইতেছিল না। জীবন-বীণা ঠিক সুরে আর যে কখনও বাজিবে, সে যেন মনে করিবারও আজ আর কোথাও কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উপরন্তু, এই রাত্রির অবসানের পর হইতে, বাঁচিয়া থাকাটাই তাহার পক্ষে যেন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিবে, এমনও আশঙ্কা তাহার মনে জাগিতেছে। মনের মধ্যের বিরাট-মূর্ত্তি আদর্শটাকে খুব উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া, তাহারই তলার একটী কোণে নিজেকে সে একেবারে গুটিসুটি পাকাইয়া ঠেলিয়া ধরিল; কিন্তু তার সেই অন্ধকারের কোণের মধ্য হইতেই সে তো তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিয়া দিয়া নিজেকে প্রচার করিতে কণ্ঠ ছাড়িল না! তীব্র রোষে স্বার্থত্যাগের বেড়া আগুন চারিধারে জ্বালিয়া দিয়া, সে যখন তার ক্রন্দনশীল হৃদয়টাকে পোড়াইয়া মারার ব্যবস্থায় সমস্ত মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়াছে,—সে সময় কোথা হইতে আবার এ কি!—নিখিল অশ্রুসাগরের কূল বুঝি আজ ধ্বসিয়া পড়ে,—আর বরুণ-বাণে অগ্নিবাণ কাটার মতন, সকল আগুন তাহারই প্লাবনে বুঝি ঐ ভাসিয়া যায়!

নদীর বাঁক ঘুরিয়া নৌকাখানা আবার স্রোতের মুখে-মুখে ভাসিয়া তেমনি নিঃশব্দেই চলিল। সঙ্গে-সঙ্গে বিমলেন্দুর চিন্তা-স্রোতও নির্ব্বাধে বহিতেছিল। নিজের আগাগোড়া সমস্ত জীবনটা পটে-আঁকা একখানা ছবির মতই তাহার মানস-চক্ষে আজ কেনই যে আবার নূতন করিয়া সুস্পষ্ট রূপে ভাসিয়া উঠিল, বলা যায় না।

তাহার জীবন,—বিধাতার সে যেন এক বিচিত্র সৃষ্টি! এমন অনাবশ্যক, এমন সর্ব্ববঞ্চিত, এরূপ কণ্টকময় জীবন—এ গড়িয়া পাঠাইবার সৃষ্টিকর্ত্তার কি যে প্রয়োজন ছিল, সে যেন বুঝাই দায়! আগাগোড়াই এ যেন একটা কূলহারা তরঙ্গ, তারছেঁড়া তানপুরা;—অকূলেই এর গতি—বেসুরাই এর বাজনা। এ' কি সৃষ্টিছাড়া হইয়া তাহার জন্ম? বিমলেন্দুর মনে পড়িল, নিজের শৈশবের প্রথম জ্ঞানোন্মেষ। সে দিনের সকলটুকু স্মৃতির হাওয়ায় ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়া আছে তাহার দিদিমায়ের কথা। সেই কলহ-বিস্তার, লীলাকলার একান্ত পটিয়সী মাতামহীর ভীষণ কবলে অসহায় ভাবে নিপতিত নিজের শৈশব-বাল্যস্মৃতির নিরানন্দতায়, এবং তাহার অর্দ্ধ-পরিচিত পিতার সাড়ায়, মন অভিমানের বিদ্বেষে ভরিয়া উঠে। আজও সর্ব্বপ্রথমে সেই চিরাভ্যস্ত রীতিতে সুপ্ত বেদনা জাগাইয়া তুলিতে গিয়া, কে জানে কেন, পিতাকে মনে পড়িতেই, অনেক দিনের বিস্মৃত তাঁহার শেষ কথা কয়টীও অকস্মাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল—

"তোমাকে দিয়ে গেলুম।—"

বিমলের বুকের মধ্যটায় হঠাৎ যেন একটা মুগুরের ঘা খাইয়াছে, এমনি করিয়াই সে চম্‌কাইয়া উঠিল। কই, এ কথা যে বহুদিনই সে ভুলিয়া গিয়াছিল! এই যে মৃত্যুশয্যার শেষ দান সে তার মুমূর্ষু জনকের হাত হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, সে কি তাহার কোনই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে? কিছু না—কিছু না।—বহু দিন হইতেই সে যে তাহাকে নিতান্ত অপরিচিত পরের চেয়েও অনেকখানি দূরে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে,—তার কোন খবরটুকু লয় নাই। সে

কি খায়, কি পরে, তার চলে কিসে,—এটাও যে কখনও সে ভাবিয়া দেখে নাই! দিদিমার মৃত্যুশয্যায় কত দিন পরে সেই অতর্কিত সাক্ষাৎ,—তাতেও কি সে তার মুখখানার পানে একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিতেও সময় পাইয়াছিল? আর—আর সেই শেষ সংবাদ!—যে দিন সে নালিশ করিবার কথা বলিয়া ইন্দ্রাণীকে বিদায় করিয়া দেয়! সে কথা মনে করিয়া আজ এতদিন পরে বিমলের বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল। যাঁকে সে দিন সে তেমন নির্ম্মম হইয়া কঠিন বাক্যের আঘাতে দূর করিয়া দিয়াছে, চিরদিনই অমনি করিয়া অবিচারের তপ্তশেল যাঁর বুকে বিঁধিয়া দিতে কখনই কোন অনুতাপ বোধ করে নাই; সেই মানুষটী—যার জন্য সেদিন তার কাছে ভিখারিণীর বেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই বোনটী ছাড়া এ জগতে আর কোথাও হইতে সে এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা লাভ করিতে পারিয়াছে কি?—বিমলের চিন্তাসূত্রে কিসের একটা টান পড়িল। সত্যই কি তাই? ঐ তারা ভিন্ন আর কি কেহ, আর কি কখন, তাহাকে সত্যই ভালবাসে নাই?—পিতা, তাঁর কথা ছাড়িয়া দাও,—যতই বলা যাক্, বাপের মনে সন্তান-স্নেহ ছিল না, এমন কি কখন ঘটিতে পারে? দিদিমা অবশ্য তার যত ক্ষতিই করুন, সে সকলই যে তাহাকে অত্যধিক ভালবাসিয়া করিয়াছেন,—তাহাতেও কি কোন সন্দেহ আছে? শেষ দিনেও যে অনেক দুঃখ সহিয়াও তাহারই নাম লইয়া তিনি মরিয়াছেন! দিদিমার মৃত্যুশয্যায় যাহা হয় নাই—আজ বিমলেন্দুর চোখে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া একবিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল।

সে তার পর আবার তার পুরাতন চিন্তাস্রোতে ডুবিয়া গেল।—অমৃত মামাও যে নিরবচ্ছিন্ন মন্দ লোকই ছিল, তাও খুব জোর করিয়া বলা যায় না। উদ্দেশ্য যাই হোক্, মোটের উপর তাহার কাছেও বিমল অনেকখানিই ঋণী। কিন্তু সে ঋণ তো ভাল করিয়াই শোধ করা হইয়া গিয়াছে!—অনারোগ্যকর একখানা গুপ্ত ক্ষতের মুখ অকস্মাৎ এই দুই স্মৃতিতে টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।

তারপর স্মরণ হইল ইন্দ্রাণীর কথা।—একটা গভীর শ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক সে ক্ষণকাল মুদিত নেত্রে সেই নির্ব্বাক বেদনাভরা, অবিরত স্নেহ-সেবাপরায়ণা মাতৃ-মূর্ত্তি যেন মনশ্চক্ষে দর্শন করিতে লাগিল। সমুদয় মনটা যেন তার সঙ্গে-সঙ্গেই কি একটা অনাবশ্যক অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল। বিস্ময়ে চিত্ত যেন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কেমন করিয়া সেই করুণাময়ী, স্নেহময়ী মাকে সে অতবড় অবহেলার চক্ষে দেখিতে পারিয়াছিল—এই কথা মনে করিয়া, সে আজ এতদিন পরে যেন পরমাশ্চর্য্য বোধ করিল। সঙ্গে-সঙ্গেই আরও একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস উঠিয়া আসিল।—এর জন্য সবটুকু দায়ী বোধ হয় তার দিদিমা। যদি তাঁর রাহুগ্রাসে সে না পড়িত, তার মা যদি অকালে না মরিত—অথবা তার পিতা যদি উঁহাকে তাঁর বাড়ীর বাহিরে রাখিতেন, তবে—তবে হয় ত বিমলেন্দুর জীবন-ইতিহাসের ধারাও ভিন্নমুখী হইয়া—হয়ত বা খুবই সহজ, খুবই সরল হওয়াও এমন কিছুই অসম্ভব ছিল না! কিন্তু এর জন্য দায়ী কে—অদৃষ্ট? না আর কিছু? না আর কেহ?

তার পর আরও যাহাদের অজস্র অফুরন্ত স্মৃতির প্লাবন তার ব্যথাভরা বিমথিত বক্ষের উপর বন্যার বেগে আছড়া-পাছড়ি করিতেছিল, সে দিকে যেন আজ চোখ ফিরাইতেও তার ভরসা হয় না। কেবলই যে মনের আনাচে-কানাচে পর্য্যন্ত অসমঞ্জের সেই স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ-প্রবাহের মতই আশ্চর্য্য দৃষ্টি, আর উৎপলার সেই অর্দ্ধস্ফুট অভিব্যক্তি,—সেই মিনতির বেদনায় অতি করুণ, অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী মুখ,—সেইটুকু যে চিত্তাকাশে দীপ্ত তারা হইয়া ফুটিয়া আছে। সে যে অন্তরের সকল স্মৃতির সুধা মর্দ্দন করিতেছে। তবে কিসের অভাবে বিমলেন্দু চিরদিনটাই এমন বুভুক্ষা-কাতর ভিখারী সাজিয়া কাটাইল? এত যদি তার সঞ্চয়ই ছিল, তবে তার স্নেহের ভাণ্ডার এতদিন খালি পড়িয়া ছিল কেমন করিয়া? সে কি এমনই কানা? এত পাইয়াও আজ এত বড় নিঃসম্বল! অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিতেও কি দুঃখে সব ছাড়িয়া, সব কাড়িয়া সন্ন্যাসীর মতই পথের উপরে নিজের আসন বিছাইয়া দিয়াছে? ওরে অন্ধ! ওরে অভাগা! এত-বড় সৃষ্টির মধ্যে তোর মত মূঢ় বুঝি আর দুটী নাই! কিসের দুঃখে তুই এমন করিয়া বিরাগী হইলি বল্ দেখি? শুধু ছায়ার পিছনে ছুটিয়া সত্যের পানে একবারও কি চোখ ফিরাইলি না? যে সব অমূল্য ভালবাসার ধনকে অবহেলা করিয়া পাপী হইয়াছিস্, এখন এই অবশিষ্ট সারা জীবনটায় প্রেমহীন, স্নেহহীন, বন্ধুত্ব-বন্ধনবিহীন, নিরানন্দ, নিরালোক জীবন বহন করিয়া ইহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত কর্। এই তো তোর জন্য

এ পৃথিবীর মাটীতে এখন শুধু বাকি রহিল। আর যা তুচ্ছ করিয়া দূরে ঠেলিয়াছিস্, সে যে জন্মের মতই তোর হাতের স্পর্শ হইতে সরিয়া গিয়াছে। চোখের জলের বন্যা ঢালিয়া দিলেও, আর কখনও যে সেই সব হারানিধি তুই কোন দিনই খুঁজিয়া পাইবি না। মনটা আগুন-ধরান চিতার মতই ব্যর্থ ক্ষোভে জ্বলিতে লাগিল ধু ধু ধু ধু ধু ধু।

আকাশ স্তব্ধ, রাত্রি নীরব, বাতাস নিদ্রিত। শুধু তাহারই মধ্যে কয়টী নিশাচরবৃত্ত বিনিদ্র প্রাণী হিংস্র পশুর মতই সতর্ক গতিতে, নিজেদের ভীষণ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্য ধরিয়া, চারিধারের পুঞ্জপুঞ্জ অন্ধকারের কঠিন বাধা ঠেলিয়া, নিঃশব্দে অগ্রসর হইতেছিল। বিমলের অশান্ত, অপ্রকৃতিস্থ চিত্ত যতই স্রোতের বিপরীতে ভাসিয়া যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল, ততই সে নিজের চিত্তে উৎসাহের তীব্র দহন জ্বালাইয়া দিয়া, তাহাকে কঠোর কর্ম্ম-সমুদ্রে ঠেলিয়া পাঠাইতে লাগিল। অন্তরের বিষম ভারটাকে অশুচি বস্তুর মতই ঝাঁটাইয়া, তাড়াইয়া, ইহার স্থলে উদ্যমের আনন্দকে, ন্যায়নিষ্ঠার গৌরবকে আসন দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু হায় রে! সেজন্য যত কিছুর শুচি-শুদ্ধ, সুপবিত্র আয়োজন, সে সবই যেন একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা-ভারে আচ্ছন্ন, অভিভূত হইয়া গিয়া, মূর্চ্ছাতুরেরই মত হৃদয়-প্রান্তে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। আর সারা অন্তরটাই যেন হাহাকারে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতেছে—এর পর তোর জন্য আর কিছুই যে কোথাও বাকি থাকিল না!—অন্তরের সেই ছিন্ন তন্ত্রীতে বিদ্যুতের ঝঞ্ঝনায় বজ্র-কঠিন নূতন সুর চড়াইতে চেষ্টা করিয়া, সে মনে-মনেই বলিল,—"না-ই থাক্, যে পথে চলিয়াছি, তারই সাধনায় বাকি দিন ক'টা যথেষ্ট কাটাইতে পারা যাইবে। এতদিন উপরে-উপরে চেষ্টামাত্র ছিল; এবার এই রিক্ত মনপ্রাণ উহাতেই সঁপিয়া দিব। এর চেয়ে আর কোন্ সুখ,—কোন্ কর্ম্ম বড়?"

না, বড় নয়! কিন্তু তবু মানুষ যে—মানুষই। আর কর্ম্মেরও যে বিশ্রাম আছে। কর্ম্মচক্রের অফুরন্ত আবর্ত্তনকে সহ্য করা কঠিন—বড় কঠিন! মানুষের যে সে সহে না। সে যে সামান্য,—সে অসামান্য হইতে চাহিলেই কি তা হইতে পারে?

নিকটস্থ তীরভূমির অল্প-দূরে জোনাকি-জ্বলার মতই দু'একটা ক্ষীণ আলোকবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে সরযূপ্রসাদ কহিল, "এইখানেই নৌকা বাঁধতে হবে। গ্রাম এখান থেকে বড় জোর মাইলটাক।"

ঝপ্ ঝপ্ করিয়া দাঁড়ের শব্দ একটীবার শোনা গেল, হালের মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইল।—বিমল যখন তীরে উঠিল, সবার চেয়ে দৃঢ় ও অচঞ্চল গতিতে সে উঠিয়া আসিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সারা গ্রাম নিস্তব্ধ। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহরের মধ্যবর্ত্তী। গ্রাম্য-পথ বিজন। শুধু পথের কুকুরগুলা আগন্তুকদিগকে একটীবারের জন্য অনুযোগপূর্ণ, সাড়ম্বর অভ্যর্থনার উপক্রম করিতেই, সরযূপ্রসাদ পকেট হইতে কিছু খাবারের টুকরা বাহির করিয়া তাহাদের বণ্টন করিয়া দিলে, বিশিষ্ট ভদ্রলোক বোধে উহারা ইহাদের পথ ছাড়িয়া দিয়া, ভোজের সভায় অধিক লাভের চেষ্টায় মনঃসংযোগ করিল। জনহীন পল্লী-পথ। পথের ধারে মধ্যে-মধ্যে নিবিড় অন্ধকারে স্বল্প বাতাসে বাঁশের ঝাড় একটা বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাসের মতই শ্বসিয়া উঠিল। দুধারে সারি-সারি খোলার ঘর। কোথাও একখানা ভগ্ন, অর্দ্ধ-ভগ্ন, অথবা অসংস্কৃত অনতিবৃহৎ পাকা-বাড়ী দেশবাসীর ধনহীনতার পরিচয় দিতেছিল। অন্ধকার,—চারিদিকেই অন্ধকার! গাছের গায়ে-গায়ে, ডোবার ধারে-ধারে, বাড়ীগুলার আশে-পাশে, আনাচে-কানাচে, সর্ব্বত্রই আজ যেন অন্ধকারেরই খেলা,—তাহারই আধিপত্য। কদাচিৎ কোথাও একখানা ঘুমন্ত পুরীর একটা খোলা জানালার মধ্য দিয়া একটুখানি ক্ষীণ আলো বাহিরে আসিয়া যেন সেই প্রকাণ্ড অন্ধকার-জমান কৃষ্ণসর্পের বিরাট বপুকে ঈষৎ খণ্ডিত করিয়া দিল। সদ্য-ঘুমভাঙ্গা কচি ছেলের তীক্ষ্ণ রোদন-স্বর আচম্‌কা সেই গভীর স্তব্ধতার তাল ভঙ্গ করিয়া, নির্ভীক পথিকদের কর্ণে যেন সতর্ক প্রহরার মতই, কোন্ অদৃশ্য প্রহরীর সুরে মৃদু-সংশয়ে বাজিয়া উঠিল।

পথের ধারে একটা একতালা বাড়ীতে রাত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরে গানের আখড়া বসে; এখন সব চুপচাপ্। কেবলমাত্র গায়কদলের একটী লোক, সাম্‌নের দালানে মাদুর বিছাইয়া, শুইয়া-শুইয়া মৃদু-গুঞ্জনে কীর্ত্তন গানের এক-একটা পদ গাহিয়া-গাহিয়া উঠিতেছিল—

"একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর, দিনেক দুয়ের মত,
যদি মন লাগেতো থাকবে সেথায়, নৈলে আসবে দ্রুত।"

পথিক কয়জন কিছুদূর অতিক্রমের পর, অন্ধকারে আবৃত একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার পশ্চাতে আসিয়া পৌঁছিল। সেখানকার গাঢ়তর অন্ধকার যেন যুগল বাহু বিস্তৃত করিয়া, প্রতি পদেই তাহাদের গমন-পথে বাধা দিতে লাগিল; কিন্তু সেই সুহৃদ্-বাক্য কাণে না তুলিয়াই, এদিক-ওদিক চাহিয়া, দ্বার ও প্রাচীর পরীক্ষান্তে সরযূপ্রসাদ বিমলেন্দুর কাণে কাণে কহিল, "এই বাড়ী"—

বিমলও মৃদু সন্দেহে তেমনি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার বাড়ী?"

"তা তো জানি না। অসমঞ্জর পিছনে-পিছনে এসে বাড়ীটাই শুধু দেখে গেছি। নাম নিয়ে কি-ই বা হবে?"

"ঠিক এই বাড়ী তো?"

"নিশ্চয়! দু-দুবার দেখে গেছি, দোরে পাঁচটা-পাঁচটা করে লোহার গুল বসান আছে। এই যে, গণে দেখ না।"

অন্ধকারে হাতড়াইয়া চিহ্নগুলা বিমল পরীক্ষা করিয়া দেখিল। পরে অর্দ্ধ-অবিশ্বাসে পুনঃ প্রশ্ন করিল, "কিন্তু এই বাড়ীতেই যে সে বিয়ে করেচে, কেমন করে তুমি তা জান্‌লে?"

সরযূপ্রসাদ ঈষৎ বিরক্তির সহিত উত্তরে কহিল, "আমি তা জানি। এই বাড়ীর কর্ত্তা একজন বুড়ো কবিরাজ, সবাই তাকে সেন মশাই বলে ডাকে,—অনেক দিনের রোগী ছিলেন। বিয়ের পরদিনের ভোরেই তিনি মারা গেছেন। সেই জন্যই অসমঞ্জ তার বউকে নিয়ে এখনও পালাতে পারে নি। চতুর্থী শ্রাদ্ধ শেষে আজ রাত্রে তাদের ফুলশয্যা,—কাল সকালেই তারা দুজনে বেরিয়ে যাবে—এ সব খবরই আমি ভাল করে নিয়েছি। আর এও জানি যে, এই মস্ত বড় ভাঙ্গা বাড়ীটার দক্ষিণ-চকের সাম্‌নের ঘরে সে রাত্রে শোয়,—আর কি-কি তুমি জান্‌তে চাও?"

বিমল আর কিছুই জানিতে চাহিল না। স্ক্রু খুলিবার যন্ত্র দিয়া রাধিকা ক্ষিপ্র-হস্তে ততক্ষণে দ্বারের কজাগুলা খুলিয়া ঢুকিবার পথ তৈরি করিয়া দিয়াছিল। সরযূপ্রসাদকে সেইখানেই রাখিয়া তাহারা দুজনে ভিতরে প্রবেশ করিল; এবং পূর্ব্ব পরামর্শমত রাধিকাকে সিঁড়ির পথে রাখিয়া, বিমল একা উপরে উঠিয়া গেল। লটারীতে তারই নামটা যে উঠিয়াছিল!

দক্ষিণদ্বারী ঘরের সাম্‌নে ভাঙ্গাচোরা রেলিং-ঘেরা বারান্দায় পা দিয়া বিমলেন্দুর পা টলিয়া গেল; ক্ষণকাল সে প্রাচীরে পিঠ দিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। একবার ঘন স্পন্দিত দুই নেত্র ঊর্দ্ধে তুলিয়া, সেই মৌন, গম্ভীর, কঠিন আকাশের অবিচলতা দেখিয়া লইল। কোন্ অদৃশ্য ন্যায়-বিচারকের সুদৃঢ় অঙ্গুলী-নিঃসৃত অলঙ্ঘ্য বিচার-ফল জ্বলন্ত অঙ্গারে আকাশের মহান পটে কঠোর ভাষায় লিখিত রহিয়াছে। কি গম্ভীর, কি কঠিন, সেই অনুশাসনের বাণী! কি অসম্ভবই তাহা হইতে চোখ ফিরাইয়া লওয়া! বিমলের বক্ষের মধ্যে খর-প্রবাহিত শোণিত-স্রোতে আবার যেন চকিতে ভাঁটার স্পর্শ লাগিয়া গেল। পদতল হইতে মস্তকের কেশাগ্র অবধি যেন তার স্তব্ধ, অসাড় হইয়া গেল। তার পর আবার সে কোনমতে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া, নির্দ্দিষ্ট কক্ষের দ্বারে আসিয়া, অন্তরের সকল দ্বিধা, সকল সঙ্কোচ জোর করিয়া কাটাইয়া, যথাসাধ্য স্থির কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল,—"অসমঞ্জ!"

ইহার সঙ্গে-সঙ্গেই নিজেকে সে যথাসাধ্য দৃঢ় করিয়া লইতে পারিল। মনকে অতি কঠোর শাসনে শাসিত করিয়া বলিল, "এখন আর পিছাইবার সময় নাই। কর্ত্তব্যের মহাভার তুমি নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়াছ। সে তোমার পক্ষে যত বড়ই অসহ্য হোক না কেন, তোমায় তা' বহিতে হইবেই।"

ভিতরে পালঙ্ক-শয্যায় নিয়ম-রক্ষার হিসাবেই মাত্র কয়েকগাছা ফুলের মালা ও নব বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত নব-দম্পতি তখন গভীর নিদ্রামগ্ন। বাড়ীতে শুভ পরিণয়ের পাশাপাশি মৃত্যুর করাল ছায়া দেখা দিয়া আনন্দোৎসবের অনেকগুলা বাতিই নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছিল। তথাপি, সেই বহুদিনের প্রতীক্ষিত মৃত্যুর বেদনা এই নব সম্বন্ধে সম্বন্ধ সহৃদয় বন্ধুটীর স্নেহ-সান্ত্বনায় এতটুকু সহনীয়ও যে হইতে পারিয়াছে, বিধাতার এ-ও কিছু অবজ্ঞার দান নয়!

ঘুমের মধ্যেও স্বপ্নের আবেগের মতই সুপরিচিত কণ্ঠের সে আহ্বান অসমঞ্জের উভয় কর্ণে যেন রণক্ষেত্রের কামানের গোলার শব্দেই গর্জ্জিয়া বাজিল,—"অসমঞ্জ!"

চমকিয়া উঠিয়া বসিতেও সেই একই সুর! এ কি?—আবার সেই শব্দই যে পুনরুচ্চারণ করিল—"অসমঞ্জ!"

অসমঞ্জ ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করিল। তার পর একবার নিজের পার্শ্বে সে তার চকিত দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিল,—সুখ-সুপ্ত

নববধূর শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সমতালেই প্রবাহিত। মুখের গুণ্ঠন-বস্ত্র তাহার অল্প একটু সরিয়া গিয়াছিল। দীপালোকে তাহাকে নিদ্রাপুরীর কোন ঘুমন্ত রাজকন্যার মতই মনে হইল। সেই অপূর্ব্ব মুখখানা একবার সে অপরিতৃপ্ত নেত্রে দর্শন করিয়া, তাহার চন্দ্রার্দ্ধবৎ সুগঠিত ও তেম্‌নি সুবর্ণ-জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়, ক্ষুদ্র ললাটে অত্যন্ত স্নেহে-ভরা মৃদু চুম্বন করিয়া, নিঃশব্দ সতর্ক পদে অতিশয় সন্তর্পণে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া সাবধানে রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিল। পাছে সে উঠিয়া পড়ে, তাই বড় ভয়ে ভয়েই আবার সে তেমনই করিয়াই তার পিছনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিল।

ঘরের বাহিরে সুদুর্ভেদ্য প্রগাঢ় অন্ধকার। মনুষ্যের আকৃতি নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে অতি অস্পষ্ট দেখা যায় মাত্র; মুখ তাহাতে চেনা যায় না। দ্বার চাপিয়া দাড়াইয়া সেই অন্ধকারাবৃত জমাট আঁধার হইতে স্বল্পদৃষ্ট মূর্ত্তিটিকে লক্ষ্যে, অসমঞ্জ নির্ভীক প্রশ্ন করিল "কে তুমি? বিমল কি?"—

উত্তর হইল—"হাঁ।"

অসমঞ্জ একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিল,—"তোমার সঙ্গে আর কেউ আছে? না একাই?"

বিমল কহিল—"আছে।"

অসমঞ্জ জিজ্ঞাসা করিল—"সরযূপ্রসাদ ও রাধিকা বোধ হয়?"

বিমল উত্তর করিল "হুঁ।"

"ওঃ" বলিয়া অসমঞ্জ দ্বারের সান্নিধ্য ছাড়িয়া আরও একটু-খানি অগ্রসর হইয়া আসিল। "একেবারেই তৈরি হয়ে তোমরা? না কিছু বলবার আছে?"

বিমল তাহার নির্ভীক ও সপ্রতিভ প্রশ্নে একটু যেন বিপন্ন বোধ করিতেছিল। অপরাধীকে অপরাধীর মত দেখিবার আশা সকলেই করে; সেইরূপ ঘটিলেই কর্ত্তব্য-পালনের পক্ষেও যেন অনেকটা সুবিধা পাওয়া যায়। সেই জন্য অসমঞ্জর এই সাধুর মত ব্যবহারটা তাহার চক্ষে উহার প্রচ্ছন্ন ছলনা বলিয়াই ঠেকিল, এবং ইহাতে সে ঈষৎ বিরক্ত হইয়াই কহিল, "কেন যে আমার এ অসময়ে এতদূরে আসতে হয়েছে, তা' কি তুমি বুঝতে পারো নি?"

অসমঞ্জ এ তিরস্কারে ক্ষুব্ধ বা লজ্জিত তো হইলই না; উপরন্তু তাহার সেই কল-ঝঙ্কারী হাসিটুকু হাসিয়াই সে জবাব দিল,—"বিলক্ষণ! বুঝতে না পারব কেন? তবে জান্‌তে চাইচি যে, আমায় মারবার জন্য সমিতি থেকে যে পরোয়ানাটা বার করা হয়েছে,—সেটা সই করলে কে? অথবা সভাপতি হিসাবে সেটা আমাকেই এখন সই করতে হবে? কাছে সেই লণ্ঠনটা আছে ত? দাও—তা হলে নয় সইটা করেই দিই। কারণ, সব কাজেই দস্তুর-মত চলাই চাই তো'!" বলিয়া আবার সে মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

আলো জ্বালা হইলে তাহার সাহায্যে কাগজে উৎপলার সইটা চোখে পড়িতেই অসমঞ্জর ঠোটের হাসি মুহূর্ত্তের জন্য মিলাইয়া গিয়া তাহার প্রশস্ত মুখটা মরা মুখের মত এক নিমেষেই ধব্‌ধবে সাদা হইয়া গেল। সে আলোর সাম্‌নে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই অক্ষর কয়টা দুতিন বার মনে মনে পড়িয়া গেল; তারপর মুখ তুলিয়া একটুখানি বেগের সহিত কহিয়া উঠিল, "বেশ, আমার কোন আপত্তি নেই। তাহলে, কোথায় সেটা হবে?"

বিমল তাহার মুখের উপরে সহসা বিস্তৃত গাম্ভীর্য্যটাকে মৃত্যুভয়ে ভুল করিয়া ফেলিয়া অধিকক্ষণ আর এই সংশয়ের মধ্যে উহাকে দোলায়িত রাখিয়া অধিকতর নৈষ্ঠুর্য্য প্রদর্শন করা অনুচিত বিধায় ঈষৎ সহানুভূতির সহিত উচ্চারণ করিল —"না হয় এইখানেই—?"

"মন্দ নয়।—তবে, তোমরা পালাতে পারবে তো? যদি সঙ্গেসঙ্গেই লোক জমে যায়? অবশ্য বাড়ীতে বা পাড়ার মধ্যেও তেমন জমা হবার মতন লোক যদিও নেই, কিন্তু পিস্তলটার শব্দও তো নেহাৎ কম হবে না। কিছু বলাও তো যায় না। তার চেয়ে চল বরং নদীর ধারে বা—"

"আমরা এখানে অপরিচিত, আমাদের চিন্‌বে কে? পিস্তল থাক্‌তে কাছে এগোতেও কেউ বড় ভরসা করবে না।—তারপর অনায়াসেই পালাতে পারবো, নৌকায় চড়ে বসলে আর কাকে ভয়!"

"তবে আরও একটু দূরে চলো, এখনি আমার স্ত্রী হয়তো জেগে উঠবে।—উৎপলাকে বলো, তার ছোড়দা তারই নিজের হাতে দেওয়া দণ্ড সানন্দে মাথা পেতে নিয়েছে।—কিন্তু শোন বিমল! আজ আমার যাবার সময় আমি তোমাদের অনুনয় করে এ'ও বলে যাই, যে, আজ থেকে তোমাদের সবাইকার আমার দেওয়া শপথ থেকে চিরদিনের মত মুক্তি হয়ে গেল। মনে পড়ে বিমু! প্রথম যেদিন তুমি আমায় তোমার নিজের সর্ব্বস্ব দিতে চেয়েছিলে? আমিই

না তা ভুল করে দেশের অনিষ্টের পথে লাগিয়েছিলুম, সে তো তুমি তখন স্বপ্নেও জানতে না ভাই! সেই পাপেরই আজ এই প্রায়শ্চিত্ত—আমি আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করচি; এবং আজ আবার যাবার দিনে, তাই আমার সেই দস্যু বন্ধুকে বিপথ থেকে টেনে এনে সোজা রাস্তায় পৌঁছে দিয়ে যাচ্চি। দেখ ভাই! তোমরা দত্তাপহারী হয়ো না যেন! কারণ, তোমরা তো সেদিন দেশকে ভালবাসো নি, যথার্থ ভাবে ভালবেসেছিলে আমাকেই। সেই ভালবাসার দাবী দিয়ে, যাবার সময় তোমাদের সকলের কাছেই আমি আমার ভুলের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা চেয়ে যাচ্ছি। দেশের অজ্ঞতা দূর করবার ব্রত নিয়ে, পতিত ও অর্দ্ধ-পতিত জাতিকে বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা দিয়ে উন্নত করতে সচেষ্ট হও। ব্যবসায়, বাণিজ্যের প্রচার চেষ্টা কর। এই দুটী আমাদের এখনকার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যকে, আর সব ফেলে রেখে, প্রাণপণেই কর। এ পথে মুক্তির দিন আমাদের এখনো আসে নি। অনর্থক কেন শক্তি ক্ষয় করবে?—আর উৎপলাকে বলো, তাকে আমি তোমায় দিয়ে গেলুম। আমি জানি, সেও তোমায় ভালবাসে,—এ কথা হয় ত সে নিজেও জানে।"

"অসমঞ্জ! অসমঞ্জ! আমায় তুমি সে ভার দিয়ে যেও না। উৎপলার সঙ্গে এ জন্মে আমার আর কখনও দেখা না হওয়ারই বেশী সম্ভাবনা।"

নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত অসমঞ্জ লণ্ঠনের স্বল্পালোকে বিমলের বিষাদ-কালিমা-লিপ্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখের দিকে চাহিল,—"এ কথা কেন বিমল?"

"কেন? এই যে তার হাতের সইটা তুমি দেখচো,—এর পরেই যখন জানতে পারলে এ কার জন্য,—তখনও কি তুমি আশা কর;—সে এতক্ষণ বেঁচে আছে কি না কে জানে?"

গুরুভারগ্রস্ত বক্ষ শিথিল করিয়া একটা দীর্ঘতর শ্বাস অতি ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া বহিয়া গেল। অসমঞ্জ ক্ষণকাল আর কোন কথাই কহিল না। তার পর সহসা মুখ তুলিয়া বিমলের স্তব্ধ, গম্ভীর মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, "যদিই বেঁচে থাকে,—বলো, আমি তাকে তোমার হাতেই দিয়ে গেছি।"

"অসমঞ্জ এ কি তুমি বলচো।—না—না, আমার যে এই পথ—যত দিন আমি বাঁচবো, তুমি জানো না কি যে, আমার আর এখান থেকে ফেরবার কোন উপায় নেই? এখন আর তার দরকারও কিছু হবে না। আমরণ এই বেঁচে থাকার শাস্তি আমায় মাথায় করে বইতেই হবে। তোমার রক্ত যে আমাদের মধ্যে দুর্ল্লঙ্ঘ্য মহাসমুদ্র হয়ে বইতে থাকবে। সে কথা তুমি হয় ত ভুলে যাচ্ছো,—আমি ভুলবো কেমন করে? আর সেও তো ভুলতে পারবে না।"

"কই তোমার পিস্তল?"

বিমলেন্দু পকেট হইতে একটা দোনলা ক্ষুদ্রাকার রিভালভার বাহির করিল। তার পর সেটা নীচু করিয়া রাখিয়া, হঠাৎ বাষ্প-সজল তরলকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"সরযূ-প্রসাদকেই বলি, না হয় তো রাধিকা—"

অসমঞ্জ মৃদু হাস্যে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "উঁহুঁ, তারা নয়,—এখন শুধু তুমি আর আমি,—ভয় কি ভাই! প্রস্তুত?"

"হুঁ" বলিয়া অস্বাভাবিক পাংশু মুখে বিমল দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিতে গেল—"তোমার মাকে যদি কিছু বলতে চাও"

একটা দ্রুত পদধ্বনির সঙ্গে-সঙ্গেই চুড়ি-বালা চাবির চঞ্চল বাদ্য শ্রুত হইল। বিমল হাত ঠিক করিয়া লইতে না লইতেই, তাহাদের মাঝখানে খসিয়া-পড়া তারার মত বিস্রস্ত-বসনা এক রূপসী তরুণী বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া আসিয়া, দুই হাতে অসমঞ্জকে জড়াইয়া ধরিল,—এতটুকু শব্দও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

অসমঞ্জ তাহাকে অত্যন্ত আদরের সহিত একবারেক স্পর্শ করিয়াই, তাহার দৃঢ়বদ্ধ বাহুপাশ হইতে নিজেকে ছিন্ন করিয়া লইবার চেষ্টার সহিত গভীরতর স্নেহভরে কহিতে লাগিল,—"উঠে পড়লে! তুমি তো সব জেনেশুনেই আমার হয়েছিলে? একদিন না একদিন তো এ দিন তোমার আসতোই,—সেও তুমি জানো তো? তবে কেন বাধা দিচ্ছো? মনে রেখ, আমার নষ্ট ব্রত উদ্যাপনে তোমার সহায়তা করাই উচিত। কি জানি, হয় ত এ ভালই হচ্চে!—বিমল! আর তা'হলে দেরি করো না।—তারা! শেষ সময়ে আমায় শান্তিতে মরতে দাও, রাণি! তুমি বুদ্ধিমতী, ধর্ম্মে তোমার অচলা নিষ্ঠা। তোমার জন্য ভাবি না—"

বিমলেন্দুর উত্থিত হস্ত নামিয়া আসিয়া হাত হইতে রিভালভারটা সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। গুলি কেন যে ছুটিল না, সেই আশ্চর্য্য! তাহার সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন

প্রবল বেগে ভূমিকম্প হইয়া গেল। অবরুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ ভেদ করিয়া উচ্চে বহির্গত হইল,—"বোনটী আমার !"

"দাদা!"—বলিয়া বংশীরবমুগ্ধা কুরঙ্গিণীর মতই নিমেষ মধ্যে তারা অসমঞ্জকে ছাড়িয়া বিমলেন্দুর কাছে ছুটিয়া আসিল।—

"দাদা! দাদা! তুমি!—তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করতে এসেছ!"—বলিতে-বলিতেই সে মূর্চ্ছিতা হইয়া বিমলেন্দুর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া গেল।

দু'জনেই পাথরের পুতুলের মত স্তব্ধ, অনড় হইয়া থাকিবার পর, অসমঞ্জই প্রথমে আত্মসম্বরণ করিল। বারেক ভূ-লুণ্ঠিতা মূর্চ্ছাপহৃত-চেতনা তারার বিবর্ণ ভয়পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে মুখ তুলিল।

"কি আশ্চর্য্য! তারা তোমারই বোন? ইন্দ্রাণীর মত মা পেয়েও তুমি কিসের লোভে এ ভুল পথে এসেছিলে বিমল? কিন্তু সে যাক্,—এখন কি করবে? না পারো, না হয় আমাকেই দাও,—আর কিন্তু দেরি করা কিছুতেই চলে না। না হয় এক কাজ করো; চলো একটু আড়ালেই যাওয়া যাক্।"—এই বলিয়া অসমঞ্জ যেন তাহার শ্যালকের হাত হইতে নব-বিবাহের যৌতুক-উপহার চাহিয়াই তাহার কাছে হাত পাতিল।

সেই ততটুকু সময়ের মধ্যেই বিমলেন্দুর অন্তর্জগতে কত বড় একটা বিপ্লব সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান ও অতীতের বহু মাস, বহু বর্ষ অতিক্রম পূর্ব্বক তাহার বিস্মৃত-প্রায় শৈশবের সেই একটী দিনের স্মৃতি—পিতার অন্তিমশয্যা—তাহার মানস-নেত্রে যেন গত দিবসের ঘটনার মতই সুপরিচিত হইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছিল। সেদিনের সেই আট বছরের বিমলের হাতে চার বছরের তারার এতটুকু ক্ষুদ্র হাতখানি তুলিয়া দিয়া মুমূর্ষু পিতার সেই সর্ব্বশেষ বাণী—"ওকে তোমায় দিয়ে গেলুম"—সেই কথাটাই যেন আজ সবচেয়ে স্পষ্ট সুরে বিমলেন্দুর কাণে সব সুর ছাপাইয়া বাজিয়া উঠিল। সেদিন সে স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে পিতার এ শেষ দান গ্রহণ করিয়াছিল। যদি সঞ্জীবন-সভার প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকার রূপে মাথায় তুলিতে হয়, তবে তারও চেয়ে বড় প্রতিজ্ঞা—নিজের মরা বাপের কাছে জীবনের সর্ব্ব-প্রথম অঙ্গীকার সে ভঙ্গ করিবে কোন্ হিসাবে?—না, না, না,—তারার বৈধব্য সে কিছুতেই ঘটাইতে পারিবে না। রাধিকা, সরযূপ্রসাদ নীচে তার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে,—এখান হইতে এখন অমনি ফেরাও অসম্ভব! তারা ফিরিতে দিবে কেন? কিন্তু কি উপায়ে অসমঞ্জকে সে বাঁচাইবে? তার কেবল একটামাত্রই পথ আছে। রিভালভারের শব্দে অসমঞ্জের মৃত্যু নিশ্চিত করিয়া, বিমলেন্দুর বিলম্বে তাহাকে বিপন্ন বোধে নিশ্চয়ই উহারা পলাইবে। উহার জন্য বিপদে মাথা গলাইতে যে তাহারা আসিবে না, ইহা সুনিশ্চিত। আর ইহাতেই তার জীবনের পূর্ব্বাপর সকল ভ্রান্তির, সকল পাপের, সব প্রায়শ্চিত্তই এক সঙ্গেই সমাধা হইয়া গিয়া, তার এই অভিশপ্ত জীবন হইতে তাহাকে মুক্তি দিবে। সেই ভাল,—সেই ভাল!

বিমলেন্দু সরিয়া দাঁড়াইল। বারেক স্থির স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মূর্চ্ছাবসন্না তারার দিকে চাহিল। তার পর নত হইয়া সেই ভীষণ সংহারাস্ত্র তুলিয়া লইয়া, নিজের চিবুকের নিম্নে উহা স্থাপন পূর্ব্বক, স্মিতহাস্যে সমুজ্জ্বল প্রসন্ন মুখ অসমঞ্জের দিকে ফিরাইয়া, নিশ্চিন্ত শান্ত স্বরে কহিল,—"আমিই তবে চল্লুম ভাই! তারার জন্যে তুমি বাঁচতে চেষ্টা করো মঞ্জু! একটা প্রতিজ্ঞা রাখতে হলে, আমায় আর একটা ভাঙ্গতে হয়; তাই তার এই সমাধানই শ্রেয়ঃ বোধ করলেম।"

কর্ণ-বধিরকারী প্রচণ্ড একটা গর্জ্জন-ধ্বনির সঙ্গে-সঙ্গেই কুণ্ডলিত ধূমধারার মধ্যে ধপাস্ করিয়া গুরুভার পতনের শব্দমাত্র শোনা গেল। আর কিছুই না।——

এক নিমেষের এই অপ্রত্যাশিত কাণ্ডে অভিভূতবৎ অসমঞ্জ সঙ্গে-সঙ্গেই পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল, "বিমল! বিমল! এ' কি করলে ভাই?"

সেই মুহূর্ত্তেই সদ্য-নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রতা ইন্দ্রাণী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতে-আসিতে, অসমঞ্জর উচ্চারিত বাক্য শ্রবণে, হাহাকার শব্দে বিমলেন্দুর শোণিতাপ্লুত স্তব্ধ দেহের উপর আছড়াইয়া পড়িলেন,—"বিমু! বিমু! বাবা রে! এম্নি করেই কি এতদিন পরে তুই আমার কাছে ফিরে এলি?"

অসমাপ্ত।

"ঘরের ডাক"*

[রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট্]

এই উপন্যাসখানি পড়িলে স্বতঃই মনে হইবে, সচরাচর যে সকল উপন্যাস পড়া যায়, তাহাদের অপেক্ষা ইহার সুর অনেক উঁচুতে বাঁধা। ঘটনার বাহুল্য বা বিচিত্র রকমের সমাবেশ ইহাতে নাই; তথাপি দিগন্তব্যাপী আকাশ জুড়িয়া যেরূপ নৈশ পাখীর করুণ সুরটি ভাসিয়া যায়, এই আখ্যানের তেমনই একটি কবিত্বময় মর্ম্মস্পর্শী সুর আছে। অনেক সময় কথার পরিস্ফুট অর্থবোধ না হইলেও, সেই সুরটা তাহার অপূর্ব্বত্ব দিয়াই মনকে আকৃষ্ট করে।

উপন্যাসখানির প্রধান চরিত্র লক্ষ্মী—খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতা, উচ্চ-শিক্ষিতা ও রূপবতী। কিন্তু ইহার প্রকৃতিতে বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার নিজের ছাপ মারিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং ভিন্ন সমাজে পড়িয়া লক্ষ্মী একদিনও সোয়াস্তি পায় নাই। গ্রন্থের অপর দুইটি চরিত্রেরও অনেকটা এই দশাই হইয়াছিল। লক্ষ্মীর মায়ের অবস্থা শোচনীয়। সে সাড়ী ছাড়িয়া, নূতন গাউন ও সেমিজের মোড়কের মধ্যে তার পূর্ব্বাবস্থার হারানো স্বাচ্ছন্দ্যটুকু না পাইয়া, গুমরিয়া মরিতেছিল। বাঙ্গলা দেশের গোলাপের একটা বুড়ো চারাকে যদি খাস বসোরার মাটীতেও লইয়া গিয়া পোঁতা যায়, তাহা হইলেও কি সে তার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি আর ফিরিয়া পায়? এইটি হচ্ছে মাটীর টান; কত নিম্নে যে শিকড় জড়াইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে গাছটা তুলিয়া আনিলে, সে না শুকাইয়া থাকিবে কি করিয়া? লক্ষ্মীর মা—তার নিরানন্দ জীবনের অবসাদ ও নৈরাশ্যের ছায়া লক্ষ্মীর উপর না পড়ে, এজন্য তাকে যথাসাধ্য সতর্কতার সহিত সামলাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু বৃথা। লক্ষ্মী উচ্চ শিক্ষা পাইয়াও, ও বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের মধ্যে পড়িয়াও, সেই সংস্কারগত অনুভূতির হাত এড়াইতে পারিল না। তাহারা যেখান হইতে আসিয়াছিল, সেখানে তাদের জন্য আর দরজা খোলা ছিল না; সাগর-সঙ্গমের কাছে আসিয়া ইচ্ছা করিলেও, গঙ্গা আর হরিদ্বারে যাইতে পারেন না। বিদ্রোহী প্রকৃতিকে চাপা দিয়া, লক্ষ্মী খৃষ্ট-সমাজে বিবাহ করিয়া, নিজকে নূতন অবস্থার সঙ্গে মিশ খাওয়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতি সত্যের মধ্যে কোন ছিদ্র থাকিতে দেন না; এখানে রিফুকর্ম্ম চলে না। লক্ষ্মীর বিবাহ চেষ্টা একটা অস্বাভাবিক খেয়াল বা পাগলামিতে পরিণত হইয়া, তাহার নিজের নিকটেই উৎকট ভাবে ব্যর্থ হইয়া গেল। লক্ষ্মীর হৃদয়ে বঙ্গীয় পল্লী-প্রীতি যে পরিমাণে গভীর, সেই পরিমাণে চাপা; উহা নিবিড় ভাবে চিত্তাকর্ষক হইয়াও দ্বিধাশূন্য নহে—তর্ক-বিতর্ক ও নানা বিরুদ্ধ চেষ্টার আবর্ত্তময়। তাহার মায়ের মধ্যে সেই প্রীতি নৈরাশ্য ও ব্যথায় ভরপুর;—কিন্তু একান্ত ভাবে নীরব। ইহাদের মাঝখানে খৃষ্টধর্ম্মে নব-দীক্ষিতা ডোম-কন্যা ফেলী। সে শিক্ষিতা নহে,—তর্ক-যুক্তির মধ্যে গড়িয়া উঠে নাই। বাহিরের অবস্থার সঙ্গে সে সম্পূর্ণ বেমানান। তার দেশের ঝুরো নদীতে গামছা দিয়ে পুঁটি মাছ ধরা ও সেওড়া দীঘিতে সাঁতার কাটা প্রভৃতি পল্লী-জীবনের শত-শত ছোট কথা সে মাদ্রাসে খৃষ্টান ব্যারাকের মধ্যে বাস করিয়াও সর্ব্বদা স্মরণ করিতে থাকে; এবং তাহা ভাবিতে তার বড়-বড় দুটি চোখ জলে ভরিয়া আইসে। সে যে খৃষ্টান, এ বুদ্ধিও তাহাতে আদৌ স্পর্শে নাই। সে অপর লোককে এখনও "কিরিস্তান" বলিয়া গালি দেয়; এবং মা কালীর নাম লইয়া শপথ করে। লক্ষ্মী যখন তার প্রাণের গভীর ব্যথাগুলি যুক্তি-তর্কের প্রলেপ দ্বারা ঢাকিয়া আত্মবঞ্চনা করিতে থাকে, ফেলী আসিয়া তখন সরল কথায় সেই ব্যথাগুলি এমনই ভাবে জাগাইয়া দেয় যে, সেই কথার উদ্দাম আবেগে লক্ষ্মীর মনের সমস্ত দ্বিধা ও যুক্তি ভাসিয়া যায়। ফেলীর কথায় লক্ষ্মী নিজের কাছে যেমন ধরা পড়ে, এমন আর কিছুতেই নহে। মোট কথা, ফেলীর খাঁটি বিশ্বাস ও একনিষ্ঠ প্রীতির কাছে লক্ষ্মীর ছদ্মবেশ ও মুখোস চুরমার হইয়া যায়। এই জন্য লক্ষ্মী ফেলীকে মনে-প্রাণে ভালবাসে। কিন্তু এই স্বভাব-শিশুর কথায় তার ভিতরকার রূপ যেরূপ ধরা দেয়, তাহাতে সে নিজেই সময়ে-সময়ে এত ভীত হইয়া পড়ে যে, সে কখন কখনও ফেলীকে এড়াইতে চেষ্টা করে।

গ্রন্থের আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র—নন্দরাণী; ইহার ভিতরেও একটা বিরুদ্ধ ভাবের তোলপাড় স্পষ্ট! স্বামী বৃদ্ধ—কতকটা বোকা। কিন্তু নন্দরাণী উচ্চ-শিক্ষিতা ও যুবতী। কি করিয়া যে এই রমণী তাঁহার উচ্চ শিক্ষাভিমান ও উন্নত রুচি বিসর্জ্জন দিয়া, সামাজিক বিধানকে মানিয়া লইয়াছিলেন, তাহা উপাখ্যানের ভিতর খুব নৈপুণ্যের সঙ্গে দেখান হইয়াছে। এই উপন্যাসখানি একটা মনোজ্ঞ মনস্তত্ত্বের রাজ্য। ইহা চিন্তার চারু বিশ্লেষণে, উৎকট মানসিক সমস্যার সমাধানে, যুক্তি-তর্ক ও আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে—সাহিত্য-কলার একটা অতি বিশিষ্ট ও উপাদেয় সৃষ্টি হইয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে—পল্লীর নীরব আহ্বান। নামেই গ্রন্থ-পরিচয় সর্ব্বাপেক্ষা সার্থক হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই শস্য-শ্যামলা, ফুল্ল-কুসুমিত ভূমি হইতে নির্ব্বাসিত, তার নিকট এই বঙ্গ-প্রকৃতি ও বঙ্গ-সমাজ যে কত মনোরম, তাহা ব্যথার সঙ্গে অনুভব করিয়া, গ্রন্থকার অতি নিপুণ তুলিতে চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি প্রাকৃতিক বর্ণনা ফেনাইয়া

---

* শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী প্রণীত; মূল্য দুই টাকা।

বড় করেন নাই। তাঁহার লেখনী সর্ব্বদা সংযত। কবিত্বের খাতিরে তিনি পুষ্পপল্লব ও আকাশের নীলিমায় বইখানি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন নাই। তাঁর চালচিত্র ঠিক ততটুকু হইয়াছে, গল্পের চরিত্রগুলির জন্য ঠিক যতটুকু দরকার। কোথাও তিনি আবেগে ভাসিয়া যান নাই। কিন্তু হঠাৎ অনায়াসে অল্প কথায় লেখনীর দুই একটি টানে প্রকৃতির যে মোহিনী মূর্ত্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা পাঠকের মনে স্থায়ী দাগ দিয়া যায়। "জীর্ণ সংস্কারহীন জোড়া মন্দিরে কে প্রদীপটি জ্বালিয়া গিয়াছে,—তাহারই ক্ষীণ শিখাটি চঞ্চল ভাবে আঁকিয়া-বাঁকিয়া দীঘির কাল জলে অনেকখানি পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে।" এইখানে লেখনী তুলির কাজ করিয়া, দিব্য একটি ছবি আঁকিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ ছবি পাঠক পুস্তকের অনেক স্থানেই পাইবেন। "দিগন্ত-বিস্তৃত কালো আকাশটি তার কোটি-কোটি চক্ষু মেলিয়া লক্ষ্মীর মনের ভিতরকার সমস্ত কথাগুলি যেন পড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল।" নিঝুম রাত্রে প্রকৃতির সঙ্গে ব্যথিত মানব মনের বোঝা-পড়ার কথা দুই ছত্রে কেমন জাগিয়া উঠিয়াছে! "পল্লীটি তার বধূদের মতই গাছতলার আবরণের মধ্যেও সঙ্কুচিত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।" এই বর্ণনার ইঙ্গিত প্রকৃতি অপেক্ষা বঙ্গীয় বধূদের প্রতিই বেশী,—ঘনীভূত আবরণের মধ্যে থাকিয়াও যাঁহাদের লজ্জার অন্ত নাই। প্রতি অধ্যায়েই পল্লীসম্পদের প্রতি লেখকের সূক্ষ্ম দৃষ্টির নিদর্শন আছে। একটা পুকুরের ভাঙ্গা বাঁধা ঘাটের ধাপে এক যুবক জলের দিকে চাহিয়া পেছন ফিরিয়া বসিয়া আছেন। লক্ষ্মী শুধু তাঁর পেছন দিকটাই দেখিতে পাইল—"গৌরবর্ণ পিঠখানি তাঁর অনাবৃত......মানুষের পিছন দিকটা যে মানুষের সম্বন্ধে এত কথা বলিতে পারে, লক্ষ্মী তাহা আগে জানিত না।" এটিতেও লেখনী অপেক্ষা তুলির কাজই বেশী দেখা যায়। একটি মহার্ঘ ছত্রে লেখক সন্ধ্যার বর্ণনা করিয়াছেন—"সন্ধ্যা দিবসের সমস্ত তর্কবিতর্কের উপর বিশ্বাসের আশীর্ব্বাদটির মত।"

এই পুস্তকে লক্ষ্মীর একটা প্রচ্ছন্ন প্রেম-কাহিনী আছে; তাহা লেখক খুব ফলাইয়া দেখান নাই। তাহা আধ-আলো, আধ-আঁধারে বড় মধুর হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই প্রেম পল্লী-সৌন্দর্য্য-পূজার রূপান্তর মাত্র, —পল্লী-সুধাধারায় পূর্ণ ঘটে এই প্রেমের বোধন। পল্লী যেন লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিতেছেন "এতদিন যে সব সত্যকে কাছে আসিতে দেও নাই, দেখিতেছ না তাহারাই দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া হাসিতেছে—ঐ অপরিচিত যুবকটির আড়াল হইতে; আর বলিতেছে—আমাদের এত দিন চিনিতে পার নাই, তাই ত আজ তোমার যৌবনের মাঝখানটিতে যুবকের বেশে আসিয়াছি।"

লেখক তরুণ যুবক। ইনি সাহিত্যের আসরে আসিয়া প্রথমেই যে উচ্চ গ্রামে সুরটি বাঁধিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট খুবই আশাপ্রদ। ইনি কবিত্বের বাড়াবাড়ি করিয়া বইখানি অযথা ভারাক্রান্ত করেন নাই। ঘটনার দ্রুতগতি ও বাস্তবতায় গল্পটি পরিপূর্ণ হয় নাই। লেখক আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নের আতিশয্য দ্বারা প্রচারকের আসনের দাবী করেন নাই। কিন্তু অল্প কথায়, সংযত ভাবে, অতি সুন্দর, অনাড়ম্বর ও দীপ্তিপূর্ণ ভাষায়—উচ্চতর চিন্তা, উন্নততর আদর্শ এবং হৃদয়ের নানা প্রকার দ্বিধার সরল সমাধান দেখাইয়াছেন। এই পুস্তকখানিতে মুষ্টিপরিমেয় সামগ্রী পাইয়াছি; কিন্তু তাহা রত্নমুষ্টি। এই নবীন লেখকের কণ্ঠে আমরা এই ক্ষুদ্র যশোমাল্য দোলাইয়া ইহাঁকে সাহিত্য-সমাজে বরণ করিয়া লইতেছি। ইহাঁর নিকট আমাদের বহু প্রত্যাশা আছে।

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

শ্লেট ও শ্লেট-পেন্‌শিল

শ্লেট-পেন্‌শিল কেমন করিয়া তৈয়ার করিতে হয়, তাহা অনেকে জানিতে চাহিয়াছেন। বিলাত হইতে যে শ্লেট-পেন্‌শিল পূর্ব্বে আমদানী হইত, এবং এখনও কিছু-কিছু হয়, তাহা কোন রাসায়নিক পদার্থ নয়। উহাও পাথর—শ্লেট-পাথরের অপেক্ষা নরম পাথর। যে প্রণালীতে শ্লেট-পাথর চাকা করাতের সাহায্যে কাটিয়া, পাতলা করিয়া, মাজিয়া-ঘষিয়া, ফ্রেম লাগাইয়া, শ্লেট তৈয়ার করা হয়, ঠিক সেই প্রণালীতে শ্লেট-পেন্‌শিলও পাথর কাটিয়া তৈয়ার করা হয়। শ্লেট এবং পেন্‌শিল উভয়েরই যন্ত্রতন্ত্র প্রায় একই রকম; কেবল পেন্‌শিলের জন্য অতিরিক্ত একটা যন্ত্র চাই,—উহার গোল আকার দিবার জন্য।

এখন শ্লেট কেমন করিয়া তৈয়ার করা হয়, তাহা শুনুন। প্রথমে ডিনামাইটের সাহায্যে পাথর ভাঙ্গিয়া লইতে হইবে। পরে পাথরের খণ্ডগুলিকে চাকা করাতের আকারানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট আকারের ব্লকে পরিণত করিতে হইবে। চাকা করাতের আকার অবশ্য যে আকারের শ্লেট প্রস্তুত করা হইবে তদনুপাতের হইবে। চাকা করাতগুলি, বলা বাহুল্য,

শক্তির দ্বারা চালিত হইবে। ১৪ হইতে ২০খানি চাকা করাত পরস্পর হইতে সিকি ইঞ্চি ব্যবধানে থাকিয়া একসঙ্গে ঘুরিতে থাকে। এই চাকা করাতগুলির সামনে পাথরের ব্লকখানিকে রাখিয়া ঠেলিয়া দিলে, ব্লকখানি কাটিয়া শ্লেটের মত পাতলা অনেকগুলি খণ্ডে ভাগ হইয়া যায়। পরে তাহাদিগকে মাজিয়া-ঘষিয়া লইতে হয়। তাহাও যন্ত্র সাহায্যে সম্পন্ন হয়। শ্লেটের ন্যায় পেন্‌শিলের পাথরও প্রথমে ব্লকে পরিণত হয়। পরে চাকা করাতের সাহায্যে চতুষ্কোণ stickএর আকার ধারণ করে। এই আকারে পেন্‌শিল কাটিয়া লইবার জন্য চাকা করাতের সংখ্যা শ্লেটের অপেক্ষা অনেক বেশী হওয়া চাই। তার পর সেই ষ্টিকগুলিকে গোল করিয়া চাঁচিয়া লইতে হইবে।

ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক জায়গায় শ্লেটের পাহাড় আছে। তন্মধ্যে কাশ্মীর—গড়োয়াল অঞ্চলের শ্লেট পাহাড়ের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু সেখানে শ্লেটের কারখানা খোলা সুবিধাজনক বলিয়া মনে করি না। কারণ, স্থানান্তরে চালান দিতে রেলভাড়া এত বেশী পড়িয়া যাইবে যে, ব্যবসায় চালানো কঠিন হইবে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে চন্দ্রনাথ তীর্থে যাইবার পথেও শ্লেট পাহাড় আছে বলিয়া শুনিয়াছি। যদি যথার্থই সেখানে শ্লেটের পাহাড় থাকে, এবং ইঙ্গিতের পাঠকগণের যদি কাহারও সে সংবাদ জানা থাকে, তবে তিনি আমাকে ঐ পাহাড়ের অবস্থান, চট্টগ্রাম সহর হইতে উহার দূরত্ব, কিম্বা ঐ পাহাড় হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী নদী বা সমুদ্রতীরবর্ত্তী যে কোন নগরের দূরত্ব, পাহাড়টি যাহার জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত তাঁহার নাম ঠিকানা প্রভৃতি সংবাদ আমাকে জানাইলে অনুগৃহীত হইব। শ্লেটের কারখানা স্থাপনের জন্য কত মূলধন, এবং কিরূপ কলকব্জা, মজুরী প্রভৃতি দরকার, আমি তাহার একটা এষ্টিমেট তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এই সংবাদগুলি না জানায় এষ্টিমেট সম্পূর্ণ করিতে পারিতেছি না। আমার মনে হয়, চট্টগ্রামের কাছে শ্লেট পাহাড় পাওয়া গেলে, তথায় কারখানা স্থাপন করিলে, রপ্তানির বিশেষ সুবিধা হইবে।

পেন্‌শিল তৈয়ারীর পক্ষে বিলাতের অপেক্ষা আমাদের একটু বেশী সুবিধা আছে বলিয়া মনে হইতেছে। বিলাতী পেন্‌শিল নরম পাথর কাটিয়া তৈয়ার হয় বটে, কিন্তু সে পেন্‌শিলের লেখা তেমন উজ্জ্বল হয় না। আমাদের ভারতবর্ষে এমন সুন্দর পাথর পাওয়া যায়, যাহা পেন্‌শিলের আকারে কাটিয়া লইলে, উত্তম—অতি উত্তম পেন্‌শিল হইতে পারে। তাহার লেখা খুব উজ্জ্বল সাদা হইবে। আমাদের গৃহস্থ-ঘরে যে সকল পাথরের বাসন ব্যবহৃত হয়, তাহার পাথর নানা প্রকারের। তন্মধ্যে একপ্রকার ঈষৎ সাদা এবং অল্প লালচে পাথর আছে। সেই পাথরটি পেন্‌শিল তৈয়ার করিবার পক্ষে খুবই উপযোগী। সাদা পাথর বলিতে, অবশ্য, শ্বেত-পাথর বলিয়া যাহা পরিচিত, তাহার কথা বলিতেছি না। আমি যে পাথরের কথা বলিতেছি, তাহা বোধ হয় পাঠক-পাঠিকাগণ সহজেই বুঝিতেছেন। কারণ, শ্বেত-পাথরের বাসন খুব মূল্যবান বলিয়া সকলের ঘরে থাকা সম্ভব না হইলেও যে লালচে পাথরের কথা বলিতেছি, তাহা প্রায় প্রতি গৃহস্থের ঘরেই দুই-চারিটা করিয়া আছে, এবং বাজারেও সেই পাথরের নানারকম বাসন সর্ব্বদাই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই পাথর যে পাহাড় হইতে পাওয়া যায়, সেই পাহাড়ের কাছে কারখানা খোলা যাইতে পারে। এবং কারখানা খুলিলে, এত ভাল পেন্‌শিল তৈয়ার হইবে যে, তাহা স্বচ্ছন্দে বিদেশে রপ্তানিও করা যাইতে পারিবে।

যতদিন না সেই কারখানা তৈয়ার হইয়া পেন্‌শিল উৎপন্ন হয়, ততদিন, আমি পরামর্শ দিই, ঐ রকম পাথরের বাসন ভাঙ্গিয়া গেলে, কেহ যেন তাহা ফেলিয়া না দেন; উহা যেন সকলে পেন্‌শিলের মত ব্যবহার করেন। তাহা হইলে একটা অকেজো জিনিস খুব কাজে লাগিবে।

দেশালাইয়ের কল।

আর এক প্রকার দেশী দেশালাইয়ের কলের সন্ধান পাইয়াছি। বেহালার ঘটক আয়রণ ওয়ার্কস এই কল তৈয়ার করিতেছেন। এই একই কলে প্রক্রিয়া-ভেদে বাক্স, টানা এবং কাটি তৈয়ার হয়। কাঠের ব্লক এই কলে রাখিয়া হাতল চাপিলে, বাক্সের উপযোগী পাতলা-পাতলা খণ্ডগুলি কাটা হইয়া যায়; এবং সঙ্গে-সঙ্গে কোণ মুড়িবার খাঁজও তৈয়ার হয়। টানার পাতলা কাঠগুলিও এই উপায়ে কাটা হয়। কাটি তৈয়ার করিবার জন্য ছুরি বদলাইয়া লইতে হয়। ছুরির ধার পড়িয়া গেলে, তাহা স্বচ্ছন্দে খুলিয়া আবার ধার

করা যায়। ইহার ওজন আন্দাজ তিন মণ। ইহা বসাইতে ৫ বর্গ-ফিট স্থানের দরকার হয়। ১০ ঘণ্টা কল চালাইলে ৭-৮ গ্রোস দেশালাই তৈয়ার হইতে পারে।

এই কলের সঙ্গে কতকগুলি সরঞ্জাম দরকার হয়। দেশালাইয়ের কারখানায় সচরাচর এই-এই কাজ করা দরকার হয়; যথা,—(১) বাক্সের জন্য কোণ মুড়িবার খাঁজওয়ালা পাতলা কাঠ কাটা। (২) টানার জন্য ঐরূপ পাতলা কাঠ কাটা। (৩) কাটি তৈয়ার করা। (৪) কাটির মুখের ও বাক্সের গায়ের মসলা তৈয়ার করা। (৫) বাক্সের গায়ে কাগজ ও লেবেল মারা। (৬) বাক্সের গায়ে মসলা লাগানো। (৭) কাটির মুখে মসলা লাগাইবার পূর্ব্বে মুখগুলি একবার প্যারাফিনে ডুবাইয়া লইতে হয়। প্যারাফিনে ডুবাইবার আগে কাটিগুলিকে উত্তমরূপে শুকাইয়া লইতে হয়। (৮) শুষ্ক কাটিগুলির মুখ প্যারাফিনে ডুবানো। (৯) তৎপরে কাটির প্যারাফিন-লাগানো মুখে মসলা লাগানো। (১০) কাটি ও বাক্সগুলিকে আবার শুকাইয়া লওয়া। (১১) বাক্সে কাটি পোরা। (১২) ডজন ও গ্রোস হিসাবে প্যাক করা। এই সকল প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথম তিনটি ঐ কলে হইবে। বাকীগুলি হাতেই হয়—জাপানেও ছেলে-মেয়েরা হাতেই করিয়া থাকে। তবে ইহাদের জন্য কতকগুলি পাত্র দরকার হয়। সে পাত্র বা সরঞ্জামগুলি এই,—(১) মসলা বা রাসায়নিক পদার্থগুলি গুঁড়াইবার হামানদিস্তা অথবা কল। (২) বাক্সে লেবেল লাগাইবার ব্যবস্থা। (৩) বাক্সের গায়ে মসলা লাগাইবার ফ্রেম। (৪) প্যারাফিন গলাইবার উনান্ বা ষ্টোভ। (৫) মসলা লাগাইবার পূর্ব্বে কাটিগুলিকে ফাঁক ফাঁক করিয়া (যাহাতে ভিজা অবস্থায় মসলা-মাখানো কাটির মুখগুলি পরস্পরের সঙ্গে জুড়িয়া না যায়) সাজানো (৬) ঐরূপে সজ্জিত কাটিগুলিকে ফ্রেমে আঁটিয়া বাঁধা। (৭) মসলা শুকাইবার জন্য ফ্রেমগুলি আটকাইয়া রাখিবার র‍্যাক। (৮) কাটিগুলি প্রথম ডবল সাইজের কাটা হয়, এবং দুই মসলা লাগানো হয়। মসলা শুকাইবার পর মাঝখান কাটিয়া লইলে সাধারণ আকারের কাটি কাটা হয়,—সেই কাটি কাটিবার জন্য ছুরি। (৯) কাটি ও বাক্স শুকাইবার ঘর। (১০) বাক্সে কাটি পূরিবার যন্ত্র।

দেশালাইয়ের বাক্স ও কাটির জন্য যে অসুবিধা আমাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে একবার আলোচনা করিয়াছি। কাঠের সম্বন্ধে ইঙ্গিতের কয়েকজন পাঠক যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও যথাসাধ্য প্রকাশ করিয়াছি।

যাহারা কল তৈয়ার করিয়াছেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত কাঠগুলি ব্যবহারের পরামর্শ দিতেছেন। বাঙ্গালা দেশে—(১) কদম্ব (Antho cephalus Cadamba); (২) ছাতিয়ান বা ছুত্রং (Alstonia scholaris), (৩) সিমুল (Bombax malabaricum, Bombax insigne), (৪) দেবদারু (Polyanthus Polyfolia); (৫) চিটিকিলা বা মেড়া (Trewia nudiflora), (৬) বরুণ (Crataeva Religiosa), (৭) গেঁয়ো (Excaecaria Agallocha); (৮) আমড়া (Spondias mangifera); (৯) বনমালা (Litsaca Salicifolia); ইহাদের মধ্যে (১), (৩), (৮) ও (৫) নং কাঠ পূর্ব্ববঙ্গেও সুলভ। আরও অন্যান্য জাতীয় কাঠের দরকার হইলে, কলপ্রস্তুতকারকেরা তাহাও জানাইয়া থাকেন।

এই কল চালাইয়া দেশালাই প্রস্তুত করিতে মোটামুটি কিরূপ পড়তা পড়ে, তাহারও একটা হিসাব এখানে দিতেছি।

এক সেট কল প্রত্যহ ১০ ঘণ্টা চালাইলে দৈনিক ৮ গ্রোস দেশালাই তৈয়ার হইতে পারে। খুব সম্ভব তিন সেট কলে দৈনিক ৩০ গ্রোস এবং ৬ সেট কলে দৈনিক ৬০ গ্রোস দেশালাই তৈয়ার হইবে, তাহা হইলে যথাক্রমে ৬০ গ্রোস, ৩০ গ্রোস ও ৮ গ্রোস দেশালাই প্রস্তুত করিবার পড়তা নিম্নলিখিত প্রকার হইবে—

	৮ গ্রোস	৩০ গ্রোস	৬০ গ্রোস
কাঠ	১৲	৩৸৴১০	৬৷৶০
মসলা	২৷০	৮৲১০	১৫৲
কাগজ ও লেবেল	১৲	৪৲	৭৲
অন্যান্য খরচ	৷৷০	১৲	২৲
ছুতার মিস্ত্রী	(১ জন) ৸০	(২ জন) ১৷৷০	(৪ জন) ৩৲
মজুর	(৩ জন) ১৷৷০	(৭ জন) ৩৷৷০	(১০ জন) ৫৲
বালক	(৬) ২৷০	(১৮ জন) ৬৸০	(৩০ জন) ১২৸০
বাক্স তৈয়ার করিবার খরচ	১৲	৪৷০	৮৲

ম্যানেজার		২॥০	২॥০
মোট	১০।০	৩৫।/০	৬১৸৵০
প্রতি গ্রোসে			
পড়তা	১।৲১০	১৵১০	১৲১০

এক সেট কল বসাইলে আর স্বতন্ত্র ম্যানেজার রাখিবার দরকার হইবে না; কলের মালিকই ম্যানেজারের কাজ করিবেন; সেই জন্য ৮ গ্রোসের তালিকায় ম্যানেজারের পারিশ্রমিক ধরা হয় নাই। একেবারে তিন সেট কল বসানোই সুবিধা। কারণ, কলে তিনটী বিভিন্ন রকমের কাজ করিতে হইবে; যথা, কাটি তৈয়ার করা, বাক্স তৈয়ার করা ও বাক্সের টানা তৈয়ার করা। এক সেট কল বসাইলে, ছুরিগুলি মধ্যে-মধ্যে বদলাইতে হইবে, তাহাতে কতকটা সময় নষ্ট হইবে; কাজেই কাজও কম হইবে। আর, তিন সেট কল বসাইয়া এক-একটী কাজের জন্য এক-এক রকম ছুরি সাজাইয়া লইলে সময় বেশী নষ্ট হইবে না। একসেট কল বসাইতে ১০০০৲ টাকা এবং তিন সেট কলে ২৫০০ কি ৩০০০ টাকা মূলধন চাই।

এখন কি-কি কল ও তাহার মূল্যাদি কিরূপ পড়িবে তাহা দেখুন।

একটী কল	৩৩৫৲
কল বসাইবার তিনটি পায়া	৪৫৲
তার	১৫৲
প্যারাফিন গলাইবার ষ্টোভ	১৫৲
কাটি সাজাইবার পাত্র	৩৲
আঁটি বাঁধিবার যন্ত্র	॥০
	৪১৩॥০
জের	৪১৩॥০
র‍্যাক	১৫৲
কাটিবার যন্ত্র	৫০
বাক্সের গায়ের মসলা লাগাইবার যন্ত্র	৩৲
অতিরিক্ত ছুরি	৪৭৲
মোট	৫২৮॥০

এই লোহার কারখানায়, দেশালাইয়ের কল চলিতেছে,—গেলেই দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা দেশালাইয়ের কল স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে ইঁহারা যন্ত্রের সহিত দেশালাই তৈয়ার করিবার প্রণালী শিখাইয়া দিয়া থাকেন। ঘটক আয়রণ ওয়ার্কসের একজন ভদ্রলোক তাঁহাদের নিজেদের কলে নিজেদের হাতে তৈয়ারী দেশালাইয়ের নমুনা আনিয়া আমাকে দেখাইয়া গিয়াছেন; দেশালাই বেশ সুন্দর হইয়াছে। ইঁহাদের কারখানায় অন্যান্য কলও তৈয়ার হয়; এবং ফরমাইস্ মত তাঁহারা অপর নানা প্রকার কল তৈয়ার করিয়াও দিতে পারেন।

সূত্ররঞ্জন।

কাপড়ের পা'ড়ের সুতার লাল রঙ করিবার একটী প্রণালী রংপুর, মুনখাওয়া হইতে শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ লাহিড়ী মহাশয় শ্রীবিশ্বকর্ম্মাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

রংপুর অঞ্চলে পূর্ব্বাপরই চরকার সুতার কাপড় কিছু কিছু ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান আন্দোলনে চরকার প্রচলন কিছু বেশী হওয়ায় ঐরূপ বস্ত্রের ব্যবহারও কিছু বেশী হইতেছে। এতদঞ্চলের জোলারা চরকায় কাটা সুতা দিয়াই টানাপোড়েন উভয় কার্য্য সুচারু রূপে করিয়া থাকে এবং এই সুতাই প্রধানতঃ লাল রং এ রঞ্জিত করিয়া উহাদ্বারা কাপড়ের পা'ড় দিয়া থাকে। সুতায় রং করিবার প্রণালী যথা—কতকগুলি আমগাছের ছাল, জিউলীগাছের ছাল (জিউলী গাছকে রংপুরে জিগা গাছ বলে, ইহার শাখা রোপন করিলেই গাছ হয়, এই গাছ হইতে বর্ষাকালে প্রচুর নির্য্যাস বাহির হয় এবং ইহাদ্বারা আঠার কাজ হয়) ও ডোয়া গাছের ছাল (পশ্চিম বঙ্গে সম্ভবতঃ ডোরে বলিয়া থাকে, ইহার ফল টকের জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। ফল পাকিলে হলুদ মিশ্রিত লাল রং হয় এবং উহার ভিতরে ছোট ছোট কোষ থাকে) সমপরিমাণে লইয়া ছালগুলি পরিষ্কার করিয়া লইয়া শিল নোড়াতে থেঁতো করিয়া লইয়া অল্প পরিমিত চূণ মিশ্রিত করার পর ওগুলি বাটীর বা লোহার পাত্রে জল মিশ্রিত করিয়া ২ ঘণ্টা পরিমাণ সময় আস্তে আস্তে জ্বাল দিলে লাল রং এর জল বাহির হইবে। ঐ ফুটন্ত জলে সুতা কতক সময় ভিজাইয়া রাখিলে বা উননের উপরেই সুতা দিয়া কিছুক্ষণ উত্তপ্ত করিলে যে লাল রং হইবে ঐ রং কিছুতেই উঠিবে না। চূণ, ছাল থেঁতো করার পর জল মিশালের সময় দিতে হইবে।—

শিল্প-বিদ্যালয়।

এবার আপনাদিগকে একটী শুভসংবাদ দিই। কলিকাতা ১২৪।৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীটে ২৫।২৬ জন খ্যাতনামা বিদেশ-প্রত্যাগত, শিল্প-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি (expert) এই টেক্নোলজিক্যেল কলেজ স্থাপন করিয়াছেন। এই থানে আমেরিকার আদর্শে আই, এস সি, ও বি, এ নাই, ছাত্র দিগকে নিম্নলিখিত শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(১) কাঁচ ও কাঁচের দ্রব্য উৎপন্ন (২) চিরুণী প্রস্তুত (৩) এনামেল দ্রব্য (৪) চীনা বাসন (৫) রঞ্জন বিদ্যা (৬) বিস্কুট প্রস্তুত (৭) সাবান ও তেলাদি (৮) ইলেক্ট্রীক্যেল ও মেকানিক্যেল ইঞ্জিনিয়ারী; (৯) রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণ।

অধ্যাপকগণের কারখানায় হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ে ১২টী করিয়া ছাত্র লওয়া হইবে এবং শিল্পের গুরুত্বহিসাবে ১ হইতে তিন বৎসর কাল শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।—

(১) বস্ত্র বয়ন (২) সুতাকাটা (৩) খাম ও পোষ্টকার্ড (৪) কার্টেজের কাজ (৫) রজ্জু-তৈয়ার (৬) বোতাম প্রস্তুত (৭) গুটীসুতা (৮) কালী ও ঔষধের বড়ি (৯) মোজা বোনা (১০) সেলাই শিক্ষা (১১) মসলা (১২) শটী ও বারলী, (১৩) ডালভাঙ্গা (১৪) আটা তৈয়ার (১৫) আসবাব পত্র প্রস্তুত করণ।

এই সমস্ত গৃহশিল্প চালাইবার উপযোগী কল-কব্জাদি বসানো হইয়াছে।

৺কমলাকান্ত

[শ্রীকালিদাস রায় বি-এ কবিভূষণ]

শ্যামার চরণ-কমলভৃঙ্গ কমলাকান্ত তুমি!
তোমার জন্মভূমিতে তোমার চরণ-চিহ্ন চুমি,
তব আশ্রম-রেণুতে জনমি জীবন ধন্য গণি,
শক্তির-বরনন্দন তুমি, ভক্তের শিরোমণি।

চিন্ময় দীপে উজল করেছ দীপান্বিতার রাতি,
নিজ চিতানলে জ্বলে গেছ তুমি স্বর্গপথের বাতি।
শ্মশানে শ্মশানে বিষাণে বিষাণে তব আহ্বান-ধ্বনি;
শক্তির বরনন্দন তুমি ভক্তের চূড়ামণি।

প্রমথ পিশাচে ভক্তিমন্ত্রে দানিলে দীক্ষা নব
লালসা বিনাস ভোগের মৃত্যু যোগের ত্রিশূলে তব।
দস্যু-দানব চরণে লুটিল, লুটিল সিংহ ফণী।
শক্তির বরনন্দন তুমি ভক্তের চূড়ামণি।

লক্ষপতির বক্ষে জাগালে পরা-মোক্ষের তৃষা,
তোমার পঞ্চমুণ্ডীর তলে বঞ্চিল কত নিশা।
মিলালে শ্মশান-ভস্মের তলে অপবর্গের খনি।
শক্তির বরনন্দন তুমি ভক্তের শিরোমণি।

তোমার উগ্র সাধনার তেজ জবায় জবায় জ্বলে
তোমার ভক্তি-অমৃত সাধুর নয়নে নয়নে গলে
বঙ্গের মঠ মন্দিরে বাজে তব বাণী সনাতনী।
শক্তির বরনন্দন তুমি ভক্তের শিরোমণি।

বিজিতা

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১)

সেদিন যখন মুখখানা অন্ধকার করিয়া যোগেন্দ্র বোস বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই খোঁজ করিলেন "পিসিমা কোথায়," তখন তাঁহার এই অকস্মাৎ আগমনে সমস্ত অন্তঃপুরটা যেন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সেখানে যে যে ছিল, সকলেই সরিয়া পড়িল,—পারিল না কেবল প্রতিভা। তাড়াতাড়ি সে উত্তর দিল, "পিসিমা সন্ধ্যা করছেন, নিজের ঘরে।"

যোগেন্দ্র বলিলেন "ডেকে দে।"

সেই তখনি মাত্র পিসিমা মালাজপ করিতে বসিয়াছেন। প্রতিভা গিয়া তাঁহাকে জানাইল, যোগেন্দ্র ডাকিতেছেন।

পিসীমা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ভাল জালা হয়েছে আমার। এ বাড়ীতে সকাল-সন্ধ্যে দুটো বেলা যদি সন্ধ্যা করতে বসবার যো আছে। বল গে যা, আমি জপ করতে বসেছি,—এখন যেতে পারব না। জপটা হয়ে যাক্,—যাওয়া যাবে'খন।"

প্রতিভা ফিরিতেছিল,—সেই সময় কি মনে করিয়া পিসীমা বলিলেন, "রোস, তা বলে সত্যি এ কথা তাকে বলতে যাস নে যেন। যে প্রকৃতির মানুষ সে, এখনি চটে উঠে, একাকার করে বসবে'খন। বল গে যা, আমি আসছি এখনি।"

প্রতিভা চলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি জপের মালা দেওয়ালের হুকে টাঙ্গাইতে গিয়া পড়িয়া গেল; বিরক্ত পিসীমা আবার সেটাকে তুলিতে গিয়া, হুকে বাধাইয়া ছিঁড়িয়া বসিলেন। চারিদিকে সবগুলি ছড়াইয়া পড়িল। বিরক্তির ফল দেখিয়া, পিসীমা খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন।

ওদিকে যোগেন্দ্র চীৎকার করিতেছেন, "আসবে কি না বল। ভাল বিপদ হয়েছে। মালাটালা সব ছিঁড়ে একদিন গঙ্গার জলে দূর করে ফেলে দিয়ে আসব।"

পিসিমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। তিনি দালানে আসিয়া সানুনাসিক সুরে বলিলেন, "তোকে আর সে কষ্ট সহ্যি করতে হবে না যোগেন,—ভগবান নিজেই মালা ছিঁড়েছেন। ইচ্ছে হয়, কুড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে আয় গে যা। সেই সঙ্গে আমাকেও নিয়ে চল না কেন,—সকল আপদ তোদের মিটে যাবে।"

বড়বাবু অপ্রস্তুত হইয়া, মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "সত্যি মালাটা ছিঁড়ে বসেছ? এই প্রতিভা, যা, দেখি, মালাটা খুব ভাল করে গেঁথে দিয়ে আয় গে। মালাটা ছিঁড়লে রাগ করে পিসিমা! আমার কি মাথার ঠিক আছে কিছু? কি বলতে কি বলে ফেলি,—তাতে যদি তুমিও দোষ ধরবে, তবে আমি দাঁড়াই কোথা বল দেখি?"

তাঁহার নরম সুর শুনিয়া বৃদ্ধা পিসীমার রাগ জল হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "না বাবা, রাগ করে ছিঁড়ব কেন,—হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। যাক, গেঁথে নিলেই হবে'খন। আমায় ডাকছিলে কেন বল দেখি?"

যোগেন্দ্র বলিলেন "কথাটা কিছু সাংঘাতিক গোছের। দেখ, তুমি এখনও মায়ের মত মাথার উপর বুক পেতে রয়েছ,—আমাদের চারটি ভাইকে তুমিই দেখছ-শুনছ। মনে কর, এই চারটীর মধ্যে কেউ যদি একত্র থাকতে অস্বীকার করে, তা হলে কি রকমটা হয়?"

পিসিমা দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, "পৃথক হবার কথা? কে বলেছে বল্ দেখি? তুই যে অবাক্ করলি যোগেন!"

যোগেন্দ্র বলিলেন, "অবাক্ হবার মত এতে কিছুই নেই পিসিমা। জগতে সবই হয়েছে, এখনও হচ্ছে। নৃপেন এখন কোন রকমে পৃথক হবার কথাটা পাড়তে চায়। আমার মনে হচ্ছে, সে বলতে চায়, এ সংসারে থেকে তার বেজায় কষ্ট হচ্ছে।"

পিসিমা একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তোর তো সবই মনে হয়; সে স্পষ্ট কোনও কথা বলেছে কি?"

যোগেন্দ্র বলিলেন, "সে আর আমার সামনে বলবে কি করে? এটা জানা কথা, মেজ বউমাকে নিয়ে যত গোল বাধছে। তিনি যতটা স্বাধীনতা চান, এই একান্ন সংসারে থেকে ততদূর হয়ে উঠছে না। তিনি তাই আলাদা হতে চান।"

যোগেন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব রহিলেন। তাহার পর গভীর দুঃখ-পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন "আমি ভেবেছিলাম নৃপেন একটা মানুষ হবে। আমি যা করতে পারলুম না, সে তাই করবে। আমি তো দুনিয়ার বা'র পিসিমা,—আমার কাছ হতে লোকে মন্দ ছাড়া ভাল কিছু পাবার প্রত্যাশা করে না। ভাই তিনটাকে গায়ের রক্ত জল করে মানুষ গড়িয়ে তুললুম, যথেষ্ট শিক্ষা দিলুম। ভাবলুম—আমি অভাবে পড়ে লেখা-পড়া শিখতে পারি নি বলেই, ভাল কাজ কিছু করতে পারি নি। তারা যথেষ্ট লেখাপড়া শিখলে ভাল হবে,—ভাল কাজও করতে পারবে। ক্রমে তাদের শিক্ষার ফল যা তারা দেখাচ্ছে, তাতে আমার ইচ্ছে হচ্চে, এখুনি সংসার ছেড়ে দিয়ে চলে যাই। একটা অতিরিক্ত স্ত্রৈণ,—একটা চরিত্রভ্রষ্ট মাতাল, একটা মাথাপাগলা, এককোঁটা বুদ্ধি মাথায় নেই। অথচ সবাই শিক্ষিত, সবাই বুদ্ধিমান। অদৃষ্ট আর কাকে বলে?"

পিসিমা সদুঃখে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "বউ এসেই তো ভাইদের পৃথক করে দেয় বাবা। যত সব ছোট বংশের মেয়ে এসেছে কি না;—মন্দটা জানে, তাই মন্দ ব্যবহারটাই আগাগোড়া করে যাচ্ছে। হোতো যদি ভাল বংশের মেয়ে, এই সংসারটাকেই স্বর্গ করে তুলত। যখন বড় বউমার পানে চাই, আমার বুকটা একেবারে ভরে উঠে। যখন মেজ বউ কি সেজ বউয়ের পানে চাই, আমার বুক একেবারে ভেঙ্গে যায়। সংসারের ভবিষ্যৎ ভেবে আমি একেবারে বসে পড়ি। তোর মা মরবার সময় তোদের চারটী ভাইকে আমারই হাতে দিয়ে গেছে;—বারবার বলে গেছে, 'দেখো, আমার চারটী ছেলে যেন চিরকাল এক হয়েই থাকে, কেউ যেন পৃথক না হয়।' আমি প্রাণপণে তোদের সব এক করে রাখবার চেষ্টাতেই আছি; কিন্তু আমার চেষ্টা যে সফল হবে, তা আমি বুঝছি নে। আর বেশী দিন নয় বাবা,—এ সংসার শীগ্‌গিরই ভাঙ্গবে। তার আগে আমায় কাশী পাঠিয়ে দে। তোদের ভাইয়ে-ভাইয়ে পৃথক হওয়া—আমি বেঁচে থাকতে চোখে দেখতে পারব না। আড়ালে থাকি—সে আমার ভাল।"

পিসিমা বারবার চোখ মুছিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্র অস্থির ভাবে বলিলেন, "থামো পিসিমা, অনর্থক এখনি কাঁদতে হবে না। কথাটা নৃপেন এখনও পাড়তে সাহস করে নি। পাড়তে পারে, তার ভাবে সেটা জানা যাচ্ছে—তাই বললুম। যাই হোক, ব্যাপারটা নিয়ে এখন গোলমাল কোর না, কাউকে জানিয়ো না। তাতে আরও খারাপ হতে পারে—ওদের চক্ষুলজ্জাটা ভেঙ্গে যাবে। তোমায় জানিয়ে রাখলুম, তার মানে—তোমরা তো আমায় বদ বলেই জানো,—এর পরে হয় তো ভাববে, আমিই এ সব কথা তুলেছি।"

পিসিমা ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তুই বদ? এ কথা আমি কখনও মনে করি নে যোগেন। লোকে যে যাই বলুক, আমি জানি তুই-ই সৎ। নেপা, রমেন বয়ে গেছে; শৈলটা আস্ত পাগল,—মাথায় কি তার কিছু আছে? ওতে কেবল গোবর ভরা। এম-এ পড়ছে যে ছেলে, সে কি না আজও যায় ছোট ছেলেদের সঙ্গে মার্ব্বেল খেলতে;—প্রতিভাদের খেলাঘরে পূজো করবার পুরুতও হয়। দিনরাত খেলা নিয়েই আছে। ওতে কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব নেই। আমি নিয্যস বলছি, ওটাও কক্ষনো মানুষ হবে না।"

"কে মানুষ হবে না পিসিমা?"

যাহার কথা হইতেছিল, সেই মাঝখানে আসিয়া পড়িল। সকৌতুকে চোখ দুইটা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, "কার কথা হচ্চে বড়দা?"

যোগেন্দ্র রাগত সুরে বলিলেন, "তোর কথা!"

থতমত খাইয়া শৈলেন বলিল "আমার কথা কি?"

জ্যেষ্ঠ উত্তর না দিতেই, পিসিমা উত্তর দিলেন, "এত বড় ছেলে হয়েছিস—আজও একটু বুদ্ধি হল না। তার পরে যেই বিয়েটা হবে, অমনি বউয়ের পরামর্শ কাণে নিয়ে বলবি, পৃথক হব। বড় ভাই যে কত আশা করে মানুষ করলে, লেখা-পড়া শেখালে,—সব ভুলবি তখন।"

শৈলেন হাসিয়া উঠিল, "গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। পিসিমা যে কি বলছ, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি নে। পৃথক কে হতে চাচ্চে বল তো?"

রাগত ভাবে পিসিমা বলিলেন, "তোর গুণধর মেজদা।"

শৈলেন আশ্বস্ত ভাবে বলিল, "ওঃ, ভারি তো কথা, এতে এত কাণ্ড কিসের? পৃথক হওয়া অমনি মুখের কথা কি না!"

যোগেন্দ্র বলিলেন, "যা, নিজের কাজ করগে,—মিছে

এসব ব্যাপার নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।"

শৈলেন একটু হাসিয়া বলিল, "তা যাচ্ছি, কিন্তু পিসিমা যে বলছেন বিয়ে করলেই আমি পৃথক হয়ে যাব—"

পিসিমা বলিলেন "তা যাবিই তো।"

শৈলেন বলিল, "বিয়ে করলে তবে তো পৃথক হব। আমি যদি বিয়ে না করি—"

যোগেন্দ্র ধমক দিয়া বলিলেন, "মিছে জেঠামো করিস নে শৈলেন, নিজের কাজ করগে যা। তোকে তো কেউ ডাকছে না, এসব বিষয়ের নিষ্পত্তি করবার জন্যে!"

শৈলেন মুখখানা অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া বলিল, "তা, আমার তো জেনে রাখা দরকার সব।"

যোগেন্দ্র বলিলেন, "কিচ্ছু দরকার নেই। যখন দরকার হবে, তখন ডাকবো তোকে। এখন তোকে যে দিকে রাখা হয়েছে, যে কাজ করতে দেওয়া হয়েছে, তাই করগে যা।"

শৈলেন্দ্র আস্তে-আস্তে সরিয়া গেল।

যোগেন্দ্র বলিলেন, "ও পাগলটার কথা ছেড়ে দাও,—ওকে কোনও কথা জানাতে নেই। কি গোলমাল করে তুলবে এখনি, কে জানে। যাই হোক, যাও তুমি, এখন জপ কর গে।"

তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন। সেদিন পিসিমার মালা-জপ সেইখানেই সমাপ্ত হইয়া গেল।

(২)

পিতা যখন চারটী ভাইকে রাখিয়া মারা যান, তখন সকলেই শিশু। ইহাদের মধ্যে যোগেন্দ্র নবম বর্ষীয় ছিলেন। তাহার পর যোগেন্দ্র যখন ত্রয়োদশ বর্ষীয়, তখন মাতাও ইহলোক ত্যাগ করেন। সংসারে ছিলেন বাল-বিধবা পিসিমা। ভ্রাতৃ-বধূর মৃত্যুর পরে তিনিই সম্পূর্ণ ভাবে এই চারটী শিশুর ভার নিজে গ্রহণ করিলেন।

শ্বশুরালয়ের অতি সামান্য সম্পত্তিই তিনি পাইয়াছিলেন। তাহার দ্বারা তিনি ইহাদের ভরণ-পোষণ চালাইতে লাগিলেন। যোগেন্দ্রের পিতা মৃত্যুকালে কয়েক হাজার টাকা দেনা রাখিয়া গিয়াছিলেন। একটু জ্ঞান হইলে, যোগেন্দ্র নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, এবং ব্যবসার দিকে মন দিলেন।

অদৃষ্ট তাঁহার সুপ্রসন্ন ছিল। প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফলে অচিরে তিনি বিশেষ ধনী হইয়া উঠিলেন। নিজে ভাল লেখা-পড়া শিখিতে পারেন নাই বলিয়া, ভাই তিনটিকে মনের মত লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। তাঁহার একান্ত যত্নে নৃপেন্দ্র আই এ এবং রমেন্দ্র বি এ পর্য্যন্ত পড়িতে পারিল। নৃপেন্দ্র ব্যবসার দিকে আসিলেন; রমেন্দ্র চাকরী করিতে গেলেন। কনিষ্ঠকে যোগেন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত পড়াইবেন, স্থির করিলেন।

এ সংসারে বাস্তবিক লক্ষ্মী ছিলেন বড়বধূ সুষমা। ইনি যোগেন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথম পক্ষের পুত্র অমিয় এখন সপ্তম বর্ষীয় বালক।

সুষমার বিবাহ হইয়াছে আজ পাঁচ বৎসর। তখন অমিয় মাত্র দুই বৎসরের শিশু। সুষমা স্বামীর আলয়ে পদার্পণ করিয়াই, এই মাতৃহীন শিশুকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। কেহ দেখিলে বুঝিতে পারে না, অমিয় তাঁহার গর্ভজাত পুত্র নহে। পিসিমা প্রথমটা সন্দেহের চোখেই এই সৎমাকে দেখিয়াছিলেন। দুই-চার দিন পরেই তিনি প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন, বড়বউ রাং নহে, বাস্তবিকই সোণা। বড়বউ যাহা করে, তাহাই উজ্জ্বল, মধুর হইয়া উঠে।

এই পাঁচ বৎসরেই বাড়ীতে বড়বউয়ের অক্ষুন্ন প্রতাপ লক্ষিত হইতেছে। ঝগড়া-বিবাদ যেখানে, সুষমা সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেই বিবাদ মিটিয়া যাইত। বাড়ীর সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত, ভালবাসিত।

সুষমা সকলকেই বশীভূত করিতে পারিয়াছিলেন; পারেন নাই মেজবউ সুলতা ও সেজবউ পূর্ণিমাকে।

এই দুইটী নারীর প্রকৃতি যে ব্যাঘ্রের তুল্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সুলতা কলিকাতার শিক্ষিতা মেয়ে। আজকাল অনেক শিক্ষিতা মেয়ে যেমন স্বাধীন হইবার ইচ্ছা মনের মধ্যে পোষণ করেন, সেও তেমনি করিত। এ সংসারের সহিত কোন ক্রমেই তাহার মিশ খাইত না। সে তাই প্রায় সমস্ত দিনটাই দ্বিতলে নিজের গৃহে বসিয়া, বুনিয়া, বই পড়িয়া, সময় কাটাইয়া দিত। সে গৃহে বড় একটা কেহ যাইত না। কেবল শৈলেন কোনও বাধা-বিপত্তি মানিত না। সে এমনি আকস্মিক ঝড়ের মত সে গৃহে গিয়া পড়িত যে, সুলতা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত। কিন্তু তথাপি সে মুখ ফুটিয়া এই চঞ্চল শিশু-প্রকৃতি দেবরকে কিছু বলিতে পারিত না। মনের রাগ তাহার মনেই থাকিয়া যাইত,—বাহির হইবার পথ পাইত না।

সেজবউ পূর্ণিমা দরিদ্রের গৃহের মেয়ে। শিশুকাল হইতেই সে বিলক্ষণ চালাক। মেজবউ রাগ হইলে কাঁদিয়া-কাটিয়া, কিট করিয়া একাকার করিয়া দিত,—পূর্ণিমা সে রকম জায়গায় দিব্য হাসিয়া চলিয়া যাইত। রাগের ভাব কখনও তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিত না। সুলতার চোখের সামনে কেহ কাহারও কাজ দেখাইয়া দিলে তবে সে দেখিতে পাইত। এইজন্য তাহার রাগটাও পরের করুণার উপর নির্ভর করিত। পূর্ণিমা বেশ সরল ভাবে সকলের সহিত মিশিত,—সকলের মনের কথা জানিয়া লইত,—মনের মধ্যে বিরাট একটা ষড়যন্ত্র সে সৃজন করিয়া লইত। তাহারই একটু-আধটু আভাষ সুলতা পাইত মাত্র। দেখা যাইত, সুলতা যেখানে কাঁদিয়া-কাটিয়া, ধমক দিয়া যে কাজ করিতে পারে নাই, চতুরা সেজ বউ একটী কথায় তাহা করিয়া ফেলিয়াছে। এ সংসারে তাহাকে বেশ চিনিয়াছিলেন পিসিমা;—তিনি লোক চিনিতে অদ্বিতীয়া ছিলেন।

নৃপেন্দ্র বড় বুদ্ধিমান ছিল। যদিও ভ্রাতারই স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি,—তথাপি সে তাহা হইতেই, ভ্রাতাদের লুকাইয়া, স্ত্রীর নামে পৃথক সম্পত্তি করিতেছিল। সত্যই সে কথা যোগেন্দ্র কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি প্রাণপণে এতদিন খাটিয়াছেন; নিজের স্বাস্থ্যের দিকে পর্য্যন্ত তাকান নাই। এখন নৃপেন্দ্রের হাতে সব ছাড়িয়া দিয়া, নিজে একটু বিশ্রাম লাভ করিতেছিলেন। তিনি কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাঁহারই বড় স্নেহের সহোদর এমন করিয়া ভাইদের ফাঁকি দিতেছে।

রমেন্দ্রর সঙ্গে বাড়ীর প্রায় সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। তিনি মাসিক যে একশত টাকা বেতন পাইতেন, তাহার এক পয়সাও বাড়ীতে দিতেন না। তিনি চরিত্র হারাইয়াছিলেন। আজকাল বাড়ীতেও আসেন খুব কম। কোনও শনিবারে আসিয়া হয় তো রবিবারটা মাত্র থাকিয়া যান।

তিনি যেমন সংসার হইতে পৃথক থাকিতেন, পূর্ণিমা তেমনি সংসার হইতে পৃথক থাকিত; অথচ, সকলেরই সহিত সমান মিশিত।

সংসারে আত্মীয়-আত্মীয়া আরও কতকগুলি ছিলেন। প্রতিভাও আজ পাঁচ বৎসর হইতে এই সংসারবাসিনী হইয়াছে।

তাহার ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস বড় বিচিত্র। সে সুষমার মাসীর মেয়ে। খুব কম বয়সেই তাহার পিতা মারা যান। যখন সে অষ্টম বর্ষীয়া, তখন মাতা তাহার বিবাহ দিয়া গৌরী-দানের ফল লাভ করেন। তাহার মাত্র দুই বৎসর পরে—যখন প্রতিভা দশম বর্ষীয়া বালিকা মাত্র, তখন সে বিধবা হয়। মাতা এই বিসদৃশ ঘটনায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তাহার কয়েকমাস পরে যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, তখন সুষমার হস্তে কন্যাকে অর্পণ করিয়া যান। সংসারে সুষমা ব্যতীত তাঁহার আপনার লোক আর কেহ ছিল না। সুষমার হস্তে প্রতিভাকে দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ভাবে চিরদিনের মতই চক্ষু মুদিলেন।

তখন সুষমার বিবাহ হইয়াছে। পিত্রালয়ে সৎভ্রাতা মাত্র বর্ত্তমান ছিল। সুষমার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও, তিনি এই পরের মেয়ের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং সে সুষমার গলাতেই পড়িল।

দশ বৎসরের বালিকা দিদির শ্বশুরালয়ে আসিয়া বেশ হাসিয়া-খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে যে বিধবা,—সংসার হইতে সে যে বহুদূরে অবস্থিতা, তাহা সে জানিত না। সুষমা তাহাকে একাদশী করিতে দেন নাই, বিধবার বেশ পরিতে দেন নাই। প্রকৃত নিষ্ঠাচারিণী পিসিমাও তাহাতে কোনও আপত্তি করেন নাই। এই ক্ষুদ্র বালিকার নিদারুণ ভাগ্যের কথা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়া গিয়াছিল।

প্রতিভা বড় সুন্দরী মেয়ে। লোকে তাহাকে দেবকন্যা বলিত। বাস্তবিকই তাহার যেমন অসামান্য রূপ ছিল, তেমনি সরল কোমল হৃদয়খানিও সে পাইয়াছিল। তাহার শিক্ষা তাহার দিদির কাছে। সুষমার হৃদয় যেমন উন্নত সরল ছিল, তেমনি ভাব দিয়া প্রতিভাকেও গড়িয়া তুলিতেছিল।

(৩)

প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যান। তাহার মাঝখানে বৃহৎ পুষ্করিণী। তাহার জল সুনীল, কাচের মতই স্বচ্ছ। জল-তলে মাছগুলি খেলিলেও দেখা যাইত। পুষ্করিণীর চারিধারে শৈলেনের স্বহস্ত-রোপিত বেল, গোলাপ, যূঁই প্রভৃতি ফুলের গাছ। তাহার পরে নারিকেল, সুপারী, তাল এবং তৎপরে আম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি গাছের শ্রেণী।

প্রকৃতপক্ষে বাগানখানি দেখিবার মত ছিল বটে। বিকাল বেলায় এই পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে মেয়েদের মেলা

বসিয়া যায়। গ্রামের অধিকাংশ মেয়ে সেই সুন্দর ঘাটে কাপড় কাচিবার প্রলোভন এড়াইতে পারেন না। সন্ধ্যার সময় যখন শৈলেন বাড়ী থাকে," এই ঘাটে গ্রামের যুবক-বৃন্দ আসিয়া জুটে। হার্ম্মোনিয়াম, ফ্লুট, বাঁয়া, তবলা ও গানের শব্দে চারিদিক ভরিয়া উঠে।

সে দিন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। গাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়া পশ্চিমের আরক্তিম আকাশখানি দেখা যাইতেছিল। মনে হইতেছিল; যেন সহস্র চাঁদের টুকরা ভাসিতেছে। মাথার উপরেই, ইহারই মধ্যে একটু দক্ষিণ-দিকে হেলিয়া তৃতীয়ার চাঁদ ভাসিয়া উঠিয়াছে। লাল সাদা হরিদ্রাবর্ণের বসরাই গোলাপগুলি ফুটিয়া, আধফুটন্ত হইয়া, মৃদু বায়ু পরশে কাঁপিতেছে। বেল কুঁড়িগুলি বসন্ত-বায়ু-স্পর্শে সন্ধ্যারাণীর সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্যই ধীরে-ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে।

শৈলেন সাদা গোলাপ গাছটার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, মুগ্ধ নেত্রে একটা আধফুটন্ত ফুলের পানে চাহিয়া ছিল। বাতাসে ফুলটী এদিক-ওদিকে কেমন হেলিয়া পড়িতেছিল,—ইহাই তাহার কাছে একটা আশ্চর্য্য দর্শনীয় ব্যাপার ছিল। পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জল যে আকাশের রঙিন ছবি বুকে আঁকিয়া পায়ের তলায় নাচিতেছিল, সেদিকে তাহার দৃষ্টি একটুও ছিল না।

সেই সময়ে ঠিক পাশেই চুড়ির ঠুনঠুন শব্দ শুনিয়া, সে চমকাইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, প্রতিভা।

সে একটা ছোট কলসী লইয়া ঘাটে আসিয়াছিল। যদিও দাসী-চাকর সবই আছে; তথাপি মাঝে মাঝে ঘাট হইতে জল বহিয়া লইয়া যাওয়া তাহার একটা নেশার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। পরে সে জলের যে কি অবস্থা হইত, তাহা দেখিবার অবকাশ আর তাহার ছিল না।

সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলো তাহার সুন্দর মুখের উপর আসিয়া পড়িয়া, সে মুখকে বড়ই প্রভাময় করিয়া তুলিয়াছিল। শৈলেন একবারমাত্র তাহার মুখপানে চাহিয়াই চোখ নামাইল। প্রতিভা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ফুলের গন্ধ আছে না কি, ছোড়দা? আজ যে নতুন গাছে ফুল ফুটেছে! বাঃ, খাসা ফুলটী তো!"

শৈলেন একটু হাসিয়া বলিল, "গোলাপের গন্ধ থাকে না, কখনও শুনেছিস না কি?"

প্রতিভা একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিল "না, তা শুনি নি বটে। তবে কেউ কেউ বলে—"

তাহাকে থামাইয়া দিয়া শৈলেন বলিল, "গোলাপের গন্ধ নেই, কেমন? এদিকে আয় দেখি,—ফুলটার গন্ধ নিয়ে দেখ্। আমার মনে হচ্ছে, এই গাছটাই সবচেয়ে সেরা গাছ হবে। ফুলগুলো দেখ্ একবার—কত বড়।"

প্রতিভা তাড়াতাড়ি কলসী নামাইয়া বলিল, "কই দেখি?"

ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, ভ্রূ দুটা টানিয়া সে বলিল, "ও হরি, এই তোমার সেরা ফুল! ছোড়দার সব ফুল যেমন, এও তেমনি। তফাৎ তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। দু'দিন বাদে এও পুরানো হয়ে যাবে,—তখন আবার একটা নূতন ফুলগাছ করবার চেষ্টায় থাকবে। তোমার তো বরাবরই এমনি স্বভাব ছোড়দা! কারে কখন এতখানি বাড়িয়ে তোল, কারে কখন দু'পায় দল, কিছু ঠিক নেই তার।"

শৈলেন হাসিয়া বলিল, "তা তো বল্‌বিই তুই। নিবি এ ফুলটা?"

লুব্ধা প্রতিভা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "দেবে ছোড়দা?"

শৈলেন বলিল, "তা যদি নিতে চাস, দিতে পারি; কিন্তু আগে বল্ দেখি, কি করবি ফুলটা নিয়ে?"

প্রতিভা একটু ভাবিয়া বলিল, "ঠাকুরকে দেব।"

শৈলেন মুখ ফিরাইয়া বলিল, "নাঃ, আমি ফুল দেব না।"

প্রতিভা অনুনয়ের সুরে বলিল, "তবে কি করব ফুলটা দিয়ে—তুমিই বলে দাও না ছোড়দা।"

চাঁদের আধভাঙ্গা আলোক ও সন্ধ্যার লোহিত আভাতে মিশাইয়া যে একটা নূতন আলোকের সৃজন হইয়াছিল, তাহাতে দীপ্ত প্রতিভার মুখখানার পানে চাহিয়া, গলার স্বরটা একটু নামাইয়া, শৈলেন বলিল, "কেন, তুই রাখ্‌বি।"

"আমি?" প্রতিভা ভারি বিস্মিতা হইয়া পড়িল, "আমি ফুল রাখব? কিন্তু—, না, আচ্ছা দাও, আমি নেব এখন।"

শৈলেন ফুল তুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, "দেখিস্, হারাস নে যেন। নতুন গাছের নতুন ফুল,—খুব যত্ন করে রাখিস্।"

প্রতিভা ফুলটা নাড়িয়া-চাড়িয়া বলিল, "তা আমি রাখব'খন। আচ্ছা ছোড়দা, ঠাকুরকে ফুল দেবার নামে

তুমি এতটা চটে উঠ্‌লে কেন? আমি জানি, নতুন যা জিনিস হয়, তা আগে ঠাকুরকে দিতে হয়। তোমার সবই উল্টা। বুঝতে পারছ না, ঠাকুরকে দিলে কতটা পুণ্যি হতো?"

শৈলেন মুখ ভার করিয়া বলিল, "পুণ্যের বোঝা মাথায় করে বইতে চাই নে আমি। ভারি তো পুতুল—মাটী, খড় যার উপাদান, সে কি দেবতা হতে পারে প্রতিভা? দেবতা যা, তা আমার মধ্যে আছে,—তোমার মধ্যে আছে। ওই যে ছোট পাখীটা উড়ে বেড়ায়, পিঁপড়েটা আস্তে-আস্তে হেঁটে যায়,—দেবতা ওদেরও মধ্যে আছে। পুতুলকে ফুল দিলে লাভ কি হবে আমার? তার কি কোনও বোধ-জ্ঞান আছে যে—"

জিভ কাটিয়া প্রতিভা বলিয়া উঠিল, "পুতুল? ও কথা মুখেও এনো না ছোড়দা। ঠাকুরের নিন্দে কর্‌লে জিভ একেবারে খসে পড়ে,—বোবা হয়ে যায়,—আরও কত কি হয়।"

শৈলেন বলিল, "তা হয় আমার হবে। তোকে যে ফুলটা দিলুম, তুই নিবি কি না বল এখন। নিতে হয় নে, না হয় দে আমাকে। মেয়েমানুষ কি না,—বোকার একশেষ। সকলকে বুঝাতে পারা যায়, তোদের জাতকে যদি বুঝিয়ে উঠতে পারা যায় কিছুতে। তাড়াতাড়ি করে কাপড় কেচে নিবি তো নে। এখনি গান-বাজনার আড্ডা পড়বে-'খন,—তখন আর এখানে থাকতে পারবি নে।"

প্রতিভা গোলাপটী উপরে রাখিয়া, তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া পড়িল। তখন বেশ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। উপর হইতে শৈলেন হাঁকিল "জলে বেশীক্ষণ পড়ে থাকিস্ নে প্রতিভা, অসুখ করবে এ সময়।"

প্রতিভা তাড়াতাড়ি জল লইয়া উঠিয়া পড়িল, "এই আমার হয়ে গ্যাছে ছোড়দা।"

ফুলটা কুড়াইয়া লইয়া সে চলিয়া গেল।

ফুল নিজে লইতে তাহার একটুও ইচ্ছা ছিল না। এমন সুন্দর গোলাপটী দেবতার পায়েই মানায়। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়াও সে ঠিক করিতে পারিল না, উহা নিজে রাখিবে, না, দেবতাকে দিবে।

কাপড়খানা ছাড়িয়া, সে ফুল লইয়া দালানে সুষমার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সুষমা তখন বাড়ীর ছেলেমেয়েদের খাওয়াইতে বসিয়াছিলেন। বাড়ীতে ছেলে-মেয়ে জুটিয়াছিল প্রায় বার-তেরটী। ইহাদের দুই বেলা খাওয়াইতে হইত সুষমাকে। নচেৎ ইহাদের ভাল করিয়া খাওয়া হইত না। দুইজন পাচিকা রন্ধন করিত। তাহারা পরিবেশণ করিয়াই ক্ষান্ত হইত,—কাহারও পেটের পানে চাহিত না।

আজ পূর্ণিমাও সেখানে উপস্থিত ছিল। প্রতিভা গোলাপ লইয়া সেখানে উপস্থিত হইতেই, অমিয় লাফাইয়া উঠিল, "আমায় দেবে মাসীমা?"

সুষমা চাহিয়া দেখিয়া, একটু হাসিয়া বলিলেন "খাসা ফুলটী। কোথা পেলি প্রতিভা? পিসিমাকে দে গিয়ে,—ঠাকুরের পায়ে বেশ মানাবে।"

অমিয় মুখখানা অন্ধকার করিয়া বলিল, "তোমাদের কেবল ঠাকুর, আর ঠাকুর। দাও না আমায় ফুলটা। না দিলে আমি ছোট কাকাকে বলে দেব'খন,—তুমি তাঁর গাছ থেকে চুরি করে ফুল পেড়ে এনেছ।"

প্রতিভা বলিল "ইস, ছোড়দাই তো দিলে।"

অমিয় বলিয়া উঠিল, "কখখনো দেয় নি। আজ আমি ওই ফুলটা নেবার জন্যে কত কাঁদলুম,—কিছুতেই দিলে না,—তোমায় অমনি দিয়ে দিলে?"

পূর্ণিমা বলিল "বাস্তবিক, অমিয় ফুলটা নেবার জন্যে বড্ড কেঁদেছিল দিদি, ওকে না দিয়ে প্রতিভাকে দিলে, তা কি হয়? যদি দেবার হতো, ওকেই দিত।"

প্রকারান্তরে তাহাকে চোর বলায়, প্রতিভা রাগিয়া উঠিল। ঝাঁজের সুরেই বলিল, "তাতো বলবেই তোমরা। আমি চুরি করেছি কি না, ছোড়দাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর। আমি কিছুতেই ফুল নিতে চাই নি,—ছোড়দাই তো দিলে। তার পরে ঠাকুরকে দিতে চাইলুম,—ছোড়দা তাও দিতে দেবে না।"

পূর্ণিমা সরল ভাবে বলিল, "তা হবে। আমি কি আর সত্যিই বলছি যে, তুই-ই চুরি করেছিস্। দিলে তো নিবি নে কেন? বেশ যত্ন করে রাখিস্ ফুলটা, নষ্ট করিস্ নে যেন, দেখিস্।"

প্রতিভা তেমনি ঝাঁজের সঙ্গেই বলিল, "চাইনে আমি ফুল। বয়েই গেল। দিদির যা খুশী করুকগে যাক ফুল দিয়ে।"

ফুল সুষমার কাছে ফেলিয়া দিয়া, অত্যন্ত রাগের সহিত সে চলিয়া গেল।

সুষমা ফুলটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "কাল তোকে আমি তিনটে ফুল দেব অমিয়, আজ ভাত খেয়ে নে।"

অমিয় ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল "হুঁ, কাল যে তুমি কত দেবে মা, তা আমি বেশ জান্‌ছি। সে দিন একটা ফুল-দানী চেয়েছিলুম না, কত দিলে আমায়, তা আমিই জানছি।"

সুষমা তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, তাহার ললাটে একটা স্নেহচুম্বন দিয়া, একটু হাসিয়া বলিলেন, "না রে পাগলা ছেলে, সত্যি দেব। রাত্তির বেলা, মিথ্যা কথা বলব কেন? কাল সকালেই আমি নিজে ফুল পাড়ব, —আমায় তোর কাকা তো কিছু বলতে পারবে না।"

পূর্ণিমা ভালমানুষের মত বলিল, "কিন্তু এটা দিদি ছোট ঠাকুরপোর বড্ড অন্যায়। অমিয় ফুল চাইসে যখন, তখন একটা ফুল দিলেই হোতো। ওর এতে রাগ, অভিমান তো হবারই কথা।"

সুষমা তাহার মুখপানে একবার চাহিয়া বলিলেন, "যদিও ছোট ঠাকুরপোর একটু অন্যায় হয়েছে এটা, কিন্তু এতে রাগ-অভিমান হবার মত তো কোনই কারণ নেই ভাই! ছেলে মানুষের আবার রাগ-অভিমান কি? ওরা জলে-ধোয়া মনটী নিয়ে এসেছে,—তাতে একটু দাগ নেই। আমাদেরই অন্যায়, ওদের সে সরল মনে দাগ এঁকে দেওয়া।"

পূর্ণিমা একটু আহত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। একটু খানি নীরবে বসিয়া থাকিয়া, সে আস্তে-আস্তে উঠিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

চণ্ডীদাসের নান্নুর

[শ্রীজলধর সেন]

অনেক দিন আগে একবার মহাকবি জয়দেবের কেন্দুলী দেখ্‌বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই সময়ই বড় ইচ্ছা ছিল যে, বীরভূমের আর এক তীর্থ চণ্ডীদাসের নান্নুর দর্শন করি। কিন্তু এতদিনের মধ্যে সে সুযোগ আর হোলো না। নান্নুর সাত সমুদ্র তের নদীর পারে নয় যে, অনেক আয়োজন করতে হয়,—অনেক ব্যবস্থা করতে হয়। রেলে চড়লে চার-পাঁচ ঘণ্টার পথ। খরচপত্রও তেমন বেশী নয়। তবুও কি জানি কেন, যাওয়া আর হয়ে ওঠে নাই। অথচ আমার ত মনে হয়, বাঙ্গালী সাহিত্যিকের নিকট কেন্দুলী, নান্নুর প্রধান তীর্থস্থান হওয়া উচিত;—দিল্লী-লাহোর দেখ্‌বার আগে কেন্দুলী, নান্নুর, কৃত্তিবাসের ফুলিয়া প্রভৃতি দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমার সৌভাগ্যক্রমে এই কিছুদিন আগে নান্নুর দেখা হয়ে গেছে। সেই কথাটাই আজ বল্‌তে বসেছি। এই মাস খানেক আগে এক দিন বীরভূমের অন্তর্গত লাভপুরের সুধী সাহিত্যিক জমিদার শ্রীমান নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়া এক নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়ে দিলেন,—তাঁর বাড়ীতে যেতে হবে। পত্র নিয়ে উপস্থিত হলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, প্রসিদ্ধ নাট্যকার, শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীমান নির্ম্মলশিব অসুস্থ হওয়ায় নিজে আসতে না পেরে, এই নিমন্ত্রণের ভার অপরেশ বাবুর উপর দিয়েছিলেন। একে শ্রীমান নির্ম্মলশিবের আকিঞ্চন, তাহার পর অপরেশ বাবুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আমি উপেক্ষা করতে পারলুম না। বিশেষতঃ, আমি দেখ্‌লাম যে, এক প্রকাণ্ড সুযোগ উপস্থিত। এক যাত্রায় চারটী কাজ করা হবে। শ্রীমান নির্ম্মলশিব নিমন্ত্রণ করছেন, দুইটী ব্যাপার উপলক্ষ করে;—এক, তাঁর জন্মভূমি লাভপুরে যে ক্লাব স্থাপিত করেছেন, তারই সংশ্লিষ্ট অতুল-শিব নাট্যমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন; দ্বিতীয়, ঐ সঙ্গে বীরভূম-সাহিত্য-সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন। এই দুইটী উপলক্ষই ফেলবার জিনিস নয়। তার সঙ্গে যোগ হ'ল, আরও প্রধান দুটা;—সে হ'চ্ছে, ফুল্লরা মহাপীঠ দর্শন, আর আমার বহুদিনের কামনা-বাসনা পরিপূরণ—বাঙ্গালী সাহিত্যেকের মহাতীর্থ নান্নুর দর্শন। লোকে এক-ঢিলে দুই পাখী মেরে খুব বাহাদুরী নিয়ে থাকে; আমি এই এক যাত্রায় একেবারে চারটী কাজ শেষ ক'রে বহুৎ বহুৎ বাহাদুরী লাভ ক'রবার প্রলোভন কিছুতেই সংবরণ করতে পারলাম না। তার পর অপরেশবাবু যখন বল্লেন যে, আমাকে একাকী যেতে

হবে না ; সঙ্গী হবেন চারজন মহারথ—বঙ্গতে গেলে বাঙ্গলার চার দিক্‌পাল ; তখন আমি সত্যসত্যই নেচে উঠলুম। এ চারজনের নাম বল্‌লেই যথেষ্ট, পরিচয়ের প্রয়োজন হবে না। তাঁরা হচ্ছেন শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, আর শেষে নাম বললেও হাতে বহরে ছোট নন শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কিন্তু কার্য্যকালে অপরেশ বাবুকে পাওয়া গেল না, শুনলাম তিনি হাইকোর্টের একটা মামলার তদ্বিরে ব্যস্ত হয়ে যেতে পারলেন না।

তাহার পর নির্দ্দিষ্ট দিনে গয়া প্যাসেঞ্জারে আমরা চারিজনেই হাবড়া ত্যাগ করলাম। পথের কথা আর কি বর্ণনা করব ;—সেই একই কথা, রেলগাড়ী, যাত্রীর কলরব, ঠেলাঠেলি,—সেই ষ্টেসনে ষ্টেসনে নানা বর্ণের লোকের সমাবেশ,—সেই পান-বিড়ি-দিয়াশলাই—সেই নূতন আপদ "চাই গরম চা" ইত্যাদি ইত্যাদি। সে সবই পুরাতন মামুলী কথা। বিশেষতঃ আমাদের সঙ্গী পূজনীয় রসসাগর শ্রীযুক্ত অমৃতবাবু একাই সমস্ত পথটা আমাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধের মত করে নিয়ে গেলেন, বাহিরের কিছু দেখবার-শুনবার অবকাশ পেলাম কৈ ?

আমাদের ব্যবস্থা ছিল যে, আমরা লুপলাইনের আমেদপুর ষ্টেসনে নেমে সেখানে আধঘণ্টার উপর অপেক্ষা করব ; তার পর গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌সের আটআনা সংস্করণের গ্রন্থমালার মত খর্ব্বাকার, ম্যাক্‌লিয়ড কোম্পানীর শাখা রেলে উঠে একেবারে লাভপুর ষ্টেসনে নামব। আমাদের টিকিটও লাভপুরেরই ছিল। আমেদপুর ষ্টেসনে নেমে আমরা সেই বালখিল্য শাখা-গাড়ীর দিকে যাবার আয়োজন করছি, এমন সময় একখানি প্রকাণ্ড মোটর হাঁপাতে হাঁপাতে ষ্টেসনে এসে দাখিল হলো, আর তার উপর থেকে অবতীর্ণ হলেন আমাদের নিমন্ত্রণকারী খোদ শ্রীমান নির্ম্মলশিব। তিনি তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে এসে বললেন যে, আমাদের আর সেখানে অপেক্ষা করতে হবে না ; মোটরে চড়ে তখনই লাভপুর যাত্রা করতে হবে। আমেদপুর থেকে লাভপুর ছয় মাইল পথ। আমি তখন অমৃতবাবুকে তামাক খাওয়াবার ব্যবস্থা করছিলাম। তা আর হোলো না, তামাক খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা ভোটে পাশ হোলো না। তখনই যাত্রা। রাস্তা অতি সুন্দর ; জেলাবোর্ডের সনাতন হাড়গোড়-ভাঙ্গা পথ নয়, সুতরাং আধমরা হয়ে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হতে হোলো না ;—বেশ হওয়া খেতে-খেতেই লাভপুরে শ্রীমান নির্ম্মলশিবের অতিথিশালা দাখিল হওয়া গেল। 'অতিথিশালা' শুনে পাঠকগণ নাসিকা কুঞ্চিত করবেন না। এ সেই বড়মানুষের বাড়ীর বাহিরের এক কোণে আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানে ভাঙ্গাচোরা সেঁতসেঁতে অতিথিশালা নয় ; যেখানে রোজ দশ পয়সা বরাদ্দে অতিথি সেবা করে একালের জমীদারেরা বাপ-পিতামহের কীর্ত্তি কোন রকমে নিতান্ত অনিচ্ছায় গলগ্রহ ভেবে বজায় রাখেন, সে অতিথিশালা নয়। এ অতিথিশালার ইংরাজি নাম রেষ্ট-হাউস (Rest house)। এখানে সম্মাননীয় অতিথিদের অভ্যর্থনা করা হয় ; সাধারণ অতিথিশালা স্বতন্ত্র। সুতরাং এ অতিথিশালায় বিলাতী ও দেশী ধরণে যা কিছু দরকার সবই ছিল ;—চেয়ার টেবিল কোচ, গোসলখানা, টানা-পাখাও ছিল, আবার ধবধবে ফরাসও ছিল ; চা বিস্কুটও ছিল, আবার সন্দেশ রসগোল্লা জিলিপিও ছিল। লাভপুরের ধনী জমিদারের বাড়ীতে যা কিছু থাকা উচিত, তার কোন অসদ্ভাবই দেখলাম না। তাঁদের আপ্যায়নের ত কথাই নেই,—অসামান্য অতিথিদের সঙ্গে পড়ে আমিও তার যথেষ্ট ভাগই পেয়েছিলাম।

একটু বিশ্রামের পর সঙ্গীরা সকলেই মজলিস্ করে বসলেন ; নানা গল্প চলতে লাগল। তখনও সন্ধ্যা হতে দুই ঘণ্টা বিলম্ব। সন্ধ্যা-বেলাই অতুল-শিব নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসব হবে। শ্রীযুক্ত অমৃত বাবুই প্রতিষ্ঠা-কার্য্যের পৌরোহিত্যে বৃত হয়ে কলকাতা থেকে এসেছেন। মজলিশে, গল্প গুজবে আমার স্থান হয় না। আমি তখন গ্রামখানি দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই গেলাম অতুল-শিব নাট্যমন্দির দেখতে। মফস্বলের একটা গ্রামে এমন সুন্দর নাট্যমন্দির অতি কমই দেখা যায়। যাঁরা এই মন্দির-নির্ম্মাণে অর্থসাহায্য করেছেন, তাঁহাদের নাম বাহিরে একদিকে শ্বেত প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে। আর একটু পরেই নাট্য-মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে, তার পরই নাটক অভিনয় হবে ; কর্ম্মকর্ত্তারা সেই নিয়েই ব্যস্ত। আমি সেখান হইতে বিদায় হইয়া ইংরাজি স্কুল দেখতে গেলাম। স্কুলের বাড়িতে সমাগত ভদ্রলোকদের স্থান দেওয়া হয়েছে। সেখানেও মহা গোলোযোগ। স্কুলের প্রকোষ্ঠগুলিতে চেয়ার বেঞ্চ কিছুই নেই, সে সব রঙ্গমঞ্চের প্রাঙ্গণে গিয়েছে।

অনেকগুলি ঘরেই ফরাস বিছানা। সুতরাং বিদ্যালয়ের শোভা আর দেখা হোলো না। বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যেই বিস্তৃত খেলার মাঠ; তারই পাশে ছাত্রাবাস। স্কুলটি বন্দোপাধ্যায় মহাশয়দিগেরই স্থাপিত; ভরণপোষণের ভারও তাঁহাদেরই স্কন্ধে। শুনেছি, এখন নাকি ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়গণ মফস্বলের স্কুলসমূহ পরিদর্শন-কালে ছেলেদের পড়াশুনা কেমন হচ্ছে, তার পরীক্ষা নেবার সময়ই অনেকে পান না; তাঁদের দেখতে হয়, কোন্ ঘরটা কত ফিট লম্বা কত ফিট চওড়া; তার পর কালি কষে দেখতে হয়, সেই ঘরে কতজন ছেলের পড়বার স্থান হতে পারে, তারপর বাড়ি-ঘর-দুয়ার কেমন। তাই পরীক্ষা করতেই সময় কেটে যায়, ছেলেদের বিদ্যা পরীক্ষার আর সময় থাকে না। লাভপুরের এই বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস দেখে মনে হোলো, এখানে এসে ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়দের আর ফিতে হাতে করে বিড়ম্বিত হতে হয় না, লম্বা চওড়া অবাধ-বায়ু চলাচল-ব্যবস্থিত ঘরগুলি দেখেই তাঁরা সন্তুষ্ট হন। স্কুলে ছেলেদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে, তাঁদেরই একজনকে সঙ্গে নিয়ে জমিদার বাবুদের ঠাকুরবাড়ী জলাশয় প্রভৃতি দেখতে গেলাম। শুনলাম ফুল্লরা মহাপীঠ লাভপুর থেকে একমাইলের মধ্যে। একবার মনে হোলো, পীঠদর্শনটাও সেরে নিই। কিন্তু তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। এসেছি নাট্য-মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে; তাতে উপস্থিত না হয়ে, বা উপস্থিত হতে বিলম্ব করে ফুল্লরা মায়ের দর্শনের সঙ্কল্প করাটা শোভন হবে না মনে করে, উপস্থিত মাকে প্রণাম জানিয়ে আড্ডায় ফিরে আসা গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল; কিন্তু তখনও উৎসব আরম্ভ হোলো না। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারা গেল যে, জেলার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব প্রভৃতি সপরিবারে এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে লাভপুরে এসে পট্টাবাসে অবস্থিতি করচেন। তাঁদের আস্‌তে দেরী হচ্ছে বলে উৎসবের কাজ আরম্ভ হতে পারছে না। সাহেব জাতটা আর সব ভুলতে পারে, কিন্তু ডিনারের সময় তারা ভোলে না। সুতরাং রাত আটটায় ডিনার শেষ না করে যে তাঁরা বেরুবেন না, এ একেবারে ধ্রুব নিশ্চিত। কাজেই আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে আরাম করতে লাগলাম।

অতুল-শিব ক্লব—লাভপুর

যা মনে করেছিলাম ঠিক তাই। সাহেব-মেমেরা সাড়ে আটটার সময় এলেন। তখন একপালা কন্‌সার্ট, তার পর গান, তারপর শ্রীযুক্ত অমৃতবাবুর বক্তৃতা ও প্রতিষ্ঠা-কার্য্য। লোকও যথেষ্ট হয়েছিল। অমৃতবাবুর বক্তৃতার পরিচয় দেওয়াই নিষ্প্রয়োজন। এতেই প্রায় দশটা বেজে গেল। তারপর গোছগাছ সাজসজ্জা করে তবে থিয়েটার হবে; সুতরাং সেই এগারটা দুপুর রাত। আমি রণে ভঙ্গ দিয়ে অন্যান্য অভ্যাগতদের সঙ্গে মিশে আহার করে—শেষে

আর কি, নিদ্রা। থিয়েটার দেখা আমার তোলা থাকল।

পরদিন প্রাতঃকালে বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের ব্যবস্থা হয়েছিল। সারারাত্রি থিয়েটার দেখে পরদিন পিতৃশ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত তিনচার ঘণ্টা পেছিয়ে দিতে হয়, এ ত সাহিত্যের শ্রাদ্ধ! লোকজন জুটতে-বসতে নটা বেজে গেল। তখন সেই থিয়েটারের আসরেই সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হলো। সভাপতি হলেন সেই বঙ্কিম বাবুর আমলের কবি, 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র লেখক, বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় বক্তৃতা করলেন; আর আমরা চারজন—অমৃত বাবু, ক্ষীরোদবাবু, মন্মথবাবু, আর এই অধীন বক্তৃতার বায়না নিয়েই ত কলিকাতা থেকে লাভপুরে গিয়েছিলাম; তাই আমরাও অনেকক্ষণ বক্তৃতাই বলুন আর বাগ্‌বিস্তারই বলুন, করলাম। তারপর বীরভূমের স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর ধন্যবাদ প্রস্তাব করবার পর, ঘন করতালির মধ্যে বেলা সাড়ে এগারটায় সভা ভঙ্গ হলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

আমাদের প্রোগ্রামের দুইটী কর্ম্ম ত শেষ করা গেল।
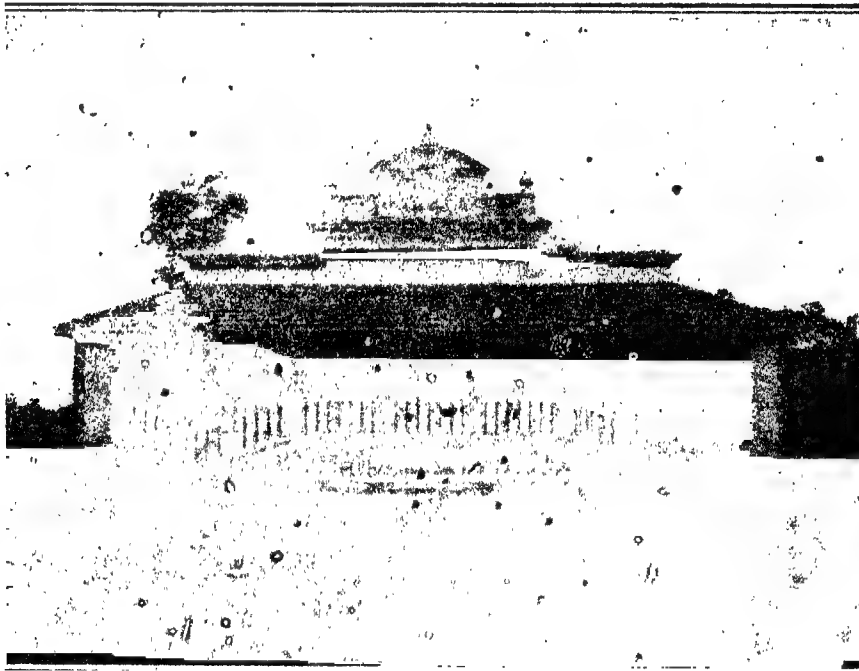
অতিথিশালা (Rest house)

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁর বয়স এখন বোধ হয় নব্বইয়ের কাছাকাছি। এই বয়সেও তিনি পরম উৎসাহে এই সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিত্ব করতে এসেছিলেন। তাঁর অভিভাষণ আর একজন পড়লেন; তাঁর চেঁচিয়ে পড়বার শক্তি নাই। তারপর যা হয়ে থাকে—অনেকগুলি কবিতা পাঠ; একটী যুবক অনেক দিন আগে মারা গেছেন; তাঁর লেখা একটী কবিতা খুব সুন্দর হয়েছিল। কবিতা পাঠ শেষ হলে সম্পাদক শ্রীমান হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিস্তৃত রিপোর্ট পাঠ করলেন। এইবার বক্তৃতা। সিউড়ি থেকে আগত এখনও আর দুইটী বাকী; ফুল্লরা মহাপীঠ দর্শন, আর নান্নুরে চণ্ডীদাসের, রামী রজকিনীর পবিত্র তীর্থ-পর্য্যটন। বেলা বেজে গেল সাড়ে এগারটা। কি করা যায়? শ্রীমান নির্ম্মলশিবের গৃহে সে-বেলায় কমবেশ তিন শত ভদ্রলোকের মধ্যাহ্ন ভোজন;—সে এক বজ্জির আয়োজন;—একেবারে ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থা। সেখানে যদি বলি 'ওগো, দুটো আলু ভাতে ভাত এখনই দেও' সে কথা কেউ শুনবেও না, কেউ মানবেও না। যেতে হবে নান্নুর—লাভপুর থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে। পথও ভাল নয়; মাইল খানেক পাকা

অন্নপূর্ণা দেবী

বাসুদেব মূর্ত্তি
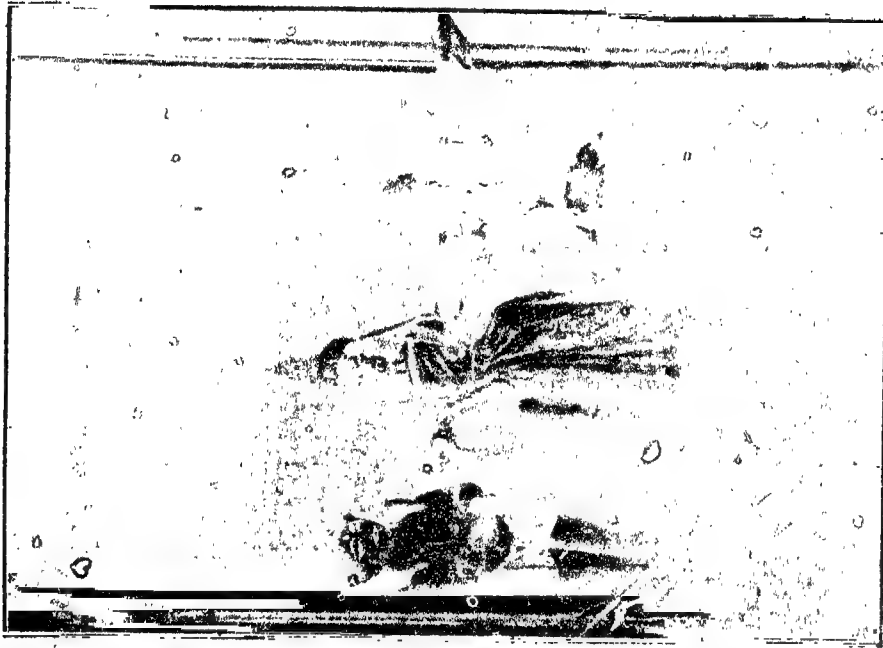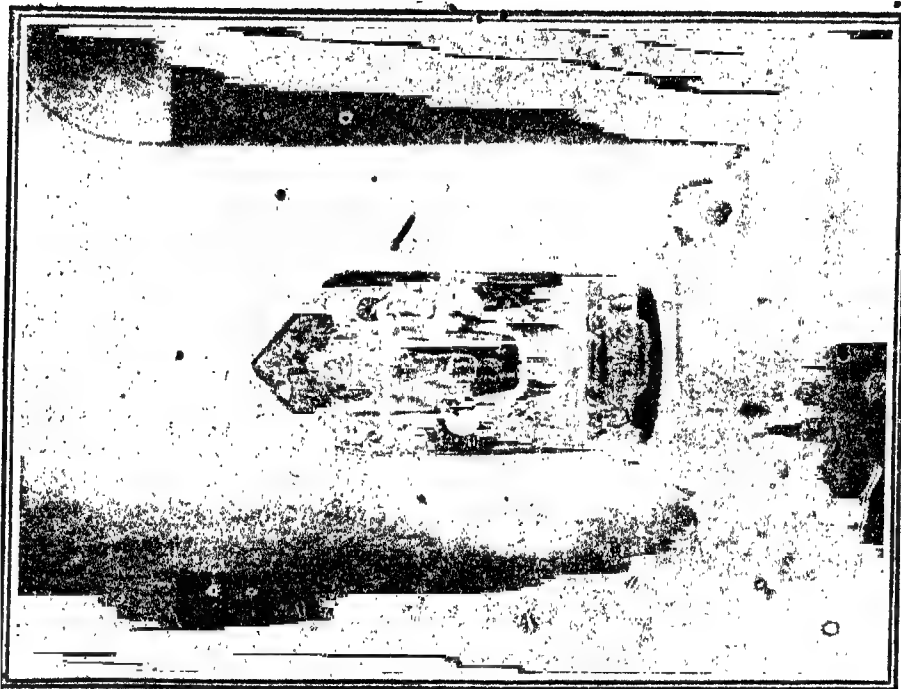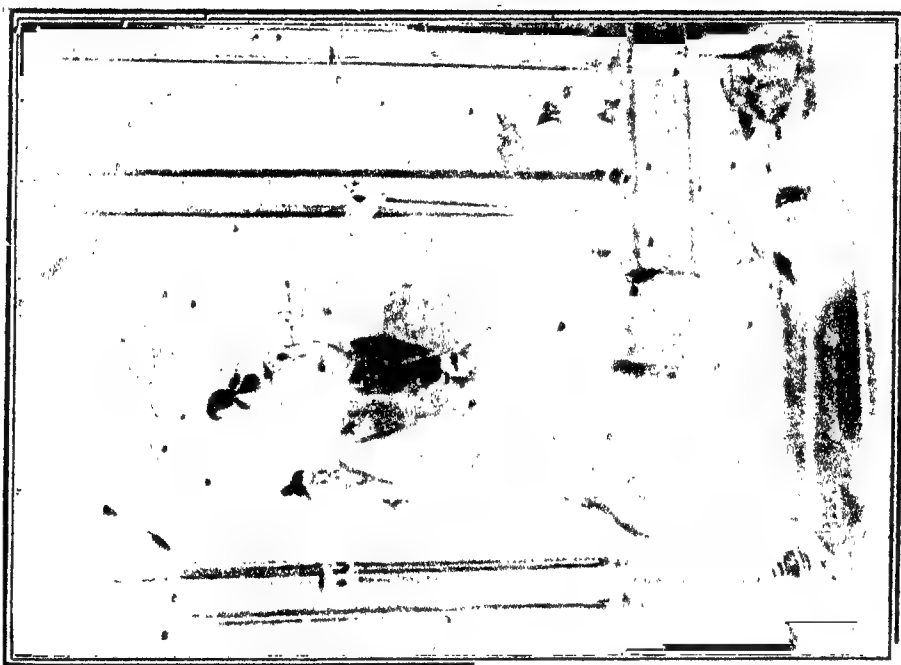
রাধাবিনোদ বিগ্রহ

নান্নুরের বাশুলী দেবী

রাস্তা, তার পরেই একেবারে কাঁচা সড়ক। এদিকে শীতের বেলা,—ছুটো বাজবার পরেই প্রকৃতিদেবী সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালবার আয়োজন করেন।

তখন অনন্যোপায় হয়ে খেদে কর্ত্তা শ্রীমান নির্ম্মলশিবের শরণাগত হলাম। তিনি বল্লেন "দাদা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। সকলের চাইতে দৃঢ় মোটর ঠিক করে রেখেছি। কীর্ণাহার ও নান্নুরের নিমন্ত্রিত ছুই জন যুবককে আপনাদের সঙ্গে যাবার বন্দোবস্ত করেছি। তাঁরা সব দেখিয়ে-শুনিয়ে সন্ধ্যার মধ্যে আপনাদের এখানে পৌছিয়ে দেবার ভার নিয়েছেন।" তবুও কি মন

বাশুলী দেবীর মন্দির—নান্নুর

চণ্ডীদাসের সমাধি—কীর্ণাহার

বোঝে ? শ্রীমানের নিকট নাম শুনে নিয়ে সেই ভদ্রমণ্ডলীর ভিতর থেকে সঙ্গী দুজনকে উদ্ধার করে, এক-রকম নজর-বন্দী করেই রাখলাম ; নিজে গারেজে গিয়ে নির্দ্দিষ্ট মোটর, আর তার চালককে যথাসময়ে ঠিক থাকবার জন্য বিশেষ করে বলে এলাম।

ভোজ শেষ হতে দেড়টা বেজে গেল। এক মিনিটও বিলম্ব না করে তথনই যাত্রা করা গেল। এই গুরুভোজনের পর অমৃতবাবু শয্যাশায়ী হলেন। আমরা তিনজন—ক্ষীরোদ বাবু, মন্মথবাবু, আর আমি নির্দ্দিষ্ট দুইটী যুবককে সঙ্গে নিয়ে মোটরারোহণে নান্নুর যাত্রা করলাম।

খানিকটা পথ বেশ ভাল ; কিন্তু যেখান থেকে আমরা কীর্ণাহারের পথ ধরলাম, সেটা কাঁচা রাস্তা। একে ধুলিময়

কাঁচা পথ, তাহার পর উঁচুনীচু পথের ধাক্কা সামলাইতে মোটরখানিকে এক-একবার বিপন্ন হয়ে পড়তে হোলো। আমাদের ত প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয় হতে লাগল, এই হয় ত চালক বলে বসবে—গাড়ী অচল। একটু এগিয়ে গিয়ে পথ এমন সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল যে, আমাদের মোটরখানিই সমস্ত পথটা জুড়ে চলতে লাগল।

কিন্তু বেশীক্ষণ এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হোল না। একটু যেতেই পথি-প্রদর্শক যুবকেরা গাড়ী থামাতে বললেন। আমরা গাড়ী থেকে নামিলাম। এই কীর্ণাহারেই মহাকবি চণ্ডীদাসের জীবন-লীলা শেষ হয়। তিনি এখানে বাস করতেন না; প্রায়ই নান্নুর থেকে সদলবলে এখানে এসে শেষ হয়েছিল। আমরা সকলে স্তূপের পাশে পাদুকা ত্যাগ করে উপর উঠে গেলাম। সেখানে অতি ক্ষুদ্রতম একটী মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে। মন্দিরটী হাত তিনেক উচ্চ। তাহারই মধ্যে একখানি ছোট আসনের উপর কাপড়ে বাঁধা ছোট একখানি পুথি দেখিলাম। প্রতিদিন ঐ পুথিরই পূজা হয়। সেখানি না কি চণ্ডীদাসের হাতে লেখা গানের বই। স্তূপের সম্মুখস্থ নিম্ন প্রাঙ্গণের পাশে একখানি খড়ের চালা-ঘর। সেখানে একজন বর্ষীয়সী বৈষ্ণবী বাস করেন। তাঁর গুরুদেব এই স্তূপের তত্ত্বাবধান করতেন; গুরুর দেহান্তে শিষ্যা বৈষ্ণবীই এখন সব দেখেন-শোনেন। ছোট মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত পুথিখানি দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ

চণ্ডীদাসের ভিটা—নান্নুর

মদনমোহনজির মন্দিরে সন্ধ্যার পর সংকীর্ত্তন করতেন; রামী রজকিনীও সঙ্গে আসত। একদিন তিনি মদনমোহনের মন্দিরে সন্ধ্যার পর দলবল নিয়ে সংকীর্ত্তন করছেন, এমন সময় হঠাৎ মন্দিরটী ভেঙ্গে পড়ে। বিগ্রহ মদনমোহনের সঙ্গে চণ্ডীদাস সদলবলে এই মন্দির-চাপা পড়ে মানবলীলা শেষ করেন। কীর্ণাহারে সেই মন্দিরের ভগ্নস্তূপ এখনও আছে। আমরা তাই দেখবার জন্য এই পথের ধারে নেমেছিলাম।

একটা অপ্রশস্ত পথ দিয়ে একটু যেতেই ডানদিকে একটা উচ্চ স্তূপ দেখলাম। এইখানেই চণ্ডীদাসের জীবনলীলা করতেই বৈষ্ণবী বললেন গুরুর নিষেধ; ও পুথি দেখা ত দূরের কথা, কাউকে স্পর্শ করতে দেবারও আদেশ নেই। সুতরাং পুথিখানির মধ্যে কি আছে, তা আর দেখতে পেলাম না। স্তূপ দেখে বেশ বোঝা গেল যে মদনমোহনের মন্দির নিতান্ত ছোট ছিল না; এখনও বনিয়াদের অনেকটা ঠিক আছে।

সেখানে আর কিছু দ্রষ্টব্য নেই শুনে আমরা আবার এসে মোটরে চড়লাম। কীর্ণাহার থেকে নান্নুর প্রায় চার মাইল; পথের অবস্থাও ভাল নয়। বিস্তীর্ণ একটা মাঠের মধ্য

দিয়া ছোট কাঁচা রাস্তা। তাই এই চার মাইল কাঁচা রাস্তা পার হতে আমরা একেবারে হয়রাণ হয়ে গেলাম। নান্নুরের থানার সম্মুখে গিয়ে যখন আমাদের মোটর থামল, তখন আমরা যেন পরিত্রাণ পেলাম।

গাড়ীখানি সেখানে রেখে আমরা সর্ব্বাগ্রে সেই পুকুর দেখ্‌তে গেলাম, যে পুকুরের এক পাড়ে জলের ধারে বসে চণ্ডীদাস মাছ ধরতেন; আর একধারে যুবতী রামী রজকিনী কাপড় কাচ্‌তেন। এই পুকুর, ঐ ধোবার মেয়ে, আর সেই পাগলা ঠাকুর, এই তিনে মিলে যে রসের ঢেউ তুলেছিলেন, যে অমৃত বিলিয়েছিলেন, তা কি আমরা আমার চর্ম্মচক্ষুর সুমুখে উপস্থিত হোলো খালি পুকুর! কিন্তু তখনি মনটা আর একদিকে ফিরে গেল। নান্নুরে অনেকগুলি লোক আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল। তাদের একজন বল্‌ল, ঐ যে পাটখান দেখ্‌চেন বাবু, ওতেই রামী কাপড় কাচত। তখন দৌড়ে সেই পাটের কাছে গেলাম। এই সেই পাট, যে পাটে আছড়ে রজকিনী রামী দেশের লোকের মলিন বসন সাদা করে দিত, আর তার সঙ্গে-সঙ্গেই ওপারে-বসা, মাছ-ধরায় নিরত এক পাগলা ব্রাহ্মণ-যুবকের মনের ময়লাও অপাঙ্গ দৃষ্টিতে ধুয়ে শাদা করে দিত। এতক্ষণে, এই পাট দেখে পুকুরটা আমার চক্ষের সুমুখে সজীব হয়ে উঠ্‌ল।

শিবাভোগ
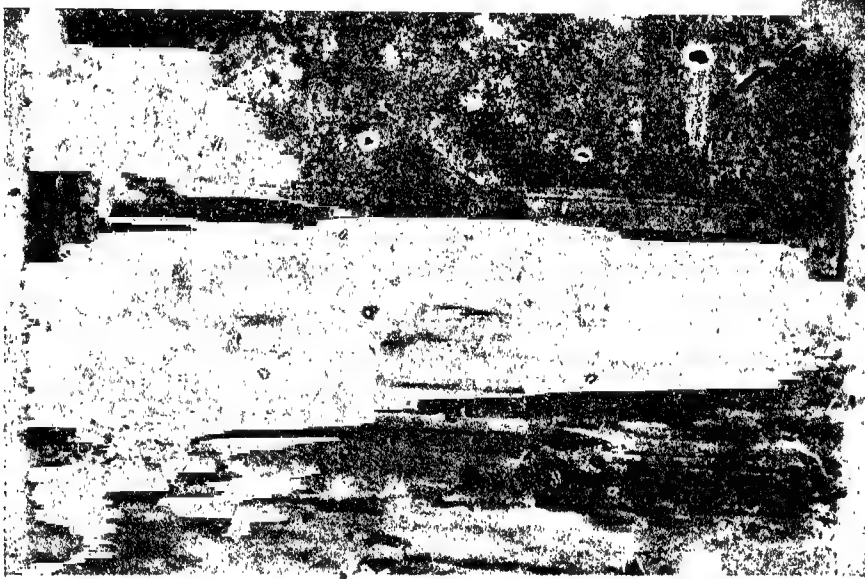
সহজে ভুল্‌তে পারি। তাই নান্নুরে গিয়ে সর্ব্বপ্রথমে বাশুলীদেবীকে প্রণাম করতে না গিয়ে এই প্রেম-সরোবর দেখ্‌তেই ছুটেছিলাম। আগে রামী, পরে বিশালাক্ষী,—আগে প্রেমের প্রতিষ্ঠা, তার পর দেবীর চরণে প্রেমোপহার। কেমন, এই ঠিক নয়? তা ঠিকই হোক, আর অঠিকই হোক, আমরা কিন্তু সেই পুকুরই প্রথমে দর্শনীয় বলে মনে করেছিলাম। মাঠের পাশে গিয়ে দেখ্‌লাম, সেই পুকুর তেমনই আছে; চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লাম পাগলা চণ্ডীও নেই, রজকিনী রামীও নেই। শুধু পুকুর আর জল—জল আর পুকুর! কবিও নেই, সাধকও নেই,—কাজেই দিব্যদৃষ্টিও লাভ করিনি; এতক্ষণ সব শূন্য ছিল, এখন পূর্ণ হোলো! ওসব তত্ত্ব কথা এখানেই ইতি করা যাক্‌, কি বলেন!

তত্ত্ব-কথাই না হয় রেখে দেওয়া গেল; কিন্তু একটা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপারের কথা না বলে রামী রজকিনীর পাটের কাছ থেকে যে বিদায় নিতে পারছি নে। ধোবার কাপড় কাচবার পাট আপনারা সকলেই দেখেছেন, আমরাও অনেক দেখেছি। কিন্তু এই পুকুরের ধারে যে পাটখানি দেখ্‌লাম, যাকে সকলে রামী রজকিনীর পাট বলে শ্রদ্ধা সহকারে তেল সিঁদুর মাখায়, সে পাটখানি দেখ্‌লাম পাথর হয়ে গিয়েছে। কাঠের তৈরী পাট, সে বিষয়ে মোটেই সন্দেহ

নেই ; এখনও কাঠের চিহ্ন পাটখানির সর্ব্বাঙ্গে বিরাজ করছে ; কিন্তু সবটা পাষাণ হয়ে গিয়েছে। রামায়ণে পড়েছি, অহল্যা পাষাণী হয়েছিল ; শেষে শ্রীরামচন্দ্রের পদস্পর্শে আবার মানবী হয়েছিল। রামী রজকিনীর পাট পাষাণ হয়ে এতকাল কার পদস্পর্শে পাষাণত্ব ঘোচাবার প্রতীক্ষায় এই পুকুরের তীরে পড়ে আছে, আপনারা বল্‌তে পারেন কি ? আর, এ পাটখানি পাষাণ হোলো কি করে ?

অনেক দিন আগের একটা কথা মনে পড়ল। হিমালয়ের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একবার রাজপুরের অনতিদূরে সহস্রধারা নামে এক নির্ঝর দেখেছিলাম। সেই সহস্রধারার নিকটেই আর একটা উৎস ছিল। তার জলের স্পর্শ লাভ করে গাছপাতা সব পাথর হয়ে যায়। আমি তা দেখেছিলাম ; এমন অনেক পাথরে পরিণত লতাপাতা সংগ্রহ করেও এনেছিলাম। সে পাথর হওয়ার কারণও জানতে পেরেছিলাম। ঐ যে উৎসটার কথা বল্‌লাম, সেটা গন্ধকের উৎস ; ইংরাজীতে বলে sulphur spring। তারই রাসায়নিক ক্রিয়ায় যে কোন দ্রব্য সেই জলের সংস্পর্শে আসে, তাই পাথর হয়ে যায়। কিন্তু নান্নুরের এই পুকুরের জলে যে সে গুণ আছে, তা ত কেউ বল্‌তে পারে না। তবে রামীর এ পাট পাথর হোলো কি করে ? কাছে-কিনারে ত পাহাড়-পর্ব্বতও নেই ; একখানি পাথরও ত কোনখানে দেখ্‌লাম না। তা হলে, এ ব্যাপার কি ? সঙ্গে আমাদের রসায়নবিদ্ ক্ষীরোদবাবুও ছিলেন। তিনিও বল্‌লেন,—তাই ত ! মীমাংসা ঐ তাই ত পর্য্যন্তই গিয়েছিল, আর এগোয় নাই।

সেখানে আর অপেক্ষা না করে সেই পুকুর, সেই প্রেম-সরোবর পিছনে রেখে আমরা ফিরে এসে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলাম ! রামীর ভিটে কোথায় ছিল, জিজ্ঞাসা করায় কেহই তার সন্ধান দিতে পারল না। একজন শুধু বলল, ঐ ও-পাড়ায় এক-ঘর ধোপা বাস করে। সে বলে, সে যে বাড়ীতে আছে, সেইটেই রামীর ভিটে। কিন্তু, সে কথা ঠিক নয় ; কোথায় তার ভিটে ছিল, তা কেউ বলতে পারে না। সুতরাং রামীর ভিটে খুজবার ভার ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের উপরে দিয়ে আমরা চণ্ডীদাসের ভিটের উদ্দেশে গেলাম। গ্রামের মধ্যে একটা উচ্চ ইষ্টক স্তূপ, সেইটাই চণ্ডীদাসের ভিটে। সেইখানেই তিনি বাস করতেন। তার পাশে নীচে সমতল স্থানে বিশালাক্ষী বা বাশুলী দেবীর মন্দির। ভিটের উপর কিছুই নেই ; শুধু কতকগুলি ভাঙ্গা ইট চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এখানে, এই কিছু দিন হতে, একটা মেলা বস্‌তে আরম্ভ হয়েছে।

চণ্ডীদাসের স্তূপ থেকে নেমে আমরা বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে গেলাম। সেবায়েতগণ আমাদের জন্য সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা মন্দিরের দ্বার খুলে দেবী-মূর্ত্তি দেখালেন। পাথরের গায়ে খোদা ছোট মূর্ত্তি। বাশুলী দেবীর যথারীতি পূজা-অর্চনা হয় ; তার জন্য জমাজমির ব্যবস্থা আছে। ভিন্ন ভিন্ন পার্ব্বণেও সমারোহ হয়ে থাকে। প্রাঙ্গণের চারিদিকে আরও অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির আছে। সবগুলি মন্দিরই পুরাতন—কতদিনের পুরাতন, তা আমি বলতে পারব না। এই 'বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস' গান গেয়েছিলেন, আর আমরা সেই গান অতৃপ্ত হৃদয়ে এখনও শুনছি। সেই বাশুলী দেবী এখনও আছেন, সেই নান্নুর এখনও আছে, সেই পূজা-অর্চনা এখনও চলছে ; কিন্তু সে চণ্ডীদাস আর ফিরে এলেন না !

বেলা প্রায় শেষ হয় দেখে, আমরা দেবীকে প্রণাম করে, এবং কবি হবার বর প্রার্থনা না করে, কোন 'আদেশে'রও প্রতীক্ষায় না থেকে, স্থানত্যাগ করলাম। এখনও যে ফুল্লরা মহাপীঠ ও শিবাভোগ দেখ্‌তে বাকী আছে !

আর কালবিলম্ব না করে মোটরে উঠে দে ছুট ! নান্নুরের সেই যুবক বন্ধুটী চা-পান করে যাবার জন্য অনেক অনুরোধ করলেন ; কিন্তু কি আমাদের অতুল ত্যাগ-স্বীকার ! চায়ের পেয়ালার আহ্বান উপেক্ষা করে ফুল্লরা দেবী দর্শনের জন্য উর্দ্ধশ্বাসে চল্‌তে উদ্যত হলাম, এমন কি পথের মধ্যে কীর্ণাহারেও দাঁড়ালাম না।

সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময় তীরবেগে এসে আমরা ফুল্লরা দেবীর মন্দিরের পাশে অবতীর্ণ হলাম। তখন দেবীর মন্দিরে সন্ধ্যা-দীপ জেলে দেওয়া হয়েছে। প্রকাণ্ড মন্দির ; দেবী-মূর্ত্তি ছোট নহে ; পীতবস্ত্রে আবৃত। সম্মুখে বড় একটা নাটমন্দির, শ্বেতপ্রস্তরে বাঁধানো ; তার পাশেই একটা বড় এঁদো পুকুর। মহাপীঠ, সুতরাং একটী ভৈরব এখানে থাকা চাই-ই। অতি ক্ষুদ্র মন্দিরে ভৈরব দর্শন করলাম। 'দর্শন করলাম' বলাটা বোধ হয় ভুল হোলো ; সেখানে প্রদীপ ছিল

না ;—অন্ধকারই দর্শন হোলো ;—দীপ থাক্‌লেও তাই হয় ; আমরা যে চোখ থাক্‌তেও কাণা ; তাই আমাদের কাছে সবই অন্ধকার !

মন্দিরের পশ্চাতে একটা অল্প-পরিসর স্থান একটু উচ্চ দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ; একদিকে ছোট একটা প্রবেশ-পথ। এইটা 'শিবাভোগ।' কথাটা এই যে, দেবীর ভোগের জন্য যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহার এক অংশ প্রথমে এই স্থানে এনে রেখে 'আয় আয়' বলে ডাক্‌লেই এক দল শিয়াল এসে সেগুলি আহার করে চলে যায়। সেবায়েতরা বল্‌লেন যে, সেবার দ্রব্যাদি যদি অশুচি হয়, তা হলে শিবার দল এসে সে সকল দ্রব্য না খেয়েই চলে যায়। তখন আবার নূতন করে ভোগের ব্যবস্থা করতে হয়। ফুল্লরা-দর্শনার্থী যাত্রীরা অনেক খাবার জিনিস নিয়ে গিয়ে ঐ স্থানে রেখে 'আয়, আয়' বলে ডাক্‌লেই শিবার দল এসে আহার করে চলে যায়; তার সময় অসময় নেই। আমরা কিছুই নিয়ে যাই নি, শিবাভোগ দেওয়া আর আমাদের অদৃষ্টে হোলো না। পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত অমৃতবাবু শিবাভোগ দিতে গিয়াছিলেন ; তিনিও এসে ঐ কথাই বল্‌লেন।

সন্ধ্যার পর অতিথি-নিবাসে প্রত্যাগমন ; রাত্রিতে নাটক-অভিনয় দর্শন ; পরদিন মধ্যাহ্নে 'খেয়ে যায়, নিয়ে যায়, আরও যায় চেয়ে'—এই কবি-বাক্যের সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করে শ্রীমান্ নির্ম্মলশিব-হরেকৃষ্ণকে সহস্র ধন্যবাদ জানিয়ে লাভপুর ত্যাগ। এই হয়ে গেল একটা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আর কি ?

লক্ষ্যবেধ

[মহারাজকুমার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়]

বধূবেশে যবে প্রবেশিলে তুমি রাজসভাগৃহ মাঝে
পুষ্পিত লতা সম সুষমায়, ধীর পদে নত লাজে।
কাঞ্চন থালে চন্দন রাখি, মাল্য অন্য হাতে,
চমকি তুলিলে জন-অরণ্য, বঙ্কিম আঁখি-পাতে।
জন্ম-অবধি শিব-পদ সেবি, মেগেছিলে যেই পতি,
তাহারে বরিতে চলেছিলে বালা দ্বিধা-কম্পিত-গতি।
লক্ষ্য-বেধের অপরূপ খেলা সাধিবে যে মহাবীর,
তাহারি চরণে নোয়াবে তোমার দেব-দুর্লভ শির।

ভারতের যত ক্ষত্রিয়-মণি, পাঞ্চাল-গৃহ-দ্বারে,
বল-বীর্য্যের পরিচয় দিতে সজ্জিত সারে-সারে।
সবার উচ্চে শোভিছে মুকুটে মণি-মাণিক্য-ঘটা,
চক্রবর্ত্তী দুর্য্যোধনের, অপরূপ রূপ-ছটা—
ভীষ্ম-কর্ণ-দ্রোণ আচার্য্য, আরো কত-শত বীর
নৃপতিরে ঘেরি বসিল সকলে গর্ব্বোন্নত শির।
কিছু দূরে বসি উচ্চ আসনে যত ব্রাহ্মণ-দল,
ধ্যান-পরায়ণ শান্ত মূর্ত্তি, শুদ্ধ-সমুজ্জ্বল।

বাজিয়া উঠিল বিজয়-বাদ্য, বন্দীর যশোগান,
কত যুদ্ধের বিক্রম-গাথা, পৌরুষ অফুরান—
কে কবে লক্ষ অরাতি নাশিল সন্ধান করি চাপে,
কাহার বিজয়ী ডঙ্কার রবে শত্রুর সেনা কাঁপে।
ক্ষুর-ধার কার তরবারি-আগে লুণ্ঠিত শত শির
লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয় না কাহার শাণিত তীক্ষ্ণ তীর।
রথ-নির্ঘোষে কে যায় চলিয়া পবনের আগে-আগে,
অরি-সেনানীর ছিন্ন মস্ত, দুর্জ্জয়-শূল-ভাগে।

দ্রুপদ-তনয় ডাক দিল যবে লক্ষ্যবেধের লাগি,
উঠিল লক্ষ-লক্ষ নৃপতি স্বপ্ন হইতে জাগি।
একে-একে ধীর প্রবেশিল বীর, সভা-মণ্ডপ মাঝে
দ্রুপদ-দুহিতা দ্রৌপদী যথা নয়ন-মোহন সাজে।
বন্দনা করি রাজকন্যারে ধনুক সমীপে যায়,
হরধনু সম মহাকার ধনু, তুলিতে নারিল হায় !
ফিরে গেল বীর নিরাশার ভারে, লজ্জায় অবনত,
কোটী কণ্ঠের কৌতুক-রবে দুঃখে মর্ম্মাহত।

চক্রবর্ত্তী-আদেশে তখন উঠিল বিজয়ী কর্ণ,
যৌবন-মদে মত্ত কেশরী নব-কাঞ্চন-বর্ণ।
ধীর-গম্ভীর, মন্থর গতি, চলিল সভার মাঝে
সহসা কি শুনি কম্পিত বাণী, মেঘ-নির্ঘোষে বাজে !
"রাজ-নন্দিনী সূত-পুত্রেরে বরিব না কোন মতে,
ফিরে যাও তুমি, ফিরে যাও বীর, অর্দ্ধেক পথ হ'তে।"
নত মস্তকে ফিরিল রাধেয়, লাজে রক্তিম মুখ,—
লক্ষ-সমর-বিজয়ী বীরের অপমানে কাঁপে বুক।

অশ্বথামা উঠিল তখন রোষ-কটাক্ষ করি
কৌরব-নাথ-সম্মান তরে সভামাঝে অবতরি—
শরাসন ধরি, চড়াইয়া গুণ, ক্ষেপিল সে মহাবাণে,
ভীম-নাদ করি ছুটিল অস্ত্র মহা শূন্যের পানে।
সমবেত বীর-বৃন্দ-কণ্ঠে উঠিল জয়-ধ্বনি,
জয় কুরুপতি দুর্য্যোধনের, জয় নরেন্দ্র-মণি !
পুরুষোত্তম হাসিল কেবল শুনি সেই জয় রবে,
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরুর কোন্ কথা কেবা কবে।

কাল-চক্রের সমান যেথায় ঘুরিছে সুদর্শন,
নিমেষ-ফেলিতে শূন্যের মাঝে লক্ষ আবর্ত্তন।
তাহারি অঙ্গে লাগিয়া সে বাণ, মহাঝঞ্ঝার প্রায়,
আছাড়ি পড়িল "অর্জ্জুন-রথ-রজ্জু ধারীর" পায়।
স্তম্ভিত হ'ল নিখিল মানব, কৌরব নত-শির,
বিস্মিত হ'য়ে নির্ব্বাক্ রহে সমাগত যত বীর।
পরাভব মানি দ্রোণ-নন্দন, ফিরে গেল অপমানে,
কৌরব-পতি ভীষ্মের প্রতি ঈষৎ নয়ন হানে।

রাজার আদেশ মস্তকে ধরি উঠিল শান্তনব,
চির-কৌমার নিয়ম যাঁহার, অনুপম অভিনব।
সভা-সমক্ষে করি যোড়-কর, কহে কম্পিত স্বরে,
"ব্রহ্মচারীর ব্রত যে আমার—বধূ নহে মোর তরে।
যদি দৈবাৎ সার্থক হয় লক্ষ্য-বেধ-প্রয়াস,
পৌত্রের করে সঁপিব কৃষ্ণা, এই শুধু মোর আশ।"
সাধু-সাধু ভাবে গর্জ্জিল সভা, কৌরব উল্লাসে,
ধনুক ধরিয়া সহসা ভীষ্ম শিহরি উঠিল ত্রাসে।

ক্লীব-শিখণ্ডী কার ইঙ্গিতে সমুখে দাঁড়াল আসি,
স্থির-প্রতিজ্ঞ গঙ্গা-সুতের প্রতিজ্ঞা গেল ভাসি।
ফেলে দিল ধনু, ফিরিল বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়-সভা মাঝে,
কৌরব-পতি প্রতি পদে আজ হতমান, নত লাজে।
সভয়ে সকলে রহিল আসনে, উঠিল না কেহ আর,
দ্রুপদ-তনয় মিছে ডাকে সবে যোড়-করে বারবার।
ক্ষত্রিয়-কুল নত-শিরে রহে, বেলা শুধু বেড়ে যায়,
পাঞ্চাল-রাজ দুহিতার লাগি স্মরিছেন দেবতায় !

কুজ্ঝটিকার কেটে গেল জাল, দেবতা হ'ল সদয় ;
তিমির-রজনী অবসান শেষে সূর্য্যের নবোদয়।
যজ্ঞসূত্র জটাজুটধারী উঠিল মূরতি ধীর
যেদিকে দাঁড়ায়ে ছিল গোবিন্দ, সেদিকে নোয়ান শির
যোড়-কর করি অনুমতি লাগি চাহিল সে দ্বিজরাজ,
দ্রুপদ-বালার কুমারী হৃদয়ে প্রথম উপজে লাজ !
পিতামহে আর দ্রোণ-আচার্য্যে বন্দিয়া মনে-মনে,
অবহেলে বীর তুলে নিল সেই অতিকায় শরাসনে ;

স্তব্ধ হইল জন-অরণ্য নির্ব্বাক চাহি রহে,—
অপরূপ রূপ কেবা ব্রাহ্মণ, কাণে-কাণে সবে কহে।
ভুবন-বিজয়ী লক্ষ বীরের অসাধ্য যেই কাজ,
ব্রাহ্মণ তাহা করিবে সাধন লক্ষ-জনার মাঝ।
রাজ-নন্দিনী পুলকিত তনু মোহন মূরতি হেরি,
ধন্য বিপ্র ধন্য ধন্য বাজিছে বিজয়-ভেরী !
গোবিন্দ-পদ করিয়া স্মরণ, তেয়াগিল সেই বাণ,
চক্র ভেদিয়া বিঁধিল মৎস্য, বিস্মিত সব প্রাণ !

পাঞ্চালী আসি বরিল বিপ্রে উচ্ছলে আঁখি-নীর
উল্লসি উঠে ব্রাহ্মণ-দল—ক্ষত্রিয় নত শির।

ভাব ও বুদ্ধি

[শ্রীশশধর রায় এম্-এ, বি-এল্]

আমরা দেখাইয়াছি, যে ভাব অদমনীয়। যাহা কর্ম্মে পরিণত হইয়া সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করতঃ জয়যুক্ত হয়, তাহা একাগ্র ভাব। তাহা বিরোধী ভাবকে নষ্ট করে, বিপরীত যুক্তি-তর্ককে দমন করে এবং সহস্র পীড়নকে অগ্রাহ্য করে। এইরূপে ঐ ভাব আপন বেগে চলিয়া গিয়া কর্ম্মে সফলতা আনয়ন করে। এ সকল কি প্রকারে সম্ভব হয়, তাহাই এক্ষণে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, অগ্রে ভাব, পরে কর্ম্ম। শারীর-বিজ্ঞানের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বলিতে হয় যে, ভাবের প্রবণতা দেহ-যন্ত্রের উপর নির্ভর করে। এ স্থলে দেহাতিরিক্ত আত্মার কথা ক্ষণকালের নিমিত্ত ভুলিয়া যাইতেছি। ভাবের প্রবণতা কখন কোন্ কর্ম্মে পরিণত হইবে, তাহা সাময়িক অবস্থার উপর নির্ভর করে। সাময়িক অবস্থার মধ্যেও, যে অবস্থার উত্তেজনা অধিক, সেই অবস্থানুসারেই কর্ম্ম হয়(১)। কিন্তু বিরোধী ভাবের দমন না হইলে ত কর্ম্ম হইবে না। এ নিমিত্ত ঐ ভাবের মস্তিষ্ক-কেন্দ্র দমিত হওয়া আবশ্যক। সৌভাগ্যক্রমে, অভ্যাস করিলে, মস্তিষ্কের অনেক প্রতিকূল ক্রিয়াই দমন করা যায় (২)। ব্যক্তির স্নায়ু-মণ্ডলে, ঊর্দ্ধাধঃ অনুসারে, বিভিন্ন স্তর কল্পনা করিলে, বলা যাইতে পারে যে, ব্যক্তির স্নায়ু-মণ্ডলের ঊর্দ্ধ স্তরের কেন্দ্রসকল নিম্ন স্তরের কেন্দ্রসকলের ক্রিয়া নিবৃত্ত করিতে পারে (৩)। এই নিবৃত্ত করণের নাম আত্মসংযম। দেহকে ঈদৃশ সংযমে অভ্যস্ত করিতে হয়। যদি ব্যক্তির দেহ স্বভাবতঃ বায়ু-প্রধান হয়, অর্থাৎ তাহার স্নায়ু-মণ্ডল অল্প কারণেই উত্তেজিত হয়, তাহা হইলে তাহার মস্তিষ্কের জ্ঞান-কেন্দ্রের ক্রিয়া নিবৃত্ত হইয়া, তাহাকে দিয়া সামান্য কারণেই নরহত্যা করাইতে পারে। তদ্রূপ স্থলে সে হত্যার ভাবে একাগ্র হইয়াছে; সুতরাং বিরোধী

(১) Haeckel—The Riddle of the Universe (1970, Page 47.)

(২) Action is the result of a cessation or inaction of inhibition on the part of the highest centres. They cease to restrain, and the result is action. Saleeby—Evolution the Master Key. (1906 Page 198.)

(৩) Ibid (page 195)

ভাব (রাজদণ্ড ইত্যাদির ভয়) নিবৃত্ত হইয়া গেল। ব্যক্তির দেহের নানা স্থানে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ জাত হইতেছে, তাহার গুণের উপরেও উত্তেজনার স্বরূপ নির্ভর করে(৪)। এই রূপে দেখা যায় যে, দেহের অবস্থা অনুসারে কর্ম্মের প্রবণতা নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু সাময়িক প্রবলতর উত্তেজনা অনুসারে ঐ প্রবণতা কর্ম্মে পরিণত হয়। বিখ্যাত পণ্ডিত হেকেল এই কথাই বলিয়াছেন। যদি ভাবের প্রাবল্য দৈহিক অবস্থার উপর নির্ভর করিল, এবং ঐ ভাব হইতে জাত কর্ম্ম সাময়িক উত্তেজনার উপর নির্ভর করিল, তবে সে ভাবের অধিকারী কে? ঐ অধিকারেরই বা হেতু কি?

দেহ বংশানুক্রমের ফল, এবং সাময়িক উত্তেজনা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত জড়িত। পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের বহু পুরুষের দৈহিক, সুতরাং মানসিক, অবস্থা জাতক বংশানুক্রমে প্রাপ্ত হয়। ঠিক যে সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে; ঐ অবস্থার স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনে, অথবা তাহা হইতে অপর যে অবস্থা উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাও প্রাপ্ত হয়। জাতক শিশুকাল হইতে যে ভাবে প্রতিপালিত হয়, যে বেষ্টনীর মধ্য দিয়া যেরূপ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রকৃতি এবং বিবর্ত্তন অনুসারে, সাধারণতঃ তাহার মানসিক অবস্থা গঠিত হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলিতে ক্ষিতি, জল, বায়ু, আকাশ, জ্যোতিষ্ক, নানাবিধ উদ্ভিদ ও জন্তু এবং মানুষ পর্য্যন্ত সকলই বুঝিতে হইবে। এ সকলই মানুষের মনোবৃত্তি গঠিত করে।

সুতরাং দেখা গেল যে, একাগ্র ভাব বংশানুক্রমের উপর, এবং সে ভাবের কর্ম্মে পরিণতি সর্ব্ববিধ বেষ্টনীর উপর গুরুতর রূপে নির্ভর করে। এক্ষণে উপরের প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দেওয়া কঠিন হইবে না। একাগ্র ভাবের অধিকারী কে? ইহার উত্তর এই যে, যাহার দৈহিক অবস্থা এবং বেষ্টনী ঐরূপ ভাবের অনুকূল, তিনিই একাগ্র ভাবের অধিকারী,—অন্যে নহে। এই নিমিত্তই, যে মহাপুরুষ একাগ্র তন্ময় ভাবে মত্ত হন, তাঁহাকে হাতে গড়িয়া লওয়া যায় না,—তিনি ঐ অধিকার লইয়াই জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অসাধ্য-সাধন ক্ষমতা দেখিয়া, তাঁহাকে লোকে অবতার বিবেচনা করিয়া থাকে। সে যাহাই হউক, তিনি সর্ব্ব প্রকার বাধা ও দুঃখ তুচ্ছ করিয়া, আপন লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হন। জন-সাধারণ তাঁহাকে বুঝুক আর না বুঝুক, তাহারাও অচিরে তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে। অনুকরণ-বৃত্তি আমাদিগের সহজ বৃত্তি; সুতরাং, আজি হউক কা'ল হউক, জনসাধারণ তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিবেই। তখনই তাঁহার প্রযত্ন সফল হইবে। এই নিমিত্ত জগতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, একাগ্র ভাবের সফলতা অনিবার্য্য। উহার প্রবর্ত্তক এক ব্যক্তি হইলেও, তিনি সহস্র বাধা অতিক্রম করেন। প্রবর্ত্তকের সংখ্যার উপর কিছুই নির্ভর করে না। এক-লক্ষ্য ভাবের উপযোগী দেহ বহু ব্যক্তি প্রাপ্ত হন না। এই নিমিত্ত যুগে-যুগেই মহাপুরুষের সংখ্যা অতি বিরল। জনসাধারণ তাঁহার প্রতি ভক্তিবশতঃ আকৃষ্ট হয়। তাঁহার মহাপ্রাণতা, তাঁহার অসীম ত্যাগ, তাঁহার অনন্ত প্রেম, তাঁহার বিরাট সাধনা দেখিয়া, জন-সাধারণ স্তম্ভিত এবং আত্মহারা হয়। তখন তাহারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার অনুসরণ করিয়া, তদীয় ভাবের পূর্ণ সফলতা আনয়ন করে।

এতক্ষণ আমরা প্রধানতঃ দেহ ও বেষ্টনীর কথাই ভাবিতেছিলাম। আত্মার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না। মানুষ কেবল দেহ নহে; মানুষ দেহ এবং আত্মা। আত্মাই দেহকে আশ্রয় করিয়া জীবাত্মা নামে পরিচিত হন। ভ্রূণ-তত্ত্বের অনুশীলনে বুঝা যাইবে যে, কোন অব্যক্ত শক্তি পিতৃ-মাতৃ-শুক্র-শোণিতকে, অর্থাৎ স্ত্রী-কোষ ও পুং-কোষকে এরূপ ভাবে মিশ্রিত, এবং এরূপ প্রণালীতে বিভক্ত করিতে-করিতে সাধারণতঃ তিনটী(৫) স্তরে বিন্যস্ত করিয়া দেন যে, তাহা হইতেই দেহ তদ্রূপে গঠিত হয়; এবং মনও দেহের অনুরূপ ভাবে প্রকাশ লাভ করে। বোধ হয় "শক্তি" শব্দটী সঙ্গত হইল না। কিন্তু অন্য কোন শব্দও পাই না। যে "শক্তি" শব্দ গণিত-শাস্ত্রে সুপরিচিত,—ভ্রূণ-গঠনকারী শক্তির লক্ষণ তদ্রূপ নহে। এ শক্তিকে কর্ম্ম দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। আমরা এই শক্তিকে জীবাত্মা নাম দিতেছি। ইনিই দেহ গঠন করিয়া লন, এবং পরিশেষে আপনিই সেই দেহ-মধ্যে আবদ্ধ হন। শ্রুতি এই কথা পুনঃ-পুনঃ বুঝাইয়াছে। উর্ণনাভের সহিত আত্মার তুলনা এতদ্দেশে চিরপ্রসিদ্ধ। উর্ণনাভ আপনি জাল গড়িয়া,

(৪) Chemical conditions affect the form of the irritability. Loeb—Comparative Physiology of the Brain, p. 145.

(৫) Ectoderm, Mesoderm, এবং Endoderm.

আপনি তাহাতে আবদ্ধ হয়। তদ্রূপ জীবাত্মাও দেহ গঠন করিয়া, আপনি তাহাতে আবদ্ধ হ'ন। আত্মা স্বয়ং অসীম এবং অনন্ত শক্তি-যুক্ত হইলেও, দেহের সসীমতা প্রথমতঃ তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করে; পরে তিনি দেহের সীমার উপরে আপনাকে আপনি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বেচ্ছায় দেহের ও বেষ্টনীর অধীন হ'ন, এবং অবশেষে যথাসময়ে দেহ ও বেষ্টনীকে পরাজয় করিয়া, আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকেন। তখন তিনি মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় স্ব প্রভায় সমুজ্জ্বল। শ্রুতি এ তত্ত্ব অনেকবার বুঝাইয়াছেন। ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড আত্মারই আত্ম-প্রকাশ। ব্রহ্মবস্তু ইহা হইতে পৃথক নহে। বিজ্ঞান এখন ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছে।(৬) তিনি ব্রহ্মাণ্ডে বদ্ধ হইয়াছেন, আবার মুক্ত হইবেন। কিন্তু তাহাও দেহের এবং বেষ্টনীর উপরেই জয়ী হইয়া। দেহকে ক্রমে "স্থূল" হইতে "সূক্ষ্মে" "সূক্ষ্ম" হইতে "কারণে" পরিণত করিয়া, এবং বেষ্টনীর আধিপত্য স্বীকার করিতে-করিতে ক্রমে অস্বীকার করিয়া আত্মা মুক্ত হইবেন। স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ(৭) ও কারণ দেহ একের পর একে দেহ-নাশের দিকেই চলিয়াছে। শ্রুতি বলেন, দেহ-নাশেই মুক্তি। বেষ্টনীর প্রভাব উন্নত মানব আর পূর্ব্ববৎ স্বীকার করিতেছে না। জন্তুগণ ইহার যতটা অধীন, মানব তত নহে। এ তত্ত্ব বিখ্যাত পণ্ডিত রে ল্যাঙ্কেষ্টার বিশদ রূপে বুঝাইয়াছেন (৮)। তিনি মানুষকে Nature's rebel অর্থাৎ প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান বলিয়াছেন। তবেই দেখা যাইতেছে যে, বন্ধন-মুক্তির উপায় দেহ ও বেষ্টনীকে পরাজয় করা; এবং তাহাও স্বভাবতঃ সম্ভব এবং প্রযত্ন-সাধ্য। এ ক্ষেত্রে অন্য পন্থা নাই। একাগ্র তন্ময় সাধক দৈহিক ক্লেশকে গণ্যই করেন না; পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে গ্রাহ্যই করেন না। জগতের ইতিহাসে এ দৃশ্য পুনঃ-পুনঃ দেখা গিয়াছে। এক ভাবের প্রাধান্যে অন্য সকল ভাব-কেন্দ্রই ক্রিয়াহীন হইয়া যায়। সুতরাং অত্যাচারীর উৎপীড়ন, প্রতিকূল বেষ্টনী—কিছুই তাঁহাকে দমন করিতে পারে না। তিনি উভয় বিজয়ী। এ নিমিত্তই তিনি বন্ধন-মুক্ত হইবেনই; এবং তাহার সঙ্গে-সঙ্গে চারি দিক হইতে সকল বন্ধনই টুটিয়া যাইবে। এ কথা ধ্রুব সত্য। মানব-সমাজ যত প্রকার বন্ধনের তাড়নায় লঘু হইয়া রহিয়াছে, একলক্ষ্য সাধক সে সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, মুক্তিপথে সিদ্ধিকে আকর্ষণ করিবেনই। ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

একাগ্র কর্ম্মীর দেহ বংশানুগত, তাহা বলিয়াছি। ইহার উপর তাঁহার দৃশ্যতঃ কোন হাত নাই। তাঁহার ভাবের স্ফুরণ বেষ্টনীর সহিত সংসৃষ্ট। এই বেষ্টনী কিরূপ হইলে অনুকূল হয়? বেষ্টনী যেরূপই হউক, তাঁহার মহাপ্রাণতা এবং ত্যাগ, আজি হউক কালি হউক তাঁহাকে, অনুকূল পথে আনিবেই। কিন্তু যখন মানব-সমাজ মৃত-কল্প হইয়া পড়ে, তখন অল্প কালে অধিক কর্ম্ম হওয়া আবশ্যক হয়। ঈদৃশ স্থলে অনতিবিলম্বে বেষ্টনী অনুকূল হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। সুতরাং দ্বিধা, ইতস্ততঃ ভাব এবং তর্ক-বিতর্কই যাহাদিগের সম্বল, যাহাদিগের জড়তা বৃথা কালক্ষেপ করিতে ভীত হয় না, যাহাদিগের স্বার্থ বিরোধী কারণের সহায় স্বরূপ হইয়া, পরার্থ সাধনের প্রতিকূল হয়, তাহারা প্রথম অবস্থায় বর্জ্জনীয়। যাহারা ভক্তিমান, তর্ক দ্বারা মনকে সংশয়াচ্ছন্ন করেন না, তাঁহারাই তখন মহাপুরুষের প্রধান বেষ্টনী হইবার যোগ্য। মহাত্মা যিশু মুষ্টিমেয় ধীবর সহ প্রথমে কর্ম্ম আরম্ভ করেন। ভগবান বুদ্ধদেব, হজরৎ মহম্মদ, মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ তার্কিকের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাহাদিগের মতি পরিবর্তন করিবার নিমিত্ত কদাচিৎ তাহাদিগের সহিত ভাব-বিনিময় আবশ্যক হইতে পারে; কিন্তু তাহারা কর্ম্ম-সাধনার প্রধান সহায় রূপে গৃহীত হইতে পারে না। অধিকারী সাধক সিদ্ধির পথে কিছুদূর অগ্রসর হইলে, তাহাদিগের জড়তা, ভীতি, তর্ক ন্যূনাধিক নিরস্ত হইতে পারে। তখন তাহারা সেই একলক্ষ্য সাধকের,

(৬) The enlarged and deepened views of the universe attained through the discoveries of recent physical science have rendered incredible the idea of a God remote from the world. The rapid growth of Biology and the spread of the doctrine of evolution have * * * tended in the same direction.

Ency: Brit: Vol. 23. p. 245 (9th. Edition.)

বর্ত্তমান একাদশ সংস্করণ নিকটে না থাকায় তাহার উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

(৭) ১৩২৭ সালের মাঘ মাসের "প্রতিভা"তে জ্রণতত্ত্বের সাহায্যে সূক্ষ্মদেহ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। কারণ দেহও ঐরূপেই বুঝা যাইতে পারে।

(৮) Vide Kingdom of Man.

সেই উচ্চ মহাপুরুষের সহায় স্বরূপ হইতে পারে,—তৎপূর্ব্বে নহে।

বেষ্টনী বলিতে কেবল পারিপার্শ্বিক মানব বুঝিতে হইবে না; স্ব-সমাজের এবং পর-সমাজের, এমন কি বিশ্ব-মানবের সর্ব্বপ্রকার অবস্থাই বুঝিতে হইবে। আর্থিক ও ধর্ম্ম-নৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক অবস্থাও বুঝিতে হইবে। দেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা এবং মানব-প্রকৃতির উপর সেই সকলের ক্রিয়াও বুঝিতে হইবে। স্ব-সমাজের ও পর-সমাজের সম্বল এবং শক্তি বুঝিতে হইবে। এতদুভয়ের সভ্যতাও তুলনা করিতে হইবে। এই সকলের মধ্যে যে উপকরণসমূহ একলক্ষ্য কর্ম্মীর পরিপন্থী, তাহাদিগকে অনুকূলে আনিতে হইবে। এ কর্ম্ম কত কঠিন, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। বহুজনের রুচি ও প্রবৃত্তি সকল বিষয়ে এক হইতে পারে না। তথাপি তন্ময় কর্ম্মীর লক্ষ্য বিষয়ে এক হইতে পারে। অন্যান্য বিষয়ে ভিন্ন রুচি থাকিলেও, উপস্থিত বিষয়ে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক একতা উৎপন্ন হইতে পারে। এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু লক্ষ্য কিরূপ হইলে বহুজনের একতা আশা করা যায়? লক্ষ্য ধর্ম্মানুগত হইলে ঐরূপ আশা করা যাইতে পারে। স্বার্থ-গন্ধ-শূন্য, মানব-সমাজের দেহ-মনের কল্যাণকর, হিংসা-দ্বেষাদি-বর্জ্জিত পবিত্র লক্ষ্যই জয়যুক্ত হয়। যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ। মানবের সকল চেষ্টা, সকল কর্ম্মই ধর্ম্মভাবের সহিত যুক্ত হইয়া সাত্বিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে অদমনীয় হয়। প্রকৃত অধিকারীর প্রযত্ন ধর্ম্মপথের অনুসরণ করিবেই; সুতরাং জয়যুক্ত হইবেই। ক্রমবিবর্ত্তনবাদ আমাদিগকে ধর্ম্মপথে, পূর্ণতার পথে লইয়া যাইতেছে। যাহা অমঙ্গল-জনক, যাহা অধর্ম্মমূলক, যাহা অপবিত্র, তাহা ক্রমে পরিত্যক্ত হইয়া মানব ক্রমোন্নত হইতেছে। বিবর্ত্তনবাদের এ মহামন্ত্র নিয়তই নেত্র-পথে রাখিতে হইবে। অধস্তন জীবের সহিত মানবের তুলনা করিলে, অনায়াসে প্রতীয়মান হইবে যে, জীবরাজ্যে কাল সহকারে কত মহৎ গুণের আবির্ভাব হইয়াছে। মানব-মস্তিষ্কের (৯) ভাঁজগুলি, তাহার সর্ব্বোচ্চ স্তরের ধূসরবর্ণ তীক্ষাগ্র কোষগুলি মানবকে যে বিশেষত্ব দিয়াছে, তাহা ইতর জীবে নাই। মানবের নিকটবর্ত্তী 'সিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাংদিগের মস্তিষ্কেও এরূপ ভাঁজ, এরূপ ধূসর কোষ দেখা যায় না। অতি অনুন্নত জন্তুগণের মস্তিষ্ক-পদার্থই নাই; কাহারও বা স্নায়ু-সংস্থানেরই অসদ্ভাব। এ সকল স্থলে অন্য কিছু থাকিলেও তাহার ক্রিয়া কত অনুন্নত! যে বিবিধ গুণরাশি মানবকে সত্বগুণে উন্নত করিয়াছে, তাহা নিম্নস্তরের জন্তুগণের কোথায়? তাহাদিগের অনেকের (১০) দেহই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেকের মন নাই বলিলেও চলে। সরীসৃপ শ্রেণী হইতে কথঞ্চিৎ উচ্চ-শ্রেণীর জীবে মনের লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু তাহাও সত্বগুণের সহিত কতদূর অসংসৃষ্ট! উদ্ভিদগণের মন আছে কি না, থাকিলে মনোভাবগুলি কিরূপ, তাহা বোধ হয় আচার্য্য বসুও নিঃসন্দেহে বুঝাইতে পারিবেন না। তাহাদিগের মন অথবা বুদ্ধি থাকিলেও কতদূর অনুন্নত! বিবর্ত্তন-বিধি জীব রাজ্যে (১১) ক্রমে-ক্রমে বিবিধ সদ্গুণের এবং উন্নত ভাবের উদ্ভব করাইয়া, নিশ্চয়ই ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতেছে। নির্দ্দিষ্ট মানব অথবা মানব-সমাজ যতদূর অসভ্যই (১২) হউক না কেন, তাহাকে ধর্ম্মপথে আনিবার চেষ্টা ও যত্ন অল্লাধিক সময়ে সফল হইবেই। এ নিমিত্ত একাগ্র ভাব যদি ধর্ম্মভাব হয়, যদি বহুজনের কল্যাণকর হয়, তবে চিরতরে তাহার গতি রোধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহা সিদ্ধি আনিবেই। নিদারুণ উৎপীড়কের সহস্র পীড়ন নিষ্ফল হইয়া যাইবে; কূট চক্রীর কৌশলজাল ব্যর্থ হইয়া যাইবে। মানব আপনার পূর্ণতা লাভ করিবেই; দেহের ও বেষ্টনীর বন্ধন আপনা হইতেই খসিয়া পড়িতেছে। কেহই তাহাকে রোধ করিতে পারিবে না। একাগ্রকর্ম্মী, তন্ময় সাধক উপলক্ষ মাত্র হইয়া, জন-সমাজকে আত্ম-শক্তিতে আকৃষ্ট করিয়া, সিদ্ধির পথে লইবেন। পুনঃ-পুনঃ অকৃতকার্য্য হইলেও পরিণামে সিদ্ধির পথে লইবেনই। তাঁহার আত্ম-শক্তি জন-সমাজের আত্মায় প্রসারিত হইয়া পড়ে। জৈব এবং জড় সর্ব্ববিধ পদার্থ সেই বিস্তৃত আত্মার অলক্ষিত স্পর্শে একসুরে বাজিয়া উঠে। কবি রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থলে ইহাকেই বাঁশীর সুরের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এ কর্ম্ম ভাবের, একলক্ষ্য ভাবের, সাধন-পূত ভাবের। সে ভাবের বেগে তাহার সম্মুখে কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। সে নীরবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে; এবং জগতকে আপনার সহিত টানিয়া লয়। ইহা চিরন্তন সত্য; ইহা বিস্মৃত হইলে যে, মানব-সমাজ ধরা-পৃষ্ঠ হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

(৯) Convolution

(১০) এককোষ জীবগণের

(১১) প্রটোজোয়া হইতে মানউ পর্য্যন্ত। (১২) Savage

তাড়িত-বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্‌সি,]

ঘর্ষণ তাড়িত

(১)

তাড়িত কাহাকে বলে ?

একটা শুক্‌না গালার কাঠিকে যে-কোন রকম শুক্‌না পশম দিয়া ঘষিলে, তাহা হাল্‌কা জিনিস আকর্ষণ করিতে থাকে। একটা কাচের কাঠিকেও এক টুক্‌রা শুক্‌না রেশমের কাপড় দিয়া ঐরূপ ঘষিলে, তাহাও গালার কাঠির মত হাল্‌কা জিনিস আকর্ষণ করে। যখন গালা ও কাচ এরূপ আশ্চর্য্য কাজ করিতে থাকে, তখন আমরা বলি, ইহাদের গায়ে তাড়িত বা বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইয়াছে।

১নং পরখ

একটা বিড়ালের চাম্‌ড়া ও একটা গালার কাঠি রৌদ্রে দাও। খানিকটা পরে যখন দেখিবে, বিড়ালের চাম্‌ড়ার পশমের দিকটা ও গালার কাঠিটি বেশ গরম হইয়াছে, তখন গালার কাঠিটি বিড়ালের পশম দ্বারা ঘষ ও কতকগুলি হাল্‌কা কাগজের টুক্‌রার উপর ধর। দেখিবে, কাগজের টুক্‌রাগুলি লাফিয়ে গালার ঘর্ষিত স্থানে লাগিতেছে, ও লাগিয়াই ইহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে। গালার কাঠি ও বিড়ালের পশম আগুনের সাম্‌নে ধরিয়া গরম করিলেও, এই পরখটি করা যাইতে পারে। এই পরখে দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, গালার কিম্বা বিড়ালের পশমে জলবিন্দু যেন না থাকে। জলের লেশ মাত্র থাকিলেও পরখ সফল হয় না।

২নং পরখ

এক টুক্‌রা রেশমের কাপড় ও একটি কাচের কাঠি (মনে কর যেন ১ফুট্ লম্বা ও ১ইঞ্চি ব্যাসের একটি রুল) রৌদ্রে ভাল করিয়া শুকাও। এখন রেশমের টুক্‌রাটি দ্বারা কাচের কাঠিটি ঘষিয়া, প্রথম পরখের মতন কতকগুলি হাল্‌কা কাগজের টুক্‌রার উপর ধরিলে দেখিবে, কাগজের টুক্‌রাগুলি লাফিয়ে কাচদণ্ডের ঘর্ষিত স্থান স্পর্শ করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে তাড়িতের পরিচয়

অ্যাম্বার (১) নামক পদার্থকে রেশম দ্বারা ঘষিলে, উহা হাল্‌কা তৃণ প্রভৃতি আকর্ষণ করে। খৃষ্টের জন্মের প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস দেশের সুপণ্ডিত থেলিস্ (২) অ্যাম্বারের এই গুণের কথা জানিতেন। অ্যাম্বারের গ্রীক্ নাম ইলেক্ট্রণ্ (৩)। ইলেক্ট্রণ্ হইতেই ইংরাজি ইলেক্‌ট্রিসিটি (৪) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তৃণমণি নামক বস্তুর উল্লেখ দেখা যায়। হয় ত তৃণমণি ও অ্যাম্বার একই পদার্থ। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের (৫) সময় ডাক্তার গিল্‌বার্ট (৬) অনেক বস্তুর এইরূপ আকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করেন।

সংজ্ঞা

বস্তুতে তাড়িত সঞ্চারিত হওয়ার পূর্ব্বাবস্থাকে আমরা বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থা (৭) বলিব।

সাধারণ কয়েকটি পরখ—~~৩নং পরখ~~

একটা বাল্কানাইট্ দণ্ডে পশম দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তাড়িত সঞ্চারিত কর ও কতকগুলি (৮) ছোট-ছোট শোলার টুক্‌রা টেবিলের উপর রাখিয়া, তাহাদের উপর দণ্ডটি ধর (১নং চিত্রে দেখ)। শোলার টুক্‌রাগুলি লাফাইয়া আসিয়া বাল্কানাইট্ দণ্ডের উপর লাগিবে; উহার উপর মুহূর্ত্তকাল থাকিয়া টেবিলে পড়িবে; আবার বাল্কানাইট্ দণ্ডে লাগিবে;

---

(১) অ্যাম্বার—Amber।

(২) থেলিস্—Thales। (৩) ইলেক্ট্রণ—Electron।

(৪) ইলেক্‌ট্রিসিটি—Electricity। (৫) এলিজাবেথ—Elizabeth। (৬) ডাক্তার গিল্‌বার্ট—Dr. Gilbert।

(৭) স্বাভাবিক অবস্থা—Neutral state। (৮) Vulcanite এক প্রকার কঠিনীকৃত রবার।

আবার টেবিলে পড়িয়া যাইবে। ব্যাপারটি দেখিলে মনে হইবে যেন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শোলার টুক্‌রাগুলি ক্ষণকালের জন্য নৃত্য করিতেছে। অন্যান্য হাল্‌কা পদার্থও তাড়িত-সঞ্চারিত বাল্কানাইট্ দণ্ডের নীচে এইরূপ নৃত্য করিবে।

একটি স্বাভাবিক-অবস্থা-সম্পন্ন কাষ্ঠ-শলাকার নিকট লইয়া যাও। দেখিবে, কাষ্ঠ-শলাকাটি তাড়িত-সঞ্চারিত ইবনাইট্ দণ্ড কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে না। কিন্তু ঐ স্বাভাবিক-অবস্থা-সম্পন্ন কাষ্ঠ-শলাকা একটি কীলকের (১২) উপর

১ নং চিত্র

৪নং পরখ
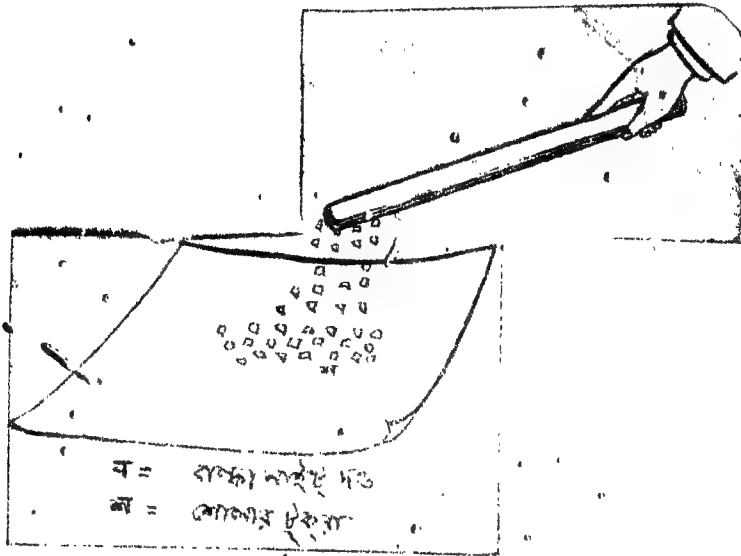
এবার একটি শুক্‌না রেশমের সূতার এক মাথায় একটা শোলার টুক্‌রা বাঁধিয়া, ও সূতার অন্য মাথা একটি গাছার (৯) বেষ্টনী (১০) হইতে ঝুলাইয়া দাও ; এবং ৩নং পরীক্ষার তাড়িত-সঞ্চারিত বাল্কানাইট্ দণ্ডটি শোলার টুক্‌রার নিকটে ধর। দেখিবে, শোলার টুক্‌রাটি বাল্কানাইট্ দণ্ড কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া নিমেষের জন্য বাল্কানাইট্ দণ্ডের উপর থাকিয়া, সজোরে বিকর্ষিত হইতেছে। এই পরীক্ষাটি রেশম দ্বারা কাচদণ্ড ঘর্ষণ করিয়া, কিম্বা পশম দ্বারা লাক্ষাদণ্ড ঘর্ষণ করিয়াও করা যাইতে পারে।

১নং হইতে ৪নং পরখগুলির ফলে আমরা দেখিতেছি, হাল্‌কা স্বাভাবিক-অবস্থা-সম্পন্ন বস্তুমাত্রই তাড়িত-সঞ্চারিত বস্তু কর্ত্তৃক আকর্ষিত হয়।

৫নং পরখ

এখন একটি ইবনাইট্ (১১) দণ্ডে বিড়ালের পশম দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তাড়িত উৎপাদন কর, ও ইবনাইট্ দণ্ডটি অপর স্থির ভাবে রাখিয়া, উহার নিকটে তাড়িত-সঞ্চারিত ইবনাইট্ দণ্ডটি ধরিলে দেখা যাইবে, কাষ্ঠ-শলাকাটি ইবনাইট্ দণ্ড কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া, কীলকের উপর অবাধে ঘুরিতে থাকিবে। ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, ইবনাইট-তাড়িতের কাষ্ঠ-শলাকাকে উত্তোলন করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়াই, প্রথমবার আকর্ষণ দেখা যায় নাই।

৬নং পরখ

কয়েকটি তারের রেকাব (১৩)। প্রথমে ইহাকে একটি শুক্‌না রেশমের সূতার এক মাথায় বাঁধিয়া, একটি গাছার বেষ্টনী হইতে ঝুলানো হইয়াছে (৪নং চিত্র দেখ)। তৎপরে ঐ রেকাবে একটি তাড়িত-সঞ্চারিত দণ্ড স্থির ভাবে রাখা হইয়াছে। এখন সাধারণ একটি কাষ্ঠ-দণ্ড উহার নিকট ধরিলে দেখা যাইবে, তাড়িত-সঞ্চারিত দোলায়মান দণ্ডটি হাতের দণ্ডের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ঘুরিতে থাকিবে। এই পরখ হইতে আমরা দেখিতেছি, তাড়িত-সঞ্চারিত বস্তু যেমন স্বাভাবিক-অবস্থা-সম্পন্ন বস্তুকে আকর্ষণ করে, স্বাভাবিক-

(৯) গাছা = Stand। (১০) বেষ্টনী = Clamp। (১১) Ebonite — চিরুণী প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য কঠিনীকৃত রবার, গন্ধকময় রবার।

(১২) কীলক = Pivot।

(১৩) রেকাব = Stirrut।
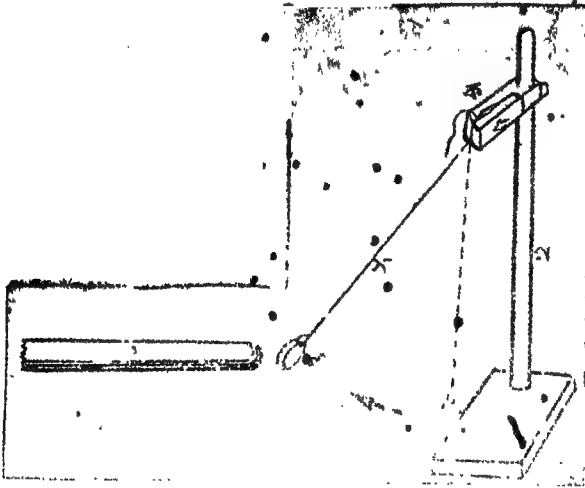
২ নং চিত্র

ব — বাক্কানাইট দণ্ড　　গ — গাছা　　ক — বেষ্টনী
স — রেশমের সুতা　　শ — শোলার টুকরা

৩ নং চিত্র
ক — কীলক
খ — কাষ্ঠশলাকা

অবস্থা-সম্পন্ন বস্তুও ঠিক তেমনিভাবে তাড়িত-সঞ্চারিত বস্তুকে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ এই আকর্ষণ-শক্তি উভয়েরই।

৭নং পরখ

২ফিট্ লম্বা একটি বাক্কানাইট-দণ্ডের এক মাথা ধর ও অন্য মাথায় মাত্র ২।৩ ইঞ্চি স্থান ব্যাপিয়া পশম দ্বারা ঘর্ষণ কর। এখন বাক্কানাইট-দণ্ডের নানা অঙ্গ, শুক্‌না রেশমের সুতা দিয়া ঝুলানো একটি শোলার টুক্‌রার নিকট ধরিলে (২নং চিত্র দেখ) দেখা যাইবে, শুধু ঘর্ষিত স্থানটিই শোলাকে আকর্ষণ করিতেছে।
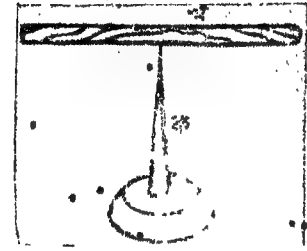
এই পরখটী, কাচ-দণ্ড রেশম দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া, কিম্বা লাক্ষা-দণ্ড ফ্লানেল দ্বারা ঘর্ষণ করিয়াও, করা যাইতে পারে। অতএব আমরা বলিতে পারি, বাক্কানাইট, কাচ, লাক্ষা ইত্যাদি বস্তুর কোনও অঙ্গে তাড়িত সঞ্চারিত হইলে ঐ তাড়িত সেই সকল বস্তুর সর্বাঙ্গে না ছড়াইয়া, তাহাদের ঘর্ষিত স্থানেই আবদ্ধ থাকে।

৮নং পরখ

হাতে একটী পিতলের দণ্ড ধরিয়া, এক টুক্‌রা গরম রেশম দ্বারা ঘর্ষণ কর, ও ৪নং পরখের ঝুলানো
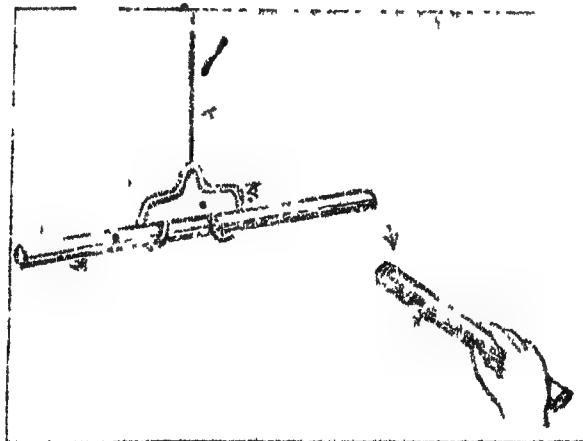
৪ নং চিত্র

র — রেকাব　　স — রেশমের সুতা　　ত — তাড়িত সঞ্চারিত দণ্ড　　শ — তাড়িত শূন্য সাধারণ কাষ্ঠদণ্ড

শোলাটির নিকট ধর। দেখিবে, হাল্‌কা শোলার টুক্‌রাটি পিতলদণ্ড কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে না। পিতলদণ্ডের পরিবর্ত্তে তাম্রদণ্ড কিম্বা লৌহদণ্ডকে সেইরূপে ধরিয়া ঘর্ষণ পূর্ব্বক, শোলার টুক্‌রার নিকট ধরিলে, পূর্ব্ববৎ আকর্ষণ দেখা যাইবে না। বস্তুতঃ ধাতব দণ্ড মাত্রই হস্তে ধারণ পূর্ব্বক, রেশম কিম্বা পশম দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া, ঝুলানো শোলার টুক্‌রার নিকট ধরিলে কোন প্রকার আকর্ষণ দেখা যাইবে না।

৫নং চিত্রে দ একটি ধাতব দণ্ড। ইহা হাতল (১৪) হ-এর উপর চড়ান হইয়াছে। হ বাক্কানাইট, ইবনাইট্‌, গালা
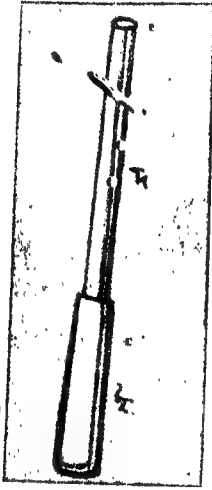
৫নং চিত্র

দ—ধাতব দণ্ড

হ—ইবনাইটের হাতল

কিম্বা কাচের যে কোন একটি দ্বারা নির্ম্মিত। এখন হ-কে ধরিয়া দ-কে গরম রেশম দ্বারা ঘষ, ও পূর্ব্ব-কথিত ঝুলানো শোলার টুক্‌রার নিকট ধর। দেখিবে শোলার টুক্‌রাটি ধাতব দণ্ড কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে, ধাতব পদার্থে গরম রেশম দিয়া ঘষিয়া তাড়িত সঞ্চারিত করিতে হইলে, উহাকে হাত না ধরিয়া, যে সকল বস্তুতে হাতে ধরিয়া ঘষিয়া তাড়িত সঞ্চারিত করা যায় (অর্থাৎ বাক্কানাইট, ইবনাইট্‌, গালা, কাচ ইত্যাদি), সেই সকল বস্তুর হাতলে চড়াইয়া ধরিতে হইবে।

৯নং পরখ

হাতল হ-কে ধরিয়া দ-এর মাথার দিকটার কেবল ২।৩ ইঞ্চি স্থান ব্যাপিয়া গরম রেশম দ্বারা ঘর্ষণ কর ও দ-এর প্রত্যেক অঙ্গ একে একে ৭নং পরীক্ষার ন্যায় রেশমের সূতা দিয়া ঝুলানো শোলার নিকট আন। দেখিবে, ধাতব দণ্ডের সর্ব্বাঙ্গই শোলার টুক্‌রাটিকে আকর্ষণ করিতেছে। অতএব আমরা বলিতে পারি, ধাতব পদার্থের যে কোন অঙ্গে তাড়িত সঞ্চারিত হইলে, ঐ তাড়িত স্থানবিশেষে আবদ্ধ না থাকিয়া, উহার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে।

এবার ধাতব দণ্ড দ-তে তাড়িত সঞ্চারিত করিয়া, হয় উহাকে স্পর্শ কর, নয় উহাকে মাটিতে লাগাও; দেখিবে, ইহা আর ঝুলানো শোলার টুক্‌রাটিকে আকর্ষণ করিতেছে না। ইহাতে পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইবে যে দ-তে আর তাড়িত নাই। এই পরখটি কাচ, লাক্ষা কিম্বা ইবনাইট্‌ দণ্ড দ্বারা করিলে দেখা যাইবে যে, উহারা শোলার টুক্‌রাটিকে আকর্ষণ করিতেছে। ব্যাপারটি দেখিলেই মনে হইবে যে, এই সকল বস্তুতে ধাতব পদার্থের ন্যায় তাড়িতের সম্পূর্ণ তিরোভাব হয় না।

পরিচালক (১৫) ও অপরিচালক (১৬) বস্তু

আমরা ৯নং পরীক্ষায় দেখিলাম, কোনও ধাতব পদার্থের কোনও অঙ্গে তাড়িত সঞ্চারিত হইলে, ঐ তাড়িত কোনও স্থানবিশেষ আবদ্ধ না থাকিয়া, ঐ পদার্থের সর্ব্বাঙ্গেই ছড়াইয়া পড়ে। অর্থাৎ ধাতব পদার্থের মধ্য দিয়া তাড়িত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অবাধে চলিতে পারে। কাজেই ধাতব বস্তু তাড়িতের পক্ষে পরিচালক। আর ৭নং পরখে আমরা দেখিয়াছি যে, অ্যাম্বার, ইবনাইট্‌, বাক্কানাইট, গালা ইত্যাদির কোনও অঙ্গে তাড়িত সঞ্চারিত হইলে, তাড়িত উহাদের সেই অঙ্গেই আবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ তাড়িত এই সকল পদার্থের মধ্য দিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে বাধা পায়। তাই তাড়িতের পক্ষে ইহারা অপরিচালক।

পরিচালক বস্তুদের মধ্যে তাড়িত পরিচালনের ক্ষমতা সকলের সমান নহে। যথা—সোণা, রূপা, তামা ইত্যাদি

(১৪) হাতল = Handle

(১৫) পরিচালক = Conductor। (১৬) অপরিচালক = non-Conductor

যত শীঘ্র তাড়িত পরিচালন করে, কাগজ, কাঠ, পাথর ইত্যাদি তত শীঘ্র তাড়িত পরিচালন করিতে পারে না। আবার গন্ধক, গালা, অ্যাম্বার ইত্যাদি মোটেই তাড়িত পরিচালন করে না। তাই পদার্থের তাড়িত পরিচালন ক্ষমতা-ভেদে তিনটি তালিকা করা গেল। যথা—

খারাপ অপরিচালক	সর্ব্ব ধাতু অঙ্গার (কয়লা) সকল প্রকার দ্রাবক (১৭) ধাতব লবণ জল জীবদেহ	ভাল পরিচালক
আংশিক অপরিচালক	কাপড় তুলা কাঠ পাথর কাগজ আইভরি	আংশিক পরিচালক
ভাল অপরিচালক	তেল পশম রেশম গন্ধক গাটা-পার্চ্চা গালা ইবনাইট্ কাচ বায়ু অভ্র (আভ্)	খারাপ পরিচালক

ডাক্তার গিল্‌বার্ট, সমস্ত বস্তুতে তাড়িত উৎপাদন করা যাইতে পারে কি না দেখিবার জন্য, অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তিনি অ্যাম্বার, গালা, রজন, গন্ধক, গাটাপার্চ্চা, রবার, কাচ ও ইবনাইট্ এই পদার্থগুলিকে তাড়িত উৎপাদন-ক্ষম(১৮) বস্তু নাম দেন; কারণ, ইহাদিগকে হাতে ধরিয়া রেশম কিম্বা পশম দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই, তাড়িত উৎপাদিত হয়। আর যে কোন ধাতু (লোহা, তামা, পিত্তল ইত্যাদি) সাধারণ কাঠ, পাথর, সাধারণ কাগজ ইত্যাদি পদার্থকে তিনি তাড়িত-উৎপাদনাক্ষম (১৯) বস্তু নাম দেন; কারণ, এই বস্তুগুলিকে হাতে ধরিয়া রেশম কিম্বা পশম দ্বারা ঘষিলে ইহাদের গায়ে তাড়িতের উপস্থিতি দেখা যায় না। কিন্তু ৮নং ও ৯নং পরীক্ষাদ্বয়ে আমরা দেখিয়াছি যে, কোনও ধাতব পদার্থে তাড়িত উৎপাদন করিতে হইলে, উহাকে অ্যাম্বার, ইবনাইট্ কিম্বা গালা ইত্যাদি দ্বারা নির্ম্মিত হাতলের উপর চড়াইতে হইবে, এবং সেই হাতলে ধরিয়া ধাতব পদার্থটি ঘষিতে হইবে। কথাটা অন্য ভাবে বলিতে গেলে, আমাদিগকে বলিতে হয় যে, ডাক্তার গিল্‌বার্টের তাড়িত-উৎপাদনাক্ষম বস্তুগুলি তাঁহার তাড়িত-উৎপাদনক্ষম বস্তুর হাতলে চড়াইয়া ঘষিলে, উহারাই আবার তাড়িত উৎপাদনে সমর্থ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, ডাক্তার গিল্‌বার্টের নামাকরণ দুইটি পরীক্ষণ-সিদ্ধ-যুক্তিমূলক নহে।

তাড়িত দ্বিবিধ ১০ নং পরীক্ষা

ক, খ দুইটি শোলার ছোট্ট গোলক। প্রথমে পাতলা সোণার পাত দিয়া মুড়িয়া, শুক্‌না রেশমের সূতা দিয়া উভয়কেই কোনও এক বিন্দু হইতে ঝুলাইয়া দেও (৬ নং চিত্রে দেখ ১।° তার পর ইবনাইট্-দণ্ডে বিড়ালের পশম দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তাড়িত সঞ্চারিত কর; এবং ঐ দণ্ডে উভয়কে ছোঁয়াও। তখন দেখিবে, একটি গোলক অপরটি হইতে সরিয়া পড়িতেছে। এখন তাড়িত-সঞ্চারিত দণ্ডটি গোলকদ্বয়ের নিকটে আনিলে দেখা যাইবে, ইবনাইট্-দণ্ড ও গোলক দুইটি পরস্পর হইতে সরিয়া পড়িতেছে। বিষয়টি তলাইয়া দেখিতে হইলে আরও দুইটি শোলার গোলক গ, ঘ পূর্ব্ববৎ

(১৭) দ্রবক=Acid

(১৮) তাড়িত উৎপাদনক্ষম বস্তু=Electrics

(১৯) তাড়িত-উৎপাদনাক্ষম বস্তু=Non-electrtcs

সোণার পাতে মুড়িয়া রেশমের সূতা দিয়া অপর একটি বিন্দু হইতে ঝুলাও। এবার যে বিড়ালের পশম দিয়া ইবনাইট্-দণ্ডটিকে ঘষা হইয়াছিল, সেই পশমে গ, ঘ গোলক-দ্বয়কে ছোঁয়াও। দেখিবে, গ, ঘ হইতে সরিয়া পড়িতেছে। যদি বিড়ালের চাম্ড়ার পশমের দিক্টা গ, ঘ-এর নিকট ধর, দেখিবে, গ, ঘ ও পশম পরস্পর হইতে সরিয়া পড়িতেছে। এখন ক-কে গ-এর নিকট রাখ। দেখিবে ক, গ-এর গায়ে লাগিতেছে। কথাটা ঘুরাইয়া বলিতে গেলে বলিব, যে গোলক-
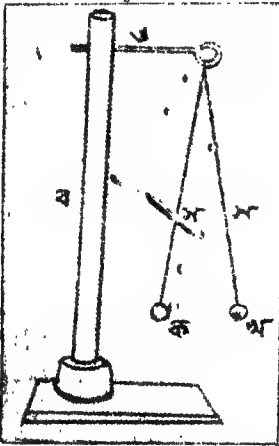
৬ নং চিত্র

ত = আমার তার ব = বাল্কানাইটের গাছা স = রেশমের সূতা
ক, খ = সোণার পাতে মুড়ানো শোলা গোলক দ্বয়

দ্বয় তাড়িত-সঞ্চারিত একই ইবনাইট্-দণ্ড স্পর্শ করিবে, তাহারা উভয়েই উভয়কে বিকর্ষণ করিবে; অর্থাৎ ঠেলিয়া দিবে। কিন্তু ইবনাইট্-দণ্ড স্পৃষ্ট গোলক ক বিড়ালের পশম-স্পৃষ্ট গোলক গ-কে আকর্ষণ করিবে, অর্থাৎ টানিয়া লইবে। অতএব ক, খ-এর গায়ে যে তাড়িত, তাহা এক রকমের, আর গ, ঘ-এর গায়ে যে তাড়িত, তাহা অন্য রকমের। ক, খ একই ইবনাইট্-দণ্ড হইতে তাড়িত গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, ইহাদের গায়ে সমধর্ম্মী তাড়িত আছে বলিয়া আমরা মনে করিব। সেই কারণে গ ও ঘ-এর গায়ে সমধর্ম্মী তাড়িত বর্ত্তমান; কারণ ইহারা একই বিড়ালের চামড়ার পশম হইতে তাড়িত গ্রহণ করিয়াছে। এখন আমরা বলিতে পারি, দুইটি বস্তুর গায়ে সমধর্ম্মী তাড়িত থাকিলে, তাহারা উভয়ে উভয়কে বিকর্ষণ করে। কিন্তু তাহাদের গায়ে বিষমধর্ম্মী তাড়িত থাকিলে, তাহারা উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করে। তাড়িতের এই ধর্ম্ম দেখাইবার জন্য আমরা একটি পরখ অতি সহজে করিতে পারি। যথা,

১১ নং পরখ

মেটে সিঁদুর (২০) ও হলদে গন্ধক একটি কাচের খলে ভাল করিয়া চূর্ণ কর। সিঁদুর গুঁড়া ও গন্ধক গুঁড়া, ঘর্ষণে উভয়ই বিরুদ্ধ-তাড়িত যুক্ত হইবে। যদি দণ্ডের তাড়িত সিঁদুরের তাড়িতের বিরুদ্ধধর্ম্মী হয়—তবে দণ্ডে শুধু সিঁদুর-গুঁড়া লাগিবে, এবং দণ্ডটি লাল দেখাইবে। আর যদি দণ্ডের তাড়িত গন্ধকের তাড়িতের বিরুদ্ধধর্ম্মী হয়, তাহা হইলে দণ্ডে শুধু গন্ধক-গুঁড়া লাগিয়া উহাকে হরিদ্রাভ দেখাইবে।

অ্যাম্বার, লাক্ষা, ইবনাইট্, বাল্কানাইট ইত্যাদির গায়ে যে তাড়িত সঞ্চারিত হয়, পূর্ব্বে সেই তাড়িতকে রজন তাড়িত (২১) বলা হইত। আর কাচের গায়ে যে তাড়িত উৎপন্ন হয়—তাহাকে কাচ-তাড়িত (২২) বলা হইত। পরে যখন দেখা গেল, রেশমের পরিবর্ত্তে অন্য বস্তু দ্বারা ঘষিয়া কাচের গায়েও ইবনাইটের তাড়িত উৎপন্ন করা যাইতে পারে, তখন কাচ-তাড়িত ও রজন-তাড়িতের পরিবর্ত্তে ধন-তাড়িত (২৩) ও ঋণ-তাড়িত (২৪) শব্দদ্বয় ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল। আজকালও ধন-তাড়িত ও ঋণ-তাড়িতের ব্যবহার-প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। তাড়িত কথাটার পূর্ব্বে ধন ও ঋণ এই দুইটি সংজ্ঞা বসাবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহারা তাড়িতের দুইটি অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে মাত্র। গণিতের (+) যোগ চিহ্নের সহিত (−) বিয়োগ চিহ্নের যে সম্বন্ধ, ধন-তাড়িতের সহিত ঋণ-তাড়িতের সেই সম্বন্ধ। কোনও সময়ে আমার হাতে পাঁচ টাকা আসিল এবং ঐ মুহূর্ত্তেই যদি আমাকে পাঁচ টাকা অপর কাহাকেও দিতে হইল, তাহা হইলে আমার হাতে কিছুই রহিল না। এইরূপ কোনও স্থানে একই সময়ে ধন-তাড়িত ও সেই পরিমাণ ঋণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইলে কোনও তাড়িতের ফল দেখা যাইবে না।

---

(২০) মেটে সিঁদুর = Red Lead (সিন্দুর, নাগ-সম্ভব)

(২১) রজন-তাড়িত = Resinous electricity।

(২২) কাচ-তাড়িত = Vitrious electricity।

(২৩) ধন-তাড়িত = Positive electricity।

(২৪) ঋণ-তাড়িত = Negative electricity।

বিশ্ব-ভারতী

[শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল্]

সমালোচনা ও সমালোচক।

ফরাসীদেশের কথা-সাহিত্য-ধুরন্ধর গীদে মোঁপাসা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সমালোচকদিগের অন্যায় সমালোচনায় বিরক্ত হইয়া উপন্যাস সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ তাঁহার Pierre and Jean উপন্যাসের প্রারম্ভে সংযোজিত করিয়া দেন। প্রকৃত সমালোচনা কাহাকে বলে ও সমালোচকের কর্ত্তব্য কি, সে সম্বন্ধে তিনি যে যুক্তিপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন সাধারণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া একটু আলোচনা করিব।

প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন, আমার যে কোন উপন্যাস প্রকাশিত হইবার পর এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন, যাঁহারা আমার সুখ্যাতি করিয়া বলিয়া থাকেন, বই খানির সর্ব্বাপেক্ষা বড় দোষ, এখানি উপন্যাসই নয়। ইহার উত্তরেও কি আমরা তাঁহাকে বলিতে পারি না, হে সমালোচক-প্রবর, প্রকৃত সমালোচনা কাহাকে বলে তাহা তোমার জানা নাই। যে সকল গুণ থাকিলে প্রকৃত নিরপেক্ষ সমালোচক হইতে পারা যায় তাহাও তোমাতে দেখিতে পাই না।

এখন দেখা যাউক কি গুণের অধিকারী হইলে প্রকৃত সমালোচক হইতে পারা যায়?

সকল দেশের সাহিত্যের মধ্যেই দলাদলি আছে। এই দলসৃষ্টির গুণও যেমন আছে দোষও তেমনি আছে। দলের অন্তর্ভুক্ত হইলে সেই দলের ভাবধারার সহিত যেরূপ সম্যক্ পরিচিত হওয়া যায় দলের গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া ততটা হওয়া যায় না। দলবদ্ধ সাহিত্যিকদের পরস্পরের ভাবের আদান প্রদান হইয়া একদিকে যেমন ভাবের পুষ্টি হইতে থাকে, অন্য দিকে আবার অপরাপর দলের ভাবের সহিত পরিচয় না থাকায় ভাবের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ হইবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় ঘটিয়া থাকে। দলাদলির ফলে বিবাদ-বিসম্বাদ অবশ্যম্ভাবী। অপর দলের সাহিত্যিকদিগের ন্যায্য প্রাপ্য দিতে অনেকেই কুণ্ঠা বোধ করিয়া থাকেন। এই কথাই স্মরণ করিয়া বোধ হয় মোঁপাসা লিখিয়াছেন,—সমালোচক কোন দলেরই লোক হইবেন না। কোন কলা-সম্প্রদায়ের তিনি সভ্য হইবেন না। পূর্ব্ব হইতে কোনরূপ সংস্কার বা অভিমত লইয়া সমালোচনাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। সমালোচকের বোধ-শক্তি প্রখর থাকা চাই। কুশাগ্রবুদ্ধি সমালোচক বিভিন্ন মতের পার্থক্য স্থির করিয়া দিবেন, এবং সেগুলির সমীচীন সমাধান করিবার চেষ্টা করিবেন; প্রত্যেক মত সাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন। বিরুদ্ধপ্রকৃতির লোককেও ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করাও তাঁহার কর্ত্তব্য। সর্ব্বোপরি কলাকুশলী বিভিন্ন-মতাবলম্বী লেখকদের প্রবন্ধসমূহের সম্যক্ সমজদার হওয়া সমালোচকের প্রধান কর্ত্তব্য।

বাস্তবিক এ সকল গুণ না থাকিলে যে প্রকৃত

সমালোচক হওয়া যায় না, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। উপন্যাস বলিতে পূর্ব্বোক্ত তথাকথিত সমালোচকেরা বুঝিয়া থাকেন, চিত্ত-চমকপ্রদ লোমহর্ষণকর ঘটনার বিবৃতি। এই ঘটনাগুলি সম্ভবপর হইলেই হইল। আধুনিক নাটক যেমন তিন অঙ্কে সমাপ্ত হয়, উপন্যাসেরও সেইরূপ হওয়া চাই। প্রথমাংশে ঘটনা-বর্ণন (Exposition), দ্বিতীয়াংশে কার্য্য (Action) এবং শেষাংশে কার্য্যের পরিণতি (Denouement) দেখাইতে পারিলেই ঔপন্যাসিকের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায়।

জানি না, উপন্যাস লিখিবার কোন বিশেষ আইন-কানুন আছে কি না? কথা-সাহিত্যের মধ্যে কোন্ পুস্তককে উপন্যাসের ভিতর স্থান দেওয়া যাইবে আর কোন্ পুস্তককেই বা দেওয়া যাইবে না তাহা নির্ণয় করিবার কোন কষ্টিপাথর আজ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে কিনা তাহা আমার জানা নাই।

যদি "Don Quixote" কে উপন্যাস বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে "Le Rouge et le Noir" কে উপন্যাস বলা চলে কিনা? "Monte Cristo" উপন্যাস, আর "L' Assommoir" কি উপন্যাস নয়? গেটের "Elective Affinities", ডুমার "Three Musketeers", Flaubert এর "Madame Bovary", Feuillet Octaveএর "M de Camors" এবং জোলার "Germinal" ইহাদের কোন্ খানি উপন্যাস? উপন্যাসের প্রকৃত সংজ্ঞা কে নির্দ্দেশ করিয়া দিবে? কোথায় ঐরূপ সংজ্ঞা পাওয়া যাইতে পারে? সমালোচকের মনঃকল্পিত আইনকানুন মানিয়া ত সকলে চলিতে পারে না? যদি কোন নিয়ম থাকে তাহা হইলেও বলিয়া দিতে হইবে, কে বা কাহারা ঐ নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছে। আর তখনই আমরা ঐ সকল নিয়ম মানিয়া লইতে বাধ্য হইব, যখনই আমাদের কেহ বুঝাইয়া দিবেন যে ঐগুলি সুযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ঔপন্যাসিকেরা যেমন আপন আপন সৌন্দর্য্যানুভূতির উপর পুস্তক লিখিয়া থাকেন, এই শ্রেণীর সমালোচকেরাও পুস্তক সমালোচন-ব্যপদেশে কেবল মাত্র কোন শ্রেণীর লোকের অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই মতানুযায়ী না হইলে ইঁহারা কোন নূতন পুস্তককে উপন্যাসের গণ্ডীর ভিতর প্রবেশ করিতে দেন না।

এরূপ করা কিন্তু প্রকৃত সমালোচকের কার্য্য নয়। বুদ্ধিমান সমালোচকের গতানুগতিক-প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়া আলোচনা করা উচিত নয়। চিরানুচরিত পথ ছাড়িয়া দিয়া যে সকল নূতন লেখক নূতন পথে চলিবার চেষ্টা করেন, তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া প্রত্যেক সমালোচকেরই কর্ত্তব্য।

মনীষা পূর্ব্বসূরিদের পথে চলিতে পারে না। সে আপনার পথ আপনিই খুঁজিয়া বাহির করিয়া লয়। হিউগো ও জোলা বহুবার এই কথাই বলিয়াছেন। মনীষা-সম্পন্ন লেখকেরা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া ও স্বাধীন ভাবে দর্শন করিয়া আপনাদের মনোমত আর্টের নিয়মানুসারে উপন্যাস লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিচারবুদ্ধিও কুশাগ্র, আবার তাঁহারা যত শীঘ্র কোন জিনিসকে বুঝিতে পারেন, অপরে তত শীঘ্র তাহা পারেন না। যে সমালোচক আপনার প্রিয় কথা-সাহিত্যিকদিগের পুস্তক পাঠ করিয়া উপন্যাস সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়া লন তাহার মাপকাটিতেই সকল উপন্যাসকে বিচার করিবেন ও যে রায় দিবেন তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইবেন এরূপ আশা করিতে পারা যায় না। মনীষীর লিখনভঙ্গী (style) বিভিন্ন হইলে যে তিনি কথা-সাহিত্যিকদের নিকট অপাঙ্‌ক্তেয় হইবেন এ কথা আমরা কল্পনায় ও স্থান দিতে পারি না।

প্রকৃত সমালোচকের কার্য্য বিশ্লেষণ করিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা—অন্ততঃ সৃষ্টি করিবার শক্তি না থাকিলেও যাহাতে সকলে লেখকের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকা উচিত। সৌন্দর্য্যানুভূতির উদ্রেক করাই সমালোচকের প্রধান কর্ত্তব্য। কোনও লেখকের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বা বিরাগ থাকা উচিত নয়। রাগ, দ্বেষ, হিংসা বা কোনরূপ অনুভূতি লইয়া সমালোচকের কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কলা-সমালোচকের (art-critic) ন্যায় সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলাই তাঁহার কার্য্য। তাঁহার অনুশীলনফলে যাহাতে লেখকের সৌন্দর্য্য সাধারণের চক্ষে প্রতিফলিত হয় সেদিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আলোচ্য বিষয়ে তাঁহার সাধারণ জ্ঞান প্রখর থাকা দরকার। সমালোচকের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে তিনি বিচারক। ন্যায়পরায়ণ বিচারক কোন পক্ষের অর্থগ্রাহী ব্যবহারজীবী নন, সে কথাটাও তাঁহার ভুলিলে চলিবেনা। বাস্তবিক ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখাই

বিচারকের যেমন একমাত্র কর্ত্তব্য, সত্যের অনুরোধে লেখকের গুণানুবাদ করাও তেমনই সমালোচকের অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত হিসাবে লেখককে তিনি পছন্দ না করিতে পারেন, কিন্তু সমালোচকের দায়িত্বপূর্ণ অধিকার গ্রহণ করিলে তাঁহাকে লেখকের রচনার উপর আলোচনা করিতে হইবে—তাঁহার বক্তব্যের ভিতর দিয়া রসের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে কিনা দেখাইতে হইবে,—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি বিষয়ে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে লেখকের ব্যক্তিত্বকে না ভুলিলে সমালোচনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। মনে রাখা উচিত সমালোচনা লেখকের নয় —লেখার।

অপর দিকে সমালোচককেও আপনার ব্যক্তিত্ব হারাইতে হইবে—ভুলিতে হইবে তিনি কোন সমাজ বা সাহিত্যিক দলের নন। বিচারবুদ্ধিবলে লেখার বিশ্লেষণ করিয়া সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া লেখকের সৃষ্ট রস হইতে সাধারণে যাহাতে আনন্দ লাভ করিতে পারে তাহার জন্য যিনি আলোচনা করেন তিনিই প্রকৃত সমালোচক।

মোঁপাসার মতে অধিকাংশ সমালোচকই কেবলমাত্র পাঠক। তাঁহারা লেখকদিগকে হয় নির্জ্জলা স্তুতি করেন, না হয় কেবলমাত্র নিন্দা করেন।

এই শ্রেণীর সমালোচকেরা তাঁহাদের আপন আপন পছন্দ মত ভাবের অনুযায়ী লেখা দেখিতে পাইলেই বলিয়া থাকেন "বা! বেশ সুন্দর হইয়াছে।" যে লেখক তাঁহার কল্পনাকে একটু আনন্দ দিতে পারে—তাহাতে একটু মাদকতা আনিতে পারে সেই লেখকই তাঁহার মতে শ্রেষ্ঠ লেখক।

ইঁহারা কেহ বা আরাম চান, কেহ বা আনন্দ চান, কেহ সহমর্ম্মিতায় আঘাত পাইতে চান, কেহ দুঃখ চান, কেহ কল্পলোকের স্বপ্ন চান, কেহ হাস্য-কৌতুক চান, কেহ চান ক্রন্দন, আবার কেহ চান নূতন চিন্তা।

প্রকৃত সমালোচক কলাবিদের নিকট হইতে মুখ্যভাবে এগুলি চান না, তিনি চান, হে কলাবিদ্, তোমার পছন্দ মত সেই ভাবেই তুমি চিত্র অঙ্কিত কর, আমরা দেখিতে চাই কেবল সৌন্দর্য্য।—কর তুমি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি—বিশ্বের ললামভূতা শ্রী সৃষ্টি করিয়া তুমি আমাদিগকে আনন্দ দাও।

আর এই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির বিচার লেখকের কৃত চিত্রের ফলাফলের উপর নির্ভর করে না—নির্ভর করে তাঁহার উদ্যম ও চেষ্টার উপর।

এ সকল কথা নূতন নয়, কিন্তু এগুলির পুনরাবৃত্তির ও যে আবশ্যকতা আছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

উপন্যাস দুই শ্রেণীর—ভাবগত (Idealistic) ও বস্তুগত (Realistic)। ভাব-গত উপন্যাসের সমালোচনা করিতে হইলে দেখিতে হইবে লেখকের আদর্শ কত উচ্চ। তাঁহার কল্পনা অসাধারণ ও তাঁহার আদর্শ মহান্ হওয়া চাই। এই আদর্শ-বিচ্যুত লেখকের লেখার সমালোচনা হওয়া আবশ্যক; বস্তুগত উপন্যাসের ধারা কিন্তু অন্যরূপ। এখানে বিচার্য্য বিষয় আদর্শ নয়—জীবনে যে সত্য আমরা উপলব্ধি করি তাহাই লেখক উপলব্ধি করিয়াছেন কি না দেখিতে হইবে। বাস্তব সত্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত এই সকল উপন্যাসে বিবৃত হইয়া থাকে। বস্তুগত উপন্যাসলেখকদের উপন্যাস পূর্ব্বোক্ত আদর্শ দ্বারা যাচাই করিলে চলিবে না; দুই শ্রেণীর উপন্যাসের বিচার বিশ্লেষণ এক প্রকারে হইতে পারে না। সমালোচকদের এই কথাটা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে।

প্রথম শ্রেণীর কথা-সাহিত্যিকেরা এইরূপ ভাবে ঘটনার সংযোজন করেন যাহাতে উচ্চ আদর্শ-চিত্র ফুটিয়া উঠে; আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকেরা ঐরূপ ভাবে ঘটনার সংযোজন করিয়া চিত্ত-চমকপ্রদ বর্ণনা করেন না, তাঁহারা ঘটনার ও চরিত্রের যথাযথ বর্ণন করিয়া থাকেন। আদর্শের দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য তত থাকে না, তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে যথাযথ বর্ণনের দিকে। সত্যের দিকে—মানসিক ভাবের স্ফুরণের দিকে। অবস্থা বা ঘটনা, চরিত্র-বিকাশের সহায় মাত্র। কোন্ অবস্থায় মানব চরিত্র কি ভাবে ফুটিয়া উঠে তাহাই দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিকেরা বর্ণন করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ভূয়োদর্শন ফলোৎপন্ন; এগুলি মনোবিজ্ঞানের নিয়মসম্মত ও বটে। অনুভূতি ও উচ্চভাবের স্ফুরণ ইঁহাদের লেখনী হইতে যতদূর জানিতে পারা যায় প্রথম শ্রেণীর কথা-সাহিত্যিকদের লেখনী হইতে ততদূর জানিতে পারা যায় না। সমাজে বা গৃহে ভালবাসা ও ঘৃণার দ্বন্দ্ব ইঁহাদের লেখনীতে যতদূর পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যত্র ততটা দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যবসাগত স্বার্থ, অর্থগত স্বার্থ, রাজনৈতিক স্বার্থ এমন কি পারিবারিক

স্বার্থেরও পোষণ চিত্র এই শ্রেণীর সাহিত্যিকদের তুলিকায় সুন্দর ভাবে ফুটিয়া থাকে।

এককথায় বলিতে গেলে এই শ্রেণীর লেখকেরা কেবল সত্যের দিকে চাহিয়াই চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বর্ণিতব্য বিষয়—সত্য। মোঁপাসার এ কথার সহিত কাহারও বিরোধ থাকিতে পারে না; কিন্তু এই শ্রেণীর কথা-সাহিত্যিকেরা সত্যের দোহাই দিয়া যে অশ্লীল চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে সমাজের অকল্যাণ সাধিত হইতে পারে বলিয়াই সমালোচকেরা তাঁহাদের উপর খড়্গহস্ত।

বস্তুগত কথা-সাহিত্যের প্রচলন বাঞ্ছনীয় কিন্তু অশ্লীল চিত্র বাঞ্ছনীয় নয়। আর একথা মোঁপাসা স্পষ্টই বলিয়াছেন,—The realist if he is an artist, will seek not to show us a vulgar photograph of life, but to give us a more complete, striking and convincing vision of life than the reality itself. কলাকুশলী বস্তুগত ঔপন্যাসিক জীবনের কুৎসিত চিত্রের ফটোগ্রাফ তুলিয়া চক্ষুর সম্মুখে ধারণ করেন না, জীবনের সমগ্রচিত্র চিত্রকরের ন্যায় অঙ্কিত করিয়া ধরিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর কোনও কোন ঔপন্যাসিকের মতে সমগ্র সত্য—কেবল মাত্র সত্যই (The whole truth and nothing but truth) বস্তু-গত সাহিত্যের প্রাণ। ইঁহাদের কথাটা সম্পূর্ণ ভাবে সত্য নয়। জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে প্রত্যহই এক একখানি উপন্যাস রচিত হইতে পারে। সুতরাং পরিবর্জ্জন অবশ্যম্ভাবী। কতকগুলি বিবরণকে বাদ দিতেই হইবে। সেই সকল সত্য ঘটনাকেই আমরা গ্রহণ করিব যাহা আমাদের চরিত্রের উদ্দেশ্য বিষয়ের পরিপন্থী। মোঁপাসার একটি ছত্র পুনরায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—That is why the artist having chosen his theme, selects in this life, encumbered as it is with accidents and trivialities only those characteristic details necessary to his subject, and will cast all the rest aside.

আর সেই লেখককেই কলাবিদ্ বলিব যিনি জীবনের কয়েকটী ঘটনা হইতে একটী সম্পূর্ণ উপভোগ করিবার মত চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন।

বস্তু-গত কথা-সাহিত্যিকেরা যে সত্যের জন্য ব্যগ্র, সে সত্যের ধারণা তাঁহারা কিরূপে করিয়া থাকেন? চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম ও বিচার বুদ্ধি দ্বারাই সত্য অনুভূত হইয়া থাকে। যখন বিভিন্ন ব্যক্তি একই দৃশ্য হইতে বিভিন্নরূপ অনুভূতি পাইয়া থাকেন, তখন সত্যের সার্ব্বজনিক মাপকাটি কিরূপে হইবে?

বস্তুতঃ কলাবিদ্ আপনার কল্পনার সাহায্যে সমস্তই গড়িয়া তুলিয়া থাকেন। অবিসংবাদী সত্য জগতে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না—আছে ভ্রান্তি—আছে মায়া—আমাদের রূপরসসৃষ্ট কাল্পনিক জগৎ! আর লেখকের কার্য্যই হইতেছে এই মায়ার—এই সত্যাভাসের যথাযথ বর্ণন। "And the writer's only mission is to faithfully reproduce this illusion by means of all the devices of art of which he is a master".

মোঁপাসা যে সত্য কথা বলিয়াছেন তাহার জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ। যদি মায়ারই সৃষ্টি করিতে হয় তাহা হইলে আমরা কি বলিতে পারি না যে এরূপ আদর্শ সৃষ্টি হওয়া উচিত যাহাতে সমাজ-বন্ধন দৃঢ় হয়? নরনারী পুণ্যের দিকে আকৃষ্ট হয়—জগতে ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হয়। এই দুই শ্রেণীর উপন্যাস আলোচনা করিবার পন্থাও যে বিভিন্ন হইবে তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বাস্তব উপন্যাসগুলিকে, ভাবগত উপন্যাসগুলির আদর্শে বিচার করিলে ত চলিবে না।

এক্ষণে আমরা বলিতে চাই মোঁপাসা সমালোচনার একটা দিক বিকৃত করিয়াছেন। তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণাত্মক (analytic) সমালোচনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য; কিন্তু সমালোচনার আর একটা দিকও আছে উহা—গঠনাত্মক (Synthetic)। লেখকের কেবলমাত্র দোষ দেখাইয়া দিলেই চলিবে না। কি উপায় অবলম্বন করিলে নূতন করিয়া গঠন কার্য্য চলিতে পারে তাহার পথ সমালোচক মহাশয়কে দেখাইয়া দিতে হইবে। ইংরাজীতে এই সকল সমালোচনাকে Constructive or synthetic criticism বলে।

রেণী মারান

নিগ্রো-লেখক রেণী মারান এবৎসর ফরাসীদেশে কথা-সাহিত্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাসের জন্য Edmond de

Goncourt পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপন্যাসখানির নাম 'বাতৌয়ালা' (Batouala)। এখানি ফরাসি সাহিত্যিক-দিগের ভিতর একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মারানের প্রশংসা অনেকের মুখেই শুনা যাইতেছে। এই প্রশংসাবাদ যে লেখকের কর্ণে পৌঁছিবে না, তাহা একরূপ ধ্রুব সত্য, কারণ তিনি এখন আফ্রিকার চাঁদ হ্রদ হইতে তিন দিনের পথে বনমধ্যে বাস করেন।

প্যারী-নগরীর জনৈক বন্ধুকে মারান জানাইয়াছেন, উপনিবেশসমূহে শ্বেতকায় ব্যক্তিরা যে সমস্ত অন্যায় অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া আজ তিনি তাঁহার জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া 'আর্চাম্বল্ট' দুর্গের নিকট একটী নির্জ্জন কুটীরে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রাত্রিতে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তর চীৎকারে তিনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন।

নিগ্রোজাতির উন্নতির জন্য লেখক কিছুই বলেন নাই। মুখবন্ধে শ্বেতজাতি, যাহারা দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে দেখিয়া 'রঙিনজাতির' (coloured race) লোক বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবার জন্য অনুযোগ করিয়াছেন—তাহারাও যে তাহাদেরই মত প্রাণবান্ মানুষ, সে কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন,—তাহাদের মত তাহারাও যে সুখদুঃখ অনুভব করিতে পারে, সে কথাটা মনে রাখা উচিত একথা বলিতে ভুলেন নাই। একটু সহানুভূতি পাইলে যে তাহারা কৃতকৃতার্থ হইয়া যায় তাহাও তিনি বলিয়াছেন। এ পুস্তকে মারান আপনার জাতীয় লোকের গুণকীর্ত্তন করেন নাই, তাহাদের গুরুতর দোষের চিত্রগুলি উজ্জ্বল চিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন। আহার, নিদ্রা ও শিকার করা ভিন্ন তাহাদের আর কোন কাজ নাই। স্ত্রীলোক লইয়া পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা সর্ব্বদাই ব্যগ্র।

পুস্তকখানিতে জনৈক জঙ্গলের প্রধান কর্ত্তার ভালবাসার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। আদিম অধিবাসীদের চাতুরী, প্রবঞ্চনা, ঈর্ষা, ঘৃণা, কুমন্ত্রণার চিত্র তিনি যথাযথই অঙ্কিত করিয়াছেন। চরিত্রের ভীষণতার দিকটা তিনি উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রাচ্য দেশের আমোদ প্রমোদ, রীতিনীতি শিকার ও পূজাপার্ব্বণাদিতে যে সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহার যথাযথ বিবরণ সরলভাবেই মারান বিবৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক সরলতাই তাঁহার পুস্তকের প্রধান গুণ। আর এই গুণের জন্যই তিনি অল্প দিনের ভিতরেই সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছেন।

'বাতৌয়ালা'র অষ্টম পত্নী, তাহার অপর পত্নীদের মত গোপনে শ্বেতকায়দিগের চরণে আত্ম-বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল না। ষোড়শ বর্ষীয় শ্বেতকায় যুবক 'বিশিবিঙ্গুই'এর অঙ্কশায়িনী হইতে সে কিছুতেই রাজী হয় নাই। 'বিশিবিঙ্গুই'এর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। শ্বেতজাতির অনেকেই কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অর্থদ্বারা লোভ দেখাইয়া দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব-রত্ন অপহরণ করিয়া থাকে। 'বাতৌয়ালা'র অন্যান্য স্ত্রীগুলির চরিত্র নষ্ট করিবার জন্য সে শ্বেতকায়দিগকে দেখিতে পারিত না। শ্বেতকায় লোক দেখিলেই তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইত। যখন 'বিশিবিঙ্গুই'এর বিষয় সে জানিতে পারিল, তখন তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য সচেষ্ট হইল। একটী চিতাবাঘকে তাহার উপর ছাড়িয়া দিয়া তাহার জীবলীলা সাঙ্গ করিবার সঙ্কল্প সে করিয়াছিল। শুধু সঙ্কল্প করিয়াই সে ক্ষান্ত হয় নাই। সত্য সত্যই সে একদিন একটী জীবন্ত চিতাবাঘকে 'বিশিবিঙ্গুই'এর উপর নিক্ষেপ করে; কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ বাঘটী তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া 'বাতৌয়ালা'কে আক্রমণ করিয়া আহত করে। এই ঘটনা হইতে তাহার পত্নী বুঝিয়াছিল দৈব তাহাকে 'বিশিবিঙ্গুই'এর অঙ্কশায়িনী হইতেই নির্দ্দেশ করিতেছে। সেও তাহার সহিত বাস করিতে চলিয়া গিয়াছিল। মৃত্যুকালে বাতৌয়ালা প্রলাপ-বাক্যের সহিত শ্বেতকায় লোকদিগের মিথ্যাভাষণ, অত্যাচার ও ভণ্ডামীর কথা বহুবার বলিয়াছে।

উপন্যাসখানির ফলশ্রুতি আমরা নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। শাদা ও কালোর ভিতর পার্থক্য কিছু নাই। সকলেই এক পিতার সন্তান, সকলকেই ভাইয়ের মত দেখা উচিত। চুরি করা যেমন দোষ, প্রতিবেশীর গায়ে হাত তোলা, বা তাহাকে অযথা আঘাত করাও দোষ। যুদ্ধ ও নিষ্ঠুরতা উভয়ই এক পর্য্যায়ভুক্ত। শাদার জন্য কালোকে যুদ্ধ করিতে যাইতেই হইবে, নচেৎ শাদা কালোকে মারিয়া ফেলিবে। যৌবন কালে 'বাতৌয়ালা' শ্বেতকায় দিগের আতপতাপক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া হাসিত। মশা, বিছা ও মাছির জ্বালায় যখন তাহারা উত্যক্ত হইত, তখনও সে হাসিত। রঙিন চশমা পরিয়া, স্কন্ধে ঝুড়ি লইয়া গর্ব্বভরে যখন তাহারা

চলিত, তখন তাহাদের গাত্র হইতে যে গন্ধ বাহির হইত, সেই গন্ধে 'বাতৌয়ালা'র নাসিকা কুঞ্চিত হইত। সে তাহাদিগকে ঘৃণা করিত। সে জানিত শাদার জ্ঞান তাহাদিগকে বড় করিয়াছে। হিংসা তাহাদের জাতিগত বৃত্তি। ফরাসীই হউক বা জার্ম্মাণই হউক, শাদার এই দুই গুণ আছেই আছে। বিড়াল যেমন ইন্দুরকে লইয়া কিছুক্ষণ খেলা করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করে, ইহারাও সেইরূপ কালার সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া ধ্বংস করিয়া তাহাকে ফেলে।

মারান দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, শাদাদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আমাদের দেশের লোক শান্তিতে বাস করিত। আহার, মদ্যপান, তামাকু সেবন করিয়া, ভালবাসিয়াও নিদ্রিত থাকিয়া তাহারা জীবন যাপন করিত। শাদার আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে উহাদের দেশের রীতি-নীতি আমাদের ভিতর প্রচলিত হইয়াছে। জুয়া খেলিতে হইলে, মদ্যপান করিতে হইলে, নাচগান করিতে হইলে, এখন পয়সা না দিলে চলে না। যাহা আমরা রোজগার করি তাহাও সম্পূর্ণ আমরা পাই না। টেক্স দিতে দিতে আমাদের রোজগারের অনেক টাকাই ব্যয় হইয়া যায়। যে জাতের প্রাণ নাই, তাহাদের নিকট হইতে আমরা কতদূর আশা করিতে পারি? কালো স্ত্রীলোকদের গর্ভে শাদার ঔরসে যে ছেলে-মেয়ে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে পশুর ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে ইহারা পশ্চাদ্‌পদ হয় না। শাদা মেয়েদের আমি মূল্যবান্ জিনিস বলিয়া মনে করি! কালো মেয়েদের যেমন সহজে পাওয়া যায়, ইহাদিগকে ঠিক সেই ভাবেই পাওয়া যায়; অথবা আত্ম-বিক্রয় করিতে ইহারা যেরূপ পারে, তদ্রূপ আর কেহ পারে না। তাহাদের অনেক পাপের বিষয় আমাদের কালো মেয়েরা কল্পনাতেও আনিতে পারে না; এবং এই সকল মেয়েদের প্রতি আমাদের সম্মান দেখাইতেই হয়। আমরা পশুদেরও অধম ঘোড়া বা কুকুরকে শাদারা যত্ন করে, আহার দেয়। কিন্তু ইহারা ধীরে ধীরে আমাদিগকে মারিয়া ফেলে।

ইহারা আমাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অভিহিত করে। আমাদের মিথ্যায় কিন্তু কাহারও কোনরূপ ক্ষতি হয় না। উহারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে। এ বিষয়ে উহাদের স্থান আমাদের চেয়ে অনেক উচ্চে।

মারানের মতে সহজাত সংস্কারবশে কার্য্য করাই উচিত। পাশ্চাত্যদের নৈতিক চরিত্র অস্বাভাবিক রকমের; তাহাদের পাপাচারণ দেখিয়া দেশের লোক স্তম্ভিত হয়। উপক্রমণিকায় মারান লিখিয়াছেন, ৭ বৎসরের ভিতর শাদার আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে যে গ্রামে ১০,০০০ হাজার লোক বাস করিত তথায় ১০০০ জন লোকের বাস হইয়াছে। শাদার সঙ্গে-সঙ্গেই মদ ও রোগ আসিয়া দেশে ঢুকিয়াছে। পরিশ্রমবিমুখ দেশের লোকেরা রাতদিন খাটিয়া খাটিয়া মারা যাইতেছে। শাদার সভ্যতা গ্রহণ করিতে না পারিলে কেহ টিকিয়া থাকিবে না। উপন্যাসখানি বৈদেশিক সাহিত্যিকদিগের নিকট সমাদৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু লেখকের দেশের লক্ষাধিক শ্বেতকায় জাতির লোক তাঁহাকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিবে, কারণ তাহাদের সজীব চিত্র ইহাতে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

শুভ-দৃষ্টি

[শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বি-এল]

যেমনি তোমারে আমি হেরিলাম, ওহে পারাবার,
অমনি বুঝিনু মনে তুমি মোর চির-আপনার,
আত্মীয় স্বজন হ'তে তুমি মোর পরম আত্মীয়,
সবার অধিক তুমি, তুমি মোর প্রাণাধিক প্রিয়;
আমাদের দু'জনের এই পুণ্য শুভ-দৃষ্টি ক্ষণে
অন্তর ছাপায়ে মোর, জানি না কি অজ্ঞাত কারণে,
আঁখি কোণে বারিবিন্দু করিতে লাগিল টলমল,
হে সিন্ধু, বুঝিনু শেষে, তোমারি সে স্নেহ সিক্ত জল।
তোমার বুকের ধন মোর বুক ভরিয়া কেমনে
গলাইয়া মন মোর ভুলাইয়া আপনার জনে,
জন্ম-জন্মান্তের কোন সনাতন পরিচয় জোরে
তোমারে আমারে, বন্ধু, বেঁধে দিল প্রণয়ের ডোরে
এ জীবনে প্রথম দর্শনে। সে মিলন হ'তে নিরবধি,
তোমার গৌরব গানে মত্ত আমি রয়েছি, জলধি!
তরঙ্গিত বক্ষ তব সুবিশাল উদার অপার,
গভীর গম্ভীর হৃদি, নিরুদ্দেশ তলদেশ যার,
বিরহ-মিলনে মেশা অজানা ভাষায় তব গান,
আশা-নিরাশায় সদা কম্পমান করে মোর প্রাণ।

বিধবা

(আলোচনা)

'কৃষ্ণকান্তের উইল'—(৪)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্-এ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তাহার পর ২য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদে ভ্রমরের পিতা ও তাঁহার আত্মীয় নিশাকর দাসের প্রসাদে প্রসাদপুরের প্রাসাদে পদার্পণ করিয়া আমরা অনেক দিন পরে প্রেমিক-প্রেমিকার সাক্ষাৎ লাভ করি। কিন্তু এক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র 'কপোত-কপোতী'র প্রেম-সম্ভাষণের (billing and cooing of doves) চিত্র অঙ্কিত করেন নাই, যুবতী রোহিণী ওস্তাদের শিক্ষায় সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে, 'যুবাপুরুষ' গোবিন্দলাল 'নবেল * পড়িতেছেন, এবং যুবতীর কার্য্য দেখিতেছেন' এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। (প্রেমিক-প্রেমিকা 'সে একা আর আমি একা' নহেন, তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত।) ইহাও বঙ্কিমচন্দ্রের reticenceএর, সুরুচির, নিদর্শন।

'নিঃশঙ্কে পাপাচরণ করিবার স্থান বুঝিয়া পূর্ব্বকালে এক নীলকর সাহেব এইখানে এক নীলকুঠি প্রস্তুত করিয়াছিল। এক্ষণে নীলকর ও তাহার ঐশ্বর্য্য ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে।' এই বর্ণনার 'ধ্বনি' টুকু (suggestion) প্রণিধানযোগ্য। গোবিন্দলালও 'নিঃশঙ্কে পাপাচরণ করিবার' জন্য এই স্থানে বাস করিতেছেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্যও সত্বর ধ্বংসপুরে প্রয়াণ' করিবে, তিনি অচিরে ভ্রমরের নিকট গ্রাসাচ্ছদনের জন্য অর্থের ভিখারী হইবেন। গৃহসজ্জার বিবরণে দেখা যায়—'কতকগুলি রমণীয় চিত্র—কিন্তু, কতকগুলি সুরুচিবিগর্হিত, অবর্ণনীয়।' এগুলি সেই বারুণী পুষ্করিণীর তীরবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানের 'অর্দ্ধাবৃতা স্ত্রীপ্রতিমূর্ত্তি'র (১ম খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ) পরিবর্দ্ধিত ও উন্নত (?) সংস্করণ! তখনকার সুপ্ত রূপ-তৃষ্ণা জাগরিত হইয়া এখন এই পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। যুবতীর 'চঞ্চলকটাক্ষের মাধুর্য্যে' এখন গোবিন্দলাল মসগুল। কিরূপ সাবধানতার সহিত আখ্যায়িকাকার 'যবনিকা পতন' করিয়াছেন, তাহা ২য় খণ্ডের আলোচনার আরম্ভেই বলিয়াছি।

এই পরিচ্ছেদ-সম্বন্ধে আর একটু মন্তব্য আছে। নিশাকরের প্রবেশমাত্র 'রোহিণীর তবলা বেসুরা বাজিল, ওস্তাদজির তম্বুরার তার ছিঁড়িল, তাঁর গলায় বিষম লাগিল—গীত বন্ধ হইল, গোবিন্দলালের হাতের নবেল পড়িয়া গেল।' ইহার সঙ্কেত (symbolism) লক্ষণীয়। নিশাকরের কারসাজিতেই অচিরে প্রমোদ-গৃহের সুখের হাট ভাঙ্গিবে, রোহিণী-গোবিন্দলালের জীবনের ঐক্যতান-বাদন বেসুরা হইয়া যাইবে, এমন কি রোহিণীর জীবনের তার ছিঁড়িবে, ইহা তাহারই সূচনা।

'অপরিচিত যুবাপুরুষ' সুবেশ 'সুপুরুষ' নিশাকর *

---

* নবেল পড়া সময় কাটাইবার জন্য। 'যুবাপুরুষ' 'যুবতীর কার্য্য দেখিতেছিল', 'নিবিষ্টচিত্তে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছে', অথচ 'নবেল পড়িতেছেন'—ইহা হইতে বুঝা যায়, গোবিন্দলালের রূপ-তৃষ্ণায় ভাটা পড়িয়াছে, এখন আর তিনি অনিমেষ লোচনে রোহিণীর রূপসুধা পান করিতেছেন না; তিনি love ও জানিয়াছেন, 'love's sad satiety'ও জানিয়াছেন। তাই রোহিণীর একটা নূতন আকর্ষণী শক্তি সৃষ্টি করিবার জন্য ওস্তাদ রাখিয়া তাহাকে সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিনী করিতেছেন। ভ্রমরের উপর অভিমানের বেলায় যেমন বর্ণিত আছে—আগে কথা কুলাইত না, এখন তাহা খুঁজিয়া আনিতে হয়' (১ম খণ্ড ২৭শ পরিচ্ছেদ), এখন বোধ হয় রোহিণীর বেলায়ও সেইরূপ হইয়াছে। আর এ অবস্থায়, এ আবহাওয়ায় (atmosphere), নবেল পড়াই সঙ্গত; তবে সব নবেলেই দূষিত রুচি নাই। (কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ এই নিষেধ-বাক্য সম্বন্ধে মল্লিনাথের টীকা 'অসৎকাব্যবিষয়তাক পশুন্' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। চরিত্রবান্ ইংরেজ কবি গ্রে (Gray) যে গিদায় ঠেস দিয়া নিত্য নূতন নবেল পড়াই জীবনের সেরা সুখ মনে করিতেন। 'to lie on a sofa and read eternal new romances.') বঙ্কিমচন্দ্র ইহা না বুঝিলে নিজে নবেল লিখিতেন না।

* নিশাকর কি রোহিণীর হৃদয়রঞ্জন চন্দ্র? আর রাসবিহারী নামটি কি কৃষ্ণলীলার দ্যোতক?

ওরফে রাসবিহারীকে ফুলবাগানে বেড়াইতে দেখিয়া রোহিণী ভাবিতেছিল "বেশভূষা রকম সকম দেখিয়া বোঝা যাইতেছে যে, বড়মানুষ বটে। দেখিতেও সুপুরুষ—গোবিন্দলালের চেয়ে? না, তা নয়। গোবিন্দলালের রঙ ফরশা—কিন্তু এর মুখ চোক ভাল। বিশেষ চোখ—আ মরি! কি চোখ!... ওর সঙ্গে দুটো কথা কইতে পাই না? ক্ষতি কি—আমি ত কখনও গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হইব না।" 'রোহিণী এইরূপ ভাবিতেছিল, এমত সময়ে নিশাকর উন্নত-মুখে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করাতে চারিচক্ষু সম্মিলিত হইল। চক্ষে চক্ষে কোন কথাবার্ত্তা হইল কিনা তাহা আমরা জানি না—জানিলেও বলিতে ইচ্ছা করি না—কিন্তু আমরা শুনিয়াছি এমত কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে।' (২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) আবার নিশাকর 'বড় হলে বসিলে 'পাশের কামরা' হইতে রোহিণীর 'পটল-চেরা চোক তাঁকে দেখিতেছিল।' (২য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ।) অনেক দিন পূর্ব্বে রোহিণী গোবিন্দ-লালকে পুষ্পোদ্যানে দেখিয়া রূপতৃষ্ণায়, লালসায় দগ্ধ হইয়াছিল। আবার ফুলবাগানে নূতন মানুষকে দেখিয়া তাহার ভাবান্তর হইল। পূর্ব্বের মত মনের বল নাই, সুতরাং প্রলোভনে পড়িতে বিলম্ব হইল না। তবে লালসা তত তীব্র নহে। কেননা তখনকার মত হৃদয় একেবারে শূন্য নহে।

রোহিণী উপযাচিকা হইয়া খুড়ার সংবাদ লইবার অছিলায় বাবুটির সহিত নিভৃতে দেখা করিতে চাহিল, অপর পক্ষও সাহ্লাদে সম্মত হইল। নদীর ধারে, বাঁধা ঘাটের কাছে বকুলতলায় দেখা করার বন্দোবস্ত হইল। (ভারত-চন্দ্রের সরোবরের ধারে বকুলতলা স্মর্ত্তব্য।) 'এখন রোহিণীর মনের ভাব কি; তাহা আমরা বলিতে পারি না। ...বুঝি আরও কিছু ছিল। একটু তাকাতাকি, আঁচা-আঁচি হইয়াছিল। রোহিণী দেখিয়াছিল যে নিশাকর রূপবান্—পটল-চেরা চোক। রোহিণী দেখিয়াছিল যে মনুষ্যমধ্যে নিশাকর একজন মনুষ্যত্বে প্রধান। রোহিণীর মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, আমি গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না। কিন্তু বিশ্বাসহানি এক কথা—এ আর এক কথা। বুঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়াছিল, "অনবধান মৃগ পাইলে কোন্ ব্যাধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে?" † ভাবিয়াছিল, নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী তাহাকে জয় করিতে কামনা না করিবে?... রোহিণী ভাবিয়া থাকিবে, যদি এই আয়তলোচন মৃগ এই প্রসাদপুর-কাননে আসিয়া পড়িয়াছে—তবে কেন না তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিই? জানিনা এই পাপীয়সীর পাপচিত্তে কি উদয় হইয়াছিল?' (২য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ।) ফলকথা, রোহিণীর লালসাবহ্নি চিরতরে নিভিবার আগে আর একবার জ্বলিল। ইহা হইতে বুঝা যায় তাহার চরিত্রের কত দূর অধঃপতন হইয়াছে। আখ্যায়িকাকার ঠিকই বলিয়াছেন, 'যেমন বাহ্যজগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে, প্রতিপদে পতনশীলের গতি বর্দ্ধিত হয়।' (১ম খণ্ড ২৬শ পরিচ্ছেদ।) পাপাচারের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আখ্যায়িকাকার ভ্রমরের পিতার জোবানী 'পামরী', নিশাকরের জোবানী 'পাপীয়সী', চাকরের জোবানী 'হারামজাদা' ও নিজের জোবানী 'মহাপাপিষ্ঠা' 'পাপীয়সী' বলিয়া রোহিণী-চরিত্রের (condemnation) দোষ-ঘোষণা করিয়াছেন, ইহাও লক্ষণীয়।

নিভৃতে সাক্ষাৎকালে রোহিণী অপরিচিত পুরুষকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিল; "আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা হলে, আমার দশা এমন হইবে কেন? একজনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।" (২য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ।)—এই বলিয়া আপ্যায়িত করিল; আরও কতদূর গড়াইত কে জানে, এমন সময় গোবিন্দলাল অকুস্থলে আসিয়া পড়িলেন। তাহার পর যে পৈশাচিক কাণ্ড ঘটিল, তাহার আর বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নাই, কেবল এইটুকু দেখাইব যে, 'যেদিন অনায়াসে অক্লেশে বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, আজি সে দিন রোহিণী ভুলিল।' সে দুঃখ নাই, সুতরাং সে সাহসও নাই। ভাবিল, "মরিব কেন? না হয় ইনি ত্যাগ করেন, করুন। ইঁহাকে কখনও ভুলিব না, কিন্তু তাই বলিয়া মরিব কেন? ইঁহাকে যে মনে ভাবিব, দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইঁহাকে মনে করিব,—সেও ত এক সুখ, সেও ত এক আশা।"...রোহিণী কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমার দেখা দিব না, আর তোমার

† We may say that regarded him somewhat as a sportsman does a pheasant:—*Anthony Trollope: Barchester Towers*, ch 38.

পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না!" (২য় খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ।) এখানেও দেখা গেল, ভোগ-লালসা 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব' বর্দ্ধিত হইয়াছে, অথচ পূর্ব্বের সে কলঙ্কভয় এবং সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব অনেক দিনই লোপ পাইয়াছে। দেখা গেল, অধঃপতন কতদূর হইয়াছে। পাপের শাস্তিও ভীষণ। রোহিণীর ভাগ্যে হীরার মত শুধু পদাঘাতই ঘটিল না, 'বিশ্বাসহন্ত্রী' প্রণয়ীর হস্তে নিহত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র 'মহাপাপিষ্ঠার' মহাপাপের উপযুক্ত কঠোর দণ্ড বিধান করিয়া সন্নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন; Poetic Justiceএর ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি 'বালক-নখর বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিণীর' মৃত দেহের উল্লেখ করিয়া পাঠকের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করিয়াছেন এবং এই হত্যাকাণ্ডের 'নিমিত্ত-মাত্র' নিশাকরের মুখ দিয়া ত্রুটি স্বীকার (apology) করাইয়াছেন।—"আমি কি নৃশংস! একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি! অথবা নৃশংসতাই বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্ত্তব্য।...কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়! রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপ-স্রোতের রোধ করিব; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয় সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। বাঁকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সঙ্কোচ হইতেছে। আর পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কার দিবার আমি কে?...বলিতে পারি না, হয়ত তিনিই আমাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি, ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" (২য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ।)

রোহিণীর চরিত্রের আলোচনা যথেষ্টই হইয়াছে। এক্ষণে পত্নীত্যাগী ব্যভিচারী তথা নারী-ঘাতক গোবিন্দলালের পাপের ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের বা শাস্তির আলোচনা করা যাউক।

গোবিন্দলালেরও অধঃপতন হইয়াছে। একটি সামান্য কথায় আখ্যায়িকাকার তাহা সূচিত করিয়াছেন। প্রসাদ-পুরের কুঠিতে ব্যভিচার-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া গোবিন্দ-লালের স্বভাবের এমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে 'যে কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবু সাক্ষাৎ করেন না—সেরূপ স্বভাবই নয়।' (২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) কিন্তু তাঁহার চরিত্রে একটি redeeming feature রহিয়াছে। ১ম খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে দেখিয়াছি ভ্রমরকে ত্যাগ করিবার সময়ও গোবিন্দলাল 'ভ্রমরের সরল প্রীতি—অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথায় ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিন রাত্রি ছুটিতেছে' ভুলেন নাই। 'মনে পড়িল যে, যাহা ত্যাগ করিলেন, তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না।' এখন ২য় খণ্ডে দেখিতেছি, নিশাকর ওরফে রাসবিহারীর মুখে ভ্রমরের নাম শুনিয়া গোবিন্দলাল 'অন্যমনস্ক' 'কথা কহিলেন না',... 'কোন উত্তর করিলেন না—বড় অন্যমনস্ক! অনেক দিন পরে ভ্রমরের কথা শুনিলেন—তাঁহার সেই ভ্রমর!! প্রায় দুই বৎসর হইল।' (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) নিশাকর উঠিয়া গেলে গোবিন্দলাল দানেশ খাঁকে গাইতে বলিলেন, বাজাইতে গেলেন, 'সঙ্গত হইল না, সকল তালই কাটিয়া যাইতে লাগিল।'* গীত বন্ধ করিয়া সেতার বাজাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, 'কিন্তু গৎ সকল ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন।' নবেল পড়িতে গেলেন, 'অর্থবোধ হইল না'; "আমি এখন একটু ঘুমাইব।...কেহ যেন উঠায় না," চাকরকে এই আদেশ দিয়া 'শয়নগৃহমধ্যে গেলেন।' (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) ঘুমাইবার কথা ছল-মাত্র; বুঝা গেল তাঁহার মন কতটা আলোড়িত হইয়াছে। রোহিণীর রূপ-বারিধিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও তিনি ভ্রমরকে ভুলিতে পারেন নাই। 'দ্বাররুদ্ধ করিয়া গোবিন্দলাল ত ঘুমাইল না। খাটে বসিয়া দুই হাত মুখে দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কেন যে কাঁদিল, তাহা জানি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিল, কি নিজের জন্য কাঁদিল, তা বলিতে পারি না। বোধ হয় দুইই। আমরা ত কান্না বৈ গোবিন্দলালের অন্য উপায় দেখি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিবার পথ আছে, কিন্তু ভ্রমরের কাছে ফিরিয়া যাইবার আর উপায় নাই। ...কান্না বৈ ত আর উপায় নাই।' (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালকে কাঁদাইলেন, নিজেও সমবেদনায় কাঁদেন নাই কি? তাঁহার কথায়ই বলি—'অত বিচারে কাজ নাই—পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সম্বরণ করে না।' (১ম খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ।) 'আমরা কেবল কাঁদিতে পারি।' (১ম খণ্ড ১৬শ পরিচ্ছেদ।)

---

* সেই জন্যই ৫ম পরিচ্ছেদের শেষ অংশের (symbolism) সঙ্কেত লক্ষ্য করিতে বলিয়াছি।

'বিশ্বাসহন্ত্রী' রোহিণীর সঙ্গে শেষ বুঝাপড়া করিবার সময় তিনি রোহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কি, রোহিণি, যে তোমার জন্য ভ্রমর—জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, † যে ভ্রমর—তাহা পরিত্যাগ করিলাম।" (২য় খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ।) অনুতাপের তুষানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে।

'হা হা দেবি! স্ফুটতি হৃদয়ং ধ্বংসতে দেহবন্ধঃ
শূন্যং মন্যে জগদবিরতজ্বালমন্তর্জ্বলামি।'
'দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে।
* * * *
জ্বলয়তি তনূমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ।'

এই জন্যই আখ্যায়িকাকার বলিয়াছেন (২য় খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ) 'রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দার-ঘর্ষণ-পীড়িত বাসুকি-নিশ্বাস-নির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরি-ভাণ্ড-নিঃসৃত সুধা নহে।...নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন।...সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে, সে বিষ উদ্‌গীর্ণ হইবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্ব্ব-পরিজ্ঞাতস্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমরপ্রণয়-সুধা...দিবারাত্রি স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীত-স্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবল-প্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপনীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা,—তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল।' যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথা এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।' ভ্রমর সতীত্বগর্ব্বে ঠিকই বলিয়াছিল, 'তুমি আমারই—রোহিণীর নও।' (১ম খণ্ড ৩০শ পরিচ্ছেদ।) সেই জন্যই বলিয়াছি, দাম্পত্যপ্রণয় আখ্যায়িকার প্রধান আখ্যানবস্তু, অবৈধ প্রণয় অপ্রধান আখ্যানবস্তু।

রোহিণীর বেলায় বলিয়াছি, তাহার ভোগলালসা 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব' বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার 'নবীন বয়স, নূতন সুখ।' সে মরিতে চাহে না।' আখ্যায়িকাকার বলিয়াছেন, 'সেদিন অনায়াসে অক্লেশে বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে চাহিয়াছিল, আজি সে দিন রোহিণী ভুলিল। সে দুঃখ নাই, সুতরাং সে সাহসও নাই।' গোবিন্দলালেরও অনুরূপ অধঃপতন হইয়াছে। ভোগলালসা বাড়িয়াছে, প্রাণের মায়া হইয়াছে। একদিন তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'আমার এ অসার, আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটীর ভাণ্ড যেদিন ইচ্ছা সেই দিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব।' (১ম খণ্ড ২৮শ পরিচ্ছেদ।) কিন্তু খুনী আসামী হইয়া গোবিন্দলাল প্রাণ ও তদপেক্ষাও প্রিয় মান বাঁচাইবার আকাঙ্ক্ষায় ভ্রমরকে জানাইবার জন্য দেওয়ানকে লিখিলেন, 'আমার পৈতৃক বিষয় হইতে আমার রক্ষার জন্য অর্থব্যয় করা যদি তোমাদিগের অভিপ্রায়-সম্মত হয়, তবে এই সময়। আমি তাঁহার যোগ্য নহি। আমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। তবে ফাঁসি যাইতে না হয় এই ভিক্ষা।' (২য় খণ্ড ১২শ পরিচ্ছেদ।) ফাঁসি যাওয়ার চরম অপমান হইতে মুক্তি লাভের জন্য তিনি ভ্রমরের নিকট নীচু হইবার অপমান স্বীকার করিলেন। আবার অব্যাহতি পাইবার পর তিনি লজ্জায় (ও অভিমানে) ভ্রমরের পিতার সহিত, অনুরুদ্ধ হইয়াও, দেখা করিলেন না, ভ্রমরের সহিত মিটমাট করিবার চেষ্টা করিলেন না, কিন্তু দারিদ্র্যে পড়িয়া শরীরধারণের জন্য ভ্রমরকে পত্র লিখিয়া আশ্রয়ভিক্ষা করিলেন; ভ্রমর কঠোর উত্তর দিলে অম্লানবদনে অর্থভিক্ষা করিলেন, 'পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি', 'যাহাতে এখানে আমার দিনপাত হয় এইরূপ মাসিক ভিক্ষা আমাকে এইখানে পাঠাইয়া দিও।' (২য় খণ্ড ১৩শ পরিচ্ছেদ।) দেখা গেল, তাঁহার কতদূর অধঃপতন হইয়াছে।

এই ত গেল, বাহিরের কথা ('the external life of the bodily machine')।

ভিতরে-ভিতরে অনুতাপের, আত্মগ্লানির তুষানল ধিকি-ধিকি জ্বলিতেছিল। এই দীর্ঘ সাত বৎসরের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ব্যাপী বিবরণ যেমন ভ্রমরের অসহ্য যন্ত্রণার, উৎকট রোগের মর্ম্মভেদী ইতিহাস আছে, তেমনি 'অনির্ভিন্নগভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ পুটপাক-প্রতীকাশ' গোবিন্দ-

† নগেন্দ্রনাথের উক্তি তুলনীয়। 'আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ।......আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য।' (বিষবৃক্ষ, ৪৮শ পরিচ্ছেদ।)

লাদেরও আত্মগ্লানির, অনুশোচনার মর্মভেদী ইতিহাস আছে। নগেন্দ্রনাথের অপেক্ষাও তাঁহার 'দোষ গুরুতর; প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর আরম্ভ হইল।' 'যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান', তখনও গোবিন্দলালের হৃদয় ভ্রমরময়, 'ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে'; তখনও তিনি মনে-প্রাণে 'ভ্রমরের কাছে যুক্তকরে' ক্ষমাভিক্ষার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু 'কতকটা অহঙ্কার……কতকটা লজ্জা—দুষ্কৃতকারীর লজ্জাই দণ্ড, কতকটা ভয়—পাপ সহজে পুণ্যের সম্মুখীন হইতে পারে না—তাঁহাকে বাধা দিল। ভ্রমরের কাছে আর মুখ দেখাইবার পথ নাই।……তাহার পর গোবিন্দলাল হত্যাকারী। তখন গোবিন্দলালের আশাভরসা ফুরাইল।'… 'কিন্তু তবু সেই পুনঃপ্রজ্বলিত, দুর্বার, দাহকারী ভ্রমর-দর্শনের লালসা বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, গোবিন্দলালকে দগ্ধ করিতে লাগিল। গোবিন্দলালের তুলনায় ভ্রমর সুখী। গোবিন্দলালের দুঃখ মনুষ্যদেহে অসহ্য। ভ্রমরের সহায় ছিল—যম সহায়। গোবিন্দলালের সে সহায়ও নাই।' (২য় খণ্ড, ১৫শ পরিচ্ছেদ।)

তাহার পর, গোবিন্দলাল যখন 'পেটের দায়ে' ভ্রমরকে পত্র লিখিলেন, তখন 'পত্র লিখিতে আরম্ভ করিতে গিয়া কাঁদিলেন', অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। তিনি নিজেকে 'পামর' বলিয়াছেন, পত্রের ছত্রে ছত্রে আত্মগ্লানি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'যে তোমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া, পরদারনিরত হইল, স্ত্রীহত্যা পর্য্যন্ত করিল', ইত্যাদি। (২য় খণ্ড ১৩শ পরিচ্ছেদ।)

তাহার পর, ভ্রমরের যখন দিন ফুরাইয়া আসিল, তখন গোবিন্দলাল সংবাদ পাইয়া একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য আসিলেন, ভ্রমরের প্রার্থনায় সাহস পাইয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিলেন। 'নিঃশব্দপদবিক্ষেপে গোবিন্দলাল—সাত বৎসরের পর নিজ শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন। দুজনেই কাঁদিতেছিল। একজনও কথা কহিতে পারিল না।…গোবিন্দলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় বসিলেন।…গোবিন্দলাল কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ভ্রমরের হাত, আপন হাতে তুলিয়া লইলেন। সেইরূপ হাতে হাত রহিল। অনেকক্ষণ রহিল।' (২য় খণ্ড ১৪শ পরিচ্ছেদ।) আর এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য বর্ণনা করিব না। কেবল গ্রন্থকারের কথার আবার বলিব, 'গোবিন্দলালের দুঃখ মনুষ্যদেহে অসহ্য। ভ্রমরের সহায় ছিল—যম সহায়। গোবিন্দলালের সে সহায়ও নাই।' (২য় খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ।)

'সে রাত্রি' গোবিন্দলালের 'বড় ভয়ানকই গিয়াছিল।' রাত্রি-প্রভাতে 'মুখে মনুষ্যের সাধ্যাতীত রোগের ছায়া।' হেমচন্দ্রের ভাষায় 'দেহের অসাধ্য রোগ চিন্তার বিকার।' তাহার পর অসহ্য শোকাভিভূত তীব্রঅনুতাপদগ্ধ গোবিন্দলাল অনেক বেলা পর্য্যন্ত গৃহসংলগ্ন (জঙ্গলে পরিণত) পুষ্পোদ্যানে ও বারুণীপুষ্করিণীতটের হতশ্রী পুষ্পোদ্যানে বেড়াইয়া বেড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন।* ভ্রমর ও রোহিণীকে ভাবিতে ভাবিতে 'প্রচণ্ড সূর্য্যের তেজে তাঁহার মস্তক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু গোবিন্দলাল কিছুই অনুভব করিলেন না। তাঁহার প্রাণ যায়।' 'জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইল।' গোবিন্দলাল সমস্ত দিন ধরিয়া সেই 'ভ্রমর-রোহিণীময় অনলকুণ্ডে' রহিলেন। 'সন্ধ্যা হইল, তথাপি গোবিন্দলালের উত্থান নাই, চৈতন্য নাই।' শেষে তাঁহার 'উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত বিষম বিকার প্রাপ্ত হইল।' তিনি শুনিলেন, 'রোহিণী উচ্চৈঃস্বরে যেন বলিতেছে, "এইখানে এমনি সময়ে আমি ডুবিয়াছিলাম।……ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া বলিয়া পাঠাইতেছে, তাহার পুণ্যবলে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।" গোবিন্দলাল তখন 'জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরের মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে' সাত বৎসর পূর্ব্বে যেখানে যে সময়ে রোহিণী ডুবিয়াছিল, সেইখানে সেই সময়ে সেই বারুণী পুষ্করিণীর জলে অবতরণ করিয়া ডুবিলেন। 'পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্ব্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গেল।' (২য় খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ।)

বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে পত্নীদ্রোহী ব্যভিচারী নারীঘাতক গোবিন্দলালের কঠোর প্রায়শ্চিত্তবিধান করিয়াছিলেন। আমরা যখন 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রথম পাঠ করিয়াছিলাম, তখন নায়কের এইরূপ শোচনীয় জীবনাবসানের সহিতই

* 'একটা ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তির পদতলে গোবিন্দলাল বসিলেন।' অনুমান হয়, ইহা সেই 'শ্বেতপ্রস্তরখোদিত স্ত্রীপ্রতিমূর্ত্তি।' (১ম খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ।) রূপককার (Symbol) প্রতীক সেই প্রস্তরমূর্ত্তি এখন ভগ্ন। রূপককার অবসানসূচক এই (Symbolism) সঙ্কেত লক্ষণীয়।

পরিচিত ছিলাম। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়ার যেমন শেষ নাটকগুলির রচনাকালে একটা wise tolerance-এর প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ পরে অধিকতর বিজ্ঞতালাভ করিয়া অপূর্ব্ব ক্ষমাশীলতা দেখাইয়া মহাপাপী গোবিন্দলালের উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা—

রোহিণীর আহ্বান-শ্রবণে "তাঁহার শরীর অবসন্ন, বেপমান হইল। তিনি মূর্চ্ছিত···হইলেন। মুগ্ধাবস্থায় মানসচক্ষে দেখিলেন, সহসা রোহিণীমূর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। তখন দিগন্ত ক্রমশঃ প্রভাসিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমর মূর্ত্তি * সম্মুখে উদিত হইল। ভ্রমরমূর্ত্তি বলিল, "মরিও না।······আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন। বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।" গোবিন্দলাল মূর্চ্ছিত অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া রহিলেন। পরে চিকিৎসায় ২।৩ মাস প্রকৃতিস্থ হইয়া 'একবারে তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।' (২য় খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ।) পরিশিষ্টে জানা যায়, 'ভ্রমরের মৃত্যুর বার বৎসর পরে' গোবিন্দলাল সন্ন্যাসি-বেশে একবার ফিরিয়াছিলেন এবং ভাগিনেয় শচীকান্তকে বলিয়াছিলেন, "ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র, তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি।······ভগবৎপাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"* তাহার পরে আবার তিনি প্রব্রজিত হইলেন। 'Calm of mind, all passion spent.'

'বিষবৃক্ষ'-বিষয়ক প্রবন্ধের উপসংহারে যাহা বলিয়াছি, এই প্রবন্ধের উপসংহারেও তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি,—'ইহা হইতে কি সম্পূর্ণ রূপে সপ্রমাণ হয় না যে তরলমতি পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে অবৈধ প্রণয়ের তীব্র উত্তেজনা-উন্মাদনার উদ্রেক করা বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য নহে, অসংযমের বিষময় পরিণাম প্রদর্শন করিয়া মোহের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য?' নগেন্দ্র-কুন্দর, দেবেন্দ্র-হীরার, গোবিন্দলাল-রোহিণীর গুরুতর পাপের গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত বা শাস্তি—সর্ব্বত্রই এই নিবৃত্তির শিক্ষা, প্রবৃত্তির প্ররোচনা নহে।

আপাতদৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের দুইটি 'অপরাধ' প্রতীয়মান হয়। ১ম, অতৃপ্তবাসনা লালসাময়ী যুবতী বিধবাকে কেন্দ্র করিয়া অবৈধ-প্রণয়-কাহিনী রচনা করা। এই বিষয়ের আলোচনায় বুঝাইয়াছি (গত চৈত্রের প্রবন্ধে) যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলনই ইহার জন্য দায়ী, এবং আরও বুঝাইয়াছি ('বিষবৃক্ষ'-সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় প্রবন্ধে) যে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাকে কেন্দ্র করেন নাই, দাম্পত্যপ্রণয়ই উভয় আখ্যায়িকায় তাঁহার প্রধান আখ্যানবস্তু, বিধবাঘটিত অবৈধ প্রণয় অপ্রধান আখ্যানবস্তু; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝাইয়াছি যে তিনি স্পষ্টবাক্যে এই অবৈধ ব্যাপারের (condemnation) দোষ-ঘোষণা করিয়াছেন ও ইহার বিষময় পরিণাম উজ্জ্বল মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার বিশিষ্টতা, মৌলিকতা ও সন্নীতিপরায়ণতা।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় 'অপরাধ'—তিনি—প্রবৃত্তি-তাড়িতা, প্রবৃত্তির সহিত দ্বন্দ্বে পরাজিতা, যুবতী বিধবার চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার পার্শ্বে—অন্ধকারের পার্শ্বে আলোক—সংযমশীলা প্রলোভন-বিজয়িনী যুবতী বিধবার চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। ইহার জন্যও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহ-সংক্রান্ত আন্দোলন দায়ী। এই আন্দোলনের নেতা ইন্দ্রিয়-দমনে অসমর্থ যুবতী বিধবার কথার উপরই জোর দিয়াছেন (অবশ্য তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য), সমাজে সাধুশীলা সংযতচরিত্রা যুবতী বিধবারও যে অভাব নাই এ কথার উপর জোর দেন নাই। আর এক কথা। বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় কাব্যের এই তত্ত্বটুকুকে আকার দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন যে অন্বয়মুখে অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভাবে (direct method) পবিত্র চরিত্রের চিত্রাঙ্কণ অপেক্ষা ব্যতিরেকমুখে, অর্থাৎ পরোক্ষভাবে (indirect method) অপবিত্র চরিত্রের শোচনীয় পরিণাম-বর্ণনায় কাব্যের উদ্দেশ্য (উপদেশ যুক্তে) সমধিক পরিমাণে সিদ্ধ হয়, যেমন উপদেশাত্মক (didactic) সাহিত্য অপেক্ষা বিদ্রূপাত্মক (satiric) সাহিত্য অনাচার-দমনে বেশী ফলোপধায়ক হয়। তবে ইহাই অবশ্য কাব্যতত্ত্বের শেষ কথা নহে। পবিত্র আদর্শ-সৃষ্টি দ্বারা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দেওয়া, হৃদয়ে দেবভাবের উদ্রেক করা ও অনুপ্রাণনা দেওয়া, কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (function) কার্য্য।

* 'জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি' ধ্যান করিতে করিতে জলে ডুবিলেন—পূর্ব্ব আমলের উপসংহার; 'জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি' রোহিণীর প্রভাব পরাজিত করিল—এখনকার উপসংহার; উভয়েই ভ্রমরের প্রাধান্য, দাম্পত্য-প্রেমের জয়; তবে এখনকার উপসংহারে উহা বেশী সুস্পষ্ট।

বিধবার আদর্শচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে বিধবার পবিত্র আদর্শ সৃষ্টি না করাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রুটি হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা চলে না।

যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্রের এই ত্রুটি তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী আখ্যায়িকাকারগণ কয়েকটি চরিত্র-চিত্রে সংশোধন করিয়াছেন, যুবতী বিধবা বিধবাবিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া, বা কামুকের অবৈধ প্রস্তাব পদদলিত করিয়া, প্রলোভন জয় করিয়া, কোনও কোনও স্থলে প্রণয়ীর চরিত্র পর্য্যন্ত সংশোধন (reform) করিয়া, পবিত্র আদর্শ স্থাপন করিয়াছে, এইরূপ বিধবাচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্থলে ৺যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'খুড়ীমা' আখ্যায়িকায় চঞ্চলার, ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর 'শরৎচন্দ্র' আখ্যায়িকায় নীরদার, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর 'তরুবালা' নাটকে শান্তর, ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' আখ্যায়িকায় বিন্ধ্যবাসিনীর, ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের 'পূজার ফুলে'র সুষমার, শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'দিদি'তে উমার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'অনুপমা'র অনুপমার এবং last not least—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'গৃহদাহে' মৃণালের * শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতে পারি। এই বিষয়ের ফিরে আলোচনা সময়ান্তরে সুযোগ পাইলে করিব।

* মৃণালের কথা পূর্ব্ববর্ত্তী একটী প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২৭) কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি।

শ্রীমান্ দিলীপকুমার রায়

শ্রীমান্ দিলীপকুমার রায়

"ভারতবর্ষের" প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র শ্রীমান দিলীপকুমার Cambridge University র বি-এ পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন; এবং গীতবাদ্য-শাস্ত্রে সম্যক রূপে পারদর্শী হইয়া, Europe ভ্রমণ শেষ করিয়া, আগামী September মাসে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিবেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট শ্রীমান দিলীপকুমারের দীর্ঘ জীবন ও উন্নতি কামনা করি।

নিখিল-প্রবাহ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

সত্যনিরূপণ যন্ত্র

(মার্টিন সাহেব স্বয়ং একজন অপরাধীর জবানবন্দী লইয়া তাহাকে কলের সাহায্যে জেরা করিতেছেন)।

ক্রোনোস্কোপ। (Chronoscope.)

(ইহা সত্যনিরূপণ যন্ত্রের প্রথম অংশ। অপরাধী সত্য বলিতেছে বা মিথ্যা বলিতেছে তাহা সহজেই এই যন্ত্রের সাহায্যে ধরা পড়িয়া যায়)।

প্লাষ্টোমিটার (Plastometer)

(এটি জার্ম্মান প্রোফেসার বার্জ্জারের উদ্ভাবিত একটি চরিত্র নিরূপণ যন্ত্র। তিনি বলেন ছ'মাস কি বছরাবধি যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেও, সে কি চরিত্রের লোক জানতে পারিনি, এই যন্ত্রটি তার মাথায় পরাবার পর, এক ঘণ্টার মধ্যে তার নাড়ী নক্ষত্র সব জানতে পেরেছিলম। প্রত্যেকেই অপরের চরিত্র কিরূপ তাহা এই যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।)

কাইমিয়োগ্রাফ (Kimeograph)

(এটি সত্য-নিরূপণ যন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ। ইহাতে অপরাধীর শ্বাস-প্রশ্বাসের তারতম্য বুঝিতে পারা যায়)।

গরম জলের ঝরণা

(গরম জলের ঝরণার ধারে রোগীর জন্য যে বিশেষ স্নানাগারের ব্যবস্থা আছে সেখানে পাইপের সাহায্যে ঝরণায় গরম জল ফোয়ারার ভিতর আনিয়া রোগীকে স্নান করানো হইতেছে।)

স্নানের কূপ

(পাথরে গাঁথা এই কূপের মধ্যে রোজ ঝরণার টাট্‌কা গরম জল ভরে দেবার ব্যবস্থা আছে; আর কূপের ধারে একটি যন্ত্র আছে যার সাহায্যে বাতে পঙ্গু, উত্থানশক্তি রহিত রোগীকেও সহজেই অবগাহন করানো যায়।)

কলের হাতুড়ী

(মিস্ত্রী প্যাঁচ কসিয়া স্প্রীংটি উপর দিকে তুলিয়া দিতেছে।

১। সত্য-নিরূপণ-যন্ত্র।

লোকে যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন তার চেহারা দেখে সব সময় ঠিক বুঝ্‌তে পারা যায় না যে, সে সত্য বলছে কি মিথ্যা বল্‌ছে। কিন্তু মনের অগোচর ত পাপ নেই; কাজেই, তার বাহ্য রূপ কোনও রকমে আত্ম-গোপন কর্‌তে পারলেও, তার ভেতরটা—অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড আর ফুস্‌ফুস্‌ কখনও মিথ্যা গোপন করে রাখতে পারে না! মানুষের অন্তরের এই দুর্ব্বলতাটুকুর সুযোগ নিয়ে, বোষ্টন সহরের শ্রীযুক্ত উইলিয়াম এম, মার্স্‌টন সাহেব একটা যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, যেটা ফৌজদারী আদালতে সন্দেহে অভিযুক্ত অপরাধীদের দোষ সপ্রমাণ করবার সময়ে বিশেষ সাহায্য ক'রছে! আসামীদের জবানবন্দী গ্রহণ করবার সময়, তাদের কথার সত্য নিরূপণ করবার জন্য মার্স্‌টন্‌ সাহেবের এই যন্ত্রটি
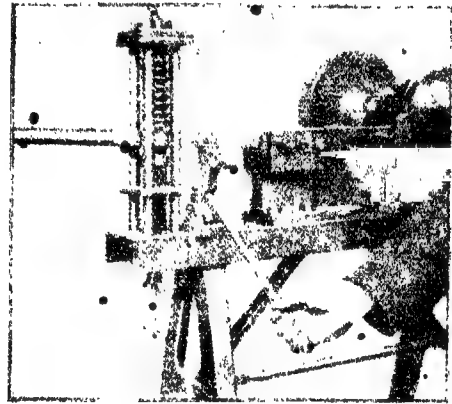
কাদা-রোধ ব্রস্
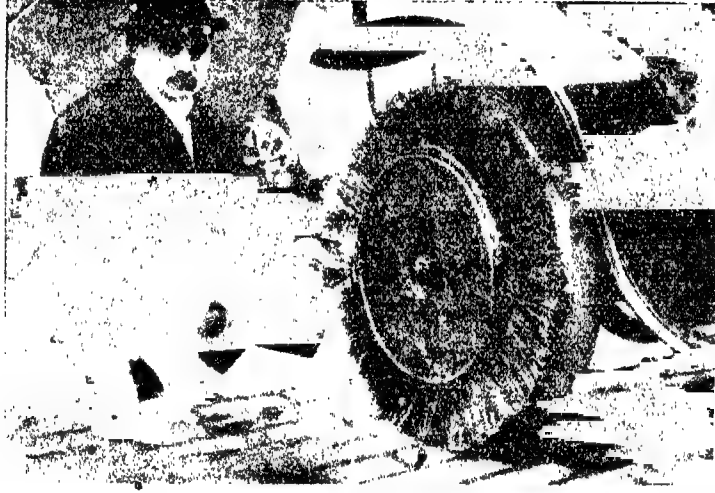
(একখানি ধাতু-নির্মিত চাক্তির চার ধারে ব্রাস্ লাগানো আছে। এই চাক্তিখানি মোটর গাড়ীর চাকার বেলুনের সঙ্গে এঁটে দিলে গাড়ী চল্‌বার সময় আর কাদা ছিটকে পথিকদের গায়ে লাগে না।)

হয় যে, কামার একা তা পেরে উঠে না। কাজেই কামারের উপার্জ্জনের অনেকটা সেই 'হাতুড়ে' আদায় ক'রে নেয়। সেই বাজে খরচটা যাতে না হয়, এই জন্যেই সম্প্রতি একটা কলের হাতুড়ি বেরিয়েছে। এই কলের হাতুড়িটে মিনিটে ৪২০ বার আঘাত ক'রতে পারে; তা'ছাড়া এর গতি ইচ্ছামত কমিয়ে নেওয়া চলে, আর আঘাতের শক্তিরও হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়—কেবলমাত্র একটা 'স্ক্রু' প্যাঁচ ক'সে কিম্বা ঢিলে করে দিয়ে! যে স্প্রীংয়ের জোরে হাতুড়িটে উঠে-নেমে আঘাত করে, স্ক্রু-প্যাঁচ ক'সে সেটা উপর দিকে তুলে দিলেই, হাতুড়িটা খুব আস্তে-আস্তে অল্প জোরে ঘা মারে। আর স্ক্রুটা ঢিলে ক'রে স্প্রীংটা নামিয়ে দিলেই, আঘাত খুব দ্রুত আর প্রচণ্ড হ'য়ে উঠে। এই কলের আর একটা সুবিধে এই যে, এতে যে রকম গড়নের, আর যে রকম আকারের হাতুড়িই হোক্ না, ব্যবহার করা চ'ল্‌বে। তবে হাতুড়ি বদল করবার সঙ্গে-সঙ্গে দরকার-মত নেহাইটি (Anvil) বদ্‌লে নিতে হবে। খুব অল্প খরচে আর অল্প সময়ের মধ্যে তামা, পিতল, লোহা প্রভৃতি ধাতুর পাত এই কলের হাতুড়িতে পিটে, যে কোনও রকম গড়নের জিনিস তৈয়ার ক'রে নেওয়া যায়।

(Popular Mechanics)
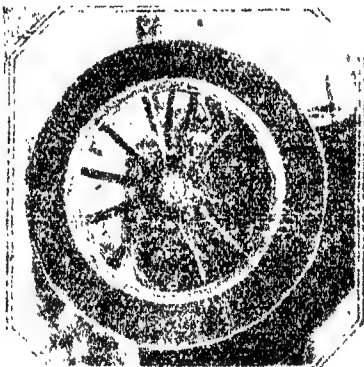
কাদ-রোধ ব্রস্ (অন্য প্রকার)

(এটি চাকার টায়ারের সঙ্গে এঁটে দিতে হয়।)
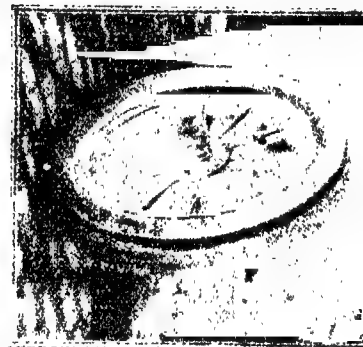
কাদা-রোধ চাকা

(এটি রবারের তৈয়ারি। গাড়ী চাকার পাশাপাশি জুড়ে দিলে কাদা ছিটানো বন্ধ হয়।)

৪। ছবিতে জামার মাপ।

জামা-জোড়া তৈয়ার করবার সময় দর্জ্জি যখন তার ফিতেটা হাতে ক'রে এসে আমাদের আগা-পাশ-তলা মাপ্‌তে সুরু করে দেয়, তখন তার সেই 'গলা—১৬ - পুট আট—' প্রভৃতি চীৎকার, আর "হাত দুটো তুলুন তো,—জামাটা খুলুন দেখি,—একটু এ-পাশে ঘুরে দাড়ান—" ইত্যাদি হুকুম—অনেকের কাছে বড় বিরক্তিকর বলে মনে হয়।

কাদা-রোধ পর্দ্দা

(এটি চামড়ার বা রবারের হলেও চলে। চাকার তলার দিকে ঝুলিয়ে বেঁধে রাখলে কাদা ছড়ায় না।)

এখন ছবিতে মাপ নেওয়ার প্রচলন হওয়ায়, তাঁরা দর্জ্জির হাত থেকে সেই গজের দিগ্‌গজ পরীক্ষাটা এড়িয়েছেন। ক্যামেরার মুখে, একখানা ছকের সামনে, একবার পিছন ফিরে, আর একবার পাশ ফিরে দাঁড়ালেই—যে দু'খানা ছবি উঠ্‌বে, তাই থেকেই দর্জ্জি এখন অনায়াসে গায়ের মাপে জামা-জোড়া বানিয়ে দিতে পার্ব্বে। ছকখানার কালো জমির উপর সাদা রুল টানা আছে। রুলগুলো আড়ে ও লম্বায় দু'দিকেই দু'ইঞ্চি অন্তর টানা থাকে। সেই ছকের সামনে একটা নির্দ্দিষ্ট দাগের উপর মাপ দিবার সময়—সকলকেই দাঁড়াতে হয়। একটু তফাতে একটা ক্যামেরা
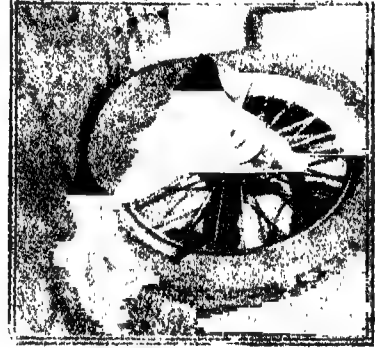
কাদা-রোধ হাতা

(এটি ধাতু-নির্ম্মিত। এটিও চাকার বেলুনে আঁটা, কিন্তু তলার দিকে ঝোলানো থাকে। জল-কাদা ছিট্‌কে উঠে এই হাতলে লেগে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে যায়। কাজেই পথিকদের কাপড় জামা রক্ষা পায়।)

একেবারে জমির সঙ্গে আঁটা একটা থামের উপর বসানো থাকে। সেখানে গজ-হস্ত দর্জ্জির বদলে ক্যামেরা-দোরস্ত এক ভদ্রলোক এক মিনিটের মধ্যে ছবিতে মাপ নিয়ে ছেড়ে দেয়। তার পর সেই ছবি দেখে ক'সে-মেজে দর্জ্জি

রুটি কাটা।

(লক্ষ লক্ষ রুটি কলে চাকা-চাকা হয়ে বেরিয়ে আসছে।)
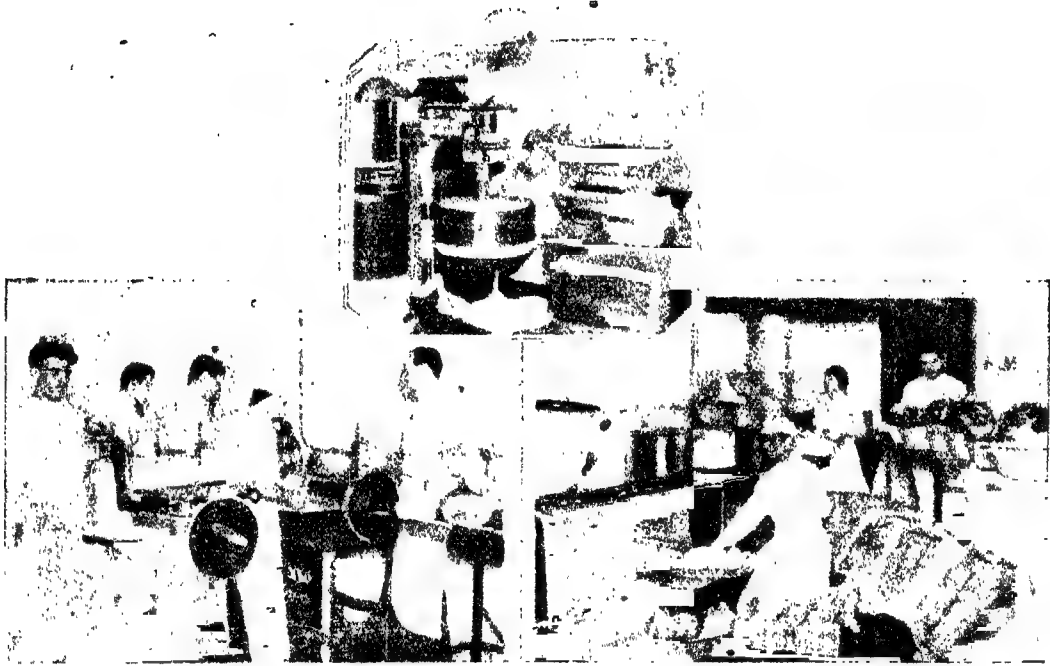
মাংস কাটা।
(ঝল্‌সানো ভেড়া বা মুর্গী একেবারে গোটা কলের মধ্যে দিয়ে পাত্‌লা পাত্‌লা করে কেটে নেওয়া হচ্ছে !)

মাংস ঝল্‌সানো।
(আস্ত আস্ত ভেড়া ও মুর্গী মেরে ছাল ছাড়িয়ে চক্ষের নিমেষে কলে ঝল্‌সে নেওয়া হচ্ছে !)

পনীর প্রস্তুত।
(পাঁচ সাতশ' মণ দুধ একেবারে একসঙ্গে কলে ফেলে পনীর তৈয়ার করে রাখ্‌ছে !)

দূরাণুবীক্ষণ যন্ত্র।
(ইহা এক স্থানে স্থির হইয়া কায করিবার জন্ত টেবিলের উপর ফিট্ করা হইয়াছে। বাম দিকের কোণে যে ছবিখানি, উহা এক টুক্‌রা ধাতু-পদার্থের আলোক-চিত্র, এই যন্ত্রেই তোলা হইয়াছে।)

াদের মাপ বুঝ্‌তে পারে। প্রথমে সে আমাদের পুরো ার মাপের সঙ্গে পাশের মাপটাও যোগ দিয়ে নেয়। পর সেই যোগফলকে দুই দিয়ে ভাগ ক'রে নিয়ে— ফলটাকে আবার ৩.১৪১৬ দিয়ে গুণ ক'রে নেয়। কারণ, অঙ্ক-শাস্ত্র অনুসারে ঐ সংখ্যাটাই হচ্ছে ব্যাসের অনুপাতে পরিধির পরিমাণের অনুপাত। এই ভাবে দর্জ্জি, আমাদের শরীরের 'ঘের্' কোনখানে কতটা, তা সহজেই ধরতে পারে। (Popular Science)
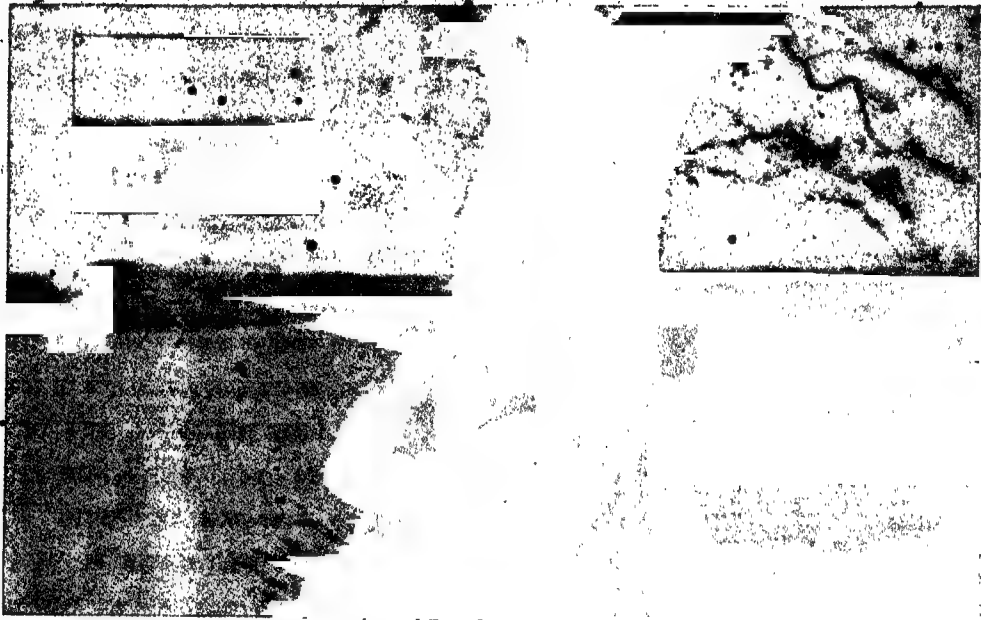
দূর হইতে চিত্র লওয়া।

(দূরাণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোনও লোক বামদিকের উপরিভাগে যে তীর-চিহ্নিত স্থান, ঐ স্থানের একখানি বাটির দূর হইতে চিত্র লইতেছেন। দক্ষিণ দিকের নিম্নে উক্ত বাটীর দূরাণুবীক্ষণ যন্ত্রে গৃহীত একখানি চিত্র দেওয়া আছে।)

পর্ব্বতের পরীক্ষা।
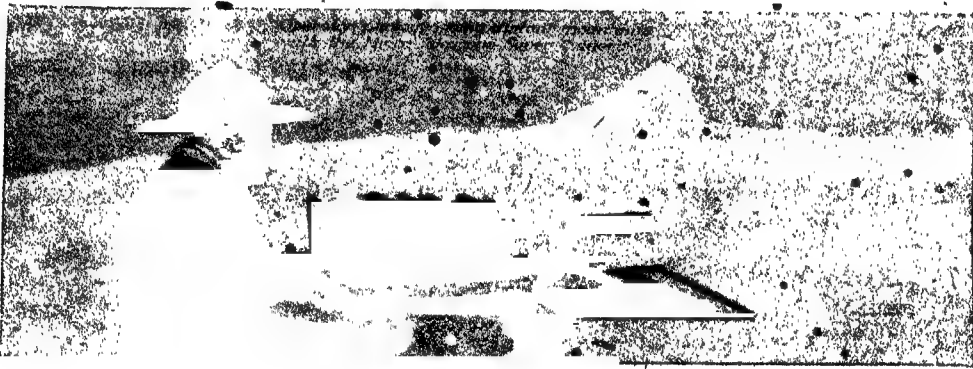
(দূর হইতে দূরাণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সুদূরস্থ কোনও দুর্গম পর্ব্বতের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও চিত্র গ্রহণ।)

৫। বেতারে চিকিৎসা।

কাশীর কোনও রোগীর চিকিৎসা এখন ক'লকাতার যে কোনও ডাক্তার নিজের বাড়ীতে বসেই ক'রতে পারবে, সে উপায় হ'য়েছে। রেডিয়োফোনের সাহায্যে যেমন হাজার মাইল তফাতের কোনও লোকের সঙ্গে কথা কওয়া এখন আর আশ্চর্য্য নয়, তেম্‌নি কাশীর রোগীর অবস্থা কেমন, সেটা ক'লকাতায় বসে জান্‌তে পারাও কোনও ডাক্তারের পক্ষে এখন আর অসম্ভব নয়। এমন কি, ক'লকাতা থেকে কাশীর রোগীর বুক পরীক্ষা করাও চল্‌বে। এ ব্যাপারটাকে কেউ যেন গাঁজাখুরী ব'লে মনে কর্ব্বেন না,—বিজ্ঞানের উন্নতির ব'লে আজ সেটা সত্যিই সম্ভব হ'য়েছে। বুকের উপর কাণ পেতে শুন্‌লে যে শব্দটা শোনা যায়, সেই ধ্বনিকে

বীজাণুর চিত্র।

(এই বীজাণুর ছবিখানি দূরাণুবীক্ষণ-যন্ত্রে গৃহীত। ইহাকে মহাণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তিন হাজার ডায়মিটার পরিমাপ বিবর্দ্ধিত করিয়া তোলা হইয়াছে।)
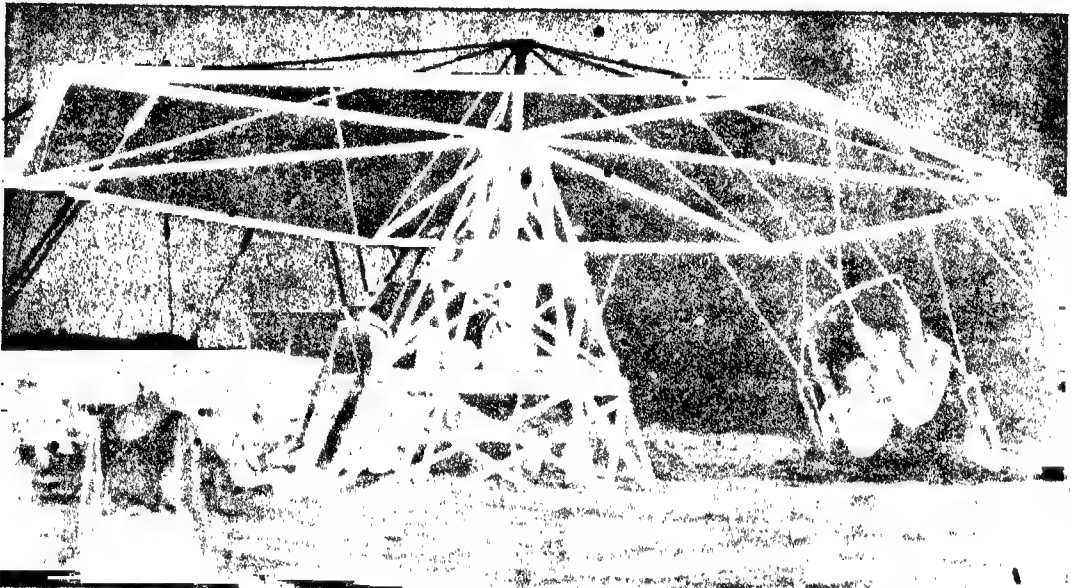
নির্বায়ু নালিকার (Vacuum tube) সাহায্যে উচ্চতর ক'রে নিলেই, দূর থেকেও শ্রুতিগোচর হয়। বৈদ্যুতিক শক্তির সংস্পর্শে হৃৎপিণ্ডের সেই মৃদু শব্দ এত বেশী বাড়িয়ে তোলা যায় যে, চিকিৎসকের কাণে তাহা লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে। রোগীর বুকের উপর উক্ত গুণ-বিশিষ্ট একটি শব্দ-প্রেরক যন্ত্র (Telephone Transmitter) রাখ্‌তে হবে। সেই যন্ত্রটির সঙ্গে সংযুক্ত অনেকগুলি নির্বায়ু নালিকা হৃৎপিণ্ডের প্রেরিত মৃদু শব্দটাকে বহুগুণ বাড়িয়ে নিয়ে, একটি প্রকাণ্ড বেতার বার্ত্তাবহ-যন্ত্রের মধ্যে পৌঁছে দেয়। সেই বেতার-বার্ত্তাবহ আবার, হাজার মাইল দূরে যে ডাক্তার আছে, তার বাড়ী ছুটে গিয়ে, তার কাণের কাছে রোগীর বুকের অবস্থা সঠিক পৌঁছে দেয়। ডাক্তার নিজে রোগীর কাছে গিয়ে তার বুকে কাণ পেতে 'ষ্টেথোস্‌কোপ্‌' দিয়ে শুনেও রোগীর বুকের অবস্থা যতটা পরিষ্কার না বুঝতে পারতেন, হাজার মাইল তফাতে থাকা সত্ত্বেও, হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চতর হ'য়ে আসে বলে, তার চেয়ে আরও ভাল বুঝ্‌তে পারবেন। দু'জন লোকের হৃৎপিণ্ড কখনও সমান তালে শব্দ করে না—কিছু না কিছু তফাৎ থাকেই; এমন কি, প্রেমবিহ্বল নবদম্পতীর বুকেও! অভিজ্ঞ ডাক্তার এই হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনেই, অনেক ক্ষেত্রে রোগীর রোগ নিবারণ করেন। আমেরিকার চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে

নাগর-দোলা।

——ড়ী। ঝাঁপ খাওয়া।
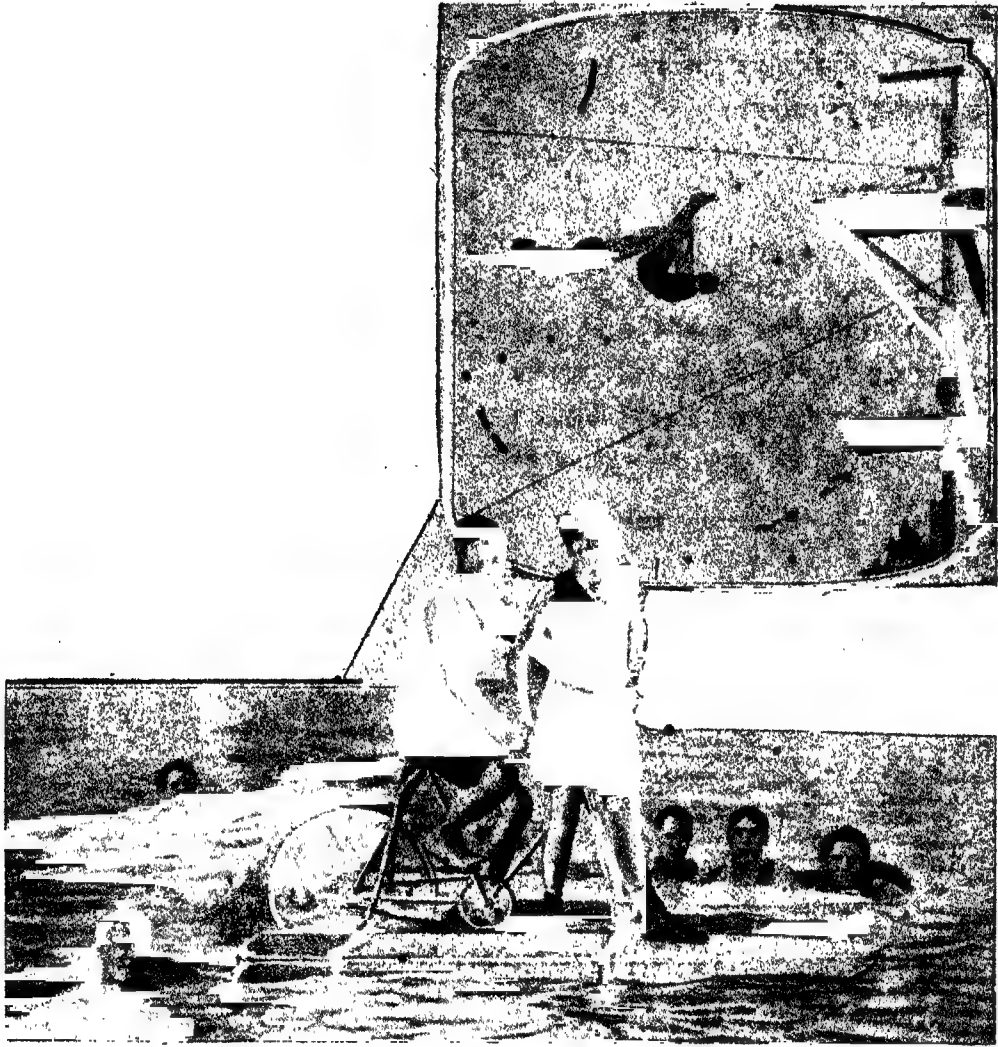
ছাত্রগণকে হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার সময়, অধ্যাপকেরা নির্বায়ু নালিকা সংযুক্ত শব্দ-প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি এমন উচ্চতর করেন যে, ঘরের সমস্ত ছাত্র একসঙ্গে তা শুনতে পায়; এবং সহজেই সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রতে পারে। (Popular Science)

৬। রূপের ভাপ্‌রা।

মেয়েদের রূপের পরিচর্য্যার জন্যে য়ুরোপের অনেক বড়-বড় সহরে রূপের কারখানা বসে গেছে। তাদের দোকানে ঢুকে সেই রূপ বাড়াবার হরেক রকম যন্ত্রপাতির দিকে চাইলে, আনাড়ি লোকের প্রথমটা ভয় হ'তে পারে। ভয় হওয়াটাও কিছু বিচিত্র নয়; কেন না, অনেক সুন্দরীকে, রূপসী হবার লোভে এখানে এসে শারিরীক যন্ত্রণাও ভোগ ক'রতে হয়। রূপের ভাপ্‌রা নেওয়াটাও তারই মধ্যে একটা। চার-পাশ-ঢাকা একটা খোলের ভিতর মুখ পুরে, তাতে গরম জলের ভাপ্‌রা নিতে হয়। এই ভাপ্‌রা নিলে বয়সের দোষে যাদের মুখের চামড়া কুঁচ্‌কে এসেছে, তাদের মুখের সে কোঁচ্‌কানিটে, ভাপ্‌রার তাপে মুখের চামড়াটা ছিটিয়ে পড়ায়, বেমালুম মিলিয়ে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে মুখখানাও ধুয়ে-

মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। আর ঐ তাপ লাগার দরুণ মুখের রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে ওঠে ব'লে মুখখানিতে একটা লালচে আভাও ফুটে ওঠে। তখন প্রৌঢ়ার ম্লান রূপ যেন সুন্দরী যুবতীর মত তারুণ্য-মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

(Popular science.)

৭। কাদা-রোধ।

ধোপদস্ত কাপড়-জামা সবে পাট ভেঙ্গে পরে পথে বেরিয়েছেন, এমন সময় পাশ দিয়ে একখানি মোটর গাড়ী চলে গেল—আর চক্ষের নিমেষে চেয়ে দেখ্‌লেন যে, আপনার ধব্‌ধবে জামা-কাপড় একেবারে কাদায় রঞ্জিত হ'য়ে গেছে। তখন আপনার মনের অবস্থাটা কেমন হয়—সেটা, যাদের কাদায় কখনও কাঁদায় নি, তারা ঠিক বুঝ্‌তে পারবে না। এই সব অসহায় পথিকদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে, সাগর-পারের অনেক সহরের ভদ্রলোকেরা তাঁহাদের মোটর গাড়ীতে কাদা-রোধ করবার হরেক রকম ব্যবস্থা করেন বা ক'রতে বাধ্য হন; কেন না, সে দেশের লোকেরা এখানকার নিরীহ পথিকদের মতন কাদা মেখে মুখ চুণ ক'রে বাড়ী ফেরেন না; তাঁরা রীতিমত একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে তোলেন। তাই সেখানে মোটরগাড়ীর মালিকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাদা-রোধের জন্য কিছু অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়। কিন্তু এ দেশের মোটর-মালিকরা বেশ নিরাপদে দুইপাশে কাদা ছিটিয়ে চলে যান,—পথিকরা কর্দমাক্ত হলে ভ্রূক্ষেপও করেন না; বরং কেউ-কেউ আবার নির্লজ্জের মত গাড়ীর ভিতর থেকে হেসে উঠেন। এ ব্যাপারে দোষটা কিন্তু আমাদেরই বেশি; কারণ, আমরা অসহায় পথিকদের উপর তাঁদের এই অত্যাচারটা বন্ধ করবার বিশেষ কোনও চেষ্টা করি নি। আমরা যদি একটু সবল প্রতিবাদও করতে পারতুম, তা'হলে বোধ হয় এ অঞ্চলের মোটর-বিহারীরাও কাদা-রোধ করবার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হতেন। আর সেটা করা যে বিশেষ কিছু শক্ত নয়, তা' বোধ হয় ছবিগুলো দেখলে সবাই বুঝতে পার্বেন।

(Popular Science)

৮। স্যাণ্ডউইচের কারখানা।

'স্যাণ্ডউইচ' সাহেবদের একটা মুখরোচক আহার্য্য।

বাঁশ-বাজী।

(একটা লম্বা খুঁটি জলের উপর আড়-কাত ক'রে বাড়ানো আছে। খুঁটিটি আবার চর্ব্বি মাখিয়ে তেলা করে দেওয়া হয়। খেলোয়াড়রা এর উপর দিয়ে চলতে গিয়ে পা পিছলে জলে পড়ে যায়।)

পাঁউরুটি খুব পাতলা ও চাকা-চাকা করে কেটে নিয়ে, দু'খানা চাকার মধ্যে বেগুনি-ভাজার বেগুনের মত করে ঝল্‌সানো মাংসের টুকরো কেটে টাট্‌কা পনীরের সঙ্গে ঘেঁটে দিলেই 'স্যাণ্ডউইচ' হয়ে যায়। সাহেবরা মধ্যাহ্ন-ভোজনে বিশেষ করে এই জিনিসটার সদ্ব্যবহার করেন। এই জন্য এক নিউইয়র্ক সহরেই হোটেলওয়ালাদের যোগান দেবার জন্যে অনেকগুলি 'স্যাণ্ডউইচের' কারখানা বসে গেছে। খরিদ্দাররা এই জিনিসটা এত বেশি চায় যে, হোটেলওয়ালারা আর খানসামা-দের দিয়ে হাতে তৈয়ার ক'রে যুগিয়ে উঠতে পারে না। তাই 'স্যাণ্ডউইচ' এখন কারখানার ভিতর কলে তৈয়ার হচ্ছে। রুটি, মাংস, পাতলা চাকা করে কাটা থেকে পনীর তৈয়ারী ও

জলে ডোবা নৌকা।

(এটাতে মোটর-ইঞ্জিন সংযুক্ত আছে সুতরাং দাঁড় টানবার প্রয়োজন হয় না, চালনচক্র ঘুরিয়ে যেদিকে ইচ্ছে ফেরানো যায়।)

'স্যাণ্ডউইচ' বানিয়ে কাগজে মুড়ে প্যাক্ ক'রে দেওয়া পর্য্যন্ত সমস্তই কলে সম্পন্ন হচ্ছে। এক-একটা কারখানা বছরে খুব কম হ'লেও দু'কোটীর ওপর 'স্যাণ্ডউইচ' বিক্রি করে। নিউইয়র্কের হোটেলগুলোয় রোজ প্রায় দশ লক্ষের ওপর 'স্যাণ্ডউইচ' খরচ হয়। (Popular Mechanics)

৯। দূরাণুবীক্ষণ যন্ত্র। (Micro-Telescope)

দূরবীক্ষণে দূরের জিনিস বড় করে-দেখা যায়; আর অণুবীক্ষণে কাছের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জিনিসটিও বড় ক'রে দেখা যায়। নক্ষত্র পরিদর্শনের যে দূরবীক্ষণ, তাতে যেমন রোগের বীজাণু পরীক্ষার উপযোগী অণুবীক্ষণের কাজ চলতে পারে না, তেমনি আবার অণুবীক্ষণ নিয়েও নক্ষত্র পরীক্ষা করা চলে না। কিন্তু এই যে নূতন 'দূরাণুবীক্ষণ' যন্ত্র তৈয়ার হয়েছে, এতে দু'কাজই হবে; কারণ, এ যন্ত্রটার দূরবীক্ষণ আর অণুবীক্ষণের সংযোগে সৃষ্টি। এটা দিয়ে চাঁদের ভিতরের পাহাড়ও যেমন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাবেন, তেমনি দেরাজের টানার ভিতরের উইচিংড়িটেকেও রূপনারায়ণের কুমীরের মত খুব বড় আকারে দেখতে পাবেন।

এ যন্ত্রটার আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এটাকে ইচ্ছে করলে শুধুই দূরবীক্ষণ করে নেওয়া চলে; আবার কেবল অণুবীক্ষণ করেও ব্যবহার করা যায়! এসব ছাড়া দূরবীক্ষণ আর অণুবীক্ষণের এই সম্মিলিত সংস্করণটির আরও একটি প্রধান সুবিধে এই যে, এর সঙ্গে ক্যামেরা সংযুক্ত আছে বলে, সঙ্গে-সঙ্গে দৃষ্ট বস্তুর আলোকচিত্রও ইচ্ছামত তুলে নেওয়া চলে। আবার সেই ক্যামেরার মুখে যদি মহাণুবীক্ষণ যন্ত্র (Supermicroscope) যুক্ত করে নেওয়া হয়, তাহ'লে দৃষ্টির অতীত কোনও ক্ষুদ্রতম বস্তুরও তিন হাজার 'ডায়ামিটার' পরিমাপে বিবর্দ্ধিত চিত্র তোলা যেতে পারে। ব্যবসায়ের ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দূরাণুবীক্ষণ যন্ত্র বিশেষ
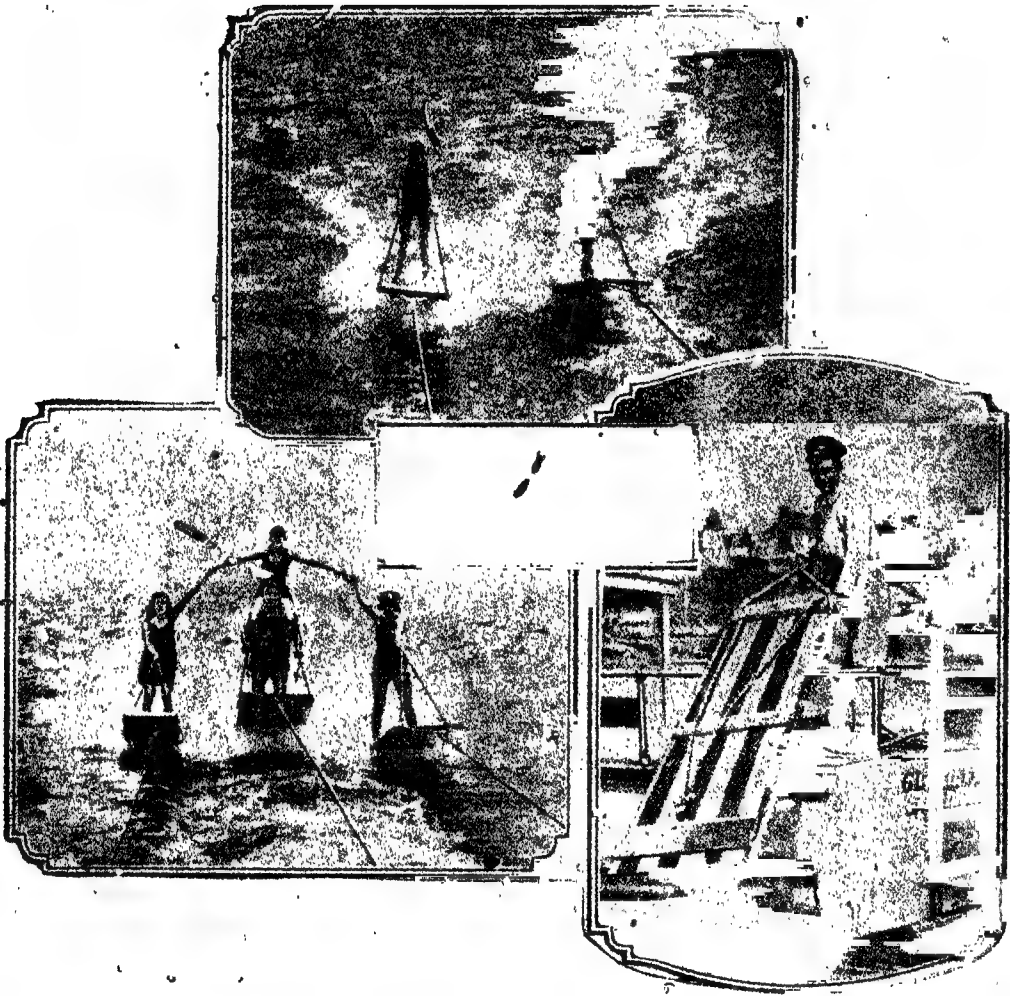
তক্তা-চড়া।

(উপরের ছবিতে ছুটি মেয়ে একা-একা তক্তা চড়ে বেড়াচ্ছেন। ডানদিকের ছবিতে ক'জনে একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলেছেন। বাঁদিকের ছবিতে তক্তাখানির আকৃতি মায় দড়ির রাশ সমেত দেওয়া হয়েছে। খেলা শেষ হবার পর তক্তাগুলি ষ্টীমারের উপর তুলে নেওয়া হচ্ছে।)

প্রয়োজনে লাগবে। ধাতুবিদ, খনিবিদ্ ভূতত্ত্ববিদ্ ও উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্, স্থপতি, মানচিত্রকর—ও চিকিৎসক-গণের নিকট এই যন্ত্রটি অমূল্য বস্তু বলিয়া বিবেচিত হবে।

(Popular Mechanics)

১০। সাগর-দোলা!

পাল-পার্ব্বণে বা মেলায় আমাদের দেশের নানা স্থানে নাগর-দোলা ঘুরতে দেখা যায়; কিন্তু সেই বৈদিকযুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত সে ঐ গরুর গাড়ীর চাকার মতই ঘুরছে; যুগ-যুগান্তেও তার কোনও উন্নতি হ'ল না,—নাগর-দোলারও নয়, গরুর গাড়ীরও না! অথচ, পশ্চিমের দিকে চেয়ে দেখতে পাচ্ছি, সেখানে গরুর গাড়ী ক্রমে মোটর-লরীতে রূপান্তরিত হ'য়ে, দ্রুতবেগে ছুটাছুটি করছে! আর নাগর-দোলা এখন আর নাগরের অপেক্ষা না রেখে, বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে আপনিই ঘুরছে! তার গতি, তার আকৃতি—তার দোলা—তার ঝোলা—কত রকমে কত বিচিত্র হয়ে নিত্য নূতন সাজে দেখা দিচ্ছে। ক্রমে নাগর-দোলা—স্থলপথ জয় করে আজ আবার জলপথও আক্রমণ করেছে! সমুদ্র-বক্ষে

তাকে 'সাগর-দোলা' হয়ে ঘুরতে দেখ্‌ছি! শিকাগোর সিন্ধুকূলে স্নানার্থীরা এই সাগর-দোলায় চড়ে, সিন্ধু-তরঙ্গের সঙ্গে নানা রঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করেন। এই সাগর-দোলাটিও বৈদ্যুতিক শক্তিতে ঘুরছে। এতে আঠারো জনের দোলবার আসন আছে। আর অল্প জল থেকে গভীর জল পর্য্যন্ত এর বাহু বিস্তৃত,—যাতে সাঁতারু ও আনাড়ী দু'রকমের লোকই এটাকে উপভোগ করতে পারেন। নানা রকম ব্যবস্থা থাকে। তার মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে—জলে-ডোবা নৌকা! এই নৌকার সবটা জলের ভিতর ডুবে থাকে; কেবল আরোহীর মুখটি বেরিয়ে থাকে। ইচ্ছে করলে, মাথাশুদ্ধ জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া যায়। এক-একখানি নৌকায় একজনের বেশি ধরে না; আর তাকেই সে নৌকা চালাতে হয়। এই নৌকা চড়ে স্নান করতে ভারি মজা! আর আছে একখানি ষ্টীমার,

মগ্নত্রাণ-বেষ্টনী।
(পরিধান করিবার পর জলে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।)

মগ্নত্রাণ-বেষ্টনী।
(একজন মহিলা সাঁতারু মাথা গলাইয়া উহা পরিতেছেন।)

সাগর-দোলায় দুল্‌তে-দুল্‌তে, ঘোর্‌বার মুখে ঝোঁক করে আসন ছেড়ে ঢেউয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়াটা অনেক খেলোয়াড় পছন্দ করেন। পাছে কোনও বিপদ-আপদ হয়, এই জন্য কেউ-কেউ এক রকম মোটা রবারের নলে তৈয়ারী, নূতন ধরণের মগ্নত্রাণ-বেষ্টনী ব্যবহার করেন। এই রবারের নলের মধ্যে হাওয়া ভরা থাকে বলে, এগুলি জলে ডুবতে পারে না। সাঁতার-খেলুড়েদের জন্যে সমুদ্রের ধারে আরও

—তার চার-পাশ থেকে দড়ি-বাঁধা এক-একখানা তক্তা ঢেউয়ের উপর পড়ে ক্রমাগত আছাড় খাচ্ছে। সাঁতারুরা সাঁত্‌রে গিয়ে সেই তক্তা ধরে তার উপর চড়ে উঠে দাঁড়ায়। ঘোড়ার লাগামের মত তক্তার গায়ে রাশ বাঁধা থাকে। সেই রাশ টেনে ধরে সাঁতারুরা তক্তার উপর সোজা দাঁড়িয়ে থাক্‌বার চেষ্টা করে; আর ষ্টীমারখানি দ্রুতবেগে তাদের টেনে নিয়ে জলের উপর ঘুরে বেড়ায়!

(Popular Mechanics)

শোক-সংবাদ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

সৌম্য, শান্ত-দর্শন, স্থিরধী, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস দেবের মানস-পুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত প্রতিষ্ঠানসমূহের তিনি সভাপতি ছিলেন। দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য তিনি আত্ম-প্রাণ নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, সেবা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আতুর-ব্যথিতের নিকট দণ্ডায়মান। 'জীবে দয়া' তিনি বলিতেন না—তিনি বলিতেন 'জীব-সেবা'। এই সেবা-ধর্ম্মকে ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্রহ্মচারী আপনার উচ্চ সাধন-মার্গ হইতে নামিয়া, আপনার নিভৃত গুহা হইতে বাহির হইয়া, প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। সন্ন্যাসীকে দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য পল্লীতে-পল্লীতে ঘুরিতে হইয়াছে। শুধু ইহাদের সেবা করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই;—তিনি এই সকল নারায়ণের শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে কেবলমাত্র লক্ষ্য রাখেন নাই;—তিনি দেখিয়াছিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে যাহাতে তাঁহাদের মানসিক স্বাস্থ্য অটুট থাকে—মানসিক উন্নতি লাভ করিয়া যাহাতে তাঁহারা প্রকৃত মানবত্বে—ক্রমে দেবত্বে উন্নীত হন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু ভারতে কেন, ভারতের বাহিরেও হিন্দুধর্ম্ম প্রচার-কল্পে, হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ আদর্শকে জগতের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার জন্য যে মহতী চেষ্টা করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহা এক্ষণে সর্ব্বজন-বিদিত। এ সকল চেষ্টার মূলেও আমরা স্বামীজির অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিতে পাই। এই প্রতিষ্ঠান-বটবৃক্ষ-মূলে তিনি আজীবন জলসেচন করিয়াছেন। এই নীরব কর্ম্মীর সাধনা কখন বিফল হইতে পারে না। এই মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালার যুবকবৃন্দ দেশের ও দশের কাজে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করুন, ইহাই আমাদের প্রাণের ঐকান্তিক কামনা।

তাঁহার অভাব আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছি। বাঙ্গালা দেশ একজন প্রকৃত কর্ম্মীকে হারাইয়া ব্যথিত। কিন্তু তাঁহার পুণ্যাদর্শে যে নূতন কর্ম্মী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে, আশা করি, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই, অন্ততঃ কেহ না কেহ অগ্রসর হইয়া, তাঁহার অভাব মোচন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন।

দেনা-পাওনা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(১৪)

অন্যান্য স্থানের মত চণ্ডীগড়েও দিন আসে যায়, বাহির হইতে কোন বিশেষত্ব নাই। দেবীর সেবা সমভাবে চলিতেছে, গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে যাত্রীরা দল বাঁধিয়া তেম্‌নি আসিতেছে যাইতেছে, মানৎ করিতেছে, পূজা দিতেছে, পাঁটা কাটিতেছে, প্রসাদের ভাগ লইয়া পূজারীর সহিত তেম্‌নি বিবাদ করিতেছে, এবং ঠিক তেম্‌নি মুক্তকণ্ঠে আপনার খ্যাতি ও প্রতিবেশীর অখ্যাতি প্রচার করিয়া দেহ ও মনের স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিকতার প্রমাণ দিতেছে। বস্তুতঃ, কোথাও কোন ব্যতিক্রম নাই; বিদেশীর বুঝিবার যো নাই যে ইতিমধ্যে হাওয়ার বদল হইয়াছে, এবং ঝঞ্ঝার পূর্ব্বক্ষণের ন্যায় চণ্ডীগড়ের মাথার আকাশ গোপন ভারে থম্‌ থম্‌ করিতেছে। এ গ্রামের সাধারণ চাষা-ভুষারাও যে ঠিক নিশ্চয় করিয়া কিছু বুঝিয়া লইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু ষোড়শীর সম্বন্ধে মোড়ল পদবাচ্যদের মনোভাব যা-ই হোক, এই দীন দুঃখীরা তাহাকে যেমন ভক্তি করিত, তেম্‌নি ভালবাসিত। এককড়ি নন্দীর উৎপাত হইতে বাঁচিবার সেই কেবল একমাত্র পথ ছিল। ছোট খাটো ঋণ যখন আর কোথাও মিলিতনা, তখন ভৈরবীর কাছে গিয়া হাত পাতিতে তাহাদের বাধিতনা। তাহার বাড়ী ছাড়িয়া আসার জন্য ইহাদের সত্যসত্যই বিশেষ কোন দুশ্চিন্তা ছিলনা, তাহারা জানিত পিতা ও কন্যার মনোমালিন্য একদিন-না-একদিন মিটিবেই। ষোড়শীর দুর্নামের কথাটাও অপ্রকাশ ছিলনা। কেবল সে-ই বলিয়া ইহা না রটিলেই ভাল হইত; না হইলে দেবীর ভৈরবীদের স্বভাব-চরিত্র লইয়া মাথা গরম করার আবশ্যকতা কেহ লেশমাত্র অনুভব করিতনা—দীর্ঘকালের অভ্যাস বশতঃ ইহা এতই তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহাকেই উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া মায়ের মন্দির লইয়া যে তুমুল কাণ্ড বাধিবে, কর্ত্তারা তারাদাস ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া সকাল নাই সন্ধ্যা নাই হুজুরের কাছে আনাগোনা করিয়া কি-যেন-কি-একটা ওলট-পালট ঘটাইবার মতলব করিবেন, এবং ওই যে অচেনা ছোট মেয়েটাকে কোথা হইতে কিসের জন্য আনিয়া রাখা হইয়াছে—এম্‌নি সব সংশয়ের বিদ্যুৎ কথায় কথায় ক্ষণে ক্ষণে যখন চমকিতে লাগিল, তখন চোখের আড়ালে কোথায় আকাশের গায়ে যে অকালের মেঘ জমিয়া উঠিতেছে এবং তাহাতে দেশের ভাল হইবেনা, এই ভাবটাই সকলের মধ্যে ক্রোধ ও ক্ষোভের মত আবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

সেদিন অষ্টমী তিথির জন্য মন্দির-প্রাঙ্গণে লোক সমাগম কিছু অধিক হইয়াছিল। প্রতিমার অনতিদূরে বারান্দার একধারে বসিয়া ষোড়শী আরতির উপকরণ সাজাইতেছিল, তারাদাস ও সেই মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া এককড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। ষোড়শী কাজ করিতে লাগিল, মুখ তুলিয়া চাহিলনা। এককড়ি কহিল, মা মঙ্গলা, তোমার চণ্ডী-মাইকে প্রণাম কর।

পূজারী কি একটা করিতেছিল, সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। ষোড়শী চোখ না তুলিয়াও ইহা লক্ষ্য করিল। মেয়েটি প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পূজারী কহিল, মায়ের সন্ধ্যা-আরতি কি তুমি দেখ্‌বে মা? তা'হলে দেবীর দক্ষিণে ওই যে আসন পাতা আছে ওর ওপরে গিয়ে বোসো।

এককড়ি ষোড়শীর প্রতি একটা বাঁকা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সহাস্যে কহিল, ওঁর নিজের স্থান উনি নিজেই চিনে নেবেন, ঠাকুর, তোমাকে চেনাতে হবেনা, কিন্তু মায়ের জিনিস-পত্র যা-যা আছে দেখিয়ে দাও দিকি।

পূজারী একটু লজ্জিত হইয়া কহিল, দেখিয়ে দিতে হবে বই কি, সমস্তই একটি একটি করে দেখাতে হবে। লিষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে সব ঠিক আছে, কোন চিন্তা নেই। মা, ওই যে ও-দিকে বড় সিন্দুক দেখা যাচ্চে, ওতে পূজার পাত্র এবং সমস্ত পিতল কাঁসার তৈজসাদি তালা বন্ধ আছে, বড় বড় কাজ কর্ম্মে শুধু বার করা হয়। আর এই যে গুলো-বসানো ছোট কাঠের সিন্দুকটি, এতে মখমলের চাঁদোয়া, ঝালর

প্রভৃতি আছে, আর এই কুঠারিটির মধ্যে সতরঞ্চি, গালচে, কানাত,—বসবার আসন এই সব—

এককড়ি কহিল, আর—

পূজারী বলিলেন, আর ওই যে পূবের দেয়ালের গায়ে বড় বড় তালা ঝুলচে, ওটা লোহার সিন্দুক, মন্দিরের সঙ্গে একেবারে গাঁথা। ওর মধ্যে মায়ের সোনার মুকুট, রামপুরের মহারাণীর দেওয়া মতির মালা, বীজ-গাঁর জমিদার বাবুদের দেওয়া সোনার বাউটি, হার, আরও কতশত ভক্তের দেওয়া কত-কি সোনারূপার অলঙ্কার, তা'ছাড়া টাকাকড়ি, দলিল-পত্র, সোনারূপার বাসন,—অর্থাৎ মূল্যবান যা কিছু সমস্তই ওই সিন্দুকটিতে।

এককড়ি কহিল, আমি আজকের নয় ঠাকুর, সব জানি। কিন্তু ও সব কেবল তোমার মুখেই আছে, না সিন্দুকটা হাতড়ালে কিছু কিছু পাওয়া যাবে? ওই ত উনি বসে আছেন, চাবিটা চেয়ে এনে একবার খুলে দেখাও না। গ্রামের ষোল-আনার প্রার্থনা মঞ্জুর করে হুজুর কি হুকুম দিয়েছেন শোননি? চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব্বে সমস্তই যে একদফা মিলিয়ে দেখ্‌তে হবে।

পূজারী হতবুদ্ধির ন্যায় চুপ করিয়া রহিল। মন্দির হইতে ষোড়শীর কর্ত্তৃত্ব যে ঘুচিয়া গেছে তাহা সে শুনিয়াছে এবং নন্দীমহাশয়ের প্রত্যক্ষ আদেশ অমান্য করাও যে অতিশয় সাংঘাতিক তাহাও জানে, কিন্তু কর্ম্মনিরতা ওই যে ভৈরবী অনতিদূরে বসিয়া স্বকর্ণে সমস্ত শুনিয়াও শুনিতেছেনা, তাঁহাকে মুখের সম্মুখে গিয়া শুনাইবার সাহস তাহার নাই। সে ভয়ে-ভয়ে কহিল, কিন্তু তার ত এখনো দেরি আছে নন্দী মশাই। এদিকে সূর্য্যাস্তও হয়ে এল—

তারাদাস এতক্ষণ কথা কহে নাই, এবং সঙ্কোচ ও ভয়ের চিহ্ন কেবল পূজারীর মুখে-চোখেই প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা নয়। আস্তে আস্তে কহিল, মিলিয়ে নিতে অনেক বিলম্ব হবে, নন্দী মশাই, একটু সকাল করে এসে আর একদিন এ কাজটা সেরে নিলে হবেনা? কি বলেন?

এককড়ি চিন্তা করিয়া কহিল, আচ্ছা, তাই না হয় হবে। পূজারীকে কহিল, কিন্তু মনে থাকে যেন চক্রবর্ত্তী মশাই, এই শনিবারেই সংক্রান্তি। ষোল-আনা পঞ্চাইতি নাটমন্দিরেই হবে। হুজুর স্বয়ং এসে বস্‌বেন। উত্তর ধারটা বনাত দিয়ে ঘিরে দিয়ে তাঁর জন্যে সেই মখমলের গালচেটা পেতে দিতে হবে। আলোর সেজ ক'টাও তৈরি রাখা চাই।

এককড়ি একটু জোর গলায় কথা কহিতেছিল, সুতরাং অনেকেই কৌতূহলবশে বারান্দার নীচে প্রাঙ্গণে আসিয়া জমা হইয়াছিল। সে তাহাদের শুনাইয়া আরও একটু হাঁকিয়া পূজারীকে কহিল, সেদিন ভিড় ত বড় কম হবেনা,—ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। মঙ্গলা মেয়েটাকে আদর করিয়া কহিল, কি গো মা, খুদে ভৈরবী! দেখেশুনে সব চালাতে পারবে ত? তবে আমরা আছি, হুজুরও এখন থেকে নিজে দৃষ্টি রাখবেন বলেছেন, নইলে তার বড় সহজ নয়! অনেক বিদ্যে-বুদ্ধির দরকার। এই বলিয়া ষোড়শীর প্রতি আড় চোখে চাহিয়া দেখিল সে ঠাকুরের পূজার সজ্জায় তেম্‌নি নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়া আছে। তারাদাসকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিল, কি গো ঠাকুর মশাই, নূতন অভিষেকের দিন-ক্ষণ কিছু স্থির হয়েচে শুনেচ? লোকে ত আমাদের একেবারে ব্যস্ত করে তুলেচে, নাবার খাবার সময় দিতে চায়না!

প্রত্যুত্তরে তারাদাস অস্ফুটে কি যে বলিল বুঝিতে পারা গেলনা। তাহারা সদর দরজা দিয়া যখন বাহির হইয়া গেল, তখন পিছনে পিছনে অনেকেই গেল, এবং গুঞ্জনধ্বনি তাহাদের প্রাঙ্গণের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্পষ্ট শুনা গেল, কিন্তু চণ্ডীর আরতির প্রতীক্ষায় যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারা দূর হইতে ষোড়শীর আনত মুখের প্রতি শুধু নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; এমন ভরসা কাহারও হইলনা কাছে গিয়া একটা প্রশ্ন করে।

যথাসময়ে দেবীর আরতি শেষ হইল। প্রসাদ লইয়া যে যাহার গৃহে চলিয়া গেলে মন্দিরের ভৃত্য যখন দ্বার রুদ্ধ করিতে আসিল, তখন ষোড়শী পূজারীকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিল, চক্রবর্ত্তী মশায়, ঠাকুরের সেবাইৎ আমি না এককড়ি নন্দী?

চক্রবর্ত্তী লজ্জিত হইয়া বলিল, তুমি বই কি মা, তুমিই ত মায়ের ভৈরবী।

ষোড়শী কহিল, কিন্তু তোমার ব্যবহারে আজ অন্য ভাব প্রকাশ পেয়েছে। যতদিন আছি গোমস্তার চেয়ে আমার মানাটা মন্দিরের ভেতর বেশী থাকা দরকার। ঠিক না?

পূজারী কহিল, তাতে আর সন্দেহ কি মা? কিন্তু—

ষোড়শী কহিল, ওই কিন্তুটা তোমাকে সে কটা দিন বাদ দিয়ে চলতে হবে।

এই শান্ত মৃদু কণ্ঠ পূজারীর অত্যন্ত সুপরিচিত; সে অধোমুখে নিরুত্তরে রহিল, এবং ষোড়শীও আর কিছু কহিল-না। মন্দির-দ্বারে তালা পড়িলে সে চাবির গোছা আঁচলে বাঁধিয়া নীরবে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দূর হইতে দেখিতে পাইল এইটুকু সময়ের মধ্যে তাহার পর্ণকুটীর-খানি ঘেরিয়া বহু লোক জড় হইয়া বসিয়া আছে। কাছে আসিতেই লোকগুলা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পদধূলির আশায় একযোগে প্রায় পঁচিশখানা হাত বাড়াইয়া দিতে ষোড়শী পিছাইয়া গিয়া হাসিয়া কহিল, ওরে, অত ধূলো পায়ে নেইরে নেই, আবার আমাকে নাইয়ে মারিস্‌নে, আমার মন্দিরের বেলা হয়ে গেছে। কি হয়েছে বল্‌?

ইহারা প্রায় সকলেই তাহার প্রজা; হাত জোড় করিয়া কহিল, মা, আমরা যে মারা যাই! সর্ব্বনাশ হয় যে!

তাহাদের মুখের চেহারা যেমন বিষণ্ণ, তেম্‌নি শুষ্ক। কেহ কেহ বোধ করি সারারাত্রি ঘুমাইতে পর্য্যন্ত পারে নাই। এই সকল মুখের প্রতি চাহিয়া তাহার নিজের হাসিমুখখানি চক্ষের পলকে মলিন হইয়া গেল। বুড়া বিপিন মাইতি অবস্থা ও বয়সে সকলের বড়; ইহাকেই উদ্দেশ করিয়া ষোড়শী জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ কি সর্ব্বনাশ হ'ল বিপিন?

বিপিন কহিল, কে একজন মাদ্রাজী সাহেবকে সমস্ত দক্ষিণের মাঠকে মাঠ জমিদার তরফ থেকে বিক্রি করা হচ্চে। আমাদের যথাসর্ব্বস্ব। কেউ তা'হলে আর বাঁচবনা,—না খেতে পেয়ে সবাই শুকিয়ে মরে যাবো, মা।

ব্যাপারটা এম্‌নি অসম্ভব যে ষোড়শী হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, তা'হলে তোদের শুকিয়ে মরাই ভাল। যা বাড়ী যা; সকাল-বেলা আর আমার সময় নষ্ট করিস্‌নে।

কিন্তু তাহার হাসিতে কেহ যোগ দিতে পারিলনা, সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, না মা, এ সত্যি।

ষোড়শী বিশ্বাস করিতে পারিলনা, বলিল, না রে না, এ কখনো সত্য হতেই পারেনা, তোদের সঙ্গে কে তামাসা করেছে। বিশ্বাস না করিবার তাহার বিশেষ হেতু ছিল। একে ত এই সকল জমিজমা তাহারা পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে; তাহাতে সমস্ত মাঠ শুধু কেবল বীজ গ্রামের সম্পত্তিও নহে। ইহার কতক অংশ ৺চণ্ডী মাতার এবং কিছু রায় মহাশয়ের খরিদা; অতএব জীবানন্দ একাকী ইচ্ছা করিলেও ইহা হস্তান্তর করিয়া দিতে পারেননা। কিন্তু বৃদ্ধ বিপিন মাইতি যখন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, কাল কাছারী-বাটীতে সকলকে ডাকাইয়া আনিয়া নন্দী মহাশয় নিজের মুখে জানাইয়া দিয়াছেন এবং তথায় জনার্দ্দন এবং তারাদাস উভয়েই উপস্থিত ছিলেন, এবং দেবীর পক্ষ হইতে তাহার পিতা তারাদাসই দলিলে দস্তখত করিয়া দিয়াছেন, তখন অপরিসীম ক্রোধ ও বিস্ময়ে ষোড়শী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। অবশেষে ধীরে ধীরে কহিল, তাই যদি হয়ে থাকে তোরা আদালতে নালিশ করগে।

বিপিন নিরুপায় ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, তাও কি হয় মা? রাজার সঙ্গে কি বিবাদ করা চলে? কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা করে জলে বাস করলে যার যা কিছু আছে,—ভিটেটুকু পর্য্যন্তও যে থাক্‌বেনা মা!

ষোড়শী কহিল, তা'হলে বাপ-পিতামহের কালের পৈতৃক বিষয়টুকু তোরা মুখ বুজে ছেড়ে দিবি?

বিপিন কহিল, তুমি যদি কৃপা করে আমাদের বাঁচিয়ে দাও মা। দীন দুঃখী আমাদের নইলে ছেলেপিলের হাত ধরে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাই ত তোমার কাছে সবাই ছুটে এসেচি।

ষোড়শী নিঃশব্দে একে একে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। ইহাদের কাহারও কিছুই করিবার সাধ্য নাই; তাই, এই একান্ত বিপদের দিনে দল বাঁধিয়া অপরের কৃপা ভিক্ষা করিতে তাহারা বাহির হইয়াছে। এই সব নিরুদ্যম ভরসাহীন মুখের সকরুণ প্রার্থনায় তাহার বুকের ভিতরটায় সহসা আগুন জ্বলিয়া উঠিল; কহিল, তোরা এতগুলো পুরুষ-মানুষ মিলে নিজেদের বাঁচাতে পারবিনে; আর মেয়েমানুষ হয়ে আমি যাবো তোদের বাঁচাতে? রাগ কোরোনা বিপিন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ জমি না হয়ে মাইতি-গিন্নীকে যদি জমিদার বাবু এম্‌নি জবরদস্তি আর একজনকে বিক্রী করে দিতেন, আর সে আসতো তাকে দখল করতে, কি করতে বাবা তুমি?

ষোড়শীর এই অদ্ভুত উপমায় অনেকের মুখই চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কিন্তু বৃদ্ধের চোখের কোণে

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। কিন্তু আপনাকে সম্বরণ করিয়া সহজ কণ্ঠে বলিল, মা, আমি না হয় বুড়ো হয়েছি, আমার কথা ছেড়েই দাও, কিন্তু মাইতি-গিন্নীর পাঁচ-পাঁচজন যোয়ান বেটা আছে, তারা তখন জেল কেন, ফাঁসি কাঠের ভয় পর্য্যন্ত কোরবে না, এ কথা তোমাকে মা চণ্ডীর দিব্যি করেই জানিয়ে যাচ্চি!

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ষোড়শী বাধা দিয়া কহিল, তাই যদি সত্যি হয় বিপিন; তোমার সেই পাঁচ-পাঁচজন যোয়ান বেটাকে বোলো, এই পিতা-পিতামহ কালের ক্ষেত-খামারটুকুও তাদের বুড়ো মায়ের চেয়ে এক-তিল ছোট নয়। এঁরা দুজনেই তাদের সমান প্রতিপালন করে এসেছেন।

বৃদ্ধ চক্ষের নিমেষে সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ঠিক! ঠিক কথা মা! আমাদের মাগ্গি ত বটে! ছেলেদের এখনি গিয়ে আমি এ কথা জানাবো, কিন্তু তুমি আমাদের সহায় থেকো।

ষোড়শী সবলে মাথা নাড়িয়া বলিল, শুধু আমি কেন বিপিন, মা চণ্ডী তোমাদের সহায় থাকবেন! কিন্তু আমার পুজোর সময় বয়ে যাচ্ছে, বাবা, আমি চল্লুম। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে গিয়া আপনার কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু বিপিনের গম্ভীর গলা সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল। সে সকলকে ডাকিয়া কহিতেছে, তোরা সবাই শুন্‌লি ত রে, শুধু গর্ভধারিণীই মা নয়, যিনি পালন করেন তিনিও মা। যা' হবার হবে, ঘরের মাকে আমরা কিছুতেই পরের হাতে তুলে দিতে পারবনা।

(৬৫)

চৈত্রের সংক্রান্তি আসন্ন হইয়া উঠিল। চড়ক ও গাজন উৎসবের উত্তেজনায় দেশের কৃষিজীবির দল প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে,—এতবড় পর্ব্বদিন তাহাদের আর নাই। নর-নারী নির্ব্বিশেষে যাহারা সমস্ত মাস ব্যাপিয়া সন্ন্যাসের ব্রত ধারণ করিয়া আছে, তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রে ও উত্তরীয়ের গৈরিকে দেশের বাতাসে যেন বৈরাগ্যের রঙ ধরিয়া গেছে। পথে পথে 'শিব-শম্ভু' নিনাদের বিরাম নাই; চণ্ডীর দেউলে তাহাদের আসা যাওয়ার শেষ হইতেছেনা,—প্রাঙ্গণ-সংলগ্ন শিবমন্দির ঘেরিয়া দেবতার অসংখ্য সেবকে যেন বাতারাতি বাঁধাইয়া দিয়াছে। পূজা দিতে, তামাসা দেখিতে, বেচা-কেনা করিতে যাত্রী আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, বাহিরে প্রাচীরতলে দোকানীরা স্থান লইয়া লড়াই করিতে সুরু করিয়া দিয়াছে,—চোখ চাহিলেই মনে হয় চণ্ডীগড়ের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত মহোৎসবের সূচনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে আর বিলম্ব নাই। ষোড়শী মনের অশান্তি দূর করিয়া দিয়া অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও কাজে লাগিয়া গেছে, —সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার মন্দির ছাড়িবার যো নাই। বিকালের দিকে মন্দিরের রকে বসিয়া সে নিবিষ্ট চিত্তে হিসাবের খাতাটায় জমা-খরচের মিল করিতেছিল, নানা জাতীয় শব্দতরঙ্গ অভ্যস্ত ব্যাপারের ন্যায় তাহার কানে পশিয়াও ভিতরে প্রবেশ করিতেছিলনা, এমন সময়ে হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত নীরবতা খোঁচার মত যেন তাহাকে আঘাত করিল। চোখ তুলিয়া দেখিল স্বয়ং জীবানন্দ চৌধুরী। তাঁহার দক্ষিণে বামে ও পশ্চাতে পরিচিত ও অপরিচিত অনেকগুলি ভদ্র ব্যক্তি। রায় মহাশয়, শিরোমণি ঠাকুর, তারাদাস, এককড়ি, এবং গ্রামের আরও অনেকে প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আরও তিন চারিজনকে সে চিনিতে পারিল না; কিন্তু পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখিয়া অনুভব করিল ইঁহারা কলিকাতা হইতে বাবুর সঙ্গে আসিয়াছেন। খুব সম্ভব পল্লীগ্রামের বিশুদ্ধ বায়ু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করাই অভিপ্রায়। জন চারেক ভোজপুরী পাইক-পেয়াদাও আছে। তাহাদের মাথায় রঙিন পাগড়ী ও কাঁধে সুদীর্ঘ যষ্টি। জমিদারের শরীর-রক্ষা ও গৌরব-বৃদ্ধি করা তাহাদের উদ্দেশ্য। ষোড়শী ক্ষণেকের জন্য চোখ তুলিয়াই আবার তাহার খাতার পাতায় দৃষ্টি সংযোগ করিল, কিন্তু মনঃসংযোগ করিতে পারিলনা। জীবানন্দ আর কখনও এখানে আসেন নাই; তিনি সকৌতুকে সমস্ত তন্ন-তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং সুপ্রাচীন শিরোমণি মহাশয় তাঁহার বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া যেখানে যা' কিছু আছে,—তাহার ইতিহাস, তাহার প্রবাদ-বাক্য,—সমস্তই এই নবীন জমিদার প্রভুটিকে শুনাইতে শুনাইতে সঙ্গে চলিলেন। এইভাবে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল ঘুরিয়া ফিরিয়া এই দলটি আসিয়া একসময়ে মন্দিরের দ্বারের কাছে উপস্থিত হইল, এবং মিনিট দুই পরেই পূজারী

আসিয়া ষোড়শীকে কহিল, মা, বাবু তোমাকে নমস্কার জানিয়ে একবার আস্‌তে অনুরোধ করলেন।

ষোড়শী মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, আচ্ছা, চল, যাচ্চি। এই বলিয়া সে তাহার অনুবর্তী হইয়া জমিদারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দ মিনিট পাঁচ ছয় নিঃশব্দে তাহার আপাদ-মস্তক বারবার নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে কহিলেন, সকলের অনুরোধে তোমার সম্বন্ধে আমি কি হুকুম দিয়েছি শুনেচ?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

জীবানন্দ কহিলেন, তোমাকে বিদায় করা হয়েছে, এবং ওই ছোট মেয়েটিকে নতুন ভৈরবী করে মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়েছে। অভিষেকের দিন স্থির হয়নি, কিন্তু শীঘ্রই হবে। কাল সকালে রায় মশায় প্রভৃতি সকলে আসবেন। তাঁদের কাছে দেবীর সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে আমার গোমস্তার হাতে সিন্দুকের চাবি দেবে। এ সম্বন্ধে তোমার কোন বক্তব্য আছে?

ষোড়শী বহু পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়াছিল; তাই তাহার কণ্ঠস্বরে কোন প্রকার উত্তেজনা প্রকাশ পাইলনা, সহজ কণ্ঠে কহিল, আমার বক্তব্যে আপনাদের কি কিছু প্রয়োজন আছে?

জীবানন্দ কহিলেন, না। তবে, পরশু সন্ধ্যার পরে এইখানেই একটা সভা হবে, ইচ্ছে কর ত দশের সামনে তোমার দুঃখ জানাতে পার। ভাল কথা, শুনতে পেলাম তুমি নাকি আমার বিরুদ্ধে আমার প্রজাদের বিদ্রোহী করে তোলবার চেষ্টা কোরচ?

ষোড়শী বলিল, তা জানিনে। তবে, আমার নিজের প্রজাদের আপনার উপদ্রব থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করচি।

জীবানন্দ অধর দংশন করিয়া কহিলেন, পারবে?

ষোড়শী কহিল, পারা না পারা মা চণ্ডীর হাতে।

জীবানন্দ কহিলেন, তারা মরবে।

ষোড়শী কহিল, মানুষ অমর নয় সে তারা জানে।

ক্রোধে ও অপমানে সকলের চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। এককড়ি ত এম্‌নি ভাব দেখাইতে লাগিল যে সে কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে।

জীবানন্দ একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, তোমার নিজের প্রজা আর কেউ নেই। তারা যাঁর প্রজা তিনি নিজে দলিলে দস্তখত করে দিয়েছেন। তাঁকে কেউ ঠেকাতে পারবেনা।

ষোড়শী মুখ তুলিয়া কহিল, আপনার আর কোন হুকুম আছে?

জীবানন্দ স্পষ্ট অনুভব করিলেন বলিবার সময়ে তাহার ওষ্ঠাধর চাপা হাসির আভাসে স্ফুরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সংক্ষেপে জবাব দিয়া কহিলেন, না, আর কিছু নেই।

ষোড়শী কহিল, তাহলে দয়া করে এইবার আমার কথাটা শুনুন।

বল।

ষোড়শী কহিল, কাল দেবীর অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দেবার সময় আমার নেই, এবং পরশু মন্দিরের কোথাও সভা-সমিতির স্থানও হবেনা। এগুলো এখন বন্ধ রাখতে হবে।

শিরোমণি অনেক সহিয়াছিলেন, আর পারিলেননা। সহসা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কখনো না। কিছুতেই নয়! এ সব চালাকি আমাদের কাছে খাটবে-না বলে দিচ্ছি,—

এবং, শুধু জীবানন্দ ছাড়া যে যেখানে ছিল ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল।

জনার্দ্দন রায় এতক্ষণ কথা কহেন নাই; কলরব থামিলে অকস্মাৎ উষ্মার সহিত বলিয়া উঠিলেন, তোমার সময় এবং মন্দিরের ভেতর যায়গা হবেনা কেন শুনি ঠাকরুণ?

ইহার শেষ কথাটার শ্লেষ উপলব্ধি করিয়াও ষোড়শী সহজ বিনীত কণ্ঠে কহিল, আপনি ত জানেন রায় মশায়, এখন গাজনের সময়। যাত্রীর ভিড়, সন্ন্যাসীর ভিড়, আমারই বা সময় কোথায়, তাদেরই বা সরাই কোথায়?

সত্যই তাই। এবং এই নিবেদনের মধ্যে যে কিছুমাত্র অসঙ্গতি নাই, বোধ করি জীবানন্দ তাহা বুঝিলেন, কিন্তু দেশের যাঁহারা, তাঁহারা নাকি বদ্ধপরিকর হইয়া আসিয়াছিলেন; তাই এই নম্র কণ্ঠস্বরে উপহাস কল্পনা করিয়া একেবারে জ্বলিয়া গেলেন। জনার্দ্দন রায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, হতেই হবে। আমি বলচি হতে হবে। এবং দলের মধ্যে হইতে একজন একটা কটূক্তি পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিল।

কথা ষোড়শীর কানে গেল, এবং মুখের ভাব তাহার

সঙ্গেসঙ্গেই অত্যন্ত কঠোর ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। পলক মাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া জীবানন্দকেই বিশেষ করিয়া উদ্দেশ করিয়া কহিল, ঝগড়া করতে আমার ঘৃণা বোধ হয়। তবে, ওসব করবার এখন সুযোগ হবেনা, এই কথাটা আপনার অনুচরদের বুঝিয়ে বলে দেবেন। আমার সময় অল্প; আপনাদের কাজ মিটে থাকে ত আমি চল্লাম।

এই মুখ, এই কণ্ঠস্বর, এই কঠিন তাচ্ছল্য হঠাৎ জীবানন্দকেও তীক্ষ্ণ আঘাত করিল, এবং তাঁহার নিজের কণ্ঠস্বরও তপ্ত হইয়া উঠিল, কহিলেন, কিন্তু আমি হুকুম দিয়ে যাচ্চি, কালই এসব হতে হবে এবং হওয়াই চাই।

জোর কোরে?

হাঁ, জোর কোরে।

সুবিধে-অসুবিধে যাই-ই হোক্?

হাঁ, সুবিধে-অসুবিধে যাই-ই হোক্।

ষোড়শী আর কোন তর্ক করিলনা। পিছনে চাহিয়া ভিড়ের মধ্যে একজনকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আহ্বান করিয়া কহিল, সাগর, তোদের সমস্ত ঠিক আছে?

সাগর সবিনয়ে কহিল, আছে মা, তোমার আশীর্ব্বাদে অভাব কিছুই নেই।

ষোড়শী কহিল, বেশ। জমিদারের লোক কাল একটা হাঙ্গামা বাধাতে চায়, কিন্তু আমি তা চাইনে। এই গাজনের সময়টায় রক্তপাত হয় আমার ইচ্ছে নয়, কিন্তু দরকার হলে করতেই হবে। এই লোকগুলোকে তোরা দেখে রাখ্; এদের কেউ যেন আমার মন্দিরের ত্রিসীমানায় না আস্তে পারে! হঠাৎ মারিস্‌নে,—শুধু গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিবি।

এই বলিয়া ষোড়শী আর দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া মন্দ-পদে বারান্দা পার হইয়া গেল। এবং এ দিকে হুজুর হইতে পিয়াদা পর্য্যন্ত পাথরের মূর্ত্তির মত সেইখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। (ক্রমশঃ)

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

৮৪। মুখ হইতে বসন্তের দাগ মুছিয়া যাওয়ার উপায় কি? শ্রীঅযোধ্যানাথ দেব।

৮৫। "কাপড়ে আলকাতরা লাগিলে তাহা উঠাইবার কোন সহজ উপায় আছে কিনা?" শ্রীপ্রফুল্লকুমার সিংহ রায়।

৮৬। আসামে যে আম পাওয়া যায়, তাহা অধিকাংশই পোকায় নষ্ট করে। পোকা আমেই জন্মিয়া থাকে। ইহা নিবারণের উপায় কি? শ্রীচন্দ্রনারায়ণ বড়ুয়া।

৮৭। কথিত আছে যে কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠপুত্র পিতৃমাতার কার্য্য (মুখাগ্নি, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি) করিবার উত্তরাধিকারী। কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় পুত্রগণ ইহার অংশীদার নন। ইহার কারণ কি? শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কি উল্লেখ আছে? শ্রীসুধীরকুমার বসু।

৮৮। ভারতবর্ষে পুরাকালে কিরূপ সূচের প্রচলন ছিল। তাহার কোনও নিদর্শন আছে কিনা। বিদেশী সূচ আসিবার পূর্ব্বে এদেশে কিরূপে সীবন কার্য্য সম্পন্ন হইত। সেরূপ এখনও করা চলে কিনা। শ্রীমতী অন্নপূর্ণা হালদার।

৮৯। "এরূপ অনেক নারিকেল গাছ দেখা যায় যাহাতে রীতিমত ফল জন্মে কিন্তু 'ডাবের' মধ্যম অবস্থা উপনীত হইলে দেখা যায় যে ভিতরে জল বর্ত্তমান আছে, অথচ নারিকেল মাত্রই নাই অথবা স্থানে স্থানে খণ্ড খণ্ড লাগিয়া আছে, মাত্র, অথবা কিছুই নাই। উপরিভাগ দেখিয়া ভিতরের অবস্থা অনেক সময় জানা যায় না, কিন্তু ভাঙ্গিবার পরই উহার ভিতরটা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ বোধ হয় ও নারিকেলের শূন্য খোলটা অসমান বলিয়া দেখা ও অনুভব করা যায়। ইহাকে পূর্ব্ববঙ্গে সাধারণতঃ মিছের খাওয়া বলে। ইহা কি এবং কেন হয় এবং কিরূপে নিবারণ করা যায়? শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন।

৯০। কি উপায়ে অতি সহজে জলপাই (olive) হইতে তৈল প্রস্তুত করা যায় এবং শোধিত করিবার প্রণালী কি? মোহাম্মদ বজ্‌লুর-রহমান।

৯১। ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধকরূপে বিলাতের এক পত্রিকায় vitex peduncularis বৃক্ষের উল্লেখ আছে। ইহার পাতা দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার চা নাকি অস্মদ্দেশীয় আদিম নিবাসীরা উক্ত জ্বরে ব্যবহার করে এবং পরীক্ষায় ম্যালেরিয়া জ্বরে নাকি ইহা কুইনাইনের চেয়েও অধিক সুফল দিবে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা আমাদের দেশীয় কোন্ জাতীয় বৃক্ষ? আমাদের দেশে এই বৃক্ষের নাম কি এবং যাহারা ইহা ব্যবহার করে, সেই আদিম নিবাসীরাই বা ইহাকে কি নামে অভিহিত করে? কি প্রকার ভূমিতে এবং কোন জায়গায়ই বা ইহা বহুল সংখ্যায় জন্মে। শ্রীঅমিয়বালা দেবী।

৯২। সন্ধ্যার সময় মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিতে লইয়া যাইলে দাহ

কাহিনগণ ভোরের তারা দেখিয়া বাড়ী ফেরেন এবং সকাল বেলা দাহ করিতে যাইলে সন্ধ্যার তারা দেখিয়া বাড়ী ফেরেন ইহার তাৎপর্য্য কি? মৃত ব্যক্তির দ্বারের সম্মুখে এককলসী জল, ঘুটের আগুন, কাঁচা ডাল, নিম, একখণ্ড লোহা রাখিবার কারণ কি? এবং দাহকারীরা দাহ করিয়া আসিয়া তাহা স্পর্শ করে কেন? শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযতীন্দ্রনাথ মণ্ডল।

৯৩। গোলাপ গাছে একপ্রকার পোকা ধরে, সেগুলি গাছের পাতাগুলি একে একে কাটিয়া খাইয়া ফেলে, অবশেষে গাছটাকে মুড়িয়া খাইয়া ফেলে, সময় সময় ফুলের পাপড়িগুলিও খায়। ইহাতে গাছের বড় ক্ষতি হয়, ঐ পোকাগুলি প্রায় ½ আধ্‌ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা, উহার ৬টা পা, রং কাল। দেখিতে অনেকটা গুবরে পোকার মত। সময় সময় ঠিক একই পরিমাণের ছাইয়ের বর্ণের পোকাও দেখিতে পাওয়া যায়। দিনের বেলায় এগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সন্ধ্যার পরে রাত্রে ইহারা গাছে আইসে, আলো দেখিলে সেই দিকে ছুটিয়া যায়। এই পোকার নাম কি? আলো দেখিলেই বা সেই দিকে ছুটিয়া আইসে কেন? আর গোলাপ গাছগুলিকে এই পোকার কবল হইতে রক্ষা করিবার উপায় কি? শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

উত্তর

৭২ নং প্রশ্নের উত্তর অনেকে দিয়াছেন। প্রায় সকলেই বলিয়াছেন যুধিষ্ঠির অজ্ঞাতকালের সময় বিরাট রাজার নিকটে গিয়া কঙ্ক এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজের পরিচয় দেন, এবং বলেন তিনি যুধিষ্ঠিরের সভায় থাকিয়া তাঁহার সহিত পাশা খেলিতেন। ইহা যুধিষ্ঠিরের দ্বিতীয় মিথ্যা কথা। তবে কেহ কেহ ইহার সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, উহাতে যখন কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই, তখন উহা নির্দ্দোষ। আর একজন লিখিয়াছেন, জতুগৃহ দাহের পর যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ পরিচয়ে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। অপর একজন লিখিয়াছেন যখন ভীম সুশর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া বিরাট রাজাকে উদ্ধার করেন তখন যুধিষ্ঠির সুশর্ম্মার কাছে গন্ধর্ব্ব বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়াছিলেন। আর একজন লিখিয়াছেন শমীবৃক্ষে অস্ত্র রক্ষাকালে মৃত জননীর দেহ রাখিলাম—এই মিথ্যার আশ্রয় লওয়া হইয়াছিল।

"Adam's Bridge"

এই বিশাল বিশ্ব যখন জনমানবহীন ছিল, তখন একমাত্র আদম তদীয় অর্দ্ধাঙ্গিনী হওবা সহ স্বর্গমর্ত্ত্য মধ্যস্থিত নন্দন কাননে (Paradise) অবস্থান করিয়াছিলেন। কাননস্থ গন্ধম (Wheet) আহার করা তাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁহারা গন্ধম্ আহার করতঃ ঈশ্বরাদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। প্রাগুক্ত অপরাধের শাস্তি বিধান করতঃ ভগবান তাঁহাদিগকে মর্ত্ত্যে নিক্ষেপ করেন। আদম সিংহলদ্বীপে (সিংহলে) ও 'হাওবা' আরবস্থিত জিদ্দা নগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন।

বহুদিন কঠোর তপস্যান্তে ভগবান তাঁহাদিগকে পাপ মুক্ত করতঃ পুনর্মিলনের আদেশ করেন। আদিষ্ট আদম জিদ্দাভিমুখে গমনোন্মুখ হইলে, সম্মুখে বিশাল বারিধি-শাখা গমনে বাধা প্রদান করতঃ আপন বক্ষ প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন; কিন্তু ঈশ্বরানুকূল্যে উহার বক্ষ ভেদ পূর্ব্বক সেতু বন্ধন করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন না। উক্ত সেতুই "Adam's bridge" ইস্‌লিমায় ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। সিংহলে 'Adam's peak' ইহার অন্যতম প্রমাণ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

সীতাদেবী উদ্ধারের সময় রামেশ্বর কর্ত্তৃক ইহার আবিষ্কার সাধন ঘটিয়াছিল, যেহেতু উহা "রামেশ্বর সেতুবন্ধ" বলিয়াও অভিহিত হয়।

খান মহম্মদ আবদুর রাজাক।

প্রশ্ন নং ২৬, কৌলিক উপাধি রহস্য। উত্তর,

গত মাঘ মাসের ভারতবর্ষে বিনয়েন্দ্রকিশোর গুপ্ত মহাশয়ের কৌলিক উপাধি রহস্য এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলিতেছেন যে, আদিশূরের পূর্ব্বে উপাধি প্রথার প্রচলন ছিল না। আমরা মনে করি যে এই অনুমান ঠিক নহে। প্রাচীন ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার বহুকাল পরে জাতিগুলি যখন জন্মগত হইয়া দাঁড়াইল, তদানীন্তন সামাজিকগণ পার্থক্য সংসূচিত করিবার জন্য এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের নাম এরূপ রাখা হইবে যে উহা ব্যক্ত করিবামাত্রই বুঝা যাইবে যে তিনি কোন্ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। তাই মহর্ষি শঙ্খ বলিয়াছেন:—

"মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্যোক্তং ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতং।

বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য চ জুগুপ্সিতং।" ৪৩,৩২ শ্লো

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের নাম মাঙ্গল্য সংসূচক, ক্ষত্রিয়ের বল সংযুক্ত, বৈশ্যের ধন সংযুক্ত এবং শূদ্রের "দাস" বা নিন্দিত শব্দ সংযুক্ত রাখা উচিত, এই ব্যক্তিগত সংজ্ঞা হইতেই ক্রমশঃ বংশগত উপাধির প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু পার্থক্য বুঝাইবার জন্য সমাজের পক্ষে ইহাও পর্য্যাপ্ত হইতেছে না দেখিয়া তৎপরবর্ত্তী সামাজিকগণ এই রীতির প্রচলন করেন, যে ব্রাহ্মণের নামান্তে—'দেব' বা 'শর্ম্মা', ক্ষত্রিয়ের নামান্তে 'বর্ম্মা' বা 'ত্রাতা' বৈশ্যের নামান্তে 'ধন বাচক শব্দ এবং শূদ্রগণের নামান্তে 'দাস বা নিন্দিত শব্দ ব্যবহার করা বিধেয়।

তাই বর্ত্তমান মনুসংহিতায় দেখিতে পাই:—

"শর্ম্মবৎ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষা সমন্বিতম্।

বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শর্ম্মার্থ (শর্ম্মা বা দেব), ক্ষত্রিয়ের রক্ষার্থ (বর্ম্মা, ত্রাতা, সিংহ ইত্যাদি) বৈশ্যের (বসু, ভূতি, দত্ত, সাধু বা সাহা, বা সাহাই বা সাউ) এবং শূদ্রের প্রৈষার্থ অর্থাৎ নিন্দিত 'দাস শব্দ ব্যবহার করাই উচিত। ইহারই ধ্বনি করিয়া যম সংহিতা বলিতেছেন:—

"শর্দ্ধ দেবেন্ড বিপ্রস্য বর্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতি দত্তশ্চ বৈশ্যস্য শূদ্রস্য কারয়েৎ॥"

আমাজিক নানা বিপ্লবে এই জাতিগত উপাধির যেমন ব্যভিচার ঘটিয়া উপাধির বিভ্রাট ঘটাইয়াছে তেমন আবার বিভাগত উপাধি উপাধ্যায়, আচার্য্য, শাস্ত্রী, ভট্টাচার্য্য, চৌবে, দোবে, ত্রিবেদি ইত্যাদি এবং বৃত্তি বা কার্য্যগত উপাধি রায়, মণ্ডল, মহামণ্ডল, ভৌমিক, বিশ্বাস, পাত্র, সর্ব্বাধিকারী, চিতনাভিস্ পুরকায়েস্থ ভাণ্ডার কায়েস্থ, ভাণ্ডারী, মজুমদার, বক্সী, মুন্সী ইত্যাদি। রাজা বা নবাব প্রদত্ত উপাধিগুলি বংশগত উপাধিতে পরিণত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ মৎবিরচিত "উপাধি-রহস্য"—দ্বিতীয় প্রস্তাব (ভাদ্র—১৩২৮ নব্যভারত) শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(২) শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্রাহ্মণবর্ণের গোত্র আদিপুরুষ হইতে সমাগত। উক্তঞ্চ :—

"গৌত্রং বংশপরাম্পরা প্রসিদ্ধং আদিপুরুষং ব্রাহ্মণরূপং" এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদির গোত্র স্ব স্ব পুরোহিত হইতে সমাগত তদুক্তং যথা :—

"পৌরোহিত্যাৎ রাজন্যবিশাং প্রবৃণীতে।"

তাই অগ্নিপুরাণে বলিয়াছেন :—

"ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাণাং গোত্র প্রবরাদিকং।
তথা বর্ণসঙ্করাণাং যেষাম্ বিপ্রাশ্চ যাজকাঃ॥"

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং বর্ণসঙ্করগণের অর্থাৎ প্রতিলোমজগণের (—বর্ণসঙ্করাঃ—প্রতিলোমজাঃ)—সূত, মাগধ (ভাট) বৈদেহ, ক্ষত্তা, আয়োগব এবং চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির গোত্র পুরোহিত হইতে সমাগত। আর মনুর "অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ॥ ৫—৩ অ।

এই বাক্য হইতে অনুমিত হয় যে জাতিগুলি জন্মগত হইবার সময় হইতেই উহার আনুসঙ্গিক গোত্র প্রবর এবং উপাধিগুলি ভারতীয় আর্য্যসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ব্যাকরণের পুরাতত্ত্ব—মাঘ ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর।

৫। এতৎসম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বিরচিত পাণিনির বয়স কত (মঙ্গল মালা ১৩২৪—পৌষ ও মাঘ) এবং শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায় মহাশয়ের বিরচিত "শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতার প্রণেতা ও তৎকাল নির্ণয় (নব্যভারত—ফাল্গুন ১৩২৩) শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য)

৬৪ নম্বর বিবিধ প্রশ্নের উত্তর :—

৩। এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রথমে দুই একটী পৌরাণিক দৃষ্টান্ত দিতে হইবে। যখন রামচন্দ্র পরশুরামের শরাসনে শর সন্ধান করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি সেই শরটী রামচন্দ্র বিফলে যাইতে দেন নাই। সেই শর দ্বারা তিনি পরশুরামের স্বর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন। আবার অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির-নামক অস্ত্র অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া অর্জ্জুন দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াও তাহার প্রতিসংহার করিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি পাণ্ডবগণদিগের মহিলাদিগের গর্ভ উদ্দেশ্য করিয়া সেই দিব্যাস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। এইরূপ কারণসমূহের জন্য অদ্যাবধি অস্ত্র উত্তোলন করিয়া তাহার প্রতিসংহার কালে সর্ব্বদাই পৃথিবীর উপরে আঘাত করা হয়।

[শরসকল এবং অন্য অস্ত্রও মন্ত্রপূত ও জীবিত। একবার তাহাদের প্রয়োগে উদ্যত হইয়া প্রতিসংহার করিলে ঐ অস্ত্র তাহার অধিকারী বা প্রয়োগকারীরই অনিষ্ট করিয়া থাকে—ইহাই প্রসিদ্ধি। সেই জন্য ভূমিতে আঘাত করিয়া অস্ত্রকে সন্তুষ্ট করিতে হয়।—সম্পাদক ভারতবর্ষ।]

৮১নং প্রশ্ন—টিউব্ ওয়েল্ সম্বন্ধে—উত্তর ;

The Indian Sanitation Improvement Co. P. O. Ghoramara, Rajshahi,—উক্ত ধরণের tube-well সরবরাহ করেন এবং উহা বসাইয়া দেন। এগুলিতে Superficial strataর জলের পরিবর্ত্তে 'Ideal well' এর ন্যায় deep strataর জল পাওয়া যায়। ইহার জল দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ইঁহাদের নিকট বিভিন্ন diameterএর tube পাওয়া যায়। সাধারণ গৃহস্থের ব্যবহারের জন্য ২ ইঞ্চি diameterএর tubeএ কাজ চলে। এরূপ একটি ১০০ ফিট্ গভীর well মাত্র বসাইবার খরচ, মিস্ত্রিদের যাতায়াতের রেলভাড়া এবং অন্যান্য সমুদয় খরচ—কেবল পাম্পের দাম বাদে—৬৭৫ পড়ে। বিশেষ বিবরণ উপরের ঠিকানায় ম্যানেজারের নিকট জ্ঞাতব্য।

শ্রীনৃপ্রসন্ন লাহিড়ী।

"কর্পূর উপিয়া যায় কেন"?

৫৬। সাধারণ তাপে (At ordinary temperature) কর্পূর উদ্বায়ী (Volatile)। এজন্য উহা সহজেই উপিয়া যায়। কিন্তু কয়েকটী কাল মরিচের সহিত কোনও কাচের শিশির মধ্যে রুদ্ধ অবস্থায় (air-tight) থাকিলে অথবা মোম বা প্যারাফিন্ (Paraffin) মাখান কাগজে উত্তমরূপে মুড়িয়া রাখিলে কর্পূর উপিতে পারে না।

গহনা পরিষ্কার।

নিম্নলিখিত যে কোনও উপায়ে কেমিক্যাল স্বর্ণের গহনা পরিষ্কার করা যায় ;—

(ক) একটা পিঁয়াজ দুই টুকরা করিয়া কাটিয়া গহনার উপর উহা ঘসিতে হইবে। পরে গহনাগুলি দুই ঘণ্টাকাল সুরাসারে (Rectified Spirit) ডুবাইয়া রাখিয়া একটি ভিজা স্পঞ্জ (Sponge) বা ফ্লানেল কাপড় দিয়া আস্তে আস্তে ঘসিলে পরিষ্কার হইবে।

(খ) পরিষ্কার জলে খানিকটা কষ্টিকিরি গুলিয়া তাহাতে কয়েক

মিনিট কাল গহনাগুলি ভিজাইয়া বুরুশ দিয়া ধীরে ধীরে ঘসিলে পরিষ্কার হইবে।

(গ) তেঁতুলের জল মাখাইয়া ধীরে ধীরে ঘষিলেও কেমিকেল স্বর্ণের গহনা পরিষ্কার হয়।

(ঘ) কিঞ্চিৎ সুরাসারে (Rectified Spirit) কয়েক ফোঁটা লিকার এ্যামোনিয়া (Liquor ammonia) দিয়া উহাতে গহনাগুলি ৩।৪ মিনিট কাল ভিজাইয়া ফ্লানেল বা স্পঞ্জ দ্বারা আস্তে আস্তে ঘসিতে হইবে। পরে পরিষ্কার জলে ধুইয়া আতপতাপে শুকাইয়া লইতে হইবে। শুকাইয়া গেলে শ্যাময় চামড়া (chamois leather) বা শুষ্ক ফ্লানেল দ্বারা ঘসিলে বেশ পরিষ্কার হইবে। যদি একটু বুরুশ দিয়া ঘসা হয় তবে আরও ভাল হয়।

তুলা গাছের পোকা নিবারণ।

(ক) কাঠের তৈল (wood creosote) এক আউন্স কোয়াসিয়া কাঠের গাঢ় কাথ (Conc. Inf. of Quassia, 1—7) ১৭ আউন্স মিথিলেটেড্ স্পিরিট ৩ আউন্স মিশাইয়া উহার এক আউন্স ৪ গ্যালন জলে মিশাইয়া পিচকারী সাহায্যে গাছের পাতা প্রভৃতিতে ছিটাইতে হইবে। পর দিবস কেবল পরিষ্কার জল ছিটাইতে হইবে।

(খ) আধপোয়া তামাকের ডাঁটা একসের আন্দাজ জলে সিদ্ধ করিয়া একপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই তামাকের কাথের সহিত নরম সাবান (Soft Soap) আধসের, কোয়াসির গাঢ়সার (Concentrated extract of Quassia)—১ আউন্স, কেরোসিন তৈল—১ পাঁইট্ ও মিথিলেটেড্ স্পিরিট ৮ পাইন্ট মিশাইয়া উহার এক আউন্স ৪ গ্যালন জলে মিশাইয়া আক্রান্ত গাছগুলিতে প্রথমোক্ত প্রকারে ছিটাইয়া দিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে পরিষ্কার জল ছিটাইতে হইবে। এই ঔষধটী সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রয়োগ করা উচিত।

এই দুই প্রক্রিয়ায় গাছের পোকা নষ্ট হইবে অথচ গাছের কোনও ক্ষতি হইবে না।　　　　শ্রীআশুতোষ দত্ত, বি, এস, সি।

শাস্ত্র-প্রমাণ

(৯) কোজাগর পূর্ণিমার দিন রাত্রিতে নারিকেল ও চিপিটক ভক্ষণ করা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে হইয়া থাকে। প্রমাণ—

নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কোজাগর্ত্তীতি ভাষিণী।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ॥
নারিকেলশ্চিপিটকৈঃ পিতৄন্ দেবান সমর্চ্চয়েৎ।
বন্ধুংশ্চ প্রীণয়েত্তেন স্বয়ং তদশনো ভবেৎ॥

ইতি সংবৎসর-প্রদীপধৃতবৎস বচনাৎ।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়।

কপির পোকা

৩৭। বাঁধা ও ফুল কপিতে দুইবার পোকার উপদ্রব হয়। একবার কপির চারাগুলি পুতিবার সময়, আর একবার কপি ফলিবার সময়। কপির চারা পুতিবার সময় উইচিংড়িরা ভয়ানক অত্যাচার করে। সন্ধ্যায় চারা পুতিয়া আসিলে সকালে গিয়ে দেখা গিয়াছে, রোপিত চারাগুলির অধিকাংশই উইচিংড়ি খাইয়া ফেলিয়াছে বা কাটিয়া দিয়াছে। উহাদিগের উপদ্রব হইতে চারাগুলি রক্ষা করিবার জন্য ইমল্সন প্রভৃতির ব্যবহার করিবার উপায় থাকিলেও তাহাতে আশানুরূপ ফলোদয় হয় না। উহাদিগের অত্যাচার হইতে চারাগুলি রক্ষা করিতে হইলে ভাল সেচনের দ্বারা কপির ক্ষেত্র ডুবাইয়া দেওয়া আবশ্যক। চারা পুতিয়া কপির ক্ষেত্র জলে ডুবাইয়া দিলে উহারা কপির ক্ষেত্রে মাটির ভিতর আর থাকিতে পারে না, পলাইয়া যায় এবং বাসা করিতেও পারে না। জল সেচনের সময় দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা দলে দলে পলাইয়া যাইতেছে। এই সময় উহাদিগকে মারিয়া ফেলা উচিত।

কপি গাছগুলি বড় হইলে এক প্রকার পোকা ধরে। এই সময় কপির ডগায় পোকা ধরিলে কপি গাছ বাড়িতে পারে না; এমন কি যে গাছে পোকা ধরে, তাহাতে আর ফসল হয় না। এই সময় কপি ক্ষেত্রে এক রকম সাদা সাদা প্রজাপতি উড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়। এই প্রজাপতিগুলি ডিম পাড়ে। এই ডিম হইতে পোকা জন্মায়। তাহাই কপিগাছ নষ্ট করে। এই পোকাগুলি আবার বড় হইয়া প্রজাপতি হইয়া পুনরায় ডিম পাড়ে। এইরূপে কপি গাছগুলি একবারে নষ্ট করিয়া দেয়। এই অত্যাচার হইতে কপির ক্ষেত্র রক্ষা করিতে হইলে প্রজাপতিগুলিকে মারিয়া ফেলা দরকার এবং প্রতিদিন কপির গাছগুলি পরীক্ষা করা উচিত। কোন কপির গাছে পোকা ধরিয়া থাকিলে তাহার পোকাগুলি মারিয়া ফেলা উচিত। এইরূপ ব্যবস্থা না করিলে সমস্ত বাগানটীরই গাছ নষ্ট হইয়া সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই সময় ঘন ঘন জল সেচন করাও কর্ত্তব্য। এই উপায় ব্যতীত কপিগাছের এই দুইরকম পোকার উপদ্রব নষ্ট করার জন্য কোন প্রকৃষ্ট উপায় আর প্রায় নাই। কপির পোকা নিবারণের অন্যান্য উপায় জানিতে হইলে "ইণ্ডিয়া গার্ডেনিং এসোসিয়েসন" হইতে প্রকাশিত "ফসলের পোকা" নামক পুস্তক ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে মহাশয়ের প্রণীত "সবজী বাগ" প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

তুলা পেঁজা

২৭ নং তুলা পেঁজার প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছি,—চরকায় কাটিবার তুলা পিঁজিবার বা পাইজ্ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। তাহা সময় ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। ১ সাধারণতঃ তিনটী করিয়া রওয়া (ফাইল) প্রত্যেকটী ফলের মধ্যে থাকে। ঐ রওয়াগুলি ফল হইতে বাহির করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া, কাটিলে বেশ চিকন, এমন কি ৪০।৫০ নং সুতা কাটা হয়। কাটিবার সময় সব তুলা ক্রমে ক্রমে বাহির হইয়া গিয়া মাত্র বীজ কয়েকটী অবশিষ্ট থাকে। আমি এই উপায়েই কাটিয়া থাকি এবং ইহাকেই অতি সহজ উপায় মনে করি।

শাস্ত্রীয় প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—ব্রহ্মাকে লোকে-পিতামহ বলে কেন?

উত্তর—ব্রহ্মার পুত্র মনু এবং মনু হইতে এই মানবের সৃষ্টি। সেই জন্যই ব্রহ্মাকে লোক-পিতামহ বলে।　　　　শ্রীমালতীমালা দেবী।

Adam's Bridge—সিংহল দ্বীপে বহু পূর্ব্বকাল হইতে মূর ও আরববাসিগণ বাণিজ্য করিতে যাইতেন, এবং এইজন্য সিংহলের পশ্চিম উপকূলে একটী মুসলমান উপনিবেশ গঠিত হইয়া উঠে। সিংহলীগণ যাহাকে রামেশ্বর সেতু বলিতেন, মূর ও আরবীয়গণ তাহাকে আদমের সেতু বলিতে লাগিলেন; সিংহলীগণ যাহাকে বুদ্ধ পর্ব্বত ও তদুপরিস্থ পদচিহ্নকে বুদ্ধপদচিহ্ন বলিতেন (এবং হিন্দুগণ যাহাকে
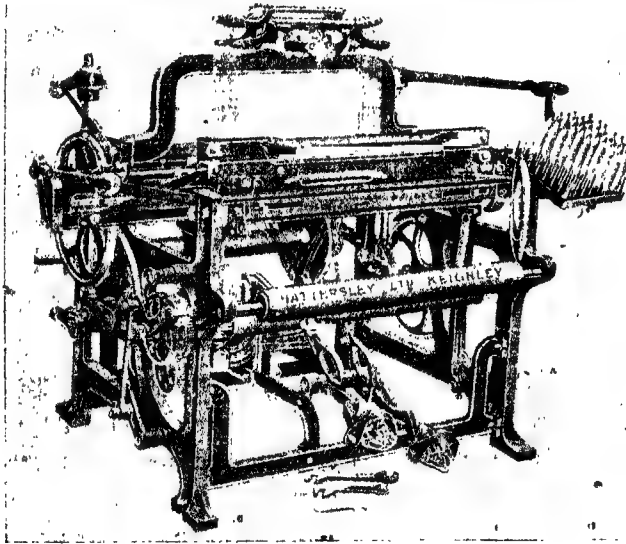
উন্নত প্রণালীর তাঁত

শিবপদ-চিহ্ন বলিতেন) মূর ও আরবীয়গণ তাহাকে আদমের পর্ব্বত ও আদমের পদ-চিহ্ন বলিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে এই নামের উপর ভিত্তি করিয়া জনপ্রবাদ গঠিত হইল যে, আদম উক্ত পর্ব্বতে ১০০০ বৎসর উপাসনা করেন এবং উক্ত সেতু দ্বারা সমুদ্র পার হয়েন। এইজন্য এই বিদেশীয়গণের সময় হইতে রামেশ্বর সেতুর নাম হইয়াছে Adam's Bridge; এবং বুদ্ধপর্ব্বতের নাম হইয়াছে Adam's Peak.

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮২ দফা। ৩ নং প্রশ্নের উত্তর:—কল্পতরৌ স্কন্দপুরাণে "লক্ষ্মী পূজায় ঘণ্টাবাদ্য নিষিদ্ধ" বলিয়া লিখিত হইয়াছে উক্ত পুরাণের "লক্ষ্মী-পূজা প্রমাণং" এই অধ্যায়ে একস্থানে লিখিত হইয়াছে

"ন ঘণ্টাং বাদয়েত্তত্র নৈব ঝিণ্টিং প্রদীপয়েৎ" এই পুরাণের নিষেধ বলিয়া আমরা লক্ষ্মীপূজায় ঘণ্টা-বাদ্য করি না।" শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র চট্টরাজ।

গহনা পরিষ্কার

কেমিকেল সোণার গহনা পরিষ্কার করিবার তিনটি সহজ উপায় আছে। (১) গহনাগুলি ১ঘণ্টাকাল তেঁতুল জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তার পর উহা নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা ঘসিলেই পরিষ্কার হইয়া যায়। (২) গহনাগুলি হলুদ মাখাইয়া ঘণ্টা খানেক রাখিতে হয়, তার পর উহা নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা ঘসিলেই পরিষ্কার হইয়া যায়। (৩) গহনাগুলি রিঠা দ্বারা ১ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তার পর উহা নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা ঘসিলেই পরিষ্কার হইয়া যায়। শ্রীসচ্চিদানন্দ সাহা পাটনা।

উন্নত প্রণালীর তাঁত।

ইংলণ্ডে "হেটার্সলী লুম" নামে এক প্রকার তাঁত পায়ে চলে; হাতে বিশেষ কিছুই করিতে হয় না। পায়ে চালাইয়া একটী লোক এই তাঁতে দৈনিক দশ ঘণ্টার পরিশ্রমে কমবেশী ৪ জোড়া বা ৪০ গজ কাপড় প্রস্তুত করিতে পারে। ইচ্ছা করিলে এই তাঁত ইঞ্জিনেও চালান যায় এবং অর্দ্ধ ঘোড়ার ইঞ্জিনে চালাইলে দশ ঘণ্টায় অন্যূন ৬০ গজ কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার আর এক বিশেষত্ব এই যে, ইহা দ্বারা সুতা রেশম, পশম প্রভৃতি সকল প্রকার সুতা দ্বারাই কাপড় প্রস্তুত করা যায়। এই কলের সমস্ত অংশই লোহার। এ কারণ ইহা বিশেষরূপ মজবুত এবং একটী কল ৮।১০ বৎসর কাজ করিলেও কিছুই হয় না। এই তাঁত বহুদিন হইতে আমাদের দেশে ব্যবহৃত হইতেছে। তবে বর্ত্তমানে ইহার বহুল প্রচলন একান্ত প্রয়োজনীয়। ২০।১ লালবাজার ষ্ট্রীটস্থিত ওরিয়েণ্টাল মেসিনারি সাপ্লাইং এজেন্সী লিমিটেড এই কল আমদানী করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহাদের নিকট পত্র লিখিলেই জানিতে পারা যাইবে। এই কলের ছবি দেওয়া হইল।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

দেশালাইয়ের কল

এই ব্লকখানি ইঙ্গিতের অন্তর্গত "দেশালাইয়ের কল" শীর্ষক প্রস্তাবের মধ্যে বসিবার কথা। কিন্তু ভ্রম ক্রমে সেখানে ছাপা হয় নাই। 'ঘটক আয়রণ ওয়ার্কস' এই কল প্রস্তুত করিতেছেন। ব্লকখানিও
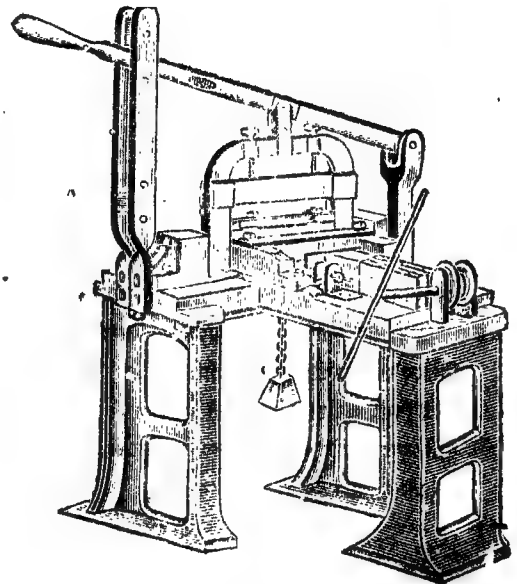
দেশালাইয়ের কল

তাঁহারাই সরবরাহ করিয়াছেন। পাঠকেরা অনুগ্রহ করিয়া এই ত্রুটিটুকু সংশোধন করিয়া লইবেন।

মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মেলন

সাহিত্য-শাখার সভাপতি-
যুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]রত্ন
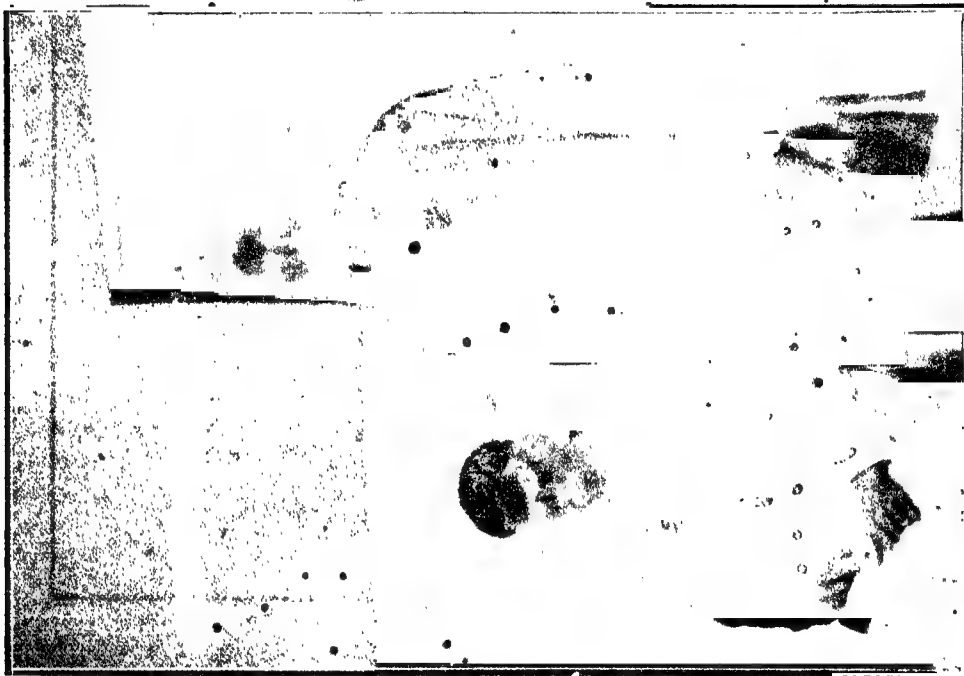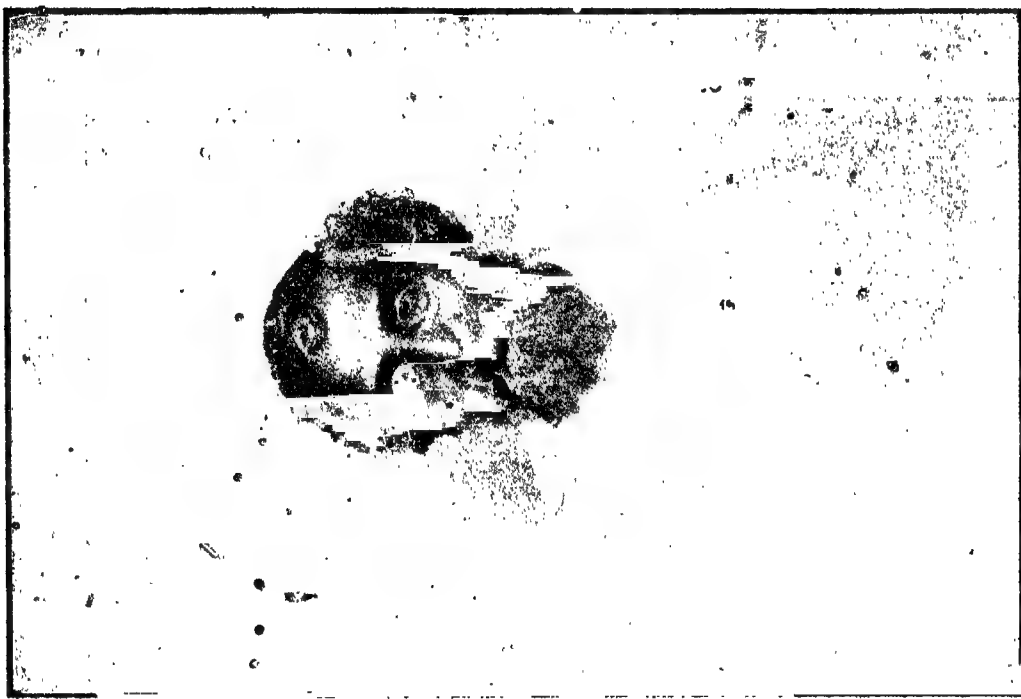
মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মেলনের প্রধান সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (বসিয়া)
এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (দণ্ডায়মান)

দর্শন-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর

ইতিহাস-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

মেদিনীপুর শাখা-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি—
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

বঙ্গীয় শাখার সভাপতি— শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর
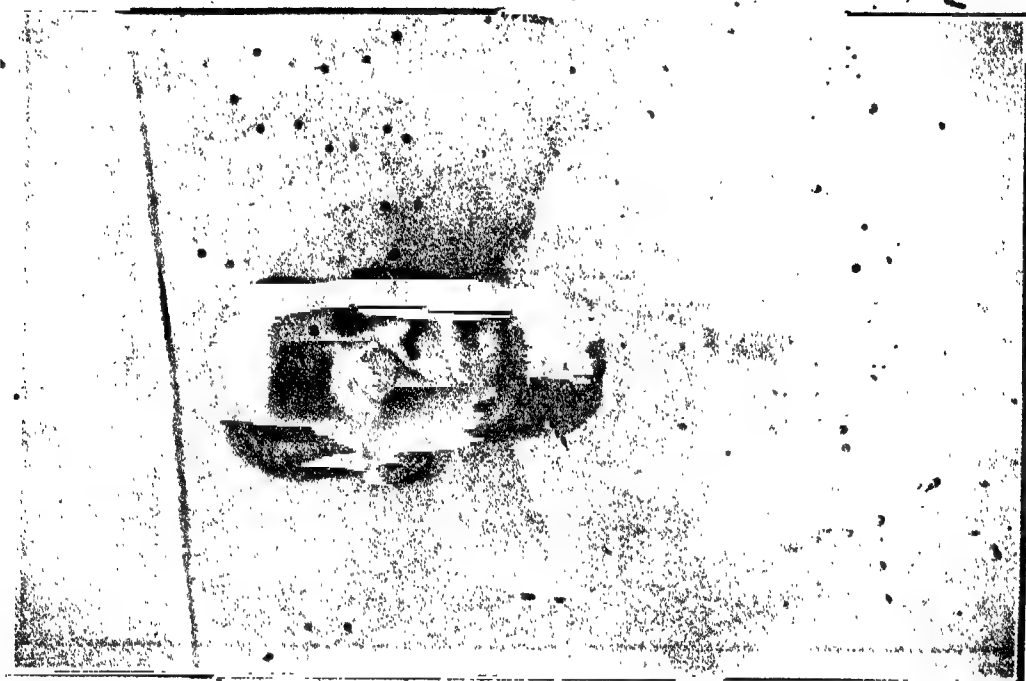
সম্মেলনে মঙ্গলাচরণ-গায়িকা বালিকাগণ

বিগত গুড ফ্রাইডের ছুটীতে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে; ইহার পূর্ব্বের দুই বৎসর কোথাও অধিবেশন হয় নাই। তিন-দিনব্যাপী অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি; প্রধান সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী; সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দর্শন-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর। এই তিন দিনের মধ্যে একদিন ঘণ্টা দুই সময় করিয়া লইয়া মেদিনীপুর শাখা-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক উৎসবও হয়; সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। সাহিত্য-সম্মেলনের প্রথম দুই দিন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, মূল সভাপতি ও শাখা-সভাপতিগণের, কাহারও বা সুদীর্ঘ কাহারও বা অনতিদীর্ঘ, অভিভাষণেই কাটিয়া যায়। তৃতীয় দিনে অমনি কোন রকমে, নিয়ম-রক্ষার হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন শাখার অধিবেশন হয়। একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিবেশন; সুতরাং প্রতিনিধি ও দর্শকগণকে শাখা হইতে শাখান্তরে গমনাগমনেই সময় কাটিয়া যায়;—পূর্ব্বাপর এমনই হইয়া আসিতেছে, মেদিনীপুরে নূতন নহে। তাহার পর প্রবন্ধ-পাঠ। শাখা-সভাপতি মহাশয়গণ, সময়ের অল্পতা জন্য, কতকগুলি প্রবন্ধকে কবন্ধ করিয়া পাঠের ব্যবস্থা করেন, আর কতকগুলিকে 'পঠিত বলিয়া গৃহীত' রায় দিয়া সমাধিস্থ করেন। তাড়াতাড়িতে অল্প সময়ের মধ্যে যাহা সাধ্য, তাহাই করা হইল। তাহার পর মামুলী প্রস্তাব গ্রহণ, ধন্যবাদের আদান-প্রদান! সম্মেলনের কার্য্য শেষ!

এই সম্মেলনের বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, ছায়া-চিত্র-সহযোগে তিনটী বক্তৃতা; যথা:—মঞ্জুশ্রী—বক্তা শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়; জীব-জগৎ—বক্তা শ্রীযুক্ত একেন্দ্র নাথ ঘোষ; এবং আমাদের দেশ—বক্তা শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসু। আর উল্লেখযোগ্য বালিকাগণের সমবেত মঙ্গলাচরণ-গীতি, সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর প্রাণস্পর্শী আবাহন-কবিতা এবং স্থানীয় যুবকগণ কর্ত্তৃক সুন্দর নাটকাভিনয়। সর্ব্বশেষে সশ্রদ্ধ, সাভিবাদন উল্লেখযোগ্য মেদিনীপুর-সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্যোগী মহোদয়গণ ও স্বেচ্ছা-সেবকগণের ঐকান্তিক অভ্যর্থনা, আদর-আপ্যায়ন ও অতুলনীয় সেবাপরায়ণতা!

শ্মশান-বৈরাগ্য

[কপিঞ্জল]

সন্ন্যাসী এক এসেছিলেন
আমাদের এই গ্রামে ;
অনেক লোকই জুটতো এসে,
শ্মশানে, তাঁর নামে।
পাণ্ডিত্য তাঁর গভীরতম
ভক্তি ততোঽধিক,
মূর্ত্তি তাঁহার সৌম্য এবং
উক্তি স্বাভাবিক।
আমি তখন নূতন নূতন
পাস করেছি এম-এ,—
বীণাপাণির বন্যা বহে
প্রায় উঠেছি ঘেমে।
সাহেব এবং বড়লোকের
দারোয়ানের পাশে
যাওয়া-আসা করছি প্রায়ই
দরশনের আশে।
মোসাহেবী মন্দ করা
আরও এই বুঝি—
পকেটেতে হয়েছে হায়
চিঠি ক'খান পুঁজি।
খেয়াল হ'ল, সন্ন্যাসীটা
যাক্ না দেখে আসা ;
ওদের ত নাই ভবনা কোনো,
দিন চলেছে খাসা।
উপবেশন প্রণাম করে
সম্মুখে তাঁর গিয়ে,
চোখা চোখা তর্ক হ'ল
নানান বিষয় নিয়ে।
তর্কে আমি নেহাৎ কাঁচা—
সাধ্য কি হায় জিনি ;
'উত্তর'ও যে নইক আমি,
'সব্যসাচী' তিনি।
অবশেষে বল্লাম হেসে
আর কিছু না পেয়ে,
সাধুর জীবন মজার কিসের
গৃহীর জীবন চেয়ে।
ঈষৎ হেসে বলেন সাধু—
এইটে মজা ভারী,
সাধুদিগে হয় না কা'রো
করতে উমেদারী।

রাজার রাজার কৃপার লাগি
সত্য অভিলাষী,—
হীনতাহীন দীনতা তার
রং'ক সে উপবাসী।
বাক্য সাধুর বিঁধলো আমার
বুকের মাঝে গিয়ে,—
ভোগবতীরে আন্‌লে টেনে
শরের আঘাত দিয়ে।
দারুণ ঘৃণা জাগলো মনে
উমেদারীর পরে,—
মানুষ হয়ে এ দিক্‌দারী
কেমন করে করে।
পড়লো মনে প্রতীক্ষা সেই
বড়লোকের ঘরে ;
তাহার কাছে যুধিষ্ঠিরের
নরক দেখা হারে।
আশা ভয়ের মধ্যে থাকা
ত্রিশঙ্কুরই মত,—
কেমন করে বলবো আমি
বেদনা তার কত।
প্রথমেতেই হীনতার এই
পাঠশালাতে ড্রিল ;
কারাবাসের আখড়া দেওয়া
নিছক নিরিবিল।
অধীনতার ক্রশ-কাঠেতে
মনকে বিঁধে মারা,
বিবেককে হায় 'যক' দেবারই
এ এক নূতন ধারা।
সন্ন্যাসীরে প্রণাম করে
ফিরে এলাম বাড়ী
মনের মাঝে চাক্‌রে হতে
জাগলো ঘৃণা ভারী
দু'মাস পরে বেতনবিহীন
নকলনবীশ কাজে,
লেগে গেলাম হাস্য মুখে
লজ্জা দিয়ে লাজে।
বিরাগ এবং অনুরাগের
মধ্যে এখন ঢুলি,
সম্মুখেতে ক্যাস-বাক্স,
পশ্চাতেতে ঝুলি।

ছাত্রগণের স্বাস্থ্য

[শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু ডি-এস-সি, এম-বি]

(নিবেদন)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ছাত্রগণের মঙ্গল সাধন উদ্দেশ্যে তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যে একটী বিভাগ খোলা হইয়াছে, তাহার একটী রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, বাঙ্গলা দেশে প্রতি তিন জন ছাত্রের মধ্যে দুই জনের স্বাস্থ্য ভাল নহে—তাহাদের কোন না কোনরূপ চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক। ইহা হইতে বাঙ্গলাদেশের অধিবাসীরা বুঝিতে পারিবেন, বাঙ্গলার যুবক-সমাজে কি ঘোর বিপদ সমুপস্থিত! আমাদের তহবিলে যথেষ্ট অর্থ মজুত নাই, অথচ, ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে দন্তের ও চক্ষুর চিকিৎসা করা আবশ্যক। সেইজন্য আমি ছাত্র-হিতসাধিনী-সমিতির পক্ষ হইতে এই আবেদন লইয়া সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা যেরূপ পারেন, আমাদিগকে সাহায্য করুন।

মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানী অনুগ্রহ পূর্ব্বক কেনা দামে চশমা সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, এবং আমাদের তহবিল প্রতিষ্ঠাকল্পে ৫১১৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা আশা করি বাঙ্গলাদেশের ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতির এই যে সদনুষ্ঠান হইতেছে, অপর সকলেও ইহাকে অর্থদ্বারা এবং অন্য উপায়ে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

অতি সামান্য দানও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে এবং যথাসময়ে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে। চেক্ দিবার সময়ে তাহা "ক্রস্" করিয়া নামে "ষ্টুডেণ্ট ওয়েলফেয়ার কমিটি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়" এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

আপনাদের সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সাহায্য একান্ত প্রার্থনীয়।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত "কান্তকবি রজনীকান্ত" বহু চিত্র শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৪৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন গ্রন্থ "পত্রচিত্র" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ৮০।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত "পথহারা" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল মূল্য ২॥০।

লক্ষ্মী-বৌ প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু প্রণীত আট আনা সংস্করণের ৭৫ সংখ্যক গ্রন্থ "স্বয়ম্বর" প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীমতী সরসীবালা বসু প্রণীত নূতন উপন্যাস "প্রায়শ্চিত্ত" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ৮০।

রাজা শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া প্রণীত "সঙ্গীত সোপান" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ২৲।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত "স্রোতের ফুল" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত "ফরিদপুরের ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ২॥০।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন গল্প পুস্তক "পঙ্কজ" বাহির হইয়াছে মূল্য ১॥০।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ক্রিয়াযোগ রহস্য" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল চৌধুরী প্রণীত "সতীর মন্দির" মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত চৈতন্যচরণ বড়াল প্রণীত "হীরার হার" মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু প্রণীত "গুরুদক্ষিণা" ২৲, "বস্ত্র হরণ" ১॥০।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় প্রণীত "মৃতের প্রতিশোধ" মূল্য ১॥০।

শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র নাগের "রূপ-রেখা" গল্প-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য এক টাকা।

হাওড়া শালকিয়া গোবর্দ্ধন-সঙ্গীত সমাজের দশম বার্ষিক উৎসব যথোচিত সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নাটোরের মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন; গান বাজনা ও নাটকাভিনয় হইয়াছিল; জলযোগেরও ব্যবস্থা ছিল।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.